... িক কাঠামোর দুর্ব্বলতা

ইহা বর্ত্তমানে অবিসম্বাদিত যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রগতি বর্ত্তমানে ... র দিক হইতে ব্যাহত হইতেছে। অর্থ নৈতিক প্রগতির দুর্ব্বল দিক বহু আছে, তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে ... যথা, (১) অতিরিক্ত ... হারে ঘাটতি ব্যয়ের ... মুদ্রাস্ফীতি ... মান, (২) পাইকারী দ্রব্যের মূল্য ... জীবনযাত্রার ... বৃদ্ধি, (৩) জীবনযাত্রামানের প্রগতিতে অচলতা ... বিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রামান দ্রুত চলিয়াছে ... এবং ... । জাতীয় ও ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হ্রাস, (৫) কৃষি উৎপাদনে হ্রাস, (৬) শিল্প-উৎপাদনে এবং উৎপাদনের হারে অবনতি, (৭) বৈদেশিক সঞ্চয় বিপদগ্রস্ত, (৮) অতিরিক্ত করহারের চাপ এবং অদূরভবিষ্যৎ আশাপূর্ণ কিছু নহে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার বর্ত্তমান পরিস্থিতি আশাপূর্ণ নহে এবং সরকারী স্তোকবাক্য নিরর্থক হইয়া যাইতেছে। কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের বিগত অধিবেশনে কয়েকজন সভ্য অভিযোগ করেন যে, যে উদ্দেশ্যে কর আদায় করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে ব্যয় না করিয়া অন্য বিষয়ে ব্যয় করা হয়। কর আয়ের অধিকাংশ পরিমাণ পরিকল্পিত বিষয়ের বাহিরে এবং উন্নয়ন খাতের বাহিরে অযথা ব্যয়িত হইতেছে। ইহা এক প্রকার ছলনার নামান্তর যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য কর ধার্য্য করা হয়, এবং পরে বলা হয় যে, এই আয়ের অধিকাংশই অন্য খাতে ব্যয়িত হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম হিসাব অনুসারে ধরা হইয়াছে যে, ১৯৫৫-৫৬ সনে বিগত পাঁচ বৎসরের কেন্দ্রীয় রাজস্ব ... আয় হইতে ৩৫০ কোটি উদ্বৃত্ত হইবে, তাহার স্থলে এখন দেখান হইতেছে যে ১৯৫৫-৫৬ সনে কেন্দ্রীয় রাজস্বখাতে ... টাকা ঘাটতি ঘটিয়াছে। ইহার অর্থ হইতেছে যে, ... পরিকল্পনার প্রথম ... বৎসরে যে অর্থ অতিরিক্ত হওয়ার কথা ছিল, তাহা ঘাটতিতে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার পঞ্চবর্ষকালে কেন্দ্রের অতিরিক্ত করধার্য্য হইতে ৬৪০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইয়াছে। কিন্তু ১৯০ কোটি টাকার ঘাটতির হিসাবে দেখা যায় যে, প্রায় ৮৩০ কোটি টাকা পরিকল্পনার বাহিরে ব্যয় করা হইয়াছে। পরিকল্পনার জন্য মাত্র ১২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত করধার্য্যের আয় হইতে ব্যয় হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ঘাটতি পড়িতেছে ৩৯০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা যে অতিরিক্ত করধার্য্য দ্বারা তোলার প্রস্তাব করা হইয়াছে, ... সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহা এখন অনুমিত হইতেছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালে পরিকল্পনার জন্য মোট ৪,২০০ কোটি টাকার অধিক পাওয়া যাইবে না। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনা গঠনের পূর্ব্বে প্রয়োজন, বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক সম্পদের সংহতি, কারণ অর্থ নৈতিক বিস্তৃতির জন্য যে প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন তাহার অভাব বর্ত্তমানে হইতেছে। ভারতবর্ষ এখন প্রায় অর্থ নৈতিক দেউলিয়া হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আর যাহাই হউক, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না, যদি অবশ্য ভিক্ষার উপরই দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্ভরশীল থাকিতে হয়।

ইদানীং ভারতবর্ষে শিল্পকারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব হইতেছে, যথা, কাঁচা পাট, কার্পাস তুলা ইত্যাদি। কারিগরী শিল্পগুলিতেও কাঁচা মালের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় ইস্পাত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইতেছে। অনেক প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানী হইত, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাঁচামাল আমদানী করার সুবিধা হইতেছে না।

পূর্ব্বে প্রায় বৎসরে ৫০০ কোটি টাকার শিল্পের কাঁচামাল এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানী করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসে কেবলমাত্র ১৬০ কোটি টাকার কাঁচামাল আমদানী করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা তিনটি প্রধান দোষে দুষ্ট। প্রথমতঃ, ইহার ফলে আভ্যন্তরিক এবং বৈদেশিক ঋণের বেড়াজালে দেশ জড়িত হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে গিয়া ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা নিঃশেষিতপ্রায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু কষ্টে এই অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়ের অনুমান যথাযথ হয় নাই, হিসাব কম করিয়া ধরা হইয়াছিল। ঘাটতি ব্যয়েরও যথেষ্ট অসুবিধা আছে। আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সম্প্রতি দিল্লীতে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত হারে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে ঘাটতি অবশ্যম্ভাবী। যে পরিমাণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে ঋণদান করিবে, ঠিক সেই পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হ্রাস পাইবে। ঘাটতি ব্যয়ের অর্থই হইতেছে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের হ্রাস। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ঘাটতি ব্যয়ের ফলে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবহারিক দ্রব্যের উৎপাদন ও আমদানী যথেষ্ট পরিমাণে না হইলে মূল্যমান তথা জীবনমান বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে ব্যবহারিক দ্রব্যের উৎপাদন আশানুরূপ হইতেছে না এবং আমদানীও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুন্নত দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে প্রধান অন্তরায় হইতেছে যে, দেশের সমস্ত জনসাধারণ উপায় করে না, বিরাট-সংখ্যক বেকার থাকে। সমাজের যে অংশ রোজগার করে তাহাদের সঞ্চয় বেকার ব্যক্তিরা ভোগ করে। ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে পরিকল্পিত অর্থনীতির ফলে দ্রুতহারে চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে, যাহা সাধারণতঃ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে হয় না। ভারতবর্ষে ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যস্তর শুধু চাহিদার বৃদ্ধির জন্যই হইতেছে না,

খাদ্যশস্যের সরবরাহ যথোচিত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে না। অনুন্নত দেশে খাদ্যই জনসাধারণের প্রধান ব্যবহারিক দ্রব্য এবং ইহার অভাব হইলে মূল্যস্তর দ্রুত বর্দ্ধনশীল হয়। ইহার ফলে শুধু যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যই বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, যে হারে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পায়, তাহার চেয়ে দ্রুতহারে মূল্যমান বৃদ্ধি পায়, সুতরাং আয় ও মূল্যস্তরের মধ্যে একটি বিরাট অসাম্য দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের অভাব মুদ্রাস্ফীতির পথকে দ্রুততর করিয়া দেয়। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাস্তব আয় হ্রাস পায় এবং তাহার জন্য আয়বৃদ্ধির দাবি করা হয় এবং মাহিনা বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যমানও বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে পারে না। ভারতের রপ্তানী গত দশ বৎসর ধরিয়া প্রায় স্থিরীকৃত আছে, কিন্তু আমদানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই কারণেই আমাদের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত মুদ্রাস্ফীতিকে সংযত করে, কিন্তু অনুন্নত দেশে বাণিজ্যিক ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যাপকতর করিয়া তুলে। অনুন্নত দেশগুলির নিজস্ব সম্পদ দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হইলে মুদ্রাস্ফীতি তত গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু ভারতের নিজস্ব সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, সেই হেতু বিদেশ হইতে টাকা ধার লইতে সে বাধ্য হইতেছে এবং তাহাতে বাণিজ্যিক ঘাটতি আরও সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার হন্তাস্বরূপ, এবং মুদ্রাস্ফীতিকে পরিহার করিতে হইলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বাবলম্বী অবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

সুতরাং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি অতি অবশ্য প্রয়োজন। উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবেও ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রগতি ব্যাহত হইতেছে। সংস্থাগত দৌর্ব্বল্যও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আছে।

পাকিস্থানী রাজনীতি

পাকিস্থানী রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাহার দ্রুত পট-পরিবর্ত্তনে শুধু বিস্ময় সৃষ্টি করে নাই, গণতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে সমস্যাও সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পৃথিবীর কয়েকটি বৃহত্তর রাষ্ট্রে সংঘটিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে সকল সমস্যার দ্রুত সৃষ্টি হইতেছে তাহা গণতান্ত্রিক কাঠামো ও ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করা সম্ভবপর হইতেছে না। শুধু তাহাই নহে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জাতীয় কতকগুলি মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থার দ্বারা ইহার স্থায়িত্ব দৃঢ়তর হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিরাট বিপ্লব ও আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার স্থায়িত্ব ও সাম্য এখনও সকল দেশে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় নাই।

মধ্যপ্রাচ্য ও প্রাচ্যের দেশগুলিতে বৈপ্লবিক পট-পরিবর্ত্তন রাজনৈতিক ভূমিকম্পের পরবর্তী অবস্থার সূচনা করে। তবে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর প্রধানতঃ জাতীয় বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ দলীয় ক্ষমতাকে সংহত করার প্রচেষ্টা মাত্র। ইরাকের বিদ্রোহকে জাতীয় বিপ্লব বলিলে ভুল হইবে। রাজাকে হত্যা করিয়া [illegible] নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা অপহরণ করিয়াছে মাত্র, আদর্শের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইরাক বাগদাদ-চুক্তিকে অস্বীকার করে নাই। ব্রহ্মের সমস্যা অবশ্য কিছুটা স্বতন্ত্র এবং তাহার সামরিক [illegible] আভ্যন্তরিক অরাজকতার প্রতিরোধক-ব্যবস্থা, এবং যেহেতু সে পৃথিবীর কোনও শক্তিবর্গের দলে যোগ দেয় নাই সেইহেতু তাহার চেষ্টা অকৃত্রিম বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

কিন্তু পাকিস্থান বাগদাদ-চুক্তির সভ্য, অর্থাৎ, ইঙ্গ-আমেরিকার কূটনৈতিক নীতির একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ, সুতরাং পাকিস্থানের রাজনৈতিক পট-পরিবর্ত্তন যে আমেরিকার অনুমতি ব্যতিরেকে হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমেরিকার অর্থবলে পাকিস্থান নির্ভরশীল, আমেরিকার অস্ত্রে সে অস্ত্রসজ্জায় সুসজ্জিত, আমেরিকার কূটনীতি দ্বারা পাকিস্থান পরিচালিত, সুতরাং এত বড় একটা বিরাট পরিবর্ত্তন যে প্রেসিডেন্ট মির্জ্জা কিংবা প্রধান সেনাপতি নিজেদের দায়িত্বে করিয়াছেন তাহা মনে করিলে ভুল হওয়া সম্ভব।

পাকিস্থানের আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থায় বহুদিন ধরিয়াই ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। ঘরোয়া রাজনীতিতে পর্য্যুদস্ত পাকিস্থানকে বাঁচাইয়া রাখা আমেরিকার পক্ষে ক্রমশঃই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছিল, অথচ পাকিস্থানকে বাদ দিলে আমেরিকার সামরিক কূটনীতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে বাধ্য। ইদানীং পাকিস্থানের নেতারা এবং জনসাধারণ আমেরিকার কতিপয় [illegible] নীতি বন্ধকের ব্যাপারে আপত্তি জানাইতে সুরু করিয়াছিল। [illegible] অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতিও এই পট-পরিবর্ত্তনের একটি প্রধান কারণ। পাকিস্থানী ঘটনাবৈচিত্র্যের প্রধান শিক্ষা হইতেছে যে, গণতন্ত্র সকল দেশে এবং সকল সময়ে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা নহে। দ্বিতীয়তঃ, শারীরিক তথা সামরিক শক্তি এখনও বহু রাষ্ট্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। তথাকথিত জনমত এবং জনসম্মতি কেবলমাত্র রাজনৈতিক দর্শনেই প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে সামরিক শক্তিই প্রধান।

সুদূর উদ্দেশ্য যাহাই হউক, কিন্তু সদ্য কতকগুলি সুফল আসিয়াছে এবং তাহা হইতেছে চোরাকারবারী ব্যবস্থার ধ্বংস। সকল সময়ে সকল জিনিস আইনসঙ্গত ভাবে করা সম্ভবপর হয় না, সুতরাং পাকিস্থান বে-আইনি ভাবে আইনসঙ্গত উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট। তবে পাকিস্থানী জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনায় এবং অধিকার সম্বন্ধে সজাগ, সুতরাং সামরিক শাসন যে বেশীদিন ধরিয়া চলিতে পারে তাহা মনে হয় না। আর ভবিষ্যতে যা

গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থা [illegible] বিবর্তন করা হইবে, তখন রাষ্ট্রপতি মির্জ্জা এবং সেনাপতি আয়ুব খান অক্ষত থাকিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। গণতান্ত্রিক-ব্যবস্থার নিধনের জন্য তাঁহাদের বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে।

পাকিস্থানে প্রতিবিপ্লব

পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জ্জা ৭ই অক্টোবর [illegible] সমগ্র রাষ্ট্রে সামরিক আইন জারী করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ বাতিল এবং সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাঙিয়া দিয়াছেন। [illegible] সংবিধানও রদ করিয়াছেন এবং সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়াছেন। পাকিস্থানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানের বিধানসভা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ মৌলিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট মীর্জ্জা যাহা বলিয়াছেন অন্যত্র আমরা তাহা তুলিয়া দিলাম।

ব্রহ্মদেশে সামরিক শাসনের অব্যবহিত পরেই পাকিস্থানেও সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন একটি বিশেষ উদ্বেগজনক ঘটনা। সামরিক শাসন জিনিসটাই অস্বাভাবিক, কারণ সমর বিভাগের কাজ শাসন চালান নহে, শাসন চালানর উপযোগী শিক্ষাও সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীদের দেওয়া হয় না। সুতরাং যখনই কোন রাষ্ট্রে সামরিক শাসনের প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহাকে দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার [illegible] লক্ষণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্থানের ঘটনাবলীর তাৎপর্য্য ঠিক এক নহে। অনেক দিক হইতেই দুই দেশের ঘটনাবলীতে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী (প্রেসিডেণ্ট নহেন) শাসনভার জেনারেল নে-উইনের হাতে দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং এই ক্ষমতা অর্পণ হইবে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ২৮শে অক্টোবর পার্লামেণ্টের অধিবেশন কালে। ব্রহ্মে পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়া হয় নাই যদিও অবশ্য পার্লামেণ্টারী কর্ত্তৃত্বের যথেষ্ট সঙ্কোচন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কতদিন পর্য্যন্ত এই সামরিক শাসন চলিবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, বলা হইয়াছে যে, জেনারেল নে-উইন আগামী এপ্রিল মাসে যাহাতে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু পাকিস্থানে [illegible] তাহার বিপরীত। ব্রহ্মে মন্ত্রীসভা প্রেসিডেণ্টকে সামরিক শাসনের পরামর্শ দিয়াছেন, পাকিস্থানে মন্ত্রীসভার অজ্ঞাতে প্রেসিডেণ্ট সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন (বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন)। পাকিস্থানে পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আগামী নির্ব্বাচন সম্পর্কে কোন কিছুই বলা হয় নাই। সর্ব্বোপরি পাকিস্থানে সংবিধানকেও রদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দুই রাষ্ট্রের ঘটনাবলীর মধ্যকার এই পার্থক্যের তাৎপর্য্য সম্পর্কে অবহিত না হইলে দুই দেশের ঘটনাবলী সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হইবে না। ব্রহ্মে হয়ত সামরিক শাসন অনিবার্য্য হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তথাপি এখনও সেখানকার প্রধান সেনাপতিকে প্রকাশ্যে বলিতে শোনা যায় নাই যে, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বা প্রেসিডেণ্টকে এক ঘণ্টার মধ্যে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চরমপত্র দিয়াছিলেন। একজন ব্রিটিশ সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাৎকারে পাকিস্থানের প্রধান সামরিক আইন শাসনকর্ত্তা প্রেসিডেণ্ট মীর্জ্জার উপস্থিতিতেই জানান যে, যদি প্রেসিডেণ্ট তাহার পরামর্শ (আদেশ?) অমান্য করিতেন তাহা হইলেও যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঘটিত।

পাকিস্থানে যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তবে পাকিস্থানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাহাদের নেতৃবর্গ যে অদূরদর্শিতা এবং নীতিজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এ রকম ঘটনা অপ্রত্যাশিত বা আপাত-বিচারে অমঙ্গলজনক ছিল না। বিভিন্ন রাজনৈতিকদলগুলির শাসনের আমলেও জনসাধারণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার বিশেষ ভাবেই সঙ্কুচিত ছিল—ছিল না শাসন বিভাগের যোগ্যতা। সামরিক শাসনে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারের স্পষ্টতঃই কোন আশা নাই, কিন্তু প্রশাসনিক যোগ্যতাবৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে—কেবলমাত্র ইহার দ্বারাই জনসাধারণের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতে পারে। সংবাদে প্রকাশ যে, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্থানে পণ্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে এবং চোরাকারবারী মহলে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। সামরিক বিভাগ সকল কাজেই নির্ব্বাক আচরণের পক্ষপাতী, কাজেই ইচ্ছা করিলে যে সামরিক শাসনকর্ত্তারা অল্পদিনের জন্য জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিতে না পারেন এমন নহে, কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কৃষি সংস্কার, শিল্পায়ন প্রভৃতি মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান ব্যতিরেকে কখনও কেবলমাত্র প্রশাসনিক বিধান দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রামানের উন্নতি ঘটান সম্ভব নহে। এবং এই সকল মৌলিক ব্যবস্থাগুলি অবলম্বনের জন্য চাই প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, সাহস এবং দূরদর্শিতা। পাকিস্থানের সামরিক বাহিনীর কর্ত্তাদের এ রাজনৈতিক জ্ঞান এবং দূরদর্শিতা কতখানি রহিয়াছে তাহা বিতর্কমূলক। অন্ততঃ মৌলানা ভাসানী, খান আবদুল গফুর খাঁন এবং জি. এম সৈয়দ প্রভৃতির ন্যায় নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মহান নেতাদের গ্রেপ্তারের মাধ্যমে এইরূপ দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। নূতন সরকার যদি জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতেন তবে কখনও এরূপ জনপ্রিয় এবং চরিত্রবান নেতাদের আটক রাখিতেন না।

সুতরাং পাকিস্থানের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য হইতেছে মূলতঃ প্রতিবিপ্লবাত্মক। সামরিক শাসনকর্ত্তারা পাকিস্থানের জনসাধারণের উপর যাহাতে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব চালাইতে পারেন সেইজন্যই নূতন ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। প্রধান সামরিক শাসনকর্ত্তা জেনারেল আয়ুব খাঁ প্রথম আদেশেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, সামরিক আইন জারী ব্যাপারে বা সামরিক শাসন সম্পর্কে

কোন সমালোচনা প্রকাশ করা চলিবে না। প্রেসিডেণ্ট সংবিধান রদের যে আদেশ দিয়াছেন তাহাও এই পর্য্যায়েই পড়ে, যে সংবিধানের ফলে শ্রী মীর্জ্জা প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন সেই সংবিধান রদ করার ক্ষমতা তাহার আছে কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে, উপরন্তু সংবিধান রদ করিবার কোন আশু প্রয়োজনও ছিল না: সংবিধান-সম্মত ভাবেই বর্ত্তমান ব্যবস্থাগুলি করা যাইত, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। নিশ্চয়ই ইহার পিছনে কোন কারণ আছে।

পাকিস্থানের ঘটনাবলীর প্রভাব ভারতের উপর না পড়িয়া পারে না। পাকিস্থানের ঘটনাবলীর পিছনে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ রহিয়াছে কি না তাহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়। মোট কথা, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশেষ শুভসূচক নহে।

পাকিস্থানে সামরিক শাসনের উদ্দেশ্য

পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া প্রেসিডেণ্ট মীর্জ্জা বলেন:

"আমি গত দুই বৎসর যাবৎ গভীর উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, পাকিস্থানে ক্ষমতালাভের জন্য লড়াই, দুর্নীতি, সরল ও সাধারণ মানুষের শোষণ অবাধে চলিতেছে। এই সমস্ত জঘন্য ব্যাপার মাঝে মাঝে সর্ব্বপ্রকার শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলামকে লইয়া অনেকে যথেচ্ছাচার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। অবশ্য দেশে সাধু প্রকৃতির লোক যে নাই তাহা নহে, কিন্তু সংখ্যা লঘু বলিয়া তাঁহারা দেশের শাসন ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেছেন না। এই সমস্ত কার্য্যের ফলে নিম্নস্তরের 'ডিক্টেটার-শিপের' সৃষ্টি হইয়াছে। জনগণের দৃষ্টি বিপন্ন করিয়া জুয়াড়ী ও শোষকরা যে-কোন জঘন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছে।

"আমার চেষ্টা সত্ত্বেও খাদ্য সঙ্কট দূর করার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। যে দেশে খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত হওয়া উচিত, সেখানে খাদ্য সম্পর্কে একটা জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিয়াছে। কৃষি ও ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া রাজনৈতিক খেলা চলিতেছে। কাজেই এখন দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থায় কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নহে।

"পূর্ব্ব-পাকিস্থানে খাদ্য, ঔষধ এবং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে চোরাকারবার চলিতেছে। অথচ এই সমস্ত দ্রব্যের অভাব এবং মূল্য বৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর ফলে গত কয়েক বৎসরে আমাদের বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার অপচয় ঘটিয়াছে এবং ইহার ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী করা একান্ত প্রয়োজন সেগুলি আমদানী হ্রাস করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের মধ্যে কোন কোন রাজনীতিবিদ রক্ত-বিপ্লবের কথা বলিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা বিদেশে যাইয়া বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত জোট পাকানই সঙ্গত মনে করেন। এইগুলি বিশ্বাসঘাতকতার কাজ ছাড়া আর কিছুই নহে।

"সম্প্রতি পূর্ব্ব-পাকিস্থানে বিধানসভায় শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে বাংলাদেশে নাকি এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। অবশ্য ইহা ঘটিয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, ইহা যে সভ্য সমাজের ব্যাপার নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্পীকারকে প্রহার করিয়া, ডেপুটি স্পীকারকে হত্যা করিয়া এবং জাতীয় পতাকার অবমাননা করিয়া আপনারা নিশ্চয়ই দেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেছেন না।

"সম্প্রতি করাচী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন হইয়া গেল। শতকরা ২৯ জন ভোটদাতা এই নির্ব্বাচনে ভোট দিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা গেল, শতকরা ৫০টি ভোটই ভুয়া ভোট।"

"প্রেসিডেণ্ট মীর্জ্জা বলেন, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা এবং একটি অস্ত্র রাখিয়া যাইবার পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা আইন অমান্য আন্দোলনের হুমকী ও চীৎকার শুনিয়া থাকি। এই ধ্বংসাত্মক অভিপ্রায় তাহাদের দেশপ্রেমের এবং রাজনীতিবিদ-ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ তাহাদের সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতদূর অগ্রসর হইতে পারেন তাহার এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।"

"আমাদের পররাষ্ট্রনীতির জন্য যাহারা দায়ী, এমনকি তাহাদের তরফ হইতেও দেশহিতৈষণার উদ্দেশ্যে নহে, পরন্তু আত্মস্বার্থের অভিপ্রায় পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে নির্ব্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সমালোচনা করা হইয়াছে। সকল রাষ্ট্রের সহিতই আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে রক্ষা করিতে চাই, কিন্তু রাজনীতিবিদ পুরুষরা আমাদের দেশ ও সোভিয়েট রাশিয়া, সংযুক্ত আরব রিপাবলিক ও সাধারণতন্ত্রী চীনের মধ্যে একটা তিক্ত সম্পর্ক ও ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য, ভারতের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ ঘোষণার জন্য চীৎকার করিতেছে, কারণ তাহারা ভালভাবেই জানে যে, যুদ্ধের সীমারেখার ত্রিসীমানার মধ্যে তাহারা কখনও টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

"পাকিস্থানের রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনা করিতেছে, বিশ্বের অন্য কোন দেশের কোন রাজনৈতিক দল এরূপ করে না। যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য আমি সুস্পষ্টভাবে একথা পুনরায় উল্লেখ করিতেছি যে, আমরা আমাদের স্বার্থ ও ভৌগোলিক দাবি অনুযায়ী নীতি অনুসরণ করিব এবং আন্তর্জ্জাতিক যে সব প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়াছি উহার সম্মান রক্ষা করিব। একথা সুবিদিত যে, পাকিস্থানের নিরাপত্তা রক্ষা এবং শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসাবে বিক্ষুব্ধ বিশ্ব হইতে যুদ্ধ পরিহারের জন্য আমরা আমাদের ভূমিকা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি।

"গত তিন বৎসর ধরিয়া গণতান্ত্রিক পথে সংবিধানকে কার্য্যকরী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। শাসন ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিয়া তুলিবে এবং দেশের কার্য্যাদি জনসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত হইবে, এই আশায় আমি কোয়ালিশনের পর কোয়ালিশনের জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই সব দেশদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী লোকেরা রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্যে আক্রমণ চালাইয়া পাকিস্থান ও সরকারের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিতেছে। তাহারা এ বিষয়ে কতকটা সফলকামও হইয়াছে এবং এইরূপ অবস্থা যদি চলিতে থাকে তাহা হইলে তাহারা তাহাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে।

"আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমি যতটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার মনে এই ধারণাই জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির প্রতি জনসাধারণের একটা বৃহদংশের কোন আস্থা নাই। তাহারা ক্রমশঃ নিরাশ ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে এবং যেভাবে তাহারা নির্য্যাতিত হইতেছে তাহাতে তাহারা ভয়ঙ্কর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের এই বিক্ষোভ ও তিক্ত মনোভাব ন্যায়সঙ্গত। তাহাদের জন্য যে সব কাজ করা উচিত ছিল তাহা নেতৃবৃন্দ করেন নাই এবং জনসাধারণ তাঁহাদের প্রতি যে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল তাহা প্রতিপন্ন করিতে নেতৃবৃন্দ ব্যর্থ হইয়াছেন।

"বহু বাধা বিপত্তির পরে ১৯৫৬ সনে ২৩শে মার্চ্চ তারিখে যে সংবিধান গৃহীত হয় তদনুযায়ী কার্য্যকরী কার্য্য পরিচালনা অসম্ভব। ইহার সংশোধনের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ বিপ্লব দ্বারা দেশকে প্রথমে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আনিতে হইবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা এবং মুসলমান জনসাধারণের পক্ষে অধিকতর প্রযোজ্য একটি সংবিধান রচনার জন্য কতিপয় দেশভক্ত ব্যক্তিকে আমি সংগ্রহ করিতে চাই। সংবিধান রচিত হইলে যথাসময়ে উহা গণভোটের জন্য জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে।

"সংবিধানকে পবিত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু সংবিধান অপেক্ষাও দেশ ও জনসাধারণের শান্তি অধিকতর পবিত্র। রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে ঈশ্বর ও জনগণের নিকট আমার প্রধান কর্ত্তব্য পাকিস্থানের অখণ্ডতা রক্ষা করা।

"সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে—(১) ১৯৫৬ সনের ২৩শে মার্চ্চ তারিখের সংবিধান বাতিল হইবে; (২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার অবিলম্বে বাতিল হইবে; (৩) জাতীয় পার্লামেণ্ট ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে; (৪) সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে; (৫) বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত পাকিস্থানে সামরিক আইন বলবৎ থাকিবে।

"এতদ্বারা আমি পাকিস্থান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন শাসনকর্ত্তা পদে নিয়োগ করিতেছি এবং পাকিস্থানের সমস্ত সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে তাঁহার অধীনে ন্যস্ত করিতেছি।

বিশ্ব কৃষিপরিস্থিতি

রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার সর্ব্বশেষ রিপোর্টে বিশ্ব-কৃষি-পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫৭-৫৮ সনে বিশ্ব কৃষি-উৎপাদন গত বৎসরের সূচক ১২৮ হইতে এক পয়েণ্ট নীচে নামিয়া আসে। মাথাপিছু কৃষি-উৎপাদন ১৯৫৬-৫৭ সনের সূচক (Index) ১০৯ হইতে দুই পয়েণ্ট নামিয়া আসে।

কিন্তু উৎপাদন হ্রাস পাইলেও কয়েকটি দেশ, বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-উৎপাদন প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। ১৯৫৪ সন হইতে সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে মার্কিন সরকার পাবলিক ল' ৪৮০ (P.L. 480) এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশকে ৬০০ কোটি ডলার মূল্যের কৃষিদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। ভারতবর্ষ এই পরিকল্পনায় প্রায় ৭০ কোটি ডলার মূল্যের কৃষিদ্রব্য পাইয়াছে। মার্কিন সরকারের বদান্যতায় অনেক ঘাটতি দেশে আমদানীর মারফত ঘাটতিপূরণ অন্ততঃ আংশিকভাবেও সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-উৎপাদন হ্রাসের যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা কার্য্যকরী হইলে কতদিন পর্য্যন্ত এই ধরনের আমদানী সম্ভব হইবে তাহা সন্দেহের বিষয়।

খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার রিপোর্টে দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যমান মোটামুটি স্থির ছিল। ভারতবর্ষে কৃষকদের আয় সাধারণভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবে ঐ বর্দ্ধিত আয়ের অধিকাংশই গিয়াছে বড় বড় ধনী কৃষকের হাতে; সাধারণ কৃষকগণ এই বর্দ্ধিত আয়ের কোন অংশই পান নাই। এই সময়ে ভারতের ন্যায় অন্যান্য দেশেও খাদ্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার রিপোর্টে বর্ত্তমান বিশ্বের অস্বাভাবিক একদিকের উপর আলোকপাত হইয়াছে। একদিকে বহুসংখ্যক কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও নানারূপ প্রতিবন্ধকের দরুন সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছে না, অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-উৎপাদন হ্রাস করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হইতেছে। তবে আলোচিত বৎসরে কম্যুনিষ্ট অকম্যুনিষ্ট সকল রাষ্ট্রেই কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে নূতন চেতনা আসিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলিতে কৃষি-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতেই এই নূতন চেতনার আভাস পাওয়া যায়। তাহা হইতেছে এই যে, কৃষিতে শোষণের একটা সীমা আছে এবং সেই সীমা অতিক্রম করিলে অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ভারতবর্ষেও কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে কিন্তু কৃষিতে লগ্নীর হার যে বৃদ্ধি করা হইয়াছে এমন কোন সূচনা দেখা যায় নাই। তবে একথাও সত্য যে, কৃষিক্ষেত্রে লগ্নীকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেই কৃষি-সংগঠনের পরিবর্ত্তন ঘটান না হইলে ভারতে কৃষি-উৎপাদন প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যসমস্যা ও কংগ্রেস এবং সরকার

পশ্চিমবঙ্গের তীব্র খাদ্যসঙ্কটে বিচলিত হইয়া প্রদেশ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গত ১৮ই সেপ্টেম্বর খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে কতকগুলি পরামর্শ দেন। কংগ্রেসের প্রস্তাবিত কার্য্যসূচীতে আশু ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য দুই দফা প্রস্তাব করিয়াছেন। আশু সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস প্রদেশ সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অধিকতর পরিমাণ খাদ্যশস্য দাবি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে পূর্ণ রেশন-ব্যবস্থা, এবং পূর্ণ রেশন-ব্যবস্থা সম্ভব না হইলে অধিকতর সংখ্যায় ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত আংশিক রেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শহরও গ্রামাঞ্চলে অনুরূপভাবে আংশিক রেশন-ব্যবস্থার পরিবর্দ্ধন ও ন্যায্যমূল্য দোকানের সংখ্যাবৃদ্ধি, খাদ্য-সরবরাহ বৃদ্ধি 'এ' এবং 'বি' উভয় শ্রেণীতেই ইহার সুবিধা লইবার অধিকার দান, টেষ্ট রিলিফ প্রভৃতির ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা, উপরিউক্ত দোকানগুলির মারফত চাউল ও গম ব্যতীত তেল, ডাল ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

খাদ্যসমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য কংগ্রেস মন্ত্রীসভার দপ্তর পুনর্বণ্টনের জন্য সুপারিশ করিয়া বলেন যে, খাদ্য, কৃষি ও মৎস্য বিভাগ একই মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা বাঞ্ছনীয়, খাদ্য ব্যক্তিগত বেসরকারী ব্যবসায়ীর হাত হইতে গ্রহণ করিয়া সমবায় ও সরকারী প্রচেষ্টার ভিতর আনয়ন করা। কংগ্রেস এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত কর্ম্মসূচী উপস্থিত করিয়াছেন।

[১৪ই অক্টোবর "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সকল প্রস্তাব গ্রহণে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। এ সম্পর্কে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নিকট দুইটি পত্রে সরকারের উক্ত অভিমত জানাইয়া দিয়াছেন।]

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রস্তাবগুলি করা হইয়াছে বিভিন্ন বেসরকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও দলের পক্ষ হইতে তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। প্রস্তাবগুলির যৌক্তিকতা, উপযোগিতা এবং আশু কার্য্যকরী করার উপায় সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ থাকিতে পারে না। সরবরাহ যদি চাহিদার সমান না হয় তবে সমাধানের একমাত্র উপায় রেশনিং একথা সকলেই জানেন। কিন্তু সরকার তাহা গ্রহণে প্রস্তুত নহেন। চোরাকারবারী দমনেও কোন উল্লেখযোগ্য সরকারী সাফল্যের প্রমাণ নাই। বিভিন্ন নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্যমান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টাগুলিও অনুরূপভাবে নিষ্ফল হইয়াছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি স্বভাবতঃই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ বুঝিতে অক্ষম যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের পরামর্শও কেন সরকার গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যপ্রশাসন ব্যবস্থা

পশ্চিমবাংলার রাজ্যাভ্যন্তরে স্থান হইতে স্থানান্তরে খাদ্যশস্য চালান এবং লেভিপ্রথার চাউলকলগুলি হইতে চাউল সংগ্রহ ব্যবস্থা কিভাবে কার্যকরী হইয়াছে সেই তথ্য সংগ্রহের জন্য রাজ্য সরকার গত ২রা মে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ২০শে সেপ্টেম্বর সেই রিপোর্ট সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টটির সারাংশ অবশ্য তৎপূর্ব্বেই কম্যুনিষ্ট দৈনিক "স্বাধীনতা" প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। এই কমিটির সদস্য ছিলেন বিধানসভার কংগ্রেসী কয়েকজন সদস্য শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ (চেয়ারম্যান), শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক, উপমন্ত্রী, শ্রীঅবনীকুমার বসু, শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রীআশুতোষ ঘোষ, শ্রীকামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীলুৎফল হক।

কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে খাদ্যশস্যের সংগ্রহে বহুদিন সরকারী অব্যবস্থা, গাফিলতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। রিপোর্টের গোড়াতেই কমিটি অভিযোগ করিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য সম্পর্কিত সরকারী বা বিজ্ঞপ্তি পরিকল্পনামত জারী করা হয় নাই। সরকারী হেফাজতে উপযুক্ত পরিসংখ্যানের অভাবের দরুনই এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া কমিটি মন্তব্য করেন, এ সম্পর্কে কমিটি বলেন যে, কৃষি বিভাগ আভাস দেন যে, ১২ লক্ষ টন ঘাটতি হইবে, পক্ষান্তরে খাদ্য বিভাগীয় পরিসংখ্যানে এই ঘাটতির পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৭ লক্ষ টন ধরা হয়।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, কর্ডনিং অর্ডার (বেষ্টনীর আদেশ) জারী হইবার দীর্ঘকাল পরও উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিয়া উহা বলবৎ করার জন্য কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। কত ক্ষেত্রে খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর বা কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও জানা যায় নাই। খাদ্য বিভাগ কোথাও পরীক্ষা ঘাঁটি (চেক পোষ্ট) স্থাপন করে নাই, অথচ ইহা ব্যতীত ভূ-পথে কর্ডন কার্য্যকরী হইতে পারে না। ১৯৫৫ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই মে পর্য্যন্ত কিছু চেকপোষ্ট স্থাপন করা হয় বটে, কিন্তু চোরাই পাচারকারীদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হয় নাই। যে ভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে বেষ্টনী রচনার উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে এবং খাদ্যশস্যের অবৈধ চলাচল ঘটিয়াছে। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীকার করেন যে, কোলাঘাটে বহুসংখ্যক চোরাই চালানদারেরা যে বিপুল পরিমাণে মাল পাচার করিয়াছে তিনি তাহার নিরুপায় দর্শক ছিলেন মাত্র। উপসংহারে কমিটি বলেন যে, ডিরেক্টর যদি কর্ডন আদেশ সম্পর্কে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিতেন তবে এই ঘাটতি রাজ্য হইতে বহু পরিমাণ চাউল পাচার নিবারণ করা যাইত।

কমিটি খাদ্য বিভাগের পরিচালনায় আরও বহুবিধ গাফিলতির উল্লেখ করেন। কমিটি খাদ্য প্রশাসনের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেন :

(১) বিভিন্ন স্তরে খাদ্যশস্যের নিম্নতম ও ঊর্দ্ধতম মূল্য নির্দ্ধারণ

করিয়া কঠোরভাবে বলবৎ করিতে হইবে। কমিটির অনুসন্ধানে প্রকাশ, খাদ্য মূল্যের যে কোন বৃদ্ধির লাভ প্রধানতঃ মিল মালিক, আড়তদার, ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজরাই ভোগ করিয়া থাকেন। ধান ও চাউলের নিম্নতম মূল্য এমন ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদনে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে পারে অথচ ক্রেতাদের কোন অসুবিধা না হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী মূল্যক্রম নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেও ইহার উপায় নির্দ্ধারণ কমিটির ক্ষমতার বাহিরে। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান কমিটি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ... একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব করিয়াছেন।

(২) ব্যবসায়ীদের দুর্নীতিপরায়ণতা দমনের জন্য খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের উপর সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৩) যাহাতে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, সেজন্য খাদ্য, কৃষি বা অন্যান্য বিভাগের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়ন করিতে হইবে।

(৪) খাদ্যশস্য ... কেবল চাউল কলগুলি হইতে করিলে চলিবে না, যে সকল আড়তদার ও ধানভানা কল একটি বিশেষ উর্দ্ধতম পরিমাণের বেশী শস্যের কারবার করে, তাহাদের নিকট হইতেও করিতে হইবে।

(৫) কমিটির মতে, খাদ্য সম্পর্কে কোন নির্দ্দেশনামা জারী করিবার পূর্ব্বে সরকার ইহার ঔচিত্য সম্পর্কে চিন্তা করিতে পারেন, কিন্তু একবার জারী করিলে সেই নির্দ্দেশনামা কঠোরভাবে বলবৎ করিতে হইবে।

(৬) আপাততঃ সরকারী উদ্যোগ ছাড়াও বেসরকারী ব্যবসায়ীদেরও উড়িষ্যা হইতে চাউল আমদানী করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। এই চাউল কঠোর নিয়ন্ত্রণে এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এককালীন বিক্রয়ের পরিমাণ উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

২০শে সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, খাদ্য বিভাগের উন্নতি সাধনের জন্য কমিটি যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন সেগুলি আরও স্পষ্টভাবে উত্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়া তিনি রিপোর্টটি পুনরায় কমিটির নিকট পাঠাইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, রিপোর্টে খাদ্যনীতির ভুলত্রুটির উল্লেখ করা হইয়াছে, সরকার সেজন্য আন্তরিক দুঃখিত। তিনি আরও বলেন যে, রিপোর্টের যে অংশে ঘটনার বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে সেই অংশটি পুনর্ব্বিবেচনার জন্য বা পরিবর্ত্তন করার জন্য তিনি কোন প্রস্তাব জোরজবরদস্তি বা পীড়াপীড়ি করেন নাই।

বিধানসভার দায়িত্বশীল কংগ্রেসী সদস্যদের এই রিপোর্ট ত্রুটি-বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই কমিটির সভাপতি নিজে বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার একজন অন্যতম সদস্য। রিপোর্টে একটি সরকারী বিভাগের কার্য্যপ্রণালীর যে চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সত্যই উদ্বেগজনক। অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইলেও যে অনুরূপ চিত্রই প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই। রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছে যে, উচ্চতর মহলেই অকর্ম্মণ্যতা সমধিক।

রিপোর্টটি সরকারকে দেওয়া হয় আগষ্ট মাসে। রিপোর্টটি প্রকাশ করিতে এরূপ অস্বাভাবিক বিলম্ব সম্পর্কে সরকার কোন কৈফিয়ৎ দেন নাই। অনেকেই বলিতেছেন যে, কম্যুনিষ্টরা রিপোর্টটি প্রকাশ না করিয়া দিলে রিপোর্টটি কখনও প্রকাশ করা হইত না। এ সম্পর্কে আরও যে সকল জনরব চলিতেছিল তাহাকে কোন মতেই সরকারী মর্য্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক মনে করা যাইতে পারে না।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়টি সাময়িক ভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হইল ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। ভারতের এই অন্যতম মহান শিক্ষা-কেন্দ্রটির সাম্প্রতিক ইতিহাস বিশেষ বেদনাদায়ক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকিবে না, ইহা কেহই ভাবিতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে কেবলমাত্র আর একবার—১৯৪২ সনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়টি এরূপ ভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু তখন বিদেশী শাসকবর্গ স্বদেশপ্রাণ ছাত্রদের দমনের উদ্দেশ্যেই ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। বর্ত্তমানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কল্যাণকামী রাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করার মত ঘটনা ঘটা উচিত নহে।

কর্ত্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিবার কারণরূপে "ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা"র উল্লেখ করিয়াছেন। কথাটির সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মুদালিয়র কমিটির রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত যে সকল বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতে হতভম্ব হইতে হয়। একদল শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকবর্গের এক গোষ্ঠীর সহিত মিলিত সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থ সাধনের যে বিষময় রাজনীতি চালাইয়াছেন তাহাই মুখ্যতঃ বর্ত্তমান অচল-অবস্থার জন্য দায়ী। কিন্তু এরূপ অবস্থা একদিনে আসে নাই—কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বাহ্নে অবহিত থাকিলে অনেক অপ্রিয় ঘটনা এড়ান সম্ভব হইত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুদালিয়র কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু অবস্থার উন্নতির বদলে অবনতিই ঘটিয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন এরূপ ঘটিল তাহার কারণ জানা প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় আত্মস্বার্থসর্বস্ব শিক্ষক ছাত্রদিগকে ভুলাইয়া লইয়া গোলমাল বাধাইতেছে অথচ কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদিগকে বুঝাইতে পারিতেছেন না এরূপ অবস্থা কর্ত্তৃপক্ষের যোগ্যতার পরিচায়ক মনে করা যায় না। ছাত্রদের অভিযোগ না থাকিলে কেবলমাত্র শিক্ষকদের কথাতেই তাহারা নাচিবে তাহা মনে করিবারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব কর্ত্তৃপক্ষের—ছাত্রদের নহে, কারণ ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করাও কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্ব। নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার বোঝা ছাত্রদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া আজ এক জনপ্রিয়

নীতিতে পরিণত হইয়াছে—ইহাতে কাহারও কোন উপকার হইতে পারে না। আর সকল বিষয়েই দম্ভ প্রকাশ বা প্রকাশের ইঙ্গিত করাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর সম্পর্কে যখন ধূমায়িত অসন্তোষ ছিল তখন তাঁহাকেই ঐ পদে পুনর্নিয়োগ করার কি অর্থ হইতে পারে তাহা সহজবোধ্য নহে। বিশেষতঃ, শ্রী ঝা নিজেই যখন পদত্যাগ করিতে বিশেষ উন্মুখ ছিলেন। শৃঙ্খলা-রক্ষার চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অসন্তোষের প্রকৃত কারণ দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া রুলের গুতায় ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ আনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সকলেই যদি একমত না হইতে পারেন তবে দোষ দেওয়া যায় না। ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যেই আসেন—যদি শিক্ষাগ্রহণের পরিবর্তে তাহারা রাজনীতিতেই অধিকতর উৎসাহী হইয়া উঠে—তবে বুঝিতে হইবে শিক্ষার সংগঠন বা প্রশাসন ব্যাপারে বিশেষ গলদ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নির্দেশ দিবার পূর্বে এ বিষয়ে কতদূর মনোযোগ দিয়াছেন তাহা জনসাধারণকে জানান কর্তব্য।

চীনের কৃষিবিষয়ে উন্নতি

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মিসেস জোয়ান রবিনসন সম্প্রতি দিল্লী স্কুল অব ইকনমিকস ও চীনের কৃষিউন্নতি সম্পর্কে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সমবায় কৃষিসম্পর্কে এদেশে আবার আলোচনা হইতে পারে। শ্রীযুক্তা রবিনসন চীনের অসাধারণ উন্নতির উল্লেখ করিয়া দুইটি বিষয় সম্পর্কে জোর দেন। প্রথমতঃ তিনি কৃষি-উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা বলেন। ১৯৫৭ সনে কৃষি উৎপাদন প্রাক্-কম্যুনিষ্ট যুগের তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগ বেশি ছিল। সমবায় কৃষির ফলেই এরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন যে, কৃষি সমবায় সমিতিগুলি গঠনের জন্য কাহারও উপর কোন বলপ্রয়োগ করা হয় নাই। তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া উক্ত মন্তব্য করেন।

বিশ্ববিজ্ঞানী সম্মেলন

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে জেনেভাতে বিজ্ঞানীদের সর্ববৃহৎ সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দুই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ৬৯টি দেশের ৬,৩০০ বিজ্ঞানী যোগদান করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রকার সম্মেলন ইতিপূর্বে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। সম্মেলনে ৭৭টি পৃথক পৃথক অধিবেশনে ২,০০০ বৈজ্ঞানিক-প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে। পরমাণু-বিজ্ঞানের কত অসংখ্য দিক লইয়া যে এই অধিবেশনে আলোচিত হয় এই তথ্য হইতেই তাহার অনুমান করা যাইতে পারে।

এই আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ বিশেষ তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে:

১। বিভাজন—রি-অ্যাক্টারের সাহায্যে ঘন পদার্থ ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজনের দ্বারা শক্তি উৎপাদন করা হইয়া থাকে। ১৯৫৫ সন হইতে মূল রি-অ্যাক্টারসমূহের সংস্কার ও উন্নতিসাধনের নূতন ধরনের রি-অ্যাক্টার নির্মাণের জন্য চেষ্টা হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানাইতেছেন যে, রি-অ্যাক্টার নির্মাণের কলাকৌশল বা ইঞ্জিনীয়ারিং সম্পর্কে তথ্যগত এবং কার্যকরী দিক হইতে যে সকল সমস্যা ছিল তাহার সমাধান তাঁহারা করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে পারমাণবিক-শক্তি উৎপাদনের পাঁচটি কারখানা ১৯৬০ সনের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে চালু হইবে এবং ঐ সকল কারখানা হইতে ৭ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে।

পরমাণু-শক্তি সাহায্যে এক লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটি কারখানা চালু করার কথা সোভিয়েট ইউনিয়নও জানাইয়াছেন। আরও ছয়টি রি-অ্যাক্টারের সাহায্যে এই বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ইহার ছয় গুণ যে ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা হইবে তাহার কথাও তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

শিক্ষা এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে যে সকল নূতন নূতন ধরনের রি-অ্যাক্টার নির্মিত হইয়াছে এবং যে সকল রি-অ্যাক্টারে খরচের তুলনায় ইন্ধন তৈয়ারি অধিকতর পরিমাণে হইয়া থাকে সেই সকলও এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৃহৎ পরিমাণে শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আজকাল অধিকাংশ রি-অ্যাক্টারেই ঘন ইন্ধন ব্যবহৃত হয়। ঘন ইন্ধনের পরিবর্তে তরল ইন্ধন ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা সম্পর্কেও এই অধিবেশনে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

২। সংযোজন—শক্তি উৎপাদনের দিক হইতে সংযোজন-পদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, ইহাতে এখনও ত্রুটি আছে। বিভাজন-সংক্রান্ত রি-অ্যাক্টারে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন ঘটানো হয় এবং ইহাতে পৌনঃপুনিক পরমাণবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ফলে বিপুলপরিমাণে অনবরত শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংযোজন-পদ্ধতিতে হাইড্রোজেনের মত হালকা মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে রি-অ্যাক্টারে রাখিয়া জুড়িয়া দেওয়ার বা একত্রিত করার ব্যবস্থা হয়। এই একত্রিত বা সংযোজনের ফলে বিপুল পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিভাজন-প্রক্রিয়ার তুলনায় সংযোজন-প্রক্রিয়ার অধিকতর শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংযোজন-পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে স্বয়ং-পুষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সাহায্যে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে এখনও অনেক দেরী আছে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সংযোজন-পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণায় চার প্রকার প্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের লস আলামসে যে প্রক্রিয়ার গবেষণা হইয়াছে তাহাও দেখানো হইয়াছে।

৩। পরমাণবিক শক্তি সাহায্যে জাহাজ চালনা—পরমাণবিক শক্তি-চালিত যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ দেখিতে কেমন এবং কি

ভাবে পরিচালিত হইবে তাহাই ছিল সম্মেলনের খুবই উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রের নেভ্যাল আর্কিটেক্ট রিচার্ড বি. গডউইন বর্তমানে নিউজার্সির ক্যামডেনে সাভান্না নামে যে জাহাজটি নির্মিত হইতেছে তাহার কলকব্জা পরিচালনা প্রভৃতি সকল বিষয়-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণী প্রদান করেন। আগামী বৎসরে এই জাহাজটি জলে ভাসানো হইবে। ১৯৬০ সনের প্রথমভাগের আগে ইহাতে নূতন ইন্ধন লইবার প্রয়োজন হইবে না।

সোভিয়েট প্রতিনিধিবর্গ পরমাণুশক্তিচালিত আইসব্রেকার বা বরফভাঙা জাহাজ লেনিনের বিস্তৃত বিবরণী প্রদান করেন। জাপানে একটি পরমাণুশক্তি-চালিত সাবমেরিন অয়েল ট্যাঙ্কার নির্মাণের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহার কথা জাপানী প্রতিনিধি বলেন। ফরাসী প্রতিনিধি ফ্রান্সে যে পরমাণু শক্তিচালিত ট্যাঙ্কার নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহারও বিবরণ প্রদান করেন।

৪। আইসোটোপ ও রেডিয়েশান—শ্রমশিল্প, ভেষজ-বিজ্ঞান এবং কৃষিবিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এবং রেডিয়েশানের প্রয়োগ ক্রমেই যে বৃদ্ধি পাইবে এ বিষয়ে সকল বিজ্ঞানীরাই একমত হইয়াছেন। রেডিও আইসোটোপ কখনও কখনও গবেষণাগারসমূহে তৈয়ার করা হয় নতুবা পরমাণবিক বিভাজন-প্রক্রিয়ার উপজাত বস্তু হিসাবে এই সকল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া যায়। ইহারা স্থায়ী বস্তু নয় বলিয়া ইহাদের দেহ হইতে তেজ নিষ্কাশিত হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি উইলিয়ার্ড এফ. লিবি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমশিল্পে ১৯৫৩ সন হইতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ভেষজবিজ্ঞান এবং কৃষিবিজ্ঞান ব্যতীত কেবল শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রেই গত বৎসর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রয়োগ করিয়া ১৯৫৩ সনের তুলনায় পাঁচ গুণ অধিক সুফল পাওয়া গিয়াছে। ভেষজ-বিজ্ঞান এবং কৃষিবিজ্ঞানেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ায়ও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রয়োগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।

৫। মৌলিক গবেষণা—যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিনিধি আই. আই. র‍্যাবি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে অনেকেরই বেশী কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। যেমন মেসন সমূহ যে ইলেকট্রনে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা এতকাল পরীক্ষা করিয়া জানা যায় নাই। জেনেভার নিকটবর্তী মেয়রনস্থিত পরমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে সিনক্রো সাইক্লোট্রনের সাহায্যে এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে। পদার্থের মূল প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে এই আবিষ্কার অনেকখানি সাহায্য করিবে।

৬। নিরাপত্তা—ব্যবসা এবং বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে পরমাণু লইয়া যাহাদের কারবার তাহাদের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা করাও বিশেষ প্রয়োজন।

আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি

সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "তাস" প্রচারিত সংবাদে আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তির অধিকারী একজন কিরঘিজ লোক-কবির পরিচয় পাওয়া যায়। "তাস" লিখিতেছেন :

"সাইয়াক্‌বাই কারালায়েফ কিরঘিজিয়ার একজন সুবিখ্যাত ও সর্বজনপ্রিয় লোককাহিনী-কথক ও চারণ কবি। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর। কিন্তু এই বয়সও তাঁহার স্মৃতিশক্তি যেরূপ প্রখর রহিয়াছে, তাহা সত্যই না দেখিলে বিশ্বাস করা অসম্ভব।

"কিরঘিজিয়ার 'মানাস' নামক জাতীয় মহাকাব্যটিকে কিরঘিজ বিজ্ঞান-পরিষদের সদস্যগণ যখন লিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে আসেন, তখন কারালায়েফ তাঁহাদের জন্য এই বীর-চরিতগাথার ৪ লক্ষ লাইন একাধিক্রমে মুখস্থ বলিয়া যান। কিরঘিজিয়ার এই জাতীয়-লোক-গাথাটি প্রাচীন কাল হইতে এতদিন পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কারালায়েফ কর্তৃক কথিত এই ৪ লক্ষ লাইন লিখিয়া লইতে ছয় বৎসর সময় লাগে। সবশুদ্ধ ১০ লক্ষ লাইনে এই মহাকাব্যটি সম্পূর্ণ। কিরঘিজ রাষ্ট্রীয় প্রকাশন ভবন হইতে শীঘ্রই এই লোক-গাথাটিকে মুদ্রিতাকারে প্রকাশ করা হইবে।

"শুধু ইহাই নহে, কারলায়েফের আরও বহু কিরঘিজ গাথা, উপকথা, লোককাহিনী ও রূপকথা মুখস্থ আছে। এগুলিও তাঁহার মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।"

স্বাধীন আলজিরিয়া সরকার

আলজিরিয়ার স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দ ১৯শে সেপ্টেম্বর কায়রোতে "স্বাধীন আলজিরিয়া সরকার" গঠনের সংবাদ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ইরাক, সংযুক্ত আরব রিপাবলিক ও লিবিয়া নূতন সরকারকে স্বীকার করিয়া লন।

স্বাধীন আলজিরিয়া সরকার গঠন করিয়াছেন, আলজিরিয়ার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট (এফ. এল. এন.)। এই মুক্তি ফ্রন্টের কয়েকজন নেতৃবৃন্দ ইতিপূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন। স্বাধীন আলজিরিয়া সরকার ঘোষণার সংবাদ আকস্মিক হইলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নহে। প্রধানতঃ আলজিরিয়া সম্পর্কিত নীতি ব্যাপারে ফরাসী রাজনৈতিকবৃন্দের মতবৈধের জন্যই জেনারেল দ্য গল ফ্রান্সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জেনারেল দ্য গলের শাসনতন্ত্রে আলজিরিয়ার ভবিষ্যত সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলা হয় নাই; কিন্তু আলজিরিয়া ত্যাগে ফরাসীদের অনিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ সংগ্রাম চালাইবার পর আলজিরিয়া নেতৃবৃন্দ বুঝিতে পারিতেছেন যে, পূর্ব্ব-অনুসৃত পন্থায় শীঘ্র স্বাধীনতালাভের কোন আশা নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, রণনৈতিক (Strategic) দিক ফ্রান্সকে বিব্রত

করিবার জন্য ফ্রান্সের নূতন সংবিধানের প্রাক্কালে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাষ্ট্র নূতন সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং নূতন সরকার গঠনের একটি উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রমুখ রাষ্ট্র আইনের অজুহাত দেখাইয়া বলিতেছে যে, যে রাষ্ট্রের নিজস্ব ভূ-খণ্ডের উপর কোন অধিকার নাই, সে রাষ্ট্র রাষ্ট্ররূপে গণ্য হইতে পারে না। এ যুক্তি একেবারে উড়াইয়া দিবার মত না হইলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মুখে এরূপ যুক্তি শোভা পায় না; কারণ রুশ বিপ্লবের পর বহুদিন যাবৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "নির্ব্বাসিত জার সরকারকে" স্বীকার করিয়া আসিয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের বহু রাষ্ট্রের সরকার স্বদেশে ক্ষমতাচ্যুত হইয়া যখন ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন সেই সকল নির্ব্বাসিত রাষ্ট্রনায়কদের পূর্ণ সরকারী মর্য্যাদাদানে ত্রুটি করে নাই। এখনও চীন ভূ-খণ্ডের উপর দশ বৎসর যাবৎ কোনরূপ অধিকার না থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ চিয়াং সরকারকেই আইনানুগ চীনা সরকাররূপে গণ্য করা হইয়া থাকে।

বর্দ্ধমানে ইউনিয়ন বোর্ড নির্ব্বাচন

"বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন:

সদর মহকুমার রায়না, খণ্ডঘোষ ও জামালপুর থানার ৩৪টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন বোর্ড নির্ব্বাচন হইবে। মনোনয়ন পত্র গৃহীত হইয়াছে। পূজার পর নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে, ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলি এমন ভাবে নির্ব্বাচন করা হয় যে, ভোটারগণকে বেশ কয়েক মাইল হাঁটিয়া ভোট দিতে যাইতে হয়। এমন কি এক ওয়ার্ডের ভোটারকে অন্য ওয়ার্ডে যাইতে হয়। এবারের নির্ব্বাচনে গত বারের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে তৎপ্রতি আমরা সদর ও মেমারী সার্কেল অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। থানার মানচিত্র হইতে অনায়াসে গ্রাম এবং ওয়ার্ড চিহ্নিত করা যাইবে এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়া ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থির করিতে হইবে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামে প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে। কাজেই নিরপেক্ষ এবং সাধারণ স্থান নির্ণয়ে কোন অসুবিধা হইবে না। আমরা সার্কেল অফিসার মহোদয়কে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা

ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার আলোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "সেবক" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন:

"কলিকাতা হইতে ষ্টীমার কোম্পানী ঘোষণা করিয়াছেন, আগরতলায় ষ্টীমার আউট এজেন্সী খোলা হইবে। এখন হইতে যে সমস্ত মাল কলিকাতায় ষ্টীমারে বুক হইবে তাহা আগরতলায় ডেলিভারী পাওয়া যাইবে এবং কলিকাতায় রপ্তানীযোগ্য মাল আগরতলায় বুক করা চলিবে। ষ্টীমার কলিকাতা হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত ভাড়ার হার কত তাহা জানা না গেলেও, আশা করা যায়, আখাউড়া দিয়া মাল আমদানী করিতে যে হারে ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয় বহন করিতে হইত তাহার অপেক্ষা বেশী পড়িবে না। আখাউড়ার তুলনায় যদি ষ্টীমারে কিছু অধিক ভাড়াও পড়ে তাহা হইলেও বোধ হয় ক্ষতির কারণ হইবে না। কারণ আখাউড়া দিয়া মাল আনিতে যে হয়রানি ভোগ করিতে হইত এবং মাল ডেলিভারীর অনিশ্চয়তা ছিল, তাহা হইতে রেহাই পাওয়া হইবে। ডেমারেজ চার্জ্জ ও সর্ট ডেলিভারী বাবত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যবসায়ীগণকে দিতে হইত। ঐ সমস্ত ক্ষতি মূলতঃ ক্রেতা-সাধারণকেই বহন করিতে হয়।

"আগরতলায় একটি রেলওয়ে আউট এজেন্সী খোলার কথা হইয়াছিল। ষ্টীমার আউট এজেন্সী খোলা হইয়াছে বলিয়া রেলওয়ে আউট এজেন্সী খোলার প্রস্তাব যেন চাপা না পড়ে। রেলওয়ে ও ষ্টীমার আউট এজেন্সী উভয়টির ব্যবস্থা থাকিলেই জনস্বার্থ রক্ষা পাইতে পারে। অতএব রেলওয়ে আউট এজেন্সী খোলার প্রস্তাবটি যাহাতে কার্য্যকরী হয় সেই প্রচেষ্টাও থাকিতে হইবে।

"আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ষ্টীমার অথবা রেলওয়ে আউট এজেন্সী স্থাপিত হইলেই পরিবহন ব্যাপারে ত্রিপুরার মূল সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। আউট এজেন্সী স্থাপন দ্বারা সাময়িক ও আশু সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে মাত্র। ত্রিপুরায় রেল লাইন নির্ম্মাণ না করা পর্য্যন্ত ত্রিপুরার উন্নয়ন হইতে পারে না। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু, আদিবাসী ও অন্যান্য অনুন্নত সমাজের কর্ম্মসংস্থান করিয়া দিতে হইলে যে আবহাওয়া ও ক্ষেত্র-প্রস্তুতের দরকার তাহা একমাত্র রেল লাইন নির্ম্মিত হইলেই সম্ভব। এতদ্ব্যতীত, সস্তায় মাল চলাচল ও যাতায়াত ইত্যাদির সুযোগ করিয়া দিতে হইলেও রেল লাইনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আউট এজেন্সীর সাহায্যে মাল আমদানী-রপ্তানী ব্যাপারে যে [illegible] অন্তরায় আছে তাহার কিছুটা দূরীভূত হইতে পারে, কিন্তু অবশিষ্ট ভারতের সহিত রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপিত না হইলে সস্তায় যাতায়াত সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। বিমানযোগে অবশিষ্ট ভারতের সহিত যাতায়াতের যে সুযোগ রহিয়াছে তাহা ধনী ব্যক্তিদের জন্য, গরীবের জন্য নয়। অবশিষ্ট ভারতে ১০০ মাইল রাস্তা ভ্রমণ করিতে তিন টাকারও কম ব্যয় করিতে হয়। ত্রিপুরায় ১০০ মাইলের জন্য অবশিষ্ট ভারতের ভ্রমণ ব্যয়ের তিন হইতে চার গুণ (আভ্যন্তরীণ যাতায়াত) অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করিয়া যাতায়াত করিতে হয়। একই রাষ্ট্রের অধীনে এইরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চলিতে পারে না।"

ত্রিপুরার সহিত আসামের যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা আলোচনা করিয়া করিমগঞ্জের সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" লিখিতেছেন:

"আসাম-আগরতলা রাস্তার যে অংশ করিমগঞ্জ মহকুমায় পড়িয়াছে তন্মধ্যে ৩.৪ মাইল যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়ে; অতঃপর দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যেও তাহার সংস্কার সাধিত হইল

না—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আসাম তথা ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ-সাধনে ইহাই একমাত্র রাস্তা। সুতরাং এক্ষেত্রে আসাম পূর্ত্তবিভাগের অক্ষমতা বাস্তবিকই দুঃখজনক। নানাভাবে বিপন্ন ত্রিপুরার এগার লক্ষ লোকের সরবরাহ ব্যবস্থা যে রাস্তার উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল তাহার প্রতি এরূপ অবহেলার কারণ আমরা বুঝিতে অক্ষম।"

রাজা রামমোহন রায়

ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত মহামনীষী রাজা রামমোহন রায়ের শতোত্তর পঞ্চবিংশ জন্মদিবস ২৭শে সেপ্টেম্বর পার হইয়া গেল। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জনসভায় এই যুগমানবের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য দাবী জানান হয়। স্বাধীন ভারতে রাজা রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থায়ই করা হয় নাই—ইহা নিতান্তই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। পার্লামেণ্ট ভবনে ছোট বড় অনেক নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি রক্ষিত হইলে রাজা রামমোহনের কোন প্রতিকৃতি স্থাপনের কথা কেহ চিন্তা করেন নাই, ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক।

কলিকাতায় গান্ধীজীর প্রতিমূর্ত্তি

কলিকাতার চৌরঙ্গী ও পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে মহাত্মা গান্ধীর একটি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন লইয়া যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সকল সুস্থ মনোভাবাপন্ন নাগরিকই বেদনা বোধ করিবেন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় মহাপুরুষের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এরূপ গোলযোগে কর্তৃপক্ষের চরম অযোগ্যতাই প্রকাশ পায়। যিনি জীবিতকালে আত্মরক্ষার জন্য পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি রক্ষার জন্য তাঁহারই স্বদেশে পুলিস নিয়োগ করিতে হয়, ইহাকে অদৃষ্টের চরম পরিহাস ছাড়া আর কি-ই বা বলা যাইতে পারে? বাঙালী জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি চিরকালই বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল। সাময়িক মতবিরোধ কখনও এই শ্রদ্ধা টলাইতে পারে নাই। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর নীতির অন্যতম সমালোচক শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর আচরণেও আমরা বাংলার এই জাতীয় শ্রদ্ধার পরিচয় পাই। বিদেশে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার পরও মহাত্মা গান্ধীকে তিনি সর্ব্বজনবরেণ্য নেতারূপে স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর অনেক নীতিই স্বীকার করিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনিই গান্ধীজীকে মহাত্মা-রূপে অভিহিত করেন। মুষ্টিমেয় অবিমৃষ্যকারী যুবক তাহাদের এই দৌরাত্ম্য দ্বারা বাঙালী জাতির যে অবমাননা করিয়াছে তাহার সীমা নাই। আমরা আশা করি, তাহারা অবিলম্বে তাহাদের নীতির ভ্রান্ততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবে এবং তাহাদের ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চতর সরকারী মহলে দুর্নীতি কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে রাজ্যসরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগ তাহার এক চাঞ্চল্যকর বিবরণ দিয়াছেন। এই তদন্ত পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগের স্পেশাল অফিসার ডঃ নবগোপাল দাশ। প্রকাশ যে, এই তদন্ত যাহাতে না হয়, সে জন্য বিভিন্ন মহল হইতে চাপ দেওয়া হইতেছিল, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের দৃঢ়তার ফলেই শেষ পর্য্যন্ত এই তদন্ত-অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। অনেকে এরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ডঃ দাশ রিপোর্ট দানের অব্যবহিত পরেই সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের যে আবেদন করেন তাহার পিছনেও কোন অদৃশ্যশক্তির হাত ছিল। অবশ্য সরকার হইতে এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র ঘটনাটিই এরূপ রহস্যাবৃত যে, এ সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছুই বলা যায় না।

কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই রিপোর্টে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনসের একজন পদস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারা একটি পাপচক্র গড়িয়া তোলার অভিযোগ আনা হইয়াছে এবং এই মর্ম্মে দ্বিতীয় অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন জয়েণ্ট সেক্রেটারী, দুই জন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন পুলিস-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, কলিকাতা পুলিসের একজন ডেপুটি কমিশনার, একজন সিভিল সার্জ্জন, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, লোকসভার একজন ভূতপূর্ব্ব সদস্য প্রভৃতির যোগ-সাজসে, প্রশ্রয়ে বা জ্ঞাতসারে ছয় বৎসর যাবৎ ঐ বাগানের এক নিভৃত প্রান্তে উক্ত পদস্থ কর্ম্মচারীর কোয়ার্টার্সে এবং কলিকাতার কয়েকটি সৌখীন হোটেলে সেই পাপচক্র নির্বিঘ্নে বিরাজ করিয়াছে।

এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা লিখিতেছেন: "নানাসূত্রে সংগৃহীত সংবাদ ও সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া এই রিপোর্টে অভিযোগ করা হইয়াছে এই যে, বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঐ কর্ম্মচারীটি উচ্চতম সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোরঞ্জনের জন্য ১৯৫২ সন হইতে ১৯৫৮ সন পর্য্যন্ত তাঁহার সরকারী কোয়ার্টার্সকে পতিতালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন, সুরা ও নারীর প্রলোভন ছড়াইয়া সরকারী দপ্তরের উপরের মহলে তিনি ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই ঘনিষ্ঠতার সুযোগে মামলা-মোকদ্দমা ও পারমিটের তদ্বিরের নাম করিয়া বহু লোকের নিকট হইতে টাকা-পয়সা লইয়াছিলেন। চোরাকারবারী ও ডক এলাকার চোরদের সহিত তাঁহার যোগ ছিল এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনকে তিনি এই দুষ্কর্ম্মকারীদের ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের মাছ ও তরিতরকারী তিনি নিয়মিতভাবে তাঁহার রক্ষিতার গৃহে পাঠাইতেন।"

রিপোর্টের বিবরণীতে বলা হইয়াছে, "পাপচক্রের এই কাহিনীর যিনি নায়ক তিনি একজন মিষ্ট স্বভাবের মানুষ।"

প্রথম আলাপেই মানুষকে যাদু করার ক্ষমতা তাঁহার আছে। প্রকাশ যে, প্রথম যৌবন হইতেই তিনি মদ ও স্ত্রীলোকের প্রতি

আসক্ত ছিলেন। অনেক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ও সিনেমা অভিনেত্রীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার কোয়ার্টাসে তিনি অভাবগ্রস্ত পরিবারের মেয়েদের লইয়া আসিতে আরম্ভ করেন। যখন টাকা-পয়সার টানাটানি পড়িল তখন তিনি উচ্চপদস্থ অফিসারদের তাঁহার পাপচক্রে আকর্ষণ করিতে সুরু করেন। তাঁহার কোয়ার্টাসে তিনি বিভিন্ন অফিসারের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করার আয়োজন করিয়া রাখেন। এক শ্রেণীর অফিসারের জন্য কেবলমাত্র মদ্যপানের ব্যবস্থা থাকিত, আর এক শ্রেণীর অফিসারের জন্য নারীসঙ্গ লাভের ব্যবস্থা থাকিত এবং তৃতীয় আর এক শ্রেণীর অফিসারদিগকে নিজেদের পরিবারবর্গের সহিত নিভৃতবাস করার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইত।

রিপোর্টে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, এইভাবে তিনি মানুষের মনে একটা ধারণা সৃষ্টি করিতেন যে, উচ্চপদস্থ অফিসারদের সহিত তাঁহার প্রভূত খাতির আছে। অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, নীচের তলার সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাকে দেখিলেই সেলাম দিত। এমনকি থানার দারোগা পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আসন ছাড়িয়া দিতেন। একটি বিশেষ জেলায় যিনি যখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আসিতেন তাঁহাদের সহিত তিনি বিশেষ করিয়া খাতির জমাইতেন। ট্যাক্সি ও বাসের পারমিট সন্ধানীরা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার খপ্পরে পড়ে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধরিয়া পারমিট আদায় করিয়া দিবার জন্য লোকে তাঁহাকে টাকা দিত। অনেকে তাঁহাকে দিয়া পারমিট পাইয়াছে। অনেককে তিনি কনট্রাক্ট ও চাকুরীও জুটাইয়া দিয়াছেন এবং সেজন্য টাকা লইয়াছেন। তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক জনের জন্য তিনি নারী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, এই রকম সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। মামলা-মোকদ্দমা, বন্দুকের লাইসেন্স প্রভৃতির ব্যাপারেও তিনি তদ্বির করিয়াছেন।

এই ধুরন্ধর সরকারী কর্ম্মচারী সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া এনফোর্সমেণ্ট পুলিস যে সমস্ত অভিযোগ সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, লোয়ার সারকুলার রোডের যে অভিজাত ফ্ল্যাটে তাঁহার রক্ষিতাটি বাস করেন সেটি লোকসভার একজন ভূতপূর্ব্ব সদস্যের নামে ভাড়া লওয়া হইয়াছে; কিন্তু টেলিফোনটি তাঁহারই নামে রহিয়াছে। মহিলাটির এক পুত্র পুলিস কর্ত্তৃক চিহ্নিত গুণ্ডা এবং বেনিয়াপুকুর থানায় পুলিসের খাতায় তাহার নাম আছে। তৎসত্ত্বেও সে কলিকাতায় একটি এবং একটি জেলা হইতে আর একটি ট্যাক্সি পারমিট পাইয়াছে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার দুষ্কর্ম্মের ঘাটি ছিল অনেকগুলি: ১। বোটানিক্যাল গার্ডেনসে তাঁহার গৃহ, ২। ইডেন গার্ডেনসে তাঁহার অফিস এবং ৩। পার্ক ষ্ট্রীটের তিনটি হোটেল। এই সকল স্থানে সব সময়ে নানা ধরনের উমেদারের ভীড় লাগিয়া থাকিত।

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনসের সরকারী কোয়ার্টাসের ভিতরে যে বহু স্ত্রীলোকের আনাগোনা চলিত, সেখানে মদ্যপানের আসর বসিত, বড় বড় অফিসারদের দেখা যাইত, গভীর রাত্রে এবং অতি প্রত্যুষে সাধারণতঃ যখন বাগানের দরজা বন্ধ থাকার কথা সে সময়ে যে এই কোয়ার্টাসের আশেপাশে মোটর চলাচল করিত তাহার সাক্ষ্য অনেকে দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন শিবপুর অঞ্চলের কয়েকজন অধিবাসী, বোটানিক্যাল গার্ডেনসের কয়েকজন ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী, কলিকাতার একজন এম-এল-এ, ঠাকুর পরিবারের একজন শিল্পী।

পার্ক ষ্ট্রীটের হোটেলে যে-সব ব্যাপার চলিত তাহারও অনেকগুলি বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। একজন সরকারী কনট্রাক্টর বলিয়াছেন যে, তিনি দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারটিকে হোটেলের বন্ধ ঘরে স্ত্রীলোকের সহিত অবস্থান করিতে দেখিয়াছেন। কলিকাতা পুলিসের একজন ডেপুটি কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিসিটি বিভাগের একজন বড় অফিসারকেও এখানে নারী ও সুরা উপভোগ করিতে দেখা গিয়াছে বলিয়া তিনি জানাইয়াছেন।

তদন্ত চলাকালে এই হোটেলে হানা দিয়া পুলিস কয়েকটি তরুণীর সন্ধান পাইয়াছে, যাহারা বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়া বড় বড় অফিসারদের সঙ্গ দান করিত।

বোটানিক্যাল গার্ডেনসের এই পাপচক্রটিকে আশ্রয় করিয়া যে চোরাচালানের ব্যবসায় চালান হইত, তারও প্রমাণ বিভিন্ন সাক্ষীর কথা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

দুইটি ট্যাক্সি-পারমিট বাহির করার বিস্তারিত ইতিহাস রিপোর্টে বর্ণনা করা হইয়াছে। বেনিয়াপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই কাহিনীর নায়ক তাঁহার সহিত থানায় দেখা করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিনি উক্ত পুলিস অফিসারকে বলেন যে, যত আই-সি-এস, আই-এ-এস, আই-পি-এস ও আই-পি অফিসার আছেন, সকলেই তাঁহার খুব বন্ধু। কিছুদিনের মধ্যেই পুলিস অফিসারটি দেখিতে পান যে, পশ্চিমবঙ্গের একজন জয়েণ্ট সেক্রেটারী ও কলিকাতা পুলিসের একজন ডেপুটি কমিশনার এই প্রভাবশালী সরকারী কর্ম্মচারীটির সহিত একত্রে ঘোরাফেরা করেন। এই ডেপুটি কমিশনারের মৌখিক নির্দ্দেশে বেনিয়াপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রবল প্রতাপান্বিত সেই সরকারী কর্ম্মচারীর রক্ষিতার ফ্ল্যাটে দুই মাস ধরিয়া কনষ্টেবল মোতায়েন করিয়া রাখেন। বাড়ীওয়ালার সহিত মহিলাটির কি ব্যাপারে কলহ বাধিয়াছিল, সেই জন্য এইভাবে থানা হইতে পুলিস দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু নিয়মানুসারে যে কি লইবার কথা, তাহা আদায় করা হয় নাই।

বেনিয়াপুকুর থানার এই পুলিস অফিসার প্রায়ই পার্ক ষ্ট্রীটের হোটেলটিতে যাইতেন। লতা, রাণী, সাগরিকা, অনিলা ও টুটু নামে কয়েকটি তরুণী প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেখানে বোটানিক্যাল গার্ডেনসের সেই কর্ম্মচারীটির সহিত সাক্ষাৎ করিত। পূর্ব্বে যে জয়েণ্ট-সেক্রেটারী ও ডেপুটি কমিশনারের কথা বলা হইয়াছে,

তাঁহারাও কখনও কখনও আসিতেন এবং একসঙ্গে মদ খাইতেন। হোটেল হইতে তাঁহারা যখন বাহির হইয়া যাইতেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে দুই-একজন স্ত্রীলোক থাকিত।

এই পুলিস-অফিসারের সাক্ষ্যে আরও প্রকাশ পাইয়াছে যে, প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সেই ভদ্রলোককে পার্ক স্ট্রীটের আর একটি রেস্তোরায় দেখা যাইত। সেখানে নিম্নপদস্থ বহু সরকারী কর্ম্মচারী বদলীর আদেশ রদ করার জন্য অথবা পছন্দমত জায়গায় বদলী হইবার জন্য তদ্বির করিতে আসিতেন। ভদ্রলোক সকলকেই বলিতেন, উপরওয়ালাদের খুশী করার জন্য কিছু টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত থাকিলেই তিনি তাঁহাদের কাজ করিয়া দিবেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত সেই রক্ষিতার পুত্র যখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটি ট্যাক্সির পারমিটের জন্য দরখাস্ত করেন, তখন এই পুলিস অফিসারের উপর তদন্তের ভার পড়ে। তিনি যাহাতে ভাল রিপোর্ট দেন, সেজন্য উপরোক্ত ডেপুটি পুলিস কমিশনার এবং একজন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার উপর চাপ দেন। কিন্তু তিনি সত্য গোপন না করিয়া আবেদনকারী যে একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাহা তাঁহার রিপোর্টে জানাইয়া দেন। কিন্তু তাঁহার এই রিপোর্টে পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আবেদনকারীর দ্বারা একটি বণ্ড লিখাইয়া লইয়া ট্যাক্সির পারমিট দিয়া দেন। রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছিবার পর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সেটি ফাইলে চাপা দিয়া রাখেন।

তৎকালীন রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সেক্রেটারী এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইয়াছিল, এবং দুর্নীতি দমন বিভাগ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছেন যে, অভিযুক্ত কর্ম্মচারীটি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধরিয়া তাঁহার রক্ষিতার পুত্রের জন্য একটি ট্যাক্সির পারমিট বাহির করিয়াছেন এবং আবেদনকারী একজন দুষ্টপ্রকৃতির লোক—একথা জানিয়াও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই পারমিট দিয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে, একই ব্যক্তি কলিকাতায় আর একখানি বেবী ট্যাক্সির পারমিট পান। কলিকাতার রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির তৎকালীন সেক্রেটারী তাঁহার আবেদনে সুপারিশ করেন এবং তাঁহার চরিত্র ও পূর্ব্ব-ইতিহাস সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর না লইয়াই পারমিট মঞ্জুর করা হয়। মোটর ভেহিকিলস বিভাগের একজন কর্ম্মচারী একবার এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলে প্রতাপান্বিত সেই অফিসারটি আসিয়া তাঁহাকে কোনরকম খারাপ রিপোর্ট দিতে নিষেধ করেন এবং তাঁহাকে জানাইয়া দেন, বড় বড় অফিসারদের ধরিয়া তিনিই ট্যাক্সি পাওয়াইয়া দিয়াছেন।

রিপোর্টের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, অনুসন্ধান এখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। আরও অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা বাকি আছে। যাঁহারা অভিযুক্ত অফিসারটিকে বড় বড় সরকারী পদাধিকারীর সহিত ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখনও তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে ভরসা পাইতেছেন না।

কলিকাতায় দুর্নীতির প্লাবন

কলিকাতার অবস্থা আরও স্পষ্টভাবে প্রকট হয় নীচের দুইটি সংবাদে। দুটিই "আনন্দবাজার পত্রিকা" দিয়াছেন :

কলিকাতা পুলিস মহলে বুধবার বড় রকমের এক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটিবার সময় অযাচিত অদৃশ্য হস্তক্ষেপে অকস্মাৎ মধ্যপথে উহার গতি স্তব্ধ হইয়া যায়। প্রকাশ, অন্ধকারের কারবারীদের বিভীষিকা এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ ও দুর্নীতি দমন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এইদিন কলিকাতা পুলিসের উচ্চপদস্থ একজন পুলিস কর্ম্মচারীকে নিম্নতন এক পুলিস কর্ম্মচারীর নিকট হইতে টাকা ঘুষ লইবার অভিযোগে হাতেনাতে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিলেন এবং ঐ ফাঁদের জাল প্রায় গুটাইয়াও তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্যপথে সেক্রেটারিয়েট ও লালবাজারের কোন কোন কক্ষে পৌঁছাইলে তথায় কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদেরই কোন পক্ষের নির্দ্দেশে নাকি উক্ত উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয় না।

সংবাদটি যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে তজ্জন্য সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা হইয়াছে এবং কি এনফোর্সমেণ্ট পুলিস ও দুর্নীতি দমন বিভাগ, কি লালবাজার ও সেক্রেটারিয়েট—কোন মহলই সংবাদটি জানাইতে চাহেন নাই। তথাপি বিশ্বস্তসূত্রে ঘটনাটি যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

ঘটনা সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগে প্রকাশ, পোর্ট পুলিসের জনৈক সার্জেণ্টের বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়; ঐ সম্পর্কে অপর একজন এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার তদন্ত করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার নাকি উক্ত সার্জ্জেণ্টকে বলেন যে, তাঁহাকে যদি ২০০৲ টাকা দেওয়া হয়, তবে তিনি ঐ সার্জ্জেণ্টের বিরুদ্ধে তদন্ত-মামলার মোড় ঘুরাইয়া উহা নাকচ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু ঐ সার্জ্জেণ্ট কয়েকদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগের স্পেশাল অফিসার ডাঃ নবগোপাল দাশকে সমস্ত ঘটনা জানান এবং এই ব্যাপারে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডাঃ দাশ ঐ সাহায্য করিতে সম্মত হন। অতঃপর এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের সহায়তায় এই বিষয়ে এক ফাঁদ পাতা হয়। বুধবার অপরাহ্ণের দিকে উক্ত সার্জ্জেণ্ট মুখ-খোলা একটি খামের মধ্যে ২০০৲ টাকার নোট ভরিয়া ঐ এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনারকে প্রস্তাবিত 'ঘুষ' দিতে যান। সঙ্গে নাকি এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের ডেপুটি পুলিস কমিশনার রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল এবং এনফোর্সমেণ্ট ও দুর্নীতি দমন বিভাগের অপর কয়েকজন কর্ম্মচারী সাদাসিধা পোষাকে যান। তৎপূর্ব্বে ডাঃ দাশ ঐ ২০০৲ টাকার নোটগুলি চিহ্নিত করিয়া রাখেন।

অভিযোগে আরও প্রকাশ, উক্ত সার্জ্জেণ্ট সংশ্লিষ্ট এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার আপিস হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিবার মুখে

তাঁহার হাতে প্রস্তাবিত ঘুষের ২০০৲ টাকা ভর্ত্তি খামটি দেন। আরও প্রকাশ, উক্ত এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার উহা গুনিয়া খামসমেত নিজের পকেটে রাখেন ও গাড়ী চালাইতে বলেন। গাড়ীটি খানিকটা পথ অগ্রসর হইতে না হইতেই ছদ্মবেশে অবস্থিত এনফোর্সমেণ্ট ও দুর্নীতি দমন বিভাগের লোকজন পশ্চাৎ ও সম্মুখ দিক হইতে আগাইয়া আসেন। এই সময় ঐ ২০০৲ টাকা নোট-ভর্ত্তি খামটি নাকি পুলের ধারে ছুড়িয়া ফেলা হয়। অভিযোগী-কারী পুলিস দল নোট-ভর্ত্তি খামটি পথ হইতে কুড়াইয়া আনেন। এই সময় রায়বাহাদুর মুখার্জ্জি, শ্রী ঘোষাল ও অন্যান্যদের প্রশ্নের উত্তরে উক্ত এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার এরূপ পাল্টা অভিযোগ করেন যে, ঐ সার্জ্জেণ্ট তাঁহাকে উক্ত টাকা "ঘুষ" দিতে আসিয়াছিল। তিনি উহা না লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। টাকা-ভর্ত্তি খামটি হাতে লইবার কিছু পরে এবং গাড়ীটি কিছু পথ আগাইয়া আসিবার পর তিনি উহা রাস্তায় ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন কিনা—এরূপ প্রশ্ন উঠে এবং উহা লইয়া উভয়পক্ষে কথা-কাটাকাটি চলে। লোকজনের ভীড় জমিয়া যায়; পোর্ট পুলিসের অনেক পুলিস কর্ম্মচারীও ঐ স্থানে আসিয়া জুটেন। ইতিমধ্যে কোন অদৃশ্যপথে ঐ সংবাদ লালবাজারে পুলিস কমিশনার, ডি সি হেড কোয়ার্টার, সেক্রেটারিয়েটে চীফ সেক্রেটারী, স্বরাষ্ট্র সচিব ও অন্যান্য কোন কোন কক্ষে গিয়া পৌঁছে এবং উহাতে উক্ত মহলগুলিতে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ এইরূপ 'দুর্দ্দৈবে' বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়েন বলিয়াও প্রকাশ। লালবাজার ও সেক্রেটারিয়েট হইতে ঐ ব্যাপার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পোর্ট পুলিসের আপিসে টেলিফোনও আসে। প্রকাশ, উহার পর এনফোর্সমেণ্ট ও দুর্নীতি দমন বিভাগের অভিযানকারী ঐ সব পুলিস অফিসার উক্ত এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনারকে আর ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করেন না। (অনুরূপ ঘটনায় সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করা হইয়া থাকে।) উক্ত এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনার, অভিযোগকারী সার্জ্জেণ্ট এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত জনসাধারণের কিছু লোককে কলিকাতার দুর্নীতি দমন বিভাগে আনা হয়। সেখানে ডাঃ দাস নাকি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেন। প্রকাশ, সেক্রেটারিয়েট হইতে দুর্নীতি দমন বিভাগেও টেলিফোন আসে। ইহার ফলে ঐ এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনার বা অন্য কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় না।

কিন্তু নাটকটির এইখানেই আপাততঃ যবনিকাপাত হইলেও উহার একেবারে পরিসমাপ্তি হয় নাই। সেক্রেটারিয়েট হইতে উর্দ্ধতন মহল 'গ্রেপ্তার স্থগিত রাখিতে' বলিলেও অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

এই তদন্ত ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারিলে এবং উহার পূর্ণ রিপোর্ট পাওয়া গেলে পোর্ট পুলিস এলাকায় অনেক 'রুইকাতলার গোপন কার্য্যকলাপ' উদঘাটিত হইবে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল আশা করিতেছেন। কারণ পোর্ট ও ডক এলাকায় ঘুষের মাধ্যমে বহু টাকার মালপত্রের চোরাই করিবার এবং উহাতে একশ্রেণীর পুলিসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগসাজসের গুরুতর কতকগুলি অভিযোগ বহুদিন হইতেই উর্দ্ধতন সরকারী মহলে জমা হইতেছে।

গত ১৫ই আশ্বিন রাত্রে বেলঘরিয়ার টেক্সম্যাকো কারখানায় সুপারভাইজার অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে ঐ অঞ্চলে ত্রাসের সঞ্চার হয়। প্রকাশ, নিহত শ্রীমধুসূদন যাদব রাত্রি প্রায় ১০টার সময় কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন, সেই সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন বলিয়া প্রকাশ।

আততায়ীরা শ্রীযাদবকে হত্যা করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লয় এবং মৃতদেহটি রেল লাইনের উপরে ফেলিয়া চম্পট দেয়।

শুক্রবার, গোয়েন্দা কুকুর মিত্রা ও লাকিকে ঘটনাস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। উহাদের ইঙ্গিতে টেক্সম্যাকোর দুইজন শ্রমিকসহ ৪ ব্যক্তিকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়।

বরাহনগর, বেলঘরিয়া, আলমবাজার এবং দক্ষিণেশ্বর অঞ্চল বর্ত্তমানে যেন দুর্বৃত্তদের সাম্রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। খুন জখম রাহাজানির ঘটনা লাগিয়াই আছে। নানা ধরনের সমাজ-বিরোধীরা এই অঞ্চলে 'আড্ডা' গাড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সিনেমার সামনে হাঙ্গামা করা, প্রকাশ্যে সোডার বোতল ছোড়াছুড়ি, স্কুলের ছাত্রীদের পিছনে লাগা ইত্যাদি সমাজবিরোধী কার্য্য ক্রমশঃ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। পর পর কয়েকটা খুনও এই অঞ্চলে হইয়া গেল।

পাকিস্থানির অনুপ্রবেশ

নিম্নস্থ সংবাদটি কোনও মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না :

কলিকাতার উপকণ্ঠে ২৪ পরগণার অধীন ইছাপুরে অবস্থিত দুইটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে গত এক মাসের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে প্রায় ৩০০ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বরখাস্ত করা হইয়াছে বলিয়া সরকারী সূত্রেই এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহারা সকলেই পাকিস্থানী নাগরিক।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে গোয়েন্দা বিভাগের একটি গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থায় এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারীর কারখানায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার চক্রান্ত ও পাকিস্থানের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী আপিসেও কর্ম্মরত পাকিস্থানী গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও ভারত

জগতের দৃষ্টিতে ভারত এখনও উজ্জ্বল আছে এইটুকু নিম্নস্থ সংবাদে বুঝা যায় :

নয়াদিল্লী, ৭ই অক্টোবর—বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রীইউজিন

আর. ব্ল্যাক বিশ্ব ব্যাঙ্কের বোর্ড অব গবর্ণরস-এর নিকট ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করার সময় বলেন, ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবজাতির আশার প্রতীকস্বরূপ। বিগত পাঁচ হাজার বৎসরে ভারতের বুকের উপর দিয়া বহু দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মহামারীর তাণ্ডব বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি আজ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আয়োজন ভারতীয় জীবনে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি বলেন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়া ভারত যদি এই ব্যাপারে সাহায্যলাভ করিতে পারে তবে তাহা বিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে।

শ্রী ব্ল্যাক এই আশা পোষণ করেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধজনিত চীৎকার ছাপাইয়াও শান্তির পথে অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথাই সুস্পষ্টভাবে শুনা যাইবে। যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে অর্থের যে বিরাট অপচয় হইতেছে তাহার ভগ্নাংশও যদি এই প্রকৃত সম্পদ সৃষ্টিতে ব্যয়িত হইত তাহা হইলে তিনি আরও অনেক কিছুই আশা করিতে পারিতেন।

ভারতের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি-প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া শ্রী ব্ল্যাক বলেন যে, বর্তমান ভারত 'জগতে আজ যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে' তাহার জন্য তাহাকে কোন সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। ভারত আজ পৃথিবীর সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছে যে, মানুষের মর্য্যাদা ও আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য যে পার্থিব সম্পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়াও তাহা করা সম্ভব।

যে সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দাবির পিছনে কেবল ভাবগত আবেদন বা বিশেষ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চাল আছে সেই সব দেশের জন্য 'ভ্রান্ত উদ্বেগে'র বিরুদ্ধেও শ্রী ব্ল্যাক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

ফ্রান্সের নূতন শাসনতন্ত্র

নিম্নস্থ সংবাদে ফ্রান্সের গণতন্ত্রের ইতি ঘোষিত হয়:

প্যারিস, ২৯শে সেপ্টেম্বর—ফ্রান্স গতকল্য জেনারেল দ্য গলের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের প্রতি ব্যাপক সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে। কলোনীসহ সমগ্র ফ্রান্সের গণ-ভোটের যে ফলাফল অদ্য সকালে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়, তাহাতে দেখা যায়, দ্য গলে-সংবিধানের পক্ষে ১৭,৬৬৬,৮২৮টি এবং বিপক্ষে ৪,৬২৪,৪৭৫ ভোট প্রদত্ত হইয়াছে।

গণ-ভোটের ফলাফল জেঃ দ্য গলের ব্যক্তিগত জয় সূচিত করিতেছে। আজ হইতে চার মাসের জন্য তিনি কার্য্যতঃ অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হইতেছেন। সরকারী কর্মচারীরা বলেন, চতুর্থ রিপাব্লিক এবং উহার সর্বপ্রকার নিষ্ক্রিয়তার সমাধির উপর দ্য গলের প্রস্তাবিত পঞ্চম রিপাব্লিক গড়িয়া উঠিতেছে। ভোটের ফলাফল সম্পর্কে স্বয়ং দ্য গলে বলেন, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। গণ-ভোটে ইহাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, ফ্রান্স যৌবনোচিত কর্মোদ্যম ও সাহস সহকারে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর রহিয়াছে।

যে সকল রাজনৈতিক দ্য গলে গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহার রচিত সংবিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছিলেন, গণ-ভোটে তাঁহারা একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছেন।

দ্য গলের বিরোধীদলের প্রধান নেতা ম্যেঁদে ফ্রাঁসের নির্বাচন কেন্দ্রের অবস্থাটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সনের সাধারণ নির্বাচনে ম্যেঁদে ফ্রাঁস যত ভোট পাইয়াছিলেন তাহার অর্দ্ধেকেরও কম ভোট এবার সংবিধানের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়। দ্য গলের অন্যতম প্রধান বিরোধী রেডিকেল পার্টির নেতা ম বায়লেতের নির্বাচন-কেন্দ্রের লোকেরাও সংবিধানের বিরুদ্ধে ভোট দেয় নাই। ভোট গণনার পর তিনি মেয়রের পদ ত্যাগ করেন।

গত দশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া যে ৫০ লক্ষাধিক ভোটের উপর কম্যুনিষ্টদের অবিসম্বাদিত একাধিপত্য ছিল, সেখানেও দ্য গলপন্থীরা অনেকটা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। গত রাত্রিতে যে আংশিক ফলাফল জানা গিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ, এতদিন যাহারা কম্যুনিষ্টদিগকে ভোট দিয়া আসিয়াছে, এরূপ প্রায় দশ লক্ষ লোক এবার দ্য গলকে ভোট দিয়াছে। কম্যুনিষ্টরা যে ভাবে সমর্থন হারাইয়াছে, তাহার ফলে দ্য গলের মর্য্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যথাকালে তিনি পঞ্চম রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইবেন ইহা সুনিশ্চিত।

ফ্রান্সের দুইজন প্রধান কম্যুনিষ্ট নেতা প্যারিসের তথাকথিত "লাল উপকণ্ঠে" তাঁহাদের পূর্ব্বতন ভোটের জোর রক্ষা করিতে পারেন নাই।

কম্যুনিষ্ট নেতা থোরেজ পূর্ব্বতন পার্লামেণ্টে 'কম্যুনিষ্ট শহর' ইভরীর প্রতিনিধি ছিলেন। এই শহরে ১৩,০৩৯ জন দ্য গলের পক্ষে ভোট দিয়াছে, বিপক্ষে দিয়াছে ১২,১৭১ জন। ১৯৫৬ সনের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে কম্যুনিষ্টরা এককভাবেই ১৪,৫৮৪ ভোট পাইয়াছিল।

জাতীয় পরিষদে কম্যুনিষ্ট দলের নেতা দুক্লোসের নিজ ঘাটিতে দ্য গলের পক্ষে ২৬,১৫১ ভোট এবং বিপক্ষে ১৭,৪৭৩ ভোট প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৫৬ সনের নির্বাচনে কম্যুনিষ্টরা ২১,৬৪০ ভোট পাইয়াছিল।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রবাসী কার্য্যালয় আগামী ৩রা কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর) সোমবার হইতে ১৬ই কার্ত্তিক (২রা নবেম্বর) রবিবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকা-কড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপিস খুলিবার পর করা হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

শঙ্করের "জীবন্মুক্তিবাদ"

(১)

ডক্টর রমা চৌধুরী

পূর্ব সংখ্যায় শঙ্করের মতে "মোক্ষ বা মুক্তি"র স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। শঙ্করের মতে "অধ্যাসে"র অভাব অথবা মিথ্যাজ্ঞানের নিরসনে সত্যজ্ঞানের উদয়ই "মোক্ষ"। সেজন্য, শঙ্কর বলেছেন যে, জীবিত অবস্থাতেই, বর্তমান দেহেই, এই সংসারেই ব্রহ্মজ্ঞ, জীব ব্রহ্মৈক্য-জ্ঞানধন্য সাধকের পক্ষে মুক্তিলাভ করা সম্ভবপর। ভারতীয় মতে, মুক্তি দ্বিবিধ: জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি। জীবিত অবস্থাতেই, বর্তমান দেহপাতের পূর্বেই, সংসার পরিত্যাগ না করেই যে মুক্তিলাভ হয়, তার নাম "জীবন্মুক্তি।" অপর পক্ষে, মৃত্যুর পরেই, দেহাদি ধ্বংসের পরেই, সংসার পরিত্যাগ করেই যে মুক্তিলাভ হয়, তার নাম "বিদেহ-মুক্তি"। শঙ্কর জীবন্মুক্তিবাদী। তাঁর মতে, জ্ঞানই যদি ব্রহ্ম বা মোক্ষের সাধন হয়, তা হলে যে মুহূর্তে জ্ঞানের উদয় হবে, সেই মুহূর্তেই মোক্ষেরও উদয় হবে পূর্ণতম গৌরবে—সেই সময়ে দেহমন প্রভৃতি অথবা জগৎসংসারের অস্তিত্ব থাকুক বা নাই থাকুক।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের মুহূর্তেই মুক্তি লাভ সম্ভবপর হলে সাধকের পূর্বসঞ্চিত অভুক্ত কর্মফলের অবস্থা কি হবে? পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কর্মবাদানুসারে, স্বেচ্ছাকৃত বিচারবুদ্ধি-সংকৃত ও ফললিপ্সাপ্রসূত বা সকাম-কর্মের ফলভোগ কর্মকর্তার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী—ফলভোগ ব্যতীত কর্মক্ষয় হয় না, কর্মক্ষয় ব্যতীত কর্মনাশ হয় না, কর্মনাশ ব্যতীত মুক্তিও হয় না।

এই আপত্তির উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, কর্মবাদানুসারে, প্রাকৃতিক জগতে যেরূপ প্রত্যেক কারণেরই একটি কার্য থাকে, মানসিক জগতে, নীতির জগতেও প্রত্যেক কারণ বা সকাম কর্মেরই একটি ফল বা কার্য থাকে।

একই ভাবে, ব্রহ্মজ্ঞান পূর্বোক্ত অর্থে সকাম কর্ম না হলেও নিশ্চয়ই একটি কারণবিশেষ এবং সেই কারণের কার্যই হ'ল পূর্বকৃত, সঞ্চিত অভুক্ত কর্মের বিনাশ। এরূপ সকাম কর্মের ফলদায়িনী শক্তি যেরূপ আছে একদিকে, সেরূপ অন্যদিকেও ব্রহ্মজ্ঞানেরও সকল সকাম কর্মের ধ্বংস সাধন করারও শক্তি আছে এই সঙ্গে। দুই শক্তির সংঘর্ষে স্বভাবতঃই প্রবলতর শক্তিরই জয় হয়। সেজন্য, এক্ষেত্রে জ্ঞানের শক্তিই কর্মের শক্তির অপেক্ষা প্রবলতর বলে, সেই জ্ঞানশক্তি বলে কর্মশক্তি ব্যাহত হয়। এই একই কারণে, প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপক্ষয়ের বিধানও ন্যায়সঙ্গত, যেহেতু প্রায়শ্চিত্তাদির পাপক্ষয়কারিণী শক্তি সেই সকল পাপকর্মের ফলদায়িনী শক্তির অপেক্ষা প্রবলতর। সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞানধন্য মুমুক্ষুর পূর্বকৃত, সঞ্চিত পাপপুণ্যাদি বা সকাম কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিঃশেষে বিনষ্ট হয়ে যায়। তাঁর ভবিষ্য কর্ম সম্বন্ধে অবশ্য কোনপ্রকার অসুবিধা নেই, যেহেতু কর্মবাদানুসারেই, কেবলমাত্র সকাম কর্মেরই ফলভোগের প্রশ্ন উঠে, নিষ্কাম কর্মের নয় এবং ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরে জীবন্মুক্ত দ্বারা কৃত সকল কর্মই ত নিষ্কাম কর্ম। সেজন্য শঙ্কর বলছেন:

"তদধিগমে উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।"

"ব্রহ্মাধিগমে সত্যুত্তর-পূর্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ ভবতঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-১-১৩)

"ন তস্য দগ্ধবীজত্বাৎ।"

(৪-১-১৯)

অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে, ভবিষ্যৎ পাপের অশ্লেষ ও পূর্ব-সঞ্চিত পাপের বিনাশ হয়। জ্ঞানের দ্বারা সকাম কর্মের ফলপ্রদায়িনী শক্তি দগ্ধ হয়ে যায়।

ভবিষ্যৎ পাপের অশ্লেষ হয়, অথবা ব্রহ্মজ্ঞানী ভবিষ্য পাপের দ্বারা আর লিপ্ত হন না, যেহেতু সেই সময়ে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে 'পাপের' কোনরূপ প্রশ্নই থাকে না। তার কারণ হ'ল এই যে, সেই সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানীর উপলব্ধি হয় এইরূপ:

"পূর্ব-প্রসিদ্ধ-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-স্বরূপ-বিপরীতং হি ত্রিষ্বপি কালেষু অকর্তৃত্বাভোক্তৃত্ব-স্বরূপং ব্রহ্মাহমস্মি, নেতঃ পূর্বমপি কর্তা ভোক্তা বা অহমাসং, নেদানীং নাপি ভবিষ্যতি কালে ইতি ব্রহ্মবিদবগচ্ছতি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-১-১৩)

অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানী উপলব্ধি করেন: "পূর্বে আমি নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলে জানতাম, কিন্তু এক্ষণে আমি যে ত্রিকালেও কর্তা ও ভোক্তা নই, আমিই যে স্বয়ং ব্রহ্ম—এই উপলব্ধি আমার হয়েছে। বস্তুতঃ আমি উপলব্ধি করছি যে, পূর্বেও আমি কর্তা ও ভোক্তা ছিলাম না, বর্তমানেও নেই, ভবিষ্যতেও হব না।"

এরূপ ব্রহ্মাত্মভাব থেকেই তার ভবিষ্য কর্ম উদ্ভূত হয় বলে, সেই কর্ম সম্পূর্ণরূপেই নিষ্কাম কর্ম—কর্তৃত্বাভিমান

তাতে নেই, ভোগাকাঙ্ক্ষাও নয় বিন্দুমাত্রও। সেজন্যই ব্রহ্মজ্ঞানীর ভবিষ্য কর্ম তাঁতে লিপ্ত হয় না, তাঁর পাপেরও হেতু হয় না।

পুনরায়, য পূর্বেই বলা হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞানীর সঞ্চিত পূর্বকর্মের বিনাশ হয়ঃ

"এবমেব চ মোক্ষ উৎপদ্যতে। অন্যথা হ্যনাদিকাল প্রবৃত্তানাং কর্মণাং ক্ষয়াভাবে মোক্ষাভাবঃ স্যাৎ।"

(ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ৪-১-১৩)

অর্থাৎ, পূর্বসঞ্চিত অভুক্ত, সকাম কর্মের বিনাশসাধন হয় বলেই মোক্ষও উৎপন্ন হয়। অন্যথ, অনাদি-কাল-সঞ্চিত কর্মের ক্ষয়াভাবে, মোক্ষেরও অভাব হ'ত নিশ্চয়ই।

পাপ সম্বন্ধে উপরে যা বলা হ'ল, পুণ্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। পাপ ও পুণ্য উভয়ই সকাম কর্মের ফল—শাস্ত্রবিরোধী, শাস্ত্রনিষিদ্ধ মন্দ কর্মের ফল হ'ল পাপ; শাস্ত্রানুযায়ী, শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্মের ফল হ'ল পুণ্য। কিন্তু উভয়বিধ কর্মই ভোগেচ্ছাপ্রসূত, সকাম কর্ম বলে প্রথমবিধ কর্মের ফল নরক, দ্বিতীয়বিধ কর্মের ফল স্বর্গ—নরক ও স্বর্গ উভয়স্থান থেকেই পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী, অর্জিত পাপ ও পুণ্যের ফলভোগ যথাক্রমে নরকে ও স্বর্গে পরিসমাপ্ত হলেই, পাপী ও পুণ্যবান্ অবশিষ্ট কর্মফল ভোগের জন্য সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। সেজন্য, সকাম কর্মপ্রসূত পাপ-পুণ্য সমভাবে মোক্ষবিরোধী বলে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে পূর্বসঞ্চিত, অভুক্ত পাপ ও পুণ্য সমভাবেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

"ইতরস্যাপি পুণ্যস্য কর্মণ এবমঘবদসংশ্লেষো বিনাশশ্চ জ্ঞানবতো ভবতঃ। কুতঃ? তস্যাপি স্বফলহেতুত্বেন জ্ঞানফল প্রতিবন্ধিত্ব-প্রসঙ্গাৎ।"

(ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, ৪-১-১৪)

অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে, পাপের ন্যায়, ভবিষ্য পুণ্যকর্মেরও অশ্লেষ এবং পূর্বসঞ্চিত পুণ্যকর্মের বিনাশ হয়, যেহেতু পুণ্যকর্মও ফলপ্রসবী বলে জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতিবন্ধক।

অবশ্য, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে, সকল পুণ্যকর্মই বিনষ্ট হয় না, কেবলমাত্র 'কাম্য' কর্মই বা সকাম পুণ্যকর্মই বিনষ্ট হয়, 'নিত্য' ও 'নৈমিত্তিক' পুণ্য কর্ম নয়। শাস্ত্রোপদিষ্ট, গায়ত্রী-মন্ত্রোচ্চারণ, ত্রিসন্ধ্যাহ্নিক করণাদি প্রমুখ নিত্যকর্ম ও অগ্নিহোত্র-শ্রাদ্ধাদি প্রমুখ নৈমিত্তিক কর্ম, চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে এবং নির্মল চিত্তেই জ্ঞানের উদয় সম্ভবপর। সেই দিক থেকে এই সকল 'নিত্য' ও 'নৈমিত্তিক' কর্ম মোক্ষের সহায়ক। সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েও এই সকল কর্মের বিনাশ হয় না। (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-১-১৬—১৮)

এরূপে, ভূত ও ভবিষ্য সকাম কর্ম যে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে নিঃশেষে পরিলুপ্ত হয়ে যায়—তা সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, বর্তমান সকাম-কর্ম বা প্রারব্ধ কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানোদয়েও বিদ্যমান থাকে কিনা।

এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে অনারব্ধ কর্মেরই নাশ হয়, আরব্ধ কর্মের নয়। আরব্ধ কর্মেরও তৎক্ষণাৎ নাশ হলে, আরব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ যে বর্তমান দেহেন্দ্রিয়াদি, তারও ধ্বংসসাধন হ'ত সেই ক্ষণেই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দৃষ্ট হয় যে, তত্ত্বজ্ঞানীরও শরীরাদি বিদ্যমান থাকে। যদিও জ্ঞানবলে, ব্রহ্মজ্ঞ, মুক্তপুরুষ অধ্যাস-বিমুক্ত হন বলে, তিনি আর পূর্ববৎ দেহমন প্রভৃতির ধর্ম, অবস্থা প্রভৃতি দ্বারা বিপর্যস্ত হন না, তথাপি যখন দেহাদির অস্তিত্ব থাকে, তখন দেহাদির কারণস্বরূপ প্রারব্ধ কর্মেরও যে অস্তিত্ব নিশ্চয়ই থাকে, তা নিঃসন্দেহ। শঙ্কর বলছেন ঃ

"অপ্রবৃত্তফলে এব পূর্বে জন্মান্তর-সঞ্চিতে অস্মিন্নপি চ জন্মনি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ সঞ্চিতে সুকৃত দুষ্কৃতে জ্ঞানাধিগমাৎ ক্ষীয়েতে, ন ত্বারব্ধকার্যে সামিভুক্তফলে, যাভ্যামেতদ্ ব্রহ্মজ্ঞানায়তনং জন্ম নির্মিতম্।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-১-১৫)

অর্থাৎ, জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত এবং বর্তমান জন্মেই কৃত অনারব্ধ কর্ম বা যে সকল কর্ম অদ্যাপি ফলপ্রসব করতে আরম্ভই করে নি, সেই সকল কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যে সকল কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্বেই যথারীতি ফলপ্রসব করতে আরম্ভ করে দিয়েছে এবং বর্তমান জন্ম ও দেহাদির সৃষ্টি করেছে—যে জন্মে ও যে দেহাদিরূপ আয়তন বা আশ্রয়েই এখন ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়েছে—সেই সকল অর্দ্ধভুক্ত, প্রারব্ধ কর্ম বিনষ্ট হয় না।

যদি প্রশ্ন হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানের যদি কর্মক্ষয়ের শক্তিই থাকে, তা হলে ত তা সকল সকাম কর্মই নির্বিশেষে বিনষ্ট করে দেবে—অনারব্ধ ও আরব্ধ কর্মের মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ এস্থলে করা যায় কিরূপে?—তার উত্তর হ'ল এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান বর্তমান দেহাদির আশ্রয়েই উৎপন্ন হয়েছে, একটি অবলম্বন ব্যতীত ত জ্ঞানের উদ্ভব হতে পারে না। সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের জন্য বর্তমান দেহাদি অত্যাবশ্যক। এই ভাবে, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যখন বর্তমান জন্ম ও দেহাদি আরব্ধই হয়ে গিয়েছে, তখন তা তাদের অন্তর্নিহিত গতিবেগ-বলেই কিছুদিন চলতে থাকবে—যেমন কুলালচক্র একবার সবেগে ঘুরতে আরম্ভ করলে, বাধাপ্রাপ্ত না হলে, গতিবেগ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত তা সমানে ঘুরতেই থাকে। এস্থলেও, ব্রহ্মজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের ধ্বংস সাধন করে সকাম কর্মের মূলোচ্ছেদ করলেও, প্রারব্ধ সকাম কর্মের সংস্কার কিছুদিন অনুবর্তন করে, যারই ফলে ব্রহ্মজ্ঞানীকেও কিছুদিন শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়। এস্থলে শঙ্কর "দ্বিচন্দ্র জ্ঞানের"

দৃষ্টান্ত দিয়েছেন (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-১-১৫) অঙ্গুলীরূপ উপাধির দ্বারা, অথবা অঙ্গুলী দ্বারা চক্ষু চেপে ধরলে, 'এক চন্দ্রও দুই বলে ভ্রম হয়। এস্থলে, কিছুক্ষণ অঙ্গুলী দ্বারা চক্ষু চেপে ধরে ছেড়ে দিলেও, অর্থাৎ অঙ্গুলীরূপ উপাধির বিলয় হলেও পূর্ব চাপের ফলে কিছুক্ষণ যেন দ্বিচন্দ্র দর্শনই হয়।

ছান্দোগ্যোপনিষদ-ভাষ্যে শঙ্কর নিক্ষিপ্ত বাণের দৃষ্টান্তও দিয়েছেন (৬-১৪-২)। বাণ একবার নিক্ষিপ্ত হলে লক্ষ্যভেদের পরও তার গতি নিবৃত্তি হয় না, আরব্ধ বেগক্ষয়েই কেবল সেই গতির নিবৃত্তি হয়। একই ভাবে, জ্ঞানী মোক্ষরূপ লক্ষ্য লাভ করবার পরেও তাঁর আরব্ধ কর্ম ও তৎপ্রসূত দেহাদি বিনষ্ট হয় না।

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়েও, শঙ্কর এই একই উদাহরণের উল্লেখ করেছেন ঃ

"প্রবৃত্তফলস্য তু কর্মাশয়স্য মুক্তেষোরিব বেগক্ষয়াৎ নিবৃত্তিঃ।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ৩-৩-৩২)

এস্থলে শঙ্কর অপর একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণিত করেছেন যে, জীবন্মুক্তের দেহেন্দ্রিয়াদি ও কর্মসমূহ নূতন ভোগাঙ্কুরের সৃষ্টি করে না কোনক্রমেই। যেমন, অগ্নি দ্বারা শালিবীজের একাংশ দগ্ধ হলেও, অন্যাংশ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হতে পারে না, তেমনি জ্ঞানদ্বারা প্রারব্ধাতিরিক্ত অন্য সকল কর্মই দগ্ধ হয়ে গেলে প্রারব্ধ কর্মও ভোগাঙ্কুর উৎপন্ন করতে অপারগ হয়। (ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, ৩-৩-৩২)

আর একটি সাধারণ দৃষ্টান্তও আমরা গ্রহণ করতে পারি। একটি তপ্ত পাত্র করতলে রেখে কিছু পরে উঠিয়ে নিলেও করতলে সেই তাপ কিছুক্ষণ ধরে স্পষ্ট অনুভূত হয়। ভামতী-কার বাচস্পতি মিশ্রও এই সূত্রের উপর তাঁর "ভামতী" টীকায় একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম করলে, স্বভাবতঃই ভয়-কম্পাদির উদ্রেক হয়। পরে যখন রজ্জু জ্ঞানোদয়ে মিথ্যা সর্প-জ্ঞান দূরীভূত হয়, তখনও কিন্তু ভয় দূর হলেও তৎক্ষণাৎ কম্পাদির নিবৃত্তি হয় না, কিছুকাল ধরে অঙ্গকম্পনাদি চলতেই থাকে। অর্থাৎ, একটি কার্য্য আরম্ভ হলে, তার মূল কারণ অপসৃত হয়ে গেলেও, কার্য্যটির বেগ পূর্ব্বতন বেগবলেই চলতে থাকে কিছুক্ষণ, ইংরেজীতে যাকে বলে 'After-effect'। এইটিকেই বলা হয়েছে 'সংস্কার'। একই ভাবে, দেহাদির কারণ মিথ্যাজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে গেলেও, মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার অনুবর্ত্তন করে, সেজন্যই তত্ত্বজ্ঞানীর বা জীবন্মুক্তের শরীর ধারণও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

অপর পক্ষে, এ কথাও বলে লাভ নেই যে, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানীর শরীরাদি আছে, সে হেতু তিনি মুক্ত নন। মুক্তির সাধক হ'ল ব্রহ্মজ্ঞান; সেজন্য যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মজ্ঞান, সেই মুহূর্ত্তেই মুক্তি—এই ত ন্যায্য কথা। অপর পক্ষে, বন্ধের সাধক হ'ল মিথ্যাজ্ঞান; সে জন্য যে মুহূর্ত্তেই মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ, সেই মুহূর্ত্তেই বন্ধনেরও বিনাশ—এও ত ন্যায্য কথা। সেজন্য, সম্যগ্দর্শন, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্ভব হলেও দেহপাতের পূর্ব্ব পর্যন্ত ভেদজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বিদ্যমান থাকে এবং সংসারনিবাসী ও দেহধারী বলে, ব্রহ্মজ্ঞ ও মোক্ষ লাভে সমর্থ হয় না—এই আপত্তির উত্তরে শঙ্কর বলছেন—

"ন, নিমিত্তাভাবাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-১-১৯)

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে বন্ধের কারণ বা মিথ্যাজ্ঞান আর বিদ্যমান থাকে না বলে বন্ধ বা সংসারাবস্থাও বিদ্যমান থাকতে পারে না। সেজন্য সেই অবস্থায়, আরব্ধকর্ম্মের ভোগ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

অবশ্য, এরূপ ভোগও সাধারণ ভোগ নয়, সকাম ভোগ নয়, নিষ্কাম ভোগ, যেহেতু দেহধারী ও সংসারান্তর্গত হলেও, যা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞানী বদ্ধজীব নন, মুক্ত। সেজন্য তিনি যেন দেহ-মনোবিশিষ্ট হলেও, দেহ, মন প্রভৃতি ও আত্মার সম্পূর্ণ বিভিন্নত্ব ও বিশ্বসংসারের মিথ্যাত্ব পরিপূর্ণ উপলব্ধি করেন। অতএব সংসারে বাস করেও তিনি, পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, সংসারে লিপ্ত হন না, জাগতিক সুখ দুঃখেও অভিভূত হন না। সেজন্য, জীবন্মুক্তের জীবন দৃশ্যতঃ সাধারণ দেহধারীর জীবন হলেও, বস্তুতঃ তা নয়।

এ সম্বন্ধে পরে আরও কিছু আলোচনা করা হবে।

জামাইষষ্ঠী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নীরদ ছিপ ফেলে মাছ ধরছিল। সতীর ইচ্ছাটা ছিল আস্তে আস্তে পেছন থেকে চোখ দুটো টিপে ধরে, কিন্তু গড়ানে পুকুরপারে একটা পা একটু পিছলে গিয়ে যে শব্দটুকু হ'ল, তাইতে নীরদ ফিরে চাওয়ায় আর পারল না। নীরদ বলল,—"তুই এলি? যে রকম অপয়া!"

সতী গিয়ে পাশে বসল, প্রশ্ন করলে—"কতক্ষণ এসেছিস?"

"ঘণ্টাখানেক হবে"

"ক'টা ধরলি তার ভেতর? ভারী যে পয়মন্ত..."

"তেমন খাচ্ছে কই যে ধরব?"

"তাহলে ত আরও পয়মন্ত! ছায়া মাড়ায় না!"

"বকবি নি একেবারে। চুপ করে দেখবি ত দেখ, নয় ত যা।"

"দেখবটা কি? ফাৎনাটা জলে ভাসছে আর পয়মন্ত তার দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে আছে?"

নীরদ ঘাড়টা ফিরিয়ে চোখ পাকিয়ে চাইল। সতীও চোখ দুটো যথাসাধ্য কড়া করে চেয়ে রইল তার দিকে, তার পর হেসে ফেলল।

নীরদ মুখটা ঘুরিয়ে আবার ফাৎনায় মনোনিবেশ করল। গর গর করতে লাগল—"এলেন জ্বালাতে—অপয়া—যাও একটু-আধটু ঠোকরাচ্ছিল..."

"জ্বালাব ত সারাজীবন, এখন হয়েছে কি?" আবার হেসে উঠে আঙুল টিপে আর একটু নেমে বসল সতী, যাতে মুখটা ভাল করে দেখা যায়। তার পর হঠাৎ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বলে উঠল—"আচ্ছা, কে অপয়া কে পয়মন্ত এইবার দেখ না..."

নীরদ ছিপটা সরিয়ে ফেলতে না ফেলতেই ছুঁয়ে দিল।

প্রথমটা মনে হ'ল হাত সরাতে সুতায় যে টান পড়ল তার জন্যেই বুঝি, তার পর হাত স্থির হতেও টপ টপ করে গোটা চারেক গোত্তা মারল ফাৎনার মাথাটা। নীরদ ছিপটা দু'হাতে মুঠিয়ে সতর্ক হয়ে বসতেই আবার ভেসে উঠল।

সতী বলল—"ঐ দেখ, দেখলি?"

"চুপ কর, চারে মাছ এসেছে।"

"আর ওপরে কে এসেছে, সেটা বুঝি..."

কয়েকটা আরও দ্রুত গোত্তা মেরে ফাৎনাটা একেবারে বোঁ করে ডুবে গেল। সুতায় টান পড়ে হুইল গেল ঘুরে, নীরদ সুতায় আঙুলের টিপ দিয়ে টান মারতেই হাতটা থচ করে গেল থেমে—গেঁথেছে মাছ।

এর পর আর কথা কাটাকাটি নয়, দুজনের মন একেবারে সুতার গতিবিধির ওপর। নীরদ একেবারেই চুপ, সতী মাঝে মাঝে পরামর্শ দিচ্ছে—"ঢিল দে—জুটো এবার—খাঁয়ে নে রে, খাঁয়ে নে—ঢিল, ঢিল..."

—চাপা গলায়।

কোনটা নিচ্ছে নীরদ—হয়ত তার মতলবের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বলেই, কোনটা আবার নিচ্ছেও না। খেলিয়ে যাচ্ছে।

"নিশ্চয় খুব বড় কাৎলা রে, কাউকে ডাকি!"

হয়ত সমস্তটুকু পরিশ্রমেই নয়, তবু মুখটা একটু রাঙা হয়ে উঠেছে নীরদের। বলল—"চুপ।"

একটু চুপই ছিল সতী। বেশ খেলাচ্ছে মাছটা।

তার পর বলল—"আধ মণ না হোক, সের পনের হবেই, ডেকেই আনি কাউকে"

উঠতে যাচ্ছিল, নীরদ চাপা গলায় শাসনের ভঙ্গীতে বলল—"খবরদার যাবি নি বলছি সতী। চুরি করে ধরছি, দাদা, কাকা কেউ জানে না।"

একটা বিশ্রী মোচড় দিয়েছে মাছটা, হাত শক্ত করে সামলে নিয়ে বলল—"ঠিক ছেড়ে যাবে হতভাগা মেয়ের জন্যে। যত বলছি চুপ করে বোস..."

এর পর চুপটি করে বসেই রইল সতী। বেশী দেরীও হ'ল না আর, ক্লান্ত মাছটা এলিয়ে পড়ল। আধ মণও নয়, পনের সেরও নয়, তিন-চার সেরের মধ্যে। ছেলেমানুষের হাত, খানিকটা নাকাল করেছে। মাছটা কাৎলাই।

একটা ছোট থলে এনেছে। মাছটা তার মধ্যে পুরে একটু ওপরে গিয়ে একটা আগাছার ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে আবার এসে বসল নীরদ। আবার বলল—"চুরি করে এসেছি, ওরা কেউ জানে না।"

মনটা ভাল হয়েছে। বলল—"না রে সতী, তোর পয় আছে। তুই-ই না হয় এবার টোপটা দে পরিয়ে। পারবি ত?"

"মস্ত শক্ত কাজ!"

টোপ পরাতে পরাতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে বলল—"তা হ্যাঁ রে, যা-ই করে আসিস, মাছ ত আবার সেই বাড়ীতে গিয়েই উঠবে।"

"খুড়ীমা আর দিদি আমার দিকেই। খুড়ীমাই ত বললে—"উনি পীরগঞ্জের হাটে গেছেন দেরী হবে, এই সময় দেখ্ না পুকুরে ছিপটা ফেলে একবার যদি কিছু পাস.... আজ আবার জামাইষষ্ঠী কিনা।''

"হুঁ, দেখলাম, শীলাদির বর এসেছে।"

একটা দূর্বার শীষ তুলে নিয়ে কুট কুট করে দাঁতে কাটতে লাগল। একসময় ঠোঁটে একটু হাসি চেপে প্রশ্ন করল—"তাই বুঝি শীলাদি তোর দিকে রে? পাঠিয়ে দিলে মাছ ধরতে?"

"শীলাদি পাঠাবে কেন? শুনলি খুড়ীমা পাঠিয়েছে।"

"ঐ হ'ল, ইচ্ছেটা ত ছিল শীলাদির, সেই জন্যেই ত বললি, তোর দিকে।"

"তা থাকে না ইচ্ছে? তোরও যখন বিয়ে হবে, মনে হবে বরের পাতে পাঁচ রকম..."

"নে, হয়েছে। বর ত তুই, পাঁশ দিয়ে ভাল করে মুখ মুছে বসে থাকিস...''

খিলখিল করে হেসে উঠল, তার পর গম্ভীর হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল—"তা হ্যাঁরে, তুই মাছ ধরে নিয়ে যাবি, তবে জামাইষষ্ঠীর রান্না হবে? যদি না উঠত?...বাছা আমার, আলুভাতে ভাত খেয়ে সোনা মুখ করে উঠে যাও"

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। ফাৎনার মাথাটা টুপ টুপ করে ডুব দিল ক'বার। নীরদ বলল—"চুপ কর, চারের মাছ ভাগিয়ে দিচ্ছিস।...শুনলি কাকা হাটে গেছে জামাইষষ্ঠীর বাজার করতে। কি মাছ পায়, কতটা পায় না পায়, তাই পাঠিয়ে দিলে আমায়..."

"চুরি করে মাছ ধরে নিয়ে আয়..."

আবার খিলখিল খিলখিল।

নীরদ জ্বালাতন হয়ে উঠল, বলল—"তুই যা, বেরো বলছি সতী। নইলে, আমার চার নষ্ট করছিস, ছিপ তুলেই দোব ঘা কতক বসিয়ে।"

বসেই রইল সতী, শুধু খিলখিলটা চাপা খুকখুকে নেমে এল। কি যেন ভাবছে।

একটু পরে বলল—"ছিপগাছা ত তোর পিঠেই ভাঙবে আজ। কাকা বলবে, 'আমি হাট থেকে কৈ মাছ নিয়ে এলাম, হেঁসেলে ঢুকে কাৎলা হয়ে গেল কি করে?' তখন খুড়ীমা দিদি ঠ্যাকাবে কি করে তা বলেছে তোকে? কাকার বাড়ি নিজেরা পিঠ পেতে নেবে?"

"সে ভাবনা আমার, তোর ত নয়। তুই চুপ করবি কিনা?"

"নয় যেন আমার ভাবনা। আহা, শীলাদির বর জামাইষষ্ঠীতে কেমন কাৎলা মাছের মুড়ো খাচ্ছে, আর আমার বরের ভাগ্যে সেই ছিপের..."

নীরদ ছিপটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নেওয়ার জোগাড় করতেই খিলখিল করে হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি উঠে হাত কয়েক ওপরে গিয়ে বসল।

একটু চুপচাপই গেল। চারে মাছ এসেছে, ঠোকরাচ্ছে ঘন ঘন। একবার তারই ফাঁকে নীরদ মাথা ঘুরিয়ে ওপরের দিকে চেয়ে দেখল, সতী সেই রকম দাঁতে ঘাসের শীষ কাটতে কাটতে কি ভাবছে। বলল—"গেলি নি ত?"

সতী বলল—"শোন্, একটা কথা ভাবছি। তার চেয়ে বরং মাছটা আমায় দে, পালটে দি সব।"

"কাৎলার মুড়ো দেখে নোলা সগবগ করছে, না?"

"কেন, করতে নেই? জামাইশালাদের একচেটে নাকি ...দিবি?"

সেই হাসি চলেছেই। ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দেওয়ার মুখেই গোটাকতক দ্রুত টোকা দিয়ে ফাৎনাটা আবার বোঁ করে ডুবে গেল। ঠিক তালের মাথায় খিঁচ না দিতে পারার জন্যই বোধ হয় এবার আর গাঁথল না মাছ। "তবে রে!"—বলে শূন্য বঁড়শিশুদ্ধ ছিপটা ডাঙায় ফেলে নীরদ দু' লাফে ওপরে উঠে গিয়েই সতীর ঘাড়টা ধরে ফেলে দুমদুম করে দুটো কিল দিল বসিয়ে, বলল—"এই খা, খা, আর খাবি? যত বলছি চুপ কর, চারে মাছ এসেছে..."

দাঁড়িয়ে উঠল সতী, ঠোঁট দুটো জুড়ো করে মুখ ফুলিয়ে বলল—"ড্যাকরা! তুই-ই ক'টা দাগা খাস দেখছি!...এই চললাম জল্‌দী কাকার কাছে..."

গটগট করে পা বাড়ালে।

নীরদ ছিপ নিয়ে বসতে যাচ্ছিল, আবার দাঁড়িয়ে উঠে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"এই সতী, যাস নি, তোর দিব্যি রইল। মা কালীর দিব্যি। আমার দিব্যি। আমি মরে গেলে কি হবে জানিস ত?"

ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন হ'ল—"দিবি মাছটা তা হলে?''

"এর পরেরটা তোর। দশ সের, আধ মণ, যা হয়।... চারে রুই-মিরগেল এসেছে, মুড়ো-সার কাৎলা নিয়ে করবিই বা কি?"

"কি করি দেখবি।''

"এই শোন্।...এক্ষুনি ধরব, তুই বরং পিঠে হাত দিয়ে বোস। যাস নে বলছি।"

"এই মাছটা যদি দিস।"

যেতে যেতেই ঘুরে দেখল নীরদ আবার ছিপ হাতে করেছে। অগ্রাহ্যের ভাবে বলল—"যাঃ, যাঃ, ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আয়। মাছ নেবে। লুভিষ্টি কোথাকার।"

নেপথ্য থেকে উত্তর এল—"দেখিস।"

বঁড়শিতে টোপ গাঁথতে পরাতে নীরদ প্রত্যুত্তর দিল—"ফাঁসিতে লটকে দিস্।"

ঠিক ফাঁসিতে লটকাবার ব্যাপার না হলেও জয়হরি একেবারেই পছন্দ করেন না যে, এ পুকুরে মাছ ধরে কেউ। পুকুরটা এই পাড়ারই বোসেদের। ওঁর বাল্যবন্ধু নিতাই বোস সপরিবারে কলকাতাবাসী এখন। বাড়ী, পুকুর, বাগান জয়হরির জিম্মায়। একটু কড়া প্রিন্‌সিপ্লের লোক, বন্ধু অবশ্য চান নি গাছের ফল, পুকুরের মাছ যায় মাঝে মাঝে জয়হরির বাড়ী। ওর কড়াকড়ির জন্য অনুযোগও করেন জয়হরি কিন্তু প্রিনসিপ্লটি এক ভাবেই ধরে আছেন। বাড়ীর মেয়েরা যে প্রয়োজন বুঝে ব্যবস্থা করে নেয় কখনও কখনও, তারও কারণ নিতাইয়ের বলা আছে আলাদা করে। কিন্তু ওই বলা আছে বলেই বেশী সতর্ক থাকেন জয়হরি, বিশেষ করে এই রকম পাল পার্বণের দিনে।

মাছ যে না ধরা হয় এমন নয়। হ'লে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন, নিজের জন্যও রাখেন, তাতে যে কার্পণ্য করেন এমনও নয়, তবে জামাইষষ্ঠীর জন্য বোস-পুকুর থেকে মাছ ধরে আনবে এ তাঁর একেবারেই অচিন্তনীয়। হাটে বেরুবার সময় কড়াভাবেই বারণ করে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সতী আবার পাড়ের ওপরে এসে বসল, প্রশ্ন করল—"আর উঠল রে?"

নীরদ ঘুরে চাইল, বলল—"এসেছিস আবার? গেছলি ত কাকাকে বলতে?"

"বয়ে গেছে যেতে। চুগলি খাওয়া ব্যবসা নাকি, যে মুখ খারাপ করতে যাব?"

"যাস নি ত?"

"গরজটা কিসের যে, যেতে গেলাম নিজের পায়ের ব্যথা ঘটিয়ে?...হ্যাঁ রে, মাছটা তা হলে দিচ্ছিস ত?"

মনটা ভাল আছে, এবার নীরদই হেসে উঠল খিলখিল করে, বলল—"দেখ! জলার পেত্নীর মত ক্রমাগত পেছন থেকে 'মাছ দিবি নে? মাছ দিবি নে?'...নেমে আয়, বোস, বলছি ত এর পরে যা উঠুক সে তোর।"

"আর, না উঠলে?"

"বুঝব তোর বরাত মন্দ।"

"একটু আটকালো না বলতে মুখে? আমার বরাত ধার করে অত বড় মাছটা ধরে..."

"তা, স্ত্রীভাগ্যে ধন ত শাস্ত্রের কথা। বাজে না বকে একটু নেমে আয় দিকিন। মশার কামড়ে পিঠটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, চুলকে দে একটু।"

ঘাসের শীষ কাটতে কাটতে ওপারে চেয়েছিল সতী। বলল—"তার মানে পিঠে হাত দিয়ে বোস, তোর পয়ে আর একটা ধরি..."

"সে ত তোরই।"

"হয়েছে, আর বসে কাজ নেই। যেখানে আছি, বেশ আছি।"

কথা কাটাকাটিতে আরও খানিকটা গেল। তার পর এক সময় নীরদ বলে উঠল—"নাঃ, আর খাবে না, এবার উঠি। ঘায়েল করা মাছ ফিরে গেছে, আর চারে মাছ আসে?"

হুইল ঘুরিয়ে সুতো জড়াতে আরম্ভ করেছে, সতী পুকুরের ওপারে সেই ভাবে চেয়েছিল, বলল—"আর একটু বোস্ না। মাছেদের যদি অত মনে থাকত তা হলে আর রক্ষে ছিল না।"

"না, উঠি। কাকারও হাট থেকে ফেরবার সময় হয়ে এল, এই বেলা আস্তে আস্তে খিড়কির দোর দিয়ে ঢুকে পড়িগে।"

"তা হলেই বেঁচে যাবি যেন!"

"খুড়ীমা থাকবে, প্রথম দেখার ধাক্কাটা মাথা পেতে নেবে'খন। যদি রাগের মাথায় এখানে এসে পড়ে ত কে সামলাবে?"

"চিরকালটা যাকে সামলাতে হবে বোকারামকে, সেই সামলাবে। তুই বোস্ ত। না হয় আমি নেমে আসছি। ...ঐ যাঃ, আর নেমে আসা! জহুরী কাকা এসেই গেল ঐ।"

"কৈ!"

আধো-ওঠা হয়ে বসে গলা তুলে চাইল নীরদ। পুকুরের পাড়ে পাড়ে রাস্তাটা ঘুরে এসেছে। নীচু থেকে প্রথমে আওয়াজটাই শুনল নীরদ—"নীরে আছিস?" তার পর দেখলও, গন্‌গনিয়ে চলে আসছেন জয়হরি।

নিজের পায়ে ব্যথা ঘটিয়ে না গেলে যে খবরটা পৌঁছে দেওয়া যায় না এমন ত নয়; ছোট ভাই সন্তু রয়েছে, মেজদিদির পরম অনুগত আর এসব কাজে খুব দড়। ঠিক

তালের মাথায় পৌঁছেও গিয়েছিল। বাইরেই একটি নিরিবিলি জায়গা বেছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, জয়হরি জ্যৈষ্ঠের রোদ মাথায় করে বাড়ীতে ঢোকবার আগেই খবরটুকু কানে তুলে দিয়ে সরে পড়েছে।

নজরে পড়তে জয়হরিও দাঁড়িয়ে পড়েছেন, বললেন—"এই ত রয়েছিস! উত্তর দিচ্ছিস না যে? তোকে কে আবার মাছ ধরতে বলেছে? আসছি আমি, যেমন বসে আছিস, থাকবি বসে ছিপ নিয়ে।"

এপারে এসে পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন—"উঠে আয়। মাছ কৈ? ক'টা ধরেছিস? কখন ধরেছিস? জ্যান্ত আছে, না মড়া?"

সতী উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখিয়েই ছিল, বলল—"মাছ ত ধরতে পারে নি, কাকা।"

"তুই জানিস? কখন এসেছিস?"

"অনেকক্ষণ। সতু গিয়ে খবর দিতেই তাড়াতাড়ি এসে এই পাড়ের ওপর বসে আছি। ধরে, ছেড়ে দিতে বলব জলে, না শোনে, জহুমী কাকাকে গিয়ে বলে দোব।"

কাছটিতে গিয়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ভালোবাসা পায়, ঠাণ্ডা করবার নিয়মকানুনগুলোও জানা আছে।

একটু নরম হয়েছেন জয়হরি। বললেন—"উঠে আসবি ছিপ গুটিয়ে, না বসে থাকবি ঐ রকম করে? একটা ছোট মেয়ের যে বুদ্ধিবিবেচনা আছে, তোমার এখনও পর্যন্ত তা হয় নি গর্দভ!...এলি উঠে, না নামব।"

উঠে আসবার ব্যবস্থাই করছিল নীরদ, তবে ছোট মেয়ের বুদ্ধিবিবেচনার দৌড় দেখে একটু থমকে পড়েছিল, এই যা। উঠে দাঁড়িয়ে কর কর করে হুইল গোটাতে লাগল।

সতী জয়হরির বাঁ হাতটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল, বলল—"চল, এবার আসবে'খন উঠে। তুমি ত আবার পীরগঞ্জের হাট থেকে তেতেপুড়ে আসছ!"

যেতে যেতে বলল—"কেন যে পরের পুকুরে মাছ ধরবার লোভ! আমি শুনেই গেছলাম তোমায় বলতে, শুনলাম হাটে গেছ, তখন মনে করলাম, নিজেই গিয়ে বসি ততক্ষণ..."

একবার ঘুরে দেখল, ছিপ নিয়ে ঘাড় হেঁট করে চলে আসছে নীরদ।

পুকুরের ওপারে গিয়ে রাস্তাটা দু'দিকে চলে গেছে, নীরদদের বাড়ীর দিকে আর সতীদের বাড়ীর দিকে। সতী বলল—"এবার বাড়ী যাই কাকা, এ্যাঁ?"

"যাও। একটু বেচাল দেখলেই আমায় খবর দেবে।"

"আমায় যে বলতে হবে না।"

অন্য দিক দিয়ে পুকুরটা ঘুরে মাছের থলেটা হাতে করে বাড়ীর দিকে চলল।

থলে উলটে উঠানে মাছটা ফেলতেই বড় বোন অরুণা বলল—"ওমা, কি চমৎকার মাছ! কোথা থেকে নিয়ে এলি রে?"

মাও ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—"নিশ্চয় নীরদ দিয়েছে। সতু এসে বলল তখন—ও ধরছে মেজদি বসে আছে...তা তুই নে..."

অরুণা বলল—"তুমি আর বকাবকি করো না মা। একটা মাছ দিয়েছে ত ভারী দিয়েছে।"

একটা যে সম্বন্ধের ইঙ্গিত রয়েছে তার কথা ভেবে একটু মুখ টিপে হাসল।

মা গম্ভীর হয়েই বললেন—"কোথায় কি তার ঠিক নেই। আর হলেও তোর ত হায়ালজ্জা আসবার সময় হয়েছে। আর কি, বার ছেড়ে তেরয় পড়তে চললি।"

গজগজ করতে করতে ভেতরে চলে গেলেন। সেখান থেকেই বললেন—"ওকে নেমন্তন্নটা করতে হবে, সে আক্কেলটা যেন থাকে। তুই-ই গিয়ে করে আসবি অরুণা।"

অরুণা কি বলতে যাচ্ছিল, সতী ঠোঁট দুটো জড়ো করে ওকেই একটু গলা নামিয়ে বলল—"সেই জন্যেই ত দিলে জোর করে।"

অরুণা বলল—"সত্যি নাকি? তা গিয়ে করে আয় নেমন্তন্নটা, লজ্জা কি! আমি মাছটা নিয়ে বসি।"

"হ্যাঃ, গেলাম অমনি! বলে—জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন করতে বলবি। ড্যাকরা, ওরই যেন কত হায়ালজ্জা!"

মুখটা ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

রাজোয়াড়ায় দুর্গোৎসব বা 'দশেরা'

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

আশ্বিন মাসের বা শারদীয়া দুর্গোৎসব কোন না কোন আকারে ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই আছে নানা নামে। রাজস্থানেও আছে নব রাত্রি নামে। 'দশেরা'ই বলা হয় যদিও।

মহালয়ার পরদিনেই দেবীপক্ষের প্রতিপদ থেকে বিজয়া-দশমীর পর একাদশী পর্যান্ত সেই উৎসবের বা অনুষ্ঠানের নিয়মের সীমা। নিয়ম উৎসব অনুষ্ঠান বললাম এই জন্য যে, একটি কঠোর নিয়ম আচারে এই কটি দিন সমস্ত রাজপুত ক্ষত্রিয়দের ঘরে ঘরে অস্ত্রাগারে দেবীশক্তির প্রতীক রূপে খড়্গ ও অস্ত্রশস্ত্র পূজা হয়। সমস্ত রাজা মহারাজা 'ঠাকুর' (জমীদার) রাজপুতের সকলের প্রাসাদে অট্টালিকায় ঘরে কুটীরে নিজের নিজের অস্ত্রশস্ত্রগুলি সম্বৎসর পরে পরিষ্কার করা হয়। পরম নিষ্ঠায় আমাদের দুর্গাপূজার মণ্ডপের মতই ঘরে ঘরে ঝুল ঝেড়ে চামচিকার বাসা ভেঙে চুনকাম করে। দেবীপূজার আয়োজনের মতই সে আয়োজন।

কিন্তু আমাদের দেশের দুর্গাপূজার মত কোন কিছুই নয়। মূর্ত্তি নেই। প্রতিমা নেই। ঠাকুরদালান বা চণ্ডীমণ্ডপও নেই। ষষ্ঠীর দিন থেকে দলে দলে নতুন কাপড় পরা ছেলে-মেয়ে, বৌ-ঝি, গিন্নীবান্নি, সাজাগোজা কুটুম-সাক্ষাৎ, অতিথি-অভ্যাগত, আমন্ত্রিত জনের ভীড় নেই। রবাহূত অনাহূত জনতাও নেই ঠাকুরদালানে। দেবীও নেই। দেবীর পুষ্পাঞ্জলী নেই, আরতি নেই। ঢাকের বাদ্য ঢাকীর নানারকম ভঙ্গীর চমৎকার নাচ আর বোলে আঙিনা মুখরিত করা নেই।

নেই, আগমনীর চমৎকার গানগুলি শরৎ কালের সূচনা থেকে।

গা তোলো গা তোলো বাঁধ মা কুন্তল

রাণী উমা তোমার এলো ঐ

এক কথায় গিরিরাজ দুহিতা উমা গৌরী পার্ব্বতীর পূজা বলে কিছুই নেই। বেলগাছ তলায় বোধনপূজা বোধনতলা বলেও কিছু নেই। মহামায়া জগজ্জননী দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী অসুরনাশিনী পূজার উৎসবও সে নয়। যাঁর পাশে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, সিদ্ধিদাতা গণপতি, বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী, সম্পদ-ঐশ্বর্য্যের দেবতা লক্ষ্মী আর সবার পিছনে ত্যাগী যোগী দেবাদিদেব শিব মঙ্গলের প্রতীক রূপে বিরাজ করেন।

এ হ'ল বীর ক্ষত্রিয় রাজপুতদের বংশানুক্রমে একটি কৌলিক চণ্ডী বা শক্তি উপাসনা আর এক ধরনের। দুর্গা দেবী নয়, শস্ত্র-রূপিণী চণ্ডীর প্রতীক মহাঘোরা চণ্ডীর পূজা। কত কালের প্রথা কে জানে। রাজা-মহারাজার জমিদার 'ঠাকুর'দের অস্ত্রাগারের দেওয়ালের গায়ে টাঙানো আছে নানা প্রহরণ, হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র, তীক্ষ্ণধার অসি বা তরোয়াল, নারাচ, কিরীট, কৃপাণ, খাঁড়া, বর্শা, সেকেলে প্রকাণ্ড বন্দুক, ছুরি-ছোরা, 'গুপ্তি', লাঠি, নানা আকারের হাতিয়ার ছোট বড়—কত না তার নাম—তার ঠিকানা নেই। (শিবাজীর 'বাঘ নখ'এর মত নিজস্ব প্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের নানা নামও থাকত) বিদেশী আধুনিক অস্ত্র তার মাঝে আছে। সেকেলে নানা আকারের ঢাল চর্ম্ম বর্ম্মও আছে।

এই এত অস্ত্র-শস্ত্র আর হাতিয়ার দেখার সুবিধা বা প্রথা ত সেকালে পর্দ্দানসীন মেয়েদের কখনও ছিল না। সহসা উদয়পুর-মহারাণার অস্ত্রাগার প্রদর্শনীতে একবার প্রবেশ করতে পেরে-ছিলাম। সেই দিনই শোনা কথা চাক্ষুষ হয়েছিল।

দেখলাম, পুরুষানুক্রমিক শত শত বছরের রাজপুত ক্ষত্রিয় বীর-পুরুষদের সম্মানিত সমাদৃত অস্ত্রশস্ত্র-শালা। তাতে রয়েছে, সম্রাট সাজাহানের কাছে উপহার পাওয়া রাণা অমর সিংহের তরোয়াল। মণিমুক্তা জড়োয়া কাজ করা বাঁট। রাণা 'সঙ্গে'র (সংগ্রাম সিংহ) প্রকাণ্ড লম্বা বিরাট ওজনের ভারী তরোয়াল— তাতেও মণিরত্ন খচিত। রাণা সঙ্গ মহাবীর ছিলেন। প্রায় সাত ফুট লম্বা ছিলেন। শরীরও সুবিশাল ছিল। তরোয়ালখানিও তেমনি। মনে হ'ল যেন অসুরের হাতের তলোয়ার বা হাতিয়ার। কি করে তাঁরা তুলতেন ভাবলাম। দেখলাম, রাণা প্রতাপের সিংহাসন থেকে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে আমরণ সঙ্গী—অরণ্য, পর্ব্বত-কান্তার, গুহায় বিশ্বস্ত সঙ্গী তরোয়ালখানি। যেদিন কয়টি বিশ্বস্ত অনুচর আর ছোট ছোট সন্তানগুলি ও মহিষীকে নিয়ে বনে বনে রাজপুত্র ভূটার জোয়ার জনার যবের রুটি খেয়ে স্বাধীনতায় ও দেশ-পুনরুদ্ধারের প্রাণপণ সংগ্রাম করছিলেন, সেদিনের সঙ্গী যারা— ছোট বড় কত অস্ত্র সাজানো রয়েছে তার সঙ্গে। মাথার লোহার শিরোস্ত্রাণ, পায়ের চামড়ার পটি, গায়ের লোহার বর্ম্ম, কোমরের শক্ত কোমরবন্ধ। যত অস্ত্র সবগুলির গায়ে টিকিট দিয়ে লেখা রয়েছে, কার অস্ত্র—কি অস্ত্র নাম তার। আরও কত রকমের হাতিয়ার, খাপ খোলা খাপে ঢাকা ছোট বড় আকারের।

আরও কত আনুসঙ্গিক দরকারী জিনিস। নির্ব্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সেই বীর জাতির প্রাণ হরণ ও প্রাণ দানের উন্মাদনা-ময় উপকরণ-সম্ভারগুলি দেখতে লাগলাম শুধু। কিবা বুঝি আমরা— মেয়েরা, অস্ত্র মহিমা! আর মারণাস্ত্রই ত। তবু কিন্তু মানুষ কত রকমের—তার শোভা আর কত কারুকার্য্য করেছে। কত সোনা মণি হীরে দিয়ে তাকে সাজিয়েছে ও রঞ্জিত করেছে। ভাবলাম, মরতে বসে বা মারতে গিয়েও তার কোন্ শিল্পীমন রক্ত-লুব্ধ—রক্তপানকারী অস্ত্রগুলিকে সুঠাম সুন্দর করে অলঙ্কৃত করার মোহ থেকে মুক্ত হয় নি। অস্ত্র যেন তার পরমা-প্রেয়সী নারী।

এ ত গেল রাজা-মহারাজার ঘরের হাতিয়ার কাহিনী। সাধারণ ক্ষত্রিয় রাজপুত ও অন্য ভীল মীনা মাওবি বন্যপার্ব্বত্য জাতিদেরও অস্ত্রাগারে, মানে শোবার বসবার ঘরের দেওয়ালেও অস্ত্রশস্ত্র কম থাকে না। একবার আমাদের এক নাপিত চাকরের ঘরে গিয়েছি। দেখি, দেওয়ালে কত রকমের ছোরা, ছুরি, তরোয়াল, বর্শা, সেকেলে বন্দুক রয়েছে। পুরাণো হয়ে গেছে খুব। মরচে ধরেছে। তবু তেল দিয়ে মাজা রয়েছে।

বললাম, 'কি করিস এ সব? বন্দুক ছুড়তে পারিস? বর্শা?' সে হাসলে। বললে, 'হাতিয়ার ছিল পূর্ব্বপুরুষের। এখনও আছে। ঘরে থাকা ভাল। পারি না পারি, দরকার হ'লে পারব নিশ্চয়।'

রোগা টিং-টিংয়ে নাপিতের ছেলে, জাতব্যবসা আর অন্য চাকরী করে গৃহস্থ বাড়ী। কিন্তু হাতিয়ার মহিমার মর্য্যাদাবোধ আছে মনে। রাজস্থানে অস্ত্র-আইনের কঠোরতা নেই। আর ঘরে হাতিয়ার থাকায় মানুষের আত্মরক্ষার সাহসও বজায় আছে। মেয়েরাও হাতিয়ার ধরে দরকার হলে।

এই 'নব রাত্রি'তে এমনি সাধারণ রাজপুত ক্ষত্রিয় থেকে রাজা-রাজরা ঠাকুরসর্দ্দারদের অস্ত্রাগারে অস্ত্রশস্ত্র পূজা। সে সব অস্ত্রাগারে সহজে কেউ ঢুকতে সেকালে পেত না। এখনও কঠোর নিয়ম আছে অনেক জায়গায়। এই অস্ত্ররূপিণী চণ্ডীর পূজামণ্ডপ যেমন পবিত্র তেমনি জনসাধারণের অপ্রবেশ ছিল। সর্ব্বসাধারণের পূজা-উৎসবের ঠাকুর দালান সে নয়। শুধু বিশ্বস্ত সামন্ত সর্দ্দার ও ঠাকুর (জমীদার)-দেরই রাজার সঙ্গে সেই পূজা করা আর যাতায়াতে অধিকার আছে। এবং আদি পূজাটি হয় কৌলিক একখানি খড়্গ বা খাঁড়ায়। ঐ খাঁড়াখানিই যেন মহাঘোরা চণ্ডী বা চামুণ্ডা দেবীর প্রতীক—যুদ্ধদেবী, রক্ষাদেবী ও কুলদেবতা।

প্রতিপদের আগে থেকেই অস্ত্রাগার পরিষ্কার করা, অস্ত্রশস্ত্রগুলি মাজাঘষা ও মরচে তোলা হয়। ঘরের দেওয়াল, আশপাশ ঝাড়া পরিষ্কার করা হয়। জীর্ণ সংস্কারও হয়। আর—আবার সমারোহে হাতিয়ারগুলি সাজানো ও নতুন করে টাঙানো হয়। রাজকীয় অস্ত্রশালাকে ওখানে বলে 'শিলেখানা' (উর্দু মনে হয়)।

তার পর প্রতিপদের দিন থেকে সুরু হয় মহিষাসুর মর্দ্দিনী দেবীর পূজা। কৌলিক খড়্গের প্রতীক।

সেদিন রাজস্থানের সমস্ত রাজা-মহারাজা সর্দ্দার ঠাকুরদের উপবাস কঠোর নিয়মে। স্নানাদির পর রাজারা সেই খাঁড়াখানির পূজা করেন। আর অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রেরও পূজা করেন। তার পর খাঁড়াখানি অস্ত্রাগার থেকে এনে কোন দেবীর মন্দিরে এক জায়গায় পুঁতে দেওয়া হয়। তার পর পূজা করেন দেবীর পুরোহিত।

জয়পুরে অম্বরেশ্বরীর মন্দিরে পূজা হয়। উদয়পুরে হয় 'মাতাচল' পাহাড়ে আর টোগাঁতেও হয়। এটিকে বলা হয় 'খড়্গ স্থাপনা'। অন্য রাজাদের ও জয়পুরের রাজার, উদয়পুরের রাণীদের পূজা যেমন নিজেদের 'শিলেখানায়' হয়, অন্য অন্য সর্দ্দার ঠাকুরদেরও নিজেদের ঘরে ঘরে নিজস্ব অস্ত্রের পূজা করা হয়। তার পর দেবীর মন্দিরে হয় বলিদান। অম্বরে অম্বরেশ্বরীর মন্দিরেও একটি মহিষ বলি হয়। মহা সমারোহে সসৈন্যে রাজা আর সর্দ্দাররা ঘোড়ায় চড়ে শোভাযাত্রা করে মন্দিরে আসেন। বলির পর পুরোহিতকে নারিকেল আর টাকা দিয়ে দক্ষিণান্ত করে ফেরা হয়।

উদয়পুরে তার পর প্রতিদিনই 'মাতাচলে' 'চউগাঁয়' একটি করে মহিষ বলি দেওয়া হয় নবমী অবধি। জয়পুরে অম্বরে কিন্তু শুধু সপ্তমী মহাষ্টমী নবমীতেই বলি হয় বলে শুনেছি। ছাগল-ভেড়াও বলি হয়। সাধারণতঃ কিন্তু মহিষ বলিরই প্রথা। মহাষ্টমীতে সব রাজা ও রাজপুত্ররা একেবারে শুধু ফল-মূলই খান, অন্য কিছু খাবার প্রথা নেই।

রাজস্থানে এই প্রতিপদ নবরাত্রির প্রথমদিন থেকেই দশেরা বা দুর্গোৎসব অথবা চণ্ডীপূজা আরম্ভ অস্ত্র বা খড়্গরূপিণীরূপে। বাংলাদেশে হ'ল সন্তানপরিবৃতা মা দুর্গার পূজা ঘরোয়া মনের ভাবাকুল ভাবে। কখনও কন্যা কখনও জননী ভাবে। যদিও সে আগমনী ও আরাধনা 'সপ্তশতী' বা চণ্ডী পাঠ করেই হয় কিন্তু মহিষাসুর বধই হ'ল মূল কথা। আর পূজাটি একেবারে মাতৃ-ভাবে ভোর—ভক্তের পূজা। আবার দেশভরে সকলের সব জাত সব শ্রেণী সকলের সে উৎসব ও পূজা।

এঁদের এ পূজা শুধু ক্ষত্রিয়দের, রাজপুতদের আগেই বলেছি। বিধিনিষেধগুলিও কুলক্রমাগত প্রথামত। প্রথাগুলি কম কঠোর নয়। অতি আধুনিক শিক্ষিত রাজপুত সমাজ ও রাজা-মহারাজারাও সে বিধি লঙ্ঘন করতে সাহসও করেন না, ইচ্ছাও হয় না। রাজার 'শিলেখানায়' অস্ত্রপূজা হয়ে গেলে, সামন্ত সর্দ্দারদের ঘরে ঘরে নিজস্ব কৌলিক শস্ত্রসম্ভারের পূজা হয়—ফুল চন্দন দীপ ধূপ অর্ঘ ভোজ্য দক্ষিণা দিয়ে। সে দিনের মত তার পর পূজা সমাপ্ত হয়। তার পর আরম্ভ হয় ন'টি দিন ধরে নিয়ম ব্রতপালন বা নিয়ম সেবা। কঠোর নিয়মে নবরাত্রি পালন।

এদের এই রাজপুতদের খাওয়া-দাওয়ার প্রথা কিন্তু সাধারণ হিন্দুদের চেয়ে একটু অন্য রকম। অর্থাৎ এরা মদ্য মাংস ভোজী। কিন্তু সমস্ত রাজপুত ক্ষত্রিয়রা রাজা-মহারাজা থেকে সাধারণ সব শ্রেণীর রাজপুতও এই নবরাত্রির কয়দিন 'একাহার' করবেন। একবেলাই খাবেন। দ্বিতীয়বার আর অনেকেই খাবেন না। রাজপুত ক্ষত্রিয়ের ঘরে মদিরা পান চলে। শূকর মুরগী বা বন্য-বরাহ কুক্কুটমাংসও তাঁরা নরনারী সকলেই খান। রাণী-মহারাণীদেরও পানভোজন চলে একই প্রথায়। রাজা-মহারাজার ঘরে বহু রকমের আকারের সোনা-রূপার বাটীতে করে নানাবিধ রকমের মাংস, অন্য তরকারী (ও দেশে বলে 'শাক') সাদা ভাত, নিরামিষ-আমিষ পোলাও, মিঠা পোলাও, রুচিমত নানা শস্যের রুটি গম ভুট্টা বাজরা নানা মিষ্টান্ন—চালের গুঁড়োর ক্ষীর, রূপালী সোনালী 'তবক' ঢাকা, একখানি রূপার প্রকাণ্ড থালায় করে পরিবেশিত হয়। তাকে বলে 'কাঁসা' (ভোজ্য) পরিবেশন ধনী। ক্ষত্রিয় রাজপুতের ঘরেও

'ঠাকুর' (জমীদার)' লোকদের ঘরেও কমবেশী সমারোহ করে 'কাঁসা' আসে। তাঁদের কাঁসার প্রকাণ্ড থালায় পাতার 'দোনা' (ঠোঙা) করে কিংবা পিতল কাঁসার কলাইকরা বাটিতে করে। রীতিমত রাজসিক ভোজ। এবং সর্বত্রই সঙ্গে থাকে সান্ধ্য-আহারের সঙ্গে পানীয় মদিরা।

সাধারণ ক্ষত্রিয়ের ঘরেও ঐ ক'দিন একাহার শুধু গৃহপতির কুলাচার অনুসারে অস্ত্রপূজা একাহারী হয়ে। যাঁরা নিতান্ত দরিদ্র গম যব বাজরা ভুট্টার রুটি খান সামান্য ডাল বা 'শাক' অথবা ঘিয়ের বা আচারের 'টাকনা' দিয়ে। তাঁরাও সকলেই একাহারী থাকেন।

সাধারণ মানুষ না হয় একাহার ও সংযম করল; ভোগী বিলাসী রাজা-জমীদারদেরই হয় বিপদ অত কঠোরতা করতে। রীতিমত ভাবনায় পড়েন তাঁরা। আবার পানীয়ও বন্ধ, ভোজ্যও নিরামিষ।

একবার এক রাজপুত সর্দার, মস্ত জায়গীরদার ঠাকুরসাহেব আমাদের বাড়ীর পুরুষদের কাছে বলেছিলেন, 'ভাই, নয় দিন ধরে একাহার। কি বিপদ যে কি বলি। কি ক্ষিদেই পায়! শেষে ভাই বন্ধু অনেককে নিয়ে বেলা দুটায় খেতে বসে দু'তিন ঘণ্টা গল্প করে বেলা শেষ করে আসন থেকে উঠি। একবার আসন থেকে উঠলে ত আর খাওয়া চলবে না।'

আমাদের আত্মীয়টি বললেন, 'এত কঠোরতা নাই করলেন, সবাই কি পারেন করতে? ঠাকুরসাহেব বললেন, 'বাড়ীর বড়কে নিয়ম পালন করতেই হবে চিরকালের কুলাচার। না করলে মনেও সংশয় জাগে। লোকনিন্দাও আছে।

মোট কথা, এ নিয়ম পালন এখনও রাজপুতরা করেন।

কিন্তু এই নবরাত্রির বা দশেরার নিয়মউৎসব কঠোর প্রথা-পালন শুধু ক্ষত্রিয় রাজপুতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্য সমস্ত জাতি বা বর্ণের মধ্যে যেমন অক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণ বৈশ্য, অন্য নানা জাতি কেউ এই ভাবে নবরাত্রি পালনও করেন না, তাঁদের অস্ত্রাগারও নেই, অস্ত্রপূজাও হয় না। তাঁদের বা অন্য কোনও বর্ণের না হয় নবরাত্রি, না আছে দুর্গোৎসব, সপ্তশতি বা চণ্ডী পাঠও নেই। সর্বত্রই কালী মন্দির জয়পুরে, অম্বরেশ্বরীর মন্দিরে পূজা, চণ্ডী পাঠ, বলি, মহিষ বলি হয়। কিন্তু ওদেশী ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য এবং শূদ্রশ্রেণী উৎসবে যোগ দেন না। তাঁহারা কঠোর নিরামিষাশী। এ ছাড়া ওদেশে আছেন জৈন জাতি বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও মস্ত বড় ব্যবসায়ী জাতি। এঁরাও অতি কঠোর নিরামিষভোজী এবং অহিংস। রাজস্থানে 'সরাওগী' নামে প্রসিদ্ধ শ্রেণী। এঁরা মুখ ধোন না! অনেকে মুখে কাপড় বেঁধে পথ চলেন, পাছে নিঃশ্বাসে জীবহত্যা হয়। সন্ধ্যার আগে আহার সেরে নেন। ঘরে প্রদীপ জ্বালেন না প্রায়, কীট পতঙ্গ হত্যার ভয়ে। জীবহিংসা কোনও ক্রমেই করেন না। এঁরাও ঐ নবরাত্রির বা দুর্গোৎসবের কিছুই মানেন না। শুধু মাত্র দর্শক রূপে থাকেন। অবশ্য ব্যবসায় পুরো করেন।

কাজেই এই নবরাত্রি দুর্গোৎসবের মত আপামর আবালবৃদ্ধ-বনিতা সাধারণের আমাদের দেশের মত সর্বজনীন নয়। জাতীয় উৎসবও হয়ে ওঠেনি, দেওয়ালী বা হোলীর মত। (দেওয়ালী ও হোলী সর্বভারতীয় উৎসব কিন্তু পূজা-অনুষ্ঠানময় সর্বত্র নয়—দেবালয় ছাড়া)।

তবে শেষ দিনে অর্থাৎ দশমীর দিনে দশেরার যে একটি বিরাট মেলা হয়, সেটিকে সর্বজনীন উৎসব বলা যায়।

এই মেলা হ'ল রাজাদের বিজয়োৎসব' ও জয়যাত্রার উৎসবময় শুভক্ষণ। আর দশমীতে রামলীলা ক্ষেত্রে রাবণবধের অভিনয়। শ্রীরামচন্দ্র থেকেই যদি দুর্গাপূজার এই প্রবর্তন ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এই বিজয়োৎসব, জয়যাত্রার 'লগ্ন' মানা ও সেই প্রথারই কথা এবং এখনও এই 'দশেরা'র উৎসব মেলার শেষে রাজারা সম্বৎসরের 'জয়যাত্রা'র শুভলগ্ন মেনে 'যাত্রা' করে নেন, চারবার চারদিকে পদক্ষেপ করে। চতুর্দ্দিকে শুভযাত্রা হয়ে গেল এই ভাবটা। সেকালের আকস্মিক যুদ্ধের আহ্বানে যাওয়ার জন্য এই যাত্রা প্রথা মানাতে আর নতুন করে দিন-ক্ষণ দেখা লাগত না। একেবারে বর্মচর্ম পরে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন এই ছিল প্রথা। আর একালে নানা দেশবিদেশ শুভাশুভ নানা কাজের যাত্রায়ও দিন দেখার প্রয়োজন থাকে না। এখনও রাজোয়াড়ায় এই শুভ বিজয়-যাত্রার প্রথাটি আছে।

রাজস্থানে নানা রকমের মেলা সম্বৎসর ধরে হয়। সে সব মেলার চমৎকার ইতিহাস কাহিনী-কথাও আছে। কিন্তু আজ শুধু বিজয়া-দশমী বা 'দশেরা' উৎসবের কথাই বলি।

সেকালের রাজস্থানের প্রত্যেক সহরই প্রায় উঁচু পাঁচিল ঘেরা থাকত। অনেক তোরণদ্বার, অনেক ছোট দরজা, বিশেষ বিশেষ দরজা, কেল্লা, দুর্গের মাটির নীচে সুড়ঙ্গময় দুর্গান্তরে যাবার নিরাপদ পথ ও শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য সুরক্ষিত প্রাসাদ দুর্গময় সহরগুলি ছিল। এই সহরে আছে গোটা সাতেক গেট বা দরজা। পশ্চিমে চাঁদপোল গেট, পূর্ব্বে সুরযপোল গেট, সাঙ্গানেরী দরওয়াজা, আজমেরী গেট, ঘাট দরজা, গণগৌরী দরজা, আরও একটি গেট বা দরজা আছে একেবারে পুরাতন অম্বরপ্রাসাদের নীচে পাহাড়ের দিকে। 'আমেরী' গেট (অম্বর) বলে অনেকে। 'পোল' অর্থে তোরণ।

আর এই 'গণগৌরী' দরজাটি হ'ল শহরের মাঝখানে, রাজার প্রাসাদে প্রবেশের প্রধান গেট। যত উৎসব, মাঙ্গলিক যাত্রা, বিয়ে ও শুভ কাজের সব সেই গেট দিয়ে প্রবেশ করে ও বেরোয়। গেটের ঘেরার মধ্যে রাজ্যের সমস্ত আপিস কর্মশালা। এবং রাজার সমস্ত হাতিশালা, ঘোড়া, উট বাহিনীর জায়গা, বলদ-বাহিত রথশালা, স্বর্ণখচিত গাড়ী, কামান ও তোপের গাড়ী, শকট, সবেরই বিরাট আশ্রয়শালাও তারি মধ্যে।

বিজয়া-দশমীতে চতুরঙ্গ গজবাজী রথ পদাতিক-বাহিনী নিয়ে আর পর দিন একাদশীতে (দশমীতে) দশেরায় রাবণবধের মেলায় শোভাযাত্রা বেরোয় এই গণগৌরী দরজা থেকে। আগের দিনে

জীব ক্ষত্রিয়দের ও রাজাদের নিজের নিজের বাহন ঘোড়া হাতী ইত্যাদির অর্চনাও করতে হয়, অস্ত্রার্চনার পর। তার পর মেলা-উৎসব হয়।

প্রথমে বেরোয় চমৎকার লাল নতুন আবরণ গায়ে নীল ও লাল রঙে রাঙানো শিং রাজার গোশালার যত গরু, বলীবর্দ্দ-বাহিনী। তার পর বেরোয় ঐ লাল ঘেরাটোপ পরা বলীবর্দ্দ-বাহিত রথ। পুরাণের ছবির রথের মতই দেখতে রথগুলি। তার পর আসে উট-বাহিনী। প্রায় শ' তিন চার। তাদেরও সাজানো হয়েছে, উচু পিঠের কুঁজ ঢেকে দেওয়া হয়েছে গদী ঢাকা লাল রঙের ঝালর দেওয়া চাদরে। গলায় তাদের কারও কারও মোটা মোটা নানা-বর্ণের কাঁচের পুতির মালা ঝুলছে। পিঠে উষ্ট্ররক্ষক মাহুত।

এর পরে বেরোয় অশ্ববাহিনী। কদমে কদমে পা ফেলে জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে আসে। এ ঘোড়ায় 'সোয়ার' থাকে না। চমৎকার মোটা মোটা নানারঙের মালা গলায়, সোনালী করা ঠুলী চোখে, কপালে সোনার কপালপাটী নানারঙের গাত্রাবরণে সাজানো, কালো সাদা তেজস্বী মহারাজার প্রিয় নিজস্ব নানা নামের ঘোড়ার দল আগে বেরোয়। তার পর অশ্বশালার অন্য সাধারণ সব ঘোড়ারা বেরোয় সকলেই কিন্তু সুসজ্জিত। আর সকলের সঙ্গে একটি করে সহিস পাশে পাশে চলে। তারাও ওদেশী পৌরাণিক-সাজে সাজে। মাথায় রঙীন পাগড়ী, গায়ে লাল চাপকান, ধুতী বা চুড়ীদার পাজামা পরা, পায়ে নাগরা, কোমরে মোটা করে বেড় দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা লাল বা অন্য রঙের কোমরবন্ধ।

পিছনের দলের সঙ্গে থাকে চোপদার ঐ রকম সাজে রূপার আঁটাসোটা হাতে। রাজকীয় নকীবের দল থাকে সুসজ্জিত বেশে হাতে তার পিতলের মোটা 'চোঙে'র বাঁশী 'ভ্যা পোঁ' 'ভ্যা পোঁ' করে মাঝে মাঝে বাজায়। পিছনে থাকে ব্যাণ্ডপার্টি যুদ্ধের ও উৎসবের বাদ্যভাণ্ডের দেশী-বিলাতী নানা বাজনা বাদকদল।

তার পর আসে রাজ্যের যত পদাতিক সৈন্যদল। তার পরে শ'দুয়েক সুসজ্জিত হাতীর সার। উৎকৃষ্ট হাওদাওয়ালা নানা গহনা-বিভূষিত শুঁড়, দাঁতের ওপর সোনার বালা পরানো লাল ঝলমলে সলমাচুমকীর কাজকরা গদীওয়ালা আসনে সামনে বসবার জায়গা। সামনে মাহুত সুসজ্জিত মেলার পোষাকে।

এদের মাঝে রাজা বেরুতেন ঘোড়ায়। চমৎকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কালো ঘোড়া, তার গলায় সোনার হার ঝলমল করছে। নাকের ওপর কপালে সোনার গহনা। পায়ে কাঁসার ঘুমুর।

তালে তালে পদক্ষেপে বেজে উঠছে, সব ঘোড়ার পায়ের নূপুর। গায়েও সাজান পিতল কাঁসার সোনা রূপার অলঙ্কার ঘোড়ার পদমর্য্যাদার বিশিষ্টতা অনুসারে অর্থাৎ রাজার প্রিয় অশ্ব।

সহরের বাহিরে এক পাশে একটা খোলা ময়দানে রাজকীয় কামান-তোপের গাড়ী বন্দুকের সারী সাজান হয়, কৃত্রিম রাবণবধের যুদ্ধের আয়োজনে। তার পর সশব্দ সমারোহে কামান-তোপের বন্দুকের গোলাগুলি ছোড়া হয়।

রাবণবধের উৎসব শেষ হলে রাজা এবারে তাঁর নিজস্ব হাতীতে চড়ে প্রাসাদে ফেরেন। হাওয়া মহলের পাশ দিয়ে পুরাতন অম্বর-প্রাসাদের পাহাড়ের নীচের পথ দিয়ে গণপোটা দরজায় শুভযাত্রা পথে।

পথের দুধারে, বাড়ীর রকে, সি ড়িভরা ছাদে, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসা সুসজ্জিত ঘাগরা 'লুগড়ী' (ওড়না) কাঁচুলী পরা নারীর দল বসে থাকে অজস্র রূপা সোনা কাঁসার গহনা পরে। আর থাকে, পাগড়ী, সাফা ময়লা ধুতি, ফর্সা মেরজাই জামা পরা, লাঠি হাতে ছেলে কাঁধে, গ্রামের জাঠ চাষা বেনের দল সহরে সৌখিন নানা শ্রেণীর দর্শকদল শোভাযাত্রার দর্শকরূপে এবং দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে ঢাকা মুখ, মেয়েদের গলায় থাকে মুখর সঙ্গীত। তারস্বরের সে গান সমবেত কণ্ঠে। গানটি ঘোমটার আড়াল থেকে মেয়েরাই গায়, সেটা নিন্দনীয় নয়। মাঝে মাঝে ঘোমটার ফাঁক থেকে তারা 'সওয়ারী' 'লওয়াজমা' অর্থাৎ শোভাযাত্রাও দেখে নেয়। গান রাজ-বন্দনার আছে, আবার ভজনও আছে। আবার উৎসবের জন্য রচনা করা গ্রাম্য সঙ্গীতও কম নেই। (আমরা একটি গানের 'কোন সময়' এক কলি লিখেছিলাম ঐসব গ্রাম সঙ্গীতের। লাইনটি হ'ল 'টিড্ডি বাদল ভরে আয়োরে' মানে 'ওরে মেঘের মত পঙ্গপাল আকাশ ভরে এল রে।' পঙ্গপাল আসাটাতে নিশ্চয়ই আনন্দ সঙ্গীত তা নয়। কিন্তু সুরটি ভারী মজার)।

রাজোয়াড়ায় সাদা পরিচ্ছদ শোকের ও দুঃখের। কাজেই উৎসবের দিনে রঙের সমারোহের শেষ থাকে না। গানে, রঙে, খেলনা, পুতুলে, বাঁশীতে, আলোতে, মানুষে ভরা পথের দু'ধার। শোভাযাত্রার মাঝ পথ বাঁচিয়ে দোকান বসে সারি সারি ফুটপাতে। মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, কাগজের খেলনার আর সীমা সংখ্যা থাকে না যেন। পথের উপরের দোকানে থাকত চন্দনকাঠের পুতুল হাতী ঘোড়া থেকে দেবতা মূর্ত্তি নানা রকমের। শ্বেতপাথরের ছোট বড় দেবতা প্রতিমা, খেলনা, বাসন, কাঁসার পিতলের খেলনা, পুতুল, বাসন। মীনাকারী করা চমৎকার নানা জিনিস, ট্রে, ফুলদানী, বাসন কত কি—কাগজের মণ্ডের তৈরী হালকা খেলনা জীবজন্তু। মানুষের কেনাকাটারও শেষ নেই। আর শিশুদের কেনার জন্য আবদারে ভেঙে ফেলারও শেষ নেই।

রাত্রি গভীর হতে থাকে—গ্রামান্তরের লোক ফিরে যেতে থাকে—সহরের লোক তখনও দর্শক। দোকানীরাও রাজার হাতীতে চড়ে বিজয়-উৎসব যাত্রা থেকে প্রাসাদে ফেরা অবধি 'পসার' সাজিয়ে রাখে। স্থানীয় মেয়েদের মাঙ্গলিক গান থামে না, গাইতে থাকে। কখনও শিশু বালক ও পুরুষরাও গায়। সেকালে আমরা গাড়ী-ভরা ছেলেমেয়ে হাতভরা খেলনা নিয়ে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে ঘুমন্ত ছোট ভাইবোনকে কোলে বসিয়ে বাড়ী ফিরতাম। তখন কারও পুতুলের হাত-পা ভেঙে গেছে, কারও বা মুণ্ড গেছে, কোনটা বা ঠিক আছে।

ছোট ছোট মাটির পুতুল খেলনা তখন এক পয়সায় হাত ভরা হ'ত।

নবরাত্রির এই শেষ দিনের মেলা বা উৎসবই সে দেশে সর্ব্ব-জনীন। অবশ্য অহিংস ব্রাহ্মণ বৈশ্য জৈন সম্প্রদায় সকলেরই কেনাবেচা বাজার পসার দোকানদারীরই শুধু উৎসব। রামলীলা ছাড়া খড়্গপূজা কিম্বা অস্ত্রপূজা রাজপুত ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য হিন্দুর উৎসব নয়।

মোটামুটি মনে হয়, বাংলাদেশ নিয়েছে, জগন্মাতার পূজার আনুষ্ঠানিক দিক। ভক্তের সপরিবার জননীর অর্চ্চনা। আবার কন্যা ভাবেও আগমনী উৎসব করা। বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম-পাঞ্জাব অবধি ভারতে কিন্তু সর্ব্বত্রই চলে রাবণবধের পালায় রাম-লীলা উৎসব। দেশে দেশে রাবণবধের কৃত্রিম অভিনয় হয়। দু' মাস আড়াই মাস ধরে শ্রাবণ মাস থেকে রামলীলা গানও হয় কত জায়গায়। রামলীলা ময়দান প্রাঙ্গণও আছে কত জায়গায়। কিছু মেলা কিছু গান যাত্রা-কথকতা ধরনের উৎসব।

তবে রাজস্থানেও আর এই সব 'দশেরা' নবরাত্রির মেলা আছে কিনা সন্দেহ। সে অস্ত্রের ব্যবহার নেই, হয়ত অস্ত্রাগারই আর নেই, তার পূজার্চ্চনা কি আছে?

কেন না দেশের স্বাধীনতার পর রাজা-মহারাজারা এখন 'নামে'ই আছেন মাত্র। 'রাজ প্রমুখ' পদও গেল গেল। দেশে দেশে রাজ্যপাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে। রাজপ্রাসাদ কোষাগার ধনৈশ্বর্য্য হাতী ঘোড়া রথ সৈন্য অস্ত্রশালা রাখার ভার আর রাজাদের হাতে নেই। প্রয়োজনও নেই হয় ত।

এক কথায় রাজা-মহারাজার সেই মৌলিক আনুষ্ঠানিক সমারোহ ও নিষ্ঠাময় জাঁকজমকের যুগ ও কাহিনী প্রায় কিম্বদন্তীর যুগেই পৌঁছে গেল। শুধু আমাদের মত দু'একজনের হয় ত সেই রূপ-কথার মত গল্পকথা মনে আছে।

কবির কথা মনে পড়ে। সে দিন আর সুদূরে নয় মনে হয়—যে দিন লোকে ভাববে :—

> যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি,
> সে আজি কোথায় তাহাও না জানি,
> কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী
> চিহ্ন নাহিক আর।"

শরৎ-প্রাতে

শ্রীসুধীর গুপ্ত

আজকে আবার এই শরতের শান্ত ভোরের বেলা
রোদের সাথে শুরু হোলো বনের লীলা-খেলা।
বন্ধু বাতাস দোল্ দিয়ে যায় আচমকা মগ-ডালে,
সহজ শোভার সবুজ শাখা দোলে রে তা'র তালে;
দোদুল দোলে কচি পাতার ভাই-বোনেরা সব;—
উঠছে জমে আকাশ-তলায় খুশীর কলরব।

রোদের খুশীর হাসি কেবল ঝল্‌মলিয়ে ওঠে;
সেই হাসি ফের ফুটছে ফুলে—কুঁড়ির কোমল ঠোঁটে।
লুঠ করে লয় তরল সোনার হাসির খুশীর ধারা
বিরাট বিপুল গাছেরা সব—উঠতি গাছের চারা।
নীল আকাশের নীচেতে ওই সবুজ শোভার মাঝে
পাখীর গানের আর এক খুশী বন ছাপিয়ে বাজে।

এই খুশীতে মন রে আমার বাদল-ব্যথা ভোল;
শরৎ-প্রাতের শোভায় গানে হৃদয় ভরে তোল;
বনের মত ওঠ রে দুলে—ফুলের মত ফোট্;
লীলায়-খেলায় ওঠ রে মেতে বাড়িয়ে রোদে ঠোঁট।
মেদুর মাটির রসের ধারায় মাটির কুম্ভ ভর;
সবার যোগে সবার ভোগে লীলার পথটি ধর।

চিত্রকুট

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

এলাহাবাদের গোঘাট দিয়ে যমুনা নদীর সেতু অতিক্রম করে নাইনির পথে চলেছে বাস। দীর্ঘ চুরাশি মাইলের পাড়ি। বিরতি চিত্রকুটে। এলাহাবাদ ষ্টেশন-সন্নিকটের বাস ষ্ট্যাণ্ড হতে বাসে চেপেছি। খাবার ও জল সংগ্রহ করে সঙ্গে নিতে হয়েছে। কারণ যদিও বাস ছাড়ে সকাল সাতটায়, চিত্রকুট পৌঁছতে বেলা দুটো বেজে যায়। সেনট্রাল রেলপথের মাণিকপুর দিয়ে চিত্রকুট ষ্টেশনে আসা যায়। কিন্তু ষ্টেশনে লোকজন নেই, কুলি নেই, যানবাহন নেই, পাণ্ডব বর্জিত অঞ্চল। এখান থেকে পদব্রজে কাঁটাগাছের মধ্য দিয়ে তিন মাইল অগ্রসর হ'লে তবে চিত্রকুটে পৌঁছান যাবে। বরং কারউই ষ্টেশনে নেমে টাঙ্গায় আট মাইল পথ অতিক্রম করে চিত্রকুটে আসা অপেক্ষাকৃত সহজ।

দু'পাশে আম গাছের সারি। মাঝে পিচের প্রশস্ত পথ, দিগন্ত-প্রসারী 'জুনরি' ও মকাইয়ের ফলন্ত ক্ষেত, টালির ছোট ছোট ঘর, বাজার হাট, চৌমাথা, গ্রাম ও তহশীল। বাস এলাহাবাদ হতে বোম্বেগামী রেল লাইন অতিক্রম করে সোজা দক্ষিণে ছুটে চলেছে। মনে হচ্ছে ক্রমে যেন ধাপে ধাপে নীচে নেমে চলেছি। আর্য্যাবর্ত থেকে দক্ষিণাপথে আমাদের অভিযান। বিন্ধ্যপর্ব্বত যেন বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে কিছুটা অগ্রসর হয়ে এসে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। বাস দক্ষিণের পথ ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অগ্রসর হয়ে চলল।

এলাহাবাদ হতে সাড়ে তের মাইল দূরে যসরা বাজারে বাস এসে থামল। এখানে রাজপুতনার চৌদ্দজন স্ত্রী-পুরুষ বাসে উঠল, বাসের লোয়ার ক্লাশে মানুষের ঠাসাঠাসি। রাজপুতানাবাসীরা অনর্গল দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে আর রাজপুত রমণীরা টেনে টেনে হাসছে। রাজপুতানীদের মাথা থেকে কদম ফুলের আকার বিশিষ্ট রূপার সিঁথি ঝুলছে। এখানের বাজারে অনেকেই চা পান করতে নামলেন। বাজার বলতে চায়ের দোকান গোটা দুই, দাড়ি কামাবার সেলুন, একটা কাপড়ের দোকান, ছাতু-চানার দোকান তিন চারটি, ব্যাস।

বাস আবার ছুটল, পথে নাকে দড়ি বাঁধা ভারবাহী উটের দেখা মিলতে লাগল হামেসা। আর দেখতে পাওয়া গেল ছোট্ট টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা মানুষ অথবা মাল। পথ চলে গেছে বান্দার দিকে, রেওয়ারীর দিকে, বুন্দেলখণ্ডের প্রত্যন্ত প্রদেশে। মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করেছি আমরা। এবার সাড়ে পঁচিশ মাইল দূরে বাস থামল বেণীপুর গ্রামে। প্রত্যেক জনপদের সম্মুখে সরকারী ফলকে স্থানটির নাম লেখা আছে। দূরত্বও লেখা আছে। 'মৌ' গ্রাম হ'ল বাসের পরবর্ত্তী বিরতি স্থান। কানে হীরের ফুলপরা একজন সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, এটি একটি তহশীল। এখানে বাজার আছে, থানা আছে। লোকটি তহশীলের মালিক অর্থাৎ জমিদার।

এখানের অবস্থাপন্ন মানুষদের কানে হীরের পাথরের ফুল পরার প্রথা আছে। মাদ্রাজে মেয়েরা কানে হীরের ফুল পরে, মধ্যপ্রদেশের চিত্রকুট অঞ্চলের পুরুষরা মেয়েলিপনাতে ওস্তাদ বলতে হবে। তারা কানে হীরের ফুলও পরে আবার ইস্পাতের সুদৃশ্য ছোট জাঁতি দিয়ে সুপুরি কুচিয়ে যখন-তখন পান সেজে মুখে ফেলে দেয়। সঙ্গে প্রত্যেকের একটি করে ভ্যানেটি ব্যাগের মত পান-বটুয়া। লোকটির দুহাতে আটটি আঙটি।

মোটরের শব্দে পথে পুচ্ছ তুলে বাছুর ছুটছে। এর পর পথ ক্রমশ বনাকীর্ণ হয়ে উঠল। লোকালয় নেই, শুধু বৃক্ষের শ্যামসমারোহ। কত চড়াই কত উৎরাই। স্বচ্ছতোয়া গিরিদরি ধারা, সিয়াকুলের ঝোপ, বিস্তৃত বনস্থলী—এ সব অতিক্রম করে বাস উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলল, বাস থামল রাইপুরা থানার গৌমী গ্রামে। এখানে একদা বাল্মীকি মুনি তপস্যা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে, এখানের নদীটির নাম বাল্মীকি নদী, ছোট পাহাড়ের চূড়ায় আজও একটি আশ্রম বাল্মীকি মুনির স্মৃতি বহন করে চলেছে। তবে অধ্যাত্ম ভাবনা এখন পাহাড় থেকে উবে গেছে। জিঘাংসার পূর্ণ রাজত্ব চলেছে এখানে। এখন এ পাহাড় সরকারী এবং বে-সরকারী তথাকথিত 'বাবুদের' পশু-পক্ষী শিকারের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিচের পথের শেষ হয়ে মাটির পথ আরম্ভ হয়েছে এবার। বাস অতি সন্তর্পণে গতিবেগ হ্রাস করে ঝাঁকানি খেতে খেতে ছুটে চলেছে। সামনেই রাইপুরা নদী। মাটির রাস্তাটি প্রায় তিন মাইল ব্যাপী এবং বিপদসঙ্কুল। বাস নদীগর্ভে নেমে গেল বহু নীচুতে। আবার নদী পার হয়ে গোঁ গোঁ শব্দ তুলে উপরে উঠতে তার নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'ল। যন্ত্র বিকল হয়ে ষ্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। হয়ত বাল্মীকির তপস্যাপূত অঞ্চলে এসে বাসের বল্মীকস্তূপ-অবস্থা প্রাপ্তির ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আমরা তা হতে দিলাম না, স্থানীয় চৌকিদারের সাহচর্য্যে কিছু দেহাতী লোক সংগ্রহ করে বাসকে ঠেলা দিয়ে সচেতন করে তুলতে হ'ল। আবার ইঞ্জিনে প্রাণস্পন্দন জেগে উঠল। যাত্রা সুরু হ'ল আবার। বেলা একটা বেজে গেছে। আমরা অচিরে করবী ষ্টেশনের সম্মুখে এসে

পৌঁছলাম। এই করবী থেকে রেলপথ মানিকপুর দিয়ে এলাহাবাদ চলে গেছে, অপর অংশ গেছে জব্বলপুরের দিকে। করবী থেকে রেলপথ ঝাঁসির দিকেও গিয়েছে। বাস থামল এখানে আধ ঘণ্টা। আর আট মাইল পরে চিত্রকূট। ষ্টেশনের বুকিং অফিসের সামনের বোর্ডে লেখা আছে, 'জেব কতরোসে সাবধান রহিয়ে'। বুঝলাম এখানেও মানব-চরিত্রের দোষ ত্রুটি-গুলি সমভাবেই বর্ত্তমান।

কতকগুলি শিশুগাছের শ্রেণী অতিক্রম করে বেলা দুটো দশ মিনিটে বাস এসে থামল চিত্রকূটে। চিত্রকূটকে গ্রামই বলব। শহর এ নয়, যদিও অনেক পাকা-বাড়ী আছে। কিছুটা পিচের পথ অতিক্রম করে আমরা আবার মাটির রাস্তায় গিয়ে পড়লাম। গ্রামের মধ্যে গিয়ে আবার সিমেন্ট-কংক্রীট-করা পথের দেখা পাওয়া গেল। এই সিমেন্ট-কংক্রীট-করা পথের প্রারম্ভে সাধুরাম তুলারাম ধর্ম্মশালা। এখানে হোটেল নেই, ধর্ম্মশালাই পান্থজনের আশ্রয়-স্থল। তবে খাবারের দোকান, চায়ের দোকান, পানের দোকানের অভাব নেই এখানে। খাবারের দোকানে পুরি তৈরি করা থাকে না কারণ, কেনার লোকের একান্ত অভাব এখানে। তাই, পুরির প্রয়োজন হলে অর্ডার দিতে হয়। ডালডার নাম গন্ধ নেই কোথাও, ভাল ঘৃতের খাবার পাওয়া যায় এ অঞ্চলে। দামেও সস্তা, স্বাদেও মধুর, দুধ এখানে প্রচুর অথচ কেনার লোক কম। রপ্তানিও হয় না বড় একটা, তাই নির্ভেজাল দুগ্ধজাত দ্রব্যের মুখ দেখে আনন্দ পেলাম।

বাসস্থান ঠিক হ'ল সাধুরাম তুলারাম ধর্ম্মশালাতে। ধর্ম্মশালাটি পাথরের তৈরি, সুরক্ষিত এবং নিরাপদ, বাসে কানে হীরের ফুল-পরা সেই ভদ্রলোক এই ধর্ম্মশালাতেই থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশ্রামের জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়লাম চিত্রকূটের পথে। পথ ক্রমশঃ ঢালু হতে হতে এক যায়গায় একেবারে যেন গড়িয়ে নেমে গেছে প্রায় তিনতলা নীচে। আমাদের ধর্ম্মশালা থেকে প্রায় ছ তলার সমান নীচে নেমে মন্দাকিনী তীরে এসে পৌঁছলাম, এই মন্দাকিনী তীরে চিত্রকূটের দোকানপাট, হাটবাজার যা কিছু দর্শনীয় সব। নদীটিকে কেউ বলে মন্দাকিনী, কেউ বলে পিসানী বা পয়স্বিনী। বাল্মীকি এই নদী সম্পর্কে রামায়ণে বলেছেন :

বিচিত্র পুলিনাং রম্যাং হংস সারস সেবিতাম।
কুসুমৈ রুপ সং পন্নাম পশ্য মন্দাকিনীম্ নদীম॥

অবশ্য বর্ত্তমানের মন্দাকিনীতে কল-হংস, সারস বা চক্রবাকের কোনটাই নজরে পড়ল না। জমে থাকা জলে মাছের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ এবং নৌকার অবিরত পারাপারই বেশী চোখে পড়ল। এখানের বাজারের পণ্যদ্রব্য বড় বিচিত্র। বেশীর ভাগ দোকানে ঘুনসি, মোটা মোটা পৈতা, পাকানো সুতো, জল নেবার টিনের রকমারি পাত্র, পাথরের বাটি, চন্দন পেড়ি, ঘটি প্রভৃতি দ্রব্য রয়েছে, আট দশখানা কাপড়ের দোকান আছে। ছাপা নামাবলী আর রঙীন ডুরে, মোটা সুতার শাড়ী, এই হ'ল প্রধান দ্রব্য ঐ দোকান-গুলির। পণ্যদ্রব্যের আকার থেকে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। দু'চার জন বসে আছে পয়সার ঢিবি সামনে নিয়ে। টাকায় এক আনা বাটাতে তারা যাত্রীদের টাকার ভাঙানি দেয়। রাণু টাকার পয়সা কিছু সংগ্রহ করলে।

মন্দাকিনীর তীরে এক প্রকার কাঁটা গাছ দিয়ে ছাওয়া ছোট ছোট কুটির। কুটিরে কুটিরে ছোট ছোট দড়ির খাটিয়া, প্রতিটি খাটিয়াতে এক একজন পাণ্ডা বসে আছে। যাত্রীদের মন-ভোলানো নানা কথায় সন্তুষ্ট করে তাদের মন্দাকিনীতে স্নান করিয়ে কিছু রোজগারের জন্য প্রতিযোগিতা সুরু করে দিয়েছে তারা। সন্ধ্যা আসন্ন, তাই আমরা স্নান করতে রাজী হলাম না। এখানের প্রতিটি স্নান-ঘাটে মাছ প্রচুর। স্নানের সময় এক আধটুকু মাছের কামড়ও সহ্য করতে হয়। মাছ এখানে কেউ খায় না, যারা মাছ খায়, এরা সে রকম লোক চায় না। বাঙালীদের খাতির করে কেবল পয়সা শোষণ করার জন্যে। কিন্তু বাঙালীর মুখ দেখা এখানে সোজা নয়। বাঙালী আরামপ্রিয়। কষ্টের পথে তারা পা বাড়ায় না। তাই চিত্রকূটে তিন দিন বাস করে একজন বঙ্গবাসীকেও দেখতে পাই নি। চতুর্থ দিবসে প্রস্থানের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে দু'জন পুরুষ এবং তিনজন মহিলাকে বাস হতে নামতে দেখেছিলাম।

দেওয়ালীর মেলা হবে দুদিন পরে, তারই প্রস্তুতি চলেছে পথে-ঘাটে। দীপালী এখানের বড় উৎসব। এই সময় জনসমাগমে পূর্ণ হয় এখানের প্রতিটি ধর্ম্মশালা, পাণ্ডাদের বাড়ী, আনাচ-কানাচ সর্ব্বত্র। তার পর সারা বছর গোটা গ্রামটা খাঁ খাঁ করে। তখন রাত্রির প্রথম প্রহরেই গ্রামের সমস্ত মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। নীলাক্ষী শুকতারা শুধু জেগে থাকে পশ্চিমগগনে। এখন সারারাত্রি সারাটা গ্রাম যেন জাগরণী গানে মুখর হয়ে উঠেছে। খট খট ঠক ঠাক শব্দ চলেছে সারারাত্রি জুড়ে। বাঁশের পরচালা বাঁধা হচ্ছে, কাঠের খেলনা তৈরি করা হচ্ছে। লাঠির মাথা পেতলে বাঁধানো হচ্ছে। দেওয়ালীর মেলাতে বিক্রী করবার জন্য কুমোরেরা কোমর বেঁধে বাঁই বাঁই চাকা ঘুরিয়ে নক্সা কাটা হাঁড়ি, সরাই, তৈরি করছে। আর মাত্র দু'দিন। তার পর এখানের সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তখন আনন্দের হাসি হবে সংক্রামক, হেমন্ত সায়াহ্নের অস্তগামী সূর্য্যের আলোকে দূর ও নিকটের নামী ও নামগোত্রহীন ছোট ছোট পাহাড়গুলি বড় ভাল লাগল দেখতে। রাখাল গরুর পাল নিয়ে গ্রামে ফিরে আসছে। একটানা ধূলিরেখা উড়ছে বাতাসে। এখানের উপজীবিকা কৃষি। ফসল মন্দ ফলে না, শ্যামলী ধবলী গোধনগুলির চেহারাও চেয়ে থাকার মত, চারণভূমি এখানের দিগন্তবিস্তৃত। এখানের চিত্রপটে সবুজ রঙের শাশ্বত প্রলেপের আধিক্য সহজেই নজরে পড়ে। চাহিদা বেড়ে চলেছে দোকানে, তাই দ্রব্যমূল্যও বাড়তে সুরু করেছে। দুধ হয়েছে তিন আনার পরিবর্ত্তে ৬ আনা, গব্যঘৃতের দর উঠেছে তিন টাকা, পুরি পাঁচ

দিকে সের। ভাতের ব্যবস্থা নেই কোথাও, মাছের নাম ত মুখে আনার উপায় নেই। বাঙালীর বাসের পক্ষে স্থানটি একেবারে অযোগ্য পর্য্যন্ত বলা চলে।

মন্দাকিনীর জল মাথায় ঠেকিয়ে রামসীতাকে প্রণাম নিবেদন করে নদীর পশ্চিমকূলে অগ্রসর হয়ে চলেছি আমরা। প্রায় অর্দ্ধ মাইলব্যাপী প্রাসাদোপম অট্টালিকা নদীর সারা পশ্চিমকুল জুড়ে বিরাজ করছে, সেই অট্টালিকার শীর্ষদেশে নানা মন্দির। কোনটি রামসীতার, কোনটি শিবের, কোনটি হনুমানের, কোনটি ভরতের। অট্টালিকাটি যে এক সময় একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল তার প্রমাণ ভিত্তিতে, সোপানশ্রেণীতে, গম্বুজে গম্বুজে, পাথরের বিলম্বিত খিলানে পরিস্ফুট হয়ে আছে। একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইস মকানকো কিসনে বনায়া হোগা, ভাই। অম্লানবদনে সে উত্তর দিলে, রামকো বনায়া। বুঝলাম বাজে কথা। বাণুর আগ্রহাতিশয্যে অক্ষম এবং অসুস্থ হলেও প্রায় দেড়শ'টি সিঁড়ি অতিক্রম করে শীর্ষদেশের একটি মন্দিরে উপস্থিত হলাম। মন্দিরটি রামানুচর হনুমানজীর। সেখানে এক পূজক বসে আছে বিরাট এক হনুমান মূর্ত্তির সম্মুখে। মূর্ত্তিটি পাথরের। মাথায় রূপার মুকুট। পূজককে জিজ্ঞাসা করলাম মূর্ত্তিটি দেখিয়ে—ইস মূর্ত্তিকো কোন বনায়া। বললে, রামকা বনায়া। 'আউর বহু মুকট' 'ওভি রামকা বনায়া হুয়া' বুঝলাম সব বুজরুকি। কেউ কিছু জানে না। সন্ধ্যা আগত প্রায়, তাই কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করে ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম।

পরদিন প্রত্যূষে চিত্রকূট পরিক্রমায় যাত্রা করলাম। দশ মাইল জুড়ে এই পরিক্রমার পথ। চিত্রকূটের প্রথম ঘাট হ'ল রাঘব-প্রয়াগ ঘাট। রাঘব প্রয়াগ ঘাটে রাম পিতা দশরথের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তর্পণ করে তিলাঞ্জলি দান করেছিলেন। মন্দাকিনীর সঙ্গে গুপ্ত গায়ত্রী নদীর মিলন ঘটেছে বলে এ স্থানকে প্রয়াগ বলা হয়। এই রাঘব ঘাটের উপর মত্ত গজেন্দ্রেশ্বরের মন্দির। রাঘব-প্রয়াগের পরের ঘাটের নাম রাম ঘাট। রাম ঘাটের পাশে একটা যজ্ঞ বেদী দেখিয়ে পাণ্ডারা দাবী করে এখানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন বলে। রাম ঘাটের উপরের মন্দিরের উত্তরে একটি ছোট্ট পর্ণ কুটির সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে রামচন্দ্র কিছুদিন বাস করে-ছিলেন বলে পাণ্ডারা। মন্দিরে রাম-সীতা-লক্ষ্মণজীর মূর্ত্তি আছে। গোস্বামী তুলসীদাস এই রামঘাটের সম্মুখের গলিতে থাকতেন। কামতানাথ পরিক্রমা-পথের চরণ-পাদুকা নামক স্থানেও তুলসীদাসজী কিছুদিন বাস করেছিলেন। তুলসীদাসের দোহা এখানের পাণ্ডারা মুখে মুখে আওড়ায়।

চিত্রকূট কে ঘাটপর, ভই সন্তন কি ভীর
তুলসীদাস চন্দন ঘসৈ, তিলক দেত রঘুবীর।

রাম ঘাট থেকে আমরা দোলায় চাপলাম। সাত মাইল পথের পরিক্রমা তার উপর পর্ব্বতারোহণ। তাই দুটো দোলা ভাড়া করা হ'ল। চলেছি মানুষ বাহিত হয়ে। রাম-ঘাট হতে মন্দাকিনী তীরে অগ্রসর হয়ে প্রথমেই গেলাম জানকী কুণ্ড। এই কুণ্ডের সন্নিকটে রাম-সীতার চরণচিহ্ন অঙ্কিত একটি শিলা দেখতে পাওয়া গেল। চরণের ছাপ স্পষ্ট নয়, তবে কিছু একটা যে আঁকা ছিল তা বোঝা গেল। এর পর কিছু পথ অতিক্রম করে আমরা ফটিক শিলাতে এলাম। একবার অত্রিমুনির আশ্রমে যাবার পথে রাম-সীতা ক্লান্ত হয়ে একটি শিলাতে উপবেশন করেন, এই শিলার নাম হয়েছে ফটিক শিলা। এসে পৌঁছালাম কামতানাথে, এই কামতা-নাথের পূর্ব্বনাম চিত্রকূট। তুলসীদাস এই পাহাড় সম্বন্ধে বলে-ছেন :—

কামদ গিরি সে রাম প্রসাদা
অবলোকত অপহরত বিষাদা

এ পাহাড় দর্শন করলে সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। অবশ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ এত মনোরম যে মুষড়ান মনও আনন্দাপ্লুত হয়ে উঠে। বাল্মীকির শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে চিত্রকূটের শোভা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

বহু পুষ্প ফলে রম্যে নানা দ্বিজ গণায়ুতে,
বিচিত্র শিখরে হ্যস্মিন্ রতবানস্মি ভাসিনি।

পাখী-ডাকা ছায়া-ঢাকা চিত্রকূট আজও ঋষি বাল্মীকির উক্তির যাথার্থ বজায় রেখেছে। এই চিত্রকূটে দীর্ঘ দিন বসবাস করে শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণাভিমুখে পঞ্চবটির দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। কামতানাথ পাহাড়ের পরিধি বড় হলেও রাম-সীতার মন্দিরের দিকটাতেই আরোহণ করলাম আমরা। নূতনত্ব কিছু নেই পাহাড়টিতে। বহু ছোট ছোট দেবদেবীর মন্দির ছড়িয়ে আছে এখানে। তবে শ্যামলে শ্যামল এই পাহাড়টি। সানুদেশ হতে সপিল গতিতে নির্ঝরিণীর রজত রেখা বয়ে যাচ্ছে। একদিক থেকে বিচার করলে এ স্থানটি নৈমিষারণ্য এবং দণ্ডকারণ্যের সন্ধিস্থল। বিন্ধ্যপর্ব্বত-মালার কোন একটা উপশাখা এখানে এসে নিশ্চল হয়ে গেছে। তারই শেষ পাহাড়গুলো চিত্রকুট, ফটিক শিলা, হনুমান ধারা আর অনসূয়া। চিত্রকুট পাহাড়টিতে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে আবার দোলায় চড়ে পথে যাত্রা করলাম। চারজন লোকে দোলা বইছে। মুখে তারা 'হুক, হুক' ধ্বনি তুলে অগ্রসর হচ্ছে। এখানের মানুষের বানর-প্রীতি বোধ হয় বেশী। তাই তারা বানরের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করেছে। বানরের গায়ে হাত তোলাকেও এখানের লোকে ধর্ম্মবিরোধী মনে করে। হনুমানজীর বংশধরদের দর্শন লাভ চিত্রকূটে বড় সুলভ। তাঁদের অত্যাচারও কম নয়। অসতর্ক হলেই এটা ওটা ওঁরা নিয়ে চম্পট দেন এবং ছোলাভাজার পুটুলীর সঙ্গে ঐ ছিনিয়ে নেওয়া জিনিসগুলির বিনিময় করে থাকেন।

ফেরার পথে চরণ-পাদুকা নামক শিলাতে শ্রীরামচন্দ্রের চরণচিহ্ন আঁকা আছে দেখতে পেলাম। আমরা রাম-শয্যা শিলাও দেখলাম, একজন দীর্ঘ সময় গদীতে শয়ন করে থাকলে যে ধরনের দাগ পড়ে সেই মত দাগ আঁকা হয়ে আছে শিলাতে। আশ্চর্য্য! ধনুর্ব্বাণ রাখার চিহ্নও হয়ে আছে পাথরে। এর পর আমরা কামতানাথের

পশ্চিমোত্তর কোণে তিন মাইল দূরে 'ভরতকূপ' নামে একটি কূপ বা কুণ্ড দেখলাম। পাণ্ডা বললে, এখানে ভরত রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাজা করার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যর্থ হয়ে চরণ-পাদুকা নিয়ে গিয়ে রামের প্রতিনিধি হয়ে সিংহাসনে পাদুকা দুটি রেখে তিনি রামের প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। অতীতের রাম-ভরত মৈত্রীর স্মৃতি-চিহ্ন এটি। এখানে ভরতজীর একটি মন্দির আছে। বেলা প্রায় আড়াইটায় আমরা ধর্মশালাতে ফিরে এলাম।

বিশ্রামান্তে বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম, হাঁটতে হাঁটতে মন্দাকিনী তীরে এলাম, নৌকায় নদী পার হয়ে বিজাওয়ারের মহারাজার বিশাল রাম-সীতার মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দিরগাত্রে রাজ-বাড়ীর পুরুষানুক্রমিক বংশধরদের ওয়েলপেন্টিং-এ ভরা। মন্দিরের ভোগরাগের ব্যবস্থা ভাল। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে পরিমিত ওজনের ডাল ও চাপাটি বিতরণের ব্যবস্থা আছে দরিদ্রের জন্য বলে শুনলাম। বিজাওয়ারের রাজার একটা প্রাসাদও আছে মন্দাকিনী তীরে। নদীতে স্রোত নেই, কিন্তু জমে থাকা জল গভীর। সারি সারি নৌকা বাঁধা আছে, একবার নদীতীরের কোন একটা ঘাটে দাঁড়ালেই দশ জন মাঝি ছুটে আসবে দশ দিক থেকে আর নৌকা ভাড়া নেবার আবেদন পেশ করবে। দর্শনীয় বেশী কিছু নেই এখানে। তবু অগ্রসর হয়ে চলি। নদীর বাঁকের একটা উঁচু ঢিবিতে চড়ে দূরের পাহাড়ের কোণে সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা দেখার প্রচেষ্টা করি। উপরে উঠে দেখি, পাশের আর একটা উঁচু জায়গাতে একটা আধভাঙ্গা বিরাট পোড়ো বাড়ী, তার মধ্য হতে বহু জনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কিসের যেন একটা বিবাদ চলছে। হাতে বড় বড় লাঠি নিয়ে আরও কয়েকজন লোক এ দিকেই অগ্রসর হচ্ছে দেখলাম, ভয় হ'ল। সন্ধ্যারও দেরী নেই। তাই ফিরে এলাম আমরা, এখানের সকল লোকই হাতে লাঠি নিয়ে চলে। লাঠিগুলি বড় এবং মাথা পিতল বা লোহা দিয়ে বাঁধানো, ঠেঙাড়ের দেশ নাকি এটা? অনুমান মিথ্যে নয়। পরদিন প্রত্যুষে ধর্মশালাতে খবর পেয়েছিলাম কি একটা তুচ্ছ কারণে দাঙ্গা করে সতের জন লোক সাংঘাতিক রূপে আহত হয়ে হাস-পাতালে গেছে, এখানের পাহাড়গুলি অতি নির্জন, তাই নরি-রাহাজানির সংবাদ হামেশা পাওয়া যায়। দীপাবলির মেলা ছাড়া কোন যাত্রী এখানে সাহস করে আসে না। দীপাবলির মেলায় সরকার পুলিসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে থাকেন। বহু জনসমাগম হয় বলে যাত্রীরা ভরসা পায় দূরের পাহাড়গুলিতে পরিক্রমা করতে।

পরদিন প্রাতে হনুমান ধারা পাহাড় পরিক্রমা করার জন্য প্রস্তুত হলাম। মন্দাকিনী তীরে গেলাম। এক সাধু এসে উপস্থিত, জিজ্ঞাসা করলেন, আপলোক হনুমানধারা যাইয়ে গা? হঁ গঙ্গাজী ক্যায়সে পার হউগী। বললাম, নাওসে। সাধু চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, মেরে পাশ ত পয়সা নেহি। ক্যায়সে যাউঙ্গে? সাধুকে বললাম, কুছ ফিকর ন হোগী হামলোগ এক নাব উঠা রাখ্যা। আইয়ে নাব পর চড়িয়ে, সাধু আশ্বস্ত হলেন। আমরা সৎসঙ্গী পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করলাম।

নদী পার হয়ে আমরা দোলায় চাপলাম। সাধু পাশে পদব্রজে চললেন। সাধুর কণ্ঠে গান জেগে উঠল—মায়াকা পটি তোড় দিজিয়ে। তিন মাইল দূরে হনুমানধারা পাহাড়। পথ জঙ্গলাকীর্ণ। নুড়ি, পাথর ও কাঁটা গাছে ভর্তি। দোলাওয়ালা হুক হুক শব্দ তুলে দোলা কাঁধে নিয়ে ছুটতে ছুটতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। যত বেশী পা বিক্ষত হচ্ছে কণ্টকাঘাতে তত তারা মজার বুলি আওড়ে যাচ্ছে। এক একজন এক একটি গানের ধুয়া ধরার মত বলে যাচ্ছে। একজন বললে:

আউর রাজা রামকা দোহাই
আউর তুলসীদাসকা দোহাই

অমনি আর একজন বলে উঠল—আউর চড়কে যানা

তৃতীয় ব্যক্তি বললে, আউর পনি কদম অর্থাৎ আরও কাঁকর পথে রয়েছে। সাবধানে চল। এই সতর্ক বাণী তৃতীয় ব্যক্তি তার ছড়ার মাধ্যমে সঙ্গীদের সমঝিয়ে দিলে। ততক্ষণ চতুর্থ ব্যক্তির পদযুগল হয়ত কণ্টক আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছে। সে হাঁকলে, আউর চণ্ডালি অর্থাৎ আবার কাঁটা। অমনি প্রথম ব্যক্তি বললে, আউর কাল্লি কদম। তখন সবাই সমস্বরে বলে উঠল, আউর লাগে গা, আউর বাঁচে গা, অর্থাৎ পথে কাঁকরও আছে, কাঁটাও আছে। পায়ে লাগবেও তারা, কিন্তু ওদের থেকে নিজেদের যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে চলতে হবে। যাত্রায় বিরতি ঘটবে না। কষ্ট এবং কঙ্কর-কণ্টকাঘাত সহ্য করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হবেই। এদের ছড়া যেন কর্ম সম্পাদনের সঙ্কল্প মন্ত্র।

ছড়া বলতে বলতে দোলাওয়ালারা দোলা নামালে হনুমানধারা পাহাড়ের পাদদেশে। তারা গামছায় বাতাস খেতে খেতে ধূম পানে রত হ'ল। খাড়া পাহাড়। সোজা উপরে উঠে গেছে প্রায় পাঁচ শ উঁচু উঁচু সিঁড়ি। পাহাড়ের পাশে একটি নির্ঝরিণীর ক্ষীণধারা পাহাড়টিকে উপবীতের মত ঘিরে রেখেছে। বর্ষাকালে এখানের নির্ঝরিণীরা খরস্রোতা হয়। অন্য সময় তাদের ক্ষীণধারা আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতেই যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ পাহাড়ে মেঘ বা কুয়াসার কোন আবরণ নেই। প্রস্ফুট পুষ্প পাহাড়টিকে মনোমদ করে নি। শুধু বৃক্ষ ও লতাগুল্মের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে আছে এখানের লালচে প্রস্তর স্তূপগুলি। রহস্যের রাসমণ্ডল আছে এখানের অরণ্যে আর সে অরণ্য কথা কয় পাখীর ডাকে।

দোলাওয়ালারা আমাদের পাহাড়ের শীর্ষদেশ পর্যন্ত নিয়ে গেল। দেবতা পূজা করার পূর্ব্বে পরিশ্রান্ত দোলাওয়ালাদের জলযোগের ব্যবস্থা করে দিতে হ'ল।

হনুমানধারা পাহাড়ের ধারাটি শীর্ষদেশ হতে একটি বাঁধানো চৌবাচ্চায় ঝরে পড়ছে। সেই চৌবাচ্চার জলে লোটা ডুবিয়ে স্নান করাই প্রথা। কাউকে চৌবাচ্চাতে নামতে দেওয়া হয় না।

কারণ ঐ জলই আবার পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। জল মিষ্ট এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। স্নান সারা হলে আমরা রাম-সীতা, হনুমান প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা সাঙ্গ করে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলাম। পথ ঘিরে বসে আছে রামানুচররা। পাসপোর্ট আদায় করতে তাদের কলা এবং কাবলি ছোলা ভেট দিতে হ'ল। বলাবাহুল্য, কলা এলাহাবাদ থেকে সংগ্রহ করে আনতে হয়েছিল। এখানে ফলফুলের বালাই নেই। দেওয়ালীর মেলার জন্য কিছু কিছু ফলমূল আমদানি করা হয়েছে বটে, তবে নারিকেলের মূল্য এখানে বাংলা দেশের চারগুণ, তাও শুষ্ক, শীর্ণ। কদলীও তথৈবচ।

হনুমানধারার শিরোদেশে সীতারসুই বা সীতাদেবীর রন্ধনাগারে, সীতারসুইয়ের সম্মুখে বসে আছে ভস্মমাখা এক সাধু। সামনে এক যজ্ঞকুণ্ড। ধুনী জ্বলছে, সাধু নির্ব্বাক। যাত্রীরা সাধুকে প্রণাম করছে। কেউবা চাল-ডালের ভোজ্য নিবেদন করছে। যজ্ঞকুণ্ডের ছাই আঙুলে তুলে নিয়ে ললাটে চিহ্ন এঁকে নিচ্ছে। সাধু জপ করে চলেছেন। একটু দূরে কয়েকজন দেহাতী মেয়ে গরম দুধ বিক্রি করছে। দু'আনা পোয়া। পরিশ্রান্ত যাত্রীরা দুধ কিনে খাচ্ছে, খাঁটি দুধ। কেউবা দুধ কিনে মাটির মালসাতে সাধুর সামনে নিবেদন করে দিয়ে যাচ্ছে, এমন নিবেদন করা কত দুধের মালসা এবং কত ভোজ্য পড়ে আছে সাধুর সম্মুখে। সীতারসুইয়ের ভিতরে এক সাধু বসে আছে। আমরা ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র সাধু বললে, এখানে সীতাদেবী রান্না করতেন, পাঁচ সের চালের ভোজ্য নিবেদন করে যাও। জীবনে কখনও অন্নকষ্ট হবে না। বুঝলাম লোকটি লোভী।

আবার দোলায় চেপে নীচে নেমে এলাম। ফেরার পথে অনুসূয়া আশ্রম দর্শন করে চিত্রকূট পরিক্রমা শেষ করলাম, অনুসূয়া ও অত্রিমুনির আশ্রম হনুমানধারা থেকে দু মাইলের মধ্যে। এখানের একটি মন্দিরে অনুসূয়া, অত্রিমুনি এবং এদের পুত্র দত্তাত্রেয় মুনির মূর্ত্তি আছে, এখানে দুর্ব্বাসামুনির মূর্ত্তি আছে দেখলাম।

জীবনের কী আশা!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১

আমি আজ ভালবাসি অতীতের আমাকে!
সাথে সাথে ভালবাসি সেদিনের তোমাকে।
ছিনু তবে নবযুবা, তুমি ছিলে যুবতী!
যৌবনরাজ্যের রাণী আর ভূপতি!

২

যৌবন গেলে, হায়, সবি যায় ফুরায়ে!
প্রেম চির-অক্ষয়, যায় না তা বুড়ায়ে।
অতীতের মধু স্মৃতি স্মরি দিবাযামিনী;
প্রেমিকের প্রাণারাম কোথা সেই কামিনী!

৩

ঝরে' গেছে রূপ তব, নহ আর রূপসী!
পড়ে' আছে হিয়া শুধু রূপ-সুধা-উপোসী!
দুইজনে দু-জনার দেখি দেহ চাহিয়া;
শোকে করি' হাহাকার প্রাণ ওঠে গাহিয়া!

৪

ছিল চোখে মুখে বুকে কটি-তটে লালিমা;—
(জলহীন মোধকের তনুময় কালিমা!)
আজ, গুরুনিতম্ব নাহি দোলে চলিতে;
হাসে না সে মৃগ-আঁখি আজি কথা বলিতে!

৫

আমিও সে আমি নই, হাসি নেই আননে;
কুহু-রবে ধাই না তো সব ভুলে' কাননে!
কুঞ্চিত কালো কেশ, নেই জ্যোতি নয়নে;
কেন গেল যৌবন—জেগে ভাবি শয়নে।

৬

রূপ আর যৌবন গেলে মরা ভালো সে;
গুঞ্জন তোলা বৃথা বসে' বসে' আলসে!
গেছে সবি, আছে শুধু বুক-ভরা পিয়াসা!
আর কেন বেঁচে থাকা, জীবনের কী আশা!

এরাও মানুষ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আমরা তখন কিশোর ছেলে—সেই সময়ে কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতাকে মুক্তি দেবার জন্য স্নেহলতা কাপড়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আত্মহত্যা করেছিল। পল্লিমাটির দেশ বাংলা, সঙ্গে সঙ্গে বরপণের বিরুদ্ধে রীতিমত আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। অনেক উদার যুবক আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অভিভাবকদের মনঃপীড়া ঘটিয়ে বহু কন্যাদায়গ্রস্তের আশীর্ব্বাদভাজন হলেন। আশীর্ব্বাদপ্রাপ্তদের দলে আমিও ছিলাম। তখন কি ভেবেছিলাম—ভাববন্যার জল কমে গেলে মাটি আর উর্ব্বরা থাকবে না। অতঃপর হাজার চেষ্টা করলেও সে জমিতে ফসল ফলবে না। কাঁটার জঙ্গলে ভরে উঠবে জমি আর সেই কণ্টকক্ষতের জ্বালা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করব আমরা—সাধুভাব উদ্বুদ্ধ আদর্শবাদীর দল।

সেই ভাব-উচ্ছ্বাস মুহূর্ত্তে প্রতিভাবান নটনাট্যকার গিরিশচন্দ্র মঞ্চস্থ করেছিলেন 'বলিদান' নাটক। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মর্ম্মান্তিক সমস্যা নিয়ে লেখা বিয়োগান্ত কাহিনী। ভদ্রলোকের মাত্র তিনটি কন্যা ছিল। সে সময়ে চালের মণ ছিল দু'টাকা—সেই অনুপাতে মাছ, দুধ, আনাজপাতি। দু'টাকা জোড়ায় শাড়ী মিলত—আটদশ টাকা মণ সরষের তেলে সংসার-যন্ত্র অচল হবার কথা নয়। তেমন সস্তা-গণ্ডার দিনেও পণের টাকা যোগাড় করতে না পেরে করুণাময়কে উদ্বন্ধনে আত্মঘাতী হতে হয়েছিল। অভিনয় দেখে হাজার হাজার দর্শকের চক্ষু অশ্রুসজল হয়েছিল, পণপ্রথা কিন্তু উঠে যায় নি। দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে পৌঁছেও সভ্যজগতের মাঝে আমরা তার জের টেনে চলেছিই। পাঁচটিই মেয়ে আমার, ছোট দুটি বাদে সব ক'টিই পাত্রস্থা হয়েছে—সেই সঙ্গে আমার অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। চতুর্থটি কুড়ি ছাড়িয়েছে, তারই জন্য পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে পড়েছি। ভিটেছাড়াদের সমস্যাটাই সরকারের চোখে বড় হয়ে উঠেছে, কন্যাদায় এ সমস্যার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। এই দায়ে ঠেকে যাঁদের সঙ্গে মিলবার সুযোগ ঘটেছে তাঁদের সবই এই কাহিনীর বিষয়বস্তু।

একদিন শুকনো মুখে বাড়ী ফিরছি—পথে দেখা এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে।

বন্ধু বলল, কোথায় গিয়েছিলে? মুখ শুকনো কেন?

গিয়েছিলাম পাত্রের সন্ধানে কালনায়। সকালে বেরিয়েছিলাম—এই ফিরছি।

সারাদিন খাওয়া হয় নি বুঝি? তা যাঁদের বাড়ী গিয়েছিলে --

তাঁরা পাত্রপক্ষ—কতদূর থেকে এসেছি সে হিসাব রাখার দায়িত্ব ত তাঁদের নয়, মেয়ের বিয়েতে কত খরচ করতে পারব সেই হিসাবটুকু শুধু করলেন।

কি বুঝছ—সুবিধা হবে?

মনে ত হয় না। গেল রবিবারেও অমনি চুঁচড়োয় গিয়ে—

বন্ধু বলল, মিছিমিছি হিল্লীদিল্লী ঘুরে মরছ কেন, বাড়ীর দুয়োরে সুপাত্র রয়েছে একটি—চেষ্টা কর। লেগে যেতে পারে। ঠিকানা বলে দিচ্ছি—কালই আপিস ফেরত চলে যাও।

ঠিকানা খুঁজে সেইখানেই গেলাম। গলির গলি তস্য গলি তারই মধ্যে থাকেন পাত্রের পিতা সদাশিববাবু। অনেক কষ্টে বে-নম্বরি দুয়ারের কড়া নাড়লাম ভয়ে ভয়ে।

একটু পরে দোর খুলে গেল। সম্ভাষণ-পর্ব্ব শেষ না করেই সদাশিববাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আরে আপনি! কি মনে করে? অনেক দিন পরে দেখা—রিটায়ার করেছেন, না বয়স কম লিখিয়ে এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন?

চেনা মুখ। আমাদেরই ফার্মে অন্য বিভাগে কাজ করতেন। অবসর নিয়েও পেন্সন পাচ্ছেন মোটা, কিন্তু বাড়ীটা এমন নরককুণ্ডে কেন?

বললাম, বয়স ভাঁড়াই নি—এখনও চাকরি আছে। কিন্তু কয়েকটি কন্যার জনক হওয়াতে আপনার শরণাপন্ন হতে এসেছি।

বিলক্ষণ! আসুন—আসুন। অভ্যর্থনা করে ঘরে বসালেন। বিস্মিত হয়ে বললাম, এটি বাসগৃহ না মেসবাড়ী? ঘর জুড়ে সারি সারি খাটিয়া পাতা।

আমার বিস্ময় দেখে সদাশিববাবু হাসলেন। বললেন, ভেতরে ঘর আছে আরও—আমার ছেলেরা এই ঘরে শোয়।

ওঃ। তা যে ছেলেটির বিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন—সেটি—

সে কাজ করে ভাল একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে—

চারশো টাকা মাইনে প্লাস এ্যালাউন্স। বিয়ের সম্বন্ধ আসছে বড় বড় জায়গা থেকে—তা আমি চাই জানা ঘরের মেয়ে।

কিঞ্চিৎ আশা হ'ল। বললাম, ছেলের জন্মকুণ্ডুলিটা দেবেন, মিলিয়ে দেখব। তারপর মেয়ে দেখার ব্যবস্থা—

জন্ম কুণ্ডুলি! নেই ত। ওসব আমি মানি না।

তাহলে মেয়ে দেখবেন কবে?

ছেলেই যাবে, পছন্দ করবে। আমাদের পছন্দে ত বিয়ে হবে না—কি বলেন? বলে উচ্চহাস্যে আমার আপ্যায়িত করলেন। আমরা শুধু ভারবাহীর কাজ করব, দেনাপাওনা ঠিক করে দেওয়ার কর্ত্তা, কি বলেন? আবার উচ্চহাস্য।

তা বইকি। প্রায় নিবু নিবু গলায় সায় দিলাম।

তা কি রকম খরচপত্র করতে পারবেন?

আগে মেয়ে দেখা হোক, পছন্দ হোক—

ধরুন পছন্দ হয়েছে। তা কি রকম খরচ করতে পারবেন জানতে পারি কি?

শুকনো গলায় বললাম, তিনটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, এটি চতুর্থ, এর পরেও আছে একটি—খরচ করার শক্তি কই বলুন?

তবু? চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে আমার পানে চাইলেন। সত্যিই ত গা খালি করে কন্যা সম্প্রদান করতে পারবেন না।

আজ্ঞে তা যথাসাধ্য দিতে হবে বইকি। এই ধরুন গিয়ে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজারের মধ্যে—

অঃ। দৃষ্টিটা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, এ বাজারে অত সস্তায় কন্যাদায়ে উদ্ধার হতে পারবেন কি?

আপনাদের অনুগ্রহ হলেই পারব।

মুখ ফিরিয়ে বললেন, আরে আমরাও ত লাখপতি নয়। ছেলের বিয়েতেও ত খরচ আছে। বৌভাত, গায়ে হলুদের তত্ত্ব, কুটুম-কুটুম্বিতে—সবই ত ওই থেকে, মাছের তেলে মাছ ভাজা। ভেবে দেখুন ভাল করে—পরামর্শ করুন, তার পর পত্র দেবেন, মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করা যাবে।

বলা বাহুল্য, ওদিকে আর ঘেঁষি নি।

আর একজন স্পষ্টই বললেন, দাবীটা কি অন্যায়! দুটি মেয়ের বিয়েতে কত ঢালতে হয়েছে জানেন! রীতিমত ছুরি চালিয়েছে মশায়।

বললাম, যার বেদনা আজও ভুলতে পারেন নি সেই আঘাতই করতে চাইছেন আর একজনকে!

করব না—খরচ করেছি উশুল করব না? মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফতুর হতে চলেছি, ছেলের বিয়ে দিয়ে সামলে নেব না বলতে চান? ভদ্রলোক রুখে উঠলেন।

সসম্মানে সরে এলাম।

আর একটি সৎপাত্রের সন্ধানে তার বাপের কাছে গিয়ে ওই গল্পটা করতেই তিনি ধিক্কার দিয়ে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ—ওদের কথা বলবেন না মশাই, ওরা মানুষ নয়। আমি ছেলে বেচার কারবার করব না, মেয়ে পছন্দ হয় বিয়ে দেব, একটি পয়সাও নেব না, বলুন কবে যাব আপনার কন্যাটিকে দেখতে?

খুসী হয়ে বললাম, কোন্‌দিন অনুগ্রহ করে পায়ের ধুলো দেবেন জানালে—

হো-হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, ধুলো কি আর পায়ে আছে—এই নিয়ে ধরুন গিয়ে শ'খানেক পাত্রী দেখা হবে।

বলেন কি—একটিও পছন্দ হয় নি? শুকনো গলায় বললাম।

তিনি পরমাশ্চর্য্য হয়ে উত্তর দিলেন, বলেন কি—সারা জীবন যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে—তাকে এক কথায় পছন্দ সহজ নাকি! পাত্রীর কুল-শীল-বংশ-গোত্র-শিক্ষা-সহবৎ-রূপ-গুণ সব যাচাই করে নেওয়া সহজ ভাবছেন? মশায় বুঝি এখনও ছেলের বিয়ে দেন নি?

আজ্ঞে না। একটিমাত্র ছেলে সবে ক্লাস এইটে উঠেছে।

তাই বলুন! এ যে কি বিষম ব্যাপার ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝতে পারবেন না। মেয়ের বিয়ের আর হাঙ্গামা কি? পাত্র দেখলেন—কোষ্ঠী মেলালেন, দরদস্তুরে বনল—ব্যস, লেগে গেল। যাক—কাল সুবিধে হবে কি?

বেশ ত - অনুগ্রহ করে যদি যান।

দাঁড়ান, পাঁজীখানা দেখি।

পাঁজী উল্টে বললেন, না, কাল একাদশী। নিরম্বু উপবাস করি—কাল ত যেতে পারব না। পরশু যদি সুবিধা হয়—

পরশুই যাবেন।

মেয়ে দেখে পছন্দ করলেন। বললেন, মোটামুটি ভালই। পটের বিবি নিয়ে কি করব বলুন। আমাদের গৃহস্থ ঘরে রাঁধতে-বাড়তে হবে—কাজকর্ম্ম করতে হবে এই হলেই হ'ল। আচ্ছা নমস্কার। খবর পাঠাব। দেনাপাওনাতে কিছু আটকাবে না—যা সাধ্য তাই দেবেন।

আশায় আশায় দিন গুনছি—ইতিমধ্যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করল, কিরে মেয়ের বিয়ের কতদূর?

তাকে বললাম সব কথা। বললাম, আশা ত হচ্ছে এইখানেই হবে, ভদ্রলোকের টাকার খাঁই নেই।

বলিস কি—এ যে মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গস্বামী রে!

একটু চিন্তা করে বন্ধু বলল, কি রকম চেহারা ভদ্রলোকের বল ত? রংটা ভুষো কালির মত? মস্ত এক জোড়া গোঁফ আছে, একটা চোখ ট্যারা? আর শিশুপ্যাটার্ণ চেহারা?

অবিকল! কেমন করে জানলি?

বাবা ও যে ধোবীমাকা মানুষ—ওকে কে না জানে!

হাঁ—বলছিলেন বটে—কমসে কম শ'খানেক মেয়ে দেখেছেন।

মাত্র শ'খানেক! ওর তিন-চার গুন হবে। মেয়ে দেখাই ত ওর পেশা।

সে আবার কি!

বন্ধু হেসে বলল, তিন-চারশ' মেয়ের বাপকে ঝুলিয়ে রেখেছে নিজের মহত্ত্ব প্রচার করে। আহা—আমার যদি অমনি একটি ছেলে থাকত! তা হলে ছেলে ম্যাট্রিক পাস করামাত্রই কনে দেখতে সুরু করতাম—আর ছেলে ডিগ্রী-কোর্স নেওয়ার পরও তার জের চালিয়ে যেতে পারতাম?

অধিকতর আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম, মানে?

মানে খুবই সোজা। ভদ্রলোক সন্দেশ রসগোল্লা খেতে ভারি ভালবাসেন। 'পল্লীসমাজে'র দী? ভট্চাজের মত আর কি, বাবাজী—বললে পেত্যয় যাবে না—সন্দেশ খেতে আমি বড্ড ভালবাসি। চার বছর ধরে অনূঢ়া মেয়ের বাবাদের ঘাড় ভেঙে তোফা জলযোগ চালাচ্ছেন আর আট-দশ দিন পর পর এমন এক-একটি লম্বা ফর্দ্দ হাঁকরাচ্ছেন যে মেয়ের বাপের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছ অবস্থা!

অবিকল মিলে গেল বন্ধুর কথা। সপ্তাহ পরে সুদীর্ঘ একখানি ফর্দ্দ পৌঁছল হাতে। সেখানা নিয়ে ছুটলাম ভদ্রলোকের কাছে। ইচ্ছা ওর সততা যাচাই করব।

কড়া নাড়তেই একটি দশ-বার বছরের ছেলে দরজা খুলে বলল, বাবা ত বাড়ী নেই।

বললাম, ফিরবেন কখন?

জানি না। রাত দশটা-বারোটা হতে পারে।

মনে হ'ল, শেখানো বুলি গড়গড় করে আউড়ে যাচ্ছে। দরজার পাশেই একটা ঘুলঘুলি। সেদিকে চাইতেই যেন সুরুৎ করে সরে গেল গোঁফের খানিকটা। ফিরে এলাম।

আর একদিন সাহস করে গেলাম এক রায়বাহাদুরের বাড়ীতে। শুনেছিলাম ভদ্রলোক স্পষ্টবাদী—পণ বলে কিছুই গ্রহণ করবেন না, দানসামগ্রীও নয়। ভাবলাম—চেষ্টা করতে ক্ষতি কি—যদি লেগে যায়।

পদস্থ হলেও ওর ব্যবহার বেশ অমায়িক। বৈঠকখানায় যত্ন করে বসালেন, সমস্ত কথা শুনলেন মনোযোগ দিয়ে। শেষে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন ত ছোট্ট একটি প্রশ্ন করব আপনাকে। তার পর মেয়ে দেখার ব্যবস্থা।

আশায় দুরু দুরু করে উঠল বুক—মাত্র একটি ছোট্ট প্রশ্ন!

বলুন। বিনীত ভাবে চেয়ে রইলাম ওঁর পানে।

একটুখানি কেসে প্রশ্ন করলেন রায়বাহাদুর, আচ্ছা—আপনার মেয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট না বি-এ অনার্স?

ছোট্ট প্রশ্নটি বড় একটা বোমার মত বিস্ফোরণ ঘটাল। কাঁচুমাচু মুখে বললাম, আজ্ঞে, ওর কোনটাই নয়। গরীব কেরাণী—কষ্টেসৃষ্টে ক্লাস নাইন অবধি পড়িয়েছি। আমাদের মত গৃহস্থ ঘরে বেশী পড়ানোও—

জানি। বাধা দিয়ে বললেন রায়বাহাদুর, কেউ ভাল চোখে দেখেন না। আমি কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করি। ইংরেজি শিখে ডিগ্রী না নিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না—আর প্রকৃত শিক্ষা না হলে কি পুরুষ—কি মেয়ে কারও জীবন সম্পূর্ণ হয় না।

আজ্ঞে ডিগ্রী না নিয়েও কি প্রকৃত শিক্ষা হয় না?

নিশ্চয় হয়, কিন্তু সে শিক্ষা ক'টি মানুষ গ্রহণ করতে পারে, ক'টি মানুষের জীবনে সে সুযোগ আসে? চাকরি আর সামাজিক ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারটাই হ'ল আসল।

অতঃপর স্থির করলাম চাঁদের পানে আর হাত বাড়াব না। কেরাণীগিরি করি, লক্ষ্য থাকুক তেমনি একটি পাত্রের উপর—যার বাড়ীঘর আছে, চাকরি আছে—হোক দিন আনা দিন-খাওয়ার মত চাকরি। ওরই মধ্যে একটু সচ্ছল অবস্থা দেখে মেয়েটিকে পাত্রস্থ করব।

একটি পাত্রের সন্ধান পেলাম। ছেলেটি চাকরি করে না—ব্যবসা করে। আমাদেরই মত গৃহস্থঘর—বেশী লেখা-পড়া জানা মেয়ে ওঁরা চান না। বাড়ীটা ওঁদের পাড়াগাঁয়ে, মার্টিনের ট্রেণে চেপে যেতে একবেলা লাগে।

তা হোক—ছুটলাম সেখানে। বাড়ীঘর দেখলাম মোটা-মুটি মন্দ নয়—সংসারও ছোট।

পাত্রের পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি পুরুষানুক্রমেই বিজনেস করছেন?

না না, ছেলেই প্রথম এই লাইনে এসেছে। তা কামাচ্ছে ভালই।

কিসের বিজনেস ?

স্টেশনে নেমে দেখতে পাননি বুঝি ? যাবার সময় দেখবেন। টিকিটঘরের বাঁ হাতি ওর স্টল।

তার পর যা রীতি—দরদস্তুরের কথা, কি খরচ করতে পারবেন বলুন ত ?

সব কাকের একই রব—যেন খরচ করার উপরই বধূ নির্ব্বাচনের ষোল আনা নির্ভর করে।

ফিরবার সময় বাবাজীবনের বিজনেস দেখলাম। ছোট্ট একটি টিনের চালার সামনে দু'খানা নড়বড়ে আম কাঠের বেঞ্চি পাতা, ছোট একটা বাক্সে কিছু বিস্কুট—এক পাশে কয়েকটি পিরিচ-পেয়ালা সাজানো। কাচঘেরা টিনের কৌটায় খান আষ্টেক কোয়ার্টার পাউণ্ডের পাঁউরুটি—তার পাশে চুণখয়েরর মাথা ভিজে ন্যাকড়া চাপা এক গোছা পান। কাঠের পিঁড়িটার উপর রয়েছে চুণখয়ের-সুপারি দেওয়া চেড়া পান—খদ্দের এলেই খিলি মুড়ে দেবে তাড়াতাড়ি। খদ্দের কিন্তু একটিও নেই দোকানে।

পান এবং চায়ের কম্বাইণ্ড বিজনেস।

আমাকে চাইতে দেখে সাদর আহ্বান জানালেন বাবাজীবন, আসুন বড়দা, ভাল চা পাবেন—আসাম দার্জ্জিলিং ব্লেণ্ড।

বাড়ী এসে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। উত্তমরূপে ক্ষৌরিত হওয়া সত্ত্বেও মাথায় একগাছিও ত কাল চুল নাই, ছোকরা সম্বোধনে ভুল করল কেন ! দাদু বলেও ত ডাকতে পারত !

আমি যতই হতাশ হয়ে পড়ছি বন্ধুর উৎসাহ তত বেড়ে চলেছে। ঠেলেঠুলে পাঠালে আর এক জায়গায়। বললে, সম্বন্ধটি ভাল। ভারি ভদ্রবংশ, উঁচু চাকরেও, দেশে ধানজমি আছে—চাকরি না করলেও চলে, তবু ছেলেরা চাকরি করে। ভাল চাকরি। একটু কামড় আছে ঘাবড়ে যেয়ো না, তুমিও কামড় লাগিও উল্টে। হিল্লে লাগবেই। এমন লোক কিন্তু হয় না।

বললাম, কনের বাপেরা সবাই ত ফোকলা, তারা কামড়াবে কি করে !

শিখিয়ে দেব মন্তর। বন্ধু হাসলেন। চল—আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

ভদ্রলোকের চেহারাটি বেশ শাঁসেজলে—মুখখানি হাসি হাসি। দেখলেই মনে হয় সহৃদয়। খুব খাতিরযত্ন করে বৈঠকখানায় বসালেন। পানি আনিয়ে দিলেন—চা ফরমাস করলেন—সরবৎ খাব কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর সমবেদনা জানিয়ে বললেন, আমি মশায় ভুক্তভোগী—আমাকেও তিন-তিনটি মেয়ে পার করতে হয়েছে, বুঝি সব।

কিভাবে কত খরচপত্র করে মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন তাও জানালেন সবিস্তারে। বললেন, কি জানেন, এ হ'ল ব্যঞ্জন রাঁধা—যত গুড় দেবেন ততই মিষ্টি। তা এক-একটি মেয়ের বিয়েতে সাত-আট হাজার টাকা খরচ হলেও আপনাদের আশীর্ব্বাদে জামাই পেয়েছি মনের মত।

অতঃপর আসল কথায় এলেন, তা আপনি কি রকম খরচ করতে পারবেন জানতে পারি কি !

আমার হয়ে বন্ধুই বললে, আগে মেয়ে দেখে আসুন, পছন্দ করুন —

ভদ্রলোক অমায়িক হাসি হেসে বললেন, তা বটে—তা বটে, পছন্দ হ'লে কি দেনাপাওনায় আটকায়। দুজনে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে, কি বলেন !

পথে এসে বন্ধু বললে, কেমন, বলি নি, এমন লোক হয় না। মেয়ে পছন্দ হ'লে দেনাপাওনায় আটকাবে না—একথা ত স্পষ্টই বললেন।

বললেন বটে, আমি যে ঘরপোড়া গরু !

আরে রাখ তোমার ভয়, এইখানে যদি লাগাতে না পারি —

থাক—দিব্যি-দিলেশাটা আগে থেকে না করাই ভাল। ওকে নিবৃত্ত করলাম।

ওঁরা যথাকালে মেয়ে দেখতে এলেন—মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে সাত জন। এসেই বললেন, দফায় দফায় ভদ্রলোককে বিব্রত করা পছন্দ করি না। দেখেছি ত নিজের মেয়ের বিয়ের বেলায়! প্রথম দিন এলেন গুরুগম্ভীর পরমাত্মীয়ের দল—বাবা, কাকা, জ্যাঠা, পিসেমশাই, মেসোমশাই-এর দল। ওঁরা বিশেষ অপছন্দ করেন না—বলেন, বেশ বেশ। বাড়ীতে গিয়ে মেয়েদের বলব, তাঁরাই বউ নিয়ে ঘর করবেন—তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ আছে ত। আমাদের কালে ছিল না রেওয়াজ—সম্প্রতি হয়েছে। আরে মশাই একটা প্রথা আছে—সোনার গহনা দিয়ে বউ-এর মুখ দেখা। তা আগেভাগেই যদি মুখ দেখে পছন্দ করে বসলেন বুঝুন ব্যাপারটা! তার পর ওঁরাও এলেন—ছেলের মা মামী পিসি দিদি বৌদিদি প্রভৃতির দল। এঁরাও ফাইন্যাল কিছু বললেন না। বললেন, দেখলাম ত ভালই, তবে যার পছন্দে আসল পছন্দ সে দেখলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়, আমাদের আর গঞ্জনা খেতে হয় না। অতএব ফাইন্যাল করতে বাবাজীবন এলেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। শুভদৃষ্টির আগেই দৃষ্টিপাত—বুঝুন অনাসৃষ্টি ! আমি মশায় দফে দফে ওই হাঙ্গামা পছন্দ করি না—তাই ছেলের মা, বৌদি আর

মাসীকে নিয়ে এলাম। আমার ছোট ভাই অর্থাৎ ছেলের কাকা, আমার বড় ছেলে আর ছোট ছেলেকে নিয়েছি সঙ্গে। ছেলে আমার সুবোধ—এতগুলি কাঁচা পাকা চোখে যা পছন্দ করে যাবে তাতে একটুও আপত্তি করবে না। এ বিষয়ে আপনাকে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি--আমাদের দেখাই ফাইন্যাল।

বন্ধু ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, শুনলি কথা—এমন লোক আর হয় না।

সত্যিই ভদ্রলোক ওঁরা। মেয়ে দেখলেন—পছন্দ করলেন। সবচেয়ে মুগ্ধ করল আমাকে ওঁর পূর্ব্বাহ্নের সাবধানবাণী। এসেই বললেন ভদ্রলোক, শুনুন, মেয়ে দেখতে এসেছি আমরা সাত-আট জন—জলখাবারের আয়োজন যেন করবেন না। ওটা পছন্দ করি না আমি। স্রেফ চায়ের বেশী যদি আয়োজন করেন ত মেয়ে পছন্দ বাতিল হয়ে যাবে—তা যত রূপগুণই থাক আপনার মেয়ের।

পরের দিনই ডেকে পাঠালেন।

বললেন, এবার দেনা-পাওনার কথাটা খোলসা করে নেয়া যাক। আসছে বোশেখেই শুভকাজ সারতে চাই।

উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।

বললেন, প্রথম থেকেই সুরু করি আসুন। কত খরচ করতে পারবেন বলুন ত?

সেই পুরাতন প্রশ্ন!

তবু ভদ্রলোকের ব্যবহার ভাল লেগেছিল—মনে হয়েছিল—এক কথার মানুষ। একটু বাড়িয়েই বললাম, এই ধরুন পাঁচ হাজার।

ভদ্রলোক ঘাড় দুলিয়ে অল্প হাসলেন, উঁহু আর একটু বাড়ুন।

আজ্ঞে সবচেয়ে বাড়িয়েই বলেছি।

এতে কি করে হবে বলুন ত? ধরুন আমাদের দিকেরও একটা হিসাব আছে ত। আর আপনার হিসেবেই কি মিলবে? তাহলে ধরুন প্রথম থেকে। একটু দম নিয়ে বললেন, আমাদের শাস্ত্রে আছে সালঙ্কারা কন্যাদানের তুল্য পুণ্য আর নাই। তা মেয়ের গায়ের যে অলঙ্কারগুলি কাল দেখলাম—ওগুলি মেয়েরই ত? ওই শুদ্ধই কন্যাদান করবেন ত?

বললাম, মেয়ের নিজের গায়ের গহনা শুদ্ধ মেয়ে দেখানোর সেই ভাগ্য ক'টা লোকের হয় বলুন? ওগুলি—

বাধা দিয়ে বললেন, যাই হোক, ওর অদ্ধেক অন্তত: ধরে নিতে পারব মেয়ের নিজস্ব। তাহলে পঁচিশ ভরির কম কি মেয়েকে সালঙ্কারা করতে পারবেন?

আমার মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখে অভয় দিলেন, এটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা—দাবি না। দ্বিতীয় দফা ধরুন—খাট একখানা নিশ্চয় দেবেন—তা পাঁচ-ছ'শো টাকার কমে কি হবে? আবার ভাল আলমারিও একটা না দিলে নয়—আজকালকার রেওয়াজ জানেন ত—ট্রাঙ্কে কাপড়-জামা রাখা উঠে গেছে—ওসব অজ পাড়াগাঁ ছাড়া ব্যবহারও করে না কেউ।

একটু থেমে বললেন, আচ্ছা—আপনার মেয়ে সেলাই জানে?

পাছে বাতিল করে দেন এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বললাম, হাঁ—জানে বই কি কিছু কিছু।

উজ্জ্বল মুখে ভদ্রলোক বললেন, তবেই বুঝুন—সেলাই কল একটা দেবেনই দেবেন। তার পর বরাভরণ—আংটি, ঘড়ি।

বললাম, ঘড়ি ত অনেক রকম আছে—

নিশ্চয়! ধরুন ভাল মেকারের হাজার, ন'শো, আটশো, সাতশো।

সাতশোয় পৌঁছে দাঁড়ি টানলেন। হৃদকম্প হ'ল।

আংটির কথা শুধোলাম না—নিজেই বললেন, যা সোনার দর—দুশো আড়াইশোর কমে কি আর জামাইকে দেওয়ার মত আংটি হবে। আর সোনার বোতামটি ফুল সেটই দেবেন, ছেলে আমার সুট পরে কিনা।

শাখাপ্রশাখায় যে গাছটি মনের উঠোনে এমন ঘন ছায়া ফেলছে তার গুঁড়িটার কথা আর ভাবতে পারছি না, অথচ সেটুকু না জেনে নিলে পাঁচ হাজারের মার্জ্জিনটারও আন্দাজ পাচ্ছি না। ভয়ে ভয়ে বললাম, নগদ বরপণ কি দিতে হবে—

নগদ এক পয়সাও দাবি করতাম না, সম্প্রতি বড় কাহিল হয়ে পড়েছি মেয়ের বিয়ে দিয়ে। আট হাজার গেছে—আর ঘর থেকে টাকা বার করে সাধ-আহ্লাদ মেটাবার সাধ্য নাই আমার। ধরুন না কেন—আমার বন্ধু আত্মীয় কুটুম্ব তাদের আনতে হবে—এই প্রকাণ্ড ছাদে ম্যারাপ বাঁধতেই ত লাগবে তিন-চারশো টাকা। তার পর বাজনা-বাদ্যি, বৌভাতের হাঙ্গামা—দু' হাজারের কম কি কুলোবে?

শুনে ত আবার চক্ষু পলকহীন।

উনি আরও কি বলছিলেন, শুনি নি। পাঁচ হাজারের বাজেট তখন ফিফটি পারসেণ্ট একসীড করেছে।

বললেন, কি মশায়, ভয় পেলেন নাকি? আর ত মাত্র একটি মেয়ে রইল বিবাহযোগ্যা—এতে ঘাবড়াবার কি আছে।

তা বটে—ভাবনার কিছু নাই। যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করে বনবাসী হবার পথটা খোলসা করেই ত দিচ্ছেন। এমনিতে ত সাধ করে শাস্ত্রবাক্য মানি না আমরা।

পথে দেখা বন্ধুর সঙ্গে। একগাল হেসে বলল, সব কথা পাকা হয়ে গেল ত? কেমন, বলেছি কিনা, অমন লোক আর হয় না।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ভদ্রলোক কি করতেন?

ওহো বলি নি বুঝি? উনি ফৌজদারি কোর্টের উকিল ছিলেন—বেশ ভাল উকিল। ওঁর জেরার চোটে তা বড় তা বড় সাক্ষীরা ঘায়েল হয়ে যেত।

বলতে হবে না—যেটা মর্ম্মে মর্ম্মে টের পেয়েছি।

বন্ধু বলল, বাঘ কামড় দিয়েছে বুঝি? তা তুই উল্টো কামড় লাগাতে পারলি নে?

কামড়াবার জায়গা রেখেছে কি—সর্ব্বাঙ্গে অমায়িক ভদ্রতার মলম লাগিয়ে দিয়েছেন। এখন শুধু ভাবছি কি করে এ দায় থেকে উদ্ধার হব?

বন্ধু সবিস্ময়ে বলল, ওইখানেই বিয়ে দিবি নাকি?

উপায় কি? মাথা ত মুড়োতেই হবে এক জায়গায় না এক জায়গায়। সব ক্ষুরেই যখন সমান ধার—ওইখানেই মাথা পেতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব ঠিক করেছি।

বন্ধু হেসে উঠল উচ্চকণ্ঠে, তা বটে—তা বটে।

পাদপদ্মে

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
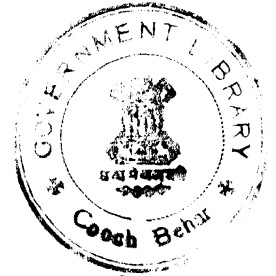
আজ কোথায় সাধেরি কেলিকদম্ব
নন্দিত মধুকুঞ্জবন;
কোথা লাখো বিহঙ্গ সঙ্গীত ভরা
ভৃঙ্গ মধুর গুঞ্জরণ।
আজ বংশীর গানে প্রাণচুরি কোথা
পুন্নাগে বাঁধা ঝুলদোলা?
চির সুন্দর সাথে সুন্দরী দল
হিল্লোল দেওয়া হিন্দোলা।
মহা রস-উৎসবে রাসেরি নৃত্যে
কোথা আজি মধু ঝুলনা গো,
সেই স্বপ্নে মাখানো বাস্তব ধরা
কার সাথে করি তুলনা গো?
কোথা হোমধুমভরা তপোবন আজ
সামবেদপূত সাম্যগান,
কোথা সঙ্গীত ঘেরা যৌবনপুরে
মানব মানবী ভ্রাম্যমান?
কোথা স্বর্গের সাথে মর্ত্তের বাঁধা
গৃহস্থালীর পুণ্যলোক,
আজ কোন্‌খানে হায় মুক্ত ধরার
দুঃখজরা ও মৃত্যুশোক?
মধু চিরবসন্ত ছিলরে যেথায়
আনন্দ ছিল অন্তহীন,

আজ অস্ত সেথায় সকল শান্তি
দুঃখ-আঁধারে অন্তরীণ।
ওরে পুষ্পকোৎসব পড়েছে ঝরিয়া
দুঃখের ঘোরে অন্ত নাই,
আর ধরণীর মধু নাই নর্ত্তন
রোষে খোরে শুধু যন্ত্রণায়।
ওরে মহাপাপে আজ পঙ্কমলিন
সৃষ্টির পূত আস্তরণ,
আজ নিজেরি কর্ম্মে হানিয়া মর্ম্ম
কাঁদিছে কাতরে সর্ব্বজন।
কবে বংশী লুকায়ে বংশী-কিশোর
লুকালো চরণছন্দ তার,
আজ ডুবেছে চন্দ্র শুধু হাহাকার
নেমেছে অসীম অন্ধকার।
এই দুর্দ্দশা মাঝে যাত্রী যে আমি
দুঃখ আঁধার রাত্রি ঘোর;
প্রভু ক্ষমো অপরাধ সঙ্গে আমার
কোর না তোমার ছিন্ন ডোর।
তব বদনপদ্ম লুকায়ে গোপনে
করো নাকো আর ছলছল;
মোর মৃত্যু করিতে নৃত্যমুখর
দাও তব পাদপদ্মতল।

জিজ্ঞাসা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বল অভিজ্ঞ, পরম বিজ্ঞ, জীবন-জিজ্ঞাসার,
উত্তর কিছু পেয়েছ, তুমি কি অর্থ পেয়েছ তার ?
ভেবেছি কখনো এ যে রহস্য, কখনো ভেবেছি—জানি,
কখনো শুনেছি দীর্ঘশ্বাস, কভু সান্ত্বনা-বাণী।

এ জীবন শুধু বেদনায় গড়া, কহিল দার্শনিক,
কবি কহে, তুমি বুদ্ধি-প্রবীণ, বলেছ হয়ত ঠিক,
এই নহে সব, এই নহে শেষ, এর পর কিছু আছে,
তাইতো জীবন বহনীয়, তাই প্রিয় মানুষের কাছে।

আছে ব্যথা, তবু আনন্দ আছে, কি-ই-বা অচঞ্চল ?
হাসির সঙ্গে মিশায়ে রয়েছে গোপন অশ্রুজল।
কখনো আলোকে উচ্ছল প্রাণ, কখনো অন্ধকার,
স্বপ্ন এবং জাগরণে মিলে হয়ে যায় একাকার।

মরীচিকা পিছে ছুটেছি কি, শুধু দিগন্তহীন মরু ?
আছে নির্ঝর, শ্যাম সরোবর, আছে হেথা ছায়াতরু।
মনে হয় এর অন্ত আছে কি রাত্রি যখন আসে,
প্রভাতে কখন পূর্ব্ব আকাশে সোনার সূর্য্য হাসে।

শ্বসি ওঠে বায়ু, উত্তাল সিন্ধু দুর্দ্দম দুর্জ্জয়,
শান্ত সাগরে পাই নাকো তার এতটুকু পরিচয়।
বর্ষার মেঘ-বিষণ্ণ রূপ নয়নে ওঠে না ভাসি
শরৎ যখন সুনীল আকাশে হাসে প্রসন্ন হাসি।

মানুষ যখন একাকী—তাহার বেদনার নাহি শেষ,
সকলের সাথে সে যবে, তাহার থাকে না দুঃখলেশ,
সবার মাঝারে আপনা হারালে আপনারে ফিরে পায়,
তুমি আর আমি একা যবে – কাঁদি বিচ্ছেদ বেদনায়।

বিরহ-মিলনে চির বিচিত্র এই জীবনের গতি,
প্রকৃতি কখনো মায়া সে শুধুই, কখনো মূর্ত্তিমতী।
অসীমে ধরিতে পারি না, তাই তো বার বার টানি সীমা,
অন্তর ভরি' জেগে ওঠে এক অপূর্ব্ব মধুরিমা।

রূপের আরোপে অরূপ যখন হয়ে ওঠে অপরূপ
তখন আরতি বেজে ওঠে, জ্বলে পূজার সুরভি ধূপ,
সীমাতীত আর থাকে না সুদূর, শাশ্বত সান্ত্বনা,
করি যে কখনো কাব্য রচনা, কখনো বা আরাধনা।

কাব্য কখনো বেদনার বাণী, কাব্য কখনো স্তব,
সর্ব্বযুগের দুঃখ-সুখের সেথায় মহোৎসব।
তোমার কথা ও আমার কথায় নিখিল কাব্য ভরা,
চিরদিন যেথা অশ্রু পড়িল আনন্দরূপে ধরা।

চলচঞ্চল জগতে নিত্য নূতনের আসা-যাওয়া,
বুঝি না কি খুঁজি ? চিরন্তনে সে খুঁজিলে কি যায় পাওয়া ?
আকাশের এক ধ্রুবতারা আছে, চির-জাগ্রত আশা,
আছে জীবনের পরম সত্য, তার নাম ভালবাসা।

কারখানা

নরেন্দ্র দেব

(একাঙ্কিকা)
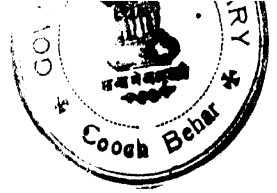
চরিত্র

ম্যানেজার, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, ইন্‌স্পেক্টর, ফোরম্যান, সেলসম্যান, প্রচার সচিব, কারখানার শ্রমিকগণ এবং ক্যান্টিন বয়।

স্থান : কারখানার ক্যান্টিন হল

সময় : টিফিন টাইম

দৃশ্য : চার-পাঁচজন শ্রমিক ক্যান্টিন হলে একখানি টেবিল ঘিরে বসে টিফিন খেতে খেতে গল্প করছে।

১ম শ্রমিক। (চা খেতে খেতে) লোকটা মোটের ওপর ভালো, কি বল ?

২য় শ্রঃ। (একখানা টোষ্ট কামড়াতে কামড়াতে) কোন লোকটা হে ?

১ম শ্রঃ। আমাদের ম্যানেজার সাহেব।

(প্রচার সচিবের প্রবেশ)

প্রঃ সচিব। সাহেব! সাহেব আবার কোথায় পেলে? বয়! আমায় একটা ডবল ডিমের ওমলেট দাও। আর গরম চা—হাঁা, সাহেবটি কে হে ?

১ম শ্রঃ। আমাদের ম্যানেজার সাহেবের কথা বলছিলাম।

(ক্যান্টিনবয় ওমলেট ও চা দিয়ে গেল)

প্রঃ সচিব। (খেতে খেতে) ম্যানেজার সাহেব! ওঃ! ভারি আমার সাহেব রে! সুট পরলেই বুঝি সাহেব হওয়া যায়? 'ম্যানেজার বাবু' বল।

১ম শ্রঃ। আচ্ছা বাবা তাই, ম্যানেজার বাবুই সই। কিন্তু, লোকটি যে ভালো এটা স্বীকার করবেন ত ?

৩য় শ্রঃ। (পরোটা আলুর দম মুখে পুরে) নিশ্চয়। এক শ' বার। খুব ভাল লোক।

প্রঃ সচিব। আরে। আমি কি অস্বীকার করছি ?

৪র্থ শ্রঃ। আমরা যখনি মিছিল বার করে 'আমাদের দাবী মানতে হবে' বলে হাঁক দিয়েছি, ম্যানেজার সাহেব তখনি তা মেনে নিয়েছেন।

প্রঃ সচিব। মেনে নিয়েছেন কি দয়া করে? সেই যাকে বলে 'গুঁতোর চোটে বাবা বলায়'।

৫ম শ্রঃ। সাহেব কোম্পানীর সাহেব ম্যানেজার হলে কি দিত?

২য় শ্রঃ। কেন দেবে তারা ? তাদের বিলেতের ভাই ব্রাদার-দের ভাগে কম পড়ে যাবে যে।

১ম শ্রঃ। যা বলেছ দাদা। ইনি আমাদের দিশী ম্যানেজার কিনা। আমাদের ধাত বোঝেন।

২য় শ্রঃ। খুব বোঝেন। জানেন যে আমাদের ক্ষেপালে কাজের সুবিধে হবে না। 'গো-স্লো' সুরু হয়ে যাবে।

৩য় শ্রঃ। যাই বল, আমরা কিন্তু এক বছরের মধ্যেই অনেক কিছু আদায় করেছি।

(সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের প্রবেশ)

সুপা :। তবু ত তোমাদের আশ মিটছে না। বয়! আমায় 'র'-কফি দে, দুধ চিনি না দিয়ে। তোমরা গো-স্লো সুরু করতে খুব মজবুদ। কিন্তু 'গো-ফাষ্ট' হতে ত কখনও দেখলাম না। মজুরী বাড়াতে হবে—আচ্ছা তাই সই, বোনাস দিতে হবে—আচ্ছা তাই সই। কাজের ঘণ্টা কমাতে হবে—আচ্ছা তাই সই। ছুটির দিনেরও রোজ দিতে, আচ্ছা তাই নাও—

(ইন্সপেক্টারের প্রবেশ)

ইন্সপেক্টর। শুধু কি তাই, ওভার-টাইম খাটব না, চিকিৎসার খরচ দিতে হবে। রিটায়ারের সময় গ্র্যাজুয়িটি চাই। বয়! এক কাপ গরম দুধ আর দুখানা অমৃতি জিলিপী।

প্রচার সঃ। আপনার মতে এ সব চাওয়া কি আমাদের খুব অন্যায় হয়েছে ?

ইন্সপেক্টর। তুমিই ত এদের মাথা খেয়েছ। ইউনিয়ন গড়ে নিজেই তার সেক্রেটারি সেজে বসেছো। তোমার কাছে ত শ্রমিকদের কোন দাবীই অন্যায় নয়! কি বলেন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব ?

প্রচার সঃ। আপনাদের সব 'সাহেব' সাজবার সখ খুব বেশি দেখছি। ম্যানেজার সাহেব, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব, ইন্সপেক্টর সাহেব—সাহেবরা ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলে কি হবে—রয়ে গেছে দেখছি তাদের পুষ্যিপুত্তুরের দল।

ইন্সপেক্টর। তুমি পাবলিসিটি অফিসার হ'লে কি হবে? এখনও ভদ্রলোকের মত কথা বলতে শেখনি দেখছি।

প্রচার সচিব। 'তুমি তামি' করছেন কেন ? 'আপনি-মশাই' বলুন। উঃ! ভারি আমার ভদ্রলোক দেখছি। আমাদের সমস্ত দাবীই ন্যায্য দাবী।

২য় শ্রঃ। আলবাৎ! পাওনা গণ্ডা বুঝিয়ে দাও, খুশী হয়ে কাজ করব। না দাও, কাজে ঢিলে পড়বেই।

৩য় শ্রঃ। তার পরই ধরব আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র—শ্রমিক ধর্মঘট! তখন ষ্ট্রাইক মেটাতে বাবুদের সব-বাপ! বাপ! আমাদের দাবী মানতে হবে—

সুপাঃ। কেন? 'বাপ-বাপ' বলে মেটাতে হবে কেন ?

কারখানা লক-আউট করে দেব না? দু' এক হপ্তা মজুরী না পেলেই চখে সর্ষেফুল দেখতে হবে। সপরিবারে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। তখন তোমাদের লাল ঝাণ্ডাধারী লীডাররা কি খেতে দেবে?

ইন্সপেক্টর। যা বলেছেন! মনিবের দু' চার লাখ লোকসানে কি আর এসে যায়? এদের কিন্তু দেনার দায়ে মাথা বিকিয়ে যাবে! একবেলা একমুঠো জোটাতে মুখে রক্ত উঠে যাবে—

সুপাঃ। তার পর সেই টিনের শীল-করা ইউনিয়নের ভিক্ষা-পাত্র নেড়ে নেড়ে ট্রাম বাসের যাত্রীদের অস্থির করে তুলবে—দু' এক পয়সা পাবার আশায়।

ইন্সপেক্টর। শেষ পর্যন্ত সেই মনিবের সর্তেই রাজী হয়ে গুড় গুড় করে এসে বাছাধনদের কাজে ঢুকতে হবে—

প্রচার সঃ। ওরে শুনছিস! এ ভদ্রলোকদের কথা? এরা পুঁজিবাদীদের দালাল বলে মনে হচ্ছে! কেমন মনিবের দিকে টেনে কথা বলছে দেখছিস!

ইন্সপেক্টার। আমরা যদি পুঁজিবাদীদের দালাল হই, তোমরা হলে কাস্তে হাতুড়ি আর লাল-ঝাণ্ডাওয়ালাদের দালাল?

প্রচার সঃ। এই বিদ্যে-বুদ্ধি নিয়ে মশাই ইন্সপেক্টার হয়ে বসেছেন কি করে? বুঝিছি স্রেফ 'অরেলিফাই' করে! দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারছি নি। আমরা যদি ইউনিয়ন না গড়তুম, আর সবাই যদি একজোট হয়ে দাবী জানাতে না পারতুম তা' হলে আমাদের অবস্থা হ'ত যে পান্নালাল সেই পান্নালাল! সেই মামুলি দশ আনা রোজে ভোর ছটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত আজও কাঁদতে কাঁদতে দিন গুজরাণ করতে হ'ত। মুনাফাখোরেরা মুখের দিকে ফিরেও চাই ত না। ভাগ্যে আমরা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে একটু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তাই না আজ সরকার থেকে খাড়া করতে হয়েছে 'লেবার-ট্রাইবুন্যাল।' শ্রমিক-বিরোধ মেটাবার জন্য কি আগে কখনো কোন সালিশী বোর্ড বসতে দেখেছিলেন?

২য় শ্রঃ। যা বলেছেন দাদা! আমরা ছিলাম এতদিন যেন সেই 'ন পিতা ন মাতা নচ বন্ধু ন দাতা' অবস্থায়। কত শ্রমিকের কত ত্যাগ, কত কষ্ট স্বীকার করার ফলেই না আজ আমরা একটু সুখের মুখ দেখতে পাচ্ছি! আমাদের বাপ-দাদারা কি কষ্টই না পেয়ে গেছে। সামান্য যা মজুরী পেত' তা থেকে হেড-জমাদারকে কমিশন দিতে হ'ত, মজুরী বিলি করত যে তাকে দস্তুরি দিতে হ'ত।

প্রচার সঃ। চোর! চোর! সব বেটা চোর! আজও চলেছে ওই জঘন্য ঘুষের ব্যাপার সারা কারখানা জুড়ে। কণ্ট্রাক্টার, সাপ্লায়ার, টিকতে পারবে কেউ উপুড়-হস্ত না হলে? প্যাকিং-বাক্স সাপ্লাই, কার্ড-বোর্ড, কার্টুনের অর্ডার, শিশি-বোতল যোগান থেকে সুরু করে সবেতেই যথাযোগ্য স্থানে প্রণামী ও দক্ষিণা না দিলে মাথা গলাতে পারবে না কেউ। আরে, আমার কাছেই কত পার্টি অফার করেছে—বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দিন মশাই, বারোটা ফুল-পেজ! বিলের শতকরা পঁচিশ পার্সেণ্ট আপনার। আগাম কেটে নিয়ে টাকা দেবেন!

শ্রমিকরা। (হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

২য় শ্রঃ। ঠিক বলেছ দাদা! ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পেরেছি বলেই আমরা এদের শোষণের হাত থেকে কতকটা বেঁচেছি!

সুপাঃ। শুধু নিজেরা বাঁচলেই ত হবে না ভাই, দেশকে বাঁচাতে হবে, জাতকে বাঁচাতে হবে, কারখানার উৎপাদন বাড়াতে হবে, তবে না ভারতবর্ষের উন্নতি হবে—

প্রচার সঃ। দোহাই আপনার! চুপ করুন। আপনি আর আমাদের অর্থমন্ত্রীর ঐ পচা মামুলী বক্তৃতা আউড়ে বাহবা নেবার চেষ্টা করবেন না। 'দেশকে বাঁচাতে হবে!' 'জাতকে বড় করতে হবে'। রাখুন না ও সব ছেঁদো কথা শিকেয় তুলে? আরে মশাই! কথায় বলে—'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'? আগে নিজেরা যাতে বাঁচতে পারি তার ব্যবস্থা করুন।

ইন্সপেক্টর। এই বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে আপনি প্রচার-সচিব হয়ে বসেছেন কি করে? আপনি ইউনিয়নের সেক্রেটারী থাকলে ত দেখছি শ্রমিকদের বারোটা বাজিয়ে দেবেন! বলি মশাই দেশ বলতে ত আমরাই, আর জাত বলতেও সেই আমরাই! সুতরাং বিরোধটা কোথায়?

২য় শ্রঃ। কে যেন আসছে এ দিকে। বারান্দায় ভারি জুতোর আওয়াজ পাচ্ছি।

৩য় শ্রঃ (উঁকি মেরে দেখে) ওরে আমাদের 'ফোরম্যান' এ দিকে আসছে! নিশ্চয় আমাদের ডাকতে। টিফিনের ঘণ্টা শেষ হয়ে গেছে বোধ হয়।

৪র্থ শ্রঃ। দূর! তা হলে ত ঘণ্টা বাজত! (ঘড়ি দেখে) আরে! আধ ঘণ্টা ত হয় নি এখনও। ওর অন্য কিছু মতলব আছে।

১ম শ্রঃ। ক্যান্টিনে আর অন্য কি মতলব থাকতে পারে? বড় জোর আর এক কাপ কড়া চা খেয়ে যাবে—

(ফোরম্যানের প্রবেশ)

ফোরম্যান। ওহে ভাই, তোমরা সব জলখাবার ঠিকমত পাচ্ছ ত? এখনি ম্যানেজার সাহেব নিজে তদন্ত করতে আসছেন এখানে—বয়! কড়া চা এক কাপ দিস ত বাবা!

প্রচার সঃ। আবার সেই সাহেব! নিজেকেও ফোরম্যান সাহেব বলেন বোধ হয়?

ফোরম্যান। তা আপনারই বা এমন সাহেব-ফোবিয়া কেন?

প্রচার সঃ। সাহেবরা ত চলে গেছে মশাই! আর কেন ওদের নিয়ে টানাটানি? দেখছ না 'ইংরেজী' ভাষা সুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে আমরা হিন্দী ধরছি?

ফোরম্যান। ধরগে যাও! আমরা আংরেজী ছাড়বো না? ওই যে ৫নং দিব্যি নিঃশব্দে বসে স্যাণ্ড-উইচ খাচ্ছে—ওকে হিন্দীতে কি বলে জান। 'বালুকা ডাইনী'!

ইন্সপেক্টার। আর, 72 Up Expressকে কি বলে জান? 'বাহাত্তর উচা ধড়াধ্বড়'!

সুপাঃ। আর ঐ যে ১ নংটি ভিজে-বেড়ালের মত 'কাটলেট' চিবুচ্ছেন— ওকে হিন্দীতে কি বলে জানেন? 'ছেদি-দেনা'।

প্রচার সঃ। আজ্ঞে না! মাপ করতে হ'ল। আমি অনেক শুনেছি বয়-বাবুর্চ্চিরা বলে 'কাংলিশ'।

সুপাঃ। এ তোমাদের বয়-বাবুর্চ্চিদের হিন্দী নয়—দিল্লীর বিশুদ্ধ হিন্দীকোষ!

ফোরম্যান। ম্যানেজার সাহেব আসছেন।

প্রচার সঃ। আবার সা—(থেমে গেলেন)

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যানেজার। (সকলকে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াতে দেখে) বসো, বসো, ভাই সব! বসো তোমরা। খেতে খেতে উঠে দাঁড়ালে কেন?

[কারুর হাতে চায়ের কাপ, কারুর হাতে দুধের গেলাস, কারুর হাতে আধ-খাওয়া কাটলেট—কারুর মুখে পরোটা-আলুর দম ইত্যাদি।]

আমি ত তোমাদেরই একজন। দিন মজুরী করে খাই! আমি জানতে এসেছি ক্যানটিনে তোমাদের টিফিন কি রকম দিচ্ছে' জিনিসপত্র সব ভাল ত?

প্রচার সঃ। আজ্ঞে সবই ভাল কেবল ওই লুচি-পরোটাগুলো দালদা বনস্পতিতে ভেজে দেয়; ওটা গাওয়া ঘিয়ে ভেজে দিলেই ভাল হ'ত।

ইন্সপেক্টার। (জনান্তিকে) বসতে পেলে শুতে চান!

ম্যানেজার। তা বেশ ত! বেশ ত! সেই ব্যবস্থাই না হয় হবে—

সুপাঃ। হতে পারে না সার। গাওয়াই বলুন আর ভয়সাই বলুন—যে রকম ভেজাল চলেছে, খেলেই অম্বল আর ডিসপেপশিয়া—সমস্ত শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়বে। ঠিকে লোকও সব সময় পাওয়া যায় না। তার চেয়ে বিশুদ্ধ 'দালদা বনস্পতি' ঢের ভাল। সহজ-পাচ্য, পুষ্টিকর, কোনও দুর্গন্ধ নেই—

প্রচার সঃ। এ লোকটা দালদার বিজ্ঞাপন শুরু করলে যে!

(সেলসম্যানের প্রবেশ)

সেলসম্যান। (জনান্তিকে) নিশ্চয় দালদার দালাল! বনস্পতির এজেন্সী নিয়েছে, মোটা কমিশন মারে আর কি?

ম্যানেজার। দুধটা খাঁটি পাচ্ছ নিশ্চয়। হরিণঘাটার দুধ! একেবারে পশ্চিমবঙ্গের প্রাইম-মিনিষ্টার মার্কা। এক ফোটা জল পাবে না—খাও তোমরা। ভাল করে খাও-দাও সব—

সুপাঃ। হ্যাঁ, তবে ত' পোষ্টাই হবে, স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, খাটতে পারবে—

সেলসম্যান। (জনান্তিকে) হ্যাঁ, মোসলমানের মুর্গী পোষা!

ইন্সপেক্টর। যা বলেছেন, ভাল খেলে-দেলে মনটা বেশ ভাল থাকে। ফুর্ত্তিতেও কাজ করা যায়। মুড়ি-চিঁড়ে আর ঐ তেলেভাজা খেয়ে কাজে মন লাগে না। শরীরটা কেমন 'শুয়ে-পড়ি'-'শুয়ে-পড়ি' করে।

প্রচার সচিব। ইন্সপেক্টর 'সাহেব' কি, I am sorry, ইন্সপেক্টার 'হুজুর' কি বলতে চান কারখানার শ্রমিকরা মন দিয়ে কাজ করে না কেউ?

ইন্সপেক্টর। এই দেখ! আমি কি তাই বললাম?

সুপাঃ। না না, উনি তা বলেন নি। এ আপনি ভুল করছেন—

সেলসম্যান। শুধু ভুল, বেভুল বকছেন।

ম্যানেজার। তা ছাড়া, আমি ত জানি, অন্য সব কারখানার শ্রমিকদের চেয়ে আমাদের কারখানার লোকজনেরা অনেক ভালো—

সুপাঃ। নিশ্চয়। সে কথা খুব ঠিক। আমাদের কারখানার output সবচেয়ে বেশী।

সেলসম্যান। হ্যাঁ, মজুরীও পান এরা অন্য কারখানার চেয়ে অনেক বেশী।

শ্রমিকরা। (জনান্তিকে) শুনছো? শুনছো? শালা যেন নিজের পকেট থেকে ওর বাপের পয়সা আমাদের দেয়।

সুপাঃ। আপনি সার, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এরা বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে মন দিয়েই সব কাজ করে। প্রোডাকসান্ ক্রমেই বাড়ছে।

ম্যানেজার। বেশ, বেশ। খুব ভাল। এই ত চাই। এ কারখানাকে তোমরা নিজেদের কারবার বলে মনে করবে। আর কি করতে পারি আমি তোমাদের জন্য বল? তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখাই আমার প্রধান কাজ।

সুপাঃ। হ্যাঁ, সকলের মুখে সর্ব্বদা একটা প্রসন্ন-তৃপ্তির হাসি, একটা সন্তোষের ভাব—চোখ দুটিতে একটা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টি—

প্রচার সঃ। মাফ করবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আপনি বুঝি এখানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে আসবার আগে মাসিক পত্রিকায় কবিতা লিখতেন?

সেলসম্যান। লিখতেন না। ছাপাখানায় কবিতা কম্পোজ করতেন?

ম্যানেজার। দেখুন, আমি চাই আপনারা পরস্পরকে ভাল করে চিনুন. জানুন আপনাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব—একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠুক। আমি চাই আমরা সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত মানুষের মত এই কারখানার উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করি।

সুপাঃ। আপনার উদারতায় আমরা মুগ্ধ। আপনাকে আমরা কিছুতেই পেশাদার ম্যানেজারের জাত বলে ভাবতেই পারি নি।

ইন্সপেক্টর। আপনাকে মনে হয় যেন আমাদের স্বজাতি, আপনজন।

প্রচার সঃ। হ্যাঁ, অনেকটা যেন আমাদের নিকট আত্মীয়-কুটুম্ব বলেই মনে হয়।

সেলসম্যান। (জনান্তিকে) বড়-কুটুম্ব না ভগ্নীপতি ?

ম্যানেজার। নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি আপনাদেরই একজন, আমিও খেটে খাই—

সেলসম্যান। (জনান্তিকে) কিন্তু খাই অনেক বেশি। সিংহের ভাগ।

ফোরম্যান। দেখুন সার, আমাদের দিক থেকেও একবারটিও মনে হয় না যে আমরা এই কারখানার শ্রমিক। মনে হয় আমরা আপনার পুষ্যিপুত্তুর।

সেলসম্যান। তার চেয়েও বেশি—আমরা যেন সব ঘর জামাই। (সকলের উচ্চহাস্য)

ম্যানেজার। না, না, আমাকে লজ্জা দিও না তোমরা। আমি বিশেষ কিছুই করতে পারি নি তোমাদের জন্য। তবে, ইচ্ছে আছে ষোলো আনা, বিশ্বাস কর। আমি চাই না যে আর পাঁচটা কারখানার মত আমার এখানকার শ্রমিকরা ঘন ঘন ষ্ট্রাইক করে। লেবার ট্রাবল আমি একটুও পছন্দ করি না। আমি তোমাদের সর্ব্বদা খুশী আর সন্তুষ্ট রাখতে চাই।

সুপাঃ। তা ত বটেই। 'মিল মালিক মুর্দ্দাবাদ', এ আওয়াজ কার শুনতে ভাল লাগে বলুন ?

ম্যানেজার। তোমরা স্পষ্ট করে নির্ভয়ে খুলে বল তোমাদের আর কি চাই ?

ইন্সপেক্টর। আপনার অনুগ্রহ আর দয়ার সীমা নেই। আমরা সকলেই আপনার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

ম্যানেজার। না, না, আমি জানতে চাই, কি করলে তোমরা এই কারখানাকে তোমাদের নিজেদের সম্পত্তি বলে মনে করবে, কি করলে তোমরা সকলে এক পরিবারভুক্ত আত্মীয়ের মত সমস্বার্থ-সম্পন্ন হয়ে এই কারখানার উন্নতি ও প্রসারের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করবে ?

সুপাঃ। বুঝলুম আপনি কি চান, কিন্তু কথা হচ্ছে, সকলে এক পরিবারভুক্ত আত্মীয়ের মত সমস্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে এই কারখানাকে তাদের নিজের বলে যে মনে করবে,—তার প্রেরণা আসবে কেমন করে আমাদের মনে ?

প্রচার সঃ। আমার মাথায় একটা উপায় এসেছে সার, সেটাকে কার্য্যে পরিণত করতে পারলে আপনার ইচ্ছা ষোল আনা পূর্ণ হবে—

ইন্সপেক্টর। বুঝিছি, আপনি নিশ্চয় আমাদের সকলকে এই কারখানার মূলধনের সম-অংশীদার করে নেবার প্রস্তাব করতে চান ?

প্রচার সঃ। তাতে অংশীদারই হওয়া যায়, ইন্সপেক্টর মশাই! আত্মীয় হয়ে ওঠা যায় না। বছর বছর শেয়ার-হোলডারের মিটিং-এ আসা আর ডিভিডেণ্ডের টাকাটা ট্যাকে গুঁজে বাড়ী ফেরা। তার পর কোম্পানী লিকুইডেশানে যাক আর থাক তাতে কিছুই যায় আসে না, বিশেষ, ইনভেষ্ট-করা টাকাটা যদি ইতিমধ্যে ঘরে উঠে আসে।

সুপাঃ। তাই ত, আমি প্রস্তাব করছিলাম যে, এমন কিছু করা হোক যাতে এ কারখানা আমাদের কাছে দিন দিন প্রিয় হতে প্রিয়তর হয়ে ওঠে, যাতে এর উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনায় আমরা প্রাণপণে পরিশ্রম করতে উৎসাহিত হয়ে উঠি। এ কারখানার সামান্য ক্ষতি যাতে আমাদের নিজেদের ক্ষতি বলে মনে হয়।

সেলসম্যান। (জনান্তিক) আরে ব্যসরে! একেই বলে দরদ! মার চেয়ে বেশী যে তাকে বলে ডান ?

ম্যানেজার। ঠিক! ঠিক! আমি ত এইটুকুই চাইছি তোমাদের কাছে। এখন তোমাদের প্রস্তাবটা কি তাই বল।

প্রচার সঃ। প্রস্তাবটা করাও যেমন কঠিন—সেটা গ্রহণ করাও আবার তার চেয়েও কঠিন।

ইন্সপেক্টর। তবে এটা ঠিক যে, যদি তা গ্রহণ করতে পারেন তা হলে এ কারখানা পৃথিবীর সেরা কারখানা হয়ে উঠবে।

সুপাঃ। এবং এর উৎপাদন আজ যে পরিমাণ হচ্ছে তার শতগুণ বেড়ে যাবে—

ম্যানেজার। (ব্যাকুল হয়ে) আমিও ত এই চাই। বলুন আপনাদের প্রস্তাবটা কি শুনি।

সুপাঃ। দেখুন, কিছু মনে করবেন না সার! প্রস্তাবটি হয়ত প্রথমটা আপনার কাছে বামনের চাঁদ ধরবার সাধ বলে মনে হবে—

ইন্সপেক্টর। অথবা মামার বাড়ীর আব্দার বলেও মনে হতে পারে—

প্রচার সঃ। এবং, আমাদের স্পর্দ্ধার পরিচয় পেয়ে আপনি হয়ত চটে যেতেও পারেন।

সেলসম্যান। অথবা, নাই-দেওয়া কুকুরের মাথায় চড়ে বসাও মনে হতে পারে।

সুপাঃ। যথার্থই যদি স্যার আপনি আমাদের ভালবাসেন, আমাদের আপন জন বলে ভাবেন আর এই কারখানার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি যদি সত্যই আপনার কাম্য হয়—তা হলে—এই সমাজবাদী গণতন্ত্রের যুগে এ প্রস্তাব আপনার অন্যায় বা অসম্ভব মনে হবে না কখনই।

প্রচার সঃ। অসম্ভব ? 'অসম্ভব' বলে কোনও শব্দ ভুবন-বিজয়ী নেপোলিয়ানের অভিধানে ছিল না। সুতরাং আপনার ন্যায় একজন অসামান্য দিগ্বিজয়ী কর্ম্মীর কাছেও ও শব্দটার যে কোনও অস্তিত্ব নেই আমরা জানি।

ম্যানেজার। (বিরক্ত হয়ে) আরে, ভণিতা রেখে আপনাদের আসল প্রস্তাবটা কি বলুন শুনি ?

সুপাঃ। আজ্ঞে হাঁ। সেই কথাই নিবেদন করতে চাই আজ অকপটে আপনার কাছে। কিন্তু, ইতস্ততঃ করছি এই ভেবে যে, আপনি না জানি এ প্রস্তাব শুনে কি মনে করবেন ? তবে এ নিশ্চয়তাটুকু আমরা দিতে পারি আপনাকে যে, যদি আপনি আমাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন তবে জানবেন যে

আমাদের কারখানাই জগতে প্রথম আদি ও অকৃত্রিম পারিবারিক কারখানার গৌরব লাভ করবে—

ম্যানেজার। (অস্থির হয়ে) অত 'কিন্তু' হবার প্রয়োজন নেই। চট করে বলে ফেলুন আপনাদের প্রস্তাবটা কি? আমাকে আপনাদের আত্মীয় বা বন্ধু বলেই মনে করবেন।

ইন্সপেক্টর। সেই ভরসাতেই ত সাহস করে আজ আপনার কাছে এই শুভ প্রস্তাব উপস্থিত করতে উদ্যত হয়েছি—

ম্যানেজার। আরে, আপনাদের কথাটা কি তাই বলুন না—

প্রচার সঃ। কথা এমন কিছুই কঠিন নয় সার। আমরা সকলে মিলে অনেকদিন ধরে ভেবে দেখেছি—আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, নিষ্ঠাবান, সদাচারী।

ম্যানেজার। (মরিয়া হয়ে উঠে) হয়েছে! হয়েছে! আর বাক্যব্যয়ে কাজ নেই আপনাদের মোদ্দা কথাটা কি বলে ফেলুন—

সুপাঃ। আজ্ঞে, বিশ্বাস করুন। এ বিষয়ে মানুষের কোনও হাত নেই! সবই ভবিতব্য?

ইন্সপেক্টর। শুধু ভবিতব্য কেন—প্রজাপতির নির্বন্ধও বলা যায়।

সুপাঃ। তাই সবিনয়ে বলতে চাই সার, কিছু মনে করবেন না। আপনার একটি মাতৃহারা কন্যা রয়েছে। মেয়েটি দেখতেও সুন্দরী। তার বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হয়ে এল প্রায়—

ইন্সপেক্টর। তা ছাড়া এ খবরও আমরা জানি আপনার একাধিক বয়স্থা অবিবাহিতা ভগ্নী, ভাগ্নী, ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতিও রয়েছেন যাঁদের বিবাহ দেবার জন্য আপনি বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রচার সঃ। আমার খবর হ'ল, পাড়ার উচ্ছৃঙ্খল যুব-সম্প্রদায় আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। ঝুড়ি ঝুড়ি প্রেমপত্র জড় হয়েছে আপনার বাড়ী, এও জানি।

সুপাঃ। আর এও শুনেছি যে, তিন মাস ধরে সেই প্রেমপত্রে আপনার বাড়ীর উনুন ধরিয়েও ফুরুতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত পুরানো কাগজওয়ালা ডেকে ওজন দরে বেচে ফেলতে হয়েছে।

ম্যানেজার। (আশ্চর্য্য হয়ে) আমার বাড়ীর এত খবর আপনাদের কাছে এল কি করে?

সেলসম্যান: আসে, আসে সার! খবর পায়ে হাঁটে! শুধু মুখেই রটে না।

ইন্সপেক্টর। তাই বলছিলুম কি, এই ইয়ুথলীগের অত্যাচার থেকে যদি মুক্তি পেতে চান সার, একদিনে এক লগ্নে সমস্ত মেয়ে-গুলির বিয়ে দিয়ে ফেলুন।

প্রচার সঃ। আর যথার্থ যদি কারখানার কল্যাণ কামনা করেন, তবে উপযুক্ত পাত্রের জন্যও ভাবতে হবে না। আপনার এই কারখানাতেই শিক্ষিত, সুস্থ, সুদর্শন একাধিক ছোকরা কর্ম্মী রয়েছেন যাঁদের সঙ্গে মেয়েদের বিবাহ দিলে তাঁরা সুখী হবেন এবং মেয়েরাও অসুখী হবেন না। তাহলেই এ কারখানা সম্বন্ধে আপনার যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তা এক বাক্যেই সফল হয়ে উঠবে। এ কারখানা তখন সত্যিই একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

সুপাঃ। এই অতি সমীচীন প্রস্তাবে যদি আপনার অমত না থাকে তা হ'লে পূর্ব্বাহ্নেই বলে রাখি, এ অধম আপনার মাতৃহারা কন্যা কুবলয়াকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। আমি তাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি, তাই বিনা পণেই আমি তার পাণিপ্রার্থী। আমাদের আপনি এক পরিবারভুক্ত করে নিন—

ম্যানেজার। (হতবুদ্ধির ন্যায় এর ওর মুখের দিকে চেয়ে) এ্যা! এ-সব কি বলছেন আপনারা? (কিছুক্ষণ চিন্তা করে) ওঃ! হ্যাঁ! তা এক পরিবারভুক্ত হতে হ'লে এ প্রস্তাব মন্দ নয় বটে। কিন্তু, মুস্কিল কি জানেন? তারা সব কলেজে-পড়া মেয়ে। 'আপটুডেট', শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না, রূপসী। তারা কি কারখানার কর্ম্মচারীদের বিবাহ করতে রাজী হবে?

প্রচার সঃ। আপনি ঠিকই বলেছেন। স্বীকার করছি, কাজটা খুব সহজ নয়। কিন্তু, আপনি যদি প্রিন্সিপিলের দিক থেকে এটা হওয়া উচিত বলে মনে করেন তাহ'লে আমি আপনাকে এ পথে এগিয়ে যাবার একটা সহজ রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি। একথা ত আপনার অবিদিত নয় যে, স্বাধীন ভারতবর্ষ একটি সেক্যুলার ষ্টেট। আমাদের সরকারের বিঘোষিত নীতিই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ধাচে দেশটাকে গড়ে তোলা। সুতরাং আমাদের উচিত নয় কি এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করা?

সুপাঃ। অতএব, আসুন না আমরা এই বিবাহ-ব্যাপারে একটা সামাজিক বিপ্লব নিয়ে এসে দেশের লোককে পথ দেখাই। আপনি ত দীর্ঘকাল বিপত্নীক অবস্থায় নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। কিছুদিন থেকে আমরা সকলেই এটা লক্ষ্য করে খুসী হয়েছি যে, আমার স্নেহের অনুজা কল্যাণীয়া শ্রীমতী কেতকী—যে এই কারখানার প্রচার ও প্রসার বিভাগে সামান্য এক অস্থায়ী ক্যানভাসার হয়ে ঢুকে আপনার অনুগ্রহে আজ 'চীফ সেলস প্রোমোটার' বা প্রধানা পসারিণীর পদে উন্নিতা হয়েছে, সেই কেতকী আপনার গুণে মুগ্ধ, আপনার শ্রীচরণের দাসী হতে পারলে জীবন ধন্য মনে করবে। কেতকী আজও অনূঢ়া, বিবাহের বয়স প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে এল। আমার বোন বলে বলছি নি, আপনিও নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, তার চেহারা ভাল, গঠনও পরিপাটি! যার জোরে সে প্রথম ইণ্টারভিয়ুতেই আপনার কাছে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছিল। তাকে যদি আপনি অনুগ্রহ করে বিবাহ করেন আমরা সেটাকে বহু ভাগ্য বলে মনে করব—আমরাও ব্রাহ্মণ, পাল্টাঘর আপনার। যদিও এ হিসাবের আজ আর প্রয়োজন কিছু নেই, তবু বলি অসামাজিক কাজ হবে না এটা।

ইন্সপেক্টর। আমাদের সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, সার আপনি সর্ব্বপ্রথম এ বিষয়ে পথ দেখিয়ে এই মহৎ দৃষ্টান্ত সকলের সামনে তুলে ধরুন।

সেলসম্যান। আশা করি 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা' অনুসারে অন্যান্য বিবাহগুলিও সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্ন হবে।

সুপাঃ। আপনার কন্যার সম্বন্ধে আমি বিশেষ করে বলতে পারি যে, আমার অনুজা কেতকীকে আপনি বিবাহ করলে, কুবলয়া আমার কণ্ঠে বরমাল্য দিতে একটুও ইতস্ততঃ করবে না।

১ম শ্রঃ। এ অতি উত্তম প্রস্তাব।

২য় শ্রঃ। এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু হতে পারে না!

৩য় শ্রঃ। কন্যাদায় ত এখন পিতৃদায়-মাতৃদায়ের চেয়ে দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে।

৪র্থ শ্রঃ। সত্যি, বাপ-মা মলে কালীঘাটে তিল-কাঞ্চন শ্রাদ্ধ করে পুরুতঠাকুরকে টাকাটা-সিকেটা দিলেই শুদ্ধ হওয়া যায়।

৫ম শ্রঃ। কিন্তু কন্যাদায় থেকে অত সহজে পার পাবার উপায় নেই। যৌতুক চাই, বরাভরণ চাই খাট-বিছানা, রূপার বাসন—এ আর তিল-কাঞ্চনে সারা চলে না।

প্রঃ সচিব। আপনি আমাদের এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে পথ প্রদর্শক হউন।

ফোরম্যান। সমাজের রুদ্ধ দ্বার খুলে দিয়ে উদার বাতাস চলাচলের পথ করে দিন।

সেলসম্যান। সেই হাওয়ায় ঢেউয়ে ভেসে আমাদের এই দিশেহারা জীবন-তরণীগুলি একে একে ঘাটে এসে লাগুক।

ইন্সপেক্টর। এক পরিবারভুক্ত হয়ে উঠবার একমাত্র প্রেসক্রিপশান এই।

১ম শ্রঃ। আর, আত্মীয়তাটাও এর ফলে আমাদের মধ্যে আরও নিবিড় হয়ে উঠবে।

২য় শ্রঃ। আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ তখন আত্মীয় কুটুম্বের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

৩য় শ্রঃ। প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধে যে একটা দূরত্ব—তা দূর হয়ে আমরা পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়বো।

৪র্থ শ্রঃ। আর সেইটেই হবে প্রকৃত সোশাল রিফর্মের উচ্চ আদর্শ।

৫ম শ্রঃ। নিশ্চয়! আমাদের মধ্যে তখন শ্রেণীভেদ উঠে গিয়ে স্থাপিত হবে এক শোষণহীন ও শাসনহীন উদার পরিবার—যারা একই কারখানায় একই সঙ্গে মালিক ও মজুর, শ্রমিক ও হুজুর!

সেলসম্যান। অর্থাৎ তোমরা সব হুজুর-মজুর মিলে 'হুমজুর' হয়ে উঠবে আর কি? (সকলের উচ্চ হাস্য)

ম্যানেজার। চমৎকার! তোমাদের এ পরিকল্পনা সরকারী ফ্যামিলি প্ল্যানিংকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাবে! কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে, এক মস্ত বড় লোকের বাড়ীর বিলেত ফেরতা একমাত্র ছেলের সঙ্গে আমার মেয়েটির সম্বন্ধ প্রায় পাকাপাকি হয়ে গেছে। অবশ্য আশীর্ব্বাদ এখনও হয় নি।

সুপাঃ। আঃ বাঁচালেন সার! ও আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলে সেটা অভিশাপ হয়ে উঠত। আবার একটা লেক্-ট্র্যাজেডি ঘটত।

ইনসপেক্টার। তা ছাড়া আপনার সব বিবাহযোগ্যা ভগ্নী, ভাগ্নী, ভাইঝি প্রভৃতিরও ত একটা আশু ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

ম্যানেজার। তোমরা কি তাদের কাউকে চোখে দেখেছ কখনও?

সেলসম্যান। হ্যাঁ সার, আমাদের বার্ষিক উৎসবে তাঁরা ত প্রতি বছরই দয়া করে পায়ের ধূলো দিতে আসেন এই কারখানায়।

ফোরম্যান। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের বিশ্বকর্ম্মা পূজোর রাত্রে জলসা শুনতে আসেন।

প্রচার সচিব। কেন? সরস্বতী পূজোর রাত্রে বাণী আরাধনায় আমরা যে নাট্যাভিনয় করি অনুগ্রহ করে তাঁরা সে অভিনয় দেখতে আসেন। আমরা ত সব কাজেই ওঁদের নিমন্ত্রণ করে থাকি। খাতির করে সামনের সীটে বসাই, পান দিই, সর্ব্বৎ দিই, চা দিই।

ম্যানেজার। তবে ত তোমরা দেখেছ তাদের। তারা প্রত্যেকেই পরমা সুন্দরী। বড় বড় সব অভিজাত ধনীর ঘর থেকে তাদের ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে।

সুপাঃ। সে ত আসবেই সার! কত বড় ঘরের মেয়ে তারা! ধরুন না আমার ওই বোন কেতকী! এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ত তাকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল। আমার কাছে কদিন ধরেই আনাগোনা করচেন।

ম্যানেজার। (চঞ্চল হয়ে উঠে) তাই নাকি? কি বলেছ তুমি?

সুপাঃ। বলব আর কি? বলছি বিয়ে সে করতে চায় না! কিন্তু, ধরুন, আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারও ত বেশ অভিজাত ঘরের ছেলে।

প্রচার সচিব। আরে রাখ। অভিজাত বংশের আর কদর নেই। দিনকাল এমন সব বদলে গেছে।

সেলসম্যান। হ্যাঁ, ওদের ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠেছে জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই।

ইনসপেক্টর। বলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই মহাদেশেই এত কালের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতন্ত্র কায়েমী হয়ে গেল, যত সব অভিজাতদের এখন জাত মারা গেছে।

সুপাঃ। সুতরাং আপনাদের আমাদের সকলেরই এই নূতন সামাজিক পরিবর্ত্তন মেনে নিয়ে বর্ত্তমানকালের জয়যাত্রার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে অগ্রসর হতে হবে।

প্রচার সচিব। আজ্ঞে হ্যাঁ সার! আপনাদের বংশগৌরব, কুলমর্য্যাদা, মান-সম্ভ্রমের সে উচ্চ আদর্শকে বলি দিতে হবে আজকের এই যুগধর্ম্মের যূপকাষ্ঠে। নতুবা গণ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলে যাবে সেই পিছনে পড়ে থাকাদের চাকার তলায় পিষে দিয়ে।

ম্যানেজার। তোমাদের সঙ্গে আমি এক মত। সময় সত্য

-ত বদলে চলেছে—তাকে মেনে না নিতে পারলে যে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে এটাও ঠিক। তোমাদের প্রস্তাব খুবই যুগোপযোগী এবং ঠিক সময়োচিতও বটে। এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে আমার দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই জেনো, কিন্তু আমার নিজের কাছে নিজের ত একটা কর্তব্য আছে? যদি নিশ্চিত জানতে পারি যে কেতকী আমাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করতে প্রস্তুত, তাহ'লে তাকে গ্রহণ করতে আমার কোনও বাধাই নেই, কারণ, এ প্রশ্ন ত আমার মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, সে কি একজন বিপত্নীককে অর্থাৎ একজন সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড স্বামীকে জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করতে রাজী হবে! বিশেষতঃ আমার বয়স যখন চল্লিশের দিকে ঝুঁকেছে।

সেলসম্যান। আচ্ছা একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না সার। আপনারা যখন লোক খোঁজেন—বিজ্ঞাপন দেন, wanted a middle aged 'experienced man' বলি বিবাহের বেলায় সে বিজ্ঞাপন চলবে না কেন? I can assure you Sir, যে, মেয়েরা experienced husband-ই পছন্দ করে বেশী।

সুপাঃ। You are right. কেতকীর বয়সও তিরিশের কোঠা ছুঁই ছুঁই করছে। Take it from me. আপনাদের মিলন একেবারে রাজযোটক হবে।

ম্যানেজার। তবু আমি তাকে একবার—

প্রচার সঃ। কোনও প্রয়োজন নেই সার। জানেন ত মেয়েরা এসব ব্যাপারে কিরকম লাজুক—বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।

সুপাঃ। তা ছাড়া এ বিয়েটা একটু চটপট সেরে নেওয়া দরকার। কারণ, এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার সাহেব যে রকম উঠে পড়ে লেগেছেন, কথায় বলে—মন না মতি? আপনি তার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য মনে করে কেতকী হয়ত শেষ পর্যন্ত তাঁকেই কথা দিয়ে বসবে। মেয়েরা বলে সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই—

ম্যানেজার: এরকম ব্যাপার হতে পারে যদি মনে কর, তা-হ'লে আর কথা নেই, দিন স্থির করে আয়োজন সুরু করে দাও।

শ্রমিক দল। হুররে! হুররে! ম্যানেজার সাহেব, জিন্দাবাদ!

সেলসম্যান। আমাদের কি ব্যবস্থা করবেন সার?

ম্যানেজার। কিসের?

সেলসম্যান। বিয়ের!

ম্যানেজার। Oh sure! আমি একটা এত বড় কারখানার ম্যানেজার, খুচরো কারবার কল্পনা করি নি। বিবাহ যখন স্থির হয়ে গেল তখন ওটা পাইকিরি হিসেবেই হবে—wholesale marriage! তোমরা সবাই আমার সঙ্গে নিতবর হয়ে যাবে। সেই বিবাহ সভাতেই স্থির হয়ে যাবে কার গলায় কে মালা দেবে। ভুলে যাচ্ছ কেন, এ বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কারখানাটিকে একটি পারিবারিক কারখানায় পরিণত করা। ম্যানেজার যদি খুচরো কারবারীর মত একলা বিয়ে করে, আমাদের কোম্পানীর বদনাম হয়ে যাবে যে! তোমরা বরং একজন মজবুদ দেখে গণপুরোহিত যোগাড় কর, যিনি খুশী হয়ে পাইকিরি বিবাহ দিতে রাজী হবেন।

শ্রমিকগণ। হুররে! হুররে! ম্যানেজার সাহেব, জিন্দাবাদ!

সুপাঃ। আপনার কন্যা কুবলয়ারও কি—

ম্যানেজার। হাঁ হাঁ, সেই রাত্রেই পরের একটা লগ্নে—

সেলসম্যান। কিন্তু, আমাদের শাস্ত্রে আছে সার, সন্তানকে বাপের বিয়ে দেখতে নেই।

প্রচার সচিব। তা' ত বটে! লোকে গালাগাল দিয়ে বলে, 'তোর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব!'

ইন্সপেক্টার। সুতরাং, প্রথম লগ্নে আপনার কন্যার বিবাহটাই হয়ে যাক। কি বলেন? কেন না, আপনার বিয়ের পর সেই বর বেশে আপনি ত আর কন্যা সম্প্রদান করতে পারবেন না!

ম্যানেজার। আমার মেয়ে বয়োপ্রাপ্তা, তার মতামতটা একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার ত?

সুপাঃ। দরকার হবে না সার! আমাদের রেজেষ্ট্রি-ম্যারেজ আগেই হয়ে গেছে!

ম্যানেজার। বটে? তুমি ত দেখছি খুব ওস্তাদ! কাজ হাসিল করে বসে আছ। Very good! আমি retire করবার পর তোমাকে এই কারখানার ম্যানেজার করে যাব।

সেলসম্যান। সে ত উত্তরাধিকার সূত্রে উনি হবেনই, বিশেষতঃ কারখানা যখন পারিবারিক সম্পত্তি হতে চলেছে।

প্রচার সচিব। আপনি সার বরং ওয়েলথ ট্যাক্স, প্রপার্টি ট্যাক্স, গিফট ট্যাক্স, ডেথ ডিউটি, এইগুলোর ব্যবস্থা করে রাখবেন, তাহ'লে আর কারবারের স্থায়ী তহবিলে হাত পড়বে না।

ফোরম্যান। আর আমাদের কি হবে সার?

ম্যানেজার। কিসের কি?

শ্রমিকগণ। বিবাহের?

ম্যানেজার। নিশ্চয়! তোমাদেরও বিয়ের ব্যবস্থা হবে। নইলে ত তোমাদের ইউনিয়ন এখনি 'বিয়ের দাবী মানতে হবে!' এই বলে 'marriage strike' শুরু করে দেবে। সে আমি হতে দেব না! নো-ধর্মঘট! বিবাহের নামেও না।

শ্রমিকগণ। "হুররে! হুররে! বল ও—ম্যানেজারসাব—জিন্দাবাদ!'

সুপাঃ। বল, বোনাইবাবু—জিন্দাবাদ!

প্রচার সচিব। বল, শ্বশুরমশাই—জিন্দাবাদ!

ইনপেক্টার। বল, পারিবারিক কারখানা—জিন্দাবাদ!

ফোরম্যান। বল, পাইকিরি বিয়ে—জিন্দাবাদ!

(যবনিকা)

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

বর্ত্তমানে শহরবাসী হ'লেও পাড়াগাঁয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; তাই মাঝে মাঝে পাড়াগাঁয়ের কথা লিখি। কিন্তু লিখতে গেলেই কেবল মনের মধ্যে ভেসে ওঠে সেই সব লোকের ম্লান মুখ যারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, জলকাদার মাঝে সারাটা দিন গতর খাটিয়ে আমাদের জন্যে খাদ্য উৎপাদন করে—যারা গরু পোষে, কিন্তু এক ফোঁটা দুধ নিজেদের বা তাদের শিশুদের খাবার জন্য রাখতে পারে না, দারিদ্র্যের জন্য সবটাই বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, অসুস্থ হ'লে যাদের ওষুধ-পথ্য সংগ্রহের কোনও রাস্তা নেই। দারুণ মশার কামড়ে যারা সারারাত্রি ঘুমোতে পারে না, মশারী কেনবার সামর্থের অভাবে, আবার শীতের সময় যারা শুকনো কাঠকুটোর আগুন জ্বেলে তার পাশে বসে থেকে অনিদ্রায় রাত শেষ করে, বস্ত্রাভাবে যাদের ছোট ছেলেমেয়েরা উলঙ্গ থাকে "খড়ি-ওঠা" গায়ে, আর অপমান ও লাঞ্ছনা যাদের অঙ্গের ভূষণ।

আমার গ্রামের অঞ্চলে এবার দারুণ অনাবৃষ্টি। চাষের জমি সব ধূ-ধূ করছে, ধানচাষ হয় নি একেবারে। পাট কাটবার ও পচাবার সময় হয়েছে; কিন্তু পচানো হবে কোথায়? সবগুলি 'পাটপচানি-ডোবা'ই শুষ্ক। রাস্তার ধারের 'নয়ানজুলি'গুলিও একেবারে জলহীন। চাষীর মহা ফাঁপর। গুজব রটল, কাগজ-কলওয়ালারা না কারা নাকি কাঁচা পাটগাছ, মাথার দিকের দেড় হাত বাদ দিয়ে বাকিটা চার টাকা মণ দরে কিনছেন। শুনে, তাদের মনে সাহস এলো, লাভ হউক আর না হউক, পাটগাছগুলোর একটা 'গতি' হবে। কিন্তু কই? কোথায় সে রকম খরিদ্দার?

সেচের জলের অভাবে, এবারেও এ-অঞ্চলে আলুচাষ হবে না, এই ভয় হচ্ছে।

সরকার বাহাদুর টেষ্ট-রিলিফ যথাসাধ্য চালাচ্ছেন। কিন্তু এই ভাবে কৃষি-শ্রমিকদের কি বরাবর বাঁচানো যাবে? সারাদিন কাজের মজুরী এক টাকা বা আড়াই সের লাল আটা। প্রতি ইউনিয়নে রাস্তা মেরামত, সেচের জন্য ব্যবহৃত পুকুরের পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি কার্য্য করানোর চেষ্টা ও ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু, এত বেশী লোক কাজ করতে চাইছে যে তত টাকার কাজ করানো সরকারের পক্ষে খুব সোজা নয়। আবার এরই মধ্যে শুনি, যেহেতু সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ চলছে, তাই যা হয় করে নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা-কয়টা কাটাতে পারলেই 'রোজ পূরণ' হ'ল—অর্থাৎ, কাজ করাটা গৌণ, সময়টা গোলমালে কাটিয়ে দেওয়াই মুখ্য। কিছু বলারও অসুবিধা বিলক্ষণ; এটা যে 'ইনকিলাবের' যুগ চলেছে। আমার গ্রামের উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বললেন, তাঁদের কয়েকটি ছাত্রও নাকি টেষ্ট-রিলিফে মাটি কাটার কাজ করছে, না করলে উপোষ যেতে হবে। বলুন, একথা শুনে চোখের জল বাধা মানে কি?

প্রধান শিক্ষকের কাছে আর একটি কথা শুনলাম। পাড়াগাঁয়ের এমন অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছে যারা মিষ্টি-দ্রব্যের স্বাদ কেমন জানে না। টক্, তেঁতো, ঝালের সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে, নেই কিন্তু "মিষ্টির" সঙ্গে। বছর দুই আগে, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার একটা বিস্তৃত অংশ আশ্বিন মাসে বানে ডুবে গিয়েছিল। অনেক কুটীর ভূমিসাৎ হয়েছিল, রেল লাইন পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অনেককেই "কুঁড়েঘর-হারা" হয়ে দামোদরের বাঁধের উপর, বড় সড়কগুলির এবং রেল লাইনের বাঁধের উপর প্রভৃতি উচ্চভূমিতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আশ্রয় নিয়ে কোনও রকমে জীবন রক্ষা করতে হয়েছিল। এই অঞ্চলের প্রবীণ, একান্ত ভাবে নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্ম্মী ডাঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ওরফে, "ঝণ্টু") সেই সময় তাঁহার ঘোরাফেরায় অঞ্চলে একটি সড়কের উপর আশ্রয় লওয়া কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে কিছু "বাতাসা" খেতে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এখনও তাঁকে দেখতে পেলেই সেই যায়গার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা "চিনিবাবু, চিনি দাও" বলে চীৎকার করে। ওরা, চিনি ও বাতাসায় কি প্রভেদ, তাও হয় ত জানে না। প্রধান শিক্ষকমশাই নিজে এ দৃশ্য দেখেছেন বললেন।

এই আমাদের পাড়াগাঁ। অনেক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা দিয়েছে। তার "পদধ্বনি" শোনা যাচ্ছে। দিন কয়েক আগে আমার গাঁয়ের কথা—বেলা শেষের দিকে কয়েকজন এক গৃহস্থের বাড়ীর পাশের জায়গায় (জঙ্গলে), "আপনি-জন্মান" ওল শাবল দিয়ে তুলছিল। বাড়ীর মেয়েছেলেরা আপত্তি করায় তাদের একজন বলেছে,—বাধা দিলে মাথায় "শাবলের বাড়ী" মারব। জানি না, কয়দিন উপবাস থাকলে তবে মানুষ এমন "মরিয়া" হয়ে ওঠে।

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের স্মৃতি আজও মনকে বিচলিত করে। এবার আবার কি হবে—কে জানে? তখন জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ হয় নি, সমগ্র দেশে এত বড় দুর্নীতির বাধাহীন স্রোত বহে নি, মানুষ মনুষ্যত্বকে এখনকার মত একেবারে বিসর্জ্জন দেয় নি। সেদিনের অনেক মানুষ সভ্যতার বাহ্য-চাকচিক্যে আত্মহারা হয়ে গ্রামের সঙ্গে এতটা সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে সহরবাসী হবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে নি। তাই, প্রতিবেশী, প্রতিবেশীকে যথাসাধ্য সাহায্য করে-

ছিল ; গ্রামাঞ্চলে, যাদের কিছু সঙ্গতি ছিল, তারা, যাদের কিছু ছিল না, তাদের ভোলে নি। জমিদারেরাও প্রজাদের কথা ভেবেছিলেন কেউ কেউ। আজ সে ছবি একেবারে বদলে গিয়েছে। কল্যাণী রাষ্ট্র হয়েছে দেশে। দেশের সব কল্যাণ রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। অন্য কারও কিছু করবার দরকার নেই।

এখন আমার গ্রামে চাউল ত্রিশ টাকার কমে পাওয়া যায় না। আরও মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা অনেকে করছেন। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরে এ অঞ্চলে চাউলের দাম ৩৫-৩৬ টাকা মণের বেশী উঠে নাই। এবার আবার কি হয়!

আমার গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়েছে। লোকে না মরুক, ভুগছে ত! এক ছটাক মাখন-তোলা গুঁড়ো দুধের দাম আমার গাঁয়ে পাঁচ আনা।

সাড়ে-বাষট্টি টাকা মাইনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের (যাঁদের সবাই-ই ঐ বেতন পান না ; সাড়ে বাহান্ন টাকা বেতনের শিক্ষকও কিছু আছেন) হাতে আমাদের বংশধরেরা মানুষ হচ্ছে। এদের মধ্য থেকেই আসবে সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার জগদীশ বসু, ডাঃ মেঘনাথ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন বসুর মত আরও কত দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কথা গেল বার লিখেছি। এবারও সেই একই কথা। সরকার-নির্দ্দিষ্ট বেতনে শিক্ষক পাওয়া যাবে না ; বেতন-হার সংশোধিত করতেই হবে। কিন্তু, দেরী করা কেন? পচে নষ্ট না হ'লে কি গলাধঃকরণ করা যাবে না?

খবরের কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন, বহরমপুর সহরের তিনটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, একটি মাত্র এম-এস-সি শিক্ষককে তিন ভাগ করে নিয়ে "নিয়ম রক্ষা" করে স্কুল চালাচ্ছেন। আমাদের প্রধান শিক্ষক বললেন, তিনি জেনেছেন, আমতা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আমতা কলেজের অধ্যাপকদের আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষাদানকার্য্যে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমি কিন্তু, আমার গ্রামের স্কুলের জন্য এখনও কিছু করে উঠতে পারি নি। আবার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। দেখি কি হয়।

স্কুল-বাড়ী তৈরী আজও শেষ করতে পারি নি। এখনও সংশোধিত প্ল্যানের অনুমোদন আর লোহার রডের "পারমিটের" অপেক্ষায় রয়েছি। মাঝে মাঝে সরকারের কড়া তাগাদা পাই, অবিলম্বে কাজ শেষ করে ফেলতে হবে ; নতুবা দণ্ডভোগ করতে হবে। কিন্তু বাড়ী তৈরী শেষ না হওয়ার অপরাধ কি আমার? বাড়ী তৈরী না হলে "ল্যাবোরেটরীগুলি" স্থাপন করা যাচ্ছে না। এর ফলে ছেলেদের বিজ্ঞানের "প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস" করা সম্ভব হচ্ছে না। সরকার-নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া না গেলেও যে-সব বিজ্ঞানের শিক্ষক স্কুলে আছেন তাঁহাদের দিয়েও উপস্থিত কাজ চালাতে পারতাম। ছেলেরা চঞ্চল হচ্ছে। সেটা গত সংখ্যায় "প্রবাসী"তে আমাকে লেখা ছেলেদের চিঠির নকল থেকে দেখেছেন। কিন্তু আমি কিংবা অন্য যে কোনও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এরূপ ক্ষেত্রে কি করতে পারি। পারেন ?

শহরে, সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলা নিত্য সবাই দেখছেন, সেটিও পাড়াগাঁয়ে পৌঁছে গিয়েছে। একটা 'কাহিনী' শুনলুম, সত্যি কিনা জানি না—কলিকাতার আশেপাশের একটি শহরে, স্কুলের ছেলেরা নাকি "বাবাগিরি চলবে না"—এই স্লোগান দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে পথপরিক্রম করছেন। নিশ্চয়ই ভিতরে নেতারা কেউ কেউ আছেন। কলেজের মাসিক "ট্যুইশন ফি:" বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলন চলছে। কতদিন ধরে সভাসমিতি, আন্দোলন, গণ-ডেপুটেশন, ডাইরেক্ট য়্যাকশন প্রভৃতি চলছে আর চলবে তা কে জানে? আমার প্রধান শিক্ষকমশাই ভীত হয়েছেন যে, বছরে বড় জোর ছত্রিশ কি আটচল্লিশ টাকা "সুসার" করবার চেষ্টায়, ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পড়াশুনা না করার ফলে "ফেল" হয়ে আর এক বৎসর পড়াবার খরচ, মোটামুটি হাজারখানেক টাকা 'গলিয়ে' না দেন।

ভাদ্র মাসের "প্রবাসী"তে আমার লিখিত "পাড়াগাঁয়ের কথা" পড়ে পুরুলিয়া নিবাসী Indian Lac Cess Committee-র সভ্য শ্রদ্ধাভাজন শ্রীকৃপালীকুমার কুণ্ডুমহাশয় "প্রবাসী"র সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্র দিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম :

"১৩৬৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্রমহাশয় লিখিত "পাড়াগাঁয়ের কথা" মন দিয়ে পড়লাম। তাঁর লেখা আমার সকল সময়েই ভাল লাগে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের চিঠিখানির উদ্দেশ্য বুঝলাম না। স্কুলঘরের প্ল্যান ও এষ্টিমেট কর্তৃপক্ষ দিচ্ছেন না, এই কথাটিতে খুবই আশ্চর্য্য লাগল। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি বহু স্কুলের বহু স্কুলের সম্পাদক, প্রধান শিক্ষক প্রভৃতিকে দেখেছি—প্ল্যান ঠিক করে সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট কয়েকদিনের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। নিজ নিজ স্থান অনুযায়ী পৃথক পৃথক প্ল্যানও সরকার ঠিক করে দিচ্ছেন। এত বেশি সংখ্যায় এই কাজটি হতে দিখেছি যে, এ বিষয়ের বিপরীত কিছু আমি কল্পনাই করতে পারি না।

"গ্রামের স্কুল। যে কোন একটি ক্লাসেই ত অস্থায়ীভাবে বিজ্ঞানের সাজসরঞ্জাম রাখা যায়। অনেক ক্লাসই ত ফাঁকা মাঠে হতে পারে, এবং বর্ষা ছাড়া অন্য সময় হওয়াই ত উচিত।

"শিক্ষক সম্পর্কে মিত্রমহাশয়ের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমার মনে হয়, আমরা কেহ গ্রামে থাকতে চাই না। "উপযুক্ত বেতন" কোন্‌টি তাহাও এতদিনে বুঝলাম না। কাজ পাবার পূর্ব্বে যে টাকা পেলেই চলে ভাবি, কাজ পাবার পরই মনে হয় ঐ টাকা অতি তুচ্ছ ; সঙ্গে সঙ্গে মনে অসন্তোষ জাগে, তারই ফল কাজে গাফিলতি, কর্তৃপক্ষের নিন্দা, নিজের অশান্তি। দুর্মূল্যের কারণে বেতনবৃদ্ধি দাবী করি, বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, (একটা উদাহরণ দিতে পারি, কারখানার কর্ম্মচারী), পুনরায় বেতন বৃদ্ধির দাবী ইত্যাদি। এইভাবে আমরা একটা

যেন Vicious circle-এর মধ্যে বাস করছি। এর সমাধান যে কি তা কেউ জানেন কিনা জানি না।

এই পত্রের উত্তরে আমি ইহাই কেবল বলতে পারি যে, আমার প্রবন্ধে অতিরঞ্জন বা অসত্য কিছুই ছিল না—সরেজমিনে যাচাই করলে ইহা প্রমাণিত হবে। ফাঁকা মাঠে ক্লাস করার কথা তিনি লিখেছেন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ও এই কথা বলেন, কিন্তু মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কিংবা শিক্ষা অধিকর্তা মহোদয় এই সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেন নাই, বরং ছাত্রদের জন্য মাথাপিছু কত পরিমাণ জায়গা দিতে হবে—তারই নির্দেশ আছে। আরও একটা কথা, আমার গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এমন কোন গাছ নাই—যাহার তলায় ক্লাস করা যেতে পারে। কিন্তু কুণ্ডু মহাশয়ের সঙ্গে আমি একমত যে, আমরা সব বিষয়েই একটা Vicious circle-এর মধ্যে ঘুরছি। আমার প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত কোন 'উদ্দেশ্য' ছিল না, সোজা কথা সোজা ভাষায় বলে দেশবাসীর ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। ছাত্র ছাত্রীদের চিঠিখানি মুদ্রিত করে স্কুলের ব্যাপার স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করেছি।

টাহো হ্রদ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

কোন্ এক কাঠুরে হেথা পেয়েছিল সোনার সন্ধান।
তারপর সুরু হ'ল মত্ত অভিযান।
ক্যালিফোর্ণিয়া কর্মঠ হ'ল—ভাগ্যান্বেষী দল
উন্মাদ, চঞ্চল!

'সিয়েরা নিভাডা' দূর দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর।
প্রাচীন জঙ্গল আর বরফে স্থবির,
দুর্ধর্ষ গভীর।
সেটাকে পেরুতে হবে।—লোভীদের দল
কেউ বা বিফল হ'ল, কেউ বা সফল।

মানুষের ছোঁয়া পেয়ে দুর্গম পর্বত
একে একে খুলে দিল বন্ধ তার পথ।
'সিয়েরা নিভাডা' পেল শহর-সম্মতি,
স্বর্ণপ্রসূ দেহে তার তীক্ষ্ণধার বাণিজ্যিক জ্যোতি!

ধূর্তদের উন্মত্ত লোভে সে সোনার খনি
দিকে দিকে আজকে তো হয়েছে নিঃশেষ;
সোনা নেই, সৌন্দর্য-উৎস—নয়নের মণি
পালটেছে বেশ।

শত শত উজ্জল হ্রদ জলে ভর-ভর:
সোনা নয়—তারা আঁকে সোনালী স্বাক্ষর।
গিরিবর্ত্মে, অরণ্যে যেন স্বপ্ন স্বয়ংবর!
পাইন, সিডার আর দেওদার-শাখা
তুলেছে সংরক্ষিত বনে সবুজ পতাকা!

স্যানফ্রান্‌সিস্কো জুড়ে জুলাইয়ের ছুটি,
গ্রীষ্মাবকাশ রচনামত্ত তাঁবুদের খুঁটি
আজ মুখোমুখী।
শিথিল হয়েছে দৃঢ় শৃঙ্খলের মুঠি।
দেখে তো হয় না মনে কাউকে অসুখী
বালুতটে বেপরোয়া পুরুষ-প্রকৃতি,
বিচিত্র দেহবাস—হাসি ঝরে পড়ে
রোদের ঝালরে!
মোটর-বোটের ঘাঁটি শূন্য হয়ে আসে।
জলে-জলে জীবনস্রোত মত্ত চারপাশে।
পানপাত্রে জলে ওঠে প্রেমের স্বীকৃতি।
ট্রেলার-স্বপ্নেতে লীন গ্রীষ্মের বিকাল,
'কার্ণেলিয়ান-বে'-তে আজ হয়েছে উত্তাল।
জুয়ার আড্ডায় চলে পটু বিকিকিনি,
'গিক্‌ট শপে' রক্তিম-ঠোঁট—লীলাপসারিণী!

ক্যালিফোর্ণিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কী জলে
সোনার বদলে
টাহো হ্রদ—কাকচক্ষু-স্বচ্ছ যার নীর,
পাহাড়ের অঙ্কে মৌন বেদান্ত-কুটির?

পড়ন্ত রোদ

শ্রীবাণী দত্ত

বিকেলের পড়ন্ত রোদের ছায়া এসে পড়েছে বিছানার এক প্রান্তে, সমস্ত ঘরখানাতে কেমন নিস্তব্ধ ভাব। বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের পানে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখল অনিন্দ্যমোহন। আজ চুয়াত্তর-পঁচাত্তরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল ঐ সূর্য্যের কথা…চিরাচরিত প্রথায় নিত্য আনাগোনার মাধ্যমে মাধুর্য্যও কম নয়, সকালের সূর্য্য বিকেলে অস্ত যায় বলেই না তাকে এত ভাল লাগে। সকাল বেলা যখন দেখা দেয় নতুন জাগরণী গান গেয়ে, তখন মনে নতুন আবেশের সঞ্চার করে। যেন সে নতুন হয়ে ফুটে ওঠে নিজের মনের মধ্যে, মনের রঙে রঙিন হয়ে ওঠে তার মন…কৈশোর যেন দাঁড়িয়ে থাকে সারা মন ঘিরে, চোখে তখন দেখা যায় না বাহিরে দেহের এই বিকৃত অবস্থা, এই লোলচর্ম্ম, পলিত কেশ… আর ভাবতে পারে না সে, একটা দিন তারও এমনি ছিল। সেদিন ছিল সে ঐ সূর্য্যের মতই সবল সতেজ! যখন সে থাকবে না, নতুন সূর্য্যের আবির্ভাব ত ঘটবে না আর ঘটলে বৈশালীর জীবনও পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, একের অভাবে তারও মন ম্রিয়মান হয়ে উঠত না…হয়ত বৈশালীর জীবনকেও আর নতুন মনে হ'ত না,…দীর্ঘশ্বাস একটু জোরেই বেরিয়ে এল। স্ত্রী বৈশালী স্বামীর এই ভাবাবেগ লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল কিছু কষ্ট হচ্ছে কি! বুকের ব্যথাটা বাড়ল আবার? বলে মাথায় সে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আজ দিনকতক যাবৎ তার শরীর অসুস্থ, একা বৈশালীর তাই ভয় হয়…যে সূত্রটুকু সে আঁকড়ে ধরে আছে, হয়ত সেটুকু ছিঁড়ে যাবে কোন দিন। হারাবার ভয়ে সে যেন সদা কণ্টকিত। কিছু না, বলে অনিন্দ্যমোহন চুপ করে রইলেন। বিগত যৌবনের কত কথাই না আজ ভাসছে মনের পর্দ্দায়…এমনি একা থাকলে তার প্রায়ই এই নিঃসঙ্গ অবস্থার সাথী হয়ে উঠে তারা—ভাবতে ভাল লাগে— কোথায় গেল সেই দিন—বয়স তার হয়েছে সত্যি, কৈ মনের বয়স ত বাড়ে নি এতটুকু, মনে হয় এখনও শরীরের যৌবনের অটুট ক্ষমতা! পরখ করে দেখবে নাকি?—থাক, হাসল মনে মনে, যৌবন-তরঙ্গে মনখানি তার এখনও উজ্জ্বল। দৃষ্টি স্বচ্ছ নয় বটে, তবে মনে পড়ে এ দৃষ্টির মাঝেই ধরা পড়েছিল আর একজোড়া দৃষ্টি—সে ভারী অদ্ভুত, সে চাহনীর মধ্যে যেন ছিল বিদ্যুতের ধার—সমস্ত মনকে বিদ্ধ করে—সেই প্রথম দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা আজও যেন মনের কোন গোপন-কন্দরে আত্মগোপন করে আছে—মনে হয় সে যেন সে নয়, সে মেয়েটি ত আর সে মেয়ে নয়, যেন কত যুগ চলে গেছে—আজ পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দু'জনের জীবনই যেন গেছে বদলে। সুপ্রিয়া মা, সুপ্রিয়া গৃহিণী। সে কর্ত্তা, তবে বাবা হবার সৌভাগ্য হতে এখনও বঞ্চিত। শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত তার জীবন-আর তার? আজ আর সে পাশে নেই, কোন একদিন ছিল হয়ত, আজ তার পাশে রয়েছে নির্ব্বোধ কর্ত্তব্যপরায়ণা স্ত্রী বৈশালী।

বৈশালী হাতখানায় একটু চাপ দিল—একবার ফিরেও তাকাল, সে চেয়ে আছে—আজও চেয়ে আছে—থাকবেও চেয়ে—কিন্তু এ চাওয়ার মূল্য কিছু দিতে পেরেছে কি? যে চেয়ে নেয় সেই ত পায়! যে কাঙালের মত চুপি চুপি হাত বাড়ায়, তার কপালেই কি দুঃখের ব্যথা নিবিড় করে আসে? সে কি কিছুই পেতে পারে না? সমস্ত ভাবনায় মুখখানা কালো হয়ে ওঠে অনিন্দ্যমোহনের। আজ যেন খুব বেশী অনুতপ্ত—বার বারই তাকিয়ে দেখছে বৈশালীকে—আজ যেন সে নতুন মানুষ! বাসর-কক্ষে চুপি চুপি যেমন নব পরিণীতাকে উপলব্ধি করা—জানার আগ্রহ সব সময়েই।

মাথায় গান্ধীটুপী, পরণে খদ্দরের ধুতী-পাঞ্জাবী তখন স্বদেশীর প্রথম দিকে যুবকদের ছিল একটা নেশা—বিলাতী বস্ত্র পোড়ানো—ইংরেজ ঠেঙ্গানো, সেই অগ্নিযুগের মানুষ এই অনিন্দ্যমোহন—তার সেই স্বপ্নে আঘাত হানল যে মেয়েটি সে এ নয়, সে মেয়েটিই সুপ্রিয়া প্রথম যৌবনোন্মেষের সঙ্গে দু'জনেরই অন্তরের দুয়ার খুলে গেল আপনি—ধরা দিল দুজনেই দুজনের মধ্যে। বৈপ্লবিক যুগে জেল খেটেছে সে কতবার তার ইয়ত্তা নেই, কত বোমা ছুঁড়েছে, কত খুন-জখম, থাক সে কথা, এখন আর কেউ মনে রাখে নি সে কথা—যখন সে এসে লুকিয়েছিল সুপ্রিয়াদের বাড়ী— কেউ ছিল না সে সময়ে বাড়ী, সুপ্রিয়া আশ্রয় দিয়েছিল তাকে, সমাদর করে বাতাস করেছিল, তার রক্তমাখা জামা পুড়িয়ে ফেলেছিল উনুনে, কারণ, একজন ইংরেজকে তারা গুলী করেছিল—প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছিল এ বাড়ী। লুকিয়ে রেখেছিল তাদের ছাদের ছোট্ট ঘরটায়, খাবার দিয়ে

আসত চুপি চুপি, তার পর একদিন যাবার সময় হয়ে এল, গম্ভীর মুখে সুপ্রিয়া বললে, চলে যাবেন আজই, যেন সে ভাবতেই পারে নি সে কথা, সে বলেছিল, তোমার আদর-যত্ন আমি ভুলব না কোনদিন সুপ্রিয়া, আমি আসব আবার, ঐ হাতের ছোঁয়া কি কখন ভোলা যায়?, তুমি আমায় বাঁচিয়েছ। তার মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে এসেছিল, সঙ্গী-সাথীদের খবর সে পায় নি, খবরের কাগজে যা পেয়েছে তা সামান্যই। ঢিপ করে সুপ্রিয়া প্রণাম করেছিল তাকে। তার চোখের কোণেও যে অশ্রু জমে ওঠে নি তা নয়, যেতে হবে, যেতে হবে, এই ভাবে দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া অপরাধ বৈ কি! বেরিয়ে এসেছিল তার ভাগ্য-সন্ধানে। তার পর আর সে যোগ দিতে পারে নি বিপ্লবীদের মধ্যে। তারাও হয়ত জেনেছিল সে মরে গেছে, পালিয়ে গিয়েছিল সুদূর বর্ম্মা দেশে। সুপ্রিয়াকে লিখেছিল চিঠি অন্য নামে, অজানা বন্ধু, প্রথমটা নাকি সে বুঝতেই পারে নি। তার পর বুঝেছিল প্রেমের রোমাঞ্চ যে কেমন সেদিন উপলব্ধি করেছিল মনে মনে। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে সে থাকবে, মনকে সে শাসালো, বিবাহ তার জন্যে নয়, সে যে বিপ্লবী, তার পর চিঠির মাধ্যমে পরিচয়ের নিবিড়তা উঠল বেড়ে। যেন তারা কাছাকাছি রয়েছে দু'জনের মাঝে। হঠাৎ সুপ্রিয়ার বাবার কাছে ধরা পড়ে গেল অনিন্দ্যমোহনের পরিচয়, তিনি রেগে বললেন, মেয়েকে বললেন, ওসব বয়সের জিনিস! ও সেরে যাবে, বিপ্লবীর সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে কিছুতেই দেবেন না। চিঠি লিখেছিল সুপ্রিয়া অনেক মিনতি করে। ফিরে এল কলকাতায়, তখন সুপ্রিয়ার বিয়ে হয়ে গেছে। অভিমান করে সে-বাড়ীতে আর গেল না সে। কিন্তু নিজেকে দমন করবার শক্তিই বা তার ছিল কৈ! বিয়ের পর সুপ্রিয়া বাপের বাড়ী এসেছে। কি চমৎকার মানিয়ে-ছিল কপালে লাল সিন্দুর-বিন্দু, যেন সেদিনের প্রথম লাল রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিল তার ললাট, যেন তারিই হাতে দেওয়া এয়োতির চিহ্ন। বার কয়েক পায়চারী করেছিল সেই রাস্তার সামনে দিয়ে। উপর থেকে নেমে এল সে চুপি চুপি দেখতে পেয়ে তাকে—জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, বিপুল আবেগ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল সেদিন। কাঁদতে কাঁদতে কুঁকরে গিয়েছিল তার দেহ, কতক্ষণ কেটেছিল মনে নেই, সহসা সে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল, ভেবেছিলাম তুমি আসবে সেদিন, লুঠ করে নিয়ে যাবে আমাকে, আজ আর কেন এসেছ, আমার কান্না দেখবে বলে তাই? তোমরা বিপ্লবী, অগ্নিযুগের মানুষ, দেশের জন্যে নাকি তোমাদের প্রাণ কাঁদে, আর কাঁদে না তার জন্যে যে মেয়ে তোমারই প্রতীক্ষায় বসেছিল সারাক্ষণ। ক্ষমা করো আমায়, আমি তোমার সব চিঠি পাই নি, শেষ চিঠি পেয়েই ছুটে চলে এসেছি, তার চিবুক স্পর্শ করে সে বলেছিল, ভুল বুঝো না আমায়, তোমার জন্যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব। তার পর চলে এসেছিল সে সে-বাড়ী থেকে সবার অলক্ষ্যে। তার পর বহুদিন অতীত হয়ে গিয়েছে, বর্ম্মাতেও আর ফিরে যাওয়া হয় নি, কিসে যে কি হয়ে গেল, সে যেন একটা ভীষণ স্বপ্ন। কিছুই ভাল লাগে না, মনটা তার ক্ষিপ্তের মত, বয়স তখন অনেকটা পার করে এনেছে, সেই সময়ে মায়ের পীড়াপীড়িতে বিয়ে করে বসল বৈশালীকে। অদ্ভুত মেয়ে এই বৈশালী, স্বামীর অন্যমনস্কতা সে লক্ষ্য করেছিল, তবু প্রশ্ন করে নি কোন দিন। তার পর সুপ্রিয়ার বাড়ী বহুদিন সে গেছে। সুপ্রিয়ার স্বামী মাতাল ও দুশ্চরিত্র ছিল, তাইতে তার দুঃখের অন্ত ছিল না। কেমন বিমনা লাগত তাকে, কিন্তু যতবার সে গেছে সেখানে, ততবারই যেন সে ধন্য মনে করেছে নিজেকে।

আর একবার যখন সে গেছে—তখন দেখেছে সুপ্রিয়ার শুভ্র মূর্ত্তি, চোখে জল এসে গিয়েছিল তার, এ মূর্ত্তির কথা কল্পনা সে করতে পারে নি কোনদিন। তাকে দেখে লুটিয়ে পড়েছিল কান্নায় ভেঙে, এ আমার কি হ'ল! যদিও সে তাকে দেখে নি কোনদিন, স্ত্রী ছিল, এই পর্য্যন্তই ছিল তার সম্পর্ক, কোন খোঁজ রাখত না। সে শুধু আসত নিতান্ত অসহায়—তুলে ধরেছিল দুই হাতে তাকে, মুছিয়ে দিয়েছিল অশ্রু, রাত্রে গাড়ীতে মদ খেয়ে সে আসছিল, মাথা ঠিক রাখতে পারে নি, তার পরই এই কাণ্ড। সুপ্রিয়ার ছেলেরা ছোট ছোট, ভারী ব্যথা লেগেছিল মনে, দু'জনের অশ্রুতে বোধ হয় পাষাণ গলে যেত, নিষ্ঠুর দেবতা, যার পায়ে চাল-কলা দিয়ে নিত্য মাথা খোঁড়া, একটু সুখের আশায়। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সবেগে সে বলল, এই ভাল হয়েছে, শাড়ীটা সাদা, দেখছ। রংটাই সাদা হয়েছে, স্বস্তি পেয়েছি খানিকটা কারণ ওর ঐ অত্যাচার সইতে পারতাম না আমি, বিধবা লোকে বলবে বটে, তবে যেখানে তোমার আসন, সেখানে তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত, সে মেয়ে কখনও বিধবা হয় না। অদ্ভুত মেয়ে সুপ্রিয়া। তার ভালবাসা দীপ তবুও নিষ্কম্প। এত ঝড়-ঝঞ্ঝায় মলিন হয় নি এতটুকু। ছোট হয়েছিল সে নিজে। মনে হ'ল এ আঘাত যেন তারই বুকে ফিরে এসেছে। ঐ নিরাভরণা সুপ্রিয়াকে সইতে পারল না বেশীক্ষণ, পালিয়ে এসেছিল চোরের মত লুকিয়ে, এসে কেঁদেছিল শিশুর মত। তার পর বহুদিন কেটে গেছে, সুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে বটে, তবে সে কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব। কারণ, সে এড়িয়ে চলত তাকে। তারই মন শাসাত তাকে,

এত ভাল নয়। সুপ্রিয়ার ছেলেরা বড় হয়েছে, কাজ করছে এখন। ছেলেরা বিয়ে করেছে। স্ব-সংসারে সে সুপ্রতিষ্ঠিতা, একাধারে সে মাতা ও গৃহিনী…আরও আরও দিন চলে গেছে, সুপ্রিয়া যেন অন্য জগতের মানুষ, আর বেশী ঘেঁষতে চায় না যেন। যেন যৌবনের স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে। তা বয়সও ত হয়েছে, ভাঁটার টান ধরেছে দেহে। তার উচ্ছল নদী যেন মজে এসেছে। ব্যথাহত হয়ে ফিরে এসেছিল একদিন সুপ্রিয়ার নির্লিপ্ত ভাব দেখে। যেন সে বিশেষ কেউ নয়, অন্তরঙ্গতাও ছিল না কোন দিন, অথচ একদিন—না ভাবতে পারে না সে, হঠাৎ পা ভেঙেছে… সুপ্রিয়া ক'টা টাকা দিয়েছে চিকিৎসার জন্যে, যেন অসীম অনুগ্রহ তার। এখন তাকে এড়িয়ে চলতে চায়, কারণ মাতৃত্বের সুনামটুকু নষ্ট হবার ভয়ে। হৃদয়ের পরিচয় ত সব নয়, যার কাছে তার কাছেই, অপরের কাছে ত সে নিঃসম্পর্কীয় একজন। দাবী কোথায় তার? আজ এই জীবনের প্রান্তে এসে মনে হয়েছে, সুপ্রিয়া মরে গেছে, তার কাছে তার স্মৃতি অনেকটা ম্লান, যাক যাবার পথে পা বাড়িয়ে সেও বৈশালীকে আর দুঃখ দেবে না। তার ত জীবনের অবসান হয়ে আসছে, ক'টা দিন আর বাকী, পারের হাতছানি যেন সে দেখতে পাচ্ছে। ঝরে-পড়া চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বৈশালী বলে, এত কি ভাবছ? সেরে উঠবে তাড়াতাড়ি। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল তার, হ্যাঁ—ভাল হবে, ভাল হবে।

সাদা মেঘ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সাদা সাদা মেঘ
মুক্তপাখা মূর্চ্ছনা আবেগ—
ঢেউ তুলে শূন্য নীলিমায়
নিরুদ্দেশ ভেসে চলে যায়।
—এ শ্বেত-কপোত যেন
নীড়-কামনায়
আকাশে হারায়।

এই-যে বাসনা
চেয়ে চেয়ে একটি হৃদয়
ফেরে দেশময়,
মমতা-নিবিড় পরিচয়
আকাঙ্ক্ষায় ম'জে
দিশিদিশি খোঁজে
যে-পাপড়ি সহজে না বোজে
তবু ঝুলি কোনো দানে
ভরবার নয়।
শুধু ধোঁয়া, ধূলি জড়ো হয়।

—এই ত সঞ্চয়?
তা-ই ত ফেরারী মন
অরণ্য-প্রান্তরে
পর্য্যটন করে—
অন্বেষণে সদা ব্যস্ত রয়
মেলে যদি একটি হৃদয়।
শূন্য নীলাম্বরে
সাদা মেঘ সে-ও ঘুরে মরে।

হয়ত এ শুভ্র মেঘ
—এ বলাকা জানে
কত তীর্থ—বন্ধ্যামাটি শেষে
পৃথিবী অরণ্য-শাখা আনে।
তা-ই মন হায়
মিশে যেতে চায়
পথে পথে, ভিড়ে-জনতায়,
কোনোদিন যদি কাছে
একটি হৃদয় পাওয়া যায়।

মন্দিরময় ভারত—গুহামন্দির

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

দেখি একে একে অষ্টাদশ ও বিংশতি গুহামন্দির। সমসাময়িক এই বিহার দুইটি নির্ম্মিত হয় ৫০০ থেকে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ গুপ্ত স্থাপত্যের নিদর্শন, স্থপতির সুন্দরতম কীর্ত্তি। সাজান স্থপতি, এই মন্দির দুইটির অঙ্গ, স্তম্ভের অঙ্গ আর শীর্ষদেশ ও মন্দিরের সম্মুখভাগ উজাড় করে দিয়ে অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, করেন তাদের মহামহিমময়। অনুরূপ ষোড়শ ও সপ্তদশ গুহামন্দিরের, পরিকল্পনায় ও নির্ম্মাণ পদ্ধতি, সমপর্য্যায়ে পড়েও, প্রাচীরের গাত্রের ও স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্প ও মূর্ত্তিসম্ভার আর ছাদের অলঙ্করণে, কিন্তু নাই এই দুইটি বিহারে ষোড়শ ও সপ্তদশ গুহামন্দিরের চিত্র-সম্ভার, নাই প্রথম ও দ্বিতীয় গুহামন্দিরের চিত্র-সম্পদও। তাই পরিণত হয় নাই স্বপ্নলোকে, রহস্যপুরীতে।

দেখি, রচিত হয় এই মন্দির দুইটিতেও, কত মহামহিমময় বুদ্ধের মূর্ত্তি, আছেন তাঁরা কত বিভিন্ন আর বিচিত্র ভঙ্গীতে। দেখেছি অনুরূপ অপরূপ একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি সপ্তদশ গুহামন্দিরেও। মূর্ত্তি দেখি কত পদ্মপাণি আর বজ্রপাণিরও। শোভন, সুন্দরতম, মহিমময় এই মূর্ত্তিগুলি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, সৃষ্টির এক মহাগৌরবময় যুগের। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। মন্দিরের সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রণতি জানিয়ে, ঊনবিংশ গুহামন্দিরে উপনীত হই।

একটি মহাযান চৈত্য এই গুহামন্দিরটি, নির্ম্মিত হয় ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। সমসাময়িক অষ্টাদশ ও বিংশতি গুহামন্দিরেরও, বুকে নিয়ে আছে গুপ্ত স্থপতির আর ভাস্করের শ্রেষ্ঠতম দান। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির অজন্তার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ভারতেরও, পাই এই চৈত্যের সম্মুখভাগে, পূর্ব্ববর্ত্তী চৈত্যের কাঠের কাজ। ব্যবহৃত হয় প্রস্তর তার পরিবর্ত্তে। বিদায় গ্রহণ করে কাঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যে, অধিকার করে প্রস্তর কাঠের স্থান।

নির্ম্মাণ করেন অজন্তার মহাযান বৌদ্ধ স্থপতি আরও একটি চৈত্য, নির্ম্মিত হয় ষড়বিংশতি গুহামন্দির, পরবর্ত্তীকালে। কিন্তু ক্ষুদ্রতর এই চৈত্যটি, সুন্দরতরও। উচ্চতায় আটত্রিশ ফুট ও প্রস্থে ৩২ ফুট এই চৈত্যের বহির্ভাগ। বিস্তৃত হয়ে আছে তার অভ্যন্তর ভাগ ছেচল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও চব্বিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে।

দেখি, আছে এই চৈত্যের সম্মুখভাগের কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র প্রবেশপথ, তিনটি নয়; ব্যতিক্রম অন্য বৌদ্ধ চৈত্যের সঙ্গে।

দেখি, এই চৈত্যের সম্মুখভাগে, স্থপতি নির্ম্মাণ করেন আটটি অষ্টকোণ-স্তম্ভের শ্রেণী, শীর্ষে নিয়ে বন্ধনী, পাদদেশে, কুলুঙ্গির ভিতর, দণ্ডায়মান বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি। রচিত হয় দ্বিতল, সেই স্তম্ভের উপর, প্রবেশপথের সম্মুখে, চারিটি কুষাণ-শীর্ষ-স্তম্ভযুক্ত অপরূপ অলিন্দ। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। দুই থাকে রচিত ছাদ, ছাদের শীর্ষদেশে, দুইটি বৃত্তাকার গম্বুজ, অঙ্গে সারি, সারি চৈত্য গবাক্ষ। শোভা পায় রেল ও চৈত্য গবাক্ষের নীচে। ভূষিত অনুরূপ অলঙ্করণে, চৈত্যের সম্মুখভাগের এক তলার ছাদের অঙ্গও। প্রবেশ পথের দুই পাশে, দুইটি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। দেখি, স্তম্ভের ফাকে ফাকে প্রাচীরের গাত্রে, মূর্ত্তি কত বুদ্ধের, কত বোধিসত্ত্বেরও, দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ভঙ্গীতে। দেখি, সুন্দরতম, অনবদ্য মূর্ত্তিসম্ভারে ভূষিত সম্মুখভাগের সর্ব্বাঙ্গ, মূর্ত্তি বোধিসত্ত্বেরও প্রবেশপথের শীর্ষদেশে, দ্বিতলের কেন্দ্রস্থলে, রচিত হয় অনবদ্য, মহামহিমময় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চৈত্য গবাক্ষ, বৈশিষ্ট্য বৌদ্ধচৈত্যের প্রবেশপথ মন্দিরে আলোবাতাসেরও। চৈত্য গবাক্ষের দুই পাশেও দুইটি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। দেখি, দ্বিতলের ছাদের শীর্ষদেশে, কানিসের অঙ্গে আর চৈত্য গবাক্ষের দুই পাশে ও সারি সারি ক্ষুদ্রতর চৈত্য গবাক্ষ আর মূর্ত্তির সম্ভার। দেখি, মুগ্ধবিস্ময়ে স্থপতির আর ভাস্করের সুন্দরতম সৃষ্টি, এক অমর কীর্ত্তি। প্রবেশ করি মন্দিরের ভিতরে।

দেখি, পনেরটি এগার ফুট উচ্চ, কুষাণ-শীর্ষ, ঘন সন্নিবিষ্ট অপরূপ স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয় মন্দিরের কেন্দ্রস্থলকে, চতুর্দ্দিকের গলিপথ থেকে। যুক্ত হয় তাদের সঙ্গে প্রবেশপথের দুইটি অনুরূপ স্তম্ভ। অঙ্গে নিয়ে আছে এই স্তম্ভগুলির দণ্ড, সুন্দরতম ও সূক্ষ্মতম শিল্পসম্পদ, শীর্ষে বিশাল বন্ধনী। স্তম্ভের বন্ধনীর উপরে, প্রাচীরের গাত্রে, কানিসের নীচে, পাঁচ ফুট প্রস্থ পাড়। বেষ্টন করে আছে পাড় সমস্ত কেন্দ্রস্থলটিকে, বিভক্ত হয়ে আছে অনবদ্য খোপে। সবার উপর দাঁড়িয়ে আছে খিলানযুক্ত, অর্দ্ধগোলাকৃতি ছাদ, অঙ্গে নিয়ে ঘন-সন্নিবিষ্ট শিরাকৃতি কড়ি, রচিত জীবন্ত প্রস্তর কেটে, কাঠ দিয়ে নয়।

অপরূপ, সুন্দরতম মূর্ত্তিসম্ভারে অলঙ্কৃত প্রতিটি স্থান, ভূষিত প্রাচীরের গাত্র, পাড়ের অঙ্গ আর স্তম্ভের বন্ধনী। মূর্ত্তি বুদ্ধের আর বোধিসত্ত্বের; বসে আছেন তাঁরা অগভীর প্রকোষ্ঠের মধ্যে, দাঁড়িয়ে আছেন কারুকার্য্যসমন্বিত চন্দ্রাতপের নীচে, আছেন কুলুঙ্গির ভিতরেও, আছেন বিভিন্ন ভঙ্গীতে। রচিত হয় কত দেব-দেবীর মূর্ত্তিও, কেউ উড়ন্ত, কেউ উড্ডীয়মান জন্তুর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। মূর্ত্তি দিয়ে রচিত হয় এক সুন্দরতম পরিবেশ, এক রহস্য লোক, রচনা করেন শ্রেষ্ঠ গুপ্ত ভাস্কর। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

স্তূপের নিকটে উপনীত হই, দেখি দাঁড়িয়ে আছে স্তূপটি কেন্দ্রস্থলের প্রান্তদেশে, বৃত্তাকার অংশের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, একটি অনুচ্চ বেদীর উপর। দাঁড়িয়ে ছিল বেদীর দুই পাশে দুইটি প্রমাণাকৃতি প্রহরীর মূর্ত্তি। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে সেই মূর্ত্তি দুইটি কালের করালে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে একেবারে।

বাইশ ফুট উচ্চ এই স্তূপটি, রচিত একটি সম্পূর্ণ পাথর কেটে,

দাঁড়িয়ে আছে এক মহামহিমময় মূর্ত্তিতে, স্পর্শ করে আছে ছাদের অঙ্গ। অর্দ্ধগোলক এই স্তুপটি, রচিত গম্বুজের আকারে, শীর্ষে নিয়ে আছে হারমিকা, তিনটি ক্রমশীর্ণায়মান ছত্র ও একটি ক্রম-হ্রস্বায়মান পাত্র। বিলীন হয়ে যায় তারা ছাদের অন্ধকারময়, পবিত্র, সুগম্ভীর পরিবেশে। কিন্তু অনাবৃত এই গম্বুজের সম্মুখ-ভাগ, অর্দ্ধাবৃত এলোরায় বিশ্বামিত্রের স্তুপের সম্মুখভাগও। দাঁড়িয়ে আছেন সেথানে স্তম্ভযুক্ত কুলুঙ্গির ভিতর, সূক্ষ্মতম অলঙ্করণে ভূষিত, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্রাতপের নীচে, এক মহামহিমময় বুদ্ধ। দাঁড়িয়ে আছেন দেবতা বুদ্ধ, তার প্রতীক নয়। সুরু হয় মূর্ত্তির পূজা, বৌদ্ধ চৈত্যে, সুরু করেন মহাযান সম্প্রদায়, পরিত্যক্ত হয় হীনযান সম্প্রদায়ের স্মৃতির পূজা। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি গুপ্ত ভাস্করের। বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে নিক্রান্ত হই মন্দির থেকে।

একে, একে, এক বিংশতি, দ্বাবিংশতি, ত্রয়োবিংশতি, চতুর্বিংশতি, ও পঞ্চবিংশতি গুহামন্দির দেখি। নির্ম্মাণ করেন এই গুহামন্দিরগুলি চালুক্য রাজারা ৫৫০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, বুকে নিয়ে মহাগৌরবময় সৃষ্টি বৌদ্ধ স্থপতির আর ভাস্করের, প্রতীক এক মহাগৌরবময় যুগের, তার চরম উৎকর্ষের, পূর্ণ পরিণতির। বুকে নিয়ে আছে এই গুহামন্দিরগুলিও সুন্দরতম স্তম্ভ, অঙ্গে নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্প ও মূর্ত্তিসম্ভার, মূর্ত্তি কত বুদ্ধের আর বোধিসত্বের। মহা-মহিমময় এই মূর্ত্তিগুলি, জীবন্ত, প্রতীক শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যেরও।

অভিনব এক বিংশতি গুহামন্দিরটি। দেখি, রচিত তার অলিন্দের দুই প্রান্তদেশে, দুইটি ক্ষুদ্রতর উপাসনা মন্দির, দুইটি স্তম্ভ আর দুইটি উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে। সভাগৃহের প্রান্তদেশে, গর্ভগৃহের দক্ষিণে আর বামেও অনুরূপ দুইটি মন্দির, পৃথক হয়ে আছে সভা-গৃহের সঙ্গে, দুইটি স্তম্ভ ও দুইটি উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে। অনবদ্য, সুন্দরতম এই উপাসনা মন্দিরগুলি, অপরূপ স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভ-গুলির অঙ্গের শিল্পসম্পদ আর তাদের শীর্ষদেশের অলঙ্করণও। স্তম্ভের শীর্ষদেশে, মুক্তার আকারে রচিত হয় পাড়। পাড়ের অঙ্গে, বুদ্ধের জীবনের কত কাহিনী, রচিত মূর্ত্তি দিয়ে। দেখি, শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি পাত্র, অঙ্গে পল্লব। সুরু হয় মন্দিরে পাত্র পল্লব স্তম্ভের নির্ম্মাণ এখান থেকেই। সুরু করেন বৌদ্ধস্থপতি। দেখি, বিস্ময়ে মূক হয়ে।

দেখি, অসমাপ্ত চতুর্ব্বিংশতি গুহামন্দির। হ'ত যদি সম্পূর্ণ, লাভ করত পূর্ণরূপ, ভূষিত হ'ত অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে, অলঙ্কৃত হ'ত মূর্ত্তিসম্ভারে, পরিণত হ'ত ভারতের শ্রেষ্ঠ বিহারে। অসমাপ্ত, তৃতীয়, পঞ্চম, চতুর্দ্দশ, সপ্ত, অষ্টা ও উনত্রিংশৎ গুহা-মন্দিরও। সম্পূর্ণ হয় নাই ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে, পল্লব নরসিংহ বর্ম্মণের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের জন্য পলায়ন করেন অজন্তার স্থপতি আর ভাস্কর, পরিত্যাগ করে যান অজন্তা। অন্যতম বৃহত্তম বিহার অজন্তার, চতুর্ব্বিংশতি গুহামন্দির, বিস্তৃত হয়ে আছে পঁচাত্তর ফুট স্কোয়ার পরিধি নিয়ে, বুকে নিয়ে কুড়িটি অনবদ্য, সুন্দরতম স্তম্ভ। দেখি, এই মন্দিরের অলিন্দে বহু পাত্র-পল্লব স্তম্ভও। উন্নততর সংস্করণ তারা এক বিংশতি মন্দিরে নির্ম্মিত পরীক্ষামূলক আদি পাত্র-পল্লব স্তম্ভের।

ক্রমে বাড়ে এই স্তম্ভের প্রচলন মন্দিরে, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি মধ্য যুগের স্থাপত্যে। দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে, এই মন্দিরের অঙ্গের অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, অনুপম অলঙ্করণও। দেখি, মহিমময় বুদ্ধের আর বোধিসত্বের মূর্ত্তিও। মূর্ত্তি উড়ন্ত দেব-দেবীর, কিন্নরীর আর গন্ধর্ব্বেরও। দেখে বিস্মিত হই, এক মহামহিমময় পরিকল্পনার সুন্দরতম রূপদান। পরম সুন্দরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ষড়-বিংশতি গুহামন্দিরে উপনীত হই।

মহাযান সম্প্রদায়ের অজন্তার শেষ চৈত্য এই গুহামন্দিরটিও, চালুক্য রাজারা নির্ম্মাণ করেন ৬০০ থেকে ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। উপনীত হয় এই সময়েই বৌদ্ধস্থাপত্য উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, লাভ করে শেষ পরিণতি।

দৈর্ঘ্যে আটষট্টি, প্রস্থে ছত্রিশ আর উচ্চতায় একত্রিশ ফুট, এই চৈত্যটি বুকে নিয়ে আছে ছাব্বিশটি বার ফুট উঁচু ঘন-সন্নিবিষ্ট স্তম্ভ। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভ, প্রথম গুহামন্দিরের স্তম্ভের অঙ্গের শিল্প-সম্ভার, শীর্ষে নিয়ে আছে বুদ্ধের মূর্ত্তি, মূর্ত্তি বোধিসত্বের আর দেব-দেবীও।

অনুরূপ এই চৈত্যটির অভ্যন্তরভাগ পরিকল্পনায় আর নির্ম্মাণ পদ্ধতিতে, উনবিংশ গুহামন্দিরের অভ্যন্তর ভাগের। কিন্তু বিস্তৃত-তর ও সূক্ষ্মতর এর স্তম্ভের বন্ধনীর অঙ্গের ও তার শীর্ষদেশের পাড়ের অঙ্গের মূর্ত্তিসম্ভার। যুক্ত হয় খোবের (প্যানেলের) ফাঁকে ফাঁকে ও অগভীর কুলুঙ্গি। মূর্ত্তি দিয়ে রচিত হয় তার অঙ্গে, কত কাহিনী, কাহিনী কত বুদ্ধের জীবনের, কাহিনী কত পুরাণেরও। দেখি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে।

প্রান্তদেশে, বৃত্তাকার অংশের কেন্দ্রস্থলে, দাঁড়িয়ে আছে স্তুপ, এক মহামহিমময় মূর্ত্তিতে, অঙ্গে নিয়ে বিস্তৃত শিল্প সম্ভার, শীর্ষে নিয়ে হারমিকা ও ক্রম হ্রস্বায়মান ছত্র। সম্মুখে, অনুপম অলঙ্করণে সমৃদ্ধ, স্তম্ভযুক্ত চন্দ্রাতপের নীচে, সিংহাসনে বসে আছেন মহামহিমময়, দেবতা বুদ্ধ।

কেন্দ্রস্থলের প্রাচীরের গাত্রে, স্তম্ভের অন্তরালে দেখি বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের মূর্ত্তি। দেখি মহানির্ব্বাণে শায়িত দেবতা বুদ্ধ। দুই প্রান্তের অজস্র ফুলে ভরতি বৃক্ষের কেন্দ্রস্থলে শয়ন করে আছেন মহামহিমময় বুদ্ধ, স্থাপিত তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ ভূতলে। বিস্তৃত তাঁর দক্ষিণ পদ বাম পদের উপর। বেষ্টিত হয়ে আছেন তিনি শিষ্য-বর্গে। অশ্রুসিক্ত তাদের নয়ন, বিষাদে আচ্ছন্ন তাদের আনন। ঊর্দ্ধে গন্ধর্ব্বেরা নিযুক্ত সঙ্গীতে। ছড়িয়ে পড়ে সুমধুর সঙ্গীতের লহরী আকাশে বাতাসে, প্রতিধ্বনিত হয় চারিদিক। নিমগ্ন থাকেন বুদ্ধ মহাধ্যানে। শেষে লাভ করেন পরিনির্ব্বাণ, হয় মোক্ষলাভ। দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে, এক সুন্দরতম সৃষ্টি বৌদ্ধ ভাস্করের, এক অমর কীর্ত্তি, নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি, দিই ডালি উজাড় করে। দেখতে পাই প্রাচীরের গাত্রের চিত্রসম্ভার।

দেখি, অঙ্কিত প্রাচীরের গাত্রে বুদ্ধের প্রলোভনের দৃশ্য। অনুরূপ এই দৃশ্যটি প্রথম গুহামন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের প্রলোভনের দৃশ্যের, বর্ণ সুষমায় আর অঙ্কন শৈলীতে। দেখি মুগ্ধ হয়ে, বিস্ময়ে মূক হয়ে, শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে। ভাবি কোথায় পান অজন্তার স্থপতি, এমন মহিমময় পরিকল্পনা, কেমন করে দেন তাদের এমন অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম রূপ। যন্ত্র দিয়ে কাটেন জীবন্ত শৈলমালার অঙ্গ, নির্ম্মাণ করেন মন্দির তার অন্তরতম প্রদেশে। রচনা করেন প্রাচীর, শোভিত করেন তার গাত্র, কত বুদ্ধ মূর্ত্তি দিয়ে, কোথাও দাঁড়িয়ে, কোথায় বসে, কোথাও বা শুয়ে, পরিনির্ব্বাণ মূর্ত্তিতে কোথাও পদ্মাসনে বসে, হস্তে নিয়ে অভয় মুদ্রা, কোথাও সিংহাসনে হস্তে নিয়ে বরদা মুদ্রা। মূর্ত্তি কত পদ্মপাণি আর বজ্রপাণিরও, বিভিন্ন আর বিচিত্র তাঁদের দাঁড়াবার ভঙ্গীও। তাঁদের শিরে শোভা পায় সুউচ্চ বহু মূল্য শিরোভূষণ, কণ্ঠে মুক্তার মালা, অঙ্গে মূল্যবান বসন। জীবন্ত তাঁরা, ফুটে ওঠে তাঁদের আননে তাঁদের অন্তরের ভাষা। বেষ্টিত তাঁরা সহচরবর্গে। গড়েন কত গন্ধর্ব্ব, কত বামনের মূর্ত্তি, জীবন্ত তারাও, প্রতিফলিত হয় তাদের চোখে মুখে তাদের অন্তরের ভাষাও, হিল্লোলিত হয় তাদের সর্ব্বাঙ্গে। মূর্ত্তি কত হিন্দু দেবতার আর দেবীরও, বিকশিত তাদের নয়ন আর আননও, অন্তরের ভাষায় কত নৃত্যপরায়না নর ও নারী, নৃত্য করেন তাঁরা অনবদ্য ছন্দে। কার্নিসের নীচে প্রাচীরের গাত্রে, মূর্ত্তি দিয়ে রচিত হয় পাড়, পাড়ের অঙ্গে কত কাহিনী. কাহিনী বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলীর, কাহিনী কত পুরাণেরও।

অলঙ্কৃত করেন সেই মন্দির স্তম্ভ দিয়ে। কি যন্ত্র দিয়ে প্রস্তরের অঙ্গ কেটে রচনা করেন স্তম্ভ? শোভিত করেন তাদের সর্ব্বাঙ্গ, তাদের শীর্ষদেশ আর বন্ধনীর অঙ্গ কত অনুপম, সূক্ষ্মতম শিল্প-সম্ভারে, ভূষিত করেন কত অনবদ্য মূর্ত্তিসম্ভারেও। রচনা করেন এক সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, এক নন্দনকানন মন্দিরে। করেন যুগের পর যুগ, এক মহাগৌরবময় সৃষ্টি, এক অমর কীর্ত্তি।

সাজান মন্দিরের সম্মুখভাগ আর প্রবেশপথও, অনবদ্য সুন্দরতম অলঙ্করণে আর নিখুঁত সুষ্ঠু গঠন মূর্ত্তিসম্ভারে ও লতা-পল্লবে। সাজান হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিঃশেষ করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের অপরিসীম মাধুরী। সৃষ্টি করেন এক-একটি অমরাবতী, রহস্যলোক।

কোন তুলি দিয়ে আর কি বর্ণ সুষমায় শোভিত করেন চিত্র-শিল্পী, তার প্রাচীরের গাত্র, ছাদের অঙ্গ আর সম্মুখভাগ। অঙ্কিত করেন জাতকের কাহিনী, কাহিনী বুদ্ধের পূর্ব্ব-জীবনের, কাহিনী তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাবলীরও, সঙ্গে নিয়ে কত রাজপ্রাসাদ, কত রাজসভা, কত উদ্যান, কত বন-উপবন। অঙ্কিত করেন কত বুদ্ধের আর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিও। ভূষিত বোধিসত্ত্বেরা বহুমূল্য ভূষণে, বিকশিত তাঁদের নয়নে আর আননে তাঁদের অন্তরের ভাষা। অঙ্কিত হয় কত নৃত্যপরায়ণা রাজনর্ত্তকী সজ্জিতা বহুমূল্য ভূষণে আর বসনে, কত পরমাসুন্দরী নারী। আনত তাদের শির, রহস্যময় তাদের আনন, তাদের আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নে, গ্রীবা ভঙ্গীতে, তাদের অনাবৃত যৌবন পরিপুষ্ট, পীনোন্নত বক্ষে, আর হিল্লোলিত অবসন্ন দেহ-বল্লরীতে কামনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

আদর্শবাদী তাঁরা, সুদূরপ্রসারী তাঁদের কল্পনা, বহু বিস্তৃত বিষয়বস্তু, মহাশক্তিশালী অঙ্কন পদ্ধতি আর নিখুঁত বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে হয় এক অপরূপ সমন্বয়, এক সুষ্ঠু সামঞ্জস্য, অজন্তার মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে ও ছাদের অঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে। বাস্তবের কল্পনার সঙ্গে সত্যের, সুষমার সঙ্গে ছন্দের আর সুস্পষ্ট কামনার। গৌরবান্বিত হয় অজন্তা, লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্য্যের দরবারে, করে চিত্র-শিল্পের দরবারেও। হয় বিশ্বশ্রী।

জানাই অসংখ্য প্রণাম অজন্তার স্থপতিকে আর ভাস্করকে, প্রণতি জানাই চিত্র-শিল্পীকেও। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা অক্ষয় হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়, হয় নাই ম্লান।

পরিসমাপ্ত হয় অজন্তা দর্শন। দেবদিবাকর যান অস্তাচলে। ম্লান হয়ে আসে তাঁর রশ্মি, মৃদু রক্তিম বর্ণ ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তে। ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন, সঙ্গীরা ফিরে যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত। একটি প্রস্তরখণ্ডের উপরে গিয়ে বসি। দৃষ্টিনিবদ্ধ হয় পশ্চিম দিগন্তে, সম্মুখের সুউচ্চ শৈলমালার শীর্ষদেশে।

ভেসে ওঠে চোখের সামনে এক উজ্জ্বল দৃশ্য। দেখি বহু ঊর্দ্ধে শূন্য দিয়ে অগ্রসর হয় একটি অপরূপ রথ। সারথি তার দেব-স্থপতি বিশ্বকর্ম্মা। বেষ্টিত রথের তিনদিক শৈলমালা দিয়ে, বুকে নিয়ে ঘনবনবীথি, শীর্ষে নিয়ে তুষার কিরীট। একদিকে সজ্জিত বিভিন্ন আর বিচিত্র যন্ত্রপাতি—কুঠার, হাতুড়ী, ছেনী, নানা আকৃতির বাটালি ও আরও কত সূক্ষ্মাস্ত্র। রথের শীর্ষদেশে সবুজ পতাকার অঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লেখা—মহত্তের পুরস্কার, তার নীচে অজন্তার স্থপতি। ভিতরে উপবেশন করে আছেন স্থপতি আর ভাস্করের দল, হস্তে নিয়ে যন্ত্রপাতি। তাঁদের শিরে শোভা পায় সবুজ শিরোভূষণ, প্রতীক সাফল্যের গৌরবের।

দেখি তার অনুগমন করে অনুরূপ একটি রথ। সারথি তার স্বর্গের চিত্র-শিল্পী। সাতটি বর্ণের—শ্বেত, রক্তিম, গোলাপী, কালো, বেগুনী, পীত ও সবুজ সংমিশ্রণে রচিত রথের তিনদিকের আবরণ, একদিকে শোভা পায় তুলি, বিভিন্ন আর বিচিত্র তাদের আকার। শীর্ষদেশে রক্তিম ধ্বজার অঙ্গে কালো অক্ষরে লেখা—মহত্তের পুরস্কার, তার নীচে অজন্তার চিত্র-শিল্পী। ভিতরে তুলি হস্তে উপবিষ্ট চিত্র-শিল্পীর দল, শিরে নিয়ে রক্তবর্ণ শিরোভূষণ, প্রতীক বিজয়ের।

মনের পর্দ্দায় ঝঙ্কৃত হয় বিশ্ব-কবির চারিটি ছত্র :

"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারংবার।"

ক্রমশঃ

বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতীয় চিন্তার ধারা ও সমাজ-জীবন

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

পরম সুখে লালিত-পালিত বুদ্ধদেব ২৯ বৎসর বয়সে যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করছিলেন, তখনও তিনি বলেছেন :

"যদি জরা ন ভবেয়া নৈব,ব্যাধি র্ন মৃত্যু—
তথাপি চ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তঃ।
কিন্তু পুনর্জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-নিত্যানুবদ্ধাঃ—
সাধো প্রতিনিবর্তয় চিন্তয়িষ্যে প্রমোচম্ ॥"

"যদি জরা না থাকত, না থাকত ব্যাধি ও মৃত্যু— তথাপি পঞ্চস্কন্ধ-ধারণ হেতু মানুষের সব দুঃখময় হবেই। তার উপর জরা, ব্যাধি, মৃত্যু যেখানে অনিবার্য, তদ্বিষয়ে কথা কি? কাজেই হে সাধো! প্রতিনিবৃত্ত হও দৈনন্দিনের ভোগমার্গ থেকে; সর্ব দুঃখের হাত থেকে মুক্তির উপায় আমি চিন্তা করব।"

তিনি আরও বলেছেন :

"নাহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্ ॥"

অর্থাৎ "আমি রাজ্য চাহি না, স্বর্গ চাহি না, পুনর্জন্ম না হোক—এও চাই না। আমি চাই দুঃখতপ্ত প্রাণিগণের দুঃখের নিবারণ ॥"

শিষ্যগণকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন—"তোমরা চারদিকে ধর্ম প্রচার কর—বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অর্থায় সুখায় দেবমনুস্যাণং", বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, লোকের করুণাবর্ধনের জন্য দেব ও মনুষ্যের অর্থ ও সুখের জন্য ॥"

এই বিরাট ব্যক্তির মহাবতার ও সংপ্রচারণার ফলে ভারতীয় জীবনে ও চিন্তাধারায় বহু পরিবর্তন সংঘটিত হ'ল। "বোধি" লাভের পরে বুদ্ধদেব ৪৫ বৎসর কাল অতন্দ্রিত ভাবে যে ধর্মপ্রচারণা করলেন, তার ফল হ'ল দিগদিগন্ত-প্রসারী ॥

ভগবান্ বুদ্ধ যে যুগে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন, তখন ধরণীর সর্বত্র এক মহৎ ধর্মচাঞ্চল্য হচ্ছে পরিলক্ষিত। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে লোজু এবং কনফুসিয়াস্, গ্রীসে পারমেনিডেস এবং এনপোডেকলস, ইরাণে জুরথুষ্ট্র এবং ভারতে মহাবীর ছিলেন ধর্মান্দোলনে ব্যাপৃত। কিন্তু বুদ্ধদেবের পূর্ণবোধির চরমাভিব্যক্তির ফলে সমগ্র বিশ্ব তাঁর ধর্মই গ্রহণ করতে সমুদ্যত হলেন কালক্রমে।

বুদ্ধদেবের অব্যবহিত পূর্বে ভারতে ধর্মের ক্ষীণাবস্থা ॥

সংযুক্ত নিকায়ে বুদ্ধদেব বলেছেন, আমার এই ধর্মে আমি আমার পূর্ববর্তী সুরিগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছি। পন্থা যা অনুসরণ করেছি, তা অতি প্রাচীন। এই পথ অনুসরণ করতে করতেই সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছি। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, গৃহস্থ ও গৃহস্থা—সকলের কাছে সেই চিরসমৃদ্ধিপূর্ণ, সর্বজন-প্রিয় ব্রহ্মচর্যের কথাই আমি বলেছি।"

হিন্দু ঋষিদের মত বুদ্ধদেবও পৃথিবীকে "সংসার" বলেই ঘোষণা করেছেন—যা নিয়ত চলেছে সম্যক্ সরতি—নদীর মত নিরন্তর, গতিপথে বিরতি নেই। কিছুই স্থির নয়। মৃত্যুও স্থির নয়, যেহেতু মৃত্যু নবজন্ম পরিগ্রহে আত্মপ্রকাশ করছে। মানবের এক একটি পরিমিত জীবন তাকে চিরকালস্থায়ী ফল দান করতে পারে না। তা হলেও স্বীয় ভবিষ্যতের উপর মানুষের কোনও হাত নেই, এ বুদ্ধদেব বলেন না। মানুষের অনির্বচনীয় আত্মিক শক্তি আছে— যার চরম বিকাশ তিনি কামনা করেন। সেই চরম বিকাশেই অর্হত্ব বা নির্বাণ। এই দুস্তর সংসার অতিক্রমণ করার উপায় "মজ্ঝিম পটিপদা"—মধ্য-পথ the Middle Path.

দীর্ঘ-নিকায়ের সাম ঞ ঞ ফলসুত্তে উক্ত আছে যে, মগধরাজ অজাতশত্রু তৎকালীন আচার্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সুস্পষ্ট মত জানতে চান এবং তাঁরাও তা বলেন। ভিন্নমতাবলম্বিগণের গ্রন্থে উল্লিখিত তাঁদের মতের কিছু ভিন্ন রূপ সন্দেহের বহির্ভূত না হলেও এই সব মত-বাদের একটা মোটামুটি পরিচয় আমরা পেতে পারি—তা থেকেই বুদ্ধদেবের ধর্মের ভিন্নত্ব ও পারম্পরিক উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হবে। ছয় জনের নাম বিশেষ করে বলা আছে। (১) নিগণ্ঠ নাতপুত্ত—খুব সম্ভবতঃ জৈন শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর নিজেই। তাঁরও প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে পার্শ্বদেব যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তিনিও প্রায় সেই ধর্মই প্রচার করেছেন।

সামাঞ্ঞফলসুত্তে নিগণ্ঠ নাতপুত্ত চারটি সংযমনীয় বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর দর্শনমত অনেকান্ত বা স্যাদ্বাদ। এই মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক জিনিসেরই একটি শাশ্বত ও একটি অশাশ্বত দিক্ রয়েছে।

সব বস্তুর অভ্যন্তরেই জীবসত্তা আছে বলে সর্বজীবের প্রতি অহিংসা এই মতবাদের মুখ্য নির্দেশ। কঠোর তপস্যা ও আত্মসংযমের উপর জৈনধর্ম জোর দিয়েছেন। কিন্তু অঙ্গুত্তর-নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থে এই মতের বিরুদ্ধবাদ খ্যাপন পূর্বক স্বকীয় মত স্থাপন করেছেন। অন্যান্য মতবাদ সম্বন্ধে মতের উৎকর্ষ-অনুৎকর্ষ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকলেও এটি ঠিক যে, নীতির উপরে বুদ্ধদেব যে প্রকার জোর দিয়েছেন, জৈন-ধর্ম ততটা জোর দেন নি। মনুষ্যাদির চরমতম বিকাশের উপরই ভগবান বুদ্ধের সবচেয়ে বেশী জোর।

(২) মস্করি-গোসাল। এই ধর্মগুরু "মস্কর" বংশদণ্ড ধারণ করতেন বলে তিনি "মস্করী" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন বলে মনে হয়। প্রথমে তিনি মহাবীরেরও শিষ্য ছিলেন, পরে নিজে স্বাধীন মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। আজীবিক সম্প্রদায়ের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ও আদি গুরু। কোনও কোনও গ্রন্থে অবশ্য এঁর পূর্ববর্তী আরও দু' জন সম্প্রগুরুর নাম পাওয়া যায়। গোসালের মতবাদ "সংসার-বিশুদ্ধি" বাদ নামে অভিহিত হয়। এই মত অনুসারে যাবতীয় জীবসত্তা আছে, তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে করতে ধীরে ধীরে জীব "বিশুদ্ধি" লাভ করে। গোসালের মতে মানবের দুঃখের বা মোক্ষের কোনও বিশেষ হেতু নেই।

গোসালের মতে নিয়তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মানুষমাত্রেরই কোনও ক্ষমতা নেই। বিজ্ঞ ও মূর্খ সকল মানুষেরই সংসারের প্রতি জীবদশার মধ্য দিয়ে যেতেই হবে। কোনও প্রকার মানবীয় প্রচেষ্টা এই সংসার-পথ দীর্ঘ বা হ্রস্ব করতে পারে না। সংসারটি একটি যেন সুতার গুটী—খুলে খুলেই যেতে হয়, যতক্ষণ না জীবন-সূত্র ফুরোয়।

(৩) মহাবীর ও গোসালের মত অন্য চারজন এমন কোনও মতবাদ প্রচার করেন নি—যার স্থায়ী প্রভাব জাতীয়-জীবনের উপর পরিলক্ষিত হয়। এই চার জনের মধ্যে প্রথম পুরাণ কস্সপ অক্রিয়াবাদের প্রচারক ছিলেন। এঁর মতে মানুষ নরবধাদি যতই পাপ করুক না কেন, তার কোনও পাপ হয় না। সমভাবে ভাল কাজ করলেও তার পুণ্য হয় না; গঙ্গার উত্তর বা দক্ষিণ পাড়ে বাস করলেও নয়। সংযম, দান, সত্যপ্রিয়তা মানুষের কৃত-কৃতার্থতার কোনও কারণ নয়। এঁরা অনেকটা চাবাকমতাবলম্বী।—

ইৰ ছিন্দিতমারিতে হতজানীসু কস্সপো
পাপং ন সমনুপস্সন্তি পুঞ্ঞং বা পন অত্তনো।

(সংযুক্ত, ২য়, ৩য় বর্গ, ১০ম সুত্ত)

(৪) পুনরায়, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ধর্মপ্রচারকের মধ্যে চতুর্থজন হচ্ছেন কেশকম্বলী। তাঁর মতেও দান, যজ্ঞ, পুণ্য বা পাপ কাজ প্রভৃতির কোনও ফল নেই। লোকোত্তর শক্তিসম্পন্ন মানুষও থাকতে পারে না, ভিন্ন ভিন্ন লোকের বা ভুবনের সত্তাও নেই। তাঁর মতে চতুর্ভূত নির্মিত দেহ মৃত্যুর পর চতুর্ভূতেই মিশে যায়। পরলোক বলে কিছুই নেই। এদের মতবাদকে উচ্ছেদ-বাদ বলা যায়।—

নত্থি পুন্নে ব পাবে বা নত্থি লয়ে
ইসসরে সরীরস্স বিণাসেণং বিণাসো হোই দেহিনো
পত্তেয়ং কসিনে আয়া জে বালা জে য পণ্ডিয়া
সন্তি পিচ্চা ন তে সন্তি নত্থি সত্তোববৈয়া

(সূয়গদ, ১, ১, ১, ১১-১২)

(৫) পঞ্চম জনের নাম—ককুধ কচ্চায়ন বা ককুদ কাত্যায়ন। তাঁর মতও শ্বেতাম্বরীয় জৈন ধর্মগ্রন্থ সূয়গদে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর মতবাদকে "অশাশ্বত-বাদ" বলা যেতে পারে। তাঁর মতে সপ্ত ভূত থেকে জাত এই মানব শরীরে তারা সুখ বা দুঃখের সৃষ্টি করতে পারে না। সপ্ত শাশ্বত ভূতে শরীর শেষে সংমিশ্রিত হয়ে যায়—

সন্তি পঞ্চ মহব্ভূয়া ইহমেগেসিমাহিয়া
আয় চট্ঠা পুণো আহু আয়া লোগে য সাসি
দুহও ন বিনস্সন্তি নো য উপজ্জই অসং সব্বে
বি সব্বহা ভাবা নিয়ত্তীভাবমাগয়া

(সূয়গদ, ১, ১, ১, ১৫-১৬)

(৬) ষষ্ঠ জন হচ্ছেন সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্ত। অজাতশত্রুর মতানুসারে ইনি সকলের থেকে মূর্খ ও অপদার্থ। এঁর মতবাদের নাম বিক্ষেপবাদ অর্থাৎ এই বাদ অনুসারে মনঃ সত্যপথ থেকে বিক্ষিপ্ত হবেই। সামাঞ্ঞ-ফল-সুত্ত অনুসারে ইনি মনসংক্রান্ত যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন। মানুষের মনে দশটি প্রশ্ন জাগে—যা দুর্জ্ঞেয় এবং দুরুত্তর, নিরন্তর মানুষের মনকে যা নাড়া দেয়। সঞ্জয়ও যেমন এ দশটি প্রশ্নের উত্তর দেন নি, বুদ্ধদেবও দেন নি এই সব প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু উভয়ের এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। বুদ্ধদেব বলেছেন, এই সব প্রশ্নের উত্তরের কোনও প্রয়োজন নেই। মানবজীবনের উন্নতি এই সব প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে না।

উপরের এই মতবাদগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময়ে যে মতবাদগুলি চলছিল—সেগুলি বৈদিক ধর্মের থেকে বহু দূরে সরে এসেছে। মানব-মনঃ তখন এগুলির দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত। কাজেই ভগবান্ বুদ্ধ এমন একটি ধর্ম এবং তার দর্শন সৃষ্টি করলেন, যা বৈদিক ও তাৎকালিক ধর্মের মধ্যবর্তী—"মজ্ঝিম—পটিপদা"। কঠোর তপস্যা ও সংযমাদির উপর মহাবীর জোর দিলেন—যা হ'ল কস্সপ, অজিত, গোসাল এবং সঞ্জয়ের মতের সংপূর্ণ পরিপন্থী। ভগবান্ বুদ্ধ এ সব

প্রশ্নের উত্তরে বললেন—প্রতীত্য সমুৎপাদ বা "পটিচ্চ-সমুপপাদ"—

স্বয়ংকৃতং পরকৃতং দ্বাভ্যাং কৃতমহেতুকম্।
তার্কিকৈরিষ্যতে দুঃখং ত্বয়া তূক্তং প্রতীত্যজম্
(নাগার্জুন-কৃত লোকাতীত স্তব)

এই "প্রতীত্য-সমুৎপাদ" একটি যেন চক্র, ঠিক এর আরম্ভ কোথায়, বলা যায় না। তথাপি সত্তার প্রারম্ভেই অবিদ্যা এবং ভববন্ধের পরিহার নিমিত্ত অবিদ্যার পূর্ণ দূরীকরণ একান্ত প্রয়োজন বলে প্রতীত্য-সমুৎপাদের বা "নিদান"চক্রের প্রারম্ভেই অবিদ্যাকে স্থান দেওয়া হয়। অবিদ্যা থেকে সংসারের, তার থেকে বিজ্ঞানের, তার থেকে নামরূপের এবং তার থেকে ষড়ায়তনের, তার থেকে স্পর্শের, স্পর্শ থেকে বেদনার, বেদনা থেকে তণ্হা বা তৃষ্ণার, তৃষ্ণা থেকে উপাদানের, উপাদান থেকে ভব এবং ভব থেকে জাতি এবং জাতি থেকে জরামরণের উৎপত্তি।

নির্বাণ আনন্দ লাভ করতে হলে এই নিদানচক্র বা প্রতীত্য-সমুৎপাদের তন্হা বা জীবসত্তার নিমিত্ত তৃষ্ণার অপসারণ করতে হয়।

শেষ পর্যন্ত মজ্ঝিম-পটিপদা বা মধ্যবর্তী পথের অর্থ দাঁড়াল—ভগবান্ বুদ্ধের মতানুসারে "আস্তিক" এবং "নাস্তিক"দের মধ্যস্থলে হচ্ছে সত্যপথ। তাঁর "জগদ্ অস্তি" এটি পূর্ণ সত্য নয়, "জগন্ নাস্তি" এটিও পূর্ণ সত্য নয়—পূর্ণ সত্য বিদ্যমান এর মধ্যবর্তী স্থলে।

ভগবান্ বুদ্ধ শুধু তাৎকালিক বিভিন্ন নবাভ্যুদিত ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, তা নয়—তিনি সনাতন ধর্মের যজ্ঞাংশের, বিশেষতঃ, পশুবধের নিন্দা করলেন। গীতগোবিন্দকার জয়দেব তাঁর এই বিশিষ্ট মতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপপূর্বক তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে ঘোষণা করেছেন —

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহং শ্রুতি-জাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশু-ঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধ-শরীর জয় জগদীশ হরে।"

সর্বদিক থেকে অত্যন্ত উদার, আত্মজীবনের উপরে পরিপূর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধাশীল এই ধর্ম ও দর্শনবাদ ভারতের হৃৎপঞ্জরে নূতন প্রাণের স্পন্দন জাগাল। লক্ষ লক্ষ লোক বুদ্ধদেবের প্রাণের ডাকে সাড়া দিলেন। এলেন ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, নারী, শূদ্র সকলে। প্রত্যাখ্যানের কশাঘাতে কেউ ফিরে গেল না। ভারতে অপূর্ব নবজাগরণের সূচনা হ'ল।

দিকে দিকে জাতীয়-জীবনে অভ্যুন্নতি

(১) নারী-সমাজ।

ধর্মের পথ পুরুষদের মত নারীদেরও সুগম হ'ল। কয়েকটি দিকে নারীদের একটু ন্যূনতা থাকলেও এই নব-প্রচারিত ধর্মে নারীরাও স্থান পেলেন। নারীরাও শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সর্বব্যাপারে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রসঙ্গক্রমে ধর্মজগতে ক্ষেমা, পটাচারা, ধর্মদিন্না প্রভৃতির নাম, সঙ্ঘের বাইরে সুজাতা, বিশাখা, সামাবতী প্রভৃতির নাম বিশেষ করে বলা চলে। অম্বপালীর মত পতিতা নারীকেও ধর্ম স্বীয় অঙ্কে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হ'ল না। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে থেরীগাথা প্রমুখ গ্রন্থে উল্লিখিত বহু মহীয়সী রমণীর নাম ভারতের ইতিহাসে চিরকালের তরে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে আছে।

(২) সর্বভূতে সমদৃষ্টি

ভগবান্ সর্বদা অন্যকে নিজের মত ভালবাসার, সে ভাবে দেখবার উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। তিনি সেভাবেই সকলকে দেখতেন। কৌশাম্বীর একখানা গ্রামের ভূস্বামী ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজকে তিনি বলেছিলেন, ভাই, তোমাতে আমাতে কোনও পার্থক্য নেই। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, যাঁর বলদ, হাল, বীজ কিছুই নেই, তিনি আবার কৃষক হলেন কি করে? বুদ্ধদেব বললেন :

"বিশ্বাস আমার বীজ।
আমার শস্যের ক্ষেত্র মানব-হৃদয়।
ধর্ম মম হল, জ্ঞান বলদ আমার,
নির্বাণ আমার শস্য, অমর অন্তর॥"

বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণার বাদ ভগবান্ বুদ্ধ মনঃপ্রাণ দিয়ে প্রচার করেছেন। একেই বলেছেন ব্রহ্মবিহার। মা যেমন প্রাণ দিয়েও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমন সকল প্রাণীর প্রতি অপরিসীম দয়াভাব উৎপাদন করতে হবে। ঊর্দ্ধে, অধোদিকে বা চতুর্দিকে—সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিসীম দয়াভাব জন্মাতে হবে। দাঁড়াতে, চলতে, বসতে, শয়নের সময়—যতক্ষণ না নিদ্রা আসবে ততক্ষণ এই মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত থাকতে হবে, তা হলেই মানব ব্রহ্মবিহারে অধিষ্ঠিত থাকবেন। এই ব্রহ্মবিহারে অধিষ্ঠিত থাকার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই—অঙ্গুলিমালের মত লক্ষ নর-প্রাণহারী দস্যুও একবার তাঁর দর্শনমাত্র শ্রীপাদে মস্তক অবনত করল।

অস্সলায়ন-সুত্তে (দীঘনিকায় ৯৩), বজ্রসূচীতে, ধর্মপদাদি গ্রন্থে বর্ণপ্রথা সম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধ কত অপূর্ব সুন্দর কথাই না বলেছেন। মানুষে মানুষে ভেদবিচ্ছেদের লৌকিক ব্যবস্থার মূলে তিনি করলেন কুঠারাঘাত। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের ৪৩, ২৭।২৯ শ্লোকে বর্ণপ্রথার যে মর্মার্থ

ধ্বনিত হচ্ছে, ভগবান্ বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম সে সত্যকেই সত্য বলে ঘোষণা করতে লাগল তারস্বরে। অতি দীর্ঘকাল পরে বঙ্গদেশের হৃদয়মণি শ্রীগৌরাঙ্গও কাপালিক-তান্ত্রিক-বিধ্বস্ত এই সোনা-পুড়িয়ে ছাই তাৎকালিক বঙ্গদেশের এই সত্য পুনরায় প্রোদ্‌ঘোষিত করেছিলেন—বলেছিলেন :

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হ রিভক্তি-পরায়ণঃ"

ভগবান্ বুদ্ধও নির্দেশ করেছিলেন—সত্যধর্মপরায়ণের জাতিগত কোনও বাধা থাকতে পারে না। ধর্মজগতেও নয়, লৌকিকজগতেও নয়।

(৩) গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রবর্তন॥

স্ব স্ব ভাষায় দেশবাসী বুদ্ধদেবের ধর্মবাদ শুনবেন, এই ছিল বুদ্ধদেবের নির্দেশ। এতে এক অপূর্ব স্ফূর্তির সঞ্চার হ'ল সকলের প্রাণে।

গণতন্ত্র অনুসারে সঙ্ঘের সমস্ত বিষয় পরিচালিত হ'ত। সঙ্ঘের প্রত্যেক সদস্যেরই ভোট দেওয়ার সমান অধিকার ছিল এবং প্রত্যেক বিষয়ে ভোটের সংখ্যাধিক্য হিসাবে মীমাংসা হ'ত। বুদ্ধদেব নিজে এই সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। কখনও যদি বিশেষ কারণে বিশেষ সমিতির উপর বিবেচনার ভার দেওয়া হ'ত, তা হলেও তাঃ সমগ্র সঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থাপিত করে তা অনুমোদন করে নিতে হ'ত। যদি কোনও কারণে সঙ্ঘের কেউ অনুপস্থিত থাকতেন, তা হ'লে তাকে সভাস্থলে বহন করে আনা হলেও তাঁর ভোট নেওয়া হ'ত।

সঙ্ঘগুলি ছিল "চাতুর্দ্দিশ সঙ্ঘ"—অর্থাৎ কোনও সঙ্ঘই কোনও নির্দিষ্ট স্থানের অধিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। সব স্থানের সকল ভক্তেরই সমান প্রবেশাধিকার ছিল সকল সঙ্ঘেই। ভোটের সময় শলাকা ব্যবহার করা হ'ত। ভোট গ্রহণপূর্বক সঙ্ঘের কর্মচারিগণকেও নিযুক্ত করা হ'ত।

জীবদ্দশায় যেমন, মহাপরিনির্বাণের পরেও সঙ্ঘই স্বীয় কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করবেন একই প্রণালীতে—এই তাঁর নির্দেশ ছিল। তিনি মৃত্যুসময়ে কোনও সঙ্ঘনায়ক নিযুক্ত করেন নি। মহাপরিনির্বাণ সুত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে—ভগবান বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, তুমি ভাবছ আমাদের আর নায়ক রইল না। কিন্তু তা ত নয়। যে ধর্ম আমি তোমাদের উপদেশ দিয়েছি, তাই হবে তোমাদের নায়ক। পুনরায় তিনি বললেন :

"হন্দ দানি ভিক্খবে আমন্তয়ামি বোঃ
বয়ধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সংপাদেথ"—ইতি।

অর্থাৎ, "হে ভিক্ষুগণ! তোমাদের আমি বলে যাচ্ছি—সব কিছুই ধ্বংসশীল; ব্যগ্রতা সহকারে, উৎসাহ সহকারে নিজের নির্বাণ নিজেই ঠিক করে নাও।" এভাবে ধর্মের নায়করূপে তিনি বিনয় ও ধর্মকেই স্থাপন করে গেলেন।

এভাবে নারীগণ, কুলিমজুর থেকে সমাজের উচ্চাঙ্গ অবস্থার সকলে ধর্মে ও সমাজে এক নব অনুপ্রাণনার মাধ্যমে নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার করলেন। গণচেতনার হ'ল নবীন অভ্যুদয়। মহাভারতে শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে প্রোজ্জীবিত ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে নব প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্যে নারী এবং সমাজের দুঃস্থ বা অধঃস্তন ব্যক্তিনিচয়ের প্রতি ব্যবহারের বিষয় কত কথাই না বলে গেছেন।

গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সেই সব সোনার উক্তিকে নব রূপায়ণে সার্থকতা প্রদান করলেন ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও সঙ্ঘের মাধ্যমে।

অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ উঠে বাড়ীর দরজা। তার একপাশে—নীচে বেসমেন্টে যাবার সিঁড়ি। সেখান দিয়ে বাইরের লোক নীচে নামত। তার এক কোণে ময়লা ফেলার ঢাকা দেওয়া টিন। সিঁড়ির নীচে যেন ফিস্‌ফিস আওয়াজ শোনা গেল। অন্যমনস্ক কুমারের কানে সে আওয়াজ যেন ঢুকেও ঢুকল না। পকেট থেকে চাবি বার করে গর্তে ঢোকাতে যাবে, দু'জনে দুপাশ থেকে এসে ওর হাত চেপে ধরল—'থামো'।

—'কে'? কুমার অবাক হয়ে ফিরে তাকাল, এগার বছরের জনে'র চোখে নীল বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল। ওঃ, আই নেভার—বলতে বলতে সে মোজা-পরা খালি পায়ে দিদির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

দিদি, অর্থাৎ তের বছরের কিশোরী মার্গারেট। সারা-দিন, একটা সস্তা ছিটের ফ্রক পরে, সোনালী চুলের রাশিকে ছোট্ট কালো ফিতে দিয়ে, মোরগ ল্যাজের ঝুঁটি বানিয়ে, যে রাতদিনই ছোট্ট খ্যাদা বোনটার খবরদারী করতে করতে ঘরের কাজ করে বেড়ায়, একমাত্র বাইরে বেরুবার সময়ে যার পায়ে মোজা দেখা যায়—যে রাতদিনই বকবক্ করতে করতে সুবিধে পেলেই ওর ঘরের বিস্কুটের টিন, চকোলেটের বাক্স ইত্যাদির দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকায়, আর কিছু পেলেই ধন্যবাদ দিয়ে চটপট মুখে পুরে দেয়, হাসি খেলা ছুটোপাটিতে যার উচ্ছ্বসিত প্রাণ সমস্ত বাড়িময় দুরন্ত হয়ে ওঠে, জিনিসপত্র ঝাড়তে ঝাড়তে অথবা হুভার চালাতে চালাতে, হঠাৎ যে হাতের কাজ ফেলে রেখে, অন্যমনস্ক হয়ে 'জনে'র সঙ্গে ঝগড়া করতে ছুটে যায়, সেই মার্গারেট হঠাৎ এই মধ্যরাত্রে কি আশঙ্কায় এসে ওর হাত চেপে ধরেছে?

কি হয়েছে মার্গারেট, কুমার অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। দেখল ছোট চোখের ভরা দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে কিশোরী মেয়ে। মুখের উপরে রাস্তার লাইট পোষ্টের আলো পড়েছে। সে আলোয় দেখা যাচ্ছে, ওর চোখে ছেলেমানুষী সরলতার সঙ্গে ঘৃণা, লজ্জা আর ভয় একসঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে মুষ্টি শিথিল করে হাত ছেড়ে দিল মার্গারেট, সিঁড়ির নীচেই 'জন' দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জনে ফিসফিস তর্ক হচ্ছে, শুনতে পেল কুমার। ভাবল, একবার খোঁজ করে দেখা উচিত। আবার ভাবলে—কি হবে, ওইটুকু মেয়েকে এমন সাহসিনী করে তুলেছে যে বেদনা, তার সন্ধান করতে যাওয়া ওর মত বিদেশীর পক্ষে উচিত নয়। অথচ এই শীতে ওই শিশু দুটিকে বাইরে দাঁড়িয়ে তর্ক করতে দেখে ও নিশ্চিন্তে কি করে ভিতরে চলে যাবে? তাই কুমার একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, ওরা ভাই-বোন ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে, তবে ও ঢুকবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখে মার্গারেট উঠে আসছে। এবারে ওর মুখে আর ভয় নেই। কি যেন একটা ঠিক করে এসেছে। মনে হচ্ছে দেখে।

আস্তে উঠে এসে মুখে অল্প একটু কৌতুকের হাসি ফুটাতে চেষ্টা করল মার্গারেট, বলল—ঘুম আসছিল না। তোমার খুট খুট আওয়াজ শুনে হঠাৎ মনে হ'ল যেন চোর। তাই 'জন'কে তুলে নিয়ে চোর ধরতে এসেছিলাম। তুমি যেন রাগ কর না"। আর, অল্প হেসে বললে—"মাকে যেন বলে দিও না।" কিন্তু মার নাম করতে করতে মুহূর্তে ওর ঠোঁটের হাসি কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল। চোখের হাসি ঝিকৃঝিক্ করে উঠল জলে।

কুমারের দরজা খোলা হ'ল না।' পকেটে চাবি রেখে, মার্গারেটের পিঠে একটু আদরমাখানো হাত রাখল। ঝুঁকে বলল মার্গারেট—"সত্যি বল, তোমার জন্যে কি সাহায্য করতে পারি। আমি তোমাদের বন্ধু।" মার্গারেটের চোখে একটু একটু জলের কণা আগে থেকেই জমছিল। এখন তারা অনেকগুলি মিলে এসে হুড়মুড়িয়ে ওর চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে ঝরে পড়ল। ক্রমে ওর ভুরু কুঁচকে এল। ও ফুঁপিয়ে উঠে দু' হাতে মুখ ঢেকে কান্না চাপতে চাপতে বেশ খানিকটা কেঁদে নিল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে কুমার ওর কান্না থামার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ওর ইচ্ছে করছিল—অভিমানিনীর আধচাঁদের মত সাদা কপালে ছোট একটা চুমো দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে দেয়? হয়ত ঐ অল্প একটু আদরের ছোঁয়ায় কিশোর মনের দুঃখতাপ অনেকটা জুড়িয়ে যেত। হয়ত মার্গারেটও মনে মনে তাই চাইছিল। কিন্তু তবু কুমার ওকে ছুঁতে পারল না। তাই যদিও পশ্চিম আকাশের

প্রান্ত থেকে অর্ধস্ফুট চাঁদের নিঃশব্দ ইঙ্গিত কুয়াশার আড়ালে ব্যর্থ হয়েছিল, ঢিলে কোট-পরা ওকে যেন ভাল করে চেনাই যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল নেহাৎই একটা ছোট্ট মেয়ে, তবু অকস্মাৎ চকিতের মত ওর সারাদিনের দেখা চেহারাটা মনে পড়ে গেল কুমারের। আঁটসাট পোষাকে স্ফুটতর ওর বিকশিতপ্রায় তরুণী-দেহকে না চিনতে পারার কোন কারণ নেই। তাই ওকে যত ছেলেমানুষই মনে হোক, এই মধ্যরাত্রে জনহীন পথের মাঝে ওর পবিত্র কুমারী শরীরকে স্পর্শ করতে সঙ্কোচ হ'ল কুমারের। তাই মুখেই আদর জানালে কুমার,—বলল, "শ, শ, টাট, টাট। অত কেঁদো না। আঃ, এই ত লক্ষ্মী মেয়ে।" আস্তে আস্তে ওর কান্না থেমে এল।

ধরাগলায় ও বললে—তাহলে নীচে এস আমাদের ঘরে।" ওরা চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে ছোট্ট অন্ধকার কোণাটুকু পার হয়ে দরজার কাছে এল। মার্গারেট চুপি চুপি ডাকল—"জন, জন।" জন বোধহয় ভিতরেই দাঁড়িয়েছিল। দরজা খুলে উঁকি দিল, মার্গারেট তার কানের কাছে ঝুঁকে বললে—"আঙ্কল কুমার আমাদের বন্ধু তাঁকে সব বলা যায়; সে আমাদের সাহায্য করতে পারে।" জন ওর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—ওকে সত্যি "বিশ্বাস করা যায় কি ?"

মার্গারেট বললে—"নিশ্চয়ই"। ওরা ওকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এল।

ঢুকতেই প্রকাণ্ড রান্নাঘর। আজকাল এত বড় রান্নাঘর কোন বাড়ীতেই থাকে না। এ বাড়ীটা প্রাচীন। একশ' বছরেরও আগের তৈরী। কোন লর্ডের পূর্বপুরুষের শহরে রাত্রিবাসের প্রয়োজনে তৈরী। সে লর্ডের পুত্র পৌত্র মরেছে। তার পরের বংশধরের লর্ডিয়ানা অনেকদিন ঘুচেছে। এখন এবাড়ী পোষা আর দেশী মতে হাতী পোষা সমান। তাই সে এর সত্ত্ব ত্যাগ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। বিনিময়ে মূল্য যা পেয়েছে, তা সামান্য নয়। লণ্ডনে বাড়ী রাখার মোহের চাইতে সে ভদ্রলোকের কাছে অর্থের মূল্য ছিল বেশী। কিন্তু যিনি সেই অর্থ দিয়ে এই সেকেলে ঢং-এর পুরণো বাড়ীটা কিনলেন, তার কাছে নিশ্চয়ই ঐ মোহের দামটা বেশী।

কিন্তু বাড়ী কিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন তিনি, না আগে-ভাগেই জীবনটা নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, কে জানে। মোটকথা, এমন হতশ্রী অপরিচ্ছন্ন বাড়ী কুমার বেশী দেখে নি।

নতুন বাড়ী কিনে শ্রীমতী বার্কার যখন ভাড়া দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময়ে কুমারের সন্ধানে এল এই বাড়ী। কুমার তখন দ্বিতীয় বার গৃহহীন হবার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। মেরীর বাড়ীওয়ালা নোটিস দিয়েছে। সে পাশাপাশি দুটো ঘরকে একটা সুইট করে ভাড়া দেবে ঠিক করেছে। বায়নাও নিয়ে রেখেছে এক ক্যানাডিয়ান ভদ্রলোকের কাছে, কাজেই কুমারকে পথ দেখতে হবে—পথ দেখা মানেই বাড়ী দেখা। খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেল, ওর সঙ্গে সঙ্গে মেরীও। ভারতীয়দের ভাড়া দিতে সহজে কেউ রাজী নয়।' কালো রং-এর ছোঁয়া লেগে পাছে ওদের সাদা রঙে ছায়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে বার বার কুমারের দেশের কথা মনে পড়ত। সেখানেও ত একই দশা। ইয়োরোপীয় ভাড়াটে পেলে কেউ আর ভারতীয়কে ভাড়া দিতে চায় না। কারণ—কারণ অবশ্যই অনেক। ভারতীয়েরা নাকি বাড়ী রাখতে জানে না, লীজের নিয়ম মেনে চলে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

হয়ত এ সবই সত্যি, তবু কুমারের মনে ঐ একটু 'তবু' আর যেতে চায় না—কেন এসব সত্যি ? কেন আমরা বাড়ীঘর রাখতে জানি না, কেন আমরা 'লিজে'র নিয়ম মেনে চলি না, কেন আমাদের নিজের জাতের কাছেও নিজের চেয়ে পরের সম্মান বেশী। এইসব ভাবতে ভাবতে কুমার যখন হাঁপিয়ে উঠেছে, জীবনযাত্রায় এসেছে বিতৃষ্ণা। এমনকি মেরীর সঙ্গও মাঝে মাঝে বিস্বাদ মনে হচ্ছে, এমন সময় একদিন মোহিত সরকার এ বাড়ীটার খোঁজ আনে, অর্থাৎ কুমারকে সোজা এ বাড়ীতে নিয়ে আসে।

জুনি বার্কারের সঙ্গে মোহিতের আলাপ হয় বছর দুয়েক আগে উত্তর ইংলণ্ডের একটা পাহাড়ঘেরা নিভৃত সুন্দর গ্রামে। মোহিতের সেই বিধবা আধ-বুড়ি ধনী বান্ধবীর সঙ্গে কি সূত্রে জুনির আলাপ হয়েছিল কে জানে। কিন্তু ইংলণ্ডে সফরের সময়ে জুনির বাড়ীতে গিয়ে উঠতে দ্বিধা করেন নি যখন, তখন চেনাশোনাটা খুব অগভীর নয় হয়ত। মোহিতের সেই বন্ধুটিকে এড়িয়ে চলত কুমার। বয়স পঞ্চাশের উপরে, কিন্তু তবু তাঁর খুকি সাজবার আপ্রাণ চেষ্টাকে বরদাস্ত করতে পারত না কুমার। তাঁর নামটা যদিও খুব জমকালো, লেডী ক্লোরা, তবু মোহিতের মত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তাঁর বাধে না। মোহিত অবশ্য বলে তাতে তার লাভটাই বেশী। কারণ লেডী ক্লোরার টাকা-পয়সা নেই নেই করেও আজও যেটুকু আটকে আছে, তা মোহিত সরকারের পক্ষে যথেষ্ট। আর যাই হোক না কেন, তার পাশে বসে হাম্বার স্নাইপ গাড়ী চালিয়ে ইংলণ্ড সফর সে বার দুই করেছে।

সেই সফরেই জুনির আতিথেয়তা গ্রহণ করতে হয়েছিল ওদের। জুনকে দেখে তখন সুন্দরী বলেই মনে হ'ত।

...ার উপরে ফ্যাকাশে নীল পাহাড়ে ঘেরা সবুজ গ্রামের ...টভূমিতে তনুদেহধারিণী ত্যক্তনাম্নী শ্রীমতী জুনকে মোহিত ...রকারের মনোহারিণী বলেই মনে হয়েছিল। সদ্য-স্বামী-...্যাগের শোকমহিমা তার মধ্যে আরও কিছু বেশী আকর্ষণ ...রে দিয়েছিল।

তাই লণ্ডনের ঠিকানা লেখা কার্ডে দেখা করার অনুরোধ পেয়ে মোহিত যখন ব্যস্ত হয়ে ছুটতে যাবে, তখন বাড়ীর খোঁজে কুমার এসে হাজির। তৎক্ষণাৎ কুমারকে বগলদাবা করে মোহিত নম্বর খুঁজে এ বাড়ীতে এসে হাজির।

কিন্তু বাড়ীতে ঢুকে অবাক হয়ে গিয়েছিল ওরা। ঢুকতেই হলটাতে জিনিসপত্র ঠাসা। ড্রইংরুমেও তার কমতি নেই। আগুনের কাছে শুধু ছোট একটা কার্পেট। বাকী মেঝেটা খালি কাঠের। তাঁতে জন হাঁটুগেড়ে বসে পালিস করছে। ঠেলাগাড়ীতে একটা ৬।৭ মাসের ব্রাউন রঙের শিশুকন্যে। তার থ্যাবড়া মুখ ও কুঞ্চিত চুলে নিগ্রো পিতৃত্বের স্বাক্ষর।

বাড়ীর চেহারা দেখে যত অবাক হ'ল, জুনকে দেখে তারও চেয়ে অবাক হ'ল ওরা। তার দেহে, মুখে, চুলের রঙে, কোথাও এতটুকু চাকচিক্য অথবা পারিপাট্যের চিহ্ন নেই। সমস্ত মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। ফ্যাকাসে ঠোঁটে মুছে যাওয়া লিপষ্টিকের চল্টা ওঠা রং চটা ছোপ। ওদের দেখে অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠল জুন। কুমার দেখল, মেয়েটির চেহারায় অভাবের ছাপ পড়েছে। দেখতে প্রায় বস্তিবাসী-দের মত করে তুলেছে। কিন্তু তার কাথবার্তায় এখনও ভদ্রতার পালিস চিক্ চিক্ করছে।

জুন কিন্তু তার হতশ্রী পরিবেশের জন্যে একটুও লজ্জা পেল না, কিম্বা হয়ত সেই রকম ভাব দেখাল—মোহিত মাঝে মাঝে বাংলায় ফিসফিস করে কুমারকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে, জুনের যে ঐশ্বর্য সে দেখে এসেছিল, তারপরে এ জুনকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে। জুন বললে, "গ্রামের জমি-জমা বেচে এই বাড়ীটা কিনেছে তার জাজির জন্যে।" জাজি ব্যারিষ্টার। পুরো একতালাটা তাকে সাজিয়ে দিতে হবে। আপিস, লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্যে। আর দোতালায় ওরা থাকবে। বেসমেণ্টে রান্না ইত্যাদি হবে। বাকী দুটো তলা ভাড়ার জন্যে রেখেছে। তা সবই প্রায় ভাড়া হয়ে গেছে। শুধু তিনতলার এই ঘরটা বাকী আছে। কুমার যদি চায় ত সে ঘর ও নিজেই সাজিয়ে দেবে। দু' পাউণ্ড ভাড়া বেশী দিলেই হবে।

"জাজি বুঝি তোমার দ্বিতীয় স্বামীর নাম? কবে আবার বিয়ে করলে?"

"ওঃ হো তুমি জান না! তোমরা চলে আসার পরেই। বিয়ে করেই শ্বশুরবাড়ী চলে গিয়েছিলাম, ছেলে-পিলেদের এক নার্সের কাছে রেখে। জাজির ইচ্ছে, লণ্ডনে প্র্যাকটিস করে, তাই এ বাড়ীটা কিনেছি। পিসি চিরকাল গ্রামে ছিল বলে আমাকেও যে তাই থাকতে হবে, যেহেতু তার সম্পত্তি পেয়েছি, এর কোন মানে হয় না। যাই হউক, বাড়ীটা এখন কি করে মনের মত সাজিয়ে ফেলব জাজি আসার আগে, তাই ভাবছি—ও আবার এলো-মেলো ভাব মোটেই সইতে পারে না।"

কুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, এ বাড়ীর সবই ত এলোমেলো।

জুনি বললে, "সকাল থেকে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ানোই এখন আমার মস্ত একটা কাজ, যেটা পছন্দ হয়, সেটার জন্যে সেকেণ্ড করার লোক পাচ্ছি না। তুমি মাঝে মাঝে আসবে মোহিত?"

মোহিত বলেছিল, "আমার চেয়ে ভাল substitute রেখে যাচ্ছি। ভাড়াটেও বটে, সঙ্গীও বটে। কুমারের রুচিটা আবার একটু বাড়াবাড়ি রকমের ভাল।"

আর কুমারকে বাংলায় বলেছিল, "বাড়ীর অবস্থা থেকে ঘাবড়িয়ো না, আপাতত এইটেই নিয়ে নাও—ভদ্রমহিলার আগেকার বাড়ী এবং চেহারা দুটোই ছিল ছবির মত সুন্দর। হঠাৎ দু'বছরে এমন হাল হ'ল কেন কে জানে। বোধ হয় নূতন বিয়ের তাল সামলাতে—আপাততঃ যতক্ষণ না ভাল পাচ্ছ ততক্ষণ এইটেই দেখ না কিছুদিন।"

কাজেই কুমার কিছুদিন দেখল। দেখতে দেখতে, বেশ কিছুদিন গড়িয়ে গেল, তবু এখনও এবাড়ী থেকে বেরুবার পথ পেল না সে। প্রায় মাস তিনেক হ'তে চলল। এখনও বাড়ীর অবস্থা যে কে সেই। অথচ এই বাড়ীরই জন্যে ছেলেমেয়ে-গুলি সারাদিন খেটে মরে, আর ভদ্রমহিলা সারাদিন দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ান, কোন দিন কুমারের ছুটি থাকলে, তাকেও বগলদাবা করে নিয়ে যান। ওর লণ্ডনের সব বড় দোকানগুলিই একবার করে ঘোরা হয়ে গেছে কুমারের,—বার্কার পণ্টিংস, থেকে এদিকে সেলফ্রিজ জনলুইস, কিছুই বাকী নেই। যত বড় দোকান ঘুরে যত ভাল জিনিসের অর্ডার দেন ভদ্রমহিলা, পরে হয়ত সে অর্ডার আবার কোন সময় নিজেই 'ক্যানসেল' করে দিয়ে আসেন। নইলে ঘরে এতদিনে তিল ফেলবার জায়গা থাকত না। কিন্তু কিছুই যে কেনেন না তাও নয়। দোতলার বড় ঘরটায় অনেক দামী জিনিস জড়ো করা হয়েছে। তবে তার কতখানি ধার কে জানে। কারণ প্রায়ই সবজিয়ালা, মুদি, বা দর্জির দোকান থেকে তাগাদা দিয়ে লোক এসে দাঁড়িয়ে থাকে, আর ভদ্রমহিলা মার্গারেটকে মিথ্যে ওজুহাত শিখিয়ে

পাঠান ওদের তাড়াতে। আজ পর্যন্ত কুমারের ঘরের সজ্জা ঠিক হ'ল না। কিছুই যোগাড় করে দেয় নি ভদ্রমহিলা। মার্গারেট আর জনকে চকলেট ঘুস দিয়ে অনেক কষ্টে ঘরের ম্যাটিংটা ঠিক করে নিয়েছে কুমার। বাস ঐ পর্যন্তই, রান্নার জন্তে একটা ছোট ষ্টোভ দেবার কথা ছিল, তা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে করে নিজেই কিনে নিয়েছে কুমার। খরচের জন্তে ভাবে না কুমার, এপ্রেন্টিস ভাবে যা পায় তাতে ওর ভালই কুলিয়ে যায়, মাসে মাসে বাবা যে টাকাটা পাঠান সেটা জমিয়ে রাখে। কাজেই নিজে কিনে নেওয়া ওর পক্ষে কষ্টকর নয়। কিন্তু ভদ্রমহিলা কেনার কথা শুনলেই হাঁ হাঁ করে উঠেন, মিথ্যে খরচ কেন করবে। আমার ওসব, অনেক আছে, কিন্তু কোথায় যে আছে,—শুধু খুঁজে পেলেই হয়। তা কাল ঠিক বার করে দেব। সে কাল আর আসে না। কাল থেকে কালেই ছুটোছুটি করে বোরে। তাই নিজের ঘরটা নিজেই কোন মতে চলনসই করে নিয়েছিল কুমার। কিন্তু বাড়ীর অন্তান্ত অংশ আজও সেই প্রথম দিনের মতই অজস্র অমনোযোগ ও অবহেলার জঞ্জালে রাশীকৃত হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে বসে কল চালিয়ে পর্দা সেলাই করে জুনি বার্কার, দামি কাপড়ের পর্দা, দোতলায় জাজির বিশেষ ঘরখানার জন্তে। সে জাজি কবে আসবে কে জানে। জিজ্ঞেস করলে শোনে, 'এইবার আসবে।' এই এল বলে, অবাক হয়ে কুমার মাঝে মাঝে ভাবে, ভদ্রমহিলার নূতন স্বামী বোধ হয় আর কারো নূতন স্ত্রীকে নিয়ে মেতেছেন, জুনির দিকে আর মন নেই। কিন্তু সে যাই হোক কালো স্বামীর মন পাবার জন্তে সাদা মেয়ের এই দুঃসাধ্য সাধনা আশ্চর্য। কুমার ভাবে, জুনি কি তার পুরাণো স্বামীর সুখ সুবিধাও এমনই করেই দেখত, যে, তাকে এমন চমৎকার চারটি সন্তান দিয়েছে—নাকি এ শুধু দ্বিতীয় স্বামীর প্রিভিলেজ। কে জানে কি, মোট কথা ছেলেমেয়েগুলির জন্তে কষ্ট হয় কুমারের। কিন্তু ওদের যে কোন কষ্ট আছে, তাও ত মনে হয় না দেখে। দিব্যি স্ফুর্তি করে আছে; চারটিতে কখনও ভাব, কখনও ঝগড়া করে। আর সবচেয়ে মজার কথা, টুপসীকে ওরা সবাই খুব ভালবাসে। ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি গাল ফোলানো সর্বদাই লেগে আছে বটে, কিন্তু টুপসীকে সবাই আদর করে। ও যে ওদের থেকে আলাদা এতেই ও সবার প্রিয়। এমন কি মা যে ওকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, সেটাও ওরা খুব স্বাভাবিক বলেই যেন মেনে নিয়েছে। শুধু জনের চোখে মাঝে মাঝে হিংসার জলুনি দেখেছে কুমার, কিন্তু ভাল বুঝতে, পারে নি। ওটাকে নিজের গল্পপ্রবণ মনের কল্পনা বলেই ধরে নিয়েছে। ওরা যে অসুখী একথা কুমারের আগে মনে হয় নি। আজ এই রাত এগারটায় হঠাৎ দেখতে পেল কি অদ্ভুত নাটকের অভিনয় চলেছে এই শিশুদের মনে মনে।

কুমার দেখল, প্রকাণ্ড রান্নাঘরে একটা আধভাঙা ডিভানের উপরে মার্গারেটের শয্যা অর্থাৎ দু'টো ময়লা কম্বল আর একটা বালিশ। পাশের গুদাম ঘরটায় একটা খাটের মতন আছে, দেখা যাচ্ছে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে। তাতে আট বছরের এবং আর পাঁচ বছরের টম শুয়ে ঘুমুচ্ছে। রান্নাঘরের বড় টেবিলটার উপরে এক লাফে উঠে বসে কম্বল দুটো গায়ে জড়িয়ে নিল জন্—বোঝা গেল, ঐ টেবিলটাই তার বিছানা।

চারিদিক দেখে কুমার শুধু প্রশ্ন করতে পারল, "মা কোথায় তোমাদের ?"

মার্গারেট বললে, "মা ত টুপসীকে নিয়ে উপরের ওই লিভিংরুমটাতেই শোয়। পাশের যে ঘরটায় আমরা শুতাম ক'দিন হ'ল সেখানেও একজন ভাড়াটে বসানো হয়েছে, কাজেই গত দু'দিন ধরে আমাদের শোবার ব্যবস্থা এইখানেই হয়েছে।"

—"তা তোমরাও কেন মার ঘরে শোও না ?" কুমার অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

"বাঃ, ঘর জুড়ে খালি খাট বিছানা পাতা থাকলে লোক এসে বসবে কোথায় ? মার্গারেট বললে, "লিভিংরুমই বল আর sitting room ই বল, ঘর বলতে ঐ ত একটিই।"

—"আর তা ছাড়া," জন হেসে উঠল। স্ব-স্থানে উঠে বসে, এতক্ষণে ওর ধাত ফিরে এসেছে। তাই ঈষৎ সবুজ স্বচ্ছ চোখে পরিচিত হাসির ঝিলিক হেনে 'জন' বললে, "আর তা ছাড়া, আমরা ত কোনকালে মার কাছে শুই না। বাবাঃ টম যা হুলুস্থুল করে রাত্রে, মা তাহলে, মোটে ঘুমুতেই পারবে না," ও হেসে উঠল।

মার্গারেট ওকে ধমক দিল, "চুপ চুপ" তারপরে উঠে একতলায় ওঠার সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বললে, "জানো আঙ্কল কুমার, আমি তোমাকে চোর বলে ভুল করি নি, পল বলে ভুল করেছিলাম।"

ঐ পলটা অবশ্য চোর। বলতে বলতে মার্গারেটের দুচোখ জ্বলে উঠল। "শুধু চোর নয়, জোচ্চোর। ড্যাডির খবর এনে দেবে বলে রোজ মাকে ভুলিয়ে নানা ছলে টাকা আদায় করে নিয়ে যায়। আজকাল আবার রাত দুপুরে আসতে সুরু করে দিয়েছে, ও এসে কি করে, কি বলে জানি না। কিন্তু টাকা নিয়ে যায় এটা জানি।

—'ড্যাডি ? তাকে ত তোমার মা ডিভোর্স করেছে, আবার বিয়ে করেছে।'' অবাক হয়ে কুমার বলে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেই নিতান্ত সহজ ভাবেই মার্গারেট বলে—টুপসীর ড্যাডিকেই আমরা ড্যাডি বলি। আমাদের আবার ড্যাডি কে ? সেটা ত হতভাগা। নইলে প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাতে এত দেরী করে। দাঁড়াও না জজি ড্যাডি একবার এসে লণ্ডনে প্র্যাকটিস সুরু করলে আর দেখতে হবে না। হতভাগাটার সব টাকা সুড় সুড় করে বেরিয়ে আসবে।"

"ঈস, ভারী ত ব্যারিষ্টার। আজ অবধি টিকি দেখা যাচ্ছে না।" বিদ্রূপ করে হেসে উঠল জন, "আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এ লোকটাও সমান হতভাগা। তাকে মা ছেড়েছিল, আর মাকে এ ছেড়েছে। নিশ্চয় করে বলতে পারি।''

—"বেশ ত,'' মার্গারেট বললে, এ ড্যাডিকে যদি তোমার পছন্দ না হয় ত তবে সেই হতভাগাটার কাছে যাও না।

জান আঙ্কল মা বলেছেন, জনকে ঠিক তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে—ওকে দেখতে কিনা ঠিক তার মত।

স্তব্ধ বিস্ময়ে কুমার চুপ করে শুনছিল। হঠাৎ চমকে উঠল, জনের চাপা গর্জনে।—টেবিলে বসে পা দুলিয়ে শুনতে শুনতে, হঠাৎ যেন গুমরে উঠল জন। "চুপরাও কুকুরী, আমাকে শুতে দাও। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে টেবিলের উপরে শুয়ে পড়ল জন। অপ্রস্তুত হয়ে কুমার বললে—' আমি আজ যাই, কাল সকালে বরং—"

—''না, না", ওর হাত চেপে ধরল মার্গারেট। বল তুমি পল্‌কে তাড়াতে পারবে ?

—মা কিছু বোঝে না। অর্দ্ধেক টাকা খরচ করে ঘর সাজানো হচ্ছে, আর বাকী টাকাটা যাচ্ছে ড্যাডির খোঁজ করতে।

— 'যার খোঁজ কস্মিন কালেও পাওয়া যাবে না,'' তার খোঁজে,—গুমরে উঠল জন শুয়ে শুয়ে।

মার্গারেট বলল—"না না, ও কথা বল না জন। সে আসবে শীগ্‌গিরই! জান, আজ আমি কি খেয়েছি। শুকনো একটুকরো রুটি আর একটা টম্যাটো। আর এই দেখ আমার মোজা। ও একজোড়া ছেঁড়া ষ্টকিং দেখালে।

—"আমার জুতোটাও ওকে দেখাও কম্বলের কোণা থেকে, উঁকি মারল জন। পরক্ষণেই গর্জে উঠল। না না, খবরদার, দেখিও না। আমি সাবধান করে দিচ্ছি।''

পাশের গুদোম থেকে কাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠল লিজি। টম ওকে ঘুমের ঘোরে ঠেলাঠেলি করে খাট্ থেকে ফেলে দিয়েছে।

বন্ধ ঘরের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়া রান্নার গন্ধ ধোঁয়ার মত ভারী হয়ে আছে। কুমার আর একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল—এক পাশে প্রকাণ্ড পোর্সিলিনের সিঙ্কের ভিতরে একগাদা বাসন ডাঁই হয়ে আছে। সারা সপ্তাহ ধরে মা অথবা ছেলেমেয়েরা যে রান্না করে প্রায় সব ওখানে জমা হতে থাকে। শনি-রবিবারে ছুটির দিনে জন ও মার্গারেট সেগুলো পরিষ্কার করে।

লিজির কান্না ক্রমে বেদনার আর্তি থেকে ক্রোধের উত্তেজনায় দ্রুত উঠে আসছিল। মার্গারেট ছুটে গেল তাকে সান্ত্বনা দিতে। সেই অবসরে জন উঠে বসল টেবিলের উপরে। হাতে মুঠি পাকিয়ে চাপা গর্জনে বললে—"যাও, যাও এবারে পালাও আমাদের ঘর থেকে।"

কুমার সোজা ওর চোখের ভিতর দৃষ্টিপাত করল। আর সেই ক্রুদ্ধ অথচ নির্ভীক দৃষ্টিপাতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল জন। এক হাতের ঘুষি আর এক হাতে মেরে চেঁচিয়ে বললে—এক্ষুনি পালাও নয়ত মাকে ডেকে আনব। বলব, তুমি চোরের মত এসে আমাদের ঘরে ঢুকেছ। তুমি মার্গারেটের পুরুষ।

'জন'। ক্রুদ্ধ গর্জনে উঠে দাঁড়াল কুমার।—"চোপরাও বোকা নিগারের বাচ্চা।'' জন মুষ্টিবদ্ধ হাতে উঠে দাঁড়াল টেবিলের উপরে। অজ্ঞাত কার উপরে অজানা আক্রোশ দুরন্ত বেগে কুমারের মুখের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই টিং টিং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। সচকিত মার্গারেট ছুটে এল ঘরে। নিঃশব্দ এক লাফে মাটিতে পড়ে জন বললে, পল মশাই চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল।

সেইজন্য এত রাত্রে একবাড়ী লোকের ঘুম ভাঙাতে লজ্জা করল না কেন ? জন বললে—"অসভ্য জানোয়ার, ও কখনো ইংরেজ নয়' আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও একজন দক্ষিণ ইয়োরোপীয় ইহুদী।'' "স্‌ স্‌ থামো।'' মার্গারেট মুখে আঙুল দিয়ে স্তব্ধতার নির্দেশ দিল। তার পরে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে দু'পা উঠে নিঃশব্দে দরজাটা একটু ফাঁক করার আগেই জন চট করে আলোটা নিবিয়ে দিল।

পাছে আলোর রেখা উপরে যায় আর সেই রেখাপথ ধরে মা এসে পৌঁছান। ওপর থেকে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খোলার আওয়াজ হল। শ্রীমতী বার্কারের চাপাগলা শোনা গেল।

"তোমার জন্যে বসে বসে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এত দেরী হ'ল কেন" বন্ধু ?

—"কি করব বল, সেই মেয়েটার আস্তানা খুঁজতে দেরী হয়ে গেল।

যাই হোক, কাজ অনেক হ'ল। সে কিন্তু সহজে ছাড়বে-বলে মনে হয় না।"

—"ঐ শোন, আবার গর্জে উঠল জন। "চুপ চুপ," মার্গারেট ওকে টেনে নিয়ে এল ঘরে। বললে—আঙ্কল কুমার, জনের কথায় রাগ কর না। আর প্লীজ, প্লীজ এসব কথা মাকে বল না। আর যদি কখনও সুযোগ পাও, আমাদের চার ভাইবোনের কথা ভেবে ঐ পলটাকে একটু সায়েস্তা করে দিও।

বাইরের দিকের দরজা খুলে দিল মার্গারেট।

ক্রমশঃ

গৈরিক-গোধূলি

উমা দেবী

১

যখন হয়নি দেহে নয়নের সূর্য্যালোকপাত
তখন হৃদয়ে ছিল নিশীথের মায়া-মরীচিকা,
ঊষর আকাশক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ তারকার শিখা
ফাঁকা কল্পনায় কভু জীবনকে করেনি আঘাত।
বিক্ষিপ্ত করেছে মন ক্ষণে ক্ষণে ভোগ-অবসান
মনের প্রত্যেক স্তরে বাধাপ্রাপ্ত দৈহিক প্রগতি,
দিগন্ত-চক্রের চক্রে পরিচ্ছিন্ন নয়নের জ্যোতি—
এ দেহে হয়নি কভু আনন্দের প্রবাহ নির্ব্বাধ।
দেহ ও মনের এই যুগ্মভাব তোমার সাক্ষাতে
এক হবে—এ আশায় প্রাণশিখা ছিল উজ্জীবিত,
আজ যেন মনে হয়—সে কখন হয়েছে স্তিমিত—
দেহতট ভগ্ন তাই হৃদয়ের আবেগ-আঘাতে।
মিলনের প্রত্যাশায় দিবা ও নিশার অভিসারে
স্বপন-শিখর চুম্বী মানসের অভিলাসগুলি,
লজ্জিত করেছে শুধু বাস্তবের গৈরিক গোধূলি,
ব্যথিত হয়েছে পক্ষ আকাশের অকূল বিহারে।
কেন দেহতট কাঁদে হৃদয়ের তরঙ্গ আঘাতে,
কেন মন লজ্জা পায় এ দেহের রূঢ় পদাঘাতে।

২

নিশীথ রাতের লজ্জা অকস্মাৎ ঘিরেছে প্রভাতে,
হে সুন্দর! অবসন্ন ভোগশিখা নেত্র-তারকায়
আর কেন কর দীপ্ত বাসনার অজস্র ফুৎকারে
নির্ব্বাপিত হোক আলো উৎসবান্তে দেহ দীপাধারে।
পীড়িত হয়েছে দেহ ঊষালোক কঠিন আঘাতে,
ব্যর্থ বলে মনে হয় গত রাত্রি মিলন-সম্ভার,
কোন লৌহ-ছিদ্রপথে কামনার গুপ্ত সর্প এসে
বিপুলা জীবন-শ্রীকে করে গেছে ম্লান রাত্রিশেষে।
হে সুন্দর! জেনো মনে এ নয় তোমার অপমান,
উদ্যত পরশে তবু এসো না ছায়ার যবনিকা,
হৃদয় বিমুখ হোক যদি, তবে দেহ-অবদান
কেন বা শোনাতে চাও—মুহূর্ত্তের অবোধ লিপিকা!
দু-পারে সেতুর বন্ধ, মধ্য দিয়ে নদী বহমান—
এ পার ও পার করি—শুনি কানে জলের কল্লোল,
অবগাহনের স্বপ্নে উৎকণ্ঠায় উদ্দীপিত প্রাণ—
সর্ব্বাঙ্গ অবশ করে তরঙ্গিত হৃদয়-হিল্লোল!
কভু দেহ কভু মন পরস্পর করে অতিক্রম
কভু দেহে কভু মনে বৈদেহী ও দৈহিক বিভ্রম।

৩

আমায় করেছে মত্ত আপনার হৃদয়-সৌরভ,
নয়ন করেছে অন্ধ নয়নের প্রতিবিম্বচ্ছটা,
মূল্য দিয়ে কিনে নিতে জীবনের সমগ্র-গৌরব
বন্ধকী করেছে হায়—বাস্তবের তামাটে ত্রিজটা।
শ্যামোদর গগনের সহোদর শ্যামল বাসনা
অদৃশ্য নিশীথযামে শুনেছে কি শ্যামের বাঁশরি?
নিভৃত ঊষার দ্বারে আকস্মিক জ্যোতি-উদ্ভাসনা
জাগ্রত করেছে যাকে—তাকে বুঝি যাবে সে পাশরি?
আমারি আপন কণ্ঠে মুহুর্মুহু ধ্বনিত আহ্বান
নীরন্ধ্র আঁধার রাতে এনেছে কি দীপ্ত জাগরণ?
উদ্বেলিত দেহ-সীমা হৃৎপিণ্ডের গতি বর্দ্ধমান—
বিদীর্ণ করেছে তাকে অতিক্রূর কার আচরণ?
ভাবনার স্বচ্ছ গেহ মনে হয় নিন্দিত স্ফটিক,
বিম্বিত আপন মূর্ত্তি মনে হয় অনির্ব্বচনীয়,
অদ্ভুত আলোক-উৎসে উৎসারিত যেন সর্ব্বদিক,
কর-বদরিকা সম এ ভুবন গ্রাহ্য-গ্রহণীয়।
কোথা থেকে আসে বাধা নিরাকার কঠিন শীতল
বক্ষ-বাসনার ভারে নিপীড়িত কাঁদে বক্ষতল।

গ্রীষ্মাবাস ইনবেয়াহসেটে শিশুদের সঙ্গে দুদিন

শ্রীশৈলনন্দিনী সেন

কোপেনহেগেনে অধিকাংশ পিতামাতা কাজে যাবার সময় কোন একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে শিশুদের রেখে যায়, কাজের শেষে আবার তাদের ঘরে নিয়ে আসে। তা ছাড়া আছে গ্রীষ্মাবাস। ইনবেয়াহসেট কোপেনহেগেন একটি গ্রীষ্মাবাস—যেখানে শিশুদের সঙ্গে দুদিন কাটাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেই গ্রীষ্মাবাসের কথাই এখানে বলছি।

সারা শীত এবং বছরের বেশীরভাগ সময়ই আবহাওয়ার দরুন শিশুদের ঘরের মধ্যে কাটাতে হয়, আর রোদও পায় না তেমন। তাই গ্রীষ্মকালে পালা করে এদের তিন সপ্তাহের জন্য গ্রামের এই গ্রীষ্মাবাসে এনে বেড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। চার বছরের শিশুরা যায় না, কারণ সেখানে এত বেশী সময়ের জন্য বাইরে থাকার ও ছুটোপাটির ক্লান্তি ওদের সইবে না। পাঁচ বছর থেকে সাত বছরের ছেলেমেয়েরা ওখানে সপ্তাহ দুয়েক আগে গিয়েছে··· কিণ্ডারগার্টেনের বন্ধুরা ফোন করে নেমন্তন্ন জানিয়েছেন সেখানে ওদের সঙ্গে গিয়ে দুদিন থেকে আসতে। আমার অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সারার ইচ্ছা তাই গ্রীষ্মের ছুটি নিই নি। ওদের মনে দুঃখ, বিদেশী এল কিন্তু আমাদের এই সুন্দর গ্রীষ্মকাল দেখবে না, তাই এই আয়োজন। কাজও চলবে, দেখাও হবে। ট্রেনে যাবার পর বাকি রাস্তা যাবার অসুবিধা আছে, তাই একজন শিক্ষয়িত্রী তার বোনকে বলেছেন, গাড়ী করে শনি রবিবারটা ঘুরিয়ে আনবে। গাড়ীতে গেলে এদিক সেদিকও দেখা যাবে।

শিশুদের সঙ্গে মাস দুয়েকে খুব ভাব হয়েছে, গলায় পিঠে ঝুলে থাকে। ঐ সুদূর প্রান্তরে দেখলে আনন্দের সীমা থাকবে না ভেবে বড় ভাল লাগছে। কিণ্ডারগার্টেনের অধিনায়িকা মিসনিশ আমার যাওয়া উপলক্ষে উৎসব করবে ঠিক করে অজস্র কেক বড় বড় বাক্স ভর্তি করে তুলে দিলেন গাড়ীতে, এবার ইউরোপীয় প্রথামতে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, 'তোমার বেড়ানোর সময়টা ভাল কাটুক।' এ যেন বুড়ি দিদিমার মেয়েদের সঙ্গে নাতি-নাতনীর জন্যে সন্দেশ পিঠে দেবার মত।

সকাল ৯টায় রওনা হলাম। গাড়ী কোপেনহেগেন ছাড়িয়ে চলল। সহর ছেড়ে বাইরে এসে পড়তেই ছোট ছোট ভিলা রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে রেখে গাড়ী চলেছে। প্রত্যেক বাড়ীর সামনে সবুজ ঘাসের মাঠ, তাতে সাদা হলদে নীল—ডেইজি, মিল্কবটল, ব্লুবেল ফুটে বুটিদার গালিচার মত দেখাচ্ছে। পাশে নানা রকম ফুলের বাগান—টিউলিপ, সুপুনির, ফ্রেক্সিয়া ইত্যাদি। বাগানের মাঝখানে বড় বড় রঙীন ছাতার ছায়ায় সাদা লাল টেবিল চেয়ার পাতা, সকলেই যার যার মত গ্রীষ্মের রৌদ্রের সদ্ব্যবহার করছে। আকাশে বাতাসে গ্রীষ্মের আনন্দ উৎসবের সুর ভেসে বেড়াচ্ছে। আপেল ও চেরী ফুলে সাদা হয়ে আছে গাছ, পাতা এখনও তেমন আসে নি। নীল আকাশের গায়ে সবুজ প্রান্তরের উপর এই সাদা ফুলের মেলা অপূর্ব্ব! মনে পড়ে গেল দুটি লাইন, কবি গেয়েছেন···

> 'আজি মধুর বাতাসে, হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে
> মন হায়
> কোন কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে সুনীল আকাশে
> মন ধায়

শীতের শেষে বরফ গলতেই রাস্তাঘাটের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ছাদ থেকে আরম্ভ করে বাইরে ভেতরে দেয়াল জানালা সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। চারিধার ঝরঝরে তকতকে। লোকে উৎসব উপলক্ষে বাড়ী সাজায় ঘর সাজায় বাগান সাজায়, কিন্তু এমন সারা দেশ জুড়ে বসন্ত উৎসবের সাজ কল্পনার অতীত। স্নিগ্ধ শ্যামল বসুন্ধরার এই ফুলের সাজ অতুলনীয়, বড় মনলোভা এর রূপ। একটু পেরিয়ে আসতেই ডেনমার্কের বিখ্যাত চাষীদের চাষ করা বিরাট শস্যের ক্ষেত। ডেনমার্কের সব জমি উঁচু নীচু ঢিবির মত। জমির এই আন্দোলিত রূপ এমন সুন্দর যে, সে রূপ সে দেশের লোকের সৌন্দর্য্যবোধের দরুণ চেষ্টাকৃত, এটা সহজেই বোঝা যায়। এই সুদূর-প্রসারী, বার্লি, গম, রাই ও শর্ষের ক্ষেতের মাঝে মাঝে দেখা যায় চাষাদের গোলাবাড়ী লাল টালীর চাল বা খড়ের চাল, তার উপর সারস পাখীর জন্য তৈরি করা বাসা। এদেশের শিশুরা গল্প শোনে যে, ইতালীর থেকে সারস পাখী ঠোঁটে করে এনে ওদের সবাইকে ডেনমার্কে রেখে গেছে—ওদের ধাত্রী মা। তাই বসন্তে ওরা গান গায়···'এসো ফিরে এসো ডেনমার্কে, তোমাদের পুরোনো আবাসে।' তোমাদের ছোট্ট শিশুগুলিকে আমরা দেখি, তোমার কি লম্বা ঠোঁট আর পা ইত্যাদি। আবার শরতের শেষে গান গেয়ে বলে, 'এখন দক্ষিণে ফিরে যাও; এখানে শীত আসছে। ওখানে অপেক্ষাকৃত গরম, আবার গ্রীষ্মে এস। গোলাবাড়ীর কাছাকাছি তারের বেড়া ঘাসের বড় বড় মাঠ তাতে বাদামী রংয়ের ডেনিশ গরু চরে বেড়াচ্ছে, কোথাও আবার অন্য এক প্রকারের গরু পায়ে তাদের সাদা কালো ছাপা। কোথাও আবার একটি দুটি ঘোড়া বাচ্চা সমেত। যেখানেই যে আছে, যেন একটি ছবি। বাদামী গরু যেখানে সেখানে শুধুই বাদামী। কালো সাদা যেখানে সেখানে শুধুই কালো সাদা। পথে যেখানে ছোটখাটো শহর সেখানে বসতি ঘন। একই

ধরনের সাজানো ঘরদোর বাগান। গ্রামের লোকের চাউনি সরল, কারণ প্রকৃতির সহজ পরিবেশে এদের জীবন গড়ে উঠেছে, সকলেই লেখাপড়া জানে। কাজ যদিও করে চলেছে নিয়ম মত্ই, তবে শহরের লোকের মত দৌড়াদৌড়ী বা ব্যস্ততা বোঝা যায় না। গাড়ী আস্তে চললে বিদেশী দেখলেই হাত নেড়ে সম্বর্ধন জানায় মিষ্টি হেসে। গোলাবাড়ীর কাছাকাছি সুগারবিট, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর ও পেঁয়াজের ক্ষেত, কোথাও অ্যাসপ্যারাগাসও আছে। মা-বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েরা গামবুট ও সাদাসিদে মোটা গাড়ো নীল বা কালো জামা প্যান্ট ও সাদা এপ্রণ পরে ক্ষেত নিড়োচ্ছে। মেয়েদের মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা, ছেলেদের টুপী। দেখলেই মাথা নীচু করে সহাস্যে অভিবাদন জানাচ্ছে। সাদাসিদে পোষাক কিন্তু স্বাস্থ্যের লাবণ্যে উদ্ভাসিত মুখ চোখ। গ্রীষ্ম স্কুল ছুটি, তাই মা-বাবার সঙ্গে কাজে সাহায্য করছে।

পথে বিখ্যাত রশকিল্ড ক্যাথিড্রাল দেখবার জন্য নামলাম। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে স্থাপিত। তখন থেকে বংশপরম্পরায় এখানে রাজারাণীর সমাধি রয়েছে। বহু ভ্রমণকারী সেদিন ছিলেন সেখানে। সামনে ঢুকতেই এখানকার রাজার মা ও বাবার সমাধি প্রথমে চোখে পড়ল। অনেক ফুল রয়েছে দেখলাম, রাজা এসেছিলেন কয় দিন আগে। সেই সমাধির পিছনে পিতামহ ও পাশে প্রপিতামহ ও তার পাশে পূর্বপুরুষদের সমাধি। দেয়ালের গায়ে ও উপরে নানা রকমের ফ্রেস্কো, মাঝখানে চার্চ। ১৩০০ সন থেকে এখানে প্রসিদ্ধ ক্যারলিন আছে। মাঝখানের বেদীর পিছনে বড় আকারের তামার পাতের উপর ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি ও পাশে তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে নানান চিত্র।

আবার যাত্রা সুরু। সঙ্গিনী মিস নেষ্টাম বললেন যে, আমরা প্রায় এসে গেছি। নানা রংয়ের সবুজ মাঠ পেরিয়ে চলেছি, মাঝে মাঝে আপেল ও চেরীর বাগান। দূর থেকে চোখে পড়ল উঁচু একটি টিলা, তার গায়ে ঘন সবুজ বীচবন, পাশে গমের ক্ষেত, মাঝে একটি দুটি বাড়ী। যে জায়গায় আমরা এসে পড়েছি তার নাম জীলাণ্ড, সব চেয়ে উঁচু টিলা। দূর থেকেই দেখা যায় একটি খুঁটিতে ডেনিশ পতাকা উড়ছে। তারই নীচে শিশুদের গ্রীষ্মাবাস। দূর থেকে নীল আকাশের গায়ে সবুজ প্রান্তরের মধ্যে বাড়ীটিকে একটি খেলাঘরের মত দেখায়। কাছে আসতেই দেখি, শিশুরা মাঠে ঘাটে হাঁটু পর্যন্ত ঘাসে দাঁড়িয়ে ফুল তুলছে, কেউ বা প্রজাপতির পেছনে দৌড়চ্ছে। গাড়ী আসতেই সবাই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। বড় আপন করার স্বভাব এদের। মিসেস আগার টফট ও মিস নেষ্টাস দৌড়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। আমার হাতের ছোট্ট এটাচী কেশটি ওরা ঘরে নিয়ে রাখলেন। দুপুরে খাবার সময় হয়েছে। তাই ঘণ্টা পড়ল ৫ মিনিট পরেই। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি, যথা রীতি ছোট ছোট টেবিল রবার ক্লথে ঢাকা। চার পাশে ছোট চেয়ার। দেয়ালে নানা রকম পাখীর ছবি। পাশে একটি অর্গান আর প্রত্যেক টেবিলে ছেলেদের আনা বুনো ফুল ফুলদানীতে সাজানো। এক পাশে একটি বড় টেবিল ও চেয়ার, সেখানে আমরা বসলাম। আজ রান্নাঘরের একজন মহিলার জন্মদিন তাই খাবারের বিশেষ আয়োজন। মাংসের চপ, সেদ্ধ আলু, সস, শশার আচার ও পরে ক্রীম দিয়ে সুপ। ছেলেরা খাচ্ছে খুশী হয়ে, অনর্গল কথাও বলছে তবে নীচু স্বরে। খাওয়া শেষে সকলে মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। একটা কথা বলা হয় নি···আমরা এক সঙ্গেই খেলাম, রান্নাঘরের মহিলারাও। যখন যেটা দরকার গরম পাওয়া যাচ্ছে রান্নাঘরের উনুনের পাশে রাখা আছে, যার যার সুবিধা মত এনে ছেলেদের দিচ্ছেন, নিজেরাও নিচ্ছেন। ছেলেরা খেয়ে মাঠে চলে গেল একজন টীচারের তত্ত্বাবধানে খেলতে। তাড়াতাড়ি টেবিল পরিষ্কার করে বাসন ইত্যাদি ধোওয়ার সাহায্য করলাম। সব আধ ঘণ্টায় শেষ হয়ে গেল। এখানে গ্যাস নেই। কয়লা ও কাঠের উনুন তিন-চারটে মুখওয়ালা। রুটি-সেকার চুল্লীও আছে, চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যায়, বাইরে, তাই ঘর কালো হয় না। চমৎকার টিলের উনুন। শহরের বাড়ীর মত তত ঝকঝকে বেসিন ইত্যাদি নয়, তবে কাঠের কাজ এদের পরিপাটী। সাদাসিদের মধ্যে প্রয়োজন মেটানোর মত সবই আছে। ঠাণ্ডা জলের কল বাইরে-ভিতরে দুই জায়গায়ই আছে। অনেক আগে টিউবওয়েল ছিল তার আগে কুয়ো। সবই এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এবার বাইরে এসে মাঠে ছেলেদের কাছে বসলাম। সবাই এখন একত্র হয়ে বসেছে। একটি মেয়ের মা জিনিস পাঠিয়েছেন, সবার সামনে সেটা খুলে দেখান হ'ল, চিঠি পড়ে শোনালেন একজন। মা লিখেছেন···"লিস, সবার সঙ্গে গিয়ে তোমার আনন্দে দিন কাটছে জেনে আমার বড় ভাল লাগছে। ভাই-বোনদের লজেন্স দিয়ে দেও।" লিস সবার সামনে এনে একে একে বাক্স ধরল, সবাই একটি করে তুলে নিল। শিশুকাল থেকেই এই মিলেমিশে উপভোগ করার শিক্ষা। ওদিকে রোদের দিকে মুখ করে একটি খোলা বারান্দা, সেখানে ততক্ষণে ভাঁজকরা টেবিল চেয়ার পাতা হয়ে গেছে। টেবিল ঢাকা, ফুলদানী সবই এল। ছোটরা জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেমনেড আর কেক খেল। আমাদের জন্যে কফি আর কেকের ব্যবস্থা। এর মধ্যে ছবি তুলতে ভুল হয় নি, সবই চলছে। কফি খাওয়া হলে আবার দশ মিনিটের মধ্যে সব যথাস্থানে রাখা হয়ে গেল। এখন বাড়ীটি ঘুরে দেখি।

লম্বা তিনফালি ঘর। একদিকে রান্নাঘর, খাবার ঘর ও বাসনপত্রের ঘর। মাঝখানে টিচারদের জন্যে সরু সরু ফালি ঘর, উপরে নীচে বিছানা জাহাজে যেমন থাকে। টেবিল চেয়ার কার্পেট কুশন ফুলদানী সবই আছে। মাঝে একটি বসবার ঘর, রেডিও টেলিফোন এবং গদি আঁটা সোফা দিয়ে ঘরটি সাজানো, দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাও আছে। শিক্ষয়িত্রীরা ফুল, লতা, পাতা ও পাখী সম্বন্ধে বইও সঙ্গে করে আনতে ভোলে নি। যখন শিশুরা কিছু জিজ্ঞেস করবে, যাতে সঠিক উত্তর দেওয়া যায়। অন্য

ইনবেয়াহসেটের সামনে শিশুরা কাঠের তক্তা ইত্যাদি নিয়ে খেলছে

পাশের একটি বড় ঘরে ৩০টি শিশু ও তিনজন শিক্ষয়িত্রীর শোবার ঘর। সেখানেও উপরে নীচে লাইন করে রেলিং দেওয়া বিছানা পাতা। ছেলেদের মাথার কাছে রাত্রের পোশাক ভাজ করা, আর যার যার মাথার কাছে খাটের গায়ে পছন্দমত ছবি আটকানো আঠা দিয়ে। বিছানাপত্র নিতান্তই সাদাসিদে। পাশেই মুখ ধোবার ঘর। সেখানে তোয়ালে টুথ ব্রাস, চিরুণীর থলে হুকে ঝোলান, নম্বর মত। এর পর নীচু স্যানিটারী পায়খানা। এই বাড়ীটি কাছাকাছি শহর থেকে অনেক দূরে, তাই ভোরবেলা গাড়ী করে প্রত্যেকের প্রয়োজন মত দুধ বড় বড় মুখ আঁটা পাত্রে বা বোতলে করে কো-অপারেটিভ সোসাইটির কেন্দ্র থেকে রেখে যায়। আবার সপ্তাহে দুদিন করে একটি গাড়ী আসে, তাতে মাংস, মাখন,

চীজ, টাটকা তরকারী, মাছ, ময়দা কেক সবই নিয়ে আসে। কাছাকাছি ডাক্তারও আছেন, দরকার মত ফোন করলেই আসেন। স্কুল দুই কিলোমিটারের মধ্যে, তারই কাছাকাছি ছোটখাটো দোকান, তাতে সিগারেট লজেন্স, চকোলেট, আইসক্রীম, লেমোনেড, বীয়ার সবই পাওয়া যায়।

এখানকার আশে পাশের লোকেরা বেশীর ভাগই খামারে কাজ করে। কাছাকাছি একটা বড় ক্যাসল ছিল, সেটা গ্রীষ্মে হোটেলের মত ব্যবহার করা হয়। তাতে অবসর মত অনেকেই কাজ করে কেউ বা দোকানে করে। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ লোকই নিজের বাড়ীর আশেপাশের জমিতে আলু, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকফি, শশা ও ষ্ট্রবেরীর ক্ষেত করেছে। গ্রীষ্মে ছেলেরা খাবে শীতের জন্য বাঁধাকফি, গাজর, আলু, ষ্ট্রবেরীর জেলী ইত্যাদি করে রাখবে। বেশ কয়েকটি ছোট আপেল ও প্লামের গাছ গত বছর থেকে ফল ধরছে বলল। পাশে ছোট্ট একটি মুরগীর ঘর এবং সঙ্গে একটি মিন্‌ক ফার্ম। কি ব্যাপার দেখতে গেলাম। এই মিনক বড় লাগচে কাঠবিড়ালীর মত। তার ছাল মেমসাহেবরা চার পাঁচটা একসঙ্গে গেঁথে কোটের ওপর ফারের মত ঝোলায়। একটি মিন্‌কের দাম ২৫০ ডেনিশ ক্রোনার (১৬২, টাকার মত) মাছের নাড়ীভুড়ি ও কাঁচা মাছ খায়। জালের ভাগকরা ফ্রেমের উপর বসান ঘর, নিজেই তৈরি করেছে। বললে, এতে লাভ কি? বলল, শ্বশুরের মাছের দোকান আছে তাই নাড়ীভুড়িগুলোও ফেলাই যেত, এভাবে সেগুলো কাজে লাগান হচ্ছে। এর স্ত্রী বাড়ীতে থেকে এটা দেখতে পারেন আর সুবিধে মত তিনি নিজেও দেখেন। বাড়ী ঘর দেখলে আশ্চর্য্য লাগবে। এক এলাকায় সবাইকে এক ধরনের বাড়ী করতে হয়, তাই বাড়ীর বাইরেটা মোটামুটি এক রকম। তিন চারটি স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ে, একটি প্রাম বাইরে রাখা আছে। এ্যালসেসিয়ান কুকুরটি বাইরে বাঁধা। পাশে একটি ছোট্ট কাঠের ঘর, তাতে প্রত্যেকের সাইকেল, বাগানের কাজের জিনিসপত্র ও বাগানের কাজের কাঠের জুতো এবং গামবুট রাখা আছে।

এবারে আমরা বেলা ৩টা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম বেড়াতে। ছেলেরা দৌড়ে দৌড়ে আগে চলল, পথ ঘাট তাদের চেনা। ঘাসের মধ্য থেকে নানা রকমের বুনো ফুল এনে দিতে লাগল। নাম জিজ্ঞেস করলে প্রায়ই বলতে পারে না, না জানলে শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞেস করে এসে বলে। পথে ইনবেয়ার ঝোপ, ছোট ছোট ফল ধরেছে এখন। ঘাস বড় হয়েছে কোমর পর্য্যন্ত, এগুলো হের জন্যে কেটে নেয়, তবে এখানে ত সাপ নেই। মাত্র দুরকমের সাপ স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিমের জলাভূমিতে আছে, তাও কদাচিৎ কামড়ায়। সেজন্যে সাবধানতা প্রচুর। ইন্‌জেক্সন ইত্যাদি সঙ্গেই আছে। হলদে, নীল, লাল, নানা রঙের ফুল ঘাসের মধ্যে থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে। তাই তুলতে তুলতে পিছিয়ে পড়ি। ছেলে দৌড়ে গিয়ে নীচু ডালওয়ালা গাছে চড়ে। আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে বাঁ-হাতি বড় রাস্তা ধরি। একটু ওপরের দিকে উঠলে একটা বড় ফার্ম হাউস। আরও একটু ওপরে উঠলে সেই ক্যাসল, নাম ড্রাগহলম ক্যাসল ৮০০ বছরের পুরাণো। খামারের কাছে যেতেই দেখি, তারে ঘেরা একটা জায়গায় শ'খানেক রাজহাঁসের বাচ্চা দেখবার কৌতূহল জানাতেই একটি দশ বার বছরের ফুটফুটে মেয়ে এগিয়ে এসে পথ দেখায়। তারে ঘেরা বিরাট একটি জায়গা, তাতে ভাগে ভাগে বয়স অনুযায়ী কম করে চার শ' মুরগী রয়েছে, আর পাশের গোলাবাড়ীর লম্বা ঘরের ফুটো দিয়ে পিল পিল করে আরো কত বেরিয়ে আসছে। এই মাত্র ঘরে খাবার দেওয়া হয়েছে তাই গিয়েছিল। এখন এলাম শূয়োরের ঘর দেখতে। এখন সব বয়স্ক

শূকর রয়েছে, যাদের জবাইখানা (স্লটার হাউস) পাঠাবার সময় হয়েছে। সাধারণ লম্বা ঘর, তাতে প্রত্যেকটি শূকরের থাকবার জায়গা আলাদা। বেরিয়ে আসছি, দেখি পিছনের রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ী আসছে। মেয়েটি বলল স্বুর বাবা ···গ্রীষ্মে এখন কাজের মরসুম, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। এখন গরুর ঘর দেখাতে নিয়ে চলল মেয়েটি। এ সময় দুধ দোয়ানো হচ্ছে। মেয়েটি তাই আস্তে কথা বলতে বলল, নইলে গরু ঘাবড়ে গিয়ে দুধ টেনে রাখবে। এক এক বংসের গরু এক এক সারিতে রাখা আছে। বড় বড় বড় পাত্রে দুধ রয়েছে। সারা রাত এমনি থাকবে, ভোরে কো-অপারেটিভ ষ্টোরের গাড়ী এসে দুধ নিয়ে যাবে। এবার যে ঘরে নিয়ে এল, সেখানে শূকরের সব মায়েদেরই বাচ্চা হয়েছে। উপরে কাঠের বোর্ডে জন্ম তারিখ লেখা আছে, পাশে আরেকটি বোর্ডে আঁটা ছাপান কাগজে এই মায়ের আগে কয়বার এবং কতটা বাচ্চা হয়েছে ইত্যাদি। নীচে প্রত্যেক খোপের কোণায় ইলেকট্রিক হীটার ঝোলান। শীতের সময় বাচ্চা হলে হীটারের তলায় এসে বসে। এবার ক্যাসল দেখার পালা। বাচ্চারা বাড়ী ফিরে আসে। গ্রীষ্মে এখানে বহু লোক শহর থেকে এসে ছুটির কয়দিন গ্রামে কাটিয়ে যায়। হানিমুনে এখানে কয়দিন কাটাবার ব্যবস্থাও রয়েছে। পুরাণো আমলের জিনিসপত্র তেমনিই সাজানো আছে। এবার বাড়ী ফিরি।

এখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, খাবার সময় হ'ল। গ্রীষ্মের সন্ধ্যার আকাশ অপূর্ব্ব! শরতের আকাশের মত অল্প অল্প রং ধরেছে দিগন্তে। মনে পড়ল শরতের আকাশে বাতাসে যে বাঁশীর সুর ভেসে বেড়ায় তাকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলছেন—

"স্বপ্নে শোনা সে সুর একি
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি॥"
"এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা—
আকাশ হতে ভেসে আসা
এ যে মাটির কোলে মানিক খসা হাসি রাশি।"

জানালা দিয়ে দেখি সমুদ্রের খাড়ির ওপারে দুটি দ্বীপ। সেও টিলার মত। দূর থেকে দেখলে মনে হয় বড় গাছ নেই, শুধুই নানা রঙয়ের সবুজের খেলা। নীচে দূরে দূরে দুটা চারটে বাড়ীর সাদা দেয়াল ছবির মত দেখায়। একটির নাম মিক্‌সেল ডুই, ছোট্ট দ্বীপ। চারটি পরিবারের বাস, ২৫ জন মাত্র লোক। ওদের জীবিকা চাষবাস। এদের ৭টি ছেলে আছে···তার জন্যে একটি স্কুল। শিক্ষয়িত্রীর ছেলেমেয়েই তিনটি। দোকানপাট নেই। প্রতিদিন শহর থেকে নৌকা গিয়ে দুধ আনে, তাতে ডাক যায়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকে কিনবার মত আর পারাপারও করে। আর একটির নাম সেয়রউই তাতে ১০০০ লোকের বাস। স্কুল আছে দোকানও আছে তবে বায়স্কোপ নেই। এদেশের চাষীর বাড়ীতে টেলিভিসন আছে, তাই প্রতিদিন সন্ধ্যেতে অবসর-বিনোদনের কোন অসুবিধা নেই খবরা-খবর থেকে শহরের আমোদ প্রমোদ সবেরই ভাগ পায়।

খাওয়াদাওয়া সারা হলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই। সন্ধ্যের আকাশে ক্রমেই রঙ ছড়িয়ে পড়েছে, আলো এসে 'ইনবেয়া হাউসের' কাছাকাছি গ্রামের উপর পড়ে মায়াপুরীর মত দেখাচ্ছে। পাশেই শান্ত সমুদ্রের খাড়ি—জলধারার কলস্বরে, সন্ধ্যার আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে, ঝিনুক আছে অল্পস্বল্প বালির চড়ায়, দেখতে সুন্দর না হলেও কুড়িয়ে নিই—ডেনমার্কের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ। আগের দিন বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই ঠাণ্ডা। বাতাসে মাথার চুল এলো-মেলো উড়ছে। এখানকার মেয়েদের মাথায় সিল্কের রুমাল বাঁধা তাই অসুবিধে নেই। এখন একটু এগিয়ে মোড় ঘুরি আর এগোতে জলাময় ভুমিতে এসে পড়ব। খালি পায়ে চলা যায় না—গ্রীষ্মকাল হলেও বড় ঠাণ্ডা, এখন ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলি। শরের মত এক রকম গাছ বুক সমান উচু। অপর্য্যাপ্ত ফুটে আছে সাদা লাল বুনো গোলাপ আর আছে বুনো ইরিস। প্রকৃতির একি অফুরন্ত রূপের মেলা। পাশ দিয়ে একটি 'সোয়ালো' পাখী শীষ দিয়ে উড়ে গেল। সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে দুটি পাখী এ ঝোপ ওঝোপে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে শীষ দিয়ে। রাস্তায় দুই তিনটি ছোট বড় গ্রীষ্মাবাস। কোনটি কেবল একটি বড় কাঠের বাক্সের মত, সামনে ছোট্ট একটি খড়ের বেড়ার আড়াল। সারাদিন-রাত বাইরেই কাটে, শুধু রাতে ঘণ্টা তিনেক শোবার ব্যবস্থা। ফুল নিয়ে বাড়ী ফিরি ফুলদানীতে রাখা যাবে। বসবার ঘরে এসে রেডিও খুলে একটু গান ও কন্‌সার্ট শোনা গেল। এবার কফি আর কেক্ এল। কোনটার ত্রুটি নেই। প্রত্যেকে বাড়ীতেই প্রায় এইটেই রীতি। নিজেরাই কেক্ ইত্যাদি করতে জানেন। রাত ১১টা, এবার ঘুমাতে হবে। কিন্তু ঘুম আসবে কেন? তখনও সন্ধ্যার আলো অপর্য্যাপ্ত। ভারী পর্দ্দা ফেলে ঘর অন্ধকার করে নিই। বিছানা ঠাণ্ডা এখানে গরম রাখার ব্যবস্থা নেই। গরম জামা ইত্যাদি গায়ে দিয়েই ঘুমাই, ঘুম আর আসে না। মনে হয় যদি রাত তিনটেতে ভোর হওয়া দেখতে না পাই। সাড়ে তিনটায় উঠে পর্দ্দা তুলে চারদিক দেখি। আশেপাশের ঝোপঝাড়, গ্রীষ্মাবাস, দূরের দ্বীপ, একে একে ছবির মত সমুদ্রের পাড়ে ভেসে ওঠে। এই রূপলাবণ্য মাখা অনির্ব্বচনীয় পরিবেশে মনে পড়ে—

রজনীর শেষ তারা···
বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম কুসুমে।
সেই মত মোর হৃদয়ের আনন্দরূপিণী
শেষ ক্ষণে দেন যেন তিনি,
নব জীবনের মুখ চুমে।
এই নিশিথের স্বপ্নবাজী,
নব জাগরণে নব গানে, উঠে যেন বাজী।

এখানে ছেলেরা ঘুম থেকে ওঠে ভোর পাঁচটায়, হাত মুখ ধোয় জামাকাপড় বদলায়। অন্যেরা ততক্ষণে বিছানাপত্র পরিষ্কার

করেন। ওদিকে সকালের খাবারের ব্যবস্থা চলে। সবই অতি অনায়াসে যেন হয়ে চলেছে। শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ছেলেদের জামা-কাপড় পরাই। নিজে আগেই তৈরী হয়ে নিয়েছে, এখন খাবারঘরে এসে একসঙ্গে চা খাই। ছেলেরা দুধ, মাখন, রুটি আর পরিজ খায়। খাবার পর, ছেলেরা কাছাকাছি ঝোপের আড়ালে রোদ পোয়াতে চলে যায়। শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে। আমি খানিক-ক্ষণ থেকেই ভাবছি, একটু রাস্তা ধরে পাহাড়ের উপর যেতে পারলে হ'ত। সাইকেল নিয়ে যেতে চাই, এরা বলে শাড়ী পরে হবে না, কোট গায়ে দিয়ে হয় ত পারি, শাড়ী পরে পরে ত নিশ্চয়ই নয়।

শিক্ষয়িত্রীর কাছে বসে গল্প শুনছে শিশুরা

পথে বেরিয়ে পড়ি। চোখ জুড়িয়ে যায়। শস্য ক্ষেতের পাশে ঘাসের মধ্য থেকে উঁকি দিচ্ছে কত রকমের লাল আর নীল ফুল। কে এমন করে সাজিয়েছে ক্ষেতকে। আর একটু ওপরে উঠলেই ফার্ম হাউস পাওয়া যাবে, কিন্তু সাইকেলে চড়াই-উৎরাই ত সহজ নয়। এদেশে প্রত্যেকেরই অন্তত একটি মোটর সাইকেল আছে, পাশে জোড়া ভান লাগান। চোর ডাকাতের ভয় নেই, বন্দুক অবিশ্যি প্রায় সবারই আছে।

বিরাট প্রান্তরের মধ্যে একটি করে বাড়ী। রবিবার অজস্র গাড়ী চলেছে। শহর থেকে লোকেরা এসেছে সমুদ্রে স্নান করতে। ফিরবার পথে দেখি দু'জন ভদ্রলোক, একটা বাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে বালি চালছেন তারের চালুনী দিয়ে। খালি গা, হাফপ্যান্ট পরা, কাছে একটা গাড়ী দাঁড়ান। বিদেশী দেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে জানতে চাইলে এখানে কোথায় এসেছি, গ্রীষ্মাবাসটি কোথায়? যথাযথ উত্তরের পর প্রশ্ন করে জানলাম ওরা দুজনেই কোপেন-হেগেনে থাকে। একজন ব্যাঙ্কে কাজ করে, আর একজন আইনের ছাত্র। গ্রীষ্মের প্রত্যেক রবিবার সকাল বেলা এখানে এসে নিজেদের গ্রীষ্মাবাস নিজেরা তৈরি করছে। স্নান নিজেরাই করেছে। ছুটির দিনে আসে সমুদ্রে স্নান করতে, খাবার সঙ্গেই আছে। কাজ করে পরিশ্রম লাগলে ঘাসে কম্বল পেতে শুয়ে বিশ্রাম করে নেয়, তার পর রাতে কোপেনহেগেনে ফিরে যায়। রাত ১১টা পর্য্যন্ত কাজ করা চলে গ্রীষ্মে। আমরা সাহেব বলতে আমাদের দেশে সুট পরে জুতো পায়ে গাড়ী চড়াটাকেই দেখি। আর এখানেও দোকানে, বাজারে, আপিসে, স্কুলে দেখলে বাইরে থেকে সে রকম ধারণাই হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে ও একটু ভাল করে মিশে থাকবার সুযোগ পেলে বোঝা যায়, এই জাতি-চরিত্রের মূল সূত্র কোথায়। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে শিশুকাল থেকেই এরা সচেতন। যে সমস্ত ব্যাপার প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে দরকারী সেগুলোকে কিছুমাত্র উপেক্ষা না করে, তাকে অত্যন্ত নিজের মত করে আয়ত্ত করে, তার পর ক্রমে তার সঙ্গে অন্য শিক্ষা ও জ্ঞানকে যুক্ত করার প্রতি মনোযোগ। এতে করে কোথাও কোন ফাঁক আর চোখে পড়ে না। প্রত্যেকের জীবন এমন সুন্দর ভাবে গড়ে ওঠে যে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও সমষ্টিগত ভাবে একটা বিশেষ ধারাকে এগিয়ে দিয়ে চলতে পারে। আর কায়িক শ্রমের মর্য্যাদাবোধও খুব বেশী। তাই সুযোগমত সকলেই সেটাকে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে।

মনের মধ্যে একটা বড় আশা নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। কল্পনায় মনে হ'ল এমন সুদিন আমাদেরও আসবে। কাজ করলে তার ফল-শস্য চোখের সামনে দেখা যায়। খাবার সময় হয়েছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। এর পর 'ভেয়হয়ের' গা বেয়ে যে রাস্তা উঠে গেছে তা দিয়ে উপরের ফার্ম হাউস দেখতে যাব। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ের গা বেয়ে, গাড়ী উঠছে, তবে খাড়াই বেশী নয়। রাস্তার আশেপাশে ঢালু জমিতে বাড়ী, ক্ষেত সবই আছে। এখন গাড়ী থামলে উপরে উঠি, খাঁজ কাটা কাঠপাতা সিঁড়ি। আমাদের বাংলা দেশের পুকুর-ঘাটের সিঁড়ির মত। উপরে একটি বিরাট পাথর তার গায়ে দুটি যুদ্ধের ইতিহাস লেখা। একটি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের আর একটি ১৯২৪-এর। এই পাথরটি নীচে সমুদ্রে পাওয়া যায়, তাকে উপরে তুলে এনে রাখা হয়েছে। নাম 'এসটারহয়।' উপর থেকে জীল্যাণ্ডের উপর দিককার সরু ফালি অংশটি সমুদ্রের নীল জলে বাঁক ধরে গিয়ে শেষ হয়েছে। ছোট ছোট সাদা নৌকা রোদে ঝলমল করছে। পাশে একটি পুরনো দিনের 'উইণ্ড পাম্প' নীচের ডোবা থেকে জল টেনে তোলার জন্যে—গরু ঘোড়ার প্রয়োজনে। এদেশে ক্ষেতে জলের দরকার হয় না। বৃষ্টি সারা বছরই লেগে আছে। নেমে এসে আবার পাহাড়ের গা বেয়ে চলি। নীচে জনপদ, ক্ষেত-খামার।

কোথায় চলেছি এখন ? একটি পুরানো উইণ্ডমিল দেখতে। ৫০০ বছর আগে এই উইণ্ডমিলের বিরাট জাঁতায় গম পেশা হত। সত্তর বছর আগে এই মিলটি পুড়ে যায়, তখন একে আবার সেই পুরানো রকম করে তৈরী করা হয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গে যেমন বাঁশের ছাউনি ঢাকে ঘরের চালে, এ তেমনি কাঠের ইঞ্চি তিনেক চওড়া ফালি পর পর সাজান। মাছের আঁশের মত দেখায়। জল গড়িয়ে যায় আর উই নেই তাই বহুদিন চলে। এখানে এক ভদ্রলোক ওপরে থাকেন। গ্রীষ্মে নীচের তলাটা রেষ্টুরেণ্টের মত করেছেন, লোকে চা, কেক আইসক্রীম খাচ্ছে। টবে ফুল টিউলিপ ইত্যাদি। বাইরের বিরাট পাখা ঘুরলে, দড়ির সাহায্যে পরে মোটা ফিতের আবর্ত্তনে কি করে বিরাট জাঁতা ঘুরতো তা দেখালেন। পুরোনো আমলের রুটি কেক বানাবার কাঠের ছাঁচ সবই রেখেছে সাজিয়ে।

এর পর আসি স্তানকেয়াড়মেটে। একটি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পুরোনো খড়ের চালের বাড়ী। সেটাও এখন এক ভদ্রলোকের বাড়ী। পাশের একটা ছোট ঘর মিউজিয়াম এর মত ঠিক তেমন অবস্থাতেই সাজিয়ে রেখেছে, রান্নার উনুন, তামার কেতলি, কুলুঙ্গী, কোণায় ছোট্ট একটি বসবার খুপরী। উলকাটার একটি চরকা, কাপড় ইস্ত্রি করার কাঠের দেড় ফুট লম্বা বেলার, একটি টেবিলক্লথ তাতে কাশ্মিরী কলকার মত কাজ করা একটি মোমবাতির লণ্ঠন। চরকাটি দেখে মনে পড়ল স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ১৯৩৩ সনে একটি স্বদেশী প্রদর্শনীতে ঠিক এই রকম চরকাতে পায়ে প্যাডল করে এক নেপালী মহিলার কাছে উল কাটা শিখেছিলাম। অন্য ঘরে তখনকার দিনের তাসার, টিপট, কফিপট, কালি লাগানই কেতলী রয়েছে। বাগানে ফুলগাছ আর নানা রকমের ছোট ছোট ঝোপ—তার আড়ালে টেবিল পাতা। বিশেষত্ব হ'ল, প্যান কেক্স আর ভিতরে ক্রীম আর জেলী দিয়ে খাওয়া। আমাদের পাটিসাপটা পিঠের মত বাইরেটা। গ্রীষ্ম, তাই জলের বদলে আইসক্রীম খাওয়া গেল। পাশে ছোট্ট তরকারীর বাগান, আলু, গাজর, মটর, রুবারবা, ষ্ট্রবেরি সবই আছে। একটি মনোরম পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। সামনে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ শস্যের ক্ষেত। এখন বেরিয়ে আসি। মিস নেষ্টাম গাড়ীটা পাশে রেখেছিলেন, গাড়ীটা ব্যাক করে আনতে গিয়ে ব্রেকের একটা ক্লি ভেঙ্গে গেল, গাড়ী পেছনে নেবে যাচ্ছে। চট করে দুজন ভদ্রলোক এসে সাহায্য করলেন আর বললেন, আস্তে চালিয়ে নিয়ে পথে ঠিক করে নিতে পারবেন। যেমন গাড়ী চালায় তেমনি ঘাবড়াবার লোক নয়। স্থিরভাবে সবটাই করে চলে। পথে গাড়ী ঠিক করে বাড়ী ফেরা গেল। মন একেবারে খুশীতে ভরা। মিস নেষ্টাম চলে গেলেন নেমন্তন্ন রক্ষা করতে।

আমরা খেয়ে দেয়ে এলাম ছোটদের শোবার ঘরে। রাত্রের পোষাক পরে শিশুরা শুলে একজন টিচার কয়েকটি গল্প পড়ে শোনালেন। পরে একটি সুন্দর গান করে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। গানটিতে সারাদিনের জন্য ফুল, পাতা, পাখী, প্রজাপতি, জল, বাতাস, সমুদ্র সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়া হ'ল।

আমরা বসবার ঘরে এসে বসলাম। গল্প চলল নানা রকম দেশের। ৯টায় চা খাওয়া হলে ঘুমিয়ে পড়ি। কাল সকালে রওয়ানা হব ১১টায় স্কুলের কাজে যোগ দেবার কথা।

স্বপ্নমধুর

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

অনেক আশার রঙ্ ভরা এই স্বপ্নমধুর সোনার সকাল
এ সকাল আমি হারাতে দেবোনা, দেবোনা।
হতাশক্লান্তি ভরাহৃদয়ের মেঘধূসরিত কুয়াশার জাল,—
কুয়াশায় এই সকাল হারাতে দেবোনা।
আকাশের নীলে জানি শুধু ধোঁওয়া—
জীবনের রঙ্ নেই,
ধুলোয় ধূসর হৃদয়ের কোণে
কোন রঙ্ বেঁচে নেই।
দিগন্তে মায়ামুগ্ধ মেঘের তবু অকারণ মোহ,—
সারাদিন ধরে [illegible] কী বিপুল সমারোহ ?
ক্ষণবিস্মৃতি ভরাস্মরণের মধুর নিমেষে রাঙা দিগন্ত···
ক্ষণিকের মেঘে রঙবিলাসের মুহূর্তে যেতে দেবোনা।

পলকের ভুলে প্রাণ পাওয়া ফুলে যদি চকিতের নামে বসন্ত,
সে ক্ষণিকে তবে হারাতে দেবোনা, দেবোনা।
বহু দুঃখের কুটিলপথের
ধুলোমাখা ঘাসফুলে,—
দেখেছি জীবন ভরে আছে যেন
শুধু পলকের ভুলে ;
দেখেছি হৃদয় এতটুকু মেঘ
শুধু রঙ্ শুধু হাওয়া,
সারাদিন ধরে অকারণ যত
মুহূর্তে মন নাওয়া।
জীবনের রঙ পলকে পলকে আলো হয়ে ওঠে জ্বলে,
এ সকাল যদি ক্ষণিক, সে ক্ষণ অনন্ত ভরে দোলে।

সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

কবি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কবি। মানে হাসনুর সিনে সেই যে। মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করল ধীরেন ভড়।

আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে। উপস্থিত যে পার্ট সে নিয়েছে সেটা ভাল ভাবে শেষ করতে পারলে নিষ্কৃতি পায় সে।

অত পান কি হবে বাবা! সুনীলের হাতের দিকে তাকাল ধীরেন ভড়।

খাওয়া হবে আবার কি।

তুমি ত পান খাও না বন্ধু, প্রাণ খাও।—অট্টহাসি হাসল ধীরেন ভড় নিজের রসিকতায়। সুনীলের হাত থেকে অযাচিত ভাবে কয়েকটা পান তুলে গালে দিল ধীরেন ভড়, তারপর একটা চোখ অর্দ্ধেক সঙ্কুচিত করে হাসনুর কামরার দিকে কি যেন ইঙ্গিত করে চলে গেল।

লোকটার সাধারণ সৌজন্যবোধ যে নেই সে কথা সুনীল অনেকদিন আগে জেনেছে। আর তাকে পার্ট দেওয়ার গূঢ় অর্থটাও তার কাছে পরিষ্কার।

কামরার দিকে তাকাল সে, লক্ষ্য করল একজন বাবাজী শ্রেণীর লোক বসে আছেন, গেরুয়া পরা কিন্তু বেশ শক্ত চেহারা। এ আপদটা আবার এল কোথা থেকে! ভাবছে সুনীল রায়। সুনীল রায় আরও লক্ষ্য করল, ইতিমধ্যে বাবাজী হাসনুর সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন—মাথা নেড়ে নেড়ে কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন বলে মনে হ'ল। বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল তার।

স্বামী স্বরূপানন্দ হাসনুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। মনে মনে তিনি প্রীত হয়েছেন। বিনা আয়াসেই যে পুরস্কার তিনি লাভ করবেন এতটা তিনি আশা অবশ্য করেন নি, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁকে অনেক সময় টোপ ফেলতে হয় না, এমনকি চারেরও দরকার হয় না, বড় বড় রুই-কাৎলা অযাচিত ভাবে ধরা দিয়ে যেন কৃতার্থ হয়। এ সৌভাগ্য কোনদিনই তাঁকে পরিত্যাগ করবে না বলেই স্বামীজীর বিশ্বাস। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কোন আজগুবী কাহিনী সরস ভাবে এবং উপযুক্ত পরিবেশে পরিবেশন করলে সকলের পক্ষেই বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে যে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয় সে কথা স্বামীজি জ্ঞাত আছেন। আবার সেই ধর্ম্মের আবরণে অনেক দুরূহ কাজই যে সুসম্পন্ন করা যায় সে অভিজ্ঞতাও তাঁর কম নয়।

সুনীল রায় কামরায় ঢুকে একবার বিরক্তিভরে তাকাল স্বামীজীর দিকে, তার পর হাসনুর দিকে পানগুলো এগিয়ে দিল। পাশের একটা বাক্সে সযত্নে পানগুলো রেখে দিল হাসনু। পকেট থেকে রুমালটা বার করে হাতটা মুছল সুনীল রায়, পানের রসে হাতের তালুটা তার লাল হয়ে গিয়েছে। সমস্ত জিনিসগুলো ঠিক একই ধরনের বিরক্তিকর। 'কুপে' না পাওয়া, হাসনুর কুঞ্চিত ভ্রূ, ধীরেন ভড়ের ভাঁড়ামী, ভণ্ডটার উপস্থিতি সবই এই পানের রসের মত অপ্রয়োজনীয়, অবাঞ্ছিত আর অস্বস্তিকর। একটা সিগারেট ধরালে সুনীল রায়, আঙুল দুটো আবার কেঁপে উঠল তার। নীলচে ধোঁয়াটা নাসারন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে উদ্গীরণ করল সে।

সুনীল রায়কে নিরীক্ষণ করলেন স্বামীজী কয়েক মুহূর্ত্ত, তার পর অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, রাহু।

অ্যাঁ, আমায় কিছু বললেন ? অস্পষ্ট কথার আওয়াজটা শুনেছে সুনীল রায়।

না, ঠিক আপনাকে নয়।—মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন স্বামীজী, তবে রোগী দেখলে কবিরাজের মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, সেই রকম গ্রহের স্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ্য করলে হঠাৎ বলে ফেলি।

গ্রহ ? কৌতূহল হ'ল সুনীল রায়ের।

হ্যাঁ, আপনি রাহুগ্রস্ত। বিচারকের মত রায় দিতে দেরী করলেন না স্বামীজী।

কথাটার সম্পূর্ণ অর্থ সুনীল রায় জানে না, তবে জিনিসটা মোটামুটি বুঝেছে সে। অবিশ্বাস আর কৌতূহলমিশ্রিত মুখের ভাবটা তার লক্ষ্য করেছেন স্বামীজী।

মনটা সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান, তবুও সুনীল প্রশ্ন করল, রাহুগ্রস্ত মানে ?

তার মানে, ঝুঁকি আছে, অনেক বাধাবিঘ্ন রয়েছে, দুস্তর দুর্গম পথ।—কথা বলা শেষ করে চোখ বন্ধ করলেন

স্বামীজী,—বিপদসঙ্কুল পথের চিত্রটা যেন অকস্মাৎ তার মানসপটে ফুটে উঠেছে।

ঠিক বুঝলাম না ত। বলল সুনীল, কৌতূহল চলে গিয়ে এবার ভয়ের চিহ্ন ফুটেছে তার মুখে, অবিশ্বাসের কথা এখন আর মনে নেই, মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

বোঝা একটু শক্ত ভাই। কথাটা তাঁর বেশ লাগসই হয়েছে দেখে খুশী হলেন তিনি। বললেন, সব জিনিসই কি সবাই বুঝতে পারে, সেই কথাই ত এই বেটিকে বলছিলাম। কথাটা শেষ করে সস্নেহে তাকালেন তিনি হাসনুর দিকে।

কি বলছিলেন?

বলছিলাম মনের দিক দিয়ে অপূর্ব্ব মিল, কিন্তু···।

কথাটা আর শেষ করলেন না তিনি, শুধু চোখ দুটো বন্ধ করে রহস্যভরে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

হু হু শব্দে ট্রেনটা চলেছে, লৌহবর্ত্মের ওপর দিয়ে। বিরাট একটা সরীসৃপ যেন এঁকেবেঁকে ছুটে চলছে গর্জ্জন করতে করতে—ঝক্, ঝক্, ঝক্। আশেপাশের কল-কারখানার আলো দেখা যাচ্ছে। বহুমূল্য রত্নাভরণের মত সেগুলো সাজানো রয়েছে যেন চতুর্দ্দিকে। শীতের কুয়াশা, ধোঁয়া আর ধূলিজালে উজ্জ্বল আলোগুলো নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। কালিমাখা বিরাট বাড়ীগুলো অন্ধকার পটভূমিতে অজানা রহস্যময় পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে একের পর একটা। হাসনু মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। লাইনের বাঁকের মুখে ট্রেনের ইঞ্জিনটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে ইঞ্জিনের চিমনীর ওপর দিকে একটা লালচে আভা ফুটে রয়েছে। আগুনের ফুলকিগুলি সেখান থেকে বার হয়ে আশেপাশের গাছের ওপর জোনাকী হয়ে জ্বলছে যেন। ইঞ্জিনের মাথার সার্চলাইটের তীব্র রশ্মিটা অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়ে পড়েছে। লাইনের স্লিপার-গুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। লম্বা লম্বা একই আকৃতির কাঠগুলো শুকনো পঞ্জরাস্থির মত সমান্তরাল ভাবে সাজানো রয়েছে। কালো পাথরের টুকরো ছড়ানো রয়েছে তার চতুর্দ্দিকে। লাইনের পাশে কয়েক জায়গায় পাথরের স্তূপ রয়েছে, তারই অদূরে একটা তাঁবু খাটানো। ইতস্ততঃ কয়েকটা ধূমায়িত লণ্ঠন দেখা গেল, লাইন মেরামত হচ্ছে হয় ত, ভাবল হাসনু। বেশ লাগছে তার এখন, ট্রেনের গতি আর চলমান দৃশ্য তার মনটা হালকা করে দিল। ঝক্ ঝক্ ঝক্—দুলকী চালে ট্রেনটা চলেছে।

কেট্ ডগলাস ওধারের বার্থটা পেয়েছে, সেও তাকিয়ে আছে বাইরের অন্ধকারের দিকে। ইঞ্জিনটা রবার্ট চালাচ্ছে, কি রকম করে চালায় কে জানে—ভাবল কেট্ ডগলাস। অনেকে ওর স্থিরবুদ্ধির প্রশংসা করে, কিন্তু তার নিজের তা মনে হয় না। বরং অনেক সময় অকারণে রাগ করতে রবার্টকে সে দেখেছে। সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে তুমুল কাণ্ডও অনেক বাধিয়েছে বলে মনে পড়ল কেটের।

অবশ্য অল্প বয়সে রবার্ট এ রকম ছিল না। প্রথম মেয়েটা হবার পরই যেন রবার্ট কেমন বদলে গেল। বাড়ী ফিরতে দেরী সুরু হ'ল, ড্রিঙ্কের মাত্রা বাড়ল, পয়সা ওড়াতে লাগল নানাভাবে। সেদিনের স্মৃতি এখনও পীড়া দেয় কেট্‌কে। স্বপ্নময় রঙীন ভালবাসার প্রথম স্পর্শের পরই রূঢ় আঘাত-গুলো বেজেছিল খুব, কিন্তু কেট্ সহ্য করেছিল। হয় ত অতটা সহ্য তখন না করলেই ভাল হ'ত। চক্ষুলজ্জার ধাপটা পার হওয়ার পরই রবার্ট যেন বেহেড বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল, আর তা ছাড়া নিজের দিক দিয়েও সে ভুল করেছিল বলে এখন মনে হয়। সে অবস্থায় অত বেশী ঢিলে দিয়ে নিজের বুকে আঘাতটা নেওয়ার ফলে প্রতিক্রিয়ার চাপটা এখন যেন তাঁকে অনুভব করতে হচ্ছে—একটু বেশী মাত্রায় মনটা তাঁর সন্দিগ্ধ আর সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে তা সে নিজেই বুঝতে পারে। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে 'সিন ক্রিয়েট' করা ইদানীং তার যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। রবার্ট ডগলাসের মূর্ত্তিটা কেটের চোখের ওপর ভেসে উঠল। রবার্ট এখন যেন কেমন মোটা থলথলে ধরনের হয়ে গিয়েছে। মনের মত শরীরের ওপরও এখন যেন তার দখল নেই আর।

শক্ত সুদৃশ্য মাংসপেশীর স্থানে জমেছে বিসদৃশ চর্ব্বির আস্তরণ। দীর্ঘদেহী রবার্টকে এখন স্থূল আর খর্ব্বকায় অন্য একটি লোক বলে মনে হয় তার কাছে। আগে কিন্তু রবার্ট বেশ লম্বা ছিল। দীর্ঘ পদক্ষেপে রবার্টের ঋজু চলনভঙ্গীটা মনে পড়ে গেল কেটের।

মানুষ কত বদলে যায়। যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন আসে তার জীবনে। রবার্টের চোখে সেও নিশ্চয়ই এই রকম পালটে গিয়েছে। তার মত রবার্টও কি সেই মধুর স্বপ্নোজ্জ্বল দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে বেদনা অনুভব করে? একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কেটের। কেট দেখল, ওদিকের বার্থে বসা লোকটি একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছে—চেইন স্মোকার বলে মনে হ'ল।

ওদের মুসলমান বলে চিনতে পারল কেট্। পাশের মেয়েটির চেহারাও ভাল লাগল তার। মুসলমান বস্তিবাসীদের সঙ্গে অনেকদিন মেলামেশা করেছে কেট্। হাসনুর অবশ্য পরণে বোরখা বা হাতে মেহদী পাতার রং নেই, কিন্তু আচার

...বহার হাবভাবটা তার সুপরিচিত বলেই ওকে চিনতে দেরী হ'ল না কেটের। মেয়েটি বারবার পান মুখে দিয়ে কচকচ করে চিবোচ্ছে আর রক্তবর্ণ পিকটা ফেলছে কয়েক মিনিট অন্তর। ন্যাসটি হ্যাবিট্—নিজের অজান্তে কেটের গৌরবর্ণ নাসিকার অগ্রভাগ কুঞ্চিত হ'ল। সিগারেটের ধোঁয়া কেটের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল।

অন্য লোক তার সাক্ষাতে ধূমপান করলে তারও নেশাটা সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দমনীয় হয়ে ওঠে, এমনকি সিনেমার নায়ক যখন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে তখনও তার ধূমপানের স্পৃহাটা জেগে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। একটা সিগারেট বার করল কেট্ ডগলাস তার সুদৃশ্য কেস থেকে, তার পর ক্ষুদ্রাকৃতি লাইটারটা জ্বালিয়ে ধরিয়ে নিলে সেটা। এক মুহূর্ত্ত লাইটারের অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে দেখল, তার পর ডালাটা হাল্কা একটা ভঙ্গীতে ছেড়ে দিল। লাইটারের আগুনটা নিভে গেল। জেনী তাকে দিয়েছিল এটা, কেটের জন্মদিনে জেনীর উপহার। ছোট্ট লাইটারের গায়ে লেখা আছে—Many happy returns Jenny to Mummy।

সেই এক ফোঁটা মেয়ে জেনী এখন চার ছেলের মা—ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে তার। শৈশবাবস্থায় জেনীর একবার হুপিং কাসি হয়েছিল, কেটের সেই কথা মনে পড়ে গেল। কি অমানুষিক যন্ত্রণাই পেয়েছিল মেয়েটা। কাসতে কাসতে শ্বাসবন্ধ হয়ে যাবার মত হ'ত অনেক সময়, নীল হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে। অবিশ্রান্ত কাসত মেয়েটা, কাসির দমকে চোখের শিরা ছিঁড়ে রক্ত জমাট বেঁধে যেত। সেদিনের কথাটাও বেশ মনে আছে কেটের, ডাক্তার সমারসেট্ জেনীকে দেখে সেদিন শেষ জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন। রোগীর অবস্থা তাঁদের ক্ষমতাবহির্ভূর্ত বলে ঘোষণা করে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে বলেছিলেন, সে মুহূর্ত্তটা ভোলবার মত নয়। সেই দুর্য্যোগের কথা এখনও মনে আছে কেটের, রাতের পর রাত সে আর রবার্ট মুমূর্ষু জেনীর শয্যার পাশে কাটিয়েছে। একদিনের কথা।

রবার্ট তাকে জোর করে এক পেয়ালা কফি আর বিস্কুট খাওয়ালে, অনেক সান্ত্বনা দিলে সেই সঙ্গে। হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ে উঠল, রবার্ট নীচে নেমে গেল দেখতে, কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল গম্ভীর মুখে।

কে এসেছে? জিজ্ঞাসা করল কেট্।

ও একটা বুজরুক। তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলে রবার্ট।

বুজরুক?

হ্যাঁ, একজন সাধু বললে তোমার বাড়ীতে অসুখ, এই মন্ত্রপূত ফুলটা তার মাথায় দাও, সে ভাল হয়ে যাবে—অল বাংকাম।

কোথায় সে? চীৎকার করে উঠল কেট্।

চলে গেছে বোধ হয়। উত্তর দিল রবার্ট। কেটের উত্তেজনার কারণটা খুঁজে পায় না সে।

চলে গেছে? যেন কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হ'ল না কেটের। রবার্টের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কেট্ নিজেই উন্মত্তের মত ছুটে গিয়েছিল রাস্তায় সেই সাধুর খোঁজে। অনেক খোঁজখবর করে শেষ পর্য্যন্ত সাধুকে ধরতেও পেরেছিল সে। সাধুপ্রদত্ত সেই মন্ত্রপূত ফুল জেনীর মাথার পাশে রেখে দিয়েছিল কেট্। মনে আছে—তার পরের দিনই জেনীর সহজ অবস্থা। আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল সে আর রবার্ট, ডাঃ সমারসেট্ও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য ভেবে নিয়েছিলেন যে, তাঁরই ওষুধের জোরে এটা সম্ভব হয়েছিল। কেট্ও কোন মন্তব্য বা সাধুর কথা উল্লেখ করে নি। তাঁর মেয়ে ভাল হয়ে গিয়েছে—সেইটাই বড় কথা

ছোট লাইটারটার দিকে তাকিয়ে রইল কেট্। এই সেই জেনী, যার জন্য রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, অনাহারে, অনিদ্রায় কাটিয়েছে। এই সেই জেনী, বছরে এখন সে মাত্র দুটি করে চিঠি লেখে, একটা নববর্ষে আর একটা তার জন্মদিনে, সঙ্গে অবশ্য এ ধরনের একটা উপহারও পাঠায়। দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার আর একটা।

ওধারে উপবিষ্ট সাধুকে দেখেই জেনীর সেই অসুখের কথা মনে পড়ে গিয়েছে তার। গেরুয়াধারী সাধুদের ওপর এখনও কেট্ ডগলাসের অচলা ভক্তি আর বিশ্বাস আছে। খুক্‌খুক্...কাসির শব্দে কেট্ বেঞ্চির অপর দিকে তাকাল। যে লোকটাকে গলায় মালা দিয়ে মহাসমারোহে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়েছিল সেই লোকটা কাসছে—এই শীতে মাথাটা বার করে আছে—কাসবেই ত। হয় ত ছোটখাট একটা নেতা হবে। যাকে গলায় মালা দিয়ে অনর্থক চীৎকার আর জয়ধ্বনি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাকেই কেট্ ডগলাস নেতা বলে ধরে নেয়। সিগারেটে আর একটা টান দিলে কেট।

কবি কমলাকান্ত ফুলের মালাটা টাঙিয়ে রেখেছিল একটা হুকে তার পাশেই সবুজ রঙের একটা লেডিজ কোট রয়েছে লক্ষ্য করল সে। রজনীগন্ধার মালাটা সবুজ রঙের পাশে বেশ মানিয়েছে, গাড়ীর দোলায় দুটোই দুলছে। কিন্তু দুলছে একই দিকে, পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারছে না, অবিশ্রাম ও দুটো যেন লুকোচুরি খেলে চলছে। বাইরের দিকে তাকাল কমলাকান্ত, অন্ধকার ভাল লাগে তার, ঘন সূচীভেদ্য অন্ধকার নয়—আবছা, ধোঁয়াটে রহস্যময় অন্ধকার

—অল্প দেখা যায় কিন্তু সবটা বোঝা যায় না। ট্রেনটা শহর ছাড়িয়ে এবার গ্রামের পাশ দিয়ে চলেছে। রহস্যাবৃত অন্ধকারের মধ্যে গাছগুলো সুন্দর দেখতে লাগছে কমলাকান্তের। ঝাঁকড়া চুল নিয়ে মাঠের মধ্যে যেন ছোট ছোট মেয়েরা খেলা করছে—দূরে সরে যাচ্ছে কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারছে না—ঠিক ওই রজনীগন্ধার মালার মত। বুনো ঘাসের গন্ধ পাওয়া গেল, শীতের রাত্তের কুয়াশার সঙ্গে বুনো ঘাসের গন্ধ বেশ লাগে কমলাকান্তের। পানাভরা ডোবা, কলাগাছের ঝাড়, পুকুরের ভাঙা শেওলাপড়া ঘাট, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ, বাংলার নিজস্ব রূপ যেন চোখের ওপর মূর্ত্ত হয়ে উঠল তার। সব জিনিসেরই একটা ছন্দ আছে বলে মনে হয় তার। এই যে ট্রেনটা ছুটে চলেছে এর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সব অবস্থার সঙ্গে যেন একটা অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে, বেশ সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে তাকাল সে। এত জায়গা থাকতে লোকের জায়গা হয় না কেন কে জানে ? মানুষগুলো ছুটে ছুটে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায় কেন, তা কে বলবে ? কিসের আশায় এত ছুটোছুটি পড়ে যায় ? ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্—ইঞ্জিনের আওয়াজটা স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে। আওয়াজটা ঠিক এক রকমের—কোন তারতম্য নেই—ছন্দেরও ব্যতিক্রম নেই ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্। গাড়ীর চাকার শব্দটা কিন্তু ভিন্ন ধরনের—ঘটাঘট-ঘটর-ঘট। অনেকগুলো অজানা অশ্রুত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কারা যেন অরকেষ্ট্রা বাজাচ্ছে। পাশেই একটা সরু নালা চোখে পড়ল কমলাকান্তের—এঁকে-বেঁকে চলেছে, ঠিক যেন বৃহদাকার একটা অজগর সাপ। গাড়ীর সঙ্গে সেটাও যেন এগিয়ে চলেছে। গুম গুম গুম—নালার সাঁকোর ওপর দিয়ে ট্রেনটা যাচ্ছে—ছন্দটা পালটে গেল, তাল ফেরতা করল যেন অদৃশ্য সঙ্গতকারী। আকাশের দিকে একবার তাকাল কমলাকান্ত। ও কোণে যেন একটু মেঘ করেছে বলে মনে হ'ল তার—তরমুজের একটা সরু ফালির মত দেখতে অনেকটা। এ পাশের মেঘটা কিন্তু পেজা তুলোর মত, উড়ে উড়ে চলেছে একপাশ থেকে অন্যপাশে। দূরে একটা পাহাড় দেখা গেল, সেটাও সরে যাচ্ছে। চলমান গাড়ীর মধ্যে থেকে দেখলে সবই গতিশীল বলে মনে হয়। চলছে, শুধু চলছে—সবেরই গতি রয়েছে, বেগ আছে। কোন কিছুই থমকে দাঁড়িয়ে নেই—ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্, ঘটঘট ঘটর ঘট—একটানা স্পন্দন ধ্বনি, ধ্বক্ ধ্বক্—ঠিক হৃদপিণ্ডের মত, অনবরত চলছে, ক্লান্তিহীন অবিরাম গতিতে—ধ্বক্ ধ্বক্।

রেবার কথা মনে পড়ল কমলাকান্তের। কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে রেবা। মাদ্রাজের উকিলের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা এবং কিছুদিন পরেই ওর স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ ও জানে, তার পর শুনেছিল, রেবা নাকি রেলে নার্সের চাকরী নিয়েছে, এখন কোথায় কে জানে। রেবার হাসিখুসি উজ্জ্বল মুখের কথা মনে পড়ল তার, সেই পরিচিত কালো আঁচিলটা, কোঁচকানো চুল, চোখের বাদামী রঙের মণিটা কিছুই ভোলে নি সে।

এক্সকিউজ মি।—তাড়াতাড়ি পা-টা সরিয়ে নিলে কমলাকান্ত। মেমসাহেব পাশ দিয়ে চলে গেল। খুকখুক কাসি হচ্ছে একটু, গলাটাও কেমন যেন খুসখুস করছে। গলার ওপরে হাত দিয়ে ব্যথা নিরূপণের চেষ্টা করল কমলাকান্ত, ঢোক গিলতেও একটু বেদনা অনুভব করল যেন। চিন্তিত হ'ল কবি কমলাকান্ত সরকার। মনে পড়ে গেল—সাহিত্যিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার কথা আছে। গলার বেদনা যদি আরও বেড়ে যায় তা হলে আগেকার দিনের নির্ব্বাক চিত্রের অভিনয়ের অনুরূপই হবে। তাড়াতাড়ি গলায় গরম মাফলারটা জড়িয়ে নিলে কমলাকান্ত—অনেকটা পথ তাকে যেতে হবে ; ইতিমধ্যে যদি গলাটা স্বাভাবিক অবস্থায় এসে যায় তা হলেই মঙ্গল। দু'একবার সশব্দে গলা ঝাড়ল, সে গলার স্বরটা নিজের কানেই শ্রুতিমধুর ঠেকল না। চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ল সে।

কামরার যাত্রীদের ওপর মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করল এবার। সুনীল রায় আর হাসনুর ওপরই স্বভাবতঃ প্রথম দৃষ্টি পড়ল তার। হাসনুর চেহারাটা মোটামুটি ভাল লাগল, কিন্তু ওর সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা রুক্ষতা লুকিয়ে আছে বলে মনে হয় কমলাকান্তের, দুর্মূল্য বাহারে ফুলের অনেকটা চটক আছে হয় ত, কিন্তু লাবণ্য আর পেলবতার অভাবটা সুপরিস্ফুট। মনে মনে কাঁঠালীচাঁপার সঙ্গে মেয়েটির তুলনা করল কবি। মনোরম সন্দেহ নেই, কিন্তু উগ্র সুগন্ধের তীব্রতাটা স্নায়ু বিভ্রমকারী বলা চলে। রজনীগন্ধার মৃদু সুরভি শ্বেত শতদলের শুচিতা খুঁজলে পাওয়া সম্ভব হবে না। প্রাচুর্য্যের দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ আছে প্রচুর কিন্তু মাধুর্য্যের ছোঁয়াচ নেই তাতে। সুনীল রায়কেও ভাল লাগল বেশ। একটা আভিজাত্যের সূক্ষ্ম স্পর্শ লক্ষ্য করা যায় ওর ব্যক্তিত্বের মধ্যে, তবে সজ্জাটা ঠিক পছন্দ হ'ল না কমলাকান্তের।

অনেক বাঙালী আছেন, তাঁরা অন্য প্রদেশের পোশাক পরতে ভালবাসেন, বৈশিষ্ট্য প্রকাশের চেষ্টা করেন হয় ত। সুনীল রায়ের আচকান সালওয়ার পরিহিত সুঠাম চেহারার দিকে নজর পড়ল তার। ভদ্রলোককে ধুতি এবং পাঞ্জাবী পরলে আরও ভাল মানাত বলে মনে হ'ল কমলাকান্তের।

স্বামীজীকে বেশ রসিক বলে মনে হ'ল। তাঁর কথায়

প্রেমিকযুগল খুব হাসছে, লক্ষ্য করল সে। গলাটার ওপর আর একবার হাত রাখল কমলাকান্ত।

স্বামী স্বরূপানন্দ নশ্বরতা সম্বন্ধে সরস ভাবে আলোচনা করছিলেন,—সবই দুদিনের, কিছুই কিছু নয়, আজ আছে কাল নেই, তবে হ্যাঁ, ভালবাসতে হবে—এই যেমন তোমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসো এই রকম। কথাটা বলে আড়চোখে ওদের দিকে তাকালেন স্বামীজী প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্য।

ও ত আমায় ভালবাসে না সাধুজী। হাসনু প্রতিবাদের সুরে বলল। অন্য মেয়ের মত দোষারোপ করার সুযোগ পেলে সহজে সেটা ছাড়ে না হাসনু।

বাসে না? স্বামীজীর মুখভাবে অবিমিশ্র বিস্ময়ের প্রকাশ হ'ল।

সুনীল কথার কোন জবাব দিল না, শুধু হাসল একটু। স্বীকার করলে ছেলেমানুষী হয়, অন্যথায় আবার বিপদ আসার সম্ভাবনাও থাকে।

হাসনু সুনীলের উত্তরের অপেক্ষায় ছিল না। তার মন্তব্যটা সে প্রকাশ করতেই উৎসুক হ'ল। বলল, ও কি বলবে সাধুজী আমি বলছি, ও আমার জওয়ানীকে ভালবাসে, আমাকে নয়।

দার্শনিক সত্যটার প্রকাশে স্বামীজী যেন মোহিত হলেন, হাসনুর দিকে তাকিয়ে ভ্রূর নীচের ক্ষতচিহ্নটায় অঙ্গুলী স্পর্শ করে অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন—মোহ আর মায়া।

এবার হাসনুকে ভাল ভাবে দেখতে লাগলেন তিনি। স্পষ্টভাবে দেখার আর কোন বাধা নেই এখন। হঠাৎ মাধবীর কথা মনে পড়ে যেতে তিনি যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন। হাসনুর ফুটন্ত ঢলঢলে যৌবনপুষ্ট লোভনীয় দেহ-সৌষ্ঠব, আধুনিক সাজসজ্জার চাকচিক্য আর কথা বলার মনোরম ভঙ্গীটার পাশে মাধবীর সাধারণ চেহারা যেন আলুনি, বিস্বাদ আর হ্রুকারজনক বলে মনে হ'ল তাঁর কাছে। কিন্তু বিচলিত হয়ে পড়লে বিপদ আসার সম্ভাবনা আছে, সে কথা তাঁর অজানা নেই। সুতরাং জোর করে মনটার মোড় ফেরালেন স্বামীজী।

হাসনুর কথাটা তখনও শেষ হয় নি, সে বলল, আমার যদি কোন খারাপ অসুখ হয়, এ দেহটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে ও কি আমায় আর ভালবাসবে?

তা ঠিক। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে স্বামীজী চোখ দুটো বন্ধ করলেন, অকস্মাৎ যেন একটি অজানা আর অপ্রিয় সত্যের সামনাসামনি তিনি এসে পড়েছেন। ভাবাবেগে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'ল।

সুনীলও অপ্রস্তুত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যে হাসনুকে সে বললে, তুমি কিছু খাবে না?

না এখন নয়, তুমি?

পরেই হবে—স্বামীজী ত কিছুই খাবেন না। স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে সুনীল বললে।

কথার কোন উত্তর দিলেন না তিনি—মৃদু হাসলেন শুধু, বেঞ্চির তলায় রক্ষিত খাবারের বাক্স থেকে লোভনীয় খাবারের গন্ধ ভেসে আসছে।

এক্সকিউজ মি, আপ কেয়া সাচু হ্যায়। কেট ডগলাস আর নিজেকে সামলাতে পারে নি, সাধুর কাছে সন্তর্পণে এগিয়ে এসেছে সে।

কেটের দিকে তাকালেন স্বামীজী। অন্য খাদ্য উপস্থিত দেখে পুলকিত হলেন তিনি। বললেন, ক্যায়সা বোলেগা?

হাতের তালুটা উলটে তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলেন তিনি, তারপর একদৃষ্টে কেটের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, দিলমে তুমহারা বহুত দুখ হ্যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে এল কেট ডগলাস, হ্যাঁ সাধুজী। দুঃখ অবসানের ইঙ্গিত পেয়েছে সে সাডুজীর কথায় আর উপস্থিতিতে। অপার অসীম দুঃখ রয়েছে তার—ঠিকই ত। আশ্চর্য্য হ'ল কেট সাধুজীর কথা শুনে। পাশে সে, তার পর সাগ্রহে স্বামীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, দুখ ক্যায়সা যায়গা সাডুজী?

হাতঠো লাও। হাতটা এগিয়ে দিল কেট তাঁর দিকে। হস্তবিচার সুরু করলেন স্বামী স্বরূপানন্দ। কেটের নরম তুলতুলে আর দুধের মত সাদা রঙের হাতটা নিজের হাতে গ্রহণ করলেন তিনি। ভ্রূর কাছের তীর্য্যক ক্ষতটার রং পালটে গেল তাঁর, শ্বাস দ্রুত হ'ল কয়েক মুহূর্তের জন্য। একটি হাতের ওপর কেটের হাতটা রেখে অপর হাতের তালু দিয়ে প্রথমে সেটা মুছে নিলেন সযত্নে। শীতকালেও কেটের হাতের তালুটা ঘর্মাক্ত হয় অকারণে। তারপর নিজের অনামিকা দিয়ে কেটের হাতের তালুর ওপর ধীরে ধীরে তুলির ভঙ্গীতে স্পর্শ করতে লাগলেন, যেন হস্তরেখাগুলোকে একাগ্রচিত্তে অনুসরণ করছেন তিনি। এধরনের স্পর্শ মেয়েদের ভাললাগে বলে স্বামীজী জানেন। কেটের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে ব্যাগ্র হয়ে আছে তার ভবিষ্যৎ জানার জন্য। সে খুঁজছে তার তীব্র দুঃখ-অবসানের ওষধি।

হাসনু তাকিয়ে রয়েছে স্বামীজীর দিকে। অপর এক জন স্ত্রীলোকের গোপন দুঃখের ইতিহাস আর তার প্রতি-কারের উপায়টা মন দিয়ে শুনছে সে। সুনীল রায়ও সেদিকে তাকিয়ে ছিল। ইতিপূর্ব্বে তার সম্বন্ধে স্বামীজী

যে মন্তব্য করেছেন সে কথাগুলো তার মনের মধ্যে এখন তোলপাড় করছে। সত্যিই খুব বেশী ঝুঁকি নিয়েছে সে। আফিসের টাকাগুলো আত্মসাৎ করার সময় ভবিষ্যতের ফলাফল সম্বন্ধে তার চেতনা ছিল না। উন্মাদনায় আর উত্তেজনায় তার মনটা সে সময় অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কৃত-কর্ম্মের ফলটা কি হতে পারে সে চিন্তাটা এতক্ষণ ছিল না, এবার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার ছবিটা মানসপটে ফুটে উঠছে যেন। স্বামীজীর ক্ষমতা সম্বন্ধে এতক্ষণ যে অবিশ্বাস আর সন্দেহের ভাবটা ছিল, মেমসাহেবের নির্ভরতা লক্ষ্য করে সেটা অদৃশ্য হয়ে এসেছে প্রায়। স্বামীজীকে একবার নিরি-বিলিতে পেলে ভাল হ'ত, ভাবল সুনীল রায়। কথাটা মনে পড়তেই আত্মরক্ষার দুর্দমনীয় স্পৃহাটা অকস্মাৎ জেগে উঠল তার মধ্যে। জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে যেমন প্রাণটা অস্থির হয়ে ওঠে, সুনীল রায়ের প্রায় সেই শ্বাসরুদ্ধ অসহায় অবস্থার অনুরূপই হ'ল।

হাসনুর দিকে নজর পড়ল এবার। অপরূপ সুন্দর! দৃষ্টিটা যেন ফেরাতে ইচ্ছা হয় না তার। হাসনুর কপালের ওপর কুঞ্চিত চুলের একটা গুচ্ছ এসে পড়েছে পাশ থেকে। সুডোল মুখের ভাবটা মনমুগ্ধকর। সূক্ষ্ম ভ্রুর পাশে সুঠাম নাসিকার রেখাটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে রয়েছে। গ্রীবাভঙ্গীটাও মনোরম। নারী-সৌন্দর্য্যের একজন বিশেষজ্ঞ সুনীল রায়, অনেক দেখেছে সে, কিন্তু এর তুলনা হয় না? সদ্য-ফোটা বাসরাই গোলাপ যেন একটা। ভাল জিনিসের জন্য মূল্য দিতে হয় একটু বেশী, সে কথাটা তার অজানা নেই—আরে বিপদের কথাই বা সে ভাবছে কেন? দুশ্চিন্তাহীন নিরুদ্বেগ শান্ত জীবন চাইলে সে অনায়াসেই পেতে পারত। মালতীর আঁচলের তলায় তার আশ্রয়ের অভাব হ'ত না নিশ্চয়ই। তা হলে অবশ্য শুধু কূপমণ্ডুকের মত তাকে ওই ছোট্ট গণ্ডীটার মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে হ'ত। ঘড়ির কাঁটার মত একঘেয়ে ভাবে চলতে হ'ত অবিরত, ছবিটা যেন দেখতে পেলাম। সুবোধ বালকের মত আফিস থেকে বাড়ী এবং বাড়ী থেকে আফিস যেত আর আসত মাকুর নির্ভুল চলনের মত! ছুটির দিনে বাড়ীর আসবাবপত্র সাফ-করা। কোন-দিন বা মালতীকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়া, অন্যায় পরশ্রী-কাতর আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী গিয়ে অখাদ্য-খাবার এবং দুর্গন্ধ-যুক্ত চা গলাধঃকরণ করে শরীর নষ্ট করা, আর না হলে মালতীর পছন্দ ও ফরমাস মত লেশ, উল বা শাড়ীর পাড় খুঁজে নিয়ে আসা। ব্যাপারটা চিন্তা করতেই মনটা কুঁকড়ে গেল তার। অসম্ভব! তা হলে তার এই সুন্দর চেহারার অর্থ কি রইল।

হাসনু একবার তাকাল ওর দিকে, দেখল সুনীল রায়ও মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাসল হাসনু। সেই মধুর প্রাণমাতানো হাসি, যে হাসি অনেকের রক্তস্রোতে জ্বলন্ত তরল আগুন ঢেলেছে, যে হাসির আকর্ষণে অনেক পতঙ্গই ঝাঁপিয়ে পড়েছে অনাহুত ভাবে। ঠিক এই হাসিটা যে কত লোকের সামনে এবং কতবার হেসেছে তার সংখ্যা গোনা অবশ্য সম্ভব নয়, কিন্তু শ্রীলেখা এই অপরূপ হাসিটার জন্যেই সিনেমা-দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জ্জন করতে সুরু করেছে। সিনেমা লাইনে হাসনু সম্প্রতি এসেছে তবে ইতিমধ্যেই স্থায়ী আসন সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলে মনে হয়। হাসনুর বুদ্ধি তার রূপের মতই প্রচুর, সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই দুই আর দুইয়ে আবশ্যক ও সুবিধা মত চার বা বাইশ করতে দেরী হয় নি তার। বোম্বাইয়ে অবশ্য প্রথম গিয়েছিল সে, কিন্তু বাজারে সেখানে ভীড় বেশী, রীতিমত গরম বলা চলে। পাওয়ার আশায় দিতে হয় প্রচুর, আর শেষ অবধি মূলধনটাও অবশিষ্ট থাকে না, আর সময় নষ্ট না করে সে চলে এসেছিল বাংলাদেশে। এখানের ফিল্মজগতে প্রবেশ করতে তার বেশী সময় লাগে নি। অর্থের দিক থেকে একটু ঘষা-মাজা, দরদস্তুর আছে বটে, কিন্তু একবার মার্কেট ক্রিয়েট করে নিতে পারলে আর ভাবতে হয় না, অপরিযাপ্ত ঐশ্বর্য্য এসে পড়ে অনায়াসেই।

বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য কয়েকটা অব্যর্থ উপায় অবশ্য হাসনু জেনে নিয়েছে এবং নানুভাই দেশাই-এর মত মালিক বাংলার ফিল্মজগতে বিরল নয় তাও সে জানে। নানুভাই-এর বাগান-বাড়ীতে উপযুক্ত সুবিধা ও অর্থের বিনিময়ে কয়েকবারই সে তার নৃত্যকলার নিদর্শন দিয়ে এসেছে! আর খতিয়ে দেখতে গেলে এই লেন-দেনে লাভ তার এ পর্য্যন্ত কিছু কম হয় নি। নানুভাই দেশাই ছাড়া অন্য কয়েকজন যেমন ডাইরেক্টার বীরেন ভড় তার দিকে কুৎসিত লোমশ হাত বাড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু সেগুলো পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাবার মত কূটবুদ্ধি তার যথেষ্ট ছিল এবং এখনও আছে। কয়েকজন পাওরিয়া ও অন্যরিয়া গ্রন্থ নামকও মালিকের ইসারায় তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। কিন্তু তারাও নিরাশ হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত ভালবাসার সাঁড়াশী দিয়ে তাকে কোন ফিল্ম কোম্পানীতে টেনে রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। সেই জন্যই সুনীল রায়কে হাসনুর ভাল লেগেছিল, ওদিক দিয়ে তার প্রকৃত পরিচয়টা সঠিক জানা না থাকলেও হাসনু সুনীলকেই সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছিল। তাদের জীবনে এবং ব্যবসায়ে ভালবাসা আর একনিষ্ঠতা শুধু পাপ নয়—অন্যায়। এক কথায় মূল্যবান বোকামী বলা চলে। কিন্তু সঙ্গীহিসেবে একজনের প্রয়োজন

থাকে। তাকে সুবিধা এবং পছন্দ মত পালটানো চলে যতবার দরকার হয় ততবার।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সুনীলের অনুপস্থিতিতে সাধুজীর কাছ থেকে নিজের সম্বন্ধে কয়েকটা ভবিষ্যৎ বাণী সে শুনেছে। সুনীল যে শীঘ্রই পক্ষবিস্তার করবে সে কথা তাকে নিভৃতে সাধুজী বলেছেন। হাসনু তাতে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। বরঞ্চ একটু খুসীই হয়েছিল যেন। নতুন সাথীর নববন্ধনে ধরা দেবার জন্য সে ব্যাগ্রভাবেই অপেক্ষা করছিল, বোধহয় ইদানীং সুনীলকে তার একঘেয়ে লাগছিল। চেহারা সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু বলিষ্ঠতার অভাব আছে বেশ, তা ছাড়া চেহারা সুন্দর বলে সুনীলের আত্মতুরিতা শুধু অস্বস্তিকর নয়, অপ্রীতিকরও বটে। লক্ষ্ণৌর মনসুর আলীর চেহারা ও ধারণাই করতে পারবে না। নিরঞ্জন ভার্গবের তুলনায় ও আর এমনকি? সত্যজিৎ কাপুরের পাশে দাঁড়াতে পারবে সুনীল রায়? তা ছাড়া সম্প্রতি ধীরেন ভড়ের কাছে ও শুনেছে যে, সুনীল রায় বিবাহিত এবং তার স্ত্রীও নাকি সুন্দরী।

হাসনু লক্ষ্য করে দেখেছে যে বিবাহিতদেরই পদস্খলন হয় বেশী। অবিবাহিতরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের সামলাবার সামর্থ রাখে। তবে রক্তের স্বাদ পেলে সবাই সে রক্তের পেছনেই ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত ঘুর ঘুর করে তাও তার অজানা নেই। হাসনুর আর ভাল লাগছে না। কোন রকমে সুটিংগুলো শেষ করতে পারলে সে বাঁচে। সম্প্রতি সুনীল রায় নাকি বেশ কিছু টাকাও সংগ্রহ করেছে বলে শুনেছে সে। তার প্রাপ্যটা নিতে দেরী করলে শেষ অবধি হয়ত তাকে নিরাশ হতে হবে। কারণ এ ধরনের হঠাৎ প্রচুর টাকার মালিক হওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে সে কয়েকবার শুনেছে। প্রেরণা অবশ্য সেই জুগিয়েছে। উপায়টা এবং পরিণতি সম্বন্ধেও কিন্তু তার বেশ সুস্পষ্ট ধারণা আছে সুতরাং আগে বুঝে কাজ না করতে পারলে পরে পস্তাতে হবে তাকেই। সাধুজীর প্রতিশ্রুত শক্তাবিজটাও নিয়ে নিতে হবে। শ' আড়াই টাকা খরচ হবে বলে বলেছেন। তা হোক, এমন আর বেশী কি, ভাবলে হাসনু। টাকাটা সুনীল রায়ের কাছ থেকে সহজেই মিলবে একবার শুধু সেই হাসিটা দেখলেই যথেষ্ট। বিষ-পাথর সামনে ধরলে যেমন বিষাক্ত কেউটে কুঁকড়ে কেঁচো হয়ে যায়, ঠিক তেমনি। চিন্তাটা উপভোগ হ'ল হাসনুর কাছে, মনে বলও পেল সেই সঙ্গে। যুদ্ধোপযোগী হাতিয়ার মজুত থাকলে মনোবল বাড়ে বৈকি। তা ছাড়া মাদুলী তাবিজের ওপর ভক্তি হাসনুর অগাধ। কেটের মত তারও বিশ্বাস জন্মেছে পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার ফলে। সত্যজিৎ কাপুরের বেলায় সন্ন্যাসী-প্রদত্ত মাদুলীর জোরেই সে জয়ী হয়েছিল। সেকথা হাসনু কোনদিনই ভুলবে না। কত বিরুদ্ধমুখী ঘাত-প্রতিঘাতই না এসেছিল সেই সময়ে। মানুষের সাধ্য ছিল না তাকে সাহায্য করে কিন্তু আশানুরূপ ফলই পেয়েছিল সে। যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা কিছু করতে পারে নি, সেখানে একটা সামান্য মাদুলী তার সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল একথা চিরদিনই তার মনে গাঁথা থাকবে। হাসনু জানে যে প্রত্যেক জিনিসটাই সংগ্রহ করতে হয়। আর সেই প্রচেষ্টায় যে বাধাগুলো সামনে এসে অভিষ্টলাভের অন্তরায় হয় তাদের জয় করতে হয় এক একটা করে।

ক্রমশঃ

যবনিকা

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

মধ্য শীতের বৃদ্ধ দুপুর প্রলাপ বকিছে বুঝি
দেউলিয়া নীল শূন্যের পানে বিছায়ে স্মৃতির পুঁজি
ঝাপ্সা চোখের জ্যোতি ;
হায় ভাগীরথী ! গাঁথিবে কে মালা কুড়ায়ে ছড়ানো মোতি !
শত গম্বুজে স্তম্ভিত যত দম্ভের ভেরীনাদে
নির্জনে আজ বর্জিত প্রেত ভগ্নহৃদয়ে কাঁদে।
অখ্যাত শিলালিপি
ফেনিলোচ্ছল মত্তত৷ 'পরে এঁটে দিলো কালো ছিপি।
ওগো উৎসুক কৌতুকে কেহ শুধায়োনা আজ কভু
কোন ধূলিতলে লীন হয়ে গেছে ক্রীতদাস আর প্রভু ;
কখন যে চুপে চুপে
আপন খড়্গে বলি জল্লাদ নিয়তি-বেদীর যূপে।
কালের ফরাস ঝাঁট দিয়ে চলে রাজ্যপাটের রাশ,
তাই ইতিহাসে এসেছে, বুলুয়া, মরু বিজয়ের ঘাস
ঝরা পাতাদের তলে
হারানো স্রোতের মরা ঢেউদের নির্বাক কোলাহলে।
লালবাগ থেকে উটের মিছিল খোসবাগে সাঁঝে বুঝি
সার্থক কোন ভাগ্যে পেয়েছে প্রহসন শেষ খুঁজি
ক্ষণভঙ্গুর স্তূপে
ঝলসানো আঁখি সমারোহ ফাঁকি মৃত্যুর অপরূপে।
অপরাজয়ের সিংহচর্ম বর্ম নিল কে কাড়ি
জবাবদিহির পুঁথির পাতায় নবাবের তরবারি
কাহার করুণা মাগে,
হাজার দুয়ারী ! দুপুরের চিলে কিসের তরাস লাগে !
মধ্য শীতের বৃদ্ধ দুপুর পশ্চিমে পড়ে ঢলে
বদ্ধ কূপের অন্ধকারের অর্থ কি যায় বলে
ডাক দিয়ে কঙ্কালে ?
শুধু সম্রাট রাতের সভায় ঝাড়বাতি কেউ জ্বালে।

একজন তো আছে

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভোরের বাতাস ডাক দিয়ে যায়
পাতার কানাকানি।
আমার কথা সবার মাঝে
হোক না জানাজানি,
এই কথাটি আজকে আমি,
বলবো সবার কাছে।
কেউ বা যদি না থাকে মোর
একজন তো আছে॥

ঘাসের বনে ঢেউ উঠেছে সবুজ ইসারায়।
অসীম আকাশ কান পেতেছে দিগন্তেরি গায়,
এমন দিনে সাধ জেগেছে বলবো তাদের কাছে।
কেউ বা যদি না থাকে মোর একজন তো আছে॥

নীল যমুনা আজও উজান আজও কদম ফোটে,
মাটির বুকে ঝাঁপ দিয়ে ঐ আকাশ-তারা ছোটে।
এই কথাটি পরাণ ভরে বলবো তাদের কাছে,
কেউ বা যদি না থাকে মোর একজন তো আছে॥

তপ্ত মরুর অশ্রুভরা এই জীবনের খেলা।
তারি মাঝে সূর্যধনুর সাতটি রং-এর মেলা॥
আপন মনে এই কথাটি বলবো নিজের কাছে।
কেউ বা যদি না থাকে মোর একজন তো আছে॥

মুক্তা কুড়ায় সাগর বেলায় শ্যামলবরণ মেয়ে;
কচি কিরণ মাধুরীমায় অঙ্গ গেছে ছেয়ে॥
আমার কথা কেমন করে বলবো রে তার কাছে ?
কেউ বা যদি না থাকে মোর একজন তো আছে॥

আচার্য সংলাপিকা

শ্রীসুখময় সরকার

বর্তমান বর্ষে ৪ঠা কার্তিক স্বর্গত আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী। দীর্ঘ আট বৎসর ব্যাপিয়া আচার্যদেবের অনুলেখকরূপে তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য লেখকের জীবনে ঘটিয়াছিল। প্রতিদিন অন্ততঃ দুই ঘণ্টা একত্র থাকার ফলে প্রবন্ধাদি রচনার ফাঁকে ফাঁকে উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। এই সকল সংলাপের মধ্য দিয়া আচার্যদেবের জীবনের নানা ঘটনা, তাঁহার সাধনা, প্রকৃতি, মতবাদ ও জীবন-দর্শন সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। আচার্যদেবের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার বাণীময়ী পুণ্যস্মৃতি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যাইতেছে। তাঁহার সাধারণ সংলাপের ভাষাও এত মার্জিত ছিল যে, তাহা অবিকল স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারা যাইত। সংলাপগুলির কাল অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

[প্রথম সাক্ষাৎ। ১৯৪৭ সনের শীতকাল]

আচার্যদেব। দেখি তোমার খাতাটা। (লেখকের হাত হইতে খাতা লইয়া পাতা উল্টাইয়া) এ যে গীতার শ্লোক! হাতের লেখাটি কার?

লেখক। মায়ের।

আ। মায়ের! তোমার মামাবাড়ী কোথায়?

লে। বেলেতোড়ে।

আ। ও—বিদ্দ্বল্লভ মহাশয়ের গ্রামে! তা তুমিও, দেখছি, পণ্ডিতার পুত্র। (খাতার পাতা উল্টাইয়া) তোমার হাতের লেখাটি তো চমৎকার। দেখছি, রেফ যুক্ত দ্বিত্ব বর্জন করেছ। কিন্তু গু, রু, শু—এগুলো পুটলি দিয়ে লিখেছ কেন? (একটু থামিয়া) তোমার দোষ নাই, সবাই এমনি করে। যা'ক, আমার প্রবন্ধে হ্রস্ব-উ-কার, দীর্ঘ-উ-কারগুলো সব সময় অক্ষরের নীচে লিখবে। আর, যুক্তাক্ষরগুলো বিকলাঙ্গ ক'রো না, স্পষ্ট দেখিয়ে দেবে।

লে। আচ্ছা।

[ঐ বৎসর কয়েক মাস পরে]

আচার্যদেব। কলেজ-ম্যাগাজিনে তোমার একটা লেখা পড়লাম। চমৎকার লিখেছ। ভাবটি যেমন বিশুদ্ধ, তেমনি সুমিষ্ট। এরই নাম প্রসাদগুণ। তুমি বাংলায় অনার্স নিয়েছ তো?

লেখক। এখানকার (বাঁকুড়া) কলেজে বাংলায় অনার্স পড়ানো হয় না। স্পেশ্যাল পার্মিশন আনিয়ে পড়ছি। কিন্তু প্রোফেসর প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন; তিনি তো অসুস্থ। আচ্ছা, আপনি কোন সাবজেক্টে অনার্স নিয়েছিলেন?

আ। আমাদের সময়ে বি-এতে অনার্স ছিল না; এম-এ পরীক্ষায় অনার্স ছিল।

লে। সেটা কি রকম?

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়

আ। বি-এ পাস করবার এক বৎসর পরে যে ছাত্র এম-এ পরীক্ষা দিয়ে পাস হ'ত, সে এম-এ অনার্স হ'ত। আমি এম-এ অনার্স।...আচ্ছা, তুমি আই-এতে লজিক পড়েছ?

লে। আজ্ঞে হাঁ।

আ। বেশ। লজিক না পড়লে বিচার-বুদ্ধি উজ্জ্বল হয় না। আজকাল যারা বিজ্ঞান পড়ে তারা লজিক পড়ে না। কিন্তু লজিক না জেনে বিজ্ঞান পড়া বৃথা। আমরা লজিক আর বিজ্ঞান এক সঙ্গেই পড়েছি। সায়েন্সের ফরমুলা মুখস্থ করলে কিংবা ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেণ্ট দেখলেই তো scientific bent of mind হয় না। ওর জন্যে লজিক পড়া চাই।

[১৯৪৮ সনের মে মাস]

লেখক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখছি, আপনি বাংলার অনেক প্রাচীন কবির কাল নির্ণয় করেছেন। আচ্ছা, প্রাচীন কবিরা অমন হেঁয়ালীতে গ্রন্থরচনার কাল লিখতেন কেন?

আচার্যদেব। ওটা সে যুগের ফ্যাশান ছিল আর কি। কবি বোধ হয় পাঠকের বিদ্যার দৌড় দেখতে চাইতেন, কিংবা পাঠকের সঙ্গে কৌতুক করতেন। তা ওটা মন্দ রীতি ছিল না। আমিও "কবিশকাব্দ" প্রবন্ধে আমার জন্ম-তারিখ, হেঁয়ালীতেই বলেছি। দেখেছ?

লেখক। আজ্ঞে, হাঁ।

সপ্তদশ গজ পৃষ্ঠে ইন্দু অন্তরিত।
তুলাদণ্ডে ধরি, বেদ গুরু উপনীত॥

আচার্যদেব। ও:! মুখস্থ করে ফেলেছ, দেখছি। মানে বুঝেছ কিছু?

লেখক। ভাল বুঝতে পারি নি।

আচার্যদেব। সপ্তদশ=১৭, গজ=৮, ইন্দু=১। তুলা=কার্ত্তিক মাস, বেদ=৪, গুরু=বৃহস্পতিবার। ১৭৮১ শকাব্দের ৪ঠা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবারে আমার জন্ম।

[ঐ বৎসর জুলাই মাস]

আচার্যদেব। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাই থেকে চিঠি লিখেছেন। একটা উত্তর দিতে হবে। আচ্ছা, লেখ তো— 'জল্পক-মহাশয়েষু'···

লে। জল্পক! তার মানে?

আ। 'জল্পক' মানে গল্প-লেখক। জল্পন-বৃত্তিই তো গল্প-লেখকদের কাজ।

লে। তা বুঝলাম। কিন্তু অত বড় সাহিত্যিককে আপনি 'জল্পক' বলছেন! তিনি কি ভাববেন?

আ। কিছু ভাববেন না তিনি। তুমি লেখ তো। তিনি আমায় গুরুজনের তুল্য ভক্তি করেন।

লে। আচ্ছা, শরদিন্দুবাবুর লেখা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

আ। আমার মতের কোন মূল্য নেই। আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্য-সমালোচকও নই। তবে শরদিন্দুবাবুর কল্পনা-শক্তি দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হয়। পড়তে পড়তে মনে হয়, আমি আর এ জগতে নেই।

লে। আপনি নিজে পড়তে পারেন?

আ। পারি বৈ কি। ছাপার অক্ষর পড়তে অসুবিধা হয় না। তবে এক সঙ্গে এক ঘণ্টার বেশী পড়তে পারি না। (তখন আচার্যদেবের বয়স ৯০ বৎসর)।

[মাস তিনেক পরে]

লেখক। আপনি কি ব্রাহ্ম?

আচার্যদেব। তোমার এ রকম ধারণার কারণ কি?

লে। আমি একজনের মুখে শুনেছিলাম। আপনাদের আমলের বড় বড় বিদ্বানেরা অনেকেই তো ব্রাহ্ম ছিলেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রামানন্দ, আনন্দমোহন।

আ। না, আমি ব্রাহ্ম নই, আমি হিন্দু। অবশ্য ব্রাহ্মও হিন্দু, কুসংস্কারমুক্ত হিন্দু। রামানন্দবাবু ছিলেন আদর্শ ব্রাহ্ম; তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। আমি হিন্দু, আমি শাক্ত। আমার পিতা-পিতামহ শাক্ত ছিলেন। আমার পূর্ব-পুরুষ রাজা রণজিৎ রায় ঘোর শাক্ত ছিলেন; গভীর রাত্রে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে জপ করতেন।

লে। রাজা রণজিৎ রায়! কোথাকার রাজা?

আ। আরামবাগের দিগড়া গ্রামের জমিদার। সেখানেই তো আমার পৈতৃক নিবাস।

লে। তা বাঁকুড়ায় এলেন কেমন করে?

আ। বাবা ছিলেন বাঁকুড়ার সবজজ। এখানে কর্ম্মরত অবস্থাতেই তাঁর কাল হয়। আমাদের দিগড়া গ্রাম তখন ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যেতে বসেছিল। বাবার ইচ্ছা ছিল, এখানেই বাস করবেন। আমার পড়াশোনাও এখানেই আরম্ভ হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলা স্কুলেই তো আমার ইংরেজী শিক্ষায় হাতেখড়ি।

লে। পিতার মৃত্যু হ'লে আপনি কি করলেন?

আ। বাড়ী ফিরে গেলাম। পরে বর্ধমান-রাজ-স্কুলে ভর্তি হ'লাম। সেখান থেকে স্কলারশিপ নিয়ে এণ্ট্রান্স পাস করলাম। তারপর হুগলী কলেজ আর কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে কটকে রেভেনশ' কলেজে বিজ্ঞানের প্রোফেসর হ'লাম। কটকে আমার ছত্রিশ বছর কেটেছে। ষাট বছর বয়সে কলেজ থেকে রিটায়ার্ড হয়ে আবার বাঁকুড়ায় ফিরে এসে বাড়ী করেছি। এখানেও প্রায় তিরিশ বছর কেটে গেল।

লে। কটকে ছত্রিশ বছর ছিলেন একটানা?

আ। হাঁ, একটানাই বলা চলে। মাঝখানে বছরখানেকের জন্যে একবার হুগলী মাদ্রাসা কলেজে আর মাস দুইয়ের জন্য চট্টগ্রামের একটা কলেজে কাজ করেছিলাম। ছত্রিশ বছর ধ'রে উড়িষ্যায় কত ছেলে মানুষ করেছি, তার সংখ্যা নেই। তখন প্রায় সব প্রোফেসরই ছিলেন বাঙ্গালী। হরেকৃষ্ণ মহতাব, প্রাণকৃষ্ণ পড়িজা—এঁরা সব আমার ছাত্র! সেই চৈতন্যদেবের আমল থেকে বাঙ্গালাই ত উড়িষ্যাকে পথ দেখাচ্ছে। আজকাল ওরা স্বীকার করতে চায় না।

লে। আপনি যখন কটকে ছিলেন, নেতাজী সুভাষ তখন ওখানে ছিলেন ত?

আ। হাঁ, সুভাষ তখন ছেলে-মানুষ। আমি রেভেনশ' কলেজের প্রোফেসর আর সুভাষ রেভেনশ' কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। মাঝে মাঝে সে আমার কাছে আসত। সে ছিল আজন্ম নেতা। সেই বয়সেই, দেখেছি, একদল ছোকরা তার পিছনে পিছনে ঘুরছে। তাকে দেখেই বোঝা যেত, ভবিষ্যতে সে একটা অসাধারণ কিছু হবে। নিজের সম্বন্ধে আবাল্য তার একটা বিরাট ঔদাসীন্য

ছিল। পায়ে জুতো নেই, জামায় বোতাম নেই, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। জিজ্ঞাসা করতাম, "সুভাষ, তুমি এভাবে থাক কেন?" সে বলত, "এই ত বেশ চলে যাচ্ছে।" ওর বাবা জানকীবাবু কটকে ওকালতি করতেন, তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। নানা সূত্রে ওঁদের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল আমাকে। ওঁদের বাড়ীতেও গিয়েছি অনেকবার। দেখেছি, ওঁদের পরিবারে ঐ ভ য ছেলেটা যেন খাপছাড়া। সুভাষ ওঁদের পরিবারের আড়ম্বর আর বিলাস-ব্যসনের ধার দিয়েও যেত না।

লে। আচ্ছা, উড়িষ্যায় যে, এতদিন ছিলেন, সেখানকার কোন জিনিসটা আপনাকে সবচেয়ে বেশী ষ্ট্রাইক করেছিল?

আ। অদ্ভুত দেশ উড়িষ্যা! ওদের যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশী ষ্ট্রাইক করত, সেটা হ'ল 'জাত' নিয়ে। কথায় কথায় ওদের জাত যাবার ভয় ছিল। আমি একদিন একটা চাকরকে বললাম, "ওরে, কতকগুলো কাঠ কেটে দে ত।" সে বললে, "মোর জাতি যিব।" মানে—আমার জাত যাবে। আমি কয়েকটা হাঁস পুষেছিলাম। একদিন সেগুলো চলে যাচ্ছে দেখে একটা চাকরকে বললাম, "ওরে, হাঁসগুলো ডেকে দে ত।" সে বললে, "মোর জাতি যিব।" জাত যাবার ভয় যাদের এত বেশী, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গিয়ে দেখ, তারাই আবার ছত্রিশ জাত একত্র হয়ে পরস্পরের ছোঁয়া খাচ্ছে, এঁটো খাচ্ছে নির্বিবাদে! (কিছুক্ষণ থামিয়া) হাঁ, ভাল কথা। কাল তোমার ছুটি। সকালে আমি ব্যস্ত থাকব।

লে। কেন?

আ। কাল যে মহালয়া, তর্পণ-শ্রাদ্ধ করতে হবে।

[১৯৫০ সনে এপ্রিল মাসের কথা। ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হইয়াছে। আচার্যদেব লেখককে স্নেহবশতঃ কৌতুক করিয়া মাঝে মাঝে 'গণেশ' বলিয়া ডাকেন। ভাবটা এই, তিনি 'বেদব্যাস', আর তাঁহার অনুলেখক 'গণেশ।']

লেখক। এখন সকালের দিকে সময় হয়ে উঠছে না, কাল থেকে বিকেলে আসব।

আচার্যদেব। কেন, গণেশ! ব্যাপার কি?

লে। সকালে একটা টোলে সংস্কৃত পড়তে যাই।

আ। সংস্কৃত পড়ছ? বেশ, বেশ। সংস্কৃত না জানলে ভারতীয় কোন ভাষায় ব্যুৎপত্তি হয় না। সংস্কৃত না জানলে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় না। সংস্কৃত না জানলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সংস্কৃত পড়, ভাল করে পড়। এখানে সারস্বত সমাজ সংস্কৃত পরীক্ষার কেন্দ্র পরিচালনার ভার নিয়েছেন। এজন্যে আমি অনেক উদযোগ, অনেক পরিশ্রম করেছি। বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় সংস্কৃতকে Optional ক'রে দেওয়ার কথা চলছে। যাদের মাথায় এই বুদ্ধি এসেছে, তা-দিকে আমি পণ্ডিত মনে করি না। বিদেশে সংস্কৃতের আদর বাড়ছে, আর আমাদের দেশেই সংস্কৃতের অনাদর হচ্ছে। ......যাক। বঙ্গ-বিদ্যালয়ে যে মাষ্টারী করছিলে, ছেড়ে দিলে?

লে। ছেড়ে দিই নি, ওখানে তিন মাসের জন্যেই ঢুকেছিলাম।

আ। তুমি বঙ্গ-বিদ্যালয়ে তিন মাস মাষ্টারী করলে, আর আমি তিন মাস বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। বঙ্গ-বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার জীবনের একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা জড়িত হয়ে আছে।

লে। কি রকম?

আ। বাবা যখন প্রথম আমায় এখানে নিয়ে এলেন, তখন সেপ্টেম্বর মাস। কোন স্কুলে ভর্তি করতে চাইলে না, বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমার বড় ভাই মারা গেলে আমার জন্ম হয়, তাই আমার নাম দেওয়া হয় 'হারাধন'। আমাদের বাড়ীর একটা চাকরের নামও ছিল 'হারাধন'। একদিন বাবা ডাকলেন, "হারাধ—ন।" আমিও সাড়া দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে চাকরটাও সাড়া দিলে। আমার বয়স তখন দশ বছরের বেশী নয়। মনে মনে ভারী রাগ হ'ল। কি! চাকরের নাম আর আমার নাম এক! আজই নামটা বদলাতে হবে। রাগ করে খেলাম না সেদিন। নামটা যে বদলাতে হবে, এই খবরটা কেমন করে স্কুলে গিয়ে পৌঁছেছিল। স্কুলে যেতেই পণ্ডিতমশায় গোটা পঞ্চাশেক নামের একটা লম্বা ফর্দ দিয়ে বললেন, "তোমার কোন নামটা পছন্দ, বেছে নাও।" অতগুলো নামের মধ্যে 'যোগেশ' নামটাই আমার পছন্দ হ'ল। সেদিন নিজেই নিজের নাম দিলাম 'যোগেশ'। আমি স্বনামধন্য পুরুষ, বুঝেছ হে? (হাসিয়া উঠিলেন)।

[১৯৫১ সন। জুলাই মাস]

আচার্যদেব। কলেজিয়েট স্কুলে আবার মাষ্টারি আরম্ভ করেছ আমিও সারা জীবনটা মাষ্টারি করে কাটালাম, তুমিও মাষ্টার হলে। তাই হও। তোমার যে প্রকৃতি তাতে মাষ্টার ছাড়া আর কিছু হতে পারবে না তুমি। তা মাষ্টারিই যদি করবে, বি-টি টা পাস করে নাও।

লেখক। ইচ্ছে ত আছে। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে দশ মাস থাকতে হবে, তাতে অনেক অসুবিধে।

আ। দশ মাস! কি আশ্চর্য! বি-টি পড়বার জন্য দশ মাস সময় নষ্ট করার মানে কি? যে ছেলে বি-এ, এম-এ পাস করেছে তাকে ত আর ভাষা-সাহিত্য শেখাতে হবে না। শিক্ষাদানের কৌশলটুকু কেবল শিখিয়ে দেওয়া। সে জন্যে তিন মাস যথেষ্ট। বছরে তিন ব্যাচ শিক্ষককে অনায়াসে ট্রেনিং দেওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, বি-টি পাস যদি না কর, কি হবে?

লে। বেতন কম হবে। এখন বি-টি পাস করা আর বি-টি পাস না করা শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের পার্থক্য খুব বেশী নেই। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে পার্থক্যটা খুব বেশী হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি

যে শিক্ষক বি-টি পাস নয়, শিক্ষক-সমাজে সে অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে।

আ। কোন্ শিক্ষাবিদের মাথায় এই বুদ্ধি গজিয়েছে? বি-টি পাস করা শিক্ষকের ছাত্রেরা কি বি-টি পাস না করা শিক্ষকের ছাত্রদের চেয়ে বেশী বিদ্যা লাভ করে? যে শিক্ষক বি-টি পাস করে, সে ত শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলো থিওরি শিখে; সে সব থিওরি কি কোন দিন কাজে লাগাবার সুযোগ পায়? তা ছাড়া বি-টি পাস হলেই যে ভাল শিক্ষক হবে, তার নিশ্চয়তা কি? আমি মনে করি, Like poets, teachers are born. আর, যে শিক্ষক born teacher নয়, তার দ্বারা ছাত্রের কোন উপকার হয় না।

[ঐ বৎসর পূজার কিছু পরে।]

আচার্যদেব। গণেশ, এবার তোমাকে দিয়ে বৈদিক-কৃষ্টি লেখাব।

লেখক। বৈদিক কৃষ্টি। 'কৃষ্টি' কি?

আ। 'কৃষ্টি' শব্দটা তোমরা পছন্দ করবে না, তা জানি। তোমরা ত রবীন্দ্রনাথের চেলা।

লে। আমি বিশেষ কারও চেলা-টেলা নই। তবে 'কৃষ্টি' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, জানতে ইচ্ছা হয়। 'বৈদিক কৃষ্টি' না বলে আপনি 'বৈদিক সংস্কৃতি' কিংবা 'বৈদিক-সভ্যতা'ও ত বলতে পারতেন।

আ। দেখ, সভ্যতা, সংস্কৃতি আর কৃষ্টি—এ তিনটে এক জিনিস নয়। সভ্যতা হচ্ছে কোন জাতির উৎকর্ষের বস্তু প্রকাশ। মোহেন্-জো-ডেরোতে যে পুরাকৃতি পাওয়া গেছে, সে গুলো সিন্ধু-সৌবীর জাতির নিদর্শন। সভ্যতা Civilization. যে কাজে মানসিক উৎকর্ষের প্রমাণ পাই, তার নাম সংস্কৃতি। 'ভরত নাটাম্' হিন্দুর প্রাচীন সংস্কৃতির উদাহরণ। সংস্কৃতি হ'ল Refinement. আর, যে কর্মে কোন জাতির বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়, আমি তাকে বলি 'কৃষ্টি'। 'এক' থেকে 'নয়' পর্যন্ত ন'টা রাশি আর একটা শূন্যের সাহায্যে যাবতীয় সংখ্যা লেখার পদ্ধতি প্রাচীন হিন্দুরাই আবিষ্কার করেছিল। এটা তাদের কৃষ্টির নিদর্শন। কৃষ্টি মানে Culture বেদের যে দিকটা দিয়ে আমি আলোচনা করেছি বা করব, তাতে প্রাচীন আর্যদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষই প্রমাণিত হবে। 'কৃষ্টি' শব্দটা আমি Coin করিনি; বেদেই 'কৃষ্টি' শব্দ রয়েছে। বেদে আছে, 'পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ।' টীকাকারেরা তার মানে করেছেন—পাঁচটি কৃষক জাতি। এই অর্থ ঠিক নয়। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে—পঞ্চ নদীর তীরে উদ্ভূত পাঁচ প্রকার কৃষ্টি বা Culture. আমি যখন প্রথম 'কৃষ্টি' শব্দ ব্যবহার করি, তখন রবীন্দ্রনাথ শব্দটার উপর বিদ্রূপ-বাণ হেনেছিলেন। কিন্তু রামানন্দবাবু আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আমার সমর্থন করেছিলেন।…বৈদিক কৃষ্টির বয়স কত, জান?

লে। ইতিহাসে পড়েছি, খ্রীষ্ট জন্মের দু'হাজার বছর আগে আর্যেরা ভারতে আসেন। তার পর পঞ্চ নদের তীরে তাঁদের সভ্যতা বা কৃষ্টি গড়ে উঠে।

আ। ও মতটা একেবারে ভ্রান্ত। আমি প্রমাণ করেছি—এবং করব, ভারতে আর্য কৃষ্টির বয়স দশ হাজার বছরের কম নয়। প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর।

[১৯৫২ সনের কথা। বৈদিক দেবতা, পূজাপার্বণ ও পৌরাণিক উপাখ্যান লইয়া প্রবন্ধ লেখা চলিতেছে। প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় চিত্রও লিখিত হইতেছে।]

আচার্যদেব। গণেশ, 'বিশ্বভারতী' পূজাপার্বণ সম্বন্ধে আমার একখানা বই প্রকাশ করতে চান। পূজা-পার্বণ সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু লিখি নি। আর লেখার সময় নেই, শক্তিও নেই। যে ক'টা প্রবন্ধ আছে, একত্র করে বই করে ফেল। যে সব পূজা-পার্বণের কথা বাদ পড়েছে, কিংবা সংক্ষেপে সেরেছি, সেগুলো তোমাকে লিখতে হবে। আমার বিশ্বাস আছে, তুমি পারবে। কাল-নির্ণয়ের জন্য আমার আবিষ্কৃত সূত্র ব্যবহার করতে পার। এত দিন লিখছ, নিশ্চয় আমার line of thinking বুঝতে পেরেছ।

লে। অল্প-স্বল্প বুঝি; সব কি বুঝতে পেরেছি? আপনার আদেশ পালন করতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।…আচ্ছা, বৈদিক কৃষ্টির প্রাচীনতা নির্ণয়ে আপনি জ্যোতিষের সাহায্য নিচ্ছেন; আপনি জ্যোতিষ-চর্চা করলেন কি করে?

আ। জ্যোতিষ-চর্চাটা আমার জীবনে একটা accident বলতে পারা যায়। আমি তখন কটক কলেজের প্রোফেসর। বয়স পঞ্চাশ হয়েছে কি হয় নি। এক দিন শুনতে পেলাম, খণ্ডপড়া রাজ্যে এক মস্ত বড় জ্যোতিষী আছেন, তাঁর নাম চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত। পাঠানেরা তাঁকে ছেলেবেলায় ধরে নিয়ে গেছল, তাই তাঁর প্রচলিত নাম ছিল 'পাঠানী সান্ত।' তিনি ছিলেন রাজার খুড়ো। ওড়িয়া আর সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষা তিনি জানতেন না। ইউরোপ যে জ্যোতির্বিদ্যায় নূতন নূতন আবিষ্কার করে চলেছে, চন্দ্রশেখর সে খবর রাখতেন না। রাজার অনুমতি নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

দেখে আশ্চর্য হলাম, চন্দ্রশেখর জ্যোতিষিক আবিষ্কারে ইউরোপের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছেন! জ্যোতিষ সম্বন্ধে তিনি একখানা বই লিখেছেন সংস্কৃত ভাষায়, তার নাম "সিদ্ধান্ত-দর্পণ"। আমি তাঁর বইখানা edit করে ইংরেজীতে তার ভূমিকা লিখে ইউরোপের কয়েকটা Astronomical societyতে পাঠিয়ে দিলাম। ইউরোপে বইখানার খুব আদর হয়েছিল; চন্দ্রশেখরকে F. R. A. S. উপাধি দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে জ্যোতিষের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মে। জ্যোতিষ-চর্চা করে বাংলায় "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" বই লিখলাম। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে জ্যোতিষের ব্যবহার করছি, এতে কাল-নির্ণয় অভ্রান্ত হচ্ছে।

লে। তা হ'লে বলুন, উড়িষ্যাকে আপনি যেমন দিয়েছেন, উড়িষ্যা থেকে আপনিও তেমনি অনেক কিছু পেয়েছেন।

আ। সে কথা অস্বীকার করি না। উড়িষ্যার আমার সমস্ত

যৌবন কাল কেটেছে। যখন স্বদেশী আন্দোলন হয় নি, তখন আমি উড়িষ্যায় বসে চরকার উন্নতি চিন্তা করেছি, স্বদেশী প্রতিষ্ঠান খুলেছি। সপ্তাহে সপ্তাহে College Extension Lecture-এর ব্যবস্থা করে সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী হয়েছি। নব-উড়িষ্যার জনক মধুসূদন দাশ, গোপবন্ধু দাস—এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে উড়িষ্যার কল্যাণে ব্রতী হয়েছি। উড়িষ্যার কবি কবিতা লিখে আমার স্তব করেছেন। উড়িষ্যার পণ্ডিত-সমাজ আমায় 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। উড়িষ্যার বিশ্ববিদ্যালয় আমায় 'ডি-লিট্' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। উড়িষ্যার সাহিত্য-পরিষদ আমাকে আমরণ 'বরেণ্য-সদস্যে'র গৌরব-জনক পদ দিয়ে আমার কৃতকর্মের স্বীকৃতি জানিয়েছেন। উড়িষ্যায় বসেই আমি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করেছি, বাংলা শব্দকোষ আর বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছি। উড়িষ্যায় অনেকদিন ছিলাম বলে বাঙালীরা অনেকে আমায় 'উড়িয়া' বলত। উড়িষ্যা থেকে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে যখন 'সাহিত্য' 'প্রবাসী' এবং অন্যান্য পত্রিকায় পাঠাতাম, তখন কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলত, "একজন উড়িয়া আমাদিগকে বাংলা শেখাচ্ছে।" বিদ্রূপ-কারীদের মধ্যে সার পি. সি. রায়ও ছিলেন। কিন্তু সার জে. সি. বোস আমার প্রত্যেক কাজ কি রকম appreciate করতেন, ঐ বাক্সের মধ্যে তাঁর চিঠিগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি সব চেয়ে বেশী উৎসাহ যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি, তিনি হলেন প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দবাবু। তাঁর উৎসাহ না পেলে আমি অগ্রসর হতে পারতাম কি না, সন্দেহ।

[কয়েক মাস পরে।]

আচার্যদেব। ক'দিন আসনি কেন ?

লেখক। ভারত-সেবাশ্রম-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাণীবাধ গেছলাম। ওখানে নূতন আশ্রম হচ্ছে।

আ। শুনেছি, তোমার কাকা রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী হওয়ার tradition তোমাদের family-তে আছে। তোমার মৎলবটা কি ?

লে। (নিরুত্তর)।

আ। দেখ, লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞান যথেষ্ট হয়েছে, অধর্ম ক'র না।

লে। অধর্ম কিসের ? ত্যাগের চেয়ে বড় ধর্ম আর কি আছে ?

আ। ত্যাগের চেয়ে বড় ধর্ম নাই, তা জানি। কিন্তু ত্যাগ করতে পারে কে ? ত্যাগী বলে কাকে ? যার ত্যাগ করার মত কিছু আছে, সে-ই ত ত্যাগ করবে। ধর, তুমি একটি ২২।২৪ বছরের যুবক, তোমার সন্ন্যাসী হওয়ার সার্থকতা কি ? তোমার না আছে বিদ্যা, না আছে ধন, না আছে মায়ার বন্ধন। অনেক বিদ্যা অর্জন কর, প্রচুর ধন উপার্জন কর, বিবাহ করে সংসারী হও, তারপর যখন সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে যেতে পারবে, তখন বলব তুমি ত্যাগী, তুমি বীর। আর, যার কিছুই নাই, সে যদি বলে, 'আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী', আমি তাকে বলি মিথ্যাবাদী—ভণ্ড।

লে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, বিবেকানন্দ—এঁরাও ত অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

আ। ওঁদের তুলনা ওঁরাই—ওঁরা হলেন exception, আর যে শত শত ছোকরা অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছে, তারা কেউ বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্য হয় নি। তাদের সন্ন্যাসী হওয়ার মূলে ত্যাগের প্রেরণা ছিল না, ছিল অন্য কিছু। ভোগ-বাসনায় পরিপূর্ণ তাদের মন—সাধারণ মানুষের চেয়েও অনেক নীচে তারা।

[১৯৫৩ সন। বিজয়াদশমীর দিন]

লেখক। (প্রণাম করিয়া) ভাল আছেন ত ?

আচার্যদেব। (আলিঙ্গন করিয়া) হ্যাঁ, এস এস। আজই বুঝি এলে বাড়ী থেকে। হঠাৎ প্রণাম করলে যে ?

লে। আজ যে বিজয়া-দশমী।

আ। বিজয়া-দশমী কেন হয়, জান ?

লে। রামচন্দ্র লঙ্কার যুদ্ধে আজ বিজয়ী হয়েছিলেন। তাই আমরা আনন্দ করি।

আ। বাল্মীকি-রামায়ণে কিন্তু ও কথা নেই। প্রকৃত ব্যাপার অন্য রকম। যজুর্বেদের কালে, খ্রীষ্ট-পূর্ব ২৫০০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে শরৎ ঋতুতে বৎসর আরম্ভ হ'ত। আশ্বিন শুক্লা দশমীতে নববর্ষ হ'ত। সেদিন লোকে পরস্পরের বিজয় কামনা করত। বিজয়াদশমীতে আমরা সেই স্মৃতি রক্ষা করছি।...এই নাও তোমার পূজার-পার্বনী। (লেখককে সদ্যঃপ্রকাশিত 'পূজা-পার্বণ' গ্রন্থ উপহার দিয়া) এই দেখ, লিখেছি—"শ্রীমান সুখময় সরকারকে 'পূজার-পার্বনী'।" আমার পার্বনী দেওয়া যেন নিরর্থক না হয়।

লে। আপনি আশীর্বাদ করুন। (প্রণাম)।

আ। জগদম্বা তোমার মঙ্গল করুন।

রবীন্দ্র সৃষ্টি চিত্রাঙ্গদা

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

মহাভারতের একটি ক্ষুদ্র গল্পাংশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের সৃষ্টি করেছেন। বেদব্যাসের লেখা কথার সাগর মহাভারতে মাত্র ১৩টি শ্লোকে এই গল্পটি বর্ণনা করা হয়েছে।

গল্পটি এই :—

অর্জুন যখন মণিপুরে যান তখন চিত্রবাহন নামে সেখানে এক রাজা রাজত্ব করতেন। মহাদেবের বরে তাঁর একটি কন্যা হয়। রাজা তার নাম রাখলেন চিত্রাঙ্গদা। নগর ভ্রমণের সময় চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের দৃষ্টিপথে পড়েন। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করবার জন্যে রাজার কাছে প্রস্তাব পাঠান। রাজা এই সর্তে তাঁদের বিবাহ দিলেন চিত্রাঙ্গদার পুত্র হলে সে রাজা চিত্রবাহনের বংশধর রূপে পরিগণিত হবে। অর্জুন সেই সর্ত পালন করেন এবং সেখানে তিন বছর বাস করেন। পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের পর তিনি মণিপুর ত্যাগ করেন।

মহাভারতের এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ "চিত্রাঙ্গদা" রচনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচক কবি প্রিয়নাথ সেন লিখেছেন—"চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি। এই কাব্যে তিনি অর্জুনকে সৌন্দর্য্যমুগ্ধ প্রেমিক করিয়া সাজাইয়াছেন, অথচ বেদব্যাস-সৃষ্ট অর্জুনের মনুষ্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার কোনও সুস্পষ্ট মূর্ত্তি নাই। কোথাও কোনও বিষয়ে তাহার কর্তৃত্ব বা বিশেষত্ব দেখি না এবং পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর মধ্যেও যখন পুনর্ব্বার তাঁহার সাক্ষাৎ পাই, তখনও তাঁহার এইরূপই নির্ব্বিশেষত্ব। মহাভারতকার যেন এক তাল মাটির উপর 'চিত্রাঙ্গদা' এই কয়টি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। রবিবাবু সেই মাটি লইয়া একটি জীবন্ত অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই অপূর্ব্ব রমণীকে কবিগুরুর মানসকন্যা বলা যায়। কবি তাঁর কাব্যে তাঁর মানসকন্যাটিকে দেবী নয়—আদর্শ মানবী রূপেই অঙ্কিত করেছেন। যেমন চিত্রাঙ্গদা নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে অর্জুনকে বলছেন—

—"আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।†

এই হচ্ছে আদর্শ মানবীর পরিচয়। সাধারণ সুখদুঃখের ভেতর দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্বকে অনুভব করবার, নারীর নারীত্বকে হৃদয়ঙ্গম করবার প্রেরণাই রবীন্দ্র-কাব্য সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ঘাত-প্রতিঘাতের আবর্তে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার হৃদয় ও প্রকৃতি রবীন্দ্র-প্রতিভায় রঞ্জিত হয়ে আমাদের কাছে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি-রূপে প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের আকর্ষণ সহজ মানব প্রেমের অভিব্যক্তি হলেও এর মধ্যে কবিগুরু এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের আস্বাদ এনে দিয়েছেন। যে সময় কবি বর্ষশেষে চিত্রাঙ্গদাকে তার দেবদত্ত রূপের মায়াবরণ থেকে মুক্ত করলেন ঠিক সেই সময়েই অর্জুন জানতে পারলেন, মানসী ও প্রণয়িনী চিত্রাঙ্গদার মধ্যে অনন্য নারীরূপ ও নারীসত্তা সর্ব্বক্ষেত্রে পরিস্ফুট। গ্রন্থের সমাপ্তিতে চিত্রাঙ্গদার শেষ উক্তিতে সেই ভাবটি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। যেমন :—

"চিত্রা—প্রভু মিটিয়াছে সাধ। এই সুললিত
সুগঠিত নবনী কোমল সৌন্দর্য্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি
করিয়াছ পান। আর কিছু বাকি
আছে? সব হয়ে গেছে শেষ?
হয় নাই প্রভু! ভালো হোক মন্দ হোক্
আরো কিছু বাকি আছে,

---

† পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর প্রিয়তমা পত্নী কমলা নেহরু সম্বন্ধে লিখেছেন—

"Like Chitra in Tagore's play, she seemed to say to me: "I am Chitra. No goddess to be worshipped, nor yet the object of common pity to be brushed aside like a moth with indifference. If you deign to keep me by your side in the path of danger and daring, if you allow me to share the great duties of your life, then you will know my true self.

(The Discovery of India. P. 31-32)

সে আজিকে দিব,...

... ...

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মত প্রভু এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর!
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে; কত দৈন্য আছে, আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াসা! সংসারপথের
পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ;
কোথা পাব কুসুম লাবণ্য, দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা। কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয়।"

এই অক্ষয় অমর হৃদয় নিয়েই চিত্রাঙ্গদা বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের চিত্ত জয় করেছিল। চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জ্জুনের প্রেম আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল যখন চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের বিদায়কালে বললেন:—

"হয় ত পড়িবে মনে, সেই একদিন,
সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে, দেখা
দিয়েছিল এক নারী বহু আবরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।
কি জানি কি বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ প্রথায়
আরাধনা; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে,
ভালই করেছ। সামান্য সে নারী রূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।"
প্রভু আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।

চিত্রাঙ্গদার নারীত্বের এই মাধুর্য্যময় ভাবটি অর্জ্জুনের গ্রহণ করবার যে অসাধারণত্ব রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত করেছেন তাতেও "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যের উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করেছে। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তার অলৌকিক স্বভাবের মধ্যে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে কাব্যের আর একটি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন:—

"চিত্রা— কি ভাবিছ নাথ?
অর্জ্জুন— রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শত মুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব্ব কাহিনী!
চিত্রা— কুৎসিত কুরূপ! এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণ-তারা!
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীর তনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে!
অর্জ্জুন— কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী, বীর্য্যে সে পুরুষ!
চিত্রা— ছি, ছি, সেই
তার মন্দ ভাগ্য! নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালোবাসা, শুধু সুমধুর ছলে,
শত রূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁধে বেঁধে হেসে কেঁদে
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা,
তবে তার সার্থক জনম! কি হইবে
কর্ম্ম কীর্ত্তি বীর্য্য বল শিক্ষা দীক্ষা তার!
সে গৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বনপথ পার্শ্বে, এই পুণ্য তীরে
ওই দেবালয় মাঝে—হেসে চলে যেতে!
অর্জ্জুন— ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত? কি অভাব তার?
চিত্রা— কি অভাব তার? কি ছিল সে অভাগীর?"

চিত্রাঙ্গদার কি অভাব এবং তার কি ছিল ও কি ছিল না—এ তত্ত্ব যে দিন সে আবিষ্কার করল সে-দিনই তার নারীত্বের চরম বিকাশ হ'ল। সে দিন সে অসঙ্কোচে প্রকাশ করল—"আমি চিত্রাঙ্গদা, নহি আমি সামান্যা রমণী।" "এই অসামান্যা নারী চরিত্র নিয়েই কবিগুরুর অসামান্য কাব্য রচিত হয়েছে।

এই কাব্যের ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথ মানুষের বিশেষ ভাবে নারীর হৃদয়-রহস্য ও প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁর অসাধারণ মননশীলতা ও কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

এ সব ছাড়া আরও একটি বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য এই কাব্যকে অমরত্ব দান করেছে। সে হচ্ছে চিত্রাঙ্গদার দুঃখ। এ দুঃখ অভিনব। এ দুঃখ মর্ম্মদাহী হলেও কবির রচনাগুণে তাও সুন্দর ও চিত্তস্পর্শী হয়ে উঠেছে। চিত্রাঙ্গদা তখন দুঃখ পেল, যখন সে জানলো তার সত্যকার রূপ ও গুণে অর্জ্জুন আকৃষ্ট নয়। এক ছদ্ম-বেশী রূপকে অর্জ্জুন ভালবেসেছে। নারীত্বের এই চরম লাঞ্ছনা যে দিন চিত্রাঙ্গদাকে আকুল করে তুলল সে দিন সে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে তার পরিবর্ত্তন ঘটাল।

রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার সেই ছদ্মবেশ—সেই মায়াবরণকে—তাঁর

অপূর্ব্ব কল্পনায় এক অমানুষিক বিদেহভূত' সত্তা দিয়ে তাহাদের মাঝখানে উপস্থিত করেছেন। যেমন :

…"মীনকতু,

কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গ সহচরী করি ছায়ার মতন—
কি অভিসম্পাত! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,'
সে করিল পান। সেই প্রেম দৃষ্টিপাত—
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে,
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনায় রাঙা চিহ্ন রেখা,—সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম চিররাত্রি তাপসিনী
কুমারী হৃদয় পদ্মপানে ছুটে এল,
সে তাহারে লইল ভুলায়ে।"

এই ভুল ভাঙার মধ্যেই চিত্রাঙ্গদার মুক্তি সাধন ঘটল। এই মুক্তি মিথ্যা থেকে সত্যের পথে এগিয়ে গেল। যে দিন পরিপূর্ণা মানবী চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের কাছে আত্মনিবেদিতা হ'ল, সে দিন অর্জ্জুনকে বলতে হ'ল—"প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।"

রবীন্দ্রনাথও এই অপূর্ব্ব কাব্য রচনায় বাঙলা সাহিত্যকে ধন্য করেছেন বলা যায়। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে "চিত্রাঙ্গদা" কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনায় এ রচনা একটি বিশেষ আসনের দাবী রাখে।

মহাকাল

বিভা সরকার

এ জীবন সহকার হতে
ঝরি গেল শ্রেষ্ঠ পত্রগুলি
ঝরাবনে মিলিল ধূলায়
ঘনালো কি বিধুর গোধূলি?
মর্ম্মরিল শুষ্কপত্র কাল পদতলে
মহাকাল উদ্‌ভ্রান্ত উন্মনা—
কে দিল সর্ব্বস্ব তার সে মহাযাত্রায়
আত্মভোলা চেয়ে দেখিল না!
যাত্রা তার কোন আদি কাল হতে
সে উদাসী, কোন কিছু না রাখে সম্বল—
আপন চলার স্রোতে উদ্দাম দুর্ব্বার
কালসিন্ধু কি উর্ম্মি চঞ্চল!
ঢেউ পরে ঢেউ আসে মুছে ডুবে যায়
কোন চিহ্ন নাহি রাখে না রাখে ঠিকানা
যাত্রা তার কোন লক্ষ্যে কে পারে বলিতে
ভবিষ্যৎ কিবা তার যায় না ত জানা।
কত ফুল কত পাতা কত ক্ষীণ আয়ু
পথে তার আপনার মরণ বিছাল
কত দীপ নিভে গেল কত হ'ল শেষ
তবু জানি মহাকাল জ্বেলে যায় আলো!
বুকে ধরি ফল্গুসম পরম কল্যাণ
সেজেছে সে নির্ম্মম সন্ন্যাসী
যত জীর্ণ আবর্জ্জনা দৈন্যতা দীনতা
মুছে দেয় স্মিতহাস্যে আসি।
তাই তার আগমনে চঞ্চল বসুধা
কান্নাহাসি পাশাপাশি ভাসে
নূতন জীবন দানে গোপনে নীরবে
রুদ্র মূর্ত্তি ধরি ঐ মহাকাল আসে।
শ্রেষ্ঠ ফুল শ্রেষ্ঠ ফল দিয়ে গেল
এ যাত্রায় মোর সহকার
যা মোর দেবার ছিল দিয়েছি নিঃশেষে
এ কাল যাত্রার পথে দিব কি আবার!

পাশ্চাত্য শিল্পকলার প্রাচ্যকরণ কথা

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

মানব জাতির সৃষ্টির আদিকাল হইতে বহু জনপদ, নগর ও রাজ্য গড়িয়াছে ভাঙিয়াছে; বহু কৃষ্টি, সাহিত্য ও শিল্পকলা প্রভৃতি সেই সঙ্গে গড়িয়া আবার ধ্বংস হইয়াছে। বিজ্ঞান বলিবে কোনও জড় পদার্থ বা শক্তির বিনাশ হয় না; তাহাদের কেবলমাত্র রূপান্তর ঘটে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি যেখানে ধ্বংসের রূপ দেখিয়াছে, মানুষের বৈজ্ঞানিক চিত্ত সেইখানে তাহার অবিনাশী রূপ ও তাহার রূপান্তর পরিদর্শন করিয়াছে। এক স্থানের শিল্প, সাহিত্য ও ভাস্কর কার্যসমূহ অন্যস্থানে রূপান্তরিত হইয়া নব কলেবর লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিগত ১৯৫৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে রোম নগরীতে আহূত আন্তর্জাতিক বিশ্ব ইতিহাস বিজ্ঞান পরিষদের দশম অধিবেশনে সোভিয়েট রাশিয়ার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, অধ্যাপক বি, বি, পিয়ো-ট্রোভস্কি তাঁহার গবেষণা ও আবিষ্কারের যে বিবরণ প্রদান করেন তাহা প্রাচীন প্রাচ্য রাজ্যসমূহের উন্নত শিল্পকলা ও ভাস্কর কৌশলাদির প্রভাব কিরূপে ধীরে ধীরে প্রতীচ্য জগতে বিস্তার লাভ করে তাহার ইতিহাসের উপর একটি নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছে। এই বিবরণ প্রতীচ্য শিল্পাদি যে প্রাচ্য বিলুপ্ত শিল্পসমূহের একটি নব রূপায়ন তাহার পক্ষে বহু যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের হায়াসদানী বা হাইকৃতি, যাহা আমাদের নিকট আর্মেনিয়া রাজ্য নামে পরিচিত তাহা বর্ত্তমান কালে তিনটি অংশে বিভক্ত হইয়া তুরস্ক, রাশিয়া ও ইরাণের সহিত যুক্ত। এই স্থানে অতি প্রাচীন কালে উরার্ত্ত নামে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত বর্ত্তমান কালের এরিভান নগরের সন্নিকটে কারমির ব্লুর [আর্মেনীয় ভাষায় লাল পাহাড়] নামক স্থানে অধ্যাপক পিয়েট্রোভস্কির পরিচালনায় খনন কার্য্য চালাইয়া প্রাচীন উরার্ত্তর একটি নগরীর অবস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রাচীন নগরীর নাম তেসেবানী। এই স্থানের অনতিদূরে ভ্যান হ্রদের তীরে এবং উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ককেসস অঞ্চলের উচ্চ মালভূমিতে সেভান হ্রদের চতুষ্পার্শ্বেও উরার্ত্ত রাজ্যের উন্নত শিল্পকলার বহুবিধ নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শিল্পকলায় এবং বিশেষ ভাবে ধাতু শিল্পে অতি প্রাচীন কালে উরার্ত্ত রাজ্য যে এক সময়ে জগতে একটি শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়া ছিল, অধ্যাপক পিয়োট্রোভস্কি এই সকল স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন।

১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে এই স্থানের খনন কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত ও ধারাবাহিক ভাবে আরম্ভ করা হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় কিছুকাল

ভগবান তাসেবা

খনন কার্য্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। যুদ্ধান্তে, ১৯৪৫ সনে এই কার্য্য পুনরায় নূতন উদ্যমে আরম্ভ করা হয়। কারমির-ব্লুরের মৃত্তিকা স্তুপের নিম্নে সহসা একটি বিস্তৃত নগরীর সন্ধান পাওয়া যায়। অসম-বাহু চতুর্ভুজাকৃতি এই নগরী আংশিক ভাবে প্রাচীর বেষ্টিত। ইহার আয়তন প্রায় সওয়া বর্গ মাইল। ইহার অভ্যন্তরে বহু মূল্যবান

ব্রঞ্জপাতে নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ

অট্টালিকা ও একটি প্রাসাদ উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রাসাদটি সম্ভবতঃ উরার্ত্তু রাজ্যের ককেসাস অঞ্চলের শাসনকর্ত্তার দুর্গ প্রাসাদ রূপে ব্যবহার করা হইত। অনুমান করা হয় যে, উরার্ত্তু রাজাও সময় সময় এই প্রাসাদে বাস করিতেন। মেসোপটেমিয়ার [প্রাচীন বাবিলনিয়া রাজ্য] দৃষ্ট অনেক প্রাসাদের সহিত এই প্রাসাদের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার কিয়দংশ ইষ্টক ও অবশিষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীরগাত্র কারুকার্য্য-খচিত ও চিত্রিত। খননকার্য্য যতদূর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা হইতে প্রাসাদ সংলগ্ন অনেকগুলি বিস্তৃত গুদাম ঘরের অবস্থিতি জানা যায়। এই সকল গুদামে বহু সংখ্যক বিরাটকায় প্রস্তর পাত্র [Stone jars] সজ্জিত দেখা যায়। গুদাম ঘরে রক্ষিত দ্রব্য-সম্ভার পরিলক্ষ করিয়া প্রতীয়মান হয় যে উৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ দ্বারাও রাজস্ব আদায় রীতি ছিল। গুদামগুলিতে গম, যব, তিল প্রভৃতি এবং তিল হইতে তৈল উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অস্তিত্ব জানা যায়। ইহা ভিন্ন বহুপ্রকার বস্ত্রসম্ভার, বিবিধ যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, প্রভৃতি ধাতু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত শিল্পদ্রব্য ও অলঙ্কারাদি প্রভৃতিও উদ্ধার করা হয়। ইহাদের মধ্যে কতিপয় ব্রঞ্জ ধাতুনির্ম্মিত ক্ষুদ্রাকৃতি দেবমূর্ত্তি [তাসেবার নগর দেবতা], ব্রঞ্জপাত্রে সংযুক্ত ব্রঞ্জ নির্ম্মিত বৃষ-মস্তক, ব্রঞ্জপাতে নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ ও কারুকার্য্য খচিত বর্ম্ম এবং তূণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই বিশেষ আধারে সুরক্ষিত ছিল। ব্রঞ্জ ধাতুনির্ম্মিত কতিপয় দ্রব্যে ক্ষোদিত কীলকাকৃতি বাবিলনীয় বা চালডীয় ভাষায় লিখিত লিপি হইতে অনুমান করা যায় তাসেবানী খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন উরার্ত্তু রাজ্যে অবস্থিত ছিল। তাসেবানীর প্রাসাদ সম্ভবতঃ রাজা দ্বিতীয় রুশাসের সময় নির্ম্মিত [খৃঃ পূঃ ৬৮০-৬৪৫]। তবে অনুমিত হয়, এই সকল ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য সম্ভারের অধিকাংশ ইহারও বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত এবং কোনও বিশেষ কারণে অন্যান্য স্থান হইতে এইগুলি এই স্থানে আনিয়া রক্ষিত হইয়াছিল। প্রাসাদের অভ্যন্তরে ও গুদামে যেরূপ অবিন্যস্ত ভাবে এইগুলি স্তূপিকৃত করিয়া রক্ষিত হয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই বস্তুগুলি অতি ব্যস্ততার সহিত দ্রুত অন্য স্থান হইতে সরাইয়া আনা হইয়াছে। পিয়োট্রোভস্কি অনুমান করেন যে, ইরানীয় ও অন্যান্য রাজ্যের আক্রমণ আশঙ্কায়ই ইহা করা হইয়াছিল। ব্রঞ্জপাতে ক্ষোদিত লিপিগুলি হইতে উরার্ত্তু রাজবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা মেনুয়াস, প্রথম আরগিস-টাইস, দ্বিতীয় সারদুর এবং প্রথম রুশাসের বিবরণও কিছু পাওয়া যায়। ইহারা সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী ও তাহার পরবর্ত্তী কোনও কালের আর কোনও লিপি বা নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই স্থানের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি-দাহের চিহ্ন বর্ত্তমান এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই রাজ্য ইরানীয় (পারস্য) বা অন্য কাহারও আক্রমণে ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়।

বর্ত্তমানে এই নিবন্ধে উরার্ত্তুর প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা না করিয়া কারমির-ব্লুর এ প্রাপ্ত ব্রঞ্জনির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যগুলির প্রতি আমাদের মনোযোগ বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ রাখিব। উরার্ত্তুর নির্ম্মিত ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যগুলির শিল্পাঙ্কন ও নির্ম্মাণ কৌশলের উৎকর্ষতা ও তাহাদের যে প্রভাব ভূমধ্য সাগরতীরবর্ত্তী রাজ্যগুলিতে পরিলক্ষিত হয় তাহাই প্রথমে আলোচনা করিতেছি।

ভূমধ্য সাগর তীরবর্ত্তী রাজ্যসমূহে নির্ম্মিত ধাতুশিল্পজাত দ্রব্য-সমূহের সহিত উরার্ত্তুর শিল্পাঙ্কন প্রণালীর সাদৃশ্য সম্বন্ধে ১৯২৯ সনে সুবিখ্যাত জার্ম্মান দেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিক লেম্যানহপ্ট বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইটালীর এট্রুরিয়া অঞ্চলে (রোমের উত্তরে অবস্থিত টাইবার নদীর পশ্চিমাঞ্চল) প্রাপ্ত ধাতুশিল্পের প্রাচীন নিদর্শনগুলি যে উরার্ত্তুর ধাতুশিল্প নিদর্শনগুলি হইতে অভিন্ন তাহার বহু প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। এট্রুস্কানগণ যে প্রাচীনকালে কোনও এক সময় বিদেশ হইতে আসিয়া এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ইহা তাহারও একটি প্রমাণ। ইহারা কবে ও কোন পথে এই স্থানে আসিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে স্থল ও জলপথে উরার্ত্তুর সহিত প্রাচীন নোসস (ক্রীট) ও ভূমধ্য সাগরতীরবর্ত্তী অন্যান্য রাজ্যগুলির সহিত যে বাণিজ্যিক যোগ ছিল তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। উরার্ত্তুর উপর দক্ষিণের ও দক্ষিণ-পূর্ব্বের রাজ্যগুলির আক্রমণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এবং আক্রমণ তীব্রতর হইবার আশঙ্কায় যে বহু উরার্ত্তুরবাসীর সহিত সেই দেশীয় বহু

শিল্পীও দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাস ও কর্ম্ম সংস্থানের চেষ্টা করিয়াছে, তাহার কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। এই বহির্গমন পথ যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমগামী ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শিল্পকলা ও অঙ্কন কৌশল যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমগামী হইয়া পাশ্চাত্য জগতে নব আদর্শ ও প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল, হপ্টম্যানের এই মত পিয়োট্রোভস্কির কারমির-ব্লুরও প্রাপ্ত শিল্পকলার নিদর্শনগুলি সমর্থন করিয়াছে। গ্রীস ও রোমের সভ্যতার প্রথম উষার রূপ ও সৌন্দর্য্যবোধের প্রথম দৃষ্টি উন্মিলিত করে প্রাচ্য শিল্পকলার রবিরশ্মি। উরার্তুর শিল্পপ্রভাব যে স্থলপথে বাবিলনীয়া ও সিরিয়া হইয়া গ্রীক অধ্যুষিত পশ্চিম আনাতোলিয়ায় পৌঁছায় তাহার বহু নিদর্শন এই সব অঞ্চলে পাওয়া যায়। বাবিলনীয় শ্মশ্রুমণ্ডিত ও পক্ষযুক্ত দৈত্যমূর্ত্তি, এসিরিয়া অঞ্চলের অশ্বারূঢ় যোদ্ধামূর্ত্তি ও যুদ্ধরথাঙ্কন, গর্ডিয়ন মন্দিরের ধাতুপাত্রের অঙ্কন এবং পশ্চিম আনাতোলিয়ার প্রাচীন গ্রীক অধ্যুষিত নগরীর ভগ্নপ্রাসাদ ও গৃহাভ্যন্তরের প্রাচীরগাত্রের ও স্তম্ভশীর্ষের মৃন্ময় অঙ্কন প্রভৃতি উরার্তু শিল্পের পশ্চিমগামী পথনির্দ্দেশক। রেনেসাঁর যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ গ্রীক ও রোমান শিল্পকলা প্রভৃতির অনুকরণ ও অনুশীলনের একটি ধুয়া চতুর্দ্দিকে দেখা দিয়াছিল, গ্রীক ও রোমের কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্মেষের যুগেও সেইরূপ প্রাচ্য শিল্পকলা প্রভৃতির অনুকরণ ও অনুশীলনের প্রচেষ্টা যে উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছিল, ইহা পিয়োট্রোভস্কি ও হপ্টম্যান ব্যতীত মিসেস ম্যাক্সওয়েল হাইসলপ এবং জি. ফন্. মারহার্ট কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। শিল্পকলা প্রভৃতির প্রাচ্যকরণ আন্দোলন খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত অতি ধীরপদে নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের শিল্পকলা প্রভৃতি যে আলাউদ্দিনের প্রদীপস্পর্শে একরাত্রিতে গড়িয়া উঠে নাই এবং তাহাদের গঠন ও নির্ম্মাণ কৌশল, আদর্শ যে প্রভূত পরিমাণে প্রাচ্য দেশীয় তাহা কারমির-ব্লুর-এ প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত উরার্তুর শিল্পনিদর্শনগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া মিসেস হাইসলপ এই কথা অতি দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন। লেম্যানহপ্ট দেখাইয়াছেন, ধাতব পাত্র, তেপায়া প্রভৃতি আসবাবপত্রে জীব জন্তুর পদাঙ্কিত সংযুক্তির (Attachments) আদর্শ সম্পূর্ণ প্রাচ্য দেশীয় এবং পরবর্ত্তীকালে পাশ্চাত্য দেশে এই আদর্শ অন্যান্য আসবাবপত্র নির্ম্মাণেও গ্রহণ করা হইয়াছে। ধাতুপাত্রের গাত্রের বহির্ভাগে খোদিত চিত্রাঙ্কন (Repousse) আদর্শও প্রাচ্যদেশীয়। রাজা প্রথম আর্গাইসথিসের (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭৮০-৭৬০) নামাঙ্কিত মানসিককৃত শিরস্ত্রাণ এই আদর্শে নির্ম্মিত। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ধাতব শিরস্ত্রাণ ও সাধারণ সৈনিকের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণের আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। এইরূপ ঘণ্টাকৃতি উন্নত শীর্ষ ও সূক্ষ্মাগ্র শিরস্ত্রাণ আসিরিয়া ও মেসোপটেমিয়াতেও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই শিরস্ত্রাণগুলির আদি ও মূল আদর্শ কারমির-ব্লুর-এ প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। শিরস্ত্রাণে খোদিত শিল্পকার্য্য ও চিত্রাঙ্কন রাজকীয় ও দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত শিরস্ত্রাণগুলিতেই লক্ষ্য করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক কলাবিশেষজ্ঞ সিলভিও ফেরীর মতে এই সকল আদর্শ হইতেই পাশ্চাত্য জগতে ধাতব শিরস্ত্রাণের উদ্ভব। জি. ফন্ মারহার্ট তাঁহার "ইউরোপীয় শিরস্ত্রাণের উদ্ভব" প্রবন্ধে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

বাবিলনীয় শ্মশ্রুমণ্ডিত ও পক্ষযুক্ত দৈত্যমূর্ত্তি

গৃহসজ্জার ও আসবাবপত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য ধাতব বা মৃন্ময় পশুমস্তক ব্যবহার সম্পূর্ণ প্রাচ্য। উদাহরণ স্বরূপ কারামির-ব্লুর-এ প্রাপ্ত ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বৃষের মস্তক ও তাহার সংলগ্ন পক্ষাকৃতি যোজকগুলি পাত্র বা প্রাচীরগাত্রে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা নির্দ্দেশক। বর্ত্তমানকালে ইহার আকৃতির কিঞ্চিৎ বিবর্ত্তন হইলেও আদর্শ কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সিংহ, অশ্ব প্রভৃতির চিত্র ক্ষোদিত কারমির-ব্লুরে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বৃত্তাকার বর্ম্মের আদর্শ প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে সমগ্র ইউরোপেই দৃষ্ট হয়। লৌহযুগ আরম্ভের সূচনাতেই এই আদর্শ ক্রীট, ডেলফী ও অলিম্পিয়া হইতে একটিয়া ও রোমের পথে উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপে গমন করে।

কারমির-ব্লুরে প্রাপ্ত বৃহদাকার ব্রোঞ্জ জলপাত্র বর্তমান কেটলির আদি আকৃতি।

কারমির-ব্লুরে প্রাপ্ত বৃহদাকার কেটলির ক্রমবিবর্তনের নিদর্শন কোপেনহেগেনের (ডেনমার্ক) জাতীয় মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রাচীন কেটলি। গ্রীস ও ইটালীতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলিতে অতি স্পষ্ট নিকটতর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এইগুলি হেলেনীয় যুগের আদি নির্মিত বলিয়া অনুমান করা হয়। উরার্তুর জলপাত্র বা কেটলি দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, ইহার উদ্ভব যজ্ঞ ও পূজাদিতে ব্যবহারের জন্য। এই কেটলি স্থাপনের তেপায়া আসন মঞ্চটির (ষ্ট্যাণ্ড) আকৃতিও উল্লেখযোগ্য। এইরূপ তেপায়ার উৎপত্তিস্থান গ্রীস বলিয়া পূর্ব্বেকার প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অভিমত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক তাহা বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে।

এই কেটলির সহিত সংযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতব বৃষমস্তক ও অন্যান্য শিল্পাঙ্কন পদ্ধতির অনুকরণের নিদর্শন ক্রীট, গ্রীস, ইটালী ও পাশ্চাত্ত্য অন্যান্য দেশেও পাওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে ইহার অনুকরণে অঙ্কিত ও নির্মিত বহু মৃন্ময় পাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। চা-দানী, ফুলদানী প্রভৃতিতে শিঙ্গা আকৃতি সংযুক্তি সম্পূর্ণ উরার্তু জাতীয় ও প্রাচ্য অনুকরণ। উরার্তু ধাতব পাত্রসমূহেও বহু শিল্পদ্রব্যে শিঙ্গাকৃতি হাতল একটি বৈশিষ্ট্য। ইহার অনুকরণ পাশ্চাত্ত্য দেশে সহজেই অনুমেয়। বৃষমস্তক প্রভৃতির সংযোজক ব্যবস্থারূপে পক্ষী-আকৃতি বিস্তৃত পক্ষ, যোজক ও উরার্তুর বৈশিষ্ট্য। গ্রীক অশ্বারূঢ় যোদ্ধা প্রভৃতির ভাস্কর শিল্পাধান কারমির-ব্লুরে প্রাপ্ত শিরস্ত্রাণের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলির পার্শ্বে স্থাপন করিলে উহাদের অতি নিকট সাদৃশ্য অতি সহজেই অনুমেয়। উরার্তুর সহিত বাণিজ্য বা সংযোগ এবং উরার্তু আক্রান্ত হইবার পর স্থানীয় শিল্পীগণের পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা উভয়ই ইহার কারণ বলা যাইতে পারে। ফোনেসিয়া হইতে হস্তীদন্ত, শিল্পদ্রব্য ও জলাধার পাত্রাদির আমদানী কালের সম্ভবতঃ কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্বে এসিরিয়া রাজ তৃতীয় তিগলথ পিলেসারের সিরিয়া জয় করিবার কালেও (খৃঃ পূঃ ৭৪২) ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী পাশ্চাত্ত্য রাজ্যসমূহে উরার্তু হইতে শিল্পদ্রব্য স্থল ও জলপথে আমদানী হইত। এই সময় হইতেই কল্পিত জীবজন্তুর মূর্তির আদর্শ ও ধাতব অঙ্কন গ্রীসের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রসারিত হইয়াছে। ধাতবশিল্পে দেবতা ও অন্যান্য মূর্তি নির্মাণ নিঃসন্দেহে প্রাচ্য দেশীয় অবদান।

১৯৫৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযাত্রীর দল এশিয়ামাইনরের অন্তর্গত প্রাচীন ফ্রিজিয়া রাজ্যে গর্ডিয়ানের সন্নিকটে মৃত্তিকা স্তূপ খনন করিয়া একটি সমাধিমন্দির আবিষ্কার করে। মৃত্তিকা স্তূপ অপসারণ করিয়া সমাধিটি সম্পূর্ণ অভগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ইহার দারুময় প্রাচীর, ব্রঞ্জ-কাষ্ঠ-নির্মিত আসবাবপত্র এবং বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত ব্রঞ্জধাতু নির্মিত পাত্র ও অলঙ্কারাদি আবিষ্কার, একটি আলোড়নের সৃষ্টি করে। ফ্রিজিয়া রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির যুগে কোনও রাজপুত্রের সমাধির উপরে এই মন্দিরটি নির্মিত। এই স্থানেও কারমির-ব্লুরে প্রাপ্ত বৃহদাকার কেটলির অভিন্ন আকারের

বৃষ মস্তক ও দেবমূর্তি একত্রে

একটি কেটলি পাওয়া যায়। এই স্থানের কেটলিটি একটি লৌহবলয় নির্মিত মঞ্চের উপর রক্ষিত ছিল। এই স্থানে সর্ব্বপ্রথম বৃষমস্তক ও দেবমূর্তি একত্রে একই পাত্রে সংলগ্ন দৃষ্টিগোচর হইল। ইহা উরার্তু হইতে আগত শিল্পী দ্বারা নির্মিত হওয়া অসম্ভব নহে। উরার্তুর কারমির-ব্লুর, ভ্যান হ্রদের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ, প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট নিদর্শনগুলির সহিত সমাধির প্রতিটি দ্রব্যের অতি নিকট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দূরবর্তী পাশ্চাত্ত্য দেশে উত্তর ইউরোপে এইরূপ নিখুঁত অভিন্নতার নিদর্শন বিরল। এই স্থানে প্রাপ্ত ব্রঞ্জনির্মিত শিল্পদ্রব্যগুলি ঈজীয়ান সাগর তীরবর্তী রাজ্যগুলির শিল্প-উপকরণগুলির সহিত প্রাচ্য দেশ ও উরার্তুর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা জানা যায় যে, নিকট বা মধ্য প্রাচ্যের উত্তরে কোনও স্থানে ফোনেসীয়, ক্রীট, অথবা পাশ্চাত্ত্য অন্য কোনও দেশীয় শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই তথ্য শিল্পকলাদির আদর্শের গতি যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমগামী, এই মত আরও দৃঢ়রূপে সমর্থন করে।

প্রাচীন প্রাচ্য রাজ্যগুলি একের পর একটি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

সেই সঙ্গে তাহাদের কৃষ্টি ও শিল্পকলাদিও কালের স্রোতে অন্তর্হিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য গ্রীস ও রোমের উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মাধ্যমে প্রাচ্যশিল্পকলার আদর্শগুলি রূপান্তরিত হইয়া আজও প্রতীচ্যে জীবিত রহিয়াছে। মানুষ নিজের প্রয়োজন ও চাহিদা মিটাইতে যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছে, মানুষের সৌন্দর্য্যপিপাসু-চিত্ত তাহাতে সুন্দররূপ দান করিয়াছে। মানুষের সত্য ও কল্যাণ-সাধনার সহিত চিরসুন্দরের সাধনা যুগ যুগ ব্যাপিয়া চলিতেছে।*

* মাসিমো পাল্লোটটিনো লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

বিনিময়

শ্রীবাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার আনন্দ নিয়ে আমার আনন্দগুলি ছড়াব দু'হাতে
তোমার শান্তির গান ছড়াব বিশ্বের কাছে সন্ধ্যায় প্রভাতে।
তোমার জীবন-ধারা বয়ে যাবে কতদূর স্রোতস্বিনীপ্রায়
আমার জীবন-তরী ভেসে যাবে তারি স্রোতে কোন্ অজানায়।

তোমার সংসার জুড়ে ছোটোখাটো খেলাঘর সাজাতে এসেছি,
মনখোলা হাসিগান প্রাণ নিয়ে তোমাকেই ভাল যে বেসেছি,
আমার জীবন দূত খবরের ঝুলি নিয়ে ফেরে ঘরে ঘরে
তোমার আঁধার ঘরে দীপ জেলে ডাকো তারে সারাদিন পরে।

একটি কথার ডাকে তারে তুমি ডেকে নাও করে আপনার,
একটি বীণার তারে নীরব হৃদয়তন্ত্রে বাজাও ঝঙ্কার,
একটু পরশ দিয়ে সহজে ভুলায়ে দাও মনের বেদনা,
তোমার আমার মাঝে ছিঁড়ুক বাঁধন-ভয় হয়ে যাক চেনা।

তোমায় যেখানে খুঁজি সেখানে সে রূপাধারে যেন খুঁজে পাই,
নিজের অলক্ষ্যে তাই খুশীর আমেজ নিয়ে খেয়ালে বেড়াই,
কখনো আবেগে কাঁদি কেউ তার শোনে নাকো এলোমেলো ভাষা—
অবুঝ মনের কাছে সত্য বলে মনে হয় এই ভালবাসা।

তোমাকে ছড়িয়ে দাও নিখিল বিশ্বের এক বিরাট প্রাঙ্গণে
নতুন সাড়ার ফুল ফোটাও মধুর করে তোমার কাননে।
জীবনে বসন্ত আনো প্রথম আলাপটুকু হোক্ মধুময়
একটি হৃদয় থেকে হাজার হৃদয়ে ভাব হোক্ বিনিময়।

সাগর পারে

শ্রীশান্তা দেবী

আমেরিকায় বাকি দিনগুলি একইভাবে কাটতে লাগল। ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে দারুণ ঠাণ্ডা একটু করে কমছে আর বাড়ছে। বাড়ীর ছাদে ছাদে যে বরফ জমা হয়েছিল এক একদিন হঠাৎ গরম হয়ে সব গলে ঝর ঝর করে পড়তে থাকে, রাস্তার বরফও গলে জল হয়ে যায়। আবার তার পরই কোনদিন শূন্য ০ ডিগ্রীর নীচে চলে যায় তাপ। জানুয়ারী মাসে ঘন ঘন বরফ পড়ে এবং বরফের পরই আবার একটু গরম হয়।

এই শীতের দিনে এখানে একটা বড় কার্নিভাল হয়। যাদের ঠাণ্ডা লাগে অথবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিছিল দেখার বয়স বা উৎসাহ নেই, তারা তাঁবুর ভিতর পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে বসে। আমরা বয়স্করা ভিতরে বসে দেখেছিলাম, কিন্তু মেয়েরা পথে দাঁড়িয়েই দেখেছে। লোকেরা এত কাপড় পরে যে, মোটা মোটা বস্তার মত চেহারা হয়ে যায়। Auditorium জায়গাটা ঠাণ্ডাই। সেখানে শীতে কুঁকড়ে কোনরকমে বসলাম, গান বাজনা ড্রিলের দিকে মন দেব কি শরীরটাকে শীত থেকে বাঁচাব ঠিক করতে পারছিলাম না। সেদিন দুপুরে যখন বাড়ী থেকে বেরলাম তখন তাপ ৬° ডিগ্রী মাত্র। তবু একরকম ছিলাম। কিন্তু গান বাজনার পর পথের ধারের পরদাগুলি যখন সব তুলে দিল তখন আর কিছু ভাববার মত অবস্থা রইল না। ওদেশে বরাবরই ঘরে তাপের মধ্যে থেকেছি, অথবা গরম গাড়ীতে চড়েছি, কখনও কখনও পথে হেঁটেও বেড়িয়েছি, কিন্তু বসে বসে শীতে পাথর হয়ে জমে যাওয়া যে কি জিনিস তা এই প্রথম অনুভব করলাম। তারই মধ্যে বড় বড় 'float' চড়ে রাজারাণী রাজকন্যারূপীরা সব ভিতরে ঢুকতে লাগলেন। ফ্লোটগুলি জন্মাষ্টমী বা রামলীলার মিছিলের চৌকির মত সাজানো চলমান ছবি। বড় বড় ব্যবসাদাররা নিজের নিজের কোম্পানী থেকে এইসব 'ফ্লোট' সাজিয়ে বার করে। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, কারটা সবচেয়ে ভাল হয়েছে এই নিয়ে।

রাজারাণীদের দেশ ছেড়ে এসে এরা আমেরিকায় সাধারণতন্ত্র করেছে, কিন্তু রাজসম্মানের লোভটা বেশ আছে। তাই অসংখ্য রাজারাণী আর রাজকন্যার আবির্ভাব চৌকিতে চৌকিতে হ'ল। টাকার দেশ, কাজেই প্রচুর খরচ করে সাজিয়েছে। যে-সব মেয়েরা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তারাই সাজে। রাজারাণী ছাড়া 'রেড ইণ্ডিয়ান' বয়েজ স্কাউট, যোদ্ধা এসবও আছে। সব 'ফ্লোট' আসার পর নানারকম নাচ হয়। কোন কোনটা খুব ভাল দেখতে। ওদেশে পা যথাসম্ভব উন্মুক্ত রেখে নাচাই নিয়ম, অথচ এত শীতে তা ত সম্ভব নয়। তাই মেয়েরা দুই-তিন জোড়া করে স্বচ্ছ মোজা পরে। শেষ নাচে শ্রেষ্ঠ রাণী বরণ হয় এবং গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ার মধ্যে নীলাভ আলোয় আধ-অন্ধকারে নৃত্য-উৎসব সাঙ্গ হয়। বরফ অবশ্য সত্যিকারের বরফ নয়, সাদা কাগজের গুঁড়ো।

ছাব্বিশ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর ভিতর থেকে রাণী বাছা হয়েছিল সেবার। মেয়েটি খুব যে সুন্দরী তা নয়, সাধারণই দেখতে। তবে শুনলাম ওরা শুধু রূপ দেখে না, গুণও দেখে। অনেকগুলি ভাবী রাণী ভীষণ রোগা এবং ছোট ছোট চোখ।

একজন 'পুবেহাওয়া' (East Wind) সেজেছিল, তাকে ভালই দেখাচ্ছিল, তবে ঠিক প্রাচ্য-ধরণের বলতে পারি না।

৭ই এপ্রিল শীতকালে কার্নিভ্যাল ছাড়াও Ice Follies প্রভৃতি হয়, তাতে নানারকম নাচই প্রধান। সবই প্রায় বরফের পটভূমিকায়। বরফের উপর "স্কেট" চমৎকার করে। "স্কেট" করার সাহায্যেই নানারকম খেলা। 'দিল্লীদরবার' এবং "আকাশের তারা" প্রভৃতি নামে কয়েকটা নাচ করেছিল যাতে সাজ-পোষাক খুব সুন্দর। তবে এদের আর্টের একটা অঙ্গ হচ্ছে যত সুন্দর পোশাকই হোক—তা স্বচ্ছ হবে, নয় ত নাচের সময় এমন করে পা ছুঁড়বে যে, নর্তকীদের প্রায় নিরাবরণ মনে হবে। আমাদের দেশের নাচের সঙ্গে ওদের দেশের নাচের এটা একটা মস্ত প্রভেদ। ভারতীয় সবরকম নাচেই পোশাকের শালীনতা যথাসম্ভব রক্ষা করা নিয়ম। ওদেশের নাচে এর উল্টা প্রথা, উৎকট ভাবে সমস্তক্ষণ মানুষের চক্ষুপীড়া ঘটায়।

তবে কিছু কিছু তামাসা-ধরনের জিনিসও ছিল। ক্লাউনদের খেলা বা নাচ অথবা জন্তুজানোয়ারের নাচ তার মধ্যে প্রধান। কাঠবিড়ালী, কুকুর, ভালুক, খরগোস ইত্যাদি অনেকে সেজেছিল। আমাদের দেশে সুকুমার রায়ের

"হ-য-ব-র-লতে" ছাড়া জানোয়ারের সাজ আমি বিশেষ দেখি নি। সুকুমার রায়ের নাট্যটি খুবই ভাল হয়েছিল।

Ice Folly-তে একটি ভালুক ছানা স্বর্গে গিয়ে মেঘ চাঁদ তারা এবং দেবশিশুদের দেখছে এই দৃশ্যগুলি বেশ নয়নরঞ্জক।

Ice Follies কিছু নামকরা জিনিস নয়। কিন্তু ওদেশে খুব খ্যাতি আছে নিউইয়র্ক থেকে আনীত এমন "ব্যালে" নাচও কিছু দেখতে গিয়েছিলাম। এ-নাচ ও অন্যান্য বিখ্যাত নাচগান ও বাজনার জন্য বিরাট বাড়ী আছে মিনিয়াপলিস শহরে। রাস্তার উপর অগুন্তি গাড়ী রাখবার জায়গা হয় না, তাই বোধহয় মাটির তলায় গাড়ী রাখবার জায়গা। সেখানে গাড়ী রেখে সুড়ঙ্গ দিয়ে অনেকখানি হেঁটে তবে আসল বাড়ীতে পৌঁছান গেল। লোকে লোকে চারিদিক ঠাসা। শাড়ী-পরা মেয়ে দেখে অনেকেই বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করতে শুরু করল। প্রথম হ'ল Constantania নামে নাচ; রং চং হাল্কা পরীর মত ধরন, ফুলের মত পেলব চেহারার নর্ত্তকী, তার গতিভঙ্গীও মোটের উপর সুন্দর। কিন্তু নাচের প্রধান উদ্দেশ্য যা মনে হয় তা যেন শুধু সুন্দর পরিবেষ্টনীর মধ্যে নর্ত্তকীর নিরাবরণ রূপ দেখানো। পোশাক আসাক সবই আছে, কিন্তু থাকার অর্থ যা তা আমাদের সেকেলে ভারতীয়দের চক্ষে শোভন বা শালীন নয়। আর একটি নাচ Harvest, তাতে জন্মমরণ ও যুদ্ধের খেলায় যেন জীবনের গভীর ও গম্ভীর রূপটাই ফুটে উঠল। পোশাক-পরিচ্ছদও সুন্দর এবং সুরুচিসম্মত। মানুষের জীবনের সুখদুঃখের চিরন্তন লীলায় হৃদয়ের তন্ত্রীতে যা যা দেয় কিন্তু মাদকতা আনে না, এতে তারই রূপ দেখে ভাল লাগল। ইউরোপীয় নাচে Swan Dance (রাজহংসীর নৃত্য) খুব চলিত, সেইরকম নাচও একটি ছিল। পুরাকালে অ্যানা প্যাবলোভার Swan Dance দেখেছিলাম; এটি অবশ্য অত সুন্দর নয়, তবুও দেখতে বেশ ভালই লাগল। বরফের উপর skating-এর নৃত্য শীতের দেশে শীতকালে থাকবেই। তার সাজ-পোষাক এবং দলবদ্ধ নৃত্যভঙ্গী বেশ নয়নরঞ্জন করে।

আমেরিকানদের টাকা প্রচুর কিন্তু শিল্পসৃষ্টি নূতন দেশে তেমন কিছু হয় নি; তাই ধনীদের শিল্পসংগ্রহের খুব বাতিক আছে। ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশ থেকে অতি নিপুণ ও সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ অথবা খুব বিখ্যাত কোন কোন শিল্পনিদর্শন তারা সে দেশ থেকে তুলে এনে নিজের দেশে রাখে। আস্ত একটা ঘরও তুলে এনে সাজানো দেখেছি Chicago-তে। মিনেসোটাতে অতবড় সংগ্রহশালা কিছু দেখি নি, তবে Walker Art Centre-এর মস্ত বাড়ীতে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখেছি। কাঠের ব্যবসাদার এক ধনী ভদ্রলোকের Jade পাথরের অনেক আশ্চর্য্য সুন্দর জিনিস ছিল। সেইগুলি তিনি এই সংগ্রহশালায় দান করেছেন। এই পাথর কেটে পাহাড় গাছপালা ঘরবাড়ী মানুষ বাসন থেকে সুরু করে গহনা ফুল ইত্যাদি সব জিনিসই গড়েছেন চীন দেশের নিপুণ শিল্পীরা। এখানে যত বড় Jade আছে আমেরিকায় আর কোথাও তা নেই। পাথরের পালিশ, পাথর কাটা, পাথরে খোদাই এমন অপূর্ব্ব যে হয় তা ভাবা যায় না। চীনদেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে, Jade মানুষের মঙ্গল করে, তাই সকলেরই অন্ততঃ একটা থাকা দরকার। বিয়ের সময় কনেকে Jade-এর তৈয়ারী ফুলগাছ দেয়। ফলে ফুলে পাতায় শোভিত এই গাছ পাথরে এমন অপূর্ব্ব সুন্দর কি করে করেছে জানি না। পাথরের উপর আবার মুক্তা বসানো।

পুস্তক সংগ্রহও একজনের বিরাট দেখেছিলাম। ভদ্রলোকের নাম Ames। এঁর বাবা আইনের বই বিক্রী করে অনেক টাকা করেছিলেন। ভদ্রলোক বুড়ো মানুষ, ব্রিটিশ ধরনের দেখতে। মাঠ জঙ্গল পেরিয়ে শহর থেকে অনেক দূরে মস্ত একটা বাগানের মধ্যে বাড়ী। বাড়ীতে যাবার আগে যে গেট দিয়ে ঢুকতে হয় সেটাও একটা বাড়ী। একেবারে বাদশাহী কারখানা। আসল বাড়ীটি খুব বড়, অনেক বড় বড় তৈলচিত্রে শোভিত। এমন সাজসজ্জা আর কোন বাড়ীর ইতিপূর্ব্বে দেখি নি। খুবই যে ধনী তা বেশ বোঝা যায়। এঁরা ভারতবর্ষে অনেক দিন ছিলেন এবং কাশ্মীর, জয়পুর, নেপাল, বিদার, মান্দ্রাজ প্রভৃতির অনেক জিনিস এঁদের আছে। গৃহকর্ত্তা হঠাৎ একবার কিংখাবের সেরওয়ানী পরে সোনা-বাঁধানো লাঠি হাতে দেখা দিলেন। তার পর অবশ্য আবার সাহেবী পোষাক পরলেন। এঁরই একটা আলাদা নিজস্ব বাড়ীতে বিরাট লাইব্রেরী আছে। তার নাম বোধহয় Ames Library of Asia. এখানে ভারত সম্বন্ধে এত বই আছে যে, কোন ভারতীয় একটা লাইব্রেরীতে এত আছে কিনা সন্দেহ। ঘরের পর ঘর ভর্ত্তি বই। ম্যাপও আছে অজস্র সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্য্যন্ত। ভারতের বিষয়ে হাজার হাজার বই, পারস্য প্রভৃতি বিষয়েও আছে। এই লাইব্রেরী বহু ব্রিটিশের লাইব্রেরী কিনে তিনি পূর্ণ করেছেন। মানুষটি নিজেও খানিকটা ব্রিটিশ মনোভাবসম্পন্ন। যে-সব বই দেখলাম একবার চোখ বুলিয়ে তার বিচার করা যায় না। তবে ভারতের নিন্দাপূর্ণ বই অনেক দেখলাম।

Chicagoর Lucy Maud Buckingham Memorial Collection-এ পৃথিবীর কত যে জিনিস সংগ্রহ করেছে বলা

যায় না। এখানেই দেখেছিলাম ফ্রান্স থেকে তুলে-আনা একটি সম্পূর্ণ গীর্জ্জা। পৃথিবীর নানা দেশের নানা সভ্যতার মানুষের নিখুঁত মূর্ত্তিসংগ্রহ এর একটি বিরাট অংশ। তার মধ্যে রাজপুত, বাঙালী, কাশ্মীরীও আছে। বাঙালী স্ত্রী-মূর্ত্তিটি আমারই এক নিকট-আত্মীয়ার মূর্ত্তি দেখলাম। আমি জানতাম না যে, এটি এখানে দেখব, অকস্মাৎ আবিষ্কার করলাম। প্রাচীনকালের রেড ইণ্ডিয়ানদের সোনাদানার ঐশ্বর্য্যও এইখানেই দেখেছি।

সিনেমায় সস্তায় আনন্দ উপভোগ আজকাল পৃথিবীব্যাপী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি এদেশেও বিশেষ সিনেমা দেখি না, ওখানে ত আরও কম দেখেছি। কিন্তু সে সময় ভারতবর্ষের 'River' নামক ছবিটি ওখানে খুব দেখানো হচ্ছিল। তাই আমাদের কয়েকজন আমেরিকান বন্ধু আমাদের সঙ্গে দেখতে যেতে চাইলেন। লোকদের যে খুব দেখবার উৎসাহ তা মনে হ'ল না। দর্শক ওদেশের তুলনায় কমই হয়েছিল। সুখের বিষয় ছবিটাতে খারাপ বা নোংরা কিছু দেখায় নি। তবে পাশাপাশি দারিদ্র্যের ছবি ছিল। গল্পটা একটু বেখাপ্পা ধরনের। ভারতীয় ছাঁচের মোটেই নয়। অথচ তার মধ্যে ভারতীয় বিবাহ, ভারতীয় নাচ ইত্যাদি ঢোকানো আছে। এর মধ্যে কিছু রূপক চিত্র আছে। কিন্তু এমনভাবে আছে যে, ওদেশের লোকে জিজ্ঞাসা করছিল যে, "তোমাদের মেয়েদের কি বিয়ের সময় নাচতে হয়?" যারা ছবিতে অভিনয় করেছিল তারা দেখতে আর একটু সুশ্রী হলে ভাল হ'ত। বাস্তবিক ভারতবর্ষে সুশ্রী মানুষের অভাব অতটা নয়। আমাদের দেশের গঙ্গা এবং ফুলের শোভা ছবিটিতে বেশ লেগেছিল, ওদের দেশের লোকও দেখে খুশী হ'ল।

Last Train from Bombay নামে একটি ছবি আমার মেয়েরা একদিন দেখতে গিয়েছিল। তাতে ভারতীয়রা সবাই চোর, খুনে, ঠগ এইরকম ধারণা মানুষের মনে জাগানো খুব সুন্দরভাবে হয়েছিল। রাজা থেকে আরম্ভ করে হোটেলের খানসামা বাবুর্চ্চি পর্য্যন্ত সবাই একজন আমেরিকানকে ঠকাতেই ব্যস্ত। এই জাতীয় ছবি হয়ত ওদেশে আরও দেখানো হয়।

ঠাকু'মার গল্প

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ডলি, মলি, কেটী—তিন বোনে তারা দূর পাড়াগাঁয়ে আসিল যবে,
মলি বলে: "ডলি, এ কোন্ রাজ্য?" ডলি বলে: "বুঝি পাতাল হবে!"
কেটী বলে: "হেথা নাই কোন লন, কোথায় টেনিস খেলিব হায়,
এর চেয়ে ভালো, মরিতাম যদি এ্যাক্সিডেণ্টে কলকাতায়!"
ঢেঁকি দেখে তা'রা বলে: "কি মেশিন? ওঠে আর নামে পায়ের নাচে—?"
ঘানি দেখে বলে: "কেন ঘোরে ওটা? চোখবাঁধা গরু কেন বা আছে!"
কুমোরের চাক দেখে বলে কেটী: "কি আশ্চর্য্য, দেখনা ভাই,
কাদার ডেলা যে হাঁড়ি হয়ে ওঠে, এ কোন্ ম্যাজিক, তুলনা নাই!"
পথে ঘাটে তারা ঘোরে দল বেঁধে, হাস্যে লাস্যে তুলনাহীন,
ছেলেমেয়ে বুড়ো গাছ কুকুরের স্ন্যাপশট তোলে রাত্রিদিন।
পল্লীবধূরা ঘোমটার ফাঁকে কৌতুকে চায় তাদের পানে,
তরুণের দল মেতে ওঠে মোহে, বৃদ্ধেরা শুধু অবাক মানে।
দেখে: ভাঁড় বাঁধা খেজুরের গাছে, দেখে ধানগাছ সবুজ মাঠে,
দেখে: আলিপথে "কিউ" হয়ে যেন গাঁয়ের লোকেরা চলেছে হাটে।
দেখে: বাঁশঝাড়, দেখে: ঘেঁটুবন, দেখে: ডোবাভরা পদ্মফুল,
শোনে: সন্ধ্যায় ডাকিছে শৃগাল, রাত্রে ডাকিছে মশককুল!

পাড়ার বধূরা ভয়ে ভয়ে আসে, ভয়ে ভয়ে তারা সরিয়া যায়,
ডলি মলি কেটী বলে : ইডিয়ট, আজো সভ্যতা শেখে নি হায়!
ঠাকু'মাকে ডেকে বলে : বলে' দাও, কেন ঢিল বাঁধা অশোক গাছে?
অশথতলায় কেন বা পাথর সিঁদুর মাখানো পড়িয়া আছে?
শত প্রশ্নের উত্তর দিতে বুড়ী ঠাকু'মার পরাণ যায়,
ডলি মলি কেটী হেসে হেসে বলে : "যাবে কি ঠাকুমা কল্‌কাতায়?
সেথা আছে লেক্, আছে মিউজ্যাম্, আছে মেমোর‍্যাল, মেট্রো আর
আছে হগ্‌মার্ট, চাং-ওয়া হোটেল,—আরশোলা ভাজে চমৎকার!"
হেসে হেসে বলে ঠাকুমা তখন : "কি হবে আমার ও-সব ভাই,
দোব থালা ভরে' আরশোলা ভাজা, আসবে যখন নাত্‌জামাই।
তার চেয়ে শোনো গল্প আমার নিছক সত্যি, মিথ্যে নয়,
এতদিন পরে তোমাদের বলে' যদি এ বুকটা হাল্কা হয়!"
গল্পের মোহে ডলি, মলি, কেটী—ঠাকু'মারে ঘিরে বসিল সবে,
সহুরে গল্প শুনেছে অনেক, গাঁয়ের গল্প শুনিতে হবে।
হেসে বলে কেটী : রূপকাহিনীর গল্প হলেই সব যে মাটি!
—সেই পুরাতন রাক্ষসপুরী, সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠি!"
ঠাকু'মা এবার বলেন গল্প : আমার শ্বাশুড়ী হলেন "সতী",
তরুণ বয়সে স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়েছেন পুণ্যবতী।
আমার বয়স বছর দশেক, বেড়াতাম ঘুরে ঘোমটা টানি',
শ্বশুর হঠাৎ গেলেন স্বর্গে, কি এক অসুখে, নাম না জানি।
সেদিন সবাই কেঁদে হোল সারা, শ্বাশুড়ীর মুখে মলিন হাসি,
স্বামীর চিতায় মরণ-বরণ এই তাঁর আশা সর্ব্বনাশী।
বছর তিরিশ বয়স তখন, করুণায় ভরা হৃদয়তল,
সবার দুঃখ বুকে নিয়ে তিনি মুছান সবার চোখের জল।
"সতী"—"সতী"—"সতী"—উঠে কলরব, গ্রামে গ্রামে ছোটে সে সংবাদ,
হাটে বাটে মাঠে এই কথা রটে, কারো হাসি, কারো আর্ত্তনাদ!
শ্বশুরবাড়ীতে জমে গেল ভিড়, সতীকে দেখিতে সবাই আসে,
আমার নয়নে ঝরে শুধু জল, অন্তর কাঁপে দারুণ ত্রাসে!
এয়োতি'রা এসে চরণ ধোয়ায়, গড় করে কেহ নোয়ায়ে মাথা,
কেহ লেপি দেয় ললাটে সিঁদুর, কারো ফুলমাল হয়েছে গাঁথা।
শাঁখা-পরা হাতে বসেছেন তিনি, লালপেড়ে শাড়ী পরণে তাঁর,
চির-এয়োতীর সিঁদুরের রেখা শোভে সীমন্তে চমৎকার!
পিতামাতা আর ভাই-বোন আসি' রয়েছেন বসি' তাঁহারে ঘিরে,
শত বোঝালেও না বোঝেন তিনি, ভাসেন সকলে নয়ন নীরে।
কা'রেও ডাকিয়া বলেন হাসিয়া, "অন্নদা দিদি, বিদায় ভাই!"
করযোড়ে কা'রে প্রণমি' বলেন : "এবার ঠানদি, বিদায় চাই!"

ছোট ছেলেমেয়ে ঘোরে কাছে কাছে, "সতী"র ব্যাপার বোঝে না তারা,
কি জানি কি হবে, এই ভাবনায় ভয়ে হ'য়ে গেছে বাক্যহারা।
আমারে ডাকিয়া বলেন খাশুড়ী—"এস গো বৌমা আমার কাছে,
লক্ষ্মীর ঝাঁপি, সুবচনী হাঁড়ি,—যত্নে রাখিও যা' কিছু আছে।
আজ থেকে সব দিলাম তোমারে পূজা-পার্ব্বণ ব্রতের ভার,
ভাঁড়ারের চাবি নিও হাতে তুলি', কেন সরে যাও? কেঁদ না আর।
গরুর সেবায় রাখিও দৃষ্টি, অতিথিরে কোরো অন্নদান,
লক্ষ্মীরূপিনী কল্যাণী হয়ে শ্বশুর ভিটার রাখিও মান।"
আগে আগে চলে শ্বশুরের শব, খোল করতাল উঠিল বাজি',
তার পিছে পিছে চলেন খাশুড়ী দৃঢ়পদে যেন বধূটি সাজি'।
যে ছিল যেখানে ছুটে এল সবে, দেখিতে সতীর পুণ্যদেহ,
খই আর ফুল কেহ বা ছড়ায়, মাটিতে লুটায়ে কাঁদে বা কেহ।
গাঁয়ের শ্মশান ভরে গেছে লোকে, কত যে নৌকা ভিড়েছে ঘাটে,
কেহ বা চড়েছে গাছের উপরে, কেহ বা রৌদ্রে দাঁড়ায় মাঠে।
শাঁখ হাতে নিয়ে এসেছে বধূরা, দেয় কিশোরীরা জলের ঝারি,
চরণের ধূলা লভিবার আশে কাড়াকাড়ি করে সকল নারী।
"জয় সতী" রবে ওঠে কোলাহল, পুরোহিত আসি' মন্ত্র পড়ে,
পশ্চিমে-হেলা সূর্য্যকিরণে-যেন স্বর্গের আশিস্ ঝরে।
খাশুড়ী আমার আছেন দাঁড়ায়ে অচল পাষাণ-প্রতিমা প্রায়,
দু'টি কর যুড়ি' সকলের কাছে নিলেন নীরবে শেষ বিদায়।
সাজানো চিতারে বেষ্টন করি' ধীরে ধীরে তিনি সাতটি বার,
বসেন চিতায় স্বামী-শবদেহ দু'হাতে জড়ায়ে বক্ষে তাঁর।
কাঁপে লেলিহান্ চিতার রসনা, অযুতকণ্ঠে "সতীর জয়।"
জীবিত ও মৃত পোড়ে এক সাথে, সারা চিতা হো'ল বহ্নিময়।
নেমে এল যেন সকলের শিরে মরণজয়ের আশীর্ব্বাদ;
শোনে নি ক' কেহ যাতনার ধ্বনি, এতটুকু কোন আর্ত্তনাদ।
চোখে ভাসে আজো সে দেবী-মূরতি, অঙ্গার হয়ে পড়িল খসি,'
ডুবিল সূর্য্য সন্ধ্যা-আঁধারে, লুকাইল মেঘে মলিন শশী।
চিতার ভস্ম লেপিয়া ললাটে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল সবে,
সেদিনের কথা ভুলিতে পারি না সতীর মরণ মহোৎসবে।
তারপরে কেটে গেছে কত যুগ, স্বপ্ন হয়েছে সে সব কথা,
ইতিহাস তার নূতন বিধানে দূর করে' দিল নির্ম্মমতা।
কোন অতীতের হারানো সে ছবি, কোন্ বেদনার অস্তরাগ,—
এ গাঁয়ের ধূলি-মাঝারে রয়েছে আজো সে সতীর পায়ের দাগ।
সে কাহিনী জাগে বনমর্ম্মরে, কাঁপে সন্ধ্যায় সে ছায়াখানি,
আজো শোনা যায় নীরব নিশীথে বাতাসে সতীর আশিসবাণী।
আজো নেমে আসে কালো দীঘি-জলে দুটি কাঁপা হাত বিলাতে স্নেহ,
আজো জাগে কার ব্যথাতুর আঁখি পল্লীশিয়রে, জানে না কেহ।"

পরাজয়

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

শুনে রাগ হ'ল অক্ষয়ের—আবার বাসায় চাকর নেই। নেই মানে, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাড়িয়েছে শ্যামা, সংসারের কর্ত্রী স্বয়ং। যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর—তাই আর কি!

চিরটা কাল এই রকমই হয়ে আসছে। তবু ইদানীং অসহ্য বাড়াবাড়ী। মোহান্তি তৃতীয়। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ওকে নিয়ে পর পর তিন জন চাকর গেল এ বাসা থেকে। গড়ে দুটি মাসও কেউ এখানে টিকে থাকতে পারছে না। দোষ ঐ শ্যামার। সে অবশ্য কিছুতেই স্বীকার করবে না। কিন্তু অক্ষয় তাই মনে করে; আর রাগে সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে যায় তার।

কবিগুরুর নির্দ্দেশ অক্ষয়ের শিরোধার্য্য—'যোগাযোগে'র নায়কের মত স্ত্রীকে সে দাসী মনে করে না। কিন্তু দাসী না হলেই অপদার্থ হতে হবে নাকি? অন্তত: দাসদাসী খাটাবার, তাদের নিয়ে মানিয়ে চলবার যোগ্যতাও থাকবে না?

শ্যামার বিদ্যা, মানে অবিদ্যা ত ঐ ম্যাটিক পর্য্যন্ত। চাকরি করতে হয় না তাকে। বাড়ীতে এক পাল ছেলেমেয়ের ঝামেলাও নেই। বড় ছেলেটি কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে, কনিষ্ঠা কন্যা পাঁচে পড়েছে—উড়তে না পারলেও খুঁটে খেতে শিখেছে। সংসারের আর একটি পোষ্য পিসিমা অবশ্য বোঝাই—বৈরাগ্যের পথে তিনি এত এগিয়ে গিয়েছেন যে, সংসারের কুটোটিও নাড়তে চান না। তাহলেও পাঁচটি প্রাণীর সংসার এত কিছু বড় নয় যার কাজ শ্যামার বয়সী ও তার মত স্বাস্থ্যবতী মেয়ের পক্ষে একেবারে অসাধ্য। এ হেন সংসারে মাইনে-করা চাকর যে রাখতে হয়, এই মাগগির বাজারে, এটাই অক্ষয়ের ক্ষোভের কারণ, বিশেষত: বাজার করার কাজটা সে যখন সখের তাগিদ ও চুরির ভয়ে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নির্ব্বিশেষে রোজই নিজেই করে থাকে। স্বভাবত:ই তার সেই ক্ষোভ ক্রোধে পরিণত হয়, যখন সে দেখে যে, শ্যামার দোষেই এ বাসায় চাকর টিকতে পারে না।

এবার রাগে ফেটে পড়বার মত হয়েই অক্ষয় বললে, থাম তুমি! দোষ মোহান্তির নয়, তোমার।

শ্যামাও রেগে গিয়ে উত্তর দিলে, আমার দোষ ত তুমি সেই শুভদৃষ্টির ক্ষণ থেকেই দেখে আসছ। কিন্তু মোহান্তির দোষটা একবারও তোমার চোখে পড়ল না কেন? কোন রকমে ডাল-চাল দুটি ফুটিয়ে দিয়েই সন্ধ্যা হতে না হতেই বাবু বেড়াতে বের হ'ত, আমাদেরই বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীচে দারোয়ানের সোমত্ত মেয়েটার সঙ্গে রোজই ফষ্টিনষ্টি করত সে।

তা সব পুরুষই করে, অক্ষয় উত্তরে বললে, আমিও দেরী করে ঘরে ফিরি, তোমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করি—অন্তত: করতে চাই মাঝে মাঝে।

দুই চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছড়িয়ে শ্যামা বললে, ও দুটো জিনিস এক হ'ল?

মূলত: একই। আর না-ও যদি হয়, তবু ওকে উপেক্ষা করা উচিত। মোহান্তির মত লোকেরা শুকদেবই যদি হবে ত তোমার বাড়ীতে চাকর খাটতে আসবে কেন?

শ্যামা দমবার পাত্রী নয়, সে ধমক দিয়ে বললে, থাম তুমি। উঠতি বয়সের ছেলে নিয়ে ঘর করি আমি—ওরকম চাকর বাড়ীতে রাখতে পারব না। আর একটি লোক দেখ তুমি। না হয় মেয়ে ছেলেই নিয়ে এস একটি। আজ কাল ত শুনছি রিফ্যুজি মেয়ে হাটে বাজারে বিকোচ্ছে।

কিন্তু সে দিন গোড়াতেই মনটাকে শক্ত করেছিল অক্ষয়। সুতরাং ফরমাসটি কানে যেতে না যেতেই সে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলে, আমি চাকর খুঁজে আনব আর তুমি তাড়াবে—বেশ মজা পেয়েছ, না? কিন্তু আর নয়। চাকর ছাড়া তোমার যদি নাই চলে তবে ছেলে হোক মেয়ে হোক, তুমি নিজে খুঁজে আন গে।

খোঁজ নিয়ে এল শ্যামাই। গরজ বড় বালাই, বোধ করি সেই জন্যই। সংসার নিয়ে দিন দশেক হিমশিম খাবার পর সেদিন রাত্রে শ্যামা একটু খুসী খুসী মুখেই স্বামীর কাছে এসে বললে, আমায় তুমি যত অপদার্থ মনে কর তা আমি নই।

হাসি মুখে হলেও খোঁচা দিয়ে উত্তর দিলে অক্ষয়, তা ত দেখতেই পাচ্ছি। দিন দশেক ত মোটে হ'ল বাসায় চাকর নেই। এরই মধ্যে বাড়ীটা হয়েছে যেন আস্তাকুড়, পিসিমা দিন রাত গজ গজ করছেন, মেয়েটা খেতে পাচ্ছে না, আর আমি—

বল যে, না খেয়ে মরে গিয়েছ তুমি—বলতে বলতে শ্যামা খাট থেকে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসল।

কিন্তু সেখান থেকেই সে আবার বললে, তোমার কথা শুনতে চাই নি আমি, আমার কথা বলতে এসেছি। দাদাকে জানিয়ে ছিলাম আমাদের অসুবিধা, তিনিই একটি মেয়েছেলের কথা বললেন—শুধু বলা কেন, ডেকে দেখিয়েও দিলেন তাকে।

এ ত সত্যি সুখবর, বলে সোজা হয়ে বসল অক্ষয়, তাকে দিয়ে কাজ চলবে যদি মনে কর ত তাকেই রাখ।

আমার কাজ চলবে হয় ত, কিন্তু—বলে থেমে গেল শ্যামা।

অক্ষয় বিস্ময়ের স্বরে বললে, কিন্তু কি?

বড্ড যেন দেমাক মেয়েটির।

কি রকম?

বলছে সে বাজার-টাজার করতে পারবে না।

ভদ্র ঘরের মেয়ে বুঝি?

প্রশ্ন শুনেই চটে গেল শ্যামা, বললে, কেন, ভদ্র ঘরের মেয়েরা বুঝি বাজার করে না? এ পাড়ায় যারা বাজার করে তাদের অধিকাংশই মেয়ে এবং তারা সকলেই ভদ্র ঘরের।

অক্ষয় মুচকি হেসে উত্তর দিলে, ও মেয়েটি হয় ত এদের মত আলোক-প্রাপ্তা নয়। আর তোমার দাদার বাসায় তাকে যখন দেখে এসেছ তখন ত চাক্ষুষ প্রমাণই পেয়েছ তুমি যে, তিনি এ পাড়ায় থাকেন না। তা ছাড়া ওই যদি তার একমাত্র দোষ হয় তার জন্ত তাকে বাতিল করবে কেন? এ বাসায় বাজার ত আমিই করি—চাকর থাকলেও করি।

তাহলেও অমন কড়ারে কি রাজী হওয়া যায়? সময়-অসময় আছে ত?

অসময়ে তুমিই চালিয়ে নিতে পারবে। তোমার ত আর দেমাক নেই।

শ্যামাও হাসল, বললে, আমাকে খোঁচা না দিয়ে তুমি কি কথা বলতে পার না? অথচ তোমার কথা ভেবেই এ আপত্তিটি তুলেছি।

অক্ষয় উত্তরে বললে, তাহলে তোমার কথা ভেবেও আমায় দু'একটি আপত্তি তুলতে হয়। আর একটি মেয়েছেলেকে যে এ বাড়ীতে আনবে, সে শোবে কোথায়?

তা আমি ভেবেছি। চিলে কোঠায় পিসিমার কাছে সে বেশ শুতে পারবে।

পিসিমাকে জিজ্ঞেস করেছ?

করি নি, করব। তাঁকে রাজী করবার ভার আমার।

তাহলেও আরও একটা কথা ভাবতে হয়—বলে থেমে গেল অক্ষয়, একটু পরে স্ত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, আর কোন ভয় নেই ত তোমার? মানে, আমিও ত এই বাড়ীতেই আছি এবং থাকব।

একটু যেন বিহ্বল হ'ল শ্যামা, কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েই হেসে ফেলল সে, বললে, এত কথাও মাথায় আসে তোমার! না, সে ভয় আমার একটুও নেই।

কারণ?

কারণ আমি জানি যে, তোমার রুচি আছে।

কথাটার মানে অক্ষয় বুঝল দিন চারেক পর। সেটা ছুটির দিন। ভোরেই বাজার সেরে দিয়ে অক্ষয় গিয়েছিল তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। সুতরাং স্নানটান সেরে খেতে বসতে বেশ বেলা হয়েছিল সে দিন।

খাওয়া যখন তার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন শ্যামা এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন খেলে? রান্নাটা কেমন হয়েছে আজ?

চমৎকার!—প্রায় উচ্ছসিতকণ্ঠেই উত্তর দিলে অক্ষয়, দেখছ না কেমন চেটেপুটে খেয়েছি। তাই ত বলি যে মন করলে সবই করতে পার তুমি।

আশা করেছিল সে যে, অমন প্রশংসা শুনে স্ত্রীর মুখ খুসীতে ঝলমল করে উঠবে। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। বেশ যেন একটু গম্ভীর হয়েই শ্যামা বললে, আজ আমি রাঁধি নি, রেঁধেছে নলিনী।

থতমত খেয়ে অক্ষয় বললে, নলিনী কে?

সেই যে মেয়েটির কথা সে দিন তোমায় বললাম, সে আজ থেকে কাজে লাগল।

ওঃ!—বলেই জলের গ্লাসটি মুখে তুলে দিলে অক্ষয়, ঢক ঢক করে সেটি নিঃশেষ করে সে আবার বললে, তা বেশ।—বলেই উঠে গেল সে।

চিরদিনের নিয়ম, অক্ষয় খেয়ে উঠে খাটে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামা খোলা পানের ডিবে হাতে নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সেদিন শ্যামা এল খালি হাতে—এসেই গম্ভীর, রীতিমত হুকুমের স্বরে সে ডাকল নলিনী, এ ঘরে পান নিয়ে এস।

বোধ করি দোরের কাছেই দাঁড়িয়েছিল সে, পরক্ষণেই ভিতরে এসে ঢুকল।

পরিধানে সরু পাড়ের সাদা ধুতি, কিন্তু আবক্ষ ঘোমটাটানা, বাঁ হাতখানাও দেহের অন্তান্ত অংশের মত সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে, ডান হাতে পানের ডিবে রয়েছে বলেই মণিবন্ধের খানিকটা ও কয়েকটি আঙুল চোখে পড়ে। নিরাভরণ হাত, তাও কাঁপছে।

ও কি! বিরক্তির তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাকে বললে শ্যামা, অত বড় ঘোমটা টানবার কি হ'ল এখানে? এতক্ষণ ত দেখছিলাম একেবারে বিপরীত ধারা। পানের ডিবেটা ঐ মেজের উপর রেখে ওঁর সঙ্গে কথাটা পাকা করে নাও।

অক্ষয় বিব্রত হয়ে বললে, আহা, থাক না। কথা ত তোমার সঙ্গেই হয়েছে। ওতেই চলবে।

কেন? শ্যামার গলার আর এক পরদা উপরে উঠে গেল, বাড়ীর কর্তার কাছে এত লজ্জা করলে এখানে কাজ করবে কেমন করে? তিন মহলা বাড়ী ত এ নয়!

পানের ডিবেটি রাখবার জন্তই নলিনীকে মাথার কাপড় খানিকটা তুলতে হ'ল এবং বোধ করি সেই জন্তই খোলা মুখ আবার ঢাকবার উদ্দেশ্তেই সে পরক্ষণেই শ্যামার পিছনে সরে গেল। বিব্রত হয়ে অক্ষয়ও তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল পানের ডিবের দিকে। তবু ঐ এক পলকের দেখাতেই বুঝল সে যে, মেয়েটির রঙই কেবল কালো নয়, মুখের গঠনও কুৎসিত। তবে সাধারণতঃ যে বয়সে মেয়েরা পরের বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ করতে যায় সে বয়স ওর এখনও হয় নি। শ্যামার চেয়েও কমই ওর বয়স, বড় জোর সমান সমান। অনুমান করলে অক্ষয় যে, কাজ করতে আসাটাকে নলিনী তখনও পরিপাক করতে পারে নি। করুণায় কোমল হ'ল অক্ষয়ের মন।

কিন্তু শ্যামা নির্মম, সে নিজে সরে গিয়ে অক্ষয়ের সঙ্গে নলিনীর

মুখোমুখী করে দিলে, তার পর বললে, সামনাসামনি কথাটা পরিষ্কার করে নাও। খাওয়া-পরা বাদে আপাততঃ মাসে পনের টাকা মাইনে পাবে তুমি।

মাটিতে চোখ রেখে মৃদু স্বরে উত্তর দিলে নলিনী, আপনারা খুশী হয়ে যা দেন তাতেই চলবে।

আর ছুটি সপ্তাহে সপ্তাহে হবে না, পনর দিন পর একদিন।

বেশ।

শ্যামার রুক্ষ, কর্ত্তৃত্বের কণ্ঠস্বরের তুলনায় বড়ই করুণ শোনাল নলিনীর স্বর। বুঝে অক্ষয় কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, আগে কোথাও কাজ করেছ তুমি?

উত্তর হ'ল বাড়ীতে করেছি।

অক্ষয় বললে, এও তোমার নিজের বাড়ী মনে করেই এখানে কাজ কর তুমি। আমরাও তোমাকে আমাদের আপন জনই মনে করব। দিদি বলবার বয়স ত তোমার এখনও হয় নি, হলে তাই ডাকতাম। এখন তুমি যাও।

নলিনী অদৃশ্য হতে না হতেই শ্যামা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, ও আসতে না আসতেই ওকে বাড়ীর লোক বানিয়ে নিলে তুমি?

তার মুখে ও কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আভাস, কিন্তু অক্ষয় হেসেই উত্তর দিলে, ও কথা বলতে হয়, বললে ভাল কাজ পাওয়া যায়। তাছাড়া বুঝতে পারছ না? মেয়েটি ভদ্রঘরের।

অস্বীকার করতে পারলে না শ্যামা। তার দাদাই তাকে বলে দিয়েছে যে, নলিনী তাদের স্বজাতি স্বঘর। অবস্থাও অতীতে ভালই ছিল ওদের। তবে কি করবে? একেই বিধবা, তা মা নেই, বাবাও জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। পিতার সঙ্গেই দেশ বিভাগের পর নলিনী কলকাতায় ওর দাদার বাসায় এসে উঠেছিল। তার পর যা হয়ে থাকে তাই হচ্ছে। দাদা লোক মন্দ না হলেও বড়লোক ত আর নয়, তার উপর ষেটের কোলে তার নিজের পরিবারই বেশ বড়। অভাবের সংসারে নলিনীর বৌদি ওকে গলগ্রহ মনে করতে সুরু করেছে। সুতরাং অনেক ভেবে, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ওর বাবা ওকে পরের বাড়ীতে চাকরি করতে পাঠিয়েছে।

তাই বলে রাঁধুনীকে ত আর মাথায় তোলা যায় না! স্বামীর মন্তব্যের উত্তরে সেই কথাই বললে শ্যামা।

অক্ষয় স্ত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে বললে, তা তেমন গুণ যদি ওর থাকে তবে মাথায় করেই রাখতে হবে বই কি।

ও কথা মানবার মেয়ে শ্যামা নয়। সে যেতে যেতে বলে গেল, তোমার আধিক্যেতা রাখ বাপু। এক বেলাতেই কি এমন গুণ তুমি দেখলে ওর মধ্যে? তা ছাড়া কেবল একটা গুণ থাকলেই ত হবে না! চেনা নেই, জানা নেই—স্বভাব চরিত্তির কেমন তাও ত দেখতে হবে।

এই হ'ল শ্যামার স্বভাব—কারও গুণ ওর চোখে পড়ে না, ও কেবলই অপরের দোষ খুঁজে বেড়ায়। এই জন্যই এ বাসায় ঝি-চাকর টিকতে পারে নি।

কিন্তু এবার সে কোণঠাসা হয়ে পড়ল।

বৈকালে পিসিমা নীচে নেমে এসেছিলেন তাঁর কি একটা অভাবের কথা অক্ষয়কে জানাতে। সেই সময়েই শ্যামা এল স্বামীর জন্য চা নিয়ে, তার আঁচল ধরে এল কন্যা বুলু। অক্ষয় একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, আজও তুমিই চা করলে নাকি?

করব না? শ্যামা উত্তরে বললে, আনকোরা নূতন লোকের হাতে প্রথম দিনই সব ছেড়ে দেওয়া যায় নাকি?

একটু থেমেই সে আবার বললে, আচ্ছা, তখন যে অত প্রশংসা করলে, কেন? কি এমন অমৃত রেঁধেছে ও? আমার ত ঝালে মুখ পুড়ে যায় আর কি!

উত্তর দিলেন পিসিমা, ওটা বাঙ্গাল দেশের রান্নার ধাচ, বৌমা। ঐটুকু না ধরলে বেশ ভালই ত রেঁধেছে তোমার নূতন রাঁধুনী। ওর রাঁধা ডাল মুখে দিয়ে আমার ত মনে হ'ল যে, ঐ এক ডাল দিয়েই আমি সব ভাত খেতে পারি।

উঁহু! বলে উঠল বুলু: ডাল ভাল না, মাছ ভাল।

হেসে ফেললেন পিসিমা, হাসল ওরা দুজনেও। হাত ধরে মেয়েকে কাছে টেনে এনে অক্ষয় তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নূতন পিসিমাকে দেখেছ বুলু?

হ্যাঁ।

কেমন পিসিমা?

খুব ভাল।

মারে নি ত তোমাকে?

না, ভালবেসেছে।

বলতে বলতে পিতার কোলের কাছে এগিয়ে এল মেয়েটি, তার জানুর উপর মাথা রেখে আবার বললে, আমি পিসিমার কাছে শোব, বাবা। মাকে তুমি বলে দিও।

অক্ষয় স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে ওকে। চা তৈরি করবার সময়েও যার কাছে দাঁড়াতে হয়, তাকে ঝোল-ডালনায় মশলার পরিমাণ বুঝিয়ে দিতে হবে না?

পিসিমাও সায় দিয়ে বললেন, তা না দিলে কি চলে? আমার ত বেশ লাগল মেয়েটিকে। একটু কষ্ট করে ধৈর্য্য ধরে ওকে শিখিয়ে নাও বৌমা। পারলে তোমারই উপকার হবে—একা হাতে সংসারের কাজ যখন করে উঠতে পার না তুমি।

শেখাবার তেমন দরকারই হ'ল না। কাজ ত গৃহস্থালির। তা নলিনীর জানাই ছিল। যা জানা ছিল না তা এ পরিবারের জীবনযাত্রা-প্রণালী, বিভিন্ন প্রাণী কয়টির বিশেষ বিশেষ রুচি বা মেজাজের হদিস। তা জানা না থাকলেও বুদ্ধি ছিল নলিনীর। সুতরাং ওসবও বেশ চট করেই আয়ত্ত করে নিলে সে। বুঝি বা

শ্যামার স্বভাবও। শ্যামার অবসরের পরিধি ক্রমাগতই বাড়িয়ে দিয়ে তারও মুখ বন্ধ করলে নলিনী।

একাই সব কাজ করে সে। রন্ধন থেকে উচ্ছিষ্ট মার্জন পর্য্যন্ত যা তার করবার কথা তা ত করেই, তার উপরেও আগে কোন ঝি বা চাকর কোন দিন যা করে নি সেই, বিছানা পাতা, বুলুকে স্নান করান, মায় শ্যামার চুল বেঁধে দেওয়া পর্য্যন্ত এরই মধ্যে আবার এক ফাঁকে সে পিসিমার পূজার আয়োজনও করে দেয়। শুধু কাজ করা নয়, নিখুঁত ভাবেই কাজ করে সে।

কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র পুত্র অক্ষয় সেদিন মাংস ভেবে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে যখন শুনল যে, বস্তুটি আসলে পাঁঠার মাংস নয়, কাঁটার ভয়ে কোন দিনই যা সে মুখে তোলে না সেই চিতল মাছের পিঠের দিকটা, তখন তার বিস্ময় ও আনন্দ দেখে কে! যার জন্য ও জিনিস তার কাছে অখাদ্য সেই পশুচর্ম্মের মতই পুরু ছালই যে কেবল বর্জ্জিত হয়েছে তা নয়, না জানি কোন মন্ত্রবলেই বুঝি ঐ অংশের অগণিত সরু সরু কাঁটা বিলকুল উড়িয়ে দিয়ে সারবস্তুটির আকৃতি ও প্রকৃতি দুই-ই একেবারে বদলে দিয়েছে পাচিকা। ভ্রম দূর হবার পর সেদিন নূতন পিসির গুণকীর্ত্তনে যেন পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল অক্ষয়।

তেমনই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তার মুখে নলিনীর পরিচ্ছন্নতাবোধ ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কুশলতার। তার মাকে শুনিয়ে শুনিয়েই সে বলে যে, নূতন পিসি আসবার পর রান্নাঘরের চেহারাও যেন বদলে গিয়েছে। অক্ষয়ের এবং আরও অনেকের চোখে পড়ে ঐ পরিবর্ত্তন। কালিঝুল কোথাও আর দেখা যায় না। অতদিনের পুরাতন বিবর্ণ মিটসেফটি নলিনী কেবল সোডা ও গরম জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়েই প্রায় নূতনের মত করে তুলেছে। কাঁসা-পেতলের বাসনগুলি আজকাল সর্ব্বদাই এমন ঝক ঝক করে যে, মনে হয় ওতে মুখ দেখা যাবে। সবচেয়ে বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছে নলিনী এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি-কড়া-বাটিতে। হঠাৎ দেখলে ভ্রম হয় যে ওগুলো রূপার বাসন।

সে আমলের নামকরা গৃহিণী বৃদ্ধা পিসিমার মুখে হাসি আর ধরে না। একদিন তিনি বলেই ফেললেন যে, এতদিনে ঘরে লক্ষ্মীশ্রী হয়েছে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণকে উড়িয়ে দেওয়া শ্যামার মত খুঁতখুঁতে মানুষের পক্ষেও সহজ নয়। কোণঠাসা হয়ে কিছুদিন সে চুপ করেই ছিল। কিন্তু পিসিমার মুখে সেদিন ঐ ভাষায় নলিনীর প্রশংসা শুনে সে অপ্রসন্ন স্বরে বললে, অত ভাল আবার ভাল নয়।

অক্ষয় হেসে উত্তর দিলে, এক হিসাবে তোমার কথা ঠিক। যে কালে চাকরের হাতে রান্নার ভার ছিল তখন অন্ততঃ পেটের দায়েও সপ্তাহে দু'এক দিন তুমি রান্নাঘরে যেতে, তোমার শরীরটা তখন নাড়াচাড়া পেয়ে অত ফুলতে পারত না। কিন্তু নলিনী আসবার পর থেকে দিন-রাত শুয়ে-বসে থেকে যে রকম মুটিয়ে চলেছ তুমি, তা দেখে কেমন করে তোমার কথা একেবারে উড়িয়ে দেব?

শুনে হঠাৎ যেন খেপে গেল শ্যামা, সে বললে, তোমার চোখে ত আমি যা করি তাই দোষের। আমি কাজ করতে গেলে তুমি বলবে, আমি তাড়া দিয়ে দিয়ে তোমার চাকর-চাকরাণী তাড়াই। আবার ওদের হাতে সব ছেড়ে দিলে, তোমার চোখে তা হয় আমার কুঁড়েমি। তাহলে আমি যাই কোথায়?

অক্ষয় বললে, আহা, যাবে আর কোথায়? যাতে তোমার যেতে না হয় সেই জন্যই ত কথাটা বললাম। এক এক করে সব দায়িত্বই যদি ওর উপর ছেড়ে দাও, তাহলে একদিন হয়ত দেখবে যে তোমার কর্ত্রীত্বও চলে গিয়েছে।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, গেলে বাঁচি।

অক্ষয় কিন্তু হেসেই উত্তর দিলে, তা তুমি হয়ত বাঁচবে, কিন্তু তাহলে আমার উপায় কি হবে?

ঠিক এমনই সময়ে বুলুর খিল খিল হাসির আওয়াজ শোনা গেল, আর সেই সঙ্গেই অপেক্ষাকৃত গম্ভীর নারীকণ্ঠের সকৌতুক গর্জ্জনধ্বনি। পরক্ষণেই ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে ঢুকল বুলু—একেবারে আদুড় গা, ববু-করা চুল লাল ফিতার বন্ধনমুক্ত হয়ে সিংহের কেশরের মত ফুলে উঠেছে, গায়ে মুখে মোটা আঙুলের তেলের ছাপ। বেশ বোঝা যায় যে, স্নানের ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে সে। কিন্তু ভয়ে জড়সড় নয়, হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন।

বুলুর ঠিক পিছনে পিছনেই ছুটে এল নলিনী। তার খোলা মুখ, মাথায় কাপড় নেই, আলগা আঁচল মাটিতে লুটাচ্ছে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে অক্ষয়কে দেখেই একেবারে বদলে গেল সে। অকস্মাৎ সঙ্কোচে একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে, দাঁতে জিভ কেটে, ত্রস্তহস্তে আবক্ষ ঘোমটা টেনে ছুটে পালিয়ে গেল সে।

শ্যামা মেয়েকে ধমক দিলে, উঠে তার হাত নয়, ঘাড় ধরে তাকে স্নানের ঘরে রেখে আবার যখন সে এ ঘরে ফিরে এল তখন বিরক্তিতে কালো ও কুঞ্চিত হয়েছে তার মুখ। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, আচ্ছা যার প্রশংসায় তোমরা প্রত্যেকেই পঞ্চমুখ হও, তার পেটে কি আছে বা থাকতে পারে তা কোন দিন ভেবে দেখছ?

অক্ষয় সবিস্ময়ে বললে, সে আবার কি?

স্বর নামিয়েও উদ্ধতভাবে উত্তর দিলে শ্যামা, বাড়ীতে ভাসুর ত ওর কেউ নেই। তবু লজ্জাবতী লতাটির মত অত ওর লজ্জা কেন বলতে পার?

একটু আগেই তা দেখেছে অক্ষয়। তারও আগে, সেই প্রথম দিন থেকেই বার বারই লক্ষ্য করেছে সে—যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নলিনীর পক্ষে তার লজ্জার অভিব্যক্তি, অতিক্রম করে যায় তার স্বভাবকেও। একা বা কেবল মেয়েদের কাছে যখন সে থাকে তখন সব ঠিক—হয়ত মাথায় কাপড়ই থাকে না তার। কিন্তু য কোন পুরুষ দেখলেই চক্ষের নিমেষে আপাদমস্তক ঢেকে ফেলে

সে। বাইরে কড়ানাড়া শুনলে যদি বা কখন নিজের হাতে দোর খুলে দেয়, আগন্তুক পুরুষ হলে পরমুহূর্ত্তেই ছুটে পালিয়ে যায় সে। একই ব্যক্তির দুই অবস্থার পার্থক্য এত বেশী বলেই ওর লজ্জাটা নজরেও পড়ে বেশী। লজ্জা না হয়ে ভয়ও যদি হয় তবু অতটা বাড়াবাড়ি চোখে একটু বেমানান ঠেকে বই কি।

সেই জন্যই তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর অক্ষয়ের মুখে ফুটল না।

কিন্তু পিসিমা প্রতিবাদের সুরে বললেন, তা বৌমা, মেয়েছেলের একটু লজ্জা থাকা ত দোষের কিছু নয়, বরং ভালই।

শুধু প্রতিবাদ নয়, একটু খোঁচাও ছিল ঐ কথায়। পাছে শ্যামা রেগে গিয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, সেই আশায় মাঝামাঝি, একটা রফা করবার উদ্দেশ্যে অক্ষয় তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললে, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কি না—ওরা অমনই হয়। আর তোমরাও ত ওকে ঘরের কোণেই আটকে রেখেছ—সহজ হবার সুযোগই পাচ্ছে না ও। পিসিমা যদি মাঝে মাঝে ওকে নিজের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে বা ঠাকুর বাড়ীতে নিয়ে যান ত ওর এই স্বভাবটা কেটে যেতে পারে।

পিসিমা কিন্তু এর উত্তরে অপ্রসন্নকণ্ঠে বললেন, তা ও যেতে চায় না বাছা। ওর দোষ যদি বল ত আমি দেখি এই একটি—ধর্ম্মে-কর্ম্মে মতি নেই। আমার সঙ্গে ঠাকুরের ঘরেই ত ও থাকে, প্রায়ই আমার পূজার আয়োজন ও করে দেয়। তবু এত দিনের মধ্যে একদিনও ত ওকে ঠাকুরের সামনে চোখ বুজে বসতে দেখলাম না।

অক্ষয় হেসে বললে, তা ঠাকুরের সামনে চোখ বুজবে কেন পিসিমা? তোমার ঠাকুর ও দেখতে চায় বলেই চোখ চেয়ে থাকে।

কেবল ঠাকুর নয় গো, বলে উঠল শ্যামা, আরও অনেক কিছুই নলিনী চেয়ে চেয়ে দেখে যা দেখলে আমরা লজ্জায় মরে যাই।

তার মানে?

শ্যামা ঝঙ্কার দিয়ে উত্তর দিল, মানে জানি নে বাপু, যা দেখি তাই বললাম।

কি দেখ তুমি?

দেখি যে, দিন নেই রাত নেই, একটু সময় পেলেই জানলায় বসে পথের দিকে চেয়ে থাকে ও। আর ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, মাসে দুটি দিন বাড়ীতে গিয়ে রাত কাটিয়ে আসা চাই-ই।

সেই জন্যই ত বলি যে, বাইরে যাবার আরও সুযোগ ওকে দেওয়া উচিত, বলে উঠে গেল অক্ষয়।

দিন কয়েক পর নিজে থেকেই অক্ষয় আবার শ্যামাকে বললে, দেখ, আমাদের রাতের রান্না সন্ধ্যার আগেই যখন শেষ হয়ে যায় তখন ঘণ্টাখানেকের জন্য নলিনীকে আমাদের ছুটি দেওয়া উচিত।

ওমা! ভ্রূ কুঞ্চিত করে শ্যামা উত্তর দিলে, আমি ওকে আটকে রাখি নাকি? পিসিমার মুখে শুনলে না সেদিন—নলিনী নিজেই বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেরোতে চায় না।

আহা, বোঝ না কেন? অক্ষয় বললে, হাজার হলেও পিসিমা ত এ বাড়ীর গিন্নী নন, গিন্নী তুমি। তুমি নিজে অনুমতি না দিলে বেচারী যেতে সাহস পায় না।

যেন প্রতিশোধ নেবার জন্যই দিন দশেক পর নলিনীর ছুটির দিনে শ্যামা স্বামীকে বললে, তুমি বার বার ওকথা আমাকে বলেছ বলেই তোমাকেও আমি না জানিয়ে পারছি নে—নলিনী পিসিমার সঙ্গেই দিন তিনেক মোটে ঠাকুরবাড়ী গিয়েছিল, আর যায় না।

অক্ষয় বললে, কেন?

সে কথা পিসিমাকেই জিজ্ঞেস কর তুমি।

ঐটুকু বলেই ক্ষান্ত হ'ল না শ্যামা। সেই দিনই স্বামীর কাছে স্বয়ং পিসিমাকে সশরীরে হাজির করে তাকে ওই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সে বাধ্য করলে অক্ষয়কে।

কিন্তু প্রশ্ন শুনে এবারও পিসিমা অপ্রসন্ন কণ্ঠেই বললেন, না, বাছা, তুমি বললে কি হবে? ঠাকুর কৃপা না করলে কারও কি ধর্ম্মে মতি হয়। বলে কয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম দুদিন। কিন্তু দেখলাম যে, ঠাকুরবাড়ী গিয়ে ও কেবলই উসখুস করতে থাকে, যেতে আসতে পথে কেমন যে করে তা বলে তোমায় বোঝাতে পারব না।

শুনতে শুনতে সশব্দে হেসে উঠল শ্যামা। সে হাসি যে ব্যঙ্গের অক্ষয় তা বুঝল। কিন্তু ওই ব্যঙ্গের লক্ষ্য নলিনী না হয়ে সে নিজেও যে হতে পারে তাই অনুমান করে অক্ষয় বিরক্তকণ্ঠে বললে, আমি কি আর বলেছি যে নলিনী গৌরী মাতার যমজ বোন? দিন-রাতের মধ্যে একবারও ছুটি না পেলে ওদের দিক থেকে অভিযোগ উঠতে পারে ভেবেই ওকথা বলেছিলাম আমি। তা ও নিজেই যদি ছুটি না নেয় ত ল্যাটা চুকেই গেল। এখন নলিনী নিজে বা তার কোন আপন জন আমাদের দোষ ধরতে পারবে না।

এর পর নলিনী সম্বন্ধে আর কোন অভিযোগই এল না শ্যামার কাছ থেকে কিন্তু বিরতি বেশি দিন গেল না। বোধ হয়, শ্যামা নিজেকে এতদিন প্রস্তুত করছিল। কারণও একটা জুটে গেল। বললে, তুমি বুঝি ভাব যে নলিনী চাকরী ছেড়ে চলে যাবে?

অক্ষয় বিস্মিত হয়ে বলে, কৈ না। এ রকম কোন ভাবনা ত মনে ওঠে নি আমার। মনে করবার কারণও ত, কৈ, কিছু ঘটে নি।

কিন্তু পরক্ষণেই মুচকি হেসে সে আবার বললে, তবে তোমার কথা শুনে এখন মনে পড়ল আমার যে, এ বাসায় কোন চাকর-বাকরই খুব বেশীদিন টিকে থাকে নি।

পরিহাসে যোগ দিলে না শ্যামা। বরং আরও গম্ভীর হয়ে চোখের তারার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটিও বিচিত্র ভঙ্গীতে একবার দুলিয়ে সে বললে, কিন্তু নলিনী থাকবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি ওকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চাইলেও, ও এ বাসা ছেড়ে যাবে না।

অক্ষয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি নিবে গেল, সে বললে, তাই ভেবে তুমি ঝাঁটা মারা শুরু করতে চাও নাকি?

না, শ্যামা উত্তরে বললে, কিন্তু কথাটা আজ তোমাকে না বলে পারলাম না।

কারণ ?

কোন্ কারণটা জানতে চাও তুমি ? কেন এ কথা বলছি তোমাকে, না, কেন আমি মনে করি যে নলিনী এ বাড়ী ছেড়ে যাবে না ?

শেষের কারণটাই আগে বল ত, শুনি।

সেটা ত আমার চেয়ে তুমিই বেশী জান। এমন আদর আর কোথায় পাবে নলিনী ?

তার মানে ?

মানে আবার কি ? রাধুনী হয়ে এ বাসায় ঢুকেছিল, হয়েছে কর্ত্তার বোন। এখন বাড়ীর বৌয়ের সঙ্গে তার ননদিনী সম্পর্ক ত হবেই। হয়েছেও তাই। আমার কথা আর এ সংসারে টিকছে না।

স্ত্রীর মুখখানা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আর একবার দেখে নিয়ে অক্ষয় নরম সুরে বললে, তোমার কোন্ কথা টেকে নি তা আরও একটু স্পষ্ট করে বল ত, শুনি।

বললে শ্যামা, সকালে বাজার থেকে ঝুনো নারকেল আনা হয়েছে দেখে সে এ বেলায় তাই দিয়ে ছোলার ডাল আর লুচি করতে বলে গিয়েছিল নলিনীকে। কিন্তু এখন এসে দেখি যে, নারকেলে হাতও দেওয়া হয় নি। রাধা হয়েছে কাঁচা মুগডাল পাতলা করে, আর লুচির বদলে ভাত।

উপসংহারে শ্যামা বললে, আজই নতুন হ'ল মনে কর না তুমি। তোমার নাই পেয়ে দিন দিন আমার মাথায় চড়ছে রাধুনী।

একটু চুপ করে থেকে বের হয়ে গেল অক্ষয়। রান্নাঘরের সামনে গিয়ে বেশ গম্ভীর স্বরে সে ডাকল, নলিনী !

তন্ময় হয়ে রান্না করছিল সে। মাথায় কাপড় নেই, বাহু দুটি অনাবৃত, তা ছাড়া ঘাড় এবং ঢিলে সেমিজের ফাক দিয়ে তার পিঠের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু অক্ষয়ের ডাক কানে যেতেই নলিনী ত্রস্তহস্তে মাথায় কাপড় তুলে দিলে, আঁচল ঢাকা পড়ল তার সম্পূর্ণ বাঁ হাত, ডান হাতেরও মণিবন্ধ পর্য্যন্ত। বিদ্যুদ্বেগে ঘরের কোণে সরে গেল সে, মেঝের দিকে চেয়ে সন্ত্রস্ত, মৃদুস্বরে সে বললে, আমায় কিছু বলছেন ?

কোন রকম ভূমিকা না করে সোজা প্রশ্ন করলে অক্ষয়, উনি তোমাকে ছোলার ডাল রাধতে বলেছিলেন, তুমি মুগের ডাল রেধেছ কেন ?

মুহূর্ত্তের জন্য চোখ তুলে অক্ষয়ের দিকে একবার তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিলে নলিনী, উত্তর দিলে না সে।

অক্ষয় বিরক্ত হয়ে বললে, চুপ করে রইলে যে ?

এবার আগের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল ; অস্ফুট স্বরে নলিনী বললে, কাল থেকে অজয়ের পেটটা ভাল নেই। নারকেল-দেওয়া ছোলার ডাল ওর পেটে সইবে না মনে করে মুগের ডালই রেধেছি আজ। নারকেল ত ঘরে থাকলে নষ্ট হয় না।

গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলা অকস্মাৎ আলগা হয়ে গেল যেন, চক্ষের নিমেষে অক্ষয়ের ললাটের কুঞ্চিত রেখাগুলি মিলিয়ে গেল, উত্তর দিতে তারই দেরী হ'ল এবার, বেশ কিছুক্ষণ পর সে বললে, একা অজয়ের জন্যই ত এ বাড়ীর রান্না হয় না। ওর মায়ের নির্দ্দেশ অমান্য করা উচিত হয় নি তোমার। ভবিষ্যতে আর কখনও এ রকম কর না।

আগের চেয়েও মৃদুস্বরে নলিনী বললে, আচ্ছা।

এর পর নলিনী আশ্চর্য্য রকম বদলে গেল।

শ্যামা চেষ্টা করে দোষ খুজবার; কিন্তু পায় না। শেষে বিরক্ত হয় নিজেরই ওপর।

হার মানল শ্যামা। একদিন স্বামীকে বলেই ফেললে, এবার সত্যিই হেরে গেলাম একটা দাসী-বাঁদীর কাছে !

অক্ষয় বিস্মিত হয়ে বলে, কি আশ্চর্য্য, তুমি হারতে যাবে কোন দুঃখে ?

তাই বলে ও অমন মুখবুজে কাজ করে যাবে ?
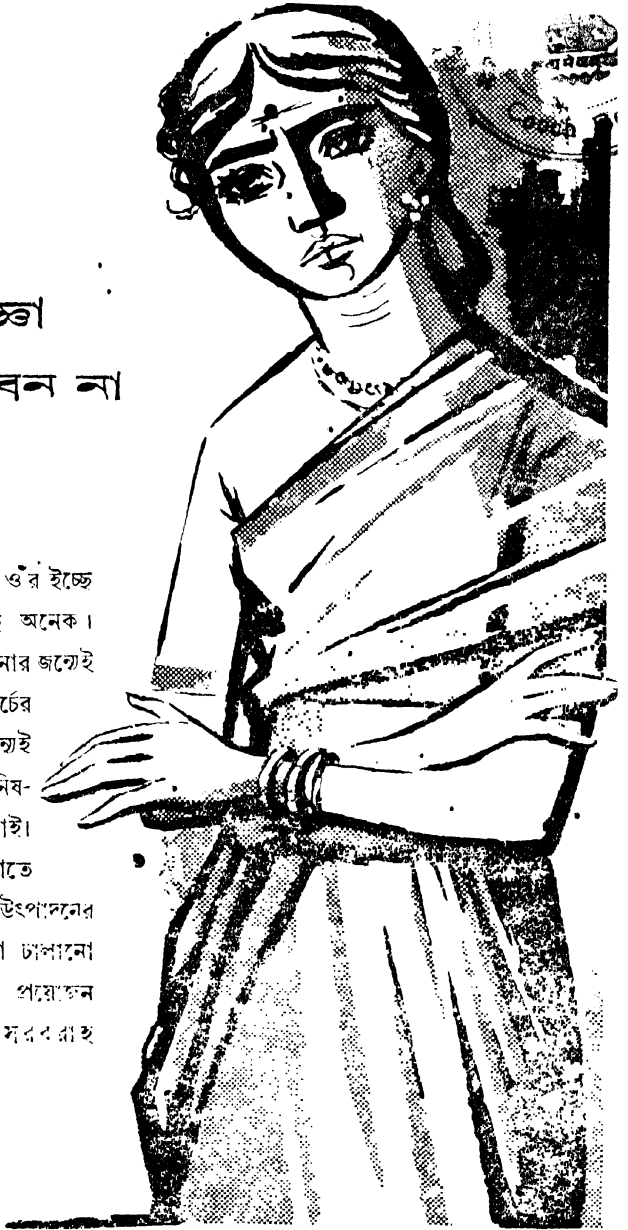
কালিদাস সাহিত্যে 'পদ্ম'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

কালিদাসের যুগে পদ্ম ছিল সকল পুষ্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট, মহাকবি তাই পদ্মকে সৌন্দর্য্যের উপমান করিয়া তাঁহার রচনায় সৌন্দর্য্য স্থানে স্থানে বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি দেখান গেল।

পদ্ম তিন প্রকার—'রাজীব' বা 'কোকনদ'—লালপদ্ম, 'ইন্দীবর', নীলপদ্ম ও 'পুণ্ডরীক' শ্বেতপদ্ম। মহাকবির কাব্য-নাটকে এ তিন প্রকার পদ্মের সহিত বিভিন্ন বর্ণের বস্তুর উপমা পাওয়া যায়।

'কুমার সম্ভবে' মহাকবি সমাধিমগ্ন শঙ্করের মূর্ত্তি বর্ণনায় রাজীব বা লালপদ্মের সহিত তাঁহার হস্তের রক্তবর্ণ তালুর উপমা দিয়াছেন :

'উত্তানপাণিদ্বয় সন্নিবেশাৎ
প্রফুল্ল রাজীবমিবাঙ্কমধ্যে।' (কু-৩।৪৫)।

ক্রোড়ের উপর তিনি হাত দুইটি চিৎ করিয়া রাখায় দেখাইতে-ছিল যেন দুইটি প্রস্ফুটিত লালপদ্ম বুঝি তাঁহার ক্রোড়ের উপর স্থাপিত রহিয়াছে।

ইন্দীবর বা নীলপদ্মের উপমা 'রঘুবংশে' পাওয়া যায়। কলিঙ্গরাজের দেহটি ছিল শ্যামবর্ণের, তাই মহাকবি ইন্দীবরের সহিত তাঁহার উপমা দিয়াছেন। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় সুনন্দা তাঁহার পরিচয় দিতে দিতে রাজকুমারীকে বলিতেছেন :

'ইন্দীবর-শ্যামতনু-নৃপোসৌ
ত্বং রোচনা গৌর শরীরযষ্টিঃ।' (রঘু-৬।৬৫)

এই নরপতির দেহ নীলপদ্মের মত শ্যামবর্ণ, আর তুমি চন্দনের মত গৌরকান্তি (পাশাপাশি যদি দাঁড়াও দুইজনে, মনে হবে যেন মেঘের পাশে বিদ্যুতের মত দুইজনে দুইজনার শোভা বাড়াইতেছে)।

পুণ্ডরীক বা শ্বেতপদ্মের উপমা রঘুর চরিত্রবর্ণনায় পাওয়া যায় :

'পুণ্ডরীকাতপত্রস্তং বিকশৎ কাশচামড়ঃ।
ঋতুর্বিড়ম্বয়মাস ন পুনঃ প্রাপতচ্ছিয়ম্।' (রঘু-৪।১৭)।

যদিও শরৎকালেরও শ্বেতপদ্ম ছিল ছত্র ও প্রফুল্ল কাশপুষ্প ছিল চামড়, তবু সে ঋতু রঘুর শোভা ধারণ করিতে পারিল না।

এখানে মহাকবি বলিতেছেন যে, রঘুর মস্তকে থাকিত শুভ্রবর্ণের রাজছত্র ও তাঁহাকে ব্যজন করা হইত শ্বেতচামড় দ্বারা, এবং শরৎকালে যদিও শ্বেতপদ্মগুলি ফুটিয়া থাকিলে মনে হইত তাহারা বুঝি শরৎ ঋতুর ছত্র ও কাশপুষ্পগুলিকে দেখাইত তাহার চামড়, তবু রাজা রঘুর শোভার কাছে শরতের শোভা হীন দেখাইত। শরৎকাল যেন রঘুর শোভার নকল করিতে গেল, কিন্তু তাহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হইল।

পদ্মের সহিত সুন্দর মুখের উপমা অন্যান্য কবিদের মত কালি-দাসের রচনারও বহু স্থানে পাওয়া যায়।

শোভাযাত্রা করিয়া বর যাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার আশায় পথের দুই ধারের বাড়ীগুলির জানালায় যে কৌতূহলী নারীর দল দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কিরূপ দেখাইতেছে? মহাকবি বলেন :

বিলোলনেত্র ভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ
সহস্রপত্রাভরণাইবাসন্। (রঘু-৭।১১)।

নারীদের সুন্দর সুন্দর মুখ ও চক্ষুর ভ্রমরকৃষ্ণ তারকাগুলি দেখিয়া মনে হইতেছিল, জানালাগুলি বুঝি পদ্মপুষ্প দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছে ও প্রত্যেকটি পদ্মের উপর ভ্রমর বসিয়া রহিয়াছে।

নারীদের মুখগুলি যেন পদ্ম, আর চক্ষুর কৃষ্ণতারকাগুলি যেন পদ্মের উপর উপবিষ্ট কালো কালো ভ্রমর।

'কুমার সম্ভবে'র সপ্তম স্বর্গের দ্বিষষ্টিতম শ্লোকেও ঠিক এই উপমাটি পাওয়া যায়।

এখানে যেমন মহাকবি বরকনে দেখিবার আশায় জানালায় দণ্ডায়মানা নারীদের মুখগুলির পদ্মের সহিত উপমা দিয়াছেন, 'রঘুবংশের' তেমনি একাদশ সর্গে, বিবাহের পর যখন রামসীতা অযোধ্যায় আসিতেছিলেন, সীতাকে দেখিবার আগ্রহে যে সমস্ত নারীরা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন মহাকবি তাঁহাদের টানাটানা চোখগুলির পদ্মের সহিত উপমা দিয়াছেন :

'পুরমবিশদযোধ্যাং মৈথিলীদর্শনানাং
কুবলয়িতগবাক্ষাং লোচনৈরঙ্গনানাম্।' (রঘু-১১।৯৩)।

অযোধ্যা নগরীতে যখন তাঁহারা প্রবেশ করিলেন, সীতাকে দেখিবার আগ্রহে যে সমস্ত নারী জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাদের চক্ষুগুলি দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, জানালাগুলি বুঝি পদ্মপুষ্পে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

'কুমার-সম্ভবে' মহাকবি প্রস্ফুটিত পদ্মের সহিত মাতৃকা নামক দেবীদের সুন্দর সুন্দর মুখগুলির উপমা এমন সুন্দর ভাবে দিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে যেন একটা অসাধারণত্বের ছাপ রহিয়া গিয়াছে।

বর সাজিয়া শিব বৃষের পৃষ্ঠে বসিয়া আকাশপথে চলিয়াছেন কনের বাড়ী, অন্যান্য দেবদেবীদের মত মাতৃকারাও নিজ নিজ
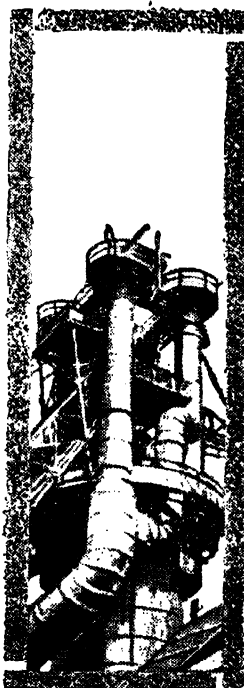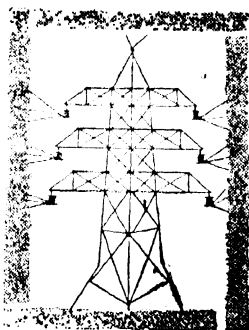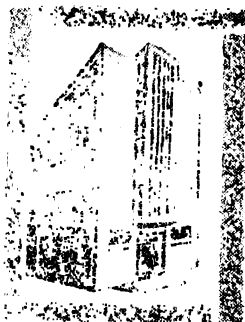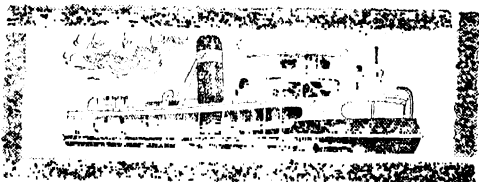
বাহনের উপর বসিয়া বরানুগমন করিতেছেন। সে শোভাযাত্রার বর্ণনায় মহাকবি বলিতেছেন :

'পদ্মাকরং চক্রুরিবান্তরীক্ষম্ (কু-৭।৩৮)।

দেখাইতেছিল যেন আকাশটাই পদ্মের আকরে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

আকাশপথের যাত্রীনী মাতৃকাদের সুন্দর সুন্দর মুখগুলি দূর হইতে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন আকাশে বুঝি অনেকগুলি পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে মহাকবি মালবিকার ঈষৎ-বিকশিত দন্তপাতিযুক্ত হাস্যময় মুখখানির বর্ণনা করিতে গিয়া সম্পূর্ণভাবে লক্ষিত হইতেছে না এমন কেশরযুক্ত একটি প্রফুল্ল পদ্মের সহিত সে মুখের উপমা দিয়াছেন :

'অসমগ্র-লক্ষ্য-কেসরমুচ্ছ সদিব পঙ্কজং দৃষ্টম (মান-২য় অঙ্ক)।

যাহার কেশরগুলি সম্পূর্ণরূপে দেখা যাইতেছে না এরূপ একটি প্রফুল্ল পদ্মের মত সুন্দর মুখখানি দেখিলাম।

পদ্মের সহিত সুন্দর মুখের সাদৃশ্যের একটি অতি সুন্দর বর্ণনা 'কুমার সম্ভবে' পাওয়া যায়।

গৌরী যখন কঠোর তপস্যা করার সময় দারুণ শীতেও সারারাত জলের মধ্যে দেহ নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়া কেবল মুখখানি বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তখন জলের উপরে তাঁহার সে অতুলনীয়রূপে সুন্দর মুখখানি দেখিলে মনে হইত যেন :

'সরোজ সন্ধানমিবাকরোদপাম্' (কু-৫ ২৭)।

দারুণ শীতে পদ্ম জন্মায় না বলিয়া গৌরীর মুখখানি যেন জলের সে অভাব পূরণ করিয়া দিতেছে, অর্থাৎ গৌরীর সুন্দর মুখখানি জলের উপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম বলিয়া মনে হইতেছে।

কালিদাস পদ্মের সহিত সুন্দর মুখের উপমা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি তাঁহার কাব্য-নাটকের স্থানে স্থানে নর বা নারীর সারা দেহটাকেই পদ্মের সহিত উপমা দিয়াছেন।

পার্ব্বতীর যৌবন উন্মেষের সময় তাঁহাকে কিরূপ দেখাইত। মহাকবি বলেন :

'সূর্য্যাংশুভির্ভিন্নমিবার বিন্দম্' (কু-১.৩২)।

যেন সূর্য্যের কিরণে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম।

'রঘুবংশ' মহাকাব্যেও এইরূপ উপমা পাওয়া যায়।

রামকে প্রসব করিয়া জননী কৌশল্যা শিশুটিকে পার্শ্বে লইয়া শুইয়া রহিয়াছেন, মহাকবি এই দৃশ্যটিকে কি অতুলনীয় সুন্দর ভাবে উপমা দিয়া বর্ণনা করিতেছেন :

'শয্যাগতেন রামেণ মাতা শাতদরী বভৌ।

সৈকতাম্ভোজ-বলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা।' (রঘু-১০ ৬৯)

শয্যায় শায়িতা কৃশোদরী জননীর পার্শ্বে শিশু-রামকে দেখাইতেছিল যেন শরৎকালের কৃশা জাহ্নবীর তটে একটি প্রস্ফুটিত কমল শোভা পাইতেছে।

বর্ষাকালের অস্বাভাবিক স্ফীতির পর শরৎকালে জল কমিয়া যাইলে পূতসলিলা জাহ্নবীকে যেরূপ দেখায় পূর্ণগর্ভার স্ফীত উদর সন্তান প্রসবের পর কৃশ হইয়া যাওয়ায় পূতচরিত্রা জননী কৌশল্যাকেও সেইরূপ দেখাইতেছিল। তাঁহার পাশে সদ্যপ্রসূত রামের কেবল মুখখানি নয়, সারা দেহটিই যেন একটি সদ্যফোটা পদ্মফুল জাহ্নবী সৈকতের শোভা বাড়াইতেছিল।

'কুমারসম্ভবে' মহাকবি পদ্মের সহিত উমারও সারা দেহের উপমা দিয়াছেন।"

চক্ষুর সম্মুখে শিবের নয়ন-বহ্নিতে মদনকে ভস্ম হইয়া যাইতে দেখিয়া উমার যখন ভয়ে পা কাঁপিতেছিল, তিনি না পারিতে-ছিলেন চলিতে, না পারিতেছিলেন চক্ষু মেলিতে, তাঁহার পিতা হিমালয় কন্যার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে দুইটি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া দেহ বিস্তৃত করিয়া চলিয়া গেলেন। এই দৃশ্যের বর্ণনায় মহাকবি বলিতেছেন :

'সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং
প্রতিপথগতিরাসীৎ বেগদীর্ঘী কৃতাঙ্গঃ॥' (কু-৩৭৬)।

দেখাইল যেন দেবহস্তী ঐরাবত তাহার দুইটি দন্তের উপর একটি প্রফুল্ল নলিনী তুলিয়া লইয়া দেহ বিস্তৃত করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

পদ্মের সহিত শকুন্তলার ও সারা দেহের উপমা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' পাওয়া যায়।

মহর্ষি কণ্বের তপোবনে বৃক্ষের বল্কল-পরিহিতা শকুন্তলাকে কিরূপ দেখাইত, মহাকবি তাহা দুষ্মন্তের মুখ দিয়া বলিতেছেন—

'সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপিরম্যম্' (শকু-১ম অঙ্ক)।

যেমন শ্যাওলা লাগিয়া থাকিলেও পদ্মকে সুন্দর দেখায়।

শকুন্তলার দেহে অলঙ্কার ছিল না, বহু মূল্য বস্ত্রও ছিল না, তবু তাঁহার সে স্বাভাবিক অনুপম রূপ বল্কলে আবৃত থাকিলেও তাঁহাকে দেখাইতেছিল যেন শ্যাওলায় ঢাকা পদ্মটি। বল্কল পরিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র হানি হয় নাই, বরং দুষ্মন্তের চোখে তাঁহাকে 'অধিক মনোজ্ঞা' দেখাইতেছিল।

এই প্রকারের উপমা 'কুমারসম্ভবে'ও পাওয়া যায়।

গৌরী যাইতেছেন বনে তপস্যা করিতে, তাই মস্তকে বাঁধিয়া-ছেন সন্ন্যাসিনীদের মত জটাজুট। ছিল ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের গুচ্ছ, তার স্থানে হইল জটা! তবু কিন্তু, মহাকবি বলেন, মুখের সৌন্দর্য্য কমিল না, কেন কমিল না বুঝাইবার জন্য তিনি বলিতেছেন :

'নষটপদ শ্রেণীভিরেব পঙ্কজং
স-শৈবালাসঙ্গমপি প্রকাশতে। (কু-৫।৯)

ভ্রমরের দল বসিয়া থাকিলেই যে পদ্মের শোভা বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে শ্যাওলা লাগিয়া থাকিলেও তাহার মনোহারিত্ব সমান থাকে।

মহাকবির সাহিত্যের বহু স্থানে পদ্মের সহিত ও পদ্মের পলাশের সহিত চক্ষুর উপমা পাওয়া যায়।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের প্রথম অঙ্কে দৈত্যের ভয়ে মূর্চ্ছিতা

উর্ব্বশীকে চক্ষু খুলিবার অনুরোধ করিতে যাইয়া পুরূরবা বলিতেছেন :

'তদেতদুন্মীলয় চক্ষুরায়তং তং

নিশাবসানে নলিনীব পঙ্কজম্ ।' (বিক্রম-১ম অঙ্ক)।

রাত্রি পোহাইলে নলিনী যেভাবে তাহার পলাশগুলি উন্মীলন করিতে থাকে, তুমিও তোমার ওই টানাটানা চোখ দুইটি সেইভাবে উন্মীলন করিতে থাক।

মহাকবি এখানে পদ্মের সহিত উর্ব্বশীর ও পদ্মের পলাশের সহিত তাঁহার চক্ষু দুইটির উপমা দিলেন।

মহাকবি চক্ষুর উপমা 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকে দিয়াছেন পদ্মের পলাশের সহিত, আর 'রঘুবংশে' দিয়াছেন স্বয়ং পদ্মের সহিত, পদ্মের পলাশের সহিত নয়।

রাজকুমার অজের চক্ষুগুলি যে পদ্মের মত সুন্দর ও তারকাগুলি যে ভ্রমরের মত কৃষ্ণ তাহা বুঝাইবার জন্য মহাকবি বলিতেছেন :

'প্রস্পন্দমান পরুষেতরতারমন্ত

শ্চক্ষুস্তব প্রচলিত ভ্রমরঞ্চ পদ্মম্' । (রঘু-৫।৬৮)।

আপনার মনোহর ও চলনশীল তারকাযুক্ত নয়ন ও চঞ্চল ভ্রমরযুক্ত পদ্ম, এক সঙ্গে যুগপৎ উন্মেষিত হইয়া পরস্পরের সাদৃশ্য ধারণ করুক।

এখানে, নিদ্রিত রাজকুমারের নিদ্রাভঙ্গ করাইবার জন্য বৈতালিকেরা গাহিয়া বলিতেছেন যে, প্রভাত হইয়াছে, নিশায় নিমীলিত পদ্মগুলি ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর পদ্মের উপর কালো কালো ভ্রমরেরা আসিয়া বসিতেছে, সুতরাং রাজকুমারেরও উচিত এই ভোর হওয়ার সময়টায় তাঁহার নিদ্রায় নিমীলিত পদ্মের মত সুন্দর চক্ষুগুলি খুলিয়া ভ্রমরের মত কৃষ্ণতারকাগুলিকে বাহির করিয়া ফেলা। কারণ, তাহা হইলে কৃষ্ণভ্রমরযুক্ত পদ্মের শোভার সহিত তাঁহার কৃষ্ণতারকাযুক্ত নয়নগুলির শোভার সাদৃশ্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

'কুমারসম্ভবে' মহাকবি নীলপদ্মের সহিত পার্ব্বতীর নয়নের উপমা দিয়াছেন। গিরিরাজ দুহিতার রূপ বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন :

'প্রবাতনীলোৎপল নির্বিশেষম্' (কু-১।৪৬)

বায়ু বহিতেছে এরূপ স্থানের নীলপদ্মের মত তাঁহার নয়ন দুইটি চঞ্চল ছিল।

'কুমার সম্ভবে'র অপর এক সর্গে মহাকবি পদ্মের সহিত চক্ষুর যে সুন্দর উপমাটি দিয়াছেন তাহার তুলনা কোথাও পাওয়া যায় না।

দেবতারা সকলে এক সঙ্গে গিয়াছেন ব্রহ্মার নিকটে। সকলকে সহসা এই ভাবে আসিতে দেখিয়া ব্রহ্মা উৎসুক হইয়া তাঁহাদের আসিবার কারণ জানিতে চাহিলেন। ইন্দ্র তখন বৃহস্পতিকে দেবতাদের মুখপাত্র হইয়া আসিবার উদ্দেশ্য জানাইবার জন্য চোখের ইসারা করিলেন, ইন্দ্রের এই চোখের ইসারা করার ভঙ্গীটি মহাকবি নিম্ন শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন :

'ততো মন্দানিলোদ্ভূত কমলাকর শোভিনী।

গুরুংনেত্র সহস্রেণ নোদয়ামাস বাসবঃ।' (কু-২।২৯)।

ইন্দ্র যখন তাঁহার সহস্র চক্ষুদ্বারা দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইসারা করিলেন দেখাইল যেন বায়ুর মৃদু হিল্লোলে সহস্র পদ্ম বুঝি একসঙ্গে নড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু পদ্মের মত সুন্দর, সুতরাং সে সহস্র চক্ষুর ইঙ্গিত যেন বায়ুর হিল্লোলে সহস্র পদ্মের এক সঙ্গে নড়িয়া উঠা।

পদ্মের সহিত সুন্দর মুখ ও সুন্দর চক্ষুর মত সুন্দর চরণেরও উপমা পাওয়া যায়। উমার চরণের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় মহাকবি বলেন :

'আভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভি-' পৃথিব্যাং

স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্' । (কু-১।৩৩)।

যখন তিনি চলিতেন, তাঁহার চরণ দুইটিকে দেখিয়া মনে হইত বুঝি দুইটি স্থলপদ্ম ভূমির উপর চলিয়া বেড়াইতেছে।

'রঘুবংশে'ও মহাকবি রামের মুখ দিয়া সীতার নূপুর প্রাপ্তির কথায় বলাইতেছেন :

'অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দম্' (রঘু-১৩-২৩)

তোমার পদ্মের মত চরণ (হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি নূপুরকে পড়িয়া থাকিতে) দেখিলাম। পদ্মকে ছত্ররূপে ব্যবহারের উপমাও কালিদাসের সাহিত্যে পাওয়া যায়।

কেন যে পার্ব্বতী অত কঠোর তপস্যা করিতেছেন ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে শিব তাহা জানিতে চাওয়ায় তাঁহার এক সখী উত্তরে বলিতেছেন :

'যদর্থমম্ভোজমিবোষ্ণবারণং

কৃতং তপঃ সাধনমেতয়াবপুঃ' । (কু-৫।৫২)।

যে কারণে ইনি পদ্মকে ছত্ররূপে ব্যবহার করার মত এই (সুকুমার) দেহ তপস্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন, শুনুন।

মহাকবির চক্ষে পদ্ম যে কেবল সৌন্দর্য্যের উপমান তাহা নহে, কোমলতারও প্রতীক্। শকুন্তলার মত কোমলাঙ্গী মেয়েকে মহর্ষি কণ্ব বৃক্ষমূলে জল দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন দেখিয়া দুষ্মন্ত দুঃখ করিয়া বলিতেছেন :

'ধ্রুবং স নীলোৎপল পত্রধারয়া

শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি' । (শকু-১ম অঙ্ক)।

নিশ্চয় মহর্ষি যেন নীলপদ্মের পলাশ দিয়া শমীলতা ছেদন করার চেষ্টা করিতেছেন।

এ শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে, পদ্মের পলাশের মত অত কোমল বস্তু দিয়া শমীলতা কাটিতে যাইলে পদ্মের যেমন তাহাতে ক্ষতিই হয়, ভাল কাটাও যায় না, তেমনি শকুন্তলার মত অমন কোমলাঙ্গী মেয়েকে গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার মত কষ্টসাধ্য কাজের ভার দেওয়া অবিবেচনার কাজ সন্দেহ নাই।

তখনকার দিনে রাজারা বয়স হইয়া পড়িলে প্রায়ই উপযুক্ত পুত্রকে প্রথমে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেন, তার পর সময়মত রাজ্য, সম্পদ, সিংহাসন প্রভৃতি সমস্তই তাহাকে সমর্পণ করিয়া

দিয়া সংসার ছাড়িয়া বনে চলিয়া যাইতেন। রাজা দিলীপ তাঁহার শেষ বয়সে একমাত্র পুত্র রঘুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার পর হইতে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল, আর রঘুর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রভৃতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এই ব্যাপারটিকে মহাকবি উপমা দিয়া নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

'নরেন্দ্র-মূলায়তনাদনন্তরং
তদাস্পদং শ্রীর্যুবরাজ সংজ্ঞিতম্।
অগচ্ছদংশেন গুণাভিলাষিণী
নবাবতারং কমলাদিবোৎপলম্'। (রঘু-৩.৩৬)।

পূর্ব্বে উৎপন্ন পদ্ম হইতে শোভা যেমন ক্রমে ক্রমে চলিয়া গিয়া নব-প্রস্ফুটিত পদ্মে সংক্রমিত হয়, গুণাভিলাষিণী রাজলক্ষ্মীও তেমনি প্রধান আশ্রয় দিলীপকে ছাড়িয়া যুবরাজ নামক নূতন আশ্রয়ে চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

মহাকবির যুগে মেয়েরা যে পদ্মফুল লইয়া খেলা করিতে ভালবাসিতেন তাহা তাঁহার কাব্যনাটকের মধ্যে 'লীলাকমল' কথাটির ব্যবহার দেখিয়া জানিতে পারা যায়।

'উত্তর মেঘে' যক্ষরাজের রাজধানী অলকার বর্ণনা দিতে গিয়া কালিদাস বলিতেছেন :

'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম্'

সেখানকার নারীদের হাতে থাকিত খেলা করার জন্য পদ্মফুল, আর কেশে থাকিত গোঁজা কুন্দফুলের কুঁড়ি।

পার্ব্বতীও যে হাতে পদ্মফুল লইয়া খেলা করিতে ভালবাসিতেন, তাহা 'কুমার সম্ভব' হইতে জানিতে পারা যায়। মহাকবি বলিতেছেন :

'লীলাকমল পত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী' (কু-৬৮৪)

পার্ব্বতী তখন লীলাকমলের পাপড়িগুলি গণনা করিতে লাগিলেন।

মহাকবি যেমন প্রফুল্ল পদ্মকে কয়েক জায়গায় সৌন্দর্য্যের উপমান করিয়াছেন, তেমনি আবার সন্ধ্যায় নিমিলিত বা শীতের হিমে নষ্টপ্রায় পদ্মের অসুন্দর অবস্থাকেও উপমান করিতে পশ্চাদ্পদ হয়েন নাই।

এখানে দুই চারিটি উদাহরণ দেখান গেল।

গভীর নিশীথে মহারাজ কুশের ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ শয়নগৃহে সহসা এক অপরিচিতা নারীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন :

'বিভর্ষি চাকার মনির্বৃতানাং
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম'। (রঘু-১৬৭)।

শীতের হিমে নষ্ট-শোভা পদ্মের মত দুঃখে মলিন তোমার আকৃতি দেখিলে মনে হয় না যে, কিছু যোগলব্ধ শক্তি তোমার মধ্যে আছে, (তবে কিরূপে তুমি আমার এ অর্গলবদ্ধ গৃহে আয়নার মধ্যে ছায়ার মত অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিলে।)

'রঘুবংশের' পঞ্চদশ সর্গেও এই রকমের উপমা পাওয়া যায়।

শম্বুক ছিল শূদ্র, তবু তপস্যা করিত, ভূমির উপর আগুন জ্বালিয়া গাছের উপর ডালে পা রাখিয়া নীচের দিকে মুখ করিয়া ঝুলিয়া থাকিত। অগ্নির স্ফুলিঙ্গে তাহার শ্মশ্রু পুড়িয়া যাওয়াতে মুখটা কিরূপ বিশ্রী দেখাইত মহাকবি তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিতেছেন :

'স তদ্বক্ত্রং হিমক্লিষ্ট কিঞ্জল্কমিব পঙ্কজং
জ্যোতিষ্কণাহত-শ্মশ্রুকণ্ঠনালাদপাতয়ৎ। (রঘু—১৫.৫২)।

শীতের হিমে কিঞ্জল্কগুলি নষ্ট হইয়া গেলে পদ্মের যে দশা হয়, অগ্নির স্ফুলিঙ্গে শ্মশ্রু পুড়িয়া যাওয়াতে শম্বুকের মুখের দশা সেইরূপ হইয়াছিল, রাম তাহার কণ্ঠরূপ নাল হইতে পদ্মরূপ মুখটিকে ছিন্ন করিয়া দিলেন।

'কুমার সম্ভব' কাব্যে তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত মলিনমুখ দেবতাদের সম্মুখে ব্রহ্মার আবির্ভাবের বর্ণনায় মহাকবি যে উপমাহীন উপমাটি রচনা করিয়াছেন তাহা এখানে দেখান গেল :

"তেষামাবিরভূদ্ব্রহ্মা পরিম্লানমুখশ্রিয়াং
সরসাং সুপ্তপদ্মানাং প্রাতর্দীধিতিমানিব।" (কু—২৪)।

মলিনমুখ দেবতাদের সম্মুখে ব্রহ্মা যখন আবির্ভূত হইলেন দেখাইল যেন প্রভাতকালে নিশায় নিমীলিত পদ্মপূর্ণ সরোবরে সূর্য্যের উদয় হইল।

এই শ্লোকটিতে কেবল যে তেজস্বী সূর্য্যের সহিত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মার ও নিশায় নিমীলিত পদ্মদলের সহিত দেবতাদের বিষাদক্লিষ্ট মলিন মুখগুলির উপমা দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, মহাকবি এখানে যেন আরও জানাইতে চাহিতেছেন—যদিও গৌণভাবে—যে, প্রভাতকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিশায় নিমীলিত পদ্মফুলগুলি যেভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রফুল্লভাব ধারণ করে, দেবতাদের বিষন্ন ও মলিন মুখগুলিও সম্মুখে ব্রহ্মার আবির্ভাব হওয়াতে সেইরূপ প্রফুল্ল-ভাব ধারণ করিল, ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে।

নিশায় নিমীলিত পদ্মের সহিত নিদ্রিত মানুষদের মুখের উপমা 'রঘুবংশে' পাওয়া যায়।

রাজকুমার অজ যখন শত্রুরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহাদের প্রতি 'গান্ধর্ব্ব' অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দিলেন, এবং সে অস্ত্রের আশ্চর্য্য প্রভাবে যোদ্ধাগণ যুদ্ধক্ষেত্রের উপর ঘুমে অচৈতন্য হইয়া শুইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের নিদ্রিত মলিন মুখগুলি কিরূপ দেখাইতেছিল এবং জয়গৌরবে উৎফুল্ল অজেরই-বা মুখখানি দেখিয়া লোকের কি মনে হইতেছিল মহাকবি তাহা এই শ্লোকটিতে উপমা দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন—

'নিমীলিতানামিব পঙ্কজানাং
মধ্যে স্ফুরন্তং প্রতিমাশশাঙ্কম্'। (রঘু—৭৬৪)।

মনে হইতেছিল নিশীথরাত্রে দীঘির জলে যেন নিমীলিত পদ্মগুলির মাঝে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

এখানে, রাত্রের নিমীলিত শোভাহীন মলিন পদ্মগুলির সহিত

নিদ্রিত যোদ্ধাদের শ্রীহীন মুখগুলির ও দীঘির জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের সহিত রাজকুমার অজের যুদ্ধে জয়লাভ করার আনন্দে ঢল ঢল মুখখানির উপমা দেওয়া হইয়াছে।

চন্দ্রের সহিত উপমা না দিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্বের সহিত উপমা দেওয়ার সার্থকতা এই যে, অজ ছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত ও নিদ্রিত যোদ্ধাদের মাঝে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় আকাশে অবস্থিত চন্দ্রের সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া সমীচীন হইত না। হয়ত ইহা বুঝিয়া মহাকবি পুষ্করিণীর জলের মধ্যে চন্দ্রের প্রতিবিম্বের সহিত অজের আনন্দে প্রফুল্ল মুখখানির উপমা দিয়া অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভার পরিচয় দিলেন।

সুখ ও দুঃখের যুগপৎ আবির্ভাব বুঝাইবার জন্য মহাকবি 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে রৌদ্রে দগ্ধপ্রায় অথচ বৃষ্টির জলে সিঞ্চিত পদ্মের উপমা দিয়াছেন।

রাজা অগ্নিমিত্র যখন সুসংবাদ শুনিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদল বিদর্ভরাজকে পরাজিত করিয়া সে দেশ জয় করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে দুঃসংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার প্রেমাস্পদা মালবিকাকে পাটরাণী ধারিণী কারাগারে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন, তখন তিনি বলিতেছেন—

'ধারাভিরাতপ ইবাভিহতং সরোজং
দুঃখায়তে চ হৃদয়ং সুখমশ্নুতে চ'। (মাল—৫ম অঙ্ক)।

রৌদ্রতাপে ক্লিষ্ট অথচ বৃষ্টির ধারায় অভিষিক্ত পদ্মের মত আমার হৃদয় যেমন দুঃখ তেমনি সুখও অনুভব করিতেছে।

কিছুটা এই ধরনের একটি উপমা মেঘদূতের 'উত্তরমেঘে' পাওয়া যায়। সেখানে গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত এক তরুণ যক্ষ তাঁহার বিরহিনী পত্নীর অবস্থা কল্পনা করিয়া বলিতেছেন—

'সাভ্রেহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্'। (উ-মে—২৯)।

মেঘাচ্ছন্ন দিনের সকাল বেলায় স্থলপদ্মের মত বুঝা যায় না সে নিদ্রিত না জাগরিত।

তরুণ ভাবিতেছে, তাহাদের শয়ন-গৃহে জানালার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলোক আসিতে দেখিলে কি আনন্দের পুলকে তাহার স্ত্রীর মন ভরিয়া উঠিত। আর এখন স্বামীর বিরহের দিনে— জ্যোৎস্না পূর্ব্বের মতই আসে, তবে মনে কি আর তার সে আনন্দ হয়? আনন্দ ত হয়ই না, বরং দুঃখে সে এমন নিঝুম হইয়া পড়ে যে, বুঝিতে পারা যায় না, সে নিদ্রিত না জাগরিত।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে মহাকবি সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময়ের পদ্মের বিভিন্ন অবস্থাকে উপমান করিয়াছেন।

'সমুদ্র-গৃহের' নির্জ্জন চিত্রশালায় আসিতে পাইয়া মালবিকা তাঁহার প্রিয় অগ্নিমিত্রের সাক্ষাৎ পাইবেন ভাবিয়া মনে যেমন আনন্দ পাইতেছিলেন, তেমনি আবার পাটরাণী যদি জানিতে পারেন এ ব্যাপার কি অনর্থই যে ঘটাইবেন তিনি তাহা কল্পনা করিয়া দুঃখও পাইতেছিলেন কম নয়। এই হর্ষ-বিষাদের ভাবটি মালবিকার মুখে কি ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল অন্তরালে দাঁড়াইয়া অগ্নিমিত্র তাহা দেখিয়া বিদূষককে বলিতেছেন—

'সূর্য্যোদয়ে ভবতি যা সূর্য্যাস্তময়ে চ পুণ্ডরীকস্য।
বদনেন সুবদনায়াস্তে সববস্থে ক্ষণাদূঢ়ে'। (মাল—৪র্থ অঙ্ক)।

সূর্য্য যখন উদিত হন, এবং যখন তিনি অস্তাচলে গমন করেন, পদ্মের যে (বিভিন্ন) অবস্থা হয়, এই সুবদনার মুখখানির অবস্থাও ক্ষণে ক্ষণে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

মালবিকা যখন ভাবিতেছেন যে, এইবার তিনি তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়ের নির্জ্জনে সাক্ষাৎ পাইবেন, তাঁহার মুখখানি সেই ভাবে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল যে ভাবে প্রফুল্ল হইয়া উঠে নলিনী সূর্য্য যখন সকালবেলা পূর্ব্বাকাশে উদিত হন। আবার যখন পাটরাণীর প্রতিহিংসার কথা মনে আসিতেছে ভয়ে তাঁহার মুখখানি শুকাইয়া যাইতেছে, যেমন শুকাইয়া যায় নলিনী সূর্য্য যখন সন্ধ্যার সময় অস্তাচলে অন্তর্দ্ধান করেন।

আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গপ্পসপ্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসনদিয়ে রানীমা বললেন "দ্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যসুখ্যা মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঃ যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন "আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা।"

"কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামাকাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—

"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?"

আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে···এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি···তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে···হাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—

"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"

"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামাকাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মকথা

শ্রীবিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

ভারত ও চীনে গৌরবময় যুগে বিজ্ঞান ও গণিত খুব উন্নত হয়েছিল অস্বীকার করা যায় না; মুসলীম সাম্রাজ্য যখন স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তখন মুসলীম সমাজও বীজগণিত, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে খুব উন্নত হয়েছিল। কিন্তু, বিজ্ঞানকে অচল করবার জন্য যে ধরনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতি দরকার, গণিতের যে নূতন রূপ দরকার এবং বিজ্ঞান ও উন্নত গণিতের মধ্যে যে ধরনের সমন্বয় দরকার, সেই রকম প্রগতির লক্ষণ প্রথম দেখা দেয় ইউরোপেই ১৬ শতকে। এই সচল ইউরোপীয় বিজ্ঞান "আধুনিক বিজ্ঞানে" রূপ পেল নিউটনের হাতে ১৭ শতকের শেষ দিকে।

বিজ্ঞান-জগতের এই বিপ্লব যদিও যথার্থ ভাবে সুরু হয়েছিল ১৬ শতকের মাঝামাঝি কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিকতত্ত্ব প্রচারের মাধ্যমে, তবুও তার আগে একটু বলা দরকার, কেমন করে মধ্য-যুগীয় সমাজের পরিবর্তন এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের বুনিয়াদ তৈরী করেছিল।

ধর্মযুদ্ধের (crusades) সময় পিসা, জেনোয়া, ভেনিস এই ইতালীয় বন্দরগুলিতে একটা নূতন বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণী তৈরী হয়। প্যালেষ্টাইনগামী ধর্মযোদ্ধাদের (crusaders) চড়া দরে খাবার সরবরাহ ও পারাপার করে এই বন্দরগুলির জেলে ও নৌকা-চালকরা যে ধনরত্ন যোদ্ধাদের কাছ থেকে পেত, সেই সম্পত্তি কাজে লাগাবার জন্য বাজার খুঁজতে লাগল। দেশের ভিতর দিকে জমি কামড়ে থাকা স্থবির সামন্ত সমাজ। সেই সমাজে মুনাফা, সুদ ও টাকা-পয়সার কারবার অচল। এই সমাজের ঘানিতে যে সব ভূমি-হীন লোকরা বাঁধা পড়ে নি, তাদের কাজে লাগিয়ে ক্রমে ক্রমে এই নূতন বণিক ব্যবসায়ীরা স্থান করে নিল সামন্ত সমাজে এবং বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ও মুনাফার চলন করে সেই স্থবির সমাজের বুনিয়াদ ভেঙে দিল। টাকা-পয়সার লেনদেন, মুনাফা ও সুদের কারবারের ওপর ভিত্তি করে এক নাগরিক সভ্যতার পত্তন হ'ল। মুনাফার লোভ ও আকাঙ্ক্ষা অনুপ্রেরণা জোগাল সংগঠিত ভাবে জাহাজ তৈরীর ও সমুদ্র পাড়ির—সাগর পেরিয়ে দেশদেশান্তর থেকে সোনা রূপা জোগাড় করতে হবে। এই লোভ নানা রকম জিনিস উৎপাদন করার উৎসাহ জুগিয়েছে। এর ফলে উৎপাদন পদ্ধতি উন্নত করতে হয়েছে এক সঙ্গে অনেক মাল তৈরী করার জন্য। বৈজ্ঞানিক ভাবে কম্পাস তৈরী করতে হয়েছে, মানচিত্র তৈরী করতে হয়েছে, জ্যোতি-বিদ্যা চর্চা করতে হয়েছে সমুদ্রপাড়িকে নিরাপদ করার জন্য। প্রতিযোগী শত্রুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে বিজয়ী হবার জন্য বারুদ তৈরী করতে হয়েছে। শক্তিশালী মারণাস্ত্র তৈরী করার জন্য ধাতু উত্তোলন ও ধাতু শিল্পের পদ্ধতি উন্নত করতে হয়েছে। সৈন্যদের মাইনে জোগাবার জন্য রূপো, সোনা, ব্রোঞ্জের চাহিদা বেড়েছে। চাহিদার সঙ্গে তাল রাখার জন্য দেশের মধ্যেই খনি খুঁজতে হয়েছে। এই ধারা বেয়ে উৎপাদন পদ্ধতি উন্নতির পথে এগিয়েছে।

ইতালির বন্দরে ও সহরে যে বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, তাদের হিসাব লেখার জন্য কেরাণীর দরকার হ'ল। তখন নিরক্ষরতা প্রায় দেশ জোড়া। তাই, গোড়ার দিকে কেরাণীর প্রয়োজন মেটাল গীর্জ্জার কিছু পুরোহিত, যারা লাটিন ভাষায় সব কিছু লিখত। [ইংরেজী 'ক্লার্ক' শব্দটির পুরানো অর্থ 'পুরোহিত'; বর্তমানে 'ক্লার্ক' শব্দের প্রচলিত অর্থ 'কেরাণী।'] কিন্তু বণিক-মালিকদের পক্ষে সেই ভাষা অসুবিধাজনক। সেইজন্য, তারা এমন একটি শিক্ষিত পণ্ডিত-শ্রেণীর সৃষ্টি করল, যারা স্থানীয় উপভাষায় লিখতে পারে। এদেরই সাহিত্য কাব্যের মধ্য দিয়ে এই অগ্রগামী বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণীর পার্থিব আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সমাজ-চেতনা প্রতিফলিত হতে সুরু করে। ১১ শতকের শেষে যখন টলেডোতে (মুর অধিকৃত স্পেনে) মুসলীমদের পতন হয় এবং তারা বিতাড়িত হয়, তখন সেই সহরে পড়ে থাকে অনেক আরবী পুঁথি। এই সব পুঁথি হচ্ছে মুসলীম বিজ্ঞানের বাহন এবং গ্রীক বিজ্ঞানের আরবী অনুবাদ। গ্রীক বিজ্ঞানের অস্তিত্বের খোঁজ তখনও পর্যন্ত লাটিন ভাষা জানা ইউ-রোপীয় শিক্ষিত পণ্ডিতদের কাছে অজানা। কিন্তু, এই পুঁথির খোঁজ পেয়ে সারা ইউরোপের এই নূতন পণ্ডিত শ্রেণীর লোকরা লেগে পড়লেন আরবী বিজ্ঞান ও গ্রীক বিজ্ঞানকে লাটিনে অনুবাদ করতে। এই নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাত্ত্বিক (theoretical) বিজ্ঞান ও গণিতের সঙ্গে সমন্বয় সুরু হ'ল কারিগরি বিদ্যার। শিল্প ও উৎপাদন পদ্ধতির যে ক্রমোন্নতির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই প্রগতির সঙ্গে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের যোগসাধন করার প্রথম সচেতন চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় লেওনার্দো-দা-ভিন্‌চির (১৪৫২-১৫১৯) মধ্যে। প্রায় এই সময় থেকেই দেখা যায় যে, বণিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রগতির তাগিদে কারিগরি-বিদ্যাকে আর জাতে ছোটো করে রাখা চলছিল না। এই বিদ্যা যখন জাতে উঠতে লাগল, তখন বাস্তব জগৎকে সঠিকভাবে বোঝবার ও জানবার জন্য এক নূতন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির আবির্ভাব হ'ল। গ্রীক বিজ্ঞান থেকে গৃহীত যে সব তত্ত্বকে (theory) স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল, সে সব তত্ত্বকে বাতিল করতে হ'ল নূতন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ প্রণালীর
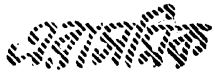
ছাকনীতে ফেলে। যখন একই প্রাকৃতিক তথ্যসমূহকে নূতন বিশ্লেষণ ও যুক্তির ছাচে ফেলা গেল, তখন দেখা গেল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে আমূলভাবে বদলাতে হয়। এই নতুন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের পথকে সহজতর করেছিল সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের আমূল পরিবর্তন। বহির্জগৎ ও দেহজগতের আরিষ্টোটেলীয় চিত্র মধ্যযুগের সামন্ত সমাজের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল। আরিষ্টোটেলীসের চোখে সব চেয়ে নীচু দরের বস্তু মাটি, তার ওপরে জল, তার ওপরে বাতাস এবং সব চেয়ে উঁচু দরের বস্তু আগুন, দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস উঁচু দরের যন্ত্র এবং যকৃৎ, অন্ত্র ইত্যাদি নীচু দরের যন্ত্র; মানুষকে কেন্দ্র করে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে, অতএব পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সব জ্যোতিষ্ককে ঘুরতে হবে তাঁবেদারের মত। নানা থাকে স্তরীভূত সামন্ত সমাজে উচ্চ-নীচের বিচারটা বদ্ধমূল হওয়াতে, জগতের স্তরীভূত রূপটাও বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, সামাজিক আলোড়নের ফলে যে পরিবর্তন হ'ল, তাতে ছোট ছোট রাজারা মাথা তুলল। তবে, এই রাজারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির জন্য নির্ভর করত বণিক শ্রেণীর সমর্থনের উপর। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজারা নিজেরাও ব্যবসায়ী বা ব্যাঙ্কার হ'ত এবং গণসমর্থন নিয়ে সামন্তজমিদারদের ধনে-প্রাণে ধ্বংস করত। এই বণিক সমাজে কেউ কারও কাছে ঘানিতে বাঁধা নয়; ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা করাতে বাধা নেই; জমা বেচে টাকা-পয়সা যোজগার করলেই হ'ল, কেউ কারও তাঁবে থাকার দরকার নেই। এই সামাজিক ভিত্তি তৈরী হবার ফলে, বুদ্ধিজীবিদের চিন্তাধারার মধ্যে যে বদল এল, তাতে প্রকৃতি ও বাস্তব জগতকে স্থবির স্তরীভূত রূপে কল্পনা করার প্রবণতা কেটে গেল। মানবসমাজের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের চিত্র ও মানুষকেন্দ্রিক রূপকে প্রকৃতির উপর না চাপিয়ে প্রকৃতির খাঁটি বাস্তব রূপ বোঝবার চেষ্টাটাই বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। তা ছাড়া, আরিষ্টোটেলীস ছাড়াও অন্যান্য প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক কীর্তি উদঘাটন, চিন্তাজগতে আরিষ্টোটেলীসের একাধিপত্য ধ্বংস করার কাজে কিছুটা সাহায্য করেছিল।

বিশ্বের যে চিত্র প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত চেপে বসে ছিল জগদ্দল পাথরের মত, সেই ভূকেন্দ্রিক চিত্রকে বদলে সৌর-কেন্দ্রিক চিত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রথম জোরাল আঘাত হানলেন কোপার্নিকাস (১৫৪৩)। যেমন ভূকেন্দ্রিক তত্ত্বটি প্রাচীন যুগেরই আরিষ্টোটেলীস ও পটলেমাইয়সের কীর্তি, ঠিক তেমনি সৌর-কেন্দ্রিকতত্ত্বেরও নজির মিলল প্রাচীন যুগেরই গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টার্কাসের পুঁথিতে। এমনি করে প্রাচীনের সাহায্যে প্রাচীনকে আক্রমণ করার সুযোগ ঘটেছিল তখন অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু কোপার্নিকাসের তত্ত্ব বুদ্ধিজীবি মহলে যথার্থ ভাবে গৃহীত হতে সময় লেগেছিল। দার্শনিক ব্রুনো প্রথম নির্ভীক ভাবে কোপার্নিকাসের তত্ত্ব গ্রহণ করলেন, বিশ্বের অসীমতা প্রচার করলেন এবং আমাদের সৌরজগতের মত আরও জগৎ থাকতে পারে—এমন সম্ভাবনার কথাও তিনি বললেন, কারণ তিনি স্বাধীন চিন্তার সৈনিক ছিলেন এবং মনে করতেন যে, বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ থেকে নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছবার অধিকার তাঁর আছে। এই 'ধর্মদ্রোহিতার' জন্য ইটালির রোমান্ ইনকুইজিশন্ (ধর্মদ্রোহিতাদমনকারী বিচার) তাঁকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পুড়িয়ে মারে।

ইটালীতে যে উঠতি বণিক শ্রেণী তার দুই শতাব্দী আগে সামন্ত সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল স্বাধীন চিন্তার জন্য, সেই শ্রেণীই ক্রমে এমন একটা বিলাসী অধোগামী শ্রেণীতে পরিবর্তিত হ'ল যে, স্বদেশে তাদের অর্থনৈতিক শিকড় শুকিয়ে এল এবং তারা হ'ল গণ-সমর্থনভ্রষ্ট। তাই, জবরদস্তি করে রাষ্ট্রনৈতিক শক্তি বজায় রাখবার জন্য তারা সাহায্য করল স্পেনকে, যাতে ইনকুইজিশন্ এবং প্রগতি বিরোধী জেসিউইট সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করা যায়। [গালিলেওকেও এই ইনকুইজিশনের বিচারে কারাবরণ করতে হয় ১৬৩৩ সনে।] স্পেনে স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণের বিশেষ দরকার ছিল না, কারণ রাষ্ট্রশক্তি বজায় রাখার জন্য নবাবিষ্কৃত আমেরিকা থেকে সোনার আমদানী ছিল অব্যাহত। কিন্তু, উত্তর ইউরোপের (ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশ) পক্ষে সোনা ও অন্য ধাতু পাওয়া সম্ভব ছিল যান্ত্রিক আবিষ্কার ও শিল্পের উপর ভিত্তি করে। কাজেই, সেই রকম বিজ্ঞান চর্চার জন্য যে চিন্তা-স্বাধীনতা দরকার, সেই প্রস্তুকুল্য উত্তর ইউরোপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই, দেখা যাচ্ছে যে, ইতালীবাসী গালিলেওর (১৫৬৪-১৬৪২) পরে বিজ্ঞান চর্চার ভারকেন্দ্র উত্তর ইউরোপে (যেমন, লণ্ডন ও প্যারিস) সরে গিয়েছিল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় উত্তর ইউরোপীয় দেশ, হল্যাণ্ডে ১৬ শতকের শেষ দিকে। কিন্তু, ইউরোপে সেই খবর রাষ্ট্র হবার (১৬০৮) আগেই, এবং দূরবীনের অস্তিত্ব না জেনেও দিনেমার জ্যোতির্বিদ ব্রাহে (Tycho Brahe, ১৫৪৬-১৬০১) যে সব সূক্ষ্ম জ্যোতিষ যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, সেগুলির সাহায্যে অসংখ্য পর্যবেক্ষণ করেন গ্রহ ও তারার অবস্থান বিষয়ে। এই সব নির্ভরযোগ্য জ্যোতিষ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং গাণিতিক প্রতিভার জোরে, তাঁর জার্মান শিষ্য (কেপলার, ১৫৭১-১৬৩০) প্রমাণ করলেন যে, যে কোনও গ্রহ, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে উপবৃত্তাকার (elliptical) পথে এবং এই উপবৃত্তের নাভিতে (focus) রয়েছে সূর্য। এ ছাড়া, গ্রহের প্রদক্ষিণকাল ও সূর্য থেকে দূরত্ব বিষয়ক দুইটি জগৎবিখ্যাত গাণিতিক সূত্র তিনি আবিষ্কার করেন। প্রদক্ষিণ পথ যে বৃত্তাকার (circular) নয়, তা কেপলার দেখালেন। এই সময় (১৬০০ সন) জনৈক ইংরেজ উইলিয়াম গিলবার্ট, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পৃথিবীটা একটা চুম্বক। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে আরও বেশী দূর পর্যন্ত টেনে বললেন যে, পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তিটা এক রকম চুম্বকত্ব, এবং মহাশূন্যে সৌরজগতের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায় এই চৌম্বক আকর্ষণ দিয়ে। কেপলার

এই মতে প্রভাবান্বিত হয়ে গ্রহের সূর্য্য প্রদক্ষিণ ব্যাখ্যা করেন। যদিও এই চৌম্বক ব্যাখ্যা ভুল, তবুও বলা দরকার যে, এক রকমের আকর্ষণের সাহায্যে গ্রহের গতি ব্যাখ্যা করার এটাই প্রথম প্রচেষ্টা, এবং এই ধরনের ব্যাখ্যার ফলে নিউটনের পক্ষে সহজতর হয়েছিল আর এক রকমের আকর্ষণের (মহাকর্ষ, gravitation) কল্পনা করা।

এই সময় হল্যাণ্ডে বই ছাপা খুব বেড়ে যাওয়ার ফলে পাঠক সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে চশমার চাহিদাও বেড়ে যায়। এই চাহিদা মেটাবার জন্য হল্যাণ্ডে পরকলার বা (লেন্সের) শিল্প খুব উন্নত হয়, এবং তখন দূরবীক্ষণ তৈরী করাও সম্ভব হয়। ১৬০৮ সালে গালিলেও এই খবর পেয়ে নিজের চেষ্টায় দূরবীন তৈরী করেন। তিনি একদিকে উপলব্ধি করেছিলেন দূরবীনের সামরিক প্রয়োজন, এবং আর একদিকে তিনি সেই যন্ত্রই আকাশ পর্য্যবেক্ষণে কাজে লাগিয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় একটা বিপ্লব এনেছিলেন। বৃহস্পতি গ্রহের চারটে পরিক্রমণশীল উপগ্রহ আবিষ্কার করে একটা ছোটখাটো "সৌরজগতের" ছবি দেখতে পেলেন এবং এর ফলে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিকতত্ত্বের বুনিয়াদ আরও শক্ত হ'ল। গালিলেওর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক কীর্ত্তি হচ্ছে যে, তিনি প্রথম গাণিতিক পদ্ধতিতে বস্তুর গতি (motion) ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বিশেষত্ব হ'ল: প্রাকৃতিক-ঘটনাসমূহ থেকে এমন সব বাস্তব সত্তা বেছে নেওয়া, যেগুলিকে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে, যেমন—আয়তন, আকার, ওজন, গতি। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব আবির্ভাবের আগে পর্য্যন্ত দেশ, কাল (space & time) এবং গতির যে গাণিতিক রূপ বস্তু বৈজ্ঞানিক জগতের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি ছিল, সেই রূপসৃষ্টির অগ্রদূত হচ্ছেন গালিলেও। তাঁরই গতি-সূত্রকে (laws of motion) নিউটন তিনটি জড়তা-সূত্রের (principles of inertia) রূপ দেন। থার্ম্মোমীটার ও দোলক-ঘড়ি বিষয়েও গালিলেওর কাজ জগৎ বিখ্যাত।

কেপলার ও গালিলেওর সাফল্যের মূলে আছে গণিতশাস্ত্রের অভূতপূর্ব্ব তৎকালীন প্রগতি। ইউরোপে বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সব রকম বেচা কেনাকে সঠিকভাবে সংখ্যা ও পরিমাণের ভাষায় প্রকাশ করায় প্রয়োজন ক্রমাগতই বেড়ে যায় এবং জটিলতর হয়ে উঠে। ১৬ শতকে যখন উত্তর ইউরোপের অগ্রগামী দেশগুলিতে পৃথিবীর বাণিজ্যের চাপ খুব বৃদ্ধি পায়, তখন হিসাবপদ্ধতিকে সহজ ও দ্রুত করার জন্য সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা গণিতের নূতন রূপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ১৫৫৭ সনে জনৈক ইংরেজ, Recorde প্রথম গাণিতিক চিহ্ন '=' ব্যবহা

করেন, ১৫৮০ vieta (ফরাসী) বীজগণিতে সংখ্যার জায়গায় অক্ষর (ভাষার) প্রবর্তন করে গাণিতিকজগতে বিপ্লব আনেন, Stevin (ওলন্দাজ) ১৫৮৫ সনে দশমিকের প্রচলন করেন, Napier (ইংরেজ) লগারিদম্ আবিষ্কার করেন (১৬১৪), ফরাসী Pascal (১৬২৩-৬২) গাণিতিক সম্ভাবনাতত্ত্ব (probability theory) সৃষ্টি করেন, এবং আর একটি উল্লেখযোগ্য বিপ্লব ঘটে যখন ফ্রান্সের দেকার্ত জ্যামিতি ও বীজগণিতের পাঁচিল ভেঙে দিয়ে বীজগাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন জ্যামিতিতে এবং কোঅর্ডিনেট জ্যামিতির জন্ম দেন (১৬৩৭)। গালিলেও বলবিদ্যার (mechanics) সঙ্গে নূতন গণিতের যোগসাধন ঘটালেন।

এখানে বলা দরকার যে, প্রায় ১৮ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত শিল্পের প্রগতিই বলবিদ্যার তত্ত্বকে theory বেশী পুষ্ট করেছে, শিল্পকে পুষ্ট করার মত পর্যায়ে তখনও এই তত্ত্ব উন্নীত হয় নি। এই পর্যায়ে রসায়ন ও জীববিজ্ঞানকে উন্নীত করতে আরও এক শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। এইজন্য, তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে তৎকালীন শিল্পোন্নয়নের ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

১৫ শতকে দামী ধাতুর চাহিদা বেড়ে উঠে মুদ্রা তৈরীর (coining) জন্য, এবং রূপোর চাহিদা বাড়ে প্রাচ্য থেকে আমদানি মালের মূল্য জোগাবার জন্য। জার্মানীর মধ্য দিয়ে ফ্লেমিশ-ইতালীয় বাণিজ্য গড়ে উঠায় জার্মান বণিকদের লাভের পথ প্রশস্ত হয় এবং জার্মান পর্বতে ধাতু উত্তোলনের খনি অনুসন্ধান করে করে এই শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি করে ১৫ শতকে। সাক্সনির গে-অর্ক বাউ-এর বা agricola ১৪৯০-১৫৫৫ খনিজ, ধাতু, ধাতু উত্তোলন ও ধাতু উত্তোলনের অর্থনৈতিক প্রশ্ন বিষয়ে যে বিশদ আলোচনা করেন, তা জগৎবিখ্যাত। মাইনিং-এর ফলে নানা রকম আকরিক ores এবং তা ছাড়া নূতন নূতন ধাতুও আবিষ্কৃত হতে থাকে। এইগুলির পৃথকীকরণ, মিশ্রণ, ইত্যাদি নানা প্রকারের প্রয়োজন থেকে রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের গোড়াপত্তন হয়। পারা ও অন্যান্য ধাতুজ দ্রব্যকে ঔষধের কাজে লাগাবার ঝোঁক বেড়ে উঠে রোগমোচনকে দ্রুত করার জন্য। স্বদেশের লোকদের জন্য, এবং সাগরপারের নূতন নূতন উপনিবেশের স্থানীয় সরল বর্বরদের মাতলামীতে ডুবিয়ে রেখে তাদের পুরোপুরি কিনে নেবার জন্য, ইউরোপে মদ চোলাই (distillation) ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। এর ফলে নবজাগরণের যুগে (Renaissance) চোলাই পদ্ধতিতে একটা বড় রকম রাসায়নিক উন্নতি হয়। নবজাগরণ যুগের (১৪৪০-১৫৪০) শেষ দিকেই রাসায়নিক পরীক্ষাগার (চুল্লী, তুলাদণ্ড, চোলাইযন্ত্র, বকযন্ত্র, ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে) যে রূপটি নেয়, সেই রূপটি এখনও আমূলভাবে বদলায় নি। লোহা শিল্পে, কাঠকয়লা দিয়ে কম উত্তাপে নরম করে লোহা পেটানোর যে পদ্ধতি ৩,০০০ বৎসর ধরে চলে আসছিল, সেই পদ্ধতি আমূলভাবে পরিবর্তিত হয়ে ব্লাষ্ট ফারনেস সৃষ্টি হ'ল এবং '১৬ শতক শেষ হওয়ার আগেই এক সঙ্গে বহু টন গলিত লোহা ঢালাই করার পদ্ধতি চালু হয়ে গেল। লোহা গলাবার ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে যে পরিমাণ কাঠ দরকার, সেই তুলনায় দেশে (যেমন, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড) অরণ্য সম্পদ ছিল না, তাই, ১৬ শতকে জ্বালানী কাঠের দাম বেড়ে উঠল, এবং সঙ্গে কয়লা উৎপাদন বাড়াতে হ'ল কাঠের অভাব পূরণ করার জন্য।' ১৫৬৪ থেকে ১৬৩৪, এই সত্তর বৎসরের মধ্যে নিউকাসল থেকে কয়লার জাহাজী চালান চোদ্দগুণ বেড়ে যায়। লোহা ও কয়লা শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক যন্ত্রশিল্পের প্রগতিও যেমন, কয়লার খাদ থেকে জল বার করে নেবার জন্য পাম্পের ব্যবহার ও উন্নতি শুরু হয়। এই শিল্প-বিপ্লব, ১৮ শতকের বিরাট শিল্পবিপ্লবের সূচনা।

মানুষের দেহবিজ্ঞানে বড় পরিবর্তনের সূচনা হয় কোপার্নিকাসের সময়ে, এবং যথার্থ বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে গালিলেওর জীবিতকালে, নিউটনের আবির্ভাবের (১৬৪২) আগে। ভেসালিউস (১৫১৫-৬৪) প্রথম খাঁটি বৈজ্ঞানিকভাবে মনুষ্যদেহ গঠনের একটা পূর্ণ বর্ণনা করেন (১৫৪৩, অর্থাৎ, যে বৎসর কোপার্নিকাসের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়), এবং ১৫৩৭-এ Paduaতে যে প্রতিষ্ঠান তিনি সৃষ্টি করেন, সেইখানেই পরে ইংলণ্ডের উইলিয়াম হার্ভি ১৫৭৮-১৬৫৭ দেহবিজ্ঞানের শিক্ষা পান। এই ইটালীয় দেহ-বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে তিনি সমন্বয় করেন যান্ত্রিক পরীক্ষার কৌতূহল। তারপর, পাম্প, কপাটক (Nalve) প্রভৃতি যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে রক্তসঞ্চালনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেন (১৬২৮)। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া তিনি উপলব্ধি করেন। দেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক নিয়ম প্রয়োজ্য, এই ধারণাটি সেই সময় থেকে দেখা দেয়।

১৭ শতকের প্রথমার্দ্ধে শেষ হ'ল কেপলার, গালিলেও, দেকার্ত, হার্ভির যুগ। ১৭ শতকের শেষার্দ্ধকে বলা যায় সঙ্ঘবদ্ধ গবেষণা ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার যুগ। এই যুগে নিউটনের জন্ম। এই যুগ সম্বন্ধে বলার আগে সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার দুজন মনীষীর বিজ্ঞান-দর্শন : ইংরেজ আইনজীবি, ফ্রান্সিস বেকন ১৫৬১-১৬২৬ ও ফরাসী প্রাক্তন সৈনিক, দেকার্ত ১৫৯৬-১৬৫০। যদিও বেকন বিজ্ঞানে গাণিতিক সূত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন নি, তবুও কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ভিত্তি যে একমাত্র নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি, এই চিন্তাপ্রবাহের দার্শনিক ও সক্রিয় সমর্থন তিনি করেন। সঙ্ঘবদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুপ্রেরণা তিনিই প্রথম দেন, এবং বিজ্ঞানীদের প্রতি আবেদন জানান বিজ্ঞানকে একটা সামগ্রিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে দেখবার জন্য। আর এক দিকে, দেকার্ত প্রচার করেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাসের জগৎ একেবারে আলাদা। এই দুই জগৎকে পৃথক করে দেবার ফলে ফ্রান্সে বিজ্ঞানীদের মতামতের ওপর ধর্মগির্জ্জার আক্রমণ কমে যায়। আর ইংলণ্ডে ১৬৪৫-এর
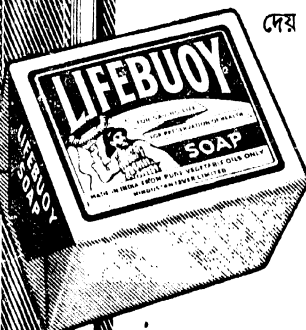
যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য
ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে
স্নান করেন
খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
LIFEBUOY
SOAP
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন-এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

গৃহযুদ্ধ অবসানের পর বিজ্ঞানদরদীদের মধ্যে দেখা দেয় রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্ম্মীয় বিবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা, এবং এমন একটা বিজ্ঞানী-ঐক্য গড়বার চেষ্টা, যার মধ্যে রাষ্ট্রীয়-ধর্ম্মীয় মতানৈক্যের কোন স্থান নেই।

সেই যুগটায় বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র হয় লণ্ডন ও প্যারিস। নানা আলোড়নের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা তখন প্রায় অব্যাহত। সব অগ্রগামী দেশগুলির শাসকবর্গ চায় বাণিজ্য, নৌবাহ, শিল্প ও কৃষির উন্নতি হউক। তারা অনুভব করেছে যে, সব দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার দরকার আছে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য, এই উন্নতির ফল শাসকবর্গই ভোগ করবে। তাই, এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের জাতীয়তাবাদী শত্রুতাও বিজ্ঞানীদের আন্তর্জ্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা'র স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নি। সেই যুগের জ্ঞানপিপাসুরা ছিলেন স্বাধীন পেশার লোক, যেমন—বণিক্, ছোট জমিদার, ডাক্তার, আইনজীবি এবং পুরোহিত। নিজ নিজ গবেষণার টাকা জোগাবার মত আর্থিক অবস্থা তাঁদের ছিল। সমাজে বিজ্ঞানীদের সংখ্যা যতই বেড়ে উঠতে লাগল, ততই পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদানের জন্য মিলিত হবার স্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দিল, এবং বেকনের অনুপ্রাণনার ফলে সঙ্ঘবদ্ধ গবেষণার ইচ্ছা তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। এই ইচ্ছা পূর্ণরূপে নেয় লণ্ডন ও প্যারিসের বিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (Royal Society of London. ১৬৬২, এবং Academic Royal des Sciences, ১৬৬৬। যে সব গবেষণা ক্রমবর্দ্ধমান বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনকে পুষ্ট করতে পারে, সেই সব গবেষণার উপর ঝোকটাই প্রধান ছিল গোড়ার দিকে। জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বাণিজ্যিক সাগর-পাড়িকে আরও বৈজ্ঞানিক করার জন্য (যেমন নিখুতভাবে দ্রাঘিমা বা longitude নিরূপণ)। এই প্রয়োজন উপলব্ধির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় গ্রীন্‌উইচ (১৬৭৫) ও প্যারিসের (১৬৭২) সরকারী মানমন্দির (observatory) প্রতিষ্ঠার মধ্যে। জ্যোতিষিক গবেষণার জন্য দূরবীক্ষণকে উৎকৃষ্টতর করার চেষ্টা যতই বেড়েছে, ততই আলোক-বিজ্ঞানের (optics) তাত্ত্বিক ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে। এই অনুসন্ধানের সূত্রেই নিউটন আলোক-বর্ণালীর (spectrum) ব্যাখ্যা করেন। আর এক দিকে, লেন্সের অন্যরকম বিন্যাস, অনুবীক্ষণ যন্ত্র উন্মোচন করল এক নূতন অদৃশ্য জগৎ। শোষণ-পাম্পের ব্যবহার বহুকাল থেকেই মাইনারদের কাছে জানা ছিল, কিন্তু, জল ৩২ ফুটের বেশী ওঠে না, এই সহজ পর্য্যবেক্ষণের কারণ ব্যাখ্যা হ'ল ১৬৪৩-এ, যখন তর্‌রিচেলি প্রমাণ করলেন বায়ুশূন্যতা (vacuum)। "বায়ুশূন্যতা অসম্ভব" এই আরিস্তোতেলীয় মত একেবারে ধ্বসে পড়ল। জার্ম্মানীর মাগদেবুর্গের তৈরি করার জন্য মেয়র গ্যারিকে (১৬০২-৮৬) বায়ুশূন্যতা তৈরি করার জন্য প্রথম বায়ু-নিষ্কাশক তৈরি করেন, এবং বায়ুশূন্যতাকে কত শক্তিশালী কাজে লাগানো যেতে পারে, তার সূচনা দেখান তাঁর বিখ্যাত "মাগদেবুর্ক অর্দ্ধগোলক" পরীক্ষায়। তৎকালীন গণিতবিদ-দার্শনিক, গাসাদি (১৫৯২-১৬৫৫) গ্রীক্ পরমাণুবাদকে উদ্ধার করেন, এবং কল্পনা করেন যে, ঈশ্বরের একটি প্রাথমিক প্রেরণাঘাত (নিউটনও এই ঐশ্বরিক প্রেরণাঘাতে বিশ্বাসী ছিলেন) পেয়ে বস্তুর পরমাণু-গুলি বায়ুশূন্যতার মধ্যে বিচরণ করছে। গালিলেওর গতিবিদ্যার যুগে বস্তুকে অখণ্ড সত্তা হিসাবে না ভেবে কণিকাসমূহের সমষ্টি হিসাবে কল্পনা করা সহজ হ'ল। Robert Boyle (১৬২৭-৯১) বস্তুর এই কণিকা চিত্রের সঙ্গে সমন্বয় করলেন গ্যারিকের প্রবর্ত্তিত বায়ুনিষ্কাশন পরীক্ষা থেকে লব্ধ তথ্য। গ্যাসের প্রসারধর্ম্মকে কণিকা-চিত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সোজা হ'ল। নিউটন বয়লের বিখ্যাত গ্যাসসূত্র গাণিতিকভাবে প্রমাণ করলেন পরমাণুচিত্রকে ভিত্তি করে। তখন থেকে এই নূতন পরমাণুবাদ একটা যথার্থ বৈজ্ঞানিক রূপ নিল, এবং রসায়নের তাত্ত্বিক বুনিয়াদ তৈরী করল। [১৯ শতকের গোড়ায় জন ডল্টন এই পরমাণুবাদকেই উন্নততর করে রসায়নে একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন আনেন]। এমন কি আলোর বাস্তব সত্তা ব্যাখ্যা করার জন্য নিউটন কণিকাচিত্রই (corpuscular hypothesis) ব্যবহার করলেন। তাঁর সমকালীন বিজ্ঞানী হয়গেন্‌স (১৬২৯-৯৫) আলোর কয়েকটি গুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলোর তরঙ্গরূপ (wave nature) ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু সেই যুগের বিজ্ঞান-জগতে নিউটনীয় মতামতের আধিপত্য প্রবল থাকায় এই তরঙ্গবাদ চাপা পড়ে থাকে এবং ১৯ শতকের গোড়ায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এইখানে বলা দরকার যে, সেই যুগে রসায়নের এবং জীব-বিজ্ঞানের উন্নতি এমন একটা পর্য্যায়ে পৌঁছায় নি, যাকে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন বলা যায়। রয়াল সোসাইটির আলোচনা সভায় সেই যুগে জ্যোতির্ব্বিদ্যা, বলবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান, ইত্যাদি খাঁটি বস্তু বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি চর্চ্চার উপর ঝোকটা বেশী পড়ে। তা ছাড়া বিজ্ঞানের রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক সমস্যা ও কর্ত্তব্য বিষয়ে নীরব ও নির্লিপ্ত থাকার যে ধারা রয়াল সোসাইটিতে চলে এসেছে, তারও ঐতিহাসিক কারণ আগে বলা হয়েছে, এই পরিষদের সংবিধির প্রস্তাবনায় (১৬৬৩) স্পষ্ট করেই লেখা হয়েছিল যে, ঐ সব প্রশ্ন পরিষদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। দেশের শাসকবর্গের চোখে বিজ্ঞানীদের এই সমাজচেতনা বর্জ্জিত নিষ্কাম কর্ম্মের উত্তম সুলক্ষণ বলেই মনে হয়েছে, কারণ, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও গবেষণা শাসকবর্গ কেমন ভাবে ব্যবহার করবেন বা না করবেন, সেই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে কোনও সমাজ-নৈতিক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হবার সম্ভাবনা প্রায় লোপ পায়।

রয়াল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অন্যতম সক্রিয় উদ্যোক্তা, রবার্ট বয়লের পর সেই পরিষদের দীপ্ত সূর্য্য হিসাবে চোখে পড়ে নিউটনকে (১৬৪২-১৭২৭)। নিউটনের সমকালীন যে বৈজ্ঞানিক প্রগতির কথা এতক্ষণ বলা হয়েছে, তার সব কিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে

LUX
TOILET SOAP
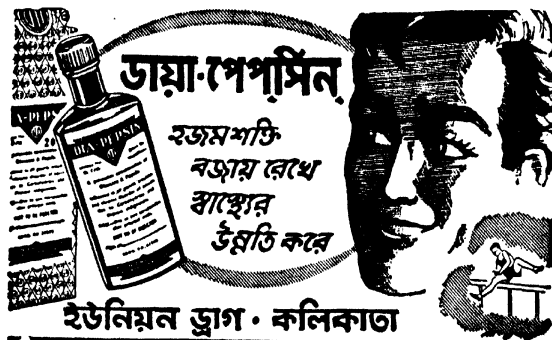
দেখা দেয় নিউটনের সৃষ্ট একটি সম্পূর্ণ বলবিদ্যা। গ্রহ উপগ্রহ ও নানা জ্যোতিষ্কের গতি পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটনীয় বলবিদ্যার সৃষ্টি। দেকার্তের গণিত, (কোঅর্ডিনেট জ্যামিতি), গালিলেওর গতিবিদ্যা, ও কেপলারের জ্যোতিষিক সূত্র—এই তিনটি ধারা মিলিত হয়ে নিউটনের প্রতিভার স্পর্শে তৈরী হয় নিখিল জাগতিক মহাকর্ষ সূত্র (Gravitation Law.)

কোনও গ্রহকে (তথা, কোনও বস্তুকে) "চলমান রাখতে গেলে একটা বলের প্রয়োজন আছে"—এই ভুল কেপলারীয় ধারণা নিউটন্ গ্রহণ না করে, গালিলেও ও দেকার্তের জড়তা-সূত্র (law of inertia) গ্রহণ করলেন ; অর্থাৎ, আদিতে "ঈশ্বরের প্রাথমিক প্রেরণাঘাতে" জ্যোতিষ্কের গতি সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু তার পর থেকে তার চলনশীলতা বজায় রাখার জন্য কোনও বলের প্রয়োজন নেই এবং অন্য কোনও বল (force) বাধা সৃষ্টি না করলে, তার সরল রৈখিক চলন অব্যাহত। কিন্তু, কেপলার গ্রহের সূর্য্য পরিক্রমন বিষয়ে যে জ্যামিতিক চিত্র (অর্থাৎ, উপবৃত্তাকার কক্ষপথ) তৈরী করেন, সেটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটনকে কল্পনা করতে হয় যে একটা কেন্দ্রোন্মুখ বল (centripetal force) গ্রহকে সূর্য্যের দিকে টেনে রেখেছে,—নয় ত কেমন করে একটা সরল পথগামী গ্রহ বাঁকা পথ (কক্ষ, orbit) ধরছে। আর, দেকার্ত যে আধুনিক বৈশ্লেষিক জ্যামিতি সৃষ্টি করেছিলেন, তা প্রথম থেকেই নিউটনকে গ্রহণ করতে হয়। যদিও, ইটালীয় গণিতবিদ্ বোরেল্লি জড়তা-সূত্র উপলব্ধি করেন নি, তবুও তিনিই প্রথম [১৬৬৫] আভাস দেন যে, গ্রহকে কক্ষপথে ধরে রেখেছে দুইটি পরস্পরবিরোধী বল : কেন্দ্রোন্মুখ ও কেন্দ্রবিমুখ বল [centripetal & centrifugal force]। হুয়গেন্‌স কেন্দ্রবিমুখ বলের গাণিতিক রূপ দেন। নিউটন ১৬৬৫-৬৬ সনে কেন্দ্রোন্মুখ আকর্ষণের গাণিতিক রূপ [ব্যস্ত-বর্গ সূত্র, inverse-square law] আবিষ্কার করেন। এই সূত্রের সাহায্যে কেপলারের তিনটিই জ্যোতিষিক সূত্রের যাথার্থ প্রমাণিত হয়। এই সাফল্যের পর নিউটন তাঁর গাণিতিক সূত্রকে নিখিল জাগতিক মহাকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ সূত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। মাটিতে 'আপেল' পড়া, জোয়ার ভাটা, পৃথিবীর আকৃতি [গোলাকার], উপগ্রহের গ্রহ পরিক্রমণ, গ্রহের সূর্য্য পরিক্রমণ, ধূমকেতুর যাওয়া-আসা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে সেই সাধারণ সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় এবং পৃথিবীর বলবিদ্যা ও জ্যোতিষিক বলবিদ্যা আর খণ্ডিত না থেকে একটা অখণ্ড মহাজাগতিক সূত্রে গ্রথিত হয়। ১৬৮৭ সনে নিউটন Principia নামক জগদবিখ্যাত বইয়ে তাঁর তত্ত্বসমূহকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেন। বস্তুকে চলমান রাখবার জন্য বলের [force] দরকার নেই, বরং তার গতির পরিবর্ত্তন ঘটাবার জন্য বলের দরকার—এই চলনশীল [dynamic] বিশ্বচিত্র প্রতিষ্ঠা করলেন নিউটন। এই চিত্রকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা থেকে অনুকলনের [infinitesimal calculus] জন্ম। নিউটন [১৬৬৫] ও লাইবনিৎস [১৬৮৪] এই দুইজনেরই এই নূতন গণিত সৃষ্টির গৌরব প্রাপ্য।

নিউটনের চলনশীল বিশ্বচিত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাঁর নিখিল জাগতিক কণিকাবাদ [atomism], অর্থাৎ যেন স্বাধীন ভাবে চলমান বস্তুকণাসমূহ অদৃশ্য প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা চালিত হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সঙ্ঘাতে আসছে। এইখানে বলা দরকার যে, তৎকালীন অর্থ নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জগতে যে বড় পরিবর্ত্তন আসে, তা হচ্ছে ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব [১৬৮৮],

যখন বণিকশ্রেণী অবাধ নীতি [laissez faire] ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করছে। বাণিজ্যজগতে প্রত্যেক 'ব্যক্তি'র সক্রিয় হবার 'স্বাভাবিক অধিকার' আছে স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কারণ, একটি 'অদৃশ্য প্রাকৃতিক নিয়মের' দ্বারা চালিত এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দেশের ধন বৃদ্ধির সহায়ক। অবাধ নৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের অগ্রদূত, জন্ লক্ [১৬৩২-১৭০৪] তাঁর দর্শনশাস্ত্রের মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু, নিউটনের বৈজ্ঞানিক মতামতকে ব্যবহার করলেন। আর, ভোলত্যার [১৬৯৪-১৭৭৮] ফ্রান্সে প্রথম নিউটনীয় দর্শন আনলেন।

নিউটন যে বিজ্ঞান সৃষ্টি করলেন, সেই বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি। তাঁরই গাণিতিক বলবিদ্যা, বর্তমান ব্যবহারিক বস্তু বিজ্ঞানের বুনিয়াদ এবং চুম্বকতত্ত্ব ও তড়িৎ-বিজ্ঞানের সূত্রও নিউটনীয় ছাঁচে তৈরী। মোট কথা, ১৬৯০ সনের আগেই যথার্থ আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বিজ্ঞান পরিষদের প্রভাবে রাশিয়া, সুইডেন্ ও জার্মানীতে জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ গড়ে উঠে। এই ভাবে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও চিন্তাধারার মধ্যে একটা সংহতি সৃষ্টি হয়।

নিউটনীয় তত্ত্ব ও দর্শন একটা সম্পূর্ণতা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। নিউটনের মৃত্যুর পরে বৈজ্ঞানিক উদ্যম ও কৌতূহলে কিছুটা শৈথিল্য আসার অন্যতম কারণ ঐ সম্পূর্ণতা।

১৮ শতকের মাঝামাঝি শিল্প-বিপ্লব [Industrial Revolution] সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-জগতে একটা নূতন জোয়ার আসে।*

* নিম্নলিখিত বইগুলির উপর ভিত্তি করে এই প্রবন্ধ লিখেছি: Crowther এর Social Relation of Science; Bernal-এর Science in History: Out line of Modern Knowledge; Butterfield-এর The Origins of Modern Science; Needham-এর প্রবন্ধ Mathematics & Science in China and the West [Science and Society Vol xx, No. 4, Fall 1956]; Dampier-এর A History of Science.—লেখক]

ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা

ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্য্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।

রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেণার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

RP. 146-X52 BG
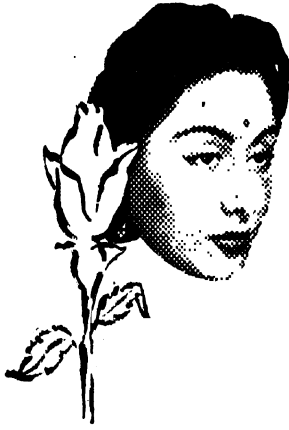
কেশবচন্দ্র সেন—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিত' মালার ইহা অন্যতম গ্রন্থ। এই অমূল্য গ্রন্থগুলির প্রয়োজনীয়তা বিদ্বজ্জন-স্বীকৃত। আলোচ্য গ্রন্থখানিকে শুধু জীবনী বলিলে ভুল হইবে, ইহা তাঁহার কর্ম্ম-বিশ্লেষণ। কেশবচন্দ্রের বিভিন্নমুখী কর্ম্ম-প্রয়াস সে যুগের সমাজ-জীবনে একটা আলোড়ন আনিয়া দিয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টানী প্রভাব হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্যই কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব। তাঁহার আগমন সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার সকল কর্ম্মই ছিল ধর্ম্ম-কেন্দ্রিক। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে সময় যে বাধার মধ্য দিয়া তাঁহাকে এই পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল—ইহাতে তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রকাশ পায়। এদিক দিয়া তিনি বিপ্লবী ছিলেন। সমাজকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়াই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র কেশব সেনকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে সৎ ব্রাহ্মণের সকল গুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে সব কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা উনিশ শতকের একটি ইতিহাস রচনা করিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মজীবনে ও কর্ম্ম-জীবনে এক অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক তাঁহার অপূর্ব্ব ভাষার কৌশলে গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'রিসার্চ-ওয়ার্কে'র কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যোগেশবাবু যে অমূল্য সম্পদ আমাদের উপহার দিলেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ 'চরিতমালা'র রত্নরাজি প্রকাশ করিয়া তাঁহারাও একটি স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন। গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মহান ভারত—শ্রীভিক্ষু, ভারতীপ্রকাশ, ৩০, আশুতোষ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট—ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১। মূল্য—সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এই বিরাট গ্রন্থখানি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। এক কথায় গ্রন্থটি কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে বলা শক্ত। সৃষ্টি-তত্ত্বের গোড়ার কথা হইতে সুরু করিয়া—মানুষের আদি বাসস্থান, তাহার সভ্যতা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের সংগঠন ও বিকাশকে সুন্দর করিয়া লেখক দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভারতের শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া গ্রন্থকার অতি সহজ কথায় তাহারই সংক্ষিপ্ত সারকথা পরিবেশন করিয়াছেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থের অধ্যায়ক্রমও লক্ষ্য করিবার মত। যথা: ইতিহাস, অধ্যাত্মলোক, ও পরমাত্মা, সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন, বেদ ও উপনিষদ সম্বন্ধে, সৌরজগত সম্বন্ধে, দেব-স্বর্গ, পুরাণ-কথা ও ভারতীয় ঐতিহ্য, বিভিন্ন বিষয় ও পরিচয় রহস্য। দ্বিতীয় খণ্ডের অধ্যায়গুলি—ধর্ম্ম কি, জীব-সৃষ্টি ও জাতি গঠন, জীব-সৃষ্টির ক্রম, বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সংস্কার, আশ্রম ধর্ম্ম, সংহিতা, যোগ ও উপাসনা, যজ্ঞ, পুরাণ, যাযাবর যুগের প্রভাব, প্রাচীন যুগ, রাজতন্ত্রের রূপ, প্রাচীন যুগের বিচার পদ্ধতি, ব্যবসা, বৃত্তি বা পূর্ত্ত, রসায়ন ও তৎসংক্রান্ত শাস্ত্র রচনা, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, মহান ভারতের অতীত গৌরব, তীর্থ, সাধক প্রভৃতি।

ইংরেজিয়ানার দোষে আমরা ভারতের এই অমূল্য সম্পদগুলিকে এতকাল অবহেলা করিয়া আসিয়াছি এবং সব কিছুকেই কু-সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করিতেও লজ্জা বোধ করিয়াছি—গ্রন্থকার সেইগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের সংস্কার-মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের দুঃসাহস—এইরূপ বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে মাত্র দুটি খণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানিকে আরও বিস্তৃত করা উচিত ছিল।

ভারতের ঐতিহ্যের ধারক আমরা—সেদিক দিয়া আমাদের গর্ব্বও কম নয় এবং এই জন্যই এরূপ একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাতে যেমন অপরূপ বৈচিত্রে রূপান্বিত হইয়াছে, গ্রন্থের প্রচ্ছদপটও তদনুরূপ রূপপরিগ্রহ করিয়াছে। এককথায় গ্রন্থখানি আমাদের কল্যাণ-বাহক।

শ্রীগৌতম সেন

তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন
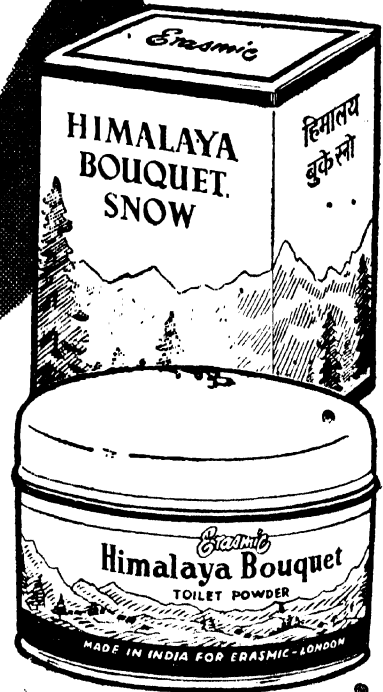
ভ্রষ্ট কুসুম—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা। ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা।

গল্প সঙ্কলন। দশটি গল্প স্থানলাভ করিয়াছে। ঘরোয়া পরিবেশে প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই লেখা হইয়াছে। গল্পগুলির মধ্যে অল্প-বিস্তর দোষ-ত্রুটি থাকিলেও লেখক গল্প বলিতে জানেন একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

জনতার কোলাহল—শ্রীগোপীনাথ নন্দী। ডি. এম. লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ২।০ টাকা।

দুই অঙ্কে সমাপ্ত একখানি ১৬০ পৃষ্ঠার নাটক। রাজনৈতিক জীবনের ভাল-মন্দ কতগুলি দিক নাটকখানির প্রধান বিষয়বস্তু হইলেও পম্পা ও দেশবল্লভের প্রেমই অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছে। দেশবল্লভের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে কষ্ট হয় না কিন্তু পম্পার জীবনের শেষ অধ্যায়টির মধ্যে কিছুটা বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হইল। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে সংলাপ বক্তৃতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এত দীর্ঘস্থায়ী সংলাপ পীড়াদায়ক। নাটকখানির বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, লেখক চতুর্দ্দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে একখানি ভাল নাটক রচনা করিতে সক্ষম হইতেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পরমাত্মা তত্ত্ব—লেখক অব্যক্ত। বামুনগাছী—ধর্ম্মতলা, সালকিয়া (হাওড়া) হইতে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মাণিক কর্তৃক প্রকাশিত। ৪+৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য—পাঁচ সিকা।

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, জন্মান্তর, আত্মার দেহত্যাগ, নিরঞ্জন, আমার বিশ্বরূপ, আমার স্বরূপ, আত্মতত্ত্ব, হিন্দুদর্শনে কাল ও কালী, আমি নিত্য বোধ স্বরূপ, বেদ ও বেদান্ত, তত্ত্বমালা প্রভৃতি বিষয় এই আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তাঁর গুরুদেবের ভাবধারা এবং জনৈক বন্ধুর সহিত আলোচনার মর্ম্মধারা অবলম্বনে পরিবেশন করিয়াছেন। জটিল বিষয়গুলি যথাসাধ্য সহজবোধ্য করার চেষ্টা হইয়াছে। পরমার্থ তত্ত্ব পিপাসুরা ইহা পাঠে তৃপ্ত হইবেন।

অরুণাচল বাণী—প্রলোকানন্দ মহাভারতী প্রণীত এবং ১।৬।১ডি, পিয়ারী দুর লেন, কলিকাতা—৬, অরুণাচল—মিশনের ওয়ার্কশিপ অফিস হইতে প্রকাশিত। ৪+৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য—

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পল্লীবোধন—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য। 'সমাধিমঠ' পোঃ ভূপালপুর, জেলা পশ্চিম দিনাজপুর। পৃষ্ঠা ২৭২, মূল্য ৪৻।

গ্রন্থকারের পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইনি উক্ত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক রাজদ্রোহের অপরাধে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

সুপণ্ডিত গ্রন্থকার পল্লীর নবজীবনের জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থে নয়টি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। বহু দেশী-বিদেশী লেখকের গ্রন্থ হইতে মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, পল্লীর এবং ভারতীয় সভ্যতার বর্ত্তমান ঘোর অবনতির জন্য প্রায় দুই শত বৎসরের ইংরেজ শাসনই দায়ী। লেখক বলেন যে, অতীত গৌরবের কঙ্কালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাশ্চাত্ত্য শোষণ-প্রধান শিল্প-সভ্যতার অনুকরণে ভারতের মুক্তি নাই। কৃষিবলই প্রধান বল যদিও শিল্প প্রভৃতিরও আবশ্যকতা জাতীয় জীবনে কম নহে। বস্ত্রশিল্পই সর্ব্বপ্রধান এবং এই বিষয়ে পল্লীকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে। শক্তির সাধনা প্রয়োজন—পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।' কুসংস্কার ত্যাগ করিতে হইবে, কায়িক শ্রমকে গৌরবদান করিতে হইবে তবেই বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে। শ্রমকে হেয় মনে করিয়া আমরা যে মহাপাপ করিয়াছি তাহারই কুফল ভোগ করিতেছি। লেখক পল্লীর উন্নতিতে সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধন অপরিহার্য্য মনে করেন। একমাত্র সমবেত চেষ্টাদ্বারাই পল্লীর উন্নতি সম্ভব, ব্যক্তিগত চেষ্টায় এমনকি সরকারী সাহায্যেও ইহা সম্ভব নহে। সমষ্টিগত চেষ্টার মধ্যে পল্লীবাসীকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। এজন্য বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী, যাহাতে মানুষকে স্বার্থপর হইতে শেখায়, উহার পরিবর্ত্তন দরকার। প্রাচীন ভারতের আদর্শকে বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া শিক্ষায় রূপায়িত করিতে হইবে—তাহাতেই ভারতের তথা পল্লীর মঙ্গল। বহুভাবে খণ্ডিত পল্লীসমাজে সামগ্রিক একতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভেদতান্ত্রিকতার অবসান ঘটাইতে হইবে। এই বিরাট কার্য্যে সর্ব্বোপরি ত্যাগী কর্ম্মীর প্রয়োজন। পুস্তকপ্রচার ও বক্তৃতাদ্বারা ইহা সম্ভব নহে। গ্রন্থকার মাত্র একলক্ষ ত্যাগী কর্ম্মীর সাহায্যে এই পল্লীবোধন কার্য্য আরম্ভ করিয়া ইহার সফলতা আশা করেন।

বহু প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক, অর্থবিদ প্রভৃতি মনীষীর লেখা হইতে এবং নানা ধর্ম্ম ও শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার তাঁহার বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনাকালে তিনি বিভক্ত ভারত ও পাকিস্থানের প্রতি সমান দরদ দেখাইয়াছেন এবং ইহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ বিভক্ত হইলেও উভয় রাষ্ট্রের জনগণের মঙ্গল পরস্পরের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।

পুস্তকে উদ্ধৃত পুরাতন পরিসংখ্যান এবং তৎসংক্রান্ত মতামতগুলি সাম্প্রতিক তথ্যাদির সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে খাপ খায় না। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা সংশোধিত হইবে।

আমরা এইরূপ সদ্‌গ্রন্থের বিপুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মুদ্রাকর ও প্রকাশক নিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৮শ ভাগ ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি

লিখিবার সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা। সেই সঙ্গে নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নামধামও পাওয়া গেল এবং জানা গেল যে, পুরাতন সমিতির চার জন "ঝাঁঝালো সদস্য" বাদ পড়িয়াছেন। কার্য্যতঃ পরিবর্ত্তন কতটা বাস্তব ও কতটা লোকদেখানো, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াই গেল একথা বলা প্রয়োজন। কেননা, বর্ত্তমানে এই প্রদেশের কংগ্রেসের সুনামের অভাব খুবই বেশী, যেটা বিশেষ চিন্তার কারণ। কংগ্রেস একদিন ছিল দেশবাসীর সকল বিষয়ে শেষ ভরসার স্থল, আজ সে ভরসা তাহার উপর কাহারও নাই—অন্ততঃ খুব অল্প সংলোকের আছে।

শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার সততার ও নির্লোভপরায়ণতার খ্যাতি আছে। গত বৎসরের নির্ব্বাচনে তিনি সরিয়া দাঁড়াইয়া, সরকারী অধিকারীর পদগ্রহণে কোন স্পৃহা না দেখাইয়া, সেই খ্যাতি আরও স্পষ্ট করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার এই সভাপতিত্ব গ্রহণে আমরা এক দিকে আনন্দিত অন্য দিকে চিন্তিত। আনন্দিত এই জন্য যে, বহুদিন পরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্বে একজন নিস্পৃহ ও সততাপূর্ণ খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইলেন। চিন্তিত এই কারণে যে, এই শঠতার যুগে বহু সজ্জন ব্যক্তি দৃঢ়তার অভাবে ও বিচারবুদ্ধির স্বল্পতায় ধূর্ত্ত চক্রান্তকারীদের ক্রীড়াকন্দুক হইয়া সুনাম খোয়াইয়াছেন। যে ভাবে চতুর্দ্দিকে শিখণ্ডীর দলের আড়ালে চৌরমণ্ডলী নিজের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতেছে তাহা দেশবাসী হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে।

নিখিল ভারতের কংগ্রেস সভাপতি এখন যিনি, তাঁহারও সততা এবং ত্যাগের খ্যাতি সুবিদিত। সেই খ্যাতি এখনও ম্লান হয় নাই, কিন্তু তাঁহার বিচারবুদ্ধি বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সম্বন্ধে কোনও আস্থা আমাদের আর নাই। শাসনতন্ত্রের অধিকারিবর্গ যাহাই বলিবেন তাহাতেই সায় দেওয়া, তাঁহাদের ত্রুটিবিচ্যুতি, দুর্নীতি, সকলকিছুরই বিষয়ে চক্ষু বুজিয়া থাকা, এই কি কংগ্রেস সভাপতির বুদ্ধি-বিবেচনা ও চরিত্রের ক্ষমতার পরিচায়ক, না তাঁহার সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক? দেশে অনাচারের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, দেশের উচ্চতম অধিকারী যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যেও দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সমানে চলিতেছে, অথচ দেশের সর্ব্বোচ্চ ন্যায় প্রতিষ্ঠানের উচ্চতম অধিনায়ক নির্ব্বাক-নিস্পন্দ! ইহা কি গান্ধীবাদ না সুবিধাবাদ?

শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা যদি কর্ম্মঠ ও সৎ সহকারীবৃন্দ বাছিয়া লইতে পারিতেন, যদি প্রকৃতরূপে প্রাদেশিক কংগ্রেসকে শক্তিশালী ধর্ম্মাধিকরণে পরিণত করিতে পারিতেন তবেই তাঁহার এই পদগ্রহণ সার্থক হইত। নহিলে এই পিচ্ছিল ও দুর্গন্ধপূর্ণ মহাপঙ্কে ঝাপাইয়া পড়ার আর কি সার্থকতা তিনি খুঁজিয়া পাইলেন?

অবশ্য একথা সত্য যে, তাঁহার সদিচ্ছা যদি থাকে তবে কংগ্রেসের উন্নয়ন ও শোধন করিবার চেষ্টা করায় কোনই দোষ নাই। সে প্রয়াস যদি প্রকাশ্য ও স্পষ্ট হয় তবে তাহা নিষ্ফল হইলেও দোষ নাই। তবে সে প্রয়াস সক্রিয় হওয়া চাই-ই, তাহা মনের আড়ালে থাকিলে চলিবে না।

ভারতের রাজনীতি তথা অর্থনীতি

ভারতীয় অর্থনীতি যে বর্ত্তমানে আশানুরূপ প্রগতির পথে যাইতেছে না, তাহা সর্ব্বজনস্বীকৃত। ইহার কারণ অবশ্য বহু আছে, তন্মধ্যে প্রধান একটি কারণ হইতেছে সর্ব্বভারতীয় নেতাদের আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী যাহা জাতীয় প্রগতির পরিপন্থী। চীন ও রাশিয়ার সামগ্রিক জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা প্রণোদিত, সুতরাং ঐ সকল দেশে জনসাধারণ জাতীয় স্বার্থের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সজাগ ও সচেষ্ট। পণ্ডিত নেহরু ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বভারতীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী আঞ্চলিক স্বার্থচিন্তার দ্বারা সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ। হিন্দী প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টার মধ্যে রাজ্যপুনর্গঠন বিষয়ে বাংলাকে তাহার যথোচিত অংশ না দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার আর একটি বড় নজীর সম্প্রতি দেখা যায় ফরাক্কা বাঁধ ব্যাপারে।

কলিকাতার অর্থনৈতিক ভাগ্যের সহিত বাঙালীর অর্থনৈতিক ভাগ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং কলিকাতার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করে কলিকাতা বন্দরের ভবিষ্যতের উপর। কলিকাতা শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও বর্ত্তমানে ভারতের বৃহত্তম বন্দর এবং ভাগীরথীর দুই কূলে যে অসংখ্য শিল্প-সমৃদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে ভাগীরথীর বহনশীলতার উপর। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত গঙ্গার সমস্ত জলপ্রবাহ কলিকাতার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। ইহার পর হইতে গঙ্গার অধিকাংশ জলধারা মুর্শিদাবাদের নিকট হইতে পদ্মা দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গ বর্ত্তমানে শস্যশ্যামলা, আর পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষতঃ কলিকাতা বন্দর শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমানে ভাগীরথীতে এত চড়া পড়িতেছে যে, বৃহদাকার জাহাজগুলি আর কলিকাতা বন্দরে ভিড়িতে পারে না; শুধু তাহাই নহে, নিম্নস্থ স্রোতধারা ক্ষীণপ্রায় হওয়ার ফলে সামুদ্রিক জল জোয়ারের প্রবাহে অধিকতর পরিমাণে ভাগীরথীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে ভাগীরথীর জলের লবণময়তা অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, নিম্নস্থ স্রোতধারা হ্রাস পাওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ব-দ্বীপ এলাকাগুলিতে দ্রুত এবং ব্যাপকতর হারে ভূমিক্ষয় হইয়া যাইতেছে। এক কথায় বলা যায়, কলিকাতার শিল্প-সমৃদ্ধি আছে বলিয়াই বাঙালী জাতি একপ্রকারে বাঁচিয়া আছে। সুতরাং ভাগীরথীকে পুনর্জীবিত করার অর্থই হইতেছে বাংলা তথা বাঙালীর অর্থনীতিকে বহুলাংশে পুনর্জীবিত করা। কিন্তু বাংলার মাছের মত বাঙালীর অর্থনৈতিক সমস্যাও সর্ব্বভারতীয় নেতাদের নিকট পরিত্যাজ্য বিষয়বস্তুর সামিল হইয়া উঠিয়াছে। তাই এহেন সমস্যাসঙ্কুল ভাগীরথীর সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা আশ্চর্য্যের উদ্রেক না করিয়া পারে না।

ফরাক্কায় যে ব্যারেজ কিংবা বাঁধ দরকার, ভাগীরথীর জলপ্রবাহকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাহা বহুপূর্ব্ব হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে; বিখ্যাত ইংরেজ পূর্ত্তবিদ উইলকক্স সাহেব ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ছোট বড়, নাম জানা-অজানা, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কতপ্রকার নদী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং নিত্যই গৃহীত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ফরাক্কা বাঁধ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ নিরুদ্বেগ ভাবে উদাসীন। কয়েকদিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল; সরকারী তরফের মুখপাত্র কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারেন নাই যে, ফরাক্কা বাঁধ কেন কার্য্যকরী করা হইতেছে না।

দামোদর পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ ও জাতীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করা হইয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা—যাহা বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ করা উচিত ছিল তাহা আজ পর্য্যন্ত সুরু করা হয় নাই, সুতরাং এখন মনে হয় যে, যেহেতু ইহা নিছক বাঙালীর সমস্যা সেইহেতু কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিয়াছেন। পাকিস্থানের আপত্তির কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নাঙ্গাল পরিকল্পনা এবং সিন্ধুনদের অন্যান্য পরিকল্পনাতে পাকিস্থান আপত্তি করিয়াছিল এবং করিতেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহাতে বিচলিত হয় নাই। আসল কথা, ফরাক্কা বাঁধ যদিও অবশ্যপ্রয়োজনীয়, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে কেন এখনও সুরু করা হয় নাই, তাহার কোনও কারণ দেখাইতে পারেন নাই। ইহা শুধু একটি মাত্র উদাহরণ যে, বাঙ্গালীর স্বার্থ কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক কিভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়। অন্যান্য উদাহরণেরও অভাব হইবে না, দ্বিতীয় জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা কলিকাতায় স্থাপন না করিয়া কোচিনে স্থাপন করা অযৌক্তিক হইয়াছে। কলিকাতার ড্রাই ডক্ এখনও ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম। তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও একই মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতা বন্দর এলাকার সুবিধাকে উপেক্ষা করিয়া ব্যারাওনীতে তৈল পরিশোধনাগার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত দ্বারা স্পষ্টতঃই বাংলার দাবী তথা জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করা হইয়াছে।

বাংলার তরফে যে কোনও দোষ নাই সে কথাও বলা চলে না। বাংলা দেশে কথায় কথায় এত ধর্ম্মঘট হয় যে, তাহাতে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়। বাংলার বাহিরে সাধারণ লোকে রাজনীতি লইয়া খুব বেশী মাথা ঘামায় না। বর্ত্তমানে নূতন শিল্পের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বোম্বাই, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে। শ্রমিক ধর্ম্মঘট প্রভৃতির জন্য বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে শিল্পপতিরা সহজে রাজী হয় না। ধর্ম্মঘটীদের হাত হইতে এড়াইবার জন্য বাংলাদেশের কয়েকটি শিল্পকে সম্প্রতি বিহারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই সকল কারণে বাংলা দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রথমতঃ, শিল্পবৃদ্ধি দ্রুতহারে হইতেছে না এবং দ্বিতীয়তঃ, চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙালী হইতে অবাঙালীর চাহিদাই বেশী, কারণ অবাঙালীদের মধ্যে ধর্ম্মঘট করার

হুজুগ কম এবং আর একটি কারণ এই যে, অবাঙালীদের নিকট হইতে অধিকতর কাজ আদায় করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব অনেকখানি আছে, যে কারণে ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা-ধারায় ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় বাংলার দাবি উপেক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন আরও দৃঢ়তার এবং আত্মনির্ভরশীলতার। কথায় কথায় দিল্লীর দরবারে তাঁহাদের ধন্না দিতে হয় বলিয়া অন্য বিষয়ে দৃঢ়তা দেখাইতে পারেন না।

বস্ত্রশিল্পে সঙ্কট

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়াছে এবং ইহার প্রধান কারণ চাহিদার অভাব। ভারতবর্ষে বর্তমানে ৪৭০টি কাপড়ের কল আছে, ইহাদের মধ্যে তাঁতের সংখ্যা কুড়ি লক্ষের কিছু অধিক। এই শিল্পের দীর্ঘকালীন মূলধনের পরিমাণ হইতেছে ১১৫৲ কোটি টাকা এবং প্রায় আট লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে নিয়োজিত আছে। ১৯৫৭ সনে বস্ত্রশিল্পের মিলগুলিতে ৫৩১ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রায় ১১০ কোটি গজ বস্ত্র ভারতবর্ষ বিদেশে রপ্তানী করে। কিন্তু রপ্তানীর বাজারে সম্প্রতি খুব মন্দা দেখা দিয়াছে এবং এই বৎসর অনুমিত হইতেছে যে, ৮৩ কোটি গজের অধিক বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইবে না। এই কারণে ১৯৫৮ সনে বস্ত্র উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে এবং ৪৯০ কোটি গজের অধিক হইবে না বলিয়া ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯৫৭ সনের তুলনায় ১৯৫৮ সনে বস্ত্র উৎপাদন প্রায় ৮ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতবর্ষের মিলবস্ত্রের প্রধান রপ্তানীর বাজার ছিল প্রাচ্যের দেশগুলি, যথা, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয় এবং সিঙ্গাপুর। বর্তমানে চীন ও জাপান রপ্তানীক্ষেত্রে এই সকল দেশে ভারতবর্ষের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের উৎপাদন খরচ কম, সুতরাং মূল্য কম, সেই কারণে অধিক মূল্যে ভারতীয় বস্ত্র আমদানী তাহারা হ্রাস করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর বস্ত্র রপ্তানী ব্যবসায়ে ভারতবর্ষের অবদান হইতেছে ১৭·৩ শতাংশ। ভারতবর্ষের বস্ত্র রপ্তানীর মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ হইতেছে মোটা এবং মাঝারি বস্ত্র। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুসারে ধরা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষে বৎসরে গড়পড়তায় মাথাপিছু সাড়ে আঠার গজ করিয়া বস্ত্র ব্যবহার করা হইবে এবং ইহাতে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু গত গ্রীষ্মকালে বস্ত্রশিল্পের উপরে যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল (যোশী কমিটি), তাহাদের অভিমতে ভারতে মাথাপিছু কাপড়ের ব্যবহার বৎসরে সাড়ে সতের গজের অধিক হইবে না। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ভারতবর্ষে প্রায় ৫ লক্ষ ৯২ হাজার গাঁইট বস্ত্র উদ্বৃত্ত ছিল এবং বিক্রীর অভাবে মিলগুলি বর্তমানে বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। বৈদেশিক চাহিদার হ্রাস এবং আভ্যন্তরিক চাহিদা বৃদ্ধি না পাওয়াতে এই সঙ্কট দেখা দিয়াছে।

সমবায় কৃষি

ভারতে ভূমিব্যবস্থার পুনর্গঠন এখনও সম্পন্ন হয় নাই, কেবল-মাত্র প্রথম ধাপ, অর্থাৎ জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। রাশিয়ায় ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিতে বিপ্লবের পর প্রায় কুড়ি বৎসর লাগিয়াছিল। ভারতে ভূমি-নীতি এখনও সুসংবদ্ধ হইয়া উঠে নাই, এবং সেই কারণে ভূমির বণ্টন ব্যবস্থারও সংস্কার সাধিত হয় নাই। এতদিন পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে, জমির খণ্ডী-করণই ভারতে ভূমিব্যবস্থার প্রধান সমস্যা, কিন্তু বর্তমানে ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৃহত্তর কৃষিক্ষেত্রও হয় ত অন্যদিক হইতে সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা এত অত্যধিক যে, যদি সমস্ত জমিকে জাতীয়করণ করা হয়, তথাপি সকল চাষী প্রয়োজনীয় জমি পাইবে না।

সম্প্রতি হায়দরাবাদে সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে-অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণের হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়ার দাবী উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রশ্নটি এত সমস্যাসঙ্কুল যে, সরাসরি কোনও সমাধানে উপস্থিত না হইয়া এই বিষয়টিকে একটি কমিটির উপর ভার দেওয়া হইয়াছে তাহাদের অনুমোদনের জন্য। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক আদর্শের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার জন্য কংগ্রেস ব্যক্তিগত কৃষিব্যবস্থার পরিবর্ত্তে সমবায় কৃষিপ্রথার সমর্থক ছিল। আদর্শের দিক হইতে ইহা বাঞ্ছনীয় হইলেও বাস্তবের দিক হইতে ইহাকে কার্য্যকরী করিবার পথে দুইটি বাধা দেখা দেয়, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থাকে আদৌ কার্য্যকরী করা যাইবে কি না, এবং দ্বিতীয়তঃ কার্য্যকরী করিলেও ইহা উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হইবে কিনা। জাপানে ব্যক্তিগত কৃষিব্যবস্থা অধিকতর সফল হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতেও অধিকতর ফসল ফলিতেছে—এই সকল তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার পর হইতে কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ জাগিয়াছে যে, বৃহদায়তন জমি ও সমবায় প্রথাই বর্তমান অব্যবস্থার একমাত্র সমাধান কিনা।

এই বিষয়ে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দুইটি প্রধান উপায় আছে। প্রথমতঃ জমিদারী প্রথায় উন্নততর উপায়ে বৃহদায়তন জমির চাষ, দ্বিতীয়, সমবায় ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রায়তী জমির চাষ। প্রথমোক্ত ব্যবস্থা বর্তমানে অচল, কারণ ইহাতে চাষীরা নিপীড়িত হয়। তাই পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, ভারতে সমবায়ের ব্যবস্থার ভিত্তিতে ছোট ছোট রায়তী জমির চাষ দেশের খাদ্যশস্যের সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে।

সমবায় প্রথায় চাষের যে অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষ সঞ্চয় করিয়াছে তাহা আদৌ আশাপ্রদ নহে। সম্প্রতি পঞ্জাব সরকার এই বিষয়ে একটি অনুসন্ধান পরিচালনা করিয়াছেন। এই রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, পঞ্জাবে সমবায় কৃষিসমিতির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হইতেছে মিথ্যা, অর্থাৎ কেবলমাত্র কাগজে কলমে রেজেষ্ট্রী করা

আছে, কিন্তু বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নাই। ৬৭০টি সমবায় সমিতি সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ হইতেছে ঘরোয়া ব্যাপার, একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা জমি যাহাতে পরিবারের বাহিরে না চলিয়া যায় তাহার জন্য সমবায় সমিতি সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রাম্য লোকেদের ধারণা হইয়াছে যে, সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমাজ ও করদাতার খরচায় ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি লাভ করা হয়। পঞ্জাবের সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমবায় কৃষি আদর্শকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে।

রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনকে সমবায় কৃষিব্যবস্থা সফল করিবার জন্য বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল। সুতরাং ভারতবর্ষে যে রাতারাতি কিছু সুরাহা হইবে তাহা মনে হয় না। পশ্চিম বাংলায় ভূমি সংশোধনী আইনে পারিবারিক সমবায় গঠন করিবার ব্যবস্থা আছে এবং তাহার ফলে পশ্চিম বাংলায় বহু সমবায় কৃষিসমিতি সম্পূর্ণরূপে ভুয়া। সমবায় প্রথার গঠন দ্বারা বহু প্রকার আইনকে আজ ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে।

বেকার-সমস্যা

সর্ব্বশেষ সরকারী পরিসংখ্যান হইতে ভারতে কর্ম্মহীনতার যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা বিশেষ উদ্বেগজনক। প্রকাশ যে, ভারতের ২০৪টি কর্ম্মবিনিময়-কেন্দ্রে যে সকল কর্ম্মপ্রার্থীর নাম রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুরুতে ভারতে বেকারের যে সংখ্যা ছিল বর্ত্তমান সংখ্যা তাহা অপেক্ষা তিন লক্ষেরও বেশি। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ভারতে বেকারের সংখ্যা ত কমে নাই-ই উপরন্তু তাহা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কর্ম্মবিনিময়-কেন্দ্রে বেকারের সংখ্যাকে যদি দেশে মোট বেকার-সংখ্যা বলিয়া মনে করা হয় তবে মস্ত ভুল হইবে। বেকারের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি। পরীক্ষামূলক সার্ভে (sample survey) হইতে দেখা গিয়াছে যে, বেকারের সংখ্যা কর্ম্মবিনিময়-কেন্দ্রে রেজেষ্ট্রীকৃত সংখ্যার চার গুণেরও বেশী হয়। এই হিসাবে বর্ত্তমানে কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৫০ লক্ষের কম হইবে না। এই কর্ম্মপ্রার্থীদের একটি বিরাট অংশ রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বৎসরে আনুমানিক কুড়ি লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান করা যাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য সংশোধন করিয়া বলা হয় যে, হয়ত পাঁচ বৎসরে ৮০ লক্ষ অপেক্ষা বেশী-সংখ্যক কর্ম্মসৃষ্টি সম্ভব হইবে না। এই হিসাব অনুযায়ীও পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে অন্ততঃ ৫০ লক্ষ লোকের কর্ম্মসংস্থান হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু দেখা যাইতেছে কার্য্যতঃ ২৫ লক্ষ লোকের মত মাত্র কর্ম্মসংস্থান হইতে পারে। এই হারে চলিতে থাকিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতে বেকারের সংখ্যা যে বিপুল আকার ধারণ করিবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে হইলে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গেলেও বেকারসংখ্যা হ্রাস পায় নাই—উপরন্তু উত্তরোত্তর তাহা বৃদ্ধির পথেই চলিয়াছিল। ১৯৫১ সনের মার্চ্চ মাসে কর্ম্মবিনিময়-কেন্দ্রগুলিতে রেজেষ্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার; তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বর মাসে দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ২২ হাজার। এই সংখ্যা ১৯৫৫ সনের ডিসেম্বর মাসে দাঁড়ায় ৬ লক্ষ ৯২ হাজার। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব মতই প্রথম পরিকল্পনার শেষে ভারতে বেকারের সংখ্যা ছিল ৬৩ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে যন্ত্রশিল্পের বিস্তার ঘটিয়াছে, কিন্তু তথাপি শিল্পকর্ম্মে দক্ষ কর্ম্মীদের সকলের জন্য কর্ম্মসংস্থান সম্ভব হয় নাই। ফলে কারিগরী শিক্ষাসমন্বিত বহুলোক বেকার রহিয়াছেন। অনুরূপ ভাবে শিক্ষিত বেকারসংখ্যাও হ্রাস পায় নাই।

ভিভিয়ান বসু কমিটির রিপোর্ট

ভারতীয় জীবনবীমা কর্পোরেশনের অর্থলগ্নীর ব্যাপারে কর্পোরেশন ও ভারত সরকারের অর্থ-দপ্তরের কয়েকজন কর্ম্মচারীর আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ভিভিয়ান বসুকে লইয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল সেই কমিটির রিপোর্ট কিছুদিন পূর্ব্বে সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রিপোর্টটি প্রায় দুই মাসেরও অধিককাল পূর্ব্বে সরকারের নিকট পেশ করা হয় কিন্তু এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে এই রিপোর্টটির সম্পর্কে কোনই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। স্বভাবতঃই এ সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে এবং দিল্লীর কোন কোন সংবাদপত্রে রিপোর্টের বক্তব্য সম্পর্কেও কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি সরকার গোপনীয় দলিলরূপে রাখিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ সাধারণ্যে প্রকাশিত হওয়ায় সরকার বিচলিত হইয়াছেন এবং এ সম্পর্কে শাস্তিবিধানের জন্য চিন্তা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীহরিদাস মুন্দ্রার কারবারে জীবনবীমা কর্পোরেশনের অর্থলগ্নী লইয়া জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিচারপতি চাগলাকে লইয়া গঠিত কমিশনের সম্মুখে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্যে সরকারী নীতি ও কর্ম্মচারীদের আচরণ সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জনচিত্তকে আলোড়িত করিতে থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের দায়িত্ব কতখানি ছিল তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্যই ভিভিয়ান বসু কমিশন গঠন করা হয়। অথচ কমিশনের রিপোর্টটি পেশ হইবার দুই মাসের মধ্যেও সে সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলেন না সে সম্পর্কে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে। এই বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক এবং সরকারের দিক হইতেও কর্ত্তব্য ছিল যথাসম্ভব অবিলম্বে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সকলকে জানাইয়া দেওয়া। সরকারের পক্ষ হইতে এই কর্ত্তব্য যথাযথ পালিত না হওয়ায় দরুণই সরকারী গোপনীয়তা বানচাল হইয়াছে।

সরকারী কার্য্যে সাময়িক গোপনীয়তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার "গোপনীয়" বলিয়া ধামাচাপা দিবেন এ ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতি হইতে জনসাধারণ বহু তথ্য জানিবার সুযোগ পায়, তাহাদের জ্ঞান ও নাগরিক চেতনার স্তর উন্নত হয়। জনশিক্ষার অঙ্গ হিসাবেও সেহেতু সকল প্রশাসনিক রিপোর্টই উপযুক্ত কালব্যবধানে প্রকাশ করা উচিত। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ভিভিয়ান বসু কমিটির রিপোর্টের সারাংশ প্রকাশে কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না এবং সেজন্য শাস্তিবিধানেরও প্রশ্ন উঠে না।

সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীপন্থ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলকে জানাইয়াছেন যে, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকার রিপোর্টটি পার্লামেন্টের সম্মুখে পেশ করিবেন। শ্রীপ্যাটেল ও শ্রীকামাথ সম্পর্কে সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ও শ্রীবৈদ্যনাথন সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন জীবনবীমা কর্পোরেশন।

পুলিস ও মুন্দ্রা

শ্রীহরিদাস মুন্দ্রাকে লইয়া সম্প্রতি এক রহস্যোপন্যাস সৃষ্টি হইতে যাইতেছিল। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমুন্দ্রা নির্দিষ্ট দিনে লক্ষ্ণৌ কোর্টে হাজিরা না দেওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার বিরুদ্ধে জামীনযোগ্য নহে এমন ওয়ারেণ্ট জারী করিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থিত ভারত সরকারের স্পেশাল পুলিস এষ্টাব্লিশমেন্টের নিকট ঐ ওয়ারেণ্ট জারীর জন্য পাঠান হয়, কিন্তু অতি আশ্চর্য্যের বিষয় পুলিস দুই দিন যাবত খোঁজ করিয়াও শ্রীমুন্দ্রাকে বাহির করিতে অসমর্থ হয়। দুই দিন পরে শ্রীমুন্দ্রা এক চিঠি দ্বারা স্বয়ং পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীমুন্দ্রার ন্যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলার সহিত জড়িত ব্যক্তি কিরূপে পুলিসের সতর্ক চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

বানারস বিশ্ববিদ্যালয়

বানারস বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খুলিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে। সরকার এই আন্দোলনের বিরোধিতা করিলেও মনে হয় তাঁহারাও অধিক কাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে অবহিত হইতেছেন। বানারস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাভার বর্ত্তমানে যাঁহাদের উপর রহিয়াছে তাঁহারা সকলেই ভারতের বিশিষ্ট নাগরিক—তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বল সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিবার যে সিদ্ধান্ত তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন আশা করি যথোচিত বিবেচনার পরই তাঁহারা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই এ বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, মুষ্টিমেয় অপরিণামদর্শী বালকের অবিমৃষ্যকারিতার দরুন বৃহত্তর ছাত্রসমাজকে শাস্তি দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইতেছে কিনা। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই বিশ্বাস করিবেন না যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই শিক্ষালাভে বিমুখ হইয়া বিশৃঙ্খলার দিকে ঝুঁকিয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা হইতে পারে না। অথচ যদি কখনও দেখা যায় যে কার্য্যতঃ ছাত্রসমাজের বৃহত্তর অংশই বিশৃঙ্খলার অংশীদার তখন বুঝিতে হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ গলদ রহিয়া গিয়াছে। শিক্ষাকামী পরিচালকবৃন্দের সেক্ষেত্রে কর্ত্তব্য হইল সেই প্রশাসনিক দুর্ব্বলতার সংশোধনসাধন করা। দেশের সকল শিক্ষাকামী ব্যক্তিই আশা করেন যে, অবিলম্বেই বানারস বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় পঠন-পাঠন আরম্ভ হইবে।

রেডিও লাইসেন্স

ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ রেডিও লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে কতকগুলি নূতন বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। সরকারের নূতন সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়া এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, লাইসেন্স প্রদান ব্যবস্থার জটিলতা দূর করিবার জন্যই মুখ্যতঃ নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যদি নূতন সরকারী বিধানে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইত তবে কিছুই বলিবার থাকিত না। রেডিও লাইসেন্স গ্রহণের জন্য এতদিন পর্য্যন্ত যে ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত তাহা বিশেষ জটিল—ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে যে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখিত, প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল তাহারই প্রতিফলন, মুখ্যতঃ রেডিও মারফত বৈদেশিক খবরাখবর যাহাতে ভারতবাসী না পাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই বিধিগুলি প্রণীত হইয়াছিল। বহুদিন যাবতই এই সকল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু সরকারের নূতন ব্যবস্থাগুলি দেখিয়া সকলেই হতাশ হইয়াছেন।

সরকার এতদিন পর্য্যন্ত নীতিগতভাবে বেতারের প্রসারের যে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, নূতন ব্যবস্থায় তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। মন্ত্রীবর শ্রী কেশকারের পূর্ব্ব ঘোষণা সত্ত্বেও বেতার লাইসেন্স ফি কমান হয় নাই, উপরন্তু উপায়ান্তরে তাহা বাড়ানোই হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত এক বাড়ীতে একটি লাইসেন্সের বলেই যে কোনসংখ্যক বেতার গ্রাহক যন্ত্র রাখা যাইত। নূতন নিয়মে বলা হইয়াছে যে, অতঃপর প্রতিটি গ্রাহক যন্ত্রের জন্য স্বতন্ত্র লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। লাইসেন্সের বর্ত্তমান মূল্য বার্ষিক পনর টাকা—ফলে যে সকল পরিবার এতদিন একটি লাইসেন্স বলে একাধিক সেট রাখিয়াছিলেন হয়ত তাহাদিগকে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ সেটটির জন্য স্বতন্ত্র লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে আর না হয় তাহাদিগকে সেগুলি বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে বেতার ব্যবহারের সঙ্কোচন ঘটিবে—ফলে, উদীয়মান বেতার-শিল্প বিশেষভাবেই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য যদি সরকার লাইসেন্সের ফি কমাইয়া দিতেন তবে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বেতারের ব্যবহার অনেক বেশি বৃদ্ধি

পাইত। ফলে শিল্প অথবা সরকারী রাজস্ব কোনটিরই ক্ষতি হইত না। বেতার গ্রাহক যন্ত্র ক্রয়ের জন্য যে মূল্য দিতে হয় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে এককালীন সে অর্থ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। যদিও বা বহু আয়াস স্বীকার করিয়া কেহ তাহা ক্রয় করিতে পারেন, অনেকেই লাইসেন্সের বোঝা বহন করিতে পারেন না। সরকারী ব্যবস্থায় বেতার ক্রমশঃই মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাসিতার বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

বোরিস প্যাস্তারনক ও সোভিয়েট কম্যুনিজম

বোরিস প্যাস্তারনক একজন সোভিয়েট (রুশ) কবি। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত শিল্পী। বোরিস প্যাস্তারনক ইংরেজী ভাষা হইতে সেক্সপীয়রের রচনাবলী রুশ ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচুর খ্যাতি এবং অর্থ উপার্জ্জন করেন। প্যাস্তারনক সর্ব্বোপরি একজন মহান শিল্পী এবং মহান শিল্পীর প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি কখনও নিজের বুদ্ধি ও বিশ্বাস বিরোধী কোন কাজ করেন নাই। তাই অসাধারণ কবিত্ব-প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রায় ১৮ বৎসর যাবৎ কোন কবিতা প্রকাশ করেন নাই—কারণ ষ্টালিনের রাশিয়ায় তখন কোন লেখকের পক্ষেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী সাহিত্যসৃষ্টির স্বাধীনতা ছিল না—বিশেষতঃ যদি সেই স্বাধীনতার সহিত কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্দ্দেশের সজ্ঘর্ষ ঘটিত। কবি প্যাস্তারনক তাই সেক্সপীয়রের মহান্ গ্রন্থরাজির অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন।

পরবর্ত্তী ঘটনাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্যাস্তারনক ষ্টালিন-যুগে লেখা প্রকাশ না করিলেও লেখা বন্ধ করেন নাই। দীর্ঘ বারো বৎসর যাবৎ সোভিয়েট রাষ্ট্রের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এক বৃহৎ উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই উপন্যাসটির নাম "ডঃ ঝিভাগো" ("ঝিভাগো" অর্থ "জীবন")। সোভিয়েট বিপ্লব একজন রুশ ডাক্তারের জীবনে কি পরিবর্ত্তন আনিয়াছিল পুস্তকটিতে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া প্রথমে অনেক সোভিয়েট লেখকই উহাকে বিশেষ প্রশংসা করেন। এই সময় একজন ইটালীয় কম্যুনিষ্ট প্রকাশক—ফেলট্রিনেল্লী—মস্কো হইতে পুস্তকটির বহির্ব্বিশ্বে প্রচারের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়া আসেন। ফেলট্রিনেল্লী ইটালীয় ভাষায় পুস্তকটি প্রকাশের আয়োজন প্রায় যখন সম্পন্ন করিয়া আনিয়াছেন এমন সময় সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতে প্যাস্তারনকের উপর বইটির পাণ্ডুলিপিটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য নির্দ্দেশ আসে। সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্যাস্তারনক উহা ফেরত চাহিয়া পাঠান কিন্তু ফেলট্রিনেল্লী উহা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন; তিনি বলেন, এমন একটি মহান্ রচনাকে প্রকাশ না করিলে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে অন্যায় করা হইবে।

এইভাবে "ডঃ ঝিভাগো" উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে—১৯৫৭ সনের শেষাশেষি। শীঘ্রই পাশ্চাত্ত্য পাঠকদের নিকট পুস্তকটি প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং উহা একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়। বর্ত্তমান বৎসরে সুইডিশ অ্যাকাডেমি পুস্তকটির জন্য প্যাস্তারনককে ১৯৫৮ সনের জন্য সাহিত্যবিষয়ক নোবেল পুরস্কার-দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। "ডঃ ঝিভাগো" পুস্তকটির প্রকাশের ইতিহাস স্মরণ রাখিলে পুস্তকটির এইরূপ সম্মানদানে সোভিয়েট রাশিয়ার ক্ষোভ অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হইবার কথা নয়; পুরস্কারদাতারাও নিশ্চয় সোভিয়েটের সমালোচনার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সোভিয়েট সরকার এবং পার্টি যে আচরণ করিয়াছে ঘোরতর সোভিয়েটবিরোধী বা সোভিয়েটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুগণও তাহা প্রত্যাশা করে নাই। সুইডিশ অ্যাকাডেমিকে নিন্দাবাদ করায় সেহেতু কেহই আশ্চর্য্য হন নাই—হয়ত এই সমালোচনা বহুলাংশে প্রযোজ্য। কিন্তু প্যাস্তারনকের প্রতি যে আচরণ তাঁহারা করিয়াছেন তাহা যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনি দুঃখজনক। যদিও পুস্তক প্রকাশ বা নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় প্যাস্তারনকের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না তবু তাহাকেই সেজন্য দায়ী করিয়া তাঁহাকে লেখক ইউনিয়ন হইতে বহিষ্কৃত করা হয় এবং তাঁহার "সোভিয়েট লেখক" খেতাব কাড়িয়া লওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের সাদা অর্থ হইল এই যে, অতঃপর সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন প্রকাশভবন বা পত্রিকা প্যাস্তারনকের লেখা প্রকাশ করিবেন না বা কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা প্রকাশ্যে তাঁহার পুস্তক ক্রয়-বিক্রয়ে সাহসী হইবেন না। তদুপরি প্যাস্তারনককে সোভিয়েট দেশ হইতে নির্ব্বাসনের জন্যও চেষ্টা চলিতে থাকে। পত্রপত্রিকায় প্যাস্তারনকের উদ্দেশ্যে অতি নিম্নস্তরের ভাষায় আলোচনা করা হইতে থাকে। বাধ্য হইয়া প্যাস্তারনক অবশেষে নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হন—যদিও প্রথমে তিনি উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্যাস্তারনক নানারূপ অপমান এবং প্ররোচনা সত্ত্বেও মহান্ বীরের ন্যায় স্বদেশত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। স্বদেশে তাঁহার কোন সম্মান নাই, হয়ত দৈনন্দিন জীবনেও তাঁহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তথাপি দেশপ্রেমিক প্যাস্তারনক স্বদেশত্যাগে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার এই বীরোচিত স্বদেশপ্রেম সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির সাহিত্যিক ডিক্টেটরদের গালে চড় পড়িয়াছে। সেহেতু বহির্বিশ্বের কোন কমিউনিষ্ট পার্টি এবিষয়ে কোন প্রকাশ্য মন্তব্য করেন নাই।

প্যাস্তারনক সাহিত্যিক, তিনি আজীবন সোভিয়েটের সমর্থক; তাঁহার পিতামাতা সোভিয়েট ইউনিয়ন ত্যাগ করিয়া গেলেও তিনি তাঁহাদের সঙ্গে যান নাই। তাঁহার সাহিত্যিক অবদানে সোভিয়েট সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু রুশ সমাজতন্ত্রের এমনই মহিমা যে, প্যাস্তারনকের ন্যায় মহান্ শিল্পীরও সেখানে শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা নাই।

ম্যালেনকভের হত্যা

সোভিয়েট পার্টি নেতা ও প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা সার্গিয়েভিচ

ক্রুশ্চেভ খাঁটি ষ্টালিনীয় পদ্ধতিতে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সহযোগী এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকোলাই বুলগানিনের বিরুদ্ধে পার্টিবিরোধী কাজকর্ম্মের অভিযোগ করিয়াছেন। ষ্টালিন যতবারই সহযোগী-দের হটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন প্রতিবারই তিনি কোন একটি জনকল্যাণমূলক ঘোষণার মুখে তাহা করিয়াছেন যাহাতে জনমত দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। অতীতে দেখা গিয়াছে যে, যখনই ষ্ট্যালিনের কর্ম্মের সমালোচনা করা হইয়াছে তখনই ষ্ট্যালিনের সমর্থকগণ ঐ জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাগুলির উল্লেখ করিয়া এই বলিয়া জনমতকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে যে, বস্তুতঃ জনকল্যাণের জন্যই ষ্ট্যালিন তাঁহার সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে ঐরূপ অপ্রীতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়াছেন। সপ্ত-বার্ষিকী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বুলগানিনের বিরুদ্ধে ক্রুশ্চেভের বিষোদ্গারের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল এই যে, কেহ যেন ক্রুশ্চেভের সমালোচনা করিয়া বলিতে না পারেন যে, বুলগানিন পূর্ব্বে কখনও ক্রুশ্চেভ হইতে স্বতন্ত্রভাবে কোন নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন নাই। স্পষ্টতঃই তাঁহার উদ্দেশ্য অন্ততঃ আংশিক ভাবেও সিদ্ধ হইয়াছে। সোভিয়েট পত্রপত্রিকার কথা বাদ দিলেও বিদেশী পত্রিকাগুলিতেও সপ্তবার্ষিকী পরিকল্পনাই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—বুলগানিন সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয় নাই, যদিও ব্যাপারটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বুলগানিন আজ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাচ্যুত—কি পার্টি, কি সরকার—কোথাও তাঁহার প্রভাব নাই, তথাপি ক্রুশ্চেভ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষোদ্গার করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন—ইহার পিছনে প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য রহিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে তাহা কি বাহিরের লোকের পক্ষে অনুমান করা শক্ত।

বুলগানিনের প্রকাশ্য নিন্দার দুইদিনের মধ্যেই আর একজন সোভিয়েট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মঃ জর্জ্জি ম্যালেনকভের হত্যার কথা ঘোষণা করা হয়। সত্য বটে, সংবাদটি মার্কিন মহল হইতে প্রচারিত এবং সোভিয়েট মহল হইতে ইহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অধিকতর তাৎপর্য্যের বিষয় হইল এই যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে এই সংবাদের কোনরূপ প্রতিবাদ করা হয় নাই। ম্যালেনকভের হত্যার সংবাদ সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহা লইয়া নানারূপ জল্পনাকল্পনাও চলিয়াছে—যাহার ফলে সোভিয়েট সরকারের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সাধারণ ক্ষেত্রে কোন সরকারই নিষ্ক্রিয় ভাবে এইরূপ (অপ)প্রচার চলিতে দিত না। অর্থাৎ ম্যালেনকভের মৃত্যু-সংবাদ যদি সত্য না হইত তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বয়ং ম্যালেনকভকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চিমী সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষা দিতে পারিত। কার্য্যতঃ সোভিয়েট সরকার এক অত্যাশ্চর্য্য নির্লিপ্ততার অন্তরালে রহিয়াছেন যাহাকে কোনক্রমেই স্বাভাবিক বলা চলে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৬ সনে যখন মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভের 'গুপ্ত' ভাষণটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেন তখনও সোভিয়েট ইউনিয়ন অনুরূপ ভাবে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিল। সমগ্র অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় যে ম্যালেনকভ নিহত হইয়াছেন। যদি তাহা হইয়া থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েট ইউনিয়নে আর এক দফা "বিচার" ও বিতাড়নের পালা অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকিবে না।

ম্যালেনকভের মৃত্যু সম্পর্কে "রয়টার" যে সংবাদ দিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ:

নিউইয়র্ক, ১৬ই নভেম্বর—'নিউইয়র্ক সানডে নিউজ' পত্রিকায় আজ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, প্রাক্তন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী জর্জি ম্যালেনকভকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের পরিকল্পনা অনুযায়ী অবাঞ্ছিত বহিষ্কার মামলায় সাক্ষীরূপে সহযোগিতা করিতে অসম্মত হওয়াতেই তাহাকে গুলী করিয়া মারা হয়।

'ওয়াকেফহাল হোয়াইট হল মহলের' সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, মিঃ ক্রুশ্চেভ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিগণ, যথা: ম্যালেনকভ, মলোটভ, জুকভ, কাগা-নোভিচ, সেপিলভ, বুলগানিন প্রভৃতির হাত হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভের জন্যই এই অবাঞ্ছিত বহিষ্কার মামলার ব্যবস্থা করেন।

বহুল-প্রচারিত উক্ত সংবাদপত্রের লণ্ডনের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সহযোগিতা করিতে অসম্মত হওয়ায় জনৈক "বদরাগী" প্রশ্নকর্ত্তা কর্ত্তৃক ম্যালেনকভ গুলীর আঘাতে নিহত হন। উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, মিঃ ম্যালেনকভের এই হত্যাকাণ্ডে মিঃ ক্রুশ্চেভ নাকি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। লণ্ডনের গুপ্তচর বিভাগের রিপোর্টে নাকি ম্যালেনকভের হত্যাকারীকে সিকিউরিটি পুলিসের জনৈক কর্ণেল বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে।

মঃ ষ্টালিনের মৃত্যুর পরে নিযুক্ত সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যালেনকভ সম্পর্কে সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে জানা যায় যে, তিনি পূর্ব্ব কাজাকস্থানে একটি হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশনের ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

'সানডে নিউজ'-এর এক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গুপ্তচর বিভাগের রিপোর্টে নাকি বলা হইয়াছে যে, একটি সুপরিকল্পিত প্রকাশ্য বিচারে মিঃ ম্যালেনকভ নিজের ও প্রাক্তন সহকর্ম্মীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া সম্পর্কে সহযোগিতা করিতে দৃঢ়ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় উক্ত কর্ণেল ক্রোধান্ধ হইয়া পড়েন এবং ধৈর্য্য হারাইয়া ম্যালেনকভকে বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা করিয়া ফেলেন।

এই মৃত্যু সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখার জন্য মিঃ ক্রুশ্চেভ পুরাপুরি সেন্সরের হুকুম দেন কিন্তু একটি অখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং সাময়িক পত্রিকায় শোক-সংবাদটি ছাপা হয় বলিয়া 'সানডে নিউজ'-এর উক্ত রিপোর্টে জানান হইয়াছে।

পাকিস্থানী বর্ব্বরতা

পাকিস্থান সরকার ভারতের সহিত সদ্ভাব রাখিতে চাহে না—যদিও পাকিস্থানী জনসাধারণের অধিকাংশই ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। পাকিস্থানী জনগণের এই মনোভাব সম্পর্কে অবহিত থাকায় জন্যই ভারত সরকার অনেক সময় রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা না করিয়া পাকিস্থানকে সাহায্য করিয়াছে। প্রতিদানে পাকিস্থান সরকার ভারতীয় সীমান্তে হামলা করিয়াছে ও ভারত ও ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছে। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করিবার কোন পন্থাই পাকিস্থান সরকার বাকী রাখে নাই এবং সেজন্য প্রয়োজন হইলে আন্তর্জ্জাতিক আইনের সর্ব্বসম্মত বিধানগুলি পর্য্যন্ত অমান্য করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। তাহারা ভারতীয় হাই কমিশনার ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে নানা ভাবে বিব্রত করিয়াছে। এই সেদিনও করাচীতে অবস্থিত ভারতীয় বিমান পরিবহন সংস্থার আপিসে হানা দিয়া তছনছ করিয়াছে। এ বিষয়ে ভারত সরকার প্রতিবাদ করিলে প্রত্যুত্তরে পূর্ব্বপাকিস্থানে ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্ম্মচারীকে প্রকাশ্য ভাবে লাঞ্ছিত করা হইয়াছে।

এই শেষোক্ত ঘটনাটি বর্ব্বরতার পর্য্যায়ে পড়ে এবং কোন সভ্য দেশে ইতিপূর্ব্বে এরূপ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই! পূর্ব্ব-পাকিস্থানে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনে নিযুক্ত ভারতীয় কর্ম্মচারী শ্রীআয়ার ও তদীয় পত্নী যখন ভারত হইতে পাকিস্থান সীমান্তবর্ত্তী দর্শনা ষ্টেশনে পৌঁছান তখন পাকিস্থান পুলিশের জনৈক জমাদার তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে বেত্রাঘাত করে—স্বামীর এই নির্যাতন দর্শনে অপারগ হইয়া শ্রীমতী আয়ার যখন ক্ষোভে দুঃখে ক্রন্দন করিয়া উঠেন তখন তাহাকেও মুখে চপেটাঘাত করা হয়। এ সম্পর্কে পাকিস্থান সরকার তদন্তের আদেশ দিয়াছেন, তবে সেই তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে কিছু জানা যায় নাই। প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জমাদার তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে, সে শ্রীআয়ারের ইংরেজী বুঝিতে না পারায় ভাবিয়াছিল যে তিনি তাহাকে গালাগালি করিতেছেন। এই উক্তির যৌক্তিকতা বুঝা কঠিন। কেবলমাত্র অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া একজন ভিন্ন রাষ্ট্রীর নিরস্ত্র নাগরিককে কিভাবে প্রহার করিবার ধৃষ্টতা জমাদারটির হইল তাহা জানা প্রয়োজন। ঘটনাস্থলের নিকটেই নিশ্চয় তাহার উপরিওয়ালারা ছিল—যাহাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য ছিল না, সে স্বচ্ছন্দেই তাহাদের কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া সে স্বহস্তেই দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইল। প্রকাশ্য ষ্টেশনে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়—তখন উচ্চতম কর্ম্মচারীরা কোথায় ছিলেন সেটিও একটি প্রশ্ন। উপরন্তু শ্রী আয়ারের প্রহারের পর শ্রীযুক্তা আয়ারের উপর আক্রমণের কি সঙ্গত কারণ ছিল তাহাও জানা প্রয়োজন।

টুকেরগ্রাম

গত আগষ্ট মাস হইতে কাছাড় জেলার অন্তর্গত পল্লী টুকেরগ্রাম পাকিস্থানের জবরদখলে রহিয়াছে। ফলে কাছাড়ে করিমগঞ্জ মহকুমার সহিত আসামের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ বিপন্ন হইয়াছে। পাকিস্থানের উৎপীড়নে কুশিয়ারা নদীর উপর দিয়াও ভারতীয়দের পক্ষে যাতায়াত করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

টুকেরগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এক সম্পাদকীয় আলোচনায় করিমগঞ্জের সাপ্তাহিক 'যুগশক্তি' লিখিতেছেন:

"প্রাচীন গ্রন্থাদি ও দলিলাদিতে টুকেরগ্রাম বা টোকের গ্রাম (টুকর গাঁও) হরিগ্রাম নামে অভিহিত ছিল। উহার পরিমাণ প্রায় এক বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক আট শত। উহার উর্ব্বর ধান্য ক্ষেত্রে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা অধিবাসীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এই বাড়তি ফসল নিকটবর্ত্তী ভাঙ্গাবাজারের লোকের চাহিদা মিটাইত।

"এই গ্রাম পূর্ব্বাবধি কাছাড় জেলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাছাড়ের শেষ নৃপতির নিকট হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড় জেলা ব্রিটিশের দখলাধিকারে আসে; সেই সঙ্গে টুকেরগ্রাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু শ্রীহট্ট জেলা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার অপর-ভূভাগ সহ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক বাংলা দেশের তালুকগুলির চিরস্থায়ী তালুকে পরিণত হয়। শ্রীহট্ট জেলায়ও সেই সময়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।

কিন্তু কাছাড়ের ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কাছাড়ের রাজগণ স্বয়ং উহার শাসন সংরক্ষণ করিতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তনের ৩৭ বৎসর পরে উহা ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার কাছাড়ে শাসনের সুবিধার নিমিত্ত কতিপয় অস্থায়ী তালুকের সৃষ্টি করেন। টুকেরগ্রাম কাছাড় জেলার অবশিষ্টাংশের ন্যায় অস্থায়ী তালুকে বিভক্ত। উহার পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত আমলসিদ গ্রাম। কাছাড়ের রেভিনিউ কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বাবধি টুকেরগ্রামের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে কতকগুলি সীমানায় পাথর গাড়িয়া আমলসিদ গ্রামের দখলা ভূমি হইতে এ গ্রামের এলাকা ভূমিকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই পাথরগুলি এখনও সরজমিনে দৃষ্ট হইতে পারে।

টুকেরগ্রাম কাছাড় জেলার পরগণা হরিনগরের অন্তর্গত। উহার থানা ও রেভিনিউ সার্কেল কাটিগড়া। হরিনগর পরগণার অবশিষ্টাংশ সন্নিকটবর্ত্তী বরাক নদীর উত্তরে ও সুরমা নদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। বহুপূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের সাহায্যে টুকেরগ্রাম হরিনগর পরগণার অপর ভূভাগের সহিত সংলগ্ন ছিল। হরিটিকরের (কাছাড়ের রাজার শেষ রাজধানী) রাজা সুরমা ও বরাক দিয়া নৌকা চলাচলের পথ সুগম করার নিমিত্ত উহা কাটাইয়া দেন। এই স্থানকে এখনও স্থানীয় লোক 'কাটা গাঙ্গ' বলিয়া থাকে। উহাতে টুকেরগ্রামের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে অবস্থিত নদী ক্রমে ভরাট হইয়া 'মরা গাঙ্গ' নামে টুকেরগ্রামের এলাকাধীন একটি উর্ব্বর

মাঠে পরিণত হইয়াছে। বহু পূর্ব্বে ভাঙ্গা গোদারাঘাটের সন্নিকটে অর্থাৎ টুকেরগ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে বরাক, কুশিয়ারা ও সুরমা নদীর সঙ্গম অবস্থিত ছিল। তজ্জন্য বারুণী উপলক্ষে পুণ্যার্থীরা এখানে স্নান করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে নদী কাটিয়া দেওয়া হেতু এ গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে বরাক নদী, সুরমা ও ও কুশিয়ারা এই দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এজন্য টুকের-গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে প্রবাহিত কুশিয়ারাকে এখনও পুরাতন বরাক নদী বলা হয়। টুকেরগ্রামের অন্তর্ভুক্ত মরা গাঙ্গের এলাম জমি হইতে শ্রীহট্ট জেলার এলাকাধীন আমলসিদের দখনা ভূমি স্থানে স্থানে দুই-তিন হাত উচ্চ।

টুকেরগ্রাম কাটিগড়া থানার এলাকাধীন একটি চৌকিদারী সার্কেলের অংশবিশেষ। রেডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী শ্রীহট্ট জেলা বিভক্ত হয়। এই গ্রাম কাছাড় জেলার একাংশ বলিয়া কাছাড়ের অন্যান্য ভূভাগের ন্যায় ইহাও স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যায়। রেডক্লিফ রোয়েদাদের সহিত উহা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন; যেহেতু ঐ রোয়েদাদ অনুযায়ী শুধু শ্রীহট্ট জেলারই বাঁটোয়ারা হয়।"

পাকিস্থানের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন

আমরা গত সংখ্যায় পাকিস্থানের ৭ই অক্টোবরের ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, ঘটনা পরম্পরাতে প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জ্জার পতনের ইঙ্গিত ছিল'। তাহার পর ২৭শে ও ২৮শে অক্টোবরের ঘটনাবলীতে আমাদের সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে। ২৭শে অক্টোবর সকালে প্রেসিডেণ্ট মীর্জ্জা প্রধান সামরিক প্রশাসক জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খাঁনকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের সময় শপথ পাঠ করিয়া জেনারেল আয়ুব খাঁ বলেন যে, তিনি প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইবেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা যাইবার পূর্ব্বেই তিনি প্রেসিডেণ্ট মির্জ্জাকে পদচ্যুত করিলেন। ঐদিন সন্ধ্যাবেলা এক ঘোষণায় প্রেসিডেণ্ট মীর্জ্জা বলেন যে, তিনি সকল ক্ষমতা জেনারেল আয়ুব খাঁর হাতে হস্তান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরদিন ২৮শে অক্টোবর জেনারেল আয়ুব খা পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্টরূপে শপথ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেণ্টের কর্ম্মভার গ্রহণ করিবার এক নির্দ্দেশ তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদের বিলোপসাধন করিয়া বলেন যে অতঃপর পাকিস্থান একটি প্রেসিডেণ্টশাসিত রাষ্ট্ররূপে শাসিত হইবে।

সুদানে সামরিক শাসন

১৭ই নভেম্বর উত্তর আফ্রিকার সুদানরাষ্ট্রে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করেন সুদান সেনা-বাহিনীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ইব্রাহিম আবুদ। সমগ্র সুদানরাষ্ট্রে সামরিক আইন জারী করিয়া, সংবিধান, পার্লামেণ্ট ও সকল রাজনৈতিক দলের বিলোপসাধন করা নয়। 'একটি সামরিক পরিষদের হাতে সুদানের চূড়ান্ত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়।

১৯৫৬ সন হইতে সুদান শ্রী আবদুল্লা খলিলের নেতৃত্বে দ্বিদলীয় কোয়ালিশন সরকার কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল। বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে উম্মাদলের ছয়জন সদস্য শ্রীখলিলকে একটি সর্ব্ব-দলীয় সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়ার জন্য পদত্যাগ করেন। বিদ্রোহের দিন সুদানী পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসার কথা ছিল, কিন্তু তাহা দুই দিন পূর্ব্বে ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়।

বাঙালীর সমস্যা

ভারতবর্ষ আজ এক সর্ব্বব্যাপী সঙ্কটের সম্মুখীন। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ও অর্দ্ধশিক্ষার বিষময় প্রভাবে আজ সমগ্র ভারত আচ্ছন্ন। মানুষের বাহ্যিক জীবনই যে আজ প্রভাবিত তাহা নয় মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের উপরেও এই বিষ সংক্রামিত হইয়াছে, ফলে আমরা এক ব্যাপক নৈতিক অবনতি প্রত্যক্ষ করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যা এক বিশিষ্টরূপে প্রকট হইয়াছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় 'শারদীয় নাগরিক' পত্রিকায় "সমস্যা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে বাংলার এই সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করিয়াছেন। শ্রী বাগল লিখিতেছেন: "চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় ইহা ভেজালের রাজত্ব। "ভেজাল" দেবীর আসনে উপবিষ্ট। খাদ্য, পরিধেয়, ঔষধ, শিল্প সব কিছুতেই ভেজাল। শাসনবিভাগও ভেজাল (দুর্নীতি)গ্রস্ত। এইরূপ অবস্থা বিপদেরই পূর্ব্বাভাষ বহন করে। শ্রী বাগল সতর্ক করিয়া বলিতেছেন, "মানুষ যখন খাইতে পরিতে পায় না তখন দাবির কথাই তার মনে আসে, দায়িত্বের কথা সে ভুলিয়া যায়।" সমাজের বর্ত্তমান অসাম্য, অকর্ম্মণ্যতা ও দুর্নীতির ফলে যাহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাই সমাজদেহে নানারূপ ব্যাধির সৃষ্টি করিতেছে। ঘনঘন ষ্ট্রাইক, আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা এই ব্যাধির প্রকাশ দেখি। সমাজের মৌলিক দুর্ব্বলতা না দূর করিলে এগুলি দূর হইবে না। কিন্তু এ বিষয়ে যদি অবিলম্বে মনোযোগ না দেওয়া হয় কখন যে সমাজদেহে বিস্ফোরণ ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

বাঁকুড়া হাসপাতালে অব্যবস্থা

বাঁকুড়া সদর হাসপাতাল সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্ব্বে একাধিক আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি। সর্ব্বশেষ সংবাদ হইতে দেখা যাইতেছে যে, হাসপাতালটিতে বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। ৪ঠা নবেম্বর তারিখের পাক্ষিক 'হিন্দুবাণী'তে 'শ্রীদুর্ম্মুখ' লিখিতেছেন:

"বাঁকুড়া সদর হাসপাতালে দিন দিন যে অবস্থা সৃষ্টি হইতেছে, তাহা যে কোন সভ্য মানুষের সরকারের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হইত না। আমরা বহুবার এই হাসপাতালের সার্জ্জেন ও কোন কোন ডাক্তারের ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছি, কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বর্ত্তমান এ্যাসিষ্টান্ট সার্জ্জেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে যেরূপ ঘনিষ্ঠ হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বেপরোয়া হওয়া স্বাভাবিক'। চীফ মেডিকেল অফিসারের (ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জেন) সঙ্গে তাঁহার ঝগড়ার প্রসঙ্গ এখন কাহারও অজানা নাই।

প্রায়ই হাসপাতালে কোনও এ্যাটেণ্ডিং ডাক্তারের পাত্তা মিলে না। এ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জেনের সন্ধ্যাবেলায় একটু তাসটাস না খেলিলে যদি না চলে, তবে সেই সময়ে কোন ডাক্তারের হাসপাতালে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করেন না কেন?

১লা নভেম্বর সন্ধ্যাবেলায় মেটার্নিটি ক্লিনিকে একটি সিরিয়াস প্রসূতিকে ডিসচার্জ্জ করিবার পর হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার ব্যাপার লইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ক্ষমার অযোগ্য। সদর হাসপাতালে কোনও ডাক্তার নাই। ডাফরিন হাসপাতালের লেডী ডাক্তার মহোদয়াকে খবর দেওয়া হইলে তিনি জানান যে, তাঁহার শরীর খারাপ, তাঁহার পক্ষে বাহির হওয়া সম্ভব নয়। রোগিণীর এখন-তখন অবস্থা; শেষ পর্য্যন্ত সিভিল সার্জ্জেনকে জানান হয়। অবশেষে বহু চেষ্টার পর প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সাড়ে নয়টায় এ্যাসিষ্টান্ট সার্জ্জেন তাস খেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া তবে রোগিণীকে দেখেন! ততক্ষণে লেডী ডাক্তার মহোদয়ার অসুখ সারিয়া গিয়াছিল, তিনিও আসিয়া জুটিয়াছিলেন।"

বর্দ্ধমান শহরে গুণ্ডামী ও পুলিস

১১ই অক্টোবর প্রকাশ্য দিবালোকে বর্দ্ধমানের প্রধান রাজপথ গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর একটি নরহত্যা সংঘটিত হয়। এই নরহত্যা সম্পর্কে সুনীল দাস নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে পুলিসের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া 'বর্দ্ধমানবাণী' এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন:

"শহরের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে এবং কলিকাতার কোন কোন দৈনিক পত্রে শুক্রবারের সম্মুখস্থ জি-টি-রোডে প্রকাশ্য দিবালোকে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ হত্যা সম্পর্কে ধৃত কুখ্যাত গুণ্ডা সুনীল দাসকে পরে জামীন দেওয়ার ব্যাপারে শহরবাসী কেবলমাত্র ক্ষুব্ধ হয় না—আতঙ্কিতও হইয়া পড়ে। প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল রাস্তার উপর হত্যা করা সন্দেহে যাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল সে ব্যক্তি কেমন করিয়া জামিন পাইল তাহা আমরা ভাবিয়া পাই নাই। এখানে শুধু পুলিস বা শাসনবিভাগের কথা নহে বিচারবিভাগের দায়িত্বও অসীম। সম্প্রতি 'দামোদর পত্রিকা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে মন্তব্য করিয়াছেন 'নিশান পত্রিকা' যে মন্তব্য করিয়াছেন তৎপ্রতি শাসন ও বিচার বিভাগের দৃষ্টি পড়িয়াছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। তবে এই গ্রেপ্তার এবং জামিনকে কেন্দ্র করিয়া যে সমালোচনা সুরু হইয়াছে তাহা কি পুলিস, কি শাসন, কি বিচারবিভাগগুলির দক্ষতা ও সুনামের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও পরে পুনরায় জামিন দেওয়া হয় নাই এবং সম্প্রতি নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনে তাহাকে আটক করা হইয়াছে তথাপি শহরের জনগণের সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। অবশ্য নূতন পুলিস-সুপার আশা দিয়াছেন যে শহরের গুণ্ডামী, অসামাজিক কার্য্যকলাপ এবং দুর্বৃত্তপনা রোধ করিতে সক্ষম হইবেন। সেই সঙ্গে তিনি শহরবাসীর সহযোগিতাও কামনা করিয়াছেন। আমরা আশা করিতেছি পুলিসের বড়কর্ত্তার সহিত নিম্নের কর্ম্মচারীরা সহযোগিতা করিবেন—জনসাধারণ স্বেচ্ছায় সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিবে।"

পুলিসের অকর্ম্মণ্যতা

রায়না থানার পুলিসের বিরুদ্ধে অকর্ম্মণ্যতার অভিযোগ করিয়া 'দামোদর' এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন:

"বহু-আলোচিত রায়না থানার কামারগড় অঞ্চলে পুনরায় অরাজকতা ও উপদ্রব মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। বড়বৈনান ইউনিয়নের কামারগড়ে ধামনারী, পিপলদহ, গণেশপুর ও পশরা এই মাত্র পাঁচখানি সন্নিহিত গ্রামের মধ্যে এই অরাজকতা সীমাবদ্ধ। বহুদিন হইতে এখানকার অরাজকতা লইয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে আলোচনা হইয়াছে, বিধানসভায়ও আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহার অঙ্কুর বিনষ্ট হইল না। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে কামারগড় গ্রামে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের পার্শ্ববর্ত্তী প্রকাশ্য স্থলে প্রকাশ্য দিবালোকে পিপলদহ গ্রামের অরুণ মালিককে লগুড়াঘাতে হত্যা করা হইল। তাহার আসামী বিচারে মুক্তি পাইবার পর তাহাকে মাল্যভূষিত করিয়া কামারগড়ে ও ধামনারী গ্রামে শোভাযাত্রা করিয়া উৎসাহিত করা হইল। স্থানীয় চাষীদের মাঠে তৈয়ারী ফসল ধান, আলু, পাট নিয়মিত ভাবে লুণ্ঠিত হইল, চাষীর সম্বল বহু গরুর গাড়ী কোথায় লোপাট হইল। শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের স্বাভাবিকভাবে ও শান্তিতে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। রায়না পুলিশ থানায় এইরূপ উপদ্রবের বহু অভিযোগ জমা হইয়া আছে, দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিকার গ্রামবাসী পাইল না। অরুণ মালিকের উপর লোমহর্ষক অত্যাচারের সংবাদ যথাসময়ে পাইয়াও রায়নার পুলিশ মাত্র ৫ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামে পৌঁছাইল না উপরন্তু বলিল, প্রেসিডেণ্ট না লিখিলে যাইব না। অরুণ বিনা চিকিৎসায় ও অসহায় অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। রায়না পুলিশের আচরণ দেখিয়া অরুণের সন্তানগণ তাহার মৃতদেহ বর্দ্ধমানে পুলিশ সাহেবের নিকট আনিল। এবারও দেখিতেছি মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে প্রকাশ্য দিবালোকে যে নৃশংস আক্রমণ হইল, তাহাতেও যথাসময়ে সংবাদ পাইয়া রায়নার পুলিশ কেন ঘটনাস্থলে গেল না, বর্দ্ধমানের পুলিশকে তথায় যাইতে হইল, তাহাই আমরা আশ্চর্য্যের সহিত লক্ষ্য করিতেছি।"

রায়না পুলিসের আচরণ সম্পর্কে 'দামোদর' যাহা লিখিয়াছেন, এ ধরনের ঘটনা কিভাবে ঘটিতে পারে তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অভিমত জনসাধারণকে অবিলম্বে জানান কর্তব্য বলিয়াই আমরা মনে করি।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংস্থায় দুর্নীতি

ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন লইয়া যে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার খেলা চলিতেছে সাপ্তাহিক 'সেবক' হইতে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটিতে তাহার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইবে। সরকারী মঞ্জুরী ব্যতীত, কিরূপে বর্ণিত ডিসপেনসারীটির অর্থবরাদ্দ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

'সেবক' লিখিতেছেন :

"আগরতলা শহরের উপর একটি পূর্ণ হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ডাইরেক্টরেট নিজস্ব একটি ডিস্পেন্সারীর ব্যয় কেন বহন করিতেছেন তাহা হয়ত অনেকেরই না জানার কথা। তবে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, উদ্বাস্তুদের নামে যে সমস্ত ঔষধপত্র, টনিক ও অন্যান্য মূল্যবান ঔষধ আসে তাহার একাংশ পুনর্বাসন বিভাগের কতিপয় ভাগ্যবান ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসার প্রয়োজন মিটাইতে সাহায্য করে।

একমাত্র রোগী হিসাবে সরকারী হাসপাতালে না থাকিলে জনসাধারণ আজ পর্যন্ত টনিক জাতীয় ঔষধ কোন হাসপাতাল হইতে পাইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। সরকারী চিকিৎসার সুযোগের মধ্যে সরকারী, বেসরকারী লোকদের কোন তারতম্য রাখা নিশ্চয়ই সরকার নীতিবিরোধী।

আগরতলার পুনর্বাসন ডাইরেক্টরেটের ডিস্পেন্সারীর মঞ্জুরী কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪-৫৫ সন হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। উদ্বাস্তু যক্ষ্মা রোগীদের জন্য কিছু ঔষধপত্র রাখার পরামর্শ তাঁহারা দিয়াছিলেন। প্রকাশ, ১৯৫৪ সনে আসামের একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল এই ডিস্পেন্সারী না রাখার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন কারণ ইহা নাকি প্রকারান্তরে কর্মচারীদের চিকিৎসাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

আমতলী, মুড়াবাড়ী, চাকমা, হাওয়াইবাড়ী, হারেরখোলা, সোনামারা, ব্রজপুর, অরুন্ধতী নগর, আম্বাসা এই ৯টি রিলিফ কেম্পে উদ্বাস্তুদের চিকিৎসার জন্য ৯টি ডিস্পেন্সারীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৭-৫৮ সনে প্রত্যেকটির জন্য মাসিক ৫০০৲ টাকা করিয়া ৫৪ হাজার টাকা এবং ট্রেন্সিট ক্যাম্পে জরুরী প্রয়োজনে ঔষধ খরিদ করার জন্য ৬,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করেন। আগরতলার ডিস্পেন্সারী রাখার জন্য কোন মঞ্জুরী দেওয়া হয় নাই। ১৯৫৬ সনে কেঃ পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় এই ডিস্পেন্সারীটি বন্ধ করার জন্য পুনরায় নির্দেশ দিলেও আজও ইহাকে জিয়াইয়া রাখা হইয়াছে।"

তারা সিং-এর পরাজয়

শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি নির্বাচনে প্রবীণ আকালী নেতা মাষ্টার তারা সিংয়ের পরাজয় অনেককেই বিস্মিত করিয়াছে। গত তিন বৎসর যাবত উপর্যুপরি তিনি এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এই বৎসর তাঁহার পরাজয় ঘটিল একত্রিশ বৎসর বয়স্ক কংগ্রেসী শিখ সর্দার প্রেম সিং লালপুরার নিকট। নির্বাচনের দিন কমিটির ১৬১ জন সদস্যের মধ্যে ১৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ৭৭ জন সর্দার প্রেম সিং লালপুরাকে ও ৭৪ জন মাষ্টার তারা সিংকে সমর্থন করেন। দুইটি ভোট বাতিল হয়। কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পন্থী শিখগণ মিলিত ভাবে আকালী নেতার বিরোধিতা করেন।

মাষ্টার তারা সিং কংগ্রেসের প্রবল বিরোধী ছিলেন এবং তিনি স্বতন্ত্র শিখ সুবার পক্ষপাতী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি গত তিন বৎসর যাবত প্রবন্ধক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। তাঁহার বর্তমান পরাজয় আকালী-পন্থী শিখদের উপর তাহার প্রভাব হ্রাসের সূচক কিনা তাহা বলা শক্ত। তবে ইতিমধ্যে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি অধিকতর সক্রিয় ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবেন।

খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায় প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতে হইলে যে সকল সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন তাহার উল্লেখ করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "যুগান্তর" লিখিতেছেন :

"খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা "রাষ্ট্রায়ত্তকরণ" সম্পর্কে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সুপারিশটি যে আকার গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের মনে অলীক আশার উদয় হইবে। পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবগুলি ব্যাখ্যা করিয়া সরকারী একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, "খাদ্যশস্য সম্পর্কে সরকারী ব্যবসা প্রবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলে উদ্দেশ্য হইল মধ্যবর্তী সব ব্যবসায়ীকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া বাজার দর স্থিতি করা।" অর্থাৎ, এই সুপারিশটি কার্য্যকরী করিলে খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা যে সম্পূর্ণই রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে এবং এই ব্যবসায়ের সর্ব্বোচ্চ স্তরে একচেটিয়া সরকারী প্রতিষ্ঠান ও নিম্নতম স্তরে খুচরা দোকানদার ব্যতীত অন্যান্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব যে লোপ পাইবে—সরকারী বিজ্ঞপ্তি রচয়িতাগণ সে সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেন নাই। কিন্তু আলোচ্য সুপারিশের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে—এরূপ ধারণা একেবারে অতিরঞ্জিত। খাদ্যশস্যের বাজারদর স্থিতি করার উদ্দেশ্যে কমিটি দুইটি প্রস্তাব বিবেচনা করিয়াছিলেন : প্রথম প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল যে, দেশে মোট উৎপাদনের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ ফসল সরকারী গোলায় কিনিয়া লওয়া এবং যে-সব জায়গায় ঘাটতি পড়ে সেখানে সরকার কর্তৃক দরকার মত খাদ্যশস্য সরবরাহের দ্বারা ঘাটতি পূরণ ও বাজার দর স্থিতি করা। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা চালাইবার জন্য একচেটিয়া একটি সরকারী কারবার গঠন

করা।' উন্নয়ন পরিষদ নাকি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাজার দর স্থিতি করার পক্ষে শেষোক্ত প্রস্তাবটিই অধিকতর উপযোগী। কিন্তু সুপারিশটি যে ভাবায় রচিত হইয়াছে—তাহাতে নিকট ভবিষ্যতে সে আশা পূরণের সম্ভাবনা নিতান্তই নগণ্য!

"খাদ্যশস্য সম্পর্কে একচেটিয়া ভাবে পাইকারী ব্যবসা" পরিচালনার ব্যবস্থা করাই নাকি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু "শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িবার মত" তাঁহারা "পাইকারী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের" জন্য রাজ্যসরকারসমূহকে অনুরোধ করিয়াছেন। নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাজ্যে খাদ্যশস্যের "বড় বড়" পাইকারী ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স লইতে হইবে। তাঁহারা সরকারের পক্ষ হইতে ব্যবসা চালাইবেন এবং সরকার তাঁহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনানুসারে খাদ্যশস্য ক্রয় করিবেন।" এ সম্পর্কে বিস্তারিত কার্য্যক্রম রচনার জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিদপ্তর এবং পরিকল্পনা কমিশনকে ভার দেওয়া হইয়াছে। এই কর্ম্মসূচী দেখিয়া রাজ্যসরকারগুলি এ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন। সুপারিশটির বচনবিন্যাস চিন্তা করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। "পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের" তাৎপর্য্য নাকি "পাইকারী ব্যবসায়ীদিগকে লাইসেন্স লইতে বাধ্য করা" এবং "সরকারের পক্ষ হইতে ব্যবসা চালাইতে দেওয়া"। সদাশয় সরকারী কর্ণধারগণ যদি এমন সর্ত্তে এ দেশের সব রকম ব্যবসা "রাষ্ট্রায়ত্ত" করিতে চাহেন, তাহা হইলে হাজারে একজন শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীও আপত্তি জানাইবেন কিনা সন্দেহ। বরঞ্চ ব্যবসায়ে লোকসানের ঝুকিটা রাষ্ট্রের উপর চাপাইয়া দেওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগে বিশেষ উৎসাহ বোধ করাই স্বাভাবিক।

এ সম্পর্কে আলোচনার সময় উন্নয়ন পরিষদ সম্ভবতঃ কতকগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। যথা—দেশে যত ফসল বিক্রয় হয় (পরিমাণে অন্ততঃ ৩ কোটি টন), তাহা ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক গুদাম সরকারের নাই; সে মালটা শ্রেণীভেদে বাছিয়া ব্যবসার নীতি অনুসারে খুচরা দোকানে সরবরাহের জন্য কয়েক লক্ষ কর্ম্মচারী দরকার হইবে, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তত কর্ম্মচারী রাতারাতি যোগাড় করাও সরকারের পক্ষে দুঃসাধ্য; এই ব্যবসায়ে কয়েক শত কোটি টাকা মূলধন আবশ্যক—সে টাকাই বা কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং, সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র ও অব্যর্থ ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও প্রস্তাবটি অবিলম্বে কার্য্যকরী করা দুরূহ। মূলনীতি স্পষ্ট ভাবায় স্বীকারের পরেও উহা কার্য্যকরী করিতে পরিষদ যদি দ্বিধাবোধ করিয়া থাকেন—তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে, মাত্র পাইকারী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের সুপারিশটি উহা 'রাষ্ট্রায়ত্ত করার' প্রস্তাব বলিয়া প্রচারিত হয় কেন? "ভাঙ্গে উচ্ছে, বলে পটল"—এরূপ অভ্যাস বাঞ্ছনীয় নহে।

উন্নয়ন পরিষদের সভ্যগণ হয় ত আশা করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত কার্য্যক্রমের দ্বারা "বড় বড় পাইকারী ব্যবসায়ীদিগকে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে ব্যবসা চালাইবার জন্য লাইসেন্স লইতে বাধ্য করিলেই" তাঁহারা সরকারের গোমস্তা হিসাবে ব্যবসাটি পরিচালনা করিবেন; সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য কিনিবেন এবং সমান নিষ্ঠার সহিত সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ক্রেতার নিকট নির্দ্দিষ্ট দরে শস্য বিক্রয় করিবেন। তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ততটা উচ্চাশা বোধ করিবেন কিনা সন্দেহ। দু-চারজন পাইকার তাঁহাদিগকে নিরাশ না করিতেও পারেন। কিন্তু অধিকাংশ পাইকার সম্পর্কে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময় ও তৎপরবর্ত্তী রেশনের আমলে বাংলাদেশে সরকার কর্ত্তৃক আনীত খাদ্যশস্য ষ্টেশন ও জাহাজঘাটা হইতে ডেলিভারী লইয়া নিজ নিজ গুদামে মজুত করার এবং নির্দ্দিষ্ট দোকানদারদিগের নিকট বাঁধা দরে সরবরাহের জন্য তৎকালীন সরকার কয়েকজন পাইকারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তার পর, তন্মধ্যে কোন কোন পাইকার ব্যবসায়ে কি ধরনের যুগান্তকারী প্রতিভার সাহায্যে রাতারাতি ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল এবং সরকারী এজেন্ট মনোনীত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে প্রতিভার কোন প্রকাশ দেখা যায় নাই কেন—সে রহস্যের সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, উন্নয়ন পরিষদের প্রত্যাশা অবাস্তব কল্পনামাত্র। এই কার্য্যক্রম অব্যর্থ ধরিয়া লইয়া, ইহার মাধ্যমে বাজার দর স্থিতি করার ভরসা না দিলেই উন্নয়ন পরিষদ বোধ হয় সতর্কতার পরিচয় দিতেন। অতিমুনাফা নিরোধ অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তনের পরে পশ্চিম বাংলা সরকার যেরূপ হাস্যকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন—এ সিদ্ধান্ত বলবৎ করিলে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়েও সেরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণধারদিগের দ্বারা গঠিত উন্নয়ন পরিষদের মতামত কতটা দূরদর্শিতাপ্রসূত—সে সম্পর্কে তারপর জনসাধারণের মনে কি ধারণার উদয় হইবে সে কথাটাও চিন্তা করা উচিত ছিল। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই একটু হেরফের করিয়া বলা যায় যে, এত সস্তায় ও সহজে জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যাটি সমাধান করা সম্ভব নয়। বাজার দর স্থিতি করাই অভিপ্রেত হইলে উপসর্গগুলির জটিলতা অনুযায়ী কঠোর ও অব্যর্থ কার্য্যক্রম স্থির করা প্রয়োজন।

পাকিস্থান ও ভারত—নেহরুর মন্তব্য

পণ্ডিত নেহরু আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার সেই কারণে তাঁহার ভাবণ ও মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বিচার করা উচিত যে, পণ্ডিতজীর মন বর্ত্তমান সম্পর্কে কতটা সচেতন। নীচের সংবাদে বুঝা যায় যে তিনি কিছু সজাগ হইয়াছেন। সেই সঙ্গেই মনে হয় যে তিনি ভারত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নহেন। না হইলে সকল সমস্যার পূরণ ও দেশের ভবিষ্যতের বিষয়ে তিনি এইরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না।

"বরোদা, ২রা নবেম্বর—আজ এখানে দুই লক্ষ লোকের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্থানের মত ভারতে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন না। কারণ "স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ও পরে আমরা যে সব কাজ করিয়াছি, তাহা আমাদের প্রভূত শক্তি দিয়াছে এবং এখনও আমরা গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলার চেষ্টা করিতেছি।"

প্রধানমন্ত্রী প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, এক সামরিক ডিক্টেটার পাকিস্থানের মালিক হইয়া বসিয়াছেন। ইহা বড়ই অশুভ লক্ষণ।' ইহার প্রশংসা বা সমর্থন কেহই করিতে পারেন না।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, গত দুই তিন সপ্তাহে পাকিস্থানে কি সব ঘটিয়াছে, আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন। পাকিস্থানের সমালোচনা করার কোন অধিকার আমার নাই। আপনাদেরও নাই। পাকিস্থান পাকিস্থানের জনগণের দেশ, তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিবেন করিবেন। কিন্তু আপনারা দেখিতেছেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর এগার বৎসরেও পাকিস্থান আত্মস্থ হইতে পারে নাই। সে তুলনায় ভারত অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে। ভারতে দুইটি সাধারণ নির্বাচন হইয়াছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পূর্ণ হইয়াছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর কাজ চলিতেছে। নানা দিকে ভারতের উন্নতি হইতেছে। 'ভারত-দর্শন' নামে বিশেষ রেলওয়ে প্রদর্শনী-ট্রেণগুলি দেশের বিভিন্ন স্থানে যাইতেছে। ভারত কত দিকে কতখানি উন্নতি করিয়াছে, জনসাধারণকে সে-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করিয়া তোলাই এই সব প্রদর্শনী-ট্রেণের উদ্দেশ্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তবে পাকিস্থানের ঘটনাবলী হইতে ভারতের শিক্ষালাভ করা উচিত। নিজের সাবধানতার জন্যই ইহার প্রয়োজন আছে।

আজ সকালে বিমান ঘাটি হইতে মোটরযোগে আসার সময় তাঁহার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়, বক্তৃতা প্রসঙ্গে নেহরুজী তাহার উল্লেখ করেন। পৃথক পৃথক ভাবে মহাগুজরাট জনতা পরিষদ, জনসঙ্ঘ ও ট্রেড ইউনিয়ন এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল।

মহাগুজরাট পরিষদের দাবি সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, বোম্বাই রাজ্য সম্পর্কে সংসদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, শুধুমাত্র সংসদই সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিতে পারে। জনসঙ্ঘের "নেহরু-নুন চুক্তি"র বিরোধিতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র এই প্রতিষ্ঠানেরই সব সময় খারাপ কাজ করার একটা ঝোঁক আছে। আমি মনে করি, "নেহরু-নুন চুক্তির" বিরোধিতা করিয়া যে সব বিক্ষোভকারী প্ল্যাকার্ড উচাইয়া ধরিয়াছিলেন, এই চুক্তির বিন্দুবিসর্গও তাঁহারা জানেন না। ট্রেড ইউনিয়নের খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস এবং আরও অধিকসংখ্যক ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার দাবি সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কেবলমাত্র খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।"

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি

পণ্ডিত নেহরুর এই ভাষণেও আমরা বাস্তবের জ্ঞানের কিছু বিশেষ পরিচয় পাই না। যে ভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এ দেশের লোকের দুরবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বাস্তব সম্পর্কে জ্ঞান থাকিবে সেই দুর্দ্দশার অবসানের পূর্ব্বে তৃতীয় পরিকল্পনার কথা উঠিতে পারে না। অন্যের বৃত্তান্ত সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করা সহজ কিন্তু কেন সে এরূপ মন্তব্য করিল সে বিষয়ে বিচার না করিয়া ঐরূপ মন্তব্য কি সুস্থ ও সচেতন মস্তিষ্কের পরিচায়ক ?

"হায়দরাবাদ, ২৬শে অক্টোবর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নবভারত গঠনে নূতন নূতন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, যাঁহারা পরিকল্পনা কমিশন বাতিল করিয়া দিবার কথা বলিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকৃতিরই পরিচয় দিতেছেন।

তিনি বলেন, বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত কর্ম্ম-পরিকল্পনা ব্যতীত ভারতের লক্ষ লক্ষ মেহনতি জনতার মঙ্গলসাধনরূপ বিরাট সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভব হইবে না।

শ্রীনেহরু বলেন, 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি কমিটি গঠন সম্পর্কে একটি বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহা ভালই হইয়াছে। আমি আশা করি, এই কমিটি ভালভাবেই কাজ করিবে। পরিকল্পনা সম্বন্ধে কংগ্রেসের আগ্রহই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজ নহে, আমার মনে হয় পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় তৎসম্বন্ধেও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত। উহা করিলে তবেই আপনারা পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন, তাহা না হইলে যে বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের কোন ধারণাই নাই তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করা খুবই কঠিন। পরিকল্পনার পটভূমিকা ভালভাবে পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। কিছুকাল আগে আমি যখন ভুটানে ছিলাম সেই সময় পার্লামেণ্টে কোন একজন বলেন, পরিকল্পনা কমিশন এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। ইহা ধৈর্য্যহীনতার লক্ষণ। আমার মনে হয়, পার্লামেণ্টের যে সদস্য উহা বলিয়াছেন তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির সাময়িক বিকৃতি ঘটিয়াছিল। কোন কোন ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশনের ভুল হইতে পারে। উহা অন্য ব্যাপার।' কিন্তু যখনই আপনি বলিবেন, 'পরিকল্পনা অথবা পরিকল্পনা কমিশন বাতিল কর,' তখনই বুঝিতে হইবে আপনার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়াছে।

বৈদেশিক ব্যাপারে আমরা নিরপেক্ষ আছি। অন্যান্য ব্যাপারেও আমরা বিদেশ হইতে আমদানী কোন ধ্বনির (যাহাতে আমাদের

দেশের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হইবে) দ্বারা বিভ্রান্ত হইতে চাহি না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোন দেশ ধনতন্ত্রবাদী, সমাজবাদী, কম্যুনিষ্ট, গান্ধীবাদী অথবা অন্য যে কোন "আদর্শবাদী হউক না কেন, সেই দেশের জনগণকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। কঠোর শ্রম ব্যতীত কোন দেশই সাফল্যের দ্বারে উপনীত হইতে পারে না। রাজনীতির যে প্রয়োজন আছে তাহা অনস্বীকার্য্য, কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর রুশিয়া ও জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশগুলি কি ভাবে নিজেদের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিল তাহা লক্ষ্য করার বিষয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কঠোর শ্রম ও শিক্ষিত কর্ম্মীর প্রয়োজন ছিল।"

পাকিস্থানের ছত্রপতির মন্তব্য

যে ভাবে পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে তাহাতে সকলেরই মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ হইতে পারে। জেনারেল আয়ুব খাঁন সেই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য সাংবাদিকগণকে নিম্নস্থ ভাষণ দান করেন। এই মন্তব্য এখন সোজা ভাবে দেওয়া যায় কিনা সে কথার বিচার স্থগিত রাখাই শ্রেয়:

"লাহোর, ১০ই নবেম্বর—পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খান আজ এখানে সাংবাদিকদের সহিত কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে সব বিরোধ রহিয়াছে তাহা আপোষে ও শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করিয়া ফেলা উচিত এবং উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। উভয় দেশের সংহতি রক্ষার ইহাই একমাত্র পথ।

আজ সন্ধ্যায় রাওয়ালপিণ্ডিতে আসিয়া পৌঁছিয়াই জেনারেল আয়ুব খান সাংবাদিকদের সহিত কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্নের উত্তরে পাক প্রেসিডেন্ট বলেন যে, রাজনীতিবিদগণ যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার সম্মুখীন হওয়া এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিসহ সর্ব্বশ্রেণীর লোকদের মন হইতে সন্দেহ দূর করাই তাঁহার সরকারের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা শক্ত কাজ সন্দেহ নাই এবং গত কয়েক বৎসর ধরিয়া রাজনীতিবিদগণ যাহা "সৃষ্টি" করিয়া গিয়াছেন তাহা "ভাঙ্গিবার" জন্য তাঁহার সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

জেনারেল আয়ুব খান বলেন যে, পাকিস্থানে সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে এবং সম্পূর্ণ সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া বসবাস করিতে পারিবে বলিয়া তিনি মনে করেন।"

পাকিস্থানী পররাষ্ট্রনীতি

এই ঘটনা সম্পর্কে আমরা অন্যত্র লিখিয়াছি। সংবাদটি এই ভাবে আসে:

"মাজদিয়া, ১৫ই নবেম্বর—রাজসাহীতে সহকারী ভারতীয় হাইকমিশনারের আপিসের একাউন্ট্যান্ট শ্রীকে, সি, আয়ার গতকল্য যখন ভারত হইতে রাজসাহীতে তাঁহার কর্ম্মস্থলে যোগদান করিতে যাইতেছিলেন, তখন তল্লাসীর অছিলায় পাকিস্থানী সৈন্য দর্শনায় ৪০১নং আপ মেলে তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে। প্রথমে শুল্ক বিভাগের অফিসারগণ তাঁহাকে প্রথামত তল্লাসী করেন, কিন্তু মিলিটারী পুনরায় তল্লাসী করার জন্য আদেশ দেয়। শুল্ক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া পুনরায় তল্লাসী করান, কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সামরিক লোকেরা শ্রী আয়ারকে দাঁড়াইতে বলে। দাঁড়াইতে হইবে কেন, শ্রী আয়ার এই প্রশ্ন করিলে ট্রেনের কামরায় এবং পুনরায় প্ল্যাটফরমে তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করা হয়। সৈন্যদিগকে থামাইতে কোন কোন উচ্চপদস্থ অফিসারকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

শ্রী আয়ারের পত্নী ও সন্তানগণ অন্যান্যের সঙ্গে অসহায়ের ন্যায় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। শ্রী আয়ার অতঃপর এই ব্যাপারে উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি

"আনন্দবাজার পত্রিকা"য় কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে যে অনাচারের প্লাবন বহিতেছে সে সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করিতেছেন। ইহা শুভলক্ষণ। আমরা সেই কারণে নিম্নের সংবাদটি উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু এই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, এইরূপ সংবাদের উপর উপযুক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য না থাকিলে উহা কেবলমাত্র "উত্তেজক" রূপে গণ্য হইতে পারে:

"জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার উহার শ্রম বিভাগের জনৈক পদস্থ অফিসার এবং তদধীনস্থ একজন মহিলা অফিসারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত নানাবিধ সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারী মহল হইতে প্রাপ্ত ঐ সংবাদে আরও প্রকাশ যে, রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যে লিপ্ত সন্দেহভাজন এক শ্রেণীর লোকের সহিত শ্রম দপ্তরের ঐ পদস্থ অফিসারের গভীর যোগাযোগ থাকার এক অভিযোগ সম্বন্ধেও রাজ্য সরকার তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রকাশ, পূজাবকাশের পূর্ব্বে দুর্নীতিদমন বিভাগে শ্রম দপ্তরের ঐ পদস্থ অফিসার এবং অপর একজন মহিলা কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অফিসের নিয়মাবলী বিরোধী কার্য্যকলাপ, অবাঞ্ছিত ও অশোভন মাখামাখি এবং উক্ত পদস্থ অফিসারের রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যে লিপ্ত থাকার সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সহিত গভীর যোগসাজস প্রভৃতি নানাবিধ অভিযোগসম্বলিত এক স্মারকলিপি পৌঁছায়। দুর্নীতি দমন বিভাগ হইতে উহার উপর মন্তব্যসহ ঐ স্মারকলিপিটি রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট প্রেরিত হয়। আরও প্রকাশ, দুর্নীতি দমন বিভাগের ঐ মন্তব্যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, স্মারকলিপির বর্ণিত অভিযোগসমূহের অনেকগুলি রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। ইহা ছাড়া উত্থাপিত অভিযোগসমূহের কোন কোনটির সহিত মন্ত্রীপর্য্যায়ের জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির নামও জড়িত আছে। সুতরাং সমগ্র ব্যাপার সম্পর্কে প্রাথমিক পর্য্যায়ে গোয়েন্দাপুলিসের তদন্ত বিশেষ প্রয়োজন।

জানা যায় যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে মুখ্যসচিব নাকি এই ব্যাপারটি লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। উহার পর রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে ঐ সকল অভিযোগ সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূজাবকাশের পূর্ব্বেই আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রম দপ্তরের উক্ত পদস্থ অফিসার এবং অধীনস্থ জনৈকা মহিলা কর্ম্মচারীর অশোভন কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সংবাদে উক্ত দুইজন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক শ্রমদপ্তরে 'মধুমিলন কেন্দ্র' রচনার অভিযোগও উত্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ অফিসারের কার্য্যকলাপের সহিত একশ্রেণীর পাকিস্থানী নাগরিকের গোপন যোগসাজসের অভিযোগও পাওয়া গিয়াছে। ইহারই জন্য সম্ভবতঃ উক্ত তদন্তটি গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনা করার সমীচিনতা সরকারী মহলে উপলব্ধি করা হইয়াছে।"

রেলওয়েতে দুর্নীতি

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের পরিচিত এক উচ্চপদস্থ রেলওয়ে কর্ম্মচারী আমাদের বলেন যে, রেলওয়ে কিরূপে আজকাল চলিতেছে তাহা প্রকাশিত হইলে দেশবাসী স্তম্ভিত হইবে। নিম্নের সংবাদ দুটি তাঁহার মন্তব্যের সমর্থক :

"১৫ই নবেম্বর—হাওড়া ষ্টেশনের অভ্যন্তরে নানা দুর্নীতির সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশের পর ষ্টেশন পরিচালন ব্যবস্থায় কিছু কিছু রদ-বদল ও বদলীর সংবাদও প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রকাশিত সংবাদগুলি ব্যতীত এমন বহু দুর্নীতির অভিযোগপ্রকাশ পাইয়াছে, যাহা তথ্য প্রমাণেরও অপেক্ষা রাখে না, নথি পত্রের দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব না হইলেও এই শ্রেণীর দুর্নীতিগুলি 'নগ্ন-সত্য' বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন।

রেলওয়ের আইনানুসারে বুকিং না করিয়া ব্যবসার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার 'নিষিদ্ধ' মাল বিশেষ করিয়া সাইকেল, টায়ার, টিউব ও অন্যান্য যন্ত্রাদি ব্যক্তিগত 'লাগেজ' হিসাবে ট্রেণে লইয়া যাইবার সুযোগ দিয়া বেআইনীভাবে অর্থাগমের কথা প্রায়ই শোনা যায়। অভিযোগকারীরা বলেন যে, প্রবেশপথে মাত্র কয়েকটি মুদ্রা 'মামুলী' দিলে দশ-বিশ মণ পর্য্যন্ত 'মার্চ্চেণ্ডাইস গুডস' বা 'রেষ্ট্রিকটেড আর্টিকেল' অনায়াসেই ব্যক্তিগত লাগেজ হিসাবে পাচার হইয়া যায়। ইহা ব্যতীতও লাগেজ বুকিং ব্যবস্থায় আর একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া শুনা যায়। যেমন ধরুন, কোন যাত্রী ৪০ মণ মাল লইয়া দিল্লী যাইবেন, সমস্ত মালই তিনি ব্যক্তিগত লাগেজ হিসাবে লইয়া যাইতে চান। কিন্তু তাঁহার নিকট টিকিট আছে একটি ও তাহারা বলে, তিনি মাত্র ২৫ সের মাল লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে উপায় ? উপায় নাকি আছে, এইরূপ ক্ষেত্রে একশ্রেণীর কর্ম্মচারী 'বুকিং আপিসে' গিয়া ঐদিন দিল্লী ষ্টেশনের জন্য বিক্রিত টিকিটের মোট সংখ্যা ও উহাদের নম্বর সংগ্রহ করিয়া ঐ নম্বর অনুযায়ী নম্বর সংগ্রহ করিয়া ২৫ সের মাল দেখাইয়া আইনগতভাবে মাল বহনের সুযোগ করিয়া দেন।"

"১৫ই নবেম্বর—গত কয়েকদিন যাবৎ হাওড়া ষ্টেশনের বিভিন্ন দুর্নীতির সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইবার পর ষ্টেশন অভ্যন্তরে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিস কর্ত্তৃক বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে তাহারা অদ্য অপরাহ্ণে দুইজন যাত্রীর নিকট হইতে বেআইনীভাবে অর্থ গ্রহণের অভিযোগে দুইজন টিকিট কালেক্টরকে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, প্রথম ক্ষেত্রে গুমো এক্সপ্রেসে হাওড়া হইতে বরাকর ভ্রমণকারী তিনজন অজ্ঞ যাত্রী ৭নং গেট দিয়া প্লাটফর্ম্মে প্রবেশ করিবার সময় উক্ত গেটে কর্ম্মরত জনৈক টিকিট কালেক্টর যাত্রীত্রয়ের টিকিট অনুযায়ী বহনযোগ্য মাল অপেক্ষা অধিক মাল আছে, এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে 'বিনা রসিদে' যখন অর্থ গ্রহণ করিতেছিল, সেই সময়ে সাদা পোষাক পরিহিত পুলিস কর্ম্মচারিগণ তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

দ্বিতীয় ঘটনাটিও প্রায় একই ধরনের। এই ক্ষেত্রে একজন রেলওয়ে 'ভেণ্ডার' এস, ই, রেলওয়ের সাঁত্রাগাছি যাইবার সময় একটি 'মান্থলী' টিকিট লইয়া ১১নং গেট দিয়া প্রবেশ করিবার সময় অপর একজন টিকিট কালেক্টার ভেণ্ডারটির নিকট হইতে অন্যায়ভাবে কিছু অর্থ গ্রহণ করিলে সন্নিকটে প্রহরারত সাদা পোষাকী পুলিস তৎপরতার সহিত তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত দুইজনকে রেল পুলিস হাজতে আটক রাখা হইয়াছে।"

পুলিসের দুর্নীতি

আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নস্থ সংবাদ দুইটি দিয়াছেন :

"কলিকাতা পুলিসের কোন কোন স্তরে দুর্নীতিচক্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা ইদানীং আত্মপ্রকাশ করায় উক্ত পুলিসের কর্তৃপক্ষ মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাঁহারা কিভাবে ঐ দুর্নীতির বাসাগুলি সমূলে উচ্ছেদ করা যায় তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

দুর্নীতির যে সব অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার, হুইস্কির বোতল চুরি এবং পুলিস অফিসারের গোপন যোগসাজসে পতিতালয় চালনার অভিযোগও আছে। ইহা ছাড়া ফিরিওয়ালা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে ত বটেই, পুলিসের নিকট হইতেও পুলিস অফিসারের ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ পর্য্যন্ত ঐ তালিকায় স্থান লাভ করিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, গত কয়েক মাসে বিভিন্ন প্রকারের দুর্নীতিতে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে ছয়-সাতটি ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে দুইজন সাব-ইন্‌স্পেক্টরকে বরখাস্ত এবং একজন ইন্‌স্পেক্টর ও একজন এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিস কমিশনারকে তদন্তসাপেক্ষে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। বর্ত্তমান

পুলিস কমিশনার শ্রীউপানন্দ মুখার্জির আদেশেই এই সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কিছুকাল পূর্ব্বে দক্ষিণাঞ্চলে একটি পল্লীতে জনৈকা নারীর উপর পুলিসের করেকজন লোক কর্ত্তৃক পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং উহা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তেই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই সম্পর্কে পুলিস কমিশনার শ্রী মুখার্জি দুইজন সাব-ইন্‌স্পেক্টরকে মাসখানেক পূর্ব্বে বরখাস্ত করিয়াছেন।

একজন সার্জ্জেন্টের বিরুদ্ধে সরকারী কোয়ার্টারের মধ্যে একটি নারীকে আনিয়া তাহার সহিত একত্রে অসদাচরণ করিবার অভিযোগ পাওয়া যায়। তাঁহাকে নিম্নপদে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যান্য কয়েকটি অসদাচরণের অভিযোগও আছে; ঐ সব অভিযোগের তদন্ত চলিতেছে।

একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের বিরুদ্ধে বন্দরে আমদানীকৃত মালের মধ্য হইতে দুই বোতল হুইস্কি চুরি করার অভিযোগ আসে। প্রাথমিক তদন্তের পর তাঁহাকে আপাততঃ সাসপেণ্ড করা হয়। বিভাগীয় তদন্ত চলিতেছে এবং তাঁহাকে কেন বরখাস্ত করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে বলা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

একজন থানা অফিসারের বিরুদ্ধে নানারূপ অসদাচরণের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে; তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগসাজসে পার্ক ষ্ট্রীট এলাকায় কয়েকটি গোপন পতিতালয় চালান হইতেছিল; তাহা ছাড়া বেআইনীভাবে একটি ভোজনাগারও নাকি তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগসাজসে চালান হইতেছিল। ঐ সব অভিযোগের তদন্তসাপেক্ষে তাঁহাকে রাতারাতি টেলিফোনে অন্যত্র বদলী করা হয়।"

জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা

সোমবার কালীপূজা উপলক্ষে বেআইনীভাবে ও নিষিদ্ধ বাজি পুড়াইবার, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও মত্ততার এবং জুয়া খেলার অভিযোগে পুলিস কলিকাতা ও হাওড়ায় পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাহার মধ্যে কলিকাতায় ৪০৭ জনকে এবং হাওড়ায় ১১০ জনকে ঐ সকল অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

ঐদিন বাজি পুড়াইবার সময় শহরে প্রায় এক শত জন অগ্নিদগ্ধ হয়, তাহার মধ্যে আনুমানিক বার জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

ইহা ছাড়া টালীগঞ্জ থানা (পশ্চিমবঙ্গ পুলিস) এলাকায় বেআইনীভাবে বাজি বিক্রয়ের অভিযোগে দশজনকে এবং অবৈধ ভাবে বাজি পোড়াইবার অভিযোগে চারজনকে ঐদিন গ্রেপ্তার করা হয়।

ঐদিন কলিকাতা, হাওড়া ও ব্যারাকপুরে প্রায় চল্লিশটি অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া যায়। তবে কোনটিই সাংঘাতিক ধরনের নহে বলিয়া প্রকাশ। হাওড়ায় একটি নারিকেল গাছ আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়।

বিভিন্ন অভিযোগে ঐদিন উত্তর কলিকাতাতেই সর্ব্বাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহাদের সংখ্যা ১৪৪ জন। ইহা ছাড়া মধ্য কলিকাতায় ১৩১ জন, দক্ষিণ কলিকাতায় ১০০ জন এবং পোর্ট এলাকায় ৩২ জন আন্দাজ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পুনর্গঠন

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রাক্তন অধিকারিবর্গের পদত্যাগ সম্পর্কে "আনন্দবাজার পত্রিকার" নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্য করিয়াছিলেন। ইহা প্রশ্নোত্তর মাত্র কিন্তু ইহা হইতেই সমস্যার গোড়ার কথা বুঝা যায়। এইজন্য আমরা ইহা তুলিয়া দিলাম। সভাপতি মহাশয়ের উত্তরও প্রণিধানযোগ্য:

"পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাগণের একযোগে পদত্যাগের পর সোমবারের মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিকাংশ সদস্যও পদত্যাগ করেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সোমবার সায়াহ্নে কংগ্রেস ভবনে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভায় সমগ্র কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে বাতিল করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আগামী ২৫শে নবেম্বর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় সভাপতি ও অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাগণ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পদত্যাগ ও বাতিলের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নূতন কর্ম্মকর্ত্তৃমণ্ডলী ও সমিতি গঠন করিবার জন্য সমিতি সুপারিশ করেন। ইতিমধ্যে বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তৃমণ্ডলী এবং বর্ত্তমান সমিতিই কাজ চালাইতে থাকিবেন। ২৫শে তারিখের পূর্ব্বেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

"কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাপতি শ্রীঘোষ না হয় সভাপতিপদ ত্যাগ করিতেছেন; কিন্তু অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাগণ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক যোগে পদত্যাগের কি কারণ ঘটিল সভাশেষে সাংবাদিকদের এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে সভায় উপস্থিত শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (খাদ্যমন্ত্রী) বলেন যে, সভাপতিকে কেন্দ্র করিয়াই অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাগণসহ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কাজ চালাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সভাপতি যখন পদত্যাগ করিতেছেন, তখন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে নূতন সভাপতি ও তাঁহার আস্থাভাজন নূতন কর্ম্মকর্ত্তৃমণ্ডলী ও সমিতি গঠনের সুযোগদানই এই ধরনের পদত্যাগের কারণ। নূতন সভাপতিসহ নূতন সমিতি গঠনের জন্য পি. সি. সিকে ইহা 'সবুজ বাতি' জ্বালাইয়া পথ সহজ ও সুগম করিয়া দিবার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে বলা যায়।

কোন পক্ষ যদি মনে করেন যে, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঘোষের ক্ষমতা কতখানি এবং তাঁহার উপর কংগ্রেসসেবীদের কতখানি আস্থা আছে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকে তাহাই ভালভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্যই এইভাবে সকলের একযোগে পদত্যাগ হইয়াছে—এইরূপ অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি শ্রীঘোষ বলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কেহই কোনদিন অনাস্থা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং আস্থা পুনঃ প্রকাশের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহা ছাড়া তাঁহার প্রভাব প্রদর্শনের কোন প্রশ্নও উঠে না।"

কোজাগরী পূর্ণিমা

শ্রীসুখময় সরকার

রজোনির্মুক্ত নভোমণ্ডল আলোকে আলোকে ঝলমল করিতেছে। মৃদুমন্দ উত্তর-বায়ু অঙ্গে অঙ্গে শিহরণ আনিয়া দিতেছে। মাঠে মাঠে শ্যাম-শস্য-শীর্ষে সোনালী আভা দেখা দিয়াছে। নীল গগনের কোলে শ্বেতবলাকার সারি একখণ্ড ছিন্নসূত্র মালার মত ভাসিয়া যাইতেছে। আম্রশাখায় চক্রবাক-মিথুন জ্যোৎস্না পান করিবার আশায় আনন্দে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে। কাশ-কুসুমের শুভ্র শীর্ষে শরৎ তাহার বিদায়লিপি লিখিতেছে। পথিপার্শ্বে ঝরিয়া-পড়া রাশি রাশি শেফালী আলিম্পন রচনা করিয়াছে। তাহাদের স্নিগ্ধ সৌরভে বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে। শারদোৎসবের স্মৃতি এখনও অন্তরে জাগিয়া আছে; বিজয়ার বাদ্য এখনও যেন কর্ণপটাহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জগজ্জননীর শক্তি-মূর্তির অর্চনা সমাপ্ত হইল; পুনরায় তিনি আবির্ভূত হইতে-ছেন শ্রীরূপে। দিকে দিকে তাই সুন্দরের অনিন্দ্য প্রকাশ; প্রকৃতির বক্ষে অপরূপ লাবণ্য-বিলাস।

শূন্য চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গা-প্রতিমার বেদীটি পুনরায় সংস্কার করা হইল। তণ্ডুল-চূর্ণের বিচিত্র আলিম্পনে পূজার বেদী অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হইল। মণ্ডপদ্বারে পুনরায় শোভা পাইল মঙ্গল-কলস ও কদলী-তরু। মণ্ডপ-প্রাঙ্গণে পাল টাঙানো হইল, চারিদিকে ঝালরের মত ঝুলিতে লাগিল আম্র ও দেবদারু পল্লবের বনমালা। সানাইয়ে আবার বাজিয়া উঠিল ইমন-কল্যাণ সুর; দিকে দিকে সে সুর মায়ালোক সৃষ্টি করিতে করিতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মন্দিরের দ্বারপিণ্ডে আবার আসন পাতা হইয়াছে, নিমন্ত্রিতেরা দুই-একজন করিয়া আসিয়া তাহাতে বসিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন। বালক-বালিকার দল প্রাঙ্গণে কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে।

দিনমান শেষ হইল। পূর্বদিগন্তে পূর্ণচন্দ্র উদিত হই-লেন। জ্যোৎস্নাধারায় ধরিত্রী প্লাবিত হইল। আজ আশ্বিন-পূর্ণিমা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। বেদীর উপর কোজাগরী-লক্ষ্মীর প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে। শিল্পীর নৈপুণ্যে সে প্রতিমা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা, রক্তবসনা, স্নিগ্ধ নয়না দেবী—পদ্মের উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার শিরে স্বর্ণমুকুট, করে কঙ্কন-কেয়ূর-বলয়, কণ্ঠে হার, কর্ণে কুণ্ডল। তাঁহার এক হস্তে ঝাঁপি, অপর হস্তে শস্য-শীর্ষ। তাঁহার অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত চরণযুগল পদ্মের উপর স্থাপিত। চরণ-কমলের পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি পেচক।

দেবীর পূজা মধ্যরাত্রিতে। কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই তাহার বিপুল আয়োজন চলিতেছে। কুলললনাগণ প্রতিমার পার্শ্বে দীপবৃক্ষের উপর সারি সারি প্রদীপ সাজাইয়া দিতে-ছেন। ডাক-সাজ ও বার্নিশের উপর প্রদীপ-শিখার সেই আলো প্রতিফলিত হওয়ায় প্রতিমা ঝলমল করিতেছে। একে একে নৈবেদ্যের উপকরণ আসিয়া দেবীর নিকট জড়ো হইতেছে। নৈবেদ্যের মধ্যে শুষ্ক চিপিটক ও খণ্ডিত নারিকেল প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় নারিকেল-চিপিটক একটি অপরিহার্য নৈবেদ্য। পূজার জন্য নানাপ্রকার ফুল আসিয়াছে; কয়েকটা পদ্মফুলও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। পদ্মালয়া লক্ষ্মীদেবীর পূজায় পদ্মফুল অবশ্যই চাই।

পূজার আনন্দোৎসব পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আজ কোজাগরী, রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে। দেবী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, "কো জাগরঃ?" (কে জাগিয়া আছ?) রাত্রি জাগরণের নানাবিধ আয়োজন হইয়াছে। অদ্য রাত্রি জাগরণের জন্য অক্ষক্রীড়া করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের বিধান। প্রবীণ ও প্রৌঢ়েরা পূজার দালানের এক পার্শ্বে পাশা খেলার আসর জমাইয়াছেন। প্রবীণা ও প্রৌঢ়ারা অপর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই কোজাগর-ব্রত করিয়াছেন; সমস্ত দিন উপবাসিনী আছেন, তদুপরি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ-বা সাংসারিক গল্প জুড়িয়াছেন, কেহ-বা লক্ষ্মী-চরিত্র পাঠ করিয়া অপরকে শুনাইতেছেন। কন্যারা ও বধূরাও মণ্ডপে আসিয়া জুটিয়াছেন। তাঁহারা পূজা ত অবশ্যই দেখিবেন, তাহার সহিত দেখিবেন পূজোপলক্ষে অনুষ্ঠিত যাত্রাভিনয়।

পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইয়া যায়। অতঃপর পুরোহিত আসিয়া যথাবিধি পূজা আরম্ভ করেন। যাঁহারা ভক্তিভাবাপন্ন, তাঁহারা খেলাধূলা,

পান্নবাজনা, গন্ধ-গুজব ছাড়িয়া পল্লনারী কৃত্তবাসে যুক্তকরে দেবী-প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেবীর আমন্ত্রণ-অধিবাস করেন, পরে দেবীর ধ্যান করেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তন্ময় হইয়া সকলেই ধ্যান-মন্ত্র শ্রবণ করে। নিশীথের নৈঃশব্দের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রের আবেগপূর্ণ আবৃত্তিতে চারিদিকে একটা অনির্বচনীয় ভাবের মায়াজাল সৃষ্টি করে। মন্ত্রের অর্থ যে বুঝিতে পারে না, তাহারও শুনিতে ভাল লাগে। কেহ-বা ধুনাধারে ধুপচূর্ণ দিয়া পাখার বাতাসে সমস্ত মণ্ডপটিকে সুরভি সম্পৃক্ত-ধূমময় করিয়া তোলে। কেহ-বা চামর লইয়া দেবী-প্রতিমাকে ব্যজন করিতে থাকে। পূজান্তে দেবীর আরতি হয়। ঢাক-ঢোল, শঙ্খ ঘণ্টা, কাঁসী বাঁশী বাজিয়া উঠে। তখন আর কেহ পাশা-খেলায় মাতিয়া থাকিতে পারে না। আরতি দর্শন করিতে ছুটিয়া আসে। বালক-বালিকারা আরতির বাদ্যের তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। আরতির পর পুষ্পাঞ্জলি। যাঁহারা ব্রত করিয়াছেন, তাঁহারা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করেন। তার পর ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ। নানাবিধ ফলের সহিত নারিকেল এবং নানাবিধ মিষ্টান্নের সহিত চিপিটক (চিঁড়া) দেবীর প্রসাদরূপে বিতরিত হয়। অদ্য নারিকেল-চিপিটক ভক্ষণ শাস্ত্রীয় বিধান।

প্রসাদ-বিতরণ শেষ হইতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর প্রায় অতিক্রান্ত হইয়া যায়। তখন পূজা-প্রাঙ্গণে যাত্রার আসর বসে। নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যে দুই-চারি জন ঘুমাইয়াছিলেন, তাঁহারাও যাত্রার আসরের ঐকতান বাদ্য শুনিয়া জাগিয়া উঠেন এবং পূজা প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হন। যাত্রা আরম্ভ হয়। পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত যাত্রা-গান চলিতে থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই যাত্রাভিনয় উপভোগ করেন। সারারাত্রি জাগিয়া থাকিতে কেহ কষ্টবোধ করেন না। অনেক স্থানে রাত্রি জাগরণের জন্য 'টাট্টু ঘোড়ার নাচ', কবি-গান ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামের লোকে কোজাগরীর উৎসব-রজনী এইরূপে বিনিদ্রভাবে যাপন করে। শহরের লোকে আজকাল সিনেমা দেখিয়া রাত্রি জাগরণ করে। সেখানে লক্ষ্মীপূজায় নানারূপ অদ্ভুত অনুষ্ঠানও দেখা যায়, যাহা আমাদের সংস্কৃতির বিরোধী।

কৌতূহলী মনে সহজেই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে,—লক্ষ্মী কে? আমরা লক্ষ্মীপূজা করি কেন? কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার বৈশিষ্ট্যগুলি, যথা—অক্ষক্রীড়া, নারিকেল-চিপিটক ভক্ষণ, রাত্রি-জাগরণ ইত্যাদির কারণ কি? এত দিন থাকিতে আশ্বিন-পূর্ণিমায় এই উৎসব বিহিত হইল কেন? এই উৎসব কতকাল ধরিয়া চলিতেছে? এখানে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

আমরা সকলেই জানি, লক্ষ্মী ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার অর্চনা করিলে ধনলাভ হয়। প্রাণধারণের জন্য ধন একান্ত আবশ্যক, সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ধনের প্রয়োজন মানুষ ত চিরকালই অনুভব করিয়াছে, তাই বলিয়া লক্ষ্মীপূজা কি আবহমান কাল প্রচলিত? পুরাণে লক্ষ্মীদেবী আছেন, সেখানে তিনি বিষ্ণু প্রিয়া। লক্ষ্মী-নারায়ণের বাস বৈকুণ্ঠে; মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারা যুগে যুগে কতই না লীলা করিয়াছেন! ভক্তের নিকট এ সব সত্য-ঘটনা; জ্ঞানীর নিকট এ সব কাব্য-কথা। যজুর্বেদেও লক্ষ্মীসূক্ত আছে; কিন্তু লক্ষ্মী যে নারায়ণ-দয়িতা বৈকুণ্ঠেশ্বরী, এমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রায় সকল পুরাণে দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। সমুদ্র-মন্থনের শেষে ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভবা লক্ষ্মী বিষ্ণুবক্ষে স্থান পাইলেন। সূর্যই যে বিষ্ণু, বৈদিক সাহিত্যে তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। প্রবন্ধান্তরে আমি তাহা দেখাইয়াছি, এখানে বাহুল্যভয়ে বিস্তার করিলাম না। সূর্য যদি বিষ্ণু হইলেন, তবে বিষ্ণু-দয়িতা লক্ষ্মীও নিশ্চয় তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতেন। করিতেন কেন, এখনও করেন। তবে প্রত্যহ নহে, ঐ লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন। এখানে সামান্য জ্যোতিষিক আলোচনা আসিয়া পড়িতেছে। আশা করি, পাঠক বিরক্ত হইবেন না; যথাসম্ভব সহজভাবেই বিষয়টি আলোচনা করিতেছি।

আশ্বিন-পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। সেদিন চন্দ্র অশ্বিনী নক্ষত্রে থাকেন। পূর্বদিগন্তে সায়ংকালে অশ্বিনী নক্ষত্রের সহিত যখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যান। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব ১৮০° অংশ। অশ্বিনী হইতে ১৮০° অংশ দূরে চিত্রা নক্ষত্র। রাশির হিসাবে চিত্রা নক্ষত্রই কন্যারাশি। অতএব আশ্বিন-পূর্ণিমার দিন সূর্য কন্যারাশিতে অবস্থান করেন। গ্রীক খ-গোল চিত্রে কন্যারাশির নাম ভার্গো (Virgo)। কন্যা ও ভার্গো সমার্থক শব্দ; ইংরেজী ভার্জিন (Virgin)। গ্রীক খ-গোল চিত্রে দেখুন, ভার্গোর হাতে একগুচ্ছ শস্য। আমাদের লক্ষ্মীদেবীও শস্য-শীর্ষ-পাণি। প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দুগণের ভাবনার (conception) এই সাদৃশ্য হইল কিরূপে? কে কাহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছে? এখানে সে তর্কে যাইব না। কিন্তু এই যোগাযোগ হইতে প্রমাণ পাইতেছি, এককালে কন্যারাশিতেই লক্ষ্মী-প্রতিমার কল্পনা হইয়াছিল। আশ্বিন

পূর্ণিমার প্রদোষে কন্যারূপিনী লক্ষ্মীর সহিত সূর্যরূপ নারায়ণের মিলন হয়; এই হেতু আমরা উক্ত দিবসে লক্ষ্মী-পূজা করি। কন্যারাশির অনতিদূরে ছায়াপথ (milky way) শুভ্রবর্ণ ছায়াপথই পুরাণের ক্ষীর-সাগর। পুরাণকারের কল্পনায় শুভ্র ক্ষীর-সমুদ্র হইতে কন্যারূপিনী লক্ষ্মী উত্থিত হইয়াছেন। (চিত্র পশ্য)।
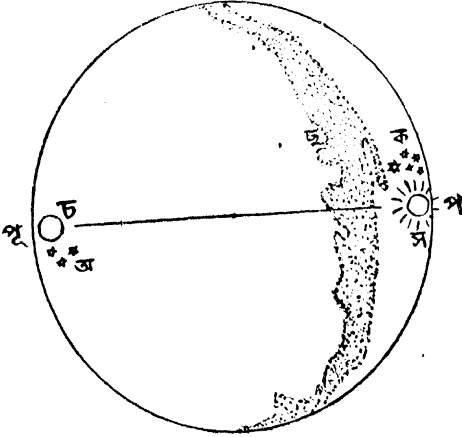
লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন
(দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া চিত্র দেখিতে হইবে)
পূ—পূর্ব দিগন্ত: প—পশ্চিম দিগন্ত।
চ—চন্দ্র; অ—অশ্বিনী নক্ষত্র। স—সূর্য (নারায়ণ);
ক—কন্যারাশি বা চিত্রানক্ষত্র (লক্ষ্মী)।
ছ—ছায়াপথ (ক্ষীরোদ-সাগর)।

ঋগ্‌বেদে লক্ষ্মীদেবীর নাম নাই। এই কারণে কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মী বৈদিক দেবতা নহেন। 'লক্ষ্মী' নামটি ঋগ্‌বেদে না থাকিলেও সেখানে এক দেবী আছেন, যাঁহার সহিত লক্ষ্মীর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। তিনি ইলা। ঋগ্‌বেদে ইলার যে প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়, তিনি জীবধাত্রী ধরিত্রী। রোমকপুরাণের সেরিস (Ceres) দেবীর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য দেখা যায়। সে যাহা হউক, বেদের ইলা দেবীই যে পুরাণে লক্ষ্মীতে পরিণত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋগ্‌বেদের সূর্য-সনাথা ধরিত্রী ইলাই পুরাণের বিষ্ণু-দয়িতা লক্ষ্মী। তবে যে পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, কন্যারাশিই লক্ষ্মী-প্রতিমা; ইহার সহিত তাহার সামঞ্জস্য কোথায়? কন্যারাশি লক্ষ্মী নহেন, 'লক্ষ্মীর প্রতিমা', এইটুকু বুঝিলেই সামঞ্জস্য হইয়া যায়। বৈদিক দেবতাগণ প্রাকৃতিক শক্তিমাত্র; কিন্তু এক এক নক্ষত্র-মণ্ডলে তাঁহাদের প্রতিমা কল্পিত হইয়াছিল। ইলা ধরিত্রী, কিন্তু তাঁহার প্রতিমা কল্পিত হইয়াছিল কন্যারাশিতে অর্থাৎ চিত্রা নক্ষত্রে।*

পূর্বে যে লক্ষ্মী-প্রতিমার বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে হস্তী নাই। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানে চারিটি হস্তীর উল্লেখ আছে; তাহারা শুণ্ড দ্বারা জলপূর্ণ ঘট লইয়া দেবীকে স্নান করাইতেছে। এই চারি হস্তী প্রকৃতপক্ষে চারিটি দিগ্‌গজ; ইহারা পূর্বাদি চারিদিক রক্ষা করে। হস্তী মেঘের দ্যোতক। হস্তিগণ লক্ষ্মীদেবীকে স্নান করাইতেছে; প্রকৃত ব্যাপার আকাশ ভাঙ্গিয়া বর্ষা নামিয়াছে, অম্বুবাচী হইয়াছে; আর সেই বর্ষাধারায় ধরিত্রী প্লাবিত হইতেছেন। লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় শুষ্ক চিপিটক ও নারিকেল ভক্ষণের যে বিধি আছে, এক্ষণে তাহার হেতু বুঝিতে পারা যাইতেছে। সেদিন প্রবল বর্ষণ-হেতু অন্য খাদ্য সংগ্রহ করা কিংবা অন্ন পাক করা কষ্টকর হইত; এই কারণে লোকে শুষ্ক খাদ্য ও শুষ্ক ফল খাইয়া থাকিত। এখন আর লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় বর্ষা নামে না; অদ্যাপি কিন্তু আশ্বিন-পূর্ণিমায় নারিকেল-চিপিটক ভক্ষণ করিয়া আমরা সেই স্মৃতি রক্ষা করিতেছি।

লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় অক্ষক্রীড়া ও রাত্রি-জাগরণ শাস্ত্রীয় বিধান। উৎসবের এই দুইটি অঙ্গ হইতে বুঝিতেছি, এককালে আশ্বিন-পূর্ণিমায় নববর্ষ হইত। বৎসরের প্রথম দিনে অক্ষক্রীড়ায় জয়লাভ হইলে সারা বৎসর বিজয় হইবে, এই বিশ্বাস হইতে উক্ত দিবসে অক্ষক্রীড়ার প্রবর্তন হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সেদিন অক্ষক্রীড়ায় সকলেরই বিজয় হয়। দীপালীর পরদিন দ্যূত-প্রতিপদেও অক্ষক্রীড়া বিহিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানও এককালের নববর্ষ-দিবসের স্মৃতি বহন করিতেছে। নববর্ষ-দিবসকে স্মরণীয় করিবার জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল, এখনও আছে। রাত্রি-জাগরণ তাহাদের মধ্যে একটি। প্রাচীন-কালে যখন পঞ্জিকা ছিল না, তখন নববর্ষ-দিবসকে বৈশিষ্ট্য দান করিবার জন্য রাত্রি-জাগরণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং রাত্রি-জাগরণের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও করিতে হইত। দ্যূত-ক্রীড়া রাত্রি-জাগরণের অবলম্বনও বটে। ইহা ব্যতীত অভিনয়াদি দর্শন করিয়া লোকে রাত্রি-জাগরণ করিত। পেচক লক্ষ্মীদেবীর বাহন হইয়াছে; কারণ সে রাত্রিতে জাগিয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাখ্যায় পেচকের মত যে জাগিয়া থাকিতে পারে, সে-ই লক্ষ্মীর কৃপায় ধনলাভ করে।

* কৌতূহলী পাঠক এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভের জন্য আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল" গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, এককালে আশ্বিন-পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন অর্থাৎ অম্বুবাচী হইত। কোজাগরী লক্ষ্মীর ধ্যানে সেই তথ্যেরই ইঙ্গিত আছে। সেদিন যে নববর্ষ হইত, অক্ষক্রীড়া ও রাত্রি-জাগরণের বিধান হইতে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। দক্ষিণায়ন-দিন নববর্ষারম্ভের উপযুক্ত একটি জ্যোতিষিক যোগ; সুতরাং আশ্বিন-পূর্ণিমায় যে এককালে নববর্ষ হইত, এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে। এক্ষণে আমরা অনায়াসে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার প্রাচীনতা নির্ণয় করিতে পারি। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা আশ্বিন-পূর্ণিমায়। আশ্বিন-পূর্ণিমা আশ্বিনের শেষদিকে ধরিতে পারি। এখন ৭ই আষাঢ় রবির দক্ষিণায়ন হয়। অতএব দক্ষিণায়ন-দিন তদবধি প্রায় ৩½ মাস পশ্চাদ্গত হইয়াছে। অয়নদিন ১ মাস পশ্চাদ্গত হইতে ২১৬০ বৎসর লাগে। অতএব ৩½ মাস পশ্চাদ্গত হইতে ২১৬০ × ৩½ = ৮১০০ বৎসর, স্থূলতঃ ৮০০০ বৎসর লাগিয়াছে। অদ্যাবধি ৮০০০ বৎসর পূর্বে আশ্বিন-পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন ও নববর্ষ হইত; কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা সেই অতীত কালের সাক্ষী। ভারতে আর্য-সভ্যতার বয়স যাঁহারা ৪০০০ বৎসর বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, আমাদের সিদ্ধান্ত তাঁহারা কোন্ যুক্তিতে খণ্ডন করিবেন?

যেমন দিল্লী দেখতে যাই

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে শ্রীবিশাল দিল্লী তোমায়—দেখতে যে চাই মনের মত,
চৌদিকে ফুল ফলের বাগান, বনস্পতি সমুন্নত।
ওই যমুনার শ্যামল তীরে
নাগেশ্বর রইবে ঘিরে,
ফুলে ফুলে সঞ্চরিবে গুঞ্জরিবে মধুব্রত।

২

পূজার কমল দীঘির জলে ফুটবে শোনো ফুটবে কেমন?
কাশ্মীরেতে 'ডাল' হ্রদেতে এখন তারা ফোটে যেমন।
বাগ বাগিচা আলো করে—
প্রচুর গোলাপ ফুটবে ভোরে,
যুঁই বেলি চম্পকের সাথে চন্দ্রমল্লী শত শত।

৩

কাশী দেবে পবিত্রতা শিলং দেবে বনশ্রী গো—
তোমার বনে তপোবনে চরবে রাজাশ্রমের মৃগ।
ঘুরবে ময়ূর ঝাঁকে ঝাঁকে—
তটিনীর ওই বাঁকে বাঁকে
চলবে রঙিন তরীর বহর কালিন্দীতে অবিরত।

৪

রইবে তুঙ্গ হর্ম্যরাজি কর্ম্মব্যস্ত রাত্রি দিনই,—
একদিকে নৈমিষারণ্য, অন্য দিকে উজ্জয়িনী।
প্রশস্ত পথ কি শৃঙ্খলা!
আনন্দ সে পথেই চলা,—
যানবাহনের কি সঙ্গতি, জনতাও কি সংযত।

৫

আকাশ চুম্বী মন্দিরেতে আরত্রিকের বিপুল ঘটা,
নিবিড় গভীর শঙ্খধ্বনি, সুদূর বিথা আলোর ছটা।
বাদ্যে গন্ধে নৃত্যে গীতে—
আশীষ ঝরে অবনীতে
উঠবে পতিত সেথায় নমি, জুড়াইবে বুকের ক্ষত।

৬

কালিদাসের শ্লোকের মত স্নিগ্ধ হবে তোমার ভাষা,
সমৃদ্ধ ও সিদ্ধ শুচি যেই মিটাবে সকল আশা।
আখর তাহার দেবনাগরী—
ত্রিদিব ঘেঁষা তার মাধুরী,
সুধাভরা তার গাগরী নয় সে ভাষা সামান্য তো।

৭

গড়বে তুমি নূতন নূতন তক্ষশীলা নালন্দাকে,—
কতই কুবের থাকবে হেথায় ত্যজি তাদের অলকাকে।
হবে পরম ধনে ধনী—
হবে চিন্তামণির খনি
দেশ-বিদেশের মহৎ বৃহৎ নিত্য হবে সমাগত।

৮

কি ছিলে, কি হয়েছিলে, কি হয়েছ, কি যে হবে—
আমি যে তাই দেখছি ধ্যানে মন মেতেছে সে উৎসবে।
হবে না কো কারো ভীতি,
বিশ্ব সাথে তোমার প্রীতি
আদর পাবে সকল জাতি সকল ধর্ম্ম মত আর পথও।

সোনার তরীর তত্ত্বকথা

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী
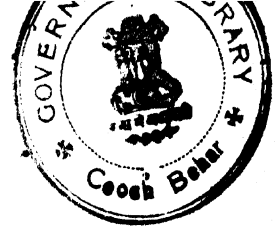
কবি য়েটস আপন উপলব্ধ কাব্যসত্যটুকু রসিকসমাজে নিবেদন করতে গিয়ে বললেন যে, মানুষের মধ্যে যে স্রষ্টার বাস তার সঙ্গে মানুষের যোগটা আত্যন্তিক নয়। কবি যে জীবনদর্শনে বিশ্বাসী, তার ধ্যান, তার ধারণা যে মূল আশ্রয়ী সেখান থেকেই আবশ্যিক ভাবে যে, তার কাব্যের পত্র-পুষ্প-সমারোহে দিক আকীর্ণ হবে এমন কথাটা ন্যায়শাস্ত্রগ্রাহ্য নয়। যদি কবির জীবনবোধ থেকেই তার সৃষ্টির উৎসার ঘটত তবে সৃষ্টিবৈচিত্র্য থাকত না রবীন্দ্রনাথ, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, সেক্সপীয়র এবং কালিদাসের অসংখ্য বর্ণবহুল সৃষ্টিতে। কবির অনুভব যখন সফল প্রকাশে ব্যক্তি অনির্ভর শিল্পরূপটুকু পায় তখন তাকে আমরা সুন্দর বলি। অনুভবের ক্ষেত্রে কোন নিষেধ নেই; আর এই অনুভবের বিস্তৃত দিগন্তেই শিল্পের অভ্যুদয় ঘটে। যা শিল্পী একদিন অনুভব করেছে তা তার কল্পনার জারক রসে জারিত হয়ে রসমূর্তি লাভ করে। সার্থক প্রকাশের ব্যঞ্জনায়। সে অনুভব বুদ্ধিশাসিত চিন্তাধনিষ্ঠ জীবন দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত নয়। জাগ্রত বুদ্ধির সঙ্গে, সচেতন চিন্তনের সঙ্গে শিল্পের এই অনৈকট্য শিল্পকে বহুধা-বিস্তৃত, অনন্ত রূপশালী করে। একই শিল্পীর সৃষ্টিসম্ভারে আমরা লক্ষ সূর্যের আলোকসম্পাত প্রত্যক্ষ করি। অনুভূতির জগতে বুদ্ধি অন্তরশায়ী, যুক্তি ফল্গুস্রোতা। অনুভূতি বুদ্ধিবহির্ভূত চেতনা নয়। যুক্তির বনিয়াদে অনুভূতির ইমারত। তাই কবির অনুভূতি বৈচিত্র্যে বিচিত্র তত্ত্বের উদ্ঘাটন করে। একই মানসে অনুভূতির উজান বেয়ে আমরা বিভিন্ন তত্ত্বকথার আবিষ্কার করি। রসাশ্রয়ী কবিকথার অন্তরলোকবাসিনী তত্ত্বকথাটুকু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বোদ্ধা পাঠকের চেতনায়।

সোনারতরী কাব্যগ্রন্থে কবিকথিত যে সব তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তার মধ্যে কর্ম-কর্মী তত্ত্ব, সৌন্দর্যলক্ষ্মী বা মানসীতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, জীবনমৃত্যুতত্ত্ব ও রবীন্দ্রদর্শনের মৌল দ্বৈতবাদ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমে আমরা কর্ম-কর্মী-তত্ত্ব আলোচনার অবতারণা করছি। সোনারতরী গ্রন্থের 'সোনারতরী' শীর্ষক কবিতাটি বহুশ্রুত, বহু-আবৃত্ত। স্বয়ং কবিগুরু এই কবিতাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাকালের পরি-প্রেক্ষণায় মনুষ্যকীর্তির অনশ্বরতার কথা বলেছেন। মহাকাল মানুষের কীর্তিকে সযত্নে গ্রহণ করে এবং তাকে রক্ষা করে। মানুষের অস্তিত্বটুকু আকস্মিক। তার অস্তিত্বের মূল্যের কোন স্বীকৃতি মহাকালের কাছে নেই। কবিকথা উদ্ধৃত করে দিই: "প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান[১] করচে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করচে, রক্ষা করচে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্চে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে ওটি কোনমতেই জমাবার জিনিস নয়।" কর্ম-অম্বিষ্ঠ আমিই অহং। মানুষের মধ্যে যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি যখন জাগতিক সুখদুঃখে বিহ্বল হন অজ্ঞান-তামসে আচ্ছন্ন হয়ে তখন দেহগত বুদ্ধিগত আমির উদ্ভব হয়, সে আমি হ'ল ব্যক্তি-আমি। সেই আমিই মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে, বিভেদ প্রত্যক্ষ করে। সঞ্চয় প্রবৃত্তিটা তারই। সে আমি মহাকালের স্বীকৃতি ধন্য নয়, একথা কবি বলছেন। আমরা বলব এই তত্ত্বের গূঢ়তর পরিণতির কথা। মানুষের কীর্তি সংসারস্বীকৃত বা কালস্ব কৃত; এই উক্তির তাৎপর্য দূরচারী হয় তখনই যখন কোন এক বিশেষ দার্শনিক মতবাদ প্রশ্রয় পায়। ভিন্নধর্মী দর্শনচিন্তায় এই ধরনের উক্তির তাৎপর্য অব্যাপক। তাই আমরা এই ব্যাখ্যাকে অধিকতর ব্যাপ্তি দিয়ে বলব যে, কবিগুরুর মগ্নচৈতন্যে মহত্তর তত্ত্বচিন্তা ছিল। সে চিন্তা অবাধিত পরম (absolute) সত্তার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তি-সত্তার সম্বন্ধ নিরূপণের চিন্তা। সংসার বা কালের সঙ্গে ব্যক্তি-সত্তার সম্বন্ধ নির্ণয়টুকুতে চরমতা বা Finality থাকে না কেননা সংসার বা কালের সঙ্গে সংসার-অতীত বা কালাতীত সত্যের সম্বন্ধটুকু অনির্ণীত থেকে যায়। এই অনির্দিষ্ট অবস্থায় চিন্তা-চরমতা অলভ্য। কাজে কাজেই আমরা ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সর্ব অস্তিত্ব-উত্তর যে পরমসত্তা তাঁর সম্বন্ধটুকু নিরূপণের জন্য চেষ্টিত। পরমসত্তার সঙ্গে যে মানুষ অপাপবিদ্ধ, কর্ম-অসংলগ্ন তার কোন আত্যন্তিক ভেদ নেই। কর্ম অম্বিষ্ঠ যে মানুষ, সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ যে মানুষের চেতনাকে ব্যর্থতা-সার্থকতায় বিচিত্র করে তুলেছে

১। রবীন্দ্ররচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৯।

তার সঙ্গে পরমসত্তার সম্বন্ধটুকু নির্ণয়-প্রয়াস সুসাধ্য নয়। যাঁরা অ্যাকাডেমিক দার্শনিক তাঁরা এই সমস্তার দিক্‌দর্শন করতে চেয়েছেন নানাভাবে। দার্শনিক ব্রাডলির কথা উদাহরণস্বরূপ বলি। তিনি ব্যক্তিসত্তার স্থান এই পরমসত্তায় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পরমসত্তায় ব্যক্তিসত্তা স্থান লাভ করে পরিবর্তিত এবং পরিণমিত হয়ে (Somehow transformed and transmuted)। মানুষের কর্ম-বিকৃত ব্যক্তিসত্তা পরিশোধিত হয়ে তবে পরমসত্তায় স্থানলাভের যোগ্যতা অর্জন করে। এই পরিমার্জন পদ্ধতি যে দুর্জ্ঞেয় এবং রহস্যময় তা দার্শনিকপ্রবর 'somehow' কথাটির দ্বারা আমাদের বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই কণ্টকিত সমস্যাটির যে সমাধান আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন তার সঙ্গে ব্রাডলির সমাধানের মৌল প্রভেদ। কবি ব্যক্তিসত্তার স্থান পরমসত্তার মধ্যে নির্দিষ্ট করলেন না। ব্যক্তির কর্ম পরমসত্তার সুবর্ণময় বিস্তারে সমাদৃত ; ব্যক্তিসত্তা সেখানে অপাংক্তেয়। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী'—সে তরী সুচিরকালের মানুষের কীর্তির বোঝাতে ভরপুর। পরমসত্তায় তাই ব্যক্তিসত্তার স্থানাভাব। পরমসত্তায় মানুষের মূল্য বা কিম্মতকে (value) রবীন্দ্রনাথ স্থান দিলেন। মানুষের কর্মে সে কিম্মতের অধিষ্ঠান। মূল্য-অন্বয়ী মনুষ্যকর্ম পরমসত্তায় বিধৃত :

> 'এতকাল নদীকূলে
> যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
> সকলি দিলাম তুলে
> থরে বিথরে—'
>
> (সোনারতরী)

সব নিঃশেষে পরমসত্তাকে নিবেদন করার পরে কবিকণ্ঠে করুণ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠল : 'এখন আমারে লহো করুণা করে'। কবি জানেন, তাঁর জন্য কোন স্থান নেই এই সুবর্ণময় তরীতে। খেয়ার কর্ণধার 'করুণা করে' কবিকে গ্রহণ করলে তবেই কবির স্থান মিলবে। স্বাধিকারে তাঁর কোন দাবি নেই ; স্থান আছে শুধু কবিকৃতির। এই পরমসত্তার স্বীকৃতিধন্য কর্মের ধর্ম কি ? এ কর্ম কি প্রায়োজনিক না পরাপ্রায়োজনিক ? কবি তাঁর 'অনাদৃত' কবিতায় এই কর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করলেন। এ কর্ম প্রায়োজনীক কর্ম। অকাজ এই কর্মধারণায় অবিধৃত। এ কাজ শিল্পীর লীলা নয়। লীলার সমাদর নেই কবির অন্তরতমের কাছে। সর্বসাধনা-সিদ্ধি কবি যাঁকে সমর্পণ করেন সেই জীবন-অধিষ্ঠান দেবতার কাছে (যাকে আমরা অবাধিত পরমসত্তা বলেছি) শিল্পকর্ম মূল্যহীন হয়ে পড়ল। কবি আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর শিল্পকর্মের কোন মূল্য নেই তাঁর দেবতার কাছে। অন্তরতমের কাছে যখন কবির আলোকোজ্জ্বল বহুবর্ণ শিল্পকৃতি অস্বীকার-লাঞ্ছিত হ'ল তখন কবি আপনমনে খেদোক্তি করলেন :

> 'ভাবিলাম, সারাদিন সারাটি বেলা
> বসে বসে করিয়াছি কী ছেলেখেলা।
> না জানি কী মোহে ভুলে
> গেনু অকূলের কূলে,
> ঝাঁপ দিনু কুতূহলে
> আনিনু মেলা
> অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা।'
>
> (অনাদৃত)

কবির শিল্পকর্ম হ'ল অনন্ত-দুর্জ্ঞেয় অরূপ-সমুদ্র থেকে রূপের ঢেলা আহরণ। এই শিল্পকৃতি মূল্যহীন হ'ল কবির অন্তরতমের কাছে। যে কর্ম ব্যবহারের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হ'ল না সে কর্ম কবির অন্তর দেবতার কাছে অগ্রাহ্য। সোনারতরীতে কবির এ প্রত্যয় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। যে কর্ম পরিশ্রমসাধ্য নয়, যে সিদ্ধিতে জীবনসংগ্রামের ধুন্ধুমার রইল না, তেমন কাজ, তেমন সিদ্ধি কবিধারণায় মূল্যহীন, কেননা তা তাঁর পরমসত্তার অস্বীকার-লাঞ্ছিত। কবির কথা উদ্ধৃত করে দিই :

> 'খুঁজি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে—
> এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে।
> কোনো দুখ নাহি যার,
> কোনো তৃষা বাসনার,
> এসব লাগিবে তার
> কিসের কাজে।
> কুড়ায়ে লইনু পুন মনের লাজে॥'
>
> (অনাদৃত)

সোনারতরীর যুগের রবীন্দ্রনাথ প্রাণবন্ত যুবক। যৌবনের প্রাণোন্মাদনা-বৈগুণ্যে কবি-ভাবিত কর্মরূপটুকু নির্ণীত হ'ল। তাই কবি-ধারণায় এই অশিল্পীজনোচিত ভ্রান্তি। উত্তরকালে বারবার প্রৌঢ় কবির কণ্ঠে এর বিপরীত তত্ত্ব ধ্বনিত হয়েছে। কীর্তির চেয়ে যে মানুষ বড় একথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের শুনিয়েছেন। পরমসত্তা২ ব্যক্তিসত্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার সব ধুলো সব মালিন্য নিয়ে তরী 'পরে আসীন হবার জন্য। পরম আশ্বাসে তরীর কর্ণধার

২। সুধীরকুমার নন্দী লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম' দ্রষ্টব্য (সম্মেলনী, পৌষ, ১৩৬৩)।

কবিকে বলেছেন : 'আছে আছে স্থান'। সোনারতরীতে ব্যক্তির জন্তও স্থান আছে, মানুষ আর অবহেলিত নয়। সোনারতরী উত্তরযুগে প্রজ্ঞায় পূর্ণতর কবিচেতনা বৃহত্তর সত্যের উদ্‌ঘাটন করলেও সোনারতরীর যুগের কবিমানস জীবনের ব্যবহারগত দিকটার প্রায়োজনিক ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে শিল্পকর্মের আত্যন্তিক মূল্যকে অস্বীকার করল।৩ কবির এ ধর্মচ্যুতি নিরপেক্ষ সমালোচকের পক্ষে অবশ্যস্বীকার্য।

এবার কবিকথিত সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা করি। পরমসুন্দর হ'ল বিদেহী। সেই পরমসুন্দরই হ'ল কবির আদর্শ। এই আদর্শ সুন্দরের ব্যঞ্জনা কবি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রাকৃতিক খণ্ড সৌন্দর্যে। বালক বয়সে কবির কর্তব্যচ্যুতি ঘটেছে বারবার এই পরম সুন্দরের আহ্বানে। পাঠশালা'-কারাগার থেকে উন্মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যনিকেতনে কবির বারবার গতায়াত ঘটেছে এই পরমসুন্দরের ইঙ্গিতে। কবি পুঁথিপত্র ফেলে, হাতের খড়ি ফেলে দিয়ে আকাশের অসীম উদারতার নীচে এসে দাঁড়াতেন তাঁর এই লীলা-সঙ্গিনীকে দেখবার জন্য। লীলারসে নিমগ্ন বালকচিত্তে পরমসুন্দরের প্রভাবটুকু কবি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন :

> "...কী বিচিত্র কথা বলে
> ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার,
> অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার।"
>
> (মানসসুন্দরী)

কবির বাল্যের লীলাসঙ্গিনী তাঁর যৌবনের অন্তরলক্ষ্মী। ইনিই সৌন্দর্যলক্ষ্মী। কবি আপন সৌন্দর্যের মাধুর্যে বিস্মিত হয়ে অন্তরে দৃষ্টিপাত করে সহসা এঁকে আবিষ্কার করলেন। পরম বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর বাল্যের খেলার সঙ্গিনীকে মর্মের গেহিনীরূপে। এই পরমসুন্দর, এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীই কবির সকল সৃষ্টির প্রেরণা। ইনিই কবি-মানসী। একদিন যে আদর্শ সুন্দরের অস্পষ্ট আভাস কবি প্রত্যক্ষ করেছেন জলেস্থলে'আপনার বালক বয়সে তাঁরই প্রতিষ্ঠা ঘটেছে পরিণত কবি-মানসের বিস্তৃত পটভূমিতে। পরমসুন্দরের কবি মানসীরূপে আবির্ভাব হয়েছে। অ্যাবস্ট্রাক্ট সুন্দরের এই বিদেহী মূর্তি কবিমানসকে নব নব সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত করলেও কবি তাঁকে চান রক্তমাংসে গড়া মানসী মূর্তিতে। সে চাওয়া 'মানস-সুন্দরী' কবিতাটির মধ্যে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। অ্যাবস্ট্রাক্ট কংক্রীট হতে চেয়েছে, গন্ধ ধূপকে আচ্ছন্ন করে থাকতে চেয়েছে। আদর্শ সুন্দরকে সীমার মধ্যে বিধৃত করতে চাইলেন কবি, দেহের তটে তার সীমা-রেখা অঙ্কিত করতে চাইলেন। কবির ব্যাকুল প্রার্থনা উচ্চারিত হ'ল :

> " সেই তুমি
> মূর্তিতে দিবে কি ধরা। এই মর্ত্যভূমি
> পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
> অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
> সব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
> করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
> ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি।"
>
> (মানস-সুন্দরী)

এই পরমসুন্দরের দেহী রূপটুকু কবির একান্ত কাম্য। কবি কংক্রীটের পূজারী, কংক্রীটের আবেদন কবি-মানসে সত্য। যা অ্যাবস্ট্রাক্ট তা অদেহী। যা ধারণার অস্পষ্ট-লোকে কুহেলি-আচ্ছন্ন তা কবিমানসকে অনুপ্রাণিত করে না। যা দেহী, যা কংক্রীট তা কবিমানসকে উদ্দীপ্ত করে। তাই ত কবি বিদেহী আদর্শ সুন্দরকে বারবার দেহান্বিত হবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। এই সৌন্দর্যানুভূতিতেই মানবজীবনের সার্থকতা। পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্যতেই তার পিপাসা চরিতার্থ হয়। আকাশের চাঁদের জন্য তিমিরাভিসার ব্যর্থ হয়। তাই ত কবি ধরণীর বিকচ সৌন্দর্যে শান্তি খুঁজে পান। দূরাশ্রিত সৌন্দর্য-আদর্শ (আকাশের চাঁদ) কবিকে তৃপ্তি দেয় না, সান্ত্বনা দেয় না। তাঁর পরিণত প্রজ্ঞা তাই পৃথিবীর সৌন্দর্যে আপন সার্থকতা চায়। বিদেহী পরম সুন্দরের অনুধ্যানে অশান্তি আর কংক্রীট সৌন্দর্যে প্রশান্তি আছে। তাই ত সুখ-দুঃখ-সমাকীর্ণ জগতে খণ্ড-সৌন্দর্যের আকর মানব-জীবনের প্রতি কবির সুগভীর আসক্তি, দুর্নিবার আকর্ষণ। খণ্ডজীবনের সার্থকতা সুন্দরের লীলা-মুখর এই পার্থিব জীবনেই মেলে।৪ 'মানসসুন্দরী' কবিতায় কবি আদর্শ সুন্দরকে দেহান্বিত দেখতে চেয়েছেন, দেহী

৩। আমরা যে তত্ত্বকথার অবতারণা করছি তা কবির ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করে নি। রবীন্দ্রনাথ কৃত ব্যাখ্যাকে আমরা অসম্পূর্ণ মনে করছি। আমরা শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করি : তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য তাঁর কাব্যসাহিত্যের উপরে বিশেষ কোনও আলো ফেলে না বরং তাঁর কাব্যসাহিত্যই তাঁর গদ্যসাহিত্যের উপর আলো ফেলে (শ্রীপ্রমথ বিশী কৃত 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবন্ধের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় তাঁর কবি-প্রতিভায়। তাই কাব্যকথিত তত্ত্বই যথার্থ তত্ত্ব। যেখানে রবীন্দ্রনাথ টীকাকার হয়েছেন সেখানে তাঁর অনুসরণ তাঁকে বোঝার পক্ষে অনুকূল নয়। কবি নিজেও কখন আপন ব্যাখ্যাকে চরম বলে মনে করেন নি এবং অন্যতর ব্যাখ্যার সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছেন। তাই আমাদের এই প্রস্তাবনা।

৪। 'আকাশের চাঁদ" কবিতা দ্রষ্টব্য।

পরম সুন্দরের সঙ্গে বিহার করতে চেয়েছেন। কবির সে প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে নি। সেই পরম বাঞ্ছাকে সত্য করে তুলতে তিনি কল্পিত জগতের (world of makebelieve) আশ্রয় নিলেন ৫. সেখানে তাঁর মানসীর সঙ্গে ক্লান্তিহীন অভিসার। তাঁর মানসলক্ষ্মী রহস্যময়ী। বিদেহী দেহরূপ পরিগ্রহ করলেও অদেহীর দুর্জ্ঞেয়তা এখনও তার দেহে মনে। তাই কবি যখনই তাঁর অভিসারিকার ঠিকানা জানতে চান তখনই তিনি নিরাশ হন। তাঁদের দ্বৈতযাত্রার উদ্দেশ্যও কবির কাছে অস্পষ্ট। সৌন্দর্যাভিসার অবশ্য উদ্দেশ্য অমূলক। যিনি পরমসুন্দর তিনি অ্যাবষ্ট্রাক্টধর্মী একথা আমরা আগেই বলেছি। এই অ্যাবষ্ট্রাক্ট সুন্দরোত্তমের স্বাক্ষর রয়েছে সংসারের যাবতীয় খণ্ড-সৌন্দর্যে। দূর পশ্চিমে অস্ত-গমনোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের বিকীর্ণ আভায়, অকূল সিন্ধুর অকূল সৌন্দর্যে এই পরম সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। মৃতদিনের শোকবিধুর প্রদোষ অন্ধকারেও তার ব্যঞ্জনা। সংশয়ময় ঘন নীল নীরের ফেনায়িত রুদ্ররূপে তারই প্রকাশ। ক্ষুব্ধ সাগরেও যেমন সে প্রত্যক্ষ, তেমনি শান্ত নির্লিপ্ত সমুদ্রসৈকতেও তার অধিষ্ঠান। পরম সুন্দর চরাচরে অভিব্যক্ত। বিদেহী আদর্শান্বিত পরম সুন্দরকে তিনি বার বার প্রশ্ন করেন:

'হোথায় কী আছে আলয় তোমার'?

এ প্রশ্নের শেষ নেই। অনাদ্যন্ত এই প্রশ্ন যুগে যুগে উচ্চারিত হ'ল। টাইগ্রীস নদীরতীরে, নীল নদের উপকূলে রূপনারায়ণের কূলে এই প্রশ্ন বহুশ্রুত। তার উত্তর মানুষের ইতিহাসে মেলে নি। এই প্রশ্নটির জবাবে এর উত্তর বিরহের নিশ্চিত রয়েছে।

মনস্তত্ত্বের Einfuhlung বা Empathy তত্ত্ব কবির সর্বগ অনুভবের পরিপ্রেক্ষণায় প্রেমতত্ত্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দার্শনিকের সহমর্মিতাকে কবি বিশ্বপ্রেমরূপে প্রত্যক্ষ করলেন। এই প্রেম হ'ল সৌন্দর্যানুভবের সোনার কাঠি। সুন্দরের সঙ্গে সৌন্দর্য উপাসকের একাত্মতা না ঘটলে সুন্দরের অন্তঃপুরে উপাসক কেমন করে প্রবেশ লাভ করবে? কবিচেতনা সুন্দরের মধ্যে আত্মহারা হয়। সামগ্রিক ভাবে কবিচেতনা সুন্দরের রূপ পরিগ্রহ করে, তবেই না সুন্দরের সার্থক অনুভব ঘটে। মরণান্তিক বিচ্ছেদদিগ্ধ পৃথিবীর সকল কারুণ্যকে মহিমময় করে প্রেম বিশ্বসংসারে বিরাজিত। তাই ত মানুষের কণ্ঠে সুন্দরের জয়গান শুনি মিলনে, বিচ্ছেদে, শোক-দুঃখের নিরন্ধ্র অন্ধকারেও:

"তবু প্রেম বলে,
'সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি'। তাই স্ফীতবুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, 'মৃত্যু, তুমি নাই।'—হেন গর্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি। মরণপীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন 'পরে
অশ্রু বাষ্পসম। ব্যাকুল আশঙ্কা ভরে
চির কম্পমান।"

(যেতে নাহি দিব)

মৃত্যুঞ্জয় প্রেম সমস্ত ভালমন্দের সংস্কার-উত্তীর্ণ। প্রেম-ধন্য নরনারী বিধাতার ক্ষমা পায়। বৈষ্ণব প্রেমের কথা কবি বললেন ৬ বৈষ্ণব প্রেমকথা শুধু বৈকুণ্ঠের তরে। এই স্বর্গীয় পরিপূর্ণ প্রেমে বুঝি মানুষের অধিকার নেই। এই পরিপূর্ণ প্রেমের পরিণত সৌন্দর্যে মানুষ অনধিকারী, একথা তাত্ত্বিক বলবেন। কবির এই তত্ত্বে সায় নেই। তিনি এই স্বর্গীয় প্রেমধারার অনন্তরসে মানুষের অধিকার স্বীকার করেছেন। প্রেমিক সৌন্দর্যের পূজারী। বিশ্ব-সংসারের লাভক্ষতির হিসাবনিকাশ তার জন্য নয়। ভাল-মন্দের তুচ্ছ বিচার প্রেমিকের কাছে, সৌন্দর্য-উপাসকের কাছে নিরর্থক। কবি প্রেমিকের বর্ণনপ্রসঙ্গে বললেন:

"সৌন্দর্যের দস্যু তারা
লুটেপুটে নিতে চায় সব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।"

(বৈষ্ণব কবিতা)

এই প্রেমের পরিণতি প্রেমেরই মধ্যে। কোন নিষেধের সংস্কার একে বাধাবন্ধ দিয়ে সীমায়িত করতে অক্ষম। এখানে পাণ্ডিত্যের বিচার নিরর্থক। ভালমন্দ আখ্যা দিয়ে এই সর্বজয়ী প্রেমকে সঙ্কুচিত করা সম্ভব নয়। ভগবানের আশীর্বাদ রয়েছে মানুষের প্রেমের ওপর। অসীম স্নেহে, পরম করুণায় মানুষের প্রেমকে তিনি ক্ষমা করেন। মানব-মানবীর আচার-সংস্কার-অতীত যে প্রেম ভগবানের আশীর্বাদ-পূত: তার সম্বন্ধে কবি বললেন:

"সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে

৫। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতা দ্রষ্টব্য।

৬। 'বৈষ্ণব কবিতা' দ্রষ্টব্য।

বিচার না করি কিছু আপন কুটীরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ঐ অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে॥"
(বৈষ্ণব কবিতা)

এই প্রেমই মানুষের সকল জ্বালার শান্তি, সব অশান্তির আশ্রয়। কবি এই প্রেমের মধ্যেই মরজীবনের এবং মর-জীবনাতীত সকল সত্তার অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষ করলেন। জীবন এবং মৃত্যুর কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় সম্বন্ধটুকুও তিনি এই প্রেমের আলোয় উপলব্ধি করলেন। মৃত্যু বেদনাদায়ক, সুভীষণ। জীবন সুন্দর, জীবন আরাধ্য। কবি এই বিপরীত অস্তিত্বের সমন্বয় ঘটালেন প্রেমের বিস্তীর্ণ পটভূমিতে। মৃত্যুর বর-বেশ; কবি-কল্পনায় মৃত্যুর প্রেমিকরূপ প্রোজ্জ্বল। জীবন যেন ক্লান্ত বধূ। বধূ যেমন পরম নিশ্চিন্ততায় একান্ত নির্ভর-তায় দয়িতের কাছে আত্মনিবেদন করে ঠিক তেমনি করেই জীবন মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। কবি সেই আত্ম-নিবেদনের রসমধুর চিত্র কল্পনা করেন:

"ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে,
আমার পরাণবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু, তখন তাহাকে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো,
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বনদানে
পাণ্ডু করি দিয়ো।
(প্রতীক্ষা)

জীবনমৃত্যু-তত্ত্ব কবির প্রেমধারণায় বিধৃত হয়ে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠল। জীবন সত্য, মৃত্যুও সত্য। তাদের মিলন, একের মধ্যে অপরের বিলীয়মানতাও কম সত্য নয়। কবি-প্রতিভায় দ্বৈতবাদ সুপ্রতিষ্ঠ। এই দ্বৈতের মধ্যে প্রেমের প্রতিষ্ঠা। কবির কাব্যদর্শনে, জীবনদর্শনে। দুইকে স্বীকার ক'রে, তাদের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েও দ্বি-অতীত প্রেমময় এক একীভূত সত্তার কথা কবিকণ্ঠে নিত্য উচ্চারিত। দ্বৈতবাদী কবি প্রেমের মধ্যে দ্বিসত্তার অস্তিত্বের সার্থকতা অবলোকন করেন। দ্বৈতে-অদ্বৈতে অভিসার নিত্যকালের, সে অভিসারও যেমন সত্য, দুজনার অস্তিত্বও ঠিক তেমনই সত্য। ধূপ-গন্ধ, ছন্দ-সুর ভাব-রূপ, অসীম সীমা, প্রলয় সৃজন ও বন্ধ মুক্তিতে কবি বিশ্বের প্রেমরহস্য প্রত্যক্ষ করেন। একে অপরের সন্নিধিতেই সত্য হয়ে ওঠে। মিলনে তাদের পরিপূর্ণ সার্থকতা। এই তত্ত্বকথা সোনারতরীতেও প্রত্যক্ষ:

"তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি, যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।"

বহুশ্রুত রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতদর্শন সোনারতরীতে অনুসৃত। এখানেও দ্বৈতের অদ্বৈতের পানে সেই মিলনাভিসার।

নব দিগন্ত

শ্রীসমর বসু

প্রায় এক সপ্তাহ হ'ল—হ্যাঁ, এক সপ্তাহই ত, এই এক সপ্তাহ ধরে প্রত্যেক দিন ঠিক বেলা সাড়ে তিনটের সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে প্রণতি। তিনটে বাজলেই সে গা-হাত ধুয়ে আসে, তার পর হাল্কা প্রসাধন সেরে অতি সাধারণ একটা আধময়লা শাড়ী পরে নেয়। ঘরের দরজায় তালা দিয়ে তার পর বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

বিশ্রী নিস্তব্ধতায় দুপুরের গলিটা যেন গুমোট আকাশের মত থমথমে। ডাষ্টবিনের পাশে আবর্জ্জনার স্তূপে খাদ্যান্বেষী কুকুর-বিড়ালের কলহ-চীৎকার মাঝে মাঝে দমবন্ধ করা নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দেয় টুকরো টুকরো করে। কোনও অসাবধানীর হাত থেকে পড়ে যাওয়ায় কাঁসার বাসনের শব্দও ভেসে আসে মাঝে মাঝে। আর মাঝে মাঝে শোনা যায় ফেরীওয়ালার টানা টানা সুর। সাড়ে তিনটে বাজার পর থেকেই গলিটা যেন হঠাৎ বেঁচে ওঠে। গভীর নীরবতার অন্ধ কবর থেকে হঠাৎ যেন বেরিয়ে আসে পাথর চাপা ফোয়ারার উচ্ছ্বাসের মত। স্কুল-কলেজ থেকে ফিরে আসা ছেলেমেয়েদের কোলাহলের মধ্যে আবার বইতে সুরু করে তার প্রাণবন্যা।

গলিতে পা দিয়েই এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে একটু দ্রুত গতিতে চলতে সুরু করে প্রণতি। কারোর সঙ্গে কোনও দিনই তার দেখা হয় না। অথচ আত্মীয়-স্বজন অনেকেই ত থাকে এই শহরে—কই কেউত এসে জিগ্যেস করে না—এই ভর দুপুরে একা একা সে কোথায় চলেছে? কেউ তার খোঁজও নেয় না। ওঃ, পৃথিবীটা কি ভীষণ স্বার্থপর!

হাল্কা প্রসাধনে আশ্চর্য্য সুন্দর দেখায় প্রণতিকে। কিন্তু অত বড় সিঁদুরের ফোটাটা ছোট্ট কপালের তুলনায় কেমন যেন বেমানান দেখায়। খুব বেশী প্রশস্ত সিঁথি রেখায় সিঁদুর যেন একটু বেশী জ্বলজ্বল করে। প্রণতির কি চোখে পড়ে না অমন সুন্দর ঢলঢলে কচি-কোমল মুখটা শুধু ঐ সিঁদুর পরার জন্যেই কেমন যেন থমথমে গম্ভীর হয়ে ওঠে গিন্নীদের মত। নইলে প্রণতির বা বয়স কত! বড় জোর উনিশ। এইত মাস আষ্টেক হ'ল তার বিয়ে হয়েছে। এখনই তার সাধ-আহ্লাদের বয়স। তবে এই বয়সে এমন তপস্বিনী হয়ে উঠল কেন প্রণতি? কিন্তু সত্যই কি সে তপস্বিনী হয়ে উঠেছে? তাই যদি হবে, তবে আজই সে হঠাৎ চমকে উঠল কেন আরসির দিকে চেয়ে! ভিজে গামছা দিয়ে সিঁদুর টিপটা তুলে দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল প্রণতি। অজানা আশঙ্কায় বুকটা তার কেঁপে উঠল। গামছাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে টিপটায় আর একটু সিঁদুর লাগিয়ে দিয়ে আরসির দিকে আর একবার তাকাল সে। মুচকে হাসতে গিয়ে চোখটা তার ছলছলিয়ে উঠল। চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে।

গলির মোড়ে এসে থমকে দাঁড়াল প্রণতি। সামনেই একটা জুয়েলারী দোকান। মুহূর্ত্তে কি যেন সে ভেবে নিল। তার পর আলতো ভাবে হাত থেকে খুলে নিল একগাছা চুড়ি। হাতটা হয়ত একটু কেঁপেছিল, চোখের কোণে হয়ত উঁকি দিয়েছিল একটি মুক্তাবিন্দু কিন্তু তা মুহূর্ত্তের জন্যেই। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল প্রণতি। মনটাকে করেছিল দৃঢ় কঠিন—অত্যন্ত বাস্তব। দেখুন ত এটা আপনারা নিতে পারেন কি না? একটু কাঁপে নি গলার স্বর। দ্বিধা সঙ্কোচের ঈষৎ কুঞ্চনও ফুটে ওঠে নি ঠোঁটের কোণে, ভ্রূতে কিংবা চিবুকে। শাড়ীটা বেশ ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে চুড়িটা সে রাখল 'শো' কেসের উপর। দোকানদার চুড়ির দিকে না তাকিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল প্রণতির দিকে। প্রণতির উনিশ বছরের আঁটসাঁট চেহারাটা নয়, অত্যন্ত সাধারণ ঐ ময়লা শাড়ীটা যেটা ঐ সুন্দর সুঠাম শরীরটার সঙ্গে নিতান্ত বেমানান, অমন ভদ্র নম্র কথাবার্ত্তার সঙ্গে যেটা নিতান্ত খাপছাড়া, যেটা শারীরিক লজ্জাকে ঢাকতে গিয়ে দৈন্যের লজ্জাকে প্রকাশ করে দিয়েছে অত্যন্ত করুণ ভাবে—সেই অত্যন্ত সাধারণ ময়লা শাড়ীটাই বেশ খানিকটা চিন্তান্বিত করে তুলল দোকানদারকে। লজ্জায় ধিক্কারে এতটুকু হয়ে গেল প্রণতি। মুখটা ঘুরিয়ে নিতেই একটুকরো অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এল ঈষৎ বিস্ফারিত তার পাতলা ঠোঁট দুটো থেকে। ছিঃ! মস্তবড় ঝকঝকে আয়নার মধ্যে তার সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বের দিকে নজর পড়তেই আবার আর্ত্তনাদ করে উঠল প্রণতি। ছিঃ, এ কাপড়টা সে কেমন করে পরে এল? এটা ত সে ছেড়ে রেখেছিল ধোপাকে দেবার জন্যে। খাটের নীচে একরাশ ময়লা শায়া-ব্লাউজের সঙ্গে এটাও ত জড়ো করা ছিল। হঠাৎ গত রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল প্রণতির, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ময়লা কাপড়-জামার স্তূপ থেকে কেন সে এই কাপড়টাই বেছে নিয়েছিল—কেনই বা সে এটা পরে আজ রাস্তায় বেরিয়েছে।

গতরাত্রে মঞ্জুই বলেছিল প্রণতিকে—গেছলেন ত হাসপাতালে, রোগী দেখতে—তা আবার সাজগোজের অত ধুম কেন? সাজ-গোজ আবার কোথায় দেখলে ভাই! এই ত একটা সাদামাটা কাপড়, তা আবার ঘরে কাচা। এর উত্তরেও মঞ্জু বলেছিল—ঘরে কাচা হলেও কাপড়টা জর্জ্জেটের এবং ওর রঙটা এত ঘোর

যে ওটা পরলে আপনাকে আগুনের মত সুন্দর দেখায়। মনে হয় এই বুঝি পুড়িয়ে সব ছারখার করে দিলেন। কথাগুলো বলেই মঞ্জু হেসে উঠেছিল—হেসে জড়িয়ে ধরেছিল প্রণতিকে। প্রণতি কিন্তু হাসতে পারে নি। মঞ্জুর হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানায় সে শুয়ে পড়েছিল। তার পর গা থেকে শাড়ীটা খুলে পাট করে রেখে দিয়েছিল বাক্সে। মনে মনে বলেছিল, ও যতদিন না ফেরে ততদিন এ শাড়ী আর ছোঁব না। আজ তাই ইচ্ছে করেই এই ময়লা শাড়ীটা বেছে নিয়েছে প্রণতি। ঘর থেকে বেরুবার সময় মঞ্জুকে একবার ডেকে দেখাবার ইচ্ছে হয়েছিল তার, মঞ্জু কিন্তু তখন ঘরে ছিল না।

—দেখুন, এতে অনেক খাদ আছে—গালিয়ে তবে··· দোকানদারের কথা শুনে চমকে ওঠে প্রণতি। বলে—তা হ'লে ওটা রেখে আমাকে দুটো টাকা দিন। পরে আমি ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।

—দেখুন আমরা ত ও কারবার করি না। তবে টাকাটা আপনি নিয়ে যান। পড়ে দিয়ে দিলেই চলবে।

পকেট থেকে দুটো টাকা বার করে 'শো'-কেসের উপর রাখল দোকানদার। একটু ইতস্ততঃ করে টাকা দুটো ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল প্রণতি—একটু দ্রুত গতিতে—ব্যস্ততার সঙ্গে। আর তার এই চলে যাওয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—"অঙ্গাভরণের" একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীঅনলকুমার দত্ত। হয়ত মনে মনে ভাবতে লাগলেন—এর পিছনে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে কোনও গভীর বেদনার এক করুণ ইতিহাস।

কোনও একটা দোকানের ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজল। —উঃ, বড্ড দেরী করে ফেলেছে প্রণতি। আর একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে সে দাঁড়াল।···ঐ ত একটা ট্রাম আসছে—। ঐটাই যাবে বেলগেছিয়ায়। অত্যন্ত গুটিগুটি হয়ে একটা 'সীটে' গিয়ে বসল প্রণতি। এই ভাবে একলা একলা কোনও দিনই সে ট্রামে যায় নি। তাই প্রথম প্রথম কেমন যেন তার ভয় ভয় করত। কেমন যেন জড়িয়ে যেত পা দুটো। শাড়ীর প্রান্ত লেগে চটিটা যেন খুলে যেতে যেতে কোনও রকমে লেগে থাকত আঙুলের ডগায়। কিন্তু এখন আর ভয়ও করে না—পা দুটো জড়িয়েও যায় না। এই ক'দিনেই বেশ অভ্যেস হয়ে গিয়েছে প্রণতির। এখন মনে হয় বাইরে যেতে গেলে বোধ হয় একলা যাওয়াই ভাল।

কিন্তু প্রণতি কি কোনও দিন চেয়েছিল ঠিক এমনি ভাবে একা একা যেতে? কোন দিন কি সে আশঙ্কা করেছিল, তার চোখের সামনে নেমে আসবে এমনি এক ভয়াবহ দুর্দিন? রোদ-ঝলমল শরতের আকাশে কালবৈশাখীর কালো অন্ধকার। রোজই ট্রামে যেতে যেতে এই কথাগুলো ভাবে প্রণতি। ভাবে, এমন কি সে অপরাধ করেছিল যা'র জন্যে ভগবান তাকে এই নিষ্ঠুর শাস্তি দিলেন? বাপ-মায়ের বিনা অনুমোদনে অরবিন্দকে বিয়ে করা যদি তার অপরাধ হয়ে থাকে তা হ'লে তার বলবার কিছু নেই। কিন্তু একজনকে মন-প্রাণ সমস্ত নিবেদন করে অন্যজনকে সামাজিক ভাবে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে যে মানসিক ব্যভিচার তার পংকিল আবর্তের মধ্যে সে ত নিজেকে ঠেলে দেয় নি। সেই অপরাধের কলুষ স্পর্শ থেকে নিজেকে সে ত অনেক দূরে রেখেছে। যে পথ একদিন মেনে নিয়ে ভারতের আদর্শ নারী বরণ করেছিল সত্যবানকে—সেই পথই ত বেছে নিয়েছিল প্রণতি।—তবে?

সেদিনকার কথা আজও মনে আছে প্রণতির—সেই যেদিন স্কুল-মাষ্টারীর চাকরী নিয়ে অরবিন্দ প্রথম এল তাদের গ্রামের স্কুলে। প্রণতির বাবা এবং গ্রামের আর পাঁচজনের দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় স্কুলটা গড়ে উঠেছিল। নূতন স্কুল। বাইরের মাষ্টাররা স্কুলেই থাকতেন। তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ভার নিয়েছিলেন গ্রামের লোকেরা। সেই সূত্রেই অরবিন্দ আসত প্রণতিদের বাড়ী। দু'বেলা শুধু খাবার জন্যে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ওদের পরিবারের সঙ্গে অরবিন্দ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। প্রণতির বাবা বাইরের ঘরটা ছেড়ে দিলেন। স্কুল থেকে বিছানাপত্তর নিয়ে অরবিন্দ একদিন এসে উঠল প্রণতিদের বাড়ী। দিনে দিনে একটু একটু করে পরস্পরকে ওরা দেখলে—মুগ্ধ হ'ল, ভালবাসলে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে একদিন কানায় কানায় ভরে উঠল দীঘি। একটি একটি তিথিডোরে একদিন পূর্ণ হ'ল পূর্ণিমা।

প্রণতি সরকারের সঙ্গে অরবিন্দ চ্যাটার্জির বিয়ে হতে পারে না—কেননা সে বিয়ে সমাজে প্রচলিত নয়। অরবিন্দের কোনও অনুরোধই টিকল না। অশ্রাব্য কটু কথা শুনিয়ে তাকে ঘর থেকে বার করে দিলেন প্রণতির বাবা। অরবিন্দ কিন্তু একলা বেরিয়ে এল না। সঙ্গে নিয়ে এল প্রণতিকে। জোর করে নয়—প্রণতি বেরিয়ে এল স্বেচ্ছায়।

কলকাতায় এসে প্রণতিকে বিয়ে করল অরবিন্দ। বহুবাজার ষ্ট্রীট সংলগ্ন একটা গলির মধ্যে মঞ্জুদের দোতালা বাড়ীর একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাসা বাঁধল তারা। স্কুল-মাষ্টারী ছেড়ে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বণিক পাড়ায় একটা চাকরী জুটিয়ে নিল অরবিন্দ।

আনন্দে-কোলাহলে দিনগুলো যে কেমন করে কেটে যেত প্রণতি তার হিসেব রাখতে পারত না। বরফগলা ঝর্ণা আকাশ-ছোঁয়া শীর্ষ থেকে পাথর ভেঙে কেমন করে নেমে আসে। নৃত্যের তালে চলার পথকে মুখর করে কেমন করে সে এগিয়ে যায় কত পাহাড় জঙ্গল পাশে রেখে, কত জনপদ পেরিয়ে কে তার হিসেব রাখে। দিনগুলো চলে যাচ্ছিল গানের মূর্চ্ছনার মত কথা থেকে ছন্দে—ছন্দ থেকে সুরে—এক গভীর আনন্দ ব্যঞ্জনায়।···তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার দুটি ছেলে এসে মঞ্জুকে যখন সেই ভয়ানক দুঃসংবাদটা দিয়ে গেল তখনও ঘরদোরের কাজ সারা হয় নি প্রণতির। সেই অবস্থাতেই মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে সে ছুটে এল

বেলগেছিয়ার হাসপাতালে। অরবিন্দ শুয়ে আছে, জ্ঞান নেই। মাথায়, হাতে, পায়ে, সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

আপিসের কোনও একটা কাজে অরবিন্দ সেদিন গিয়েছিল বরানগর। বাসে করে ফেরার পথে শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় তাদের বাসটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল একটা ট্রামের—আহত হয়ে সে ছিটকে পড়ে গেল রাস্তায়। সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে বেলগেছিয়ার হাসপাতালে।

ট্রাম থেকে নেমেই একটা ফলওয়ালার কাছে গিয়ে বসে পড়ল প্রণতি। হাসপাতালে ঢোকার 'গেটে' অনেকগুলো অস্থায়ী ফলের দোকান সাজানো। প্রণতি কিন্তু এর কাছ থেকেই রোজ ফল কেনে। নিজের অজ্ঞাতে শুকনো গলা থেকে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল। ফলওয়ালা মুখ তুলে তাকাল প্রণতির দিকে, জিজ্ঞাসা করলে—রোজই জিজ্ঞাসা করব ভাবি—কার অসুখ দিদিমনি?—স্বামীর।'—জানিনে গিয়ে কি দেখব!'—আবার বিলাপ করে উঠল প্রণতি। সিক্ত পক্ষ চোখ দুটো বন্ধ করে উদ্গত অশ্রু রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। আর তাই দেখে ফলওয়ালা আশ্বাস দিলে—সে কি হয় দিদিমনি, আপনার মত সতীলক্ষ্মীর কোন দিনই অমঙ্গল হবে না। হতে পারে না। আমি বুড়োমানুষ—এই বলে দিলাম দেখে নিও। বুড়োর চোখ দুটোর দিকে প্রণতি একবার তাকিয়ে দেখল। নিষ্প্রভ চোখের তারায় যেন জ্বলে উঠেছে সত্যদ্রষ্টার দ্যুতি। ঘন মেঘের কালো আস্তরণের আড়াল থেকে যেন ভাস্বর হয়ে উঠল মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রাখর্য্য। আশ্বস্ত হ'ল প্রণতি। মনে মনে ভাবল সবার চোখের আড়াল থেকে যে সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ সব কথাই জানতে পারেন তিনিই যেন ঐ বৃদ্ধ ফলওয়ালার মুখ দিয়ে জানিয়ে দিলেন তার আগামী কালকে। সেই অজ্ঞাত বিধাতার উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করল প্রণতি।

কিন্তু বৃথাই তার ভক্তি নিবেদন। ব্যর্থ হ'ল সত্যদ্রষ্টার পরম আশ্বাস। অরবিন্দকে বাঁচাতে পারে নি হাসপাতালের ডাক্তারেরা। অপারেশন থিয়েটারে সেই যে জ্ঞান হারিয়েছিল অরবিন্দ সে জ্ঞান আর সে ফিরে পায় নি।

খালি বিছানাটার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল প্রণতি। কাউকে কিছু প্রশ্ন করবার মত সাহসটুকুও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। নার্স-ইনচার্জ নিজে এসেই সব কথা বললেন। এমন ভাবে বললেন যেন এই বলাটাও তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। থর থর করে সারা শরীরটা কেঁপে উঠল। চোখের সামনে কেমন যেন সব ওলটপালট হয়ে গেল। খালি বিছানাটার উপর আছড়ে পড়ল প্রণতি।...

আকাশ জোড়া কালো মেঘের আড়ালেও সূর্য্য লুকিয়ে থাকে। দীর্ঘ ভয়ঙ্কর রাত্রিরও ঘটে অবসান। সাহারার উষর প্রান্তরের প্রান্তেও আছে জনপদ, আছে স্রোতস্বতী। কিন্তু প্রণতির সামনে এই মুহূর্তে যে ঘন অন্ধকার নেমে এল—তার শেষ কোথায়। তার আড়ালেও কি লুকিয়ে আছে কোনও সান্ত্বনা, কোনও আশ্বাস—বেঁচে থাকবার মত সামান্যতম অবলম্বন।...

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল প্রণতি, টলতে টলতে নয়—ধীর স্থির গতিতে। তার দৃষ্টিতে হয়ত কুয়াশা ছিল—কিন্তু চোয়ালের হাড়ে ছিল কঠিন দার্ঢ্য। বাসায় এসে মঞ্জুকে ডেকে সব কথা সে বলল। হাসপাতালের কর্তব্যরতা নার্সের মুখ থেকে কথাগুলো যেমন করে বেরিয়ে এসেছিল—আশ্চর্য্য ঠিক তেমনি ভাবেই—তেমনি সুরেই কথাগুলো বললে প্রণতি। ছলছলিয়ে উঠল মঞ্জুর চোখ দুটো—আর তাই দেখে প্রণতির বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, চীৎকার করে সে কাঁদতে চাইল, কিন্তু পারল না।

অনেক রাত্রে শ্মশান থেকে ফিরে এল প্রণতি। মঞ্জুও ছিল সঙ্গে—কিন্তু কেউ সঙ্গে না থাকলেও কোনও ক্ষতি ছিল না তার। আজ সাত দিন ধরে যে ঘরটায় সে একা রয়েছে সেই ঘরে ঢুকেই মঞ্জুকে সে বললে—তুমি শোওগে, আমার কাছে কাউকে থাকতে হবে না। আমি একটু একা থাকতে চাই। বাকী জীবনটা যাকে একাই কাটাতে হবে—সে একটু একা থাকতে চায়—আশ্চর্য্য। মনে মনে কথাগুলো আবৃত্তি করে প্রণতির মুখের দিকে একবার তাকাল মঞ্জু। না, সেখানে ঝড়ের সঙ্কেত নেই—আছে দৃঢ় সঙ্কল্পের ধৈর্য্যশীল কাঠিন্য।

এক মাস ভাড়া আগাম দেওয়া আছে—সুতরাং এখনও কিছু দিন এই বাড়ীতে থাকতে পারবে প্রণতি। মঞ্জুর মা এসে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেছেন—কি করবে মা, সবই অদৃষ্ট! আর সেই সঙ্গে অশৌচ পালনের সমস্ত ব্যবস্থা করে ফিরে গেছেন। প্রণতি শান্ত হয়েছে কিন্তু শান্তি পাইনি।

ঘরের পূর্বদিকের ছোট্ট এক চিলতে বারান্দায় এসে চুপ করে সেদিন দাঁড়িয়ে ছিল প্রণতি। ভাবছিল এই বারান্দাটুকুই ছিল তাদের প্রাণস্পন্দন—এতেই আলো, এতেই হাওয়া। নবজীবনের স্বপ্ন-মাখা সন্ধ্যাগুলো এইখানেই কাটিয়ে ছিল তারা। দূরের ঐ বকুল গাছটায় সেদিনও যেন এমনি ফুল ফুটেছিল, এমনি সন্ধ্যায় এক ঝাক পাখী সেদিনও যেন এসে বসেছিল ঐ গাছটার শুষ্ক শাখায়। ঐ নিষ্পত্র শাখাটা আজও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি চায় ও? হঠাৎ প্রণতির মনে হ'ল ওই শাখাটার মধ্যে যেন জমাট বেঁধে আছে অনেক শূন্যতার অবরুদ্ধ ইতিবৃত্ত, অনেক ব্যর্থতার ক্ষুব্ধ ইতিহাস। তাই বোধ হয় আজও ও দাঁড়িয়ে আছে। হয় ত ওর বিবর্ণ চেতনায় এখনও বেঁচে আছে কোনও সবুজ কামনা! প্রণতির বুকটাকে খালি করে দিয়ে হঠাৎ ঝরে পড়ল একটা দীর্ঘশ্বাস।

ঘরের মধ্যে চলে এল প্রণতি। অরবিন্দের সুটকেশ থেকে এক গোছা কাগজ বার করে নিয়ে খাটে এসে বসল। ছোট্ট একটা পোষ্টকার্ড তুলে নিল সেই কাগজের স্তূপ থেকে।

কল্যাণীয় অরবিন্দ,

তোমার পত্রে জানিলাম তুমি বিবাহ করিয়াছ। যাহাকে বিবাহ করিয়াছ তাহার পিতামাতা এই বিবাহে আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের আপত্তি না শুনিয়া মেয়েটিকে তুমি ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ। হয় ত তাহাকে তুমি স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়াছ—কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। তোমার কার্য্য-কলাপে যে পশুভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ক্ষমার অযোগ্য এবং সেই জন্যই আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটায় তাহাকে, বংশের বধূ বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারিব না। সুতরাং এখানে তাহাকে আনিবার চেষ্টা করিও না। ইতি

তোমার দাদা।

বিয়ের পর এদেশের মেয়েদের শ্বশুরের ভিটেই হ'ল স্বর্গাদপী গরিয়সী—জন্মভূমি নয়—এই কথাই প্রণতি জানত। তাই শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে থাকবে বলেই সে স্থির করেছিল, কিন্তু এই চিঠিখানা সে পথও বন্ধ করে দিল। এ চিঠিখানা অরবিন্দ তাকে দেখায়নি, তখন হয়ত দেখাবার প্রয়োজনও ছিল না—কিন্তু এখন কি করবে প্রণতি তবে কি সে ফিরে যাবে বাপের বাড়ী?

দরজার কড়ানাড়ার শব্দে প্রণতির চমক ভাঙল। অবসাদক্লিষ্ট শরীরটাকে কোনও ক্রমে টেনে নিয়ে দরজা খুলে দিতেই আতঙ্কে সে শিউরে উঠল। বা-বা, তুমি? প্রণতির বিবর্ণ ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ কানে যেতেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন প্রণতির মা। অনাদিবাবুর সঙ্গে তিনিও এসেছেন বোধ হয় প্রণতিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

মঞ্জুর মায়ের চিঠি পেয়েই চলে এলাম। যা হবার হয়ে গিয়েছে। এই ভাবে এখানে থাকা আর তোমার চলবে না। আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে। অনাদিবাবুর প্রাণহীন শুকনো কথাগুলো গলিত সীসার মত ঝরে পড়ল প্রণতির কানে। বুকের মধ্যে একটা দুঃসহ বেদনাপিণ্ড পাক খেতে খেতে উঠে এল উপরের দিকে—তার কণ্ঠনলী চেপে ধরে তাকে আর কিছু বলতে দিল না। দুঃসহ অভিমান প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত বুকের পাঁজরগুলোকে যেন বিদীর্ণ করে দিল। ফুপিয়ে কেঁদে উঠল প্রণতি। আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে মেয়েকে কাছে টেনে নিলেন প্রণতির মা। প্রণতির শোকক্লিষ্ট বিশীর্ণ শরীরটা হঠাৎ ইস্পাতকঠিন হয়ে উঠল যেন। ছিটকে সরে দাঁড়াল সে। বললে, এখন আর আমার ফিরে যাওয়া চলে না মা। আমার স্বামীকে যখন তোমরা ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলে—'

সে সব ত মিটে গিয়েছে মা। প্রণতিকে কথা শেষ করতে দিলেন না অনাদিবাবু। আমাদের ভুল শোধরাবার সুযোগ না দিয়েই সকলকে ফাঁকি দিয়ে সে চলে গেল ....এখন আর ও প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। আমি বেঁচে থাকতে তুমি এখানে একা পড়ে থাকবে, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমি তা হতে দেব না। খুব বেশী লেখাপড়া তুমি শেখ নি। ভাল চাকরী-বাকরী তুমি যোগাড় করতে পারবে না, তা হলে তোমার চলবে কি করে? নিশ্চয়ই তুমি এমন কোনও কাজ করবে না—যাতে আমাদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়।

ঘর ছেড়ে যখনই পালিয়ে এসেছি তোমাদের মর্য্যাদা যা নষ্ট হবার তখনই তা হয়েছে। তবে আমার মর্য্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কাজ আমি কোনও দিনই করব না। যদি কোনও দিন সাহায্যের প্রয়োজন হয় শ্বশুরবাড়ী থেকেই সে সাহায্য আমি দাবী করব—তবুও তোমাদের কাছে আমি ফিরে যেতে পারব না। না, কোনও অবস্থাতেই না।

আবার গুমরে কেঁদে উঠল প্রণতি। দু'হাতে মুখ ঢেকে খাটের উপর সে আছড়ে পড়ল।

বুকটা হঠাৎ খালি হয়ে গেল অনাদিবাবুর। শরীরটা যেন হাল্কা পাখীর মত। মাথায় হাত দিয়ে মেঝের উপর বসে পড়লেন তিনি—যেন সর্ব্বস্বান্ত বিদেশী পথিক। প্রণতি আবার উঠে দাঁড়াল। ধীর, স্থির অত্যন্ত নম্র গলায় সে বলল, তোমাদের কোনও চিন্তার কারণ নেই বাবা, আমি শ্বশুরবাড়ীতেই যাব।

পরদিন সকালে মা-বাবা চলে যেতেই ছোট্ট একটা সুটকেশে কিছু কাপড়-জামা ভরে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল প্রণতি। চরম দুঃসাহসের উপর নির্ভর করে একটা দৃঢ় বিশ্বাসকে বুকে বেঁধে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে বলেই সে ঠিক করেছে। চিঠিতে যে কথা লিখেছিলেন ভাশুর সেটা হয়ত রাগ-অভিমানের কথা—অন্তরের কথা কিছুতেই নয়। অন্ততঃ তার এই অবস্থায় তার ভাশুর যে কোনও রকমেই ঘর থেকে তাকে বার করে দিতে পারবেন না এ বিশ্বাস আছে প্রণতির।

রাস্তার দু'ধারে সে একবার তাকিয়ে দেখল, দোকানপসরা ঠিক সেই রকমই সাজানো আছে—ট্রাম-বাস গাড়ী ঠিক সেই রকমই দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। পথচারীদের ব্যস্ততাও ঠিক সেই রকমই। কোথাও এতটুকু কোনও জিনিসের নড়চড় হয় নি, যেমন আগে ছিল সব ঠিক তেমনই আছে। ক্ষয়ক্ষতি যা হবার শুধু প্রণতিরই হয়েছে, শুধু তারই জীবনে ঘটেছে এই মর্ম্মান্তিক পরিবর্ত্তন। রাস্তার এই প্রাণচঞ্চলের মধ্যে সে যেন অত্যন্ত বেমানান, অবাঞ্ছনীয় অতিরিক্ত। তবুও ত সে বেঁচে আছে। আজ এই মুহূর্ত্তে দুনিয়ার যত মানুষ বেঁচে আছে তার মধ্যে সেও ত একজন। কিন্তু আর পাঁচ জনের মত সেও কি বেঁচে থাকতে চায়? হঠাৎ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল প্রণতি। আর ঠিক সেই সময় একটা ছোট ছেলে ছুটে এল তার কাছে। বললে, আপনাকে দোকানে ডাকছে। প্রণতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দোকানের দিকে। "অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের" একমাত্র স্বত্বাধিকারী অনল দত্ত ঘাড় দুলিয়ে তাকে আহ্বান জানাল। প্রণতির মনে পড়ে গেল সেই দুটো টাকার কথা। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল মঞ্জুর কাছ থেকে মাত্র পাঁচ টাকা ধার নিয়ে সে আজ পথে বেরিয়েছে। দুটো টাকা ফেরৎ দেওয়ার মত সঙ্গতি তার নেই।

দোকানে এসেই অত্যন্ত লজ্জা জড়ানো গলায় সে বললে—

দেখুন, আপনার দুটো টাকা দিতে পারি নি বলে কিছু মনে করবেন না। দু-একদিন পরে পাঠিয়ে দেব।

প্রণতির দিকে অবাক হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অনল দত্ত। সারা শরীরে একি বিবর্ণ রুক্ষতা। বর্ষার চলনামা দুকুল ছাপা শ্রাবণের ভরা নদী দেখে অনল একদিন মুগ্ধ হয়েছিল, আর আজ সেই নদীটাই শুকনো শীতের মলিন শীর্ণতাটুকু বুকে নিয়ে বিস্তীর্ণ বালুশয্যায় শুধু চিক্‌চিক্‌ করছে—কে জানে কিসের আশ্বাসে! অনল আর একবার ভাল করে দেখে নিল প্রণতিকে। ছিঃ, ছিঃ, আপনাকে সেজন্তে ডাকি নি। দুটো টাকার জন্য আপনাকে এইভাবে তাগাদা দেব একথা স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারি না। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বলেই আপনাকে ডেকেছি।

একটু ভেবে নিয়ে, গলাটা আর একটু পরিষ্কার করে নিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভাষায় সুরু করল অনল। আমার এক কর্মচারীর কাছে শুনলাম আপনার দুর্ভাগ্যের কথা। জানতে পারলাম আপনি বিপন্নাপন্ন, তাই আপনাকে ডেকেছি—যদি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমার কাছে কোনও লজ্জা সঙ্কোচ করবেন না। দরকার হলে—যদি আপত্তি না থাকে এখানে একটা চাকরীও পেতে পারেন।

কিসের চাকরী? বুকে যেন অনেক সাহস পেল প্রণতি। ডুবে যাওয়া মানুষটি যেন সামনে দেখতে পেল ভাসমান একটি কাষ্ঠখণ্ড।

বিশেষ কিছুই নয়। এইখানে দাঁড়িয়ে 'কাষ্টমার অ্যাটেণ্ড করা।' আজকাল প্রত্যেক দোকানেই 'সেলস গার্ল' রাখা চালু হয়েছে। এতে নাকি ব্যবসা ভাল চলে। সুতরাং আপনাকে পেলে আমরা উপকৃত হব।

কিন্তু আপনার দোকানের যারা 'কাষ্টমার' তারা ত বেশীর ভাগ মেয়ে। আমাকে রেখে বোধহয় আপনার বেশী লাভ হবে না। অনঙ্গের সঙ্গে এইভাবে ভঙ্গী করে কথা কইছে প্রণতি। ওঁর সঙ্গে কি-ই বা পরিচয় তার। অত্যন্ত বিপদের সময় দুটো টাকা উনি সাহায্য করেছেন সত্যি, কিন্তু তখন ত সাহায্য চায় নি প্রণতি—হাত থেকে চুড়িটা সে খুলেও দিয়েছিল। কিন্তু আজ? আজ কি প্রণতির কোনও সাহায্যেরই প্রয়োজন নেই? উনিও সেই সাহায্যেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—কে জানে দূরের মানুষ কখন কেমন করে এমন কাছে চলে আসে। সোজাসুজি অনলের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল প্রণতি। চোখ দিয়ে একবার জরীপ করে নিল ওর মনের বিস্তৃতি! অলিতে-গলিতে কোথাও কোন আবর্জ্জনা লুকিয়ে আছে কিনা, চকচকে পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ালে কোনও পশু গা-ঢাকা দিয়ে আছে কিনা—অনেকক্ষণ তার সন্ধান করল। তার পর বোধ করি আশ্বস্ত হয়েই বললে—যদি প্রয়োজন হয় আপনার কাছেই আসব।

নিজের পরিচয় দিয়ে এবং দুরবস্থার কথা জানিয়ে শ্বশুর-বাড়ীতে যখন গিয়ে দাঁড়াল প্রণতি, তখন কেউ এলনা ওকে হাত ধরে তুলে নিয়ে যেতে। কেউ জিজ্ঞেসও করল না অরবিন্দের কি হয়েছিল। সংসারের এই দিকটায় যে এত গভীর অন্ধকার, এত শ্বাসরুদ্ধ দুঃসহ সঙ্কীর্ণতা সংসার-অনভিজ্ঞা প্রণতির অজানা ছিল না। ফিরে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াল। বাড়ীর সামনের চওড়া পীচঢালা রাস্তা দিয়ে একটা মোটর চলে গেল। শুকনো পীচের উপর ভিজে টায়ারের দাগ। সারা শরীর শিরশিরিয়ে উঠল প্রণতির। মনে হ'ল ওর পিঠের উপর কে যেন চাবুক মেরেছে, আর সেখানেও ফুটে উঠেছে ঠিক ঐ রকম রক্তঝরা দাগ। পিঠের উপর একবার সে হাত বুলিয়ে নিল।

সেই থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছ! চল ভেতরে গিয়ে বসবে চল। আমি অরুর পিসী। পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে প্রণতি সোজা হয়ে দাঁড়াল। বাঁধ-ভাঙা নদীর মত একরাশ লোনা-জল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ওর চোখের কোণে।

প্রণতি জানত না তার মনের মধ্যেও জমেছিল এত হাহাকার। একটু স্নেহের ছোঁয়া, একটু সান্ত্বনা, একটু আদর করে ডাকা—তার জন্যে এত কাঙাল হয়েছিল তার মন। পিসীমা আঁচল দিয়ে প্রণতির চোখ মুছিয়ে দিলেন, নিজের কান্না কিন্তু রোধ করতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, অরুর আপিস থেকে আমরা খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার কথা এতদিন আমাকে কেউ জানায় নি। মাত্র কাল রাত্রে শুনলাম বৌমার কাছ থেকে—যে অরু বিয়ে করেছিল—তার বৌ আছে।

প্রণতির আশ্রয় মিলল শ্বশুরবাড়ীতে। শুধু পিসীমার জোরেই তাকে সংসারের একজন বলে স্বীকার করে নিল—অহীন আর তার স্ত্রী। অরবিন্দের দাদা আর বৌদি। বাবা মার দুটো আসন একাই অধিকার করে নিয়ে আছেন পিসীমা অনেকদিন, তাই তাঁর উপর আর কারও কথা চলে না।—তা ছাড়া একটা কাজের লোকেরও প্রয়োজন। ঝি-চাকরাণীকে দিয়ে ত সব কাজ হয় না। রাতদিনের লোক রাখতে গেলেও অনেক পয়সা বেরিয়ে যাবে, তার চেয়ে এই ভাল। দুবেলা দুটো খাবে বইত নয়, আর পরণের কাপড়। ও আমার যা আছে তাইতেই চলে যাবে। হলেই বা বিধবা—থান পরা ত আজকাল উঠেই গেছে। স্ত্রীর যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো শুনে অহীন একটু হাসল, হয়ত ভাবলে এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী না পেলে তার কি দুর্দ্দশাই না হ'ত। বললে, তা তুমি যখন বলছ তখন থেকেই যাক। সুতরাং প্রণতির আশ্রয় মিলল শ্বশুর বাড়ীতে।

পিসীমার শূন্য হৃদয়ের অন্তরালে বোধ হয় লুকিয়েছিল অনেক জমাট বাঁধা বেদনা। জীবনের দীর্ঘপথে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এসেও কৈশোর সীমান্তের সেই স্বপ্নমাখা স্মৃতিখানি আজও ভুলতে পারেন নি পিসীমা। তাই প্রণতিকে তিনি টেনে নিলেন তার শূন্য বুকে যেখানে কান পাতলে আজও হয়ত শোনা যাবে সাহানার আকুল মূর্চ্ছনা। কৈশোরের খেলাঘরে কখন কোন

ফাঁকে তিনিও ভালবেসে ফেলেছিলেন পাড়ারই একটি ছেলেকে—যার সঙ্গে কোন রকমেই বিয়ে হওয়া, সে যুগে সম্ভব ছিল না। বিয়ে হ'ল যার সঙ্গে তাকে 'স্বামী দেবতা' বলে ভক্তি জানালেন অনেক—কিন্তু ভালবাসতে পারলেন না কোনও দিন। বিধবা হয়ে হয়ত কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু বেদনা পান নি একটুও। মনের ফাঁকে কোথাও যেন তাঁর লুকিয়েছিল এক বিরাট ফাঁকি, সেই ফাঁকিটাই সত্য হ'ল—ফাঁকটুকু আর ভরল না। তবুও এতদিন বেঁচে আছেন পিসীমা সেই স্মৃতিটুকুকেই বুকে নিয়ে। প্রণতির মধ্যেও তিনি দেখতে পেলেন—পাথর হয়ে যাওয়া সেই একই বেদনার ইতিহাস। পেয়ে হারানো আর না পেয়ে হারানো একই বেদনার দুটো রূপ।

পিসীমার কাছ থেকে একে একে সবই শুনল প্রণতি। কোথাও কোনও কিছু আর গোপন রইল না। পিসীমা নিজের কথা বললেন, বললেন অরবিন্দের কথা, তার বাবা-মার কথা, অহীনের কথা, বড় বৌমা আর তার বাপের বাড়ীর কথা। প্রণতি কিছু শুনল, কিছু হয়ত শুনল না। কিন্তু যেটুকু শুনল—তাইতেই জ্বালা ধরল প্রণতির মনে, দারুণ বেদনা সে অনুভব করল মস্তিষ্কের কোষে। বিবেকের উপর কে যেন চাবুক মারল বার বার। বাড়ীতে একজন রাতদিনের ঝিয়ের দরকার তাই তাকে রাখা হয়েছে। উঃ, এত বড় অপমান! ওরা কি ভেবেছে প্রণতি ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে, সাহায্যের প্রত্যাশায়? এ বাড়ীতে ওর কিছুই কি দাবী নেই? এই যে ঘরদোর, জমী-জায়গা, বাগান, পুকুর, ফসল, এর কোনও কিছুতেই কি এতটুকু অধিকার নেই প্রণতির?

আছে—দাবী অধিকার সবই আছে তার। ইচ্ছে করলে বাকী জীবনটা এইখানেই সে কাটিয়ে দিতে পারে। জমিজায়গা যা আছে তাতে মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কোনও দিনই হবে না। তবুও এই বিষাক্ত পরিবেশে, শ্বাসরুদ্ধ অবমাননার মধ্যে তিলে তিলে মরে যেতে পারবে না প্রণতি। প্রণতিকে বাঁচতে হবে—নিজের জন্যেই প্রণতি বেঁচে থাকতে চায়। স্বাভাবিক, সহজ সুস্থ জীবন আজও সে কামনা করে। অনেক ভেবে, অনেক চিন্তা করে তবেই সে বুঝতে পেরেছে তার জীবনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে অপমৃত্যু তার সুষ্ঠু সমাধান নয়। তার জীবন-পথের শেষ মাইলষ্টোন্ এখনও অনেক দূরে—ভবিষ্যতের অতলান্ত গভীরে।

ছোট ছেলের বৌকে দেবেন বলে শাশুড়ী যে গহনাগুলো পিসীমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন, যেগুলো সেদিন প্রণতির হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন পিসীমা, সেই গহনাগুলো সুটকেসের মধ্যে রেখে কাউকে কিছু না বলে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল প্রণতি। বেরিয়ে পড়ল অনির্দ্দেশ্য যাত্রায়, ভাগ্যের পরীক্ষায়—বাঁচবার তাগিদে, কিংবা অজ্ঞ কিছুর গভীর আহ্বানে।

হাওড়ায় এসে নিজের অজ্ঞাতেই এমন একটা বাসে চেপে বসল প্রণতি—যেটা মঞ্জুদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যায়। বোধ হয় অজ্ঞাতেই যন্ত্রচালিতের মত নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে সে নেমে পড়ল। মাথা তুলতেই দেখতে পেল বিরাট একটা সাইন বোর্ড "অঙ্গাভরণ" হঠাৎ যেন শিরদাঁড়া বেয়ে শিরাশিরিয়ে উঠল বিদ্যুৎ-প্রবাহ। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই সমস্ত দুর্ব্বলতা দূরে ফেলে দিয়ে প্রচণ্ড সাহসের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াল প্রণতি। চিন্তাক্লিষ্ট পাণ্ডুর ঠোঁটে মরা হাসিকে আবার সে জীবন্ত করে তুলল। "অঙ্গাভরণের" ঝকঝকে ঘরে গিয়ে ঢুকল শরীর-মনে নিজেকে একটু ঝকঝকে করে নিয়ে।

—নমস্কার, কেমন আছেন? অনলের অন্তরঙ্গ আহ্বানে আশান্বিত হ'ল প্রণতি। সুটকেশ থেকে গহনাগুলো বার করে 'শো' কেসের উপর রেখে জিগ্যেস করল—দেখুন ত, সিকিউরিটি হিসেবে এগুলো রেখে 'সেলস গার্ল'এর কাজটা আমাকে দিতে পারেন কি না? আপনিই ত সেদিন বলেছিলেন সিকিউরিটির দরকার।

—হুঁ, বলেছিলাম, সেই সঙ্গে এই কথাও বলেছিলাম যে, আপনার কাছ থেকে 'সিকিউরিটি' না পেলেও চলবে। কেন না আপনার অবস্থা আমি জানি।

—যেটুকু জানতেন সেটুকু হয়ত ভুল। যাই হোক সিকিউরিটি হিসেবে যদি না রাখতে চান অন্ততঃ এদের নিরাপত্তার জন্য এগুলো আপনাকে রাখতেই হবে। আর চাকরীটাও আমাকে দিতে হবে। কোথা থেকে যে সে এত জোর পেল সে কথা একবারও ভাবল না প্রণতি। ওর শক্ত হয়ে ওঠা চোয়ালের দিকে চেয়ে অনল জিগ্যেস করল—নিরাপত্তা কি শুধু ঐ গুলোরই প্রয়োজন? আবার যেন অবশ হয়ে গেল সমস্ত শরীরটা। অনলের দিকে মুখ তুলে একবার চাইতে চেষ্টা করল প্রণতি, কিন্তু পারল না। মাথা নীচু করে গহনাগুলো ওর হাতে তুলে দিতে গিয়ে বললে, নিন ধরুন। ওর লজ্জামাখা আনত মুখের দিকে চেয়ে হাসতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে গেল অনল। বললে, দুষ্টুমি।

মন্দিরময় ভারত—গুহামন্দির

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

ঔরঙ্গবাদ ও এলোরা

(১)

পরের দিন ভোরে উঠে চা ও জলযোগ শেষ করে, আবার আমরা ট্যাক্সি চড়ে রওনা হই। দেখি যা কিছু আছে দর্শনীয় ঔরঙ্গবাদ শহরে।

দেখি, মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের তৃতীয় সম্রাট-পত্নী, সম্রাজ্ঞী রাবিয়া দুরানীর সমাধি মন্দির, সমাপ্ত ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। নির্ম্মিত এই সমাধি-মন্দিরটি সাজাহান বাদশাহ রচিত আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ তাজমহলের অন্যতম বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্য্যের অনুকরণে। তাই পরিচিত নকল তাজমহল নামেও। তার ক্ষুদ্রতর আর নিকৃষ্ট সংস্করণ। প্রবেশপথে অতিকায় সিংহদরজা, নির্ম্মিত মোগল পদ্ধতিতে। সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের বুক চিরে উপনীত হয় পথ, সমাধি-মন্দিরের সোপানশ্রেণীতে। পথের পাশে সরোবর আর বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প-সম্ভার। রচিত এই সমাধি-মন্দিরটিও শ্বেত মার্ব্বেল প্রস্তরে, শীর্ষে নিয়ে গম্বুজ, চারি পাশে দ্বার, শোভা পায় চারিটি মিনার ও চাতালের চার প্রান্তে। কিন্তু নাই তার অঙ্গে স্থপতির সুন্দরতম অনুপম, শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার, সমৃদ্ধিশালী নয় তাঁর হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে আর মনের মাধুরীতে। নাই প্রেমিক শ্রেষ্ঠ সাজাহানের একনিষ্ঠা। নাই তার অঙ্গের প্রতিটি প্রস্তরের বুকে, প্রেমিকের অন্তর বেদনার চিরন্তন প্রকাশ। সকরুণ নয় তার আকাশও এক নিত্য উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাসে। তাই লাভ করে নাই শ্রেষ্ঠত্ব, হয় নাই অমর।

দেখি, তাঁর নিজের সমাধি-মন্দিরও। এইখানেই ধরিত্রীর বুকে, প্রখ্যাত মুসলমান ফকির, বুরহানুদ্দিনের সমাধির পাশে চির নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে আছেন ভারতের মহাপরাক্রমশালী, শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী, মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজীব, শ্রান্তদেহে, ভগ্ন হৃদয়ে, অনুশোচনায় জর্জ্জরিত অন্তঃকরণে।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চের সকাল। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে আছেন ঔরঙ্গজীব, আহমদ নগরের শিবিরে, সুদূর প্রবাসে। বহু বৎসরের অমানুষিক পরিশ্রমের ক্লান্তিতে আর আশা ভঙ্গে, অবসন্ন তাঁর দেহ আর মন। উচ্চারিত হয় "আল্লা-হু আকবর" তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েন, প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ হন চিরনিদ্রায় অভিভূত। নিয়ে আসা হয় তাঁর মরদেহ দৌলতাবাদে, সমাধিস্থ হয় এইখানে।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি তাঁর বিদ্রোহী পুত্রদের কাছে চিঠি লেখেন। আজমকে লেখেন, আমি একাই এসেছি, যাচ্ছিও একা। আমার দেশের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করি নি, করি নি কিছু প্রজার হিতের জন্যও, তাই নাই কোন ভবিষ্যতের আশা, নাই ভরসাও।

কামবকসকে লেখেন, সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি আমার যত অপকীর্ত্তির বোঝা, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি যা আজও রয়েছে অপূর্ণ, লাভ করে নাই পরিণতি হয় নি সম্পূর্ণ। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেই আমি আমার জীবন-তরী ভাসিয়ে দিলাম।

অভিভূত হয়ে সমাধি-মন্দির দেখি। চোখের সামনে ভেসে উঠে একটা যুগের ইতিহাস। অত্যাচার আর ধ্বংসের কালিমায় কালো হয়ে আছে সেই ইতিহাসের প্রতিটি পাতা। ধ্বংস কত হিন্দু মন্দিরের, কত বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহারের, কত জৈন বস্তির। বুকে নিয়ে ছিল তারা কত স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অন্ধ্র, দ্রাবিড়, সুঙ্গ, গুপ্ত, বাকাটক, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট আর হোয়সল স্থাপত্যের আর ভাস্কর্য্যের। তাদের বহু শত বৎসরের সাধনার দান। বুকে নিয়েছিল কত অমূল্য সম্পদ। তাই বুঝি এমন দুঃখপূর্ণ, এমন মর্ম্মান্তিক, এমন হৃদয় বিদারক এই মৃত্যু।

সম্বিত ফিরে পাই সিংহী মহাশয়ের ডাকে। সমাধিক্ষেত্রে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে মোটরে গিয়ে বসি। শহর অতিক্রম করে ঔরঙ্গবাদের বৌদ্ধ গুহামন্দিরের সামনে উপনীত হই।

শহরের উত্তরে এক মাইল দূরে এক ফালি উঁচু, ঋজু, পর্ব্বতের অঙ্গে, দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরগুলি, তিন সমষ্টিতে। আছে প্রথম সমষ্টিতে একটি চৈত্য, বৌদ্ধ ধর্ম্ম-মন্দির ও চারিটি বিহার, দ্বিতীয়তে চারিটি বিহার, তৃতীয়তে তিনটি বিহার। নাই কোন চৈত্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমষ্টিতে।

আমরা প্রথমে তৃতীয় সমষ্টির মন্দিরগুলি দেখি। নাই কোন বৈশিষ্ট্য এই মন্দিরগুলিতে। সমৃদ্ধিশালী নয় তারা স্থপতির শিল্প সম্ভারে, নয় ভাস্করের মূর্ত্তি সম্ভারেও। খুব সম্ভব নির্ম্মিত হয় এই মন্দিরগুলি, সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে অস্তমিত হতে থাকে যখন বৌদ্ধ স্থাপত্য, নিষ্প্রভ হয় বৌদ্ধ স্থপতির স্থাপত্য জ্ঞান।

দেখতে সুরু করি, প্রথম সমষ্টির মন্দিরগুলি। প্রথমে চতুর্থ গুহামন্দির দেখি। ক্ষুদ্রতর এই চৈত্যটি দাঁড়িয়ে আছে অর্দ্ধ ভগ্ন অবস্থায়, চল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও বত্রিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। দেখি অনুরূপ কার্লির চৈত্যের, এই চৈত্যের অভ্যন্তর ভাগ। রচিত হয় অর্দ্ধ গোলাকৃতি খিলানযুক্ত ছাদ ও কার্লির চৈত্যের অনুকরণে। দেখি বৃত্তাংশে গর্ভগৃহে অর্দ্ধ গোলাকৃতি স্তূপ ও অনুরূপ কার্লির চৈত্যের, নাই তার অঙ্গে কোন বৌদ্ধ মূর্ত্তি। বৌদ্ধ মূর্ত্তি নাই

প্রাচীরের গাত্রেও। দেখি, শোভিত সম্মুখ ভাগের প্রাচীরের গাত্র আর কেন্দ্র স্থলের চতুর্দিক অপরূপ তোরণ দিয়ে। তাই মনে হয়, নির্ম্মিত এই চৈত্যটি হীনযান বৌদ্ধ যুগে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে।

তৃতীয় গুহামন্দিরে উপনীত হই। অন্যতম, সুন্দরতম আর প্রকৃষ্টতম গুহামন্দির অজন্তার, নির্ম্মিত হয় ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে, গুপ্ত যুগে। মহা সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে এই বিহারটি, স্তম্ভের অঙ্গের শিল্পসম্ভারে ও শীর্ষদেশের মূর্ত্তিসম্পদে। শোভিত হয়ে আছে তার প্রাচীরের গাত্রও, অনবদ্য, সুন্দরতম, মহিমময় মূর্ত্তিসম্ভারে, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুপ্ত যুগের স্থপতির আর ভাস্করের।

একটি সুন্দরতম স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ অতিক্রম করে, আমরা মন্দিরের ভিতরে, কেন্দ্রস্থলের সভাগৃহে উপনীত হই। দেখি, বুকে নিয়ে আছে সভাগৃহটি অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভ, নির্ম্মিত হয়েছে তার চারি পাশে প্রকোষ্ঠ, বাসস্থান বৌদ্ধ শ্রমণের। শোভিত স্তম্ভদণ্ড, সুন্দরতম, সুষ্ঠু গঠন মূর্ত্তি দিয়ে, মূর্ত্তি বুদ্ধের, মূর্ত্তি বোধিসত্ত্বের, মূর্ত্তি কত দেবদেবীরও, অলঙ্কৃত লতা-পল্লবেও। শোভা পায় স্তম্ভের শীর্ষদেশে অনুপম বন্ধনী, বন্ধনীর অঙ্গে সুন্দরতম মূর্ত্তি। বন্ধনীর শীর্ষদেশে রচিত হয় পাত্র, পাত্রের ভিতরে পল্লব-গুচ্ছ। পরিচিত এই স্তম্ভগুলি "পাত্র-পল্লব প্রতীক" স্তম্ভ নামে, অন্যতম সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ বৌদ্ধ স্থপতির। দেখেছি অলিন্দের বুকেও অনুরূপ অপরূপ স্তম্ভ, অনুরূপ গঠনে, অঙ্গের শিল্পসম্পদে আর শীর্ষদেশের মূর্ত্তিসম্ভারে। দেখি সুবিশাল, মহামহিমময় মূর্ত্তি দিয়ে শোভিত সভাগৃহের প্রাচীরের গাত্র, মূর্ত্তি বুদ্ধের, মূর্ত্তি বোধি-সত্ত্বের, মূর্ত্তি অতিকায় দেবদেবীরও, বসে আছেন তাঁরা কত বিভিন্ন ভঙ্গিতে, ভূষিত হয়ে আছেন কত বিচিত্র বহুমূল্য ভূষণে আর বসনে, কত জড়োয়ার অলঙ্কারে। অনবদ্য এই মূর্ত্তিগুলির সুষ্ঠু গঠন, জীবিত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এক মহা গৌরবময় যুগের, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

বিহারের প্রত্যন্ত দেশে উপনীত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই গর্ভগৃহের মূর্ত্তির সম্ভার দেখে। দেখি, সিংহাসনে বসে আছেন এক সুবিশাল বুদ্ধ, বসে আছেন মহামহিমময় মূর্ত্তিতে, অপরূপ, সুষ্ঠু-গঠন এই মূর্ত্তিটি, একেবারে জীবন্ত। তাঁর সামনে মুখোমুখি হয়ে দুই দল শ্রমণ আকৃতির পূজারী আছেন, তাঁরা জানুগতিতে। আছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ, কয়েকটি রূপবতী নারীও আছেন। তাঁদের কারও হস্তে মালা, কেউ হস্তে ধরে আছেন পূজার উপচার, কেউ আছেন কৃতাঞ্জলিপুটে। সজ্জিত তাঁরাও বহুমূল্য ভূষণে আর বসনে। তাঁদের শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, কর্ণে হীরক কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার মালা, বাহুতে মণিমুক্তা-খচিত ব্রেসলেট, মণিবন্ধে স্বর্ণকঙ্কণ। তাঁরা ভক্তিভরে, অবনত মস্তকে দেবতাকে পূজা করেন। প্রতিফলিত হয় তাঁদের চোখেমুখে, তাঁদের অন্তর-নিহিত, অপরিসীম, প্রগাঢ় ভক্তির উচ্ছাস-তাঁদের অন্তরের ভাষা। প্রদীপ্ত হয় তাঁদের আনন, উদ্ভাসিত হয় নয়ন, বিকশিত হয় সর্ব্বাঙ্গ ভক্তির পুলকে। অপরূপ এই মূর্ত্তি-সম্ভার, অনবদ্য, সুন্দরতম, মহামহিমময়, জীবন্ত। প্রাণময় তাঁদের প্রতিটি অঙ্গ, ভাস্করের হস্তের সুনিপুণ স্পর্শে, বাঙ্ময়, তাঁর হৃদয়ের অতুল ঐশ্বর্য্যে, আর মনের অপরিসীম মাধুরীতে। তাই বুকে নিয়ে আছে এই মূর্ত্তিসম্ভার, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সপ্তম শতাব্দীর বৌদ্ধ মহাযান ভাস্করের, সর্ব্ব ভারতের ভাস্করেরও। প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, এক অমর কীর্ত্তির। তাই সৌভাগ্যশালী হয় ভারত, বিশ্বের ভাস্করের দরবারে, শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করে।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করি, যুগাবতার, মহামানব বুদ্ধকে। জানাই গুপ্ত রাজাদের, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা ভারতের। জানাই ভাস্করকেও। অমর তাঁরা ইতিহাসের পাতায়।

দ্বিতীয় গুহামন্দির দেখি। অনুরূপ তৃতীয় গুহামন্দিরের এই মন্দিরটি, সমসাময়িকও। এই বিহারটিও গুপ্তরাজারাই নির্ম্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে এই বিহারটিও সুন্দর স্তম্ভ ও মূর্ত্তি-সম্ভার, কিন্তু সুন্দরতম নয় তারা তৃতীয় গুহামন্দিরের স্তম্ভ আর মূর্ত্তিসম্ভারের মত। নয় তেমন সমৃদ্ধিশালীও, ভাস্করের হস্তের সুনিপুণ স্পর্শ।

প্রথম গুহামন্দিরে উপনীত হই। অনুরূপ তৃতীয় গুহামন্দিরের পরিকল্পনায় আর নির্ম্মাণকুশলতায়, সমসাময়িকও। নির্ম্মাণ করেন এই গুহামন্দিরটিও গুপ্তরাজারা। দেখি সুন্দরতর এই বিহারটি, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভ। স্তম্ভের দণ্ডে শোভা পায় মূর্ত্তিসম্ভার, শোভা পায় লতা-পল্লবও। শীর্ষদেশে রচিত হয় মূর্ত্তি দিয়ে বন্ধনী, অনুরূপ বাতাপির (বাদামির) স্তম্ভের শীর্ষদেশের সুন্দরতম বন্ধনীর। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভার, দেখি মূর্ত্তিসম্ভারও। দেখি শোভিত সভাগৃহের প্রাচীরের গাত্রও, সুবিশাল, মহিমময় মূর্ত্তি দিয়ে, মূর্ত্তি বুদ্ধের, মূর্ত্তি বোধিসত্ত্বের, মূর্ত্তি বিশালকায় দেবদেবীরও। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

দেখি, একে একে পঞ্চম আর ষষ্ঠ গুহামন্দির। নির্ম্মিত হয় এই বিহারগুলিও ষষ্ঠ আর সপ্তম শতাব্দীতে, গুপ্ত রাজারাই নির্ম্মাণ করেন। বুকে নিয়ে আছে এই বিহারগুলিও সুন্দরতম অনবদ্য স্তম্ভ আর বৃহৎ মহিমময় মূর্ত্তিসম্ভার।

সব শেষে সপ্তম গুহামন্দিরে উপনীত হই। অন্যতম সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির ঔরঙ্গবাদের, সমসাময়িক এই মন্দিরটি তৃতীয় গুহা মন্দিরের। পড়ে সমপর্য্যায়েও, স্তম্ভের শ্রেষ্ঠত্বে আর প্রাচীরের গাত্রের মূর্ত্তিসম্ভারের মহামহিমময়ত্বে। এই বিহারটিও গুপ্তরাজারা নির্ম্মাণ করেন। দেখি রচিত হয় সভাগৃহের কেন্দ্রস্থলে প্রকোষ্ঠ, বেষ্টিত নয় সভাগৃহ প্রকোষ্ঠ দিয়ে। দেখি রচিত প্রকোষ্ঠের চারি পাশে প্রদক্ষিণের পথও। ব্যতিক্রম বৌদ্ধ বিহারের পূর্ব্বাভাষ এলোরার পরবর্ত্তী কালের হিন্দু গুহামন্দির রামেশ্বরমের।

দেখি মুগ্ধ হয়ে এই বিহারের স্তম্ভগুলির অঙ্গের অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্পদ। দেখি তাদের শীর্ষদেশের আর বন্ধনীর অঙ্গের মহা-

মহিমময় মূর্ত্তি সম্ভার অনুরূপ তৃতীয় গুহামন্দিরের স্তম্ভের। দেখি ঘুরে ঘুরে সভাগৃহের প্রাচীরের গাত্রের বৃহৎ মূর্ত্তিসম্ভারও। মহা-সমৃদ্ধিশালী তারা ভাস্করের হস্তের সুনিপুণ স্পর্শে তার হৃদয়ের অতুল ঐশ্বর্য্যে আর অন্তহীন মাধুরীতে। তাই অনবদ্য, সুন্দরতম, মহা-মহিমময়, প্রতীক তারা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির, এক মহাগৌরব-ময় যুগের।

বপন করেন যে বীজ গুপ্তযুগের বৌদ্ধ স্থপতি আর ভাস্কর নাসিকে আর কানেরিতে, পরিণত হয় সেই বীজ মহামহীরুহে, অজন্তাতে আর ঔরঙ্গাবাদে। সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে তাদের স্তম্ভে, করে তাদের মূর্ত্তিসম্ভারেও। লাভ করে তারা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্য্যের দরবারে, হয় বিশ্বজিৎ।

স্থপতিকে আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধর্ম্মশালায় ফিরে আসি। আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে ঔরঙ্গাবাদের মন্দিরের স্মৃতি, মনের মণিকোঠায়।:

(১০)

তার পরের দিন ভোরে উঠে আগের দিনের মত প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপন করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ট্যাক্সির পিছনে বেঁধে নিয়ে এলোরা অভিমুখে রওনা হই।

এক ট্যাক্সিতে আমি ও আমার স্ত্রী, সকন্যা মিসেস হাজরা আর সিংহী সাহেব উঠি। দ্বিতীয়টি সপরিবারে কেদার, আমার কন্যা, হাজরা আর চাকরটি। এক সঙ্গেই দুখানি ট্যাক্সি ছাড়ে। আমরা আগে যাই। আমাদের অনুগমন করে কেদাররা।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় না পিছনের গাড়ীর চিহ্ন, হয়ে যায় অদৃশ্য। মিনিট কুড়ির মধ্যেই আমাদের ট্যাক্সি দৌলতাবাদের দুর্গের সামনে এসে থামে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে দ্বিতীয় গাড়ীর অপেক্ষায় থাকি। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়, কিন্তু দর্শন মেলে না দ্বিতীয় ট্যাক্সির। সম্ভব নয় এত অধিক সময় লাগা সাত মাইল অতিক্রম করতে। নিশ্চয়ই বিকল হয়েছে যন্ত্র, অচল হয়েছে গাড়ী। অথবা কোন আকস্মিক বিপদ হয়েছে। এক মহা আতঙ্কে কণ্টকিত হয় সর্ব্বাঙ্গ। আছে সেই গাড়ীতে ছেলেমেয়েরা, কেদার আর হাজরা।

সিংহী সাহেব আমাদের গাড়ী নিয়ে ফিরে যান। অতিবাহিত হয় আরও আধ ঘণ্টা। এক সীমাহীন আতঙ্কে আর উৎকণ্ঠায় ছেয়ে ফেলে আমাদের অন্তকরণ, দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে তাদের আসবার পথের পানে। হঠাৎ দিকচক্রবাল থেকে ভেসে ওঠে দুখানি গাড়ী, শেষে উপনীত হয় দুর্গের সামনে। ফেলি স্বস্তির নিশ্বাস। শুনি, সত্যই যন্ত্র বিকল হয়ে বাহন অচল হয়েছিল। কিন্তু ব্যাধি সামান্যই, তাই বিলম্ব হয় নাই নিরাময় হতে। ড্রাইভার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তারও ভরসা দেয়।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক মহিমময়, সু-উচ্চ গিরিশ্রেণী। সমস্ত পর্ব্বত আর তার শীর্ষদেশ অলঙ্কৃত করে আছে একটি সুবিশাল দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এই সেই দেবগিরির সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ। এই দুর্গই ছিল একদিন শত্রুর অনতিক্রমণীয়, ছিল দুর্ভেদ্যও। রাজত্ব করতেন এখানে দেবগিরির যাদব নৃপতিরা। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-পুরুষ যদুর বংশধর তাঁরা, অবতীর্ণ হন দাক্ষিণাত্যের রঙ্গমঞ্চে, রাষ্ট্রকূট আর পরবর্ত্তী চালুক্যরাজাদের অধীনে সামন্ত রাজারূপে। দ্বাদশ শতাব্দীতে, কল্যাণের চালুক্যরাজাদের পতন হলে ১১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিল্লম দেবগিরিতে স্থাপন করেন এক স্বাধীন রাজ্য। সিংঘন, শ্রেষ্ঠ নৃপতি এই বংশের, পরাজিত করেন চোলদের। বিস্তৃত হয় যাদব রাজ্যের সীমানা, উত্তরে নর্ম্মদা থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণপ্রভা পর্য্যন্ত। পারদর্শী সঙ্গীতশাস্ত্রেও। তিনি ভাষ্য রচনা করেন তাঁর মন্ত্রী সারঙ্গধর প্রণীত সঙ্গীতগ্রন্থের। রাজত্ব করেন একে একে তাঁর দুই পৌত্র কৃষ্ণ আর মহাদেব। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণের পুত্র রামচন্দ্র অধিরোহণ করেন দেবগিরির সিংহাসনে। বিদ্যোৎসাহী তিনি, অলঙ্কৃত করেন তাঁর রাজসভা চতুর্বর্গ চিন্তামণি প্রণেতা হেমাদ্রি, করেন মনীষী বোপদেব আর জ্ঞানেশ্বরও।

১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী দেবগিরি আক্রমণ করেন। লুণ্ঠিত হয় দেবগিরি। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর দ্বিতীয় বার দেবগিরি আক্রমণ করেন। পরাজিত হন রামচন্দ্র, নিহত হন তাঁর পুত্র, নিহত হন তাঁর জামাতা হরপালও ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে। দেবগিরি আসে দিল্লীর সম্রাট মুসলমান আলাউদ্দিনের অধিকারে। অবসান হয় দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রের প্রভুত্ব, লুপ্ত থাকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত।

আলাউদ্দিনের হাতে পরাজিত হয়ে এই দেবগিরিতেই রাম-চন্দ্রের কাছে আশ্রয় নেন গুজরাটের রাজা বাঘেলা, রাজপুতবংশের দ্বিতীয় রায় কর্ণদেব, সঙ্গে নিয়ে পরম রূপবতী কন্যা দেবলাদেবী। হৃতা হন তাঁর পত্নী কমলাদেবী, পরিণতা হন সম্রাটের অন্যতমা প্রিয়তমা মহিষীতে। রাজা রামচন্দ্রের পরাজয়ের পর ধৃতা হন দেবলাদেবীও। বিবাহ হয় তাঁর সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র, খিজির খানের সঙ্গে।

খিলজীদের পতন হলে দেবগিরি তুঘলকদের অধিকারে আসে। ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ তুঘলক দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পরিচিত হয় দেবগিরি দৌলতাবাদ নামে, অন্তর্হিত হয় ইতিহাসের পাতার অন্তরালে। নির্ম্মিত হয় রাজ-প্রাসাদ আর সুন্দর অট্টালিকাশ্রেণী। রচিত হয় কত উদ্যান, শোভিত পত্র-পুষ্পে। পরিণত হয় দৌলতাবাদ এক বৃহৎ নয়না-ভিরাম নগরে। নির্ম্মিত হয় দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ পর্য্যন্ত সাত শত মাইল দীর্ঘ একটি প্রশস্ত রাজপথও। কিন্তু সম্ভব হয় না দিল্লীবাসীর দৌলতাবাদে সহজ আগমন। পথে মৃত্যুবরণ করে বহু দিল্লীবাসী। যারা এসে পৌঁছায় অক্ষত থাকে না তারাও। তাই ফিরে যেতে হল সম্রাটকে দিল্লীতে। দৌলতাবাদে নিযুক্ত হন রাজ্যপাল।

পতন হয় দিল্লীর সুলতান, তুঘলকদের, দৌলতাবাদ বাহমণি রাজ্যের অধীনে আসে। ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদ আহম্মদ নগরের মালিক আহম্মদ বাহিরি অধিকারে আসে। তিনি ছিলেন গোদাবরীর উত্তরের পথিরি হিন্দু নায়কের পুত্র, যোগ দেন মহম্মদ

গাওয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে। নিযুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী, মহম্মদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর, হন জুনারের শাসনকর্তা।' শেষে হন স্বাধীন নৃপতি। স্থাপিত হয় রাজধানী আহম্মদনগরে, নিজের নামানুসারে। এই দৌলতাবাদেই, ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনিরা নির্ম্মাণ করেন একটি অপরূপ মিনার, পরিচিত চাঁদমিনার নামে।

১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট সাজাহান সাড়ে দশ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে অধিকার করেন এই অনতিক্রমণীয় দুর্গ আহম্মদনগরের হাত থেকে। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ নগরও মুঘলের অধিকারে আসে। বন্দী হন রাজা হুসেনসাহা গোয়ালিয়রের দুর্গে। পরিসমাপ্তি হয় আহম্মদনগরে নিজামশাহী বংশের রাজত্বের।

১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই দৌলতাবাদ থেকেই পরিচালিত হয় মুঘলের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের অভিযান। খান্দেশ, বেরার আর তেলিঙ্গানা একে একে তাঁদের অধিকারে আসে। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক ঔরঙ্গজেব নিযুক্ত হন দাক্ষিণাত্যের রাজ্যপাল। আবার সম্রাট হয়ে এই দৌলতাবাদের নিকটে অবস্থিত ঔরঙ্গবাদে শিবির স্থাপন করেন ঔরঙ্গজেব ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এখান থেকেই একে একে জয় করেন গোলকুণ্ডা আর বিজাপুর। কিন্তু সম্পূর্ণ দমন করতে পারেন না মহারাষ্ট্রদের। এই দুর্গেই, গোলকুণ্ডার সুলতান আবুল হাসানকে কাটাতে হয় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি। এইখানে বসেই, ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে উপনীত হয় মুঘল সাম্রাজ্য উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে, বিস্তৃত হয় তার সীমানা কাবুল থেকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত, কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্য্যন্ত। কিন্তু সুখ নাই সম্রাটের মনে,নাই শান্তিও। বিদ্রোহী সেনাপতিরা, বিদ্রোহী নিজের পুত্রেরাও। বিজয়ের অভিযানের চাহিদা মেটাতে শূন্য রাজকোষ। বাংলার দেওয়ান, মুর্সিদকুলি খানের প্রেরিত অর্থের আগমনের প্রতীক্ষায় কাটাতে হয় দিন। তাতেই নির্ব্বাহ হয় সংসারের খরচ। শেষে ৩রা মার্চ, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ব্বাপিত হয় তাঁর জীবন-প্রদীপ। আহম্মদ নগরের শিবিরে তিনি ত্যাগ করেন শেষ নিশ্বাস। সমাধিস্থ হয় তাঁর মৃতদেহ, ঔরঙ্গাবাদে, প্রসিদ্ধ মুসলমান, সাধু বারুদ্দিনের সমাধির পাশে।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতাবাদের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ মহারাষ্ট্রের অধিকারে আসে। অধিকারে আসে পেশোয়ার। অধিকার করেন তাঁর ভ্রাতা সদাশিবরাও।

মহারাষ্ট্রদের পতন হ'লে, হায়দ্রাবাদের নিজামের অধিকারে আসে। স্থাপিত হয় ঔরঙ্গাবাদে তাঁদের দ্বিতীয় রাজধানী। অত্যুচ্চ শৈলশ্রেণীতে বেষ্টিত হয়ে আছে ঔরঙ্গাবাদ, প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে, এক লীলা নিকেতনে।

পুত্র কন্যাদের কেদার আর সিংহী মহাশয়ের জিম্মায় রেখে আমরা আর সকলে সিংহদ্বার অতিক্রম করে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করি। বামে এক সুবিশাল জলশূন্য জলাশয় বেষ্টিত সু-উচ্চ পাড় ও সোপানের শ্রেণী দিয়ে। তার পাড়ে ভারতমাতার মন্দির, নির্ম্মিত পরবর্ত্তিকালে। দক্ষিণে সুপ্রশস্ত চত্বরে, উঁচু মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি মিনার, খুব সম্ভব চাঁদমিনার। নির্ম্মাণ করেন এই সুন্দর মিনারটি বাহমণি রাজারা ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, বুকে নিয়ে ভারতীয়, তুর্কী, মিশরীয় আর পার্শিয়ার প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যের নিদর্শন তাদের অনবদ্য, সুসামঞ্জস্য, সুন্দরতম সংমিশ্রণ দেখি মুগ্ধ হয়ে।

ভারতমাতার মন্দির দেখে, আমরা উঠতে থাকি দুর্গের শীর্ষদেশে। ঋজু আর উঁচু এই সোপানের শ্রেণী, সঙ্কীর্ণ, অসংস্কৃত ও কখন সোজা, কখনও সর্পিল গতিতে উঠেছে। তাই কষ্ট সাধ্য এই আরোহণ, বিপদসঙ্কুলও, উঠতে হয় সাবধানে পদক্ষেপ করে, মন্থর গতিতে।

কিছুদূর উঠবার পর একটি চলমান সেতুর (ড্র ব্রিজ) নিকটে উপনীত হই। সেতু অতিক্রম করে একটি চত্বরে উপস্থিত হই। দাঁড়িয়ে আছে এই চত্বরে একটি লৌহ কামান, অঙ্গে নিয়ে ছাগমুণ্ড, তাই পরিচিত "র‍্যাম্‌স হেড" নামে।

প্রাঙ্গণ পার হয়ে অতিক্রম করি একে একে কত অলিন্দ, কত কক্ষ, অঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্থাপত্যের নিদর্শন, উপনীত হই একটি সুড়ঙ্গের সামনে। আরোহণের ক্লান্তিতে অবসন্ন হাজরা ও মিসেস বসু অক্ষম অগ্রসর হতে, এইখানে বসে পড়েন।

ঘন তিমিরাবৃত সঙ্কীর্ণ দীর্ঘ সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে আমরা তিনজন একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে একটি উন্মুক্ত বাতায়নের পাশে এসে দাঁড়াই। গাইড বলে এইটিই "ভুলভুলিয়া" এখানে ভুলিয়ে নিয়ে আসা হত অবাঞ্ছিত নর-নারীদের। নিক্ষিপ্ত হত তারা এই বাতায়ন থেকে দুর্গের বাইরে, গড়িয়ে পড়ত সহস্র ফুট নীচু পর্ব্বত-কন্দরে, বিচূর্ণ হত তাদের দেহ, হত জীবনান্ত। দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বহিঃপানে। দেখি পর্ব্বতের অঙ্গে গভীর শ্যাম অরণ্য, বুকে নিয়ে ঘন বনবীথি আর লতাগুল্ম, স্পর্শ করে সেই অরণ্য শৈলমালার পাদদেশ। পদতলে পরিখার বক্ষে প্রবাহিতা একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। বিপরীত দিকে দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত। দেখা যায়, কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রামও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে প্রান্তরে। দেখি স্তব্ধ বিস্ময়ে মূক হয়ে প্রকৃতির এই উদ্দাম অপরূপ রূপ। সম্বিৎ ফিরে পাই গাইডের ডাকে। বলে, একেবারে শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আছে যাদব রাজাদের নির্ম্মিত দেবালয়, সেই মন্দিরে বিরাজ করেন বিষ্ণুর পাদপদ্ম। সাহসে বুক ভরে নিয়ে গাইডের অনুগমন করি। করেন লীলা হাজরাও, ধীরে ধীরে অতিক্রমণ করেন সোপানের শ্রেণী। সক্ষম হন না আমার স্ত্রী, সাফল্যমণ্ডিত হয় শুধু আমাদের দু'জনের স্বর্গারোহণের প্রচেষ্টা। এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রকোষ্ঠ, নাই তাতে কোন গবাক্ষ, রুদ্ধ তার প্রবেশ দ্বারও। গাইড বলে, এই গৃহেই মুসলমান রাজারা বারুদ রাখতেন, ছিল এই দুর্গের বারুদের গুদাম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ঐ কক্ষ থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে সহস্র বৎসর পূর্ব্বের তৈরী বহু শত মণ বারুদ, দগ্ধিভূত হয়েছে সেই বারুদ, পরিণত হয়েছে ভস্মে।

ধীরে ধীরে নেমে আসি, সঙ্গে নিয়ে আসি যাঁরা মাঝ রাস্তায় বসে থাকেন। বঞ্চিত যাঁরা স্বর্গারোহণের সৌভাগ্য থেকে।

দেখি চা প্রস্তুত, সামনের দোকানের বৃহৎ পপিতা তিনটি আর কমলালেবুগুলিও নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছে আমাদের গাড়ীর ভিতরে।

সমস্বরে, কলকণ্ঠে আমাদের বিজয় অভিযানের সংবর্দ্ধনা শেষ হলে চা পান করে আমরা আবার গাড়ীতে উঠে বসি। গাড়ী বিদ্যুৎ-গতিতে এলোরা অভিমুখে ছুটে। পিপল ঘাটের দু'পাশের সুবিশাল পিপল বৃক্ষের ভিতর দিয়ে মাইল ময়েক রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের গাড়ী এলোরায় কৈলাসের মন্দিরের সামনে এসে থামে। শৈলমালার অঙ্গবেয়ে নৃত্য-চপল গতিতে নেমে আসে একটি নির্ঝর, সেই নির্ঝরের জলে সৃষ্টি হয় একটি কুণ্ড। সেই কুণ্ডের পাশে জিনিসপত্র নামিয়ে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসি। বার করা হয় খাবার, মাংস আর পরোটা সাজান হয় ডিসে, হয় জলে ভরতি দুইটি সোরাই, ডজনখানেক কলা আর কয়েকটি কমলালেবুও। কুণ্ডের জলে একে একে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে সকলে আহারে নিযুক্ত হই। আহার সমাপ্তে জিনিসপত্র গাড়ীর মধ্যে তুলে দিয়ে আমরা ষোড়শ গুহামন্দির কৈলাস দেখতে অগ্রসর হই। পরিচিত শিবের স্বর্গ নামেও। নির্ম্মাণ করেন এই মন্দিরটি রাষ্ট্রকুট শ্রেষ্ঠ প্রথম কৃষ্ণ, ৭৫৭ থেকে ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। উপনীত হয় এই সময়ে রাষ্ট্রকুট নৃপতিরা, উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে হন মহাসমৃদ্ধিশালীও।

আর্য্য ভারতের সৃষ্টি থেকেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম। পূজিত হন দেবদেবী। শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। প্রধান ইন্দ্র, বরুণ, সবিতা, মারুত আর অগ্নি। পূজিতা হন শক্তি ও কালী, তারা আর দুর্গা। পূজিত হন তাঁরা গৃহকোণে, হন মন্দিরেও, হিন্দুরা জন্মান্তর মানে। মানে আত্মার অবিনশ্বরতা আর দেহের মরণশীলতা। বার বার জন্ম নেয় আত্মা। মৃত্যু হয় দেহের, হয় না আত্মার—সহস্র কোটি জন্মের ভিতর দিয়ে লীন হয় পরম ব্রহ্মে—অনাদি, অনন্ত ব্রহ্ম।

অনার্য্যেরা পূজা করে ভূত, দানব আর নাগ অথবা সর্পকে।

জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধদেব কপিলাবস্তু নগরে, নৃপতি শুদ্ধোধনের ঔরসে মহারাণী মায়ার গর্ভে। তাঁর নাম রাখা হয় গৌতম। লালিত হন তিনি ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে, বিলাসে ও ব্যসনে। ষোল বৎসর বয়সে পরম রূপবতী যশোধারার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জন্মায় এক রূপবান পুত্রও। নাম তার রাহুল।

একদিন প্রাসাদের বাইরে ভ্রমণে গিয়ে, তিনি রোগ, জরা ও মৃত্যুকে দেখেন। মিথ্যা মনে হয় রাজসুখ। সুখ পান না অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে জীবন যাপনে। এর আগেও তিনি এক এক করে ত্রয়োবিংশবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধ হবেন বলে। কিন্তু জন্মেছিলেন বোধিসত্ত্ব হয়ে। হতে পারেন নাই বুদ্ধ। মন প্রস্তুত ছিল। একদিন তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে যান। পরিত্যাগ করে যান স্নেহময় পিতামাতা, ফেলে রেখে যান প্রিয়তমা পত্নী আর প্রাণাধিক রাহুলকেও। পরিত্যাগ করে যান ভবিষ্যৎ সিংহাসনের মোহ। তখন তাঁর উনত্রিশ বৎসর বয়স। বহু স্থানে ভ্রমণ করে গয়াতে উপনীত হন। নিমগ্ন হন ধ্যানে এক বটবৃক্ষের নীচে। নিযুক্ত থাকেন কঠোর তপস্যায় দীর্ঘ ষষ্ঠ বৎসর। লাভ করেন জ্ঞানের আলোক। হন পরম জ্ঞানী, হন তথাগত, হন বুদ্ধ। অবগত হন নির্ব্বাণ লাভের উপায়, পথ মোক্ষলাভের, জন্মান্তরের কষ্ট বিদূরিত হবারও।

আসন ত্যাগ করে তিনি মুক্তির বাণী প্রচার করতে সুরু করেন। বলেন, নাই মুক্তি আনন্দে, উপভোগে, মুক্তি নাই কঠোর তপস্যাতেও। তিনি প্রচার করেন জগতবাসীর কাছে তাঁর মুক্তির বাণী—সে বাণী অহিংসার আর সাম্যের, শান্তির বাণীও। সৎ পথে থেকে, সৎ কার্য্যের ভিতর দিয়ে নির্ব্বাণ লাভ করবার বাণী।

শোনে নাই এমন বাণী পূর্ব্বে কেউ। বলে নাই আগে কেউ—কি করলে বিদূরিত হবে জন্মান্তরের দুঃখ, এক জন্মেই মোক্ষলাভ হবে। দলে দলে তাঁর শিষ্য হয়। শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কত রাজা, কত সম্রাট।

বুদ্ধ প্রচার করেন তাঁর বাণী, নগরে নগরে, একাদিক্রমে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর। তার পর আশী বৎসর বয়সে কুশী নগরে লাভ করেন মহানির্ব্বাণ। তিরোহিত হন এক মহামানব—এক যুগাবতার।

অতিবাহিত হয় দীর্ঘ দ্বিশত বৎসর, বৌদ্ধধর্ম্ম আবদ্ধ থাকে গঙ্গার উপত্যকায়—নালন্দায়, রাজগৃহে আর সারনাথে। বিস্তার লাভ করতে পারে না আর্য্য ভারতে, প্রবলতম হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিযোগিতায়, তার বিরুদ্ধতায়। আসে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৩৭ অব্দ, মৌর্য্য সম্রাট অশোক অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে। বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্যের সীমানা হিন্দুকুশ থেকে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজধর্ম্মে পরিণত হয় বৌদ্ধধর্ম্ম, হয় ভারত সম্রাট অশোকের ধর্ম্মে। প্রচারিত হয় বৌদ্ধধর্ম্ম। প্রবেশ করে মহীশূর পর্য্যন্ত। প্রেরিত হন তাঁর পুত্র মহেন্দ্র আর কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে। প্রচারক যায় কাশ্মীরে, গান্ধারে, ব্রহ্মদেশে, যায় তিব্বতেও। পৃথিবীর ধর্ম্মে পরিণত হয় বৌদ্ধধর্ম্ম।

লেখা হয় বুদ্ধের বাণী—বাণী অহিংসার আর সাম্যের, বাণী শান্তিরও, শৈলমালার অঙ্গে, লিখিত হয় প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভের বুকেও। নির্ম্মিত হয় সারা ভারতবর্ষে কত বৌদ্ধ স্তূপ, কত চৈত্য আর সঙ্ঘারাম বা বিহার। কত প্রস্তর নির্ম্মিত রেলে শোভিত হয় স্তূপ, চৈত্য আর বিহারের অঙ্গ। গড়ে ওঠে বৌদ্ধ স্থাপত্য ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত। সুন্দরতম মহিমময় তাদের পরিকল্পনা, অনবদ্য তাদের রূপদান। সাজান তাদের অঙ্গ বৌদ্ধ স্থপতি আর ভাস্কর, কত বিভিন্ন অলঙ্করণে, কত অনবদ্য, অপরূপ সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে আর জীবিত মূর্ত্তিসম্ভারে। শোভিত করেন যুগের পর যুগ। রচনা করেন কত গৌরবময় সৃষ্টি, কত সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ। আজও তার নিদর্শন বুকে নিয়ে আছে সাঁচী, ভারহুত,

সিক, আর কার্লি। আছে এলোরা আর অজন্তা। অমর হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

বৌদ্ধ স্থপতিই প্রথমে জীবন্ত শৈলমালার অঙ্গ কেটে গুহা-মন্দির নির্মাণ সুরু করেন। নির্ম্মিত হয় চৈত্য আর বিহার। সাজান তাদের অঙ্গ অনবদ্য সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে, শোভন গঠন জীবন্ত মূর্ত্তিসম্ভারেও। তাঁরাই আদি, তাঁরাই অগ্রণী। দানও তাঁদের অপর্য্যাপ্ত। এক পশ্চিম ভারতে, পশ্চিম ঘাটের শৈল-মালার অঙ্গ কেটে, রেখে যান তাঁদের অক্ষয় কীর্ত্তির নিদর্শন প্রায় পঞ্চাশটি স্থানে। নির্ম্মাণ করেন সহস্র গুহামন্দির। প্রসিদ্ধতম আর শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে কার্লির, ভাজার, নাসিকের, জুনারের, কানেরির, অজন্তার আর এলোরার গুহামন্দির।

হিন্দু শিল্পীরাও বৌদ্ধদের অনুসরণ করেন, নির্ম্মাণ করেন গুহামন্দির শৈলমালার অঙ্গে এলোরাতে, এলিফ্যাণ্টাতে আর যোগেশ্বরীতে। শ্রেষ্ঠ তাদের মধ্যে এলোরার কৈলাস আর এলিফ্যাণ্টার শিব মন্দির, পরিচিত গণেশগুম্ফা নামেও।

পশ্চাদপদ হন নাই জৈন স্থপতিও। তাঁরা অবতীর্ণ হন রঙ্গমঞ্চে সবার শেষে। কিন্তু পর্য্যাপ্ত নয় তাঁদের দান। এই এলোরাই বুকে নিয়ে আছে তাঁদের কীর্ত্তির নিদর্শনও। এই এলোরাই বুকে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৌদ্ধ। হিন্দু আর জৈন স্থপতির আর ভাস্করের, নিদর্শন চিত্রশিল্পীরও, তাঁদের সুন্দরতম দান, অপরূপ সৃষ্টি, অমর কীর্ত্তি। তাই এই বৈশিষ্ট্য এলোরার, লাভ করে এলোরা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের দরবারে, অমর হয় ইতিহাসের পাতায়। অমরত্ব লাভ করে তার স্থপতি, ভাস্কর আর চিত্রশিল্পীও।

আরব দেশীয় ভূগোলজ্ঞ মাসুদিই প্রথমে দশম শতাব্দীতে এলোরার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, মহাতীর্থ এলোরা, সমবেত হন এখানে কত দেশ-বিদেশের যাত্রী।

উল্লিখিত হয় এলোরা ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দেও। আলাউদ্দিনের মুসলমান সৈনিকেরা এলোরা দর্শনের পথে, বন্দী করেন গুজরাট রাজ দুহিতা ও দেবগিরির রামচন্দ্রের আশ্রিতা দেবলাদেবীকে।

M. Thenevot তাঁর "Voyage des Indis" গ্রন্থে এলোরার প্যাগোডার কথা উল্লেখ করেন। বলেন, অতি মানবের রচিত এই গুহামন্দিরগুলি।

তাঁর অনুগমন করেন Anaquil-du-Parron ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, Sir charles Malet ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, Captain Suly ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে আর Col. Sykes ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। রচনা করেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Wonders of Ellora ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, মনীষী Fergusson আর Burgess দর্শন করেন এলোরা। তাঁরাই এলোরার গুহামন্দির সম্বন্ধে বিস্তৃত ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেন। রচিত হয় তাঁদের যুক্ত প্রচেষ্টায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "Cave Temples of India" ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। পুনরাবিষ্কৃত হয় এলোরা—হয় বিশ্বজিৎ।

মহা পবিত্র তীর্থ এলোরা, পরিচিত বেরুল নামেও। নির্ম্মিত হয় এখানে তেত্রিশটি গুহামন্দির। নির্ম্মাণ করেন চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজারা। রাজত্ব করেন তাঁরা দাক্ষিণাত্যে, প্রবল প্রতাপে, ৫৫০ থেকে ৭৫৩ আর ৭৫৩ থেকে ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কেন্দ্র-স্থলে সতেরটি হিন্দু গুহামন্দির ত্রয়োদশ থেকে ঊনত্রিংশৎ। তাদের দক্ষিণে প্রথম থেকে দ্বাদশ (বারটি) বৌদ্ধ গুহামন্দির। উত্তরে চারিটি জৈন গুহামন্দির, ত্রিংশৎ থেকে চতুস্ত্রিংশৎ।

প্রায় দেড় মাইল পরিধি নিয়ে বঙ্কিমভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে কাটা হয় পশ্চিমঘাটের বুক। নির্ম্মিত হয় মন্দির। দুই প্রান্তে রচিত হয় দুইটি শৃঙ্গ, পৃথক হয় মন্দিরগুলি পশ্চিম-ঘাটের মূল শৈলমালা থেকে। নির্ম্মিত হয় প্রথম ও দ্বিতীয় গুহামন্দির (বৌদ্ধ) ৫৮০ থেকে ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তারাই আদি গুহামন্দির এলোরার। নির্ম্মাণ সুরু হয় তৃতীয় ও চতুর্থ (বৌদ্ধ গুহামন্দির) ও এক-বিংশতি, পঞ্চবিংশতি ও সপ্তবিংশতি হিন্দু গুহামন্দির ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে, সমাপ্ত হয় ৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। পঞ্চম গুহামন্দির (বৌদ্ধ) ও ঊনত্রিংশৎ গুহামন্দির (হিন্দু) নির্ম্মিত হয় ৫৮০ থেকে ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ বৌদ্ধ গুহামন্দির ও ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ হিন্দু গুহামন্দির নির্ম্মিত হয় ৭০০ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। নির্ম্মাণ করেন সবগুলি মন্দিরই চালুক্য রাজারা। প্রেরিত হন স্থপতি আর ভাস্কর রাজধানী বাতাপি থেকে। তাই বুকে নিয়ে আছে এই সব মন্দির বাতাপির গুহামন্দিরের ছাপ।

রাষ্ট্রকূট নৃপতি দন্তীদুর্গ ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন পঞ্চদশ গুহামন্দির (হিন্দু) দশাবতার। নির্ম্মিত হয় ষোড়শ গুহামন্দির কৈলাস ৭৫৭ থেকে ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। নির্ম্মাণ করেন রাষ্ট্রকূট-শ্রেষ্ঠ প্রথম কৃষ্ণ। ত্রয়োত্রিংশৎ ও চতুস্ত্রিংশৎ (জৈন গুহামন্দির)। নির্ম্মিত হয় ৭৫০ থেকে ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। নির্ম্মিত হয় এক ত্রিংশৎ (জৈন) গুহামন্দির, সবার শেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। রুদ্ধ হয় গতি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি মন্দিরের অপরূপ রূপ। দেখি স্তব্ধ হয়ে। বিস্মৃত হই পারিপার্শ্বিক। ভুলে যাই কোথায় এসেছি, কেন এসেছি। প্রসারিত হয় দৃষ্টি সুদূর অসীমের পানে। ছিন্ন হয় মনের বন্ধন। সম্মুখের মেঘ-চুম্বিত ধূসর গিরিশ্রেণীর বেষ্টনী অতিক্রম করে ঊর্দ্ধে নীলাকাশ ভেদ করে উপনীত হয় এক রহস্যলোকে, উপস্থিত হয় স্বর্গলোকে। উৎসবে মুখরিত স্বর্গ। মুখর দেবগণ, মুখর দেবীরাও। প্রতিধ্বনিত হয় তার আকাশ-বাতাস সুরললনার সুমধুর সঙ্গীতে আর উর্ব্বশীর নৃত্যে। অনবদ্য সেই নৃত্যের ছন্দ, নিখুঁত তার তাল। প্রতিহত হয় সেই মহা-নন্দের স্পন্দন হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে, আঘাত করে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। অভিভূত হয় মন, অবশ হয় দেহ।

সিংহী মহাশয়ের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর

সকলেই। স্বীকার করল না শুধু শঙ্কর। গীতশ্রীকে বলল, এ করেছ তুমি কি? অপাত্রে দান শোভনীয় নয়।

গীতশ্রী অবাক হবার চেষ্টা করে। বলে দান? আমি করব দান? কোন ঐশ্বর্য্যই আমার নেই, দান করব কি?

শঙ্কর বলে, নেই? কিছু নেই? বাঁচা গেল। যা ভয় পেয়েছিলাম, নিষ্কৃতি পেলাম এবার।

গীতশ্রী হেসে ফেলে ফিক করে। বলে, দুষ্কৃতের আবার নিষ্কৃতি। না গো ঠাকুর, না। মরা-বাঁচা অত সহজ নয়। বাঁচতে গেলে মরতে হবে আগে। লোকে তোমায় বলে, তুমি রাজার দুলাল। তোমায় আবার দান করব কি?

—লোকে ভুল বলে।

ভুল বলে? কখনও না। যারা চেনে না তারা ভুল বলে। যারা চেনে তারা বলে না।

—অবাক করলে শ্রী। অজ্ঞাত কুলশীল আমি, আমায় লোকে চিনবে কি?

গীতশ্রী সবেগে মাথা নাড়ে, অজ্ঞাত কুলশীল তুমি নও। তুমি জ্ঞাত কুলশীল। তোমায় চেনে সকলেই। আর সবার চেয়ে চিনি আমি। তাই—, বাকী কথাটা শেষ হয় না। মাঝখানেই জিভ কাটে গীতশ্রী।

শঙ্কর হাসে। অপূর্ব্ব মুখে, অপূর্ব্ব হাসি। বলে, ভাল করনি গীত। অখ্যাত, অনামা পুরুষ আমি। তাকে বিশ্বাস করে ভাল করনি তুমি। চাল নেই, চুলো নেই, তুষব তোমায় কি দিয়ে?

ভালবাসা দিয়ে। কথাটা জিভের গোড়ায় এসেও আটকে গেল গীতশ্রীর। বলতে পারল না। মুখ নামিয়ে শুধু বলল, তোমায় তোষণ চাই না আমি। রাজার দুলালের চাল-চুলোর অভাব নেই। যদি থাকে, তারও প্রয়োজন নেই আমার।

শঙ্কর বিব্রত বোধ করে। বলে, তা হয় না গীত। তোমায় গান শেখাতে পারি আমি প্রাণপণে কিন্তু ঠকাতে পারি না। মলিনতার পঙ্কে নিমজ্জিতও করতে পারি না। তাই বলি, এ সব পাগলামিকে প্রশ্রয় দিও না তুমি।

গীতশ্রী চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, হয় ত ব্যথা পায় অন্তরে। নত কণ্ঠে বলে ধীরে ধীরে, ঐটাই ত আমার একমাত্র আশ্রয়। ও থেকে বঞ্চিত কর না আমায়। তা হলে মরণেও সুখ পাব না আমি। সে চলে যায় ঘর ছেড়ে। হয় ত অশ্রু গোপন করবার জন্যই।

পর দিনই আবার দেখা হয়। হাসি মুখে কথা বলতে যায় শঙ্কর। কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে নেয় গীতশ্রী। ভ্রূ কুঁচকে বলে, রাজার দুলালদের বিশ্বাস নেই। তারা পারে সব।

—না কিছুই পারে না। শঙ্কর হাসে, তারা ঠকাতে পারে না। ছেলেমানুষের পাগলামিকেও প্রশ্রয় দিতে পারে না। কিন্তু গীত, কাল অমন করে চলে গেলে কেন বলত?

—নিজের পাগলামিকে অবহেলার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে।

'অনেকক্ষণ আমি অপেক্ষা করে বসেছিলাম শুধু তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে? কিন্তু কেন? চোখে শাণিত দৃষ্টি গীতশ্রীর।

'আমার অতীত ইতিহাসের কথা তোমায় শোনাব বলে।'

'শুনে আমার লাভ।'

'তোমার নয়, আমার। সে ইতিহাস শোনার পরও যদি তোমার পাগলামি আমার আশ্রয় খোঁজে তা হলে তোমায় বঞ্চিত করব না আমি।'

গীতশ্রী কেমন ভয় পেয়ে যায়। বলে, না থাক। অতীত ক্ষীন, অতীত মরা ছেলে। তাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে রাজী নই আমি। আমি বিশ্বাসী বর্ত্তমানে, আশাবাদী ভবিষ্যতে। আমার পাগলামি বর্ত্তমানকে ঘিরে, ভবিষ্যতকে আশ্রয় করে। সেখানে অতীতের ঠাঁই নেই কিছু।'

শঙ্কর চুপ করে যায়। কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

গীতশ্রী এগিয়ে আসে। শঙ্করের ডান হাতখানা দু'হাতে টেনে নিয়ে বলে, আমার পাগলামি সত্যিই কি ভীতিস্থল হয়ে দাঁড়াল তোমায়? বল, বল তুমি। সত্যি করে বল। লুকও না আমার কাছ থেকে। তোমার ভয়ের কারণ হয়ে, তোমায় জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে চাই না আমি। তার চেয়ে সরে যাব নিজে। নিঃশব্দে সরে যাব, তোমার চোখের সামনে থেকে চিরদিনের তরে।

শঙ্কর কথা বলতে পারে না। হয়ত গীতশ্রীর করুণ আবেদন মনকে দুর্ব্বল করে ফেলে গভীর ভাবে। অকস্মাৎ নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে। দু'হাত দিয়ে আকর্ষণ করে গীতশ্রীকে নিজের ঘন-সান্নিধ্যে। তার পর মুহূর্ত্ত তরে দু'জনেই হারিয়ে ফেলে দু'জনাকে।

তার পর আরও দুটি বছর কেটে গেছে পরম সুখে। সুখী শঙ্কর, সুখী গীতশ্রী। দুজনেই সুখী দুজনাকে পেয়ে। দুজনে মাধুর্য্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে দুজনাকে। উচ্ছসিত যৌবন, উল্লসিত জীবন। গলা আনন্দ প্রতি মুহূর্ত্তে ঝরে ঝরে পড়ে প্রাণ-প্রাচুর্য্যের রসে সিক্ত হয়ে। স্বপ্নময় জীবন। কবিতার কাব্য আর ছন্দ দুই আছে এতে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে গীতশ্রী। অদ্ভুত প্রশ্ন, শঙ্করকে অন্তরঙ্গতা দিয়ে বলে, বলত, জিতেছে কে?

শঙ্কর বলে, আমি।

গীতশ্রী স্বীকার করে না। ঘাড় দুলিয়ে বলে, না। আমি।

'কারণ?'

'তুমি ছিলে গীত-ভারতী। কিন্তু আমার কাছে হয়ে উঠেছ গীত-গোবিন্দ।'

'কিন্তু গীতশ্রী যে আজ রাজশ্রী, তার মধ্যে যে সকল সৌন্দর্য্যেরই সন্ধান পেয়েছি আমি।'

'সৌন্দর্য্য না কদর্য্য? তাই মাঝে মাঝে অমন ভাবে চমকে ওঠ আমায় দেখে। মাঝে মাঝে কেমন বিবর্ণ হয়ে পড়। আচ্ছা, ভাল লাগে না আমায়, না?

শঙ্কর হাসে। মধুর স্নিগ্ধ হাসিটি। বলে, পাগল।

'তবে? তবে অমন ভাবে শিউরে ওঠ কেন? মনে হয় ভয়

পেয়েছ যেন। কিন্তু ভয় কিসের ? তোমার অতীত ইতিহাসের ?'

'যদি বলি তাই।' শঙ্করের মুখের রং পাল্টে যায়।

গীতশ্রী অভয় দেয়। বলে, তুমি নির্ভয়ে থাকতে পার। আমি জানতে চাইব না কিছু। এ নিয়ে পীড়নও করব না তোমায় কোন দিনই।

এবারও হাসি ফুটে উঠে শঙ্করের মুখে কিন্তু করুণ হয়ে। বলে, তুমি জানতে চাইলেও জানাতে আর পারব না আমি।

'কারণ ?'

'যখন জানাতে চেয়েছিলাম শোন নি। এখন চাইলেও, বলতে পারব না।'

'কাজ নেই আমার শুনে।' সঙ্গে সঙ্গে গীতশ্রীর মুখ আর শঙ্করের বুকের মাঝের ব্যবধান একেবারে মিলিয়ে এক হয়ে যায়।

কিন্তু শুনতে হ'ল একদিন। একথা গীতশ্রী শুনতে না চাইলেও তাকে শোনাল তার দাদা।

উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, শুনেছিস, শঙ্করের কীর্ত্তি।

একটা অজানা ভয়ে কাঠ হয়ে যায় সে। গলায় স্বর ফোটে না। শুধু ঘাড় নাড়ে বার কয়েক।

দাদা তেমনি কণ্ঠে বলে, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তোর সঙ্গে করেছে, আমাদের সঙ্গে করেছে।

'দাদা! আর্ত্তনাদ করে ওঠে শঙ্করের রাজ্যশ্রী।'

'তখনি বলেছিলাম, অজ্ঞাত কুলশীল ছেলে, ওদের ওভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আমার কথায় কান দিল না কেউ। সুন্দর মুখ দেখে গলে গেল সব। এখন ?'

'তুমি ওঁকে কোন দিন সুনজরে দেখনি দাদা।'

'দেখিনিই ত। যে লোক দু-দুটো বিয়ে করবার পরও আবার একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে পারে, তাকে সুনজরে দেখবার মত প্রবৃত্তি আর যার থাক আমার নেই।'

'কি বলছ তুমি দাদা ?'

'সত্যি কথা বলছি বোন। তোর শঙ্কর এ বাড়ীতে ঢোকবার আগে আরও বিয়ে করেছে দুবার। তারা জলজ্যান্ত বেঁচে আছে আজও। আমাদের মুখে চুণকালি দিয়েছে সে। আমি ক্ষমা করব না তাকে। তাকে জেলে দেব। শঠ, প্রতারক, জোচ্চোর একটা।'

ভয়ে গীতশ্রী পাষাণ হয়ে যায়। শুধু মনের মধ্যে চমকাতে থাকে শঙ্করের অতীত ইতিহাসের কথাটা।

সারা বাড়ীতে একটা থমথমে ভাব এসে পড়ে। বাবা মা গম্ভীর সকলেই। একটা অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাষ দেখা দেয় সকলের চোখমুখে।

শঙ্করের হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে আনে গীতশ্রী। দরজা ভেজিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, বল তুমি, দাদা যা বলছেন সত্যি কিনা ?

শঙ্কর বিহ্বল হয়ে পড়ে। বোকার মত তাকিয়ে থাকে গীতশ্রীর মুখের দিকে।

—বল, বল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। বল, যা বলছেন দাদা, সব মিথ্যে।

শঙ্কর মাথা নাড়ে। বলে, না। সত্যি। তবে—।

গীতশ্রী চীৎকার করে ওঠে, সত্যি ? হা ভগবান! কেন, কেন এ কাজ করলে তুমি ? এতবড় সর্ব্বনাশ কেন করলে আমার ? ওগো—।

—গীতশ্রী—।

—না। কোন কথা শুনতে চাই না তোমার। তুমি শঠ, তুমি প্রবঞ্চক, তুমি মিথ্যাবাদী। উঃ—।

—কিন্তু আমার কোন কথাই তোমার কাছ থেকে গোপন করতে চাই নি গীতশ্রী। বরং শুনতে চাও নি তুমি। আমার অতীত ইতিহাস—যা তোমায় জানাতে চেয়েছি বার বার, অবহেলা করে শোন নি তুমি। এর পরও বলবে আমি প্রতারক ? আমি প্রবঞ্চক ?

—বলব। শুধু প্রতারকই বলব না, বলব তুমি নীচ, তুমি হেয়, তুমি বিশ্বাসঘাতক। তুমি ভীরু। চীৎকার করে শোনাবার সাহস হ'ল না যে, তুমি বিবাহিত—এক বার নয় দু-দুবার।

—তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছ গীতশ্রী, তাই ভুলে যাচ্ছ সেদিনের কথা যেদিন জানিয়েছিলাম তোমায়—আমি অজ্ঞাত কুলশীল, চালচুলো হীন যুবক। কিছু নেই আমার। সেদিন শোন নি তুমি আমার অতীত ইতিহাসের কথা।

গীতশ্রী তাকিয়ে থাকে জ্বলন্ত চোখে। তার পর বলে, তখন ভাবতে পারি নি এতখানি জঘন্য তুমি, এতখানি হলাহল লুকিয়ে থাকতে পারে তোমার ঐ মাকালফল চেহারার মধ্যে। উঃ, সব জ্বলে গেল আমার। তোমার অশুচিতার স্পর্শে জ্বলে গেলাম আমি। অসচ্চরিত্র, লম্পট কোথাকার।

শঙ্কর মুখ বিকৃত করে। তার পর দু'হাতে মাথা টিপে ধপ করে বসে পড়ে খাটের উপর পাতা বিছানায়। শ্বেতশুভ্র অমলিন বিছানা। অনেক রাতের মাধুর্য্য দিয়ে ঘেরা, অনেক অতন্দ্র রজনীর স্বপ্ন দিয়ে ভরা—তাদের রাজশয্যা।

কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই ছুটে আসে তার অনন্ত সুখের সঙ্গিনী, রাজশয্যার নিত্যসহচরী। উন্মাদিনীর মত তাকে দু' হাত দিয়ে টানতে টানতে বলে, না ওখানে নয়। তোমার স্পর্শে আর বিছানাকে কলঙ্কিত হতে দেব না আমি। তুমি যাও। জন্মের মত চলে যাও এবাড়ী ছেড়ে। আর কোন ছলে, কোন ছুতোয় মুখ দেখাবার চেষ্টা কর না আমায়। আমি ভাবব, আমার স্বামী নেই, আমি বিধবা। এই নাও ফিরিয়ে তোমার দান। বলতে বলতে হাতের শাঁখাটিকে সে ভেঙে ফেলে মট মট করে। তার পর টুকরোগুলি শঙ্করের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে পাগলের মত মাথা ঘষতে থাকে দেওয়ালে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলবার জন্য।

শঙ্কর হয়ত শিউরে উঠে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে উন্মাদিনীকে ধরে। বলে, থাক। ওটুকু মুছে দিতে পারব আমিই নিজের

হাত দিয়ে। ওর জন্তে তোমাকে রক্তখদা হতে হবে না দেওয়ালে মাথাকুটে। বলে নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করে সমস্ত সিঁদুরটা ঘষে তুলে নেয় রুমালে। তার পর একটু ফ্যাকাশে হাসি হেসে বিকৃত গলায় বলে, অসচ্চরিত্র, লম্পটটা এবার সত্যি সত্যি মুক্তি দিয়ে গেল তোমায়। এখন থেকে তুমি মুক্ত। সঙ্গে সঙ্গে সে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে। আর শঙ্করের আদরের রাজ্যশ্রী আছাড় খেয়ে পড়ল ভূতলে দু' হাতে বুক চেপে।

তার পর কেটে গেছে পাঁচ বছর। শঙ্কর আর ফেরে নি সেদিনের পর। রাগ করে গীতশ্রীও কোন খবর নেয় নি তার। কিন্তু এই পাঁচ বছরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে গীতশ্রীর জীবনে। ঝড়ঝাপটা অনেক বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। বাপ-মা চিরদিনের নয়। কিন্তু তবুও তারা যেন চলে গেলেন বড় তাড়াতাড়ি, যেন গীতশ্রীর এ বেশ দেখতে না পেরে। ভাইয়ের সংসার, ভ্রাতৃবধূরই সংসার। সেখানে ননদিনী অবাঞ্ছিত। এ সংসারে একদিন যতখানি দাপটই থাক না কেন গীতশ্রীর, আজ সবই অবহেলা। এ সইতে পারে না তার তেজী স্বভাব। তাই সে চাকরী যোগাড় করে স্কুলে। বাড়ী ত্যাগ করে তার পরই।

ঠিক এমনি একদিনে অকস্মাৎ দেখা হয়ে যায় তার শঙ্করের মাসীমার সঙ্গে। তাঁরই মুখে শোনে শঙ্করের ইতিহাস। বিচিত্র এ ইতিহাস। একটা নির্দ্দোষ ছেলের জীবনকে ব্যর্থ করে দেবার মত এ ইতিহাস।

মাসীমা বলেন, রাজার দুলাল শঙ্কর—লাখপতির ছেলে শঙ্কর। ব্যবসায় ফেল করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন বাবা। টাকার লোভে বিয়ে দেন ছেলের এক ধনী কন্যার সঙ্গে। কিন্তু যক্ষ্মারোগ-গ্রস্তা মেয়ে। রোগ লুকিয়ে বিয়ে দেন বাপ-মা। এ গোপন-চারিতায় মেয়েটি ভীষণ ব্যথা পায় মনে। ফুলশয্যার রাতে শঙ্করকে বলে দেয় সব। এমনকি শঙ্করকে ঘেঁষতে দেয় নি কাছে। গভীর আঘাতে মেয়েটি ভেঙে পড়েছিল ভিতরে ভিতরে। এর পরই শয্যা নিল সে। সেই তার শেষ শয্যা। নিষ্ঠুর রোগ তাকে মুক্তি দিল অচিরেই।

ঋণের কিছুটা শোধ করতে পেরেছিলেন শঙ্করের বাবা, কিন্তু সবটা নয়। তারই ভারে আর অসহ্য দুঃখ কষ্টের চাপে একদিন চিরবিদায় নিলেন তিনি সকলের কাছ থেকে। যাবার আগে ছেলেকে ডেকে বলে গেলেন একান্তে, পার ত পিতৃঋণটা শোধ কর তুমি। নইলে শান্তিও পাব না, মুক্তিও পাব না আমি। বাপের কথা রেখেছিল শঙ্কর। পিতৃঋণ শোধ করেছিল সে প্রথম বারের মত এবারেও। তবে টাকার বিনিময়ে নয়, নিজের বিনিময়ে। উত্তমর্ণ অবিনাশবাবু। তাঁরই মেয়ে। ভারী সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু পাগল মেয়ে। বিয়ে দিলে হয়ত সেরে যেতে পারে এ রোগ, এমনি একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মনস্তাত্ত্বিকেরা। অবিনাশবাবু খুলে বলেছিলেন শঙ্করকে সে কথা। বলেছিলেন, মেয়েটিকে যদি তুমি বাঁচিয়ে দাও শঙ্কর, তোমার পিতৃঋণের সবকিছু থেকেই মুক্তি দেব তোমায়। আর মেয়ের চিকিৎসার সবকিছু ভার বহন করব আমি। পিতৃঋণে অস্থির শঙ্কর। ঋণমুক্তির আশায় রাজি হ'ল সে। মুক্ত হ'ল ঋণের দায় থেকে। কিন্তু মুক্ত করতে পারল না নিজের বৌকে—এই দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে। বিয়ের ঠিক দু'বছর পর মেয়েটিই মুক্তি দিল শঙ্করকে আত্মহত্যা করে।

তার পর বিবাগী হ'ল শঙ্কর। কোথায় যে গেল সে, খবর পেল না কেউ। ভুলেই গিয়েছিলাম তার কথা। এমনি সময়ে হঠাৎ দেখা এলাহাবাদে। বলল, মাসী, দেশ ঘুরে বেড়ালাম মেলা, শান্তি নেই কোথাও। এইবার ভাবছি ফিরব নিজের দেশে।

বললাম, তাই ফিরে চল বাবা। এমনি ভাবে সন্ন্যেসী হয়ে বেড়াস নি আর। বাপ-মা নেই বলে কি বাউণ্ডুলে হয়ে যাবি শেষ পর্য্যন্ত ?

রাজী হ'ল সে। দেশে ফেরবার মুখে প্রয়াগতীর্থে স্নান করিয়ে নিয়ে এল আমাকে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় সেই সূত্রেই।

ছাদপেটা শব্দ সুরু হয়ে গেল গীতশ্রীর বুকের মধ্যে। এক-আধটি নয়, একেবারে শতসহস্র দুরমুষ পাত—একসঙ্গে, একই তালে। সে বুঝল, মাসীমার সংবাদসূত্রের দৈর্ঘ্য অল্প। তার বিস্তার প্রয়াগের রেলষ্টেসন বা সুরেশ্বরের কোয়ার্টার পর্য্যন্ত। তার বাইরে সূত্র দীর্ঘ হয়ে উঠে নি আজও। তাকে দীর্ঘতর করবার চেষ্টাও করল না গীতশ্রী। শুধু প্রশ্ন করল দুরু দুরু বুকে, তার পরের খবর কিছু জানেন না মাসীমা ?

মাসীমা ঘাড় নাড়েন। বলেন, কোথায় যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাউণ্ডুলের মত, ভগবান জানেন। রাজপুত্র ছেলে। জীবনটা বিষিয়ে গেছে শুধু শোক পেয়ে পেয়ে। সেদিন দেখা হয়েছিল আমার ভাসুর-পো রাজীবের সঙ্গে। রাজীবই বললে, বর্দ্ধমানে সার্কাস পার্টিতে খেলা দেখাচ্ছে সে।

—সার্কাস পার্টিতে ? গীতশ্রীর বুকটা ধক্ করে উঠে।

—সার্কাস পার্টির কথাই ত বললে সে। তাকে চিনতে পেরেছিল শঙ্কর। তাই দেখা করল না কিছুতেই।

এতদিন সর্ব্বংসহ ছিল গীতশ্রী। এবার সীমা লঙ্ঘন হ'ল তারও। অন্তরের গভীরের শূন্যতা আজ দুর্ব্বহ হয়ে উঠল জগদ্দল পাথরের ভারে। আর্ত্ত একটা নারী-হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে লুটিয়ে পড়ল অদৃশ্য শঙ্করের পায়ে। সে চেনে নি শঙ্করকে, চেনে নি তার মহানুভবতাকে। তাই সে হতে পেরেছিল নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। খেঁকি কুকুরের মত কামড়েছিল তাকে। কুৎসিৎ অপবাদে, অপমানে, গ্লানিতে বিষিয়ে দিয়েছিল অন্তরটি তার। এ-যে কতখানি মিথ্যা, সে-কথা বুঝেছিল শঙ্কর। তাই মুক্তি দিয়ে গিয়েছিল তার রাজ্যশ্রীকে অত সহজেই। এতদিনে অন্তর ভার-মুক্ত হ'ল গীতশ্রীর। স্নেহময় স্বামী তার অসচ্চরিত্র নয়। প্রেমময় স্বামী তার লম্পট নয়। গীতশ্রী উঠে দাঁড়ায়। আজ সমস্ত ক্ষোভ

তার জমা হয়ে উঠে দাদার বিরুদ্ধে। সমস্ত আক্রোশ তার ফেটে পড়তে চায় এই কুটিল মানুষটির বিপক্ষে। দাদা তার চিরদিনই কুটিল। এই কুটিলতার আশ্রয় নিয়ে সরিয়েছে নিরপরাধ স্বামীকে তার। কিন্তু বিনা স্বার্থে নয়, পিতৃসম্পত্তির অংশীদার কমাবার লোভে। তাই নাটকের মিথ্যা চিত্রটাই তুলে ধরল সকলের সামনে, সত্যটাকে গোপন করে।

বিগতদিনের অবিচার আজ অসহনীয় হয়ে উঠে শ্রীকৃশ্রীর কাছে। প্রতিবিধানের আশায় ছিটকে বেরিয়ে পড়ে সে। ছোটে বর্দ্ধমানের দিকে সার্কাসের অনুসন্ধানে। কিন্তু সে সার্কাস তখন চলে গেছে শহর ছেড়ে। দূরে—কত দূরে কেউ জানে না। তারপর যত সার্কাসের সন্ধান পেয়েছে সে, ছুটে গেছে সেখানে রুদ্ধ নিশ্বাসে, আবার রুদ্ধ নিশ্বাসেই ফিরে এসেছে শূন্য হৃদয়ে। শঙ্করের সন্ধান নাই, এতদিনেও পেল না সে। বিয়ের পর তোলা ছবি—দোকানে টাঙ্গান আছে যা আজও—তারই কাছে ছুটে আসে ঘন ঘন। একই মিনতি জানায় ঠোঁট টিপে টিপে, ক্ষমা কর, ফিরে এস। তোমার রাজ্যশ্রী শ্রীহীনা আজ। তাকে ভরিয়ে তোল, সাজিয়ে তোল, সব দৈন্য ঘুচিয়ে দাও তার।

দিন যায়, বছর যায়, দেবকী আসে। সেই একই প্রার্থনা করে চলে ছবিখানির কাছে, ক্ষমা কর, ফিরে এস, সাজিয়ে দাও আমাকে। পনেরটা বছর এই প্রার্থনাই করে চলেছে সে। যৌবন তার এসেছিল সোনার বরণ পাখা মেলে, কিন্তু নিঃশব্দে পালিয়ে গেছে—অলক্ষে সে পাখা গুটিয়ে। আজ সে প্রৌঢ়। মসৃণ চামড়া অনাদরে কুঁচকে এসেছে স্থানে স্থানে, সারা দেহে ক্লান্তি। চোখের দীপ্তি নিষ্প্রভ। তবুও সে প্রার্থনা করে মৃদু মৃদু ঠোঁট নেড়ে, তোমার রাজ্যশ্রী আজও শ্রীহীনা। এ শ্রীহীনতা ঘুচিয়ে দাও তার।

একদিন নয়, দু'দিন নয়, পনেরটা বছর সাধনা করে এসেছে দেবকী। ঐকান্তিক সাধনা আজ সফল হতে চলেছে তার। তার ডাক গিয়ে পৌঁছেছে শঙ্করের কানে। সাড়া দিয়েছে সে এতদিন পর। রাজার দুলাল শঙ্কর আজ ভিখারী শঙ্কর। ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে আসছে দেবকীর দ্বারে। আজ সে অন্নপূর্ণার মতই গ্রহণ করবে ভিখারী শিবকে। দু' হাতে ভরে দেবে তার ঝুলি। অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য—যা সে তিলে তিলে সঞ্চিত করে রেখেছে মনে মনে—দিয়ে করবে তার পূজা। দেবকী নড়ে বসে, পার্কে ভিড় বেড়ে উঠেছে ছেলেমেয়ের। গোধূলী লগ্নে ছুটোছুটি করছে চারিদিকে—তারই আনাচে-কানাচে। একটা দীর্ঘশ্বাস জমে উঠে বুকে। হায়! লগ্ন বয়ে গেছে বৃথা। সুতরাং বুক ভারী করা ছাড়া আর উপায় নেই তার। দেবকী তাকায় মণিবন্ধে বাঁধা ঘড়ির দিকে। ছ'টা বাজে নি তখনও, সে ধীরে ধীরে উঠে পড়ে। পার্ক ছেড়ে পায় পায় এগিয়ে চলে বাড়ীর দিকে।

ঘড়িতে ন'টা বাজে, দেবকী বসে আছে সুদৃশ্য একখানা টেবিলের সামনে, ঘড়ির দিকে চোখ রেখে। এক একবার উৎকর্ণ হয়ে উঠে সে। বুকের দাপাদাপি বেড়ে যায়, এত বাড়ে যে হাঁফাতে থাকে দেবকী। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয় তার, তিনবার সে ঠকেছে। পদশব্দ ভ্রমে, ছুটে গেছে সিঁড়ির দিকে, কিন্তু তিনবারই ফিরেছে সে নিস্ফল হতাশায়। মাঝে মাঝে একটা দোলা লাগে প্রাণে, একটা শিহরণ জাগে অন্তরে, এ নারীত্বের দোলা, নারীত্বের শিহরণ। যৌবন খসে গেছে তার বাইরের আবরণ থেকে, কিন্তু জেগে আছে এখনও অন্তরের গোপন আবরণের মাঝে। সে দোলা লাগায়, চমকও জাগায়।

ভয়ের সঙ্গে একটা ভাবনা ক্রমশঃই নিঃসাড় করে ফেলে দেবকীকে। নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয় তার। অনুভূতিশূন্য অঙ্গ, অনুভূতিশূন্য মন। সে বসে থাকে নিস্পন্দভাবে, ঘড়ির দিকে চোখ দু'টি মেলে।

হঠাৎ দরজার পাশ থেকে আওয়াজ আসে, আসতে পারি ঘরে?

দেবকী চমকে উঠে, একটা হিমপ্রবাহ বয়ে যায় তার সারা দেহের উপর দিয়ে। গলার ভিতরটা অদ্ভুতভাবে ঘড় ঘড় করে উঠে, কিন্তু স্বর ফুটে উঠে না এতটুকু।

প্রশ্ন হয় আবার, আসতে পারি ভেতরে?

ভারী পরিচিত কণ্ঠস্বর, কুড়ি বছর আগে শোনা এ স্বর। আজও ভুলে নি দেবকী। সারা জীবন সে ভুলবে না এ স্বরকে। রিনৃরিনে মিঠে স্বর, মন ভোলান স্বর। পৃথিবীতে একটি মানুষের কণ্ঠেই এ স্বর সম্ভবপর। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে দেবকী। কিন্তু এ স্বরকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে ভুলে যায় সে, শুধু তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে।

একটা দীর্ঘ অসরল দেহ অতি সন্তর্পণে ঘরে এসে ঢোকে। দেবকী চমকে উঠে, চেতনা ফিরে পায়। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখে। চিনতে কষ্ট হয়, তবুও চিনতে পারে সে, এ শঙ্কর। শিবের কায়ার উপর অশিবের ছায়া। বিশ বছর আগে দেখা—সে শঙ্কর, এ শঙ্কর নয়। সেই স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল, রাজার দুলাল শঙ্করের সঙ্গে এ জরাজীর্ণ শঙ্করের মিল কোথাও নেই। তবুও এ শঙ্কর। এ অস্বীকার করতে পারে না দেবকী।

সাধ ছিল স্বামীকে দেহ ও মনে অদৈন্যের মাঝে স্বাগতম জানাবে সে, হাতে ধরে এনে বসাবে পাশে। এর জন্যে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই রাখে নি দেবকী, কিন্তু লগ্ন মুহূর্ত্তে বেভুল হয়ে গেল সব। লগ্ন হ'ল ভ্রষ্ট।

ঘরে ঢুকে হকচকিয়ে যায় শঙ্কর। হয়ত ইতস্ততঃ করে এক মুহূর্ত্ত। তারপরই ধুপ করে বসে পড়ে একখানি চেয়ারে আড়ষ্টভাবে —অনেকখানি নৈকট্য বাঁচিয়ে। এটুকু দৃষ্টি এড়ায় না পারে না দেবকীর। আলোর ঝরণা ধারায় সমস্ত ঘরখানি স্নাত, ফুলদানির উপর সাজান নানা রকম ফুল ফুলের গন্ধে আমোদিত। চেয়ারে, টেবিলে, দেওয়ালে, জানালায়, চারিদিকেই সৌখীনতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। একটা আবেগোচ্ছ্বাস-আনন্দচঞ্চলতা যেন উকি-ঝুকি মারছে ঘরখানির চারিদিকে। তাদের কেন্দ্র করে মাঝখানে

বসে আছে দেবকী প্রসাধনের হিল্লোল জাগিয়ে। যৌবন প্রায় তিরোহিত তার দেহে, কিন্তু মনে সে অতৃপ্ত যৌবনা। সাধে বাদ পড়েছে, কিন্তু ছেদ পড়ে নি। সেই ছেদের সূত্রকে সে দিতে চায় জোড়া। তারই অপেক্ষায় প্রহর গুণে চলেছিল সে।

প্রতীক্ষার শেষ হ'ল, প্রহরও এল, কিন্তু অনুনয়ের বেশে। শঙ্করের এমন অশরীরী মূর্তি এ সকল কল্পনার বাইরে ছিল দেবকীর।

কথা বলল শঙ্কর। কেমন একটুখানি হেসে বলল, এ তুমি আশা কর নি, না? আমিও করি নি। আবার যে তোমার সামনে কোন দিন আসব এ ভাবতে পারি নি আমি, কিন্তু আসতে হ'ল—স্বভাবে নয় অভাবে।

দেবকী সামলে নিল নিজেকে। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, অভাবে? শুধু কি তাই? আর কিছু নয়?

—আর কি? শঙ্কর প্রশ্ন করে বোকার মত।

—পৃথিবীতে ঐ একটিমাত্র জিনিসই ছিল, যা টেনে এনেছে তোমাকে আমার কাছে? দ্বিতীয় কোন বস্তুর আকর্ষণ অন্তরে খুঁজে পাও নি তুমি? স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা—এদের তাগিদও কি ছিল না তোমার?

—স্নেহ! প্রেম! ভালবাসা! শঙ্কর আবৃত্তি করে মনে মনে। তারপর মাথা নেড়ে বলে, না, সে সব শেষ হয়ে গেছে। বিশ বছর আগে একদিন মৃত্যু হয়েছে তাদের—আমার এ জীবনে। মৃত্যু হয়েছে আমার আত্মার, আমার সত্তার। আর কেউ বেঁচে নেই তারা।

দেবকী শিউরে উঠে। এ করেছে কি সে, একটা জীবন্ত স্নেহকে হত্যা করেছে, জীবন্ত প্রেমের সমাধি দিয়েছে, জীবন্ত ভালবাসাকে দগ্ধে মেরেছে! এ মূর্তি একদিন সবল ছিল। সেদিন অন্তর বাহির সবই ছিল সরস। পাকা আঙ্গুরের মত রসাল অন্তর-দিয়ে যে রস পড়ত ঝরে ঝরে, তাতেই দিবারাত্র সিক্ত হত সে, অভিসিঞ্চিত হত সে। আজ সে মূর্তি শুষ্ক, অন্তর-বাহিরে শুষ্ক। এক ফোঁটা রসও আর চুঁইয়ে পড়বে না সেখান থেকে, হয়ত সিক্ত করবে না তাকে। দেবকী ভীত আর্ত্ত চোখে তাকিয়ে দেখে ঐ বৈশাখ-দগ্ধ মূর্তির দিকে। রাজার দুলাল শঙ্কর আজ ভিখারী শঙ্কর —তেমনি শ্রী, তেমনি ছাঁদ। দেবকীর ইচ্ছা হয় হাত বাড়িয়ে সমস্ত আলোগুলি এক সঙ্গে নিভিয়ে দিয়ে, বসে থাকে দু'জনে মুখোমুখি অতীতের দিনগুলিকে স্মরণ করে।

সহসা শঙ্কর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে একটুখানি। তারপর শশব্যস্তে বলে, এক গ্লাস জল, ঠাণ্ডা জল পেতে পারি? অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি কিনা, পিপাসা পেয়েছে বড়।

দেবকী আর একবার চোখ তুলে চায় শঙ্করের মুখের দিকে। সারা শরীরটা তার কেমন আনচান করে উঠে। নিজের উপর একটা নিষ্ফল আক্রোশ রক্তাক্ত করে তোলে অন্তরটিকে তার, দাঁতে দাঁত চেপে উঠে পড়ে সে। তারপর দামী শাড়ীর আঁচল দিয়ে ভাল একখানি রেকাবি পুঁছে এক থালা মিষ্টি সাজিয়ে কাচের গ্লাসে জল ভর্ত্তি করে সযত্নে এগিয়ে দেয় শঙ্করের সামনে। মৃদুকণ্ঠে বলে, শুধু জল খেতেনেই। মিষ্টি ক'টা খেয়ে জলটা খেয়ে নাও।

শঙ্করের দৃষ্টি লোলুপ হয়ে উঠে। একবার যেন হাত বাড়াতে যায়। তারপর হাত গুটিয়ে নিয়ে নীচু গলায় বলে, তোমার কাছে লুকোতে চাই না। আজ তিনদিন একটাও দানা পড়ে নি পেটে। রাস্তায় রাস্তায় শুধু জল খেয়েই কাটাচ্ছি ক'টা দিন। আজকাল মাঝে মাঝে এমনই হয়। আবার হঠাৎ কিছু জুটেও যায়, কিন্তু এবার আর সে সম্ভাবনা কিছু নেই। তাই হাত পেতেছি তোমার কাছে।

শুনে কাঠ হয়ে যায় দেবকী। স্বামী তার অভুক্ত তিনদিন। না খেয়ে তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে মরণের মুখে, আর সে নিজে? দামী শাড়ীর আঁচল ভার ভারী হয়ে উঠে কাঁধের উপর। মুখের পাউডার লেপে একাকার হয়ে যায় ঘামে। সমস্ত মুখ বিস্বাদ হয়ে আসে তিক্ততায়।

শঙ্কর খায়। দেবকীর কেমন অদ্ভুত লাগে তার এ খাওয়াটা। মনে হয় চিবোবার আগেই সে যেন গিলে খাচ্ছে সব। এ যে ক্ষুধার তাড়না এটুকু বুঝতে বাকি থাকে না তার। তাই চোখের জল গোপন করে ক্লান্তকণ্ঠে সে বলে, তিনদিন খাওয়া হয় নি তোমার। অনাহারে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলেছ তিলে তিলে মরণের মুখে। তবুও একবারটি খবর দিতে পার নি আমায়? অথচ আমি বেঁচে আছি। প্রতিশোধ নিতে চাইছ কেন বলতে পার? ভুলের কি প্রায়শ্চিত্ত হয় না? না, এতটুকু দয়ারও যোগ্য নই আমি?

শঙ্কর মুখ তোলে। বলে, প্রতিশোধস্পৃহা আমার নেই। তোমার ওপর ত নয়ই। মাঝে মাঝে মনে হ'ত, ছুটে চলে যাই তোমার কাছে। তোমার কল্যাণপরশে হয়ত ঘুচে যাবে আমার সকল দৈন্য, সকল ক্লেদ, সকল গ্লানি। কিন্তু—

—কিন্তু? কিন্তু কি?

—লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় এরা পথ আগলে দাঁড়াত আমার। তোমার শান্তির নীড়ে অশান্তির অনুপ্রবেশ—এ চিন্তা দুঃসহ হয়ে উঠত আমার কাছে।

—না, তুমি নিষ্ঠুর। তাই নিষ্ঠুরতা দিয়ে জয় করতে চেয়েছিলে অন্তরের স্নেহ, প্রেম, ভালবাসাকে। মুছে ফেলতে চেয়েছিলে তাদের শোণিতের কণিকা থেকে। আর আমি? কঠোর সাধনা করে চলেছি এই পনের বছর ধরে। দিনের পর দিন। প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি নিজ কৃতকর্মের। তবু তুষ্ট হলে না দেবতা!

শঙ্করকে খাওয়াচ্ছে দেবকী।

শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর পরিপাটি করে সাজান ভোজ্য-দ্রব্যগুলি। তারই সামনে শঙ্করকে এনে বসিয়ে দিল যত্ন করে। নিজে এসে বসল পাশে একখানা সুদৃশ্য হাতপাখা হাতে নিয়ে। যদিও বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছিল মাথার উপর বন বন করে তবুও হাতপাখাখানা সযত্নে নেড়ে চলেছিল দেবকী।

বলতে গিয়ে শঙ্কর চমকে উঠে। বলে, করেছ কি? এত?

—হ্যাঁ। তিনদিন খাও নি, মনে আছে?

—তা আছে। কিন্তু এত তিন দিনের খাওয়া নয়। এ যে বিশ বছরের খাওয়া বেড়ে দিয়েছ একসঙ্গে। আহা! অতি উপাদেয় জিনিস এ সব। যেমনি সুখাদ্য, তেমনি সুগন্ধী! কতদিন যে এ সব জোটে নি কপালে! বলে জিভ দিয়ে ঝোল টানার মত মুখে একটা শব্দ করে শঙ্কর। তার পর হাত বাড়াতে গিয়েই সহসা হাত টেনে নেয়। প্রশ্ন করে দেবকীকে, খাব?

দেবকী বিস্মিত হয়। বলে কেন? এ সব ত তোমারই জন্যে করেছি আমি। তুমি খেতে ভালবাসতে বলে।

—তা বাসতাম। কিন্তু এখন আর বাসি না। তোমার কাছে গোপন করে লাভ নেই। আর সহ্য হয় না। না খেয়ে না খেয়েই বল, আর অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েই বল, পেটের এইখানে একটা ব্যথা ধরে। তখন কাটা ছাগলের মতই ছটফট করি। ডাক্তার বলে, গ্যাসট্রিক আলসার। খুব সাবধান। এগুলো খেলে সে ব্যাথাটা ধরবে ঠিকই। অথচ তুমি দিয়েছ। না খেয়ে থাকি কি করে ব'ল?

মুহূর্তের মধ্যে নীল হয়ে উঠে দেবকী। হাতপাখাখানা ফেলে দিয়ে ভোজ্যদ্রব্যগুলির উপর হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, থাক, এসব খেয়ে কাজ নেই তোমার। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আলাদা। বলতে বলতে ডিসগুলি তুলে নিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে যায় পাশের ঘরে। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসে আবার। তার দু'হাতে ধরা থালার উপর সাজান সাদাসিদে অন্ন আর ব্যঞ্জন।

নতমুখে বলে, গুরুপাক খেয়ে কাজ নেই তোমার। লঘুপাক খাওয়াই ভাল। এতে অসুখ করবে না তোমার। দেবকী নতমুখেই দাঁড়িয়ে থাকে। স্পষ্ট বোঝা যায় চোখ তুলে তাকাবার সাহস নেই তার। পাছে অশ্রুসিক্ত মুখখানি ধরা পড়ে যায় শঙ্করের কাছে।

শঙ্করের খেয়াল নেই সে দিকে। কোন কিছু না ভেবেই বলে, এই ভাল। বেশ সাদাসিদে খাওয়া। কিন্তু এও কি রেঁধে রেখেছিলে তুমি আমার জন্যে?

দেবকী উত্তর দেয় না। বলতে পারে না, এ রান্না তোমার জন্যে নয়, এ আমার। পনেরটা বছর একে সম্বল করেই বেঁচে আছি আমি। ঠিক এমনি একটা দিনের জন্য মুহূর্ত গুণে চলেছি মনে মনে।

কিন্তু দেবকীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে না শঙ্কর। একগ্রাস ভাত মুখে দিয়ে বলে উঠে, চমৎকার রেঁধেছ কিন্তু তুমি। এ রাজভোগ। গুরুপাক খেতে পেলাম না বলে দুঃখ আমার একটুকু নেই।

দেবকী বলে, আমার রান্না ত কোনদিন খাও নি তুমি। কি করে বুঝলে এ রান্না আমার?

—অনুমান। আজকাল অনেক কিছু অনুমান করতে শিখেছি আমি।

দেবকী সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকায় শঙ্করের মুখের দিকে।

শঙ্কর বলে, বিশ বছর পর তোমায় প্রথম দেখি রাস্তার ধারে, ছবির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। চমকে উঠি। দেখি দেওয়ালে টাঙান আছে আমাদের বিবাহের সেই ছবি। তারই দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছ তুমি, চোখে যেন একবিন্দু জল। তাই দেখে অনুমান করি, অতীতের স্মৃতিকে বিস্মৃতির তলে ঠেলে দিতে পার নি আজও। আজও তার প্রতি আছে তোমার দুর্বলতা, আছে সকরুণ মমতা। এ অনুমান যে আমার মিথ্যা নয় তার প্রমাণ পাচ্ছি হাতে হাতে।

দেবকী মুখ নামিয়ে নেয়। লজ্জারুণ হাসির ক্ষীণ ছটা দেখা দেয় সেখানে।

শঙ্কর বলে, জীবনে একটি জিনিসকে আজও ভারী শ্রদ্ধা করি আমি। সে তুমি। আর তেমনি ভয় করি আর একটা জিনিসকে—সে আমার ঋণ। প্রথম যৌবনে পিতৃঋণের দায়ে দুবার বিকিয়ে দিয়েছিলাম নিজেকে। তারই ফলভোগ করে চলেছি সারা জীবন ধরে। তবুও সে ঋণ পরিশোধ করেছিলাম কিছুটা। কিন্তু শেষ জীবনের ঋণ! এ বুঝি অপরিশোধ্যই থেকে যায়। তাই লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে স্মরণ নিয়েছি তোমার। শঙ্কর থামে। অপ্রতিভ মুখে একবার তাকিয়ে দেখে দেবকীর দিকে। তার পর বলতে থাকে আবার, সামান্য ঋণ। কিছুটা করেছি লজ্জা নিবারণের তাগিদে আর বাকীটা পোড়া পেটের জ্বালার তাড়নায়। শোধ করে উঠতে পারি নি আজও। ঠিক করেছি এই শেষ। এই বারই বেরিয়ে পড়ব সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যে দিকে দু'চোখ যায়। হরিদ্বারেও যেতে পারি, আবার কেদার-বদরীও যেতে পারি। তবে ঋণের বোঝা নিয়ে যাব না। তাই এসেছি তোমার কাছে। বল এ সাহায্যটুকু আমি পাব তোমার কাছে?

শুনে পাথর হয়ে যায় দেবকী। শঙ্কর বেরিয়ে যাবে! সর্বস্ব ছেড়ে বেরিয়ে যাবে সুদূর হিমালয়ের এক হিমশীতল প্রান্তরে! এ চিন্তা পাথর করে তোলে তাকে। সে অবুঝের মত তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে।

খাওয়া শেষ হয়ে আসে শঙ্করের। শেষ গ্রাস মুখে তুলে দিয়ে সে বলে, অবশ্য শুধুহাতে নেব না ঐ টাকা। সম্বল আমার কিছু নেই বটে, তবুও যা আছে তার মূল্য অপরের কাছে কিছু না হলেও আমার কাছে মহামূল্য। এর মূল্য বুঝবে না কেউ তুমি ছাড়া। তাই তোমার হাতে তুলে দিতে চাই এ জিনিস। শত দুঃখে, শত দারিদ্র্যেও হাতছাড়া করি নি একে একটা দিনের তরেও। বলতে বলতে গোপন পকেট থেকে একটা আংটি বার করে শঙ্কর। কোমল হীরের আংটি। সামান্য আলোতেই ঝকঝকিয়ে উঠে। দেবকী চিনতে পারে। তারই দেওয়া আংটি। বাসর ঘরে ঐ আংটি সে পরিয়ে দিয়েছিল শঙ্করের হাতে। তলার সোনার পাতে নাম লেখা আছে তার। অনুমান মিথ্যা হয় না। আংটিতে হাত দিয়েই বুঝতে পারে দেবকী। শান্ত করুণ মুখ তার মুহূর্তেই

কঠিন হয়ে উঠে। চোখ দিয়ে বিদ্যুতের দ্যুতি ঠিকরে পড়ে। আংটিটিকে মুঠো করে ধরে সে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠে, কি নির্মম। এত বড় অপমান করতে পারলে আমাকে! তিলে তিলে দগ্ধ করেছে আমাকে এই বিশ বছর ধরে। আজ দংশন করলে আবার। সামান্য টাকা! তুচ্ছ টাকা! তারই দিকে দৃষ্টি তোমার বদ্ধ। একবার তাকাবার সময় হ'ল না আমার দিকে। এই টাকার বিনিময়ে পেতে চাও তুমি মুক্তি? বিদায় নিতে চাও চিরতরে? আর তাইতে সাহায্য করব আমি! না। পারব না। এমন করে নিজের সর্ব্বনাশ করতে আর পারব না আমি কিছুতেই।

দেবকী উচ্ছ্বসিত কান্নায় উপুড় হয়ে পড়ে সেইখানে।

আর শঙ্কর তাকিয়ে থাকে সেই দিকে বোবার মত।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম। এ দেবকীর আদেশ। এ আদেশ অমান্য করতে পারে না শঙ্কর। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পৌঁছলেও মনের মধ্যে ছেড়ে আসা যৌবনের চাঞ্চল্য, তার মধুময় উন্মাদনা আজ এই প্রথম অনুভব করে সে, এবং তারই আবেশে রুক্ষ কঠিন দেহখানি তার এলিয়ে দেয় দেবকীরই শুভ্র শয্যার উপর।

দেবকী এসে বসে শঙ্করের শিয়রের কাছে। এতক্ষণে শান্ত হয়েছে তার মন। চোখের বিদ্যুৎ-জ্যোতিতে এখন ঘরের কোমল আলোর স্নিগ্ধতা। কঠিন মুখ শান্ত কমনীয়তায় ভরা একটা গোপন প্রীতিরস যেন উপচে পড়ছে সারা চোখেমুখে। সে তৃপ্ত. শঙ্করের মাথার কাছে বসে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে সে। তারপর তার রুক্ষ অগোছাল চুলের মধ্যে নিজের সরু সরু আঙুলগুলি প্রবেশ করিয়ে দেয় সন্তর্পণে। নিস্তব্ধ ঘর, নিস্তব্ধ দু'জনেই। দু'জনেই হয়ত একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে শিরায় শিরায়।

দেবকী কথা বলে, প্রশ্ন করে মৃদুকণ্ঠে সার্কাস করতে তুমি?

শঙ্করের চোখ বোজা। হয়ত এ স্পর্শসুখটুকু উপভোগ করছিল সে মনেপ্রাণে। হয়ত তলিয়ে গিয়েছিল বিশ বছরের অতীতে—এমনি করে যেদিন স্নেহভরে খেলা করত দেবকী তার মাথার চুলগুলি নিয়ে, প্রশ্ন শুনে হঠাৎ চমকে উঠে। মৃদু হেসে বলে, সব খবরই রাখতে দেখছি, কিন্তু দিল কে?

—মাসীমা, সব কথাই বলেছেন তিনি আমাকে।

—শঙ্কর বলে, করতাম না, যোগান দিতাম।

—মানে?

—বাঘ-ভালুকের খেলায় ছিলাম না, ছিলাম অর্কেষ্ট্রায়। তারই দোলায় দোলায় তাতিয়ে রাখতাম সকলকেই।

দেবকীর চোখের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে যায়। সাগ্রহে প্রশ্ন করে, অর্কেষ্ট্রায়? গ্লোব সার্কাসের অর্কেষ্ট্রায়? সাদা ড্রেসের উপর বাঘ-ছাল আর হাতে গ্লোভস পরে শূন্যে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে তালে তালে এগিয়ে যেতে পায় পায়?

—হাঁ। ঠিক তাই। তুমি দেখেছিলে নাকি?

—দেখেছিলাম। গ্লোব সার্কাসেই দেখেছিলাম তোমায়।

—ঠিকই দেখেছিলে। আশ্চর্য্য! চিনতেও পেরেছিলে ঠিক।'

দেবকী কথা বলে না। মনে পড়ে যায় তার পনের বছর আগের কথা। মুখে রঙ মাখা সাদা পরিচ্ছদে ছিপ ছিপে লোকটি ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে চলেছে তালে তালে। আর তার পিছনে পিছনে চলেছে অর্কেষ্ট্রার দল ড্রাম বাজাতে বাজাতে। দেখেই চমকে উঠে দেবকী। স্মৃতির উপর কি যেন ভেসে ওঠে। তার পর তলিয়ে যায় নিমেষেই। উঃ! একটুখানি যদি ধৈর্য্য ধরতে পারত সে দিন! যদি অবজ্ঞা ভরে মুখ না ফিরিয়ে নিত সে দিক থেকে, যদি তার সংশয়াকুল দৃষ্টি বার বার নিবদ্ধ না হ'ত প্যারালাল-বারের লোকটির উপর, তা হলে হয় ত এ ভাবে ব্যর্থ হত না জীবনের মূল্যবান পনেরটা বছর। সে দিনই মীমাংসা হয়ে যেত সব কিছুরই। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে।

শঙ্কর প্রশ্ন করে, কি হ'ল?

—কিছু না। দেবকী বলে নত কণ্ঠে, হার হয়েছে আমার। অহঙ্কার ছিল মনে, যে দেশেই থাক তুমি, যে বেশেই থাক, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না কোন মতে। অথচ সব সার্কাসই ঘুরে বেড়ালাম পাতি পাতি করে। হাতের মধ্যে পেয়েও সেদিন হারালাম তোমায়। অহঙ্কার আমার খর্ব্ব হ'ল সেদিন।' দেবকী থামে। অনেকক্ষণ পর প্রশ্ন করে আবার।

—সার্কাস ছাড়লে কেন?

—ছাড়লাম প্রাণের দায়ে আর মানের দায়ে।

—প্রাণের দায়ে? দেবকী শিউরে উঠে।

—প্রাণটাই আসল, মানটা কিছু নয়। সার্কাস করি। সারা ভারতবর্ষটা ঘুরে বেড়াই এদের সঙ্গে। তার পর পাড়ি দেই সাগর-পারে। যাই ইন্দোনেশিয়ায়, জাভা, সুমাত্রায়। সার্কাসের সেক্রেটারী আমি। ম্যানেজার একজন গোয়ানিজ। লোকটি যেমনি মাতাল তেমনি লম্পট। এরই চক্রান্তে পালাতে হ'ল আমাকে দল ছেড়ে।

—কেন? উৎসুক দেবকী, প্রশ্ন করে উৎসুক কণ্ঠে।

—সে কথা সকলকে বলা যায় না।

—আমাকেও না? অভিমানে ঘা লাগে দেবকীর।

—সত্যি কথা বললে, অসন্তুষ্ট হবে তুমি।

—মিথ্যে বললেও হব।

—তবে কিছু না বলাই ভাল। শঙ্কর হাসে।

দেবকী আর প্রশ্ন করে না। মুখ ফিরিয়ে বসে অভিমানাহত হয়ে। বিশ বছরের সঞ্চিত অভিমান দেখা দেয় নূতন রূপে।

শঙ্কর বলে, অন্তরের সব লালিত্যে জলাঞ্জলি দিলেও তোমার প্রতি যে স্নেহ, যে অনুভূতি তা লয় পায় নি এতটুকু। তোমার মান, তোমার অভিমানকে আজও আমি চিনি। কিন্তু বিশ বছর আগেকার যে শান্তির নীড়, যে মধুময় আবেষ্টনীর স্বাদ পেয়েছি আমি কয়েকটা মুহূর্ত্তের জন্যে, তাকে নষ্ট হতে দিতে মন চাইছে না আমার। বিশ্বাস কর, তোমাকে অদেয় যেমন কিছু নেই, তা

জানাবারও তেমনি কিছু নেই। তবে এখন নয়। সময় হ'লে সবই জানাব তোমায়।'

বেশ তবে আমাকে ছুঁয়ে কথা দাও, আমাকে না জানিয়ে এক পাও নড়বে না তুমি এখান থেকে। কোথাও যাবে না চলে।

শঙ্কর দেবকীর উদ্যত হাতখানি ধরে বলে, বেশ তাই। কথা দিলাম।

হয় ত একটা তন্দ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল দেবকী। হঠাৎ শঙ্করের ধাক্কায় জেগে উঠে সে। ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে শঙ্কর বলে, পুলিশ, দেবকী পুলিশ।

তন্দ্রোত্থিত দেবকী অবুঝের মত তাকিয়ে থাকে। তার পর প্রশ্ন করে, পুলিশ? কেন?

শঙ্কর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, ধরতে এসেছে আমাকে। টের পেয়েছে তারা আমি আছি এখানে। আমি যাই। শঙ্কর উঠতে যায়। কিন্তু বাধা দেয় দেবকী। দৃঢ় হাতে তার হাত চেপে ধরে বলে, না। শোন, সব কথা খুলে বল আমায়। লুকিও না এতটুকু। আমি থাকতে পুলিসের সাধ্য নেই কেশাগ্র স্পর্শ করে তোমার।

শঙ্কর বলে, সার্কাসের সেই গোয়ানিজ—সেই লেলিয়ে দিয়েছে এদের আমার পেছনে। ইরানীকে খুন করেছে সে। কিন্তু দোষ চাপিয়েছে আমার ঘাড়ে।

ইরানী? কে ইরানী? দেবকীর মুখ সাদা হয়ে উঠে।

সার্কাসের মেয়ে। ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে। ট্র্যাপিজের খেলা দেখাত সে। গোয়ানিজটার দৃষ্টি পড়ে তার ওপর। হিংস্রলোলুপ দৃষ্টি। মেয়েটি চিনল এ দৃষ্টিকে। কিন্তু আমল দিল না তাকে। আমার সাহসেই মেয়েটির সাহস। ভক্তি করত, শ্রদ্ধা করত আমাকে বড় ভাইয়ের মত। আমল না পেয়ে হিংস্র গোয়ানিজ, হিংস্রতায় হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। তার রাগ আমার উপর যতটা তার চেয়েও বেশী মেয়েটির ওপর। তাই সরিয়ে দিল তাকে পৃথিবী থেকে আমার অনুপস্থিতিতে। ব্যাটাভিয়া থেকে তখন ফিরছি আমরা দেশেতে! আমি নেই তাঁবুতে। মাইল দুয়েক দূরে গেছি এক বন্ধুর বাড়ীতে। ফেরবার পথে খবর পেলাম ইরানীকে শেষ করেছে গোয়ানিজ। শুধু তাই নয়—চক্রান্ত করে জড়িয়ে দিয়েছে আমাকে এর সঙ্গে। ইরানীর ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেছে নাকি আমার ফটো। তার আঙ্গুলেতে রয়েছে নাকি আমারই নামাঙ্কিত আঙট। যে লোকটি এ খবর দিল আমাকে, সেই পরামর্শ দিল পালাতে। বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পালালাম আমি। সেই হ'ল আমার কাল। পুলিশ নিল আমার পিছু, কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, দেবকী, আমি নির্দ্দোষ। এর বিন্দুবিসর্গও জানি না কিছু। ইরানীকে স্নেহ করতাম মায়ের পেটের বোনটির মত।

বাইরে দরজায় টোকা পড়ে, প্রথমে আস্তে, তার পর জোরে। দেবকীর মুখ শুকিয়ে যায়, খাট থেকে নামতে যায় সে। কিন্তু শঙ্কর দৃঢ় মুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরে। ভীমশঙ্কিত কণ্ঠে ফিস ফিস করে বলে, কর কি? ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে চাও আমাকে?

দেবকীর মুখও সাদা, কিন্তু কণ্ঠে তার দৃঢ়তা। বলে না। বিশ বছর পর স্বামী ফিরে পেয়েছি আমি, তাকে জল্লাদের হাতে ঠেলে দেব না, এটুকু বিশ্বাস কর আমায়, তুমি ভয় পেয় না, আমি দেখি।

দেবকী এগিয়ে এসে দরজা খোলে, কিন্তু মুখ বাড়িয়েই চমকে উঠে। সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারী দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। দেবকী কিছু বলবার আগেই সার্জ্জেন্ট এগিয়ে আসে। বলে, এত রাত্রে তোমায় বিরক্ত করতে এলাম দেবকী। খবর এসেছে, একটা সাজ্ঘাতিক প্রকৃতির লোক নাকি আশ্রয় নিয়েছে এ বাড়ীতে এসে?

সার্জ্জেন্টকে চিনতে পারে দেবকী। তাদেরই আত্মীয় নীরেন লাহিড়ী। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে খেলা করেছে তারা। বড় হয়েও সে কতবার এসেছে তাদের বাড়ী। সব কিছুই সে জানে তাদের। দেবকীকে স্নেহও করে খুব।

দেবকী নীচু গলায় বলে, সাংঘাতিক লোকই এসেছে দাদা। বিশ বছর পর ফিরে এসেছে তোমার ভগ্নীপতি। একেবারে জরাজীর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য। গ্যাসট্রিক আলসারে জর্জ্জরিত, যন্ত্রণায় ছটফট করছিল এতক্ষণ। এই মাত্র তন্দ্রা এসেছে একটুখানি। পাশের ঘরে চল, বলছি সব।

লাহিড়ীকে দেবকী শোনায় অনেক কথা। সত্য মিথ্যে দিয়ে বানানো এক অপরূপ কাহিনী। এর মধ্যে ইরানী নাই, সার্কাস পার্টি নাই আছে শুধু শঙ্কর—এক বিচিত্র কাহিনীর ততোধিক বিচিত্র নায়ক হয়ে। অত্যাচার করেছে দেহের উপর, তারই ফল-ভোগ করছে আজ। বলতে বলতে অকৃত্রিম স্নেহের ধারায় দু'গাল ভেসে যায় দেবকীর।

লাহিড়ী উঠে দাঁড়ায়, হাতের ব্যাটনটা পথের উপর ঠুকতে ঠুকতে বলে, আজকে আর বিরক্ত করব না দেবকী। দু'একদিনের মধ্যেই দেখা করে যাব আবার, কিন্তু হতভাগা বোনাইকে বলে দিস, আমার বোনের চোখের জল অত সস্তা নয়। এর প্রতি ফোটার জন্যে বাছাধনকে সাতটি বছর ঘানি ঠেলাব আমি শ্রীঘরে। তখন টের পাবে মজাটা। বলে নিজের রসিকতায় সে হেসে উঠে হা-হা করে।

লাহিড়ী বিদায় হয় তার দলবল নিয়ে। দেবকী দাঁড়িয়ে থাকে এক মুহূর্ত্ত। তারপর দরজা বন্ধ করে এক রকম ছুটে আসে এ ঘরে, শঙ্করকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ছোট্ট মেয়েটির মত। বিশ বছরের সঞ্চিত অশ্রু আজ সুযোগ বুঝে শ্রাবণের ধারার মত ঝরে পড়ে দু'জনার বুক ভিজিয়ে।

খাদ্যাভাব নিবারণে সবুজসার বা পাতপচা সার

অণিমা রায়

পশ্চিম বাংলায় খাদ্য বলিতে বুঝায়, ভাত। শহরে তবু কিছু পরিমাণে গম প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে চাউল ব্যতীত গত্যন্তর নাই—আটা, ময়দা বা ছাতুর প্রচলন নাই এবং গমজাত দ্রব্য পাওয়া যায় না। পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ জন গ্রামে বাস করে এবং তাহাদের দুইবেলা দুই মুঠা ভাত চাই। পশ্চিম বাংলায় যে দারুন চাউলের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে—এ অভাব বহুকালাবধি অন্ন-বিভক্ত বাংলায় আছে। ভারত স্বাধীন হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানী করাইয়া বাংলার চাহিদা মিটাইতে হইত—বাংলার চাউল বাঙালীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইত না। দেশ বিভাগের পর বাংলার ধানক্ষেত্রের অধিকাংশ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অন্তর্গত হইল এবং ব্রহ্মদেশও স্বাধীনতা লাভ করিল। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অবস্থা একেবারে সঙ্গীন হইয়া পড়িল। এই জন্য প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পশ্চিম বাংলায়ও সর্ব্বাপেক্ষা ঝোঁক দেওয়া হয় কৃষি ও সেচের উপর—যাহাতে সত্বর দেশটিকে খাদ্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়। পশ্চিম বাংলায় জমির অনুপাতে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী—প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ১,০০০ জন। পশ্চিম বাঙলার আজ লোকসংখ্যা ২৬,২৫০,০০০ এবং এখানে মোট জমির পরিমাণ ১২,৩০০,০০০ একর (মোট ধানজমি ৯৯,৯০,৩০০ একর)। এই পরিস্থিতিতে বাংলার সকলের খাদ্যব্যবস্থা করা অসম্ভব। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে ও বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া কোনও রকমে চলিতেছে কিন্তু এ ভাবে কতদিন চলিতে পারে? বিদেশী মুদ্রার এখন এত অভাব যে, বিদেশ হইতে অধিক খাদ্যশস্য আমদানী করিলে দেশগঠন কার্য্যে বিদেশী মুদ্রার অভাব হইয়া পড়িবে। অবশ্য প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ কালে এবং দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরের কার্য্যের ফলে পশ্চিম বাংলায় কিছু খাদ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৪৭ সনে পশ্চিম বাংলায় ৩৬,৯৬,০০০ টন ধান্য উৎপন্ন হয় এবং ১৯৫৭ সনে সেই স্থলে ৪৩,৯৩,০০০ টন ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহা পর্য্যাপ্ত নহে। এই বৎসরে আরও ৭ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন। যদি অনাবৃষ্টি বা অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হয় তবে ঘাটতির পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। প্রতি বৎসর লোকসংখ্যা শতকরা ১·৩ জন বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু চাষের জমি বাড়াইবার কোন উপায় নাই। এই অবস্থায় পশ্চিম বাংলায় যে জমি আছে তাহাতে সহজে কি ভাবে অধিক ফসল ফলানো যায় তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

ফসল বৃদ্ধির জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে: (১) দেশে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ এবং চাষের জমিতে সেচ-ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু অর্থব্যয়ে ও সম্মিলিত চেষ্টায় ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং দামোদর পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ করিতেছেন এতদ্ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৪,০৪৬টি ক্ষুদ্র সেচ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ফলে মোট ২,৫০৪,৩০০ একর জমিতে সেচ-ব্যবস্থা হইয়াছে। সে ব্যবস্থাযুক্ত জমির পরিমাণ মোট চাষের জমির শতকরা প্রায় কুড়ি ভাগ। বাকী জমির অধিকাংশ সেচ-ব্যবস্থা যুক্ত করা সম্ভব কিনা সন্দেহ এবং তাহা করাও ব্যয়সাধ্য ও সময়সাপেক্ষ।

(২) উন্নত উপায়ে চাষ করা এবং উন্নত বীজ ব্যবহার করা: প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় মেয়াদ কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামাঞ্চলে ২,৪০১টি প্রদর্শনীকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ৩,৬৬১টি প্রদর্শনীকেন্দ্র এবং ১০০টি উন্নত বীজ উৎপাদনের আবাদ স্থাপন করা হইতেছে।

(৩) জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা: খাদ্য বৃদ্ধির জন্য এই কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। গ্রামাঞ্চলে যে কোন কৃষককে জমিতে পূর্ব্বেকার মত ফসল হয় না কেন জিজ্ঞাসা করিলে একমাত্র উত্তর পাওয়া যায়,—"জমি নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে।" জমি নিস্তেজ হওয়ার কারণ কি? পর্য্যাপ্ত সার জমি পায় না। জমির উর্ব্বরাশক্তির মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে সারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পটাশ, ফসফেট, চুণ এবং যবক্ষারজান বা নাইট্রোজেন জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। পশ্চিম বাংলার জমিতে পটাশ, ফসফেট এবং চুণের অভাব নাই—অভাব শুধু যবক্ষারজানের। অথচ যবক্ষারজান উদ্ভিদের এবং শস্যের প্রধান খাদ্য এবং পরিপুষ্টিকারক। বিশেষজ্ঞেরা গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ভারতের প্রতি প্রধান ফসল (যথা ধান, গম প্রভৃতি) জমি হইতে ৩৮ লক্ষ টন যবক্ষারজান খরচ করিয়া ফেলে। এই ফসল উৎপাদন করিবার জন্য যাহা সার হিসাবে দেওয়া হয় তাহা হইতে জমি ১০ লক্ষ টনেরও কম যবক্ষারজান ফেরত পাইয়া থাকে। যে পরিমাণ যবক্ষারজান ঘাটতি পড়ে তাহা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় দ্বারা এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক অসংগৃহীত জৈব ও উদ্ভিজ্জ আবর্জ্জনা হইতে জমি কতক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লয়। এই ভাবে জমিতে যবক্ষারজানের ঘাটতি বাড়িয়া চলিতেছে এবং জমি ক্রমে ক্রমে উর্ব্বরাশক্তি হারাইতেছে। ফসল ও জমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়াইবার জন্য জমিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যবক্ষারজানীয় সার দিতে হইবে।

যবক্ষারজানীয় সার দুই প্রকারের (১) রাসায়নিক (এমোনিয়া সালফেট প্রভৃতি) (২) পচা সার (জৈব ও উদ্ভিজ্জ)।

সেচ-ব্যবস্থাযুক্ত জমি এবং যে সব জমিতে চাষের সময় প্রয়োজন মত বৃষ্টি হয়, সেরূপ জমি ব্যতীত রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হবে

বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। পশ্চিম বাংলার বৃষ্টিপাত হইতে প্রতি বৎসর প্রয়োজন মত সেচের ব্যবস্থা হইতে পারে এরূপ জমি কম এবং সেচ-ব্যবস্থাযুক্ত জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। যাহা আছে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ জমির উপযোগী রাসায়নিক সার দেশে উৎপন্ন হয় না। বিদেশী মুদ্রার অভাবের জন্য বিদেশ হইতে রাসায়নিক সার আমদানী করা সম্ভব নহে। কাজেই রাসায়নিক সারের দ্বারা বিপুল ভাবে পশ্চিম বাংলায় খাদ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে।

এইবার জৈব পচা সার ও উদ্ভিজ্জ পচাসার বা সবুজসারের বিষয় বলা যা। বাঙলার জৈব পচাসার—গোবর। আবহমান কাল হইতে চাষের জন্য পশ্চিম বাংলায় গোবর সার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আজ কিন্তু পশ্চিম বাংলায় গোবর সারের একান্ত অভাব গ্রাম-সংলগ্ন জঙ্গলসমূহ এরূপভাবে কাটা হইয়াছে যে, পল্লীঅঞ্চলে জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায় না। গোবর বা ঘুঁটে এখন পল্লীবাসী ইন্ধন—চাষের জন্য পর্য্যাপ্ত গোবর সার পাওয়া যায় না। খৈল একটি উৎকৃষ্ট যবক্ষারজানীয় সার ; কিন্তু পশ্চিম বাংলায় তাহা এত অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, তার দ্বারা পশ্চিম বাংলার সমস্ত জমির সারের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।

কাজেই আমাদের একমাত্র ভরসা সবুজসার। ভারতের সর্ব্বত্র কৃষিগবেষকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সবুজসার দিলে ধান ও গমের ফলন শতকরা ২০।৪০ ভাগ বাড়িয়া যায়। এইজন্য প্রতি একর ধানজমিতে গড়ে ৬১ মণ সবুজসার দেওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলায় ধানের ফলন গড়ে শতকরা ৩০ভাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এখানকার খাদ্যাভাব বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু পশ্চিম বাংলার ৯৯০,০০০ একর ধানজমিতে প্রতি একরে ৬১ মণ সবুজসার দিতে হইলে যে বিপুল পরিমাণে উদ্ভিদ সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে ? পশ্চিম বাংলার গ্রাম-সংলগ্ন জঙ্গল এমনভাবে কাট হইয়া গিয়াছে যে, এত পরিমাণ পাতাপল্লব সংগ্রহ করা সম্ভবনহে। প্রতি জেলায় দুই-চারিটি করিয়া সবুজসারের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা এবং দূরস্থ জঙ্গল হইতে পাতাপল্লব আনাইয়া সেই সকল কারখানায় সবুজসার তৈরী করাইয়া কৃষকদের নিকট বিক্রয় করা ব্যবহারিক পরিকল্পনা নহে। তাহা হইলে উপায় কি ? মাদ্রাজ সরকার এই সমস্যাটির সুন্দরভাবে সমাধান করিয়াছেন। ১৯৫১-৫৫ সনে মাদ্রাজ রাজ্যের তৎকালীন কৃষি-অধিকর্ত্তা শ্রী এম.এস. শিবরামণের (ইনি এখন প্ল্যানিং-কমিশনের পরামর্শদাতা) নেতৃত্বে ও প্রচেষ্টায় মাদ্রাজের বিভিন্ন সরকারী কৃষিকেন্দ্রে গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রতি কৃষকের পক্ষে অতি সামান্য চেষ্টায় এবং অতি অল্প ব্যয়ে নিজের ক্ষেতে সচরাচরি ফসলের ক্ষতি না করিয়া নিজ শস্যক্ষেত্রে তথাকার প্রয়োজন মত সবুজসার উৎপাদন করিয়া লওয়া সম্ভব। মাদ্রাজ রাজ্যের সরকারী কৃষিকেন্দ্রগুলি বিভিন্ন আবহাওয়া ও মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিত : কয়েকটি কেন্দ্রের আবহাওয়া ও মৃত্তিকা একেবারে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার মত। সুতরাং মাদ্রাজে সবুজসার সম্পর্কে গবেষণার দ্বারা যে চমকপ্রদ ফল পাওয়া গিয়েছে, তাহা পশ্চিম বঙ্গের কৃষিক্ষেত্রেও পাওয়া যাইবে।

মাদ্রাজ রাজ্যের কৃষি-বিভাগ বহু গবেষণার পর কয়েকটি গুল্ম মনোনীত করেন যাহা ভারতের সর্ব্বত্র জন্মান সম্ভব। বাৎসরিক ৩০″ ইঞ্চি বা ততোধিক বৃষ্টিপাত হইলে এই গুল্মগুলি ভালভাবে জন্মাইবে এবং কয়েকটি গুল্মের জন্য বাৎসরিক ২০″ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত যথেষ্ট। গুল্মগুলির নিম্নলিখিত বিশেষত্ব আছে : (১) গুল্মগুলি বায়ু হইতে প্রভূত পরিমাণে যবক্ষারজান সংগ্রহ করে (Leguminous)। (২) গুল্মগুলি বেশ ঝাঁকড়া এবং ১.২ ফুটের অধিক উচ্চ হয় না বলিয়া ছায়া বিস্তার করে না। (৩) গুল্মগুলি শিকড় বিস্তার করে না। (৪) বার বার ছাঁটিয়া পাতা সংগ্রহ করিয়া লইলেও গুল্মগুলির ক্ষতি হয় না এবং শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (৫) গুল্মগুলি এক বৎসর বা দুই বৎসর স্থায়ী এবং ৪।৬ সপ্তাহের মধ্যে প্রচুর পাতা ও বীজ উৎপাদনক্ষম। গুল্মগুলির নাম : (১) গ্লিরিসিডিয়া ম্যাকুলাটা (ভারতের বাহির হইতে আমদানী করা গুল্ম), (২) ইণ্ডিগোফেরা টেসমান্নি (বিদেশী নীল), (৩) আইপোমিয়া কারণিয়া (হিন্দীনাম বেসরম), (৪) সেসবেনিয়া এগিটিয়াকা (হিন্দী ও বাংলা নাম জয়ন্তী), (৫) ক্রোটালারিয়া জুনসিয়া (বাংলা শণ), (৬) সেসবিনিয়া একুলকাটা (বাংলা ধনচে), (৭) সেসবেনিয়া স্পোসিওসা (বিদেশী অগথি), (৮) ফাসিকোলাস ট্রিলোবাস (তেলেগুনাম-পিল্লি-পেসারা), (৯) তেফ্রোসিয়া পুরপুরিয়া (জংলী-নীল)।

(২), (৪), (৫), (৬) এবং (৯) নম্বর গুল্ম পশ্চিম বাংলায় স্বভাবতঃ জন্মায় এবং এখানকার বাসিন্দা। বাকী গুল্মগুলি এখানে উৎপাদন করা যাইতে পারে। (২), (৪), (৫) এবং (৯) নম্বর গুল্মগুলি শুষ্ক স্থানে ভাল জন্মায়, বাকীগুলি শুষ্ক এবং ধানক্ষেতের ন্যায় জলবদ্ধ জমিতেও সমানভাবে জন্মায় এবং প্রচুর পাতা ও বীজ উৎপাদনক্ষম।

১৯৫১-৫২ সনে মাদ্রাজ রাজ্যে যাবতীয় সরকারী কৃষি-গবেষণা-কেন্দ্র এবং পরীক্ষামূলক ও পথপ্রদর্শক সরকারী আবাদগুলির অধীক্ষকদিগকে আদেশ দেওয়া হয় যে, জৈব ও উদ্ভিজ্জ পচাসার বাহির হইতে ক্রয় করা চলিবে না এবং যত শীঘ্র সম্ভব যবক্ষারজানীয় পচাসারের জন্য সবুজসার ও তাহার বীজ সরকারী আবাদগুলিতে উৎপাদন করিয়া লইতে হইবে। এক বৎসরের মধ্যে এই সব আবাদগুলি অতি সামান্য পরিমাণে সবুজসারের বীজ বপন করিয়া সবুজসার ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইলে সক্ষম হয় এবং ক্রমে মাদ্রাজ রাজ্যের সর্ব্বত্র সবুজসারের বীজ সরবরাহ করে। সবুজসার উৎপাদন করার জন্য আবাদগুলিতে নিয়মানুগত শস্যোৎপাদনের কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নাই।

সবুজসার ব্যবহারের দ্বারা মাদ্রাজ রাজ্যে শস্যোৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাবেরী-বদ্বীপে আদুথুরাই ধান্য গবেষণা

ক্ষেত্রের ৫০ একর জমিতে ১৯৫২-৫৩ সনে সবুজসার প্রয়োগে বাৎসরিক ফসলের পরিমাণ হয় ২·৩৫ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৪৮-৪৯ সনে ফলন হয় ১·০৭ লক্ষ পাউণ্ড)। মালাধারে পাঞ্জাবী ধান্য গবেষণাকেন্দ্রে (বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৬০″ ইঞ্চি) সবুজসার প্রয়োগে ধানের ফলন ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তিন বৎসর পরে শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কভিলপত্তি কৃষি-গবেষণাকেন্দ্রের ১০০ একর আবাদে (বাৎসরিক বৃষ্টিপাত মাত্র ২৫″ ইঞ্চি, অগভীর কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা) সবুজসার ও তাহার বীজ উৎপাদন আরম্ভ করা হয় এবং ক্রমে তৃতীয় বৎসর হইতে বাৎসরিক ৩৪৬ টন সবুজসার উৎপন্ন হইতে থাকে—আবাদের প্রতি একর জমি সাড়ে তিন টন সবুজসার পায় এবং তাহা শুষ্ক ফসলের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। এইভাবে মাদ্রাজ রাজ্যে নানাবিধ আবহাওয়া বেষ্টিত বিভিন্ন জমিতে সবুজসার প্রয়োগে ফসল প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদের শেষে ১৯৫৫-৫৬ সনে দেখা যায় যে, মাদ্রাজ রাজ্যে শস্য ফসলের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগের উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। সবুজসার জমির আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করাতে সবুজসারের গুণ ক্রমবর্দ্ধনশীল (cumulative)।

এখন মাদ্রাজ রাজ্যে প্রতি একর জমিতে গড়ে ২,৫০০ হইতে ৩,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। ভারতের অন্য রাজ্য-গুলিতে ধান্যের ফলন প্রতি একরে গড়ে ১,১০০ পাউণ্ডের অধিক নহে।

পশ্চিম বাংলার কৃষিক্ষেত্রে সবুজসার ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলন করিতে হইবে। তজ্জন্য বহুল পরিমাণে সবুজসার ও উহার বীজের প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলার প্রতি কৃষককে স্বীয় জমির জন্য সবুজসার ও তাহার বীজ উৎপাদন করিয়া লইতে হইবে। আষাঢ় মাসের প্রথমে মাত্র পাঁচটি নয়া পয়সা মূল্যের এক ছটাক ধনচে বীজ এক একর সেচ ব্যবস্থাহীন বা সেচ ব্যবস্থাযুক্ত ধান-জমির আলের উপর বা আল না থাকিলে জমির চতুষ্পার্শে বপন করিলে পৌষ মাসের পূর্ব্বে গড়ে প্রায় ৪ মণ ধনচে বীজ পাওয়া যাইবে। ধনচের পরিবর্ত্তে স্থানবিশেষে উপরিউক্ত যে-কোন গুল্মবীজ বপন করা যাইতে পারে। ধান চাষের জন্য জমি হিসাবে প্রতি একরে ২৪ মণ হইতে ৯৬ মণ পর্য্যন্ত সবুজসার দিতে হয়। জমির চতুষ্পার্শে বা আলের উপর প্রতি একরে ১০ সের হইতে ১৫ সের পর্য্যন্ত এইসব গুল্মবীজ বপন করিলে মূল শস্যের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া ২৪ মণ হইতে ৯৬ মণ পর্য্যন্ত সবুজসার পাইবার মত উদ্ভিদ সংগ্রহ করা যায়। এইভাবে প্রতি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ক্ষেত্রের প্রয়োজন মত সবুজসারের বীজ ও সবুজসার উৎপন্ন করিয়া লওয়া যায় এবং পশ্চিম বাংলার কৃষককে ইহার জন্য বিশেষ শ্রম বা অর্থব্যয় করিতে হইবে না। চারাক্ষেত্রে ধান্য চারা এবং সবুজসারের চারা একত্র তৈরী করিয়া লইয়া ধান্যচারাগুলি ধান্যক্ষেত্রে রোপণ করিবার পর সবুজসার চারাগুলি ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শে বা আলের উপর ২।৩ ফুট অন্তর রোপণ করা যাইতে পারে। চাষের সময় গৃহস্থ গরু-ছাগলগুলি মাঠে ছাড়েন না; সুতরাং গুল্মচারা-গুলি গরু-ছাগলের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

গ্রীষ্মে আউসধানের সহিত ক্ষেত্রে দুই বা তিন ইঞ্চি অন্তর সবুজসার গুল্ম রোপণ করিলে যে পরিমাণ সবুজসার উৎপন্ন হইতে পারে তাহা সেই গ্রামের পরবর্ত্তী আমনধানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। পশ্চিম বাংলায় রবিশস্যের চাষ নিতান্ত কম। সবুজসার সহযোগে রবিশস্যের চাষও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

গত বৎসর মাদ্রাজ সরকার বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে ২০ লক্ষ প্যাকেট সবুজসারের বীজ বণ্টন করিয়াছেন। প্রত্যেকটি প্যাকেটে এক একর জমির চতুষ্পার্শে রোপণ করিবার মত সবুজসারের বীজ ছিল এবং প্যাকেটের মূল্য এক আনা মাত্র। এই সকল রাজ্য সবুজসারের বীজ উৎপন্ন করিয়া লইবার জন্য প্যাকেটগুলি দেওয়া হয়। এই বৎসরেও এইসকল রাজ্যে এই উদ্দেশ্যে ৬৫ লক্ষ প্যাকেট সবুজ-সারের বীজ মাদ্রাজ সরকার বিতরণ করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবুজসারের বীজ এবং সবুজসার উৎপাদনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বীজ এখন উৎপাদন করিতেছেন এবং কৃষকদের মধ্যে উহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কৃষকেরা এই বীজ প্রত্যেক মহকুমার সরকারী বীজভাণ্ডার হইতে ক্রয় করিতে পারে। এক বার বীজ ক্রয় করিলে কৃষককে আর বীজ ক্রয় করিতে হইবে না—সে নিজেই বীজ উৎপাদন করিয়া লইতে পারিবে।

পশ্চিম বাংলার জমির উর্ব্বরাশক্তি স্বভাবতঃ মাদ্রাজের জমির উর্ব্বরাশক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক। সবুজসার প্রয়োগে ধানের ফলন দুই বা আড়াই গুণ বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। যবক্ষারজানীয় সবুজসার এবং ফসফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সার একত্রে ব্যবহার করিলে শস্যের ফলন চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা বাঙ্গালীরা অত্যন্ত রক্ষণশীল জাতি। এখানকার কৃষক সহজে নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে রাজী হইবে না। এইজন্য সবুজ-সারের উপকারিতা সম্বন্ধে কৃষক-সমাজে বহুল প্রচার হওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেসকর্ম্মী ও বিরোধী দলের কর্ম্মীগণকে রেষারেষি ভুলিয়া এই প্রচারকার্য্যে অবতীর্ণ হইতে হইবে। অবশ্য সরকারী কৃষি-প্রদর্শক আবাদগুলিতে হাতেকলমে সবুজসার প্রয়োগের সার্থকতা কৃষকদিগকে দেখাইয়া দিতে হইবে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং কৃষিমন্ত্রী ডাঃ আর আহম্মদ সবুজসার প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ভগবানের আশীর্বাদে হয়ত পশ্চিম বাংলা খাদ্যবিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া যাইতে পারিবে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির "ইকোনমিক রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রী এম. এস শিবরামণ আই-সি-এস মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে সবুজসার সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

ব্যাপার দেখে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছিল কুমার। এই সব শিশুদের জীবনের আকাশও যে সুসভ্য লণ্ডনের আকাশের মত কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তা এতদিন জানতে পারে নি। ধীর পায়ে চুপিচুপি বেরিয়ে এল সে। নিজেকে মনে হ'ল যেন চোর! সত্যি যেন চুরি করতে গিয়েছিল। "গুডনাইট" বললে, মার্গারেট। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে, ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ে অনেক স্নেহ চোখে ভরে কুমার অনুবৃত্তি করল—"গুডনাইট।" তখন রাস্তার লাইট-পোষ্টের বেঁকে পড়া ঝিকিমিকি আলোয় বাঁ চোখ নাচিয়ে মার্গারেট নিজের অধরে আঙুল রেখে শব্দ করে ছোট এক টুকরো চুম্বনের ইঙ্গিত ছুড়ে দিল ওর দিকে।—হিঃ হিঃ করে হেসে উঠল জন।

ক্ষোভে, বিস্ময়ে এবং ক্রোধে হতবাক হয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল কুমার। অদ্ভুত জীবন এদের, ততোধিক অদ্ভুত এদের দ্রুত পরিবর্তমান সমাজ ব্যবস্থা। কোন কিছুই যেন তেমন কিছু নয় এদের কাছে। বিশেষতঃ মেয়ে-পুরুষের চুম্বন বিনিময়ে। বয়স এবং সম্পর্কের সীমারেখাও যেন বারবারই মিলিয়ে যায়। কোন কিছুরই আর তেমন কোন অর্থ নেই। সবটাই ভাসা ভাসা সবটাই খেলা। এদের শিশুরা আজকাল অনেক কিছু শেখে বটে, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বড় বড় জিনিস, এমনকি ধর্মভাব ও নীতি বোধও তারা বই পড়ে শেখে। কিন্তু গভীর হতে শেখে না। সত্য হতে শেখে না। চরম বেদনার মুহূর্তেও খানিকটা হাল্‌কা না হয়ে পারে না।

খোলা রাস্তায় খোলা মাথায় অনেকক্ষণ ধরে পায়চারী করে কুমার যখন দরজা খুলে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে এসে লেপের নীচে শুয়ে পড়ল। তখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওর মাথাটা হয় ত কিছুক্ষণের জন্যে জুড়োল বটে, কিন্তু শরীর উঠল আগুন হয়ে।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন গায়ে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা, আর মুখের মধ্যে জ্বরের স্বাদ। মাথা বিষম ভারী, তুলতে গেলে ঝন্ ঝন্ করে বাজে। অনেক কষ্টে চোখ মেলে দেখে, ঘরের মাঝখানে কার্পেটের উপরে প্লাগ লাগানো হুভারটা বসানো। চালিকার সন্ধান ধারে কাছে নেই। সে হয় ত কোন একটা ভীষণ রকম কাজে, মায়ের কোন ফরমাস অথবা টুপসীর কোন অপকর্ম সামলাতে, কিম্বা, জন, লিজি ও টমের সঙ্গে ঝগড়া করতে ব্যস্ত আছে।

সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল কারা যেন উপরে উঠে আসছে। ঘরের দরজার কাছে এসে তারা ফিস্‌ফাস্ করতে লাগল। বোধ হয় কুমারের ঘুমকে সমীহ করে। ক্লান্তিতে অর্ধ নিমীলিত চোখে কুমার দেখল, প্লায়াস, স্ক্রুড্রাইভার ইত্যাদি হাতে নিয়ে দু ভাই-বোনে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। ওরা খুটখাট করে সুইচ খুলে কি সব করতে লাগল। অর্ধ আচ্ছন্ন কুমার শুধু বুঝতে পারল, ইলেকট্রিকের কিছু একটা খারাপ হয়েছিল, ভাই-বোনে সারিয়ে নিচ্ছে। একটু পরেই যন্ত্রটার গোঙানি সুরু হ'ল। কুমারের জ্বরতপ্ত মাথার মধ্যে বিরক্তি এসে বার বার প্রশ্ন করতে লাগল—"আজকে হঠাৎ এত সকালে এদের ঘর পরিষ্কারের ধুম লাগল কেন?" আলমারীর কাছে এসে ওর জুতোগুলোর দিকে চেয়ে জন বললে, "দেখ দেখ, নিগারটার সাত জোড়া জুতো।"

"শাট্ আপ"—মার্গারেট বললে, "শুনতে পাবে। তার চেয়ে ওকে খোসামোদ করলে চাই কি? এক জোড়া জুতো বকৃশীষও নিয়ে যেতে পারিস।"

—"ঈস, মুখের উপরে ছুড়ে ফেলে দেব।" গর্জ্জে উঠল জন। অর্ধ আচ্ছন্নতার মধ্যেও কুমার ভাবল, কে জানে, কাকে বলে চরিত্র, আর কাকে বলে নীতি। নৈতিক চরিত্র বলতে যা বুঝি তা হয় ত এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে একেবারেই নেই। কিন্তু তবু কি আশ্চর্য, এত দারিদ্র্যের মধ্যেও এত অহঙ্কার যে, এ পর্যন্ত কুমারের একটা জিনিসও এরা চুরি করে নি। এমন কি বিস্কুট-লজেন্সও না। সবই ত খোলা পড়ে থাকে সারাদিন। ঘরের চাবিও প্রায়ই ওদের কাছে থাকে, ইচ্ছে করলে আস্তে আস্তে কত কিই ত সরাতে পারত, কিন্তু সরায় না। অথচ এ সবে যে প্রয়োজন নেই, তাও ত নয়। দিলে পরে তৎক্ষণাৎ নিতে দ্বিধা করে না। তবে অবশ্য তাও যেন অহঙ্কার করেই নেয়, দৃপ্ত একটা ধন্যবাদ ছুড়ে দিয়ে। অবশ্য সবাই কিছু আর এরকম নয়। ছিঁচকে চুরিও এদেশে আজকাল

হামেশাই হচ্ছে। কিন্তু সে যাই হোক, কুমারের ক্লান্ত চোখ খুলতে চায় না, অথচ সমস্ত দেহ জুড়ে একটা প্রবল তৃষ্ণা। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না, অথচ প্রাণ চাইছে জল। ভাই-বোনে কাজ সেরে চলে গেছে অনেকক্ষণ, বেলা বাড়ছে আঁচল দিয়ে রোদকে আড়াল করে করে।

সেই ছায়াচ্ছন্ন মেঘাবিষ্ট দিনে, কুমারের সাতাশ বছরের মন সাত হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে, কোলকাতার লেকভিউ রোডের একটা বিশেষ বাড়ীর দোতালার পূর্বদিকের ঘরে, মায়ের কোলের উপরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। আর সেই লেকভিউ রোডের বিশেষ বাড়ীর অধিবাসিনীর কি হ'ল কে জানে। স্নানে গিয়ে জলের ঘটি পড়ে গেল হাত থেকে, কিম্বা পান চিবুতে চিবুতে বিষম খেল অকারণে, কিম্বা বুকের পরে নভেল রেখে দিবানিদ্রার আবেশে, জাগ্রত মনের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে যোজন যোজন দূরের দেশের ব্যাকুল মনের খবর স্বপ্নে এল ভেসে। কে জানে কোথায় কি হ'ল। এধারে বেলা বেড়ে চলল। কুমার কোনমতে উঠে মুখ হাত ধুয়ে একটু জল খেতে পেরেছে। এখন একটু চা পেলে মন্দ হ'ত না। কিন্তু মনটা আত্মীয় স্নেহের জন্যে, বিশেষতঃ মায়ের গায়ের গন্ধের জন্যে হঠাৎ যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল ঠক্ ঠক্ ঠক্। প্রথমটা উত্তর দিল না কুমার। তার পরে একটা গুমগুমে রাগের গুঁজগুজে স্বর বার করলে—"কাম ইন্।" মা নয়, মেরীও নয়, এমনকি রমলা অথবা কাকীমাও নয়, শ্রীমতী বার্কার। বিরক্তিতে চোখ বুজল কুমার।

—"কি হয়েছে তোমার ?" শ্রীমতী বার্কারের গলায় ক্ষুব্ধ বেদনা।

—"বোধ হয় একটু জ্বর", বললে কুমার। কুমারের কপালে হাত রাখলেন শ্রীমতী বার্কার। ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া ভাল লাগল কুমারের। ইচ্ছে হ'ল আরো কিছুক্ষণ হাতটা চেপে রাখে কপালের উপরে। কিন্তু তার আগেই হাত সরিয়ে নিলেন শ্রীমতী বার্কার। বললেন—"থার্মোমিটার আছে ?"

—"না", ঘাড় নাড়লো কুমার,—"তার কিছু দরকার নেই।"

—"কিন্তু", শ্রীমতী বার্কার গম্ভীরভাবে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, বললেন—"দরকার আছে।"

এতক্ষণ ধরে মায়ের স্নেহমাখা মেয়ের হাতের আদরের জন্যে কুমারের মনটা ছট্‌ফট করছিল, যেমন ওর বুকের মধ্যে ছট্‌ফট করছিল তৃষ্ণা। জুনি চলে গেলে তাই ওর হঠাৎ আশাজাগা মনটা যেন নিবে গেল। আর অমনি মনে পড়ল, যাকে দেখে কোনদিন বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। আজ তারই সঙ্গের জন্যে মন বেশ একটুও আকুল হ'ল। আশ্চর্য! ভাবে কুমার, বিশেষতঃ যখন মায়ের জন্যে মন-কেমন করছে। তখন হঠাৎ এই মেয়েটির কাছেও সান্ত্বনার জন্যে মন কেঁদে উঠল কেন? তার সেই পবিত্রলোকবাসিনী সতীমায়ের সঙ্গে এই বহুজন ভোগ্যা নটী মেয়েকে একসঙ্গে মনে করতে বিদ্রোহে গর্জে উঠল না ত মন? তবে কি সব মেয়ের মধ্যেই মায়ের তুলনা স্বাভাবিক ভাবেই মিশে আছে? অভাবে পড়লে তার সন্ধান পাওয়া যায়?

জুনির ফিরতে বেশ একটু দেরী হ'ল। যখন এল তখন ওর হাতে চায়ের ট্রে আর একটা থার্মোমিটার। কুমারের জ্বর এখন কমের দিকে নামছে। মাথাধরাটাও অনেক কম। কুমার বললে, "থার্মোমিটার কি তোমার কাছে ছিল?"

—"দূর"। জুনি বললে, "আমার কাছে আবার কিছু থাকে নাকি আজকাল, সবই কোথায় হারিয়ে যায়। এটা আমি এখুনি ঐ মোড়ের বুটসের দোকান থেকে কিনে আনলাম। তা ছাড়া ডাক্তারকেও ফোন করে দিয়েছি, সে প্রেসক্রিপসন্ লিখে বেরুবার সময় ডাক্তারখানায় দিয়ে যাবে বলেছে। আমি ঘণ্টাখানেক পরে গিয়ে তোমার ফিভার মিক্‌চার নিয়ে আসব। সেটা খেলে দু'দিনেই জ্বর সেরে যাবে। কোন ভয় নেই।"

—"কে ভয় করছে?"

—"তোমার মেরীকে কি ফোন করে দেব?"

—"না না", কুমার ভয় পেল।"

—"কেন?" জুনির চোখে কৌতূহল।

—"না না", শুধু বললে কুমার। আর চায়ে চুমুক দিয়ে একটা দীর্ঘ আরামের নিঃশ্বাস ফেলল—"আঃ।"

—ক্রিং ক্রিং ঘণ্টা বাজল টেলিফোনে। দোতালার করিডরে ফোন থাকে সব ভাড়াটের সুবিধের জন্যে। ফোন ধরতে ছুটে গেল জুনি। কারণ ছেলেমেয়েরা সব স্কুলে।

—ফিরে এসে জুনি খুব হাসল। বলল, "জ্বরে তোমার নিষ্কৃতি নেই। মেরী আসছে—আস্তে, আস্তে, আস্তে মারি—য়া।"

—মেরী আসছে। সামনের টেবিলে রাখা আয়নায় মুখটা একবার দেখে নিল কুমার। শুকনো শুকনো রুক্ষ মুখ, উস্কখুস্ক অবাধ্য চুল আর নিষ্প্রভ ম্লান চোখ। বিশ্রী একেবারে বিশ্রী—সবটাই। এই ঘর, এই বিছানা, ওই স্বেচ্ছাসেবিকা গৃহকর্ত্রী, সবটাই অত্যন্ত শ্রীহীন। এই পরিবেশের মধ্যে ও মেরীকে আনতে চায় না, যেমন দেখাতে চায় না চকচকে সার্টের নীচের আংময়লা গেঞ্জীটাকে।

কোন অসুন্দর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে মেরীর সাহচর্যের কথা ও ভাবতে পারে না। মেরীর নিজের ঘরটা কি সুন্দর। সে ঘরের ছবি স্বপ্নের মত মনে ভেসে ওঠে। আর সেই বাড়ীতে কুমারের ঘরটিকেও মেরী কি সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল। ও যে শুধু নিজেই রুচিরা তা নয়, ওর চারপাশ ঘিরেও রুচি এবং সৌন্দর্য। ওর সঙ্গে প্রেমেও যেন সুন্দরের আল্পনা আঁকা আছে। এখানে এই যে যেমন তেমন বেশবাসে, যেমন তেমন বিছানায় শুয়ে একটি মহিলার সঙ্গে যেমন তেমন ভাবে আলাপ করছে। এ মেরীর কাছে নিতান্ত দৃষ্টিকটু ঠেকত। কিন্তু জুনি বার্কারের সামনে রুচি নিয়ে লজ্জা পাবার প্রয়োজন নেই। কারণ ও বালাই জুনির মধ্যেও হয় ত কোনদিন ছিল, আজ আর অবশিষ্ট নেই।

ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে জুনি হাসল। বলল,—"রুক্ষ চেহারার একটা মোহ আছে আজ তোমাকে অন্যদিনের চেয়ে বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। দেখ, আজ তোমার পাওনার চেয়ে বেশী লাভ হবে।" কুমার তবু মুখ ভার করে রইল। ওর অস্বস্তি ঘুচতে চায় না। জুনি বললে,—"তা হলে তোমার জন্যে এক গামলা জল নিয়ে আসি। এইখানেই শেভ করে মুখ ধুয়ে নাও। আর চুলটা আঁচড়ে মুখে একটু ক্রীম দিয়ে দি।"

—"রক্ষে কর।" কুমার শুয়ে পড়ল, "আমার চেহারার কথা নয়, ভাবছিলাম ঘরটা বড় অগোছাল হয়ে আছে।"

—"অর্থাৎ এই অগোছাল ঘরে, প্রেমিকার সঙ্গে আলাপ করতে চাও না। ছি ছি, তা হলে বলব, তোমার প্রেম নেই। না একটুও না। আমি যদি এই মুহূর্তে জর্জের দেখা পাই ত তার হাত ধরে নরকে অবধি যেতে রাজী আছি।"

—"নাঃ, আমার প্রেম নরক থেকে বার হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে জানে।" কুমার হাসল, "কিন্তু জর্জের জন্যে যখন নরক হলেও চলে, তখন দোতালার ঐ বড় ঘরটা কেন ঐ সমস্ত মহার্ঘ্য জিনিসপত্র আর নরম কার্পেট পুরে বন্ধ করে রেখেছ ?"

—"কি করব বল ? জুনির মুখ ম্লান হয়ে এল। জর্জের পছন্দটা বড় উঁচু। ওর সব কিছুই up to the mark হওয়া চাই। বললে, "লণ্ডনে প্র্যাকটিস করবে, যদি ওকে ভাল পাড়ায় লর্ড স্টাইলে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। তা বলে ভেব না ওরা গরীব। ওদের অগাধ টাকা। পতি-গর্বে উজ্জল হয়ে উঠল জুনির মুখ। কিন্তু কি দরকার। আমার নিজের যা আছে তাই যথেষ্ট। তাই দিয়ে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে তুলব। ওদের বাপ আমাকে যতই জ্বালাতে চেষ্টা করুক, আমি কিছুতেই হার মানব না। হতভাগা বজ্জাত আমাকে টাকা দেবার ভয়ে চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দেবে।"

—"বল কি ?"

—"হ্যাঁ সেই রকমইত শুনছি।"

—"কেন ?"

—"কেন আর কি ? তা হলে ত আর ছেলেমেয়েদের মেইনটেনেন্স দিতে হবে না। কিন্তু আমি ছাড়ব না।" গলা কঠিন করে জুনি বার্কার বললে, "কিছুতেই ছাড়ব না। যদি পাঁচ টাকাও রোজগার করে ত তা থেকে আড়াই টাকা আমার চাই। দাঁড়াও না, জর্জ একবার এলে হয়, ওকে নাকানি চোবানি খাইয়ে ছাড়বো।"

—"অদ্ভুত কথাবার্তা।" কুমার ভাবে, এদিকে ত ছেলেমেয়েদের না খেতে দিয়ে নীচের ঘরে ফেলে রেখে দেয়। তবে এ কিরকম ভালবাসা। নাকি এক ধরনের পাগলামী। এদিকে ত প্রাণে দয়ামায়া যথেষ্ট আছে। এই যে কুমারের জন্যে তখন থেকে এত করছে, এত কি দরকার ছিল। কেউ ত ওকে সাধে নি। নিজের গরজেই করছে। অথচ নিজের অমন টুকটুকে ছেলেমেয়েদের অত কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখেছে। কি বিপরীত চরিত্র একসঙ্গে ধারণ করছে মেয়েটি। যত রাগ আগের স্বামীর উপরে। অথচ এ স্বামীটিও কিছু কম নয়, এই ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, পালিয়ে বসে আছে। কে জানে কেন ? হয়ত এর হাত থেকে এড়াতে চায়। কি জানি, কি দরকার পরের কথা ভেবে। একেই মন ক্লান্ত, তার উপরে এসব কথার আলোচনা ভাল লাগে না কুমারের। তবু ভদ্রতার খাতিরে বলে, "ছেলেমেয়েদের বিষয়ে তাদের বাপের মত কি ?"

—"কি আবার ? ছেলেমেয়েদের নাকি তিনি নিজের কাছে রেখে মানুষ করবেন।"

—"অবাক কাণ্ড।" কুমার এবারে সত্যিই অবাক হয়ে যায়—"তাই দিলে না কেন ? ভালই ত, বাপের কাছে মানুষ হ'ত। তোমারও কোন ঝঞ্ঝাট থাকত না। ছেলে-মেয়েদের চেঁচামেচি, আবদার, নবদাম্পত্যে বিঘ্ন ঘটাতে পারত না।"

—হাঃ হাঃ। ছেলেমেয়েরা ওর কাছে থাকবে ? একবার ডেকে জিজ্ঞেস কর না ওদের ইচ্ছেটা কি ? জন কথা না শুনলে তো ঐ ভয়ই দেখাই। দাঁড়া তোর বাপের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। অমনি ভয়ে ভয়ে যা বলি, তা শোনে।"

—"বল কি, ছেলেমেয়েরা বাপকে একটুও পছন্দ করে না ?"

—"কি করে করবে? তুমিই বল। কোনদিন কি বাপ ওদের নিয়ে একসঙ্গে বসে গল্প করেছে, কি কিছু প্রেজেণ্ট এনে দিয়েছে? এখানে যতদিন ছিল করেছে খালি আমার পিছনে চৌকিদারী। আরু-ইণ্ডিয়াতে শুধু মদ নিয়ে পড়ে থেকেছে। বাড়ী ফিরে এসে যদি ছেলেমেয়ের চেঁচামেচি শুনেছে ত বেত চালিয়েছে।"

চা-বিস্কুট খেয়ে কুমার একটু চাঙ্গা হয়েছিল। বললে,— "শ্রীমতী বার্কার যদি আপত্তি না থাকে ত তোমার গল্প আজ বল। আজ হাতে অঢেল সময় দেখতেই পাচ্ছ।"

—"আমার আর কি এমন গল্প। নেহাৎই সোজাসুজি, পানসে—তোমার মত আর্টিস্টকে inspire করার মত নয়।"

—"তবু, বল সমস্ত। একেবারে ছেলেবেলা থেকে। কিছু বদলানো চলবে না।"

—শ্রীমতী বার্কার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। নীচে সব চুপচাপ। ছেলেমেয়েদের সাড়া নেই। এদিকে দুপুর ঘন হয়ে বিকেল জমতে চলল। শ্রীমতী বার্কার বললেন—

"আমার বাপ ছিলেন ভদ্রলোক। মায়ের খবর জানি নে। কবে যে সে মরে গিয়েছিল, আমার মনে নেই।" একটু চুপ করে মাথা নেড়ে বললে,—"নাঃ, মাকে আমার কিছুই মনে পড়ে না। শুধু ম্যাণ্টলপীসের উপরে একটি রুগু তরুণীর ছবি ছিল, আর তার নীচে বড় বড় হরফে লেখা ছিল—মার্থা ওয়েলস। আমি জানতাম ঐ আমার মা। ব্যস্, এই পর্যন্ত।

"আমার বয়স যখন ন'দশ বছর, বাবা তখন একটা ছোট কারখানায় ফিটারের কাজ নিয়ে ম্যাঞ্চেষ্টারে এলেন। গাঁয়ের বাড়ীতে রইলেন বুড়ো ঠাকুর্দা আর চিরকুমারী পিসী। আমি বাবার সঙ্গে শহরে চলে এলাম। খিট্‌খিটে পিসীর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু কে জানত, সেই পিসীই আমার জন্যে স্নেহের পেয়ালা ভরে রেখেছে। তারই দৌলতে আমার যা কিছু। ঠাকুর্দার সম্পত্তি সে পেয়েছিল, আর তার সব সম্পত্তি আমাকে দান করে গেছে। সেই সব দিয়ে এই সব হয়েছে। তার স্বভাবের বাইরেটায় যেন কড়া পড়ে কঠিন হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তোমাদের নারকোলের মত। সর্বদা ঠক্ ঠক্, খিট্ খিট্ করত। কিন্তু ভিতরে ছিল নরম কোমল শাঁস।

যাক্ সে কথা। শহরে এসে বাবা আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। গ্রামের স্কুলে যাবার মতো অর্থের সম্বল আমাদের ছিল না। কোন প্রাইভেট স্কুলেও জায়গা পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়েই একটা সাধারণ গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্তি হতে হ'ল। সেখানে অজস্র মেয়ে গিস্ গিস্ করত। পড়ার চেয়ে জটলা হ'ত বেশী। আমি যেন বেঁচে গেলাম। খাঁচা থেকে ছাড়া পেল বিহঙ্গ। কত সব অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত সব খেলা। জীবনের কত মজার রহস্যের সন্ধান আভাসে এল। আমি মেতে উঠলাম। পড়াশুনোর জন্যে মাথাব্যথা ছিল না। সেলাইটা ভাল লাগত। মাতৃহীন ঘরে সেলাই-এর প্রয়োজনও হ'ত। সেলাই হাতে করে বন্ধুদের সঙ্গে জটলা করারও সুবিধে হ'ত। কাজেই ওটা খুব শিখলাম। ইতিমধ্যে ছেলেবন্ধুও কম জোটে নি। বল নাচটাও বেশ রপ্ত করলাম। আমার চেয়ে অবশ্য অনেক মেয়েই ভাল নাচতে পারত। কিন্তু আমার চুলগুলো সাদা সোনার মত আর চোখের তারা ফ্যাকাশে নীল হওয়ায় সবাই আমার সঙ্গে নাচতেই পছন্দ করত বেশী। শহরে আমাদের আত্মীয়-স্বজন বেশী কেউ ছিল না। শুধু এক রুগ্ন খুড়ো অর্থাৎ বাবার এক কাসিনের বউ, আর তার দুই ছেলে। খুড়ীর স্বামী ভালই ছিলেন।" জুনি বার্কার মুচকি হাসলেন, "কারণ মারা যাবার সময় বেশ কিছু পয়সাসমেত ছোট একটা বাড়ী রেখে গিয়েছিলেন। কারণে এবং অকারণে, ছুটিতে এবং না ছুটিতে আমি সেই বাড়ীতে ছুটতাম। ঘরকন্নায় আমি ছোট থেকেই পোক্ত"। শুনে কুমার অবাক হয়ে তাকাল। মোহিতও তাই বলেছিল। যেমন সুন্দর তেমন গোছানো ঘরকন্না। কিন্তু আজ তার কি পরিণতি। জুনি বলে চলল,—"খুড়ীর গৃহস্থালীর ব্যবস্থা আধ ঘণ্টায় সেরে নিয়ে চলত আমাদের ছুটোপাটি খেলা। কেরী আর বিল দুজনেই আমার পায়ে পায়ে ঘুরত। দুজনকেই আমি সমানে হুকুম চালাতাম। আমার বয়স যখন পনের, তখনই ওরা দুজনেই আমার প্রেমে হাবুডুবু খেত। আমি দুজনকে দু'আঙুলে নাচাতাম। আর শুধু বিল কেরীই নয়, আরো কত যে ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল,—তাদের সকলকেই আমার ভাল লাগত। সবাই যে চোখ দিয়ে আমার পুজো করে, আর আমাকে একটু ছুঁতে পেলেই ধন্য হয়ে যায়, এইটে জানা থাকায় আমাকে বাগ মানানো কারো সাধ্য ছিল না। পনের বছর বয়সে স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি এক দর্জির দোকানে ছাঁট-কাট শিখতে ভর্তি হলাম এ্যাপ্রেণ্টিস হয়ে। বাবার ইচ্ছে ছিল আমি সর্টহ্যাণ্ড শিখি, কিম্বা ঐ জাতীয় আর কিছু। কিন্তু আমার বিদ্যের বহর দেখে ছেড়ে দিলেন আশা।

দর্জির স্বামী ছেলেমানুষও নয় আবার আধবুড়োও নয়—পূর্ণযুবাপুরুষ তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে কোন একটা বয়স। কোন এক আপিসে কাজ করত সে। একদিন পড়ন্ত বিকেলে, পাতাঝরা পথে, দোকান থেকে বেরিয়ে বাড়ীর দিকে চলেছি। মোড় ঘুরতেই কালো বাড়ীগুলির পাশ

দিয়ে হঠাৎ এসে হাজির হ'ল সে। বললে, আমাকে ধরবার জন্যে একটু শীগগিরই কাজ থেকে ফিরেছে সে - কাল সন্ধ্যা-বেলায় আমাকে 'নাচে' নিমন্ত্রণ করতে চায়। সেখানে ডিনার খেয়ে তবে আমার ছুটি। একসঙ্গে নাচ এবং ডিনারের নিমন্ত্রণ তাও আবার একজন রীতিমত বয়স্ক লোকের কাছ থেকে। আমার ইচ্ছে হ'ল তখনি নাচি। কিন্তু তা না করে সংযত করে নিলাম নিজেকে। মৃদু হেসে বললাম, ধন্যবাদ। ও আমাকে 'বাই' করে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমার সবচেয়ে ভাল পোষাকটা পরে, ঠোঁটে টকটকে রং মেখে, কানে আর গলায় নকল মুক্তার দুল দুলিয়ে দিলাম। ভাল টুপী না থাকায় মাথায় পরে নিলাম কয়েকটা ফেল্টের ফুল। তার পর আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে খুশী হয়ে উঠলাম।

"স্মিথ আমাকে দেখে বেশ চমকাল। বললে—বাঃ কি সুন্দর, দু'হাত বাড়িয়ে আমার হাত নিয়ে ছোট্ট একটি চুম্বন করল। তার পরে বড়দের মত আমার বাহুতে বাহু পরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। প্রতি মুহূর্ত ও আমাকে মনে করিয়ে দিল যে, আমি সত্যি বড় হয়ে গেছি। বড়দের মত ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইলে আমার সঙ্গে। প্রতি বিষয়ে জানতে চাইল আমার মতামত। ক্ষমা চাইল প্রত্যেকটি কল্পিত কথায়। আমাকে পান করতে দিল প্রথমে একটু শেরী পরে হুইস্কী।

"আমি বুঝলাম, আমি আর ছেলেমানুষ নই—পূর্ণযৌবনা নারী। তার পরে সুরু হ'ল নাচ। এতদিন পর্যন্ত কেরী, বিল, জন, বব, সিরিল ইত্যাদির সঙ্গে যে হুল্লোড় করেছি, এ তার থেকে একেবারে আলাদা। ও আমার হাত ধরল সন্তর্পণে, পাছে ব্যথা লাগে, আর যে হাতে কটি বেষ্টন করল সে হাতে আদর মাখা। ওর ফিস্‌ফিসে কথা আমার কানের কাছে শিউরে শিউরে উঠল। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার গালের উপরে গরম হয়ে জ্বলতে লাগল। একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষের দেহ মৃদু ছোঁয়ায় আমাকে ঘিরে নাচতে লাগল। অসহ্য সুখে আমার দেহে রোমাঞ্চ হ'ল।

"আমি ওর প্রেমে পড়তে সুরু করলাম। ওকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করত না। অন্য কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলতেও যেন ইচ্ছে করত না। সমস্ত দিন সব কাজের মধ্যে সন্ধ্যের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকাটা নেশার মত হয়ে দাঁড়াল। আঃ জান কুমার, সেই দিনগুলি যেন অমৃতের স্বাদে মাখামাখি ছিল। এই দেখ না, সে দিনগুলি মরে নি; আজও আমার মধ্যে বেঁচে আছে তার ছবি। জান কুমার, সে জিনিসের স্বাদ আমি আর কখনও পাই নি।

"স্বামীর কাছে ত নয়ই। অনেকদিন পরে হঠাৎ জর্জের কাছে এসে মনে হ'ল, বোধ হয়, এ সেই জিনিস। অমনি আমি তার জন্যে সব কিছু ছাড়তে প্রস্তুত হলাম। সমাজ-সংসার সব, কিন্তু তবু, তবু কুমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বোধ হয় সে জিনিস নয়। সে বোধ হয় না। ভালবাসা বোধ হয় একবারের বেশী আসে না জীবনে। অত ভাল জিনিস কি বার বার পাওয়া যায়? তবু জর্জকে আমার ভাল লাগে, ভাল লাগে ওর জন্যে সবস্ব ত্যাগ করতে।"

কুমারের মনে হ'ল, প্রশ্ন করে—"শুধু ভাল লাগাই কি সব। ভাল হওয়ার কিছু প্রয়োজন নেই? ত্যাগও ভাল, খুবই ভাল, কিন্তু সন্তানস্নেহও কি ত্যাগ করার জিনিস? প্রেমের জন্যে মানুষ কি, তা বলে প্রেমই ত্যাগ করতে পারে? এ তা হলে প্রেম নয়, প্রেমের রূপধরা কোন সর্বনাশা বিকৃতি।" কিন্তু জুনির মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে পারল না কুমার। সে মুখে এমন নিঃসহায় মরিয়া ভাব ফুটে উঠেছে যে, তিরস্কারের বাণী উচ্চারণ করা গেল না। কুমার ভাবলে, যার মধ্যে বিধাতার শাস্তি সুরু হয়েই গেছে, তাকে আবার নীতি-উপদেশ দেবার কি অধিকার আছে কুমারের।

জুনি বললে—"আমার সেই গত জীবনের দিনগু'ল যেন স্বর্গের স্বপ্ন দিয়ে ভরা ছিল।"

কাৎ হয়ে হাতের উপরে মাথা রেখে চুপ করে শুনছিল কুমার। হঠাৎ ভারী ভারী গলার স্বরে চমকে চোখ তুলে দেখে, শ্রীমতী জুনির কপালে, নরম বিকেলের সোনার আলো, আর চোখের কোণে সজল মেঘের ছায়া। এই শুকনো কঠিন পাগলাটে স্বার্থপর মেয়ের ভিতর থেকে হঠাৎ কেমন করে দেখা দিল অশ্রুমুখী নারী? কুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, শ্রীমতী বার্কার রুমালে শব্দ করে নাক ঝেড়ে একটু চুপ করে রইলেন। তার পরে আবার বলতে সুরু করলেন—"রোজ রাতে বাড়ী ফিরতে দেরী হ'ত। বাবা প্রথমে অনেক বকলেন, অনেক বোঝালেন, শেষে হাল ছেড়ে দিলেন। আমি যখন রাত এগারোটার পর চুপি চুপি বাড়ী ফিরতাম, বাবা দেখেও দেখতেন না।"

"কিন্তু বাবা শুধুই চুপচাপ ছিলেন না, ভিতরে ভিতরে তাঁর কাজ চলছিল। একদিন পিসী তার বন্ধুর ছেলে ডেভিট রাসকে নিয়ে এলেন আমাদের শহরের বাড়ীতে ক'দিন কাটাতে। মনে মনে বাবার মতলব বেশ বুঝতে পারলাম। কিন্তু ভাণ করলাম যেন বুঝি নি। উৎসাহে মেতে উঠে বাবা সাত দিন ছুটি নিলেন।

ডেভিড স্কুলের সনদ পরীক্ষায় পাস করে একটা কেমিষ্টের দোকানে এ্যাসিষ্টাণ্ট হয়ে ঢুকেছিল, আর সেই সঙ্গেই ইউনিভার্সিটিতেও ভর্তি হয়েছিল। ওকে নিয়ে ক'দিন খুব পিকনিক্ হ'ল। একদিন গেলাম চোরে।

নদীতে নৌকা বাইতে বাইতে ও আমাকে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে স্মিথের কথা ভাবছিলাম। ও বললে, 'তুমি কি ভাবছ? আমার কথা শুনছ না।' আমি হাসলাম। ডেভিডে নামটা বেশ স্মার্ট হলে কি হবে, আসলে ও স্মার্ট ছিল না মোটেই। আর এই নিয়ে স্মিথের সঙ্গে কত হাসতাম।"

"ছুটির দিন চারেক বাকী থাকতে বাবা আমাদের নিয়ে দেশের বাড়ীতে গেলেন। আমরা এবারে অনেকদিন পরে গ্রামে গেলাম। তাই সবাই খুব চায়ের নেমন্তন্ন করতে লাগল। আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। সব কিছুই অত্যন্ত বোরিং মনে হতে লাগল। ডেভিড কিন্তু যেন মেতে উঠল। একদিন বাগানের কোণে লতাকুঞ্জের পাশে ফস্ করে বিয়ের প্রস্তাব করে বসল। আমি মুখের উপর শব্দ করে হেসে উঠলাম, কিছুতেই থামাতে পারলাম না। ডেভিড ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে চলে গেল।

"পরদিন ভোরবেলা আমার পাতলা রাত-পোষাকের উপরে নীল ড্রেসিং গাউন পরে চুলের ফণা ঘাড়ে ঝুলিয়ে, আয়নার দিকে ক্লার্ক গেবলের মত দৃষ্টিপাত করে ডেভিডের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম। ফিস্ ফিস্ করে ডাকলাম, 'ডেভিড, ডেভিড।" মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। দুই হাত বুকের উপরে বেঁধে, রাত-পোষাকের উপরে কিমানো পরে ডেভিড দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, 'ডেভিড, একটা কথা তোমাকে বলতে এসেছি।' ও বললে, 'ভিতরে এস।' আমি ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালাম। ও জিজ্ঞাসুভাবে আমার দিকে তাকাল। আমার তখন ভয় হ'ল, স্পষ্ট মনে আছে জান কুমার, আমার তখন হঠাৎ কেমন ভয় হ'ল। কি বলতে এসেছি, আমি জানি না ত—কি আমার উদ্দেশ্য, বোধ হয় একটু ঠাট্টা রসিকতা, একটু হালকা ইয়াকি করতেই গিয়েছিলাম। কিন্তু ওর মুখ দেখে সে বাসনা উবে গেল। মনটা কেমন টন্ টন্ করে উঠল। আগে হলে এমনটি হ'ত না। কিন্তু স্মিথকে ভালবেসে আমার মনটা নরম হয়েছিল। ওর মুখে চেয়ে আমি বুঝতে পারলাম, এই বোধ হয় ওর প্রথম ভালবাসা, আর প্রথম বঞ্চনা, আমি যার পরিচয় তখনও পাই নি।' আমি বললাম, ডেভিড, আমি যদিও তোমাকে এখন ভালবাসতে পারি নি, সেজন্যে দুঃখিত, কিন্তু যদি কোনদিন তোমার জন্যে মন কেমন করে, তা হলে তোমাকে লিখব। আপত্তি হবে না ত? 'আপত্তি?' ডেভিড মাথা নাড়ল, দেরাজ হাতড়ে একটা ছোট্ট নোটবুক বার করে, তার মধ্যে ঠিকানা ফোন নম্বর সব লিখে, উপরে আমার নাম লিখে দিল জান কুমার।" জুনি বললে—"ও সেদিন আমায় ভালবেসেছিল,—সেদিন, যেদিন আমাকে পাবার কোন আশা ছিল না, আর যখন পেল তখন সব ভালবাসা পুড়িয়ে ছাই করে দিল। যাকগে সে পরের কথা। খাতাটা আমার হাতে দিয়ে বললে, 'যদিও জানি, কোনদিনই প্রয়োজন হবে না, কারণ আমি সত্যি তোমার যোগ্য নই। আমি বিশ্রী, আমি ভোঁতা, আর তুমি কি সুন্দর।' জান কুমার, আমার তখন ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল ওকে একটা কিছু দিই। নিদেন পক্ষে, একটা ছোট্ট চুমো, কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে আমার কেমন তখন সাহস হ'ল না। আমি আস্তে চুপ করে চলে এলাম।"

"পরদিন বাবারও ছুটি ফুরোল। আর আমরা আবার সেই ধুলোকালিমাখা কালো শহরটায় ফিরে চললাম। সেই কালো শহরটার এক জায়গায় আমার জন্যে ছোট্ট একটু আলো লুকানো ছিল। সেই আলোর আকর্ষণে গাড়ীতে বসে, গাড়ীর চেয়ে অনেক জোরে, এক'শ দু'শ মাইল বেগে আমার মন ছুটে চলল।"

ক্রমশঃ

বিপিনচন্দ্র পাল

(১৮৫৮–১৯৩২)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের জন্ম-শতবার্ষিকী সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই সময় তাঁহার কথা সংক্ষেপে ও বিশদভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং এই উদ্দেশ্যে আয়োজিত সভা-সমিতিতে পরিবেশন করা হইয়াছে। এখানে এই সকল বিষয় সবিস্তারে বলিবার আবশ্যক নাই। আমরাও স্বদেশবাসীদের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

বিপিনচন্দ্র ভারতের জাতীয় জীবনের এক সঙ্কট মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান শতাব্দীতে এক বিষম সঙ্কট মুহূর্ত্তে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার আয়ুকাল দীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসরের ইতিহাস আধুনিক যুগের চড়াই-উৎরাইয়ের ইতিহাস। এই সময়ের মধ্যে জাতীয় জীবনের কত দিক কত রকমে স্ফূর্তি লাভের প্রয়াসী হইয়াছে, কোথাও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, কোথাও-বা ব্যর্থকাম হইয়াছে; কিন্তু মোটের উপর বলিতে গেলে আমরা আগাইয়াই চলিয়াছি। ব্রিটিশের ভারতবর্ষ-ত্যাগের মধ্যে এই প্রয়াস এক ধরনের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আমরা কথায় কথায় 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারণ করি; ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। কিন্তু, সে-যুগের একটি কথা মনে পড়িতেছে,—'অনধীনতা' কি 'স্বাধীনতা'? বিপিনচন্দ্র এক সময়ে এই কথা দুইটির ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছিলেন—'অনধীনতা'ই 'স্বাধীনতা' নহে। স্বাধীন হইতে হইলে অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। "Democratic Swaraj" অর্থাৎ জনসাধারণের নিমিত্ত জনসাধারণের পরিচালিত স্বরাজই প্রকৃত স্বরাজ। তখন স্বাধীনতা কথাটির এমন চালু হয় নাই, 'স্বরাজ' শব্দটির বদলে এই কথাটি বসাইলেই হয়। মনীষী বিপিনচন্দ্র ১৯২১ সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে যে "Democratic Swaraj"-এর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তথাকথিত স্বাধীনতার নূতন পরিবেশও আমাদের দিক্‌দর্শনস্বরূপ হইবে। তাঁহার ব্যাখ্যা এখনও বিশেষভাবে অনুধাবন করিবার যোগ্য।

অরবিন্দ ঘোষের (পরে, "শ্রীঅরবিন্দ") ভাষায় বিপিনচন্দ্র ছিলেন—"The Prophet of Indian Nationalism", অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয়তার 'ঋষি'। 'প্রফেট', 'ঋষি', ভবিষ্যদ্রষ্টা এই কথাগুলি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নব-রূপায়ণকালে যতখানি প্রযুক্ত হইয়াছিল এমনটি পূর্ব্বে হয়ত কখন হয় নাই। অরবিন্দ স্বদেশী যুগে বিপিনচন্দ্র সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। ভারতাত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় অনুভূতি আমাদের ঐহিক উন্নতির পথনির্দ্দেশে বিশেষ সহায় হইয়াছিল। ভারতের জাতীয়তার আদর্শ আর এই আদর্শে পৌঁছিবার সোপানগুলির নির্দ্দেশ তিনি যেরূপ দিতে পারিয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্রের পূর্ব্বে বা পরে এমনটি কাহারও বক্তৃতায় বা লেখনী-মুখে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া তো আমাদের জানা নাই। তিনি যে এতাদৃশ দূরদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন তাহা একদিনে হয় নাই। তিনি প্রথম জীবনে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিরত অধ্যয়ন-অনুধ্যানে নিরত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র প্রথম জীবনে কয়েক বৎসর শিক্ষাব্রতী-রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহার পরে তিনি নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র-সেবা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কিছুকালের জন্য ছেদ পড়িল। তিনি দুই বৎসর কাল কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান বা গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু শুনিয়াছি, এই সময়ে তাঁহার অধ্যয়ন-অনুধ্যান আশাতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী গত শতাব্দীতে বহু বাঙালী মনীষীর শিক্ষাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। বিশিষ্ট সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এখান হইতে যে-সব বিদ্যা আহরণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের কার্য্যে বিশেষ রসদ জোগায়। বিভিন্ন বিদ্যা—যেমন সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান কত বিদ্যারই না পুস্তক-পুস্তিকায় দ্বারা গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র কলিকাতায় অবস্থানকালে এই গ্রন্থাগারটির সবিশেষ সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহার রচনা বা বক্তৃতার মধ্যে প্রায়শঃই ইহার কোন-না-কোনটিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইত। আমরা বিপিনচন্দ্রকে তাঁহার পরিণত বয়সে দেখিয়াছি। তখন যৌবনের আবেগ তাঁহার মধ্যে ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার উক্তির মধ্যে আশ্চর্য্য জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাইতাম। তাঁহার এই অধ্যয়ন-অনুধ্যান পাশ্চাত্ত্য দেশ পরিক্রমায় পরিশুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি তখন একাদিক্রমে পনর বৎসর যাবৎ কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন, কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী নেতৃত্বের আদর্শও তিনি নিকট হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু স্বদেশে-বিদেশে লব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিদ্যা অনুশীলনে বা মননের ফলে এই আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে নিতান্তই পরিমিত বলিয়া মনে করিতে শিখিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রভাতকালে বঙ্গদেশে যে নূতন যুগের (new spirit) সম্ভাবনা দেখা দিল তিনি ইহারই অন্যতম প্রধান উদ্গাতা।

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিপিনচন্দ্র প্রারম্ভিক আয়ো-

জন্মাদির পর "নিউ ইণ্ডিয়া" ('নূতন ভারত') নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে শুরু করিলেন ১৯০১ সনের শেষদিক হইতে। নাম হইতেই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য বেশ প্রতিভাত হয়। বিপিনচন্দ্র বিলাত ঘুরিয়াছেন, মার্কিন মুলুকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতাত্মার পরিচয় স্বয়ং নানাভাবে পাইয়াছেন। কিন্তু পশ্চিম ভ্রমণে আর একটি বিষয়ও সম্যক্ প্রত্যক্ষ করিলেন। বিদেশীর শাসনমুক্ত না হইতে পারিলে, ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি অসম্ভব, আবার ভারতাত্মার যে পরিচয় মিলিয়াছে তাহাকে সর্ব্বজনমান্য ও গ্রাহ্য করাও যাইবে না। কংগ্রেসী-রাজনীতি চলিয়াছিল 'আবেদন-নিবেদনের' মধ্যে। হাজারো লাথি-ঝাঁটা খাইয়াও মতজাত দাস যেমন প্রভুর প্রসাদ-লালসায় কাল কাটায়, ঠিক যেন এমনি ভাব। কিন্তু ভারতবর্ষের উন্নতি-লক্ষ্মী 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। বিপিনচন্দ্র 'নিউ ইণ্ডিয়া'র সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই কথাই ব্যক্ত করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি কখন নেতিবাচক উক্তি করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, ইতিবাচক বা রচনাত্মক কার্য্যের দিকেও স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রাতঃকালে এশিয়া ভূখণ্ডে নবারুণ মনীষীরা দেখিতে পাইয়াছিলেন। জাপানী-চিন্তানায়ক ওকাকুরা এশিয়ার ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য তূর্য্যনাদে ঘোষণা করিতেছিলেন। বাংলাদেশের মনীষীরাও এই সময় স্বকীয় শাশ্বত বৈশিষ্ট্যের কথা নানাভাবে সবিনয়ে অথচ সবিস্তারে বর্ণনা করিতে-থাকেন। বিপিনচন্দ্রের ব্যাখ্যান এই সময়ে জাতির মনে নবযুগের নূতন আলোর সঞ্চার করিল। রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী-সমাজ" ঐ সময়কার এই স্বাবলম্বনভিত্তিক ভাবধারার একটি অনবদ্য রূপায়ণ। যেমন চিন্তায় তেমনি কর্ম্মে এই নব-রূপায়ণের একনিষ্ঠ প্রয়াস সূচিত হইল। বিপিনচন্দ্র পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন-অনুধ্যান সকলই যেন এই নব-রূপায়ণে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিলেন। এই যে নব-ভাবনার ধীর স্ফুরণ, তাহা স্বদেশী-আন্দোলনের আরম্ভেই এক অদ্ভুত গতি লাভ করিল। এই গতি প্রবীণেরা রোধ করিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না; কত বাদ-প্রতিবাদ-বিতণ্ডা! এই বিভেদ সুরাট কংগ্রেসে বিচ্ছেদে পরিণত হয়, উদ্ভব হইল নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের। সরকার এই বিভেদ-বিচ্ছেদের পূর্ণ সুযোগ লইয়া প্রচণ্ডভাবে দমন-নীতির আশ্রয় লইলেন। বিপিন-চন্দ্র কারাবরণ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল রহিলেন। ইহা আজ ইতিহাসের বস্তু। তখন 'লাল-বাল পাল' কথাটির খুব চল। পাঞ্জাবে লালা লজপৎ রায়, মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক এবং বঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল—নব-ভারতের নেতা। কিন্তু নব-ভারতের নব-ভাবনার ব্যাখ্যাতারূপে বিপিনচন্দ্র ছিলেন সকলের শীর্ষে, তাই অরবিন্দের উক্তি—"Prophet of Indian Nationalism"-এর এত সার্থকতা।

স্বদেশী যুগে বিপিনচন্দ্র ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-পাশমুক্ত নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা লাভের মোক্ষম অস্ত্র—"Passive Resistance" বা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ। বিপিনচন্দ্র ঐ সময়ে দিনের পর দিন 'বন্দে মাতরম্' দৈনিকে এবং নিজ "নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বাগ্মী—ইংরেজী ও বাংলা বক্তৃতায় বাঙালী ও অ-বাঙালীকে তিনি জাতীয় আদর্শ বুঝাইয়া দিয়াছেন; আবার তিনি দক্ষ সাংবাদিক, তিনি প্রতিনিয়ত এই আদর্শ এবং কর্ম্মপন্থার ব্যাখ্যাও করিতে থাকেন সংবাদপত্রের স্তম্ভে। জাতীয়তার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন দুই-দুইবার। দ্বিতীয় বারের কারাবরণ একটু বিচিত্র রকমের। বিপিনচন্দ্র তখন বিলাতে। তৎকর্ত্তৃক লণ্ডন হইতে প্রকাশিত স্বরাজ্য পত্রিকায় "The Aeteology of Bomb in Bengal" বা 'বঙ্গে বোমার নিদান' শীর্ষে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, বিপিনচন্দ্র সদ্য-উদ্ভূত বাঙালী বিপ্লবীদের সহিংস বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপদ্ধতির সমর্থক ছিলেন না তথাপি কি কি কারণে এই বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপদ্ধতি যুবজন গ্রহণ করিলেন তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন বিপিনচন্দ্র উক্ত প্রবন্ধে। বিলাতে অবস্থান কালে বিপিনচন্দ্রের ভারতবর্ষের নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা-বিষয় মতবাদ অনেকটা বদলাইয়া যায়। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে থাকিয়া যে সর্ব্বপ্রকার আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ সম্ভব এই বিষয়টি তখন তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয়। এই মতবাদ তিনি পরবর্ত্তী কালে বরাবর পোষণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী জাতীয় আন্দোলনগুলির বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিপিনচন্দ্রের এই মতবাদ অনেকটা সমর্থনও লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ে ব্রিটিশ সরকার বিপিনচন্দ্রের উপর সবিশেষ রুষ্টই ছিলেন। ভারতে পদার্পণ করিতেই সরাসরি বিচারে বোম্বাইয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। ইহার পরে আরও কোন কোন বিষয়ে বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া 'হিন্দু রিভিয়ু' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ইহার এক সংখ্যায় তখনকার একটি মতবাদের মারাত্মক ভবিষ্যতের দিকে সকলকে অবহিত হইতে বলিলেন। 'প্যান-ইসলামিজম' বা 'জগতের সব মুসলমান এক' এইরূপ মতবাদ ভারতবর্ষে বহুলরূপে প্রচারিত হইতে সুরু হয়। মুসলমান সমাজ যে সর্ব্বপ্রকারে 'ভারতীয়', এই বোধ বা 'জাতীয়তা-বোধ' ঐরূপ মতবাদের আবির্ভাবে ভীষণভাবে ব্যাহত হইবার উপক্রম হয়। পরে অবশ্য কিছুকাল আন্তর্জাতিক কারণে এই মনোভাব তেমন দৃঢ়মূল হইতে পারে নাই। কিন্তু প্রথম মহাসমর অন্তে কতকগুলি বিপর্য্যয়ের পর মহাত্মা গান্ধী যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন তাহার ভিতরে ঐক্যের বদলে ভারতের মুসলমান সমাজ পুনরায় নিজেদের আলাদা করিয়া ভাবিতে শিখে। আর বিপিনচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ সম্ভাবনার কথা সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করেন। বিপিনচন্দ্রের দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ।

মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অভাবাত্মক দিকসমূহের প্রতি বিপিনচন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিলেন বিশেষভাবে। রাজনীতিতে গুরুবাদ বিষম অনিষ্টের আকর, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে সাম্প্রদায়িকতায় প্রশ্রয় দান—জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত। রাজনীতির পটভূমিকায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য কি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যের বদলে বিরোধেরই প্রশ্রয় দিয়া থাকে বেশী। দ্বিতীয় দশকে প্রথমটির কুফল দেখা গেল—হিন্দু-মুসলমানে অভূতপূর্ব দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে। এই অনৈক্য ও তজ্জনিত কুফলসমূহ ক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে এরূপ বিষম আকার ধারণ করে যে, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরিক কারণে শাসকজাতি চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেও, ভারতবর্ষ দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে ভাগ হইয়া গেল। হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণী-বিরোধও ক্রমে বাড়িয়া চলে, কিন্তু নানা কারণে ইহা ঐরূপ মারাত্মক আকার ধারণ করিতে পারে নাই। অবশ্য এই বিত্ত-বৈষম্য শাসকবর্গের উস্কানিতে খুবই বাড়িয়া যায়, কিন্তু গোড়ায় যে গলদ হইয়াছিল, শেষ পর্যন্ত তাহা শোধরানো আর সম্ভব হইল না। বিপিনচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া বার বার তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করি। তদ্ব্যাখ্যাত "Democratic Swaraj" বা গণস্বরাজ, অথবা এক কথায় পল্লী-স্বরাজের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর কত দিকে আমাদের দৃষ্টি খুলিয়াছে। কত পরিকল্পনা আমরা করিতেছি। কিন্তু বিপিনচন্দ্র-পরিকল্পিত পল্লী-স্বরাজের দুন্দুভিধ্বনি এখনও তো শুনা যাইতেছে না। গণদেবতা এই দুন্দুভিধ্বনি শুনিবার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। মনীষী ব্যক্তিরা এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শও ছিল পল্লী-স্বরাজ। এক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র ও গান্ধীজীর মতবাদের সম্পূর্ণ মিল দেখি। তিনি সত্যসত্যই জাতীয়তামন্ত্রের ঋষি।

অনাগত

শ্রীরাধামোহন মহান্ত

সে খবর কেউ ত জানে না।
সেদিন রাতটা ছিল পূর্ণিমার হাসি উদ্ভাসিত
পাশে ছিলে তুমি বন্ধু, আর,
আকাশের অগণিত তন্দ্রালু তারারা ;
পাশ দিয়ে বয়েছিল শ্রীমতীর স্বচ্ছনীল জল
আমার চোখের জলে পরিপুষ্ট হয়ে।

সে সংবাদ সকলে জানে না—
যেদিন প্রথম, হয়েছিল চোখোচোখি তোমার আমার
বোশেখের চলন্ত দুপুরে,
আশে পাশে কেউই ছিল না—
মুখোমুখি তুমি আর আমি,
মনে হ'ল এ পৃথিবী তোমার আমার।

সে বারতা কেউই ত জানে না—
প্রথম সাহস ক'রে দুরু দুরু বুকে
ঋতুর প্রথম ফল দিয়েছিনু প্রসারিত করে,
তুমিও সকোচে, নিয়েছিলে হাত পেতে,
হাত নয় ঠিক যেন এক জোড়া হৃদয়ের গলিত বিদ্যুৎ
আশার মেঘের বুকে—কয়ে গেল কি যেন কি কথা!

সে সংবাদ অনেকে জানে না—
ছুঁয়ে গেল মন-কেলাভূমি,—
দিয়ে গেল শতেক যুগের ফসলের আমন্ত্রণ লিপি;
সুরভি প্রলেপে যেন আমোদিত উতল বাতাস!
সেদিনের কৈশোরের পাগলামীতে ভরা তপ্ত
চলন্ত দুপুর
চলন্ত জীবন হতে ঝরে গেল জীবন মধ্যাহ্নে

সেদিন রাতটা ছিল পূর্ণিমার স্পর্শ কলঙ্কিত,
পাশে ছিলে পাশবদ্ধ তুমি বন্ধু, আর,
নির্জ্জন আকাশে ছিল স্বপ্নাচ্ছন্ন বিমুগ্ধ তারারা,
পাশ দিয়ে বয়েছিল অনেক চোখের জলে পরিপুষ্ট
কূল প্লাবী শ্রীমতীর স্বচ্ছ নীল জল।
পললের মর্ম্মে তাই আজো শুনি, অনাগত প্রাণের মূর্চ্ছনা,
এ সংবাদ, আজো জানি, অনেকে জানে না।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
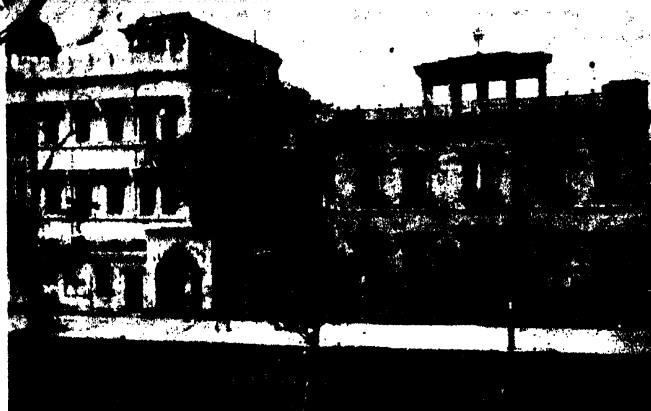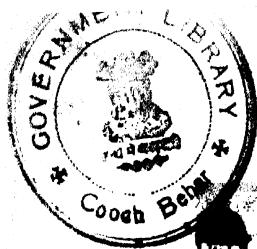
সভ্যতার উষাকালে ভারতীয় মনীষার প্রকাশ দীর্ঘদিন জগত আলোকিত করিয়াছিল। মধ্যযুগে ভারতীয় সংস্কৃতির খ্যাতি প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাহা ক্রমেই গণ্ডীবদ্ধ হইয়া যায়। প্রাচীন চিন্তাধারাই এদেশের সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসে যাহার ফলে নূতন গবেষণা, নূতন তথ্য ও জ্ঞানসংগ্রহের স্পৃহা ইত্যাদি ব্যাহত হইয়া যায়। যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই সিদ্ধ ও সনাতন, যাহা কিছু নূতন তাহা অর্ব্বাচীন সুতরাং অগ্রাহ্য ও অসিদ্ধ, এই ধারণাই আমাদের পতন ও হাস মনোভাবের মূল এবং উহারই বশে আমাদের মনীষা ও প্রতিভা আড়ষ্ট ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের জীবন্ত স্রোত হইতে বঞ্চিত হয়। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ঐ মনোভাব আমাদের চিন্তা-শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিতে পারে নাই, কেননা সংস্কৃতির কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিভার বিকাশ ক্ষীণ, কিন্তু জীবন্তই ছিল।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকে এদেশের জাগরণ আরম্ভ হয়। তখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবে ঐ সকল দেশের জাতি প্রবল প্রতাপ হইয়া উঠিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদের দিগ্বিজয়ী অভিযান অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চল তখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর আয়ত্তাধীন; মোগল, মারাঠা ও শিখের অধিকার পতনোন্মুখ। এই অবস্থার কারণ বিচারে আমাদের চৈতন্যের উদয় হয় এবং সেই কারণেই বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সহিত পরিচিতি ও পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির কারণ সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমাদের মধ্যে আসে। উহারই ফলে ইংরেজী ভাষা ও শিক্ষার প্রচার এবং প্রভাব সারা ভারতে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। এই শিক্ষা-দীক্ষার ফলে ভারতীয় প্রতিভার বহুমুখী বিকাশ অতি শীঘ্রই দেখা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও অনুসন্ধানে মৌলিক চিন্তার কোনও প্রকাশ উনবিংশ শতকের তিন-চতুর্থাংশের মধ্যে দেখা দেয় নাই। সাহিত্যে, দর্শনে, প্রত্নতত্ত্বে ও পুরাতত্ত্বে, ইতিহাসে ভারত-সন্তানের কৃতিত্ব যেভাবে দেখা দিয়াছিল, তাহার অনুরূপ কোনও কিছু আমরা ঐ শতকের তিন-চতুর্থাংশে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, দেখি নাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয়ের পদাঙ্ক আমরা দেখিতে পাই আচার্য্য জগদীশ-

চন্দ্রের। প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি জ্ঞানের সোপানে কিছুদূর উঠিয়াই স্থাণুভাব লইয়া জড়ভরতের মত থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যে চিন্তার ধারা তাঁহার সন্ধানী অন্তরের মনীষায় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার এক উৎস ছিল কেম্‌ব্রিজের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানাগার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য উৎস ছিল অনেক গভীরে বহু শতাব্দীবাহিত প্রাচীন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ক্ষীণ প্রবাহের প্রস্রবণে। সেই কারণেই তিনি অন্য বিদ্বানজনের ন্যায় পরের আহৃত জ্ঞানের বেসাতি খুলিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার চিন্তাধারা যে ভারতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম চিন্তার সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ছিল তাহার পূর্ণ পরিচয় আমরা তাঁহার বক্তৃতায় ও লেখনীপ্রসূত বাক্যে বহুবার পাইয়াছি এবং এই কারণেই বোধ হয় তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানের ঐ তমসাচ্ছন্ন যুগেই নূতন আলোকের সন্ধান দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পথিকৃৎ যে জন, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা যে মহামানব, তাহার প্রেরণা-উদ্দীপনার মূল উৎস তাহারই জাতীয় জীবনের প্রাচীন চিন্তা ও চেতনার প্রবাহের উৎসমুখ হইবেই, ইতিহাসের এই সাক্ষ্য স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীন ভারতে, তথা প্রাচীন সভ্য জগতে, বিজ্ঞানচর্চ্চা দার্শনিক চিন্তার অঙ্গীভূত ছিল। অর্থাৎ প্রাচীনগণের সৃষ্টি-রহস্য বিচারের পন্থা ও পদ্ধতি আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা সমীক্ষার ভিত্তিমাত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইন্দ্রিয়গোচর ও অতীন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের মধ্যে প্রভেদ তাঁহারা অতটা স্বীকার করিতেন না। আদি কারণের বা আদিম সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার একত্ব বা নৈকট্যের অনুভূতি তাঁহাদের সকল চিন্তা অধিকার করিয়া থাকিত। সেই কারণে তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তা এত ব্যাপক অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিল, এবং তাঁহাদের প্রাকৃতিক তত্ত্ববিচারে এতই প্রখর মেধার পরিচয় পাওয়া যাইত।

আচার্য্য জগদীশের জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তথ্যপূর্ণ গবেষণার মূলে সেই প্রাচীন দ্রষ্টা ঋষিগণের চিন্তার প্রেরণা আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই। তাঁহার অজ্ঞাত ও অব্যক্ত সৃষ্টি-রহস্য, বিচারের পদ্ধতি ও পন্থা অত্যাধুনিক ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত ছিল। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান তাঁহার আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি দ্বারা উপকৃত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার চিন্তার ধারা আমাদের চিরন্তন পন্থা অনুযায়ী ছিল। তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে সেই চিন্তার প্রকাশ অতি উজ্জ্বল। তাঁহার শেষ বয়সে লিখিত "জড়-জগত, উদ্ভিদ-জগত ও প্রাণী-জগত" নামক প্রবন্ধের আরম্ভে আমরা পাই এই কথাগুলি:

রয়াল ইনষ্টিটিউশনে আচার্য্য বসু বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কার বর্ণনা করিতেছেন (১৮৯৬-৯৭)

"সকলেই মনে করেন যে, জড়, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর বর্ত্তমান। তবে দৃষ্ট জগত কি কোন নিয়মে আবদ্ধ নহে? এরূপও হইতে পারে যে, আপাততঃ বৈষম্যের মধ্যে কোন মূলগত একত্বের বন্ধন আছে।

আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই সমস্যা আমার মন অধিকার করিয়াছিল। আমি তখন আকাশের বিদ্যুৎতরঙ্গ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলাম, এবং দূর হইতে প্রেরিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এক নূতন কল আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। দেখিতে পাইলাম, ধাতুনির্ম্মিত কলের লিপি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল, যেন কলটি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। লিপির ধরন আমাদের ক্লান্ত লিপিরই অনুরূপ। মানুষের যেমন বিশ্রামের

পর ক্লান্তি দূর হয়, কলটিরও সেইরূপ বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হইল। আবার কতকগুলি ঔষধে যেমন আমাদিগকে উত্তেজিত করে, জড়নির্ম্মিত কলেও তাহার অনুরূপ প্রক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। উহার ফলে বহুদূর হইতে প্রেরিত অতি ক্ষীণ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অপিচ কতকগুলি দ্রব্য কলের উপর বিষবৎ কার্য্য করিয়াছিল, যাহার জন্য কলের সাড়া দিবার শক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইল। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, অনেক সময় যেমন অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করিলে জীবদেহে উত্তেজকের ক্রিয়া করে, ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্রেও সেইরূপ ফল দৃষ্ট হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার আভাস দেখিতে পাইলাম। ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, জড় ও জীব জগত একই নিয়মে পরিচালিত এবং উহারা একই সূত্রে গ্রথিত।

উদ্ভিদ, জড় ও প্রাণীর মধ্যগত বলিয়া উহার মধ্যে প্রাণীর ন্যায় ক্রিয়া আরও সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব মনে করিয়াছিলাম।

কিন্তু এইরূপ বিবেচনা প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। প্রচলিত মতবাদীগণ মনে করেন, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে কোন সাদৃশ্য থাকিতে পারে না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, বাহিরের আঘাতে জীবপেশী যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, উদ্ভিদ সেরূপ হয় না। প্রাণীকে এক স্থলে আঘাত করিলে স্নায়ু দ্বারা উত্তেজনা দূরে প্রেরিত হয় এবং তথায় সঙ্কুচনশীল পেশীকে চালিত করে। উদ্ভিদে উত্তেজনাবাহক এরূপ কোন পথ নাই। প্রাণীগণ বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে যেরূপ উত্তেজিত কিংবা অবসন্ন হয়, উদ্ভিদে সেরূপ কিছু হয় না। প্রাণী-জগতে স্বতঃস্পন্দনশীল পেশী দেখা যায়, যাহা পুনঃ পুনঃ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, তাহা উদ্ভিদে দৃষ্ট হয় না। স্বতঃস্পন্দনশীল পেশী বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে উত্তেজিত, প্রশমিত অথবা আড়ষ্ট হয়। উদ্ভিদে তদনুরূপ প্রক্রিয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে না, ইহা এবং অন্যান্য কারণে বিরুদ্ধবাদীগণ মনে করিতেন যে, বৃক্ষ-জীবন ও প্রাণী জীবন সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন।

এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রকৃত কারণ এই যে, এতদিন বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত ছিল। যদি কোন অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। তবে কি করিয়া যাহা অজ্ঞাত ছিল তাহা জ্ঞানগোচর করা যাইতে পারে? ইহার জন্য জীবন্ত ভাবের একটি মাপকাঠি প্রস্তুত করা আবশ্যক।

প্রাণী যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন নানা রূপে সাড়া দিয়া থাকে। বাহিরের ধাক্কা কিম্বা "নাড়া"র উত্তরে "সাড়া"। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়াতে প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্ব্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার একমাত্র উপায় এই, সে যেন তাহার ইতিহাস স্বয়ং লিখিতে সক্ষম হয়। ইহা যে কোন দিন সম্ভব হইবে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। তথাপি বহু চেষ্টার পর যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাহা দ্বারা অব্যক্ত জগতের সীমাহীন

প্রার্থনারত ফরিদপুরের খেজুর বৃক্ষ

বামে সকালবেলায় উত্থিত অবস্থা
এবং ডাইনে সন্ধ্যা-আরতির সময়ে প্রণমিত অবস্থা

রহস্য, পরীক্ষা-প্রণালীতে স্থিরপ্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এইরূপে যাহা অসম্ভব তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। সে সব কলের ব্যাখ্যা অল্প কথায় হইতে পারে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে যাহা দ্বারা সহজেই তাহার ভিতরকার প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়।"

পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পূর্ণজীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্ত্তনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা অনাবশ্যক, জীর্ণ পত্রের ন্যায় সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে বাহিরের বিভীষিকা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বৃদ্ধিমানযন্ত্র, হাইম্যাগনিফিকেশন ক্রেস্কোগ্রাফ। ইহাতে বৃক্ষের বৃদ্ধি সহস্র সহস্র গুণ বাড়াইয়া লিপিবদ্ধ হয়
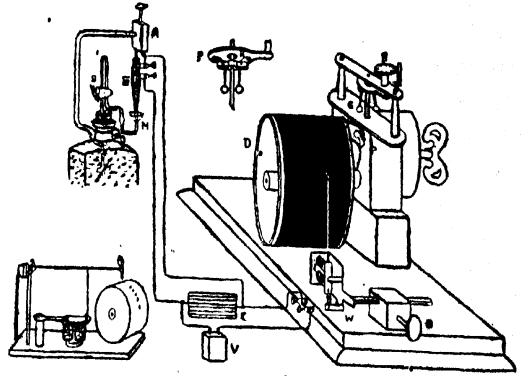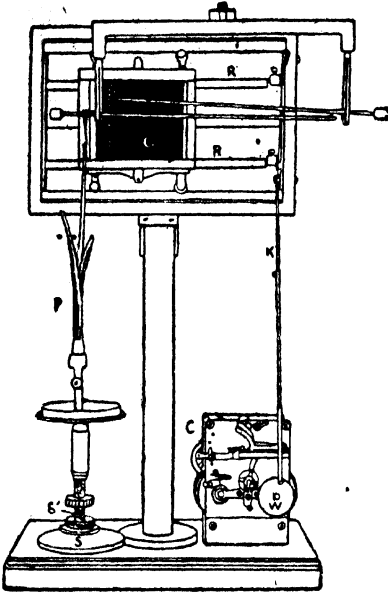
আলোকপাতে বৃক্ষপত্রের অঙ্গারায় বিশ্লেষণ করিয়া খাদ্য-আহরণ-পরিপাক যন্ত্র। ইহা প্রতি সেকেণ্ডে এক তোলার এক কোটি অংশ খাদ্য আহরণ জ্ঞাপন করিয়া থাকে

ঐ প্রবন্ধেরই শেষে আমরা আরও স্পষ্ট ভাষায় তাঁহার চিন্তার প্রবাহগতি অনুভব করিতে পারি, যথা :

"বৃক্ষজীবনের ইতিহাস হইতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক বিষয় আছে, যেমন, জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা।

বহুবিধ দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়াও বৃক্ষ তাহার জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তবে কোন্ শক্তিবলে মৃত্যুর বিরুদ্ধে সে যুঝিতে পারিয়াছে? তাহার একটি কারণ এই যে, বৃক্ষের মূল একটি নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে-স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংগঠিত হইতেছে। সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক। বৃক্ষের ভিতর আরও একটি শক্তি নিহিত আছে যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরের কত

ইহার সঙ্গে আরও একটি শক্তি তাহার সম্বল। সে যদি বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তবে সেই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্গে ধারণ করিয়াছে। এইজন্য তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত, তাহার শির ঊর্দ্ধে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখাপ্রশাখা ছায়াদানে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। তবে কি কি শক্তিবলে সে বাহিরের আঘাত পাইয়াও বাঁচিয়া থাকে? তাহা এই : যে ধৈর্য্যে, যে দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থান দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, যে অনুভূতিতে ভিতর ও বাহিরে সামঞ্জস্য করিয়া লয়, এবং যে স্মৃতিতে বহুজীবনের শক্তি নিজস্ব করিয়া রাখে। আর যে হতভাগ্য আপনাকে স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে জীবন-সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া পরমুখাপেক্ষী ও পর-অন্নে প্রতিপালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।

অদৃশ্য আলোকের পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, অসংখ্যবিধ জ্যোতির মধ্যে এক ক্ষুদ্র গণ্ডিটিই আমাদের দৃশ্যরাজ্য। আমাদের ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ এবং এই অপূর্ণতার জন্য অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন নিরাশ হয় নাই। বরং অদম্য উৎসাহে সে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন রাজ্যের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

অনন্তের পথযাত্রী কি সম্বল তোমার? সম্বল কিছুই নাই, কেবল আছে অন্ধ বিশ্বাস, সে বিশ্বাস বলে প্রবাল দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্যও সাধকদিগের অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়াই আরম্ভ এবং আঁধারেই শেষ, মাঝে দুই একটি ক্ষীণ আলোরেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায়ের ফলে ঘন কুয়াশা অপসারিত হইলে বিশ্বজগত জ্যোতির্ম্ময় হইবে।"

যে "আকাশের বিদ্যুৎতরঙ্গ বিষয়ে অনুসন্ধান" সম্পর্কে কাজের কথা ঐ প্রবন্ধের গোড়ায় লিখিত হইয়াছে, উহারই ফলে বেতার জগতের দ্বারোদ্ঘাটন সম্পন্ন হয়। কেননা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ঐ তখনকার অজ্ঞাত জগতের প্রথম তিনজন দ্রষ্টা ও পথিকৃতের অন্যতম। বেতার তরঙ্গের অতি সূক্ষ্ম অংশের ক্ষেপণ ও গ্রহণ উঁহারই উদ্ভাবিত যন্ত্র ও পদ্ধতিতে জগতে সর্ব্বপ্রথমে সম্ভব হয়, যাহার ফলে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-জগতে সাড়া পড়িয়া যায়।

আচার্য্য জগদীশ আমাদের প্রাচীন দার্শনিকদিগের মতই জ্ঞান ও গবেষণার পথকে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথ হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই ঐ অদ্ভুত যন্ত্র-কৌশল ও উদ্ভাবন-ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে ঐ অত্যাশ্চর্য্য বিজ্ঞান-সমস্যা পূরণের ক্ষমতা সেই দিকে প্রয়োগ করিলে তিনি মার্কনির পূর্ব্বেই বেতার জগতে নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও অতুল ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিতে পারিতেন। কেননা তিনি শুধু পথই দেখান নাই, সে পথে চলিবার উপায়েরও যথেষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার মন ছিল দ্রষ্টা ও দার্শনিকের। সুতরাং নূতন এবং অজ্ঞাত জগতের সন্ধান পাইয়া তাঁহার মন সে দিকেই ছুটিল। ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যে ব্যবধান, যে অজ্ঞানের পর্দ্দার আড়াল ছিল তাহা তাঁহার মনীষার ইন্দ্রজালে সরিয়া গেল। মানুষ এক পথ খুঁজিয়া পাইল যাহাতে উদ্ভিদেরও সাড়া মনুষ্যজগতের স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর হইল।

পাশ্চাত্ত্যের বহু বৈজ্ঞানিক বহু বিদ্বান আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রকে অভিনন্দন জানাইয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে
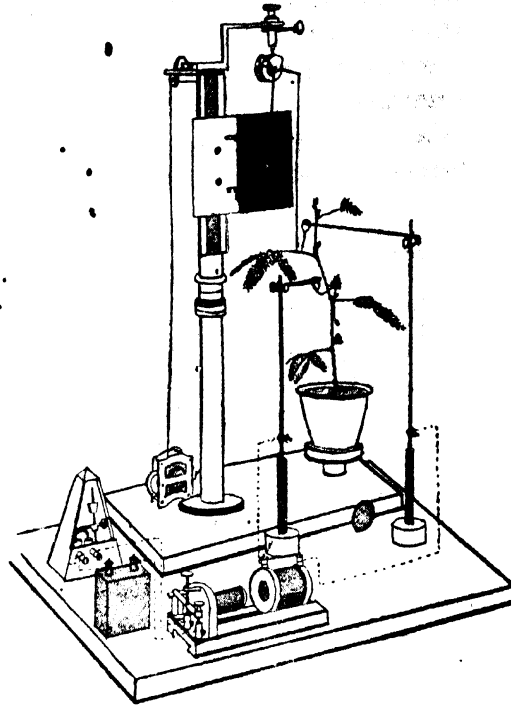
'সমতাল' অথবা রেজোনেন্ট রেকর্ডার। ইহা দ্বারা আঘাতজনিত আবেগের গতি লিপিবদ্ধ হয় এবং সেকেণ্ডের এক সহস্রাংশ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয়

বিখ্যাত লেখক ও ঋষিতুল্য মনীষী রমঁ্যা রলাঁ তাঁহার অভিনন্দনে বলিয়াছিলেন, "তুমি শুধু বৈজ্ঞানিক নহ, তুমি ধর্ম্মপ্রবণ দার্শনিক। তুমি তোমার সুদূর অতীতের ক্ষত্রিয় পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর কেননা তুমি উদ্ভিদ-জগতে জয়যাত্রা করিয়া বিজয়ী হইয়াছ।"

ইহা সম্পূর্ণ সত্য। আচার্য্য জগদীশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণা তাঁহার খ্যাতি চিরস্থায়ী করিবেই। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান অন্যদিকে। তিনি জগতকে সর্ব্ব-প্রথমে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, সনাতন ভারতীয় চিন্তাধারা ও বিনয়, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় সবল ও সক্ষম হইলে, জগতের বিদ্বান ও বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা যথেষ্ট নহে। সে শিক্ষা কলগাছের কলমের মতই আদিম বৃক্ষের সবল মূল ও পল্লবের সঙ্গে যুক্ত হইলেই সুফলপ্রসূ হয়। কেননা জাতীয়

জীবনের স্রোতধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকিলে সকল বিজাতীয় শিক্ষাই কৃত্রিম হইয়া দাঁড়ায়। অন্তেতরের ন্যায় তাহার জীবনী-স্রোত রুদ্ধ ও সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য।

এই শেষ শিক্ষাই আচার্য্য জগদীশের জীবনের শিক্ষা। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা তাঁহার এই দান পাইয়াছি।

যে যুগে তাঁহার আবির্ভাব তখন এদেশ কিরূপ তমসাচ্ছন্ন ছিল তাহার ধারণা করাও আমাদের পক্ষে আজ অসম্ভব। তখন বিদ্বান ছিলেন দুই শ্রেণীর। এক দল কেবলমাত্র প্রাচীনযুগের কাব্যশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট যাহা কিছু বিদেশ-আগত সে সবই অর্ব্বাচীন ও অস্পৃশ্য এবং সেই বিচারের বশে দেশকে দাসত্বের মহাপঙ্কে আরও নিমজ্জিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। অন্য এক দল বিদেশীর অর্জ্জিত তথ্যাদিতে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিয়া এদেশের সব-কিছুকেই হেয়জ্ঞান করিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত অবহেলা করিতেন। তাঁহাদেরও সম্বলমাত্র ছিল পুঁথিগত বিদ্যা এবং তাঁহাদের জ্ঞান-বৃক্ষের কোনও শিকড় এদেশের মাটিতে ঠেকে নাই। বিজ্ঞান জগতের নূতন যাহা কিছু তাহা তাঁহাদের অনেকে জানিতেন, কিন্তু সে রাজ্যে অগ্রসর হওয়ার উদ্যম বা উদ্দীপনা তাঁহাদের মধ্যে ছিল না, কারণ এদেশের জীবনী-স্রোতের সহিত তাঁহাদের কোন যোগই ছিল না।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র পুঁথিগত বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া এবং বিদেশীর উদ্ভাবিত যন্ত্রকৌশল আয়ত্ত করিয়া বিজ্ঞানের সোপানে পদার্পণ করিয়া স্থাণুভাব অবলম্বনে সন্তুষ্ট বা ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহার পথে অসীম ও অসংখ্য বাধা ছিল কেননা তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার এদেশে ছিল না বলিলেই চলে। সে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি কি শক্তি কি অনুপ্রেরণার বশে ঐ সকল তথ্য আবিষ্কার ও যন্ত্র উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়া সমস্ত পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক জগতকে চমৎকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত অবহিত হওয়া উচিত।

তাঁহার মৃত্যুর পর "প্রবাসী"র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক তাঁহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আমরা ইঙ্গিত পাই আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রেরণার উৎস সম্পর্কে। সেই কারণে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

আচার্য্য বসু তাঁহার একটি বক্তৃতার শেষে বিশ্বের একত্ব সম্বন্ধে ইংরেজীতে ঋষিদের বাক্য বলিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কঠোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা,
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি,
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ,
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥"

"সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা একেশ্বর যিনি আপনার একরূপকে বহু করেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা আত্মস্থ (আপনাদের মধ্যে স্থিত) দেখেন, তাঁহাদের সুখ শাশ্বত, অন্যদের নহে।"

বহুর মধ্যে এককে যিনি জানেন, তিনিই সত্য জানিয়াছেন, অন্যেরা নহে, এই মর্ম্মের উপনিষদ বাক্য তাঁহার প্রিয় ছিল। বহুর মধ্যে এই একের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন।

পরমাত্মার উপলব্ধির জন্য কর্ম্মের পথ, রসানুভূতির পথ ও জ্ঞানের পথ তাঁহার অধিগম্য ছিল, এবং তিনি তাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভবিতব্য

শ্রীরেণুকা চক্রবর্ত্তী

শীতের সন্ধ্যা, চোখ জ্বালা করছে। সমস্ত কলকাতাটাই যেন ঘুসে ঘুসে পুড়ছে। ধোঁয়ায় আর কিছু দেখার সাধ্য নেই, এখন বেলঘোরে লোকালখানায় একবার চাপতে পারলে নিশ্চিন্ত। বেলঘোরে বাসা নেবার সময়ে অনেকেই বলেছিল ডেলিপেসেঞ্জার হবার ঝকমারী আছে সত্যি তবু কলকাতা বাস করার চেয়ে ভাল। একটু হাওয়া-আলোর মুখ দেখে বাঁচা যায়। খরচও কলকাতার চেয়ে ঢের কম। কমলার পছন্দ নয়, বেরুতে পারে না। আরে বাপু, কলকাতায় থাকলেই বা তুমি কোন চুলোয় ঘুরতে? যেখানেই যাও পয়সা, আর পয়সা। কমলা বলে, তা হউক, তবু কলকাতার লাইফ আছে। আসল লাইফ যে কোথায় মেয়ে মানুষ ত তা বুঝে না! পয়সা থাকলে বেলঘোরের থেকে কলকাতা কতটুকু?

একখানা গাড়ী আসে, ঠেলেঠুলে ওরই মধ্যে ঢুকে পড়ে অশোক। বাড়ীতে ফিরতে দেরী হলে আজও আর নন্তু সন্তুকে নিয়ে বসা হবে না। পরের ছেলে মানুষ করি অথচ নিজেরটার দিকে নজর দেবার সময় হয় না। ভাবতে ভাবতে গাড়ীর ভিতর আর একটু সেঁদোয়। এলোমেলো চিন্তায় হাঁক-ডাকে ওঠা-নামায় কখন সময়টুকু কেটে যায়। দেখা দেয় বেলঘোরের ষ্টেশন। অশোক ট্রেন থেকে নেমে কলকাতা থেকে আনা কপি-কড়াইশুটির থলেটা গুছিয়ে নেয়। থলেতে একটু পাটালী গুড় আছে। যতটা সম্ভব দেখে নিয়েছে, রসের গন্ধ আছে তবে ভেলী গুড় হয়ত কিছু মিশিয়ে থাকবে। আজকাল ত আর খাঁটি জিনিস পাবার উপায় নেই। ওই গুড়টুকু পেয়ে ছেলেমেয়েরা কতই না খুশী হবে। অশোকের নিজের মুখও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ওর সামনেই একখানা গাড়ী কাঁচ করে থেমে যায়। চমকে উঠে অশোক, গাড়ীর দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। এ যে স্যুট পরা এক ভদ্রলোক, তার দিকে চেয়ে হাসছে। কে এ? তাই ত হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে, অসিত। অসিত ততক্ষণে গাড়ীর দরজা খুলে ধরেছে,—তবু যা হো'ক চিনতে পেরেছিস। উঠে আয়।

কোথায়?

যেখানে যাচ্ছিলি।

বাড়ী যাচ্ছিলাম, তুমি কোথায় চলেছ?

আমি এই দিকেই কাজে এসেছিলাম তুই কি এখানে বাড়ী করেছিস?

আরে না-না, আমি করব বাড়ী? বাসাভাড়া করে আছি।

তা বেশ করেছিস, শহর ছেড়ে এখানে কেন?

অশোক ভাবে কেন তা অসিত বুঝবে না। অসিতের দিকে চেয়ে দেখে দামী স্যুট পরা, দামী সু পায়ে, আঙ্গুলের আংটির হীরকের দ্যুতি সাক্ষ্য দেয় কৌলিন্যের। অশোক যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। আর একটু পরেই তার বাসা, সেখানে অসিতকে বসাবার মত একটা চেয়ারও নেই। আশ্চর্য্য সেই অসিত, এরি মধ্যে কি করে এতটা উন্নতি করে ফেলেছে! ও কি আশ্চর্য্য প্রদীপ পেয়েছে?

অসিত অনর্গল বকে চলেছে,—জানিস সেই যে কেরাণীগিরি করছিলাম, যুদ্ধের সময় তা ছেড়ে দিয়ে কণ্ট্রাক্টরী করি। তার পর কণ্ট্রাক্টরী বন্ধ হতেই এই আমেরিকান কোম্পানীতে ঢুকে পড়ি। ওরা দেয় ভালই, এ গাড়ীখানাও আমিই পার্সনাল ব্যবহার করি। বলতে বলতে অশোকের বাড়ীর কাছে মটর থামে, ওর ছেলেমেয়েরা অবাক, মটরে করে তাদের বাবা এসেছে।

অশোক ছেলেমেয়ের জামাকাপড়ের দিকে চেয়ে অস্বস্তি বোধ করে, পরিচয় করিয়ে দেয়, এই যে তোদের অসিত কাকু। সামনের বারান্দাতে একটি মাদুর পেতে অসিতকে বসতে দেয়। ঘরের একপাশে তক্তাপোষে অশোকের বাবা জগদীশবাবু শুয়ে আছেন।

অসিত বলে, আমি ত একাই বকে চলেছি; এখন তোর কথা বল, তুই কি এখনও সেই স্কুল মাষ্টারী আর কোচিং করেই দিন গুজরান করছিস?

তা কেন? সবাই তোমার কণ্ট্রাক্টারী করে বেড়াবে।

তোদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। এ জন্যই কি এত লেখাপড়া শিখেছিস?

ঘা খেয়ে অশোকও ফোঁস করে উঠে, কেন, স্কুল মাষ্টারীটা কি এমন বেইজ্জতি কাজ? এর চেয়ে ভাল কাজ আছে নাকি? বলতে পারিস টাকা নেই। তা টাকাই কি দুনিয়ার সব?

হ্যাঁ বন্ধু, হ্যাঁ, টাকা ছাড়া আজকের দুনিয়া অচল।

তোমরা তাই করে তুলেছ বটে।

তা আমার উপর চটছিস কেন? টাকার প্রয়োজনীয়তা তুই অস্বীকার করতে পারিস?

জগদীশবাবু বলে উঠেন,—সবই ভাগ্য। যার যেটুকু ভাগ্য থাকে সে সেটুকুই পায়।

অসিত হেসে উঠে,—ও কথা বলবেন না জ্যাঠামশাই, আজকাল ও কথা একেবারে অচল। আমরা এ কথা মানি না, আমরা বলি মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে।

বৃদ্ধ একটু স্মিত হাসলেন,—তা পুরুষকার বল, আর চেষ্টাই

বল, তবু যেন কোথায় একটু গলদ থেকে যায়।

অসিত চেঁচিয়ে উঠে,—না জ্যাঠামশাই, ওগুলি অক্ষমের উক্তি। ভাগ্য, ভগবান—এ সবের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে কুঁড়েরা। চেষ্টায় কি না হয়?

চেষ্টায় অনেক কিছু হয় মানি, তবু অদৃষ্টে না থাকলে পাওয়া কঠিন।

এর পর আর অসিতের বসার ধৈর্য্য থাকে না।

অশোক বাধা দেয়,—সে কি চা খেয়ে নাও।

'চা'? স্কুল মাষ্টারের বাড়ীতে চা?

—কেন নয়? স্কুল মাষ্টারকে তোরা মানুষ বলেই মনে করিস না?

—তা নয়, স্কুল মাষ্টারকে আমরা সুপারম্যান—যাকে বলে মহা মানব—তাই বলে গণ্য করি। তাই এসব অখাদ্য জিনিস তারা স্পর্শ করে না বলেই মনে করি।

এ সময় কমলা চা আর হালুয়া নিয়ে আসে।

অসিত বলে,—বাঃ বৌদি আমার নামেও কমলা, কাজেও তাই। কিন্তু ভাই আজ আর গল্প করার সময় নেই, আর একদিন আসব, বলে চা জলখাবার খেয়ে অসিত বিদায় নেয়।

গতানুগতিক দিন চলতে থাকে। ঝড়ের মত অসিত এসে এক আবর্ত্তের সৃষ্টি করে যায়। অশোকের দরিদ্রতা অশোককে সতত ভেংচাতে থাকে। তোষকের অর্দ্ধেক তুলো খুলে পড়ছে, খোকার এ শীতে একটা গরম জামা না করলে নয়। শ্যামলীর একখানা শাড়ী চাই, সন্তুর বড্ড কাসি হয়েছে, একটা সিরাপ চাই-ই। চাই-ই, কিন্তু আসার কোন পথ নেই। উদয় আর অস্ত—রাত্রিরও কিছু অংশ পরিশ্রম করেও পেটের ভাতই যোগাড় হয়ে উঠে না। উপরন্তু কাজ কি করে হবে? কত সখ ছিল তার লেখার, সময় কোথায়? রুটি জোগাতেই দিন খতম।

আবার একদিন দেখা দেয় অসিত নলেন গুড়ের সন্দেশ নিয়ে।

অশোক বলে,—তবু ভাল মনে পড়ল, আমি ভাবলাম ডুব মেরেছিস।

আমিই ত তবু এলাম, তুই ত একদিনও গেলি নে।

সময় কোথায়?

হ্যাঁ, কাজ ত শুধু তুই করিস। বৌদি একবার আসুন দেখি, অশোককে বেশ করে মিষ্টি খাইয়ে দেখুন ওর কথা একটু মিষ্টি করা যায় কি না।

কমলা বলে,—বেশ, আমরা মিষ্টি খেয়ে মিষ্টি কথা বলব আর আপনাকে কিছু ঝাল খাইয়ে দেব।

অসিত হেসে উঠে,—এইত চাই, দেখছিস বৌদি আমায় কেমন চিনে ফেলেছে।

হ্যাঁরে, এইত তোর বড় মেয়ে?

হ্যাঁ।

কি পড়ছে? মুখখানা কিন্তু ভারী—নাম কি মা তোমার?

শ্যামলা মেয়ে তাই ওর নাম শ্যামলী। ম্যাট্রিক পাশ করেছে, বিয়ের চেষ্টায় আছি।

বলিস কি? ম্যাটিক পাশ করিয়ে বিয়ে দিবি। আমার নন্দা এবার বি, এ দেবে, তার পর তাকে লণ্ডন পাঠাব।

অশোক বলে,—মানিয়ে চলতে শেখাটাই বড় শেখা মেয়েদের। পরের বাড়ী গিয়ে ঘর করতে হয়, সেখানে পরকে আপন করতে যে ত্যাগ ক্ষমা সহিষ্ণুতার দরকার সেটুকু তারা ঠিকমত পেয়েছে কি না এটা লক্ষ্য রাখা দরকার। লণ্ডন যাবে নন্দা, খুবই ভাল কথা, কিন্তু শিক্ষা কি শুধু লণ্ডনেই আছে? বিদ্যাসাগরের জননী কোন্ লণ্ডন থেকে পাশ করে এসেছিলেন?

আরে থাম বাপু, তুই যে আমাকেই ছাত্র ঠাউরেছিস। শিক্ষকদের এই এক রোগ। কেবল উপদেশ দেওয়া।

জগদীশবাবু বলে উঠেন,—মেয়েদের আসল কাজ সুশ্রী ভাবে সংসার করতে পারা, তার উপর যা হয় সেটা উপরন্তু। শ্যামলী দিদি আমার শিক্ষা ভালই পেয়েছে। জন্ম মৃত্যু বিয়ে এ ত ভবিতব্য। এর উপর মানুষের হাত কোথায়?

জ্যাঠামশাই! বিজ্ঞান আজ ভবিতব্যকে হারিয়েছে। জন্মকে ঠেকিয়েছে, মৃত্যুকে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত রোধ করেছে। আর বিয়ে, বিয়ে ত আজ কোন সমস্যাই নয়। যে কোন বয়সে, যে কোন জাতে অবসর সময়ে করলেই হ'ল, না করলেও বিশেষ ক্ষোভ নেই, তা কি ছেলের বেলা, কি মেয়ের বেলা।

জগদীশবাবু বিড় বিড় করে বলতে থাকেন,—বিজ্ঞান অনেক কিছু করেছে ঠিকই, তবু নিয়তি আছেই, এরা ভাবে, সবই বুঝি ইচ্ছে করলেই করা যায়, ওরে তা যায় না। জাতই কি উঠেছে? এক জাত গিয়ে আরেক জাতের উত্থান হচ্ছে। চাটার্জ্জি, চক্রবর্ত্তী বোস-এর ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে, তেমনি আবার কেরাণী ইঞ্জিনিয়ার মাষ্টারে বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

অসিত সমর্থন করে,—সে কথা সত্যি। টাকা না হলে মানুষের কোন মূল্যই নেই। আমি একটি ব্রিলিয়ান্ট ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, এবার নন্দাকেও পাঠাব। ওরা তৈরি হয়ে এলে ওদের বিয়ে দেব।

তোমার টাকা আছে তাই তুমি খুসীমত জামাই তৈরি করে নিতে পারছ। আমাদের ত তা হবার জো নেই।

আসল কথা কি জানিস, আকাঙ্ক্ষাটা বড় রাখতে হয়, তার পর সেই ভাবেই সব গড়ে উঠে। আমি ইচ্ছে করেই কোন বড়লোকের তৈরি ছেলে মনোনীত করি নি। একে আমি পড়িয়ে আসছি তাই আমার মেয়ের উপর এ কখনও খারাপ ব্যবহার করবে না, তা ছাড়া আমার প্রতিও যথেষ্ট টান থাকবে। তাই না?

অশোক কেমন জানি চুপসে যায়, শুষ্ক মুখে বলে,—তোমার আজ অনেক কিছুই হাতের নাগালে।

অসিত উঠতে গেলে কমলা বাধা দেয়,—না খেয়ে কোথায় যাবেন?

অশোক বলে,—তোমার সাহস ত কম নয়! কমলা! অসিতকে কি তুমি শাক-শুক্ত দিয়ে ভাত খাওয়াবে?

অসিত ব্যস্ত হয়,—কি বলছিস! দিন বৌদি, আমায় খেতে দিন।

কমলা ঘরের মেঝে পরিষ্কার করে জল ছিটিয়ে জায়গা মুছে নেয়, তার পর পরিপাটি করে ভাত শাক ভাজা ডাল মাছ টক তরকারী দিয়ে খেতে দেয়। শ্যামলী একখানা পাখা নিয়ে হাওয়া করে, কমলাও কাছে বসে; এটা খান সেটা খান বলে একটু দুধ দেয়।

অসিত পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে বলে,—অনেক দিন পরে মনে হ'ল যেন মার হাতে খেলাম। মা আমায় এমনি যত্ন করে খাওয়াতেন।

তার পর আঁচিয়ে আসতেই মশলা সংযুক্ত পান, তোষকের উপর পাটি পেতে ভিজে গামছায় মুছে বিশ্রাম করতে দেয়। একটা কাপে একটু জলে কয়েকটা বেলফুল ভাসে। তার মিষ্টি সৌরভে সমস্ত ঘরখানা ভরে ওঠে।

অসিত বলে,—তুই যে রাজাধিরাজ হয়ে আছিস।

তারও বেশী—

সত্যি ভাই, কি যত্নটাই পাচ্ছিস।

আর আমাদের আছে কি? আগে ছিলাম আমরা মধ্যবিত্ত, এখন হয়েছি শূন্যবিত্ত। এই শূন্যতাকে ঢাকতে গিয়ে আমরা প্রাণান্ত হচ্ছি। এদের এই স্নেহ-যত্নটুকুই ত আমাদের একমাত্র সম্বল।

এ সামান্য জিনিস নয় ভাই, এ মহার্ঘ্য! বলে অসিত বিদায় নেয়।

দু'একদিন অসিত গাড়ী পাঠিয়ে কমলাদের নিয়ে গেছে; সেদিনও গাড়ী পাঠিয়েছে। কমলাকে নিয়ে অশোক যেতেই অসিত বলে—ওরে দিলীপ এসেছে, এখন আর নন্দাকে পাঠান হ'ল না, তা না হোক বিয়ের পর দু'জনে যাবে। নন্দাকে বললাম চল, বম্বে থেকে ওকে নিয়ে আসি। নন্দা কি জবাব দিলে জানিস? দিলীপ বাবু আসছে তা আমরা বোম্বে যাব কেন? শোন কথা। আমরা যাব না ত কে যাবে। আসল কথা কি জানিস, মেয়েদের সেই চিরন্তন লজ্জা।

দিলীপ এসেই একটা ভাল চাল পেয়েছে ষ্টার্টিং পাঁচ শ', তার পর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাই ভাবছি আর দেরী করে লাভ কি? শুভ কাজ চুকিয়ে ফেলাই ভাল।

কমলা বলে,—সে ত ভাল কথা।

কথা ত ভাল, কিন্তু নন্দাটাই গোলমাল করছে। বলে, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করব না। তুমি আমায় একটা কাজ দাও। শোন মেয়ের কথা, তুই চাকরী করতে যাবি কোন দুঃখে? তোর বাবাকে কি এতই অক্ষম মনে করিস? আমায় কি বলে জানিস, বলে, দিলীপ বাবুকে পড়িয়ে এনেছ বেশ ভাল কথা, তাকে জামাই করলে আর পরের উপকার কি করলে? মেয়েটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে, এত দিন পরে দিলীপ এল, ওর সঙ্গে গল্প করা, বেড়ান এ সব মোটে ও করে না। এ সব লেখাপড়া-জানা মেয়েদের এতটা লজ্জাও বেমানান লাগে। তাই তোদের আসতে বলেছি, তোরা যদি ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করতে পারিস।

নন্দা কোথায়?

এই ত কোথায় যেন গেল।

এ জন্য চিন্তা কর না। বিয়ের আগে বেশী মেলামেশার দরকার কি? আমার এটা ভালই লাগে। তুমি সব ব্যবস্থা করে ফেল।

ওরা জলযোগ করে বিদায় নেয়।

ক'দিন আর অসিতের পাত্তা নেই।

শনিবার স্কুল থেকে বেরিয়েই দেখে, অসিত গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে।

অসিতের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে অশোক, একি চেহারা, চুল-গুলি অবিন্যস্ত রুক্ষ, চোখের কোণে কালি, বয়েস যেন কয়েক বছর বেড়ে গিয়েছে! অশোক বলে ওঠে, একি, তোর কি অসুখ করেছে?

অসিত হাসির প্রহসন করে।—অসুখ? হ্যাঁ, আমার ভীষণ অসুখ, এমন অসুখ যে হতে পারে তা ত কখনও কল্পনাও করিনি। বলে আউটরাম ঘাটের কাছে গাড়ী রেখে ওরা গিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে জেটিতে গঙ্গার উপর বসে।

অশোক তাড়াতাড়ি অসিতের গায়ে হাত দেয়।

ওরে! অসুখ শরীরে নয়, মনে। নন্দা চিরকালের জন্য আমার সুখ হরণ করে নিয়েছে।

নন্দা! নন্দা কি এমন করতে পারে যার জন্য তুমি এত দুঃখিত হয়েছ, এমন মুষড়ে পড়ছ? না হয় বিয়েটা কিছু দিন পরেই করবে।

ওরে থাম, থাম—নন্দা আমার শ্রাদ্ধ করে ফেলেছে; আর কিছু বাকী রাখেনি। গোপনে এক নীচু বংশের একটা বাজে ছেলেকে বিয়ে করেছে। ভেবেছিল চাকরী নিয়ে তার পর আমাদের জানাবে। দিলীপের সঙ্গে বিয়ে দেবার তাড়া দেখে আর গোপন রাখতে পারে নি। উঃ অশোক! কি করে নন্দা এমন কাজ করতে পারে? ওর জন্য যে আমি হীরে যোগাড় করে রেখেছিলাম, কোন্ দুঃখে ও কাচ বেছে নিলে?

ছেলেটি কি করে?

সে কথা আর আমায় জিজ্ঞেস করিস না। তার পরিচয় কোন মতেই লোকের কাছে দেবার নয়। ম্যাট্রিক পাশ, সিনেমার ক্যামেরাম্যান। আমি যখন ওর কুৎসিত রুচির জন্য গালি দি তখন কি বলে জানিস? ডিগ্রী আর চাকরীই কি মানুষের সব পরিচয়? বাইরে থেকে মানুষের কি বিচার হয়?

আমি খুব ধমকে উঠেছি, বলেছি—বুঝলাম আমি ওর দেবত্ব দেখতে পারছিনে? তুই বল কি দেখেছিস ওর ভেতর, কিসের জন্য তুই দিলীপের মত ছেলেকে ফেলে বিয়ে করতে গেলি ওকে?

সে তুমি বুঝবে না বাবা, আমি তোমায় বোঝাতে পারব না। সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড ওই বিরাট সাম্রাজ্য ছেড়ে দিয়ে তার বদলে কি পেয়েছেন সে কি তোমরা বুঝবে?'

আমি বলেছি, তোর তত্ত্ব কথা আর শুনতে চাইনে। এখন আমি দিলীপকে কি বলি?

নন্দা তার কি জবাব দিলে জানিস? দিলীপ বাবু খুসীই হবেন, কৃতজ্ঞতার ফাঁস গলায় পরে তাকে সারা জীবন ঘুরতে হবে না। তিনি তাঁর পছন্দ মত মেয়ে বিয়ে করতে পারবেন।

অশোক! এ শোক যে আমি সইতে পারছি না।

সময়ে সবই সইবে ভাই। এখন কতগুলি দিন অসহনীয়ই মনে হবে। কি করবে? যেটার কিছু করণীয় নাই সেটা সহ্য না করে আর উপায় কি?

সেদিন বহু কষ্টে অসিতকে বাড়ী নিয়ে আসে অশোক। তার পর অনেক দিনই স্কুলে যাবার সময় শ্যামলীকে অসিতের বাসায় দিয়ে যায়। যদি ওদের দুঃখ এ'টুও লাঘব হয়।

অশোক যখনই যায় সখেদে বলতে থাকে নন্দার কথা, নন্দার বিয়েতে কি যৌতুক দেবে বলে রেখেছিল। ঘরের জন্য কি কেনা হয়েছিল। আর আক্ষেপ দিলীপের জন্য ওর মুখের দিকে চাওয়া যায় না। দিলীপ অসিতের জন্য প্রচুর এটা সেটা নিয়ে আসে। কিন্তু বিয়ে আর কিছুতেই করতে রাজী হয় না।

অসিত বলে,—আমি যে অপরাধী হয়ে রইলাম অশোক।

তবু সময় সান্ত্বনার প্রলেপ বুলোয়। এখন অন্য কথাও আলোচনা করে। নন্দা সেই যে গিয়েছে আর ফেরেনি। অসিতও কোন খোঁজ খবর নেয়নি। অসিতের গৃহিণী চুপে চুপে খবর সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছে। দু'বছর হয়ে গেল—কত দিন আর রাগ থাকে? তা ছাড়া মেয়ে ত আর সত্যি ফেলে দেওয়া যায় না! কিন্তু সে কথা অসিতকে বলবে কে? মায়ের মন তাই হাহাকার করে কেঁদে মরে।

অশোক গিয়েছিল শ্যামলীর জন্য সম্বন্ধের খোঁজে। পাত্রপক্ষের বিরাট দাবী মেটাবার সাধ্য অশোকের নেই। শ্যামলী অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হাতে বাবাকে হাওয়া করছে. জগদীশ বাবু ছেলেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে,—ওরে যেখানে আমার দিদির বর ভগবান ঠিক করে রেখেছেন, সেখানে গেলে ত কথায় বনবে। তোরা ব্যস্ত হোসনে, সুময় হলেই হবে।

অশোক বলে ওঠে,—তোমার দিদির বর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। যে…

অশোক আছিস,—বলে ঝড়ের বেগে অসিত ঘরে ঢুকেই বলে ওঠে,—দিলীপ রাজী হয়েছে।

কি রাজী হয়েছে?

আমি বলেছিলাম, দিলীপ, বাবা তুমি আমায় আর অপরাধী করে রেখ না, বিয়ে কর।

বিয়ে করলে আপনি সুখী হবেন, বললে আমায়।

'হব না? নিশ্চয় হব। আমার মাথার উপর থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে যাবে।

বেশ, তবে ঠিক করুন।

'আমি আর কোথা থেকে করব বাবা? সে সৌভাগ্য আমার হ'ল কৈ?

আপনার জানা কোন মেয়ে দেখুন।

আমার তোমার উপযুক্ত কোন মেয়ে জানা নেই।

কি রকম?

শিক্ষিতা বলা চলে এমন মেয়ে ত দেখছিনে।

ডিগ্রীর মোহ আমার আর নেই, একটি গৃহস্থালীর উপযোগী মেয়েই আমায় দেখে দিন। প্রয়োজন মত তাকে আমি তৈরী করে নিতে পারব।

তবু আমার মাথায় ধরে না, আমি চারদিক হাতড়াতে থাকি, তোর বৌদিই আমায় বাঁচালে, বললে, শ্যামলীকে তুমি নাও বাবা, ও ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, ও তোমায় নিশ্চয় সুখী করবে।

দিলীপ জবাব দেয়, 'আপনাদের আদেশ আমি অমান্য করব না।

বৌদিকে ডাক শাঁখ বাজা, মিষ্টি আন। আঃ শ্যামলী মা আমার এত ভাগ্যবতী! বিয়ের যৌতুক কিন্তু সব আমি দেব, তা আগেই তোকে বলে রাখছি।

জগদীশবাবু বলে ওঠেন—

হরি নারায়ণ! 'তুমি কর তোমার লীলা,
আমার প্রাণে লাগে ডর।'
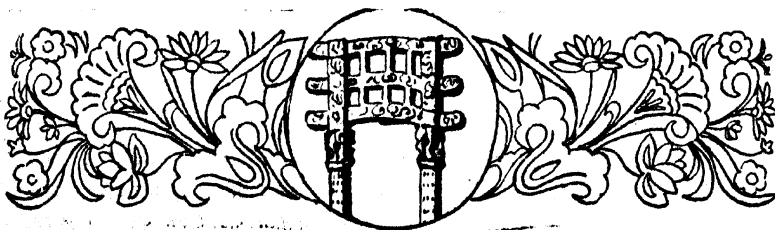
ইউরোপ দেখে এলাম

শ্রীপৃথ্বীশ মজুমদার

পালাম ছাড়িয়ে বোম্বাই সান্তাক্রুজ এয়ার পোর্ট। 'কাষ্টমসে'র বেড়াজাল পুলিস শান্ত্রী আর নানান নিয়মকানুন মেনে প্লেন ছাড়ল প্রায় রাত্রি একটায়। ঘুম যখন ভাঙল, তখন এসে পৌঁছেছি সেই দেশে, যেখানে ধীরে বহে নীল। কায়রোতে পৌঁছতে চলেছি আমরা। হাত মুখ ধুয়ে এসে বসতেই শুনলাম রেডিওতে এয়ার হষ্টেস বলছে, "Good morning ladies and gentlemen, we are about to reach Cairo, we shall now serve you in the plane continental Break-fast, you will get your usual Break-fast at Cairo. Thank you."

কায়রোতে প্লেন নামল বেলা আটটায়। চমৎকার রোদ উঠেছে চারদিকে। বেশ বড় 'এরোড্রোম'। চারদিকে দেখি কালো কালো চেহারা লম্বা ঝাল-খেলা পরে, মাথায় লাল ফেজ টুপী পরে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো মানুষ। মনে হ'ল এশিয়ার উদীয়মান নির্ভীক নেতা কর্ণেল নাসেরের পদ-রেখায় কতবার এই এয়ার পোর্ট চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর অনেক অনেক রক্তক্ষয় আর প্রাণদানের মহিমায় সমুজ্জ্বল এই মিশর দেশ। আর তার প্রাণকেন্দ্র এই কায়রো। সাধারণ ভারতীয় হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যের এই জাগ্রত নগর কায়রো আমার মনে গেঁথে রইল। বেলা ন'টায় প্লেনের জানালায় কায়রো এরোড্রোম শেষবারের মত দেখে নিলাম সেদিন।

কায়রো ছেড়ে রোম। দুপুরের সূর্য্য মাথার উপর আগুন ছড়িয়েছে। কিন্তু রোম এরোড্রোমে পৌঁছে সত্যি মুগ্ধ হলাম। এত চমৎকার এরোড্রোম। এই ইটালী—পৃথিবীর সৌন্দর্য্যবাদীদের স্বপ্নের দেশ রোম। রোম মানব-সভ্যতার পীঠস্থান। আশ্চর্য্য সুন্দর আর নিখুঁত এখানকার মানুষের রুচি-বোধ। সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবি কি কারখানার বুদ্ধিজীবি, প্রত্যেকেই রুচিবান। উল্লেখযোগ্য এদের পরিচ্ছন্নতা। সত্যি এই পরিচ্ছন্নতা আমার ভাল লাগল।

তার পর আবার আকাশ-বিহার। এবার আর নীচে ঊষর মরু-মৃত্তিকা নয়, সাগর-কল্লোলও নয়, শুধুই পাহাড়। আলপসের উপর দিয়ে চলেছি আমরা। ভয় হ'ল এই বুঝি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে প্লেনটা। কিন্তু না। বেশ কিছু উপরে উঠে গেল প্লেনটা। ক্রমেই উঁচুতে উঠল এবং মনে হ'ল শেষ পর্য্যন্ত পঁচিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি সূর্য্য তখনও ডোবে নি, আমরা নামলাম ডুসেলডর্ফে।

ডুসেলডর্ফ এয়ার পোর্ট ত' নয় যেন স্বর্গোদ্যান। চারদিকে শুধু ফুল। জার্ম্মান রুচির পরিচয় ডুসেলডর্ফেই প্রচুর। এয়ার পোর্টে যথারীতি কাষ্টমসের পাহারায় বেড়াজাল ডিঙিয়ে বাইরে এসে দেখি আমার এক জার্ম্মান বন্ধু অপেক্ষা করছেন। মালপত্র নিয়ে তাঁর গাড়ী করে এলাম এক হোটেলে। এয়ার পোর্ট থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে এই হোটেল। 'Breideu Barcherhop' এর নাম। সারা ঘরে ব্যালকনিতে, পুরু পুরু দামী কার্পেট বিছানো। আমার ঘরখানার সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। এত চমৎকার সাজানো যে, আমাদের ধনীদের গৃহেও ঐ বাথরুম বিরল। আমার ঘরে একটি ও বাথরুমে একটি, মোট দুটি টেলিফোন ছিল। এই হোটেলের খরচা শুধু থাকা ও প্রাতরাশের জন্য আমাদের দেশের হিসাবে ৩৬৲ টাকা। হোটেল থেকেই সাবান তোয়ালে চিরুণী সব দেয়।

ডুসেলডর্ফ শহরটা চমৎকার। সবই নূতন করে সেজেছে। চার-পাঁচ বৎসর আগে গেলে এমন সব রাস্তাঘাট ছিল যেখানে চলা যেত না। গত যুদ্ধে ভয়ঙ্কর ভাবে বোমা বিধ্বস্ত হয়ে শুধু শ্মশান আর ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিল। কোন চিহ্ন ছিল না। ডুসেলডর্ফ হামবুর্গ, বার্লিন আর ফ্রাঙ্কফ্রার্ট যেন গত বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজও। নূতন ঘর-বাড়ী যা তৈরি হচ্ছে সবই আমেরিকান কায়দায়। বড় বড় বাড়ী। প্রচুর খোলা মেলা। বিরাট বিরাট দোকান। বিরাট বিরাট শো-কেস। এত যত্ন আর সুন্দর ভাবে সাজান যে দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। রাত্রে এই সব শো-কেসের পাশে জমাট ভীড়। মনে হয় যেন ওরা রাত্রে জিনিস পছন্দ করে আর দিনে কিনে। রেস্তোরা হোটেল ছাড়া আর সব দোকান বিকাল পাঁচটায় বন্ধ।

আর একদিন শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। প্রথম গেলাম রাইন নদীর ধারে। রাইনের পাশে দাঁড়িয়ে নদীর কল্লোল আর স্রোতোচ্ছ্বাস যেন সমস্ত জার্ম্মান জাতির প্রাণস্পন্দন হয়ে আমার কাছে ধ্বনিত হ'ল। মনে হ'ল আমাদের গঙ্গা, ওদের রাইন। রাইনের পাশেই এক মনোরম আধুনিক রেস্তোরা। ঐ রেস্তোরায় এক পেয়ালা কফির দাম ডি-এম-টু। অর্থাৎ আমাদের ২·২৫ নয়া পয়সার মত। সুতরাং সেলামি দিয়ে আসতে হ'ল। সেদিন আমার সঙ্গে দু'জন জাপানী ভদ্রলোক ছিলেন। আমরা তিন জনেই চলে এলাম আর এক রেস্তোরায়—এক জার্ম্মান ভদ্রলোকের গাড়ীতে। গাড়ীটা হচ্ছে 'ভক্সওয়াগন।' জার্ম্মানদের প্রায় প্রত্যেকেরই এই গাড়ী। দাম প্রায় ৪,৫০০ টাকা। চলে খুব এবং এক গ্যালনে বাট মাইল যায়। হিটলারের নাকি ইচ্ছা

ছিল যে, এর দাম হবে ২,০০০ টাকা এবং প্রত্যেক জার্মানের এই গাড়ী একটা করে থাকবে।

রেস্তোরাঁয় আমরা খেলাম মাছ ভাজা আর ডিম ভাজা। জার্মান ভদ্রলোক কিছু খেলেন না।

আমাদের পাশে বসে একটি জার্মান তরুণী খাওয়ার পর সিগারেট ফুঁকছিল। শুধু বসে আছে দেখে জার্মান ভদ্রলোকটি ওকে আমাদের সঙ্গে তাঁর বাড়ী যেতে বললেন। আশ্চর্য্য, চেনা-পরিচয় নেই। তবুও মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হ'ল। আমরা অর্থাৎ আমি, ঐ দুই জাপানী ভদ্রলোক ও তরুণীটি সবাই গেলাম জার্মান ভদ্রলোকটির বাড়ীতে। বেশ দূরে। ওর বাড়ী পৌঁছেই জাপানীদের মধ্যে একজন বললেন, ক্যামেরাটা রেস্তোরাঁয় ফেলে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ভদ্রলোকটি টেলিফোন করলেন। জাপানী ভদ্রলোকটি একটি ট্যাক্সি করে গিয়ে কিছুক্ষণ পরেই ক্যামেরাটা নিয়ে ফিরে এলেন। ওদের কেউ ইংরেজী জানে না। জাপানী ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন জার্মান জানতেন। জার্মান তরুণীটি জানত ইংরেজী। সুতরাং এদের দু'জনের সাহায্যে আমাদের কথাবার্ত্তা ও হাসি-গল্প চলতে লাগল। তিন-চার ঘণ্টা ওখানে থেকে কেক-বিস্কুট, কফি প্রভৃতি খেয়ে জার্মান-জাপান-ইণ্ডিয়ান সব ভাই ভাই বলে আলিঙ্গন জানিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। এ পৃথিবীতে ঝগড়া-বিবাদ আর হানাহানি আমরা কেউ চাই না।

জার্মান ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ঐ দিনই রাইন নদীর তীরে। আমরা ওকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে চেয়েছিলাম কাছাকাছি কোন ভাল রেস্তোরাঁ আছে কিনা। আমার অবাক লাগে ওদের সুন্দর ভদ্রতায়। শুধু রাস্তা বলে দেয় নি বাড়ীতে নিয়ে খাইয়েছে পর্য্যন্ত। আগেও এর প্রমাণ পেয়েছি। কোন বাড়ীর ঠিকানা চাইলে ওরা শুধু নির্দ্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হবে না, নির্দ্দিষ্ট বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবে। কলকারখানা থেকে হোটেল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পেয়েছি এই সৌজন্য-বোধ আর ভদ্রতার পরিচয়। হোটেলের টেলিফোন-মেয়েগুলোও কি ভদ্র। আমি জার্মান ভাষা জানি না ওরা তা জানে। কোন ঠিকানা চাইলেই আগে ফোন করে জেনে নিত যে তিনি ইংরেজী জানেন কিনা। না জানলে ওরা নিজেরাই দো-ভাষীর কাজ করে ওদের জবাব আমাকে জানাত।

ডুসেলডর্ফ ছেড়ে এলাম হামবুর্গ। বেশ মনে পড়ে রাত্রে পৌঁছেছিলাম। প্লেনে এক সুইডিশ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁর গাড়ী এরোড্রোমেই ছিল এবং তিনিই আমায় পৌঁছে দিয়েছিলেন হোটেলে। নাম 'হোটেল আতলান্তিক'। হামবুর্গ বুঝি তার বন্দরের গৌরবে গর্ব্বিত। যেমন এই শহর—তেমনি পথ-ঘাট। রাত্রে অপূর্ব্ব—শুধু আলো আর আলো। পথ-ঘাট ঝক-ঝকে তক-তকে। পোড়া 'সিগারেটে'র টুকরাও ফেলবে না কেউ পথে। আশ্চর্য্য! ইডেন গার্ডেন যদি হয় কলকাতার গৌরব ত হামবুর্গের বুঝি 'প্ল্যান্টেন এ্যাণ্ড ব্লুমেন'। শুধু ফুল আর ফুল। লেকও আছে, আর লেকের বুকে শতধারায় ফেটে পড়েছে রঙ-বেরঙের ফোয়ারা।

আমাদের এপারে কলকাতা ওপারে হাওড়া। ওপরে ঝুলমান হাওড়ার পুল। ওদের অবাক কাণ্ড। হামবুর্গের স্রোতোস্বিনী হ'ল আলষ্টার নদী। এ নদীর দুই তীরে সেতু বন্ধন হয়েছে ওপরে নয়, জলের নীচে। সেতুতে নয় পথে। সে পথে গাড়ী চলে। হামবুর্গ বন্দরেই একদিন দেখলাম ভারতীয় জাহাজ 'জলবিষ্ণু' নোঙর করে আছে। মাস্তুলে অশোকচক্র শোভিত ঐ ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তির বাণী পৃথিবীর দেশে দেশে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এত আনন্দ হয়েছিল সেদিন।

হামবুর্গে একরাত্রে নৈশ-ভোজনে বসেছি, সামনে খাদ্য-তালিকা ধরল। একশ নামের তালিকা রয়েছে, কিছুই বুঝি না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'মাছ আছে?'

বলল, হ্যাঁ, লবষ্টার। খুশি হলাম, চিংড়ী খাওয়া যাবে ভেবে, খেলামও। কিন্তু তার পর দাম শুনে অবাক হয়ে গেলাম, শুধু একটা চিংড়ী, দাম ধরেছে আমাদের হিসাবে প্রায় ছত্রিশ টাকা।

পনেরই আগষ্ট হামবুর্গ ছেড়ে এলাম বার্লিনে। আবার আকাশ-ভ্রমণ। এবার প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজে। বার্লিনে আমাদের প্লেনটা একটা শেডের মধ্যে ঢুকে গেল। রেলগাড়ী যেমন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। পৃথিবীর মধ্যে বেরিয়ে এক বার্লিনেই এরকম ব্যবস্থা আছে।

বিরাট এরোড্রোম, বিরাট আয়োজন। আমি যখন মালপত্র ছাড় করিয়ে নিচ্ছি তখন পেছনে দেখি একটি দেশী মুখ, দেখে আনন্দ হ'ল। এত দূরে এই বিদেশে ভারতবাসী দেখে আনন্দ হ'ল। তিনি এবং এক জার্মান মহিলা আমায় নিতে এসেছেন। বার্লিনে কোন কুলির ব্যবস্থা নেই। সুতরাং নিজের মালপত্র নিজেকেই বইতে হ'ল। মালপত্র নিয়ে চলেছি, একজন ফটোগ্রাফার এলে আমাদের ছবি তুলতে চাইল এবং অনুমতি পাওয়া মাত্র ছবি তুলল। ওখান থেকে এলাম হোটেল 'কেম্পিন্‌স্কিতে।' চমৎকার এই হোটেলটি। যত জায়গায় গিয়েছি, এই হোটেলটি আমার কাছে সব চেয়ে ভাল লেগেছে। চমৎকার প্রশস্ত ঘর, রেডিও, টেলিফোন, সঙ্গে লাগোয়া স্নানঘর। বার্লিনের নাকি শ্রেষ্ঠ হোটেল এটি।

জার্মানরা সাধারণতঃ পশ্চিম থেকে পূবে যায় না। তবে যেতে কোন বাধা নেই। আসলে পূর্ব্ব-বার্লিনই হ'ল বার্লিনের প্রাণকেন্দ্র এবং ওখানেই হিটলারের চ্যান্সেলারী ইত্যাদি। একদিন চলেছি ট্যাক্সিতে। পূর্ব্ব-বার্লিনের সীমান্তে বড় বড় থামওয়ালা দরজা। আমি যেতেই রাশিয়ান পুলিস ড্রাইভারকে জার্মান ভাষায় কি যেন বলল, তার পর আমাকে ছেড়ে দিল। আমিও চলে এলাম। কিন্তু দেখে সমস্ত মন ভারী হয়ে উঠল, চার দিকে শুধু ধ্বংসস্তূপ, যেন শ্মশান। বাড়ী, ঘর, প্রাসাদ, মিনার যা ছিল, সব যেন ধূলোয় মিশেছে। আমাদের পুরানো কেল্লা আর পুরানো

শিল্পীর মত যেন অনেকটা। মাঝে মাঝে দু'একখানা ঘর তৈরী হয়েছে—তাতে ছোট ছোট দু একখানা দোকান ঘর, দোকানে জিনিস নেই বললেই চলে। ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছদ জীর্ণ, চেহারাও তাই, দেখলে দুঃখ হয়। কে বলবে যে এটা বার্লিন শহর। একশ গজ দূরেই পশ্চিম-বার্লিন, সেখানে সমস্ত শহর যেন উপচে পড়েছে আনন্দে, চারদিকে প্রাচুর্য্য, আর এখানে সব নিষ্প্রভ, ম্রিয়মান। হিটলার, গোয়েরিং, ডাঃ গোয়েবলসের বাড়ী দেখলাম, বাড়ী নয় যেন ভগ্নাবশেষ। এ শতাব্দীর অন্যতম স্মরণীয় ঐ রাষ্ট্রনেতার বাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল হিটলার কি কোন দিন ভেবেছিলেন যে, যুদ্ধ একদিন থামবে আর তার পরিণতি হবে এই দ্বিধা-বিভক্ত জার্মানীর ভঙ্গুর সমাজজীবন। আমার জার্মান বন্ধু এবং দু'তিন জন ভারতীয়, যাঁরা ওখানে ত্রিশ বছর রয়েছেন এবং জার্মান মেয়ে বিয়ে করেছেন তাদের মুখে শুনেছি যে জার্মান বিজয়ের পর তিন মাস পর্য্যন্ত বার্লিনে রাশিয়ানরা অন্য কোন জাতিকে ঢুকতে দেয় নি। এই তিন মাসের মধ্যে বার্লিনের সমস্ত যন্ত্রপাতি তারা সরিয়ে ফেলেছে এবং নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে অসভ্য ভাবে অত্যাচার করেছে। সে কথা মনে হলে ওরা এখনও শিউরে ওঠে। ইংরেজ ও আমেরিকানরা তিন মাস পর ঢুকতে পেরেছে। সেই ভারতীয় বন্ধুদের মুখে শুনেছি যে, হিটলারের সময়ে কোন কোন উচ্চ-শ্রেণীর রেস্তোরায় প্রত্যেক টেবিলে টেবিলে দুইটি টেলিফোনের ব্যবস্থা ছিল এবং এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে কথা বলা যেত। এখন অবশ্য সে সব কিছুই নেই। বার্লিনের সব চেয়ে বড় কারখানা হচ্ছে Siemens-এর। এখানে প্রায় এক লক্ষ লোক কাজ করে, একটা বিরাট শহর যেন। বার্লিন আজও ভুলিনি।

বার্লিন থেকে যাই কোপেনহেগেনে। এখানে একটা কলেজ হোটেলে থাকতে হয়েছিল আমায়। স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান দেশগুলি গ্রীষ্মকালে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলিকে হোটেলে রূপান্তরিত করে এবং কলেজের ছেলেমেয়েরাই সেই সব হোটেল চালায়। ওদের ওখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। শুধু থাকা আর প্রাতরাশের ব্যবস্থা রয়েছে। সবই নিখুঁত আর চমৎকার। এ ব্যবসা থেকে ওরা টাকা পায় প্রচুর এবং তা কলেজের হিসাবে জমা হয়। আমি উঠেছিলাম হোটেল-এগমণ্ডে। একজনের থাকবার মত ঘর। সঙ্গে বাথরুম। আসবাবপত্রের কোন বাহার নেই। খুবই সাধারণ। কোপেনহেগেন শহরটাও বেশ সুন্দর, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, কিন্তু গরীব দেশ। সাইকেল চলে রাস্তায় রাস্তায়, অবিরাম চলে। কোপেনহেগেনে একটি চমৎকার বাগান রয়েছে, নাম টিভোলী। ওরা বলে হামবুর্গের 'প্লান্টেন এ্যাণ্ড ব্লুমেনে'র চেয়ে টিভোলী অনেক ভাল। আবার হামবুর্গের লোকেরা বিপরীত বলে। দুটিই ভাল। টিভোলীতে রাত্রে বাতি দিয়ে চমৎকার করে সাজায়।

কোপেনহেগেন থেকে যাই ষ্টকহোমে। পাহাড়ে জায়গা, চমৎকার শহর, তবে খরচ একটু বেশি। এখানে শ্রমিকেরা মাসে প্রায় এক হাজার টাকা করে পায়। বেশীর ভাগ লোকই গাড়ী ক'রে অফিসে যাসে।

ষ্টকহোম থেকে এলাম আর্ম্মসষ্টাডম শহরে। সমুদ্রের নীচে এ শহর যেন ফুল দিয়ে ঢাকা। এখানে প্রবাদ আছে যে, যত লোক তার চেয়ে সাইকেল বেশী। শহরের ভেতর দিয়ে এখানে ওখানে খাল বয়ে গেছে। এপারে ওপারে সেতু বন্ধন করেছে পোল। আর এই খালগুলির চার পাশে সব ফুলের দোকান। রাত্রে অপূর্ব্ব। 'আর্ম্মসষ্টারডম' থেকে ব্রাসেলস—তারপর এয়ার সানবলাতে লণ্ডন। অপূর্ব্ব সুন্দর লণ্ডনের 'এরোড্রোম'। নতুন নতুন ঘর-বাড়ী তৈরী হচ্ছে। শহর থেকে প্রায় বাইশ মাইল দূরে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল পেয়েছিলাম। কেন জানি না লণ্ডন আমার ভাল লাগে নি। বড় ঘিঞ্জি শহর। আমাদের যেন আজকাল দেখতেই পারে না। আমার মনে হয় যারা 'কন্টিনেণ্ট' হয়ে লণ্ডনে যায় তাদের কাছে ও শহর ভাল লাগবে না। লণ্ডন থেকে গিয়েছিলাম ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে। ভয়ঙ্কর নোঙরা জায়গা। তারচেয়ে বোধহয় আমাদের কাণপুর শহর অনেক ভাল। লণ্ডন সম্বন্ধে একটা কথা না বলে পারছি না। লণ্ডনের ট্যাক্সির ব্যবস্থা সত্যি প্রশংসনীয়। ট্যাক্সিতে উঠতেই চালক গন্তব্য পথ জানতে চাইবে। প্রতি ট্যাক্সিতে বেতারের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ভাড়া নিয়ে বকশিশ চাইবে। না দিলেই অসন্তুষ্ট। দিতেই হবে। লণ্ডন সম্বন্ধে আরও কিছু বলার আছে। বিশেষতঃ ওদের রেল ষ্টেশনের। আমি যেদিন 'ম্যাঞ্চেষ্টার' যাই, সেদিন 'ইউষ্টন' ষ্টেশন থেকে আমাকে গাড়ী ধরতে হয়েছিল। ষ্টেশনের চেহারা অতি পুরাতন, জীর্ণ আর কালিমাখা। বাথরুমে গিয়েছিলাম। যেতেই আমার অন্নপ্রাশনের ভাত ঘুলিয়ে উঠল। আমাদের দেশের যে কোন ছোট ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম ঘরও এত বাজে আর নোংড়া নয়। আশ্চর্য্য, কোন ভারতীয় লণ্ডন ঘুরে এসে একথা কখনও স্বীকার করেন না। কি তাঁদের মোহ জানি না। আর একটা কথা। ওরা এখন আমাদের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। তবে ওদেশেও ভাল লোক যে নেই তা নয়। বেশীর ভাগ লোকই আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট। আমি একদিন হোটেল থেকে বাইরে টেলিফোন করতে চেয়েছিলাম—আমার সঙ্গে খুব অভদ্র ব্যবহার করেছিল।

লণ্ডন থেকে এলাম প্যারীতে। কেতাদুরস্ত আভিজাত্যের গরিমা থেকে যেন স্বাভাবিক প্রাণ চঞ্চলতায়। খুব ভাল জায়গা, তবে মানুষগুলো যেন সুবিধের নহে। প্যারী যেন স্বপ্ন-পুরী। যেমন ঘর বাড়ী তেমনি পথঘাট। এমন সব রাস্তা রয়েছে যেখানে চৌদ্দ-পনেরোটা মটর এক সঙ্গে পাশাপাশি চলবে। প্যারীর রেস্তোরা আর কাফে যেন ওদের শিল্প-সংস্কৃতির—আর সাহিত্যের ধারক হয়ে রয়েছে যুগ-যুগ ধরে। রাত বারোটার পর থেকে ওদের রাস্তায় লোক চলাচল বৃদ্ধি পায়। আমরা তখন ঘুমাই। জল ওদেশে কেউ খায় না। শ্যাম্পেন খুবই সস্তা। আধুনিক

আমেরিকানদের কাছে প্যারী যেন স্বর্গ। একবার না ঘুরে গেলে এ জীবন যেন ব্যর্থ। কেনই বা হবে না। অজস্র নৈশ-ক্লাব আর রেস্তোরাঁ হোটেল।

আনন্দ আর উচ্ছলতায় রঙীন প্যারী থেকে এলাম ঘড়ি আর চকোলেটের দেশ সুইজারল্যাণ্ডে—জেনিভায়। উচ্ছলতার পরিবর্তে এখানে পেলাম স্থিতধী গাম্ভীর্য্য। এর আর এক কারণ হয়ত ঐ রাষ্ট্রসঙ্ঘের আধুনিক প্রাসাদ। হয় ত পৃথিবীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের এই পাদপীঠে উচ্ছলতা আর জীবনের বহিরঙ্গ রোমাঞ্চের স্থান সহজ লভ্য নয়। তাই সেখানে বিচারালয়ের গাম্ভীর্য্য স্বাভাবিক ভাবেই মানুষকে প্রভাবান্বিত করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাড়ীতে ঝোলান ঘূর্ণায়মান ঐ গ্লোব যেন পৃথিবীর প্রতিকৃতি। চিরচঞ্চল এই পৃথিবীর অনন্তকালের গতিশীলতার সার্থক প্রতীক।

জেনিভা থেকে জুরিখ। তার পর ট্রেনে এলাম মিলান শহরে। যেই ইতালীর সীমান্তে এলাম তখন ইতালীয়ান পুলিশ উঠে এল তল্লাস করতে। আমার তখন মনে হ'ল ভারত-পাকিস্থানের সীমান্ত। মিলানের কাছাকাছি এসে এগিয়ে হঠাৎ আমার মনে হ'ল এবার ত তা হলে ভারতবর্ষের কাছাকাছি এসেছি ছেঁড়া কাঁথা ঝুলছে, ভাঙা ভাঙা বাড়ী, নোঙরা কাপড়, ছেলেমেয়েগুলিও অপরিচ্ছন্ন। রেল লাইনের দু'পাশে বস্তি। দূরে দূরে আদিগন্ত মাঠ, হাল-গরুতে চাষ চলছে। জুরিখ থেকে মিলান যেতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সত্যি অপূর্ব্ব। মন আনন্দে, ভরে ওঠে। মিলান শহরটাও শিল্পকেন্দ্রিক, ষ্টেশনটাও বড়। এ যুগের অন্যতম জনপ্রিয় আমেরিকান লেখক আর্ণেষ্ট হেমিঙওয়ের লেখায় এই মিলান শহরের বহু এবং বিচিত্র বর্ণনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ছোট গল্প, 'ইন্ অ্যানাদার কান্‌ট্রি' ও উপন্যাস 'এ ফেয়ারওয়েল টু দি আর্ম্‌সে'র নাম করা যেতে পারে। এই মিলানতে প্রথম দেখলাম যে আমাদের দেশের মত লোক রাস্তায় কলে মুখ লাগিয়ে জল খাচ্ছে।

মিলান থেকে ফ্লোরেন্স, ফ্লোরেন্স থেকে রোম। রোম থেকে কায়রো। আমার দেশ দেখা প্রায় শেষ হয়ে এল। কায়রো থেকে ভারতবর্ষ। রাশিয়া ও আমেরিকা ছাড়া পশ্চিম গোলার্দ্ধ আমার দেখা শেষ হ'ল।

কিন্তু সব দেখে আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের তুলনা হয় না। আমাদের দেশের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত-ঘেরা এই মনোরম ঋতু-পরিক্রমা পৃথিবীর অন্য দেশে দুর্লভ। সবই রয়েছে আমাদের। বিরাট গণশক্তি, বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ। সমাজ-জীবনের দিকে দিকে ভারতীয়দের বুদ্ধিদীপ্ততা পৃথিবীর অন্য দেশে বিরল। এ কথা সত্য যে, কল-কারখানায়, শিল্প-প্রসারে আর জীবনধারণের মানে আমরা হয়ত আজ অনেকের সঙ্গে সমতুল্য নই, কিন্তু সে দোষ আমাদের নয়। সুদীর্ঘকাল পরাধীনতার যূপকাষ্ঠে মুমূর্ষু হয়ে উঠেছে এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। নতুন স্বাধীনতা-সূর্য্যের আলোয় আজ আমাদের দেশ ও জাতি উদ্ভাসিত। আমরাও আর দীর্ঘ দিন পিছিয়ে থাকব না।

জীবন ও মরণ

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

চারি দিকে মোর চেনা জগতের পরিচিত বেষ্টনী ;
চেনা সে আকাশ, চেনা সে বাতাস, বহু-শোনা সেই ধ্বনি।
দেখেছি তাদের স্থূল রূপ শুধু, দেখিনি অরূপ মায়া
গোপনে আপন মাধুরীধারায় ভরিছে বিশ্ব কায়া।
খালি চোখে-দেখা সে রূপলেখায় রেখা আঁকে নাই মনে ;
রূপের লীলায় আলো ও ছায়ায় খুঁজেছি ক্ষণে ক্ষণে
সেই অপরূপ নিভৃত উৎস উচ্ছিয়া যাহা হতে
কায়াময় এই রূপের বিলাস চলে অনাহত স্রোতে।
না-পাওয়ার সেই পরম বেদনা ঘুরে চেতনারে ঘিরে ;
খুঁজে মরে মন অরূপ রতন রূপসিন্ধুর তীরে !
সুর হতে স্বরে পৃথক্ করিয়া, মালা হতে ছিঁড়ে ফুল
অখণ্ড সেই রূপ-সুষমার করিয়াছি নির্মূল।
সুখ ভেবে যারে রাখি বুকে করে পলকে মিলায়ে যায় ;
ভোগ-শেষে শুধু জ্বালা জেগে থাকে, প্রাণ করে হায় হায় !
দূর দুর্গম পথের যাত্রী, রাত্রি ঘনায়ে আসে ;
মৃত্যু-লোকের তিমির-তোরণ হাতছানি দিয়ে হাসে !

জীবনে-মরণে, আলোকে-আঁধারে মিলায়ে দেখো তো চাহি ;
পূর্ণ রূপের বিরল মাধুরী বহিবে চেতনা বাহি'।
রহস্যঘন মৃত্যু-পাথারে সন্তরি' অবশেষে
অমৃত-লোকের অভয় মন্ত্র পঁহুছিবে প্রাণে এসে।
সব কামনার, ভোগ-বাসনার শেষ হবে সেথা গেলে ;
হরষ-খনির পরশমণির পরশ সেথায় মেলে !
অন্ন লইয়া এ কি ছেলেখেলা, বেলা যে অনেক হলো ;
বাজে পূরবীতে ভূমার বাঁশরী, ধ্যান-আঁখি তব খোলো।
ঐ হের দূরে যম-মন্দিরে চলিয়াছে নচিকেতা
বুকে বহি' কোন্ গূঢ় জিজ্ঞাসা প্রত্যয় দৃঢ়চেতা।
জীবনেরই মাঝে মরণে জানিবে—জিনিবে কঠিন পণ ;
প্রজ্ঞার বলে উন্মোচিবে সে মৃত্যুর গুণ্ঠন !
অনিকেত আমি ভব-নিকেতনে বৃথা খুঁজে মরি পথ ;
কহো, নচিকেতা, পথের বারতা পুরাও, হে মনোরথ।
দুষ্ট-অশ্ববাহিত এ মন শমন শঙ্কাভীত ;
লহো প্রগ্রহ, চালাও, সারথি প্রমাদ-প্রপথ চিত্ত !

আগামী কাল

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

কথাগুলো শেষ পর্য্যন্ত মনোযোগ দিয়েই শুনল অলক।

বললে, তোমার যে চাহিদা অনেক—

রুনু বললে, এর চেয়ে আমার অনেক বড় চাহিদাও এককালে তুমি মিটিয়েছ অলক।

অলক এক ঝলক হাসল। বললে, তখন যে তোমার সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না রুনু।

ভ্রূ উৎক্ষেপ করল রুনু—একটুখানি সিঁদুর আমাদের বন্ধুত্বকে আড়াল করেছে, বলতে চাও নাকি?

চোখের বিস্ফারে বিস্ময় এনে অলক বললে, বন্ধুত্ব বলছ কেন?

—আর কিছু বলা যায় না বলে।

—ওরকম বন্ধুত্বে আমি বিশ্বাসী নই। নিঃশেষিত সিগারেটটা এ্যাশ-ট্রেতে নিক্ষেপ করে প্রায় নির্দ্দ্বন্দ্বকণ্ঠে অলক বললে, আমার অভিধানে সোনার পাথরবাটি বলে কোন কথা নেই।

—তুমি কি আমাদের পূর্ব্ব পরিচয়কে অস্বীকার করতে চাও?

—পারলে খুশিই হতুম। অলক বলতে পারল, ওটা একটা পচা ঘায়ের মত। মনটাকে বিষাক্ত করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই ওর।

—কিন্তু আমার সঙ্গ ত কাম্য ছিল তোমার।

—ছিল। শান্তকণ্ঠেই বলল অলক,—কিন্তু বন্ধু হিসেবে ছিল না অন্ততঃ। সেদিনের সম্বন্ধটাকে তুমি সামাজিক ওড়নার তলায় চাপা দিতে চাইছ।

—কথার প্যাঁচে তুমি আমার বক্তব্যকে ঘুলিয়ে দিতে চাও অলক। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুনু।

—তুমি যে অনেকখানি আশা করে এসেছ রুনু,—অলক বললে, খালি হাতে এসেছ।

রুনু চুপ করেই রইল।

অলক, আবার বললে, মানুষ শুধু শুধু কাউকে কিছু দেয় না রুনু। কিছু পেতেও চায় বিনিময়ে।

—দেওয়ার মত আমার তো কিছুই নেই অলক?

—একদিন চেয়েছিলাম—চিবিয়ে চিবিয়ে আশ্চর্য্য শান্ত-কণ্ঠে বলল অলক,—কিন্তু সেদিন স্বীকৃতি দাও নি আমার সেই চাওয়াকে। আজ যদি তেমনি করেই চাই?

চেয়ার ঠেলে রুনু উঠে দাঁড়াল।

চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরাল অলক। বললে, কি হ'ল, উঠছ যে? জবাব দিলে না কথাটার?

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে রুনু তাকাল অলকের চোখে চোখে। বললে, জবাব পাবার মত প্রশ্ন করতে তুমি ভুলে গেছ অলক।

—কিন্তু তোমার স্বামীর চাকরী—

—লোভ দেখিও না অলক। কঠিনকণ্ঠে রুনু বললে, স্ত্রীর অসম্মানের বিনিময়ে কোন স্বামীই চাকরী চায় না।

—চাকরী সম্মানের চেয়ে বড় রুনু—

—মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় নয়।

হো হো করে হেসে উঠল অলক। বললে, মনুষ্যত্বে পেট ভরে না রুনু। চললে নাকি সত্যি সত্যি? শোন, শোন, বোস না আর একটু—

দরজার কাছে গিয়েও একবার থমকে দাঁড়াল রুনু।

বললে, মেয়েদের একটু সম্মান দেবার চেষ্টা কর অলক। পুরণো পরিচয়ের দাবীতে ওঁর চাকরীর জন্যে অনুরোধ করতে এসেছিলাম। তোমার ক্ষুধা মেটাতে নয়—

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে অলক এগিয়ে এল—তোমার স্বামী সেই বন্ধুত্বের খবরও রাখেন নাকি?

—রাখতে দোষের কিছু দেখি নে।

—সেই বন্ধুত্বে তিনি বিশ্বাস করেন, এই ধারণা নাকি তোমার? অলক বাঁকা হাসল।

এবার রুনুও হাসল। বললে স্মিতমুখে—ঐখানেই বিনয় ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে অলক গাঙ্গুলীর তফাৎ।

—তফাৎ সত্যিই আছে কিনা জানি নে। সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে অলক বললে, যদি থাকেই, বিনয়বাবু তা হলে নমস্য ব্যক্তি। তবে এটুকু জানি রুনু, কোন চরিত্রবান স্বামীই তাঁর স্ত্রীর প্রাক্-বিবাহ-বন্ধুত্বে বিশ্বাস করেন না পুরোপুরি—

—থাক, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমার লাভ নেই অলক। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল রুনু।

—তর্ক করবার মত সাহসই নেই যে। অলক প্রায় নিরর্থক হাসল,—তা বিনয়বাবুকে একবার পাঠিয়ে দিতে

পার আমার বাড়ীতে। পুরোদস্তুর একটা ইণ্টারভিউর জন্তে প্রস্তুত হয়েই আসতে বল। তোমার অনুরোধটার ঐটুকু দাম হয়ত এখনো দিতে পারি রুনু।

তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল রুনু। কথাটা শুনল কিনা বোঝা গেল না।

অলক তার চেয়ারে ফিরে এল আবার। সন্ধ-ধরানো সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল এ্যাশ-ট্রেতে। মাথার উপরে পূর্ণবেগে ঘূর্ণমান পাখাটার দিকে তাকিয়ে রিভলবিং চেয়ারটায় ঘুরপাক খেতে থাকল বসে বসে।

ভাবতে লাগল: পাঁচ বছর পরে এমন আবেদন নিয়ে কেন এল রুনু। কোন আশ্বাস সে খুঁজে পেল? একদিন হয়ত এমন করে এসে দাঁড়ানো অসম্ভব ছিল না। সেদিন রুনুর যে-কোন অনুরোধ রাখতে পারত অলক, সানন্দে, সাগ্রহে। পিছপা তো সে হয় নি কোন দিন। কিন্তু রুনুই আসে নি। মন-ভরা ব্যাকুল আহ্বান নিয়ে প্রতীক্ষাই করেছে অলক, কিন্তু বৃথা। অলক নয় শুধু, সুধীন দত্ত, রমেন্দ্র চাটুজ্যে, আরও কে—কে বলবে? কাউকেই ফেরায় নি রুনু, কিন্তু নিজেকে আড়াল করে রেখেছে একটি সুকঠিন বর্মের আড়ালে। একটি সীমারেখার সুস্পষ্ট নিষেধ দিয়ে। অলকের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা আহত হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু সে প্রত্যাখ্যানও এত মধুর যে, বিমুখ হয় নি মন। গুঞ্জন তুলে ফিরেছে অনুক্ষণ, স্বপ্নের জাল বুনেছে।

অথচ কি ছিল রুনুর?

মাথার উপরে কেরাণী দাদা। লেখাপড়া শেখেনি সুযোগের অভাবে। থাকবার মধ্যে ছিল উদ্ধত রূপ। যা পুরুষকে আকর্ষণ করত পতঙ্গের মত। সে রূপের তলায় ছিল জ্বলন্ত অঙ্গার—এগুলো অসম্ভব। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকা শুধু, কাছে এলে পুড়ে মরা ছাড়া গতি নেই। মনে হ'ল অলকের, অনেকখানি কাছে যাবার অধিকার পেয়েছিল বলেই আঘাতটা ওর এত বেশী।

অলকের অর্থ ছিল, রূপ ছিল, ছিল বিদ্যা-বুদ্ধি-যৌবন। কিন্তু সে-সব তো অবহেলায় ত্যাগ করল রুনু। কি পেল সে ঐ বিনয় ব্যানার্জ্জীর মধ্যে, কি দেখে ভুলল? কিছু না, কিছুই না। প্রেম কি এমনই অন্ধ। এমনি করেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিশ্চিত ধ্বংস জেনেও।

কিন্তু যে রুনু মাথা উঁচু করে সদর্পে অস্বীকার করেছিল অলককে, তার এ কোন্ পরিণতি? অলকের দরজাতেই এসে আবার কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে পারল রুনু? ওদের প্রেমের কি মৃত্যু ঘটেছে? একটা চাকরী মাত্র, আর কিছুই নয়। অনায়াসে দিয়ে দিতে পারে অলক, তার সে ক্ষমতা আছে। দেবেও। কিন্তু রুনুকে বাজিয়ে দেখবার প্রবল ইচ্ছেটা দমাতে পারল না সে।

অফিসের আবহাওয়াটাই খারাপ লাগছে। খটাখট্ টাইপের আওয়াজ, কেরাণীদের কলগুঞ্জন, চাপরাশী-বেয়ারার জুতোর আওয়াজ—সব মনে হচ্ছে কেমন একটা গোঙানির মত। বিরক্ত হয়ে কলিং-বেলটা বাজাল অলক।

উর্দ্দী-পরা চাপরাশী এসে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

—সেক্রেটারী-সাব—না তাকিয়েই অলক বললে।

ত্বরিতপদে এসে দাঁড়ালেন সেক্রেটারী। বললেন, আমায় ডেকেছেন স্যর?

—হ্যাঁ, বসুন মিঃ কাঞ্জিলাল। টেবিল থেকে কতকগুলি জরুরী ফাইল এগিয়ে দিয়ে অলক বললে, এগুলো দেখবেন। প্রয়োজন হলে এ্যাকশন নিয়ে নেবেন। আমি বেরুচ্ছি। শরীরটা ভাল নেই। হ্যাঁ, যদি দরকার হয় বাড়ীতে ফোন করবেন—

—আচ্ছা স্যর—ফাইলগুলো নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন সেক্রেটারী।

এ্যাটাচীটা টেনে নিয়ে অলক উঠল। যাবার আগে একবার দেখে যেতে হবে সেক্শনগুলো। এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টকে কাজ দিতে হবে কিছু। চেকও সই করে যেতে হবে থাকলে।

বেরিয়েই চাপরাশীকে বলল, ড্রাইভারকো গাড়ী লানে বলো, হাম আতে হ্যায়—

পর দিনটা রবিবার। অলক আশা করেছিল বিনয় আসবে। সকাল-দুপুর-বিকেল, কখন আসবে জানা না থাকায় বেরুনোই হয় নি বাড়ী ছেড়ে। যদি এসে ফিরে যায় বিনয়। কিন্তু মিছিমিছি। কেউই এল না। ছট্ফট্ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল অলক।

চাকরী চায় রুনুর স্বামী। কিন্তু মনে মনে ওর কেন অত ছট্ফটানি? এত উদ্বেগ কিসের? শুয়ে, বসে, বই পড়ে সময় আর কাটে না। রুনু তার কৃপাপ্রার্থী, ভাবতে আনন্দ আছে বই কি খানিকটা। কিন্তু কেউ এল না। এল একটি চিঠি বাহক মারফৎ:

অলক, ভেবেছিলাম, পুরণো বন্ধুত্বের জের টেনে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো চলে। কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম। অনেক বারের মত এও সম্ভবতঃ একটি ভুল। তোমার মনের যে ছবিটা দেখে এলাম, কথার চমকের পিছনে যে ব্যঙ্গ-কঠোর চাবুকের আস্ফালন শুনলাম, তা উপেক্ষা করে তোমার কাছে আর যাওয়া চলে না। আমরা গরীব সত্যিই। অভাব আছে, অনটন আছে, বঞ্চনা আছে—এও মানি।

কিন্তু আমরা এখনো বেঁচে আছি, এটা তুমি ভুলে যেতে চাও অলক? বেঁচে থাকাটাই জীবনের চরম লক্ষ্য হয়ত। কিন্তু সেটা খেয়ে-পরে কোনক্রমে পশুর মত বাঁচা নয়। বুদ্ধি-বৃত্তির স্বাভাবিক স্ফূরণে, সুস্থ স্বাধীনতার মধ্যে বাঁচা। আমরা যা চাই এবং চাই বলেই তোমার কাছে পাঠাতে পারলাম না আমার স্বামীকে। অভাব সামনাসামনি আঘাত করে, তাকে সহ্য করতে পারব। কিন্তু তোমার অনুকম্পা তিলে তিলে আমায় দগ্ধে মারবে, সে অসহ্য।

চিঠিটা আবার পড়ল অলক। আরও একবার। পড়তে পড়তে জোর হাসিতে ফেটে পড়ল অলক। হাসতে হাসতে চোখ জ্বালা করে জল এল। দেখল চিঠির উপরের ঠিকানাটা। কেন দিয়েছে ওটা? কি প্রয়োজন ছিল? চাইনে যদি অনুকম্পা, তবে ঠিকানা দিয়ে এমন পরোক্ষ আহ্বান কেন? চিঠিটা হাতে করে উঠে দাঁড়াল অলক। কৌতূহল তার চরমে উঠেছে। রুনুর সংসারটা একবার দেখে আসতে দোষ কি।

অনেক খুঁজে পাওয়া গেল বাড়ীটা। কলকাতায় এমন পথ আছে এবং সে পথে মানুষ বাস করে, এ অভিজ্ঞতা নতুন হ'ল অলকের। গাড়ীটা গলির মুখেই ছেড়ে দিতে হয়েছে। ফিরবার মুখে ট্যাক্সিই করতে হবে।

দু'পাশে খোলার চাল। নোংরা আবর্জনাময় বস্তি। দু'জন লোক পাশাপাশি চলতে অসুবিধে হয় এমন রাস্তা। আঁকাবাঁকা, এবড়ো-খেবড়ো, ভাঙা ইঁট বেরুনো সরু গলি। গা ঘিনঘিন করতে লাগল অলকের। ডাষ্টবিন যেন একটা, তবু নম্বর মিলিয়ে বাড়ীটার দরজায় কড়া নাড়ল অলক। একতলা ছোট্ট বাড়ী, কতকালের পুরণো কে জানে। পাশের উলঙ্গ বস্তির সঙ্গে গা মিলিয়ে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে পঞ্জরাস্থি বার করে।

কড়া নাড়তেই লাগল অলক।

ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের প্রশ্ন ভেসে এল, কে?

অলক উত্তর দিল না, কারণ গলাটা চেনা। শব্দ তুলল কড়াটায়।

বিশ্রী একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে দরজাটা খুলল আচমকা। খুলেই অবাক হয়ে গেল রুনু তুমি!

—ভিতরে যেতে পারি ত? অলক উত্তরের অপেক্ষা না করেই এগোল, তোমার ঘরকন্না দেখতে এলাম রুনু—

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে দরজাটা বন্ধ করল রুনু। অপ্রতিভ হাসল এবার, রবাহূত যারা আসে, পত্রপাঠ বিদায় দেওয়াই রীতি তাদের। কিন্তু তোমাকে অতটা কেমন করে বলি অলক? এসেছই যখন, দেখে যাও আমার সংসার—

একখানা শোবার ঘর। সামনে টালি-ঢাকা একফালি বারান্দা, সেটা ঘিরে নিয়ে রান্নার জায়গা হয়েছে। বারান্দার এককোণে ঘুঁটে-কয়লা, লণ্ঠন-কেরোসিনের টিন স্তূপীকৃত। দুটি উলঙ্গ শিশু সেই বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে ঝগড়া করছে সামনে খাবার নিয়ে।

রুনু বললে, এ ঘরে তুমি কতক্ষণ বসে থাকতে পারবে জানিনে। তবু কিছুক্ষণ অন্ততঃ বসো।

অলকের মুখে কথা সরছে না।

সেদিন মৃদু প্রসাধনের আড়ালে চোখে পড়ে নি, কিন্তু আজ স্পষ্ট লক্ষ্য করতে পারল অলক, রুনুর সেই ভাস্বর রূপ স্তিমিত হয়ে এসেছে। উচ্ছল দেহতটে ভাঙন ধরেছে নিঃশব্দে। ওর আঁচলটা কোমরে জড়ানো। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়েছে সারা পিঠে। চোখের কোণে শ্রান্তির কালিমা। বোধ হয় কাজে ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ।

শিশু দুটির দিকে তাকিয়ে আরও হতবাক হয়ে যাচ্ছে অলক। কঙ্কালসার দুটি উলঙ্গ ছেলেমেয়ে, ওদের চোখে-মুখে কোথাও শিশুর কমনীয়তা নেই।

রুনু বললে আবার, অমন করে কি দেখছ, আমার ছেলেমেয়ে ওরা!

—বুঝতে পারছি। অপ্রতিভ হাসল অলক। কেমন যেন মনের তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলছে ও। বললে, এ বাড়ীতে তোমরা কেমন করে থাক রুনু?

খিলখিল করে হেসে উঠল রুনু। বললে, তুমি কি আমাকে রাজপ্রাসাদে দেখবে ভেবে এসেছিলে?

—কিন্তু এই কি তোমার বেঁচে থাকা? অলক যেন আর্তনাদ করল, এই ডাষ্টবিনে মানুষ কি তার মনুষ্যত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে?

– জীবনের নীচুতলার কতটুকু তুমি দেখেছ অলক? রুনুর চোখ দুটো করুণ হয়ে এল ব্যথায়, কোন বস্তির মধ্যে ঢুকে তাকিয়ে দেখেছ কখনও? বুঝবার চেষ্টা করেছ, সেখানে কেমন করে থাকে মানুষ। আলো নেই, বাতাস নেই, ধোঁয়া ধুলো-নোংরা দমবন্ধ ঘরে মেয়েপুরুষে শূয়োরের মত কেমন করে রাত কাটায়, অনুভব করবার চেষ্টা করেছ? করনি অলক, তাই আমার ঘরকে তোমার ডাষ্টবিন মনে হচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় এ ত স্বর্গ।

—বিনয় তোমাকে এতটা নামিয়েছে, জানতাম না রানু। অলক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—তুমি কি বাড়ী বয়ে নিন্দে করতেই এসেছ অলক? রুনু তীর্যক তাকাল, কে কাকে নামিয়েছে, এ প্রশ্ন অবান্তর। আসলে বোধ হয় সব মানুষই নামছে ধাপে ধাপে। সেই শেষ ধাপ লক্ষ্য। নগ্ন, বীভৎসতার মাঝে এগিয়ে চলেছি সবাই।

—কিন্তু সে কি সেই কথাই বলে? চোখ-ঝলসানো অলক, এ চিন্তা অক্ষমের। যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না জীবনের সামনাসামনি, তার। মানুষের লক্ষ্য নীচে নামা নয় কুন্তু, ওপরে ওঠা। তার জন্যে কঠোর সংগ্রাম আর অক্ষয় ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। এবং তারই নাম বেঁচে থাকা।

—কিন্তু বেঁচে কি সত্যিই থাকা যাচ্ছে, না যাবে? কুন্তুর ঠোঁট কঠিন বাঁক নিল, জীবনভরা আশা-আকাঙ্ক্ষা, শরীর-ভরা শক্তি-সামর্থ্য আর মস্তিষ্কভরা বিদ্যাবুদ্ধি নিয়েও মানুষ কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখবে না? বেঁচে থাকার? মানুষের মত বেঁচে থাকবার সুযোগ কি পাওয়া যাচ্ছে এ যুগে?

আগন্তুক দেখে থমকে যাওয়া শিশু দুটোর পানে তাকিয়ে অলক বললে, সুযোগ হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয় না কুন্তু, সুযোগ তৈরি করে নিতে হয়। জীবনের আদিম বৃত্তিই হ'ল সংগ্রাম, বেঁচে থাকবার জন্যে মরণপণ যুদ্ধ। সেখানে অক্ষম ত মরবেই!

কুন্তু হাসল। দু'হাতে লুটিয়ে-পড়া চুল শাসন করতে করতে বললে, মানুষ তার আদিম বর্ব্বর যুগ কাটিয়ে অনেকটাই যে এগিয়ে এসেছে অলক। সভ্য মানুষের আইনে বলে, নিজে বাঁচো এবং অপরকেও বাঁচতে দাও। এখনও যদি অনাহারে অত্যাচারে সুযোগের অভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগোয় মানুষ, যারা সক্ষম, তারা শুধু অর্থের জোরে বঞ্চিতকে ঠেলে দেয় অনিবার্য্য ধ্বংসের মুখে, তবুও কি যুগটাকে সভ্য বলতে হবে? বলতে হবে, এযুগের সাধনা বেঁচে থাকবার এবং বাঁচিয়ে রাখবার? বলতে হবে, এ যুগের লক্ষ্য উর্দ্ধগামী?

কুন্তুর ভাস্বর চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণকাল কি ভাবল অলক। তারপর বললে, সুযোগ পেয়েও যারা শুধু দারিদ্র্যের অহঙ্কারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে চায় অন্ধকারে, তাদের জন্যে বলবার তোমার কি আছে কুন্তু?

তীব্র জলন্ত চোখ দুটো কুন্তুর স্নিগ্ধ হয়ে এল ধীরে ধীরে, মৃদু হাসি দেখা দিল ওর শীর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে। বললে, তোমার প্রশ্নটাই যে ভুল হ'ল অলক। দারিদ্র্যকে মানুষ ঘৃণাই করেছে চিরকাল, ভয় করেছে। দারিদ্র্য নিয়ে আর যাই হোক অহঙ্কার করা চলে না। যা নিয়ে চলে, সে মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকাকে আমি মৃত্যুর নামান্তর বলেই মনে করি। তার চেয়ে সীমাহীন অন্ধকারে, পূতিগন্ধ আবর্জ্জনায় মুখ গুঁজে জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়া অনেক শ্রেয়। তুমি যাকে সুযোগ বল, তা সুযোগ নয়, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু।

অলক চুপ করেই রইল। অনেক কথাই গুমরে মরতে থাকল ওর অন্তরের কোণে কোণে। কিন্তু তর্ক করে কি হবে। একথা সে উচ্চারণ করতে পারল না, সেদিন যে কথা সে কুন্তুকে বলেছিল, তা ওর প্রাণের কথা নয়। তিলে তিলে ওরা অতল অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যাবে, এটা চায় নি অলক। বলতে পারল না, সর্ত্ত নয়, সুযোগানুসন্ধান নয়, অঙ্গীকার নয় কোন, শুধু কুন্তুকে একদিন ভালবেসেছিল বলেই আজ এগিয়ে আসতে পেরেছে পাঁচ বছরের অবহেলাময় বিস্মৃতি পেরিয়ে। ওদের বাঁচাতে চেয়েছে, তুলে ধরতে এসেছে স্থূল জীবনের উর্দ্ধে। কথায় শুধু উত্তাপই দেখল কুন্তু, অশ্রু দেখল না। কিন্তু বলতে কোথায় যেন বাধল অলকের।

কুন্তু পাণ্ডুর মুখে বললে, খুব অভদ্র ভাবছ, নয়? অতিথিকে দাঁড় করিয়ে তার সঙ্গে তর্ক সুরু করেছি দেখে? তর্ক থাক, ঘরে এসে একটু বস অলক, এক কাপ চা হয়ত খাওয়াতে পারব তোমাকে।

—না না, থাক। বাধা দিল অলক।

—থাক তা হলে। কুন্তুর চোখ দুটো সজল হয়ে এল এবার, আমার ঘরে এসে এক কাপ চা না পেলে তোমার হয় ত কিছুই এসে যাবে না, কিন্তু ঐ চায়ের পয়সায় বাচ্চা দুটোর একবেলাকার জলখাবার হয়ত জুটে যাবে অলক।

আনত মুখে ঘরে গিয়ে ঢুকল অলক।

ঘরের এককোণে মেঝেয় একটি সতরঞ্চের উপর তোষক পাতা। বেড-কভার নেই, মলিন বালিশগুলো স্তূপীকৃত। কয়েকটা কাঁথা আর ছেঁড়া একখানা রবার-ক্লথ ভাঁজকরা একপাশে। ওদিকে রংচটা টিনের সুটকেশ একটি, কতকগুলি বই। বাক্সের উপরই আয়না-চিরুনী, সিন্দুর-কৌটো।

দমবন্ধ হয়ে আসছে অলকের। একটিমাত্র জানালা ঘরে, তা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ঢুকছে। পাশের বস্তিতে উনুনে আঁচ দিয়েছে বুঝি। কুন্তু এগিয়ে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিল।

সন্ধ্যার কত দেরী, অথচ এঘরে সন্ধ্যা নেমেছে। কেমন ভারী, দম আটকানো অন্ধকার। তবু অলক বসল এসে বিছানার এক কোণে।

বললে, বিনয় কখন আসবে?

—তুমি কি ওর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছ? কুন্তু মেঝেয় বসে পড়ল।

—হ্যাঁ। অলকের কণ্ঠ প্রায় শান্ত, তুমি জান কুন্তু সেকথা, আমার আসার দায়িত্ব তোমার।

—না। কুন্তু বলল উদ্দীপ্ত হয়ে, আমার ভুল হয়েছিল। সে ভুল আমি স্বীকারও করেছি। ভেবেছিলাম, টাকার

চেয়ে বন্ধুত্ব বড় কিন্তু এখন দেখছি, বন্ধুত্বের চেয়েও সম্মান বড়। টাকাকে কেমন করে অশ্রদ্ধা করব, ওর চাকরীর প্রয়োজনকে কেমন করে অস্বীকার করব। কিন্তু এ প্রসঙ্গ তুমি বাদ দাও অলক। এ অসম্ভব।

স্থির অপলক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সেই অন্ধকারে বসে থাকা মূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে রইল অলক। মনে মনে এক প্রসন্ন শ্রদ্ধা জাগছে ওর। এ কেমন মেয়ে, সুখ-শান্তিকে যে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে চায় একটুখানি মর্য্যাদার বিনিময়ে? এ কি অনমনীয় মন, যা ভাঙে, তবু মচকায় না। এ কেমন হৃদয়, যে নিশ্চিন্ত স্বচ্ছলতাকে পায়ে মাড়িয়ে আঁকড়ে ধরে অনটনকে? অলক অবাক!

বললে, আমি উঠি। তুমি ভেবে দেখো রুনু, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র অসম্মান নেই, তিলমাত্র অমর্য্যাদা নেই। যদি অসঙ্গত মনে না কর, বিনয়কে পাঠিও আমার কাছে। ওকে ফেরাব না।

নীরবে এসে দরজাটা খুলে দিল রুনু। দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ না অলক আড়াল হয়ে গেল সপিল গলিটার বাঁকে।

মনটা বিমুখ হয়ে উঠেছে রুনুর। অন্তরটা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইছে। রাতদিন হন্যে হয়ে রোদে-বৃষ্টিতে আপিস-পাড়ার দরজায় দরজায় মাথা কুটছে বিনয়। কিন্তু কোথায় চাকরী? সকাল-সন্ধ্যের ছুটিমাত্র টিউশনি সম্বল করে বেঁচে থাকা। এ ত বাঁচা নয়, বেঁচে থাকবার কল্পনাই যেন হারিয়ে যাচ্ছে এই পরিবেশে। চল্লিশ টাকা আয়ে স্বামীস্ত্রী আর দুটো ছেলেমেয়ে, বাড়ীভাড়া। কেমন করে সম্ভব হচ্ছে, ভেবে পায় না রুনু। অথচ ওরা মানুষের মত সচ্ছল হয়ে একটি সুখের না হোক, স্বস্তির পরিবেশে বাঁচবার অধিকার রাখে। বিনয় শিক্ষিত, মার্জ্জিত, কার্য্যক্ষম। অথচ তার জন্যে জীবনের কোন দরজাই ত খোলা নেই। বিনয়ের ভীতি-বিহ্বল, করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে মায়া হয়। মুচড়ে ওঠে বুকের ভিতরটা। একটি সমর্থ জীবনকে জোর করে পঙ্গু করে দিলে, তার রূপ যে কি অসহায়, কি বীভৎস, বুঝতে পারে রুনু। অথচ তার কিছুই করবার নেই। অসহায় দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া গতি নেই। বিনয়ের পৌরুষ, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, সংযম—সব চোখের সামনে আসছে শিথিল হয়ে। বীতশ্রদ্ধ, বিক্ষুব্ধ মনে ভাঙন ধরেছে। এ ভাঙন ধরবেই। এ যুগের, একালের স্বত্বসর্ব্বস্ব সমাজের বলি ও। বেঁচে থাকবার সব উপকরণ, সব সুযোগ ওর লুন্ঠিত হয়ে গেছে। ওর শক্তি অপচয়িত হবে শুধু। দু' চোখে ওর ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। কোন আলো নেই। ও যে শিক্ষিত—লুন্ঠন করতে শরম লাগে। ও যে মার্জ্জিত, জালিয়াতিতে কুণ্ঠা জাগে। ও যে ভদ্রলোক, কাজে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ওর কাছে এখনও ঘোচে নি। তাই ওর সামনে পথ নেই, নেই কোন আলোকোজ্জ্বল দিঙ্‌নির্দ্দেশ। সীমাহীন অন্ধকার শুধু।

বাচ্চা দুটো সিমেন্টের মেঝের উপরই ঘুমিয়ে পড়েছে। সামনে কলাই-করা টিনের বাটিটা নিঃশেষিত। অপলক চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রুনু। নিষ্পাপ দুটি শিশু, পৃথিবীর দুঃখ-শোকের খবর রাখে না কোন। ক্ষুধা পেলে দুটি খেতে চায়, আর কিছু 'ত নয়। তাও কি জুটছে? কঙ্কালসার দুটো শিশু-শব যেন। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা দুরন্ত নয়, দুরন্ত হতে পারে নি। জন্ম থেকে যে শিশুর পেটে নিরন্তর শুধু ক্ষুধার হুল ফুটেছে, সে দুরন্ত হবে কেমন করে? কাঁদে—এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। জন্ম থেকেই শুধু সামনে দেখছে দৈন্য, যেখানে দুটি অন্ন জোটে না, সেখানে পেটটাই চরমতম সমস্যা। ওরা কেমন করে মানুষ হবে, মহত্তর লক্ষ্য ওরা কোথায় পাবে, যেখানে ক্ষুন্নিবৃত্তিই একমাত্র সমস্যা?

চোখ দুটো জ্বালা করে জল আসছে রুনুর। কিন্তু জল পড়ে না চোখ বেয়ে,মনের আগুনে শুকিয়ে যায় বুঝি। হাত-পাগুলো অবশ হয়ে আসে। তবু বাঁচতে হবে, কুকুর-বেড়ালের বাঁচা নয়। অনেক আশার, অনেক কামনার মধ্যে বাঁচা। এ অন্ধকার ঘুচবেই। এ রাত্রির ভোর জাগবেই।

বাচ্চা দুটোকে সস্নেহে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল রুনু। নিষ্পলক তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সন্ধ্যে হয়েছে বাইরেও, কিন্তু আলো জ্বালিয়ে কি হবে, শুধু শুধু তেল পুড়বে। দায়ে না পড়লে ওরা আলো জ্বালে না। চার দিকে ঝুপসি অন্ধকার, বন্যজন্তুর মত ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। ঐটুকু টিমটিম লণ্ঠন, তার কতটুকু অন্ধকার ঘোচাবে, কতখানি আলো আনবে?

রাতের টিউশনি সেরে বিনয় যখন ফিরল, রাত তখন দশটা বেজে গেছে। এমনি সময়েই রোজ ফেরে বিনয়। কোনদিন ঘুমিয়ে পড়ে রুনু, কোনদিন জেগেই বসে থাকে। মূঢ়ের মত নির্ব্বাক হয়ে ওরা কিছুক্ষণ বসে থাকে মুখোমুখি। সব কথা ফুরিয়ে গেছে যেন, কিছু বলবার নেই, কিছু শুনবার নেই।

বিনয়ের পাঞ্জাবীটা ছিঁড়েছে, আর একটা করবার পয়সা নেই। রুনুরও সেই অবস্থা। তবু ওদের শরীরের আবরণ একটা আছে এখনও। কতদিন আর থাকবে, কে জানে।

কিন্তু আজ বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল রুনু। চোখ দুটো বসে গেছে, চোখের কোলে দুশ্চিন্তার

পড়েছে কালি। রুক্ষ, দুর্বিনীত চুল, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল।

কিছু জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হচ্ছে। নীরব অপেক্ষা করতে থাকল রুনু। বলবে, বলতেই ত হবে বিনয়কে। এত অভাবের মধ্যেও সান্ত্বনা ছিল রুনুর, বিনয় ভেঙে পড়ে নি। কিন্তু আজ যেন সে বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে ওর, ভয় ধরছে মনে।

অনেকক্ষণ পর একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিনয়। হাতপা ছড়িয়ে দেওয়ালে পিঠ রেখে বসেছিল, এবার ঝুঁকে পড়ল মাথাটা।

ভগ্ন, বেসুরো গলায় ও যেন আর্ত্তনাদ করল, রাতের টিউশনিটা চলে গেল রুনু।

কথা নয়, যেন চাবুক একটা পড়ল এসে রুনুর পিঠে। শঙ্কিত মনটা কেঁপে উঠল ওর।

—কি হবে? বিনয়ের কণ্ঠস্বর কান্নার মত শোনাল, কেমন করে বাঁচব, বলতে পার রুনু? কেমন করে চলবে—

কেমন করে বলবে রুনু? কোন্ পথের নির্দ্দেশ দেবে?

তবু বলল, পথ একটা হবেই—তুমি ভেঙে পড়লে চলবে কেমন করে? ভগবান কি এতই নিষ্ঠুর হবেন?

একটা চরম পরিহাসের মতই যেন শোনাল কথাটা। কোন ভগবান, কাদের ভগবান। গরীবের আবার ভগবান কিসের?

বিনয়ের নিস্তেজ মন তবু চাইল একটু চুপ করে থাকতে। অবসাদ আর হতাশার মধ্যেও একটুখানি নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা। রূঢ় জীবন থেকে এক মুহূর্ত্তের বিশ্রাম, বিশ্রাম ত নয়, পলায়ন।

বিনয়ের মাথায় অসীম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে রুনু স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, সব যাক। সব যাবে, আমরাও হয় ত শেষ হয়ে যাব তিলে তিলে। কিন্তু এ শুধু মৃত্যু নয়, তীব্রতম যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই মানুষ একদিন বাঁচবার মন্ত্র খুঁজে পাবে।

ভাবলেশহীন মুখে বিনয় চুপ করে পড়ে রইল। রুনুর এ স্পর্শটুকু এখন ভাল লাগে ওর। মনে আসে শক্তি, হৃদয়ে প্রেরণা।

রুনু বললে, কিন্তু আমরা কি শুধুই ফুরিয়ে যাব, প্রতিবাদ করব না কোন। শুধু বঞ্চনায় আর প্রতারণায় নিঃশেষ হব, আঘাত করতে পারব না এ অবিচারের বিরুদ্ধে?

ক্লান্ত চোখ দুটোতে এবার বুঝি আগুনের হলকা জাগছে বিনয়ের। উঠে বসল আড়মোড়া ভেঙে। বললে, কার দরবারে নালিশ জানাবে রুনু, মানুষ কোথায়? এ যুগে মানুষকে ভেঙে গড়তে হবে। নতুন মানুষ, নতুন প্রাণ। তার জন্যে হয় ত কীট-পতঙ্গের মত লাখে লাখে মরতে হবে আমাদের আমাদের পঞ্জর দিয়েই হয়ত তৈরি হবে এ যুগের বজ্র। হয় ত দূর হবে সব পাপ আর অপমান। আমাদের মৃত্যুই আমাদের প্রতিবাদ।

চোখে চোখে তাকিয়ে ওরা বসে রইল অন্ধকারে, নির্জীব, ক্লান্ত, অবসন্ন। ক্ষত-বিক্ষত প্রাণে জ্বলতে লাগল ধিকি ধিকি আগুন।

তবু ওদের দিন কাটতে লাগল। অভাব-অনটন-দারিদ্র্য, বঞ্চনা-অপমান-নির্যাতন। তবু খুঁজতে লাগল পথ, জীবনের অন্তবিহীন পথে আশার ক্ষীণ প্রদীপ জেলে ওরা তবু কাটাতে লাগল দিন।

বিনয় জেনেছে অলকের প্রস্তাব। লোভাতুর মনটা আনন্দে চীৎকার করে উঠতে গিয়েও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এমন প্রলোভনও আসে মানুষের জীবনে? নীরেট অন্ধকারের মাঝে এক ঝলক আলোর আহ্বান? কিন্তু সে যে আলো নয় ওদের কাছে, মরীচিকার মতই মিথ্যে, তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, সে শুধু উতলা করে দিতে জানে, ছুটিয়ে মারতে জানে নিশ্চিত হতাশার পিছনে।

তবু এই পরিশ্রান্ত মনটা এক-একবার উন্মুখ হয়ে ওঠে বৈকি। চোখের সামনে ছেলেমেয়ে দুটো জীবনীশক্তি হারিয়ে দিনে দিনে শুকিয়ে কঙ্কাল হচ্ছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখবার মত সঙ্গতিও যে নেই তাদের। শুধু সম্মান দিয়ে কি বাঁচা চলে এই দুনিয়ায়? তার কর্ত্তব্যবোধ আছে, স্নেহ-মমতা আছে, আছে প্রেম—মনুষ্যত্বও আছে। তাদের কি দাবী নেই কোন? তার সন্তান, তার স্ত্রী, তার কত সাধে গড়া সংসার দিনে দিনে চরম বিপর্য্যয়ের মুখে তলিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে অপমৃত্যু ঘটছে স্নেহ-মায়া-মমতা-প্রেমের। শুধু সম্মানবোধকেই কি বাঁচিয়ে রাখতে হবে? এতগুলি জীবনের চেয়ে কি সম্মান বড়?

বিনয় ভাবে—স্বেচ্ছায় নয়, দুনিয়ার চলমান জীবন বাধ্য করে ওকে ভাবতে। একদিকে চাকরী, অন্যদিকে নিশ্চিত ধ্বংস। দরজায় দরজায় ঘুরে যেখানে চাকরী দূরের কথা টিউশনিও জুটছে না, সেখানে অলকের কথাটা ভগবানের আশীর্বাদের মত। মৃত্যুর করাল অন্ধকারে অমৃতের আলোর মত বাঁচবার আশ্বাস। তাকে কি করে অপাংক্তেয় করে রাখবে বিনয়? কি করে অবজ্ঞায়, অশ্রদ্ধায়, নিরুৎসাহে সরিয়ে দেবে? কেন দেবে?

কেন, কেন? ওর বঞ্চিত, লাঞ্ছিত আত্মা যেন আর্ত্তনাদ করে ওঠে। গোটা দুনিয়া যেখানে অন্যায়ে প্রবঞ্চনায়,

হতাশায়-বেদনায়, মিথ্যায়-মনুষ্যত্বহীনতায় জর্জ্জরিত, প্রতি পদে যেখানে ছলনার পঙ্কিল আশ্রয়, সেখানে সে কেন আঁকড়ে ধরে থাকবে সত্যকে? কেন সে সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে ছুটে যাবে না অপমানে আর অবজ্ঞায় ঘেরা শুধু মাত্র বাঁচবার আশ্বাস দেওয়া আশ্রয়ে? কেন, কেন।

তবু কুন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে শিথিল হয়ে আসে মন। ও জানে, কুন্দু ভাঙবে, তবু মচকাবে না। মিশে যাবে মাটির সঙ্গে, তবু মাথা নত করবে না, ক্ষমা করবে না, আত্মসমর্পণকে।

ওরা ধুঁকছে, শীর্ণ মুখচোখে কুন্দুর আরও তীব্র হয়ে জলছে অঙ্গীকার। চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে। বিশীর্ণ দেহরেখায় যৌবন অবলুপ্ত। কোটরগত দৃষ্টিতে অগ্নির স্বাক্ষর। যে পৃথিবী ওদের বঞ্চনা করল, তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ মনের জলন্ত প্রতিবাদ। মলিন কাপড়ে, রুক্ষ চুলে, নিমেষহীন জলন্ত চোখে ও যেন ভৈরবী কালী।

শিশু দুটো এখন আর ঝগড়াও করে না। বসে বসে কাঁদে শুধু, শুধুই কাঁদে। সে কান্নায় শব্দ নেই, তীব্র ক্ষুধার কান্না। পাঁজরার হাড় গোনা যায়, পেট দুটো টিংটিং করছে, ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখ। কুন্দু তাকাতে পারে না।

যেদিন অবশিষ্ট টুইশনিটাও গেল, ওরা বলতে পারল না একটি কথাও। দুজনের চোখের সামনে ঘন হয়ে নামল অন্ধকারের করাল ছায়া। বিমূঢ় মনের সামনে একটিমাত্র প্রশ্ন রইল—এবার? এবার কি হবে!

সকাল থেকে হাত গুটিয়ে বসে রইল কুন্দু। ও প্রশ্নের উত্তরের প্রত্যাশা নেই। কোন উত্তর নেই ওরা জানে, তবু অনুরণিত হয়ে ওঠে দুর্ব্বার জিজ্ঞাসা। তীব্র তীক্ষ্ণ আঘাতের মত ওদের সচকিত, ভয়ার্ত্ত মনের মাঝে কাঁপতে থাকে ব্যাকুল প্রশ্ন—কি হবে, কি হবে?

বাড়ী ভাড়া বাকী পড়েছে ছ'মাসের। বাড়ীর মালিকের ধৈর্য্যেরও ত সীমা আছে। সে নোটিশ দিয়েছে উঠে যাবার জন্যে। মুদির কাছে প্রচুর টাকা দেনা। বন্ধুবান্ধবের কাছে কত হিসেব নেই। কারও কাছে আর হাত পাতবার পথ নেই, পাতলেও পাওয়া যাবে না একটি পয়সা। হাঁড়িতে চাল নেই—কিছুই নেই। অর্দ্ধাহার, স্বল্পাহার করেও চলেছিল এতদিন, এবারে অনাহারের পালা।

দিনের পর দিন হন্তে হয়ে ঘুরল বিনয়, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। কিন্তু ওর সামনে কোন দরজা খুলে গেল না, আলাদীনের প্রদীপ জলল না।

এদিকে বাচ্চা দুটো কাঁদতে কাঁদতে ঘুমল, ঘুম ভেঙ্গে উঠে আবার কাঁদল। আর্ত্তনাদ করতে থাকল ক্ষুধার জালায়—মানুষের আদিম চাহিদা। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে পড়ে রইল কুন্দু। মরুক, মরে যাক ওরা। মানুষের অধিকার নিয়ে ওরা জন্মায় নি। ওদের বাপ-মা অক্ষম, মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে ছিনিয়ে আনবার ক্ষমতা নেই ওদের বাপমায়ের। তিলে তিলে এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করবার চেয়ে শেষ হয়ে যাক একেবারে, সেই ভাল—সবচেয়ে ভাল।

জোর করে মন থেকে অলকের কথাটা সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করল বিনয়। কিন্তু সে মনে জোর কোথায়? তেমন করে আত্মাভিমান বাধা দিচ্ছে না ত! জীবন যে এত প্রিয় কে জানত? কুন্দুর চেয়েও যে অলককে আপন বলে মনে হচ্ছে বিনয়ের—অনেক বেশী কাছের।

তাকানো যায় না শিশু দুটোর দিকে। ওকে দেখে একটা টলমল পায়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। আধো গলায় কান্না উঠল উথলে, বাবা, খেতে দেয় না কেন মা। খিদে লেগেছে যে—

আর একটা কান্না জুড়ল বসে বসেই, মুলি দাও, বাল্লি দাও—

ওরা দুধ চায় না, ভাত চায় না। মুড়ি চাটি, একটুখানি বার্লি। তাও নেই। কানে আঙুল চেপে ছুটে বেরোল বিনয়। কোন দ্বিধা নেই আর, কোন সংশয় নেই। মরে যাক হৃদয়, মন শুদ্ধ হয়ে যাক চিরকালের মত। অলকের কাছেই সে যাবে। চাকরীই তার জীবনের একমাত্র প্রয়োজন আজ। টাকা, টাকা চাই সর্ব্বস্বের বিনিময়ে।

বিনয়কে ফেরাল না অলক। নিয়োগপত্র পেল সঙ্গে সঙ্গে। কিছু টাকা অগ্রিম।

অলক বললে, সহৃদয় কণ্ঠে, সেই এলেন বিনয়বাবু, যদি আরও কিছু আগে আসতেন।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসবার পর বিনয় যখন বাসায় ফিরল—ওর দু'হাতে বোঝাই খাদ্য সম্ভার। চাল-ডাল, মুড়ি-চিড়ে মাছ-তরকারী—

বিস্মিত অপলক চোখে তাকিয়ে কুন্দু ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে উঠল আনন্দে, চাকরী পেয়েছ তুমি, চাকরী! এত সব খাবার!

এক মুহূর্ত্তের নিস্তব্ধতা! মনের যত দ্বিধা নিংড়ে ফেলল বিনয়। বললে সহজ তৃপ্ত কণ্ঠে, অলকবাবুর চাকরীটাই নিলাম কুন্দু।

অনেক, অনেকক্ষণ হাতভর্ত্তি খাবার নিয়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুন্দু। তার পর প্রায় চীৎকার করে ককিয়ে উঠল, তুমি! তুমি চাকরি নিলে!—কিন্তু তার পর?

তার পরের কথা পরে ভাবব কুন্দু।

রিফাইন্যান্স কর্পোরেশন ও শিল্প প্রতিষ্ঠান

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ভারতের অর্থনীতি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের উদ্যমে কতকগুলো ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। এই সব কর্পোরেশনের প্রধানতম উদ্দেশ্য হ'ল বে-সরকারী শিল্পে দাদন সরবরাহ করা। এখানে আরও একটা প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সে প্রতিষ্ঠানটির নাম হ'ল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন। কর্পোরেশনটি একটা বিরাট আকারের যৌথ প্রতিষ্ঠান। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মার্কিন সরকার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সহযোগিতা, এবং ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং অনেকগুলো তপশীলী ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর সহানুভূতি এবং সাহায্য না পেলে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হতে পারত না। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলো কর্ত্তৃক গঠিত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং মার্কিন সরকার ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় গঠিত ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন কর্ত্তৃক দাদন সরবরাহের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি, যে সব শিল্প এঁদের কাছ থেকে কর্জ্জ চেয়ে থাকেন সে সব শিল্পকে কয়েকটা স্তরে ভাগ করা যায়। প্রধানতঃ দুটো জিনিসের উপর সব চাইতে বেশী জোর দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথম জিনিস হ'ল কর্জ্জপ্রার্থী শিল্পের আকার। দ্বিতীয়তঃ কর্জ্জপ্রার্থী শিল্প কর্ত্তৃক কি ধরনের উৎপাদন-সূচী অনুসৃত হচ্ছে এবং এই উৎপাদন-সূচীর সাফল্যের কতটুকু সম্ভাবনা আছে সেটা বিবেচনা করে দেখা হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, দাদনী সংস্থাগুলো কর্জ্জপ্রার্থী শিল্পের প্রয়োজন সবটা মিটাতে পারে নি। অবশ্য কর্জ্জপ্রার্থী শিল্পের চাহিদা বহুমুখী। তবে সে চাহিদা নূতন কিছুই নয়। আসল কথা হচ্ছে, দাদনী সংস্থাগুলোর বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। অভিজ্ঞতার অভাবের কথা বলছি এজন্য যে, দাদনী সংস্থাগুলো এমন কতকগুলো কর্জ্জপ্রার্থী শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে দাদন দিয়েছেন যেগুলোর ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য সম্পর্কে এদের কোন ধারণা নেই। অর্থাৎ দাদন দেবার আগে কর্জ্জপ্রার্থী শিল্প-প্রতিষ্ঠান কি রকম ব্যবসা চালাচ্ছেন এবং কিস্তি-মাফিক টাকা পরিশোধ করার অভ্যাস এবং সত্যিকারের সামর্থ্য কর্জ্জপ্রার্থী প্রতিষ্ঠানের আছে কিনা সে সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় নি। ফলে এমন কতকগুলো প্রতিষ্ঠানকে দাদন দেওয়া হয়েছে যেগুলোর কাছ থেকে যথাসময়ে কিস্তি-মাফিক ঋণ পরিশোধের আশা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য আদালতের সাহায্য নিয়ে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত দাদন উদ্ধার করা যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে কয়েকটা অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ মামলা করে দাদন উদ্ধার করতে গেলে খরচের পরিমাণ না বাড়িয়ে উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। তা ছাড়া যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দাদন দেওয়া হয় সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। আমরা মনে করি, শিল্পের উন্নতি সাধন করা যে সব দাদনী সংস্থার উদ্দেশ্য সে সব সংস্থার পক্ষে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে না পড়াই ভাল। অবশ্য আমরা বলছি না সব দাদনী সংস্থা কর্জ্জপ্রার্থী প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য বিচার না করেই দাদন দিয়ে থাকেন। তবে কোন কোন দাদনী সংস্থা দাদন সরবরাহের ব্যাপারে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেন নি। তাই সম্ভাব্য অসুবিধার কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করছি। যে সব দাদনী সংস্থা খুব চালু সে সব সংস্থা দাদন সরবরাহের ব্যাপারে সতর্কতার সঙ্গে চলে না। এদের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর শিল্পে দাদন দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়। দাদন দেবার সময় এরা প্রথম শ্রেণীর জামিন ছাড়া অন্য কোন জামিন গ্রহণ করেন না। ফলে যে সব প্রতিষ্ঠান আকারে ক্ষুদ্র এবং তেমন খ্যাতিসম্পন্ন নন সে সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই প্রকার চালু দাদনী সংস্থার কাছ থেকে সহজে দাদন পাওয়া অসম্ভব। তাই দেখা যায়, যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দাদন দেবার ব্যবস্থা হয়েছে সে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হয় না। অবশ্য কিভাবে এই প্রচেষ্টা সফল হতে পারে সেই সম্পর্কে অর্থনীতি-বিদ্‌দের চেষ্টার অন্ত নেই। এঁরা বলেছেন, যে ব্যাঙ্কের মারফৎ কর্জ্জপ্রার্থী শিল্প-প্রতিষ্ঠান লেনদেন চালাচ্ছেন সে ব্যাঙ্কের মারফৎ যদি প্রতিষ্ঠানকে কর্জ্জ দেওয়া হয় তা হলে কর্জ্জপ্রার্থী প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য সম্পর্কীয় সমস্যার উদ্ভব হবে না, কারণ কর্জ্জপ্রার্থী প্রতিষ্ঠানের লেনদেনের যে হিসাব ব্যাঙ্কে আছে সেটা পরীক্ষা করলেই প্রতিষ্ঠানটি কি রকম ব্যবসা-পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন এবং কিস্তি-মাফিক টাকা পরিশোধ করার সামর্থ্য প্রতিষ্ঠানটির আছে কিনা সেটা বুঝা যাবে। আশা করা যেতে পারে, যে ব্যাঙ্কের মারফৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান লেনদেন করছেন সে ব্যাঙ্ক যদি প্রতিষ্ঠানকে দাদন পাবার যোগ্য বলে মনে করেন তা হলে প্রতিষ্ঠানটি সত্যই নির্ভরশীল। বিশেষ করে নিজের স্বার্থের দিক থেকে ব্যাঙ্কের পক্ষে সতর্কতার সঙ্গে না চলে উপায় নেই কারণ যদি দাদনের টাকা মারা যায় তা হলে ব্যাঙ্কের নিজেরই ক্ষতি হবে।

বোম্বাই থেকে এই জুন তারিখে প্রচারিত খবরে প্রকাশ, ১৯৫৬ সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী একটা প্রাইভেট যৌথ

প্রতিষ্ঠান রেজেষ্ট্রী করা হয়েছে। যৌথ প্রতিষ্ঠানটির নাম হ'ল "Refinance Corporation for Industry. Private Limited" বোম্বাইর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভবনে যৌথ প্রতিষ্ঠানটির রেজিষ্টার্ড আপিস খোলার ব্যবস্থা হয়েছে। সাত জন সদস্য নিয়ে কর্পোরেশনের ডিরেক্টর বোর্ড গঠন করা হবে। সদস্যদের মধ্যে আছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর (চেয়ারম্যান), একজন ডেপুটি গবর্ণর, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান, জীবনবীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং এই পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলোর তিনজন প্রতিনিধি।

প্রচার করা হয়েছে, রিফাইন্যান্স কর্পোরেশনের মঞ্জুরীকৃত মূলধনের মোট পরিমাণ হ'ল পঁচিশ কোটি টাকা। তবে আপাততঃ সাড়ে বারো কোটি টাকার মূলধন নিয়ে কাজ সুরু করা হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এই টাকা কোত্থেকে আসবে। জানা গেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং পনেরটি বৃহৎ তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক রিফাইন্যান্স কর্পোরেশনকে সাড়ে বারো কোটি টাকার মূলধন সরবরাহ করবেন। পনেরটি বৃহৎ ব্যাঙ্কের মধ্যে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, লয়েডস ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক চাটার্ড ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দরাবাদ ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জানা গেছে কেবলমাত্র মাঝারি আকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সদস্য-ব্যাঙ্কগুলো ঋণ দিতে পারবেন। তবে একটা প্রতিষ্ঠানকে কতটা পরিমাণ ঋণ দেওয়া হবে সেটাও সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশী ঋণ দেওয়া চলবে না। শুধু তাই নয়, আরও কতকগুলো সর্তের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে উদাহরণস্বরূপ কেবলমাত্র তিনটি সর্তের উল্লেখ করছি। প্রথমতঃ, যে ঋণ দেওয়া হবে সে ঋণ কেবলমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, ঋণের মেয়াদ তিন বৎসরের কম কিংবা সাত বৎসরের বেশী হবে না। তৃতীয় সর্ত হ'ল এই যে, কেবলমাত্র সে সব প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া হবে যে সব প্রতিষ্ঠানের আদায়ীকৃত মূলধন এবং সংরক্ষিত টাকার পরিমাণ অনধিক আড়াই কোটি টাকা।

স্মরণ থাকতে পারে যে পনেরটি বৃহৎ তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে সে পনেরটি ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে বিগত ১৯৫৬ সনের আগষ্ট মাসে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত কৃষিপণ্য চুক্তির সর্তানুযায়ী বে-সরকারী ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দেবার উদ্দেশ্যে প্রায় ছাব্বিশ কোটি টাকা কাউণ্টারপার্ট তহবিল থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, প্রয়োজন অনুসারে ভারত সরকার মাঝে মাঝে রিফাইন্যান্স কর্পোরেশনকে সুদবাহী ঋণ হিসাবে অর্থ সরবরাহ করবেন এবং যাতে উপযুক্ত সময়ে কাউণ্টারপার্ট তহবিল থেকে টাকা নেওয়া যেতে পারে সেজন্য ভারত সরকারের পক্ষ-থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যদি সাড়ে বারো কোটি টাকার সঙ্গে ছাব্বিশ কোটি টাকা যোগ করা হয় তা হলে প্রায় সাড়ে আটত্রিশ কোটি টাকা রিফাইন্যান্স কর্পোরেশনের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে। প্রত্যেক অংশ গ্রহণকারী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক এই টাকা থেকে বরাদ্দমত টাকা পাবেন।

বিগত ১৭ই জুন তারিখে বোম্বাইতে নবগঠিত পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের ডিরেক্টর বোর্ডের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী আয়েঙ্গার ব্যতীত কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ডিরেক্টরগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন :

শ্রী পি. সি. ভট্টাচার্য্য (রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান), শ্রী পি. এ. গোপালকৃষ্ণ (জীবনবীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান), শ্রী বি. ভেঙ্কপিয়া (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গবর্ণর), শ্রী এন. কে. করঞ্জিয়া (সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার), মিঃ জি. উডস (চার্টার্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজার) এবং শ্রী এস. টি. সদাশিবম (জেনারেল ম্যানেজার, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক)।

পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের ডিরেক্টর বোর্ডের প্রথম বৈঠকে এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বর্ত্তমানের জন্য কর্পোরেশনের বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ বারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট করা হবে। অবশ্য এ কথা আমরা আগে অনেকবার উল্লেখ করেছি। এক লক্ষ টাকা মূল্যের এক হাজার দু'শত পঞ্চাশটি শেয়ার নিয়ে এই মূলধন গঠন করা হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কর্পোরেশন, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং চৌদ্দটি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে এই সব শেয়ার বিলি করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে বিলিকৃত মূলধনের শতকরা দশ ভাগ এবং শেয়ারগুলো বণ্টিত হবার পর শতকরা আরও দশ ভাগ অর্থ দিতে হবে। এ ছাড়া এই বৈঠকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শিল্পে অর্থসংস্থান বিভাগের চীফ অফিসার শ্রী টি. কে. রামসুব্রহ্মনিয়ামকে পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়েছে। কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রেসনোটে বলা হয়েছে :

"One of the items considerd by the board today (June 17, 1958) relates to the execution of an agreement with the President of India so as to enable the Corporation to avail itself of loans to the extent of Rs. 26 crores being the equivalent of $ 55 million which has been reserved for re-lending to private enterprise in India under the agricultural commodities agreement between the Governments of India and the U. S. A".

শ্রী এন. সি. সেনগুপ্ত হলেন ভারত সরকারের অর্থদপ্তরের জয়েণ্ট সেক্রেটারী। তিনি ২৯শে জুলাই তারিখে নয়াদিল্লীতে মিঃ লিওনার্ড ই হাটজৈন-এর সঙ্গে একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

মিসেস হাওয়ার্ড ই হাউটম হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরী সহযোগিতা মিশনের ডাইরেক্টর। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারতে বেসরকারী শিল্প-প্রচেষ্টা ক্ষেত্রে মাঝারি আকারের শিল্পগুলোতে লগ্নী করার জন্য ছাব্বিশ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। রিফাইন্যান্স কর্পোরেশন মাঝারি আকারের শিল্পগুলোকে, তিন থেকে সাত বৎসরের জন্য ঋণ দেবার উদ্দেশ্যে নূতন করে অর্থ পাবেন। এই ঋণদানের প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বেসরকারী শিল্প-প্রচেষ্টা ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত শিল্পসংস্থাগুলোকে এই ঋণ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

নবগঠিত পুনর্লগ্নী কর্পোরেশনের কার্যপ্রণালী কি সেটা "রিফাইন্যান্স" এই কথাটি থেকেই অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অর্থাৎ এই কর্পোরেশন নিজে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে অর্থঋণ দেবার জন্য গঠিত হয় নি। এটা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ঋণদানের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য গঠিত করা হয়েছে। যাতে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নিয়ম মেনে ঋণ দেয় সেজন্য ব্যাঙ্কগুলোকে উৎসাহিত করাই হ'ল রিফাইন্যান্স কর্পোরেশনের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

ঝরা ফুল

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

তারা আসে অর্ঘ্য নিয়ে জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে—
লোকে-লোকে করে পূজা অন্তর উজাড় করে দিয়ে
তার পর কেউ ফেরে রিক্ত ভাণ্ড পূর্ণ করে নিয়ে,
কেউ বা পায় না কিছু, পাবে ভেবে হাত পেতে থাকে!

তারা এসে কেড়ে নেয় কৃপণের ধন, ভালবাসা;
সহজ সরল জনে কখনো কাঁদিয়ে চলে যায়!
যে শুধু দেওয়ার দায়ে হাসিমুখে দুহাত বাড়ায়
তাকে করে অবহেলা, তারা যে এমনি সর্ব্বনাশা!

কি কুক্ষণে কবি-মনে তুমিও এসেই গেলে চলে!
কি যে নিয়ে গেলে সাথে জানো না তো তার সমাচার,
কি ধন গিয়েছে ফেলে সে খোঁজও করো নি একবার
তোমার অজ্ঞাতে বোবা-পৃথিবীকে গেলে পায়ে দলে!

বার বার তারা আসে, সে-দলে তুমিও আসো ফিরে;
পূর্ণ করো, ধন্য করো আমায় এ-শূন্য ধরিত্রীরে!!

হেমন্তের দ্বিপ্রহরে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হেমন্তের দ্বিপ্রহর। সুনীল আকাশ;
বহিতেছে মধুক্ষরা নির্ম্মল বাতাস
মর্ম্মরিত বেণুবনে। বন-কপোতীর
করুণ কণ্ঠের গানে কোন্ উদাসীর
বৈরাগ্যের সুর বাজে অশ্রুছলোছল!
বাজোর ছাতারে যত করে কোলাহল
কার্ত্তিকের বনে বনে। দিকে দিকে আজ
পাখীদের কণ্ঠে কণ্ঠে বিচিত্র আওয়াজ।
ফুলের আসরে ঐ সেজেগুজে কারা
—স্থলপদ্ম, রক্তজবা, অপরাজিতারা—
রঙের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ করেছে হৃদয়!
যে দিকে তাকাই—দেখি ফুলে ফুলময়।
ঘুমঢাকা হেমন্তের অপূর্ব্ব দুপুর
মনের অঙ্গনে মোর বাজায় নূপুর।

চীন-ভারত সভ্যতার কথা

শ্রীপুলিনবিহারী বসু

জনসংখ্যায় ও আয়তনে এশিয়ার দুইটি বৃহত্তম দেশ, চীন ও ভারত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধীর সভ্যতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া হারাইয়াছিল বীর্য্য ও প্রাণ, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া দুই দেশই বুঝিতে পারিল তাহাদের দুর্ব্বলতা ও শক্তি-হীনতা এবং দুই দেশই নিজ নিজ উপায়ে হইল স্বাধিকার চেষ্টায় ব্রতী। আজ দুই দেশই স্বাধীন এবং নিজেরাই তাহাদের ভাগ্য-বিধাতা। চীন স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল সামরিক শক্তি দ্বারা এবং চলিয়াছে সমাজতন্ত্রের পথে। আর ভারত স্বাধীনতা পাইল আত্মিক শক্তি দ্বারা, কিন্তু সে আত্মিক শক্তি রোধ করিতে পারিল না। দেশ বিভাগ এবং চলিয়াছে বিশেষণযুক্ত সমাজতন্ত্রের পথে যে বিশেষণ আবার সদাই পরিবর্ত্তনশীল। তবুও আজ জাগিয়াছে দুই দেশের মধ্যে একটা প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব এবং পরস্পর চায় পরস্পরকে বুঝিতে।

চীন ও ভারতের পরিচয় নূতন নহে। তাহাদের বন্ধুত্ব দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপী। সে বন্ধুত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভারত-জাত বৌদ্ধধর্ম্ম চীনের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম এবং সে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথমাংশে।

ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি যেমন বেদ ও উপনিষদ, তেমনি চীন সভ্যতার ভিত্তি কনফিউসিয়াস ও লাওতের মতবাদ। কনফিউসিয়াস ও বুদ্ধ দুইজনের মতবাদের সাদৃশ্য হেতু বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনে আদৃত ও গৃহীত। সত্য কথা বলিতে গেলে এই দুই ধর্ম্ম মিশিয়া এক ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা চীনের বৌদ্ধ ধর্ম্ম। সাধারণতঃ ধর্ম্ম বলিতে গেলে আমরা যাহা বুঝি তাহার সহিত জড়িত থাকে এক ভগবান যিনি এই সৃষ্টির আদি ও অন্ত, তাঁহার প্রার্থনা বা পূজাপদ্ধতি এবং তাঁহার অবতার বা প্রেরিত পুরুষের আদেশাবলী যাহা আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক এবং যাহাকে ভিত্তি করিয়া গঠিত হয় আমাদের সমাজ। কিন্তু চীন ও ভারতের ধর্ম্ম এই শ্রেণীর প্রত্যাদেশমূলক ধর্ম্ম নহে। ভারতীয় ধর্ম্মের আরম্ভ প্রকৃতি-পূজা হইতে এবং মানবজ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ। ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম এমনই অঙ্গাঙ্গী জড়িত যে উভয়কে পৃথক করিতে গেলে আমরা ধর্ম্মের সার বস্তুই হারাইয়া ফেলি। ভারতের দার্শনিকগণ জগতের অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্যে তুষ্ট না হইয়া মগ্ন হইলেন এক শাশ্বত চিরসত্যের সন্ধানে এবং যখন তাঁহারা বিশ্বাস, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান ও অনুভূতি দ্বারা অমৃতের সন্ধান পাইলেন তখন এই জগৎ হইল তাঁহাদের কাছে মায়া, মানব-জীবন হইল সেই পরমব্রহ্মে উপনীত হইবার পথের একটা অংশ মাত্র এবং তখন ইহজগৎ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জগৎ তাঁহাদের নিকট প্রাধান্য লাভ করিল। ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি—পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই অথচ পৃথক। পার্থক্যের কারণ পরমাত্মা আত্মমুখী এবং জীবাত্মা বিষয়-মুখী। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য এই জীবাত্মাকে বিষয় বা বহির্জ্জগৎ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে পুনরায় পরমাত্মায় লীন করা।

আদিম চীনে প্রকৃতি-পূজা খুব সম্ভব ছিল না। কনফিউসিয়াস ও লাওতে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাকে তাঁহারা বলেন, টাও। কনফিউসিয়াস টাওকে স্বীকার করিয়াও তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করেন নাই। তিনি চিন্তা করিয়াছেন ভগবান-সৃষ্ট মানুষ সম্বন্ধে এবং এক নীতিশাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহাদের কল্যাণের জন্য। লাওতের মতে জ্ঞান ও নীতি দ্বারা মানুষের কল্যাণ সম্ভব নহে, পৃথিবীর কিছুই মানুষকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারে না, প্রকৃত শান্তির জন্য চাই টাও-এ বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ। তাঁহার চিন্তা ও ধ্যান। লাওতের দর্শনের মূলতত্ত্ব টাও বা ব্রহ্ম চির-সত্য,তাঁহা হইতেই এই সৃষ্টির উৎপত্তি,তাঁহাতেই এই সৃষ্টির বিলয়। মানুষ তাহার সসীম জ্ঞান, বুদ্ধি বা মন দ্বারা তাহাকে পাইতে পারে না, টাওকে পাইতে হইলে চাই ধ্যান, ধারণা, বিশ্বাস ও পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। সৃষ্টি সম্বন্ধে উপনিষদের মত লাওতে বলেন, পরব্রহ্ম সৃষ্টি-কর্ত্তা, তাঁহার সৃষ্টি সর্ব্বত্রই, তিনি বিরাজমান অথচ তিনি অসঙ্গ ও অকর্ত্তা এবং এই সৃষ্টি অনিত্য। উপনিষদের ও তাঁহার দর্শনের পার্থক্য এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে একই অর্থাৎ সোঽহম বা তত্ত্বম ভাব, তাঁহার দর্শনে পাওয়া যায় না। প্রধান পার্থক্য এই যে, ভারতীয় দর্শনে জগৎকে মায়া বলিয়া মানুষকে এই জগতের সহিত সর্ব্ব সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বলা হয়, কিন্তু লাওতের দর্শনে জগৎকে একটা জ্যামিতিক data বা প্রদত্ত বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয় এবং যেহেতু এই জগৎকে আশ্রয় করিয়া মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় এবং এই জগতে থাকিয়াই মানুষকে টাও-এর ধ্যান, ধারণা ও সমাধিতে মগ্ন হইতে হয় সেইজন্য এই জগতের উপর মানুষের একটা কর্ত্তব্য আছে। চীনের জনগণের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা যাহা কিছু গ্রহণ করে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা; কেবলমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া প্রত্যাদেশ বা গূঢ় রহস্য তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। সেইজন্যই লাওতের দর্শন চীনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৫১ অব্দে কনফিউসিয়াসের জন্ম। তাঁহার নিজের ভাষায় তাঁহার জীবনী এই "১৫ বৎসর বয়সে আমি জ্ঞানলাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ করিলাম, ৩০ বৎসর বয়সে আমি নিজের

স্বাধীন মত গঠন করিলাম, ৪০ বৎসরে আমি সকলসন্দেহ-মুক্ত হইলাম ৫০ বৎসর বয়সে আমি প্রকৃতির বিধান বুঝিতে পারিতাম, ৬০ বৎসর বয়সে আমি যাহা কিছু শুনিতাম বিনা আয়াসেই বুঝিতে পারিতাম এবং ৭০ বৎসর বয়সে আমি কোনও নৈতিক বিধি লঙ্ঘন না করিয়াই আমার সর্ব্ব কামনা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতাম।" ইতিহাস ও তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিচার-স্পৃহা জাগিয়া উঠিত। রাজনৈতিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী তাঁহাকে অতি সহজেই বিচলিত করিত। তাঁহার নির্দ্দেশিত নৈতিক বিধানাবলীর ভিত্তি জীবনের বাস্তবতা ও বৈচিত্র্য মানস-সৃষ্ট আদর্শ নহে।

কনফিউসিয়াসের নীতিদর্শনের মূল প্রশ্ন মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ ও ব্যবহার। তাঁহার মতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক পাঁচ প্রকার—(১) রাজা ও মন্ত্রী, (২) পিতা-পুত্র, (৩) স্বামী-স্ত্রী, (৪) জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, (৫) বন্ধু-বন্ধু। এই পাঁচ প্রকার সম্পর্কের নৈতিক ভিত্তি যথাক্রমে সত্যশীলতা, ভালবাসা, স্পষ্টতা (অসংশয়), শৃঙ্খলা ও অকপটতা। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার মত আইন ও শাস্তি লোকের নৈতিক উন্নতির সহায়ক নহে, ভয়ে তাহারা অন্যায় কার্য্য না করিতে পারে, কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা আত্ম-সম্মান জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা ও নৈতিক জ্ঞানের প্রসার হইলে তাহাদের বিচার বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয় এবং তখন তাহারা স্বেচ্ছায় অন্যায় হইতে বিরত থাকে। তিনি বলিলেন, শাসন করার অর্থ নিজেই সৎ হওয়া।

স্থান কাল পাত্র ভেদে মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহার বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং এই জন্য তিনি বিভিন্ন নীতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত পাঁচটি সূত্র হইতে তাঁহার বিভিন্ন নীতির একটি সুন্দর আভাস পাওয়া যায়।' (১) চরিত্রবান ব্যক্তি অর্থ ব্যয় না করিয়াও কল্যাণ সাধন করে, (২) কোনও রূপ অভিযোগের কারণ সৃষ্টি না করিয়া পরিশ্রমকে উৎসাহ দাও, (৩) লোভ ত্যাগ কর জীবনের আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে, (৪) অহঙ্কারী হইও না, কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদা হারাইও না, (৫) কঠোর না হইয়া সকলকে অনুপ্রাণিত কর।

কনফিউসিয়াসের নীতিশাস্ত্রে মানুষের বহু গুণের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার দর্শনের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি এই সমস্ত বিভিন্ন গুণের মধ্যে একটা সাংযোগিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দর্শনে মৌলিক গুণ জেন। জেন শব্দটি লিখিত হয় দুইটি চিহ্ন দ্বারা একটির অর্থ মানুষ, অপরটির অর্থ দুই। সুতরাং ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে জেনের অর্থ সেই গুণ যাহা দুইজন মানুষের সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন। ইহার বিশ্লেষণে তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আছে এবং ন্যায় অন্যায় ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতাও তাহার আছে। যদি সে অপর মানুষের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি জানিতে পারে তাহা হইলে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সে নিজেই ঠিক করিতে পারে। অপরের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বা মন জানিবার উপায় তিনি বলেন, তোমাকে তাহার স্থানে এবং তাহাকে তোমার স্থানে প্রতিষ্ঠিত কর। অর্থাৎ নিজের দুইটি বিভিন্ন সত্তা কল্পনা করিতে হইবে। তখন নীতি-নির্দ্ধারক বিচারক হইবে তোমার দ্বিতীয় সত্তা, তোমার প্রথম সত্তার নিকট হইতে যে ব্যবহার আশা করে না তুমিও তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে না। একজনের মনকে অপরের মনের স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজের মনকে অপরের মনের মত করাকে চৈনিক ভাষায় বলে সু। এই শব্দটি লিখিত হয় দুইটি চিহ্ন দ্বারা একটির অর্থ সদৃশং অপরটির অর্থ মন। বঙ্গভাষায় সদৃশ-মনতা বলা যাইতে পারে।

স্বাধীন ইচ্ছা যাহাতে অন্যায় না হয় সেইজন্য চাই আত্ম-সংযম এবং ভালমন্দ বিচারের জন্য চাই জ্ঞান। জ্ঞান ও গুণ দুই-ই একই সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন। গুণের অভাবে জ্ঞান হয় নিষ্ফল এবং জ্ঞানের গুণ অনেক সময় দোষ হইয়া দাঁড়ায়—যেমন সাহস হয় দুঃসাহস, সরলতা হয় নির্বুদ্ধিতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা হয় অত্যাচার, পরার্থপরতা হয় আত্মদ্রোহিতা।

এক সুখী ও সার্থক মানব-সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য কনফিউসিয়াস এক অষ্টাঙ্গিক মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ আমাদের পারিপার্শ্বিক সমস্ত জিনিসের সম্যক উপলব্ধি, তারপর যথাক্রমে (২) জ্ঞান ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন, (৩) শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ সংকল্প ও সত্যশীলতা, (৪) আত্মশুদ্ধি, (৫) আত্মসংযম, (৬) স্বীয় পরিবারে, (৭) স্বদেশে, (৮) বিশ্বে সুখ শান্তি ও শৃঙ্খলা। তাঁহার নীতিশাস্ত্রের মূল আত্মসংযম, কামনা-বাসনা জয়।

জন্ম-মৃত্যু, ভগবান, আত্মা প্রভৃতির জটিল তত্ত্বারণ্যে প্রবেশের চেষ্টা তিনি কখনও করেন নাই। ভগবান unknowoble বলিয়া তিনি তাঁহার সম্বন্ধে নীরব।

জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, জীবনের সব কথা জানি না, মৃত্যু কি বা তাহার পরে কি আছে বুঝিব কেমন করিয়া। যাহা জানা যায় তিনি শুধু তাহারই চিন্তা করিতেন। যাহার সম্বন্ধে কোনও প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় না তাহার চিন্তা কখনও করিতেন না। তিনি নিজেকে কোনও দিন ধর্ম্মপ্রচারক বলেন নাই এবং তাঁহার নীতিবাদকে ধর্ম্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মধ্যে নৈতিক জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার।

কনফিউসিয়াসের নীতিপ্রচারের প্রায় ৫০০ বৎসর পরে চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে জটিল দার্শনিক তত্ত্ব নাই, ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা নাই, বিশেষ কোনও আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। সে ধর্ম্ম মানুষকে বলে পবিত্র, সংযত, সেবাপরায়ণ ও প্রেমপরায়ণ হইতে। কনফিউসিয়াসের নীতিশাস্ত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য স্পষ্ট। সেইজন্যই ইহা চীনবাসীকে আকৃষ্ট

করে এবং ধর্মের অভাবে চীনবাসীর মনে যে শূন্য স্থান ছিল তাহা পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়।

চীন ও ভারত দুই দেশেরই সমাজের মূলে পরিবার এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন পরিবার-কেন্দ্রিক। পরিবারের নৈতিক উৎকৃষ্টতা ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও মধুর ভাব রক্ষার জন্য উভয় সভ্যতাই ব্যগ্র। ধর্মপ্রাণ ভারতে পিতা ধর্ম, কর্ম, পরমতপ, মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী, স্ত্রী সহধর্মিণী, পুত্র নরক হইতে ত্রাণকর্তা ও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক। চীনে পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা তথাকথিত অষ্টমার্গের অন্যতম এবং কনফিউসিয়াসের পাঁচটি মৌলিক সম্পর্কের মধ্যে তিনটি পারিবারিক।

ভারতীয় সভ্যতায় ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য শেষ করিয়া বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণের নির্দেশ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং সে বিকাশ শুধু নিজেকেই কেন্দ্র করিয়া। ভারতের ব্যক্তিত্ব-নীতি মানবিকতা ও সামাজিকতা বোধের পথে কতটা অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভারতের ব্যক্তিত্ব নীতি মানব সমাজকে কল্যাণকর করিবার জন্য কতটা ব্যবস্থা অনুশাসিত হইয়াছে সে তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমাজের অংশ হিসাবে মানুষের নৈতিক কর্তব্য চীনে যেরূপ স্পষ্ট নির্দেশিত ভারতে তাহা হয় নাই। জাতিভেদ-প্রথার উৎপত্তি কাহারও মতে আর্য্য ও অনার্য্যের অবাধ মিশ্রণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আবার কাহারও মতে কর্মের বিভিন্নতা। যে কারণেই হউক না কেন, ভগবানের সৃষ্ট মানুষের মধ্যে এই উচ্চ-নীচ জ্ঞান, এই পার্থক্য-সৃষ্টি একমাত্র ভারতীয় সভ্যতায় আছে। আজ ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। কিন্তু জাতিভেদ-প্রথার আনুষঙ্গিক অস্পৃশ্যতা যে সম্পূর্ণ মানবতা-বিরোধী তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আমরা বেদান্ত, উপনিষদ ও আধ্যাত্মিকতার গৌরব করি, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে আমাদের সামাজিক, গার্হস্থ্য বা ব্যক্তিগত জীবনে তাহার কোনও স্থান নাই। আমাদের তত্ত্বগুলি শুধু পুঁথিগত, সমাজের কোনও ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগের চেষ্টা কোনও দিন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। মনুসংহিতা বা অন্যান্য সংহিতার অনুশাসনে যে সমাজ গঠিত হইয়াছে তাহাতে সোঽহম্ ভাবটা বেশ আছে, কিন্তু তত্ত্বম্ ভাবটার অভাব। সমাজের বিভিন্ন স্তর বা অংশের মধ্যে কর্তব্য নির্দ্ধারণে চীনে মানবতার যতটা প্রভাব ভারতে বোধ হয় তাহা নাই।

মানুষ কি মিথ্যা? সৃষ্টির বিবর্তনে যে মানুষ মন পাইয়া অমৃতের রসাস্বাদ করিয়াছে কালক্রমে সে উন্নততর মন পাইয়া আরও কিছু নূতনের সন্ধান পাইবে কিনা কে জানে? সত্যের সন্ধানী মানুষও সত্য।

প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতা যতই গৌরবময় হউক না কেন স্বাধীন বর্তমান আধ্যাত্মিকতায় শুনি ধনীকে বলিতে "যেতনাই পাপ করো না কেন দান করনেসে বর্তনকা মাফিক সাফা হো যায়েগা" (দানটাও হয় আবার যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে এই উদ্দেশ্য লইয়া), মধ্যবিত্তকে দেখি আত্মার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে মুদ্রায় আর নির্ধন ও সর্ব্বহারাকে দেখি ভাগ্যের দোষে যুগ যুগ ধরি সর্ব্ব অত্যাচার ও অনাচার নীরবে সহিতে। আর এই আধ্যাত্মিকতাপুষ্ট মানবতার নিদর্শন পাই খাদ্যের ভেজালে, রোগীর ঔষধ ও পথ্যে, শিশুর দুগ্ধে, হাসপাতাল হইতে রোগীর নির্যাতনে, পাড়া-মাতান রেডিও গানে, প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে হাসপাতালগামী আসন্নপ্রসবা নারীর পথরোধে...

স্বাধীন ভারতবাসীর ব্রহ্ম হইয়াছে অর্থ। এই আত্ম-প্রবঞ্চনা আর কত দিন!*

---

* এই প্রবন্ধের চীন সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি ডাঃ কারসান চঙ্গ লিখিত এবং ডাঃ কালিদাস নাগ সম্পাদিত "China and Gandhian India" হইতে গৃহীত।

চিকাগোর স্মৃতি

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

সান-ফ্রান্সিসকো থেকে বিদায় নিলাম ২২শে অক্টোবর শুক্রবার। বিমান ষ্টেশনে পৌঁছে দিলেন মিসেস এডওয়ার্ডস, মিসেস এগান এবং বিল। সুন্দর ও অনির্ব্বচনীয় এই অনাত্মীয়ের নিবিড় আত্মীয়তা।

এরোপ্লেনে বসে ছবি তুললাম কয়েকটি। পথে খাওয়ার জন্ত একটি বড় আপেলর্ণকনে নিলাম—সঙ্গে ৫।৬ খানি বিস্কুট ছিল, তাই দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা হ'ল। এই বিমানে খাওয়া দেবার ব্যবস্থা ছিল না—তাই বিকালে পাশের ভদ্রলোকের চীজমাখা স্যাণ্ডউইচ খেলাম—এরা শুধু কাফি দিয়াছিলেন। পশ্চিম কূল থেকে মধ্য-আমেরিকায় চলেছি। বিমানের বাতায়ন-পথে চোখে পড়ল সুবিস্তৃত প্রান্তর, পর্ব্বত-শ্রেণী—হ্রদ, শস্যক্ষেত্র—শহর ও গ্রামের বাড়ী-ঘর।

বিলের নির্দ্দেশ মত মিসেস উইলসন নামক এক মহিলাকে চিঠি লিখেছিলাম—এয়ার পোর্টে নামবার পর খবর পেলাম—মিসেস উইলসন আমাকে চিকাগোর বিখ্যাত পামার হাউস মোটরে নিয়ে যাবেন। বিমান কোম্পানীর বাসে পামার হাউসে এসে গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলাম—তা প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

শিকাগোর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সহিত আলাপরত লেখক

মনে জাগছিল শঙ্কা ও দ্বিধা। অনেক পরে যখন মিসেস উইলসন এলেন তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ডক্টর উইলসন গাড়ী চালিয়ে এনেছিলেন।

রাত্রে খাওয়া হয়েছে কি না এবং কিছু খাব কি না—এ কথা ওরা আর জিজ্ঞাসা করলেন না—বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েই ওরা বেরিয়ে গেলেন—এদের এক ছেলে ও দুই মেয়ে—বড় ছেলে আর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা থাকে বাইরে—সঙ্গে থাকে ছোট মেয়ে মেরী। বাপ মা চলে যাওয়ার খানিক পরে মেরী এল—সেও যাত্রাগীণ—এসেই চুপচাপ থেকে কয়েক মিনিট পরে বেরিয়ে গেল।

নিঃসঙ্গ বাড়ীতে একা আর কি করি—জিনিসপত্র গুছিয়ে শয়নের ব্যবস্থা করলাম। রাত্রে আর আহার হ'ল না—অচেনা জায়গায় যায় হওয়া ঠিক মনে হ'ল না। এদের অবশ্য ফোন নেই—কারণ এরা ভেবেছিল আমি নিশ্চয়ই বাইরে খেয়ে আসব।

মিসিগান হ্রদের তীরে চিকাগো শহর—পৃথিবীর বৃহত্তম নগরের মধ্যে চতুর্থ—হ্রদ থেকে মৃদুমন্দ সমীরণ সারা বৎসর নগরে একটি মৃদু শীতল আবহাওয়া বজায় রাখে—এই বাতাসের জন্ত লোকে একে বলে windy city। নিউইয়র্ক চিকাগোর চেয়ে বড়, কিন্তু চিকাগো ব্যবসা বাণিজ্যে নিউইয়র্ককে ছাড়িয়ে যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিকাণ্ডে চিকাগো ভস্মীভূত হয়ে যায়, কিন্তু তার পর নবোৎসাহে এই বিরাট নগর গড়ে উঠেছে। এর সমুচ্চ ও সুবৃহৎ অট্টালিকার সমৃদ্ধি নিউইয়র্কেও নাই বলা চলে।

চিকাগোর মাংসের বাজার জগতের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এত পশু কোথাও একত্র করা হয় না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই বিরাট নগরের বিরাট কর্ম্ম-প্রবাহ ভাবতে ভাবতে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে আজ আর স্নান করলাম না—কেমন শীত শীত লাগছিল। পৌনে আটটায় বিতল থেকে নীচের হলঘরে নামলাম। এরা নামল ৮৩০ মিনিটে।

মিসেস উইলসন প্রাতরাশ খুব খাওয়ালেন। ডক্টর উইলসন আপিসে যাওয়ার সময় আমাকে International House নামক বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এখানে সনৎকুমার বসু নামক একজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি আমাকে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা স্থানে ঘুরিয়ে আনলেন—তার পর মিসিগান হ্রদের ধারে গিয়ে উনি বিদায় নিলেন। আমি একা একা Science Museum দেখলাম। জ্যাকসন পার্কে অবস্থিত এই বিরাট শিল্পবিজ্ঞান ভবন জুলিয়াস রোজেনওয়াল্ড কর্তৃক স্থাপিত।

এইখানেই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ধর্ম্ম সম্মেলন হয়। এখানে দাঁড়িয়ে সেই বিগত দিনের কথা মনে জাগল। মনে মনে বীর বিবেকানন্দের দিগ্বিজয়ের কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিলাম। প্রায় ১৪ একর জমির উপর এই বিরাট যাদুঘর অবস্থিত। প্রবেশদ্বারে লেখা আছে—"বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করে, আর শিল্প তাকে মানুষের ব্যবহারে লাগায়।"

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের এই আদর্শ এখানকার চমৎকার চমৎকার প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে সুচারু ভাবে দেখান হয়েছে। এই সুবিশাল কলাভবন একদিনে দুদিনে ভাল ভাবে দেখা সম্ভব নয়—সেই সময় আর ধৈর্য্য আমার ছিল না—আমি শুধু চোখ বুলিয়ে নিলাম। এখানে দশ সেণ্ট দিয়ে ফলের রস পান করলাম, তার পর ৫০ সেণ্ট দিয়ে একখানি বই কিনে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরলাম।

বাসায় ফিরে মিস্ ড্যানিশ যে সব পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন তাদের ফোনে ডাকলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কার্ল বিংম্যান এডভোকেট—তিনি অসুস্থ হয়ে পল্লীভবনে শুয়ে রয়েছেন রোগশয্যায়—মিসেস জেকব ভোটদ্বন্দ্ব নিয়ে ব্যস্ত। শ্যামাচরণ মাঝি বলে একজন ছেলে এদেশী মেয়ে বিয়ে করে বাস করছে—তার স্ত্রী এবং তার সঙ্গে আলাপ হ'ল—শ্যামাচরণ এখানকার ভারতীয় সভার সম্পাদক। তাকে International House গৃহে একটি সভার আয়োজনের অনুরোধ জানালাম। আজ রবিবার—উঠলাম ৫-১০ মিনিটে। তার পর মনের আনন্দে স্নান করলাম। খানিক পড়াশুনা করে ৮-১৫ মিনিটে হলঘরে নামলাম। প্রাতরাশ খেতে দশটা বাজল। তার পর এদের সঙ্গে এদের ব্যাপ্টিষ্ট গির্জ্জায় গেলাম। গির্জ্জা ৫০০০ উডলন আভিনিউয়ে অবস্থিত, প্রারম্ভিক গান হ'ল অর্গানে—তার পর প্রার্থনা আহ্বান হ'ল Awake my tongue Thy Tribute bring—এই গানটি গেয়ে। তার পর প্রার্থনা হ'ল—ভগবানের ইচ্ছায় জীবন সমর্পণের কথা বলে। তার পর হ'ল বাইবেল পাঠ—একে বলে Responsive reading—এই ভাবে ঘণ্টা দুই কাটল। খ্রীষ্টান প্রার্থনায় এ ভাবে আর যোগ দিই নি।

মানুষের হৃদয়ের সহিত জগৎপিতার যোগসাধনের এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা হয় ত সকলে মানবে না, কিন্তু এর সামাজিক ও মানসিক মর্য্যাদা তুচ্ছ করবার নয়। বাসায় ফিরে ডক্টর উইলসন মোটর করে বেড়াতে নিয়ে গেলেন—মিসিগান এভিনিউ বেয়ে গেলাম গ্রাণ্ট পার্কে। এখানে জেনারেল লোগানের একটি চমৎকার মূর্ত্তি আছে। মিসিগানের নীল জলের পাশে এই সুন্দর সুদৃশ্য পার্কটি চিকাগোর আকাশচুম্বী হর্ম্ম্যমালার মাধুর্য্য শতগুণ বাড়িয়ে তোলে। ওখান থেকে Lake drive দিয়ে গেলাম লিনকন পার্ক পশুশালায়। সেখান থেকে এলাম Planetarium দেখতে—এই নক্ষত্রভাগে আকাশের সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারার ভ্রমণ সুন্দর ভাবে দেখান হয়। তার পর গেলাম Natural History museumএ—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্শাল ফিল্ড এটা স্থাপন করেন। আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকার অতীত ইতিহাসকে সুন্দর সুন্দর প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে চমৎকার ভাবে বাস্তবে পরিণত করা হয়েছে। দুষ্প্রাপ্য নানা বস্তুর সংগ্রহে এখানে জলের মত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এটা দেখে বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফিরে কাছের একটা মনোহারী দোকানে ষ্ট্যাম্প কিনতে গেলাম। ষ্ট্যাম্প কিনতে ২০ সেণ্ট হারাল—কি করে যে হারাল বুঝতেই পারলাম না - দোকানের মেয়েটি ঠকিয়ে নিল কিনা ধরতেই পারলাম না। রাত্রে বসে বসে রেডিও শোনা গেল, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রার্থনা ছিল আজকের বিশেষ প্রোগ্রাম।

সোমবার, আজ একাকীই এলাম Internatioal House-এ—এত ভোরে চিঠি পাওয়া যায় না—ওখান থেকে Oriental Institute-এ গেলাম। তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব অধ্যাপক ডক্টর রেশফিল্ডের সন্ধান করলাম—তার সেক্রেটারী আগামী কাল তার সঙ্গে দেখা করবার সময় করে দিলেন। তার পর ধর্ম্মের অধ্যাপক joachim wacha-র সঙ্গে দেখা করলাম। তার Divinity School-এ তিনি অনায়াসেই বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর আদৌ আগ্রহ দেখলাম না। মানুষটি বেশ চতুর এবং অমরল—তার পর অধ্যাপক রোজনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে International House-এ ফিরে এলাম। প্যারিস P. E. N. সম্পাদক চিঠি দিয়েছেন করাচীতে—Skarder নামক এক ভদ্রলোকের সাহায্যে তাহার পাঠোদ্ধার হ'ল। ওখান থেকে ট্রেনে করে গেলাম Down-town.

Wr gley Building-এ টাওয়ারে উঠলাম—কুয়াশায় সারা দিক আচ্ছন্ন ছিল বলে বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হ'ল না। ৪০০নং উত্তর মিসিগান এভিনিউতে এই বিরাট বাড়ী। রাত্রে এই হর্ম্ম্য-শিখরপুঞ্জ যখন অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন সে এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। এর উচ্চতা ৩৯৮ ফিট। সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিনে চিকাগোর এক বিরাট ছবি টাওয়ার থেকে দর্শকের চোখে পড়ে। উপরের দুটি তলা জুড়ে এক বিরাট ঘড়িও আছে এই বাড়ীতে। ঘড়িটির চার দিকে চারটি ডায়াল—প্রত্যেকটি ডায়ালের ব্যাস ২০ ফিট।

সেখান থেকে গেলাম এদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈনিকপত্র চিকাগো ট্রিবিউনে। ফ্যানি বুচার এখানে কাজ করেন—তিনিই P. E. N. Club-এর সম্পাদিকা। বুড়ী একান্ত রসকষহীন মানুষ—বলল চিকাগোর P. E. N. শাখার কিছুই কাজকর্ম্ম হয় না, সে আমার জন্য কিছুই করতে পারবে না। যখন বললুম, তাদের কাগজে আমার সম্বন্ধে কিছু ছাপাবার কথা, তখন একজন রিপোর্টারকে ডেকে বুড়ী বিদায় নিল। রিপোর্টারটিও রাম্ভ লোক, বলল, তোমার credential নেই, তোমার কিছু আমারা কাগজে ছাপাতে পারব না। ট্রিবিউনের বাড়ীটিও অতি বিপুল, এটা ৪৫৬ ফিট উচ্চ।

এখান থেকে গেলাম আর্ট মিউজিয়মে, দেখলাম নানা ধরনের ছবি, তখন এখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। রঙ ও রেখার আলিম্পনে বর্ত্তমানে যে সব উদ্ভট ছবি তৈরী হয়, তার অনেকগুলি দেখলাম, তার ভাবার্থ উদ্ধার করা অতি কষ্টকর। চীন, জাপান, পারস্য, ইজিপ্ট ভারতবর্ষ থেকেও অনেক শিল্পদ্রব্য আহৃত হয়েছে। গ্রীক ও রোমক শিল্প, মধ্যযুগীয় এবং রেনেসাসের ভাস্কর্য্য, বারোক এবং আধুনিক ভাস্কর্য্য, এক বিচিত্র ও বিপুল সংগ্রহ। প্রবেশ-দক্ষিণা ৩০ সেণ্ট দিতে হয়েছিল।

তার পর বাসে করে Collage-grove নামক যায়গায় এলাম। সেখান থেকে অনেক সন্ধান করে বাসায় ফিরলাম। ফোনে Foriegn Policy Association-এর সম্পাদিকার সঙ্গে আলাপ করলাম। মেয়েটি খুব ভাল, বেশ সৌজন্যের সঙ্গে সব শুনল, পরে বলল অন্যান্যের সঙ্গে আলাপ করে বক্তৃতার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবে। রাত্রে ডিনারের পর ডক্টর উইলসন তার মুভি দেখাতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু এর আলো ঠিক ছিল না, তাই ম্যাজিক লণ্ঠনে তাঁর ভ্রমণকাহিনী দেখালেন। বেশ ভাল লাগল, ছবিগুলি রঙীন আর যেখানে যেখানে ডক্টর উইলসন গেছেন, সেখানকার দ্রষ্টব্যকে ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন। তার নৈপুণ্য এবং আনন্দে আমি মুগ্ধ হলাম। রাত্রি ৯-১৫ মিনিটে বিদায় নিয়ে শুতে গেলাম।

প্রভাতের আলোকিত প্রাণসত্তায় চারিদিক যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সপ্রতিভ হাসি হেসে মিসেস উইলসনের নিকট বিদায় নিয়ে ডক্টর নন্দীর ওখানে গেলাম—ইনি দন্ত-চিকিৎসক। আমার দাঁতের বেদনা হয়েছিল, তাঁকে দেখালে তিনি বললেন—দাঁত তুলতে হবে। কিন্তু যতদিন না তুলি ততদিনের জন্য একটা ঔষধ দিয়ে দিলেন। ডক্টর নন্দী অনেক দিন আমেরিকায় আছেন, কিন্তু আমেরিকাকে ভাল চোখে দেখেন না।

হেঁটে হেঁটেই চললাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাস্তায় রাস্তায় চলেছে কলকোলাহল রাজপথের বৃহৎ বনস্পতির মাঝে যেন প্রাণের পরম বিস্ময়। আনন্দের সঙ্গে University Campus-এ পৌঁছে গেলাম। মেকফিল্ড অসুস্থ তাই আসেন নি। রোজানস্কির সঙ্গে আলাপ হল। মানুষটি ভাল কিন্তু আমার জন্য কিছুই করতে পারবেন না বললেন।

Oriental Institute দেখতে আর ইচ্ছা হল না। চিঠির সন্ধান করে down-town সিভিক সেণ্টারে গেলাম। সবচেয়ে এখানে যা ভাল লাগল সেটা এদের পরিকল্পনা। চিকাগো শহরকে নবতর ও মধুরতর করবার জন্য এরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অনন্ত অভ্যুদয়—এই হ'ল এদের অভিলাষ।

এখানকার নীচের তলায় এক চেক দোকানদারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। সে বলল, "ইউরোপ শান্তিময়, সুখময়। এখানে শুধু টাকা আয়ের বিরাট স্বপ্ন—" গতি মানুষকে ক্লান্ত করে। সাগরের দূরান্তে যে রূপলোক সেখানে কল্পনার পাখা নিয়ে মানুষ উড়তে চায়, কিন্তু এই অবিরাম চলাকে সে সহজে গ্রহণ করতে পারে না—সে চায় বিরাম, সে চায় স্থিতি।

মেয়রের সন্ধান নিলাম। একজন কর্ত্তব্যরত পুলিশ মৃত্যুমুখে পড়েছে, তার সমাধির ওখানে গিয়েছেন তিনি। তাঁর সহকারী যিনি, তিনি বেশ অমায়িক মানুষ। তার হাত কাটা—কিন্তু কাজের দিকে তাঁহার অদম্য উৎসাহ। তিনি সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। এদের কাজকর্ম্ম বুঝালেন—কাগজপত্র দিলেন।

তার পর দুপুরে গেলাম এদের আদালতে। District Attorney মিঃ গুনটেকনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল। ইনি ভারতবর্ষ বেড়িয়ে এসেছেন—দিল্লী, বোম্বাই দেখে এসেছেন। দেখালেন এদের এক চমৎকার ঘড়ি। মোরগ বার হয়ে ঘণ্টা জানায়। তার পর জজদের ঘরে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন। এক সঙ্গে ছবি তোলা হ'ল।

এদের Chief Justice বোল্টন বুড়ো মানুষ, কিন্তু বেশ সদাশয় ও আলাপী—তার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল।

ওখান থেকে নামবার পর বাটারফিল্ড বলে একজন এটর্ণি পামারহাউসে নিয়ে গিয়ে রেস্তরায় কাফি খাওয়ালেন। ওদের under ground বাসের জায়গা দেখালেন। তার পর ট্রলি করে এবং বাসে করে বাসায় ফিরলাম।

মিসেস উইলসন Y. W. C. A. সমিতির সভ্য। সেখানে যাবেন, তাই সকাল সকাল রাত্রির খাওয়া সেরে নিলাম। বুড়ী আমার জন্য নিত্য নূতন খাবার তৈরি করেন। ওরা সবাই বার হয়ে গেল। মেরীর বন্ধু একজন পোল-যুবক নাচ শিখতে আসবে, তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য হলঘরে বসে রইলাম। পোল-যুবক এল, কিন্তু মেরী না থাকায় সে অন্য নাচের মজলিসে চলে গেল। মিসেস উইলসনের বন্ধু মিসেস মুর এলেন, তার সঙ্গে খানিক আলাপ হ'ল।

রাত্রে শোওয়ার ঘরের আলো নিভে গেল, অপ্রস্তুত হয়ে বুড়ীকে ডাকলাম—মিসেস ঠিক করে দিলেন। বললেন, এটা তাঁর কুকুর জেমির দুষ্টামি।

জেনিকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে খাওয়ার লোভে সে রান্নাঘরে লাফালাফি করে বেড়ায়।

কয়েকখানি চিঠি লিখে শুয়ে পড়লাম।

বুধবার, ২৭শে অক্টোবর। সকাল থেকে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা—বেশ শীত করতে লাগল। উইলসন পোষ্টাপিসে নিয়ে গেলেন—সেখান থেকে Oriental Institute দেখতে গেলাম। জেমস ব্রেষ্টেড প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এটা স্থাপন করেন। পাঁচটি ঘরে মিশর, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, তুর্কী, ইরাক ও ইরাণ দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ জড় করা হয়েছে। ছোটখাট হলেও বেশ ভাল। তার পর এদের চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম—দেখা হ'ল না। তার পর চিঠির সন্ধানে গেলাম। কয়েক জন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করলাম, কারও দেখা পেলাম না। ফিরে এসে পিকাডেলি থিয়েটারে একটা ছবি দেখলাম—খরচ হ'ল ৮৭ সেণ্ট। অযথা অপব্যয়ের জন্ম মন খারাপ লাগল।

বাসায় ফিরে মিসেস উইলসনকে দিয়ে ওভার কোটের বোতাম বদলে নিলাম। স্বামী বিশ্বানন্দের সঙ্গে ফোনে আলাপ হ'ল। তাঁর ওখানে যেতে বললেন। রাত্রে ইণ্টারন্যাশন্যাল হাউস-এ বক্তৃতা হ'ল। ঘর ভর্তি লোক হয়েছিল। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তর চলল। ডক্টর উইলসন ও মিসেস এলেন। সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু তার ফলোৎপত্তি হ'ল না—এদেশীয় কেউ নূতন কোথাও কিছু বলতে বললেন না—আলোচনার জন্ম বিরক্ত করলেন না।

বৃহস্পতিবার ডক্টর উইলসনের বন্ধু গিবসন তার প্লাষ্টিক কারখানা দেখাবার জন্ম সাড়ে নয়টায় এলেন। কারখানাটি ১৫।১৬ মাইল দূরে—চিকাগোর শহরতলীতে স্থাপিত। বুড়া তন্ন তন্ন করে সব দেখিয়ে দিলেন। প্লাষ্টিক সম্বন্ধে একখানি বড় বই দিলেন—সেটা বড় বলে নিয়ে আসতে পারি নি।

এখান থেকে পুনরায় Science Museum দেখতে গেলাম। প্রথম কুরুক্ষেত্রে ধৃত জার্মান সাবমেরিন দেখে গেলাম De Harding মিউজিয়ামে। জর্জ্জ হার্ডিং নামে এক ভদ্রলোক নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্ম এই যাদুঘরের জিনিসপত্র সংগ্রহ করেন—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এটা স্থাপিত হয়েছে—এখানে মধ্যযুগের যুদ্ধাস্ত্র, বর্ম্ম প্রভৃতির উৎকৃষ্ট সংগ্রহ আছে। নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র, যুদ্ধ জাহাজের মডেল, আসবাবপত্র এবং ছোট্ট চিত্রশালাও আছে। সেখান থেকে বাসায় ফিরে আগামী কাল ফিলাডেলফিয়ার জন্ম বিমানে আসন নির্দ্দিষ্ট রাখার জন্ম ফোন করলাম। তার পর ফিলাডেলফিয়ার অধ্যাপক হোল্ডেন কারবারিকে ১ ডলার ৫ সেণ্ট খরচ করে একটি টেলিগ্রাম করলাম।

বুড়ী আজ রাত্রে খাওয়ার বিশেষ আয়োজন করেছিলেন—আহার শেষে ফোনে বিশ্বানন্দের সঙ্গে আধ ঘণ্টা আলাপ হ'ল—তার ওখানে বিকালে যাওয়ার কথা ছিল—কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় কষ্ট করে সেখানে গেলাম না।

বিশ্বানন্দ বেশ আলাপী মানুষ—নানা ধরনের কথাবার্ত্তা হ'ল।

বিশ্বানন্দ বললেন—"বাংলার ভবিষ্যৎ ভেবে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে।"

উত্তরে বললাম—"সে কথা ঠিক, বাঙালী আজ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে কেউ নয়—সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে বাঙালী দিনে দিনে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।"

—"এ কি অযোগ্যতা না ঈর্ষ্যা?"

—"খানিকটা অযোগ্যতা, খানিকটা ঈর্ষ্যা—সুযোগ জীবনে বড় জিনিস—বাঙালী তরুণেরা আজ সুযোগ পাচ্ছে না।"

—"কিন্তু তবু বাঙালী মরবে না—কি বলেন।"

—"সেই আশাই করুন—বঙ্গভঙ্গের বেদনা ছাপিয়ে বাঙালীর প্রাণসত্তা ফুটে উঠুক এই কামনাই করুন।"

—"আসবে—আসবে—নবীন অভ্যুদয়ের রক্তিম আলো নামবে।"

বুড়ীকে আমার কয়েকটি শার্ট কাচবার জন্ম দিয়েছিলাম—চীনা ধোপার কাছে তার তাগাদা করবার জন্ম ব্যস্ত হলেন—সে সেগুলি বেছে দিতে পারল না—বুড়ী চিন্তিত হলেন। পরে অন্য শার্ট দিয়ে দিলাম—তাই নিয়ে আমার শার্ট খুঁজে আনলেন।

আমার খুব সর্দ্দি লেগেছে। মিসেস জননীর মত স্নেহব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, "কমলা লেবুর রস এর ঔষধ—খান তাই ভাল করে" এই বলে একটিন কমলা লেবুর রস দিলেন।

ডক্টর উইলসনের সঙ্গে ভারত ও আমেরিকার সম্বন্ধ নিয়ে কথাবার্ত্তা হ'ল। উইলসন বললেন—"ভারতের নিরপেক্ষতা আমরা আদৌ পছন্দ করি না—আপনাদের যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছিল—তখন আমরা সক্রিয় সহানুভূতি দেখিয়েছিলাম—আজ রাশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষের দিনে আপনাদের এই উদাসীনতা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না।"

স্পষ্টবাদী উইলসন। তাকে আমি ভারতীয় বৈদেশিক নীতির কথা বুঝিয়ে দিলাম। অহিংসার মাধ্যমে জগতে নেমে আসবে এক নব যুগ—তার আগমনে ভারতের অবদান হবে দৃপ্ত ও দীপ্ত।

ডক্টর উইলসন চুপ করে শুনলেন কিন্তু হয়ত বুঝতে পারলেন না। অহিংসা ও প্রেম বাস্তবপন্থী মানুষের নিকট কল্পনার সামগ্রী বলেই মনে হয়।

২৯শে শুক্রবার। ভোর রাত্রি ৩-৩০ মিনিটে ঘুম ভাঙল। ৪টায় উঠে পড়লাম—ভাল করে স্নান করে পোশাক পরে John Gunther রচিত "Behind the Curtain" বইটি পড়লাম। গুন্থার লেখক হিসাবে অতুলনীয়—অনেক খবর তার জানা। রাশিয়ার অনেক গোপন তথ্য পরিবেশন করে লিখেছেন সরস ও চিত্তাকর্ষক বই। লিখবার শৈলী খুব চমৎকার, উপন্যাসের মতন সুখপাঠ্য।

সাড়ে সাতটায় উঠে ডক্টর উইলসন ছবি তুললেন। তার পর প্রাতরাশ খেয়ে নিলাম। বুড়ী ছাঁদা বেঁধে সঙ্গে স্ন্যাক দিয়েছিলেন। আমি সামান্য কয়েকটি জিনিস উইলসন দম্পতীকে উপহার দিয়েছিলাম—ওরা আমার জন্য দিলেন একটি গরম মধ্যাহ্ন।

বিদেশী এই অপরিচিত দম্পতী যে সদ্ব্যবহার করেছিলেন, তা জীবনে ভুলবার নয়। "দূরকে করিলে নিকট বন্ধু! পরকে করিলে ভাই—" পথে বাহির হলে কবির এই কথার সত্যতাটি একান্তভাবে উপলব্ধি হয়।

ডক্টর উইলসন মোটরে করে বিমানঘাটিতে নিয়ে এলেন। ওরা ভুল করেই হউক বা ইচ্ছা করেই হউক Air-coach-এ না দিয়ে দিল ওদের Main-line-এর বিমানে।

ডক্টর উইলসন বিদায় নিলেন। তাঁকে সজলচোখে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তাঁর ছেলে ও মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা ঘটে ওঠে নি। তাঁর কন্যা ষ্টাটেন দ্বীপে থাকেন—সেখান থেকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—কিন্তু নির্দ্ধারিত দিনে তাঁর ছেলেদের অসুখ হওয়ায় সে নিমন্ত্রণ বাতিল করতে বাধ্য হন। ছেলে নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি তাঁদের ওখানে বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পারেন নি—কাজেই সেখানে যাওয়া হয় নি। তা না হউক—জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে রইলেন সদাপ্রসন্ন ডক্টর উইলসন আর তার হাস্যমুখী পত্নী মিসেস উইলসন। সবার উপরে মানুষ সত্য—এই নিঃস্বার্থ প্রেমের মধ্যেই সে কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

আদি বেদ কোনটি ?

শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ

বাল্যাবধি শুনিয়া আসিতেছি—বেদসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীনতম। ভারতের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্যতঃ এই মতটিই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকগুলিতে পর্য্যন্ত এই বার্ত্তাই পরিবেশন করা হইতেছে। প্রাচীন-ভারতীয় তথ্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত প্রত্যেক গবেষকই উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গবেষণাকার্য্য চালাইয়া থাকেন; এবং এদেশের ও বিদেশের প্রায় প্রত্যেক প্রখ্যাতনামা লেখকই নির্ব্বিচারে এই বার্ত্তাটিকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। কোন কোন গবেষক অথর্ব্ববেদের অংশবিশেষের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াও তাহার অপর অংশের অর্ব্বাচীনত্ব কল্পনা করিয়া সমগ্র অথর্ব্ববেদখানিকেই অর্ব্বাচীন বেদ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

বেদসমূহ অতি প্রাচীন—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত প্রবীণ মনীষীর পক্ষেও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। যদি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলেই এইরূপ ভুল মার্জ্জনীয়; কিন্তু তাদৃশ প্রমাণ থাকিলে দীর্ঘকাল যাবৎ এবম্বিধ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত চলিতে দেওয়া মোটেই সঙ্গত নহে।

বেদাদিশাস্ত্রে এবং মধ্যযুগীয় বহু গবেষণামূলক গ্রন্থে বেদের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে এত প্রমাণ আছে যে, আমি ভাবিয়া বিস্মিত হই—এত সব প্রমাণ থাকিতেও আধুনিক যুগের আচার্য্যেরা কেমন করিয়া এমন একটি ভ্রান্ত ধারণাকে সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদকে ছাড়িয়া দিলে বাকী যত গ্রন্থ থাকে, তাহাদের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীনতম। ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন ঋষি ও যজ্ঞাগ্নির প্রবর্ত্তক হিসাবে অথর্ব্ববেদ-প্রবক্তা অথর্ব্বা ঋষির নামোল্লেখ দেখা যায়। অথর্ব্বা এবং অঙ্গিরা মুনির শিষ্য-প্রশিষ্যগণের মধ্যেই অথর্ব্ববেদ প্রথমে প্রচারিত হয়। উক্ত অঙ্গিরা ঋষির নামোল্লেখও ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে দেখা যায়। প্রমাণ হিসাবে দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিতেছি—

"ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত।
মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ।" (ঋগ্বেদ ৬।১৬।১৩)

বঙ্গার্থ—হে অগ্নে! অথর্ব্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্কর হইতে মন্থন করিয়া তোমাকে নিঃসারিত করিয়াছেন।

"অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা
অথর্ব্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানা—
মপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম॥"
(ঋগ্বেদ, ১০।১৪।৬)

বঙ্গার্থ—অঙ্গিরা নামক, অথর্ব্বন্‌ নামক এবং ভৃগু নামক আমাদের পিতৃলোকগণ এইমাত্র আসিয়াছেন। তাঁহারা সোমরস পাইবার অধিকারী এবং যজ্ঞকার্য্যে অভিজ্ঞ। তাঁহাদের নির্দ্দেশিত সুবুদ্ধি, উদারতা এবং মঙ্গলজনক পথে আমরা বিদ্যমান থাকিব।

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলটিকে কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালের রচনা মনে করেন; কিন্তু ষষ্ঠ মণ্ডল যে অতি প্রাচীন, এই সম্বন্ধে সকলেই একমত। এমতাবস্থায় ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলেও প্রাচীন ঋষি হিসাবে যে অথর্ব্ববেদ প্রবক্তা অথর্ব্বা ঋষির উল্লেখ আছে, তাঁহারই প্রচারিত বেদটিকে কেমন করিয়া অর্বাচীন বলা যায়, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

কেবল ইহাই নহে। মুণ্ডক উপনিষদের প্রথমেই লিখিত আছে—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব,
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা—
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
অথর্ব্বণে যং প্রবদেত ব্রহ্মা
অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্‌।
স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ,
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্‌॥"

বঙ্গার্থ—দেবতাদের মধ্যে সকলের আদিতে ছিলেন—ব্রহ্মা। তিনিই সমগ্র বিশ্বের পোষক ও রক্ষক। উক্ত ব্রহ্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা প্রাচীনকালে অথর্ব্বাকে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন অথর্ব্বা তাহা অঙ্গিরা ঋষির নিকট বলিয়াছিলেন। অঙ্গিরা সত্যবাহ ভারদ্বাজের নিকট এবং ভারদ্বাজ অঙ্গিরার শিষ্য-প্রশিষ্যদিগের নিকট এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন।

অতএব, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আদি ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বপ্রথম অথর্ব্বা ঋষির নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিল, এবং ইহাই পরবর্ত্তীকালে উক্ত অথর্ব্বা ঋষির নামানুসারে অথর্ব্ব বেদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আদিদেব ব্রহ্মার অনুগ্রহবশতঃ অথর্ব্বা ঋষির চিত্তপটে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব ঘটে। অথর্ব্বাকে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে বর্ণনা করার হেতু এই যে, পিতা যেমন পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রকেই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাদান করেন, ব্রহ্মার অনুগ্রহও তেমনি মনুষ্যগণের মধ্যে অথর্ব্বা ঋষিকেই সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মবিদ্যায় অভিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছিল।

যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদের বিভিন্ন স্থানেও অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ (প্রকরণ-১৩, প্রপাঠক—৩, কাণ্ডিকা—৭), এবং সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৭ম প্রপাঠক, ৬ষ্ঠ খণ্ড) এর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত দুইটি স্থলেই অথর্ব্ববেদের প্রশংসাপূর্ব্বক তাহার অবশ্য প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া তাহাকে বেদ নামেই অভিহিত করা হইয়াছে।

গোপথ ব্রাহ্মণে অথর্ব্ববেদেরই প্রাধান্য প্রকটিত হইয়াছে। তথায় প্রশ্নোত্তরমুখে স্পষ্টভাষায় বলা হইয়াছে যে, যিনি অথর্ব্ববেদে অভিজ্ঞ, একমাত্র তিনিই যজ্ঞকার্য্যে ব্রহ্মা হওয়ার অধিকারী (গোপথ ব্রাহ্মণ, ২।২৪)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৫।৩৩) "মনসৈব ব্রহ্মা সংস্করোতি" কথাটি দ্বারা অথর্ব্ববেদবেত্তা ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

রামায়ণের যুগেও যে অথর্ব্ববেদ প্রমাণরূপে বিবেচিত হইত এবং অথর্ব্ববেদের বিধান অনুসারে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহারও প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে রামায়ণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ।
অথর্ব্বশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ॥"

বঙ্গার্থ—তোমার পুত্রলাভের জন্য আমি অথর্ব্বশিরাঃ উপনিষদে উল্লিখিত মন্ত্র ও বিধানের সাহায্যে অতিপ্রসিদ্ধ যজ্ঞ সম্পাদন করিব।

অথর্ব্বশিরাঃ অথর্ব্ববেদের একখানা উপনিষদের নাম। উল্লিখিত শ্লোকটি রাজা দশরথের নিকট মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ বলিয়াছিলেন; এবং উল্লিখিত বিধানে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিয়া দশরথ রাজাকে পুত্রলাভে সমর্থ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা ভর্ত্তৃহরি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। উক্ত মহাত্মাও তাঁহার বাক্যপদীয় গ্রন্থে অথর্ব্ববেদের প্রাথম্যই স্বীকার করিয়াছেন।

"অথর্ব্বণামাঙ্গিরসাং সাম্নাসগ্‌যজুষস্য চ।
যস্মিন্‌ উচ্চাবচা বর্ণাঃ পৃথক্‌স্থিত-পরিগ্রহাঃ॥"
—বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড, ২১ শ্লোক।

কাশ্মীর প্রদেশীয় মহামনীষী জয়ন্ত ভট্ট খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তাঁহার ন্যায়মঞ্জরী নামক গ্রন্থের প্রমাণ প্রকরণে স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন—বেদসমূহের মধ্যে অথর্ব্ববেদই সর্ব্বপ্রথম (প্রাচীনতম)।

"তচ্চ চতুর্দ্দশবিধং যানি বিদ্যাংসশ্চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানান্যাচক্ষতে। তত্র বেদাশ্চত্বারঃ। প্রথমোঽথর্ব্ববেদঃ, দ্বিতীয়ঃ

ঋগ্বেদঃ, তৃতীয়োঃ যজুর্ব্বেদঃ, চতুর্থঃ সামবেদঃ··· ··।"
—ন্যায়মঞ্জরী, প্রমাণ প্রকরণ, পৃষ্ঠা—২ ॥

বেদসমূহের মধ্যে অথর্ব্ববেদই যে প্রাচীনতম, ইহা বিশ্বকোষ অভিধানেও একপ্রকার স্বীকৃত হইয়াছে। তথায় অথর্ব্বন্ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"ঋগ্বেদ প্রভৃতি প্রাচীন পুস্তক দেখিয়া এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে, অথর্ব্বা প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং আর্য্যদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করেন।"

যিনি সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞ ও যজ্ঞাগ্নির প্রবর্ত্তন করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রচারিত বেদ সকল বেদের মধ্যে প্রাচীনতম।

অথর্ব্ব বা অথর্ব্বন্ শব্দের অর্থ—অতি প্রাচীন। যখন কোন লোক বার্দ্ধক্যহেতু চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়েন, তখন আমরা বলি—ইনি একেবারে অথর্ব্ব হইয়াছেন। অথর্ব্ব শব্দের এই অর্থদ্বারাও তাহার অতি প্রাচীনতা সমর্থিত হয়। ঋক্, যজু এবং সামবেদে অথর্ব্ববেদের বহু মন্ত্র অবিকৃত অবস্থায় গৃহীত হইয়াছে। উক্ত তিনটি বেদে পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বাচার্য্য হিসাবে অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা ঋষির উল্লেখ থাকায়, অথর্ব্বাকে অগ্নির স্রষ্টা হিসাবে বর্ণনা করার, এবং সর্ব্বোপরি অথর্ব্ববেদের মন্ত্রসমূহ এইভাবে পরবর্ত্তী বেদসমূহে গৃহীত হওয়ায় আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, অথর্ব্ববেদই প্রাচীনতম।

অথর্ব্বা ঋষিকে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং অগ্নির স্রষ্টা হিসাবে বর্ণনা করায় স্পষ্টই বুঝা যায়, ঋগ্বেদের রচনাকাল হইতে অথর্ব্ববেদের রচনাকাল এত অধিক পূর্ব্ববর্ত্তী যে, ঋগ্বেদের ঋষিগণের নিকট অথর্ব্বা ঋষির বিবরণ স্মরণাতীত ঐতিহাসিক ব্যাপাররূপে বিবেচিত হইত। অথর্ব্বা ঋষিগণের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়াই তাঁহাকে এই নামে এবং ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ইহা আমরা অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারি।

অথর্ব্ববেদের ভাষাদ্বারাও তাহার অতি প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিতেছি—

"যথেদং ভূম্যা অধি তৃণং বাতো মথায়তি।
এক মথ্নামি তে মনো, যথা মাং কামিন্যসো
যথা মন্নপগাঃ অসঃ ॥ ১ ॥
সং চেন্নয়াথো অশ্বিনা কামিনা সং চ বক্ষথঃ।
সং বাং ভগাসো অগ্মত সংচিত্তানি সমুব্রতা ॥ ২ ॥
যৎ সুপর্ণা বিবক্ষবো অনমীবা বিবক্ষবঃ।
তত্র মে গচ্ছতাদ্ধবং শল্য ইব কুল্মলং যথা ॥ ৩ ॥
যদন্তরং তদ্ বাহ্যং যদ বাহ্যং তদন্তরম্।
কন্যানাং বিশ্বরূপাণাং মনো গৃভায়ৌষধে ॥ ৪ ॥
এয়মগন্ পতিকামা জনিকামোঽহমাগমম্।
অশ্বঃ কনিক্রদদ্ যথা ভগেনাহং সহাগমম্ ॥ ৫ ॥

—অথর্ব্ববেদ। ২য় কাণ্ড। অনুবাক ৫। সূক্ত—৩০ ॥

উল্লিখিত ৫টি মন্ত্রের মধ্যে প্রাচীনত্বসূচক প্রয়োগ এত অধিক যে, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশও ইহার কাছে হার মানে। যজুর্ব্বেদ বা সামবেদের ত কথাই নাই। ভূম্যা অধি, মথায়তি, এবা, কামিন্যসো, মন্নপগা অসঃ, অশ্বিনা, বক্ষথ, ভগাসো, অগ্মত, সমুব্রতা, সুপর্ণা, অনমীবা, গৃভায়, এয়মগন্, জনিকামো, কনিক্রদৎ, আগমম্, এই প্রত্যেকটিই অতি প্রাচীন বৈদিক প্রয়োগ। তাহা ছাড়া উল্লিখিত মন্ত্রগুলিতে স্থিত 'ভূম্যা অধি', 'নয়াথো অশ্বিনা' এবং 'ভগাসো অগ্মত' এই সন্ধিগুলিতেও অতি প্রাচীন বৈদিক বিধানেরই নিদর্শন দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতেও এই শ্রেণীর প্রয়োগ আরও অনেক কম দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত দ্যাবাপৃথিব্যৌ অর্থে দ্যাবাপৃথিবী (৬৬৫৪১), বহতি আহ 'বহাতি' (৬৬৫৪১), দধতু অর্থে 'দধাত' (৬৬৫৪২), গচ্ছামি অর্থে 'গমেমহি' (১১।১।১৪), মৃগাঃ অর্থে 'মৃগাসো' (৬৬৫২২), কুরু অর্থে 'কৃধি' (৬১৫১), কুর্ম্মঃ অর্থে 'কৃণ্মে' (৬১৫৩), বর্দ্ধয় অর্থে 'বর্দ্ধয়া' (৬১৫৩) ইত্যাদি প্রাচীনতম বৈদিক প্রয়োগ অথর্ব্ববেদে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

ইউরোপীয় মনীষিগণও অথর্ব্ববেদের প্রাচীনত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। প্রখ্যাত মনীষী R. T. H. Griffith তাঁহার অথর্ব্ববেদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"The Atharva is, like the Rik, in the main historical and original, but its contents cannot, as a whole, lay claim to equal antiquity."

বঙ্গার্থ—অথর্ব্ববেদও ঋগ্বেদের ন্যায় মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক এবং মৌলিক; কিন্তু ইহার রচনাগুলি সামগ্রিকভাবে সমান প্রাচীনত্বের দাবি করিতে পারে না।

অধ্যাপক Whitney অথর্ব্ববেদের অংশবিশেষকে অর্ব্বাচীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহার মৌলিক অংশ যে ঋগ্বেদ প্রণয়নের সময় বিদ্যমান ছিল, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

"The greater portion of the hymns are plainly shown both by their language and internal character, to be of much later date than the general contents of the other historical veda··· however would not imply that the main body of the Atharva hymns were not already in exis-

tence, when the compilation of the Rik took place." (Griffith-এর ভূমিকার মূল)।

বঙ্গার্থ—(অথর্ব্ববেদের) অধিকাংশ মন্ত্রই তাহাদের ভাষা ও রচনাভঙ্গী দ্বারা অন্যান্য ঐতিহাসিক বেদের রচনা অপেক্ষা অত্যন্ত অর্ব্বাচীন বলিয়া প্রতীত হয়......কিন্তু ইহা দ্বারা বুঝায় না যে, ঋগ্বেদের রচনাকালে অথর্ব্ববেদের মূল অংশ বর্ত্তমান ছিল না।

অধ্যাপক Weber ও অথর্ব্ববেদের অংশবিশেষের অতি প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে অথর্ব্ববেদ সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আর ঋগ্বেদ প্রচলিত ছিল শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক Weber লিখিয়াছেন—

"But the Athorva-Samhita likewise contains pieces of great antiquity, which may perhaps have belonged more to the people proper, to its lower grades, whereas the songs of the Rik appear rather to have been the property of higher family."

বঙ্গার্থ—কিন্তু অথর্ব্ববেদ সংহিতাতেও অতি প্রাচীন অংশসমূহ বিদ্যমান। সম্ভবতঃ, ইহা নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যেই অধিকভাবে প্রচলিত ছিল। অপরপক্ষে ঋগ্বেদের গানগুলি উচ্চশ্রেণীর লোকদের সম্পত্তি ছিল।

অধ্যাপক Max Muller-ও অথর্ব্ববেদের অন্ততঃ অংশবিশেষের অতি প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"The songs known under the name of the Atharva ngirasas formed probably an additional part of the sacrifice from a very early time."

বঙ্গার্থ—সম্ভবতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে অথর্ব্বাঙ্গিরস নামে পরিচিত গানগুলি যজ্ঞের একটি অতিরিক্ত অংশ রচনা করিয়াছিল।

অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন বেদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মুখে মুখে প্রচলিত হইত। লিপি-বিদ্যা প্রচলিত হওয়ার পরেও বহুকাল পর্যন্ত ইহারা সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় সমকালে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস চারিটি বেদকে পৃথক-ভাবে সঙ্কলন করেন। এই সময়ে উল্লিখিত মহর্ষি যে সকল মন্ত্রের সম্প্রদায় নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই, অথবা যে সকল অর্ব্বাচীন মন্ত্র বেদের সমমর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহাদিগকে অথর্ব্ববেদে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

অথর্ব্বা এবং অঙ্গিরা গোত্রের ঋষিগণের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে যে ১২৩০০টি মন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহারাই মূল অথর্ব্ববেদ। এই মূল অথর্ব্ববেদকেই আমরা প্রাচীনতম বেদ বলিয়া অভিহিত করিতে চাই। পরবর্ত্তী-কালে সঙ্কলনকারী মহর্ষি ব্যাস যে সকল নূতন অংশ অথর্ব্ব-বেদে প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহার প্রাচীনত্ব প্রমাণে আমরা প্রয়াসী নহি। কুমারিল ভট্ট, জয়ন্ত ভট্ট, সায়নাচার্য্য প্রভৃতি ভারতীয় মনীষিগণ যে অথর্ব্ববেদকে প্রাচীনতম বলিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত মৌলিক অথর্ব্ববেদ বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, একখানি প্রাচীন গ্রন্থে যদি পরবর্ত্তীকালে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি উক্ত সমগ্র গ্রন্থখানিকেই অর্ব্বাচীন বলিতে হইবে? নিশ্চয়ই এরূপ বলা সঙ্গত নহে। অথর্ব্ববেদের বেলাও ঠিক এই কথাই খাটে, যদিও বা পরবর্ত্তীকালে অথর্ব্ববেদে কিছু অংশ যোগ করা হইয়া থাকে, তথাপি এই কারণে সমগ্র অথর্ব্ববেদখানিকে অর্ব্বাচীন বলা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে।
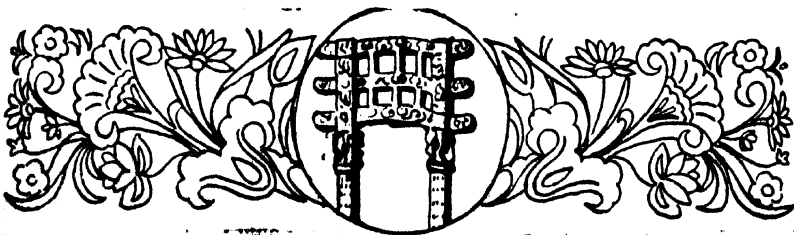
সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

পন্থাগুলো কি হবে, ভাল কি মন্দ, পার্থিব কি অলৌকিক সে সব চিন্তা করতে গেলে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হটে যেতে হয়। পরাজয়ে গ্লানি আর দুঃখে জর্জ্জরিত হয়ে ধূলিসাত হয় শেষ পর্য্যন্ত। হাসনু তাকাল সাধুজীর দিকে। হঠাৎ তার চেহারাটা খুব পরিচিত বলে মনে হ'ল তার ঠিক এই ধরনের মানুষের সংস্পর্শে জীবনে যেন এসেছে বলে মনে হ'ল। অনেক জুয়া ও গুণ্ডার আড্ডায় সে বহুবারই নাইট-ক্লাবে, ক্যাবারেতে ডান্সিং বা গার্ডেন পার্টিতে সে যেন অনুরূপ ব্যক্তিত্বের সাহচর্য্য আর সংস্পর্শে কয়েকবারই এসেছে। হাসনু শুনতে পেল সাধুজী মেম সাহেবকে বলছেন—

সব ঠিক হো যায়ে গা—সাধুজীর হিন্দি উচ্চারণ ভঙ্গীটা বাঙ্গালী কথিত হিন্দির মত নয়, চমকে উঠেছিল হাসনু ওঁর বাচনিক ভঙ্গী লক্ষ্য করে, অবিকল হিন্দুস্থানীদের মত। বিভিন্ন জাত এবং ভাষার সঙ্গে মেশার ফলে সাধুজীর অনেক ভাষার ওপর দখল এসে গিয়েছে হয় ত, ভাবল হাসনু।

কোই ডর নেহি, সব ঠিক হো যায়গা স্বামীজী বলছেন কেট্ ডগলাসকে, আশ্বাসের সুরে। কেটের নরম শুভ্র হাতটা নিয়ে অনেক কচলাকচলি করলেন তিনি।

ঠিক হো যায়গা ক্যায়সে ? দুর্ভোগের অবসান কি করে সম্ভব হবে, সে কথা ধারণা করতে পারল না কেট্ ডগলাস।

গ্রহকা ফের হ্যায়—দুর্ব্বোধ্য জিনিসটা সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করলেন স্বামীজি—কেয়া হ্যায় ? মানেটা ঠিক বোধগম্য হ'ল না কেটের।

ব্যাড ষ্টারস্। স্বামীজীর ভাঁড়ারে দু-একটা ইংরেজী কথার সঞ্চয় আছে—

আই সি, এতক্ষণে বুঝলে কেট্ ডগলাস—ভাগ্যাকাশে দুষ্ট গ্রহের আবির্ভাবে সম্মোহিত হ'ল সে, অস্ফুট স্বরে বললে, তব ক্যায়া হোগা সাডুজী ? আর্ত্তনাদের মত শোনাল কেট ডগলাসের কথাটা—

ডর মাৎ, ইসকো সমমে রাখখো—পার্শ্বস্থিত বালির মধ্য থেকে একটা শুকনো শিকর বার করে দিলেন স্বামীজী। অনেক দরকারী জিনিস সঞ্চিত তাতে, ভক্তিভরে কেট-ডগলাস সেটা নিল। মনে পড়ে গেল ঠিক এইরকম একটা শিকড়ের প্রভাবে জেনীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে পেয়েছিল সে। এতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে তার, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় তার মুখটা ঝলমল করে ওঠল, এতদিন পরে তার দুর্ভাগ্যের অবসানের ইঙ্গিত দেখতে পেল সে। ইঞ্জিনের হুইসিলের তীক্ষ্ণ আওয়াজটা শোনা গেল।

খুক্ খুক্ কমলাকান্ত কাশছে, কাশিটা ঠিক কবি সুলভ নয়। গলার মধ্য থেকে অব্যক্ত আর্ত্তনাদের মত বার বার সেটা বেরিয়ে এসে বিরক্ত করছে তাকে। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা বার করে নিলে, তা ছাড়া গলাটাকে যত্ন করছে কমলাকান্ত। অতি নিকট আত্মীয়ের মত পরমাদরে তাকে নিবিড় উষ্ণতায় ঢেকে রেখেছে, জানলাটা অবশ্য বন্ধ করেনি সে। ইচ্ছে একবার হয়েছিল বটে, কিন্তু বাইরের উন্মুক্ত আবহাওয়া আর দৃশ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে শেষ পর্য্যন্ত মন উঠল না তার। আবছা অন্ধকারের ঢাকা চলমান দৃশ্য দেখতে লাগল কবি। ট্রেনটা চলছে ঝক্ ঝক্ ঝক্, একটানা শব্দ করে। একটা গ্রামের পাশ দিয়ে গাড়ীটা চলেছে এবার। আশপাশে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা কুটির দেখা গেল। গ্রাম্য পরিবেশে মানুষের বসতি—অনেকদিন পরে দেখল কমলাকান্ত। গ্রামের রাস্তা পার হ'ল ট্রেনটি। দুপাশের গেট দুটো বন্ধ করা। গেট-ম্যান হাতে সবুজ বাতি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, নীরব আশ্বাসের প্রতীক নিয়ে। গেট বন্ধ হওয়ার জন্য দুটো গরুরগাড়ী আর কয়েকজন লোক আটকে রয়েছে। দুটো ধূমান্বিত হ্যারিকেন জ্বলছে, গরুর গাড়ীর সামনে। আর একটু দূরেই উন্মুক্ত জায়গায় জনসমাগম লক্ষ্য করল কমলাকান্ত। গ্রামের হাট বলে মনে হ'ল তার কাছে। সেখানেও কয়েকটা আলো জ্বলছে। সব জিনিসটাই কমলাকান্তের নিকট অত্যন্ত প্রিয়, পরিচিত আর নিজস্ব বলে মনে হ'ল। অদূরে একটা কুটিরের মধ্যে মিটমিট করে আলো জ্বলছে দেখতে পেল সে। কিষাণ বধূ অপেক্ষা করছে স্বামীর প্রত্যাশায়, তাকিয়ে আছে আঁকা-বাঁকা পথের দিকে। ওদের সুখ-দুঃখ ভরা জীবনের চিত্রটা কবির মানসপটে ভেসে উঠল। হাট থেকে মানুষটা ফিরলে, ধূলিধুসরিত হাতমুখ ধোবার জন্য জল রেখেছে এক ঘটি, পাশে তার একটা পিঁড়ে পাতা। বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট কুটীরের মধ্যে জেগে রয়েছে দুটি শ্রান্ত অলস চোখ। কান পেতে রয়েছে শূন্য-অঙ্গনে

পদধ্বনি শোনার জন্য। আর তার জন্যে কে প্রতীক্ষা করছে? মেসের সেই হলদে পার্টিশান দেওয়া ঘরটির মধ্যে সেই ক্রীম রঙের টিকটিকিটা হয়ত নিঃসঙ্গ বোধ করছে তার অভাবে? মনে মনে হাসল কবি। তাকে যেমন এই ট্রেনটি দূরে নিয়ে যাচ্ছে, এমন ত কত লোকই চলেছে। কত দুঃসহ বেদনা মুখর বিরহেরই না সৃষ্টি করছে এই ট্রেনটি! স্বামী চলে যাচ্ছে হয়ত তার নববধূকে ছেড়ে, ছেলে চলেছে দূর দেশে মায়ের স্নেহ-বন্ধনকে ছিন্ন করে। প্রেমেরও বিচ্ছেদ এল হয়ত কারও বা জীবনে। আবার অপর দিকটাও ভাবল কবি কমলাকান্ত—এই ট্রেনটি আবার কত বিরহের অবসান ঘটাচ্ছে। অনেক দিন পরে আনন্দোজ্জ্বল ঘরে ফিরে যাচ্ছে, কোন প্রবাসী হয়ত ঐ কৃষাণ বধূর মত কেউ হয়ত আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই। লোক চলেছে এপার থেকে ওপারে ক্রমাগত। এ বিরহ মিলনের সেতু যেন এই ট্রেনটা রূপকথার রাজপুত্রের মত নিজের খেয়ালে—কখনও দান আর কখনও বা বঞ্চিত করে চলেছে জনে জনে। ঝক্ ঝক্ ঝক্—ইঞ্জিনের আওয়াজটা যেন সায় দিল কবি কমলাকান্ত সরকারের চিন্তায়।

সুনীল রায় একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছে। দুর্ভাবনার জটটা যেন ক্রমশঃই দুরূহ হয়ে উঠেছে তার কাছে মুহূর্তে মুহূর্তে। মানসিক চাঞ্চল্য এলে সুনীল রায় সিগারেট খায় একটার পর একটা। গলা আর জিবের স্বাদটা পালটে গিয়েছে তার এতক্ষণে। নিকোটিনের তিক্ততা ভিজিয়ে রেখেছে তার মুখের ভেতরটা আরও ভেজা আমের টুকরোর মত। তবুও আর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করল সে। এটা না করলে আরও ছটফট করতে হয় তাকে। জলন্ত দেশলাই কাঠিটা সিগারেটের প্রান্তে ধরে রাখার সময় তার আঙুলগুলো কেঁপে উঠল, বার বার এটা তার নজরে পড়ে কেন? এটা সে লক্ষ্য না করলেই ত পারে, অগ্রাহ্য কেন করে না? এটা যে একটা স্নায়বিক দুর্বলতা সে কথা সুনীল রায় বোঝে, এবং বোঝে বলেই সেটাকে বন্ধ করতে চেষ্টা করে প্রাণপণে। ফল কিন্তু একই হয়—অর্থাৎ কম্পনটা বন্ধ ত হয়ই না, উলটে যেন বেড়ে যায়। সমস্ত জিনিসটা চিন্তা করতে গিয়ে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল সে।

অনেক ঝুঁকি নিয়েছে সত্যি কিন্তু সেই সঙ্গে ধরা যাতে না পড়ে সেজন্যে সবদিক দিয়েই ত সে আঁটঘাঁট বেঁধে কাজ করেছে বলে মনে হ'ল তার। শেষ করা কাজের পরিকল্পনাটি আবার ভেবে নিয়ে কোন খুঁত বার করতে পারল না সুনীল রায়। নিজেই নিজের বিরুদ্ধে মনে মনে অনেক যুক্তিই খাড়া করতে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দোষী প্রতিপন্ন হ'ল না কোন মতেই। এবার মনে একটু বল পেল সে। সিগারেটের দগ্ধাংশটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে সেটাকে নিভিয়ে দিয়ে ধোঁয়াটা মুখ দিয়ে উদ্গীরণ করে দিল সুনীল রায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলিটা চক্রাকারে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে সুরু করেছে। হিসাব-পত্রে কোন খুঁত আছে বলেও ত মনে হ'ল না। কিন্তু আবার সুনীল রায়ের মনের কোণে উদ্বেগ আর দ্বিধার কালো মেঘটা ঘনীভূত হয়ে উঠল। সন্দেহের ভূতটা আবার কোন অসতর্ক মুহূর্তে তাকে আশ্রয় করেছে। হঠাৎ কামরার আলোটার ওপর নজর পড়ল সুনীল রায়ের, একটা পোকা বার বার আলোটার চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করছে আর বসছে এক একবার। সুনীল মনে মনে ভেবে নিলে, যদি পোকাটা এক থেকে তিন অবধি গোণবার মধ্যে আলোটার ওপরে বসে তা হলে সে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে না। এক···মনে মনে বললে সুনীল, দুই বলার আগে একটু সময় নিলে সে। সেই সঙ্গে আন্তরিকভাবে পোকাটাকে আলোর ওপর বসতে অনুরোধ করল; শুধু তাই নয়, সমস্ত মনের জোরটা অর্থাৎ উইল ফোর্স প্রয়োগ করে পোকাটাকে আলোর ওপর বসতে বাধ্য করতে চেষ্টা করল সে। দুই, নাঃ—পোকাটা বৃত্তাকারে শুধু ঘুরেই চলেছে, আলোর ওপর বসছে না মোটেই। এর আগে কিন্তু বার বার বসছিল। ওটা আলোর ওপর বসার জন্য যে সুনীল রায়ের জীবনমরণ একটা সমস্যা নির্ভর করছে এটা সে বুঝতেই চাইছে না যেন। তিন—মনে মনে বললে সুনীল রায়। এইটাই শেষবার না; এবারও সব উপেক্ষা করে পোকাটা সমানে প্রদক্ষিণ করে চলল আলোটাকে। হ্যাঁ, ধরা পড়ে যাবে সে, এ বিষয়ে সে এখন নিঃসন্দেহ—মুহ্যমান মনের প্রতিক্রিয়াটা সুনীল রায়ের সারা শরীর শিথিল করে দিল এক নিঃশ্বাসে। দুর্ব্বলতাটা ক্রমবর্দ্ধমান হয়ে তাকে যেন গ্রাস করতে চাইল। এক পেগ হুইস্কি খেতে হবে পরের ষ্টেশনে, ভাবল সুনীল রায়। হুইস্কির তীব্র স্বাদটা আর উন্মত্ততা মুখে আর পাকস্থলীর মধ্যে অনুভব করল সে। হাসনুর দিকে চোখ পড়ল তার, হুইস্কি এবং হাসনু একই যোগসূত্রে বাঁধা রয়েছে, একটার কথা ভাবলে আর একটাও মনে পড়ে যায় সেই সঙ্গে। সুনীল দেখল কুঞ্চিত কেশের একটা গুচ্ছ হাসনুর কপালের সামনে দুলছে। ঝক্ ঝক্ ঝক্—ট্রেনটায় ঝাঁকুনি লাগল অকস্মাৎ। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অপর কামরায় নানুভাই দেশাই ল্যাভাটারির থেকে বার হওয়ার মুখে টালটা সামলে নিলেন পাশের দেওয়ালটা ধরে। নানুভাই দেশাই ভ্রুকুঞ্চিত করে এসে বসলেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট জায়গায়। ট্রেনের অকস্মাৎ

ঝাঁকুনিতে তিনি বিরক্ত হন নি, বিরক্ত হয়েছেন অকারণে এতগুলো টাকা অপব্যয় হওয়াতে। হাসন্তু আর সুনীল রায়কে বার করতে এবং হাসমুকে দিয়ে বইটা শেষ করাতে তাকে অযথা এই বিড়ম্বনায় পড়তে হ'ল। ধীরেন ভড়ের জন্যেই এই অঘটন ঘটেছে। আহম্মকটা এ অবস্থার কথাটা ভেবে দেখারও সময় পায় নি। হাজার হোক, বাঙালী ত, ভাবলেন নানুভাই দেশাই। অপরিণামদর্শী, পরশ্রীকাতর, আত্মবিদ্বেষী, শ্রমবিমুখ এ জাতটার সম্বন্ধে নানুভাই-এর ধারণা ভাল নয়।

ধীরেন—ডাকলেন নানুভাই।

অ্যাঁ, চমকে উঠেছে সে। এতক্ষণ একমনে অপর দিকের বেঞ্চে বসা মেয়েটিকে লক্ষ্য করছিল ধীরেন ভড়।

মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের রবীনবাবু কোথায়? জিজ্ঞেস করলেন নানুভাই।

পাশের থার্ড ক্লাসে কেন?

মানে এখানে ভীড় হলে আপনার কষ্ট হবে তাই। প্রভুভক্তির চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করল ধীরেন ভড়।

কষ্ট হবে? থার্ড ক্লাসে গেলেও আমার অসুবিধে হ'ত না। নানুভাই-এর কথাটা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করলে তিনি প্রকৃতপক্ষে আরও স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম পেতেন। নানুভাই দেশাই আরামপ্রিয় নন। যুক্তকণ্ঠে জনগণ সমক্ষে অবশ্য তিনি আরাম হারাম হ্যায় একথা ঘোষণা করেন নি, কিন্তু প্রত্যেক কাজকেই তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন প্রচুর। তিনি ঠিক বাঙালী বাবুদের মত নন।

কাপড়, জামা, সেণ্ট, সিনেমা, পরদা, সোফা বন্ধুদের নিয়ে চারবেলা ভুরিভোজ—নতুন নতুন উত্তেজনার লোভে শুধু শুধু নিজেদের দেউলিয়া করা। আর মাসের শেষে অফিস থেকে, এর তার কাছ থেকে দু'দশ টাকা ধার নেওয়া, এ তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং ধীরেন ভড়ের কথায় তিনি প্রীত হলেন না।

ট্রেন থামলে গিয়ে ডেকে এন—

আচ্ছা, এত সহজে নিষ্কৃতি পাবে এ আশা ধীরেন ভড়ের ছিল না। সব ব্যাপারেই তাকে সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়—কি ঘরে কি বাইরে। দ্বিতীয়পক্ষে বিয়ে করে আর এক ঝঞ্ঝাট হয়েছে—ভেবেছিল পল্লীগ্রামের মেয়ে কলকাতায় এসে খুশীই হবে, হাতে আকাশের চাঁদ পাবে। ওমা, একেবারে উল্‌টো ব্যাপার—ঝগড়া, ঝগড়া, ঝগড়া—এ ছাড়া কথা নেই। অবশ্য ভাল যে বাসে না তা নয়। এই ত গত মাঘ মাসে নিউমোনিয়া হয়েছিল—এক হাতে সব করেছে, রাতের পর রাত জেগেছে। বিছানা ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও নড়তে চায় নি। শুধু কি তাই, নিজের গলার হার, হাতে বালা সব বাঁধা দিয়েছিল তার চিকিৎসার জন্যে। তখন ঝগড়া বাধত সত্য ডাক্তারের সঙ্গে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল ধীরেন ভড়ের। তখন তার অসুখ বাড়ের মুখে। একদিন সত্য ডাক্তারকে অপর্ণা বললে—

ডাক্তারবাবু একটা কথা বলব?

বলুন, সত্য ডাক্তার তাকালেন অপর্ণার দিকে।

আপনি ত রোজ চারটে করে ফুঁড়ছেন, কিন্তু জ্বর ছাড়ছে না কেন?

এইবার সারবে—ঢোক গিলে বললেন তিনি।

সাত দিন হয়ে গেল, আপনি না হয় এক কাজ করুন ডাক্তারবাবু—

বলুন—

আরও চারটে করে ফি নিন একসঙ্গে।

কেন, শুধু শুধু ফি নেব কেন? আশ্চর্য্য হন ডাক্তারবাবু।

আমি জানি, বাঁকড়োর মধুসূদন ডাক্তার ঠিক এই-রকম করে—যেই মনের মত ফি টি পেল ব্যস—অমনি অসুখ সেরে গেল রোগীর।

না না, ও-সব ঠিক কথা নয়—ব্যস্ত হলেন সত্য ডাক্তার।

ঠিক কথা নয় মানে? নিজের চোখে দেখা। ডাক্তারদের আর কি বলুন না, রোগী যতদিন ভোগে ততই ভালতাদের।

সব অসুখই সময়ে সারে—টাইফয়েড যদি চার দিনে সারাতে চান তা কি হতে পারে? অত ভয় পাচ্ছেন কেন?

ভয় কি আর সাধে পাই ডাক্তারবাবু? পাড়াগাঁ থেকে এসেছি কলকাতায় স্বামীর ঘর করব বলে—কিন্তু ও লোকটাই যদি ওরকম করে পড়ে রইল, তা হলে আর সাহস পাব কোত্থেকে?

তার দু'চার দিন বাদেই ধীরেন ভড়ের অসুখ সেরে গেল। কিন্তু বিপদ দেখা দিল অন্যদিক দিয়ে—সেদিন নজরে পড়ল অপর্ণার গলায় হারটা নেই—দোষের মধ্যে শুধু সে বলেছিল—

হ্যাঁ গো তোমার গলার হারটা কোথায়?

চুলোয়, জানে না ন্যাকা;

কেন, কি হ'ল?

বলতে লজ্জা করছে না—ভুঁড়ি উল্টে এক মাস বিছানায় শুয়ে রইল, আর হার কি হ'ল?

আমি বলেছিলাম নাকি তোমার হারটা নষ্ট করতে?

তবে কি করতে শুনি? কোমরে হাত দিয়ে এগিয়ে এল অপর্ণা।

কেন হাসপাতাল কি নেই? সেখানে যেতাম—ভয় দেখাচ্ছ কাকে? ধীরেন ভড়ের কি অভিমান থাকতে নেই? কিন্তু চালে ভুল হ'ল। অপর্ণা রেগে গেল আরও।

হাসপাতাল কেন নিমতলায় গেলে ত পারতে?

তা হলে ত বাঁচতাম—আবার অভিমান করে ভুল করলে ধীরেন ভড়।

তুমি নয়, তুমি নয়—আমি বাঁচতাম, আমার হাড়ে বাতাস লাগত—বুঝলে, আমার হাড়ে বাতাস লাগত।

দুম্ দুম্ করে চলে গেল অপর্ণা। কিছুক্ষণ পরেই এক বাটি দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকল।

দুধটা খেয়ে নাও।

কিন্তু ধীরেন ভড়েরও অভিমান তখনও রয়েছে।

নাঃ, খাব না—মুখ ফিরিয়ে নিলে ধীরেন ভড়।

কি বললে? জ্বলে উঠল যেন অপর্ণা, খাবে না? এই বাটি দিয়ে ওই যে তোমার ছেলে শুয়ে রয়েছে ওর মাথায় মারব। সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে—বুঝলে?

কি, খাবে?

দাও—ধীরেন ভড় দুধটা খেয়ে নিলে।

অপর্ণা আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে দিলে ধীরেন ভড়ের।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি হয়েছে দেখ না—ধীরেন ভড়ের সন্দেহ হ'ল, অপর্ণার ঠোঁটের কোণে হাসির যেন আভাস রয়েছে। আচ্ছা দজ্জাল মেয়েছেলে যা হোক।

ওধারে বেঞ্চে বসা মেয়েটা ত মন্দ নয়, নানুভাই কয়েক বার সতৃষ্ণ দৃষ্টি দিয়েছে—তা সে লক্ষ্য করেছে। মেয়েটার ফিল্মি ফেস আছে—ছবি উঠবে খাসা। কয়েক মাস ধরেই নতুন ফেস রিক্রুট করার চেষ্টায় আছে, কিন্তু আগের দিন আর নেই। আভিজাত বংশের শিক্ষিতা সুন্দরীরা অবশ্য ফিল্মে নামছেন, কিন্তু তাঁদের সামলান খুব মুস্কিলের কথা। টাকা-পয়সার কথা ছেড়ে দিলেও তাদের বইয়েতে নামতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়।

সাধারণ অবস্থা থেকেও যে-সব খেঁদী-পেঁচীদের পালিশ করে জাতে ওঠান হয়—কিছুদিন পরে তারাও চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে সুরু করে। ধরাকে সরা দেখে—এও ধীরেন ভড় দেখেছে—আর বলবে নাই বা কেন একটু পালিস পড়লে, একটু চকচকে হলেই হল্লে কুকুরের মত সব ছেঁকে ধরে। তখন খেঁদী-পেঁচীদের দেমাক হবে বৈকি! আর তা ছাড়া তখন ত আর খেঁদী-পেঁচী নয়—তখন সুপর্ণা দেবী কিংবা বিশাখা মুখার্জ্জি। এই ত সেদিনের কথা, কল্পনাকে কত কষ্টে ঘষে-মেজে যেই একটু চকচকে করেছে অমনি সকলের শ্যেনদৃষ্টি পড়ল—আর মেয়েগুলোই কি কম নিমক-হারাম নাকি,—বলে কিনা, ধীরেনদা এবার থেকে আপনাকে জেঠু বলে ডাকব। এমনকি আর বয়েস হয়েছে? না হয় বংশগত টাকটাই অসময়ে একটু প্রকট হয়েছে, তাতে কি সে একেবারে জ্যাঠামশায়ের পর্য্যায়ে উঠে যাবে? তা নয়, আসল কথা হ'ল, সুনীল রায় হাসনু আসবার আগে কল্পনার সঙ্গে সুনীলের মাখামাখির কথা সকলেই জানত, অবশ্য সুনীলকে বেশীদিন টেঁকতে হয় নি। কারণ খোদ কর্ত্তার নজর পড়েছিল কল্পনার ওপর। মেল ট্রেন যখন যায় তখন মালগাড়ী সাইডিং-এ যাবে এ আর বিচিত্র কি? এখন আবার সেই সুনীল রায় আর হাসনুকে নিয়ে আর এক কাণ্ড। হঠাৎ ধীরেন ভড়ের মাথায় একটা মতলব এল, হুঁ, ঠিক হয়েছে—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। সুনীল রায়কে মেয়েটার সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া যাক্—সুনীল এ পর্য্যন্ত কোন কাজেই ব্যর্থকাম হয় নি। সুতরাং সুফল যদি হয় তা হলে হাসনুকেও ম্যানেজ করা যাবে, আর নতুন একটা মুখও সংগ্রহ হ'ল। সিনেমা-সংক্রান্ত মাসিকে বিভিন্ন লোভনীয় ভঙ্গীতে স্বল্প পরিচ্ছদে ফটো তুলিয়ে ছাপিয়ে দিলেই চলবে—তলায় হেডিং থাকবে ফিল্ম জগতে নব-অভ্যুদয়—

আগামী দিনের উজ্জ্বল তারকার প্রকাশ...তার পর একটু লেখা থাকবে শ্বেতা দেবীর জীবনী সম্বন্ধে—লিখে দিলেই হবে অভিজাতবংশের সুশিক্ষিতা অপূর্ব্ব দেহছন্দের অধিকারিণী। শ্রীমতী শ্বেতা শীঘ্রই আপনাদের অভিনন্দন করবেন। দু-একটা যোগব্যায়ামের ভঙ্গীতে ফটো দিলেও মন্দ হয় না। পরের স্টেশনে সুনীলকে খবরটা দিতে হবে।

আড়চোখে এধার দিকে তাকিয়ে হাত দুটো ঘষে নিলে ধীরেন ভড়। মনে মনে খুশী হয়েছে সে। সুনীল রায়কে এর পর কাজ দিতে হবে, ছেঁটে ফেলতেও হবে। ওর জন্যে বহুবার তাকে বিপদে পড়তে হ'ল। হাসনুর সুটিংগুলো শেষ হোক তার পর সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে ওদের, আর এ মেয়েটাকে বাগাতে পারলে ত কথাই নেই। কিন্তু আবার ত সেই একই প্রশ্ন—সুনীল রায়। বয়সটা যদি একটু কম হ'ত তা হলে একবার দেখিয়ে দিত সে সুনীল রায়ের সব বাহাদুরী, নিঃশেষ করে দিত বাছাধনকে, আর চয়ে খেতে হ'ত না। মেয়েটা একলা এসেছে—তা ধীরেন ভড় লক্ষ্য করেছে—একটি ছোকরা ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল, হয় ত তাও সে দেখেছে। কলেজে-পড়া ছোকরার প্রেম করতে সাধ হয়েছে। জানে না ত কত ধানে কত চাল? মেয়েটার পাশে একটা হোঁৎকা কালো টেকো লোক বসে বসে পান চিবুচ্ছে।

অধিকতর খাদ্য উৎপাদন

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

খাদ্যসমস্যা প্রকট আকারে দেখা দিয়াছে, পূর্ব্বের পরিসংখ্যান, হিসাবনিকাশ প্রভৃতি অলীক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সরকারী ও বেসরকারী মহলে পুনরায় নানাবিধ পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে, কতকগুলি পরিকল্পনা এতই প্রাথমিক যে সাধারণ মানুষ ভাবিতেছে, এই পরিকল্পনাগুলি এত দিন কার্য্যকরী করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই কেন—তবে একটা কথা আছে—কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, সুতরাং কর্ত্তা এতদিন ইচ্ছা করেন নাই বলিয়াই এই সহজ কর্ম্মগুলি করা হয় নাই। আবার কতকগুলি পরিকল্পনা এতই জটিল যে, অদূর ভবিষ্যতে ঐগুলিকে কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কৃষির উন্নতি ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয় চিন্তা করিতে হইবে।

প্রথম কথা হইতেছে—কৃষককে বাদ দিয়া বা দূরে রাখিয়া কৃষির উন্নতি অথবা খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না। এই অতি সহজ কথাটা কর্ত্তৃবৃন্দের মনে রাখিতে হইবে। বংশপরম্পরায় কৃষক যে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে তাহার মূল্য পুঁথিগত বিদ্যা বা অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অনেক বেশী। তথাকথিত পুঁথিগত বিদ্যা সে অর্জ্জন করে নাই বটে, কিন্তু সে মূর্খ নয়, অবুঝ নয়। কেতাবী বিদ্যা বা অভিজ্ঞতার গর্ব্ব লইয়া 'ত্রাণকর্ত্তা' হিসাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। কৃষক এইরূপ 'ত্রাণকর্ত্তা'র উপদেশ এক কান দিয়া শুনিবে এবং অন্য কান দিয়া বাহির করিয়া দিবে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহাই ঘটিতেছে। সুতরাং গোড়ার কথা হইতেছে—তুমি যত বড়ই 'ত্রাণকর্ত্তা' হও না কেন কৃষককে তাহার প্রাপ্য সম্মান দাও, তাহার অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ কর, তাহার সহিত সমান আসনে বসিয়া কৃষির উন্নতি বা খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রস্তুত কর। উচ্চ স্থান হইতে তাহার উপর কোন স্বরচিত পরিকল্পনা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিও না। তাহার কি দরকার, তাহার কি অভাব ও অসুবিধা প্রথমে হৃদয়ঙ্গম কর, সাধ্যমত সেই দরকার মিটাও, অভাব ও অসুবিধা দূর কর। তাহার আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা কর। সকল ক্ষেত্রে একই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে না। বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, জলবায়ু, সেচের সুযোগাদি অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশকে সমান মাটি, সমান জলবায়ু, সমান সেচের সুযোগ ইত্যাদি অনুসারে সুবিধামত ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক ভাগে বর্ত্তমানে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় প্রথমে নির্ণয় করিতে হইবে; তার পর প্রত্যেক ভাগের আবাদযোগ্য জমি—যাহা বর্ত্তমানে অনাবাদী অবস্থায় পতিত পড়িয়া আছে—তাহার সংস্কার করিয়া এবং বর্ত্তমানে স্থানীয় মৃত সেচের সুবিধাগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন কি পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায় তাহার জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে। স্থানীয় মাটি, আবহাওয়া প্রভৃতির উপযুক্ত বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সার সম্বন্ধে প্রধান কথা হইতেছে—গোবর সংরক্ষণ, কম্পোষ্ট সার প্রস্তুতের দিকে কৃষককে অধিকতর মনোযোগী করিতে হইবে। যদি ইহার জন্য আইন প্রস্তুত করিতে হয় তাহাও করা দরকার। অসময়ে বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহ না করিয়া সময়মত সরবরাহ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কৃষিবিভাগের বিরুদ্ধে বহুদিনের সঞ্চিত নিন্দা ও সমালোচনা বিদ্যমান আছে।

উপরোক্ত প্রত্যেক ভাগে বা অঞ্চলে দুই-তিনটি কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন করিতে হইবে—এই সকল কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রণালীর সাহায্যে খাদ্যশস্যের চাষের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। তবে উন্নত প্রণালী এইরূপ হইবে—যাহা কৃষক তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রহণ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শস্যের চাষকে লাভজনক করিতে হইবে।

আরও একটি মূল কথা এই যে, প্রত্যেক অঞ্চলের ভদ্র-শ্রেণীর কয়েকজন বেকার যুবককে কৃষিকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে; ইহার জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন; যুবকগণকে জমি, মূলধন, শিক্ষা প্রভৃতির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। এই সকল যুবক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র পত্তন করিবে। ফলে বেকারসমস্যা কতকটা দূর হইবে, ইহা ছাড়া এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্র স্থানীয় কৃষকদের শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইবে, ইহার দ্বারা কৃষকের ও কৃষি-কার্য্যের সম্মান বাড়িবে—কৃষকেরা মনে করিবে কৃষি কাজ হেয় নহে এবং কেবল অনুন্নত সম্প্রদায়ের পেশা নহে।

সকল রকম কৃষি-উপদেষ্টা সমিতিতে কৃষকের স্থান

থাকিবে—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্য দিতে হইবে, সমানভাবে তাহার সহিত সকল পরিকল্পনার আলোচনা করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যে সকল কর্ম্মচারী কৃষকদের দৈনন্দিন সমস্যার সহিত জড়িত, কৃষি-উপদেষ্টা সমিতিতে তাহাদেরও স্থান থাকিবে, তাঁহাদের সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে এবং তাহার সমাধান করিতে হইবে। যে সকল পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নাই, সেই সকল পরিকল্পনা তাঁহাদের উপর চাপাইয়া দিলে চলিবে না।

কৃষি-বিভাগ ও খাদ্যবিভাগকে একত্রীকরণ করিতে হইবে। যে বিভাগ খাদ্য সরবরাহ বা বণ্টনের জন্য দায়ী সেই বিভাগ খাদ্য-উৎপাদন সম্বন্ধে অজ্ঞ—ইহা হাস্যকর এবং বাঞ্ছনীয় নহে। গৃহিনী যদি তাঁহাদের পরিমাণ জানেন, তবেই তিনি পরিবারের সকলকে সুষ্ঠুভাবে খাদ্য বণ্টন করিতে পারেন

সব শেষের কথা এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা এই যে, কৃষকের 'প্রাণ ধারণে'র ব্যবস্থা করিতে হইবে। গৃহহীন, খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন কৃষকসম্প্রদায় খাদ্য উৎপাদন করিবে, আর আমি সুসজ্জিত গৃহে পোশাক-পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হইয়া নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিব—ইহা কি আশা করা যায়? ইহাকে নৈতিক পাপ বলা যায়। মোট কথা, অতীতের ও বর্ত্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

চমকে বিজলী

শ্রীকরুণাশঙ্কর বিশ্বাস

এখনও, কখনও সহসা,
চমকে বিজলী ঝড়ের আকাশে
খণ্ডিত করি তমসা।
ঘোর চরাচর উদ্ভাসি ওঠে নিমেষে,
থর থর সুখে আজও জাগে আশা আবেশে
মরুভূ-পাদপ আতপ-দগ্ধ পত্রে
চাহিছে রসের ভরসা।
—এখনও, কখনও সহসা॥

'দ্বন্দ্বেরে দেবে ছাড়িয়া',—
আমার কবিতা আতুর আঁখিতে
সহসা কহিছে ডাকিয়া।
'তোর যাহা আছে, তার 'পরে থাক্ মমতা,
ভালবাসিতেই কবির শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা,
হিসেবী মনের সীমানা ছাড়ায়ে, বাহিরে
আজও আমি আছি বাঁচিয়া।
দ্বন্দ্বেরে দেবে ছাড়িয়া॥'

মরে নাই,—মন বলিছে;
প্রাণধারণের হানাহানি মাঝে
চেতনা-বিলীন রহিছে।
আমার সত্য—সে আছে আমারই মাঝেতে,
সহজ-শক্তি নহে দূরে,—সে তো কাছেতে;
উদার গতি জীবন ছন্দে কেবলই
কঠিন পেষণে দলিছে।
মরে নাই,—মন বলিছে॥

ওরে প্রত্যয়, আয়রে,
যে-ক'টি দিবস আছে হাতে বাকী—
কাঁকিতে কেটে না যায়রে।
কালের বক্ষে ফুঁসিছে উষ্ণ নাগিনী,—
—এখনও নম্র যূথিকা যাপিছে যামিনী;
মোর বাণী মাখি অঙ্গে সুরভি স্নিগ্ধ
শীতল হইতে চায়রে।
ওরে প্রত্যয়, আয়রে॥

আচার্য জগদীশচন্দ্র

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সুপ্রসিদ্ধ কবি ভর্তৃহরি তাঁর অনুপম নীতিতত্ত্ব গ্রন্থ "বৈরাগ্য-শতকে" মানবজীবনের অসারত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে সখেদে বলেছেন—

"আয়ুর্বর্ষশতং নৃণাং রাত্রৌ তদর্ধং গতম্ ॥"

—ইত্যাদি।

অর্থাৎ মানুষের আয়ুর পরিমাণ এক শত বৎসর। তার মধ্যে অর্ধেক বা পঞ্চাশ বৎসর ব্যয় হয় নিদ্রায়; অবশিষ্টাংশেরও অর্ধেক বা পঁচিশ বৎসর চলে যায় বালত্ব ও বৃদ্ধত্বে; শেষ অবশিষ্টাংশ বা পঁচিশ বৎসরও বৃথা নষ্ট হয় ব্যাধি-বিরহ-দুঃখাদি-সমন্বিত রাজসেবাদিতে। এরূপে, জীব ত জলের বুদ্বুদ্ ই মাত্র—তার আর সুখ কোথায়?

কিন্তু যে মহামনীষী তাঁর সুদীর্ঘ আশী বৎসরের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই সার্থকতম করে তুলেছিলেন জ্ঞানে, কর্মে, ভক্তিতে, সেবায়, সাধনায়, ত্যাগে, তপস্যায় যাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের প্রকৃষ্টতম প্রকাশ দেখে আমরা ধন্য হয়েছি সেই পরমারাধ্য জ্ঞানতপস্বীর তুলনা কোথায়?

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা বহু বৎসর আচার্য-দেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটিয়েছি তাঁর সাধনক্ষেত্র আপার সার্কুলার রোডের সেই পবিত্র বাড়ীতে যা আজ জাতির মহাতীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তিনি ছিলেন আমাদের বাবার মামা। আমাদের ঠাকুরমা স্বর্ণপ্রভা ছিলেন আচার্য-দেবের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় আচার্যদেবের প্রিয় বন্ধু দেশসেবক ও পণ্ডিতাগ্রগণ্য আনন্দমোহন বসুর। আচার্যদেবের দ্বিতীয় ভগ্নী সুবর্ণপ্রভার সঙ্গে বিবাহ হয় আনন্দমোহনেরই ভ্রাতা মোহিনীমোহনের। তাঁদেরই কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু আচার্যদেব স্থাপিত "বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে"র বর্তমান ডিরেক্টার। আচার্যদেবের অন্য দুই ভগ্নী লাবণ্যপ্রভা ও হেমপ্রভা যথাক্রমে সে যুগের প্রসিদ্ধা লেখিকা ও উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপিকা ছিলেন। এই ভাবে, বহু দিক থেকেই আচার্যদেবের পরিবার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ছিল।

এই জ্ঞানই ছিল ঋষি জগদীশচন্দ্রের মহাজীবন-ব্রত। "ঋষি" কে? আমাদের শাস্ত্রমতে ঋষি হলেন দ্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা। এই সত্যদৃষ্টি লাভের জন্য জগদীশচন্দ্রও সমগ্র জীবন অকাতরে উৎসর্গ করেছিলেন। মনে পড়ে, শিশুকালে তাঁর ঘরের সামনে এসে আপনিই আমাদের ক্রীড়াচঞ্চল পদযুগল স্তব্ধ হয়ে যেত, শান্ত হয়ে যেত শিশুসুলভ অকারণ উচ্ছল হাসি—বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে আমরা দেখতাম সেই স্থির, ধীর, সৌম্য, গম্ভীর, ধ্যানরত ঋষিমূর্তি। এই দিক থেকে তিনি ছিলেন যথেষ্ট 'রাশভারি', জ্ঞানের ক্ষেত্রে আর অন্য কিছুকেই তিনি কোনদিন প্রবেশাধিকার দিতেন না, সেখানে কেবল ছিলেন তিনি এবং তাঁর জীবনদেবতা একাকী মুখোমুখি বসে।

কিন্তু আচার্যদেবের এই 'রাশভারিত্বে'র মধ্যে কঠিনত্বের কণামাত্র ছিল না। সাধারণের ধারণা যে, যাঁরা জ্ঞানসাধক, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক, তাঁরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিরীক্ষা-পরীক্ষার জটাজালে আবদ্ধ হয়ে শুষ্ক কঠোর জীবনমাত্রই যাপন করেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। যে প্রাণের লীলাখেলা তিনি পৃথিবীর সর্বত্রই দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন, সেই প্রাণের রসেই তাঁর নিজের প্রাণও সিঞ্চিত হয়েছিল নিরন্তর। একদিন উপনিষদের ঋষিরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—

"রসো বৈ সঃ। কো হি এবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

(তৈত্তিরীয়)

তিনিই পরমরসস্বরূপ, কারণ কেই বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করত, কেই বা প্রাণধারণ করত, যদি এই আকাশে সেই আনন্দ চিরবিরাজ না করত।

প্রাণের পূজারী আচার্যদেবও বিশ্বভুবন থেকে আনন্দরস আহরণ করে নিজের জীবনশতদলকে বিকশিত করে তুলে-ছিলেন এক অপরূপ সৌন্দর্যে, ঐশ্বর্যে, মাধুর্যে।

সেই মাধুর্য থেকে আমরা—ছোটরাও বঞ্চিত হতাম না কোনদিন। প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি আমাদের "ঠাকুর্দা" হলেও আমরা সর্বদাই তাঁকে ডাকতাম "দাদামশায়" বলে এবং যে কোন সাধারণ দাদামশায়ের মতই তাঁর নিত্য-নূতন লীলা-কৌতুকেরও অন্ত ছিল না।

তাঁর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যও আমাদের সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করত। সেটি হ'ল তাঁর অতুলনীয় অমায়িকতা ও ভোগবিমুখতা। সকলেই জানেন যে, সাধনার পথ কণ্টকাকীর্ণ, অতি দুর্গম ও কঠিন এবং জগদীশচন্দ্রকেও

প্রারম্ভে বহু বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কথা যখন থেকে আমাদের মনে আছে, তখন তাঁর যশ ও অর্থের অভাব ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি চিরকাল অতি সহজ, সরল, ভোগবিলাসবর্জিত জীবন-যাপন করেছেন। কোনপ্রকার অপব্যয়ের ছিলেন তিনি ঘোরতর বিরোধী এবং প্রত্যেকটি পাই-পয়সা সযতনে জমিয়ে তিনি দান করে গেছেন তাঁর প্রাণপ্রতিম বিজ্ঞান-মন্দিরে। আমাদের উপনিষদ বলেছেন—

"ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

অমৃতত্বের পিয়াসী জগদীশচন্দ্রও এই ত্যাগকেই শ্রদ্ধাবনতচিত্তে বরণ করে নিয়েছিলেন পরম জীবনব্রতরূপে। এরূপে, তিনি ছিলেন গীতায় বর্ণিত নিষ্কাম কর্মযোগী, গৃহী-সন্ন্যাসী। এই গৃহী-সন্ন্যাসীর আদর্শ অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করে মহানির্বাণ-তন্ত্র বলছেন :—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যৎ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

যিনি গৃহস্থ, তিনিও হবেন ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানী ; এবং তিনিও সমস্ত কর্মই সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে সম্পাদন করে তা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মেই অর্পণ করবেন।

একই ভাবে, জগদীশচন্দ্রও তাঁর সমগ্র জীবনকেই আনন্দে নিবেদিত করে দিয়েছিলেন তাঁর সেই পরমারাধ্য জীবনদেবতারই কমল কোমল শ্রীচরণতলে, তাঁর সমগ্র জীবনকে ধূপের মত জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে সৌরভ বিস্তার করে গিয়েছিলেন সেই পরমরসঘন, পরমসুন্দরের। সংসারের কুটিল, দুর্গম, বন্ধুর পথে তিনি সুখ-দুঃখ, প্রশংসা-নিন্দা, সাফল্য-অসাফল্যকে সমান ভাবে সেই পরমপ্রেমময়ের পদধূলি বলে মাথায় তুলে নিতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সত্যই হতে পেরেছিলেন গীতায় বর্ণিত "মুনি, স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ"।

এইভাবে, আচার্যদেব ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি, দার্শনিক। তাঁর সৌন্দর্যবোধ ছিল অসাধারণ, এবং তাঁর শিল্পীমনের পরিচয় আজও ছড়িয়ে আছে তাঁর সুন্দর বাস-ভবনে ও বিজ্ঞান-মন্দিরে।

একই ভাবে, তাঁর দার্শনিক মনের পরিচয়ও আমরা পেয়েছি তাঁর প্রতি পদক্ষেপে, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি কার্যকলাপে। দর্শনের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হ'ল প্রাণতত্ত্ব, সেই তত্ত্বেরই মহাপ্রকাশক ছিলেন জগদীশচন্দ্র। কঠোপনিষদ্ বলেছেন—

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।" (৬।২)

বিশ্বের সর্বত্রই,—অন্তরে, বাহিরে, প্রকৃতিতে মানবমনে যে একই প্রাণের লীলা স্পন্দিত হচ্ছে নিরন্তর—তাকেই আচার্যদেব কান পেতে শুনেছিলেন পরম পুলকে, ধরে নিয়েছিলেন তাঁর নিজেরই প্রাণ-স্পন্দনে, প্রকাশিত করেছিলেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে। বস্তুতঃ, দর্শনই বিজ্ঞানের শেষ, চরম-সীমা, পরম পরিণতি। সেজন্য যে বিজ্ঞান দর্শনে পৌঁছতে পারে না, তা কেবল খণ্ডজ্ঞানই মাত্র। কিন্তু জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্তাগত মিলনসূত্রটি উপলব্ধি করে এক অখণ্ড, পরিপূর্ণ সার্বজনীন জ্ঞানলাভে ধন্য হয়েছিলেন, বিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ, বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান থেকে উপনীত হয়েছিলেন সকল বিশ্লেষণের অতীত এক আনন্দরসঘন স্থিরা প্রজ্ঞায়।

দর্শনের, বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনের, আর একটি মূলতত্ত্বও তিনি অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রহণ করেছিলেন—সেটি হ'ল অদম্য আশাবাদ। তাঁর অপূর্ব ভাষায় তিনি বলছেন :

"সেই যুগ কি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? নরের দুঃখপাশ ছেদন করিবার জন্য ঈশ্বরের লীলাভূমি এই দেশে কি মহাপুরুষগণের পুনরায় আবির্ভাব হইবে না? পূর্বপিতৃগণের সঞ্চিত পুণ্যফল ও দেবতার আশীর্বাদ হইতে কি আমরা চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি? যখন নিশির অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘোরতম, তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায়, এবং পরশ্রীকাতরতায়। ভাঙিয়া দাও এ সব অন্ধকারের আবরণ। তোমাদের অন্তর্নিহিত আলোকরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া দিগদিগন্ত উজ্জ্বল করুক।" (অব্যক্ত)

এই আত্মার চিরন্তন আলোকেই যেন আজ আমরা আমাদের তমসাচ্ছন্ন জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারি। তাই ত হবে আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা।

বালা গান

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

শিবের গাজন বা গম্ভীরা উৎসব বাংলা দেশের একটি প্রাচীন উৎসব। প্রাচীনতায় এবং জনপ্রিয়তায় গাজন (১) বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব। বাংলা এবং ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই উৎসব একদিন প্রকার ভেদে অনুষ্ঠিত হ'ত। গাজন যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-উৎসব এবং বাংলার বৌদ্ধদের শেষ স্মৃতি—এ কথা এখন সর্ব্বজনস্বীকৃত। একদা ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশেও এই গাজনের মত এক রকম উৎসব প্রচলিত ছিল—এমন প্রমাণও মেলে।(২)

শিবের এক নাম গম্ভীর—'যুগাদিকৃদ যুগাবর্ত্তো গম্ভীরো বৃষবাহনঃ।' তাই শিবকে কেন্দ্র করে এই উৎসবের নাম গম্ভীরা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গম্ভীরা শব্দটি গৃহ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (৩) গম্ভীরা উৎসব প্রধানতঃ শিবলিঙ্গ এবং সেই সঙ্গে হর-গৌরীর পূজা। অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম লিঙ্গপুরাণে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

বাংলার মালদহের গম্ভীরাই যথেষ্ট উন্নত বলে গণ্য হয়ে থাকে। শিবকে অবলম্বন করে বাংলার পটুয়া-সম্প্রদায় যে সমস্ত গান রচনা করেছে তা পটুয়া-সঙ্গীত (৪) নামে পরিচিত। এই গানে শিবকে আমরা একেবারে আমাদের ঘরের মানুষ বলে অনুভব করতে পারি।

—বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য যশোর-খুলনায় গম্ভীরা উৎসবের মত উৎসবানুষ্ঠান হলেও তা গাজন নামে পরিচিত। এই উৎসবে জেলে-মালো, পোদ-নমশূদ্র ইত্যাদি লোকদেরই উৎসাহ বেশী দেখা যায়।(৫) সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা নীরব দর্শক মাত্র।

—যশোর-খুলনায় সাধারণতঃ চৈত্র মাসের(৬) নয়, এগারো ইত্যাদি বেযোড়া দিন বাকি থাকতে সন্ন্যাসীরা দেউলপাট(৭) বের করে, কর্ম্মকর্ত্তা দেউলিয়ার তত্ত্বাবধানে। দেউলিয়ার বাড়ীতে একটি মণ্ডপ তৈরি করা হয়। সেখানে শিবের নামে ঘট-স্থাপনপূর্ব্বক নিত্যপূজা, সন্ধ্যা-বন্দনাদি হয়। ঐ দিন থেকে কর্ম্মকর্ত্তা দেউলিয়া সাত্ত্বিক জীবন-যাপন ও নিরামিষ আহার করতে থাকেন। এবং তিন জন প্রধান সন্ন্যাসীর একজন মূল ও বাকী দু'জন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীত্রয় আচার-ব্যবহারে ও পবিত্রতা রক্ষায় পূর্ব্বোক্ত দেউলিয়ার অনুসরণকারী। বাকী সন্ন্যাসীগণ ঢোল-কাঁসী সহযোগে শিবদুর্গার স্তবস্তুতি বা 'বালাকি' পাঁচালী পতছন্দে গান করেন।(৮) এবং গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে কৌতুকাভিনয়, মুখোস-নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা যা-কিছু আয় করেন—সংগৃহীত সমস্ত অর্থাদি পূজার জন্যেই ব্যয় করেন।

—এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা শিবের মালঞ্চ-বাড়ি-গমন অভিনয় করেন। রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাবিধান-এ এই রকম উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়।(৯) তা ছাড়া ভূত-প্রেতের উদ্দেশ্যে হাজরা-ভোগ, এবং বুড়া-বুড়ীর ঘর-পোড়ানো, খেজুর-ভাঙ্গ', পাটাল-ভাঙ্গা ইত্যাদি দুঃসাহসিক খেলাধূলার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই ধরনের অনুষ্ঠান ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর 'ধর্ম্মমঙ্গল'-এ পাওয়া যায়।(১০)

—উপরোক্ত 'বালাকি' সংক্ষেপে বালা। বালা শিবের ভক্ত অনুচর বিশেষ। বালাকে মহেশ্বর নামে অভিহিত করার কথা দেলপূজার ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়।(১১) যশোর-খুলনার গ্রাম্য-কবিরা ঐ বালাকে উপলক্ষ্য করে যে সমস্ত গান রচনা করেছেন তা বালা গান নামে পরিচিত। গানের দলের মূল গায়েন (গাইয়ে-গায়ক) বালাদার নামে পরিচিত। কতকটা সাঁওতালী-প্রথায় নাচ ও ঢোল-কাঁসী সহযোগে এই গান গীত হয়। গানের মূল উপাদান—হিন্দুধর্ম্মের বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনীগুলি।

২

বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ বরাবরই ধর্ম্মভীরু। তাই এদেশের যে কোন গান—যেমন মেয়েলি গান, তেমন আবার গাজন পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক ভাবে রঞ্জিত। আধ্যাত্মিকতার আমেজ না থাকলে বাংলা দেশে কোন গানই হৃদয়গ্রাহী হয় না। এখানেও (যশোর-খুলনায়) তার ব্যতিক্রম হয় নি।

বর্ত্তমান সংগ্রহের 'অভিমন্যু-বধ' গানটি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। গানটিতে অভিমন্যুর দ্রোণ-ব্যূহচক্রে প্রবেশ-কথা বর্ণিত হয়েছে। দ্রোণ-ব্যূহচক্রের নির্গমন-পথ সম্পর্কে অভিমন্যুর অজ্ঞতার সঙ্গে এই পৃথিবীতে সংসার-চক্রের নির্গম পথ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও মোহাবিষ্ট মানুষের এক হৃদয়গ্রাহী তুলনা করা হয়েছে। দ্রোণ-ব্যূহচক্রে অবরুদ্ধ অভিমন্যুর আক্ষেপ :

পঞ্চ আত্মা পাণ্ডব সহায়
থাকিতে আমা প্রাণ যায়,—
মলেম ব্যাস দ্রোণের বাণেতে।

এই আক্ষেপের সুর সংসার-বিরাগী সমস্ত মানুষের কামনা-বাসনায় জর্জ্জরিত মানুষের এক শাশ্বত সুর। আবার,

আগম-নিগম না জানিয়ে,
দ্রোণ-ব্যূহচক্রে গিয়ে,
শূন্যপ্রাণে পড়িলাম আজ রণে।

আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন।
একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গপ্পসপ্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন

"দ্যাখ, আমি না হয় মুখ্যসুখ্য মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁ: যত সব—"।
আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন-"আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"
রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

S. 261A-X52 BG

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা!" "কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামা-কাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?" আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা। বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!" রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে…এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।" রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি…তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে…হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত

ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"

"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামা-কাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামা-কাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

' মনে হয়, সংসার-চক্রের আগম-নিগম-অনভিজ্ঞ মানুষের এর চেয়ে আর্ত্ত সুর আর কিছুই নেই।

—এই সমস্ত গান রচনা করে অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত অথচ ধর্ম্মপ্রাণ ও সরলমনা পল্লীকবিরা নিজ নিজ কবিত্ব-শক্তির যথাসাধ্য পরিচয় দিয়েছেন। এবং পল্লী-বাংলার ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের মনে ধর্ম্মভাবের প্রেরণা জুগিয়েছেন। ইদানীং ধর্ম্মভাব সম্পর্কে মানুষের মতিগতির পরিবর্ত্তন হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই সমস্ত গ্রাম্য-কবিদের কাছে যে পরিমাণে কৃতজ্ঞ—কালের পরিবর্ত্তনের দোহাই দিয়ে আমরা যদি তাঁদের উপযুক্ত সম্মান এবং সামাজিক স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হই—তবে আমরা নিশ্চয়ই অকৃজ্ঞতার দায়ে দায়ী হব। যদিও এই সমস্ত পল্লীকবিরা তথাকথিত সভ্যসমাজের স্বীকৃতি বা সম্মানের আশা রাখেন না।

—এখানে যশোর খুলনার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কয়েকজন কবির রচনার নিদর্শন প্রকাশ করা গেল। শিবদুর্গার কোন্দল, অভিমন্যু-বধ, মনসার জন্ম, ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন, বালী বধ, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গান রচিত, তেমন আবার বাংলা ষোল সালের ঝড়, পঞ্চাশের মন্বন্তর, কন্ট্রোল, দুর্ভিক্ষ ও গান্ধীর জীবন প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনা নিয়েও বালা গান রচিত হয়েছে। (এই ধরনের গান এখনও সংগ্রহ করতে পারি নি)। তবু বলা যায়, বালা গান প্রধানতঃ ধর্ম্মীয় উপাদানে পুষ্ট। এবং সমাজে হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিক কাহিনী প্রচারে বালা গান এবং গান-রচয়িতাদের বিশেষ দান রয়েছে। এজন্যে বাংলার সমাজ-জীবনে তাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব ও গৌরবের দাবী করেন।

—যাঁদের সহযোগিতায় গানগুলি সংগৃহীত তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১। গাজন। "বহু জনগণের চীৎকার বিপুল বাদ্যোত্তম-ব্যাপারে গর্জ্জন উঠিত, তাই বোধ হয় এই উৎসব কালক্রমে 'গর্জ্জন' নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।" দ্রঃ 'শিবের গাজন' প্রবন্ধ। হরিদাস পালিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮ সাল ৪র্থ সংখ্যা। 'আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই' ছড়া। 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' প্রবাদ। প্রাচীনতা ও জনপ্রিয়তার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

২। আদ্যের গম্ভীরা—হরিদাস পালিত। মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি, ১৩১৯।

৩। "গম্ভীরা ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্তো মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব।"

রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। মধ্য-লীলা, ২য় পরিচ্ছেদ।

"ধ্যানে বৈসে ময়নামতি আপন গম্ভিরে।" পৃ. ১৮; গোবিন্দচন্দ্র গীত। শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত, ১৩০৮।

৪। পটুয়া-সঙ্গীত—গুরুসদয় দত্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯ খ্রীঃ।

৫। আদ্যের গম্ভীরা—হরিদাস পালিত। পৃ. ৯, পৃ. ১২।

৬। 'চৈত্রমাস মধুমাস শিবের জন্মমাস।' পৃ.১৫৯; বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড—দীনেশ সেন। "চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে গম্ভীরা হয়, কিন্তু বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেও কোন কোন পল্লীতে গম্ভীরা উৎসব হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ কতক আদি এবং কতক নূতন ও একান্ত তামসিক। আদি গম্ভীরা সকল চৈত্র মাসেই অনুষ্ঠিত হয়।"— পৃ. ১১; আদ্যের গম্ভীরা। হরিদাস পালিত। 'চৈত্র মাসে চড়কপূজা গাজনে বাঁধে ভারা।'—ছড়া।

৭। দেউল মন্দির। দেব-দেউল—দেব মন্দির।

"যাও বাছা কামিলা তোমারে দিলাম বর।
মৃত্তিকাতে দেউল দালান দেবতা লোকের ঘর॥"

পৃ. ১০৮, পটুয়া-সঙ্গীত। গুরুসদয় দত্ত।

"দেউলের মধ্যে শিব অধিষ্ঠান করেন। দেউলকে পাটও বলা হয়।" দ্রঃ দেল পূজার ছড়া, প্রবন্ধ, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা; ১৩৪৭, ৪র্থ সংখ্যা।

"পাটের জীবন ন্যাস করি তুলে বন্দি মস্তে।
পাটের জীবন ন্যাস করি মহেশের ধ্যান।
শিবপূজা পূজি আর পূজি পাটবান।"—(পাটের জীবনন্যাস), পৃ. ৯, দেল পূজার পাঁচালী। খুলনা জেলা নিবাসী, অদ্বৈতচরণ দেবনাথ প্রণীত। শান্তি লাইব্রেরী প্রকাশিত, নূতন সংস্করণ (প্রকাশ কাল নেই)।

৮। যশোর-খুলনার ইতিহাস সতীশচন্দ্র মিত্র। ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬৫। "নানা পদ্ম বাদ্য বাজে নাচে বেত হাতে।" পৃ. ৩৪, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। ২য় সংস্করণ, বঙ্গবাসী ১৩০৮।

৯। 'পুষ্প-পাবন' অধ্যায়। রামাই পণ্ডিতের 'ধর্ম্মপূজা বিধান'। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩ সাল।

১০। "ঊর্দ্ধ বাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
মস্তক উপরে কেহ পুড়াইল ধুনা। ৪৪
ঊর্দ্ধে বান্দি পদযুগে ভূমে লুটে মুণ্ড।
যেখানে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে যজ্ঞ কুণ্ড। ৪৮
ফেলায়ে প্রচুর তায় দেন ধুনাচূর্ণ।৪৯"—পৃ. ৩৪,
(৫ম সর্গ; শালে ভরপালা), শ্রীধর্ম্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী।

১১। "যেই দিন পৃথিবী হইল অনাদি প্রচার।
ব্রহ্মা হইল পূজাকারী বালা মহেশ্বর।"
"ব্রহ্মা হইল পূজাকারী, বিষ্ণু হইল ধর্ম্মাধিকারী,
বালা হইল মহেশ্বর।"—"দেল পূজার ছড়া" পুথি। খুলনা জেলার কাড়াপাড়া গ্রাম নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথের নিকট হইতে তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত। পরিষদের পত্রিকা, ১৩৪৭ সাল ৪র্থ সংখ্যায় আলোচিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি গান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শিবদুর্গার কোন্দল

তোমার সকলকীর্ত্তি বলব খুলে,
সভাতে এখন—
শুন ওহে দেব পঞ্চানন॥—ধুয়া
শিব দুর্গার কোন্দল বিবরণ
শুন সভার যতজন।—
শাস্ত্রকথা বলব হেথা করিয়া বর্ণন।
দুর্গা হয়ে এই সভাতে বলছি শুন পঞ্চানন॥

দুর্গা॥

তোমার দয়াময় নাম, বল দিগম্বর সুঠাম,
সংহারে প্রশস্ত হস্ত, নাইকো তাতে বাম।
এবার কফ রূপেতে জীবের কণ্ঠে,
তুমি দিতেছ মরণ॥(১)

শিব

যখন ত্রিদশে ফিরি, গুরু রূপে দয়া করি,
তাইতে জীবে দয়াময় বলে আমারি।
রজোগুণে কফরূপেতে জীবাত্মা করি হরণ।
শুন জগৎ প্রসবিণী, তুমি হও জগৎজননী,
মুণ্ডমালা গলে পরে সন্তান ঘাতিনী।
ও রূপসী এলোকেশী, কালো রূপ করলে ধারণ॥

দুর্গা

শুন ওহে দয়াময়, আমি বলিতেছি তোমায়,
মুণ্ডমালা মহালীলা করলাম শত্রুক্ষয়।
শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে, করলাম কালীরূপ ধারণ।
তুমি হলে ব্রহ্মচারী, আমি যাই বলিহারী,
কাম-উন্মাদে ধরেছিলে ভুবনকুমারী।
তোমার ব্রহ্মচারী নাম—
কেমনে মধু করিলে পতন॥

শিব

কহিলে সত্য যে বাণী, আমি বলছি আপনি,
তোমা হতে স্ত্রীত্বজ্ঞান যায়নি ভবানি।
সেই হইতে ব্রহ্মচারী, মাতৃ জ্ঞানে করি ধ্যান।
তুমি কালীরূপ ধরি, কোথায় করিলে চুরি,
চুরি বিদ্যায় বড় পটু, আ মরি মরি।
হয়ে ক্ষুধাবস্ত, হলে শান্ত—
সন্তান-রক্ত করে পান॥

দুর্গা।

রক্তবীজ বধের কারণ, করি জিহ্বা আচ্ছাদন,
রক্ত পান না করিলে হয় না মরণ।
চুরি করে ছিলাম বটে, নিশুম্ভের শক্তি হরণ।
তুমি হয়েছ নিষ্কাম, তাইতে মৃত্যুঞ্জয়ী নাম,
সাগর মন্থন কালে গরল খেলে, গরলেতে বাম।
তখন কোথায় ছিল মৃত্যুঞ্জয়ী—
সেখানে হইল পতন॥

শিব

কহিলে সত্য যে বচন, অতি গোপনীয় ধন,
তুমি কি ভাবে স্নেহ কর, জানিবার কারণ।
সেথায় মরে যদি ছিলাম আমি—
কে করিল দুগ্ধ পান।
আমি বলতেছি এখন, শুন ওহে ত্রিনয়ন—
আমার বাধা না শুনিয়ে, করলে যজ্ঞেতে গমন।
সেথায় লাঞ্ছনা কি পেয়েছিলে—
করিলে দেহ পতন।

দুর্গা

আমি বাপের বাড়ির ঝি, আমার নিমন্ত্রণ কি,
তুমি আমায় রাখতে নার, দোষ তাতে মোর কি।
তোমার নিন্দায় সেই সভায়, করিলাম দেহ পতন।
আমি যে হলেম অবাধ্য, কারণ বলতেছি সত্য—
গঙ্গাকে পাইলে কোথায়, ও ভবারাধ্য!
মস্তকে রাখিলে তারে—
আমায় না করো যতন॥

শিব

সগরবংশ মুক্ত করিল, ভগীরথ গঙ্গা আনিল,
বিষ্ণু-দক্ষিণপদে গঙ্গা জনমত নিলো।
মর্ত্তে আসিবার কালে, মস্তকে করি ধারণ।
দর্শনে জীব আনন্দ পায়,
পর্শনে হয় পাপক্ষয়, অপার মহিমা—
আলিঙ্গনে মুক্ত হয়।
তোমার সতিন বলে মনে হিংসা—
জ্বলে মরো কি কারণ॥

দুর্গা

আমি সদা জ্বলে মরি, গুণের কি বাহাদুরী,
নারীকে মস্তকে ধরে কে ব্রহ্মচারী।
নারীর অশৌচ হলে, ও দয়াময়
ধারায় ভেসে যায় বদন।২
গঙ্গা সতিন আমারি, ঐ দুঃখে মরি।
হরিবে কি দেহত্যাগ যজ্ঞেতে করি—
লাজে মরে যাই সভাতে, শুনে গুণের আচরণ॥

---

১ বাত, পিত্ত, কফ—এই তিন ধাতু সমন্বয়ে শরীর সংগঠিত। কফের আধিক্যে জীবের জীবন সংশয়। প্রলয় কর্তা শিব জীবদেহে কফরূপে অবস্থান করেন—এই রকম বলা হয়।

শিব[২]

গঙ্গার ঋতু যখন হয়, আমি বলতেছি তোমায়
মেরুদণ্ডের মধ্যে রাখি, দিচ্ছি পরিচয়।
তাইতে তারে যত্ন করে, মস্তকে করি ধারণ।
তোমার গুণ যদি বলি
দিবে সবে করতালি, জগৎপাবনী নাম যাইবে চলি।
কন্যা হয়ে মা বিধবা, হাসালে এ ত্রিভুবন।

দুর্গা

পিতার মরণ করেছি বরণ, আমি তার কারণ,
সতি হয়ে পতি পূজ্য, জগতে পূজন।
দেবের দেব হও তুমি, পিতা না করে গণন।
দক্ষের ছাগ মুণ্ডের কারণ
তার পশুত্ব জ্ঞান মনে ছিল, শুন বিবরণ।
সেই কারণে নরপশু, জগতও শিক্ষার কারণ।
শিব দুর্গার চরণ ভাবি, রাজেন রচেন ইতর কবি,
রচিলেন শশধরের চরণও ভাবি।
রাণীর নরপশু স্বামী হ'ল, বৈধব্য হ'ল মোচন।

সপ্তরথী

শুন সবে করি নিবেদন
বূহচক্র করিয়ে সাজন, যুদ্ধ করে সপ্তরথিগণ,
নয়টি দ্বার ঘিরিয়া। বূহচক্র অপূর্ব্ব সৃজন
স্থানে স্থানে চক্র করিয়া স্থাপন,
প্রত্যেক চক্রে অপূর্ব্ব কথন,
কত বলব তাহা বর্ণিয়া।
সপ্ত পাতাল, সপ্ত স্বর্গ, তাহে পুরিয়াছে চতুর্ব্বর্গ।
অহং-এর অহং করিতে খর্ব্ব,
সৃজন করিলেন চক্রধারী।
একদিন অর্জ্জুন ভাবিয়ে মনে
সুভদ্রাকে ডাকিয়ে যতনে, বসিয়া তখন একাসনে,
চক্রের কথা বলে যতন করি।
বূহচক্র চোদ্দ ভুবন, নদনদী কত করিছে সৃজন।
মায়া পুরী করিয়া সৃজন,
মুগ্ধ করে জীব সযতনে।
একটি দ্বারে গমন করে জীব,
চক্রে চক্রে বসে আছে শিব,
মায়া ভ্রমে মুগ্ধ করে জীব—
পথ হারায় অন্ধকার দেখে।
বূহচক্র ঘিরিয়াছে, সপ্তরথী যোদ্ধা সাজে।
তারা অন্যায় যুদ্ধে মজে,
রণস্থলে বিষঅস্ত্র হানে।

প্রবেশ কথা শুনিয়া রাণী,
নিদ্রায় মোহিত হলেন অমনি—
অভিমন্যু শিক্ষা তখনি,
বাহিরে আসিতে নাহি জানে।
অভিমন্যু প্রবেশি রণে, বূহচক্র আচ্ছাদনে,
আছে সপ্ত রথিগণে, অন্যায় যুদ্ধ আরম্ভিল।
বূহচক্রে পড়িয়া রাজন,
অন্যায় যুদ্ধে করিছে ক্রন্দন
কোথায় মাতুল শ্রীকৃষ্ণ ধন, পিতা নরনারায়ণ।

ত্রিপদি

ধর্ম্মরূপ ধর্ম্মসুত, সহায় আমার অনুগত,
ডাকি তোমায় পড়িয়া বিপদে।
অনুরাগ বৃকোদর, অতিশয় গর্জ্জন কর,
মুক্ত কর ব্যূহচক্র হতে।

এস পিতা মহারথী, দয়াময় তব সারথী,
সন্তান ডাকে এস হে ত্বরিতে।
পঞ্চ আত্মা পাণ্ডব সহায়,
থাকিতে আমা প্রাণ যায়,—
মলেম কাম দ্রোণের বাণেতে।
আগম-নিগম না জানিয়ে, দ্রোণ ব্যূহচক্রে গিয়ে,
শূন্যপ্রাণে পড়িলাম আজ রণে—
দ্বিজ শশধরের এই তো বাণী,
অভিমন্যু হারায় প্রাণী—
রাজেন পড়লি বূহচক্র-রণে।

রোহিতাশ্বের সর্পাঘাতে মৃত্যু

ঘোরতর নিশিকালে, মরা পুত্র লয়ে কোলে
কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী যায়—
রাণীর বক্ষ ভাসে নয়ন জলে, আহা পুত্র, পুত্র, বলে
উপনীত হইল গঙ্গায়।

রাখিয়া গঙ্গার তটে, মুদ্দফরাস চিতাকাটে
রোহিতাশ্বে করাইল স্নান—
উত্তর শিয়র করি, রাখি মড়া চিতাপরি
মনে মনে ভাবেন ভগবান।

যখন অগ্নি দিবে পুত্র মুখে, এমন সময় থেকে
গর্জ্জন করিয়া অতিশয়—
হাতে নিয়ে দণ্ডবাড়ি, সাধিতে মড়ার কড়ি
উপনীত হরিশ্চন্দ্র রায়।

মহা তর্জ্জন করিয়ে অতি, বলে রাজা রাণীর প্রতি
কে হে তুমি কাহারো রমণী—
একাকিনী এত রাত্রে, এলে গঙ্গায় মড়া দিতে

২। গঙ্গার ধারা।

মড়ার কড়ি দেহ ত হে গুণি।
আমি থাকি যে কিঙ্কর ঘরে, নিত্য আসি গঙ্গাতীরে
দিবানিশি সাধি মড়ার কড়ি—
মড়াপ্রতি আনা বারো, ইহা যদি দিতে পারো
তবে গঙ্গায় দেহ এই মড়ি।

এতেক শুনিয়া বাণী, কাঁদিয়া বলেন ও রাণী
কড়িপাতি কিছুই নাহি মোর—
ছিল একটি পুত্রধন, হারায়েছি সে রতন
এতে কিছু দয়া নাহি তোর।
ছিল হরিশ্চন্দ্র মহাতেজা, অযোধ্যাপুরেরও রাজা
আমি শৈব্যা তাহারও বনিতে—
একটি মাত্র পুত্র ছিল, সর্পাঘাতে মৃত্যু হোল
এনেছি আজ তারে গঙ্গায় দিতে।

এতেকও শুনিয়া তায়, বলে হরিশ্চন্দ্র রায়
হায়রে বিধি কি দশা ঘটিল—
তখন হা-পুত্র হা-পুত্র বলে, মরা পুত্র লয়ে কোলে
উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

তখন পরিচয় পেয়ে রাণী, শিরে করাঘাত হানি
আছাড় খেয়ে পড়িল ধরায়—
রাজারাণী দোঁহে মিলি, কাঁদি হইল শোকাকুলি
নারায়ণের দয়া হইল তায়।

অন্তরীক্ষে থাকি পর, কৃপা করি গঙ্গাধর
অমৃত বৃষ্টি করিলেন মড়ার গায়—
বেঁচে উঠল রোহিশ্চন্দ্র(৩) স্বর্গধাম থেকে ইন্দ্র,
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন দেবরায়।

তখন রাজারাণী দোঁহে মিলে, রোহিতাশ্ব লয়ে কোলে
হইলেনও আনন্দিত মন—
বংশী বলে অন্তিমকালে, রেখ দুর্গা চরণতলে
অন্তে যেন পাই শ্রীচরণ।

মনসার জন্ম

একদিন গৌরী আগে বিদায় হয়ে
শিঙ্গা ডম্বরু করে লয়ে,
তপস্যাতে গেলেন শূলপানি।
হর যেয়ে কালীদহের কূল, করে লয়ে পদ্মফুল,
মুখে কেবল রাম রাম ধ্বনি।

ধ্যানেতে বসিলেন হর, যুড়িয়া যুগল কর,
কালীদহের কূলে ত্রিলোচন।
হেথা পদ্ম বিকশিত হোল,
মধুলোভে ধেয়ে এল, ভ্রমর ভ্রমরা দুইজন।

অলি মত্ত মধুপানে, রতি করে পদ্মবনে,
দেখে হরের টলে গেল মন।
মদনে পীড়িত হয়,—
ধ্যান ভঙ্গ গঙ্গাধর, তথা বীর্য্য হইল পতন॥

মহাবীর্য্য লয়ে হাতে, রাখিলেনও পদ্মের পাতে,
হংসিনীতে করিল গ্রহণ।
সহিতে না পারে ভার,—
চিন্তা কয়ে আপনার, বিপাকেতে হারালাম জীবন।(৪)

হংসিনী কয় হংসরে, মলেম আমি উদর ভরে,
এ যাতনা সহিতে না পারি।
হংস বলে তখন, কর বীর্য্য উভরণ,(৫)
প্রাণ রক্ষা করো প্রাণেশ্বরী।

হংসের কথা শুনে নারী, বীর্য্য উভরণ করি,(৬)
পুনরায় রাখে পদ্মের পাতে।
পদ্মের মৃণালে প্রবেশ করি,
নামে বীর্য্য পাতালপুরী, দেখে কদ্রু(৭) চিন্তিত মনেতে॥

ছিল নারী ঋতুমতী, খেয়ে হলো গর্ভবতী,
ক্রমে গর্ভ হইল প্রবল।
কদ্রু প্রসবিল কন্যা, রূপেতে পরম ধন্যা,
যেমন চন্দ্রমা নামিল শতদল।

দেখিয়া কন্যারও আভা, জিনি চন্দ্র কত শোভা,
রক্তজবা যেন ওষ্ঠাধর।
কদ্রু চিন্তে মনে মন, কে আনিল কারও ধন,
প্রবেশিল ঘরেতে আমার॥

৩। রোহিতাশ্ব

(৪) পরিপূর্ণ জীবন কঠোর ঘন শ্বাস।
আপন লক্ষণ দেখি আপনার ত্রাস॥
কৌমোদিকা হ্রদে আমি পাইল পীযূষ।
এই অনুভবে তাহা করিল গণ্ডুষ॥

—পৃ. ১৭৬, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র কৃত শিবায়ন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত। ১৩৬৩, আষাঢ়।

(৫) উভরণ—উদ্গীরণ, বা বমন।

(৬) নর্ম্মদার কোলে কন্যা করিল উদ্গার।
নির্গত হইল যেন ভুজঙ্গ আকার॥

—পৃ. ১৭৬; শিবায়ন।—ঐ

নর্ম্মদা বলেন, শুন কদ্রু নাগমাতা।
উদ্গার করহ তুমি কেন পাও ব্যথা।

—পৃ. ১৭৬; শিবায়ন।—ঐ

(৭) কদ্রু—নাগমাতা কদ্রু।

কর্দ্দ জানিলেনও ধ্যানে, শিববীর্য্য পদ্ম বনে,
দৈব যোগে হইল পতন।
তাই প্রবেশিল পাতালপুরি,
খেয়ে হলাম গর্ভধারি, প্রসবিলাম কন্যা সুলক্ষণ॥

কর্দ্দ বলেন কন্যা প্রতি, পদ্মবনে কর গতি,
এখানে আর বিলম্বে কাজ নাই।
এখন হরের আগে যাও তুমি—
তোমায় বিদায় দিলাম আমি, শুন পদ্মা বলি তব ঠাঁই॥

তখন কর্দ্দ কাছে বিদায় হয়ে, পদ্মা পদ্মবনে যেয়ে,
পদ্মমুখি বসিলেন তখন।
হর তখন দেখেন নয়নে, পদ্মাসনে পদ্মবনে,
ষোড়শী রূপসী একজন।

বুঝিয়ে হরেরও মতি, চিন্তা করে পদ্মাবতী,
করযোড়ে বলে শুন হর।
আমি তোমার কৃতকন্যা,
মনেতে ভেবনা অন্যা, তব বীর্য্যে জনম আমার।

শুনিয়া কন্যারও কথা, লাজে হেট করি মাথা,
অধোমুখে বসিলেন ত্রিলোচন।
হরের হোল দিব্যজ্ঞান,
না করিল রতিদান, ধ্যানভঙ্গ করিলেন তখন'॥

পদ্মাবতী বলে পিতে, চল যাই কৈলাসেতে,
মায়েরও নিকটে এখন যাই।
আমি হেরি মায়ের চন্দ্রমুখ, নিবারিব সকল দুখ,
এখানে আর বিলম্বে কাজ নাই।

তখন পদ্মাবতী লয়ে করে, পদ্মা রেখে পদ্ম পরে,
গেলেন হরও ভঙ্গ দিয়ে ধ্যান।
হর চলিলেন আনন্দ মনে,
কন্যা লয়ে কৈলাসধামে, উপনীত গৌরী বিদ্যমান॥

তখন পদ্মা রেখে গৃহমাঝে, পুনরায় দেবরাজে,
তপস্যাতে করিলেন গমন।
একদিন ফুলের-সাজি খুলে সতি,
মধ্যে দেখে পদ্মাবতী, ষোড়শী রূপসী একজন॥

দেখে সতি কোপে জ্বলে,
হাতের কঙ্কন ফেলে মারে,
মারিলেনও শিব-অনুরাগে।
অন্ধ হোল পদ্মাবতী, কেঁদে বলেন সতির প্রতি,
এই ছিল কি মোর ভাগ্য যোগে॥

চক্ষু আমার হৈল অন্ধ, লোকেতে বলিবে মন্দ,
যুগে যুগে থাকিবে যোষণা।
শ্রীফকিরচন্দ্র নাথে ভণে, এসে মায়ের দরশনে,
পদ্মাবতীর চক্ষু হোল কানা॥
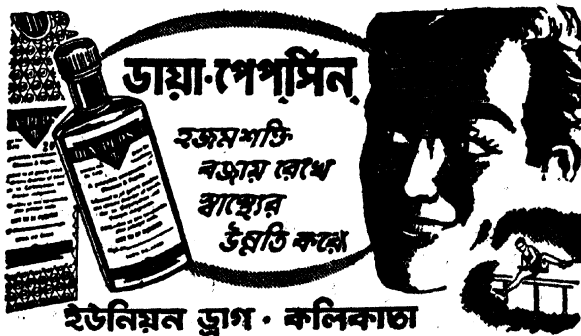
গান্ধীবাণী-বর্ত্তিকা

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

দেখতে দেখতে প্রায় দশ বছর হয়ে গেল আমরা মহাত্মাজীকে হারিয়েছি বটে, কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর প্রভাব আজও আমাদের মধ্যে থেকে হারায় নি এবং কোন দিন হারাবে বলেও মনে হয় না। ভারতে এখনও এমন অসংখ্য ব্যক্তি আছেন যাঁরা মহাত্মাজীর আদর্শ ও উপদেশাবলী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন। গান্ধী-সাহিত্যের মধ্যে এই আদর্শ ও উপদেশসমূহের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচনির্বিশেষে সর্বভারতীয় নর-নারীর কল্যাণের রূপটিই ফুটে উঠেছে সর্বক্ষেত্রে। সত্য, ন্যায় ও ধর্ম যা ভারতের মূল নীতি তারই বাণী সর্বোপরি তিনি ঘোষণা করেছেন। গীতার আদর্শকে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পালন করে গিয়েছেন মহাত্মাজী। এই মহান্ গ্রন্থ সম্বন্ধে একস্থানে তিনি বলেছেন, "যেমন কোন অজানা ইংরেজী শব্দযোজনায় বা উহার অর্থ না বুঝিতে পারিলে আমি ইংরেজী অভিধান খুঁজিয়া দেখি, তেমনি আচরণে যখন সঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন গীতাজীর নিকট হইতেই সেই সঙ্কটের সমাধান করিয়া লইয়া থাকি।"

অহিংসার আলোকবর্ত্তিকা হাতে নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য মহাত্মাজী যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা অতুলনীয়। কিন্তু স্বাধীনতা-যুদ্ধে এই অহিংসার একমাত্র মন্ত্রকেই আয়ুধ হিসাবে গ্রহণ করলেও, তিনি কাপুরুষতা ও ভীরুতাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। হিংসা ও অহিংসার ব্যাখ্যায় বাপুজী একস্থানে বলেছেন, "কাপুরুষতা এবং হিংসা এই দুইয়ের মধ্যে আমি হিংসাকেই বরণ করিব। আমি হত্যা না করিয়া মরিবার প্রশান্ত সাহস অর্জ্জন করিতে চাই। কিন্তু আমি ইহাও চাই যে যে ব্যক্তি মরিবার সাহস পাইবে না, সে যেন বিপদের সম্মুখ হইতে লজ্জাজনক ভাবে না পালাইয়া মরিবার কৌশলটুকুও আয়ত্ত করে। কারণ, যে পালায় সে মনে মনে হিংসার কাজ করে। সে পালাইয়াছে কারণ সে মরিতে সাহস পায় নাই।···সমস্ত জাতিকে নিবীর্য্য করিবার অপেক্ষা আমি হিংসাকেই শ্রেয় মনে করি। কিন্তু আমি জানি হিংসার অপেক্ষা অহিংসা অসংখ্যগুণে শ্রেয়, শাস্তির অপেক্ষা ক্ষমাই পৌরুষের।"

আমাদের সমাজ-জীবনে অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ সম্বন্ধে মহাত্মাজীর উক্তিগুলি যেমন হৃদয়স্পর্শী, তেমনি যুক্তিসঙ্গত। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি বহুকাল পূর্ব্বেই বলেছেন, "অস্পৃশ্যতাকে আমি মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অতি জঘন্য পাপ বলিয়া মনে করি। ইহা সংযমের চিহ্ন নয়—ইহা শ্রেষ্ঠত্বের স্পর্দ্ধিত দাবি। ইহাতে কিছুই লাভ হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মের ভিতরের অসংখ্য লোক, যাহারা কেবল যে আমাদের সমকক্ষ তাহাই নয়, যাহারা সমাজের নানা কক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেবা দিতেছে, ইহা তাহাদিগকে দলিত করিয়া রাখিয়াছে। এই পাপ হইতে হিন্দু ধর্ম্ম যত শীঘ্র মুক্ত হয় ততই মঙ্গল।" তিনি আরও বলেছেন, "যদি একথা মানিয়া লওয়া যায় যে, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ একই পদার্থ, তবে যত শীঘ্র জাতিভেদ দূর হয় সকলের পক্ষে ইহা ততই শ্রেয়।···উচ্চবর্ণের লোকেরা মৃগনাভীর মত সুগন্ধী নয়, আর অস্পৃশ্যরাও পিয়াজের মত দুর্গন্ধ নয়। এমন হাজার হাজার অস্পৃশ্য আছে, যাহারা উচ্চবর্ণের লোক অপেক্ষাও অনেক শ্রেষ্ঠ।"

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহাত্মাজীর নিজস্ব কতকগুলি বিশেষ ধারণা ছিল। একস্থানে তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন, "চরিত্র গঠন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের ঋষি-মুনিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদাদি সকল শাস্ত্র জানার পরেও যে লোক আত্মাকে জানে না, সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার যে যোগ্য হয় না, তাহার জ্ঞান ব্যর্থ।···বই-পড়া বিদ্যা না থাকিলেও আত্মজ্ঞান হওয়া সম্ভব। পয়গম্বর মহম্মদের অক্ষর জ্ঞান ছিল না। যীশুখ্রীষ্ট কোনও দিন পাঠশালায় বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন না, তাঁহারা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা না দিলেও আমরা তাঁহাদিগকে পূজনীয় বলি। বিদ্যার যত ফল তাহা সমস্তই তাঁহারা পাইয়াছিলেন—তাঁহারা মহাত্মা ছিলেন।" তিনি এই বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আরও বলেছেন, "রোজগারের জন্য বিদ্যাশিক্ষা করা চাই এরূপ ভাবা ঠিক নয়। খাদ্য ত ঈশ্বরই সকলকে দিয়া থাকেন। তুমি মজুরী করিয়াও পেট ভরাইতে পার। দেশের ভালর জন্য যদি বিদ্যাশিক্ষা করিতে চাও তবে কর, যদি আত্মজ্ঞানের জন্য বিদ্যা শিখিতে চাও, তবে ত তাহাই হইতেছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাল শিক্ষণীয় বস্তু। * * * আমি এ কথা বলি না যে, বই-পড়া বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন নাই। কেবল এই বলি যে, এই জন্য অধীর হইয়া পড়িও না। যাহাতে পরের সেবা করিতে পার, সেই উদ্দেশ্যেই শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন। ধনী হওয়া অপেক্ষা গরীব হওয়ার ভিতর বেশী আশ্বাস রহিয়াছে। ধনবান হওয়ার চাইতে গরীব হওয়া, গরীবের সুখ-দুঃখের অংশগ্রহণ করা অনেক সুন্দর—অনেক ভাল।"

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেছেন, "একদিকে যেমন স্ত্রীলোকদিগকে অন্ধকারে ও হীন অবস্থায় রাখা খারাপ, তেমনি অন্য দিকে আবার তাহাদিগকে পুরুষের কর্ম্মভার দেওয়াও দুর্বলতার
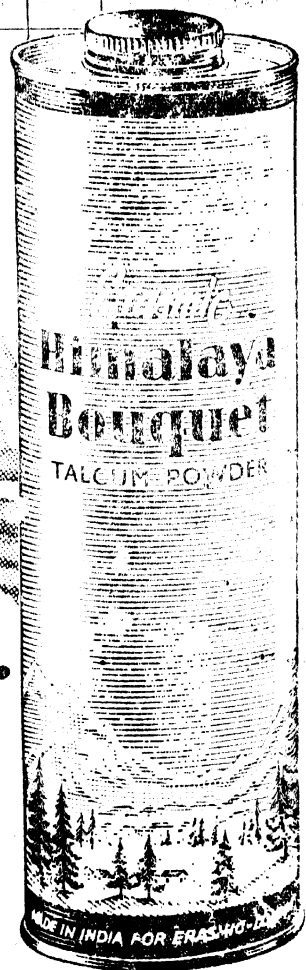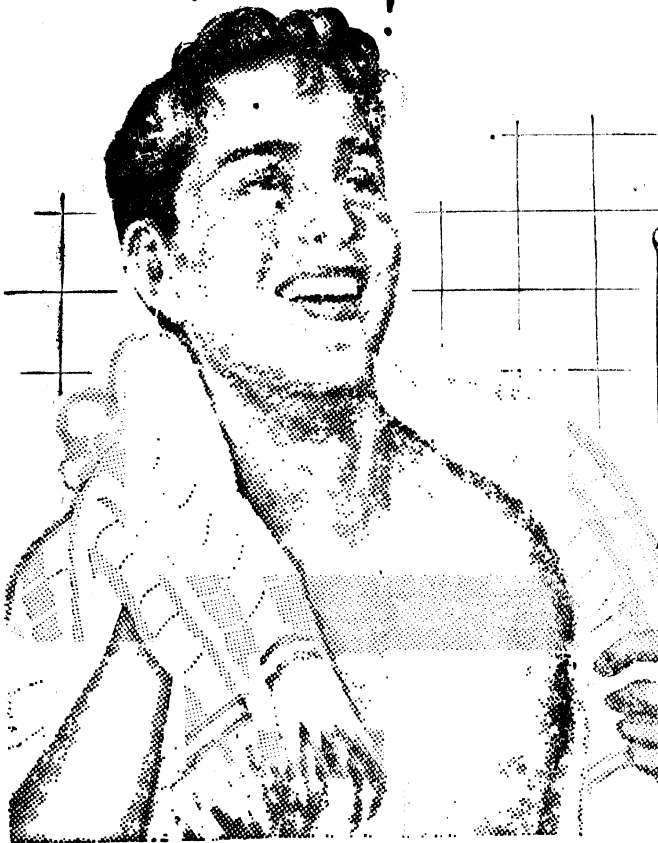
চিহ্ন। তাহা স্ত্রীলোকদিগের উপর জুলুম করার মতই হয়।" বর্তমান কালের স্ব-প্রধান স্বাধীনচেতা স্ত্রীলোকদের এ উক্তি মনঃপূত হবে কি না ভাববার বিষয়।

গান্ধীজী অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রিয় ছিলেন। একবার এই পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ইংরেজীতে একটা কথা আছে যার অর্থ হচ্ছে: পরিচ্ছন্নতা ভগবদ সান্নিধ্য লাভেরই পূর্বাবস্থা। অপরিচ্ছন্নতার ভিতর থাকিবার বা ময়লা আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিবার আমাদের কোনই কারণ নাই। ময়লার ভিতর পবিত্রতা থাকিতে পারে না। অপরিচ্ছন্নতা—অজ্ঞতা ও আলস্যের চিহ্ন।"

মহাত্মাজী কেবলমাত্র যে দেশবাসীকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকেই মুক্ত করার জন্য মন্ত্রদান করেছিলেন তা নয়, তিনি তাদের চরিত্রবলে বলীয়ান, দুঃখজয়ে জয়ী এবং আধ্যাত্মিক চেতনাতেও উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর বাণীসমূহ মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সহায়ক হয়ে চিরদিন জাতিকে তার মঙ্গলময় পথের নির্দেশ দেবে। মানুষের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে দরিদ্র সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সম্বন্ধে মহাত্মাজীর নির্দেশিত পন্থা ছিল অমোঘ। এ সম্বন্ধেও তিনি যে কি গভীর চিন্তা করেছেন এবং রুগ্ন, ভগ্নস্বাস্থ্য ভারতবাসীকে সুস্থ সবল করে তোলার জন্য চেষ্টা করেছেন, তা তাঁর অসংখ্য নিবন্ধ ও কয়েকখানি পুস্তক থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেছেন। এখানে তা থেকে টুকরো টুকরো কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন, "ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে 'অসুখ সারানো অপেক্ষা অসুখ হতে না দেওয়াই শ্রেয়।' গুজরাটি প্রবাদ হ'ল 'জলের পূর্বেই আল বাঁধিবে।' যাহাতে অসুখ না হয় এমন অবস্থাকে ইংরেজীতে 'হাইজিন' বলা হয়। গুজরাটি ভাষায় উহাকেই 'আরোগ্য স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ শাস্ত্র' বলা হয়ে থাকে। * * * যেমন ধনরত্ন একবার খোয়া গেলে আবার তাহা পাওয়া মুস্কিল হয়, তেমনি স্বাস্থ্যরূপী রত্ন একবার হাতছাড়া হইলে অনেক সময়েই উহা ফিরিয়া পাওয়ার চেষ্টা মিথ্যা হয়। * * * ইংরেজ কবি মিল্টন বলিয়াছেন, মানুষের মনই তাহার স্বর্গ বা নরক। নরক কিছু পৃথিবীর নীচে নাই ও স্বর্গ আকাশের উপরে নাই। এই প্রকার যুক্তি সংস্কৃত পুস্তকেও রহিয়াছে: 'মনঃ এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ঃ।' অর্থাৎ মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। এই নীতির অনুসরণ করিয়া এ কথাও বলা যায় যে, মানুষ যে রুগ্ন হয় বা নীরোগ থাকে তা অনেক সময় নিজের উপরেই নির্ভর করে। আমরা যেমন নিজের কার্য্যের দ্বারা অসুস্থ হই, তেমনি নিজের চিন্তার দ্বারাও অসুস্থ হই।" কথাগুলি যে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ এবং যুক্তিসঙ্গত তা সকলেই স্বীকার করবেন।

মহাত্মাজীর প্রত্যেকটি বাণীর মধ্যেই ব্যক্তিগত ও জাতিগত কল্যাণের পথনির্দেশ আছে। এই আপ্তবাক্যসমূহ জাতীয়-জীবনে যথাযথ প্রতিপালিত হলে, ভারতে সত্যই একদিন রামরাজ্যের যে প্রতিষ্ঠা হবে, তাতে আর সন্দেহ নেই।
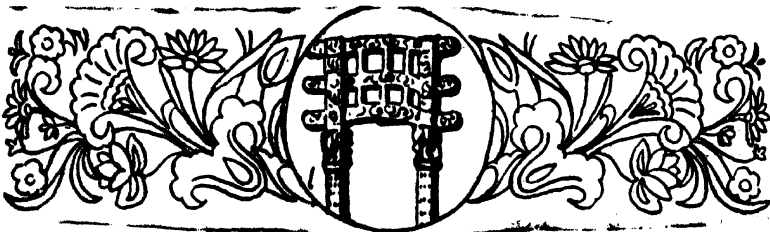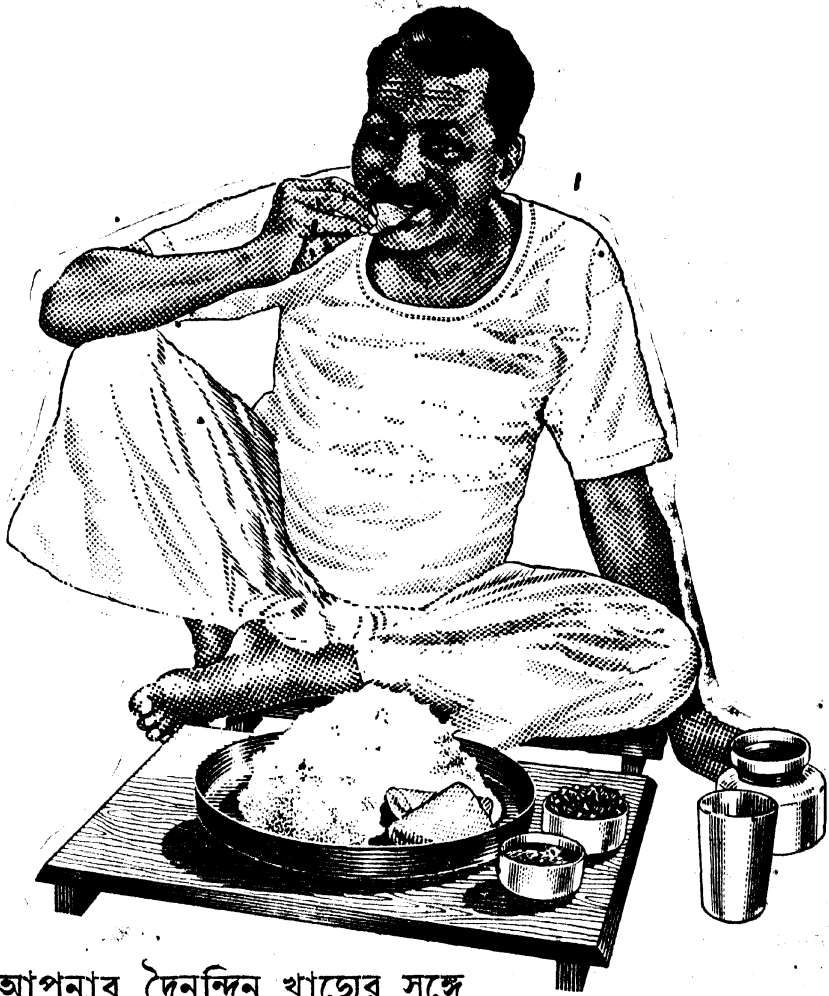
আপনার দৈনন্দিন খাদ্যের সঙ্গে ২ আউন্স স্নেহজাতীয় জিনিস থাকে ত?

খাদ্যবিশেষজ্ঞেরা বলেন যে আমাদের শক্তি ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হ'লে 'সুসম খাদ্যের' দরকার ··· যাতে এই পাঁচরকম উপাদান থাকা চাইই : ভিটামিন, লবণ, প্রোটিন, শর্করা ও — সবচেয়ে প্রয়োজনীয় — স্নেহপদার্থ।

স্নেহপদার্থ আমাদের পক্ষে উপকারী

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে প্রত্যেকের রোজ অন্তত ২ আউন্স স্নেহজাতীয় খাদ্যের দরকার! কারণ, স্নেহ আমাদের কর্মশক্তি যোগায় ··· রান্না সুস্বাদু করে ··· খাদ্যের ভিটামিন বহন করে। ভিটামিন সমৃদ্ধ বনস্পতি দিয়ে রান্না করলে এর প্রায় সবটুকুই সহজে এবং কমখরচে পাবেন। বনস্পতি দিয়ে রান্না খাদ্য সুস্বাদু হয় — খাদ্যের স্বাভাবিক সুগন্ধ বজায় থাকে।

সত্যিকার খাঁটি জিনিস

বনস্পতির প্রত্যেক আউন্স, ৭০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট এ-ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন চোখ ও ত্বক ভাল রাখে, এবং শরীরের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ক'রে শরীর গড়ে তোলে। আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় উৎকর্ষের উচ্চমান বজায় রেখে বনস্পতি তৈরী, প্যাক ও সিল করা হয়। বনস্পতি কিনলে একটি বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যকর জিনিস পাবেন।

DMA 6650 দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

গ্রামের নামকরণের হদিশ

শ্রীঅশান্ত সোম

সম্প্রতি 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়, পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন গ্রামের নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং নামকরণ সমস্যার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। আমি বর্তমান প্রবন্ধে হাওড়া জেলার কতকগুলি গ্রামের নামকরণ নিয়ে আলোচনা করব। আগ্রহশীল পাঠকদের কাছে যে কৌতূহল সৃষ্টি করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, গ্রামের এই নামকরণের হদিশ খুঁজতে গিয়ে আমাকে কিছু দলিল-দস্তাবেজ এবং বাকীটা জনশ্রুতির উপরই বহুল পরিমাণে নির্ভর করতে হয়েছে।

প্রথমেই হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত নামগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। গত সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, বাগনান থানায় ১০০টি মৌজা আছে। তার মধ্যে 'নান' যুক্ত মৌজা ৭টি, যেমন, পাতিনান, খানিনান, বাইনান, বাগনান, হান্যাণ, এবং নিপুন্যান প্রভৃতি। এই নানযুক্ত মৌজা-গুলিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, এই মৌজাগুলিতে মুসলমান-দের বসতি আছে। নান যুক্ত গ্রামগুলি পত্তনের পিছনে তবে কি নবাবী আমলের মুসলমান বসতকারীদের হাত আছে?

যাই হোক, এই নান যুক্ত গ্রামের মধ্যে 'বাগনান' গ্রামের নামকরণ কেন হ'ল—এ প্রসঙ্গ তোলা যাক। বাগনান থানার আদি ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে, এককালে ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল এই বাগনান। বাঘের উপদ্রব যে ভীষণ আকারে দেখা দিত, তা প্রতি গ্রামে গ্রামে সুন্দরবনের আমদানী বাঘের দেবতা 'দক্ষিণ রায়' ঠাকুরের ছড়াছড়ি দেখলে বোঝা যায়। বোঝা যায়, বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্যে দক্ষিণ রায় ঠাকুরের কাছে আকুল মিনতি। বাগনানের কাছেই আবার 'বাগমারী' নামে একটা জায়গা কথিত হয়ে আসছে। কিংবদন্তী যে, সেখানেও এককালে একটি বাঘ মারা পড়েছিল; তাই তার নাম হয়েছে বাগমারী আর বাগমারীর কাছে নতুন করে 'দক্ষিণ রায়' ঠাকুরের আবির্ভাবও হয়েছে। বাগনানে আবার বাঘের পিঠে-চড়া এক দেবীমূর্তি 'বাগেশ্বরী' নামে পূজিত হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্যে দেওয়ালীর সময় সেই অঞ্চলের লোকেরা যেমন 'বাঁধনা পরব' করে থাকে—এই অঞ্চলেও দেওয়ালীর সময় গৃহস্থ চাষীরা 'বাঁধনা পরবের' মত গরুর কপালে সিঁদুর এবং শিঙে তেল প্রভৃতি দিয়ে বরণডালা দিয়ে বরণ করে থাকে। এই প্রথা যে বাঘের উপদ্রব নিবারণের জন্যে করা হয়—তা ঝাড়গ্রামের বাঁধনা পরবের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। সুতরাং এই সব বাঘের উপদ্রবকে কেন্দ্র করেই যে 'বাগনান' কথাটির সৃষ্টি হয়েছিল এককালে, এমন ধারণা করা মোটেই অস্বাভাবিক হবে না বলেই মনে হয়। তা ছাড়া হাওড়ায় পাণিত্রাস গ্রামে 'শরৎ-স্মৃতি সংগ্রহশালা'য় রক্ষিত বাগনান গ্রামের প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজে 'বাঘনান' কথার উল্লেখ আছে। এমন কি, অম্বিকাচরণ গুপ্ত কৃত 'দক্ষিণ রাঢ় বা হুগলী' বইয়েতে একটি সনন্দ প্রসঙ্গে এই 'বাঘনান' কথাটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বোঝা যায় 'বাঘ' কথাটি পরে 'বাগে' রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, ব্যাঘ্র সঙ্কুল স্থানের জন্যেই 'বাগনান' নামের উৎপত্তি।

এই থানার অন্তর্গত 'পাতিনান' গ্রামখানি এককালে জল নিকাশের অসুবিধের জন্যে প্রায় সারা বৎসর জলে ডুবে থাকত। ফলে কেঁচকো, পাতি এবং হোগলার মত জলজ উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মাত; তার মধ্যে এই পাতিগাছ থেকে পল্লীর লোকেরা 'ঝেলদা' নামে এক ধরনের মাদুর তৈরি করত। পরে যখন জল নিকাশের ফলে গোটা অঞ্চলটায় একটু একটু করে বসবাসের যোগ্য হতে থাকল তখন ঐ অঞ্চলটার নামকরণই হয়ে গেল পাতিনান।

অধুনালুপ্ত লবণ শিল্পের জন্যে বাগনান থানা একদা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। লবণ তৈরির জন্যে যে সমস্ত জ্বালানী কাঠ লাগত তার সমস্তই পাওয়া যেত কাছাকাছি জালপাই জঙ্গল থেকে। যোগেশচন্দ্র বসু তাঁর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, উড়িয়া ভাষায় পাই শব্দের অর্থ হ'ল জন্য, আর জাল শব্দ জ্বলন শব্দের অপভ্রংশ। জ্বালানী কাঠের জন্য জঙ্গল রক্ষা করা হ'ত বলে বলা হ'ত জালপাই জঙ্গল। বাগনান থানার 'জালপাই' নামক গ্রামে এককালে নুন তৈরির ঘাটি ছিল এবং এই গ্রামটির নামকরণ এইভাবে যে হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়।

উল্লিখিত লবণ তৈরির কাজ যারা করত তাদের বলা হ'ত মলঙ্গী। মলঙ্গীরা জমিদারের অধীনে লবণ তৈরির জন্যে বৎসরের ছ'মাস মাইনে নিত আর বাকী ছ'মাস জমিদারী থেকে বিলি করা মাদুরী-জমি চাষাবাদ করত। আগে যে 'জালপাই' গ্রামটির কথা উল্লেখ করা হ'ল, ঐ গ্রামটির কাছে এই 'মাদুরী'-জমির উপরই এককালে যে গ্রাম গড়ে উঠেছিল, তারই নামকরণ পরে হয়েছিল 'মাদারী'।

এবারে মাদারী আর জালপাই গ্রামের কাছে 'নবাসন' গ্রামটির নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। নবাসন গ্রামটিতে এককালে কোন মনুষ্য-বসতি ছিল না। পরে এই গ্রামটিতে লবণ তৈরির কাজে নিযুক্ত মলঙ্গীরা বসবাস করতে সুরু করে এবং নতুন

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সর্বসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—
LIFEBUOY
FOR SAVING LIFE
FOR PRESERVATION OF HEALTH
SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
LIFEBUOY SOAP
L. 279-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

করে একটি গ্রামের পত্তন হয়।' নতুন গ্রাম তৈরি হবার ফলে লোকমুখে গ্রামটির নাম প্রচার হয় 'নয়াবসান'। পরে কথায় কথায় সাধারণ মানুষ গ্রামটির নাম আরও সরল চলতি করে বলতে থাকে 'নবাসন'।

গ্রাম-দেবতাদের নাম অনুসারে এই অঞ্চলের কোন কোন গ্রামের নামকরণ হয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে, কল্যাণপুর গ্রামের কথা। একযুগে 'কল্যাণ-চণ্ডী' নামক গ্রামদেবতাকে কেন্দ্র করেই এই গ্রামটির পত্তন হয়েছিল বলে গ্রামের নামও হয়েছিল কল্যাণপুর। বর্ত্তমানে কল্যাণ-চণ্ডী ঠাকুরের অস্তিত্ব বিলীন বললেই চলে। গ্রাম-দেবতাদের নামানুসারে গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে 'চন্দ্রভাগ', 'ডাকাবেড়ে' প্রভৃতি গ্রামের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। চাঁদরায় দেবতার নামে 'চন্দ্রভাগ' এবং ডাকাই-চণ্ডী দেবতার নামে ডাকাবেড়ে গ্রামের নামকরণ হয়েছে। ডাকাই চণ্ডী চলতি কথাতেই লোকে বলে থাকে, কিন্তু আসলে হ'ল ডাকাইত-চণ্ডী। অর্থাৎ এই ডাকাবেড়ে গ্রামের চণ্ডীঠাকুর একদল ডাকাতের দ্বারা পূজিত হতেন। তাই ক্রমে চণ্ডীর নাম হয়ে পড়ে ডাকাইত-চণ্ডী এবং পরে ডাকাই-চণ্ডী। তার পর ঐ সূত্রে গ্রামের নাম হয়ে যায় ডাকাবেড়ে।

এক একটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার এককালে যে যে অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল তাদের পদবী অনুসারে সেই সব অঞ্চলের গ্রামের নামকরণ হয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে, বাঙ্গালপুর, ভুঁয়েড়া, শিঙ্গেড়া, পালোড়া এবং বাগাবেড়ে প্রভৃতি। 'বাঙ্গাল' উপাধিধারী ব্যক্তিরা বাঙ্গালপুর গ্রামের আদি বাসিন্দা এবং ঐ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। তাই গ্রামের নামকরণ পরবর্ত্তীকালে 'বাঙ্গালপুরে' রূপান্তরিত হয়। এখনও এই অঞ্চলে 'বাঙ্গাল' পদবীধারী পরিবারের বাস আছে। যেমন বাঙ্গাল পদবী-অনুসারে বাঙ্গালপুর গ্রামের নামকরণ হয়েছে, তেমনি ভুঁইয়া পদবীধারী ব্যক্তিরা 'ভুয়েড়া গ্রামের, শিং পদবীধারী ব্যক্তিরা 'শিঙ্গেড়া' গ্রামের, পাঁজি পদবীধারী ব্যক্তিরা 'পালোড়া' গ্রামের এবং বাগ পদবীধারী ব্যক্তিরা 'বাগাবেড়ে' গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। এখনও উল্লিখিত গ্রামগুলিতে ঐ সব পদবীধারীদের বাস আছে এবং পদবী অনুসারে যে উপরিউক্ত গ্রামগুলির নামকরণ হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়।

এই অঞ্চলের রবিভাগ গ্রামটি দামোদর নদের চর থেকে সৃষ্টি এবং এককালে রবিশস্যের চাষে এই অঞ্চল খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ক্রমে এই অঞ্চলে মনুষ্যবসতি গড়ে ওঠার পর এই গ্রামটির নামকরণ হয় 'রবিভাগ'।

এবারে 'দহ' যুক্ত গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করব। বাগনান থানার ছোট বড় অনেক দহ আছে এবং ঐ দহগুলি স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বলেই সাধারণ মানুষের ধারণা। এই অঞ্চলের বরুন্দা, কামারদা, এবং বাঁকুরদা নামক গ্রামগুলি সম্পর্কে পুরাতন কাগজপত্রে পাওয়া যাচ্ছে বরুন্দহ, কামারদহ এবং বাঁকুড়দহ অর্থাৎ 'দহ' যুক্তগ্রাম। হাওড়া জেলার অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর ধারের গ্রামগুলির নাম হয়েছে মাকড়দহ এবং ঝাপড়দহ প্রভৃতি। সুতরাং বিন্দুমাত্র বিচিত্র নয় যে, এই গ্রামগুলির পাশ দিয়ে রূপনারায়ণ নদ প্রবাহিত হ'ত বলে এবং কোনও কারণে রূপনারায়ণের প্রবল স্রোতে এই গ্রামের মধ্যে কোন 'দহ' কোনকালে সৃষ্টি হয়েছিল বলেই এই সব নামকরণ হয়েছে।

উল্লিখিত বরুন্দা গ্রামটিতে একটি বিরাট দহ আছে। সাধারণ মানুষের ধারণা যে, ঐ 'দহ' দেবতার সৃষ্টি এবং সম্ভবত বরুণ দেবতার সৃষ্টি। দেবতা হিসাবে বরুণই হউন বা বরুণ-নামধারী কেউ হউন—বরুণের দহ থেকেই বরুন্দহ বা বর্ত্তমানে বরুন্দা গ্রামের যে নামকরণ হয়েছে, একথা বেশ বোঝা যায়।

আলোচ্য গ্রামগুলির নামকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামের নামকরণের পিছনে একটা ছোট ইতিহাস লুকিয়ে আছে এবং নামকরণ সমস্যার সমাধান করতে পারলে আমরা বহু গ্রামেরই অলিখিত ইতিহাসের সন্ধান পেতে পারি।

শিক্ষার গণতান্ত্রিক আদর্শ

শ্রীহরিচন্দন মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কটি প্রণধান করতে হলে প্রথমেই দেখা যাক 'গণতন্ত্র' বলতে কি বোঝায়। মূলতঃ এটি একটি রাজনৈতিক মতবাদ। দেশের লোকের হাতেই যখন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা থাকে তাকেই গণতন্ত্র বলা হয়। এব্রাহাম লিঙ্কনের মতে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

"Government of the people, for the people, by the people"—অর্থাং জনগণের সরকার, জনগণের জন্ম সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার। যে সরকারকে রাষ্ট্রের অধিবাসীরা আপন বলে জানে শুধু তারই জন্ম করবে তারা কল্যাণ-কামনা। দ্বিতীয়তঃ যে-সরকার জনগণের সুখ-সুবিধার কথাই চিন্তা করে সেই আদর্শ সরকারই গণতন্ত্রের সরকার। তৃতীয়তঃ গণতন্ত্রে জনগণই স্বীয় দেশ শাসন করে।(১)

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা থেকে মোটামুটি একথা জানা গেল যে, দেশের লোকের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং নির্ব্বাচনের ভিত্তিতেই শাসন-সংস্থা গঠিত হবে।

তবে শিক্ষাক্ষেত্রে যে গণতন্ত্র তা রাজনৈতিক মতবাদ নয়। সেটা 'A way of life'—একটা বিশেষ জীবনদর্শন। সে জীবনদর্শনের মূল কথা হচ্ছে প্রতিটি মনের মধ্যে ব্যক্তি-সত্তা এবং সমাজ-সত্তার চেতনা থাকবে। মহামান্য ফিক্‌টে বলেছেন—"Man becomes man only among men." সামগ্রিক কল্যাণ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রেণীবৈষম্যের অবসানই (সাম্য) গণতন্ত্রের মূলধর্ম।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। বিশেষতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা চাই। আবার গণতন্ত্রের মধ্যেও যে স্বাধীনতা অপরিহার্য্য তারও মূলনীতি যথেচ্ছাচারিতা নয়—তার মূলনীতি হচ্ছে ব্যক্তিত্বের ছাপ দিয়ে জীবনকে পরিচালিত করা।

ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাই যে, আদিম যুগ থেকে তা আজকের সভ্য মানুষ অবধি চলে আসছে একটা ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীলতার ভেতর দিয়ে। এই পরিবর্ত্তনের মূলে আছে গতিশীলতা। গতিশীলতা যদি না থাকত তা হলে আমরা মানুষের এই উন্নত সমাজ দেখতে পেতাম কিনা সন্দেহ।

এই গতিশীলতার মূলে আছে স্বাধীনতা। অথবা স্বাধীনতাই গতিশীলতার প্রাণবস্তু। মানুষের শিরা-উপশিরায়, তার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে নিরন্তর অনুরণিত হচ্ছে স্বাধীনতার এই আবহমান স্পন্দন। তাই স্বাধীনতার অভাব ঘটলে মানুষের জীবনে আসে হতাশা-বিষাদ—নৈরাশ্যের ভারে মুষড়ে পড়ে তার উদ্যম-উন্মাদনা।

স্বাধীনতার উপাসক সেই মানুষের স্বাধীন-জীবনযাত্রার পূর্ণ... এই গণতন্ত্র। বহু ব্যক্তি মিলেমিশে যে সমাজ-জীবন গড়ে ও... তাই হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজ।

এই গণতন্ত্রের মূলে নিহিত আছে গণ-চেতনা। আবার গণ-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার একমাত্র উপকরণ শিক্ষা। ব্যক্তি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সমাজ-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হবে এবং সমাজের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। মানুষ আত্ম-কেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের উপাসক নয়—সমাজ-কেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বই গণ-তন্ত্রের উপকরণ।

শিক্ষার সঙ্গে গণতন্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই, যে দেশে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে যত পরিমাণে, সে দেশে গণতন্ত্রেরও আবির্ভাব হয়েছে তত তাড়াতাড়ি। আবার যে দেশ শিক্ষায় যত অগ্রসর সে দেশের গণতন্ত্রের রূপটিও তত উজ্জ্বল। রাষ্ট্রগত গণতন্ত্রে রয়েছে শ্রেণী-বৈষম্য এবং কলহ-দ্বন্দ্ব—কিন্তু শিক্ষায় যে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে সেখানে ব্যক্তি ও সমাজের অচ্ছেদ্য বন্ধন এবং সাম্যের কথাই মুখ্য

শিক্ষা আর গণতন্ত্রের গুণগত ঐক্য এবং সাদৃশ্য প্রচুর। গণতন্ত্রের ন্যায় শিক্ষাও স্বাধীনতার ধারক ও বাহক। শিক্ষাও মানুষের জীবনকে ফুলের মত বিকশিত করে দেয় সামাজিক কল্যাণের উপকরণ হিসাবে। শিক্ষার পরিসরে স্বাধীনতার প্রবর্ত্তনা আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের সবচেয়ে বড় অবদান।(২)

মৌন এবং মূক মুখে ভাষা জোগায় শিক্ষা; শ্রান্ত, শুষ্ক এবং ভগ্ন বুকে আশার ঝঙ্কার ধ্বনিত করে তোলে শিক্ষা; ভবিষ্যতে নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলে শিক্ষা। শিশুর দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং আনুভূতিক বিকাশ সাধনই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

---

(১) বিখ্যাত চিন্তাবিদ বার্ণার্ড শ' সম্প্রতি গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটির একটু অদলবদল করে দিয়েছেন। তাঁর মতে "Government of the people, for the people" কিন্তু "by the chosen representatives of the people." অর্থাং সমস্ত জনগণই শাসনকার্য্য পরিচালনা করে না; তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গই দ্বারা দেশ শাসিত হয়।

(২) "Freedom first, freedom second, freedom last."
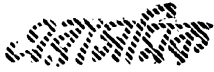
গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করতে হ'লে ব্যক্তিকে কতকগুলি যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে।

(ক) ব্যক্তি যেন যন্ত্রমাত্র না হয়। অন্যের নির্দ্দেশে বা গতানুগতিকভাবে এবং অন্ধভাবে যেন সে কাজ না করে। তাকে সমাজ-পরিবেশ এবং ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হবে। তবেই হবে সচেতন অংশ-গ্রহণ। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জীবন সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ, সামগ্রিক এবং অখণ্ড জ্ঞান ফুটে ওঠে।

(খ) বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে অবলম্বন করে মানুষের সঙ্গে যাতে মানুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেজন্য সমাজ-প্রদর্শিত পথে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার।

(গ) বর্তমান সমাজ-তান্ত্রিক জীবন এত জটিল যে, আমাদের নব নব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নানা চিন্তা, বুদ্ধি প্রভৃতির প্রয়োগ করে আমাদের কাজ করতে হয়। জটিল কাজগুলো সহজে যাতে করতে পারি তার জন্য অভ্যাস গঠন করতে হবে। ফলে আমরা উচ্চ চিন্তায় মনোনিবেশ এবং বৃহত্তম কর্ম্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হব।

(ঘ) সমস্ত ব্যাপারে এবং নানান দিকে মনোনিবেশ এবং বহুমুখী অনুরাগ থাকা চাই।

(ঙ) গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, নীতি ও আদর্শ অর্জ্জনের প্রয়োজন।

(চ) গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে অপরিহার্য্য জ্ঞান সকলকেই অর্জ্জন করতে হবে। তারপর নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কোন বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জ্জন, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন, চিন্তা ও বিচারক্ষমতার বিকাশ-সাধন এবং সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে।

(ছ) দেহের ও মনের স্বাস্থ্য চাই।(৩)

(জ) সমাজক্ষেত্রে সার্থক পারিবারিক জীবনযাপনের প্রস্তুতি আবশ্যক।

(ঝ) রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্ম্মীয় এবং গোষ্ঠী-জীবনে সামঞ্জস্য বিধান (Social-Personal Relationship) প্রয়োজন।

(ঞ) সাহিত্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীত ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি এবং এগুলি উপভোগে যোগ্যতা অর্জনান্তে সৌন্দর্য্যবোধ ও রুচির উন্মেষসাধন আবশ্যক।

(ট) গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শের মূলনীতি সম্বন্ধে বিশ্বাস অর্জন একান্ত প্রয়োজন।

এখন দেখা যাক—গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে শিক্ষার স্থান কোথায়। গণতন্ত্রের প্রধানতঃ দুটি দিক। প্রথমতঃ আপামর জনসাধারণ এবং দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী। এদের উভয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার কার্য্যকারিতা এবং উপযোগিতাই বর্ত্তমানে আলোচ্য বিষয়।

জনগণের মধ্যে যদি শিক্ষার আলোক বিতরিত না হয় তা হলে দেশের শাসন-ব্যাপারে, কে উপযুক্ত আর কে অনুপযুক্ত তা নির্ণয় করার ক্ষমতা তাদের আসবে না। ফলে তারা অযোগ্য ব্যক্তির হাতে দেশ শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে বসবে এবং স্বভাবতঃই দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

দ্বিতীয়তঃ আদর্শ নাগরিকের গুণাবলী যদি জনগণের জানা না থাকে তা হলে তারা নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হবে না। ফলে সরকারকে সাহায্য করা দূরে থাক—নানা বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের অকল্যাণ সাধনে এরাই হবে অগ্রদূত।

অপর পক্ষে যদি নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী সুশিক্ষিত না হন তা হলে রাষ্ট্রের উন্নতিও হবে সুদূরপরাহত এবং শাসনকার্য্যে দেখা দেবে নিত্য-নূতন বিশৃঙ্খলা।

অতএব দেখা গেল—শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত না হলে এবং ব্যাপক শিক্ষা-ব্যবস্থা না থাকলে গণতন্ত্র কখনই সফল হতে পারে না। এক দিকে সুশাসন, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ, কর্ত্তব্যবোধ এবং সামাজিক কল্যাণ প্রভৃতি যেমন গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য্য অঙ্গ—

(৩) মনের স্বাস্থ্য ত্রিবিধ:

(অ) ভাবাবেগ ও চিত্তবৃত্তির পরিমার্জ্জনা

(আ) পরস্পর-বিরোধী বৃত্তিগুলির মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য-বিধান।

(ই) ব্যক্তিত্ব (Personality) ও চরিত্র সংগঠন।

অন্ত দিকে তেমনই শিক্ষা ব্যতীত এর কোনটিই আত্মপ্রকাশ করে না। সেই জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাস অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাই—যে রাষ্ট্র যত উন্নত তার মূলে সেই পরিমাণে জাগ্রত আছে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা। সেই জন্যই সব দেশে এবং সব কালে রাষ্ট্র অব্যাহত ভাবে এগিয়ে এসেছে শিক্ষাভার গ্রহণের গুরু দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে বহন করতে।

গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর। জাতীয় শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে মুখ্যতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নজর রাখতে হবে।

প্রথমতঃ দেশের সর্ব্ব দলের এবং সর্ব্ব স্তরের জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। শিশুই হ'ল ভবিষ্যতের নাগরিক। অতএব তার জীবনকে ঠিক মত গড়ে তোলা শুধু শিক্ষার মূল কথা নয়—গণতন্ত্রেরও এইটিই প্রাণ-কথা। এই শিশুশিক্ষার ব্যাপারে শিশুকে প্রথম থেকেই শিক্ষা দিতে হবে তার দেশের ইতিহাস—তার পরিচয় সাধন করতে হবে দেশের সমাজের সঙ্গে। তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সর্ব্ববিধ চেষ্টা করাতে হবে আমাদেরই রাষ্ট্রের কল্যাণে।

তার পর স্ত্রীশিক্ষা। গণতন্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের ভোটাধিকার বা অন্যান্য অনেক অধিকার সমান বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। অথচ ভারতবর্ষ প্রমুখ দেশে এখনও শতকরা পাঁচজন নারী শিক্ষিতা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের কাছ থেকে শাসন-ব্যাপারে প্রতিনিধির সু-নির্ব্বাচনের আশা সুদূরপরাহত। অতএব স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং সুব্যবস্থা প্রয়োজন।

বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে অশিক্ষিত এবং অল্প শিক্ষিতের সংখ্যাই বেশী। অথচ নির্ব্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের একচেটিয়া অধিকার। রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করতে হলে বা গণতন্ত্রের পূর্ণ রূপটি প্রণিধান করতে হলে বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দারিদ্র্য বিস্ফোটক স্বরূপ। অথচ দারিদ্র্যের মূলেও নিহিত আছে অশিক্ষা। দারিদ্র্য অপসারণের জন্য রাষ্ট্রকে প্রথম হস্তক্ষেপ করতে হবে বেকার সমস্যা সমাধানের ওপর। এই বেকার সমস্যা সমাধানের মূলেও আছে শিক্ষা। বর্ত্তমানে শিল্প ও বিজ্ঞানের যুগ। বিভিন্ন শিল্প ও বিজ্ঞানের দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এবং বৃত্তি ও কারিগরী-শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষার দ্বিতীয় কথা—নির্ব্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিনিধি-বর্গের উপর শিক্ষার ভার ন্যস্ত করা। গণতন্ত্রের একটা সুবিধা এই যে, যারা আমাদের একান্ত আপনার, যাদের ওপর আমাদের বিশ্বাস অটুট, যারা আমাদের কল্যাণের জন্য উদ্‌গ্রীব সেই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই আমাদের শিক্ষার পথপ্রদর্শক। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে দুষ্পাচ্য এবং অপ্রয়োজনীয় কিছু প্রবেশ না করাটাই স্বাভাবিক।

জাতীয় শিক্ষার তৃতীয় কথা—শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ আনয়ন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার সঙ্গে সমাজের এবং দেশের লোকের একটা নাড়ীর যোগ থাকে। মেকলে সাহেবের নীতি শিক্ষার সঙ্গে এ দেশের সমাজের নাড়ীর যোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল বলেই ভারতবর্ষ হারিয়েছিল তার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের ভিত্তিকে মজবুত করতে হলে ভারতের সামাজিক এবং জাতীয় উপকরণগুলির অনুশীলন করতে হবে। বয়স্ক নিরক্ষর জনসাধারণকে অধিক বয়সে লিখন-পঠন শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষাদানে ব্যর্থতা আসবে এবং সময়ের অপব্যবহার করা হবে। তাই তাদের জন্য যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার প্রবর্ত্তন করে সামাজিক শিক্ষার ভিতটা শক্ত করতে হবে। দেশের মধ্যে নানাপ্রকার শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা দানের মাধ্যমে রাষ্ট্রও পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে। যে শিক্ষা গণতন্ত্রের সঞ্জীবনীস্বরূপ, তার উৎকর্ষ-সাধনের দায়িত্ব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই। ভোগের চেয়ে সেবার আদর্শই হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র এবং সেই সেবাকার্য্যের সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হবে শিক্ষার চত্বর থেকে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য "to aim at some good" অর্থাৎ কল্যাণ, আর গণতন্ত্রেরও আদর্শ কল্যাণ। শিক্ষাও ব্যক্তিগত কল্যাণের মাধ্যমে সমাজের উৎকর্ষ সাধন করে—গণতন্ত্রও ব্যক্তিবিশেষের সুখ-সুবিধাকে ভিত্তি করেই সামাজিক সমৃদ্ধির জন্য প্রয়াস পায়। শিক্ষাক্ষেত্র থেকেও অধুনা ধর্ম্মের গোঁড়ামি নির্ব্বাসিত হয়েছে—গণতন্ত্রেরও নীতি হচ্ছে ধর্ম্মনিরপেক্ষ শাসনপদ্ধতি।

অতএব সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের শাসনপদ্ধতি বিচার করে অত্যাধুনিক রাজনীতিবিদ্‌গণ যে গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন সেই গণতন্ত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্য—এমন কি শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। গণতন্ত্রের কলেবরে শিক্ষা প্রাণস্বরূপ। যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শিক্ষার আলোকে যত অধিক পরিমাণে উদ্ভাসিত—সেই রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি তত বেশী মজবুত। শিক্ষার পলিমাটিতে জন্মে স্বাধীনতার অঙ্কুর—আবার স্বাধীনতার অঙ্কুর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে গণতন্ত্রের পল্লবিত কিশলয়।

বাংলা সাহিত্যের চতুষ্কোণ—শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশান্ত মিত্র পাবলিকেশনস, ৯ অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা—১২। মূল্য—এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক সাহিত্যের চারটি দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। রম্য রচনা, আধুনিক বাংলা নাটক, উপন্যাস ও ছোট গল্প। সমালোচনা-সাহিত্য আমাদের দেশে বিরল না হইলেও, বিশেষ সমৃদ্ধ নয়। আলোচনা ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার শক্তি না থাকিলে, কাহারও এ কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। লেখক প্রতিটি বিষয় লইয়া যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রশংসারই দাবি করিতে পারেন। সাধারণের কাছে এরূপ আলোচনার প্রয়োজন ছিল, কারণ অনেকেই এ বিষয়ে সম্যক অবহিত নয়। এদিক দিয়া গ্রন্থকার প্রভূত উপকার করিয়াছেন। তবে একটা কথা না বলিয়া পারিতেছি না, আলোচনা বিষয়ে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই। ব্যক্তিকে লইয়া তুলনা করিতে গেলেই বিচার পক্ষপাত-দুষ্ট হইয়া পড়ে। ছোট গল্পের আলোচনা-ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের এই দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে। মতবাদমাত্রই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক। তথাপি লেখকের বিশ্লেষণ-ক্ষমতাকে অস্বীকার করা যায় না।

ছোট গল্প এবং উপন্যাসের ভিতর কোথায় কতটুকু পার্থক্য লেখক অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অনেক লেখকই ইহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তাই অনেক দিক দিয়াই গ্রন্থখানি মূল্যবান। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

আমার জীবন কথা—অনুবাদিকা মায়া ভায়া। পার্ল পাব্লিকেশন্‌স প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই—১, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।

হেলেন কেলারের নামের সঙ্গে পরিচয় নাই, এমন লোক বিরল। তিনি অন্ধ এবং বোবা কালা। জন্মের কয়েক দিন পরেই পৃথিবীর আলো তাঁহার চোখ হইতে সরিয়া যায়। এই অল্পক্ষণের দেখা আলোর স্মৃতি তাঁহার রহিয়া যায়। পরিণত বয়সে এই স্মৃতি তাঁহার বিশেষ কাজে লাগিয়াছে। এক ইন্দ্রিয় নষ্ট হইলে অপর ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি বাড়ে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। হেলেন কেলারের জীবনেও আমরা তাহার পরিচয় পাই। তাঁহার অনুভব-শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি স্পর্শ করিয়া এবং ঘ্রাণ লইয়া প্রতি জিনিসটির সম্যক পরিচয় লইতে পারিতেন।

আজ অন্ধ-বোবা-কালার জন্য স্কুল, কলেজ প্রায় সর্বত্র হইয়াছে, কিন্তু হেলেন কেলারের বাল্যকালে কোন স্কুলই ছিল না। তাঁহার পিতামাতা বহু চেষ্টা করিয়া এক শিক্ষয়িত্রীর হাতে ইহাকে সমর্পণ করেন। তিনিই মাতার আদরে সর্বদা সঙ্গে থাকিয়া তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই অপরিণত বালিকা হেলেন কেলার আজ জগৎবিখ্যাত। অসাধারণ তাঁহার প্রতিভা, অদম্য জানিবার ইচ্ছা। এই অসামান্য জ্ঞান-পিপাসাই তাঁহাকে আজ এত বড় করিয়াছে। তিনি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন। অল্পদিন হইল, কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার আত্মজীবনী, 'The Story of My Life' হইতে বাংলায় অনূদিত। অনুবাদ করিয়াছেন মায়া ভায়া। হেলেন কেলারের জীবনী হয়ত আরও আছে, কিন্তু স্বহস্ত-রচিত দিনপঞ্জীর মূল্য অনেকখানি। আমার দুঃখের কথা আমিই ভাল বলিতে পারি, অপরকে সেখানে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। হেলেন কেলার নিজেকে কোথাও প্রচ্ছন্ন রাখেন নাই। অকপটে সকল কথাই বলিয়া গিয়াছেন। এই বলার মধ্যে যে-দরদ এবং আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব।

এই সুরটি অনুবাদক্ষেত্রেও বজায় আছে। অনুবাদিকার ইহাই কৃতিত্ব। বইখানি সাধারণের কাছে সমাদৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস রাখি।

শ্রীগৌতম সেন

অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা-সমস্যা—শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩্।

সংসারে আনন্দের রসদ যোগায় শিশু। সমাজের তথা দেশের ভবিষ্যৎও শিশু। শিশু যদি দেহে ও মনে সুস্থ হইয়া না উঠে তাহা হইলে তাহারাই ভবিষ্যতে সমাজ-দেহে দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া চতুর্দ্দিকের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। ব্যাধি-আক্রান্ত মানুষের যেমন চিকিৎসার প্রয়োজন, অপরাধপ্রবণ দুষ্ট-প্রকৃতির শিশুরও তেমনি সংশোধন আবশ্যক। কিন্তু শোধন প্রণালী শুধু মাত্র দৈহিক শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেই চলিবে না। শিশু মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সহায়তায় সাফল্য লাভ করার প্রচেষ্টা আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মানব-গোষ্ঠীর একটা বৃহৎ অংশ আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছে। বিশেষ করিয়া শিশুর অবাধ্যতা মানসিক বিকার ও অপরাধপ্রবণতা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ইহাকে আজ আর অবহেলা করা চলে না। আমাদের আশে পাশে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রতিদিন চোখে পড়ে। দুঃখ পাই—ভবিষ্যতের একটা ভয়াবহ রূপ কল্পনা করিতে গিয়া শিহরিয়া উঠি। শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয় সমালোচ্য পুস্তকখানিতে বর্তমান কালের একটি অতি প্রয়োজনীয় সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

শিশু-অপরাধপ্রবণতা ও তার প্রতিকারের বহু নজির আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

নূতন মায়েদের প্রতি শিশুপালন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিও সুন্দর। গুহ মহাশয় কতকগুলি উপদেশ দিয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ করেন নাই, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে শিশু বিদ্যালয়গুলি কি ভাবে নানা শ্রেণীর শিশুদের শিক্ষা দিয়া সফল হইয়াছে, তাহারও বহু দৃষ্টান্ত এই পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এইরূপ একখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয় সমাজের একটি গুরুতর সমস্যার প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

নববধূর আগমন—ষ্টিফেন ক্রেন। অনুবাদিকা শ্রীসাধনা দেবী। 'পার্ল' পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-১। মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

সমালোচ্য পুস্তকখানি ষ্টিফেন ক্রেনের The Bride Comes to Yellow Sky-র বঙ্গানুবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত আমেরিকান লেখক ষ্টিফেন ক্রেনের নয়টি শ্রেষ্ঠ গল্প নিয়ে এই সঙ্কলন গ্রন্থ। বিদেশী পরিবেশে গল্পগুলি রচিত না হইলে অনুবাদ বলিয়া মনে হইত না। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।

সেতুর ওপারে মুক্তি—জেমস. এ. মিচেনার। অনুবাদক শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী। পার্ল পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। বোম্বাই-১। মূল্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

'সেতুর ওপারে মুক্তি' জেমস এ. মিচেনার লিখিত "The Bridge at Andau"-এর বঙ্গানুবাদ।

১৯৫৬ সনের তৎকালীন কমুনিষ্ট রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষক হাঙ্গেরী সরকারের বিরুদ্ধে যে গণবিপ্লব দেখা দিয়াছিল তাহারই ভয়াবহ পরিণতির স্বরূপ এই পুস্তকখানিতে দেখান হইয়াছে। রাশিয়ানরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে বর্বর অত্যাচার করিয়াছিল—একটা সমৃদ্ধ নগরী কিভাবে তাহাদের হাতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—তাহারই এক নৃশংস কাহিনী এই পুস্তকখানিতে দেখান হইয়াছে। পুস্তকখানিতে কতটা প্রপাগাণ্ডা করা হইয়াছে—কতখানি প্রকৃত ঘটনা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে—পৃথিবীর আর একপ্রান্তে বসিয়া তাহা সঠিক নির্ণয় করা শক্ত কিন্তু বর্বর অত্যাচারের যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা আংশিক সত্য হইলেও ভয়াবহ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

স্বচ্ছ অনুবাদ গুণে পুস্তকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

রাজঘাটস্থ গান্ধীজীর সমাধিতে মাল্যদান

কলিকাতা হইতে বঙ্গীয় মূক-বধির সঙ্ঘের এক প্রতিনিধি দল দিল্লীতে রাজঘাটে গান্ধীজীর সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করিতে গিয়াছিলেন। পার্শ্বের চিত্রে ডান হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বধির দোভাষী শ্রীযুক্ত নলিনী-মোহন মজুমদারকে দেখা যাইতেছে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৭৫ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান তথা ভারত

কাগজের অভাবে এ মাসের "প্রবাসী" দেরীতে প্রকাশিত হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে পাকিস্থানের ছত্রপতি জেনারেল আয়ুবখাঁ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমানে ভারতের অবস্থা সামরিক ডিক্টেটরের অধিকারের পূর্ব্বের পাকিস্থানের সঙ্গে তুলনীয়।

এই মন্তব্য আমাদের অধিকারীবর্গকে কিছু বিচলিত করে নাই। তাঁহারা শুধুমাত্র এদেশে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা—বা আশঙ্কা—নাই কেন সে বিষয়ে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ পাকিস্থানি ইঙ্গিত অত সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় কি?

পাকিস্থানের জনসাধারণ যেরূপ দুর্দ্দশা ও অভাবগ্রস্ত—অন্ততঃ পক্ষে আমরা যাহা জানি বা শুনি সেই মতে—হয়ত আমাদের জনসাধারণ অতটা ক্লিষ্ট নয়। কিন্তু আমাদের জনসাধারণ যে নিদারুণ অভাবক্লিষ্ট সে বিষয়ে কি কোনও সন্দেহের অবকাশ আছে? আয়ের পরিমাণ ত চোরাবাজারীদলের ও সরকারী পেটোয়া দলেরই বাড়িতেছে। অন্যদের কাগজে পত্রে বা অঙ্কের হিসাবে যাহা বাড়িতেছে খরচের খাতে তাহার সমস্তটাই নিঃশেষ হইয়া আরও কিছু ঘাটতির অঙ্কে পড়িতেছে। আয়-ব্যয় খতাইয়া দেখিলে সাধুলোকের অভাব বাড়িয়াই চলিতেছে, ফলে সাধু বা সংলোকের ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকার হইতেছে, এমনই আমাদের পরম সদাশয় সরকার বাহাদুরের কৃতিত্ব।

তবে দুই দেশে প্রভেদ যে কিছু নাই তা নয়। পাকিস্থানের ভূতপূর্ব্ব কর্ত্তারা দেশের লোককে ভুলাইবার জন্য ভারতের শত্রুতার ওজরে সবকিছুই চালিয়াছিলেন, বর্ত্তমানের অধিকারিবর্গও সেই পথে চলিয়াছেন। আমাদের মহাশয়বৃন্দ সবকিছুই পরিকল্পনার আলেয়ার আলো দেখাইয়া ভুলাইতে চাহেন। প্রথমের পর দ্বিতীয়, তাহার পর তৃতীয়—অপরা কিম্ বা ভবিষ্যতি! গল্প আছে গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি হইলে সে প্রতিবেশীর সাহায্য চাহিয়া উত্তর পায় "দাঁড়াও দাদা, ছেলে তিনটের বিয়ে দিই, তার পর নাতিপুতি জোয়ান হলে সবাই মিলে ডাকাত তাড়াব।" আমাদের মহামহিমান্বিত সরকার পক্ষের ভাষণ, অভিভাষণ-বাণী, আপ্তবাক্য ইত্যাদি প্রায় ঐ একই কথা। "ধৈর্য্য ধর, প্রথম শেষ হইয়াছে, দ্বিতীয় চলিতেছে, তৃতীয়ের আবাহন চলিতেছে। তাহাতেও যদি তোমরা না মর তবে চতুর্থ ও পঞ্চম নিশ্চয় আসিবে।"

দেশে তো দুর্নীতির প্লাবন বহিতেছে এবং এই সরকার-পরিপোষিত শোষণনীতি যতদিন চলিবে ততদিন ইহার কোনও উপশম হওয়া অসম্ভব।

আমদানী কমাইয়া দেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাইবার চেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলে দেশের লোকের দুর্দ্দশা চতুর্দ্দিকে বাড়িয়াই চলিতেছে। এ দেশে অতি অল্প লোকই আছে—চোরা কারবারী ও দেশের অধিকারীবর্গ ছাড়া—যাহারা স্বেচ্ছায় বিদেশের পণ্য কিনে। অন্যদিকে দেশের অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি বিদেশের মাল-মশলা বা শিল্প উপকরণ লইয়া নানা ব্যবসায় বা কার্য্য-প্রতিষ্ঠান চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যে বিদগ্ধ চূড়ামণিবর্গ দেশের 'উন্নতির' জন্য পরিকল্পনারূপী ছায়াবাজী দেখাইতেছেন তাঁহাদের ঘটে এইটুকু বুদ্ধি নাই যে, ইহারা যদি বৃত্তিহীন ভিক্ষুক হইয়া দাঁড়ায়, তবে এদেশের অবনতি শেষ সোপানে নামিয়া যাইবে।

বলা হয় "এখন কৃচ্ছ্রসাধন কর পরকালে ভূস্বর্গে বাস করিবে।" অবশ্য কৃচ্ছ্রসাধন করিলে স্বর্গলাভ হইতে পারে, তবে সেটা ভূলোকে নহে।

পৃথিবীতে ইতিপূর্ব্বে এরূপ মূর্খের ন্যায় কোনও ব্যবস্থাবিহীন পরিকল্পনা হয় নাই তাহা নহে। সোভিয়েটে এইরূপ কার্য্যক্রমের ফলে দুই কোটি লোকের প্রাণনাশ হয় এবং তাহার পর আসে ষ্টালিনতন্ত্র। পাকিস্থানে লোক মরে নাই কিন্তু আসিয়াছে সামরিক শাসন। তবুও আমাদের মহাবুদ্ধিমান বাক্যবাগীশদের হুঁস নাই—আছে শুধু ভুয়ো বক্তৃতা।

দেশে যাহা আছে যদি সকলে ন্যায্য মূল্যে তাহার উপযুক্ত ভাগ পাইতে পারে তবেই দেশে সোসিয়ালিজম, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির নাম যেন উচ্চারিত হয়। নহিলে এই সরকারী মিথ্যার প্রচারে লাভ তো নাই বরঞ্চ সমূহ অপকারই হইবে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক সংস্থা

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক সংস্থার কার্য্যাবলী লইয়া আইন পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে খুব আলোচনা চলিতেছে। বিদেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহিত ব্যবসায় করার সুবিধার্থে এই রাষ্ট্রীয় সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে এই সংস্থা ভারতীয় খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানী কার্য্যে লিপ্ত আছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যশস্যের কেনাবেচাও এই প্রতিষ্ঠান করিবে। দেশে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে কালোবাজারী ও মুনাফাখোরী বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে, ইহাতে প্রধানতঃ লাভবান হইতেছে মুষ্টিমেয় ফড়িয়া ও আড়তদার ব্যবসায়ী। অর্থাৎ দেশের অগণিত জনসাধারণের স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী অসামাজিক কার্য্যকলাপ দ্বারা নিজেদের পকেট ভর্তি করিতেছে। ইহারই প্রতিরোধকল্পে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক সংস্থা খাদ্যশস্যের ব্যবসা সুরু করিয়াছেন।

ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, ভারতবর্ষে কৃষিদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে মাধ্যমিক ব্যবসায়ীরা, অর্থাৎ ফড়িয়াদাররা বাজার দখল করিয়া আছে। তাহারা কৃষকদের নিকট হইতে সস্তায় ক্রয় করিয়া আড়তদারদের নিকট চড়া দরে বিক্রয় করে, ফলে কৃষিদ্রব্যের মূল্য অযথা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সেই তুলনায় চাষীরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের যথার্থ মূল্য পায় না। এই অনাচার দূরীকরণের জন্য সরকার স্থির করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খাদ্যশস্য ক্রয়বিক্রয় করিবে। কিন্তু ফড়িয়াদারদের নিকট হইতে ক্রয় করিলে এবং আড়তদারদের নিকট বিক্রয় করিলে এই অনাচার দূরীভূত হইবে না। প্রত্যক্ষভাবে চাষীদের নিকট হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে হইবে এবং আড়তদারদের নিকট বিক্রয় না করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করা প্রয়োজন। অর্থাৎ বাজারে এক-চেটিয়া ব্যবসায় বন্ধ করিতে না পারিলে খাদ্যশস্যে মুনাফাখোরী ব্যবসায় বন্ধ করা যাইবে না।

কিন্তু ভারত সরকারের বড় বড় আড়তদার ও ব্যবসায়ীর উপর কিছুটা দুর্ব্বলতা আছে এবং সেই কারণে আমাদের সন্দেহ হয় যে, নূতন ব্যবস্থায় বাজারের অনাচার সত্যই দূরীভূত হইবে কিনা। এই বিষয়ে ভারতীয় যুক্ত বাণিজ্য সংসদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি যেন খাদ্য-শস্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত না হয়। বাণিজ্য সংসদের এই বিষয়ে মাথা-ব্যথার কারণ বুঝিতে অবশ্য কষ্ট হইবে না। ইহার বড় বড় রুই-কাতলারা খাদ্যশস্যের মত লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে এবং ইহাকে হাতছাড়া করিতে চায় না। বাংলাদেশে ১৯৪৩ সন হইতে ইস্পাহানী কোম্পানীর ঐতিহ্য এখনও চলিয়া আসিতেছে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে। খাদ্যশস্যের বাস্তবিক যে অভাব, তাহার চেয়ে অধিক অভাব সৃষ্টি করা হয় কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যদি এই রাঘববোয়ালদের জোট ভাঙিতে পারেন তাহা হইলে খাদ্যশস্যের মূল্যই শুধু যে হ্রাস পাইবে তাহা নহে, সরবরাহের সঙ্কট অনেকখানি দূরীভূত হইবে। সরকার কর্ত্তৃক খাদ্যশস্যের সর্ব্বনিম্ন মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন এবং সেই মূল্য অনুসারে চাষীদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে হইবে। ইহাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

বিপ্লবী সমাবেশ

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের তিন শত বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধা সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়াছিলেন। তিন দিনব্যাপী অধিবেশনের শেষে সম্মেলন দশজন বিপ্লবীকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে রহিয়াছেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, ডঃ খানখোনে সর্দ্দার, মোহন সিং ভাকনা, লালা হনুমন্ত সহায়, গুরু মহারাজ প্রতাপ সিং, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত সুন্দরলাল এবং শ্রীযোগেশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিপ্লবী শহীদদের স্মৃতির সহিত জড়িত স্থানগুলি যাহাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হিসাবে রক্ষিত হয় কমিটি সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে কমিটি কয়েকটি "বৈপ্লবিক কেন্দ্র" স্থাপন করিবেন যে কেন্দ্রগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা চালান হইবে এবং যেখানে প্রয়োজনমত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসের সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। কমিটি একটি শহীদ-স্মৃতি ট্রাষ্ট গঠন করিবেন।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার ব্যাপারে কার্য্যতঃ এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। কয়েকটি রাজ্যে অবশ্য ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টার প্রাথমিক স্বাক্ষর পাওয়া গিয়াছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখনও কিছু করা হয় নাই। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিপ্লবীগণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রয়োজনবোধে বিপ্লবীদের অধিকাংশ কার্য্যকলাপই লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে হইত। এই সকল ঘটনার বহু প্রমাণই আজ লোপ পাইয়াছে। যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদি এখনও সংগ্রহ করা সম্ভব প্রবীণ নেতৃবৃন্দের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও অচিরে লোপ পাইবে। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ স্বতঃ-প্রণোদিতভাবে ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় উৎসাহী হইয়াছেন ইহা বিশেষ আশার কথা। সকলেই আশা করেন যে, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহ বিপ্লবী কমিটিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য প্রদান করিবেন।

পাটের মূল্য হ্রাস

যে কয়টি পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে ভারত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করিতে পারে পাট তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি পাটের মূল্য হ্রাস হইবার ঝোঁক দেখা দেওয়ায় অনেকেই তাহাতে বিশেষ ভাবে চিন্তিত হন। লোকসভায় এ বিষয়টি উত্থাপন করা হইলে বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন যে, দেশে উৎপাদন-বৃদ্ধিই

এই মূল্যহ্রাসের অন্যতম কারণ। ১৯৫৩-৫৪ সনে মোট ৩৭ লক্ষ ৪৭ হাজার গাঁইট উৎপন্ন হয় এবং ঐ বৎসরে ১৮ লক্ষ ৮৪ হাজার একর জমিতে পাট ও মেস্তার চাষ হয়। ১৯৫৮-৫৯ সনে ৬৫ লক্ষ গাঁইট পাট ও মেস্তা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, অথচ পাট ও মেস্তা চাষের জমির পরিমাণ ১৯৫৩-৫৪ সন অপেক্ষা মাত্র ১০ হাজার একর অধিক। ১৯৫৩-৫৪ সনে আসাম মিডলের গড়পড়তা দর ছিল মণপ্রতি ২৯-৫ টাকা, সম্প্রতি এই পাটের দর মণপ্রতি ২৪৲ হইতে ২৭৲ টাকার মধ্যে। একর প্রতি ফলনবৃদ্ধির কথা মনে রাখিলে এই দর মোটামুটিভাবে খুব কম বলিয়া মনে করা যায় না।

তথাপি যাহাতে পাটের মূল্য আরও নীচে নামিয়া না যায় তজ্জন্য সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীশাস্ত্রী জানান। এই জন্য ছয় দফা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, (১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট ও হেসিয়ান এক্সচেঞ্জ পাটের দর একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরের নীচে নামিয়া গেলে উহা পূরণকল্পে প্রদেয় মারজিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। (২) ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়েশন ১৯৫৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্দ্দিষ্ট হেসিয়ান (চট) ও প্যাকিং-এর (থলিয়া) দর অক্ষুণ্ণ রাখার অভিপ্রায় পুনর্ঘোষণা করিয়াছেন। (৩) এসোসিয়েশন সদস্য মিলগুলিকে তিন মাসে তাঁহাদের যে পরিমাণ কাঁচা পাট প্রয়োজন হয় সেই পর্য্যন্ত পাট ক্রয় বাড়াইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মিলগুলিকে চার মাসের প্রয়োজন মিটিতে পারে, এমন পরিমাণ পাট ক্রয় ও মজুত করিতে রাজী করাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরের জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সময়ে মিলগুলি ২১ লক্ষ ৯৪ হাজার গাঁইট পাট ক্রয় করিয়াছে, গত বৎসর এই সময়ের মধ্যে ক্রীত পাটের পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ ১৪ হাজার গাঁইট অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৮০ হাজার গাঁইট পাট অধিক ক্রয় করা হইয়াছে। (৪) এই বৎসর কাঁচা পাট আমদানী খুব কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (৫) দেশে পাটের দর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু পরিমাণ পাট রপ্তানীর চেষ্টা করা হইতেছে। (৬) যে সমস্ত অঞ্চলে পাট উৎপন্ন হয়, তথা হইতে কলিকাতায় পাট আনিবার জন্য পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় ওয়াগনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীশাস্ত্রী আরও বলেন যে, চাষী যাহাতে তাহার উৎপন্ন দ্রব্য অধিককাল ধরিয়া রাখিতে পারে সে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ও বিবেচনা করা হইতেছে।

তিনি বলেন যে, সরকার অবস্থার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং প্রয়োজন হইলে অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করিবেন।

সরকারী কর্ম্মচারী

১লা ডিসেম্বর লোকসভায় শ্রীভি. সি. শুক্ল অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেন তাহাতে একটি নীতিগত প্রশ্ন উঠিয়াছে। যে বিশেষ ঘটনাটি সম্পর্কে প্রশ্নটি তোলা হয় তাহা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। রেলওয়ে বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান ১৯৫৫ সনের ১লা আগষ্ট অবসর গ্রহণ করিয়া সেই দিনই একটি সুবিখ্যাত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বার্ড এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেডে একটি উচ্চ মাহিনার চাকুরী গ্রহণ করেন। এই একটি মাত্র তথ্য হইতেই বিষয়টির অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন হইবে, কিন্তু আরও যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে বা প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে তাহাতে উহা যে অনেককেই চমৎকৃত করিবে সন্দেহ নাই। রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের ভাষণ অনুযায়ী উক্ত অফিসার অবসর গ্রহণের নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বেই সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সাধারণ অবস্থায় তাঁহার অবসর গ্রহণের কথা ছিল ১৯৫৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি অবসর গ্রহণ করেন আগষ্ট মাসের ১লা তারিখ। সাধারণতঃ পেন্সনভোগী না হইলে অবসর গ্রহণের পর পুনর্নিয়োগের জন্য কাহারও সরকারী অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। এই কর্ম্মচারীটি অবশ্য পূর্ব্বাহ্নেই সরকারী অনুমোদন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, অবসরপ্রাপ্ত রেলবোর্ডের চেয়ারম্যান বার্ড কোম্পানীতে যোগদানের অব্যবহিত পরেই উক্ত কোম্পানী প্রায় বার লক্ষাধিক টাকা মূল্যের কাজের জন্য রেলওয়ে বোর্ডের নিকট হইতে একটি অর্ডার পান। এই সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ফলে পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয় স্পীকারের বক্তব্যে তাহার প্রতিফলন পাওয়া যায়। স্পীকার বলেন, "ইহা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কারণ ইহার সহিত নীতিগত প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে। যাহাদের উপর রেলওয়ে পরিচালনার ভার রহিয়াছে এবং যাহারা প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার অর্ডার দেন যদি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চ মাহিনার চাকুরী গ্রহণ করেন সদস্যগণ তখন স্বতঃই জানিতে চাহেন যে, ইহার পিছনে যোগসাজস রহিয়াছে কি না। সেজন্যই কোনরূপ দোষারোপ না করিয়া শ্রীমহাবীর ত্যাগী জানিতে চাহিয়াছিলেন কতদিন যাবত উক্ত অফিসার এবং কোম্পানীটির মধ্যে আলাপ আলোচনা চলিতেছিল।" সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মন্ত্রীমহাশয় বিশেষ ফাঁপরে পড়েন এবং তিনি খোলাখুলিই স্বীকার করেন যে, এ বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না, "আমার পক্ষে সবকিছু বলা অসম্ভব। কতদিন যাবত আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল এ সম্পর্কে কোন লিখিত দলিল নাই।"

এই বিষয়টি আলোচনার জন্য স্পীকার সময় দিয়াছেন। তাহাতে অবশ্য ইহাই বলা হইয়াছে যে, উক্ত অফিসার নির্দ্দোষ কিন্তু এই ঘটনাটির সহিত নীতির বৃহত্তর প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে—যাহা কেবলমাত্র অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্ম্মচারীদের পুনর্নিয়োগের প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। কেবল রেলকর্ম্মচারীগণ নহেন, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্ম্মচারীগণও লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করেন।

স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড ও কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানরূপে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহাদিগকেও লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। দেখা গিয়াছে যে, অবসর গ্রহণের পর ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল ভারত সরকারের যে সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ অবসর গ্রহণের পর বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মগ্রহণ করেন সেই তালিকায় তাহার একটি বিবরণী ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখান হইয়াছিল যে, কেবলমাত্র এই সকল কর্ম্মচারীগণ নহেন, ইঁহাদের পুত্রগণও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বিশেষ অর্থকরী পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের যে সকল বিধি মানিয়া চলিতে হয় তদনুসারে কোন সরকারী কর্ম্মী বা তাঁহার পুত্র গ্রহণ করিতে চাহিলে পূর্ব্বাহ্নেই সরকারী অনুমোদন গ্রহণ করিতে হয়। এই অনুমোদনদানের কোন মাপকাঠি নাই। ঐ তালিকা দৃষ্টে এরূপ অনুমানই স্বাভাবিক যে এই সকল বিধি-নিষেধ উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত অফিসারদের বেলায় প্রযোজ্য হয় না। অপরপক্ষে নিম্ন মাহিনায় নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের একটি প্রধান অভিযোগ হইল এই যে, জীবনে একবার চাকুরী গ্রহণ করিলে তাহাদের পক্ষে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে চাকুরীর বদলে অন্য কোন সরকারী চাকুরী গ্রহণ করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম লোকসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে অফিসার কতদিন যাবত বাড কোম্পানীর সহিত আলোচনা চালাইতেছিলেন তাহার কোন লিখিত দলিল নাই। যদি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী কর্ম্মচারীটি আলাপ-আলোচনা চালাইয়া থাকেন তবে নিশ্চয়ই বিভাগীয় নথিপত্রে তাহার উল্লেখ থাকিত।

উপরন্তু সরকারী বিধিগুলি যদিও সমান ভাবে সকলের প্রতি প্রযোজ্য কার্য্যক্ষেত্রে উচ্চতর কর্ম্মচারীদের উপর কোন প্রভাব পড়ে না অথচ অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য নিম্নতম কর্ম্মী ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ফলে, সরকার ও সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটি মানসিক ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে—যদি এ সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান করা হয় তবে দেখা যাইবে যে, বহু কর্ম্মচারীই এই সকল বিধি-নিষেধ মানেন না। উপরন্তু সরকার ও কর্ম্মীদের মধ্যে সন্দেহের ভাব থাকায় কাজেরও ক্ষতি হয়।

জেলাবোর্ডের রাস্তা

পশ্চিমবঙ্গের জেলাবোর্ডগুলি এক সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। বহুদিন হইতেই এই প্রতিষ্ঠানগুলি এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে। বিহারে রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক জেলাবোর্ড-গুলির উচ্ছেদের পর এবং পশ্চিমবঙ্গেও আংশিক ভাবে সরকার ইহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি জনসাধারণ এখন আর বিশেষ গুরুত্ব দেন না। তথাপি রাস্তা মেরামত প্রভৃতি কয়েকটি জরুরী কাজের দায়িত্ব এখনও জেলাবোর্ডগুলির উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির অনিশ্চিত অবস্থা এবং নিত্য বিরাজমান আর্থিক সঙ্কট হেতু এই সকল দায়িত্ব যথাযথ পালিত হইতেছে না। ফলে জনসাধারণকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে।

বর্দ্ধমান জেলাবোর্ডের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিয়া আসানসোলের 'জি. টি. রোড' পত্রিকা লিখিতেছেন যে, জেলাবোর্ডের রাস্তাগুলি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ফলে অব্যবহার্য্য হইবার উপক্রম হইয়াছে। "কাঁচা রাস্তায় তবু যানবাহন চলে—কিন্তু এই সকল বাঁধানো রাস্তা এক প্রকার দুর্গম হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাধানগর রোড হইতে মিঠানি হইয়া জেলাবোর্ডের যে রাস্তা গিয়াছে—সেই রাস্তায় পাথর বাহির হইয়া রাস্তার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এথোড়া হইতে গোরাংডি অথবা দোমোহানী হইয়া গোরাংডীর রাস্তাও যানবাহনের চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজবাঁধের নিকট জি. টি. রোড হইতে গোপালপুর মোল্লানদীঘি হইয়া অজয়ের ধার অবধি যে রাস্তা গিয়াছে তাহার অবস্থাও শোচনীয়। জেলাবোর্ডের এমন একটি রাস্তাও নাই—যাহা ভাল অবস্থায় আছে।"

জেলাবোর্ডগুলির নিষ্ক্রিয়তার একটি কারণ অর্থাভাব। এই অর্থাভাবের প্রধান কারণ জেলাবোর্ডগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের অক্ষমতা। এই সরকারী অব্যবস্থচিত্ততার ফলে দেশের যে বিপুল ক্ষতি হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া "জি. টি. রোড" লিখিতেছেন :

"একটি নূতন রাস্তা করিতে পশ্চিমবঙ্গে মাইলে গড় প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ পড়ে। সে ক্ষেত্রে জেলা বোর্ডের (পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র) হাজার হাজার মাইল তৈরি রাস্তা নষ্ট হইয়া যাইতেছে সে দিকে সরকারের ভ্রূক্ষেপ নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলাবোর্ডগুলি রাখিবেন কি তুলিয়া দিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অস্থির মতির জন্য কোটি কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তি শুধু নষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জেলাবোর্ডে ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি যে সকল বিভাগ আছে তাহারাও বেকার আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সকল কাজের লোককে কাজ না করাইয়া বেতন দেওয়াও আর এক প্রকারের অর্থের অপচয় হইতেছে। এছাড়া এই সকল রাস্তায় বাস, মোটর গাড়ী প্রভৃতি যানবাহন চলাচল করে, কিন্তু রাস্তা খারাপ হওয়ার দরুণ প্রায়ই গাড়ীগুলির অংশসকল ভাঙিয়া যায়। মোটর গাড়ীর অধিকাংশ অংশ বিদেশ হইতে আসে—ফলে এইভাবে বহু বৈদেশিক মুদ্রাও ব্যয় হয় এবং ব্যবসাদারদের অর্থেরও যথেষ্ট অপচয় হয়। দরিদ্র পশ্চিমবঙ্গের করদাতাদের অর্থ লইয়া এই ধরনের ছিনিমিনি খেলিয়া যে সরকার অর্থের অপচয় করে—সে সরকারের নিকট আমরা কি ভাল আশা করিতে পারি? সরকারের অবিলম্বে এই দিকে মনোযোগ দিয়া জেলাবোর্ড রাখিবেন কি তুলিয়া দিবেন,

সে বিষয়ে একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলুন। আসল কথা, প্রজার রক্ত হইতে সংগৃহীত অর্থে যে সকল রাস্তা নির্মিত হইয়াছে সরকারের অবিমৃষ্যকারিতায় তাহা কোনরূপ নষ্ট হইতে দেওয়া যায় না।"

কাছাড়ে রেলওয়ের অব্যবস্থা

আসামের লামডিং-এর দক্ষিণাংশস্থ অঞ্চল, অর্থাৎ পাহাড় লাইন এবং কাছাড় এলাকার মোট প্রায় ২৫০ মাইল রেলপথের শোচনীয় অবস্থার আলোচনা করিয়া করিমগঞ্জের সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই রেলপথটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—উক্ত অঞ্চলের পঞ্চাশ লক্ষ লোকের সহিত আসাম ও ভারতের অন্যান্য স্থানের মধ্যে ইহাই একটি মাত্র যোগসূত্র—উহার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিক গুরুত্বও সেহেতু অসাধারণ। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে ব্রিটিশ সরকার সামরিক প্রয়োজনে এই রেলপথটি নির্ম্মাণ করেন। দীর্ঘকাল এই পথটিকে আসাম বেল কোম্পানী সযত্নে এবং বহু ব্যয়ে রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু সরকারী পরিচালনায় রাস্তাটির চরম দুর্গতি ঘটিয়াছে। "যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যাত্রী ও মালের হিড়িক এই লাইন সহ্য করিয়াছে। বহু সুড়ঙ্গ, বিশেষ ধরনের ইঞ্জিন, বাঁকা পুল, পর্ব্বতোপরি আঁকাবাঁকা উচ্চনীচ লাইন এই রেলের বিশেষত্ব। তাই এই লাইন রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কোম্পানীর আমলে ছিল। এই ১১৫ মাইল রাস্তা রক্ষার জন্য কোম্পানী বহু কর্ম্মচারী, বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতিকে উচ্চবেতনে নিয়োগ করতঃ সর্ব্বদা লাইনের নিরাপত্তা রক্ষা করিতেন। ফলে কোম্পানীর আমলে ধ্বস নামা ছাড়া বড় কোন প্রকার দুর্ঘটনার খবর আমরা জানি না। পাহাড়ের বিরাট জলরাশি নিষ্কাশনের জন্য সমস্ত রাস্তার দুই পাশে পরিষ্কার নালা নির্ম্মাণ, পাহাড় ভাঙ্গিয়া লাইন নষ্ট না করার জন্য Baffle Wall-এর ব্যবস্থা, স্থানে স্থানে বিরাট পাথরের দেয়াল, জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি কোম্পানীর প্রায় প্রাত্যহিক কার্য্য ছিল; তাই এই লাইনে দুর্ঘটনা ঘটে নাই বলিলেই চলে।

"কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতে এই লাইনের কি দুরবস্থা! যাঁহারা পাহাড় লাইনে সর্ব্বদা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের চোখে চট করিয়া এই লাইন রক্ষায় চরম অব্যবস্থা ও অবহেলা ধরা পড়িবে। এই ১১৫ মাইল রাস্তার মধ্যে ৩৬টা restriction—এখানে dead slow, এই পুলে ৫ মাইল speed, ঐ সুড়ঙ্গে ১০ মাইল speed, অমুক জায়গায় থামা ইত্যাদি;—ফলে গাড়ী মৃদুমন্দ গতিতে চলে—লামডিং না পৌঁছান পর্য্যন্ত কিংবা বদরপুর না আসা পর্য্যন্ত যাত্রীরা বলিতে পারেন না যে, তাঁহারা আদতে তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবেন কি না এবং পৌঁছিলেও কত দেরীতে। গত কয় মাসের সঠিক হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, মাসের মধ্যে উজান ভাটি গাড়ী কয় দিন Connection রক্ষা করিতে পারিয়াছে। Connection রক্ষিত না হইলে যাত্রীদের যে ভয়াবহ লাঞ্ছনা ও ক্ষতি হয় সে সম্বন্ধে এতদঞ্চলের প্রত্যেক যাত্রীরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। এতগুলি restriction, অথচ সেই সব বাধানিষেধের মূল কারণ দূরীভূত করার কোন চেষ্টা নাই।"

উক্ত রেলপথে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। "যে ধরনের দুর্ঘটনা পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই, বর্ত্তমানে তাহাও ঘটিতেছে; এমন কি সুড়ঙ্গের মধ্যেও দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। দুর্ঘটনাগুলি মালগাড়ীতে ঘটিয়াছিল বলিয়া সংবাদপত্রে সে রকম প্রাধান্য পায় নাই। ২৯শে জানুয়ারী এক দুর্ঘটনায় ইঞ্জিন ও মালগাড়ী লাইনচ্যুত হয় এবং ১৭ই অক্টোবর আর একটি মালগাড়ীর ৩৪টি বগী লাইনচ্যুত হওয়ায় রেল লাইনের প্রায় সোয়া মাইল জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুড়ঙ্গের গভীর অন্ধকারে যদি কোন যাত্রীবাহী ট্রেনে দুর্ঘটনা ঘটে তবে কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি সুড়ঙ্গ রক্ষার তেমন সুব্যবস্থা নাই। কোম্পানীর আমলে পাহাড়ের জল সুড়ঙ্গের পার্শ্বে পড়িত এখন পড়ে সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে। জল নিষ্কাশনের নালাগুলিও ক্রমশঃ উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিতেছে। পাহাড় লাইনের জঙ্গল কাটিবার জন্য পূর্ব্বের তুলনায় চতুর্গুণ খরচ বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলও বাড়িতেছে। Baffle Wall-গুলি আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে।

"যুগশক্তি" বলিতেছেন :

"পাহাড় লাইনে অতি বেশী উঁচু-নীচু থাকায় বিশেষ ধরনের (Garret Type) ইঞ্জিন ছাড়া ঐ লাইনে গাড়ী চলে না। যে Garret Type ইঞ্জিনগুলি আছে, তাহা কোম্পানীর আমলের। এগার বৎসরে কোন ইঞ্জিন আনার খবর আমাদের জানা নাই। ইঞ্জিনগুলির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে—কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে নূতন ইঞ্জিন আনা হইতেছে না। যে কয়টি ইঞ্জিন ঐ লাইনে কাজ করিতেছে, সেইগুলি প্রায় অকেজো; বহু পুরানো তাই তাদের শক্তিও কমিয়া গিয়াছে। আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হই যে, অনেকগুলি ইঞ্জিন হইতে পার্টস জোড়াতালি দিয়া তবে কয়েকটা ইঞ্জিন চালু হইতেছে। তাই মধ্যপথে যে কোন সময় ইঞ্জিন আটকাইয়া যাওয়া একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রেলের রেকর্ড ইহার সততা প্রমাণ করিবে। গত দুই বৎসর ধরিয়া পাহাড় লাইনে কয়েকটা ষ্টেশনে ইঞ্জিনের জন্য জল পাওয়া যায় নাই, ফলে বালতি বালতি করিয়া জল উঠাইয়া ইঞ্জিনে দিতে হইয়াছে। রেলওয়ে ইতিহাসে এবম্বিধ ঘটনা শুধু এই অঞ্চলেই সম্ভব হইয়াছে। কোম্পানীর আমলে তো এবম্প্রকার ঘটনা অবিশ্বাস্য ছিল।

"অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবহারে রেল লাইন ক্ষয় পাইয়াছে, কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থা অদ্যাবধি হয় নাই। কাজেই রেল ভাঙ্গিয়া যে কোন মুহূর্ত্তে দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক এবং প্রায়ই তাহা হইতেছে। পাহাড় লাইনে দুই ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব এত বেশী যে, একটা গাড়ী এক ঘণ্টা দেরী হইলে সেই গাড়ীকে পাস দিবার জন্য অন্য

গাড়ীকে দূরবর্ত্তী পরের ষ্টেশনে দুই ঘণ্টা দেরী করিতে হইবে। অথচ দূরত্বপূর্ণ দুইটা ষ্টেশনের মধ্যে গাড়ী পাস দিবার ব্যবস্থা করিলে (Reduction of block) সময়ের যথেষ্ট আয় হয়। প্রত্যেক রেইকে, (rake) দুইটা TLR (ব্রেকভান ও গার্ডের গাড়ী) থাকার কথা, কিন্তু এতই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অনেক গাড়ীতেই দুইটা TLR নাই। ফলে যে গাড়ীতে একটি মাত্র TLR উহা কোন কারণে নষ্ট হইলে গাড়ী অচল। সম্প্রতি এরূপ ঘটনা ঘটে, পরে পাণ্ডু-তিনসুকিয়া লাইনের গাড়ী হইতে একটা TLR কাটিয়া পাহাড় লাইনে জোড়া দিতে হয়। কাছাড়ে যে ৭টা rake আছে, তার প্রায়ই দুই TLR নাই, ফলে এতদঞ্চলে গাড়ীর অগ্রভাগের TLR-কে শান্টিং করিয়া পেছনে নিতে হয় এবং পুনরায় অনুরূপ ভাবে পেছনের TLR-কে সামনে নিতে হয়, এতে গাড়ীর যে দেরী হইবে তাহা স্বাভাবিক। এই দিককার প্লেন সেক্শনের ন্যায় হিলের রেইক সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। ফলে যে রেইক বদরপুর হইতে লামডিং পৌঁছে, সেই রেইককেই আবার পরবর্ত্তী গাড়ী হিসাবে বদরপুর ফিরিতে হয়। যদি প্রথমোক্ত গাড়ী লামডিং পৌঁছিতে দেরী হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী গাড়ীকে লামডিং হইতে দেরীতে ছাড়িতেই হইবে। এরূপ প্রায়ই হইতেছে এবং বদরপুর বা লামডিং জংশনে কানেক্শন না পাইয়া যাত্রীগণকে অশেষ দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে। আলাদা রেইক এবং ইঞ্জিন থাকিলে এই অবস্থা হইত না। কাছাড়ের ব্রাঞ্চ লাইনেও এরূপ ঘটিতেছে।"

ডি. ভি. সি. ও জনসাধারণ

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার রূপান্তরে জনসাধারণের যে সকল সুযোগ-সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল; তাহাদের অনেকগুলিই অপূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। উপরন্তু ডি. ভি. সি. খালের জল লইয়া এক মহা ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন। এ বিষয়ে বর্দ্ধমান পত্রিকার মন্তব্য বিশেষ সমীচীন। "বর্দ্ধমান" লিখিতেছেন :

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, জল না পাওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রামের উপর ক্যানেল-কর চাপান হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীগণের অত্যুৎসাহের ফলেই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক ইহা কৃষকগণের নিকট অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ক্যানেল-কর ধার্য্য হইবার পূর্ব্বে যে Test note তৈয়ারী হয় তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য বহু ক্ষেত্রে জল পাওয়া সত্ত্বেও কর এড়াইবার চেষ্টার কথাও শুনা গিয়াছে। ইহাও কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। এই বৎসর যাহাতে এই ব্যাপারে কোন ত্রুটি না ঘটে তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবার জন্য আমরা সেচ বিভাগকে অনুরোধ জানাইতেছি এবং স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী ও সমাজ-সেবীগণকেও প্রকৃত অবস্থা নিরপেক্ষ ভাবে জানাইতে সরকারী কর্ম্মচারীগণকে সহযোগিতা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও রাজ্য সরকার

কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে গত কয়েক মাস যাবত নানারূপ অভিযোগ করা হইতেছে। গত ২রা ডিসেম্বর মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন বলেন যে, কর্পোরেশনের বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে অযথা বিলম্ব হওয়ায় কর্পোরেশনের কাজকর্ম্ম বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতেছে। খাদ্যে ভেজাল নিরোধের ব্যাপারে যাহাতে কর্পোরেশনের হাতে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করা হয় সে সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গত ১৯৫৭ সনের ৫ই জুলাই কর্পোরেশনের একটি সভায় গৃহীত হয়। পরদিন অর্থাৎ ৬ই জুলাই মেয়র কর্পোরেশন কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটি সরকারের নিকট পাঠাইয়া দেন যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য। তাহার পর প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সরকারের নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

১৯৫৭ সনের ৬ই জুলাই মেয়র কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণাদপ্তরে একটি প্রস্তাব পাঠান খাদ্যে ভেজাল নিরোধক আইনের সংশোধনের জন্য। চিঠি দেওয়ার পর ব্যক্তিগত ভাবে দিল্লীতে তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তখন তাঁহাকে জানান হয় যে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া খাদ্য ভেজাল নিরোধ সম্পর্কিত বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং সেই কমিটির নিকট মেয়রের প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করা হইবে এবং শীঘ্রই কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কর্পোরেশনকে জানান হইবে। ১৯৫৭ সনের আগষ্ট মাসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অফিসার এক পত্রে জানান যে, প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ "বিবেচনাধীন" রহিয়াছে। তার পর ১৯৫৭ সনের ২৬শে ডিসেম্বর আর এক চিঠিতে কর্পোরেশনকে জানান হয় যে, বিষয়টি বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং যখন সংশ্লিষ্ট আইনটি সংশোধন করা হইবে তখন পুনরায় কর্পোরেশনকে জানান হইবে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মেয়র ডাঃ সেন বলেন যে, যদিও শেষ চিঠি পাওয়ার পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে চলিল তথাপি সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

কলিকাতা মহানগরীতে কর নির্দ্ধারণের যে পদ্ধতি ১৯৫১ সনের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে সে সম্পর্কে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত করদাতাদের অভিযোগ বিবেচনা করিয়া কর্পোরেশন গত ১২ই আগষ্ট এক প্রস্তাবে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের কয়েকটি সংশোধনের জন্য সুপারিশ করেন। বিষয়টি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

মেয়র বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে সরকারী নিষ্ক্রিয়তার দরুণই কর্পোরেশন শহরের খাটালগুলি অপসারণের জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান মেয়র ডঃ ত্রিগুণা সেন কর্পোরেশন পরিচালনা ব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যার কথা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরায় জনসাধারণের পক্ষে বিষয়গুলির যথাযথ অনুধাবন করা

সহজসাধ্য হইয়াছে। ডঃ সেনের অভিযোগ হইতে কর্পোরেশনের নিষ্ক্রিয়তায় সরকারী দায়িত্বের অংশও প্রকাশিত হইয়াছে। চিঠি-পত্রের উত্তর না দেওয়া সরকারী প্রথা—কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের ন্যায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পত্রগুলিও যে সরকারী দপ্তরখানায় এরূপ অনাদর পাইয়া থাকে তাহা জানা ছিল না।

ভূদান যজ্ঞ

গত সাত বৎসরে বিনোবাজী ভূদান যজ্ঞ মারফত ৪৪ লক্ষ একর জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ৬৫৫,০০০ একর জমি ইতিমধ্যেই ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। সংগৃহীত জমির অর্দ্ধেকের বেশী পাওয়া গিয়াছে বিহার রাজ্য হইতে। জমি দান ব্যাপারে তার পরই স্থান পায় উত্তর-প্রদেশ ও রাজস্থান। সবচেয়ে কম জমি পাওয়া গিয়াছে দিল্লী হইতে—মাত্র ৩৯৬ একর। ভারতের প্রত্যেক রাজ্য হইতেই ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার পরিবহন-ব্যবস্থা

"বর্দ্ধমানবাণী" এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন :

"জেলা আঞ্চলিক পরিবহন-সংস্থার ধীর মন্থর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একাধিকবার আলোচনা আমরা করিয়াছি এবং এই সংস্থার সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কোন ফল পাওয়া যায় নাই। বৎসর চারেক পূর্ব্বে বর্দ্ধমান মন্তেশ্বর ভায়া মেমারী একটি বাস দিবার জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রকাশ, ইত্যাদি সবই হয় কিন্তু জানি না কোন্ অজ্ঞাত কারণে সভা ডাকিয়া কোন এক আবেদনকারীকে দিবার সময় ইহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শোনা যায় আবেদনপত্রগুলির পরীক্ষা নাকি এখনও শেষ হয় নাই। এমনতর দৃষ্টান্ত আরও আছে। শোনা গিয়াছে গত ২৫শে নভেম্বর তারিখের সভায় কয়েকটি রুটে আরও বাস দিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে প্রস্তাবিত রুটগুলিতে বাস দিতে বোধ হয় তিন-চার বৎসর লাগিবে। জেলা শাসক, যিনি এই সংস্থার সভাপতি তাহাকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ জানাইতেছি।"

বাঁকুড়া শহরে চুরি

"হিন্দুবাণী" লিখিতেছেন :

'বিগত অক্টোবর মাস হইতে বাঁকুড়া শহরের কয়েকটি দোকান হইতেই অদ্ভুত ধরনের চুরির কথা কর্ণগোচর হইয়াছে। দোকানগুলির বাহিরের তালা ঠিকমত বন্ধ অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে, দোকানের অন্যান্য জিনিসপত্রেও হাত পড়ে নাই, কেবলমাত্র ক্যাশ-বাক্সটি ভাঙিয়া টাকাকড়ি লইয়া চোরেরা চলিয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া পুলিসের 'এ' ফাঁড়ির পাশেই এই ভাবের চুরিও হইয়া গিয়াছে। যথারীতি থানায় সংবাদও দেওয়া হইয়াছে কিন্তু কোন হদিশ পাওয়া যায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে যদি সাধারণ পুলিশের দ্বারা সম্ভব না হয় বিশেষজ্ঞদের আনাইয়া তদন্ত করার ব্যবস্থা করা যায় না কি? আরক্ষাধ্যক্ষ মহাশয় এ বিষয়ে চিন্তা করিলে জনসাধারণ উপকৃত হইবে।"

পুলিস মন্ত্রীমহাশয় এই সংবাদটি সম্পর্কে অবহিত হইবেন কি?

কর্পোরেশন বাজেট

কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন সন্দেহ নাই, এবং তাহা ট্যাক্স না বাড়াইয়া অন্য পথে করা যায়। কিন্তু উহার কার্য্যপন্থা ও কার্য্য-প্রকরণ দুই-ই নূতন ছাঁচে ফেলার সময় আসিয়াছে। কেবলমাত্র সরকারী কর্ত্তৃত্ব ফলাইলেই সে কাজ সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার ১৯৫৯-৬০ সনের জন্য যে বাজেট প্রস্তুত করিয়াছেন উহাতে ৪৭ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া প্রকাশ পায়। বাজেটে আলোচ্য বৎসরের জন্য আয় ৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৮ কোটি ৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে।

ঐ ঘাটতির সহিত বর্ষশেষ তহবিল ১২ লক্ষ টাকা যোগ করিলে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ ৫৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকায় দাঁড়াইবে। বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের ঐ ১২ লক্ষ টাকা বর্ষশেষ তহবিলস্বরূপ রাখিয়া দিতে হয়।

চীফ একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীপি. সি. মজুমদারের অনুপস্থিতিতে ঐ বাজেট ডেপুটি কমিশনার শ্রীএ. কে. বসাক সোমবার ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটির সমক্ষে পেশ করেন। সি-ই-ও বাজেটে দেখান যে, কর্পোরেশনের আয় ১৯৫২-৫৩ সনে ৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ১৯৫৮-৫৯ সনে ৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কর্পোরেশনের ব্যয় যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে ঐ আয় প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সি-ই-ও মনে করেন যে, জলসরবরাহ, শিক্ষা, আলোক-ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য ব্যয় ছাড়াও জিনিসপত্রের দর এবং অফিস পরিচালনার ব্যয়বৃদ্ধির জন্যই ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও কর্পোরেশন যথাসাধ্য সন্তোষজনকভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

কলিকাতার পরিকল্পনা

বর্ত্তমানে শহর পরিকল্পনা পৌরসভা তথা শাসকগোষ্ঠীর একটি প্রধান দায়িত্ব। কলিকাতা একটি বৃহৎ শহর, কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, রাস্তা-পথঘাটের পরিকল্পনা সত্ত্বেও শহরের পরিকল্পনা বলিয়া এখানে কিছুই নাই এবং পৌরসভা যে কি করিয়া এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন, তাহাই আশ্চর্য্য। কলিকাতার সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার হইতেছে জনাকীর্ণ এলাকায় কারখানা প্রতিষ্ঠা। এই সকল কারখানার জন্য জনস্বাস্থ্য যে বিপদাপন্ন হয় সে

বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ। ইদানীং আর একটি ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহা হইতেছে পেট্রোল-পাম্প ও গ্যারেজ স্থাপন। যে পেট্রোল পাম্প প্রতিষ্ঠা দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় শুধু জনস্বাস্থ্যই বিপদাপন্ন হইতেছে তাহা নহে, ইহার আরও একটি দিক আছে। খালি জায়গায় বসতবাটী প্রতিষ্ঠা না করিয়া পেট্রোল পাম্প স্থাপন করায় বসতবাটী প্রতিষ্ঠার স্থান-সঙ্কুলান হয়। গড়িয়াহাটা ও হাজরা রোডের সঙ্গমস্থলে সম্প্রতি তিনটি পেট্রোল পাম্প গ্যারেজ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে স্থানের অপব্যবহার হইতেছে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হইতেছে। দুই শত কিংবা চারি শত গজের মধ্যে একটির অধিক পেট্রোল পাম্প থাকিবে না, এইরূপ ব্যবস্থাই হওয়া উচিত।

আর একটি অব্যবস্থা ইদানীং দেখা যাইতেছে এবং তাহা হইতেছে দোকান খোলা। কলিকাতা শহরের মধ্যে খালি জায়গা নিঃশেষিত-প্রায়, বসতবাটীর অভাবে জনসাধারণের অসুবিধা হইতেছে। এই সকল খালি জায়গায় বহু বসতবাটি নির্মিত হইতে পারিত এবং তাহাতে জনগণের সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা কিছু হইত না। সুতরাং নিয়ম করা উচিত যে, কলিকাতায় একতলা কোনও দোকানবাটী হইতে পারিবে না। দিল্লী ও বোম্বাই শহরে একতলা বাড়ী সহজে চোখে পড়ে না, কলিকাতাতেও ত্রিতল বাটী নিম্নতম নিয়ম হওয়া উচিত। এই সকল বাটীর এক তলায় দোকান খোলা যাইতে পারে। কলিকাতায় গৃহ-পরিকল্পনা অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আর একটি সমস্যা হইতেছে খাটাল। শহরের মধ্যে বহু খাটাল এখনও আছে, তাহার ফলেই মশা ও মাছির উপদ্রব কমিতেছে না। ইহাতে সংক্রামক রোগ বিস্তারলাভ করিবার সুযোগ পায়। কলিকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে খাটাল এবং কারখানাকে শহরের বাহিরে স্থানান্তরিত করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শহর হইতে খাটাল অপসারণের প্রচেষ্টা বহু বিজ্ঞাপনের সহিত সুরু হইয়াছিল, কিন্তু অচিরেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়—কি কারণে তাহা অবশ্যই জানা যায় নাই। সম্প্রতি খাটালের সংখ্যা এবং কদর্য্যতা উভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এ সম্বন্ধে পৌরসভার দৃঢ় কর্ম্মসূচী প্রয়োজন।

আর একটি কথা এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন। বাৎসরিক ব্যয় বর্ত্তমানে প্রত্যেক ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের তত্ত্বাবধানে করা হয়। বর্ত্তমানের নিয়ম অনুসারে আলো, রাস্তা উন্নয়ন এবং জলের ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বৎসরে প্রতি ওয়ার্ডের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় এবং এই ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন প্রতি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারেরা। প্রতি ওয়ার্ডে একটি করিয়া নাগরিক সমিতি আছে যাহার সহিত কাউন্সিলারেরা আলোচনা করেন, কিন্তু এই সমিতিগুলি যথার্থভাবে প্রতিনিধিমূলক নহে। কাউন্সিলারেরা নিজেদের সুবিধা এবং অসুবিধা অনুসারে ওয়ার্ডের কয়েকজনকে লইয়া তথাকথিত নাগরিক সমিতি গঠন করেন এবং সেই সমিতিতে বাৎসরিক বরাদ্দ ব্যয়ের খসড়াও প্রস্তুত হয়। এই ব্যয় যে বেআইনী হয় তাহা আমরা বলিতে চাই না, কিন্তু তাহা কতখানি আইনসঙ্গত সে সম্বন্ধে ভাবিবার আছে। দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও অবশ্য এই কথাই প্রযোজ্য। সরকারের কোন ব্যয়ই বেআইনী নহে, যদিও অনেক ব্যয়ই আইনসঙ্গত হয় না।

নাগরিক সমিতিকে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে প্রতি ওয়ার্ডের ব্যয় নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। মোট কথা পৌরসভায় পূর্ব্বে যে সকল গলদ ছিল বর্ত্তমানেও তাহা বজায় আছে, তবে ভিন্নরূপে। সেই জন্য তাহা সহজে নজরে পড়ে নাই, তাহাতে এবং গলদ দূরীকরণের কোনও সুরাহা হয় নাই। ইহা বলা প্রায় নিষ্প্রয়োজন যে, ঠিকাদারী কণ্ট্রাক্টরী ব্যবস্থাকে আইনসম্মত ভাবে অর্থ অপহরণের ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর অন্য কোনও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই রকম ভাবে ঠিকাদারী ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। রাষ্ট্রের নিজস্ব কর্ম্মচারী বিভাগ থাকা প্রয়োজন, যাহারা সকল প্রকার কণ্ট্রাক্টরী কাজ করিবে। সরকারী পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের মত পৌরসভার নিজস্ব কর্ম্মদপ্তর থাকা প্রয়োজন এবং ভাড়াটিয়া ঠিকাদারী ব্যবস্থা রহিত হওয়া অবশ্য উচিত। ইহাতে চৌর্য্যকর্ম্ম একেবারে লোপ পাইবে না, তবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। এখন যেমন দিনে ডাকাতি হইতেছে তাহা না হইয়া তখন রাত্রে ডাকাতি হইবে এবং তাহা খানিকটা অবশ্যম্ভাবী, তবুও মন্দের ভাল।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ

নিম্নস্থ সংবাদে বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়: এ বিষয়ে আমরা বহু বৎসর ধরিয়া লিখিয়া আসিতেছি এবং আমাদের পূর্ব্বে বহু মনীষী, যথা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাব যাহা, তাহার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করিয়া, তাহার যাহা দোষ তাহারই সুযোগ লইয়া বর্ত্তমানে রাজনৈতিক দলাদলির সৃষ্টি এবং সেই সকল দলের নেতৃবর্গের বীজমন্ত্রই বাঙালীর যত কুপ্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে যৌথ উদ্যোগে বাঙালীর নিষ্ফলতা:

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এই রাজ্যে যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন, বাঙালীদের উদ্যোগহীনতার জন্য সেগুলির অধিকাংশই অবাঙ্গালীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা এইরূপ পশ্চাদপদ হওয়ায় তাঁহাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে।

এই রাজ্যে নানা ধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্প-অধিকার নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিতেছেন। সেই সকল সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য যে সকল দরখাস্ত সরকার পাইতেছেন, উহাদের মধ্যে বাঙ্গালীদের দরখাস্ত প্রায় থাকেই না। কাজেই সরকারকে

সে সকল সুবিধা একে একে উদ্যোগী অবাঙ্গালীদের হাতেই তুলিয়া দিতে হইতেছে।

অবস্থা যে কতদূর ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই উদাহরণটি হইতেই বুঝা যাইবে। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি সূতাকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। প্রতিটি সূতাকল প্রতিষ্ঠা করিতে ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

তজ্জন্য প্রতিটি সূতাকলের পিছনে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ লক্ষ টাকা সাহায্য বাবদ দিবেন। দীর্ঘকাল পরে পরিশোধের সর্ত্তে বিদেশ হইতে ৩০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানীর সুযোগও সরকার করিয়া দিবেন। এই কার্য্যের জন্য যিনি বা যাঁহারা উদ্যোগী হইবেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে ৩০ লক্ষ টাকার মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে ইহাই ন্যূনতম সর্ত্ত।

কিন্তু এই সর্ত্ত পূরণ করিবার মত লোক বা প্রতিষ্ঠানেরও বুঝি বাঙালীদের মধ্যে অভাব দেখা দিয়াছে। নতুবা এই সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য যে তিনটি বাঙালী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে দুইটিই নাকচ হইয়া যাইবে কেন?

সরকারী দপ্তরে খোঁজ লইয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি, ন্যূনতম সর্ত্ত পূরণ করিতে সমর্থ না হওয়ার জন্যই ঐ দুইটি দরখাস্ত বাতিল করিয়া দিতে হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রে সংবাদ

কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড ঘোষণা করিয়াছেন যে, বোম্বাই রাজ্যের পুনর্গঠন সম্পর্কিত কোন প্রস্তাব তাঁহারা বিবেচনা করিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের এই ঘোষণা সত্ত্বেও বোম্বাই রাজ্যে মারাঠী ও গুজরাটীদের মধ্যে বোম্বাই রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করিবার আন্দোলন ক্রমশঃই দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। আমেদাবাদে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন লইয়া এক বিরাট আন্দোলন কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলনরূপে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও কংগ্রেসের প্রভাব ক্রমশঃই কিরূপ কমিতেছে সওয়নতবাদী উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীর শোচনীয় পরাজয়ে তাহার আংশিক পরিচয় মিলে। সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির সদস্য শ্রীশিবরাম মহারাজ ভোঁসলের নির্ব্বাচন বাতিল হওয়ায় তথায় যে উপনির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সমিতির প্রার্থী রাজমাতা পার্ব্বতীদেবী ভোঁসলে ৩২,৬৮৫ ভোট পাইয়া কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীপ্রতাপরাও ভোসলেকে ত্রিশ হাজারেরও অধিক ভোটে পরাজিত করেন। গত নির্ব্বাচনে সমিতির প্রার্থীর যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবার তদপেক্ষা ৭,০০০ ভোট বেশী ছিল। শ্রীপ্রতাপরাও ভোসলে পান মাত্র ২৫৬১টি ভোট। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণ নির্ব্বাচনের পরে বোম্বাইয়ের মারাঠী অঞ্চলে যে কয়টি উপনির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সবকয়টিতেই সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির প্রার্থী জয়যুক্ত হইয়াছেন।

দুর্গাপুর কয়লা চুল্লী

আধুনিক রাসায়নিক উদ্যোগ বিষয়ে যে বাংলা দেশ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে নিম্নস্থ বিবৃতিতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তাহাই জানাইয়াছেন।

বাঙালী কিন্তু "যে তিমিরে সেই তিমিরে!"

দুর্গাপুর কয়লাচুল্লীর প্রথম ব্যাটারীতে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে উহা ঘোষণা করা হয়। ব্যাটারীটি সম্পূর্ণ তাতিতে ১০ সপ্তাহ সময় লাগিবে। চুল্লীটি সম্পূর্ণ তাতিয়া গেলে নানা ধরনের মিশ্রিত কাঁচা কয়লা উহাতে দগ্ধ করিয়া বিভিন্ন প্রকার "কোক" বা পোড়া কয়লা, গ্যাস এবং কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের মৌল উপাদানসমূহ পাওয়া যাইবে। প্রথম ব্যাটারীর ২৯টি চুল্লী হইতে দৈনিক প্রায় ৫০০ টন পোড়া কয়লা উৎপন্ন হইবে।

১০ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় ব্যাটারীটিও (ইহাতেও ২৯টি চুল্লী আছে) প্রথম ব্যাটারীর সাহায্যে আপনা-আপনিই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং আরও ১০ সপ্তাহের মধ্যে উহা সম্পূর্ণ তাতিয়া উঠিলে উভয় ব্যাটারী হইতে পোড়া কয়লার মোট উৎপাদন দাঁড়াইবে দৈনিক ১,০০০ টনে।

এই কয়লাচুল্লীতে পূর্ণভাবে কাজ চলিতে সুরু করিলে ইহা হইতে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইবে সেইগুলির দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৈনিক আয় হইবে প্রায় এক লক্ষ টাকা।

এই কয়লাচুল্লী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৪·কোটি টাকার "দুর্গাপুর পরিকল্পনার" অন্তর্গত। ইহা এবং ইহার আনুষঙ্গিক কয়েকটি রাসায়নিক প্ল্যাণ্ট নির্ম্মাণ করিতে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। আলকাতরা নিষ্কাশক প্ল্যাণ্টটি এখনও নির্ম্মিত হয় নাই। উহার জন্য আরও ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া সরকার অনুমান করেন।

এই কয়লাচুল্লী প্ল্যাণ্টের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা এবং নক্সা প্রস্তুত করেন একটি জার্ম্মাণ কোম্পানী মেসার্স দি ষ্টীল এক্সপোর্ট এবং উহা নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদেরই ভারতীয় ঠিকাদার কোক ওভেন কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী। জার্ম্মাণ কোম্পানী ছয় মাস উৎপাদনের পর এই প্ল্যাণ্টের তত্ত্বাবধানের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত দুর্গাপুর ইণ্ডাষ্ট্রীজ বোর্ডের হাতে অর্পণ করিবেন।

ফিল্মে দুর্নীতি

সম্প্রতি লোকসভায় ফিল্ম সম্বন্ধীয় আইনের কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। সে সময় কিছু বিতর্ক হয় যাহার স্বল্প বিবৃতি নিম্নস্থ সংবাদে দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু এই বিতর্কের কোনও সুফল হয় নাই তাহার কারণ লোকসভায় আমাদের প্রতিনিধিবর্গ শুধু এ বিষয়ে—এবং প্রায়

সকল বিষয়েই—অজ্ঞ। যদি এ বিষয়ে তাঁহারা যথাযথ ভাবে খবর লইতেন তবে শ্রীকেশকারের বোম্বাই পোষণ-নীতির পূর্ণ রূপ খুলিয়া যাইত এবং ফিল্মে দুর্নীতির কিছু উপশম সম্ভব হইতে পারিত :

নয়াদিল্লী, ১১শে ডিসেম্বর—ভারতীয় ফিল্মে দুর্নীতির প্রশ্ন সম্পর্কে অদ্য লোকসভায় প্রবীণ সদস্যগণের সহিত তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ বি. ভি. কেশকারের বাদানুবাদ হয়। কিন্তু ডাঃ কেশকার মৃদু প্রতিবাদের সুরে যাহা বলেন, তাহাতে তাঁহারা নিবৃত্ত হন এবং সাংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারে ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করেন।

তিনি "নীতিবাদী" নহেন, এই মন্তব্য দ্বারা তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করিয়া শ্রীসাধন গুপ্ত (কম্যুনিষ্ট) বলেন যে, সেন্সর ব্যবস্থা সত্ত্বেও "নৈতিক দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত ফিল্মসমূহ দেশে প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে, মানুষের প্রবৃত্তিগুলিকে লইয়া ফিল্মের কাহিনী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও এই প্রবৃত্তি-সমূহকে শিল্পসৌন্দর্য্য সৃষ্টির কার্য্যে লাগানো হইতেছে না। পরন্তু এইগুলিকে এরূপভাবে চিত্রায়িত করা হইতেছে যে, যে আদিম প্রবৃত্তিসমূহকে আমরা সামাজিক শৃঙ্খলা ও শালীনতার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া নিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংযত করিতে শিখিয়াছি, তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে চাওয়া হইতেছে। শ্রী গুপ্ত বলেন যে, "চিত্র-তারকাদের 'ভক্ত উন্মাদনা'" নিকৃষ্ট ফিল্মসমূহের নীতিবিগর্হিত প্রভাবের ফলে সৃষ্টি হইয়া থাকে। আকর্ষণের কারণ চিত্রতারকার কলাকুশলতার সাফল্য নহে, তিনি তাহার বিরোধীও নহেন। যে সব বিষয় আকর্ষণের প্রকৃত কারণ, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। প্রেমঘটিত ব্যাপারের খারাপ দিক, অপরাধ ও দুর্বৃত্ততাকে মহিমান্বিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই সব বিষয় চিত্রে রূপায়িত করা হয়।

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য বলেন যে, কোন ফিল্ম পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির দর্শনযোগ্য না হইলে তাহার প্রদর্শন করিতে দেওয়া উচিত নহে এবং "কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য"—এই সার্টিফিকেট রহিত করা কর্ত্তব্য। তিনি মনে করেন যে, নির্ব্বাচনের ব্যাপারে ২১ বৎসর প্রাপ্তবয়স্কদের বয়স বলিয়া ঘোষিত। সে ক্ষেত্রে "১৮ বৎসর বয়সের বালকের" 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' নির্দ্দিষ্ট সমস্ত ফিল্ম দেখিতে দেওয়া উচিত নহে। তিনি বলেন যে, আপত্তিকর পোষ্টার ও বিজ্ঞাপনের ফিল্ম সেন্সর করিবার ক্ষমতাও সেন্সর বোর্ডকে দেওয়া উচিত।

স্বতন্ত্র সদস্য রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অন্যান্য কয়েকজন সদস্যও ফিল্ম ও সেন্সর ব্যবস্থার সমালোচনা করেন।

সামরিক ডিক্টেটরশিপ ও পণ্ডিত নেহরু

পণ্ডিত নেহরুর এ বিষয়ে মতামত নিম্নস্থ সংবাদে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে পণ্ডিত নেহরু যদি ঐরূপ সামরিক একনায়কত্বের এই বর্ত্তমান যুগে উদ্ভবের সকল কারণ বিশ্লেষণ করিতেন তবে আমাদের—ও তাঁহার নিজের—উপকার হইত। রোগ অতি কঠোর হইলেই ঔষধ হিসাবে বিষের প্রয়োগ হয়। ফলাফল যাই হোক। এদেশে সেই রোগের লক্ষণ দেখা গিয়াছে কিনা ইহাও দেখা প্রয়োজন :

নয়াদিল্লী, ১০ই ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ বলেন যে, সম্প্রতি গণতন্ত্র ও পার্লামেণ্টারী প্রথার পক্ষ হইতে বিচ্যুতির একটা প্রবণতা দেখা যাইতেছে। গণতন্ত্রে আস্থাবান ব্যক্তিমাত্রেরই ইহাতে বিচলিত হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিচলিত হওয়ার পরিবর্ত্তে তাঁহারা যেন ইহাকে স্বাগত জানাইতেছেন, ইহার পিঠ চাপড়াইতেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে শ্রী নেহরু উল্লিখিত মন্তব্য করেন। ভারতে ব্রিটিশ হাই-কমিশনার মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড নাকি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ভারত সামরিক ডিক্টেটরশিপ ও পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সহাবস্থানে বিশ্বাসী। সুতরাং কমনওয়েলথের মধ্যে এই দুইয়ের সহাবস্থান সম্ভব না হওয়ার মত কোন কারণ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। সাংবাদিকগণ মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের এই বিবৃতি সম্পর্কেই প্রধানমন্ত্রীর মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কমনওয়েলথের প্রশ্ন তুলিলে সেখানে বড় রকমের একটি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রই কমনওয়েলথের মধ্যে মিলনের বনিয়াদ। কোন দেশ সেই গণতন্ত্র হইতে বিচ্যুত হইলে সেই বনিয়াদেও ফাটল ধরে।

শ্রী নেহরু বলেন যে, সামরিক ডিক্টেটরশিপ সমেত সকল প্রকার শাসন-ব্যবস্থার সহিত সহাবস্থানে আমরা বিশ্বাসী—কিন্তু প্রশ্নটি ব্যাপক। সাধারণভাবে যাহাকে গণতন্ত্র বা নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টারী সরকার বলা হইয়া থাকে, তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়ার একটা প্রবণতা সমগ্র বিশ্বে আজ দেখা যাইতেছে। গণতন্ত্রে আস্থাবানরা ইহার ফলে বিচলিত হওয়ার বদলে যেন ইহাকে স্বাগত জানাইতেছেন, ইহার পিঠ চাপড়াইতেছেন। এই উৎসাহদানের মনোভাব গণতন্ত্রের বিরোধী।

ভারত-পাক প্রসঙ্গে নেহরু

নিম্নস্থ সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য :

নয়াদিল্লী, ৯ই ডিসেম্বর—পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত সাত ঘণ্টা ব্যাপী বিতর্কের জবাব দিতে উঠিয়া প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু আজ লোকসভায় ভারত-পাক সমস্যার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার আশঙ্কা—যতদিন এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধ চলিবে, ততদিন সীমান্ত-সংঘর্ষ থামিবে না। ভারত ও পাকিস্থানের মূলগত সম্পর্কের মধ্যেই গলদ রহিয়াছে এবং বিনা বাধায় তাহার সুযোগ লইতেছে অসৎ লোকেরা।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, সারা পৃথিবীর জনমতকে ইহা "বিলক্ষণ" প্রভাবিত করিয়াছে। "এশিয়া, ইউরোপ বা আমেরিকা যেখানেই যান, সর্ব্বত্র দেখিবেন শান্তির কথা উঠিলেই ভারতের নাম উচ্চারিত হয়।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারতের পররাষ্ট্র নীতিকে 'নেহরু-নীতি' বলা ভুল। ভারতের পরিবেশ, ভারতের অতীত চিন্তাধারা, ভারতের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, মুক্তি-সংগ্রামে ভারতীয় মনের পরিবর্ত্তন ও ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা হইতেই এই নীতি সঞ্জাত। ইহার স্রষ্টা তিনি নন।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর সদস্যগণ মৌখিক ভোটে সরকারের পররাষ্ট্রনীতি অনুমোদন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, যে দলই ক্ষমতায় আসীন হউন এবং পররাষ্ট্র ব্যাপারের ভার যিনিই গ্রহণ করুন—বর্ত্তমান নীতি হইতে খুব বেশী দূরে সরিয়া যাইতে পারিবেন না।

ভারত-পাক বিরোধের কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, নেহরু-নূন আলোচনায় ভারত দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়াছে—এ কথা বলা ঠিক নয়। সীমান্ত অঞ্চলে মোট ৪৭·২ বর্গমাইল এলাকা লইয়া বিরোধ দেখা দেয়। নেহরু-নূন চুক্তি অনুযায়ী উপরোক্ত এলাকার ৪২·৪ বর্গমাইল স্থান ভারতের প্রাপ্য, পাকিস্থানের প্রাপ্য ৪·৮ বর্গমাইল।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন যে, টুকেরগ্রামকে লইয়া কোন বিরোধ দেখা দিতে পারে না। কারণ উহা ভারতেরই অংশ। ৩৮·৬ বর্গ মাইল এলাকা লইয়া গঠিত সমগ্র হিলিও ভারতের। শুধু মাত্র বেরুবাড়ি ইউনিয়নকে দুইটি দেশের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

সাম্প্রতিক সীমান্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, পাকিস্থানের সহিত "ভাল" ব্যবহার করা সত্ত্বেও "অপর পক্ষের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না। তবে পরিবর্ত্তন ঘটুক না ঘটুক—আমরা ঠিক পথে কাজ করিয়া যাইব। ইহা শক্তিরই পরিচায়ক, দুর্ব্বলতার নয়।"

প্রধানমন্ত্রী জানান যে, ছিটমহলগুলি হস্তান্তরিত করার জন্য সরকার শীঘ্রই সংসদে একটি বিল আনিবেন। এই বিষয়ে তাঁহারা আইন-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন না হইলেও সংসদ কর্ত্তৃক একটি আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোন দেশের বিরাট সৈন্যবাহিনী আছে বা আণবিক অস্ত্র-শস্ত্র রহিয়াছে শুধুমাত্র সেই কারণেই তাহার সিদ্ধান্ত সঠিক ও বিজ্ঞজনোচিত হইবে—এ কথা মানিয়া লইতে তিনি রাজী নন। সামরিক শক্তিতে শক্তিমান হইলে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিও সুস্থ হইবে—তাহার কোন মানে নাই। ব্যক্তিগতভাবে ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কোন ব্যক্তি বা দেশের নিকট নিজস্ব স্বাধীন মতামত তিনি বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। ইহাই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা।

ভারতের কমনওয়েলথভুক্ত থাকাকে সমর্থন করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, ইহার ফলে ভারতকে তাহার নীতি ত বিসর্জ্জন দিতে হয় নাই, বরং অনেক সময় অধিকতর ভালভাবে সে তাহার নীতি প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে। কমনওয়েলথের বাহিরে থাকিলে হয়ত তাহা সম্ভব হইত না।

তিনি বলেন যে, ভারত কোন সামরিক জোটে যোগ দেয় নাই, স্নায়ুযুদ্ধ হইতে সে দূরে আছে। প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রথম লক্ষ্য স্বীয় নিরাপত্তা বিধান। নিরাপত্তার ব্যবস্থা নানাভাবে করা যাইতে পারে। সচরাচর সৈন্যবাহিনীই নিরাপত্তার রক্ষক। কিন্তু ইহা আংশিক সত্য। "বিভিন্ন নীতির দ্বারাই নিরাপত্তা রক্ষিত হয়। আপনার যদি বন্ধু থাকে, আপনি কিছুটা নিরাপদ। আপনার যদি শত্রু থাকে, আপনি কিছু পরিমাণে বিপদাপন্ন। সুতরাং অন্যান্য দেশের সহিত মৈত্রী স্থাপনই অন্যান্য উপায়ের চেয়ে নিরাপত্তার অনেকখানি সহায়ক। সে চেষ্টা সফল না হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইল স্বতন্ত্র ব্যাপার।" শ্রীডাঙ্গের সমালোচনার কথা উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, ভাল হউক মন্দ হউক অতীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত ভারতের বৈষয়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "পশ্চিমের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে পুরাতন সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা আমরা করি নাই। তবে নূতন রাষ্ট্রের সহিতও আমরা ব্যবসায় সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছি।"

দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের বর্ণ-বৈষম্য নীতির প্রতিবাদে ভারত সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই বলিয়া যে সমালোচনা করা হয় তাহার উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তিনি এ বিষয়ে কি করিবেন? দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা? নিশ্চয় নয়। বিষয়টি তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জে উপস্থাপিত করিতে বা ইহার প্রতিবাদ জানাইতে পারেন মাত্র। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটি কথা ওঠে—যাঁহারা সাম্যবাদ, সাম্যবাদ বিরোধিতা ইত্যাদি বড় আদর্শের বুলি কপচাইয়া থাকেন, যাঁহারা রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদ ও মানবীয় অধিকার বিষয়ক ঘোষণাবলীর স্বপক্ষে ভোট দিয়াছেন তাঁহারাও দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের নীতি সম্পর্কে অতি মৃদুভাবে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেন অথবা আদৌ কিছু বলেন না। এ বড় বিস্ময়কর ব্যাপার। "আমি বলি, কোন জাতির পক্ষে এই ভাবে চলা চরম নীতিভ্রষ্টতা, আন্তর্জাতিক অসাধুতা।"

সিংহলের প্রসঙ্গে শ্রীনেহেরু বলেন যে, সেখানকার ভারতীয় বংশোদ্ভবগণের সমস্যা মানবীয় সমস্যা এবং সেইভাবেই উহার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ভারত-পাকিস্থান চুক্তি

ভারত-পাকিস্থান ভূমি-বদল চুক্তি যদিও বর্তমানে পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহা নূতন আছে কারণ ইহা এখনও সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুম আসিয়াছে যে, ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে ভূমি-বদল ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের অধিক ব্যক্তি ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং সেই হিসাবে পাকিস্থানের নিকট হইতে ভারতবর্ষের বরং আরও ভূমিখণ্ড পাওয়ার কথা এবং ভারতবর্ষ তাহা দাবী করিতে পারে।

ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যের এলাকার হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আছে, এবং তাহা বিল আনয়ন করিয়াই করিতে হইবে। ভারতীয় সংবিধানের কোনও ধারায় মন্ত্রী পরিষদ কিংবা প্রধানমন্ত্রীকে এমন কোনও ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই যাহার দ্বারা তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতায় ভারতের এলাকা বিদেশকে দান করিতে পারেন। গায়ের জোরে অবশ্য সব কিছুই হয় এবং ইহা যেন একান্ত গায়ের জোরের ব্যাপার।

আর একটি প্রশ্ন এখানে আসে। তাহা হইতেছে এই যে, এই চুক্তি মানিতে ভারতবর্ষ বাধ্য কিনা। আন্তর্জাতিক আইনে বলে, যে অবস্থার ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেই অবস্থার যদি পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে চুক্তিবদ্ধ যে কোনও দেশ এই চুক্তিকে অস্বীকার করিতে পারে। ভারত-পাকিস্থান চুক্তির পর পাকিস্থানে সামরিক একনায়কতন্ত্রবিশিষ্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসানে চুক্তির নিশ্চিত অবসান ঘটিয়াছে তাহা ধরিয়া লওয়া ভারতের পক্ষে উচিত ছিল। পাকিস্থানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, সেই অবস্থার অবসানে ভারতবর্ষ আর চুক্তি মানিতে বাধ্য নহে, ইহাই বলা উচিত ছিল। অর্থাৎ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজের ভুল সংশোধন করার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। আর যদিও চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তথাপি ভারতীয় এলাকায় পাকিস্থানের গুলীবর্ষণ বন্ধ হয় নাই, সুতরাং এই চুক্তি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে। বর্তমানের সামরিক একনায়কতন্ত্রকে ভারতবর্ষের স্বীকার করা একেবারেই উচিত হয় নাই। সেনাপতি আয়ুব খানের প্রথম হইতেই ভারতের প্রতি 'যুদ্ধং দেহি' ভাব, সেই অবস্থায় পাকিস্থানের বর্তমান শাসনকে ভারত স্বীকার না করিলে লাভবান হইত।

সীমান্তে পাকিস্থানী হামলা

পাকিস্থান সীমান্ত সমস্যাকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য কিছুদিন পর পরই সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়া বলপূর্বক ভারতীয় এলাকা দখল করিয়া লইবার এক কৌশল গ্রহণ করিয়াছে। এই উপায়ে ভারতীয় অঞ্চলগুলিকে পাকিস্থানভুক্ত করা সহজ মনে করিয়াই এই কৌশলের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে এবং তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই। সম্প্রতি পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনী মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তে ভারতীয় এলাকাভুক্ত পদ্মার কয়েকটি চর বিদ্যুৎ-গতিতে দখল করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চরটি হইতেছে সূতী থানার অন্তর্গত নূরপুর দিয়াড় সংলগ্ন নবোদ্ভূত নূরপুর চর। তিন হাজার একর আয়তনবিশিষ্ট এই চরটি ভারতীয় তীরের সন্নিকটবর্তী।

পাকিস্থানী সৈন্যদল কর্তৃক বলপূর্বক এই চরটি দখল করার ফলে বর্তমানে যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে-ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে তাহার আলোচনা করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার "ভারতী" পত্রিকা ৪ঠা ডিসেম্বর এক সম্পাদকীয় আলোচনায় লিখিয়াছেন :

"বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, মাত্র এই স্থানটি ছাড়া মুর্শিদাবাদ সীমান্তে চর এলাকায় এমন কোন স্থান নাই যেখানে পদ্মার উভয় পারেই পাকিস্থানীদের সুরক্ষিত ঘাটি আছে এবং এই দিক দিয়া ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্থানটি গঙ্গা ও পদ্মার মোহনার এক মাইলের মধ্যে। কাজেই ইহা যদি পাকিস্থানীদের দখলে থাকিয়া যায় তবে তাহারা অতি সহজেই গঙ্গা ও পদ্মার উভয় জলপথই নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হইবে এবং ইহার ফলে নদীপথে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এমন কি প্রস্তাবিত ফরাক্কা বাঁধটির নিরাপত্তাও ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা আছে। বর্তমানে এতদঞ্চলে ভাগীরথীর অবস্থা যেরূপ শীর্ণ তাহাতে ইহা বৎসরে ১০।১১ মাসই নাব্য থাকে না এবং এজন্য বড় নৌকা ও স্টীমার সাধারণতঃ পদ্মার জলপথেই যাতায়াত করিয়া থাকে। ভাগীরথীর পথে ইহাকে পরিচালিত করিবার কোন উপায়ই নাই। এ ছাড়া [illegible] শোনা যাইতেছে মোহনার কিছুটা পশ্চিমে (আপে) চর-হাসানপুর, যাহা বর্তমানে ভারত ইউনিয়নের দখলে আছে, তাহাও পাকিস্থানের এলাকা এবং ইহার দখলও নাকি তাহাদের অনুকূলে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইহা যদি সত্য হয় এবং কার্যে পরিণত হয় তবে সমস্ত জলপথই যে অবরুদ্ধ হইবে এবং ঘোরতর বিপর্যয় দেখা দিবে ইহা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যে এই চরটি দখলের পরই পাকিস্থানীরা কয়েকটি ভারতীয় পাট-বোঝাই নৌকা এই চরটির সম্মুখে পদ্মার উপর আটক করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ ইহাই তাহাদের ভবিষ্যৎ অবরোধ-নীতির সূচনা বলিয়া আমাদের মনে হয়। কাজেই এখনও যদি আমরা নির্বিকার থাকি এবং এই চরটি হইতে পাকিস্থানী হানাদারগণকে বিতাড়িত করিতে না পারি তবে ভারত রাষ্ট্রের যে সমূহ ক্ষতি হইবে ইহা সন্দেহাতীত ভাবে বলা চলে। সীমান্ত রক্ষায় সরকারের আজ চরম ব্যর্থতা দেখা দিয়াছে। ভারত এলাকায় হানা দিয়া একের পর এক চর পাকিস্থানীরা দখল করিয়া লইতেছে এবং ইহার ফলে এক দিকে সীমান্তবর্তী ভারত এলেকার নাগরিকগণ উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে অপর দিকে মোল্লামাতব্বরদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ

বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতিরে ইহার বিরুদ্ধে অবিলম্বে অত্যন্ত কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আমরা এদিকে শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নয় ভারত সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্বশীল অফিসারকে প্রেরণ করিয়া এ সম্বন্ধে আশু তদন্তের দাবি জানাইতেছি।"

ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত বিরোধ

ভারত ও পাকিস্থানের সীমান্ত বিরোধ কবে মীমাংসা হইবে তাহা অনিশ্চিত। পাকিস্থান সম্প্রতি বাগে রোয়েদাদের উপর ভিত্তি করিয়া আসামের করিমগঞ্জ মহকুমাস্থ পাথারিয়া বনাঞ্চল ও করিমগঞ্জ থানার পশ্চিমাস্তে ৩০।৩২টি গ্রাম দাবী করিয়াছে। এই দাবীর অযৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করিয়া করিমগঞ্জের সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" যে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করিয়াছেন তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

"ভারত বিভাগ হওয়া কালে জাষ্টিস স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ যে রোয়েদাদ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার বক্তব্যের সঙ্গে যে মানচিত্র সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন (এই মানচিত্রটি নিখুঁত বা অভ্রান্ত নহে বলিয়া সন্দেহ থাকায়) যদি তাঁহার বর্ণনার সঙ্গে কোথাও ঐ মানচিত্রের বৈষম্য ঘটে তবে বর্ণনাই গ্রাহ্য হইবে।

"জাষ্টিস র‍্যাডক্লিফ প্রদত্ত রোয়েদাদ অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্থানের সীমা ত্রিপুরা রোজ্য, পাথারকান্দি থানা ও কুলাউড়া থানার মিলন স্থান হইতে উত্তরাভিমুখে পাথারকান্দি ও কুলাউড়া থানার সীমারেখা দিয়া যাইবে ; অতঃপর পাথারকান্দি ও বড়লেখা থানার সীমারেখা দিয়া অগ্রসর হইয়া করিমগঞ্জ থানা ও বিয়ানীবাজার থানার সীমারেখা বরাবর গিয়া কুশীয়ারা নদীর মধ্য সীমা প্রাপ্ত হইয়া ঐ সীমারেখা দিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হইবে। তৎপর কুশীয়ারা নদীর মধ্যস্রোত অনুসরণ করিয়া ঐ সীমারেখা শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার সীমান্ত পর্য্যন্ত যাইবে।

"এক্ষণে উল্লিখিত সীমানা নির্দ্ধারণে সর্ব্বপ্রথম বড়লেখা ও বিয়ানীবাজার থানার আয়তন ও পরিসীমা সম্পর্কে বিবেচনা করা একান্ত আবশ্যক। উক্ত থানাদ্বয় ১৯৪০ ইং সনের ৫ই জুন তারিখের আসাম গেজেটে প্রকাশিত ২৮।৫।৪০ইং তারিখের আসাম গবর্ণমেণ্টের ৫১৩৩II নং বিজ্ঞপ্তি দ্বারা গঠন করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে উক্ত থানাদ্বয়ের অস্তিত্ব ছিল না। জাষ্টিস র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদের সঙ্গীয় মানচিত্র ১৯৩৭ ইং সনে মুদ্রিত ; তখন বড়লেখা ও বিয়ানীবাজার থানার একটি প্রস্তাবিত (proposed) মানচিত্র তৈয়ারী হইয়াছিল। উহার বর্ণিত বড়লেখা ও বিয়ানীবাজার থানাদ্বয়ের সীমারেখা উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া উক্ত বিজ্ঞপ্তি মতে চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই থানাদ্বয়ের সম্পর্কে উক্ত মানচিত্রের সীমারেখা ত্রুটিযুক্ত। উক্ত থানাদ্বয়ের সীমারেখা ১৯৪০ ইং ৫ই জুন তারিখের গেজেটে প্রকাশিত উক্ত বিজ্ঞপ্তি মতেই বলবৎ হইয়াছে এবং তাহাই একমাত্র প্রামাণ্য বটে।

"বড়লেখা থানার পূর্ব্ব সীমা ঐ বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নোক্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। বড়লেখা থানার পূর্ব্ব সীমা—"বড়াইলচক, আতুয়া বড়াইল, কুমারশাইল, পাইকপাত্তন, শেওবারতল, গ্রামতলা ও কেচরীগোল গ্রামসমূহের পূর্ব্ব সীমানা দিয়া দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হইয়া পাথারিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত যাইয়া ঐ বনাঞ্চলের পশ্চিম সীমারেখা বাহিয়া দক্ষিণমুখী ঝুম্মছড়া পর্য্যন্ত যাইবে।

"উক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পাথারিয়া বনাঞ্চল বড়লেখা থানার বহির্ভূত। সুতরাং উহা র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ তথা বাগে রোয়েদাদ অনুযায়ী পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রাপ্য নহে।

"বিয়ানীবাজার থানার পূর্ব্ব সীমা উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নোক্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিয়ানীবাজার থানার পূর্ব্বসীমা—সাফা গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে সাফা, সাফাচক, মৌজপুর, হাজরাপাড়া, পৈলগ্রাম চক, হাজড়াপাড়া চক, গ্রামসমূহের বাহিরের সীমা অর্থাৎ পূর্ব্ব সীমা দিয়া কুশিয়ারা নদী পর্য্যন্ত আসিবে এবং তৎপর কুশিয়ারা নদীপার হইয়া গজুকাটা, চন্দিয়া, বড়গ্রাম, সিলেটি পাড়া, বাঙ্গালহুদা ও নয়াগাও প্রভৃতি গ্রামসমূহের বাহিরে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঐ গ্রামগুলি বিয়ানীবাজার থানার অন্তর্গত রাখিয়া সোনাই নদী পর্য্যন্ত যাইবে।

"বর্ত্তমান পাকিস্থান করিমগঞ্জ থানার যে কয়টি গ্রাম সম্পর্কে দাবি করিতেছে তাহা বিয়ানীবাজার থানার বহির্ভূত। কাজেই ঐ গ্রামসমূহ কিছুতেই পাকিস্থানের প্রাপ্য হইতে পারে না।

"রোয়েদাদ প্রদান কালে জাষ্টিস বাগে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের সঙ্গীয় ম্যাপে চিহ্নিত বিয়ানীবাজার থানা ও করিমগঞ্জ থানার সীমারেখা দিয়া র‍্যাডক্লিফ অঙ্কিত লাল রেখাকে ভারত ও পাকিস্থানের সীমা বলিয়া প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ ঐ সীমা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে তখন কোনও বিরোধ ছিল না, অথবা ঐ সীমা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে উক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের স্বীকৃত কোনও terms of reference বাগে ট্রাইবুনালকে প্রদান করা হয় নাই। এখানে র‍্যাডক্লিফ বর্ণিত কুশীয়ারানদী কোনটি তাহাই বাগে ট্রাইবুনালের আলোচ্য ও বিচার্য্য বিষয় ছিল। তাঁহারা কুশীয়ারা নদী সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে। তদতিরিক্ত কোনও বিষয় প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকিলে তাহা র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের বিরুদ্ধে যাইতে পারে না।

"বাস্তবিক পক্ষে করিমগঞ্জ থানা ও বিয়ানীবাজার থানার যে সীমা রেখা ১৯৪০ ইংরেজী সনের ৫ই জুন তারিখের আসাম

-গেজেটে চূড়ান্তভাবে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া তদবধি নির্বিবাদে স্বীকৃত ও গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, সেই সীমারেখাই ভারত ও পাকিস্থানের প্রকৃত সীমারেখা। বাগে-ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদ দ্বারা উহার কোনও ব্যত্যয় ঘটে নাই। সুতরাং করিমগঞ্জ থানার পশ্চিমাংশে অবস্থিত এবং বিভাগ পূর্ব্বকাল হইতে করিমগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত যে কয়টি গ্রাম সম্পর্কে পাকিস্থান রাষ্ট্র ইদানীং উদ্ভট দাবি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা ন্যায়ানুমোদিত নহে এবং ঐগুলি কোন অবস্থায়ই পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

"পাকিস্থানের অসঙ্গত এই দাবী সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রাহ্য না করিয়া ভারত সরকার তথা আমাদের অত্যুদার বিশ্বপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু যে মারাত্মক ভুল করিয়াছেন (এবং যাহার ফলে এতদঞ্চলবাসীকে অনর্থক উদ্বেগ অশান্তি ভোগ করিতে হইতেছে), অবিলম্বে তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা হইবে এই আশা আমরা করিতে পারি কি?"

পাকিস্থানে সামরিক শাসনে আইন ও শৃঙ্খলা

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে সামরিক শাসনে গ্রামাঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়া শ্রীহট্টের "জনশক্তি" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহীন গ্রামগুলিতে এখনও যে কয়জন মুষ্টিমেয় ভদ্রলোক রহিয়াছেন, কয়েক বৎসর যাবত তাঁহাদের মধ্যে গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার বিশেষ আকুলিবিকুলি দেখা যাইতেছিল। গ্রামত্যাগের জন্য তাঁহাদের এই আগ্রহের মূলে যে কারণগুলি ছিল সংক্ষেপে সেগুলি হইল এইরূপ:

১। গ্রামে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কোন, ভাল সুযোগ নাই এবং রুচিবিহীন পরিবেশে ছেলেমেয়েগুলি মানুষ হইতেছে না; (২) অসুখ-বিসুখে ভাল ডাক্তার-বৈদ্য কিংবা ঔষধপথ্য পাওয়া যায় না; (৩) পল্লীর রাস্তাঘাটগুলি সংস্কারের অভাবে চলাফেরার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে; (৪) পুরাতন জলাশয়গুলি কচুরীপানা ও জলাজঙ্গলে ভর্ত্তি হইয়া মশক ও সাপের আড্ডায় পরিণত হইয়াছে; (৫) চোরের উপদ্রবে রাত্রে ঘুমান যায় না (৬) গো-মহিষাদির গ্রাস হইতে ফসল রক্ষা করা যায় না; (৭) উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির লোকদের উৎপাতে মেয়েদের রাস্তায় চলাফেরা করা নদী বা পুকুরঘাটে স্নান করা, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ীঘরে থাকিয়াও সম্মান রক্ষা করা কঠিন হয়; (৮) পুকুরের মাছ, গাছের ফল রাখা যায় না; (৯) মাতব্বর ব্যক্তিদের জুলুম, দুষ্ট ব্যক্তিদের উৎপাত; (১০) গ্রামগুলি জলাজঙ্গলে ভর্ত্তি হওয়ায় এবং পানীয়-জলের অভাবহেতু জ্বর, আমাশয়, কলেরা, বসন্ত লাগিয়াই থাকে, (১১) পাঠশালায় নিয়মিত পড়া হয় না, (১২) বাজারে নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মিলে না ইত্যাদি।

সামরিক শাসনের প্রবর্ত্তনের পর এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে। "জনশক্তি" লিখিতেছেন:

"কিন্তু গত মাসাধিক কাল যাবত সামরিক শাসনের প্রচেষ্টার ফলে তড়িৎগতিতে বহুদিনকার পুঞ্জীভূত কতকগুলি সামাজিক ব্যাধি রাতারাতি যেভাবে বিদূরিত হইতে দেখা যাইতেছে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। এই অল্পদিনের মধ্যেই (১) গ্রামের জঞ্জাল-জঙ্গল ইত্যাদি অনেকটা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে; (২) পুকুর ও জলাশয়গুলির কচুরী জলাজঙ্গল ইত্যাদি পরিষ্কার হইতেছে; (৩) পথঘাট সংস্কার; (৪) গরুমহিষাদি দ্বারা অপরের ফসল নষ্ট করার কুপ্রচেষ্টা কম হইতেছে; (৫) চুরির উপদ্রব খুবই হ্রাস পাইয়াছে; (৬) উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের উৎপাত প্রশমিত হইয়াছে; (৭) পুকুরের মাছ, গাছের ফসলাদি চুরি হইতেছে না; (৮) নিয়মিত সময়েই পাঠশালা বসে।

পল্লীর শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের পক্ষে ইহা যে কতখানি আশীর্ব্বাদ তাহা ভুক্তভোগী লোক ছাড়া অন্য কেহ ধারণাও করিতে পারিবে না।

পাকিস্থানী "বড়ের চাল"

পাকিস্থানী কূটনীতি সম্পর্কে অন্য মুসলিম দেশও যে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছেন নীচের সংবাদ তাহারই দৃষ্টান্ত:

কায়রো, ১৮ই ডিসেম্বর—সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের 'আল গেইস' নামক সাময়িক পত্রের গত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে, পাকিস্থান কাশ্মীর-সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের উপর চাপ দিতে সমর্থ হওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতের সহিত খালের জল সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করিতে অসম্মত হইতেছে।

পাকিস্থান খালের জল সংক্রান্ত বিরোধের যে কোন যুক্তিসঙ্গত সমাধান মানিয়া লইতে অসম্মত হইতেছে। ইহার কারণ অন্যত্র নিহিত। বস্তুতঃ পাকিস্থান মনে করে, এই অসম্মতি কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান উহার পক্ষে অধিকতর অনুকূল করাইবার উদ্দেশ্যে ভারতের উপর এক প্রকার রাজনৈতিক চাপ। কিন্তু চাপ দেওয়ার নীতি দ্বারা কোন লাভ হয় না। ইহা নিঃসন্দেহ যে, একবার খালের জল সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা হইলে বৃহত্তর কাশ্মীর-সমস্যারও মীমাংসা হইবে।

উক্ত পত্রে আরও বলা হইয়াছে, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ভারতের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা স্বাভাবিক। জনগণের জীবনযাপন-পদ্ধতির উন্নতির উদ্দেশ্যে ভারতের ভাকরা বাঁধ ও অন্যান্য পরিকল্পনা প্রণয়নের অধিকার কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

চীনে নূতন অধিনায়কত্ব

চীনের রাষ্ট্রনীতি, কম্যুনিষ্ট মতানুযায়ী হইলেও, অন্যদেশ হইতে পৃথক তাহার কিছু আভাস বোধ হয় নীচের সংবাদে পাওয়া যায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় এইরূপ পরিবর্ত্তন এত সহজে কি হইত?:

পিকিং, ১৬ই ডিসেম্বর—বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, মাও-সে-তুং এ

বৎসর চীনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ ত্যাগ করিতে চলিয়াছেন।

তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যকাল শেষ হইলে তিনি চেয়ারম্যান পদে পুনরায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন না স্থির করিয়াছেন।

ওয়াকিবহাল মহল বলেন, চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ই অদ্য এক বৈঠকে বৈদেশিক কূটনীতিকগণকে সরকারীভাবে জানান যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গত বুধবার মাও'র সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছেন।

মাও কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকিবেন এবং পার্টি ও রাষ্ট্রের নীতি ও কার্য্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে তিনিই প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করিবেন।

প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান পদে মাও-এর স্থলাভিষিক্ত কে হইবেন, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই।

চীনে রাষ্ট্রপতির কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের হস্তে অর্পিত নহে। প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যান ও জাতীয় গণকংগ্রেসের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির ৬৬ জন সদস্য যুক্তভাবে সে কর্ত্তব্য ও ক্ষমতার অধিকারী রহিয়াছেন।

মাও-সে-তুংয়ের এই সিদ্ধান্তে বিদেশী কূটনীতিক ও পর্য্যবেক্ষকগণের মধ্যে কেহ কেহ আদৌ বিস্মিত হন নাই। কেননা মাও সম্প্রতি খুব কমই বাহিরে আসিতেন এবং অনুমান করা হইয়াছিল যে, চীনের সাম্প্রতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি একটি গবেষণাত্মক রচনায় আত্মনিয়োগ করিবেন এবং সে জন্য তাঁহার অবসর গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে।

সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, প্রজাতন্ত্রের চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করিলেও পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি দেশে সর্ব্বাধিক মর্য্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

ফ্রান্সে নির্ব্বাচন

ফরাসী দেশে দ্যগল প্রস্তাবিত সংবিধান গ্রহণের পর নবেম্বর মাসে যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে দ্যগলের সমর্থক দলগুলি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। নির্ব্বাচনে জ্যাক্‌স সুস্তেলের দ্যগলপন্থী নূতন দল পার্লামেণ্টের ৪৬৫টি আসনের মধ্যে ১৮৮টি আসন লাভ করিয়াছে; রক্ষণশীল দল পাইয়াছে ১৩৩টি ও ক্যাথলিক এম. আর. পি. দল ৫৭টি। আর সোস্যালিষ্ট, র‍্যাডিক্যাল ও কম্যুনিষ্ট পার্টি তিন দলে মিলিয়া পাইয়াছে ১০০টির কম আসন। গত পার্লামেণ্টে কম্যুনিষ্ট পার্টিই ছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, কিন্তু এবার মাত্র ১০টি আসন লাভ করায় পার্লামেণ্টে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দলে পরিণত হইয়াছে, তবে এবারে কম্যুনিষ্ট পার্টি নিতান্ত কম ভোট পায় নাই—তাহারা সর্ব্বমোট ভোটের প্রায় পৌণে ২১ শতাংশ ভোট পাইয়াছে; তাহাদের প্রাপ্ত ভোটের সহিত আসনের কোন সম্বন্ধ নাই। নির্ব্বাচনে র‍্যাডিক্যালদের প্রায় বিলোপ সাধন ঘটিয়াছে যদিও যুদ্ধোত্তর যুগের প্রত্যেকটি মন্ত্রীসভাতেই এই মধ্যপন্থী দল প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। ফরাসী দেশে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রথম নির্ব্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সমর্থকদের—অর্থাৎ দ্যগল বিরোধীদের ব্যাপক পরাজয়। নির্ব্বাচনে ফ্রান্সের ১৪ জন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অংশ গ্রহণ করেন; তন্মধ্যে পাঁচজন পরাজিত হইয়াছেন। পরাজিত মন্ত্রীদের নাম: মঃ এডগার ফর (দক্ষিণপন্থী র‍্যাডিক্যাল), মঃ জুলে মস (সোস্যালিষ্ট), মঃ পিয়ের মেণ্ডেস ফ্রাস (র‍্যাডিক্যাল), মঃ মরিস বুর্জেস মনোরি (র‍্যাডিক্যাল) এবং মঃ জোসেফ লানিয়েল (রক্ষণশীল)।

সংক্ষেপে নির্ব্বাচনের ফলাফল এইরূপ:

রক্ষণশীল দল ৩৫,৩৩,৫৯৬ অর্থাৎ শতকরা ২৩·৫৪টি ভোট।

দ্যগলপন্থী দল ৩৯,৭৩,৪২০ অর্থাৎ শতকরা ২৬·৪৬টি ভোট।

এম. আর. পি. ক্যাথলিক দল ১১,৯৪,১৪৮ অর্থাৎ শতকরা ৭·৯৫টি ভোট।

র‍্যাডিক্যাল ও র‍্যাডিক্যাল পন্থী ২,৪২,৪১৩ অর্থাৎ শতকরা ১·৬১টি ভোট।

সোস্যালিষ্ট ২০,৩৬,২০১ অর্থাৎ শতকরা ১৩·৫৬টি ভোট।

কম্যুনিষ্ট ৩১,০৫,১৯৩ অর্থাৎ শতকরা ২০·৬৮টি ভোট।

অন্যান্য দল ৯,২৭,১৩৯ অর্থাৎ শতকরা ৬·০৯টি ভোট।

ভোট দাতাদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় দুই কোটি।

নূতন পার্লামেণ্টে ২১শে ডিসেম্বর ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবেন। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ ব্যতীত ফরাসী উপনিবেশসমূহের পরিষদসমূহ, জেলা পরিষদগুলি এবং পৌর পরিষদসমূহের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ মোট প্রায় ৭০ হাজার ভোটদাতা অংশ গ্রহণ করিবেন। নূতন প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল সাত বৎসর। নূতন সংবিধানে প্রেসিডেণ্টের হাতে অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পর্য্যবেক্ষকগণের অভিমত এই যে, দ্যগলই প্রেসিডেণ্টরূপে নির্ব্বাচিত হইবেন। দ্যগলের সরকারে প্রধানমন্ত্রী কে হইবেন সে সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। তবে আশা করা যায় যে, হয় মঃ সুস্তেল বা বিচার-সচিব মিঃ মরিস ডেবরিই প্রধানমন্ত্রীরূপে বৃত হইবেন।

দ্যগলের সম্মুখে এখনও বহু সমস্যা রহিয়াছে। প্রথমতঃ কোন দলের উপর তাঁহার সাংগঠনিক প্রভাব নাই। ফ্রান্সে বর্ত্তমানে যে সরকার রহিয়াছে, একজন ফরাসী সোস্যালিষ্ট আইনজ্ঞের ভাষায় তাহা দ্যগলের মতানুযায়ী গঠিত হয় নাই। এই সরকারের গঠনে স্পষ্টতই আপোষের সূচনা মিলে। অ্যালজিরিয়া সম্পর্কে তাঁহার নীতির সহিত জ্যাকস সুস্তেল প্রমুখ দ্যগলপন্থী নেতৃবৃন্দের নীতির যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। দ্যগল ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক, সেহেতু বাহ্যিক আবরণের জন্য তিনি এমন সকল লোককে সহযোগী করিয়াছেন যাহাদের বুদ্ধির ক্লৈব্য প্রধানতঃ চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের পতনের মূলে ছিল। ফলে চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের বহু ভ্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি পঞ্চম রিপাবলিকেও গৃহীত হইতে চলিয়াছে।

অপর পক্ষে সরকারী ব্যবস্থায় বেতার এখন ছগলের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে ছগলের ভূমিকাকে বিশেষ বড় করিয়া দেখানো এই প্রচারের এক অভিনব কৌশল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচারকারীরা ছগলের প্রাক্তন প্রতিপক্ষ নাৎসীবাদী ছিলি সরকারের প্রাক্তন সমর্থক।

ছগল তাঁহার কোন নীতিই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার অর্থনৈতিক নীতিও তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার বর্তমান অর্থমন্ত্রী শ্রী অ্যান্তোয়া পিনে ধনীদের সমর্থনপুষ্ট হওয়ায় জরুরী ঋণ বণ্ডের টাকা উঠিয়াছে। বহির্বাণিজ্যে ফ্রান্সের হিসাবে উদ্বৃত্ত ছিল—তাহার মূলে ছিল বহুসংখ্যক ভ্রমণকারীর আগমন এবং মূলধনের প্রত্যাবর্তন। কিন্তু আসল অর্থনৈতিক সমস্যার কোন প্রতিকার এখনও পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নাই। রপ্তানী শিল্পের উন্নতির জন্যও কোন নূতন প্রচেষ্টা করা হয় নাই। ১৯৬০ সনের বাজেট সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলা হয় নাই; কিন্তু সরকারী ব্যয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

রেলের চলাচল

যাঁহারা রেলের ভিতরের ব্যাপার অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে ট্রেন যে আদৌ চলিতেছে ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সরকার উদাসীন। যথা:

নয়াদিল্লী, ২রা ডিসেম্বর—আজ লোকসভায় অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের ব্যাপারে সদস্যগণ রেল কর্তৃপক্ষের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁহারা এই পুরাতন ব্যাধির হেতু নির্ণয় এবং উহার উপযুক্ত প্রতিকারের উপায় অবলম্বনকল্পে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সরাসরি উহা প্রত্যাখ্যান করেন।

শ্রীফিরোজ গান্ধী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষাত্মক স্বরে মন্তব্য করেন যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯৪৭ সনে তৎকালীন রেলমন্ত্রী শ্রী জন মাথাই বিলম্বে ট্রেন চলাচল সম্পর্কে প্রথমবার যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট বারবার সেই একই আশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। রেল কর্তৃপক্ষ রেলপথের উন্নতিকল্পে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নিয়মিত ট্রেন চলাচল আদৌ হইতেছে না।

ট্রেনে অত্যধিক ভিড়, মাত্রাতিরিক্ত বিপদজ্ঞাপক শিকল টানা এবং ইঞ্জিনের গলদ ইত্যাদি যে সব কারণ গবর্ণমেণ্ট দর্শাইয়াছেন শ্রী গান্ধী সেসব যুক্তি 'মামুলি' বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, যদি এইসব কারণ মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে এক্সপ্রেস অথবা মেল ট্রেনের তুলনায় মন্থরগামী ট্রেনগুলির কম অনিয়মিত চলাচলের কোন সদ্ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহা ছাড়া প্রত্যহ যেখানে ৪ হাজার ট্রেন যাতায়াত করে, সেখানে মাত্র ১১৮টি বিপদজ্ঞাপক শিকল টানার ঘটনা দ্বারা ট্রেন চলাচল ব্যবস্থার ক্রমাবনতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা অসম্ভব।

সরকারী পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলেন যে, কোন বিশেষ বিশেষ রেললাইনে যখন সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ভাঙন ঘটে সেইসব ট্রেন চলাচল পূর্ব্বাপেক্ষা নিয়মিতভাবে চলে। কাজেই এই ব্যাখ্যাও এক্ষেত্রে অচল। পক্ষান্তরে ত্রুটিযুক্ত রেল ইঞ্জিন এবং রেলকর্মীদের দক্ষতা হ্রাসই বিলম্বে ট্রেন চলাচলের জন্য দায়ী।

পণ্ডিত ডি, এন, তেওয়ারী ট্রেনের অনিয়মিত চলাচল ও রেল কর্মচারীদের সময়মত ট্রেন চালাইবার ব্যর্থতা সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, সে বিষয়েই লোকসভায় আজ বিতর্ক চলে।

এই প্রস্তাব ও তদন্ত কমিশন গঠন সম্পর্কিত শ্রী গান্ধীর দাবী সদস্যগণ মোটামুটি সমর্থন করেন। কিন্তু কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রী এ. কে. গোপালন প্রস্তাবের শেষাংশের সঙ্গে একমত হন না এবং অনিয়মিত ট্রেন চলাচল প্রমাণ করিবার দাবির বিরোধিতা করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, সংসদের ব্যয়-বরাদ্দ কমিটির সুপারিশগুলি পর্য্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন নাই; কাজেই আবার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা সময়ের অপচয় হইবে।

তিনি মনে করেন যে, অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের জন্য রেল কর্মচারীদের উপর পুরাপুরি দোষ দেওয়া উচিত নয়, যেহেতু তাহাদের পরামর্শ খুব কম সময়ই চাওয়া হয় এবং যখন তাঁহারা কোন প্রস্তাব করেন তখন ঊর্দ্ধতন কর্মচারীরা তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিয়া থাকেন। কর্মীদের সঙ্গে যৌথ আলোচনার ব্যবস্থায় কোন কাজ হইতেছে না এবং বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যাও কম।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নূতন সভাপতি

আমরা নূতন সভাপতিকে অভিনন্দন জানাই। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখিয়াছেন:

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নবনির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজা শুক্রবার সন্ধ্যায় কলিকাতায় সাংবাদিকদের সহিত আলোচনাকালে এরূপ মন্তব্য করেন যে, "প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে এই রাজ্যে বিভিন্ন মণ্ডল ও জেলা কমিটিগুলি গঠনের জন্য অবাধ ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচনের ব্যবস্থা করাই আমার প্রথম কর্তব্য।"

শ্রীপাঁজা নবগঠিত প্রদেশ কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশনে যোগদানার্থ এই দিনই অপরাহ্নে বর্দ্ধমান হইতে ট্রেনযোগে কলিকাতায় আসেন। তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশনে কংগ্রেসকর্মীরা বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

প্রকাশ, শ্রীপাঁজা উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভায়ও বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, যদি কংগ্রেসের সুনাম কিছু ক্ষুণ্ণ হইবার কথা উঠে তবে অতীতে অবাঞ্ছিত পন্থাদি অবলম্বনের জন্যই ঐরূপ হইতে পারে, সুতরাং কংগ্রেসের কাজে কোন ক্ষেত্রেই যাহাতে কোনরূপ গলদ না থাকে তজ্জন্য তাঁহাদের সকলেরই সচেতন ও সক্রিয় হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে তিনি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সমস্ত সদস্যকে তাঁহার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবার আহ্বান জানান।

শঙ্করের "জীবন্মুক্তিবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

২

পূর্ব সংখ্যায় শঙ্করের মোক্ষ তত্ত্বের মূলীভূত তত্ত্ব "জীবন্মুক্তি-বাদ" সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে কি বলেছেন, সে সম্বন্ধে দু'একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

গীতা-ভাষ্যেও শঙ্কর এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন (গীতা-ভাষ্য, ১৩-২৩) এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে :

"য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।"

(গীতা, ১৩-২৩)

যিনি এইভাবে পুরুষ ও গুণসহ প্রকৃতিকে জানেন, তিনি যে কোনো অবস্থাতেই বর্তমান থাকলেও, পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না।

এস্থলে শঙ্কর বলছেন যে, যিনি পুরুষ বা আত্মাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে, এবং প্রকৃতি বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মিথ্যারূপে জানেন, তিনি যে কোনো অবস্থাতেই থাকুন না, দেহপাতের পর আর জন্মান্তরভাগী হন না।

এস্থলে একটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। কর্ম-বাদানুসারে কর্ম কৃত হলেই তার ফল অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য, ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে ও পরে, বর্তমান জন্মে অনুষ্ঠিত অসংখ্য কর্ম, এবং অন্যান্য পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সঞ্চিত কর্ম, স্ব স্ব ন্যায্য ফল প্রসব করবে নিশ্চয়ই। ফলদানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধ প্রাক্তন কর্ম এবং ফলদানে অপ্রবৃত্ত অনারব্ধ প্রাক্তন কর্ম উভয়েই ত সেই কর্মই। সেজন্য উভয়েই সমানভাবে ফলোৎপাদনও করবে নিশ্চয়ই। সেক্ষেত্রে প্রারব্ধ প্রাক্তন কর্মই কেবল ফলভোগ না হলে বিনষ্ট হবে না, অনারব্ধ প্রাক্তন কর্ম ফলভোগ না হলেও বিনষ্ট হবে—এরূপ প্রভেদ ত অযৌক্তিক। এই কারণে, উপরে উল্লিখিত তিন প্রকারের অনারব্ধ কর্মের ফলোপভোগের জন্য অন্ততঃ তিনটি জন্মের প্রয়োজন। তা না হলেও, এই ত্রিবিধ কর্মের একত্রে ভোগের জন্যও অন্ততঃ একটি জন্ম ত অত্যাবশ্যক। অতএব, জ্ঞানোৎপত্তির পর যে আর পুনর্জন্ম নেই—এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

এই আপত্তির উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, জ্ঞানোদয়ে কর্মের আর অস্তিত্বই থাকে না।

"বিদুষঃ সর্ব-কর্ম-দাহঃ।" (গীতা-ভাষ্য, ১৩-২৩)

জ্ঞানীর সকল কর্মই দগ্ধ হয়ে যায়।

একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে শঙ্কর বলছেন :

"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥"

যেমন বীজ অগ্নিদগ্ধ হলে, তার থেকে আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তেমনি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়ে গেলে অবিদ্যা-কর্ম-রূপ ক্লেশ থেকে আত্মার আর জন্মান্তর লাভ হয় না।

এস্থলে পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, জ্ঞানোৎপত্তির পরের কর্ম না হয় জ্ঞান দ্বারা ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু তার পূর্বের কর্ম এবং পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত অসংখ্য কর্ম পরবর্তী জ্ঞান দ্বারা কি করে দগ্ধ বা বিনষ্ট হবে? এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন যে, পূর্ববর্তী, পরবর্তী, সমকালীন সকল প্রকার অনারব্ধ কর্মই ধ্বংস করবারই সম্পূর্ণ শক্তি জ্ঞানের আছে।

অবশ্য প্রারব্ধ কর্মের কথা স্বতন্ত্র।

"তেষাং মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্ত-ফলত্বাৎ॥"

(গীতা-ভাষ্য ১৩-২৩)।

ধনুক থেকে একবার একটি শর প্রক্ষিপ্ত হলে, তার বেগ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তা ছুটে চলতেই থাকে, তাকে আর কোনো কিছুতেই সংহত করা যায় না। একই ভাবে, প্রারব্ধ কর্মও স্বীয় সংস্কার-বেগ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে, এবং ততদিন পর্যন্ত তার ফলস্বরূপ বর্তমান দেহেন্দ্রিয়াদিও বিদ্যমান থাকে। অপর পক্ষে, যে শরটি এখনও ধনুক থেকে প্রক্ষিপ্তই হয় নি, তার বেগও নেই, এবং তাকে অনায়াসেই সংহত করা যায়। একই ভাবে, অনারব্ধ কর্মকেও জ্ঞান দ্বারা নিরুদ্ধ ও বিনষ্ট করা চলে, আরব্ধ কর্মকে নয়। সেজন্য, জ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞর সমস্ত ভূত ও ভবিষ্যৎ অনারব্ধ কর্ম নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যায় বলে, প্রারব্ধ কর্মফলোপভোগের পর, আর অন্য কোনো কর্মের ফলোপ-ভোগ তাঁকে করতে হয় না। এই কারণেই, জ্ঞানীর আর পুনর্জন্ম নেই।

শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের সুবিখ্যাত চতুঃসূত্রীর শেষ সূত্রেও (১-১-৪), জীবন্মুক্তি বিষয়ে যুক্তি-তর্কসহকারে বিশদ আলোচনা করেছেন।

এই সূত্রভাষ্যে শঙ্কর প্রমাণিত করতে প্রচেষ্টা করেছেন যে, বেদান্তবাক্যসমূহ ক্রিয়ামূলক বিধিবাক্য নয়, সে সব কেবল বস্তু বা ব্রহ্মকেই নির্দেশ করে। যদি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, এরূপ বিধিনিষেধবিহীন, বাক্য নিরর্থক, যেহেতু 'এই কর্ম কর', 'ঐ কর্ম করো না' প্রমুখ বিধিনিষেধ অনুসরণ করেই অজ্ঞ জীব শুভ লাভ ও অশুভ বর্জনে সমর্থ হয়—তার উত্তর এই যে, বিধিনিষেধবিহীন, বস্তুর অস্তিত্ব-প্রদর্শনকারী বাক্যের প্রয়োজনও অল্প নয়। যথা, 'রজ্জুরিয়ং, নায়ং সর্পঃ', 'এই বস্তুটি রজ্জু, সর্প নয়'—এরূপ বস্তুমাত্র-কথনপর বাক্যেও ভ্রান্ত ব্যক্তির মিথ্যা সর্পজ্ঞান ও তজ্জনিত ভয়কম্পাদি অল্পক্ষণ পরে বিদূরিত হয়। একই ভাবে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬.৮.৭) প্রভৃতি ব্রহ্মপর বেদান্তবাক্য-শ্রবণে, অজ্ঞ জীবের মিথ্যা ভেদজ্ঞান ও তজ্জনিত সংসারিত্ব বিদূরিত হয়, এবং তিনি মুক্তিলাভ করেন।

এর প্রত্যুত্তরে, পূর্বপক্ষবাদী পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করছেন যে, এরূপ বেদান্তবাক্য-শ্রবণের পরও মুমুক্ষুর পূর্বের ন্যায় সংসারিত্ব বিদ্যমান থাকে—সেজন্য এরূপ বাক্যাবলী নিরর্থকই মাত্র। এই আপত্তির উত্তরেই শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞের অসংসারিত্ব বা জীবন্মুক্তির যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন নিম্নলিখিতরূপে :

প্রথমতঃ, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে, মুমুক্ষু প্রারব্ধ কর্মের ফলস্বরূপ সংসারে বাস করেও এবং দেহাদিধারী হয়েও, প্রকৃতপক্ষে অসংসারী ও অশরীরী হয়ে যান। এস্থলে 'সংসারী' বা 'সংসারিত্ব' এবং 'অসংসারী' বা 'অশরীরত্ব'—এই দুটি শব্দের অর্থ কি? সাধারণতঃ, 'সশরীরত্ব' বলতে আমরা 'দেহাদি-বিশিষ্টত্ব' এবং 'অশরীরত্ব' বলতে 'দেহাদিহীনত্ব'ই বুঝি। কিন্তু বস্তুতঃ, 'সশরীরত্বের' অর্থ হ'ল : 'শরীরাভিমান-বিশিষ্টত্ব' ; এবং 'অশরীরত্বের' অর্থ হ'ল : 'শরীরাভিমান-শূন্যত্ব'। অর্থাৎ, শরীর বিদ্যমান আছে, কি না,—সেইটিই এক্ষেত্রে প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা হ'ল, সেই শরীরাদির সঙ্গে অবিদ্যা ও অধ্যাসমূলক অভিমান, দেহ ও আত্মার মিথ্যা অহঙ্কারজনিত একীকরণও আছে কি না। যে ক্ষেত্রে এরূপ একীকরণ আছে, সে ক্ষেত্রেই সশরীরত্ব ও সংসারিত্বও আছে ; যে ক্ষেত্রে এরূপ একীকরণ নেই, সে ক্ষেত্রেই সশরীরত্ব ও সংসারিত্বও নেই—দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতি থাকুক, বা নাই থাকুক। কারণ, যে ক্ষেত্রে দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতিতে 'অহং মম' ভাব হয়, সে ক্ষেত্রেই দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতির ধর্ম, অবস্থাদি আত্মার আরোপ করা হয়, এবং ফলে জীব যেন দুঃখক্লেশাভিভূত হয়ে পড়েন—এই হ'ল বদ্ধাবস্থা, সংসারিত্ব ও সশরীরত্ব। অপরপক্ষে, দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতি বিদ্যমানেও যদি সে সকলে 'অহং মম' ভাব না থাকে, তা হলে আত্মা স্বভাবতঃই দেহেন্দ্রিয়-মনো-বিশিষ্ট হয়েও সংসারাবদ্ধ হন না, দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতির ধর্ম, অবস্থাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হন না, দুঃখক্লেশাদিভূত হন না—এই হ'ল মোক্ষাবস্থা, অসংসারিত্ব ও অশরীরত্ব।

উদাহরণ দিয়ে শঙ্কর বলছেন যে, ধনাভিমানী, 'অহং মম' ভাবের দাস, গৃহস্থের ধন অপহৃত হলে, তিনি দুঃখাকুল হয়ে পড়েন ; কিন্তু সেই গৃহস্থই যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, ও ধনাভিমান ত্যাগ করেন, তখন ধনাপহরণ হলেও তাঁর আর কোনোরূপ দুঃখই হয় না। একই ভাবে, কুণ্ডলাভি-মানী, কুণ্ডলধারী ব্যক্তি কুণ্ডলধারণের সুখ অনুভব করেন ; কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন কুণ্ডলাভিমানশূন্য হন, তখন তাঁর আর কুণ্ডলধারণজনিত সুখ বলে কিছুই থাকে না। (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)

এরূপে, শরীরপাতের পরই কেবল 'অশরীর' অবস্থা হয়, জীবিতকালে নয়—এই ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত। সেজন্য, শঙ্কর সিদ্ধান্ত করছেন :

"সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ। ন হ্যাত্মনঃ শরীরাত্মাভিমান-লক্ষণং মিথ্যাজ্ঞানং মুক্ত্বা অন্যতঃ সশরীরত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)

অর্থাৎ 'সশরীরত্ব' মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত। শরীরাভিমান বা শরীর ও আত্মার অভিন্নতারূপ মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত 'সশরীরত্বের' অন্য কোনো কারণ কল্পনামাত্র করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতপক্ষে, 'অশরীরত্ব' নিত্য, অর্থাৎ, জীব নিত্যমুক্ত। জীব কোনোদিনও বাস্তবভাবে দেহেন্দ্রিয়-মন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় না। সেজন্য অশরীরত্ব কর্মপ্রসূত নয়, সৃজ্য পদার্থ নয়। কেবলমাত্র অবিদ্যাবশতঃই বদ্ধ জীব মনে করেন যে, তিনি দেহাদির সঙ্গে যেন সংশ্লিষ্ট হয়েছেন। এইভাবে, ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে, আত্মা নূতনভাবে দেহাদি থেকে ভিন্নতা প্রাপ্ত হন না ; কেবল আত্মা যে শাশ্বতকাল দেহাদি-ভিন্ন—এই জ্ঞানেরই উৎপত্তি ও উপলব্ধি হয় সাধক-হৃদয়ে।

তৃতীয়তঃ, 'অশরীরত্ব' প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়, ভ্রান্তজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞানই মাত্র। সেজন্য ধর্মাধর্ম, পুণ্যপাপাদিও অশরীরত্বের হেতু নয়—আত্মারও ধর্মাধর্ম নেই।

চতুর্থতঃ, শরীর বিদ্যমানেই ধর্মাধর্ম সম্ভব, সেজন্য পুনরায়, ধর্মাধর্মই শরীরের কারণ—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ইতরেতরাশ্রয় দোষের উদ্ভব হয়।

পঞ্চমতঃ, শরীর ও ধর্মাধর্মের সম্বন্ধকে অনাদি বলে গ্রহণ করলে, অন্ধ-পরম্পরা-দোষের উদ্ভব হয়। অবশ্য কর্ম ও সংসারের মধ্যে বীজাঙ্কুর ন্যায়ানুসারে অনাদি-সম্বন্ধ স্বীকার

করা হয়, সত্য। কিন্তু, তা হ'ল ব্যবহারিক দিক্ থেকেই মাত্র। কিন্তু এক্ষেত্রে, বিষয়টি পারমার্থিক দিক্ থেকেই আলোচিত হচ্ছে বলে, এরূপ অনাদি-সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না।

ষষ্ঠতঃ, আত্মা কর্তা নয়। সেজন্য, যাগযজ্ঞাদি-কর্ম ও তজ্জনিত ধর্মাধর্মও আত্মার ক্ষেত্রে সম্ভবপরই নয়।

সপ্তমতঃ, ন্যায়-বৈশেষিক মতে, দেহ ও আত্মা ভিন্ন হলেও যে দেহাদিতে আত্মজ্ঞান হয়, তা গৌণ, মিথ্যা নয়। কিন্তু এই মতবাদও ভ্রান্ত। যখন দুটি বিভিন্ন বস্তু এবং উভয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান থাকে, অথচ জ্ঞাত এক বস্তুর গুণ জ্ঞাত অপর বস্তুতে দৃষ্ট হয় বলে একের জ্ঞান অপরে হয়, ও একের নাম অপরে আরোপিত হয়—তখন সেই জ্ঞান 'গৌণ'। যেমন, পুরুষে পুরুষ-জ্ঞান ও সিংহে সিংহ-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, পুরুষে সিংহের শৌর্য্যাদিগুণ দর্শনে, পুরুষে সিংহশব্দের প্রয়োগ ও পুরুষে সিংহ-জ্ঞানই হ'ল 'গৌণ' জ্ঞান। কিন্তু, এক অজ্ঞাত বস্তুতে অপর বস্তুর জ্ঞান 'মিথ্যা', 'গৌণ' নয়। যেমন, উপরের দৃষ্টান্তে, পুরুষে পুরুষ-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে, যদি সিংহ-জ্ঞান হ'ত, অর্থাৎ, পুরুষকে সিংহ বলে ভ্রম করা হত, তাহলে, তা হ'ত 'মিথ্যা' জ্ঞান। অথবা অন্ধকারে অজ্ঞাত স্থাণু বা বৃক্ষে পুরুষ-জ্ঞান ও পুরুষ-শব্দ প্রয়োগ, অজ্ঞাত শুক্তিতে রজত-জ্ঞান ও রজত শব্দ প্রয়োগ প্রভৃতি সকলই 'মিথ্যা' জ্ঞানের দৃষ্টান্ত, 'গৌণের' নয়। একই ভাবে, অজ্ঞাত আত্মায় দেহাদি-জ্ঞান ও দেহাদি-শব্দ প্রয়োগও 'মিথ্যা', 'গৌণ' নয়।

এরূপে, নানাদিক্ থেকেই প্রমাণিত করা যায় যে, জীবিত অবস্থাতেই অশরীরত্ব, অসংসারিত্ব এবং মোক্ষ সম্ভবপর:

"তস্মান্মিথ্যা প্রত্যয়-নিমিত্তত্বাৎ সশরীরত্বস্য সিদ্ধং জীবতোঽপি বিদুষোঽশরীরত্বম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)

অর্থাৎ, 'অশরীরত্ব' মিথ্যাজ্ঞান-প্রসূত বলে, জীবিত অবস্থাতেও জ্ঞানীর অশরীরত্ব সম্ভবপর।

পরিশেষে শঙ্কর সিদ্ধান্ত করছেন:

"তস্মান্ন অবগত-ব্রহ্মাত্ম-ভাবস্য যথাপূর্বং সংসারিত্বম্। যস্য তু যথাপূর্বং সংসারিত্বং নাসাববগত-ব্রহ্মাত্ম-ভাব ইত্যনবদ্যম্।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)

অর্থাৎ, যিনি ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্ব অবগত হয়েছেন, তাঁর কখনই পূর্বের ন্যায় সংসারিত্ব থাকে না। যাঁর থাকে, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞ নন—এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

এইভাবে, জীবন্মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞের শরীর-ধারণ সম্বন্ধে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

এরূপে, নিরাসক্ত, নির্বিকার, সংসারাতীত, দেহমনাতীত, পার্থিবাবস্থাতীত, জীবন্মুক্তের জীবন যে সম্ভবপর, তা তর্ক দ্বারা স্থাপনের প্রচেষ্টা করে, শঙ্কর পরিশেষে উপস্থাপিত করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যক্ষ প্রমাণের:

"অপি চ, নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদঃ কঞ্চিৎ কালং শরীরং ধ্রিয়তে ন বা ধ্রিয়ত ইতি। কথং হ্যেকস্য স্বহৃদয়-প্রত্যয়ং ব্রহ্মবেদনং দেহধারণঞ্চাপরেণ প্রতিক্ষেপ্তুং শক্যতে।" (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-১-১৫)।

অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞ কিছুকাল শরীর ধারণ করেন, কি না—সে বিষয়ে বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরেও যে শরীরাদির অস্তিত্ব থাকে, তা ব্রহ্মজ্ঞের স্বানুভবসিদ্ধ, অন্যে তার প্রত্যাখ্যান করবে কি প্রকারে?

এরূপে, জীবিত অবস্থাতেই, সংসারে বাস করেই, ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তিলাভ করে জীবন্মুক্ত হন। পরে, প্রারব্ধ কর্মজাত দেহাদি বিনাশের পর, তিনি বিদেহমুক্তিও লাভ করেন।

"বিদুষঃ শরীরপাতে মুক্তিরিত্যবধারয়তি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-১-১৪)।

"তদারব্ধ-কার্যক্ষয়ে বিদুষঃ কৈবল্যমবশ্যম্ভাবীতি।"

(ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ৪-১-১৯)

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ব্যতীত অন্যান্য বহু স্থলেই শঙ্কর একই ভাবে জীবন্মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। যথা, কঠোপনিষদের একটি শ্লোকে একই সঙ্গে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির কথা বলা আছে:

"ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।"

(কঠোপনিষদ্, ২-২-১)

এক্ষেত্রে, দু'বার মুক্তির বিষয় উল্লিখিত হয়েছে—বিমুক্তই বিমুক্তি লাভ করেন। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্কর বলছেন:

"ইহৈবাবিদ্যাকৃত-কামকর্মবন্ধৈর্বিমুক্তো ভবতি। বিমুক্তশ্চ সন্ বিমুচ্যতে—পুনঃ শরীরং ন গৃহ্লাতীত্যর্থঃ।"

(কঠোপনিষদ্-ভাষ্য, ২-২-১)।

অর্থাৎ, অবিদ্যা-প্রসূত সকাম-কর্মের বন্ধন থেকে জ্ঞানী এই জগতেই বিমুক্ত হন, বা জীবন্মুক্তি লাভ করেন। পরে তিনি পুনরায় বিমুক্ত হন বা বিদেহমুক্তি লাভ করেন, ও পুনর্জন্ম থেকে পরিত্রাণ পান।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্যেও শঙ্কর সমভাবে বলছেন:

"কিন্তু বিদ্বান্ ইহৈব ব্রহ্ম, যদ্যপি দেহবানিব লক্ষ্যতে। স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। যস্মাৎ ন হি তস্যাব্রহ্মত্ব-পরিচ্ছেদ-হেতবঃ কামাঃ সন্তি, তস্মাদিহৈব ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি ন শরীরপাতোত্তরকালম্।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্য, ৪-৪-৬)।

অর্থাৎ, বিদ্বান্ বা ব্রহ্মজ্ঞ কিন্তু দেহবান্‌রূপে দৃষ্ট হলেও,

এইখানেই ব্রহ্ম হন; ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মলাভ করেন। অব্রহ্মত্বের কারণস্বরূপ কাম তখন থাকে না, বলে তিনি এইখানেই ব্রহ্মই হয়ে ব্রহ্মলাভ করেন, শরীরপাতের পরে নয়।

"অতো মৃত্যুবিয়োগে বিদ্বান্ জীবন্নেব অমৃতো ভবতি। অত্র অস্মিন্নেব শরীরে বর্তমানঃ ব্রহ্ম সমশ্নুতে ব্রহ্মভাবং মোক্ষং প্রতিপদ্যতে।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্য ৪-৪-৭)।

অর্থাৎ, অবিদ্যা-বিয়োগে, বিদ্বান্ জীবিতাবস্থাতেই অমৃতত্বলাভ করেন। এই বর্তমান শরীরেই তিনি এইভাবে ব্রহ্মভাব বা মোক্ষলাভ করেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্যেও, শঙ্কর একই সঙ্গে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির উল্লেখ করেছেন:

"স এবংলক্ষণো বিদ্বান্ জীবন্নেব স্বারাজ্যেঽভিষিক্তঃ পতিতেঽপি দেহে স্বরাডেব ভবতি।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্য, ৭-২৫-২)।

অর্থাৎ, বিদ্বান্ জীবিতাবস্থাতেই স্বারাজ্যে অভিষিক্ত হন, দেহপাতের পরও স্বরাট্ই থাকেন।

ছান্দোগ্য-ভাষ্যের অন্যত্রও শঙ্কর বলছেন:

"সদাত্মতত্ত্বে অবিজ্ঞাতেঽপি সকৃদ্ বুদ্ধিমাত্রকরণে মোক্ষ-প্রসঙ্গাৎ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্-ভাষ্য, ৬-১৬-৩)।

অর্থাৎ, আত্মতত্ত্ব অবিজ্ঞাত থাকলেও, একবারমাত্র ঐরূপ জ্ঞান সম্পাদন হলেই, মোক্ষলাভ হয়। সেজন্য জীবন্মুক্তি সম্ভবপর।

গীতা-ভাষ্যেও শঙ্কর একই ভাবে, একত্রে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির বিষয় বলেছেন:

"উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষো বর্ততে বিদিতাত্মনাং সম্যগদর্শিনামিত্যর্থঃ।"

(গীতা-ভাষ্য, ৫-২৬)।

"যথোক্ত-বিশেষণসম্পন্নঃ সমাহিতশ্চ জীবন্নেব ব্রহ্মভাবং প্রাপ্নোতি, ব্রহ্মণি পরিপূর্ণে নিবৃত্তিং সর্বানর্থনিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাং স্থিতিমনাতিশয়ানন্দাবির্ভাব-লক্ষণাং প্রাপ্নোতি।"

(গীতা-ভাষ্য, ৫-২৪)।

অর্থাৎ, যাঁরা আত্মজ্ঞ বা সম্যগ্‌দর্শী, তাঁরা জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে, উভয়াবস্থাতেই মোক্ষলাভ করেন।

এরূপ লক্ষণসম্পন্ন, সমাহিতচিত্ত যোগী, জীবিতাবস্থাতেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, পরিপূর্ণব্রহ্মে নিরতিশয়ানন্দঘন, সর্বানর্থ-নিবৃত্তিকারণ ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করেন।

কঠোপনিষদ্-ভাষ্যেও শঙ্কর বলছেন:

"অত্র ইহৈব প্রদীপ-নির্বাণবৎ সর্ববন্ধনোপশমাদ্ ব্রহ্ম সমশ্নুতে, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ॥"

(কঠোপনিষদ্-ভাষ্য, ৬-১৪)

অর্থাৎ, প্রদীপ-নির্বাণের ন্যায়, সর্ব-বন্ধন-নিবৃত্তি হলে; মুমুক্ষু এই দেহেই, এই সংসারেই ব্রহ্মভোগ করেন, বা স্বয়ং ব্রহ্মই হয়ে যান।

কঠোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত সুবিখ্যাত শ্লোকের ভাষ্য-রূপেই, শঙ্কর উপরের ব্যাখ্যা দান করেছেন:

"যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" (৬-১৪)

এই শ্লোকে, জীবন্মুক্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

জীবন্মুক্তির অপর একটি অকাট্য প্রমাণ এই যে, পুণ্য-শ্লোক আচার্যগণ সকলেই জীবন্মুক্ত। স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞ না হলে গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করবেন কিরূপে? অথচ, গুরুর উপদেশ ব্যতীত মুমুক্ষুর মোক্ষলাভও অসম্ভব। সেজন্য, জীবন্মুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞ, গুরু সাধনমার্গে অত্যাবশ্যক। এই কারণে শঙ্কর ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্যে (৬১৪-১) মূলের উপমা ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, স্বদেশ গান্ধার থেকে বদ্ধচক্ষু অবস্থায় তস্করগণকর্তৃক অপহৃত হয়ে, এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্রপশু ও চৌরাদিসঙ্কুল, গহন ও ভীষণ অরণ্য মধ্যে পরিত্যক্ত হয়ে, দিগ্‌ভ্রমগ্রস্ত ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে, দুঃখশোকাভিভূত পুরুষ যখন বন্ধন মোচনের জন্য আর্ত চিৎকার করেন, তখন এক করুণাসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর চক্ষুর বন্ধন বিমোচন করেন, তাঁকে স্বদেশের পথ নির্দেশ করেন; এবং এইভাবে, তাঁরই সহায়তায় মুক্তিলাভ করে আর্ত পুরুষ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, পরমা শান্তিলাভ করেন। একই ভাবে পাপ-পুণ্যাদি-সকামকর্মরূপ তস্করগণকর্তৃক স্বদেশরূপ পরব্রহ্ম থেকে অপহৃত ও আবৃতদৃষ্টি বা বদ্ধচক্ষু হয়ে, ঐহিক পুত্রকলত্রাদি ও পারলৌকিক ভোগপাশে আবদ্ধ হয়ে, বদ্ধজীব নিবিড় দেহারণ্যে পরিত্যক্ত হন, এবং দেহাদির অসংখ্যবিধ ক্লেশ-ক্লেদলিপ্ত হয়ে পড়ে মুক্তির জন্য আর্ত চিৎকার করেন। সেই সময়ে, ব্রহ্মদর্শী, জীবন্মুক্ত, ব্রহ্মস্বরূপ গুরু তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান-দানে ধন্য করলে, তিনি অবিদ্যা ও তৎপ্রসূত সকাম-কর্মের আবরণ থেকে বিমুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করে, আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে, পরমানন্দের আস্বাদ করেন।

সেজন্য, জীবন্মুক্ত, আচার্যবৃন্দের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এ বিষয়ে পরে আরো আলোচনা করা হবে।

অসুখী আত্মা

শ্রীভূপতি ভট্টাচার্য

কথাটা অবাক হবারই বটে। শেষে কিনা ওই রতু ছোঁড়াটাও বিয়ে করে বসল! রতু মানে শ্রীমান রতনলাল প্রামাণিক। ওই ত আমার পাশের বাড়ীতেই থাকে। আমার বৈঠকখানা ঘরের জানলার একেবারে সোজাসুজি। খোলা জানলা দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায় ওর ঘরের ভেতরটা। ময়লা তেল-চিটচিটে একটা চাদর পাতা রয়েছে তক্তপোষের ওপর। একটা মান্ধাতার আমলের তিন পাওয়ালা গোল টেবিল আর একটা টিনের প্যাট্‌প্যাটে চেয়ার। মেঝেতে দেওয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে এলোপাথাড়ি পড়ে রয়েছে দুটো সুটকেস না তোরঙ্গ বুঝবার উপায় নেই। ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ অবধি একটা দড়ি টাঙানো। তাতে ঝুলছে দুটো-চারটে জামাকাপড়, ছেঁড়া ন্যাকড়া, গরম কম্বল, আরও কত কিছু। দেওয়ালে খানকয়েক বিশ্রী ক্যালেণ্ডার—দৃষ্টি পড়তেই সারা গা রি-রি করে ওঠে। এ ছাড়া একটা তোবড়ানো স্টোভ, কয়েকটা হাতলবিহীন কানাভাঙা কাপ-সসার, একটা মরচে-পড়া টাইমপিস ইত্যাদি খুঁটিনাটি নানান জিনিস মেঝেতে ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। আমার বৈঠকখানা ঘরের জানলাটা খুললেই সব চোখে পড়ে।

এই কাবাড়িখানারই বাসিন্দা শ্রীমান রতনলাল প্রামাণিক। বয়স আর কত হবে! আমি ত বছরতিনেক ধরে ওকে ঠিক অমনই দেখছি। পরিবর্তন কিছুই চোখে পড়ে না। তা যাই হোক, বছর বাইশ-তেইশের বেশী হবে না।

ঘরের ছিরিটা যেমনই হোক না কেন, শ্রীমান রতুর বাইরের সাজ-পোশাকের বহরটা কিন্তু বেশ জোরদার। অন্য দিনের কথা বলতে পারি না, তবে ছুটির দিনে আমি কমসে-কম বারআষ্টেক ওকে ওই ছোট্ট গলিটায় ঢুকতে আর বেরুতে দেখেছি। একেবারে ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী, নয় ত সদ্য ক্রীজভাঙা আমেরিকান হাওয়াই সার্ট আর রং-বেরঙের সার্কিনের কি লিনেনের ফুলপ্যান্ট বাতাসে ফরফর করছে। আর তার সঙ্গে মানানসই শান্তিনিকেতনী চপ্পল, নয় ত ক্রেপসোলের ক্যাচক্যাচে সু। ঘাড়ে আর গলায় একরাশ পাউডারের ছোপ। আর চুলের বাহারটাই কি কম! 'স্যাম্পু' না কি যেন বলে—সেই করে ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলগুলোকে সজারুর কাটার মত চোখা চোখা করে তুলেছে—তার ওপর আবার সিঁথির কায়দা। হাতে চওড়া ব্যাণ্ডের ঘড়ি, চোখে নীল গগ্‌লস আর পান চিবুনো লাল টুকটুকে ঠোঁট নিয়ে ও যখন ভ্রু কুঁচকে একটুখানি 'স্মাগ' করে ঝড়ের মত পাশ কেটে বেরিয়ে গেছে, তখন একটা ভুরভুরে গন্ধ অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার নাকের ডগায় লেপটে রয়েছে। স্নো-পাউডার-সেন্ট ঢেলে যেন স্নান করে যাচ্ছে ছোঁড়াটা। ঘেন্নায় সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে আমার। যত সাজগোছ সব বাইরে বাইরে। ইচ্ছে হয়েছে, একবার কাছে গিয়ে ওর চকচকে পাঞ্জাবীটা তুলে ধরি। ভেতরের তেল-চিটচিটে গেঞ্জিটা লোকে বেশ করে দেখে নিক। কিন্তু না—সে সাহস বা ধৈর্য কখনও হয় নি, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তক্ষুণি চলে এসেছি।

এই রতুই যাচ্ছে বিয়ে করতে! অবাক কাণ্ডই বটে! এইটুকু ত ছোকরা! ঠোঁটের ওপর গোঁফের সবুজ রেখা এখনও কালো হয়ে ওঠে নি, মেয়েদের দেখে ঘাড় বেঁকিয়ে তেরছা ভাবে চেয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং তৈরী করে, আর সব চেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল—যার কিনা কাজকর্ম, চালচুলোর কোনই ঠিক-ঠিকানা নেই—সেই পয়লা নম্বরের ফোক্কড় ছেলেটার আজকে বিয়ে করার সখ হয়েছে! কে দেবে ওকে মেয়ে? সঙ্গে সঙ্গে হাসিও পেল। কি এমন বিয়েটাই না করতে যাচ্ছে, যার জন্যে চিঠি না ছাপালে আর চলছিল না। চিঠি মানে রঙীন চিঠি—সোনালী হরফে লেখা। আবার তাও কিনা হাতে এসে দেওয়া নয়, আধ মাইল দূরের পোস্ট-আপিস থেকে স্ট্যাম্প লাগিয়ে—তবে।

যাক গে, চিঠি দিয়েছে ত দিয়েছে। তাই বলে যে সশরীরে আমায় গিয়ে উঠতেই হবে এমন ত কোন কথা নেই। এই যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে মত স্থির করে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও যুক্তি আর টিকল না, মত পালটাতে হ'ল। এতটা আমি ভাবতেই পারি নি। অবশ্য এই বিয়ের আগাগোড়াই আমার কাছে অভাবনীয় একটা হাস্যকর উদ্ভট কাণ্ড বলে ঠেকছিল।

ঠিক বিয়ের আগের দিন সকালে রতুর কোথাকার এক কাকা আমার বাড়ীতে এসে হাজির। আমি এর আগে

কোনদিন ওঁকে দেখি নি—চিনি না। পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক আর্জি পেশ করলেন—এই বিয়ের সব ব্যবস্থাই নাকি তাঁর বাড়ীতে হচ্ছে। রতু বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানিয়েছে, আমি যেন অবশ্য অবশ্য যাই। ও নিজেই আমাকে বলতে আসত। কিন্তু এত বড় কাজের নানাদিক দেখাশুনো করার চাপে পড়ে আর সময় করে উঠতে পারে নি।

দেখলাম ভদ্রলোকটিও নাছোড়বান্দা। শেষ অবধি কথা আদায় করে ছাড়লেন, বরযাত্রী যাওয়া যদি কোন কারণে সম্ভবপর না হয়, বৌভাতের নেমন্তন্ন নিশ্চয়ই রাখব।

হরিতকীবাগান লেনের বাড়ীটা খুঁজে পেতে সেদিন তেমন কোন কষ্ট হয় নি। বেশ চকচকে ঝকঝকে বাড়ীটা, হয়ত দিনকয়েক আগেই 'হোয়াইটওয়াশ' করা হয়েছে। বাইরে ভেতরে আলোয় আলোময়। লোকজনের আনাগোনা, ডোবা ঘিয়ে লুচি ভাজার গন্ধ, আর চারদিকে উছলে-পড়া একটা খুশীর মিঠে আমেজ সবই ঠিক ধরতে পারছি। কিন্তু তবু ঢুকতে ইতস্ততঃ করছিলাম। নম্বরটা ঠিক আছে ত?

হঠাৎ পেছন থেকে রতুর গলা শুনতে পেলাম, 'এই যে কাকাবাবু, এসেছেন তা হলে? চলুন চলুন, ইস্ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ একটা...'

আমায় দেখে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠল রতু।

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,'তাতে আর কি হয়েছে? এই ত সবে এসেছি।'

দোতলায় নিয়ে গেল রতু। বেশ সাজান-গোছানো ঘরখানা। লোকজনের এখানে ভিড় তেমন নেই, জন দুই ভদ্রলোক বসেছিলেন। রতু খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। আমি লক্ষ্য করলাম, রতুর সেই চালবাজির চিহ্নও নেই। এই ক'টা দিনে ওর হাঁটা-চলা, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী মায় চুলের সিঁথিটাও দিক পরিবর্তন করেছে। সেই চুয়েন-এ নাজির লেনের টেরিকাটা, গায়ে ভুরভুরে গন্ধ মাখানো, শিস্ দিতে দিতে চালিয়াতি চালে পা ফেলে ফেলে হাঁটা রতনলাল, আজকে এই সাতচল্লিশ নম্বর হরিতকী-বাগান লেনে ঢুকে যেন স্রেফ পালটে গেছে। চোখে না দেখলে হয় ত বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু সব দেখে শুনেও মনটা যেন কেমন খুঁত খুঁত করতে লাগল। না, একদম বেমানান দেখাচ্ছে ওকে এখানে এই বেশে—একেবারে খাপছাড়া। হয় ত রতু নিজেও সেটা বুঝতে পারছে, তবু কোন রকমে দম বন্ধ করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ সবই ওর ছদ্মবেশ কি না! দিন দুই যাক না, আসল রূপটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। নাজির লেনের অন্ধকূপের রতন প্রামাণিক কি কখনও হরিতকীবাগান লেনে টিঁকতে পারে?

বসে বসে নানা কথা ভাবছি, হঠাৎ রতু বলে উঠল, 'কাকাবাবু, আপনার বৌমাকে দেখেছেন?'

আমার বৌমা! কথাটা এতক্ষণ খেয়ালই করি নি, সেই ছিঁচকে ছোঁড়া রতুর আবার বৌ! আমার বৌমা! মাত্র এই দিনদশেকের ভেতর ছেলেটার কথার ঢংও এমন ঘুরে গেল কি করে? আশ্চর্য!

রতুর কথায় ঘাড় নাড়লাম, 'না এখনও দেখি নি।'

'দেখেন নি? চলুন তবে—আগে আপনাকে দেখিয়ে আনি...'

নাঃ, দেখছি ছেলেটা এই ক'দিনে একটু বেশী মাত্রায় মুখরও হয়ে উঠেছে।

অগত্যা আমাকে উঠতেই হ'ল। সত্যি বলতে কি, বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে এসে নতুন বৌ দর্শন করার আগ্রহ যেমন লোকের থাকে—এ ক্ষেত্রে আমি কিন্তু তেমন কিছুই অনুভব করি নি। এখন সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতে নামতে মনে মনে একটুখানি আন্দাজ করবার চেষ্টা করলাম, আচ্ছা, বৌটি দেখতে কেমন হতে পারে? সুন্দর? ফরসা? নিটোল স্বাস্থ্যবতী?—ধ্যেৎ তাও কখনও হয়? রতুর বৌ! ভাবতেই হাসি পায়। একটা অসম্ভাব্যতার ছোঁয়াচ লাগে মনে।

কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম আমি। একতলায় সিঁড়ির বাঁ-দিকের বেশ বড়-সড় ঘরটায় ঢুকেই রতু দেখিয়ে দিলে। তাজ্জব ব্যাপার করে তুলেছে ছেলেটা। মেঝেয় কাশ্মীরী ফুলকাটা গালিচা পাতা। ঘরের চার কোণায় রজনীগন্ধার ডাল অদ্ভুত কায়দায় ঝোলানো। কিসের যেন একটা স্নিগ্ধ গন্ধ আর আমেজে ঘরটা ভরে উঠেছে। কিন্তু এ সব ছাড়িয়ে এক সময়ায় যার ওপর গিয়ে দৃষ্টি আটকে থাকে—সেই রতুর নবপরিণীতা ঠিক দরজার সোজাসুজি বসে রয়েছে—একটা রঙীন ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে। সত্যিই দৃষ্টিকে টেনে রাখবার মত। সুন্দরী মানে পরমাসুন্দরী। চোখ, মুখ, নাক, চিবুক থেকে সুরু করে পায়ের আঙুল অবধি একেবারে নিখুঁত। সারা দেহে একটা অপূর্ব কমনীয়তা ছড়িয়ে রয়েছে—দেখলেই মায়া হয়। বয়সও খুব কাঁচা, এই সতেরোর কাছাকাছি হবে।

মাথায় সিঁদুরের টিপ, মুখভরা চন্দনের ফোঁটা, পায়ে লাল টুকটুকে আলতা আর পরণে একটা হালকা নীল রঙের বেনারসী শাড়ী। আমি হাতের টয়লেট সেটটা তুলে দিতেই ও হাত পেতে নিয়ে পাশে রাখলে। দেখলাম, ঘরের এক দিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দর্শনীয় জিনিসপত্রগুলো। আর

পেয়েছেও বটে জিনিস! শাড়ি, ব্লাউজ, সিঁদুরের কৌটো, বাক্স-প্যাঁটরা, ফুলদানী, টয়লেট-সেট, নাকের-হাতের-গলার গয়নাগাটি আর অগুণতি বই স্তূপাকার করে পড়ে রয়েছে।

রতু বললে, 'রেখা, প্রণাম কর, কাকাবাবু...'

দু-ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়ল রেখার। আমার পা ছুঁয়ে ও প্রণাম করল। আমিও আশীর্বাদ করলাম, 'সতীসাধ্বী হও...'। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেদিন খানিকটা চিন্তিত হয়েই বাড়ী ফিরতে হ'ল। না, রতুর বা আর কারও আদর-আপ্যায়নে এতটুকু ত্রুটি হয় নি। সে সব বরং অনেক দিন মনে রাখবার মত, লোকজনের কাছে বলে বেড়ানোর মত। কিন্তু আমার ভাবনার বিষয় ছিল একেবারে অন্য।

রেখা! রতুর বৌয়ের নাম রেখা! বেশ মিষ্টি নামটা! শুধু নামই নয়, দেখতে-শুনতে, আদব-কায়দায়, চালচলনে ওই অতটুকু সময়ে যা দেখেছি, এককথায় অপূর্ব। আর যাই হোক, বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটার ভাগ্যটা কিন্তু এদিক দিয়ে খাসা, কেল্লা মেরে দিয়েছে। কিন্তু কথা হ'ল, অমন বৌ জোটালে কোত্থেকে? ওই ত লায়েক ছেলে! তার আবার বিয়ের সখ! শুনেই ঠোঁট উল্টেছিলাম। এখন দেখছি, বেটাচ্ছেলে একদম তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই কথাই চিন্তা করছিলাম। ঘুম আসছিল না অনেকক্ষণ। হঠাৎ মনে হ'ল, নির্ঘাৎ কোন চাল চেলেছে রতু। কম চালিয়াৎ ও! গাদা গাদা মিথ্যের প্যাঁচ কষেছে আর কি! তবে হ্যাঁ, সেদিন আর নেই। বিয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেল ত তার কি হ'ল? আইন আছে না! ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে আর ভণ্ডামী ফাঁসতে কতক্ষণ? তখন মাথায় ডাণ্ডা-পিটে ছাড়বে কন্যাপক্ষ। বিয়ে করার সখ বেরুবে রতন প্রামাণিকের।

কিন্তু কি জানি কেন খানিক পরে মন ঠিক সায় দিল না এতে। একটা মনের মত উত্তর পাবার জন্যে উসখুস করতে লাগলাম। খানিক পরে উত্তর একটা মিললও। হ্যাঁ, ঠিক—একেবারে লাগসই। এই হবে—এ ছাড়া আর কি হতে পারে? সামান্য কয়েক মিনিটের ত দেখা! চোখেরই ভুল হয়েছে। এতক্ষণ ধরে যা ভেবে আসছি—সব ভুল, ডাহা মিথ্যে। বিয়ের হাটে ও রকম কত ভুল হয়। মুখে রংচং মেখে ওই একটা দিনই শুধু লোককে অবাক করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আদপে যে সব ফাঁকি—এ ত সবাই জানে। আর যারা আজ জানে না, দুটো দিন যাক না—ঠিক ধরে নেবে। বাব্বাঃ! রতনলালের চালাকি! কাকার ঘাড় ভেঙে কিস্তি মাৎ করতে চায়।

বুঝবে একদিন—নির্ঘাৎ বুঝবে বাছাধন। বিয়ে করার সখ তখন হাড়ে হাড়ে কাঁটা হয়ে বিঁধবে। আজ না হয় কাকার অবস্থা ভাল। বাপ মা মরা ছেলে আর ছেলে-বৌকে আদর-যত্ন করে পুষছেন, কিন্তু সে আর ক'টা দিন? *ছোকরার চালবাজি আর সাজগোছের বহরটি যেদিন ধরা* পড়বে, সেদিন দেখা যাবে বৌয়ের হাত ধরে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এমনি নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় চোখে ঘুম নেমে এল।

তার পর কেটে গেছে অনেক দিন—বেশ কয়েক মাস। রতু কিন্তু আর নাজির লেনের ওই পুরনো বাড়ীতে ফিরে আসে নি। অন্য ভাড়াটে উঠেছে ওখানে। ইতিমধ্যে রতুর সঙ্গে আর দেখা হয় নি, কোন খবরও পাই নি। আমিও তার কোন প্রয়োজন মনে করি নি। সত্যি বলতে কি, আমি ওর কথা বেমালুম ভুলে যাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পেরেছি কি ভুলতে? বৈঠকখানার জানলা খুলতেই দৃষ্টি চলে গিয়েছে মাঝের গলিটা ডিঙিয়ে একটা ছোট্ট চুণ-সুরকি খসে পড়া অন্ধকার কুঠরীর ভেতর। তিন বছর ধরে ও এখানেই ছিল। কি অপরিষ্কার আর নোংরাই না করে রাখত ঘরটা! নতুন ভাড়াটের হাতে এসে এখন অনেক বদলেছে, শ্রী ফিরে এসেছে ঘরের। একবার ওদিকে চোখ পড়লেই তফাৎটা চট করে ধরা পড়ে। আর তক্ষুনি চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই একটি দিনের কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখা কচি মুখখানা। সেই সলজ্জ চাউনী—সেই ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে মিষ্টি হাসি। রতুর বৌ! রেখা!

কিন্তু ব্যস্, ওই পর্যন্তই। পুরণো স্মৃতিটাকে ঘাঁটিয়ে আর তলিয়ে যাবার চেষ্টা করি নি। হালকা হাসির তোড়ে উড়িয়ে দেবার ফিকির খুঁজেছি। মনের অস্থিরতাকে চাপা দিয়ে রেখেছি নানা ভাবে। নিশ্চয়ই ওদের দুজনের ভেতর কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝির পালা চলছে। তা নইলে এতদিনে একবার দেখা করতেও এল না। আর এ রকম যে হবে এ ত জানা কথাই। কন্যাপক্ষ বা বরপক্ষ যে কোন এক তরফ নির্ঘাৎ ধোঁকাবাজি করেছে। মোট কথা, ছেলেটা বিয়ে করে সুখী হতে পারল না একেবারেই, আর পারবে বলেও মনে হয় না। এখন হয় ত চাকরীর ধান্দায় ঘুরে মরছে। চাকরী কি আর রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে? পেটে যেন বিদ্যে গিজগিজ করছে শ্রীমানের। তার ওপর আবার সাজ-পোশাকের অমন বাহার। নাঃ! আচমকা যে কি মতিগতি হ'ল ওর! ওই ত কাঁচা বয়স! বিয়ে না করলে

আর চলছিল না? বউ না হয় পেয়েছে সুন্দরী। কিন্তু শুধু সুন্দর দিয়ে ওর এমন কি আসবে যাবে? এও ত হতে পারে, ঘরকন্নার ব্যাপারে একটু লবডঙ্কা। আর লেখাপড়া? সে কি আর স্বামীর চেয়ে কিছু বেশী হবে?

দিনগুলো আমার একরকম কেটে যাচ্ছিল। খাই-দাই আর সময়মত আপিস যাই। একঘেয়ে নিস্তরঙ্গ জীবন।

সেদিন শরীরটা সুবিধের ছিল না। দিনতিনেক ধরে সর্দি-জ্বরে ভুগছি, তবু আপিস কামাই করি নি। সেদিনও জ্বর-গায়ে আপিসে এলাম। খানিকপরেই যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। বড়সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ট্রাম-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ কোত্থেকে রতু এসে উপস্থিত। পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

'কেমন আছেন কাকাবাবু? বাড়ীর খবর সব ভাল ত? এখনও কি আপনি ওখানেই আছেন, না...'

আমাকে কথা বলবার যেন সুযোগ করে দেয় রতু। আমি তখন চোখের সামনে সরষেফুল দেখছি। কোন রকমে আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ, ওই বাড়ীতেই আছি। তারপর এত দিন কোথায় ছিলে তুমি?'

জ্বরে আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু রতুকে সেকথা জানতে দিই নি।

আমার প্রশ্নে ও একটু বিনম্র হাসি হাসল। তার পর বললে, 'কটা দিন বড়ই কষ্টে গেছে, চাকরী-বাকরী ছিল না। যাক, এখন ভগবানের কৃপায় একটা ভালই জুটেছে। হ্যাঁ—থাকার কথা বলছিলেন? বিয়ের পর মাসচারেক কাকার ওখানেই ছিলাম। এখন শহর থেকে বেশ দূরে...'

'কোথায়?'

'ঠাকুরপুকুর।' গড়গড় করে নতুন আস্তানার ঠিকানা বলে গেল রতু।—'যাবেন কিন্তু একদিন। দেখার ভারী ইচ্ছে।'

আমার তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত কথা শোনবার মত মনের অবস্থা নয়, ট্রাম এসে পড়েছে।

বললাম, 'হ্যাঁ, তাই যাব। আচ্ছা—আজ আসি। একদিন তুমিও এস না বৌমাকে সঙ্গে করে আমার ওখানে...'

বলতে বলতে ট্রামের হাতল ধরে ঝুলে পড়লাম। পেছনে শুনতে পেলাম রতু বলছে, 'যাব, নিশ্চয়ই যাব—দেরাদুন থেকে ফিরে এসেই যাব। এই সপ্তাহেই আমরা...'

আর শোনা গেল না, ট্রামের ঘড়ঘড়ানির ভেতর রতুর কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল।

আমি ভাবতে লাগলাম, 'দেরাদুন! দেরাদুন বেড়াতে যাচ্ছে রতু! তবে কি বিয়ে করে সত্যিসত্যিই ওর ভাগ্য ফিরে গেছে!

এর প্রায় দিন দশেক পরেই রতুর একটা চিঠি পেয়েছিলাম—দেরাদুন থেকে লেখা। বৌ নিয়ে বেড়াতে গেছে ওই সুদূর পশ্চিমে। অপূর্ব জায়গা! চমৎকার আবহাওয়া আর প্রাকৃতিক দৃশ্য। দু'পাতা ভরে লিখেছে ওখানকার কথা। সব শেষে আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে, ঠাকুরপুকুরে ওর বাড়ীতে একবার যাবার জন্যে। আর মাসখানেক পরেই ওরা ফিরবে। তখন একবার সময় করে যেন যাই।

ব্যস, ওই পড়াই সার। চিঠির উত্তর দেবার কথা আর ভাবি নি, ইচ্ছে করেই ভাবি নি। চাল দেখাবার আর জায়গা পেলে না ছোকরা! ওই কোন্ মুলুক থেকে ওর চিঠি না পেলে যেন আমার ঘুম হচ্ছিল না। বৌ নিয়ে হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে! টাকার গরম হয়েছে ছোকরার তাই বুক ফুলিয়ে দেখাতে চায়। আবার সেখান থেকে বলছে ঠাকুরপুকুর যেতে। আস্পর্ধার চূড়ান্ত একেবারে! আমায় যদি নিয়ে যাবার অতই গরজ থাকে ত বাড়ী এসে বললেই হয়। এর জন্যে হাজার মাইল দূরে বসে চিঠি লেখালেখি কিসের? আবার কত ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা। এ সব ন্যাকামি ছাড়া আর কি? আসলে স্বভাব যাবে কোথায়? লম্বা-চওড়া কথা কয়ে আর সাজ-পোশাকের ঠাট দেখিয়েই ত এতখানি বড় হ'ল।

যাক গে। ওর কথা ভেবে মরতে আমার বয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ভুলতে বসলাম ওকে। প্রায় বছরদুয়েকের ওপর দেখতে দেখতে কেটে গেল। রতুর টিকির খবরও এর মধ্যে পাই নি।

হঠাৎ একদিন আপিস থেকে আমাকে পাঠালে ঠাকুরপুকুর। এক ভদ্রলোকের সম্প্রতি কেনা একটা প্লটের এনকোয়ারী করতে। ওখানে আমার এই প্রথম গমন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্লটের নিশানা পাওয়া গেল। সকাল সকাল বেরিয়েছিলাম, এখন কাজ সারতে সারতে দুপুর গড়িয়ে এল। ঝাঁ ঝাঁ রদ্দুর, ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে আসছি। বাস-স্ট্যাণ্ডও প্রায় আধ মাইল দূরে। মাথার ছাতি যেন ফেটে যাচ্ছে, জল তেষ্টাও পেয়েছে খুব।

হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল। অনেকদিন পরে আচমকা রতুর কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, এতদূর যখন এসেছি একবার দেখা করে গেলে কেমন হয়। সুখের পায়রার এখন কেমন দিন গুজরান হচ্ছে কে জানে!

দেখলাম সামনে একজন ভদ্রলোক আসছেন। ছোট্ট পাড়াগাঁ, অত রাস্তা গলির ঠিকানা দিয়ে কি হবে। যদি এখানে থেকে থাকে ত শুধু নাম বললেই বাড়ী চিনিয়ে দিতে পারবে।

আমার ধারণা মিথ্যে গেল না। জিজ্ঞেস করতেই ভদ্রলোক দূরে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে দেখছেন বটগাছটা—ওর পেছনেই যে হলদে রঙের বাড়ীটা – ওই ডালপালার আড়াল থেকে তার একটা কোণ দেখা যাচ্ছে, ওর ডান দিকেই পাবেন একটা আটচালা। আর ওই আটচালার গায়ে লেখা রয়েছে আপনার শ্রীযুত রতন প্রামাণিকের বাড়ী।

বাব্বাঃ! নামের আগে আবার 'শ্রীযুত' বসাতে শিখলে কবে থেকে? শ্রীযুত রতন প্রামাণিক! দেখছি, ছোকরা এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে কি হবে, চালিয়াতী ছাড়তে পারে নি। লোকগুলোকেও খুব সাদাসিধে পেয়েছে। ওর বাইরেকার ওই চকচকে ধুতি পাঞ্জাবী আর নেকটাই-প্যান্টুলুনের বহর দেখেই ওরা একটা কেউকেটা বলে ঠাউরেছে। নাঃ, ওর হাঁড়ির খবরটা আদপে কারুর কানেই আসে নি।

ভদ্রলোকের কথামত চলে এলাম বটগাছের পেছনে—হলদে রঙের বাড়ীর ডান দিকের সরু রাস্তা ধরে আটচালার কাছাকাছি। তার পর আর কয়েক পা এগুতেই চোখ পড়ল থামের গায়ে বসান একটা নেমপ্লেটের ওপর—শ্রীরতনলাল প্রামাণিক।

কাঠের গেট পেরিয়ে উঠে এলাম উঁচু বারান্দার কাছে। ছোটখাট বাড়ীখানা, কিন্তু বেশ সুন্দর। ভদ্রলোকের রুচির প্রশংসা করতে হয়। বাড়ীটা তৈরী করেছেন বেশ বুদ্ধি খরচ করে। সরু একফালি রাস্তার দু'পাশে ফুলের বাগান। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীখানা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখছি, হঠাৎ একটা চাকরগোছের অল্পবয়স্ক ছেলে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'কাকে চান?'

বললাম, 'রতু—মানে রতনবাবু আছেন?'

হঠাৎ আমার অজান্তে ওর নামের পেছনে একটা বাবু বেরিয়ে এল।

'না, বাবু ত বাড়ী নেই। আপনি বরং বিকেলের দিকে...'

ছেলেটির কথা আর শুনতে পেলাম না। ঘরের ভেতর থেকে সুস্পষ্ট নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'কিরে শিবু, কার সঙ্গে কথা কইছিস?'

আমার কেমন যেন সন্দেহ হ'ল, হয় ত ভুল বাড়ীতে এসে পড়েছি। আমাদের রতুর বাড়ী এটা হতেই পারে না। ওর কি আজ এমনি সামর্থ্য হয়েছে যে, হট্ করে একটা চাকর রেখে বসবে? না, এ কখনোই হতে পারে না।

কিন্তু ভাবনাটা আর বেশীদূর গড়াতে পারল না। খোলা দরজা পথে এক জোড়া টানা টানা চোখ যেন সেঁটে রয়েছে। সেই এক দিনের মাত্র কয়েক মিনিটের দেখা, তবু চিনতে ভুল হ'ল না। সেই কপাল জোড়া ভুরু, নিকষ কালো চোখের মণি, টিকলো নাক আর সেই ফুটফুটে ফরসা রং। না, এতটুকু পালটায় নি, একেবারে ওই ছিপছিপে গড়ন। চোখের তারায় তারায় হাসি।

'চিনতে পারছ? আমি কাকাবাবু...'

'কাকাবাবু, আপনি?'

আশ্চর্য! একদিকের ছোট্ট এককণা স্মৃতিকে রেখাও মনে করে রেখেছে! ছুটে এসে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলে। চোখেমুখে ওর খুশীর বন্যা, 'সত্যিই কাকাবাবু, আজ আমাদের কত সৌভাগ্য!'

'না না, ওকি বলছ? সৌভাগ্যের কথাই যদি বললে ত সেটা আমারও কম নয়। কতদিন ভেবেছি তোমাদের কথা। কিন্তু 'আসি-আসি' করেও আর আসা হয়ে ওঠে নি। শুনেছ বোধ হয়, আমার যে কাজের চাপ...'

একটুখানি বিনয়ী হতে গিয়ে এত বড় জলজ্যান্ত মিথ্যেটা বলতে জিভে আমার বাধল না। রেখা কিন্তু সেটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিলে।

বললে, 'ওঃ! সে আর শুনব না! ওর মুখে ত দিন-রাত্তির আপনার কথা। কতদিন কত রকমে আপনি ওকে সাহায্য করেছেন। সত্যিই ও নিজের কাকার চেয়েও আপনাকে কিছু কম শ্রদ্ধা করে না।'

তাই নাকি! রতুর আবার এত ভক্তিশ্রদ্ধা উথলে উঠল কবে থেকে? তিন বছর ত দেখেছি ওকে। নেহাৎ মুখোমুখি পড়ে না গেলে কই, কোনদিন আমার সঙ্গে যেচে কথা বলেছে বলে ত মনে পড়ে না।

রেখার সঙ্গে বারান্দা পেরিয়ে সামনের ঘরটায় এসে দাঁড়ালাম।

মাঝারি ধরনের ঘর। দু'চারটে আসবাবপত্র, গোটা তিনেক ক্যালেণ্ডার ও বাঁধানো ছবি ছাড়া আজেবাজে কোন জিনিসের বালাই নেই। হ্যাঁ—আর একটা রেডিও। সাদা কাপড়ের ঝালর-কাটা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। সুন্দর পরিপাটি করে সবকিছু গোছানো।

জাজিম পাতা পালঙ্কের ওপর বসতেই রেখা পর পর দুটো সুইচ টিপে দিলে। বন্ বন করে সিলিং ফ্যান ঘুরতে

লাগল আর একপাশে টেবিলের ওপর রাখা রেডিওতে বেজে উঠল মিষ্টি গানের কলি। অল্পক্ষণের ভেতরই একটা মধুর আবেশে সমস্ত প্রাণমন জুড়িয়ে এল।

রেখা আমার সামনে একটা বেতের চেয়ার টেনে বসল।

আমি বললাম, 'বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে বসেছ দেখছি! বাড়ীটা কি...'

চট করে আমার প্রশ্ন ধরে ফেলল রেখা। বললে,'বাড়ীটা নতুনই, প্রায় বছরখানেক হ'ল তৈরি করিয়েছি। এর আগে এখানেই একটা ভাড়াটে বাসায় অনেকদিন কাটিয়েছি। জায়গাটা আমাদের দু'জনেরই খুব পছন্দ হয়ে যাওয়ায় একটা প্লট কিনে পাকাপাকি আস্তানা পেতে বসলাম। এই দেখুন না, ঠিক এই জন্যেই আপনার কাছে আর যাওয়া হয়ে উঠল না ওর। অফিস থেকে লোন নেওয়া, মিস্ত্রী ডাকা, জিনিস-পত্রের অর্ডার দেওয়া—আবার চব্বিশ ঘণ্টা দেখাশুনো করা —বাব্বাঃ! বাড়ী করার কম ঝক্কি নাকি?'

আমার মুখে সহসা কোন কথা জোগাল না। একদম থ' বনে গেলাম।

রেখা বলতে লাগল, 'যাক আজ যখন একবার পায়ের ধুলো পড়েছে তখন আর টপ করে ছাড়ছি নে। অন্ততঃ আজকের দিনটা ত থেকে যেতেই হবে।'

আমি জোর করে হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'না না, আজকে আর থাকতে বলো না। বাড়ী যখন করেছ, তখন যে কোন একদিন এসে থাকলেই হ'ল। আজ এসে এমনি দেখে গেলাম—চিনে গেলাম বাড়ীটা। কি বল?'

'আচ্ছা, তা যেন হ'ল, কিন্তু কবে আসবেন বলুন? শীগগিরই আসা চাই কিন্তু।'

ঠিক ছেলেমানুষের মত আবদার ধরলে রেখা, 'একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে, খোকার অন্নপ্রাশনের খবর আপনাকে দেওয়াই হয় নি।'

'খোকা!' আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

'বাঃ! আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। ও আপনাকে জানায় নি?'

চটুল হাসি ছড়িয়ে পড়ল রেখার দু'ঠোঁটের ফাঁকে। থুতনীর ঠিক মাঝখানে একটা খাঁজ পড়ল, আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। একবার ইচ্ছে হ'ল বতুর ছেলেকে দেখবার। কিন্তু একরকম নিষ্ঠুরভাবে সে ইচ্ছাটাকে চাপা দিয়ে রাখলাম। কেমন হবে বতুর ছেলে? মায়ের মত নিশ্চয়ই হবে না, বাবার মতই হবে। বতুর মতই নাক ভোঁতা, কপাল উঁচু, কুদে কুদে চোখ।

কিন্তু আমার অনুমান স্রেফ মিথ্যে গেল। খানিক পরেই পাশের ঘর থেকে 'মা-মা' বলে ডাকতে ডাকতে একটি বছর-খানেকের ছেলে ছুটে এল। এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে, চোখে এখনও ঘুমের রেশ জড়ানো। কিন্তু ওই অবস্থাতেই ওকে দেখলাম, চোখ দুটো বড় বড় আর বেশ টানা টানা, কপাল চওড়া, সরু টিকলো নাক, কোঁকড়ান চুল আর সব-চাইতে সুন্দর ওর ঝকঝকে মুক্তোর মত দাঁতগুলো। অবিকল মায়ের মত হয়েছে। 'রংটাও টুকটুকে ফরসা। না, বতুর আদল একটুও পায়নি, তবে যে একেবারে কিছুই পায় নি তা নয়। স্বাস্থ্যটা পেয়েছে বাবার ধরনের, বেশ গোলগাল নাদুস-নুদুস।'

'এই যে খোকা—ঘুম হয়ে গেল? কি, অমন করছ কেন? এই দেখ না, কে এসেছেন—দাদু—তোমার দাদু-মণি...'

ব্যস্, আর কি! যেমন সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে, আর রক্ষে আছে কোন! এবার আন খেলনা, জামা, বিস্কুট, লজেন্স। তুলে দাও খোকার হাতে এক এক করে। সে সব যখন হাতের কাছে নেই কোলে নিয়ে অন্ততঃ একটু আদর কর। আপশোস কর, ইস্ আগে জানা থাকলে কিছু খেলনা আর খাবার...

অগত্যা আমাকেও তাই করতে হ'ল। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, 'খোকনমণি—যাদুধন—দাদুসোনা আমার...'

এমন সময় শিবু চাকর থালায় সাজিয়ে নোনতা-মিষ্টি নানারকম খাবার এনে হাজির। আমি কিছু বলবার আগেই রেখা বলে উঠল, 'কিছুই না, সামান্য দুটো বাজারের জিনিস। সত্যিই বড্ড লজ্জা করছে, নিজের হাতে করে কিছু খাওয়াতে পারলাম না।'

'কিন্তু আমাকে ও কথা বলা অবান্তর। জানই ত দু' বেলার খাবার আমি বাইরে রেস্তোরাঁয় শেষ করি। কাজেই ও জিনিসটিতে আমার কোনই অরুচি নেই।'

খাওয়ায় মন দিলাম আমি। রেখা ঘরকন্নার টুকিটাকি কথা বলতে লাগল। পাকা গৃহিনী হয়ে উঠেছে যেন।

কথায় কথায় এক সময় বললে, 'ওর ভারি ইচ্ছে ম্যাট্রিকটা পাস করি। বইপত্তর সব কিনে দিয়েছে। একজন টিউটরও রেখে দেবে বলেছে। আমিও ভাবছি, দেখিই না একবার চেষ্টা করে...'

'বেশ বেশ, খুব ভাল কথা।'

মুখে উৎসাহ দিলেও মনে কিন্তু আমার একটা কাঁটা বিঁধল। এদিক নেই ত ওদিক আছে বতুর। নিজে ত একটা বিদ্যের জাহাজ! এখন বৌকে পাস করানোর সখ হয়েছে।

খাবারগুলো উজাড় করে মুখ ধুয়ে এসে বসলাম। রেখা

বললে, 'চলুন, আপনাকে ওদিককার ঘরগুলো দেখিয়ে আনি গে।'

দেখলাম, ছোট বড় নিয়ে সবশুদ্ধ ছ'খানা ঘর। রান্না-ঘরটা আলাদা—বেশ একটু তফাতে। দেওয়াল দিয়ে ঘেরা সিমেণ্ট করা পাকা উঠোন। একপাশে টিউবওয়েল, তার ঠিক মুখোমুখিই তুলসীমঞ্চ। কোথাও বাড়তি বা অদরকারী কিছুই নেই। সব জায়গাতেই একটা সুরুচির চিহ্ন।

মাত্র দুটো বছর। এই দু'বছরের মধ্যে অনেক কিছু করে ফেলেছে রতু। কিন্তু কেমন করে সেটা সম্ভব হ'ল? জিজ্ঞেস করতে পারলাম না আমি। কি জানি, যদি আবার কোন অপ্রিয় শুনে বসি। হাঁসফাঁস করতে লাগল মনটা।

অনেকক্ষণ পরে আগেকার একটা কথার পুনরাবৃত্তি করলাম, 'হুঁ—বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে সংসার পেতেছ তা হলে।'

রেখা চোখ দুটো বড় বড় করে বললে, 'সংসার পেতেছি না আরো কিছু! সবই ত দেখাশুনো করে ওই শিবু। আমার কাজের মধ্যে শুধু দু'বেলা দুটো রান্না। তাও মাসের অধেক দিন ওঁর আপিসের কোন আর্দালী এসে…'

'আর্দালী! আর্দালীর রান্না ভাল লাগে?'

'হ্যাঁ, খু-উ-ব। চমৎকার হাত ওই বুড়ো লোকটার। না, সেদিক দিয়ে কোন গণ্ডগোলই নেই। ওদের ওপর কাজকর্মের ভার চাপিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত আছি। তবে কিনা…'

'কি, কি তবে?' এতক্ষণ পরে যেন একটু স্বস্তির ছোঁয়াচ পাই। মনটা চনমন করে ওঠে, ব্যগ্র হয়ে উঠি রেখার কথা শোনবার জন্যে।

রেখা বললে, 'না, এমন কিছু নয়। বলছিলাম, এই চুপচাপ একা একা থাকি—হাতে কাজকর্মও থাকে না, লোকজনও আশেপাশে তেমন নেই যে দুটো গল্প করি। উনি ত যান সেই সকাল দশটায় আর বাড়ী ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে আসে। তার ওপর আবার কোন কোনদিন…'

একটু থামে রেখা, একটা লম্বা হাই তোলে। কিন্তু আমার যেন এতটুকুও তর সইছে না। কি বলতে চায় রেখা? তা হলে কি ওর এই দাম্পত্য জীবনেও কোথাও কোন ফাঁক রয়েছে? তা হলে কি রেখাও রতুকে পেয়ে সত্যিকারের সুখী নয়? তাই কি? অদ্ভুত একটা আনন্দের শিহরণ আমার সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর ভেতর দিয়ে দ্রুত তালে বয়ে গেল।

মনের অস্থিরতা আর চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, একটা কথা বলব রেখা? কিছু মনে করো না যেন।'

জিজ্ঞেস করলাম বটে, কিন্তু রেখার অনুমতির জন্যে খানিক অপেক্ষা করার ধৈর্যও তখন আমার নেই। রেখার জীবনের একটা বড় অপূর্ণতার খোঁজ আমি পেয়েছি।

'আমার কি মনে হচ্ছে জানো, রতু নিশ্চয় তোমায় সুখী রাখতে পারছে না।'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন আপনি…'

'ঠিক! ঠিক তাই! আর সে চেষ্টাও ওর নেই…'

আচমকা যেন বাজ পড়ল ঘরে। চীৎকার করে উঠল রেখা, 'না-না-না—এ কি বলছেন আপনি কাকাবাবু? ছি-ছি-ছি, একথা আপনি বলতে পারলেন? আপনি জানেন না ও আমায়…'

কান্নায় ভেঙে পড়ল রেখা। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলতে লাগল, 'ওঃ আপনি যদি একবার দেখতেন আমাকে সুখে রাখবার জন্যে ওঁর সে কি আপ্রাণ চেষ্টা! উনি বলেন—আমি নাকি লক্ষ্মীপ্রতিমা। আমি আসার পর থেকেই ওঁর জীবনে নাকি এসেছে সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য সবকিছু। স্ত্রীর পক্ষে এর চেয়ে বড় আর কি সৌভাগ্য হতে পারে—আমি ত জানি না কাকাবাবু।'

একটু থামল রেখা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে, 'আপনি হয় ত বিশ্বাস করবেন না, এই ঠাকুর-চাকর দুটো শুধু আমার দিকে চেয়েই রেখেছে ও। সামান্য টিউবওয়েলে দুটো 'পাম্প' দিই—তাও দেখতে পারে না। আমার এতটুকু কষ্ট দেখলে ওর যেন প্রাণ ফেটে যায়। জানি—আপনি বলবেন, এ সমস্তই ওর বাড়াবাড়ি। কিন্তু আমাকে সুখী রাখতে ওর যে চেষ্টার অন্ত নেই, একথা কি এর থেকে প্রমাণ হয় না?'

সোজা ধারালো প্রশ্ন রেখার। আমি হতবাক! কি উত্তর দোব এর? মুখে কোন কথা জোগাল না।

ভুল—আগাগোড়াই ভুল করে এসেছি ওদের এই দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি স্তরের ওপর। খুঁত ধরবার চেষ্টা করেছি প্রত্যেক পদে পদে। মুখে যাই বলি না কেন, মনে মনে রতু ও রেখার অতৃপ্ত কামনার একটুখানি হদিশ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।

আশ্চর্য! ওদের দাম্পত্য-জীবন ত সুখে টইটুম্বুর। অসুখী আত্মা আমার। হঠাৎ চোখের সমুখ থেকে যেন একটা পর্দা সরে গেল। ভেসে উঠল ছিন্নবসনা অশ্রুসজল এক নারীমূর্তি। সুমনা—আমার স্ত্রী।

পরিষ্কার দেখতে পেলাম—এগিয়ে আসছে সুমনা খুব ধীরে ধীরে। দেখলাম ওর কণ্ঠার হাড় মাংসের আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। চোখের কোটর দুটো হিংস্র শ্বাপদের গুহার মতই অন্ধকার ও রহস্যময়।

ভয়ে চোখ বুজলাম আমি। তবু ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। যেন আর কোনই নিস্তার নেই আমার। এক্ষুনি এসে ঝাঁঝিয়ে উঠবে। কঠিন খিটখিটে সুরে জেরা সুরু করবে। কৈফিয়ৎ চাইবে—গত চার বছর ধরে কেন ওকে আমি শহর থেকে তের মাইল দূরে একটা নোংরা, দুর্গন্ধ বস্তির মধ্যে ফেলে রেখেছি? কেন ওকে এত দিন জানতে দিই নি যে, নাজির লেনের এক সুদৃশ্য ঘরে আমি দিনের পর দিন দিব্যি আরামে কাটিয়ে চলেছি? কেন মাসে মাসে মাত্র পঁচিশটা টাকা ওর নামে পাঠিয়েই আমি ক্ষান্ত থেকেছি? কেন? কেন? শত শত, হাজার হাজার 'কেন'র জবাব আমায় দিতে হবে। নিরুপায় আমি। ধরা পড়ে গিয়েছি আজকে, এই মুহূর্তে, সুমনার ওই কঙ্কালসার হাতের আবেষ্টনীতে।

মাপ ওজনে দশমিক বা মেট্রিক প্রথা

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

... দুই, তিন, এমনি করে নয়টি অঙ্ক। এগুলিকে দশ, একশ' হাজার, অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি প্রভৃতি সংখ্যা দিয়ে গুণ আর যোগ করে যে কোনও সংখ্যা লেখা যায়। যেমন ধরুন, নয় হাজার আট শত বারোকে লিখতে হলে ৯ × ১০০০ + ৮ × ১০০ + ১ × ১০ + ২ = ৯৮১২ হয়। একে আবার যে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ, ভাগ, যোগ, বিয়োগ অনায়াসেই করা যায়। কিন্তু রোমান পদ্ধতিতে (অর্থাৎ I, II, III···) এই সংখ্যা কিংবা এর চাইতে বড় কোন সংখ্যা লেখা এবং গুণ ভাগ করার প্রয়োজন হলে এক মহা হাঙ্গামার ব্যাপার। মাত্র কয়েকশ' বৎসর আগেও ইউরোপে এই সামান্যতম কৌশল আয়ত্ত করতে রীতিমত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হতে হ'ত। এই যে দশের গুণে সংখ্যা নির্ণয় করার প্রণালী আমাদের দেশেই আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে। এই আবিষ্কার বর্তমান যুগের পরমাণু-শক্তি আবিষ্কারের চাইতে কম নয়। অঙ্কশাস্ত্র-জগতে এর প্রভাবের ফলে গণিতকে সহজ-সাধ্য করে দিয়েছে। রোমান পদ্ধতির কথা ভাবলেই এই সত্য উপলব্ধি করতে সহজ হবে।

দশের গুণে সংখ্যা নির্ণয় ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হলেও দশের ভাগে অর্থাৎ দশমিক প্রথার সূচনা হয় ফরাসী দেশে। এই দুটি সহজ প্রথার প্রচলন পুরাতন হলেও ব্যবহারিক জীবনে আমরা এর বিশেষ ফয়দা উঠাতে পারি নি। যদিও নয়া পয়সা বা দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন করে এর প্রাথমিক পর্যায় শুরু করা হয়েছে, কিন্তু মাপ আর ওজনের বেলায় দশমিক প্রথার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যেমন ধরুন—চার কাচ্চায় এক ছটাক, ষোল ছটাকে এক সের, আর চল্লিশ সেরে এক মণ। আবার দেখুন—বার ইঞ্চিতে এক ফুট, তিন ফুটে এক গজ এবং সতেরশ' ষাট গজে এক মাইল। জমির মাপ অর্থাৎ বিঘে-কাঠার ব্যাপারও তাই। তার'পর সের-মণই বলুন আর গজ-মাইলই বলুন, যে কোন পর্যায়কে অপর পর্যায়ে রূপান্তরিত করতে হলে যে সংখ্যাটি দ্বারা গুণ বা ভাগ করতে হবে তা আপনাকে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। শুধু এইখানে সমস্যার শেষ হলেও বুঝিবা অতটা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন ছিল না। মাপ-ওজনের ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মাপ বর্তমান। অর্থাৎ বাংলা দেশে বসে এক সের দুধ কিনে কিংবা এক থান কাপড় কিনে যে পরিমাণ দুধ বা কাপড় পাবেন, দক্ষিণ ভারতে গিয়ে কিন্তু আর আপনি অতটা দুধ আর কাপড় নাও পেতে পারেন। মোটামুটি খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে যে, প্রায় শ' দেড়েক রকমের মাপ-ওজন ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত আছে। এমনি গোলমেলে অবস্থার প্রধান কারণ হয়ত ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে অতীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার শিথিলতা। কিন্তু বর্তমানে দ্রুত অর্থনৈতিক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবর্তনের ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশের মানুষের সঙ্গে লেন-দেন তথা ব্যবসা-বাণিজ্য নিত্য বেড়ে চলতে থাকবে। কিন্তু বর্তমানে মাপ-ওজনের যে বিভ্রান্তিকর বৈষম্য ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত আছে, তার প্রচলন বন্ধ না করলে হয়ত ভারতীয় ঐক্য কেবল সংবিধানের পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

মুদ্রার ব্যাপারে সারা ভারতের যেমন একই মান, তেমনি মাপ-ওজনের বেলাতেও এক মান হওয়া উচিত। যেহেতু সারা ভারতবর্ষে আজ নির্দিষ্ট একটি মান নেই, সুতরাং কোনও একটি বিশেষ পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট মানের মর্য্যাদা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ কোনও একটি প্রণালীকে আইনসিদ্ধ করে তা জনসাধারণের কাছে ব্যবহারিক জীবনে সহজবোধ্য করে তুলতে হবে। কেবল মাত্র সহজ বা সরল হলেই চলবে না, তা বিজ্ঞানসম্মতও হওয়া চাই। কেন না, মানুষের দৈনন্দিন উন্নতির সঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের প্রসার ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মাপ-ওজনের সঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহৃত প্রথার মিল থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এই সব দিক থেকে বিচার করতে গেলে ভারতে বর্তমানে

প্রচলিত কোন একটি পদ্ধতিও বিজ্ঞানসম্মত নয়। বর্তমান জগতের প্রায় সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন যে, দশমিক প্রথায় মাপ-ওজনই হচ্ছে সব চাইতে সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত। এরই অন্য নাম হচ্ছে মেট্রিক প্রণালী। এই মেট্রিক প্রথা পৃথিবীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ দেশে প্রচলিত। একমাত্র আমেরিকা, ইংলণ্ড ও কমনওয়েলথ দেশগুলি ছাড়া আর প্রায় সব দেশেই মেট্রিক প্রথা চালু আছে।

প্রাচীন মতে মাপ

১। হাত ২। ফুট ৩। ফ্যেম

ফটো: উনেস্কোর সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং Metric Measures হইতে পুনর্মুদ্রিত।

এ সমস্ত যুক্তি দ্বারা চালিত হয়ে ভারত সরকার ১৯৫৬ সনে মাপ-ওজনের মান নিয়ামক যে আইন করেন তার বলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এ বৎসর ১লা অক্টোবর থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দশমিক বা মেট্রিক প্রথায় মাপ-ওজন চালু হবে।

মেট্রিক প্রথা যতই পুরানো কিংবা ব্যাপক হউক না কেন, এ জিনিসটি কি এবং এর সঙ্গে বর্তমান চালু প্রথার কি ভেদাভেদ বা ভালমন্দ আছে, তা বিচার না করে দেশবাসীর উপর চাপানো ঠিক হবে না। সব দিক বিবেচনা করে তবে নয়া পয়সার প্রবর্তন হয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণ কি নিদারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল এবং তার ফলে যে তিক্ততা লোকের মনে স্থান পেয়েছে তা থেকে মাপ-ওজন নূতন প্রথায় চালু করার ব্যাপারে আরও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এর প্রথম সোপান হচ্ছে মেট্রিক প্রথা সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা জনসাধারণের মনে ধরিয়ে দেওয়া উচিত।

মেট্রিক প্রথায় দৈর্ঘ্য মাপের মধ্যমণি হ'ল 'মিটার' (metre). এ শব্দটি এসেছে লেটিন কথা মেট্রাম (metrum মাপ) থেকে। তাই অনেক মাপজোখের যন্ত্রের নামের শেষে 'মিটার' (metre) কথাটি যোগ করা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—থারমো-মিটার (Thermo=তাপ+metre=মাপা)। অর্থাৎ তাপ মাপবার যন্ত্র। এমনি আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

মিটারের লম্বাই স্থির করা এবং মেট্রিক প্রথা চালু করার কৃতিত্ব ফরাসীদের। যদিও মাপজোখের ব্যাপারে পৃথিবীর সব মনীষীরাই মাথা ঘামিয়েছেন কিন্তু আঠার শতকের শেষের দিক

প্রাচীন গ্রীক পাত্রে চিত্রিত ওজন পদ্ধতি।

ফটো: Metric Measures হইতে মুদ্রিত।

ভিন্ন কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় নি। ঐ সময় ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদ স্থির করেন যে, বিষুবরেখা থেকে মেরু পর্যন্ত চাপের (arc) দৈর্ঘ্যকে এক কোটি দিয়ে ভাগ করলে যা হয় তাই হবে এক মিটারের লম্বাই।

মুশকিল দাঁড়াল এই যে, এ দৈর্ঘ্য কোথাও কেউ মেপে রাখেনি বা মাপাও এক রকম অসম্ভব। তাই বিজ্ঞান পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফরাসী সরকার দিলাম্বার (Delambre) এবং ম্যাচে (Mechain) নামে দু'সাহেবের ওপর নির্দেশ দিলেন যে, তাঁরা যেন ফরাসী দেশের ডানকার্ক থেকে স্পেনের বার্সিলোনা পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যরেখা (meridian) মাপেন। কাজ সুরু হ'ল ১৭৯২ খ্রীঃ আর শেষ হ'ল ১৭৯৮ খ্রীঃ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে

এদের যে কত বিপদ ও অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে তার অন্ত নেই। কিন্তু এক্ষ এদের মানসিক দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায়। কোন অবস্থাতেই এরা পিছু হটে আসেনি। এই মাপের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর পরিধি স্থির হ'ল এবং পাওয়া গেল মিটারের মাপ (প্রায় ১'১ গজ)।

১৭৯৯ খ্রীঃ মধ্যে একটি প্রমাণ (standard) মিটার তৈরী হ'ল। পরে অবশ্য আরও অনুসন্ধানের পর বিজ্ঞানজগৎ জানলেন যে, এ মিটারের মাপ সামান্য পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। ১৮৮৯ খ্রীঃ আবার একটি নতুন মিটার তৈরী হ'ল। শতকরা নব্বই ভাগ প্লাটিনাম এবং দশ ভাগ ইরিডিয়াম মিশ্রিত সঙ্কর ধাতুর একটি দণ্ডে (bar) দুটি সরু লাইন টেনে মিটারের মাপ স্থির করে প্যারীর নিকট ওদের জাতীয় প্রমাণাগারে রেখে দিল শূন্য ডিগ্রী তাপ মাত্রার মধ্যে। যে সব দেশ মেট্রিক প্রথা অবলম্বন করল তারা এর একটি নকল নিয়ে গেল।

প্রশ্ন উঠল, এ প্রমাণটি নানা ভাবে নষ্ট হতে পারে। তা ছাড়া যতই সাবধানতা অবলম্বন করা হোক না কেন, স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে প্রমাণ-মাপের হেরফের হতে পারে—তা যত নগণ্যই হোক না কেন। তাই অনেক অনুসন্ধানের পর এমন একটি প্রমাণ স্থির হ'ল যার কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন হবে না। আলোকরশ্মি সাতরঙে বিভক্ত। প্রত্যেকটি রং তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলে। আর তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও আলাদা। তাই ত বিভিন্ন রং দেখতে পাই আমরা রামধনুতে। সে যা হোক। এক মিটার দৈর্ঘ্যের ক্যাডমিয়াম ধাতু নির্গত লাল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মেপে চিরতরে প্রমাণ স্থির করে রাখা হ'ল। মিটার ত পাওয়া গেল। এর চেয়ে ছোট এবং বড় মাপও একান্ত প্রয়োজন। তাই মিটারের সঙ্গে 'মিলি', 'সেণ্টি', 'ডেসি' যোগ করে নীচের মাপ ও 'ডেকা', 'হেক্‌টো', 'কিলো' যোগ করে উপরের মাপ স্থির হল। সর্ব নিম্ন 'মিলি' থেকে সর্বোচ্চ 'কিলো' পর্যন্ত মাপগুলি দশের গুণক। অর্থাৎ মিলিমিটারকে দশ দিয়ে গুণ করলেই সেন্টিমিটার হয়, সেন্টিমিটারকে দশ দিয়ে গুণ করলে ডেসিমিটার···ইত্যাদি।

শুধু দৈর্ঘ্য মাপের মান নির্ণয় করে ফরাসীরা ক্ষান্ত হয় নি। মাপের সঙ্গে ওজনেরও একটা সম্বন্ধ স্থাপন করল। এক সেন্টিমিটার ঘন (cubic) পরিমাণ পরিশ্রুত জল ৪° সেঃ তাপে যে ওজন হয় তাকে এক 'গ্রাম' (Gram) ধরা হ'ল। এর সঙ্গে আবার সেই 'মিলি,' 'সেণ্টি', 'ডেসি', 'ডেকা', 'হেক্‌টো', 'কিলো' যোগ করে ছোট বড় ওজন স্থির হল।

ওজন মাপের পর ধারকত্ব (capacity) মান স্থির হ'ল 'লিটার' (litre)—এক ডেসি মিটার ঘন (cube)। আবার সেই মিলি, সেণ্টি ডেসি, ডেকা, হেক্‌টো, কিলো যোগ করে ছোট-বড়র সংখ্যা নির্ণয় করা হচ্ছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে—মাপ, ওজন এবং ধারকের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ আছে। তা ছাড়া মিলি, সেণ্টি, ডেসি, ডেকা, হেক্‌টো এবং কিলো শব্দ বা শব্দাংশের অর্থ যদি জানা থাকে তবে মেট্রিক প্রথার কাজকর্ম করা খুবই সহজসাধ্য হবে। যেমন:

মিলি (milli)	= এক হাজার ভাগের ১ ভাগ	ল্যাটিন শব্দ
সেণ্টি (centi)	= এক শতের এক ভাগ	
ডেসি (deci)	= দশ ভাগের এক ভাগ	
ডেকা (deca)	= দশ গুণ (×১০)	গ্রীক শব্দ
হেক্‌টো (hecto)	= এক শত গুণ (×১০০)	
কিলো (kilo)	= এক হাজার গুণ (×১০০০)	

কাজেই মিটার গ্রাম ও লিটারের সঙ্গে এদের যে কোন একটির যখন যোগ হয় তখন খাতা-পেন্সিলের সহায়তা ছাড়াই বলতে পারি মিটার, গ্রাম বা লিটারের কত ভাগ বা গুণ। দশকের গুণ বা ভাগের ওপর নির্ভর করছে বলেই এই মেট্রিক প্রথার অপর নাম হচ্ছে দশমিক প্রথা।

দশ, একশ বা হাজার দিয়ে কোন সংখ্যাকে গুণ বা ভাগ করা খুবই সহজ। গুণের বেলায় কেবল একটি, দুটি কিংবা তিনটি শূন্য ডাইনে বসিয়ে দিলেই হ'ল, আর ভাগের বেলায় ডান দিক থেকে এক দুই বা তিন ঘর বাঁয়ে একটি ফুটকি (দশমিক বিন্দু) বসালেই উত্তর। এই জন্যই মেট্রিক প্রথায় মাপ ওজন আর সব প্রথা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন না, ইঞ্চি, ফুট, গজই বলুন কিংবা তোলা, সের, মণ বলুন, তোলা থেকে মণে যাওয়ার কিংবা ইঞ্চি থেকে গজ-মাইলে যাওয়া খাতা-পেন্সিল ছাড়া পারবেন না। তা ছাড়া ১২ ইঃ = এক ফুট, কিন্তু ৩ ফুটে গজ, আবার ১৭৬০ গজে মাইল। একটার সঙ্গে আর একটার কোন মিল নেই। ধরা যাক্ পরীক্ষার খাতায় আছে ৭৭৮২৫ ইঞ্চিকে মাইলে পরিণত করতে হবে। ভেবে দেখুন দেখি কত লম্বা লম্বা ভাগ করতে হবে! কিন্তু যদি বলা হয়, ৭৭৮২৫ মিলি-মিটারকে মিটারে পরিবর্তন করতে, তবে একবারেই, খাতা-পেন্সিলে হাত না দিয়েই, জবাব দিতে পারা যায়। এক মিলি-মিটার হ'ল মিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ। সুতরাং আমাদের আগেকার সংখ্যার ডান দিক থেকে তিন ঘর পরে ফুটকি বসিয়ে ৭৭'৮২৫ মিঃ উত্তর পেয়ে যাই।

তার পর, আমাদের দেশে নয়া-পয়সার অর্থাৎ দশমিক মুদ্রার প্রচলন হয়েছে। সুতরাং মাপ-ওজন দশমিক প্রথায় না হলে আশানুরূপ মুশকিল আসান হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। কারণ ১ ফুট কোন দ্রব্যের দাম যদি ১ টাকা (একশত নয়া পয়সা) হয় তবে এক ইঞ্চির দাম দিতে বার ভাগ করতে হবে। কিন্তু যদি মিটার হয়, তবে তার অংশও দশমিক হবে সাধারণ ভাবে।

মেট্রিক প্রথার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আমাদের দেশে তা চালু করা উচিত, কিন্তু তা এখনই না করলে ক্ষতি কি? দেশে আরও পাঁচটা হাঙ্গামা আছে, তার সঙ্গে আর একটা জুটিয়ে দেওয়ার কি প্রয়োজন? এই প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই ইংলণ্ড ও আমেরিকার কথা বলতে হয়। এই দুটি দেশে মেট্রিক প্রথা আইনসঙ্গত, এবং তারাও মেট্রিক প্রথার পক্ষপাতী। কিন্তু

তাদের শিল্প-সমৃদ্ধি পুরাণো প্রথায় গড়ে ওঠার ফলে মেট্রিক প্রথায় পুরোদমে কাজ করতে পারছে না। তবে তাদেরও লক্ষ্য হচ্ছে ধাপে ধাপে মেট্রিক প্রথায় এগিয়ে যাওয়া। ঐ সব দেশ থেকে আমদানী-করা অনেক জিনিস মেট্রিক প্রথায় তৈরী দেখা যায়।

আজ আমাদের দেশ এগিয়ে চলেছে নানা শিল্প-প্রতিষ্ঠায়, সুতরাং যদি নতুন প্রথায় এ সমস্ত শিল্পের গোড়া পত্তন না হয় তবে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার মতই আমাদের অবস্থা হবে। আজ আইন প্রবর্ত্তন হয়েছে বলেই কাল থেকে মেট্রিক প্রথায় কাজ শুরু করা যাবে না। কেননা, পুরাণো কলকব্জা মাপজোখের যন্ত্রপাতি সবই প্রায় আগেকার নিয়মে। এগুলি ফেলেও দেওয়া যায় না, তা ছাড়া মানুষের মনকেও গড়ে তোলা দরকার নতুন প্রথায় চিন্তা করতে, তা নইলে এর প্রবর্ত্তন বই-খাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। ধরুন, যদি বলি এক মাইল পথ হাঁটতে হবে, তবে তার দূরত্ব আমরা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু যদি বলি ১০০০ মিটার যেতে হবে তবে তাকে গজ ফুটে পরিবর্ত্তন না করে দূরত্ব ঠিক বুঝতে পারি নে। সুতরাং যদিও স্থির হয়েছে এ বছর ১লা অক্টোবর থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে মেট্রিক প্রথার প্রবর্ত্তন হবে, তবু এর পূর্ণ প্রবর্ত্তন দু-তিন ধাপে বছর দশেকের আগে সম্ভব হবে না।

আবার অনেকে মনে করেন, মেট্রিক প্রথা যতই বিজ্ঞানসম্মত হোক না কেন, বর্ত্তমান প্রথা চালু রাখলে আমাদের দেশের উন্নতি ব্যাহত হবে এ যুক্তি ঠিক নয়। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার শিল্প-বিজ্ঞান যদি আজ এত উন্নত পর্য্যায়ে উঠতে পেরে থাকে তাদের বর্ত্তমান পদ্ধতিতে, তবে আমাদেরই বা আটকাবে কোথায়। তা ছাড়া আমাদের দেশেও এজন্য বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কিছু অভাব হয় নি। আচার্য্য জগদীশ বসু, স্যার সি. ভি. রমন এর জ্বলন্ত নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা পুরাণো পদ্ধতিতে শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তুলেছে একথা ঠিক, কিন্তু তারাও মেট্রিক পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করছে না। শুধু তাই নয়, তারাও ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে নতুন না দশমিক পদ্ধতিতে। অনেক কলকব্জা আজকাল ওরা নতুন মাপ-ওজনে তৈরী করছে। তা ছাড়া প্রতিভাধরদের কথা আলাদা। কোন পদ্ধতি তা যতই কঠিন হক না কেন, তাতে তাদের সাময়িক অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু তাদের গতি ব্যাহত করা শক্ত। কিন্তু কথা হ'ল সর্ব্বসাধারণকে নিয়ে। তারা যা সহজে গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে পারবে সেই হবে গ্রহণযোগ্য পথ। এক হিসেব মত দেখা যায়, যে সব দেশে মেট্রিক প্রথা প্রচলিত আছে, সে সব দেশের ছেলেমেয়েদের তুলনায় আমাদের ছেলেমেয়েরা শতকরা কুড়িভাগ বেশী মাথাঘামাতে বাধ্য হয়, বর্ত্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি আয়ত্ত করতে। এটা অবহেলার কথা নয়। এ সবের ওপরে আর একটি কথা হ'ল এই যে, আজ আর আমরা শিল্প, বাণিজ্য বা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার উপর নির্ভরশীল নই। সারা দুনিয়ার সঙ্গেই আমাদের লেনদেন। সুতরাং বিশ্ববাসী দ্বারা গ্রাহ্য পদ্ধতিতেই আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।

নতুন কোন ব্যবস্থা তা যতই ভাল হক না কেন, মানুষ তা সহজে গ্রহণ করতে চায় না। এজন্য অবশ্য কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই। তা ছাড়া, নতুন প্রথা চালু করলে যে জনসাধারণ নানাপ্রকার অসুবিধায় পড়বে, সাময়িকভাবে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং এ ধারণা হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, এক বিশেষ কোন শ্রেণীর সুবিধার জন্য এই নতুন প্রথা চালু করা হচ্ছে। কাজেকাজেই এমন একদল সমবেদনশীল কর্ম্মীর প্রয়োজন,
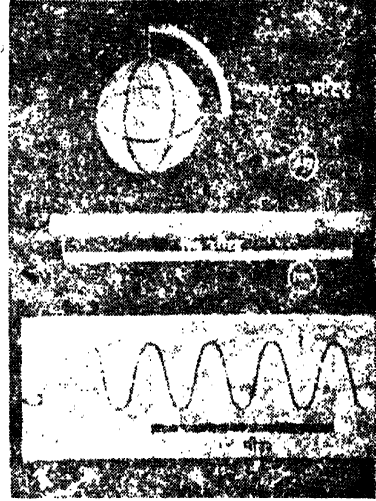
১। মেরু হইতে বিষুব রেখা ১০,০০০,০০০ (এক কোটি) মিটার
২। ধাতব দণ্ডে ১ মিটারের প্রমাণ।
৩। আলোর তরঙ্গে ১ মিটার প্রমাণ।
ফটো: ইউনেস্কোর সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং Metric Measures হইতে পুনর্মুদ্রিত।

যারা সাধারণ লোককে নিত্যকার সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে সহায়তা করবে। ভারতবর্ষের একটা বিরাট গণসমষ্টি অক্ষর-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। দৈনন্দিন জীবনে তারাই পদে পদে অসুবিধায় পড়বে সবচেয়ে বেশী। এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী লোক আছে যারা এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে এদের শোষণ করতে একটুকু কুণ্ঠা বোধ করবে না। সরকারের প্রয়োজন হবে এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। যাঁরা লেখাপড়া জানেন তাঁদের পক্ষেও অনেক ব্যাপারে গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে। মেট্রিক মাপ বা ওজনের সঙ্গে বর্ত্তমানে প্রচলিত মাপ-ওজনের কি সম্পর্ক, তার জন্য প্রয়োজন একটা নির্দ্দিষ্ট মান স্থির করা। তা না হলে এর অপপ্রয়োগ হওয়া অসম্ভব নয়। নয়া পয়সার উদাহরণ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অবশ্য ভারতীয় প্রমাণ মন্দির (Indian Standard

Institute) এই সকল সমস্যা নিয়ে কয়েকখানি প্রামাণ্য পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। সরকারী স্বীকৃতির ফলে তাদের দ্বারা নির্দিষ্ট এই সমস্ত প্রমাণই হবে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া মেট্রিক মেজার (Metric Measure) বলে একটি সাময়িক প্রচার-পুস্তিকাও ইংরেজিতে প্রকাশিত হচ্ছে কেন্দ্রিয় সরকারের প্রচার-দপ্তর থেকে। শুধু ইংরেজী নয়, সর্ব্ব ভাষায় এই জাতীয় পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত ও ব্যাপক প্রচারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের এই নতুন পদ্ধতির ভবিষ্যৎ আলোক-সমুজ্জ্বল। কিন্তু আজ আমাদিগকে যে পথ অতিক্রম করতে হবে তা খুব নিরাপদ বা সরল নয়। তবে সকল সহযোগিতা ও অধ্যবসায় থাকলে পথচলার দুঃখ নিম্নতম হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কৈশোর-স্মৃতি

শ্রীকালিদাস রায়

খাটিগঙ্গা হ'ল বিল, কাটি গঙ্গা অপনাম ধরে
ব্যাধিত জীবন মোর তার তীরে যাপিনু কৈশোরে,
জীর্ণ গেছে শীর্ণ দেহে। চারিদিকে যেথা গেস্তাবান
বাণপ্রস্থ নিল যেথা শেঠেদের সখের বাগান।
চারিদিকে বিদেশীর কুঠির কঙ্কাল
সিদ্ধিবন, এঁধো ডোবা, বটচূড় মন্দির বিশাল,
কোম্পানীর শোষণের অস্থিচর্ম্মসার এ শ্মশান
সারা লোকালয়ে মশা বানায়েছে শ্রীমন্ত মশান।
নরনারী প্রেতমূর্ত্তি ভোগে শুধু জ্বরে,
খাদ্য আছে সাধ্য নাই খায় তাহা, শুধু পথ্য করে।
তাহারা ভাতের চেয়ে সাগুদানা খায় বেশীদিন
সাগুর চেয়েও বেশী খায় কুইনিন।
মানুষের এই দশা, সবল কেবল তরুগণ
অনাময় দেহে তারা পালে জীবগণ।
পরিপক্ক ফল দোলে শাখাতে শাখাতে,
উৎফুল্ল অতিথিগণ প্রতিদিন ফলাহারে মাতে।
তাহাদের নিত্য মহোৎসব,
কেহ গায় কেহ নাচে কেহ শুধু করে কলরব।

কৃকলাস, গোধা, বেজি, সর্প, কাঠবিড়ালী, তক্ষক
গণতন্ত্রে করে বাস ভুলি ভক্ষ্য অথবা ভক্ষক।

লতায় কুসুম ফুটে কেহ তারে করে না চয়ন,
পবনে মোদিত করে, শুধু তারা জুড়ায় নয়ন।
বৃন্তের ফুটন্ত ফুলে সুন্দরের চলে পূজারতি,
পুরোহিত হেথা প্রজাপতি।
এঁধো পুকুরের বুকে ফুটে ইন্দীবর,
পুতনার বুকে যেন গোলাপ সুন্দর।
বসন্তে শিমুল জবা অশোকের গাঢ় রক্তরাগে,
বাগে বাগে হোলীলীলা চলে ফাগে ফাগে—
শরতে শারদ লক্ষ্মী নামেন নিশীথে অগোচরে
নিরখি বিলের বুকে পদচিহ্ন ফুল্ল থরে থরে।
ধূপগন্ধ পাই যেন রাতে
ছাতিম শেফালি তলে দেখি খই ছড়ানো প্রভাতে।
মানুষের দুঃস্থ দশা, প্রকৃতির ঐশ্বর্য সুরভি
দুয়ে মিলে সে কিশোরে করিল কি কবি?

সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

ক্রমাগত চিবিয়ে যাচ্ছে, যতক্ষণ গাড়ীতে উঠেছে ততক্ষণ, একনাগাড়ে চিবুচ্ছে—কচ কচ, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বিরাম নেই। লোকটার চোয়ালটা যেন লোহার তৈরী, বার বার ইঞ্জিনের পিষ্টনের মত ওঠানামা করছে, সঙ্গে সঙ্গে চর্ব্বির অন্তরালে গায়ের মাংসপেশী দুটো একসঙ্গে ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

ব্রজেশ্বরবাবু পান খেতে ভালবাসেন আর শুধু পান কেন, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাঁর একটু দুর্ব্বলতা আছে। তাঁর ধারণা,খাওয়ার জন্যেই প্রাণীর জন্ম, আর মরতে যখন একদিন হবেই তখন না খেয়ে মরার কি সার্থকতা থাকতে পারে? রসনা এবং জিহ্বার তৃপ্তিই তৃপ্তি। খাওয়ার জন্যই ত সব! এই যে তাঁকে দারুণ শীতের মধ্যে নরম ও গরম বিছানা ত্যাগ করে একটা জুয়াচোরের পশ্চাদ্ধাবন করতে হচ্ছে, এও সেই পেটের তাগিদে। নিজের অজান্তে ব্রজেশ্বরবাবু তাঁর হাতের তালু দুটি উদরের ওপর ন্যস্ত করলেন। বেঞ্চির ওপর রক্ষিত টিফিন-কেরিয়ারটার ওপর নজর পড়ল তাঁর। বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়লেন তিনি, মনে পড়ে গেল, তার মধ্যে সুরমা দেবীর প্রস্তুত কড়াইশুঁটির কচুরি ও আলুর দম রয়েছে। তাঁর স্ত্রী সুরমা দেবী সত্যই পাকা রাঁধুনী, বিশেষতঃ তাঁর তৈরী কচুরী এবং আলুর দম অতুলনীয় বলা চলে। বার দুই ঢোক গিললেন ব্রজেশ্বরবাবু, রসনা সিক্ত হয়ে এসেছে তাঁর। গাড়ীতে উঠলেই তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক হয়, সেটা তিনি বরাবরই লক্ষ্য করেছেন, আর হবে নাই বা কেন? দুপুর বেলার আহারকে দস্তুরমত লঘুপাচ্য বলা চলে, সুতরাং ক্ষুধার উদ্রেকে তিনি আশ্চর্য্য হলেন না। আশপাশে তাকিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু দেখলেন, যাত্রীদের মধ্যে কেউই খাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত নয়। বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন তিনি। সকলের সামনে টিফিন-কেরিয়ারটা খুলে ক্ষুধা নিবারণ করতেও সঙ্কোচ বোধ করলেন। এই খাওয়ার জন্যে কয়েকবার তিনি লজ্জায় পড়েছেন বলে মনে পড়ল তাঁর।

তাঁর বিয়ের কয়েক বৎসর পরের একটি ঘটনা। শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়েছেন ব্রজেশ্বরবাবু। খেতে বসেছেন, সামনে বড় শালাজ বসে তত্ত্বাবধান করছেন।

কি খাচ্ছেন, ভাল করে খান, অত লজ্জা কিসের?

না লজ্জা আর কি, দিন আর দুখানা।

আর একটু মাংস?

দিন।

দ্বিধাহীন চিত্তে উত্তর দিলেন ব্রজেশ্বরবাবু। কয়েকবারই মাংস এবং লুচি নিলেন।

মিষ্টি দিই? প্রশ্ন করলেন বড় শালাজ।

খাচ্ছি, আগে এগুলো খাই—বাঃ, মাংসটা ত চমৎকার হয়েছে, কে রেঁধেছে? আপনি?

হ্যাঁ।

দিন তা হলে আর একটু। বোধ হয় একটু ভদ্রতা দেখাবার চেষ্টা করলেন ব্রজেশ্বরবাবু। মাংস তখন নিঃশেষ।

ইয়ে, মিষ্টিগুলো খান। আর একবার রাশ টানতে চেষ্টা করলেন ভদ্রমহিলা।

ওঃ বেশ! তাই খাই। কিছুতেই আপত্তি নেই তাঁর।

আর দোব? ভদ্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বিপদে পড়লেন আবার।

দেবেন? তা দিন।

তাও এক-একটি করে শেষ হয়ে গেল, যেন রাবণের বুভুক্ষু ব্রজেশ্বরবাবুর, শুধু তাই নয়, খাদ্য সম্বন্ধে যে লজ্জা নেই, সে কথাও প্রমাণিত হ'ল।

সে রাত্রে ঘরে যেতে সুরমা দেবীর বেশ দেরী হ'ল, ঘরে ঢুকে তিনি হেসে অস্থির। ব্রজেশ্বরবাবুকে বললেন, যা কাণ্ড করেছ তুমি।

কেন কি হয়েছে?

আর কি, হাঁড়ি চাট-পুট, দোকান থেকে খাবার আনিয়ে তবে আমরা সকলে খেলাম।

তাই নাকি, ইস্, বড় অন্যায় হয়ে গেছে তা হলে। অপ্রস্তুত হলেন তিনি।

ওমা, অন্যায় কিসের, সকলের খুব ভাল লেগেছে।

বস্তুতঃ সুরমা দেবীরও নিজের ভাল লেগেছিল, এবং এ পর্য্যন্ত সে দিক দিয়ে সুরমা দেবীকে কোন দিনই নিরাশ হতে হয় নি। এখনও ব্রজেশ্বরবাবুর খাবার সময় তাঁর সামনে তিনি বসে থাকেন। ব্রজেশ্বরবাবু একমনে হাঁসফাঁস করে খেতে থাকেন, আর সুরমা দেবী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সেই দিকে, খুব ভাল লাগে তাঁর।

প্ল্যাটফর্মে যে লোকটার লক্ষ্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেই লোকটা ট্রেন ছাড়বার পর যখন তাঁর কম্পার্টমেণ্টেই উঠল তখন একটু আশ্চর্য্য হলেন ব্রজেশ্বরবাবু। লাল হরিণ-মার্কা জামাটা আর নীল রঙের প্যান্টপরা লোকটাকে ভাল লাগে নি তাঁর। লোকটার চালচলনও খুব আপত্তিজনক। বৃদ্ধবয়সে পদস্খলন হয়েছে বলে মনে হয়। তা না হলে বেঞ্চির ওপাশে বসা ওই মেয়েটার দিকে ওরকম ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকার কি মানে হয়? ওদিকের হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের ভয়ে ত লোকটা যেন সর্ব্বদা সশঙ্কিত হয়ে রয়েছে। কোন কোম্পানীর মালিক-টালিক হবেন বোধ হয়। চোমরান গোঁফ, ভুঁড়ির পরিধি এবং আশেপাশে জনসমাগম দেখে সেই কথাই মনে হ'ল ব্রজেশ্বরবাবুর। মেয়েটির দিকেও লক্ষ্য করেছেন তিনি, অনেক মানুষের সঙ্গে তিনি মিশেছেন। পুলিসে চাকরী করার সুবিধেই এই, মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বেশ খানিকটা জ্ঞান হয়ে যায়। প্রথম দর্শনেই মেয়েটির স্থির এবং দৃঢ় চরিত্রের কথা মনে হ'ল তাঁর। স্বদেশী যুগে বিপ্লবী দলে দু'একজন এই ধরনের মেয়ের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। ভারি শক্তজাতের হয় এই মেয়েরা—ভাঙে তবু মচকায় না। চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায়,—দৃষ্টিটা স্থির—চাঞ্চল্য নেই, শুধু গভীরতা আছে। বুড়ীর অর্থাৎ তাঁর মেয়ে কল্যাণীর কথা মনে পড়ে গেল, সে কিন্তু অন্য জাতের মেয়ে, এর চেয়ে ছোট। তাঁর কাছে সব মেয়েই বুড়ীর চেয়ে বড়, একথাটা কেন মনে হয়, তা বিশ্লেষণ করে তিনি কখনও দেখেন নি। অন্ধ স্নেহের ওটা যে একটা নিদর্শন সেকথা ব্রজেশ্বরবাবু কোনদিনই ভাবেন নি। বুড়ী কি এভাবে একলা দূরে পাড়ি দিতে পারত? না, তা হয় ত পারত না। তবে বলা যায় না, কারণ মেয়েদের বিষয়ে কোন কথা সঠিক বলা যায় না। সময় এবং অবস্থা অনুসারে তারা সবই করতে পারে, এ অভিজ্ঞতা তাঁর পুলিস-লাইনে থেকে হয়েছে।

হাজরা রোডের কেসটার কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটার নাম ছিল শিউলি গুপ্ত। সুন্দর চেহারা, বয়স আর কত হবে, তবে তাঁর বুড়ীর চেয়ে অনেক বড়। কলকাতা ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েট। আশপাশের থেকে সংগ্রহ করা রিপোর্ট থেকে মেয়েটির বিষয় যা জেনেছিলেন, তাতে এইটুকু বুঝেছিলেন যে, মেয়েটি আদর্শ চরিত্রের, শান্ত এবং মধুর স্বভাব। বছর তিনেক বিয়ে হয়েছিল, একটি দেড় বছরের ছেলেও ছিল। স্বামী ইঞ্জীনিয়ার—নাম নীরেন গুপ্ত। হাসপাতালে ব্রজেশ্বরবাবু শিউলি গুপ্তের জবানবন্দী নিয়েছিলেন—

আপনার নাম?

শিউলি গুপ্ত।

আপনি এ রকম করলেন কেন?

এ ছাড়া আর উপায় ছিল না বলে?

আপনার স্বামীর ওপর রাগ হতে পারে কিন্তু অতটুকু শিশু ত কোন অপরাধ করে নি।

তাই তার কোন অবকাশ দিলাম না।

আপনার স্বামীর ব্যবহারে ইদানীং কোন···

না, তাঁর ব্যবহারে কোন পার্থক্য ছিল না, তিনি চিরকালই ভদ্র।

হঠাৎ উত্তেজনার বশে কি এ রকম করলেন?

না, অনেক চিন্তার পর এ রকম করেছি, তবে উত্তেজনা একটু ছিল বৈকি।

স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য এ রকম করেছেন?

না, ও আমায় যাতে ভুলতে না পারে সেইজন্য···

কত দিন আগে আপনি এই খবরটা পেয়েছিলেন?

তিন মাস আগে উনি নিজেই আমায় সব বলেছিলেন।

তা হলে এই তিন মাস সময় আপনি অপেক্ষা করেছিলেন কেন?

কোন পন্থা আমায় অবলম্বন করতে হবে, সেটা এই সময় ঠিক করে নিয়েছি।

সে মেয়েটির নাম কি?

অমিতা সিংহ। সম্পর্কে আমার বোন হয়।

মেয়েটির স্বভাব কি ভাল নয়?

এত ভাল স্বভাবের মেয়ে হয় না।

তবে এ রকম হ'ল কেন? তা হলে আপনার স্বামীর দোষ নিশ্চয়ই।

তা জানি না—কার দোষ বুঝতে পারছি না—বোধ হয় আমার নিজেরই দোষ। অমিতাকে ওর সঙ্গে না পাঠালেই হ'ত।

কোথায়?

উত্তর প্রদেশে। ওখানে আমার স্বামী একটা ব্রীজ করছিলেন। সেই সময় তিনি অসুখে পড়েন। অমিতাকে লক্ষ্ণৌতে চিঠি লিখে আমিই পাঠিয়েছিলাম তাঁর সেবা করার জন্যে।

তার পর?

তার পর সবই বুঝলাম। উনি যখন ফিরে এলেন তখন যেন অন্য মানুষ, শরীর ত ভেঙেছেই, তা ছাড়া মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলে মনে হ'ল।

কি রকম ?

রাত্রে ঘুমতেন না, বিড় বিড় করে একমনে কি বকতেন, তা ছাড়া সময় সময় আমার হাত ধরে কাঁদতেন আর ক্ষমা চাইতেন।

আপনি কিন্তু ক্ষমা করতে পারলেন না ?

ক্ষমা মানে যদি বলেন ভুলে যাওয়া, জিনিসটাকে লঘু করে নেওয়া, তা হলে করি নি। আমি জানি, কাজের চাপে অসুখের ফলে বিদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থাতে হয় ত প্রতিক্রিয়া হিসাবে এক মুহূর্তের অসতর্কতায় সেটা ঘটেছিল। কিন্তু আমি কেন ওই কাঁটাটা সারাজীবন বুকে বয়ে বেড়াব ? আমি কেন সকলের কাছে ছোট হব ?

কিন্তু আপনার স্বামীকে এ কষ্টে ফেললেন কেন ?

আমার কষ্ট বুঝবে বলে।

এক মুহূর্তের ভুলের জন্যে এত বড় শাস্তি কেন তাকে দিলেন ?

এক মুহূর্তও আমায় ভুলবে না বলে।

কিন্তু অসহায় শিশুটা ?

অসহায় যাতে না হয় সেই জন্যেই ত···

কিন্তু নিজে এভাবে···

হ্যাঁ, হয় ত আরও সহজ ভাবে মরা যেত ! কিন্তু একটা ভুল করলাম, বিষটা সবটাই খোকনকে দিয়ে দিলাম—যদি বেঁচে যায় তা হলে। তার পর নিজে বিপদে পড়লাম।

কেন ?

এমন কিছু হাতের কাছে পেলাম না যাতে করে— আর তা ছাড়া মৃত্যুটা একটু একটু করে হলে উপভোগ করা যায়।

উপভোগ ?

হাঁ। একটা কাঠের পার্টিশন থেকে সরু একটা লোহার রডের মত বেরিয়ে ছিল, তাতে বাঁদিকের বুকটা ঠিক হৃদ্‌-পিণ্ডের জায়গায় দিয়ে নিজের দেহটা সজোরে ঠেলে দিলাম, প্রথমটা ভেতরে ঢুকতে চায় নি, তার পর খুব জোরে দেওয়ার পর রডটা ভেতরে ধীরে ধীরে ঢুকতে লাগল, সব শক্তি দিয়ে নিজের দেহটাকে আরও ঠেলে দিলাম, কচকচ করে কাটতে কাটতে লোহার রডটা ঢুকে গেল।

শিউলি গুপ্ত সুন্দরী, আধুনিকা এবং শিক্ষিতা। তার সম্বন্ধে একথা কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছিল কি !

হ্যাঁচ-চো-ও-ও। চমকে উঠলেন ব্রজেশ্বরবাবু। নানুভাই দেশাই সশব্দে হাঁচলেন। লোকটা এমন অসভ্য যে, ভদ্র ভাবে অসভ্য কাজগুলো এখনও করতে শেখে নি। পকেট থেকে দেড়-গজি একটা রুমাল বের করে নাক ঝাড়লেন— নানান ভঙ্গীতে একবার এ নাক একবার ও নাক, মোটা কড়ে আঙুলে রুমাল জড়িয়ে বুরুশ দিয়ে শিশি ধোয়ার ভঙ্গীতে কয়েকবার, তারপর হাতের তালু দিয়ে নাকের উপর ঘষলেন দু'তিনবার, দু'আঙুলে নাকটা টিপে ধরলেন, নিশ্বাস নিলেন জোরে জোরে বারকতক, অতঃপর রুমালটা খুলে নিরীক্ষণ করলেন কয়েক সেকেণ্ড—প্রয়াসের ফলটা অনুধাবনের জন্য। রুচিটাও দেহের মতই স্থূল।

উসখুস করছেন ব্রজেশ্বরবাবু, তিনি শুধু বিরক্তই হন নি, বেশ রেগেও গেছেন। আর কাঁহাতক সামলানো যায়—এ কম্পার্টমেন্টে সকলেই কি অনশন ব্রত নিয়েছে নাকি ? রাগে তাঁর তালু শুকিয়ে গেল, দুটো পান গালে দিয়ে ক্রমাগত চিবুতে লাগলেন। থাক গে, এর পরের ষ্টেশনে শুনেছেন পানতুয়া পাওয়া যায়—ভাল ঘিয়ে ভাজা তাজা পানতুয়া— ষ্টেশনে গাড়ী থামলে টাকাখানেক পানতুয়া নেওয়া যাবে। কড়াইশুঁটির কচুরী—আলুর দমের পর একটু মিষ্টিমুখ না করলে খাওয়াটা ঠিক সম্পূর্ণ হবে না। পানতুয়া আর পানের রস এক হয়ে গেল। মেয়েটি মনে হয় তাঁর দিকে আড়চোখে একবার তাকালে।

এষা চৌধুরী সত্যিই তাকিয়েছিল ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে, কারণ বিরক্ত বোধ করছিল এষা। যতগুলো মূর্তিমান উৎপাত সব যেন একসঙ্গে জুটেছে এই কামরাটায়। পাশের ভদ্রলোক ত ক্রমাগত পান চিবুচ্ছেন আর চর্ব্বির স্তূপের মধ্য থেকে ছোট চোখ দুটো বার করে কেবল নিরীক্ষণ করছেন সকলকে। অবশ্য চাউনিটা আর কিছু না হোক ভদ্র। যেন হাঁসফাঁস করছেন ভদ্রলোক, দারুণ শীতেও ঘেমে গেছেন, আর ঘামবেন নাই বা কেন, যা দেহের আয়তন তাতে ঘামা আশ্চর্য্য নয়।

ওপাশে আর একজন বসে রয়েছেন, তাঁর অবস্থা ত সঙ্গীন, লাল হরিণ মার্কা জামা আর নীল রঙের প্যান্টপরা। এষার বাবার বয়সী হবে, কিন্তু তার দিকে এমন তীর্য্যক দৃষ্টি দিচ্ছেন, যাকে ঠিক পিতৃসুলভ বলা চলে না। মানুষের কি অদ্ভুত রুচি হয়—স্থানকালপাত্রভেদে নাকি রুচি পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু ও-ধরনের লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হওয়া খুব শক্ত। পাশের মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও ওই শ্রেণীর। একটা জিনিস এষা লক্ষ্য করল—এই তিনজন আয়তনে, বয়সে এবং ওজনে প্রায় সমতুল্য—পাশের ভদ্রলোকের অবশ্য চাউনিটা আপত্তিজনক নয়—এই যা তফাৎ। কম্পার্টমেন্টে একজনও মেয়েছেলে নেই—একটু অস্বস্তি বোধ করছিল এষা সেইজন্যে, তা ছাড়া ভয়ও করছে, একলা এভাবে বাইরে এর আগে কখনও আসে নি, শুধু যদি সঞ্জীব কাছে থাকত তা হলে সব ভুলে থাকতে পারত। সঞ্জীব তাকে কোন

দিনই ভুল বুঝবে না, তারা দুজনেই দুজনকে চেনে, পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে পারে। শত বিপদও ওদের মিলনের কাছে হার মেনে যায়—সঞ্জীব, সঞ্জীব ভুল বুঝ না আমায়…।

আশ্চর্য্য ওরা, একটুও বোঝে না, পাওয়া মানে কি! স্থূল অনুভূতি ছাড়া ওদের অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী নেই। সঞ্জীব ভাবছে, আমার স্বার্থের জন্য আমি তাকে ছেড়ে চলেছি—অর্থের আশায় প্রতিষ্ঠার আশায়—তা নয়, পাব বলেই ত দূরে যাচ্ছি। না, চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়, মালতীদির মত সে অবস্থা বিপর্য্যয়ে নিজেও পড়তে চায় না, সঞ্জীবকেও ফেলতে চায় না, কিন্তু মালতীদিই বা কেন ও রকম অবস্থায় পড়ল? বরাত—বলে চুপ করে বসে থাকব নাকি? সারা জীবনই মালতীদির ওই একই অবস্থা থাকবে? দুঃখে, কষ্টে, বেদনায় জর্জরিত হয়ে কাল কাটাবে? এর কোন প্রতিকার নেই? এখন হয় ত নেই, এখনও সমাজের, দেশের সে দৃঢ়তা—বলিষ্ঠতার অভাব রয়েছে! সুনীলদা, ওই একটা লোকের জন্যে মালতীদি আজ হাসতে ভুলে গেছে। কিন্তু সুনীলদাকে প্রথম থেকে দেখেই ভাল লেগেছিল—যেমন সুন্দর চেহারা তেমনই ব্যবহার, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে এ রকম সাংঘাতিক তা কে জানত! তার বাবা শান্ত, আত্মসমাহিত, ধ্যানগম্ভীর। পৃথিবীর কলরোল থেকে যিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, আত্মভোলা মহেশ্বরের মত কঠিন তপস্যায় যিনি ডুবে রয়েছেন—তিনি কি করে সহ্য করবেন এ আঘাত, তাঁর স্নেহের মালতীর এ দুর্দশায় তিনি কি করবেন? মালতী অবশ্য বলবে না কিছুই, কিন্তু রমেনবাবুর মত সহানুভূতিসম্পন্ন অনেক প্রতিবেশী আছেন—দুঃসংবাদ দেওয়ার জন্য তারা যেন সর্ব্বদাই উন্মুখ হয়ে আছেন—মুখে সমবেদনার কথা বলেন বটে, কিন্তু প্রতিবেশীর দুঃখ তাদের কাছে অত্যন্ত মুখরোচক, খাদ্যের মতই লোভনীয় ও কাম্য।

ঘাড় ফিরিয়ে এষা দেখলে বাইরের দিকে—চারিদিকে অন্ধকার, ঘন ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড দু'একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন অনেকগুলি শিশুসন্তান নিয়ে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্রেনের আওয়াজটি দূরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে আর একটা ট্রেন যেন পাশাপাশি যাচ্ছে, টেলিগ্রাফের পোষ্টগুলো এতক্ষণ লাইনের কাছাকাছি ছিল—এবার সেগুলো দূরে সরে গেল—একটার পর একটা যাচ্ছে, ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে। একটা গাছের মাথায় একটা পতাকা, বনদেবীর পূজার আয়োজন হয়েছে বোধ হয়। দূর থেকে বেশ লাগে দেখতে, কাছে গেলে কি জত লাগবে!

নতুন চাকরীটার কথা মনে পড়ে গেল এবার। চাকরীর কোন অভিজ্ঞতা ওর নেই—অনেক কষ্টে চাকরীটা পাওয়া গেছে, দেখা যাক শেষ পর্য্যন্ত কি হয়? এবারে তাকে মন স্থির করতে হবে—বাবাকে সাহায্য করতে হবে, মালতীদির ভার নিতে হবে।

পাশের ভদ্রলোক যেন উসখুস করছেন, বেঞ্চের তলায় রাখা টিফিন-কেরিয়ারটা একবার বার করলেন—হয় ত ক্ষিধে পেয়েছে, সেটা অবশ্য বিচিত্র নয়, বপুর বহর দেখলে ক্ষিধেটা আন্দাজ করা যায়। ওপাশের লাল হরিণমার্কা জামা পরা ভদ্রলোক এখনও তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, হয় ত পরিচিত বা আত্মীয় কোন মেয়ের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিংবা হয় ত তার মত দেখতে কোন মেয়ে তাঁর মারা গেছে—কিন্তু মৃত কন্যাকে স্মরণে চোখের দৃষ্টিটা ওরকম হবে না, আর তা ছাড়া হাবভাবও তেমন নয়, বৃদ্ধ বয়সে, যুবসুলভ মুখভঙ্গী নকলও তেমন শোভনীয় বা সময়োপযোগী বলে মনে হচ্ছে না। সঞ্জীবের চাউনীটা বেশ, ওর চোখের তারাটা কিন্তু ব্রাউন রঙের, মুখটা লম্বা ধরনের, চোখ দুটো বড় বড়, ল দুটোও বেশ লাগে, একটা সামঞ্জস্য আছে ওর চোখের সঙ্গে। কোন দিন ও সোজা ভাবে চায় না, একবার তার মুখের দিকে তাকায় আবার দৃষ্টিটা অন্য দিকে ফেরায়—এক সঙ্গে অনেকক্ষণ তাকায় না কেন কে জানে? দৃঢ়তার মধ্যে সলজ্জ হাসিটা এষার বেশ লাগে, ওদের দুজনেরই মন অনেকটা এক। মনের কথা নিয়ে ওরা পরস্পরের ভালবাসাকে যাচাই করে না। ভালবাসা নিয়ে গল্প করে না—ভালবাসা কি বলার জিনিস? গল্প-উপন্যাসের পাতায় ইনিয়ে বিনিয়ে ভালবাসার কাহিনী শুনতে শুনতে তার মনে হয় ভালবাসার আসল রূপটি মিলিয়ে গেছে—তার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। কমলা খুব ভালবাসার কথা বলতে পারে—তাকে কত ছেলে যে ভালবাসল, কার ভালবাসা কি রকম তা বিশদ ভাবে বর্ণনা করতে পারে সে। তার বক্তব্য হ'ল—তার জন্যে সকলে পাগল, এর জন্যে সে কি করতে পারে—তার সৌন্দর্য্যের জৌলুসে পতঙ্গের মত কাতারে কাতারে মোহমুগ্ধ হয়ে তার চতুর্দ্দিকে প্রশংসা ও ভালবাসার গুঞ্জনধ্বনি তুলে যদি কেউ আসে তা হলে তার অপরাধ কোথায়?

কিন্তু এই ভালবাসার গল্পগুলিই কমলার অমূল্য সম্পদ। যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরীর সুদৃঢ় ভূগর্ভস্থিত সেলটারের মধ্যে সেগুলি সঞ্চিত করে রেখেছে, জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত থেকে সযত্নে সেগুলো বাঁচিয়ে রেখেছে। নেশার সময়ে নেশার জিনিস থেকে বঞ্চিত হলে বিপদ হয়। ভালবাসার গল্প কমলার নেশার জিনিস। মৌতাতের সময় সেগুলো চাই। অপরের কাছে বলতে হবে, নিজে মনে মনে ভাবতে হবে, তবে তার

মনটা সরস হবে, উদ্দীপনা আসবে—তা না হলে ছটফট্ করবে, উসখুস করবে—পাশে বসা ওই পেটুক ভদ্রলোকের মত। এষা কিন্তু নিজের মনের কথা নিয়ে আলোচনা করে না, সঞ্জীবও তাই। সেবার সঞ্জীবের সর্দ্দি জ্বর হয়েছিল, বেশ ভোগালে কয়েকদিনই। পরস্পরের খবর পেল না কয়েক দিন। তার পর যেদিন দেখা হ'ল, সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে এষা বললে, কয়েক দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি এমন আটকে গেছলাম।

ও! তাই নাকি?

হাঁা। এষা আগেই সঞ্জীবের শরীর খারাপের কথা জেনেছিল।

কি নিদারুণ উৎকণ্ঠায় এ ক'দিন কাটিয়েছিল সেকথা প্রকাশ করতে ও কিন্তু রাজী নয়।

তোমার চেহারাটা কেমন শুকনো লাগছে। প্রশ্ন করল সঞ্জীব।

আমার? আশ্চর্য্য হ'ল এষা—উল্টো চাপ কেন?

হাঁা, মনে হচ্ছে কয়েক রাত্রিই তুমি যেন ঘুমোও নি।

চেহারা দেখে অনিদ্রার কথা বলা যায় নাকি?

হাঁা, তা বলা যায় বৈকি—অন্ততঃ আমি ত বেশ বুঝতে পারছি। সঞ্জীবের চোখে কৌতুক। মুখ ফেরাল এষা, ধরা পড়ে যাবে নাকি?

হাঁা, একদিন শরীরটা তেমন ভাল ছিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে বললে এষা।

হাঁা, আমিও বালিগঞ্জে গিয়ে সেই খবরই পেলাম।

সে কি, তুমি ওই শরীর নিয়ে বালিগঞ্জে গেছলে? উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল এষা।

হেসে উঠল সঞ্জীব, ওরা দুজনেই ধরা পড়ে গেল।

পাশের ভদ্রলোক এবার মরিয়া হয়ে উঠেছেন, টিফিন-কেরিয়ারটা বেঞ্চির নীচে থেকে ওপরে তুলেছেন, বাঁ হাতে তালু দিয়ে উত্তাপটা লক্ষ্য করছেন বোধ হয়—বেঞ্চির ওপর রেখে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে—অদর্শনে কাতর হয়ে পড়েছিলেন নিশ্চয়ই।

গাড়ীর গতি মন্দীভূত হয়ে এল—এক লাইন থেকে অপর লাইনে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে—কামরাটা দুলছে—এক ধার থেকে অপর ধারে—লাইনের সঙ্গে গাড়ীর চাকার সংঘর্ষ হচ্ছে—একটানা আওয়াজটা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তীক্ষ্ণ—ওপরের বাঙ্কের শিকলগুলো কেঁপে কেঁপে আওয়াজ করছে ঝম ঝম ঝম—সব শব্দ সব এক রকমই আওয়াজ বোধ হয়। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে গাড়ীটা ঢুকল। নির্জ্জন অঙ্গন থেকে কোলাহলময় জনাকীর্ণ ঘরের মধ্যে যেন হঠাৎ ঢুকে পড়েছে, অন্য পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছে ট্রেনটা। এতক্ষণ দারুণ পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন সে, ধীরে ধীরে থামল গাড়ীটা।

ব্রজেশ্বরবাবু অপেক্ষা করছিলেন, ট্রেন থামতেই তিনি প্লাটফর্ম্মে নামলেন—পানতুয়া কিনতে হবে তাঁকে।

ক্রমশঃ

জিজ্ঞাসা

শ্রীহরিপদ গুহ
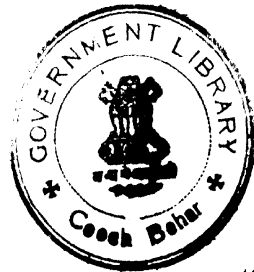
জ্ঞানীরা এ যুগে 'আধুনিকা' নিয়ে ব্যঙ্গ করছে মেলা,
সহানুভূতি তো এতটুকু নেই, শুধু চলে ছেলেখেলা!
দোষ যত সবই নারীদের এবং পুরুষ জানে না কিছু;
রাতদিন তাই আধুনিকাদের তাড়া করে পিছু পিছু!
সুবিধা পেলেই কাছে টেনে এনে ভালবাসবার ভান,
কত যে চাতুরী, বলে—'দিতে পারি অনায়াসে নিজ প্রাণ।'
পুলকের বান জাগে চোখে-মুখে, করে কত জয়গান;
অথচ আবার সুযোগ পেলেই কুপথেও নিতে চান।

যারা দিনরাত নিন্দায় রত, তারাই এদের সাথে
মেশার আশায় শৃঙ্খল ভেঙে কত আনন্দে মাতে!
যুগ যুগ ধরে পুরুষ নারীর খর্ব করেছে মান,
যত কলঙ্ক রয়েছে নারীর—পুরুষেরই সব দান!
নারীর যে-রূপ চেয়েছে পুরুষ, সে-রূপ পেয়েছে আজ,
আধুনিকাদের নিন্দায় তবু তারা কেন গলাবাজ?

রসিকলাল রায়

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

রসিকলাল রায় একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। তবে সাধারণ স্কুল শিক্ষকের তুলনায় তাঁহার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার জন্য তিনি ছাত্রসমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। অনেক ছাত্রের জীবন সুগঠিত করিয়া তোলার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ অন্যতম ও প্রধান। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে (অটোবায়োগ্রাফি, পৃঃ ২৫, ২৬) শিক্ষক রসিকলালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন এবং কিভাবে এই শিক্ষকের উৎসাহ ও উপদেশ তাঁহার জীবনগঠনে সহায়ক হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। রসিকলালও এই ছাত্রটি সম্পর্কে বিশেষ গৌরববোধ করিতেন। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে আমরা যখন তাঁহার ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের নিকট কৃতী ছাত্র রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্বন্ধে সগৌরবে তিনি যে সমস্ত কথা বলিতেন তাহাতে আমাদের তরুণ চিত্ত উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত।

রসিকলাল বিহারে অনেকদিন সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বর্তমান বিহারের কর্ণধারগণের মধ্যে অনেকেই স্কুলজীবনে তাঁহার ছাত্র ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের কার্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার ছাত্র হিসাবে তাঁহার নিকট যে শিক্ষা—যে নির্দেশ লাভ করিয়াছিলাম তাহা এই জীবনে পরম সম্পদ হইয়া রহিয়াছে—তরুণ বয়সে তিনি জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহার অম্লান শিখা আমার জীবনপথকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

শিক্ষকতা রসিকলালের প্রধান পরিচয় হইলেও একমাত্র পরিচয় নয়। বাংলার সমসাময়িক সুধীসমাজে রসিকলাল সাহিত্যিক হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত এ খবর জানা নাই। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদও তাঁহার আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ করেন নাই। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার লেখা অসংখ্য প্রবন্ধ নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখা তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাঁহার বহুমুখী আলোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু কিছু কবিতাও তিনি লিখিয়াছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি নিজেকে বিশেষ ভাবে সাহিত্য-সাধনায় নিয়োজিত করেন। এজন্য তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। মনে হয়, এই পরিশ্রম তাঁহার অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। প্রাদেশিক সাহিত্যালোচনা তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত আলোচনা বাংলা ভাষায় মাঝে মাঝে দেখা গেলেও নিয়মবদ্ধ ব্যাপক আলোচনার যথেষ্ট অভাব অনুভূত হয়। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে রসিকলাল এই আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট লেখকদের পরিচয় বাঙালী পাঠককে উপহার দেন। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'বীণার তান' নাম দিয়া প্রাদেশিক ভাষার নামকরা পত্রিকাগুলির বিশেষ বিশেষ লেখার বিবরণ প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয়, এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রারব্ধ কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই মৃত্যুর করাল হস্ত তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়। আজ যখন আমরা 'সাহিত্য আকাদেমি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনগণের পরিচয় সাধনের চেষ্টা করিতেছি তখন এই কার্যের পুরোধা রসিকলালের কথা আমাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করা কর্তব্য। রসিকলালের কৃতকার্যের পরিচয় আজ সাহিত্যিক সমাজে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাদেশিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার লেখা প্রবন্ধগুলি একত্র সংকলিত ও প্রকাশিত হইলে আজও তাহা সাহিত্যরসিকের আনন্দ সম্পাদন করিতে পারিবে।

প্রাদেশিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার লেখা যতগুলি প্রবন্ধের সন্ধান করিতে পারিয়াছি তাহাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

প্রবন্ধ	পত্রিকা ও সংখ্যা
শ্রীতুকারাম	নব্যভারত ভাদ্র-কার্তিক ১৩১৬
কবি বিহারীলাল	" আশ্বিন ১৩১৮
ভক্তকবি সুরদাস	,, মাঘ ১৩১৮
হিন্দীভাষা	,, শ্রাবণ ১৩২০
মহাকবি ভূষণ ত্রিপাঠী	বিজয়া, অগ্রহায়ণ ১৩২০
কলিকাতা হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ	" ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২০, বৈশাখ ১৩২১

কবি কেশবদাস	ভারতবর্ষ মাঘ ১৩২১
মৈথিলীভাষা	" ফাল্গুন ১৩২১
পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্ট	" বৈশাখ ১৩২২
হিন্দী সাহিত্য ও তাহার সেবকগণ	" মাঘ ১৩২২
গুজরাতী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ	" বৈশাখ ১৩২৩
বীণার তান১	" মাঘ ১৩২১— শ্রাবণ '১৩২৩

সাহিত্যসেবায় কায়স্থ (হিন্দি)
কায়স্থ পত্রিকা ১৩২২, পৃ. ৪৯২

কবিভূষণ ও শিবাজী (অসম্পূর্ণ রচনা)
মানসী ও মর্মবাণী, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র ১৩২৩

উমরায়ণ২ সুপ্রভাত, শ্রাবণ ১৩১৮

রসিকলাল দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে লিয়ার্কস্‌ 'ঐতিহাসিক চিত্রে' (১৩১৬,পৃ. ৪৭৫, ৫০৯, ৫৫৫), মার্কোপোলো 'নব্যভারতে' (আষাঢ় ১৩১৭), জয়সিয়া বা জয়-সিংহ 'আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা'য় (১৩১৭, কার্তিক—মাঘ) এবং নীচে 'ভারতবর্ষে' (অগ্রহায়ণ, ১৩২২) প্রকাশিত হয়। কায়স্থ-দের সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার নিম্ননির্দিষ্ট দুইটি প্রবন্ধও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—'বিজলী ও কায়স্থ', 'ইংরাজের আমলে কায়স্থদের মান' (আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা—১৩১৬-১৭, ১৩২২)। হিন্দু সমাজের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি পর্যালোচনা করিয়া তিনি ধারাবাহিক ভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'সমাজ-সমস্যা', 'সমাজপতি' ও 'বঙ্গের ব্রাহ্মণ' নামে এগুলি 'নব্যভারত' (১৩২০—১৩২২) ও 'কায়স্থপত্রিকা'য় (১৩২০।পৃ. ৩৭০,২২১, ৫৮৫) প্রকাশিত হইয়াছিল।৩ সাধুসঙ্গের আকর্ষণে রসিক-লাল বিভিন্ন সাধুসন্দর্শনে নানা স্থানে গিয়াছেন। তিনি তাঁহা-দের বিবরণ 'কাশীবাস' নামে কতকগুলি প্রবন্ধের আকারে (নব্যভারত, '১৩১৯-২০) প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সাধক প্রভু জগবন্ধু ও রসিকলাল একই সময়েও একই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই বাল্যবন্ধু সম্বন্ধে রসিকলালের লেখা একটি প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' (শ্রাবণ ১৩২২) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাধু বলিতে আমরা যাহা বুঝি প্রসিদ্ধ শিক্ষক ভুবন-মোহন সেন মহাশয় তাহা না হইলেও একজন স্মরণীয় সজ্জন ছিলেন। বন্ধু বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র আদর্শে এবং তাঁহারই নির্দেশে রসিকলাল 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র 'পরিশিষ্ট' নাম দিয়া ভুবনমোহনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন (নব্যভারত, বৈশাখ ১৩২২, পৃ. ১৭-২৫)। রসিকলাল তাঁহার বিন্ধ্যাচল ভ্রমণ কাহিনী 'অবকাশে' নামে 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা'য় (১৩১৭) প্রকাশ করেন।

রসিকলাল শুধু নামেই নহে কার্যতও রসিক ছিলেন। তাঁহার সরস ব্যঙ্গপূর্ণ সমালোচনা বিশেষ উপভোগ্য ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন সম্পর্কে তাঁহার লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধে ইহার নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। (দ্রষ্টব্য :—'সীতাভোগ সম্মেলন'—নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ. ৯৪-১১৬ ; 'সাহিত্য সম্মেলনে'—ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ. ৮৯১-৯১১ ; 'ত্রিপুরার পথে'—ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২২, পৃ. ৪০৯-৪১৮)।

রসিকলালের মৃত্যুর পর শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় 'নব্য-ভারতে' (কার্তিক, ১৩২৩) তাঁহার জীবনকাহিনী—বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রথম বয়সের কথা—সংক্ষেপে বিবৃত করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় মহাশয় আমার নিকট তাঁহার সম্বন্ধে এক বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন। এই দুই সূত্র এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এখানে রসিক-লালের জীবনবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

রসিকলাল ইংরেজি ১৮৭৪ সনে ফরিদপুর জেলার ভাজনডাঙ্গা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল ঐ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত নরসিংহদিয়া গ্রামে। ফরিদপুর হইতে যশোর রোড ধরিয়া ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুমারনদীর তীরে কানাইপুরের বড় বন্দর। কানাইপুর হইতে এক মাইল পূর্বে নরসিংহদিয়া গ্রাম। এই গ্রামে কায়স্থ সমাজভুক্ত যে বংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। রসিকলাল এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

রসিকলাল আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতা তারকচন্দ্র রায় মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা

১। ১৩২৩ সালের কার্তিক সংখ্যা হইতে রসিকলালের পুত্র শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় 'বীণার তানে'র ভার গ্রহণ করেন এবং ১৩২৪ সালের পৌষ পর্যন্ত উহা চালাইয়া যান।

২। মুখ্যতঃ এই প্রবন্ধ সাহিত্যবিষয়ক না হইলেও হিন্দি সাহিত্যের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। উমরায়ণ ছাপরার নিকটবর্তী মাঝি গ্রামের একটি অতি পুরাতন দুর্গ। ইহার অধিপতি বীর লোরিকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'লোরিকাইন' নামক গাথা উত্তর বিহারের আহিরজাতির মধ্যে সুপরিচিত। ইহা আহিরচারণদের মুখে মুখে গীত হইয়া থাকে। এই কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৩। 'সমাজপতি' প্রবন্ধ রক্ষণশীল সমাজে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই বিক্ষোভের উত্তরে রসিকলাল 'কৈফিয়ত' নামক প্রবন্ধ (কায়স্থপত্রিকা ১৩২১, পৃঃ ২১) লেখেন।

করেন। রসিকলাল ভাল ছাত্র ছিলেন। ১২৯৩ সালে মাইনর পরীক্ষা দিয়া তিনি বৃত্তিলাভ করেন। ১২৯৮ সালে (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ) ফরিদপুর জিলা স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তিলাভ করিয়া রিপন কলেজে ভর্তি হন। ফরিদপুরে রসিকলালের বন্ধু ও সহপাঠীদিগের মধ্যে প্রধান শিক্ষক ভুবনমোহন সেনের পুত্র ইন্দুভূষণ সেন (জাতীয় আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যারিস্টার), কেশব রায় (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা), বকুলাল বিশ্বাস (সব-জজ) এবং বিখ্যাত সাধক শ্রীজগদ্বন্ধুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই রসিকলালের বিবাহ হয়। তিনি চন্দনীনিবাসী কালীপ্রসন্ন মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসিদ্ধ শিক্ষক-সাহিত্যিক ঈশানচন্দ্র ঘোষের পিসতুত ভগ্নী সুশীলাসুন্দরীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

এই সময়ই তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সদস্য ফরিদপুর জেলার উলপুরনিবাসী সাহিত্যিক ও সমাজসেবক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর সংস্পর্শে আসেন এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে তাঁহার সহযোগিতা করেন। ফলে তাঁহার এফ-এ পরীক্ষার ফল ভাল হয় না এবং ১৮৯৬ সনে বি-এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন।

দেবীপ্রসন্নের সহিত যোগাযোগের ফলে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মমহোদয়ের সঙ্গে রসিকলালের পরিচয় হয়। ইঁহাদের মধ্যে ছাপরা জিলা স্কুলের প্রধানশিক্ষক ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং রাঁচি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার ত্রিপুরাচরণ রায় অন্যতম। ইঁহাদের আগ্রহে ও অনুরোধে রসিকলাল ছাপরা জিলা স্কুলের শিক্ষকতা স্বীকার করেন এবং কিছুদিন সেখানে কাজ করার পর রাঁচি জেলার স্কুল সাব-ইন্‌সপেক্টরের কাজে যোগ দেন। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে পালকোট রাজের কুমারদের অভিভাবক শিক্ষকের কাজ করেন। ১৮৯৯ সনে রাঁচি থাকাকালে তাঁহার স্ত্রী স্বামী ও একমাত্র শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। রসিকলালও রাঁচির কাজে ইস্তফা দিয়া ছাপরায় ফিরিয়া আসেন। ১৯১২ সন পর্যন্ত তিনি ছাপরা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মাঝে ১৯০৪-৫ সনে দুই বৎসরের জন্য তিনি গয়ায় বদলী হইয়াছিলেন। ছাপরা হইতে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে আসেন এবং এখানে কাজ করার সময়ই ১৩২৩ সালের ১৫ই শ্রাবণ (১৬ই জুলাই, ১৯১৬) মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।[১]

রসিকলাল আদর্শচরিত্র মানুষ ছিলেন। স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। একমাত্র পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত। এই ব্রতপালনে যাহাতে কোন বাধা না হয় এজন্য তিনি উচ্চপদের প্রলোভন পরিত্যাগ করেন। স্ত্রী-বিয়োগের সময় তাঁহার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের সহকারী ম্যানেজার পদলাভের সম্ভাবনা হইয়াছিল। তিনি তাহা উপেক্ষা করেন। ছাত্র, পুত্র ও সাহিত্যই ছিল তাঁহার জীবনের অবলম্বন। পড়ানর সময় ছাড়াও তিনি ছাত্রদের সহিত অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। ক্লাসের বাহিরেও নানা বিষয়ে ছাত্রদের উৎসাহ ও উপদেশ দেওয়া তিনি প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। লাইব্রেরীতে বসিয়া পাঠ্যেতর পুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশ চিহ্নিত করিয়া তিনি তাহাদের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। পড়ায় অমনোযোগী ছাত্রকে মনোযোগী করিবার জন্য তিনি অনেক সময় তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন এবং নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন। কর্মবহুল সাহিত্যিক জীবনেও তাঁহার এজন্য কখনও সময়ের অভাব হইত না। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সমভাবে তাঁহার ছাত্র ও সাহিত্যিক সমাজের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক সাহিত্যিক বন্ধুর সহিত তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। বিভিন্ন পত্রিকার কার্যালয়ে ও অন্যত্র যে সমস্ত সাহিত্যিক আড্ডা ছিল রসিকলাল তাহাদের অনেকগুলিতে নিয়মিত যাতায়াত করিতেন। তাঁহার সাহিত্যিকবন্ধুদের মধ্যে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। অনেক সময় তিনি মহারাজের কথা বলিতেন—তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতেন। মেসে তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে মহারাজকে উপবিষ্ট দেখিয়াছি বেশ মনে আছে।

১। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার আত্মজীবনীতে যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হইতে পারে রসিকলাল তাঁহার এফ-এ, পরীক্ষার (১৯০৪) কিছুদিন পরেই মারা যান।

কুমেদানজী

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস। গরমের সন্ধ্যা।

রাজার 'খাসা' কুঠির (খাস বা বিশেষ আসর) সামনে প্রথামত অস্তমান রক্ত-সূর্য্যের আরতির হিন্দী গৎটি সানাই বাঁশী ব্যাণ্ডে অস্ত-রাগিনীর সুরে ঘুরে ফিরে বার বার বাজিয়ে ব্যাণ্ডওয়ালারা সন্ধ্যা-বন্দনা শেষ করল রাজোয়াড়ার চিরকালের প্রথামত।

তার পরেই সানাই ব্যাণ্ড বাঁশীর শ্রোতার দল সেখান থেকে বেরিয়ে এল। কেউ কেউ বাড়ী ফিরবে। অনেকেই এই বিপর্য্যয় বিদকুটে গরমে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে কি করবে—বেড়াতে থাকে এদিক ওদিকে প্রায়-শুকনো নালার ধারে—বাঁধের ধারে যেখানে জল আছে। পাহাড়ের দেশের মানুষের জলের ওপর, জলাশয়ের ওপর বড় মোহ। একটু বৃষ্টির জল জমলেও সেখানে মানুষ যাবে, জীবজন্তু যাবে—হরিণ ময়ূর যাবে। কিন্তু এ সময়ের গরমে বাঁন্ধা (বাঁধ) ছাড়া কোথাও জল নেই।

যাই হোক অবশিষ্ট কয়েকটি যুবক বা ছেলেরা এল কুঠির সামনে কুমেদানজীর বাড়ীতে। বাড়ীর সুমুখে মস্ত বকুল গাছ। তার ছায়ায় ভিজা মাটির ওপর তিন চারখানা দড়ির খাটিয়া পাতা। সন্ধ্যার আগে একটি ভিস্তী এসে 'ছেড়কাও' (জল ছিটানো) করে গেছে। কিন্তু সারা দুপুরের গরম আঙিনা দু'মশক জলে কত ভিজবে? ওপর ওপর ভিজেছে মাত্র। সেই ভিজে মাটি বা বালি নিয়ে কুমেদানজীর নাতি-নাতনীরা ঘর বাড়ী—লাড্ড পেঁড়া তৈরী করছে নিবিষ্ট মনে। এবং ঝগড়াও করছে।

আর কুমেদানজী একখানা দড়ির খাটের উপর বসে প্রকাণ্ড একটা আলবোলায় তামাক খাচ্ছেন। খেলো হুকোয় নয়—বড় গড়গড়ায়। কুমেদানজীর মাথার মাঝখানটা রাজস্থানী ধরনে কামানো। অর্থাৎ চারদিকে চুল রেখে কপাল থেকে ব্রহ্মতালুর শেষ অবধি লম্বা চৌকো করে কামানো। ঠিক যেন একটি লম্বা ধরনের টাক। বাঙালীর ছেলেরা ঐ রকম কামানো টাক তৈরীর কোনও হদিস খুঁজে পেত না—আসলে ওটা হচ্ছে পাগড়ী মাথায় বসাবার জন্য তৈরী করা টাক। কুমেদানজীর চেহারা লম্বা ছিল বোঝা যায়। বেশ শক্ত-সমর্থ গড়ন। এদানী একটু কুঁজো ভাবে ঝুঁকে পড়েছে শরীর, বয়স প্রায় আশী। গা খোলা, মেরজাইটা খাটের পাশে রাখা রয়েছে। পাগড়ীটাও মাথা থেকে নামানো গরমের জ্বালায়।

ছেলের দল এসে দাঁড়াল। তার পর খালি খাটিয়াগুলোতে বসে পড়ল ইচ্ছামত। বাঙালী, রাজপুত, অন্য জাত সবাই এসেছে।

কুমেদানজী জানেন ওদের আসার কারণ। তবু তামাকের নল রেখে বললেন, 'কি বাবুজী কি খবর?'

বাবুজীরা (সুরেন, সত্যেন, গোপাল নরেনরা) বললে, 'কিছু নয়। বড় গরম আজ কুমেদানজী। কত ডিগ্রী গেছে জানেন?'

কুমেদানজী একটু হেসে বললেন, 'ডিগ্রী সে কেয়া কাম বাবুজী। দেখনা পাগড়ী ভি উতারকে রাখ্‌খা। তোমাদের ত আর মাথায় পাগড়ী নেই, বাঙালীদের।'

বাঙালীরা হাসল। বললে, 'তাই বলে গায়ে কিছু কম লাগছে না। ওদেশী অন্যরা সকলেই জোয়ান ছেলে, তারা বললে, আমাদেরও ইচ্ছে হচ্ছে বাঙালীদের মত মাথাটা খালি রাখি। কিন্তু পাগড়ী খুললে বাবা বড় রাগ করেন। বলেন, আমি মরে গিছি, না তুই কারও বান্দা হয়েছিস? যখন তখন পাগড়ী উতার না, বড় অলক্ষণ। জানিস না?'

ওখানে সাধারণতঃ পাগড়ী খোলাটা হচ্ছে শোকের চিহ্ন এবং প্রভু বা প্রবীণের কাছে মিনতি প্রকাশের অভিব্যক্তিও। কাজেই দুর্দ্ধর্ষ গরমের দিনেও ক্ষেতখামারে চাষী মজুরেরাও মাথায় ছেঁড়া নেকড়ার ফালির মত পাগড়ীটুকুও নামায় না—সম্পন্ন লোকেরা ত দূরের কথা। শুধু ঘরে বসেই নামানো চলে।

সন্ধ্যে ঘন হয়ে জমাট অন্ধকার রচনা করতে লাগল গাছের ছায়ায়, গাছের ডালপালায়। ময়ূরগুলো মোটা ধরনের মগডালে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসল। অন্য পাখীরাও ঘরকরনা গুছিয়ে বসেছে আগেই। পথের দু'ধারে গাছ। গ্যাসের আলো। ওপারে খাসা কুঠির কেল্লা নির্জ্জন বনপুরীর মধ্যে বালির উঁচু টিলার বিরাট দৈত্যপুরীর মত অন্ধকার মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

সকলেই চুপচাপ বসে আছে। কিন্তু কিসের জন্য তা বলছে না। কুমেদানজীর তামাক খাবার শব্দ হচ্ছে। গাছের পাতাটিও নড়ছে না গুমোট গরমে।

সহসা আর এক ঘর থেকে আর একটি বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। এসে কুমেদানজীর খাটে বসল। কুমেদানজী তামাকের নলটি তার হাতে দিলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'খাও ভাই। কেমন্ গরম, এতক্ষণ কোথায় ঘরে বসে ছিলে?'

'আর ভাই গরম! বাইরেই কি আর তোমার সিমলা পাহাড়, না আবুরাজে (আবু পাহাড়) বসে আছ? সব জায়গা সমান।' এত আর সোনাদানা হীরেমতি নয় যে, বড় লোকদের জন্য এক রকম আর আমাদের জন্য আর এক রকম পাব। এ হচ্ছে ভগবানের

দেওয়া রোদ্দুর—সবাইকে সমান খেতে হবে।' বৃদ্ধ পরম খুসী মনে হাসতে লাগলেন।

ছেলের দলে গুন গুন করে প্রতিবাদ উঠল।

একটি ছেলে হেসে বললে, 'পদটেলজী (মোড়ল) বড় লোকের ঘরে কিন্তু খসখসের টাটি আছে, টানা পাখা আছে—নয় ত 'পাখা-বর্দার' (পাখাকুলী) আছে। পয়সা দিয়ে সবই কেনা যায় গরম কমের ব্যবস্থা।'

'হাঁ বেটা হাঁ। তবু ত পথে বেরুলে গরমে মরবে তারাও।'

তার পর বৃদ্ধ নিজেই বললেন, 'ভাই একটা ভালো গল্প তোমার ঝুলি থেকে বার কর—লড়াই-টড়াইয়ের কাহিনী। এই সব লেড়কারা বসে আছে সেই জন্মেই ত। বলতে পারছে না—পাছে তুমি ভাগিয়ে দাও। এই গরমে—এই গাছতলা—আর গল্প ছেড়ে কোথায় যায় সব?'

বৃদ্ধের কথায় ছেলে-শ্রোতার দল খুব খুসী হয়ে সহাস্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসল।

কুমেদানজী চুপ করে হাসছিলেন শুধু। এবারে বললেন, 'কি দিব ভাই দেবনাথজী, সব গল্পই ত তোমাদের শোনা। আর গল্প নূতন কোথায় পাই?' নূতন শ্রোতা ছেলেরা গুন গুন করে উঠল, 'তারা ত সবাই সব শোনে নি। হোক পুরোনো, বলুন ভাই কুমেদানজী।'

দেবনাথজী বললেন, 'আরে ভাই, কাহিনী কখনও পুরানো হয়? রামায়ণ, মহাভারত থেকে রাণা প্রতাপের, রাজসিংহের, শিবাজীর কাহিনী, গুরুগোবিন্দের কাহিনী সবই ত পুরাণো কথা ভাই। বেতাল পাঁচিশিও ত রাজা বিক্রমের পুরাণো কাহিনী।'

'বল ভাই তোমার পুরানো কথাই বল। আচ্ছা, তোমার কুমেদান-খেতাবের কথাই বল আজ।'

'কুমেদানজী' কুমেদানজীর নাম নয়? কি খেতাব? ছেলেরা প্রশ্নের জন্য উসখুস করে।

কিন্তু গল্প আরম্ভ হচ্ছে। চুপ করেই রইল যদি থেমে যায়।

কুমেদানজী তামাকের নলটি বন্ধুর হাতে দিয়ে বললেন, 'তবে ভাই শোনো পুরোণো কথাই। সে আজ বহুদিনের কথা। তখন আমার বয়স হবে ১৭।১৮। আমরা তখন এখানে ছিলাম না। আমাদের খাস বাড়ী হ'ল পেশাবরী জেলার একটি গ্রামে। আমরা রাজপুত জাঠ (চাষা)। জাঠেরা খেত-খামারও করত সবাই। আবার সেপাইয়ে নামও লিখাত লড়াই লাগলে বা শওকসে (সখ করে)।

'গাঁয়ে 'মাদ্রাসা' (পাঠশালা স্কুল) ছিল। বাবা ভর্ত্তিও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু লেখাপড়ায় আমার মন ছিল না, যেতাম মাদ্রাসায় মাত্র। সামান্যই পড়েছিলাম। আমার সখ ছিল কুস্তিগীরিতে। সেকালে সব গ্রামেই গাঁয়ের সব জোয়ান-ছেলেরা আর বহুত বহুত বুঢ়াও নিয়ম করে কুস্তি করত। মস্ত কুস্তির 'আখাড়া' (আখড়া) থাকত। আর সেই বুড়োদের গায়েও কি জোর। গামা-কিকড়দের মত নাম করতে পারত যদি শহরে থাকত। তা সেকালে ত তারা গাঁয়েই থাকত নিজেদের ক্ষেত খামার নিয়ে। কেউবা লড়াই লাগলে সেপাই হ'ত। বাস, তাতেই তাদের জিন্দগী আর জওয়ানীর সুরু খতম হয়ে যেত। বাইরের দুনিয়ায় কেউ তাদের চিনত না। আমিও খুব কুস্তিবাজ হয়ে উঠলাম।

'এমন সময়ে লড়াই লাগল আফ্রিকায়—বুয়র যুদ্ধের। সে কবে, সাল তারিখ তবে আমার কিছু মনে নেই।'

কুমেদানজী হাসলেন, বললেন, 'সে সব লিখাপড়িকে বাত বাবুজী। আমি ত সবই পড়া-শোনা ভুলে গিছি। এক 'রামচরিত মানস' ছাড়া। এখন যেমন লড়াই লাগল রাজপুতানায় বহু রাজ দরবার থেকে বিলায়েতী রাণীর জন্যে লড়াইয়ের সেপাই-সৈন্য মজুর যুদ্ধের সাজ রসদ সরঞ্জাম যোগাড় করা আর পাঠাবার ব্যবস্থা হতে লাগল। জয়পুর উদয়পুর বিকানীর যোধপুর আদি সব রাজ্যেই সৈন্য সংগ্রহের ধুম পড়ে গেল। মজুত সৈন্য চিরকালই রাজাদের থাকত ট্রান্সপোর্ট বিভাগে। কিন্তু লড়াই লাগলে আরও লোক নেওয়া হ'ত এখনকার মতই।

'আমাদের গাঁয়ের সব জোয়ানরাই মেতে উঠল যাবার জন্য পুরানো বুড়ো সেপাইদের সঙ্গে। পেনসন পাওয়া বুড়োরাও আসতে লাগল, ডাক এসেছে তাদের।

'আমি বাপের বড় ছেলে। আমার নাম বীর সিং। কুমেদান আমার নাম নয়। বাবার খুব ইচ্ছে নয় আমি যাই। পাছে কিছু বিপদ হয়। কিন্তু যুদ্ধে গেলেই ত লোকে মরে যায় না। এই দেখনা—এখনও ত বেঁচে আছি। সে যুদ্ধ ছাড়া '১৪ সালের লড়াইয়ে গিয়েছি। এই দুসরা লড়াইয়ের গল্পও শুনেছি। কোন লড়াইয়েই ত মরিনি।

'কুমেদানজী আবার হাসলেন, বললেন, 'বিছানায় শুয়েই আমি মরব বাবুজী। তোমাদের মাঝে 'পোতা-পুতী' ছেলের সামনে। যাক, তার পর গাঁয়ের সব ছেলেদের দলের মত আমিও যাবার মত পেলাম যাবার জন্য।

'আবার বিপদ এল। একেবারে সমুন্দর পার দেশ নানান জাত যাবে। জাত কি করে থাকে? সেও আবার মিটল, লাখ লাখ সেপাই যাচ্ছে হিন্দুস্থান রাজস্থান থেকে। সবারির জাত থাকলে আমারও থাকবে। না হয় ফিরে এসে হরদোয়ারজী (হরিদ্বার) স্নান করে আসব। গেলাম শহরে সকলে মিলে। এগার টাকায়—সেপাইয়ে নাম লেখালাম। আমাদের গাঁয়েরই দশ বারো জন। তার পর শহরে দেখি কত জ্ঞাতি-কুটুমের ছেলে এসেছে নানা ঘর থেকে, বন্ধু-বান্ধবও কত এসেছে যে তার ঠিক নেই। বাঁচতে গেলেও মানুষের যেমন মানুষদল দরকার হয়, মরতে যাবার সময়ও দল থাকলে হিম্মৎ (সাহস) বাড়ে। অত লোক দেখে ভারি তেজ এল মনে আমাদেরও। সবাই না হয় এক সঙ্গেই মরব। এত লোক যাচ্ছে। তারাও মরতে বা জিততে যাচ্ছে!

চলল আমাদের দল। তখন কলকাতাই রাজধানী—দিল্লী নয়। কলকাতায় গেলাম আমরা সব। আমাদের দলের নাম হ'ল রাজপুত রেজিমেণ্ট না ইনফেনটী, কে জানে ভাইসব মনে নেই।

'কিন্তু লড়াইয়ের আমরা কি জানি? গড়ের মাঠের কেল্লায় তখন আমাদের আস্তানা হ'ল। কিছু শেখার পর পাঠাবে জাহাজে করে আফ্রিকা।

'কিছু ইংরেজী জানি না। কাকে বলে হোলট (হলট) লেফট রাইট ইংরেজীতে। আগে বারো—পিছে চল কোন লবজই (শব্দ) বুঝি না। দু'একটা ছেলের লেখাপড়া শেখা ছিল তারাই একটু বলে দিত। যে শেখাত সে একজন গোরা—সেও লোক ভাল ছিল। ভুল করলে বুঝিয়ে দিত আর হাসত। আসলে, পরে বুঝলাম আমাদের জওয়ানী চেহারাই তাদের ভাল লেগেছিল।

'মাসখানেক কুচকাওয়াজ করার পরে হুকুম এল। লড়াই বড্ড জোর লেগেছে—আরও জোয়ান সেপাই পাঠাও।

'তার পর একদিন জাহাজ ভর্তি হয়ে আমরা বোম্বাই থেকে যাত্রা করলাম। জাহাজে কত যে দেশ-বিদেশের সেপাই হিন্দু, মুসলমান, শিখ, নেপালী কত জাত, কত রকমের খানা-পিনার হাঙ্গামা আর বন্দোবস্ত সে আর কি বলব! ছুত আর জাত কোথায় তা জানি না। কিন্তু চাকি চুলা আলাদা করার জন্য সবাই ব্যস্ত। তা চাকি ত (জাতা) জাহাজে নেই, চুলা আছে। তাতেই হিন্দু আর শিখ-নেপালীরা একটু আলাদা টোকা করে নিত। তাতেই কি কম ঝামেলা—সবাই মাংস খায় না, মাছ খায় না। যে খায় সে আবার মুসলমানের টোকায় খাবে না। রাজপুত, শিখ, গুর্খা সেপাইরা আলাদা খাবে মাছ-মাংস। রসদ-কারেরা, বেনিয়া-শেঠ তারা—মোটেই ওসব খায় না, ছোঁয় না। জাহাজ ভরে কত রকমের যে কিচেন হল সে এক তামাসা বাবুজী। খাস আফ্রিকায় গিয়ে তার পর ত দেখলাম কোথায় জাত আর কোথায় জান। মান বাঁচলে ত জাত বাঁচবে। সমুন্দরে এক মাসেরও ওপর কাটিয়ে আমরা আফ্রিকায় পৌঁছে গেলাম।

কুমেদানজী আবার তামাকের নলটি নেন বন্ধুর হাত থেকে। যেন সিনেমার মধ্য বিশ্রাম সময়। সবাই চুপ করে বসে। অন্ধকার ঘোর হয়ে গেছে। কুমেদানজীর গৃহিণী বেঁচে নেই। এক পুত্রবধূ এসে দু'বাটি চা দিয়ে গেল দুই বৃদ্ধের সামনে এনামেলের বড় সেকেলে কাপে করে। চা খাওয়া হ'ল। ঈষৎ হেসে কুমেদানজী বললেন, 'ইয়ে নিশা ভি উসি বখত কা (এ অভ্যাসও তখনকার)।' তার একটু পরে এল চকচকে মাজা ঘটিভরা এক ঘটি ভাঙ বা সিদ্ধি সবুজ রঙের, ঠাণ্ডাই বাদাম-পেস্তা মেশানো। সেটা আনল আর এক বৌ। পাশে রাখা রইল। দুই বন্ধু বা আরও কেউ কেউ পরে খাবেন।

'তার পর আমরা কুচকাওয়াজ করতে করতে লড়াইয়ের জায়গার দিকে যেতে লাগলাম। দেশের গাঁয়ের নামটাম আমাদের আর কিছুই মনে থাকত না। আজ এখানে কাল সেখানে, শুধু চলা-ফেরা করতে করতে এলাম ঠিক যেখানে লড়াই চলছে তার একটু দূরের এক গাঁয়ে।

একজন ছেলে বললে, দেশটা কি রকম কুমেদানজী? খুব বাঘ ভালুকের সাপের নানান জানোয়ারের দেশ? বন-জঙ্গলও খুব?

কুমেদানজী হাসলেন, বললেন, 'বাবুজী, জঙ্গল ত আমাদের দেশেও কম নেই। জঙ্গল আমাদের কাছে নয়া বাত নয়। আর শের সাঁপ ভালুও আমাদের দেশে আছে বহুত। আসল ভয় ত দুষমনকে। আমরা দুষমনের সঙ্গেই লড়াই করতে গিছি। এরা জানোয়াররা দুষমন হলেও মানুষের চেয়ে বেশী দুষমন নয়। জঙ্গলেই লুকিয়ে থাকে। মানুষকে ভয়ই পায়। তবে হাঁ, জঙ্গল খুব। আসামের জঙ্গল দেখেছ বাবুজী? নদী-বন পাহাড় ঝরণা-ভরা হিমালয়ের জঙ্গলও ত দেখে থাকবে। তেমনি জঙ্গল-ভরা দেশ।

'কখনো পাহাড়, কখনো বড় ভারি নদী পাড়ে, কখনো লোক-বসতিময় গাঁয়ে আমাদের ছাউনি হ'ত। তবে শের বা সাপ যে কখনো দেখি নি তা নয়। ঝরণা বা নদীর ধারেই ছাউনি হ'ত। সেপাইদের জল ত চাই। আবার জলের দরকারও সব জানোয়ারেরই। তাই মাঝে মাঝে শেরের পায়ের ছাপ চোখে পড়েছে। আওয়াজও কানে এসেছে। সাপও দেখেছি গাছে ঝুলতে, বনে পালিয়ে যেতে। ঐ হাজার হাজার সেপাইয়ের ছাউনির গোলমালে তারা কি আর সামনে থাকত, সব পালিয়ে যেত। তবে আমরা জলের ধারে একলা যেতাম না, পাঁচ-সাত জন দল হয়ে যেতাম।

'কেননা একবার খুব একটা আপশোষের ঘটনা ঘটেছিল। আমাদেরই অন্য এক রেজিমেণ্টের একটা জোয়ান লেড়কা কারুকে সঙ্গে না নিয়েই সন্ধ্যের পর একটা নদীর দিকে গিয়েছিল। তার পর রাত্রে যখন ছাউনিতে লোক গুণে নেওয়া হয়, তখন আর নাম ডেকে, নম্বর ডেকে তাকে পাওয়া গেল না। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল হৈ হৈ করে। তখন ত ভাইসাবরা জানেন, না ছিল টর্চ, না ছিল ভাল ভাল আলোবাতি। মশালচীরা আলো দেখাত মশাল জেলে। ছোট ছোট লালটেমও (লণ্ঠন) থাকত। যতদূর পারা যায় খোঁজা হ'ল নদীর পাড়ে পাড়ে, পাওয়া গেল না। ফিরে এলাম।

'সাহেব হুকুম দিলেন, সকালে খুঁজো। সকালবেলা দূর জঙ্গল থেকে কাঠুরেরা আসত রান্নার জন্যে কাঠ দিতে। তারা খবর দিলে একজন সিপাহীর পাগড়ী তারা দেখেছে বনের মধ্যে। আর এক দল খবর দিলে তার পর—একটু গভীর জঙ্গলে তারা একজনের দেহটা আধ-খাওয়া অবস্থা দেখতে পেয়েছে।

'সবাই আমরা গেলাম। সাহেবও গেলেন ঘোড়ায় চড়ে। তাকে নিয়ে আসা হ'ল ছাউনিতে শেষ কাজ করার জন্যে। খুব আফশোষ হ'ল সকলের। সেই থেকে আমাদের একলা বেরুতে বারণ করে দিলেন সাহেব। চার-পাঁচ জন লোক আর আলো

ছাড়া যাওয়া চলবে না কোথাও দিনে ও রাতে। দিনেও ত সাপ ভালু বেরুতে পারে।

'কিন্তু বাবু শের-সাপের হাতে না হয় দশ-পাঁচ জন গেছে। কিন্তু লড়াইয়ে? হায় হায় বাবুজী, কত জন, কত ঘর, কত গ্রামের সব জওয়ান শেষ হয়ে গেছে তাও ত দেখলাম।

'এখন শোন, আস্তে আস্তে এখান-ওখান জায়গা বদল আর কুচকাওয়াজ করতে করতে লড়াইয়ের বহুত রকম কায়দা-কানুন শিখতে শিখতে এক জায়গায় পৌঁছলাম। সেটা শুনলাম খুব ভারি বড়া সাহেবের ছাউনি।

'আমরা খানিকটা তখন ইংরেজী লবজ (শব্দ) বুঝতে শিখেছি। সাহসও খুব বেড়েছে মনে। খাস লড়াইয়ের জায়গায় পৌঁছাই নি তখনো যদিও, তবু ভারি 'সওক্‌' (সখ) লড়াই করবার। আজকে আমাকে দেখছ কুঁজো হয়ে গেছি, বুড়ো হয়ে গেছি। তখন আমার যেমন ছাতি, তেমনি লম্বা ছিলাম 'ছ'ফুটেরও বেশী। রাজস্থানী দাড়ী-মুচ (গোঁফ) পালপাট্টা করে বাঁধা। অনেকেই ভাবত শিখ। এখনকার মত তখনও লড়াইতে শিখদের কদর খুব বেশী জান ত। কিন্তু রাজপুতেরাও ত কিছু কম হিম্মতি লড়াইবাজ নয়। রাজপুতরাও জঙ্গীজাত চিরকাল ছিল। তখন রাজারা সর্দ্দাররাও সব লড়াইয়ে যেত। এখনকার রাজাদের মত ঘরে বসা রাজা নয়। শুধু সেপাইরা মাহিনাদাররা মরতে যাবে, লড়তে যাবে এমন লড়াই আগের কালে ছিল না। মোগল-বাদশারা, রাণা প্রতাপ, শিবাজী সবাই লড়েছেন।

'এখন আমরা ত নতুন বড়া সাহেবের ছাউনিতে পৌঁছলাম। লাল লাল মুখ অনেক গোরা সাহেব চারদিকেই দেখছি কালো কালো নানাদেশী সেপাইয়ের সঙ্গে। আগে কখনও অত সাহেব একসঙ্গে দেখি নি। বেশ একটু ভাবনা হ'ল, তাদের জবানও ত বুঝি না। তাদের কাছে কাজ করতে হলে কি মুশকিলে পড়ব হয় ত। কুচ-কাওয়াজ করি আর কথা শেখবার উমেদ করি (আশা) আর ভয়ও পাই। তবু কোশিস (চেষ্টা) করি।

'হঠাৎ আমাদের ছাউনির সাহেব ডেকে পাঠালেন, আমাদের রেজিমেণ্টের বাছা বাছা ছাতিওয়ালা লম্বা চেহারার জোয়ানরা এলো। ধরমসিং, মানসিং, ইকবাল সিং, আরও দু'তিন জন, আর আমিও ডাক পেলাম। এখন তারা ত মাদারসা-পালানো ছেলে ছিল না। শহরের স্কুলে একটু-আধটু পড়েছিল। আমিই একদম গাঁওয়ার (গেঁয়ো) ছিলাম। আমার ডাক আসাতে আমার যেমন ভয় হ'ল, তেমনি খুশীও এল মনে, গেলাম।

'তখন আমার চেহারা খুব ভাল ছিল জওয়ানীতে। বেশ গোরা রঙও ছিল। দাঁড়ালাম সাতজন সেলিউট করে। আমিই সবচেয়ে জোয়ান।

'বড়া সাহেব ছোট সাহেব সকলে দেখতে লাগল' আমাদের কাছে এসে।

তার পর ছোট সাহেবকে বড়া সাহেব কি বললে। ছোট সাহেব আমাদের বললেন, আচ্ছা ভাই সব, আজ থেকে তোমরা সাত জন বড়া সাহেবের খাস বডিগার্ডে বহাল (নিযুক্ত) হলে। সাহেবের তোমাদের ভারি পছন্দ হয়েছে। দেখ যেন হিম্মতসে কাম করো। আমাদের শেখানোর বদনাম না হয়। সব সময়ে সাহেবের পিছে সাহেবের শরীর সামলাতে হবে। এমনকি আপনা জান দিয়েও।

'আমরা সকলে আবার সেলাম করলাম, এবার মিলিটারী ধরনের নয়—রাজপুত ধরনে মাথা নিচু করে।

'চারদিকের বড়া ছোট' নীল নীল চোখওয়ালা সাহেবেরা ভারি খুশী—ঐ সেলাম করা দেখে।

'এরা কিন্তু ইংরেজী ভাল জানে না বলে আমাদের ছোট সাহেব একটু হাসলেন। বড়া সাহেবের বয়স খুব কম, খুব সুন্দর চেহারা। খুব জোয়ান লম্বা। আর কি রূপ! যেমন রঙ তেমনি মুখচোখ। নীল চোখ লালচে চুল হাসিভরা মুখ।

'সেই বড়া সাহেব এসে আমাদের পিঠ চাপড়ে হেসে বললে—দেখলাম একটু হিন্দী জানে। বললে, ইয়েস মেরা বডিগার্ড টুমলোগ। অল রাইট। ঐটুকু বলে তার পর ইংরেজীতে বললে, কিছু ভয় নেই আমিই শিখে নেব তোমাদের কথা। ভারি জোয়ান বডিগার্ড মেরা। আন্দাজী ইংরেজী বুঝি তখন।

'বডিগার্ডের কাজ সুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে থাকি। এখানে-ওখানে সর্ব্বত্র হাওয়ার মত সাহেবের সঙ্গে যাই। সাহেব যখন খানা খায় তাঁবুর বাইরে থাকি। যখন ঘুমোয় তখন সোজা সঙ্গীন উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকি তাঁবুর চারদিকে চার জন করে।

'লড়াই আমাদের করতে হয় না। অর্থাৎ তখনও করতে হয় নি।

'হঠাৎ একদিন খবর এল জোর লড়াই সুরু হবে কাছাকাছি এক জায়গায়। নাম-ধাম ঠিকানা বলা ত মিলিটারী নিয়ম নয়, বললেই বা কি বুঝতাম। তামাম ছাউনি উঠিয়ে দেবার হুকুম এল। রসদখানা মজুর-কুলী দল যারা নানারকম কাজ করে জখমী-জিন্দা, মুর্দ্দা সহন করে, তাঁবুর খোঁটা পোঁতে, ঠেলায় করে খাবার মাল নিয়ে যায় এখান থেকে ওখানে। ঘোড়া খচ্চর রেশলো সহিস সব রাতারাতি উঠে পড়ে—চলা বাঁধা সুরু হয়ে গেল। এক কথায়, ছাউনি আবার চলতে সুরু হ'ল।

নদী পার হই, জঙ্গল পার হই, ছোট ছোট ডুঙ্গরও (পাহাড়) পথে পড়ে ঘিরে ঘুরে চলে যাই। দু'দিন তিনদিন ধরে চলি। চলন্ত ছাউনিতেই এক আধবার থেমে বাটীয়া (বাটীরমত মোটা রুটী গোল গোল ঘুতের সেঁকা) ডাল, চাপাটি যেদিন যা হয় খেয়ে সব চলি। প্রায় একবারই খেতে পাই তিন চারটার সময়।

'তার পর এক সময় শুনলাম তাঁবু গাড়ো। একটা ছোট মত টিলার নীচে ছাউনি পড়ল। কাছে বনের মাঝে ছোট্ট একটা নদী ছিল। জলের বড় কষ্ট হ'ল। অত লোক ছাউনিতে।

যাই হোক বাঁকে করে মজুররা জল আনতে লাগল খাওয়ার, রান্নার, সাহেবের গোসলের।

'কি জাত—কে জল দেয়—বাবুজী, সেই দিন মালুম হ'ল লড়াইয়ের সময় জাত-পাঁত কিছুই থাকে না। পিয়াস লাগলেই পানি পিই বেই আমুক জল। আর ভুখকে বখত রুটীটা ঝুট খাই আপনাদেরই লোকজনের টোকায়।

'ডুঙ্গরের' পাহাড়ের আড়ালে—এপারে আমরা, দূরে ওপারে নাকি দুষমনদের ছাউনি পড়েছে।

'দিনের আলো ফুটল। সব চুপ-চাপ কাজ করার হুকুম হ'ল। জঙ্গলে জঙ্গলে লুকিয়ে রাঁধ, খাও, শোও। আওয়াজ না হয়, দেখা না যায়। আর সাহেবরা জন-তিনেক ছিলেন—শুনলাম আরও সেপাই রেজিমেণ্ট আসছে। তাঁরা সাহেবরা সেই ছোট্ট পাহাড়ের উপর চড়ে প্রায় শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলেন দূরবীন দিয়ে কোথায় শত্রুদের ছাউনি পড়েছে। কত বড় দল তাদের জমায়েত হয়েছে।

'সবাই আপসমে বলেন, তারাই আসুক, আমরা এগোব না। আবার কেউ বলেন, একেবারে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া যাক।

'কিন্তু লড়াইয়ের ত কানুন আছে। কেউ বলে, আগে বাড়ো। কেউ বলে, চুপচাপ থাক—আগে ওরা আসুক, তখন পড় ওদের ঘাড়ে। যে যা বোঝে তাই বলে।

'সবাই বলাবলি করলে আমাদের—সাহেব নাকি ভারি জঙ্গী সাহেব। আবার বিলায়েতের কোন্ জঙ্গী লাট সাহেবের ছেলে উনি।

'তিনি চুপ করেই থাকেন। শুধু দূরবীন দিয়ে দেখেন আর 'শলা' করেন। দু'দিন গেল। হঠাৎ খবর এল আরও একজন সাহেব আসছে পাঞ্জাবী ভারি ছাউনির আমাদের 'সাহারা' (সাহায্য) করবার জন্তে। 'ডোগরা' রাজপুত ছাউনির সৈন্তও আসছে আর এক সাহেবের সঙ্গে।

'খবরে ভারি খুশী আমাদের সাহেব। জোর লড়াই হবে এবারে, নিশ্চয়ই ফতে (জয়) হবে। তার পর শুনলাম, সেই রাত্রেই লড়াই সুরু হবে। আমাদের উপর হুকুম হ'ল সব ঠিক থাক সাহেবের হুকুমের অপেক্ষায়।

'সবাই হুঁসিয়ার হয়ে আছি। রাত যখন দুটো, মনে হচ্ছে ওদিকেও ছাউনিতে কেউ জেগে নেই, আর আমাদেরও সব ঘুমে ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

'আমাদের সাহেব সব সৈন্ত ভাগে ভাগে নিয়ে আর আমাদের বডিগার্ডদের নিয়ে টিলার উপর চড়ে দূরবীন দিয়ে কি দেখতে লাগলেন কে জানে। হঠাৎ বললেন, দুষমন এগিয়ে আসছে। অন্ধকার রাত, নিচে শুধু জঙ্গল, কিছুই দেখতে পাবার জো নেই, কি করে কি দেখতে পেলেন কে জানে। কথা বলে না, যে সেই বিল্লি কা সা খোপরী, কুত্তা কা সা কান—মানে, বেড়ালের মত মাথা (চতুর) কুকুরের মত কান (সতর্ক)। লড়াইয়ে কাপ্তেন-দের তাই হতে হয়। (অবশ্য কথাটি বলেছিল রাজপুতরা অন্ত অর্থে। সে কথায় কাজ নেই আমাদের)। সাহেব দেখেছেন নিচে থেকে একটা জমাট অন্ধকার এগিয়ে আসছে। কানাকানিতে সে কথা শুনতে পেলাম।

'হঠাৎ শুনি, দুম দুম দুড়ুম দুম করে তোপের আওয়াজ নিচে থেকে। আর আমাদের সেপাইদের উপর হুকুম হয়ে গেল শুয়ে পড়—টিলার নিচের ঢালু জায়গায়। হাঁটু গেড়ে আমাদের তোপে আগুন দাও সাবধানে। ওরা নিচে, আমরা উঁচুতে, আমাদের চেয়ে ওদের সেপাইদের জখম হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ওরা এখনও জানে না আমরা ঠিক কোথায় রয়েছি।

'আমরা সাতজন সাহেবের পিছনে পাশে দাঁড়িয়ে আছি স্থির হয়ে, কিন্তু কি করতে হবে কিছু জানি না। কোন হুকুম আমাদের জন্ম সাহেব তখনও দেন নি।

'হঠাৎ একটা লাল রং-এর বড় গোলা খুব উঁচুতে উঠে আমাদের ডুঙ্গরের একেবারে সৈন্তদের সামনে পড়ল···। সাহেব একটু পেছিয়ে গেলেন। সামনের সারির সেপাই—তোপের সেপাইরা কিছু জখম হ'ল, কিছুর জান গেল। আমাদের তোপও জবাব দিলে দুড়ুম দুড়ুম করে। সেই আলোয় ওদের ফৌজদের জমায়েত অনেক দূর অবধি দেখা গেল।

'আমরা কাঠের সেপাইয়ের মত দাঁড়িয়ে আছি। ভাববার ক্ষমতাও যেন নেই, কি হচ্ছে, কি হবে, মরব না বেঁচে থাকব। কিন্তু ভয় নেই ভরসাও নেই। যেন যন্ত্রের মত সাহেবের পাশে খাড়া হয়ে আছি। সাহেব শুধু হুকুম দিচ্ছেন, তোপ ছাড়তে—এদিকে ওদিকে বুঝছেন যেখানে।

'কিন্তু এবারে আমাদেরই তোপের আগুনের আলোয় তাদের কাপ্তেনও দেখতে পেয়েছে আমাদের। সব চুপচাপ। যেন থেমে গেছে সব।

'হঠাৎ আরও জোর একটা আলো হ'ল। মস্ত একটা লাল গোলা এসে আমাদের খুব কাছে পড়ল। আমাদের সামনের সারির অনেক সেপাই জখম হ'ল জানও গেল। আমাদের গায়ে মাথায় গোলার গরম কুচি লাগল। কিন্তু জখম হই নি কেউ।

'আমি সাহেবের পাছেই ছিলাম। হঠাৎ সাহেব আমার হাতটা জোরে চেপে ধরে আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে ইংরেজীতে বললেন, ও গড। বীর সিং, ভারি চোট লাগা।

'অন্ধকার ঘুটঘুটে। আলোর চিহ্ন নেই। কোথায় চোট লেগেছে, কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। আমরা তিন-চার জনে তাঁকে ধরে নিলাম।

'আবার একটা গোলা লাল হয়ে উঠল আকাশে। সেই আলোতে দেখলাম সাহেবের মুখ সাদা হয়ে গেছে মূর্চ্ছার মত। আমার গায়ে হেলানো তাঁর কাঁধটা ভিজে শপ শপ করছে। বুঝলাম কাঁধে চোট লেগেছে ভিজেটা রক্তের।

'পিছন থেকে আরও সেপাই আর ছোট সাহেব অন্তদিক থেকে

উঠে এল—কে জখম হ'ল কত জখম হ'ল দেখতে। ছোট সাহেব দেখেই বুঝতে পারল ব্যাপারটা। সে সাহেবকে ধরে নিল পিঠ থেকে। কষ্টে আচ্ছন্ন ভাবে বড়া সাহেব আর একবার 'ও গড' বলে বললেন, বীরসিং 'কমাণ্ড' কর। লড়াই ছোড়ো মৎ।

'আমি ছোট সাহেবের দিকে তাকালাম। তখনও সাহেবের শরীর আমার কাঁধের উপর ভার দিয়ে রয়েছে।

ছোট সাহেব আস্তে আস্তে বড় সাহেবকে আমার কাঁধ থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, ইয়েস—তুমি কামাণ্ড কর। যতক্ষণ তোপরা রেজিমেণ্টের কাপ্তেন সাহেব না আসে। আমি বড়া সাহেবকে নিয়ে নিচে নাবছি।

'আমাদের সব বডিগার্ডরা আর ছোট সাহেব কি ভাবে নিচে সাহেবকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে গেল, আমার দেখবার সময় নেই।

'এদিকে লড়াই জোর চলছে'। আবার ওদের তোপ চলল। আমাদের দল একটু যেন থেমে গেছে।

'আমি কমাণ্ড (হুকুম) করলাম। কি করে আমাদের সেপাইরা তোপ ছুড়ল, কি করে ভোর অবধি লড়াই হল, দুষমনেরা পিছে হটে গেল, কেমন করে তাদের দিকের বহুত জান মালোয়ার নুকসান (লোকসান) হ'ল কিছু জানি না। আমি শুধু হুকুম করে চলেছি, আর গজব (আশ্চর্য) এই যে আমার হুকুম সবাই শুনেছে।

'ভোরের শেষে আমরা নাবলাম। মনের ভিতর কোথায় যেন বড়া সাহেবের কথা জেগেই ছিল। নাববার সময় আর অন্য দিকে না তাকিয়ে একেবারে দূরের ছাউনির কাছে চললাম। সাহেবকে একবার দেখব। বেঁচে আছেন ত! কোথায় চোটটা লেগেছে। তাঁবুতে ঢুকব ডাক্তার বকবে না ত? কিন্তু আমি ত বডিগার্ড।

'তাঁবুর সামনে দু'চার জন নূতন আর পুরানো সেপাই ছিল। সবাই চুপচাপ। আমি আর কাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করতেও পারলাম না, যেন ভয় হচ্ছে—খারাপ খবর দেবে। হায় বাবুজী! খারাপ খবরের আগে এইসাই হয়।

'তাঁবুর দরজা ঠেলে খুব আস্তে ভিতরে গেলাম, দেখলাম, সাহেব শুয়ে আছেন বিছানায়। সাহেবের চেহারা সাদা কাগজের মত হয়ে গেছে। বাঁ দিকের কাঁধের ব্যাণ্ডেজ লাল হয়ে আছে রক্তে। ছোট সাহেব আর আমাদের ছাউনির ডাক্তার সাহেব পাশে বসে।

'বেঁচে আছেন, না নেই কিছু বুঝতে পারলাম না। চোখে জল এল। ছোট সাহেব ইশারা করলেন বেরিয়ে যেতে।

'চুপচাপ বেরিয়ে এলাম। তখন জোয়ান বয়স, মনের সব প্রীতি দিয়ে সাহেবকে ভাল লেগেছিল। খাতির করতাম। আমাদের রাজপুতের ইমানদারীর চিরকালই খুব নাম। তার জন্যে জান দিতে পারতাম, সাহেবও খানদানী ঘরের ছেলে ছিলেন বোধ হয়, তেমনি ভাল ব্যবহার করতেন। আমার আঁখ থেকে আঁসু (অশ্রু) পড়তে লাগল। তাঁর শেষ কথা—বীরসিং কমাণ্ড কর। শুনলাম আর কথা বলেন নি।

শ্রোতারা নিঃশব্দে বসে আছে, কোন প্রশ্ন নেই মুখে।

কুমেদানজী একটু চুপ করে রইলেন, তার পর বললেন, 'আজও যেন সব ছবির মত মনে আছে। তার পর সাহেবকে শেষ দেখবার জন্য আমরা ইনাজত (অনুমতি) নিলাম। তখন তিনি নেই। 'চেত' আর ফিরে আসে নি।

'বুকের উপর আড়াআড়ি হাত দিয়ে তাঁকে শুইয়ে রেখেছে। আমরা সব সেপাইরা বডিগার্ডরা তাঁকে বহন করে নিয়ে চললাম। কফন (কফিন) বানানো হ'ল কি করে কে জানে।

মিটি (মাটি) দেওয়া হ'ল একটু দূরের এক জায়গায়—যেন শত্রুরা দেখতে না পায়। তখন ত এখনকার মত 'হাওয়াই জাহাজ' হয় নি—এখনকার মত দাওয়াইও ছিল না সুই দিয়ে (ইনজেকসন) যে দেশবিদেশে আপনা আদমীর শরীর নিয়ে যাবে যতদিনেই হউক ঠিক থাকব মুরত।

'তখন ছোট-বড়া সাহেব হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শেষ কাজ যেখানে জান যেত সেখানেই করত সবাই। পাদরী ব্রাহ্মণ মোল্লার কাজও করা হ'ত।

'মাটি দেওয়া হ'ল। সকলেরই মন উদাস চোখে আঁসু। যদিও সবাই বুঝতে পারছি হয়ত কালই আমাদেরও জান যাবে। হয়ত আর ফিরব না দেশে। সাহেব দু'দিন আগে গেছে মাত্র। তবু···। মাটির জায়গায় একটা কাঠের খাম্বার (থাম) মত কাঠ লাগিয়ে ক্রশ বানিয়ে একটা নিশানা করে রাখলেন ছোট সাহেব। বললেন, জিত হলে কখনও ছত্রি (সমাধি) বানিয়ে দেওয়া হবে নামটাম লিখে।···

'সেই থেকে আমাকে আমার দলের সেপাইরা কমাণ্ডারজী বলত। আর এখানকার দেশোয়ালী মানুষের মুখে আমি ক্রমে কুমেদানজী হয়ে গেলাম।

'এই আমার কুমেদান নামের কাহিনী।'

কুমেদানজী তামাকের নলটা নিলেন বন্ধুর কাছ থেকে। তখন কল্কে একেবারে হিম। এক নাতি গিয়ে তামাক সেজে আনল। ভাঙের ঘটী থেকে খানিকটা সিদ্ধি পান করলেন দুই বৃদ্ধ।

ছেলেরা উঠবে কিনা ভাবছে। একজন বললে, 'আর লড়াইতে যান নি আপনি? কবে ফিরলেন সে সময়ে?'

'লড়াইতে গিয়েছি বই কি। তখন কিছু দিন বাদে যখন যুদ্ধ মিটে গেল, ফিরলাম। কিন্তু সেপাইতে নাম ত ছিলই। আবার ডাক পড়ল ১৯১৪ সনের ভারি লড়াইয়ে।'

তখন লড়াই অন্য রকম হয়েছে আগের মত নয়। আমিও বিয়ে করেছি, একটু বয়স হয়েছে—জোয়ানের সে তেজ হিম্মৎ আর নেই। মরবার ভয় হয়েছে। তবু লড়াইয়েতে ছিলাম। কিন্তু আর কোন দিন অমন ভালো সাহেব দেখিনি।

'তার পর পেনসিল (পেন্সন) হয়ে গেল। আবার যে ভারি

লড়াই হ'ল '৩৯ সনে তাতে আর আমায় ডাকে নি। ছেলেরা গিয়েছিল।'

কুমেদানজী তামাক খাচ্ছেন। শেয়াল ডাকল 'হুয়াহুয়োই' কেল্লার ও-পাশ থেকে—সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরের দল গাছের ওপর থেকে কেকা (ক্যাঁও) রব করে উঠল—এ-গাছ থেকে ও-গাছ, অন্য গাছ থেকে কেকা স্বর তরঙ্গ বয়ে গেল যেন—শেয়াল ডাকল কেন—কেন—কেন? বলে চিন্তা বেরিয়েছে?

ছেলেরা কেউ কেউ উঠল।

... ...

কিন্তু কুমেদানজী যেন আরও কিছু বলবেন মনে হ'ল সবারই। কে গেল কে না গেল সে দিকে না দেখেই তিনি হাতের নলটি বন্ধুর হাতে দিয়ে বললেন, 'প্রথম লড়াইয়ের পর তার পর কত দিন গেল। রাজার কি কাজে আমরা দিল্লী গেলাম। আমার এক সেখানকার দোস্ত বললে, ভাই চল এক জায়গায়। শুনছি আমাদের লড়াইয়ের তসবীর দেখাচ্ছে কাপড়ের পর্দ্দায় এক বিলায়েতী কম্পানী। চল দেখে আসি। বহুত লোক দেখে ভালো ভালো বলছে। বাইস কোপ নাকি কি বলে তাকে।

'গেলাম জনকয়েক। কত সব দেশবিদেশের ছবি দেখালে। পিলেগের (প্লেগের) তসবীরও দেখালে রাক্ষসের মত।

'তার পর দেখালে এক ভারী-বয়সের সাহেবের ছবি। তিনি পিছন ফিরে যেন বলছেন, কি? রব ইজ ডেড? (রব মর গিয়া?) তখন লেখা তসবীর। কথা বলত না।

'আমার দোস্ত ইংরেজী একটু জানত, বললে, ভাই এই সাহেব আমাদের সেই সাহেবের বাপ। জঙ্গী লাট তখনকার। ছেলের হঠাৎ খারাপ খবর পেয়ে—চমকে উঠে বলছে—কেয়া 'রব' মর গিয়া?'

'রবট সাহেব নাম ছিল না আমাদের সাহেবের? (রবার্ট)

'তসবীর শেষ হ'ল। আমরা ফিরে এলাম।

আজও সেই বুঢ্ঢা সাহেবের তসবীর আর আমাদের সাহেবের মুখ কিন্তু আমার ইয়াদ আছে।

... ...

'যাও বাবুজী রাত হ'ল অনেক। এইবার ধরতি (ধরিত্রী) একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।'

অন্বীক্ষণ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অরণ্যবীথিকা,
চলিয়াছি পল্লীপথে শুব্ধতার আবেষ্টনী মাঝে।
এদিকে ওদিকে অতীতের ক্ষীণ স্মৃতিশিখা রাজে।
হারায়েছে হেথা কত জীবনের মধুর গীতিকা!
ইতিহাস ঘুমায়েছে ভূমিগর্ভতলে:
ভাসে অশ্রুজলে
পাদপেরা লতাগুল্মপাথে।
ভগ্নসৌধ, শূন্যবাপী, লুপ্ত পর্ণগৃহ—শুধু বন!
কালের আঘাতে
অশরীরী আত্মাদের আনাগোনা চলে অনুক্ষণ।

কে করে সন্ধান
ফণি-মনসার ঝোপে ঢাকা ক্লিন্ন-পাষাণ-ফলক!
মাথার ওপরে ওড়ে অগণিত চিল আর বক,
বিষণ্ণ চেতনা জাগে উদাস বাতাসে—কাঁদে প্রাণ।
কত না উপলখণ্ড কাননে লুকায়
দিন চলে যায়
বেদনার রেখা টেনে টেনে।
পথ যেন শব সম আছে পড়ে। দীর্ঘশ্বাস বহে।
বক্ষে তীর হেনে
কালব্যাধ লুকায়েছে, হতপল্লী ছায়া ঢাকা রহে।

যে-প্রেম মিলন লাগি
হেথা এসেছিনু মোর মানসীর ডাকে
একদিন,—কেমনে ভুলিব তাহা? ক্লান্ত দুটি আঁখি।
সে আজ কোথায় থাকে!
মোর জীবনের সব গ্রন্থি-ডোর দিয়েছিল সে যে,
আজ কেন বিষাদের সুর ওঠে বেজে!

মন্দিরময় ভারত—গুহামন্দির

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

এলোরা

একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে শুধু এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়েছে, বুকে নিয়ে আছে মন্দিরটি দ্রাবিড় শিল্পের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যেরও। চারিদিকের বেষ্টনী থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৈলাস, এক মহামহিমময় মূর্ত্তিতে। তিনদিকে পাহাড়ে বেষ্টিত হয়ে আছে অন্য গুহামন্দিরগুলি।

প্রশস্ত আর সুউচ্চ এই মন্দিরের সর্ব্বনিম্ন তলা, সেখানে সারি সারি হস্তী, সিংহ ও ব্যাঘ্র দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন আর বিচিত্র তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গি! কেউ নিযুক্ত যুদ্ধে, কেউ অপরকে দংশন করতে।

তাদের উপর একটি অতি প্রশস্ত কক্ষ (সভাগৃহ) নির্ম্মিত হয়েছে। শোভিত সেই সভাগৃহ, সুষ্ঠু-গঠন ষোলটি অপরূপ স্তম্ভ দিয়ে। সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম তাদের অঙ্গের শিল্পসম্পদ, জীবন্ত তাদের শীর্ষদেশের মূর্ত্তিসম্ভার, মূর্ত্তি দেবদেবীর। উৎকীর্ণ হয়েছে আরও অনেক ক্ষুদ্র স্তম্ভ প্রাচীরের গাত্রে, অঙ্গে নিয়ে অনবদ্য অলঙ্করণ, শীর্ষে নিয়ে দেবদেবীর মূর্ত্তি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। তার দুই পাশে দুইটি অলিন্দ, অনুপম তাদের অঙ্গের কারুকার্য্য। প্রবেশদ্বারে রচিত হয় তোরণ, শোভিত সেই তোরণ জোড়া চন্দ্রাতপ দিয়ে। মূল মন্দিরের সঙ্গেও একটি আচ্ছাদিত তোরণ সংযুক্ত হয়েছে। সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম তাদের অঙ্গের অলঙ্করণও। তোরণের দুই পাশে প্রাচীরের গাত্রে খোদিত হয়েছে বৃহৎ, সুন্দর, শোভন-গঠন মূর্ত্তির সম্ভার—মূর্ত্তি কত দেবদেবীর।

মূল মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে একটি সুপ্রশস্ত মঞ্চের কেন্দ্রস্থলে, বেষ্টিত হয়ে আছে পাঁচটি ক্ষুদ্র মন্দির দিয়ে। মহামহিমময় এই পরিকল্পনা। এই মন্দিরের স্থপতির কল্পনা, পেয়েছে পূর্ণ পরিণতি, লাভ করেছে শ্রেষ্ঠ রূপ, তাই লাভ করেছে এই মন্দিরটি শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের দরবারে।

দু'শ ছিয়াত্তর ফুট দীর্ঘ, একশ চুয়ান্ন ফুট প্রস্থ একটি সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে। রচিত এই প্রাঙ্গণটিও একটি সম্পূর্ণ পাহাড় কেটে। পিছনে একটি একশ সাত ফুট উঁচু পর্দা রচিত হয়েছে সম্মুখেও পাহাড় কেটে রচিত হয়েছে অনুরূপ একটি সুবিশাল পর্দা। তার অঙ্গে সুবৃহৎ মূর্ত্তি, খোদিত হয়েছে মূর্ত্তি শিবের আর বিষ্ণুর। কেন্দ্রস্থলে একটি দীর্ঘ অলিন্দ, তার দুই পাশে প্রকোষ্ঠ।

অলিন্দ অতিক্রম করে, আমরা একটি মহামহিমময়ী গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি দেখি। লক্ষ্মী বসে আছেন একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর, সঙ্গে নিয়ে দুইটি হস্তী, দেবীর বাহন।

প্রাঙ্গণে ফিরে এসে, প্রাঙ্গণ অতিক্রম করি। দেখি, সামনের দিকে, দুই প্রান্তে দুইটি বৃহৎ হস্তী দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ, জীবিত এই হস্তীমূর্ত্তিগুলি, শোভা করে আছে দক্ষিণ আর উত্তর প্রান্ত। রক্ষী তারা মন্দিরের।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে আর একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হই। দৈর্ঘ্যে একশ' চৌষট্টি ফুট, প্রস্থে একশ' নয় ফুট এই প্রাঙ্গণটি, বুকে নিয়ে আছে মন্দির। সম্মুখে মন্দিরের দিকে মুখ করে, সুউচ্চ মঞ্চের উপরে বসে আছেন নন্দী (বৃষভ), দেবতার বাহন। একটি সেতু দিয়ে মণ্ডপটি সংযুক্ত হয়েছে মন্দিরের সঙ্গে। মণ্ডপের দুই পাশে, দুই পঁয়তাল্লিশ ফুট উঁচু ধ্বজস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ষে নিয়ে ত্রিশূল। সেতুর নীচেও দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখি। কালভৈরবরূপী শিবের মূর্ত্তি, রোষদীপ্ত তাঁর আনন, বিস্ফারিত অক্ষিতারকা, শায়িত তাঁর পদতলে, সপ্তমাতা। মূর্ত্তি মহাযোগীরও, সঙ্গে নিয়ে দেবগণ ও মুনি-ঋষি। মহিমময় এই মূর্ত্তি দুইটি।

সেতুর দুই পাশে সোপানের শ্রেণী, উপনীত হয়েছে সুপ্রশস্ত সভাগৃহে। সোপানের প্রাচীরের গাত্রে, দক্ষিণ দিকে, খোদিত বিভিন্ন মূর্ত্তি। মূর্ত্তি দিয়ে রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনী, হনুমান ও বানর সৈন্যের সাহায্যে রাম ও লক্ষ্মণের স্বর্ণলঙ্কা বিজয়ের; গল্প—রাম কর্ত্তৃক লঙ্কাধীশ রাবণবধেরও। উত্তরে মূর্ত্তি দিয়ে মহাভারতের কাহিনী। প্রাচীরের গাত্রে, কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রস্তরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের দৃশ্য খোদিত হয়েছে। সারথি হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। দাঁড়িয়ে আছেন কৌরবের আত্মীয়-স্বজনরাও, নিযুক্ত তাঁরা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে।

এই মূর্ত্তিগুলির পিছন থেকে সর্ব্বনিম্ন তলা সুরু হয়েছে। স্কন্ধে নিয়ে আছে এই তলাটি বহু বিবদমান আর যুদ্ধমান বন্য জন্তু। সীমাহীন তাদের সংখ্যা। এক প্রান্তে, লঙ্কাধীশ রাবণ, কৈলাসের নীচে দাঁড়িয়ে কৈলাস উত্তোলনে নিযুক্ত। তাঁর প্রবল প্রতাপে কম্পিত কৈলাস। ভীতা, ত্রস্তা পার্ব্বতী দু'হাত বাড়িয়ে মহাদেবের কণ্ঠ আকর্ষণ করে আছেন। তাঁর পিছন দিয়ে পলায়নরতা পরিচারিকাবৃন্দ। অপরূপ এই মূর্ত্তিগুলি।

একটি দ্বার অতিক্রম করে একশ' আঠার ফুট দীর্ঘ একটি অলিন্দে উপস্থিত হই। বেষ্টন করে আছে এই অলিন্দটি মন্দিরের

পিছনের অর্দ্ধাংশ। সুন্দরতম উদ্গাত স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে এই প্রাঙ্গণটিকেও বারোটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা হয়েছে। শোভিত করা হয়েছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠে এক একটি অনবদ্য, মহিমময়, খোদিত প্রস্তরমূর্তি দিয়ে। সবগুলিই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, রাষ্ট্রকূট ভাস্কর্য্যের এক মহা গৌরবময় সৃষ্টির প্রতীক। তাদের মধ্যে আছেন চতুর্ভুজা অন্নপূর্ণা, হস্তে নিয়ে জলপাত্র, দ্বিতীয় হস্তে তিনি একটি পুষ্পকোরক ধারণ করে আছেন। লক্ষ্মীর অনুকরণে কেশ বিন্যাস করেছেন। আছেন চতুর্ভুজ বালাজি, হস্তে নিয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা আর পদ্ম। নিধনকারী রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের, বিরাজ করেন বিষ্ণু হস্তে নিয়ে সপ্তফণাযুক্ত কালীয়র পুচ্ছ। কালীয়র হস্তে একটি অসি, বক্ষে স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণের পদ, শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমন করছেন। চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বরাহও আছেন, ধারণ করে আছেন ধরিত্রীকে। তাঁর পদতলে একটি সর্প লুটিয়ে পড়েছে। দেখি গরুড় বাহনে বিষ্ণুকে, ষড়ভুজ বামনকেও দেখি, হস্তে নিয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম আর অসি, স্থাপিত তাঁর পদ বলির মস্তকের উপর। হস্তে একটি স্বর্ণপাত্র। চতুর্ভুজ বিষ্ণুও আছেন, ধারণ করে আছেন গিরি গোবর্দ্ধনকে। শয়ন করে আছেন নারায়ণ এক বৃহৎ সর্পের উপর, তাঁর নাভি থেকে নির্গত হয়েছে সহস্রদল পদ্ম, তার উপর উপবিষ্ট চতুর্ভুজ ব্রহ্মা। আছেন নরসিংহও, নখর দিয়ে বিদীর্ণ করছেন হিরণ্যকশিপুর উদর। চতুর্ভুজ চতুর্মুখ ব্রহ্মাও আছেন, নিযুক্ত তিনি লিঙ্গ উৎপাটনে। বৃষভ বাহনে চতুর্ভুজ শিবও আছেন। আছেন নন্দীর সঙ্গে অর্দ্ধ-নারীশ্বর চতুর্ভুজ শিবও।

দক্ষিণের অলিন্দ দেখে আমরা পূর্ব্ব দিকের বারান্দায় উপনীত হই। দৈর্ঘ্যে একশ উননব্বই ফুট এই অলিন্দটি। এখানে রচিত হয়েছে উনিশটি প্রকোষ্ঠ। শোভিত প্রতিটি কক্ষ শিবের বিভিন্ন খোদিত প্রস্তর মূর্তি দিয়ে। কোথাও তিনি পার্ব্বতীর সঙ্গে বিরাজ করেন, কোথাও একক। বিরাজ করেন ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর সঙ্গেও। অনবদ্য এই মূর্তিগুলির গঠন সৌষ্ঠবও, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের, তাদের বহুশত বৎসরের সাধনার দানের। প্রায় সবগুলি মূর্ত্তিই চতুর্ভুজ।

বিরাজ করেন কালভৈরব, তাঁর এক হস্তে শোভা পায় ত্রিশূল, দ্বিতীয় হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন পার্ব্বতীকে। কালভৈরব শিব একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসে আছেন। দেখি নয়ন-যোগিনী মূর্ত্তিতেও, শিবের দক্ষিণ হস্তের ত্রিশূল স্পর্শ করেছে পার্ব্বতীর মস্তক, বাম হস্তে তাঁর বক্ষ। সিদ্ধযোগিনীরূপেও বিরাজ করেন, তাঁর মস্তকের উপর গন্ধর্ব্বগণ, পদতলে পারিষদবর্গ। বালটুকা ভৈরবরূপে তিনি বামনের স্কন্ধের উপর নৃত্য করেন, তাঁর বাম হস্তে শোভা পায় একটি দীর্ঘ ত্রিশূল। ভূপাল ভৈরবরূপে তিনি কৌপীন পরিধান করেন, তাঁর দক্ষিণ স্কন্ধে শোভা পায় ত্রিশূল। বাম হস্তে তাঁর ভিক্ষার পাত্র, দক্ষিণ হস্তে তিনি ডমরু বাজান। পার্ব্বতী আর নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে ভৈরবরূপেও বিরাজ করেন, তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় একটি বৃহৎ অজগর। দেখি তাঁকে মহাদেবের মূর্ত্তিতেও সঙ্গে নিয়ে নন্দী। বিরাজ করেন হংস বাহনে চতুর্ভুজ, ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মাও হস্তে নিয়ে কমণ্ডলু আর জপের মালা। শিবের জটা বেয়ে গঙ্গা অবতরণ করেন, শিবের মস্তকে শোভা পায় একটি গন্ধর্ব্ব, কণ্ঠে সর্প। তাঁর বাম পাশে পার্ব্বতী, তাঁর মস্তকের উপর ব্রহ্মা, দক্ষিণ পাশে একটি হস্তী দাঁড়িয়ে আছে। বিরাজ করেন প্রদীপ্ত লিঙ্গরূপী শিব, তাঁকে ব্রহ্মা, বরাহ আর বিষ্ণু বেষ্টন করে আছেন। আছেন চতুর্ভুজ শিবও, হস্তে নিয়ে ডমরু, ঘণ্টা আর গদা। দেখি শিব আর পার্ব্বতী বসে আছেন, তাঁদের পদতলে নন্দী। বিরাজ করেন তিনি ষড়ভুজ সদাশিবের মূর্ত্তিতে। রথারোহণে যুদ্ধ করেন ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে, সারথি তাঁর ব্রহ্মা, ধ্বজার অঙ্গে নন্দীর মূর্তি। ষড়ভুজ বীরভদ্ররূপেও বিরাজ করেন, হস্তে নিয়ে ত্রিশূল, ডমরু আর পাত্র। নিযুক্ত তিনি রক্তাসুর বধে, সঙ্গে আছেন কালী, পার্ব্বতী আর ভৃঙ্গী। দেখি, বিবাহ হয় হর-পার্ব্বতীর, পার্ব্বতী দাঁড়িয়ে আছেন হরের বাম পাশে। শিবের হস্তে শোভা পায় একটি পুষ্প, দ্বিতীয় হস্তে তিনি ধারণ করেন পার্ব্বতীর হাত। তাঁদের নীচে ব্রহ্মা বসে আছেন।

সেখান থেকে আমরা উত্তরের অলিন্দে উপনীত হই। একশ' কুড়ি ফুট দীর্ঘ এই অলিন্দটি। এখানেও বারোটি প্রকোষ্ঠ রচিত হয়েছে। শোভিতও প্রতিটি প্রকোষ্ঠ বৃহৎ মূর্ত্তি দিয়ে। অধিকাংশই শিবের মূর্তি। যমের হাত থেকে শিব মার্কণ্ডেয় ঋষিকে রক্ষা করছেন। উপবিষ্ট তিনি দুই জন কিরাতের সঙ্গে, তাদের একজনের হাতে শোভা পায় ধনু, অপরের হাতে সর্প। পাশাপাশি উপবিষ্ট শিব আর পার্ব্বতী, নিযুক্ত তাঁরা দ্যূতক্রীড়ায়। তাঁদের নীচে এগার জন আর নন্দী বসে আছেন। আলিঙ্গন করছেন শিব-পার্ব্বতীকে। মুখোমুখী হয়ে শিব আর পার্ব্বতী বসে আছেন। উপবিষ্টা পার্ব্বতী শিবের বাম উরুর উপরও। দেখি ঋষি মুচুকুন্দ বসে আছেন স্কন্ধে নিয়ে থলে। কণ্ঠে জড়িয়ে আছেন শিব অজগর সর্প, তাঁর দক্ষিণ পাশে নন্দী দাঁড়িয়ে। উপবিষ্ট শিব আর পার্ব্বতী, তাঁদের পদতলে বাহন নন্দী। ভক্তপ্রবর রাবণ জানু পেতে বসে, শিবলিঙ্গকে পূজা করছেন। বেষ্টিত হয়ে আছে লিঙ্গটি তাঁর নিজ হস্তে কর্ত্তিত নয়টি মুণ্ড দিয়ে। সাজিয়েছেন তাদের পূজার উপকরণ স্বরূপ।

বাম দিকের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ চন্দ্রাতপে উপস্থিত হই। শোভিত তার ছাদের অঙ্গ আদি চিত্র সম্ভারে। অপরূপ তাদের বর্ণ সুষমা, অনবদ্য অঙ্কন পদ্ধতি। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন দুইটি অতিকায় দ্বারপাল, মহামহিমময় মূর্ত্তিতে।

দ্বার অতিক্রম করে মণ্ডপে প্রবেশ করি। প্রস্থে সাতান্ন ফুট, গভীরতায় পঞ্চান্ন ফুট এই মণ্ডপটি। কেন্দ্রস্থলে একটি সুপ্রশস্ত বেদি শোভা পায়, চারিকোণে ষোলটি বিশাল চতুষ্কোণ স্তম্ভ, প্রতি কোণে চারিটি করে। শোভিত করেছেন শিল্পী তাদের অঙ্গ

অপরূপ অলঙ্করণে, জীবিত মূর্তিসম্ভারে ভূষিত তাদের শীর্ষদেশ, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের প্রতীক। দাঁড়িয়ে আছে ষোলটি উদ্গত স্তম্ভও, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্ভার, শীর্ষে নিয়ে সুন্দরতম মূর্তিসম্ভার। উত্তরের প্রাচীরের গাত্রে, হর-পার্বতীর মূর্তি খোদিত, নিযুক্ত তাঁরা দ্যূতক্রীড়ায়। দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে বৃষভবাহনে শিব আর পার্বতী। বেদির চারকোণে চারিটি দ্বার। সেই দ্বার অতিক্রম করে চারিটি "ব্যালকনি"তে উপনীত হতে হয়। শোভিত করেছেন শিল্পী এই সব ব্যালকনির ছাদ আর স্তম্ভের অঙ্গ, সুন্দরতম বিভিন্ন লতা-পল্লবে ও পুষ্পে, রচিত হয়েছে এক একটি সৌন্দর্যের প্রস্রবণ, নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষের।

মণ্ডপের পূর্বপ্রান্তে তোরণের ছাদে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে এক অপরূপ লক্ষ্মীমূর্তি। তাঁর দক্ষিণে গণ সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মা বসে আছেন, বামে গন্ধর্ব সঙ্গে বিষ্ণু। এই তোরণের প্রবেশদ্বারে মকর বাহনে গঙ্গা, আর কচ্ছপ বাহনে যমুনা, দুই স্ত্রী দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছেন। বেদের উপরে বিগ্রহ শিবলিঙ্গ বিরাজ করেন, নাই কোন শিল্পসম্ভার গর্ভগৃহে।

দক্ষিণের সোপান দিয়ে অবতরণ করি দেখি কত সুন্দর মূর্তি, মূর্তি গণপতির। ময়ূরবাহনে শিশু, অঙ্কে নিয়ে কার্তিকেয়র মূর্তি, ত্রিশূল হস্তে, মহিষপৃষ্ঠে এক দেবীর মূর্তি। মূর্তি সরস্বতীর ও আরও কয়েকটি দেবীর, বসে আছেন তাঁরা এক মহা সম্মেলনে, পৃথক হয়ে আছেন প্রাচীরের গাত্র থেকে।

প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে উপস্থিত হই, পূর্বপ্রান্তে একটি সুন্দর লক্ষ্মীর মূর্তি দেখি। হস্তে ধরেছেন লক্ষ্মী পদ্ম, তাঁর পশ্চাতে, লক্ষ্মীর বাহন, চারিটি হস্তী দাঁড়িয়ে আছে।

সোপান অতিক্রম করে, একটি অতি প্রশস্ত হল ঘরে (সভাগৃহে) উপনীত হই, সেখানে আছেন লঙ্কেশ্বর রাবণ। আরও কিছু দূরে অগ্রসর হয়ে একটি প্রদক্ষিণের পথে পৌঁছাই। এখানেও একটি ষাট ফুট দীর্ঘ অলিন্দ রচিত হয়েছে, বুকে নিয়ে পাঁচটি বিশাল স্তম্ভ। সেখানেও বিরাজ করেন কত শিব আর পার্বতী, মকর বাহনে গঙ্গা আর কচ্ছপ বাহনে যমুনাও। দেখি, এক অতি সুন্দর বরাহমূর্তি, হস্তে ধারণ করে আছেন বরাহ পৃথিবীকে।

আবার সভাগৃহে ফিরে আসি। এক প্রান্তদেশের দ্বার অতিক্রম করে ছাদে নির্গত হই। এইখানেই ছিয়ানব্বই ফুট উচু মন্দিরের শিখা বা চূড়া নির্মিত হয়েছে।

দাঁড়িয়ে আছে শিখারা এক মহামহিমময় মূর্তিতে, বুকে নিয়ে অনবদ্য শিল্পসম্ভার। অলঙ্কৃত হয়ে আছে সুন্দরতম মূর্তিসম্ভারেও। প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের আর স্থাপত্যের, এক মহাগৌরবময় সৃষ্টির। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে, দেখি স্তব্ধ হয়ে। নিম্নাংশে, উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ রচিত হয়েছে। তাদের কোনটিতে শোভা পায় শিবের মূর্তি, কোনটিতে বিষ্ণুর। নিখুঁত এই মূর্তিগুলির গঠন-সৌষ্ঠব, জীবন্ত। অপরূপ মূর্তি দিয়ে শোভিত প্রকোষ্ঠের ছাদের অঙ্গ ও প্রাচীরের গাত্র। তাদের উপর নির্মিত হয়েছে মন্দিরের সূক্ষ্মাগ্র চূড়া। চূড়ার অঙ্গের শিল্পসম্ভারে, প্রকোষ্ঠের প্রাচীরের গাত্রে ও তাদের ছাদের অঙ্গের মূর্তিগুলির অনুপম গঠন-ভঙ্গিমায় এক অপরূপ সমন্বয় করা হয়েছে। রচিত হয়েছে এক বিরাট সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। এইখানেই দ্রাবিড়, স্থাপত্য আর ভাস্কর্য পেয়েছে পূর্ণ পরিণতি, উপনীত হয়েছে উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে।

বহির্ভাগেও, পাঁচটি ক্ষুদ্র মন্দির রচিত হয়েছে। দেখি একে একে।

ফিরবার পথে আরও একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখি। দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন দ্বারপাল, গঙ্গা আর যমুনা। গর্ভগৃহে, পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে, খোদিত একটি ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর। অলঙ্কৃত করে আছেন তার বেদিও এক দেবতা, সঙ্গে নিয়ে এক দেবী। এক প্রান্তে বিষ্ণু বিরাজ করেন। তাঁর দুই হস্তে দুইটি পুষ্প। বরাহও আছেন। বিস্তৃত তাঁর হস্ত। শৃঙ্গে ধারণ করে আছেন ধরিত্রীকে। কেন্দ্রস্থলে প্রদীপ্ত অগ্নি। তার একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন উমা, অপর দিকে পার্বতী। তাঁরা গণপতিকে ধরে আছেন। মহাদেব বসে আছেন; কণ্ঠে ধারণ করেছেন এক অজগরকে। তাঁর বাম পাশে বিষ্ণু উপবিষ্ট, দক্ষিণে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা। নরসিংহও আছেন। শায়িত তাঁর জানুর উপর দৈত্য হিরণ্যকশিপু। নিযুক্ত নরসিংহ তাঁর দুই হস্তের নখর দিয়ে তার উদর বিদীর্ণ করতে। তাঁর পদতলে, উপবিষ্ট গরুড়। দেখি একটি মহিমময় গণেশের মূর্তিও। যেমন তাঁর অঙ্গের সৌষ্ঠব, তেমনই জীবন্ত তাঁর মূর্তি। অপরূপ সুন্দরতম এই মূর্তিটি, দেখি নাই এমন সুন্দর গণেশের মূর্তি অন্য কোন স্থানে, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের, এক অমর কীর্তির। দেখে মেটে না আশ, হয় না পরিতৃপ্তি।

ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি। ভাবি, এই ত স্বর্গের কৈলাস! নয় এ মর্ত্যভূমি এলোরা। কৈলাস-শ্রেষ্ঠ দেবলোকেও, শিবের স্বর্গ, প্রিয়তম দেবতাদেরও, দাঁড়িয়ে আছে সম্মুখে, নিয়ে তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্য তার অন্তহীন সুষমা। জানি না কে রচনা করেন এমন মহামহিমময় পরিকল্পনা, কোন্ শিল্পী দেন তাতে এমন সুন্দরতম নিখুঁত রূপ? সাজান তাকে তুলনাহীন শিল্পসম্পদে, ঢেলে দেন হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, মিশিয়ে দেন মনের অপরিসীম মাধুরী, রচনা করেন মর্ত্যভূমে স্বর্গের কৈলাস। তাই লাভ করে কৈলাস শ্রেষ্ঠত্বের আসন, বিশ্বের শিল্পের দরবারে, লাভ করে যুগে যুগে।

শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করি রাষ্ট্রকূট শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় কৃষ্ণকে, জানাই শিল্পীদেরও। সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা অক্ষয় হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়।

একটি সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে আমরা পঞ্চদশ গুহামন্দির, "দশাবতারে" প্রবেশ করি। হিন্দু গুহামন্দির, একটি সম্পূর্ণ জীবন্ত পাহাড় কেটে রচিত মন্দিরের প্রাঙ্গণটি। সম্মুখে রচিত হয়েছে একটি বৃহৎ প্রস্তরের পর্দা, কেন্দ্রস্থলে যজ্ঞশালা, প্রাচীরের ধার দিয়ে

কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আর জলাধার। পশ্চিম প্রবেশপথে একটি অপরূপ তোরণ। দাঁড়িয়ে আছে তোরণটি দুইটি সুন্দর স্তম্ভের উপর। শীর্ষদেশে রচিত হয়েছে কয়েকটি জাফরি জালের গবাক্ষ। কক্ষের অভ্যন্তরে চারিটি অপরূপ স্তম্ভ শোভা পায়। অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে বাহিরের প্রাচীরের গাত্র। ছাদের চারি কোণে চারিটি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে আর প্রান্তদেশে কয়েকটি মনুষ্যমূর্ত্তি। অপরূপ তাদের গঠনসৌষ্ঠব, জীবন্ত, দেখে মুগ্ধ হই। দ্বিতল এই মন্দিরটি। পঁচানব্বই ফুট দীর্ঘ নিম্নতলটি। বুকে নিয়ে আছে চৌদ্দটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ আর দুইটি কক্ষ, পশ্চাতের প্রাচীরের দুই প্রান্তে। সামনের গলিপথে, উত্তর প্রান্তে, দ্বিতলে উঠবার সোপানের শ্রেণী আলোকিত ল্যাণ্ডিং-এর শীর্ষদেশের গবাক্ষ দিয়ে। ল্যাণ্ডিং-এর চতুর্দ্দিকের প্রাচীরের গাত্রে দু'ফুট উচু এগারটি প্রকোষ্ঠ রচিত হয়েছে। খোদিত হয়েছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠে এক একটি সুষ্ঠু গঠন, জীবন্ত মূর্ত্তি—মূর্ত্তি দেবতার, মূর্ত্তি গণপতির। দেখি, শিবের উরুর উপর উপবিষ্টা পার্ব্বতী, পদ্মফুল হস্তে বিষ্ণু, বসে আছেন শিব আর পার্ব্বতী, সঙ্গে নিয়ে গণপতি আর নন্দী। গরুড় বাহনে বিষ্ণুও আছেন। বিরাজ করেন মহিষাসুরও, নির্গত হন তিনি মহিষাসুরে কর্ত্তিত মস্তক থেকে। পড়ে না এক বিন্দু রক্ত ভূমিতে, নইলে জন্মাবে অসুর প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে। দেখি চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী ভবানীর মূর্ত্তি, তাঁর এক হস্তে শোভা পায় ত্রিশূল, অপর হস্তে ডমরু। তপস্যায় নিযুক্তা চতুর্ভুজা, কালীও দেখি। তাঁর হস্তে শোভা পায় খাঁড়া, ত্রিশূল আর মাংসখণ্ড। আর দেখি, অর্দ্ধনারীশ্বরকে, পুরুষ ও নারীরূপী শিব। তাঁর এক হস্তে শোভা পায় ত্রিশূল অপর হস্তে তিনি ধারণ করেন একটি মুকুর।

আমরা ল্যাণ্ডিং-এর এই অপরূপ মূর্ত্তিগুলি দেখে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হই। পঁচানব্বই ফুট দীর্ঘ ও একশ' নয় ফুট গভীর এই কক্ষটিও। তার সঙ্গে একটি সুন্দরতম কারুকার্য্যসমন্বিত তোরণ। দাঁড়িয়ে আছে কক্ষটি বা সভাগৃহটি চুয়াল্লিশটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর। সুন্দর এই স্তম্ভগুলি। সুন্দরতম তাদের মধ্যে, সম্মুখের দুইটি, অলঙ্কৃত তাদের সর্ব্বাঙ্গ আর শীর্ষদেশ লতাপল্লব আর মূর্ত্তি দিয়ে। মূর্ত্তি সর্পের, মূর্ত্তি বামন আর গন্ধর্ব্বেরও। রচিত হয় এক একটি সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, প্রস্তরের অঙ্গে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি, তাদের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভার।

সভাগৃহের প্রবেশদ্বারে দুই অতিকায় শৈব দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছেন। প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করি। দেখি একদিকে চতুষ্কোণ উদ্গত স্তম্ভের বেষ্টনীর ভিতর প্রাচীরের গাত্রে খোদিত হয়েছে বিষ্ণুর বিভিন্ন মূর্ত্তি, অপর দিকে শিবের। মহামহিমময় জীবন্ত এই মূর্ত্তিগুলি। অনবদ্য তাদের গঠন-সৌষ্ঠব, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, প্রতীক সৃষ্টির এক গৌরবময় যুগের। আমরা উত্তর দিক থেকে দেখা সুরু করি। দেখি ভৈরব মূর্ত্তিতে এক সুবিশালকায় শিবকে। পরিধানে তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, বাহুতে নরমুণ্ডের চুড়ি, বেষ্টন করে আছে তাঁকে একটি অতিকায় অজগর। প্রথিত তাঁর হস্তের ত্রিশূল রক্তাসুরের বক্ষে। দ্বিতীয় হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন অপর এক অসুরের পদযুগল। বিস্তৃত তাঁর আনন। নির্গত তাঁর মুখগহ্বর থেকে বীভৎস, বৃহৎ দন্তগুলি। উন্মত্ত আনন্দে তিনি ডমরু বাজাচ্ছেন, আর অসুরের রক্ত সংগ্রহ করছেন। তাঁর পদতলে শায়িতা এলোকেশী, ভয়ঙ্কর দর্শনা কালী। বিশাল তাঁর আনন, কোটরে প্রবিষ্ট তাঁর অক্ষিতারা, তিনি এক হস্তে ধারণ করে আছেন একটি অসি, অপর হস্তে একটি পাত্র, বিস্তৃত সেই পাত্রে, পতিত হয় তার মধ্যে শোণিতবিন্দু। পিছনে দাঁড়িয়ে এক পেচক এই দৃশ্য দেখছে, দর্শন করছেন এক পাশ থেকে পার্ব্বতীও। অসুরের পদতলে কয়েকটি দানব দাঁড়িয়ে, তারাও ভয়চকিত হয়ে এই ভীষণ দৃশ্য দেখছে। ভয়াল, ভয়ঙ্কর এই দৃশ্য। কিন্তু অপরূপ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শে, মনের মাধুরীতে আর হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেবতার এই ভয়াল রূপ।

দ্বিতীয় কক্ষে উন্মত্ত, তাণ্ডব নৃত্যে নিযুক্ত নটরাজ। নৃত্য করেন বহুভুজ নটরাজ। তাঁর দক্ষিণে উপবিষ্ট বাদকেরা, কারও হস্তে বীণা, কেউ ডমরু বাজান। নৃত্য করেন নটরাজ তালে তালে। বামে দাঁড়িয়ে পার্ব্বতী এই নৃত্য দর্শন করেন। অপরূপ এই দৃশ্যটির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ভাস্করের।

চতুর্থ কক্ষে পার্ব্বতী আর শিব পাশা খেলায় নিযুক্ত, সঙ্গে আছেন গণপতি আর নন্দী।

পঞ্চম কক্ষে শিব আর পার্ব্বতীর বিবাহ হয়েছে। পার্ব্বতী শিবের বাম পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নীচে ব্রহ্মা উপবিষ্টা নিযুক্ত তিনি পুরোহিতের কাজে। অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারা এই বিবাহ দর্শন করেছেন, এসেছেন তাঁরা বিভিন্ন বাহনে।

ষষ্ঠতে কৈলাসে উপনীত হয়ে, রাবণ মহাদেবের কাছে, অমরত্ব লাভের বর প্রার্থনা করছেন।

পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে দেখি, মার্কণ্ডেয়কে উদ্ধার করবার জন্য শিব লিঙ্গ থেকে নির্গত হচ্ছেন। রজ্জুবদ্ধ মার্কণ্ডেয়র কণ্ঠ, যম তাকে যমালয়ে নিয়ে যেতে উদ্যত। দেখি, শিব আর পার্ব্বতীকে। এক হস্তে শিব নিজের কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করে আছেন, দ্বিতীয় হস্তে তাঁর জপের মালা। দক্ষিণে নন্দী দাঁড়িয়ে, পিছনে ভৃঙ্গী। ঊর্দ্ধে হস্তীপৃষ্ঠে এক ধ্যানমগ্ন ঋষি। তাঁর মস্তকের চতুর্দ্দিকের দিব্যজ্যোতির বাম পাশে একটি মৃগ।

সভাগৃহ অতিক্রম করে, আমরা তোরণে উপস্থিত হই। বাম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন এক বিশালকায় গণপতি, মহামহিমময় মূর্ত্তিতে। মেঝের উপর দুই প্রান্তে, দুইটি সিংহ বীর বিক্রমে দাঁড়িয়ে আছে।

পিছনের প্রাচীরের গাত্রে, মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বামে

প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর পার্ব্বতী উপবিষ্টা। তাঁর দুই পাশে দুই জন সঙ্গীতজ্ঞা বসে আছেন। দ্বারে দুই চতুর্ভুজ দ্বারপাল দণ্ডায়মান, হস্তে নিয়ে গদা, সর্প আর বজ্র। ভিতরে একটি বেদি। বেদির উপর লিঙ্গ বিরাজ করেন। দ্বারের দক্ষিণ পাশে, শ্রী বসে আছেন, হস্তে নিয়ে পদ্ম। চারিটি হস্তীর শুণ্ড থেকে বর্ষিত হচ্ছে বারি তাঁর মস্তকে। সঙ্গে আছে দু'জন পরিচারকও, হস্তে নিয়ে জলপাত্র, শঙ্খ আর চক্র। তোরণের দক্ষিণ প্রান্তে দেখি একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি, হস্তে নিয়ে ত্রিশূল, তাঁর পাশে গরুড় বসে আছেন।

দেখি, পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে লিঙ্গের ভিতর শিব উপবিষ্ট, নির্গত হচ্ছে জ্যোতি সেই লিঙ্গ থেকে। বরাহ অবতারে বিষ্ণু, লিঙ্গের ভিত্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য তাঁর সম্মুখের ভূমি খনন করছেন। কিন্তু বিফল হয় তাঁর প্রচেষ্টা, কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন লিঙ্গের সম্মুখে, নিযুক্ত থাকেন পূজায়। বিপরীত দিকে, ঊর্দ্ধে আরোহণ করে ব্রহ্মা দেখেন কোথায় এই লিঙ্গের সমাপ্তি। অক্ষমতার অপরাধে অপরাধী হয়ে তিনিও কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে স্তব করতে থাকেন। প্রমাণিত হয় মহেশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব। রথে আরোহণ করে শিব যাচ্ছেন। চতুর্বেদ সেই রথের অশ্ব, সারথি ব্রহ্মা। যাচ্ছেন তিনি তারকাসুর নিধনে।

সবশেষে দক্ষিণের প্রাচীরের সম্মুখে উপস্থিত হই। দেখি অষ্টভুজ বিষ্ণুকে: তিনি বামপদ স্থাপন করেছেন বামনের স্কন্ধে, হস্তে ধারণ করে আছেন গিরি-গোবর্দ্ধনকে, রক্ষা করছেন দেবরাজ, ইন্দ্রের প্রেরিত বৃষ্টির হাত থেকে ব্রজের ধেনুগণকে। দেখি শেষনাগের উপর বিষ্ণু শয়ন করে আছেন। শেষনাগের শিরে শোভা পায় সুবিশাল ফণা। বিষ্ণুর নাভি থেকে নির্গত হয় একটি সহস্রদল প্রস্ফুটিত পদ্ম—তার উপর ব্রহ্মা উপবিষ্ট। সপ্তমণী পরিবৃতা হয়ে, লক্ষ্মী তাঁর পদসেবা করছেন। দেখি গরুড়-বাহনে বিষ্ণু। বরাহরূপী বিষ্ণুও দেখি, হস্তে নিয়ে পৃথ্বী, তাঁর পদতলে তিন নাগ বিরাজ করেন। দেখি বামন অবতারে বিষ্ণুকে। পরিগ্রহ করে বামন এক মহামহিমময় মূর্ত্তি, স্থাপিত হয় তাঁর এক পদ স্বর্গে, অপর পদ পৃথিবীতে, তৃতীয় পদে তিনি বলিরাজাকে পাতালে প্রেরণ করেন। বলিরাজার হস্তে একটি পাত্র। পিছনে দাঁড়িয়ে গরুড় নিযুক্ত বলিবন্ধনে। সবশেষে নরসিংহ অবতারে বিষ্ণুকে দেখি। অষ্ট হস্তে তিনি হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। হিরণ্যকশিপুর এক হস্তে অসি অন্য হস্তে ঢাল।

"দশাবতার" দেখে আমরা চতুর্দ্দশ গুহামন্দির রাবণ কা কাই দেখতে যাই। চোখের সামনে ভাসতে থাকে দশাবতারের মূর্ত্তি-সম্ভার, তুলনাহীন অপরাজেয় দান ভারতের ভাস্করের, তাদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিদর্শন।

রাবণ কা কাই, অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু গুহামন্দির এলোরার, বুকে নিয়ে আছে চুয়াল্লিশ ফুট প্রস্থ, সাড়ে বাহান্ন ফুট দীর্ঘ সভাগৃহ। দাঁড়িয়ে আছে সভাগৃহটি মন্দিরের সংলগ্ন, শোভিত হয়ে আছে বারোটি সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে। তাদের মধ্যে দুইটি সম্মুখে আর বারোটি কক্ষের ভিতরে। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি সূক্ষ্মতম লতাপুষ্প, শীর্ষে নিয়ে আছে আনমিত কর্ণ। বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দিরটি একটি পঁচাশী ফুট দীর্ঘ প্রদক্ষিণের পথ দিয়ে। উদ্গাত স্তম্ভ দিয়ে, প্রাচীরের গাত্রে রচিত হয়েছে প্রকোষ্ঠ। অপরূপ এই উদ্গত স্তম্ভের অঙ্গের অলঙ্করণও, বিস্তৃত হয়ে আছে তাদের পাদদেশ থেকে বন্ধনী পর্য্যন্ত। প্রকোষ্ঠের ভিতরে শোভা পায় মূর্ত্তি।

দেখি শোভিত দক্ষিণের প্রাচীর, বহু শৈব মূর্ত্তি দিয়ে। সুন্দর তাদের গঠনভঙ্গিমা, শোভন তাদের প্রকাশ। দেখি মহিষাসুরী দুর্গা, নিযুক্তা মহিষাসুর নিধনে। মঞ্চের উপর বসে পাশা খেলছেন হরপার্ব্বতী। শিবের পিছনে সপারিষদ গণপতি উপবিষ্ট। পার্ব্বতীর পিছনে দুই নারী পরিচারিকা। পিছনে দাঁড়িয়ে ভৃঙ্গী, সেই খেলা দেখছেন।

দেখি তাণ্ডব নৃত্য করেন নটরাজ। নাচেন প্রলয় নাচনে। লুপ্ত হয় সৃষ্টি। তিনি বাদক, ঢক্কা আর বাঁশী বাজান। পশ্চাতে নরকঙ্কাল সঙ্গে ভৃঙ্গী, বামে পার্ব্বতী, সঙ্গে নিয়ে বিড়াল-আনন বিশিষ্টগণ। তাঁর বামে উপবিষ্ট ব্রহ্মা আর বিষ্ণু। দক্ষিণে হস্তীবাহনে দেবরাজ ইন্দ্র আর মেষবাহনে অগ্নি। তাঁরা দর্শন করেন এই ভয়ঙ্কর নৃত্য।

আর দেখি লঙ্কাধিপতি দশানন, বিংশ হস্ত রাবণ ধারণ করে আছেন শিবের স্বর্গ, কৈলাস। তাঁর শিরোভূষণে একটি জন্তুর মূর্ত্তি শোভা পায়। প্রচেষ্ট তিনি কৈলাসকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে। ভীতা, চকিতা পার্ব্বতী, মহাদেবকে দুই হস্ত দিয়ে বেষ্টন করে আছেন। মহাদেবের পদাঘাতে পিষ্ট রাবণ। পরিচারক পরিবৃত হয়ে শিব আর পার্ব্বতী বসে আছেন, সঙ্গে আছেন চারিটি গণও, তারা রাবণকে উপহাস করছেন।

দেখি ভৈরব মূর্ত্তিতে শিব, দু'হস্তে পরিধান করছেন ব্যাঘ্রচর্ম্ম। প্রোথিত তাঁর দুই হস্তের ত্রিশূল রক্তাসুরের বক্ষে। অপর এক হস্তে তিনি ধারণ করেছেন অসি, তাঁর ষষ্ঠ হস্তে শোভা পায় একটি পাত্র। রক্তাসুরের রক্তে রঞ্জিত সেই পাত্র।

প্রদক্ষিণের পথে, তিনটি কঙ্কালমূর্ত্তি দেখি। দেখি, চতুর্ভুজ কাল, বুকে জড়িয়েছেন সর্প। বিরাজ করেন কালী, মহাকালীরূপে। গণপতি লাড্ডু ভক্ষণ করছে, তাঁর পিছনে, তাঁর সপ্ত মাতা দাঁড়িয়ে আছেন। দেখি, পেচকবাহনে চামুণ্ডা, হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্টা ইন্দ্রাণী, বরাহবাহনে বরাহী, গরুড়বাহনে বৈষ্ণবী, ময়ূরবাহনে কুমারী, বৃষভবাহনে মহাদেবী, হংসবাহনে সরস্বতী, দেখছেন এই দৃশ্য।

উত্তরের প্রাচীরের গাত্রে, দেখি, ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে চতুর্ভুজা ভবানী দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হস্তে শোভা পায় একটি ত্রিশূল। দেখি, এক সুবিশাল প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মী গজে উপবিষ্টা। তাঁর হস্তে শোভা পায় শঙ্খ ও চক্র। তাঁর সম্মুখে নাগিনীরা, হস্তে নিয়ে জলপাত্র। দু'পাশ থেকে দুই হস্তী শুঁড় দিয়ে সেই পাত্র থেকে জল তুলে নিয়ে প্রক্ষালন করিয়ে দিচ্ছে তাঁর হস্ত। আছেন

বরাহ অবতারে বিষ্ণু, পদদলিত করছেন একটি ফণাযুক্ত সর্পকে, হস্তে ধারণ করে আছেন পৃথিবী রূদ্ধ হয় ধরিত্রী। ধ্বংসের গতি। তাঁর দুই পাশে কৃতাঞ্জলিপুটে দুইটি নাগ দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুও আছেন, বসে আছেন বৈকুণ্ঠে। তাঁর দুই পাশে তাঁর দুই প্রিয়তমা, লক্ষ্মী আর সীতা উপবিষ্টা, পদতলে বাহন গরুড় দাঁড়িয়ে। তাঁর নীচে কতকগুলি গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞা বসে আছেন। একাসনে বিষ্ণু আর লক্ষ্মী বসে আছেন, তাঁদের মস্তকের উপর শোভা পায় একটি অপরূপ চন্দ্রাতপ। পদতলে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সাতটি বামন।

মন্দিরের দ্বারে দুইটি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। খোদিত হয়েছে আরও অনেক মূর্ত্তি মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ শুয়ে আবার কেউ উড়ে চলেছে। বিলম্বিত তাদের হস্তের মালা। গর্ভগৃহে, বেদির উপর দুর্গা বিরাজ করেন, বিগ্রহ এই মন্দিরের। সুন্দরতম এই মন্দিরের মূর্ত্তিগুলিও, পরিচায়ক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের।

চতুর্দ্দশ গুহামন্দির দেখে আমরা দ্বাদশ গুহামন্দিরের তিনতলায় উপনীত হই। খুব সম্ভব ত্রয়োদশ গুহামন্দিরই প্রাচীনতম গুহা-মন্দির এলোরার, নির্ম্মিত হয় স্থপতির আর মন্দির-নির্ম্মাতাদের বাসের জন্য, বুকে নিয়ে একটি মাত্র নিরাভরণ কক্ষ।

এখান থেকে প্রথম গুহা পর্য্যন্ত সবগুলিই বৌদ্ধমন্দির। ত্রিতল এই মন্দিরটি, তাই পরিচিত তিনতলা নামে।

প্রাঙ্গণ থেকে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করে আমরা একতলার সভাগৃহে প্রবেশ করি। সম্মুখে শোভা পায় আটটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ, শীর্ষে নিয়ে বন্ধনী।

শোভিত কেন্দ্রস্থলের স্তম্ভদুটির অঙ্গ, অনুপম লতাপুষ্পে আর সূক্ষ্মতম পল্লবে। সম্মুখ সারির পশ্চাতেও দুইটি স্তম্ভের শ্রেণী নির্ম্মিত হয়েছে। আছে প্রতিটি শ্রেণীতে আটটি করে স্তম্ভ। ভিতরেও রচিত হয়েছে ছয়টি স্তম্ভ। বুকে নিয়ে আছে সভাগৃহটি সর্ব্বসমেত তিনটি স্তম্ভ।

মন্দিরের প্রবেশপথের বাম দিকের পশ্চাৎ দেওয়ালে রচিত হয়েছে একটি বৃহৎ কক্ষ। বিভক্ত সেই কক্ষটি নয়টি অংশে, শোভিত,খোদিত অপরূপ মূর্ত্তি দিয়ে। কেন্দ্রস্থলে বুদ্ধ বিরাজ করেন। দু'পাশ থেকে তাঁকে দুই পরিচারক ব্যজন করছে। তাঁর দক্ষিণে পদ্মপাণি, বামে বজ্রপাণি। আরও তিনটি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের একজনের হস্তে একটি পুষ্পগুচ্ছ। আবদ্ধ সেই পুষ্পগুচ্ছ একটি গ্রন্থের সঙ্গে। দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তে শোভা পায় পদ্মের কোরক। তৃতীয় একটি ধ্বজা ধারণ করে আছেন। মস্তকের উপর এক রমণী উপবিষ্টা, হস্তে নিয়ে একটি পুষ্প। পদ্মপাণির দক্ষিণ পাশেও তিনটি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনের হস্তে একটি দীর্ঘ অসি, মস্তকের শিরোভূষণে স্থাপিত একটি সুষ্ঠু-গঠন ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি, কণ্ঠে বহুমূল্য মুক্তার মালা। অপর হস্তে শোভা পায় একটি মুদ্রাধার। খুব সম্ভব ইনিই জবালা, বৌদ্ধ ধনদেবতা। অলঙ্কৃত করা হয়েছে অনুরূপ মূর্ত্তির সমষ্টি দিয়ে এই মন্দিরের আরও অনেক স্থান।

তোরণের দুই পাশে, সিংহাসনে বসে আছেন সারি সারি বুদ্ধ। মন্দিরের দুই দ্বারে দুই স্থূলকায় ব্যক্তি বসে আছেন, রক্ষক তাঁরা এই মন্দিরের। তাঁদের মধ্যে একজনের হস্তে শোভা পায় একটি পুষ্পগুচ্ছ। মন্দিরের অভ্যন্তরে, গর্ভগৃহে, বেদির উপর উপবিষ্ট এগার ফুট বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্ত্তিতে। ঊর্দ্ধে, প্রাচীরের গাত্রে, এক এক দিকে পাঁচ বুদ্ধ বসে আছেন। নীচে, বামে, পুষ্পহস্তে পদ্মপাণি, তাঁর পাশে, দীর্ঘ অসি হস্তে নিয়ে একটি নর। স্থাপিত অসিখানি একটি পুষ্পের উপর। তার পাশে আর একজন হস্তে নিয়ে পুষ্পগুচ্ছ আর গ্রন্থ। তার পাশেও একজন পদ্মের কোরক হস্তে। দক্ষিণে বজ্রপাণি। তাঁর পাশেও শোভা পায় কয়েকটি মূর্ত্তি। কারও হস্তে শোভা পায় পুষ্প, কেউ হস্তে ধারণ করে আছেন একটি গ্রন্থ। উত্তরে একটি নারী উপবিষ্টা। শোভা পায় তাঁর বক্ষে একটি মেখলা। দক্ষিণে একটি চতুর্ভুজা নারী। তাঁর এক হস্তে শোভা পায় একটি বোতল, অপর হস্তে পুষ্প।

বেদির পাশ দিয়ে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, ল্যাণ্ডিংয়ের সম্মুখে, একটি প্রকোষ্ঠে উপনীত হই। শোভা পায় প্রকোষ্ঠের সামনে দুইটি সুন্দরতম স্তম্ভ। দেখি পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে, একটি সুউচ্চ সিংহাসনে বুদ্ধ বসে আছেন। তাঁর দুই পাশে পারিষদবর্গ। পদ্মপাণিও এক পাশে বসে আছেন। তাঁর এক পাশে একটি নর, অন্য পাশে একটি নারী, পুরুষটির পত্নী। দেখি, আরও অনেক ক্ষুদ্র দেবদেবীর মূর্ত্তি এই কক্ষের মধ্যে।

সোপান অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হই। রচিত হয়েছে একটি দীর্ঘ অলিন্দ, দ্বিতলের সভাগৃহের সামনে। অলিন্দের কেন্দ্র-স্থলে, দুইটি অনবদ্য, সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে সভাগৃহের প্রবেশপথ নির্ম্মিত হয়েছে। অলিন্দের দুই প্রান্তেও দুইটি প্রবেশ পথ আছে। সুদীর্ঘ এই সভাগৃহ, উচ্চতায় সাড়ে এগার ফুট। দুই শ্রেণীতে আটটি করে স্তম্ভ নিয়ে তিনটি গলিপথে বিভক্ত করা হয়েছে এই সভাগৃহকে। কেন্দ্রস্থলের তোরণের প্রান্তদেশে শোভা পায় বহু মূর্ত্তি। শোভা পায় দুই পাশে নারী পরিবেষ্টিত হয়ে পদ্মপাণি। তাঁদের একজনের হস্তে একটি বোতল, দাগবা ও একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি।

মন্দিরের প্রবেশদ্বার আলো করে, পদ্মপাণি আর বজ্রপাণি দাঁড়িয়ে আছেন। অনবদ্য তাঁদের গঠনসৌষ্ঠব, অপরূপ তাঁদের দাঁড়াবার ভঙ্গী, শ্রেষ্ঠ প্রতীক বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের। পদ্মপাণির হস্তে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। বজ্রপাণির হস্তে শোভা পায় বজ্র, কোটিদেশে বহুমূল্য রত্নখচিত মেখলা, কণ্ঠে মুক্তার মালা। মন্দিরের ভিতরে, গর্ভগৃহে, সিংহাসনে অধিরোহণ করে আছেন এক মহামহিমময় বুদ্ধ। তাঁর সম্মুখে, পাত্রহস্তে এক পরমারূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছেন। বিপরীত দিকেও এক ক্ষুদ্রকায়া নারী দাঁড়িয়ে; তার পদতলে, আরও একটি নারী শয়ন করে আছে। বুদ্ধের দুই প্রান্তে বিরাজ করেন পদ্মপাণি আর বজ্রপাণি মহিমময় মূর্ত্তিতে।

সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রেও শোভা পায় একজন পুরুষ ও একজন নারী। ঊর্দ্ধে, তাদের উপর উপবিষ্ট সাত-বুদ্ধ।

উত্তর প্রান্তেও মহামহিমময় মূর্ত্তিতে বুদ্ধ বসে আছেন। তাঁর পদতলে একটি চক্র, সম্মুখে দুইটি মৃগ, দুই পাশে বুদ্ধের পার্শ্বচরেরা।

সোপান অতিক্রম করে, সর্ব্বোচ্চ তলায় উপনীত হই। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি ভাস্করের অনবদ্য মহিমময় পরিকল্পনা, আর তার সুন্দরতম, আর সূক্ষ্মতম রূপদান। দেখি বৌদ্ধ স্থপতির আর ভাস্করের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মহান কীর্ত্তি, এক মহান গৌরবময় যুগের, নিদর্শন তাদের পূর্ণ পরিণতির, চরম উৎকর্ষের।

দেখি, নির্ম্মিত হয়েছে পাঁচটি স্তম্ভের সারি, প্রতিটি সারিতে আটটি করে স্তম্ভ। বিভক্ত হয়েছে সভা গৃহটি পাঁচটি গলিপথে স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে। রচিত হয়েছে দুইটি স্তম্ভ দিয়ে প্রবেশদ্বারও। অনবদ্য, সুন্দরতম এই স্তম্ভগুলি, বুকে নিয়ে আছে অনুপম শিল্প-সম্ভার, শ্রেষ্ঠদান বৌদ্ধ স্থপতির, নিদর্শন এক অমর কীর্ত্তির। বিস্মিত হয়ে দেখি, স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্পদ। তার পর, দেখতে থাকি সভা গৃহটি।

দেখি, গলিপথের প্রান্তদেশের, কুলুঙ্গির ভিতরে, সিংহাসনে আরোহণ করে আছেন বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্ত্তিতে। সঙ্গে আছে পারিষদবর্গ।

পশ্চাতের গলিপথের দক্ষিণ প্রান্তেও বুদ্ধ সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন। আছেন মহামহিমময় মূর্ত্তিতে। তাঁর পদতলে শোভা পায় চক্র আর হরিণ, প্রতীক বারানসীর হরিণ উদ্যানের। এই উদ্যানেই বুদ্ধ প্রথম প্রচার করেন তাঁর বাণী। প্রতীক তাঁর ধর্ম্মেরও। তিনি দক্ষিণ হস্তের অনামিকা আর অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বাম হস্তের অনামিকা আর অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করে আছেন। নিযুক্ত তিনি শিক্ষাদানে।

গলিপথের উত্তর প্রান্তে সিংহাসনে অধিরোহণ করে আছেন এক বুদ্ধ। সিংহাসনের কেন্দ্রস্থলে একটি সিংহমূর্ত্তি তাঁর এক পাশে এক ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ, স্থাপিত তাঁর দুই হস্ত তাঁর অঙ্কে, নিযুক্ত তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য কঠোর ধ্যানে।

দেখি এক উড্ডীয়মান বুদ্ধ, দেবতাদের নিকট বাণী প্রচারের জন্য স্বর্গে যাচ্ছেন। নির্ব্বাণ অভিলাষী বুদ্ধকেও দেখি। বিরাজ করে পরম শান্তি তাঁর চতুর্দ্দিকে, এক মহা প্রশান্তি।

দেখি, এই মূর্ত্তিগুলির দক্ষিণে, পিছনের প্রাচীরের গাত্রে উঁচু মঞ্চের উপর, সারি সারি সাতটি বুদ্ধ বসে আছেন, বিস্তৃত হয়ে আছেন মন্দিরের তোরণ পর্য্যন্ত। অনুরূপ তাঁদের আকৃতি, নিযুক্ত তাঁরাও ধ্যানে। তাঁদের মস্তকের উপর শোভা পায় এক একটি বট-পল্লব, বিভিন্ন তাদের আকৃতি। তাঁরা বুদ্ধ আর তাঁর অগ্রগামী ষষ্ঠ বোধিসত্ত্ব, জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সপ্তকল্পে, পরিচিত বিপাশ্যা, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্চন্দ, কনকমুণি, কশ্যপ আর শাক্যসিংহ নামে। জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বিশ্ববাসীকে জ্ঞানের আলোক দান করবার জন্য। বৌদ্ধ মতে, প্রবল থাকবে শাক্যসিংহ-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম পঞ্চ সহস্র বৎসর। প্রবলতম হবে তার পর, আবার হিন্দুধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্তে, বিলুপ্ত হবে বৌদ্ধধর্ম্ম। জন্মগ্রহণ করবেন তখন আর্য্য-মৈত্রেয়, আর এক বুদ্ধ। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে বৌদ্ধধর্ম্ম, হবে পুনর্জ্জীবিত, ফিরে পাবে লুপ্ত গৌরব। অঙ্কিত দেখি অজন্তার দ্বাবিংশ গুহামন্দিরের ছাদে অনুরূপ সাতটি বুদ্ধ। চিত্রে প্রচারিত হয় বৌদ্ধ মতবাদ।

তোরণের দক্ষিণ পাশেও সপ্ত ধ্যানমৌন বুদ্ধ বসে আছেন। তাঁদের শিরে শোভা পায় ছত্র। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন আদি বুদ্ধের অন্যতম, পরিচিত বীরচনা, অক্ষভা, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘ-সিদ্ধ নামে। পরে বোধিসত্ত্ব হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, খ্যাতি-লাভ করেছিলেন সামন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি আর বিশ্বপাণি নামে।

মন্দিরের তোরণের দ্বারে দুই ভীমকান্তি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে, তাদের শিরে শোভা পায় পাগড়ি, দুই হস্ত বক্ষের উপর স্থাপিত। প্রাচীরের প্রান্তদেশে, সুউচ্চ মঞ্চের উপর তিনটি রূপবতী নারী, স্থাপিত তাঁদের দক্ষিণপদ এক একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর। আছেন তাঁদের মধ্যে একজন চতুর্ভুজা, মূর্ত্তি কোন হিন্দু দেবীর। পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রেও অনুরূপ একটি মূর্ত্তি দেখি। সকলের হস্তেই শোভা পায় বৌদ্ধ প্রতীক—পুষ্প অথবা বজ্র। তাঁরা পদ্মাসনে বসে আছেন, ধারণ করে আছেন পদ্মগুলি এক একটি নাগিণী, শিরে নিয়ে ফণা। নাগিণীরা মৎস্যের সঙ্গে পদ্মবনে দাঁড়িয়ে আছেন। জলচর পক্ষীও আছে। তাঁদের উপরে প্রতি কক্ষে চারিটি করে বুদ্ধমূর্ত্তি। পশ্চাতের প্রাচীরের দুই প্রান্তেও পাঁচটি করে।

গর্ভগৃহে সিংহাসনে বিরাজ করেন বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্ত্তিতে। তাঁর বাম পাশে, পদ্মপাণি, পরিচিত অবলোকিতেশ্বর নামেও, মস্তকে ধারণ করেছেন অমিতাভকে। তাঁর পাশে তিনটি মূর্ত্তি, প্রথমটির হস্তে শোভা পায় পুষ্প, দ্বিতীয়টির একটি গ্রন্থ ও একটি পুষ্প। তৃতীয়টি ধারণ করে আছেন একটি পুষ্পকোরক। বুদ্ধের দক্ষিণ পাশে বজ্রপাণি বিরাজ করেন, পরিচিত মৈত্রেয়ী নামেও। তাঁর হস্তে শোভা পায় বজ্র, কণ্ঠে বহু মূল্য মুক্তার মালা, অনামিকায় হীরের অঙ্গুরী। তিনি একটি পুষ্পবৃন্তে হেলান দিয়ে আছেন। তাঁর পাশেও দেখি কতকগুলি মূর্ত্তি, অনুরূপ এক আর মন্দিরের ভিতরের মূর্ত্তির।

সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রে নারী উপবিষ্টা। তাঁর বিপরীত দিকে এক স্থূলকায় পুরুষ, হস্তে নিয়ে মুদ্রাধার। জানুর উপরে স্থাপিত সেই মুদ্রাধারটি। তাঁর পদতলে রক্ষিত একটি কমণ্ডলু, গর্ভে নিয়ে পুষ্প গুচ্ছ। উপরে এক এক দিকে পাঁচটি করে বুদ্ধ উপবিষ্ট, দুই পাশের প্রাচীরের গাত্রে দুইটি করে। অনুরূপ এই বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি সভাগৃহের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রের বুদ্ধমূর্ত্তির। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাস্করের এই মহিমময় সৃষ্টি, এই অমর কীর্ত্তি দেখি।

ধীরে ধীরে, একাদশ গুহামন্দির, দোতলাতে প্রবেশ করি। বহুদিন পর্য্যন্ত এই মন্দিরটি ছিল দ্বিতল, তাই পরিচিত দোতলা নামে। পরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে এই মন্দিরের সর্ব্ব নিম্ন তলে একটি এক শ' দুই ফুট দীর্ঘ অলিন্দ, একটি গর্ভগৃহ

ও দুইটি প্রকোষ্ঠ। গর্ভগৃহে বুদ্ধ বিরাজ করেন, সঙ্গে নিয়ে পদ্মপাণি আর বজ্রপাণি। বজ্রপাণির দক্ষিণ হস্তে শোভা পায় একটি বজ্র।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, দ্বিতলে উপনীত হই। সেখানেও অনুরূপ একটি অলিন্দ দেখি। শোভিত হয়ে আছে অলিন্দটি আটটি সুন্দর চতুষ্কোণ স্তম্ভ দিয়ে। রচিত হয়েছে পশ্চাতের দেওয়ালের অঙ্গে পাঁচটি প্রবেশপথ। দ্বিতীয় প্রবেশপথ দিয়ে আমরা গর্ভগৃহে প্রবেশ করি। দেখি, গর্ভগৃহে সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন, এক মহামহিমময় বুদ্ধ। তাঁর দক্ষিণ হস্ত জানুর উপর স্থাপিত, বাম হস্ত স্থাপিত তাঁর অঙ্কে। সিংহাসনের সম্মুখে, জলপাত্র হস্তে, একটি পরমা রূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশেও একটি সুন্দরী নারী শয়ন করে আছেন। বুদ্ধের বাম পার্শ্বের অনুচরের হস্তে শোভা পায় একটি পুষ্পগুচ্ছ, তার উপর রক্ষিত একটি বজ্র। তিনিই বজ্রপাণি। তাঁর দুই পাশেও কয়েকটি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের কারও হস্তে শোভা পায় পুষ্প, কারও ফল। কেউ হস্তে ধারণ করে আছেন পুস্তক। কারও কণ্ঠে শোভা পায় বহু মূল্য জড়োয়ার হার, কারও হস্তে অসি। অনুরূপ "তিন তলার" পুরুষমূর্তির এই মূর্তিগুলি, বসনে আর ভূষণে। এই মূর্তিগুলির উপরে, উপবিষ্ট সপ্তবুদ্ধ। তাঁদের মস্তকের উপরে ছত্রাকারে শোভা পায় এক একটি বট বৃক্ষ।

কেন্দ্র স্থলের প্রবেশপথ অতিক্রম করে আমরা একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপে উপনীত হই। শোভিত হয়ে আছে এই প্রবেশপথটিও দুইটি অপরূপ, সুন্দরতম সুষ্ঠুগঠন স্তম্ভ দিয়ে। শীর্ষদেশে দুইটি গবাক্ষ রচিত হয়েছে। আলোকিত হয়েছে মণ্ডপ। মণ্ডপের প্রান্তদেশে, যোগাসনে বসে আছেন একটি বুদ্ধ। বজ্রপাণিও আছেন হস্তে নিয়ে বজ্র।

অনবদ্য, কিন্তু চতুর্থ প্রবেশপথটি বুকে নিয়ে আছে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার, অনুপম অলঙ্করণ। নিদর্শন শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের। মুগ্ধ বিস্ময়ে, এই প্রবেশপথটির শিল্পসম্পদ দেখে আমরা গর্ভগৃহে প্রবেশ করি।

এই গর্ভগৃহেও সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন এক মহিমময় বুদ্ধ। তাঁর পাশে বহু মূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত, আর কণ্ঠে মুক্তার হারে শোভিত পদ্মপাণি। বজ্রপাণিও আছেন, হস্তে নিয়ে একটি পুষ্প আর গ্রন্থ। ঊর্দ্ধে সপ্তবুদ্ধ উপবিষ্ট। তাঁদের শিরে শোভা পায় বট-পল্লবের চন্দ্রাতপ।

গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রেও একটি মূর্তি দেখি, তাঁর কণ্ঠে শোভা পায় বহু মূল্য হার। এক হস্তে তিনি ধারণ করেছেন একটি পুষ্প, অপর হস্তে মুদ্রাধার। পতিত হচ্ছে মুদ্রা ভূমির উপর। তাঁর বিপরীত দিকে একটি সুন্দরী নারী। খুব সম্ভব, তাঁরা এই মন্দিরের রক্ষক আর তাঁর পত্নী।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে তিন তলায় উপনীত হই। নির্মিত হওয়ার কথা ছিল এই তলাটিও দ্বিতলের অনুকরণে। কিন্তু সময় হয় নাই সম্পূর্ণ রূপদানের, রয়ে গিয়েছে অসমাপ্ত অবস্থায়। প্রাচীরের গাত্রে দেখি অনেকগুলি মূর্তি—বিভিন্ন তাদের আকৃতি। এক পাশে বুদ্ধ বসে আছেন, সঙ্গে নিয়ে শুধু দুইজন পার্শ্বচর।

নেমে এসে দশম গুহামন্দির 'বিশ্বকর্মা' দেখতে যাই।

ক্রমশঃ

অসংলগ্ন

শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী

অসম্পূর্ণ আমার কবিতা
ছন্নছাড়া জীবনের মাঝে,
যতিহীন গতি শুধু বিকেন্দ্রিক মন
অসংলগ্ন থাকে ভগ্ন নীড়ে।
ফেনশুভ্র সমুদ্র সৈকত
দুরন্ত নেশার মত সপিল বেষ্টনে
কেড়ে নেয় অকথিত বাণী,
পড়ে থাকে অসমাপ্ত সুর
পরিত্যক্ত গৃহস্থের তৈজস যেমন।
শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ
সলজ্জ হাসির মত ঢলে পড়ে
স্বীয় পক্ষপুটে।
ভগ্ন এক অপরাহ্ন নিয়ে
আর কত চলিবে লেখনী,—
অকস্মাৎ চিত্তভ্রমে ঘটে বিপর্যয়
ভেসে আসে দিগন্তের ফেনোচ্ছল সুর।

ভূমির প্রধান শত্রু অজ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

[illegible] মিলিত হইয়া ভূমিক্ষয় এবং সেই সম্পর্কে খাদ্য উৎপাদনের বিষয় আলোচনা করেন তখনই আমাদের পরিচিত গৃহপালিত জন্তু ছাগলের কথা আসিয়া পড়ে। স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, ভূমিক্ষয় বা দুর্ভিক্ষের সঙ্গে আবার ছাগলের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে?

কোষগ্রন্থ খুলিলেই দেখা যায় যে, ছাগকে চতুষ্পদ জাতির অন্তর্গত করিয়া বলা হইয়াছে। ইহা পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায়। ইহাকে পালন করাও সহজ। ছাগ-দুগ্ধ সুপেয়, মাংস সুখাদ্য। ইহার লোম দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত হয়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, ছাগল খুবই উপকারী পশু এবং মানুষের খাদ্য যোগানের ব্যাপারেও ইহার অবদান কম নহে।

কিন্তু যে সকল বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে অনুসন্ধান করে বিশেষতঃ রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-পরিষদ (UNESCO) খাদ্য ও কৃষিসংস্থা (FAO) এবং আন্তর্জাতিক প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে (INCU) ছাগ সম্বন্ধে অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা সকলেই বলিবে যে, ছাগল মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু।

প্রধানতঃ ছাগলের জন্যই ভূমধ্যসাগরের সমীপবর্ত্তী দেশগুলি বৃক্ষশূন্য হইয়াছে। ইহারা ঘাস খাইয়াই তৃপ্তি পায় না, শিকড়গুলিও খাইয়া ফেলে। ছোট ছোট গাছপালার বীজ পর্য্যন্ত খায় সুতরাং এই সকল গাছের বাঁচিবার বা ছড়াইবার সম্ভাবনা মোটেই থাকে না।

পেছনের পায়ে ভর দিয়া ছাগল দাঁড়ায় এবং গাছের নীচের ডালপাতাগুলি ধ্বংস করে এবং কোন কোন গাছে ছাগলকে চড়িতেও দেখা যায়। পাহাড়ের পার্শ্ব যতই খাড়া হউক, ছাগলের গতি সেখানে অব্যাহত। ছোট পাথরের নীচে চাপা ক্ষুদ্র গুল্মটিও ইহার রাক্ষসী গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায় না। ছাগল পাহাড়ের পার্শ্বস্থ গাছপালা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে, যাহার ফলে উলঙ্গ পর্ব্বতদেহে সূর্য্যতাপে এবং বর্ষায় ভীষণভাবে ভূমিক্ষয় হইতে থাকে।

ছাগল ও ভেড়ায় মিলিয়া স্পেন দেশকে এবং সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহকে বৃক্ষশূন্য করিয়াছে—তবে একার্য্যের জন্য উভয়ের মধ্যে কে বেশী ক্ষতি করিয়াছে বা বড় অপরাধী, বলা শক্ত। রোম সাম্রাজ্যের সময়েও জঙ্গলময় পাহাড়ে ছাগ ও মেষের পালকে বৎসরের কোন কোন ঋতুতে চড়াইবার জন্য নেওয়া হইত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে কেটোর মত চিন্তাশীল লেখক লিখিয়াছিলেন—"যদি জলাভাবে নিম্নভূমিতে তোমাদের স্বাভাবিক পশুচারণ জমির অভাব হইয়া থাকে তবে, পর্ব্বতের শুষ্ক উঁচু দুর্গম স্থানে পশুচারণ জমি তৈরি কর।" এই সর্ব্বনাশা উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করায় যতই পর্ব্বতের উচ্চদেশে পশু চরিতে আরম্ভ করিল, ততই সেখান হইতে চিরশ্যামল ওকের বন অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

উত্তর আফ্রিকার বার্ব্বার দেশের সম্পূর্ণ ধ্বংস সে দেশে একদল ছাগকে ছাড়িয়া হইয়াছিল। মরোক্কো দেশে সিডার বৃক্ষ এখন দুর্লভ হইয়াছে—সে দেশে ছাগল খাওয়ার পরে আর সিডার বৃক্ষের জন্মাবার উপায় থাকে নাই। পশ্চিম-সাহারায় মুরেরা 'মিমোসা' জাতীয়-উদ্ভিদ কাটিয়া ছাগলের সহজখাদ্য করিয়া দিত। বিখ্যাত উদ্ভিদ-বৈজ্ঞানিক আগষ্ট শিভেলিয়ার বলেন যে, এই জন্তুগুলি কেবল গাছ নষ্ট করিয়াই থামিত না, মাঠে যে সকল বীজ পড়িয়া থাকিত এবং আগামী বর্ষাকালে যাহা আবার মুঞ্জরিত হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহাও খালি মাঠে চরিয়া খাইয়া ফেলিত। উত্তর হইতে দক্ষিণ—মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত সমস্ত আফ্রিকায় এই ধ্বংসলীলা চলিয়াছিল। সিরিয়া, লেবানন এবং ইস্রাইল এশিয়ার চুণা-পাহাড়ের অঞ্চল এমন কি চীন পর্য্যন্ত বৃক্ষরাজী ছাগলের পাল ধ্বংস করিয়াছে।

যখন বেপরোয়াভাবে এই সকল ধ্বংসের জন্য ছাগলকে দোষ দেওয়া যায় তখন কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বলেন, মেষ, খরগোস প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীও এই সকল ধ্বংসের জন্য দায়ী।

অবশ্য সেক্ষেত্রে ছাগল দ্বারা কতটা ক্ষতি হইয়াছে তাহা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কারণ এই ধ্বংসের কাজ বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এক একটি দ্বীপে এই মারাত্মক ধ্বংসকার্য্য কিভাবে হইয়াছে তাহার সঠিক প্রমাণ আছে।

পুরাতন কালে যখন নূতন দেশের বা দ্বীপের সন্ধানে নাবিকেরা পাড়ি দিত, তাহারা জাহাজে কিছু কিছু গৃহপালিত পশু লইত, আর নূতন আবিষ্কৃত দেশে উহাদের দুই-এক জোড়া ছাড়িয়া আসিত। নূতন দেশের জলবায়ু এই সকল জানোয়ারের একবার সহ্য হইলে উহারা অসম্ভব গতিতে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকিত। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে দক্ষিণ আমেরিকার ঘোড়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার খরগোসের কথা। ছাগলের কথা আরও অদ্ভুত।

আতলান্তিক মহাসাগরের সেণ্টহেলেনা দ্বীপটি ১৫০২ সনে আবিষ্কৃত হয়। দ্বীপটি ছিল জঙ্গলময়—একেবারে জনশূন্য। ১৫১৩ সনে পর্ত্তুগীজেরা এখানে ছাগল আনিয়াছিল। দুই শতাব্দী পরে দেখা গেল ছাগল এই দ্বীপের সমস্ত বনরাজী ধ্বংস করিয়াছে। ১৭৪৫ সনে দ্বীপের গবর্ণর ছাগলের ধ্বংসলীলায় বিচলিত হইলেন

এবং বনের অবশিষ্ট অংশের জন্য বিশেষতঃ আবলুস বৃক্ষ যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তাঁহার কথা তখন গ্রাহ্য হয় নাই কিন্তু ১৮১০ সনে তদানীন্তন গবর্ণর সমস্ত ছাগল ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তখন খুবই বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল—কারণ ইতিমধ্যে দ্বীপটি বৃক্ষশূন্য হওয়ায় আগ্নেয়গিরির উদ্‌গত পদার্থ হইতে উৎপন্ন উর্ব্বর জমি যাহা এতদিন জঙ্গলাবৃত থাকার দরুণ সঞ্চিত হইয়াছিল উহা অবাধ বাস এবং বর্ষার প্রভাবে সমুদ্রের জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মৃত্তিকাহীন উষর পার্ব্বত্য ভূমি মাত্র পড়িয়াছিল।

ছাগল কর্তৃক জমি মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে

চার্লস ডারউইন উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিয়াছেন যে, প্রশান্ত-মহাসাগরের জুয়ান ফার্ণেণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ (যেখানে জাহাজ-ডুবি হওয়ার পর স্কটল্যাণ্ডের নাবিক আলেকজাণ্ডার, সেলুকাস ১৭০৪ সন হইতে ১৭০৯ সনে বসবাস করিয়াছিলেন এবং যাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া ডেনিয়াল ডিফো তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'রবিনসন ক্রুসো' রচনা করিয়াছেন) পূর্ব্বে চন্দনবৃক্ষের জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ছাগলের দ্বারা এই বৃক্ষ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছিল, মাত্র দুই-একটি জনমানবশূন্য দুর্গম ক্ষুদ্র দ্বীপে অল্পসংখ্যক চন্দন গাছ দেখা যাইত। ১৯৫২ সনে ক্যারাকাস শহরে যখন আন্তর্জ্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ-রক্ষণ প্রতিষ্ঠান এক সম্মেলনে মিলিত হন, তখন বৃক্ষবিহীন এই দ্বীপসমূহের অবস্থা এরূপ শোচনীয় দেখা যায় যে, সম্মেলন এই দ্বীপের মালিক চিলি গবর্ণমেণ্টকে ধ্বংসাবশিষ্ট বৃক্ষাদি রক্ষা করিবার জন্য ছাগবংশ ধ্বংস করিতে অনুরোধ জানান।

ফিনিসির ও তাহাদের পরবর্তী ঔপনিবেশিক সাইপ্রাস দ্বীপের বনজঙ্গল ধ্বংসের যাহা বাকী রাখিয়াছিল, ছাগল তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছিল।

হাওয়াই দ্বীপে ছাগল এতটা 'শনি' হইয়াছিল যে, ছেলেমেয়েরা দল বাঁধিয়া ইহাদিগকে তাড়া করিয়া সমুদ্রে সাগরের মুখে ফেলিয়া দিত।

ছাগল গাছেও উঠিতে পারে

এই সকল প্রমাণ একেবারে অকাট্য। এই সকল সুপরিচিত দ্বীপের বৃক্ষাদি একমাত্র ছাগল দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

দায়িত্বপূর্ণ লোকেরা বহুপূর্ব্বে বুঝিয়াছিল যে ছাগল অতি ভয়ানক জীব। ১৬৩৬ সনে ফরাসী দেশে একটি আইন পাশ হয়—যে সকল অরণ্য ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেখানে আর ছাগল প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু জনসাধারণ এই আইনের বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিরোধ জানাইল যে, ১৭৩১ সনে এই আইন সংশোধন করিয়া আর একটি অল্প-কঠোর এবং অকার্য্যকরী আইন পাশ করিতে হইল।

কিন্তু সমস্যার সমাধান খুবই সহজ—যে সকল অঞ্চলে ইহাদের ধ্বংসলীলা খুব বেশী হইয়াছে সেখানে ছাগলগুলিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলা, আর যেখানে এরূপ কোন ধ্বংস এখনও হয়

স্রাই সেখানে ছাগযূথকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা। অনেক বিশেষজ্ঞ ছাগলগোষ্ঠী একেবারে নিপাত করিতে চান। কিন্তু এই চরম এবং অমোঘ ব্যবস্থা নানা কারণে সম্ভব নহে।

ছাগল নিজের স্বভাব অনুযায়ীই কেবল কার্য্য করে না। ইহা একটি গৃহপালিত জন্তু এবং মানুষ ইহাকে যেখানে লইয়া যায় সেখানেই ইহার ধ্বংসলীলা সম্ভব। গলায় দড়ি দিয়া খুঁটায় বাঁধিয়া রাখিলে ছাগল কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। একটি সমতল ভূমিতে অবাধে চড়িতে দিলেও একদল মেষ অপেক্ষা একদল ছাগল বেশী ক্ষতি করে না। কিন্তু একটি পার্ব্বত্য জমিতে – যেখানে বনরাজি ইতিমধ্যেই কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে—একদল ছাগল সেখানে ধ্বংস আনিয়া দিতে পারে। সুতরাং ছাগলযূথের মালিকগণের এরূপভাবে ছাগপালন করা উচিত যাহাতে উহা ভূমিক্ষয়ের কারণ না হয়।

আইন বা নিয়ন্ত্রণই একমাত্র উপায়। অনেক দেশে আইন আছে, কিন্তু আইন মানা হয় না; ফলে গ্রামাঞ্চলে ছাগলের ধ্বংসলীলা চলে।

উত্তর আফ্রিকার, সাহারা এবং উহার দক্ষিণাঞ্চলে বন-বিকাশের রোপিত নূতন নূতন বনভূমিও ছাগলের দল নষ্ট করিতেছে। কার্য্যটি এত বৃহৎ যে, সে দেশের গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াও প্রতিবিধান করিতে অক্ষম।

ছাগল ভূমিক্ষয়ের কারণ, এই বাস্তব সত্যটি খুব পরিষ্কার হইলে ছাগলের মালিক, রাজনৈতিক নেতা, উচ্চস্থানের সরকারী কর্ম্মচারী কেহই এই বিষয়ে সজাগ নহে। মাদাগাস্কারের সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ১৯৩৬ নাগাদ এই দ্বীপের দক্ষিণাংশে সরকার মোহেয়ার ছাগল আনে। ১৯৩৭ সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল হাজার খানেক। ১৯৪৬ সনে—২৩,০০০, ১৯৪৮ সনে ১,৪৭,০০০, ১৯৪৯ সনে ২,০৩,০০০, ১৯৫০ সনে ২,১৬,৫৮৫ হয়; ইহাতেই বুঝা যায় ছাগলের বৃদ্ধির সংখ্যা কিরূপ। ইতিমধ্যেই দ্বীপের বিস্তৃদংশ ছাগলের দ্বারা মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ছাগলের ধ্বংসে মানুষের উপকারই হইবে। কৃষি এবং বনের বিশেষজ্ঞগণও খরগোস দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করিয়া এই প্রাণী সম্বন্ধেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। বিষপ্রয়োগে কিছু পরিমাণ খরগোস বিনাশ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সে অঞ্চলে উহাদের সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি বাড়িয়াছে। ছাগল সম্বন্ধেও সাইপ্রাস, ভেনিজুইলা এবং নিউজিল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা হইতে তিনটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সাইপ্রাস দ্বীপে বনবিভাগের অনুরোধে স্থানীয় সরকার ১৯১৪ সনে একটি "ছাগল-বিরোধী" (Anti-goat) আইন পাস করে—অবশ্য পূর্ব্বেই জনসাধারণকে এই আইনের সৎ উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ছাগল ধ্বংস করা সরকারের উদ্দেশ্য ছিল না, ইহা বলিয়াই জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করা হইয়াছিল। সরকার ছাগলের মূল্য দিতে এবং চাষের জমি দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। যে কোন গ্রামে দশজন জমি ও ছাগলের মালিক ছাগল মারিয়া ফেলিতে সম্মত হইলে, স্থানীয় নেতাসকল ছাগল-মালিকদের এক সভা আহ্বান করিয়া সরকারের আইনের উদ্দেশ্যের কথা বুঝাইয়া দিত এবং সকলকে ছাগলযূথ ধ্বংসের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে বলা হইত। অধিকাংশের মত ছাগ-বিনাশের স্বপক্ষে হইলে, উহাদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া বাকি পশুগুলিকে দড়ি দ্বারা খুঁটায় বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভূমধ্যসাগরে ডুবো-জাহাজের আক্রমণের জন্য দ্বীপে খাদ্য সরবরাহ সঙ্কট দেখা দেয় এবং দ্বীপটিকে অধিকাংশে খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল হইতে হয়। অনেক আপত্তি সত্ত্বেও ছাগ-বিরোধী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এখন ইহার সুফল দেখা যাইতেছে। সহজভাবে আবার বনরাজি বাড়িতেছে এবং কৃষির জমিও হ্রাস পাইতেছে না।

ভেনিজুইলার কারাকাস এবং লা-গুএইরার মধ্যবর্ত্তী তাকাগুয়া নদীর তীরের প্রদেশটি এককালে খুবই সমৃদ্ধশালী ও কৃষিপ্রধান ছিল। আজও বহু ক্ষেত আমাদের এবং কারখানার ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। ১৯৩৪ সনে এখানে আর জনমানব ছিল না এবং পাহাড়ের গায়ের অরণ্যও লোপ পাইয়াছিল। ১৯৪৭ সনে এই স্থানের অবস্থা একেবারে সঙ্কটজনক বলিয়া অধ্যাপক ফ্রান্সিসকো তেমারও বর্ণনা করিয়াছেন। নির্ম্মম কাঠুরিয়ার হাত হইতেও যে বনভূমি রক্ষা পাইয়াছিল, ১৫ বৎসরে ছাগবংশ তাহা একেবারে নির্ম্মূল করিয়াছে।

ভেনিজুইলার সরকারী বনবিভাগ পরীক্ষামূলকভাবে এখানে বন জন্মাইবার জন্য একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। এই স্থান হইতে ছাগযূথকে একেবারে দূর করিয়া দেওয়া হয়, কেহ ছাগ চড়াইলে তাহার জন্য মোটা জরিমানা এবং কারাবাসের ব্যবস্থা করা হয়। সরকার সমস্ত ছাগল কিনিয়া লইতে রাজি হয় এবং ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সনের মধ্যে এই স্থানের অধিবাসী ১১টি পরিবারের নিকট হইতে ১৬,০০০ ছাগল ক্রয় করে। তিন বৎসরের মধ্যেই অনেক উন্নতি দেখা যায়—নূতন জঙ্গলের পত্তন এবং ঘাস রোপনের জন্যই ইহা করা হয়। আর ছাগলের ধ্বংসলীলা ছিল না।

নিউজিল্যাণ্ড হইতে ১৯৫৪ সনে মিঃ জি. জি. এটকিনসন এক বিবরণীতে জানান যে, কিরূপে ১৯২০ সনে মাউণ্ট এগমণ্ট ন্যাসনাল পার্ক ছাগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। একপ্রকার আগাছা দ্বারা ফসল নষ্ট হইতেছিল, এই আগাছা ধ্বংস করিবার জন্য দশ বৎসর পূর্ব্বে চাষীগণ কিছু ছাগ আমদানী করিয়াছিল। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। ১৯২৬ হইতে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত ছাগ নির্ম্মূল করিবার আন্দোলন চলে—ন্যাসনাল পার্কেই ১৫,০০০ ছাগল মারিয়া ফেলা হয়। ভবিষ্যতে যাহাতে আর বিপদ না হয়, এজন্য চাষীরা নিজেদের ছাগলগুলিও মারিয়া ফেলে। মিঃ এটকিনসন বলেন, একটি ছাগলকে স্বাধীনভাবে চড়িতে দেওয়াও জাতির পক্ষে বিপদজনক। নিউজিল্যাণ্ডের অন্তর্গত কারমাডেক

দ্বীপপুঞ্জও ছাগলের উৎপাত দেখা দেওয়ায় রয়েল সোসাইটি অব নিউজিল্যাণ্ড ছাগল ধ্বংসের সুপারিশ করিয়াছিল।

অবশ্য যেখানে স্বাধীনভাবে ছাগল চড়িয়া বেড়ায় সেখানে ছাগল অনর্থ ঘটায়। গৃহপালিত খুঁটায় বাঁধা ছাগলের ক্ষতি করিবার শক্তি স্বতঃই সঙ্কীর্ণ। তবুও ছাগলের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যত বাড়ে ততই মঙ্গল, ততই সকলে সাবধান হইতে পারে। ছাগলের দুধ, ছাগলের মাংস, ছাগলের চামড়া ও পশম মানুষের নিকট মূল্যবান। অনেক ক্ষেত্রে ইহা কেবল ব্যক্তি ও জাতীয়সম্পদ নহে, আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের মূল্যবান উপকরণ।

ছাগলের স্বভাব, ব্যবহার এবং অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয়, মানুষকে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে সব সময়ই ইহার সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। (কুরিয়ার-ইউনেস্কো)

তিমির-তীর্থ

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

শীতের সকাল। সারারাত স্বচ্ছ নীল আকাশ থেকে ঝরেছে কুয়াশা, তাতে সকালে লেগেছে সোনালী রং। তবুও কিছু দূরের লোক মসলিনে ঢাকা।

এক কোল বই সুলেখার কোলে। ফরসা রঙের পট-ভূমিকায় ফিকে গোলাপী একটি কলেজ-হাতা সোয়েটার পরা। গলায় জড়ানো গরম বাহুলতা মাফলার।

বেশ লম্বা-চওড়া সুলেখা। কুয়াশায় সাঁতার কেটে কেটে এসে সামনাসামনি হ'ল নিখিলেশের। যেন অবাক,—তেমন সুরেই বলল, আপনি!

উত্তরে নিখিলেশের মুখে হাসি। বলল, এত সাত-সকালে বোধ হয় কলেজে?

হ্যাঁ।

এবার তোমার আই-এ পরীক্ষা ত?

কিন্তু কি করব কে জানে!

যেমন পড়াশুনা করবে তেমন··

তা অবশ্য করছি। কিন্তু কোর্স ফিনিস হয় নি; সময় নেই বলে হবেও না। সেগুলো একেবারে গ্রীক্ হয়ে রয়েছে।

কোন্ বিষয়?

শুনলে ওষুধ দিতে হবে।

তার মানে বাংলার কথা বলছ?

হ্যাঁ। ভেবেছিলাম আপনার কাছে যাব।

রাস্তায় হঠাৎ দেখা হলে এমন নাটকীয় কথা অনেকে বলে।

না—না, আমি তেমন নাটক করছি না। তা ছাড়া এমনিতেও আমি ত প্রায়ই আপনাদের বাসায় যাই। অবশ্য আপনার সঙ্গে দেখা হয় না।

আমার দুর্ভাগ্য। যাক্, কবে থেকে যাব বল?

গুণীকে ছোট করতে চাই না, আপনার বাসায় গিয়েই দিন ঠিক করব।

কথা বলছিল আর হাঁটছিল ওরা। এল প্রায় সুলেখার কলেজ পর্যন্ত। সেটুকু দূরে থাকতেই সুলেখা বলল, কাল ত ছুটি, বিকেলের দিকে বাড়ী থাকবেন ত?

থেয়ো।

আগের বছরেই বাংলা নিয়ে এম-এ পাস করেছে নিখিলেশ। কিন্তু সেটাই তার বড় পরিচয় নয়। তার সত্যিকারের পরিচয়—সে সুসাহিত্যিক এবং এ উপাধি সে পেয়েছে আই-এ পড়ার সময় থেকে।

একটা গোটা বাড়ীর দু'ভাগে ছিল নিখিলেশ আর সুলেখারা। সুলেখা তখন ছোট, বাড়ীর আর সব ছেলে-মেয়েকে দেখার মতই নিখিলেশ দেখত সুলেখাকে। কিন্তু মানুষের নিশ্চিত পরিচয় থাকে তার মনের গহন-গভীরে লুকিয়ে। কোন আচমকা সময়ে এমন এক-একটা অভাবনীয় মুহূর্ত আসে যখন সে পরিচয় বেরিয়ে আসে সাবলীল গতিতে, বেরিয়ে পড়ে তারও অজ্ঞাতসারে তার নিজেরই কথার মাঝে, সেখানে সব সময় বয়স বড় কথা নয়। ক্লাস 'এইটে' পড়া মেয়ে সুলেখার কাছ থেকেও একদিন তেমন পরিচয় পেয়ে-ছিল নিখিলেশ।

সেবারে একটা সার্কাস এসেছিল কলকাতায়। ভালো

সিটের দাম দশ টাকা। বাড়ীতে চাইলে নিরাশ হতে হবে নিখিলেশ জানত। কিন্তু সার্কাস দেখার একান্ত ইচ্ছা পেয়ে বসেছিল তাকে। মনের একান্ত ইচ্ছা প্রেরণা দিল একটা নূতন কাজে। কলম নিয়ে বসল। জীবনে প্রথম গল্প লিখল সে। নামকরা একটা ম্যাগাজিনে দিল ছাপতে—ছাপা হ'ল এবং না চাইতেই পেল পারিশ্রমিক। শুধু তাই নয়, এক গল্পেই বাজারে তার নামের ছড়াছড়ি।

সুলেখাও তার এক বান্ধবীর বাসায় পড়েছিল গল্পটা। একবার পড়েই মুগ্ধ হয়েছিল, বিস্মিত হয়ে ভেবেছিল—লেখক তাদেরই পাশের ঘরের লোক, কত পরিচিত নিখিলেশ। সব সময় কেমন চুপচাপ করে বসে থাকে। তার এমন সুন্দর লেখা! তার মনোবনে এত ফুল!

সুলেখার মনের এই ভাল-লাগা চাইল প্রকাশের পথ। বাড়ী ফিরে সুলেখা নিখিলেশকে বলল, আপনার গল্পটা পড়েছি। [illegible] আছে? আর একবার পড়ে দেখতাম।

ফ্রকের বয়স হলেও স্বাস্থ্যের জন্যে কাপড় পড়ত সুলেখা। নিখিলেশ তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, সে যেন পাশের ঘরের পরিচিত সুলেখা নয়। যেন বাংলার একজন পাঠিকা। একটা আনন্দবিহ্বল মুহূর্ত! সেই মুহূর্তে নিখিলেশের নিজের অজ্ঞাতে তার চির অভ্যাসের হ'ল পরিবর্তন। সুলেখাকে 'তুই' সম্বোধন তখন মুখ দিয়ে বের হ'ল না তার। বলল, তোমার কেমন লেগেছে সুলেখা?

'তোমার' কথাটা রং লাগিয়ে দিল সুলেখার মুখে, সোজাসুজি হয়ে বলল, অনেকে প্রশংসা করেছে আপনার লেখার, আমার কিন্তু ভাল লাগে নি।

একটু হাসল নিখিলেশ। ম্যাগাজিনখানা সুলেখার হাতে দিয়ে বলল, খারাপ যখন লেগেছে তখন আর একবার পড়ে দেখাই দরকার।

সে আজ অনেক দিনের কথা। সুলেখারা সে বাসা ছেড়ে উঠে গেল নূতন বাসায়। ঠিকানা অবশ্য জানা ছিল নিখিলেশের। কিন্তু বাহ্যতঃ কোন কারণ না থাকায় যায় নি আর সেখানে।

অনেকদিন পরে আবার এই যোগাযোগ। মাসতিনেক নিখিলেশ পড়াল সুলেখাকে। পাস করল সে, বাংলা-পত্রেই পেল বেশী নম্বর। এজন্যেই সুলেখা নিখিলেশকে বলল, যেমন মন দিয়ে পড়িয়েছিলেন...

অযৌক্তিক কথা তোমার সুলেখা। মন দিয়ে অনেকেই পড়ায়, মনোযোগী ছাত্রেরই অভাব। সুতরাং কৃতিত্ব তোমার।

তবুও একটু গর্ব অনুভব করতে পারত নিখিলেশ, মুখে ফুটে উঠতে পারত একটু হাসি। সুলেখাও তা আশা করেছিল, কিন্তু তা না দেখে সুলেখা বলল, পাকা সাহিত্যিক হয়ে...

হাসিতে আপত্তি জানাল নিখিলেশ, পাকা সাহিত্যিক?

লেখা ত ঘরে আটকা থাকে না, ছাপা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কাগজে কাগজে সে লেখার মৌলিকত্ব আর প্রকাশভঙ্গিমার প্রশংসা। পাঠক-পাঠিকার চোখে তা পড়েই। তার মুখে এমন পাকা-মাস্টারী কথা!

ঠিক এমন রসভঙ্গ জীবনের আরও অনেক ছন্দে ছন্দে নিখিলেশ করেছে। একদিন মোহিতলাল মজুমদারের 'দীপশিখা' পড়াচ্ছিল সুলেখাকে। 'জাগর রক্ত আঁখির কাজল' সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করে নিখিলেশ কি কথায় যেন বলেছিল, মেয়েদের চোখে যদি কাজল না থাকে তবে বিধবার চোখ বলে মনে হয়।

পড়াতে বসে অবান্তর কথা বলত না নিখিলেশ। সব সময়ই সে থাকত সংযত। শুধু মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে সুলেখা, দু'একবার কি কথা যেন ভেসে উঠত নিখিলেশের চোখে। [illegible] পালিয়ে যেত পলকে। সুলেখা তাই নিখিলেশের [illegible]-খাতাকে মনে করল তার গোপন মনের একটু [illegible]; রুদ্ধ হৃদয়ের জানালা খোলা! তাই সে উত্তর দিত [illegible]। কিন্তু ঘুরিয়ে কেন? সোজা ভাবে বললে আরও যে ভাল লাগত! কেন জয় করেও ওর জয় লেখা না? [illegible] সে যে জয়ী তা বুঝতে পারছে না?

[illegible] সেই থেকেই সুলেখার মনে এক নূতন নেশা। [illegible] গুনগুন। জীবন-পেয়ালা যেন [illegible] কোন সাজসজ্জা নয়, পোশাক সেখানে বাহুল্য, [illegible] শুধু দুটি কাজল রেখায়। একেই ত পটল-চেরা চোখ!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নিজেকে কয়েকবার দেখল সুলেখা। নিজেকে দেখেও আশা মিটছে না তার।

সময়মত এল নিখিলেশ। দুজনে মুখোমুখি—সুলেখার সুষমামাখা মুখখানার চোখ দুটিতে দুনিয়ার সবটুকু শোভা। সে চোখ দুটি হাসি-হাসি; সবুজ বনানীর হাতছানি তাতে। অপলক চোখে সে-চুম্বকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল নিখিলেশ।

সুলেখা তখন পদ্ম! তার সর্বাঙ্গের পাঁপড়ি মেলে সে পান করতে চেয়েছিল নিখিলেশের ছোট্ট একটু কথার মধু-সৌরভ। নিখিলেশ মুগ্ধ হয়ে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল ঠিকই কিন্তু নিজেকে হারিয়ে ফেলার তন্ময়তায় নির্ঝরের মত সহজ সঙ্গীতের সুরে বলে ফেলল না

'খুব সুন্দর'! যদি বলত তাতে সুলেখার মানসবীণার তারে তারে যে সুর তখন ছুঁই-ছুঁই করছিল তা মধুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হয়ে তার অন্তরের কোমলে সৃষ্টি করল মন্ময়তা। অনির্বচনীয় মরমী আবেশে বিভোর হতে পারত সে—তা হতে পারল না সুলেখা। নিখিলেশের কার্পণ্য ম্লান করে দিল অর যৌবনের প্রথম মুকুলের মালাটি, ব্যর্থ করে দিল সব আয়োজন! লজ্জা পেল সুলেখা। সে লজ্জা ঢাকতেই এতক্ষণের শিথিল কাপড়ের আঁচলখানা ভাল করে জড়িয়ে দিল বুকে। আড়ষ্ট সে তখন। শিল্পীর নিপুণ হাতের সুনিপুণ একটু আঁচড়ে যে প্রতিমার হ'ত চক্ষুদান, তা তখন অন্ধ।

আকাশের কোলে কোলে বিদ্যুৎবালার বিচ্ছুরিত সোনালী রঙের মত সুলেখার সারা শরীরে তখন লজ্জা ছড়ানো। সে লজ্জা-সুন্দরী-রূপ তখন নির্বাক ভাবে আকণ্ঠ পান করছিল নিখিলেশ। তখনই একবার বলে উঠল, তুমি এমন লজ্জাবতী লতা হয়ে রইলে কেন সুলেখা?

ব্যর্থ আশার একটা গরম নিশ্বাস শুধু বের হ'ল সুলেখার!

একটু ঠাট্টার সুরে নিখিলেশ বলল, রবি বৈ মুখ খোলে না শশি বৈ কয় না কথা?

সুলেখার বলতে ইচ্ছা হ'ল, তা যদি বুঝো থাক তবে এমন কৃপণ হয়ে রয়েছ কেন? মনের কথাকে স্রোতের ধারায় প্রবাহিত না করে কেন রইলে এমন নির্বাক হয়ে? কিন্তু বলতে পারল না কিছু সুলেখা। শুধু আনত চোখ দুটি অভিমানের ব্যথায় একবার তুলে ধরল নিখিলেশের দিকে, বলল, শরীরটা ভাল লাগছে না আমার।

কালকে আসব?

আসবে। হঠাৎ বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

শুনে বেশ একটু হেসেছিল নিখিলেশ!

সাধারণতঃ সন্ধ্যা ছ'টায় পড়াতে যায় নিখিলেশ। সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে থাকল সুলেখা—প্রস্তুতি ভেতরে বাইরে। ঠিক করল, নিখিলেশের কাছ থেকে একটা কথাই চাইবে সে। বলবে, এমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে থাকছ কেন?

বেজে গেল ছ'টা-সাড়ে ছ'টা। মনের প্রস্তুতি শিথিল হতে লাগল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। নিখিলেশ এল না। অথচ কোনদিনই কথার খেলাপ হয় না তার, হয় না সময়ের এদিক ওদিক। তাই কত কি চিন্তা করল সুলেখা। সে চিন্তাই গতি এনে দিল তাকে।

বাড়ীতেই ছিল নিখিলেশ, ছিল তার ঘরে। সেখানে আরও ছিল কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। ওটা নিখিলেশের রবিবারের সাহিত্যসভা।

সাধকের মত বসেছিল নিখিলেশ, বন্ধুদের পড়ে শোনাচ্ছিল তার লেখা।

সুলেখা ইচ্ছা করেই নিখিলেশের ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরল বার কয়েক। মায়ের কোলে শিশুর অপূর্ব সৌন্দর্যের মত সাহিত্যের আসরে সাহিত্যিক-নিখিলেশকে অপূর্ব শান্ত, সৌম্য আর সুন্দর দেখল সুলেখা।

একটা ঝড় উঠল সুলেখার মনে। বুকের সীমায় সীমাহীন গতি সে প্রচণ্ড ঝড়ের। মুহূর্তে সব ভেঙেচুড়ে একাকার করে দিল সুলেখার। হ'ল যেন নূতন সুলেখা! আগের সুলেখার দিকে তাকিয়ে দেখল, সে হয়েছে লজ্জায় সঙ্কুচিতা।

সুলেখা যে এল এবং চলে গেল তা জানতে পারে নি নিখিলেশ। রাতে খেতে বসে জানল। মা বলল তাকে।

অবাক হয়ে নিখিলেশ বলল, আমাকে তবে ডাকলে না কেন?

আমি বলেছিলাম, জানাল মা। সুলেখাই আপত্তি করল।

কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে নি বলে পরের দিনই নিখিলেশ গেল সুলেখার কাছে। গিয়ে বলল, সত্যি খুব ভুল হয়ে গেছে সুলেখা!

নূতন কিছু নয়, ছোটকে বড়র এমনি ভুল হয়।

এমন অভিযোগ করো না সুলেখা, মনের মিল ছোট-বড়তে হয় না। তা যাক্, এটা অবশ্য খুবই সত্য কথা যে, আমি তোমাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।

মানে?

আমার লেখা তোমারই দান। বন্ধুদের তাই পড়ে শোনাচ্ছিলাম।

সাহিত্যিক কল্পনার পথে রঙীন পাখা মেলে উড়তে পারে, সে সভায় আমরা অচল। আমরা চলি বাস্তবে। সেখানটার সত্যটাই আমাদের মনে দাগ কাটে। যাক—তুমি তবে আমার কাছে ঋণী।

অশেষ?

এ ঋণপত্র কোথায় লেখা থাকবে?

মনে।

মনের পাষাণে?

হেসে দিল নিখিলেশ, কোমলে।

তবে ত নূতন নায়িকার আগমনে সহজেই মুছে যাবে! হাসতে হাসতে বলল সুলেখা।

নিখিলেশও হাসল, পরে গম্ভীর হয়েই বলল, কি করে বলতে পারলে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সুলেখা বলল, তোমার প্রয়োজনের কষ্টিপাথরে হয় ত আমি ফুরিয়ে যাব; তখন একান্ত প্রয়োজন হবে নূতন কোন প্রেরণাময়ীর।

না সুলেখা, একজনকেই বহুরূপে পাওয়া যায়। আমিও তোমাকে সে-ভাবে পেয়ে আমার চাহিদা মেটাই।

একটু ঠাট্টার সুরেই সুলেখা বলল, সত্যি?

নিশ্চয়ই।

নিখিলেশের ও কথাটাকেই বেশ করে মনে গেঁথে রাখল সুলেখা। কেটে গেল মাসের পর মাস।

সুলেখা প্রায়ই আশা করে নিখিলেশ আসবে। আশা যখন ছলছল চোখে দাঁড়ায় নিরাশার দুয়ারে, সুলেখা তখন বের করে নিখিলেশের লেখা। অগুণতি ম্যাগাজিন, অনেক বই। পড়ে—পড়তে পড়তে ভাল লাগে সুলেখার। মাদকতায় হারিয়ে ফেলে নিজেকে। দেখে, নিখিলেশের ওপর অভিমানে তার মনে যে মেঘ জমা হয়েছিল—তা উড়ে গেছে কোথায়। সে জায়গায় তখন নির্মল বিমল এক অনুভূতি। তাকে আনন্দময় মধুর এ অনুভূতি দিতেই ত সময় পাচ্ছে না নিখিলেশ।

সুলেখার মনে যখন এমন হিসেব নিখিলেশের মনেও তখন সুলেখা। কিন্তু নিখিলেশের প্রকৃতিতে বাহ্যিক প্রকাশ নেই এতটুকু। তার পরে আবার মাসিক পত্র-পত্রিকার চাহিদা মেটাতে সময় পাচ্ছে কম; আছে প্রকাশকদের আগাম টাকার বিনয়-নম্র তাগাদা। তাতে উপযুক্ত সাড়া দিতেই হয় তাকে। সেখানেই ত তার জীবন।

কিন্তু তা ছাড়াও! হঠাৎ মনের মধ্যে থমকে দাঁড়ায় নিখিলেশ। তার জীবনের জীবন লুকান রয়েছে সুলেখার মাঝে—তার চোখ দুটিতে। কি মায়া মাখা, স্বপ্ন জড়ানো অপূর্ব চোখ দুটি, যেন দুখানি কাব্য। সেই ত প্রেরণাময়ী।

নিখিলেশের সারা মনে ঝড় ওঠে। দুরন্ত বাতাস যেন বলে দিয়ে গেল, অনেকদিন সুলেখাকে দেখে নি সে।

সুলেখাদের বাসায় গেল নিখিলেশ—অনেক দিন পরে। সুলেখা তাকিয়েই রইল তার দিকে। তা দেখে নিখিলেশ বলল, এত দিনের দেখা লোকটিকে অমন করে কি দেখছ?

অপরূপ! দুটি চোখে তোমাকে দেখে শেষ করা যায় না…। বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সুলেখা। তার চোখে তখন ভেসে উঠল সেই কতদিন আগেকার সাহিত্য-বাসরের নিখিলেশ। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত সুলেখা হয়ে গেল মুকুল।

সুলেখার এই হঠাৎ থেমে যাওয়া নিখিলেশ বুঝল। বলল, বেশ ত বলতে শুরু করেছিলে, হঠাৎ থেমে গেলে কেন?

সুলেখা তখন সামলে নিয়েছে নিজেকে। বলল, না কিছু নয়। তুমি বস, চা নিয়ে আসছি।

চায়ের কাপ নিখিলেশের হাতে দিয়ে সুলেখা বলল, আজ কত দিন পরে এলে হিসেব আছে? কথা ক'টি সুলেখা মুখে না বলে তার ছলছল চোখ দিয়েই যেন বলল।

সুলেখার একখানি হাত ধরল নিখিলেশ, সত্যি। কিন্তু জান ত, কত ব্যস্ত থাকি। অবশ্য তার মাঝেই যখন ইচ্ছা হয় মনের চোখে একবার দেখি তোমাকে।

যে তা পারে না?

হেসে উঠল নিখিলেশ, হাসিতে সুলেখার হাতে একটু বেশী চাপ লাগলে সুলেখা বলল, ছাড়, বড় স্বার্থপর তুমি।

না সুলেখা। আমাকে ভুল বুঝবে না। মন আমার তোমার কাছেই। কিন্তু সে কথা কি করে তোমাকে বোঝাব। যাক, এবার থেকে যেমন করেই হোক মাঝে মাঝে আসবই।

কাজে দেখা গেল ঠিক তার উল্টো। আবার অনেকদিন হয়ে গেল দেখা নেই নিখিলেশের। সুলেখা যায় নিখিলেশের বাসায় কিন্তু দেখা পায় না তার। সুলেখার সারা মন জুড়ে দেখা দেয় রাগ আর ক্ষোভ। আবার আত্মভোলা নিখিলেশের পরিপূর্ণ ভালবাসার কথা মনে করে তৃপ্ত পায় ক্ষণিক। এমন করেই কেটে যেতে লাগল তার দিন। মানে আর অভিমানের রসসিক্ত সে-দিনগুলো সুলেখার কাছে যে কত ব্যথা-ভরা নিখিলেশ তা জানতেও পারে না। সে মনে করে সুলেখার কাছে তার ব্যক্তিগত উপস্থিতির চেয়ে তারই সৃষ্টিতে দেশের বুকে যে আনন্দের বন্যা বইবে তাতেই বেশী খুসী হবে সুলেখা।

তখন নিখিলেশের একখানা উপন্যাস ছাপা হচ্ছিল। সেখানার নায়িকা ছদ্মনামে সুলেখা। নিখিলেশ ঠিক করল, ওখানা উৎসর্গ করবে সুলেখার নামেই। বইটি নিজের হাতে তুলে দেবে সুলেখাকে; আর এ অনুষ্ঠানকে ঘিরে অন্তরে অন্তরে চলবে উৎসব। সুলেখার মুখে নিশ্চয়ই তখন হাসি ফুটে উঠবে।

মাস দেড়েক লাগল 'মনোময়ী' ছাপা হতে। তখনই একদিন সকালে খবরের কাগজ পড়ে খুশীতে ভরে উঠল নিখিলেশ। বাংলা অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে সুলেখা। সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানা টেবিলে চাপা দিয়ে নিখিলেশ রওনা হ'ল সুলেখার কাছে।

সুলেখার ঘর। সাজানোতে একটা সুষ্ঠু শিল্পমনের ছাপ। সাদা আর সবুজ মেশান দেওয়ালের রং। তা লাঞ্ছিত নয়; শুধু রামকৃষ্ণর একখানা ছবির ছোঁয়ায় ধন্য। একখানা মাত্র দেওয়ালপঞ্জী, মেঝেতে কার্পেট পাতা, বই ভর্তি তিনটি

কাচের আলমারী, একটা পড়ার টেবিল, এককোণে ধূপদানি আর এক ঝাড় রজনীগন্ধা।

বাথরুমে তখন সুলেখা। সে অবসরে নিখিলেশ দেখল সুলেখার সংগ্রহ। সবই খ্যাতনামা লেখকের সুখ্যাত বই। তাতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু নিখিলেশ অবাক হ'ল সেই সব খ্যাতনামা লেখকদের পাশেই তার বইগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে। সুলেখা তখন এল দুধে-গরদ একটা শাড়ী পরা। শুচি স্নাত, পিঠে ছড়ানো ভেজা চুল, পৃথক করা কয়েকটা চুলের শেষ সীমায় ছোট একটু শিথিল বন্ধন। সোজা গিয়ে সে দাঁড়াল রামকৃষ্ণের পায়ের নীচে। হাত জোড় করে চোখ বুঁজে রইল খানিকক্ষণ। পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে তেমন যুক্ত করেই নিখিলেশকে সম্বোধন করল, সুপ্রভাত।

এ সুপ্রভাতে তোমাকে বেশ নূতন লাগছে। অবশ্য ঘরের নূতন পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তোমার মনটাকেও বুঝতে পেরেছিলাম।

কি বলতে চাও?

গরদ না পরে' গেরুয়া পরলেই মানাত ভাল। সেকথা এখন থাক, শুভ-অনুষ্ঠানে ঝগড়া করতে নেই। তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এলাম।

সুলেখা তাকিয়ে থাকল নিখিলেশের দিকে, চোখ দুটি আর নামে না তার। কিন্তু তাতে বিস্ময়। দেখতে দেখতে সে চোখে পড়ল একটা ছায়া। ধীরে ধীরে বলল, তোমাকেই অভিনন্দিত করছি।

কথার মাঝে যে শ্লেষ লুকানো নিখিলেশ তা বুঝল। বলে উঠল তাড়াতাড়ি, তোমার সঙ্গে ত ভদ্রতা করে মন রক্ষার প্রশ্ন ওঠে না সুলেখা। সত্যি সত্যি, সময় করে উঠতে পারি নি। তা ছাড়া, কখনও যদি বা একটু সময় পেয়েছি, তোমার পড়াশোনার ক্ষতি হবে মনে করে তাও আসি নি।

মনের ভাব গোপন রেখে সুলেখা গেল অন্য প্রসঙ্গে। বলল, তোমার যে বইখানা ছাপা হচ্ছিল সেখানা বেরিয়েছে?

খালি মুখে অভিনন্দন জানাতে আসি নি। বলতে বলতে নিখিলেশ বের করল বইটা। সুলেখার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, এই নাও।

হাতখানা কাঁপছিল সুলেখার। এক পাতা ওলটাতেই তার চোখে পড়ল উৎসর্গের ভাষা—এত দিনের অলেখা কথা লিখে দিলাম সুলেখার হাতে।

একটু যেন বিরক্ত হ'ল সুলেখা। কপালে ফুটে উঠল কয়েকটা রেখা। সুরে তার ছোঁয়া লাগিয়ে বলল, এ কি ছেলেমানুষী করেছ?

কেন? বিস্মিত হ'ল নিখিলেশ। বলল, তোমার কাছে আমি ঋণী সুলেখা। আমার সাধনা দিয়ে এটা তারই কিছু ঋণ শোধ।

অবাক আর বিস্ময়ে স্পন্দনহীন হয়ে গেল সুলেখা, তার পরেই অব্যক্ত বেদনার নির্বাক প্রকাশে কেমন যেন একটু চেতনা। তাই সুলেখার মুখে এনে দিল ভাষা, বাকি ঋণ তবে একখানা গেরুয়া শাড়ী কিনে দিয়েই পরিশোধ করো; তোমার এ বই না পড়ে সেখানাই পরব।

কাক ডাকে

শ্রীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

শুষ্ক মরা ডালে বসে কাকটা ডাকে
রোদে খাঁ খাঁ করা শ্রান্ত দুপুরে।
একটানা কর্কশ ক্লান্তিকর সে ডাক
বিরাট হতাশা নামে সারা মন জুড়ে।

মনের গোপন কোণে কেঁপে কেঁপে ওঠে
রিক্ততায় ভরা এক হাহাকার সুর।
বুকের পরমধন নিয়েছে বিদায়
সেদিনও তো ছিল এক এমনি দুপুর।

কাকটা তেমনি ডাকে একটানা কা-কা
শ্মশানের হাহাকার ঝরে তার স্বরে।
সেদিনের মত কি অমঙ্গল বার্ত্তা বুঝি
বহিয়া এনেছে কোন হতভাগ্য তরে?

পালের জাহাজে সমুদ্রযাত্রা

শ্রীনিখিল মৈত্র

পাল-জাহাজে সমুদ্রযাত্রা ! [illegible] কারনিকোবর দ্বীপ থেকে দেড়শ' মাইল উত্তরে দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপের পোর্টব্লেয়ারে। এ সব অঞ্চলে তখন বাষ্পীয় জলযান মহারাজা যাতায়াত করত। এই সামুদ্রিক পথটুকু গজেন্দ্রগমনে হেলে-দুলে পুরাতন মহারাজা অতিক্রম করত ষোল ঘণ্টায়। সেই সময় মহারাজা কলকাতায় সাধারণ সার্ভের জন্মে আটক পড়ে আছে। জরুরী কাজের তাগিদে পাল জাহাজে করে পোর্টব্লেয়ারে চলেছি।

কাঠের মজবুত দেড়শ' টনের জাহাজ। পাল খাটাবার জন্মে দুটো বড় বড় মোটা কাঠের ডোল জাহাজের উপর শক্ত করে লাগানো। তাতে ছোট বড় নানা রকমের পাল। বাতাসের গতিপথ পরিবর্তিত হলে পালকেও এদিক-ওদিক করার ব্যবস্থা আছে। একেবারে সামনের দমকা হাওয়া হলেই পাল গুটিয়ে পবনদেবের করুণার উপরে জাহাজকে ছেড়ে দিতে হয়। ক্রুদ্ধ বাতাস জলযানকে কোথায় নিয়ে ঠেলে দেবে তা কেউ বলতে পারে না। পোতের অধ্যক্ষ ইউসুফ মালিম আশ্বাস দিয়ে বললেন, "বাতাসের বেগ স্তিমিত হয়ে আসছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস তার উদ্দাম শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আল্লার হুকুমে আমরা দিন দুয়েকের মধ্যেই আন্দামানে পৌঁছিব।" এখানে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে সবাই মালিম সাহেব বলেই অভিহিত করে। আরব সাগরের মাঝে প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপমালার কোনও এক ছোট দ্বীপে সমুদ্রের গর্জ্জন-গানের মাঝে মালিম সাহেবের জন্ম হয়েছিল। পিতা বালকপুত্রকে নিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আরও ঘনিষ্ঠভাবে। পাল জাহাজে ফাই-ফরমাস খাটার কাজ নিয়ে মালিম সাহেবের নাবিক জীবন শুরু হয়। বহু বছরের অভিজ্ঞতার পর আজ তিনি জাহাজের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব হাতে পেয়েছেন। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে কতবার—কত জায়গায় যে পাড়ি দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গেও পরিচয় আছে। যুদ্ধের আগে সমুদ্রপথের স্বাধীনতা ছিল আরও ব্যাপক। বাণিজ্যের উপর বাধানিষেধের শৃঙ্খল এ ভাবে পরানো হয় নি। তাই, দেশ-দেশান্তরে পাড়ি জমাতে অসুবিধার কোনও কারণ ছিল না। এখন সে অবাধ-ভ্রমণ সঙ্কুচিত হয়েছে। সমুদ্রপথেও একেবারে বাঁধা সড়ক বনে গিয়েছে। একটুকু বেচাল হবার উপায় নেই।

আমাদের পাল জাহাজ নঙর তুলল ভোর রাত্রে। আকাশে তখনও তারার মেলা। রাত্রি ও প্রভাতের মাঝখানে অস্ফুট আলো-ছায়ার খেলা এখানে চলে খুব অল্পক্ষণ ধরে। বিষুবরেখার কাছে অবস্থিতির জন্মে দিন ও রাত্রি নিজের সময় পরিষ্কার করে ভাগ করে নিয়েছে। মাঝামাঝি বে-এক্তিয়ারি অবস্থা রাখে নি। পিঁপের মত বিরাট কাঠের লাটাইয়ের গায়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নঙরের মোটা শিকল পেঁচাতে লাগল নাবিকের দল। এ সময় সবাই শশব্যস্ত। মালিম সাহেবের খাস ফাইফরমাস খাটা বেয়ারা আর ভাণ্ডারীও গিয়েছে নঙর তুলতে। একটু পরে বাঁধন মুক্ত হয়ে জাহাজ দুলতে আরম্ভ করল। এবার পাল খাটানোর পালা। হাওয়ার গতিপথ ও বেগ পরীক্ষা এর আগেই মালিম সাহেব করে নিয়েছিলেন। তাঁর নির্দ্দেশ মতে বড় পালের দড়ি কোণাকুণি করে বাঁধা হ'ল হাওয়ার সম্পূর্ণ শক্তিকে পাবার জন্মে।

সহযাত্রী পবন বেগে পালতোলা জাহাজ নীল সমুদ্রের তরঙ্গ ভেদ করে এগিয়ে চলেছে। পূর্ব্ব-গগন রাঙিয়ে বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে সূর্য্যদেব আবির্ভূত হলেন। দক্ষিণ কোণে দিকচক্রবালের নীলাভ রেখার মাঝে কারনিকোবর দ্বীপের অস্পষ্ট পরিচয় মুছে গেল। এবার আমরা দশ ডিগ্রী চ্যানেলে পড়লাম। আন্দামান দ্বীপমালার সর্ব্বোত্তর অংশ থেকে সারা বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে অপ্রশস্ত বহু ছোট বড় দ্বীপসমষ্টি, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বিরাট সামুদ্রিক সর্পের মত পড়ে আছে। দক্ষিণে গ্রেট নিকোবর দ্বীপ প্রায় সুমাত্রাকে স্পর্শ করেছে—মাঝখানে মাত্র এক শ' মাইলের ব্যবধান। আন্দামান এবং নিকোবরকে বিভক্ত করেছে এই দশ ডিগ্রী উত্তর অক্ষরেখার অশান্ত, চঞ্চল জলধারা।

মালিম সাহেব আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, এই পঁচাত্তর মাইল জলধারা রাত্রির মধ্যেই অতিক্রম করে লিটল আন্দামান দ্বীপের তটরেখা পরের দিন সকালেই দেখতে পাব। তারপর যাত্রা অনেক সুগম হয়ে যাবে। দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রের বায়ুবেগ প্রশমিত হবে একের পর এক দ্বীপের গায়ে আঘাত খেয়ে। দ্বীপের আড় দিয়ে যাবার ফলে দুলুনিও লাগবে অনেক কম। জাহাজ থেকে লম্বা লাইন সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কাঁটার সঙ্গে টোপ নেই, তার বদলে রং-বেরঙের ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো দিয়ে মৎস্য শিকার-অস্ত্রকে ঘিরে রাখা হয়েছে। কাপড়ের উজ্জ্বল রঙের বড় মাছ আকৃষ্ট হয়ে আসছে, ছোট মাছ মনে করে কাঁটা গিলে ধরা পড়ছে। মালিম সাহেব হুকুম দিয়েছিলেন যে মাছের পোলাও-কোর্ম্মা তৈরি করার। দুপুর পর্য্যন্ত আকাশ মেঘমুক্ত, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে চারদিক উদ্ভাসিত। সেক্সট্যান্ট দিয়ে নিজেদের সঠিক স্থান নির্ণয় করা হ'ল। সমুদ্রপথে যান্ত্রিক সাহায্য বলতে পাল-জাহাজে সেক্সট্যান্ট ছাড়া রয়েছে কম্পাস ও ক্রনো-

মিটার। বাকি সব কিছু মালিম সাহেব ঠিক করবেন এতদিনকার নিজের নাবিক-জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে।

খাওয়ার সময় মালিম সাহেব সঙ্গে বসলেন না। বিশেষ কাজে ব্যস্ত, খেতে দেরি হবে। রাজসিক ভোজ একা একা খেতে ভাল লাগল না। খাওয়ার পর উপরে যখন জাহাজের 'চালন কেন্দ্র 'ব্রিজে' গেলাম, তখন মালিম সাহেব দু' তিনখানা নক্সা খুলে নিয়ে খুব গভীর মনযোগের সঙ্গে দেখছেন। যেতেই গম্ভীরভাবে বললেন, "বাবুজী, দরিয়া গরম হয়ে উঠছে। এলোমেলো বাতাস অশুভ তুফানের সঙ্কেত দিচ্ছে।"

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ হয়ে উঠল ভীম-ভয়ঙ্কর। যৌবন-সায়াহ্নে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস এত উদ্দামতা, এত উচ্ছৃঙ্খলতা কোত্থেকে পেল। মালিম সাহেব স্থির দৃষ্টিতে পানি ও হাওয়ার মল্লযুদ্ধ দেখছিলেন। ধীর, স্থিরভাবে বললেন, "হাতী তুফান উঠছে। মত্ত মাতঙ্গ কোথায় যে টেনে নিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। এর গতিপথ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তা হয়ত ঠেলে নিয়ে যাবে পূর্ব্ব দিগন্তে, বর্ম্মা-মালয়ার তটভূমিতে, অথবা করোমণ্ডল কূলে।"

স্বল্পভাষী, অতি ভদ্র ও শান্ত মানুষটির সমুদ্রের অশান্ত রূপ দেখে গ্রেনাইট পাথরের কঠোর মূর্ত্তির মত হয়েছে। সাগরের ক্রুদ্ধ আক্রোশকে পরাভূত করার পণ প্রতিটি কথায় ফুটে উঠেছে। হাওয়ার সঙ্গে অল্প অল্প জলের ঝাপটাও লাগছে। ব্রিজ-এর চার পাশে কাচের জানালার কাচ তুলে দেওয়া হয়েছে। সুখান শক্ত হাতে সারেঙ্গ ধরে রয়েছে। পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ এক একবার ছোট জাহাজকে মোচার খোলার মত উপরে ঠেলে তুলছে, আবার জাহাজ মুহূর্ত্তের জন্যে শূন্যে ভাসমান থেকে ধপাস করে জলের উপর আছড়ে পড়ছে। নিচের ডেকে সমুদ্রের জল উপচে পড়ছে, আবার ছোট ছোট পয়ঃপ্রণালী দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কম্পাসের কাঁটা দেখে অনবরত জাহাজের সুখান ঘুরোতে হচ্ছে, যাতে জলযান বিপথে না চলে যায়। সুখানের হাতল ধরতে দু'জন সারেঙ্গের প্রয়োজন। হাওয়ার বেগ বাড়ছে, গতিপথও পরিবর্ত্তিত হচ্ছে।

মালিম সাহেব ঘন ঘন দড়ি নেড়ে বড় ঘণ্টা বাজাতে আরম্ভ করলেন। পাল নামাবার নির্দ্দেশ পেয়ে নাবিকরা উঠল ডোলের উপর। হাওয়ার প্রকোপ এমন ভীষণ যে, মনে হচ্ছে পাল জাহাজ থেকে মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বাইরে দাঁড়ালে শক্ত করে কোনও কিছু ধরতে হয়। অথচ তারই মধ্যে জলের উপর থেকে পালের দড়ি খুলতে হবে। বাতাস আর কোনও বাধা মানতে চাইছে না। পালকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেবে। ক্ষিপ্র বেগে, শক্ত হাতে পাল খুলে, আবার ঐ বিরাট কাপড়ের স্তুপকে ঠিক ভাবে গুটিয়ে রাখল। এই সময় জাহাজও অসম্ভব দুলছে। সুখানকে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে ভরাডুবির ভয়।

জাহাজের গতি বেগ ও গতিপথ একান্ত ভাবেই পবনদেবের অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল। সুযোগ বুঝে, হাতী তুফানও তার সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রলয় কম্পন আরম্ভ করল। ক্রনোমিটারে তখন সময় মিলছে বিকাল পাঁচটা। কিন্তু অন্ধকার যেন দিনের বাকি সময়কে গ্রাস করে ফেলেছে। এবার সুখানে মাঝে মাঝে মালিম সাহেবও হাত দিচ্ছেন। ডাইনে বাঁয়ে, উপরে, নিচে সবদিকেই জাহাজ দুলছে। পাল না থাকলেও জাহাজের গতিবেগ বেশ বেড়েছে। কে জানে, কোথায় বিক্ষুব্ধ সাগর আমাদের নিয়ে গিয়ে ফেলবে? কম্পাসের কাঁটা, ঘড়ি আর নক্সা দেখে মালিম সাহেব মাঝে মাঝে কাগজে কি লিখছেন।

সে রাত্রে ঘুমোবার চেষ্টা করেছি, ঘুম পায় নি। সমুদ্রের অসম্ভব দুলুনিতে শরীরে অস্বস্তি বোধ করেছি। কিন্তু দারুণ দুর্য্যোগে তরণী যেখানে টলমল করছে, নিরুদ্দেশের পথে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে সেখানে ওকথা ভুলে গিয়েছি। আমার কিছু করার নেই। তবুও জাহাজের নাবিকদের গোত্রজ হয়ে গিয়েছি। অবাক বিস্ময়ে এই সব মানুষের কর্ম্মক্ষমতা দেখছিলাম। এত আলোড়নের মাঝখানেও মালিম সাহেব আমাকে ভোলেন নি। যাত্রী আমি একা। বাকি সবাই সমুদ্রের রুদ্র মূর্ত্তির সঙ্গে পরিচিত। কর্ম্মজীবনে এই বিপদ-আপদের কথা জেনে-শুনেই এসেছে। তাই আশ্বাস দিয়ে জলযানের পরিচালক বললেন, "বাবুজী, হিম্মত ধরুন। দিল শক্ত রাখুন। তুফান আজ হউক, কাল হউক, পাঁচদিন পরে হউক থেমে যাবে। যেখানেই নিয়ে গিয়ে ফেলুক না কেন—পরোয়া নেই। আবার আমরা নিজেদের পথ করে নেব। পোর্ট ব্লেয়ারের ছোট ছোট পাহাড় সমুদ্রের বুক থেকে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকবে। আপনি খানা খান, ঘুমোন। ফিকির করবেন না।"

সে রাত্রে ভাণ্ডারী উনুনে ডেগচি চড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জাহাজের অসম্ভব দুলুনিতে পাত্রকে বসিয়ে রাখতে পারে নি। তাই, চিঁড়ে, কলা, সকালের ভাজা মাছ দিয়ে কোনও রকমে ভোজনপর্ব্ব সমাধান করলাম। চিরদিন সে রাত্রের অন্ধ উন্মত্ততার কথা মনে থাকবে। কালো কালো মেঘ সারা আকাশকে ঘিরে রয়েছে। বর্ষণও হচ্ছে মুষলধারে। বাতাসের বেগে জলের ঝাপটা হাণ্টারের মোটা চাবুকের মত শপাং, শপাং করে সারা জাহাজকে আঘাত করছে। সামান্য একটু ছিদ্রপথ পেলে জলের ধারা ভিতরে ঢুকছে। দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই ক্ষণিকের আলোক ঝলকে সমুদ্রের রণতাণ্ডব মূর্ত্তি প্রকট হয়ে উঠছে। মেঘের রং আর গাঢ় নীল জলের বর্ণ মিলে মিশে গিয়েছে। সাগর ও আকাশের মিলন তাণ্ডবকে ঢেকে রেখেছে বর্ষণধারা এবং জমাট অন্ধকার। জাহাজের দুপাশে সাগর-তরণীর 'নেভিগেশনাল লাইট' জ্বলছে। বিরাট লণ্ঠনের পুরু সবুজ কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলোক শিখাকে দেখা মুস্কিল। ব্রিজের উপরে খালি কম্পাসের মধ্যে কেরোসিন বাতি জ্বলছে। তাইতে জাহাজের গতিপথের ইঙ্গিত মিলছে। জাহাজের সামনে, পেছনে অতল

প্রহরীর মত নাবিকরা পালা করে ডিউটি দিচ্ছে। ছোট কাপড়ের পতাকা উড়িয়ে হাওয়ার গতির হদিশও নিচ্ছে।

মালিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "নক্সায় আন্দামান সাগরের তটরেখার ধারে অগভীর জলের মধ্যে ডুবন্ত শিলারাশির অবস্থিতির কথা আছে। তারই সঙ্গে সঙ্কেত লাগলে সলিল-সমাধি অবধারিত।" হেসে পরিচালক বললেন, "এই হাতী তুফানের রাত্রে সব থেকে বড় বিপদ হ'ত, যদি আমরা কার নিকোবার দ্বীপে নঙর দিয়ে থাকতাম। সেখানে কোনও পাড়ি নেই, পোতের আশ্রয় নেবার কোনও উপায় নেই। উন্মুক্ত সমুদ্রের মধ্যে তট-রেখার ধারে উত্তাল, উচ্ছল তরঙ্গের সঙ্ঘাতে নঙর ছিঁড়ে যেত। আর তার পর, কিনারায় জাহাজ ঠেলে নিয়ে গেলে অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার উপায় ছিল না। তাই, দুর্যোগের সম্ভাবনা হলে আমাদের কিনারা ছেড়ে সাগরের বুকে পাড়ি জমাতে হবে পোতাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে। কোনও ভয় নেই। আমরা আন্দামান সাগরের দিকে একেবারেই যাচ্ছি না। দক্ষিণ-বঙ্গোপসাগর দিয়ে সোজা পূবে পাড়ি জমাচ্ছি। বর্ম্মা, শ্যাম, মালয়ার তীরে গিয়ে হয় ত জাহাজ ভিড়বে। তবে, জমীন এখনও বহু দূরে। মাঝপথেই তুফান আমাদের ছেড়ে দেবে —সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করাই ত জাহাজের কাজ। আপনি বেফিকির থাকুন।"

রাত্রের অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে গেল। কিন্তু হাওয়ার গতিপথ ও প্রচণ্ড বেগ পরিবর্ত্তিত বা প্রশমিত হ'ল না। বৃষ্টি পড়ছে, তবে ধারা ক্ষীণ। সূর্য্যদেবকে মেঘের রাশি সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে। দুপুরে সেক্সট্যাণ্ট দিয়ে কোনও কাজ হ'ল না; মালিম সাহেব নিজের হিসাব ও অনুমান থেকে বললেন, "আমরা দেড়শো মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণায় এসেছি।" জাহাজের গতি-বেগ ঠিক করছেন একান্ত ভাবেই নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জোর করে না বললেও, আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় অবস্থার যে কোনও পরিবর্ত্তন হবে না, তা ভাল করেই বুঝলাম।

দরিয়ার হাল, কোন পথে, কোথায় চলেছি—এ সম্বন্ধে কোনও নাবিক মালিম সাহেবের সঙ্গে একটা কথাও বলছে না। এখানে সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন মানুষের উপর সবাই ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বাস আছে, ভরসা আছে যে, পরিচালক অভ্রান্ত ভাবে পথের সন্ধান দেবে। আবার, পোতাশ্রয়ের শান্ত, হাস্যমুখরিত খাড়ির মধ্যে জাহাজ ফিরে যাবে। সবাই নিজের কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও তৎপরতার সঙ্গে করে যাচ্ছে।

সমুদ্রপথে পাল-জাহাজে যাবার সময় মিষ্টি জল ব্যবহার সম্পর্কে কড়া নির্দ্দেশ মেনে চলতে হয়। খাবার ও হাত-মুখ ধোবার জন্যই ট্যাঙ্কের সঞ্চিত জল পাওয়া যাবে। অন্য সব কাজ সারতে হবে সমুদ্রের জলে। চলার পথে বৃষ্টির জল ধরারও ব্যবস্থা আছে। প্রবল বর্ষণের ফলে রাত্রে সব ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য জলাধার পূর্ণ হয়ে গিয়েছে মিষ্টি জলে। তাই, ভাল জলে চান করার অনুমতি মিলল। ভীষণ দুলুনির মধ্যেও আজ হাঁড়ি চড়েছিল এবং ভাত তরকারী নেমেছে। দিনের শেষে, রাত্রের অন্ধকারে তুফানের দাপাদাপি যেন আরও বেড়ে গেল। আর বসে থাকতে পারছি না। দিনের বেলায় ব্রিজের উপরে আরাম কেদারায় শুয়ে মাঝে মাঝে ঘুমিয়েছি।

জাহাজের খোলের মধ্যে ছোট কেবিন। বাঙ্কের উপর মোটা তোষকে বেছান ধবধবে পরিষ্কার বিছানা। কিন্তু বড় গরম। আগের রাত্রের অনিদ্রায় ক্লান্ত, অবসন্ন অবস্থায় ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত্রে দু-একবার উঠে উপরে ব্রিজে গিয়েছিলাম। সেই একই রকম অশান্ত গর্জ্জন-গান। বৃষ্টির প্রকোপ নেই বললেই চলে। কিন্তু, বাতাস এখনও তার আক্রোশ ভুলতে পারে নি। আমাদের বিপথগামী করার জন্যই বোধ হয় এ ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছে। রাত্রেও আকাশ পরিষ্কার হলে আমরা ঠিক কোথায় আছি তার সম্বন্ধে একটা হদিশ পাওয়া যেত—তারার নক্সা দেখে। এই মাসে, এ অঞ্চলের তারার বড় নক্সা খুলে মালিম সাহেব লণ্ঠনের আলোতে দেখছিলেন। তাঁদের ভাষায় নক্ষত্রের নানা নাম আছে। নক্সার গায়ে ছোট করে ইংরেজী ছাপার অক্ষরের পাশে কালি দিয়ে তাও লেখা রয়েছে। এরোপ্লেনের নেভিগেটারের কাছে, শুনেছিলাম তারার অবস্থান দেখে পথের সন্ধান পাওয়া যায় অভ্রান্ত ভাবে। মেঘের উপরে উড়ে যেতে পারলে আমরাও হয় ত বুঝতে পারতাম কোথায় রয়েছি আর কোন পথে চলেছি।

চতুর্থ দিন দুপুর বেলা অল্প কিছুক্ষণের জন্য আকাশ পরিষ্কার হয়েছিল। মেঘের অবগুণ্ঠন সরিয়ে সূর্য্যদেব আত্মপ্রকাশ করে-ছিলেন। এবার যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হ'ল। আমরা সাড়ে চার-শো মাইল পূর্ব্বে এসেছি। আর ঘণ্টা তিরিশ এই পথে, এই গতি বেগে চললে পেনাঙের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে পৌঁছাব। গন্তব্য স্থান কোথায় ছিল আর কোথায় চলেছি।

ঠিক ছ'দিন পরে সূর্য্যোদয়ের আগে মালিম সাহেব দক্ষ নাবিককে ডোলের উপর চড়তে হুকুম দিলেন। আকাশ মেঘমুক্ত, মৃদুমন্দ বাতাসের আঘাতে ছোট ছোট তরঙ্গ সাদা ফেণায় ফেটে পড়ছে। জাহাজ আর জলের ঢেউ শক্তি পরীক্ষা করছে, কিন্তু সখ্যতার সঙ্গে মালয়ার তটরেখা এখনই দেখতে পাওয়া যাবে বলে মালিম সাহেব বললেন। ডোলের উপর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নাবিক দেখছে পূর্ব্ব-দিগন্তের অস্পষ্ট তীর-চিহ্নের সন্ধানে। সূর্য্যোদয় হ'ল বড় রাজসিক ভাবে। সমুদ্রের কালো জল রঙের বন্যায় প্লাবিত। গাঢ় নীলের সঙ্গে রক্তিম আভা মিলিয়ে সৃষ্টি করেছে অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা। সমুদ্রও যেন নিজের উন্মত্ততায় লজ্জিত হয়ে আরও প্রশান্ত, ধীর, গম্ভীর হয়ে উঠেছে বাতাস বইছে বেশ জোরেই, তবুও তার স্পর্শ ঠেকছে বড় মধুর। উপর থেকে নাবিক চেঁচিয়ে উঠল—জমীন দেখা যাচ্ছে, সকলেরই মুখে স্মিত হাসি। এরা 'দরিয়ার বিল্লী' হলে কি হয়, প্রাণের নিবিড় যোগ রয়েছে মাটির সঙ্গে।

সব দেখে-শুনে মালিম সাহেব হুকুম দিলেন পাল তোলার। আমরা আবার পশ্চিম দিকে রওনা হলাম গন্তব্য পোতাশ্রয় পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে। যেখানে আমরা এসেছি, সেখান থেকে পেনাঙ্গ বেশ কিছু দূরে। আশে-পাশে কোনও বন্দর নেই। আর আমাদের কিনারে যাবার প্রয়োজনই বা কি?

যে পথ পবনদেবের তাড়নায় অতিক্রম করতে আমাদের লেগেছিল পাঁচ দিন, এবার তাতে লাগল দশ দিন। নিয়ে আসার সময় যে ক্ষিপ্রতা ছিল, ফিরিয়ে দেবার সময় সে শক্তি আর বাতাসের নেই। দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রের মৌসুমী বাতাস এবার যেন বিদায় নেবার সুযোগ, খুঁজছে। ধিকুতে ধিকুতে চলেছি। একদিন সন্ধ্যায় লিটল আন্দামান দ্বীপ দেখতে পেলাম। পনের দিন পরে দশ ডিগ্রী চ্যানেল অতিক্রম করে আন্দামান সাগরে পড়লাম। পঁচাত্তর মাইল পথ অতিক্রম করতে গিয়ে হাজার মাইল সমুদ্রযাত্রা করে ফিরলাম।

দাগ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শত শত দাগ লুপ্ত, সুপ্ত,
দেয় না'ক পরিচয়,
কত নির্ম্মম আঘাতের দাগ
হয়ে থাকে অক্ষয়।
দাগ 'সোমনাথ দেউল' গাত্রে,—
এখনো যে কয় কথা,
দেয় নৃশংস বর্ব্বরতাকে
দুর্ব্বিহ অমরতা।
প্রাচীর গাত্রে পাষাণ ছবিও
লাঞ্ছনা সহিয়াছে,
ঘাতক এবং কুঠার গিয়াছে,
দন্তের দাগ আছে।
দন্তের এই স্বভাব—
শিলাস্তম্ভেও নরসিংহের
ঘটায় আবির্ভাব।

২

জল আসে চোখে চিতোর গড়েতে
তোপের চিহ্ন দেখে,
লোলুপ ভয়াল ব্যাঘ্র গিয়াছে
নখরের দাগ রেখে।
দাগে যে রয়েছে সে দুর্দ্দিনের
উন্মাদনার ছোঁয়া।
আকাশ আবরি' উঠিছে তীব্র
'জহর ব্রতের' ধোঁয়া।
আগুার আঁখরে লেখা যা রয়েছে,
সে হরফ আমি চিনি।
অগ্নির মাঝে ঝলমল করে
সহস্র পদ্মিনী।
রাঙা ভাঙা সব দাগ—
আজও চামুণ্ডা কণ্ঠে বলিছে—
জাগ্ তোরা জাগ্ জাগ্।

৩

'পম্পী'র পথে রথচক্রের
যে সকল দাগ জাগে,
রেখে গেছে তারা,—চলে গেছে যারা,
বিশ শতাব্দী আগে।
হায়, আজ সেই বিলাসীর দল
কোন্ ছায়াপথে চলে?
শুষ্ক দাগ যে ভরে ভরে ওঠে
যুগের নয়ন জলে।
তাহাদের পানে ফিরে ফিরে চায়
অস্তোন্মুখ রবি।
অজ পথেতে আজও চলন্ত
অতীতের ছায়াছবি।
ক্ষয়া দাগ গায় নিতি—
বহুদিন গত অশরীরীদের
জীবনের সঙ্গীতই।

৪

'হারাপ্পা'র সে অঙ্গুলি দাগ
মৃৎপাত্রের গায়।
মোছা মোছা তার ক্ষীণ তনু লয়ে
এখনো খুঁজিছে কায়?
স্নিগ্ধ ক্ষুদ্র পরিবার কোথা
কোথা সে গৃহিনী তার?
পঞ্চ হাজার বছর পুরাণো
ধান কি ছোঁবে না আর?
ধূপের উপর কলসীর দাগ,
এখনো যায় নি মুছি,
এখনো রয়েছে সেই বধূটির
আশাপথ চেয়ে বুঝি?
দাগের হয় না লোপ—
ভাবের দাগ যে আজও বহে
সৌহার্দ্দ্যের ঝোপ।

বৌদ্ধ 'নির্ব্বাণ' ও বেদান্তের 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ'

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

যুগে যুগে দার্শনিকগণ দুঃখের স্বরূপ নির্ণয়পূর্ব্বক, দুঃখ দূর করবার জন্য বিবিধ পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন। 'আমার যেন দুঃখ দূর হয়'—'আমার যেন দুঃখ আর না হয়'—ইহাই যদি পুরুষার্থ হয় তা হলে অনন্ত কালের জন্য আমার সমস্ত দুঃখ দূর হোক ইহাই জীবের পরম কাম্য বা পরম পুরুষার্থ।

সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন উভয়ই যুক্তিপ্রধান। সাংখ্য সূত্রকার বলেন, "অথ ত্রিবিধ দুঃখাদত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ" অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ হতে যে শাশ্বতিক নিবৃত্তি তাই পরম পুরুষার্থ।

দুঃখের প্রকার :—আমাদের যে সমস্ত দুঃখ হয় তা বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক। বাহ্য আবার দ্বিবিধ, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। সুতরাং দুঃখ ত্রিবিধ, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক।

পার্থিব কারণে জৈব বা অজৈব বস্তুজাত যে দুঃখ তা আধিভৌতিক। অপার্থিব কারণে, সর্ব্ববিধ সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও প্রাণিচেষ্টার বহির্ভূত দৈবায়ত্ত যে দুঃখ তাই আধিদৈবিক।

আত্মা দেহ মনের আধিব্যাধিজাত অথবা অন্তঃকরণগত কাম-ক্রোধাদিজাত যে দুঃখ তাই আধ্যাত্মিক।

দুঃখ নিবৃত্তি, সাময়িক ও শাশ্বতিক :—এই ত্রিবিধ দুঃখের অনন্ত কালের জন্য একান্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই সকল দার্শনিকের লক্ষ্য বা উপেয়।

ত্রিবিধ দুঃখে কাতর জীব জিজ্ঞাসু হয়—"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ",—তত্তদ্দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে। তার পর তর্ক উঠে যে, "দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ।" অর্থাৎ যদি বল যে, পার্থিব সুখলাভই দুঃখহানির কারণ এবং প্রতিকার, সুতরাং ঐ জিজ্ঞাসা 'অপার্থা' বা নিরর্থক, তা বলা চলে না, কারণ সুখভোগের দ্বারা কোন কোন দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হয়ত হয়, কিন্তু একান্ত নিবৃত্তি হয় না।

পণ্ডিতেরা তাই এই সাময়িক নিবৃত্তিকে 'কুঞ্জর শৌচ' বা হস্তি স্নানের সঙ্গে তুলনা করেন। হাতীকে স্নান করিয়ে নির্ম্মল রাখা যায় না, সে পরমুহূর্ত্তেই ধূলা কাদা লেপন করে শরীরটাকে মলিন-পঙ্কিল করে তোলে।

সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন উভয়ই বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় দর্শনই মুক্তিবাদী এবং উভয় দর্শনেই স্রষ্টা ঈশ্বরের কোন স্বীকৃতি নেই। উভয়েরই মোক্ষের বর্ণনা নঞর্থক বা নেতিবাচক। তবে সাংখ্যে অবিনাশী আত্মার স্বীকৃতি আছে। 'ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিঃ অপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ'—সাং সূ ৫৮, অর্থাৎ মোক্ষ হলে সর্ব্বোচ্ছেদ বা অস্তিত্ব নাশ হয় না, জীবত্বের বন্ধন হতে আত্মার মুক্তি হয়, তখন 'বিশুদ্ধং কেবল মুৎপদ্যতে জ্ঞানম্' বা কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এই জ্ঞান কাহার হয় ?

যদি অহংমুক্ত জীবের এই জ্ঞান হয় বলা যায় তো তা অর্থহীন হবে, কারণ সাংখ্যমতে অবিদ্যাবদ্ধ জীব, অবিদ্যা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জৈব অস্তিত্ব হারায়। সুতরাং গীতোক্ত 'বুদ্ধি গ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ বা আনন্দময় অবস্থাই, আমাদের অধিকতর বুদ্ধিগ্রাহ্য বা বোধগম্য মনে হয়।

বৌদ্ধ দর্শনের লক্ষ্য নির্ব্বাণ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় পুণ্য কর্ম্ম বিশেষের দ্বারা অক্ষয় স্বর্গলাভের কথা যা বলেন তা সুযুক্ত বা বিচারসহ নয়। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে পাওয়া যায় :—

'অপাম সোমমমৃতা অভূম' অর্থাৎ যাগ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম করে সোম পান করে, আমরা অমর হয়েছিলাম। কিন্তু এই অমরত্ব সাময়িক মাত্র—শাশ্বতিক নহে। শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন :—

'আভূত সংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।'

অর্থাৎ পুণ্যবানগণ স্বর্গলোকে সুদীর্ঘকাল দিব্য সুখ ভোগের পর পুণ্য ক্ষয় হলে—ভৌতিক প্রলয়ের সময় তাঁদের ইহলোকে পুনরাবর্ত্তন ঘটে। 'ক্ষীণে পুণ্যে স্বর্গলোকাৎ চ্যবন্তে।' সুতরাং দেখা গেল এই লৌকিক বা যজ্ঞাদি জন্য আনুশ্রবিক বা পারলৌকিক উভয়বিধ দুঃখ নিবৃত্তিই সাময়িক, ইহা দুঃখের সম্যক্ নিবৃত্তি বা আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়।

সাধারণ পুরুষার্থ সম্বন্ধে যে নিয়ম, দুর্ল্লভ পরম পুরুষার্থ সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। প্রথমে আপ্তবাক্য এবং শ্রুতিবাক্য প্রভৃতি থেকে তত্ত্ব নিশ্চয় করা প্রয়োজন, তার পরে তার মনন বা দার্শনিক যুক্তি সহকারে তত্ত্ব বিষয়ে বিশ্বাস বা নিষ্ঠা স্থাপন, এইরূপে নিশ্চয় জ্ঞান দৃঢ় হলে—তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে একনিষ্ঠ সাধন বা নিদিধ্যাসন।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান যেরূপ চতুর্ব্যূহ, পারমার্থিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও ঠিক সেইরূপ চতুর্ব্যূহ। যথা :—রোগ-বিজ্ঞান, রোগের নিদান বা হেতুভূত উপাদান, রোগের প্রতিকার বা চিকিৎসা এবং তার পরে আরোগ্য বা অনাময় অবস্থা লাভ।

অপর পক্ষে দুঃখের স্বরূপ জ্ঞান, দুঃখের হেতু নির্ণয়, দুঃখ নিবৃত্তির উপায় এবং সর্ব্বশেষে কৈবল্য (সাংখ্যে) বা নির্ব্বাণ (বৌদ্ধদর্শনে) অথবা বেদান্তের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়।

পুনঃ পুনঃ তত্ত্বাভ্যাসের দ্বারা—"নাস্মি, নমে, নাহম্, ইত্যপরিশেষম্ অবিপর্য্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম্" অর্থাৎ আমি নাই, আমিত্ব নাই, আমার বলতে কিছু নাই, এই বিচারে

অহংতা অস্মিতা মমতা প্রভৃতি দূর হলে—অবিদ্যাবিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান—কেবল জ্ঞান বা কৈবল্যের উদয় হয়। ইহা 'অপরিশেষ' কারণ জ্ঞাতব্য বা জ্ঞেয় বিষয়ের বহুত্ব বা নানাত্বের শেষ হওয়াতে—"যজ্‌ জ্ঞাত্বা ন পুনঃ কিঞ্চিজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে," সুতরাং এই জ্ঞানই কেবল জ্ঞান বা চরম জ্ঞান। ইহার পরে আর জানবার কিছুই থাকে না।

যুক্তিবাদের বিশেষত্ব :—বৌদ্ধদর্শন এবং সাংখ্যদর্শনে অন্ধ বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। উভয় দর্শনেরই অপ্রত্যক্ষ বিষয়সকল অনুমান-প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়। যাঁরা চক্ষুষ্মান, ধীসম্পন্ন—বিবেক-বিচারপরায়ণ, মেধাবী, অহিংসা সত্যাদি বিশুদ্ধশীলপালী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁরাই এই উভয় মার্গের অধিকারী।

কেহ কেহ বলেন : তর্ক অপ্রতিষ্ঠ 'সুতরাং 'বাদো নাবলম্ব্যঃ' কারণ একজন যুক্তির বলে যা প্রতিষ্ঠা করেন অন্য একজন অধিকতর যুক্তিবলে তা বিপর্য্যস্ত বা নিরস্ত করেন। শুধু যুক্তির দ্বারা দার্শনিক চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যাঁদের তত্ত্বজ্ঞান নাই, প্রমেয় বিষয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি কিছুই নাই অথচ কেবল তর্কবলে প্রমেয় বিষয়কে প্রমাণ করতে চান—তাঁদের তর্ক অপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু এ ছাড়াও আর এক প্রকার তর্ক আছে—যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। মিথ্যা বর্জ্জন এবং সত্য অর্জ্জনেই তার বিনিয়োগ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় Experiment (পরীক্ষা), Observation (নিরীক্ষা) ও Inference (অনুমিতি) এই শ্রেণীর তর্কের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। গাণিতিক তর্ক, জ্যামিতি-পরিমিতির তর্ক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) এর তর্কও এই শ্রেণীর। এই সকল তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত নহে সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সত্যের এক ধাপ থেকে অপর ধাপে উত্তরোত্তর উপর্য্যুপরি ধাপে আরোহণ করতে অন্ধের যষ্টির মতই অপরিহার্য। তাই বলা হয়—

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ
> যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

যুক্তিহীন হয়ে, শুধু শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্যের অভিধা অর্থ ধরে তার তাৎপর্য নির্ণয় করলে বিপরীত ফল হতে পারে।

'কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ' এইরূপ অশ্ব চিকিৎসার ব্যবস্থা মানুষের উপর প্রযুক্ত হওয়াও অসম্ভব নয়!

যুক্তির সীমা :—কিন্তু তর্কের অতীত এবং অগোচর বস্তুও আছে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। যেখানে শুধু "বাগবৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম"—কোনো ধ্রুব সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়—বেদান্তের 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ', সাংখ্যের 'কৈবল্য' এবং বৌদ্ধের 'নির্ব্বাণ'। যা যুক্তি-বিচার ও বাক্যোবাক্যের বিষয়ীভূত নয়। এ সম্পর্কে দার্শনিকরা সকলেই স্বীকার করেছেন—

> 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ
> প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্‌ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম।

পরমতত্ত্বের কথা বাদ দিলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, Physical (বাহ্য), Physiological (ইন্দ্রিয়াদি দেহযন্ত্র-নিষ্পন্ন) ও Psychological (মানসিক)—সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই তাঁকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর নীচের দিকে এবং উপরের দিকে দুই দিকে দুই অনন্তের সম্মুখীন হতে হয়।

নীচের দিকে 'ছোট অনন্ত'—Man as an epitome of the world—মানুষের ভাণ্ডটিই (microcosm) যেন ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। উপরের দিকে বৃহৎ অনন্ত—The great world (macrocosm)—in relation to the microcosm or the miniature world or man, ছোট অনন্ত—infinitesimal,—অণুপরমাণু জীবকোষ প্রভৃতি নিয়ে তার কারবার। তাই এইদিকে সে 'অণোরণীয়ান',—অপরদিকে পরিমাণে সে "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ"—অর্থাৎ কেশাগ্রকে শত ভাগ করে তার এক ভাগকে শত ভাগ করলে যে ভাগফল কল্পিত হয় উহার পরিমাণও সেইরূপ। অপর দিকে এক বৃহৎ অনন্ত বা infinity যার সীমা সংখ্যা পরিধি বা পরিমাণ কিছুই নাই,—যার একটি তারা থেকে তার আলোকরশ্মির, শত শত শতাব্দী লেগে যায় এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে যদিও আলোকের গতিবেগ এক সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল।

তাই নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেলে তার যা অবস্থা হয় ছান্দোগ্য উপনিষদ তারই সঙ্গে ইহার তুলনা করেছেন,—আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা এই অনন্তকে ইয়ত্তা বা ঈদৃকতার ছাঁচে ঢেলে পরিমাপ করবার হাস্যকর প্রয়াসকে।

আমরা atom bomb-এর বড়াই করছি বটে, কিন্তু একটি অ্যাটমকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করবার আমাদের শক্তি নাই। এবং একটি পরিমাণুকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে ফেলবারও আমাদের সামর্থ্য নাই। তাই তার অকিঞ্চিৎকর একটু জ্ঞানলাভ করেই আমরা অসীম শক্তির অধিকারী হয়েছি বলে অন্তঃসারশূন্য অভিমান পোষণ করছি।

বুদ্ধের আবির্ভাব ও বাণী :—ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবকালে জীববলির রুধিরস্রোতে ভারতের বক্ষ পঙ্কিল হয়ে উঠেছিল। তিনি উপলব্ধি করলেন মানবমাত্রেই সাংসারিক সুখভোগ এবং ভোগান্তে সুলভে স্বর্গলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত। মুক্তির উচ্চ আদর্শ ভুলে গিয়ে তারা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার মোহে মূঢ়তাপ্রাপ্ত হতে বসেছে। তাই তিনি জীবে দয়া এবং করুণার মহাবাণী প্রচার করলেন।

ধ্যান পঞ্চক : তিনি পাঁচ প্রকার ধ্যান বা ধ্যান পঞ্চকের উপদেশ করেছেন :—

১। প্রেমের ধ্যান—শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলের উপকার ও কল্যাণে মনকে নিযুক্ত করা। আবহমান কালের লক্ষণ তর্পণের মন্ত্রটি ঠিক এই ধ্যানেরই প্রতিধ্বনি—"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু"—অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে তৃণ পর্য্যন্ত জগৎ তৃপ্তি লাভ করুক এই ভাব।

২। করুণার ধ্যান—জীবজগৎ দুঃখসাগরে নিমগ্ন, সুতরাং শুধু নিজের দুঃখ দূর করার চেষ্টায় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা মাত্র প্রকাশ পায়, তাই সকলের দুঃখ প্রশমনের ধ্যান অবশ্য কর্তব্য। তাই ভাগবতের প্রার্থনায় শুনি, "আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদুঃখভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ", অর্থাৎ আমি মুক্তি বা সিদ্ধি চাই না—আমি অখিল দুঃখতাপক্লিষ্ট জনের দুঃখের অংশ চাই যাতে তাদের দুঃখের অল্পকিছুও লাঘব হয়।

৩। আনন্দ ধ্যান—অপরের সুখে সুখী হওয়া এবং উচ্চতর আনন্দ অনুভব করা।

৪। বিবেক বিচার রূপ ধ্যান, ক্ষণিক নশ্বর দৈহিক সুখ থেকে সর্ব্ববিধ পাপ এবং দুর্ব্বলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করা। তাই ভগবান বুদ্ধ 'ধর্ম্মপদ' ২৭ শ্লোকে বলেছেন :

মা পমাদং অনুযুঞ্জেথ, মা কামরতি সন্থব'

অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং।

কখনো প্রমাদের অনুসরণ কোরো না, কামরতিতে আসক্ত হয়ো না। অপ্রমত্ত ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ বিপুল সুখ (মুক্তি বা নির্ব্বাণ) লাভ করেন।

৫। শান্তির ধ্যান—দুঃখসুখ, নিন্দাস্তুতি, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দ্বন্দ্ব থেকে মনকে বিমুক্ত করে অক্ষয় শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। তাই তথাগত ২০২-২০৫ শ্লোকে ধর্ম্মপদে বলেছেন : আসক্তির ন্যায় অগ্নি নাই, দ্বেষের ন্যায় পাপ নাই, পঞ্চস্কন্ধের ন্যায় দুঃখ নাই। (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটিকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয় বৌদ্ধদর্শনে) এবং শান্তি অপেক্ষা সুখ নাই।

জিঘৃক্ষা গৃধ্নুতা বা লোভই পরম রোগ, সংস্কারই পরম দুঃখ,—এই সকল থেকে আরোগ্যলাভই পরম লাভ,—

আরোগ্য পরমা লাভা সন্তুট্ঠি পরমং ধনং

বিসসাস পরমা ঞাতী নিব্বাণং পরমং সুখং।

আরোগ্যই পরম লাভ; সন্তোষই শ্রেষ্ঠ ধন, বিশ্বাসই পরম আত্মীয় (জ্ঞাতি) নির্ব্বাণই পরম সুখ। এই সুখ আসে কোথা থেকে। তিনি বলছেন : "ধম্ম পীতি রসং পিবং"—অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রীতি রস পান থেকে।

এই সুখকে তিনি ৪১১ (ধম্মপদ) শ্লোকে "অমতো গধং" বা বা অমৃতাবগাধং বা গাঢ় অমৃত লাভ রূপ অর্হৎ পদপ্রাপ্তি বা ব্রাহ্মণত্বলাভ বলে স্বীকার করেছেন।

তিনি জাতি ব্রাহ্মণকে "ভো বাদী" বলেছেন ("ভো বাদী" অর্থে 'হে মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ—এইরূপ কথনশীল')। তিনি অকিঞ্চন অনাদান, ধ্যানসমাধিরত, অবিদ্যাতীত শীলবান, তৃষ্ণাশূন্য, ভয়হীন, পাপমুক্ত, শান্ত প্রসন্ন চতুরার্য্যসত্যে প্রতিষ্ঠিত, গম্ভীর প্রজ্ঞ (স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ), মারজিৎ মহর্ষিকে সুগত বুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ বলেছেন—(৪১৯ ধর্ম্মপদ)—"অসত্তং সুগতং বুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং"।

পাছে স্বার্থপর জগতের স্বার্থপরতা আরও বৃদ্ধি পায় তাই তথাগত আপনাকে না দেখে দুঃখাভিভূত জগৎকে দেখতে শিখিয়েছিলেন। পাছে নিজের আনন্দ বা নিজের মুক্তি সাধনাতেই সে নিজেকে ব্যয় করে ফেলে তাই তিনি নূতন পন্থা দেখিয়েছেন।

যোগদর্শনের সাধনা :—কেন্দ্রানুগ জীব চৈতন্য বা ক্ষেত্রস্থ খণ্ড চৈতন্যের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ,—'আত্মানং বিদ্ধি।' "বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ—ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে" পরিণামে অণুব্রহ্মই পরব্রহ্মে নিমগ্ন হয়।

বুদ্ধের পন্থা :—বিশাল ব্রহ্মসেবা বা গীতার বিস্তার ব্রহ্মের সেবা—"যদা ভূতপৃথগভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৩।৩১

ফলে—"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে"—বিভক্ত খণ্ড চৈতন্য জীবের মধ্যে অবিভক্ত বিস্তার ব্রহ্মের উপলব্ধি রূপ অব্যয় ভাব লাভ হয়। কেবল নামতঃ ভিন্ন, মূলে দুই-ই এক পথ। একত্বেই হউক আর পৃথক্ত্বেই হউক বিশ্বতোমুখের উপাসনা বহুধা (গীতা ৯।১৫) হলেও—"পয়সামর্ণব ইব"—সকল নদীই এক সমুদ্রে মিলিত হয়। তা না হলে অর্থাৎ, এই জীবসেবার মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধি না থাকলে 'ধর্ম্মপদে'র 'ব্রাহ্মণ'-বর্গের সার্থকতা থাকত না, এবং জীবসেবা একটা প্রাণহীন প্রথামাত্রে পরিণত হ'ত।

আত্মা ও অনাত্মা :—আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, অপরোক্ষ অনুভূতির সাধনোপায় কিরূপ, ইত্যাকার উপদেশ ভগবান বুদ্ধের বচনাবলীর মধ্যে বেশী পাওয়া যায় না, কিন্তু তাই বলে আত্মা বা ব্রহ্মের স্বীকৃতি নাই এ কথা বলা সমীচীন নয়।

পারিভাষিক শব্দের মারপ্যাঁচ বশতঃ ভ্রান্তি এবং ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ হিন্দু যে অর্থে 'আত্মা' বুঝেন—বৌদ্ধেরা সে অর্থে 'আত্মা' শব্দ ব্যবহার করেন না। 'মিলিন্দ পঞ্হের' নাগসেন—মিলিন্দার কথোপকথনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মিলিন্দা প্রশ্ন করলেন, "নাগসেন কে?" নাগসেন উত্তর দিলেন, "শরীরচিত্তাদি সমষ্টিই নাগসেন।" বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি বিশেষকে 'আত্মা' বলেন, হিন্দু তাহাকে 'অনাত্মা' বলেন। 'ধম্মসঙ্গনি' নামক গ্রন্থে রূপ (ভৌতিক শরীর), বেদনা, সংজ্ঞা (ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান), সংস্কার, বিজ্ঞানরূপ পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত আত্মার (যাহা হিন্দুদর্শনের অনাত্মা) বর্ণনা আছে। ইহা অহমহমিকা বা অস্মিতা মমত্বাভিমান সমন্বিত অবিদ্যোপহিত আত্মা। অনাত্মায় আত্মবোধই অবিদ্যা। বৌদ্ধেরা বলেন তৃষ্ণা ক্ষয় হ'লে 'নির্ব্বাণ' হয়। গীতাও তাই বলেন, 'সর্ব্ব সংকল্প সন্ন্যাসী' (৬।৪), 'জিতাত্মা', 'প্রশান্তাত্মা' (৬।৭) নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ (৬।১৮) 'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি' দর্শনশীল (৬।২৯) সাধক 'শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং' লাভ করেন। "যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারাম…লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং…সর্ব্বভূত হিতে রতাঃ" (৫।২৪-২৫), শান্তি পাবার একমাত্র পথ এই ব্রাহ্মীস্থিতি এবং এই স্থিতি অন্তকালে লাভ করলেও 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' লাভ হয় (২।৭২)।

সমন্বয় :—সুতরাং নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করলে গীতার ব্রহ্ম-

নির্ব্বাণ, সাংখ্যের কৈবল্য, এবং বৌদ্ধের 'নির্ব্বাণ' এ সমস্তই এক-মাত্র চরম বা পরম পদের দ্যোতনা করে। বৌদ্ধেরা যাকে অনাত্মা-বোধ অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ সমষ্টির অতীত নির্ব্বাণ বা অসংস্কৃত ধাতু রূপ অনন্ত অনুৎপন্ন পরমানন্দ বলেন, তাহাই হিন্দুরও ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মার পরমানন্দময় অবস্থা। মাণ্ডুক্য শ্রুতি তাকেই বলেছেন, "অচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।"

তুলনা করে দেখা গেল যে, বৌদ্ধের অনাত্মা এবং হিন্দুর আত্মা, বৌদ্ধের নির্ব্বাণ এবং হিন্দুর ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ এই উভয়ের বাচক বিভিন্ন হলেও বাচ্য অভিন্ন।

নির্ব্বাণ ও শূন্যবাদ:—এই নির্ব্বাণকে বৌদ্ধ গ্রন্থে শূন্য, অনিমিত্ত অপ্রণিহিত অনিশ্রিত ইত্যাদি বলা হয়। এই শূন্য ও হিন্দুর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভিন্ন নয়। নেতি-নেতি প্রণালীতে যে গুণাতীত নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্প অবস্থা বুঝায় তাহাই শূন্য, অতএব বৌদ্ধের শূন্যবাদ ও হিন্দুর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ—একার্থ প্রতিপাদক বিভিন্ন প্রাতিপাদিক মাত্র।

শূন্য ও পূর্ণ:—কেহ কেহ মনে করেন, বৌদ্ধ দার্শনিকের মহা-শূন্যতা হিন্দুর ব্রহ্ম হতে স্বতন্ত্র পদার্থ, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে সামঞ্জস্যের দৃষ্টিতে আলোচনা করলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রতীত হয় না প্রত্যুত উভয়ই এক পদার্থ বলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়। যাহা এক দিকে শূন্য, তাহা অপর দিকে পূর্ণ। মায়িক বা সাধারণ লৌকিক গুণের দিক থেকে দৃষ্টি করলে ব্রহ্ম শূন্য, আবার লৌকিক বিশিষ্টতার বিশেষণের ব্যবধান সরিয়ে দিলে স্ব-স্বরূপে অলৌকিক-কল্যাণ-গুণ-স্বরূপে সেই শূন্যই আবার মহাপূর্ণ বা অনন্ত অসীম। অর্থাৎ "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

প্রথমটি বৌদ্ধ দার্শনিকের ভাব, দ্বিতীয়টি বেদান্তের ভাব। উদ্ধৃত মাণ্ডুক্য শ্রুতি ও অন্যান্য শ্রুতি বাক্যেও এই শূন্যভাব দেখানো হয়েছে—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" "অস্থূলমনণু" ···ইত্যাদি। আবার ভগবান বুদ্ধও শূন্যকে পূর্ণভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি সুভূতিকে বলেছেন, "যে তু সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপিতে, যা চ শূন্যতা অপ্রমেয়তাপি সা" অর্থাৎ হে সুভূতে, যাহা শূন্য তাহাই 'আবার অক্ষয়—যাহাকে শূন্যতা বলা হয়, তাহাই আবার অপ্রমেয়।

এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয় 'আকাশ'-তত্ত্ব। আকাশকে আমরা শূন্যও বলি অনন্তও বলি। তাই 'আকাশ' ব্রহ্মেরও পর্য্যায় বিশেষ। ভগবান বুদ্ধ আরও বলেছেন, "অপ্রমেয়মিতি বা অসংখ্যেয়মিতি বা অক্ষয়মিতি বা শূন্যমিতি বা···অভাব ইতি বা বিরাগ ইতি বা নিরোধ ইতি বা নির্ব্বাণমিতি বা।" সুতরাং এই সমস্ত বচন একই বস্তু বা অবস্তুকে, ভাব বা অভাব পদার্থকে, বাচ্য বা অবাচ্য তত্ত্বকে সূচিত করে।

নির্ব্বাণের স্বরূপ:—এই শূন্য বা নির্ব্বাণ যে vacuum বা ফাঁকা নাস্তি পদার্থ নয়, তাও মিলিন্দ পঞ্‌হ গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সেখানে নির্ব্বাণকে 'একন্ত সুখং' বা একান্ত আনন্দময় অবস্থা বলা হয়েছে। ধর্ম্মপদে ভগবান বুদ্ধ নির্ব্বাণলাভকে 'পরম সুখ' 'অমৃতাবগাধম' প্রভৃতি বাক্যে বর্ণনা করেছেন।

এই অসংস্কৃত ধাতু বা 'নির্ব্বাণ'কে বৌদ্ধধর্ম্মে 'অপপমানা' (অপ্রমেয়) বা 'অমিতা,' পণীতা বা সর্ব্বোত্তম, লোকুত্তরা (লোকোত্তর) প্রভৃতি বিশেষণেও বিশিষ্ট করা হয়েছে।

সুতরাং এই সমস্ত বাক্যের মধ্যে সমন্বয় করতে হলে এই অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, এইরূপ পরমসুখ বা পরমানন্দ পূর্ণ অবস্থায় মায়িক বা প্রাকৃত গুণের শূন্যতাই সূচনা করে এবং তাহাই বৌদ্ধদর্শনেরও চরম অবস্থা। যার বর্ণনায় ইংরেজ কবি বলেন:

"Eye hath not seen it my gentle boy
Ear hath not heard its deep songs of joy
Dream cannot picture a world so fair
Sorrow & Death may not enter there."

অর্থাৎ শুধু "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

সকাল দুপুর ও ট্রেন ছাড়ার আগে

শ্রীবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

[সকালে]

পনের নম্বর আপ, আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস লেট করল। দু'চার মিনিট নয় পুরো দু ঘণ্টা সাত মিনিট। সকাল পাঁচটা পাঁচে তিন পাহাড় পৌঁছবার কথা। সে গাড়ী পৌঁছল দু ঘণ্টা পরে—অর্থাৎ সকাল সাতটা বারোতে।

অমিয় চৌধুরীর মত আরও শতাধিক সহযাত্রী প্রমাদ গণলেন। সকালের ট্রেনটা ছেড়ে গিয়েছে, বেলা চটোর আগে আর লোকাল ট্রেন নেই। সুতরাং ট্রেন ফেল করা এই শতাধিক সহযাত্রী তিন পাহাড়ে ভীড় করলেন।

কিন্তু অমিয় চৌধুরী এখন কি করবেন? ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে প্রথমে চা খেলেন। মাটির খুরিতে চা চার পয়সা দাম, সুস্বাদু আর মনোরম গন্ধ ছড়িয়েছে। এক চুমুক খেয়েই চৌধুরী বললেন, কেক দাও।

টি-ষ্টল ওয়ালা কেক দিল—চৌধুরী বললেন, টোষ্ট দাও। টোষ্ট খেয়ে বললেন, আর কি আছে?

—আজ্ঞে পুরী তরকারী মিষ্টি এখনি আসবে।

—গুড। অমিয় চৌধুরীর চোখজোড়া ভরে উঠল খুশীর আমেজে।

সবে চা'টা শেষ করেছেন, পুরীওয়ালা এল। মাথায় শো কেস। ঢাকা খুলতেই ধোঁয়া বের হচ্ছিল—গরম পুরী তরকারী আর রসগোল্লার গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল।

চৌধুরী বললেন, পুরী দুটো, মিষ্টি দুটো।

—তরকারী?

—হ্যাঁ। চৌধুরী মাথা নাড়লেন।

এখন কি করবেন? কি করে কাটাবেন সারাটা দিন? ষ্টেশনের চারদিকে তাকালেন অমিয় চৌধুরী। পূব দিকে একসার খড়ো ঘর। রেলওয়ে ষ্টাফ কোয়ার্টার্স। বারান্দার তারে রোদ্রে কতগুলো জামাকাপড় মেলা ছিল। জানালার শিকের ফাঁকে একটি কালো বিনুনী সাপের মত দুলছিল। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না। শুধু তার সুগঠিত দেহরেখা আর ফর্সা ঘাড় এক টুকরো বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য্যের মত সারাটা জানালা জুড়ে ছিল! তার পর ধূ ধূ মাঠ। মাঠের শেষে ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড়। পূব দিকে তাকালেন চৌধুরী। ষ্টেশন রুম—বুকিং অফিস। আর তার মাথার ওপর যেন উদ্ধত মহিমায় ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীর মত অপ্রকম্পিত তিন পাহাড়। ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে। চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে, উপত্যকা পেরিয়ে। তিন পাহাড়ের রৌদ্রজ্বলা চূড়ায় হয়ত পৌঁছান সম্ভব চৌধুরী ভাবছিলেন। কিন্তু সঙ্গী চাই। একা একা ঐ পাহাড় ডিঙানো জমে না, চার্ম নেই।

প্ল্যাটফর্মের চারদিকে তাকালেন। ট্রেন-ফেল যাত্রীর দল তখন ক্লান্ত। সব উৎসাহ স্তিমিত। তার পাশেই বেঞ্চে বসে একটি বছর ছাব্বিশের তরুণ। চৌধুরী একবার ভাবলেন, একে বলবেন। কিন্তু 'লাইফ' পত্রিকার পাতা যে ভাবে সে উল্টাচ্ছিল, চৌধুরী ভরসা পেলেন না। চোখ ফেরাতেই দেখলেন একজোড়া নব-দম্পতি। তরুণীটি দীর্ঘাঙ্গী। মাথা প্রায় ঘাড় ছু য়েছে ভদ্রলোকটির। পাশাপাশি হাঁটছিলেন পেছনে ছায়া রেখে। প্ল্যাটফর্ম থেকে লাইনে লাফিয়ে নামলেন ভদ্রলোকটি। ডান হাত মেলে দিলেন—সে হাত ধরে নামল তরুণীটি। লাইন পার হ'ল দু'জন। এবারও ভদ্রলোকটি আগে প্ল্যাটফর্মে উঠে ডান হাত এগিয়ে দিলেন। সে হাত ধরে উঠল তরুণীটি। তার পর আবার পাশাপাশি হেঁটে ওরা মিলিয়ে গেলেন বাইরে। বেশ লাগছিল ওদের পথ চলার ছন্দটুকু—সুর মেলান যেন।

চৌধুরী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন।

—গুড মর্ণিং। চৌধুরী প্রায় চমকে উঠেছিলেন। গতকাল রাত্রের সেই সহ-যাত্রীটি। চৌধুরীকে 'বাঙ্কে' শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। স্যুটকেশে লেবেল লাগান ছিল সুরজিৎ রায় মালদহ। দু চোখের পাতা মিট মিট করছিল লোকটির, বলল, চিনতে পারছেন?

—হ্যাঁ। চৌধুরী হাসলেন।

—kindly একটু মুখের কথা শেষ করল না লোকটি—পকেট থেকে একটি এক আউন্সের শিশি বের করল।

—কি ওষুধ? আইডিন?

—না।

—তবে?

—আইলোশন। চোখে একটু ড্রপ দিয়ে দেবেন?

—দিন। চৌধুরী কয়েক ফোটা আইলোশন ঢেলে দিল। সুরজিৎ রায় ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, চৌধুরী ডাকলেন, শুনুন।

—চলুন পাহাড়টায় ঘুরে আসি।

—বেশ ত চলুন।

দু জনে হাঁটতে লাগল। রওনা হওয়ার আগে পকেট হাতিয়ে নিলেন চৌধুরী। মনিব্যাগ আর টিকেটটা ঠিকই আছে। তিন পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে খানিকটা উঠলেন দুজনে। চৌধুরী বললে, ক্লান্ত লাগছে, সারা রাত ঘুম হয় নি।

—চলুন ফিরি।

দু জনেই ফিরে এলেন। সামনেদেশের একটা ঢালুতে কয়েকটা জাম গাছ যেন ভীড় করেছিল গায়ে গা জড়িয়ে। রাশি রাশি

কালো জাম ছড়িয়ে ছিল। চৌধুরী কতগুলো জাম খেলেন। তার পর ঐ জাম গাছের শীতল ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। সুরজিৎ রায় পাশে বসে রইল। বেলা বাড়ছিল ধীরে ধীরে। *সকালের দিকে তিন পাহাড়ের এই আকাশে মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা চলছিল—এখন যেন হার মেনেছে মেঘের দল। ঝলমলে রৌদ্রে তিন পাহাড় যেন ঘষে মেজে স্নান করে উঠেছিল।

চৌধুরীর ভাল লাগছিল। গতানুগতিক জীবনযাত্রা আর স্কুল মাষ্টারী করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। পাঁচ দিন কলকাতায় কাটিয়ে আজ এই সকালে তিন পাহাড়ের উদার গাম্ভীর্যে, চারদিকে পাহাড়—প্রান্তরের অকৃপণ হাওয়া আর বিহার ভূখণ্ডের লাল রুক্ষ মাটির প্রাকৃতিক ব্যাপ্তির মাঝে চৌধুরী যেন নিজেকে বিলিয়ে দিলেন।

সম্মুখে কোন এক ব্যবসায়ীর পাথর ভাঙ্গার কাজ চলেছে। সাদা পাথর-কালো পাথর গেরুয়া রঙা পাথর ভাঙ্গা চলছে। ঘড় ঘড় শব্দ করে হিংস্র পশুর মত পাথর ভাঙ্গছিল ষ্টোন ক্রাশার মেশিনটা। কখনও হাতুড়ি পিটছিল সবাই—ছোট ছোট পাথর নানা সাইজের পাথর ভাঙ্গছিল—শব্দ উঠছিল খন্ খন্। কখনও আগুনের ফুলকি তারার গুড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। ঠিকাদার কাজ দেখছিল। চৌধুরী তেমনি শুয়ে রইলেন। বেলা বেড়ে আকাশ তপ্ত তামার মত হ'ল। একটি দেহাতী চলেছিল মাথায় ডালি নিয়ে।

চৌধুরী বললেন, কি আছে ?

—খেজুর।

—কি দাম ?

—আনায় কুড়িটা।

—দেখি দু' আনার।

চৌধুরী খেজুর খেলেন—দু চারটে ছুড়ে দিলেন সুরজিৎ রায়কে।

[দুপুরে]

জ্যৈষ্ঠ দুপুরের চোখ ধাধানো রোদে তিন পাহাড় পুড়ছিল।

চৌধুরী চোখ বুজে রইলেন। ফুরফুরে হাওয়ায় চৌধুরীর ঘুম আসছিল। আর এক ঝাঁক বলাকা পাখা কাঁপিয়ে গেল দক্ষিণ উপত্যকার দিকে।

—তরমুজ নেবেন ?

চৌধুরী চোখ মেললেন। একটি লোকের মাথায় ডালি—ডালিতে তরমুজ।

—কত দাম ? চৌধুরী বললেন।

—ছ' আনা।

—চার আনা হবে ?

—নিন।

একটা পাথরের ওপর চৌধুরী আছড়ে ভাঙ্গলেন তরমুজটা। লাল টকটকে তরমুজ আর শাঁসালো। চৌধুরী অর্দ্ধেকটা খেলেন—অর্দ্ধেকটা এগিয়ে দিলেন সুরজিৎ রায়কে।

—এখন স্নান করা দরকার। রুমালে মুখ মুছে চৌধুরী বললেন।

—হাঁ—আর একটু ভাত। সুরজিৎ রায় যোগ দিলেন।

—চলুন দেখা যাক। চৌধুরী আড়ামোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। পাশেই পুকুর। শাপলা-শালুক আর কলমী লতার ঘন জঙ্গল। স্নান করে পাথরের পথ পেরিয়ে ওরা এলেন গঞ্জে—এখান থেকে ষ্টেশন দেখা যায়। গুডস ক্লার্ক কাজ করছেন ঘরে বসে। রেল লাইনের উপর একটি ইঞ্জিন ফুঁসছিল। এক রাশ কালো ধোঁয়া যেন উঠে জট পাকিয়েছে মাথায়।

চৌধুরী একটি সাইনবোর্ডের নীচে থমকে দাঁড়ালেন। জয়হিন্দ হিন্দু হোটেল। বাইরে বট গাছটার নীচে মাচায় একটি মেয়ে—চুলে চিরুনী চালাচ্ছিল। মেয়েটির দিকে একবার তাকালেন অমিয় চৌধুরী। তার পর ভেতরে পা বাড়ালেন। পেছনে পেছনে এলেন সুরজিৎ রায়। ছোট ঘরখানায় তিনটে বড়চটা টেবিল। তিনটি টেবিলের চার পাশে একসার জীর্ণ চেয়ার টেবিলের প্রান্তে একটি লোক মাথা গুঁজে খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল—আর বাঁ হাতে মাছি তাড়াচ্ছিল। আর একটি মেয়ে—লম্বা তন্বী সিঁথিতে ডগ-ডগে সিঁন্দুর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটির চোখে মুখে তখনও মন-খুশি হাসির রেশ। লোকটিকে চিনতে কষ্ট হ'ল না চৌধুরীর। সেই পাথর ভাঙ্গার ঠিকাদার।

ঘরের আর এক প্রান্তে একটি বৃদ্ধ বসেছিল। সম্মুখে ছোট একটি টেবিল, একটি টিনের বাক্স—একটি সিগ্রেটের কৌটা। চেয়ারে বসে অমিয় চৌধুরীর দৃষ্টি কিছুই এড়াল না।

মেয়েটি এবার চৌধুরীর পাশে প্রায় গা ঘেসে দাঁড়াল। সস্তা প্রসাধন সুরভিত দেহ ছাড়িয়েও আর একটা গন্ধ পেল চৌধুরী। হেঁসেলে কাজ করা মেয়েদের কাপড়ের গন্ধ।

মেয়েটি বলল, কি দেবে আপনাদের ?

—কি আছে ?

—ভাত ডাল ভাজা মাছ মাংস মুরিঘণ্ট।

—মাংস ভাত।

—কি চান বাবুরা ? বৃদ্ধটি বলল।

—মাংস ভাত। মেয়েটি বলল।

—কি ?

—মাংস ভাত।

—অ্যাঁ ?

—মাংস ভাত। মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল। এবার চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, উনি কানে কম শোনেন।

—বাবুরা মাছ ভাত খাবেন না ? বৃদ্ধ মাথা দুলিয়ে বলল।

—না। মেয়েটি মাথা নাড়ল।

—বাঙ্গালী বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ আমরা বাঙ্গালী। চৌধুরী বলল।

—বাঙ্গালী হয়ে মাছ খাবেন না।

—মাছ ত রোজই খাই—

—তা বেশ। গীতা বাবুদের ভাল করে দাও।

মেয়েটির নাম গীতা—ততক্ষণে ঝড়ের মত পাশের ঘরটায় ঢুকেছে। একটু পরেই ফিরে এল গীতা—দু'হাতে দুটো থালা। থালায় উপর পদ্ম পাতায় ভাত রয়েছে। পেছনে এল একটি বছর পনেরর ছেলে। জল আর দুবাটী মাংস নিয়ে। থালা দুটো নামিয়ে রেখেই ঠিকাদারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল গীতা। বৃদ্ধটি ডাকলেন, গীতা—

—গীতা এগিয়ে গেল।

—বৃদ্ধটি বললেন, বাবুদের দেখ—ওরা ত রোজ আসবেন না। গীতা এবার সুরজিৎ রায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল, বলল, রান্না কেমন হয়েছে?

—ভাল। সুরজিৎ রায় বলল।

—কি বললেন? বৃদ্ধ জানতে চাইল।

—রান্না ভাল। গীতা বলল।

বৃদ্ধের চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

গীতা বলল, বাবুরা খেতে জানেন না—কিছুই খেলেন না।

—কি বললে? বৃদ্ধ কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল।

—বাবুরা খেতে জানেন না—কিছুই খেলেন না। গীতা চিৎকার করে বলল। বৃদ্ধ বোধ হয় এবারও সব কথা শুনতে পায় নি—তার চোখে মুখে বিচিত্র হাসি।

গীতা আবার ঠিকাদারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ঠিকাদার আড়চোখে গীতাকে দেখে এক পলক হাসল, আর ফিসফিসিয়ে যেন কিছু বলল।

খাওয়ার পর হাতমুখ ধুয়ে মশলা মুখে দিলেন চৌধুরী। সুরজিৎ রায়ও। দাম মিটিয়ে আসছিল, দোরগোড়ায় গীতা। হাসছে। চোখ অমিয় চৌধুরীর মুখে।

চৌধুরী চার আনা বকশিশ দিলেন, গীতা ছোট নমস্কার করল। সুরজিৎ রায় একটি আধুলি দিলেন। গীতার দুই হাত নিখুঁত ভাবে এক হ'ল। বেরিয়ে এসে রায় বললেন, ব্যবসা দেখলেন?

হু।

চৌধুরী মাচার ওপর বসে বললেন, আমি একটু শোব। রায় বলল, আমি চলি—মালপত্রগুলো পড়ে রয়েছে।

[ট্রেন ছাড়ার আগে]

চৌধুরীর তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রা ভাঙল ইঞ্জিনের আগ্নেয় কলিজার ধস ধস শব্দে। দুটো বাজতে কয়েক মিনিট দেরী। চৌধুরীও যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে প্রায় ছুটেই আসছিলেন চৌধুরী। গাঁটে গাঁটে বেতো বুড়োর মত ঝরঝরে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে যেন বিশ্রাম নিচ্ছিল লাইনে।

—টিকিট! ষ্টেশনের গেটে একটি লোক হাত পাতল। চৌধুরীর আড়চোখের দৃষ্টি স্থির হ'ল লোকটির মুখে, আপনি?

—হ্যাঁ, আমি টিকিট কলেক্টর।

সাদা হাফ-সার্ট আর ধুতি পরে এ কোন টিকিট কলেক্টর?

চৌধুরীর বিস্ময় দ্বিগুণ হ'ল।

—কালো কোট খুঁজছেন? লোকটি যেন বাঁকা করে হাসল।

তিন পাহাড়ের হয়ত এই রীতি—এমনি সাধারণ পোষাক পরে টিকিট কলেক্টররা। চৌধুরী তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ালেন।

—টিকিট কোথায়? টিকিট? মনিব্যাগটা ত রয়েছে।

—তবে কি স্নানের আগে যখন সার্ট খুলেছিলেন—

—তাড়াতাড়ি করুন, গাড়ী ছাড়ছে। লোকটি বলল।

—টিকিট কিনেছিলাম, কিন্তু—চৌধুরী অসহায় হয়ে বললেন।

—দশটা টাকা দিন।

দশটা টাকাই দিলেন চৌধুরী। তার পর ভেতরে ঢুকবার জন্য পা বাড়ালেন।

টিকিট কলেক্টর বাধা দিল, ভেতরে যাবেন না, মোবাইল কোর্ট বসেছে।

লোকটা চলে যাচ্ছিল, চৌধুরী বললেন, রসিদ?

—দাঁড়ান আনছি। ষ্টেশনের মাল গুদামের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

ইঞ্জিনটা ফুঁসছিল হিংস্র অজগরের মত। প্ল্যাটফর্মে গার্ড-সাহেব ঘড়ি দেখছেন। ঘণ্টা পড়ল, কিন্তু লোকটি এল না। এক মিনিট, দু'মিনিট, তিন মিনিট। বাঁশী বাজল। লোকটি এল না। চৌধুরী ছুটে গিয়ে শেষের কামড়ায় উঠলেন। উঠতেই গাড়ী ছাড়ল, কিন্তু চৌধুরীর মাথায় যেন ঝড় বইছিল। চেইন টেনে গাড়ী থামাবেন? লাফিয়ে নামবেন?

দরজায় দাঁড়িয়ে চৌধুরী ছটফট করছিলেন। গাড়ীর গতি বেড়েছে ততক্ষণে। ঐ ত, ঐ ত লোকটা গুমটি গেটের পাশে একটা পান-বিড়ির দোকানে সিগারেট টানছে পরম পরিতৃপ্তিতে। হাসছে।

না আর কিছুই করবেন না চৌধুরী। তিন পাহাড়ের সারাদিনের আনন্দের মাঝে ঐ টিকিট কলেক্টরটা যেন নতুন অভিজ্ঞতা—এ অভিজ্ঞতা চৌধুরীর বাকি ছিল।

তিব্বত

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে (প্রবাসী, শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৬৫) বলা হইয়াছে যে, রাশিয়াকে বাদ দিলে সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে তিনটি কৃষ্টিগত জগতে বিভক্ত করা চলে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার, চীনের মধ্যস্থলে, ভারতের ও পশ্চিমে আরবের জগৎ। এই হিসাবে তিব্বতকে ভারতের কৃষ্টি-জগতে অবস্থিত বলা চলে; যদিও এই জগতের কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। তিব্বত রাজ্য অতি প্রাচীনকালে "বোদ-যুল" নামে পরিচিত ছিল। ইহাই পরবর্ত্তিকালে "বোদ", "বধ", "তো-বধ", "তু-বধ" এবং কালক্রমে "তি-বধ" নামে পরিণত হয়। ইহাই বর্ত্তমানকালের তিব্বত। অদ্যাবধি তিব্বতের স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ দেশের প্রচলিত কথিত ভাষায় নিজ দেশকে "বধ" ও "বোধ" প্রভৃতি নামে উল্লেখ করে।

ভারতবর্ষ ও হিমালয়ের উত্তরে উচ্চমালভূমিতে অবস্থিত এই রাজ্য পূর্ব্বপ্রান্তে চীনের যুন-লিং পর্ব্বতমালা; উত্তরে তুর্কীস্থান ও মঙ্গোলিয়ার কুয়েন-লুন পর্ব্বতমালা দ্বারা; পশ্চিমে ভারতের কাশ্মীর প্রদেশের নিকট সঙ্কীর্ণ হইয়া পামীর মালভূমি দ্বারা এবং দক্ষিণে ভারতের উত্তর প্রান্তস্থ হিমালয় পর্ব্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। তিব্বতের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দীর্ঘতম সীমা প্রায় ষোল শত মাইল এবং দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তের প্রসার—পশ্চিমাঞ্চলে দেড়শত, মধ্যস্থলে পাঁচশত ও পূর্ব্বাঞ্চলে প্রায় সাত-শত মাইল। পৃথিবীর এই উচ্চতম মালভূমি পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহ ব্যতিরেকে দশ হাজার হইতে আঠার হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। এই উচ্চ মালভূমি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া চীনের যুন-লিং পর্ব্বতমালার সন্নিকট হইতে সোপানাবলীর ন্যায় ক্রমশঃ নিম্নমুখী হইয়া চীন-ভূখণ্ডে বিলীন হইয়াছে।

তিব্বত দেশকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। (১) পশ্চিম তিব্বত অথবা গাঁরি-করসুম—পশ্চিমে লাডাক হইতে ত্রান্দাম-তাসাম বা ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি স্থলের সন্নিকট পর্য্যন্ত; এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কিছু খর্ব্বাকৃতি; মানস সরোবর ও কৈলাস—এই অঞ্চলেই অবস্থিত। (২) মধ্য-তিব্বত অর্থাৎ নেপাল রাজ্যের সন্নিহিত হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত সাং, লোহনাক্ ও কংপো প্রদেশসহ অঞ্চল; এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ মধ্যমাকৃতি। (৩) পূর্ব্ব-তিব্বত অথবা খাম প্রদেশ; এই স্থানের অধিবাসীগণও সাধারণতঃ মধ্যমাকৃতি; লাসা, সিক্সারশি প্রভৃতি বৃহৎ নগরী এই অঞ্চলে অবস্থিত। (৪) উত্তর-পূর্ব্ব তিব্বত খাম প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত আমদো বা কোকো-নোর প্রদেশ; এই স্থানের অধিবাসীগণ তিব্বতীয়গণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়, বুদ্ধিমান ও বহু বিষয়ে উন্নত; তিব্বতের অধিকাংশ লামা, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, পণ্ডিত, প্রভৃতি এই অঞ্চল হইতে আগত। (৫) উত্তর তিব্বত অথবা চাং থাং প্রদেশ; এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান বৃক্ষ-তৃণহীন অনুর্ব্বর ও জনমানব শূন্য।

ভারতে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বহু নামে তিব্বতের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্নর খণ্ড, কিম্পুরুষ খণ্ড, ত্রিভিষ্টপ, স্বর্গভূমি অথবা স্বর্ণভূমি প্রভৃতি এই সকল নামের অন্যতম। তিব্বতে অবস্থিত কৈলাস প্রভৃতি বহু স্থান প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত। যীশুখৃষ্টের জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিব্বতের সহিত ভারতের যোগাযোগ ছিল, ইহা অনুমান করা ভুল হইবে না।

মহাভারত বর্ণিত কুরুরাজ্যের পতনের পর কোশল (অযোধ্যা) পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে প্রসেনজিত কোশলের রাজা ছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রুর সহিত কোশলরাজের বিবাদ বাধে। সম্ভবতঃ সেই সময়ই রাজা প্রসেনজিতের এক পুত্র তিব্বতে পলায়ন করে। তিব্বতীয় প্রাচীন পুঁথি হইতে জানা যায়, এই প্রসেনজিতের সেই পুত্রই তিব্বতে প্রথম রাজতন্ত্র স্থাপন করেন ও তিব্বতীয় দলপতিগণ কর্ত্তৃক প্রথম রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনিই লাসার রাজধানী স্থাপন করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিত বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম তখন ভারতেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। ভারতে ও ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ও প্রচার হইয়া ছিল অশোকের রাজত্ব কালে। কুষাণ বংশের রাজত্বকালে চীন দেশে এই ধর্ম্ম প্রথম প্রবেশ করে। তিব্বতে এই ধর্ম্ম প্রবেশ করে তাহারও বহু পরবর্ত্তি কালে। প্রসেনজিতের বংশধরেরা প্রায় সহস্র বৎসরকাল তিব্বতে রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই বংশের এক রাজা সম্ভবতঃ চীন দেশের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে স্ত্রংচেন গাম্পোর রাজত্বকালে (খ্রীঃ অঃ ৬৩০-৬৯৮) তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে। ইনি থানেশ্বররাজ হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। এই সময় ভারতের সহিত তিব্বতের মাধ্যমে চীনদেশের বাণিজ্যের যোগ ছিল। স্ত্রংচেন গাম্পো নেপালরাজ্যের সহিত একটি যুদ্ধের পর সন্ধিসূত্রে নেপাল রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন চীন দেশের তাং বংশীয় এক রাজকন্যাকে। তাঁহার সময় হইতে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করিতে আরম্ভ করে।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের প্রচেষ্টায় পশ্চিম তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে তিব্বত দেশ বৌদ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ আচার্য্য শান্তিরক্ষিত তিব্বতে গমন করেন ও তথাকার বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেন। তাঁহার পরামর্শে তিব্বতরাজ লাসার সন্নিকটে একটি বৌদ্ধবিহার (বা মঠ) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই তিব্বতের বর্তমান প্রাচীনতম বৌদ্ধমঠ এবং সামা গোম্পা নামে পরিচিত।

শান্তি রক্ষিত এই মঠে ত্রয়োদশ বৎসর কাল অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পরে তাঁহার ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভব ও তাঁহার শিষ্য কমল শীল তিব্বতে গমন করেন। ইঁহারা তিব্বতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতরাজের আমন্ত্রণে তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতের ইতিহাসে তাঁহার আগমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তি অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিতগণের চেষ্টায় ভারতের প্রায় সমুদয় সংস্কৃত, পালী ও অন্যান্য বহু শাস্ত্র প্রভৃতি তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া তিব্বতে একটি বিশাল গ্রন্থাগারের সৃষ্টি করে। এই সকল বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রচেষ্টায় তিব্বতের নানা স্থানে বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ও বৌদ্ধধর্ম স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সময় হইতেই মঠধারী বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের (লামা ও দাবা সম্প্রদায়) প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রোমীয় সম্রাট ও পোপের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ন্যায় এই স্থানেও কিছুদিন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। অবশেষে ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে তিব্বতের প্রধান (ভিক্ষু) লামা শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। পঞ্চম দালাই লামা (১৬১০-৮?) আপনাকে ভগবান বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। পরবর্তিকালে ধর্ম্মগুরুর পদ পাঞ্চেন লামা বা তাসিলামার হস্তে অর্পিত হয় এবং দালাই লামা সমগ্র রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হন। তাসিলামা ভগবান অমিতাভ বুদ্ধের অবতার বলিয়া ঘোষিত হয়। দালাই লামা লাসায় পোটালা প্রাসাদে অবস্থান করেন এবং তাসিলামা (পাঞ্চেন লামা) শিগার সি-নগরীতে তাসি-লুন পো মঠে অবস্থান করেন।

তিব্বতের পাঁচটি অঞ্চলে দুই জন করিয়া 'গাপন" বা "উকস" (রাষ্ট্র প্রতিনিধি অথবা ভাইস-রয়) থাকে। তাহাদের একজন "উকো-কং" (প্রধান) এবং অপর জন "উকো-ইয়ক্" (সহকারী)। তাহাদের অধীনে তিনটি বা চারটি প্রদেশ থাকে। এই সকল প্রদেশের শাসন কর্তাদের "জোং" অথবা "জোংপন" (দুর্গাধিপতি বা গবর্ণর) বলা হয়। সমুদয় তিব্বতে এইরূপ পঞ্চান্নটি জোং বা প্রদেশ আছে। ইহা ভিন্ন সকল ব্যবসায় ক্ষেত্রে একজন করিয়া "ছাসুস" বা শুল্ক ও খাজনা সংগ্রাহক কর্ম্মচারী, যুগ-ছং বা বাণিজ্য-ব্যবসায় নিয়ন্ত্রক কর্ম্মচারী, তাজাম বা ডাক ও যানবাহন কর্ম্মচারী থাকে। দালাই লামার ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা হিসাবে তাঁহার সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী কাশ্যক তাঁহার শাসনকালে অন্ততঃ একবার সমগ্র তিব্বত পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শন সম্পূর্ণ করিতে বৎসরাধিক কাল সময় লাগে। উচ্চপদের সমুদয় কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যবস্থা লাসা হইতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতি দুই তিনটি গ্রামের শাসনকর্তা গোবাগণ (গ্রাম্য মোড়ল বা প্রধান) প্রাদেশিক শাসনকর্তা জোংপন কর্তৃক প্রতি তিন বৎসর অন্তর নিযুক্ত হয়। অপর পক্ষে মাগলনগণ (জমির ভাগবিলি ব্যবস্থাপক ও খাজনা সংগ্রাহক গ্রাম্য কর্ম্মচারী) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমিক ভাবে নিযুক্ত। প্রতি অঞ্চলের বেতন আঞ্চলিক আদায় বা আয় হইতেই প্রদান করা হয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইহাদের বেতন ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকে না। সরকারী কর্ম্মচারীগণের ব্যক্তিগত ব্যবসায়-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণে কোনও বিধিনিষেধ নাই। কর্ম্মচারীগণের বিচার ব্যবস্থায় অপরাধিগণের শাস্তি অনেক ক্ষেত্রে অতি নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়। বিচার-বিভাগের ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে শাসক কর্তৃপক্ষের হস্তেই ন্যস্ত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীনে মাঞ্চুবংশের রাজত্বকালে চীনরাষ্ট্র ক্রমশঃ তিব্বতে অনুপ্রবেশ আরম্ভ করে ও চীনের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে। কিন্তু তিব্বতীয়গণ তাহাদের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নাই। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নেপালরাজ তিব্বত আক্রমণ করিলে চীনা বাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হয়। প্রায় একশত বৎসর পরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল রাজবাহিনী পুনরায় তিব্বত আক্রমণ করে। ইহার ফলে তিব্বতীয়গণ নেপাল রাজকে বাৎসরিক দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করে ও লাসায় একটি স্থায়ী নেপালীয় রাজপ্রতিনিধির অবস্থান ব্যবস্থা মানিয়া লয়। নেপালরাজ নেপালীদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও আদায় করেন।

অপরদিকে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ গোলাব সিং-এর প্রধান সেনাপতি জোরাভার সিং পশ্চিম প্রান্ত হইতে লাডাক পুনরধিকার করিয়া কাশ্মীরের সহিত যুক্ত করেন এবং সৈন্যবাহিনী লইয়া টাকলা কোট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া যান। বার্থার নিকট তিনি কেবলমাত্র দেড় সহস্র সৈন্য লইয়া দশ সহস্র সৈন্যের তিব্বতীয় বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন। পথিমধ্যে তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন। কিন্তু পরাজিত তিব্বতীয়গণ তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সমাধির উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করে। জোরাভার দেহাবশেষ অদ্যাবধি তিব্বতের দুই তিনটি মঠে সম্মানের সহিত রক্ষিত আছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিব্বতীয়গণ সেনাপতি জোরাভার সিংয়ের শতবার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত পালন করে। শত্রু কর্তৃক বিজেতার এইরূপ সম্মান ও স্মৃতিরক্ষা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে চীনরাষ্ট্র তিব্বতে অনুপ্রবেশ আরম্ভ করিলেও তাহারা তিব্বতের শাসন-ক্ষমতা সম্পূর্ণ অধিকার করিতে

পারে নাই। তাহার একটি কারণ, দুর্গম পথে তিব্বতীয়গণের সমবেত বাধা দান এবং অপর কারণ, দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামার বৌদ্ধ জগতের উপর প্রভাব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিব্বতে নামেমাত্র চীনের আধিপত্য ছিল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার একজন রাষ্ট্রদূতকে লামার দরবারে অভ্যর্থনা করা হয়। তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন রুশ দূতের অভিনন্দনকে ব্রিটিশ বিদ্বেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই অজুহাতে ১৯০৪ সনে কর্ণেল ইয়ং-হাজব্যাণ্ডের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী উনিশ হাজার ফুট উচ্চ পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া লাসায় উপস্থিত হয় এবং তিব্বতীয়গণকে একটি নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করে। কিন্তু ১৯০৬ সন হইতে চীনরাষ্ট্র পুনরায় তিব্বতে তাহাদের আধিপত্য দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। তাহার ফলে দালাই লামা তিব্বত হইতে পলায়ন করিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ১৯১২ সনে ডাঃ সান-ইয়াং-সেনের নেতৃত্বে চীনদেশে বিপ্লব ঘটিবার পর তিব্বতীয়গণ চীনাদিগকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে। দালাই লামা পুনরায় লাসায় প্রত্যাগমন করেন। ভারতের ইংরেজ শাসনকর্ত্তা তিব্বতের সহিত আর একটি নূতন চুক্তি করেন। ১৯১৮ সন হইতে ১৯৩৩ সন পর্য্যন্ত তিব্বতীয়গণের সহিত চীন-রাজ্যের ক্রমাগত বিবাদ ও সংঘর্ষ চলিতে থাকে। ১৯২৩ সনে ধর্ম্ম-গুরু পাঞ্চেন লামার সহিত রাষ্ট্রনায়ক দালাই লামার বিবাদ বাধে এবং পাঞ্চেন লামা চীন দেশে পলায়ন করেন। ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অপর দিকে ১৯৩৩ সনে ত্রয়োদশ দালাই লামার মৃত্যু হইলে নাবালক চতুর্দ্দশ দালাই লামার শাসনভার একজন অভিভাবক প্রতিনিধির হস্তে অর্পিত হয়। এই দালাই লামা ১৯৩৯ সনে শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় একজন নূতন পাঞ্চেন লামা মনোনীত হন; কিন্তু দালাইলামা এই মনোনয়ন অনুমোদন করে নাই। এই ঘটনায় তিব্বত দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া যায়। কিছু দিন তিব্বতে প্রবল বিবাদ চলিতে থাকে। ১৯৫০ সনে নূতন চীনরাষ্ট্র পাঞ্চেন লামার সমর্থনের অজুহাতে ও তিব্বতীগণের মুক্তি কামনায় তিব্বত আক্রমণ করে। ইহার ফলে তিব্বতে চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম অবস্থায় আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে তিব্বতীয়গণের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা অনেকখানি বজায় রাখিয়া সাম্যবাদী চীনরাষ্ট্র অতি ধীর পদে অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে তিব্বত সাম্যবাদী চীন সাধারণতন্ত্রের একটি প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত। তিব্বতের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সকল চুক্তি বাতিল করিয়া নূতন ভারত সরকার ১৯৫৪ সনের ২৯শে এপ্রিল চীনরাষ্ট্রের সহিত একটি চুক্তির দ্বারা তিব্বতের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। এই চুক্তির মূলনীতি "পঞ্চশীলে"র উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চুক্তিতে বলা হইয়াছে (১) তিব্বতীয়গণ দিল্লী, কলিকাতা ও কালিম্পংয়ে ব্যবসায় যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে; (২) ভারত সরকার ইয়াটুং, গ্যাণ্টশি ও গারটকে ব্যবসায় যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে; (৩) চীন সরকার ইয়াটুং, গ্যাণ্টশি ও ফারীকে প্রচলিত প্রথানুসারে ব্যবসায় লেন-দেনের কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন এবং ভারত সরকার অনুরূপ ভাবে কালিম্পং, শিলিগুড়ি ও কলিকাতায় ব্যবসায় কেন্দ্র রক্ষার ব্যবস্থা অনুমোদন করেন; (৪) ভারতের তীর্থযাত্রীগণ বিনা বাধায় কৈলাস ও মানস সরোবরে যাইতে পারিবে এবং অনুরূপ ভাবে তিব্বতীয়গণ কাশী, সারনাথ, গয়া ও সাঁচী গমন করিতে পারিবে; পূর্ব্ব প্রথানুসারে লাসায় গমনেচ্ছু ভারতীয়গণের পক্ষেও কোনও বাধা থাকিবে না।

তিব্বতে তিব্বতীয় ভাষা প্রচলিত এবং তাহার স্থানীয় সাধারণ নাম "বোদ-স্কাদ্"। প্রচলিত কথিত ভাষাকে বলা হয় "গাল-স্কাদ" এবং শাস্ত্রীয় বা পুস্তকের ভাষাকে বলা হয় 'কোস্-স্কাদ্'। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রথম যুগে স্ত্রংচেন গাম্পোর রাজত্ব কালে সম্ভবতঃ ৬৪১ খ্রীঃ অব্দে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদের জন্য তিব্বতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সাহায্যে প্রাচীন কাশ্মীরী 'সারদা' বর্ণমালা অবলম্বনে সর্ব্বপ্রথম তিব্বতীয় ভাষার বর্ণমালা রচিত হয়। তিব্বতীয় ভাষার উপর পালি ও সংস্কৃত ভাষার এবং সাধারণ ভাবে ভারতীয় ভাষার যথেষ্ট প্রভাব বর্ত্তমান। কালক্রমে পালি ও সংস্কৃতাদি শব্দের উচ্চারণের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সপ্তম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতে গেলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র, বেদ বেদান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই সকল অনুবাদ হইতে তিব্বতীয় ভাষায় দুইটি অতি বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়। প্রথমটির নাম 'কাঞ্জুর', এই পুস্তকে বুদ্ধদেবের জীবনের সমুদয় বাণী সংগ্রহ করা হইয়াছে, এই গ্রন্থ এক শত আট খণ্ডে বিভক্ত। অপর গ্রন্থটির নাম 'তাঞ্জুর', ইহা দুই শত পঁয়ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত, ইহাতে প্রাচীন সমুদয় ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গ্রন্থমালার সংগ্রহ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তিব্বতের গ্রন্থাগার অতি বিরাট। লাসার সন্নিকটে অবস্থিত 'দেপুং' মঠের (বিহার) গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিলে কেহই মনে করিবে না যে তিব্বতের শতকরা পঁচাত্তর জনের অধিক অধিবাসী নিরক্ষর। তিব্বতের শিক্ষা-ব্যবস্থা কেবলমাত্র মঠ নিবাসী লামা সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেপুং মঠে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী ভিক্ষুর বাস। এই মঠে পৃথিবীর বৃহত্তম আবাসিক (Residential) বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত বলা চলে। ভারপ্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপক ভিক্ষুদের বলা হয় 'লামা' এবং সাধারণ ভিক্ষু ও শিক্ষার্থীদের বলা হয় 'দাবা'। শহর ও পল্লী অঞ্চলে গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্মে যাহারা সচরাচর সহায়তা করে তাহাদের অধিকাংশ 'দাবা' শ্রেণীর। তিব্বতের শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিতে এই ভিক্ষু সম্প্রদায়কেই বুঝায়। তিব্বতের বর্ষ পঞ্জিকা কাশ্মীরের 'কালচক্র-জ্যোতিষ' অবলম্বনে রচিত। ফাল্গুনের শুক্লা প্রতিপদে তিব্বতের নববর্ষ। এই দিন তিব্বতের একটি জাতীয় উৎসবের দিন।

১৯৫৩ সন পর্য্যন্ত তিব্বতে জনসাধারণের জন্য কোনও শিক্ষা-ব্যবস্থা অথবা বিদ্যালয় ছিল না।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্ম, তান্ত্রিক শাক্তধর্ম্ম ও প্রাচীন তিব্বতীয় 'বন' ধর্ম্মের সমন্বয় বলা চলে। পাশ্চাত্য জগতে এই ধর্ম্ম লামাবাদ নামে পরিচিত। মোটামুটি ভাবে তিব্বতীয়গণ বৌদ্ধমহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধ-জগতে দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামার প্রভাব বহুকাল অবধি খুব শক্তিশালী ছিল। এই ধর্ম্মীয় সম্মান তিব্বতকে পূর্ব্ব-প্রাচ্যের বহু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বর্ত্তমানে তিব্বতে বৌদ্ধদিগের দশটি শাখা-সম্প্রদায় আছে। ইহাদের একটি শাখায় সম্পূর্ণ তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি প্রচলিত। শিমব্রিং মঠের দেবী 'ডেমচগ' যে তারা বা চণ্ডীমূর্ত্তি সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। এই পূজায় অঙ্কিত যন্ত্র ও মুদ্রা প্রভৃতি ভারতীয় পূজা-পদ্ধতির সহিত প্রায় অভিন্ন। অনেক মঠে বিশেষ দিনে বৈদিক হোমের অনুরূপ অনুষ্ঠানও দেখা যায়। তিব্বতীয়গণ গায়ত্রী মন্ত্রের ন্যায় "ওঁ মণি পদ্মে হুম্‌" এই মন্ত্র জপ করে। তিব্বত দেশে এই মন্ত্রকে "মণিমন্ত্র" বলা হয়। তিব্বতের তিন সহস্রাধিক ক্ষুদ্র বৃহৎ মঠে প্রধান দশটি মঠের শাখা প্রশাখা। এই সকল মঠের অধ্যক্ষগণ কেন্দ্রীয় মঠ হইতে নিযুক্ত হন। তিব্বতীয় মঠ "গোম্পা" নামে পরিচিত। ভারতে দুষ্প্রাপ্য ও বিলুপ্ত বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের নকল ও অনুবাদ অদ্যাবধি এই সকল "গোম্পায়" সুরক্ষিত আছে।

তিব্বতের বর্ত্তমান জনসংখ্যা অনূ্ন পঞ্চাশ লক্ষ। তিব্বতের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অতি সামান্য। তাহার একটি কারণ, উত্তর তিব্বতের চাং আং প্রদেশ সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর ও জনশূন্য। অপর কারণ, সম্ভবতঃ লামা ও দাবা সম্প্রদায়ের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষে বিধি-নিষেধ। তাহা ছাড়া এই দেশে জীবিকা নির্ব্বাহ অতিশয় শ্রম ও কষ্টসাধ্য। চাষাবাদে অতি কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। তিব্বতীয়গণ সচরাচর অধিক বয়সে বিবাহ করে। পুরুষের পক্ষে বহু-বিবাহে বিধি-নিষেধ না থাকা সত্ত্বেও বহু-বিবাহ নাই বলিলেও চলে। তবে তিব্বতের অভ্যন্তরে পঞ্চ পাণ্ডব ভ্রাতার ন্যায় দুই বা তিন ভ্রাতার একটি পত্নী কোনও কোনও স্থলে দেখা যায়। মঠের অভ্যন্তরে লামা ও দাবাদিগের অনেক দুর্নীতির সংবাদও পাওয়া যায়। জনবহুল লাসা নগরীর পথে অনেক সময় শিশুক্রোড়ে মঠনিবাসী সন্ন্যাসীনীর দর্শন পাওয়া যায়। তিব্বতীয়গণের নিকট তাহারা হেয় হয় না। এই সকল শিশুর লালন-পালনে সর্ব্বত্র সাহায্য করা হয়, এবং সমাজেও স্থান পায়। মঠনিবাসী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ অতি বাল্যকালে শিক্ষালাভার্থ মঠে প্রেরিত হয়, সেইজন্য ইহারা বিবাহিত জীবনের কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা লাভে বঞ্চিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সকলেই মুণ্ডিত মস্তক। ইহারা দীর্ঘ আলখাল্লার ন্যায় লোহিত-বাস পরিধান করে।

সাধারণ গৃহস্থ তিব্বতীয়গণ অনেকে গলাবন্ধ, কোট ও পশমের কাশ্মীরি পায়জামার ন্যায় আবরণ ব্যবহার করে। কেহ কেহ দীর্ঘ আলখাল্লার ন্যায় পোষাকও পরিধান করে। রমণীগণ পশমের গাউনের ন্যায় পোষাক পরিধান করে। পুরুষ ও নারী উভয়েই দীর্ঘ কেশ রাখে ও বেণী বন্ধন করে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার আছে। তিব্বতের নারী গাপন (ভাইস-রয়) পদেও নিযুক্ত হয়। তিব্বতীয় নারীর ডেকো-কং (গবর্ণর) পদে নিয়োগ স্বাভাবিক ঘটনা। অপরদিকে সাধারণ "লামা" ও "দাবা"গণের যে কোনও ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পেশা গ্রহণে কোনও প্রকার বিধি-নিষেধ নাই। তিব্বতের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী লামাগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে লামা ও দাবাগণের কেহ কেহ মধ্য-জীবনে গৃহস্থ হইয়া বিবাহিত জীবনযাপন করিতেছে এইরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায়। লামা ও দাবাগণের অনেকে সর্ব্বোচ্চ পদ দালাই লামা হইলে সামান্য মজুরের কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে দেখা যায়। তিব্বতীয়গণ কোনও প্রকার শ্রমের কার্য্যকে মর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করে না। উত্তর-তিব্বতের অধিবাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক যাযাবর শ্রেণীর অধিবাসী দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেক দুর্দ্দান্ত তস্কর প্রভৃতি দেখা যায়। তবে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

তিব্বতীয়গণের চরিত্রে দুর্দ্দান্ত, উচ্ছৃঙ্খল ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি এবং কোমল সহৃদয়তার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়। রমণীগণ কোমল হৃদয়, অতিথিবৎসলা ও সেবাপরায়ণা।

অধিকাংশ গৃহস্থ ইয়াক, ডেমো, পাঙ্‌ ও জেমু (তিব্বতীয় ষণ্ড ও গাই) প্রভৃতি পালন করে। ইহা ব্যতীত অশ্ব, গর্দ্দভ, খচ্চর, মেষ ও ছাগ প্রচুর সংখ্যায় পালন করে। মেষ-পালন ও মেষ-লোমের পশমের ব্যবসায় ইহাদের একটি প্রধান উপজীবিকা।

মাংস ও দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহা ভিন্ন যব চূর্ণের সহিত লবণ সহযোগে মাংস সিদ্ধ ইহাদের অতি উপাদেয় আহার। এই আহার্য্য দেখিতে অনেকটা পায়েসের ন্যায়। লাসা নগরীতে ও পশ্চিম তিব্বতের অনেক স্থানে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত গৃহে বর্ত্তমানকালে অনেকেই আটার রুটি ও অন্ন গ্রহণ করে। চীন দেশীয় চা এই দেশের প্রধান পানীয়।

পশুলোম ও পশম তিব্বতের প্রধান পণ্য। পশম প্রচুর পরিমাণে ভারতে রপ্তানী হয়। ইহা ভিন্ন ধাতবলবণ, সোডা, সোহাগা প্রভৃতিও ভারতে রপ্তানী হয়। কিছু পরিমাণে কুটির ও ধাতব শিল্পজাত দ্রব্যও বিদেশে রপ্তানী হয়। এই সকল দ্রব্য রুচি ও সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। তিব্বতীয়গণের গৃহস্থালীতে শিল্পদ্রব্যের সমাবেশ দেখিলে রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। টঙ্কা বা টাঙ্গা (টাকা) তিব্বতীয় প্রচলিত মুদ্রা। ইহা রৌপ্য মুদ্রা। কিন্তু তিব্বতীয়গণ ভারতীয় মুদ্রা গ্রহণে আপত্তি করে না। ব্যবসায় কেন্দ্রে দশ ও একশত টাকার নোট বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে। মধ্য ও পূর্ব্ব তিব্বতে বহু সংখ্যক নেপালী ও ভুটানী ব্যবসায়ী স্থায়ীভাবে বসবাস করে। অন্যান্য ভারতীয়

ব্যবসায়ীও কিছু সংখ্যক আছে। পশ্চিম তিব্বতে ভারতীয় ও নেপালী ব্যবসায়ী অনেক দৃষ্টিগোচর হয়। তিব্বতে ভুটানী ও নেপালীর সংখ্যা নেহাৎ নগণ্য নহে।

১৯৫০ সন হইতে তিব্বতে একটি বিপুল পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে। ১৯৫৩ সনে রাজধানী লাসা নগরীতে এবং সিঙ্গারসিতে দুইটি বৃহৎ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নিকট ভবিষ্যতে আরও অনেকগুলি উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় বহু স্থানে স্থাপনের পরিকল্পনাও করা হইয়াছে। তিব্বতের ইতিহাসে মঠের বাহিরে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এই প্রথম। বর্ত্তমানে এই দুইটি বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চার সহস্র। শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণও অনেকে সচেতন হইয়াছে। তিব্বতীয় ভাষায় আধুনিক ইতিহাস,বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে তিব্বতে কোনও বৃহৎ শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না। একটি মোটর গাড়ী মেরামতের ক্ষুদ্র কারখানা চাষাবাদের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে চীনদেশীয় মিস্ত্রীর সাহায্যে পার্ব্বত্য অঞ্চলে ব্যবহারের উপযুক্ত চাষাবাদের যন্ত্র (ট্র্যাক্টর) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তিব্বতের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের উপযোগী তিন চাকা বিশিষ্ট মালবাহক মোটর যান (লরী) নির্ম্মাণও আরম্ভ হইয়াছে। তিব্বত দেশে শস্য প্রভৃতি একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণের অসুবিধার জন্য ইহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া মনে করা হইতেছে। পূর্ব্বে মেষ ও অন্যান্য পশু-পৃষ্ঠে ধীর গতিতে পণ্য বহন করা হইত। এই কারখানায় বহু সংখ্যক তিব্বতীয়ের কর্ম্মসংস্থানও হইয়াছে। বিদ্যালয় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অল্পকালের মধ্যেই তিব্বতীয়-গণের সামাজিক জীবনে একটি পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থারও কিছু সংস্কারের উদ্যম চলিতেছে। দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থাগুলির প্রতি জনগণের স্বাভাবিক বিরাগ আসিয়াছে। চির তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গগুলির উপর নব অরুণালোক প্রতিভাত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জগতের নিকট অন্ধকার তিব্বত অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবাসীর নিকট আলোকোজ্জ্বল ছিল। প্রাচীনকালের চীন ও তিব্বতীয়গণের মৈত্রী বন্ধন বর্ত্তমানকালেও ভারতীয়গণের স্বাভাবিক নীতি।

নর্ম্মদার বুকে জাগে ঢেউ

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নর্ম্মদার বুকে জাগে ঢেউ,
তুমি জান, আমি জানি, আর জানে কেউ ?
ওগো সখি, যেইদিন শাদা নুড়ি কুড়াইয়া,
ফেলেছিলে নর্ম্মদার বুকে,
অসহ্য পুলক সুখে,
অতল নর্ম্মদা হিয়া উঠেছিল কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
যাঁর নামে সেই অর্ঘ্য দিয়েছিলে,
কুতুহলে, লীলাছলে নদীজলে,
তারে সাথ দিলে তুমি অনন্তের সীমা।
এপারে ওপারে বাজে তরঙ্গের অন্তহীন বীণা॥
নর্ম্মদার বুকে জাগে ঢেউ,
তুমি জান, আমি জানি, আর জানে কেউ ?
তুমি যেন সে নদী নর্ম্মদা আপনার মাঝে,
রূপধরি নদীতীরে উপল কুড়াও—
উপল কুড়াও আর ফেলে ফেলে যাও,
গানে গানে নানা রঙে নানা সাজে।
যাঁর নামে সেই অর্ঘ্য দিয়েছিলে,
কুতুহলে লীলাছলে নদীজলে,
কপোতাক্ষী তার গানে নিষ্পল নয়ানে চাহ বার বার,
সামান্য নামের নুড়ি সঁপে দেয় অন্তরে তোমার।

* * *

হে নর্ম্মদা আজিও বহিছ তুমি,
কহিছ অশান্ত বাণী অযুত ব্যথায়,
সে জন ছুঁইয়া গেছে তব তটভূমি,
আছে তার নাম লেখা উপল রেখায়—
আজিও সে নর্ম্মদার বুকে জাগে ঢেউ,
কালের সাগরপারে ভেসে ভেসে যায়,
থরে থরে, লীলা ভরে নিঃশব্দ বেলায়,
আমি জানি, তুমি জান জানে নাক কেউ,
নর্ম্মদার বুকে জাগে ঢেউ।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

(স্মৃতি-চিত্র)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন

প্রথম জীবনে দশ বৎসর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহিত কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তাঁহার নিকট যে শিক্ষা লাভ করি তাহাই সম্বল করিয়া পরবর্ত্তী জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম। জীবনে যাহা কিছু ভাল করিতে সক্ষম হইয়াছি তজ্জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। তাঁহার অনুগ্রহ আজ শেষ বয়সেও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি।

আমার কতিপয় বন্ধু আচার্য্যদেবের জন্মশতবার্ষিকীতে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। দশ বৎসরের সমস্ত ঘটনা, যাহার সহিত আমি জড়িত ছিলাম, লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়। এইজন্য সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা লিখিয়া আমি শেষ করিব। আচার্য্যদেবের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিব না। এইগুলি এখন সর্ব্বজন-বিদিত। তাঁহার সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাই বলিব।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে প্রথম দর্শনের সুযোগ হয় ৫১ বৎসর পূর্ব্বে ১৯০৭ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজে। তখন তিনি উক্ত কলেজের বি, এস্‌সি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে সপ্তাহে এক ঘণ্টা পড়াইতেন। তখন তাঁহার সৌম্য, গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং প্রতিভাদৃপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে সাহস হইত না। প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং দূর হইতেই মনে মনে উহা নিবেদন করিতাম। পরে তাঁহার অধ্যাপনায় আরও মুগ্ধ হইলাম। তিনি সাধারণতঃ ৪০ মিনিটের বেশী পড়াইতেন না। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তিনি যাহা পড়াইতেন অন্য অধ্যাপকের পক্ষে দুই ঘণ্টায়ও তাহা সম্ভবপর হইত না। তিনি অত্যন্ত কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অত্যন্ত সরলভাবে বুঝাইতে পারিতেন। আমরা নিবিষ্টমনে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতাম। ক্লাশে একটুও গোলমাল বা শব্দ হইত না। তাঁহাকে ক্লাশে কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হইত না, জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও কাহারও হইত না।

ইহার তিন বৎসর পরে আচার্য্যদেবের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হয় ময়মনসিংহে, ১৯১১ সনে। আমি ঐ সময় তথায় আনন্দমোহন কলেজে, বিজ্ঞান বিভাগে নিযুক্ত ছিলাম। ঐ বৎসর আচার্য্যদেব বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া তথায় আগমন করেন। তাঁহার সহকারীরূপে অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। টাউন হলে তাঁহার বক্তৃতার স্থান নির্দিষ্ট হয়। ময়মনসিংহে তখন Electricity ছিল না। Electricity ছাড়া আচার্য্যদেবের Experiment দেখান অসম্ভব। এইজন্য প্রথমটা তিনি চিন্তিত হইয়া পড়েন। পরে আনন্দমোহন কলেজ হইতে কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান করিতে চারুবাবু ও নরেন নিয়োগীকে উক্ত কলেজে পাঠান। উঁহারা কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত দেখা করিলে তিনি উঁহাদিগকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সেই সময় আচার্য্য-দেবের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ হওয়ায় অত্যন্ত গর্ব্ব ও আনন্দবোধ করিয়াছিলাম। আচার্য্যদেব প্রথমেই তাঁহার দর্শনীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি অতি সরলভাবে বুঝাইয়া দেন এবং আমাকে কি কি করিতে হইবে তাহাও বলেন। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইলে আমি কাজগুলির ব্যবস্থা করিতে পারিব কিনা জিজ্ঞাসা করেন। আমি তখন কোনপ্রকার চিন্তা না করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, "পারিব।" বলা বাহুল্য আমার উত্তরে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং আমার উপর কাজের ভার ন্যস্ত করেন।

আনন্দমোহন কলেজে অনেকগুলি ইলেকটিক সেল ছিল। এইগুলি একত্র করিয়া আবশ্যকীয় বৈদ্যুতিক-শক্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। অন্যান্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থাও যথাযথরূপে হইয়াছিল। আচার্য্যদেবের বক্তৃতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। পরের দিন তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং বলেন যে, আমার কাজে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাহার পর নানা বিষয়ে আলাপ হয়। অবশেষে আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহার গবেষণাগারে যাইবার জন্য প্রস্তাব করেন। আমি এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হই। ঠিক হয় এক মাস পরে আনন্দমোহন কলেজ হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতায় তাঁহার সহিত দেখা করিব। কিন্তু আনন্দমোহন কলেজ তিন মাস পরে আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে। আমি কলিকাতায় গেলে আচার্য্যদেব আমাকে বলেন—"প্রথমেই তুমি কথা রাখিতে পারিলে না।" পরে আমার নিকট সব শুনিয়া বলেন—"তুমি যে আনন্দমোহন

কলেজের অসুবিধা করিয়া আস নাই, ইহাতে তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।

গবেষণা ছাড়াও আমি তাঁহার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতিতে সহায়তা করিতাম। শেষোক্ত কাজ পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে আমার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি অনেকগুলি সূক্ষ্মযন্ত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হই এজন্য তিনি আমার সুখ্যাতি করিতেন। আচার্য্যদেব নিজেও একজন বিচক্ষণ যন্ত্রবিদ্ ছিলেন। তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তি ছিল অসাধারণ।

১৯১৭ সনে "বসু বিজ্ঞান মন্দির" প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার সহকর্ম্মী ডাঃ গুরুপ্রসন্ন দাস, ৺সুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীবশীশ্বর সেন ও নরেন্দ্রনাথ নিয়োগী সহ আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করি। এই উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আচার্য্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করি এবং তিনিও আমাদের শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

আচার্য্যদেব সর্ব্বদাই কর্ম্মব্যস্ত থাকিতেন। প্রথমদিকে দেখিয়াছি তিনি কাহারও সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না। তবে আমাদের জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদাই অবারিত ছিল। কাজের বিষয়ে আমরা সর্ব্বদা দেখা করিতে পারিতাম। তিনি নিজেও অনেক সময়ে আমাদের কাজ দেখিতেন। অনেক সময়ে অলক্ষিতে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, আমরা টের পাইতাম না। যাইবার সময়ে একটা মন্তব্য করিতেন—"বেশ কাজ কর; বেশ ভাল হইয়াছে," ইত্যাদি। তখনই আমরা তাঁহার উপস্থিতি জানিতে পারিতাম। কাজের সময় আমরা চেয়ার ছাড়িয়া তাঁহাকে সম্মান জানাইলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন।

প্রথম দর্শনে যে ভয় হইয়াছিল, কিছুদিন পরে তাহা কাটিয়া গেল। আচার্য্যদেব সুরসিক ছিলেন। অনেক সময়ে তিনি আমাকে বাঙ্গাল বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। একদিন আমি বলিয়া ফেলিলাম, "আপনার বাড়ী বিক্রমপুর, আমার বাড়ী খুলনা; আপনিই আমার অপেক্ষা বেশী বাঙ্গাল।" উত্তরে তিনি হাসিয়া বলেন,—"বাঙ্গাল কি জেলা দ্বারা ঠিক হয়? বাঙ্গালের গোঁ দ্বারা বাঙ্গাল ঠিক হয়। গোঁ তোমারই বেশী।"—তাঁহার কথা শুনিয়া আমিও খুব হাসিয়াছিলাম।

একবার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আচার্য্যদেবকে নিমন্ত্রণ করেন। আচার্য্যদেবের সহিত আমি বহরমপুর গিয়াছিলাম। আমাদের আহারের সময় মহারাজা নিজে উপস্থিত ছিলেন। প্রকাণ্ড রূপার থালায় ভাত এবং বাটটি রূপার বাটিতে নানাবিধ ব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্ন দেওয়া হয়।

দূরবর্ত্তী বাটিগুলি অবশ্য হাতের নাগালে ছিল না। আচার্য্যদেব খাইতে খাইতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি মনে করিলাম, তিনি বোধ হয় খাওয়া শেষ করিলেন। আমি কি করিব ইতস্ততঃ করিতেছি, এমন সময়ে দেখি তিনি দূর হইতে দুইটি বাটি লইয়া আসিয়া পুনরায় আসনে বসিলেন. মহারাজা অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন নিকটে ঠাকুর উপস্থিত ছিল, কিন্তু আচার্য্যদেব তাহাকে আদেশ না করিয়াই স্বয়ং বাটি আনিতে উঠিয়া যান।

আচার্য্যদেবের সহিত আমি দার্জ্জিলিং গিয়াছিলাম, তথায় 'গ্লেন ইডেনে' অবস্থানকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহই সন্ধ্যায় আচার্য্যদেবের সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তাঁহার স্বরচিত গান শুনাইতেন।

দিল্লীতে বোমা নিক্ষেপের অব্যবহিত পরে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলিকাতায় আসেন। তখন পুলিসের কড়াকড়ি ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিবার রাস্তা নিরাপদ নহে বিবেচনায় লাটভবনে আচার্য্যদেবের আবিষ্কৃত পরীক্ষাগুলি দেখাইবার ব্যবস্থা হয়। কথা হয় তথায় প্রবেশের পূর্ব্বে আমাদিগকে তল্লাসী করা হইবে। ইহাতে আচার্য্যদেব ঘোর আপত্তি করেন। অবশেষে এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী লেখেন, আমাদিগকে সান্ধ্য-পোষাকে যাইতে হইবে। আমি আপত্তি করিলাম, ও লাটভবনে যাইব না ঠিক করিলাম। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি কলেজে যাই নাই। বেলা ১১টার সময় আমার বাসায় আচার্য্যদেব গাড়ী পাঠাইয়া দেন এবং জানান তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীকে আমার আপত্তি জানাইয়াছিলেন এবং তিনি উত্তরে ভারতীয় পোষাকে আমি যাইতে পারিব লিখিয়াছেন। আমি তখন ধুতি পরিয়াই লাটভবনে গিয়াছিলাম।

বাল্যকালে আচার্য্যদেব গ্রামে ছিলেন। এইজন্য গ্রামীন প্রভাব তাঁহার মধ্যে বরাবর বর্ত্তমান ছিল। যদিও বহুদিন কলিকাতায় ও বিদেশে ছিলেন তথাপি তাঁহার কথায় পূর্ব্ববঙ্গের কথার টান ছিল। তিনি নৌকায় চড়িতে ও চালাইতে ভালবাসিতেন। ঘোড়ায় চড়ায়ও অভ্যস্ত ছিলেন। দার্জ্জিলিং যাইয়া প্রত্যহই ঘোড়ায় চড়িতেন। যাত্রাগান শুনিতে পছন্দ করিতেন। তাঁহার বেশভূষা সাদাসিদে ছিল। তিনি সর্ব্বদাই গলাবন্ধ কোট পরিতেন। বাড়ীতে সাধারণতঃ ধুতি-পাঞ্জাবী পরিতেন। আচার্য্যদেবের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ ছিল। স্যার পি. সি. লায়ন, আই-সি-এস যিনি ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বদেশী আন্দোলন দমন করিয়াছিলেন, তিনিই এডুকেশন সেক্রেটারীরূপে আচার্য্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যান।

তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করেন

এবং বার্ষিক সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহারই চেষ্টায় জমি সংগ্রহ হয় এবং আমাদের চাকুরীগুলি শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত হয়।

কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূরে গঙ্গাতীর, 'সিজবেড়িয়া বাংলো' লায়ন সাহেবই আচার্য্যদেবের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই স্থানটি অত্যন্ত মনোরম। আচার্য্যদেব প্রায় প্রত্যেক শনিবারই তথায় যাইতেন এবং সোমবার কলিকাতায় ফিরিতেন। আমাকেও সঙ্গে লইতেন, অনেক সময় তিনি কলিকাতা হইতে সিজবেড়িয়া নৌকায় যাইতেন। নৌকায় উঠিয়া নিজে একখানা দাঁড় ধরিতেন ও আমাকেও একখানা ধরিতে বলিতেন। দাঁড় টানায় তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। একদিন আমার একটু জ্বর হওয়ায় আমি দাঁড় টানিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি আমার কপালে হাত দিয়া বলেন, "Sportsman-এর আবার এই সামান্য জ্বরে কি হয়? দাঁড় ধর, এখনই সব ঠিক হইয়া যাইবে।" আমি লজ্জিত হইয়া তখনই দাঁড় ধরিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় সিজবেড়িয়া যাইয়া দেখি আমার জ্বর সারিয়া গিয়াছে।

নৌকায় তিনি অনেকপ্রকার গল্প করিতেন। খুব সহজভাবে কথাবার্ত্তা চলিত। তিনি কিরূপে পদার্থ বিজ্ঞান ছাড়িয়া ধাতু পদার্থ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন এবং পরে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে প্রবেশ করেন, বলিতেন।

বেলুড় মঠে তিনখানি নৌকা ছিল, তিনি তাহার একখানি সিজবেড়িয়ার জন্য চাহিয়া নেন। ঐ নৌকায় একটা মোটর লাগাইয়া আমি বেলুড় হইতে সিজবেড়িয়া লইয়া যাই। আচার্য্যদেব পূর্ব্বে ট্রেনেই তথায় গিয়াছিলেন। আমাদের ৪টায় সিজবেড়িয়া পৌঁছিবার কথা ছিল। নৌকায় জল প্রবেশ করায় পথে নৌকা মেরামত করিতে তিন ঘণ্টা বিলম্ব হয়। সিজবেড়িয়ায় সন্ধ্যা ৭টার সময় যাইয়া দেখি আচার্য্যদেব নদীর ঘাটে বসিয়া আছেন। আমাদের অপেক্ষায় তিনি ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার অপার স্নেহ অনুভব করিয়াছি এবং উহা আমার মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছিল। সিজবেড়িয়ায় একটি খাল আছে। নৌকাখানা ঐ খালে বাঁধা হইয়াছিল। আচার্য্যদেব, লেডী বসু Prof. Geddes উহাতে বেড়াইতেন। একবার সিজবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী কালদাপা গ্রামে যাত্রাগান হয়। গ্রামের জমিদার মহাশয় আসিয়া আচার্য্যদেবকে যাত্রা শুনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। আচার্য্যদেব আমাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা শুনিতে যান। পালা ছিল "প্রহ্লাদ চরিত্র।" আমরা যাইবার পূর্ব্বেই যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা যখন তথায় পৌঁছিলাম তখন বালক প্রহ্লাদ উচ্চস্বরে "হরি কোথায় তুমি" বলিয়া আকুলভাবে ডাকিতেছে। এই সময় আচার্য্যদেবকে দেখিয়া যাত্রাদলের অধিকারী দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠেন—"রে প্রহ্লাদ, তুই হরি হরি করিতেছিস্, তোর ডাকে সাড়া দিয়া স্বয়ং জগদীশ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" তখন আসরে করতালি পড়িয়া গেল। ফিরিবার পথে আচার্য্যদেব আমাকে বলেন যে, যাত্রাটা তাঁহার ভালই লাগিয়াছে। আমি বলিলাম, "অধিকারীর ভাষণটা খুব ভাল হইয়াছে।" সিজবেড়িয়ায় অনেকগুলি খেঁজুরগাছ ছিল। ইহার মধ্যে কতকগুলি ফরিদপুরের গাছের ন্যায় হেলানো অবস্থায় ছিল। ফরিদপুরের "Praying Palm" সম্বন্ধে যখন গবেষণা চলিতেছিল, আচার্য্যদেব আমাকে সিজবেড়িয়ার গাছের Record লইতে বলেন। দেখা গেল এইগুলিরও একই প্রকার গতি আছে। শুধু মাত্রায় তফাৎ। ফরিদপুরের গাছ তিন ফুট ওঠা-নামা করিত, সিজবেড়িয়ার গাছ মাত্র ২" করিত। কিন্তু আমাদের যন্ত্রের প্লেটের আয়তন ছিল ১০" লম্বা ৬" চওড়া, কাজেই ফরিদপুরের গাছের গতি যন্ত্রের সাহায্যে হ্রাস করিয়া ৬" করা হয়। সিজবেড়িয়ায় ২"কে তিন গুণ বর্দ্ধিত করিয়া ৬" করা হয়। ইহাতে উভয় স্থানেই একই প্রকার রেকর্ড পাওয়া যায়, কোনও পার্থক্য ছিল না।

Praying Palm সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখা হয় তাহাতে সিজবেড়িয়ার রেকর্ডও সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল।

শেষবার সিজবেড়িয়া হইতে নৌকায় কলিকাতা আসিবার সময় বিপদে পড়িয়াছিলাম। নৌকায় আচার্য্যদেব ও লেডী বসু ছিলেন। আমি পূর্ব্ব হইতে আচার্য্যদেবকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম বেলা দুইটায় জোয়ার আসিবে, আমরা তখন নৌকা খুলিব। কিন্তু দুইটার সময় আচার্য্যদেব বলেন যে, তাঁহার লেখাটা একটু বাকী আছে। তাঁহার লেখা শেষ করিতে চারিটা বাজিয়া যায়। আমরা যখন নৌকা খুলিলাম, তখন অর্দ্ধেক জোয়ার। আমরা নর্হী (বাটানগর) পর্য্যন্ত ভালই আসিলাম। কিন্তু পরে ভাঁটা আরম্ভ হইল। মাঝিরা প্রাণপণে দাঁড় টানিয়া দুই ঘণ্টায় মাত্র দুই মাইল অগ্রসর হইল। উহারা প্রস্তাব করিল যে, ঐ স্থানে নোঙর করিবে ও পরবর্ত্তী জোয়ারে কলিকাতায় রওয়ানা হইবে। আচার্য্যদেব রাজী হইলেন না; কলিকাতায় আহারের ব্যবস্থা ছিল এবং তাঁহার মোটরগাড়ী পূর্ব্বব্যবস্থা অনুযায়ী চাঁদপালঘাটে বিকাল ৫টা হইতে অপেক্ষা করিতেছিল। নৌকা তখন মাঝিদের অগ্রসর হইবার চেষ্টা সত্ত্বেও ভাঁটার টানে পিছনের দিকে চলিতে লাগিল। এই সময় আকাশে মেঘ দেখা গেল, কিছু পরে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আচার্য্যদেব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, বিশেষতঃ লেডী বসুর জন্য। আমাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন কি করা যায়। বাতাস মুখর ছিল। আমি প্রস্তাব করিলাম নৌকা ঘুরাইয়া সিজবেড়িয়া ফিরিয়া যাই। বাতাসের সাহায্যে হয় ত পথে বজবজে কলিকাতা-গামী শেষ ট্রেণও পাইতে পারি। উহা রাত্রি ১০টায় ছাড়িত। আচার্যদেব তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন। বজবজ ঘাটে যখন নৌকা লাগিল তখন ট্রেণ ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা বাজিল। আমি নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিলাম। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। পিছনে পায়ের শব্দ পাইয়া ফিরিয়া দেখি আচার্যদেব ছাতা হাতে আসিতেছেন। তিনি চেঁচাইয়া বলিলেন—"নরেন বৃষ্টিতে ভিজিও না, ছাতাটা লও।" আমাকে ছাতা দিয়া নিজে অবশ্য ভিজিয়া নৌকায় ফিরিতেন। এই ব্যাপারে আমার মানসিক অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি বিব্রত বোধ করিলাম এবং বাহ্যতঃ বিরক্তভাবে বলিলাম—"আপনি যে কি করেন; নৌকায় ফিরিয়া যান।" তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া নৌকায় ফিরিয়া গেলেন। আমি ষ্টেশনে যাইয়াই দুইখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিলাম এবং ষ্টেশনমাষ্টারকে ট্রেণ দশ মিনিট বিলম্ব করাইতে অনুরোধ করিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে আচার্যদেব ও লেডী বসুকে নৌকা হইতে আনিয়া ট্রেণে উঠাইয়া দিলাম এবং বজবজ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যাইয়া মিঃ এস্ এম্ বোসকে ফোনে ব্যাপার জানাইলাম ও মোটরগাড়ীখানি চাঁদপাল ঘাট হইতে বেলেঘাটা ষ্টেশনে পাঠাইতে বলিলাম। বাড়ী পৌঁছিয়া নিজের গাড়ীতে আমাকে বাসায় পাঠাইয়া দেন। তখন রাত্রি ১২টা।

এইস্থলে আচার্যদেবের সহধর্মিণী লেডী অবলা বসুর কথা কিছু না বলিলে এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই মহীয়সী মহিলা অত্যন্ত স্নেহশীলা ও কর্তব্যপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার সহযোগিতা না পাইলে আচার্যদেবের গবেষণা সম্ভবপর হইত না। ঘরে বাহিরে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন। কাজের চাপে আমাদের আহারে বিলম্ব হইলে তিনি নিজে খাবার লইয়া গবেষণাগারে আসিতেন। তাঁহার নিকট হইতে মাতৃস্নেহ পাইয়াছিলাম। তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

নর-নারীর কথা

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

তোমাকে কি দেব আমি? কয়েকটি মুহূর্ত শুধু
স্বপ্ন গাঁথা গাঁথা,
নীলাভ চেতনা কটি! মৃত্যু আর মনের প্রমত্তা
সেও তো তোমারই দান—মেঘ-ঝরা আষাঢ়ের জল
আমার লবণে জাত—তোমারই সন্ধ্যার সামগাথা,
দূর হৃদয়ের কাজ; যে হৃদয় আমার উচ্চাশা।
ঋতুর আরোগ্য-স্নানে অম্লান অরণ্য ঝলমল
আমাকে কেন যে তুমি এত দিলে—এতটা আকাশ
এ গাঢ় সমুদ্র-স্বাদ—উদ্দীপিত বর্ণের পিপাসা!
যন্ত্রণার বিনিময়ে একি তীক্ষ্ণ স্বপ্নের বিশ্বাস
আমার দুহাতে দিলে—মুক্তি দিলে মুহূর্তের ঘরে!
যত ভাবি—নিজেকে ততই যেন মনে হয় ঋণী;
নিয়েছি কেবলমাত্র, কিছুই তো তোমাকে দেই নি।

তোমাকে ছাড়িয়ে তবু যেতে হবে অনাগত ঝড়ে
দূর সমুদ্রের দিকে। ঋণ শোধ হবে না হবে না।
আমার আকাঙ্ক্ষা আরো। তুমি সেই আকাঙ্ক্ষার দিকে
আমারে দিয়েছ মুক্তি—অতএব তোমার এ দেনা
অসহ্য আমার রক্তে আরো দূর বাণিজ্যবিলাস!
তুমি তো তৃপ্তির খুদ ফেলে ফেলে হৃদয়ের হীরামনটিকে
শেখালে সুলভ কটি বাঁধা বুলি,—মুগ্ধ বারোমাস
শান্তিতে থাকবে তুমি সময়ের মণি-কুট্টিমে
শিল্পের স্বধর্মে বৃত: সে শিল্প তোমার শিশু, ঘর;
সংসারের বাঁধা ঘাটে রোজ রোজ ভাসাবে কলস।
যন্ত্রণা এখন স্নিগ্ধ মৌন আলো—মাটির পিদ্দীমে।

আমার তো তা নয় সখি—এ আকাশে ঝড়
অনির্বাণ! তবু এ ঝড়ের মধ্যে মৃত্যুর সাহস
আমাকে নিতেই হবে; আমাকে ডেকেছে দূর
সমুদ্রের ঢেউ,
আমারে ডেকেছে বড় বন্দরের আলোর চারণ।
এখানে একক আমি;—পাড়া পড়শী কোথাও যে কেউ
বলবে দুদণ্ড কথা—কেউ নেই—আছে এক
অন্তহীন অভিজাত মন॥

কালিদাস সাহিত্যে 'দৈব'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাটকগুলি পড়িবার পর তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সম্বন্ধে যে কয়েকটি ধারণা পাঠকের মনে আসা স্বাভাবিক, দৈবের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে একটি। তিনি যে মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, দৈবের প্রভাব অলক্ষ্যে থাকিয়া মানুষের জীবনের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মানুষ যতই কর্ম্মনিপুণ হউন না কেন, তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি এক অদৃশ্য শক্তি দ্বারা যেন পূর্ব্ব হইতে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে পরিকল্পিত থাকে এবং যে-সমস্ত ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক বলিয়া মনে হয়, তাহাদের কোনটিই আকস্মিক নহে, প্রত্যেক ঘটনার যে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ করা না গেলেও রহিয়াছে ইহাই তিনি বার বার দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুরুষকারকে যদিও তিনি কোথাও ক্ষুণ্ণ করেন নাই তবু তিনি দেখাইতেই চাহিয়াছেন যে, মানুষ যে ক্ষেত্রে তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারে না দৈবশক্তির বলে ও সাহায্যে সে কাজ সে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারে।

'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গল্প যিনি পড়িয়াছেন তিনি জানেন যে, দুষ্যন্ত ছিলেন এক প্রকাণ্ড রাজ্যের প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা, প্রাসাদের নানা ভোগবিলাসে জীবন যাপন করিতেন, আর শকুন্তলা ছিলেন এক মহর্ষির পালিতা কন্যা, মুনির শান্তিপূর্ণ তপোবনে তাঁহার সংযত জীবনে ভোগ বিলাসের নামগন্ধ ছিল না। এই দুই বিসদৃশ জীবনপথের যাত্রী ও যাত্রিনীর মধ্যে যে কোনও দিন বিবাহ হইতে পারে এ কল্পনা কি কেহ কোনও দিন করিতে পারিয়াছিল? কিন্তু একদিন তাঁহাদেরও জীবন-সূত্র একত্রে গ্রথিত হইয়া গেল। এ ব্যাপার যে কিরূপে ঘটিল মহাকবি সে ঘটনাস্রোত বর্ণনা করার সময় দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, এ বিবাহ যেন দৈবের নির্দ্দেশে পূর্ব্ব হইতে পরিকল্পিত ছিল, ইহা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। বিবরণটি তিনি এইভাবে দিয়াছেন :

রাজা দুষ্যন্ত গিয়াছেন বনে মৃগয়া করিতে। একদিন যখন তিনি মহামুনি কণ্বের তপোবনের নিকট এক মৃগকে বধ করবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তপস্বীরা সেটি আশ্রমমৃগ বলিয়া বধ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে মহর্ষির আশ্রমে খানিক বিশ্রাম লইতে বলেন ও আশীর্ব্বাদ করেন, 'আপনার পুত্র লাভ হউক।' আশ্রমের দিকে যাইতে যাইতে দুষ্যন্ত যখন তপোবনের সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন সহসা তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। পুরুষের দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন যে দৈবের ইঙ্গিত—দৈব যেন ইঙ্গিতে জানাইয়া দিতে চাহিতেছেন যে, এক সুন্দরী নারীর সহিত তাঁহার মিলন ঘটিবার সম্ভাবনা আসিতেছে, দুষ্যন্ত এ কথা মানিতেন, সুতরাং তাঁহার দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন হওয়া মাত্র তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'এ শান্তিপূর্ণ মুনির আশ্রমে স্ত্রীলোকের সহিত মিলনের সম্ভাবনা, এ আবার হইতে পারে নাকি।' শেষে ভাবিলেন, 'ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র'—ভবিতব্যতার দ্বার সকল স্থানে উন্মুক্ত। মনকে যেন তিনি বুঝাইতে চাহিলেন, কোনও নারীর সহিত তাঁহার মিলন হয়, ইহাই যদি দৈবের নির্দ্দেশ, তাহা হইলে এখন যতই উহা অসম্ভব বলিয়া মনে হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত কোনও না কোনও উপায়ে তাহা সঙ্ঘটিত হইবেই। যেন দৈবের বিধান যে অলঙ্ঘনীয় ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। এইত গেল দুষ্যন্তের দিক, ঠিক সেইদিন সকাল বেলা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে তাঁহাদের মাধবীলতায় ফুল ফুটিতে দেখিয়া শকুন্তলার এক প্রিয়সখী প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে শুনাইয়া বলিতেছেন যে, সম্মুখের ঐ মাধবীলতার অসময়ে ফুল ফোটা শকুন্তলার পক্ষে অতি শুভ লক্ষণ, তাঁহার বিবাহের দিন সন্নিকট। ইহা যে প্রিয়ংবদার রহস্য তাহা নহে, তিনি বাস্তবিকই মহর্ষি কণ্বকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে, মাধবীলতার যে দিন ফুল ফুটিবে সেইদিন বুঝিতে হইবে যে, শকুন্তলার শুভ বিবাহের দিন আসিতে আর বিলম্ব নাই।

মহাকবি যেন স্পষ্টভাবে জানাইতে চাহিলেন যে, দুষ্যন্তের দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন ও মাধবীলতার অকালে পুষ্পোদ্গম—দুইটিই যেন দৈবের ঘোষণা দৈব যেন নীরব ভাষায় জানাইয়া দিতে চাহিতেছেন যে, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিবাহ আসন্ন, এ মিলন যেন আকস্মিক ঘটনা নয়, দৈবের নির্দ্ধারিত বিধি, সফল না হইয়া যায় না। হইলও তাই, গোপনে তপোবনের লতাকুঞ্জের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিধানে সখীদের সমক্ষে দুষ্যন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহ হইয়া গেল।

আশ্রমে তখন মহর্ষি কণ্ব ছিলেন না, শকুন্তলার 'বিরূপ দৈবকে' প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে ক্রিয়াকর্ম্মের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি গিয়াছিলেন সোমতীর্থে। মহামুনি যে কখন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, শকুন্তলার দৈব বিরূপ হইয়া রহিয়াছে, যাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে তাঁহার কন্যার জীবন বিষময় হইয়া উঠিবে, বলা যায় না, তবে তাঁহার ক্রিয়াকর্ম্ম আরম্ভ করিতে যে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়, যখন দেখা যায় যে, তাঁহার ক্রিয়াকর্ম্ম শেষ হওয়ার পূর্ব্বে 'বিরূপ দৈব' শকুন্তলার জীবনে দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতের রূপ ধরিয়া দেখা দিল এবং তাঁহার সে অমঙ্গল বাণীর

প্রভাবে দুষ্মন্তের মন হইতে শকুন্তলার সমস্ত কথা, সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া গেল, তাঁহাকে যখন রাজসভায় রাজার সম্মুখে লইয়া আসা হইল দুষ্মন্ত তাঁহাকে কিছুতেই চিনিতে পারিলেন না, শকুন্তলার কোনও কথা তাঁহার মনে পড়িল না।

দৈবের নিষ্ঠুরতার আর একটি বড় উদাহরণ শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের দেওয়া আংটি হারাণোর ব্যাপার। তপোবন হইতে পতিগৃহে যাত্রা করবার সময় শকুন্তলা যখন সজলনয়নে প্রিয় সখীদের নিকট বিদায় লইতেছিলেন, তাঁহারা সে সময় দুর্বাসার অভিসম্পাত স্মরণ করিয়া তাঁহাকে গোপনে বলিলেন, 'রাজা যদি তোকে চিনতে না পারেন ঐ আংটিটা তাঁহাকে দেখাইয়া দিস।'

রাজা যদি তাঁহাকে চিনিতে না পারেন! নিশ্চয়ই এ কথা শুনিয়া ভীতবিহ্বলা শকুন্তলা কম্পিতবক্ষে খুব সাবধানে আংটিটি রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হাতে নিজের নাম-লেখা আংটি দেখিতে পাইলে পাছে দুষ্মন্ত তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেন, দুর্বাসার অভিসম্পাত ব্যর্থ হইয়া যায় তাই দৈবের বিড়ম্বনা যেন তাঁহার সকল সাবধানতাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া অদৃশ্য হস্তে শচীতীর্থে প্রণাম করার সময় শকুন্তলার অজ্ঞাতে তাঁহার হাত হইতে আংটিটি খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল।

কিন্তু মহর্ষি কণ্বের শকুন্তলার বিরূপ দৈবকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নাই, যেন তাহাই দেখাইবার জন্ম মহাকবি মৎস্যের উদর হইতে হারাণ আংটি ফিরিয়া পাওয়ার প্রসঙ্গ আনিলেন। বিরূপ দৈব শেষে প্রসন্ন হইয়া শকুন্তলার জীবনের সকল বিড়ম্বনার সাঙ্গ করবার পথ প্রস্তুত করিয়া দিল, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উপায়ে নাম-লেখা আংটি আবার দুষ্মন্তের হাতে ফিরিয়া আসিল, তিনি শকুন্তলার সমস্ত স্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন।

শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের চিনিতে না পারার মধ্যে যেমন দৈবের শক্তিই প্রকৃত নিয়ন্তা, তেমনি আবার বহুকাল পরে শকুন্তলার দেখা পাওয়া এবং তাঁহাকে ফিরিয়া পাওয়াও যে দৈবের কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয় মহাকবি সে কথাও নাটকের সপ্তম অঙ্কে ভালভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুষ্মন্ত আসিতেছিলেন হিমালয় পর্ব্বতের উপর দিয়া, মহর্ষি মারীচের আশ্রম সন্নিকটে শুনিয়া তিনি রথ হইতে নামিয়া মহামুনিকে ভক্তি নিবেদন করবার জন্ম তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে দেখিলেন একটি বেশ সুদর্শন বালক এক সিংহশাবকের কেশর ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। এমন দুষ্টামি করিতে তাহাকে নিষেধ করিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল যে বালকের বাহু হইতে তাহার কবচটি খুলিয়া গিয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল। যেমন রাজা কবচটি হাত দিয়া তুলিয়া লইতে গেলেন যে দুইজন তাপসী তখন বালকের নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাকে দৌড়াত্ম্য করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, তাঁহারা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, রাজাকে সে কবচ স্পর্শ করিতে মানা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুষ্মন্ত ক্ষত্রিয় রাজা কাহারও নিষেধ-বাণীতে কর্ণপাত করা তাঁহার স্বভাব নয়, তাপসীদের বাধা না মানিয়া তিনি কবচটি তুলিয়া লইলেন। তার পর তাপসীদেরকে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন আপনারা আমাকে এ কবচটা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছেন।'

তাঁহারা উত্তর দিলেন, "বালকের পিতা বা মাতা ছাড়া অন্ত যে কেহ উহা স্পর্শ করে কবচটি অমনি সাপ হইয়া গিয়া তাহাকে কামড়ায়।" তাঁহারা আরও বলিলেন রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে যে, এরূপ ব্যাপার তাঁহারা তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে কয়েকবার ঘটিতে দেখিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, দুষ্মন্ত যে বালকটির পিতা দৈব যেন সে কথা আপনা হইতে সকলকে জানাইয়া দিয়া শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলনের ক্ষেত্র করিয়া রাখিলেন। তার পর যখন জানা গেল যে, বালকের মাতা শকুন্তলা, তখন মিলনের আর কোন বাধা রহিল না।

'কুমার-সম্ভব' কাব্যেও মহাকবি দৈবশক্তিরই প্রাধান্ত দেখাইয়াছেন। প্রথমে অসুররাজ তারকের কথা ধরা যাউক, প্রথম জীবনে তারক কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে অতুলনীয় রূপে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দেবতাদিগকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। অসুররাজের এই শক্তি—যে শক্তির বলে তিনি দেবতাদিগকেও পরাজিত করিয়া ত্রিভুবনের মধ্যে অজেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, মহাকবি দেখাইলেন উহা দৈবের দেওয়া শক্তি, ব্রহ্মার বরে লাভ করা।

তার পর দেবতারা যখন বহু চেষ্টা করিয়াও অসুররাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কবল হইতে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিতে পারিলেন না, সকলে তখন নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা—তাঁহাদের উপর অসুরের অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন, তিনি যেন কৃপা করিয়া এমন এক সেনাপতি সৃষ্টি করেন যিনি তারকাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বর্গ উদ্ধার করিয়া দিতে পারিবেন। মহাকবি এখানে সুস্পষ্টরূপে দেখাইলেন যে, পুরুষকারের সাহায্যে যখন কোনও অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারা যায় না তখন দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তা' তিনি মানুষই হউন বা দেবতাই হউন।

প্রেমের ঠাকুর মদনের যেটুকু জীবনকাহিনী 'কুমার-সম্ভবে' পাওয়া যায়, তাহা লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মহাকবি সেটুকুরও বর্ণনা দিতে গিয়া দৈবের শক্তি যে কি অপরাজেয় তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। একবার কোনও কারণে রতিপতির ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দেন, 'তুমি ভস্ম হইয়া যাইবে'। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তপস্যারত শিবের মনে গৌরীকে বিবাহ করবার অভিলাষ উৎপাদনের চেষ্টা করিতে গিয়া তাঁহার নয়নবহ্নিতে ভস্ম হইয়া যাওয়া মদনের ছিল যেন অপরিহার্য্য বিধিলিপি, এ শোচনীয় পরিণামের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য তিনি দেবতা হইলেও তাঁহার ছিল না। এখানে ব্রহ্মার অভি-

সম্পাতের প্রসঙ্গ আনয়ন করিয়া মহাকবি যেন জানাইতে চাহিলেন, মদন যে স্বেচ্ছায় মহেশ্বরের উপর সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিতে গিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার বিধিলিপি তাঁহাকে দিয়া এ কাজ করাইয়া লইয়াছিল।

'কুমার-সম্ভবের' শ্রেষ্ঠ ঘটনা শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ। দৈব-নির্দ্দেশের অদৃশ্য হস্ত সমস্ত ঘটনাগুলিকে যে কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল, মহাকবি এখানে পরিষ্কার ভাবে তাহা দেখাইলেন। দেবতারা যখন অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন, লোক পিতামহ তখন তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, চুম্বকের দ্বারা যেমন লৌহ আকৃষ্ট হয় উমার রূপের দ্বারা শিবের ধ্যান ধারণায় নিশ্চল মনকে সেইভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। শিব পার্ব্বতীকে বিবাহ করেন ইহাই ছিল ব্রহ্মার ইচ্ছা তাই তিনি জানাইয়া দিলেন যে, এ বিবাহের যিনি পুত্র হইবেন একমাত্র তিনিই অসুররাজ তারককে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতে পারিবেন।

শিব করিতেন তপস্যা। হিমালয়ের এক নিভৃতস্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তিনি ধ্যান ও সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন, বিবাহ করার কোনও ইচ্ছা তাঁহার ছিল না, তবু দৈবের নির্দ্দেশে, দৈব-ঘটনার পরম্পরায় মহাযোগীশ্বরকেও পত্নী গ্রহণ করিতে হইল, মহাকবি যেন দেখাইতে চাহিলেন যে, স্বয়ং বিধাতাও স্বরচিত বিধান লঙ্ঘন করিতে পারেন না।

'রঘুবংশ' লইয়া আলোচনা করিলেও এই একই ভাবের পরিপুষ্টি দেখা যায়। সূর্য্যবংশের রাজা দিলীপ গুটিকয়েক মহিষীর স্বামী হইয়াও ছিলেন নিঃসন্তান, কিন্তু কেন? মহাকবি এ কেনর উত্তরে দৈবের প্রভাবকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। দিলীপের যে সন্তান হয় নাই, তাহার কারণ মহাকবি বলেন, 'স্বর্গের কামধেনু সুরভির অভিসম্পাত।'

একদিন সুরভি যে পথের ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই পথ দিয়া তখন রাজা দিলীপ পত্নীর কথা ভাবিতে ভাবিতে এমন অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিলেন, যে সুরভিকে দেখিয়াও দেখেন নাই, অভিবাদনও করেন নাই। রাজার ব্যবহারে গোমাতা নিজেকে অপমানিতা মনে করিয়া তাঁহাকে শাপ দেন, 'আমার সন্তানের সেবা না করিলে তোমার সন্তান হইবে না।' রাজা এ শাপ শুনিতে পান নাই, তথাপি এ শাপের ফলে তিনি নিঃসন্তান রহিয়া গেলেন। তার পর এ ঘটনার বহুকাল পরে গুরুদেব বশিষ্ঠের পরামর্শে কামধেনু সুরভির কন্যা নন্দিনীকে সেবা ও যত্নে তুষ্ট করিয়া তাহার বরে পুত্র লাভ করিলেন। মহাকবি স্পষ্টভাবে দেখাইলেন যে, দিলীপ রাজার সন্তান না হওয়া ও হওয়া—এ দুইয়ের একমাত্র কারণ দৈবের অদৃশ্য প্রভাব—দৈবশক্তিসম্পন্ন প্রাণীর 'শাপ' ও 'বর'।

সূর্য্যবংশের আর একজন রাজা অজ—তাঁহার জীবনীতেও দৈব ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অজের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা তাঁহার পত্নী ইন্দুমতীর অকাল মৃত্যু। মহাকবি ইন্দুমতীর এ অস্বাভাবিক মৃত্যু—যে কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের পরিণাম ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তিনি বলেন, ইন্দুমতী ছিলেন পূর্ব্বজন্মে স্বর্গের এক অপ্সরা, কোন এক মুনির কঠোর তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে থাকায় মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ দেন, 'তুই পৃথিবীতে গিয়া মানবী হইয়া থাক।'

তার পর শাপের আঘাতের দুঃখে ভাঙিয়া পড়িয়া অপ্সরা কাতর ভাবে মুনিকে অনুনয়-বিনয় করায় মুনি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলেন, 'যদি কোনও দিন স্বর্গের কোনও পুষ্প তোমার চোখে পড়ে, তবেই আবার তুমি তোমার অপ্সরা রূপ ফিরিয়া পাইবে।'

এই ঘটনার পর অপ্সরা পৃথিবীতে গিয়া ভোজরাজের ঘরে তাঁহার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, যথা সময় রাজকুমার অজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। কিছুকাল পরে একদিন অজ ও ইন্দুমতী তাঁহাদের প্রমোদ-উদ্যানে এক শিলার আসনে বসিয়া গল্পে মাতিয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদ সে সময় আকাশ-পথ দিয়া দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে গোকর্ণ তীর্থে যাইতে যাইতে যেমন সেই স্থানটির উপর আসিয়া পড়িলেন, সহসা বায়ু জোরে বহিয়া উঠায় দেবর্ষির বীণায় স্বর্গের পুষ্পের যে মালাগাছটি পরান ছিল সেটি খসিয়া গিয়া নীচে ইন্দুমতীর বক্ষের উপর পড়িয়া গেল। চমকিতা হইয়া মহারাণী যেমন সেই মালাটির দিকে চাহিয়াছেন, 'রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের' মত তিনি জ্ঞানহারা হইয়া ভূমির উপর পড়িয়া গেলেন, শত চেষ্টাতেও তাঁহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনা গেল না, ইহলোক ছাড়িয়া তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন। ইন্দুমতীর এই মৃত্যু—পুষ্পের আঘাতে মৃত্যু, ইহা কি স্বাভাবিক ঘটনা? অজের কথায় বলিলে বলিতে হয়:

> 'কুসুমস্যাপি গাত্রসঙ্গমাৎ
> প্রভবন্ত্যায়ুরপোহিতুং যদি।
> ন ভবিষ্যতি হন্ত সাধনং
> কিমিবান্যৎ প্রহরিষ্যতো বিধেঃ॥ (রঘু-৮।৪৪)।

পুষ্পের মত অত কোমল বস্তুও যদি দেহ স্পর্শ করিলে মানুষের মৃত্যু হয়, তবে বিধাতা বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইলে কি দিয়া না সংহার করিতে পারেন!

যে ভাবে মহাকবি ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, দৈবের পরিকল্পনা অনুসারে স্বর্গের পুষ্প ইন্দুমতীর চোখে যেন পড়িল ও উহা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গেল, এত বড় অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যেও আকস্মিক বলিয়া কিছুই নাই। মহারাজ অজের পুত্র দশরথের বয়স যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল, অথচ তাঁহার পুত্র হইল না, তখন মহাকবি বলিতেছেন, 'অতিষ্ঠৎ প্রত্যয়াপেক্ষ সন্ততিঃ স চিরং নৃপঃ'—দশরথ বুঝিলেন যে, তাঁহার সন্তানোৎপত্তি অপর কারণের উপর নির্ভর করিতেছে। অপর কারণটি যে কি তাহা অবশ্য মহাকবি স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও বুঝা যাইতেছে যে, উহা দৈবের কৃপা, কারণ দশরথ দৈবের তুষ্টিসাধন করিয়া দৈবের কৃপায় পুত্রলাভ করার আশায় ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি ঋষিদিগকে আনাইয়া 'পুত্রযজ্ঞ' আরম্ভ করিয়াদিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের শুভজন্মের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি দৈবের ইঙ্গিতের একটি সুন্দর ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি

বলিতেছেন যে, যে মুহূর্ত্তে শ্রীরাম ভূমিষ্ঠ হইলেন চারিদিকে যেন একটা সুখশান্তি ও মঙ্গলের আবহাওয়া দেখা দিল, কিন্তু রাক্ষস-রাজ রাবণের বেলা ব্যাপারটি অন্যরূপ হইল। কি হইল? তিনি বলিতেছেন, 'সেই মুহূর্ত্তে রাবণের মুকুটগুলি হইতে মণি খসিয়া ভূমির উপরে পড়িয়া গেল, দেখিয়া মনে হইল যেন, রাক্ষসরাজ-লক্ষ্মীর নয়ন হইতে কয়েক ফোটা অশ্রু বুঝি মণিগুলির রূপ ধরিয়া ঝরিয়া পড়িল।

মহাকবি এখানে বলিতে চাহিতেছেন যে, রাবণের রাজলক্ষ্মী এতকাল ধরিয়া তাঁহার গৃহে বাস করার পর তাঁহার সৌভাগ্য-রবি অস্তাচলে চলিয়া পড়িলেন দেখিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিয়া লইলেন'।

'কুমার সম্ভবের' মত 'রঘুবংশে'ও দেখা যায়, দেবতারা রাক্ষস-রাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া সকলে মিলিয়া নারায়ণের কাছে গিয়া প্রার্থনা করিলেন, তিনি যেন কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে এ মহাবিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দেন। দেবতারাও যেন কার্য্যোদ্ধার করিতে হইলে দৈবশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া পারেন না, যেন দেবতাদেরও পুরুষকার যথেষ্ট নয়, দৈবশক্তির সাহায্য ব্যতীত কেবল পুরুষকারের সহায়তায় সফলতা লাভ করার শক্তি দেবতাদেরও সকল সময় থাকে না।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের প্রারম্ভে যদিও মহাকবি প্রতিষ্ঠানপুরের তরুণ রাজা পুরূরবাকে দিয়া বাহুবলের সাহায্যে কেশীদৈত্য ও তাহার অনুচরদিগকে পরাজিত করাইয়া তাহাদের কবল হইতে অপ্সরা উর্ব্বশী ও চিত্রলেখাকে উদ্ধার করাইয়া পুরুষকারের জয়গান করিয়াছেন, তবু তাহার পরের ঘটনাগুলি বিশেষতঃ উর্ব্বশীর লতায় রূপান্তরিত হইয়া যাওয়া এবং পূর্ব্ব রূপ আবার ফিরিয়া পাওয়ার বিবরণ এমন ভাবে দিয়াছেন যে, পড়িলে মনে হয় যেন দৈবের যে কি অদ্ভুত শক্তি তাহা তিনি স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিতে চাহেন।

দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের উদ্যান 'কুমার বনে' নারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, কেবল যে নিষিদ্ধ ছিল তাহা নহে তাঁহার নির্দ্দেশ ছিল, যদি কোনও নারী প্রবেশ করে সে তৎক্ষণাৎ লতায় পরিণতা হইয়া যাইবে; উর্ব্বশীর এ নিয়ম ভালভাবে জানা ছিল, কিন্তু একদিন যখন তিনি তাঁহার প্রণয়ী রাজা পুরূরবার উপর অভিমান করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে 'কুমার-বনের' নিকট আসিয়া পড়িলেন, সে কথা তাঁহার মনে পড়িল না, যেমন তিনি সে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন অমনি লতায় রূপান্তরিতা হইয়া গেলেন। জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে অমন জানা-কথা মনে পড়িল না কেন? মহাকবি বলিতেছেন, তাহার কারণ তাঁহার নাট্যগুরু ভরতমুনির অভিসম্পাত। একবার স্বর্গে দেবতাদের সভায় এক নাটকের অভিনয় করিতে করিতে উর্ব্বশী অন্যমনস্কতা বশতঃ একটি ভুল করিয়া ফেলায় মুনি তাঁহাকে শাপ দেন, 'তোর দিব্যজ্ঞান লোপ পাউক'। গুরুর এ অভিসম্পাত অপ্সরার স্মৃতির দ্বারে অর্গল হইয়া রহিল, জানা-কথা তাই মনের অবচেতন কোণে রুদ্ধ থাকিয়া গেল চেতনার অংশে আসিবার শক্তি রহিল না। দৈবের নির্বন্ধই জয়ী হইল।

লতায় রূপান্তরিতা উর্ব্বশীর আবার পূর্ব্ব রূপ ফিরিয়া পাওয়ার ব্যাপারেও মহাকবি দৈবশক্তির প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। উর্ব্বশী যখন লতায় পরিণতা হইয়া গেলেন ও তাঁহার বিচ্ছেদের শোকে তাঁহার প্রিয়তম পুরূরবা বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, উর্ব্বশীর অপ্সরা সখীরা উদ্বিগ্ন হইয়া একদিন সকলে সূর্য্যমন্দিরে গিয়া উর্ব্বশী ও পুরূরবার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া আসিলেন। সমবেত প্রার্থনার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না, সেই দিনই পুরূরবা যখন উন্মাদের মত কখনও হাসিয়া, কখনও কাঁদিয়া কখনও বা রাগিয়া উঠিয়া পথ চলিতেছিলেন সহসা সম্মুখে দেখিলেন একটা অতি উজ্জ্বল মণি পথের উপর পড়িয়া রহিয়াছে এবং ঠিক সেই সময় কে যেন অলক্ষিতে আসিয়া তাঁহার কানে কানে বলিয়া গেল, 'মণিটা তুলে নাও, ওটি 'সঙ্গমনীয় মণি', তোমার প্রিয়াকে ফিরিয়া পাইবে।

খানিক ইতস্ততঃ করিয়া পুরূরবা শেষে মণিটি তুলিয়া লইয়া প্রতিদিনের মত সেদিনও যেমন লতাটিকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, 'সঙ্গমনীয় মণি'র স্পর্শে ও প্রভাবে উর্ব্বশী তাঁহার পূর্ব্ব রূপ ফিরিয়া পাইলেন। দৈবশক্তির জয় হইল, পুরূরবারও বিকৃতমস্তিষ্ক আবার স্বাভাবিক হইয়া গেল।

'মালবিকাগ্নি মিত্র' নাটকখানি যদিও কোন পৌরাণিক গল্প লইয়া রচিত নয়, সামাজিক নাটক তথাপি মহাকবি নায়িকা মাল-বিকার বাস্তব জীবনেও দৈবশক্তির প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। মালবিকা ছিলেন রাজকন্যা, বাল্যকালে যখন তিনি একটা মেলায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন, এক সন্ন্যাসী তাঁহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এ বালিকার কালে সুযোগ্য পতির সহিত বিবাহ হইবে, তবে মধ্যে কিছুকাল তাঁহার অদৃষ্টে দুঃখ আছে। কোনও এক রাজ-পরিবারে তাঁহাকে এক বৎসর পরিচারিকার মত থাকিতে হইবে।

গণকঠাকুরের এ বাণী আশ্চর্য রূপে ফলিয়া গিয়াছিল। মাল-বিকার ভ্রাতা মাধব সেন বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্রের সহিত ভগিনীর বিবাহ দেবেন বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বিদিশায় আসিতে-ছিলেন, পথে একদল শত্রুসৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, উভয়পক্ষে মারামারি চলিতে থাকার সময় মালবিকা সুযোগ পাইয়া সকলের অলক্ষ্যে সে স্থান হইতে পলাইয়া গিয়া পথে একদল বণিকের সাক্ষাৎ পান, এবং তাহাদের সাহায্যে যে বিদিশার রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়ার কথা ছিল দৈবের নির্ব্বন্ধে তাঁহারই প্রাসাদে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার পাটরাণী ধারিনীর পরিচারিকা হইয়া রহিয়া গেলেন। তার পর এইভাবে এক বৎসর কাটিয়া যাওয়ার পর মহারাণী যখন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলেন, স্বয়ং উদ্যোক্তী হইয়া স্বামী অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার বিবাহ দেওয়াইলেন।

সাধু-সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী যে হুবহু ফলিয়া গেল, ইহা হইতে মহাকবির দৈবের উপর যে কি অগাধ বিশ্বাস ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না!

অলস মায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

মার্গারেট বললে,—"বাবাঃ, পিসীকে মা যা ভয় করে, শনিবার ঠিক তার জন্যে মুর্গীর মাংস রান্না হবে।"

—"তুমি বুঝি তাকে ভয় কর না?" কুমার হাসল।

—"রক্ষে কর।" মার্গারেট বললে,—"আমি ওকে দু' চক্ষে দেখতে পারি না। কিন্তু কি করব, মায়ের ভয়ে কথাটি কইতে পারি না। ননদকে ভয় করা ভাল বটে, তা বলে অত?"

—"কি রকম দেখতে তোমার ওই মায়ের ননদকে?"

—"বিশ্রী কালো।"

—"তোমার ড্যাডির মত?"

—"কি করে জানব? তাকে ত আমি দেখি নি।"

—"দেখ নি, অথচ মনে হয়, তুমি তাকে পছন্দ কর।"

"সে ত করিই, ভীষণ পছন্দ করি। আমার কেবল মনে হয়—সে এলে আমাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। সপ্তাহের মধ্যে অর্ধেক দিন শুধু রুটি খেয়ে থাকতে হবে না। সে শুধু মায়ের মুখেই হাসি দেবে না, আমাদেরও একটু আনন্দ দেবে। অনেকদিন পরে আমরা আর পাঁচটি ছেলেমেয়ের মত নিজেদের ভরা সংসারে হৈ হৈ করব। ছোটদের সঙ্গ নাকি তার ভাল লাগে শুনেছি মায়ের কাছে। তার কথা ভাবতে আমার ভাল লাগে। তবু যদিও এখনও তাকে দেখি নি।"

—"কেন—সেই কথাই ত জিজ্ঞেস করছি।"

—"কারণ, আমাদের গ্রামের বাড়ীতে রেখে, মা লণ্ডনে এসে বিয়ে করে সোজা চলে যান ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। সেখানে বছরখানেক থেকে ছোট্ট টুপসীকে নিয়ে ফিরে এল একা।"

—"কেন?" কুমার বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

—"কারণ।" মার্গারেট ঢোঁক গিলে ভয়ে ভয়ে তাকায়, "কারণ কি জান? কারণ হচ্ছে মায়ের গায়ের রং। আমরা যেমন কালদের ঘৃণা করি, জামাই কনেরাও নাকি তেমনি শাদাদের ঘৃণা করে। তা ছাড়া জর্জ নাকি খুব বড়লোক—ও সেখানে একসঙ্গে ব্যারিস্টারী এবং পলিটিক্স করে। তখন ইলেকসনের সময় আসছিল। কালো নেতার শাদা বউ—কালোরা বরদাস্ত করতে পারত না। মার 'ইন লজ'রাও বোধ হয় তাকে জ্বালাতন করত। অথচ মা আজও তার শাশুড়ীকে কোট বুনে পাঠায় আর ননদ এলে চর্বচোষ্য খাওয়ায়।"

—"কি আশ্চর্য!"

—"নিশ্চয়ই তাই। অথচ আজ অবধি, মা কখনও তার নিজের 'কাজিন'দের সহ্য করে নি। আমার বাবার এক রুগ্ন বোন ছিল। তাকে মা কখনও নিমন্ত্রণ করে আনে নি। এই নিয়ে প্রায়ই বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া লাগত মনে আছে।—বাই দি ওয়ে, আমার রচনাটা দেখা হয়ে গেছে আঙ্কল কুমার?"

—"ও হ্যাঁ, সে ত পরশুই দেখে রেখেছি।" কুমার বললে,—"বেশ হয়েছে রচনা তোমার। কখন লেখ? সারাক্ষণই ত কাজ করতে দেখি, স্কুলের টাস্ক কর কখন?"

—"আঃ, সেই ত মজা, আমার গড-মাদার এসে করে দিয়ে যায়। সে লুকিয়ে থাকে আমার আঙুলের ডগায়। বাই দি ওয়ে, তোমার খাতার কপির কাজটাও প্রায় শেষ হয়ে এল।"

—"সত্যি?" কি আশ্চর্য শক্তিময়ী এই কিশোরী—কুমার ভাবল,—"কখন কর এত সব?"

—"কেন? সন্ধ্যেবেলা মা বেরিয়ে গেলে, টুপসীকে ঘুম পাড়িয়ে হোমটাস্ক করে নি। আর তোমার খাতাটা ত সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গেই থাকে আমার। যখনই সময় পাই, বের করে কাজে লেগে যাই। কিন্তু সত্যি, ওটুকু কাজের জন্যে পয়সা নেওয়া উচিত হবে না তোমার কাছে। মা শুনলে রাগ করবে।"

—"বাঃ, তা কেন!" কুমার বললে,—"অন্যকে দিয়ে কপি করালে যা লাগত, তোমাকেও সেই রেট দেব।"

শুনে খুশীতে চকচক করে উঠল মার্গারেটের মুখ। ক্ষুব্ধ মনে কুমার ভাবল, এত শক্তি মিথ্যা শিক্ষায় হয়ত একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

টক্ টক্ টক্—কড়া নাড়ছে কে:—"ভিতরে এস।—ওঃ মেরী, এস, এস মেরি।"

কুমারের মুখ অভ্যর্থনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এই প্রথম ওর এ-ঘরে মেরি পদার্পণ করল। ওর চোখ দুটো ছলছলে হাসি ভরে মেরীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মেরীকে দেখেই মার্গারেট উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেরী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে সেই চেয়ারটায় বসল।

কুমার বললে,—"অত মুখ ভারি করো না গো, জ্বর আর নেই, তুমি আসছ শুনেই ভয়ে পালিয়েছে।"

—"বাজে বকো না।" মেরী রাগ করবার চেষ্টা করল, —"এই বুঝি…।"

—"আমাদের ছোট্ট মার্গারেট।" কুমার পাদপূরণ করল।

মার্গারেট এতক্ষণ এই নবাগতার দিকে আড়ে আড়ে চাইছিল। স্বজাতীয়া হলেও সে যে ওদের কাছে' প্রায় বিদেশিনী, একথা বুঝতে দেরী হয় নি। ও কি করবে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কুমার ওকে উদ্ধার করলে। বললে,—"মার্গারেট, ঐ মিষ্টির বোতলটা দাও না ভাই।" মার্গারেট বোতল এনে দিল। কুমার বললে,—"নাও না ক'টা।"

লজ্জা পেয়ে মার্গারেট বললে,—"না,না।"

কুমার আবার বললে,—"সত্যি আর একটাও নেবে না? একেবারে নিশ্চিত ?"

—"কোয়াইট সিওর।" মার্গারেট বললে,—"সত্যি দরকার নেই, আমি তা হলে এখন যাই।" আস্তে দরজা ভেজিয়ে ও চলে গেল।

—"ছি ছি, এই পরিবেশে তুমি থাক কি করে—কি করে কর পড়াশুনো ?"

মেরীর কঠিন কণ্ঠে বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে কুমার দেখল মেরীর মুখের চেহারা কঠিনতর। তাতে শুধু ক্রোধ নয়, ঘৃণাও যেন মিশে আছে। এই পরিবেশে কুমারকে বরদাস্ত করতে পারছে না মেরীর মন। আর সেই অধৈর্য্য ফুটে উঠেছে ওর চেহারায়। দেখে কুমারের জ্বরতপ্ত বুকের মধ্যে জোরে একটা ধাক্কা লাগল—আর সেই ধাক্কা বিদ্রোহের মত জ্বলে উঠল ওর চোখে।

কুমার গম্ভীর হয়ে বললে,—"কিছু ত অসুবিধা হচ্ছে না, বেশ ত কেটে যাচ্ছে।"

—"সব অবস্থাকেই মানিয়ে নিতে হবে। তোমার এই অদ্ভুত মত থেকেই নিশ্চয় হচ্ছে এটা। নেহাৎই অবস্থার দাস তুমি।"

এই কথাটাই মেরী যদি অন্য সুরে বলত, হয় ত হেসে উঠত কুমার। কিন্তু এই কঠিন বাঁকা সুরে ওর বুকের মধ্যে ওর মায়ের দেশের পদ্মানদীর বেগ গর্জে উঠল, আর কণ্ঠ থেকে গুমরে উঠল সেই গর্জন,—"অবস্থার দাস না হলে তোমার দাস হলাম কি করে ?"

—"তার মানে ?"

—"মানে কিছু নেই।"

—"অর্থাৎ।"

—"অর্থাৎ এখানে থাকতে আমার এমন কিছু খারাপ লাগছে না।"

—"মিথ্যে কথা।" গর্জে উঠল মেরী।

কুমারের প্রতি অবাধ অধিকার-বোধ কিছুদিন ধরেই মেরীকে একটু একটু করে ভুলিয়ে দিচ্ছিল যে, প্রেমিক প্রেমেরই দাস, প্রভুত্বের নয়। সব সময় প্রভুত্ব ফলাতে গেলে ফল উল্টো হয়, এখানেও তাই হ'ল। কুমারও পাল্টা গর্জন করল,—"না, না, মিথ্যে আমি বলি নি। সত্যি, এতে আমাদের কিছু এসে যায় না।" কুমার গলাটাকে ধীরতায় নামিয়ে আনবার চেষ্টা করল,—"আমরা গরীব দেশের লোক। এই আমাদের ভালো।"

—"বাজে কথা। গরীবিয়ানা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। দারিদ্র্য যদি থাকে, তবে তাকে পরিশ্রম ও যত্ন দিয়ে ঢেকেঢুকে রাখ, লোকের চোখের সামনে তাকে হীন করিয়ে রেখ না।"

—"দারিদ্র্য আমাদের ভূষণ। দারিদ্র্যই আমাদের অহঙ্কার।"

—"হাঃ হাঃ"—ছোট্ট একটুকরো ধারালো বিদ্রূপ হাসির মত শব্দ করে ঝলসে উঠল মেরীর বাঁকানো অধরোষ্ঠের প্রান্তে। আজ সারাদিন কুমারের নতুন বাসার খোঁজ এবং ব্যবস্থা করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল মেরী। তার পরে আবার জ্বরের কথা শুনে মন আরও ব্যস্ত ছিল। এসে দেখল, অসুখ বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু কি হতশ্রী ছন্নছাড়া পরিবেশ! আর তার মধ্যে দিব্যি নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে শুয়ে গল্পগুজব ও চকোলেট খাওয়া চলছে। মেরীর মনে হ'ল—হয় ত ওর সব বাজে কথা। এখানে হয় ত সত্যিই আরামে ছিল। তাই মেরীকে এখানে আসতে বারণ করেছিল—কে জানে কি, আজকাল কারণে-অকারণে প্রেমের মধ্যে সন্দেহের নাক চক চক করে ওঠে।

বিদ্রূপ-বাঁকানো ঠোঁটে মেরী বললে,—"আমাদেরও এক-কালে সেই রকম ধারণাই ছিল। সেন্ট ফ্রান্সিসের আমলে। কিন্তু আমরা বহুদিন হ'ল সে মতবাদ পার হয়ে এসেছি। আমাদের মনের জমিতে বালি মেশানো আছে—মনের বাগান তাতে সরে সরে চলে, নতুন নতুন ফুলের ফসল ঝরে ঝরে পড়ে। তোমাদের জমিতে শুধু কাদা আর পাঁক। একবার কোন একটা মতের বীজ যদি তাতে উড়ে পড়ে, আর তার রক্ষে নেই।"

মেরীর হাসিতে আবার ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গ ঝিঁকিয়ে উঠল,—"সে অতলে গেঁড়ে বসবে। না হলে আড়াই হাজার বছর আগের ধারণা আজও তার শিকড় উপড়াতে পারল না!"

—"তার কারণ, আমাদের বিশ্বাসের মূল গভীর।" গম্ভীর ভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করে কুমার,—"আর তোমাদের

সবই ভাসা ভাসা, ওপর ওপর। আমাদের জমিতে বনস্পতির অরণ্য আর তোমাদের শুধু সাজানো বাগান। তোমাদেরই গুরু ত বলেছেন যে, বরং ছুঁচের ভিতর দিয়ে উট গলবে, তবু স্বর্গের দরজা দিয়ে ধনী গলবে না। তবু তোমাদের ধনের বড়াই।"

—"বেশ, বেশ।" মেরী আবার তার ক্ষুরধার হাসি দিয়ে কুমারের গুরুগম্ভীর কথাগুলি কেটে টুকরো টুকরো করে দিল,—"বেশ বেশ, তোমরা স্বর্গে যেও মরার পরে। আমরা বেঁচে থেকেই স্বর্গে যাব। এই জীবনেই গড়ে তুলব স্বর্গ, আমাদের চার পাশে।"

একটুখানি থেমে বলল,—"থাক্, যাক্ সে কথা—তর্ক আজ থাক। তোমার জন্যে ভাল ঘর ঠিক করেছি, সেকথাই বলতে এলাম। ভাল ঘর, আমার বাড়ী থেকে কয়েকটা বাড়ী পরেই। সারাদিন ধরে সেই সব নিয়েই ত ব্যস্ত ছিলাম।"

আঃ, মেরীর ঋণ ও কি করে শোধ করবে। কত ভাবে যে ওকে সাহায্য করছে। সত্যি আশ্চর্য এই মেরী, কুমারের জন্যে সহস্র অভাববোধ, ও যেন কিনে নিয়ে আসে।—এটা চাই, সেট চাই। এ নেই, ও নেই, তা নেই শুনে শুনে কুমারেরও মনে হয়, সত্যিই এটা থাকলে ভাল হ'ত, ওটা নইলে চলছেই না। আগে কুমারের নীতি ছিল—না পাও ত যা আছে তাই দিয়ে চালিয়ে নাও। কিন্তু মেরী বলে—যদি না পাও ত তৎক্ষণাৎ তা পাবার জন্যে লড়াই সুরু করে দাও। অভাবের সঙ্গে আপোষে মিতালী করো না। অভাবের সঙ্গে আপোষ রফা না করাই ভাল, কিন্তু প্রণয়িনীর সঙ্গে যে আপোষ না করে উপায় নেই—একথা কুমারের জানা ছিল, তা ছাড়া ওর স্বভাবে ছিল ভারতবর্ষের সহিষ্ণুতার ছায়া। পরের মতকে বুঝতে পারলে তাকে স্বীকার করতে সাধারণতঃ কখনো ওর বাধে না। এমনকি অনেক সময় মনে মনে মতের অমিল হলেও তাকে পথের অমিল হতে দেয় না। কিন্তু আজ বোধ হয় শরীরটা ভাল ছিল না, আর মনটাও বহু দূরে ফেলে আসা আত্মীয়পরিজনের জন্যে আকুল হয়েছিল। তা ছাড়া এতক্ষণ ধরে জুনি বাকারের জীবনচরিতের রহস্যলোকের অপরিচিত ছায়া এদেশের প্রতি একটা অজ্ঞাত অবিশ্বাস ঘনিয়ে তুলছিল। সমস্ত মিলিয়ে ওর মন ক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল।

মেরী বললে,—"কালই এখানকার পাট চুকিয়ে দাও। নাও, ওঠ, জিনিসপত্র প্যাক করতে সুরু করে দাও।"

ঘামে ভেজা-ভেজা কপালের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্যে একটু মায়া হ'ল, পরক্ষণেই মনকে কঠিন করে মনে মনেই বললে মেরী—আগে এই গর্ত থেকে একে বের করা যাক। তার পরে ধীরেসুস্থে আদরযত্ন করার সময় পাওয়া যাবে। মুখে বললে,—"ঠাণ্ডা লেগে একটু জ্বর হয়েছিল, এস, আমি হাত লাগাচ্ছি। দুজনে মিলে আজকেই শেষ করে যাচ্ছি আমি বলে এসেছি—কালই তুমি যাচ্ছ।"

হঠাৎ খাট থেকে নেমে দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করতে লাগল কুমার। পদ্মাপারের যে জেদী স্বভাবটা ওর চরিত্রের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেটা আবার জেগে উঠতে চাইল। মেরীর কর্তৃত্ব প্রভাব ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে আসতে চাইল স্বাধীন বাঙাল।

অপরের রাগ সহ্য করার ক্ষমতা মেরীরও বিশেষ ছিল না। ভালবাসার মানুষের জন্যে সে অনেক কিছুই করতে পারে, করতে পারে অনেক ত্যাগ স্বীকার—কিন্তু তার আগে অন্ততঃ সেই মানুষটির আনুগত্যটুকু ও দাবী করে।

বিস্মিত মেরী তাই প্রশ্ন করল,—"হঠাৎ এমন বিদ্রোহী ভাবভঙ্গী কেন? দেশের নিন্দে গায়ে বাজল বুঝি?"

—"বাজাটা কি অস্বাভাবিক?"

—"তা হয় ত না, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম সত্যকে স্বীকার করার শক্তি হয় ত তোমার আছে।"

—"শক্তি? মিথ্যে কথা, আগাগোড়া বানিয়ে তোলা মস্ত একটা ভান। প্রথমতঃ সত্য কি তা কেউ জানে না। তার পরে যতটুকু বা জানে তা স্বীকার করার মত শক্তি কারোরই নেই। তোমার নিজের বিষয়েই কি সত্যকে সহ্য করতে পার?"

—"তোমার সঙ্গে ঝগড়া করার মত সময় অথবা মন দুটোর একটাও এখন নেই আমার।" মেরীর মুখের ভাঁজে ভাঁজে অভিমানের রেখাগুলি ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ফুটে উঠতে লাগল।

মেরী বললে,—"তোমার সঙ্গে কথার খেলার প্রবৃত্তি নেই আজকে। সোজা ভাষায় শুধু বল—এ বাড়ী তুমি ছাড়বে কি না?"

—"অত নিশ্চয় করে বলতে পারি না, তবে নাও ছাড়তে পারি।"

—"তা জানি। কোন কিছুকেই নির্দিষ্ট করে বলা তোমাদের স্বভাবে নেই জানি, তার কারণ, তোমরা জীবনকে এড়িয়ে যেতে চাও সব বিষয়েই। কিন্তু এখানে আর সে কৌশল চলবে না—ডেফিনিট তোমাকে হতেই হবে। এ বাড়ী না ছাড়লেও বাড়ীটা এখনই গিয়ে তা হলে ছেড়ে দিচ্ছি।"

চকিতের মধ্যে কুমারের মনে হ'ল—ভাল বাড়ীটা হাত-

ছাড়া হয়ে যাবে। এদিকে রমলা এসে কোথায় উঠবে সেই ভাবনা ওকে ভিতরে ভিতরে ব্যস্ত করে রেখেছিল। তার উপরে আধছাড়া জ্বরের গ্লানি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠছিল। না ভেবেচিন্তে কুমার হঠাৎ বলে ফেলল,—"তা হলে, ওটা আমার বোনের জন্যেই রাখতে পারি।"

বলেই মনে হ'ল, না বললেই হ'ত। ছি ছি, কেন এ হীনতা এল মনে! যা ভয় করেছিল তাই হ'ল, তৎক্ষণাৎ মেরী প্রত্যুত্তর করলে,—"রক্ষে কর, ভারতীয় পুরুষদের ব্যবহারেই এখানকার বাড়ীওয়ালীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তার উপরে আবার ভারতীয় নারীদের ভার চাপাতে চাই না।"

—"ও:। ভারতের ওপরে যদি এতই অবজ্ঞা তা হলে—যাক. ভারতের মেয়েদের নাম তোমাদের মুখে না আনাই উচিত। তোমরা তাদের সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্যও নও।"

—"ও:. ভাবছ বুঝি তাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসার জন্যে একেবারে আকুল হয়ে উঠেছি?"

আবার সেই শাণিত বিদ্রূপ মেরীর গলার মধ্যে হা হা করে হেসে উঠল,—"তাঁদের সঙ্গে বসব, হুঁঃ! চুলের গন্ধে বমি আসবে। হি!"

—"তাই নাকি?" বলতে বলতে ব্যঙ্গের গলা তেঁতো হয়ে উঠল, রাগ হ'ল নিজের উপরে। এ কি বলছে সে, এ কি করছে, এ কি কটু কলহের সুর তার গলায়। এই তার পৌরুষ! একজন মেয়ের সঙ্গে মেয়েলী ভাষায় ঝগড়া! নিজের উপরে যত রাগ হচ্ছে তত ঝাঁজ বেরোচ্ছে বাইরে। পায়চারী করতে করতে কুমার বললে,—"হ্যাঁ, বলবই ত, হাজার বার বলব। ভারতীয় প্রেমিক রাখতে আপত্তি নেই, ভারতীয় ভাড়াটে রাখতেই যত আপত্তি?"

ধীরে উঠে দাঁড়াল মেরী। ক্রোধে ও অপমানে ওর মুখ ঘন লাল হয়ে উঠেছে। ও চাপা গলায় গর্জন করে উঠল,—"বার্বারাস।"

তেমনি মুষ্টিপাকানো হাতে পায়চারি করতে লাগল কুমার,—"হ্যাঁ হ্যাঁ, বার্বারাস বটেই ত।"

জোরে জোরে পা ফেলে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল মেরী। শান্তভাবে বললে,—"তুমি তা হলে এ বাড়ী ছাড়বে না?"

—"না।" গর্জে উঠল কুমার।

আরও শান্ত গলায় মেরী বললে,—"তা হলে তোমাকে আমার ছাড়তে হ'ল।"

সেদিকে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইল কুমার, তার পরে দু' হাতে মাথা টিপে চেয়ারের উপরে বসে পড়ল। আগুনের মত কিসের একটা তরল প্রবাহে ওর সর্বাঙ্গ যেন পুড়ে যেতে লাগল।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে মেরীর পায়ের শব্দ খট্ খট্ করতে করতে নেমে গেল। কুমার বুঝল, জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। এখনও হয় ত ছুটে গিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আর যেন তেমন প্রয়োজনও নেই। নেই ইচ্ছেও।

বিকেলের নরম আলো শীতের ভয়ে পালাই পালাই করতে করতেও মেরীর রেশমের মত লালচে চুলের জালে আটকে রইল। খট্ খট্ করে হেঁটে হেঁটে টিউব স্টেশনটা পার হয়ে এল মেরী। এই মুহূর্তে ভূ-গর্ভে নামতে ইচ্ছে করছে না, মনটা একটু আলোবাতাস চাইছে. যে আলো-বাতাস মানুষের হাতে তৈরি নয়।

বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেগে উঠল মেরী। এই মুহূর্তে যেন বাসের দেরী হওয়া ছাড়া আর কিছু ওর ভাবার নেই। মনের ভিতরটায় একটা তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে চায়, সভ্যতার পালিশের নীচে তাকে চাপা দিয়ে রেখে মনের সক্রিয় অংশটা ভাবতে চেষ্টা করে কতক্ষণ আর বাসের জন্যে দাঁড়াতে হবে। তবু থেকে থেকেই সে ভাবনা ভুলে অন্যমনস্ক মন কুমারের সঙ্গে কাল্পনিক তর্কে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় ওর গালের উপরে ছায়া ফেলে বিকেলের হারিয়ে-যাওয়া রক্তিমা। লালমুখে দাঁড়িয়ে থাকে বাসের জন্যে।

আশেপাশে সবাই চলে গেছে। এ নম্বরের খদ্দের বুঝি সে একাই। না, ঠিক একা নয়, তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। গায়ের রং এবং চেহারা দেখে তাকে ইউরোপীয় বলেই মনে হয় বটে, কিন্তু ইংরেজ বলে নয়। হতে পারে পূর্ব-ইউরোপের অধিবাসিনী কিন্তু পরণে ভারতীয় নারীর পোশাক—শাড়ী। আর বিশেষত্ব আছে তার গায়ের মোটা পশমের কোটে। হাঙ্গেরীয়, কি বুলগেরিয়া, কি যুগোস্লাভিয়া কোথাকার বৈশিষ্ট্যের ছাপ অবশ্য বোঝা গেল না। মেরীর মনে হ'ল—ওর সর্বাঙ্গে বিচিত্র দেশ একসঙ্গে মিলে একটা যেন সচল মিউজিয়মের মত লাগছে। শীতের বিকেলে, সোনার ছোপ ধরার আগেই আলোগুলো কম্বলের নীচে ঢুকতে সুরু করেছে। সেই কম্বল-মোড়া মলিন আলোয় বিদেশিনীর কপালের টিপটা ম্যাড় ম্যাড় করছিল। সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত মেরীর হঠাৎ নিজের কথা মনে হ'ল। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে!

ভারতীয় নারীদের পোশাক খুব আর্টিষ্টিক সন্দেহ নেই, এমনকি রোমাণ্টিকও বলা যেতে পারে। কিন্তু তা যতক্ষণ

ভারতীয় নারীর অঙ্গে থাকে ততক্ষণই। ইউরোপীয় মেয়ের দর ভারতীয় পোশাকে নিতান্তই বিসদৃশ লাগে। এত দিন অবশ্য ওর এ মত ছিল না, বরং কুমারের সঙ্গে বিয়ে হলে ও যে অনেক শাড়ী-গয়নার মালিক হবে, এ খবর শুনে ওর ভালই লেগেছিল। কিন্তু আজ মনে হ'ল, ভাগ্যিস ও রকম কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হওয়ার চেয়ে আমাদের এই রকম স্মার্ট পোশাকই ভাল। একমাত্র ফার্স্ট ক্লেশ ছাড়া বিলিতী মেয়েদের দেশী পোশাকে মানায় না। যদি আজকের ঘটনাটা না ঘটত তা হলে শীগগিরই হয় ত ওকেও এই পোশাকে এই রকম ভাবে দেখা যেত। উঃ, খুব বেঁচে গেছে।

ওর দিকে তাকিয়ে একটা অর্ধস্ফুট হাসির সূক্ষ্ম রেখা ওর ঠোঁটের কোণে বেঁকে গেল। সে হাসি ভাল করে ফিরিয়ে দিল মেয়েটিকে। বললে,—"তুমিও কি ৭৪-এর খদ্দের?"

—"ধরেছ ঠিক। দেখ, তোমার ভাগ্যে ঐ বুঝি এসে গেল।" দূর থেকে আসন্ন বাসের নম্বরটাকে যেন ৭৪-এর মতই ঠেকল।

—"কার ভাগ্য বলা কঠিন।" মেয়েটি বললে—"আমিও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। তুমি অন্যমনস্ক ছিলে বলে লক্ষ্য কর নি।"

"তা হবে।" ওরা দুজনেই লাফিয়ে উঠে পড়ল বহু-প্রতীক্ষিত বাসে এবং ভাগ্যক্রমে একটা খালি বেঞ্চি পেয়ে বসে পড়ল পাশাপাশি।

মেয়েটির বিষয়ে অনন্ত কৌতূহল বার বার মেরীর মনে মাথা নাড়া দিয়ে উঠছিল, ও তাতে খবরের কাগজ চাপা দিয়ে চোখ বুলিয়ে চলল।

মেয়েটি স্মিতমুখে তার খোলা ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে নিয়ে পড়তে সুরু করে দিল।

মেরী কাগজের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ইংরেজীর মাধ্যমে বাংলা সহজ শিক্ষার বই। কে এই মেয়েটি—বাংলা ভাষায় ওর প্রয়োজন কি? যে ওকে শাড়ী-সিঁদুর পরিয়েছে সে বুঝি তা হলে আর একজন বাঙালী প্রবঞ্চক? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় মেরীর। কিন্তু ভদ্রতার ঐ সূক্ষ্ম আবরণটুকু ভেদ করতে পারে না, সরাতে পারে না ঐ একফালি কাগজের আড়াল।

বাসের গতি ক্রমশঃ মন্থর হয়ে আসছে। এই আপিস-ভাঙার মুখে। লণ্ডনের হৃদয়ের মধ্য দিয়ে 'বাসে' করে যাবার সখ হঠাৎ হ'ল কেন ভাবে মেরী। কুমার এখন কি করছে কে জানে। কিন্তু ওর কথা ভাবতে আর ইচ্ছে নেই তার—য খুশী করুক, নরকের মধ্যে পড়ে থাক—তার ঘুচে গেছে দু'দিনের চেনাশোনা। এ ভালই হয়েছে। যে দেশ বর্তমানকে হারিয়ে এখনও অতীতে বাস করে, সেই ভূতের দেশে থাকতে পারত না মেরী। সে মুখে যতই বড় বড় কথা বলুক, তার কোনটাই ওর জীবনের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারে নি। চিন্তাকে কাজে খাটাবার মত শক্তির সম্বল ওর নেই, ওদের কারোরই নেই।

মনে মনে বিতর্ক করতে করতে মেরী যখন আবার ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে, বাস তখন একটা ধাক্কা দিয়ে থামল। বিরক্ত হয়ে মেরী বাইরে তাকিয়ে দেখে, এত ভিড় যে বাস যেন চলতেই পারছে না। যাত্রীরা সবাই এক-একবার হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছে।

সকলেরই সন্ধ্যাবেলায় জরুরী কোথাও দরকার থাকে। কিন্তু বাস না নড়লে আর কে কি করবে? সব অধৈর্যতা মনের বাক্সে ঠেসেঠুসে বন্ধ করে রেখে নিঃশব্দে যে যার জায়গায় বসে কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ভীড়ের দিকে আর মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে নিঃশব্দে চেয়ে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

হঠাৎ ফিসফিসিয়ে চাপা গলায় পাশেই কে বলে উঠল—"চিনতে পার?"

চমকে ফিরে তাকাল মেরী। কে তাকে ডাকল?—না, তাকে নয়, সেই মেয়েটিকে। মেয়েটি সরে এসে ওকে বসবার জায়গা করে দিল। লোকটা খাঁটি ইংরেজ সন্দেহ নেই। মেরী ফিরে দেখল, ওরা চাপা গলায় কথা কইছে।

গলার স্বরে ও ভাবভঙ্গীতে অতীত রোমান্সের ইঙ্গিত। "তুমি কি শেষ অবধি ভারতীয়কেই বিয়ে করলে নাকি?"

"দূর, বিয়ে করি নি, শুধু ভালবেসেছি।"

"হ্যাঁ, ভালবাসায় তুমি ওস্তাদ জানা আছে।"

"দূর দূর তুমি কিছু জান না।" সুরে বিদেশী টান এনে মেয়েটি বললে—"এ সে ভালবাসা নয়।"

"তবে কি?"

"সে আর এক রকম।"

"অর্থাৎ?"

মেয়েটি অল্প হেসে মাথা দুলিয়ে বলল,—"এই বাসে বসে কি বলব, একদিন এস, তা হলে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এ জিনিস বলা যায় না, এ দেখতে হয়।"

"কি দেখতে যাব?"

"যাকে আমি ভালবাসা বলি।"

"ফুঃ, আমি একবর্ণ বিশ্বাস করি না, তোমার যত বাজে রোমান্স। ভালবাসা ভালবাসাই, তার মধ্যে রকমফের নেই।"

"বেশ তবে তাই।"

"যা হোক তোমার ঠিকানা দাও।"

"কি করবে ঠিকানা দিয়ে?"

"তোমার মানুষটিকে একবার দেখে আসব।"

"হা হা।" ছোট ছোট হাসির খুটখুট একটু তরঙ্গ তুলে মেয়েটি বললে—"হা হ দেখতে পাবে না।"

"কেন?"

"কারণ সে মানুষ ভূগোলের মাপকাঠিতে আছে অনেক দূরে, দু'তিনটে সাগর পেরিয়ে। আর বাস্তবে আছে বড় বেশী কাছে, তোমার নজরের বাইরে। একেবারে আমার মনের ভিতরে।"

ওদের চুপি চুপি কথা একটা জমাট ফিসফিসানিতে পরিণত হ'ল। কান খাড়া করে অবাক হয়ে শুনতে শুনতে কাগজটা খসে পড়ল কোলের উপরে। সেই শব্দে চকিত হয়ে আবার মেরী সেটা তুলে নিল মুখের কাছে। ভাবলে, ওর ঠিকানাটা জেনে নিতে হবে। যেতে হবে একদিন ওর আস্তানায়। দেখতে হবে, ব্যক্তিহীন ভালবাসা বলে ওর সত্যি কোন পদার্থ আছে কি না।

ছেলেটি বললে—"তবে তোমার ঠিকানায় গিয়ে কি দেখব?"

"কেন আমাকে।"

"সে ত এখানেই দেখতে পাচ্ছি।"

"সেখানে গেলে দেখবে আমার কাজ, যার মধ্যে আমার যথার্থ পরিচয় সার্থক সত্য।"

"বেশ যাব, ঠিকানা দাও।" পকেট থেকে নোটবুক বার করে ঠিকানা টুকে নিল, মেরীর মনে হ'ল লেকটস স্কোয়ারের কাছাকাছি একটা ঠিকানা। হঠাৎ হাতের কাগজটার সঙ্গে সঙ্গে অনেক চেষ্টায় মনের সঙ্কোচটাও ফেলে দিয়ে মেরী বললে—দুঃখিত, তোমার কথার টুকরোগুলো একটু একটু কানে যাচ্ছিল। তা থেকে মনে হচ্ছে, কি একটা ইণ্টারেষ্টিং এক্সপেরিমেণ্টে তুমি ব্যস্ত। তা সেখানে কি সাধারণের প্রবেশ চলতে পারে? মানে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল আছে।"

প্রথমে অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটি। পরক্ষণেই বিদেশী উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওর হাত ধরে বললে—"নিশ্চয়ই। আমরা ভীষণ খুশি হব। সামনের শনিবার আমাদের বক্তৃতা আছে, চারটের সময়। এস সত্যি। নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগবে। তুমিও শনিবারেই এস, এরিখ।"

এরিখ বললে—"চারটের সময় ত টী-টাইম। সে সময় কি লেকচার জমবে।"

"নিশ্চয়ই, চাও থাকবে, লেকচারও থাকবে। ভাবনা নেই।"

"আচ্ছা তা হলে শনিবার পর্যন্ত। যদিও হঠাৎ বহুদিন পরে দেখা হওয়ায় এই মুহূর্তে ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত যাই।"

এরিখ যুগোপযোগী ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে হাসল—"কিন্তু উপায় নেই, সভ্যতার দায় বইতে আমাকে এর পরের অনুচ্ছেদেই থামতে হবে।"

"সভ্যতার দায়? অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ রোজগারের চেষ্টা।"

"আহা, তুমি শেষ অবধি সে কাজটা ছাড়লে বুঝি? আবার সেই পাবলিশারদের পিছনে ঘুরছ নাকি?"

"ধরেছ ঠিক।" এরিখ তার সেই রপ্তকরা সিনিক্যাল হাসি হাসে—"লেখক হবার সখ আমার জীবনে ঘুচবে না। কিন্তু আজ এই পর্যন্ত।"

বাস থামতে না থামতে ও লাফিয়ে নেমে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে দুষ্টু ছেলের প্রতি মায়ের মত ছোট্ট একটু স্নিগ্ধহাসি হাসল ক্যাথারিন।

ঠিকানাটা দেখে নিয়ে মেরী বললে,—"এখানে কি তুমি থাক, না এটা তোমাদের ক্লাব?"

—"থাকিও বটে, ক্লাবও বটে, ফ্যাক্টরিও বটে।"

—"ফ্যাক্টরি?"

—"হ্যাঁ আমার ছোট্ট ফ্যাক্টরি। আমার দুটো ছোট তাঁত আছে, তার একটাতে পশমের স্কার্ফ বুনি। আর একটাতে মোটা সুতোর ব্যাগ, ইত্যাদি।"

মেরীর চোখে উৎসাহ চকচক করে উঠল। ও বললে,—"হাউ ইণ্টারেষ্টিং, কি মজার!"

বলেই নিজেকে সংশোধন করলে, আর সেই প্রয়াসটুকু ধরা পড়ল ক্যাথারিনের চোখে। ওরা যে সবজান্তার জাত। কোন কিছুকেই নতুন বলে স্বীকার করতে ওদের বাধে। সব নতুন খবরই ওদের কাছ থেকে নিল।

মেরী বললে,—"হ্যা, শুনেছি বটে, হাঙ্গেরীর মেয়েরা তাঁত বোনে।"

—"তোমার অনুমান সত্য, তবে আমার দেশ হাঙ্গেরীতে নয়—রুমানিয়ায়।"

—"রুমানিয়া, সে আবার কোন্ দেশ?" যেন যে দেশের কথা মেরী জানে না, সে দেশের অস্তিত্বই প্রায় হাসির ব্যাপার।

ক্যাথারিন কিন্তু রাগ করে না, হাসে। বলে,—"দেশটা অখ্যাত বটে, তবে এখনও জগতের মানচিত্রের সামান্য একটু জায়গা দখল করে আছে।"

—"দুঃখিত।" বললে মেরী,—"মনে পড়েছে সত্যি। রাশিয়ার অধিকারে যে ছোট ছোট দেশগুলি আছে রুমানিয়া তারই অন্যতম। কিছু মনে করো না, আমি প্রথমটা ঠিক ধরতে পারি নি।"

—"তাতে আর কি হয়েছে।" ক্যাথারিন মিষ্টি হাসল, —"ও রকম ভুল হয়েই থাকে। শনিবারে কিন্তু আসতে ভুলো না।"

—"না না, নিজেই সেধে নেমন্তন্ন নিয়ে কি আর ভোলা যায়? আমি কিন্তু সত্যিই দুঃখিত। তোমাকে এতক্ষণ বকালুম।"

—"মোটেই না, আমি তাতে খুশীই হয়েছি। তা হলে চলি, আমাকে নামতে হবে এইখানেই।"

ও বাসের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সোঁয়াটে সন্ধ্যায় বিজলী-বাতিগুলি রাস্তার ধারে ধারে ম্যাড় ম্যাড় করছিল। না দিচ্ছিল আলো, না দিচ্ছিল অন্ধকার। সেই সর্বব্যাপী ধূসরিমার মধ্যে ক্যাথারিনের ঘন-সবুজ শাড়িটা, গাঢ়তর ছায়া ঘুরিয়ে দ্রুত ধাবমান বাসের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেরী ভাবল, লণ্ডনে এত বিদেশীর ভীড় যে, ইংরেজকে খুঁজে প্রায় পাওয়াই যায় না। মনে হয়, চেষ্টা করলে বিদেশীরা জোট বেঁধে শহরটা হাত করতে পারে। জানালা দিয়ে অন্যমনস্ক চোখ মেলে দিল মেরী। এতক্ষণে ভিড়টা একটু পাতলা হয়েছে। গতিতে একটু বেগ ফিরে পেয়েছে যন্ত্রযান। থর থর করে কাঁপছে তার দেহ।

মেরীর মনে হ'ল, এই বেগের ছন্দে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ আগের সেই তীব্র উত্তেজনা এতক্ষণ ধরে অজানা লোকের সঙ্গে অন্যমনস্ক গল্পের মাধ্যমে স্তিমিত হয়ে এসে কখন যে ওর মনের মধ্যে গভীর অবসাদের একটা স্তূপ রচনা করছিল, টের পায় নি মেরী। এখন হঠাৎ মনে হ'ল, যেন আর কিছু ভাবার নেই, আর কিছু করার নেই। যেন শুধু এই চলে যাওয়াটাই সব। মনে হ'ল, আর সে কিছু ভাববে না, কিছু করবে না। ছেড়ে দেবে নিজেকে কালের হাতে, ঘটনাচক্রের হাতে।

কি হ'ল তার কে জানে। একেই কি বলে 'ওরিয়েণ্টাল চার্ম'—পুবের যাদু! তাকে কি শেষে যাদু করল কেউ? যদি করে থাকে ত করুক, সেই যাদুর হাতেই সে ছেড়ে দেবে নিজেকে। তার পরে ঘটুক যা ঘটবার, বয়ে চলুক কাল আর ছুটে চলুক জীবন-প্রবাহ। আর সেই প্রবাহের ধারায় ভেসে যাক সে।

অন্যমনস্ক চোখ, এতক্ষণ খেয়াল করে নি। যা ঘটবার তাই ঘটেছে—নিজের বাড়ীর পথ বহুদূরে ছেড়ে এসেছে মেরী। এখন বাস ছুটছে তার গন্তব্যস্থলে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে ফুটিয়ে তুলেছে রাস্তার আলো। বাসের মধ্যে ভিড় এসেছে অনেকটা পাতলা হয়ে। হঠাৎ কণ্ডাক্টরের খেয়াল হ'ল,—"তুমি কোথায় নামবে, দেখি তোমার টিকিট?"

মেরী বললে,—"অন্যমনস্ক হয়ে আমি অনেক দূরে চলে এসেছি। আমার টিকিট হচ্ছে হাইগেট পর্যন্ত। তোমাদের বাস ত হাম্পষ্টেডে যাবে। তা হলে আমিও সে পর্যন্ত চলে যাই। হাতে যখন বিশেষ কিছু করার নেই। তা কত দাম বেশী লাগবে বল।"

পয়সা নিয়ে হাম্পষ্টেডের টিকিট দিয়ে কণ্ডাক্টরের হঠাৎ গল্প করার ইচ্ছে হ'ল। কাজের ভিড় কম থাকলে এমন ইচ্ছে ওদের হামেশাই হয়ে থাকে। বাস প্রায় খালি হয়ে এসেছে। তাই মেরীর পাশের 'সীটে' বসে পড়ে সে বললে— "ও জায়গাটা চমৎকার—নয়?"

—"ভারি সুন্দর।" অনেকক্ষণ পরে সাধারণ ভাবে কথা বলতে পেরে বেঁচে গেল মেরী। বললে,—"বাস কি হীথের পাশ দিয়ে যাবে?"

—"হ্যাঁ নিশ্চয়।"

—"ওঃ, তা হলে আমি বাড়ী না গিয়ে ওখানেই নামব। একটু ঘুরে পরের বাসে চলে আসব।"

কিন্তু কণ্ডাক্টর ভাবলে, একে নারীজাতীয়, তায় বয়স হয়েছে। দেখে মনে হয় ঘরসংসার করে থাকে, মায়া-মমতাও আছে। তাই ঝুঁকে পড়ে সে ওর কাঁধে দুটো টোকা মেরে বললে,—"এ রিস্‌ক্ নিও না. ভুলে গেছ কি যে, এটা শীত-কাল। বাসের মধ্যেই কাঁপুনী লাগছে, বাইরে কি হবে ভাব।"

ক্রমশঃ

প্রাচীন বাংলা 'চর্য্যা'পদে সমাজচিত্র

শ্রীঅধীর দে

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যে সাহিত্য সমাজের রূপে ও রসে রসায়িত, সাহিত্য বিচারে তার মূল্য কম নয় এবং তার আবেদনও শাশ্বত ও সর্বজনীন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্য্যাপদগুলি আজও আমাদের কাছে একটা রস-আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়, কারণ তৎকালীন সমাজ-জীবনের পটচিত্র আমরা এগুলির মধ্যে প্রতিফলিত দেখি। হাজার বৎসর আগের বাংলা দেশের একশ্রেণীর মানুষের জীবনাচরণের খণ্ড খণ্ড চিত্র, তাদের চিত্তবৃত্তি ও রূপদৃষ্টির চিহ্ন পাওয়া যায় এই চর্য্যাপদগুলিতে।

চর্য্যাপদগুলি যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন বৌদ্ধ-সহজিয়া মতের সাধক বা সিদ্ধাচার্য্য। সমাজের মধ্যে থেকেও তাঁরা সমাজকে উপেক্ষা করেছেন; নরনারীর যৌনাচরণ প্রতিপাদ্য বিষয় হয়েও যৌনাচার তাঁদের কাছে পরিত্যাজ্য ছিল—একথা ঠিক যে, তাঁদের অখণ্ড সমাজবোধ ছিল না। তাঁরা যা কিছু বর্ণনা করেছেন—তা সে যৌনাচারই হউক আর দাবা-খেলা বা হরিণ শিকারই হউক—সবই রূপক অথবা উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় নিয়ে তাঁদের সাধনতত্ত্বকেই সহজবোধ্য করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই তাঁদের বর্ণিত চিত্রগুলি প্রায়ই সম্পূর্ণ নয়, খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমষ্টি মাত্র। যে সমাজের মধ্যে সিদ্ধাচার্য্যগণ বিচরণ করতেন সে সমাজের কথ্যভাষা তাঁরা তাঁদের পদগুলিতে ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের বক্তব্য কখনই সাধারণ মানুষের জন্য ছিল না। সে বক্তব্য তাঁদের নিজস্ব গুহ্য-সাধনতত্ত্ব। আর সেই গুহ্য-সাধনতত্ত্ব এখন যেমন টীকা ছাড়া দুর্বোধ্য, হাজার বৎসর আগেও দীক্ষিত ছাড়া অন্যের কাছেও সমান দুর্বোধ্য ও জটিল ছিল। কিন্তু এ কথা স্বীকার্য্য যে, টীকা-টিপ্পনীর সাহায্যে এর গূঢ় ধর্মতত্ত্বের কথা জানা গেলেও সাধারণভাবে যখন আমরা এর বাহ্যিক অর্থ উপলব্ধি করি তখন এতে পাই এক শাশ্বত মানবীয় রসের সন্ধান।

এই সিদ্ধাচার্য্যরা সমাজের নীচু স্তরে বিচরণ করতেন এ কথা যেমন সত্য, তাঁদের অনেকেই যে নিম্ন সমাজ-জাত ছিলেন একথাও তেমনি সম্ভাব্য সত্য। চর্য্যাকার শবরপাদ বোধ হয় শবর সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। তাঁর দুটি চর্য্যাতেই শবর-জীবনযাত্রার চিত্ররূপ অঙ্কিত দেখি। মনে হয়, বীণাপাদ নট জাতিভুক্ত ছিলেন, ডোম্বীপাদ জাতিতে ডোম ছিলেন, তন্ত্রীপাদ তাঁতী ছিলেন। এমনি কুক্কুরী, কম্বলাম্বর, তাড়ক, চাটিল প্রভৃতি নামগুলি হয়ত বংশ বা জাতিবাচক। এগুলি সাধকদের আবার ছদ্মনামও হতে পারে। যাই হোক অন্ত্যজ-সমাজের সঙ্গে সিদ্ধাচার্য্যদের যে যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে তন্ত্রের সংমিশ্রণে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের উদ্ভব হয়েছে। তন্ত্র আর্য্যেতর আদিম মানবের সৃষ্টি। নারী ও যৌনাচার তন্ত্র-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ। আর্য্যেতর সমাজধর্ম্মের সঙ্গে সংযোগের ফলেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে তন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর তা থেকেই মহাযান মতের বিভিন্ন রূপকল্পের সৃষ্টি। এই তন্ত্রমিশ্রিত মহাযান মতেরই একটা শাখা সহজিয়া বৌদ্ধমত—যার প্রতাপ ও প্রভাব একদিন প্রাচীন বাংলায় ছিল অপরিসীম। মূলতঃ প্রাচীন বাংলার আর্য্যেতর সম্প্রদায়ের খুব বড় একটা অংশ ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মী। বিদগ্ধ আর্য্য-মানবের সঙ্গে এদের যোগ ছিল না। আর্য্যদের সাহিত্য অথবা শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। তাঁদের কাছে আর্য্যেতর সমাজের আচার-ব্যবহার ছিল ঘৃণ্য ও উপেক্ষিত। অন্যদিকে সিদ্ধাচার্য্যরা তাঁদের বক্তব্য প্রকাশের বাহন করেছিলেন কথ্য ভাষাকে। আর্য্য-জীবনযাত্রা বা শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে তাঁদের বিরূপতাও কম ছিল না। নগর ও নাগর-সভ্যতা থেকে অনেক দূরে লোকায়ত জীবনযাত্রার অন্যতম সারিক ও সুহৃৎ ছিলেন এই সিদ্ধাচার্য্যরা। কিন্তু সে জীবনযাত্রার বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তাঁরা বর্ণনা করেন নি। কারণ, কামনা, বাসনা ও দুঃখময় জীবনের প্রতি তাঁরা ছিলেন জন্মবিরোধী। তবুও তাঁদের বর্ণিত খণ্ড চিত্রাংশগুলিকে পর্য্যায়ক্রমে যদি সাজানো যায় তা হলে এমন একটা জীবনের রূপ গড়ে উঠে যা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মানুষের সুখেদুঃখে ভরা কর্ম্মের আর ধর্ম্মের জীবন।

স্পষ্টই অনুমান করা যায়, আজকের মত হাজার বৎসর আগেও নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবনে দারিদ্র্য ছিল নিত্যসাথী। সুজলা-সুফলা বাংলা দেশের এই সব অধঃপতিত মানুষের সংসারে সেদিনও ছিল অভাব আর অনটন। চর্য্যাকার ঢেণ্টনপাদ লিখেছেন:

'হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী' ইত্যাদি

অর্থাৎ 'হাড়ীতে ভাত নেই, নিত্যই তার দরকার। তবুও সংসার ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। তার ঘর উঁচু পাহাড়ের উপর, কাছাকাছি কোন প্রতিবেশী নেই। সার কথা এই যে, প্রতিবেশীদের সাহায্য পাবারও কোন উপায় নেই।'

এই শ্রেণীর মানুষেরা আর্য্যসমাজবিন্যাসে অন্ত্যজ। গ্রাম পত্তনে তারা অন্তেবাসী। নগরের বাইরে নদীর ধারে সেদিন তাঁতী, ডোম, বাগ্দী প্রভৃতির বাস ছিল। তারা ডালা, চাঙ্গাড়ী, বিক্রী করে জীবননির্বাহ করত। এই অন্ত্যজ-সমাজের সেদিনকার বৃত্তি ছিল এই সব, যেমন, মদ চোলানো, কাঠ কাটা, নৌকা গড়া, সাঁকো তৈরি করা, হরিণ শিকার করা, হাতী ধরা ও পোষা, নাচগান করা, তুলা-ধোনা প্রভৃতি। এই বৃত্তিগুলি এখনও এই সমাজে চলতি রয়েছে। হরিণ শিকারের একটা বর্ণনা পাওয়া যায় ভুসুকুর পদে:

'বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।

*　　*　　*

তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ।'

'হরিণ ভয় পেয়ে ছুটেছে, তার খুরের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।'

সবচেয়ে বেশী উল্লেখ আছে নৌকা ও নৌকা-বাওয়ার—প্রায় আট-নয়টা পদে। নদীমাতৃক বাংলা দেশে—বিশেষতঃ নিম্ন বাংলায় সব থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ নৌকা।' চর্যাচারের কাছে এই নদী হয়েছে সংসারের রূপক 'ভবনই' নৌকা আশ্রয়—যাকে অবলম্বন করে সাধক যাত্রা করবেন শূন্যমার্গে। কখনও সেই নৌকা বাইছেন সাধক নিজেই, আবার কখনও বা বাইছেন ডোম্বী—যাঁকে 'নৈরাত্মাদেবী'র রূপক বলা হয়েছে। সর্বত্রই ধর্মীয় গূঢ় অর্থ। কিন্তু এর বাইরে এর সাধারণ অর্থও একেবারে নীরস নয়। নদীতে খেয়া চলে, পাটনী খেয়া পারাপার করে। পারের কড়ি না পেলে যাত্রীর লাঞ্ছনাও ঘটে। পাটনী যাত্রীর সব জিনিস তল্লাস করতেও কুণ্ঠা করে না। তাড়কপাদ লিখেছেন :

'বাণ্ড কুরুণ্ড সন্তারে জানী' অর্থাৎ পাটনী বটুয়াও খোঁজ করে দেখে তার কাছে পারের কিছু সম্বল আছে কি না?

ডোম, তাঁতী প্রভৃতি অন্ত্যজ নারীরা চিরকালই কিছুটা স্বাধীন প্রকৃতির স্বেচ্ছাচারিণী। ষোড়শ শতাব্দীর ফুল্লরার মতই চর্যার যুগেও অন্ত্যজ নারীরা ফিরি করে জিনিসপত্র বিক্রী করত। কাহ্নুপাদ ডোম্বীকে তাই বলছেন :

'তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরণা চাংগেড়া।' অর্থাৎ 'ডোম্বী, তুমি তাঁত আর চাঙ্গড়ী বিক্রী কর।' এই সমাজে নট-গীতের চলন অর্থাৎ নট-নটি বৃত্তিও ছিল। আর্যসমাজ মতে নট-নটীরাও অন্ত্যজশ্রেণীর। চর্যাপদে নট-নটীরও উল্লেখ আছে।

নিম্ন সমাজের এইরূপ অসংস্কৃত জীবনযাত্রার খণ্ড বিচ্ছিন্ন বহু চিত্র বিভিন্ন চর্যায় পাওয়া যায়। সে যুগের সাধারণ মানুষের আহার-বিহার, ক্রিয়াকর্মগত গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় চর্যাপদগুলির মধ্যে রয়েছে। দাম্পত্য প্রেমের একটি উজ্জ্বল মধুর বাস্তব চিত্র পাই শবরপাদের গীতে। উঁচু উঁচু পাহাড়, সেখানে শবর বালিকার বাসভূমি। পরনে তার বিচিত্রবর্ণ ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা। শবর কিন্তু তাকে বিস্মৃত হয়ে নেশায় উন্মত্ত। অনন্ত আকুলতা নিয়ে মিনতি জানায় শবরী :

'উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।' অর্থাৎ 'উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, পাগলামী করো না, দোহাই তোমার।'

চর্যাকারের হাতে পরিবেশ বর্ণনাও কেমন নিখুঁত ও সুন্দর হয়েছে। এ থেকেই তাঁদের শিল্প-মানসের পরিচয় মেলে। উক্ত পদের পরিবেশ বর্ণনা এমনি : 'গাছে গাছে ফুলের মেলা বসেছে, ফুলে লতায়-পাতায় আকাশ গেছে ঢাকা পড়ে। একাকী শবরী বনে বনে ঘুরে ফিরছে। কুণ্ডল পরেছে সে কানে।' যা হোক, শেষে শবরের নেশার ঘোর কাটল—ফিরে এল তার চেতনা।' তখন খাট পাতা হ'ল—শয্যা বিছিয়ে দেওয়া হ'ল তাতে। কর্পূর মেশান তাম্বুল গ্রহণ করার পর শবর শবরীকে নিবিড় ভাবে বক্ষে আশ্লিষ্ট করে অবশেষে রাত্রি অতিবাহিত করল। শবরীর কত জ্বালা। শবর প্রায়ই রাগ-অভিমান করে। অভিমানী শবর পাহাড়ের গুহায় নিভৃতে বসে থাকে। শবরী কোথায় তাকে খুঁজে ফিরবে?

'উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে।'

এমন মান-অভিমান সিক্ত প্রেমলীলার পাশে হতভাগিনী দয়িতার অন্তর-বেদনা-বিমথিত দীর্ঘশ্বাসও শুনতে পাওয়া যায়। মায়ের কাছে অভিযোগ করছে যুবতী কন্যা। সন্তান ধারণের ক্ষমতায় যৌবন তার পরিপূর্ণ। কিন্তু তার স্বামী অথর্ব, বৃদ্ধ, বীর্যহীন। মিলন তাদের ঘটে না। তার দুঃখের জন্যে পিতাই তার দায়ী। কুক্কুরীপাদের এই পদটি :—

'ফাল-জোবন মোর ভইলেসি পুরা।
মূল নখল বাপ সংঘারা॥'

এই পদটি পড়ে হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ-নিকুষা-কুলীন কন্যাদের কথা স্মরণ হয়।

হাজার বছর আগে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল দারিদ্র, অভাব-অনটন। জীবনাচরণে ক্লেশ, মালিন্য ও দুঃখ-বেদনার সঙ্গে জুয়াখেলা, নাচ-গান, কাম-কেলি প্রভৃতি অসংস্কৃত প্রাকৃত আনন্দোপভোগও তারা করত। এ সমাজে দরিদ্র বা ক্ষুধার সংখ্যাই ছিল বেশী—তবে প্রহরী দ্বারা রক্ষা করবার মত ধন-সম্পত্তিও কারও কারও নিশ্চয় ছিল। সে সময়ে চুরি-ডাকাতিও যে ছিল না তা নয়, কেন না ঘুমন্ত গৃহস্থ বধূর কানের গয়নাও চুরি যেতে শোনা যায়। প্রহরীহীন অবস্থা সম্পর্কে কাহ্নুপাদ লিখেছেন :

'সুণ বাহ তথতা পহারী।
মোহ ভণ্ডার লই সঅলা অহারী।'

এই দারিদ্র্যপীড়িত, অমার্জিত, প্রাকৃত জীবনে যে শান্তি বা সুখ একেবারে ছিল না তা নয়। যে তৃপ্তি বা সুখ কেবলমাত্র প্রেম ও কামনায় নয়, সে সুখ বা তৃপ্তি শ্রম ও প্রেমের যুগ্ম সম্মিলনে। শবরপাদের চর্যায় সেই সুখানন্দের অপূর্ব সুন্দর পরিচয় মেলে। পদটি এই :—

'গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী।
* * *
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবর শবরী মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা॥'

অর্থাৎ এর ভাবার্থ : পাহাড়ের ওপর শবর-শবরীর ঘর। তা গগনকে যেন স্পর্শ করেছে। চারপাশে আলো করে ফুটেছে কাপাসের ফুল। ঘরের আঙ্গিনায় জ্যোৎস্না উথলে পড়ছে, কঙ্গুচিনা ফল পেকেছে এবং তার রস পান করে শবর-শবরী আনন্দে মত্ত হয়ে উঠেছে। আজ তাদের মহা সুখের সঙ্গম—সত্যিকার আনন্দের মিলন। প্রাকৃত জীবনের এমন সুন্দর মধুর অথচ সুখকর ছবি তৎকালে অন্যত্র দুর্লভ। চর্যাপদগুলির ভেতরে সে যুগের বাংলার সমাজ-জীবনের এমনি নানা বৈচিত্র্যময় পরিচয় আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

বিস্মৃত কবি ঃ ঠাকুরদাস দত্ত

শ্রীহারাধন দত্ত

বাংলা কাব্যে আধুনিকতম মুক্তি ঘটে কবি মধুসূদনের আমলে। সে মুক্তির প্রস্তুতি ঘটেছিল সচেতন ও অবচেতন ভাবে মধুসূদন-পূর্ব উনিশ শতকের প্রথমাবধি। এমনকি ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল হতেই সাহিত্যের যুগ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অষ্টাদশ শতকেই বাংলা তথা ভারত এক রাজনৈতিক যুগসঙ্কটের সম্মুখীন হয়। মোগলযুগের অবসান, নবাবী আমলের শেষপ্রহর ঘোষণা, ইংরেজের অভ্যুদয় বাংলাদেশ ও সমাজকে এক অজানা নূতনের দ্বারদেশে পৌঁছে দেয়। ঐ পরিবর্তিত সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন যে সাহিত্যেও ছায়া ফেলবে তাতে আর সন্দেহ কোথায়? জানা-অজানার এই দ্বন্দ্ব সমাজে ও সাহিত্যে দীর্ঘতর ছায়া বিস্তার করল। শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে বর্গীর হাঙ্গামা দৈনিক জীবন-যাপনকে ভয়সঙ্কুল করে তুলল। সর্বসাধারণ অনিয়ম অপরিচিত ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা আতঙ্কে আন্দোলিত হতে লাগল। অষ্টাদশ শতকের এই রাজনীতি মানসিকতাই বাংলা-সাহিত্যে বাস্তবতাবোধের সূচনা করে। নবযুগের দুই প্রধান লক্ষণ, ব্যক্তি-পরতন্ত্রতা ও মানবিকতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যে গানে সাহিত্য প্রচেষ্টার সকল অঙ্গে এই দুই লক্ষণের স্বীকৃতি স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর। এই শতকের মানিকরাম, মনরাম, সহদেব চক্রবর্তী, কবি রামকান্ত, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং আরও বিভিন্ন কবিদের মধ্যে তখনকার এই জাতীয় চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে। আমরা দেখেছি বাংলা-সাহিত্য ধীরে ধীরে দৈবী প্রভাব বিমুক্ত হয়ে সমাজ ও মানুষের মহিমা গান করেছে। এই কারণেই এই যুগে লোকসঙ্গীত, প্রণয়বাক্য, আখ্যায়িকাকাব্য, গ্রামীণ-প্রণয়গীতি, সরস পল্লীগীতি লোক-সাহিত্যের সকল শাখায় মৃত্তিকাগন্ধী জীবনরসের জোয়ার এসেছে। শিল্পীর ভাবতন্ময় ব্যক্তিত্বের নিভৃত প্রেরণাই যদি সার্থক কাব্যের উৎস হয়ে থাকে তবে ভারতচন্দ্রের পর দীর্ঘকাল বাঙালীর জীবনপ্রবাহে সে মর্মাভিসারী নিভৃতি ও গভীরতা প্রায় অলভ্য হয়েছিল। কারণ সে যুগে ছিল না প্রশান্তি, গভীরতা ও আত্ম-সংযম। এই কারণেই ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর হতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরগুপ্তের "সংবাদপ্রভাকরের" আবির্ভাব পর্যন্ত কোন ব্যক্তিত্বধর্মী কবির দেখা পাওয়া যায় নি। এই যুগ কবিওয়ালাদের যুগ—সাহিত্যে তখন কবিওয়ালাদেরই জয়জয়কার। তর্জ্জা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, হাফআখড়াই, ফুলআখড়াই, দাঁড়া কবিগান, বসা কবিগান, ঢপ, কীর্ত্তন, টপ্পা, ঝুমুরগীতি প্রভৃতি সমস্তই কবিগানের অন্তর্গত। এই গীতি-প্রধান সাহিত্যই একদিন বাংলার পল্লী মুখরিত করেছিল এবং জাতির রস-জীবনকে পরিতৃপ্ত করেছিল। ছোট, বড় অসংখ্য কবির কণ্ঠ সে যুগের আসরকে মাতিয়ে তুলেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের সকলের কথা আজ আর আমাদের গোচরীভূত নয়—তাঁহাদের ইতিহাস ও কীর্ত্তি লুপ্ত হতে চলেছে। বাংলা-সাহিত্যের মূল্যমান নির্ণয়কালে তাঁদের ইতিহাস ও সাধনা যে অপরিহার্য্য একথা আজ সকলেই অনুভব করছেন। এখানে আমরা সেই যুগেরই বিস্মৃতপ্রায় কবিগানের স্রষ্টা, পাঁচালীকার ও যাত্রার পালা রচয়িতা ঠাকুরদাস দত্তের সাহিত্য-জীবনের কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি।

হাওড়া জেলার বাঁটরা গ্রামে ১২০৮ সালে (ইং ১৮০১) এই ঠাকুরদাসের জন্ম হয়। ঠাকুরদাসের জন্ম তারিখ ১২০৮ হিসাবেই অধিকাংশ স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় লিখেছেন: Thakurdas Dutta born in 1207 (1800) A. D at Byatra, Howrah, তাঁর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে এমন ভিন্ন মত আরও থাকতে পারে। ঠাকুরদাস কায়স্থ পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতার নাম রামমোহন দত্ত। রাম-মোহন ফোর্ট উইলিয়মে কাজ করতেন এবং তাঁর অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। পুত্রের লেখাপড়ার জন্য তিনি বোড়াল গ্রামনিবাসী রামময় মুখোপাধ্যায়কে শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। রামময়ের হাতেই ঠাকুরদাসের ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ঠাকুরদাস বাল্যকাল হতেই সঙ্গীতপ্রবণ ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে খাঁটি সংসারী হিসাবে দেখতে চান। নিজের কর্ম্মস্থল ফোর্ট উইলিয়মে তিনি ঠাকুরদাসের জন্য একটি চাকুরীও ব্যবস্থা করেন। ঠাকুরদাস কিন্তু একটু কর্ম্মবিমুখ ছিলেন। তাঁর কবি-স্বভাব এজন্য দায়ী। এজন্য পিতা তাঁকে বহু তিরস্কারও করেছেন। তবু ফোর্ট উই-লিয়মে ঠাকুরদাসের চাকুরী দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এমন অবস্থার মধ্যেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার মৃত্যুকালে ঠাকুরদাসের বয়স ছিল ২৮।২৯ বৎসর। সমস্ত সংসারের ভার ঠাকুরদাস গ্রহণ করেন। কিন্তু ঠাকুরদাসের সঙ্গীত-পিপাসার নিবৃত্তি ঘটে না। সংসার-জীবনের মধ্য হতেই কবি-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াসও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। দীর্ঘ জীবনের সাধনার পর ৭৫ বৎসর বয়সে ১৮৮৩ সনে ঠাকুরদাস গঙ্গালাভ করেন। মৃত্যুকালে কবির দুই পুত্র ও এক কন্যা জীবিত ছিল। তাঁর পুত্রেরাও সঙ্গীত কবিতাদি লিখতেন—সে পরিচয়ও আছে। পৌত্র কিরণচন্দ্র দত্ত আজিও জীবিত। তিনি বাংলার সাহিত্যসেবার জগতে সুপরিচিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তিনি আজীবন জড়িত। কবি-পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত লিখিত 'উপাসনা'১ গ্রন্থে কবির একটি বংশলতাও আছে।

বহুশিক্ষা লাভ কিংবা চাকুরী গ্রহণ।
এসকলে ঠাকুরের না উঠিল মন॥
পিতৃসখা রাম বসু কবিদের মধ্যে।
পবিত্র করিল মন বাণীসুধারসে॥
কবিতা, পাঁচালী, যাত্রা, বাউল সঙ্গীত।
এ সকল আলাপনে হয় হরষিত॥
অসংখ্য পাঁচালী রচি কবিতা ও গান।
দেশে প্রচারিয়া পান অজস্র সম্মান॥
সুকবি সে দাশরায় সুধী কীর্তিমান।
যাঁহার পাঁচালী কাব্য নব অবদান॥
ঠাকুরদাসের কাব্য করি আস্বাদন।
'দাদা' বলি, 'কবি' বলি করেন বন্দন॥

এ যুগের বর্ষীয়ান কবি কিরণচন্দ্র১ তাঁর ঊর্ধ্বতন কবি-পুরুষ ঠাকুরদাসের উদ্দেশ্যে এই পরিচয় লিখে রেখেছেন। ঠাকুরদাসের কবি-জীবনের কীর্তিত অনেকগুলি পরিচয় উপরি-উক্ত ছত্রেই পাওয়া যাবে। এখানে অতঃপর সে কথাই বলা হবে। ঠাকুরদাসের আবির্ভাব কালের কথা আগেই বলা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সেই বহুখ্যাত কবিওয়ালা যুগেই ঠাকুরদাসও এসেছিলেন। তর্জা, যাত্রা, পাঁচালী, আখড়াই, টপ, কীর্তন সমস্তই কবি-সঙ্গীতের অন্তর্গত হলেও বিশেষ কবিগান বলতে যা বোঝা যায় তার পৃথক আলোচনারও প্রয়োজন আছে। ঠাকুরদাসের ক্ষেত্রে আমরা সেই নীতিই অনুসরণ করব। ১৭৬০ হতে ১৮৩০ পর্যন্ত কালই কবি-সাহিত্যের গৌরবময় যুগ। কিন্তু কবি-সাহিত্যের সমাপ্তি এখানেই ঘটে নি। এর পরেও উনিশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত এর ধারা অব্যাহত ছিল। তবু কবি-সাহিত্যের অবনতির যুগেই ঠাকুরদাস এসেছিলেন। ২৯৷৩০ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাস সত্যিকার সঙ্গীতাদি রচনা করতে থাকেন—এ প্রায় ১৮৩০-এর দিকেই। তবু তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে পূর্ববর্তী যুগের হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, রাম নৃসিং, ভবানী বণিক, রাম বসু প্রভৃতি অনেকেই জীবিত ছিলেন। কবিওয়ালা যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাম বসুর মৃত্যু ঘটে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। অনেকেই রাম বসুর মধ্যেই কবি-সঙ্গীতের অভ্যুদয় ও বিনষ্টির সূচনা-সঙ্কেত প্রত্যক্ষ করেছেন। হরুঠাকুর ও রাম বসুর রচনায় যে মুক্তিকাগন্ধিতার আভাস দেখা দেয়, পরবর্তী অপরিণত উত্তর-সূরীদের হাতে তার সমাধি রচনা হয়। আমাদের আলোচ্য ঠাকুরদাস দত্ত রাম বসুর মৃত্যুর দুই-এক বৎসর পরেই সখের দল গঠন করেন। হরুঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতির পর কবি-সঙ্গীতের স্রষ্টাদের অভাব ছিল না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কবি প্রায় কেউই ছিলেন না। অনুকরণ ও রুচির বিকৃতি কবি-সঙ্গীতের মর্যাদার আসন টলিয়েছিল। এই অসংখ্য কবিওয়ালাদের কল-কাকলিকে সমালোচক বলেছেন—It is, however, like the swarming of flies in the afternoon lethargy and fatigue of glorious day. তবুও এই কালেই যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁর নাম কোন সমালোচক বহু পূর্বেই করে গেছেন। ডক্টর সুশীল কুমার দে রাম বসুর পরবর্তী যুগের কবি-ওয়ালাদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

…for after 1830, Kabipoetry languished in the hands of the less inspired successors of Haru, Netai and Ram Basu. It continued upto 1880 to be a very populer form of entertainment, but rapidly declined, if not in quantity, at last in quality, of this belated Groups. Netai and Ramprasad Thakur. Anthony or Antonio the domicited Portuguse Songster, Thakurdas Singha, Thakurdas Chakraborty and Thakurdas Dutta and later on Gadhadhar Mukhopadhyay and even Iswar Gupta obtained considerable reputation as Kabiwalas or composer of Kabisongs,…2

কবিওয়ালা হিসাবে ঠাকুরদাস খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—গত যুগের কোন কোন সাহিত্য-পত্রিকাতেও তার সাক্ষ্য আছে। কবি বাল্যেই তৎকালীন কবিসঙ্গীতের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেন নি। কবির পিতা রামমোহনের সঙ্গে বিখ্যাত রাম বসুর সখ্যতা ছিল। রামমোহন রাম বসুকে মিতা বলতেন। সুতরাং পিতার কাছেই তিনি কবিসঙ্গীতের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের কথা শুনে থাকবেন। তদুপরি রাম বসুর প্রভাবও হয়ত তাঁর উপর বেশী হয়েছিল। যাহোক ঠাকুরদাস সে যুগের বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন—কিন্তু কবিওয়ালা হিসাবে ঠাকুরদাসের দানকে অনেকেই গণ্য করেন নি। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত প্রাচীন কবিসংগ্রহে, ১ম খণ্ড, ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭) কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন সঙ্গীতসংগ্রহে, ১৩০১ (১৮৯৪) ঠাকুরদাসের কোন কবিতাই স্থান লাভ করে নি। এই সকলন দুখানি কবিসঙ্গীত সংগ্রহ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতসংগ্রাহক দুর্গাদাস লাহিড়ীও ঠাকুরদাসকে স্পষ্ট করে কবিওয়ালা বলেন নি। তিনি

১। ঠাকুরদাস দত্তের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেন, লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের মৃত্যুর পর পুত্র হরিপদ দত্ত ও কিরণচন্দ্র দত্ত উক্ত সঙ্গীতগুলি 'উপাসনা' নামক গ্রন্থে সঙ্কলন করেন।

২। Bengali Literature in the Nineteenth Century—Dr. S. K. De. p 383-84

ঠাকুরদাস সম্পর্কে লিখেছেন—'বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত রচনায় ইহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। শেষে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ইনি এক পাঁচালীর দল করেন।'[৩] স্বর্গীয় হরিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'বাংলা ভাষার লেখক' গ্রন্থে ঠাকুরদাসের জীবনকথা আলোচনা করেছেন—তিনিও ঠাকুরদাসকে কবিসঙ্গীতের স্রষ্টা হিসাবে উল্লেখ করেন নি।[৪] হরু ঠাকুর রাম বসু প্রভৃতি যে অর্থে কবিসঙ্গীতের স্রষ্টা—ঠাকুরদাসকে সেই পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। ঠাকুরদাস কেবলমাত্র কবির দলের জন্য গানই বাঁধতেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন দল ছিল না—নিজে গাইতেনও না। এ সম্পর্কে ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় লিখেছেন—'তিনি জীবনে কখনও কবি দল গঠন ও গাওনা করেন নাই। তিনি শেষ বয়স পর্য্যন্ত গান রচনা করিয়া বিভিন্ন কবিওয়ালাকে দান করিতেন, তাহারা আগ্রহের সহিত তৎসমুদয় নিজ নিজ দলে গাওনা করিতেন। ঠাকুরদাসের প্রধান গৌরব পাঁচালীর গান। তিনি পাঁচালীর এক দল গঠন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই গাওনা করিতেন। এই কারণে তাঁহার পৃথক কবির দল করা ঘটে নাই। ঠাকুরদাস কবির দল না করিলেও যে সকল কবিগান রচনা করিয়াছিলেন তাহা কবিত্ব-গৌরবে বিশেষ সমৃদ্ধশালী।'[৫] সেকালে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সুকবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ কোন কবির দলে তাঁর সঙ্গীত শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ঠাকুরদাসকে Indian Bird বলতেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখেছেন—'তিনি হরুঠাকুরাদির ন্যায় গীতকর্ত্তা।' কবিগান বাংলা সাহিত্যের জাতীয় সম্পদ। কবিগানের মধ্যেই অন্তর্মুখী সাহিত্য-চেতনার প্রথম আভাস সূচিত হয় এবং পরবর্ত্তী গীতিকাব্য সাহিত্যের উৎসমুখ খুলিয়া দেয়। এই সুখ্যাত কবিগীতি সাহিত্যে ঠাকুরদাসের দান ছিল অনেক, এর পরিপুষ্টির জন্য তাঁর প্রাণান্ত প্রয়াসের অন্ত ছিল না। ঠাকুরদাসের কবিগীতিগুলি এক সময়ে লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরত। কিন্তু কবিওয়ালা যুগের অধিকাংশ কবির ভাগ্যে যে অনন্ত বিস্মৃতির যবনিকা পড়েছিল—ঠাকুরদাসও তার বাইরে ছিলেন না। তাঁর দু' একটি গীতি আজও পাওয়া যায়—অধিকাংশই লুপ্তপ্রায়—কিছু কিছু অপরের নামে প্রচারিত। তাঁর 'গীতমালা' নামক একখানি সঙ্গীত-সংকলন ছিল। আজ তাহাও প্রায় অলভ্য হয়ে পড়েছে।

ঠাকুরদাস দত্তের প্রধান গৌরব পাঁচালীগান। ব্যাপক অর্থে, পাঁচালী, ঢপ, কৃষ্ণযাত্রা কবিসঙ্গীতের অন্তর্গত। কবিওয়ালাদের মত একই সমাজ পরিবেশে এগুলি রচিত। পাঁচালীর রচয়িতারাও অশিক্ষিত। প্রাচীন ভারত পাঁচালী, রামায়ণ পাঁচালী, মঙ্গল পাঁচালী প্রভৃতি নূপুর, মন্দিরা, চামর সহযোগে গীত হ'ত। কিন্তু এই প্রকার পাঁচালী পরবর্ত্তীকালে পরিবর্ত্তিত হ'ল। পাঁচালী হ'ল কীর্ত্তনাশ্রয়ী। এখানে কাহিনী বিভিন্ন পালায় বিভক্ত করা হ'ত এবং অনেকটা নাটকের মত উপস্থাপিত হ'ত। মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান এই প্রকার পাঁচালীর প্রবর্ত্তক। একে ঢপ কীর্ত্তন বলা হ'ত। মধুসূদন কিন্নর অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ দাশরথি রায় এই ঢপ কীর্ত্তনকে আরও মার্জ্জিত করেন। মধুসূদনের পরিণততর রূপ দাশরথি রায়ের পাঁচালী। পালা পাঁচালী রচনায় দাশরথির তুল্য সে যুগে কেউই জন্মগ্রহণ করেন নি। ঠাকুরদাস এই দাশরথি রায় অপেক্ষা কয়েক বৎসর বড় ছিলেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় দাশরথির জন্মকাল ১২১১ সাল (ইংরেজী ১৮০৪) নির্ণয় করেছেন। কোন কোন স্থলে দাশরথির জীবংকাল ১৮০৬-১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ দেখা যায়। দাশরথিতেই পাঁচালীর উৎপত্তি ও শেষ এমন মত বিভিন্ন স্থলে দেখা যায়। নবাধরণের পাঁচালী যিনি প্রথম প্রবর্ত্তন করেন—তাঁর নাম গঙ্গানারায়ণ লস্কর। তার পরে রামপ্রসাদ ও দাশরথি রায়। যাহা হউক দাশরথির চরম খ্যাতির মধ্যে ঠাকুরদাসও অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। দাশরথি ঠাকুরদাসের পাঁচালীকাব্য আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন—এবং ঠাকুরদাসকে দাদা বলে ডাকতেন। দাশরথির প্রভাব ঠাকুরদাসের উপর পড়েছিল—আবার অনেকক্ষেত্রে ঠাকুরদাসের নূতনত্বও ছিল। যথাস্থানে সে কথা বলা হবে। ঠাকুরদাসের উপর দাশরথির প্রভাবের কথা ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ও উল্লেখ করেছেন।

"But of these mysterious figuers, nothing Practically is known and no Specimen of Production has come down to us. After Dasu Roy, came Sannyasi Chakrabarti, Nabin Chakrabarti, Rasik Roy, Thakurdas Dutta, Gobardhan Das, Keshab Chand, Nanilal, Jadu Ghose and a host of others who were more or less followers and imitators, of Dasurathi Roy···"[৬] সেকালে কবির দলের মত ঠাকুরদাস নিজে পাঁচালীর দল গঠন করেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে এই দল পেশাদারী দলে পরিণত হয়। এই দলের জন্যই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ···ঠাকুরদাসের পাঁচালী সম্পর্কে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"ঠাকুরদাস স্বয়ং এক পাঁচালীর দল করেন। অতি অল্পদিনেই এই পাঁচালীর দলের সুখ্যাতি বহুবিস্তৃত হইয়া পড়ে। বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ীতে, সাতক্ষীরা, উলা, বড়িষা, গঙ্গা, মালঞ্চ, কলিকাতা, পাইকপাড়া, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, হালিসহর, বাঁশবেড়িয়া, তারকেশ্বর প্রভৃতি বহুস্থানে এই পাঁচালীর গাহনা হয়। কবি ঠাকুরদাস সর্ব্বত্রই অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি

৩। বাঙালীর গান—পৃঃ ৪২৯

৪। 'ইনি অন্যতম প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার, বহু যাত্রা সম্প্রদায়ের নানাবিধ পালা রচয়িতা'—বঙ্গভাষার লেখক।

৫। নব্য ভারত—১৩১২, চৈত্র।

৬। History of Bengali Literature in the Nineteenth Century—Dr. S. K. De. P 441.

মার্কণ্ডের চণ্ডী, রামের দেশাগমন, অক্রুর আগমন, শিববিবাহ, দান, মাথুর, মান, পারিজাত হরণ, ধ্রুবচরিত্র এবং প্রেম-বিরহাদি নানা বিষয়ক পালা রচনা করেন।৭

ঠাকুরদাসের পাঁচালীর দুটি দিক ছড়া ও গীত। ঠাকুরদাসের পাঁচালী দাশরথি রায়ের অনুযায়ী ছিল কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর নূতনত্ব ছিল—সেই নূতনত্বের কথা উল্লেখ করেছেন ব্রজসুন্দর সান্যাল। 'কবির দলের লড়াইয়ের অনুরূপ ঠাকুরদাস পাঁচালী দলে লড়াইয়ের সূত্রপাত করেন। নানা স্থানে নানা দলের সহিত তাঁহার কবি-লড়ই হইয়াছে। কিন্তু অতি অল্প স্থানেই তিনি প্রতিপক্ষ কর্তৃক পরাজিত হইতেন।'৮ ঠাকুরদাস নিজের দলের জন্য গান বাঁধতেন এ ছাড়া হাওড়া বাকসাড়ার পাঁচালীর দলে এবং সিঁথির সখের দলের জন্যও গান বেঁধে দিতেন। ঠাকুরদাস পাঁচালীকার হিসাবে বেশ বড় ও খ্যাতিমান ছিলেন, কিন্তু তাঁর পাঁচালীর পালাগুলি আজ আর পাওয়া যায় না। পাঁচালীকার ঠাকুরদাস সম্বন্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ব্যোমকেশ মুস্তফী।৯

ঠাকুরদাস দত্ত যাত্রাদলের রচয়িতা হিসাবেও তৎকালে খ্যাতি অর্জন করেন। ঠাকুরদাসের পূর্বেই বিদ্যাসুন্দরের পালা দেশে খুব প্রচলিত ছিল। বিশেষ গোপাল উড়ের গাওনা খুব বিখ্যাত ছিল। ঠাকুরদাস বিদ্যাসুন্দরের গানে খুব অনুপ্রাণিত হন। বিদ্যাসুন্দরের পালা দিয়েই তিনি তাঁর কবিজীবনের সূচনা করেন। পিতার মৃত্যুর পর ২৯।৩০ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম সখের দল খোলেন। এই দল তিন বৎসর চলে। সখের দলের জন্য বিদ্যাসুন্দর পালা ব্যতীতও তিনি হরিশ্চন্দ্র, কমলবরঞ্জন, শ্রীবৎসচিন্তা এই পালা কয়খানি রচনা করেন। কিন্তু এখানেই তাঁর পালা রচনার শেষ নয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পেশাদারী দলের জন্য তিনি কয়খানি পালা রচনা করেন। তাঁর পালার বিষয়-বস্তু অধিকাংশই বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি হতে গৃহীত। নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন, শ্রীমন্তের মশান, রাবণবধ, অক্রুর আগমন, দুর্গামঙ্গল, লবকুশের পালা, রামচন্দ্রের দেশাগমন, তাঁর অসংখ্য রচিত পালার মধ্যে কয়েকখানি মাত্র। সেকালে হাড়কাটার দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, লোকনাথ দাস, কালীনাথ হালদারই বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা হিসাবে খুব খ্যাতি অর্জন করেন। লোকনাথ দাস ও কালীনাথ হালদারই বিখ্যাত লোকা-ধোপা ও কালী হালদার। ঠাকুরদাসের রচনার গুণেই তাঁদের এত খ্যাতি। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি সেকালের গণ্যমান্য লোকের বাড়ীতে গাহনা এই সমস্ত দলের একচেটিয়া ছিল। ঠাকুরদাস বিদ্যাসুন্দরের পালায় খেউড় বর্জন করেন। সেকালের দূষিত আবহাওয়ায় শ্লীল ও শুচির প্রতি তাঁর এই পক্ষপাত বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয়। কত বিভিন্ন স্থলের পেশাদারী দলের জন্য তিনি পালা রচনা করতেন তার পরিচয় ব্যোমকেশ মুস্তফী ও হরিমোহন মুখোপাধ্যায় উভয়েই দিয়েছেন। সেকালের যাত্রা ও পালা রচনায় ঠাকুরদাস দত্তের এ ভূমিকা বড় কম নয়। বাংলার নাট্য সাহিত্যের বিবর্ত্তনে এই যাত্রা স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল। যাত্রা সাহিত্য সুপ্রাচীন। এর সূচনা কবিসঙ্গীতের বহু পূর্ব্বেই হয়েছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের বিবিধার্থ সংগ্রহে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেখেন—'গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে 'কবির' হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে 'যাত্রা' বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল।'১০ ঠাকুরদাসের কালে এই যাত্রা নূতন ছিল না। তবু ঠাকুরদাসের এই অজস্র পালা রচনার জন্য সে যুগের সমাজ দায়ী ছিল। বাংলার সমাজ তখন দুভাগে বিভক্ত ছিল। একদিকে গ্রামীন জীবনের মূল্যবোধ কমছে—অন্যদিকে নগর-সভ্যতার অগ্রগতি। তবু সে যুগের সমাজের বিলীয়মান গ্রাম-জীবনের জন্য আমাদের সাহিত্য উপকৃত। জারি, সারি, প্রভৃতির সঙ্গে 'যাত্রাগান'ও সে যুগে উদ্ভূত হয়েছিল। ঘটনা-প্রধান নাট্য রচনার জন্য বাংলার জাতীয় স্বভাব অনুকূল নয়। প্রবল ভাবাবেগ ও আত্মগত উচ্ছ্বাসই বাঙালী স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই বাংলার গদ্য কাব্যলক্ষণাক্রান্ত। ঠাকুরদাসের পালাগুলি এই স্বভাবের বহির্ভূত নয়। শহরের রুচি-বিপ্লবের ফলে গ্রাম-বাংলা অকালে গঙ্গালাভ করল। নগর হ'ল প্রধান। ফলে গ্রামীন সমাজের জন্য সৃষ্ট যাত্রাও ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে নেমে এল। যাত্রার মৃত্যু-তোরণ দিয়েই এল নূতন মঞ্চাশ্রয়ী নাটক। যাত্রা স্বভাবের প্রবল অস্বীকৃতির মধ্যে আধুনিক নাটকের সূচনা হলেও মঞ্চে মঞ্চে যাত্রা স্বভাবকে বরণ করেই নাটকে তার যথার্থ প্রতিষ্ঠা। বাংলার নাট্য সাহিত্যের বিবর্ত্তনে যাত্রা পালা রচনার বিশেষ মূল্য আছে। একদা ঠাকুরদাস এই যাত্রা সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধন করেন—আজ সেকথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে।

"ঠাকুরদাস হরুঠাকুরাদির ন্যায় গীতকর্ত্তা, দাশরথি রায়াদির ন্যায় পাঁচালিকর্ত্তা এবং গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির ন্যায় যাত্রার সাট (পালা) রচয়িতা ছিলেন।" বাউল সঙ্গীত ও হাস্যরসের সঙ্গীত রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাঁচালি, যাত্রাপালা এবং সখের কবিদলের জন্য তাঁর অসংখ্য রচনার কথা উল্লেখ করেছি। সেই সমস্ত রচনার দু-একটি গীতিখণ্ড তাঁর কবি-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর 'গীতমালায়' কিছু কিছু সঙ্গীত ছিল, দুর্গাদাস লাহিড়ীর 'বাঙালীর গান' গ্রন্থে ঠাকুরদাসের ছয়টি গান মাত্র সংগৃহীত আছে। কবি-পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের 'উপাসনা' গ্রন্থে ঠাকুরদাসের এগারটি গান সঙ্কলিত হয়েছে। ব্যোমকেশ মুস্তফী সাহিত্য ও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় কিছুসংখ্যক গান উদ্ধৃত করেছেন। এগুলি 'উপাসনায়' সংগৃহীত গানগুলির সহিত প্রায়

৭। বঙ্গভাষার লেখক।

৮। নব্যভারত—১৩১২ চৈত্র।

৯। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩০৫। সাহিত্য, ঊনবিংশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা

১০। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

মিলে যায়। এ ছাড়া যমুনা মাসিক পত্রিকা শিবরতন মিত্রের সাহিত্যসেবক চরিতাভিধানে ঠাকুরদাসের আরও দু-একটি সঙ্গীতের সন্ধান মেলে। বাকি সমস্তই বিস্মৃতির পথে। এখানে ঠাকুরদাসী সাহিত্যের নিদর্শনস্বরূপ দু-একটি গান উদ্ধৃত করছি। গুণাগুণের বিচারের ভার পাঠকদের উপর।

১

কবির স্বভাব বর্ণনা :

যা জান তাই কর নাথ আমি ত চলিলাম জলে
বড় লজ্জা পাবে হরিদাসী তোমার লজ্জা পেলে।
চললাম লয়ে ছিদ্রঘটে যদি কোন ছিদ্র ঘটে
গলেতে ঘট বেঁধে ঘাটে ত্যজিব প্রাণ কৃষ্ণ বলে
একে বুদ্ধি শূন্য ঘটে অঘটন ঘটনা ঘটে
যদি পড়ি হে সঙ্কটে দেখ হে সে সময়,—
কমলিনীর হৃদ কমলে দাঁড়াও একবার বামে হেলে
দেখে যাই যমুনার জলে দেখি কি ঘটে কপালে।

২

রূপক ও অনুপ্রাস :

ওহে কেশব এ সব কত সব আর
অধীন জনেরে কেন করা নমস্কার
দাসীর দায়ে দাসত্ব করা এতে কি প্রাণ যায় হে ধরা
জীবের জন্য হরির ভরা করা অঙ্গীকার
চলহে মান থাকে যাতে কাজ কি এ ছার পারিজাতে,
মাগা ফুলের দাগা চিতে জ্বলবে অনিবার।

এর শেষ লাইনটি সেকালের রসিক জনের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল।

৩

ধন দিয়ে কি এসেছ মন ছলতে
সামান্য ধন দিয়ে বল পরম ধন তুলতে।
শ্যামরূপ ত্রিভঙ্গ বাঁকা হৃদয়ে রয়েছে আঁকা
জল দিয়ে পাথরের লেখা পারবে না হে তুলতে।
সে ধনে ভক্তিকপাটে যতনে রেখেছি এঁটে
(আজি) ও কপাটে সে কপাটে পারবে না হে তুলতে।

৪

বিরহ বর্ণনা :

সইলো সইলো শৈলবক্ষে রইল বৃথা।
এ যুগ্ম গিরি ক্রমে হ'ল ভারি, যার ভার সে ত নাহি সেথা।
যার করে করে এ দুঃখশান্তি কার করে পড়ে তার এ ভ্রান্তি,
ঐ ভেবে ক্ষয় হইল কান্তি, কারে বল বলি মনের কথা।
আর কে করিবে এর সুযতন, বিন্ধ্যাগিরির ন্যায় হয়েছে পতন
সে ত করে গেছে অগস্ত্যের গমন, ভূধরে রাখিয়ে ধরায় মাথা।

"একদা বিখ্যাত রাজা কান্তিচন্দ্র নিজে গাইতে গাইতে বলেন, এই গানটির রচয়িতাকে একবার আমাকে কেহ দেখাইতে পার।"[১১]

৫

প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা :

একরূপ প্রাণধন নয়
বহুরূপ বহুজন যে যা রূপ বেছে লয়।
পুরুষ প্রকৃতি প্রেমশশীর সম উদয়
যৌবন পূর্ণিমা'পরে কলাক্ষয় লোকে কয়।
কুসুম ফুটিলে যেমন বাসি হলে বাস ক্ষয়
নিশীথে সৌরভ যত প্রভাতেতে তত নয়।
জোয়ার ভাটার বারি কোনখানে স্থিতি যার,
ওলো ঠিকে প্রেমের মুখে আগুন কিছু সুখ দুখময়।
আর এক প্রেমেতে দেখ শঙ্কর সন্ন্যাসী হয়
সুখ ত্যজে শুকদেব গৃহবাসী কভু নয়।
ধ্রুব ধ্রুবজ্ঞানে এক প্রেমে হয়ে মত্ত
চরমেরি ধন পেলে পরম পদার্থ,
সেরূপ প্রেমেতে মন মজে যার যথার্থ
আপদ কি তার ঘটে ত্রিলোকে সুখ্যাতি রয়।

৬

ভক্তিমূলক রচনা :

তোর রাজার কি রাজ্য, করিস তার কি মাৎসর্য্য
আমার মায়ের ঐশ্বর্য্য বিভা জান জান না
বাসনা রাজ্যখণ্ড শুনরে পাষণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড আমার মায়ের বদনে
বিধি যার আজ্ঞাকারী কুবের যার ভাণ্ডারী
ত্রিপুরারী করেন মায়ের সাধনা।
চরণে দিলে বল ধরা যায় রসাতল,
মহাপ্রলয় হয় কেহ বাঁচে না।

তাঁর সব সঙ্গীতগুলি এখানে উদ্ধৃতি দেওয়ার ইচ্ছা করে। ঠাকুরদাসের আগামী ও বিরহ বিষয়ক গানগুলি মধুর ও মনোরম। স্থানাভাবে এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল না। তার "এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদল বাসিনী", "বল দেখি কলঙ্কে কি মানীর মান যায়। কমলে কণ্টক আছে লাগে কমলা পূজায়", অথবা "তোমরা কি দোষে দূষিছ বল কাল ভাল নয়", ইত্যাদি লাইনগুলি এদেশের সঙ্গীত সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। ঠাকুরদাসের গানে রাগ-রাগিনী সুরের পরিচয়ও লক্ষ্য করার মত। ললিত বিভাস—আড়াঠেকা, বিভাস-আড়াখেমটা, বাঁরোয়া-পোস্ত, একতালা প্রভৃতি সুর রাগিণীর উল্লেখ আছে। সমসাময়িক কালে যাত্রাগানের মধ্যে পশ্চিমা কায়দার তান করতব প্রবেশ করেছিল। কিন্তু এই পশ্চিমা ঢং বাঙালী যাত্রাওয়ালারা আপন করে নিলেন; প্রাচীন ঢং-এর বাংলা গানে ঐ সুর তালগুলির কত সুন্দর ও সঙ্গত প্রয়োগ হ'ত তা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। নিদর্শনস্বরূপ এখানে ঠাকুরদাসের কয়েকটি গানের উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করা গেল।

১১। নব্যভারত—১৩১২ চৈত্র।

ভারতচন্দ্র হতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যান্ত বাংলা সাহিত্যে প্রধানতঃ গানই মুখ্য। গানই এই শতাব্দীর সাহিত্য। এই দীর্ঘকালের সাহিত্য-সাধনাকে কেহ কেহ 'অপরিণত' বলেছেন। বহু প্রতিভা-শালী পুরুষ ও অজ্ঞাতনামা কবি গীতিরচনা ও গানের মোহিনীশক্তি দিয়ে আমাদের সেদিনকার রসলোলুপতাকে সঞ্জীবিত করেছিলেন। বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্য এঁদের কাছে ঋণী। এঁদের প্রতিষ্ঠা-ভূমির উপর এখনও আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এঁরা গোধূলিলগ্নে পঙ্গপালের মত আকাশ মসীলিপ্ত করে নি। এঁদের আবির্ভাব স্বাভাবিক। তবু সে যুগের সাধনা ভাবনার মূল্য সমষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই শত শত অজ্ঞাতনামা বিস্মৃতপ্রায় যুগ-শিল্পীকে পৃথকভাবে বিচারের সুবিধা নেই। প্রত্যেকেই একে অপরের পরিপূরক। এঁদের সমষ্টির প্রয়াস ছিল আলোক উৎসাভিমুখী। তাই কবি-সাহিত্য আজ ইতিহাসের সজীব সামগ্রী। ইতিহাসের দিক থেকেই সেই যুগ-শিল্পীদের ইতিহাসেরও প্রয়োজন আছে। এঁদের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস ও কিম্বদন্তীর সূত্রগুলি আজ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পরীক্ষা ও আহরণ করার প্রয়োজন আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ঠাকুরদাসের এই জীবন-কথাটুকুরও প্রয়োজন। বিস্মৃতপ্রায় ঠাকুরদাস দত্তের লুপ্তপ্রায় রচনাবাজি আধুনিক যুগে আলোক-স্নান করতে পেলে সাহিত্যের গৌরবই বাড়বে।

মথুরায় মাধব

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

বাঁশী-বাজানোর দিনগুলি গেল কোথা!
ধেনু-চরানোর—হাসি-ছড়ানোর দিন।
ধূসর সহর—মথুরার রুক্ষতা
মাধবের মন বেদনায় বিমলমিলন
করিয়া তোলে যে; কোথা পথ ফিরিবার?
দেয়ালে দেয়ালে ছায়া পড়ে বেদনার।

২

কংসপুরীর ধোঁয়াটে গুমোট ঘিরে
অসুর-দাপটে সুরহারা হেথা সবি।
কানু-মনে ভাসে ফিরে ফিরে আঁখি-নীরে
বৃন্দাবনের—যমুনার জলছবি,—
বাঁশরী-বাজানো পুলকিত নীপ-ছায়া,
হারানো হিয়ার বিবাগী ব্যথার মায়া।

৩

কংস পুরীর কপাটের খিল খুলে
কিশোর-বেলার স্বপন-মাখানো দেশে
ফিরিবার পথ কানু বুঝি গেছে ভুলে!
যমুনার স্মৃতি তাই বুঝি বুকে এসে
মাথা কুটে মরে নীরস কাজেরও ফাঁকে!
অতীত কেবলই ইসারায় শুধু ডাকে!

কোথা যশোদার বৎসল বাহু-ডোর,
সখ্য-রসের আবেশের অবদান!
শ্রীমতী-গাহনে, গাগরী-ভরণে ভোর,—
কোথা সে যমুনা, প্রীতি-পুলকিত প্রাণ?
মথুরায় কানু ভাসিছে নয়ন-নীরে;—
হারায়ে ফেলেছে গোকুলের পথটিরে।

৫

গোকুলের স্মৃতি যতই মধুর হোক,
মথুরায় এলে হারায় ফেরারও পথ,
কিশোর-বেলার স্মৃতি-মাখা রসলোক
যদিও কাঁদায়, তবুও জীবন-রথ
দূর-দ্বারাবতী দুয়ারের দিকে ধায়;—
কিশোর-মাধুরী গুঁড়ায়ে গুঁড়ায়ে যায়।

৬

দূর-দ্বারাবতী—জীবন সাগর-তীরে,—
ঊর্ম্মিমুখর—দুস্তর বারি-রাশি
বাঁশী-বাজানোর কিশোরী-কালিন্দীরে;
সব মাধুরীরে তিমিরে ফেলিবে গ্রাসি।
মিলনে-বিরহে এই মত চিরন্তরে
মুসাফির পথই উঠিবে জীবনে গড়ে।

৭

বাঁশী-বাজানোর দিনগুলি অবসিত,
ধেনু-চরানোর—হাসি-ছড়ানোর দিন।
যে কিশোর গত, যদি তা ফিরায়ে দিত!
মাধবের মন বেদনায় বিমলিন;
জড়ায়ে যেতেছে হাজার কঠোর কাজে;
ভাল লাগিবে না, ভাল মোটে লাগে না যে।

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

হিন্দু বাঙালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার্ষিক উৎসব দুর্গাপূজা সম্প্রতি হয়ে গিয়েছে। যাঁরা শহরে থাকেন, প্রস্তুতি থেকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত আগাগোড়া দেখেছেন ও অনুভব করেছেন। খবরের কাগজে সকলেই পড়েছেন লাখবিশেক টাকা নাকি কেবল কলিকাতার সর্ব্বজনীন (সার্ব্বজনীন ?) পূজায় খরচ হয়েছে, পূজার সংখ্যা নাকি আগের বছরের চেয়ে এবার কিছু কম হয়েছিল।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এই রকমের পূজাগুলি এখন একটা প্রতিযোগিতার ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ আড়ম্বরের প্রতিযোগিতা। আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের কৈশোরে ও যৌবনে, গ্রামাঞ্চলে পূজা, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে লোকসেবায়, দরিদ্রদিগকে দান ও ভোজনাদি করানোর ব্যাপারে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখেছি। পূজায় প্রতিমা সজ্জায় কিছু বেশী ব্যয় করাও মাঝে মাঝে নজরে কখনও পড়ে নি এমন নয়, কিন্তু এমন "চ্যালেঞ্জ" করার ভাব, এ রকমের বিষয়ে দেখি নি। দেখেছি, কয়দিনব্যাপী অকাতরে অন্নদান, সময়ে সময়ে বস্ত্রদান, নিতান্ত নিঃস্বজনের সঙ্গেও অন্তরঙ্গতা। তাতেই ছিল উৎসবের আনন্দ, উৎসবের কর্ম্মকর্তাদের তৃপ্তি। সে চিত্রের বিস্তৃত বিবরণ দেবার ইচ্ছা থাকলেও এখন তার ক্ষেত্র নয়।

শহরের "সর্ব্বজনীন" পূজা, "সর্ব্বজনের" পূজা। কেননা, সর্ব্বজনের কাছে "ট্যাক্স" নিয়েই ত এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ পূজা "সার্ব্বজনীন" হলে না জানি, আরও কত সুন্দর হয়, যদি এ উৎসব "সর্ব্বজনের জন্য" হয়। গ্রামাঞ্চলে সেদিনের পূজা তাই ছিল। আজও মন থেকে সে স্মৃতি মুছে যায় নি। এখনকার পূজা ও উৎসব যেন একটা প্রদর্শনীর রূপ নিয়েছে। এর মধ্যে যদি কিছু কল্যাণ নিহিত থাকে, তবে তা যাদের তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। আঞ্চলিক অধিবাসীরা চাঁদার চিন্তায় চিন্তাগ্রস্ত, কর্ত্তৃপক্ষ, কর্ম্মিগণ আদায়ী অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ও তার সদ্গতির পরিকল্পনা রচনায় বিভোর। 'সার্ব্বজনীনতা' শুধু এই দুই জাতীয় দলের মধ্যেই আবদ্ধ, একথা বললে অবশ্য ঠিক বলা হবে না। প্রদর্শনীতে (পূজামণ্ডপে) কে কি অপরকে দেখাবে, দেখাবারই বা কার কি আছে, তারও পরিকল্পনা রচনা করতে অবশ্য হয়।

কিন্তু কাল নিতান্তই দ্রুতগতি ও পরিবর্ত্তনশীল। রাষ্ট্রের ও সমাজের প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটেছে ও ঘটছে: পুরাতন সংস্কার-চিন্তা-ঐতিহ্য, এটম্ বোমার দাপটে হিরোসিমা নিশ্চিহ্ন হওয়ার মতই নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে। সব ব্যাপারেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটছে। আত্মকেন্দ্রিকতা আমাদের মনকে দ্রুত আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সমাজে ও পরিবারে যে ভাঙনের পরিবর্ত্তন এসে গিয়েছে, সে ত আত্মকেন্দ্রিকতারই ফলে। এই ভাবপ্রবাহ থেকে আজ আর কারুরই রেহাই নেই। শহরে-পল্লীতে খুব ঘনিষ্ঠতা ঘটার সুযোগ নানাভাবে আসার ফলে আজ আর 'পুরবাসী' ও 'জনপদবাসীদের' মধ্যে পূর্ব্বেকার দিনের পার্থক্য বর্ত্তমান নেই। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 'রসদ' সংগ্রহের পথগুলি শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সম্পূর্ণ ভাবে একপ্রকারের না হলেও অনেকগুলি সাধারণ বটে। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে, গ্রামাঞ্চলেও দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন ঘটবে। তাই আজ আর 'যগ্যি বাঁড়ী'র (যজ্ঞবাটী) পুরাতন দৃশ্য সহসা দেখবার আশা করা বৃথা।

গত কয়েক বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে, দুর্গাপূজার প্রতিমা নির্ম্মাণে 'কলা'র পরিচয় দেবার চেষ্টারও 'প্রতিযোগিতা' চলছে। ধ্যানোল্লিখিত দেবীমূর্ত্তি 'সর্ব্বজনীন' পূজায় দেখা যায় না। মা সরস্বতীরও কত না রকমের মূর্ত্তি গড়া হচ্ছে। মা কালীর উপর এখনও ততটা কেরামতি দেখাবার চেষ্টা নজরে পড়ছে না বটে, তবে 'আর্টিষ্ট'রা যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চেষ্ট আছেন, সেটা ঠিক ভাবা যাচ্ছে না। এবার একদিন কলিকাতায় একটা রাজপথে, কালীপূজার আগের দিন, একখানি বিরাট কালীমূর্ত্তিকে কোনও এক পূজামণ্ডপে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখা গিয়েছিল বাহকদের স্কন্ধে একটা বেশ বড় ময়াল সাপ। সেটিকে নাকি দেবীপ্রতিমার মহাদেবের গায়ের উপর রাখা হবে, যাতে মহাদেবকে কতকটা আসল মহাদেব বলে মনে হয়।

গ্রামের সর্ব্বজনীন দুর্গাপূজার ব্যাপারে অবশ্যই শহরের অনুকরণে চলবার চেষ্টা হয়। পারিবারিক পূজা, যা কোন

কোনও ক্ষেত্রে দু'তিনশ' বছরের পুরনো, একেবারে প্রাণহীন হয়ে গিয়েছে। যাঁদের 'প্রাণে'র জন্য ঐসব পূজা প্রাণবস্তু ছিল, তাঁরা আজ আর কেউ জীবিত নেই। বংশধরেরা নূতন ভাবধারায় বিশ্বাসী; তাঁরা আর 'শহর থেকে দূরে' নেই। জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদ ও মধ্যস্বত্ব বিলোপের ফলে গ্রামের সঙ্গে এঁদের সংস্রব থাকার কথা নয়। কাজেই গ্রামের পারিবারিক পূজার পুরনো ঐতিহ্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, গ্রামেও এখনও সার্ব্বজনীন পূজাই চলবে। গ্রামে অবশ্য বেশী টাকা সংগ্রহ করার সম্ভাবনা নেই, তাই আড়ম্বরের মাত্রাও কম। তবু কিন্তু স্বীকার করতে হয় যে, এদিকে যুবকদের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এখানেও 'আর্ট' ভেবে প্রতিমা নির্ম্মাণ হচ্ছে, যেটুকু সাধ্য সেটুকু দিয়ে শহরের অনুকরণ করার প্রবল চেষ্টা চলছে, এটা বেশ বুঝা যায়।

এখন গ্রামের কথা অতি সংক্ষেপে বলছি। আমার গ্রামাঞ্চলে এবার অনাবৃষ্টির কারণে ধানচাষ একেবারে হয় নি, পোকার উপদ্রবে পাট ভাল হয় নি; পুকুর ডোবা একেবারে শুষ্ক, তাই সেচের অভাবে আলু, কফি প্রভৃতি লাভজনক তরকারীর চাষ সবক্ষেত্রে কতটা সম্ভব হবে জানি না। তবে সম্প্রতি স্থানে স্থানে 'কানা' দামোদর থেকে সেচের জন্য জল পাওয়া গেছে। সরকার বাহাদুর 'টেষ্ট রিলিফ' কার্য্য করাচ্ছেন বলেই অনাহারে কারোর মরার খবর এখনও পাই নি। ফলে এবারকার দুর্গোৎসব ঠিক "উৎসব" হয়ে উঠতে পারে নি। যারা পেটের অন্নই জোগাড় করতে পারে না, তারা কি করে ছেলেমেয়েদের নূতন কাপড়-জামা কিনে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাবে? চারিদিকেই দারিদ্র্য ও মালিন্যের ছাপ দেখা গিয়েছিল। অন্যবারের ন্যায় আমার গ্রামে পারিবারিক পূজা পাঁচখানি এবং সর্ব্বজনীন পূজা তিনখানি এবার হয়েছিল। সর্ব্বজনীন পূজার কাহিনী সবই শহরের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। পারিবারিক পূজাগুলির মধ্যে, অপেক্ষাকৃত নূতন একটি ক্ষেত্রে পুরনো দিনের পূজার কিছুটা ছবি দেখা গিয়েছিল, শুধু গভীর অন্তরঙ্গতার ভাবটা ঠিক আগের যুগের মত ফুটে উঠতে দেখা যায় নি বলে যেন মনে হ'ল।

চালের দাম আমার গ্রামাঞ্চলে এখনও পঁচিশ-ত্রিশ টাকা মণ; এর কমে পাওয়া যায় না। সরকার বাহাদুর এই অঞ্চলে কিছুটা 'মডিফায়েড রেশনিং' প্রথা চালু করবার চেষ্টা করছেন। এ চেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়; এই রেশনিংকে আরও ব্যাপকভাবে চালানোর দরকার। সরকার বাহাদুর এ বিষয়ে তৎপর আছেন, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

কন্ট্রোলের যুগে শত শত বস্তা বোঝাই সাদা ছোট সাইজের কাঁকর রেলযোগে আমদানী হতে দেখা গিয়েছিল। ভিজে বালি চালে মেশানো বহু লোকই প্রত্যক্ষ করেছেন। ভিজে মাটির মেঝেয় চাল ঢেলে রেখে পরে ঐ চাল বিক্রয় করা অতি সাধারণ ঘটনা। এবার আর একটা গুজব শুনলাম, এই গুজবের ভিত্তি কি জানি না; সম্প্রতি একজন সরকারের নিযুক্ত খাদ্যশস্য ডিলারের সরকার প্রদত্ত কোটা মালের, (চাউল, গম, আটা, ময়দা) চালানের মধ্যে একবস্তা (ড্র'মণ) 'বিশুদ্ধ' ধুলো পাওয়া গিয়েছিল।

এবার দুর্গোৎসব আশ্বিন মাসে না হয়ে কার্ত্তিক মাসে হওয়ার ফলে স্কুল-কলেজগুলি খুলতে দেরি হয়েছে। তবে স্কুলগুলির পক্ষে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না এই কারণে যে, এখন আর বার্ষিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে হচ্ছে না। তার বদলে মার্চ্চ মাসে বার্ষিক পরীক্ষা এবং এপ্রিল মাস হতে নববর্ষ আরম্ভের ব্যবস্থা হয়েছে।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকশিক্ষিকা সংগ্রহের সমস্যায় কোনও সমাধানের আশা দেখা যাচ্ছে না। প্রারম্ভিক বেতনের হার বিশেষ ভাবে না বাড়ালে গ্রামাঞ্চলের ঐ জাতীয় বিদ্যালয়গুলির পক্ষে যোগ্য শিক্ষক সংগ্রহের সকল রকম প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ ছাড়া তাঁদের জন্যে উপযুক্ত বাসগৃহেরও দরকার।

সরকার বাহাদুর প্রচার করেছেন, ভারত নাকি কাঁচা পাটের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। কাজেই মিলমালিক, যোগানদার এবং বড় ব্যবসায়ীরা একযোগে পাটের দামকে আর কিছুতেই বাড়তে দিচ্ছে না; অর্থাৎ চাষীকে লোকসান করে পাট বেচতে হচ্ছে। ফলং, কৃষকের বিশেষ আর্থিক দুর্গতি।

এখন আবার প্রচার করা হচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় আমন ধানের ফলন নাকি খুব ভাল হয়েছে। এর ফলে অবস্থা কি দাঁড়ায় পরে বোঝা যাবে।

আবার দুর্গোৎসবের কথা বলে শেষ করি। সহর ও পল্লীর বার্ত্তমান সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কি সত্যই আনন্দের, না সর্ব্বজনের দুঃখ কষ্ট ভোলবার সাময়িক প্রচেষ্টা?

বিভিন্ন দর্শনে সমবায়

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

"বিভিন্ন দর্শনে সমবায়" বিষয়ে সুষ্ঠু আলোচনা করিতে গেলেই তৎপূর্বে প্রাচীন ও নব্য ন্যায়শাস্ত্রের 'সমবায়' বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন প্রয়োজন। গৌতম সূত্রের ১ম অধ্যায় ৪র্থ সূত্রে বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে গুরুত্ব প্রমাণ, প্রত্যক্ষের কথা বলা হইয়াছে। বাৎস্যায়ন এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"অক্ষমক্ষস্য প্রতি বিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্। বৃত্তিস্তু সন্নিকর্ষো জ্ঞানোবা।" প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যখন স্ব স্ব বিষয়ে সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হয় তখন যে অভ্রান্ত ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে ইন্দ্রিয়, বিষয়, সন্নিকর্ষ ও জ্ঞান এই চারিটি জিনিস থাকে। ইন্দ্রিয় ও বিষয় বা বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ অর্থাৎ সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার—(১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত সমবায়, (৩) সংযুক্ত সমবেত, (৪) সমবায়, (৫) সমবেত সমবায় ও (৬) বিশেষণতা। প্রথমে আমরা যখন ঘট দেখি তাহার নাম সংযোগ, আমরা ঘটের বর্ণ দেখি তখন সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধ ঘটে। যখন আমরা ঘটটির বর্ণ কি শ্রেণীর জানি, তাহা লাল, নীল বা সাদা, তখন সংযুক্ত সমবেত সমবায় সম্বন্ধ ঘটে। বর্ণের দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। শব্দ ও কর্ণপটাহের যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলা হয়। আমরা যখন শব্দ শোনার পর শব্দের জাতি অর্থাৎ শব্দটি ঝড়ের না সমুদ্রের সন্ধিজনিত তাহা জানিতে পারি তখন সেই জানাকে সমবেত সমবায় সংস্পর্শ বলে। আমরা অনেক পদার্থও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; ভূতলে চক্ষু সংযোগ করিয়াই বলিতে পারি যে, এখানে সর্প নাই, এইরূপ অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ তাহাকে বিশেষণতা বলে।

এই আলোচনা হইতে জানিতে পারি যে, সন্নিকর্ষজনিত সম্বন্ধ হইতে 'সমবায়' জন্মে এবং সমবায় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ব্যাপার, এতদতিরিক্ত যাহা জানিতেছি তাহা এই যে, প্রত্যক্ষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় অভাব ও সমবায় সংশ্লিষ্ট হইতে পারে, প্রাচীন দর্শনের সমবায় বিষয়ক এই জ্ঞান ভিত্তি করিয়া আমরা বিভিন্ন দর্শনের সমবায় প্রসঙ্গ আলোচনা করিব। মীমাংসা (বিশিষ্টাদ্বৈত), বেদান্ত ও নব্য ন্যায়ে সবিকল্পক এবং নির্বিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষের সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ন্যায়ানুমোদিত সমবায় বুঝিবার জন্য এই ত্রিবিধ সমবায়ের পার্থক্য তুলনা করা যাইতেছে।

ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদের জ্ঞানকাণ্ডরূপে উত্তর-মীমাংসা বা ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্তকে এবং কর্মকাণ্ডরূপে পরিগণিত পূর্ব্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা-দর্শনকে গণ্য করা হয়। ন্যায়াদর্শে রচিত অদ্বৈত বেদান্ত গ্রন্থ প্রমাণমালা" (পৃঃ ২ঃ) এবং "ন্যায় দীপাবলি" (পৃঃ ১৬) প্রভৃতি ছাড়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী" ন্যায়পরিশুদ্ধি" (পৃঃ ৭৯ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি গ্রন্থে সমবায় স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত প্রসঙ্গের মর্য্যাদা উন্নীত হইয়াছে। অদ্বৈত বেদান্ত নিরপেক্ষ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য্য কর্তৃক লিখিত উক্ত "ন্যায় পরিশুদ্ধি"তে সমবায়ের প্রমাত্বও প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কর্মকাণ্ড মুখীভূত পূর্ব্ব-মীমাংসা দর্শনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বার্ত্তিককার ভট্টকুমারিল সমবায় আলোচনা অস্বীকার করিলেও ঐ ভট্ট মতাবলম্বী পার্থসারথী মিশ্র তাঁহার "শাস্ত্র দীপিকা" গ্রন্থে সমবায় স্বীকার করিয়া তাহার লক্ষণে বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, "যেন সম্বন্ধেনাধেয়মাধারে স্বানুরূপাম্ বুদ্ধিং জনয়তি স্বাধারেণ বোধয়তীতার্থঃ স সম্বন্ধ সমবায় ইতি" (পৃঃ ২৮৩ ৪)। উক্ত মতাবলম্বী 'নারায়ণ পণ্ডিতে'র ন্যায়ানুগ "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে সমবায় আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার ব্যাপ্তি-স্বতন্ত্রতা ব্যক্ত হইয়াছে। এই দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আচার্য্য প্রভাকর তাঁহার গ্রন্থে আদি ভাষ্যকার শবরের সমবায় বিষয়ক ইঙ্গিত বিষয় এবং বিষয়ী সম্বন্ধ (বৃহতী-৩০ পৃঃ) বিস্তৃত করিয়াছেন। বাস্তব প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধির মিলনে যে অনুভূতি হয় ভাট্টমতে তাহা তাদাত্ম্য এবং প্রভাকর মতে সমবায়, ভট্টবাদীরা সমবায় অস্বীকার করিলেও তাঁহারা যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন তাহার সহিত আলোচ্য আন্বীক্ষিকী-সমবায়ের কোনও পার্থক্য নাই। "মানমেয়োদয়ে"র গ্রন্থকার নারায়ণ পণ্ডিত মতে সমবায় হইতেই সামানাধিকরণ্যের জ্ঞান জন্মে। এই সকল মতের সহিত নৈয়ায়িক সমবায়ের কোনও বিরোধ নাই। কিন্তু আচার্য্য গুরু-প্রভাকর, শবর স্বামী বা ভবনাথের ন্যায় সমবায়কে অনুমানসিদ্ধও (মানমেয়োদয়—পৃঃ ২৮৮ ২৯০) বলায় ইহা বৈশেষিকের সমবায়ানুরূপ এবং সেজন্য ন্যায়সিদ্ধ সমবায় হইতে স্বতন্ত্র। তবে আচার্য্য পার্থসারথী—"যস্য যাদৃশস্য যেন যাদৃশেন সহ সাক্ষাৎ প্রণাল্যা বা যাদৃশঃ সম্বন্ধঃ—সংযোগঃ সমবায়, এ কার্য্য সমবায়ঃ কার্য্যকারণত্ব-মহত্ত্বা বা দৃষ্টান্ত ধর্ম্মিষু নিয়তো জ্ঞাতস্তং তাদৃশং সাধ্য ধর্ম্মিষু দৃষ্ট বতন্তাস্মিং স্তাদৃশে—তাদৃশ সম্বন্ধ সম্বন্ধি ধ্যান প্রবলেন প্রমাণেন তাদ্রূপ্য তদ্বিপর্য্যয়াভ্যাসম্পরিচ্ছিন্নে যা বুদ্ধিঃ সাহনুমানম্ (শাস্ত্র দীপিকা—পৃঃ ১৬৬ ৭ ; ১৬৯)"। যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে সমবায়কে অনুমানের পরিপূরক বলিয়া স্বীকার করায় ন্যায়সিদ্ধ স্বতন্ত্র মত পাইতেছি।

বৈশেষিক দর্শন গুরুপ্রভাকরের ন্যায় সমবায়ের দ্বিবিধ ভেদ বা বঙ্গশিরোমণি রঘুনাথ প্রভৃতি নৈয়ায়িকের ন্যায় বহুবিধ ভেদ

স্বীকার করেন না। ইহা ছাড়া নৈয়ায়িক সমবায়ে ইতিপূর্বে যে স্বাভাবিক নিয়ত ব্যাপ্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা বৈশেষিক সমবায়ে স্বীকৃত হয় না। কিন্তু মীমাংসা-দর্শনে সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার হেতু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায়ানুগ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ "ন্যায়পরিশুদ্ধি" দ্বারা প্রমেয়াধ্যায় ১ম আহ্নিক উল্লিখিত সার্বত্রিক সিদ্ধ অভিব্যক্তি নিয়মের সহিত উপদ্বার মূলীভূত "প্রকৃতির একরূপতা" (স্বভাব শক্তিরের সর্ব্বত্র নিয়ামিকা ৭।২।২৬ ; Law of the University of Nature) সূত্র সমবায় প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ।

আন্বীক্ষিকী মতে সাধারণ নিয়মের স্থান আগে, বিশেষ বস্তু বা ঘটনাদির স্থান পরে। কোনও বিশেষ বস্তু বা ঘটনা কোনও এক সময়ে উদ্ভূত হইয়া আবার বিলীন হইয়া যায় কিন্তু যে সাধারণ নিয়মগুলি তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে তাহারা তাহাদের উদ্ভবের বহু পূর্ব্বেই বর্তমান ছিল এবং পরেও থাকিবে। এই সাধারণ নিয়মগুলি আছে বলিয়াই বস্তু বা ঘটনাগুলি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছে এবং বিশেষ গুণের অধিকারী হইয়াছে। প্রকৃতিতে সাধারণ নিয়ম ও বিশেষ বস্তুগুলির যে পৌর্ব্বাপুর্ব্ব সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিখ্যাত অভিব্যক্তিবাদী ডারউইন তাঁহার তত্ত্ব প্রমাণ করিবার পূর্ব্বেই নিয়মের আবিষ্কার করিয়াছেন। সমবায়ে সাধারণ নিয়মের স্থান যে আগে তাহা বলিতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল এবং "ন্যায়পরিশুদ্ধি"-কারের—"সম্বন্ধা-ন্তরাভাবাৎ নিয়মাদিতি চেৎ ন সম্বন্ধস্যাপি সমবায়নাম্নঃ সার্বত্রিকত্ব চ সামান্য তত্রাভিব্যক্তি নিয়মস্য দ্রষ্টব্যত্বাৎ" (পৃঃ-৫০০।১) বলিয়া ইহার যে অনুমোদন করিয়াছেন তাহা আন্বীক্ষিকীসম্মত।

নৈয়ায়িকেরা এই বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় যে, জড় বা দ্রব্য জগৎ এবং তাহাদের রূপ ও কর্ম্মজনিত প্রকাশ আপেক্ষিক ব্যাপার। কাজেই প্রাকৃতিক কোনও নিয়ম আগে হইতে জানা না গেলেও জড়দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ বা কর্ম্ম এই উভয়ের সামান্য সম্বন্ধ নিত্য। কৃষ্ণ-দাসও "ভাষা পরিচ্ছেদ"-কারিকা এবং ন্যায়সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী টীকায় বলিয়াছেন, "সমবায়ি কারণতাম দ্রব্যস্যেবেতি বিজ্ঞেয়ম"—২৩ কারিকা এবং "সমবায়ত্বাম নিত্য সম্বন্ধত্বাম—১১ কারিকার মুক্তাবলী। ন্যায় বৈশেষিক "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থেও শিবাদিত্য বলিয়াছেন, "নিত্য সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ" (৬৪ সূত্র)।

বৈশেষিক মতে, "সমবায়স্ত্বেক এব" (সপ্তপদার্থী সূত্র ৮)। ন্যায়শাস্ত্রে ইহা স্বীকৃত নহে বলিয়া সাহসী শূলপাণি দৌহিত্র রঘুনাথ মতে, "সমবায়োঽপিচ নৈকো…পরন্তু না নৈব" (পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ, ১৬ পৃঃ)। বাপেক্ষাবাদী কৃষ্ণদাস এই উভয় মতের সামঞ্জস্য প্রচেষ্টায় তাঁহার "ভাষা পরিচ্ছেদ" গ্রন্থে বলিয়াছেন, "অনন্ত স্বরূপানাং সম্বন্ধত্ব কল্পনে গৌরবাদ লাঘবাদেক সমবায় সিদ্ধিঃ—১১ —কারিকার সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী। কৃষ্ণদাসের এই মত সমর্থনযোগ্য নহে, কেন না সপ্তপদার্থীর বিভিন্ন টীকাকার, বিশেষতঃ শেষানন্ত তাঁহার "পদার্থ চন্দ্রিকা" য় ইহা অস্বীকার করিয়া সমবায়ের চতুর্বধিক বিভাগ করিয়াছেন। গুরুপ্রভাকর তাঁহার মীমাংসা-দর্শন ভাষ্যে সমবায়ের যে (১) নিত্য ও (২) অনিত্য বিভাগ বলিয়াছেন তাহার সহিত শেষানন্ত ও রঘুনাথের বিভাগ মিলাইলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই আধুনিক সময়ে গ্রহণোপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেই বিভাগ চিত্র নিম্নরূপ :—
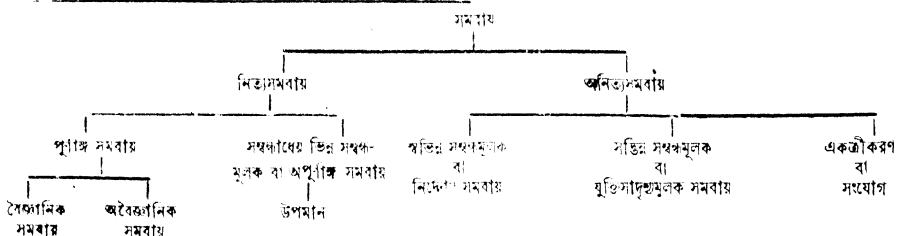
এই চিত্রের ব্যাখ্যারূপে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, সংযোগও হেতুত্বগত [প্রত্যক্ষ সমবায় বিশেষে সন্নিকর্ষ বিশেষো হেতুত্বগত এবং সংযোগেন দ্রব্যগ্রহ—প্রত্যক্ষ চিন্তামণি, সন্নিকর্ষ বাদ] বলিয়া এবং বৈশেষিক সূত্র ৭।২।২৬ মতে হেতুত্ব বা কারণত্ব সমবায়ের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ বলিয়া সংযোগকে সমবায়ের বিভাগরূপে ধরা গিয়াছে।

প্রায় সকল দর্শনই বলিয়াছেন যে—'সমবায়ে জাতিরপি নোপ-পন্নম্', অর্থাৎ সমবায়ে জাতি স্বীকৃত হয় না। ন্যায়শাস্ত্রে ইহা স্বীকৃত বটে কিন্তু বঙ্গগৌরব রঘুনাথ অতিরিক্ত একটি কথা বলিয়া সমবায়ের এই সামান্য লক্ষণ আরও বিশদীকৃত করিয়াছেন। 'পদার্থ-তত্ত্বনিরূপণ' গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে—সমবায়ত্বং তু পুনরমুগতম্ অখণ্ডোপাধিরিতি (পৃঃ-১৬) অর্থাৎ সমবায়ত্ব অখণ্ডোপাধি। আচার্য্যের এই উক্তির ফলে কারণত্বের সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ আসিয়া গিয়াছে। কেননা উক্ত 'পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ' গ্রন্থে কারণত্বের পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে—কারণত্বম্ চ পদার্থান্তরম। তচ্চ কার্য্যভেদাবচ্ছেক ভেদাচ্চ ভিদ্যতে, কারণত্বেন খণ্ডোপাধিনামুগতং চ তত্তৎ কারণ পদ শক্যতাবচ্ছেদকম (পৃঃ ১১-১৪)। রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার আবার উক্ত সূত্রের 'পদার্থ খণ্ডন' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কারণত্ব প্রসঙ্গের মাধ্যমে সমবায়কে অন্যথাসিদ্ধি (probabilityর) সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। কারণ

তাঁহার উক্তি এই যে—কারণত্বং নানথায়াসিদ্ধত্বে সতি কার্যনিয়তত্ব পূর্ব্বকাল বৃত্তিত্বম (পৃঃ ৭১-২)। ব্যপেক্ষাবাদী কৃষ্ণদাস তাঁহার ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের ২৩ তারিখের অবশ্য 'সমবায়ী কারণত্বম দ্রব্যস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম' এবং অন্তত্র—'নিয়ত পূর্ব্ববৃত্তিত্বং কারণত্বম ভবেৎ' বলিয়াছেন বটে কিন্তু রঘুনাথের সূত্র হইতে আমরা পূর্ব্বগ (antecedent) ও অনুগের (consequent) ধারণা যত সহজে পাই ভাষাপরিচ্ছেদ সূত্রদ্বয় হইতে তত সহজে পাই না, বৈশেষিক সূত্রে—'ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ' উক্তি থাকিলেও শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি সমবায়ের কারণত্ব সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন।

ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য সমূহদর্শন সমবায়, 'প্রত্যক্ষসিদ্ধ অস্বীকার করিয়া অনুমানসিদ্ধ বলায় আমরা ন্যায়ানুমোদিত সমবায়কে (১) অযুতসিদ্ধ (co-existence), (২) সহচার (succession) ও সামানাধিকরণ (The relation of equality and inequality) সহিত বিচার করিতে পারি, অন্যান্য দর্শনানুমোদিত অনুমানসিদ্ধ সমবায়কে সেরূপ করিতে পারি না। বৈশেষিকের সমবায় কেবল অযুতসিদ্ধ। মীমাংসার সমবায় অবয়ব ও অবয়বী ভিন্ন অন্যগুলির সামানাধিকরণ্য সংশ্লিষ্ট। ইহার ফলে ন্যায়ের সমবায় যেমন সম্পূর্ণ প্রকরণরূপে পাইতে পারে বৈশেষিকের সমবায় সেরূপ কিছু পায় না বলিয়া পঙ্গু এবং ক্ষীণ। মীমাংসার সমবায় বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ বিচার করিয়া 'অপূর্ব্ব' সংশ্রবে ন্যায়বৈশেষিকসি — 'স্বভাব শক্তিরেব সর্ব্বত্র নিয়ামিকা' সত্যসঙ্গত অধুনোপযোগী দার্শনিকরূপ পাইতে পারে মাত্র, কারণ গুরুপ্রভাকরের মতে,— 'যস্মিন্নয়ং পুরুষোনিযুজ্যতে সবিষয়ঃ (বৃহতী ৩০ পৃঃ) এবং সমবায়েরই বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিচার-ক্ষমতা আছে।

আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, বৈশেষিক মতে সমবায় দ্বারা অনুমান ও শব্দজ্ঞান মীমাংসা মতে প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দজ্ঞান কিন্তু ন্যায় মতে প্রত্যক্ষ, উপমান ও শব্দজ্ঞানসিদ্ধ হয়। বৈশেষিক দর্শন সমবায়কে অনুমানসিদ্ধ বলিয়া ব্যাপ্তির সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ, বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত সমবায়কে অনুমানসিদ্ধ বলিয়াও ব্যাপ্তির সহিত সমবায়ের সংশ্রবশূন্য এবং ন্যায়শাস্ত্র সমবায়কে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া ব্যাপ্তির সহিত অনুরূপ সংশ্রবহীন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত 'সর্ব্ব খল্বিদং ব্রহ্ম' সূত্র হইতে প্রকৃতির একরূপতা বা সর্ব্বলোকসিদ্ধি (Law of the Uniformity of Nature) উৎসারিত হইতে পারে কিন্তু উহা দর্শন বলিয়া ইহাকে সমবায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই তবে ন্যায়শাস্ত্র এই দর্শনের সংশ্রব এবং বৈশেষিকোপস্কার উল্লিখিত—স্বভাব শক্তিরেব সর্ব্বত্র নিয়ামিকা" (৭।২।২৬ সূত্র দ্রষ্টব্য) উক্তির সুযোগ লইয়া 'ন্যায়বার্ত্তিক' উল্লিখিত 'সর্ব্বলোকসিদ্ধি'র ইঙ্গিতে উক্ত প্রকৃতির একরূপতা-নিয়মসূত্রকে সমবায় প্রকরণের অঙ্গীভূত করিতে পারি। সমবায়ের অখণ্ডোপাধিত্ব এবং সপ্তপদার্থী সূত্র "প্রতিযোগিজ্ঞানাধীন জ্ঞানোঽভাবঃ" (সূত্র-৮০) এর টীকায় শেষানন্ত তথাঽপ্যভাবত্বম খণ্ডোপাধিরেব লক্ষণতয়া বিবক্ষিত মিত্যাহঃ উক্তি দ্বারা এই অখণ্ডোপাধিলক্ষণের মাধ্যমে সমবায়, অভাবের সহিত সংশ্রবযুক্ত; কারণ ন্যায়মতে অনুযোগী ও প্রতিযোগীর স্বরূপই অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ব্যধিকরণ ধর্ম্মাবিশিষ্ট অভাবের সহিত নানা দিক দিয়া সমবায়ের সম্পর্ক আছে। অন্য কোনও দর্শন সমবায়ের অখণ্ডোপাধিত্ব এবং অভাবের অনুযোগী ও প্রতিযোগীর স্বরূপত্ব স্বীকার করে না বলিয়া তাহাদের মতে অভাব ও সমবায়ের সম্পর্ক নাই। সমবায়ের অখণ্ডোপাধিত্ব লক্ষণ অনিয়ত পদার্থবাদী রঘুনাথের স্বীকৃত অতএব ঐ সম্পর্ক বৈশেষিকেরও স্বীকৃত নহে, কেননা রঘুনাথ 'বিশেষ পদার্থ' অস্বীকার করেন।
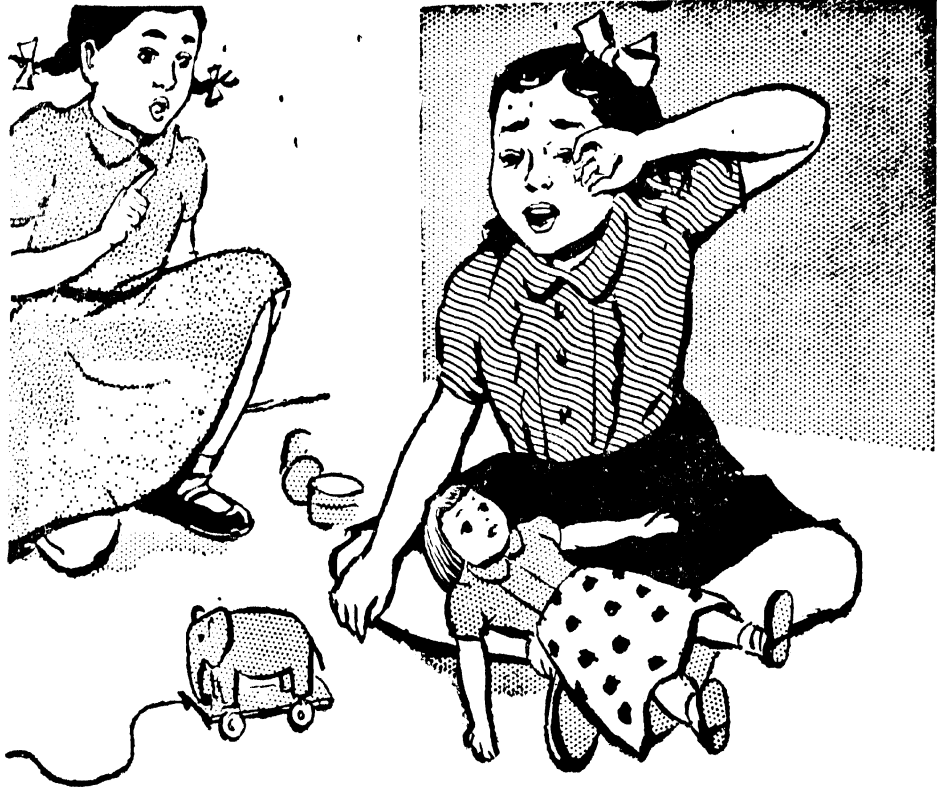
ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙ্গুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

S. 258A-X52 BG

"আচ্ছা, আমরা নিন্টুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, নিন্টুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিংকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "ডলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারন আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ডলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"
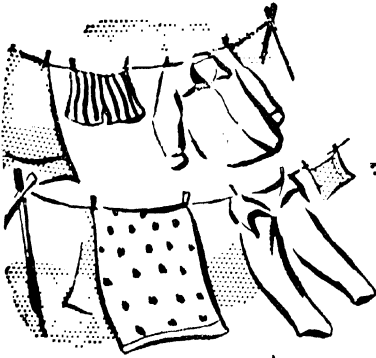
আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, পায়জামা, সার্ট, ধুতী, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?
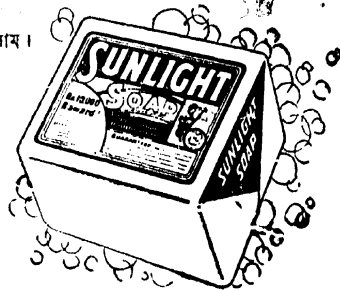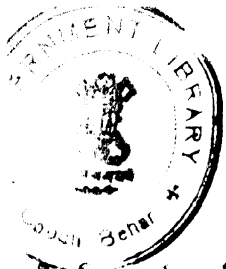
ভারতের ক্ষারশিল্প

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় ক্ষারবস্তু কষ্টিক সোডা এবং সোডা (সোডা অ্যাশ কাপড় কাচায় বেশী লাগে যা) তে, ভারতবর্ষ এখনও দেশের প্রস্তুতির উপর নির্ভরশীল হতে পারে নি যদিও খুব সম্প্রতি দেশের প্রায় অর্দ্ধেক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে। বাকি অর্দ্ধেক সরবরাহে পরদেশের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। পাঠকবর্গ আশ্চর্য হবেন জেনে যে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৭ কোটি টাকার শুধু কষ্টিক সোডা ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে কিনেছিল। যদিও বর্তমানে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু কত টাকা যে বাইরে চলে গেছে তার ইয়ত্তা নাই।

বৃহত্তর রসায়ন শিল্পে, সালফিউরিক এ্যাসিডের মত কোন দেশের ক্ষার ব্যবহার ও প্রস্তুতির উপরেও সেই দেশের শিল্প-শ্রীবৃদ্ধির মান নির্ভর করে। Its consumption may be regarded as an index of the industrial progress of a country ক্ষার বা আলকালি বলতে রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে কষ্টিক সোডা ও সোডা অ্যাশ এই দুইটিই বস্তু এবং বৃহত্তর রসায়ন শিল্পের মূল পদার্থ (raw material)। আবার এই দুটি ক্ষারই আমরা পাই, লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড, বা আহার্য) হতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হয়ে। সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমানে আমাদের দেশ লবণ উৎপাদন করে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়েও বহির্দেশে রপ্তানী করতে পারছে, কিন্তু উদ্বৃত্ত লবণ হতে ক্ষার প্রস্তুতির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে তার সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে হবে তবেই দেশের অর্থ বাঁচবে। তাতে বহির্দ্দেশের সঙ্গে লবণ সরবরাহের কারবারের ক্ষতি হবে বলে মনে করি না, কারণ প্রতি বৎসরই সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী লবণ প্রস্তুতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। যে লবণশিল্প একদিন ব্রিটিশ সরকারের চাপে ধ্বংস পেতে বসেছিল সেটিকে যখন পুনরুদ্ধার করে দাঁড় করাতে পারা গেছে তখন তাকে ভিত্তি করে ক্ষারশিল্পের উন্নতি করলে দেশের বহু কল্যাণ হবে। কারণ ক্ষার আবার অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্পের মৌলিক দ্রব্য। সুখের বিষয়ে যে অল্প কালের মধ্যেই ভারতবর্ষে ক্ষারশিল্পের উন্নতি কিছুটা সম্ভব হয়েছে। এখন কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, আমেদাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বিহার প্রভৃতি মহানগরী বা রাজ্যে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত হচ্ছে এবং সৌরাষ্ট্র গুজরাটের মিথাপুর ও ধারাংগাদ্রায় সোডা অ্যাস প্রস্তুত হচ্ছে এবং আরও কয়েকটি স্থানে উৎপাদনের কারখানা বসানোর কাজ এগোচ্ছে।

কষ্টিক সোডা ও সোডা অ্যাস ব্যবহার হয় সাবান, ফিল্ম, কাচ, লাই, রেওঁ, রং (dye), নাইট্রেট সার প্রভৃতি প্রস্তুতিতে এবং কাগজ ও কাপড়ের কলে বিশেষ বিশেষ পরিস্কৃতি ও শোধন প্রণালীতে। ইলেকট্রিক সাহায্যে যে সব স্থানে কষ্টিক সোডা উৎপাদন করা হয় সেখানে ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন গ্যাস বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে পাওয়া যায়। ক্লোরিন ব্লিচিং পাউডার, ডি, ডি, টি প্রভৃতি উৎপাদনে এবং হাইড্রোজেন, বনস্পতি প্রভৃতি প্রস্তুতিতে কাজে লাগান হয়। কিন্তু ক্লোরিন এত বেশী পাওয়া যায়, যার তুলনায় সামান্যই কাজে লাগে। এ নিয়ে মাথাব্যথা পাশ্চাত্য দেশেও কম নহে, তবে ওসব দেশে ব্লিচিং পাউডার, ডি, ডি, টি প্রভৃতির উৎপাদন অনেক বেশী।

কষ্টিক সোডা

ভারতে বোধ করি প্রথম কষ্টিক সোডার কারখানা স্থাপিত হয় ১৯৪০ সনে কলিকাতার নিকট রিষড়াতে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ বিলাতী কোম্পানীর দ্বারা। ইংলণ্ডের কষ্টিক আমদানী যুদ্ধের দরুণ কমাতে, এরা আলকালি কেমিক্যাল কর্পোরেশন নাম দিয়ে এর প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৬ সনে প্রথম এই কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে এই কথাটাই মনে হয়েছিল যে ওয়ালডির মত বা তার চেয়ে বড়, বেঙ্গল কেমিক্যালের সালফিউরিক এ্যাসিড প্ল্যাণ্ট যদি বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল ক্ষারশিল্পেও কেন বাঙ্গালী পেছনে পড়ে রহিল? অবশ্য বর্ত্তমানে হিন্দুস্থান এ অভাবটা মেটাবার প্রয়াস পাচ্ছে—ইস্পাহানীর পরিকল্পনাটি সফলকাম করে। অ্যালকালি কেমিক্যালও তাদের খেওড়ার (পাকিস্থানে) সোডা অ্যাশের কারকখানার টাকায় রিষড়ার কারখানা বাড়াচ্ছে। রিষড়ার অনেক পূর্ব্বে অবশ্য বিলাতী কাগজ কোম্পানী টিটাগড় পেপার মিলস তাদের কলের প্রয়োজন মত কষ্টিক প্লাণ্ট বসিয়েছিল এখন ও তা থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করে তাদের কাগজ ম্যানুফ্যাকচারের কাজে লাগাচ্ছে।

দিল্লীতে দিল্লী ক্লথ মিল, কেরালার আলওয়েতে সেহাসয়ে ত্রাদার্সের নকল রেশম, রেওঁর কারখানায় বিশ টনই (দৈনিক) কষ্টিক কল বসানো হয়েছে, দ্বারকার নিকট মিথাপুরে টাটা-কেমিক্যালস এবং বিহারের সোনা নদের তীরে ডিহরীতে রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজের কাগজ বোর্ড কলে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত হচ্ছে (যা লেখকের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল), আমেদাবাদে সরাভাইয়ের ক্যালিকো মিলে এবং দক্ষিণ ভারতে মেটুর কেমিক্যালেরও অল্প বিস্তর কষ্টিক সোডা উৎপাদন হচ্ছে এক টাটা ছাড়া সবগুলিতেই বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য নিয়ে। টাটা সোডা অ্যাশ বেশী কষ্টিক

প্রস্তুত করে। নিম্নলিখিত তালিকাতে এদের উৎপাদনের পরিমাণ বুঝা যাবে।

	বৎসরের প্রস্তুতির পরিমাণ (টন হিসাবে)
এ্যালক্যালি কেমিক্যাল কর্পোরেশন	২,০০০
হিন্দুস্থান হেভি কেমিক্যালস	২,০০০
বোটাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ	২,৫০০
ক্যালিকো মিলস	২,২১৫
দিল্লী ক্লথ ,,	৬,৬০০
মেট্টুর কেমিক্যাল (মাদ্রাজ)	৩,৭০০
টাটা কেমিক্যাস (সৌরাষ্ট্র)	৮,৪০০ বেশীর ভাগ সোডা থেকে
কোচিন ,, (কেরালা)	৬৬০০
হেভি কেমিক্যালস (টিউটিকরিন) সবে আরম্ভ	
	৩৪,০১৫

কাগজ কলে—

	টিটাগড় পেপার মিলস	২,৪২২
পাঞ্জাবে	শ্রীগোপাল ,, ,,	৪১৫
পুণাতে	ডেক্কান ,, ,,	৩০০
হায়দ্রাবাদে	শীরপুর ,, ,,	৩০০
সাহারাণপুরে ষ্টার	,, ,,	৩০০
		৩,৭৯৭

সর্ব্বশুদ্ধ—৩৭,৮৭২

সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু বেড়েছে, মোট ৪০ হাজার টন ধরা যেতে পারে। কিন্তু দেশের প্রয়োজন ৮০,০০০ টন যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। অর্দ্ধেক বা তার বেশীর জন্য আমরা এখনও পরমুখাপেক্ষী। ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত অধিকতর কষ্টিকসোডার আমদানী হ'ত যুক্তরাজ্য হতে, ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকা থেকেও আসত, তারপর স্বদেশী সরকার রক্ষণ শুল্ক বসাতে (দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিধায়ে) বিদেশী আমদানীর পরিমাণ কমে আসে এবং ক্রমে দেশে কষ্টিক সোডা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং প্ল্যানিং কমিশনের আনুকুল্যে আরও কতকগুলি স্থাপিত হচ্ছে কিন্তু বাংলাতে নহে।

কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করতে আমাদের ভারতে কিন্তু অন্য উন্নত দেশের তুলনায় অধিক ব্যয় হয়, তার কারণ প্রধানতঃ দুটি, প্রথম হ'ল কলগুলি ছোট, দিনে বিশ টন উৎপাদকের বেশী ত নহেই বরং আরও অনেক ছোটর সংখ্যাই বেশী এবং দ্বিতীয় হ'ল বৈদ্যুতিক শক্তির মূল্য বেশী পড়ে যায়, একমাত্র মেট্টুর কর্পোরেশন ছাড়া বোধ করি সুলভ মূল্যে জলবিদ্যুৎ কেহই পায় না। অথচ এক টন কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করতে ঘণ্টায় ৩,২৮০ কিলোওয়াট ইলেকট্রিক শক্তির প্রয়োজন। কুড়িটন প্লান্টগুলি কিছুটা ব্যয়সাপেক্ষ বলে নতুন যা বসানো হচ্ছে সেগুলির শক্তি এই মত করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এমন কলও আছে যাতে দিনে সাড়ে তিন শত টন পর্য্যন্ত কষ্টিক, নিকাশ করা হয়। এই কারণে এবং বিশেষ করে ক্লোরিন, হাইড্রোজেনের বেশীর ভাগ কাজে না লাগাতে প্ল্যানিং কমিশন খরচ কমাতে, সৌডা অ্যাশ থেকে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করা সুপারিশ করেছেন—যা টাটা কেমিক্যালস ছাড়া বর্ত্তমানে কেহই করে না। কিন্তু ইলেকট্রিক প্রণালীতে প্রাথমিক খরচ খুব বেশী হলেও সহজ পদ্ধতিতে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করা যায়। খুব ভাল পরিষ্কৃত ঘন লোনা জলে কারেন্ট পাশ করিয়ে ব্যাটারীর সাহায্যে ক্লোরিন হাইড্রোজেন এবং কষ্টিক লিকার নিকাশ করা হয়। প্রতি টন কষ্টিক করতে প্রায় দুই টন লবণ দরকার। সেজন্য ক্ষার উৎপাদন কেন্দ্র লবণ ক্ষেত্র সংলগ্ন হলেই ভাল। কিন্তু এ সুবিধা মিধাপুর এবং ধারাংগাদ্রা ছাড়া কোথাও নেই। মাদ্রাজে মাদুরার নিকটে অধিরামপত্তমে লবণ কারখানায় দেখেছিলাম সেখান থেকে পরিষ্কার লবণ প্রস্তুত করে কত দূরে মেট্টুর কেমিক্যাল ওয়ার্কস নিয়ে যাচ্ছে সালেমের কাছে তাদের কষ্টিক কারখানায়। এইজন্য বাংলা দেশে কাঁথি অঞ্চলে যেখানে বর্ত্তমানে লবণের কারখানাগুলি লবণ প্রস্তুত করছে তার কাছাকাছি কষ্টিক সোডার কারখানা করা প্রশস্ত, আর দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের নিকট হতে যদি সুলভ মূল্যে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায় তা হলে আরও সুবিধা। কিন্তু করে কে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার? বঙ্গবাসী? না কোন মারবারী কোম্পানী?

যে সমস্ত কারখানার কথা পূর্ব্বে বলেছি তারা ব্যাটারীতে অনেক রকম সেল ব্যবহার করে—গিবস, অ্যালেন মুর, ভোর্স, নেলসন্ হ্রেসাম, বিলিটার সীমেন্স প্রভৃতি। পারা (mercury) যুক্ত সেলে অনেকটা বিশুদ্ধ কষ্টিক ক্ষার পাওয়া যায় যা রে ও শিল্পের উপযোগী। রাসায়নিক প্রণালীতে সোডা অ্যাশ থেকে কষ্টিক সোডা প্রস্তুতির প্রথম উদ্যম করেছিল 'বিলাতী, ম্যাগাদি সোডা কোম্পানী ১৯১৪ সনে কলকাতার কাছে বজবজে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার কাজ হয় নি। ১৯১৭ সনে বোম্বাইতেও এই রকম উদ্যোগ হয়েছিল, কার্য্যকরী হয় নি। ১৯৪৪-৪৫ সনে কপিলরাম ভকিলের আপ্রাণ চেষ্টায় মিধাপুরে সোডা অ্যাশ কারখানা বসলে তবে এই প্রণালীতে প্রথম ভারতবর্ষে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত হয়। কপিলরাম ১৯৪৬ সনে মারা যান; তৎপূর্ব্বেই টাটা এগিয়ে আসে। বাজারে কষ্টিক সোডা বিক্রয় হয়, জলীয় অবস্থায় শতকরা ৫০ বা ৭৫ ভাগ লিকার ব্যারেলে এবং সলিড অবস্থায় বা ফ্লেক্স-এ ইস্পাতের ড্রামে। কষ্টিক সোডা সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় সাবান ম্যানুফ্যাকচারে তার পরেই বিশেষ করে পরিস্কৃতি প্রণালীতে, কাগজ, নকল সিল্ক রে ও, তৈলদ্রব্য শুদ্ধ করান এবং ব্লিচিং দ্রব্যাদি ম্যানুফ্যাকচারে।

সোডা অ্যাশ

সোডার ব্যবহার কাপড় কাচার পরই কাচ শিল্পে, কষ্টিকসোডা

প্রস্তুতিতে, সাবান কলে এবং জলকে নরম করতে প্রভৃতি বহু রাসায়নিক ক্রিয়ায়। সোডা দুই রকম হাল্কা এবং ভারী, যেটা কাচশিল্পের উপযোগী। কিন্তু হেভি সোডা অ্যাশ আমাদের দেশে এখনও ঠিকমত তৈরি হচ্ছে না। সারা ভারতে সোডার চাহিদা, বৎসরে কাচ প্রস্তুতিতে ৪০ হাজার টন, কাপড় ও কাগজ মিলে বার হাজার, সোডা বাইকার্ব, কষ্টিক সোডা, বাইক্রোমেট, সিলিমেট প্রভৃতি রসায়ন শিল্পে ১৮ হাজার এবং কাপড় কাচায় ৪৫ হাজার টন—মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার টন। প্ল্যানিং কমিশনের হিসাবে বেড়ে দেড় লক্ষ টন সারা দেশের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে দুইটি সোডা ম্যানুফ্যাকচারের কল, টাটার মিথাপুরে এবং সাহু জৈনের ধারাংগাধ্রায় বৎসরে ৭০,৮০ হাজার টন প্রস্তুত করে। এদের যৌথ উৎপাদনে ব্রিটিশ গাবেনার এবং কেনিয়ার ম্যাগাদি সোডার আমদানী খুব কমে গেলেও হেভি অ্যাশের জন্য ইটালী, জার্ম্মানী, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি হতে সোডার আমদানী বন্ধ করা যায় নি।

কাচা বা পরিষ্কার করায় গৃহস্থের বাড়ীতে এর ব্যবহার এত বেড়ে গেছে যে সাজি মাটি বা সজীমাটি (রেহ) আর বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। এটা মাটি মিশ্রিত স্বাভাবিক সোডা, উত্তরপ্রদেশ, রাজপুতানা, বেরার, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যে বেশী হয়। রেহ, সোডার স্ফোটক বিশেষ, লোনা পতিত জমিতে ফুটে ওঠে। খাটি সোডা ত নহে, মাটির সঙ্গে পাড়ি (সোডা সালফেট) এবং লবণও কিছু উহার সঙ্গে মিশে থাকে। এই মাটি বেশ করে অল্প জলে ধুয়ে শুদ্ধ করা হয়। এক সময়ে দক্ষিণ ভারতে সালেম, মহীশূর অঞ্চলে, এর ভাল ব্যবসা ছিল। বেরারের লোনা হ্রদ থেকেও এখনও রেহ সংগ্রহ করা হয়। খাড়ি লবণ মিশ্রিত সজি কাচের চুড়ি তৈরিতে এখনও ব্যবহার হয়।

১৯২৩ সনে ধারাংগাধ্রার পূর্ব্ববর্ত্তী কোম্পানী, শক্তি অ্যালক্যালি এই সাজিমাটি নিয়ে সোডা ম্যানুফ্যাকচার আরম্ভ করে। আট বৎসর শক্তি অ্যালক্যালি কাজ করবার পর নূতন প্রতিষ্ঠান ধারাংগাধ্রা কেমিক্যালস সলভে প্লাণ্ট বসিয়ে লবণ থেকে সোডা প্রস্তুত করে। বর্ত্তমানে এটা বোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজের মালিকরা চালাচ্ছে। মিথাপুরে (দ্বারকার নিকট) টাটা কেমিকেলস্‌-এর লবণ কারখানা-সংলগ্ন সলভে প্লাণ্টে সোডা প্রস্তুতি হয় ১৯৪৪ সন হতে যদিও এর পত্তন হয় ১৯৩৯ সনে। তাও আবার মাঝে কয়েক বৎসর বন্ধ ছিল। যাই হোক, প্রথমে এরা ৫০ টন (দিনে) ম্যানুফ্যাকচার করে বর্ত্তমানে দেড়শ' টন প্রায় করছে এবং যন্ত্রের ডবল ক্ষমতা করবার জন্য চেষ্টা করছে। অথচ মাঝে যে বন্ধ ছিল তার অন্যতম কারণ বিদেশী সোডার প্রতিযোগিতায় এরা দামের দিকে লোকসান পাচ্ছিল, তার পর দেশীয় সরকারের সাহায্যে দাঁড়িয়ে ওঠে।

দুঃখের বিষয় যে, মাত্র দুটি সোডার কারখানা দেশে কাজ করছে সে দুটিই ভারতের পশ্চিম প্রান্তে। দক্ষিণ-ভারতে একটি বসানো হচ্ছে বটে, কিন্তু এদিককার অর্থাৎ পূর্ব্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কতদিন আর লবণের মত অধিকতর রেল বা ষ্টীমার ফ্রেট (freight) দিয়ে লোকে বেশী দামে সোডা কিনবে?

সোডা উৎপাদনে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি দরকার—প্রতি টন সোডা প্রস্তুত করতে প্রয়োজন—লবণ ১·৫০ হতে ২·০৫ টন, চূণা-পাথর ১·২০ হতে ২ টন, কোক্ ·১০ হতে ·১৮ টন, অ্যামনিয়াম সালফেট ১৬ হতে ৬০ পাউণ্ড এবং সোডিয়াম সালফাইট ১০ থেকে ১২ পাউণ্ড। পশ্চিম বাংলা বা উড়িষ্যায় এই সমস্ত দ্রব্য (raw material) পাওয়ার সুবিধা আছে। কাঁথি বা গঞ্জামে লবণ প্রস্তুতি কেন্দ্রের নিকট সম্ভবতঃ সুবিধাজনক স্থান সহজেই পাওয়া যাবে। পশ্চিম বাংলা সরকার ত দুর্গাপুরে সোডা উৎপাদনের এক পরিকল্পনা করে মাঝপথে থেমে গেছেন। আমার কথা এই যে, লবণ যখন এই দিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছে তখন ক্ষার-শিল্পের প্রসার পরিকল্পনায় সোডা বা কষ্টিক সোডার কারখানা বসানো হলে লাভ ছাড়া লোকসান হবে না। সোডা অ্যাশ তিন রকম প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, লেবলাঙ্ক, ইলেকট্রিক এবং অ্যামনিয়া সোডা বা সলভে প্রসেসে যেটি পৃথিবীর বেশীর ভাগ স্থানে কার্য্যকরী হয়েছে। লেবলাঙ্ক প্রণালীতে অবশ্য খাড়ি-লবণ এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া যায় কিন্তু সলভে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ অঙ্গারাম্ল গ্যাস এবং অ্যামনিয়া চক্রগতিতে ব্যবহৃত করা যায় বলে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যেত কিন্তু সে বিষয় বললে প্রবন্ধ অনেক বড় হয়ে যাবে। আশা করি পাঠকবর্গ মার্জ্জনা করবেন।
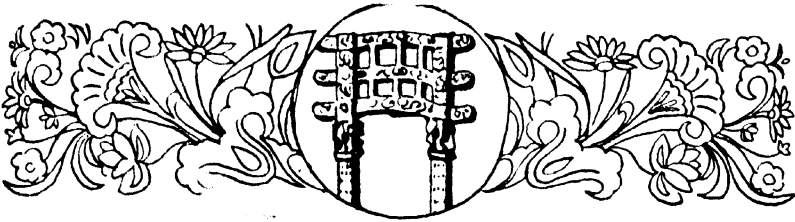
ছেঁড়া খাম

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

একখানি ছেঁড়া খাম শুধু ভাই
শুধু একখানি খাম।
দুনিয়ায় মোর আস্তানা নেই
নেই মোটে কোনো দাম।
—আস্তানা নেই? বলেছি কি আমি?
ভুল বলেছি তা ভাই!
আস্তাকুঁড়েতে আস্তানা মোর আবর্জনায় ঠাঁই।
আমারি মতন শত শত খাম লাখে লাখে গেছে ক্ষ'য়ে,
উড়ে গেছে তারা, পুড়ে গেছে তারা,
গেছে নিচিহ্ন হয়ে।
...ভুল কথা ভাই, ভুল বলেছো তা,
চিহ্ন যায়নি মুছে;
উড়ে যাক্ তারা, পুড়ে যাক্ তারা,
যায়না বেবাক্ ঘুচে।
কিছু তার থাকে বাকী,
শাঁস গেলে তবু সব যায় নাকো
সবটা পড়েনা ফাঁকী।

চেয়ে দেখে কতো কিশোর কিশোরী নগ্ন ধুলোয় মাথা,
রুক্ষ চেহারা, সুক্ষ্ম বয়ান, উসখুসে চুলে ঢাকা।
মাথায় তাদের ভরতি উকুন রক্ত চুষছে তারা,
গায়ে চুলকোণা, চোখেতে পিচুটি, কপালে ঘামের ধারা;
ঝুঁকে ঝুঁকে ওরা, ধুঁকে ধুঁকে ওরা, কেন ঘাঁটে জঞ্জাল?
বেছে বেছে ওরা করেছে যে জড়ো, যতেক বাতিল মাল।
খাম! শুধু ছেঁড়া খাম!
হয়তো একথা নেহাৎ সত্য, ভুলে গেছো এর নাম।
এদের বাজারে, এদের ভাঁড়ারে আজও আছে এর দাম!
বস্তায় ভরে পাচার করবে পেপার মিলের গেটে;
মণ দরে এরা সব বেচে যাবে দালালের জুতো চেটে।

আগুনের তাপে, যন্ত্রের চাপে, এ্যাসিডের জ্বালাতনে,
এই ছেঁড়া খাম কাগজের রূপে জাগবে নতুন ক্ষণে।
হবে সে কাগজ হবে,
এক শেষ হলে আরেক গজাবে, ক্ষয়ালেও নাহি ক্ষবে।

ছেঁড়া খাম! ছেঁড়া খাম!
তোমাদের চোখে, হায়, হায়, হায়, নেই এর কোনো দাম!
একদিন ছিলো এর কতো দাম, বেছে কিনেছিলে সখে,
লাল খাম আর নীল খাম, তাতে গন্ধ ভক্‌ভকে!
বুকের ভিতরে পুরে দিতো কেহ প্রিয়ার প্রেমের কথা,
গোপনে লিখতো ভীরু বেদনায় কোনো সে বেপথু লতা;
ছন্দে কেউ বা, কেউ বা চিত্রে
প্রথম প্রণয়রাগ পবিত্রে,
কেউ এঁকে দিতো, কেউ লেখে দিতো কতো প্রণয়ের বাণী,
আমার এ বুকে লুকিয়ে রেখেছি কতো সে গুণগুণানি।
আবার কোথাও যুদ্ধে মরেছে এক ছেলে কোনো মার,
পাটের দোকানে আগুন লেগেছে, মহরৎ সিনেমার।
কারও বা কোথায় চাকরি গিয়েছে চাকরি হয়েছে কারও,
আমার বুকের মাঝে যে খবর চিনতে কি তাকে পারো?
চিরে দেখতেই হবে;
নখ দিয়ে নয়, ছুরি দিয়ে চেরো, চিরে শাঁসটুকু লবে।
তারপরে আমি খাম, শুধু খাম;—শাঁসহীন শুধু খোল!
নেই দাম আজ নেই কোনো দাম, কভু ছিনু 'অনমোল'!
আমার বুকেতে তোমার খবর দুনিয়ার সব বাণী,
টেনে টেনে তুমি করেছো বাহির, শেষে ফেলে দেছো টানি।
কাল বেসেছিলে কতই না ভালো, আদর করেছো কতো!
আজ অনাদরে দূরে ফেলে দাও, যেন জঞ্জাল যতো!
ছেঁড়া খাম জঞ্জাল!
আজ যদি হারি নিশ্চয় জানি বেঁচে উঠবোই কাল!
নতুন কাগজ! নতুন কাগজ! জন্ম আবার লবো।
তোমরা জানো কি এই ছেঁড়াবুকে কি কথা কালকে কবো?
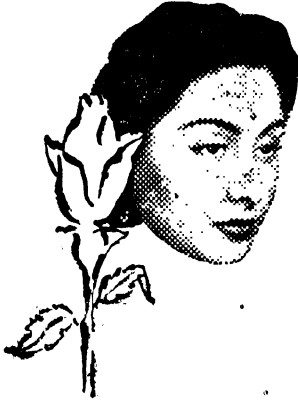
ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে **ক্যাডিল** অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্য্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।

রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেণার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড'এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 146-X52 BG

ছবি

অনামিকা

ক্যানভাসের উপর দ্রুত তুলি চালাচ্ছে অনসূয়া বড়ুয়া। এই ছবিটি সে আজ শেষ করবেই। শিল্পী বোধিসত্ত্বের ছবি—আপন শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন তিনি হাজারও কর্মকারের সম্মুখে প্রধান কর্মকারের "পরম রূপবতী অপ্সরোপম, জনপদ কল্যাণী লক্ষণসম্পন্ন" কন্যালাভের আকাঙ্ক্ষায়।

জাতকের এই ছবিটি দিয়ে সে আজ বিস্মিত করবে দু'জনকে; অঙ্কন-শিক্ষক শিবতোষকে আর অসীমকে, তার শিল্পনিষ্ঠার প্রতি অসীমের প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ তাকে বড় পীড়িত করে।

তুলির স্পর্শে ক্যানভাসের উপর জীবন্ত হয়ে উঠছে ছবিটি।

অঙ্কন-শিক্ষক শিবতোষের কথা বেশী করে মনে পড়ছে—অত্যন্ত খুশী হবেন তিনি শিষ্যার কৃতিত্বে। সূচী-জাতকের এই গল্পটি তাঁর খুবই প্রিয়।

বিভিন্ন তুলিতে বিভিন্ন রঙের ছোঁয়া লাগছে—ফুটছে ছবির বিভিন্ন রং—পোশাক, অলঙ্কার। দাঁড়িয়ে আছেন কর্মকাররূপী বোধিসত্ত্ব, হাজারও কর্মকার। কর্মকার-প্রধানও দাঁড়িয়ে, পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কন্যা—বোধিসত্ত্বের অভীপ্সিতা। বোধিসত্ত্বের কণ্ঠস্বরে মোহিতা এখন তার রূপ ও গুণ মোহিতারূপে রূপায়িতা অপরূপা লাবণ্যময়ী কর্মকার দুহিতার চোখের দৃষ্টি বোধিসত্ত্বের নৈপুণ্যের পরিচয় লাভে প্রশংসা-উজ্জ্বল।

কর্মকাররূপী বোধিসত্ত্বের আনীত সূচের গুণ পরীক্ষা চলেছে। ক্রমে ক্রমে সূচের সাতটি কোষ বা আবরণী উন্মুক্ত করা হয়েছে—তা পড়ে আছে একপাশে। বলবান এক যুবক ধাতুপেটা লৌহপীঠটি তুলছে জলভরা একটি কাঁসার থালার উপর। এই লৌহপীঠটির উপর সূচটি রেখে তার উপর আঘাত করলে এ সূচ বিদ্ধ করবে এই লৌহপীঠ। তার পর থালায় রাখা জলের উপর বেড়াবে ভেসে।

তুলির পর তুলির আঁচড় পড়ছে ক্যানভাসে—জীবন্ত হচ্ছে ছবিটি। থালার উপর জলের অবস্থিতির রং ভ্রম আনছে জল বলে। চিত্রের প্রতিটি জনের চোখমুখ এমনকি হাসিটি পর্যন্ত ঠিক কল্পনানুসারে অঙ্কিত করতে পারায় অপরিসীম তৃপ্তি জাগছে অনসূয়ার মনে। বিশেষ করে কর্মকার বোধিসত্ত্ব। ঠিক ঠিক তাঁর মনে-আঁকা দেবতার মুখ।

ঈজেলের নীচু ধাপে আটকানো ক্যানভাস। সে বসেছে একটি নীচু টুলে। মাথার চুল খোলা—দীর্ঘ চুলের রাশ পিঠ ঢেকে প্রায় মাটি ছোঁয়া ছোঁয়া অবস্থায়। বাতাসের মৃদু দোলা লাগছে পিঠের ওপর—তেলমুক্ত কিছুটা চুল সেই হাওয়ায় দলছাড়া হয়ে খানিকটা উড়ে আসছে শূন্যে।

ছোট্ট এই ঘরখানাই বেছে নিয়েছে অনসূয়া অঙ্কনের জন্যে, ঘরখানার তিন দিকই খোলা। বেশী আসবাবপত্রে ঠাসা নয় এ ঘর, বড় একটা টেবিল, নানা রং ও নানা রকমের তুলিগুলি সাজান রয়েছে ছোট ছোট ট্রের উপর, জানালার কাছে আঁকার ঈজেল। দেওয়ালে তার নিজের আঁকা নানা ছবির দল, বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে রূপায়িত।

ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই চোখে পড়ে দরজার বিপরীত দিকে দেওয়ালের টাঙানো নন্দলালের আঁকা মহাত্মার ডাণ্ডিমার্চের ছবিখানি। ছবির উপর সূর্যের আলো পড়েছে, সেই আলোয় দেখা যায় মহাত্মার মুখে অভীষ্টলাভের দৃঢ়সঙ্কল্প।

অনসূয়া বুঝতে পারছে—সূচীপাতক কাহিনীটির সার্থক অনুকৃতি তার তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠছে আজ। না—এ স্বীকৃতি পাবেই, তার তুলির আঁচড় এমন প্রাণবন্ত আর হয় নি কখনও। সার্থক—সার্থক তার আজকের সাধনা।

শেষ হয়ে এল ছবি, ঘণ্টাকয়েকের কঠোর শ্রম ও মনোযোগে।

সার্থকতায় কণ্ঠে সুর জাগছে এখন অনসূয়ার। গুণ গুণ করে গান করছে সে। অঙ্কিত চিত্রে দেবতার কল্পিত রূপ সার্থক পরিস্ফুট হচ্ছে বুঝতে পারছে সে। তাই তাঁরই বন্দনা কণ্ঠে লাগছে তাঁর গানের মাধ্যমে।

দেউল তোমার ফুলে ফুলে দেব ভরে।
গন্ধ তাহার নিশিদিন তোমারে রহিবে ধরে।

শেষ হয়ে গেল অঙ্কন—সমাপ্তির শেষ রেখায় ছবির খুঁত ও শোধন করে এনেছে—এমন সময় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন শিবতোষ, 'অনু'।

তাঁর কণ্ঠ শুনেই উল্লসিত হয়ে উঠল অনসূয়া, অঙ্কনের

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুসী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি [illegible] আপনি যতই সাবধানী হোন না [illegible] তেই এড়াতে পারবেন না। এই [illegible] বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই [illegible] সাফ করে দেয় এবং আপনার [illegible] প্রতিদিন **লাইফবয়** সাবান দিয়ে [illegible] এবং ময়লা জনিত বীজাণুর হাত [illegible] কে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।

L. 273-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত

পুরস্কার এত শীঘ্র মিলবে এ যে ভাবনাতীত, আশাতীত। আজ ত তাঁর আসবার দিন নয়!

তাড়াতাড়ি ছবিটি ঢাকল সে। ছবি ঢাকা পর্দ্দায়, পরে পরম আন্তরিকতায় ডাকল, 'আসুন, আসুন মাষ্টারমশাই।'

আহ্বানের সুর স্পর্শ করল শিবতোষকে, ঘরে ঢুকলেন তিনি, বহুপ্রত্যাশিত বস্তু প্রাপ্তির মধ্যে যে সে জানলে মনে যে তৃপ্তি জাগে, তারই ছায়া তাঁর মুখে।

বয়স তাঁর চল্লিশের উপর, ছাত্রী অনসূয়ার চাইতে প্রায় ষোল-সতের বছরের বড় তিনি। অত্যন্ত সুপুরুষ, যৌবনের দীপ্তি আজও দেহখানাকে তাঁর ঘিরে আছে পরম আদরে। অকৃতদার—জীবনে নারীর প্রয়োজন, পূর্ব্বে অনুভব করেন নি—আজকাল কিন্তু অবিশ্বাস্যকর এক দুর্ব্বলতা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। তাঁর জীবনে এসেছে তীব্র এক অনুভূতি, যার তাগিদ তাঁকে বিহ্বল করে তুলছে। জীবনকে স্বীকৃতি দেবার স্পৃহা ও স্বপ্ন—তাঁর মানসিক জগৎকে আলোড়িত করছে সবলে। যাকে ঘিরে চলে জীবন-স্বীকৃতির পরিকল্পনা সেই অবিচলিতা মানসীর মধ্যে অব্যাহত কল্পনা শূন্যে ভেসে বেড়ায়। তাঁর ঐকান্তিক আবেদন ব্যর্থ বেদনায় রক্তাক্ত হয়ে উঠে শুধু।

আজ অনসূয়ার আহ্বানের সুরে বহুপ্রত্যাশিত আন্তরিকতা খুঁজে পেলেন তিনি, এগিয়ে এলেন উল্লসিত মনে। 'নূতন ছবি এঁকেছি মাষ্টারমশায়, এই মাত্র শেষ করলাম।'

ছবির কথায় তাঁর শিল্পীমন আরও খুশী হয়ে উঠল, 'দেখি, দেখি' বলে এগিয়ে গেলেন বোর্ডের কাছে। ঢাকা না খুলেই জিজ্ঞাসা করলেন ছবির বিষয়বস্তুর কথা।

কাহিনীটি নাম করল অনসূয়া, আলোচনা হ'ল ছবির পটভূমি, মাপ ও রং ইত্যাদি নিয়ে।

আবৃত ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটা ছেলেমানুষী করে বসল অনসূয়া, আবদারের সুরে বলল, 'মাষ্টার মশায়, আপনার প্রিয় গল্পের রূপ দিতে চেয়েছি আজকের ছবিতে, যদি সার্থক হয়ে থাকে তবে কি পাব পুরস্কার? কি দেবেন আমায় বলুন?'

চেয়ে রইলেন শিবতোষ অনসূয়ার মুখের দিকে—দৃষ্টিতে ফুটে উঠল সর্ব্বস্ব দেবার পণ। মুখে বললেন, 'দেখাও আগে, পরে ত পুরস্কার।'

কিন্তু গাঢ় তাঁর কণ্ঠস্বর সচকিতা করে তুলল অনসূয়াকে, চোখ তুলে তাকাল। ছবি দেখার আগে অনসূয়ার একান্ত কাছে এসে দাঁড়ালেন শিবতোষ, দুই হাতে তুলে ধরলেন তার মুখখানা—পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আজকের ছবি যদি সার্থক হয়ে থাকে তোমার, তবে এক শিল্পীকেই তোমায় দান করব অনু।'

ছেড়ে দিলেন অনসূয়ার মুখ, এগিয়ে গেলেন ছবির দিকে —পর্দাখানা সরাতেই চমকে উঠলেন শিল্পী—তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছবিটি কি হাসছে?

নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন তিনি ছবির দিকে—হঠাৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি—স্বচ্ছ চেতনায় ধরা পড়েছে ছবির মডেল।

ক্ষোভে জলে উঠলেন শিবতোষ, খসে পড়ল তাঁর মার্জ্জিত রূপ, ক্রূর দৃষ্টি দিয়ে বিঁধলেন চকিতা অনসূয়াকে। বললেন, অনুকূল বড়ুয়ার ছেলের মুখখানা না বসালেই পারতে দেবতার মুখে।' আর দাঁড়ালেন না তিনি, ব্যর্থতার জ্বালা তাঁর সমস্ত অন্তর বিষাক্ত করে তুলল, বুঝতে পারলেন তিনি তাঁর আবেদনের ব্যর্থতার কারণ।

এই নাটকীয় সংঘাতে বিহ্বলমনা অনসূয়া ছবির দিকে চেয়েই চমকে উঠল, অঙ্কিত বোধিসত্ত্বের মুখে অসীমের মুখ, চোখে অসীমের দৃষ্টি—দেবতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন হাসছে, চরম সার্থকতায় সেই হাসি প্রোজ্জ্বল।

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী মাতার নিত্যপূজা কোথায় হয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

দশমহাবিদ্যার অন্যতম শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরীমাতার মন্দির ও মূর্ত্তি ভারতবর্ষে বড় একটা দেখা যায় না। ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির অল্পতার একটি আচরণ এইরূপ। কোনও সাধক একাদিক্রমে ৩২ বৎসর ধরিয়া ভুবনেশ্বরীর মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ না করিলে তাঁহার ভুবনেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার অধিকার জন্মায় না। এইরূপ সাধকের সংখ্যা খুবই অল্প, সাধক সিদ্ধিলাভ করিলেও সঙ্গতি না থাকার জন্য মূর্ত্তি বা মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। এজন্য ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের সংখ্যা খুব কম। সম্বলপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সম্বলেশ্বরী হইতেছেন ভুবনেশ্বরী। মূর্ত্তি বৃহৎ পাথরে অল্প খোদাই করা—দেবী পূর্ব্বাস্যা; ক্ষত্রিয় পূজারী পূজা করেন। সম্বলপুরে দুর্গাপূজার তিন দিন ভুবনেশ্বরীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া স্থানে স্থানে পূজা হয়।

সম্বলেশ্বরীর মন্দিরে মহাষ্টমীতে পুটিত চণ্ডীপাঠ হয়। বলি শূন্যে হয়। ঐখানে শূন্যে বলি দেওয়াই প্রথা। মন্দিরের একস্থানে কালাপাহাড়ের ঢাক্‌ ও "ঘুলঘুল্লা" আছে। প্রবাদ কালাপাহাড় সম্বলপুর আক্রমণ করিলে মাতা গোয়ালিনীর বেশ ধরিয়া বিষাক্ত দই তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া আইসেন। এই দুধ ও দই খাইয়া আক্রমণকারী সৈন্যদলের মধ্যে কলেরার প্রকোপে বহু সেনাপতি ও সৈন্য মারা যায়। সেনাপতিদের পাথরে ঢাকা কবর এখনও মহানদীতীরে দেখা যায়। এইরূপ কবরের সংখ্যা প্রায় ২০০।২৫০; পূর্ব্বে নাকি ৭০০ কবর ছিল। কালাপাহাড় যুদ্ধে হারিয়া তাঁহার ঢাক্‌ ও "ঘুলঘুল্লা" ফেলিয়া পলায়ন করেন। ঢাকের এখন চামড়া নাই, যদি কেহ মানত করিয়া শৃঙ্গযুক্ত মহিষ বলি দেয় তাহা হইলে এই মহিষের চামড়ায় ঢাক্‌ ছাওয়া হয়। বহুদিন এইরূপ মহিষ বলি হয় নাই; এবং পূর্ব্বের চামড়াও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। "ঘুলঘুল্লা" এখনও বাজে; তবে কষ্‌ ধরিয়া সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছে; খারাপ হইয়া যাইতেছে। কালাপাহাড় যে সম্বলপুর জয় করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ বহু অভগ্ন হিন্দু দেব-দেবী এখানে আছেন।

দক্ষিণ ভারতে বেল্লারী জেলার হোস্‌পেট তালুকে তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে হাম্পাগ্রামে হেমকুট পর্ব্বতের পাদদেশে ভুবনেশ্বরীর একটি মন্দির আছে। ইহারই অল্পদূরে বিরুপাক্ষেশ্বর মহাদেবের বিরাট মন্দির আছে। এই মন্দির শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য মাধব বিদ্যারণ্য স্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ, বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার

সায়নাচার্য্য, মাধব ও ভোগনাথ তিন ভাই ছিলেন। মাধব আয়ুর্ব্বেদের মাধব-নিদান ও রস-মাধব প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। তিনি বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্কার মন্ত্রী ছিলেন। মাধব মহাপণ্ডিত ছিলেন; সাধারণে তিনি মাধব বিদ্যারণ্য বলিয়া পরিচিত। পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্‌গুরু হয়েন। তিনিই আন্দাজ ইং ১৩৫০ সনে ভুবনেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ গল্প আছে যে, বিজয়নগরের রাজাদের সময় মহাষ্টমীর দিন ২৫০ মহিষ ও ৪,৫০০ ভেড়া বলি দেওয়া হইত।

নেপালেও ভুবনেশ্বরীর মন্দির আছে; কিন্তু কোন স্থানে তাহা জানিতে পারি নাই। সম্প্রতি ১৯৪৬ সনে গোত্তালের রাজবৈদ্য তথায় একটি ভুবনেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কামাখ্যা পাহাড়ে অন্যান্য পীঠের সহিত ভুবনেশ্বরীর পীঠ আছে। এই পীঠটি সর্ব্বোচ্চ পাহাড়ের উপর।

আমাদের বাংলা দেশে অন্ততঃপক্ষে ৪টি জায়গায় ভুবনেশ্বরীর পূজা হয় বলিয়া জানা যায়। যশোহরের মেথ-হাটি গ্রামে প্রস্তরময়ী ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি দেশবিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিত্য ষোড়শোপচারে পূজিত হইত। এখন কি হয় জানা নাই। জেলা ২৪ পরগণা, থানা খড়দহের অন্তর্গত রহড়া গ্রামে (ইহা প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক কোন কায়স্থ সেনাপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি); বর্দ্ধমান জেলার মিঠাপুর গ্রামে ও ঐ জেলার কুলীনগ্রামে ভুবনেশ্বরীর পূজা হয়। কতদিন হইতে পূজা হইতেছে বা কে মন্দির বা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

দশমহাবিদ্যার একত্রে পূজা অন্ততঃপক্ষে বাংলা দেশের দুইটি স্থানে হয়। ইহাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরীরও নিত্যপূজা হয়। এই দুইটি স্থান হইতেছে যশোহরের চাঁচড়ার রাজবাটী ও বরাহনগর-কাশীপুর রতনবাবুর শ্মশানঘাটের নিকট। অন্য কোথায়ও হয় কিনা জানা নাই।

কোথায় কোথায় ভুবনেশ্বরীর মূর্ত্তি ও মন্দির আছে তাহার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। যাহাতে সহজে মূর্ত্তির সনাক্তকরণ হয় তজ্জন্য ভুবনেশ্বরীর ধ্যান নিম্নে দেওয়া হইল। যথাঃ

"উদ্যদ্দিনকর দ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশাম্॥

ইহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল। যথাঃ

উদিত দিনকরের ন্যায় যাঁহার দেহকান্তি, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ও মস্তকে মুকুট আছে, যিনি পীনোন্নত পয়োধরা ও ত্রিনয়না, যাঁহার বদনে সর্ব্বদা হাস্য এবং চারিহস্তে বরমুদ্রা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়মুদ্রা আছে। এই ভুবনেশ্বরী দেবীকে ভজনা করি।

পাঠকগণ ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের যেখানে যেখানে ভুবনেশ্বরীর মন্দির ও মূর্ত্তি দেখিয়াছেন ও আছেন বলিয়া জানেন তাহা যদি আমাদিগকে জানান তাহা হইলে এই দেবীর পূজার ভৌগোলিক বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটা আন্দাজ হইবে। বাংলার কালীপূজা ও কালীমন্দির খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-এক জায়গায় তারা মা ও কালীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ভুবনেশ্বরী মাতার এইরূপ নামান্তর তথা পূজান্তর হইয়াছে কিনা জানি না; হইয়া থাকিলে কেন হইল, কবে হইল প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যাদি অনুসন্ধেয়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জীবন-কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থখানি রচিত। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তথ্যাদিতে ইহা সমৃদ্ধ। পিতার চরিত্র এবং পরিবেশানুযায়ী সন্তানের চরিত্র গঠিত হয়। ঐ একই পথ ধরিয়া সম্ভাবনার রথ আগাইয়া আসে।

জগদীশচন্দ্রের বাল্য-জীবন হইতে সুরু করিয়া তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

সব চেয়ে বড় কথা, তাঁহার জীবনে আমরা গীতার মানুষটিকে দেখিতে পাই। তিনি নিজে বলিয়াছেন, 'যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল নিরপেক্ষ থাকেন।' এ শুধু কথার কথা নয়, তাঁহার জীবনেও প্রত্যক্ষ করিলাম, প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল তাঁহার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। এই তড়িতের ঢেউ হইল রেডিওর জনক। কিন্তু তাঁহার এই গবেষণার ফল নানা আঘাতে প্রচারের সুযোগ পাইল না। তাই একের আবিষ্কার অপরের নামে মহা সমারোহে ঘোষিত হইয়া গেল। আজ সকলেই জানে 'মারকনী' ইহার আবিষ্কর্তা। কিন্তু এত বড় আঘাত পাইয়াও জগদীশচন্দ্র দমিলেন না। তিনি নূতন উদ্যমে পদার্থবিদ্যা হইতে পদার্থের জীবনবিদ্যা আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই আবিষ্কারই উদ্ভিদের চৈতন্য-শক্তিকে প্রমাণিত করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞান-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। তিনি স্বীকার করিয়াছেন—ইহা ভারতীয় প্রজ্ঞার পরিণতি। তাই তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্ম-জীবন এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। জগদীশচন্দ্র ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, কবি, দার্শনিক। তিনি বলিতেন দর্শনই বিজ্ঞানের শেষ, চরম-সীমা, পরম পরিণতি। যে বিজ্ঞান দর্শনে পৌঁছিতে পারে না, তা খণ্ড জ্ঞানমাত্র।

মনোরঞ্জন বাবুর কৃতিত্ব এইখানেই—তিনি আচার্যদেবের জীবন-কাহিনী লিখিতে বসিয়া তাঁহার এই মূল সুরটি ধরিতে পারিয়াছেন। এইরূপ জীবন-কথা শিশু-মনে যতই রেখাপাত করে ততই তাহাদের কল্যাণ। বিজ্ঞান-সাধক-চরিত-মালায় এইগ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়া ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী যথার্থই উপকার করিলেন।

অনামী—শ্রীদিলীপকুমার রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে দিলীপকুমার সর্ব্বজনপরিচিত। আলোচ্য পুস্তকটি কয়েকখানি কাব্যের একত্র গ্রন্থন। মণিমঞ্জুষা, কবিতাকুঞ্জ, গীতিগুঞ্জন, সুধাঞ্জলি এবং পরিশিষ্টাংশে, বাংলা ও ইংরেজী কতকগুলি পত্রাবলী। এই পত্রগুলি শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রোলাঁ, রাসেল, শরৎচন্দ্র প্রমুখ নানা মনীষীর। পত্র হিসাবে ইহার মূল্য যথেষ্ট। মণিমঞ্জুষাতে আছে ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীরূপ গোস্বামী, পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ, শ্রীঅরবিন্দ, গুরু নানক, কবীর, দাদূ, তুলসীদাস, ফকির শাহানশাহ প্রভৃতি কবির কাব্যানুবাদ। কবিতাকুঞ্জে নানা ধরণের কবিতা লঘুগুরু ছন্দে স্থান পাইয়াছে। গীতিগুঞ্জনে আছে অনেকগুলি গান, 'সুধাঞ্জলি' মীরা ভজনের বঙ্গানুবাদ।

কাব্যগুলি সুখপাঠ্য—রচনা বৈশিষ্ট্যে ইহার মাধুর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণের কাছে ইহা সমাদর লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস রাখি।

পরিক্রমণ—শ্রীশান্তশীল দাশ। তুলি-কলম, ৫৭এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—দু'টাকা।

পরিক্রমণ কবিতার বই। কবিতাগুলি পূর্ব্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি হিসাবে লেখকেরও খ্যাতি আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে যে কবিতাগুলি স্থানলাভ করিয়াছে তাহা সুনির্ব্বাচিত। সবচেয়ে বড় কথা কবিতাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, যা আধুনিক যুগে বিরল। কবি সাজিবার কোথাও অপচেষ্টা নাই। দেখিয়া মনে হয় ইনি জাত-কবির বংশধর। বইখানি রসিক-সমাজে সমাদর লাভ করিবে।

অরুন্ধতী—শ্রীঅংশুপতি দাশগুপ্ত। তুলি-কলম, ৫৭-এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—দেড় টাকা।

কবি নবাগত। আজকাল নূতন কবিতা দেখলেই ভয় হয়। সুখের বিষয় তাঁহার কবিতাগুলিতে আধুনিকতার উগ্র ঝাঁজ নাই। কবিতাগুলি সুখ-পাঠ্য। যদিও প্রথমটা রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ বলিয়া মনে হয়। আশা করি, এ দোষ তাঁহার ক্রমে শুধরাইয়া যাইবে। তবু আধুনিক যুগের সংক্রামক-পরিবেশ হইতে তিনি যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন—এজন্য আমরা তাঁহাকে স্বাগত জানাই।

শ্রীগৌতম সেন

হে যুদ্ধ বিদায়—অনুবাদিকা শ্রীদীপালি মুখোপাধ্যায়। পার্ল পাব্লিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-১। দাম—এক টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭০।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত মার্কিন লেখক আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে রচিত 'ফেয়ারওয়েল টু আর্ম্‌স' গ্রন্থ-

সেই 'সদ্য স্নানের' অনুভূতিটি সারাদিন ধরে বজায় রাখার জন্যে...
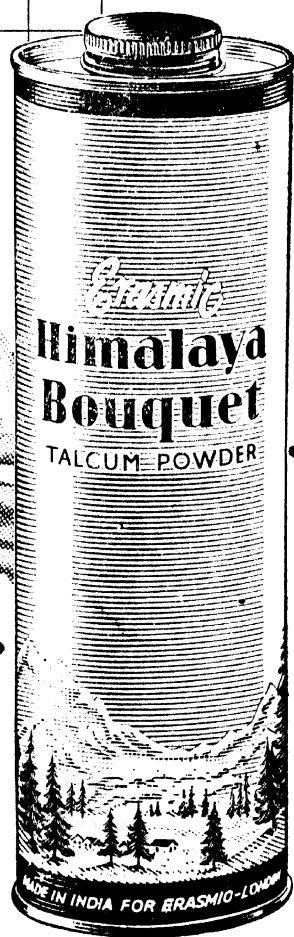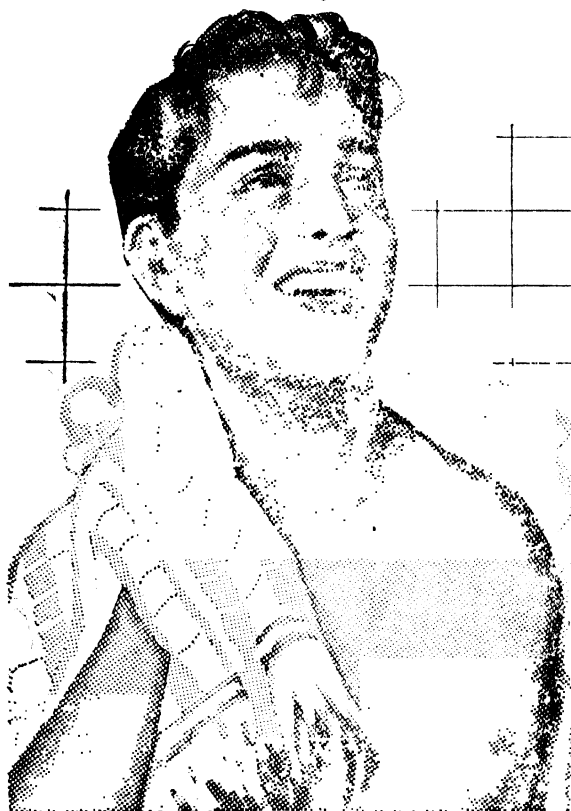
খানির বঙ্গানুবাদ। হেমিংওয়ে ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধে অ্যাম্বুলেন্স কর্মী রূপে যোগ দেন। এই গ্রন্থে তাঁর সৈনিক-জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণিত। হেমিংওয়ের রচনাশৈলী অনবদ্য। অনুবাদে তা বজায় আছে। অনুবাদিকার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

ত্রিনয়ন—শ্রীসুনীল দত্ত। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম এক টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯।

গ্রন্থখানি লেখকের তিনটি একাঙ্কিকা নাটিকার সমষ্টি। আমাদের সাহিত্যে ছোট একাঙ্কিকা নাটিকার অভাব আছে। অনেক অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও আনন্দ দানোদ্দেশ্যে ভাল একাঙ্কিকা নাটিকার প্রয়োজন হয়। লেখক সেই প্রয়োজন পূরণোদ্দেশ্যে নাটিকা তিনটি রচনা করেন। গ্রন্থের প্রথম নাটিকা 'কুয়াশা' উল্লেখযোগ্য। সংলাপে, প্লটে, নাটকীয় ঘটনায় রচনাটিকে সার্থক বলা যায়। গ্রন্থখানি নাট্যামোদী মহলের অভাব পূরণে কিছু সাহায্য করবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মীরা—শ্রীব্রজনন্দন সিংহ। অথর্স কর্ণার, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ১৷০।

মীরাবাইয়ের নাম মুখে মুখে ফিরছে, তাঁর ভজন সারা দেশের মন মুগ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু তাঁর জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর এবং সংশয় আছে। লেখক এখানে যথাসাধ্য প্রমাণ সহকারে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত লিখেছেন এবং অনুবাদসহ ভজনাবলী সঙ্কলন করেছেন। বড় না হলেও বইখানি তথ্যপূর্ণ, সুলিখিত এবং মূল্যবান।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হারানো ছন্দ—মীঘাটলাক। অরুণিমা প্রকাশনী, ২ জগবন্ধু মোদক রোড, কলিকাতা-৫। মূল্য ২।

উপন্যাস। ডিমাই-৮৫ পৃষ্ঠা। লেখক ছদ্মনামে পুস্তকখানি রচনা করিলেও তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত। ইতিপূর্ব্বে এই ছদ্মনামে লিখিত আর কোন লেখা চোখে পড়ে নাই। কিন্তু লেখক নূতন হইলেও সংসারে প্রবেশপথের একটি জটিল সমস্যাকে বিষয়-বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া একটি সুন্দর আনন্দময় পরিণতির পথে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই।

লেখকের সংযম এবং শালীনতা-বোধ প্রশংসনীয়। ভাষা মিষ্টি। অকারণে বিষয় বস্তুকে জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস কোথাও নাই। এক নিঃশ্বাসে বইখানি পড়া চলে।

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারিলে লেখক ভবিষ্যতে অনেক ভাল কিছু দিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়।

প্রচ্ছদ সুন্দর।

বন্দিনী—অনুবাদক শ্রীগৌরাঙ্গ পণ্ডিত। প্রকাশিকা উমা দেবী। ৮।১এ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য: ৩৲।

সমালোচ্য পুস্তকখানি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'The Captive Ladie'র বঙ্গানুবাদ। Captive Ladie মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্যোদ্যম। ইংরেজীতে এই পুস্তকখানি লিখিত হয়। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য বাংলা ভাষায় তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন।

Captive Ladieর বঙ্গানুবাদ ,করিয়া অনুবাদক কবির বাংলায় রচিত পুস্তকভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করিলেন। এই অনুবাদ কার্য্যে লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। কবির মূল ভাবধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গৌরাঙ্গ বাবু যে ভাবে বাংলায় রূপ দান করিয়াছেন তাহা সত্যই সুন্দর হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মূল কবিতাগুলিকে এক পৃষ্ঠায় রাখিয়া অপর পৃষ্ঠায় তাহার অবিকৃত মূল রচনার অনুবাদ—মাইকেল কাব্যের সহিত পরিচিত হইবারও সুযোগ করিয়া দেওয়ায় উপভোগ্যতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনুবাদকের নিজের আঁকা প্রচ্ছদপটটি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ঢাকাই গল্প—শ্রীঅবিনাশ সাহা। প্রকাশ মহল, ২২২ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। পরিবেশক ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য: ২৲।

গল্প গ্রন্থ। আলপাকার কোট, জামাই আদর, জাফর আলীর জুতো খরিদ, চুলি বিদায়, সাফাই সাক্ষী, মহারাজা হরচন্দ্র, বিপিন পণ্ডিত ও পৌষপার্ব্বণ। এই আটটি গল্প পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকার এক বিশেষ শ্রেণী সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তি আছে এই বিশেষ শ্রেণীদের লইয়াই অবিনাশ বাবু গল্প ফাঁদিয়াছেন। গল্পগুলি হাস্যরসাত্মক। বিভিন্ন পরিবেশে গল্পগুলির মধ্যে লেখক প্রচুর হাসির খোরাক জোগাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া আলপাকার কোট, জামাই আদর, জাফর আলির জুতা খরিদ ও পৌষপার্ব্বণ এই গল্প চারিটি সত্যই প্রচুর আনন্দদানে সক্ষম হইয়াছে।

গল্পগুলি পড়িবার মত এবং পড়াইবার মত।

প্রচ্ছদ ও ছাপা ঝরঝরে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দেশ-বিদেশের কথা

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন

বিষ্ণুপুর, বঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান। পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা স্থাপনের পক্ষে মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর উপযুক্ত স্থান। বিষ্ণুপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শাখা, বিষ্ণুপুর ও মল্লভূমের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে, বহু পুথি ও মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগ্রহ করিয়া আচার্য্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনটি গড়িয়া তুলিতেছেন। এই পুরাকৃতি ভবনের জন্য উপযুক্ত ভূমিও তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। আচার্য্য যোগেশচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত এই সংগ্রহশালাটির সার্থক রূপায়ণের জন্য দেশবাসী ও সরকারের সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।

উজ্জয়িনীতে কালিদাস জয়ন্তী

এইবারের উজ্জয়িনী কালিদাস স্মরণোৎসবের অনুষ্ঠান সূচীতে একটি বিশেষ বিষয় ছিল—কালিদাস-বিষয়ে স্বরচিত সংস্কৃত সঙ্গীত সহ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর সংস্কৃতে কথকতা। ডক্টর রমা চৌধুরী প্রথমেই কালিদাসের দর্শন বিষয়ে ভাষণ দেন। অতঃপর ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সুললিত সংস্কৃত ভাষায় কালিদাস ও তাঁর গ্রন্থনিচয়ের মাহাত্ম্যবাচক সঙ্গীত সহ যে কথকতা করেন, তাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেত প্রায় বিশ হাজার সুধী বিশেষ অপ্যায়িত হন। বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, সংস্কৃত ভাষার সারল্য এবং গবেষণামূলক তথ্য এই কথকতায় পরিবেশনে বিশেষ সহায়ক হয়। অতি উচ্চ বিষয়ের এই ভাবে পরিবেশন সকলকেই বিশেষ মুগ্ধ করে।

এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলনেও চৌধুরী দম্পতী যোগদান করেন এবং সংস্কৃত ও বাংলা কালিদাস শীর্ষক কবিতা পাঠ করেন।

ডক্টর চৌধুরীর "অদ্যাবধি অপ্রকাশিত মেঘদূতের টীকাসমূহের গুরুত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ সুধীসমাজকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করে।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

আগামী পৌষ মাসে আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন সুরু হইবে।

এবারের সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন কেবলমাত্র আয়ুর্ব্বেদের নানা বিষয়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় কেন্দ্র হইবে না, একটি আয়ুর্ব্বেদ-প্রদর্শনীও ইহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবে ও আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দিগদর্শন রূপে প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু এই আয়োজনের চেয়েও বিশেষ প্রয়োজন হইল ভারতীয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও নিষ্ঠা ফিরাইয়া আনা—অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসার ক্ষুরধার দৃষ্টি সত্যের অনুবীক্ষণে নিয়োজিত করা।

সরকারী অব্যবস্থিতচিত্ততা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির যথার্থ কোন নির্দ্দেশ দিতে পারে নাই। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্যের আধুনিক চমকপ্রদ আবিষ্কারে এত উদভ্রান্ত ও অভিভূত হইয়াছে যে, আয়ুর্ব্বেদের মত এত বড় একটা ঐতিহ্য ও বিজ্ঞানসম্মত, আবার বর্ত্তমানের উপযোগী চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ লাভের সর্ব্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা শিথিল ও সঙ্কল্পহীন হইয়া পড়িয়াছে—সঙ্কল্প কিছু থাকিলেও তাহা ধ্বংসের জন্য। প্রদেশে প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির প্রচেষ্টা চলিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাও সংমিশ্রণের বালুচরে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে—উন্নতি ত দূরের কথা।

অথচ আয়ুর্ব্বেদ ভারতের সুপ্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞান। শতাব্দীর পর শতাব্দী সরকারী সাহায্য না পাইয়াও নিজস্ব নির্ভুল নীতি ও ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কারের জন্য জনসাধারণ ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহার অমূল্য সম্পদের অনুসন্ধানে বিদেশীয়রাও আগ্রহশীল। শুধু কবিরাজ ও জনসাধারণের নহে, ডাক্তারদেরও ইহা গৌরবের বস্তু, বিশেষতঃ কবিরাজী ঔষধের সাহায্যে ডাক্তারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য সরকার চেষ্টা করিতেছে। এখনও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মহাসমারোহ ও উদ্ভাবন সত্ত্বেও দুরারোগ্য ব্যাধি ইহা দ্বারা নিরাময় হইতেছে। ভারতীয় প্রকৃতিতে ইহার যুক্তি-যুক্ততা অনস্বীকার্য্য। এইজন্যই প্রয়োজন আলাপ-আলোচনার।

এই অধিবেশনে বিশিষ্ট কবিরাজগণ এক একটি বিভাগে সভাপতিত্ব করিবেন এবং বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করিবেন। এ বৎসরেও একটি আয়ুর্ব্বেদ-প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং জনসাধারণকে স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য খাদ্য, ঋতুচর্য্যা, দিনচর্য্যা, সংক্রামক ব্যাধি প্রভৃতি সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হইবে।

এবারের অধিবেশনকালে 'ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের' আয়োজন বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হইবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৮শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৬৫

সংখ্যা
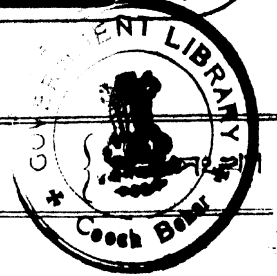
বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর জীবনসঙ্কট

প্রত্যেক বৎসর জাতীয় দিবস বা 'গণতন্ত্র দিবস' উপলক্ষে কলিকাতায় দুই প্রকার সমারোহ ইত্যাদি হইয়া আসিতেছে। সরকারী হিসাবে উহা উৎসবের ন্যায় শোভাযাত্রা, সৈন্যসামন্তের কুচকাওয়াজ, রাজ্যপালের ভবনে আনন্দমেলা ও বেতার ইত্যাদিতে অধিকারীবর্গের আত্মপ্রশংসায় উদ্‌যাপিত হয়। বিপক্ষদল 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' ইত্যাদি স্লোগানে গগন ফাটাইয়া, বড় বড় পথে ঘাটে মিছিল চালাইয়া যানবাহনের বিপর্যায় ঘটাইয়া এবং ময়দানে বিরাট সভায় 'গণবিক্ষোভের ঝড়' বহাইয়া, নানা দলের ক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

এ বৎসরও ঠিক ঐভাবেই গিয়াছে, শুধু যা বাঙালীর দিক হইতে উৎসব নিরানন্দেই কাটিয়াছে। পথে-ঘাটে বা জন-সম্মেলনে হাসিমুখ দেখা গিয়াছে অবাঙালীর এবং অনুচরপরিবৃত অধিকারীবর্গের। বেতারের ভাষণে কর্তৃপক্ষের কৃতিত্বের পরিচয় এবারও কংক্রীট ও ইস্পাতের হিসাবেই দেওয়া হইয়াছে এবং দেশের সন্তান-সন্ততিগণকে ভবিষ্যতের আলেয়ার রঙীন আলোক দেখাইয়া ভুলাইবার চেষ্টা আগেকার মতই করা হইয়াছে।

কিন্তু এবার সরকারী সমারোহ যেন আরও প্রাণবস্তুহীন ও মারামরীচিকামূলক মনে হইয়াছে। বিশেষতঃ বাঙালীর কাছে যেন "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়" এই আর্তনাদ নিদারুণ সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে মনে হয়। এই দশম জাতীয় দিবসে বাঙালী আজ আরও "গত গৌরব হৃত আসন!"

এই অবস্থার জন্য দায়ী আমরা সকলে। আজ পশ্চিম বাংলায় যাঁহারা আমাদের মনোনীত মুখপাত্র হিসাবে সরকারী দলে ও বিপক্ষ দলে কর্তৃত্ব করাইতেছেন তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা আমরাই দিয়াছি। আমাদের বিচারবুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞানের বা তাহার অভাবের পরিচয় আজ বাংলার রাজনৈতিক দলগুলি এবং এই বুদ্ধি-বিবেচনার বিকারে আজ বাঙালী ভারতে নগণ্য বলিয়া অবহেলিত। ভিক্ষাবৃত্তি ও আত্মঘাতী দলাদলি এবং সেই সঙ্গে নৈতিক চরম অবনতি ও ঐ বিচারবুদ্ধির বিকারের ফল। এ পথে চলিলে জাতির শেষ পরিণতি কোথায় সেকথা বলিতে দৈবজ্ঞের বা গণৎকারের প্রয়োজন হয় না।

যাহাই হউক, এখন বৃথা বিলাপে কোন কাজ হইবে না। আমাদের এখন প্রয়োজন রোগের কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের চেষ্টা। আমরা যদি বুঝি যে, শুধু পরের উপর নির্ভর করিয়া বা সরকারী ত্রুটিবিচ্যুতির বিরাট হিসাব দেখাইয়া কোনও কাজ হইবে না তবেই কিছু কাজ হওয়া সম্ভব। ইহার জন্য প্রয়োজন সর্বাগ্রে যাহারা আমাদের ভবিষ্যতের দীপধারক সেই কিশোর ও যুবজনের মধ্যে একটা গঠনাত্মক সক্রিয় ভাব আনা। তাহাদের বুঝাইতে হইবে যে, তাহাদের জীবনমরণ, তাহাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে নূতন যাত্রাপথের উপর। শুধু স্লোগানে বা হাতে-লেখা পোষ্টারে বা পথেঘাটে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিমাপে যদি তাহাদের প্রগতির কোনও উপকরণ থাকিত তবে চাকরীর বাজারে—ব্যবসা বাণিজ্যের কথা নাই বলিলাম—তাহাদের স্থান আজ এত নীচে নামিত না। তাহাদের বুঝা প্রয়োজন, "আমাদের দাবী মানতে হবে" এই স্লোগানের আজ "উৎপাত মূল্য" (nuisance value) পর্যন্ত নাই।

সরকারী কংগ্রেসদলকে কিছু বলিবার নাই। তাঁহারা প্রতি বৎসর বাঙালীর ব্যবসা-কারবার আরও রসাতলে পাঠাইতেছেন। বাঙালীর রক্তশোষণের সকল পথ আজ ব্রিটিশ আমল অপেক্ষাও প্রশস্ত। যাহারা এ বিষয়ে কিছু বলে 'সে বেটা বেজায় পাজী'—কিংবা 'প্রাদেশিকত্ব দোষযুক্ত'।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একদিন বাঙালী সমস্ত দেশের শীর্ষে ছিল। আজ ভারতের প্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে সাতটিতে শিক্ষার মূল উপকরণ, পুস্তক ও পত্রিকার উপর বিক্রয়কর বন্ধ করা হইয়াছে। বাকী আছে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গ।

পরিকল্পনার মূলধন

বর্তমানে দ্বিতীয় পরিকল্পনা এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে যেখানে স্বতঃই প্রশ্ন আসে যে ভারতবর্ষ তৃতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ করিবে না, দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা করিবে। ভারতীয় পরিকল্পনার প্রধান অন্তরায় হইতেছে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব; আগামী দুই বৎসরে ভারতবর্ষকে প্রায় ৯০০।১০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার পাওনা মিটাইতে হইবে এবং ইহার জন্য ভারতবর্ষকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে।

পরিকল্পনার ব্যয়ও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সেই তুলনায় মূলধনের বৃদ্ধি হইতেছে না। সরকারী ক্ষেত্রে যে তিনটি নূতন লৌহ-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহাদের ব্যয় পূর্ব নির্দ্ধারিত ৩১০ কোটি টাকা হইতে ৪২৫ কোটি টাকায় উঠিয়াছে। ইহা অনুমিত হইতেছে যে, এই ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পসমৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মোট ৫৮৯ কোটি টাকার ব্যয় ধার্য্য হইয়াছিল। এই ব্যয়ের পরিমাণ বর্তমানে বৃদ্ধি পাইয়া ৮১৫ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মোট ৬৮৫ কোটি টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৫৩৫ কোটি টাকা নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় হইবে এবং ১৫০ কোটি টাকা পুরাণো শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হইবে। কিন্তু সংশোধিত হিসাব অনুসারে বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে মোট ৮৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ৫১৫ কোটি টাকার অধিক মূলধন নিয়োজিত হইবে বলিয়া ভরসা হইতেছে না এবং ইহা প্রাথমিক নির্দ্ধারিত ব্যয় ৬২৫ কোটি টাকা হইতে অনেক কম; সুতরাং সংশোধিত ভাবে যে ৮৪০ কোটি টাকা ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা আদৌ সম্ভবপর হইবে না।

বেসরকারী ক্ষেত্রে বৎসরে ১৩৭ কোটি টাকার মূলধন সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল; দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ১৩৫ হইতে ১৪০ কোটি টাকার মূলধন বেসরকারী শিল্পগুলিতে নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রে যদিও প্রথম দুই বৎসরের বাজেটে শিল্প নিয়োগের জন্য ২৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তথাপি ২৪০ কোটি টাকা প্রকৃতপক্ষে নিয়োজিত হইয়াছে। বৈদেশিক মূলধনের আমদানীও আশানুরূপ হয় নাই, ইহার প্রধান কারণ ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক আদর্শ গ্রহণ। ১৯৪৮ সনের জুলাই মাস হইতে ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বৎসরে মাত্র ২৫·১ কোটি টাকা করিয়া বৈদেশিক মূলধন আসিয়াছে। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সনে বৈদেশিক মূলধনের আমদানীর পরিমাণ ছিল বৎসরে ১৬ কোটি টাকা; ১৯৫৬ সনে ২৪ কোটি টাকা; ১৯৫৭ সনে ২০ কোটি টাকা এবং ১৯৫৮ সনে ইহার চেয়েও কম মূলধন আসিবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ভারতের প্রয়োজনের অনুপাতে বৈদেশিক মূলধনের আমদানী অত্যন্ত কম।

সরকারী শিল্পনীতি বহুলাংশে বৃহদায়তন শিল্পগুলির অধোগতির জন্য দায়ী; যেমন দেখা যাইতেছে বর্তমানে মিল বস্ত্রশিল্প বিষয়ে, যাহা ভারতের বৃহত্তম সংস্থাবদ্ধ শিল্প। মিল বস্ত্রশিল্প বর্তমানে সঙ্কটের সম্মুখীন এবং তাহা হইতে উদ্ধার সহজে পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁত-শিল্পকে সাহায্য করিবার মানসে মিল-বস্ত্রের উপর বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যমূলক কর ধার্য্য করা হইয়াছে, এবং তাহার ফলে মিল-বস্ত্রের মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে যে তাঁত-শিল্পের বিশেষ কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা মনে হয় না। কিন্তু মিল বস্ত্রশিল্পের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে—আভ্যন্তরিক এবং বৈদেশিক বাজারে। মিল বস্ত্রশিল্পে প্রায় আট লক্ষ কর্মী কাজ করে। বৃহদায়তন শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারিলে দেশে শিল্পসমৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। সরকারী বিভ্রান্তকর শিল্প-নীতির ফলে কুটীর-শিল্প বর্তমানে বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুটীর-শিল্পকে বৃহদায়তন শিল্পের সহযোগী এবং পরিপূরক হিসাবে দেখা উচিত ছিল।

ভারতীয় পরিকল্পনা বাস্তবকে পরিত্যাগ করিয়া আদর্শকে লইয়া মাতামাতি করিতেছে, অর্থাৎ হাতের কাছের কাজ না করিয়া বড় বড় কল্পনা লইয়া ব্যস্ত। ছোট ছোট এবং মাঝারি আকারের সেচ ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী না করিয়া বৃহদায়তন নদী পরিকল্পনা লইয়া ব্যস্ত, বৃহদায়তন নদী পরিকল্পনা দশ-বিশ বৎসর পরে গ্রহণ করিলেও কোন ক্ষতি হইত না, বরং লাভ হইত যে পরিকল্পিত অর্থনীতির সুরুতেই ভারতবর্ষের বহু মূল্যবান এবং বহু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ব্যয়িত হইত না। অধিকন্তু আগের কাজ আগে না করিয়া পরের কাজকে আগে করা হইতেছে। ভূমি সংস্কার আগে না করিয়া সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন যথেষ্টভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না।

চীনের পরিকল্পনা বাস্তবিকই যুগান্তরকারী হইয়াছে, চীন শুধু যে খাদ্যশস্য উৎপাদনেই স্বাবলম্বী হইয়াছে তাহা নহে, সে আজ খাদ্যশস্য রপ্তানী করিতেছে। বড় বড় পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়া সহজ ভাবে ছোট ছোট পরিকল্পনার দ্বারা তাহার উৎপাদন দ্রুতহারে বৃদ্ধি করিতেছে। চীন তাহার সমস্ত কার্য্যক্ষম লোককে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে, বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মাঝারি আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেছে। ভূমি প্রথার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে এবং ব্যক্তিগত শ্রমের সাহায্যে বৃহদায়তন শিল্পের কাজ লাভ করিতেছে। এই সকল কারণে ভারতের চেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে চীন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় দুই শতাংশহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে; অর্থাৎ প্রায় ৫০.৬০ লক্ষ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে

এবং তাহার ফলে প্রায় ২০ লক্ষ বেকারের প্রতি বৎসরে চাকুরীর সংস্থান দরকার। এই হারে চাকুরীর সংস্থান সৃষ্টি করিতে হইলে জাতীয় আয় বৎসরে ২০০-৩০০ কোটি হারে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। এই পরিমাণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন বৎসরে ৫০০-৬০০ কোটি টাকার নূতন মূলধন সৃষ্টি। কিন্তু বর্তমানে বৎসরে ২০০-২৫০ কোটি টাকার মত মূলধন সৃষ্টি হইতেছে, তাহার ফলে বেকার সমস্যার সমাধান আশানুরূপ হইতেছে না এবং জাতীয় উৎপাদন দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে না।

ভারতবর্ষের বিগত ৪০০ বৎসরের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে কয়েক বৎসরের মধ্যে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে এবং সেই জন্যই পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক হইতে একটি অনগ্রসর দেশ এবং অনগ্রসরতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে অত্যল্প জাতীয় এবং ব্যক্তিগত উৎপাদনের হার ও পরিমাণ। ইহার ফলে জাতীয় সঞ্চয় তথা মূলধন সৃষ্টি প্রয়োজনীয় হারে বৃদ্ধি পায় না এবং ফলে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। ক্রমবর্দ্ধমানশীল বেকার সমস্যাই হইতেছে অনগ্রসর অর্থনীতির প্রধান সমস্যা। ভারতবর্ষে এই সমস্যাই দিন দিন প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

সুতরাং বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিয়াছে যে ভারতে পরিকল্পনাক্ষেত্র আর বিস্তৃত না করিয়া তাহাকে সুসংবদ্ধ করা উচিত, কিন্তু ইহা অযৌক্তিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল উপদেশ। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিরগতিশীল, এবং গতিশীলতাই ইহার প্রাণ ও ভিত্তি। সেই কারণে ইহার ফলকে কার্য্যকরী করিয়া রাখিতে হইলে বিস্তৃতির পর বিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী, অনগ্রসরতা অর্থনীতির মৃত্যুস্বরূপ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃতি ব্যতীত সুসংবদ্ধতা আসে না ইহা বিশ্বব্যাঙ্কের বোঝা উচিত ছিল। আসল কথা বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক আদর্শকে পছন্দ করে না, তাই ইহা বার বার উপদেশ দিতেছে যে ভারতে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা উচিত।

কিন্তু বর্তমান ভারতকে দ্রুতহারে তাহার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে হইবে; ইহার জন্য বেসরকারী প্রচেষ্টা ও সম্পদ সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত। ঘরের পাশে চীন পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। নিজের প্রচেষ্টাতে সে আজ ভারতের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। সেই তুলনায় ভারতবর্ষ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এই অনগ্রসরতার জন্য দায়ী ভারতের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নহে—দায়ী তাঁহার আধা-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

বৈদেশিক সাহায্য

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য বৈদেশিক অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কারণ তাহার নিজের আভ্যন্তরিক আয় ও সঞ্চয় পরিকল্পনার পক্ষে যথেষ্ট নহে। কয়েকটি দেশ এবং কয়েকটি বৈদেশিক সংস্থা হইতে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক সাহায্য ও ঋণ পাইয়াছে। এই সকল দেশগুলির মধ্যে প্রধানতঃ দেখা যায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে এবং জাপান। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান মধ্যে আছে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বে-সরকারী ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠান, যথা, ফোর্ড ফাউণ্ডেশান, রকফেলার ফাউণ্ডেশান প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠান হইতেও ভারতবর্ষ সাহায্য পাইয়াছে। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রায় তিন বছর অতীত হইয়াছে। ভারতবর্ষ তাহার পরিকল্পনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ভাবে কোনও ঋণ কিংবা সাহায্য পায় নাই। তদ্বিষয়ে ফলে মাঝে মাঝে ঋণ পাইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভ হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য হিসাবে মোট ১৩১৩ কোটি টাকা পাইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদী যে সকল ঋণ দিয়াছে তাহা বাদ দিয়া দেখা যায় যে বাকী টাকার মধ্যে ভারতবর্ষ ৮৪৫.৮৫ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে পাইয়াছে এবং ১৮১.৫৮ কোটি টাকা সাহায্য হিসাবে পাইয়াছে। এই পরিমাণ অর্থের মধ্যে ১৯৫৮ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ২৬৬ কোটি ঋণের টাকা এবং ১৩২ কোটি সাহায্যের টাকা ভারতবর্ষ ব্যয় করিয়াছে এবং বাকী ৬৩২ কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারে। ঋণ এবং সাহায্যের পরিমাণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতেই সর্ব্বাধিক পরিমাণে আসিয়াছে এবং ইহার মোট পরিমাণ প্রায় ৬৮৩ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত আমেরিকার বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি ৫.৩৩ কোটি টাকার ঋণ দিয়াছে এবং আমেরিকার মোট সাহায্য দাঁড়ায় ১৫৯.২২ কোটি টাকায়।

সরকারী ক্ষেত্রে মোট ৬৭১.৫০ কোটি টাকার ঋণ পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক ১৩৭ কোটি টাকার ঋণ দিয়াছে। বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের টাকা হইতে ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত ৭৯ কোটি টাকা খরচ করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ভারত সরকার ১৬৭ কোটি টাকা ঋণ পাইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া ১১২.৫৭ কোটি টাকার ঋণ দিয়াছে; তাহার মধ্যে ভিলাই ইস্পাত কারখানার জন্য ৬৩ কোটি টাকা এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ৫৯.৫০ কোটি টাকা। দুর্গাপুর ইস্পাত শিল্পের জন্য ব্রিটেন দিয়াছে ৩৫.৩৩ কোটি টাকার ঋণ; ইহার মধ্যে ১২.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। রুরকেলা ইস্পাত-শিল্পের জন্য পশ্চিম-জার্মানী যে ৭৪.৮৩ টাকার ঋণ দিয়াছে তাহার মধ্যে ২৮.৪২ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। জাপানের নিকট হইতে ভারতবর্ষ ঋণ হিসাবে ২৩.৮০ কোটি টাকা পাইয়াছে এবং কানাডার নিকট হইতে গম ঋণ বাবদ আসিয়াছে ১৬.৫১ কোটি টাকা। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে ভারতবর্ষ ৯৫.২৩ কোটি টাকার ঋণ লইয়াছে

এবং বিভিন্ন দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্ত ভারতবর্ষকে ২৪৩৪ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ দফা কার্য্যতালিকা অনুসারে ১৯৫২ সনের ৫ই জানুয়ারী ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তি হইয়াছে এবং সেই চুক্তি অনুসারে কারিগরী শিক্ষা সাহায্যের জন্ত আমেরিকা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্ত অর্থ সাহায্য করিবে। এই চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত ৮৮টি কার্য্য তালিকার জন্ত মোট ৫৯ কোটি ডলার পাইয়াছে, তাহার মধ্যে সাহায্য হইতেছে ২৬ কোটি ডলার এবং ঋণ হইতেছে ২২.৫০ কোটি ডলার। ৫৯ কোটি ডলার প্রায় ২৯০ কোটি টাকার সমান। বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে ভারতবর্ষের বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র প্রায় ৬১ কোটি টাকা ঋণ পাইয়াছে। বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরকারী ও বেসরকারীক্ষেত্র মোট ২৪১.৪৭ কোটি টাকা ঋণ পাইয়াছে।

দ্যগল নূতন ফরাসী প্রেসিডেন্ট

জেনারেল দ্যগল বিপুল ভোটাধিক্যে পঞ্চম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পার্লামেন্ট ও বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য এবং সমুদ্রপারের ফরাসী উপনিবেশগুলির প্রায় ৮১,০০০-এরও অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত এক নির্ব্বাচকমণ্ডলী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। দ্যগল ব্যতীত আর দুইজন প্রার্থী ছিলেন—তাঁহারা হইলেন মঃ জর্জেস মারানে (কম্যুনিষ্ট) এবং মঃ আলবার্ট শ্যাটেলেট (বামপন্থী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক)। তাঁহাদের ভোটসংখ্যা এইরূপ :

জেনারেল দ্যগল : ৬২,৩৯৪টি ভোট, ফ্রান্সের মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৭.৫০ ভাগ, সমুদ্রপারের ডিপার্টমেন্টগুলিতে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৮১.৪৫ ভাগ।

মঃ মারানে : ১০,৩৫৪টি ভোট, ফ্রান্সের প্রদত্ত ভোটসংখ্যার শতকরা ১৩.০৪।

মঃ শ্যাটেলেট : ৬,৭২২টি ভোট অর্থাৎ শতকরা ৮.৪৬টি ভোট।

৮ই জানুয়ারী দ্যগল প্রেসিডেন্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি সেনেটর দেব্রেকে তাঁহার প্রধানমন্ত্রীরূপে মনোনীত করেন। নূতন ফরাসী সংবিধানে প্রধান কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রেসিডেন্টেরই হাতে থাকিবে। বস্তুতঃ ওয়াকিবহাল মহলের অভিমতে সম্রাট নেপোলিয়নের পর ফ্রান্সে দ্যগলই হইলেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পূর্ব্ববর্ত্তী ফরাসী সরকারের প্রতিনিধি-বৃন্দ যে সকল আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করেন তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিতেই ফ্রান্সের জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয় নাই। দ্যগল এবং তাঁহার নব মনোনীত প্রধানমন্ত্রী দেব্রে উভয়েই এই সকল চুক্তির বিরোধী। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্যগলের নেতৃত্বে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে ফ্রান্সের ভূমিকা অধিকতর সক্রিয় এবং স্বাধীন হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

তবে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে সকল মৌলিক সমস্যার সমাধানে পূর্ব্ববর্ত্তী ফরাসী সরকারসমূহ অক্ষম হইয়াছিল সেগুলি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে আলজিরিয়া এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সমস্যা কোনটিরই সমাধান এখন হয় নাই। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূলেও রহিয়াছে আলজিরিয়া সমস্যা। আলজিরিয়ার ব্যাপারে এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্ত যে সকল শক্তি দায়ী তাহাদের দমন করিবার প্রকৃত ক্ষমতা এবং ইচ্ছা দ্যগলের কতখানি আছে আলোচনা-সাপেক্ষ। তবে যতদিন পর্য্যন্ত ঐ মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করা না যাইবে ততদিন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

নেপালের নির্ব্বাচন

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নেপালে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে। ইতিপূর্ব্বে দুইবার সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল—কিন্তু নানা কারণে তাহা হয় নাই। সাধারণ নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত কার্য্য পরিচালনায় সাহায্য করিবার জন্ত রাজা মহেন্দ্র একটি পরামর্শদাতা সভা মনোনয়ন করেন; গত ১৯শে নবেম্বর সর্ব্বপ্রথম তাহার অধিবেশন বসে। কিন্তু এই পরামর্শদাতা সভা কাজের মধ্যে এক সপ্তাহে দুই বার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই করেন নাই। নেপালের সকল রাজনৈতিক দল এবং জনসাধারণ যখন যথাসম্ভব সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্ত আন্দোলন করিতেছেন তখন পরামর্শদাতা সভার নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সত্যই দুর্ব্বোধ্য। রাজা মহেন্দ্র অবশ্য সভার মতামতে আস্থা স্থাপন করেন নাই, তিনি সভার অধিবেশন স্থগিত করিয়া দেন।

রাজা মহেন্দ্রের সিদ্ধান্তের অর্থ হইল যে, নির্ব্বাচন পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সময়তালিকা অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হইবে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী নির্ব্বাচনের দিন ধার্য্য হইয়াছে। নির্ব্বাচনে নেপাল পার্লামেন্টের ২০৯টি আসন পূর্ণ করা হইবে। ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১০৭টি আসনের জন্ত নয় শত বিয়াল্লিশটি মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়। বাকী দুইটি নির্ব্বাচনকেন্দ্রে—পশ্চিম নেপালের জুমলা ও হুমলা অঞ্চলের জন্ত মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ পরে জানান হইবে।

একশত সাতটি আসনের মধ্যে কম্যুনিষ্টরা ৪৮টি আসনের জন্ত, গোর্খা পরিষদ ৮২টি আসনের জন্ত, শ্রী কে. আই. সিং-এর সংযুক্ত গণতান্ত্রিক দল ৫৫টি আসনের জন্ত, শ্রী ডি. আর রেনামীর নেপালী ন্যাশনাল কংগ্রেস ১৬টি আসনের জন্ত, প্রজাপরিষদ (শ্রীটঙ্কপ্রসাদ আচার্য্যেরদল) ২৯টি আসনের জন্ত এবং প্রজাপরিষদ (শ্রীভদ্রকালী মিশ্রের দল) ৩১টি আসনের জন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

সৌর রকেট

২রা জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি সৌর রকেট উৎক্ষেপ করে। ৩রা জানুয়ারী রকেটটি ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৮ শত মাইল

অতিক্রম করিয়া যায়। ৪ঠা জানুয়ারী বিকালের মধ্যেই রকেটটি চন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। রকেটটি এখন উহার কক্ষপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, রকেটটি ২১১৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। এই মহাকাশগামী রকেট মনুষ্যসৃষ্ট প্রথম উপগ্রহরূপে সূর্য্য হইতে ১৪,৬৪,০০,০০০ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ৯ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করিবে এবং ইহাই হইবে এই রকেটের পক্ষে সূর্য্যালোকের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে উপনীত হওয়া। এই রকেটটি ৩৪,৩৬,০০,০০০ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ২১,৪৭,৫০,০০০ মাইল কক্ষপথে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রতিবারের সূর্য্য প্রদক্ষিণে ১৫ মাস লাগিবে।

জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে আগামী সাত বৎসরের মধ্যেই মানুষ মহাকাশে ভ্রমণ করিতে পারিবে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অভিমতে আগামী এক শত বৎসরের মধ্যে চন্দ্রে ভ্রমণ সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইবে।

পর্তুগালে রাজনৈতিক নির্যাতন

পর্তুগাল গোয়া, দমন, ডিউ দখল করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের সমর্থন জোগাইয়াছে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পর্তুগালের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জীবনে কোন স্বাধীনতার বালাই নাই, তাহার সর্ব্বশেষ প্রমাণ মিলিবে জেনারেল হামবার্টো ডেলগাডোর প্রতি সরকারী আচরণে।

গত ত্রিশ বৎসর যাবত পর্তুগালে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে কেহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সাহস পান নাই। ১৯৫১ সনে অবশ্য দুই জন প্রতিযোগী সালাজারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু সালাজারের প্রভাবান্বিত কাউন্সিল অব ষ্টেট একজনের মনোনয়ন বাতিল করিয়া দেন, অপর প্রার্থী এডমিরাল মেয়ারেলস সংবিধানিক স্বাধীনতা অপহরণের প্রতিবাদে নির্ব্বাচন বয়কট করেন। কিন্তু গত বৎসর জেনারেল হামবার্টো কোনরূপেই তাঁহার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে সম্মত হন নাই। অবশ্য নির্ব্বাচনে সালাজারেরই জয় হয়, কিন্তু জেনারেল হামবার্টোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাব তাহাতে নষ্ট হয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি ডঃ সালাজারের একজন প্রাক্তন সহকর্ম্মী—পর্তুগাল বিমানবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার এবং গত বৎসর নির্ব্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় তিনি ছিলেন অসামরিক বিমানপরিবহন বিভাগের কর্ত্তা।

ডঃ সালাজার অবশ্য জেনারেল হামবার্টোর এই "ঔদ্ধত্য" ক্ষমা করিতে পারেন নাই। নির্ব্বাচনে জয়লাভের অব্যবহিত পরেই জেনারেল হামবার্টোর সহযোগীদিগকে গ্রেপ্তার, পুলিস হয়রানী প্রভৃতি নানা উপায়ে নির্য্যাতিত করা হইতে থাকে। জেনারেল হামবার্টোর প্রতিপত্তির কথা স্মরণ রাখিয়া তাঁহাকে সরাসরি গ্রেপ্তার করা হয় নাই—কিন্তু তাঁহাকে কড়া নজরে রাখা হইয়াছে। গত ৬ই জানুয়ারী তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। তিনি বিপদ বুঝিয়া লিসবনস্থিত ব্রাজিল সরকারের দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন।

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, জেনারেল হামবার্টোর রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে পর্তুগীজ সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করেন নাই, একটি নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যই তিনি ব্রাজিল দূতাবাসে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তবে অবশ্য এক্ষেত্রে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, গত নবেম্বর মাসে অনুরূপভাবে আর একজন সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রদ্রোহী পুস্তিকা প্রচারের অপরাধের জন্য শীঘ্রই তাঁহার বিচার হইবে। জেনারেল ডেলগাডোর অপরাধ তিনি সালাজারের শাসনব্যবস্থায় খুশী নহেন, তিনি উহার একজন কড়া সমালোচক। সরকার তাঁহার সমালোচনার কোন সন্তোষজনক উত্তরদানে অসমর্থ, সেহেতু তাঁহার বিরুদ্ধে এই সকল ষড়যন্ত্র করা হইতেছিল; জেনারেল ডেলগাডো যথাকালে তাহা বুঝিতে পারিয়া সালাজারের মুঠির বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

ভারত ও পূর্ব্ব জার্ম্মানী

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর দেশ বিভাগের যে হিড়িক দেখা দেয় তাহার সুরু হয় জার্ম্মানীতে। জার্ম্মানীকে দুই দিক হইতে মিত্রশক্তির সৈন্যদল প্রবেশ করে। পূর্ব্ব দিক হইতে সোভিয়েট সৈন্যদল এবং পশ্চিম দিক হইতে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যদল। সোভিয়েট সৈন্যদলই প্রথমে বার্লিন অধিকার করে পরে সৌজন্যমূলকভাবে ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন সৈন্যদল আসিয়া বার্লিন দখল করে। একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মানী অধিকারী মিত্রশক্তিবর্গের অধীনেই থাকিবে বলিয়া স্থির হয়—কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরও জার্ম্মানী সম্পর্কে কোন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হয় নাই।

ইতিমধ্যে বিভক্ত জার্ম্মানীতে দুইটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, পশ্চিম জার্ম্মানী ও পূর্ব্ব জার্ম্মানী। জার্ম্মানী সম্পর্কে ভারতের সরকারী নীতি বিশেষ সহজবোধ্য নহে। মহাযুদ্ধের পর যে সকল দেশ বিভাগ হইয়াছে সেই সকল দেশ হইতেছে কোরিয়া, ইস্রায়েল, ভিয়েৎনাম ও জার্ম্মানী। উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া কোনটিরই সহিত ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই। ইস্রায়েলের সহিতও ভারতের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই। উত্তর ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম উভয় রাষ্ট্রকেই ভারত স্বীকার করিয়া লইয়াছে—কিন্তু জার্ম্মানীর বেলাতেই ভারতের নীতি জটিলতা ধারণ করিয়াছে। ভারত পশ্চিম জার্ম্মানীর সহিত কূটনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ কিন্তু পূর্ব্ব জার্ম্মানীর সহিত ভারতের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই।

জানুয়ারী মাসের ১২ তারিখ পূর্ব্ব জার্ম্মানীর প্রধানমন্ত্রী হার গ্রোটে অল ও পূর্ব্ব জার্ম্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ লোথার বেলজ পাঁচ

দিনের জন্ম ভারতে আগমন করেন—তবে তাঁহারা বেসরকারী ভাবে আসেন। তাঁহারা নয়াদিল্লীতে উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত দেখা করেন। হার গ্রোটে অল শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনার পর বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনাকালে হার গ্রোটেঅল বার্লিন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে পূর্ব্ব জার্ম্মান সরকারের নীতি সম্পর্কে শ্রীনেহরুকে বুঝাইয়া বলেন।

মাও সে-তুংয়ের অবসর গ্রহণ

চীন সাধারণতন্ত্রের চেয়ারম্যান (রাষ্ট্রপতি) মাও সে-তুং চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, তিনি নূতন পার্লামেণ্টের অধিবেশনকালে পুনর্বার চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হইতে চাহেন না। মাও সে-তুংয়ের খ্যাতি কেবলমাত্র চীনা রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টরূপে নহে, চীনা বিপ্লবী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতারূপেই বিশ্বে তাঁহার খ্যাতি—বিগত বিশ বৎসরাধিক কাল যাবত চীনা গণসংগ্রাম, কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মাও সে-তুং একাত্ম হইয়া রহিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে চীন বিপ্লবের সাফল্যের পর নূতন রাষ্ট্রের কর্ণধার নির্ব্বাচনের প্রশ্ন উঠিলে সে হেতু স্বতঃই মাওয়ের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব করা হয় এবং তিনি চীনা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এই দশ বৎসর যাবত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বহন করিয়া আসিয়াছেন। মাও সে-তুংয়ের কর্ম্মক্ষমতা এখনও অটুট রহিয়াছে, চীনা জাতীয় দিবসে (১লা অক্টোবর) তিনি এক ভঙ্গিমায় একাদিক্রমে সাত ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকেন—ইহাতেই তাঁহার শারীরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সে হেতু মাওয়ের এইরূপ বিদায় গ্রহণ সকলের মনেই কৌতূহলের উদ্রেক করিয়াছে।

অনেকে বলিতে চাহিয়াছেন যে, চীনে সম্প্রতি কমিউন স্থাপনের যে প্রচেষ্টা হইতেছিল—তাহা প্রধানতঃ মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বেই সংগঠিত হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কমিউন ব্যবস্থার বিফলতা দেখা দেওয়ার ফলেই মাওকে তাঁহার পদ হারাইতে হইল। এইরূপ ধারণার বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, চীনে কমিউন ব্যবস্থা বিফল হইয়াছে বলিয়া চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি স্বীকার করেন না। পার্টির সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্তেও কমিউন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে রাষ্ট্র বা সরকারের নেতৃত্ব অপেক্ষা পার্টি নেতৃত্বেরই গুরুত্ব সমধিক, সুতরাং মাও সে-তুংয়ের অবনতি ঘটিলে কখনই তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান পদে বহাল থাকিতেন না। তাহা ছাড়া চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে চীন সাধারণতন্ত্রের সাধারণ মানুষের মনে মাও সে-তুং-এর প্রতি যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা রহিয়াছে সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

চীন সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে রাষ্ট্রের চেয়ারম্যানের তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাই। বস্তুতঃ ব্যক্তিগতভাবে চেয়ারম্যানের কোন কিছুই করণীয় নাই। সেদিক হইতে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনে প্রকৃত ক্ষমতা অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় না। মাও সে-তুং যতদিন চেয়ারম্যান ছিলেন ততদিন তিনি অবশ্য কোনক্রমেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাহার রাজনৈতিক প্রভাব এবং ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের হেতু তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি সংবিধান রচনাকারী কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন; চীনে সমবায়-কৃষিপ্রবর্ত্তন, শিল্পরাষ্ট্রীয়করণ এবং কমিউন সংগঠনে তিনি নেতৃত্ব করেন।

চীনে কমিউন

চীনে কমিউন প্রবর্ত্তন সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছে। কমিউনের মাধ্যমে চীনে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল যাবত কমিউনিষ্ট শাসনে থাকার পর সোভিয়েট ইউনিয়নেও তাহা করা হয় নাই। এই পরিবর্ত্তন এইরূপ যুগান্তরকারী যে, বিদেশী কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। মার্শাল টিটো প্রকাশ্যেই কমিউন ব্যবস্থাকে মার্ক্সবাদ-বিরোধী আখ্যা দিয়া নিন্দা করিয়াছেন। মার্কিন "লাইফ" পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে, সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মঃ ক্রুশ্চেভও নাকি কমিউন ব্যবস্থাকে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। লাইফ পত্রিকায় প্রচারিত সংবাদের কোন প্রতিবাদ এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি অখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে আগ্রহান্বিত সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে রুশ কম্যুনিষ্ট নেতার বক্তব্য প্রকাশের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

সে যাহাই হউক, চীনে কমিউন লইয়া যে পরীক্ষা চলিতেছে তাহাকে কোন দুষ্ট লোকের দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা হিসাবে না দেখিয়া একটি সামাজিক বিপ্লবের প্রচেষ্টারূপে দেখাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এই পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিবার সময় এখনও আসে নাই।

কমিউন কি? কমিউন কতকগুলি কৃষি-সমবায়ের সমষ্টি। একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের (শিয়াং) সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানের একীকরণের মাধ্যমে কমিউন গঠিত হয়। কমিউনে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই—বাড়ী, ঘর, জমি সকলই সামাজিক সম্পত্তি। উপরন্তু কমিউনে কাহারও বাড়ীতে পৃথক পৃথক রান্নার ব্যবস্থা নাই—সকলেই সাধারণ হোটেল বা ক্যাণ্টিনে আহার গ্রহণ করে। গৃহকর্ম্ম—যেমন সেলাই, কাপড়কাচা, রান্না-বান্না, শিশু-প্রতিপালন এবং বৃদ্ধদের পরিচর্য্যা—এই সকল কাজই কমিউনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। অর্থাৎ কমিউন ব্যবস্থায় পরিবার—এর এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়াছে।

কমিউনে সকলকেই "বিনামূল্যে" আহার্য্য দেওয়া হয়। কোন কোন কমিউনে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও বিনামূল্যে দেওয়া হয়। ফলে, চীনের গ্রামাঞ্চলে এখন আর কাহারও অনাহারে মরিবার

আশঙ্কা নাই। কমিউনের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারেরও বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। সাধারণের সাংস্কৃতিক মান এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য কমিউন মারফত বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

কমিউন ব্যবস্থার সমালোচনার দিকটি আলোচনা করিয়া বলা হয় যে, ইহাতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় পরিশ্রমী ও অলস লোকেদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উপরন্তু পারিবারিক রান্নাব্যবস্থার বিলোপসাধনে জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালী বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। গৃহস্থালীর কর্ম্ম না থাকায় বহু রমণী খেত, খামার ও ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত হইয়া দেশগঠনের কাজে সাহায্য করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহার ফলে গৃহসুখ নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি কমিউন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বলিয়াছে—পার্টি হইতে বলা হইয়াছে যে কমিউন প্রতিষ্ঠার ফলে উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু কমিউন প্রতিষ্ঠার সময় এবং চাষের সময়ের কথা স্মরণ রাখিলে এই ধরনের প্রচারের অসারতা বুঝা যায়। আগামী বৎসর শরৎকালে চাষের ফসল হইতে হয়ত কমিউনের কার্যকারিতা বা অপকারিতা সম্পর্কে আংশিক ধারণা করা যাইবে। এখন এ সম্পর্কে কোন কিছুই বলা চলে না। কারণ কমিউন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে প্রধানতঃ সেপ্টেম্বর মাসে—এই এক মাসেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে এইরূপ ধারণা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ কোম্পানী সম্পর্কে তদন্ত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সকল কোম্পানীগুলিই বেসরকারী পরিচালনায় অন্তর্গত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-একটি কোম্পানীর ধনসম্পদ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি সুদূর প্রসারিত। কিন্তু এই সকল কোম্পানী তাহাদের এই বিপুল ক্ষমতা সর্ব্বদা জনকল্যাণে নিযুক্ত করে না। সম্প্রতি এইরূপ একটি কোম্পানী—জেনারেল মোটরস-এর কার্য্যকলাপে সন্দিহান হইয়া মার্কিন কংগ্রেসের সিনেট এ সম্পর্কে এক প্রাথমিক তদন্ত চালান। এই তদন্তের ফলাফল চমকপ্রদ। নিউইয়র্কের নিউ লীডার পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এই তদন্তের ফলাফল আলোচনা করিয়া মিঃ হার্লান কিন্তু লিখিতেছেন :

"A Huge, blind, unchained, multiheaded monster—that is the picture drawn of General Motors by the Senate Anti-Trust Committee (headed by Senator Kefauver) in its report on administered prices in auto industry. G.M. (General Motors), according to the report, can stagger the economy by its misteps, it overcharges the Federal Government, eats up small suppliers practices wholesale usury, and sets prices with little, if any concern, for the general welfare....The Committee's actual recommendation—that the Justice department investigate the industry is find out whether to try to break up the G.M. empire—is mild in comparison to the profusion of facts developed by the investigation."

ইহার মর্ম্মার্থ হইল : মোটরগাড়ী-শিল্পে মূল্যনির্দ্ধারণ সম্পর্কে সিনেট ট্রাষ্টবিরোধী কমিটির রিপোর্টে জেনারেল মোটরস কর্পোরেশনকে একটি বহুমুণ্ডবিশিষ্ট অতিকায় দৈত্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে জেনারেল মোটরস কর্পোরেশন একটি ভ্রমাত্মক পদক্ষেপের ফলে অর্থনীতিকে দুর্ব্বল করিতে পারে; উহা সরকারের নিকট হইতে অত্যধিক মূল্য নেয়, মহাজনী করিয়া সুদ খায় এবং মূল্যনিরূপণের সময় সাধারণ কল্যাণের কথা মনেও রাখে না।

ডালমিয়ার কোম্পানীগুলি সম্পর্কে যে তদন্ত চলিতেছে তাহা হইতে ভারতে বৃহৎ পুঁজিপতিদের আচরণ সম্পর্কেও অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধানের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল আমেরিকার সর্ব্ববৃহৎ কোম্পানী—১৯৫৭ সনে উহার যে মোটরগাড়ী বাজারে ছাড়ে তাহার মূল্য ৫৫০০ (পাঁচ হাজার পাঁচশত কোটি টাকারও বেশী।

ত্রিপুরায় রেলপথ নির্ম্মাণের দাবী

বিগত পাঁচ বৎসর যাবত ত্রিপুরার বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষ ভাবে ত্রিপুরার কমিউনিকেশন কমিটি, ত্রিপুরায় ২০০ মাইল রেলপথের জন্য আন্দোলন করিতেছেন। এই দাবীর সমর্থনে ১৮ই জানুয়ারী আগরতলায় একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। ১৭ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী শ্রীবি. এন. দাতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ত্রিপুরা উপদেষ্টা পরিষদের সভায় কলকলিঘাট হইতে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত প্রায় ১৪ মাইল রেল লাইন নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সাপ্তাহিক 'সেবক' লিখিতেছেন :

"ত্রিপুরার দাবী দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় কলকলিঘাট হইতে সাবরুম পর্য্যন্ত দুই শত মাইল রেল লাইন স্থাপন করা। দ্বিতীয় পাঁচসালায় সাবরুম পর্য্যন্ত রেললাইন স্থাপনের প্রস্তাবটি গ্রহণ করার জন্য ত্রিপুরা সরকারও দাবী করিয়াছেন। ত্রিপুরা কমিউনিকেশন কমিটির অনুরোধে আসাম সরকার সাবরুম পর্য্যন্ত ২০০ মাইল রেল লাইন স্থাপনের প্রস্তাবটি বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে রেলওয়ে বোর্ডকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। রেলওয়ে বোর্ড এবং পরিকল্পনা কমিশনের সহিত বিগত পাঁচ বৎসর যাবত কমিউনি-

কেশন কমিটির অসংখ্য পত্র বিনিময় হইয়াছে। রেলওয়ে বোর্ড ও পরিকল্পনা কমিশন ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। রেলওয়ে বোর্ড জানাইয়াছেন, অর্থ ও সাজসরঞ্জামের অভাবের দরুণ প্রস্তাবটি মঞ্জুর করা যায় নাই বটে কিন্তু ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপনের প্রস্তাবটি প্রতি বৎসর বিবেচিত হইবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিতপন্থের সহিত নয়া দিল্লীতে কমিউনিকেশন কমিটির পক্ষে কয়েকবার সাক্ষাৎ করিয়া ত্রিপুরায় রেললাইন স্থাপনের প্রস্তাবটি কার্য্যকরী করার জন্য তাঁহাকে (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে) হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ জানান হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অবিলম্বে ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং এ বিষয়ে তিনি সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন।

"ভারত সরকারের আচরণে ত্রিপুরায় রেল লাইনের দাবীকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ এ যাবত পাওয়া যায় নাই। বরং দুই বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত পন্থ রেল লাইন স্থাপনের প্রস্তাবটি কার্যকরী করার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন বলিয়াই আমরা জানি। পন্থজীর চেষ্টায় রেল লাইনের প্রস্তাবটি যখন ভারত সরকার কর্ত্তৃক বিশেষভাবে চিন্তা করা হয় তখন ত্রিপুরার তদানিন্তন চীফ কমিশনার শ্রীভার্গব পূর্ব্ব পাকিস্থান রেলওয়ের কয়েকটি সাইডিং ত্রিপুরার অভ্যন্তরে স্থাপনের এক পাল্টা প্রস্তাব করিয়া ভারত সরকারের চিন্তার স্রোত পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। ত্রিপুরার পরিবহন সমস্যার আশু সমাধানে পাকিস্থান রেলওয়ের সাইডিংয়ের প্রস্তাবটি ভারত সরকার কর্ত্তৃক গ্রহণের পর ত্রিপুরার মূল প্রস্তাবটি সাময়িক চাপা পড়িয়া যায়। কমিউনিকেশন কমিটি সাইডিং নির্ম্মাণের প্রস্তাবটির তীব্র প্রতিবাদ করেন। কারণ এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে পাকিস্থানের পথে মাল আমদানী-রপ্তানির বাধাগুলি অপসারিত হইবে না, তদুপরি ত্রিপুরার নিজস্ব রেল লাইন স্থাপনে অযথা বিলম্ব ঘটিবে। যাহা হউক, পাকিস্থানের সরলতার অভাবে শ্রীভার্গবের প্রস্তাবটি আতুড় গৃহেই মৃত্যুবরণ করে। আগষ্ট মাসে পাকিস্থান ত্রিপুরা সীমান্ত হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর অবস্থার আরও পরিবর্ত্তন ঘটে। ত্রিপুরার পরিবহন ব্যাপারে যে সমস্ত নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার পরিত্রাণের উপায় হিসাবে ত্রিপুরার বর্ত্তমান চীফ কমিশনার শ্রীপট্টনায়ক কলকলিঘাট হইতে ধর্ম্মনগর সীমান্ত পর্য্যন্ত কয়েক মাইল রেল রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করার জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, ভারত সরকার এই প্রস্তাবটি কার্য্যকরী করিতে যত্নবান হইয়াছেন।"

বর্দ্ধমান শহরের পথসমস্যা

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "দৃষ্টি" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বর্দ্ধমান শহরের পথঘাটের অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন:

"বর্দ্ধমান শহরের প্রধান পথ হইল স্যর বিজয়চাঁদ রোড। রাস্তাটি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেকালে শহরের প্রয়োজনের অনুপাতে রাস্তাটি রাজপথই ছিল। তখন শহরের লোকসংখ্যা খুবই কম ছিল এবং যানবাহনও কয়েকখানি মাত্র ও আকারে ছোট ছিল।

"ক্রমবর্দ্ধমান বর্দ্ধমানের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তাটির সংস্কার হয় নাই। এখনও এই রাস্তার বহু অংশই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ আছে। বর্ত্তমান কালের বৃহৎ বৃহৎ যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত করিয়া রাস্তাটির সংস্কার করা উচিৎ ছিল। রাস্তার প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা ত হয়ই নাই, বরং কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলায় এই স্বল্পপরিসর রাস্তাটি যানবাহন ও লোক চলাচলের পক্ষে আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে যেভাবে ইলেকট্রিক ও টেলিফোন পোষ্টগুলি বসান আছে, তাহা দেখিলেই বোঝা যায় রাস্তাটি কি ভাবে সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে। তদুপরি পথিপার্শ্বস্থ ব্যবসায়ীরাও রাস্তার অংশবিশেষ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে দখল করিয়া রাখেন। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকিলে এই সকল অত্যাচার হইতে সহজেই রাস্তাটিকে মুক্ত করিতে পারেন। রাস্তা মেরামত সম্বন্ধেও পৌর প্রতিষ্ঠান সম্যক সচেষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। জলকলের পাইপ বাহির করিয়া রাস্তাকে কার্য্যান্তে মেরামত করিয়া দিবার রীতি দেখা যায় না। গৃহাদি মেরামতের জন্য ও আনন্দোৎসবের জন্য রাস্তায় খুঁটি পুতিয়া রাস্তাকে সঙ্কীর্ণ করার দৃষ্টান্ত প্রত্যহই দেখা যায়। এ সকল ছাড়াও আবর্জ্জনা ফেলার জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান থাকে না, কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না।

"সম্প্রতি শহরে লাইট ট্যাক্স বসান হইয়াছে। কিন্তু এই প্রধান পথের উপরেও প্রায়ই আলো নিভিয়া থাকে এবং তাহার তৎপর প্রতিকারেরও ব্যবস্থা প্রয়োজন।

"এই পথটি প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জন ও যানে পূর্ণ থাকে। কর্ত্তৃপক্ষের অমনোযোগিতার জন্য এই পথে দুর্ঘটনা নিত্যই সংঘটিত হয়। পথের নিরাপত্তার দায়িত্ব পৌর প্রতিষ্ঠানের সহিত পুলিসেরও থাকা কর্ত্তব্য এবং জেলা শাসকেরও আছে।"

রঘুনাথগঞ্জে ইউনিয়ন বোর্ড নির্ব্বাচন

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ থানায় সম্প্রতি ইউনিয়ন বোর্ড নির্ব্বাচন হইয়া গেল। সম্ভবতঃ ঐ অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ডের সর্ব্বশেষ নির্ব্বাচন কারণ ১৯৬০ সনের পর ইউনিয়ন বোর্ড অবলুপ্ত হইয়া গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রবর্ত্তন হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচন সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়া স্থানীয় 'ভারতী' পত্রিকা লিখিতেছেন:

"এবারের ইউনিয়ন বোর্ড নির্ব্বাচনে যে ভাবের গোলমাল হইয়াছিল ইতিপূর্ব্বে ইউনিয়ন বোর্ড নির্ব্বাচনে তেমন হইয়াছিল বলিয়া আমাদের স্মরণ হয় না। ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রার্থীর সংখ্যাও ছিল আশাতীত। ভোটদাতাদের প্রতি গৃহে প্রার্থীরা নিজে-

দের অনুকূলে ভোটের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। ফলে প্রতিটি ইউনিয়নের শতকরা নব্বই জন ভোটার উপস্থিত থাকিয়া ভোটদান করিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের সেকেলে নির্ব্বাচনে মারাত্মক অসুবিধা —খোলাখুলি ভোটদান প্রথা। সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়া থাকেন এবং ভোটারের ভোটদানকালে সামনাসামনি বসিয়া থাকেন। প্রার্থীদের মুখোমুখী ও চোখাচোখি হইয়া দরিদ্র, অজ্ঞ ভোটারদের যে কি অসুবিধা ও বিড়ম্বনার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। যদিও মহাজনী, জমিদারীপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর ভয়-ভীতির কারণ অনেক কমিয়াছে কিন্তু ভূমি-সংস্কার আইন এখনও কার্য্যকরী হয় নাই তাহা ছাড়া আত্মীয়তা বন্ধুত্ব, সময় অসময়ে নানাপ্রকারের বাধ্যবাধকতার মধ্যে গ্রামের মানুষকে বাস করিতেও হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে কি ভাবে খোলাখুলি ভোটদান দ্বারা গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন সম্ভব হইতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

"যাহাই হউক, সদস্য নির্ব্বাচন সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ ভোটারদের দায়িত্ব আপাততঃ শেষ হইল। এখন প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের পালা সুরু হইবে। বিভিন্ন ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে টানা-হ্যাঁচড়াও চলিবে। স্বাধীনতার পরে ইউ-নিয়ন বোর্ডগুলির গুরুত্ব নানাদিক দিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, কাজেই ইউনিয়নের স্বার্থে সুযোগ্য প্রার্থীরা প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেই আমরা সুখী হইব। প্রসঙ্গক্রমে আর একটি বিষয়ের প্রতি আমরা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের পর ইউনিয়ন বোর্ড অফিস নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্টের নিজস্ব বৈঠক-খানায় না হইয়া অন্যত্র স্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ সাধারণের প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত আওতার বাহিরে রাখিতে না পারিলে সকলকেই অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া আমরা মনে করি।"

স্বর্গতা ডাঃ রোল্যাণ্ডস-এর স্মৃতিরক্ষা

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন:

"করিমগঞ্জ কলেজের নবনির্ম্মিত এবং আসামের রাজ্যপাল কর্ত্তৃক উদ্বোধিত সুরমা গ্রন্থাগার ভবনের নাম স্বর্গতা মহীয়সী মহিলা ডক্টর মিস জে. এইচ. রোল্যাণ্ড-এর নামানুসারে 'রোল্যাণ্ডস হল' রাখিয়া কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। ডক্টর রোল্যাণ্ডসের স্মৃতি মনে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক মধুরভাষিণী সেবাপরায়ণা মাতৃমূর্ত্তি যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখি—যিনি সুপণ্ডিত বিদেশিনী হইয়াও করিমগঞ্জের একান্ত আপন জন ছিলেন,—খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিকা হইয়াও জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। বস্তুতঃ ডঃ রোল্যাণ্ডসকে বিদেশিনী বলিয়া কেহ ভাবিত না। তিনি যৌবনে এদেশে আসিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল জ্ঞানার্জ্জনে এবং জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বাংলা ভাষাতত্ত্ব এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণা হন এবং মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-লিট উপাধি লাভ করেন। একজন বিদেশিনীর পক্ষে ইহা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

কিন্তু ডঃ রোল্যাণ্ডস শুধু জ্ঞানতপস্বিনী না হইয়া কর্ম্মযোগিনী হইয়াছিলেন এবং এই চিরকুমারী মহিলা অনাথ-আর্ত্তদের সেবায় নিজেকে বিলাইয়া দেন। তিনি দীর্ঘকাল বালিকা শিক্ষালয় পরি-চালনা করেন এবং করিমগঞ্জ কলেজের প্রতিষ্ঠা কাল হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কলেজে ইংরেজী ও বাংলার অবৈতনিক অধ্যাপিকা হিসাবে অতিশয় নিষ্ঠার সহিত শিক্ষাদান করেন। করিমগঞ্জের আবালবৃদ্ধবনিতা পরম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা স্মরণ করেন।

১৯৫৫ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে ডক্টর রোল্যাণ্ডসের মৃত্যুর পর স্থানীয় প্রেসবিটারিয়ান মিশনের উদ্যোগে একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কোন অজ্ঞাত কারণে সেই কমিটি এখনও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রহিয়াছেন। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আশা করি ডক্টর রোল্যাণ্ড স্মৃতি-রক্ষা কমিটিও তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে পশ্চাৎপদ হইবেন না।"

ধান্যের মূল্য নির্দ্ধারণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার ধান্যের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে কৃষকদিগকে বহু স্থানেই অসুবিধায় পড়িতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। 'দামোদর' পত্রিকা এ সম্পর্কে লিখিতেছেন:

"সরকার অতি মিহি ও মিহি ধান্যের দর এই অঞ্চলের জন্য যথাক্রমে ১১৷০ টাকা ও ১১৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন, আসলে ঐ দুই শ্রেণীর ধান্য পশ্চিমবঙ্গে নিতান্তই কম হয়। মাঝারী ধান্যটিই সাধারণতঃ বেশী হইয়া থাকে। কিন্তু এই মাঝারী ধান্যের দর বাঁধা হইয়াছে মাত্র ১০৲ টাকা এবং মোটা নামধারী ধান্যের দর হইবে ৯৶০ আনা মাত্র। ইহাই আবার সর্ব্বোচ্চ দর। আমরা পরিষ্কার ভাবে বলিতে চাই, ইহাতে ধান্য-চাষী নিধনযজ্ঞের ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বৎসর ধান্যচাষের যে ব্যয় এবং সার খইলের দর যেরূপ, তাহাতে মোটা ধান্যের দর ১১৲ টাকা এবং মাঝারী ধান্যের দর ১২৲ টাকার কম হইলে চাষীর পোষাইবে না। সরকার কি হিসাব ধরিয়া তাহাদের দর নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহা জানাইবেন কি? টাকা কমাইয়া ২৷০ টাকা করিলে মাঝারী চাউলের মূল্য ২০৲ টাকা এবং মোটা চাউলের মূল্য ১৯৲ টাকা হইবে। নচেৎ চাষী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। অধিক শস্য ফলাইয়া দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি সরকারের থাকে তাহা হইলে ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই।"

'বর্দ্ধমানবাণী'ও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন:

"দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য কি এবং তাহা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার আওতায় আসে কিনা, তাহা

সরকারের আশা করি অজ্ঞাত নহে। এ অবস্থায় যে হারে ধান্য, যাহা দেশের প্রধান এবং অন্যতম ফসলরূপে পরিচিত এবং স্বীকৃত, তাহার মূল্য যে ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের আশঙ্কা যে দরিদ্র কৃষকই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সরকার সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে পুনরায় বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশা করিতেছি।"

আসানসোল সরকারী হাসপাতালের দুরবস্থা

আসানসোলে অনেকগুলি হাসপাতাল আছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন কয়লাখনিগুলি এই সকল হাসপাতাল পরিচালনা করে; কিন্তু এই সকল হাসপাতালে শ্রমিক ব্যতীত অন্যান্য লোকের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ নাই। সাধারণের চিকিৎসার জন্য কেবলমাত্র একটি হাসপাতাল আছে—সরকারী এল এম হাসপাতাল। স্বভাবতঃই এই হাসপাতালে সর্ব্বদাই রোগীর বিশেষ ভীড় থাকে। কিন্তু এই হাসপাতালটিতে সর্ব্বব্যাপারেই অব্যবস্থা।

এল এম হাসপাতালের অব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া জি টি রোড পত্রিকা লিখিতেছেন:

"অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় আসানসোলের সরকারী হাসপাতালের সর্ব্বপ্রকার দৈন্য থাকা সত্ত্বেও এখানে সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসার জন্য রোগী আসিয়া থাকে এবং উল্লিখিত হাসপাতালের মতই কঠিন কঠিন অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু এল এম হাসপাতালের দৈন্য দেখিলে মনে হইবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এক শতাব্দী আগেও যা ছিল এখনও তাহাই আছে। আগের দিনের অপেক্ষা অধুনা গণচেতনা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাই হাসপাতালে আসিতে লোকে ভয় পায় না। তা ছাড়া এই হাসপাতালে পর পর তিন জন উৎকৃষ্ট শল্যবিদ্ মেডিকেল অফিসাররূপে আসায় সাধারণের ধারণা হইয়াছে যে, এখানে যে কোন আধুনিক শল্য-চিকিৎসা সম্ভব।"

এ ছাড়া আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। চক্ষু রোগের শল্য-চিকিৎসাও এই হাসপাতালে হইয়া থাকে এবং একথা অকুণ্ঠচিত্তে বলা চলে চক্ষু রোগের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় হাসপাতালে যাইবার দরকার হয় না। এখানে Rupture eye ball-এর চিকিৎসা করিয়া রোগীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে এবং চোখের Plastic surgery করা হইয়াছে। এই বিভাগে জনৈক অবৈতনিক বিশেষজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল কঠিন চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং আধুনিক অস্ত্র পর্য্যন্ত হাসপাতালে নাই। যেমন A. T. S., যাহা হাসপাতালে হামেশাই দরকার হয় বা চক্ষুর অপারেশনের জন্য কোকেন। এমন কি সামান্য ষ্টোভ ধরাইবার কেরোসিন, হাত পরিষ্কার করিবার সাবান পর্য্যন্ত জোটে না।

হাসপাতালে Indoor patient-দের খাদ্যের পিছু খরচ করা হয় মাত্র দৈনিক এক টাকা। আর তাহাদের স্নানের জল পর্য্যন্ত জোটে না। একটি নোংরা চৌবাচ্চায় বেআব্রু অবস্থায় মহিলাদের স্নান করিতে হয় এবং অধিকাংশ সময় জলই পাওয়া যায় না, ফলে প্রসূতিদের অস্নাত থাকিতে হয়। সরকার স্নানের স্থানটি ঘেরিয়া দিয়া মহিলাদের আব্রু রক্ষার প্রয়োজন মনে করে না। এই প্রসূতি বিভাগে দৈনিক গড় ৪।৫টি মহিলা প্রসূতা রূপে থাকেন।"

জঙ্গীপুর হাসপাতাল

জঙ্গীপুর হাসপাতালটি দীর্ঘদিন যাবত সরকারী পরিচালনায় রহিয়াছে, কিন্তু হাসপাতালটি ক্রমশঃ অবনতির পথেই চলিয়াছে। হাসপাতালটিতে পুরুষদের জন্য দশটি শয্যা ও মহিলাদের জন্য মাত্র চারটি শয্যা আছে। কিন্তু এক জনও পাশকরা ধাত্রী বা শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্স নাই। শহরের সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে এখনও বৈদ্যুতিক সংযোগ গ্রহণ করা হয় নাই।

হাসপাতালটির এই শোচনীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া স্থানীয় "ভারতী" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন: "যেখানে গ্রামাঞ্চলেও আজ অপেক্ষাকৃত উন্নততর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে সেখানে মহকুমার এই জনবহুল সদর শহরে অবস্থা এইরূপ শোচনীয় কেন—এই প্রশ্ন আজ সাধারণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।"

'ভারতী' লিখিতেছেন:

"শহরাঞ্চলে প্রসূতিসদন না থাকার বিড়ম্বনা বা দুর্ভোগ যে কিরূপ তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কাজেই এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যদিও সম্প্রতি বর্ত্তমান মেডিক্যাল অফিসারের উদ্যোগে দুইটি শয্যাবিশিষ্ট নামমাত্র একটি প্রসূতিসদন সাময়িকভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এই শীর্ণ ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের কিছুটা উপকারও হইতেছে তবুও প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যবস্থা যে অত্যন্ত সামান্য ইহা বলাই বাহুল্য। যেখানে গড়ে দৈনিক চার-পাঁচ জন প্রসূতি আসিতেছে সেখানে এই শয্যায় তাহার ব্যবস্থা করা মোটেই সম্ভব নহে। অনেক জটিল লেবার কেসও আসে এবং সে ক্ষেত্রে পাশকরা ধাত্রী বা শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্সের অভাবে মেডিক্যাল অফিসারকে বস্তুতঃ একক ভাবেই কাজ করিতে হয়। যখন হাসপাতালটি সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল না তখনও এখানে বরাবরই একজন পাশকরা ধাত্রী ছিলেন। তিনি আজ তিন বৎসর হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদবধি তাঁহার স্থলে আজ পর্য্যন্তও একজন ধাত্রী দেওয়া হইল না। এই যে অব্যবস্থা ইহা, ব্যয়-সঙ্কোচ না ঔদাসীন্য?

শোনা যাইতেছে এখানে নাকি একটি পূর্ণাঙ্গ মহকুমা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সে সম্বন্ধেও দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরিয়া যেরূপ গড়িমসি চলিতেছে তাহাতে যে শেষ পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনার অবস্থা কি দাঁড়াইবে, সে সম্বন্ধেও মানুষ কিছুটা সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক যদিও বা ইহা কার্য্যকরী হয় তবুও আগামী দুই-তিন বৎসরের মধ্যে যে তাহা সম্ভব হইবে ইহা মনে হয় না। লক্ষ টাকার পরিকল্পনা গৃহীত হয়, সুখের কথা এবং আমরা ইহাকে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাইব কিন্তু আপাততঃ দুই-

চার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া বর্ত্তমান হাসপাতালের ঘর-দুয়ারের কিছুটা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিয়া প্রসূতিদের জন্য বৃদ্ধি অধিকতর সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় তবে মানুষকে অযথা দুর্ভোগের মুখে ঠেলিয়া দিবার কি কোন সার্থকতা আছে ?"

এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য,অবিলম্বে জনসাধারণকে জানান কর্ত্তব্য।

রাণীগঞ্জে গুণ্ডামী

'জি. টি. রোড' লিখিতেছেন :

"রাণীগঞ্জ ডাকবাংলোর নিকট হইতে দামোদর কলিয়ারী যাইবার পথে প্রায়ই এক শ্রেণীর দুর্বৃত্তদের উৎপাত দেখা যায়। ইহারা অসহায় পথিকদের আক্রমণ করিয়া যখন-তখন জিনিসপত্র কাড়িয়া লয় ও মারধোর করে। সম্প্রতি ২৮।১৮।৫৮ তারিখে বেলা ৪ ঘটিকার সময় দামোদর কলিয়ারীর ষ্টোরকীপার কলিয়ারীর কোন কাজে রাণীগঞ্জ যাইতেছিলেন। এমন সময় জনৈক দুর্বৃত্ত তাঁহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু ষ্টোরকীপার তাহাকে বাধা দিলে দুর্বৃত্তটি তাহার সঙ্গীদের ডাকে এবং তখন আরও ৪।৫ জন আসিয়া ষ্টোরকীপারকে ঘিরিয়া ধরে এবং মারপিট করিয়া তাঁহার কাছে যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লয়। ইহাদের চীৎকারে কিছু লোক আসিয়া জমা হয় এবং দুর্বৃত্তদের কয়েকজনকে ধরিয়া ফেলে ও পুলিশের হাতে সমর্পণ করে। ইহাতে জনৈক দুর্বৃত্ত বলে, 'আরে পুলিশ মে দেনে সে কেয়া হোগা ? পুলিশ কা বড় বাবু হামলোক কা বড়া ভাই।'

এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্ব্বে জনৈকা মহিলা অনুরূপ একই স্থানে আক্রান্তা হন এবং গুণ্ডারা ভদ্রমহিলার দুই কাণের দুল ছিনাইয়া লয়।"

এই বিষয়ে অবিলম্বে কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করা উচিত।

মৃত্যুকর আদায়

'হিন্দুবাণী'তে 'শ্রীদুর্মুখ' বাঁকুড়াতে মৃত্যুকর আদায়ের ব্যাপার আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন :

"ভারত সরকার কর্ত্তৃক মৃত্যুকর (এষ্টেট ডিউটি এ্যাক্ট চালু হইবার পর বাঁকুড়ায় ঐ কর কিরূপ আদায় হইয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হইল !

১।	নারায়ণপ্রসাদ গোয়েনকা	৭৫১'০০ টাকা
২।	ধান্নুকানন্দন গোয়েনকা	৮৭৭'০০ টাকা
৩।	গোপালচন্দ্র নন্দী	৬৯৪'৫৮ টাকা
৪।	যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	২,২০৫'০০ টাকা

প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন এবং জীবিতকালে প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। আচার্য্য বিদ্যানিধি অধ্যাপনা ও শেষ জীবনে বিভিন্ন গবেষণা করিয়া কাটাইয়াছেন, তথাপি মৃত্যুকর প্রদানের হার হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তি হইতে অধিক সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। উপরোক্ত চারি ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সম্পত্তির উপর ভ্যালুয়েশন হইয়াছে, তাহার পরিমাণ মোটামুটি নিম্নরূপ :

১।	নারায়ণপ্রসাদ গোয়েনকা	৬৫,০২০ টাকা
২।	ধান্নুকানন্দন গোয়েনকা	৬৭,৫৪০ টাকা
৩।	গোপালচন্দ্র নন্দী	৬৩,৮৯১ টাকা
৪।	যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	৯৪,১০০ টাকা

ইনকামট্যাক্সের বেলায় যেমন রাঘববোয়ালেরা স্বচ্ছন্দে জাল কাটিয়া যাইতে পারে এবং চুণোপুটিরা ধরা পড়িয়া নাজেহাল হয়, মৃত্যুকরের বেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না দেখা যাইতেছে। যোগেশ বিদ্যানিধি চালাক ছিলেন না বা তাঁহার উত্তরাধিকারীরা পূর্ব্ব হইতে হুঁসিয়ার হয়েন নাই বলিয়া ডুবিয়াছেন।

"যাহাদের মৃত্যুকরের আওতায় পড়িবার সমূহ সম্ভাবনা, তাঁহারা এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই হুসিয়ার হইবার চেষ্টা করিবেন আশা করা যায়।"

বর্দ্ধমানে জমিদারী অব্যবস্থা

বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া-কালনা মহকুমার মধ্যবর্ত্তী দশ মাইল দীর্ঘ ও দুই মাইল প্রস্থ বিস্তীর্ণ বোরো বিল এলাকায় কৃষকের দুর্ভোগ সম্পর্কে বর্দ্ধমানের একাধিক সাময়িক পত্রিকাতে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৮ই ডিসেম্বর বিধানসভাতেও এই প্রশ্নটি সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিধানসভায় শ্রীদাশরথি তা বলেন যে, ঐ অঞ্চলে মধ্যস্বত্ব লোপ হওয়ার পরও মধ্যস্বত্বভোগীরূপ কিছু লোক কৃষকদের নিকট হইতে জমিদার সাজিয়া বিঘাপ্রতি দশ টাকা হইতে পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা আদায় করিয়া আসিতেছেন, অথচ ইহার জন্য কোন রসিদ বা দাখিলা দিতেছেন না।

এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন :

"কাটোয়া ও মন্তেশ্বর থানার মাঝখান দিয়া খড়ি নদী প্রবাহিতা। এই দুইটি থানায় খড়ি নদীর তীরবর্ত্তী প্রায় দশ হাজার বিঘা জমিতে বোর ধান চায হইয়া থাকে। আমন ধান পৌষ মাসে লোকে ঘরে লইয়া আসে কিন্তু বোর ধান এই সময় চায করিতে হয়। নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জমিতে জল তুলিয়া এই ধান চায হয়। চৈত্র মাসে যখন আমন ধানের মাঠ খাঁ খাঁ করে সেই সময় খড়ির দুই পাশে দশ হাজার বিঘা জমিতে সবুজ ধানের উপর দিয়া ঢেউ খেলিয়া যায়। চৈত্রের ফাকা মাঠ সবুজ ত এমনই হইয়া যায় না—কৃষককে তাহার জন্য কি পরিশ্রমই করিতে না হয়। দুরন্ত শীতের ফাকা মাঠে পড়িয়া থাকিয়া কৃষকরা বোর চায করিয়া থাকে।

"জমিদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার জমিদারীর সঙ্গে সঙ্গে এই জমিগুলি পাইয়াছিল—জমিদারী চলিয়া যাইবার সঙ্গে এই জমিগুলির মালিকানা তাহাদের চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা যায় নাই আজও। ইহারা কৌশল করিয়া এই জমিগুলি

হাতে রাখিয়া দিয়াছে। উদ্বৃত্ত জমি সরকারকে বর্তাইবার কথা কিন্তু যাহা হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই—যাক সে কথা।

"কৃষক জমি চাষ করিতেছে—সে সেই চাষ করিবারই অধিকার চায় এবং তাহার পরিবর্তে যে খাজনা ধার্য্য হইবে সেই খাজনা সর্ব্বদাই দিতে প্রস্তুত আছে। যে কৃষক বোর বিলের জমি চাষ করিয়া আসিতেছে, গত বছরেও চাষ করিয়াছে—এই বৎসরও এই জমি চাষ করিবার অধিকার তাহারই থাকিবে বলিয়া একপ্রকার অভিমত জেলা কংগ্রেস প্রকাশ করিয়াছে। আমরাও সেই মত পোষণ করি।

"বোর বিলের জরিপকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ২৪টি গ্রামের জমিদার হাইকোর্ট হইতে নিষেধাজ্ঞা জারী করাইয়া ইহাকে স্থগিত রাখিয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রমমন্ত্রী বোর বিল এলাকায় গিয়াছিলেন—সেই সময় বোর চাষীগণ শ্রমমন্ত্রীর নিকট ঐ অঞ্চলের সেটেলমেন্টের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্যে তাই সেই সেটেলমেন্ট হইতেছে। সেটেলমেন্টের উদ্দেশ্য হইল এই সব জমিতে যাহার যে সত্ব আছে তাহা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং সেটেলমেন্ট সমাপ্ত হইলেই বোর বিলের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পাইবে। জমিদারেরা কিভাবে আজও জমি তাহাদের বলিয়া দাবী করিতেছে ও খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতেছে তাহা প্রকাশ পাইবে। মধ্যস্বত্ব লোপ হইয়াছে, কোন কারণেই আজ মধ্যস্বত্ব চলিতে পারে না। তাই এই সমস্ত তথ্য যাহাতে প্রকাশিত হয় তাহারই জন্য সেটেলমেন্ট। বোর বিলের সেটেলমেন্ট ত্বরান্বিত করা হউক, সরকারের নিকট এই আমাদের আবেদন।"

নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন

পি. ই. এন. এর উদ্যোগে সম্প্রতি পঞ্চম নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীনেহরু রচনা যাহাতে সৃষ্টিধর্মী ও আন্তরিকতাপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, ভারতে একটি বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতেছে, হয় অতি প্রশংসা, নয় অতি নিন্দা। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ভারতে যে সব জীবনীগ্রন্থ রচিত হইয়া থাকে তাহা প্রকৃত অর্থে জীবনীগ্রন্থ নহে। এই ধরনের রচনা হয় ব্যক্তিকে 'দেবতা নয় দানব' করিয়া তোলে অথচ আমাদের কেহই দেবতা বা দানব নয়, আমরা মানব মাত্র।

নূতন শব্দ গ্রহণ সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন, "আমাদের জীবন ক্রমশঃই প্রয়োগবিদ্যা ও বিজ্ঞানভিত্তিক হইয়া উঠিতেছে। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে (ভারতীয়) ভাষাতে এই সব প্রয়োগবিদ্যা সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই সব শব্দের মূল অভারতীয় হইলেও তাহা গ্রহণ করা উচিত।" তিনি "বাইসাইকেল" শব্দটির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই শব্দটি বিদেশী কিন্তু বিদেশী বলিয়াই ইহাকে বর্জ্জন করিয়া ইহার স্থলে নূতন শব্দ ব্যবহারের প্রচেষ্টা হাস্যকর।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, "সাহিত্যে প্রাণ থাকার প্রয়োজনে যুগের বার্ত্তা সাহিত্যকে বহন করিতে হইবে। যুগের প্রাণধর্ম্মী ভাবধারায় সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়া সাহিত্যকে সমাজের জীবন ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিতে হইবে।" তিনি বলেন যে, সাহিত্য লেখকগণ নিজ যুগের বিচারক ও ভবিষ্যৎ যুগের সেবক। সকল মহৎ সাহিত্যেই দিব্যদৃষ্টি অন্তস্থ রহিয়াছে। যাহা শাশ্বত ও বাস্তব পৃথিবীতে তাহার প্রভাব পরিস্ফুট, তাহা মহৎ সাহিত্যের পরিস্ফুট হয়। প্রকৃত সাহিত্যিকের লক্ষ্য বিশুদ্ধি চিন্তায় উপনীত হইয়া রীতি ও রেওয়াজ অতিক্রম করিয়া নশ্বর হইতে অবিনশ্বরে উপনীত হওয়া। কঠোর সাধনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারেন।

লেখকদের দায়িত্ব

নিখিলভারত লেখক সম্মেলনে শ্রীনেহরু ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। উভয়েই সাহিত্যের সৃষ্টিধর্ম্মী, আন্তরিকতাপূর্ণ এবং যুগধর্ম্মী রূপের বিশেষভাবে জোর দেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ একথাও বলেন যে, সাহিত্যিক নিজ যুগের বিচারক। শ্রীনেহরু ও ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্যে সাহিত্যের মৌলিক দাবিরই প্রতিফলন করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সাহিত্যের বিচারধর্ম্মী প্রকৃতির প্রকাশ বাস্তবের সমালোচনায়। সাহিত্যিককে এই সমালোচনার অধিকার না দিলে কোন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে না যেমন হয় নাই সোভিয়েট রাষ্ট্রে, হিটলার জার্ম্মানীতে বা চিয়াংকাইশেক শাসিত চীনে ভারতবর্ষেও কর্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক স্বার্থসিদ্ধির সহজ-পথের লোভ কোন কোন সাহিত্যিককে বিচলিত করিয়াছে। ইহা প্রকৃত বিপদের লক্ষণ। একবার যদি এই মানাইয়া চলিবার মনোভাব ছড়াইয়া পড়ে তবে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা কমিয়া আসিবে। আমাদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে বর্ত্তমানে যে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে conformism-এর পাপ তাহার অন্যতম মূল। আশা করা যায় যে, ভারতের দুই প্রখ্যাত মনীষী এবং রাষ্ট্রনায়কের এই সতর্কবাণী আমাদের নৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে।

ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্কট

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের সফরের সময় ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্কট পুনঃরুদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কানপুর ও কলিকাতার টেষ্টম্যাচে ভারতের শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ হিসাবে খেলোয়াড় নির্ব্বাচনে ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই সমালোচনা পুঙ্খাপুঙ্খ মানিয়া লইতে অক্ষম। খেলোয়াড় নির্ব্বাচনে ভারতের ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ড কখনই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। এইরূপ পক্ষপাতিত্ব ভারতীয় বৈশিষ্ট্য না হইলেও (ওখানে দলাদলির ফলে অষ্ট্রেলিয়ায়

ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে) ভারতে এই দলাদলি যে অত্যন্ত শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু কেবলমাত্র নির্ব্বাচনের ত্রুটীকেই সকল ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা যায় না। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ওয়ালকট, ওরেল, উইক্‌স প্রভৃতি ভারতে আসেন নাই। কিন্তু তাহাতে দলের কোন ইতরবিশেষ হয় নাই। ভারতের দলে যে কয়জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন মোটামুটি রূপে তাঁহারা অধিকাংশই সুপরিচিত। ভারতের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য প্রধান ভাবে দায়ী ভারতের দলের নৈতিক বলের অভাব। কাণপুরে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলায় এক সময় ভারতের জয়লাভের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ছিল—সেই সম্ভাবনার কোন সদ্ব্যবহারই ভারতীয় দল করিতে পারে নাই। খেলোয়াড়দের যথাযথ অভ্যাসের অভাব (অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ব্যাটিং ও ফিল্ডিংএ যেরূপ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন অন্য কোন দেশের দলের পক্ষেই তাহা কল্পনাতীত) এবং দায়িত্ববোধের অভাবকে কোন ক্রমেই খাটো করা যায় না। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত টেষ্টম্যাচে একের পর এক খেলোয়াড় যে ভাবে আগাইয়া আসিয়া আউট হইয়াছেন তাহা সত্যই অবিশ্বাসযোগ্য।

এই সকলের পিছনে একটি বৃহত্তর সামাজিক সমস্যা রহিয়াছে। অতীতে ভারতে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে যাঁহারা খ্যাতিমান হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ধনীবংশজাত। তাঁহাদের খেলার সময়ে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান খেলোয়াড়দের অনেকেরই সেই আর্থিক সুবিধা নাই—খেলা অভ্যাস করিবার সময় তাঁহাদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ইহাতে দুই এক বৎসর পরই তাঁহাদের খেলা খারাপ হইয়া আসে। অপর পক্ষে আর্থিক স্বচ্ছলতার আধিক্যও অনেকের খেলা নষ্ট করিয়াছে। মৌলিক প্রশ্ন হইতেছে : ভারতে কি ক্রিকেট খেলার কোন্ ভবিষ্যৎ রহিয়াছে।

হানিফ মোহাম্মদের বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন

পাকিস্থানের তরুণ খেলোয়াড় হানিফ মোহাম্মদ ৪৯৯ রাণ করিয়া ক্রিকেট খেলায় সর্ব্বোচ্চ রাণ করিবার রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত ব্র্যাডম্যানের ৪৫২ (নট আউট)ই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় সর্ব্বোচ্চ রাণ ছিল। সার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান তরুণ হানিফের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানান।

পঞ্জাব ও শিখ

পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখ এবং কংগ্রেসী ও আকালীপন্থীদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদের ফলে পঞ্জাবের রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পঞ্জাবে শিখদের ভাষা গুরুমুখী আর হিন্দুদের ভাষা হিন্দী পঞ্জাবকে দুইটি ভাষাগত অংশে ভাগ করা হইয়াছে এক অংশে প্রশাসনিক ভাষা হিন্দী অপর অংশে গুরুমুখী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যাপারে প্রায়শঃই মতদ্বৈধ ঘটায় পঞ্জাবের রাজনীতিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। অপরপক্ষে প্রাক্তন পেপসু এলাকায় গুরুদ্বার আইনের প্রচলন লইয়া সম্প্রতি যে সমস্যা দেখা দিয়াছিল অতিকষ্টে তাহার একটি আপাত সমাধান ঘটিয়াছে।

শিখদের ধর্ম্মমন্দির (গুরুদ্বার) পরিচালনার জন্য একটি কমিটি আছে তাহার নাম শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি। প্রাপ্তবয়স্ক শিখদের ভোটের ভিত্তিতে এই কমিটির সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হন। এই কমিটির হাতেই সকল শিখ গুরুদ্বার পরিচালনার ভার রহিয়াছে। এই কমিটির কর্ত্তৃত্ব এতদিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র পঞ্জাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি প্রাক্তন পেপসু রাজ্যের শিখ গুরুদ্বারের পরিচালনও এই কমিটির হাতে অর্পণ করিয়া একটি আইন পাস হইয়াছে। এই আইনটি পাস হইবার পূর্ব্বে মাষ্টার তারা সিং-এর নেতৃত্বে আকালীপন্থী শিখ এবং কর্ত্তার সিং ও সর্দ্দার প্রতাপ সিং কাইরন ও সর্দ্দার জ্ঞান সিং রারেওয়ালার নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসী শিখদের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। পঞ্জাবে নানা স্থানেই শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দেয়—পরে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ কম্যুনিষ্টদের সহযোগিতায় বিলটি পাস করাইয়া লন।

আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসালয়

পল্লীবাংলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা মহাপ্রাণ স্বর্গতঃ ডাক্তার আশুতোষ দাস মহাশয় ১৯৩৪ সনে আশুতোষ চিকিৎসা সমিতির গোড়াপত্তন করেন। তদবধি এই প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও পল্লীবাংলার সেবা করিয়া আসিতেছে। অন্যত্র আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এই সমিতি বিভিন্ন অঞ্চলে সাময়িক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া গ্রামাঞ্চলেই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ছানি তোলাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই চিকিৎসকের নাম শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য। ইহাতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের প্রভূত উপকারসাধন হইতেছে। অধিকাংশেরই শহরে আসিবার মত সঙ্গতি নাই। উপরন্তু, শহরে আসিয়া চক্ষু পরীক্ষা করাইতে হইলে থাকিবার স্থানেরও অভাব। গ্রামে গ্রামে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনে গ্রামবাসীদের এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে হয় না—কিন্তু তাহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার সুযোগ পায়।

সমিতির প্রধান সমস্যা অর্থ। ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ শাখা গত কয়েক বৎসর যাবৎ রোগিগণের জন্য কিছুকিছু ঔষধাদি সরবরাহ করিতেছেন। সহৃদয় ঔষধ ব্যবসায়ীও কেহ কেহ এই কার্য্যে সময় সময় সহযোগিতা করেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সাহায্যের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। ছানি তোলা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্যের জন্য অর্থ-সংগৃহীত হয় প্রধানতঃ গ্রামবাসীদের প্রদত্ত চাঁদার মাধ্যমে। অর্থাভাবে সমিতির কার্য্যাবলী বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইতেছে। সাধারণতঃ কোন কেন্দ্রেই ২০।২৫ জনের অধিক রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হইতেছে না।

সমিতি এই দীর্ঘকাল যাবত একপ্রকার কোনরূপ সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই এই সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। দীর্ঘ

পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসে সরকারের নিকট হইতে মাত্র এক হাজার টাকা সমিতি পাইয়াছেন। সমিতির কার্য্যাবলী বিচার করিয়া ইহাকে অধিকতর সরকারী সাহায্যদানের কথা অবিলম্বে বিবেচনা করা উচিত বলিয়াই আমাদের অভিমত। প্রয়োজনের তুলনায় সমিতি যাহা করিতেছেন তাহা পথ-নির্দ্দেশ করিতেছে মাত্র। এ বিষয়ে অবহিত হইতে আমরা স্বদেশবাসীকে এবং জাতীয় সরকারকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

কংগ্রেসের অগ্রগতি ?

নীচের সংবাদে বুঝা যায় কংগ্রেস এখন কোথায় পৌঁছিয়াছে :

"অভয়ঙ্করনগর, ১১ই জানুয়ারী—জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন আজ এখানে শত শত বাঁশ চালনকারী পুলিস ও সেবাদল স্বেচ্ছাসেবকের সহিত যোগদান করেন।

বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শনের জন্য এক বিরাট জনতা প্যাণ্ডেলের প্রধান প্রবেশপথ ভাঙিয়া ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করিলে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিস দুইবার লাঠি চালায়। ৪৩ জন লোক আহত হয়।

প্যাণ্ডেলের ভিতরে লক্ষাধিক দর্শক ছিল। তাহা ছাড়াও প্রায় লাখ খানেক লোক বিভিন্ন প্রবেশপথ দিয়া ভিতরে ঢোকার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। তাহাদের সামলানো পুলিস ও সেবাদল স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে ক্রমেই দুষ্কর হইয়া পড়ে। অনুমান আরম্ভ হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পরে অবস্থা বশে পৌঁছায়। বাহিরের লোকেরা তখন মরিয়া হইয়া গিয়া ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে, আর ভিতরে দর্শকেরা সরাসরি গিয়া মঞ্চের উপরে।

শ্রীরাজকাপুর প্রমুখ বোম্বাইয়ের ত্রিশজন চলচ্চিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। তাহাদের দেখিবার জন্য প্রচণ্ড ভিড় হইয়াছিল। ফলে আশেপাশের রাস্তায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। কয়েক স্থানে হুড়াহুড়ি বাধিয়া যায়। তাহার ফলভোগ করে বিশেষ করিয়া নারী ও শিশুরা।"

ডঃ তারকনাথ দাস

ভারতের অন্যতম সুসন্তান মনীষী অধ্যাপক তারকনাথ দাস হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২২শে ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরলোকগমন করেন। ১৮৮৪ সনের ১৫ই জুন ডঃ দাস ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী মাঝিপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকালিমোহন দাস ও মাতার নাম শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী দাস। অতি অল্পবয়সেই তারকনাথের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। তিনি কলিকাতায় আসিয়া আর্য্য মিশন ইনষ্টিটিউশনে পড়াশুনা করেন এবং তথা হইতে ১৯০১ সনে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল এসেম্বলীজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) ভর্ত্তি হন। এই সময় তিনি অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পরলোকগত সতীশচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার অন্যতম সহকর্ম্মীরূপে কাজ করিতে থাকেন। ১৯০৩ সনে পিতৃবিয়োগের পর তারকনাথ টাঙ্গাইলে অধ্যয়ন করিতে যান। টাঙ্গাইলে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সহিত পরিচিত হন। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশ, উত্তর-ভারত ও পাঞ্জাবের বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া রাজনীতি ও ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি এই সময় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সহিত জড়াইয়া পড়েন।

আন্দোলনে যোগদানের জন্য তারকনাথকে প্রেরণা জোগান তাঁহার বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী পরলোকগতা গিরিজা মিত্র। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদানের ফলে শীঘ্রই তিনি পুলিসের নজরে পড়েন। আত্মগোপনের জন্য এবং বিদেশে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম চালাইবার উদ্দেশ্যে তারকনাথ ১৯০৫ সনে প্রায় কপর্দ্দকহীন অবস্থায় জাপানে যান। সেখানে এক বৎসর থাকার পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং তদবধি তিনি সেখানেই বসবাস করেন। ১৯০৭ সনে তারকনাথ সানফ্রান্সিসকোতে "ফ্রি হিন্দুস্থান" নামক একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার ফলে ১৯০৯ সনের নবেম্বর মাস হইতে ১৯১০ সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত "টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী ম্যাগাজিন"-এ—কাউণ্ট লিও টলষ্টয় এবং তারকনাথ দাসের খোলাচিঠি হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতামতের আদানপ্রদান হয়। এই সকল চিঠি নিউ ইয়র্কের "আমেরিকান ফিচার এণ্ড নিউজ সার্ভিস" কর্ত্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষেও তারকনাথ দাস ফাউণ্ডেশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।

তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন এবং ১৯১১ সনে তিনি এম-এ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ফেলো ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি বার্লিন যান এবং তথায় ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পান। ১৯২৪ সনে তিনি একজন মার্কিন মহিলা ম্যারী কিটিঞ্জকে বিবাহ করেন। ১৯২৫ হইতে ১৯৩৪ সন পর্য্যন্ত সময়ের অধিকাংশই দাস-দম্পতি ইউরোপে অতিবাহিত করেন। তাঁহাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও কয়েকজন বিশিষ্ট জার্ম্মান শিক্ষাবিদের সহযোগিতায় ১৯২৫ সনে মিউনিকে "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট" নামক এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই ইনষ্টিটিউট ১৯৩৮ পর্য্যন্ত দশকের মধ্যে একশত ভারতীয় ছাত্রকে জার্ম্মানীতে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তিগ্রহণে সাহায্য করে।

ভারত স্বাধীন হইবার পর ডঃ দাস একবার ভারতে আসেন। তাঁহার জলন্ত দেশপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ ডঃ দাস কলিকাতায় আসিয়া বাংলায় বক্তৃতা করিয়া যান। জনসভায় বক্তৃতার সময় এখনও অনেক বাঙ্গালী বাংলা বলিতে পারেন না ; সেই স্থলে পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল ভারতের বাহিরে সম্পূর্ণ বিদেশী পরিবেশে

থাকিয়াও তিনি বাংলা ভাষার চর্চ্চা বন্ধ রাখেন নাই, ইহা কম কথা নহে।

১৯৩৫ সনে তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহযোগিতায় তারকনাথ দাস ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখার উপযোগী যে সকল কাজ ডঃ দাস ও শ্রীমতী দাস উভয়েই তাহাতে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন।

যে সকল ভারতীয় আমেরিকায় যাইতেন ডঃ দাস তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল ভারতের মাটিতেই দেহত্যাগ করা। কিন্তু তাহা হয় নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ছিলেন। আমরা এই মহান্ আত্মার মহাপ্রয়াণে বিশেষ বেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহার আত্মার সদ্গতি হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ বিপর্য্যয়

পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষ চোরাকারবার দমনে কিরূপ অক্ষম তাহার নিদর্শন "আনন্দবাজার পত্রিকা" নিম্নের সংবাদ দিয়াছেন। দেশকে উৎসন্নে দিতে হইলে যাহা কিছু দুরাচারের প্রয়োজন তাহার মধ্যে খাদ্যে চোরাকারবারীকে প্রবল করিয়া তোলাই সর্ব্বপ্রধান।

কলিকাতার নাগরিকদের নিকট সুপরিচিত 'কাঁকরমণি' চাউলের ব্যাপক পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে।

কোন কোন স্থানে চাউলের বেসরকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবৃত্তি দেখা দিয়াছে বলিয়া খাদ্যদপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বৃহস্পতিবার সাংবাদিক-দের নিকট মন্তব্য করেন। উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, মোটা চাউলকে মাঝারি, মাঝারিকে সরু এবং সরু চাউলকে অতি সরু চাউলরূপে চালাইয়া উপরোক্ত ব্যবসায়ীশ্রেণী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন—এইরূপ অভিযোগ বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্যদপ্তরের নিকট পৌঁছিয়াছে। বেশী লাভ করার আশায় অনেক চাউল কল নিজেরাই পাইকারের কাজ করিতেছেন। এইভাবে চাউল-ব্যবসায়ীরা সরকার-নির্দ্দিষ্ট মুনাফা অপেক্ষা বেশী মুনাফা কামাইতেছেন।

তিনি বলেন যে, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ হওয়ার ফলে ঢেঁকির প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এইজন্য গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র লোকদের অর্থ অর্জ্জনের পথ কিছুটা সুগম হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় নয় লক্ষ ঢেঁকি আছে। এইগুলির অধিকাংশই এতদিন অচল হইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে কলিকাতার খুচরা বাজারে সরু ও অতি-সরু চাউল সব জায়গায় পাওয়া যাইতেছে না। কোন কোন স্থানে মাঝারি ও মোটা চাউলেরও অভাব দেখা যায়। উড়িষ্যা হইতে ৬৩ ওয়াগন সরু ও অতি সরু চাউল পাঠান হইয়াছিল। বুধবার মাত্র দুইটি ওয়াগন কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। বৃহস্পতিবার খাদ্যদপ্তরের একজন পদস্থ অফিসার বলেন যে, দুই-একদিনের মধ্যে আরও ওয়াগন আসিয়া পৌঁছিতেছে। তিনি বলেন যে, ঐ চাউলগুলি কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ ছাড়া হইবে।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

স্বাধীনতার সময়ে অভাগিনী বাংলা মায়ের যে কয়টি কৃতি সুসন্তান ছিল তাহাদের মধ্যে একে একে অনেকেই গিয়াছেন। শেষ কয়জনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের সমূহ ক্ষতি হইল।

ঐদিনই (২১শে জানুয়ারী) সন্ধ্যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির নিকট পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু সম্পর্কে এক বিশেষ শোকবাণীতে বলেন:

"বহুদিন থেকে আমি ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে জানি। তিনি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তার চেয়েও বড় কথা, তিনি দেশকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। বাংলার উন্নতির জন্য তাঁর প্রাণ সর্ব্বদাই উৎসুক থাকত। দিল্লী যাবার পর পশ্চিমবঙ্গের সামনে যতগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে, সে সবগুলিরই সমাধানের জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। এই সময় বাংলার এমন বন্ধুকে হারিয়ে আমি বিশেষ দুঃখ ও শোক বোধ করছি।

"মরণ-বাঁচন কারও হাতে নেই। সময় এলে সকলকেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেই হবে। তবে ইচ্ছে করে, তাঁর মত এত ভাল ও জ্ঞানী লোক আরও যদি কিছুকাল বেঁচে থাকতেন, তবে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হ'ত।"

বিঠ্ঠলনারায়ণ চন্দভারকর

বাংলার বাহিরে বাঙালীর বন্ধু আজ বড়ই কম। সেই কারণে শ্রীচন্দভারকরের পরলোকগমনে আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি বাংলার চিন্তাধারার সহিত দীর্ঘদিন সংযোগ রাখিয়াছিলেন এবং সেই কারণে বিশেষ অসুস্থতা সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে ভাষণ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষণের সারাংশ আমরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে নীচে উদ্ধৃত করিলাম:

"শ্রীচন্দভারকর তাঁহার সমাবর্ত্তন ভাষণে বলেন, আজকাল প্রায়ই ছাত্রসমাজের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাবের কথা শোনা যায়। তিনি মনে করেন যে, এই সমস্যাটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে অথবা বাহিরে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে ব্যাপক শৃঙ্খলাবোধের অভাব দেখা যায় উহার পটভূমিকায় বিচার করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যদি তাহাদের গুরুজনের দ্বারা স্থাপিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া থাকে তবে তাহাদের উপর দোষারোপ করা বিজ্ঞজনোচিত হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

শ্রীচন্দভারকর বলেন, ছাত্রসমাজের মধ্যে যুবজনোচিত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কখনও কখনও কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতাও আসিয়া পড়িবে। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ও নৈতিক প্রভাব বিস্তারের দ্বারা ঐসব ভাবধারা সংশোধিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখানে বয়ঃপ্রাপ্তরা কখনও কখনও নিজেদের একান্ত ভাবে বহির্মুখী ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ঐসব ভাবধারাকে কাজে লাগাইয়া থাকেন। ইঁহারাই ছাত্রদের শৃঙ্খলাবোধের অভাবকে প্রকৃত সমস্যায় পরিণত করিয়াছেন।

শ্রীচন্দভারকর বলেন, বিভিন্ন কলেজে অধ্যক্ষঘেঁষা এবং অধ্যক্ষ-বিরোধী দলের কথা শোনা যায়। এই ধরনের কলহ-বিবাদ নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক। তাঁহার মতে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যে সব গোলযোগের কথা শোনা যায়, উহাদের উৎসস্থল এই সব তথাকথিত 'ছাত্রমুরুব্বীদের' মধ্যে খুঁজিতে হইবে বয়ঃপ্রাপ্তদের মধ্যে যে অবনতি দেখা দিয়াছে তাহাই তরুণ সমাজকে সকল প্রকার নীতিবোধ সম্পর্কে অবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে। রাজনীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, এমন কথা তিনি বলিতেছেন না। কিন্তু রাজনীতি লইয়া আসিবার সঠিক স্থান কোথায় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। অন্যথায় ছাত্রসমাজ শুধু ক্ষমতা কাড়াকাড়ির খেলার ক্রীড়নকে পরিণত হইবে। তিনি মনে করেন যে, এই ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যই বয়ঃপ্রাপ্তরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তরুণসমাজের উপর নৈতিক কর্তৃত্ব হারাইতেছেন। এই পটভূমিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব ক্রমবর্দ্ধিত হারে লক্ষিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

শ্রীচন্দভারকর বলেন, এমন হইতে পারে যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট বাহির করা যাইতেছে না, তাহার নানা কারণ আছে। "হয় ত উহা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে"। কিন্তু দৃঢ়চরিত্রসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট বাহির করিতে বাধা কোথায়? শুধু সাজসরঞ্জাম ও সুযোগ সুবিধা থাকিলেই ইহা সম্ভব হইবে না। এইখানেই সাধারণভাবে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং বিশেষভাবে অধ্যাপকদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

শ্রীচন্দভারকর এইরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যদি এই মূলভিত্তির উপর দণ্ডায়মান না হন, তাহা হইলে সংস্কৃতির প্রসার অথবা নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করিবার সকল কথাই নিরর্থক হইবে। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, নূতন নূতন আদর্শ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বহু-বিস্তৃত পাঠ্যক্রম প্রচলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এক বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাদের সম্মুখে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা এমন এক অবস্থা যখন পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ধারাবাহিকতা যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যুগোপযোগী পরিবর্তনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

শ্রীচন্দভারকর কলেজসমূহে ছাত্রদের অত্যধিক ভিড়ের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, সাহসিকতার সহিত উহার মোকাবিলা করিতে হইবে। তাঁহার ধারণা যে, সংখ্যাগত সম্প্রসারণের মধ্যে গুণগত উন্নতির সম্ভাবনাও নিহিত রহিয়াছে। তিনি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে নিরাশ না হইবার জন্য অনুরোধ জানান।

পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-বৃত্তান্ত নীচে উদ্ধৃত করা হইল:

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন রবিবার ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত যশাইকাটি গ্রামে মাতুলালয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে তাঁহার জন্ম। সংসারে অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল। পিতা নিবারণচন্দ্র জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন। শিশুকাল তাঁহার মাতুলালয়েই কাটে। এখানে একটি ছোট বাংলা বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তারপর বসিরহাট মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েন। ইহার পর তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটে। মাইনর স্কুলটি হাই স্কুলে পরিণত হওয়ার পর তিনি ইংরেজী শিক্ষা ত্যাগ করিয়া মধ্য বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থে একটি বাংলা স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই সময় পরীক্ষার ফল ভাল না হওয়ায় প্রধান শিক্ষক কর্তৃক তিরস্কৃত হন। ইহার ফলে স্কুল পরিবর্তন ঘটে। নূতন স্কুলে গিয়া তিনি বৃত্তি পান। তারপর যশাইকাটির নিকটস্থ বাদুড়িয়া লণ্ডন মিশনারী স্কুলে এবং পরে কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেমব্লিতে তিনি পাঠ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাসের পর অর্থাভাবে তাঁহার পক্ষে পড়াশুনা চালানো কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি যখন তাঁহার গ্রামের স্কুলের ছাত্র তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এক বছর বৃত্তি দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইয়া মেট্রোপলিটন কলেজে (বিদ্যাসাগর কলেজে) ভর্তির সুযোগ পান। এখানে তৃতীয় বার্ষিক বি-এ পর্য্যন্ত পড়েন, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে বি-এ পাস করা হয় না।

১৩০৯ বঙ্গাব্দে হরিচরণ শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হন। এই সময় হইতে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

হরিচরণের সুবৃহৎ কাজ বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণয়ন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে এই কাজ আরম্ভ করিয়া পূর্ণ একচল্লিশ বৎসর একক পরিশ্রমের পর ১৩৫২ বঙ্গাব্দে এই কাজ তিনি শেষ করেন।

১৯৪৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়া সম্মানিত করেন। ১৯৫৭ সনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যরূপে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ইঁহাকে 'দেশিকোত্তম' (ডি-লিট) উপাধি দান করেন।

মকর-সংক্রান্তির পরে

শ্রীসুখময় সরকার

বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে নারীর মুখে একটা ছড়া শুনিতে পাওয়া যায় :

চাউড়ী বাঁউড়ী মকর।*
করিস না কেউ সফর।
আখ্যান ঘ্যান ঘ্যান সাঁই, সুঁই।
তার পরের দিন আসিস তুই।

চাঁউড়ী, বাঁউড়ী ও মকর—এই তিন দিন কেহ বিদেশ-যাত্রা করিবে না, গৃহের বাহির হইবে না, কারণ ইহা উৎসবের কাল। তাহার পরদিন 'আখ্যান'। সেদিন উৎসব-কোলাহলে দিগ্‌দেশ মুখরিত, বাদিত্র-রবে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত। সেদিনও কেহ কোথাও যাতায়াত করিবে না।

গত বৎসর (১৩৬৪) মাঘের প্রবাসীতে মকর-সংক্রান্তি বর্ণনা করিয়া তাহার উৎপত্তি দেখাইয়াছি। এই প্রকরণে তাহার পরবর্তী আখ্যান-দিনের উৎসব বর্ণনা করিতেছি। সৌর মাঘের প্রথম দিবস পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আখ্যান-দিন নামে অভিহিত হয়। সেদিন দেবালয়ে, মনুষ্যাবাসে, প্রান্তরে, কান্তারে যত দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতা আছেন—সকলের সাড়ম্বর অর্চনা হয়। ধানবাদ ও সাঁওতাল-পরগণার পূর্বাংশেও এই রীতি প্রচলিত আছে।

গ্রামের প্রান্তে শাল-পলাশের কুঞ্জে 'গ্রাম-দেবতা'র স্থান। তিনি পুরুষ-দেবতা কি স্ত্রী-দেবতা, জানি না ; শুধু জানি—তিনি গ্রামের মঙ্গল-বিধাতৃ-শক্তি। তিনি আর্য-দেবতা কি অনার্য দেবতা, জানি না ; কিন্তু জানি—বেদের বাস্তোষ্পতি ও ক্ষেত্রপালের ইনি সগোত্র। গ্রাম-দেবতার মূর্তি নাই ; তাঁহার স্থানে মৃন্ময় হস্তী ও অশ্বগুলি তাঁহার অস্তিত্বের সূচনা করে। মধ্যে মধ্যে নানা উপলক্ষ্যে তাঁহার পূজা হয় ; কিন্তু আখ্যান-দিনে তাঁহার বিশেষ পূজা। ধূপ-ধুনার গন্ধে সেদিন গ্রাম-দেবতার স্থানের বায়ুমণ্ডল পরিপূক্ত হইয়া উঠে ; ঢাক-ঢোলের বাদ্যে তাঁহার মহিমা ঘোষিত হইতে থাকে।

জোড়ের* ধারে উপবনের মধ্যে 'কুদরা-সিনী' আছেন। তিনি অতিশয় কোপন-স্বভাব দেবতা। অন্য দিনে যাহাই হউক, আখ্যান-দিনে তাঁহার 'থানে' পশুবলি দিতেই হইবে। ছাগ অথবা মেষ হইলে উত্তম, না হইলে অন্ততঃ পারাবত অথবা কুক্কুট। বলি না পাইলে তিনি গ্রামের অমঙ্গল করেন। 'কুদরা-সিনীর'ও মূর্তি নাই—সিন্দুর-লিপ্ত একখণ্ড শিলাই তাঁহার প্রতিমা বা প্রতীক্।

শিলাবতী নদীর ওপারে বেতস-কুঞ্জের মধ্যে আছেন 'কাল-ভৈরব'। আশে-পাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাস্তূপ ; মধ্যস্থলে আমলকি তরুর ছায়ায় একটি গুহাবৎ স্থানে রক্ষিত সিন্দুর-রঞ্জিত নগ্নদেহ কাল-ভৈরবের মূর্তি। শৈশব হইতে তাঁহাকে ভীষণ দেবতা বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এখন আর তাহা মনে করিতে পারি না। লক্ষণ দেখিয়া বুঝি, তিনি দিগম্বর মহাতীর্থঙ্কর বর্ধমান জিন। অহিংসার অবতারকে লোকে কেমন করিয়া ভয়ঙ্কর দেবতা মনে করিল! কেমন করিয়া তাঁহার সম্মুখে অকাতরে পশু বলি দিতে আরম্ভ করিল !! ভাবিতে গেলে মাঘ মাসের শীতের দিনেও ললাটে স্বেদস্রুতি হয়। কিন্তু উপায় নাই, দশচক্রে ভগবান ভূত। লোকের পাল্লায় পড়িয়া করুণার অবতার আখ্যান-দিনে পশু-রক্তে আপন আসনের শিলাতল রঞ্জিত করিতেছেন! মনে হয়, তাঁহার নগ্নত্বই প্রাকৃত-জনের মনে ভীষণত্বের ভাবনা জাগাইয়াছে।

পাহাড়ের কোলে সুবিস্তীর্ণ তেঁতুলিয়ার 'বাঁধ'*†।

* চাউনী ও বাউনী শব্দের দন্ত্য-ন বাঁকুড়ায় মূর্দ্ধণ্যয়ের মত উচ্চারিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা ওড়িয়ার প্রভাব। মূর্দ্ধণ্য-নয়ের উচ্চারণ 'ড়ঁ'এর মত। বাংলায় আমরা দন্ত্য-ন ও মূর্দ্ধণ্য-নয়ের উচ্চারণে প্রভেদ করি না, কিন্তু হিন্দী, মরাঠী ও ওড়িয়ায় প্রভেদ সুস্পষ্ট। চাউনী—চাহনি, অর্থাৎ প্রার্থনা। লক্ষ্মীর নিকট ধন-প্রার্থনা। বাউনী—বন্দনা, অর্থাৎ লক্ষ্মীর স্তুতি। মকর-সংক্রান্তির পূর্ব্বের দুই দিন চাউনী (চাঁউড়ী) ও বাউনী (বাঁউড়ী)।

* বাঁকুড়ায় ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীকে বলে 'জোড়'। জোড়, জোল ও সোল মূলতঃ একই শব্দ।

† বিপুলায়তন জলাশয়কে বাঁকুড়ায় 'বাঁধ' বলে। পাহাড় বা তত্তুল্য উচ্চ ভূমি হইতে ঢাল বাহিয়া বৃষ্টির জল নামিতে থাকে, ঢালের মুখে তিন দিকে বাঁধ দিয়া সেই জল ধরিয়া রাখা হয়। 'বাঁধ' নামের তাৎপর্য এই।

বাঁধের পূর্বপারে একটি প্রকাণ্ড তেঁতুল বৃক্ষ 'আছেন'। তাহার তলায় মহাদানার 'থান'। আখ্যান-দিনে তাঁহার 'থানে' বিপুল সমারোহে মহোৎসব। চতুষ্পার্শ্বস্থ দশ-বারো খানা গ্রামের লোকে মহাদানার পূজা দিতে আসে। তেঁতুল গাছটি অতি পুরাতন, তাহার অগণিত শাখা-প্রশাখা প্রায় দুই বিঘা পরিমিত ভূমি ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মহাদানার সামীপ্যহেতু সেও 'দেবত্ব' পাইয়াছে। লোকে 'গাছ' না বলিয়া 'বৃক্ষ' বলে, তাহার উল্লেখ করিতে হইলে সম্ভ্রমাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়। আখ্যান-দিনে বেলা এক প্রহর হইতে না হইতে মহাদানার থানে তেঁতুলের ছায়ায় জনসংঘট্ট হয়। অনেকের 'মানসিক' থাকে, তাহারা বলির নিমিত্ত ছাগ-শিশু আনিয়া সারি সারি বাঁধিয়া রাখে। কেহ নূতন তণ্ডুল, কেহ গুড়, কেহ-বা দুগ্ধ আনিয়া তেঁতুলের ছায়ায় পরিচ্ছন্ন স্থানে জড়ো করে। কেহ ফুল, কেহ ফল, কেহ-বা বিল্বদল আনিয়া মহাদানার পূজার আয়োজন করে। একদিকে বিপুলাকার উদ্যানে সুবৃহৎ কটাহে তণ্ডুল-গুড়-দুগ্ধ-সহযোগে মহাদানার ভোগ রন্ধন করা হয়; ইহার নাম 'মুমুই-ভোগ'*। মুমুই-ভোগের বৈশিষ্ট্য এই যে, রন্ধন-পাত্রের তলদেশ পুড়িয়া গিয়া ভোগে পোড়া গন্ধ হয়। সাবধানতা অবলম্বন করিলেও নাকি মুমুই-ভোগে পোড়া গন্ধ হয় ইহা বাবার 'মাহাত্ম্য'—বাবা পোড়া গন্ধযুক্ত মুমুই-ভোগই পছন্দ করেন। আর একদিকে ছাগ-বলির নিমিত্ত যূপকাষ্ঠ প্রোথিত এবং খড়্গ শাণিত হইতে থাকে। মহাদানার পূজারী ব্রাহ্মণ, বৈদিক-সংস্কার-সম্পন্ন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কিন্তু কি মন্ত্রে তিনি মহাদানার পূজা করেন, জানি না।

মহাদানার মূর্তি নাই; তাঁহার থানে প্রদত্ত পোড়া-মাটির হাতী-ঘোড়া তাঁহার অস্তিত্ব সূচিত করে। আখ্যান-দিনের পূজায় হাতী-ঘোড়াগুলিকে সিন্দুরে রঞ্জিত এবং বিচিত্র বর্ণের চন্দ্রমালায় সজ্জিত করা হয়। পূজান্তে বলিদান। বলি-প্রদত্ত ছাগ-শিশুর রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড মহাদানার উদ্দেশে উপহার দেওয়া হয়। বলিদান সমাপ্ত হইলে মহা-সমারোহে মুমুই-ভোগের প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং মুণ্ডহীন ছাগ-শিশুর দেহ বাড়ীতে লইয়া গিয়া লোকে সানন্দে মাংস ভক্ষণ করে।

দানব শব্দের অপভ্রংশে 'দানা'। এই কারণে পণ্ডিতেরা বলেন, মহাদানা অনার্য অপদেবতা। আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতেছি না। কিন্তু বেদেও পরম-দেবতাকে 'অসুর' বলা হইয়াছে,—"মহদ্দেবানাম্ অসুরত্বমেকম্"। জেন্দ্-অবেস্তাতেও পরমেশ্বর 'অহুর মজদ্' (অসুর মহৎ) নামে অভিহিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ অতি প্রাচীনকালে কি আর্য, কি অনার্য, সকল জাতিরই দেব-দেবী কল্পনার মূলে একই বিশ্বাস সক্রিয় ছিল। বিশালতা ও শক্তিমত্তার নিকট সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে মস্তক অবনত করিত। অদ্যাপি তাহার ব্যতিক্রম অতি অল্পই দেখা যায়।

আখ্যান-দিনের আর একটি উৎসব ভবানীদেবীর 'এয়োযাত'*। সেদিন প্রধানতঃ সধবা নারীরা ভবানী-দেবীর পূজা দিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করেন। অবশ্য তাঁহাদের সহিত আরও অনেকে পূজায় যোগদান করিয়া থাকেন। চতুষ্পার্শ্বে সাত-আটটি গ্রাম, মাঝখানে ভবানী-পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় ভবানীদেবীর স্থান। দেবীর নামানুসারে পাহাড়ের নাম ভবানী-পাহাড়। ভবানী-পাহাড়ের চূড়া বহুদূর হইতে লক্ষিত হয়। চূড়ায় কয়েকটি অত্যুচ্চ চিরহরিৎ মহীরুহ জগজ্জননী ভবানীর নৈসর্গিক মন্দির নির্মাণ করিয়া বহুদূর হইতে পথিক-জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাহাড়ের পূর্বদিকে দে-দহ (দেবদহ) ও কলাবতী গ্রাম এবং পশ্চিমদিকে দেবীদিয়া (দেবীদ্বীপ) গ্রাম ভবানী-দেবীর কোন্ পুরাতন ইতিহাসের সহিত অচ্ছেদ্য সূত্রে বিজড়িত, কে জানে? দে-দহার নিকট প্রবাহিত ক্ষীণস্রোতা শিলাবতীর পার্শ্বে সতীঘাটা। এককালে নারীগণ এখানে মৃত পতির চিতায় প্রাণ বিসর্জন করিয়া 'সতী' হইতেন। এই সকল গ্রামের সধবা নারী আখ্যান-দিনে ভবানীদেবীর এয়োযাত করেন। গোময়-লিপ্ত বাঁশের ঝুড়িতে হলুদ-মুড়ি ও কলাই ভাজা, তিলের নাড়ু ও পাটালি। দেবীর জন্য হরিদ্রা-রঞ্জিত একখণ্ড বস্ত্র। পাহাড়ের উপর ফুল ও বিল্ব-পত্রের অভাব নাই, কেবল রক্তচন্দন সঙ্গে লইলেই হয়। কাহারও হাতে বলির নিমিত্ত রজ্জুবদ্ধ ছাগ-শিশু। ঢাক-ঢোল-কাঁসি-বাঁশী লইয়া সঙ্গে চলে বাদ্যকরের দল। ভবানী-দেবীর স্থানে যাইবার পথ অতি দুর্গম। পদে পদে প্রস্তরচ্যুতি ঘটিয়া পদস্খলনের আশঙ্কা। আশে-পাশে কণ্টকী গুল্ম—সাবধান না হইলে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। উপবাসিনী পূজার্থিনীগণ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুচিবস্ত্র পরিধানপূর্বক বেলা একপ্রহরে পাহাড়ে আরোহণ আরম্ভ করেন, চূড়ায় পৌঁছিতে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া যায়। সুকুমারী বালিকা-বধূর কোমল মুখমণ্ডল ও পদতল আরক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু দেবীর কৃপালাভের নিমিত্ত সে ক্লেশ স্বীকার করিতেই

* মুনি শব্দের সহিত 'মুমুই' শব্দের যোগ থাকিতে পারে। মুমুই-ভোগ সম্ভবতঃ মুনির খাদ্য।

* এয়ো=অবিধবা (পতিবত্নী নারী)। যাত=যাত্রা (পূজার্থে দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা)।

হইবে। আখ্যান-দিনে যে নারী ভবানীদেবীর এয়োঘাতে যোগদান করে, সে কখনও বিধবা হয় না।

ভবানীদেবীর মন্দির নাই। কয়েকটি আরণ্য বৃক্ষের নিম্নে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত শিলাস্তূপের মধ্যস্থলে একটি গুহা। সে গুহায় কেহ কখনও প্রবেশ করিয়াছে কিনা, জানি না। ভবানীদেবীর মূর্তি নাই। লোকে বলে ঐ গুহার অভ্যন্তরে রৌপ্যনির্মিত কৌটার মধ্যে দেবীর অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ স্বর্ণ-মূর্তি আছে। সত্যই আছে কিনা, কেহ তাহা প্রত্যক্ষ করে নাই; 'নাই' বলিয়া কেহ অবিশ্বাসও করে নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, দুলালপুর গ্রামের রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গুহা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৌটা হইতে দেবীর প্রতিমা বাহির করিয়া পূজা করিতেন; দেবী নাকি তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। সে শতাধিক বৎসর পূর্বের কথা। গুহার দ্বারপথে দুইদিকে দুইটি প্রায় বর্তুলাকার শিলাখণ্ড প্রস্তর বেদীর উপর স্থাপিত। দেখিলে মনে হয়, প্রস্তরীভূত দুইটি নরকপাল! ওগুলি এখানে কেন? সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী!

একদা বৃদ্ধ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গুহামধ্যে ভবানী-দেবীর পূজা সমাপন করিয়া বলিলেন, "মা, আমার ত দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই পাহাড়ের চূড়ায় এসে প্রতিদিন কে তোর পুজো করবে, মা?"

দেবী বলিলেন, "আমি নিজেই সে ব্যবস্থা করে নেবো; তোর চিন্তা নেই। কাল যখন পুজো করতে পাহাড়ে আসবি, তখন দেখবি, দুটি ব্রাহ্মণ বালক পাহাড়ের কোলে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছে। তাদের এখানে ডেকে নিয়ে আসবি পুজো দেখবার জন্যে। পুজো শেষ হলে আমার সামনে ওদের বলি দিবি। ওদের আত্মা চিরদিন এখানে থাকবে আমার পূজারী হয়ে। আর, ওদের মুণ্ড আমার গুহার মুখে প্রতিষ্ঠা করবি। আমার অনন্তকালের পূজারী-ওরাও লোকের পুজো পাবে।"

দেবীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ী পরদিন পাহাড়ে উঠিতে গিয়া রামচন্দ্র সত্যই দেখিলেন, উপবীতধারী দুই ব্রাহ্মণ কুমার এক তরুতলে বিশ্রাম করিতেছে। তাহাদিগকে ভবানীর স্থানে লইয়া গিয়া পূজান্তে তিনি তাহাদিগকে বলি দিলেন। তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড দেবীর গুহার মুখে স্থাপন করা হইয়াছিল। দেবীর মহিমায় তাহারা পাষাণ হইয়া গিয়াছে। দেবীর চরণে রক্ত দিয়া ব্রাহ্মণ কুমারদ্বয় প্রাণত্যাগ করিয়াছে; নিশ্চয়ই তাহারা ভাগ্যবান্। অদ্যাপি আখ্যান-দিনে লোকে সেই প্রস্তরীভূত নরকপালে ফুল-জল দিয়া পূজা করে।

গুহামুখে বসিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবীর উদ্দেশে যাত্রা-বিধি হলুদ-মুড়ি, কলাই ভাজা, তিলের নাড়ু ও পায়সান্নের ভোগ নিবেদন করেন এবং স্বহস্তে ছাগ শিশু বলি দিয়া পূজা সমাপন করেন। বলিদানের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের চূড়ায় সেদিন ঢাক-ঢোল-সানাই বাজিয়া উঠে।

আখ্যান-দিনে গৃহে গৃহে লক্ষ্মীপূজা। আখ্যান-লক্ষ্মীর পূজার বৈশিষ্ট্য আছে। বৎসরে বহুবার লক্ষ্মীপূজা হয়, সে সব গৃহ-কক্ষের অভ্যন্তরে; কিন্তু আখ্যান-লক্ষ্মীর পূজা হয় গৃহের অঙ্গনে। কোজাগরী ব্যতীত অন্যান্য লক্ষ্মী-পূজা দিবাভাগে ও সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু আখ্যান-লক্ষ্মী রাত্রি একপ্রহর অতীত হইলে পূজিত হন। সাধারণ লক্ষ্মী-পূজার আলিম্পনে কেবল দেবীর পদচিহ্ন ও পুষ্প-পত্রাদির নক্সা থাকে; কিন্তু আখ্যান-লক্ষ্মীর আলিম্পনে পুষ্পপত্রাদির সহিত গোরু, লাঙল, জোয়াল ও ধানের মরাইয়ের চিত্র লিখিত হয়। বৈকালে প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দুহিতা ও বধূগণ লক্ষ্মীপূজার আলিম্পন আঁকিতে আরম্ভ করে। চম্পক-কলির মত কোমল অঙ্গুলির বিচিত্র লীলায় মুহূর্তের মধ্যে প্রাঙ্গণ তণ্ডুল-চূর্ণের শুভ্র আলিম্পনে ভরিয়া উঠে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অঙ্কিত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিচিত্র আলিম্পনের উপর নূতন ধান্যের একটা প্রকাণ্ড স্তূপ। তাহার উপরে লক্ষ্মীর ঝাঁপিটিকে কেন্দ্র করিয়া পিত্তল নির্মিত লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি; পিত্তলের মৎস্য, ময়ূর, পেচক ও পারাবত; নানা আকারের ও নানা প্রকারের শঙ্খ ও ঝিনুক গৃহিণীর নিপুণ হস্তে সজ্জিত হয়। পিটালীর সহিত হরিদ্রা চূর্ণ মিশাইয়া তাহাতে লক্ষ্মীদেবীর এবং শিমপাতার রস মিশাইয়া তাহাতে নারায়ণের মূর্তি নির্মাণ করা হয় এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের এই স্বস্তিক-প্রতিমার* পূজা হয়। নানাবিধ ফল-মূল ও মিষ্টান্ন দেবীর ভোগের জন্য আয়োজিত হয়। অঙ্গনে আসন পাতিয়া বসিয়া পরিবারস্থ সকলেই পুরোহিতের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। রাত্রি এক প্রহর হইলে পুরোহিত আসিয়া পূজা আরম্ভ করেন। চতুর্দিকে ভক্তিযুক্তচিত্তে উপবেশন করিয়া সকলে পূজা দর্শন করে। পূজার শেষে প্রসাদ বিতরণ। তার পর শৃগালের ডাক শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা। শৃগালের ডাক না শুনিলে আখ্যান লক্ষ্মীকে গৃহে তুলিবার জো নাই। প্রহরে প্রহরে শৃগাল ডাকে, কিন্তু কাছাকাছি না ডাকিলে সে ডাক

* তণ্ডুল-চূর্ণের সহিত জল মিশাইয়া যে পিণ্ড প্রস্তুত করা হয় তাহার নাম স্বস্তিক। আখ্যান-দিনে গৃহিণীরাই স্বস্তিকের লক্ষ্মী-নারায়ণ-প্রতিমা নির্মাণ করেন।

শুনিতে পাওয়া যায় না। কোন কোন বৎসর এমন হয় যে, শৃগালের ডাক শুনিবার জন্য গৃহিণীকে রাত্রি দুই-প্রহর এমন কি তিন-প্রহর পর্যন্ত প্রাঙ্গণে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। কোজাগরীর ন্যায় আখ্যান-লক্ষ্মীও ভক্তকে জাগাইয়া রাখিতে ভালবাসেন।

আখ্যান দিনের বৃহত্তম উৎসব 'মৃগয়া'। অবশ্য সকল শ্রেণীর, সকল বয়সের লোক মৃগয়ায় যোগদান করে না। 'আখ্যান-শিকার' সাধারণতঃ ছত্রি, সাঁওতাল, ভূমিজ ও খেড়িয়াদের** মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইহার আনন্দ সকলেই উপভোগ করে। মাসাধিক কাল পূর্ব হইতে আখ্যান-শিকারের আয়োজন চলিতে থাকে। শিকারীরা ধনুর্বাণ, ভল্ল-কুন্ত (বল্লম ও কোঁচা), লগুড়-দণ্ড নির্মাণে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ শিকার ধরিবার জাল বুনিতে থাকে। আখ্যান-শিকারে কখনও বন্দুক ব্যবহৃত হইত না; ইদানীং কেহ কেহ বন্দুক লইয়া শিকারে যায় বলিয়া শুনিয়াছি। অতি প্রত্যূষে, সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে, শিকারীর দল সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া শিকারে বহির্গত হয়। সূর্যোদয়ের পর হইতে অন্ততঃ একটা শিকার না পাওয়া পর্যন্ত তাহারা কেহ জল স্পর্শ করিবে না। ছাত্রেরা নিজদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই দাবী করে; তাহাদের বাহুবল আছে, তাহারা মৃগয়া-প্রিয়। আখ্যান শিকারে তাহাদের শৌর্য, সাহস, কৌশল ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মাল-সাঁট আঁটিয়া, পাগড়ী বাঁধিয়া, ধনুর্বাণ হাতে লইয়া, কটিতে কৃপাণ ঝুলাইয়া ছত্রিরা যখন শিকারে বাহির হয় তখন প্রাচীনকালের মৃগয়া-ব্যসনী ক্ষত্রিয় রাজাদের চিত্র কল্পনা-নেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যাহারা মৃগয়ায় তেমন পটু নহে, তাহারা দামামা, কাড়া-নাকাড়া, ঢাক-ঢোল, শিঙা ইত্যাদি লইয়া শিকারীদের অনুগমন করে। জঙ্গলে পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে পল্লীপথ ও প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠে। জঙ্গলের নিকটবর্তী হইলে বাদ্যযন্ত্র নীরব হইয়া যায়। বাদ্যকরের দল একটা নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে; শিকারীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বন-বনান্তরে গমন করে। কোন দল ঘন-সন্নিবিষ্ট গুল্মাবলী বেষ্টন করিয়া শশক ধরিবার জাল পাতে। তিন দিকে জাল পাতিয়া একদিক হইতে অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বনস্থলী চমকিত করিয়া তাড়া করে। গর্ত ও ঝোপের ভিতর হইতে শশক বাহির হইয়া নক্ষত্রবেগে দৌড়াইতে থাকে; তখন কোনটা জালের মধ্যে পড়িয়া যায়, কোনটা শিকারীর ক্ষিপ্র শায়কে প্রাণ হারায়। শশক-শিকারই বর্তমান কালের শিকারীদের প্রধান লক্ষ্য, কারণ শ্বাপদ জন্তুর মাংস অভক্ষ্য। তাহা ছাড়া শ্বাপদ-জন্তু শিকারের নিমিত্ত যে সাহস ও শৌর্যের প্রয়োজন এখনকার শিকারীদের মধ্যে তাহা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। সরকারের বনসংরক্ষণ (?) পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছে; অরণ্য ক্রমশঃ উৎসাদিত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং শ্বাপদ-জন্তুর অভাবও ঘটিয়াছে। তথাপি কোন কোন দুঃসাহসী শিকারীর দল আখ্যান-দিনে চিতাবাঘ, হিংস্র বন্যবরাহ, কোক (হায়েনা) ইত্যাদি শিকার করিয়া আনে।

আখ্যান দিনে শিকারীর হুঙ্কারে আরণ্য পশু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, অরণ্যানীর অখণ্ড স্তব্ধতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। বনলক্ষ্মীর অঞ্চল-প্রান্তে ক্রীড়া-চঞ্চল শশক-শিশুর নিষ্পাপ শোণিতে সিক্ত হইয়া যায়। কিন্তু মানুষ তাহাতে আনন্দ উপভোগ করে! শিকার না পাইলে শিকারীরা সেদিন জল স্পর্শ করে না। শিকার পাওয়া গেলে বেলা প্রায় দেড় প্রহরে সকলে মিলিয়া কোন স্রোতস্বতীর পার্শ্বে বসিয়া গুড়-মুড়ি-চিড়া দিয়া জলযোগ করে। কেহ কেহ পূর্ব-রাত্রের সিদ্ধ পুলি-পিঠা সঙ্গে লইয়া আসে। সঙ্গে রন্ধনের আয়োজনও থাকে, একদল রন্ধনের উপযোগী স্থান নির্বাচন করিয়া অন্ন-পাক করিতে আরম্ভ করে। বেলা আড়াই প্রহরের সময় রন্ধনকার্য সমাপ্ত হইলে শিকারীরা পরস্পর হাঁকাহাঁকি করিয়া সমবেত হয় এবং স্রোতস্বিনীর জলে অবগাহন করিয়া সকলে সানন্দে তৃপ্তিসহকারে শাকান্ন ভোজন করে। শিকারের পশুর মাংস বনের মধ্যে রন্ধন বা ভোজন করা হয় না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সকলে আর একবার শিকারে বাহির হয় এবং যে যাহা পারে শিকার করিয়া সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সকলে একত্র মিলিত হয়। কাহাকেও বাঘে খাইয়াছে কিনা, বারংবার তাহা গণিয়া দেখিয়া লওয়া হয়। বৃদ্ধদের মুখে গল্প শুনিয়াছি, সেকালে আখ্যান-শিকারে গিয়া সকলেই গৃহে ফিরিতে পারিত না।

তার পর নিহত পশু লইয়া শোভাযাত্রা। একটা বংশ-দণ্ডের দুই প্রান্ত বৃষস্কন্ধ দুই যুবার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া তাহাতে মৃত পশুদের দেহ ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে সারি সারি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। শিকারের সংখ্যা অধিক হইলে এইরূপ বংশদণ্ড ও বাহকের সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তিমিরা রজনীর অন্ধকারকে স্পর্দ্ধা করিয়া আশে-পাশে দশ-পনরটা মশাল জ্বলিয়া উঠে। ঢাক-ঢোল ও কাড়া-নাকাড়া বাজাইতে বাজাইতে বাদ্যকরের দল আসিয়া জুটে; আর উল্লসিত শিকারীর উন্মত্ত চীৎকারে নিস্তব্ধ নৈশগগন বিদীর্ণ হইতে থাকে। শোভাযাত্রা পল্লী-

** খেড়িয়া—আখেটিক (মৃগয়াজীবী)। ইহারা জঙ্গলে বাস করে। বাঁকুড়ায় ইহাদের সংখ্যা অল্প নহে।

পথে অগ্রসর হইয়া চলে। দলে দলে বাল বৃদ্ধ-যুবা আসিয়া শোভাযাত্রায় যোগদান করে। সাঁওতাল, খেড়িয়া ও ভূমিজ শিকারীরা প্রায়ই মদ্যপান করিয়া পথে পথে আমোদ করিয়া বেড়ায়। ছত্রিদের মধ্যে এই অসংযম দেখা যায় না। শোভাযাত্রা সমাপ্ত হইলে নিহত পশুর মাংস শিকারীরা বণ্টন করিয়া লয়।

পূর্বে বলিয়াছি, সকলে আখ্যান-শিকারে যোগদান করে না। কিন্তু অনেককে সেদিন জুয়া খেলিয়া আমোদ করিতে দেখা যায়। দ্যূত শব্দের অপভ্রংশ 'জুয়া'; কিন্তু জুয়া খেলা কেবল দ্যূতক্রীড়া নহে। তাস, দাবা, ঝাণ্ডি—এই সমস্ত লইয়াও জুয়া-খেলা হয়। প্রাচীনকালে দ্যূতক্রীড়া নির্দোষ প্রমোদের মধ্যে গণ্য হইত; এক্ষণে উহা ব্যসনে পরিণত হইয়াছে। আখ্যান দিনে সমস্ত রাত্রি কেহ কেহ জুয়া খেলিয়া কাটাইয়া দেয়।

এক্ষণে আমরা আখ্যান পর্বের উৎপত্তি অন্বেষণ করিব। পঞ্জিকায় ১লা মাঘ আখ্যান পর্বের কোন উল্লেখ নাই। স্মৃতিতে আখ্যান-ষষ্ঠীর উল্লেখ আছে, কিন্তু পঞ্জিকায় উহা পালনীয়া-ষষ্ঠীর মধ্যে গণ্য নহে। পশ্চিমবঙ্গে আখ্যান-ষষ্ঠী-পর্ব কোথাও দেখি নাই; উহার প্রকরণ আমার জানা নাই। যতদূর মনে হয়, আখ্যান-ষষ্ঠীর সহিত ১লা মাঘ আখ্যান-পর্বের কোন সম্পর্ক নাই; কারণ, প্রতি বৎসর ১লা মাঘ ষষ্ঠী তিথি হইতে পারে না। পঞ্জিকায় কিংবা স্মৃতিগ্রন্থে যে পর্বের উল্লেখ অথবা বিধান নাই, অনেকে সে পর্বে কোন গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করেন। এই মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নহে। মনে রাখা উচিত, স্মার্ত পণ্ডিতগণ বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সকল দেশের, সকল কালের সর্ববিধ আচারানুষ্ঠান শাস্ত্র-নিবদ্ধ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; তাঁহারাও মানুষ ছিলেন, সর্বজ্ঞ ছিলেন না। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ বহু ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে। আমাদের মনে হয়, বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূমের আখ্যান-পর্ব তাহাদের অন্যতম।

আখ্যান শব্দের অর্থ কি? মনু সংহিতায় (৩২৩২) আখ্যান শব্দের অর্থ,—কাহিনী, প্রতিবচন, ইতিহাস, পুরাণ। কুল্লূকভট্ট আখ্যান শব্দে সৌপর্ণ মৈত্রাবরুণাদির ইতিকথা ধরিয়াছেন। কিন্তু আখ্যান-দিনে ত সেরূপ কোন কাহিনী, ইতিহাস কিংবা পুরাণ-কথা পাঠ করা অথবা শ্রবণ করা হয় না। কেহ কেহ লক্ষ্মীর ব্রত কথা পাঠ ও শ্রবণ করেন, কিন্তু উহা আখ্যান নহে; হইলেও তাহার এমন কোন গুরুত্ব নাই যে, তজ্জন্য 'আখ্যান-দিন' নামকরণ হইতে পারে। বিশেষতঃ, বৎসরে বহুবার লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীর ব্রত-কথা পাঠ করা হয়। এক একবার মনে হইয়াছে, মৃগয়াবাচক আক্ষোদন বা আখেটন শব্দ বিকৃত হইয়া প্রাকৃত-জনের মুখে 'আখ্যান' রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ মনে করিবার হেতু এই যে, আখেটনই (মৃগয়া) আখ্যান-দিনের প্রধান উৎসব। কিন্তু মৃগয়া আখ্যান-দিনের প্রধান উৎসব হইলেও উহা একমাত্র উৎসব নহে এবং বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে, যাহারা মৃগয়ায় যোগদান করে না, তাহারাও অন্যান্য বহুবিধ উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া আখ্যান-দিনে আমোদ আহ্লাদ করে। বিশেষতঃ, আখেটন শব্দের বিকৃত রূপ 'আখ্যান'—ভাষা-তত্ত্ববিদ্ ইহা স্বীকার না করিতেও পারেন।

তবে কি আমরা একান্ত ভ্রমবশতঃ 'আখ্যান' শব্দ ব্যবহার করিতেছি? সম্ভবতঃ তাহাই হইবে। সংস্কৃত 'আক্রাণ' শব্দও বাংলায় 'আখ্যান' শব্দের মত উচ্চারিত হইতে পারে। আক্রাণ শব্দের অর্থ—ব্যাপ্যমান, ক্রম-বর্ধমান। ঋগ্‌বেদে (১০।২২।১১) আছে,—"আক্রাণে শূরবজ্রিবঃ"। কিন্তু ব্যাপ্যমান বা ক্রমবর্ধমান দিন বলিতে কি বুঝায়? যেদিন হইতে দিবামান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে (ফলে রাত্রিমান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে) সেদিনকে 'আক্রাণ-দিন' বলিতে পারি। সে কোন্ দিন? সকলেই জানেন, উত্তরায়ণ দিনে দিবামান হ্রস্বতম হয় এবং তাহার পরদিন হইতে দিবামান তিলে তিলে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এক সময়ে নিশ্চয়ই ৩০শে পৌষ রবির উত্তরায়ণ হইত এবং তাহার পরদিন ১লা মাঘ হইতে দিবামান বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। সে অধিক দিনের কথা নহে, ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ঐ বৎসর হইতেই গুপ্তাব্দ গণনা আরম্ভ হয়। অদ্যাপি আমাদের পঞ্জিকায় সেই পুরাতন গণনা ধরিয়া ৩০শে পৌষ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি নামে অভিহিত হইতেছে। কিন্তু বর্তমান কালে প্রকৃতপক্ষে ঐ দিবসে রবির উত্তরায়ণ হয় না। অয়নদিন চিরকাল স্থির থাকে না; প্রতি ২১১০ বৎসরে এক মাস পশ্চাদ্‌গত হয়। ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্তমান কালের ব্যবধান ১৬৪০ বৎসর; এই কালের মধ্যে অয়নদিন প্রায় ২৩ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে। এখন ৭ই পৌষ রবির উত্তরায়ণ হয়। কিন্তু পুরাতন স্মৃতি ধরিয়া অদ্যাপি লোকে ৩০শে পৌষ মকর-সংক্রান্তি ও ১লা মাঘ 'আক্রাণ' (এখন আর 'আখ্যান' বলিব না) দিনের উৎসব করিতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, দিবামান বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহাতে এত আহ্লাদের কি আছে? আহ্লাদের কারণ অবশ্যই আছে। দিবামান যতই হ্রাস পাইতে থাকে শীত ততই প্রবল হয়। প্রবল শীতে জীব-জগৎ কাতর হইয়া পড়ে, লোকে কষ্ট পায়। দিবামান বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে শীত

কমিতে থাকে, লোকের জড়তা দূরীভূত হয়, কর্মশক্তি ফিরিয়া পায়। অন্ততঃ প্রাচীনকালের সাধারণ মানুষ শৈত্য হ্রাস এবং দিবামান বৃদ্ধিতে নিশ্চয়ই আনন্দ অনুভব করিত।

কিন্তু আক্ষাণ দিনের আনন্দোৎসবের পশ্চাতে আরও একটি নিগূঢ় কারণ আছে। ঋগ্‌বেদের কালে, প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্বে, উত্তরায়ণ দিনে নববর্ষ আরম্ভ হইত। তখন অবশ্য পৌষ-সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ হইত না, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হইত; দোলযাত্রা তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে। নববর্ষ দিবসকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য লোকে মৃগয়া করিত; দ্যূত-ক্রীড়া করিয়া রাত্রি জাগরণ করিত। সেই পুরাতন স্মৃতি ধরিয়া অদ্যাপি রাজপুতানায় ১লা ফাল্গুন 'আহেরিয়া' (মৃগয়া) উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা প্রায় ৩৮০০ বৎসর পূর্বের উত্তরায়ণ ও আক্ষাণ দিনের স্মৃতি। আবার সেই প্রাচীন স্মৃতি আমাদের ১লা মাঘ আক্ষাণ-শিকারে বিধৃত হইয়াছে। লক্ষ্মীপূজায় শৃগালের ডাক শুনিবার জন্য রাত্রি-জাগরণ, দ্যূতক্রীড়া করিয়া রাত্রি জাগরণ এবং নানা দেব দেবীর পূজা করিয়া সমগ্র বৎসরের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা, সেই অতি প্রাচীনকালের নববর্ষ দিবসের স্মৃতি বহন করিয়া হিন্দুকে যুগে যুগে জাতিস্মর করিয়া রাখিয়াছে। স্মৃতিগ্রন্থে উল্লেখ না থাকিলে কি হইবে, এইরূপ কত পুরাতন কথা জাতির স্মৃতিপটে উৎকীর্ণ আছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার দিন আসিয়াছে। তাহা না করিয়া, কেবল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা ভারতের পুরাতন ইতিহাস অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহারা বৃথা পণ্ডশ্রম করিতেছেন।

কর্ম্মযোগী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভাবুক— ভাবের কারবারীকে ভালবাসি পরাণ ভরি,
ভাবকে যারা রূপ দিতেছে, তাদের কিন্তু প্রণাম করি।
ভাব দিয়ে যে বস্তু গড়ে,
সাবাসি সব কারিকরে,
অনুরাগে রাঙায় ভুবন নিত্য নূতন অভাব হরি।

২

বীজ ভিজায়ে তুলছে তরু, সাজাইছে পুষ্পে ফলে—
আশায় বাসা বাঁধছে নিতি মহাকালের রঙমহলে।
যারা কামার যারা কুমোর,
গোটা দেশ ও জাতির গুমর,
অসন বসন ভূষণ জোগায় স্বর্ণহার দেয় মায়ের গলে।

৩

গুণগুণানি ভালবাসি, উনঘুনানি জাগায় কাঁকা,
ধন্য তারাই গড়ছে যারা মোম দিয়ে ওই মধুর চাকা।
সাজায় যারা বসুন্ধরা
পৃথ্বী গড়ে মধুক্ষরা,
আঁধার মথি' বাহির করে নূতন নূতন তারার থাকা।

৪

তারাই কৃতী— কর্ম্মযোগী, কর্ম্ম করে এ সংসারে,
পূর্ণ করে বিপুল ধরা কালজয়ী সব আবিষ্কারে।
ধ্যানের ছবি মর্ম্মরেতে—
চাইছে সদাই আকার পেতে,
ভাবের মূল্য, সার্থকতা, তারাই শুধু দিতে পারে।

৫

ঘূর্ণায়মান এই পৃথিবী বলছে সদাই কর্ম্ম কর,
ভাবুক ভাল, ভাবুক ভাল, তাহার চেয়ে কর্ম্মী বড়।
পূজে তারাই হায় অনিবার,
ভগবান আর ভুবনকে তাঁর
সেরা সেবক ভক্ত তারা ভাবুক চেয়ে শক্তিধর ও।

৬

বরণ করি আনন্দেতে বিরাট পরিকল্পনাকে,
তারা মহৎ বৃহৎ যারা অনাগতের নক্সা আঁকে।
কিন্তু যারা করছে ভুবন
বাসের যোগ্য, শান্ত-শোভন,
কর্ম্ম যাদের তপস্যা হে, প্রভু তাদের কাছেই থাকে।

মেঘের আড়ালে

শ্রীপ্রবাস দত্ত

নির্মলার কাছে আজ সব শূন্য লাগে। মনে হয়, জীবনটাই ওর ব্যর্থ গেল। না-পাওয়ার একটা কেমন যেন বেদনা এই একলা দুপুরে ওর বুকের মধ্যে বার বার মোচড় দিয়ে উঠতে থাকে—কিছু ভাল লাগে না। এতদিন যার পেছনে ও অন্ধ হয়ে ছুটে চলেছিল, আজ বুঝতে পারে সেটা মরীচিকা—তৃষ্ণার্তকে যা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়—হাত ছানিতে।

মাদ্রাজ থেকে আসা অজয়ের দু' ছত্রের চিঠিখানা হাতের মুঠোয় মুড়িয়ে মেঝেয় ফেলে দেয় নির্মলা। অজয় লিখেছে, ওর আসতে এখনো অনেক দেরী। প্রচুর কাজ সেখানে। নির্মলা কেমন আছে জানতে চেয়েছে, আর জানিয়েছে, নিজেও ভালই আছে। এই শেষ কথাটা মনে পড়তেই হঠাৎ জ্বলে ওঠে নির্মলা। ভাল আছে অজয়, বেশ ভাল আছে! নির্মলাকে ছেড়ে থাকতে তা হলে ওর কিছুই কষ্ট হয় না? নির্মলা ওর জীবনের খাতায় একটা নাম শুধু, আর কিছু নয়? না না, নির্মলা কেন ভাববে অজয়ের জন্যে, অজয় কি ভাবে ওর কথা? অজয় ত বেশ আছে তার কাজ নিয়ে। নির্মলার দিন কেমন করে কাটে, তা জানবার প্রয়োজন নেই তার। প্রয়োজন নেই।

উত্তেজনায় উঠে পড়ে নির্মলা। ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারী করে বেড়ায়। ইচ্ছে হয়, এই মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে যায় রাস্তায়। কিন্তু এই দুপুর রোদে কোথায় যাবে—সে কথা মনে হতেই নিজের আবেগকে স্তিমিত করে আনে নির্মলা। মনের বিশ্রী জ্বালাটাকে ভুলতে নূতন আসা সিনেমা ম্যাগাজিনটা নিয়ে পালঙ্কের গায় হেলান দিয়ে বসে পড়ে। চুলোয় যাক্ অজয়, অজয় বলে কাউকে সে চেনে না।

চৈত্র মাসের দুপুর। চারদিকে রোদ ঝাঁ ঝাঁ। রাস্তায় লোকজন অল্প। মাঝে মাঝে দু'চারখানা ট্যাক্সি আর রিক্সা আসা-যাওয়া করছে। এত বড় বাড়ীটাকে মনে হচ্ছে যেন প'ড়ো। নিঃঝুম। আর হবেই বা না কেন? তিনতলা এই বাড়ীটায় এখন মানুষ বলতে নির্মলা, অজয়ের দূর সম্পর্কের এক পিসীমা, আর গোটা চারেক ঝি-চাকর। বাড়ীর সামনে একটুখানি বাগান। চৈত্রের খর রোদে লাবণ্যহীন। বাড়ীটাও এমন জায়গায়, যেখানে মানুষের কোলাহল রাস্তা পেরিয়ে কারুর বাড়ীতে ঢোকে না। সারি সারি প্রত্যেকটা বাড়ী আপন আভিজাত্য নিয়ে গম্ভীর।

কিন্তু, কি আশ্চর্য! এত নিঃসঙ্গ, আর এত নিঃঝুম ত এ বাড়ীটাকে আগে মনে হয় নি নির্মলার! গাড়ীর শব্দ তুলে কতবার আজ প্রায় দু' বছর ধরে নির্মলা প্রতিদিন যাওয়া-আসা করছে এখান থেকে। কই, এত নিরালা ত লাগে নি! আজ যেন চারদিক থেকে নিরালা নিঃঝুম বাড়ীটার দম আটকান পরিবেশ তাকে চেপে ধরেছে। কিন্তু, কেন?

ফ্যানের হাওয়া লেগে সিনেমা পত্রিকার পাতা উল্টাতে থাকে। নির্মলার মন চলে যায় দু' বছর আগে।

কলেজে পড়ত তখন নির্মলা—বি-এ। শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে কলেজে আসত। কথা বলত পরম আভিজাত্য নিয়ে। শাড়ী আর ব্লাউজ যেদিন ম্যাচ করত না, সেদিন কলেজেই আসত না। তবে, নির্মলার বাবা সত্যি সত্যি কুবের ছিলেন না। তিনি ছিলেন উকীল। পসার ছিল। আর পাঁচজন উকীলের চেয়ে দু' পয়সা তাই তাঁর পকেটেই বেশী আসত। একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড অষ্টিনও কিনেছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে তাতে চড়ে কলেজে আসত নির্মলা।

কিন্তু বাবার সামর্থের দিকে না চেয়ে নির্মলা চলত তার খুশী মত। নিজের প্রতি সে ছিল অতিমাত্রায় সচেতন। বাড়ীতে ছিল উদ্ধত।

একবার নির্মলার বাবা ওর জন্যে পাত্র ঠিক করলেন। পাত্রপক্ষের কনে দেখার দিন ধার্য হ'ল। কিন্তু নির্মলা যখন শুনল পাত্র ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে, আর দু'শো টাকা মাইনের চাকরী করে সরকারী আপিসে, তখন পষ্টাপষ্টি সে বাবার মুখের ওপর জানিয়ে দিল, বিকেলে সে থাকতে পারবে না।

অনিমেষবাবু কাতর কণ্ঠে বললেন, কিন্তু নিমি, আমি যে তাদের কথা দিয়ে দিয়েছি।

নির্মলা কঠিন কণ্ঠে বললে, তাঁরা এলে বলবেন, জরুরী তার পেয়ে মেয়ে তার মাসীমার বাড়ী চলে গেছে। যত সব—আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে নির্মলা গট্ গট্ করে

বেরিয়ে গিয়েছিল। অনিমেষবাবু মেয়ের গমন পথের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছিলেন।

তারপর মাস ছ'য়েকের মধ্যেই নির্মলার বিয়ে হয়ে যায় ইঞ্জিনিয়ার অজয়ের সঙ্গে। নির্মলা যা চেয়েছিল, তা সে পেয়েছিল। গাড়ী, বাড়ী, শাড়ী—কোনটাতে তার ইচ্ছে অপূর্ণ রয়ে যায় নি। নির্মলা নিজেও ভাবতে পারে নি এমন বিয়ে তার হবে।

বিয়ে হবার পর তাই নির্মলা সাধ মিটিয়ে টি-পার্টি আর পিক্‌নিক্ করে বেড়িয়েছে। সিনেমা দেখেছে, বান্ধবীর বাড়ীতে দিন কাটিয়েছে। অজয়ের কথা তার ভাববার সময় ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না।

কলেজে বান্ধবীদের কাছে নির্মলা মাঝে মাঝে বলত, স্বাধ, প্রেম একটা ভাঁওতা। যারা প্রেমে পড়ে তাদের আমি বোকা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। সাবানের ফেনায় খড়ের কাঠি দিয়ে ফুঁ দিয়ে ছেলেরা যেমন রঙিন ফানুস বানায় দেখেছিস ; ওরই মতন প্রেম। দেখতে না দেখতে ফেটে মিলিয়ে যায়।

বান্ধবীরা ওর কথায় অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। কেউ হয়ত তর্কের জন্তে বলত, তবে কি নারীর জীবনে পুরুষের ভালবাসার কোন প্রয়োজন নেই ?

—প্রয়োজন ? ঠোঁট বাঁকাত নির্মলা। কথার জবাব না দিয়ে বলত, পুরুষের টাকা আর প্রতিপত্তিটাই শুধু সলিড। ওইটেই চাই।

নির্মলা তাই পেয়েছিল। শুধু রাত্রি ছাড়া সারাদিন তার অজয়ের সঙ্গে কথা বলবার অবকাশ হ'ত না। আলাদা দুটো পাশাপাশি পালঙ্ক। নির্মলা যখন শু'ত অজয় তখন টেবিলে পড়াশুনা করত। দু'চারটে অতি প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর কিছু তাই হ'তও না। নির্মলাও চাইত না।

কোন কোন দিন মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে নির্মলা হয়ত দেখেছে, অজয় বিছানা ছেড়ে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। নির্মলা ডাকে নি, পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য আর সংযম অজয়ের! কোনদিন নির্মলাকে সে প্রশ্ন করে নি, তার কোন কাজের কৈফিয়ৎ চায় নি। তার সামনে দিয়ে নির্মলা যখন গট্ গট্ করে চলে গিয়েছে, তখন সে একবার শুধু হয়ত পেছন ফিরে তাকিয়েছে।

তারপর একদিন রাত্রে ঘাড় না ফিরিয়েই অজয় বললে, আগামী সপ্তাহে মাদ্রাজ চলে যাচ্ছি।

—কেন ? নির্মলা জিজ্ঞেস করলে।

—বদলী হয়েছি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে নির্মলা বলেছে, একাই যাবে ত ?

—হ্যাঁ, তাই ঠিক করেছি। সেখানে গেলে তোমার অনেক অসুবিধে হবে।

নির্মলা মনে মনে খুশী হয়েছে। আর কোন কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়েছে সে তার পর।

অজয় চলে গেছে. আজ প্রায় ছ'মাস। মাঝে দু'বার এসেছিল, অল্প ক'দিনের জন্তে। নির্মলা পাল্টায় নি। রাতগুলো আগে যেমন কাটত, তখনও তেমনি কেটেছিল। দিনের রুটিনেরও কোন পরিবর্তন হয় নি।

কিন্তু এবার যেন ক্লান্তির ছোপ লেগেছে নির্মলার মনে, সারা দেহে। পার্টি আর ভাল লাগে না, পিক্‌নিক্ একঘেয়ে হয়ে গেছে। সিনেমায় নূতনত্ব নেই। মাঝে মাঝে এখন মনে পড়ে অজয়কে। মনে হয়, অজয় কাছে থাকলে ভাল হ'ত।

শোবার ঘরে অজয়ের টেবিলটার কাছে গিয়ে বইগুলো নাড়াচাড়া করে। কলমটা খুলে প্যাডের ওপর আঁকিবুকি কাটে, অজয়ের নাম লেখে। তার পর ফের বাইরে চলে আসে। ব্যালকনিতে দাঁড়ায়। রাস্তার মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া দেখে সময় কাটায়।

সেদিন দুপুরে অমনি সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছিল নির্মলা। বাইরে গাড়ীর শব্দ হ'ল। নির্মলা উঠে এল ব্যালকনিতে।

একখানা ট্যাক্সি। দরজা খুলে নামল অজয়। ভাড়া মিটিয়ে দিতেই গাড়ী চলে গেল ধোঁয়া ছেড়ে। নির্মলা ফিরে এল।

ঘরে ঢুকতেই নির্মলা বললে, তুমি না চিঠিতে লিখেছিলে—

—হ্যাঁ, একটু হঠাৎ করেই এসে পড়লাম, ঠিক ছিল না কোন।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। নির্মলাই ফের বললে, থাকবে ত কিছুদিন ?

—কিছু ঠিক নেই। জামা খুলতে খুলতে বললে অজয়।

নির্মলা চুপ করে গেল। অজয় তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে না। ভেতরের সেই উদ্ধত আর বহির্মুখী ভাবটা তাই ফের জেগে উঠল নির্মলার ভেতর। খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর তাই সে হঠাৎ বলে উঠল, আমার একটু কাজ আছে, বাইরে যেতে হবে।

—এই রোদে! বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে অজয়।

—হ্যাঁ, এই রোদেই। উষ্ণ জবাব দিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল নির্মলা। তার পর গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেল সেই দুপুর রোদে।

রাত্রিতে নির্মলা যখন শু'ল, অজয় তখনো ফেরে নি। বিছানায় উসখুস করে কাটাল নির্মলা। কিন্তু অজয় আসতেই পাশ ফিরে ঘুমের ভাণ করে শু'ল। অজয় তাকে সত্যি সত্যি ঘুমন্ত ভেবে আর কোন কথা বললে না। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লে। তারপর এক সময় ঘুমিয়েও পড়লো।

ঘুম এল না নির্মলার চোখে। শিয়রের কাছে খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক ফালি চাঁদ। ঘরে এসে পড়েছে আবছায়া জ্যোৎস্না। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে নির্মলা হঠাৎ উঠে বসল। তারপর অজয় যেখানটায় কোন কোন মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে দাঁড়াত চুপচাপ, সেইখানে এসে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল লম্বা হয়ে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে অজয় বলে উঠল, কে? ও নির্মলা। ঘুমোও নি?

—ঘুম আসছে না। নির্মলা জবাব দিলে।

—শরীর খারাপ করছে কি?

প্রশ্ন শুনে জ্বলে উঠল নির্মলা।

—তোমায় ভাবতে হবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও।

তার পর এসে ফের বিছানায় মুখ গুঁজে কি এক অসহ্য যন্ত্রণায় শুয়ে পড়েছে।

মনে হয়েছে, ব্যঙ্গ করছে ওই এক ফালি আকাশের চাঁদ। জ্যোৎস্নাটাকে মনে হয়েছে বিষাক্ত।

চারদিন পর। অজয় বললে, আজ বিকেলে রওনা হব।

—ক'টায় গাড়ী? সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলে নির্মলা।

—পাঁচটায়।

অজয় বেরিয়ে গেল।

নির্মলা চুপচাপ বসে রইল। মনে মনে একবার ভাবলে, তিনটের গাড়ীতেই সে বরানগরে মাসীমার বাড়ী চলে যাবে। কিন্তু, সঙ্কল্পটা দৃঢ় হ'ল না কিছুতেই।

দুপুর বেলায় তেমন কোন কথা হ'ল না দু'জনের মধ্যে। এড়িয়ে এড়িয়ে কাটাল নির্মলা। একটা চাপা যন্ত্রণা ওকে অস্থির করে তুলল।

একি শুধুই অজয়ের নিদারুণ ঔদাসীন্যের জন্যে? নির্মলা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না। পরাজয়ের আর রিক্ততার গ্লানি তাকে চঞ্চল করে তোলে।

ঘড়ির কাঁটা যত এগোয়, নির্মলার চঞ্চলতা ততই বাড়ে। চারটে বাজল। অজয় প্রায় তৈরী।

নির্মলা ঘরে ঢুকল।

টাইটা ঠিক করতে করতে অজয় বললে, কিছু বলবে?

সহসা এতদিনের জমাট মেঘ গলে ঝরে যেন চিরদিনকার নীল আকাশটাকে প্রকাশ করে দিলে।

—তুমি কি, তুমি কি কিছুই বোঝ না? দু' হাতে মুখ ঢেকে নির্মলা ফুঁপিয়ে উঠল।

অজয় খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল তার দিকে। দু' চোখে তার কিসের চাপা আলো জ্বলে উঠল। এগিয়ে এসে নির্মলার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললে, বুঝি, সব বুঝি আমি নির্মলা। শুধু অপেক্ষায় ছিলাম। শুধু অপেক্ষায়।

ও-পাশের জানালাটা একটা দমকা হাওয়ায় খুলে যেতে এক ঝলক শেষ বেলাকার রোদ এসে পড়ল দু'জনের মুখের ওপর।

শকুন্তলা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হে শুচিতা অনভিজ্ঞ অজ্ঞানের ধন
নাহি জানে সংসারের রহস্য গোপন
পাপের কুটিল গতি,—শক্তি কোথা তার
চলিতে জীবন-পথে করিয়া বিচার?

যে প্রেম বিবশা হয়ে প্রিয়ের গলায়
পরাইয়া দেয় মালা, নাহি মানি হায়
জীবনের কৃত্য যত, সুখ নীড়ে তার
আচম্বিতে অভিশাপ বাজে দুর্ব্বাসার।

তাই তব পরাজয়; তার পরে হায়
সাধিয়া অজ্ঞান ঋণ দীর্ঘ তপস্যায়
নিষ্কলঙ্ক সীতা সম রহি নির্ব্বাসনে
তপঃ শেষে পেলে সতি নিজ পতি ধনে।

মোহের যে প্রেম ব্যর্থ হ'ল ধরণীতে,
স্বর্গে তাহা এল ফিরে পরম সিদ্ধিতে।

শঙ্করের "জীবন্মুক্তিবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

৩

পূর্ব প্রবন্ধে শঙ্কর জীবন্মুক্তিবাদ সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে কি বলেছেন, সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন হ'তে পারে, এরূপ জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি? গীতানুসারে, শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে জীবন্মুক্তকে "স্থিতপ্রজ্ঞ" নামে অভিহিত করেছেন (১-১-৪, ৪-১-১৫)। এই স্থিতপ্রজ্ঞ, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, সংসারে থেকেও অসংসারী, দেহধারী হয়েও দেহাভিমানশূন্য। সেজন্য, তিনি চক্ষু থাকতেও চক্ষুবিহীন, কর্ণ থাকতেও কর্ণবিহীন, বাগিন্দ্রিয় থাকতেও বাগ্‌বিহীন, মন থাকতেও মনোবিহীন, প্রাণ থাকতেও প্রাণবিহীন। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণবিশিষ্ট হলেও, জীবন্মুক্ত সে সকলেরই বহু উর্ধে। (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, ১-১-৪)

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ (৪-৪-৭) অনুসরণ করে, শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, সর্প তার চর্ম (খোলস) ত্যাগ করলে, তা' যেমন জীর্ণ হয়ে বল্মীকস্তূপে পড়ে থাকে, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞের শরীরও 'এটি আমি বা আমার নয়'—এই ভাবে উপেক্ষিত হয়ে' পড়ে থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞের নিকট, জীবন্মুক্তের নিকট, শরীর একটি বাহ্যিক তুচ্ছ আবরণই মাত্র।

গীতা অনুসারে শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। (গীতা-ভাষ্য, ২-৫৪ - ৭২)

'আমিই পরব্রহ্ম'—এইপ্রকার প্রজ্ঞা বা উপলব্ধি যাঁর স্থিত বা স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তিনিই হলেন স্থিতপ্রজ্ঞ। তিনি সকল কামনা ত্যাগ করেছেন, যেহেতু আত্মা বা ব্রহ্মদর্শনের অমৃতরসাস্বাদনের পরে তিনি অন্য সকল বস্তুতেই বিগতস্পৃহ। কামনাবিহীন বলে, তিনি দুঃখে কাতর হন না, সুখেও উৎফুল্ল হন না; তিনি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যরূপ ষড়রিপু জয় করেছেন; সেজন্যই তিনি স্থিতধী, স্থির, শান্ত, সমাহিত এবং মুনি বা প্রকৃত জ্ঞানবান্‌। তিনি এই ভাবে সকল বস্তুতে আসক্তি-বিহীন, হর্ষবিষাদ-রহিত, শুভাশুভ তাঁর নিকট সমতুল। কূর্ম যেরূপ অঙ্গসমূহকে সঙ্কুচিত করে, তিনিও সেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহৃত করেন। অবশ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু উপভোগে অসমর্থ হয়ে, সেই সকল বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়সমূহ সংহৃত করেন, সত্য; কিন্তু সেই সকল বিষয়ের জন্য তাঁর আসক্তি থেকেই যায়। স্থিতপ্রজ্ঞের আসক্তিও নেই। 'আমিই পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্ম' এই উপলব্ধির জন্য তাঁর অণুমাত্রও, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মও ভোগলালসা থাকতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সংযমই সর্বাপেক্ষা কঠিন কার্য, সেজন্য, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়সংযমই সাধন করেন। পার্থিব বিষয়সমূহের তথাকথিত রমণীয়তা চিন্তা করতে করতে স্বভাবতঃই পুরুষের সেই বিষয়ে আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কাম, কাম থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। এইভাবে ক্রোধ থেকে মোহ, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ থেকে বিনাশের উদ্ভব হয়। সেজন্যই রাগদ্বেষবিমুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ ইন্দ্রিয়সমূহকে আত্মার দ্বারা বশ করেন, এবং বাহ্যিক বিষয় পরিত্যাগ করে, আত্মাতেই আনন্দ লাভ করেন। এরূপ, আত্মানন্দ ও প্রসন্নচিত্ততাই চিত্তস্থৈর্যের হেতু। যিনি এই ভাবে চিত্তস্থৈর্য লাভ করেন না, তাঁর শান্তি কোথায়? বায়ু যেরূপ জলস্থিত নৌকাকে বিক্ষুব্ধ করে' জলমগ্ন করে, সেরূপ ইন্দ্রিয়ানুসারী চঞ্চল মনও, পুরুষের প্রজ্ঞাকে বিপথগামিনী ও বিনষ্ট করে। সেইজন্যই ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত কেহ স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারে না। অন্যান্য সকলের যা 'নিশা', স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট তা 'দিবা', অন্যান্য সকলের নিকট যা 'দিবা' স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট তা 'নিশা'। অর্থাৎ, অজ্ঞেয় পরমার্থ বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে যখন সাধারণ জন নিদ্রিত থাকেন, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ সেই তত্ত্ব জাগ্রত ভাবে প্রত্যক্ষ করেন; পুনরায় তথাকথিত সংসার-প্রপঞ্চ যখন সাধারণ জন জাগ্রত-ভাবে প্রত্যক্ষ করেন, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ সেই বিষয়ে নিদ্রিত থাকেন। সেজন্য সমুদ্রে বহু নদনদীর জল প্রবেশ করলেও যেমন সমুদ্র কোনদিন বিক্ষুব্ধ হয় না, তেমনি স্থিতপ্রজ্ঞ সংসারের ভোগ-লালসার মধ্যে বাস করেও কোনদিন চঞ্চল বা অশান্ত হন না। সমস্ত কামনা ত্যাগ করে, নিস্পৃহ, নির্মম (পার্থিব বিষয়ে মমতা-বিহীন) নিরহঙ্কার রূপে বিরাজমান বলেই, স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন্মুক্ত পরমা শান্তির অধিকারী। স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন্মুক্তের এরূপ স্থিতিই হ'ল ব্রাহ্মী স্থিতি।

এরূপে গীতানুযায়ী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, শঙ্কর জীমুক্তের

প্রধানতম লক্ষণরূপে গ্রহণ করেছেন নিষ্কামতাকে, এবং বারংবার, নানাবিধ দৃষ্টান্তের সাহায্যে তারই উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

জীবন্মুক্ত সংসারের সর্বত্রই পরব্রহ্ম দর্শন করেন। সে-জন্য তিনি সমদর্শী—তাঁর নিকট ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, গো হস্তী, কুক্কুর-কীট-পতঙ্গাদি সকলই সমান। (গীতা-ভাষ্য, ৫-১৮)

যদি আপত্তি হয় যে, জগতের অশুদ্ধ বস্তুর সংস্পর্শে এসে, অপাপবিদ্ধ-শুদ্ধ ব্রহ্ম-স্বরূপ জীবন্মুক্তও অশুদ্ধ ও পাপলিপ্ত হয়ে পড়েন—তার উত্তর এই যে, জীবন্মুক্তের নিকট পার্থিব জীব ও জড়বস্তুসমূহ স্বয়ং ব্রহ্ম, সাধারণ বস্তু নয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, এই সকল সাধারণ জীব ও বস্তু, অশুদ্ধ ও পাপসংকুল হলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সকলই শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে নির্মল, নির্দোষ, নিষ্কলুষ, নিরঞ্জন।

"ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈর্জিতো বশীকৃতঃ সর্গঃ জন্ম, যেষাং সাম্যে সর্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে স্থিতং নিশ্চলীভূতং মনোঽন্তঃকরণম্।"

(গীতা-ভাষ্য, ৫-১৯)

অর্থাৎ, যে সকল সমদর্শী পণ্ডিত জীবিতাবস্থাতেই জন্ম জয় করেছেন, তাঁদের মন পরমসাম্যে, বা সকল বস্তুতেই অবস্থিত ব্রহ্মেই নিশ্চল হয়ে থাকে।

ঈশোপনিষদ্-ভাষ্যেও শঙ্কর জীবন্মুক্তের লক্ষণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে, একই ভাবে, তাঁর তিনটি প্রধান লক্ষণের উল্লেখ করে বলছেন :

(১) "যঃ পরিব্রাড্ মুমুক্ষুঃ সর্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদীনি স্থাবরান্তানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি আত্ম-ব্যতিরিক্তানি ন পশ্যতীত্যর্থঃ।" (ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য, ৬)

(২) "স তস্মাদেব দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে—বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি।" (ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য, ৬)

(৩) "পরমার্থ-বস্তু-বিজ্ঞানতস্তত্র তস্মিন্ কালে তত্রাত্মনি বা কো মোহঃ কঃ শোকঃ ?" (ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য, ৭)

অর্থাৎ, যিনি মুক্তিকামী হয়ে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি প্রথমতঃ সমস্ত বস্তুকেই স্বীয় আত্মারূপেই দর্শন করেন—তাঁর নিকট আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই নেই। এইভাবে, তিনি আত্মদর্শী বলে' সমদর্শী।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি সমদর্শী বলে', বিশ্বপ্রেমিক। কারণ,—

"সর্বা হি ঘৃণা আত্মনোঽন্যৎ দুষ্টং পশ্যতো ভবতি। আত্মানমেবাত্যন্ত-বিশুদ্ধং পশ্যতো ন ঘৃণা-নিমিত্তমর্থান্তরমস্তীতি প্রাপ্তমেব।"

(ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য, ৬)

অর্থাৎ, নিজের থেকে ভিন্ন অন্য এক বস্তুর দোষ দেখলেই ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে। কিন্তু যিনি সর্বত্রই, সর্বদাই সেই এক অতি-বিশুদ্ধ আত্মাকেই মাত্র দর্শন করেন, তার ঘৃণার কারণ হতে পারে এরূপ অন্য এক বস্তু আর কই ?

তৃতীয়তঃ, তিনি পরমার্থজ্ঞানী ও সমদর্শী বলে শোক-মোহাতীত। কারণ—

"শোকশ্চ মোহশ্চ কাম-কর্মবীজমজানতো ভবতি, ন তু আত্মৈকত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ।"

(ঈশোপনিষদ্, ভাষ্য ৭)

অর্থাৎ, শোক ও মোহের তিনটি কারণ : অবিদ্যা, কামনা ও সকাম কর্ম। অবিদ্যাবশতঃ বদ্ধজীব প্রিয় বস্তু-লাভ, অপ্রিয় বস্তু বর্জনের জন্য কামনা করে এবং সেই মত বিবিধ সকাম কর্মে রত হয়। তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ, সে প্রিয় বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগে শোক মোহাদিক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যিনি গগনের ন্যায় বিশুদ্ধ ও নিরাসক্ত আত্মাকেই মাত্র সর্বত্র দর্শন করেন—তাঁর শোক-মোহ নেই, থাকতে পারে না।

এই ভাবে, মুক্তজীব সংসারে বাস করেও সংসারাতীত ; পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, সাংসারিক বাসনা কামনা, হিংসা-দ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থপরতা, শোক-তাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না মুহূর্তের জন্যও।

ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত জীবন্মুক্তের অবশ্য কর্তব্যকর্ম কিছুই নেই। কিন্তু দেহ ধারণ করেন বলে ; দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, স্বপ্ন শ্বাস, প্রলাপ (বাক্য-কথন), বিসর্জন, গ্রহণ, উন্মেষ, নিমেষ (উন্মীলন নিমীলন) প্রভৃতি কার্য তাঁকে সম্পাদন করতে হলেও তিনি জানেন যে, প্রকৃত পক্ষে, ইন্দ্রিয়গণই স্বভাববশে ইন্দ্রিয়ার্থে প্রবৃত্ত হচ্ছে—তিনি স্বয়ং কিছুই করছেন না। দৃষ্টান্ত দিয়ে শঙ্কর বলছেন যে, যদি কোন ভ্রান্ত ব্যক্তি মৃগতৃষ্ণিকা দর্শনে জলপানে প্রবৃত্ত হয় এবং পরে জলাভাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে, তা হলে সে নিশ্চয়ই পুনরায় জলপানে প্রবৃত্ত হবে না। একই ভাবে, বদ্ধজীব পূর্ব সংস্কারকে সত্য বলে ভ্রম করে' নানাবিধ সকাম কর্মে রত হন ; পরে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে সংসারের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করলে, তিনি পুনরায় কর্মে রত হন না। এরূপে, পূর্ণ ব্রহ্ম জীবন্মুক্ত অকর্তা।

(গীতা-ভাষ্য, ৫ ৯)

সেজন্যই শঙ্কর শ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত বা জ্ঞাননিষ্ঠ জীবন্মুক্ত "সাংখ্যদের" যে শরীরধারণাদি ব্যতীত আর অন্য কিছু কর্তব্যকর্ম নেই—সেকথা বারংবার বলেছেন। যেমন :

"শরীর-স্থিতি-কারণাতিরিক্তস্য কর্মণো নিবারণাৎ।"

"শরীর স্থিতি-মাত্র প্রযুক্তেষপি দর্শন শ্রবণাদি-কর্মসু

আর বাগান বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রিজার্ভ-করা বাস। ভূপালে পৌঁছেই সাঁচীর পথে পাড়ি জমাতে হ'ল। প্রায় ৪৮ মাইল। যত দূর দৃষ্টি যায় সোজা রাস্তা—দুপাশে গাছের সারি, কোথাও ফাঁকা মাঠ, কোথাও বা হরিৎ শস্যক্ষেত্র। দলের ছাত্রীরা-একতানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুরণন তোলে—বাধা নেই, শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, আছে অবিরাম গতির ছন্দে ছন্দে এগিয়ে চলার আনন্দ। দুরন্ত বেগে ছুটে চলে বাষ্পযান—পশ্চিমাচলে কে যেন সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে, সাঁঝের আকাশে তামসী রাত্রির হাতছানি। হঠাৎ সকলের চমক লাগিয়ে ডক্টর শাস্ত্রী বলে ওঠেন, 'ঐ রাইসিনা কোর্ট।' মারাঠা যুগের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। পাহাড় কেটে গড়ে তোলা আত্মরক্ষার দুর্গম স্থাপত্য।

ধীরে ধীরে বাস পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল। আঁধার রাতের সে চমক-লাগানো দৃশ্য অপূর্ব্ব। নীচে বহুদূরে সাঁচীর গ্রাম—পাহাড়ের ওপর বৌদ্ধস্তূপ। সন্ধ্যার পর কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এ স্তূপে যাওয়া নিষিদ্ধ। এর পাশেই এক বিহার গড়ে উঠেছে। তার অধ্যক্ষ ভিক্ষু বর্ণনা করলেন মঠের ইতিকথা, ডক্টর মিত্র নিয়ে চললেন আমাদের। তিনি একাধারে বহুমুখী দলটির ম্যানেজার ও গাইড। ঐতিহাসিক অঙ্কসগুলি তাঁর নখদর্পণে। সোপান-পংক্তি বেয়ে উঠে চললাম প্রধান স্তূপটির দিকে। মানস-পটে ভেসে উঠল অতীতের কত নীরব কীর্ত্তি-কাহিনী।

এমনি ভাবেই একদিন এসেছিলেন অশোক, সাম্য-মৈত্রীর বাণী নিয়ে ছুটে চলেছিলেন দিগ-দিগন্তরে। দৃষ্টি তাঁর অনন্তপ্রসারিত, প্রাণে অদম্য উৎসাহ। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণস্পন্দন জেগেছে। ভগবান্ বুদ্ধের দেহাবশিষ্ট ভস্ম নিয়ে তিনি চলেছেন দেশ হতে দেশান্তরে। আশা তাঁর, চুরাশি হাজার স্তূপ রচনা করবেন—শান্তি ও মৈত্রীর বাণী অখণ্ড ভারতের আকাশে-বাতাসে হবে প্রতিধ্বনিত। অবন্তী-বিদিশা তাঁকে জানাল সাদর আহ্বান। উজ্জয়িনী যাত্রাপথে বিদিশার বণিককন্যা 'দেবী' তাঁকে নিবেদন করলেন প্রাণমন। দয়িতের হৃদয়ে জাগল শিহরণ। মৈত্রীসাধনায় নিবেদিত প্রাণ অশোক তাঁকে আপন করে নিলেন। ধর্ম্মপত্নী 'দেবী'র সাহচর্য্য ও অনলস সাধনায় গড়ে উঠল রূপময় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন সাঁচী বৌদ্ধস্তূপ।

এর পরেও এই স্তূপ আহ্বান জানিয়েছে কতশত বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুনীকে। পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় এর ইতিহাস গড়ে উঠেছে তেরশ' বছর ধরে। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা পিতৃদেবের আদেশ মাথায় নিয়ে চলেছেন সিংহলে। পিতার অক্ষয়কীর্ত্তি দর্শন-মানসে এলেন এই পথে। এর পর শুঙ্গযুগে মহাকবি কালিদাসের অমর নায়ক অগ্নিমিত্র এই বিদিশায় গড়ে তুললেন তাঁর রাজধানী। শুঙ্গ গেল, অন্ধ্র এল। ভারত-শিল্পের সে এক সুবর্ণময় যুগ। স্তূপের চার-দিকে চারিটি তোরণদ্বার রচিত হ'ল। একাদশ-দ্বাদশ শতকের চারপাশে পাথরের বেড়ায় ঘিরে দেওয়া হ'ল। এর পরেই সাঁচী ডুবে গেল স্মৃতির অতলতলে। ভুলে গেল মানুষ অতীত ইতিহাসের এই সাক্ষীটিকে। বিদিশা ডুবল, ভীলশা উঠল। মধ্যযুগের বর্ব্বরতা থেকে রেহাই পেল এ। সত্যই নিয়তি একে বাঁচিয়েছে। অত্যাচারী বিধর্ম্মী খুঁজে পায় নি এর সন্ধান। ঘন বনানীর মাঝে আত্মগোপন করেছে এ প্রায় পাঁচ শ' বছর ধরে। এর পর ১৮১৮ সালের কথা। জেনারেল টেলর সাহেব আবিষ্কার করলেন একে। ১৮৫১ সালে সারিপুত্র ও মোগগলায়ন-এর অস্থি-ভস্মাবশেষ আবিষ্কার করলেন কানিংহাম সাহেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তূপ থেকে। মার্শাল সাহেবও এর অনেক সংস্কারসাধন করলেন। এমনি করে কতশত যুগ ধরে কত শিল্পীর প্রাণের স্পন্দন রূপ পেল এর মধ্যে। জাতকের, কাহিনীর রূপ দেখতে দেখতে সেদিন একথাই বার বার ভেসে উঠছিল মানসলোকে।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উজার করে ঢেলে দিয়েছে আপন সঞ্চয়। মায়াবিনী কুহকিনীর অঙ্গুলি হেলনে চলেছি আমরা। চকিতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালাম পশ্চিমের দ্বারপ্রান্তে, অমিতাভ বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে। ধ্যানী মূর্ত্তির প্রাণময় অভিব্যক্তি অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি—এই চার ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তি চারদিকে। যেদিকে তাকাই পুণ্যজীবনের সার্থক শিল্পায়ন—জন্ম, সম্বোধি, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ও মহাপরিনির্ব্বাণ। প্রদক্ষিণপথ বেয়ে নেমে এলাম যখন দেহ ভারাক্রান্ত, প্রাণে উজ্জ্বলতা। হেরম্বদা ডাকছেন এক-দিকে 'ধর্ম্মচক্র' দেখতে—শাস্ত্রীজীর কঠোর আহ্বান অন্যদিকে এখনই নেমে যেতে হবে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দেখে এলাম আসল অশোকচক্র—'সত্যমেব জয়তে' এর সার্থক প্রতিভূ।

অন্ধকার গ্রাম্যপথ বেয়ে বাস ছুটে চলল। রাত ন'টায় উজ্জয়িনীর পথে পাড়ি দিতে হবে। প্রায় মাঝপথে এসে বাস অচল হ'ল। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে রাস্তা। প্রায় চল্লিশ জন আমরা আটকে পড়লাম। এদিকে গাড়ীও সময়মত ছেড়ে দেবে। অগত্যা অনিশ্চয়তার মধ্যে ডুব দিতে হল। সকলেই আশঙ্কিত, সব চুপচাপ। এত সঙ্গীতমুখর আনন্দউজ্জ্বল পরিবেশ যেন নিমেষেই স্তম্ভিত হ'ল। একটা থমথমে আবহাওয়া। শাস্ত্রীজীর মুখে-চোখে গভীর আশঙ্কার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে একটা লরিকে থামিয়ে আমাদের উঠতে আদেশ দিলেন। বালি-ভর্ত্তি লরির উপরে গিয়ে কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে মুড়ি দিয়ে বসলাম আমরা। তরুণ থেকে বৃদ্ধ সকলেরই প্রাণে যেন অটুট দৃঢ়তার নিদর্শন। বিধাতা বোধ করি প্রসন্ন হলেন—গাড়ী ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে এসে ষ্টেশনে পৌঁছলাম।

যাত্রাপথের শেষ পর্ব্ব। ভূপাল থেকে উজ্জয়িনী। ক্ষীণ দীপালোকে পথ দেখে নি, দুপাশে গ্রাম। উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-শিখরে চলার-পথে বিরহীযক্ষের সহমর্ম্মী মেঘদূত যেখানে ঘনঘটায় বিদ্যুৎ-উৎসব করেছিল, বিরহিনী-চিত্তের হাহাকার যেদিন তাকে পাগলপারা করেছিল, যেখানকার বধূজনের দৃষ্টিতে ভাব নেই, বিলাস নেই, চাতুর্য্য নেই, বিভ্রম নেই আছে কেবল চকিত-চাহনী, 'প্রাণ-কেড়ে-নেওয়া প্রীতি আর চোখ-জুড়ানো মাধুরিমা,

সৌন্দর্য্যের আদি সৃষ্টি সেই অবন্তী-বিদিশার পথে মহাকবিকে স্মরণ করতে চলেছে ছোট্ট যাত্রীদল। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছলাম সেই উজ্জয়িনীর বিজন-প্রান্তে।

সপ্তাহব্যাপী কালিদাস সমারোহ উৎসব হবে আজ বাইশে নভেম্বর। কর্তৃপক্ষের কয়েকজন এসে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। মুহূর্তে আপন করে নিলেন তাঁরা। মালপত্র সব তুলবার ব্যবস্থা করে দিলেন। উৎসব প্রাঙ্গণের কাছে এক সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে আমাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হ'ল। সারা নগরীটাকে এমনভাবে প্রাণ দিয়ে সাজিয়েছে দেখলে চোখ জুড়োয়। প্রতিটি রাস্তায় মাঝে মাঝে সুদৃশ্য তোরণ। দেশ-বিদেশের অতিথিকে হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছে তারা। রাষ্ট্রপতি এলেন উৎসবের উদ্বোধন করতে। কয়েকদিনের জন্যে উচ্ছ্বাস গতিবেগ দেখা দিল উজ্জয়িনীর প্রাণ-প্রবাহে। উৎসব-মুখরিত প্রাঙ্গণে চলেছে সর্ব্বস্তরের রসিকজনের আনাগোনা। সুদৃশ্য মঞ্চ নির্ম্মিত হয়েছে মাধব কলেজের প্রাঙ্গণে। প্রায় দশ হাজার দর্শকের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছে একশ' টাকা থেকে দশ টাকা পর্য্যন্ত। প্রতিদিন সকালে বসতে শিপ্রাতীরে মহারাজা বিদ্যাভবনে মহাকবির সার্থক-সৃষ্টির রসমধুর আলোচনা। সর্ব্ব-প্রদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এসেছেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করছেন উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ সম্পূর্ণা-নন্দ। অন্য পথের পথিক হয়েও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি এমন অনুরাগ সত্যই বিরল। সংস্কৃত বেশ বলতেও পারেন। সভাস্থলে প্রবেশ করে মনে হ'ল যেন আন্তর্জাতিক মিলন-কেন্দ্রে মিলিত হয়েছি আমরা। ডক্টর রাঘবন, ডক্টর উপাধ্যায়, চীন, রাশিয়া, জার্ম্মানী থেকে প্রতিনিধি দল এসেছেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাকবির সৌন্দর্য্যবোধ নিয়ে আলোচনা করলেন। এক বক্তা কবির শকুন্তলা নাটকের মধ্যে খুঁজে পেলেন বেদান্তের ব্রহ্ম-চৈতন্যের সাক্ষাৎকার। তাঁর মতে এ নাটক নাকি ব্যষ্টি-চৈতন্য ও সমষ্টি-চৈতন্যের সম্মেলনের প্রতিভূ। বিদগ্ধমণ্ডলীর মাঝে আছেন ওঁকারনাথ ঠাকুর, ডক্টর লাহিড়ী, অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য ও নানান্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, উৎসাহী তরুণ গবেষক। মহাকবির কবিকৃতির উপর এমন প্রাণময় আলোচনা অনেক তথ-কথিত 'কনফারেন্সে'-এও চোখে পড়ে না। ডক্টর শাস্ত্রী মেঘদূতের কবিদৃষ্টির উপর নূতন আলোকপাত করলেন। কবির অসীম সৃষ্টি-নৈপুণ্য এক নূতন রূপে ধরা দিল সহৃদয় সমাজের কাছে। শিপ্রা-তটের সভা ভাঙল, জীবন-তরী বয়ে চলল আবার 'মন্দাক্রান্তা'-তালে'।

ত্বরা নেই, শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই—চলেছি শিপ্রানদী-তীরে। টাঙ্গা থেকে নেমে প্রায় আধ মাইল শিপ্রার মজাগর্ভ পার হয়ে এগিয়ে চলি। এই মজাগর্ভের তটে এখন মহাকালের মন্দির। শিপ্রা বিশীর্ণা, উজ্জয়িনীকে তিন দিকে ঘিরে রেখেছে। কতবার এ গতি বদলেছে। শিপ্রাতীরে স্নানঘাট দুটি, রামঘাট ও নরসিংহ ঘাট। মহারাজা রামচন্দ্রের নির্ম্মিত রামঘাট। সেকথা ভুলেছে পুণ্যলোভী তীর্থযাত্রী। গড়েছে নূতন কাহিনী। জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র নাকি এ ঘাটে স্নান করেছিলেন, মন্দির ও মূর্ত্তি গড়ে উঠেছে শ্রীরামচন্দ্রের। উজ্জয়িনীর বিজন-প্রান্তে মন যেতে চায়। এ কোলাহলের মাঝে শিপ্রাকে আপন করে পাওয়া সম্ভব নয়। নির্জ্জন ঘাটের অশথ তাল-তমাল বন পার হয়ে চলতে লাগলাম আমরা কয়েকজন—চন্দ্রকান্তবাবু, অশোক, ধ্যানেশ, শক্তি, নিধুদা, রবিদা, বিমল ও ভজন। কবির সেই 'মঞ্জরিত কুঞ্জবনে' চোখে পড়ে শিখীর দল। শান্ত সমাহিত আশ্রম প্রান্তে এসে অনন্তপ্রবাহিনী শিপ্রায় ডুব দিলাম। এ শিপ্রায় আর ফুটন্ত পদ্মের সৌরভ নেই, সারসকূজনের অব্যক্ত মধুর ধ্বনি নেই, কিন্তু শিপ্রা আছে, আছে তার উচ্ছলগতির নিরন্তর ছন্দ।

মঙ্গলনাথ

কিন্তু কোথায় সেই বিশালা উজ্জয়িনী! কোথায় উদয়ন-কথায় আত্মহারা গ্রামবৃদ্ধের স্থবির গুঞ্জন, কোথায় সেই 'নিপুণিকা চতুরিকা মালবিকার দল'। মহাকালের সোনার তরী বেয়ে আজিকালের উজ্জয়িনী ভগ্নস্তূপের মধ্যে পড়ে গুমরে মরছে। তার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অভিশাপ আছে, হাহাকার আছে, রুদ্ধকণ্ঠের বাণীতে আছে করুণ মিনতি। চায় সে আবার আত্মপ্রকাশ। বিংশ শতকের সন্ধানীর চোখে তাই সে লেপন করে মায়াঞ্জন।

বর্ত্তমান উজ্জয়িনী থেকে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সেই কবির কালের স্বপনপুরীর সাক্ষী। প্রায় দেড় বর্গমাইল এলাকা সুউচ্চ। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মীবৃন্দের সন্ধানী দৃষ্টিতে সে ধরা পড়েছে। তিন জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে খননকার্য্য শুরু হয়েছে শিপ্রাতটে। অনুসন্ধান কার্য্য চালাচ্ছেন শ্রী ব্যানার্জ্জী ও তাঁর অন্যতম সহকর্ম্মী 'কৃষ্ণমূর্ত্তি', বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদেরই সহাধ্যায়ী "বিট্টু"। এতদিন পরে দেখা, উৎসাহ নিয়ে

একে একে সব দেখিয়ে যেতে লাগল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পাঁচ শতক থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সভ্যতার নানান্ নিদর্শন মিলেছে। প্রায় যাট ফুট নীচে গুপ্তযুগের ইঁটের সন্ধান পেয়েছে। ওপর থেকে দেখলেও তিনটি স্তরের সভ্যতার নজির মেলে। মুসলমান যুগের জীর্ণ মসজিদের অংশাবশেষও রয়েছে এপাশে-ওপাশে। কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে, উজ্জয়িনী নামাঙ্কিত। আর অসংখ্য হার, মণি, শঙ্খশুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে অনেক অর্দ্ধ-সমাপ্তও আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এরই বর্ণনা নাকি মহাকবি দিয়েছেন 'তারাস্তারাস্তরলগুটিকান্' ইত্যাদি শ্লোকে। যাই হোক, কালিদাস সম্বন্ধে ইতিহাস আজও নীরব। তাঁর সম্বন্ধে উজ্জয়িনীতে পাথরে প্রমাণ আজও মেলে নি—পণ্ডিতের বিবাদও থামে নি।

উজ্জয়িনী ষ্টেশন
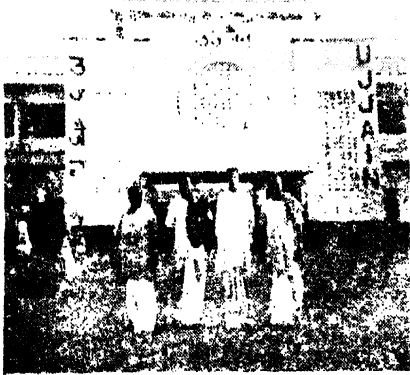
কাছেই ভর্তৃহরি "গুম্ফা"। অবন্তীর রাজা ভর্তৃহরি, রাজধানী তাঁর উজ্জয়িনী। প্রবাদ আছে, তিনি ছিলেন বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক নিঠুর কাহিনী। এক ব্রাহ্মণ একটি ফল উপহার দিলেন ভর্তৃহরিকে। রাজা প্রিয়তমা পত্নীকে সেই ফলটি দিলেন। কিন্তু রাণী আবার সেই ফলটি উপহার দিলেন তাঁর প্রণয়ীকে। এই সংবাদে ভর্তৃহরি সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন, রম্যা নগরীর সকল সুখসম্পদ অকাতরে বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন, আশ্রয় নিলেন এই গুহায়। 'বৈরাগ্যশতক' রচিত হ'ল। প্রদীপ জ্বালিয়ে পাণ্ডাজী নিয়ে চলেছেন আমাদের সঙ্কীর্ণ গুহার মধ্যে ভর্তৃহরির সাধনকেন্দ্রে। ধীরে ধীরে নামছি সিঁড়ি বেয়ে, বেশ খানিকটা নীচে নামবার পর স্বল্প-পরিসর গৃহে ভর্তৃহরির প্রস্তর-মূর্ত্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। গুহায় নামবার আর একটি পথ ছিল। পাণ্ডা বলেন, সে পথটি নাকি শিপ্রার গর্ভ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। সরকার সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। দেখলে মনে হয় স্বাভাবিক গুহা এ নয়। পাথরের পর পাথর বসিয়ে মাটির নীচে নির্ম্মিত এক গৃহই আজ গুহা নামে চলে আসছে। শিপ্রার বিজন তীরে রচিত এ গুহা আজও কঠোর তপস্যার ইঙ্গিত দেয়। নিরাসক্ত যোগীবরের সাধনভূমিতে প্রণাম জানিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

সন্ধ্যায় আবার মাধব মহাবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে। সুসজ্জিত মণ্ডপে রাষ্ট্রপতি ও মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর কাটজু এসে পৌঁছলেন। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বেতার ও তথ্যমন্ত্রী ডাঃ কেশকার, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, পতঞ্জলি শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বজ্জন। ডক্টর শাস্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উজ্জয়িনীর পৌরজনকে অভিনন্দন জানালেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুসারে আদর্শ রূপক প্রযোজনা করতে সমর্থ হবেন এ আশ্বাস পেল দর্শকমণ্ডলী। পরিপূর্ণ মণ্ডপে অগণিত সহৃদয়ের চিত্ত জয় করলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোষ্ঠী। স্থানীয় সংবাদ-পত্র 'মধ্যপ্রদেশ ক্রনিকল' ও 'নয়া দুনিয়া'তে এ সংবাদ পরিবেশিত হ'ল। বাঙালীর উচ্চারণ সম্বন্ধে দুর্নাম বোধ করি এতদিনে ঘুচল। প্রথম দিনে গোয়ালিয়র ললিতকলাকেন্দ্রের সভ্যবৃন্দ ঋতুসংহার নৃত্যনাট্য পরিবেশন করলেন। প্রতিটি ঋতুর স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে এমন নৃত্যের মাঝে রূপ দেবার প্রচেষ্টা তাঁদের সার্থক হয়েছে। বর্ষায় 'শিখি-নৃত্য' সত্যই অনুকরণীয়, উচ্ছেং-ভঙ্গিমা বড় মধুর। 'শকুন্তলা' নাটকের অনুষ্ঠানেও ডক্টর গোবিন্দগোপাল ও মাধুরী দেবী তাঁদের অনুপম কণ্ঠে যে সুরের অনুরণন তুলেছিলেন, শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার প্রারম্ভে 'যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি'... শ্লোকটির পরিবেশনে যে করুণ রসের ধারা প্রবাহিত করেছিলেন তা' যেন আজও কানে বাজে। তাঁর মহাকালের স্তোত্র-আবৃত্তি যেন যক্ষদূতের সেই মেঘমন্দ্র ধ্বনি। মন যেন চলে যায় সুদূর স্বপ্ন-লোকে—যেখানে দুঃখ নেই, বিয়োগ নেই, ব্যথা নেই আছে কেবল শাশ্বত আনন্দানুভূতি।

উৎসব প্রাঙ্গণের একদিকে মেঘদূত চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। ইন্দোর, ভূপাল, লক্ষ্ণৌ, শান্তিনিকেতন থেকে রূপদক্ষ যোগ দিয়েছেন এতে। মেঘদূতের প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত শ্লোকের এমন চিত্ররূপায়ণ সত্যই অপূর্ব্ব। আষাঢ়ের প্রথমদিবসে বিরহী যক্ষের মেঘদর্শন থেকে সুরু করে অলকায় সজল-নয়না বিরহিনীর রূপ বর্ণনা পর্যন্ত সবই এ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-শিখরে মেঘের ঘনঘটায় বিদ্যুৎ-উৎসব, অভিসার পথে অভিসারিকার চকিত-চাহনি, অথবা "কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে, বিরহিনী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে, সৌন্দর্য্যের আদি সৃষ্টি"...। মুক্ত বাতায়ন হতে মেঘ দেখছে—বিরহিনী মলিন বসনে রুদ্ধদ্বার-কক্ষে বীণা বাদনরতা, কণ্ঠে তার মহাজন সঙ্গীত—বীণার তারে ঝঙ্কার উঠল, অমনি চোখে জল, সে জলে সিক্ত হ'ল বীণার তন্ত্রী, যক্ষপ্রিয়া ভুলে গেল সুরের মূর্চ্ছনা—এরই চিত্ররূপটি প্রদর্শনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এ ছাড়া শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশীর নাটকের

কয়েকটি দৃশ্যের চিত্রও প্রদর্শনী স্থানে পেয়েছে। রাশিয়া এবং জার্মানীতে শকুন্তলা নাটক অভিনয়ের আলোকচিত্রও সংগৃহীত হয়েছে। মহাকবির বিভিন্ন গ্রন্থের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিও প্রদর্শিত হয়েছে এতে। সন্ধ্যায় আবার অনুষ্ঠান, ফিরে এলাম সভা-মণ্ডপে।

একুশে নবেম্বর সন্ধ্যায় মধ্যপ্রদেশের খয়রাগড় সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কুমারসম্ভবের সঙ্গীতরূপ দান করলেন। পরে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে ইন্দোর কলাকেন্দ্র নিবেদন করল শকুন্তলা গীতিনাট্য, 'আর্টিষ্ট কম্বাইন' গোয়ালিয়র অভিনয় করল মহাকবির 'বিক্রমোর্বশীয়ম্', ডক্টর রাঘবনের পরিচালনায় মাদ্রাজ নাট্যসঙ্ঘ, কর্তৃক পরিবেশিত হ'ল 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'; ডঃ চৌধুরীর সংস্কৃত সঙ্গীতানুষ্ঠান হল, 'কুমারসম্ভব' নৃত্যে রূপায়িত করল দিল্লীর ভারতীয় কলাকেন্দ্র। এই দীর্ঘায়িত অনুষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধান করলেন মধ্যপ্রদেশ কলাপরিষদের কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানের শেষে ফিরছি। পথের মাঝে সুদৃশ্য তোরণ—একপাশে মহাকবি, অন্যদিকে রাজা বিক্রমের চিত্ররূপ। প্রোজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রয়েছে—"বাসন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপৎ সর্বঞ্চ তদেকীয়নঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি। বাংলারই স্বভাবকবি তারাকুমার কবিরত্নের রচিত। এটি গেটের বিখ্যাত উক্তির সংস্কৃত অনুবাদ। মনটা ভরে উঠল—বাঙালীকে ওরা এখনও ভোলে নি।

উজ্জয়িনীর কাছ থেকে বিদায় নিতে চলে'ছি মহাকালের মন্দির-প্রান্তে। অবন্তী-বিদিশার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মহাকবির বড় সাধের মহাকাল। বিরহ-বিধুর যক্ষ দুশ' পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে ফিরিয়েছে মেঘকে—এ মন্দিরে প্রণাম জানাতে হবে, সন্ধ্যারতির দামামা বাজাবে সে—মন্দ্রমধুর গর্জ্জন তার সার্থক হবে। মহাকাল দর্শন এ যে জীবনের পরম সঞ্চয়। নিথর পুরী—পাণ্ডার পীড়ন নেই। মাঝে মাঝে দু-একটি পুণ্যার্থীর আনাগোনা—সন্ধ্যারতির মন্দমধুর একটানা সুর—স্তোত্রপাঠের মৃদুগম্ভীর ধ্বনি—গর্ভগৃহ থেকে ওঠে সে প্রচণ্ড বেগে, ছড়িয়ে পড়ে মহাকাল মন্দিরের চত্বরে চত্বরে, উজ্জয়িনীর আকাশে-বাতাসে তোলে অনুরণন, ওপারে নৃত্যচপলা শিপ্রা বয়ে চলে আপন মনে। আরতি প্রদীপ নিভে যায়, যাত্রী ফিরে চলে আপন ঘরের টানে।

বন্ধঘরে

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

চুপচাপ আছি বন্ধঘরে।
এখানে আলোর সাড়া জাগে না মর্মরে।
দেয়ালের ইটে আঁকা মৃত্যু-পাণ্ডুরতা
ঘিরে থাকে শব্দহীন অরণ্য-স্তব্ধতা।
সংকীর্ণ আকাশ
ঘুলঘুলি-পথে শুধু আনাগোনা করে—
লেখে না রক্তিম ইতিহাস।

অগাধ জীবন আছে
বন্ধঘর পরিধির শেষে,
নতুন হলুদে-চাঁদ আবেগে আশ্লেষে
যে-পৃথ্বীর মাটিকে জড়ায়,
উষ্ণতা ছড়িয়ে রাখে দক্ষিণ হাওয়ায়,—
সেইখানে মুক্তখোলা মাঠে
শূন্য মন শুধু যেতে চায়।
হয় ত সেখানে ফুল মেলে' আছে সৌরভ-হৃদয়,
একেকটি ঊর্ণ খুলে উজ্জীবিত বৃক্ষের বিস্ময়
অরণ্যে ও মাঠে।
কিছুই আভাস তার জানবার নয়—
এখানে মুহূর্তগুলি ম্রিয়মান কাটে।
স্বেদবিন্দু জমে থাকে শরীরে-ললাটে
কুজ্ঝটিকাময়
বন্ধঘরখানি এই—তার পরিচয়।

দিন যায় শূন্য বন্ধঘরে।
শিস দিয়ে যায় পাখি উন্মুক্ত প্রান্তরে।
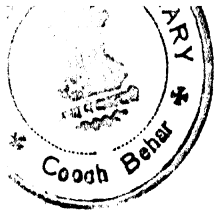
সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

ব্রজেশ্বরবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, পানতুয়া বিক্রেতারা হঠাৎ ডুমুর ফুল হয়ে উঠল যেন, একটাকেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত কয়েকবারই ঘুরে এলেন, ওদিকটা দেখা হয় নি। দ্রুত চললেন তাঁর হস্তীতুল্য দেহটি নিয়ে।

মাধবী তৃতীয় শ্রেণীর বগীতে বসে, ষ্টেশনে গাড়ীটা থামতেই নজর পড়ল ব্রজেশ্বরবাবুর ওপর—আরামবাগের দাদাবাবু না? হাঁ্যা, তাই ত মনে হচ্ছে। আবার সামনে দিয়ে চলে গেলেন তিনি। খুব নিরীক্ষণ করে দেখল মাধবী—আর সন্দেহ নেই তার—আরামবাগের দাদাবাবুই, সেই লম্বাচওড়া কালো রঙের চেহারা। বদলেছে অনেক, প্রায়, বুড়ো হয়ে গেছেন, মোটা হয়েছেন খুব, মাথার চুলগুলো উঠে গেছে। তা হোক, আরামবাগের দাদাবাবুকে চিনতে মাধবীর দেরী হ'ল না। ট্রেন থেকে নামল মাধবী—একবার প্রণাম করতে হবে, কতদিন দেখা হয় নি।

ব্রজেশ্বরবাবু ফিরে আসছিলেন, হঠাৎ পায়ের ওপর মাধবী উপুড় হয়ে প্রণাম করল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, বললেন, কে?

আমি মাধু।

মাধু? অবাক হলেন ব্রজেশ্বরবাবু, মাধু বলে কোন স্ত্রীলোককে তিনি চেনেন না ত।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল মাধবী, আমায় চিনতে পারলেন না দাদাবাবু?

হাঁ্যা, না, ইয়ে—ঠিক মনে করতে পারছি না ত—

আরামবাগের কথা সব ভুলে গেছেন? আমার মা আপনাদের বাড়ী রান্না করত।

বিস্মৃতির অতলগহ্বরে ব্রজেশ্বরবাবু ডুব দিলেন—হাঁ্যা, একটা শুঁটকে মেয়ে মাথায় উকুন আর ময়লা কাপড় নিয়ে, ছেঁড়া ফ্রক্‌ পরে বাইরের দাওয়াতে বসে থাকত, এই সেই নাকি?

তুমি মাধু?

হাঁ্যা দাদাবাবু, আমিই মাধু। আবার প্রণাম করলে মাধবী—আপনার দয়া কোনদিনই ভুলব না। আমার মায়ের অসুখের সময় আপনি কত করেছেন। আর আপনি না দেখলে ত আমি মরেই যেতাম।

এত উপকার যে ব্রজেশ্বরবাবু করতে পারেন সেকথা তাঁর নিজেরই বিশ্বাস হয় না।—কোথায় যাচ্ছ? বললেন তিনি।

স্বামিজীর সঙ্গে যাচ্ছি।

মাধবীর নাকের তিলকের ওপর নজর পড়ল ব্রজেশ্বরবাবুর—স্বামিজী?

হাঁ্যা, হুগলীর স্বামী স্বরূপানন্দ।

হুগলীর?

কৌতূহল হ'ল ব্রজেশ্বরবাবুর, নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

ওখানে কতদিন আছ?

তা প্রায় তিন মাস হ'ল।

আমিও ত স্বামীজিকে খুঁজছি?

কেন? মন্ত্র নেবেন বুঝি?

না, দেখার ইচ্ছে আছে?

দেখার কিছু নেই।

কেন বল ত?

দাদাবাবুকে সব বলে দেবে, দাদাবাবুর চেয়ে আপনার আর কে আছে পৃথিবীতে? স্বামিজী, দত্তবাড়ীর বাবু, সেন সাহেব সবাই এক, সাজসজ্জায় শুধু তফাৎ। কেবল দাদাবাবুই যা মানুষ—মাধবীর কৈশোরের স্বপ্ন।

ব্রজেশ্বরবাবুর মুখের দিকে তাকাল মাধবী, স্বপ্নের সঙ্গে অবশ্য কোন মিল লক্ষ্য করল না ব্রজেশ্বরবাবুর চেহারায়। তবুও সাহস পেল মাধবী, হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে এল যেন।

বললে, আপনি মানুষ নয় দাদাবাবু, দেবতা, আপনাকে সব বলব। থেমে উচ্চারণ করল মাধবী।

বল। ব্রজেশ্বরবাবু তাকালেন মাধবীর দিকে।

স্বামিজী লোক ভাল নয়।

কেন?

একটা মাড়োয়ারীর অনেক টাকা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে আর আমাকেও নিয়ে যাচ্ছে সেইসঙ্গে। আনুপূর্ব্বিক ঘটনার একটা বিবৃতি দিল মাধবী।

তুমি কাউকে বলনি কেন?

কাকে বলব দাদাবাবু? আর যদি জানতে পারে তা

হ'লেও আমায় শেষ করে দেবে। পাংশুমুখে জবাব দিলে মাধবী।

কোন্ গাড়ীতে আছে সে ?

ওই যে আগের কামরায়। একটা কামরার দিকে দেখিয়ে দিলে সে, তার পর আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমি কি করব দাদাবাবু ?

তুমি যাও, গিয়ে গাড়ীতে বস, পরের ষ্টেশনে আমি দেখা করব আবার। হ্যাঁ, আর একটা কথা—স্বামিজীর ডান চোখের তলায় একটা কাটা দাগ আছে ? প্রশ্ন করলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

হ্যাঁ আছে, লম্বা একটা কাটা দাগ। কেন দাদাবাবু ? স্বামিজীকে নিশ্চয় চেনেন দাদাবাবু, ভাবছে মাধবী।

ঠিক আছে, তুমি গাড়ীতে বস। কারণটা বলার মত সময় নেই ব্রজেশ্বরবাবুর।

এগিয়ে গেলেন তিনি নির্দ্দিষ্ট কামরাটির দিকে, ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন স্বামিজীকে—হ্যাঁ, ঠিক তাই। বরাত তাঁর ভালই বলতে হয়—একসঙ্গে দুজনকে পাওয়া যাবে। হুগলী থেকে কয়েক সপ্তাহ আগেই স্বামিজীর খবরটা পেয়েছিলেন তিনি। কদবার নামুভুরও এত দিনে সন্ধান মিলল।

ষ্টেশনের ঘণ্টা বেজে উঠল। এবার ট্রেন ছাড়বে, পা চালিয়ে চললেন তিনি। মাধবী মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। ব্রজেশ্বরবাবুর পানতুয়া কেনা হ'ল না। মাধবীর শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টির সামনে পানতুয়া কেনাটা খুব শোভন হবে বলে মনে হ'ল না। ব্রজেশ্বরবাবু নায়কোচিত ভঙ্গীতে লাফিয়ে উঠে পড়লেন নিজের কামরায়।

ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই ধীরেন ভড়ও ব্যস্ত হয়ে উঠল। পাশের তৃতীয় শ্রেণীতে রবীন সরকার বসে আছে—কর্ত্তার হুকুম হয়েছে তাকে ডাকতে হবে। লাল হরিণমার্কা জামার ওপর নীল রঙের একটা কোট চাপিয়ে নিলে ধীরেন ভড়। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, ভেতরে অপর্ণার তৈরি স্লিপ ওভারটা আছে, গরম গেঞ্জীও একটা আছে বটে, তবুও শীত করছে বেশ। রবীনের থার্ড ক্লাসের কামরাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ধীরেন ভড়।

ওহে, কর্ত্তা তোমায় ডাকছেন—

আমাকে ? আশ্চর্য্য হ'ল রবীন, তাকে কেন ?

হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে গাড়ীতে থাকতে হবে—মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের কি সব কথা আছে যেন—

কিন্তু আমার থার্ড ক্লাসের টিকিট যে। আপত্তি জানায় রবীন।

তার জন্যে চিন্তা নেই, সে ব্যবস্থা করা যাবে। রবীন সরকারকে একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে দিয়ে ধীরেন ভড় বাকি টাকাটা পকেটস্থ করেছিল এবার সেটাকে উদ্‌গীরণ করতে হবে ভেবে ক্ষুণ্ণ হ'ল সে।

নিয়ে এস—এই কুলী। ডাকল ধীরেন ভড়।

রবীন সরকার মালপত্র নিয়ে নামুভাই দেশাইয়ের গাড়ীতে এসে উঠল।

এই যে রবীনবাবু, বসুন। অভ্যর্থনা করলেন নামুভাই। মাঝের বেঞ্চিতে বসল রবীন।

হরবংশ কোম্পানীতে খবর দিয়েছেন ?

হ্যাঁ, কাল টেলিগ্রাম করেছি।

মালের অর্ডার কি রকম পাওয়া যাবে বলে মনে হয় ?

'কমভিটোলিনে'র অর্ডার কিছু পাওয়া যাবে বোধ হয়।

গত মাসে বিক্রী ত ভাল হয় নি। রবীনের দিকে তাকালেন নামুভাই।

এখন বাজার মন্দা, তা ছাড়া কমপিটিসান বেড়ে গেছে, আর ওই একই ধরনের ওষুধ চালান মুশকিল।

রোজ কি নতুন নতুন ওষুধ বার করতে হবে নাকি ? নামুভাই বিরক্ত হলেন। ধীরেন ভড় রবীনের নির্বুদ্ধিতা দেখে খুশী হ'ল যেন।

তা বলছি না, তবে একটু পালটাতে হবে। উত্তর দিল রবীন।

তার মানে, খুলে বলুন।

আমার সাজেসান হচ্ছে, কমভিটোলিনের সঙ্গে কয়েকটা ওষুধ মিলিয়ে আরও দু'একটা ভ্যারাইটি করতে হবে, যেমন ধরুন কমভিটোলিন উইথ ডায়াসটেস, কমভিটোলিন উইথ ফলিক এ্যাসিড এণ্ড আয়রন, কমভিটোলিন উইথ কোলা কোলা—এই রকম আর কি। লোকে একটা না নিলে আর একটা দেওয়া চলবে—ডাক্তারবাবুরাও ইম্প্রেসড হবেন; তা ছাড়া 'লিটারেচার'গুলোও ভাল করে ছাপানো দরকার। বাজে ছবি দিয়ে সস্তায় ওগুলো ছাপান হলে কোম্পানীর সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা হয়ে যায়।

হুঃ, খরচ বাড়বে না ? স্ফীত চিবুকের ওপর কয়েকবার হাতের তালুটা ঘষলেন তিনি।

না, খরচ আর এমন কি হবে, লেবেলগুলোও পালটাতে হবে ঐ সঙ্গে, আর খরচ যা হবে সামান্যই, তার বদলে বিজনেস পাওয়া যাবে ভালই।

ভ্রুকুটি করে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইলেন নামুভাই দেশাই। ধীরেন ভড় আশা করছে, রবীন সরকারের এবার দফা শেষ হবে, ধমক খেল বুঝি।

আপনার এ সাজেসান আগে দেন নি কেন? বললেন নানুভাই। চুপ করে রইল রবীন সরকার।

সামনের মাস থেকে কোম্পানীটাকে রিঅরগ্যানাইজ করুন। সেলস ম্যানেজার আমাদের ছিল না, ওটার দরকার। আপনি কত মাইনে পাচ্ছেন এখন? একটু চিন্তা করে প্রশ্ন করেন নানুভাই।

একশ' পঁচাত্তর টাকা। মৃদুস্বরে উত্তর দিলে রবীন।

সামনের মাস থেকে চারশ' পঞ্চাশ টাকা আর টি-এ পাবেন, কোন অসুবিধা হবে না?

না। ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেল রবীন। কারণ সংবাদটা হঠাৎ তাঁকে বিমূঢ় আর স্তম্ভিত করে দিয়েছে যেন।

ধীরেন ভড়ও হকচকিয়ে গিয়েছে, ভুল শুনছে না ত! কি আশ্চর্য্য, রবীন সরকারও তাকে ছাপিয়ে ওপরে উঠে গেল? ঈর্ষায়, কশাঘাতে মুখটা ছোট হয়ে গেল ধীরেন ভড়ের।

রবীন সরকার আশা করে নি যে, এভাবে ট্রেনের কামরায় তার পদোন্নতির খবরটা পাবে। তখনও যেন খবরটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

মীরার কথাই আগে মনে পড়ে গেল। খবরটা শুনে মীরা কি করবে? খুব শক্ত মেয়ে মীরা, নিজেকে ঠিক সামলে নেবে। মীরার সুন্দর মুখটা তার কোলের সামনে ভেসে উঠল—মাঝারি ধরনের চেহারা মীরার, তার মত দীর্ঘাকৃতি লোকের পাশে যেন ছোট দেখায়।

মীরার মুখটা কিন্তু সুন্দর, একটু গোল ভাব, চোখ দুটো বড় বড়, মুখটি ঘিরে যেন লাবণ্য ছড়িয়ে আছে। বয়সের তুলনায় ছোট মনে হয় তাকে, কে বলবে তার মিণ্টুর মত মেয়ে আছে? শুভ সংবাদটা সে নিজেই মীরাকে দেবে, টেলিগ্রাম করার কোন দরকার নেই। মীরার মুখটা খবর পেয়ে যে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, সেটা দেখার লোভ আছে রবীন সরকারের। পাশ থেকে মীরাকে আরও সুন্দর দেখায়। একটা ছবি মনে পড়ে গেল তার।

একদিন স্নান করার পর মীরা বসে বসে সেলাই করছে। ভিজে চুলগুলো সারা পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে ময়ূরের পেখমের মত। কপালের পাশে একগুচ্ছ চুল এসে পড়েছে, সবেমাত্র সিঁদুর পরেছে মীরা। স্নান করার পর মীরা সিঁদুর পরে। মাথার সীঁথিতে চিরুনি দিয়ে সোজা একটা রেখা টানে, তার পর দেয় কপালে একটা ছোট্ট টিপ, পরে সেই আঙুলটা বাঁ হাতের শাঁখার ওপর ছুঁইয়ে নেয়, কেন তা কে জানে? খুব ভাল লেগেছিল রবীনের। মীরার সজ্জা, বসবার মনোহর ভঙ্গীটা, তার তন্ময়তা, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল সে, চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না, হঠাৎ মীরা নিজেই চোখ তুললে। রবীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল তখনও। হাসল মীরা, বলল, কি দেখছ?

তোমায়?

সে ত অনেক দেখেছ।

হ্যাঁ, তা দেখেছি। তবে আজ যেন তোমায় নতুন করে দেখলাম।

নতুন করে? মীরার মুখে হাসি।

হ্যাঁ, মীরা, তোমার এক-একটা রূপ আমার কাছে নতুন করে যেন ধরা দেয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

এখনও পুরনো হয় নি? মীরার চোখে কৌতুক।

না মীরা, তুমি আমার কাছে চিরদিনই নতুন। এগিয়ে গেল রবীন, মীরার পাশে বসে কাঁধে একটা হাত রাখল তার।

কি মতলব বল ত? এখনই মিণ্টু এসে পড়বে। আড়-চোখে মীরা তাকাল।

না, বাইরে খেলা করছে আমি দেখে এসেছি, কি সুন্দর মুখটা তোমার মীরা। বশীভূত হ'ল রবীন।

বাবু! রূপকথার দৈত্যের মত মিণ্টু ঠিক সময়েই হাজির হয়, একটুও ভুল হয় না।

কি হয়েছে ত বলিনি আমি? মীরা হাসিমুখে তাকায় রবীনের দিকে।

মীরার কাঁধের থেকে হাতটা সরিয়ে নিলে রবীন।

মিণ্টু!

অ্যাঁ।

তুমি খেলছিলে না?

হ্যাঁ বাবু।

খেলা হয়ে গেল? আকস্মিক এই স্বল্পক্ষণ স্থায়ী খেলাটা বন্ধ করার কারণ খুঁজে পায় না রবীন।

আর কি করে খেলব? মিণ্টু তাকাল বাবুর দিকে।

কেন বল ত, কি হয়েছে?

ঘোড়াটার অসুখ করেছে?

ঘোড়ার অসুখ করেছে?

হ্যাঁ, তুমি যে আমায় কাঠের ঘোড়াটা দিয়েছিলে, সেইটার।

কি হ'ল? ঘোড়া সম্বন্ধে রবীনের ধারণা পালটে গেল, এমন অভাবনীয় ভাবে যে জীবের শরীর খারাপ হয় তার সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

ওই ত বললাম, অসুখ।

কি অসুখ বল ত? শিষ্টাচার প্রণোদিত হয়েই প্রশ্নটা

করল রবীন। রোগ সম্বন্ধে তার জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ, ঘোড়ার রোগের ত কথাই নেই।

তা আমি কি করে বলব, তুমি জান—

আমি ?

হ্যাঁ, তোমার ব্যাগে ত অনেক ওষুধ আছে। রবীনের ব্যাগে যে ওষুধ থাকে সে সংবাদ মিণ্টু রাখে আর যে সঙ্গে অত ওষুধ রাখে—রোগ সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু তার জ্ঞান থাকা উচিত বৈকি!

কি হয়েছে বল। জ্ঞানপক্ব অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ভঙ্গীটা নকল করল রবীন।

গায়ের রং উঠে গেছে ঘোড়াটার। দুঃখের সঙ্গে বললে মিণ্টু, রাণীরমা গায়ে জল ঢেলে দিয়েছিল কিনা তাই। কথাটা আর শেষ করলে না সে।

তাই ত। রবীন চিন্তিত হ'ল, ঘোড়ার রং? আধুনিকাদের রং সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা সর্ব্বজনবিদিত, সুতরাং ঘোড়াই বা দোষ করলে কি?

আমি কিন্তু ঠিক করেছি। বললে মিণ্টু।

করেছ ?

হ্যাঁ।

পরে ঘোড়ার ওপর প্রাথমিক চিকিৎসার নমুনাটা দেখেছিল রবীন—মায়ের সিঁদুর তেলে গুলে একটা নতুন ঘোড়ার সৃষ্টি করেছিল মিণ্টু।

টপ ল্যাটরিনের দরজাটা সজোরে বন্ধ করলেন নানুভাই দেশাই। ডায়াবিটিসে ভুগছেন তিনি। আহাম্মক ডাক্তারগুলো শুধু খাওয়া বন্ধ করতে বলে! মিঠাই খাবে না, পাকোড়া মানা, আলু খাওয়া চলবে না, ভাত খাবে না—তবে খাবে কি? সুতরাং নানুভাই দেশাই ঘন ঘন ল্যাটরিনে যান। নানুভাইয়ের অনুপস্থিতিতে ধীরেন ভড় রবীনের কাছে এগিয়ে এল। ফিল্ম লাইনে থেকে রাজনীতিজ্ঞান ধীরেন ভড়ের তীক্ষ্ণ হয়েছে।

যাক, শেষ পর্য্যন্ত কথাটা রাখল তা হলে। অন্তরঙ্গভাবে ফিসফিস করে বললে ধীরেন ভড়।

কি কথা?

রোজই ত কর্ত্তাকে বলি তোমার কথা। মুখে তার আত্মীয়সুলভ একটা ভাব ফুটে উঠল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আমাদের মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টে সেলস ম্যানেজার নেই, রবীনকে এ্যাপয়েণ্ট করুন, একথা প্রায় বলি, জান ত, আমার কথা কর্ত্তা বড় একটা ঠেলতে পারে না।

মনে মনে কৃতজ্ঞ হ'ল রবীন, সত্যি আজকাল এ ধরনের লোক হয় না, পরের জন্যে কে এত করে?

খাওয়াটা পাওনা রইল ভাই। বন্ধুত্বের দাবীটা পেশ করে রাখল সে।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

ভাল করে খাওয়াতে হবে ধীরেন ভড়কে—ভাবছে রবীন। কিন্তু তার আগে বাসাটা বদলান দরকার। উত্তর পাড়ায় আর থাকা সম্ভব নয়। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট নেবে সে। দক্ষিণ কলকাতার দিকে, উত্তর কলকাতা তার পছন্দ নয়, মধ্য কলকাতা খুব ঘিঞ্জি, ভাবতেই পুলকিত হ'ল রবীন। এত ভীড়ের মধ্যে থাকতে পারবে না সে, মীরারও কষ্ট হবে। একটা ছোট্ট গাড়ীরও দরকার, মাইনে যখন বাড়ছে, তা ছাড়া ট্রাভেলিং এলাউন্স যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন গাড়ী রাখতে অসুবিধা হবে না খুব। মিণ্টুকে একটা স্কুলে ভর্ত্তি করতে হবে। লরেটো কেমন? কিম্বা লা মার্টিনিয়ার, না ওখানে খরচ বেশী, ছোটখাট একটা স্কুলে দিলেই চলবে। একটা কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড রাখতে হবে সেই সঙ্গে। বেশী লোকজনের তার কি দরকার। তবে মীরাকে এবার একটু বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, অনেক কষ্ট করেছে সে। এবার ভাল করে মনের মত করে মীরাকে সাজাতে হবে, কত সুন্দর দেখতে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত মনের মত করে সাজাতে পারে নি—রবীনের এ দুঃখটা বরাবরই আছে। হ্যাঁ, রোজ বেড়াতে যাবে সে মীরা মণ্টুকে নিয়ে। নিজেই গাড়ী চালাবে, ড্রাইভার রাখবার দরকার কি?

স্বপ্নময় রঙীন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবির দিকে তাকিয়ে রইল রবীন সরকার।

টপ—ল্যাটরিনের দরজা বন্ধ করে নানুভাই বেরিয়ে এলেন। সন্ত্রস্ত হয়ে ধীরেন ভড় সরে এল তার নিজের জায়গায়। রবীন কামরাটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে। ওপাশে একটি মেয়ে বসে আছে, মেয়েটার মুখের ভাব অনেকটা পরিচিত বলে মনে হ'ল। মিণ্টু বড় হলে কি ঐ রকমই হবে? তখন ত সেও বুড়ো হয়ে যাবে। মিণ্টুর বিয়ে হবে—ভাবছে রবীন। নিজের পছন্দ করে করবে কিনা কে জানে, নিজের মেয়ে হলেও আগামী যুগের মানুষের সম্বন্ধে কিছু ধারণা করে নেওয়া উচিত হবে না। মীরা তখন কি রকম দেখতে হয়ে যাবে, আর কি রবীনকে এত ভালবাসবে মীরা? হয় ত মেয়ে আর জামাইয়ের কাছে রবীনের মেজাজ বা অন্য কোন দোষত্রুটি দেখিয়ে সমবেদনার দাবী করবে। বুড়ো হলে অনেক সময় মনটা ছোট হয়ে যায়, স্বার্থপরতা আর ছোটখাট খুঁটিনাটি জীবনটাকে যেন সীমাবদ্ধ করে দেয়—না বুড়ো সে হবে না—মনে মনে স্থির করে ফেলল রবীন সরকার।

নানুভাই এসে পুনর্ব্বার নিজের জায়গায় বসলেন। রবীন

সরকারের ওপর অনেক দিনই লক্ষ্য ছিল তাঁর। কর্ম্মচারী-দের ওপর বরাবরই নজর থাকে তাঁর, ওদের নিয়েই তাঁর কাজ, ওদের ভাল ভাবে না চিনলে চলে না। রবীনের কাজের সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল তার নিষ্ঠা—নিজের কাজটি ঠিক সময়ে করে যেত সে, শত বিপর্য্যয়েও কর্ত্তব্য করতে ত্রুটি তার হয় নি। দেড় বৎসর চাকরীর মধ্যে এক দিন কামাই আছে মাত্র। তা ছাড়া মেডিক্যাল ডিপার্ট-মেণ্টের যা কিছু বিক্রী তার মারফৎই হয়েছে, সে সংবাদও নান্নুভাই রাখেন। শুধু তাই নয়, নান্নুভাই মানুষ চেনেন, কাকে দিয়ে কি কাজ আদায় হয় সে অভিজ্ঞতা এত দিনে তাঁর হয়েছে। ধীরেন ভড়ের যোগ্যতা আছে বটে, কিন্তু দোষও আছে প্রচুর। টাকার ব্যাপারেও একটু হাতটান আছে, তা তিনি লক্ষ্য করেছেন, তা ছাড়া সম্প্রতি সিনেমার মেয়েদের নিয়েও একটু বেশী মাত্রায় মাখামাখি করছে বলে যেন মনে হয়। সুনীল রায় ও হাসনুর ব্যাপারটাও ধীরেন ভড়ের কারসাজি বলে মনে হয় তাঁর। যে কোন দিক থেকে একটা জট পাকিয়ে দিতে পারলে অনেক সুবিধে। একটা বই নিয়ে অনেক দিন কাটানো চলে, বেশ কিছু টাকাও টানতে পারা যায়। মনে মনে একটা হিসেব করে নিয়েছেন নান্নুভাই। সুনীল রায় আর হাসনুর জন্যে যে খরচটা হ'ল সেটা অন্য দিক দিয়ে পূরণ করে নিতে বেশী দেরী হবে না তাঁর। কথাটা এখন গোপনে রাখতে হবে, ধীরেন ভড়কে জানতে দিলে অন্য একটা বিভ্রাটে ফেলতে পারে সে। অপরপক্ষে টাকাই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় টোপ, জল দিলে তবে জল আসবে। রবীনের মাইনে যা বাড়ান হ'ল তাতে কোম্পানীর লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। মনে মনে লাভের ছকটায় চোখ বুলোতে লাগলেন তিনি।

রবীনের উত্তেজনা এখনও কমে নি, এখনও ধীর শান্ত স্বাভাবিক হয় নি তার মনের গতি। কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার ছোঁয়াচ লেগেছে, মনটা হঠাৎ যেন হালকা হয়ে গিয়েছে, আনন্দ নয়, তার সঙ্গে দায়িত্বের প্রশ্নও রয়েছে। ঠিক কি ভাবে কাজ সুরু করবে তার একটা ছক মনে মনে ঠিক করছিল রবীন সরকার। কলকাতাটা চারটে ভাগে ভাগ করে নিতে হবে, প্রত্যেকটার জন্যে দু'জন করে রিপ্রেজেনটেটিভ রাখতে হবে, ডাক্তারবাবুদের স্যাম্পেল দিতে হবে, আর যদি সম্ভব হয় তা হলে একটা করে ডায়েরী বা কাগজকাটা প্লাষ্টিকের সুদৃশ্য ছুরি, তাতে লেখা থাকবে, "দেশাই ল্যাবরেটারীর কমভিটোলিন ব্যবহার করুন"। ডাক্তারবাবুদের এ ধরনের দু'একটা জিনিস দিলে তাঁরা মনে রাখেন, লেখবার সময় ঐ ওষুধটার কথাই মনে পড়ে যায়। এটা মনস্তত্ত্বের কথা, অন্য কিছু নয়, দু'একজন উন্নাসিক ডাক্তার আছেন তাঁরা কোম্পানীর দেওয়া স্যাম্পেল বা অন্য কোন জিনিস গ্রহণ করেন না—তাতে নাকি তাঁদের সম্ভ্রমহানি হয়। সামান্য শিষ্টাচার জ্ঞানও তাঁদের আছে কিনা সন্দেহ—ভাবল রবীন। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে, তাতে বিভিন্ন কোম্পানীর সঙ্গে ডাক্তারদের একটা প্রীতির সম্পর্ক আছে, অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে ঘুস দেওয়া নয় এটা।

ব্রজেশ্বরবাবু ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছিলেন, কানের কাছে নিয়ে যেতে মনে হ'ল, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দু'একবার বাঁ হাতের কজীটা ঝাঁকি দিয়ে কানে ঠেকালেন। নাঃ, থেমে গিয়েছে, তাই তখন থেকে কাঁটাটা পৌনে আটটার ঘরে আটকে আছে। অকৃতজ্ঞ ঘড়িটার দিকে বিরক্ত ভাবে আর একবার চাইলেন।

আপনার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে? রবীনের দিকে তাকিয়ে ব্রজেশ্বরবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

আটটা দশ। উত্তর দিলে রবীন।

মাত্র আটটা দশ? আমার মনে হয়েছিল ন'টা—ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।

শীতের রাত কিনা। উত্তর দিলে রবীন, অন্য সময় হলে ঐ রকম চেহারার একজন লোকের এ ধরনের অবান্তর প্রশ্নে রবীন নিশ্চয়ই খুসী হ'ত না, কিন্তু হঠাৎ সে যেন উদার হয়ে গিয়েছে, এখন তার কাছে সকলেই ভাল, মনে কোন গ্লানি নেই তার—নেহাৎ নান্নুভাই উপস্থিত আছেন তাই, তা না হলে প্রাণ খুলে আড্ডা জমিয়ে তুলত।

তা ঠিক, শীতের রাত আন্দাজ করা শক্ত, আর যা শীত পড়েছে। বললেন ব্রজেশ্বরবাবু।

ছোকরাটিকে বেশ ভাল লেগেছিল ব্রজেশ্বরবাবুর, বেশ সৌম্যদর্শন, চিবুকের গঠনটা দেখে মনে হয় ভেতরে বেশ দৃঢ়তা আছে, তার পাশের মেয়েটা আর এই ছোকরাটির মধ্যে এ বিষয়ে মিল আছে বলে মনে হ'ল তাঁর।

রবীনও ব্রজেশ্বরবাবুর দিকে তাকাল, এত শীত, অথচ ভদ্রলোকের গায়ে গরম কাপড়জামা তেমন নেই। একটা বাদামী রঙের পাঞ্জাবী আর কাঁধের ওপর ফেলা একটা আলোয়ান—এ জিনিসটা কিছুক্ষণ আগেই সে লক্ষ্য করে-ছিল, এইবার প্রশ্ন করার সুযোগ পেল, বললে, আপনার গায়ে গরম জামা বেশী নেই? শীত করছে না আপনার? আত্মীয়তার প্রশ্ন করতে বাধল না, তার কাছে এখন সকলেই আত্মীয়।

হাসলেন ব্রজেশ্বরবাবু, কি জানেন। ঈশ্বরদত্ত জামা রয়েছে কিনা। বাঁ হাতে চিমটি কেটে মেদবহুলতা দেখালেন

রাজেশ্বরবাবু। বললেন, মানে চর্ব্বির আধিক্যে ঠাণ্ডা লাগে কম।

এষার হাসি পেল। এতক্ষণ ধরে সে ওদের কথোপকথন শুনছিল। যে ভদ্রলোক কামরায় ঢুকলেন, এতক্ষণে ভাল করে তাকে দেখে নিয়েছে এষা। ভদ্রলোকের চেহারাটি বেশ লম্বা ছিপছিপে, ফিগারটা সুন্দর, সুনীলদার চেহারাও ভাল, কিন্তু এ ত পুরুষোচিত নয়, ম্যানলি। এর চেহারার মধ্যে স্পষ্ট পৌরুষত্বের বিকাশ রয়েছে। সুনীলদার চেহারায় সেটার খুব অভাব। সুনীলদাকে শীতপ্রধান দেশের দুর্মূল্য একটি পাখীর মত সাজিয়ে রাখলে মানায় ভাল। কিন্তু হেফাজৎ করতে হয় প্রচুর, বদলে তার সুন্দর রূপটা দেখেই তৃপ্ত হয়ে থাকতে হয়। এ ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সে খাটে না, একে সুন্দর পরিবেশে রাখলেও যেমন মানাবে ধূলিধূসর হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রেও ঠিক ততখানিই মানাবে। কথাটা ভেবে মনে মনে হাসল এষা, তার এই অভিমত যদি সঞ্জীব শুনতে পেত ? মনে পড়ে গেল এক দিনের কথা। দুজনে দাঁড়িয়ে আছে বাসের জন্য এসপ্লানেডের কাছে। পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক গেলেন, এষা এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল তাকে। বললে, বেশ চেহারা নয় ?

হুঁ। বললে সঞ্জীব—পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ভাল নয় ? আবার জিজ্ঞেস করলে এষা।

হ্যাঁ, এই ত বললাম ভাল। স্বরটা একটু রুক্ষ।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। বললে এষা। অন্য কোন লোকের চেহারার প্রশংসা করলে তুমি রেগে যাও।

মোটেই নয়। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল সঞ্জীব। সুন্দর চেহারা সব মানুষই পছন্দ করে। আমি নিজে কন্দর্প নই, আর আমার চেয়ে নিশ্চয়ই সুন্দর আছে, সেকথা বললে রেগে যাব কেন ?

বাস এসে পড়ল, দুজনে বাসে করে কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে নামল। গাড়ীতে মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছ ? বাস থেকে নেমে বললে সঞ্জীব, ঠিক তোমার সামনের লেডিস সীটে বসেছিল।

ও, হ্যাঁ—সাদা জর্জ্জেট পরে ?

হ্যাঁ, তার সঙ্গে ঘোর সবুজ রঙের ব্লাউজ, অদ্ভুত ম্যাচ করেছে, মুখটাও বেশ সুন্দর নয় ?

হ্যাঁ। শুষ্ক উত্তর।

আর গড়নটাও বেশ লম্বা ছিপছিপে—না ?

হ্যাঁ, আমি চলি।

সে কি, বইটা কিনবে না ?

না, পরে দেখা যাবে। এষা ট্রামে উঠে পড়ল, একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে সঞ্জীব হাসছে।

তার পরদিনেই অবশ্য ব্যাপারটা মিটে গিয়েছিল। সঞ্জীবের চেয়ে এষা বেশী লজ্জিত হয়েছিল। তার চেয়ে অন্য কোন মেয়ে সঞ্জীবের চোখে সুন্দর লাগবে এষা তা সহ্য করতে পারে না, এই একটা জায়গায় তার শিক্ষা আর সংযমবোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। আদিম মানবীর মত আঁকড়ে রাখতে চায় তার প্রিয়তমকে।

রবীনের দিকে আবার তাকাল এষা, হ্যাঁ সঞ্জীব এর চেয়ে একটু বেঁটে হতে পারে, রংটাও এত ফরসা নয়, কিন্তু সঞ্জীবের চুলগুলো কি সুন্দর ঢেউ-খেলানো নরম, এ ভদ্রলোকের কপালের দু'পাশের চুল উঠে গেছে, কিছুদিন পরে বিপদ অনিবার্য্য, মানে টাক পড়তে তার বেশী দেরী নেই, কথাটা চিন্তা করে মনে মনে হাসল এষা। তা ছাড়া ধোপদুরস্ত কাপড়জামা পরার খুব পক্ষপাতী নয় এষা, কেমন যেন একটা বাবু বাবু ভাব মনে হয়, তার চেয়ে সঞ্জীবের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এলোমেলো ভাবটা অনেক ভাল লাগতে তার। সঞ্জীব কারোর কাছেই ছোট নয়। প্রথম দৃষ্টিতে হয় ত অনেককে ভাল লাগতে পারে কিন্তু ওটাকে দৃষ্টিবিভ্রম বলা চলে। সঞ্জীবের কাছে কেউ নয়—কথাটা খুব দৃঢ় ভাবে নিজের কাছে কয়েকবার মনে উচ্চারণ করল সে, কিন্তু মনটা উদাস হয়ে গেল এষার, নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল সেই সঙ্গে। এটা তার প্রায়ই হয়—বিশেষতঃ যখন সঞ্জীবের অনুপস্থিতিতে তার কথা চিন্তা করে তখন ত হয়ই। এতক্ষণ একভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না এষার—পরের ষ্টেশনে একটু ঘুরে আসবে, অন্ততঃ প্ল্যাটফর্ম্মে একটু পায়চারী করবে সে, ভাবল এষা—কোমরটা ধরে গেছে যেন মালতীদি সঙ্গে থাকলে বেশ হ'ত—দুজনে সারারাত কাটিয়ে দিতে পারে ওরা শুধু হেসে আর গল্প করে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ল এষার, খুব দুষ্টু ছিল এষা ছোটবেলায়। মালতীকে বেশ বেগ পেতে হ'ত তাকে সামলাতে। স্নান করিয়ে খাইয়ে ফ্রক পরিয়ে ; স্কুলে পাঠাত মালতী, কিন্তু সে এক পর্ব্ব।

ক্রমশঃ

সমুদ্র তীরে

শ্রীকালিদাস রায়

সিন্ধুর উপর দিয়ে পাখী যায় উড়ে
সৈকতে দাঁড়িয়ে দেখি যতদূর দৃষ্টি যায় দূরে,
অস্বস্তি জাগায় মোর প্রাণে
চেয়ে রই বহুক্ষণ একদৃষ্টি নীলাকাশ পানে।
আঁধার ঘনাল ধীরে ধীরে
ফিরলাম গৃহপানে বৃথা কেন রই সিন্ধুতীরে।
ফিরল কি ফিরল না উড়োপাখী জাগল সংশয়,
তিন পরিণাম তার হ'ল মোর অন্তরে উদয়।
হয় ত সে চলে যাবে হয়ে সিন্ধুপার
নয় ত সে বহুদূর উড়ে গিয়ে ফিরবে আবার,
নয় ত সে ক্লান্ত হয়ে সাগরের জলে
পড়ে গিয়ে হারাবে অতলে।
এই তিন গতি—
মানুষেরো মৃত্যুপথে হয় ত এমতি।
পরলোক ? পুনর্জন্ম ? চির অবসান ?
কেবা জানে এ রহস্যে কি বা সমাধান ?
এ রহস্য চিরন্তন নিত্য শাশ্বতিক
শোক সে ত অস্বস্তি ক্ষণিক।
তত্ত্ব-চিন্তা তাও শুধু ক্ষণিকের তরে
একটা অস্বস্তি নিয়ে ফিরলাম ঘরে।
কিসের সন্ধানে মোর দৃষ্টিসীমা করি অতিক্রম
অতদূরে গেল পাখী অকারণে করি বৃথা শ্রম ?
উড়ন্ত যে কোন পাখী তারি স্মৃতি মনে মোর আনে।
কি হ'ল সে পাখীটার দশা কে তা জানে ?
মনেরে সান্ত্বনা তবু দিই বারে বারে
নিশ্চয় নীড়ের টান ফিরায়েছে তারে।
এই সান্ত্বনায়
কেহ তার প্রিয়জন-শোক ভুলে যায় ?
রেখে হেথা অসমাপ্ত ব্রতখানি তার
যে যায় সে ফিরে কভু আসে না কি আর ?

রাম, সীতাকে

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

আমাকে বলেছ তুমি ধরে দিতে দিগন্তের সোনা
লক্ষ্যবেধে গেঁথে দিতে পলাতকা পৃথিবীর আশা,
যদি এ গভীর সাধ করে থাকো, মানা করব না।
ভেঙে দাও আজ থেকে সদ্যগড়া এ পাখীর বাসা।

ভেঙে দাও সে মন্দির যে অঙ্গনে গেয়েছিলে গান ;
খুলে ফেল কবরীর পুষ্পিত যৌবনভরা কেশ ;
ঠোঁটের সীমায় হাসি বিধবার মত হোক ম্লান ;
বুকে বেঁধে ভালবাসা এবারের মত হোক শেষ।

পুনরায় ফিরে-আসা পঞ্চবটী বনের সবুজে
এ আশা তীরের মত তূণ থেকে যাক্ বহুদূরে ;
যাই প্রিয়া : বলে যাই আমাকে পাবে না আর খুঁজে।
ব্যর্থ বসন্তের হাওয়া : একা তুমি শূন্য অন্তঃপুরে।

যা ছিল বুকের ভাঁজে সদ্য লোভ নীড় রচনার ;
যা ছিল চোখের মায়া মানসের কমল বিলাস ;
সমস্ত পুড়িয়ে দিয়ে পাই নি যা তার বঞ্চনার
মধুলোভে এ মৃগয়া, আনবেই ডেকে সর্বনাশ।

তবু ত তোমার চোখে রাখব না অমন জিজ্ঞাসা,
অপূরিত বাসনায় কণ্টকিত না হোক জীবন ;
হয় ত মৃগয়া করে পাব কিছু নেই যার বাসা ;
তবু খুলে যেতে হবে আঁচলের নিবিড় বন্ধন।

যদি ফিরে এসে দেখি ভরাঘরে সীতা নেই আর
বনে বনে কেঁদে কেঁদে শেষ হবে পাতাঝরা দিন,
তবু আমি এনে দেব অনিশ্চিত আশার শিকার,
হয় হোক অভিমানে ভরাতূণ শূন্য, শরহীন।

মিঃ টমাসের বাড়ী—দু'রাত্রি

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সেই জর্জ টমাসের বাড়ী—আজ উইক-এণ্ডে আমি অতিথি।

বিলেতের অফিসে কাজ শিখতে ঢুকেছি। তখনও কাউকে চিনি না। জানি না। কলকাতা অফিসের ম্যানেজারের চিঠির নকল নিয়ে বিলেতের অফিসের ইংরেজ ম্যানেজারের কাছে গিয়েছি। তিনি হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ করে বললেন, মিঃ টমাস আজ থেকে তোমাকে কাজ শেখাবেন। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে বস গে যাও।

না জানি, মিঃ টমাস কেমন ব্যক্তি! একটি শানিত, টকটকে ইংরেজের চেহারা কল্পনা করে নিলাম। ভয় হতে লাগল আবার, কি জানি, যদি তাঁর মুখনিসৃত ইংরেজী শব্দ না ভাল করে বুঝতে পারি! আমাদের যে ভাবের ইংরেজী উচ্চারণভঙ্গি, বিলাতী সাহেবদের ত তা নয়। যদি আমার কথা শুনে মিঃ টমাস হাসেন? যদি অবজ্ঞা করেন? কিন্তু কে কাকে দেখে হাসবেন, অবজ্ঞা করবেন—দু'মিনিট পরেই যেন তার পরীক্ষাপর্ব শেষ হয়ে গেল।

মিঃ টমাসের পাশের একটি চেয়ারে তখন আমি সমাসীন। আলাপ এগিয়ে চলেছে। শুনেছিলাম, মিঃ টমাস নাকি হিন্দী বলতে পারেন। তিনি তা অস্বীকার করলেন। হিন্দী তিনি কোনদিন বলেন নি; আর বলবেন—এমন আশাও সুদূরপরাহত। রঙ তাঁর ভীমরুলের মতো কালো। তিনি একজন ভারতীয় ক্রীশ্চান। আদি নিবাস দক্ষিণ ভারতে। তবু তাঁকে সাহেব আখ্যা না দিলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। যেহেতু তাঁর স্ত্রী একজন ইংলিশ লেডি। ইংলিশ লেডির নামে বাড়ী কেনা হয়েছে ইনষ্টলমেণ্টে। ১০ বছরের স্কীম। লণ্ডনের অদূরেই। যেহেতু সে-বাড়ী উভয়ের,—উভয়েই ভোগদখল করবেন, যদি অবশ্য ইতিমধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা না আসে। সেণ্টপলস্ গির্জায় তোলা নব-দম্পতির একটি ছবিও পরে দেখেছি মিঃ টমাসের বুকপকেটে।

সেইদিনই দুপুরবেলা মিঃ টমাসের সঙ্গে বেরিয়েছি লাঞ্চ খেতে। পথে বেরিয়ে ভাবতে পারি নি, অফিস-পাড়ায় মিঃ টমাসের এত পরিচিত জন আছে। এক-একজনের সঙ্গে মিঃ টমাস অবলীলাক্রমে ইংরেজীতে কথা বলে যেতে লাগলেন। এত তিনি ভাল ইংরেজী বলতে পারেন, ভাবতে পারি নি। মিঃ টমাস বললেন, তাতে আর কি? তুমিও বলতে পারবে—এদেশে কিছুদিন থাকলে। এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস। একটা ইংরেজ যদি ভারতবর্ষে বেশ কিছুদিন থাকে, সেও সেখানকার কথা বলতে পারে। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? তা ছাড়া—আমার স্ত্রী যে ইংরেজ। ঘরে-বাইরে ইংরেজী ছাড়া আমার আর কথা কি?

এমন একটি ইংরেজ স্ত্রী পেলে মন্দ হয় না। সময় সময় মিঃ টমাসকে দেখে হিংসা হয়েছে। সন্দেহও হয়েছে, পরোক্ষে মিঃ টমাস ইংরেজী স্ত্রী জুটিয়ে দেবার আড়কাটি নন্ ত?

সাহেব-মেমে গিস্‌গিস করছে হোটেল। মিঃ টমাসকে খাবার মেনু ঠিক করবার অধিকার দিয়ে বসে আছি।

মাংস খেতে গিয়ে কেমন কেমন যেন লাগল।

মিঃ টমাসকে প্রশ্ন করলাম, কি মাংস আপনি আমার জন্য নিয়েছেন?

কেন, ভাল মাংসই ত নিয়েছি। খেলে হার্ট শক্ত হবে। লণ্ডনের শীতে শরীর ভাল থাকবে। প্রগতিশীল ভারতীয়রা ত সকলেই খাচ্ছেন এখন এই মাংস।

তবু, কি মাংস?

কেন, খেয়ে বুঝতে পারছ না? এত ভাল মাংস, বীফ!

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। খাওয়া অভ্যাস থাকলে তবে ত বুঝব।

ডিসে আর হাত দিতে পারি নি।

এই মিঃ টমাসই আমাকে প্রথম ইণ্ডিয়া-হাউস চেনালেন। ছ-তলা বিরাট বাড়ী। কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে 'এনকোয়ারি ব্যুরো'। তাঁর ডানপাশে উঁচু টেবিলের উপর একটা জাবদা খাতা। ভিজিটারস্ বুক। বাঁপাশে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি। অদূরে ডান হাত ভাঙা বোধিসত্ত্বের মূর্তি। ওদিকে রবীন্দ্রনাথের। তাঁর ষ্ট্যাচুর গায়ে লেখা: Born 7th May 1861—Died 7th Aug. 1941, জন্ম ৭ই মে, ১৮৬১। মৃত্যু ৭ই আগষ্ট ১৯৪১। শিল্পী: মিসেস মারকুইরাইট মিলওয়ার্ড।

দেখলেম সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রল।

স্যার ক্রীষ্টোফার ওরেন-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি—১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের বিরাট অগ্নিকাণ্ডের পর পুনর্গঠনের বিজয়স্তম্ভ। বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম প্রাচীন ক্যাথিড্রল। উচ্চতায় ৩৬৫ ফুট। ক্রীষ্টোফার ওরেন, নেলসন, ওয়েলিংটন, ফ্লোরেন্স

মাইটিংগল, রেনল্ডস, টার্ণার প্রভৃতির সমাধিস্থল। হুইসপারিং গ্যালারী, ষ্টোন গ্যালারী আর ৬২৭টি সিঁড়ি নিয়ে—পৃথিবীর এ একটা অষ্টম আশ্চর্য। চূড়ার উপর লণ্ডনের প্রসারিত আকাশ। আকাশে অসংলগ্ন জলভরা মেঘ।

তার পর, ওয়েষ্ট মিন্সটার ক্যাথিড্রল। অপূর্ব সুন্দর এর ভাস্কর্য—বর্ণনাতীত। বিরাট মিনার উঠে গেছে মাটি থেকে ২৮৪ ফুট উঁচুতে। ভিতরে একাধিক ভজনালয়। অপ্রতিদ্বন্দ্বী কারুকার্যে অনবদ্য এর খিলেনগুলি। কোথাও ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের পবিত্র বেদীমূলে কেউ জেলে দিয়ে গেছেন একাধিক মোমবাতি। কোথাও মেরীমার চোখে বিশ্বজনীন সন্তান-বাৎসল্যের কমনীয়তা।

তার পর কত লোকজন, অফিসের মেয়ে-কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন মিঃ টমাস। নিয়ে গেছেন ম্যাডাম লুসাডের প্রদর্শনী দেখাতে। প্রদর্শনীতে ঐতিহাসিক মন্ত্রীবর্গ, উইণ্ডসরের ডিউক, রাজন্যবৃন্দ ও সংরক্ষণশীল সরকারের সদস্যগুলির যথাযথ অবিকল মূর্তি অনেক সময় মনে হয়েছে যেন জীবন্ত। কোথায় হিটলার, জিন্না, মহাত্মা গান্ধী—মরে তল হয়ে গেছেন। কিন্তু এ আশ্চয মূর্তিগুলি তাঁদের অবয়বের অব্যর্থ সাক্ষী হিসাবে বিরাজমান। এমন কি, তাঁদের হাতের শিরা-উপশিরাগুলি পর্যন্ত কোথাও অবলুপ্ত নয়। স্লিপিং বিউটি নাম দিয়ে একটি ঘুমন্ত মহিলাকে দেখানো হয়েছে। মানুষ ঘুমুলে তার নাক-মুখ থেকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের একটা নির্দোষ শব্দ বার হয়। বুকের ওঠানামা বাড়ে। সেটাকে পর্যন্ত অবিকল নকল করা হয়েছে ইলেকট্রিকের সাহায্যে। যার মাথা থেকে এ কৌশল বেরিয়েছে, বলিহারি যেতে হয় তার বুদ্ধি ও শিল্পজ্ঞান দেখে। তার পর, মাটির তলায় ঘর। সে ঘরে সব ভয়ঙ্কর মূর্তি! সেও কম আশ্চর্যের নয়।

ক্লাফোড ষ্ট্রীটের ভারতীয় হাইকমিশনারের আর এক অফিসে যাবার পথে সঙ্গ দিয়েছেন মিঃ টমাস। সেখানে যাবার প্রয়োজন পড়েছিল, ইউরোপের কয়েকটি দেশের নাম পাসপোর্টে এনড্রস করাবার জন্য। পরে যে-সব জায়গায় যেতে হয়েছিল। ক্লাফোড ষ্ট্রীটের ভারতীয় অফিসারকে মিঃ টমাস তাঁর বাড়ীতে চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ জানিয়ে দিলেন। তিনি হেসে বললেন, অত দূরে গিয়ে চা খাওয়া কি পোষায়? তবু যখন মিঃ টমাস বলেছিলেন, স্ত্রী আমার একজন ইংলিশ লেডি, তিনি আর বেশী কিছু বলতে পারেন নি। শুধু বলেছিলেন, দেখব। আমার অবশ্য কার্যসিদ্ধি হয়েছিল তাতেই তাড়াতাড়ি।

টাওয়ার হিল-চত্বরে কম্যুনিষ্টদের বক্তৃতা শুনতে গেছি মিঃ টমাসের সঙ্গে। খানিকটা শোনার পরই তিনি বলেছেন, চলে এস, এ অশ্রাব্য।

এক জনের সঙ্গে তর্ক বেধে গেছে মিঃ টমাসের। সে ভদ্রলোক বলেছিলেন, পৃথিবীর পথ সাম্যবাদেই শেষ হবে।

মিঃ টমাস বলেছেন, কখনও না। পৃথিবীর পথ লীন হবে আধ্যাত্মিকতায়, পরমাত্মার সন্ধানে। সেই দিন আসছে, শীঘ্রই আসবে।

আমার দিকে চেয়ে মিঃ টমাস বলেছেন, এত লোক যে দেখছ লণ্ডনে—সবাই ক্রীশ্চান, কিন্তু নাম-কো-ওয়াস্তে। কেউ সত্যিকারের ক্রীশ্চান নয়। ক্রীশ্চান হলে কম্যুনিষ্টদের বক্তৃতা শোনে? আশ্চর্য! বিজ্ঞান যে জগতের এত পরিবর্তন এনেছে—কিন্তু আনতে পেরেছে কি মানুষের অন্তরের পরিবর্তন? রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, পাপকে কেউ এড়াতে পেরেছে? মানুষ কি পেয়েছে শান্তি? এর উত্তর নয় কম্যুনিজমে। উত্তর যীশুখৃষ্টে।

মিঃ টমাস আমার জন্য কতরকম পুস্তিকাই না রোজ কষ্ট করে অফিসে নিয়ে আসতেন। সে-সব পুস্তিকার কাগজ, ছাপা ও মলাট এত চমৎকার যে, নেব না বলতে ইচ্ছা হ'ত না। পুস্তিকার নামগুলি বেশ সুন্দর।

সেই মিঃ টমাসের বড় ইচ্ছা হয়েছিল, আমি যেন এক শনিবার তাঁর বাড়ী যাই। শনি ও রবি—দুটো রাত্রি তাঁর বাড়ী থেকে আসি।

তাই জর্জ টমাসের বাড়ী আজ উইক-এণ্ডে আমি অতিথি।

লণ্ডন-ব্রীজ থেকে ট্রেনে চড়লে পথে ইষ্ট ক্রয়ডন নামক ষ্টেশন পড়ে। দূরত্ব লণ্ডন থেকে পনেরো মাইল। সারে—চার্চ রোডে মিঃ টমাসের বাড়ী। বাড়ী না বলে দোতলা কুটীর বলাই ভাল। পরিবেশ একদিকে যেমন গ্রাম্য, অপর দিকে নির্জন। বেশ ফাঁকার উপর বাড়ী। রাস্তার ধারের বাড়ীগুলির জানালায় সুন্দর লেসের পর্দা।

সেদিন রোদ ছিল। বেলা তখন তিনটে। একদিকে যেমন রোদ, অপর দিকে শীত। মিঃ টমাস বাড়ীর ভিতরে তাঁর বাগানে আমাকে বসতে দিলেন। ভালই লাগল জায়গাটা। বাগানে যে কত রকমের ফুল গাছ—তার সংখ্যা নেই। দুটি গোলাপ গাছে আশাতীত বিরাট বিরাট কয়েকটি গোলাপ ফুল ফুটে আছে। আরও কয়েকটি গোলাপ গাছে অসংখ্য কুঁড়ি। জমিতে চমৎকার সবুজ ঘাস, সেই ঘাস ছাঁটবার মেশিন নিয়ে পড়ল মিঃ টমাস।

সহসা এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। এ বাঙালী-বাড়ী নয়, যে লুকিয়ে-চুরিয়ে সে বাড়ীর মেয়ে দেখতে হবে।

এ প্রকাণ্ড দিবালোকে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা। কিন্তু অত সাহস কই?

ঠিকই দেখেছিলাম। মিসেস টমাস বেরিয়ে এলেন, একটি ইংলিশ লেডি।

আমাকে দেখে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, হাউ আর ইউ?

হয় ত বলেছিলাম, ও.কে. মনে নেই ঠিক। কিন্তু তাঁকে দেখে প্রমাদ গণলাম। তাঁকে মিঃ টমাসের স্ত্রী বলব, না মা? কি ভয়ানক বড়-সড়, মাথার কিছু চুল পেকে গেছে। মোটা যেন বড়সাহেব, তার উপর আসন্ন-প্রসবা। মিঃ টমাসের বয়স আর কত? বড় জোর ত্রিশ। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর বয়স নিঃসন্দেহে চল্লিশের উপর। আর রং? রং আছে বৈকি! আলতার আভা যেন তাঁর ফরসা গা থেকে ফেটে পড়ছে।

মিঃ টমাস আমার জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন, ঠিক বাগানের পাশেই। সেটাতে নিয়ে গিয়ে বসালেম। চমৎকার চাদর বিছানো উঁচু বিছানা। স্প্রীঙের খাট, বিছানায় ঘেরাটোপ—এটা লণ্ডনের একটি বিশেষত্ব। এক পাশে একটা টেবিল, একখানা চেয়ার, সুন্দর আয়না। মেঝেয় মূল্যবান গালিচা। একটা তাকে কতকগুলো রূপার বাসন-কোসন। আর একটা টেবিলে মিঃ টমাসের টাইপ-রাইটার মেশিন, যোগ দেবার মেশিন। দরজার পাশেই—হ্যাঙ্গারে ঝোলানো কতকগুলো লেডিস ওভারকোট। মিসেস টমাসেরই হবে নিঃসন্দেহে। আর বাকি কয়েক তাকে অসংখ্য বই।

সন্ধ্যাবেলা মিঃ টমাস ডেকে নিয়ে গেলেন, ডিনার খাবে এস।

টেবিলে গিয়ে দেখি, মিসেস টমাসও বসে আছেন খাবার সাজিয়ে। খাবার বলতে এক গোছা চাপাটি আর কিছু কুমড়ো জাতীয় ঘ্যাঁট।

ছুরি-কাঁটার লড়াই সুরু করব—এমন অবস্থায় দেখি মিঃ টমাস একটা ছোট বই তুলে নিয়েছেন হাতের উপর। বইটার নাম হ'ল – ডেলি লাইট অন দি ডেলি পাথ। বছরের প্রত্যেক দিনের তাতে তারিখ আছে। সেই তারিখ অনু-সারে পড়তে হয় সেদিনের আচমন-মন্ত্র। হে ঈশ্বর, তোমার দয়ায় আমরা আনন্দ করছি, আমরা খেতে বসছি। তোমাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, ইত্যাদি।

অর্থের দিক দিয়ে আচমন-মন্ত্রটি সত্যই সুন্দর। মিঃ টমাস লেখাটা শুধু নিজে পড়লেন না, পরকে পড়ে শোনালেন। চোখ বুজে যীশুখ্রীষ্টকে ধ্যান করলেন, তার পর ছুরি-কাঁটা নিলেন। তাঁর ছুরি-কাঁটাকে অনুসরণ করে আমরাও বেকার হাতগুলিকে কার্যকরী করে তুললাম। বাড়ীতে হলে ও ঘ্যাঁট ছুঁতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু অতিথি হতে গেলে সংযমশিক্ষার প্রয়োজন আছে। খাবার শেষে পেলাম কফি।

শুতে গিয়ে মিঃ টমাসকে বললাম, আলোটা জেলে শোব কি?

মিঃ টমাসের মুখে কেমন যেন এক অসহায় ভাব ফুটে উঠল। তিনি বললেন, এ ত ভারতবর্ষ নয়। এখানে চোর-ডাকাতের ভয় নেই। সমস্ত রাত আলোটা জেলে রাখবে কেন?

অপরিচিত জায়গা, তাই।

যে রকম বলছ, তোমার কাছে আমারই যেন শোওয়া উচিত মনে হচ্ছে। তোমার কষ্ট হলে আমার দুঃখের শেষ থাকবে না। যা ভাল বোঝ বল।

মিসেস টমাসকে ছেড়ে তুমি এখানে শোবে, সে কি কথা?

আমি প্রতিবাদ করলাম।

তা হলে সমস্ত কথা তোমাকে খুলেই বলি। মিঃ টমাস বিপন্নের মত বললেন, আলো জেলে রেখে তুমি শুতে পার, আমার তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আমার স্ত্রী যেন না জানতে পারেন। এই যে বৈভব দেখছ আমার বাড়ীতে – ভেব না, এসব আমার একার উপার্জিত। এর পিছনে আমার স্ত্রীর সাহায্যটাই প্রধান। আসলে এ বাড়ীটা স্ত্রীই কিনেছেন তাঁর স্বোপার্জিত টাকায়। স্ত্রী একসময় নার্স ছিলেন, অনেক উপায় করেছেন। আজকে অসমর্থ হয়ে পড়াতেই ভাবনা। তোমাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনেছি ভাল করে খাওয়াতে পারলাম না। সেটা তুমি প্রকাশ না করলেও তার বেদনার অনুভূতি আমাকে আঘাত দিয়েছে। তুমি আমার অপরাধ নিও না।

এসব কি বলছেন আপনি? মিঃ টমাসকে থামিয়ে দিয়ে গুডনাইট জানালাম।

তাঁর এই কাতর অতিথিপরায়ণ রূপ সত্যই বড় মুগ্ধ করল। আলোটা নিভিয়েই শোওয়ার আয়োজন করলাম, আর শুতে গিয়ে দেখি, বিশেষ অসুবিধা নেই। বাগান থেকে একটা ক্ষীণ আলোর আভাস আসছিল ঘরে। কোথায় এই আলোর উৎস—কে জানে! কাচের জানালার প্লাষ্টিকের পর্দা সরালেই প্রশান্তি। আর আমি তখন অন্ধকারে একা নই। আমার সঙ্গে জেগে আছে বাগানের সহানুভূতি। বড় গোলাপ ফুলটার অম্লান অনুরাগ।

আশপাশের বাড়ী থেকে ভেসে-আসা সাহেব-মেমদের

কথাও কানে আসতে লাগল। এ যেন গাঁ-ঘরে রাত্রিকালে প্রতিবেশীদের ঘরোয়া আলাপ। তবে সেটা তারস্বর নয়—মৃদু কণ্ঠধ্বনি।

রাত্রি তখন হয় ত বারটা, তখনও ঘুম আসে নি চোখে। জানালার পাশে গোঙানীর মত একটা আওয়াজ শুনলাম। সহসা সতর্ক হতে হয়। হাতের কাছে একটা খেঁটে লাঠি থাকলে ভাল হ'ত। কি জানি, কি ব্যাপার! লাঠির সন্ধানে অনর্থক তরল অন্ধকারে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাঠির আর দরকার করল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাগানে একটা কালো মত যেন কি, তার পিছু পিছু আর একটা। মিঃ টমাস শুয়েছিলেন দোতলায়। নিশ্চয় তিনি তখনও জেগে, কি ঘুম থেকে সহসা জেগে উঠেছিলেন—জানি না। এক মগ জল পড়ল সশব্দে বাগানে। কালো মত জন্তু দুটি বিড়ালই হবে। বিড়াল দুটিকে আর দেখা গেল না।

রবিবার সকালে যখন ঘুম ভাঙল, ঘড়িতে দেখি ছ'টা বেজেছে। শীতের দেশে এটা খুবই সকাল। বাগানের গোলাপ গাছগুলোয় জল কি শিশির লেগে আছে বুঝতে পারলাম না। কিন্তু চমৎকার প্রত্যূষ: মেঘ নয়, বৃষ্টি নয়, কুয়াশা নয়। একটা নবীনতর উষালোকের উত্তরণ।

উঠেই দাড়ি কামাবার আয়োজন করতে হ'ল। দাড়ি না বাড়লেও প্রত্যেক দিন সেটাকে কামিয়ে কামিয়ে কড়া করাই এখানকার রীতি।

দরজা খুলতেই দু'হাত দূরে রান্নাঘর। রান্নাঘরে যেতে হ'ল দাড়ি কামাবার জল সংগ্রহ করতে। এক রাশ এঁটো কাপ-ডিস পড়ে আছে কলের পাড়ে—মানে বেসিনে: মিসেস টমাস এখনও নীচে নামেন নি। কিন্তু তাঁর গলার ছোট-খাটো আওয়াজ আসতে লাগল দোতলা থেকে।

জল এনে দাড়ি কামাবার উদ্যোগ করছি, মিঃ টমাস এসে হাজির। হাতে তাঁর বেড-টি। তাঁর ভদ্রতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

মিঃ টমাস বললেন, 'সুপ্রভাত! ঘুম হয়েছিল রাতে ত?'

'খুব ঘুম হয়েছিল'। বললাম, 'আর শুনে বোধ হয় খুশী হবেন, আলো জেলে রাখবার দরকার করে নি।'

মিঃ টমাস বললেন, 'জানি! খানিকটা রাত অবধি আমিও জেগে ছিলাম।'

'যাবার সময় বলে গেলেন, যাই। আমার স্ত্রীকে আবার সাহায্য করতে হবে। যদি ইচ্ছা হয় স্নান করতে পার, আমি বয়লার চালু রাখছি।

চা খেয়ে এঁটো কাপটি কার জন্য রাখলাম জানি না। বাগানে তখন সুন্দর আলোর ঝিকিমিকি সুরু হয়েছে। এক রাশ চড়ুই পাখি কিচির-মিচির করছে। আমাদের কলকাতার চড়ুইয়ের মত এরা অবিকল। তবে রোগা নয়, বেশ মোটা।

বেলা আটটা হবে, সাজগোজ করছি; মিসেস টমাস নামলেন গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। তারপর রান্নাঘরে কমনে খুচখাচ করেই চীৎকার করে উঠলেন, ডারলিং, ব্রেকফাস্ট রেডি।

মিঃ টমাস আমাকে ব্রেকফাস্টের টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসালেন। মন্ত্র পড়লেন সেই বইখানি দেখে, চোখ বুজলেন, তার পর খাবার অনুমতি দিলেন।

দশটা নাগাদ গীর্জায় চললাম। মিঃ টমাসের অনেক দিনের সাধ, আমাকে গীর্জায় নিয়ে যান। তাঁর বন্ধুস্থানীয় ইংরেজ স্ত্রীপুরুষদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন।

ক্যামেরাটা হাতে নিয়েছিলাম। ইংলণ্ডের গ্রাম্য পথ-ঘাট, বাড়ী ও পার্কের দৃশ্য—এক এক জায়গায় এত লোভনীয় যে কয়েকখানা ছবি না তুলে পারি নি।

গীর্জায় গিয়ে দেখি, সুন্দর সুন্দর হাত এগিয়ে আসছে এ অধমের সঙ্গে করমর্দনের জন্য। মিঃ টমাস আমার কি পরিচয় দিয়েছিলেন জানি না, তবে তাঁদের নিবিড় অভ্যর্থনা আমাকেও আশ্চর্য ও অভিভূত করে দিয়েছিল। তার পর কত রকমের যে সংগ্রহ প্রশ্নাবলী—তার পরিসংখ্যা ছিল না। দেশে দেশে যে ঘর আছে, আমার আত্মীয় আছে, এই কথাটি অনুভব করা সেই মুহূর্তে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। আমি হিন্দু বলে কিনা জানি না—আমি ইংলণ্ডের চার্চ-সার্ভিসের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে এসেছি বলে কিনা বুঝলাম না, সেদিনের প্রার্থনাসভায় দেখলাম, সকলেরই দৃষ্টি প্রায় আমাকে লেহন করতে সুরু করেছে।

মিঃ টমাসের পাশেই বসেছিলাম। সহসা পিয়ানো বেজে উঠল, সকলেই দাঁড়িয়ে উঠলেন। বেদীতে বসেছিলেন অনেক পুরুষ এবং নারী, ধর্মযাজক ও যাজিকার দল। তাঁরা আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। গীত সুরু হয়ে গেল সমবেত কণ্ঠে।

যে যুবকটি বাইবেল পাঠ করলেন গীর্জায়, তাঁকেই ফের দেখলাম মিঃ টমাসের বাড়ী বিকেলে চায়ের আসরে। মিঃ টমাস হয় ত কোন্ ফাঁকে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এসেছিলেন। নাম জানলাম তাঁর মিঃ চাণ্ডলার। এবার বাইবেলে এম-এ দিয়েছেন।

প্রচুর বিস্কুট ও কেক সহযোগে চা-পর্ব সমাধা করা হ'ল।

ফের যেতে হ'ল সন্ধ্যায় গীর্জাতে। মিসেস টমাস সকালে যেতে পারেন নি, রান্নাবাড়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পেট নিয়ে নড়া-চড়া করতে নাকি কষ্ট হয়। এ বেলা সঙ্গে গেলেন, তাঁর পাশে ছায়ার মত মিঃ টমাস।

সকালে চাঁদা দিয়েছি ছ'পেনি। এ বেলাও চাঁদা দিতে হ'ল গীর্জাতে। গীর্জাতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করবার ব্যবস্থাটুকুও উত্তম দেখলাম।

এ বেলাও অনেকগুলি গান হ'ল। মাথা নত করে প্রার্থনা করলাম যীশুখ্রীস্টের কাছে।

বাড়ীতে ফেরার পথে মিসেস টমাসের সঙ্গে এক ইংরেজ দম্পতি এলেন। এলেন মিঃ চাণ্ডলার আবার। ফের গান সুরু হ'ল মিঃ টমাসের লাউঞ্জে। মোটা শরীরটা নিয়ে শ্রীমতীই বসলেন পিয়ানো বাজাতে। পর পর দু'তিনটে গান চলল।

এক ফাঁকে মিঃ চাণ্ডলারের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, বাইবেলের এত বেশী প্রক্ষিপ্ত তর্জমা হয়েছে, যেগুলিকে বলা যায় unauthorised তর্জমা। আসলে ওটা ত হিব্রুতে লেখা। সেই জন্য গীর্জাতে আমি দু'চারটে কথা বদলে পড়ছিলাম।

সেটা লক্ষ্য করেছিলাম যথাস্থানে। তাঁর যুক্তিতে সায় দিলাম। আরও বললাম, আপনার প্রতিটি উচ্চারণই বেশ স্পষ্ট, ভাল লেগেছে।

স্পষ্ট করে উচ্চারণ করবারই চেষ্টা করেছি। মিঃ চাণ্ডলার বললেন, তুমি বিদেশী, যাতে না দেশে ফিরে গিয়ে তুমি বলতে পার, আমার পাঠ ভাল লাগে নি।

মিঃ চাণ্ডলারকে বেশ অমায়িক ও ভদ্র বলে মনে হয়।

রাত ন'টা নাগাদ সকলে মিলে ডিনার খেতে বসলাম। কফি, বিস্কুট, কাঁচা টম্যাটো, কাটা পাঁউরুটি আর ছোট ছোট মাছের ঝাল।

সোমবার সকালে যখন ঘুম ভাঙল, দেখি মিঃ টমাস দরজায় টোকা দিচ্ছেন—বোধ হয় হাতে তাঁর বেড-টি।

মনে হয়, শুধু ঘুম থেকেই জাগলাম না, একটা মধুর স্বপ্ন থেকেও জেগে উঠলাম। স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়? কে জানে।

কিন্তু আমার দেখা স্বপ্নবৃত্তান্ত অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হুবহু মিলে গেল। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

স্বপ্ন দেখেছিলাম, ব্রেকফাস্ট সেরে মিঃ টমাসের সঙ্গে যেন বেরিয়ে পড়ছি। আকাশ অন্ধকার, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি সুরু হয়েছে। ট্রেনে চেপে লণ্ডন-ব্রীজ স্টেশনে গিয়ে নামতে হবে, তার পর আপিস। বেরিয়ে পড়বার সময় মিসেস টমাস এলেন তোয়ালেতে ভিজে হাত মুছতে মুছতে। আমি তাঁকে বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ। উত্তরে তিনি জানালেন, একটা ম্যাক্স নিয়ে যাও, বৃষ্টি সুরু হয়েছে। আবার এস, যখনই ইচ্ছা হবে চলে এস। এ ত তোমার নিজের বাড়ীর মত। কাম এগেন।

এ ত আমার জানবার কথা নয়। মিঃ টমাসের বাড়ী ইতিপূর্বে যে এসেছি তাও নয়, এই প্রথম। কাল সকালেও চমৎকার রোদ উঠেছিল। কে জানত, আজ সকালে এই ঘনঘটার আয়োজন করবে ইংলণ্ডের খেয়ালী আকাশ। কিন্তু স্বপ্নে ঠিক যেমনটি দেখেছি—বাস্তবে কেমন করে তা সম্ভব হতে পারে?

কিন্তু তাই হ'ল।

মিসেস টমাস এলেন তোয়ালেতে ভিজে হাত মুছতে মুছতে, বোধ হয় হ্যাণ্ডশেক করবেন। আমি তাঁকে বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ। উত্তরে তিনি জানালেন, একটা ম্যাক্স নিয়ে যাও, বৃষ্টি সুরু হয়েছে। আবার এস, যখনই ইচ্ছা হবে চলে এস। এ ত তোমার নিজের বাড়ীর মত। কাম এগেন।

যেন তিনি আমার কত দিনের আত্মীয়া!

আমার দেশেও আমার দিদি, বৌদি ও নিকট-আত্মীয়ারা এই কথাই বলেছেন—যখন আকাশের এই বিশেষ অবস্থা—তাঁদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। সে মধুপুর, দিল্লী, রামপুরহাট অথবা মাজদিয়া থেকেই হোক...

তা হলে তাঁদের সঙ্গে এই খ্রীষ্টান বিদেশী রমণীটির পার্থক্য কোথায়?
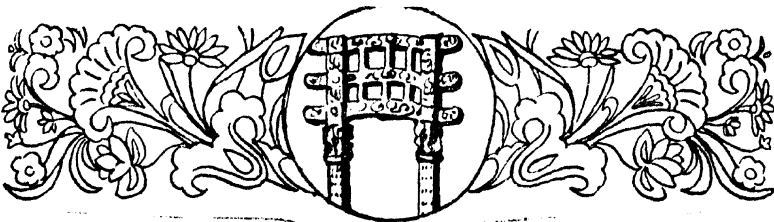
শেষ পরিচয়

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ বিকালে আপিস থেকে ফিরে মালা বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেল। সে নড়ল না কথাও বললে না। বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় এই কথাটা ভাবল যে দারিদ্রের শত ছিদ্র দিয়ে প্রকৃতির সমস্ত আশীর্ব্বাদ এই কুঁড়েখানায় বর্ষণ হয়, এ সম্ভব, কিন্তু যে ভদ্রলোক তক্তায় জমিয়ে বসে আছেন তাদের মাথা গুঁজবার এই আশ্রয়স্থলে এ সম্ভব হ'ল কি করে! ঘরখানার দেয়ালে পলস্তারা পড়ে নি, ইটের ওপরেই চুণকাম করা, কতকাল আগে যে করা হয়েছে ঠিক নেই, তলদেটে হয়ে গেছে, দেয়ালে নোনা ধরে কোথাও কোথাও চাঙরা উঠে গেছে। নোনা ইট বেরিয়ে পড়েছে। চালের ছিদ্র দিয়ে ঘরখানায় চালুনীর মত সরু সরু আলো সর্ব্বত্র পড়েছে। মেঝের সিমেণ্ট উঠে জায়গায় জায়গায় গর্ত্ত হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক আড়ষ্ট ত নহেন এমনকি এটাই যেন তাঁর এতকালের নিজস্ব বাড়ী। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন এই কথাটা ভাবতে লাগল তখন অজয় তার ব্যক্তিত্বের এই বিশিষ্ট রূপকে মনে মনে তারিফ করল। সেখানে চিরাচরিত প্রথায় পরিচয় করিয়ে দেবার তৃতীয় পক্ষের অভাব, যেখানে উভয়ে কাজটা সেরে লওয়ায় ভদ্রতা রক্ষা পায়, এ কথা মালা সেদিন ভুলল, অজয়ও তেমনি ভুলে গেল।

রান্নঘর থেকে এ ঘরে ঢুকে ভুবনময়ী বললেন, ও মা, ও যে মালা—তিনি আর অগ্রসর হতে পারলেন না। অজয় প্রতিবাদ করল, সে হলে আমি ঠিক চিনতাম। আমার এত ভুল হবে! তিনি তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে মালা বলে উঠল, তুমি গিয়ে দেখত উনুনে আঁচ উঠেছে কি না, আমি এক্ষুণি আসছি।

সে তাঁকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে। তাঁর এতদূর আন্তরিকতার পরে যে অনুমানটা করেছিল এখন তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পেরে অন্তর্য্যামীকে ডেকে হেসে নিল। এক কদম এগিয়ে গিয়ে বললে, আমার নামটা উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু আমি কে তা ত বললেন না।

অজয় অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে বললে, জানি না, আপনাকে কখনও দেখি নি। এই সংক্ষিপ্ত উত্তর ছাড়া আর একটাও বেশী কথা সে বলল না।

মালা নীরবে কি ভেবে নিয়ে মুখ টিপে হেসে বললে, সেই ভাল। কিন্তু ওটা ছেড়ে দিন।

কি!

আপনি।

অজয় সেই কতকাল আগে সেখানে তাকে ছেড়ে গিয়েছিল তখন সে গৌরী। তখনও পৃথিবীর সমস্ত কিছু বুঝে উঠতে পারে নি। তবে এইটুকু বুঝেছিল যে সকালে যেমন সূর্য্য না উঠলে তার চলে না, তিনি একদিন না এলে তার অন্ধকার লাগে, দিনটা বিষণ্ণ ঠেকে, তার কষ্ট হয়। সূর্য্যমুখী সে আকর্ষণে ফোটে, নিয়ত সূর্য্যের মুখ দেখে তার আকর্ষণও এমনি, এর বেশী নয়। তাই প্রথম যেদিন সে তাকে দেখতে পেলে না, বিষণ্ণ আশায় সে রাতটা কাটিয়ে দিলে এই ভেবে যে, আজ মেঘলা করলেও কাল সকালে নিশ্চয়ই সূর্য্য উঠবে। কিন্তু এই কাল কত কালের সাগরে হারাল। একদিন সে তার হিসাব নিতে ভুলে গেল। এই বার বছরে সে কতদিন কত সময়ে রাস্তায় এগিয়ে গেছে, কাছে গিয়ে মিথ্যাটা বুঝতে পেরেছে। বাড়ীতে ফিরে ভুবনময়ীকে বলেছে। তিনি সস্নেহে তাকে কোলে টেনে নিয়ে বলেছেন, মা, এই কথাটা তোকে বলে রাখলাম, সে যদি মরে না গিয়ে থাকে ত তোর অজয়দাকে একদিন নিশ্চয়ই পাবি।

অজয়কে পূর্ব্বের মত গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে মালা পূর্ব্বকথার জের টেনে বললে, পারবেন না!

সে তার প্রথম আবির্ভাবের অপরূপ মুহূর্ত্তটা এখনও ভুলতে পারছে না। বজ্রাহত তালগাছ তার পরেও যতদিন বাঁচে ততদিন যেমন ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ যুগের সমস্ত অভিশাপ মাথায় নিয়ে মালা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রকৃতিকে বিদ্রূপ করেছে। ভাগ্যকে করেছে পরিহাস। তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে এই সত্য বৈদুর্য্যমণি হয়ে ঠিকরাইয়া পড়ছে। এর সমস্তটাই ফুটে উঠেছে তার ব্যক্তিত্বে। অজয় কিছুতেই বুঝতে পারল না কেন এত বেশী ভাবছে! মালার এ জিজ্ঞাসার উত্তর না দিয়ে সে নেমে দাঁড়াল, বললে, আমি চললাম। ভুবনময়ীর খোঁজ নিয়ে বললে, তিনি কোথায়?

মালা কাউকে আটকায় না, সে চায় না। তাই বলতে পারল না, এখনই যাবেন! সে একথাও বললে না, কবে আসবেন! সে তাকে এগিয়ে দিতে দোরগোড়া পর্য্যন্তও গেল না।

একটা টুল টেনে নিয়ে বসল। ভুবনময়ী অজয়কে বাইরে ছেড়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুখহাত ধোবে না? মালা এ কথা শুনতে পেল না। তিনি পুনরাবৃত্তি করলে সে বলে উঠল, উঃ, কি বললে! পরে কথাটা বুঝতে পেরে নিজের এই অন্যমনস্কতায় লজ্জা পেয়ে গিয়ে মৃদু হেসে বলে উঠল, এখানে এনে দাও মা। আগে চা খেয়ে নিই। পরে একেবারে কলে যাব।

শূন্য চায়ের পেয়ালাটা হাতে নিয়ে ভুবনময়ী বললেন, তোর অজয়দাকে চিনতে পারলি নে!

মালা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে ফেলল, কি হবে মা তাঁদের চিনে! আমরা গরীব।

এর সমস্তটাই যে অভিমান বুঝতে বাকী থাকল না। ভুবনময়ী নীরবে হেসে বললেন, প্রায় এক ঘণ্টা বসেছিল, তোর দাদার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তোর কথা বার বার বললে, সে কত বড় হয়েছে, কোথায় গেছে, কি করে!

অপ্রত্যাশিত হারাণ-প্রাপ্তির সমস্তটাই যখন লোকসান না হয়ে লাভ হয়ে দেখা দেয় তখন সেই মানুষের যেমন আনন্দ হয় ভুবনময়ী আজ অজয়কে ফিরে পেয়ে তেমনি আনন্দ পেয়েছেন। তিনি তাকে পুত্রজ্ঞান করেন। তার প্রকৃতি প্রবৃত্তির অন্ধি-সন্ধির খোঁজ রাখেন। তিনি পূর্ব্বে কন্যাকে সান্ত্বনা দিতেন, বিশ্বাস করতেন যে, সে এ জগতে থাকলে একদিন আসবেই। তাঁর উচ্ছ্বাস এখনই এ ক্ষুদ্র কুঁড়েখানাকে প্লাবিত করে দেবে অনুমান করে মালা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দাদার খবরটা দিয়েছ।

ভুবনময়ী বললেন, না। আজই যেন বলতে পারলাম না। তোর বাবার কথাও বলতে পারি নি। কোন খবরই দিতে পারি নি। বললুম শুধু তোর কষ্টের কথা।

মালা নীরবে এগিয়ে গিয়ে আলনা থেকে শাড়ী জামা পেড়ে কাঁধে ফেলে সংক্ষেপে বললে, হয়েছে। তুমি আমাকে একখানা সাবান বের করে দাও।

কলঘরে সাবানটা তিনবার হাত ফসকাইয়া জলের চৌবাচ্চায় পড়ল। সে ঝুঁকে এক চৌবাচ্চা জল থেকে পদার্থটা তুলল। তখনও আলোর ক্ষীণ প্রভা ঘরখানায় আছে। তারই কৃপায় জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে এর অসহায় নিরুপায় অবস্থার কথা ভেবে করুণায় হেসে উঠল। কিন্তু বসে ভাববার মত অবসর তার হাতে নাই। নির্জ্জন চিন্তায় দার্শনিক হয়ে উঠবার স্পৃহাও তার কখনও জাগে না। তাই সে শেষবার সাবানটা তুলে নিয়ে হাত দিয়ে জলে প্রবল ঢেউ তুলে দিলে।

ছোট গোল টেবিল আয়নাটায় দাঁড়িয়ে আলতো করে মাথার সামনের ক'গাছি অগোছাল চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে মালা আর একবার অজয়ের কথা মনে করল। এই দীর্ঘদিন যতবার রাস্তায় এগিয়ে গেছে, ফিরে এসেছে, হয়ত আজও অমনি মিথ্যাটাই দেখেছে।

সে তোরঙ্গ খুলে একটা ব্যাগ বার করে কাঁধে ঝুলিয়ে রান্না-ঘরে গিয়ে বললে, মা, আমি বেরুচ্ছি।

ভুবনময়ীর হাত জোড়া ছিল, কাঁসিখানার কোটা আনাজগুলো কড়ায় ঢেলে দুবার খুন্তি নেড়ে বললেন, কখন ফিরবে।

একটু রাত হবে। ওদের পরীক্ষা এসে গেছে।

ভুবনময়ী বললেন, এস মা। সাবধানে যেও।

মালা যখন ছাত্রীদের ঘরখানায় পৌঁছল তখন তার দুটি ছাত্রী পাঠ ঠোঁটস্থ করতে ঘর ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। তার নিঃশব্দ আগমন লক্ষ্য করে নাই। তারা এতই মনোযোগী যে তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে এখন নিশ্চয়ই মনে করত, বাংলা দেশে পোড়োয়া ফেল করে বিধিলিখনে।

ফাইনাল পরীক্ষার পূর্ব্বে ক'মাস পাড়ায় পাড়ায় পাঠের যে অবিশ্রান্ত বিমিশ্র উচ্চারণ-সুর উত্থিত হয় তা বর্ষাকালের দাদুরীর ডাক মনে করিয়ে দেয়। এ দেশটার নিতান্তই মন্দ কপাল! এত মনোযোগী ছাত্র থাকা সত্ত্বেও তরুণদের অকৃতকার্য্যতা লজ্জাকর হয়ে উঠছে।

মালা ভূগোল পাঠের কৌশলটা বাৎলিয়ে দিয়ে আজকের মত উঠে পড়ল। ছাত্রী বলে উঠল, দিদি আপনি একটু বসুন, বাবার কি দরকার আছে।

মালা কুঞ্চিত কপালে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবল। পরে আলগা ভাবে বললে, আচ্ছা গিয়ে পাঠিয়ে দাও।

বিনয়বাবু ঘরে ঢুকলেন। কৌচে গিয়ে বসলেন। বয়স চল্লিশের উর্দ্ধে, কানের পাশে ক'গাছা চুল পেকেছে। অমিতাচারের প্রথম চিহ্নগুলি অবয়বের নানান জায়গায় ফুটে উঠেছে। এই ঘরখানার রুচি ও পারিপাট্য দেখে মনে হয় না তিনিই এ বাড়ীর অধিকর্ত্তা। বিয়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে তিনি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-টুকু খুইয়ে বসেছেন। এমনই হয়, পৃথিবীতে বিত্ত এসেছে মানুষের ঘরে, পশ্চাৎদ্বার দিয়ে গেছেও অন্ধকারের চোরা গলিতে!

তিনি মালাকে তুমি বলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কিন্তু তার হিমালয় ব্যক্তিত্বের গভীরে 'পাদমেকং' প্রবেশ করতে না পেরে ফিরে এসেছেন। তাই বয়সে বহু ছোট এই মেয়েটিকে আজও আপনি বলেন। তাঁর কন্যাদের পাঠ প্রস্তুতের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে গিয়ে কতদিন বলি বলি করেও সে কথাটা বলতে পারছিলেন না, দুবার ইতস্ততঃ করে কথাটা বলে ফেললেন, তিনি বললেন, আপনার পড়ানোর ক্ষমতা আছে বটে!

মালা এই ভূমিকার বিন্দুমাত্র বুঝতে না পেরে পূর্ব্ববৎ দাঁড়িয়ে রইল।

বিনয়বাবু বলতে লাগলেন, আমার আপিসে জয়েন করুন না! অনেকদিন থেকে বলব ভাবছিলুম। কিন্তু কি মনে করেন।

মালা বললে, আপনার কি লোকের অভাব হয়েছে।

গুণী লোক পাচ্ছি না।

তার প্রতি কথায় বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন। মালা বললে, গুণাগুণের বিচার করতে হলে বিচারকের গুণ থাকা চাই।

বিনয়বাবু তার অতদূর স্পর্দ্ধায় সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা অনুভব করলেন। অতি কষ্টে নিজকে সংযত রেখে আরও কি বলতে গেলেন। কিন্তু তিনি ভিতরে ভিতরে কাঁপছিলেন। কথা আটকিয়ে গেল।

মালা বললে, আমি দরকারী কথা ছাড়া বলি না, সত্য জেনেও অপ্রিয় কথা কম বলি।—আচ্ছা নমস্কার।

সে এই চাকরিটা গ্রহণ করলে তিনি ধন্য মনে ক   ন। কিছুক্ষণ আগের রূঢ় প্রত্যাখ্যান ভুলে গিয়ে, দীনভাবে বলে উঠলেন, আপনি তর্কের খাতিরে ওকথা বললেন। তা শুনে ধরে নেব আপনি আমার offer গ্রহণ করেছেন।

মালা নীরবে ভেবে কিছুক্ষণ পরে বললে, কত মাইনে দেবেন।

বিনয়বাবু আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, আমি handsome দিই।

বুঝলাম না, স্পষ্ট করে বলুন।

তিনি কিছুমাত্র না ভেবে বলে উঠলেন, এই ধরুন আপনাকে প্রথমে আড়াই শো দেব, আপনার গুণ আছে, এক বছরেই সাড়ে তিন শ' করতে পারবেন।

মালা সংক্ষেপে বললে, এই টাকাই দেবেন?

হাঁ।

আচ্ছা। কালই আপনাকে লোক দেব। তিন দিন দেখবেন দক্ষতা না দেখালে বরখাস্ত করে দেবেন।

বিনয়বাবু যে পরিমাণ আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন মালার এই কথায় তৈলহীন প্রদীপের মত নিভে গেলেন। স্তিমিত কণ্ঠে বললেন, শুনেছি আপনি কষ্ট করেন তাই চাকরিটার কথা তুলেছিলাম। নিলে আপনার কষ্ট দূর হ'ত।

তা হ'ত।

অতি সংক্ষিপ্ত এই দু'কথার উত্তরে তুষ্ট হতে না পেরে বিনয়বাবু আরও বেশী কি আশা করে অসত্য অভিমানে উঠে দাঁড়ালেন। মালার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অপ্রত্যাশিত আচম্বিতে দুই হাত মুঠায় পুরে একান্ত আবেগে অনুনয় করে উঠলেন, তুমি এ কাজটা নাও, সত্যি আমি তোমার কষ্টে কাঁদি।

মালা এই কাণ্ডটাই অনুমান করেছিল। সে রাগল না। উত্তেজিত প্রতিবাদও করল'না। ধৃত হাতখানাকে মুক্ত করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে স্তব্ধ অরণ্যের মহামৌন বুকে নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। বিনয়বাবু তাকে আকর্ষণ করলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্যর্থতার সূক্ষ্ম বেদনায় ভিজে গলায় বললেন, কিছুই বলবে না।

তাঁর উত্তেজনার বেগ মন্দীভূত হয়ে এলে মালা ধীরে ধীরে বললে, আপনি এখন আমার মতামত চাননি ত। শুধু শুনিয়ে দিলেন আমার জন্য ভাবেন, আমার জন্য কাঁদেন।

এ কি সত্য নয়!

আমি মিথ্যা বলি নি।

এই কথা ক্ষীণ আশার আলো জ্বালিয়ে দিল, বিনয়বাবু সামান্য আশ্বাস পেয়েছেন মনে করে আবেগে বলে উঠলেন, আমি তোমার সম্মতি পেলাম।

না।

তার এই কঠিন উচ্চারণের দৃঢ় 'না' শুনে বিনয়বাবু অবশ হ॓ য় গেলেন। মুঠা থেকে হাত দুটা খসে গেল। বুঝলেন এই 'না' আর কখনও 'হাঁ' হবে না।

মালা যাবার জন্য পা বাড়াল বলল, আর পনের দিন আমি আপনার বাড়ী আসব। এই ক'দিন আর জ্বালাতন করবেন না।—নমস্কার।

এই বিরাট বাড়ীটার নোংরাগর্ভ থেকে বেরিয়ে শুচিতায় পরিশোধিত হয়ে মালা এই কথাটাই ভাবল যে, মানুষ এই রকম নির্বোধ! সে বীণার যে তন্ত্রীতে সুর বেঁধেছে সেখান থেকে যে সুরলহরীর মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হয় তা ঘৃণার নয় নিন্দার নয়। তা শ্রোতাকে মুগ্ধ করে এই ভাবিয়ে যে, মানুষে মানুষে বিভেদ শুধু কি লালসা! জীবনে যে না-পাবার স্বাদ পেল না, বঞ্চনার দুঃখ পেলে না পরন্তু আরামে কাল কাটাবার গৃহ-গৃহিণী সমস্তই যার আছে তারও অভাব কেন থাকে; কেন অতর্কিত এই ভাবে কদর্য্যরূপে ফুটে ওঠে। সে এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারল না। সমস্ত পথটা ভাবতে ভাবতে এল।

খেতে খেতে ভুবনময়ীকে আজকের কথা পেড়ে বললে, মা, চল্লিশ বছর ত একটা লোকের কম না। অত বয়সেও মানুষ কি করে বুদ্ধি হারায়।

ভুবনময়ী এই তত্ত্বকথায় যোগ না দিয়ে শঙ্কায় সন্দেহে বলে উঠলেন, কাজ নেই মা অমন চাকরি, কাল থেকে আর যেও না।

তাঁর সন্দেহ নিরীক্ষণ করে মালা বললে, সাধ্য কি কেউ আমার ক্ষতি করে। আমি তোমারই ত।

ভুবনময়ী তৃপ্তিতে একটা শ্বাস ত্যাগ করে বললেন, ও বিশ্বাস আমার আছে, তাই ত সর্ব্বান্তকরণে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। তার পরে তিনি বিষয়ান্তরে গিয়ে বললেন, আরে সেই আগেরই মত ছেলেমানুষ আছে, তোকে দেখেই অমন জড়সড় হয়ে গেল। না রে, ও চিরকালই শিবের মত সাদা।

মালা এই বিষয়টা চাপা দিতে মাঝপথে সাংসারিক বিষয়ে দুচারটা কথা উত্থাপন করেও ভুবনময়ীকে নিরস্ত করতে পারল না। তিনি পৃথিবীতে এই একটি মাত্র ব্যাপারে দুর্ব্বল, নিতান্তই দুর্ব্বল। যখনই যে কোন কথা উঠেছে বিষয়টা গিয়ে থেমেছে তাতে। সে যদি থাকত, সে যদি শুনত—এই রকম হ'ত ঐ রকম করত। তার মায়ের এই প্রিয় পাত্রটিকে নিয়ে যত দিন যত কথা হয়েছে মালা নীরবে এই শাস্তি ভোগ করেছে। স্থান ত্যাগ করলে ভুবনময়ীর কথায় যতি টানা যায় কিন্তু সে এখন খাচ্ছে, শেষ না করে ওঠে কি করে।

ভুবনময়ী বলতে লাগলেন, একটা কথা এখনও বলি নি। তিনি থেমে গেলেন। মালা এই প্রথম কৌতূহলী হয়ে উঠল। কিন্তু সে তার অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম ঘাতপ্রতিঘাত কখনও কারও কাছে প্রকাশ করে না, লজ্জা পায়, তাই পরের কথাটা শোনবার জন্য নীরবে নতমুখে প্রতীক্ষা করতে লাগল। তিনি বললেন, সে এই

ক' বছরে পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছে। কি কি বললে যেন মনে করতে পারছি নে।

মালা মন্তব্য করল, বাবার টাকা থাকলে মানুষ ঘোরে। ঘুরলেন, কিন্তু কেন, কোন কাজে।

ভুবনময়ী বললেন, সেই কথাই ত হচ্ছিল। ও ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিল। এমন সময় তুই এসে পড়লি।

অনেকক্ষণ নীরবতার পরে কি একটা সত্য মিথ্যা যাচাই করে নিতে মালা প্রশ্ন করল, আচ্ছা মা, তুমি কাকে বেশী ভালবাস, আমাদের না তাঁকে।

ভুবনময়ী তাঁর কন্যাকে চেনেন। ভালবাসার হিসাব সে কখনও নেয় না, যে বিষয়ে ব্যথা সে ঐ ক্ষুদ্র বুকখানার চেপে রাখে—তা উনি মুখের আলোয় দেখতে পান। আজ হঠাৎ এই প্রশ্নে কিছুই বুঝতে না পেরে নীরবে ভাবতে লাগলেন। একটুখানি পরে বললেন, নিজেই কি ছাই বুঝি কাকে কতখানি ভালবাসি। কিন্তু আজ এ জিজ্ঞাসা কেন মা।

ন', এমনি। মালার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে শূন্য কাঁসার থালাখানার আনমনে তর্জনী দিয়ে আঁক কাটতে কাটতে মুখ তুলে বললে, ভাবছি যদি কখনও ঠকো সে দিন বঞ্চনার দুঃখ তুমি ভুলবে আর কাকে পেয়ে।

ভুবনময়ী হেসে বললেন, তোমার কথার বহুদূর অর্থ আমি করতে পারলাম না। কিন্তু মা, সংসারের হিতাহিত, শুভ-অশুভ বোধ, বোধ করি বিধাতা মেয়েদের এই বুকখানার লোহা পুড়িয়ে দাগিয়েছেন যে দিন এরা মা হয়। এ ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের কল্যাণ আর কে বেশী বোঝে।

মালা সকালে স্নান করে কাপড় পরে রান্নাঘরে এল। সে সাদা জর্জেট পরেছে। গায়ের জামাটা সাদা, কনুই পর্যন্ত হাতায় সবুজ রেশমের ফুল লতা পাতা। মাথার ঘন চুল 'পনিটেল' করে পিঠে এলিয়ে দিয়েছে। সে একটা টুল টেনে এনে দোরগোড়ায় বসল। ভুবনময়ী প্লেটে মুড়ি দিয়ে চা ছাঁকতে বসলেন, বললেন, আজ তাড়াতাড়ি ফির, সে আসবে।

বলে গেছেন?

না। কিন্তু আসবে সে ঠিকই।

আচ্ছা।

এই সকালেই শহরে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেছে। মহানগরীর এ মহাযজ্ঞের বলি হতে দিক থেকে মানুষ ছুটছে দিগন্তরে। বাস, ট্রাম, রিক্সা, মান্ধাতার কাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল রকম যানবাহন অবিশ্রাম এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্তে ছুটছে, যাত্রীতে ঠাসা। কারও অন্য লক্ষ্য নেই অন্য ভাবনা নেই। গত রাতের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, নিদ্রা-অনিদ্রার কথা বিস্মৃত হয়ে শুধু একটার লক্ষ্যে ছুটছে।

সকাল হয়েছে। কে চোখের জল ফেলল, কে চোখের জল মুছে দিল সমস্তই কোথায় হারিয়ে গেছে। সকালে তাজা ফুলের মত বাগানে বাগানে ফুটে অপরাহ্নে নিস্তেজ বিষণ্ণ হয়ে ঝিমিয়ে পড়বে, ঝরে পড়বে, ফিরবে ঘরে ঘরে।

সায়াহ্নের সূর্য্য রক্তবর্ণ আভায় শহরের গাছের মাথার পাতাগুলো রাঙিয়ে দিয়েছে। উচ্চ উদ্ধত কোঠাগুলোর ফাঁক দিয়ে কৃপণ ছটা সূক্ষ্ম সুতার মত মাঝে পড়ছে পথচারীদের কপালে, ঘাড়ে, মাথার চুলে।

মালা আপন মনে হাঁটছে। তাকে চমকিয়ে দিয়ে একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে অজয় বলে উঠল নমস্কার।

মালা বোধ করি তার কথা ভাবতে ভাবতেই হাঁটছিল। সে চকিতে পিছন ফিরে তাকে দেখে স্মিত হেসে প্রতিনমস্কার করল।

দূরে জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। বড় বড় কৃষ্ণচূড়া, আম, দেবদারু গাছ নীচে ঘাসের উপরে শেষ ছায়া ফেলেছে। কয়েকটা ছাগল, বাছুর এখনও মুখ নীচু করে ঘাস চিবুচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে দেখছে, বোধ হয় তাদের মনিবদের খুঁজছে। একধারে একখানা ইজিল রাখা রয়েছে। কাঠখানার বুকে একটা মস্ত সাদা কাগজ। অসমাপ্ত একটা ছবি। বোধ হয় অজয় আঁকছিল।

তার হাতের তুলিটার উল্টো দিক দিয়ে কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে অজয় বললে, দেখুন একটা ভুল হয়ে গেছে।

তার এই সর্ব্বভোলা স্বভাবের নিরহঙ্কার বক্তব্যে মালা চোখ তুলে বললে, কি?

আমি কাল বলেছিলাম আপনি মালা না।

মালা মৃদু হেসে বললে, বেশ ত আমি না হয় আর কেউ।

আমি রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। কি লজ্জা বলুন ত।

মালা এ কথার উত্তর না দিয়ে বললে, এ দিকে কি করছিলেন।

দেখছেন না, আঁকছি।

থামলেন কেন?

আপনাকে দূর থেকে দেখে চিনতে পারলাম।

তখনও সূর্য্যাস্তের কিছু আলো আছে। সে আরও কিছুক্ষণ আঁকতে পারবে। তাই মালা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আচ্ছা আপনি যান, আমি চললাম।

আপনি এখন কেন যাবেন!

আমার কাজ আছে।

বাড়ীতে ফিরবার পর থেকে ভুবনময়ী কয়েকবার বলেছেন, অজয় এল না ত। কি জানি কি হ'ল।

তাঁর এই উৎকণ্ঠায় মালা গোপনে হেসে কয়েকবার কয়েক রকম মন্তব্য করল। কিন্তু এই গভীর রাতে তাঁকে আর পীড়িত না করে সে বললে, তোমার অজয় আসবে না।

ভুবনময়ী কন্যার মুখের দিকে চেয়ে কিছুই বুঝতে না পেরে আতঙ্কে বলে উঠলেন, কেন? তুমি কিছু বলেছিলে না কি কাল?

মালা হেসে বললে, না। তার পরে আজ তার সাক্ষাতের

কথা উল্লেখ করে বললে, তোমার অজয় দেখলাম ছবি আঁকছেন।

ভুবনময়ী এই চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে হেসে বললেন, তুই ভারী দুষ্ট হয়ে উঠেছিস। এই তিন ঘণ্টা আমাকে কি রকম ভাবনায় ফেলেছিলি বলত?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মালা এক সময়ে বলে উঠল, মা বাবার চিঠি পেয়েছ?

ভুবনময়ী বললেন, হাঁ। লিখেছেন,

ছাড়া পেতে এখনও কয়েক মাস বাকী আছে।

মালা উপুর হয়ে শুয়ে শিয়রের কাছে টেবিল থেকে একখানা বই টেনে নিল। বইখানা খুলে চিহ্নিত পাতায় মনোনিবেশ করল। সে 'মা' উপন্যাসখানার বাংলা অনুবাদ পড়ছিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বললে, মা, এই বইখানা পড়লে দুঃখ কষ্ট আর কিছু মনে থাকে না।

ভুবনময়ী বোধ করি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, গোর্কীর এই বইখানাই পৃথিবীতে নাম করেছে।

মালা কতক্ষণ পড়েছিল খেয়াল ছিল না। দূরের কোন এক থানার প্রহর-ঘোষণার ধ্বনি শুনতে পেয়ে ডানদিকে কাত হয়ে টেবিলে-রাখা টাইমপিসটা দেখে ধড়মড় করে উঠে বসল। দেড়টা বেজেছে। সে বইখানা মুড়ে রেখে দিল। হারিকেনের পলতে কমে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

এমনি করে মালা কি একটা আশায় মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিল। সে আগেও খাটত কিন্তু জোর পেত না। দূরান্তরের যাত্রী নিয়ে পল্লীগ্রামের বলদ যেমন নির্লিপ্তভাবে রাস্তায় পাড়ি দেয়, সে তেমনি জীবনের এই পথটায় পাড়ি জমিয়েছিল। পথের বাহার, সৌন্দর্য, শোভা কিছুই তার নজরে পড়ত না। কিন্তু আজ সে রাস্তার ধারে আমগাছটার পাতা সবুজ দেখে, কৃষ্ণচূড়ার রঙ লালই দেখে। এখন তার দিনগুলো কোথা দিয়ে যে কি করে কেটে যাচ্ছে সে বুঝে উঠতে পারে না। অজয় এই ক'মাসে কতদিন কত সময়ে এসেছে, কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কোনদিন হয় নি। কিন্তু সে অহরহ তার কাছেই আছে। এমনকি রাতে নিদ্রায় সে কোথাও হারায় না, সে সঙ্গে থাকে।

আজ বিকালে আপিস করে ফিরতে ফিরতে মালা একমনে হাঁটছিল। অতর্কিতে একখানা গাড়ী তার পাশে এসে ব্রেক কসল, থেমে গেল। দরজা খুলে অজয় বেরিয়ে এল বললে নমস্কার। তাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বলতে লাগল, আপনাকে রোজ দেখতে পাই না কেন?

মালা বিস্মিত হবার অবকাশটুকুও পেল না। সে তার এই কথা শুনে মনে মনে কি একটা আঁচ করে বললে, আমাকে দেখতে বুঝি অত জোরে গাড়ী থামালেন। কিন্তু এদিকে কোথায় যাচ্ছিলেন, গাড়ী থামালেন, গেলেন না যে?

আপনাকে দেখলাম।

রাস্তায় চেনা লোক দেখলেই বুঝি গাড়ী থামান, নেবে দাঁড়ান। মুখে এলেও সে একথা উচ্চারণ করতে পারল না, বললে, আচ্ছা আপনি যান, আমি চললাম।

অজয় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তাও কখনও হয়। আপনি আসুন।

আমি কোথায় যাব?

আসুন না।

মালা তার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। এমন করে বোধ হয় পৃথিবীর আর কারও উপর নির্ভর করা যায় না। তবু সে বললে, ডাকলেই কি যেতে হয়।

অজয় বললে, আমি ডাকলে হয়।

কিন্তু লোকজন আত্মীয়-স্বজন—।

তার কথা শেষ হ'ল না, অজয় মাঝপথেই বলে উঠল, যাবেন ত আমার সঙ্গে?

মালা প্রশ্ন করতে গেল, লোকে বলতে পারে ও তোমার কে। কিন্তু সে একথা উচ্চারণ করতে পারল না, জিভে আটকিয়ে গেল।

এই রূঢ় কথার কঠিন আঘাতে মানুষ তার গুণ হারায়। জীবনে যে পথে এ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয় নাই, নিষেধের হাজার-গণ্ডা বেড়া ডিঙায় নাই পরন্তু মসৃণ পথে খুসী হয়ে চলতে পেরেছে সে এখনও দেবদারু গাছের মত সরল, বলাকার মত সাদা আছে। অনাত্মীয় যুবকের পাশে বসে গাড়ী থেকে বাড়ীর দোরগোড়ায় নামলে নারীর কোন্ মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় মালা আজও বুঝে উঠতে পারে না। তবু তাকে এই সমাজে থাকতে হয়, তাদের কথা ভাবতে হয়। কিন্তু আজ এই নির্ভর মানুষটাকে 'না' বলার বেদনা কিছুতেই বুক পেতে নিতে পারল না। সে বলল, চলুন।

গাড়ীখানা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। দু'জনে গাড়ীর দুই কোণে বসেছে। কেউ কথা বলছে না। তারা বোধ হয় একটা কথাই ভাবছে যে, এতগুলো বছর কোথা দিয়ে কি করে কেটে গেল। একটা গলির মুখে এসে ড্রাইভার পথের নির্দ্দেশ চাইলে অজয় মালাকে প্রশ্ন করল, কি বলব? মালা তাকে উত্তর না দিয়ে ড্রাইভারকে বললে, ওই রাস্তায় কিছুদূর গিয়ে নামব।

বাড়ীর সামনে ফাঁকা জমিটায় ভুবনময়ী দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের নামতে দেখে এগিয়ে গেলেন। হেসে বললেন, তোমরা কি করে,—

তিনি কি বলছেন শেষ পর্য্যন্ত না শুনে অজয় বলতে বলতে এগিয়ে গেল, এখানে আসছিলাম। ওঁকে রাস্তায় হাঁটতে দেখলাম। বলুন ত, আমার সঙ্গে গাড়ীতে এলে আপনি মনে করবেন কেন?

ভুবনময়ী কথাগুলো বুঝতে না পেরে মালার মুখের দিকে তাকালেন। মালা ধারণা করতে পারে নি যে, সে এমনি করে

তারই সামনে ভুবনময়ীকে এই কথা বলবে। তা হলেও সে মুচকিয়ে হাসছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ?

এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে মালা বললে, রাস্তায় দাঁড়িয়েই গল্প করবে নাকি ? তোমরা এস, আমি চললাম।

সে আগে আগে হাঁটতে লাগল। ভুবনময়ী অজয়কে ডেকে বললেন, এস বাবা।

অজয় হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগল, বুঝলেন, কাণ্ডজ্ঞান নেই, কিছু ভেবে বলেন না, আমি কি পর !

কার কাণ্ডজ্ঞান নেই, কে ভেবে বলে না, সেই কাণ্ডজ্ঞানহীনের নামোল্লেখ না থাকলেও ভুবনময়ী বুঝলেন সে মালার কথাই বলছে। তিনি হেসে সস্নেহে বললেন, কে বলেছে তুমি পর ?

এই উত্তরে খুশী হয়ে উঠে অজয় বললে, বারণ করে দেবেন।

যে অনুভূতিগুলো কপট নিদ্রায় মনের নিরন্ধ্র অন্ধকারে সুপ্ত ছিল আজ ধীরে ধীরে তারা পুনরায় ঘুম ভাঙার আনন্দে নেচে বেড়াতে লাগল। এই ক'মাসেই বার বছরের ব্যবধানকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে অজয় পুনরায় স্বাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে পূর্ব্বের সমস্ত অক্ষত গুণগুলো নিয়ে এই পরিবারে ছিন্ন সূতা সংযোজন করার কাজে লেগে গেল। সে ভুলতে চাইল এই দীর্ঘকালের ব্যবধান। সে এখানেই থেকেছে, এখানেই ঘুরেছে, এখানেই কতকাল কাটিয়েছে। এই ঘরখানা তার পৃথিবী, এখানেই সূর্য্য উঠে, সূর্য্য ডোবে, পাখী গান গায়, নদীতে জলোচ্ছাস হয়, পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ এখানে এসে জমে। সে মুঠায় মুঠায় আনন্দ আহরণ করে। দেয়ালে দারিদ্র্যের যে পরিচ্ছন্ন রূপ, মেঝেতে বিত্তহীনের যে রুক্ষ চিহ্ন, চালায় বঞ্চিত জীবনের যে যুগসঞ্চিত মূর্ত্তি, এই তার আপন, এই তার জীবন, তার ভাল লাগার আলো-অন্ধকারের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব।

কল থেকে বেরিয়ে তাকে এই ভাবে দেখে মালা বললে, কি ভাবছেন ?

হুঁ।

ভুবনময়ী চা দিয়ে গেলেন।

মালা পাউডারের পাফ নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ পরে আড়চোখে তাকে দেখে স্মরণ করিয়ে দিলে, মা চা দিয়ে গেছেন, জুড়িয়ে গেল যে, খেয়ে নিন।

সে পরিপূর্ণ চোখে তাকে দেখে নিয়ে বললে, তোমার—না—আপনার।

মালা হেসে বললেন, বেশ ত তোমার বেরিয়ে গেল, ঢাকলেন কেন।

অজয় জিজ্ঞাসা করল, আমি আগে কি বলতাম।

এই স্পষ্ট প্রশ্নকে 'জানি না' বলে এড়িয়ে গিয়ে মালা বললে, পূর্ব্ব সূত্র ছেড়ে দিন। এখন যা বেরিয়ে গেল সেটাই চালিয়ে যান।

চা খেতে খেতে অজয় অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করল, একটা কথা বলবেন ?

হাতের কাজটা বন্ধ করে ঘাড় বেঁকিয়ে মালা বললে, কি ?

আগে এখানে কাকে দেখতাম, এখন তাকে দেখছি না ত ?

কাকে দেখতেন ?

তা কি করে বলব।

মালা এই অদ্ভুত ব্যাপারটার কিছুই বুঝতে না পেরে কৌতূহলী হয়ে উঠে বলল, তাকে কেমন কেমন দেখতে মনে পড়ে ?

হাঁ।

তার সর্ব্বাঙ্গের নিখুঁত বর্ণনায়, অনুভূতি উপলব্ধির সূক্ষ্মতর অভিব্যক্তি এমন দক্ষ ভাবে ফুটিয়ে তুলল যে, মালার বুঝতে বাকী থাকল না সে কে। তাই এই রহস্যের সমস্ত বন্ধ দরজায় যেখানে যেটুকু ফাঁক ছিল তাও বন্ধ করে দিয়ে বললে, সে নেই।

অজয় ভীতকণ্ঠে বলে উঠল, কেন, কি হয়েছে ?

শোকের সমস্ত বিষাদ কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলে মালা বললে, মারা গেছে।

কেন, কি করে, আপনি তাকে চিনতে পেরেছেন ?

এক সঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন করে তার বিস্মৃত অতীতের প্রিয়র এক্ষুণি মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অজয় অভিভূত হয়ে পড়ল।

মালা বললে, চিনতাম।

অজয় ধরা-গলায় জিজ্ঞাসা করল, বলুন ত কে ?

বললাম ত চিনি, মালা এবারও সুস্পষ্ট ভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

অজয় স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ বসে থেকে এক সময়ে বলে উঠল, আপনাকে কি বলে ডাকব ?

আমার নাম অনেকবার শুনেছেন, মনে রাখেন নি কেন ? মালা একটুখানি থেমে আবার বললে, আপনি বসুন, আমাকে বেরুতে হবে।

কোথায় যাবেন ?

মালা মৃদু হেসে বললে, সব কথা বুঝি জিজ্ঞেস করতে হয় ?

এ কথার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অর্থ বুঝতে না পেরে অজয় বলে উঠল, আমি বাড়ী যাব না।

মালা বললে, না। মার সঙ্গে গল্প করবেন।

এত জোর কোথায় পেল তা মালা নিজেই বুঝতে পারল না। এই 'না' কে না মেনে চলে যাবার সাধ্য নেই। সে কখন কাকে 'হাঁ' বলতে হয় কখন 'না' বলতে হয় জানে। এই জানা মন্ত্রের গণ্ডিটা মোটা করে টেনে দিয়ে সে দিনে রাতে একা চলাফেরা করে, নিজকে বাঁচিয়ে রাখে।

অজয় প্রশ্ন করল, আপনি কখন ফিরবেন ?

আমার দেরী হবে। তার পরে তার মুখের দিকে চেয়ে কি ভেবে বললে, কাল শনিবার, আপনি দুকুরে আসবেন।

এই সময়ে ভুবনময়ী কি একটা নিতে ঘরে এলে অজয় বলে

উঠল, কাল আমাদের বাড়ী আসুন না! ওখানেই গল্প করা যাবে।

ভুবনময়ী হেসে তাকে সমর্থন করলেন। তিনি কি একটা বলতে গেলেন। মালা শান্ত গাম্ভীর্য্যে ডেকে উঠল, মা।

তার এই একান্ত অনুরোধ থাকল না। অজয় ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, জানতাম না। আর কখনও এমন ভুল হবে না।

ভুবনময়ী বলে উঠলেন, ছিঃ।

মালা তেমনি গম্ভীর। সে আবেগে বলতে লাগল, এমনি করে পায়ের তলার মাটি সরে যায় মা। উনি এখানে এলে আদর-যত্ন, মান-সম্মান এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবে না, আমি হতে দেব না। সেখানে আমরা গেলে হবে। জীবনে কিছুই নেই আমাদের, লজ্জা গেলে বাঁচব কি নিয়ে।

ঘরখানা এখন এতদূর ভারী হয়ে উঠল যে, সহজে এ আর লঘু হবে বলে মনে হ'ল না। ভুবনময়ী অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। অজয় নীরবে নতমুখে বসে। মালা পুনরায় বলতে লাগল, আলাপ ত ওঁর সঙ্গে আজকের নয়। উনি নিরুদ্দেশ হলেন, তার আগে কত সন্ধ্যা, কত রাত এখানে কাটিয়ে গেছেন, একবারও কি নিতে চেয়েছেন।

ভুবনময়ী কন্যার অন্তর্গূঢ় মুখের দিকে চেয়ে তার বেদনার সবটুকু বুঝতে পেরে বললেন, চুপ কর মা, চুপ কর। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মানুষ জীবনে কোথাও দুর্ব্বল, কোথাও কঠিন। এগুলো কি তার অপরাধ?

মালা এখন শান্ত হয়ে গেছে। সে অজয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। সে চোখের জল মুছবার কিছুমাত্র চেষ্টা করল না। কাতরকণ্ঠে বললে, আমাকে ক্ষমা করবেন।

অজয় চোখ তুলে চাইল। সে মালার আর্দ্র-চোখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, আমাকে কেন অবিশ্বাস করলেন? আমাকে কেন শিখিয়ে দিলেন না,—

সে কথা শেষ করতে পারল না। মালা বললে, আপনাকে কষ্ট দিলে কষ্ট কি আমি কম পাই? আপনি বড় ছেলেমানুষ। আমার মার দাঁড়িপাল্লায় একদিকে আপনি আর এক দিকে দাদা আর আমি।—

এতকাল যে কথা জানি না, থাক না তা চিরকাল অজ্ঞাত। আপনি ত আমাদের রইলেন।

কত বড় নিতান্ত ভরসায় সে এই কথা উচ্চারণ করলে তা বুঝতে পেরে মালার সমস্ত বুকখানা মথিত করে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল, সে শ্বাস ত্যাগ করে বললে, আপনাকে করব আমি অবিশ্বাস? মরব তার আগে। কিন্তু আমার এ উঁচু ইমারতগুলোর ওপর বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের বাহার দেখে তারিফ করি, ভিতরে গিয়ে একঘণ্টা বসতেও ঘৃণা হয়।

সে যে কতখানি সত্যনিষ্ঠায় একথা বলে গেল, তার মুখ দেখে বোঝা গেল। বিদ্বেষে তার মুখ মসীবর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাগাড়ে পূতিগন্ধময় মৃত গোবৎস শকুন টুকরে টুকরে খায়, হঠাৎ সেই বীভৎসতা দেখে ফেললে পথিকের চোখমুখের চেহারা যেরকম হয় মালার অবস্থা হ'ল তেমনি। সে নিদারুণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই তীব্র ঘৃণার অন্তরালে একজনের জন্য বুকখানায় যে কি ব্যথা রয়েছে তা তার ঐ বিকৃত মুখ ভেদ করেও ফুটে বেরুল। সে জন্মগ্রহণ করেছে রূপায় চামচ মুখে দিয়ে কিন্তু সে জাতিচ্যুত। তাই গরীবের অহঙ্কার তাকে স্পর্শ করে না। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ সে সেখানে অনুভব করে না, করে এখানে, এই শতছিদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে।

মালা শাড়ীর আঁচলে চোখের জলের শুষ্ক ধারা মুছে ফেলে হাসি ফুটিয়ে বললে, আমার দেরী হয়ে গেল—আপনি বসুন।

অজয় কি একটা ভাবছিল, সে অন্যমনস্ক থেকে বলে উঠল, আমাকে ছেড়ে যাবেন না, আমার কাছে বসুন।

মালা তেমনি হেসে বললে, কিন্তু আমার যে ছাত্রীর বাড়ী যেতে হবে, না গেলে তার ক্ষতি হবে।

না, যাবেন না।

আপনার পাশে বসে থাকলে আমার চলবে?

অজয় পূর্ব্ববৎ বলে উঠল, আমি আর কোথাও যাব না।

খুব ভাল কথা। তা হলে ত আজকেই আবার আমাকে পাবেন।

না, তুমি যেও না।

মালা এক মিনিট নীরবে কি ভেবে বললে, তুমি কষ্ট পেলে যাই কি করে?

এতক্ষণ যাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে আটকাতে চাইছিল, ধরে রাখতে চাইছিল, এ কথার পরে অজয় আর নিষেধ করতে পারল না, সে দ্বিধাহীনকণ্ঠে বললে, আমার আর কষ্ট হবে না।

মালা চলে গেল।

"কেম্‌ব্রিজের ইতিকথা"

শ্রীসবিতা ঘোষ

অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ জগদবিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র—এরা বয়সেও অতি প্রাচীন। এদের নাম আমাদের দেশেও সুপরিচিত। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "কেম্‌ব্রিজ" নামটাই আমাদের কাছে পরিচিত—কিন্তু পুরাকালে এর নাম ছিল গ্র্যাণ্টব্রীজ। তা থেকে ক্যাণ্টাব্রীজ ও শেষে হয় কেম্‌ব্রিজ। 'গ্র্যাণ্টা' নামক নদীর ধারে শহরটি গড়ে ওঠায় গ্র্যাণ্টাব্রীজ নামের উৎপত্তি। এখন (আন্দাজ ষোড়শ শতাব্দী থেকে) লোকমুখে শহরাঞ্চলের নদীর নাম দাঁড়িয়েছে 'ক্যাম'। শহরের বাইরে নদীর একাংশের নাম এখনো গ্র্যাণ্টা। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এখনো কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ল্যাটিন ভাষায় ক্যাণ্টাব্রীজ নামটিই ব্যবহার করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতেও 'ক্যাণ্টাব' কথাটির ব্যবহার এই ক্যাণ্টাব্রীজ নাম থেকেই।

কেম্‌ব্রিজ শহরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও অনেক অনেক পুরনো। একাদশ শতাব্দী থেকে নদীর দুধার জুড়ে অ্যাংলো-স্যাকসনদের, পরে নর্ম্যানদের একটি শহর ছিল। "সেণ্ট বেনেডিক্ট" গীর্জ্জার চতুষ্কোণ চূড়াটি এখনো স্যাক্সন বসতির সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে আছে। কেম্‌ব্রিজের সবচেয়ে পুরনো ইমারৎ এইটি। এই গীর্জ্জার চূড়াটির নির্ম্মাণ-কৌশল ও একেবারে উপরের ঘণ্টা-ঘরের বিশিষ্ট ধরনের জানালাটি প্রাক-নরমন যুগের স্থাপত্যের নিদর্শন। কিন্তু কেম্‌ব্রিজের জগৎজোড়া নাম তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ও সুপ্রাচীন। বয়সে অবশ্য আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এর তুলনা চলে না; কিন্তু সে ত চাপাপড়া ইতিহাস। কবর থেকে তাকে তুলে আনা হয়েছে। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতশ', সাড়ে সাতশ' বছরের একটানা ইতিহাস চলেছে—কোথাও ছেদ নেই। আজও সে সজীব। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনের ইতিহাস জানা আছে কিন্তু জানা নেই এর জন্মকথা। আধুনিক যুগের মত করে বোধ হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি কোনদিন—এ নিজেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এইটুকু শুধু জানা যায় যে, ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড থেকে কিছু বিদ্যার্থী কেম্‌ব্রিজে চলে আসেন। তখন থেকেই এই বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন বলে ধরা যেতে পারে। ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দের নথিপত্রে 'ইউনিভার্সিটি' কথাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয় আইনতঃ স্বীকৃত হয় ও কিছু কিছু বিশেষ সুবিধা-সুযোগ পায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরস্পরের অধিকার ও ক্ষমতার সীমা নিয়ে নাগরিক 'কর্পোরেশনের' সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয় গোষ্ঠীর দেড়শ' বছরেরও বেশী দিন ধরে অশান্তি, এমন কি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলে।···এই 'টাউন' আর 'গাউন'-এর ঝগড়ার কথা লিখতে গেলে এক আলাদা ইতিহাস হয়। ক্রমে কেম্‌ব্রিজের শহর হিসেবে মর্য্যাদার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাতিই ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে।

প্রথম কলেজ "পীটার হাউস" প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৮৪ সনে। লক্ষ্য করার বিষয়—বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার অর্দ্ধ শতাব্দীর পর হ'ল প্রথম কলেজের পত্তন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ক্রমে ক্রমে আরও সাতটি কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। কলেজ স্থাপনার আগে পর্য্যন্ত ছাত্রদের থাকবার কোন বিশেষ ব্যবস্থা বা নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। কেউ ছোটখাট কোন অস্থায়ী ছাত্রাবাসে, কেউ সাধারণ কোন বাড়ীতে থাকতেন। এই কলেজগুলি মুখ্যতঃ ছাত্র ও শিক্ষকদের থাকবার ও লেখাপড়া করবার জন্যে তৈরী হয়। এই পড়ুয়া ও মাষ্টারদের একসঙ্গে থাকাটার শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্য আছে—আজও তাই কেম্‌ব্রিজ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা 'কলেজ' বলতে বুঝি যেখানে ছাত্রদের ক্লাস হয়। এখানে কিন্তু ছাত্ররা কলেজে বাস করে; কলেজে কোন ক্লাস-লেকচার হয় না। 'সুপারভাইজার-এর' অধীনে পাঠচর্চ্চা হয় ঘরোয়াভাবে। ক্লাস-লেকচারের-ব্যবস্থা আছে—'ইউনিভার্সিটি ফ্যাকালটির' অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন কলেজ স্থাপনা সুরু হয় তখন একান্ত আবশ্যক যেটুকু সেইটুকুই শুধু তৈরী হ'ত। এখনকার মত রাতারাতি অট্টালিকা তৈরী করে তবে কাজকর্ম্ম সুরু করার মত সুবিধা সেকালে ছিল না। বহু ধীরে ধীরে, যুগে যুগে প্রয়োজনের একান্ত তাগিদে এক-একটি কলেজের এক-একটি অংশ তৈরী হয়েছে—তার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে পঠন-পাঠন। কলেজভবন তৈরী হবার আগে ছাত্রদের শোবার ও লেখাপড়ার জন্যে স্থানীয় বসতবাড়ী কিনে নিয়ে কাজ চালানো হ'ত—সকলের একত্র উপাসনার জন্যে নিকটস্থ গীর্জ্জাই ছিল যথেষ্ট। শুধু গুরু-শিষ্য সকলে একসঙ্গে আহার করার জন্যে একটি বড় হলঘরের দরকার হ'ত—সুতরাং এইটিই তৈরী হ'ত সর্ব্বাগ্রে। এখনও এখানে 'কলেজ-হল'—মানে কলেজের খাবার ঘর। 'পীটার হাউস' কলেজটি দেখলে তখনকার কলেজভবনগুলির নক্সা আন্দাজ করা যায়। সাধারণতঃ এক-একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ মাঝখানে রেখে, আবশ্যকমত তার চারিপাশ ঘিরে ক্রমে ক্রমে এক-এক কাজের জন্য এক-একটি গৃহ নির্ম্মিত হ'ত। এক-একটি কলেজের এইরকম তিন-চারখানি করে প্রাঙ্গণ ও তার চারিধারে এক একটি বড় বড় ভবন আছে। এইগুলিকে কোর্ট

কোর্ট, সেকেণ্ড কোর্ট, ক্লয়েষ্টার কোর্ট ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়।

'পীটার হাউস'-এর প্রতিষ্ঠাতা হিউন্-ডি-বাল্শাম, বিশপ-অব-ইলি—তাঁর চৌদ্দটি ছাত্র নিয়ে দুখানি সাধারণ বসতবাড়ী কিনে প্রথম তাঁর কলেজ খোলেন (১২৮৪)। মাত্র দুই বৎসর পর তাঁর মৃত্যুসময়ে তিনি কিছু অর্থ রেখে যান তাঁর ছাত্রদের জন্যে। ছাত্ররা আরও দুই বছর পর ১২৮৮ সনে ঐ বাড়ী দুটির পিছনে জমি কিনে সুন্দর 'হল' তৈরী করেন। তার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে এই কলেজের গৃহ-নির্মাণ। তৈরী হয়েছে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের এক-একদিকে এক-এক যুগে ছাত্রদের থাকবার জন্যে ছোট ছোট ঘর ও টানা বারান্দা—একে বলে 'ক্লয়েষ্টার কোর্ট'। আবার যুক্ত হয়েছে অন্য প্রাঙ্গণ—তার চারিধার ঘুরে উঠেছে আরও নানা প্রয়োজনে নানা সদন ও ভবন; তৈরী হয়েছে পাঠাগার, কম্বিনেশন রুম ইত্যাদি। (কম্বিনেশন রুম হচ্ছে 'হলঘরে' আহারাদির পর শিক্ষকদের কফি (coffee) খাবার ও ধূমপান করার ঘর। 'পীটার হাউস'-এর পাশেই একটি দ্বাদশ শতাব্দীর পুরণো 'সেন্ট' পীটারের নামে উৎসর্গীকৃত গীর্জ্জা ছিল। সেই গীর্জ্জার নামানুসারে কলেজের নাম পীটার হাউস হয়। রাস্তা থেকে আজ যে পীটার হাউস ভবন ও চ্যাপেল দেখা যায় তা অনেক পরে তৈরী। এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর পীটার হাউসের পুরণো বাড়ীগুলির শুধু একটি দেওয়াল অবশিষ্ট আছে। পীটার হাউসের সেই সাতশ' বছরের পুরণো হলঘর কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে আছে। আজও সেখানে পুরণো প্রথামত গুরুশিষ্য একত্রে বসে আহার করেন। এই 'হল'-এর দুপাশের দরজা দুটি আদি ও অকৃত্রিম রয়েছে এখনও। ভীষণ ভারী, পুরু কাঠের তৈরী কবাট। দরজা দুটি এতই ছোট আর নীচু যে মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়। মানুষের পুরণোর প্রতি শুধু যে মমত্ববোধ তা নয়, সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাও যেন হাড়ে-মজ্জায় জড়ানো। তাই এই সাতশ' বছরের পুরণো দরজার কাছে এলে মাথা আপনিই নত হয়ে আসে।...কথা প্রসঙ্গে 'পীটার হাউস' সম্পর্কে দু-চার কথা এসে পড়ল। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক্।

তখনকার যুগে 'মঙ্ক'রাই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন, (ধর্ম্মের নামে নানারকম শপথ নিয়ে 'মঙ্ক' হতে হয়—অনেকটা বৌদ্ধভিক্ষুদের মত)। তাই অনেক রকম বাধা নিষেধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে। ক্রমে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব ধর্ম্মের গোঁড়ামির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে গত একশ' বছরে এর অনেক সংস্কার হয়েছে, অনেক আধুনিকতা এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে ধর্ম্মবিষয়ক যে পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা তুলে দেওয়া হয়। কলেজের 'ফেলো'দের এখন বিবাহ করায় বাধা নেই। আগে ছাত্রদের পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব কলেজগুলিই বহন করত। এখন বিশ্ববিদ্যালয় অনেকাংশে তা ভাগ করে নিয়েছে। যদিও এখনও বিশেষ করে কলেজে সুপারভাইজরদের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করেই ছাত্ররা পরীক্ষার জন্যে তৈরী হয়। নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হয়। ১৮৬৯ সনের আগে মেয়েদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন স্থান ছিল না। বর্তমানে মেয়েদের জন্য তিনটি কলেজ আছে। মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোপুরি সভ্য হবার অধিকার অর্জ্জন করেছেন মাত্র ১৯৪৮ সনে। বলা বাহুল্য, কেমব্রিজে "কো-এডুকেশন" সহশিক্ষা নেই। দুই কিংবা তিন বৎসর কেমব্রিজে থেকে পরীক্ষা দিয়ে বি-এ ডিগ্রী পেতে হয়। এম-এ-র জন্য আর কোন নূতন পরীক্ষা নেই। বি-এ পাশ করার একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর কর্তৃপক্ষ এম-এ ডিগ্রী দিয়ে দেন। বর্তমানে একুশটি কলেজ আছে—তার মধ্যে আঠারোটি ছেলেদের। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা আন্দাজ আট হাজার। এছাড়া আছে চারশ' 'নন-কলেজিয়েট' ছাত্র। চ্যান্সেলর, মাষ্টার ও সমস্ত ছাত্রসংখ্যা মিলিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যা ৬৫,০০০ (১৯৫৭ সনের হিসেব অনুযায়ী)। গত চল্লিশ বৎসরে কেমব্রিজের সীমানা অনেক বাড়াতে হয়েছে। বড় বড় আধুনিক গবেষণাগার তৈরী হয়েছে। অতি আধুনিক কলেজ-বাড়ীতে যারা থাকে তারা 'সেন্ট্রাল হিটিং' ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার সব সুযোগ-সুবিধা পায়—আবার কোন কোন ছাত্র আদিকালে যে-সব ঘরে পণ্ডিত ইরাসমাস বা এলিজির (Elegy) কবি গ্রে ছিলেন সেই সব ঘরে থেকে নিজেদের ধন্য মনে করে। এই হচ্ছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব মোটামুটি ইতিহাস।...

ইতিহাসের পাতা থেকে চোখ তুলে আজকে কেমব্রিজের দিকে তাকালে অনুভব করি প্রাচীনত্বের যথোচিত সম্মানও এ সব দেশে আছে। পুরণো পুরণো কলেজভবন ও গীর্জ্জাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা সর্ব্বত্রই বর্তমান। কিন্তু এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, আধুনিকতাকে এই বিশ্ববিদ্যালয় দূরে ঠেলে রেখেছে। অনেক পুরনো ঐতিহ্যকে যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও এখানে অনুসরণ করা হয়—তেমনিই আবার অতি আধুনিক বিজ্ঞানের বহুমুখী গবেষণারও কর্ণধার এই কেমব্রিজ। এখানকার 'ক্যাভেণ্ডিস' গবেষণাগারেই আজকের আণবিক বিজ্ঞানের জন্ম। গুরুশিষ্য সকলে এক সঙ্গে এক বড় হলঘরে খেতে বসার নিয়ম এখনও চলেছে। ছাত্রশিক্ষক সকলকেই এখানকার বিশেষ পোশাক—খুব ঘের দেওয়া কালো 'গাউন' পরতে হয়। অনুমান এই পোশাকটিও পুরাকালের মঙ্কদের পোশাক থেকেই এসেছে। এখানকার আবহাওয়ায় কোথায় যেন কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এ যেন এক বিলিতি শান্তিনিকেতন। কত মনীষীর যে এই কেমব্রিজে প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হয়েছে ভাবলে কেমব্রিজের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। জগদ্বিখ্যাত বহু বৈজ্ঞানিক, কবি এখানকার ছাত্র ছিলেন। কেমব্রিজে ছাত্রজীবন কাটিয়ে এক এক জন এক এক

বিষয়ে দিক্‌পাল হয়েছেন। একদিকে নিউটন, ডারউইন, রাদারফোর্ড, অন্যদিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মিল্টন, টেনিসন, বায়রণ, টমাস গ্রে, স্পেনসর, সেক্সপীয়রের সমসাময়িক ক্রিষ্টোফর মার্লো—ইত্যাদি বহু বিশ্ববিশ্রুতজনের স্পর্শ যুগ যুগ ধরে কেমব্রিজের ইটের দেওয়ালে, নদীর ধারে, আকাশে-বাতাসে রয়েছে, আমাদের শ্রীঅরবিন্দ এখানকার সেন্টজনস্ কলেজের ও জওহরলালজী টি নিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন।

আধুনিক কেমব্রিজ শহরটি খুব বড় নয়। শহরের গড়নটা মোটামুটি ইংরেজী "Y" অক্ষরের মত। দুটি বড় রাস্তা যেন "Y"-এর দুটি বাহু। এই দুই বড় রাস্তার উপরই অধিকাংশ কলেজ। রাস্তা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এই দুইটি রাস্তা শহরের প্রায় শেষ সীমায় যুক্ত হয়ে গিয়ে একটি রাস্তা হয়ে শহরের বাহিরে চলে গেছে। ক্যাম নদীটি এই দুই বড় রাস্তার একটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বয়ে গিয়েছে, নদীটি ছোট, অত্যন্ত সরু, দু' পাশ বাঁধানো। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের দেশের লোকের কাছে এটা একটা সরু বাঁধানো খাল বিশেষ। যে সব কলেজের সদর ফটক উপরোক্ত রাস্তার উপর, তাদের পিছন দিকে পড়ে এই ক্যাম নদী। প্রত্যেক কলেজের নিজস্ব সেতু আছে এই নদীর উপর। নদীর ধারে প্রতি কলেজের নিজের বিস্তৃত এলাকা, বাগান, ঘাসের বিরাট বিরাট ময়দান। এই দিকটা 'কলেজ ব্যাকস'—সংক্ষেপে শুধু ব্যাকস নামে খ্যাত। বসন্তকাল থেকে গরমের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ইংরেজী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত নানান রকম ফুল ফোটে—তখন এই বিশ্ববিখ্যাত ব্যাকস-এর শোভা হয় অপূর্ব্ব! পালা করে মরশুমী ফুলের মহোৎসব লেগে যায়। দলে দলে দেশী-বিদেশী পর্য্যটক এসে জোটে চারি ধার থেকে—ট্রেনে, বাসে, কোচে, মোটরে চড়ে। লণ্ডন থেকে কেমব্রিজের দূরত্ব মাত্র ৫৪ মাইল। কন্টিনেন্টের টুরিষ্ট যারা 'হাইকিং' করতে বের হয়—তারা বাইসিকল-এ বা পায়ে হেঁটে চলে—পিঠে পর্ব্বত-প্রমাণ বোঝা চাপিয়ে—রাস্তার মানচিত্র হাতে করে দ্রষ্টব্য যা কিছু সব দেখে বেড়ায়। এই সব টুরিষ্টদের প্রায় প্রতি তৃতীয় জনের হাতে নয় কাঁধে ঝোলে ক্যামেরা। বেহিসেবী অসংখ্য, অজস্র ছবি তোলে তারা—সাধারণ পথিকদের রাস্তা চলা ভার। এই সময় দোকানে দোকানে ঝোলে বসন্তের ফুলে ভরা এই বিখ্যাত ব্যাক্‌স-এর সুন্দর সব ফটোগ্রাফ—'পিকচার পোষ্টকার্ড'। এই ব্যাকসে বিশেষ করে কিংস কলেজের পিছনে প্রথম ফোটে 'ক্রোকাস' ফুল—খুবই অল্প দিনের জন্যে এরা হয়, অতি সুকুমার হাল্কা নানা রংয়ের। তার পর আসে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ড্যাফোডিলস—এদেরই বসন্তের প্রথম ফুল বলে ধরা হয়। লম্বায়, চওড়ায় মাইল-জোড়া নদীর ধারের সমস্ত মাঠে-ঘাটে এই উজ্জ্বল হলদে ফুলের হাট বসে যায়। নদীর খোলা হাওয়ায় এরা এক স্রোতে হেলেদুলে মাথা নাড়ায়। এর পালা সাঙ্গ হলেই 'টি নিটি ব্যাকস-এর আসরে আসে নানা উজ্জ্বল রঙে সেজে 'টুলিপ' ফুলের দল। এমন কোন রং বোধ হয় নেই—যে রঙের টুলিপ ফুল হয় না। এক একটি সোজা ডাটার উপর এক একটি ফুল—রঙীন আলোর বাল্‌ব-এর মত দেখায়। এ ফুলের পাঁপড়িগুলি ছড়িয়ে খোলে না, পাঁপড়ির বিন্যাস আধফোটা কুঁড়ির মত। এই টুলিপ ফুলের সঙ্গে আছে 'চেরীব্লসমস' এর বাহার, দুধারে চেরীব্লসমস-এর সারি দিয়ে একটি বীথিকা এভিনিউ আছে—বসন্তের শেষ দিকে যথার্থই অপার্থিব শ্রী হয়। সাদা ধপধপে ফুলের যেন ঝরণা নেমে আসে প্রতি গাছে, আলোর স্রোত বইয়ে দেয় চারিদিকে। নদীটিকে বাঁধিয়ে ফেলে যেমন তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হানি করা হয়েছে, তেমনি মানুষ নিজের হাতে প্রকৃতিরই মালমশলা দিয়ে তার চারিধার খুবই রমণীয়—একেবারে ছবির মত করে রেখেছে। এই ব্যাকস কিন্তু সাজানো কেয়ারী করা ফুল বাগান নয়। নদীর ধারের এই বিস্তৃত খোলা মাঠে প্রতি কলেজের নিজস্ব সীমানা আছে। পুরাকালে এখানে বন্য ফুলেরই শোভা ছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ সেই সব ফুলকেই প্রতি বৎসর বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। প্রকৃতির খুসীর সঙ্গে মানুষের হাতের সেবাযত্নের যোগে এদের যথাসম্ভব একটা বন্য আবহাওয়াই দেওয়া হয়। অতি যত্নেই খেটে-খুটেই একে বন্য (wild) করে রাখা হয়েছে। এ হ'ল studied negligence—চেষ্টাকৃত এলোমেলো অন্যমনস্কতা। এই ব্যাকস ছাড়াও প্রতি কলেজের তিন-চারখানা করে সবুজ মখমলের মত বিরাট বিরাট ঘাসের চত্বর আছে—তার চারি ধারে আছে কেয়ারী করা ফুল বাগান। কলেজে কলেজে যেন এই সময় প্রতিযোগিতা চলে নানা রকম করে ফুল ফোটাবার। শুধু মরশুমী ফুলেরই সৌন্দর্য্য নয়, বড় বড় গাছও এই সময় শীতের নগ্নমূর্ত্তি কচি পাতায় ঢেকে ফেলে। বিশাল বিশাল চেষ্টনাট গাছের এক ঐশ্বর্য্য আছে। নদীর ধারে ধারে 'উইপিং উইলো' গাছ ডালপালা লুটিয়ে উপুড় হয়ে আছে নদীর টলটলে জলে ছায়া ফেলে। লণ্ডনের 'টেম্‌স' নদীর মত এখানকার ক্যাম নদীতেও অনেক রাজহাঁস সাতার দিয়ে বেড়ায়—এ ছাড়া আছে রঙীন ছোট ছোট হাঁস। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই হাঁসদের রুটির টুকরো খাওয়াতে খুব ভালবাসে। নদীতে ছাত্র-ছাত্রীরা অসংখ্য নৌকা চালায়—কেনো (canoe), পান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের নৌকা আছে। এই পান্টিং করা ছাত্র-ছাত্রী মহলে এক প্রিয় খেলা বা আমোদ। নানা রকম নৌকা প্রতিযোগিতা হয়। সাধারণের জন্যে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়।···

এবার একটি বিশেষ কলেজের কথায় আসা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশ হিসেবে যাদের কথা আগে বলা উচিত তাদের কথা আজ না বলে অন্য একটি বিখ্যাত কলেজের বিষয়ে সামান্য দু'চার কথা বলা যাক। বিশেষ করে ব্যাকস এই যখন এসে পড়া গেছে তখন 'কিংস' কলেজেই ঢোকা যাক। যে কোন দিক দিয়ে কলেজ ব্যাকস-এ এসে পড়লে বাগান, নদী, ঘরবাড়ী ছাড়িয়ে সবচেয়ে আগে চোখে পড়বে 'কিংস' 'কলেজের

'চ্যাপেল' উপাসনা মন্দির। আকাশের গায়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে সুন্দর কারুকার্য্য করা এই চ্যাপেলের মিনারগুলি। কেমব্রিজের সব চেয়ে জমকালো ও বিশিষ্ট স্থাপত্য বোধ হয় এই কিংস চ্যাপেল। এই বিরাট চ্যাপেলের সামনে দাঁড়ালে মনে পড়ে নিজেদের দেশের স্থাপত্যের নিদর্শন সব ঐতিহাসিক প্রাসাদ, অট্টালিকা, মন্দির, মসজিদকে। আগ্রা দিল্লীর মোগল আমলের স্থাপত্যের সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য আছে মনে হয়। ১৪৪৬ সনে কিংস-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ষষ্ঠ হেনরী এই চ্যাপেলের ভিত্তি পত্তন করেন। কিন্তু বহু বৎসর ধরে এর নির্ম্মাণকার্য্য চলে। কখনও তার গতি ধীর, কখনও দ্রুত। এর ভেতর ইংলণ্ডের ইতিহাসে চলে গৃহবিবাদ—বহু রাজার উত্থান-পতন। অবশেষে অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে ১৫১৫ সনে চ্যাপেল তৈরী শেষ হয়। এই বিশাল চ্যাপেলের দেওয়ালেই যেন এর সৃষ্টির দীর্ঘ ইতিহাস লেখা আছে। ষষ্ঠ হেনরীর সময়ে এর প্রধানতম অংশ তৈরী হয় সাদা বেলে পাথর (lime stone) দিয়ে, তার পর বিভিন্ন সময়ের প্রচলিত বিভিন্ন পাথর দিয়ে এর দেওয়াল গাঁথা হয়েছে যুগে যুগে। এই দীর্ঘ সময়ে স্থাপত্যশৈলী ও গথিক থেকে সুরু করে ক্রমে রেনেসাঁতে এসে পৌঁছেছে—কিন্তু এই বিভিন্ন স্থাপত্যভঙ্গী এই চ্যাপেলের আকারে সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করে গেছে। ইংলণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দীর্ঘ, ঋজু (perpendicular architecture) স্থাপত্যের উদাহরণ এই কিংস চ্যাপেল। এর বড় বড় জানলা জুড়ে আছে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রচলিত রঙীন, চিত্রিত কাঁচ। পৃথিবী বিখ্যাত এর পাথরের ছাদ—আর তার ভেতরের পাথার আকৃতির জালিকাজ (Fan tracery)। স্থাপত্য কৌশল ছাড়াও এই চ্যাপেলের প্রার্থনা সঙ্গীতও প্রসিদ্ধ। বড়দিনের সময়—'খ্রীষ্টমাস-ইভ-কয়া'র সঙ্গীত আজও জগদ্বিখ্যাত।

কিংস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৪১ সনে। ইটন-এর (Eton) সঙ্গে কিংস-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ষষ্ঠ হেনরী এই দুই বিদ্যাপীঠেরই প্রতিষ্ঠাতা। তাই এদের প্রতীক (emblem)-ও একই। চ্যাপেল ভিন্ন শিক্ষাভবনটির প্রায় সব অংশই অপেক্ষাকৃত নূতন। প্রধান তোরণের মুখোমুখি 'ফেলোজ বিল্ডিং'(Fellows building) ১৭২৪ সনের, এ ছাড়া সবই উনবিংশ শতাব্দীর। প্রধান তোরণ-দ্বার দিয়ে ঢুকেই প্রথম প্রাঙ্গণে একটি ফোয়ারার সামনে ষষ্ঠ হেনরীর একটি মূর্ত্তি আছে। কিংস-এর প্রধান তোরণদ্বারটিও খুবই চিত্তাকর্ষক। চ্যাপেলের অনুরূপ স্থাপত্য ভঙ্গীতে তৈরী।

উপনিষদমালা

শ্রীপুষ্প দেবী

আকাশ জুড়ে এই যে তপন হ'ল আলোয় আলো
পেয়ে যাহার সরস পরশ কাটলো সকাল ভালো।
দীপ্তি ভরা ছটা যাহার,
অতুল রূপের প্রকাশ তোমার,
বইল তাতে সুধার পাথার তোমারি সন্ধানে,
জগৎ হ'ল আলোয় আলো আনন্দেরি বানে।

সোমার বরণ কমল দোলে চিত্ত সরোবরে,
পরাণ-হরা গন্ধ তাহার হৃদয় পাগল করে।
জোছনা ভরা মধুর আকাশ
শ্রান্তিহরা এই যে বাতাস
মধুর হ'ল সবি তোমার মধুর পরশ পেয়ে,
তাইত তোমার বন্দনাতে চিত্ত ওঠে গেয়ে।

কোথায় আমার মুক্তিদাতা কোথায় কত দূরে?
মনের আমার সুর বেঁধে দাও তোমার সুরে সুরে।
অহঙ্কার যে বাধা রচে,
দেয় না যেতে তোমার কাছে
কেঁদে বলি কেন আমায় রাখলে এত দূরে?
মনের আমার সুর বেঁধে দাও তোমার সুরে সুরে।

তোমার পরশ পশে যখন বুকের মধ্যিখানে,
সাধ্য কি আর আঘাত আমায় দহন-জ্বালা হানে?
অমৃতময় স্পর্শ তোমার
মুছিয়ে দেবে সব হাহাকার
যা কিছু মোর সকল যাবে তোমারি সন্ধানে,
বলবে তুমি নাই কোন ভয় আমার কানে কানে।

এলোরা

মন্দিরময় ভারত—গুহামন্দির

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী
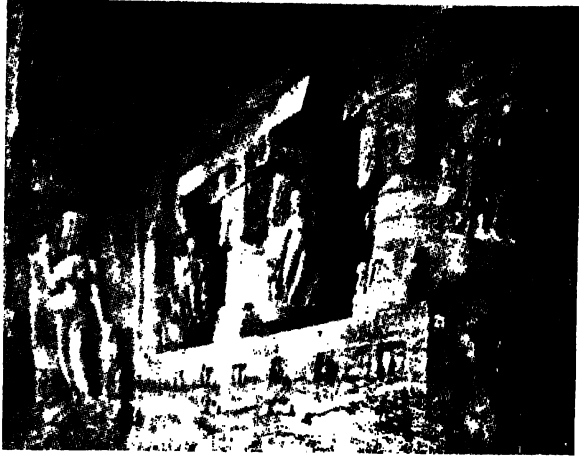
বিশ্বকর্ম্মা একটি চৈত্য বা বৌদ্ধ ধর্ম্মমন্দির। আছে শুধু একটি মাত্র চৈত্য এলোরায়। অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ চৈত্যের, কিন্তু পড়ে না কার্লির চৈত্যের সমপর্য্যায়ে, নাই তার অনুপমত্ব; মহিমময়ত্বও নাই।

একটি প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে চৈত্যটি দাঁড়িয়ে আছে, বেষ্টিত হয়ে আছে অলিন্দ দিয়ে। সেই অলিন্দের স্তম্ভের শীর্ষদেশে কার্নিসের সংযোগস্থলে, পশ্চাৎধাবনের দৃশ্য খোদিত হয়েছে।

মন্দিরের ভিতরের কেন্দ্রস্থল আর তার চারিপাশের গলিপথের পরিধি পঁচাশি ফুট দীর্ঘ, তেতাল্লিশ ফুট প্রস্থ, উচ্চতা চৌত্রিশ ফুট। চৌদ্দ ফুট উচু আটাশটি অষ্টকোণ স্তম্ভ দিয়ে, গলিপথ থেকে কেন্দ্রস্থলকে পৃথক করা হয়েছে। রচিত হয়েছে বন্ধনী স্তম্ভের শীর্ষদেশে। নাই সেই বন্ধনীর অঙ্গে কোন শিল্পসম্ভার, সমৃদ্ধশালী নয় তারা মূর্ত্তি দিয়েও।

মন্দিরের শীর্ষদেশের গ্যালারিটি (মঞ্চটি) প্রবেশপথের দুইটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অঙ্গে নিয়ে আছে এই স্তম্ভ দুটিও অনবদ্য শিল্পসম্পদ, শীর্ষে নিখুঁত মূর্ত্তিসম্ভার। অনুপম মন্দিরের সম্মুখ ভাগের শিল্পসম্ভারও, ভূষিত সুন্দরতম অলঙ্করণে। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রচিত মন্দিরের শীর্ষদেশ। তার দু'পাশে, মহাপরাক্রমশালী অশ্বপৃষ্ঠে তিনটি করে জীবন্ত সৈনিক, কেন্দ্রস্থলে প্রবেশপথ। যেমন মহান পরিকল্পনা তেমনই অনবদ্য রূপদান। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলের শেষ প্রান্তে সমস্ত মন্দির জুড়ে, মন্দিরের স্তূপ বা দাগোবা (স্মৃতির আধার) দাঁড়িয়ে আছে, মহামহিমময় মূর্ত্তিতে, শীর্ষে নিয়ে হারমিকা আর ছত্র। ব্যাস তার সাড়ে পনর ফুট, উচ্চতা সাতাশ ফুট। রচিত হয়েছে সতের ফুট উচু দাগোবার সম্মুখ ভাগ। তার অঙ্গে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান। শোভিত খিলানের অঙ্গ বটপল্লব আর বিভিন্ন আকৃতির গন্ধর্ব্বের মূর্ত্তি দিয়ে। সেই সুন্দরতম চন্দ্রাতপের নীচে এগার ফুট উচু মহামহিমময় বুদ্ধ উপবিষ্ট, প্রসারিত তাঁর পদযুগল। সঙ্গে নিয়ে আছেন বুদ্ধ তাঁর সহচরবৃন্দ, পদ্মপানি, বজ্রপানি। দেখি স্তব্ধ হয়ে।

দেখি ছাদের নির্ম্মাণ পদ্ধতি আর তার অঙ্গের সুন্দরতম অলঙ্করণও। খিলানের আকৃতিতে নির্ম্মিত মন্দিরের অর্দ্ধগোলাকৃতি ছাদটি। কেন্দ্রস্থলে একটি শিরদাঁড়া। যুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে দুই প্রান্ত থেকে বহু শিরা, নির্গত সেগুলি পর্য্যায়ক্রমে এক একটি নাগ ও নাগিণীর বক্ষ থেকে। রচিত হয়েছে স্তম্ভের শীর্ষদেশে, কার্নিসের নীচে, প্রাচীরের গাত্রে সুপ্রশস্ত পাড়। বিভক্ত সেই পাড় দুই অংশে। শোভিত অগভীর নিম্নাংশ গণমূর্ত্তি দিয়ে। বিভিন্ন তাদের আকৃতি, বিচিত্র তাদের অঙ্গের গঠন। উর্দ্ধাংশে রচিত হয়েছে বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি করে বুদ্ধ বিরাজ করেন, সঙ্গে নিয়ে দুজন বোধিসত্ত্ব আর অনুচরবর্গ। বিভক্ত গ্যালারির অন্তরতম প্রদেশও তিনটি প্রকোষ্ঠে। অলঙ্কৃত এই প্রকোষ্ঠ তিনটি ও অসংখ্য মূর্ত্তিসম্ভার দিয়ে। অনবদ্য, সুন্দরতম তাদের গঠন-সৌষ্ঠব, জীবন্ত। দেখে মুগ্ধ হই।

সম্মুখের অলিন্দের প্রান্তদেশে দেখি, রচিত দুইটি মন্দির, সঙ্গে নিয়ে দুইটি প্রকোষ্ঠ। সেই সব মন্দিরে আর প্রকোষ্ঠেও কত বুদ্ধ

শোভা পান, সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব আর পার্শ্বচর। মহিমময় এই মূর্ত্তিগুলি ও জীবন্ত।

উত্তরের অলিন্দের প্রান্তদেশের, সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, উপরের গ্যালারিতে উপনীত হই। দেখি, দুই অংশে বিভক্ত এই গ্যালারিটিও। বহিরাংশে রচিত সম্মুখের অলিন্দের উপবিভাগ, ভিতরাংশে, সম্মুখের গলিপথের ভিতর। অপরূপ সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয়েছে এই অংশ দুইটিও, রচিত হয়েছে তিনটি গবাক্ষ, প্রবেশপথ আলোবাতাসের। ব্যতিক্রম কার্লি ও ভাজার গবাক্ষের, রচিত হয় সেখানে একটি মাত্র বৃহৎ, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চৈত্য-গবাক্ষ।

আমরা বাইরের মঞ্চ অতিক্রম করে ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রবেশ করি। দেখি, শোভিত মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রও, বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী দিয়ে। মূর্ত্তি দিয়ে রচিত সেই সব কাহিনী। নিখুঁত এই মূর্ত্তিগুলিও জীবন্ত। দেখি নারীর কত বিভিন্ন আর বিচিত্র কেশবিন্যাসও। শ্রেষ্ঠ প্রতীক বৌদ্ধভাস্কর্য্যের এই মূর্ত্তিগুলি। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে।

গবাক্ষের দক্ষিণে মন্দিরের উপরিভাগেও অনেকগুলি গণমূর্ত্তি দেখি। অপরূপ তাদের গঠন সৌষ্ঠবও। শোভিত দেখি মন্দিরের শীর্ষদেশে, উদ্গত পাড়ের অঙ্গ দুইটি মহিমময়, জোড়া মূর্ত্তি দিয়ে। অনুরূপ এই মূর্ত্তিগুলি প্রকোষ্ঠের ভিতরের জোড়া মূর্ত্তির, শ্রেষ্ঠদান বৌদ্ধভাস্করের, এক পরমাশ্চার্য্য সৃষ্টি, এক মহাগৌরবময় যুগের। তাই আসেন এখানে দেশবিদেশ থেকে শিল্পী, স্থপতি আর ভাস্করও সমাগত হন, নিবেদন করেন শ্রদ্ধার অঞ্জলী বিশ্বকর্ম্মারূপী বুদ্ধকে। আমরাও দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে নবম গুহামন্দিরে উপস্থিত হই। অনবদ্য এই মন্দিরের সম্মুখভাগের শিল্পসম্পদও রচিত হয় একটি সুন্দর ব্যালকনি, মন্দিরের বাইরের দিকে, ভিতরের দিকে একটি আচ্ছাদিত অলিন্দ, সংযোগস্থলে দুইটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। চতুষ্কোণ তাদের নিম্নাংশ, অষ্টকোণ উপরাংশ, শীর্ষদেশ নির্ম্মিত আনমিত কর্ণের আকারে। পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে তিনটি প্রকোষ্ঠ দেখি। কেন্দ্রস্থলটিতে বুদ্ধ বিরাজ করেন। তাঁর মস্তকের উপর গন্ধর্ব্বেরা ও বামে পদ্মপানি, সঙ্গে নিয়ে এক রূপবতী যুবতী আর দুজন গন্ধর্ব্ব। দক্ষিণে বজ্রপাণি তাঁর সঙ্গেও দুজন রূপসী।

নবম মন্দির দেখে অষ্টম গুহামন্দিরে প্রবেশ করি। এই মন্দিরেও দুটি প্রকোষ্ঠ ও একটি গর্ভগৃহ দেখি। ভিতরে একটি আটাশ ফুট দীর্ঘ, পঁচিশ ফুট প্রস্থ সভাগৃহ, বুকে নিয়ে আছে তিনটি প্রকোষ্ঠ ও একটি প্রদক্ষিণের পথ। মন্দিরের দ্বারে দ্বারপাল। গর্ভ-গৃহে বেদীর উপর বুদ্ধ উপবিষ্ট, সঙ্গে নিয়ে অনুচরবৃন্দ। তাঁর দক্ষিণে চতুর্ভুজ পদ্মপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর এক হস্তে চামর, অপর হস্তে পদ্ম, দক্ষিণ স্কন্ধে একটি অজিনাসন। পদতলে ভক্তবৃন্দ বসে আছে। পশ্চাতে একটি ক্ষীণাঙ্গী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে পুষ্প। তার মস্তকের উপর একটি গন্ধর্ব্ব বসে। বুদ্ধের বামে বজ্রপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে নিয়ে অনুরূপ সহচরবৃন্দ প্রদক্ষিণের পথে, প্রাচীরের গাত্রে একটি অপরূপ সরস্বতী মূর্ত্তি দেখি। বিপরীত দিকে একটি প্রকোষ্ঠ। আরও দুইটি প্রকোষ্ঠ পথের উপর নির্ম্মিত হয়েছে। দেখি একটি বৃহৎ কুলুঙ্গী ও মন্দিরের পশ্চাৎভাগেও তার সামনে দুইটি সুন্দরতম চতুষ্কোণ স্তম্ভ,অঙ্গে নিয়ে প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ।

বাইরের কক্ষটি একটি ঈষৎ উচু ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পরিধি তার আটাশ ফুট দীর্ঘ, সতের ফুট প্রস্থ। কক্ষের উত্তর প্রান্তে একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে।

তার কেন্দ্রস্থলে একটি বেদী। বেদীর সম্মুখে দুইটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ। মন্দিরের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে, দেখি, বুদ্ধ বসে আছেন। সঙ্গে আছেন অনুচরবর্গ, সজ্জিত তাঁরাও অনুরূপ বসনে আর ভূষণে। বুদ্ধের বাম পাশে, বজ্র হস্তে বজ্রপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, পশ্চিমের প্রাচীরের গাত্রে পদ্মপাণি, সঙ্গে নিয়ে একটি পরমা রূপবতী নারী।

একটি বৃহৎ ছিদ্র দিয়ে একটি উন্মুক্ত অঙ্গণে প্রবেশ করে দেখি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি পুরুষ ও নারী মূর্ত্তি।

অষ্টম গুহামন্দির দেখে আমরা সপ্তমে প্রবেশ করি। সাড়ে একান্ন ফুট দীর্ঘ আর সাড়ে তেতাল্লিশ ফুট গভীর এই বিহারটি, বুকে নিয়ে আছে পাঁচটি প্রকোষ্ঠ। তার দুই পাশও তিনটি করে প্রকোষ্ঠ দিয়ে বেষ্টিত। দাঁড়িয়ে আছে বিহারটি চারিটি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর। নাই কোন শিল্পসম্ভার তাদের অঙ্গে, মন্দিরের গাত্রেও নাই।

সেখান থেকে আমরা ষষ্ঠ গুহামন্দিরে উপনীত হই। একটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, উপস্থিত হই সভাগৃহে। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই কক্ষটির পশ্চিমাংশ, পূর্ব্বাংশে একটি প্রকোষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরাংশেও ছিল একটি সুউচ্চ সভাগৃহ, পৃথক করা হয়েছিল দুইটি স্তম্ভ ও অনেকগুলি উদ্গত স্তম্ভ দিয়ে। অবশিষ্ট আছে শুধু একটি স্তম্ভ আর উদ্গত স্তম্ভগুলি। কেন্দ্রস্থলেও একটি সভাগৃহ নির্ম্মিত হয়েছে, পরিধি তার তেতাল্লিশ ফুট দীর্ঘ, সাড়ে ছাব্বিশ ফুট প্রস্থ। ভিতরেও একটি প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হয়েছে, তার সম্মুখে দুইটি অপরূপ চতুষ্কোণ স্তম্ভ। উত্তরাংশেও একটি সভাগৃহ নির্ম্মিত হয়েছে, পরিধি তার সাতাশ ফুট প্রস্থ, ঊনত্রিশ ফুট দীর্ঘ। অনুরূপ এই সভাগৃহটি দক্ষিণাংশের সভাগৃহের, বুকে আছে তিনটি প্রকোষ্ঠ।

দেখি, মন্দিরের সম্মুখের মণ্ডপে বহুমূর্ত্তি। উত্তর প্রান্তে দেখি, পদ্মপাণির বেশে সজ্জিত একটি রূপবতী নারী। দ্বারপালে পরিণত হয়েছেন পদ্মপাণি, দাঁড়িয়ে আছেন উত্তরের দ্বারে। প্রহরী তিনি মন্দিরের উত্তর দ্বারের। দক্ষিণ দ্বারে একটি পরমা রূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর বাম হস্তে ধৃত একটি ময়ূর, খুব সম্ভব, তিনিই বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী। তাঁদের পাশে তাঁদের অনুচরবর্গ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মস্তকের উপর বটপল্লব, তাদের ফাঁকে ফাঁকে

এক একটি রূপবতী নারী। অনবদ্য এই মূর্তিগুলির গঠনসৌষ্ঠব, জীবন্ত শ্রেষ্ঠদান, বৌদ্ধ ভাস্করের অমর কীর্তি। মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভগৃহে, মহামহিমময় মূর্তিতে বুদ্ধ উপবিষ্ট সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব আর অনুচরবর্গ। দুই পাশের প্রাচীরের গাত্রেও, তিন সারিতে বুদ্ধ বসে আছেন, ঊর্ধ্বে প্রক্ষিপ্ত তাঁদের পদযুগল। প্রতি সারিতে তিন জন করে বসে আছেন। তাঁদের পদতলে, ভক্তের দল। তুলনাহীন এই মূর্তিগুলিও, প্রতীক এক গৌরবময় সৃষ্টির, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের।

ষষ্ঠ গুহামন্দির দেখে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পঞ্চম গুহামন্দিরের সামনে উপনীত হই। পরিচিত এই মন্দিরটি মারোয়ারা নামেও। কয়েকটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে একটি একশ' সত্তর ফুট গভীর, আটান্ন ফুট প্রস্থ সভাগৃহে প্রবেশ করি। তার দু' পাশে কুলুঙ্গির আকারে নির্মিত হয়েছে দুইটি প্রকোষ্ঠ, নিভৃত স্থল বিহারের। বুকে নিয়ে আছে সভাগৃহটি, দুই সারিতে চব্বিশটি সুন্দরতম স্তম্ভ। শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি থাকে থাকে আসন। স্তম্ভের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি অনুচ্চ প্রস্তরের বেদী নির্মিত হয়েছে, রচিত হয়েছে কুড়িটি প্রকোষ্ঠও। খুব সম্ভব ছিল, এই বিহারটি বৌদ্ধশ্রমণদের বিদ্যামন্দির। এই বেদীর উপর পুস্তক স্থাপন করে, বিদ্যার্থীরা নিযুক্ত থাকতেন পাঠে। প্রবেশ-পথে, একটি উপাসনা মন্দির, তার ভিতরে বুদ্ধ বসে আছেন। বিহারের পিছনে, মন্দিরের মধ্যেও উপবিষ্ট বুদ্ধ, মহিমময় মূর্তিতে সঙ্গে নিয়ে অনুচরবর্গ। দ্বারের দুপাশে, খিলানের আকৃতিতে রচিত কুলুঙ্গির মধ্যেও, বুদ্ধ, অনুচরবর্গ নিয়ে বসে আছেন। উত্তরের কুলুঙ্গির ভিতরে, পদ্মপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে নিয়ে আছেন দুই রূপবতী নারী। তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ। দ্বিতীয় কুলুঙ্গির ভিতরে বজ্রপাণি দাঁড়িয়ে আছেন, সজ্জিত তিনিও বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে। তাঁর সঙ্গেও দুই পরমা রূপবতী নারী। মেঘের অন্তরাল থেকে গন্ধর্বেরা মালা হস্তে উড়ে আসছেন, পরাবেন সেই মালা তাঁদের কণ্ঠে।

পঞ্চম গুহামন্দির দেখে, আমরা চতুর্থ গুহামন্দিরে প্রবেশ করি। প্রাচীনতম বৌদ্ধ গুহামন্দিরের অন্যতম এই মন্দিরটি, অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। উনচল্লিশ ফুট গভীর, আর পঁয়ত্রিশ ফুট প্রস্থ এই মন্দিরটি, তার উত্তরপ্রান্তে, পদ্মপাণি বসে আছেন এক মহিমময় মূর্তিতে। তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, বিরাজ করেন তার উপরে অমিতাভ। তাঁর বিশাল স্কন্ধের উপর স্তরে স্তরে নেমে এসেছে তাঁর কুঞ্চিত কেশরাশি। তাঁর বাম স্কন্ধে স্থাপিত একটি অজিনাসন, দক্ষিণ হস্তে মালা, বামে পদ্ম। তার দুই পাশে দুই পরমা রূপবতী নারী উপবিষ্টা, হস্তে নিয়ে মাল্য আর পদ্মের কোরক। পদ্মপাণির মস্তকের উপর বোধিসত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছেন, নারীদের মস্তকের উপর বুদ্ধ, হস্তে নিয়ে পদ্মফুল।

মূর্তিগুলি দেখে পশ্চাতের প্রাচীরের প্রবেশপথ দিয়ে একটি প্রকোষ্ঠে উপনীত হই। দেখি দ্বারপালদের শিরোভূষণ, তাদের পাশে একটি বামনের মূর্তি। প্রকোষ্ঠ দেখে মন্দিরে প্রবেশ করি। দেখি, প্রচারকের মূর্তিতে বুদ্ধ সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন। তাঁর মস্তকের উপর একটি বটপল্লব। বহুমূল্য বসনে আর ভূষণে সজ্জিত হয়ে, অনুচরবর্গ দাঁড়িয়ে আছেন। দক্ষিণের প্রকোষ্ঠেও অনেকগুলি সুন্দর মূর্তি দেখি। তাঁদের মধ্যে সপরিষদ বুদ্ধ আছেন, আছেন পদ্মপাণিও।

সেখান থেকে তৃতীয় গুহামন্দির দেখতে পাই। কিছুদূর এগিয়ে খানিকটা নীচে নেমে একটি বিহারে উপনীত হই। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছেচল্লিশ ফুট, উচ্চতায় এগার ফুট, বুকে নিয়ে আছে বারটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ। বিলম্বিত তাদের শীর্ষদেশের আনমিত কর্ণ, তাদের বৃত্তাকার স্কন্ধের উপর। অষ্টকোণ তাদের মধ্যে তিনটের স্কন্ধ। অপরূপ তাদের অঙ্গের অলঙ্করণ, সুন্দরতম। মুগ্ধবিস্ময়ে দেখি। রচিত হয়েছে বারটি প্রকোষ্ঠও, দুই পাশে পাঁচটি করে, বাসস্থান শ্রমণদের, পশ্চাতে দুইটি। পশ্চাতের প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে গর্ভগৃহ।

দেখি, উত্তরের প্রাচীরের গাত্রে দুইটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি। প্রবেশ-পথের উত্তরে, দুইটি স্তম্ভের শীর্ষদেশে রচিত হয়েছে গবাক্ষ, পদ্মপুষ্পে শোভিত তার অঙ্গ। উত্তর প্রান্তে, উপাসনা গৃহ। তার অভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর পদ্মাসনে বুদ্ধ বসে আছেন। শিরে ধারণ করে আছে সেই পদ্মটি নাগ আর নাগিনীরা, তাদের কারও শিরে শোভা পায় তিনটি ফণা, কারও পাঁচটি, কেউ সপ্তফণাযুক্ত। বুদ্ধের দুই পাশে, দুই চামরধারী দাঁড়িয়ে আছেন। সজ্জিত তাঁরাও বহুমূল্য শিরোভূষণে। থাকে থাকে বিলম্বিত তাঁদের বক্ষের উপর তাঁদের স্খলিত কুণ্ডল। তাদের হস্তে পদ্মফুল, মস্তকের উপর গন্ধর্বের দল।

দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে বিরাজ করেন পদ্মপাণি বা অব-লোকিতেশ্বর, বিভিন্ন মূর্তিতে। দেখি অগ্নিকে, নিযুক্ত পদ্মপাণির উপাসনায়। দেখি এক মহাপরাক্রমশালী দেবতা, দাঁড়িয়ে আছেন পদ্মপাণির সম্মুখে, হস্তে নিয়ে অসি। অবনত তাঁর শির। বামেও তপস্যায় নিযুক্ত এক ব্যক্তিকে দেখি। তাঁর পশ্চাতে একটি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। দেখি অনুরূপ অপর দুই ব্যক্তিকেও। তাঁদের এক জনের পিছনে ফণা বিস্তার করে দুইটি সর্প দাঁড়িয়ে আছে, অন্যটির পশ্চাতে একটি ক্রুদ্ধ হস্তী। মহাকালীকেও দেখি। উদ্যত মহা-কালী বৃদ্ধ ভক্তের উৎপীড়নে। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে এই মূর্তিগুলি, পরমাশ্চর্য সৃষ্টি বৌদ্ধ ভাস্করের, শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

তৃতীয় গুহামন্দির দেখে আমরা দ্বিতীয় গুহামন্দিরে প্রবেশ করি। অলিন্দে উপনীত হই। দেখি, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ, অলঙ্কৃত তাদের সম্মুখ ভাগ গণমূর্তি দিয়ে। বিভিন্ন তাঁদের রূপ। অলিন্দের উত্তর প্রান্তে একটি স্থূলকায় পুরুষ উপবিষ্ট, তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য মুকুট, কণ্ঠে মূল্যবান জড়োয়ার হার, হস্তে পুষ্পগুচ্ছ। সঙ্গে আছেন চামরধারী, হস্তে নিয়ে চামর। তাঁদের দক্ষিণে, বামে, পরিষদবর্গ বসে আছেন।

তাঁদের সঙ্গেও আছেন চামরধারীর দল। দক্ষিণ প্রান্তে অনুরূপ একটি নারীমূর্ত্তি, সঙ্গে নিয়ে পরিচারিকা, তার শিরে শোভা পায় একটি মালা, হস্তে গন্ধর্ব। ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী তাঁরা, এই মন্দিরের স্রষ্টা ও তাঁর পত্নী। দ্বারে, দুই বিশালকায় দ্বারপাল দণ্ডায়মান। তাদের শিরেও শোভা পায় শিরোভূষণ। তাদের মস্তকের উপর গন্ধর্বেরা। একটি নারী সমস্ত প্রবেশপথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রে রচিত হয়েছে একটি দ্বার ও দুইটি গবাক্ষ। দ্বারের পাশ, গবাক্ষের তাক, আর প্রাচীরের সারা গাত্র পরিপূর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি দিয়ে। দুই পাশে দুইটি মঞ্চ বা গ্যালারি। আটচল্লিশ স্কোয়ার ফুট পরিধি এই মন্দিরটি, দাঁড়িয়ে আছে বারটি বৃহৎ চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর। নির্ম্মিত স্তম্ভের শীর্ষদেশে চতুষ্কোণ প্রস্তরের আসন, স্থাপিত তাদের পাদদেশ সুউচ্চ বেদীর উপর, বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলির অঙ্গ আর তাদের শীর্ষদেশ, আর বেদীর চারিপাশ, অনুপম শিল্পসম্ভার, ভাস্করের বহু সাধনার দান, প্রতীক চরম উৎকর্ষের। শোভিত হয়ে আছে দুপাশের গ্যালারির সম্মুখ ভাগও চারিটি করে স্তম্ভ দিয়ে, বিভিন্ন তাদের আকার, বিভিন্ন তাদের গঠনপদ্ধতি আর অঙ্গের অলঙ্করণ। বিভিন্ন প্রকারের লতাপুষ্প, গায়ক-গায়িকা আর বামনের মূর্ত্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে গ্যালারির সম্মুখ ভাগও। পশ্চাতের পাঁচটি কক্ষে, পঞ্চ বুদ্ধ, মহামহিমময় মূর্ত্তিতে বসে আছেন। সঙ্গে নিয়ে আছেন চামরধারীর দল, হস্তে নিয়ে প্রস্ফুটিত পদ্ম। মন্দিরের ভিতরেও দেখি, উপবিষ্ট এক বিশালকায় বুদ্ধ, সঙ্গে নিয়ে চামরধারী। তাঁদের এক জনের দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্ম।

মন্দিরের দ্বারে তের ফুট উচু দুই অতিকায় দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। বাম পাশেরটির পরিধানে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি, শিরে জটা, স্থাপিত সেই জটার উপর অমিতাভ বুদ্ধের ক্ষুদ্রমূর্ত্তি। তার দক্ষিণ হস্তে একটি মালা, বাম হস্তে পদ্ম। ভূষিত দ্বিতীয় দ্বারপালটি মহামূল্য পরিচ্ছদে। তাঁর শিরে শোভা পায় বহুমূল্য জড়োয়ার শিরোভূষণ, তার উপরে একটি দাগোবা বা স্তূপ। তাঁর বাহুতে বহুমূল্য অনন্ত আর তাগা, মণিবন্ধে কঙ্কণ, কণ্ঠে মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত হার। হস্তে ধারণ করে আছেন তিনি একটি পুষ্পগুচ্ছ। তাঁদের উপরে, মালা হস্তে উড্ডীয়মান গন্ধর্বের দল। দ্বার ও দ্বারপালের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন একটি পরমা রূপবতী নারী, যৌবনপুষ্ট পীনোন্নত তাঁর বক্ষ, তাঁর হস্তে শোভা পায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম।

মন্দিরে প্রবেশ করে দেখি সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন এক অতিকায় বুদ্ধ, প্রশান্ত তাঁর মূর্ত্তি। স্থাপিত সিংহাসনটি চারিটি কেশরযুক্ত সিংহের মস্তকের উপর। দাঁড়িয়ে আছে তারা চারি কোণে। স্থাপিত বুদ্ধের পদদ্বয় একটি বৃত্তাকার বেদীর উপর। স্পর্শ করে আছেন বুদ্ধ তাঁর বাম হস্তের অনামিকা, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জ্জনী দিয়ে। রূপ ধারণ করেছেন তিনি প্রচারকের। তাঁর মস্তকের কুঞ্চিত কুন্তলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছ অর্দ্ধাবৃত করেছে তাঁর মসৃণ ললাট। তাঁর মস্তকের চতুষ্পার্শ্ব থেকে নির্গত হচ্ছে জ্যোতি, উদ্ভাসিত হচ্ছে সারা মন্দির সেই জ্যোতির আলোকে। জ্যোতির পাশে গন্ধর্বের দল দাঁড়িয়ে আছে। সিংহাসনের দুই প্রান্তেও দুই চামরধারী দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে চামর। অনুরূপ বাইরের দ্বারপালও, আকৃতিতে অঙ্গের প্রসাধনে আর ভূষণে। প্রাচীরের গাত্রেও দুই বিশালকায় বোধিসত্ত্ব শোভা পান। বিলম্বিত তাঁদের দক্ষিণ হস্ত, প্রসারিত করতল। বাম হস্তে ধারণ করে আছেন তাঁরা অঙ্গের বসন। প্রান্তদেশে, চারি পূজারী পূজা করেন বুদ্ধকে।

দেখি মন্দিরের দুই পাশেও দুইটি করে যুগল কক্ষ, নির্ম্মিত পাশের গলির সমান্তরালে। বাইরের প্রকোষ্ঠে আর সম্মুখের প্রাচীরের গাত্রে দেখি অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি। দেখি, বুদ্ধ বসে আছেন বিভিন্ন ভঙ্গীতে, সঙ্গে নিয়ে অনুচরবৃন্দ। মন্দিরের দ্বারপালের বিপরীত দিকেও এক পরমা রূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছেন, সজ্জিত হয়ে আছেন মূল্যবান অলঙ্কারে। তাঁর মস্তকে শোভা পায় বহুমূল্য মুকুট, হস্তে পদ্ম। সঙ্গে আছে পরিচারিকার দল। তাঁদের হস্তেও শোভা পায় পদ্ম। খুব সম্ভব ইনি মায়া, বুদ্ধজননী, হতে পারেন বুদ্ধের পত্নী যশোধরাও, কোন বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর—অথবা পদ্মপাণি। হতে পারেন অমিতাভও। তাঁদের সকলের প্রতীক ধারণ করে আছেন এই মূর্ত্তিটি।

এলোরার প্রাচীনতম গুহামন্দিরের অন্যতম এই মন্দিরটি, নির্ম্মাণ সুরু হয় এই মন্দিরের খুব সম্ভব তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে, সমাপ্ত হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তুলনাহীন এই মন্দিরের শিল্পসম্পদ, অনবদ্য জীবন্ত এই মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ স্থাপত্যের, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যেরও। সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের। স্থপতি আর ভাস্করকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করে, ধীরে ধীরে মন্দির থেকে নির্গত হয়ে প্রথম গুহামন্দিরে উপনীত হই।

প্রাচীনতম বৌদ্ধ গুহামন্দির এলোরার, নাই এই মন্দিরে স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, নাই শিল্পসম্ভারও। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি একচল্লিশ ফুট প্রস্থ, বিয়াল্লিশ ফুট পরিধি নিয়ে। ছিল এই মন্দিরে (বিহারে) বৌদ্ধশ্রমণদের বাসের জন্য আটটি প্রকোষ্ঠ, এখন অবশিষ্ট আছে শুধু একটি মাত্র স্তম্ভ।

পরিসমাপ্তি হয় বৌদ্ধ গুহামন্দির দর্শনের। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চা ও জলযোগ সমাপন করি। তার পর, প্রতীক্ষমান ট্যাক্সিতে চড়ে, এক-বিংশতি গুহামন্দির, রামেশ্বরমের সামনে উপনীত হই। ট্যাক্সি থেকে নেমে, মন্দিরে প্রবেশ করি।

অন্যতম প্রসিদ্ধ হিন্দু, শৈব মন্দির এলোরার, পরিচিত রামেশ্বরম নামেও। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দেখি, একটি মণ্ডপের মধ্যে, মঞ্চের উপর, দেবতার বাহন নন্দী (বৃষ) বসে আছেন।

দেখি, উত্তরে একটি মন্দিরের মধ্যে,মহামহিমময় মূর্ত্তিতে গণপতি বসে আছেন। মন্দিরের সম্মুখে দুইটি সুন্দরতম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত

স্তম্ভ। গণপতির এক পাশে মকর বাহনে এক দীর্ঘাঙ্গী নারী, সঙ্গে নিয়ে চামরধারিণীরা। বামন আর গন্ধর্ব্বেরাও আছেন। বিপরীত দিকেও, কূর্ম্মের পৃষ্ঠের উপর দাঁড়িয়ে আছেন অনুরূপ একটি নারী।

স্তম্ভ দুটিকে সংযুক্ত করে রচিত হয়েছে একটি প্রস্তরের পর্দ্দা, আবৃত হয়ে আছে স্তম্ভগুলির অর্দ্ধাংশ। রচিত হয়েছে স্তম্ভের শীর্ষদেশে কমণ্ডলু, তাদের গর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে পুষ্পবৃক্ষ। অবনত তাদের পল্লব, স্পর্শ করেছে দুপাশের মৃত্তিকা, প্রণতি জানাচ্ছে ধরিত্রী দেবীকে। পল্লবের নীচে এক গর্ব্বিতা নারী মূর্ত্তি সঙ্গে নিয়ে বামন। স্তম্ভের শীর্ষদেশে বন্ধনীর, অঙ্গে দানবের মূর্ত্তি, তাদের মস্তকে শোভা পায় শৃঙ্গ। কার্নিসের নীচে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। বিরাজ করেন সেই সব প্রকোষ্ঠে গণদেবতা।

প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। সুপ্রশস্ত এই সভাগৃহটি, পরিধি তার উচ্চতায় ষোল ফুট, দৈর্ঘ্যে দুশ' একান্ন আর প্রস্থে উনসত্তর ফুট। সভাগৃহের দুই পাশে দুইটি উপাসনা মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, পৃথক করা হয়েছে তাদের আসন শীর্ষস্তম্ভ দিয়ে। অপরূপ এই স্তম্ভগুলি, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভার। মূর্ত্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে উপাসনা মন্দিরের চতুর্দ্দিক।

দেখি দক্ষিণের প্রাচীরের গাত্রে এক ভীষণদর্শন কঙ্কাল মূর্ত্তি। নিবদ্ধ তার দৃষ্টি, পশ্চাতে অবস্থিত কালী মূর্ত্তির দিকে। আকর্ষণ করে আছেন কালী তার কেশাগ্র। কালীর কণ্ঠে সর্পের মালা। তাঁর পশ্চাতে আরও একটি নারী কঙ্কাল মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। বেষ্টন করে আছে তার কণ্ঠদেশও একটি সর্প। দাঁড়িয়ে দেখছি এই দৃশ্য। বীভৎস এই দৃশ্য, কল্পনাতীত।

মহাকালের সম্মুখে একটি মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে, পূজারীর ভঙ্গীতে। মিনতি জানাচ্ছে মহাকালকে।

দেখি, পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে গণপতির মূর্ত্তি, সঙ্গে নিয়ে চতুর্ভুজা সপ্ত মাতা। অনুরূপ এই মূর্ত্তিটি দশ অবতারের মূর্ত্তির।

পূর্ব্ব প্রান্তে নৃত্যপরায়ণ অষ্টভুজ শিব, নৃত্যের ছন্দে দাঁড়িয়ে আছেন নটরাজন। মেঘের অন্তরালে দেবতারা বিরাজ করেন। কেউ ময়ূর বাহনে, কেউ হস্তী, কেউ বৃষ, কেউ বা গরুড় বাহনে। দর্শন করেন এই দৃশ্য। দেখেন পার্ব্বতীও, এই তাণ্ডব নৃত্য, সঙ্গে নিয়ে চার পরিচারিকা আর সঙ্গীতজ্ঞের দল। নৃত্য করেন মহাদেবের পদতলে ক্ষুদ্রকায় ভৃঙ্গী।

উত্তরের উপাসনা মন্দিরের বাম প্রান্তে একটি দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখি। তাঁর এক হস্তে শোভা পায় একটি চিক, অপর হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি পক্ষীর স্কন্ধ। তাঁর দুই পাশে, দুই মেষ।

পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে দেখি, সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন ব্রহ্মা। তাঁর সামনে ভূতলে জোড়াসনে উপবিষ্ট একটি পুরুষ। তার পিছনে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে।

হরপার্ব্বতীর বিবাহের দৃশ্য দেখি। বাম প্রান্তে হোমাগ্নি সামনে নিয়ে ব্রহ্মা উপবিষ্ট। বিপরীত দিকে এক দীর্ঘশ্মশ্রু মুনি। তাঁর পশ্চাতে দুজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে হস্তে নিয়ে আছেন একজন একটি আধার। তার পর, উমা সঙ্গে নিয়ে একটি সখী, তার সঙ্গে জলপাত্র হস্তে একজন পুরুষ। আবদ্ধ গিরিকুমারীর হস্ত, হরের হস্তে। তাঁদের সম্মুখে গণপতি বসে আছেন। হরের পশ্চাতে একটি বামন, সঙ্গে নিয়ে চার অনুচর, একজনের হাতে শোভা পায় একটি শঙ্খ।

দেখি, তপস্যাপরায়না হিমালয়-দুহিতাকেও। হোমাগ্নিতে বেষ্টিত হয়ে তিনি তপস্যায় নিযুক্তা। হবে দেবাদিদেবের সঙ্গে মহা মিলন। মন্থরগতিতে অগ্রসর হন মহাদেব, হস্তে নিয়ে একটি জলাধার। তাঁর পিছনে এক পুরুষ, মস্তকে তার পাত্রে ভর্ত্তি পদ্ম, কিছু ফলও আছে। তার দক্ষিণে এক সুন্দরী নারী, নিযুক্তা তিনি সামনের পুরুষটির সঙ্গে আলাপনে। খুব সম্ভব, এই পুরুষটিই মদন, বসন্ত সখা, রতিপতি, প্রেমের দেবতা। চূড়ার আকারে বিন্যস্ত তাঁর কেশপাশ, নির্গত হন তিনি একটি মকরের মুখগহ্বর থেকে। তাঁর অনুগমন করছেন আর একটি পুরুষ। তাঁদের নীচে সারি সারি গণদেবতা দাঁড়িয়ে আছেন, অতুলনীয় তাঁদের গঠন-সৌষ্ঠব।

পূর্ব্ব প্রান্তে মহিষাসুরী মূর্ত্তি দুর্গাকে দেখি, নিযুক্তা তিনি মহিষাসুর বধে। তাঁর সম্মুখে গদা হস্তে এক দৈত্য দাঁড়িয়ে আছেন, পশ্চাতে অসি হস্তেও একজন। উর্দ্ধে গন্ধর্ব্বেরা বিরাজ করেন।

মন্দিরের প্রবেশপথের উত্তরে দেখি, লঙ্কাধীশ, পঞ্চানন রাবণ দাঁড়িয়ে আছেন কৈলাসের নীচে। তিনি মস্তকে ধারণ করে আছেন একটি বরাহ। নিযুক্ত তিনি কৈলাস উত্তোলনের প্রচেষ্টায়। কম্পিত কৈলাস, ভীতার্ত্ত দেবগণ, আতঙ্কিতা দেবীরা। নাই কোন ভ্রূক্ষেপ শুধু কৈলাসপতি শিবের, পার্ব্বতীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বসে আছেন পর্ব্বতের উপর—অচল, অটল।

দেখি, পাশা খেলায় নিযুক্ত হর ও পার্ব্বতী, ভৃঙ্গী দেখছেন সেই খেলা। দেখি, রত পার্ব্বতী কেশ বিন্যাসে, সখীরা বন্ধন করেন তাঁর শিথিল কবরী। পদতলে গণদেবতারা নিযুক্ত, চণ্ডযুদ্ধ দর্শনে।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখি, উৎকাত স্তম্ভের সামনে একটি নারী, চামর হস্তে দাঁড়িয়ে আছে। দেখি বেদীর সম্মুখেও দাঁড়িয়ে আছে দুইটি সুন্দরতম স্তম্ভ, শীর্ষে নিয়ে আসন। খোদিত হয়েছে তাদের বন্ধনীর অঙ্গে অপরূপ মূর্ত্তিসম্ভার, মূর্ত্তি দেবদেবীর। অনুরূপ এই স্তম্ভ দুটি এ্যালিফ্যান্টার গণেশ গুম্ফার স্তম্ভের, গঠনপদ্ধতিতে আর অঙ্গের অলঙ্করণে দেখি স্তব্ধ হয়ে। বিভিন্ন মূর্ত্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে মন্দিরের দ্বারও, রচিত হয়েছে তার অঙ্গেরও তুলনা—পৌরাণিকহীন কাহিনী। দেখি, তাণ্ডব নৃত্য করেন নটরাজ, দেবতারা সেই নৃত্য দর্শন করেন, দেখেন মুনিঋষিরাও। দ্বারের দুই পাশে দুই অতিকায় দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের এক জনের হস্তে শোভা পায় একটি ত্রিশূল। তার শিরোভূষণ থেকে নির্গত হয় একটি অসি। একটি অজগর বেষ্টন করে আছে তার কটিদেশ। গর্ভগৃহে বিরাজ করেন এই মন্দিরের

বিগ্রহ, একটি লিঙ্গ। স্থাপিত সেই লিঙ্গটি, প্রাচীরে বেষ্টিত একটি অনুচ্চ বেদীর উপর। বেদীর চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত প্রদক্ষিণের পথ।

অনবদ্য এই মন্দিরের মূর্ত্তিগুলি, মহিমময় হরপার্ব্বতীর বিবাহের দৃশ্য, অনুপম স্তম্ভের অঙ্গের আর শীর্ষদেশের শিল্পসম্ভার। প্রতীক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির, কীর্ত্তির এক গৌরবময় যুগের, দেখে মুগ্ধ হয় মন, শ্রদ্ধায় অবনত হয় মস্তক। শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে, দ্বাবিংশতি গুহামন্দির, নীলকণ্ঠে উপস্থিত হই। একটি দ্বার অতিক্রম করে, প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি, পরিধি তার চুয়াল্লিশ স্কোয়ার ফুট। শৈব মন্দির, এই নীলকণ্ঠ দেখি মঞ্চের উপর বসে আছেন, দেবতার বাহন নন্দী। গণপতি আর তাঁর চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, অষ্টমাতাকেও দেখি।

সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করি। দাঁড়িয়ে আছে বার ফুট উচ্চ মন্দিরটি, সত্তর ফুট দীর্ঘ আর চুয়াল্লিশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম দশটি চতুষ্কোণ, আসন শীর্ষ ও বন্ধনীযুক্ত স্তম্ভ। চারিটি দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের সম্মুখে, মণ্ডপের তিন কোণে, এক এক কোণে দুইটি করে, ছয়টি। চার প্রান্তদেশে একটি করে উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। তাদের কেন্দ্রস্থলে, একটি করে বেদী। অনবদ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি দিয়ে সজ্জিত হয়েছে তোরণের অঙ্গ আর প্রাচীরের গাত্র। তাদের মধ্যে মূর্ত্তি আছে গণেশের আর তিন দেবীর, তাঁদের একজন মকর বাহনে। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর আর কার্ত্তিকের মূর্ত্তিও আছে। গর্ভগৃহে দেখি, বিগ্রহ একটি অত্যুজ্জ্বল লিঙ্গ। ঘোর নীল তার কণ্ঠদেশের বর্ণ। তাই পরিচিত এই মন্দিরটি নীলকণ্ঠ নামে।

সমুদ্র মন্থন করেন দেবগণ, সঙ্গে থাকেন দানবেরা। মথিত হবে অমৃত। সেই অমৃত পান করে, তাঁরা অমর হবেন। উঠে না অমৃত। নির্গত হয় গরল। হয় বুঝি মহাপ্রলয়। দেবলোক, ভূলোক আর নাগলোক, সব বুঝি যায় রসাতলে, সেই বিষের প্লাবনে। কি হবে উপায়! কেমন করে রুদ্ধ হবে এই হলাহলের প্লাবন! নিরুদ্ধ হবে ধ্বংসের লীলা, রক্ষিত হবে সৃষ্টি। এগিয়ে আসেন দেবাদিদেব মহাদেব, পান করেন সেই বিষ, পান করেন যত উঠে হলাহল মন্থনে। নীলবর্ণ ধারণ করে তাঁর কণ্ঠ। সেই থেকে নীলকণ্ঠ নামে খ্যাতি লাভ করেন শিব।

নীলকণ্ঠ দেখে আমরা চতুর্ব্বিংশতি গুহামন্দির তেলিকাগণ দেখতে যাই। শুনি, আছে নাকি অপেক্ষাকৃত উঁচুতে, একটি ক্ষুদ্র গুহ, আছে তাতে একটি অলিন্দ, পাঁচটি দ্বার ও প্রকোষ্ঠ। আছে একটি লিঙ্গও তার পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে আর একটি ত্রিমূর্ত্তির মূর্ত্তি। পরিচিত সেই গুহাটি ত্রয়োবিংশতি গুহামন্দির নামে। দেখি, এই মন্দিরেও পাঁচটি প্রকোষ্ঠ, শোভিত হয়ে আছে ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দিয়ে। সুন্দর নয় এই মূর্ত্তিগুলি, নাই কোন স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য তাদের অঙ্গেও।

চতুর্ব্বিংশতি গুহামন্দির দেখে আমরা পঞ্চবিংশতিতে, কুম্ভ ওয়াড়াতে উপনীত হই। নাই কোন চিহ্ন এই মন্দিরের সামনের অংশের, নিশ্চিহ্ন হয়েছে কালের কবলে। তবুও প্রশস্ত এই মন্দিরটি। সভাগৃহটির দৈর্ঘ্য পঁচানব্বই ফুট, প্রস্থ সাতাশ ফুট। উচ্চতায় চোদ্দ ফুট এই মন্দিরটি।

উত্তর প্রান্তে, স্তম্ভমূলে এক দেবতা বসে আছেন। দক্ষিণ প্রান্তে একটি কুলুঙ্গি, তার পিছনে একটি মন্দির, পরিধি তার পনর স্কোয়ার ফুট। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি আয়তনক্ষেত্র বেদী। কুলুঙ্গির সামনে আধার হস্তে একটি স্থূলকায় ব্যক্তি বসে আছেন। শোভিত সভাগৃহের পশ্চাৎভাগ চারিটি স্তম্ভ ও দুইটি উদ্গাত স্তম্ভ দিয়ে। তাদের পিছনে একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সভাগৃহ দাঁড়িয়ে আছে, বিস্তৃত হয়ে আছে সাতাশ ফুট দীর্ঘ তেইশ ফুট প্রস্থ পরিধি নিয়ে। রচিত হয়েছে তার পশ্চাতেও, দুই প্রান্তে দুইটি করে স্তম্ভ, পৃথক করা হয়েছে মন্দিরকে মন্দিরের তোরণ থেকে, পরিধি তার ত্রিশ ফুট দীর্ঘ আর নয় ফুট প্রস্থ। তোরণের ছাদে সপ্ত অশ্ব চালিত রথ-আরোহণে দেব দিবাকর বিরাজ করেন। দাঁড়িয়ে আছে মার্ত্তণ্ডের দুই পাশে দুই পরমা রূপবতী নারী, হস্তে নিয়ে তীর আর ধনু। খুব সম্ভব সূর্য্যমন্দির এইটি।

সূর্য্যমন্দির দেখে আমরা ষড়বিংশতি মন্দির জনসাতে উপস্থিত হই, একশ' বার ফুট দীর্ঘ এই মন্দিরটি। আছে এই মন্দিরের সম্মুখের দুইটি সুন্দর স্তম্ভ, অনুরূপ এলিফ্যান্টার গণেশ গুম্ফার স্তম্ভের। পশ্চাতেও দাঁড়িয়ে আছে দুইটি স্তম্ভ। প্রশস্ত সভাগৃহের দুই প্রান্তে দুইটি উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। মন্দিরের তোরণের সামনে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে, অপরূপ তার কেশের বিন্যাস, তার সঙ্গে একটি বামন পরিচায়ক। মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বারে, দুই অতিকায় দ্বারপাল, তাদের এক জনের হস্তে একটি পুষ্প। সঙ্গীর মস্তকে পাগড়ি, হস্তে নরকপাল।

গর্ভগৃহে চতুষ্কোণ বেদীর উপর বিরাজ করেন একটি লিঙ্গ। বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দির সাতষট্টি ফুট দীর্ঘ প্রদক্ষিণের পথ দিয়ে।

উপনীত হই গভীর সংকীর্ণ গিরিপথের প্রান্তদেশে, প্রবেশ করি সপ্তবিংশতি মন্দিরে, পরিচিত গোয়ালিনীর মন্দির নামে। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে অলিন্দে উপনীত হই। অলিন্দের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে একটি দ্বার ও চারিটি গবাক্ষ দেখি। দেবদেবীর মূর্ত্তি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে এই প্রাচীরের গাত্র। দেখি, দুইটি পরিচারিকা সঙ্গে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছেন। দেখি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে। মহাদেবকেও দেখি। বেষ্টন করে আছে তাঁর কণ্ঠে একটি অজগর। আছেন ত্রয়ানন ব্রহ্মা, হস্তে নিয়ে মালা আর জলাধার। মহিষাসুরীও আছেন। উত্তর প্রান্তে ধরিত্রিকে ধারণ করে আছেন বরাহ, দক্ষিণে শেষ-নাগের উপর নারায়ণ শয়ন করে আছেন।

দ্বার অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। তিপ্পান্ন ফুট দীর্ঘ, বাইশ ফুট প্রস্থ আর বার ফুট উচ্চ এই সভাগৃহটি, নির্ম্মিত

হয়েছে তার সঙ্গে একটি তোরণ, তোরণের সংলগ্ন মন্দিরের গর্ভগৃহ, পরিধি তার তেইশ ফুট দীর্ঘ আর দশ ফুট প্রস্থ। দাঁড়িয়ে আছে গর্ভগৃহের সামনে দুইটি সুন্দরতম স্তম্ভ। মন্দিরের দুপাশের গলিপথে দাঁড়িয়ে আছে বৈষ্ণব দ্বারপাল। মন্দিরের ভিতরে আয়ত ক্ষেত্র বেদী। মনে হয়, বিষ্ণুমন্দির এই গুহামন্দিরটি।

সপ্তবিংশতি গুহামন্দির দেখে আমরা অষ্টবিংশতিতে উপনীত হই। একটি অত্যুচ্চ পর্বতকন্দরে দাঁড়িয়ে আছে এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে দুইটি প্রকোষ্ঠ, একটি তোরণ ও সভাগৃহ। দেখি একটি দ্বারপালের ভগ্নাবশেষ। গর্ভগৃহের ভিতরে একটি বেদী, প্রাচীরের গাত্রে, একটি অষ্টভুজা দেবীর মূর্ত্তি দেখি। খুব সম্ভব এটিও বিষ্ণুমন্দির।

অষ্টবিংশতি দেখে আমরা উনত্রিংশৎ গুহামন্দির, সীতার নাহানীতে পৌঁছাই। অনুরূপ এই গুহামন্দিরটি, এলিফেন্টার গণেশ গুম্ফার, কিন্তু বিস্তৃততর এই মন্দিরের পরিকল্পনা, সূক্ষ্মতম আর সুন্দরতম রূপদান। নির্ম্মিত হয় এই মন্দিরটি পরবর্ত্তী কালে, বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও একটি অতি প্রশস্ত সভাগৃহ, পরিধি তার একশ' আটচল্লিশ ফুট প্রশস্ত ও একশ' উনপঞ্চাশ ফুট গভীর, দাঁড়িয়ে আছে দুশ' চল্লিশ ফুট প্রাঙ্গণের ভিতর।

একটি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি, সোপানের শীর্ষদেশে দুই অতিকায় সিংহ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পাদমূলে কয়েকটি হস্তী শিশু। প্রহরী তারা এই মন্দিরের। পশ্চিমের প্রবেশ পথে মঞ্চের উপর দেবতার বাহন নন্দী বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছে সভাগৃহটি, ছাব্বিশটি বৃহৎ সুষ্ঠুগঠন স্তম্ভের উপর। বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অনবদ্য শিল্পসম্পদ।

মূর্ত্তি দিয়ে শোভিত করা হয়েছে মন্দিরের গলিপথের সম্মুখদেশ, অলঙ্কৃত করা হয়েছে তার তিন প্রান্তদেশও। উত্তরের গলিপথের দক্ষিণ প্রান্তে দেখি, আন্দোলিত কৈলাস লঙ্কাধীপ রাবণের ভুজবলে। দক্ষিণ প্রান্তে ভৈরবকে দেখি। পশ্চিম প্রান্তে হরপার্ব্বতি পাশা খেলায় নিযুক্ত। পদতলে নন্দী আর গণেরা উপবিষ্ট। তাদের দক্ষিণে বিষ্ণু বামে ব্রহ্মা। পূর্ব্ব প্রান্তে স্বর্গলোকে দেবতাদের দেবী-দের সঙ্গে বিবাহের দৃশ্য। অনবদ্য সেই দৃশ্য, বিস্ময় জাগায় মনে। বাইরে এক মহিমময়ী দেবী দাঁড়িয়ে আছেন, ময়ূরের আকারে বিন্যস্ত তার কেশপাশ। উর্দ্ধে উপবিষ্ট চার মুনি, সঙ্গে নিয়ে তিনটি রূপবতী নারী। তাঁদের পদতলে হংস। খুব সম্ভব তিনি বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী দেবী। একটি সোপানের শ্রেণী নীচের নদীতে গিয়ে মিশেছে।

উত্তরের অলিন্দে দেখি, পদ্মাসনে উপবিষ্ট মহাদেব, ধরেছেন তিনি মহাযোগীর বেশ। তাঁর বাম হস্তে শোভা পায় গদা, দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্মের গুচ্ছ। ফণাযুক্ত কয়েকটি নাগিনী, শিরে ধারণ করে আছে সেই পদ্মাসনটি। পিছনে দুজন ভক্ত বসে আছেন।

বিপরীত দিকে তাণ্ডব নৃত্যে নিযুক্ত নটরাজ। তাঁর বাম পাশে উপবিষ্টা হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতী। পূর্ব্ব প্রাচীর গাত্রে মকর-বাহনে গঙ্গাদেবী উপবিষ্টা। তাঁর সঙ্গে শুধু একটিমাত্র পরিচারিকা আর কয়েকটি গন্ধর্ব্ব। গুহার পশ্চাতে প্রান্তদেশে মন্দিরের গর্ভ-গৃহ, একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠে। বিরাজ করেন সেখানে বেদীর উপরে লিঙ্গ। মন্দিরের চার দ্বারে অতিকায় দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে, হস্তে নিয়ে পুষ্প। বিভিন্ন আর বিচিত্র তাদের শিরোভূষণ, বিস্মিত হয়ে দেখি। চতুর্দ্দিকে রচিত হয়েছে প্রদক্ষিণের পথ।

অনেকখানি পথ অতিক্রম করে একত্রিংশৎ গুহামন্দিরে উপনীত হই। ত্রিংশৎ গুহামন্দির লুপ্ত হয়ে আছে মৃত্তিকার অন্তরালে, হয় নাই সংস্কৃত।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ সরকার এই মন্দিরটির সংস্কারে নিযুক্ত হন কিন্তু সক্ষম হন নাই সম্পূর্ণ সংস্কার করতে, রয়ে যায় অসম্পূর্ণ অবস্থায়।

খুব সম্ভব, ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়, কৈলাসের অনুকরণে, বুকে নিয়ে দ্রাবিড় স্থাপত্য পদ্ধতি। তাই পরিচিত এই মন্দিরটি ছোট কৈলাস নামে।

কাটা হয় পাহাড়ের অঙ্গ, খনিত হয় একটি গভীর গহ্বর, পরিধি তার ত্রিশ ফুট দীর্ঘ আর আশী ফুট প্রস্থ। রচিত হয় একটি ছত্রিশ ফুট স্কোয়ার অপরূপ মণ্ডপ। ষোলটি সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে শোভিত করা হয় সেই মণ্ডপটিকে। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অনবদ্য অলঙ্করণ। নির্ম্মিত হয় মণ্ডপের সম্মুখে একটি তোরণ, বুকে নিয়ে অতুলনীয় শিল্পসম্পদ, প্রান্তদেশে গর্ভগৃহ, আয়তনে সাড়ে চৌদ্দ ফুট দীর্ঘ, এগার ফুট প্রস্থ। বুকে নিয়ে আছে ছোট কৈলাসও, অনবদ্য শিল্পসম্ভার আর জীবন্ত মূর্ত্তিসম্ভার, মূর্ত্তিরও দেবদেবীর। দেখি মুগ্ধ হয়ে।

ছোট কৈলাস দেখে আমরা ইন্দ্রসভার দিকে অগ্রসর হই। পথে পড়ে দ্বাত্রিংশত মন্দির। দেখি অসমাপ্ত এই মন্দিরের কাজও, লাভ করে নাই মন্দিরটি সম্পূর্ণ রূপ, হয় নাই পূর্ণ সংস্কৃতও। দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটি তোরণ, রচিত তার তিন দিক, তিন পাহাড়ের অঙ্গ কেটে। কয়েকটি আসনযুক্ত স্তম্ভের শীর্ষদেশও দেখি। দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভগুলি আর তোরণটি একটি পর্দ্দার উপর, স্থাপিত সেই পর্দ্দা কয়েকটি হস্তীর পৃষ্ঠে। সুন্দরতম এই পরিকল্পনা, অনবদ্য রূপদান।

দ্বাত্রিংশৎ মন্দির দেখে, আমরা ইন্দ্রসভায় উপনীত হই।

ক্রমশঃ—

রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ মানুষ

শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মল্লিক

(১)

বর্ত্তমানকালে সুধীসমাজে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অনাবশ্যক। তাঁহার বিশাল কাব্যসমুদ্রে সন্তরণরত বহু বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁহার কাব্যের বিভিন্ন দিক তথা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার মাধ্যমেই কবি আজ আমাদের এত পরিচিত।

জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্ব্ব মানবের প্রতি কবির যে একটি পরমাত্মীয় ভাব ছিল তাহা তাঁহার কাব্য-সাহিত্যের বহু অংশেই বাঙ্ময় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি—এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ কবি প্রকৃতির মূল প্রেরণা মানবপ্রীতি ও প্রকৃতি-প্রেম।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন নিবিড় মানবপ্রীতি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে এক অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এই সীমাহীন মানবপ্রীতির প্রেরণাবশেই কবি জনগণের সঙ্গে অন্তরের নিবিড়তা অনুভব করিয়াছেন—এই গভীর মানবপ্রেমই তাঁহার সংবেদনশীল চিত্তকে জনজীবনের অভিমুখী করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য, তিনি আহ্বান জানাইয়াছেন অনাগতকালের কবিকে—যিনি জন্মলাভ করিবেন জনসাধারণের রক্ত, অস্থি ও মজ্জা মন্থন করিয়া।—অর্থাৎ, এই কবি জনগণের কবি হইবেন। কবি তাই, এই অজাত কবিকে পূর্ব্বাহ্ণেই অভিনন্দন জানাইয়া বলিয়াছেন—

"নির্ব্বাক মনের
মর্ম্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার।···
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি—
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি
আমি বারংবার তোমারে করিব নমস্কার।"

* * *

কবির প্রথম বয়সের রচনা 'কড়ি ও কোমল' হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার শেষ বয়সের রচনা 'জন্মদিনে' পর্য্যন্ত কাব্যগুলির বহু-বিস্তৃত ধারাপথ অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, পূর্ব্বকথিত ঐ মানবপ্রীতিই উন্মেষিত, পরিপুষ্ট ও পল্লবিত হইয়া ক্রমে মধ্যবিত্ত হইতে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছে। আভিজাত্যের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া কাব্যানুশীলনে রত থাকিলেও কবির স্পর্শকাতর হৃদয়, সর্ব্বব্যাপী সামান্য মানুষের এতটুকু স্পর্শ পাইবার জন্য সুতীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে।—মাটির মানুষের নিকট হইতে দূরে থাকিবার বেদনা কবিচিত্তকে যে কতখানি পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার নির্ভুল পরিচয় আছে কবির জীবনের প্রথম পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত 'চিত্রা'র 'এবারে ফিরাও মোরে' কবিতায় এবং শেষ পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত 'জন্মদিনে'র 'ঐকতান' কবিতায়। এই দুইটি কবিতার প্রথমটিতে সাধারণের অভিমুখী কবিচিত্তের প্রথম প্রকাশ—দ্বিতীয়টিতে সর্ব্বশেষ প্রকাশ। ইহাদের মাঝখানে অজস্র কবিতা রহিয়াছে, যাহার মধ্যে জন্ম-অভ্যস্ত আভিজাত্যের সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জনগণের কাছাকাছি আসিবার আন্তরিক আকূতি প্রবল সুরে ধ্বনিত হইয়াছে।

কবি তাঁহার জীবনের সর্ব্ব সময়েই সর্ব্বসাধারণের জীবনধারায় নিজের প্রাণপ্রবাহটিকে মিশাইয়া দিবার আকুলতা অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু বারে বারে তাঁহার এই আন্তরিক ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হইয়া দেখা দিয়াছে তাঁহার জন্মগত আভিজাত্য। কবি তাঁহার এই অক্ষমতাকে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার কাব্যে। এই জন্য, কবি বলিয়াছেন—

"ভাবি এই কথা
ঐখানে ঘনীভূত জনতার বিচিত্র তুচ্ছতা
এলোমেলো আঘাত ও সঙ্ঘাতে
নানা শব্দ নানা রূপ জাগিয়ে তুলেছে দিনরাতে।
তারি ধাক্কা পেয়ে মন
ক্ষণে ক্ষণে
ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি
সর্ব্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি।"

—কিন্তু এই 'সর্ব্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শে'র প্রতিবন্ধক তাঁহার জন্মগত আভিজাত্য—যাহাকে তিনি মানিয়া লইতে পারিতেছেন না,—দূরে সরাইয়া রাখিতেও পারিতেছেন না। এই জন্যই, এই বাধাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া কবি বলিয়াছেন—

"আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্ত ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।"

যে বৃহত্তর জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের কলস্বরটি কবি দূর হইতে শুনিয়াছেন মাত্র—যে জনসাধারণের সহিত তাঁহার পরিচয় অন্তরঙ্গ নয় তাহাকে লইয়া তিনি কাব্যরচনায় প্রয়াস পান নাই; সেজন্য তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতে অপূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছে। কবি অকুণ্ঠিতচিত্তে মানিয়া লইয়াছেন—

"...সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্ব্বত্রগামী।"

জনসাধারণের সহিত 'জীবনে-জীবন যোগ করা' বলিতে যাহা বুঝায়, ব্যক্তিগত জীবনে তাহা করিতে না পারিলেও, কবি আপনার কর্ম্মজীবনে জনগণের জন্য যথাসাধ্য কাজ যে করিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও অজানা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের চেয়ে ভাষাই কবির বড় অস্ত্র। তাই শুধু, কর্ম্মসাধনা নয়, বাণীসাধনার মধ্য দিয়াই কবি জনগণের অনেকখানি নিকটে আসিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—এবং জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া এই সাধারণ মানুষের দিকেই তিনি নিজের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

"পথে চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্ব্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।"

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্য্যায়ের কবিতাগুলি বিশদভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, নিজের কবিপ্রকৃতির অসম্পূর্ণতার বেদনা কবিচিত্তকে বিশেষভাবে পীড়িত করিয়াছে। কবি নিজেই বলিয়াছেন,—"আমার প্রকাশে অনেক আছে অসমাপ্ত, অনেক ছিন্নবিচ্ছিন্ন, অনেক উপেক্ষিত।" কাব্য-জীবনেও কবি এই ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। "আজ দেখি অনেক রয়েছে বাকি।"—কিন্তু কবির এই স্বীকারোক্তি কবির মহত্ত্ব। আপাতদৃষ্টিতে এই জনসাধারণ যাহারা কবির বাস্তিক জীবনে বারংবার উপেক্ষিত বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহারা কাব্য-জীবনের সুরু হইতেই কবির মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই অজ্ঞাত জনসাধারণের মুখে ভাষা দিবার জন্য কবি তাঁহার যৌবনকালে উচ্চকণ্ঠে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

—জাতিধর্মনির্ব্বিশেষে সকল মানবের প্রতি কবির নিজস্ব আন্তরিকতা কবি তাঁহার কাব্যজীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই অনুভব করিয়াছেন। এই জন্যই, কবি বলিয়াছেন—

"...নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন এক হয়ে
সকলের সনে।"

কবির কাব্যজীবনে মানবের প্রতি যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহার ভিত্তি কবি-প্রকৃতিতে—কবির ব্যক্তিগত চরিত্র মধ্যে। কবির ব্যক্তিগত জীবনের এক দিনের একটি ছোট ঘটনা বলিয়া আমার এই আলোচনা পরিসমাপ্তি করিতে ইচ্ছা করি।—

রবীন্দ্রনাথ তখন খুব অসুস্থ। সেই সময় এক দরিদ্র ব্যক্তি বহু মাইল পথ পদব্রজে আসিয়া গুরুদেবের সহিত দেখা করিতে আসেন। কিন্তু সেই সময়ে ঐ লোকটি কবির এক ভৃত্যের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হ'ন। রবীন্দ্রনাথ কোনও ক্রমে জানিতে পারিয়া ভৃত্যকে তিরস্কার করেন ও লোকটিকে আসিতে বলেন। সেই লোকটি আসিয়া গুরুদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। গুরুদেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি ত অনেক দূর হতে হেঁটে আসছ—আমার কাছে তোমার কিছু দরকার আছে কি?" উত্তরে লোকটি বলে,—"আজ আমার দেবতা দরশন্ হ'ল।"

গুরুদেব তাকে বললেন,—'তুমি ত আবার পায়ে হেঁটে ফিরবে। তুমি যাবার সময় আমার কাছ থেকে কিছু পয়সা নিয়ে যেও—যাবার সময় গাড়ী করেই যেও।"

বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও ভগবদ্‌মুখিতা রবীন্দ্র কাব্য-জীবনে বিশেষভাবে স্পষ্ট হলেও এই মাটির জগতের মানুষের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের মধ্যে কবি সাধারণ জীবনের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন—ইহার সম্বন্ধে সন্দেহ নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রকাব্যে মানবপ্রীতি যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে—সেকথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। শিল্পী বা কবি তাঁহার অন্তরজগতে যাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহাই বহির্জীবনে শিল্পকর্ম্ম অথবা কাব্য মধ্যে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথও ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারেন না। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ মানুষের প্রতি কবির প্রীতি ও ভালবাসা কেবলমাত্র তাঁহার কাব্যজীবনে নহে, ব্যক্তিগত জীবন মধ্যেও এক বিশিষ্ট সম্পদ হইয়া কবির অন্তরজীবন ও বহির্জীবন উভয়কেই পূর্ণতা দিয়াছিল। এই চিরন্তন উপলব্ধি তাঁহার অন্তরে ছিল বলিয়াই কবি তাঁহার গতির কাব্য 'বলাকা'র মধ্যেও বলিয়াছেন—

"কত যে যুগ-যুগান্তের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলামাটির মানুষ।"

রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্‌মুখিতা ও মানবমুখিতা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সমালোচকগণ নিজ নিজ মনের চিন্তাধারা অনুসারে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেইজন্য আজ সকল আলোচনা শেষ করিয়া রবীন্দ্রভক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করিয়া বলিতে চাই—

কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।'

পিপাসা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আজ প্রায় মাসখানেক হ'ল এক ঘর ভাড়াটে এসেছে আমাদের পাশের বাড়ীর একতলায়। পাড়ার কারোর সঙ্গে আলাপ এখনও তাদের জমে ওঠে নি। শুনলাম—গড়পার থেকে তারা উঠে এসেছে। দু'ভাই—দু'ভাই-ই চাকরী করে। বড় ভাই মণিবাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, ছোট ভাইয়ের নাম অনাদিবাবু—বয়স হবে প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। অনাদিবাবু বিপত্নীক, পাঁচ-ছ' বছর হ'ল ছেলেমেয়ে রেখে অনাদিবাবুর স্ত্রী স্বর্গগতা হয়েছেন। মণিবাবুর স্ত্রীই তাদের সকলের দেখাশুনা করেন।

মাঝে দু'একবার মণিবাবুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়েছিল। একদিন একটু হেসে মণিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন?

হাসিমুখে উত্তর দিলাম, বেশ ভালই। তার পর ভদ্রতার খাতিরে আমিও জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের খবর ভাল?

মণিবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের পাঁচ জনের কাছে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এসে পড়েছি, একটু দেখবেন সময়ে-অসময়ে।

উত্তরে বেশ জোর গলায়, কোন ভয় নেই—কোন ভয় নেই, বলে মণিবাবুকে সেদিন আশ্বাস দিলাম। ব্যস—ঐ পর্য্যন্ত, তার পর দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হয় নি। মানুষের কাজকর্ম্ম ত আছে! শুধু পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ করে বেড়ালে ত আর চলবে না!

অনাদিবাবুকেও দু'দিন চোখে পড়েছিল। কিন্তু লোকটি যেন কেমন-কেমন। সর্ব্বদাই যেন কি চিন্তা করেন, মুখে একেবারে কথা নাই। মেজাজটা যেন বেশ গম্ভীর। পথে বড় একটা বার হন না। আপিস যেতে-আসতে যেটুকু পাড়ার পাঁচজনে তাঁকে পথে দেখতে পায়। চোখের চাহনিটাও যেন বেশ সরল নয়। বোধ হ'ল লোকটা কুটিল, বেশ সুবিধার নয়।

যাক্ গে—কে কার খবর রাখে! যেচে আলাপ পরিচয় করবার লোক আমি মোটেই নই। হেসে কথা কও—না হয় হেসে উত্তর দেব। নইলে তোমারই বা কি আমারই বা কি!

মণিবাবুর আসবার দিনদশেক পর হতেই অনাদিবাবুর নামে নানা নিন্দনীয় অভিযোগ কানে আসতে লাগল। লোকটার নাকি স্বভাবচরিত্র খারাপ, সামনের বাড়ীর হাবুলের ষোল সতের বছরের বোন শিপ্রার দিকে কেবল চেয়ে থাকে। শিপ্রার এখনও বিয়ে হয় নি। শিপ্রা বারান্দায় এসে দাঁড়ালে লোকটা কেমন যেন চনমনিয়ে ওঠে। শিপ্রা ঘরের মধ্যে চলে গেলে অনাদিবাবু নাকি তাঁর ঘর থেকে জানালা দিয়ে মেয়েটাকে দেখবার জন্যে এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মারেন, মাঝে মাঝে শিপ্রাকে অনাদিবাবু চোখের কুৎসিত ইঙ্গিতও করেন—এমনিধারা অনেক অভিযোগ।

প্রথম কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। পাড়ার ছেলেরা আমায় পূর্ব্বে জানিয়ে রেখেছিল—তারা সকলেই নাকি অনাদিবাবুকে ও রকম একদৃষ্টে শিপ্রার দিকে তাকিয়ে থাকতে অনেকবার দেখেছে। আপিসটুকু বাদে দিনরাতের অনেকখানি সময় অনাদিবাবু তাঁর ঘরের জানালাটিতে চুপ করে বসে থাকেন আর শিপ্রাদের বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকেন। জানালা দিয়ে শিপ্রাদের দোতলার ঘরের ভিতর অনেকখানি বেশ দেখা যায়।

শিপ্রাকে দেখতে বেশ সুন্দরী, তাকে আমি বহুবার দেখেছি। আমাদের বাড়ী সে অনেক বার এসেছে, আমিও তাদের বাড়ী প্রায়ই যাই। শিপ্রার বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছে।

যাক—পাড়ার ছেলেদের একটা ধমক দিয়ে দূর করে দিলাম। নিতাই একদিন হঠাৎ আমার হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, আপনি জানেন না কুঞ্জদা, লোকটা বড় বাড়াবাড়ি করছে।

—কি রকম?

—কাগজে লিখে শিপ্রাকে চিঠি পাঠাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কই, কি লিখেছে দেখাতে পারিস—চিঠি কই?

নিতাইয়ের সঙ্গে হাবুলের খুব ভাব, ওরা সব সমবয়সী। নিতাই আমায় বলে গেল, আচ্ছা কুঞ্জদা, আমি 'সিওর' আপনাকে দেখাব। ও বেটার চিঠিলেখা বার করে দেব। একেবারে ডান হাতখানা একদিন রাস্তায় ধরব আর খুলে আনব। চালাকি নয় আমাদের সঙ্গে! দেখি ও বেটাকে ঠাণ্ডা করতে পারি কিনা!

আমি আর থাকতে পারলাম না। নিতাইয়ের মাথায়

একটা সাদরে চাঁটি মেরে বললাম, থাম থাম, তোর অত মাথা ব্যথা কিসের রে? যাদের বাড়ীর মেয়ে তাদেরই মাথা ব্যথা নেই, যত মাথা ব্যথা ওর। তা যদি হয় শিপ্রার বাপ আছে মা আছে ভাইয়েরা আছে, তারা যা ভাল বোঝে করবে।

নিতাই বললে, শিপ্রার ভাই হাবুলই ত আমায় সব বলেছে কুঞ্জদা। নইলে আমি আর কেমন করে জানব?

—আচ্ছা, আচ্ছা, বলে নিতাইকে সেদিন ভাগিয়ে দিলাম।

কিন্তু এই ব্যাপারটায় মনটা আমার কেমন যেন একটু খারাপ হয়ে গেল। এর একটা ব্যবস্থা কি করা যায়—আমিও মনে মনে ভাবতে লাগলাম।

সেদিন রবিবার। সকালে চা খেতে গেলাম শিপ্রাদের বাড়ী। যাবার সময় সত্যই আমার চোখে পড়ল—অনাদি বাবু জানালার ধাপিটাতে একা চুপ করে বসে শিপ্রাদের বাড়ীর বারান্দার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। চোখের চাউনি কেমন যেন উদাস। আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অনাদিবাবুর দিকে চেয়ে রইলাম। অনাদিবাবু এত তন্ময় যে, আমায় মোটেই লক্ষ্য করতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলাম—তাই ত, লোকটা ত বড় বেহায়া। লোকটার স্বভাবচরিত্র সত্যিই ত দেখছি বড় খারাপ।

এর দিনতিনেক পরে একদিন সকালে অনাদিবাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে আপিস যাচ্ছিলেন। অভ্যাসবশে যেমন শিপ্রাদের বাড়ীর বারান্দার দিকে তাকিয়েছেন অমনি হাবুল ও নিতাই ছুটে এসে অনাদিবাবুর সামনে রুখে দাঁড়ালো। তারা ওঁৎ পেতে বাড়ীর কাছেই বসেছিল। অনাদিবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন।

নিতাই বেশ জোর গলায় বললে, আপনাকে বলে দিচ্ছি মশাই, বেশ জেনে রাখবেন, এটা ভদ্রপাড়া। আপনি অমন করে সকল সময় মেয়েদের দিকে চেয়ে থাকবেন না।

অনাদিবাবু আমতা আমতা করে বলতে লাগলেন, আমি, আমি—

পাপী মন তাই ভাষা আর জোগাচ্ছিল না। আমি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। আমার বয়স হয়েছে। প্রথম থেকেই আর এ নোংরামিতে হাত দিতে ইচ্ছে ছিল না। ভদ্রলোককে একটু সতর্ক করে দিলেই হবে। তাই ব্যবস্থাটা পূর্ব্ব হতে আমার পরামর্শেই এমনি হয়েছিল।

অনাদিবাবুর মুখের ওপর হাবুল তেড়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি—আপনি। আমরা সব লক্ষ্য করেছি আজ অনেক দিন ধরে। মেয়েছেলে দেখেন নি কখনও? খুব সাবধান—আজ আপনাকে 'ওয়ার্নিং' দিয়ে দিলাম। ফের যেদিন দেখব বা শুনব, সেদিন একেবারে ঘুষি মেরে দাঁতের পাটি বার করে দোব—মনে রাখবেন। আমার নাম হাবুল মিত্তির।

হাবুল যেমন ভাবে ভদ্রলোকটিকে কথাগুলো বলতে লাগল—আমার মনে হ'ল বুঝি বা তখনই অনাদিবাবুর দু'পাটি দাঁত ঘুসির চোটে বার করে আনে। তা দিক দু'ঘা—ও রকম দুষ্টচরিত্র লোককে বেশ দু'ঘা দেওয়াই ভাল।

অনাদিবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। নিতাই আর তাঁকে কোন কথা বলতে দিলে না, পেছন থেকে একটা সজোরে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল, যান, যান, যেখানে যাচ্ছেন যান। আর একটা কথা কইবেন ত—

ধাক্কাটা প্রথম সামলাতে না পেরে অনাদিবাবু সামনের দিকে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। অতি কষ্টে টালটা সামলে নিয়ে আর কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে গেলেন।

হাবুল মিত্তির আর নিতাই দেখলাম তার পর তাদের গুটানো জামার আস্তান—বুকটা বেশ ফুলিয়ে নামিয়ে নিলে।

কিন্তু এততেও অনাদিবাবুর চেতনা হ'ল না। চোখের পিপাসা তাঁর মিটল না। সেই একদৃষ্টে পূর্ব্বের মতই জানালায় বসে কুমারী তরুণী শিপ্রার দিকে কুৎসিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে লাগল। আচ্ছা জ্বালাতন হ'ল ত!

দিনপাঁচেক পরে পাড়ার ছেলেরা একটা কাণ্ড করে বসল। সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। অনাদিবাবু আপিস থেকে বাড়ী ফিরছিলেন, শিপ্রাও ঠিক সেই সময় কাপড় কেচে কাপড়খানা শুকোবার জন্যে বারান্দায় মেলে দিতে এসেছিল। অনাদিবাবুর সেদিকে চোখ পড়তেই তিনি কেমন থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে শিপ্রার দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। শিপ্রার কিন্তু সেদিকে নজরই ছিল না।

ব্যস্—হাবুল আর নিতাই অমনি ছুটে এসে কোন কথা নেই বার্ত্তা নেই একেবারে অনাদিবাবুর মুখের উপর ধাঁই ধাঁই করে সজোরে ঘুসি হাঁকাতে লাগল। পাড়ার আরও পাঁচটা ছেলে ছুটে এল। আমিও খবরটা পেয়ে ছুটতে ছুটতে সেই অকুস্থলে এসে হাজির হলাম। হাবুলকে হাত ধরে ছাড়াতে যেতেই সে চীৎকার করে বলে উঠল, ছেড়ে দাও কুঞ্জদা। আজ ব্যাটাকে একেবারে খুন করে ফেলব। ছোটলোক কোথাকার—নিজের বাড়ীতে মা বোন নেই? চোখের ইসারা করা—ভদ্রঘরের মেয়ের বেইজ্জত করা, ছেড়ে দাও কুঞ্জদা, আজ দেখে নোবো ওকে।

জোর করে হাবুলকে টেনে ধরলাম ত ওদিকে আবার নিতাইয়ের চীৎকার। এতটা বাড়াবাড়ি করে বসবে জানতাম না। অনাদিবাবুর একেবারে দাঁতের পাটি বেরিয়ে না পড়ুক কিন্তু নাকমুখ দিয়ে ক্ষীণধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, মুখখানা ফেটে-ফুটে গেছে। নিজের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে তিনি হাত দিয়ে নাকমুখ চেপে ধরে রাস্তায় বসে পড়লেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল, থর থর করে কাঁপছিলেন। একটা চোখের ইসারা করতেই হাবুল ও নিতাই সরে পড়ল। আমি আর তখন কি করি! ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি অনাদিবাবুকে পথ থেকে হাত ধরে তুলে তাঁদের বাসায় নিয়ে এলাম।

অনাদিবাবুর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে মণিবাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। কি ব্যাপার তা আমি আর বাড়ীর কাউকে কিছু বললাম না। একজন ডাক্তার আনিয়ে তাড়াতাড়ি 'ফার্ষ্ট এড' দেওয়ালাম।

মণিবাবুর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করলেন, কি হ'ল ঠাকুরপো, এ কেমন করে হ'ল।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো—তারাও ভয় খেয়ে গেছে, তারা কাঁদতে লাগল।

অনাদিবাবু কোন কথার উত্তর দিলেন না। একটা আচ্ছন্ন অবস্থা, যন্ত্রণার কাতরোক্তি!

মণিবাবু তখনও আপিস থেকে ফেরেন নি। আমি মণিবাবুর স্ত্রীকে বললাম, ব্যস্ত হবেন না—ভাবনার কিছু নেই। কাল সকালে অনেকটা সুস্থ হয়ে যাবেন।

মণিবাবুর স্ত্রী ঘটনাটা জানতে চাইলেও আমি আর তখন জানালাম না।

আরও খানিকক্ষণ অনাদিবাবুর শয্যার ওপর বসে একটু তাঁকে সেবাশুশ্রূষা করে, মণিবাবু আপিস থেকে বাড়ী ফিরে এলে, তাঁকে গোপনে খুব সংক্ষেপে একটু জানিয়ে আমি রাত্রে চলে এলাম।

রাত দশটা তখন বেজে গেছে। হাবুল আর নিতাই আমার কাছে এল। আমি তাদের ধমক দিয়ে বললাম, ছি ছি, তোরা হাত তুললেই কি অমনি একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করে তবে ছাড়বি? এখন যদি ওরা থানায় গিয়ে 'ডায়রী' লিখিয়ে একটা পুলিস-কেস করে বসে, তখন?

ওরা দুজনে পুলিসের হাঙ্গামার কথা শুনে একটু দমে গেল, ভয়ও পেল।

নিতাই বললে, তুমি ত বললে কুঞ্জদা দু'এক ঘা একদিন দিতে, তাই ত দিলাম।

আমি তখন বললাম, আরে বাবা—দু'এক ঘা দেওয়া মানে কি পোয়াটাক রক্ত টেনে বার করা? এ যে খুনী ব্যাপার।

হাবুল বললে, সে তুমি সামলাও কুঞ্জদা, আমরা ওসব কিছু জানি না।

আমি বললাম, আচ্ছা, তোরা এখন যা।

ওরা চলে গেল। আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। পুলিসের ভয় আমারও যে একটু না হয়েছিল তা নয়। আমার পরামর্শে হাবুল আর নিতাই এ কাজ করেছে, পুলিস যদি তা জানতে পারে। যাক্—কি মনে করে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

মণিবাবুদের সদর দরজার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলাম, মণিবাবু—

মণিবাবু দরজা খুলে দিলেন। বললেন, আসুন, আসুন কুঞ্জবাবু, ঘরের ভেতর আসুন।

ঘরের ভিতর এসে অনাদিবাবুর কাছে বসলাম। অনাদিবাবুর সমস্ত মুখখানা বেশ ফুলে উঠেছে, নাকের রক্তপাত বন্ধ হয়েছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বর এসেছে, জ্বরের উত্তাপ বেশ। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে আপনমনে কি বকে যাচ্ছেন। যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করছেন খুব।

মণিবাবু আমায় খুব একপ্রস্থ প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, কুঞ্জবাবু, আপনি আমাদের আজ কি যে উপকার করেছেন তা বলবার নয়। আপনি অমন করে ছুটে গিয়ে না রক্ষে করলে অনাদি আজ মারাই যেত। ওর এখন গ্রহ চলছে, কোথা থেকে কি হয় দেখুন।

অনাদিবাবু চোখ বুজে পড়ে আছেন। একবার অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি চেয়ে বলে উঠলেন, উঃ, একটু জল, বড্ড পিপাসা পাচ্ছে।

অনাদিবাবুর মাথার কাছে একটা কাঁচের গেলাসে জল ছিল। আমি সেটা হাতে নিয়ে অনাদিবাবুর মুখের মধ্যে দু'ঢোক জল ঢেলে দিলাম। অনাদিবাবু তা পান করলেন। তার পর মৃদুস্বরে ডাকতে লাগলেন, অণিমা, অণিমা—

অনাদিবাবুর দু'চোখের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। ঠোঁট দুটি কাঁপছে, কি যেন বলে চলেছেন আপনমনে, অস্ফুট স্বরে। মণিবাবু সস্নেহে ছোট ভাইয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

তার পর মণিবাবু বললেন, কুঞ্জবাবু, আপনাকে কি আর বলব—আপনি নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে আমাদের ভাই ছিলেন, নইলে—

বাধা দিয়ে বললাম, না না, এ আর কি!

মণিবাবু বলতে লাগলেন, অনাদির জন্যে দুঃখ হয়, কুঞ্জবাবু! বহুদিন বিপত্নীক, তার ওপর ওর বড় মেয়েটার

গড়পারের বাসাতে এই এখানে আসবার দিন পনের আগে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় কলেরা ধরল। তার পর আর ধরতে-ছুঁতে দিলে না মোটেই, সেদিন শেষ রাত্রেই মেয়েটা মারা গেল। সেই থেকেই অনাদি কেমন যেন হয়ে গিয়েছে, কারোর সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না, হাসে না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আপিসের চাকরীতে পাঠাই।

অনাদিবাবু ঠিক সেই সময় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ কেমন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন সজোরে। তার পর আবার ক্ষীণকণ্ঠে ডেকে উঠলেন, অণিমা—অণিমা—

জিজ্ঞেস করলাম মণিবাবুকে, অণিমা কে?

মণিবাবু বললেন, অণিমা অনাদির সেই বড় মেয়েটির নাম। ঐ সামনের বাড়ীর আপনাদের শিপ্রার মত দেখতে। আমায় একদিন অনাদি এই জানালা দিয়ে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলেছিল—দাদা, মেয়েটি দেখতে একেবারে ঠিক অণিমার মত, না?'

আর আমি শুনতে পারছিলাম না, কেমন যেন করে উঠল আমার ভেতরটা।

একটা চাপা কাতরোক্তি প্রকাশ করে অনাদিবাবু পুনরায় জল চাইলেন—পিপাসার জল। আমি আর জোর করে চাইতে পারছিলাম না অনাদিবাবুর দিকে। জলের গেলাসটা ধীরে ধীরে তুলে দিলাম মণিবাবুর হাতে।

তুমি ও আমি

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

তুমি আর আমি যাযাবর পাখী
ক্ষণিকের লাগি' বেঁধেছি বাসা,
শুধু নিমেষের ডানা ঝট্‌পট,
বিরহ-মিলন, কান্নাহাসা।
চোখে চোখ দিয়ে ব'সে মুখোমুখি
ভাবি দুজনায় কত মোরা সুখী!—
এই মত কি গো রবে চিরকাল?—
হায় নির্বোধ, কত যে আশা!

উড়ে-আসা পাখী তুমি আর আমি
বেঁধেছি কুলায় সাগরতীরে,
চোরাবালুকায় যে তরুর মূল—
আছি দুইজন তাহারি শিরে!
উপরে অকূল সুনীল আকাশ,
উদয়-অস্ত-বর্ণ বিলাস,
তার নীচে হোথা মরণ-উর্ম্মি
সিন্ধুসিকতা নাচিছে ঘিরে!

দূরের যাত্রী মোরা দুটি পাখী
একসাথে হেথা এসেছি উড়ে;
একটি কুলায়ে আজি নিশি যাপি'
কাল প্রাতে যাবো সে কোন্ দূরে!
ভুলে-যাওয়া যদি জীবনের রীতি—
ক্ষণিকের নীড়ে রহিবে কি স্মৃতি?
এই অভিনয় করিবারে হেথা
এ তরু-কোটরে আসিব ফিরে?

তুমি আর আমি দুই হয়ে এক,—
যুগলপুষ্প একটি ডালে,
জীবননর্ম্মলীলাপ্রমত্ত—
মৃত্যুতিলক আঁকিয়া ভালে!
এস এ দেহের প্রতি অণু দিয়া
দুঁহু দোঁহা আজ লই ভুঞ্জিয়া;
চপল হরিণী, কবে মহাকাল
জড়াবে মোদের জরার জালে!

ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের গবেষণার নতুন পরিপ্রেক্ষিত

শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

ভাষাতত্ত্বের গবেষণাকে সাধারণতঃ আমরা জনকয়েক পণ্ডিত ব্যক্তির বিশেষ ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করি। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার কোন প্রত্যক্ষ গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না। আর পণ্ডিতেরাও যেভাবে গবেষণা করেন তার সাথে বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক থাকে না। এমনকি তাঁদের বাস্তব সমস্যার ময়দানে নামাতে চাইছি শুনলে হয়ত তাঁরা প্রস্তাবটিকে মূর্খের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, উপরোক্ত দুটি মনোভাবেরই কোনটিই সঠিক নয়। ভারতের ভাষাসমস্যা সম্বন্ধেও কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কেউ বড় একটা মাথা ঘামাতে চাইতেন না, দু'চারজন বিশেষজ্ঞের ব্যাপার মনে করে নিশ্চিন্ত থাকতেন। অন্যদিকে, বিশেষজ্ঞরাও কাজ চালিয়ে যেতেন অনেকটা বিচ্ছিন্ন ভাবে। কিন্তু গত কয়েক বছরের ভিতর দু'দুবার এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে আলোড়ন উঠেছে। একবার ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের আন্দোলনে এবং আর একবার উঠেছে সাম্প্রতিক সরকারী ভাষা সংক্রান্ত বিতর্ক উপলক্ষ্যে। দু'বারই অনেকগুলি মৌলিক প্রশ্ন সামনে এসে গেছে, যথা : (১) জনগণের বিকাশে ভাষার ভূমিকা, (২) বহু ভাষার দেশ ভারতে বিভিন্ন ভাষাগুলির স্থান ও পরস্পর সম্বন্ধ, (৩) বিভিন্ন ভাষাগুলির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্যক্রম ইত্যাদি। এই সব প্রশ্ন নিয়ে আমাদের যেমন ভাষাতত্ত্ববিদদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে, তেমনি তাঁদেরও নামতে হয়েছে বিতর্কের উন্মুক্ত প্রান্তরে। ঐ প্রশ্নগুলির চূড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই এবং হওয়ার পরও করণীয়ের দিক দিয়ে অনেক কিছু বাকী থাকবে। তাই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে নতুন পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের গবেষণার কাজ সুরু করতে হবে।

প্রগতিশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন যে, জনগণের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ ও জ্ঞানচর্চ্চা অপরিহার্য্য। সুতরাং বহু ভাষার দেশ ভারতে সমস্ত ভাষার সমান অধিকার, মর্য্যাদা ও বিকাশের সুযোগ, এই তিনটি হ'ল গণতান্ত্রিক ভাষানীতির ভিত্তি। নীতি স্বীকারের পর আসে তাকে রূপায়িত করার জন্য কার্য্যক্রমের কথা এবং সেখানেই ভাষাতত্ত্ববিদদের সব চাইতে বড় অবদান দেওয়ার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে যে শুধু বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে তাই নয়, সেগুলি আবার বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তার পর দেখা যায় যে, বিভিন্ন ভাষা উন্নতি ও বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রয়েছে। একই ভাষাগোষ্ঠীর ভিতরে উন্নত ভাষার পাশাপাশি রয়েছে পশ্চাৎপদ বা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ভাষা। এই ভাষাগুলির দ্রুত উন্নতিতে সাহায্যের জন্য তাদের ইতিহাস, বিকাশ ও অগ্রগতির নিয়ম, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান দরকার। সেজন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত ভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং অনুসন্ধান। দ্বিতীয়তঃ সুদূর অতীতকাল থেকে ভারতে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলি অল্পবিস্তর পরস্পরের সংস্পর্শে এসেছে এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। যেখানে উন্নততর ভাষার সংস্পর্শে এসে অনুন্নত ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে সেখানেও ঐ উন্নত ভাষার মধ্যে তার অনেক বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছে। এইদিক দিয়ে বহু কিছু জানার এবং অনুসন্ধানের বিষয় আছে। বিস্মৃত অতীত থেকে সুরু করে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর পরস্পরের সাথে সম্পর্ক এবং আদান-প্রদানের যে প্রক্রিয়াটি ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিয়েছে তার উদঘাটনে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা অনেক অবদান দিয়েছে এবং আরও বেশী দিতে পারে। গণতান্ত্রিক ভাষানীতিকে কার্য্যকরী ও ভারতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করার কাজে তার বিরাট গুরুত্ব আছে।

নতুন ভাবে গবেষণার জন্য যেমন পরিষ্কার পরিপ্রেক্ষিত থাকা চাই, তেমনি দরকার এই বিষয়ে পূর্ব্বসূরীদের কাজের ধারার সঙ্গে পরিচিতি। আর এ পর্য্যন্ত সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ভাষাগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। তা হলেই নতুন ভাবে কাজ সুরু করার গুরুত্বটা বোঝা যাবে।

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টার গৌরব কবি আমীর খুসরুর (১৩১৭ সাল) প্রাপ্য। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নিম্নলিখিত ভাষাগুলির কথা উল্লেখ করেন : সিন্ধী, লাহোরী, কাশ্মীরী, ডুগারদের ভাষা (ডোগরা), দুয়ার সমন্দর (কানাড়ী), তিলঙ্গ (তেলেগু), গুজরাতী, মাবার (তামিল), গৌড় (উত্তরবঙ্গ), বঙ্গাল, অবধ ইত্যাদি। আমীর খুসরুর পর আবুল ফজল থেকে সুরু করে টেরী, ফ্রেয়ার, ওগিলবী, ডানিয়েল মেসের স্মিট এবং সুলজে প্রমুখ প্রথম ইউরোপীয় অনুসন্ধিৎসুদের সময় পর্য্যন্ত এই প্রচেষ্টা প্রধানতঃ তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা হিসাবে সূত্রপাত হয় সার উইলিয়াম জোনসের দ্বারা, ১৭৮৬ সনে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষাকে আবিষ্কার করার পর থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গোড়াপত্তন হয় বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে উইলিয়াম জোনসের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ও গ্রীক, লাতীন প্রমুখ ইউরোপীয় ভাষাগুলির মৌলিক সাদৃশ্যের প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই গবেষণার ধারা অনুসরণ করেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।

অবশ্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি সম্বন্ধে জোনস যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তী কালের গবেষণার ফলে সেগুলির বেশীর ভাগ ভুল বলে প্রমাণিত হয়। সংস্কৃতের সাথে ইউরোপীয় ভাষাগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জোনসের অনুমান ১৮১৬ সনে ফ্রানজ বপের গবেষণার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। ১৮৫৩ সনের 'তুলনা-মূলক ব্যাকরণ' (Comparative Grammar) প্রকাশের পর এই তত্ত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উইলিয়াম জোনসের সময়ে দ্রাবিড় ভাষাগুলিকে স্বতন্ত্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হ'ত না এবং দ্রাবিড়গোষ্ঠী নামটিও তখন প্রচলিত হয় নাই। এর পর উইলিয়াম কেরী; জে, মার্শম্যান এবং ডব্লিউ, ওয়ার্ড তেত্রিশটি ভারতীয় ভাষার নমুনা সংগ্রহ করেন। অবশ্য তাঁরা ভাষা ও উপভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। জোনসের পর যাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন ব্রায়ান হটন হগসন। তিনি ১৮২৮ সনে নেপাল ও ভোটের বৌদ্ধদের ভাষা, সাহিত্য এবং ধর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে তিনি নেপালের নৃতত্ত্ব এবং ১৮৪৭ সনে হিমালয়ের সানুদেশে প্রচলিত কথ্য উপভাষাগুলির একটি তুলনামূলক শব্দাবলী নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর এই প্রবন্ধগুলি ভারতবর্ষ ও তাঁর প্রতিবেশী দেশগুলিতে প্রচলিত প্রায় সমস্ত অন-আর্য্য ভাষার সম্বন্ধে বহুল সঠিক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেগুলিকে আজও খুব মূল্যবান মনে করা হয়ে থাকে। হগসন ভারতে প্রচলিত ভোট চীনগোষ্ঠীর এবং মুণ্ডা ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রায় সমস্ত ভাষার তুলনামূলক শব্দাবলী সঙ্কলন করেন। ইংরেজ গবেষকদের মধ্যে তিনিই প্রথম দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী কথাটি প্রচলন করেন, তবে তিনি মুণ্ডা ভাষাগুলিকেও দ্রাবিড়গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। হগসনের মতে তিনি যে সব ভাষা নিয়ে চর্চা করেন সেগুলির উৎপত্তি হয়েছে একই ভাষা থেকে। এই তত্ত্বকে প্রমাণের জন্য তিনি সেগুলির সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার বহু ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেন। পরবর্তীকালের গবেষকদের বেশীর ভাগই অবশ্য ঐ তত্ত্বকে ঠিক মনে করেন না।

মুণ্ডাগোষ্ঠীকে একটি স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠী বলে প্রমাণ করেন অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ১৮৫৪ সনে বিশপ ক্যাল্ডওয়েল দ্রাবিড় ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ১৮৬৮ সনে উইলিয়াম হান্টার ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার বিভিন্ন ভাষার তুলনা-মূলক অভিধান প্রকাশ করেন।

১৮৩৮ থেকে ১৮৭৪ সনের মধ্যে বেশী পরিচিত ভারতীয় কথ্য ভাষাগুলির বহু ব্যাকরণ এবং তুলনামূলক শব্দ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। মেজর লীচ ব্রাহুই, বেলুচী, পাঞ্জাবী, পশতু, বুন্দেলী এবং কাশ্মীরী প্রভৃতি ব্যাকরণ সঙ্কলিত করেন। ১৮৫৩ সনে বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এরস্কিন পেরী ভারতীয় ভাষাগুলির ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি ভাষাগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেন: (১) সংস্কৃতজ বা আর্য্যদের ভাষা। তিনি এই বিভাগে হিন্দী, কাশ্মীরী, গুজরাটী, বাংলা, মারাঠি, ওড়িয়া, কোঙ্কনী এবং আর দশটি উপভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি পাঞ্জাবী, লাহন্দা (পেরীর মতে মুলতানী), সিন্ধী, মাড়ওয়ারী ইত্যাদিকে হিন্দীর উপভাষা এবং মৈথিলীকে বাংলার উপভাষা বলে প্রকাশ করেন। (২) দাক্ষিণাত্যের সভ্য নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা। পেরী এগুলিকে তামিলজ বা তুরানীয় সংজ্ঞা দেন। পেরী যে সব উপভাষার উল্লেখ করেছিলেন তাদের অনেকগুলি পরে স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর অষ্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে তাঁর নজর এড়িয়ে যায়।

ষ্টিভেনসনের অ-সংস্কৃত ভাষাগুলির তুলনামূলক শব্দাবলী এবং কথ্য ভাষাগুলির শব্দাবলী সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সনে। ইন্দো-আর্য্য ভাষাগুলি কি ভাবে দ্রাবিড় ভাষা থেকে শব্দ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছে, সেই প্রক্রিয়ার কথা সব প্রথমে ষ্টিভেনসনই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন এবং এইরূপ ঋণের নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য্যের দিকটি তুলে ধরেন। তাঁর সিদ্ধান্তগুলিতে অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বলতে হবে যে তিনি অনুসন্ধানের এক সম্পূর্ণ নূতন ধারার উপর আলোকপাত করেছিলেন।

এর পরে মেজর বীমসের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি ১৮৬৭ সনে "ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের রূপরেখা" (outlines of Indian philology) এবং ১৮৭২ সালে ভারতীয় আর্য্য-ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ঐ সালেই এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের মুখপত্রে ডাঃ হর্ণেলের প্রথম প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সঙ্গে পূর্ব্বী হিন্দীর ব্যাকরণের তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে তিনি যে বই লেখেন তা প্রকাশিত হয় ১৮৮০ সনে।

ভারতীয় ভাষাগুলি নিয়ে অনুসন্ধান প্রসঙ্গে পরবর্তী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল ১৯০৬ সনে পেটার শ্মিডের 'মোনখমে'র ভাষাগুলি সম্বন্ধে স্মরণীয় গ্রন্থ "Die Mon-khmer Volker" এর প্রকাশ। তাঁর গবেষণার দ্বারা ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশিয়ার ভাষাগুলির সঙ্গে মুণ্ডাগোষ্ঠীর ভাষাগুলির সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। খাসি ভাষাও এদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জানা যায়। মধ্য-ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই ভাষাগোষ্ঠীর নামকরণ করেন "অষ্ট্রিক" এবং তাদের দুটো বড় ভাগে ভাগ করা হয়, যথা: (১) অষ্ট্রো-এশিয়, ভারত, দক্ষিণ ব্রহ্ম এবং শ্যামে প্রচলিত ভাষাগুলি এর অন্তর্ভুক্ত, (২) অষ্ট্রো-নেশীয় অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া, মেলানেশিয়া ও পলিনেশিয়ার ভাষাগুলি।

পশতু ও নেওয়ারী ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দাবলী সংগ্রহ করেন যথাক্রমে ভর্ণ এবং অপর একজন রুশীয় ভাষাতত্ত্ববিদ।

এই ভাবে বিচ্ছিন্ন ও একক প্রচেষ্টার ভিত্তিতে অনুসন্ধানের ধারা ১৮৯৪ সন পর্য্যন্ত চলতে থাকে। ঐ বছরে প্রথম তদানীন্তন ভারত গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন ভাষাগুলির সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল ভাবে তথ্য

সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার কয়েক বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮৮৬ সনে ভিয়েনাতে প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনে উক্ত কাজে উদ্যোগী হওয়ার জন্ত ভারত সরকারকে অনুরোধ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ভারতীয় ভাষাগুলি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের কাজের ভার দেওয়া হয় সার জর্জ্জ গ্রিয়ার্সনকে। কাজের শেষ দিকে তাঁকে সাহায্য করতে আসেন জার্মান পণ্ডিত ষ্টেন কনো। তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হ'তে বেশ কয়েক বৎসর লাগে এবং সংগৃহীত তথ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ, সম্পাদনা এবং ১৯২১ সনের সেন্সাসের ফলাফলের সঙ্গে তুলনার পর ১৯২৭ সনে কয়েক খণ্ডে Linguistic Survey of India নামে প্রকাশিত হয়।

আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় ভাষার গবেষকদের কাছে Lingustic Servey-র মূল্য যথেষ্ট। ভারতের ভাষাগুলির সম্বন্ধে সামগ্রিক ছবি বা বিশেষ কোন ভাষার সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য জানতে হলে ঐ কয়েক খণ্ড বইয়ের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই। আর সার জর্জ্জ গ্রিয়ার্সনের বিরাট অবদানের কথা ত পরবর্ত্তী সমস্ত অনুসন্ধিৎসু অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন। কিন্তু ঐ Surveyর অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিগুলির কথাও উল্লেখ করা দরকার। প্রথমতঃ তার ক্ষেত্র এবং অনুসন্ধানের পদ্ধতি দুই-ই ছিল খুব সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সংগ্রহের প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত আছে সেগুলির নমুনা সংগ্রহ। বাইবেলের একটি প্যারাকে নির্ব্বাচন করে নিয়ে তথ্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত এলাকার বিভিন্ন ভাষায় সেটিকে অনুবাদ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কোন একটি লোক-উপাখ্যান বা বর্ণনাত্মক গদ্য বা পদ্যের কয়েক লাইন ঠিক করে বিভিন্ন ভাষাভাষী এলাকার কথ্য ভাষায় নমুনা সংগৃহীত হয়। পরীক্ষামূলক ষ্ট্যাণ্ডার্ড শব্দ বা বাক্যের তালিকা সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল আগেই তৈরি করেছিলেন। সেই তালিকার ভিত্তিতে অনুসন্ধান হয়। তৃতীয়তঃ তথ্য সংগ্রহের কাজটি হাতে কলমে করান হয় প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারীর দ্বারা। বেশীর ভাগ না ছিল বিষয়টির সম্বন্ধে কোন ধারণা আর না ছিল সংশ্লিষ্ট জনগণের ইতিহাস বা সামাজিক পটভূমি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান। চতুর্থতঃ দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে অনুসন্ধানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। গ্রিয়ার্সন নিজেও উক্ত ত্রুটিগুলির কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বড় জোর বলা যেতে পারে ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাগুলির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও তাদের গোষ্ঠীগত শ্রেণীবিভাগের কাজটি করা হয়েছে। ঐ সার্ভের দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুতির কার্য্য নিষ্পন্ন হয়েছে কিন্তু তার পরে করণীয় বহু জিনিস বাকী পড়ে আছে।

পরবর্ত্তীকালে শুধু যে বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে তাই নয়, অনেক নতুন তত্ত্বও গড়ে উঠেছে। গ্রিয়ার্সনের উত্তরাধিকারী হিসাবে যেসব ভারতীয় পণ্ডিত গবেষণার কাজে অগ্রসর হন তাঁরা কোন কোন ব্যাপারে গ্রিয়ার্সনের সিদ্ধান্তগুলিকে খণ্ডন করেছেন। উপরে যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করা গেছে তাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্বসূরীদের মধ্যে কেহ কেহ ভাষাগুলি সম্বন্ধে নিছক তথ্য সন্ধানের চাইতে গভীরতরভাবে অনুসন্ধান সুরু করেছিলেন। সেই ধারাকে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। তা ছাড়া গত কয়েক দশকে ভাষাগতক্ষেত্রে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। গ্রিয়ার্সনের সময়ে যেসব ভাষাকে অনুন্নত মনে করা হ'ত তারা আজ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে নতুন মর্য্যাদা দাবি করছে। যেগুলিকে অন্য কোন না কোন ভাষার উপভাষা বলে গণ্য করা হয়েছিল তাদের অনেকে স্বতন্ত্র ভাষার মর্য্যাদা পাওয়ার জন্ত মুখর হয়ে উঠেছে। Linguistic Survey-তে ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির উপরই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী, জাঁ প্রেশিলস্কি, পুলে ব্লখ, কুইপার প্রভৃতি পণ্ডিতদের অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধানের ফলে আজ একথা স্বীকৃত হয়েছে যে, ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির বিকাশে প্রাক্-আর্য্য বিশেষতঃ কোল ও দ্রাবিড় ভাষাগুলির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অবদান আছে। যেমন ক্রমশঃ ভারতে আর্য্য ভাষার বিস্তার হতে থাকে তেমনি তাকে অন-আর্য্য ভাষাগুলির সংস্পর্শে আসতে হয়। অন-আর্য্য ভাষাভাষীরা ক্রমে উন্নততর আর্য্য ভাষার সংস্পর্শে এসে নিজেদের ভাষা হারিয়ে আর্য্যভাষী হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের প্রাক্তন ভাষা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না, আর্য্য ভাষার মধ্যে নিজ বাক্যরীতি, শব্দাবলী, শব্দগঠন প্রণালী, উচ্চারণ পদ্ধতি ইত্যাদির স্পষ্ট ছাপ রেখে যায়। ভারতে প্রাচীন আর্য্য ভাষার ক্রমশঃ মধ্যকালীন বা প্রাকৃতে ও আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলিতে পরিবর্ত্তনের সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার পিছনে এই ঘটনাটিই প্রধান কারণ হিসাবে কাজ করেছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে আর্য্য ও অন-আর্য্য ভাষার পারস্পরিক প্রভাব এবং আধুনিক ভাষাগুলিতে নিম্নস্তর (Substratum) হিসাবে অন-আর্য্য ভাষাগুলির নিদর্শন—এই দুটি বিষয়ে অনুসন্ধান বর্ত্তমানে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় প্রধান স্থান দখল করেছে। ভাষাগত অনুসন্ধানের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশের ধারায় প্রাক্-আর্য্য সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধে বহু নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এই ইতিহাসকে বাদ দিয়ে ভারতীয় ভাষাগুলির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ বা সার্ভে করতে গেলে তাতে অনেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকতে বাধ্য। বৈদিকযুগ সুরু হয়ে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে যে প্রক্রিয়া চলে এসেছে তার সম্বন্ধে এখনও গবেষণার বহু বাকী। যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তার আলোকেই ডাঃ সুনীতিকুমার চাটার্জ্জী প্রমুখ পণ্ডিতেরা হর্ণেল এবং গ্রিয়ার্সনের কয়েকটি মত খণ্ডন করেছেন। হর্ণেল উত্তর ভারতের 'মধ্যদেশীয়' এবং 'প্রত্যন্ত দেশীয়' আর্য্য ভাষাগুলির মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখে সিদ্ধান্ত করেন যে, এগুলি একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও একই মূল ভাষা থেকে সঞ্জাত নয়। তিনি এ থেকে আরও অনুমান করেন যে, ভারতে আর্য্যভাষীদের আগমন হয়েছে দুটি ভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন পথে ও বিভিন্ন সময়ে। গ্রিয়ার্সন হর্ণেলের মতকে মোটামুটি মেনে

নেন। তাঁরা উভয়েই ভাষার আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের প্রক্রিয়াকে পরিবেশ-বিচ্ছিন্ন ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন।

Linguistic Surveyর অসম্পূর্ণতা দূর করাটাই সব নয়। পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে নতুন নতুন সম্ভাবনার যে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তাকে পরিপূর্ণ করে তোলার কাজে অগ্রসর হতে হবে। আর ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধেও ত আজ দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ভাষার বিকাশ এবং অগ্রগতির কাহিনী জানার জন্য শুধু তার আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের ধারাকে অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট নয়। কোন ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে হলে তাকে সেই ভাষাভাষী জনগণের ইতিহাসের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে সেই পটভূমিতে আলোচনা করা প্রয়োজন। কেন না, ভাষা হ'ল জনগণের ঐতিহাসিক ও সমবেত সৃষ্টি। জাতির জীবনের সূত্রপাত থেকে সুরু করে অগ্রগতির প্রত্যেক ধাপে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নিত্যনব সম্পদকে তারা আপনার করে নেয় ভাষার মাধ্যমে। জনগণের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও মননভঙ্গীর ছাপ পড়ে ভাষার উপরে। কোন ভাষার বিকাশের প্রক্রিয়া আলোচনার সাথে সেই ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে প্রচলিত লোককথা, রূপকথা ইত্যাদির সম্পর্ক কত গভীর সে বিষয়ে জার্ম্মানীর গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় অনেক আগে দিক নির্দ্দেশ করেছিলেন। বর্ত্তমানে সেদিকে নতুন ভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে। সুতরাং নতুন পদ্ধতি ও পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে অনুসন্ধানের ফলে অফুরন্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে একদিকে অতীত ইতিহাসের অনেক বিস্মৃত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করবে, অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে সুদীর্ঘকালব্যাপী যোগসূত্রের সত্যটিকে তুলে ধরবে। গবেষণার এই ধারা যে বিভিন্ন ভাষার সুপরিকল্পিত অগ্রগতিতে সাহায্য করবে তা বলাই বাহুল্য।

আজ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদের অভাব নাই। গ্রিয়ার্সনের পর ডাঃ সুনীতি-কুমার চাটার্জ্জী প্রমুখ বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় মূল্যবান অবদান দিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের একক প্রচেষ্টা বিশেষ বিশেষ ভাষার ক্ষেত্রে সীমিত আছে। সামগ্রিকভাবে অনুসন্ধানের কাজে উদ্যোগী হতে হবে দেশের গবর্ণমেণ্টকে। কারণ এ কাজ শুধু ব্যয়সাধ্যই নয়, আনুষঙ্গিক প্রস্তুতির কাধাগুলি বে-সরকারী প্রচেষ্টার দ্বারা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

জৈব-বিবর্ত্তনে হারানো সূত্র নেই

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

অভিব্যক্তিবাদের প্রধান হোতা ডারউইনকে অনেক স্থলে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল জৈবজীবন বিকাশের মাঝে মাঝে আপাতদৃষ্ট অসেতুময় ব্যবধান। মানব ও বানরের মধ্যে ছিল কারা, স্তন্যপায়ীর ও সরীসৃপের মধ্যেকার জীব কে, পাখী, কূর্ম, বাদুর, বাঘ এরা কি ও কে? এককোষ পলিপ থেকে নিরন্তর প্রবহমান প্রাণসত্তা কোটি কোটি বৎসরে অপরিমেয় জীবজীবনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে, অপ্রাপ্ত সংযোগগুলির বাধা এ তথ্যকে প্রামাণ্য তত্ত্বের মর্য্যাদাভূষিত করতে পারছিল না, বৈজ্ঞানিক প্রবরের ললাটে তাই সংশয়াকুল বলিরেখা। সেদিন যে খেই হারিয়ে যাচ্ছিল বার বার আজ নানা শাস্ত্রের প্রাণবন্ত গবেষণাপুষ্ট তথ্যগুলি সর্বজনগ্রাহ্য করেছে 'অভিব্যক্তি' সিদ্ধান্তকে, হারানো-সূত্রের কোন সমস্যা আজ নেই।

অসীম কাল ধরে প্রাণের অপ্রতিহত স্রোত বহে চলেছে ধরণীতে, তার ধারাবাহিকতা যেমন নিঃসন্দিগ্ধ পরিচিত-অপরিচিত তথ্যের বিপুল সমাবেশে বিভিন্ন প্রাণীর ক্রমিক যোগসূত্র তেমনি অনস্বীকার্য। ফসিলসমূহ আবিষ্কারের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিক মহল 'হারানো-সূত্রে'র জন্য নিঃসংকোচে অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করতে পারেন নি, সন্নিবিষ্ট ক্রমের মাঝে মাঝে শূন্য ব্যবধান বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছিল যথেষ্ট। ডারউইন প্রথমে মানুষ ও বানরের মধ্যেকার যোগসূত্রের খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন, পরবর্তীকালে জীববিদরা অভিব্যক্তিবাদের চটি বিষয় সম্বন্ধে শঙ্কাকুল। প্রথম, এক জাত ও অন্য জাত, এক পরিবার ও অন্য পরিবার, এক বর্গ ও অন্যবর্গের মধ্যেকার বিশাল গহ্বরগুলির উপর সেতু কোথায়? কোন অজাত প্রাণ-বন্ধন অসম জীবকুলকে আত্মীয়তাসূত্রে নিকট করেছে, রাখি বেঁধে সম্বন্ধ নির্ণয় করেছে কে? মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডীর মাঝে যোগসূত্র আছে কি? অন্যথায় অমেরুদণ্ডী ছোট ছোট জীব হতে রক্তকণিকাযুক্ত মেরুদণ্ডী উদ্ভবের প্রমাণ কোথায়, কৃমি ও বিছাদের মত মেরুদণ্ডী দেখা যায় কি?

নিশ্চয় যায়। এর উত্তরস্বরূপ বিরাজ করছে এম্ফিও-ক্সাস, সামুদ্রিক স্কোয়ার্ট।

জল থেকে স্থলে উঠল কারা, কোন কষ্টসহ বুদ্ধিমান স্থল-ভাগের বিপুল সম্ভাবনাকে তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিল? প্রোকাদের বাদ দিলেও উভয়চরের অভাব নেই আজ কোন দেশে, ভেক সালমান্ডার-দের জীবনযাত্রা স্বাক্ষর হয়ে আছে সেই চিরন্তন স্মৃতির, যে ঐকান্তিক অধ্যবসায় বলে নতুন পৃথিবীর সন্ধান রেখে গেল অনাগত ভবিষ্যের অন্তরে।

পরবর্তী যোগসূত্র একান্ত পরিচিত। সরীসৃপগোষ্ঠী অণ্ডের জটিলতা বৃদ্ধি করে ক্রমবর্ধনশীল ভ্রূণকে খাদ্য জুগিয়েছে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা করেছে। সরীসৃপ-ক্রমাভিব্যক্তি বিশেষ চিত্তাকর্ষক দ্বিধারা প্রবাহিত জীবকুল। একদিকে উদ্ভূত হয়েছে পক্ষীকুল, স্তন্যপায়ীরা অন্য দিকে। যোগসূত্র নিবিড় না হলেও অনুমানের সাহায্যে সম্বন্ধ নির্ণয় খুব কঠিন হয় না; আরকোটেরিক্সদের সর্বাঙ্গ সরীসৃপানুরূপ, তফাৎ কেবল পক্ষে, মস্তক দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে এরা পাখী, যেন পাখীর ছদ্মবেশে সরীসৃপ। আরকোনিস যখন অবতীর্ণ হয়েছে কিছুটা পাখী বলে চেনা যাচ্ছে তখন, আধুনিক পাখীর সঙ্গে পক্ষ লেজ আঙুল বেশ মেলে। স্তন্য-পায়ী ও সরীসৃপের মধ্যবর্তী বন্ধনসূত্র আদি স্তন্যপায়ী হংস-চঞ্চু প্লাটিপাস, ডিম পাড়ে আবার শাবকদের স্তন্যপান করায়।

হিমরক্ত হতে উষ্ণরক্ত জীবের আবির্ভাব কিছু কিছু আন্দাজ করা যায়; স্তন্যপায়ীর মত সরীসৃপ উদ্ভূত সরীসৃপের মত স্তন্যপায়ী, আধুনিক স্তন্যপায়ীর পূর্বপুরুষ।

দ্বিতীয় বিষয় স্তন্যপায়ীদের নানাদিকে প্রসারণ প্রবণতাকে কেন্দ্র করে। যত বিভিন্ন জাতির স্তন্যপায়ী আজ নানা প্রতিবেশে আধিপত্য করছে তারা সকলেই সমগোত্র উদ্ভূত, অথচ আকৃতি স্বভাবের পারস্পরিক বৈষম্যে অপর শ্রেণীকে হার মানায়।

এদের ভিতর আত্মীয়তাসূত্র নিধারণের পন্থা কি? মধ্যবর্তী প্রাণী সজীব অবস্থায় আছে অথবা তাদের জীবাশ্মি?

কঙ্কাল পরীক্ষান্তে জানা যায়, এরা প্রত্যেকে সমগোত্রের, সে ক্ষুদ্র মূষিকই হোক বা ভীমাকৃতি হস্তী বা তিমিই হোক। শারীরসংস্থান বিদ্যা বিশদ ভাবে প্রমাণ করে যে, সমস্ত স্তন্যপায়ীর বনিয়াদ এক। ফসিলের প্রভূত সাহায্য এসেছে বহুক্ষেত্রে, ধারা নিরূপণে নির্দেশ দিয়েছে, সঠিক সম্বন্ধ নির্ণয় করেছে অজানা জটিল স্থানে; এমনতর দূরস্থিত প্রাণীর মধ্য-স্তরে জীবাশ্মির আবিষ্কার যে সৌসাদৃশ্য সংঘটন করেছে তার কল্পনাও আপাতদৃষ্টিতে অলীক।

ডানা, হস্ত সাঁতারের লেজ, তর্কু দেহ জলজ-স্তন্যপায়ী ম্যানাটির সহিত গজরাজের সম্বন্ধ কিছু আছে নাকি।

সম্বন্ধ সত্যই বাহির হয়ে পড়েছে। লিবিয়া মরু-ভূস্তর থেকে এক ফসিল পাওয়া গেল, যার দেহে এই দুই জীবেরই অমোচনীয় পরিচয়লিপি, সম্পূর্ণ নয় কোনটিই, অথচ কিছু কিছু সাদৃশ্য বর্তমান দুটি জীবের সঙ্গেই। বোঝা যাচ্ছে, এর অগ্রতন পুরুষ কেউ আশ্রয় নিয়েছে সমুদ্রগর্ভে কেউ লতাগুল্মাচ্ছাদিত ঘন জঙ্গলে। হস্তের ব্যবহার নেই, দেহভার বৃক্ষারোহণের অনুপযুক্ত অথচ বন্য বৃক্ষশাখাপল্লব সংগ্রহে উদর পূর্ণ করতে হবে, শুণ্ডের উদ্ভব ও প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার। ম্যানাটি ও ডুগং উদ্ভিদভোজী জলজস্তন্যপায়ী, পুং ডুগং গজদন্তের অধিকারী, প্রথমটির তাও নেই। অবিচ্ছিন্ন প্রাণপর্যায়ের নিশ্চিত পরিচয় লেখা রয়েছে আজকের দূরে-সরে-যাওয়া প্রাণীদের ভিতর। একটু মস্তিষ্ক চালনা করলেই দূরের না হোক নিকটস্থিত জ্ঞাতিবর্গের কুলুজির অনুসন্ধান পাওয়া খুব অসম্ভব নয়।

জলজ স্তন্যপায়ী হিসাবে শুশুক শিশুমার তিমিদের কথা অগ্রগণ্য। তিমিরা নানা জাতিতে বিভক্ত—বর্ষাফলক নারহোয়াল, নীল তিমি, সালফার বটম তিমি ইত্যাদি। ব্রিটেনের সমুদ্রে অদ্ভুতাকৃতি মাংসাশী 'গ্রামপ্যাস'ও (শুনে বলা হয়) সেটেশিয়াবর্গের। সমজাতি হতে উদ্ভূত হলেও জলতলে নির্বিঘ্নে কালাতিপাত করেছে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে, বংশধরেরা পরম্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হস্তী মৃগ শূকরের আকৃতি-প্রকৃতিতে যতটা তফাৎ এদেরও তাই। আবার জলের মাংসাশী স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক সিংহ, সামুদ্রিক ভল্লুক, সামুদ্রিক হস্তী সিন্ধুঘোটকরা বেশীদিন জলে নামে নি, কারণ তীরে এসে বহুক্ষণ পরে সময় কাটিয়ে যায় আজও। আচরণ ও আকৃতিতে কোন পরিচিত স্থলচর স্তন্যপায়ীর সঙ্গে মিল আছে? স্বতঃই শূকরের কথা মনে আসে। স্থূল দেহ এই জীবটির বাস কাদামাটি অপরিচ্ছন্ন স্থানে, জলের নিকটবর্তী স্থান পছন্দ করে। পেকারী ও হিপো নিঃসন্দেহে সাক্ষাৎ বংশধর, তাপির ও গণ্ডারের স্বভাবের সঙ্গে খানিকটা মিল রয়েছে, হস্তী, তিমি এবং অপর সমস্ত জলজ স্তন্যপায়ী শূকরজাতীয় প্রাণী হতে উদ্ভূত।

জগতের বিস্ময় দীর্ঘগ্রীব জিরাফ মৃগাকৃতি হলেও অসাদৃশ্য অধিক। আফ্রিকায় ওকাপি আবিষ্কারের পর অন্যান্য খুরেলা প্রাণীর সঙ্গে এদের সংযোগ খুঁজে পাওয়া গেছে; ওকাপির পদের উপরাংশ ও পশ্চাদ্ভাগই শুধু চিত্রিত জিরাফের মত সারাদেহ নয়, গ্রীবা জিরাফের তুল্য উচ্চ না হলেও বেশ লম্বা, নিরীহ স্বভাব ও জিরাফের ন্যায় আত্মরক্ষায় অপটু।

জেব্রার উজ্জ্বল ডোরা অনেকের প্রশংসোদ্রেক করে, রাসভের সঙ্গে এর সম্বন্ধ সুপরিস্ফুট। কোয়েগার শরীরের সম্মুখভাগে অবিকল এইরূপ, লম্বা লম্বা ডোরা অথচ পদচতুষ্টয় ও পশ্চাদ্ভাগ গর্দভের মত, আসল বনগর্দভের মত প্লেন। বন্যগর্দভেরা ধোপার গাধার মত শান্তশিষ্ট নয় মোটেই, এদের সাহস ও তৎপরতা প্রসিদ্ধ। তিব্বতের মালভূমি হতে 'কিয়াং' নামক সমবর্গের এক জীব পশুশালায় প্রেরিত হয়, এদের ভিতর অশ্ব ও গর্দ্দভের গুণ মেশানো, মধ্যবর্ত্তী স্তর বলা চলতে পারে স্বচ্ছন্দে।

বিড়াল জাতের বংশ বহুধাবিস্তৃত। ব্যাঘ্র সিংহের জ্ঞাতি এরা—তা না বললেও চলে। ভারতেই বহুপ্রকার বাঘের অস্তিত্ব আছে, তরাই অঞ্চলের শ্বেত ব্যাঘ্র, আসামের কৃষ্ণ ব্যাঘ্র, বাংলার রাজা বাঘ, নানা রকমের চিতা এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ। জার্মানীতে হেগেনবেক সিংহ-ব্যাঘ্র মিলনজাত সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। মধ্য-আমেরিকা ও ব্রেজিলের বিড়ালগোষ্ঠী শক্তিশালী জাগুয়াতে পরিণত। পুমা ওসিলো হিমাঞ্চলের আউন্স সারভাল বাঘা-বিড়াল প্রত্যেকেই বিড়ালের হেরফের, বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে কালের গতিতে।

মৃগজাতি অগণিত, গৃহপালিত ছাগ-মেষাদির ন্যায় স্বভাব, আকৃতি হলেও ব্যবধান দুস্তর। সাধারণের চক্ষে মৃগ এক দিকে ও ছাগ মেষ অন্য দিকে, প্রভেদ বিস্তর। কিন্তু এরাও নিতান্ত আপনার জন, এদের ভিতর যোগসূত্র রক্ষা করছে নু কুহ নীলগাই আন্টেলোপ ঈলোপ্ত ইত্যাদি। কেবল যে যূথচর তাই নয়, প্রত্যেকে দ্রুতগামী সদাসতর্ক, আবার কেউ কেউ বন্যমেষের মত ফিরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।

স্তন্যপায়ী শুধু মানুষের নিকটাত্মীয় নয়, এদের আলোচনা হয়েছে সবচেয়ে বেশী। জানা গেছে, কেবল দেহভাগ নয় স্বভাব-চরিত্রে অধুনাবিচ্ছিন্ন খেচর, জলচর, খুরেলা, মাংসাশী, কীটভুক্, তীক্ষ্ণদন্তী ইত্যাদি বর্গ সমভাবের। পুরাকালে এদের পূর্বপুরুষ এক ছিল নিঃসন্দেহে। তবে কেউ এখন যদি প্রত্যেক ধারাবিভাগের দিন-তারিখ, স্থানকাল এবং পাত্র অর্থাৎ যথাযথ পূর্বপুরুষ অনুসন্ধানে বহির্গত হয় তাকে ত্রিশঙ্কুর মত চিরকাল শূন্যমার্গে ভ্রমণ করতে হবে—বস্তু মিলবে না নিশ্চয়। কারা ছিল এই বিভিন্নমুখী স্তন্যপায়ী-আদিপুরুষ, তদানীন্তন প্রাণিকুলের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ তাদের এ কেউ বলতে পারবে না।

মানবজাতি কোন্ বংশসম্ভূত ?

সকলেই জানেন বানর* আদিম স্তন্যপায়ীরা যে সময় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ছিল, কোন কোন হীনবীর্য জীব যারা পোকামাকড়, কৃমি বা ক্ষুদ্র টিকটিকিতে জীবন-ধারণ করত পালাল গাছে, কারণ হিংস্র প্রাণিদের অভ্যুদয় বনভূমিকে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছে। আধা-বানরাকৃতি জীব ঊষাযুগের (ইয়সিনে) শেষে দেখা যায়। ইউরোপ থেকে উত্তর-আমেরিকা তার পর পুনরায় ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকায় ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিল। বনমানুষ এই বর্গের অথচ বেশ উন্নত, বুদ্ধি বিচক্ষণতায় মানুষের পরে দ্বিতীয় স্থান এদের। কি করে মানুষের সঙ্গে এদের যোগসূত্র স্থাপন করা হয় ? এরা যে জ্ঞাতিভাই, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং-ওটাং প্রমুখ বনমানুষদের সঙ্গে মানুষের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তার যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ কোথায় ? প্রমাণ বিশেষ নেই।

কপিমানব, আমাদের প্রত্যক্ষ ঊর্ধতন অমানব পুরুষ, ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত বহুকাল, ফসিল পর্যন্ত এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। তবে হ্যাঁ, মানুষের পূর্বপুরুষের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এখানে-সেখানে, আদিম বর্বর গুহাবাসী বনচর যাযাবর, প্রকৃতির বিশুদ্ধ সন্তান।

পাললিক শিলাস্তরের জীবাশ্ম-লিখন অসম্পূর্ণ, কেবল প্রত্নজীবতত্ত্ব দিয়ে অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্তরের পর স্তরে সজ্জিত ফসিল সাজানো নেই কোথাও, কল্পনা অনুমান প্রকল্প একসঙ্গে একত্রিত হয়ে রচনা করে সিদ্ধান্ত পরিচয়। জৈব-অভিব্যক্তির বিশালত্ব অনন্ত শক্তিসমন্বিত প্রকাশমহিমা, চিত্তাকর্ষক পরিবর্তনশীল দৃশ্য, অল্প কয়েকটি নশ্বর সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল নয়, স্মরণাতীত যুগ ধরে শাখাপ্রশাখাসমন্বিত মহীরুহের ন্যায় তার বহিঃপ্রকাশ।

---

* 'বানরের মানবত্ব প্রাপ্তি' শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৯ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বানরের চিন্তাশক্তি ও বিচার সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা করেছেন, 'বানর জাতীয় প্রাণীদের বুদ্ধিবৃত্তি' প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭ দ্রষ্টব্য।

পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

পশ্চিম বাংলার গ্রামের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা 'প্রবাসী'তে কিছু কিছু লিখিয়াছি। কিরূপে গ্রামের নামের উৎপত্তি বা পরিবর্তন হইয়াছে বা গ্রামের নাম লোপ পাইয়াছে। এইবার আরও কয়েকটি উদাহরণ দিব।

১। জনার্দ্দনপুর (মেদিনীপুর)

পশ্চিম বাংলার জনার্দ্দনপুর বলিয়া ৭টি মৌজা আছে; তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় ২টি আছে। একটি নারায়ণগড় থানায় অপরটি দাসপুর থানায়। আমরা যে জনার্দ্দনপুরের কথা বলিতেছি ইহা মেদিনীপুর শহর হইতে ৫.৭ মাইল দূরে অবস্থিত। শহর হইতে ৫.৬ মাইল দূরে কংসাবতী নদীর তীরে পাথরা গ্রাম; ইহারই ঠিক অপর পারে জনার্দ্দনপুর গ্রাম।

১৩৪৫ সালের ফাল্গুন মাসে উৎসব পত্রিকায় রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রায়দয়াল মজুমদার মহাশয়ের জন্মভূমি ও জীবনী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে আছে:

"এই দুইটি গ্রামই পূর্ব্বে বহু ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত ও বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। ধর্ম্ম, দান ও তপস্যা-প্রধান জায়গা হিসাবে এই দুইটি গ্রামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এখনও ইহাদের ভগ্ন অট্টালিকা ও মন্দিরাদির ধ্বংসস্তূপ দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।"

বিদ্যানন্দ ঘোষাল এই অঞ্চলের খাজনাদি আদায় করিতেন বলিয়া দরবারী পদবী লাভ করেন। নাম হয় তপস্বী মজুমদার। তপস্বী মজুমদারের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র "জিতরাম পাথরায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় নদীর অপর পারে আসিয়া বসবাস করিতে মনস্থ করেন। তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতা জনার্দ্দন ঠাকুর (শ্রীশ্রীসীতা-রামজীউ)-কে লইয়া এইখানে বসবাস করেন এবং গ্রামের নাম রাখেন "জনার্দ্দনপুর"। এই গ্রামও সমৃদ্ধিশালী ছিল।"

"জিতরামের পাঁচটি পুত্র ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺রামকৃষ্ণ ১১৭৯ সালে শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরেই এখনও শ্রীশ্রীসীতারাম, শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ও শ্রীশ্রীকাশীনাথের পূজা হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত এখানে দুর্গামণ্ডপ, নাটমন্দির ও পাঁচটি শিবমন্দির আছে। ৺জিতরামের পাঁচ পুত্রের নামে ঐ পাঁচটি শিবমন্দির ১১৯০ হইতে ১১৯৭ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরগাত্রে এখনও সন, তারিখ ও নাম খোদিত আছে।"

জিতরামের পুত্রেরা ১১৭৯ হইতে ১১৯৭ সাল পর্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তাঁহারা প্রৌঢ় বয়স্ক সহজেই ধরিয়া লইতে পারা যায়। এ মতে ১১৭৯ সাল হইতে যদি আমরা ৪০ বৎসর বাদ দিই ত খুব অন্যায় হইবে না। ১১৪০ সালে জিতরাম বর্ত্তমান। ইহারই কিছু পরে তিনি জনার্দ্দনপুর গ্রামে আইসেন ও ইহার এই নাম রাখেন। এই হিসাবে বর্ত্তমান কাল হইতে দুই শত বৎসরের কিছু বেশী এই গ্রামের "জনার্দ্দনপুর" এই নামকরণ হয়—অথচ মৌজা-লিষ্টে ইহার নাম উঠে নাই।

২। হরনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর (কোতওয়ালী) থানায় হরনগর গ্রাম। কৃষ্ণনগর-ঘূর্ণি (যেখানকার মাটির পুতুল পৃথিবী বিখ্যাত) হইতে গ্রাম দেড় মাইল-দু মাইল—জলাঙ্গী বা খড়িয়া নদীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত। ইহার কালি ১৪৬৬ বিঘা; জনসংখ্যা ১৯৫১ সনে ১৪৪৪ জন। প্রবাদ যে, এই স্থান পূর্ব্বে জলাঙ্গীর চর ছিল। চরের বালি-স্তূপে একটি হরগৌরীর ভগ্নমূর্ত্তি পাওয়া যায়—তাঁহার নাম অনুসারে হরনগর গ্রামের নামকরণ হয়। অজ্ঞতাবশতঃ বা মূর্ত্তি ভগ্ন বলিয়া কেহ এই মূর্ত্তি পূজা বা স্পর্শ করিত না। চরের ধারেই পড়িয়া থাকিত—কালক্রমে এই মূর্ত্তি নদীগর্ভে বিলীন হয়। হরনগর গ্রাম উখড়া পরগণার অন্তর্গত। পশ্চিম বাংলায় দুইটি হরনগর আছে; দুইটিই নদীয়া জেলায়। ইহার একটি এই হরনগর। অপর হরনগর নকাসীপাড়া থানার অন্তর্গত।

৩। বাঁকিবাজার (২৪ পরগণা)

বাঁকিবাজার বা বাকিবাজার বলিয়া বর্ত্তমানে কোনও গ্রাম বা মৌজা নাই। শতাবধি বৎসর পূর্ব্বেও ছিল না। তবে বাঁকি-বাজার বলিয়া গ্রাম ছিল। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে আছে:

> "দিন দুই তথা রহি মেলিল বুহিত।
> কুমারহাট গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত।
> ডাহিনে হুগলী রহে বামে ভাটপাড়া।
> পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্ব্বে কাঁকিনাড়া।
> মূলাজোড়া গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর।
> পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর।
> চাপদানি ডাহিনে বামে ইছাপুর।
> "বাহ, বাহ" বলিয়া রাজা ডাকিছে প্রচুর।
> বামে বাকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে।
> চাপাদানি বাহি রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে।"

বিপ্রদাস ইং ১৪৯৫ সনে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ী ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া বা বাদুড়িয়া গ্রামে।

ইং ১৭২২ সনে বেলজিয়মের অন্তর্গত অষ্টেণ্ড, এ্যানটোয়ার্প প্রভৃতি শহরের সওদাগরেরা, তখন এই অঞ্চল অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীন ছিল বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সনদ পাইয়া অষ্টেণ্ড

কোম্পানী গঠন করেন। তাঁহারা বাংলার নবাব নাজিম মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট হইতে ব্যবসা করিবার অনুমতি চাহিলে তিনি তাঁহাদিগকে ভাগীরথী তীরস্থ বাঁকিবাজারে আড্ডা স্থাপন করিবার অনুমতি দেন। ২৪ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুকের xxiii পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :

"The name of the village has disappeared from the maps, and its site can only be identified from old charts, which show that it was situated near Garulia and Palta, about 3 miles north of Barrackpore".

অর্থাৎ এই গ্রামের নাম ম্যাপ হইতে মুছিয়া গিয়াছে ; ইহার সংস্থান পুরাতন নক্সা হইতে বুঝা যায় যে, গাড়ুলিয়া ও পলতার নিকটে বারাকপুর হইতে তিন মাইল উত্তরে ছিল।

ইং ১৭২৩ সনে মোগলরা এই কোম্পানীকে বাঁকিবাজার হইতে তাড়াইয়া দেয়।

বাঁকিবাজার বিপ্রদাসের সময় প্রসিদ্ধ গ্রাম না হইলে তিনি তাহার উল্লেখ করিতেন না। আর বিশিষ্ট স্থান না হইলে অষ্টেণ্ড কোম্পানীও এখানে কুঠি স্থাপন করিতেন না। সওয়া দুই শত বৎসর বাঁকিবাজার নিজ প্রাধান্য বা বিশিষ্ট সত্তা বজায় রাখিয়া এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৪। কুচিনান (২৪ পরগণা)

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ইংরেজী ১৫৯৩।৯৪ বা ১৫৯৪।৯৫ সনে শেষ করেন। তিনি ধনপতি সদাগরের মগরায় গমন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে :

"ত্বরায় চলিল তরি তিলেক না রহে।
ডাহিনে মাহেশ রাখি চলে খড়দহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
কুচিনান ধনপতি দেখিবারে পায়॥
নানা উপচারে তথা পূজে পশুপতি।
কুচিনান এড়াইল সাধু ধনপতি॥
ত্বরায় বাহিছে তরি তিলেক না রয়।
চিত্রপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥"

পুনরায় কবি শ্রীমন্তর গমন প্রসঙ্গে অনুরূপ ভাষায় লিখিয়াছেন :

"ত্বরায় চলে তরি তিলেক নাহি রহে।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ রহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগ মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী।
কুচিনান এড়াই সাধু শ্রীপতি॥
ত্বরায় চলিল তরি তিলেক না রয়।
চিত্রপুর সালিখা এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥"

এই কুচিনান বা কুচিনাল ভাগীরথীর তীরবর্তী কোন গ্রাম ; হুগলী জেলার কোন্নগর ও কোতরঙ্গ গ্রামের দক্ষিণে এবং কলিকাতা ও চিত্রপুরের (চিৎপুরের) উত্তরে। কুচিনানের "পশুপতি" শিব বিখ্যাত। এই কুচিনান বা কুচিনাল কোথায়? বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলায় কুচিনান বা কুচিনাল বলিয়া কোনও মৌজা পাওয়া যায় না।

কলিকাতার সন্নিকট ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম সরকারের খাস মহল। ইহার মধ্যে ১৫টি ডিহি থাকে। ডিহি সুঁড়ার অন্তর্গত যে চারিটি গ্রামের নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কুচনান একটি। এই কুচনান (ইংরেজী বানান Koochnan) পূর্ব্বোক্ত কুচিনান বা কুচিনালের সহিত অভিন্ন কি আলাহিদা গ্রাম তাহা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। যতদূর মনে হয় এই কুচনান আলাহিদা গ্রাম—কারণ ডিহি সুঁড়া ভাগীরথী তীর হইতে দূরবর্তী।

৫। খিরাইতলা।

খিরাইতলা বলিয়া কোন গ্রামের নাম বর্ত্তমানে ২৪ পরগণা, হাওড়া বা হুগলী জেলায় পাই না। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা এম-এ, আমাকে জানাইয়াছেন যে, দ্বিজ মাধবাচার্য্য রচিত "মঙ্গলচণ্ডীর গীতে" তিনি ধনপতি সদাগরের সিংহলযাত্রা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে :

"সেই বাঁক বাহে সাধু দাঁড়ে দিয়া ভর।
স্বর্ণকোয়া বাহে তবে সপ্ত মধুকর॥
সেই কোণাকুনি সাধু বাহে অবহেলে।
পঙ্কাটি বাহিয়া যায় আগরপুর জলে॥
খিরাইতলা বাহিল বুঝিয়া ধনপতি।
বরাহ নগরে ডিঙ্গা হৈল উপনীতি॥
চিত্রপুর বাহি সাধু যায় সাবধানে।"

মাধবাচার্য্য আকবরের সমসাময়িক। এই হিসাবে তিনি মুকুন্দরামেরও সমসাময়িক।

এই খিরাইতলার কোন সন্ধান মিলে না। বিপ্রদাস (ইং ১৪৯৫) কামারহাটী, আড়িয়াদহ, চিতপুরের উল্লেখ করিয়াছেন। পঙ্কাটী=পানিহাটী, আগরপুর=আগড়পাড়া ধরিলে খিরাইতলা দক্ষিণেশ্বর বা আলমবাজারের কাছাকাছি কোনও জায়গা হইবে বলিয়া মনে হয়।

৬। সিঙ্গী গ্রাম বা সিদ্ধি গ্রাম (বৰ্দ্ধমান)

মহাভারতকার কাশীরামদাসের জন্মস্থান বলিয়া সিঙ্গী বা সিদ্ধি গ্রামের প্রসিদ্ধি আছে। কাশীরামদাস স্বয়ং লিখিয়াছেন যে :

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধি গ্রাম।" ইত্যাদি

এই সিদ্ধি গ্রাম বা সিঙ্গী গ্রাম কোথায়? কেহ কেহ বলেন যে, দাঁইহাট ও কাটোয়ার মাঝামাঝি বর্ত্তমানে বীরহাট বলিয়া একটি গ্রাম আছে। জনশ্রুতি ইহার পূর্ব্ব নাম 'সিদ্ধি গ্রাম'। বর্ত্তমানেও শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবী এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই গ্রামেই 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট, যাহার উল্লেখ মুকুন্দরাম কবিকঙ্কন বলিয়াছেন— 'ইন্দ্রেশ্বরে পূজা কৈল দিয়া ফুলপানি।'

সম্ভবতঃ এই ইন্দ্রেশ্বর হইতেই "ইন্দ্রাণী" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানেও 'কেশের ডাঙ্গা' বলিয়া একটি স্থানকে গ্রামবাসীরা কাশীরাম দাসের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, কাশীরামদাসের জন্মস্থান বীরহাটেই। (সন ১৩৬৫ সালের ২৩শে বৈশাখ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দ্রষ্টব্য)

কবিকঙ্কণে ধনপতির নৌকারোহণ প্রসঙ্গে আছে :

"বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী।
ভাতসিংহের ঘাট খান ডাহিনে রাখিয়া।
মেটারির ঘাট বায় বামে তেয়াগিয়া।
ঘন কেরোয়াল পড়ে জলে পড়ে সাট।
এড়াইল চণ্ডীগাছা বোলনপুরের ঘাট।
ত্বরা করি সদাগর রাত্রিদিন যায়।
পূর্ব্বস্থলী সদাগর বাহিয়া এড়ায়।
কোথাও রন্ধন কোথা দধিগুড় কলা।
নবদ্বীপে উত্তরিল বেনিয়ার বালা।"

শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা প্রসঙ্গে আছে :

"সম্মুখে উধনপুর নৈহাটী কতদূর
পাষাণি ঘাটে দিল দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পানী মহাপুণ্য মনে গণি
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ।
মণ্ডলঘাট ডাহিনে আছে থাকিব হাটের কাছে
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখেতে ইন্দ্রাণী ভুবনে দুর্লভ জানি
দৈব নাশে যাহার স্মরণে।"

পুনরায় শ্রীপতের ত্রিবেণী গমন প্রসঙ্গে আছে :

"ডাহিনে লক্ষিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী।
ইন্দ্রেশ্বরে পূজা কৈল দিয়া ফুলপানী।
ভাওসিংহের ঘাটখানি ডাহিনে এড়ায়ে।
মেটেরি সহর খান বামদিকে থুয়ে।

*　　*　　*

বোলনপুরের ঘাটখান কৈল তেয়াগণ।
নবদ্বীপ ঘাটে সাধু দিল দরশন।"

ইন্দ্রাণীর স্থান নির্দ্দেশের জন্য উপরের উদ্ধৃতি দিলাম। বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলার গ্রামের নামের লিষ্টে সিদ্ধি গ্রামের বা বীরহাটীর উল্লেখ দেখিতে পাই না। আনন্দবাজার পত্রিকার লেখকের কথা সত্য হইলে গ্রামের নাম এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে :

সিদ্ধি বীরহাটী (বর্ত্তমান নাম)।

১৯ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে রেভিনিউ সার্ভে হইয়াছিল তাহাতেও বীরহাটী বলিয়া কোন গ্রামের উল্লেখ নাই। অপর একজন লেখক আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে :

"বর্ত্তমানে দাঁইহাট, পাতাইহাট, জগদানন্দপুর, চান্দুলী মোড়া-নাস, অকর্ষা, মুস্টী, সিঙ্গী, আখড়া প্রভৃতি গ্রাম ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্ভুক্ত। কালক্রমে সিদ্ধি গ্রাম সিঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে। সিঙ্গী গ্রামে কাশীরাম দাসের ভিটা নামে একটি ক্ষুদ্র ভদ্রাসনবাটী অদ্যাপি বর্ত্তমান। তাঁহার পুত্র ১০৮৫ সালে আষাঢ় মাসে উক্ত বাস্তুভিটা কুল-পুরোহিতদিগকে দান করেন। এই দানপত্র ছিন্ন-গলিত অবস্থায় কিছুকাল পূর্ব্বেও ছিল। উক্ত ভিটার অনতিদূরে কাশীরামদাসের পুষ্করিণী "কেশে পুষ্করিণী" নামে একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। সিঙ্গী গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বদিকে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্ষেত্রপাল নামে ঠাকুরের স্থান। এই দেবতা অতি জাগ্রত। কাশীরামদাস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষেত্র-পালকে নিমন্ত্রণ করাইতে ত্রুটি করেন নাই, তাই কবি দেখিতেছেন যে, অন্য দেবতাদের সঙ্গে ক্ষেত্রপালও সভামণ্ডপে উপস্থিত :

"অশ্ব আরোহণে করে খর করবাল।
ঊনকোটি দৈত্য লয়ে আসে ক্ষেত্রপাল।"

এই গ্রাম ব্রহ্মাণী নদীতীরে এবং ভাগীরথী হইতে অদূরে, মাত্র দুই ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত।

লেখকের মতে সিদ্ধি গ্রাম কালক্রমে সিঙ্গী গ্রামে পরিণত হইয়াছে। জুরিসডিকসান লিষ্ট দেখিয়া জানা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেভিনিউ সার্ভের সময় সিঙ্গী গ্রামের নাম ছিল শিবরামবাটী আর ইহা জাহাঙ্গীরাবাদ পরগণায়।

কাশীরামদাস ইং ১৫৪৯ সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ের ইন্দ্রাণী পরগণার কিয়দংশ পরে জাহাঙ্গীরাবাদ পরগণা সৃষ্ট হইলে ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। আকবরের সময়ের ৬৮২ পরগণা কালক্রমে ১৬৬০ পরগণায় পরিণত হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু গ্রামের নাম সিদ্ধি শিবরামবাটী সিঙ্গী হইল কিরূপে? আরও একটি কথা কাশীরামদাস ইংরেজী ১৫৪৯ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলে (ভারতবর্ষ ১৩৬৫ বৈশাখ ৬২৮ পৃঃ) তাঁহার পুত্রের ১০৮৫ সনে বা ইংরেজী ১৬৭৮ সনে সম্পত্তি দান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দুই পুরুষে ১২৮ বৎসরের ব্যবধান হয়।

এই সম্বন্ধে সুধী সমাজে আলোচনা হওয়া দরকার।

৭। কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামের

নামের উৎপত্তি এইরূপ। গুমাই তেরপাড়া পরগণার আদি জমীদার মহারাজা বড়িয়ং রায় চৌধুরীর অধঃস্তন ষষ্ঠ পুরুষ কল্যাণ রায় চৌধুরী ষোড়শ শতাব্দীতে জঙ্গল কাটিয়া এই কল্যাণপুর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নাম অনুসারে গ্রামের নাম কল্যাণপুর হইয়াছে।

৮। হামুভূঞ্যা (মেদিনীপুর)

ঐ জেলার নন্দীগ্রাম থানার হামুভূঞ্যা গ্রামের নামের উৎপত্তি এইরূপ। পূর্বে হামু ও ভামু নামক দুই জন রাজা এই গ্রামে ছিল। হামুর প্রতিপত্তি বেশী ছিল। ইহারা ভুঁইয়া ছিলেন। হামুর নামানুসারে গ্রামের নাম হামুভূঞ্যা হইয়াছে।

৯। শ্যামলহরিবাড় (মেদিনীপুর)

ঐ জেলার এগরা থানায় 'শ্যামলহরিবাড়' গ্রাম। ২০০।২৫০ বৎসর পূর্বে, আরও পূর্বে হইতে পারে, শ্যাম ও গর নামে এক প্রতাপশালী ব্যক্তি এইখানে বাস করিতেন। তাঁহার নাম অনুসারে গ্রামের নাম শ্যামলহরিবাড় হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি।

১০। ধাগুঘর (মেদিনীপুর)

ধাগুঘর গ্রাম মহিষাদল থানার অন্তর্গত। গুমাই পরগণার রাজা দক্ষিণাচরণ রায় চৌধুরীর গোলাধান এই গ্রামে থাকিত। দক্ষিণাচরণের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর শিব ও দক্ষিণারঞ্জন কালী এই গ্রামে আছে।

১১। পিরল্যা (নবদ্বীপ)

জয়ানন্দর চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে আছে :

'পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিবে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।"

কিন্তু বর্তমানের মৌজা-তালিকায় উহার নাম বা উহার সহিত শব্দ সাদৃশ্য আছে এইরূপ গ্রামের নাম পাওয়া যায় না। ইহার অন্যান্য কারণের মধ্যে ভাগীরথীর স্রোতের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা নদীগর্ভে লীন হইয়া গিয়া থাকিলে একটি কারণ বলিয়া মনে হয়।

১২। নবদ্বীপের অন্তর্গত গ্রামসমূহ।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকের ২৪৫ পৃঃ লিখিয়াছেন :

'আতোপুর' মাজিতা গ্রাম, বামন পোখেরা, হাটডাঙ্গা, চাপাহাটি, রাতুপুর, বিটানগর, মাউগাছি, রাহুপুর, বেলপোখেরা, মায়পুর প্রভৃতি বহু সংখ্যক পল্লী ইহার অন্তর্গত ছিল, নরহরির অতিরঞ্জিত বর্ণনায় ইহার বসতি অষ্টক্রোশ ব্যাপক বলিয়া উল্লিখিত আছে (ভক্তিরত্নাকর-১২শ তরঙ্গ)। উক্ত পল্লীসমূহ ব্যতীত গন্ধবণিক পাড়া, তাঁতিপাড়া, শাখারিপাড়া, মালাকারপাড়া প্রভৃতি চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত দেখিতে পাই।"

এক্ষণে এই সব নাম পাওয়া যায় না।

১৩। জয়নগর-মজিলপুর (২৪ পরগণা)।

জয়নগর ও মজিলপুর দুইটি বিভিন্ন পাশাপাশি গ্রাম। মরাগাঙ্গের এদিকে আর ওদিকে। পূর্বে জয়নগরের নাম ছিল পোলাবাড়ি। এখানে বহু কায়স্থ জমিদার ও তাঁহাদের আশ্রয়পুষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। একবার বিচারে স্থানীয় পণ্ডিতগণ নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করেন। তখন হইতে জমিদারগণ পোলাবাড়িকে বিচারে নিজেদের বাসভূমির জয় হইয়াছে বলিয়া জয়নগর আখ্যা দেন। প্রথমে প্রথমে লোকে গ্রামের নাম পোলাবাড়ি-জয়নগর বলিত। এক্ষণে কেবলমাত্র জয়নগর বলে। কতদিন আগে এই বিচার ও নাম পরিবর্তন হইয়াছে বলিতে পারি না। লোকমুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়াছি।

(ক) গোঁসাইপুর (ময়মনসিংহ)।

আমরা পশ্চিম বাংলার গ্রাম লইয়া আলোচনা করিতে করিতে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি গ্রামের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি। সেগুলি একস্থানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকের ৩৪৫ পৃঃ লিখিয়াছেন :

"কথিত আছে, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা-নদীর তীরস্থ নবীনপুর (জ্ঞানপুর) গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই স্থান এখন গোঁসাইপুর বলিয়া পরিচিত।"

মাধবাচার্য্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন ১৫০১ শকে বা ইং ১৫৭৯ সনে। তাঁহার আদিবাস সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীতে। তিন শত বৎসরে নবীনপুর বা ভাষার অবক্ষয়ে জ্ঞানপুর এক্ষণে গোঁসাই-পুরেতে পরিবর্তিত হইয়াছে।

(খ) সোহাগাবা (চট্টগ্রাম)।

১৩৬৪ সালের ফাল্গুন মাসের "মাসে-নও" মাসিক পত্রিকায় শ্রীমাহবুব-উল-আলম "সাহিত্যবিশারদ বংশ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

"কথিত আছে, বাঙ্গলার সেন বংশীয় শেষ রাজার রাজসভায় নবদ্বীপবাসী এক ব্রাহ্মণ সভাসদ ছিলেন। তাঁহার গসাই রায় ও সগাই রায় নামে দুই পুত্র ছিল। ইহারা বিদ্যার্জন মানসে ভ্রমণে বাহির হইয়া আজমীরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং খাজা মাইনুদ্দীন চিশতী সাহেবের হস্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষালাভ করেন। অতঃপর তাঁহাদের নাম হয় গিয়াসুদ্দীন ও শামসুদ্দীন খান।

"গিয়াসুদ্দীন খান বখতিয়ার খিলজীর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন এবং ক্রমে সেনাপতির পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু বখতিয়ারের পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে দিল্লীশ্বরের পুত্র ও সেনাপতি নাসিরউদ্দীন কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাঁহার হত্যার ফলে যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়, বিদ্রোহী সুলতানের সেনাপতিরূপে ধৃত ও দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি পুত্র মুরাদ খান ও আজিম খানকে সঙ্গে করিয়া চট্টগ্রামে

পলাইয়া আসেন। তিনি প্রথমে সাতকানিয়া থানার লোহাগারা গ্রামে অবস্থিত হন। প্রবাদ, তিনি বাড়ীর চারিদিকে লোহার ঘেরা দিয়াছিলেন। উহা হইতেই গ্রামের নাম 'লোহাগারা' হয়।"

(গ) (ঘ) মুরাদাবাদ, আজিমপুর (চট্টগ্রাম)

"এই পরিবার ক্রমে স্থান পরিবর্ত্তন করে। প্রথমে সাতকানিয়া থানার করইয়ানগর গ্রামে, পরে পটিয়া থানার মুরাদাবাদ গ্রামে, অতঃপর আজিমপুর গ্রামে এবং সর্ব্বশেষ আশিয়া গ্রামে আসিয়া অবস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন, মুরাদ খানের নামে মুরাদাবাদ এবং আজিম খানের নামে আজিমপুর গ্রামের উৎপত্তি হইয়াছে।"

(ঙ) (চ) (ছ) (জ) হাবিলাষ, সৈয়দপুর, খরদ্বীপ, চরণদ্বীপ (চট্টগ্রাম)

আবদুল করিম "সাহিত্যবিশারদ সাহেব যে মল্লবংশের, যতদূর জানা যায়, উহার আদি-পুরুষ হাবিলষ মল্ল। বোয়ালখালী থানার হাবিলাষ-দ্বীপ নামে একটি গ্রাম আছে। কথিত আছে, হাবিলাষ এই গ্রামের পত্তন করেন এবং তাঁহার নাম হইতেই স্থানের নাম হইয়াছে।"

"অষ্টম শতাব্দীর পরও চট্টগ্রামের এই অংশ চর-ভরাট হইতেছিল এবং আরবগণের উপনিবেশ স্থাপন উপলক্ষ্যে সৈয়দগণের বাসস্থান হওয়ায় সৈয়দপুর, খড়্গ পড়িয়া চর হওয়ায় খরদ্বীপ এবং চরণ রাখার সৌভাগ্যে চর পড়ায় চরদ্বীপ উদ্ভব হয়। ইহারা হাবিলাস দ্বীপের নিকটবর্ত্তী।"

হাবিলাষ মল্ল আকবরের সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল

শ্রীঅণিমা রায়

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানবের শিল্পোদ্দীপনা প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল মাটির নানা রকম পাত্র গড়ে—কেননা সেইটাই তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল। পরে সেই আদি মানবের মনে কলানুভূতি এলে সে রং ফলিয়ে কৃষ্ণবর্ণ, ধূসরবর্ণ প্রভৃতি পাত্র গড়তে থাকে। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে সে ক্রমে মাটির মূর্ত্তি ও অলঙ্কার গঠনে মন দেয়। পরে পোড়ামাটির (Terracotta) শীলমোহর ও পোড়ামাটির উপর নানা রকম কারুকার্য্য করতে শিখে। মানব সভ্যতার এই সব গোড়ার নিদর্শন আজ ভূগর্ভে নিহিত হয়ে গেছে। আজ পৃথিবীর বহু স্থানে ভূমি খনন করে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সেই সব কৃষ্ণবর্ণ ও ধূসরবর্ণ পাত্র প্রভৃতি বাহির করেছেন। সেই সব জিনিস দেখে তাদের রচয়িতাদের সভ্যতার মান ও স্তর এবং সেই দিনের মৃৎশিল্পীরা ক'হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বাস করতেন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তা নির্ণয় করেছেন। ভারতবর্ষেও এই রকম খননকার্য্য চলছে। মহেঞ্জোদারো', হারাপ্পা', রঙ্গপালা প্রভৃতি স্থানে ভূমি খনন করে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে তা দিয়ে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার ইতিহাস রচিত হচ্ছে।

মৃৎশিল্প মানবের আদিশিল্প। এই শিল্প ভারতের সর্ব্বত্র এখনও একটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্প হিসাবে চলছে। হাঁড়ি, কলসী, খুরি, গেলাস, নানাবিধ মূর্ত্তি, গৃহসজ্জার অলঙ্কার প্রভৃতি ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত দিনের পর দিন গড়া হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের অভাব মোচন করছে। তবে এই মৃৎশিল্প উৎকর্ষ লাভ করেছে উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে।

দু' শতাব্দী পূর্ব্বে বাংলায় নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম নদীয়াধীপ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিরাজের পতনের পর স্বপ্নাদেশে জগদ্ধাত্রী দেবীর অর্চ্চনা করার মনস্থ করেন। পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলা দেশে এই প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা। ধ্যানের মূর্ত্তির সবটুকু বজায় রেখে জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা গড়বার জন্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাটোর থেকে দু'চারজন সুদক্ষ মৃৎশিল্পী এনে কৃষ্ণনগরে বসবাস করান। এই শিল্পীরা বহু দেবদেবীর প্রতিমা গড়ত এবং নানা রকম মাটির পুতুল তৈরি করত। তাদের পুতুল গঠনের ও তার উপর রং ফলানোর দক্ষতা ক্রমেই বেড়ে উঠে। রাজানুগ্রহ না থাকলে শিল্পীর উন্নতিলাভ করা বা বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়ে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতা থেকে এই শিল্পীরা কখনও বঞ্চিত হয় নি। এই ভাবে কৃষ্ণনগরে মাটির পুতুল গড়ার শিল্প স্থাপিত হয়।

কৃষ্ণনগরে মৃৎশিল্পীর সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে এবং নানাবিধ মাটির পুতুল তারা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে গঠন করে। প্রথমে তারা খড় বেঁধে তার উপর মাটি চাপিয়ে পুতুল ও অন্যান্য পশুপক্ষী, ফল প্রভৃতি তৈরি করত এবং সেই কাঁচামাটির উপর রং ফলাত। কিছুকাল পরে এগুলিকে আরও মজবুত ও মনোহর করবার জন্য শিল্পীরা খড়ের পরিবর্ত্তে লোহার শিক ব্যবহার করে এবং শিল্পদ্রব্যগুলি গড়ার পর সেগুলিকে উনানে (সাধারণ চুল্লীতে) পোড়ানোর ব্যবস্থা করে।

এই পোড়ানোর ভার শিল্পীগৃহের নারীদের উপর ন্যস্ত হয়। কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র হাতপাখার

সাহায্যে চুলীর তাপ নিয়মিত করা যে কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। বহু চেষ্টা, বহু অভিজ্ঞতার ফলে এই কাজটি তাদের আয়ত্ত হয়েছে এবং বংশপরম্পরায় এই জ্ঞান মাতার নিকট কন্যারা হাতে কলমে অর্জ্জন করেছে। শিল্পীরা যে সব রং ব্যবহার করত তা নিজেরা দেশীয় উপাদানে স্বগৃহে প্রস্তুত করে নিত। পোড়ার সময় বহু পুতুল ফেটে যেত, সেগুলিকে মেরামত করার নৈপুণ্য কম নয়। শিল্পদ্রব্য যা প্রস্তুত হ'ত সেগুলি কৃষ্ণনগরে ও চারিপাশের গ্রামে বিক্রী হ'ত এবং কিছু কিছু কলিকাতার বাজারে ব্যাপারীরা বিক্রী করবার জন্য আনত। বহু কষ্টে শিল্পীদের গ্রাসাচ্ছাদন চলত।

প্রায় এক শতাব্দীর সাধনার ফলে পুতুল গঠন ও রং করবার নৈপুণ্য (Technique) কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা একেবারে করায়ত্ত করে ফেলে। তাদের প্রস্তুত শিল্পসম্ভার এত সুন্দর ও এত স্বাভাবিক হয় যে বাংলার সর্বত্র এই সব পুতুলের আদর হয়। কৃষ্ণনগরে প্রস্তুত মনুষ্য মূর্ত্তি দেখলে মনে হয় যে সেখানকার শিল্পীরা দেহতত্ত্ব শাস্ত্রে (Anatomy) সুপণ্ডিত। একটি গল্প শোনা যায় যে এক ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের প্রস্তুত দুটি মাটির ইলিশমাছ নিয়ে রেলগাড়ীতে উঠে গাড়ীর একটি বেঞ্চে রাখেন। অদৃষ্টক্রমে একজন পরম বৈষ্ণব সেই বেঞ্চে বসেছিলেন। মাছ দুটিকে বেঞ্চের উপর দেখে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কটু কথা বলতে সুরু করেন এবং নিজের যষ্টির দ্বারা একটি মাছ মেঝেতে ফেলে দেন। পতনের ফলে মাছটি ভেঙে যাবার পর তিনি বুঝতে পারেন যে, সেটি মাটির মাছ। মালিককে মাছের মূল্য দিয়ে বৈষ্ণবপ্রবর মন্তব্য করেন যে, এ মাছ জলের ধারে নিয়ে গেলে প্রাণবন্ত হয়ে জলে পালাবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহির্জগত কৃষ্ণনগরের এই অপূর্ব্ব মৃৎশিল্পের পরিচয় পায়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জুলেজুবার নামক জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক কলিকাতায় একটি প্রদর্শনী চালান। সেখানে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প প্রদর্শিত হয়। পৃথিবীর বহুস্থানের লোক এই প্রদর্শনীতে আসেন এবং কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প দেখে মোহিত হন। তাঁরা বহু পুতুল ক্রয় করে স্ব স্ব দেশে পাঠান। এতে শিল্পীগণ প্রভূত উৎসাহ পায় এবং কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ভারতের বাহিরে রপ্তানি করবার দ্বার খুলে যায়। সেই সনেই (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রী টি. এন মুখার্জ্জী 'ভারতীয় শিল্পদ্রব্য গ্রন্থে' (A hand book of Indian product) লেখেন, "কৃষ্ণনগরের প্রস্তুত বাঙালীর জীবন রূপায়িত করা নানাবিধ প্রমাণ মাপের ও ছোট ছোট মাটির পুতুল অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই ধরনের পাঁচটি পুতুল আমেষ্টার্ডাম প্রদর্শনীতে পাঠান হয়েছিল এবং এই পুতুল কয়টি সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক দ্রষ্টব্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। এইসব পুতুলের শিল্পী যদুনাথ পালের উপর ভারতের বিভিন্ন জাতির (শিখ, বাঙালী, নাগা প্রভৃতি) প্রমাণ মৃন্ময়মূর্ত্তি গঠনের ভার দেওয়া হয়—কলিকাতা প্রদর্শনীতে সেগুলি প্রদর্শিত হবে বলে।" এই প্রতিমূর্ত্তিগুলি যদুনাথ অতি নিপুণতার সহিত গঠন করেন এবং সেগুলি এখনও কলিকাতার যাদুঘরে বিদ্যমান আছে।

১৯০৩ সনে মিষ্টার জে, জি, কামিং আই-সি-এস মহাশয় ভারতীয় শিল্পের যে আলোচনা পুস্তিকা লিখেছেন তাতে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের প্রশংসা করে সেখানকার পাঁচজন ওস্তাদ শিল্পীর (Master Craftsman) নাম লিপিবদ্ধ করে গেছেন—রাখালদাস পাল, সি. সি. পাল, নিবারণচন্দ্র পাল, বক্রেশ্বর পাল এবং যদুনাথ পাল। এই যদুনাথ পালের বংশধরগণ জি. পাল প্রভৃতি এখনও কলিকাতার কুমারটুলিতে সুন্দর সুন্দর প্রতিমা গড়ে বহু টাকা উপার্জ্জন করছেন। দেবদেবীর প্রতিমা গঠনের জন্য কৃষ্ণনগরের শিল্পীদিগকে সারা বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে—ভারতের নানাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের এখন এটি সর্ব্বাপেক্ষা লাভের কাজ। গোপেশ্বর পাল ইউরোপে গিয়ে মৃৎশিল্পের কাজে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগরে এই যে মৃৎশিল্প গড়ে উঠেছিল, শিল্পীদের সাধনার ফলে তা নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে। গত শতাব্দীর শেষভাগ হতে শিল্পীরা যে-সব মূর্ত্তি গঠন করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল :

১। দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন।

২। পৌরাণিক নানাবিধ ঘটনাকে মৃত্তিকার সাহায্যে রূপায়িত করা—রামলীলা, রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি।

৩। ঐতিহাসিক ঘটনাকে রূপদান করা—যেমন দিল্লীর দরবারের দৃশ্য, সুজাতা ও বুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহের কয়েকটি ঘটনা প্রভৃতি।

৪। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আবক্ষ বা পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি গঠন, যথা : মহাত্মা গান্ধী, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি।

এই শিল্পীগণ বাংলা ও বাংলার বাহিরে বহু রাজা, মহারাজা এবং জমিদারের মূর্ত্তি গঠন করেছেন। ফটো থেকে তাঁরা মূর্ত্তি গঠন করতে পারেন—এমন কি মানুষকে সামনে বসিয়ে তাঁর অবিকল প্রতিমূর্ত্তি গঠন করেন। এইসব মূর্ত্তি এত স্বাভাবিক হয় যে, মূর্ত্তির ফটো তুললে মনে হবে যেন আসল মানুষটির ফটো তোলা হয়েছে। লালদীঘিতে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যে মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে তার মডেল কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের দ্বারা গঠিত একটি মৃন্ময়মূর্ত্তি।

৫। নানা দেশের নরনারী এবং বাংলার বিভিন্ন স্তরের নরনারীর নিখুঁত মূর্ত্তি—যথা : ইংরেজ, আফ্রিকাবাসী, চীনা, কাবুলীওয়ালা, উড়িয়া, শিখ, বাঙালীবাবু, মেথরাণী, ঘাসুড়ে, পাহারাওয়ালা, বরফওয়ালা, সাপুড়ে, কেরাণী, সন্তানক্রোড়ে জননী প্রভৃতি।

৬। নানাবিধ পশুপক্ষীর মূর্ত্তি গঠন—যথা : গরু, ঘোড়া, হাতী, উটপাখী, টিয়া, চন্দনা, কাকাতুয়া, শালিক প্রভৃতি। এ-সবের গঠন-পরিপাট্য এবং রঙফলানো কৌশল অদ্ভুত।

৭। নানাবিধ সামাজিক ঘটনার প্রতিচ্ছবি গঠন—যথা : অন্নপ্রাশন, বিবাহ, দীক্ষাগ্রহণ, শব-সংকার প্রভৃতি।

৮। নানাবিধ পোকামাকড় যথা: আরসুলা, মাকড়সা, টিকটিকি, কাঁকড়া প্রভৃতি। দূর থেকে দেখলে এগুলিকে জীবন্ত বলে মনে হবে।

৯। নানাবিধ মাছ যথা: ইলিশ, রুই, কাতলা, গলদাচিংড়ি প্রভৃতি।

১০। যানবাহন যথা: গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, নৌকা, বজরা, রেলওয়ে ইঞ্জিন, জাহাজ প্রভৃতি।

১১। নানাবিধ ফলমূল যথা: কলা, পেঁপে, শশা, নারিকেল, তরমুজ, আম, লিচু, মূলা, বেগুন, ঝিঙা, আলু, পটল প্রভৃতি। এগুলি এত স্বাভাবিক যে, কেহ হাত না দিলে সেগুলি আসল কি কৃত্রিম তাহা বুঝতে পারবেন না।

১২। খাদ্যদ্রব্য যথা: পাউরুটি, বিস্কুট, সন্দেশ, রসগোল্লা পান্তুয়া, পানের খিলি প্রভৃতি।

এসব ছাড়া আরও বহু জিনিস শিল্পীর দল রূপায়িত করেন যথা: হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ষাড়ের লড়াই, মহরমের মিছিল, বিদ্যালয় প্রভৃতি।

ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পের সমাদর আছে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল কিছু কিছু ভারতের বাহিরে রপ্তানি হয়। এই কাজটি ভালভাবে চালাইবার কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, চিকাগো মিউজিয়ম ও রাশিয়ার কয়েকটি যাদুঘরে এইসব পুতুল সযত্নে রক্ষিত আছে। আমাদের বাণিজ্য-দূতেরা (Trade-commissioners) একটু মনোযোগ দিলে এইসব মাটির পুতুল বিভিন্নদেশে রপ্তানি হতে পারে।

গত শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সারা ভারতে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের সমাদর ছিল। ধনীরা ত বটেই, সাধারণ গৃহস্থরাও কিছু কিছু পুতুল কিনে গৃহসজ্জার জন্য স্বগৃহে রাখতেন। এখন এইসব পুতুলের চাহিদা একেবারে কমে গিয়েছে। প্রতিমা গঠন করে কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন চালাচ্ছেন। অনেকের অর্থনৈতিক অবস্থা এত হীন হয়ে পড়েছে যে, তাঁরা পূর্ব্বপুরুষ-প্রদত্ত এই শিল্পনৈপুণ্যের মায়া কাটিয়ে অন্য ব্যবসা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এই দৈন্যের কারণ কি? নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি এর জন্য দায়ী:

১। ভারতবাসীর রুচির পরিবর্তন হয়েছে। ইউরোপ থেকে আগত গৃহসজ্জার পুতুল, অন্ততঃ চীন-জাপানের পুতুল গৃহে না রাখলে সভ্যতার হানি হবে—গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে এইরূপ ধারণা এসে গিয়েছিল।

২। পোরশিলেন, কাঁচ, চীনামাটির পুতুল ছাচে গড়া হয়, তাই তার মূল্য কম। কাজেই সাধারণ গৃহস্থ সেই সব জিনিস গৃহে স্থান দিয়েছেন। যদিও কলাহিসাবে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের অনেক নিচে এর স্থান।

৩। ইংরেজ আমলে ইংরেজের এই অপূর্ব্ব কুটীর-শিল্পের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি ছিল না। অথচ রাজানুগ্রহ না পেলে কোন শিল্পের বেঁচে থাকা কঠিন। ১৯১৬ সনে কয়েকজন দেশ-সেবক যুবক কলিকাতায় গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠান (Home Industries Association) নামে একটি বড় দোকান খোলেন। তাঁরা কৃষ্ণনগরে প্রস্তুত নানাবিধ বহুসংখ্যক পুতুল দোকানে রাখতেন। দোকানটি কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের স্থায়ী প্রদর্শনীর কাজ করত। ইংরেজ দেশপ্রীতির অপরাধে যুবকদের উপর এমন অত্যাচার আরম্ভ করেন যে, তাঁরা দোকানটি বন্ধ করতে বাধ্য হন। ইংরেজ এদেশের এই অপূর্ব্ব পুতুলকে উপেক্ষা করে বিলাত থেকে নানাবিধ সাধারণ পুতুল আমদানী আরম্ভ করেন—আপিসের শোভার জন্য। ১৯০০ সনে জগদ্বিখ্যাত কলা-সমালোচক পণ্ডিত মিঃ হ্যাভেল লণ্ডনের আর্ট সোসাইটিতে ভারতীয় কলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—তাতে তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে, কয়েক বৎসর আগে কলিকাতায় কতকগুলি সরকারী বাড়ী নির্ম্মাণ করা হয়েছিল, সেগুলির জন্য বিলাত থেকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের অতি সাধারণ ও নগণ্য পুতুল আমদানী করা হয়েছিল। সে সব পুতুল দেখে ভারতবাসীর মনে কোন শিল্পোদ্দীপনা আসবে না—কেন না তাদের নিজেদের শিল্প অনেক উচ্চস্তরের। এই সব পুতুলের কয়েকটি রাইটার্স বিল্ডিং-এর ছাদের উপর এখনও দেখা যায়।

মরণোন্মুখ এই অপূর্ব্ব শিল্পের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করতে হবে:

(১) ভারতের সমস্ত প্রদর্শনীতে এই সব পুতুল পাঠাতে হবে।

(২) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন এই সব পুতুল দেখাবার ব্যবস্থা করেন।

(৩) স্কুল-কলেজে শিক্ষার জন্য যা কিছু মডেল প্রয়োজন তা যেন বিদেশ থেকে না এনে কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের দ্বারা প্রস্তুত করিয়ে নেওয়া হয়। ডাক্তারী শিক্ষায় বহু মডেলের প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণনগরের শিল্পীগণ অনায়াসে তা গড়তে পারেন।

(৪) আমাদের বাণিজ্য-দূতেরা ভারতের বাইরে এই সব পুতুলের প্রচার করবেন—যাতে বহু পুতুল রপ্তানি হতে পারে।

(৫) উপযুক্ত কারিকরদের বৃত্তি, পদক প্রভৃতি দিয়ে উৎসাহ-দান করতে হবে।

(৬) ভারতের বড় বড় শহরে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য কুটিরশিল্পের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের দোকান রাখতে হবে। এই দোকানগুলি শুধু বাণিজ্যের স্থান নয়, স্থায়ী প্রদর্শনীর কাজ করবে।

(৭) কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের তথ্যমূলক ফিল্ম তুলে সর্ব্বত্র দেখালে এই শিল্পের প্রচারকার্য্য বেশ ভাল ভাবে হবে।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই মৃৎশিল্পের উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির শিল্প বিভাগ এই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের চেষ্টায় কৃষ্ণনগরের এই শিল্পীর দল যে পূর্ব্ব-মহিমা ফিরে পাবে তা আশা করা সঙ্গত।

দুস্তর

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

বাইরে যেন একটা কথাকাটাকাটির শব্দ। চিঠি সই করতে করতে একটু উৎকর্ণ হ'ল শশাঙ্ক রায়। একটি স্ত্রীকণ্ঠের মৃদু কলরোল যেন বচসায় রূপ নিচ্ছে। চাপরাশিকে ডেকে খোঁজ নেবে কিনা ভাবল সে—ডোমিনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার শশাঙ্ক রায়। কিন্তু হঠাৎ সেই বচসার শব্দ থেমে গেল। আর তার পরেই তার কামরার হাফ-ডোরের বাধা সরিয়ে ভেতরেই চলে এলেন এক মহিলা। তাঁর পেছনে পেছনে আর একটি পুরুষ—গলাবন্ধ কোটে সম্ভবতঃ রুদ্ধবাক্ তিনি। কিন্তু মহিলা একাই একশ'।

শশাঙ্কর টেবিলের ওপরে তিনি একটি পাঁচশ' টাকার ড্রাফট ধরে বললেন—দেখুন, আমার নামে ড্রাফট। আপনাদের কলকাতা অফিস থেকে কালই নিয়েছি, আর আজ এখানে পেমেণ্ট দিচ্ছেন না। কেন দেবেন না? ওরা বলছে আইডেনটিফিকেশন লাগবে। কেন? আমার টাকা আমি নেব? আমি কি চোর?

মহিলার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও অনর্গল। উত্তেজনায় তাঁর ফর্সা সুন্দর মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। শশাঙ্কর কানে কথাগুলি হয়ত সম্পূর্ণ প্রবেশ করল না। সে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল মহিলাটির মুখের দিকে।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল ভদ্রমহিলার। কথার স্রোত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল; এবং ম্যানেজারের দৃষ্টির সামনে সে বোধহয় কুণ্ঠিত বোধ করল। হঠাৎ চকিত ও আরক্ত হ'ল তাঁর মুখ। আর শশাঙ্ক সে মুখের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলল, বসুন আগে। ভদ্রমহিলা ও তাঁর সঙ্গী উপবেশন করলে শশাঙ্ক বলল, আপনার নামও লেখাই আছে ড্রাফটে—ললিতা দত্ত। আপনার?

ভদ্রলোক মৃদুহাস্যে বললেন, আমি সমর দত্ত। এখানে ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিয়েছি। একেবারে নতুন লোক। আলাপ পরিচয় এখনও হয় নি কারও সঙ্গে।

শশাঙ্ক বলল, আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি ডক্টর দত্ত। আপনাকে আমি দেখবার আগে থেকেই চিনি। আমার নাম শশাঙ্ক রায়।

শশাঙ্ক পলকে চাইল ভদ্রমহিলার দিকে। কিন্তু মনে হ'ল তিনি অন্যমনস্ক। শশাঙ্ক আশ্চর্য্য হ'ল—ললিতা এমন করে এড়িয়ে যেতে চায়? নাকি সে লজ্জা বা অভিমানে নীরব! হয়ত স্বামীর সামনে কুণ্ঠা বোধ করছে পূর্ব্ব পরিচয়কে প্রকাশ করতে। শশাঙ্ক একটু আশ্চর্য্য হ'ল, একটু আহত হ'ল। তবু সে আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলল, বছর সাতেক আগে আমি একবার বোলপুর গিয়েছিলাম। তখন আলাপ হয়েছিল অধ্যাপক সরকারের সঙ্গে। মনে হচ্ছে যেন···

ডক্টর দত্ত খুশীভরা চোখে তাকালেন—তা হলে ত ললিতার চেনা উচিত। অধ্যাপক সরকার আমার শ্বশুর।

ললিতার কঠিন গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে শশাঙ্ক বলল, ব্যাঙ্কের কতকগুলি নিয়ম বা আইন আছে। আপনার ড্রাফটটা হারিয়ে যেতেও ত পারে। কাজেই যিনিই আসুন তাঁকে পরিচয় দিয়ে তবে টাকা নিতে হয়। তবে আপনাদের ত আমিই চিনি। টাকা আনিয়ে দিচ্ছি।

টাকা হাতে পেয়ে তাঁর ছোট্ট একটি হাত-ব্যাগে টাকাটা পুরে ফেললেন ললিতা দত্ত। তার পর কোনরকম সৌজন্য না দেখিয়েই সোজাসুজি উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীকে বললেন, চল।

ডক্টর দত্ত অবশ্য বার বার ধন্যবাদ জানালেন ও তাঁদের বাড়ীতে একদিন খাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তবে বিদায় নিলেন।

সত্যিই, আশ্চর্য্য হয়ে গেল শশাঙ্ক। ললিতার না চেনা, বা না চেনার ভাণ তার কাছে বিস্ময়কর বৈকি। ললিতা তাকে চিনতে চাইল না? সাত বছর আগে একদিন যে ললিতা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করত, সাত বছর আগের যে মেয়ে সারাদিন ধরে একটি নামই মুখস্থ করত—সেই ললিতা?

চেয়ারে হেলান দিয়ে নিঃশব্দ হয়ে বসে রইল শশাঙ্ক। বসে বসে সে ভাবতে লাগল পুরণো দিনের সেই মধুর বেদনাবহ ছোট্ট একটু অতীতকে। সময়ের চরে বসে শশাঙ্ক আজ পেছিয়ে রয়েছে, সাত বছরের অতীতে। আর ললিতা এগিয়ে গেছে স্রোতে। এ ললিতা তাকে চেনে না। এ ললিতার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই কোন।

ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে একটি মেয়ে এসেছিল তার বাপের একটা চেক ভাঙাতে। কিন্তু একই কারণে সেদিনও ওকে ফিরিয়ে দিয়েছিল অফিস। আর ও খেপে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল ম্যানেজারের ঘরে।

—আমার বাবা চেক দিয়ে টাকাটা নিয়ে যেতে বলেছেন। আর এঁরা আমায় টাকা দিচ্ছেন না। কেন বলুন ত?

সুন্দরী একটি মেয়ের উদ্দীপ্ত চেহারার দিকে চেয়ে সেদিন কৌতুক বোধ করেছিল শশাঙ্ক। বলেছিল, দেখি চেকটা।

চেকে বেয়ারার কথাটা কাটা আছে। সেটা দেখিয়ে বলল শশাঙ্ক—আপনাকে আপনার পরিচয় দিতে হবে। চেকে তাই বলা আছে।

ললিতা গর্জ্জে উঠল প্রায়—আমার নামে চেক; আমি ললিতা সরকার। "বেয়ারার" কথাটা ত আমিই এখানে এসে কেটে দিলাম।

শশাঙ্ক ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার হলেও বয়েসে একেবারেই তরুণ। তাই হাসির দীপ্তি খেলে গেল তার মুখে। তবু সে গম্ভীর হতে চেষ্টা করে বলল, ও আপনিই ললিতা সরকার? আচ্ছা বসুন। ভবিষ্যতে কিন্তু 'বেয়ারার' কথাটা আর কেটে দেবেন না।

শশাঙ্ক নিজেই চেকের টাকা আনিয়ে দিল।

এটা ছিল সূত্রপাত। কিছুদিন পরের কথা। নির্জ্জন একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল শশাঙ্ক। পূর্ব্ব-পল্লীর কাঁকড়ভরা পথ। উল্টো দিক থেকে সাইকেলে যে আসছিল সে নারী। দ্রুতগতিতে পাশ কাটাতে গিয়ে স্লিপ করল তার সাইকেলের চাকা। আরোহিনী হুড়মুড় করে পড়ল রাস্তার পাশের মেঠো-জমিতে। সাইকেলের চেনে তার শাড়ীটাও জড়িয়ে গেল।

অনেক কষ্টে চেন থেকে কাপড় ছাড়িয়ে দেওয়ার পর সে যখন উঠে দাঁড়াল তখন শশাঙ্ক হেসে ফেলল—আপনি?

ললিতা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'ল। সাইকেলে উঠতে উঠতে সে উত্তর দিল—হ্যাঁ আমি।

অধ্যাপক সরকারের সঙ্গে পরিচয় হলো সার্কেল অফিসার মিঃ দে বিশ্বাসের বাড়ীতে চায়ের পার্টিতে। অত্যন্ত গল্পের লোক অধ্যাপক সরকার। রাজনীতির আলোচনায় সব্যসাচী। কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। দেখা গেল, শশাঙ্কর মতামত তাঁর সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

অত্যন্ত খুসী হয়ে তিনি শশাঙ্ককে নেমন্তন্ন করলেন তাঁর বাড়ীতে। আর বস্তুতঃ শশাঙ্কও এমনই একটি আমন্ত্রণের প্রত্যাশাতেই ছিল। তাই কালবিলম্ব না করে এক ছুটির দিনের সকালে সে হাজির হ'ল তাঁর বাড়ী।

ললিতা তখন তানপুরায় গলা সাধছিল। শশাঙ্ক পৌঁছতেই থেমে গেল তার সঙ্গীত-সাধনা। তানপুরা সরিয়ে রেখে সে এসে দরজা খুলে দিয়ে অবাক্ হ'ল—আপনি!

—আমি এসেছি অধ্যাপক সরকারের কাছে। কিন্তু খুব অন্যায় করলাম মনে হচ্ছে। আপনার এমন সুন্দর জৌনপুরীর আলাপটাকে নষ্ট করে দিলাম।

—জৌনপুরীর আলাপ? আপনি গান জানেন তা হলে?

—না, মানে শুনে শুনে এক আধটা সুর চেনা হয়ে গেছে আর কি?

অধ্যাপক কাছেই এক বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলেন। কাজেই আধঘণ্টা প্রায় তাঁর জন্যে বসে অপেক্ষা করল শশাঙ্ক। আর ললিতার সঙ্গে আলোচনা করল অর্থনীতি নিয়ে। ললিতা অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ছে।

আলাপটা এমনি ভাবেই জমে উঠেছিল—শুধু জমে ওঠে নি, শশাঙ্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল ললিতার কাছে। ওর বাবা অধ্যাপক সরকার ছুটির দিন হলেই খুঁজতেন কোথায় শশাঙ্ক। কিন্তু শশাঙ্কর ভুল হ'ত্ত না আসতে। তার কাছে অনেক বড় আকর্ষণ আছে। অধ্যাপক সরকার বড় জোর একটু দুঃখিত হবেন। কিন্তু ললিতা হবে অভিমানাহত। শশাঙ্কর একক জীবনে ললিতা হ'ল একটা আবির্ভাব।

একদিন একটি গোধূলি সন্ধ্যেকে সামনে রেখে ললিতা সেতারে পূরবীর সুর সাধছিল। এমন সময় শশাঙ্ক এসে পৌঁছল, ডাকল—ললিতা।

ললিতা সেতার ছেড়ে উঠে এল, বলল—বসুন। বাবা মাকে নিয়ে চায়ের নেমন্তন্নে গেছেন। আমি একা আছি। শশাঙ্ক ইতস্ততঃ করছিল কিন্তু ললিতা ওকে টেনে নিয়ে গেল ভিতরে। বলল—না বসলে বাবা ভীষণ রাগ করবেন।

শশাঙ্ক সহাস্যে চাইল—শুধু বাবা রাগ করবেন? আর কেউ না ত? আমি যাই তবে।

ললিতা কটাক্ষে চাইল—যাই মানে! আমি রাগ করব না?

—আমি না এলে তুমি খুব রাগ কর ললিতা?

—ভীষণ। ললিতা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল। আর সেই শেষ গোধূলির আলোকে ললিতার অন্তর পলকের মধ্যে ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠল শশাঙ্কর কাছে।

সেদিন রাত্রে ফিরে এসে তার নির্জ্জন ঘরের বারান্দায় বসে অনেক দূর পর্য্যন্ত আকাশকে চেয়ে দেখতে লাগল শশাঙ্ক। না, তার আকাশে একটিই মাত্র তারা—ললিতা। সেদিনই সে ভেবে দেখল, তার জীবনের তারে সুর বেঁধেছে যে সে ললিতা।

কদিন ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশের ঝামেলা গেল। ডিসেম্বর মাসটায় বছর শেষ হয় ব্যাঙ্কের। বড় ব্যস্ত রইল সে। অনেকগুলি দিন বাদ গেল। তার পর একদিন ঝামেলা শেষ হলে শশাঙ্ক ছুটে গেল ললিতাদের বাড়ী।

শশাঙ্ক আশা করেছিল, দূর থেকেই হয়ত সে সেতারের মৃদু শব্দ শুনতে পাবে। সে আসছে দেখে ছুটে এসে দরজা খুলে দেবে ললিতা, কিন্তু অভিমানে ব্যথাতুর হয়ে থাকবে তার মুখ। কিন্তু তাকে আবাহন জানালেন অধ্যাপক নিজে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়ে অধ্যাপক গল্প সুরু করলেন। সুভাষ বোস হঠাৎ ফিরে আসতে পারে কিনা, গান্ধীবাদের মধ্যে অবাস্তবতা কতখানি ইত্যাদি আলোচনায় অনর্গল তাঁর যুক্তি। শশাঙ্কই এক সময় বলল—ললিতাকে দেখছি না?

অধ্যাপক অপ্রস্তুত হলেন যেন। তাই ত! বলা হয় নি আপনাকে। ললিতা কলকাতা গেছে তার মাসীর বাড়ী। ওর মাসীর ভাসুরের ছেলে দর্শনে প্রথম শ্রেণীর এম-এ, এবারে রিসার্চ করছে ডক্টরেট পাওয়ার জন্যে। ললিতার সঙ্গে যদি তার একটা সম্বন্ধ করা যায়—মানে ললিতাকে যদি তার পছন্দ হয়...

অধ্যাপকের সঙ্গে বেশীক্ষণ সেদিন তর্ক চালাতে পারে নি শশাঙ্ক। কাজের অজুহাতে ফিরে এল। অন্ধকার বোলপুরের

মাঠ ডিঙিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হ'ল তার—এতদিনের বোলপুর মিথ্যা হয়ে গেল তার কাছে; ফুরিয়ে গেল নিঃশেষ হয়ে।

আজ শশাঙ্ক বড় বেশী করে বুঝতে পারল যে, তার জীবনটা কতখানি ফাঁকা হয়ে গেছে। কি তার যোগ্যতা? কোন্ আশায় সে ললিতার কাছে প্রেমের দাবী জানাতে পারে? রিসার্চ ষ্টুডেন্ট সেই ভদ্রলোক, যার নাম সমর দত্ত তার পাশে কি সম্পদ নিয়ে সে দাঁড়াবে?

পরের দিন আপিসে এসে সে পেল ললিতার চিঠি। ললিতা লিখছে—কলকাতায় হঠাৎ আসতে হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই চটে গেছেন আমার ওপরে। আপনার রাগ করা চেহারা মনে করতে ভারী মজা লাগছে। দেখা হলে সব কথা হবে।

ইতি ললিতা।

শশাঙ্ক সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিল। তার মনে হ'ল, ললিতা নিছক কৌতুকের খেয়ালে লিখেছে এ চিঠি।

আশ্চর্য্য এই যে, ললিতাকে পৌঁছে দিতে সমর দত্ত নিজেই এলেন বোলপুরে। আর সকালের ট্রেনে তাঁরা এলেন, খবর পাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই শশাঙ্ক তৎপর হয়ে উঠল তাকেও কলকাতা যেতে হবে। কাজ আছে। শশাঙ্কদের বাড়ী কলকাতার কাছেই। তার মা অনেক দিন থেকেই ছেলেকে তাড়া দিচ্ছিলেন বিয়ের জন্যে। শশাঙ্ক নিজে এসে সমস্ত ঠিক করে বিয়ের দিন পর্য্যন্ত স্থির করে তবে ফিরল। আরও কাজ করল সে। আপিসে এসে আবার কলকাতায় ফিরে আসার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলল।

বোলপুরের আপিসে যেদিন সে এসে পৌঁছালো ললিতা সেই-দিনই ছুটে এল দেখা করতে। শশাঙ্ক নীরব গাম্ভীর্য্যে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। ললিতা ওর স্তব্ধ মুখের দিকে চেয়ে কি যেন একটা ভাবল। তার পর বলল—সন্ধ্যায় আমি অপেক্ষা করব। নিশ্চয়ই আসবেন।

ললিতা চলে গেল। কিন্তু সন্ধ্যাতে শশাঙ্ক রেল ষ্টেশনে ঘুরে বেড়াল। পরের দিন যখন ললিতার চিঠি নিয়ে আর একটি ছেলে এল তাকে ডাকতে, তখন উত্তর দিল শশাঙ্ক—বড় ব্যস্ত আছে সে। সময় মত যাবে। তারপর একে একে সাতদিন কাটল, সাতদিনের মধ্যে আরও একবার চিঠি পাঠাল ললিতা। লিখলো—দোহাই আপনার। একবারটি আসুন।

শশাঙ্ক হাসল আপন মনে। পরের দিন সকালে সে পরিচিত মহলে প্রচার করল তার বিয়ের কথা। সে কথা পল্লবিত হয়ে ললিতার কানেও যথাসময়ে পৌঁছালো।

পরের ঘটনাগুলি অবান্তর। কারণ, শশাঙ্ক কয়েকদিনের মধ্যেই বদলী হয়ে গেল কলকাতায়। কিন্তু বিয়ে গেল ভেঙ্গে। কারণ, হঠাৎ কয়েকদিনের জ্বরে শশাঙ্কর মা মারা গেলেন। আর শশাঙ্ক আর একবার চেষ্টা করে বাঙলাদেশের বাইরে চলে এল। সেদিনের কথাও স্মৃতি হয়ে সময়ের বুকে হারিয়ে গেল।

* * *

ললিতা হারিয়ে গেছে। তবু ডক্টর সমর দত্ত'র বাড়ীতে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় বেড়াতে এল ডোমিনিয়ন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ-ম্যানেজার—শশাঙ্ক রায়।

ডক্টর বাড়ী ছিলেন না। তাই তাঁর বৈঠকখানায় বসে অনেক-ক্ষণ ধরে একা একা অপেক্ষা করল সে। ললিতার বাড়ীতে আজ সে হয়ত অবাঞ্ছিত। ললিতা হয়ত তাকে আর দেখতে চায় না। শশাঙ্ক কেমন যেন একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা বোধ করল বুকে।

বাইরে থেকে গুনগুনিয়ে একটা গান ভেসে এল হঠাৎ। আর কিছু বুঝবার আগেই একেবারে আচমকা এক ভদ্র-মহিলা প্রবেশ করলেন ঘরে। আর যেন আচম্বিতেই তাঁর মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এল— তুমি?

শশাঙ্ক আর ললিতা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি। ললিতার মুখের বিস্ময় যখন কাটল, তখন শশাঙ্ক চেয়ে দেখল, সে মুখে সুস্পষ্ট ঘৃণার রেখা। বহুদিনের সঞ্চিত ঘৃণা আর বিদ্রূপ যেন নীল হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণতায়। শশাঙ্ক চাইতে পারল না; মুখ নামালে।

যখন আবার মুখ তুলল সে তখন আর নেই ললিতা।

কিন্তু আর বসল না শশাঙ্ক। উত্তর পেয়ে গেছে সে। বেত্রাহত কুকুরের মত সে ছিটকে এল বাইরে। তারপর দীর্ঘ সমতল জনবহুল রাজপথ। কিন্তু একটা রিক্সা ধরতে পারার আগেই একটা বাচ্ছা চাকর ছুটতে ছুটতে এল। আর তার হাতে পৌঁছে দিয়ে গেল একটা পুরনো লেফাফা। শশাঙ্ক আশ্চর্য্য হয়ে দেখল, সাত বছর আগের কোন এক তারিখে পোষ্ট-করা খাম। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে না পেয়ে প্রেরকের কাছেই ফিরে যাওয়া—ডেড-লেটার আপিসের ছাপ লাগা খাম। ভেতরে তার একটি চিঠি—যে চিঠি তারই উদ্দেশ্যে লেখা। লেখক—ললিতা নামের একটি মেয়ে। যে বলছে—

তুমি না এলে কেমন করে বোঝাই তোমাকে, যে একটা ভুল ধারণা নিয়ে গেছ তুমি। কেমন করে বলি যে, আর কেউ নয়, শুধু তুমিই আছ আমার।

শশাঙ্ক স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে দেখল পথের দিকে। না, সে পথের কোন প্রান্তে তাকে এত বড় বিদ্রূপে ব্যঙ্গ করবার জন্যে কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

এত ঘৃণা করবে বলেই কি এতখানি ভালবেসেছিল ললিতা?

খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণের পরিকল্পনা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, আজকের দিনে দুটো জিনিস বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ খাদ্যশস্যের মূল্য আয়ত্তে রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ খাদ্যশস্য নিয়ে মুনাফা এবং ফাটকাবাজী বন্ধ করতে হবে। সরকারও এই দুটো জিনিসের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তাই খাদ্যশস্যের ব্যবসা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বিগত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ঝামঝর (পঞ্জাব)-এ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে নীতি সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে, পাইকারী ব্যবসায়ীদের ভীতিপ্রদর্শন কিছুতেই সরকারকে সেই নীতি বিচ্যুত করতে পারবে না। শ্রীনেহরু বলেছেন :

"We may have some initial difficulty, but this decision will be soon implemented. We propose to choose some big wholesale traders, who are good, and give them licences to buy foodgrains on behalf of the Government at prices fixed by the Government. These dealers will get a certain commission on these purchases which will constitute their legitimate profit. We shall store these foodgrains and release it to retail dealers."

অর্থাৎ প্রথমে সরকারকে হয়ত কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। তবে সরকার শীঘ্রই এই সিদ্ধান্তটি কার্য্যকরী করবেন। কয়েকজন সৎ পাইকারী ব্যবসায়ীকে বেছে নিয়ে সরকারের পক্ষে সরকার নির্দ্দিষ্ট দরে খাদ্যশস্য ক্রয়ের লাইসেন্স দিবার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সব ব্যবসায়ী কিছুটা কমিশন পাবেন এবং এটাই হবে এদের ন্যায্য মুনাফা, সরকার এই খাদ্যশস্য মজুত করবেন এবং পরে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট মজুত খাদ্যশস্য বিক্রী করা হবে।

স্মরণ থাকতে পারে, বিগত ৯ই নভেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে দি ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, শীঘ্রই খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা উচিত। 'দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার নয়াদিল্লীস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন :

"The consensus of opinion was that only through State trading could the food prices be kept in check—an essential condition for increased deficit financing that was bound to follow yesterday's (e i Nov 9, 1958) decision not to scale down any further the total Plan outlay of Rs. 4,500 crores".

বিগত ২রা ডিসেম্বর তারিখে কটক থেকে প্রচারিত একটা সরকারী প্রেসনোটে ঘোষণা করা হয়েছে, ১লা ডিসেম্বর তারিখ থেকে উড়িষ্যা সরকার কর্ত্তৃক ধান এবং চাউলের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বাধীন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রচারিত প্রেসনোটটিতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র অনুমোদিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত খরিদকারী এজেণ্ট ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান পাইকারীভাবে চাউল কিংবা ধান ক্রয় অথবা বিক্রয় করতে পারবেন না। একমাত্র সরকারই প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দ্ধারিত দামে এজেণ্ট মারফৎ পাইকারী হারে চাউল কিংবা ধান ক্রয় করবেন।

মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে ভুবনেশ্বরে ভারত কৃষক সমাজের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ পাইকারী খাদ্য বিক্রী ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এই অধিবেশনে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানান হয়েছে। তবে ভারত কৃষক সমাজ এইপ্রকার ব্যবস্থায় যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক সে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়াবার জন্য সমস্তপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন এবং কার্য্যপদ্ধতি ও নিয়মগুলি প্রণয়নের সময় কৃষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করেছেন। ভারত কৃষক সমাজের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, সরকার যদি শীঘ্র পাইকারী খাদ্য বিক্রয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে চান তা হলে দেশে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য সমবায়, কৃষক সমিতি এবং এই প্রকার উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিগত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে মিঃ ডি, এন, জালান কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটা সভায় বলেছেন :

"The Government has hardly any machinery for the storage, handling and distribution of foodgrains, which involve special technique and experience, The problem has arisen because of the foodgrain shortage and so the emphasis should be on increasing production rather than on distribution. "Controls are no solution to the

food problem. The Government's proposal for State trading in foodgrains involves the risk of heavy losses and may result in more unemployment."

কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে ভারত চেম্বার অব কমার্স-এর পক্ষ থেকে একটা লিপি প্রেরিত হয়েছে বলে জানা গেছে। সে লিপিতে নাকি ভারত চেম্বার অব কমার্স খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তে আনার বিরোধিতা করেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে চেম্বার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বর্তমান মরশুমে স্বল্পস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে সরকারের এই ব্যবসায় নামবার কোনপ্রকার প্রয়োজন নেই। এছাড়া খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তে আনার বিরোধিতা করে দেশের শিল্পপতিরা নানা উপলক্ষে যে সব মন্তব্য প্রকাশ করেছেন সে সব মন্তব্যের সারমর্ম হ'ল এই যে, খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তে না এনে যদি সমাজের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তা হলে দেশের মঙ্গল হবে। তা ছাড়া, যাতে দেশকে একচেটে সরকারী খাদ্য ব্যবসার আদর্শমূলক পরীক্ষার মধ্যে না ফেলা হয় সেজন্য এরা দাবী জানিয়েছেন। চড়া দাম পাবার আশায় যাতে কোন লোক ধান মজুত করে না রাখতে পারে সেজন্য এঁরা প্রধানতঃ দুটো ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রথমতঃ এঁরা লাইসেন্স প্রথা চালু রাখার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এরা উৎপাদনকারীদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে প্রচারকার্য চালাবার সার্থকতার উপর জোর দিয়েছেন। যাতে উদ্বৃত্ত এলাকার শস্য উৎপাদনকারীরা উৎসাহিত হন আজকের দিনে সরকারকে সেদিকে বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। শুধু তাই নয়। জাতীয় স্বার্থ এবং অর্থনীতির কথা চিন্তা করে সরকারের পক্ষে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার যার ফলে উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে অন্যান্য এলাকায় ধান এবং চাউল যাতায়াতের পথে কোন অন্তরায় দেখা দেবে না। শিল্পপতিদের তরফ থেকে বলা হয়েছে, খাদ্যশস্যের ব্যবসার জন্য কমপক্ষে ৩৩৭ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। অত টাকা এই ব্যবসায় খরচ না করে সরকারের পক্ষে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য খরচ করা বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া শিল্পপতিরা মনে করেন, বর্তমানে যে ভাবে খাদ্যশস্যের ব্যবসা চালান হচ্ছে তাতে নিরুৎসাহ হবার কিছুই নেই এবং সুষ্ঠুভাবে এই ব্যবসা চালাবার জন্য সরকারী আধিপত্য একেবারে অপ্রয়োজনীয়। কাজেই খাদ্যশস্যের ব্যবসার জন্য অত টাকা খরচ করা সরকারের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হবে না, মিঃ ভি. এস. অগ্রবাল কলকাতায় অনুষ্ঠিত দি ইণ্ডিয়ান প্রডুস এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"The Government should exercise great caution in undertaking State trading in foodgrains as it is fraught with great risk, unless there is suitable administrative machinery with wide practical experience in the technical aspects of the trading, something similar to the L. I. C. scandal may happen."

খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণের সমর্থনে সরকার কর্তৃক প্রদর্শিত যুক্তির সারবত্তা একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমাদের দেশে এই রাষ্ট্রীয়করণ সফল হবার আশা আছে কি না কিংবা আশা থাকলে কতটুকু আশা আছে এই প্রশ্ন আজ অনেকের মনেই জেগেছে, কারণ সরকারী খাদ্যশস্য ব্যবসারে যে লোকবল এবং অর্থবল দরকার সে লোকবল এবং অর্থবল সরকারের নেই। তা ছাড়া শস্য গুদামজাত করার জন্যও সরকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন বলে মনে হয় না। কাজেই বর্তমান অবস্থায় খাদ্যশস্যের ব্যবসায় সরকারী আধিপত্যের ফলে গুরুতর অসুবিধা দেখা দিলে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছুই নেই। বিগত ১৮ই নভেম্বর তারিখে নয়াদিল্লী থেকে প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ, দি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি একটা বিবৃতি মারফৎ বলেছেন :

"The Government's proposed scheme to replace the existing channels of wholesale foodgrains trade is anything but realistic and is absolutely unwarranted judged by reference to both immediate and long-term requirements"

দি ফেডারেশন জোর দিয়ে বলেছেন :

"The organization for State trading in foodgrains may well prove an extremely costly proposition in terms of resources as well as administration, planning and technical personnel The position on the food front complicated as it is, will further deteriorate in so far as the latest proposal tends to divert the attention and energies of the authorities and the public alike from the basic facts of the situation."

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত লিপিতে ভারত চেম্বার অব কমার্স-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অতীতে এমন কোন লাভজনক ঘটনা ঘটেনি যেটাকে নজীর হিসাবে উপস্থিত করে সরকার নিজের হাতে খাদ্যশস্যের ব্যবসা নিতে পারেন। অতীতে একদিকে যেরকম উদ্বৃত্ত এলাকার খাদ্যশস্যের উৎপাদকগণ উপকৃত হন নি সেরকম অন্যদিকে যাঁরা ঘাটতি এলাকার ক্রেতা তাঁরা উপকার পান নি। গত বছর উদ্বৃত্ত রাজ্যসমূহের শস্য উৎপাদনকারীরা নাকি ধান বিক্রয় করে মণ করা আট টাকা থেকে সাড়ে নয় টাকার বেশী দাম পান নি। অথচ ঘাটতি রাজ্যে একই শ্রেণীর ধানের দর দাঁড়িয়েছিল মণকরা চৌদ্দ থেকে ষোল টাকা। এছাড়া কোন স্থানে সরকারী ব্যবসা পর্য্যন্ত মূল্যের সমতা রক্ষা করতে পারে নি।

আমাদের অনেকেরই হয়ত মনে আছে, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্ম যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন সেসব প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে একটা সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তির এক স্থানে বলা হয়েছে, খাদ্যশস্য সম্বন্ধে সরকারী ব্যবসা প্রবর্ত্তনের জন্ম যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সে সিদ্ধান্তের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীকে ছেঁটে ফেলে বাজার দর স্থিতি করা। সরকারী বিজ্ঞপ্তি থেকে একটা জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ যদি খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত হয় তা হলে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে। শুধু থাকবে ব্যবসায়ের সর্ব্বোচ্চ স্তরে একচেটিয়া সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং নিম্নতম স্তরে খুচরা দোকানদারবৃন্দ, কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের আসল অভিপ্রায়টি কি। অবশ্য প্রচার করা হয়েছে, পরিষদের অভিপ্রায় ছিল খাদ্যশস্য সম্পর্কে একচেটিয়াভাবে পাইকারী ব্যবসা পরিচালনার ব্যবস্থা করা। অথচ দেখতে পাচ্ছি, পরিষদ রাজ্য-সরকারগুলিকে পাইকারী ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত করার জন্ম অনুরোধ জানিয়েছেন। পরিষদ বলেছেন, পাইকারী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্ম প্রত্যেক রাজ্যে খাদ্যশস্যের বড় বড় পাইকারী ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স নিতে হবে। এরা সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবসা চালাবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার এদের কাছ থেকে শস্য ক্রয় করবেন। সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের আসল অভি-প্রায়ের সঙ্গে পরিষদ কর্তৃক রাজ্যসরকারগুলিকে প্রদত্ত নির্দ্দেশের মিল নেই।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে যেসব খবর প্রচারিত হচ্ছে সেসব খবর বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্ম জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সে সিদ্ধান্ত বানচাল হতে বসেছে, যদিও সরকারের তরফ থেকে সরাসরি এবং সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্তটি বাতিল করা হয় নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং অন্যান্য সরকারী মুখপাত্ররা খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রীয়-করণ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট কার্যপদ্ধতির আভাস দিতে পাচ্ছেন না। সরকার বোধ হয় পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সিদ্ধান্তটি পরিবর্ত্তিত করার কথা চিন্তা করছেন এবং হয়ত আর একটা বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান করে চলেছেন।

দুই মালা

শ্রীবাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'জন ফিরিওলা দু'বেলা হেঁকে যায় পাড়ার পথে পথে রোজ,
দু'জনে আসে-যায় ফুলের মালা নিয়ে রাখে না কেউ কারো খোঁজ।
একের হাতে থাকে গাছের ফুলমালা অনেক সারি সারি সব,
অপরে আনে তার কাগজ-ফুলমালা পাড়াতে জাগে কলরব।
তখন যত কাজ থাক না পড়ে থাক তবুতো যাওয়া আগে চাই
নাই বা হল কেনা শুধুই দেখাশোনা সবারই টানে মনটাই।
যার যা খুশী কিনে ঘরেতে নিয়ে যায় পরায় প্রিয় দেবতায়,
যার যা ভাল লাগে তাই যে তার প্রাণ তাই সে রেখে চলে যায়।

এমনি একদিন মিলন হল দোঁহে কারে তো চেনে নাকো কেউ
রূপ যে রূপে চেনে মন যে মনে আনে তাই তো এসে লাগে ঢেউ ;
তাই যে এত কথা তাই সে এত গান তাই তো ভেসে ওঠে সুর
বিজন স্মৃতিপথে আলোক ঝরণায় তাই তো চির-সুমধুর।
ফুলের মালা বলে, আমার রূপ নিয়ে সাজাও তুমি নিজ রূপ
কে তুমি ? কোথা ঘর ? দাও গো পরিচয় এখন থেকো নাকো চুপ
অনেক কাছাকাছি আমরা দু'জনায় এমন নিরালা পরিবেশ।
কাগজ-ফুল-মালা জানায়, আমি ভাই, আমি তো আছি সব দেশ,
কাগজ-মালা আমি সৃষ্টি মানুষের তারি যে হাতে-গড়া দান
আমার বড় সে যে আমায় বড় ভাবে, আমারি সেই ভগবান।
ফুলের মালা বলে, আমায় চেনো আর আমার জানো তুমি নাম
বিশ্বখেলাঘরে খেলাই খেলা করি কি জানি কি-বা আছে দাম।
তবুও আমি যাই জীবনে কতবার, দেখেছি মুখে হাসি মা-র
দেখেছি চোখে জল আবেগ টলমল মরণ যবে ভাঙে দ্বার।
কাগজ মালা বলে, জননী প্রকৃতির তুমি তো দেহ-মন-প্রাণ
সবাই ভালবেসে শোনায় কাছে এসে এ-নব জীবনের গান।
তোমার মধু খেয়ে ঘুমায় মৌমাছি নরম বুকে রেখে মাথা,
তোমার হাসি নিয়ে শিশুর হাসি ফোটে বোজায় ধীরে আঁখিপাতা।
আমার মধু কই ? আসে কি মৌমাছি ? হাসে কি কোন শিশুফুল ?
হাসে কি প্রিয়মুখ প্রিয়ার মুখ চেয়ে ? জীবনে একি সব ভুল ?
ফুলের মালা বলে, বিশ্বসংসারে ফেলার কোন কিছু নাই
সবই যে তাঁর প্রিয় সকলি তাঁর কাছে সমান মূল্য যে ভাই।
কে তিনি ? সীমাহীন ভুবনসংসারে মিলন রূপে যিনি সব
ক্ষুদ্র-বৃহতের নাহিক ভেদাভেদ, সেখানে তাঁরি উৎসব।

অসমাপ্তা

শ্রীচিত্রিতা দেবী

—"তা বটে।" মেরী বললে,—"তবে কি করা যায় আর?"

—"আমি যদি তুমি হতাম।" যাত্রীনিয়ন্ত্রী বললেন,—"তা হলে ফিরতি টিকিট কিনে এখানে বসেই এক ঘুম দিয়ে নিতাম।"

—"সেই জন্যেই আমি বাসে যাতায়াত পছন্দ করি। যদি অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি না থাকে। এখানে ইচ্ছে করলেই জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখে নেওয়া যায়। আবার ইচ্ছেমত চোখ বুজে খানিকটা ঘুমিয়েও নেওয়া যায়। সারাদিনের পরিশ্রমের মধ্যে এই একটুখানি বসার আরাম কম নয়।"

—"কিন্তু জান, এমনও দেশ আছে।" মহিলাটি জাঁকিয়ে বসলেন পাশের সীটে, গল্পের নেশায় পেয়েছে ওকে। কণ্ডাক্টররা অনেক সময় এ রকম নাছোড়বান্দা হয়ে থাকে। মনে করে হাসি পেল মেরীর। কিন্তু গল্প করতে মন্দ লাগছে না, মনটা অন্যমনস্কই হতে চাইছে বোধ হয়।

কণ্ডাক্টরটি বললে,—"জান এমন দেশ আছে, যেখানে বাসেও লোকে বসতে পায় না। বাদুড়ের মত ঝুলে ঝুলে যায়।"

—"তাই নাকি?" মেরী অবাক হয়ে তাকায়,—"সে কোন্ দেশ? তুমি শুনলে কোথায়?"

—"বাসে কাজ করি, অনেক বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ হয়। বিশেষতঃ ছাত্রদের সঙ্গে। তাদেরই কাছ থেকে শোনা।"

—"বল কি? তারা নিজের দেশের নিন্দে করে?"

—"বাস কম থাকা বা লোক বেশী থাকা কি আর এমন নিন্দের?"

—"নিন্দে নয় ত কি?"

—"শুধু একটা অবস্থামাত্র, জাস্ট এ সিচুয়েশুন, অন্য-রকমও হতে পারত?"

—"অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ, তুমি যে তুমি, আর আমি যে আমি। তুমি যে ব্লণ্ড আর আমি যে ঘোর লাল,প্রায় কালোর কাছাকাছি। এতে নিন্দের কিছু আছে কি?"

—"এত কথা তুমি শিখলে কোথায়?"

—"ঐ ছাত্রদেরই কাছে।"

—"তোমার সঙ্গে গল্প করে সময়টা কাটল ভাল।" ঐ দেখা যায় হীথের ঢালু মাথা। রাস্তার দু'ধারে আলোর মালায় ওর অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে।—তোমার উপদেশ শুনতে পারছি না। মিসেস, আমি এবারে নেমে যাব, মাথায় একটু ঠাণ্ডা লাগিয়ে পরের বাসে ফিরব।"

—"যেমন তোমার খুশী, জব করতে চাও কর। আমার নাম টমাস।"

—"তা হলে ধন্যবাদ মিসেস টমাস।"

অল্প একটু হেসে কোটটা একটু টেনেটুনে নেমে পড়ল মেরী।

নবেম্বর মাসের পৌনে সাতটায় ঘোর অন্ধকার, উঁচুনীচু কালো রাস্তাটার দু'ধারে বাড়ীগুলির বন্ধ কাচের জানালার ভিতর দিকে পর্দা ঝুলছে। পাছে কোন্ ফাঁকে শীতবুড়ো ঢুকে পড়ে ঘরে তাই আষ্টেপৃষ্ঠে সাঁটা। পথ নির্জন, শুধু এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা গাড়ী। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফেরা গাড়ীর ভিড় বাড়বে হয় ত। এখন এই সমস্ত জায়গাটার একটিমাত্র বিশেষ প্রসাদগুণ—সে এর জনহীনতা। কি অদ্ভুত নির্জন আর শান্ত। শুধু অন্ধকারটা খণ্ডিত বিকৃত হয়ে গেছে বাতির আলোয়। দূরে বাসস্টপের কাছে, নিঃশব্দে দুটি মূর্তি কালো ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে।

এমন করে তার নিজের দেশের এ রূপ দেখে নি কখনও মেরী। নির্জন পথে যখনই কোথাও যেতে হয়েছে, কিছু একটা কাজে, সেই কাজের ভাবনা ঘুরেছে মাথায়। ছুটির দিনে এসব জায়গায় অনেক এসেছে, কিন্তু তখন কেউ না কেউ সঙ্গী থাকত সঙ্গে হয় কোন মেয়েবন্ধু নয় কোন ছেলে। কিন্তু এ রকম নির্জন সন্ধ্যা ওর জীবনে বেশী এসেছে কিনা সন্দেহ। তাই মেরী ভাবল, আজ একে কিছুক্ষণ ভোগ করবে।

হঠাৎ কুমার এসে সামনে দাঁড়াল যেন। কাল এমন সময় কে জানত যে, আজ এমন সময়ে হঠাৎ একটা তুচ্ছ কারণে, কুমারের সঙ্গে এত দিনের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে। সত্যিই কি একেবারে ছিঁড়ে গেল তার?

আর কি কখনও বাজবে না, আর কি দেখা হবে না জীবনে? ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে মেরী। না না, এ ক্ষণিকের, এ শুধু কুয়াশার ঝড়, এ বোধ হয় কেটে যাবে। যাবে কি? ও যে কুমারের মধ্যে সত্যের দেখা পেয়েছিল। ও যে আশা করেছিল, এত দিনে ওর খেলার অবসান হয়েছে। ও আসল মানুষের দেখা পেয়েছে। শেষকালে সেই আসল মানুষটি নকল হয়ে গেল? কুমার কি কোনদিন ওকে ভালবাসে নি। বোধ হয় না, তা হলে এত সহজে এত অপমান করতে পারত না। মেরী ভুলে গেল যে, সেও ওকে কম অপমান করে নি। ভারতের উপরে, কুমারের উপরে, শেষ পর্যন্ত সব দেশের সর্বকালের পুরুষজাতটার উপরে একটা তীব্র অভিমান ওকে মনে মনে কাঁদাতে লাগল। কুমারের কত কথা এক সঙ্গে ওর মনে এসে ভিড় করতে লাগল। মনে পড়ল, ওর কথা শুনতে কেন এত ভাল লাগত। ওর প্রত্যেকটা কথায় যে অন্তর মেশানো থাকত। কোথাও থাকত না কৃত্রিমতার বাধা। নিজের দেশের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যদিও একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত, কিন্তু সে উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে ওর মনকে স্পষ্ট দেখতে পেত মেরী। আজকের দিনের কৃত্রিম জগতে যা অতি দুর্লভ। আর সেই মনকে দেখতে ওর ভাল লাগত।

হঠাৎ মেরীর মনে পড়ল, কিছুদিন আগে ওরা দুজনে কি একটা ছুটিতে দিন কাটাতে গিয়েছিল মাইল পঁচিশ পথ পেরিয়ে। কুমারের প্রাচীনা গাড়ীটা তখন কি একটা কারণে কারখানায় গিয়েছিল। ওরা দুজনে দুটো সাইকেল ভাড়া করে বেরিয়ে পড়েছিল ভোরবেলা। মাইল বিশেক চলে সহরতলীর পথ ছাড়িয়ে একটা গাছের ছায়ায় এসে বসেছিল। ঝুলি থেকে প্যাকেট করা স্যাণ্ডউইচ আর ফ্লাস্কে ভরা চা দিয়ে পিকনিকটা জমেছিল ভাল। আজকের এই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় সেদিনের সেই হাস্যমুখর বিহ্বল দুপুরটা হঠাৎ যেন ছবির মত ভেসে উঠল মেরীর মনে। দুইয়ের মধ্যে মিল কোথায়—ভেবে পেল না মেরী। সেদিনের নির্জনতায় ছুটির সুর মাখা ছিল। দুজনে মিলে হৈ হৈ করতে করতে কাড়াকাড়ি করে খাওয়া দাওয়া সেরে কাগজের প্যাকেটগুলি মুড়ে টুড়ে থলিতে ভরে ওরা পাশাপাশি চীৎ হয়ে শুয়ে পড়েছিল। আঃ! আর শোওয়ামাত্র দেখতে পেয়েছিল একেবারে ওদের মুখোমুখি শুয়ে আছে অনন্ত আকাশ। ওদের চোখে চোখে তার গভীর নীলচোখের ছায়া, আর ওদের চারিদিক ঘিরে বিহ্বল দুপুরের ঝিরঝিরে মায়া। হঠাৎ এক নিমেষে ওদের সমস্ত হাসিগল্প থেমে গিয়েছিল। যদিও খুব গভীর ছিল না সেই নীরবতা, গরমকালের লঘু সুরের ছন্দ ছিল বাতাসে। তবু সেই দিনটির সঙ্গে আজকের এই বিষণ্ণ সন্ধ্যার কোথায় যেন মিল আছে। সেদিনটা এত ভারী ছিল না। সেই দুপুর-বিকেলের রাঙা রাঙা সময়টা যেন পাকা পীচের মত টসটস করছিল। যেন তাকে দু'আঙুলে আলতো করে ছোঁয়া যায়। আর সেই নীরবতাও এমন নিঃসঙ্গ ছিল না। সঙ্গী ছিল কুমার।

কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে হাতে ভর দিয়ে উঠে বসেছিল কুমার। বলেছিল,—"মেরি, আমার আজ দুঃখ হচ্ছে গান জানি না বলে। এমন সুন্দর জায়গায়, এমন মিঠে নীরব দুপুরের নেশায় অনেকেই ত দেখি ছুটে এসেছে শহর থেকে। কিন্তু তারা কেউ গান করছে না কেন বলতে পার?"

—"গান?" মেরী অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, গান বৈকি, এমন চমৎকার দিনে কোথাও একটা গান শোনা যাচ্ছে না।"

মেরী বললে—"এখানে সবাই মিলে যদি গান ধরত, তবে এই নীরব দুপুর আর নীরব রইত না। তখন আর একে মোহময় মনে হ'ত না, গান করার ইচ্ছেটাও বেশীক্ষণ বজায় থাকত না।"

—"তা বটে!" কুমার বললে—"ঠিক বলেছ মেরী, আশ্চর্য রকম ঠিক!"

মেরী অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, স্পষ্ট মনে পড়ে মেরীর। কি এমন বলল সে, এ ত এদেশে সবাই জানে। কিন্তু কুমারের কাছে বোধ হয় কথাটা নতুন। সে তাই ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—"সত্যিই, সৌন্দর্যসৃষ্টিতে শুধু সৃষ্টির সাধনা নয়, ত্যাগের সাধনা। সবাই মিলে কোন জিনিসকে ভোগ করতে হলে, সবাই মিলে তার জন্যে কিছু কিছু ত্যাগ করতে হবে। এমনকি সবচেয়ে সূক্ষ্ম ভোগ, যে সৌন্দর্য,—যা বিশুদ্ধ এস্থেটিক্স, যা শুভ্রবর্ণা সরস্বতীর বীণানিঃসৃত সুর, সেই সুরসুধা গ্রহণের বাসনাকেও সংযত করে শুদ্ধ করতে হবে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কুমার বলেছিল—"মেরী তুমি জান না তুমি কি বলেছ। তোমরা কেউই জান না, তার অর্থ কি গভীর। যে বাণী একদিন ভারতের তপোবনে জন্মলাভ করেছিল, এখানে এসে দেখছি বহুক্ষেত্রে সেই বাণীর নির্দেশে কাজকর্ম চলছে, অথচ তোমরা সে বাণীকে তেমন সচেতন ভাবে জান নি, দেখ নি তাকে প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞানে, কিন্তু জেনেছ তাকে সত্যভাবে কর্মে।"

—"অর্থাৎ?" মেরী সত্যি অবাক হয়েছিল হঠাৎ এই উচ্ছ্বসিত ইংলণ্ড স্তুতিতে। যা পারতপক্ষে কুমারের মুখ থেকে বেরুতে চায় না।

কিন্তু কুমার থামে নি।—"অর্থাৎ তুমি একটা আশ্চর্য তত্ত্বকথা বলেছ এই মুহূর্তে,—যার মানে তুমি নিজেই জান না। তুমি বলেছ ভোগের মধ্যেই নিহিত আছে ত্যাগ। ত্যাগ ছাড়া ভোগ হয় না, তাই ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর।"

কি একটা দুর্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র বলেছিল সেই সঙ্গে।

ওর মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে চুলের মধ্যে রক্তনখর আঙুল বুলোতে বুলোতে মেরী বলেছিল—"তুমি বড় বেশী দার্শনিক কুমার, প্রায় তোমাদের সেই গৌটামা বুদ্ধের মত।"

—"উপায় কি মৌরি বল।"

মাথা থেকে ওর হাতটা খুলে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কুমার বলেছিল—"আমাদের দেশে ফিলজফার হওয়া ছাড়া উপায় নেই। চারিদিকে এত দুঃখ যে, নিতান্ত যেমন-তেমন ভাবে জীবনটাকে টেনে নিয়ে যেতে হলেও বেশ খানিকটা ফিলজফির প্রয়োজন। এই যে, এই মুহূর্তে আমার চারিদিক ঘিরে স্বর্গের ফুলের মত সুখের রেণু উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, এর কণামাত্র কি আমার দেশে পেতে পারতাম?"

—"কেন, সে দেশে কি মেয়ে নেই?"

—"মেয়ে যথেষ্ট আছে, অনেক স্বপ্নের মত সুন্দর, অনেক সাগরের মত গভীর, অনেক তারার মত উজ্জ্বল মেয়ে আছে। কিন্তু তাদের গায়ে একটা মোটা স্যাঁতসেঁতে কাপড়ের ঘোমটা টানা আছে। সে অবস্থা এবং পরিবেশের ঘোমটা।"

—"সে কিসের পরিবেশ কুমার?"

—"যদি শুনতে চাও ত বলেই ফেলি, মিথ্যে বলে লাভ কি? সে দারিদ্র্যের পরিবেশ।"

বলতে বলতে হঠাৎ উঠে বসেছিল কুমার। মেরী তাকিয়ে দেখেছিল, ওর মুখ উত্তেজনায় গাঢ় হয়ে উঠেছে। কুমার বলেছিল—"তোমার সামনে বলতে আমার লজ্জা হচ্ছিল মৌরি, কিন্তু আমি জোর করে সে লজ্জার বাঁধন কাটালাম। কারণ আমার দেশ যে গরীব, সে লজ্জা শুধু কি আমারই, তোমার নয়? সমস্ত সভ্যজগতের এই লজ্জা। সবচেয়ে বেশী ইংলণ্ডের। ও কিছু রেখে-ঢেকে খায় নি মৌরি, একেবারে চেটে-পুটে খেয়েছে। সমস্ত রস নিঃশেষ করে সারা দেশটাকে একটা স্তূপীকৃত ছিব্‌ড়ের পাহাড় করে রেখে গেছে। রস নেই শুধু দেহে নয় মনেও। এখন এই ছিব্‌ড়েগুলো নিয়ে আমরা কি করব মৌরি, বলতে পার? একমাত্র উপায় ছিল যদি ওর মধ্যে আগুন ধরাতে পারতাম, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে আবার সমস্ত বিশুদ্ধ হয়ে উঠত। সেই ভস্মসারে আবার শস্যশ্যামলা হয়ে উঠত দেশ। কিন্তু মৌরি, বারুদের কণাটুকুও বুঝি দেশে অবশিষ্ট নেই।"

—"কেন বন্ধু, এই ত তুমি আছ।" সমবেদনায় দ্রব হয়ে মেরী বলেছিল—"তোমার মত আরও নিশ্চয় আছেন।"

—"দূর দূর, সব ফাঁকি।" জোরে জোরে কৃত্রিম হাসি হেসেছিল কুমার, আর সেই কৃত্রিমতার দ্বারা বাহিত হয়ে কুমারের হৃদয়ের আন্তরিকতা মেরীর হৃদয়কে আশ্চর্য ভাবে স্পর্শ করেছিল। সেদিন যদিও কুমার বিশেষ কোন মিষ্টি ব্যবহার বা মিষ্টি কথা দিয়ে ওর মন ভোলাতে আসে নি—তবু সেদিন কুমারকে মেরীর ভাল লেগেছিল। এত ভাল যে, মনে হয়েছিল, সেই মুহূর্তে ওর মন শান্ত করতে, ওকে ভালবাসার জন্যে মেরী সেদিন বিনামূল্যে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারত, কিন্তু অমন করে ফাঁকি দিয়ে কিনতে রাজি ছিল না কুমার।

অবাক হয়ে মেরী মাঝে মাঝে ভাবত, বাংলাদেশের জোলো আবহাওয়া হয়ত ওর কামনার তীক্ষ্ণ ধারে মরচে পড়িয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া নীতিবুদ্ধি, কর্তব্যবুদ্ধি ইত্যাদি কতকগুলি অবাস্তব মতবাদ ওকে সাধারণ পুরুষোচিত দুর্বলতার হাত থেকে অনেকখানি উদ্ধার করেছে। ওর, এই ভাবটার জন্যে মাঝে মাঝে ওকে আশ্চর্য রকম ভাল লাগত মেরীর, মাঝে মাঝে ঘৃণা হ'ত। যে পুরুষ নারীর দান গ্রহণ করতে দ্বিধা করে,তাকে নারী কখনও মনে করে অপৌরুষেয়, কখনও মনে করে কাপুরুষ।

কুমার বলেছিল—"মেরী তোমার দান নেবার আগে আমার অর্ঘ্য তোমায় দেব। আগে তোমাকে দেশে নিয়ে আমার আত্মীয়পরিজন, আমার মায়ের সামনে আমার রাণী বলে প্রতিষ্ঠিত করব। তার পরে বিস্তার করব তোমাতে আমার অধিকার।"

শুনে মেরী মুখে বলত—"এ এক রকমের এস্কেপিজিম্, প্রাণ এড়ানো জগৎ পালানো ভাব।"

কিন্তু মনে মনে খুসী হ'ত। কথাগুলি এত অদ্ভুত রকম, প্রেমের প্রকাশের ভঙ্গী এত নূতন, এত অন্তরময়। যেমন সত্য ছিল ওর প্রেমে, তেমনি সত্য উঁকি মারত ওর দেশের কথায়। দুটোতে খুব একটা মিল ছিল, তাই সেদিনের কথা এত করে মনে পড়ছে। কুমার সেদিন কৃত্রিম হাসির ঝড়ো হাওয়া তুলে হেসে উঠেছিল। বলেছিল—"সব ফাঁকি মৌরি, সব ফাঁকি। আমার এ গর্জন দেখে ভুল করো না, এও ভুয়ো। এ সেই মেঘের গর্জন যা বর্ষণ করতে জানে না। নইলে কখনও এমন করে থাকতে পারতাম, এই কোনমতে খেয়ে-দেয়ে, প্রাণ ধারণ করে আমাদের সেই দারিদ্র্যের সঞ্চয়, তোমাদের দেশে এনে ঢেলে দিয়ে।"

বলতে বলতে ওদের কবির কি যেন ক'লাইন কবিতা আবৃত্তি করে উঠেছিল। কথা পালটে কুমারকে শান্ত করার

জন্তেই মেরী তার সেই মুহূর্তের ইচ্ছেটাকে প্রকাশ করেছিল, বলেছিল—"আমাকে তোমাদের ভাষা শেখাও কুমার। তোমাদের কবিকে চিনব, তোমাদের সাহিত্য জানব, তোমাদের প্রাণকে বুঝব।"

—"কিছু আর বোঝার নেই মৌরি।" কুমারের উত্তেজনা অত শীঘ্র শান্ত হয় না—"কিছু বোঝার নেই মৌরি, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এল, দম বন্ধ হয়ে আসে ভীড়ের চাপে। এত মানুষ যে মানুষের প্রাণের মূল্য গেছে কমে, মন বা মানের দাম তারও চেয়ে কম।"

"সত্যি ?" দ্বিধান্বিত হয়েছিল মেরী—"কিন্তু শুনতে পাই তোমাদের দেশে এখনও আছে প্রাচীন কালের প্রাণের চিহ্ন। আমাদের দেশই ত শুনি চাপা পড়েছে ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিজমের তলায়।"

—"তুমি বুঝবে না মৌরি, ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিজমের তলায় চাপা পড়ায় তোমরা শাপের চেয়ে বর পেয়েছ অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের দেশে হয়েছে উল্টো ব্যাপার। তোমাদের কারখানার ঝড়তি-পড়তি কুশ্রী মালগুলোয় আমাদের দোকান-বাজার ভরে উঠল, প্রায় গোটা দেশটাই তলিয়ে গেল ধার-করা উপকরণ আর ধার-করা মতবাদের তলায়। কচিৎ কখনও এখানে-সেখানে দেখা যায় আদি প্রাণের ঝিলিক।"

মেরীর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়েছিল কুমার। ওর হাতে হাত দিয়ে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ চোখে চোখ রেখে বলেছিল—"ভাবছ বুঝি, ভারতে গিয়ে খুব কবিত্ব করবে। আমবাগানের ছায়াঘেরা, পুষ্পলতার বেড়া দেওয়া শান্ত-শ্রীমণ্ডী একটি ঘরকন্না তোমার জন্তে অপেক্ষা করে আছে—সে গুড়ে বালি।"

আবার কুমার সেই কৃত্রিম নাটকীয় হাসি হেসেছিল,—"তোমার দিন কাটবে কলকাতা শহরের দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে। সেই শহরের আশেপাশে, অনেক দূর পর্যন্ত শুধু মানুষ, আর তাদের বসতি। প্রকৃতিদেবীর চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। তিনি কোন্ সুদূর নিভৃতে গ্রামের কিনারে, কোন্ ঘন অরণ্যের সবুজ সীমান্তে লুকিয়ে আছেন, কে তার খোঁজ রাখে ?"

শুনে শিউরে উঠেছিল মেরী। বলেছিল—"কেন ? আজকের দিনে খাদ্য, স্বাস্থ্য ও জন্ম তিনটেই ত নিয়ন্ত্রণ করা যায়।"

—"তা হয় ত যায় এবং হয় ত চেষ্টাও হচ্ছে তাই। কিন্তু এত ধীরে এগোচ্ছে সে চেষ্টা আর এত দ্রুত মানুষ বাড়ছে, যে শীগগিরই হয় ত ভারতবর্ষে আর গাছ থাকবে না, থাকবে শুধু মানুষ। অবশ্য সেখানে গাছের স্থাবরত্ব মানুষ অনেক দিন অধিকার করেছে। সত্যিই যেদিকে তাকাও মানুষের জঙ্গল। নির্জনতাও যে মানুষের পক্ষে জনতার মতই সমান প্রয়োজনীয়, একথা আমাদের দেশে গেলে মনে করবার জো নেই।"

আজকের সন্ধ্যেটা সেদিনের দুপুরের চেয়ে আরও বেশী নির্জন, আরও গভীর, অন্ধকার রহস্যময়। এই মুহূর্তে কুমারকে কাছে পাবার ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠল মেরীর মনে। আর তখনই হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল নিজের সম্বন্ধে।—এ কোথায় চলেছে সে অকারণে। এ কোথায় এসে পড়েছে, জনশূন্য অন্ধকারে,—গা ছম ছম করে উঠল মেরীর। স্মৃতি রোমন্থন থেকে হঠাৎ জেগে উঠে দেখতে পেল, অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে এসেছে। ওপাশে ঢালু পাহাড়ের ওদিকে কৃত্রিম বনানীর ইঙ্গিত। এদিকে পেভমেণ্টের ধারে রেলিং-ঘেরা কতক-গুলি নীরব বাড়ী। মাঝে মাঝে বিজলীবাতির থামের চারি-পাশ ঘিরে আলোছায়ার প্রেতলোক।

বাস স্টপটা দেখা যাচ্ছে, বেশ খানিকটা দূরে। আরও কিছুক্ষণ এই নির্জন রাত্রি মাড়িয়ে মাড়িয়ে মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে জড়িয়ে চলতে হবে, তারও পরে আরও কতক্ষণ ওখানে বাসের জন্তে অপেক্ষা করতে হবে, কে জানে। এইখানেই কোথায় যেন ওর ছোট বেলার বন্ধু 'সুসানে'র বাড়ী। কিন্তু এখন সে বাড়ী খুঁজে বার করার মত ধৈর্য বা সামর্থ্য তার অবশিষ্ট নেই।

এদিকে সারাদিন প্রায় কিছু খাওয়া হয় নি। কুমারের অসুখের খবর পেয়ে মনটা চঞ্চল ছিল। তার উপরে ওর ঘরটার জন্তে পাকা বন্দোবস্ত করতে ছুটেছিল। ভেবেছিল, কুমারকে নিয়ে একটু পা বাড়িয়ে অল্প কিছু খেয়ে নেবে। তা হঠাৎ এই কাণ্ড! যাক্, ভালই হ'ল, অনেক দায় থেকে বেঁচে গেল মেরী। আর মিছিমিছি পরের জন্তে খেটে মরতে হবে না, আর ভাবতেও হবে না। ওর কিসের প্রয়োজন ? ও ইচ্ছে করলে, বেশ ভাল ঘরেই বিয়ে করতে পারত। ওর মা ত তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু ও মত দেয় নি। তবে আজ কিসের জন্তে এই গরীব বিদেশীর মায়ায় সে নিজেকে এমন করে বাঁধল। ছোটবেলা থেকে 'ভাল-বাসা' এই নামটার প্রতি একটা অন্ধ আসক্তি ছিল ওর। সেই মোহেই ভাল সম্বন্ধ হাতছাড়া করত, প্রেমে না পড়ে বিয়ে করাকে পাপ মনে করত। আজ স্বচক্ষে দেখল সেই প্রেমের নমুনা। মা বলতেন—"প্রেমে পড় ক্ষতি নেই কিন্তু জাত মিলিয়ে পড়ো, নইলে দুঃখ পেতে হবে।" তা সে করে নি, বর্ণের জাত না মেলাক, মনের জাতটা অন্ততঃ মেলানো উচিত ছিল। দুঃখকে তখন কেয়ার করত না মেরী, ছোটবেলায় দুঃখ শব্দটাও প্রায় রূপকথার সামিল হয়েই

দেখা দেয়। আজ দেখতে পাচ্ছে তার আসল রূপটা কি। সে যেমন বোকা, তেমনি এ ভালই হ'ল, এ আঘাতের প্রয়োজন ছিল তার।

বাতির থামে পিঠ রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করে রইল মেরী। ক্ষুধা এবং অভিমান ওর সমস্ত শরীর মুচড়ে মুচড়ে দুই বোজা চোখ দিয়ে পুরন্ত গাল বেয়ে টপটপ করে ঝরতে লাগল। কিছুক্ষণ কেঁদে যখন ওর দুঃখের বেগটা কমে এল, তখন ধীরে ধীরে আবার সেই ঠুঁটো ভয়টা ওর চারিদিকে দুলে দুলে উঠতে লাগল। এই রকম সময়ে এই সব ধরনের জায়গাতেই ত যত অঘটন ঘটে থাকে, যত কুচক্র পাক খেয়ে এই নয়নমনোহর দেশের, এই আচমকা সুন্দর সমাজব্যবস্থার ক্ষতদুষ্ট রুগ্ন স্নায়ুগুলির অন্তর্লীন বিষ গর্জন করে ছুটে বেরিয়ে আসে। যত চুরি, ডাকাতি, খুন সকাল বেলার চায়ের পেয়ালার সঙ্গে যাদের খবর নেহাৎই ফাঁকা ফাঁকা শূন্য দিয়ে গড়া বলে মনে হয়, আজ এই সময়ে তাদের পক্ষে একান্ত বাস্তব হয়ে উঠতে বাধা নেই। ওই ঝাউয়ের কোণে কি যেন নড়ল। কোন উন্মাদ নারীহত্যাকারীর ওখানে লুকিয়ে বসে থাকা আশ্চর্য নয়। বেঞ্চির উপরে একটা কালো ছায়া। যেন কেউ টুপিটি কপালের উপরে টেনে বসে আছে। আগাথা ক্রিষ্টির গল্পের নায়ক নায়িকারা যেন লণ্ডনের খবরের কাগজের হত্যাকাণ্ডের পাতাগুলির মালা গলায় পরে, চারিদিকে ছায়া ফেলে দাঁড়াল। মনে হ'ল, যেন কার নিশ্বাস লাগল গালে। চোখ খুলে দেখে, অন্ধকার, আকাশে শুধু তারার ঝিকিমিকি। আবার চোখ বোজে মেরী, স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। যে কোন মুহূর্তে যা কিছু হতে পারে এই আশঙ্কায় নিরুদ্ধনিশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু কিছু হ'ল না, কেউ এল না—না চোর কিংবা গুণ্ডা, না প্রেতলোকের ছায়া। শুধু স্তূপ স্তূপ নির্জনতা ম্যাড়ম্যাড়ে অন্ধকারে ছমছম করতে লাগল। তারই মধ্যে এক সময় গর্জন করে ছুটে এল বাস। আর যন্ত্রচালিতের মত তার মধ্যে উঠে বসল মেরী। বাসের মধ্যে স্বল্প ক'জন যাত্রী—পথের নিষ্প্রভ আলোয় মুহূর্তের জন্যে প্রেতায়িত হয়ে উঠল। মেরীর মনে হ'ল, যেন ভূতের গাড়ীতে চলেছে। এখনই যেন দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে গর্জন করতে করতে পৃথিবী ছাড়িয়ে কোন্ মৃত্যুলোকের শূন্যে শূন্যে উধাও হয়ে যাবে। নিজের হাতের দিকে চোখ পড়ল মেরীর—তারাও আপন বিশিষ্টতা হারিয়ে ভূতের হাতের মত পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে।

সে নিজেও কি সত্যি সত্যি বেঁচে আছে—না সেও ভূত? ফুরিয়ে-যাওয়া মৃতজীবনের বোঝা বয়ে ছুটে চলেছে এই বাসটারই মত। কেন? কিসের জন্যে? উদ্দেশ্য কি? লক্ষ্য কোথায়? এই সব প্রশ্নগুলি একসঙ্গে মেরীর মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রশ্নচিহ্নের মত জেগে রইল। অবাক হয়ে মেরী ভাবল—শেষে কি ওকে পুবদেশের ফিলজফির নেশায় পেয়ে বসল? কুমার কি যাদু করেছে ওকে? এই জন্যেই বোধ হয় অনেকেই তাকে সাবধান করতে আসত—ভারতীয় ছেলের সঙ্গে অত মিশো না, ভারতের ঐ সর্বনাশা ফিলজফি তোমায় হজম করে ফেলবে।

কে জানে কেন এত সব কথা মনে হচ্ছে আজ। এই অদ্ভুত ভয়, আর অদ্ভুত ভাব। কুমারের সঙ্গে কি এই চির-বিচ্ছেদ হয়ে গেল? আর কি কখনও দেখা হবে না? কিংবা যদি বা হয়, দুজনে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। আর কখনোই হয় ত তেমন করে কাছাকাছি আসা হবে না।

ছুটে চলেছে বাস। দু'ধারে রুদ্ধদ্বার দোকানগুলির পুরু কাচের ভিতর দিয়ে বিচিত্র বেসাতি ঝলমল করছে। আর মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে মসৃণ কালো রাস্তার স্রোত।

হঠাৎ মনে হ'ল, দেখা যে হবেই না, এমন না'ও হতে পারে। মনে হয়েই মনে হ'ল—না হওয়াই সম্ভব। হয় ত দেখা হবে, হয় ত আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন আজকের মনোভাব নিয়ে ওরা হাসিঠাট্টা করবে। আর আজকের এই তীব্র দুঃখের মূল্য তুচ্ছ হয়ে যাবে সেই লঘু-ছন্দের সুরে। হয় ত আজই দেখা হয়ে যাবে। হয় ত, হয় ত বাড়ী গিয়ে দেখবে ডিভানটার উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে কুমার অপেক্ষা করে আছে। যদি হয়—যদি তাই হয় তা হলে কি করবে মেরী—কি বলবে! জানে না সে। একেবারে তাড়িয়ে দেবে, না কি মেকআপ করে ফেলবে। না না, এখনই নয়। এখনও ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় নি, এখন দেখা হলে আবার সংঘর্ষ বাধতে পারে, আবার জ্বলতে পারে আগুন। এখন দেখা হলে হয় ত কিছুই বলতে পারবে না মেরী—কিছুই না। না না, পরে যদি আবার কখনও দেখা হয় ত হোক কিন্তু এখন নয়, এখন নয়।

কিন্তু শুধু সেইদিনই নয়, তার পরে আরও অনেক—অনেকদিন কেটে গেল, তবু কুমারের সঙ্গে মেরির আর দেখা হ'ল না।

সেদিন মেরী চলে যাবার পর বহুক্ষণ সেই নড়বড়ে

চৌকিটার উপরে বসেছিল কুমার। মাথার মধ্যে ক্রমে যেন আগুন ছুটতে সুরু করেছিল—তার পরে কখন যে ধীরে ধীরে অন্ধকার হতে সুরু করেছে, কখন যে চৌকিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে, কিছুই ওর মনে নেই। যখন জ্ঞান হ'ল, তাকিয়ে দেখে হাসপাতালে শুয়ে আছে। শুনতে পেল ও দু'দিন জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়েছিল, ডাক্তার ব্যবস্থা করে হাসপাতালে এনেছে। ওর দুই বুকে নিউ-মোনিয়ার ডবল আক্রমণ।

শুনে প্রথমটা শিউরে উঠেছিল কুমার। বাবা! একেবারে নিউমোনিয়া। এ রাজকীয় চিকিৎসা চলবে কি করে। কোথায় টাকা। তখনই মনে হ'ল, ওঃ এদেশে ত চিকিৎসার জন্যে টাকার দরকার হয় না।

সাদা রং করা খাটে—সাদা বিছানায় শুয়ে কুমার দেখছিল, সাদা এপ্রন-পরা সেবিকারা ঘোরাফেরা করছে। দেখে কুমারের মনটা খুশীতে গুনগুন্ করে উঠল—"আমরা সবাই রাজা।" আমাদের কবি বাঁধলেন গান, এরা তাকে রূপ দিল জীবনে। একেবারে বিনা পয়সায়, বিনা সুপারিশে এমন হাসপাতালে জায়গা পাওয়া সম্ভব হ'ল কি করে। যে করেই হোক, হ'ল ত। শুধু ক'দিন নয়, প্রায় এক মাস ভুগলো কুমার। ইতিমধ্যে যেদিক দিয়ে সূর্য্য ওঠে, সেই দিক থেকে অনেক হাজার মাইল নদী সমুদ্র পেরিয়ে অনেকগুলি উৎকণ্ঠিত চিঠি এসে পৌঁছল কুমারের কাছে। প্রথম প্রথম নার্সেরা লিখে দিত ওর জবাব।

যেদিন ওর নিজে হাতে বাংলায় লেখা চিঠি মায়ের হাতে পৌঁছল, সেদিন বাড়ীতে নিশ্চয় উৎসব পড়ে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাল লাগল কুমারের। ওঁর নাম করে পাঁচটা পয়সা নিশ্চয় তুলে রেখেছিলেন পিসীমা। আর সেদিন হয় ত কালীবাড়িতে পূজো গিয়েছিল। আর বাবার সার্টে বোতাম বসাতে বসাতে মা হয় ত সাত হাজার মাইল দূরে বসে চুলে বিলি দিয়ে দিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

চিঠিগুলো নানারকম দেশের খবর কুমারের মনে লাগাত দোলা। বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, ওর আর কত দেরী। কুমার মনে মনে হাসে—আরও মাসছয়েক ত বটেই। ইতি-মধ্যে ব্রিস্টলের কারখানায় যদি কাজ করার সুযোগ পায়, তা হলে আরও কিছুদিন কাজ করে হাতে কিছু টাকা জমিয়ে নিতে পারে, তা হলে ফিরতি পাথেয় আর বাবার কাছে নিতে হবে না। মোটমাট দেশে ফিরতে ওর আরও বছরখানেক-বছর দেড়েক সময় ত যাবেই। ইতিমধ্যে রমলারা এসে পড়বে। খবরের মধ্যে সেইটেই সবচেয়ে বড় খবর। ওরা জাহাজে উঠেছে—রমলা আর তার পার্থ। পার্থর বয়স এগারো হয়েছে কিনা সন্দেহ, এরই মধ্যে সংস্কৃত শিখেছে খুব ওর দাদুর কাছে। ওর বয়সী ছেলেরা যখন ইংরেজী বুকনি দেয় ও তখন সংস্কৃতে বুকনি ঝাড়ে। ওর স্কুলের নামটা জানাতে ভুলে গেছে রমলা। সে নিজে কিন্তু লণ্ডনেই থাকবে, ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজমের কোর্সে ভর্তি হয়েছে। আবার তার ভাগ্নী কৃষ্ণাকেও নিয়ে আসছে, সে যাবে কেম্ব্রিজে। আর সবচেয়ে মজা, ওদের দলে আছেন মামা।

কুমারের নিজের মামা নেই। রমলার মামাকেই সে চিরকাল মামা বলে এসেছে। তাই শুধু নয়, তাঁকে একান্ত আত্মীয় বলেই চিরকাল জেনেছে। মামা শুধু মামা নন, শুধু গুরুজন নন, বন্ধুও বটে। মামার কাছে মনের কথা খুলে বলতে কোন সঙ্কোচ হয় না। মামা আসছেন স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল স্টাডিস-এ ছ'মাসের জন্যে ভারতীয় সঙ্গীতের উপরে একটা লেকচারশিপ নিয়ে। মামাবাবুকে নিয়ে জাহাজে ওদের দিনগুলি নিশ্চয়ই সাতরঙা সুরের রাম-ধনু হয়ে ফুটছে। আর যখন চাঁদ ওঠে, আর তরল জ্যোৎস্নায় অন্ধকার সমুদ্র সাদা হয়ে ঝিকমিক করতে করতে ছুটে চলে, তখন নিশ্চয়ই ওরা ক'জনে মিলে বিজাতীয় নৃত্যগীত ও পানোৎসবের হুল্লোড় এড়িয়ে ডেকের কোন নির্জন কোণায় জটলা করে বসে, আর মামাবাবু খুলে দেন তাঁর গলা—ঢেলে দেন তাঁর সুর—আকাশে-বাতাসে-জলে। আঃ, মামাবাবু এলে গান শুনে বাঁচা যাবে।—"তোমাদের যেমন বাজনা, আমাদের তেমনি গান।"

মনে মনে মেরীর সঙ্গে তর্ক করে হাসে কুমার—"তোমাদের বেহালা, তোমাদের পিয়ানো, তোমাদের গীটার সুরকারদের আঙুলের ছোঁয়ায় মনকে প্রায় মূর্চ্ছিত করে আনে আনন্দ-বেদনার পীড়নে, কিন্তু আমাদের গানও তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় জন্ম-জন্মান্তর পার করে, দূর স্বর্গের পথে।" মনে মনে তর্ক ওঠে বনিয়ে, কিন্তু হাতের কাছে ঘন হয়ে ওঠে না মেরির সুগন্ধভরা দেহ। কেন কুমার সেদিন ওর উপরে অকারণ রাগ করেছিল। ও ত কোন দোষ করে নি, কুমারের জন্যেই ছুটোছুটি করেছে। বাড়ী খুঁজে বার করা কি সোজা কথা। মেরী দুবার সেই অসাধ্যসাধন করেছে। শুধু কি এই—আরও কত কি? বিদেশে ওর সমস্ত দুঃখ লাঘব করার হাজার চেষ্টা করেছে। সেই তাকেই কুমার কুবাক্য বলল কি করে। তবে কি মেরীকে ভাল-বাসে নি কুমার? কে জানে কাকে বলে ভালবাসা? মেরীকে ওর ভাল লাগত সন্দেহ নেই। খুব তীব্র একটা নতুন রকম ভাল লাগা। এরই নাম বোধ হয় মোহ, তা যদি হয় তো হোক, এ মোহ সে ভাঙতে চায় না। কিন্তু মোহ মাত্রই

বুঝি ভেঙে যায়। তাই ত গেল, কতকাল তার দেখা মেলে নি, কোন খবরও পাওয়া যায় নি, কতদিন হয়ে গেল, কাছে এসে একবারও বসে নি। বলে নি, "কেমন আছ?" এত অসুখ একবারও খোঁজও করে নি। অবশ্য বাড়াবাড়ি অসুখের খবর মেরী পায় নি, জুনি বার্কার নাকি ওকে খবর দিতে ভুলে গিয়েছিল। দিন আষ্টেক পরে একটু সামলে নিয়ে কুমার যখন জুনিকে জিজ্ঞাসা করেছিল মেরীর খবর, জুনি বার্কার বলেছিল—"কাউকে খবর দেবার কথা মনেই ছিল না। সবই ত একা আমাকে করতে হয়েছে। তা ছাড়া এও ভেবেছিলাম, যে অসুখ দেখে গেল, নিশ্চয়ই একবার খোঁজ করবে। তা যখন এল না—"

—"তখন—।" কুমার বললে—"তখন আমার হয়ে তুমিই একবার ফোন করে দেখ।"

কিন্তু ফোন করে খোঁজ পেল না জুনি। মেরী তার ঠিকানা বদলেছে, কিংবা হয় ত লণ্ডনেই নেই। মেরী তার সেই স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল অনেক আগেই। কিছুদিন হ'ল একটা আপিসে সেক্রেটারীর কাজ করত। বন্ধুদের দিয়ে সেখানেও খোঁজ করেছিল কুমার। কিন্তু উদ্দেশ মিলল না; ছুটি নিয়েছে এক মাসের।

হঠাৎ সেদিন মার্কাসের কথা মনে পড়ল কুমারের। ও চেষ্টা করলে হয় ত কোন খবর এনে দিতে পারত এবং রমলাদের জন্যেও একটা থাকার ব্যবস্থা হয় ত হয়ে যেতেও পারে। ওর ফ্ল্যাটের কাছেই ফোন এনে দিল সেবিকা। কিন্তু মার্কাস মেরীর কোন খবরই জানে না।

—"সেই যে তোমরা দুজনে এসেছিলে।" মার্কাস বললে, —"তার পরে ত আর তার দেখা পাই নি।"

ইতিমধ্যে একটা গ্রীক নাটককে ভেঙেচুরে গড়বার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল ও। কিন্তু কুমারের অনুরোধে একটা কাজ করতে রাজী হয়েছে মার্কাস—রমলাদের জন্যে ফ্ল্যাটের চেষ্টা করতে।

—"লণ্ডনের একটু বাইরে যদি হয়?"

—"সে তুমি যা বোঝ আর যা পাও।"

কুমার নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কুমারের অসুখ শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছিল মার্কাস। মেরীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির পালা যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করে ফেলা উচিত এও তার মত।

—"শীগগিরই একদিন আসব তোমায় দেখতে।" মার্কাস বলেছিল। মার্কাসের বন্ধুত্বে কৃত্রিমতার বাধা নেই। ও সাহায্য করতে চায় বন্ধুর মতই। এদেশের সব বন্ধুর মধ্যেই এ ভাবটা লক্ষ্য করেছে কুমার, সাহায্য করতে পেলে সে সুযোগ কিছুতে ছাড়বে না।

কিন্তু মার্কাসের বিশেষত্ব আরও বেশী। সে শুধু সাহায্য করেই এবং বন্ধুত্ব স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয় না। ও আসে জিজ্ঞাসা নিয়ে আর সে জিজ্ঞাসায় শ্রদ্ধা আছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে মার্কাস আর জানতে চায় তার বর্তমান পরিণতি কি। ভারতের মেয়েদের বিষয়েও তার কৌতূহল খুব সজাগ। তবু, এখনও কোন মেয়ের সঙ্গে তেমন আলাপ জমাবার সুযোগ পায় নি। কুমার জানে, রমলার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে মার্কাস প্রতীক্ষা করে আছে। মার্কাসের বার বার মনে হয়, ভারতের বিরুদ্ধে যত প্রপাগাণ্ডা হয় তার অধিকাংশই সত্য নয়, সত্যের ভান মাত্র।

মার্কাস চেষ্টা করবে শুনে অনেকখানি নিশ্চিন্ত মনে হ'ল নিজেকে। কিন্তু মেরীর ইচ্ছে করে হারিয়ে যাবার কথা কুমারের মনের একটা কোণে সারাক্ষণ কাঁটা বেঁধাতে লাগল। কবে কতদিনে সে কাঁটা উঠবে কিংবা একেবারেই উঠবে কি না কে জানে?

ক্রমশঃ

শিল্পীকে লিখিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র ও তাঁহার রচিত একটি গান

স্নেহের মিনি,

একদিন তুমি আমার কাছে আমার হাতের একটা লেখা চেয়েছিলে। তাই ভগবানের বিভূতির বিষয়ে আমার রচিত একটি গান নিজে লিখিয়া তোমাকে দিলাম। ইহা স্নেহের দান।

আশীর্বাদ করি, তুমি আয়ুষ্মতী হও। তোমার অভীষ্ট কলাশাস্ত্রে যশস্বিনী হও। ভগবান্ তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন।

আশীর্বাদক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শান্তিনিকেতন, ৩রা আষাঢ়, ১৩৫৪।

তোমার বিভূতি বিশ্বময়, তুমিই আদিকারণ।
নির্গুণ, সগুণরূপে স্বগুণে কর সৃজন॥
প্রচণ্ড মার্তণ্ড-গলে, তব জ্বালামালা জ্বলে,
সৌম্যরূপ সোমমণ্ডলে, (তব) হাসি হাসে ঝলমলে॥
পবন নিশ্বাস তব, জীবে জীবে, অতএব
অন্তরা এ মর্ত্যলোক, ভূলোক, সব আকাশন॥
বিরাট মূরতি অতি, জ্ঞানরূপে সূক্ষ্মাকৃতি,
আত্মরূপে ভূতেস্থিতি, তুমি চেতনের চেতন॥
অপার দুয়ার খোলে, তরঙ্গিণীর কল কলে,
এ কালো ভুবন জলে, তুমি প্রাণ-জীবন॥
ওঙ্কার-নাম গীত, লেখা রেখায় ছন্দে ছন্দে,
বিভূতির পদে পদে, নিলেখ্য চিত্রকর॥
শীতলতা নাম জলে, স্নেহ জননীর কোলে,
মাতৃ অঙ্কে কবলে, তাই তোমা দোষী বেশে॥

জন্ম : ২৩শে জুন ১৮৬৭ মৃত্যু : ১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৯

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পী : শ্রীচিত্রনিভা রায়চৌধুরী

পঞ্চনদীর দেশে

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

মানবসভ্যতার সুপ্রাচীন যুগে পঞ্চনদীবিধৌত পঞ্জাবে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার সূচনা হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ এ কথাই বলেন। কালক্রমে এই সভ্যতা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার পর ভারতবর্ষের কূল ছাপাইয়া দেশ-দেশান্তরে ধর্ম্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আলোকশিখা জ্বালাইয়া তোলে। ভারতবর্ষ সত্যই ভাবগঙ্গার ভগীরথ।

বহিঃশত্রুর পৌনঃপুনিক আক্রমণ, অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার তাণ্ডবের মধ্যে পঞ্জাব দিন যাপন করিয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণেই পঞ্জাবে আর্য্যভারতীয় সভ্যতার উন্নত এবং পূর্ণতর রূপ চোখে পড়ে না। আত্মরক্ষার প্রয়াস এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্কটের মধ্যেই পঞ্চনদবাসীর দিন কাটিয়াছে। এই জন্যই গভীরতার অভাব এবং স্থূলতা পাঞ্জাবী-চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে শিখ সম্প্রদায়ের আদিগুরু নানক দেবের আবির্ভাবকালে (১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দ) পঞ্জাব এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল। আচার-আচরণ এবং ধ্যান-ধারণায় পশ্চিম পঞ্জাব তখন প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে। অধিবাসীদিগের অধিকাংশই ধর্ম্মেও মুসলমান হইয়া গিয়াছে। হিন্দু বলিয়া যাহারা নিজেদের পরিচয় দেয়, তাহারাও ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অপেক্ষা ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকেই প্রাধান্য দেয়। এই দুঃসময়ে গুরু নানকের আবির্ভাব। ঈশ্বরের একত্ব, মানবের ভ্রাতৃত্ব, ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি এবং মানব সেবার মন্ত্রে তিনি পঞ্জাববাসীকে সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা করেন। গুরু নানক এবং তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুদিগের এই চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু মনে হয় যে, শিখধর্ম্মের মত উদার এবং মহান্ একটি ধর্ম্মের আরও পূর্ণতা এবং সফলতা লাভ করা উচিত ছিল। কেন তাহা হয় নাই বোঝা খুব শক্ত নয়। ধর্ম্ম জাতি মানসকে প্রভাবিত করে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতি-মানসও ধর্ম্মের বিকাশ, বিবর্ত্তন এবং পরিণতিতে কম সহায়তা করে না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাসে একথার প্রমাণ মিলে। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

আধুনিক পঞ্জাবের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে শিখধর্ম্ম এবং শিখ গুরুদিগের দানকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিলে পঞ্জাব-ইতিহাসের একটি মূলসূত্রকেই অস্বীকার করা হয়। উচ্চ-শিক্ষিত বিশিষ্ট পঞ্জাবীর—ইনি শিখ নন—মুখে শুনিয়াছি যে, শিখধর্ম্মের প্রভাব না থাকিলে ভদ্র এবং সভ্যমানুষ পঞ্জাবে বাস করিতে পারিত না।

গুরুদ্বারা বা শিখ ধর্ম্মমন্দিরগুলি শিখধর্ম্ম এবং শিখ সমাজের প্রাণকেন্দ্র। 'গ্রন্থী' অর্থাৎ পুরোহিতদিগের প্রভাবও উপেক্ষা করিবার মত নয়। ইংরেজ আমলে ইঁহাদের সুপারিশ ভিন্ন সৈন্যবিভাগে শিখদিগের পদোন্নতি হইত না। এই সেদিনও স্বাধীন ভারত সরকারকে পূর্ব্বনীতি অনুসরণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। ভারত সরকার রাজী হন নাই।

যাক্ সে কথা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শিখগুরুদিগের পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি মন্দিরের কথা বলিব।

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির শিখসম্প্রদায়ের তীর্থরাজ। ১৯১৯ সনের এপ্রিল মাসে স্বর্ণমন্দিরের অনতিদূরে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। হাওড়া হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত প্রসারিত "সড়কের রাজা" গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অমৃত-সরের বুক চিরিয়া লাহোর হইয়া পেশোয়ার চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে অমৃতসর প্রায় ১,১৫০ মাইল। অমৃত-সরের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ২৫ মাইল দূরে নগণ্য একটি গ্রাম খাডুর বা খাডুর সাহেব। দ্বিতীয় শিখগুরু অঙ্গদ খাডুরে বাস করিতেন। গুরু অঙ্গদের প্রকৃত নাম লহিনা। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গুরুমুখী বর্ণমালার উদ্ভাবন এবং গুরু নানকের জীবন চরিত রচনা ইহার দুইটি অমর কীর্ত্তি।

অমৃতসর হইতে মোটরে চৌদ্দ মাইল তরণতারণ, ট্রেনেও যাওয়া যায়। চৈত্রমাসের পাখীডাকা ভোরে আমাদের যাত্রা সুরু। পথে প্রচণ্ড 'আন্ধেরী' (ধূলার ঝড়) উঠিল; রাজ্যের ধূলা, বালি এবং পাথরের কুঁচি চোখে-মুখে বিঁধিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় থামিয়া গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নামিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বৃষ্টিও থামিয়া গেল। আমরাও তরণতারণ পৌঁছিলাম। এখান হইতে খাডুর দশ-এগার মাইল, টাঙ্গায় যাওয়াই সুবিধা।

পাকা রাস্তায় টাঙ্গা চলিয়াছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ি-

তেছে। আবার ঝড় উঠিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে বিশাল প্রান্তর। কচিৎ-কদাচিৎ দুই-একখানা গ্রাম। মাঠে মাঠে গম পাকিয়াছে। গমের সোনালী শীষ ছাড়া বড় কিছু একটা চোখে পড়ে না। পঞ্জাবীতে গমকে কণক বলা হয়। পাকা গমের কাঁচা সোনার মত রঙের জন্যই বোধ হয় এই নাম। মধ্যে মধ্যে কোন কোন ক্ষেতে সতেজ, সরস, গাঢ় সবুজের সমারোহ—ঘাসের ক্ষেত। দুই পাশে যতদূর চোখ চলে পীত-হরিতের মহামহোৎসব। শ্রেণীবদ্ধ শিরিষ গাছের সারি রাস্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে, শিরিষ ফুলের মৃদুগন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

দেড় ঘণ্টার মধ্যেই খাডুর পৌঁছিলাম। আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া টাঙ্গা চলিয়া গেল। খাডুরে দুইটি গুরুদ্বারা—খাটি সাহেব এবং তপিয়ানা সাহেব। সঙ্গী অধ্যাপক সর্দ্দার সাধু সিংয়ের সঙ্গে প্রথমে খাটি সাহেব দর্শনে চলিলাম। জনশ্রুতি এই যে, গুরু অঙ্গদের সময় এখানে এক তাঁতী বাস করিত। গুরু অঙ্গদের ভক্তশিষ্য অমরদাস ছয় মাইল দূরে বিপাশা তীরে গৈণ্ডোয়ালে বাস করিতেন। অমরদাস শিখদিগের তৃতীয় গুরু। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে গুরু অঙ্গদের মৃত্যুর পর অমরদাস গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অমরদাস প্রতিদিন শেষরাত্রিতে অঙ্গদের স্নানের জন্য বিপাশার জল লইয়া আসিতেন।

একদিন অমরদাস গুরুর স্নানের জল লইয়া আসিতেছেন, হঠাৎ ধূলার ঝড় উঠিয়া পথঘাট একাকার হইয়া গেল। কিছুই দেখা যায় না। তাঁতীর বাড়ীর কাছে আসিয়া অমরদাস পথ হারাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁত বুনিবার সাজ-সরঞ্জামে হোঁচট খাইয়া গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। কাছেই তাঁতীর ঘর। অমরদাসের পতনের শব্দে গৃহমধ্যে নিদ্রিত তন্তুবায় দম্পতীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাঁতী স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল যে, বাহিরে যেন কিসের শব্দ হইল। স্ত্রী তাচ্ছিল্য-ভরে উত্তর দিল, এ অমরদাস ছাড়া আর কেহ নয়। সে আর তাহার গুরু অঙ্গদ দুজনেই দিনরাত্রি ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়। অমরদাস অঙ্গদ সম্বন্ধে এই অশোভন উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। গুরু অঙ্গদ পরে তাঁতীর নিকট হইতে এ জায়গা কিনিয়া লইয়া এখানে একটি গুরুদ্বার নির্ম্মাণ করেন এবং আশীর্ব্বাদ করেন যে, ভক্তিভরে যাহারা এখানে আসিবে তাহাদের কল্যাণ হইবে। গুরু অঙ্গদের ইচ্ছা অনুসারে এইখানেই তাঁহার মৃতদেহের সৎকার করা হয়।

অঙ্গদ বা অমরদাস কেহই আজ বাঁচিয়া নাই। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ শিখ আজও শ্রদ্ধার সহিত অমরদাসের গুরুভক্তির কথা স্মরণ করে—'কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি'।

গুরু অঙ্গদ নির্ম্মিত মন্দির কালক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়ে। উনবিংশ শতকে পঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের আদেশে এবং তাঁহারই ব্যয়ে এই মন্দির মেরামত করা হয়। সংস্কৃত মন্দিরের বিভিন্ন অংশ চিত্রিত এবং স্বর্ণখচিত হয়। মন্দিরশীর্ষে স্থাপিত সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যমণ্ডিত স্বর্ণময় ছত্রটিও মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের দেওয়া উপহার। ছত্রসংলগ্ন ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি মৃদু বাতাসে টুংটাং করিয়া বাজিতেছে। মধুর শব্দ তরঙ্গ উঠিয়াছে।

অল্পদূরেই গুরুদ্বারা তপিয়ানা সাহেব। গুরু অঙ্গদ এখানে বসিয়াই নাকি গুরু নানকের প্রথম জীবনচরিত 'জনমশাখী' রচনা করিয়াছিলেন। গুরু অঙ্গদ সত্যই জনমশাখী রচনা করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জনশ্রুতি বলে যে, অঙ্গদ গুরু নানকের অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর ভাই বালার মুখে-শোনা কাহিনীর ভিত্তিতে 'জনম-শাখী' রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কিন্তু বলেন, গুরু নানকের বালা নামে কোন পার্শ্বচরই ছিল না।

বৃহৎ জলাশয়ের এক তীরে গুরুদ্বারা তপিয়ানা সাহেব; অপর তীরে গুরু অঙ্গদের তপস্যার স্থান।

খাডুর হইতে ছয় মাইল দূরে গৈণ্ডোয়াল। তৃতীয় গুরু অমরদাসের জীবন এখানেই অতিবাহিত হয়। অমরদাসের সময় গৈণ্ডোয়াল মাঝারি গোছের একটি শহর ছিল। কিন্তু 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। বর্ত্তমানে গৈণ্ডোয়াল অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য একটি গ্রাম। অধিবাসী সংখ্যা চারি শত বা তাহারও কম। অধিকাংশই শিখ। অমরদাসের সময় বিপাশা নদী গৈণ্ডোয়ালের গা ঘেঁষিয়া প্রবাহিত হইত। বিপাশা খাত পরিবর্ত্তন করিয়া গৈণ্ডোয়াল হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

অমরদাসের সময় শিখধর্ম্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে। তিনি নিয়ম করেন যে, গুরুর বাসগৃহ সংলগ্ন লঙ্গরী বা ভোজন-সত্রে ভোজন না করিয়া কেহ গুরুর দর্শন পাইবে না। ইহার ফলে একদিকে যেমন শিখদিগের মধ্যে একতা এবং সম্প্রীতির ভাব বর্দ্ধিত হয়, অপর দিকে তেমনই আবার জাতিভেদ প্রথার মূলেও কুঠারাঘাত হইয়াছিল। শিখগণ বলে যে, স্বয়ং সম্রাট্ আকবরও গুরু অমরদাসকে দর্শন করিতে গৈণ্ডোয়াল আসিলে ভোজনসত্রে আহার্য্য গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন পান নাই। অমরদাসের নির্দ্দেশেই সম্ভবতঃ গুরু নানক এবং গুরু অঙ্গদের রচনাবলী সংগৃহীত হয়। তাঁহার সময় কিছু মুসলমানও বোধ হয় শিখধর্ম্ম গ্রহণ করে। অমরদাস দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ সনে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা রামদাস গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হন। রামদাসের পর হইতে গুরুর পদ বংশানুক্রমিক হইয়া পড়ে।

গুরু অমরদাসের আদেশে খনিত বিরাট কূপ বাওলী সাহেবে (বাওলী = কূপ) স্নান এবং তাঁহার বাসস্থান গুরুদ্বারা চৌবারা সাহেব দর্শনের জন্য গৈণ্ডোয়ালে বহু যাত্রীসমাগম হয়। বাওলী সাহেবে নামিবার চুরাশিটি সিঁড়ি। এই কূপে একদিনে চুরাশিবার স্নান করিয়া প্রত্যেক সিঁড়িতে বসিয়া একবার করিয়া গুরু নানকের 'জপজী' আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে এই জন্মেই নাকি মুক্তিলাভ হয়। প্রতিবার স্নানের পর নূতন একটি সিঁড়িতে বসিয়া জপজী পাঠ করিতে হইবে। বিশ্বাস, বিশেষতঃ ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা কিছু না বলাই ভাল। কূপের নিকটেই একটি গুরুদ্বারা। কূপ এবং গুরুদ্বারা দুইটিকেই 'বাওলী সাহেব' বলা হয়। অল্প দূরেই গুরুদ্বারা চৌবারা সাহেব। গুরুদ্বারার মধ্যে এক জায়গায় পাশাপাশি অনাড়ম্বর এবং বাহুল্যবর্জ্জিত দুইটি শ্মশান। অমরদাস এবং তাঁহার জামাতা অমৃতসরের প্রতিষ্ঠাতা চতুর্থ গুরু রামদাসের শ্মশান। রামদাসের পুত্র পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন মল এইখানেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গুরু অর্জ্জুন যে কক্ষে জন্মগ্রহণ করেন, সে কক্ষটি আজও বর্ত্তমান। গুরু অর্জ্জুন প্রথম শিখ শহীদ। শিখ সম্প্রদায় কোন দিনই তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। তিনিই শিখদের আদিগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই পবিত্র গ্রন্থের কোন কোন অংশ তিনি নিজেই রচনা করিয়াছিলেন। শিখ সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করা তাঁহার দ্বিতীয় অমর কীর্ত্তি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। গুরু অর্জ্জুন বিদ্রোহী খুসরুকে সহায়তা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অর্জ্জুন অর্থদণ্ড দিতে সম্মত না হওয়ায় সম্রাটের আদেশে তাঁহার উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। এই নির্যাতনের ফলে তাঁহার প্রাণান্ত হয় (১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

গুরুদ্বারা চৌবারা সাহেবের মধ্যেই একটি কক্ষের দ্বারদেশে কাচের আধারে গুরু অমরদাসের মাথার চুল এবং তাঁহার ব্যবহৃত জামার কিয়দংশ রক্ষিত হইয়াছে। ভক্তগণ গুরুর স্মৃতিচিহ্ন দুটিকে পরম পবিত্র মনে করে। জরাগ্রস্ত বার্দ্ধক্যজীর্ণ অমরদাস দেওয়ালে পোঁতা একটি কাঠের গোঁজ ধরিয়া দাঁড়াইতেন। গোঁজটিকে রূপার পাতে মুড়িয়া রাখা হইয়াছে। ভক্তগণ ইহাকে 'কিলা সাহেব' বলে। এক জায়গায় দেওয়ালের গায়ে বসানো একখানা তক্তাকে 'তক্তা সাহেব' বলা হয়। ভক্তগণের নিকট ইহাও পরম পবিত্র। শিশু অর্জ্জুনমল নাকি এই তক্তা লইয়া খেলা করিতেন।

কয়েকদিন পরের কথা। নবমগুরু তেগবাহাদুরের স্মৃতিপূত বাবা বাকালা চলিয়াছি। চৈত্র শেষের সকাল বেলা। আকাশ পরিষ্কার, নির্মেঘ। বাতাস বন্ধ। বেলা আটটা বাজিতে না বাজিতেই সমতল পঞ্জাবের আগুন-ঝরা গরম সুরু হইয়াছে। মনে হয়, কত বেলা হইয়াছে। বেলা তিনটা চারিটা পর্য্যন্ত গরম বাড়িতেই থাকিবে, তাহার পর ধীরে ধীরে কমিতে কমিতে রাত্রি নয়টা দশটা নাগাদ অবস্থা সহনযোগ্য হইবে। তবে ব্যতিক্রমও হয়। সূর্যাস্তের পর ঘরের ভিতর থাকিবার জো নাই। ছাদ, মেঝে এবং দেয়াল হইতে প্রচণ্ড তাপ বাহির হইতে থাকে। এদেশে গরমের দিনে রাত্রিতে সকলেই ঘরের বাহিরে ঘুমায়। রাত্রিতে যেদিন ধূলার ঝড় উঠে, সেদিন কষ্টের একশেষ হয়। ঘরে-বাহিরে কোথাও ঘুমাইবার জো থাকে না।

চৈত্রমাসের কয়েকদিন বাকী আছে। এখনও সন্ধ্যা হয় সাতটার পর। আর কয়েকদিন পর দিনমানের মধ্যেই ডুবিবার আটটা বাজিতে দেখা যাইবে। শিখদিগের বাহাদুরি আছে। এই গরমেও ইহারা সপ্তাহে একদিন মাত্র পূর্ণ স্নান করে। বাকী ছয় দিন গায়ে জল দিয়াই খালাস। মাথায় জল দেওয়া ইহাদের স্নানের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া অমৃতসর হইতে দিল্লীর পথে বইয়া। দূরত্ব প্রায় পঁচিশ মাইল। এ পর্য্যন্ত বাসে আসা যায়। এখান হইতে উত্তর দিকে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হইতে দুই-আড়াই মাইল দূরে বাবা বাকালা ছোট্ট একটি শহর। বইয়া হইতে হাঁটিয়া বা টাঙ্গায় বাবা বাকালা যাইতে হয়।

ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র তেগবাহাদুর শিখ-ইতিহাসের স্বনামধন্য পুরুষ। ইনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক। সম্রাটের পরধর্ম্মপীড়ন নীতির প্রতিবাদ করিয়া তেগবাহাদুর সম্রাটের বিরাগভাজন হন। তিনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদিগকে আওরঙ্গজেবের অনুদার ধর্ম্মনীতির বিরোধিতা করিবার পরামর্শ দেন। ফলে ক্রুদ্ধ সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যাওয়া হয়। এ সম্বন্ধে একটু মতভেদ আছে। কোন কোন শিখ ঐতিহাসিক (!) বলেন যে, গুরু তেগবাহাদুর স্বেচ্ছায় সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে ধর্ম্মত্যাগ করিতে বলেন। তেজস্বী তেগবাহাদুর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে সম্রাটের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ হয় (১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

তেগবাহাদুরের প্রথম জীবন বাকালায় অতিবাহিত হয়। এখানেই তিনি গুরুর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গুরু হইবার পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে 'তেগা পাগলা' বলিত। অষ্টম গুরু হরকিষণ (১৬৬১-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) মৃত্যুকালে বলিয়া

যান—'বাবা বাকলা' অর্থাৎ (পরবর্ত্তী) বাবা বা গুরু বাকালায় আছেন। এদিকে হরকিষণের মৃত্যুর পর বাইশ জন ভণ্ড প্রত্যেকেই নিজেকে গুরু বলিয়া জাহির করিতে থাকে। ইহাদের প্রত্যেকেই বাকালাতে বাস করিতে থাকে।

এই সময় শিখ বণিক মাখনশাহ্ বাণিজ্য উপলক্ষ্যে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। ঝড়ে তাঁহার জাহাজ বিপন্ন হইলে তিনি গুরু নানকের প্রকৃত (আধ্যাত্মিক) উত্তরাধিকারী অর্থাৎ আসল গুরুকে পাঁচ শত মোহর প্রণামী দিবার মানসিক করেন। মাখনশাহের জাহাজ বানচাল হইতে হইতে বাঁচিয়া যায়। দেশে ফিরিয়া মানসিক শোধ করিবার জন্য তিনি আসল গুরুর সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বাকালায় উপস্থিত হইলেন। বাইশ জন ভণ্ড গুরুর সহিত দেখা করিয়া তিনি প্রত্যেককে পাঁচ মোহর প্রণামী দিলেন। সকলেই প্রণামী গ্রহণ করিল, কেহই উচ্চবাচ্য করিল না। মাখনশাহ্ বুঝিলেন যে, ইহারা সকলেই ভণ্ড। নিরাশ হৃদয়ে তিনি ফিরিয়া চলিলেন। রাস্তায় ছোট ছেলেরা খেলা করিতেছে। মাখনশাহ বাকালায় আর কোন গুরু আছে কিনা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ছেলেরা তাঁহাকে 'তেগা পাগলা'র কথা বলিল এবং জানাইল যে, অন্যান্য 'গুরু' (!) এবং তাহাদের চেলাচামুণ্ডার ভয়ে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হন না। তিনি রাস্তায় বাহির হইলেই অন্যেরা তাঁহাকে মারধোর করে। মাখনশাহ একটি ছেলেকে লইয়া তাঁহার নিকট চলিলেন। তেগবাহাদুর নিজের ঘরের মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে থাকিতেন। এই গর্ত্তের মধ্যেই নাকি তিনি ২৬ বৎসর ৯ মাস ১০ দিন কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা নানকী মাখনশাহকে সঙ্গে করিয়া ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুত্রকে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। তেগবাহাদুর কিছুতেই বাহিরে আসিবেন না, মাখনশাহও নাছোড়বান্দা, দেখা না করিয়া নড়িবেন না। অবশেষে তেগবাহাদুর গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাখনশাহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পাঁচ মোহর প্রণামী দিলেন। তেগবাহাদুর সেদিকে এক নজর চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন :

"পানশ মুক্কে পাঁঞ্জ চড়াওয়ে"
"বাবুকে বচন ফের মুকর যাওয়ে"।

অর্থাৎ—

মানসিক করিয়াছিলে ৫০০ (মোহর)। দিলে মাত্র ৫ (মোহর)। কথা দিয়া কথা রাখিলে না।

মাখনশাহ মহাখুশি, কিন্তু সন্দেহ তখনও একেবারে দূর হয় নাই। তেগবাহাদুরই যে আসল গুরু তিনি তাহার প্রমাণ চাহিলেন। তেগবাহাদুর নিজের বাম বাহু অনাবৃত করিয়া চারটি বড় বড় ক্ষত চিহ্ন দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, মাখনশাহর জাহাজ ঝড়ের মুখে ডুবিবার উপক্রম হইলে তিনিই রক্ষা করিয়াছিলেন। জাহাজের চারটি পেরেক তাঁহার বাহুতে ফুটিয়াছিল, তাই এই ক্ষতচিহ্ন। মাখনশাহ সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"সাচো গুরু লাধোবে" অর্থাৎ আসল গুরুর সন্ধান পাইয়াছি।

ভুয়া গুরুর দল ত চটিয়া আগুন। ইহাদের দলপতি শিখা মোসাণ্ডা তেগবাহাদুর ঘরের বাহিরে আসিয়া বসিলে তাঁহাকে গুলি করিল। বন্দুকের গুলি তেগবাহাদুরের গায়ে লাগিয়া ফিরিয়া আসিল। তার পর অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হইল। ভুয়া গুরুদিগকে ধরিয়া বেদম মার দেওয়া হয়। আদিগ্রন্থ তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তেগবাহাদুরকে দেওয়া হয়।

বাবা বাকালার গুরুদ্বারা শিখসম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। গুরু তেগবাহাদুর গুরু হইবার পূর্ব্বে যে গর্ত্তের ভিতর বাস করিতেন তাহার উপর নির্ম্মিত একটি মিনার বহু দূর হইতে চোখে পড়ে। গর্ত্তের পঞ্জাবী প্রতিশব্দ 'পুরা'। সেই জন্য মিনারটিকে 'পুরা সাহেব' বলে। মিনারের নীচে গর্ত্তটি আজও বর্ত্তমান। ইহাকে সযত্নে বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছে। গুরুদ্বারার 'গ্রন্থী' অর্থাৎ পুরোহিতের অনুমতি লইয়া গর্ত্তের ভিতর নামা যায়। অদূরে একটি বাঁধানো বেদী, এখানেই নাকি তাঁহার গায়ে গুলি লাগিয়াছিল।

প্রতিকৃতি নির্ম্মাণে কুশলী-ভাস্কর দেবীপ্রসাদ

শ্রীরাধিকা রায়চৌধুরী

বাংলার শিল্পী ও শিল্পানুরাগীরা শিল্পী দেবীপ্রসাদের মূল কাজের সহিত অতি সামান্য মাত্র পরিচিত। তাঁর কর্ম্মস্থল ছিল মাদ্রাজে। বিখ্যাত ভাস্কর্য্য ও চিত্রের অধিকাংশ বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আছে। কিছু সংখ্যা রয়েছে, দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারীতে।

শিল্প-সাধনার পীঠস্থান কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান রয়েছে, শিল্পী দেবীপ্রসাদকে জানবার ও তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিতি লাভের পক্ষে ইহাই ছিল প্রধান অন্তরায়। অথচ শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে পরিপূর্ণ ভাবে জানতে হলে, তাঁর বৈচিত্র্য-বহুল সৃষ্টির সহিত সম্যক পরিচয়ের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শিল্পী-জীবন সম্বন্ধে সন্ধানী হওয়া। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে সৃষ্টির প্রথম উৎস কিভাবে আত্মশক্তিতে বিকাশ লাভ করে বিপুল জলধারায় জগৎকে অভিসিঞ্চিত করে, তার কাহিনী না জানা থাকলে, শিল্পীর শিল্পধারার ক্রমবিকাশও সঠিকভাবে বোঝা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। দেবীপ্রসাদের সাধনা পাণ্ডবকুমার অর্জ্জুনের সাধনা নয়, একলব্যের একনিষ্ঠ কঠিন সাধনায় পরবর্ত্তী জীবনের প্রতিষ্ঠা।

তিনি মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষপদে যোগদানের পর, নিজে মূর্ত্তির কাজ করার জন্য একটি স্বতন্ত্র ষ্টুডিও তৈরী করে, নিবিষ্টভাবে কাজ করার সুযোগ গ্রহণ করেন। ইহার ফলে শিক্ষার্থীরাও অর্থকরী কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে।

সাধারণতঃ স্কুলের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হলেও অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক-প্রয়োগ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বৃহৎ আকারের পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি তৈরীর কৌশল জানা না থাকলে, পরবর্ত্তী জীবনে সুযোগ এলেও সাফল্যের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠে না।

বড় বড় মূর্ত্তির Armaturo তৈরী করে, মাটির কাজ শেষ করার পর Fiece Mould এবং তারপর Casting করে Final-finishing-এর কারিগরী শিক্ষা হাতে-কলমে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেবীপ্রসাদের ষ্টুডিয়োতে বড় বড় Commission-work হয়ে থাকে। এবং এই অর্থপ্রাপ্তির সুযোগে তিনিও বেপরোয়া অর্থ ব্যয় করেন, নানাভাবে গবেষণায়। চোখে না দেখলে আমার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তাঁর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণের (Modelling) কর্ম্মকুশলতা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর।

১৯৪৪ সনের কথা। মিঃ পট্টভীরমণের প্রতিমূর্ত্তি তৈরী হবে। তিনি মিঃ সি. পি. রামস্বামীর পুত্র দেবীপ্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। পট্টভীরমণের মুখমণ্ডলে এমন একটা শান্ত-সৌম্য গড়ন ছিল, যার বৈশিষ্ট্য শিল্পীমনকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই বহুদিন থেকে উৎসুক প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁর স্বীকৃতির জন্য। কর্ম্মব্যস্ত পট্টভীরমণ অবশেষে 'সিটিং' দিতে রাজী হলেন।

'প্রিন্সিপাল'-এর বাংলো 'আর্ট স্কুল কম্পাউণ্ড'-এর মধ্যে। স্কুলের আলাদা 'মডেলিং ষ্টুডিও' রয়েছে। এটা হচ্ছে দেবীপ্রসাদের নিজের ষ্টুডিও। দিনের আলোকে সংযত করে প্রয়োজনমত কাজে ব্যবহার করার চমৎকার বন্দোবস্ত এবং বিচিত্র রকমের অগণিত 'মডেলিং ষ্টল'-এর সমাবেশ। যাঁরা মূর্ত্তি-নির্ম্মাণরত দেবীপ্রসাদকে কোনদিন দেখেন নি, তাঁরা ধারণা করতে পারবেন না যে, আলো এবং অসংখ্য হাতিয়ারের যাদুকরী স্পর্শে তিনি কি-ভাবে অদ্ভুত সৃষ্টি করেন।

গুরুর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধ ছিল সংস্কারমুক্ত প্রাণের ঐশ্বর্য্যে দীপ্ত। তাই কর্ম্মনিরত দেবীপ্রসাদের ব্যক্তিগত ষ্টুডিওতে, শিক্ষার্থী-দের প্রবেশাধিকার ছিল সহজ। আগামী কাল থেকে পট্টভীরমণের 'ষ্টাডি' সুরু হবে। এইচ. ভি. রামগোপাল ও আমি স্কুলের খুব কাছে থাকি। রামগোপাল 'ফাইন আর্টস'-এর 'ডিপ্লোমা' নিয়ে 'মডেলিং ক্লাস'-এর সেকেণ্ড ইয়ার-এ পড়ে (বর্ত্তমানে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের শিক্ষক)। তার মধ্যে ছিল না শিক্ষার্থীর অহেতুক উচ্ছ্বাস —শান্ত সচেতন শিল্পীমন। গুরুর প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা।

রামগোপালকে সঙ্গে নিয়ে 'ষ্টুডিও' গুছিয়ে সব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে নিলাম। এলেন দেবীপ্রসাদ। সমস্ত ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে নিলেন—হাতিয়ারগুলো সাজানো, আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা, আলমারিতে সাজান 'ডিফারেণ্ট গ্রেড'-এর, ক্লে সব ঠিক আছে কি না।

পরদিন সকালেই এসে আমরা হাজির হলাম। সামনের ছায়াশীতল পরিবেশ—দেবীপ্রসাদ সেখানটাতে বসলেন। নানা কথা হচ্ছিল আমাদের মধ্যে কিন্তু তাঁর মন প্রতীক্ষা করছিল মিঃ পট্টভীরমণকে। এটা লক্ষ্য করে বুঝলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ের আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী—দেবীপ্রসাদ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ফোনে এটেণ্ড করতে বাংলোতে পাঠিয়ে দিলেন। উৎসুক হয়ে ফোনের কাছে বসে আছি, মিঃ পট্টভীরমণ ডেকে জানিয়ে দিলেন, আজ আসতে পারবেন না বলে অত্যন্ত দুঃখিত। কাল নিশ্চয়ই উপস্থিত হবেন।

সৃষ্টির ব্যাকুলতায় তখন শিল্পীমন আচ্ছন্ন। প্রতিটি মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষায় উন্মুখ। ভগ্নদূতের মত আমাকেই খবরটি পরিবেশন করতে হ'ল।

আগামী কাল আসার প্রতিশ্রুতিতে দেবীপ্রসাদ আশ্বস্ত হতে পারেন নি। মুখের উপরে একটা নিরাশ কাতরতা ফুটে উঠল। পরদিন অবশ্য নির্দ্ধারিত সময়ে মিঃ পট্টভীরমণ এসে হাজির হলেন। কাজ সুরু হ'ল। বার কয়েক মাপ নিয়েই প্রথম 'স্কাল'টা তৈরী করে নিলেন তারপর লম্বা লম্বা বলিষ্ঠ আঙুলগুলি দিয়ে এমন ক্ষিপ্রগতিতে 'পোর্ট্রেট স্কেচ' করে নিলেন, যে প্রথমটা ঠিক ঠিক অনুসরণ করতে পারি নি। এবং মডেলের জায়গা পরিবর্ত্তন করে নূতনভাবে আলোকসম্পাত করা হ'ল। নানা রকম হাতিয়ারের ব্যবহার সুরু হ'ল। আমি ও রামগোপাল তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আদেশমত হাতিয়ারগুলি এগিয়ে দিতে লাগলাম। তিনি মডেলের মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তন্ময়ের মত কাজ করে যাচ্ছেন।

রামগোপাল কানে কানে কি বলতে যাচ্ছিল, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, এবার কথামত হাতিয়ার এগিয়ে দিতে ভুল হয়ে গেল। তিনি রেগে হাতিয়ার ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজে হাতে প্রয়োজনীয় জিনিসটি তুলে নিয়ে কাজ করে যেতে লাগলেন। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। নিজেদের ত্রুটির জন্য লজ্জিত হলাম। এ অবস্থার সঙ্গে পূর্ব্বে আমরা পরিচিত নই। এই প্রথম দেবীপ্রসাদের নিজের ষ্টুডিওতে সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করছি।

আরও এক ঘণ্টা কাজ করার পর আগামী দিনের জন্য কাজ স্থগিত রাখা হ'ল। ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মডেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ফিরে আমাদের লক্ষ্য করে দেবীপ্রসাদ বলে উঠলেন, "আমি রেগে গিয়েছিলাম বলে তোমরা দুঃখিত হইও না কিন্তু। কাজের সময় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যথাযথভাবে না পেলে সমস্ত একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন মেজাজ খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক।" আমাদের দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল।

পরদিন যথাসময়ে মডেল এসে উপস্থিত হলেন। প্লাটফরম ও আলোকসম্পাতের ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করা হ'ল। আরও নরম কাদা দিয়ে নানা রকম শক্ত ব্রাশের সাহায্যে মুখের ছোট-বড় পেশীগুলিকে বসিয়ে যেতে লাগলেন।

আজ আমি প্রথম থেকেই হুসিয়ার হয়ে একান্ত নিবিষ্টমনে কাজের অনুসরণ করতে লাগলাম। চোখ রাখলাম, কি কি ধরনের কাদা কি কি রকম তুলিতে কোথায় ব্যবহার করে কি কি উন্নতি, হচ্ছে।

গত দিন রেগে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে দেবীপ্রসাদ যা বলেছিলেন তার সহজ অর্থ বুঝতে পারলেও মর্ম্মার্থের সন্ধানী হওয়ার জন্য একাগ্রভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজন মনে করলাম। আমি নূতন শিক্ষার্থীর পর্যায়ে পড়ি না। শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার ভাষা বোঝবার মত সামান্য জ্ঞান পূর্ব্বেই অর্জ্জন করেছিলাম। তাই গুরুর কাজের অসাধারণ বৈচিত্র ও শক্তিশালী প্রয়োগ-পদ্ধতি বিশদভাবে অনুধ্যান করার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। ষ্টুডিওতে কাজ দেখার পর বাড়ী গিয়ে মনে মনে সেগুলি আওড়াতাম। মডেলিং ক্লাসে শিক্ষা করার সময় সেই সব পদ্ধতিগুলি অভ্যাস করে ঠিক করে নিতাম। ক্রমশঃ কাজের বৈজ্ঞানিক ধারাটা উপলব্ধি করতে পারলাম। কাজে উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা বেড়ে গেল।

এখন মডেলকে ছুটি দিয়েও দেবীপ্রসাদ কিছু সময় কাজ করেন আপন মনে। ইতিমধ্যে প্রতিমূর্ত্তি এমন পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিকৃতির কাজ নিখুঁতভাবে শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

সেদিন যাবার বেলা মিঃ পট্টভীরমণ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ চৌধুরী আশা করি আপনার কাজ শেষ হয়ে গেল, এবার আমার ছুটি?"

দেবীপ্রসাদ বললেন, "আপনার কি মনে হচ্ছে? আপনার কি মনোমত হয়েছে?"

মিঃ পট্টভীরমণ "আমার খুব ভাল লাগছে। প্রতিকৃতি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উৎরেছে।"

দেবীপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমার মনোমত এখনও হয় নি। শুধু প্রতিকৃতি নয়, সজীব বলিষ্ঠ-প্রাণ মানুষটিকে আমি মূর্ত্তিতে জীবন্ত করে পেতে চাই। এর জন্য আপনাকে আরো ক'টা দিন কষ্ট করে আসতে হবে।"

এর পর প্রতিকৃতি কি ভাবে জীবন্ত মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হবে! শেষ অধ্যায়ের জন্য আমার ঔৎসুক্য আরো বেড়ে গেল।

পরদিন এসেই দেবীপ্রসাদের নির্দ্দেশমত প্রথমেই নানারকম গ্রেড-এর নরম কাদা করে অনেকগুলি বাটিতে সাজিয়ে রাখলাম। বড় বালতিতে জল, স্প্রে তাতে ষ্টিরাপ-পাম্প প্রস্তুত করে রাখলাম।

মিঃ পট্টভীরমণ তখনও আসেন নি। ইতিমধ্যে আমি গত দিনের মূর্ত্তি ঢাকা ওয়েলক্লথ-এর ঢাকনাটা খুলে দিলাম। গত চব্বিশ ঘণ্টায় মূর্ত্তির গায়ের উপরের জলের ভাগটা শুকিয়ে গিয়ে মূর্ত্তিটা দেখতে যেন অনেক সুন্দর লাগছে।

দেবীপ্রসাদ ভেতরে এসেই আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগছে? অনুসরণ করতে পাচ্ছ ত তোমরা?" আমরা নীরবে মাথা নাড়লাম।

মিঃ পট্টভীরমণের গাড়ী এসে হাজির হ'ল। রোজকার মত মডেলকে এর উপর দাঁড় করিয়ে কাজ আরম্ভ হ'ল। এবার নূতন ঢং-এ কাজ সুরু হ'ল। নানারকম নরম কাদা, নানারকম ব্রাশ এবং স্প্রে'র সাহায্যে জলের কাজ এগুতে লাগল। কিছুক্ষণ পর পর মডেল ও মূর্ত্তির উপর বিভিন্ন দিক থেকে আলোকসম্পাত করে ভাল করে দেখে নেওয়া হচ্ছিল। এভাবে ধীরে ধীরে এক ঘণ্টা কাজ করার পর মূর্ত্তির উপর ষ্টিরাপ-পাম্প দিয়ে খুব করে জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া হ'ল।

ক্লান্ত হলেও দেবীপ্রসাদকে খুব প্রশান্ত মনে হচ্ছিল। মূর্ত্তির গায়ের জল যেন শিল্পীর সারা দেহ সিক্ত করে দিয়েছে।

মিঃ পট্টভীরমণকে নিয়ে দেবীপ্রসাদ বাইরে গাছতলায় এসে বসলেন। আমরাও তাঁদের অনুগমন করলাম। দু'জনে নানা কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। প্রায় আধঘণ্টা কেটে যাবার পর ষ্টুডিওর ভিতরে ঢুকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে মূর্ত্তির সমস্ত

জল ঝরে গিয়ে, মুখের উপর এমন graceful skin effect পড়েছে, যে প্রতিকৃতিকে সজীব বলে মনে হচ্ছে।

দেবীপ্রসাদ মূর্তির দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্তির হাসিতে বলে উঠলেন, "মিঃ পট্টভীরমণ এবার আমার কাজ শেষ হ'ল।'

মিঃ পট্টভীরমণ অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলে উঠলেন, "মিঃ চৌধুরী, আশ্চর্য হচ্ছি আপনার প্রতিকৃতি তৈরীর নৈপুণ্য দেখে। কিছুদিন থেকে আমি লক্ষ্য করে বিস্মিত হচ্ছিলাম, যে, ষ্টাডি করবার সময়ে, আপনার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি যেন আমাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইত। কখনও মনে হ'ত তারা যেন আমার ভিতরের ছবি তুলে নিচ্ছে।

উচ্চ হাসিতে ষ্টুডিও প্রতিধ্বনিত করে মিঃ রমণের হাত ধরে দেবীপ্রসাদ বেরিয়ে এলেন।

আজও সন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু প্রতিমূর্তি নির্মাণে এরূপ নৈপুণ্য কোথাও চোখে পড়ে নি এখনও।

প্রতিমূর্তি তৈরীর কাজে সব চাইতে দক্ষতা হচ্ছে ব্যক্তি-মানসকে মূর্তিতে রূপায়িত করা। তাই শুধু রক্তমাংসের মানুষটিকে তৈরি করার পদ্ধতি আয়ত্তে থাকলেই চলে না, ব্যক্তি-চরিত্রকে গভীর ভাবে অনুধ্যান করা এবং প্রতিমূর্তি নির্মাণে তা ফুটিয়ে তোলার কৌশলও জানা প্রয়োজন। এই দুটোর উপর সমান অধিকার না থাকলে, প্রতিমূর্তি সার্থক হতে পারে না। দেবীপ্রসাদ প্রতিকৃতি নির্মাণে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এইজন্য প্রধানতঃ তিনি দুইটি নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করেন। একটি হচ্ছে জীবিত ব্যক্তির ফটো থেকে কখনও মূর্তি তৈরি করেন না। ষ্টুডিওতে এসে সিটিং দিতে রাজী হলেই নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন—নতুবা নহে।

অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির খুব ভাল ফটো এক বা তদধিক হওয়া চাই। ফটো ভাল না হলে দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। তিনি নিজের কাজের মর্য্যাদা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। যাঁরা প্রতিকৃতি নির্মাণ করাতে আসেন, তাঁরা তাঁর কাজের খ্যাতির সঙ্গে পরিচিত বলে, প্রতিকৃতির নিশ্চিত সাফল্যের কথা চিন্তা করেই আসেন। এবং এত বড় ভাস্করের ষ্টুডিওতে সিটিং দিতে গৌরব বোধ করেন।

বহু বৎসর আগের কথা। একবার বোম্বাইয়ের কোন এক প্রতিষ্ঠান থেকে জনকয়েক ভদ্রলোক এসেছিলেন একজন খ্যাতিমান দেশনেতার ব্রোঞ্জ মূর্তি তৈরি করবার জন্য। Double life size মূর্তি হবে। প্রায় ৫০ হাজার টাকার কাজ। প্রাথমিক কথাবার্তা শেষ হয়ে গেল কিন্তু মূর্তি তৈরির জন্য এখানে এসে ষ্টুডিওতে সিটিং দেবার কথা যখন উঠল, তখন ভদ্র আগন্তুকরা বললেন, "ব্যক্তিগত প্রতিকৃতি নির্মাণের জন্য তিনি এখানে আসতে রাজী হবেন না। এবং তাঁর মত এত বড় ব্যক্তিকে আমাদের অনুরোধ করাও শোভনীয় হবে না। তার চেয়ে আপনি যত রকম ফটো বলবেন, আমরা এনলার্জ করে আপনার নির্দেশ মত পাঠিয়ে দেব। আপনি ফটো দেখেও ভাল মূর্তি তৈরিতে সিদ্ধহস্ত বলেই ত এতদূর থেকে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

"ভাল কাজ করি জেনেই আপনারা আমার কাছে এসেছেন, এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। তবে এইটুকু কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বড় ডাক্তারের কাছে রোগী যায় সম্পূর্ণ ভাবে রোগমুক্তির নির্ভরতা নিয়ে। সেখানে চিকিৎসকের সঠিক নির্দেশ মেনে চললেই সে হয় রোগমুক্ত। এ ক্ষেত্রে আমার নির্দেশ আপনারা মেনে চললেই, প্রতিকৃতি হবে ব্যক্তির সার্থক রূপায়ণ। মূর্তি নির্মাণের সফলতার জন্য, স্রষ্টার কাছে পথের ভিক্ষুক আর সাম্রাজ্যের অধিশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।"

আগন্তুকরা নিরুপায় হয়ে ফিরে গেলেন।

দৃঢ়তার সঙ্গে এই নীতিগুলি অনুসরণ করেও তিনি ষ্টুডিওতে সিটিং নিয়ে বহু প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেছেন। শুধু আবক্ষ মূর্তি নহে, অতিকায় প্রতিমূর্তি পর্য্যন্ত। নিম্নে তার একটা মোটামুটি হিসাব দিচ্ছি—

পূর্ণাঙ্গ মূর্তি

১। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ফটো থেকে		
২। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,		
৩। জয়পুরের মহারাজা	ষ্টুডিওতে বসিয়ে		
৪। কোচিনের মহারাজা	,,	,,	২টি মূর্তি
৫। মিঃ আবদুল হেকিম	,,	,,	
৬। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা	,,	,,	

(পূর্ণাঙ্গ মূর্তি দ্বিগুণ অপেক্ষা বড়)

আবক্ষ মূর্তি

৭। লর্ড আর্চবীন মাদ্রাজের গবর্ণর	,,	,,	৩টি মূর্তি
৮। স্যার জর্জ্জ ষ্টেনলী	,,	,,	
৯। মিঃ রাজ মান্নার (মাদ্রাজ হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস)	,,	,,	
১০। মিঃ কুমারস্বামী শাস্ত্রী (মাদ্রাজ হাই কোর্টের জাষ্টিস)	,,	,,	
১১। মিঃ সি. পি. রামস্বামী আইয়ার (ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটের দেওয়ান)	,,	,,	
১২। ডাঃ সি. আর. রেড্ডী (ভাইস চ্যানসেলার)	,,	,,	
১৩। স্যার হোপটন ষ্টোক (আই সি এস)	,,	,,	
১৪। লেডী ষ্টোক	,,	,,	
১৫। স্যার এ. সি. জি. সি. থামপো (আই সি এস)			
১৬। মিঃ জে. পি. এস. সেনয় (আই সি এস)	,,	,,	
১৭। ডাঃ মিস ম্যাক্‌কেল	,,	,,	

১৮। শ্রীকামাসুব্বারাও ,, ,,
(সম্পাদক "স্বরাজ্য পত্রিকা")
১৯। শ্রী করুণাকরণ মেনন ,, ,,
(উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী)
২০। শ্রী পট্টভীরমণ ,, ,,
(মিঃ সি. পি. রামস্বামীর পুত্র)
২১। শ্রী পুলিসিয়াথন্ (বাবু) ,, ,,
২২। শ্রীচারুবালা রায়চৌধুরী ,, ,,
(শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর পত্নী)
২৩। গীতাদেবী ,, ,,
(শ্রী কে. জি. মেনন আই সি এস'র কন্যা)
২৪। 'নিক্কি' ,, ,,
(শ্রী সামুল রঙ্গনাদনের পৌত্র)

২৫। ডাঃ এনিবেশান্ত ,, ,,ফটো থেকে ৪টি মূর্ত্তি
২৬। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ,, ,,
২৭। মহাত্মা গান্ধী ,, ,, ১০টি মূর্ত্তি
মাদ্রাজ সরকার নিয়েছেন এবং ১০৫টি নিয়েছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য ১১ ফুট ৪ ইঞ্চি উঁচু গান্ধীজীর যে নূতন ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি তৈরী হয়েছে তা দেখতে গত জুন মাসে CHROMEPET (Madras) গিয়েছিলাম। দেবীপ্রসাদের এই অস্থায়ী ষ্টুডিওতে আরও কয়টি বড় বড় কাজ হচ্ছিল। তার মধ্যে চিদাম্বরম্ চেট্টিয়ারের ১৩´ ৬´´ ইঞ্চি মূর্ত্তিটির plaster casting শেষ হয়েছে। এত বড় মূর্ত্তিটির Moulding এবং Casting করতে চুনী বিশ্বাসের যে নৈপুণ্য দেখলাম তাহা বিস্ময়কর। শিষ্যের এই দক্ষতা নিঃসন্দেহে গুরুকে পরনির্ভরশীলতার দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করেছে।

অভিনেত্রী

শ্রীকা[illegible]কঙ্কর সেনগুপ্ত

অভিনেত্রি!
নেত্রে তব পদ্ম দুটি ভরাজলে করে ঢল ঢল
কাজল দীঘিতে যেন, লাবণ্যের আনন্দ উচ্ছল,—
চোখেমুখে উঠে ফুটি; দর্শকের দেখি হয় ভুল
পদ্মে কি ফুটিল পদ্ম অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে অতুল
স্থগিত বিদ্যুৎপ্রভা?
পল্লবিত দুটি করতলে
কনক চম্পক কলি লীলায়িত হয় কুতূহলে
বলয়িত বাহুবল্লী হতে।
সুচিক্কণ চেলাঞ্চল
বক্ষোজে গোপন করি চোখে চোখে মায়ার কাজল
পরায়ে ভুলায়ে দেয় পূর্ণপ্রাণ যেন কমলের
পেলব কুট্মল দুটি; সুপূর্ণ যৌবন-বসন্তের
উদ্ভিন্ন সুষীম শোভা গঠনের সুঠাম গৌরব
সৌন্দর্য বিস্তারে শুধু,—যদিও না বিতরে সৌরভ,—
বিমুগ্ধ নয়ন ভরি।
ও দুটি রাতুল পদতল
সুগঠিত কটি হতে শ্রোণি হতে আগুলফ সরল
কেন যে পরশে ভূমি!
সুকঠিন শীতল পাষাণ
তাহার আঘাতে পাছে ব্যথা পাও, ব্যথা পায় প্রাণ
যে দেখে, তোমারে দেখি।
বুঝি তাই তাহার সম্পদ
প্রসাধিয়া দূর্বাদলে পদতলে রচি মসনদ
দেয় পাতি ধরাতল সুদূর্বার অনুনয়চ্ছলে
সুকোমল তুলাসম তুলাহীন সবুজ মখমলে
নবদল বিকশিয়া।
প্রতিদিন তব বন্দনায়
স্বাগত তরুণ প্রাণ আপনারে আনন্দে বিলায়
মহার্ঘ বৈভব তার উপহার দেয় অর্ঘ্যসম
তোমারে অঞ্জলি ভরি' যাহা তার আকাঙ্ক্ষিততম
কামনার নৈবেদ্য পূজায়।
ওই দুটি অনুপম
চটুল নেত্রের অপাঙ্গবীক্ষণে, যজ্ঞবাজিসম
তব যুগলাশ্ব ধায়,—জয় করি,—দিগ্বিদিক ভরি'—
চারণ কবির কণ্ঠে জয়গান তুলিয়া গুঞ্জরি
দৃষ্টি দিগ্বিজয়ে বালা তুমি যেন প্রতিদ্বন্দ্বিহীনা
সুচির যৌবনা, যৌবনেরে বাঁধিয়াছ সুস্মক্ষীণা।

রেশ্মিকায় আঁটি যুদ্ধবেশে।
ছায়ালোক সমাবেশে
শীতাতপ রশ্মিধারা দুটি নেত্রে মিলিয়াছে এসে
একসাথে সাথীসম।
যুগপৎ আনন্দ বিস্ময়
দক্ষিণে দাক্ষিণ্য তব প্রেমিকের আনন্দ নিলয়
স্নিগ্ধ দৃষ্টিখানি, তবু বামে বামা নহ তুমি বামা
বাম দৃষ্টি করে সৃষ্টি দর্শকের নেত্রে অভিরামা
অভিনয় বৃত্তি তব,
সর্ব কামরূপা অনঙ্গের
উদ্বেলিত হয় রূপ উৎসেচিত রূপ তরঙ্গের
তরঙ্গে তরঙ্গ তুলি।
চক্ষে হেরি নব রূপায়ণ
কল্পনার তিলোত্তমা রূপ ধর আরেক নূতন
চিত্রপট হতে চিত্রপ্রতিমা নূতন প্রাণ পেয়ে
রঙ্গালয়ে করি নৃত্য লঘুচ্ছন্দে রঙ্গগীতি গেয়ে
নূপুরে নিক্কণ তুলি সুধাসিন্ধু উলসি বিলসি
আনন্দের বন্যা তোল আকাশের শাপভ্রষ্ট শশী
আমাদের ধরাপরে।
মনে হয় তুমি যেন বসন্তের
বনদেবীসমা, বরষার অবসানে শরতের
প্রসন্ন পূর্ণিমাখানি; বিন্দু বিন্দু করি হেমন্তের
গ্রথিত নীহারমালা; নীহারিকা তুমি শিশিরের
অঙ্গঢাকা অঙ্গরাখা সুখোষ্ণ পশমিনা।
জয়টীকা
লাভ করি রাজলক্ষ্মীসমা প্রশস্তির ললাটিকা
প্রতিষ্ঠিতা শ্রেষ্ঠ নটীরূপে।
সাধনায় উত্তরিয়া
অধিকার কর তুমি মুগ্ধ করি দর্শকের হিয়া
অকুণ্ঠিত সমাদরে।
বিজয়িনি! তব স্তব গানে
মুখরিত ধ্বনি শুনি নিখিলের আনন্দিত প্রাণে
উঠে রোমাঞ্চিয়া ধরা।
শ্রবণ নয়ন পূর্ণ করি
অন্তরের অন্তস্তল পুলকের সঞ্চারে শিহরি
সৌন্দর্যে সঙ্গীতে নৃত্যে অপাঙ্গ ভঙ্গীতে রঙ্গময়ী
অমৃত মন্থন করি বারংবার কে গো তুমি অয়ি!
পরিবেশি সেই সুধা বসুধার বাসনা বহ্নির
শিখাশীর্ষে পূর্ণাহুতি স্নেহধারা ঢালি বিক্তনীর
মেঘসম প্রাবৃটের শেষে, অন্তহীন অন্ধকারে
আপনারে নিঃশেষিয়া যাও চলি ধীর পদ চারে
নয়নের অন্তরালে।
ঢালি দিয়া লাবণ্যের ভার,
সদ্য-মুক্ত আবরণ কুসুমের ফুল্ল সুষমার
সৌরভের নিভৃত সঞ্চয়, ঝরে পড় ম্লান হেসে
পরিশেষে যৌবন-সন্ধ্যায়।

মৃন্ময়ীর বেশে
অর্চনার ফুলরাশি ফিরাইয়া দিয়া অবশেষে
বিসর্জন লও বরি অপসরি বিস্মৃতির দেশে
স্মৃতির সরসীজলে বিকশিত তামরসখানি
বিশ্ব বাসনার বর্ণে অনুরাগ রক্তরেখা টানি
বিমুগ্ধ নয়নতটে।

সূর্যপানে নিবদ্ধ নয়নে
আনন্দ নন্দনসুধা ধারা বরষণে কায়মনে
মাগি লও দাবদগ্ধ তৃষাতুর মানবের তরে
পূর্ণ মনস্কামনার পরমতর্পণ।

প্রতিধার

তব আশীর্বাদে দেবি! কল্যাণের সন্ধ্যাদীপ জ্বলে
আজিও স্বর্গের শান্তি বিরাজিত রয় পৃথ্বীতলে
প্রাসাদে ও পর্ণাবাসে; ধূপসম দহি তিলে তিলে
সঞ্চারিলে পবিত্রতা পতিব্রতা ব্রত শিখাইলে
আপনি কলঙ্ক নিলে শুচিস্মিতে! আপনি যাচিয়া
আপনার হৃদিরক্তে সীমন্তে সিন্দুর পরাইয়া
কুলবধূটিরে, আপনারে নগ্ন করি আবরণে
আবরিলে তারে, পাঞ্চালীর মত নিলে সযতনে।
পঞ্চপতি ভার, তাই সখা তব শ্রীমধুসূদন
সাজি তাই বস্ত্ররূপে তোমারে করেন আবরণ,
দুঃশাসন টানে বস্ত্র, পঞ্চজন দগ্ধনেত্রে চাহে,
ঊর্ধ্বনেত্রে ঝরে জল অনর্গল গঞ্জিত প্রবাহে,
কলঙ্ক ভঞ্জন তব যুগে যুগে করে নারায়ণ
ছিদ্রবটে রোধ করি বারি, কভু দিয়া শ্রীচরণ
পাষাণ প্রতিমা পরে সমাদরে দেন বুঝাইয়া
যারে চাহে নর তারে দেবরাজ শ্রেষ্ঠ পূজা দিয়া
চাহে দেবীরূপে।

কভু অগ্নিদাহে বক্ষ ভরি ভরি
দগ্ধ কর পিশিতের পুত্তলীরে ভস্মস্তূপ করি
লালসার শ্মশান বিলাসে, পূর্ণ হয় ধ্বংসলীলা,—
ওতপ্রোত প্রেমধারা তার মাঝে বহে অন্তঃশীলা।
দেহ তব, হে রঙ্গিনি! রঙ্গালয়ে করে অভিনয়
প্রাণ তব, হে কল্যাণি! নিখিলের অন্তঃপুরে রয়।

গোণ্ডদের দেশে

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু
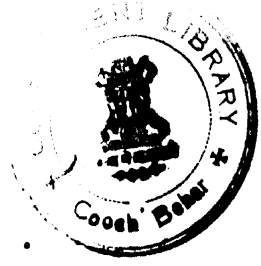
মধ্যপ্রদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসাবে অতি রমণীয় স্থান। সাতপুরা, বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতশ্রেণী আর সে সব গিরিগাত্রের নিবিড় বনানী, শ্যামল শোভায় দর্শকের মন মুগ্ধ করে। কত নির্ঝরিণী, দুর্গম গিরিশিখর থেকে বের হয়ে নেচে নেচে ছুটে চলেছে কত জনপদ অতিক্রম করে। সে সব নিবিড় অরণ্যের ভিতর নদীর তীরে তীরে ভীল বনজারা, কুর্গ গোণ্ড, ওঁরাও, মাড়িয়া কোল বা আরও কত কি পাহাড়ী আদিবাসীরা বাস করে। বিচিত্র তাদের বেশভূষা, বিচিত্র তাদের চালচলন, ততোধিক বিচিত্র তাদের রীতিনীতি ও উৎসব।

মধ্যপ্রদেশে আদিবাসীদের মধ্যে গোণ্ড হ'ল প্রধান, তারা এক জায়গায় দলবদ্ধ হয়ে বাস করে না। অমরকণ্টকের পাশে বেতুল, সাতপুরা, ছত্রিশগড় ও বস্তারের জঙ্গলে জঙ্গলে এরা বসতি করে ও ঘুরে বেড়ায়। গোণ্ড জাতি দুভাগে বিভক্ত হয়েছে—এক হ'ল রাজগোণ্ড, অপর শুধু গোণ্ড। রাজগোণ্ডরা শহরবাসীর সংস্পর্শে এসে অনেকটা সভ্য ও উন্নত হয়েছে। কাপড় পরতে শিখেছে, এমনকি দুচার জন লেখাপড়াও শিখছে।

একবার মধ্যপ্রদেশের একটি গ্রামে গোণ্ডদের দেখবার সুযোগ পেলাম বিশেষ করে। বছর কয়েক আগে চিরিমিরি পাহাড়ে থাকাকালীন এক গোণ্ড গ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম, গুটিকয়েক ঘর নিয়ে ছোট একখানা গ্রাম। মোড়লের স্ত্রী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করে বসাল। মোড়লের বাড়ীতে একটা চেয়ার ছিল তাই আমাকে দিল, অন্যান্য সঙ্গিনী মেয়েদের বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে দিল। ঘরগুলি সাদা মাটিতে লেপে রেখেছে, মনে হয় ঠিক যেন কেউ চুণকাম করেছে। দু-একটা বাড়ীতে দেয়ালে নানা রকম চিত্র এঁকে রেখেছে রং দিয়ে। মোড়লের বাড়ীতে এবং অন্য দু-একটি বাড়ীতে অন্ধকার ঘুঁঘুটে একটা কামরা দেখতে পেলাম, এটা 'দেওঘর বা ভুতঘর,' এখানে দেবদেবী ও ভূতের আশ্রয় হয় ও পূজাদি চলে। মোড়লের স্ত্রী বেশ ফর্সা একখানা কাপড় পরেছিল অবশ্য হাঁটুর উপরে এবং গায়ে কোন জামা ছিল না, হাতে ও গলায় রূপার মোটা মোটা গয়না ছিল, কথাবার্ত্তা বলে দেখলাম এরা অনেক সভ্য হয়েছে শহরবাসীর সংস্পর্শে এসে।

কিন্তু এর পর সেবার আর একটি গ্রামে গেলাম, যা হ'ল মধ্যপ্রদেশের নিবিড় অরণ্যের মধ্যে। হোসাঙ্গাবাদ ডিষ্ট্রিক্টে পিপরিয়া একটি ছোট শহর, সেখান থেকে গরুর গাড়ীতে করে বনোয়ারী গ্রামে যেতে হয়। আমার ছেলের বন্ধু শ্রীমান অশোক পাটেল হ'ল সে গ্রামের জমিদার। তারা জাতে রাজপুত তবে বহু বৎসর যাবত মধ্যপ্রদেশবাসী। তার বাবা মধ্যপ্রদেশের E. A. C. ছিলেন। কাজেই অশোক তাদের বস্তার জঙ্গলের, জগদলপুরের এবং নর্ম্মদা তীরের বহু আদিবাসীদের সঙ্গে মিশবার ও তাদের কৌতুহলজনক রীতিনীতি, নাচগান দেখবার সুযোগ পেয়েছে, তাদের কাছ থেকে আদিবাসীদের বিচিত্র জীবনকথা শুনে বিস্ময় জাগে।

অশোকের বিশেষ আগ্রহে তাদের গ্রামে গেলাম, পঞ্চাশখানা বলদের গাড়ী নিয়ে অশোক ষ্টেশনে ছিল। আমাদের বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে গেল তাদের বাড়ীতে। ছোটখাট গ্রাম, স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানশীন, অবশ্য গোণ্ডরা পর্দ্দানশীনা নয়। ঘরদুয়ার আমাদের গ্রামের দেশ থেকে ভিন্ন। ও-দেশে ডাকাতের উপদ্রব বড় বেশী, তাই প্রত্যেক ঘরের এক একটা চোরা দরজা বা জানালা আছে, সময় বিশেষে সে দিক দিয়ে পালানো যায়। গ্রামখানা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অশোকদের মস্ত বড় পেয়ারা ও কমলালেবুর বাগিচা আছে, দু'জন গোণ্ড মালী সে সব সংরক্ষণ করছে। অশোকদের অধিকাংশ প্রজাই গোণ্ড, তাই তার সাহায্যে গোণ্ডদের কয়েকটি উৎসব ও নাচ-গান দেখতে পেলাম।

"মড়ই" হ'ল এদের প্রধান উৎসব। "ভূতাখানি"—শরীরে ভুত এসে ভর করলে এই উৎসব হয়। দেওয়ালীর পর দ্বিতীয়া দিনে কোথাও কোথাও বা তৃতীয়া-চতুর্থীতেও এই উৎসব হয়। একটা উঁচু বাঁশের উপর একটা ময়ূরের লম্বা পাখা বাঁধা হয়, তারপর গোণ্ডরা তার চারদিকে সমান আকারের ময়ূরের পাখা অতি নিপুন ভাবে গোল করে বাঁধে, দেখে মনে হয় যেন ময়ূর পাখার একটি ছাতা। বাঁশটিকে নীচ থেকে উপর পর্য্যন্ত রং লাগানো হয়, তারপর ছোট ছোট লাল নিশান বেঁধে বাঁশটিকে সুন্দরভাবে সাজায়, এবং গরুর গলায় যেমন ঘুংঘুর বাঁধে তেমনি সে সব ঘুংঘুর ময়ূরের ছাতার নীচে বাঁধে, কাজেই বাঁশ নিয়ে চলবার সময় ঘুংঘুরের ঠুংঠুং মিষ্টি আওয়াজ হয়। যদি সময়ে নর্ম্মদা উপত্যকায় যাওয়া যায় তবে ট্রেণ থেকে দেখতে পাওয়া যায়, দু'ধারের ছোট ছোট গ্রামগুলিতে বাড়ীর সামনে এই সুসজ্জিত বাঁশ পোতা আছে। এই উৎসবের দিন দশ-বার পূর্ব্ব থেকে নর-নারীর মধ্যে আনন্দের বান বয়ে যায়, সারা দিনরাত মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করে মদ খায়। উৎসবের দিন শৈলানৃত্য হয়, এ নাচটা খুব কঠিন এবং বীরত্বসূচক নাচ।

যেদিন উৎসব হবে সেদিন ভোরে এই বিশেষ বাঁশ সাজানো হয়। পুরাণো বাঁশ হলেও কাজ চলে, তবে ময়ূরের সব পাখা

আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গপ্পসপ্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন

"দ্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যুসুখ্যু মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁ: যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন—"আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন'। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন: "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

S. 261A-X52 BO

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা!"

"কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামা-কাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?"

আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে···এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি···তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে···হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"

"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামা-কাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামা-কাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

নূতন হওয়া চাই। সেই উৎসবের দিনে গ্রামে খুব বড় মেলা বসে। উৎসবের পূর্ব্বে গ্রামের মোড়লরা স্থির করে এ বছর কোথায় দেবী বসবে ও মেলা জমবে।

এই মেলা যেখানে বসবে সেই স্থানে বেশ কয়েক গ্রামের এই বিশেষভাবে ময়ূরের পাখায় সজ্জিত বাঁশ নিয়ে যেতে হয়। এই বাঁশের শোভাযাত্রাকে ঢাল বলে। সেই মেলায় যাবার আগে বিশেষ শুদ্ধসাঙ্গ ভাবে এই বাঁশের পূজা করা হয়, এবং তখন বাঁশে দেবতার আবির্ভাব হয়, একটি লোকের শরীর দেবতা বা ভূত ভর করে। তখন গ্রামের প্রধানরা ও অসুস্থ লোকেরা এসে তাদের ভাগ্যলিপি সেই দেবাবিষ্ট লোকটিকে প্রশ্ন করে জেনে নেয়। এই দেবতার বাঁশটি সাজসজ্জায় এত ভারী হয়ে উঠে যে, একজনের পক্ষে তা হাতে করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব, তাই বাঁশ থেকে চার-পাঁচটা রশি বেঁধে তা কয়েকটি লোকের হাতে দেওয়া হয়, লোকেরা চারদিক থেকে তা টেনে বাঁশের ভার ঠিক রাখে, গৃহকর্ত্তা বাঁশ নিয়ে চলে। প্রত্যেক ঢালের সঙ্গে এক একজন ওঝা থাকে, তার হাতে মন্ত্রপূত: লেবু ও ঘুটে থাকে, আর একজনের হাতে থাকে একটি পিতলের থালা বা কাঁসার থালা, যদি শোভাযাত্রার সময় কোন কারণে বাঁশ নীচে নামাতে হয়, তবে ঐ পিতলের বা কাঁসার থালা নীচে রেখে তাতে বাঁশ দাঁড় করায়, বাঁশ অপবিত্র ভূমি স্পর্শ করতে পারবে না। সেই ঢালে পুরুষরা গীত গায় এবং শৈলা-নৃত্য করে, এই নৃত্য-গীতে নারীরা যোগ দেয় না, সেদিন এই উৎসবে নারীরা শুধু দর্শক হয়।

মেলাতে পৌঁছবার সময় যত জায়গাতে নদী পার হতে হয়, সত জায়গাতেই বাঁশকে প্রথমে নদীতে একটু চুবিয়ে নিবে, নদীকে শান্ত করে দিতে। নদী হ'ল জলদেবতা, তাকে সন্তুষ্ট রাখা চাই। মধ্যপ্রদেশে একটা রীতি আছে, বোধ হয় গোণ্ড হতেই এসেছে, রাজপুত এবং হিন্দুস্থানী নর-নারী নদীকে জলদেবতা বলে মানে, এবং নববধূকে নিয়ে নদী পার হতে হলে, প্রথমে নববধূকে দিয়ে নদীর জল ছুঁইয়ে প্রণাম করিয়ে নেয়, তার পর জলদেবতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে নববধূ নিয়ে নদী পার হয়।

যদি দুই গ্রামের ঢাল (বাঁশ) এক স্থানে মিলিত হয় তবে দুই বাঁশের দেবতাদের মধ্যে অলক্ষ্যে প্রতিযোগিতা চলে—এক জন আর এক জনের বাঁশের শোভাযাত্রা চালনা বন্ধ করে দেয়, তখন সঙ্গের ওঝা প্রতিপক্ষকে বলে, "যদি তোমাদের দেবতা বেশী শক্তিশালী হয় তবে তুমি আগে চল।" আর সে পক্ষের দেবতা প্রধান হলে এ পক্ষের ঢাল চলা সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে যায়। তখন ওঝা মন্ত্রপূত: লেবুটি মাটির উপর রেখে বলে, যাও এগিয়ে যাও, আর লেবুটা খাও। প্রবল প্রতিপক্ষ তখন বহু কষ্টে চলে কখনও বুকে হেঁটে কখনও স্বাভাবিকভাবে হেঁটে দশ-পনর মিনিটের পথ প্রায় ঘণ্টা-খানেকে গিয়ে লেবুটা তুলে খায়। অপরপক্ষ তাতেও সন্তুষ্ট হয় না, তখন এক টুকরা ঘুটে জ্বালিয়ে বলে এবার এটা মুখে পুরে রাখ, দেখি তোমার কত ক্ষমতা। আর কি বলব, এসব আশ্চর্য্য জিনিস কি করে সম্ভব হয় কে জানে, লোকটা জ্বলন্ত ঘুটে মুখে তুলে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কি করে এই জ্বলন্ত ঘুটে মুখে রাখতে পারে, সেটা কি অভ্যাসের বলে জিহ্বা আগুনের এই দাহিকা শক্তি সহ্য করে নিতে পারে, না অলৌকিক কিছু আছে, বুঝতে পারি না। প্রাহাড়ীরা ভূত-প্রেত-ডাইন এ সবেও মন্ত্রতন্ত্রে গভীর বিশ্বাস করে।

এ সব দুই দলের প্রতিযোগিতায় বহু সময় নষ্ট হয়, কিন্তু মেলাতে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঢাল নিয়ে পৌঁছুতেই হয়, তাই প্রথম থেকেই গ্রামে গ্রামে ঢাল বের হবার সময় নির্দ্দিষ্ট করে দেয়, যাতে একদল অপর দলের রাস্তায় দেখা না পায় এবং প্রতিযোগিতা না চলে। এক একটি গ্রাম থেকে প্রায় সাত-আটটি ঢাল যায় এবং নিজ গ্রামের ঢালের ভিতর প্রতিযোগিতা চলে না। মেলাতে যে দেবী বসানো হয় তার নাম হ'ল "গাঙ্গুতেলেনী।" মেলার মধ্যস্থলে ঘাস-পাতা দিয়ে একটি মন্দির তৈরী করে, আর তার মধ্যে এই দেবী স্থাপিত করে। দেবীমূর্ত্তি বীভৎস, এক হাতে ডিম রেখেছে আর এক হাতে লম্বা জিভ বের করে মাংস খাচ্ছে। এই দেবী সম্বন্ধে গোণ্ডরা গল্প বলে যে, বহু পূর্ব্বে তাদের জাতে এক যাদুকরী ছিল, তার নাম গাঙ্গু। সে পণ করল যাদুবিদ্যায় যে তাকে হারাতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে, আর যে হারবে তার প্রাণ যাবে। এভাবে গাঙ্গু যাদুকরীকে বিয়ে করতে এসে বহু লোক প্রাণ হারালো। অবশেষে বিখ্যাত ওঝা, তার নাম হ'ল গজা, সে গাঙ্গুকে যাদুবিদ্যায় হারিয়ে বিয়ে করল। এই গাঙ্গু আর গজার স্মৃতিরক্ষার্থে মেলাতে প্রতি বৎসর আর এক উৎসব হয়। প্রত্যেক মেলাতে সাধারণ বাঁশ সাজিয়ে গজা বানানো হয়, আর বহুদিন আগে থেকেই গ্রামের মোড়লরা স্থির করে এবার কোন্ গ্রামে গজার মূর্ত্তি বানানো হবে। গজার প্রতীক হ'ল খুব লম্বা একটা বাঁশ, নানা রঙের কাপড় দিয়ে সাজায়। ওটাতে ময়ূরের পাখা না দিয়ে একটা কাঁসার লোটা উল্টা করে রাখে। মেলার দিন একটা জীবন্ত তক্ষক সাপ ধরে মন্ত্রপূত করে এটাকে উল্টো করে সেই বাঁশে ঝুলিয়ে বেঁধে রাখে, আর উৎসবের পরদিন ওটাকে ছেড়ে দেয়।

পণ্ডিত শুভমুহূর্ত্ত দেখে বলে, সময় হয়েছে, তখন গজা বাঁশকে নিয়ে সব লোকেরা গঙ্গাতেলিনীর চারদিকে ঘুরিয়ে বিয়ে দেয়, আর সবাই ফুল ও পয়সা ছোড়ে তাদের উপর। তার পর গজাকে গাঙ্গুর মন্দিরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। তখন যত যত শোভা-যাত্রা এসেছে ঢাল নিয়ে, তাদের মধ্যে সুরু হয়ে যায় নাচের প্রতি-যোগিতা, সে এক বিরাট ব্যাপার। মাদল বাজতে থাকে বিচিত্র সুরে। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল আর টিমকি বাজে, আর শৈলা-নাচ আরম্ভ হয়ে যায়। নাচ-গানের প্রতিযোগিতা শেষ হলে সবাই যে যার ঢাল নিয়ে গাঙ্গুকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে বাড়ী ফিরে যায়। রাত্রে এই উৎসব হয়, প্রথম প্রহরে জ্যোৎস্না রাতেই নাচ-গান হয়, কিন্তু তার পর চাঁদের কিরণ একটু ম্লান হলেই বড় বড় মশাল জ্বালানো হয়। গ্রামের কেউ কেউ ধনী ব্যক্তি কোন কোন ঢালকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করে নিজ বাড়ীতে এনে নাচ-গান করায় ও তাদের

মিঠাই খেতে দেয়। গাঙ্গুর বিয়েতে লোকেরা যে সব পয়সা ছুড়ে ফেলে সে সব পয়সা জমা করে মোড়লের কাছে রাখা হয় আগামী বৎসরে গাঙ্গুর মূর্ত্তি তৈরী করতে। এর পর মেলা ভাঙে। মহা সমারোহে গাঙ্গুকে নিয়ে সবাই নদীতে বিসর্জ্জন করে ও গ্রামে ফিরে এসে সে সব বাঁশ যার যার বাড়ীর দরজায় পুঁতে রাখে।

প্রত্যেক গোণ্ডের বাড়ীর উঠানেই একটা বেদীর উপর ত্রিশূল ও কয়েকটি কাঠের খোঁটা থাকে, তারাই হ'ল দেবদেবী। কখন কখন এই খুঁটিতে দেবতার ঝোলাও বাঁধে। আর এই বেদীর পাশে লেবুর গাছ পুঁততে হয়, কারণ লেবু সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

গ্রীষ্মকালে এক উৎসবের নাম হ'ল "ঝণ্ডা তোরণা"। এটা হ'ল বীরত্বের উৎসব, আর এটা শুধু পুরুষদের জন্য। গ্রামের একটা খোলা মাঠে প্রায় ১০৮০ ফিট উঁচু একটা মজবুত কাঠের থাম পোঁতা হয়। যুবকরা এটা ঘসে ঘসে একেবারে পালিশ করে তোলে, আর তার উঁচু আগায় একটা কাপড়ের পোঁটলাতে দশ সের ওজনের একটা গুড়ের টুকরা বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়। তার পর গ্রামের সক্ষম পুরুষদের নিমন্ত্রণ করা হয়, যার শক্তি থাকে সে এসে ঐ গুড় খুলে নিয়ে যায়। ঐ থামের কাছে একদল লোক লম্বা বাঁশ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যে লোকটি সাহস করে ঐ পিচ্ছল থামে চড়তে থাকে, তাকে নীচের লোকেরা বাঁশ দিয়ে পিটতে থাকে। লোকটা যদি সত্যিকারের শক্তিমান পুরুষ হয় তবে সে ঐ সমস্ত মার খাওয়া সত্ত্বেও থাম বেয়ে উপরে উঠে, আর সগৌরবে গুড়ের পোঁটলা নিয়ে নীচে নেমে আসে। গ্রামের লোকেরা তখন তার জয়জয়কার করে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করে ও স্ত্রী-পুরুষ মিলে শৈলা-নাচ নাচে। তার পর সেই গুড় সবার হাতে বেঁটে দেওয়া হয়।

"যোয়ারী"কে উৎসব বলা চলে না, এটি হ'ল একটি ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান। খুব বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এ অনুষ্ঠান করা হয় না। যখন গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, আর কারও শরীরে বসন্ত দেখা দেয়। সে যদি বলে যোয়ারী কর তা হলেই এই অনুষ্ঠান হয়। ঘরে একটি নূতন মাটির পাত্রে শুদ্ধসাঙ্গ হয়ে যোয়ার বুনে। রোজ সন্ধ্যায় তাতে জল দেওয়া হয় এবং স্ত্রীলোকেরা দেবী-স্তুতি করে গীত গায়, নাচে না। আমাদের দেশে বসন্তকে যেমন শীতলাদেবী বা মাতা বলে এদেশেও সেরূপ মাতা বলে। গোণ্ডদের প্রতি গ্রামের বাহিরে একটি ছোট মন্দির তৈরী করে মাতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, আর তার নাম হ'ল "খেরাপতি"। খেরা হ'ল গ্রাম, আর পতি অর্থ মালিক, মানে গ্রামের অধিকারী। বসন্তরোগীর ঘরে নয় দিন গীতবাদ্যের পর যখন যোয়ারের চারা হয়, তখন তাকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় সেই দেবীর সামনে। এই নয় দিন নারীরা গান গেয়ে দেবীর স্তুতি করার পর দেবী যার শরীরে ভর করেন, সে এই উৎসবের মুখ্য স্থান গ্রহণ করে। যোয়ার কেউ নয়টা গামলাতে বোনে কেউবা সাতটা গামলাতে বোনে। নারীরা রঙীন বস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মাথায় সেই গামলাগুলি নিয়ে খেরাপতির মন্দিরে চলে, সঙ্গে সঙ্গে ঢোলক ও টিমকি বাজে কিন্তু নাচ হয় না। পুরুষ ও নারীরা আলাদা আলাদা ভাবে দেবীর স্তব গান করে।

যদি ছোট বালকের শরীরে দেবী ভর করে তবে তার জন্য ছোট ত্রিশূল, নয়ত বয়স্কদের জন্য লম্বা বড় ত্রিশূল আনে। তার ফলাগুলি মোটা মোটা ও ধারাল। যার শরীরে দেবী আসেন সে হাঁ করে ও তার মুখের একগালে ত্রিশূল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ত্রিশূল গাল ভেদ করে বের হলে সেটাতে একটা আস্ত লেবু বসিয়ে দেয়। ত্রিশূল বসাবার আগে তাকে একটা মন্ত্রপূতঃ পান খাওয়ান হয়। লোকটির শরীরে দেবী ভর করাতে শরীর থেকে রক্ত বের হয় না। দেবাশ্রিত লোকটি ত্রিশূল সহ ঘুরে ঘুরে তাণ্ডব নৃত্য করে। দুই জন লোক স্নান করে শুদ্ধসাঙ্গ হয়ে ত্রিশূল ধরে তার সঙ্গে ঘুরতে থাকে। এই ত্রিশূল নিয়ে নাচ ও শোভাযাত্রা আমি খাণ্ডোয়াতেও দেখতে পেয়েছি। এইসব দেবতা ও ভূতের আবির্ভাব এবং শারীরিক পীড়ন করে অলৌকিক কিছু দেখানো প্রায় সব জাতেই সংক্রামিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে এবং মহারাষ্ট্রের কোলাপুর রাজ্যে এ ধরনের অনেক উৎসব দেখবার সুযোগ হয়েছে। শোভাযাত্রা চলে, চারদিক থেকে জনতা ভিড় করে দাঁড়ায়, যে যার জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন করে ও উত্তর পায়। এই শোভাযাত্রায় মোটা বর্শিতে বড় বড় লোহার ফলা গেঁথে কেউ কেউ সেই বর্শি নিজের পিঠে দমাদম করে মারতে থাকে। কেউ বা খড়মের মধ্যে ধারাল লোহার কলক গেঁথে সেই খড়ম পায়ে দেয়, তার উপর লাফায়, নাচে, আর সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র ধরনের বাদ্য বাজতে থাকে। তার পর সবার শেষে শোভাযাত্রা চলে নদীতে, সেখানে তারা যোয়ারী বিসর্জ্জন দেয় ও বলে, মাতাকে ঠাণ্ডা করি। 'মাতার' রোগ দূর হয় ও রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। আবার কেউ কেউ মারাও যায়, কিন্তু গ্রামে মহামারী হয় না এই রোগে। কোন কোন সময় যখন রোগীর আরোগ্যের আশা থাকে না, তখন দেবীর সামনে গ্রামের বাহিরে জঙ্গল থেকে বহু কাঁটা এনে স্তূপ করে তার উপর রোগীকে শুইয়ে চলে যায়, প্রার্থনা জানিয়ে বলে, 'দেবী একে তোমার পায়ে রেখে গেলাম, তোমার ইচ্ছা হয় রাখ ইচ্ছা হয় মার।' পর দিন ওরা দেখতে আসে, কারও কারও অবস্থা ভালর দিকে যায়, কেউ কেউ মারা যায়, ভাল রোগীকে বাড়ী ফিরিয়ে আনে।

এই ঘটনাটি শুনে বহু বৎসর আগের কথা মনে পড়ল। আমার ঠাকুরমার কাছে ছেলেবেলায় শুনতাম, তখনকার দিনে নাকি আমাদের দেশের লোকেরাও ভূতপ্রেতে খুব বিশ্বাস করত। শিশু-পালন তখনকার দিনে জানতো না, কোন কোন শিশুর তড়কা হলে তারা বলত 'পেঁচোয়' পেয়েছে। শিশুটি তড়কার দরুণ হাত-পা ছুড়ত শরীর মোচড়াত, তাতে কচি শিশুর রং কখনও লাল, কখনও বা নীল হয়ে যেত, মুখ দিয়ে ফেণা বেরুত। অমনি সবাই বলত, ভূতে পেয়েছে। তখন সেই শিশুকে নিয়ে একটা কাপড়ের

ঝোলার গাছের ডালে ঝুলিয়ে আসত, যার অদৃষ্টে মৃত্যু সে মানে প্রায় অধিকাংশ শিশুই মারা যেত। দুচারটি নিতান্ত আয়ুর জোরে বেঁচে উঠত, কিন্তু ভীষণ কষ্ট পেয়ে, কারণ প্রায়ই গাছ থেকে লাল পিঁপড়ে বেয়ে বেয়ে শিশুকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিত। ঠাকুর মায়েদের গ্রামে নাকি একটি শিশু দৈবাৎ বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু পিঁপড়ের কামড় সারাতে বহু দিন লেগেছিল, আর সবাই ঐ শিশুকে বড় হলেও বলত, ওটা ত ভূতুড়ে ছেলে।

গোণ্ডদের বিয়েতে খুব নাচ-গান হয়। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় রাজগোণ্ড আর অরণ্যের অধিবাসী গোণ্ডের মধ্যে বিয়ে খুব কম হয়। কারণ পাহাড়ী গোণ্ড মেয়েরা গ্রামে গিয়ে থাকতে চায় না, আর গ্রামের গোণ্ড মেয়েরা জঙ্গলে থাকতে চায় না, পালিয়ে যায়। গ্রামে বিয়ে হয়ে পাহাড়ী মেয়ে আসে, তার ঐ গ্রাম্য বাঁধা-ধরা জীবন ভাল লাগে না, তাই 'জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাচ্ছি' বলে এই ছুতো করে বাপের বাড়ী চলে যায় আর ফিরে আসে না। আর গ্রামের মেয়ে পাহাড়ে গেলে 'সহর থেকে কাঠ বেচে আসি' বলে গ্রামে চলে আসে আর পাহাড়ে যায় না।

এই গোণ্ড স্ত্রীপুরুষরা কারও সঙ্গে বড় মেলামেশা করে না, স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ অন্তদের কোন উৎসবে যোগ দেয় না, কাজেই অন্য জাতের রীতিনীতি ভাব-ধারণা কিছুরই প্রভাব তাদের উপর পড়ে না। যদি কোন ধনী লোক তাদের বাড়ীতে এদের নাচ-গান করাতে ইচ্ছে করে তবে এদের বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করতে হয় ও বলতে হয় প্রসাদ বাঁটব। প্রসাদ না দিলে কেউ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে না, প্রসাদ হ'ল আর কিছুই নয় একটু একটু গুড়।

গোণ্ডদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নেই, পাত্র-পাত্রী বেশ বয়স্ক হয়েই বিয়ে করে। পাত্র যখন নিজে রোজগার করে ও তার থাকবার জন্য নিজস্ব ঝোপরী বানায় তখনই সে বিয়ে করে। একটি আফ্রিকান ছাত্র তাদের দেশের গল্প বলতে গিয়ে বলল, তাদের দেশে যুবকরা যে পর্য্যন্ত নিজে স্বতন্ত্র ঘর না তুলিতে পারে সে পর্য্যন্ত বিয়ে করে না। কারণ সবাই এক ঘরে থাকে, কাজেই বিয়ে করলে বউয়ের জন্য নূতন ঘরের আবশ্যক হয়।

বিয়েতে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই উদ্যোগী হয়ে সব কাজকর্ম্ম করে। প্রথমে 'সাগাই' মানে কনে দেখা ও আশীর্ব্বাদ হয়। রূপার চার-পাঁচ রকম গয়না নিয়ে কয়েক জন লোক কনের বাড়ীতে যায় ও কনেকে পছন্দ করে আশীর্ব্বাদ করে আসে। তিন-চার মাস পরে বিয়ে হয়। বিয়েতে খাওয়ার পাট এত বেশী নেই যতটা নাচ-গানের। বিয়ের আগে দুই তিন রাত নারীরা খুব নাচ-গান করে। বিয়ের দিন বা আগের দিন কনেকে ডুলিতে বসায়, ডুলিটা হ'ল খাটিয়ার ডুলি। বাজনা-ওয়ালারা ঢোল ও টিমকি বাজাতে বাজাতে চলে। আর নারীরা গান গাইতে গাইতে কনের ডুলি নিয়ে বরের বাড়ী পর্য্যন্ত যায়।

গ্রামের সীমানায় এলে বরের বাড়ীর নারীরাও আসে, তখন কনের বাড়ীর ও বরের বাড়ীর নারীদের মধ্যে নাচের প্রতিযোগিতা হয়। উভয় পক্ষের পুরুষদের মধ্যেও লাঠি খেলা এবং নাচ হয়। তার পর বরাত মানে শোভাযাত্রা চলে, গ্রামের মধ্যভাগে গাছতলায় কনের বাড়ীর লোকদের বসান হয়। কনের ডুলি নিয়ে নারীরা বরের বাড়ীতে যায় এবং কনেকে অতি গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখে। বর সে পর্য্যন্ত অন্যত্র থাকে। এবার বরের পালা কনেকে খুঁজে বার করবার। বর এসে গলদঘর্ম্ম হয়ে কনেকে খুঁজে বের করে। তখন বরের ও কনের পিসা পিসি একটা শাদা কম্বল এনে চার কোণা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার নীচে বরকনে বসে। বরের পিসি গিয়ে কনের ঘোমটা তুলে ধরে, বর কনেকে দেখে, কনের পিসি গিয়ে কনের ঘোমটা তুলে বরকে দেখতে সাহায্য করে। তখন বর কনের সিঁথিতে সিন্দুর পরায়। স্ত্রীলোকেরা বরকনেকে নিয়ে বিয়ের মণ্ডপে যায়, অবশ্য কয়েকদিন আগেই খুব হৈ চৈ করে মণ্ডপ বাঁধা হয়, সেখানে বরকনের সাতপাক হয়। বিয়ে শেষ হয়, আর॰ ॰বহু স্ত্রী-আচারাদির পর। বিয়ের সময় বর হলুদে ছোপানো ধুতি ও কুর্ত্তা পরে আর কনে লাল সালুর ঘাঘরা পরে ও হলুদ রঙের ওড়না মাথায় দেয়। বরের গলায় রূপার হার ও হাঁসুলী থাকে, সেদিন যে যার বাড়ীর খাওয়া খায়। পর দিন কনের বাড়ীতে বরের বাড়ীর লোকজনকে খাওয়ানো হয়, খাওয়া অতি সাধারণ তবে খুব নাচ-গান হয়। গোণ্ড নারীদের কোন বিশেষ বিশেষ নাচ বড়ই সুন্দর। সাধারণতঃ নারী পুরুষে মিলেই নাচ হয়। বিন্ধ্যাচলের জঙ্গলে, নর্ম্মদা উপত্যকায় এদের একটি বিশেষ নাচ হয়, তার নাম "কলস নাচ।"

গ্রামে নববধূ এলে তাকে বরণ করে এই কলস নাচ হয়। নাচে সুকৌশলী নারীদের আনা হয়, এদের নাচের পোষাক হ'ল লাল টকটকে সালুর ঘাঘরা, গায়ের কুর্ত্তা ও ওড়না নানা রং-বেরঙের, এবং গলায় হাতে পায়ে রূপার মোটা মোটা গয়না, কাণে ভারী রূপার ঝুমকা। নারীরা গোল হয়ে দাঁড়ায়, মাথার উপর ঘাসের তৈরী বিড়া বসিয়ে তার উপর মাটির কলসী রাখে। সেই কলসীর মুখের উপর এক একটা প্রদীপ, তাতে তেল দিয়ে সলতে জ্বেলে দেয়। দু' হাতে থাকে "চটকোরা"। চটকোড়া হ'ল একজোড়া কাঠের বাজনা, তাতে ঘুংঘুর লাগানো থাকে, দু'হাত চেপে তা বাজাতে হয়, তাতে চট চট করে আওয়াজ হয় আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘুংঘুরগুলি বাজতে থাকে মিষ্টি আওয়াজ তুলে ঝুমুর ঝুমুর। এই নারীদের গোল বৃত্তের মাঝে একজন পুরুষ মাদল নিয়ে থাকে, আর বাইরে থাকে আর একজন পুরুষ, সে টিমকি বা ড্রাম বাজায়।

নাচ সুরু হয়, পুরুষ লোকটি মাদল বাজাতে সুরু করে আর নারীরা গোল হয়ে হাতের চটকোরা বাজাতে থাকে, খানিক পর তালমান ঠিক হলে গান সুরু করে—

"ও বাগীমে কে ভোরা, তু মেরি গলিসে আইয়েরে
আইয়েরে
তু মেরি গলিসে আইয়ে।
ডোলীমে এক ফুল খিলোহায়
তে সে মত মরমাইয়েরে
তু আইয়েরে, ও বাগীমে কে ভোরা তু আইয়েরে।"
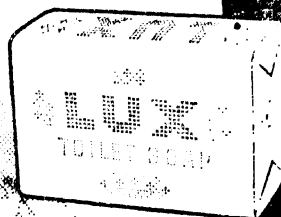
"ও বাগিচার ভোমরা, তুই আমার গলিতে আয়, তুই আমার গলিতে আয়। ডুলিতে এক ফুল ফুটে আছে, তাকে লজ্জা করিস নে, ওরে ভোমরা তুই আয়, আমার গলিতে আয়।"

এই কয় পদ গান গেয়ে তারা থেমে যায় অল্প সময়ের জন্য, মাদলওয়ালাও মাদল বাজান বন্ধ রাখে, তার পর নারীদের নাচ সুরু হয়, এদের এই "কলস নাচের" বৈশিষ্ট্য এই নারীরা নাচতে নাচতে এত ঘুরে যায়, তবু তাদের মাথার প্রদীপ পড়ে যায় না। বধুবরণে বা পূজাপার্ব্বণে এই নাচ নাচবার সময় যদি কোন নারীর মাথা থেকে প্রদীপ পড়ে যায় তবে তা বড় অশুভ লক্ষণ, সেজন্য এই নাচে খুব ওস্তাদ নাচিয়ে নারীদের নেওয়া হয়। নারীরা কখন দু'হাত সামনে, কখনও দু'হাত পেছনে রেখে চটকোরা বাজিয়ে, কখন মাথা উপরের দিকে সোজা রেখে সমস্ত শরীর ঘুইয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে দ্রুতগতিতে নাচতে থাকে, তৎনকার দৃশ্য বড় সুন্দর। রঙীন ঘাঘরা-পরা নারীর দল, মাথায় চিত্রবিচিত্র কলসীর উপর জলন্ত প্রদীপশিখা, আর মাদলের তালে তালে তাদের বিচিত্র নৃত্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

একজন নারী খুব জোরে চেঁচিয়ে বলে "ও ভাবী"
অন্য সব নারীরা বলে 'হাঁ, হা, রে।"

তখন আবার মাদল বাজতে সুরু হয়, আর নারীরা গাইতে থাকে—

"এক রং পলকা, বিজ রং প্যায়োরে
শোভে রামসীতা অযোধ্যামে, শোভে রামসীতা"

সবে সমস্বরে বলবে এ, হো, হো, হো, গান থেমে যায় আবার বাজনা বাজে ও নাচ সুরু হয়। গানের পদগুলি গায়িকারা বারে বারে গাইতে থাকে।

আবার মাদল বাজাতে সুরু করে এবং নারীরা বিচিত্র ভঙ্গীতে নাচতে থাকে। খানিক পর তারা বিশ্রাম নেয়। গায়িকারা গায়—

"অরে পিরে সে হণ্ডা, গরম ধরো পানিরে
সপরে রামসীতা অযোধ্যামে
রে, হো, হো, হো, হো।"

"পালঙ্কের এক রং, আর তার পায়াগুলি নানা রং দিয়ে চিত্রিত। রামসীতা অযোধ্যাতে শোভা পায়। বড় পাত্রে ঠাণ্ডা জল রেখে গরম করো, অযোধ্যাতে রামসীতা স্নান করবে।"

এই কলস নাচে খুবই পরিশ্রম হয়, তাই নৃত্যকারিণীরা ও গায়িকারা নাচ ও গানের মধ্যে অদলবদল করে বিশ্রাম নেয়।

"অরে তাতী জলেবী, দুধন কি সড় হারে,
অরে খাবে রামসীতা, অযোধ্যামে খাবে রামসীতা
এ, হো, হো, হো।
ও বাগীমে কে ভোরা, তু বনকি রাহ পাকড়িয়েরে
তু বনকি রাহ পাকড়িয়ে
রাম সিয়াকি বীচমে পড়কে বিরথা মত লড়ওয়ে,
মত লড়ওয়েরে।
এ, হো, হো, হো।"

"অযোধ্যাতে রামসীতা খাবে, গরম গরম জিলাবী আর ক্ষীরের নাড়ু নিয়ে এস। ও বাগিচার ভোমরা, তুই এবার বনের পথ দেখ, তুই এবার বনের পথ দেখ। রামসীতার মধ্যে পড়ে বৃথা ঝগড়া লাগাসনে, বৃথা ঝগড়া লাগাসনে।"

'অরে বাগীমে ধান বোই, গড়া মে পিসি
ভাবী তে মার পড়ি ময় ভই খুসী
অরে চন্দা চকোর নেহা লগে
দুই কোড়ে কোড়
ও ভাবী হাঁ, হাঁ, রে।"

"এবার নববধূকে সম্বোধন করে গায়িকারা গায়—
ও বৌদি বাগিচাতে ধান বুনেছি, আর ছোট ক্ষেতে গম।
ভাবী, তুমি এখন মার খেলে আমি খুসী হই।
দুদিকে চাঁদ আর চকোর চেয়ে দেখছে। ও বৌদি
হাঁ, হাঁ, রে।"

'ওরে কুটকীকে পেজ ভাঁরি মাহুলকে দোনা
গুড্ডা গুড্ডি বিয়া করে লেনা, না দেনা।
অরে চন্দা চকোর নেহা লগে দুই কোড়ে কোড়
ও ভাবী হাঁ, হাঁ, রে।
ওরে হম পরদেশী ঘরে চলে, আব কাঁহা বলেঙ্গে
হাম পরদেশী ঘরে চলে।

"মাহুল পাতার ঠোঙা ভরে কুটকী ভাল রান্না করে এনেছি। পুতুলের বিয়ে হচ্ছে, তাতে কিছু উপহার দিতেও হয় না নিতেও হয় না, ও বৌদি চাঁদ আর চকোর দুদিক থেকে চেয়ে আছে।"

তার পর গায়—"ওগো বধূ আমরা পরদেশী, আমরা এখন আমাদের বাড়ী চলে যাচ্ছি, এখন আর তোমাকে কিছু বলব না, মানে তোমার ঘর সংসারের দায়িত্ব, ভাল মন্দ সব কিছু আজ থেকে সম্পূর্ণ তোমার।"

মাদলের মিঠা বোলের সঙ্গে রং-বেরংয়ের ওড়না ও ঘাগরা পরিহিতা নারীদলের কলসী ও প্রদীপের অগ্নিশিখা মাথায় নিয়ে বিচিত্র নৃত্য এবং মধুর কণ্ঠের গীতি বধূবরণকে এক মনোরম উৎসবে পরিণত করে।

রুমানিয়ায় রবীন্দ্রনাথ

রুমানিয়ার জনসাধারণের রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন তাঁর রচনাবলী বিশ্বের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হচ্ছিল এবং রুমানিয়ার পাঠকসাধারণের মধ্যেও তাঁর রচনাবলীর চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। রুমানিয়ার সর্ব্বসাধারণ তখন রবীন্দ্রনাথের প্রবল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনুভব করছিল। ১৯২৬ সনে কবি ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণে বেরোন এবং ইটালি ফ্রান্স, গ্রেটব্রিটেন, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ইত্যাদি দেশে সফর করে বেড়ান। বুলগেরিয়ায় রবীন্দ্রনাথের আগমন এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। কবিকে সম্মান জানাবার জন্যে সেদিন সমস্ত স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়। বুলগেরিয়ায় রবীন্দ্রনাথ যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই এক বিপুল জনতা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছে। রোশচুক বন্দরে জাহাজে চেপে ড্যানিয়ুব নদীপথ বেয়ে ২১শে নভেম্বর, ১৯২৬ তারিখে কবি রুমানিয়ার জিউজিউ নামে জায়গাটিতে এসে পৌঁছান।

কবির সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ আর দৌহিত্র। সেখান থেকে তাঁরা রেলপথে বুখারেষ্ট পৌঁছান। পথে একজন সাংবাদিক কবির স্বাক্ষর চাওয়ায় তিনি সেই সাংবাদিকের খাতায় 'গীতাঞ্জলি'র এই কবিতাটির কয়েক পংক্তি লিখে দেন :

'কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে ভাই।'

রবীন্দ্রনাথ এই সাংবাদিককে বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের এই দেশগুলি তাঁকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছে কারণ এখানে এসে তিনি এক স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত আবহাওয়ার স্পর্শ পেয়েছেন, এখানকার জনসাধারণের সঙ্গে তিনি এক ধরনের একাত্মতা অনুভব করেছেন। তিনি বলেন, বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীন কাল থেকেই এই দেশগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের এক সঙ্গমস্থল হয়ে আছে। বাইজেণ্টাইন রাজ্যের মধ্যস্থতায় হাজার বছরের পুরাতন এশিয়ার বহু প্রভাব এই সব দেশের জনমানসকে প্রভাবিত করেছে।

বুখারেষ্টে এক বিপুল জনসমাবেশ কবিকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জানায়। এখানকার রাষ্ট্রীয় নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতের কাব্যসম্পদ'। রুমানিয়ার সমস্ত পত্র-পত্রিকায় তাঁর ছবি, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ প্রবন্ধ এবং তাঁর সঙ্গে স্থানীয় সাংবাদিক ও সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারের বিবরণী ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে রুমানিয়ার জনসাধারণ স্মরণ করে শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর এক অগ্রদূত হিসাবে। আধুনিক ভারতের মনীষা সম্বন্ধে ইউরোপ বোধ হয় প্রথম সচেতন হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথকে দেখেই। ইউরোপের এই চৈতন্যের প্রয়োজন ছিল। এদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ যেন তখন শুধু শহরগুলিরই চতুঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সঙ্কীর্ণতার ফলে পারস্পরিক একটা বৈরভাবও বর্ত্তমান ছিল। এরই মধ্যে ভারত থেকে এলেন এক মহাপুরুষ যিনি সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইউরোপ যেন উপলব্ধি করল যে প্রকৃতির মধ্যেই মানুষের মুক্তি।

বুখারেষ্টের নাগরিকরা যেমন রবীন্দ্রনাথকে তাদের মধ্যে পেয়ে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে, তেমনি কবিও তাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার স্পর্শে অভিভূত হন। বুখারেষ্ট থেকে তিনি রেলপথে কন্স্টানাৎসা যান এবং সেখান থেকে আবার জলপথে যান কন্স্টান্টিনোপল-এ। সেখান থেকে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য রওনা হন।

বলা বাহুল্য, কবি রুমানিয়ায় যাবার অনেক আগেই তাঁর খ্যাতি সে দেশে পৌঁছেছিল। ১৯২১ সনের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী দ্রুত ক্রমান্বয়ে রুমানীয় ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। মোটামুটি ১৯৩৩ সন পর্য্যন্ত ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় তাঁর প্রত্যেকটি রচনার পুনর্মুদ্রণ হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে প্রতি বছরেই নতুন নতুন রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু তার পরেই জার্মানিতে ফ্যাসীবাদের অভ্যুত্থানের ফলে সারা

ইউরোপ জুড়ে এক দুর্যোগের সূত্রপাত হয়, অল্প কিছুকালের মধ্যেই যুদ্ধবিগ্রহের আবর্তে ইউরোপ ডুবে যায়, কবির শান্তির বাণী আর সর্বমানবের প্রতি মৈত্রীর আহ্বান সাময়িক ভাবে চাপা পড়ে যায়।
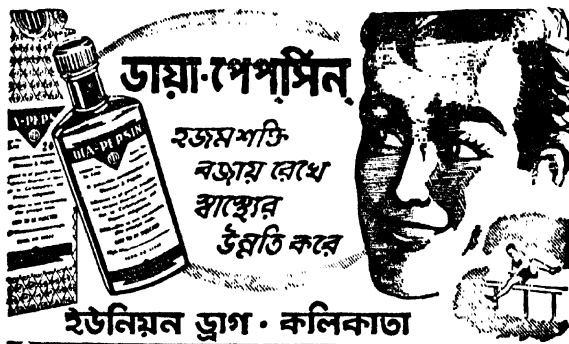
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রুমানিয়ার জনগণের আগ্রহ অব্যাহত আছে। রুমানীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা অনূদিত হয়েই চলেছে। কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে গীতাঞ্জলি, শিশু, চিত্রা ও সাধনা ইত্যাদি এবং কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার সঙ্কলন; গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে ক্ষুধিত পাষাণ, দৃষ্টিদান, ঘরে-বাইরে, চোখের বালি, মালঞ্চ ও গল্পগুচ্ছের আরও কতকগুলি নির্বাচিত গল্পের সঙ্কলন; প্রবন্ধগুলির মধ্যে কালান্তর, ইংরেজীতে লেখা 'ন্যাশনালিজম' ইত্যাদি রুমানীয় পাঠকসাধারণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়। তা ছাড়া রুমানিয়ার পত্রপত্রিকাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী সম্পর্কে বহু আলোচনানিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তৎকালীন বিশ্বসাহিত্যে, তথা রুমানীয় সাহিত্যে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সেদিক থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আরও বিশদভাবে অনুশীলন করার প্রয়োজন আছে বলে রুমানিয়ার সাহিত্য-সমালোচকরা মনে করেন। ভাষাতত্ত্ববিদদের পক্ষে এটা একটা চিত্তাকর্ষক বিষয় হতে পারে। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে ভারত ও রুমানিয়ার মধ্যে সাহিত্যিক সম্পর্কের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর রুমানীয় মহাকবি মিহাইল ইমিনেস্কু প্রাচীন ভারতের দর্শনচিন্তার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, ভারতীয় দর্শনের বহু তত্ত্বকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও রচনাবলীর সঙ্গে রুমানীয়ার জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তাঁর রচনাপাঠে তারা অনুপ্রাণিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে রুমানিয়ায় যে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে, তার পেছনে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ছিল অনেকখানি। বর্তমানে রুমানিয়ায় এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, ভারতের এই মহাকবিকে রুমানিয়ার জনসাধারণ আবার নূতন ভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। নূতন করে তারা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী গভীর অনুরাগের সঙ্গে অধ্যয়ন অনুশীলন করছে।

আজকের দিনে যে সব সমস্যা মানবজাতিকে পীড়িত করছে, রবীন্দ্রনাথ তার সমাধানের পথ নির্দেশ করেছিলেন। ১৯২৬ সনে বুখারেস্টে যারা মহাকবির অমর বাণী শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল, তাদের অন্তরে আজও কবির সেই সৌম্য-উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ছবি আঁকা হয়ে আছে। ভারতের এই বাণীমূর্তি রুমানিয়ার জনগণের উদ্দেশ্যে যে সব কথা বলেছিলেন সে সব কথা আজও তাদের প্রেরণা দিচ্ছে।

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন— এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
L. 278-X 52 BG

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ—হানা ক্যাথেরীন মালেন্স। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত পরিচিতিসহ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নূতন সংস্করণ। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। আষাঢ় ১৩৬৫, মূল্য পাঁচ টাকা।

নানা কারণে অনেক সময় অনেক ভাল গ্রন্থও যথোচিত সমাদর লাভ করিতে পারে না—এরূপ দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নহে। কালক্রমে কোন ঐতিহাসিকের শ্যেনদৃষ্টি এইরূপ কোন অনাদৃত উপেক্ষিত গ্রন্থের উপর পতিত হইলে উহার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে এই সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ১৮৫২ সনে প্রকাশিত এই গ্রন্থেই যে বাংলা উপন্যাসের প্রথম সূচনা পরিলক্ষিত হয় তাহা এতদিন আমরা জানিতে বা বুঝিতে পারি নাই; ফলে, ইহা বাংলা সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। অথচ খ্রীষ্টান সমাজে ইহার আদরের অভাব ছিল না। সে যুগে ইহা ইংরেজী ও ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত বলিয়া ইহা ঐ সম্প্রদায়ের বাহিরে কোন প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। সম্প্রতি শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে ইহা যে বিশেষ মূল্যবান তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং যাহাতে সাহিত্যরসিকমাত্রেই প্রত্যক্ষ ভাবে ইহার রস আস্বাদন করিয়া তাঁহার মতের যথার্থ পরীক্ষা করিবার সুযোগ পান সেজন্য এই দুর্লভ গ্রন্থের একখানি শোভন ও সহজলভ্য সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাংলার সাহিত্যপ্রেমীদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রচারধর্মী আখ্যানভাগ তেমন চিত্তাকর্ষক না হইলেও ইহার মধ্যে যে সাহিত্যধর্ম ও ভাষার নৈপুণ্য প্রকটিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই কারণে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে গ্রন্থখানি একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করিতে পারে। তাই এই সংস্করণখানি বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। সকল দিক দিয়া ইহাকে পাঠকের উপযোগী করিয়া তুলিতে সম্পাদক মহাশয় চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সংস্করণের বিস্তৃত ভূমিকায় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য আলোচিত ও লেখিকার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। লেখিকার ভগ্নী কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত লেখিকার জীবনবৃত্ত পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে সামান্য যে কয়েকটি অধুনা অপ্রচলিত বা অশুদ্ধ শব্দ বা প্রয়োগ তথা খৃষ্টধর্ম বিষয়ক অপরিচিত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় টীকায় তাহাদের অর্থ বা প্রচলিত ও শুদ্ধ রূপ দেওয়া হইয়াছে।

আত্মবোধ—জগদ্রাম রায় রচিত। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সঙ্কলিত। সম্পাদক শ্রীঅভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনিখিলনাথ দে। উত্তরায়ণ লিমিটেড, ১৭০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। এক টাকা বারো আনা।

'আত্মবোধ' পুরাতন বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। রূপক কাব্যের আকারে ইহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষাপকর্ষের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১৩০৬ সালে এই গ্রন্থ টীকা-টিপ্পনীসহ প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তবে এই সংস্করণে নূতন উপকরণ বিশেষ কিছু নাই। অথচ প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে নূতন আলোচনা হইয়াছে—গ্রন্থের আরও পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণমাত্র—এখানে-সেখানে অতি সামান্য পরিবর্তন বা সংযোজন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কয়েকটি টিপ্পনী এবং গ্রন্থমধ্যে গীতা হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ বচনের যথাযথ মূল নির্দেশ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গ্রন্থ হইতে বা আকর গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করিয়া যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের মূল নিরূপণের কোনরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে কি না বলা যায় না। ইহাদের অনেকগুলির বর্ণাশুদ্ধি ও পাঠবিকৃতি পাঠককে বিভ্রান্ত করে। গ্রন্থের মূল অংশেও স্থানে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি দেখা যায়। প্রথম সংস্করণে সম্পাদকের নাম ছিল শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত ও শ্রীআশুতোষ সান্যাল। বর্তমান সংস্করণে সম্পাদকের নাম পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্ব সংস্করণের প্রকাশক বর্তমান সংস্করণে সঙ্কলকরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। এইরূপ পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ করা উচিত ছিল। বস্তুতঃ নূতন সম্পাদকের কোন কার্যের পরিচয় গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায় না। গ্রন্থখানির একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পুষ্পরাণী ও কলির দধীচি—শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত। প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালীমন্দির "ভক্তিতীর্থ"। ৮৫ দ্বারিকজাঙ্গাল রোড, ভদ্রকালী (হুগলী)। মূল্য—পুষ্পরাণী তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা এবং কলির দধীচি এক টাকা।

পণ্ডিত শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী বহুকাল 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ-রিভিয়ু' পত্রিকার সেবা করছেন এবং অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। বহু বৎসরের রচনা—তাঁর কবিতা-পুস্তক 'পুষ্পরাণী' তাঁর বঙ্গ-সাহিত্য সাধনায় সাক্ষ্য দিবে। মহাত্মা

গান্ধীর প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়োপবেশন ও কলির দধীচি (১৯২৪, ৪৭, ৪৮) কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

'কলির দধীচি' বইখানি ছোট বড় সব বয়সের নর-নারীদের প্রেরণা দেবে। মহাত্মার প্রিয় সঙ্গীতাবলী এবং তার 'মর্ম্মবাণী' সরল বাংলায় প্রকাশ করে গ্রন্থকার আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের তথা বাংলা অধ্যাত্ম সাধনার প্রভাব গান্ধীজীর উপর কম নয়, তার প্রমাণ 'একলা চলবে' গানটি তাঁর প্রিয়তম সাধন-সঙ্গীত ছিল।

'পুণ্যবাণী' ও 'দধীচি' বইগুলির বহুল প্রচার হউক এই প্রার্থনা।

শ্রীকালিদাস নাগ

সাগরে-হাওরে—শেফালী নন্দী। পপুলার লাইব্রেরী—১৯৫।১ বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—৩'৫০ নয়া পয়সা।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল—এই কাহিনী তথাকথিত সিনেমা-সুলভ প্রেম-উপজীব্য কাহিনী নহে। পূর্ব্ব বাংলার অখ্যাত পল্লীর খাল-বিল (হাওর-অর্থে) হইতে সাগরপারে ইংলণ্ডের রাজধানী পর্য্যন্ত ইহার পটভূমিকা প্রসারিত। গল্পের নায়িকা মধ্যবিত্ত ঘরের প্রাণ-চঞ্চল দুরন্ত একটি মেয়ে।···মেয়েটি শৈশব হইতে শোক ব্যথা অনাদর বহিয়া বহু বিপর্য্যয় সহিয়া দৃঢ় চারিত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। উচ্চ-শিক্ষা লাভের পিপাসায়··· আত্মীয়স্বজন দেশ ছাড়িয়াছে। শৈশব-সঙ্গীকে তার ভাল লাগিয়াছে—ভালও বাসিয়াছে সে। বিদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও একজনের সঙ্গে অন্তর মিলিয়াছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই গৃহের সঙ্কীর্ণ পরিধি তাহাকে বাঁধিতে পারে নাই। পৃথিবীর বৃহত্তর পরিসরে জীবনকে প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হওয়াতে···এই ভালবাসার স্বাদ আত্মবিলোপ ঘটায় নাই। যদিও ইহার জন্য মানসিক দ্বন্দ্ব··· তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। প্রেমের এই অন্তর্দ্বন্দ্বে বেদনা আছে, উচ্ছ্বাস নাই। জলো ভাবে-ভরা সংলাপে প্রেম সুলভ হয় নাই, এখানে জীবনের গতিটা স্পষ্ট এবং বাস্তব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিধা-বিভক্ত বাংলার বাস্তুহারাদের সামনে চরিত্রটি আশার আলোয় সমুজ্জ্বল।

পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি-পরিবেশ ও গ্রাম্য-চরিত্র অঙ্কনে লেখিকার দক্ষতা গল্পটিকে সুখপাঠ্য করিয়াছে।

সুধী পাঠকের কাছে বইখানি সমাদৃত হইবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ইন্দোচীনের কথা—অজিতকুমার ভারণ প্রণীত। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১ বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২·৫০ ; পৃষ্ঠা ১০৩।

জেনেভার ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতির চুক্তি অনুযায়ী ভারতবর্ষ তদারকী কমিশনের চেয়ারম্যান হয়। এই কমিশনের সঙ্গে লেখক ১৯৫৪ সনে ঐ দেশে যাওয়ার সুযোগ পান। সেই দেশে কিছু দিন থাকিয়া, উহার নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া, ঐ দেশের নানা শ্রেণীর লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া মিশিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাই সরল ভাবে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। পল্লী বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র শিশু হইতে প্রেসিডেন্ট হো-চি মিনহের জীবন কথা এই বর্ণনায় স্থান পাইয়াছে।

মোট কুড়িটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তু ভাগ করা হইয়াছে—যথা ইন্দোচীনের কথা (ভৌগোলিক), মুক্তি-দূত ডাঃ হো-চি-মিনহ, খাদ্যাখাদ্য, চৌ-চৌ-উ, দাদা, মাছের যে চারটে পা, কত বিড়াল কোথায় যায় ? ছাত্র-ছাত্রীর কথা, শিশুরক্ষা-সদন, ভিয়েৎনামের নারী, যেখানে ভিখিরী নাই, ভিয়েৎনামের নাচ-গান, নাট্যগান, আজকের দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম, লাওস, কম্বোজ প্রভৃতি।

নদী-নালা গাছপালার দেশ এই ইন্দোচীন কতকটা বাংলা দেশের মত। আয়তন ২,৮৫,৮০০ বর্গমাইল। উত্তরে চীন, পশ্চিমে ব্রহ্মদেশ ও থাইলাণ্ড বা শ্যামদেশ, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ সাগর বেষ্টিত। লোক সংখ্যা তিন কোটির উপর। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী (২৭৩৪ মাইল) মেকং সম্প্রতি সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ হইতে এই নদী ও অববাহিকার জরিপ হইয়া গিয়াছে। মেকং নদীর জলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তিনটি দেশের (ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওস) আর্থিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ভিয়েৎনাম দেশটি আজও দ্বিধা বিভক্ত উত্তর ও দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম। এখানেও সাম্রাজ্যবাদী খেলা।

লেখক বলেন—"খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে এদেশের লোকেরা পরম উদার।...অনেকে পরম তৃপ্তিতে খায়—কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ, গোসাপ প্রভৃতির মাংস এবং শামুক, ঝিনুক, ফড়িং ও আরশুলা ইত্যাদি পোকা-মাকড়।" কিন্তু তাঁহারা নিজের দেশকে খুবই ভালবাসে—ডাঃ হো-চি-মিনহের নেতৃত্বে প্রচুর রক্ত ও জীবন দান করিয়া দেশকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছে। দেশকে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা ও যত্নের বিরাম নাই। এখানে এশিয়ার নবজাগরণ খুব পরিষ্কার উপলব্ধি হয়।

বাঙালী ছেলেমেয়েরা এই পুস্তক পড়িয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অনেক কিছু জানিবার ও উহা হইতে শিখিবার জিনিস পাইবে। বয়স্করাও এই পুস্তক পাঠে আনন্দ পাইবেন কারণ প্রতিটি লেখায় বাস্তবতার এবং লেখকের প্রাণের স্পর্শ আছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

অমিয় বাণী—শ্রীবিশ্বরঞ্জন দেব কথিত। প্রকাশক—ব্রহ্মচারী ওঁঙ্কারপ্রকাশ, আর্য নিকেতন, ১১ সি নিজখুদা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৭। ২৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য ২।০ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্রেষ্ঠ বাংলা ব্যাখ্যা 'সাধনা সমর' বরিশালের ঠাকুর সত্যদেব কর্ত্তৃক রচিত। ঠাকুর সত্যদেবের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীশ্রী বিশ্বরঞ্জন দেব ভক্তবৃন্দের আহ্বানে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন শহরে যাইয়া প্রায় আড়াই মাস অবস্থান করেন। তিনি সাধন সমর আশ্রমের তৎকালীন আচার্য্য ও কাশীধামস্থ আর্য্য বিদ্যানিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা। রেঙ্গুনে অবস্থান কালে তাঁহার নিকট বহুলোক আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনিতে আসিতেন ও পারমার্থিক আলোচনা চলিত। জিজ্ঞাসুর প্রশ্নসমূহের উত্তরে তিনি যাহা বলিতেন তৎসমুদায় যথাসময়ে লিপিবদ্ধ হইত। তাহাই আলোচ্য পুস্তকে প্রকাশিত।

এই পুস্তকে বিশ্বরঞ্জন দেবের একটি সুন্দর আলেখ্য প্রদত্ত তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী না থাকায় এই পুস্তক প্রাণস্পর্শী হয় নাই। ধর্ম্মপিপাসু পাঠক-পাঠিকা যাঁহার উপদেশ পড়িবেন, অগ্রে তাঁহার জীবনী জানিতে চাহেন। উপদেশের অনুলেখক ও প্রকাশক ব্রহ্মচারী ওঁঙ্কারপ্রকাশ সুশিক্ষিত ও চিরকুমার শিক্ষাব্রতী। তিনি স্বীয় গুরুর উপদেশ প্রকাশপূর্ব্বক শিষ্যোচিত ঋষি-ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন। প্রকাশিত উপদেশে গীতা, চণ্ডী, উপনিষদাদি নানা শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ আছে।

দুই-এক স্থলে উপদেষ্টার অভিমত শাস্ত্রসম্মত নহে। ১৪২ পৃষ্ঠায় তিনি কোন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমি যতটা জানিতে পারিয়াছি, তাতে আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস, একবার মানুষজন্ম হইলে আর পশুজন্ম হয় না। মানুষ পশু হতে পারে, মানুষের মধ্যে হীন যোনিতে জন্মিতে পারে, বর্ব্বর বন্য অসভ্য মানুষ হতে পারে, কিন্তু একেবারে চতুষ্পদ জন্তু হইতে পারে না।" পরেই আবার তিনি ভাগবতোক্ত জড়ভরতের দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্ব্বক মন্তব্য করেন, "সাধারণতঃ এরূপ হওয়া সম্ভব নয়।" হিন্দুশাস্ত্রে উভয় মত সমর্থিত ও অভিব্যক্ত। শাস্ত্রমতে মানুষও পশু হয়, আবার পশুও মানুষ হয়।

সে যাহা হউক, এই গ্রন্থ ধর্ম্ম বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাকে নূতন আলোক ও বিপুল প্রেরণা দান করিবে এবং বাংলার আধুনিক ধর্ম্ম সাহিত্যে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইবে।

ভাগবত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা—শ্রীমনীষীনাথ বসু সরস্বতী প্রণীত। ৮, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৯০। মূল্য তিন টাকা।

মূল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে চিন্তাশীল লেখকের মনে যে প্রশ্ন-সমূহ উদিত হইয়াছিল তৎসমুদয়ের সমাধানার্থ তিনি গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি

যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তৎসমূহ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বৃহৎকায় ভাগবত মহাপুরাণের উপপাদ্য বিষয়গুলিও সযত্নে বিশ্লেষিত ও নির্দেশিত। ইহাকে ভাগবতের ঐতিহাসিক ও উচ্চতর আলোচনা বলা উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। ইহাতে আঠার হাজার শ্লোক থাকিবার কথা; কিন্তু ইহার দ্বাদশ স্কন্ধে অধুনা মোট ১৪,২৩৯ শ্লোক পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ৩,৭৬১ শ্লোক কোথায় গেল? সুতরাং ভাগবতের বর্তমান আকার অবশ্যই অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ। এই সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান আবশ্যক।

লেখক ভাগবতের রচনাকাল সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি অনুমান করেন, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভাগবত রচিত। ভাগবতে মনুসংহিতার বাক্যোদ্ধৃতি থাকায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, ভাগবত ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতার পরে রচিত। মনুসংহিতা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুমিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইন্টারনিজ ও কীথ সাহেব বলেন, ভাগবত খ্রীষ্টীয় দশম শতকে রচিত। পণ্ডিত সি. ভি. বৈদ্য মন্তব্য ও প্রমাণ করেন যে, এই মহাপুরাণ শঙ্করাচার্যের পরে ও জয়দেব কৃত 'গীতগোবিন্দম্'-এর পূর্বে রচিত। শঙ্করাচার্য তৎকৃত গ্রন্থসমূহে ভাগবত-বাক্য উদ্ধার করেন নাই; অথচ রামানুজাচার্য কর্তৃক তদীয় গ্রন্থসমূহে বহু ভাগবত বাক্যের উদ্ধৃতি প্রদত্ত। সেইজন্য কোন কোন গবেষক সিদ্ধান্ত করেন, রামানুজের পূর্বে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে ভাগবত রচিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৭।৩৬ শ্লোকে ব্যাসকে অবতার বলা হইয়াছে। ব্যাসদেব ভাগবতের রচয়িতা হইলে স্বীয় গ্রন্থে নিজেকে অবতাররূপে বর্ণনা করিতেন না। সেইজন্য আলোচ্য পুস্তকে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভাগবত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত নহে। ভাগবতের রচনা-স্থান ও আলোচিত বিষয়সমূহের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্রকায় তথ্যবহুল গ্রন্থের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আমরা এই পুস্তকের প্রতি বিদ্বদ্গণের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য—দুই টাকা।

গ্রন্থখানি হাতে পড়িতেই প্রথম নজরে পড়িল—'ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ।' ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা অনেক রামায়ণই দেখিয়াছি, কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণ হইতে এরূপ সরস ও সহজবোধ্য অনুবাদ এই প্রথম দেখিলাম। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন: 'বাল্মীকি রামায়ণকে ছোটদের উপযোগী করে আনতে গিয়ে বাল্মীকি রামায়ণের কতগুলি বৈশিষ্ট্যের উপরে আমি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রেখেছি। প্রথমতঃ—বাল্মীকি কর্তৃক বর্ণিত চরিত্রগুলির বলিষ্ঠতা; দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতি বর্ণনা ও বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ; তৃতীয়তঃ বাল্মীকির বর্ণনার চমৎকারিত্ব ও গাম্ভীর্য।'

রামায়ণের কাহিনীটুকুই যে সবখানি নয়—বাল্মীকির কাব্য-প্রতিভার সঙ্গে ছেলেদের যে অল্প-বিস্তর পরিচয় থাকা দরকার ইহা গ্রন্থকার উপলব্ধি করিয়াছেন। বাল্মীকির মূল রামায়ণের সঙ্গে অতি অল্প লোকেরই পরিচয় আছে, এদিক দিয়া শুধু ছোটরা কেন, বড়রাও বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি।

গ্রন্থখানি পড়িয়া আর একটি কথা আমার মনে হইয়াছে—গ্রন্থকার অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। মূল রসকে অব্যাহত রাখিয়া এরূপ সরস রচনা যে লেখা যায়, ইহাও তিনি ঐ সঙ্গে প্রমাণ করিয়া দিলেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন: 'শব্দের অর্থবোধের উপরেই আমাদের সাহিত্যবোধ নির্ভর করে না, সব জড়িয়ে গ্রহণ করবার আমাদের চিত্তের একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে।'

সাধারণতঃ দেখা যায়, অতি সুন্দর অনুবাদও রসের দিক দিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি রচনা পারিপাট্যে মূল সুরকে কোথাও আঘাত করে নাই, বরং তাঁহার ছন্দ বাল্মীকির ছন্দে অনুরণিত হইয়াছে। যেমন: সন্ধ্যাসূর্যের রশ্মি লেগে ঈষৎ পাণ্ডুর হয়েছে মেঘগুলি—তাতে আকাশকে মনে হচ্ছে বেদনা-বিধুর। মেঘের ভিতর থেকে নেমে আসছে যে শীতল বাতাস কেয়াফুলের গন্ধে তা ভরে গেছে—তাকে আজ হাতের অঞ্জলি ভরে পান করতে ইচ্ছা করছে কর্পূর-মেশান সুগন্ধি শীতল জলের মত। বড় বড় পাহাড়গুলি কৃষ্ণ মৃগচর্মের বর্ণ মেঘ গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে, গলায় দিয়েছে বৃষ্টিধারার উপবীত, আর তাদের গুহায় গুহায় চলছে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, মনে হচ্ছে এ পাহাড়গুলি আজ যেন বেদপাঠরত-ব্রাহ্মণ-ঋষি।

রামায়ণের সঙ্গে কবি-বাল্মীকির সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভ শুধু অভিনবই নয়, ছেলেদের পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ইহা সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকট সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস রাখি।

যতদূর পৃথিবী ততদূর পথ—রবিগুহ মজুমদার, ডাক পাবলিশার্স, ১১।১, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। দাম তিন টাকা।

গ্রন্থখানি উপন্যাস। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বড় গল্পকেই উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা হয়। সে হিসাবে ইহাকে উপন্যাস বলা যাইতে পারে। কিন্তু আসলে ইহা একটি বড় গল্প মাত্র। গল্পাংশ অতি সাধারণ এবং জটিল। গল্পের নায়ক এবং নায়িকা মঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রী। এবং মঞ্চই ইহার প্রধান পটভূমিকা। তাই গল্পের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে—'চীপ সেন্টিমেন্ট।' নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া রোমাঞ্চ সিরিজের মত চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশে পুস্তকখানি ভারাক্রান্ত। তবে লেখকের মুন্সিয়ানা

আছে—লিখিবার ভঙ্গিটিও চমৎকার। শক্তিমানের হাতে পড়িয়া এমন হাল্কা জিনিসও তাই এতখানি উপভোগ্য হইয়াছে।

নায়ক বিষ্ণু—কলেজে থিয়েটার করিবার অপরাধে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইল। নায়কের নট-জীবন গ্রহণ করিবার পক্ষে এরূপ একটি অবাস্তব যুক্তি গ্রহণ কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে। নায়িকা কাজরীর চরিত্র-রহস্য আরও দুর্বোধ্য। কেনই বা সে থিয়েটার ছাড়িল এবং কেনই বা সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল বুঝা কঠিন।

যাঁহারা গল্পের মধ্যে 'থ্রীল' খোঁজেন, তাঁহাদের এ বই ভাল লাগিবে। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুন্দর। আরও সুন্দর লেখকের ভাষা। মোট কথা, পাঠক আকর্ষণ করিবার মত একখানি বই।

শ্রীগৌতম সেন

বিপাশার পিপাসা—শ্রীরমেশ মজুমদার। অরুণিমা প্রকাশনী। ২, জগবন্ধু মোদক রোড। কলিকাতা-৫। মূল্য—২্।

উপন্যাস। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৬০।

আবগারী ইন্সপেক্টর হরিশ বাবুর দুই পুত্র রণজিৎ ও বরজিৎ প্রতিবেশিনী পিতৃহীনা মালতী আর ফেরার আসামী বিজন বাবুর কন্যা বিপাশা—ইহারাই পুস্তকের প্রধান নায়ক ও নায়িকা। বিভিন্ন ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের সাহায্যে চরিত্রগুলি ফুটাইবার চেষ্টা করা হইলেও লেখক সফলকাম হন নাই। এক কথায় ব্যর্থ প্রয়াস।

সংবাদপত্রের রূপায়ন—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ। ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২। মূল্য—২্

বর্তমান যুগে শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত প্রায় সকলের ঘরেই সংবাদপত্র প্রবেশ করিতে সুরু করিয়াছে। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া অনেকেই সংবাদপত্রের অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকেন। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা জানিবার আগ্রহ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। নিত্য নূতন নূতন খবর একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্রেই পরিবেশিত হয়।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই সংবাদপত্র কি ভাবে প্রকাশিত হয়, কেমন করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের ছোট, মাঝারি ও বড় বড় নানা ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পূর্ণ কলেবরে প্রতিদিন প্রকাশিত হইতেছে তাহাই লেখক সমালোচ্য পুস্তকখানিতে পরম যত্নের সহিত পরিবেশন করিয়াছেন। প্রথমেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর গোড়ার কথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্বারা আরম্ভ করিয়াছেন। এই ইতিহাসটি অত্যন্ত মূল্যবান।

সংবাদপত্রের দায়িত্ব, সম্পাদকীয় বিভাগ, বার্তা বিভাগ, বার্তা সংগ্রহের উৎস, নিজস্ব সংবাদদাতার টেলিপ্রিণ্টারের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান, টেলিপ্রিণ্টার বস্তুটি কি, ইহা সুন্দর ভাবে স্বল্প কথায় বুঝান হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রত্যেকটি বিভাগীয় কর্ম্মপদ্ধতি, খুঁটিনাটি কাজের ধারা বিবরণীত পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

সংবাদ-সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ কি ভাবে সংবাদ প্রেরিত হয় তাহাও মোটামুটি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মোটকথা একখানি পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে হইলে সম্পাদকীয় বিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রোটারী মেশিন হইতে ছাপিয়া ভাঁজ হইয়া বাহির হইয়া আসা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয় অল্প কথায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই ধরনের পুস্তক বাংলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।

সামান্য দু'-একটি ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও পুস্তকখানি আদৃত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দিব্য জীবনের সন্ধানে—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। পৃষ্ঠা ১০৫। মূল্য দুই টাকা।

ঋষি অরবিন্দের দর্শন সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য। ইহার অন্যতম কারণ, তাঁহার দার্শনিক ভাবধারা দুরূহ ইংরেজীতে লিখিত। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ যোগকে সাধারণ পাঠক পাঠিকাগণের নিকট পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে সরল সুবোধ্য ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থ রচিত। ইহা ছাড়া নবযুগের বিরাট পুরুষ শ্রীঅরবিন্দের মূল রচনাবলীর প্রতি পাঠকগণের আগ্রহ সৃষ্টি করাও গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য। আগ্রহ জন্মিলে পাঠক মূলের সৌন্দর্য্য এবং দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে পারিবেন। নিবেদনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এই বইখানি পড়ে যাঁদের মনে আরও বেশী জানবার ঔৎসুক্য জাগবে, তাঁরা অবশ্যই মূল গ্রন্থগুলি পড়বেন এবং তখন হয়ত সহজেই তার অর্থ বুঝতে পারবেন।" গ্রন্থখানির প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা মীরা রিসার্ডের একটি সুদৃশ্য চিত্র সন্নিবিষ্ট। পুস্তকটির পাঁচটি অধ্যায় সাবলীল কথাভঙ্গীতে লিখিত। 'জগতে এত দুঃখ কেন?' 'কাকে বলে দিব্য জীবন?' 'বিশ্বাস', 'সমর্পণ', 'পূর্ণযোগ', 'সাধারণ জীবনে যোগ', 'ভগবৎকৃপা' 'নিদিধ্যাসন বা ধ্যান', 'জপ', 'প্রশান্ত মন', 'অতিমানস উপলব্ধি', 'দিব্য জীবনে ব্যক্তির সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা', 'সমষ্টিমানবের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা' প্রভৃতি শিরোনামায় অধ্যাত্মসাধনের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে মহাসাধক শ্রীঅরবিন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতিমানসচেতনা এই মানব-জীবনে অবতীর্ণ হইয়া মর্ত্ত্যলোকে নব স্বর্গ রচনা করিবে—ইহাই মহাযোগী অরবিন্দের যুগবাণী। গ্রন্থকার নৈপুণ্যের সহিত তাহা ফুটাইয়া তুলিলেও স্থানে স্থানে তাঁহার মন্তব্য কিঞ্চিৎ বিতর্কমূলক হইয়াছে। 'শ্রীঅরবিন্দই আমাদের প্রথম শোনালেন

বাড়ীর সবাইকে গুচ্ছের খেতে দিলেই হয় না। দিতে হয় সুসম খাদ্য—যাতে শরীরের পক্ষে দরকারী সবরকম খাদ্য-উপাদান থাকার ফলে তারা শক্তি ও উৎসাহ পায়।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, আমাদের সুস্থসবল থাকতে হ'লে পাঁচ রকমের খাদ্য-উপাদান দরকার—ভিটামিন, খনিজ লবণ, প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহ। এদের মধ্যে স্নেহপদার্থের গুরুত্ব খুব বেশী—কেননা স্নেহপদার্থ উত্তাপ যোগায়... রান্না খাবার সুস্বাদু করে এবং খাদ্যের ভিটামিন বহন করে।

বনস্পতি—বিশুদ্ধ ও সুলভ স্নেহপদার্থ

দৈনিক আমাদের অন্ততঃ দু'আউন্সের মত স্নেহপদার্থ প্রয়োজন। বনস্পতি দিয়ে রান্নাবান্না করলে আপনি তার প্রায় সবটাই কম খরচায় অনায়াসে পেতে পারেন।

বনস্পতি খাঁটি উদ্ভিজ্জ তেল—বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরীর ফলে সাধারণ তেলের চেয়ে অনেক ভাল জিনিস। স্নেহপদার্থের স্বাভাবিক পুষ্টি ছাড়াও প্রতি আউন্স বনস্পতিতে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' ত্বক ও চোখ ভালো রাখে, শরীরের ক্ষয়পূরণ করে ও শরীর বেড়ে ওঠার সহায়তা করে।

বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে বনস্পতি স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক কারখানায় তৈরী করা হয়—বনস্পতি কিনলে আপনি বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যদায়ী জিনিস পাবেন!

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়া

VMA 6647 R

এই দিব্য জীবনের কথা' (পৃষ্ঠা ৫) ; অথবা 'অতিমানসচেতনা এখন তার স্বরূপে মানুষের জগতে নেমে এসেছে' (পৃষ্ঠা ১২১) প্রভৃতি উক্তি বিতর্কনীয়। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-মানবগণের উপদেশ যথাস্থানে উল্লিখিত হওয়ায় গ্রন্থকারের বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হইয়াছে। পুস্তকের ছাপাও রুচিসম্মত। বাংলার ধর্ম্ম-দর্শন সাহিত্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ এক নূতন সংযোজন। শ্রীঅরবিন্দের অনুরাগী ও অধ্যাত্ম-রসপিপাসুগণের নিকট গ্রন্থটি সমাদৃত হইবার যোগ্য।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার

শ্রীশ্রীভূপতিনাথ সন্নিধানে—শ্রীমোহিতকুমার মুন্সী। প্রকাশক : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। ঋষভ আশ্রম, কোঁড়া, বারাসত, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ২২০। মূল্য আড়াই টাকা।

ফরাসী মনীষী রোমা রোলার ভাষায় "স্বশিষ্য সন্নিধানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ জীবন-চিত্র পাওয়া যায় : তাঁহার অলৌকিক জীবনবেদের ভাষ্য শিষ্যগণের তপঃপূত মহাজীবন।" শ্রীশ্রীভূপতিনাথ রামকৃষ্ণদেবের গৃহী-শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে' বহুবার 'ভাই ভূপতি' নামে উল্লিখিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবত প্রেরণায় তাঁহার উত্তরজীবনে আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ দেখা গিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এইরূপ এক মহাসাধকের উৎকৃষ্ট জীবনী ও অমৃত উপদেশ সাধারণের নিকট এতদিন দুর্লভ ছিল। আলোচ্য পুস্তকখানি এই অভাবমোচনে কিঞ্চিৎ সহায়ক হইবে। ইহাতে ভাই ভূপতির শিষ্যগণ সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন স্বীয় গুরুর পুণ্যস্মৃতি। এই স্মৃতি-চিত্রণে উদ্ঘাটিত হইয়াছে শ্রীভূপতিনাথের অপূর্ব্ব চরিত্রমহিমা ও বিরাট অধ্যাত্মব্যক্তিত্ব। গ্রন্থারম্ভে প্রদত্ত ভূপতিনাথের জীবনীটি আরও তথ্যবহুল হইলে চিত্তাকর্ষক হইত।

আশা করা যায়, এই গ্রন্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট সমাদৃত হইবে।

শ্রীশিবানীপ্রসাদ মৈত্র

আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসা সমিতি

(ছানিতোলা কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সন ১৩৬৪ সাল)

আশুতোষ চক্ষু চিকিৎসা সমিতির সভাপতি শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠাইয়াছেন।

সূচনা

সন ১৩৬৪, অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সময়ে সমিতি সুদূর পল্লী-অঞ্চলে ৫টি বিভিন্ন কেন্দ্রে চক্ষু-চিকিৎসাকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কেন্দ্রগুলিতে মোট ১৩৩ জন নরনারীর চোখের ছানি তুলিয়া দেওয়া হয়।

কলিকাতার অভিজ্ঞ চক্ষু-চিকিৎসক সদাশয় শ্রীঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য এম্‌-বি মহাশয় বিভিন্ন কেন্দ্রে রোগিগণের চোখের ছানি তুলিয়া দেন।

সৌভাগ্যের বিষয়, বিভিন্ন কেন্দ্রের ১৩৩ জন রোগীই আরোগ্য-লাভ করিয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন।

ছানি কাটিয়া দিবার পর গ্রামের এই সকল সাময়িক চক্ষু-চিকিৎসাকেন্দ্রে রোগিগণকে সাধারণতঃ ১০ দিন রাখা হয়। নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থামত স্থানীয় ডাক্তার ও কর্ম্মিগণ তাঁহাদের চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন।

ব্যয়-নির্ব্বাহ

ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটির পশ্চিমবঙ্গ শাখা গত কয় বৎসর ধরিয়া রোগিগণের জন্য ঔষধাদি সরবরাহ করিতেছেন। সহৃদয় ঔষধ-ব্যবসায়ীও কেহ কেহ এই কার্য্যে মাঝে মাঝে সহায় হইয়া থাকেন।

ছানিতোলা ও তৎসংক্রান্ত কার্য্যের অন্যান্য ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বিভিন্ন গ্রাম-কেন্দ্রে উৎসাহী কর্ম্মিগণ প্রধানতঃ চাঁদা তুলিয়া অর্থাদি সংগ্রহ করেন।

প্রাথমিক পরীক্ষা ও ছানির ব্যাপকতা

প্রত্যেক কেন্দ্রে অগ্রে চক্ষুরোগিগণের প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়। তাহার ফল বিচার করিয়া ছানি তোলার জন্য রোগী নির্ব্বাচন করা হয়।

প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য বহুসংখ্যক চক্ষুরোগী প্রত্যেক কেন্দ্রে আশামুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিড় করে। কোন কোন কেন্দ্রে রোগীর সংখ্যা ৩৬০ এরও অধিক হইয়াছে।

ইহাদের মধ্য হইতে ছানিতোলার জন্য সাধারণতঃ ২০ ২৫ জনকে বাছিয়া লওয়া হয়। কারণ কেন্দ্রে তদধিক সংখ্যক রোগীর সুব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না সুতরাং অবশিষ্ট লোক ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

এই সকল রোগী সুদূর পল্লীর অধিবাসী। লোকবল ও অর্থবল ইহাদের নাই। কলিকাতায় গিয়া ছানি কাটাইবার কথা ইহাদের কল্পনার অতীত।

দেখা গিয়াছে, ইহাদের সহিত ভালভাবে কথা কহিলে ইহারাও কথা কয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ইহাদের অঞ্চলে কত লোকের চোখে ছানি পড়িয়াছে এবং ইহারা কত দুঃখ পাইতেছে তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

এই আন্দাজে ধরা যায় যে, প্রত্যেক ইউনিয়নে অন্ততঃ শতাধিক লোকের চোখে ছানি আছে। কিন্তু ইহা আন্দাজ মাত্র।

তথ্যসংগ্রহ

এইখানে দেশের গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়া তথ্যসংগ্রহ করিলে দেশে চোখে ছানি-পড়া লোকের সংখ্যা কত তাহার সঠিক নির্ণয় হইতে পারে :

কর্ত্তব্যনির্ণয়

তথ্যসংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ছানি তুলিয়া দিবার ব্যাপক বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

আমাদের স্বাধীন দেশে গ্রাম-অঞ্চলে এখন অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স ও সাধারণ সরঞ্জামাদিও আছে।

এক্ষণে সরকার-নিযুক্ত চক্ষু-চিকিৎসক যাহাতে ব্যবস্থামত কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরিয়া দুঃখী লোকের চোখের ছানি তুলিতে পারেন গবর্ণমেণ্ট তার উদ্যোগ করুন। এই কাজ বহু ব্যয়সাপেক্ষ নহে।

আমাদের অভিজ্ঞতা

কেন্দ্রীভূত জটিল ব্যবস্থায় অনেক দোষ। গ্রামের লোক শহরে আসিয়া বড় বড় হাসপাতালে চোখের ছানি তোলার সুযোগ পায় না। চক্ষু-চিকিৎসক গ্রামে যাইলেই গ্রামের রোগীর দুঃখের অবসান হইতে পারে।

কলিকাতার হাসপাতালে ছানি তুলিবার জন্য চক্ষু-রোগীর প্রাথমিক পরীক্ষায় যথেষ্ট কঠোরতা লক্ষিত হয়।

আমাদের ব্যবস্থায় যেখানে ১৩৩ জন ছানি তোলার জন্য বাছাই হইয়াছে, কলিকাতা হাসপাতালে সেখানে ঐ সংখ্যা ১৩৩ না হইয়া মাত্র ৩৩ হইতে পারে।

গ্রামে চোখে ছানি পড়া অসহায় লোকের সংখ্যাবাহুল্য দেখিয়া আমাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরীক্ষার মান একটু শিথিল করিতে হইয়াছে। কিন্তু ১৩৬৪ সালে বিভিন্ন কেন্দ্রে ১৩৩ জনের ছানি তোলার পর ১৩৩ জনই আরোগ্য লাভ করায় এবং তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে প্রায় তদনুরূপ সুফল পাওয়ায় এই শিথিলীকরণ সঙ্গত হইয়াছে কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণের বিবেচনার যোগ্য বলা যায়।

উপসংহার

নিম্নে বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে :

এই সেবাকার্য্যে বিভিন্ন কেন্দ্রের কেন্দ্রকর্ত্তা, কংগ্রেসকর্ম্মী ও অপর অনেকে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করিয়া থাকেন।

আমরা ভালই জানি, আমাদের এই প্রচেষ্টা কত সীমাবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েক লক্ষ লোকের চোখের ছানির কথা ভাবিলে এই চেষ্টা নগণ্য, সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ বলিয়া মনে হইবে। তথাপি এই চেষ্টায় পথের নির্দ্দেশ রহিয়াছে—এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রকাশের ইহাই একমাত্র কারণ।

আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসা সমিতি
২৭-৩বি হরিঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়
আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসা সমিতির পক্ষে
১৪-১২-৫৮

আশুতোষ চক্ষু-চিকিৎসা সমিতি

সন ১৩৬৪ অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত (১৯৫৭-৫৮)

বিভিন্নকেন্দ্রে ছানিতোলার হিসাব

গ্রাম-কেন্দ্র	তারিখ	সংখ্যা	মোট
১। সুভাষপল্লী, হেঁড়্যা থানা খেজুরী (মেদিনীপুর)	১০-১২-৫৭ ১১-১২-৫৭	পুং ১৭ স্ত্রী ৯	২৬
২। জগদীশপুর (ষষ্ঠ বর্ষ) থানা বালি (হাওড়া)	২২-১২-৫৭	পুং ৮ স্ত্রী ১৫	২৩
৩। আঁইয়া (৪র্থ বর্ষ) থানা চণ্ডীতলা (হুগলী)	২৩-১-৫৮ ২৪-১-৫৮	পুং ২৪ স্ত্রী ২৩	৪৭
৪। কলানবগ্রাম থানা মেমারি (বর্দ্ধমান)	১৬ ৩-৫৮	পুং ৬ স্ত্রী ৭	১৩
৫। রাধানগর থানা খানাকুল (হুগলী)	২১-৩ ৫৮	পুং ১৬ স্ত্রী ৮	২৪
			১৩৩

বিগত তিন বৎসরের ছানিতোলা কার্য্যের তুলনামূলক ছক

রোগীর বয়স	সংখ্যা ১৩৬৪ (১৯৫৭-৫৮)	সংখ্যা ১৩৬৩-৬৪ (১৯৫৬-৫৭)	সংখ্যা ১৩৬২ (১৯৫৫-৫৬)
১ হইতে ৯ বৎসর	২	×	×
১০ ,, ১৯ ,,	১	×	১
২০ ,, ২৯ ,,	×	×	×
৩০ ,, ৩৯ ,,	৩	৫	১
৪০ ,, ৪৯ ,,	১৩	১৮	১৪
৫০ ,, ৫৯ ,,	২২	২৯	২২
৬০ ,, ৬৯ ,,	৫৫	২৩	২৮
৭০ ,, ৭৯ ,,	২৯	৮	১৯
৮০ ,, ৮৯ ,,	৫	২	৪
৯০ ,, ১০০ ,,	২	×	×
বয়স লেখা নাই	১	×	১
	মোট ১৩৩	মোট ৮৫	মোট ৯০
পুরুষ	৬০	৪০	৪৮
স্ত্রী	৭৩	৪৫	৪২

১৯৩৪ হইতে ১৯৫৮ পর্য্যন্ত ছানিতোলার হিসাব

সন	কেন্দ্র	জেলা	কতজনের ছানি তোলা হয়
১৯৩৪	বন্দর	হুগলী	২৬
১৯৩৫	বড়ডোঙ্গল	,,	১৪
১৯৩৬	নোকুণ্ডা	,,	১১০
২৯৩৭	রাজবলহাট	,,	২৫
১৯৩৮	ধনিয়াখালি	,,	১৯
১৯৩৯	হরিপাল	,,	৪
*১৯৪০	ফতেপুর	,,	২২
*১৯৪৮	পামারগোড়ী	,,	১৯
১৯৪৮	রাজবলহাট	,,	১৯
১৯৫০	বালি	হাওড়া	৩
১৯৫১	বালি	হাওড়া	৭
১৯৫১	ফতেপুর	হুগলী	২৭
১৯৫২	ফতেপুর	,,	২০
১৯৫২	জগদীশপুর	হাওড়া	১০
১৯৫৩	জগদীশপুর	,,	১৪
১৯৫৩	ফতেপুর	হুগলী	১৯
১৯৫৪	জগদীশপুর	হাওড়া	২২
১৯৫৫	আইয়া	হুগলী	১১
১৯৫৫	ফতেপুর	,,	২০
১৯৫৫-৫৬	জগদীশপুর	হাওড়া	১৯
১৯৫৫-৫৬	হরিপাল	হুগলী	২৫
১৯৫৬	আইয়া	,,	২৩
১৯৫৬	ফতেপুর	,,	২৩
১৯৫৬	জগদীশপুর	হাওড়া	১৭
১৯৫৭	আইয়া	হুগলী	৩৫
১৯৫৭	রঘুনাথপুর	,,	১৫
১৯৫৭	শ্যামবাজার	,,	১৮
১৯৫৭	সুভাষপল্লী হেঁড়্যা	মেদিনীপুর	২৬
১৯৫৭	জগদীশপুর	হাওড়া	২৩
১৯৫৮	আইয়া	হুগলী	৪৭
১৯৫৮	কলানবগ্রাম	বর্দ্ধমান	১৩
১৯৫৮	রাধানগর	হুগলী	২৪

তথাপি হরিপাল কেন্দ্রে এই সময় ছানিতোলার কাজ চলিয়াছিল। কিন্তু তাহার হিসাব রক্ষিত হয় নাই।

* উপরের ছক দৃষ্টে জানা যাইবে যে, ১৯৪১ হইতে ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত ছানিতোলার কাজ হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক, পল্লী বাংলার অন্যতম কংগ্রেসনেতা মহাপ্রাণ ডাক্তার আশুতোষ দাস ১৯৪১ সনে ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ করিবার কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বাধীনতালাভের ঠিক পূর্ব্বে ঐ সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও যথেষ্ট জটিল ছিল।

দেশ-বিদেশের কথা

প্রাচ্যবাণী-মন্দির বার্ষিক অধিবেশন

গত শনিবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচ্যবাণীর বার্ষিক কার্যবিবরণীতে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বলেন, গত ডিসেম্বর মাসেও প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে "শ্রীশ্রীগৌরভক্তম" ও "ভক্তি-বিষ্ণু-প্রিয়ম" নামক সংস্কৃত নাটক—এই দুইটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সর্বসমেত প্রাচ্যবাণী প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থের সংখ্যা ১৬০। প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, সংস্কৃত ভাষণ পরিষৎ এবং মহিলা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষার সংপ্রসারণে কাজে রত রহিয়াছে। এই সভায় ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী রচিত শ্রীশ্রী মহাপ্রভু হরিদাসম্ নামক সংস্কৃত নাটক অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরীর প্রযোজনায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অভিনীত হয়। শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃগণ বহু পদক পুরস্কার লাভ করেন। অভিনেতৃগণের মধ্যে অধ্যাপক অশোক চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, গোপিকা ভট্টাচার্য, ধ্যানেশ চক্রবর্তী, শ্রীমতী স্বপ্না দাশ, তারা চক্রবর্তী ও সুনন্দা মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রারম্ভে শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলভূষণ প্রভৃতি সঙ্গীত বিশারদগণ ডক্টর চৌধুরী-দম্পতি লিখিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশন, কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের আট দিবসব্যাপী ২৭তম বার্ষিক অধিবেশন একদিকে যেমন সক্রিয় অনুসন্ধিৎসু কবিরাজমণ্ডলীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান, প্রবন্ধ-পাঠ, আলোচনা, জনপ্রিয় বক্তৃতামালা ও বিচিত্র সম্ভার-সমন্বিত আয়ুর্ব্বেদ প্রদর্শনীর যুগপৎ মিলনকেন্দ্র হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বিবিধ বিষয়ে পারদর্শী বিদ্বজ্জনের হৃদয়গ্রাহী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমাবেশে সমগ্র অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাতে শুধু কবিরাজদের মধ্যেই আয়ুর্ব্বেদের উৎকর্ষ সাধনের তীব্র আগ্রহ ও আলোড়ন আনিয়াছে তাহা নহে, জনসাধারণের মধ্যেও আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে জানিবার ও শুনিবার অধিকতর আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার করিয়াছে। এই অধিবেশন ১৮ই পৌষ হইতে ২৬শে পৌষ, ১৩৬৫ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

দ্বারভাঙ্গা হলে ইহার মূল সভার উদ্বোধন করিতে উঠিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন যে, আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ভারতীয়দের অটুট বিশ্বাস আছে, কবিরাজদের দরকার আয়ুর্ব্বেদের উৎকর্ষ সাধন ও ঔষধ সেবন সহজসাধ্য করা। ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন যে, আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলন তাহার বিশিষ্ট নীতি অনুসারে করিতে হইবে, সংমিশ্রণে উহার অবনতি নিশ্চিতই সংঘটিত হইবে। কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক সভাপতির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ুর্ব্বেদের প্রতি শিথিল ও অব্যবস্থিত নীতির কথা উল্লেখ করেন এবং বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অল্প বিস্তর আলোচনা করেন।

দ্বারভাঙ্গা হলে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির নানা কথার উল্লেখের মধ্যে বৈদিক ও বেদান্তের যুগে যাজ্ঞবল্ক্য, রাজা অশোকের ত্যাগধর্মের সহিত আধুনিকের তুলনা করেন এবং পরিবর্তিত অবস্থায়ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বলিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় ও কবিরাজ শ্রীমুরারীমোহন ঘোষ প্রভৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির নানা দিক হইতে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন।

আয়ুর্ব্বেদ-প্রদর্শনীতে ওষধি, ধাতু-উপধাতু, রত্ন-উপরত্ন, জনস্বাস্থ্য—বল্কলপত্রাদি-দ্রব্যগুণ—ঋতুচর্য্যা-দিনচর্য্যার চার্ট, মকরধ্বজ, রসমাণিক্য শঙ্খদ্রাবক প্রস্তুতের চার্ট, শুষ্ক দ্রব্য, অষ্টবর্গ, পুস্তক ও পুঁথি প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বিভাগীয় সভাগুলি কলেজ স্কোয়ারস্থিত ষ্টুডেন্টস হলে' অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিদোষতত্ত্বের মূল ভিত্তি কি, ধাতু ও ওষধির মধ্যে কোনটি দেহানুগ, মনঃসমীক্ষার বিচারণা, জন্মনিয়ন্ত্রণ কি ভাল, সংস্কারের উন্নতিই কি উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার সূচনা করেন কবিরাজ শ্রীমজুমদার। আগাগোড়া তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা পরিষদের বাৎসরিক কার্য্যাবলি, আট দিবসব্যাপী বার্ষিক

অধিবেশনের বিচিত্র অনুষ্ঠানসূচী রূপায়ণ সম্ভব করিয়াছেন। তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

বিগত বৎসরে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা ও গবেষণার উপর নির্ভর করিয়া কবিরাজদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছে।

বাৎসরিক সারস্বত সম্মেলনে কয়েকটি উপ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কাজের সুবিধার জন্য, যথা, সংস্কৃতি, কায়চিকিৎসা, মনোবিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, কৌমারভৃত্য, অর্ব্বুদ, রসশাস্ত্র প্রভৃতি। এইগুলি ব্যতীত চরক পাঠচক্র, বিজ্ঞান বিভাগ, জনস্বাস্থ্য বিভাগও বিদ্যমান আছে।

সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র শাস্ত্রী সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে, মনোবিজ্ঞান উপসমিতির সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, "মনের প্রকৃতি ও বিকৃতি।" "মন ও ত্রিদোষতত্ত্ব", "দেহতত্ত্ব" এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে, আধুনিক রোগ চিকিৎসা পর্য্যায়ে কবিরাজ শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'ব্লাডপ্রেসার' ও 'মেনেঞ্জাইটিজ' সম্বন্ধে, "আধুনিক গবেষণার ধারাবাহিকতা' সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্ত্তী 'উন্মাদ রোগ' সম্বন্ধে, কায়চিকিৎসা উপসমিতিতে কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা 'পাণ্ডুরোগ' সম্বন্ধে, কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন 'অর্শ রোগ' সম্বন্ধে এবং শ্রীইন্দুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'চক্র ও পদ্ম' সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনা করেন।

পরলোকে হিমাংশু সেন (ঢুলুবাবু)

অরঙ্গাবাদের (মুর্শিদাবাদ) প্রবীণ দেশকর্ম্মী হিমাংশু সেন দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ৯ই পৌষ পরলোক গমন করিয়াছেন।

ছাত্রাবস্থায় কৃতী ছাত্র হিসাবে বহরমপুর কলেজে একদা তাঁহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু বি, এ পড়িবার সময় অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধুর আহ্বানে তিনি কলেজ ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। অতি নিষ্ঠার সহিত আজীবন তিনি দেশের সেবাই করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন স্বদেশ-বৎসল ছিলেন তেমনি ছিল তাঁহার অমায়িক ব্যবহার। এই ব্যবহারের গুণেই তিনি হিন্দু মুসলমান সকলেরই হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিলেন। শুধু গ্রামের কেন, সমগ্র জেলারই তিনি ছিলেন ঢুলুবাবু। বিপদে

হিমাংশু সেন

আপদে এই ঢুলুবাবুর ডাক সর্ব্বত্র হইতেই আসিত। আজ ঢুলুবাবুকে হারাইয়া তাহার আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছে। নীরব কর্ম্মী হিসাবে তিনি যে ভাবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে গীতার কর্ম্ম-পন্থাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার করিবার অনেক কিছু ছিল, কিন্তু কাজ শেষ করিবার আগেই তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে!

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

আমরা অনেকদিন যাবৎ বাঙালীর—বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের সন্তানের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা বলিয়া আসিতেছি। এত দিন তাহা অরণ্যে রোদনই ছিল, কেননা কর্তৃপক্ষ ত সেদিকে কর্ণপাতই করেন নাই—এবং এখনও মুখের কথা ছাড়া কোনও নির্দ্দেশ পাই না যে, কিছু করিতেছেন—আর যাহার জন্য চিন্তা সেই বাঙালীও হা-হুতাশ বা স্লোগানের আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া যাওয়া ছাড়া কোনও সাড়া-শব্দই দেন নাই। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে, দেশের সন্তানের দুরবস্থা চরমে উঠিয়া যাওয়ায় কারবারী লোকদের মনে দুশ্চিন্তার উদয় হইয়াছে এবং সেই দুশ্চিন্তার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের "বড়কর্ত্তা" অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও মুখর হইয়া উঠিয়াছেন।

বাংলার কারবারী ও শিল্পপতি (শব্দটা অতি অর্ব্বাচীন) সকলে এক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিশদভাবে চর্চ্চা করার ব্যবস্থা করেন। সেই সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও ভাষণ দিয়াছেন। অন্যেরাও নানা বিষয়ে নানা কথার অবতারণা করেন। সেই সকল কথার মধ্যে বাংলার সন্তানদিগের বিষয় যাঁহারা আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের বক্তৃতার সারাংশ আমরা এই সংখ্যারই 'বিবিধ প্রসঙ্গে' অন্যত্র দিয়াছি। সে সকল বিষয় পূর্ণ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নহে। কিন্তু আমরা সর্ব্বপ্রথমে একথা বলিব যে, বাংলার যে সকল ছোটবড় বাঙালী কারবারী আছেন তাঁহাদের এখনই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, ঐ আলোচনার বশে ভবিষ্যতে তাঁহাদের কাজ কারবারের উন্নতির পথে কি কি বাধাবিঘ্ন আছে, কি বিষয়ে সাহায্য বা সহায়তার প্রয়োজন তাহার জন্য সরকারই বা কি করিতে পারেন বা বড় কারবারীদের কি করা উচিত, সে বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। নচেৎ পৃথকভাবে কিছু করা যাইবে না।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে বলিব যে, বাঙালীর বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কোনও সুচিন্তিত বা সুসংবদ্ধ ধারণা না বাংলার কর্তৃপক্ষের আছে না কারবারীদিগের মধ্যে আছে। বাংলার বেকার সমস্যা সমাধানে দুর্গাপুরের কোকচুল্লী ইত্যাদি অতি সামান্যই কার্য্যকরী হইবে। মজদুরী বা মিস্ত্রীর কুঞ্জীতে বাংলার ছেলেকে ভিন্নপ্রদেশীয়ের সহিত কঠোর প্রতিযোগিতায় হটিতেই হইবে। কল কারখানায় আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে ঐ বাবদ ধরাবাঁধা রেট দেওয়া হয়। বাঙালীর জীবনের মান উচ্চ এবং দীর্ঘদিন কায়িক পরিশ্রমে অনভ্যস্ত থাকার দরুণ তাহার 'দিন-রোজে'র কাজের পরিমাণ কিছু কম। তাহাকে অন্যের তুলনায় বেশী দিয়া কম কাজ লইতে কেহই রাজী হইবে না। সুতরাং সুদক্ষ কারিগরিই তাহার পথ।

বাঙালীর ব্যবসায়ের অবস্থাও খারাপ ঐ কারণে। দুর্ম্মূল্যতার বাজারে আয় প্রায় সর্ব্বস্থলেই কমিয়াছে, কেবলমাত্র যাঁহারা অন্য বাঙালীকেই ঘায়েল করিয়া কালোবাজার চালাইতেছেন তাঁহাদেরই এখন লাভের মরশুম। যাঁহারা ছোটবড় কলকারখানা বা যন্ত্রচালিত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ব্যবসায় ব্যাপার চালাইতেছেন তাঁহারাও চতুর্দ্দিকে কাঁচা মালমশলার কমের জন্য কালোবাজারের কবলে ঘায়েল হইতেছেন। উপরন্তু আছে সরকারী নূতন আইন-কানুনের উৎপাত এবং শ্রমিক নেতৃবর্গের আত্মঘাতী কার্য্যকলাপ। আত্মঘাতী লিখিলাম এই কারণে যে, তাঁহাদের কার্য্যের ফলে যদি বাংলাদেশ হইতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সব চলিয়াই যায় তবে তাঁহাদের দলেরই বা কি হইবে এবং নিজেদেরই বা কি হইবে? রামস্বামী মুদালিয়র এ বিষয়ে অতি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। বাঙালী শ্রমিকের বদনামের দায়িত্ব তাঁহাদেরই।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণে আমরা কোনও সুচিন্তিত বা সুপরিকল্পিত কার্য্যক্রমের পরিচয় পাই নাই। "করিতে হইবে" অনেক কিছু নহিলে সমস্যার সমাধান হইবে না, একথা সকলেই জানে। কিন্তু নিজের চাটুকারবর্গ বা পোষ্যবর্গের বাহিরে কোনও বাঙালীর কারবারের কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি কি পথ দেখাইয়াছেন? এমন কি বাংলার সন্তানেরা যে ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্য ও অশান্তির শেষ সীমায় পৌঁছাইতে চলিয়াছে সে বিষয়ের প্রতিকারে কি তিনি কোনও নিরপেক্ষ লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছেন?

পশ্চিম বাংলার সন্তানদিগের সুখদুঃখের সর্ব্বতোভাবে ভার লওয়া এবং দলনির্ব্বিশেষে তাহাদের সর্ব্বকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহার ঐ বিরাট খরচের কিরিস্তিতে কি কোনও ব্যবস্থা হইত না?

রপ্তানী বৃদ্ধি

ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি অনেকখানি দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের সহিত জড়িত ; রপ্তানী ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির ফলেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর। কিন্তু গত দশ বছর ধরিয়াই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে ঘাটতি চলিতেছে এবং তাহাতে পরিকল্পনার অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে, কারণ ঘাটতি বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাব হইতেছে। বিশ্বের আমদানী-রপ্তানীর গতি হইতে দেখা যায় যে, বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে কৃষিপ্রধান দেশগুলির রপ্তানী ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে, কিন্তু শিল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানী সেই তুলনায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের ১৯৫৮ সনের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে, জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ মোট ৪৮১ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানী করিয়াছে এবং ৬২৮ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানী করিয়াছে এবং মোট ঘাটতির পরিমাণ ১৪৭ কোটি টাকা হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে ২২২ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল। ঘাটতির পরিমাণ যদিও কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি ঘাটতি যে আরও বেশী হইবে বাকী দুই মাসের হিসাব ধরিয়া তাহা নিশ্চিত। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে চারিটি দেশ প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহারা যথাক্রমে ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান। ১৯৫৭ সনে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে ইহাদের অংশ ছিল যথাক্রমে—২৬·৬, ১·৫৬, ৪·১ এবং ৪·৫ শতাংশ। ১৯৫৬ সনের তুলনায় ১৯৫৭ সনে রপ্তানী বৃহৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে রপ্তানী বৃদ্ধি কতকগুলি কারণের দ্বারা সম্ভবপর, যথা, সমগ্র জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-বৃদ্ধি, (কৃষি, শিল্প, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি)। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি বিশিষ্ট দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি, যে গুলির জন্য আন্তর্জ্জাতিক বাজারে চাহিদা আছে। তৃতীয়তঃ, সাময়িক ভাবে আভ্যন্তরিক ভোগের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে যাহাতে রপ্তানীর জন্য অধিকতর পরিমাণে উদ্বৃত্ত থাকে।

ইহা ব্যতীত প্রতিযোগিতামূলক হারে মূল্যমানকে স্থির রাখিতে হইবে। মূল্যমান বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ রপ্তানী হ্রাস। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রয়োজন নূতন নূতন বৈদেশিক বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে সরকারী নীতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, যাহাতে রপ্তানী আরও অনুকূল ব্যবস্থায় সাহায্য লাভ করিতে পারে। ১৯৫৮ সনে ভারতের প্রধান প্রধান রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ আশানুরূপ হয় নি। সবচেয়ে দুর্দিন গিয়াছে মিলজাত বস্ত্রশিল্পের উপর দিয়া। মিল বস্ত্রের রপ্তানী হ্রাসের ফলে এই শিল্পে সঙ্কট দেখা দিয়াছে। পাটজাত দ্রব্যকে কঠিন বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ভারতের পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বেশী হওয়ার ফলে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না।

চা, যাহা বর্ত্তমানে ভারতের প্রধান রপ্তানী, তাহাকে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে। বর্ত্তমানে সিংহল ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় সস্তা ও উন্নততর চায়ের প্রতিযোগিতার ফলে ভারতীয় চা পৃথিবীর বাজার হইতে হটিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে। ভারতের খনিজ দ্রব্যের রপ্তানীর মধ্যে ম্যাঙ্গানিজই প্রধান। কিন্তু ব্রেজিলের সস্তা ম্যাঙ্গানিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের রপ্তানী হ্রাস পাইতেছে। অন্যান্য রপ্তানী দ্রব্য, যথা কাঁচা তুলা, বনস্পতি, কাঁচা চামড়া প্রভৃতিও নানা কারণে তাহাদের পূর্ব্বেকার শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখিতে পারিতেছে না।

ইয়োরোপের ছয়টি প্রধান দেশের সাধারণ বাজার গঠনের ফলে ভারতের রপ্তানী ব্যবসায় আর একটি সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ইয়োরোপের যে যে রাষ্ট্রগুলি এইরূপ অর্থনৈতিক সংযুক্তির মধ্যে আসিয়াছে তাহাদের নিকট হইতেই ভারতবর্ষ প্রধানতঃ মূলধন-জাতীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করে। ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যে যে ঘাটতি হয় তাহার প্রায় ৩০ শতাংশ ঘটে প্রধানতঃ ঐ সকল দেশের সঙ্গে। সুতরাং ইউরোপীয় সাধারণ বাজার সংগঠনের ফলে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ আরও হ্রাস পাইবে।

ভারতের আভ্যন্তরিক ক্ষেত্রেও রপ্তানী বাণিজ্যে কতকগুলি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ বিভিন্ন রপ্তানী দ্রব্যের উপর বহু প্রকার রপ্তানী শুল্ক ও ব্যবহারিক শুল্ক আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে এই সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির ফলেও দ্রব্যের মূল্য কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে রেল গাড়ীতে মালবহনের খরচও অত্যধিক এবং উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে বন্দরে মাল আনয়নের খরচ বেশী হওয়ায় ঐ সকল জিনিসের মূল্যও স্বভাবতঃই বেশী হয়।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের একটি প্রধান দোষ হইতেছে যে, মাল রপ্তানীর জন্য ভারতের নিজস্ব জাহাজের অভাব। ভারতের রপ্তানীর ৮০ শতাংশ বৈদেশিক জাহাজ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, এই সকল জাহাজ কোম্পানী অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ভাবে মাল চলাচলের ভাড়া দাবী করে। আর একটি অসুবিধা হইতেছে ভারতের নিজস্ব জাহাজের অভাবে প্রয়োজনীয় বিদেশের বন্দরে প্রত্যক্ষভাবে মাল রপ্তানী করার সুবিধা হয় না। বিভিন্ন দেশ কিংবা বন্দর দিয়া ঘুরাইয়া মাল পাঠাইতে হয় বলিয়া তাহাতে ব্যয় বেশী পড়ে এবং দ্রব্যমূল্য অধিক হয়।

বর্ত্তমানের আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে প্রাচ্যের কৃষি-প্রধান দেশগুলি রপ্তানী বাণিজ্যে নানা কারণে অসুবিধা ভোগ করিতেছে এবং ভারতের ক্ষেত্রেও তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। অনগ্রসর অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নয়নশীল ব্যবস্থার ফলে মূল্যমান দ্রুতহারে

বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য, সুতরাং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য স্বাভাবিক ভাবেই অধিক হইবে। এই অবস্থায় রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক বসান অনুচিত। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বহুদিন হইতেই দাবী করিয়া আসিতেছেন যাহাতে চা, পাটজাত দ্রব্য এবং মিলবস্ত্রের উপর হইতে রপ্তানী শুল্ক রহিত করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সে বিষয়ে দৃকপাত করেন নাই। বর্ত্তমানের বিশ্ব-প্রতিযোগিতার মধ্যে রপ্তানিজনিত আয়ই দেশের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করা উচিত, তাহার উপর রপ্তানী শুল্ক হইতে আয় করিবার চেষ্টা করিলে শেষকালে ক্ষতিই হয়, কারণ তাহাতে রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানী হ্রাস পায়।

ভারতীয় তাঁত-শিল্পের পুনরুজ্জীবন

কল-কারখানার চাপে পড়িয়া ভারতীয় তাঁত-শিল্প এতকাল নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। এই শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য জাতীয় সরকারের প্রথম প্রয়াস সুরু হইয়াছিল ১৯৫২ সনের শেষ দিকে। কিন্তু নানা কারণে ইহার কাজ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাঁতিরা বলে, ন্যায্য দরে সূতা, রঙ ও অন্যান্য উপকরণ তাহারা সংগ্রহ করিতে পারে না, তৈয়ারী মাল বেচিয়াও ন্যায্য দর পায় না। এদিকে উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য মূলধন নাই, আবার কাটতির অভাবে তৈয়ারী মালও পর্ব্বত প্রমাণ মজুত হইয়া আছে। অঞ্চল ভেদে দুরবস্থার অবশ্য তারতম্য ছিল তবে কোন রাজ্যেই তাঁতিরা নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় ছিল না। সেই দুদ্দিনে শ্রীরাজাগোপালাচারি সর্ব্বপ্রথম প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, কলে তৈয়ারী কাপড়ের উপর কর বসাইয়া সংগৃহীত টাকাটা তাঁত-শিল্প উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে হইবে। তখন ঐ প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আদৌ উৎসাহ ছিল না। বরং তৎকালীন শিল্প-বাণিজ্য সচিব, শ্রী টি. টি কৃষ্ণমাচারি অত্যন্ত তীব্রভাবে উহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তিনি জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত তাঁত শিল্প সম্ভায় দেশের কাপড়ের চাহিদা মিটাইতে কোন দিন পারিবে না। কিন্তু কয়েক মাস অতীত হইতে না হইতে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যার চাপে পড়িয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণধারগণ কেবলমাত্র প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন তাহা নহে, ক্রমে ক্রমে এই কার্য্যসূচীতে অধিকতর উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার পর ছয় বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য সংরক্ষণ সুবিধার পরিসর ও পরিমাণ অনেক অংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে সাহায্য-লাভের ফলে তাঁত শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ ও মান যেমন বাড়িয়াছে, তাঁতিদের আর্থিক অবস্থারও তেমনই উন্নতি ঘটিয়াছে।

১৯৫৩ সনে সমগ্র ভারতে ১৮০ কোটি গজ বস্ত্র তাঁতে উৎপন্ন হইত, আর দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ২২০ কোটি গজ বস্ত্র তৈয়ারি হইবে অনুমান করা যায়। সমগ্র ভারতে তাঁতের সংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ, আর এই শিল্পের মাধ্যমে প্রায় এক কোটি লোক রুজি-রোজগার সংগ্রহ করিয়া থাকে। গত ছয় বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইহার উন্নতির জন্য মোট ২২ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন—তাহার মধ্যে ১০ কোটি টাকা দান, অবশিষ্টাংশ কর্জ্জ। ন্যায্য দরে সূতা, রঙ, ও অন্যান্য উপকরণাদি সরবরাহ করা হইয়াছে, উন্নত বয়ন পদ্ধতি শিখাইবারও ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে কেবল এ দেশেই যে তাঁতের কাপড়ের কাটতি বাড়িয়াছে তাহা নহে, বিদেশেও ক্রমশঃ চাহিদা দেখা যাইতেছে।

কিন্তু এই শিল্পের আসল অবস্থা কি? পড়তা দরের উপর ৬ হইতে ১২ শতাংশ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া না দিলে তাঁতের কাপড় বিক্রয় করা সম্ভব হয় নাই। এই ছাড়ের টাকাটা আসিতেছে কোথা হইতে? কলের কাপড়ের ক্রেতারা অর্থাৎ জনসাধারণই এ বোঝা বহন করিতেছে। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের উপর এই অতিরিক্ত বোঝা চাপাইয়া দিয়া কোন শিল্পকে চিরদিন বাঁচাইয়া রাখা যায় না।

তাঁত শিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন আজ অনস্বীকার্য্য। কৃষির পরে ইহাই ভারতে লোক নিয়োগের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষেত্র, এই শিল্পে ভারতীয়দিগের দক্ষতা পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য দ্বারা সমৃদ্ধ, ব্যক্তিগত শিল্প-পটুতা ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগও এখানে অজস্র। তাঁত-শিল্প পুনরুজ্জীবনের মূল পরিকল্পনাতেই গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। সেগুলির সংশোধন ব্যতীত ইহার ভিত্তি দৃঢ় হইতে পারে না।

বিদেশে উৎকৃষ্ট তাঁত-শিল্পের কাপড় রপ্তানীতে যথেষ্ট আয়-বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে বিদেশী অর্থার্জ্জন, এই দুই কাজই সম্ভব দেখা যাইতেছে। এদিকে যথাযথ ব্যবস্থা, অর্থসাহায্য এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র-প্রস্তুতির জন্য কারিগরী নক্সা উৎপাদন ইত্যাদির সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করিলে রপ্তানী শতগুণ বাড়িতে পারে ও তাঁত-শিল্প স্বাবলম্বী হইতে পারে।

ভারতের পেট্রোলিয়াম শিল্প

সম্প্রতি দিল্লীতে পেট্রোল শিল্প সম্বন্ধে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, ঐ অধিবেশনে প্রাচ্যদেশগুলির পেট্রোল সম্পদ এবং তাহার উন্নয়ন সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে। ভারতে বর্ত্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষ টন পেট্রোল খরচা হয়, তাহার মধ্যে ভারতে উৎপাদন হয় মাত্র ৪ লক্ষ টন এবং ইহার সমস্তই প্রায় আসে আসামের ডিগবয় তৈলখনিসমূহ হইতে। ১৯৬১ সন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অপরিশ্রুত তৈল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরে ত্রিশ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে। তখন আসামের নাহোরকাটিয়া, হুগরীজান এবং মোরান তৈলখনিসমূহতে উৎপাদন সুরু হইবে। ভারতে বর্ত্তমানে পেট্রোল খরচের গতি হইতে অনুমিত হয় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে আভ্যন্তরিক প্রয়োজন মিটাইতে প্রায় সত্তর লক্ষ টন পেট্রোল বৎসরে লাগিবে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১'৪ কোটি টনে।

সুতরাং ভারত সরকারের প্রধান সমস্যা হইতেছে যে, কি করিয়া

পেট্রোলের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে সমতা রক্ষা করা যায়। ভারতের নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে ১৯৭৬ সনে পেট্রোল আমদানীর জন্য বৎসরে ৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে। ভারতের তৈলশিল্পে বর্ত্তমানে ২৪৪ কোটি টাকা মূলধন হিসাবে নিয়োজিত আছে, ইহার মধ্যে ২১৪ কোটি টাকা বৈদেশিক মূলধন এবং বাকী ৩০ কোটি টাকা ভারতীয় মূলধন। সরকারীক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার দুইটি পরিশোধন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের মাধ্যমে অধিকতর ভারতীয় মূলধন তৈলশিল্পে নিয়োগ করিতেছেন। ভারতে তৈল অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ষ্টাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম তৈল কোম্পানীর সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন তাহাতে এক-চতুর্থাংশ অংশ আছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রধানতঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বঙ্গোপসাগর এলাকায় তৈলের অনুসন্ধান করা হইবে। নাহোরকাটিয়া এলাকায় তৈল উৎপাদনের জন্য আসাম তৈল কোম্পানীর সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকার যে সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের তেত্রিশ এক-তৃতীয়াংশ আছে।

ভারতবর্ষে প্রায় ৪ লক্ষ একর মাইল জুড়িয়া তৈল এলাকা বিস্তৃত আছে। এদেশের আভ্যন্তরিক চাহিদা বৎসরে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষে ডিগবয় তৈলখনি ব্যতীত নূতন যে তিনটি পরিশোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে তাহারা সকলেই আমদানী-করা তৈল পরিশোধনের জন্য ব্যবহার করে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে তৈল পরিশোধিত হইলেও বহু টাকার অন্যান্য পেট্রোল-জাত দ্রব্য এখনও ভারতবর্ষকে আমদানী করিতে হয় এবং ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে কারখানা তৈলাক্তকরণের জন্য তৈল। আসামের নাহোরকাটিয়া এলাকায় যে ৩০ লক্ষ টন অপরিস্রুত তৈল বৎসরে উৎপাদিত হইবে তাহা দুইটি সরকারী পরিশোধনাগারে শোধিত হইবে। এই দুইটি পরিশোধনাগারের মধ্যে একটি স্থাপিত হইবে গৌহাটিতে এবং অপরটি হইবে বিহারের ব্যারণীতে। একটি ১৯৬১ সনে এবং অপরটি ১৯৬২ সন হইতে কার্য্য সুরু করিবে।

কিন্তু সম্প্রতি তৈল আমদানীর জন্য ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষার সুরাহা কিছু হইবে না, কারণ যে দ্রুতহারে আভ্যন্তরিক চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে তৈল আমদানী করিতে বাধ্য হইতেছে। তবে সুখের বিষয় যে, ভারতের আরও অন্যান্য জায়গায় তৈলখনি আবিস্কৃত হইতেছে। যেমন পঞ্জাবের জাওয়ালামুখীতে এবং বরোদার ক্যাম্বে এলাকায়। তবে অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহাদের মজুতের পরিমাণ এখনও সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই। বর্ত্তমানে ভারতে যে তৈল উৎপাদিত হয় তাহা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ০·০৫ শতাংশ মাত্র। পৃথিবীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই তৈল উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে; ইহার দৈনিক উৎপাদন ৬৭ লক্ষ ব্যারেল। ইহার পরে আসে ভেনিজুয়েলা যাহার দৈনিক উৎপাদন ২১ লক্ষ ব্যারেল। মধ্যপ্রাচ্যে কোয়াতের দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ ১১ লক্ষ ব্যারেল, আরবের উৎপাদন দৈনিক সাড়ে নয় লক্ষ ব্যারেল, ইরাকের ৬·৯ লক্ষ ব্যারেল এবং ইরাণের ৩·২ লক্ষ ব্যারেল। সেই তুলনায় ভারতের দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ৮ হাজার ব্যারেল অপরিশোধিত তৈল। ভারতবর্ষে কেরোসিন, ডিসেল, কারখানার তৈল, এরোপ্লেনের তৈল, বিটুমেন প্রভৃতির যথেষ্ট অভাব আছে।

ভারতের তটসন্নিকটে সমুদ্র এলাকায় তৈলখনি নিমজ্জিত আছে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। বিশেষতঃ, দক্ষিণ-ভারতের তাঞ্জোরের নিকটে সমুদ্র এলাকায় এবং বঙ্গোপসাগরে। সমুদ্র এলাকায় অনুসন্ধানের জন্য ভূতাত্বিক এবং প্রাকৃত-ভৌগোলিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। সমুদ্রের উপর লৌহদ্বীপ প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমুদ্রতল খনন করিতে হইবে। সম্প্রতি মেক্সিকো দেশের সমুদ্র এলাকায় তৈল নিষ্কাষণের জন্য একটি এক মাইলব্যাপী দ্বীপ সৃষ্টি করা হইয়াছে। আণবিক শক্তির দ্বারা সমুদ্র এলাকায় তৈল নিষ্কাষণের প্রচেষ্টা করা হইতেছে। ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে প্রায় একশত কোটি টাকার পেট্রোল বিদেশ হইতে আমদানী করে। নাহোরকাটিয়া এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহার ফলে বাৎসরিক দশ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়া যাইবে।

১৯৭৫ সন নাগাদ ভারতের আভ্যন্তরিক প্রয়োজন প্রায় পাঁচ কোটি টনে দাঁড়াইবে। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বহু টাকা খরচ করিতে হইবে। আগামী পনর-বিশ বৎসরে ভারতবর্ষ যদি তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করিতে পারে তাহা হইলে অদূরভবিষ্যতে ভারতবর্ষ তৈল উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে পারে। পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু এলাকাকে পশ্চিম পঞ্জাবের তৈল এলাকার বিস্তৃতি বলিয়া ধরা হয়। এইসকল এলাকার কোন কোন অংশ পারস্যের তৈলখনির ভৌগোলিক গঠনের সামিল। জাওয়ালামুখী অঞ্চল এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত; এখানে পেট্রোল ব্যতীত যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাসের অবস্থান আছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ক্যাম্বে-কাচ্ছ এলাকায় প্রচুর তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দক্ষিণ-ভারতে কেরালা এবং কাবেরী নদীর অঞ্চলে তৈলস্তর আছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

এবারে নয়াদিল্লীতে যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৬তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে শ্রীনেহরু একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিজ্ঞান আজ মানুষের সম্মুখে অসীম শক্তির ঐশ্বর্য্য আনিয়া দিয়াছে। মানুষকে প্রভূত ক্ষমতার উত্তরাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইচ্ছা করিলে মানুষ আজ সকলকে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়া দিতে পারে। আবার ইচ্ছা করিলে সমগ্র মানুষকে নির্ম্মমভাবে ধ্বংস করিতেও পারে। কাজেই বিজ্ঞান আজ এক হাতে সুধাপাত্র এবং অপর হাতে বিষপাত্র লইয়া দেখা দিয়াছে। মানুষ ইহার কোন্‌টা লইবে তা নির্ভর করিতেছে তাহার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানসিক প্রবণতার উপর। পৃথিবীর রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, মানুষের শুভবুদ্ধি আজ অনেকটাই কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। মানুষ যেন আজ ধ্বংসের নেশাতেই মাতিয়াছে। আজিকার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাপন রীতির বহির্মুখিতা, ভোগ-সর্ব্বস্বতা জীবনের

শুচিতা ও মহৎ মূল্যমান সম্বন্ধে প্রগাঢ় ঔদাসীন্য, মানুষকে ক্রমেই তাহার মানবিক মহিমা-ভ্রষ্ট করিতেছে। এই পটভূমিতে মানুষ চন্দ্রলোকে হানা দিয়া কি করিবে? সেখানে ত আর মানুষ বাস করিতে যাইবে না—তাহাকে থাকিতে হইবে পৃথিবীর মাটি আঁকড়াইয়াই এবং এই মাটি যাহাতে সুস্থ, সুন্দর, সমুন্নত জীবনধারণের সম্পূর্ণ উপযোগী হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। এবং এইজন্যই বিজ্ঞানের শক্তিকে জাগাইয়া ও তাহার সেই শক্তিকে শান্তি ও কল্যাণের পথে চালিত করিয়া সার্থক মনুষ্যত্বের পথে আগাইয়া যাইতে হইবে। এই চেতনা সঞ্জীবিত করিবার দায়িত্বই আজ বিজ্ঞানীদের।

সভাপতি ডাঃ মুদালিয়ার যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম হইল: দারিদ্র্যকে জয় করিতে হইবে এবং তাহা করিবার উপায় বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ। পথ-ঘাট, যানবাহন, আলো, জল, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, কারখানা এককথায় বিজ্ঞান-সৃষ্ট সমস্ত আধুনিক উপকরণ আনিয়া সামাজিক অনগ্রসরতা ঘুচাইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, ভাবাশ্রিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আনিয়া তাহার স্থানে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে।

কিন্তু ইহাই কি সব? ছেলেমেয়েদের শুধু দলে দলে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা শিখাইলেই হইবে না। কারণ শুধু ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা লাভই মানুষের পক্ষে পরমার্থ নয়। দুই-ই চাই—ইহার ঊর্ধ্বে উঠিয়া মনুষ্যত্বও তাহাদের অর্জন করিতে হইবে। আর সেজন্য সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাসের চর্চাও চাই। যুগ-ধর্মের বিপাকে এদিকের বিদ্যাগুলির কাঞ্চনমূল্য আজ কমিয়াছে, তাই তথাকথিত উদারনৈতিক শিক্ষাকে আজ অনেকেই অকুলীন ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা মূঢ়তা এবং এই মূঢ়তার ফলেই বিজ্ঞান আজ মানুষের হাতে চক্ষু-কর্ণবিহীন বিশাল শক্তির অধিকারী দৈত্য হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন। বিজ্ঞানসভায় একথাও বলা হইয়াছে।

শিল্পের অগ্রগতির পথে বাধা

জাতির সংস্কৃতির সঙ্গে শিল্পের প্রসার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু জাতীয় অগ্রগতির পথে শিল্প-উদ্যোগ বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এই শিল্পের প্রসারের দিকে সরকার এবার দৃষ্টি দিয়াছেন। কিন্তু উদ্যোগের গতি ত্বরান্বিত করিতে হইলে যে পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ। পরস্পরের কাজের মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠানই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

শুনা যাইতেছে, সরকার একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া তিন পক্ষের সম্মিলিত চেষ্টায় অর্থাৎ সরকার, শ্রমিক ও মালিক সকলে মিলিয়া একটি বুঝা করিবার চেষ্টা করিবেন।

বিষয়টি জাতীয় উন্নতির স্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে শ্রমিকগণের কর্মদক্ষতার অভাব এবং উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মালিকের পক্ষ হইতে বিবিধ অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। অপর পক্ষে সুযোগ-সুবিধার অভাব, স্বল্প বেতন, ছাঁটাই ইত্যাদি অভিযোগও পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। ইহার সামঞ্জস্য কি ভাবে করা যাইতে পারে সেই হইতেছে প্রশ্ন। পারস্পরিক বিরূপ মনোভাব লইয়া কোন কাজই অগ্রসর হইতে পারে না। দরকার উভয়ের শুভবুদ্ধি এবং সহানুভূতি-পূর্ণ মনোভাব। সরকার পক্ষই হন, কিংবা শ্রমিক বা মালিক পক্ষই হন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও জাতীয় স্বার্থের প্রতি সকলের সমান লক্ষ্য না থাকিলে কোন সিদ্ধান্তেই আসা সম্ভব হইবে না। অর্থ নৈতিক অসামঞ্জস্য, ন্যূনতম প্রয়োজনে উপেক্ষা শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া দিতেছে। ইহা বুঝিয়াও, সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে এরূপ অপঘাত বাঞ্ছনীয় নহে।

পুস্তকের উপর বিক্রয়কর

পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক ব্যবসায় বর্তমানে চরম সঙ্কটের মধ্যদিয়া চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া বিক্রয়করের চাপে বাঙালী ব্যবসায়িগণ ক্রমশঃ কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছেন। রাজ্য সরকার পুস্তকের উপর বিক্রয়-কর চালু রাখায় ব্যবসায়ে যে কেবল মন্দাই দেখা দিয়াছে তাহা নয়, এখান হইতে ইহা সরিয়া গিয়া ভারতের বিক্রয়-কর-মুক্ত প্রদেশসমূহে প্রসারলাভ করিতেছে। এ সম্বন্ধে একাধিক পুস্তক ব্যবসায়ী মন্তব্য করিয়াছেন যে, অবিলম্বে পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয়-কর তুলিয়া না দিলে বাঙালী পুস্তক ব্যবসায়িগণ অন্যান্য রাজ্যের পুস্তক ব্যবসায়ীদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। তাঁহারা এই অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্যবসায়ের পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকার কেবল যে বিক্রয়-কর হইতেই বঞ্চিত হইবেন তাহা নহে, আয়কর বাবদও তাঁহারা কম রাজস্ব পাইবেন। পুস্তক ব্যবসায়িগণ যে সকল অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন, তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের পুস্তক ব্যবসায় প্রধানতঃ তিন দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। প্রথমতঃ বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার অ-রেজেস্ট্রীকৃত দোকানগুলি পশ্চিমবঙ্গ হইতে পুস্তক ক্রয় করা কমাইয়া দিয়াছেন। কারণ এখান হইতে বই কিনিতে হইলে তাহাদিগকে শতকরা সাত টাকা কেন্দ্রীয় বিক্রয়-কর দিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ যে সকল রাজ্যে বিক্রয়-কর নাই, সেই সকল রাজ্যের রেজেস্ট্রীকৃত ব্যবসায়িগণ পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশকদের নিকট হইতে পুস্তক খরিদ করিয়া বিক্রয়-কর ছাড়া তাহাদের খরিদ্দারদের নিকট বিক্রয় করিতেছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গেরই কোন লোক যদি বোম্বাই বা অন্য কোন বিক্রয়-করমুক্ত রাজ্য হইতে পুস্তক ক্রয় করে তবে তাহাকেও কর দিতে হয় না। ডাক মাশুল কলিকাতা হইতে কিনিলেও যা, বাহির হইতে কিনিলেও একই পড়ে বলিয়া জানা গিয়াছে।

তৃতীয়তঃ একাধিক পুস্তক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভারতের অন্যান্য স্থানে শাখা স্থাপন করিয়া ঐ সকল শাখা মারফৎ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয়-কর না লইয়া পুস্তক

সরবরাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই নূতন পরিস্থিতিতে পুস্তক-ব্যবসায়িগণ বিশেষ আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।

পুস্তক ব্যবসায়ে এই সাময়িক মন্দার ফলে রাজ্য সরকারও প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। ব্যবসায় পূর্ণোদ্যমে চলিলে তাঁহারা যে পরিমাণ আয়কর লাভ করিতে পারিতেন, বর্ত্তমানে তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইতেছেন। বিক্রয় ও আয় উভয় প্রকার করের পরিমাণই সাম্প্রতিককালে বিশেষ কমিয়া গিয়াছে।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, অন্ধ্র, মহীশূর এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া, ভারতের আর কোন রাজ্যে পুস্তকের উপর কোনরূপ কর নাই। এই রাজ্যগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনদিনই প্রতিযোগী সম্বন্ধ ছিল না, আজও নাই। বোম্বাই, মাদ্রাজ সকলেই পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয়-কর উঠাইয়া লইয়াছেন। প্রতিযোগিতার বাজারে আজ একা পশ্চিমবঙ্গই পড়িয়া গিয়াছে এবং সকল রকমে কোণঠাসা হইয়া পড়িতেছে।

ইহা অতীব দুঃখের কথা! সংস্কৃতি রক্ষার দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই দিকে বিশেষ অবহিত হওয়া দরকার। বোম্বাই সরকার মাদক নিষেধ করিয়া আবগারী রাজস্ব খাতে প্রায় দেড় কোটি টাকা ছাড়িয়া দিয়াও যদি পুস্তক ও মাসিক পত্রিকার বিক্রয়-কর ছাড়িতে পারেন তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে কোন যুক্তি আছে ইহা চালু রাখার সপক্ষে?

বিদেশীর প্রতি দুর্ব্যবহার

পাটনা হইতে প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ান নেশন" পত্রিকায় ৭ই জানুয়ারী যে সংবাদটি বাহির হইয়াছে তাহা যেমনই দুঃখের তেমনই লজ্জার। একজন জার্মান ভ্রমণকারীর প্রতি পাটনা ষ্টেশনে অনুষ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাহিনী যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। প্রকাশ যে, ভদ্রলোকটির ব্যাগ ট্রেণে খোয়া যায় এবং সঙ্গে অধিক অর্থ না থাকায় তিনি পুনরায় টিকিট করিতে না পারায় চেকারকে তাঁহার পাসপোর্ট দেখান ও বিষয়টি জার্মান দূতাবাসে জানাইতে এবং তথা হইতে ভাড়ার টাকা লইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এ অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার উপর নাকি অকথ্য অত্যাচার করা হয় এবং দিনাপুর ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আপিসে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেখানেও নাকি তিনি নির্য্যাতিত হন। অবশেষে নিম্নবর্গের কর্ম্মচারীরা চাঁদা তুলিয়া তাঁহার ভাড়ার টাকা চুকাইয়া দিলে তিনি অব্যাহতি পান। ঘটনাটি সত্য হইলে, ইহা শুধু দুঃখজনক নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষে লজ্জাজনকও। একজন বিদেশী ভদ্রলোক আমাদের দেশে বেড়াইতে আসিয়া যে অভিজ্ঞতা লইয়া গেলেন, সমগ্র জাতির সম্মানকেই কি তাহা নিদারুণভাবে আহত করিল না? বিদেশে মানুষের প্রতি সৌজন্য, প্রীতি ও শিষ্টাচার প্রদর্শনই সমস্ত সভ্য জাতির বৈশিষ্ট্য। বিদেশে বিপাকে পড়িয়া বহু ব্যক্তি প্রভূত সাহায্য পাইয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ভারতও চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ক্রমশঃ আমাদের ধরন-ধারণ যদি এমন অধঃপতনের স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইলে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। পুলিস, ডাকঘর, রেলপথ, হাসপাতাল প্রভৃতি জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের আচরণবিধি সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষাদানের এবং তাহার ব্যতিক্রম হইলে উপযুক্ত দণ্ডদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

কংগ্রেসের সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী

বিনা বাধায় শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নাগপুর কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত ঢেবরের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইবার পরে যখন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধীকে সেই পদে নিয়োগের কথা উঠে, তখনই বুঝা গিয়াছিল যে, উহাই অবধারিত সিদ্ধান্ত। তথাপি নির্ব্বাচনের একটি সাধারণ রীতি থাকে, সে রীতি যথাযথভাবে পালিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে একজন এবং রাজস্থান হইতে একজন মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য তাঁহারা মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। যদিও আসাম হইতে কোন মনোনয়ন পত্র প্রেরণ করা হয় নাই, তথাপি শ্রীযুক্তা গান্ধীর নির্ব্বাচন প্রায় সব কংগ্রেস প্রদেশ সম্মত নির্ব্বাচন বলা চলে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহরুর কন্যা বলিয়া এই ব্যাপারে কোন কোন মহলে যে সঙ্কোচ বা বিসদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল ইহাতে তাহার অবসান হইল।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নেহরু ছয়বার এবং শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী এই প্রথমবার সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর। কংগ্রেসে নবীনদের ক্ষমতা নিয়োগের জন্য যাঁহারা আগ্রহান্বিত, তাঁহারা শ্রীযুক্তা ইন্দিরার নেতৃত্বে খুশী হইবেন।

পাকিস্থানে অসহায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

"যুগশক্তি" জানাইতেছেন:

"সামরিক শাসন চালু হওয়ার পর পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নানা নূতন বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতেছেন বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত সংবাদে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পাকিস্থানে হিন্দুদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই দুঃসাধ্য। এদিকে ভারতের সহিত যোগসূত্রও ছিন্ন। তাহাদের নূতন পাসপোর্ট মঞ্জুর করা হয় না—এমনকি যাহাদের পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের পুনরায় পাসপোর্ট দেওয়াও বন্ধ। প্রকাশ যে, একমাত্র শ্রীহট্ট জেলায়ই ৭০ হাজার (সমগ্র পূর্ব্ব-পাকিস্থানে কয়েক লক্ষ) পাসপোর্ট পাকিস্থান সরকার আটক করিয়া রাখিয়াছেন। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কড়াকড়িও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে পাকিস্থানের হিন্দুর পক্ষে ভারতে আগমন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতেছে।"

"জানা গিয়াছে যে, পাকিস্থান হইতে যাহারা মাইগ্রেশন

সার্টিফিকেট নিয়া ভারতে আসিতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে অনেক কাগজপত্র দাখিল করিতে হয়—এবং মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট পাইতে হইলে দলিলাদি প্রদর্শন করিয়া প্রমাণ করিতে হয় যে, ভারতে নিজের জমিজমা রহিয়াছে—অথবা ভারতীয় নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিয়া দেখাইতে হয় যে, পাকিস্থানত্যাগকারীর পুত্র বা ভ্রাতা কেহ না কেহ ভারতে চাকুরীতে নিযুক্ত রহিয়াছেন।"

এদিকে ভারতের পক্ষেও মুক্তদ্বার হইয়া থাকা সম্ভব নহে। কেন না সে অবস্থায় পাকিস্থানি নীতি কোন দিনই পরিবর্ত্তিত হইবে না। এই কড়াকড়ির পূর্ব্বে পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের সকলের স্বাবলম্বী হওয়ার সুবুদ্ধি যতদিন না হয় ততদিন নূতন বোঝা লওয়ার ক্ষমতা ভারতের নাই। উপায় কি তবে?

চাউলের ব্যবস্থায় সরকার

আজকের দিনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হইতেছে খাদ্য-সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও মাথা খুঁড়িয়া এক কণা চাউল ন্যায্য মূল্যে পাইবার উপায় নাই। অথচ দুই মাস পূর্ব্বেও বাজারে প্রচুর পরিমাণে চাউল ছিল। দুঃস্থ বাঙালী কেরাণী পঁয়ত্রিশ টাকা মণ দরেও অসহায়ের মত চাউল কিনিয়া খাইয়াছে। ইহার পর সরকার নির্দ্ধারিত দর বাঁধিয়া দিলেন—আশ্বাস দিলেন, আর চাউলের অভাব হইবে না। কিন্তু ইহার পরই অতি আশ্চর্য্যজনক ভাবে বাজার হইতে চাউল উধাও হইয়া গেল! এই অন্তর্দ্ধান-রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। চীৎকার উঠিয়াছে, বিধান পরিষদেও তর্ক চলিয়াছে, কিন্তু উত্তরে তাঁহারা সব কথাই বলিতেছেন, চাউল-প্রাপ্তির কথা কৌশলে এড়াইয়া যাইতেছেন। শেষে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হইয়া খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন অসহিষ্ণুর মত উত্তর দিয়া বসিলেন, "লোকে কি না খাইয়া মরিয়া যাইতেছে?"

মন্বন্তরের আশঙ্কা অবশ্য আমরা করি না। কিন্তু ইহাই বা কিরূপ কথা?

ফলনে কত কম পড়িল, আমদানীতেই বা কত—কত ধানে কত চাল, এই সব পরিসংখ্যাতত্ত্বে সাধারণের আর বিশ্বাস নাই। তাহারা চাহিতেছে চাউল। সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "নির্দ্ধারিত দরের চেয়ে বেশী দিয়া খোলা বাজারে চাউল কিনিও না।" কিন্তু তাহারা খাইবে কি ইহা বলেন নাই।

সরকার 'মডিফাইড' রেশন-কেন্দ্রগুলি হইতে অধিকতর পরিমাণে চাউল সরবরাহ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিতে চাহেন। কিন্তু ঐ ব্যবস্থা সর্ব্বত্র চালু করা অসম্ভব। কারণ, রাজ্যের সকল স্থানে প্রয়োজনানুরূপ চাউল সরবরাহ করিতে হইলে যে ব্যাপক বিলিব্যবস্থা ও সংগঠনের প্রয়োজন তাহা সরকারের আয়ত্তের মধ্যে আনা ক্ষমতার বাহিরে। এখন দেখিতেছি, ফাইলের পর ফাইল, কন্ট্রোলের পর কন্ট্রোল, আইনের পর আইন, সংখ্যাতত্ত্বের উপর আরও সংখ্যার পাহাড়।

ইহা পৃথিবীর যে-কোন রাষ্ট্রের পক্ষে অগৌরবের কথা। সরকারের আশ্বাস-বাণী নিয়ত বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু খালি পেটে বাণী শুনিবার মত ধৈর্য্য জনসাধারণ আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আজকাল পুলিসি-তৎপরতা অবশ্য লক্ষ্য করা যাইতেছে—তাহারা চুনাপুঁটি ব্যবসাদারদের ঘর হইতে মজুত চাউল উদ্ধার করিয়া খাদ্যের আর একমাত্রা বাড়াইয়া চলিয়াছে। আসল রুই-কাৎলা গভীর জলেই আনন্দে বিচরণ করিতেছে। পুলিস সে জল ঘোলাইতে সাহস করে না। সরকারের অক্ষমতা এদিক দিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে।

ঘুষ প্রসঙ্গে বর্ত্তমান ভারত

ঘুষ কথাটির সঙ্গে আজকাল সকলেই পরিচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বোধ হয় ইহার চলন এতটা ব্যাপক হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার এই ঘুষ ও দুর্নীতি দূর করিবার কথা বহুবার বহুভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ব্যাপক প্রসার বন্ধ করিবার চেষ্টা সেরূপ হয় নাই। আইনে বলা হইয়াছে যে ঘুষ দেওয়া এবং লওয়া সমান অপরাধ এবং উভয়েই দণ্ডনীয়।

পার্লামেণ্ট সদস্য আচার্য্য কৃপালনী লোকসভায় বলিয়াছেন যে, তিনি একটি ব্যাপারে ঘুষ দিয়াছেন। তাহার কারণস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, গান্ধী আশ্রম অনেক বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় রেশম তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। এই কেন্দ্রটিকে বাসোয়া নামক ক্ষুদ্র ষ্টেশন হইতে সমগ্র ভারতে রেশম পাঠাইতে হয়। কোন একটা ছুতায় হয় এই পণ্য গ্রহণ করা হয় না, অথবা মাল গ্রহণে এত বিলম্ব করা হয় যখন জিনিস-গুলি খারাপ হইয়া যায়। ইহার জন্য আশ্রমের অনেক সময় হাজার টাকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। সভার সদস্যগণ সম্ভবতঃ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, দরিদ্রের কর্ম্মসংস্থান ও মজুরী-দানকারী এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার টাকা লোকসান বাঁচাইবার জন্য আশ্রমের ডিরেক্টর হিসাবে তাঁহাকে রেল-কর্ম্মচারীদের প্রচলিত কয়েক টাকা ঘুষ দিবার জন্য নির্দ্দেশ দিতে হইয়াছে। আচার্য্য কৃপালনী বলেন, তিনি যখন এই নির্দ্দেশ দেন তখন অডিট আপত্তি করিবে বলিয়া তাঁহাকে জানান হয়। ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে, এই ব্যয় তিনি অনুমোদন করিবেন এবং অন্যান্য ফলাফলের জন্য তিনিই দায়ী থাকিবেন। প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতির জন্য জনসেবীদেরও এই অসহায় অবস্থায় পড়িতে হয়। আশ্চর্য্যের কথা, সংবাদপত্রে অথবা প্রচারপত্রে এই দুর্নীতির কথা প্রকাশ হইলেও নিজেদের সম্মান-রক্ষার্থে এই সব অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গৃহীত হয় না।

সঙ্গোপনে ঘুষ হিসাবে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা বাহিরে প্রকাশ করা যায় না। তথাপি আচার্য্য কৃপালনী ঘুষ দিবার সকল দায়িত্ব নিজের উপর লইয়া, কেন ঘুষ দিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহা অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন। কেন লোকে ঘুষ দেয় বা দিতে বাধ্য হয়, তাহার মর্ম্মকথা তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এবং অতি দুঃখের সঙ্গেই তিনি ইহাও বলিয়াছেন, হাজার হাজার টাকা লোকসান এড়াইবার জন্যই তিনি গান্ধী আশ্রমের পরিচালক হইয়াও ঘুষ দিবার নির্দ্দেশ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আচার্য্য কৃপালনী শুধু রেল-বিভাগের একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু প্রায় সকল বিভাগেই এই একই অবস্থা।

সরকার যাঁহাদিগকে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা যদি সৎ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ কর্ম্মচারী না হন, কিংবা ঘুষ না দিলে ক্রমাগত হয়রাণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে জনসাধারণ কি করিতে পারে? কয়েক ঝুড়ি কমলালেবু লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া উহা বুক করিতে যদি দুই দিন কাটিয়া যায়, তাহা হইলে মাল-প্রেরকের অবস্থা কি হইতে পারে? সরকারী লাইসেন্স, পারমিট, টেণ্ডার ইত্যাদিতে ঘুষের অবাধ প্রভাব চলিতেছে ইহা কে না জানে? বিল মঞ্জুর করিতে, মঞ্জুরীর পরে পাওনা টাকা আদায় করিতে ঘাটে ঘাটে কত স্থানে যে কত প্রণামী, সেলামী, বখশিস বা পান খাইতে দিতে হয় তাহার খবর সরকারও যে না জানেন এমন নয়।

আমরা ত মনে করি, ঘুষ বা দুর্নীতি দমনে জনসাধারণের দায়িত্ব অপেক্ষা সরকারী দায়িত্ব অনেক বেশী। কিন্তু যে দেশের সরকারই ব্যাধিগ্রস্ত, সে দেশের দুর্নীতির রোগ নিরাময় হইবে কোন্ উপায়ে?

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচী সমস্যা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে যে জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে তাহা সত্যই ভয়াবহ। বর্ত্তমানে শিক্ষা কোন্ পথে যাইতেছে এবং কি-ই বা ইহার পরিণাম তাহা বুঝা শক্ত।

বাঁকুড়ার 'হিন্দুবাণী'তে যে সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, যদি ঐ ত্রুটিগুলি সত্যই থাকে তবে তাহার প্রতিকার বাঞ্ছনীয়:

"মাধ্যমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পর্ষদ দশ ও এগার শ্রেণী বিশিষ্ট দ্বিবিধ বিদ্যালয় যুগপৎ পরিচালনার পরিকল্পনা নিয়ে উভয়ের জন্য যে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম গ্রহণ করেছেন তাতে ছাত্রছাত্রীগণের বিবিধ অসুবিধার কথা চিন্তা করে অনেকেরই মনে পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে গভীর সন্দেহ এসেছে। একবিধ বিদ্যালয় থেকে Transfer নিয়ে অন্যবিধ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া পাঠ্য বিষয়ের দিকে চিন্তা করিলে প্রায় অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হয়েছে অথচ বিবিধ কারণে ছাত্রগণের বিদ্যালয় পরিবর্ত্তন করা অনেক সময় অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে।

"একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে মাত্র একটি শ্রেণী বেশী আছে, কিন্তু পাঠ্যসূচীর এত পার্থক্য যে দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মাধ্যমে যে সমস্ত ছাত্র তৈরী হবে তাদের যোগ্যতা ভিন্নরূপে হতে বাধ্য। নিম্নের কয়েকটি পাঠ্যক্রমের ভিন্নতা দেখলেই তা স্পষ্ট হবে।

"দুই স্কুলে ইংরেজী পাঠ্যসূচী সম্পূর্ণ পৃথক। এগার শ্রেণীর স্কুল থেকে যারা কলেজে যাবে তারা কলেজে এক বৎসর কম পড়বে এবং কলেজে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট সাহিত্য থেকে ইংরেজী পড়া তারা প্রথম সুরু করবে অথচ স্কুলে তাদের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক থাকবে না! দশ শ্রেণীর স্কুলের ছাত্র কলেজে এক বৎসর বেশী পড়বে এবং স্কুল থেকেই তাদের নির্দ্দিষ্ট ইংরেজী সাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে হবে। এগার শ্রেণী বিশিষ্ট স্কুলের ছাত্রগণকে ইংরেজীতে পর্ষদের পরীক্ষা দিতে হবে না। এতে ভাষাজ্ঞানের তারতম্য না হয়ে পারবে না। দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত এক রেখে একাদশ শ্রেণীতে ভিন্ন ব্যবস্থায় আপত্তি নাই কারণ এক স্কুল থেকে সেখানে অন্য স্কুলে Transfer-এর প্রশ্ন থাকছে না।

"দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক গণিতের চেয়ে একাদশ শ্রেণীর বাধ্যতামূলক গণিত অনেক কম। এ ছাড়া দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পর্ষদের গণিত পরীক্ষা দিতে হবে, একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এ পরীক্ষা দিতে হবে না। আবার একাদশ শ্রেণীতে যে ছাত্র বিজ্ঞান বিভাগে যাবে তাদের গণিতে পাটীগণিত থাকবে না; ফলে প্রথম থেকেই এদের পাটীগণিতের জটিল সমস্যার ভিতর প্রবেশ করার প্রয়োজন থাকবে না। এতে পাটীগণিত শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হবে না কি?

"দশ শ্রেণীর স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও পর্ষদের পরীক্ষা আছে, কিন্তু একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ে ষষ্ঠশ্রেণী থেকেই হিন্দী অথবা সংস্কৃত পড়তে হবে। তাও পর্ষদের পরীক্ষা দিতে হবে না। সংস্কৃত ও হিন্দী অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক থাকা উচিত।

"ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান একাদশ শ্রেণীর স্কুলে বরং কিছু আছে, কিন্তু ভূগোলের কিছুই নাই বললেও চলে; প্রাকৃতিক ভূগোল গণিত ভূগোল এদের পড়তেই হবে না। সেজন্য এ বিষয়-গুলিতে দশ শ্রেণীযুক্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ অভিজ্ঞ হবে, কিন্তু একাদশ শ্রেণীর স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ একেবারেই অজ্ঞ থাকবে।

"দশম শ্রেণীর বাধ্যতামূলক বিজ্ঞানে ও একাদশ শ্রেণীর বাধ্যতা-মূলক বিজ্ঞানের পাঠ্যে প্রচুর পার্থক্যেরই বা কারণ কি?

"তা ছাড়া যে বিষয়গুলি একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ঘরোয়া পরীক্ষায় শেষ হবে ছাত্রছাত্রীগণ সেগুলি ভাল ভাবে পড়বে কি? পাস করলেই ত হ'ল? এতে নানা স্কুলে নানা ভাবে ছেলে-মেয়েদের জ্ঞানের বেশ তফাৎ থেকে যাবে।

"উল্লিখিত সমস্ত কারণে আমাদের বিশেষ অনুরোধ দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত উভয়বিধ স্কুলের যতটা সম্ভব সামঞ্জস্য করা বিধেয় নতুবা শিক্ষায় বিপর্য্যয় ঘটবার সম্ভাবনা।"

বাঁকুড়া সদর হাসপাতাল

হাসপাতাল সম্বন্ধে অভিযোগ আজকাল প্রায়ই শোনা যাইতেছে। ইহাকে মানুষের কল্যাণের কাজে না লাগাইয়া যাহারা স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজিতেছে তাহারা মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক। অথচ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এরূপ ছিল না। যদিও ভারতের আদর্শানুযায়ী ইহা হইবার কথা নয়। কলিকাতার অবস্থাই যখন এইরূপ তখন সুদূর মফঃস্বলে কি অবস্থা হইয়াছে তা সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি 'হিন্দুবাণী' বাঁকুড়া সদর হাসপাতালের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যতম কর্ত্তা (এসোসিয়েট ডিরেক্টর) কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী আসিয়া বাঁকুড়া সদর হাসপাতালটি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কর্ণেল চ্যাটার্জ্জীর হাসপাতাল পরিদর্শনে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা পীড়া দিয়াছে হাসপাতালের অপরিচ্ছন্নতা। আমরা বহুবার বলিয়াছি এই হাসপাতালের গৃহগুলির সংস্কার সাধন প্রয়োজন এবং এখানের শৌচাগার, স্নানের জল প্রভৃতি বিষয়ে চরম অব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু স্থানীয় এম, এল, এ, তথা স্বাস্থ্য-রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় কর্ণপাত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। আরও দুঃখের বিষয় যে, ইতিপূর্ব্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বয়ং কয়েকবার হাসপাতাল পরিদর্শন করা সত্ত্বেও এ সমস্ত বিষয়ে নজর দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

"সদর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডি, এম, ও, শ্রীসেন গু নিজে ভাল সার্জ্জেন এবং বহু দুরূহ অপারেশনও তিনি এখানে করিয়াছেন। তিনি এখানে থাকায় সার্জ্জেন হিসাবে তাঁহার দ্বারা বহু লোক উপকৃত হইয়াছে কিন্তু ভাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের অভাব এবং সরকারী লাল ফিতার কারবারের দরুণ হাসপাতালের দুরবস্থা দূর হইতেছে না।"

বাদ প্রতিবাদ অনেক হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রতিকার কোন্ পথে? সরকার কি ইহার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারেন না?

ডাক্তারবিহীন হাসপাতাল

সেবা-প্রতিষ্ঠানের নামে মানুষের দুর্নীতি কতদূর চরমে উঠিতে পারে চুঁচুড়া হইতে 'বর্ত্তমান ভারত' নিম্নের এই সংবাদটি দিতেছেন :

"চুঁচুড়া হাসপাতালে এমার্জ্জেন্সী বিভাগে ডাক্তার না থাকায় রোগীর নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ ও ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনার আবার এক মর্ম্মন্তুদ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বাবুগঞ্জস্থিত শ্রীপ্রফুল্লকুমার সিংহরায় "বর্ত্তমান ভারত" পত্রিকায় তাঁহার স্ত্রীর মরণাপন্ন অবস্থায় যে মর্ম্মন্তুদ বিবরণ দিয়াছিলেন, ইহাও প্রায় তদ্রূপ অভিযোগ। শ্রী সিংহরায়ের অভিযোগের কোন তদন্ত হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকিলে উহার কি নিষ্পত্তি হইল, তাহা আমরা জানি না।

"এখন বাঁশবেড়িয়া হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ মণ্ডল লিখিতেছেন : 'গত ৩০শে ডিসেম্বর আমার তিন বৎসরের পুত্র শ্রীমান অসীম বাড়ীতে পড়িয়া গিয়া নাকে ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও রক্ত বন্ধ হয় না। আমি বেলা আড়াইটায় রিক্সাযোগে চুঁচুড়া হাসপাতালে যাত্রা করি এবং তথায় প্রায় সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত কোন ডাক্তারের সাক্ষাৎ পাই না। একটি ডাক্তার যিনি কি পরীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, অপেক্ষা করুন, ডাক্তার এখনই আসিবে, উহা আমার কাজ নহে। হাসপাতালের সকল কর্ম্মচারীরই এক কথা, 'অপেক্ষা করুন—ডাক্তার আসিবে'। এদিকে আমার পুত্র যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়িতেছে এবং রক্তও অনর্গল ঝরিতেছে। মহাবিপদে বিষণ্ণ মনে অপর কোন চিকিৎসালয়ের কথা চিন্তা করিতেছি। এমন সময় এক নার্স আমার দুঃখের কথা শুনিয়া পুত্রকে ফিমেল ওয়ার্ডে লইয়া প্রাথমিক চিকিৎসা করেন ও পরদিন সকালে আউটডোরে আসিবার নির্দ্দেশ দেন। আমি পরদিন আউটডোরে আসি ও ডাক্তার দেখাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, স্থানীয় ডাক্তারের মতে পুত্রের আহত নাকটি চ্যাপ্টা হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ উহার কোন সুচিকিৎসা নাকি হয় নাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন, হাসপাতাল থাকিলে মানুষ বিপদে পড়িয়া তথায় গমন করে, কিন্তু সেখানে যদি ডাক্তার না থাকে, তবে এইরূপ হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?"

খাদ্যে ভেজাল ও তাহার উপকরণ

সকলেই বলেন খাদ্যদ্রব্যে যাহারা ভেজাল দেয় তাহাদের কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত—তাহারা সমাজের শত্রু। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া শুধু 'কথাই' ধুলার সহিত উড়িতেছে—ভেজাল যাহারা দিবার তাহারা দিয়াই চলিয়াছে। খাদ্যে ভেজাল নিবারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়াছেন।' কিন্তু সেই আইনের ফলেই ভেজাল-বিক্রেতাদের সুযোগ কিরূপে আরও প্রশস্ত হইতেছে, কলিকাতা কর্পোরেশনের অভিযানের ফলাফলই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আটা, ময়দা, সাগু, চা, সরিষা ও নারিকেল তেল এবং বনস্পতি জাতীয় দ্রব্যাদিতে ভেজালের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন সতের শো'রও অধিক মামলা করিয়াছেন। ইহাদের অর্দ্ধেক মামলায় এ পর্য্যন্ত আসামীদের একশত টাকা হইতে এক হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে এবং উহাতে গত বৎসর প্রায় এক লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসা শহরের ভিতর কত ব্যাপক হইয়া আছে তাহা অনুমান করা সহজ হইবে। কারণ, যাহারা অপরাধ করিয়াও ধরা পড়িতেছে না, তাহাদের সংখ্যা যে ইহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী হইবে, তাহা সকলেই জানে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভেজালের আসামীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য অনেক সময় হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত নিয়োগ করা হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ভেজালের অভিযোগে যাহারা লিপ্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে

অনেকেই বহু ধনশালী, সুতরাং তাহাদের অপরাধ আরও গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি ঔষধে ভেজালের কথা এই তালিকায় নাই। চাউলে কাঁকরের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, খাঁটি গব্য ঘৃত বলিয়া তাঁহারা যে ভেজাল চালাইতেছেন তাহাও আজ কাহারও অবিদিত নয়। বিদেশীয়া একরূপ এসেন্স বাজারে ছাড়িয়াছেন যাহা দালদা এবং হোয়াইটঅয়েলে মিশ্রিত করিলে চমৎকার গব্যঘৃতের ও সরিষার তৈলের সুগন্ধ করা যায়। সম্প্রতি হাওড়া জেলায় এক বিখ্যাত ঘৃত ব্যবসায়ী এই অপরাধে ধরা পড়িয়াছেন। খেজুর গুড়েও এই ফাঁকি চলিতেছে। অথচ এই ফাঁকির উপকরণ যাঁহারা জোগাইতেছেন, তাঁহারা নিজেরা কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে সচেতন।

নূতন আইনে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ভেজাল সন্দেহে কোন দ্রব্য আটক করা হইলে তাহা দ্বারা ব্যবসায়ীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলিবে না। যদি আটক জিনিস পরে খাঁটি বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে সন্দেহক্রমে মাল আটকের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ইনস্পেক্টরকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

নিঃসন্দেহে ইহা এক অদ্ভুত নিয়ম। রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট পৌঁছানর মধ্যে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার মধ্যে ব্যবসায়ীর সমস্ত মাল বিক্রয় হইয়া যায়। আইনের এই ত্রুটির ফলে খাদ্যে ভেজাল দিয়া উহা বিক্রয়ের উৎসাহ তাহাদের বাড়িয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। যে সরিষার দ্বারা ভূত তাড়াইতে হইবে, সেই সরিষাতেই যদি ভূত থাকে তবে কে তাহাকে তাড়াইবে? চাউলের মূল্য বাঁধিয়া দিতে গিয়া যেমন চাউলের সঙ্কট দেখা দিয়াছে তেমনি ভেজাল খাদ্য নিবারণের আইনের দ্বারাই ভেজাল দমনে জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে এবং উহার ফলে অসাধু বেপরোয়া ব্যবসায়ীদের ভেজাল বিক্রয়ের সুযোগ আরও প্রশস্ত হইতেছে।

ঐতিহাসিক দলিল কমিশনের কার্য্যের গুরুত্ব

ঐতিহাসিক দলিল সংগ্রহের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা স্বতঃসিদ্ধ। স্বাধীন ভারত সরকার আজ নূতন করিয়া এই দুরূহ গবেষণার কাজে অগ্রসর হইয়াছেন। ত্রিবান্দমে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক দলিল কমিশনের ৩৪তম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে, এল, শ্রীমালি যে ভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহাতে তিনি ঐতিহাসিক কমিশনের এবং কমিশনের বন্ধু ও সহায়কদিগের সম্মুখে এখনও যে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দেশের অসংখ্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত নরনারীর কাছে এখনও অপরির্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ পুরাতন কাগজপত্র ও অন্য উপকরণ উপেক্ষিত ও অবিন্যস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহা ছাড়া জেলায় দপ্তরখানাগুলিতেও দেশের শাসনকার্য্য, রাজস্ব ও আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রভৃতি পুরাতন অনেক কাগজপত্র স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। এই সমস্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান একত্র সংগ্রহ এবং গুরুত্ব ও বিষয় অনুসারে উহাদের নির্ঘণ্ট তৈয়ারি করিয়া ঐতিহাসিকের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলা একটি অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য।

এই দেশের অনেক পুরাতন মঠে, মন্দিরে, প্রাচীন ঐতিহ্যশালী অভিজাত বংশের গ্রন্থভাণ্ডারে, সাধারণ গৃহস্থের কাছে এবং অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করিলে এখনও পুরাতন জীর্ণ হস্তলিপি, মুদ্রা এবং প্রস্তরে ও ধাতুফলকে উৎকীর্ণ-লেখনের সন্ধান হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ ভারতের কোন কোন অধিকতর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অঞ্চলে এই শ্রেণীর মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান যে যথেষ্ট পরিমাণে লুক্কায়িত আছে তাহা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

মারাঠা অভ্যুত্থানের রঙ্গভূমি মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ, মধ্যযুগে জাঠ, সৎনামী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের ক্ষেত্র উত্তরপ্রদেশ, সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর কুমার সিং-এর কর্ম্মক্ষেত্র বিহার, প্রাচীন বাঙালী জাতির বহু গৌরবময় কীর্ত্তিকাহিনীর স্মরণীয় ক্ষেত্র বরেন্দ্রভূমি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এখনও অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

মোটের উপর, এ পর্য্যন্ত ভারতের নানা অঞ্চল হইতে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই যে শেষ সংগ্রহ ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা ঠিক এমনি করিয়াই গ্রাম, শহর, পর্ব্বতচূড়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের দেশের তথ্যগুলি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এইভাবে অনুসন্ধান না করিলে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই অলিখিত থাকিয়া যাইবে।

ইউরোপীয়দের লিখিত আধুনিক ভারতের অনেক ইতিহাস ভ্রমাত্মক। সেগুলিরও সংশোধন আবশ্যক।

ঐতিহাসিক দলিল কমিশন এই কার্য্যে পূর্ণ সফলতা লাভ করুক, দেশের ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই ইহা কামনা করিবেন।

ভারতে নূতন ইস্পাতের কারখানা

বহু প্রতীক্ষিত রুরকেল্লা ও ভিলাই এ দুইটি বৃহৎ ইস্পাতের কারখানা এইবারে চালু হইল। এই যাত্রা শিল্পায়নের পথে ভারতের বলিষ্ঠ পদক্ষেপরূপে সমস্ত দেশবাসীকেই উদ্দীপ্ত করিবে। যানবাহন, রেলপথ, সেতু, কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতি—যা কিছু আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মানুষ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছে, পরাধীনতার বিপাকে পড়িয়া ভারতবর্ষ যাহার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিয়াছে, তাহার অবসান এইবারে হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রুরকেল্লা ও ভিলাই এপথে আমাদের প্রথম সার্থক প্রয়াস। এক হিসাবে এই দুইটি কারখানাই হইবে পরবর্ত্তী ধাপের শিল্পায়নে আমাদের ভিত্তিভূমিস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন হইতে লোহা

আবিষ্কার, করিয়াছে তখন হইতে সে আদিমতার অধ্যায় কাটাইয়া সভ্যতায় উন্নীত হইয়াছে। আর লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করার কৌশল আয়ত্ত করিয়াই সে সমুন্নত হইয়াছে। সেই সমুন্নতির শুভযাত্রায় আমাদের পরনির্ভরশীলতা ঘুচিতেছে এবং অদূরভবিষ্যতে আমাদের এই কৃষিকেন্দ্রীক পুরাতন দেশ শিল্পে, বাণিজ্যে সমৃদ্ধ আধুনিক দেশে পরিণত হইবে, এই প্রত্যাশা লইয়া আমরা রুরকেল্লা ও ভিলাইকে স্বাগত জানাইতেছি।

রাষ্ট্রপতি তাঁহার প্রথম দিনের উদ্বোধনী ভাষণে যথার্থই বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানের শক্তিকে মানুষের হিতে নিয়োজিত করার দ্বারা মানুষ পৃথিবীকে যেমন সচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ করিতে পারে, তেমনি এই অসীম শক্তিকে বিপথে নিয়োজিত করিলে সমগ্র দুনিয়াকেই সে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিতে পারে। কাজেই এই বিশাল শক্তির নিয়োগ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব প্রয়োজন। কেবলমাত্র বৈষয়িক শক্তি ও ঐশ্বর্য্য কামনায় আমরা যদি বিজ্ঞানের অনুশীলন করি এবং শক্তি ও সম্পদ, এই দুটি বস্তুকেই পরমার্থ জ্ঞান করি, তাহা হইলে হয়ত আমরা দারিদ্র্য-বিজয়ী হইব, কিন্তু মানুষকে শান্তি দিতে পারিব না। তাই বিজ্ঞানের সঙ্গেই চাই, সদ্‌জ্ঞান, নতুবা বিজ্ঞান আমাদের হিতের চেয়েই অহিত বেশী করিবে। কথাটা যে কথা মাত্র নয়, আজিকার পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই তা বুঝা যাইবে।

চাঞ্চল্যকর ট্রেন ডাকাতি

চারিদিকে খুন জখম ডাকাতির যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মানুষের শান্তিতে বসবাস একরূপ কঠিনই হইয়া উঠিল। সম্প্রতি চলন্ত ট্রেনে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লখিমপুর খেরী শাখার খাজাঞ্চি যখন ট্রেনে দুই লক্ষ টাকার একটি বাক্স লইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন দেওকালি এবং ফারধান ষ্টেশন দুটির মধ্যে একদল দুর্বৃত্ত তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গের সশস্ত্র রক্ষীকে গুলী করিয়া নিহত করে এবং সঙ্গের টাকা লইয়া চলন্ত ট্রেন থামাইয়া সরিয়া পড়ে। নিকটবর্ত্তী মাঠে যখন তাহারা হাতুড়ি দিয়া ক্যাশ-বাক্সটি ভাঙ্গিতেছিল তখন কয়েকজন ট্রেনযাত্রীর তাড়ায় ক্যাশ-বাক্সটি ফেলিয়া তাহারা পলায়নের চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যে খবর পাইয়া একদল পুলিস সমগ্র এলাকাটি ঘিরিয়া ফেলে। বেগতিক দেখিয়া ডাকাতরা গুলী ছুড়িতে ছুড়িতে পলায়নের চেষ্টা করিলে পুলিস ও যাত্রীদের চেষ্টায় তাহারা ধরা পড়ে।

ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা

ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা আজ এত ব্যাপক যে তাহাকে কোন্ ভাষায় নিন্দিত করিব ভাবিয়া পাই না। সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ হইতে 'ভারতী' পত্রিকাও এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন:

"পরীক্ষায় পাস করিবার জন্য দুর্নীতির আশ্রয়গ্রহণ ও কর্ত্তৃপক্ষের উপর বলপ্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্প্রতি ছাত্রদের সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় জলন্ত সিগারেট হস্তে উদ্দণ্ড নৃত্য, জনতার মধ্যে পটকা ও জলন্ত হাউই নিক্ষেপ, শোভাযাত্রীদের উপর বেপরোয়া ইষ্টক বর্ষণ ইত্যাদি যে ধরনের অশিষ্ট আচরণ একের পর এক আমাদের চোখের সামনে ঘটিয়া গেল তাহা নিন্দা করিবার ভাষা আমাদের নাই। আমরা জানি এই ধরনের দুষ্কৃতকারীর সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাত্রের অবিমৃশ্যকারিতার ফলে একদিকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যেমন মানমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, অপরদিকে সমাজ-জীবনেও ইহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।"

কিছুদিন পূর্ব্বেও আর একটি অভিনব ঘটনা এই কলিকাতার বুকেই ঘটিয়া গিয়াছে। ছাত্রকে শাসন করার ফলে অভিভাবক কর্ত্তৃক শিক্ষকমহাশয় প্রহৃত হইয়াছেন। সুতরাং দোষ কাহাকে দিব? যাহাদের আদর্শ লইয়া ছাত্র-জীবন গড়িয়া উঠিবে সেই অভিভাবকের চরিত্রই যখন এইরূপ মসীলিপ্ত তখন আর চীৎকার করিয়া লাভ কি? আজ আমাদের পরিবেশ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সৎ অসৎ, ভাল মন্দের কোন মানই যেখানে নির্দ্দিষ্ট নাই, যেখানে চুরি করাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতেছে না, সেখানে আজ শুধু ছেলেমেয়েদের উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে কেন? যে সমাজ আজ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সম্মেলন

আমরা নীচে আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার সঙ্কলিত বক্তৃতার সারাংশ ও বিবরণী দিলাম। ইহাতে মুখ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্য বাদ আছে, যাহাতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের পয়সাওয়ালা লোকের ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিমুখতার কথা বলিয়াছিলেন।

অন্যদের ভাষণের মধ্যে স্যার বিজয়প্রসাদের, স্যার বীরেনের ও স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য। এইগুলি বিবেচনা করার জন্য ছোট বড় বাঙালী ব্যবসায়ীর মিলিতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন।

শনিবার কলিকাতায় ৪৩নং চৌরঙ্গী রোডে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সম্মেলনের দুইদিনব্যাপী অধিবেশন সুরু হয়। প্রথম দিনের অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক বেকার-সমস্যা বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার-সমস্যার পটভূমিকায় পরিপূরক, মাঝারি ও ছোটখাট শিল্পসমূহ কিরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে, তাহার আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করে।

প্রখ্যাত শিল্পপতি স্যার বীরেন মুখার্জ্জী ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় উহাতে সভাপতিত্ব করেন। তাঁহারা উভয়েই পশ্চিমবঙ্গের যুব-সমাজকে শুধু চাকুরি না খুঁজিয়া ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করার আবেদন জানান।

পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ব্যবসায় সম্মেলন ইহাই সর্বপ্রথম। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ এন, এন, লাহা বলেন যে,ভারতের

বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের ইতিহাসে এই সম্মেলন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। উহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়-সমূহের বিভিন্ন শাখার জন্য একটি সমস্বার্থভূমি সৃষ্টি করা। তিনি আশা করেন যে, তাঁহাদের সহযোগিতার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হইবে।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স, ভারত চেম্বার অব কমার্স এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল সভার যুক্ত উদ্যোগে ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মফঃস্বল এলাকা হইতে অনুমান দুই হাজার প্রতিনিধি এবং তিন হাজার দর্শক উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদান করেন। এক বিস্তৃত সুসজ্জিত মণ্ডপের নিচে সম্মেলন বসে। রাজ্যের বৃহৎ, মাঝারী ও ছোটখাটো শিল্পের প্রতিনিধিগণ উহাতে উপস্থিত ছিলেন।

স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় সভাপতির ভাষণে বৃহৎ শিল্পপতিদের পশ্চিমবঙ্গে নূতন, মাঝারি ও পরিপূরক শিল্পপ্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রণী হওয়ার আবেদন জানাইয়া বলেন, "মাঝারি এবং পরিপূরক শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা যাহাতে বিনা বাধায় সম্ভব হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এই সম্মেলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।"

স্যার বিজয় উল্লেখ করেন যে, বৃহৎ শিল্পপতিদের মধ্যে কেহ কেহ ইতোমধ্যেই বাঙালী যুবককে নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বৃহৎ শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁহার আর একটি নিবেদন, তাঁহারা যেন দেশের শিক্ষিত যুবকগণকে সরবরাহ ব্যবসায়ে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করিয়া দেন।

স্যার বিজয় আরও বলেন, "সৌভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নাই। গত কয়েক বৎসরে এইখানে যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুর্গাপুরে যে নূতন শিল্পনগরী গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে আরও নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হিসাবে ছোট ও মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে উদ্যোগী মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকের কর্মসংস্থানের নূতন পথ খোলা হইতেছে। দুঃখের বিষয় নানা কারণে আমাদের দেশের যুবসম্প্রদায়ের একাংশ শিল্প-ব্যবসায়ে যোগ দেওয়া অপেক্ষা চাকুরী জীবনের পক্ষপাতী এবং তাঁহাদের অনেকের মধ্যে ব্যবসায়ীসুলভ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অভাব রহিয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। যে সকল ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁহাদের সহযোগিতায় উপযুক্ত ও কার্য্যকরী ব্যবসা বা শ্রমশিল্পের জন্য মূলধন সমস্যার সমাধান খুব কঠিন হইবে না।"

স্যার বিজয় অতঃপর নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রসঙ্গে বলেন যে, কেবলমাত্র করের হার কমাইলেই শিল্পপ্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সমস্যার সমাধান হইবে না। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে সুবিধাজনক সর্ত্তে দীর্ঘমেয়াদী টাকা ধার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাও একান্ত দরকার। এই জন্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়াকে তাঁহাদের অর্থ বিনিয়োগের নীতি এমনভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে টাকা পাওয়া সহজ হইতে পারে। এইজন্য স্যার বিজয় মনে করেন যে, যদি কোনও ব্যবসায়ী তাঁহার প্রয়োজনীয় মূলধনের এক-চতুর্থাংশ নিজে জোগাড় করিতে পারেন, তাহা হইলে লগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বাকী তিন-চতুর্থাংশ টাকা পাইতে তাঁহার অসুবিধা হইবে না এবং এইরূপ একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে শিল্প ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের একটা প্রকাণ্ড বাধা দূর হইবে।

স্যার বিজয় আর্থিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার আবেদন জানাইয়া বলেন যে, উৎপন্ন মাল বিক্রয় না হইলে উৎপাদনের বহর বাড়াইবার যে চেষ্টা করা হইতেছে, তাহা কখনই সফল হইতে পারে না। তাই শিল্পের প্রসার ও ভোগ্য পণ্যের ব্যবহারের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া দরকার। স্যার বিজয় এই প্রসঙ্গে দেশের ভিতর খাদ্যোৎপাদনের এবং এই ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা দরকার এবং বিঘাপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টায়ও অগ্রণী হইতে হইবে।

তিনি কলিকাতা বন্দরের উন্নয়ন এবং ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যাপারে অবিলম্বে সচেষ্ট হইতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

স্যার বিজয় উপসংহারে বলেন, "এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক রকম অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ইস্পাত শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের একটা প্রকাণ্ড অভাব দূর হইবে। কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য, চা, চট, কাগজ ইত্যাদি শিল্পেরও প্রসার হইতেছে। বিদেশী মূলধন এবং কারিগরী সাহায্যের ফলে এই উন্নতি আরও সুদূরপ্রসারী হইবে। এইজন্যই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থায় আছি, তাহার ভাল-মন্দকে আমরা যদি সাহস ও ভরসার সঙ্গে আমাদের কাজে লাগাইতে পারি, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক বুনিয়াদ আরও দৃঢ় হইবে।"

উদ্বোধনী ভাষণে স্যার বীরেন মুখার্জ্জি তরুণ সমাজকে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন করিয়া অধিক সংখ্যায় ব্যবসায় ক্ষেত্রে নামিবার আবেদন জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান বেকার-সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান আশানুরূপ উন্নত হয় নাই। ইহার ফলে দেশের মধ্যে কিছুটা হতাশা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গের মত রাজ্যের পক্ষে—যেখানে জনশিক্ষার হার উর্দ্ধগামী এবং

উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাও খুব বেশী—ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

স্যার বীরেন বলেন, "শিল্পোদ্যমের প্রসারই বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। কারণ, শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্যভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিবহন ও লগ্নীর ক্ষেত্রে কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে কর্ম্মসংস্থানের নানা পথ খুলিয়া যায় এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের শিল্প প্রসারের সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই রাজ্যে অনেকগুলি প্রধান শিল্প আছে এবং কাঁচামাল ও দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য্যের দিক হইতেও এই রাজ্য সৌভাগ্যবান। অদূর-ভবিষ্যতে পিণ্ড লৌহ, ইস্পাত, কয়লা, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পপ্রসারের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। সেইজন্য শিল্পপ্রসারের জন্য যোগ্য লোকেরও প্রয়োজন। তাই দেশের তরুণসমাজ যেন এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং অধিক সংখ্যায় ব্যবসায়ে যোগ দেন।"

স্যার বীরেন আরও বলেন যে, ক্রমবর্দ্ধমান শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কারিগর ও শ্রমিকদের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। তাই অধিক সংখ্যায় ছাত্রদের কারিগরী বিদ্যা অর্জ্জনে যোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং কায়িক পরিশ্রমে কলকব্জা চালানোর ব্যাপারে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়। গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নের গুরুত্বও তিনি উল্লেখ করেন।

স্যার বীরেন দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেলার ইস্পাত কারখানার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "শিল্পের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের নবজাগরণ ও নেতৃত্ব করার সম্ভাবনা অচিরেই দেখা দিতে পারে।"

তিনি সরকারী কর ধার্য্য নীতির প্রসঙ্গে বলেন, "এমন ভাবে করের হার নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যাহাতে জনসাধারণের হাতে লগ্নী ও ন্যায্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যথেষ্ট সঞ্চয় থাকে। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাকে হ্রাস করিয়াছে, যাহার ফলে কাপড় ও সিমেন্টের বাজারে মন্দা দেখা দিয়াছে এবং প্রধান শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে।" উচ্চ হারে কর নির্দ্ধারণের ফলে ধনীদের মত মধ্যবিত্ত সমাজও যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতেছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি উপসংহারে বলেন, "যখন উৎপাদনবৃদ্ধি ও কর্ম্মসংস্থানের বিষয়টি অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য আমাদের নিকট বিশেষ জরুরী, ঠিক সেই সময়ে ধর্ম্মঘট ও অন্যান্য বিশৃঙ্খলা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকলেরই এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে বাহিরের লোক আসিয়া শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা হইতে বিপথগামী না করিতে পারে।"

তৃতীয় পাঁচসালা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদিও ইহাতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইবে, তবুও ব্যবসায়ীদের পক্ষে উদ্যম ও প্রচেষ্টার বিস্তৃত সুযোগ হইতে থাকিবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এন. এন. লাহা তাঁহার ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা ও উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন সমস্যার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমদানী সম্পর্কে কঠোর নিষেধ নীতির ফলে বেকার-সমস্যা আরও তীব্র হইয়াছে। এই নীতির ফলে অনেক আমদানীকারী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের কাজ কমাইতে বাধ্য হওয়ায় বহু লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। এমনকি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একেবারে বন্ধও হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ভাবে বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান হারে ব্যাপক বেকার-সমস্যার উল্লেখ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন, যে অনুপাতে কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে, সে হারে কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না। 'তথাপি আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।' কারণ যাহার কিছুই করিবার নাই, তাহার স্বাভাবিক পথ পরিহার করিয়া অন্য পথে অগ্রসর হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান অত্যন্ত জরুরী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে পাট, কয়লা, বস্ত্র, চা-বাগান প্রভৃতি শিল্প-সংস্থাসমূহে নিযুক্ত কর্ম্মীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই এই রাজ্যের অধিবাসী নহে, তাহারা অন্যান্য রাজ্য হইতে এখানে আসিয়াছে। ভারতবর্ষ এক। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এক রাজ্যের অধিবাসী এবং অন্য রাজ্যের অধিবাসীর মধ্যে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নয়।

ডাঃ রায় বলেন, এক শ্রেণীর বড় বড় শিল্পপতি কোন কারখানা স্থাপন করিতে হইলে (তাহা রবার, সিমেন্ট অথবা কেমিক্যাল কারখানা হউক না কেন) পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে (বারাণসী, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে) স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন। তিনি অবশ্য তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিতেছেন না, কারণ যে এলাকায় প্রস্তাবিত শিল্পের উপকরণাদি পাওয়া যাইবে, সেই এলাকাকে কেন্দ্র করিয়াই উহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু তিনি এই সম্পর্কে শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাহেন। ঐ সব শিল্পপতির মধ্যে অনেকেই 'শ্রমিক অশান্তির' জন্য 'সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন।' সম্ভবতঃ এই রাজ্যের শ্রমিকেরা অধিকতর 'বাক্‌পটু' এবং উত্তেজনাকর সংবাদ পরিবেশনের জন্য আগ্রহশীল বামপন্থীদের জন্য ঐগুলি ফলাও করিয়া প্রকাশিত হয়। তিনি শিল্পপতিদের অন্ততঃপক্ষে এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) শ্রমিক পরিস্থিতি অধিকতর খারাপ নহে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যবসায় এবং অন্যান্য উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগে বাঙালী পুঁজিপতিদের দ্বিধাগ্রস্ততাই বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। তিনি এই অবস্থার উন্নতি বিধানের নিমিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্প এবং কঠোর শ্রমশীল ব্যক্তিদের অগ্রসর হওয়ার জন্য আবেদন জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বড় বড় শিল্পের সহিত ছোট ছোট শিল্পগুলির ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা থাকা আবশ্যক। কারণ একমাত্র বড় বড় শিল্পের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াই ছোটখাট শিল্প সংস্থাগুলি সফল

হইতে পারে। তিনি পশ্চিমবঙ্গে ছোটখাট শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল। কারণ, যে কোন শিক্ষিত বেকার যুবকের পক্ষে এই ধরণের শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব। এখানে ছোটখাট শিল্প গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে উৎসাহ দানের অনেক অবকাশ আছে। এই শিল্পগুলিকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে উহা জনসাধারণের সাধারণ প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কারণ, বড় বড় শিল্পের দ্বারা ভোগ্যপণ্য এবং উৎপাদক-পণ্য উভয়ই উৎপাদন করা সম্ভব হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের একটি বিশেষ পদ্ধতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এই রাজ্যে বেকার-সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কুটিরশিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রচুর অবকাশ আছে।

রবিবার কলিকাতায় ৪৩ নং চৌরঙ্গী রোডে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সম্মেলনের দুই দিনব্যাপী অধিবেশনের সমাপ্তি হয়। ঐ দিন সম্মেলনে বিশিষ্ট বক্তারূপে প্রখ্যাত শিল্পপতি ডাঃ এ রামস্বামী মুদালিয়র এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির মধ্যে দুর্নীতির প্রচলনের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এই দুর্নীতি সার্বিকভাবে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সুনাম ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

দুর্নীতিপরায়ণ ঐ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বরূপ প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি বিবৃত করেন এবং বলেন যে, আপনারা যদি আইনসঙ্গত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়রূপে আপনাদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন, "তাহা হইলে আপনাদের মধ্যে 'গজাইয়া-উঠা' যে সব লোক সমগ্র সমাজকে দুর্নীতিকবলে ঠেলিয়া দিতেছে এবং লজ্জার ও ঘৃণার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেওয়া আপনাদের কর্ত্তব্য।"

ঐ দিনের অধিবেশনে অপর একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রী বি এম বিড়লা বক্তৃতাকালে এইরূপ মন্তব্য করেন যে, ব্যবসায়ীদের নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। ব্যবসায় দিনের পর দিন প্রসার লাভ করিতেছে। নিজেদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া ইহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতিগঠনমূলক কাজ করিয়া যাইতেছে। এই ভাবে যদি ব্যবসায়ী সমাজ কাজ করিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার গভীর বিশ্বাস তাঁহারা দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন।

ডাঃ মুদালিয়র এবং শ্রী বিড়লা উভয়েই ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। ডাঃ মুদালিয়র ব্যবসায়ী সমাজের বক্তব্যসমূহ নিঃসংকোচে জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করার প্রস্তাব করেন। কারণ তাঁহার মতে অজ্ঞতাবশতই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা বেশী হয় এবং এমন লোকের নিকট হইতে সমালোচনা উঠে, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে যাহারা খুব কমই বুঝে।

ডাঃ মুদালিয়র প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গ হইতে শিল্প কারখানাসমূহ স্থানান্তরের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কার্য্যকলাপের ফলেই মুখ্যত উহা হইতেছে। এই সব ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে 'ট্রেড ইউনিয়নের কার্য্যের বহির্ভূত' কাজ করিয়া এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করেন, তিনি অভিযোগ করেন। এই সব নেতা শ্রমিকরা যে সব শ্রমসাধ্য গুরুতর ও কখনও কখনও দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহাতে কোন অংশ গ্রহণ করেন না। কিন্তু যে কারখানা শ্রমিকরা তৈরি করিয়াছেন, তাহাকে ভাঙিয়া ফেলাই তাঁহাদের কাজ।

পশ্চিম বঙ্গের পুনর্ব্বাসন দপ্তর

আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নস্থ মন্তব্যগুলি করিয়াছেন। আমরা বলিব যে ঐ দপ্তর সুরু হইতেই অযোগ্য মন্ত্রীর হাতে যাওয়ায় যাহারা সাধু ছিল তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করা হয় এবং ফলে অসাধু লোকের উহা লীলাভূমি দাঁড়ায়।

বাংলার লক্ষ লক্ষ সন্তানের দেহমন চিরদিনের মত অবনত ও কলুষিত হওয়ার কারণ স্বরূপ মন্ত্রীত্ব। কেননা মন্ত্রীর যদি বুদ্ধি বিবেচনা থাকিত তবে এরূপ নিদারুণ পরিণাম ঐ বিভাগের হইতে পারিত না।

এই বিষয়ে অনেকগুলি সংবাদপত্রের দায়িত্বও বড় কম নয়। তাঁহাদের সম্পাদকীয় বিভাগের স্বার্থান্বেষী কয়েকজনের প্ররোচনায় যে সংবাদপত্র অভিযান চালিত হয় তাহারই ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীদিগের মত অকর্ম্মণ্য পরগাছা হইয়া গেল।

রাজ্য পুনর্ব্বাসন দপ্তরের কাজ সুরু হইবার পর হইতেই নানা দুর্নীতির অভিযোগে গোটা দপ্তরই যেন কালিমালিপ্ত হইয়া আছে। উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা, প্রতারণা, স্বজনপোষণ ইত্যাদি অভিযোগের অন্ত নাই। কিছু প্রকাশ পায়, কিছু গোপনই থাকে। আক্ষেপের কথা, কোন কোন অভিযোগ তদন্তক্রমে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকারের টালবাহানা করার কিংবা গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা দিবার চেষ্টার ঘটনাও বিরল নহে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 'গোপন হস্ত' অদৃশ্য হইতে চাবিকাঠি ঘুরায়, দুর্নীতি আরও কায়েম হইয়া বসে।

তদন্তে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকারী টালবাহানার একটি ঘটনা সম্প্রতি আমাদের হাতে আসিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার জনৈক রিলিফ অফিসারের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ তদন্তক্রমে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও, তদন্ত রিপোর্টে উক্ত অফিসারকে বরখাস্ত করার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও সরকার ঐ সম্পর্কে এখনও নাকি স্থির সিদ্ধান্ত নাকি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতেছে, অবস্থা এখনও 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।' তাই এত অর্থব্যয় করিয়া কাটখড় পুড়াইয়া তদন্তের প্রহসন করার প্রয়োজন কি ছিল, এই প্রশ্নও অনেকের মনে জাগিয়াছে।

সংশ্লিষ্ট ঐ অফিসারের বিরুদ্ধে ১৯৫৬ সনে পর পর ৭টি অভিযোগের দায়ে চার্জ্জসীট আনা হয় এবং সাময়িকভাবে বরখাস্তও করা হয়। দুর্নীতিদমন বিভাগ এই ব্যাপারে তদন্ত চালান এবং

শেষ পর্য্যন্ত তদন্ত কার্য্য পরিচলনার ভার গ্রহণ করেন শ্রী জে. বি সেন আই. এ. এস।

প্রায় এক বৎসর তদন্ত চলে। ৬।৮।৫৭ তারিখে শ্রী সেন রাজ্য সরকারের নিকট তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করেন। ২০ পৃষ্ঠার টাইপ করা দীর্ঘ রিপোর্টে তিনি মন্তব্য করেন যে, ৭টি গুরুতর অভিযোগের মধ্যে ৫টি অভিযোগই সত্য। সংশ্লিষ্ট অফিসারটি তাঁহার দুই ভাগিনেয়কে গৃহনির্ম্মাণ ঋণদান সম্পর্কে জালিয়াতি ও অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া নিজ ভগ্নীকে একখণ্ড জমি বণ্টন সম্পর্কেও জ্ঞাতসারে সরকারী নীতি ভঙ্গ করিয়াছেন। এমনকি মিথ্যা 'বিলের' দ্বারা যাহা খরচ বাবদ সরকারী অর্থ অপচয়ের অভিযোগেও তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। শ্রী সেন তাঁহার রিপোর্টে লিখিতেছেন :

"He has been found guilty of fraud and misconduct in respect of H. B. loan, paid to his nephew, Secondly he gave a plot of land to his own sister Sm, Labanya knowing fully well that she is not entitled to get separate rehabilitation benefits. Not less important for consideration is the most graceless type of nepotism practiced by the delinquent to favour his relations in violations of the G. O. Added to this is the dishonesty and misconduct involved in drawing false T. A. claims."

শ্রী সেন তাঁহার রিপোর্টের উপসংহারে স্পষ্ট ভাষায় লিখিতেছেন :

Taking all these into consideration, I do not find any extenuating circumstances which may warrant considerations for clemency. His conduct in a responsible post cannot be defended, In my opinion he does not deserve to be in public service, and dismissal is the only punishment warranted.

শ্রীসেনের বক্তব্যে কোন অস্পষ্টতা নাই। চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা ছাড়া অন্য কিছুই করা যাইতে পারে না বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। সরকারী নিয়মানুযায়ী তদন্ত রিপোর্টের ফাইলটি অনুমোদনের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট পাঠান হয়। তাঁহারা আরও কঠোর মন্তব্যসহ বরখাস্ত করার সুপারিশই অনুমোদন করেন বলিয়া প্রকাশ।

বরখাস্ত করা সম্পর্কে কোথাও মতদ্বৈধতা নাই। দ্বিধা শুধু যিনি বরখাস্ত করিবেন, সেই রাজ্যসরকারের। প্রকাশ, আজ পর্য্যন্ত উক্ত অফিসারটি সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত তাঁহারা লইতে পারেন নাই। তিনি এখন পর্য্যন্ত সাসপেণ্ড হইয়াই আছেন। শুধু তাহাই নহে, এমনও শোনা যাইতেছে যে, সরকারী বড় কর্ত্তাদের কেউ কেউ নাকি উক্ত অফিসারকে পুনরায় কাজে—সম্ভব হইলে আরও উচ্চ পদে বহাল করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তদন্ত রিপোর্টটি ধামা চাপা দিবারও গোপন চেষ্টা চলিয়াছে। বরখাস্ত কেন করা হইতেছে না এই প্রশ্নের অর্থ খুঁজিতে গেলে আরও অনেক রহস্য, অনেক গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে।

কথা বনাম কাজ

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডল (অর্থাৎ ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায়) এই অভাগা দেশের সন্তানগণের জন্য কত যে চিন্তিত ও চেষ্টিত তাহার পরিচয় নিম্নস্থ সংবাদে পাওয়া যায়।

যে সরকার কেবলমাত্র দলগোষ্ঠী পোষণের জন্য চালিত তাহার কাছে জনকল্যাণ শব্দের অর্থই বোধ হয় কিছু অভিনব নূতন এই অবস্থায় বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা এই সংখ্যার প্রথম প্রসঙ্গে যাহা মন্তব্য করিয়াছি তাহা কি অসমীচীন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনকল্যাণমূলক যে সব দপ্তর বরাদ্দমত অর্থ ব্যয় করিয়া উঠিতে পারে নাই তাহার মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিভাগই প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সনে ঐ বিভাগে খরচ না হইয়া যে টাকা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার পরিমাণ ১,০৬,০৮,০০০ টাকা।

বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অর্থমন্ত্রীরূপে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন তাহাতে উপরোক্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

ঐ আয়-ব্যয়ের হিসাবে আরও প্রকাশ পায় যে, সেচ, শিক্ষা, চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে মিলিয়া যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে সে টাকা সংশোধিত বাজেটের টাকার অঙ্ক হইতে ২,৫০,৯৭,০০০ টাকা কম।

জনস্বাস্থ্য বিভাগ ছাড়া ঐ বৎসর সেচ বিভাগ ৩০,৫১,০০০ টাকা ব্যয় করিতে পারেন নাই। শিক্ষা বিভাগে ৮৫,৩৩,০০০ টাকা এবং কৃষি বিভাগে ৫৩,২৮,০০০ টাকা ব্যয় না হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

মূল বাজেটের তুলনায় সংশোধিত বাজেটে ঐ সব জনকল্যাণ-মূলক বিভাগের মোট বরাদ্দ অর্থের টাকার পরিমাণ ৬৭,৮৭,০০০ টাকা বাড়াইয়া দেখান হইয়াছে।

১৯৫৭-৫৮ সনে মোট যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের প্রস্তাব ছিল বাস্তব ক্ষেত্রে তদপেক্ষা ৮,৩৮,৬২,০০০ টাকা কম খরচ হইয়াছে বলিয়া সংশোধিত আয়-ব্যয় সংক্রান্ত টাকার হিসাবে প্রকাশ পায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবসায় ও আধা-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দুইটি ছাড়া আর সবগুলিতেই প্রচুর লোকসান হইতেছে। রাজ্য সরকারের ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ১৪টি। লোকসানে যে সব ব্যবসায় চলিতেছে তাহার মধ্যে রাজ্য পরিবহন ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মোট আয় ও পরিচালন ব্যয়ের ভিত্তিতে রাজ্য পরিবহনের যে হিসাব দেওয়া হয় তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫৭-৫৮ সনে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,২৫,০০০ টাকা। সুদের অর্থ ধরিলে নীট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৭,৮৮,০০০ টাকা।

ঐ সম্পর্কে হিসাবে আরও দেখান হয় যে, ১৯৫৯-৬০ সনে সুদ বাবদ টাকা পরিশোধ করিবার পর ঐ প্রতিষ্ঠানে নীট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪,৫৫,০০০ টাকা। বর্ত্তমানে রাজ্য পরিবহনের গাড়ীর সংখ্যা মোট ৫৮৩। ১৯৫৯-৬০ সনে রাজ্য পরিবহনে বাসের সংখ্যা ৭৭খানি বৃদ্ধি এবং ২৯খানি হ্রাস করা হইবে। অর্থাৎ মোট বৃদ্ধির সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪৮।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবসায়ে ১৯৫৭-৫৮ সনে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬,৫১,০০০ টাকা (আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী)। সুদের টাকা ধরিয়া উহার পরিমাণ ৭,৩৬,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। চলতি বৎসরে নীট ক্ষতির পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৬,৮৩,০০০ টাকা। ১৯৫৯-৬০ সনে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ৭,২৫,০০০ টাকা।

ইট ও টালির ব্যবসায়েও লোকসান চলিতেছে। ১৯৫৭-৫৮ সনে উহাতে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯,০০০ টাকা। চলতি বৎসরে ক্ষতির পরিমাণ ৬২,০০০ টাকা এবং আগামী বৎসরে ১৯,০০০ টাকায় দাঁড়াইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত এই খবরে বুঝা যায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতাস্থ "মহাকরণের" কার্য্যপন্থায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে। রোগটা ছোঁয়াচে। আর এই পোড়া দেশেরও দুঃসময় আসিয়াছে।

লালদীঘির শম্বুকগতি গোলদীঘিতে শুধু সংক্রামিত হয় নাই, উহা গোলদীঘির বিশ্ববিদ্যালয় ভবনকে কতখানি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বুধবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় আলোচনা হইতে তাহার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডাঃ নীলরতন ধর তাঁহার গুরু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কৃষি রসায়ন শাস্ত্র' সম্পর্কে একটি চেয়ার সৃষ্টির জন্য ১৯৪৪ সনের শেষভাগে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। গত ১৫ বৎসরেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐ চেয়ারে লোক নিয়োগ করিতে পারেন নাই,—যদিও প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর হিসাবক্রমে ঐ টাকা সুদসমেত শতকরা ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রী মুখার্জ্জী তীক্ষ্ণ ভাষায় এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলেন যে, ডাঃ ধর ইতিমধ্যে বিরক্ত হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান যে, তাঁহারা যদি ঐ টাকা দিয়া প্রস্তাবিত চেয়ারে লোক নিয়োগ করিতে না পারেন, তবে ঐ অর্থ যেন ফেরৎ দেওয়া হয়। কারণ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐরূপ চেয়ার সৃষ্টি করিতে বিশেষ আগ্রহশীল।

অধ্যাপক পি, কে, সেন ঐ চেয়ারে অধ্যাপক নিয়োগের নিমিত্ত অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলে উক্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উপাচার্য্য অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত সকলকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে, এই চেয়ারে লোক নিয়োগের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত আগ্রহশীল। ঐ সম্পর্কে একবার বিজ্ঞাপন দিয়া উপযুক্ত লোক না পাওয়াতেই এইরূপ বিলম্ব হইয়াছে। এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই অতঃপর তৎপরতা দেখান হইবে। অধ্যাপক সেনের প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পাকিস্থানী কথা ও কাজ

আমরা কয়েকদিন পূর্ব্বে শুনিলাম যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ বন্ধ হইল। তাহাতে মনে হইয়াছিল যে, হয়ত বা কিছুদিনের মত পাকিস্থানী মনোবৃত্তির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু নিম্নস্থ সংবাদে যে পাকিস্থানী সবকিছুর মত ঐ "সমঝোতা" ও মেকী। এই উৎপাতের প্রতিকার নেহরুর দ্বারা হইবে না ইহাই আমাদের ধারণা।

করিমগঞ্জ, ১৬ই ফেব্রুয়ারী—এখানকার সরকারী সূত্র হইতে জানা যায় যে, সীমান্তবর্ত্তী শহর করিমগঞ্জের ৭ হইতে ১২ মাইলের মধ্যে অবস্থিত মদনপুর, বড়পুঞ্জী, সন্দেশ, দেওতলী, মহীশাসন, লাতু, কুড়িখালা, জারাপাতা ও সুতারকান্দীর উপর পাকিস্থানী সৈন্যদল কর্তৃক মেশিনগানের প্রবল গুলীবর্ষণ আজও অব্যাহত রহিয়াছে। এই গ্রামগুলির মধ্যে সুতারকান্দী, জারাপাতা ও সন্দেশের উপর গত রাত্রি হইতে গুলীবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। সরকারী সংবাদে প্রকাশ, পাথারিয়া পাহাড়ের হরিতকীটিলার উপরও পাক সৈন্যদলের গুলীবর্ষণ অব্যাহত আছে।

করিমগঞ্জ হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র শহর লাতু বহুসংখ্যক ভবনে ও মদনপুর চা-বাগানের বহু গৃহে পাকিস্থানী সৈন্যদলের মেশিনগানের গুলীবিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এখানকার সরকারী সূত্র হইতে জানা গিয়াছে। এই সূত্র হইতে আরও জানা গিয়াছে যে, লাতুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ডাকঘর, একটি ডিসপেনসারী, নিম্নপ্রাথমিক গৃহ গুলীবিদ্ধ হইয়াছে।

ভারতীয় সীমান্তবর্ত্তী পরীক্ষা ঘাটি ও সুতারকান্দীস্থিত সরকারী ভবনসমূহ পাকিস্থানী মেশিনগানের প্রধান লক্ষ্যস্থল বলিয়া মনে হয়।

সরকারী সংবাদ হইতে জানা যায় যে, মদনপুর চা-বাগানের উপর গুলীবর্ষণের ফলে বহু গৃহ গুলীবিদ্ধ হওয়ায় বাগানের কার্য্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইয়াছে।

পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

মৃত্যু দীর্ঘকাল ধরে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করলেও তার জন্যে মন প্রস্তুত হয় না। প্রত্যক্ষ হ'লেও আমাদের প্রাণ তাকে প্রতিবাদ করে। কিন্তু হার মানতেই হয়। হার মানার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনে আসে, যে মৃত্যু কেবল যে অপহরণ করে তা নয়, মৃত্যু জীবনের ভূমিকা। জীবনের অনেক সম্পদ দেখতে পাইনে তার নিজের আলোর মধ্যে, মৃত্যুর কালো পটের উপর তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যার কোন মূল্য দিইনি তারও মূল্য ধরা পড়ে, যা ছোট বলে কোণে পড়েছিল তাও দেখি ছোট নয়। তখন প্রাণ দেবতাকে এই বলে প্রণাম করি তোমার প্রতিমুহূর্ত্তের দান আমাকে ধন্য করেছে, তার বিচ্ছেদে যে শোক করি এতেও প্রমাণ করি সে আমার কতখানি। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে কিছুই তার ব্যর্থ হয় নি, তার মধ্যে সত্য যা তা রয়ে গেছে। হারাণোটাকেই বড়ো করে যেন না জানি, পেয়েছিলুম এইটেই বড়ো, সকল হারাণোর উপরে সে থাকে। বিচ্ছেদের শোককে কোনো সান্ত্বনাই দূর করতে পারে না, কেননা সেই শোক আমাদের অর্ঘ্য, জীবনের মধ্যে যাদের পেয়েছিলেম মৃত্যুর মধ্যে তাদের সেই পাওয়ার স্বীকৃতি। প্রাণের উপহার থেকে মৃত্যু আমাদের দূরে এনে দাঁড় করিয়েছে বলেই তাকে আমরা সম্পূর্ণ করে দেখতে পেয়েছি, গভীর করে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি। বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের বেদনাতেই আমরা দেবতাকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করি।

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো।

ইতি, ২৮ আশ্বিন ১৩৩৯

স্নেহাসক্ত

স্বাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বিজয়া দশমীর দিনে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে পৃথ্বী সিংহ নাহারকে লিখিত। পত্রখানি পৃথ্বী সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ইহার মূল তাঁহার নিকটে আছে। প্র. স]

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বর্তমান ধারা

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বর্তমান ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাম্প্রতিক বাঙালী জীবনের মনোগঠন ও আচরণের ভিতর অনেক প্রবণতা একসঙ্গে জড়িয়ে-মিশিয়ে জট পাকিয়ে আছে। প্রবণতাগুলির মধ্যে কোন কোনটি একটি আর একটির বিরোধী। বর্তমান নিবন্ধে আমি এই বিভিন্ন প্রবণতাগুলির মধ্য থেকে বাছাই করে কয়েকটির স্বরূপ-লক্ষণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করব। তবে খুব বেশী বিস্তারিত ভাবে আমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠার অবকাশ হয়ত এই নিবন্ধে হবে না, আমি আপাততঃ আপনাদের সামনে সূত্রাকারে আলোচনা উপস্থাপিত করেই ক্ষান্ত থাকব।

বাংলাদেশের যুদ্ধ-পরবর্তী মানসিকতা আর প্রাক্-যুদ্ধ মানসিকতায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। যুদ্ধ বলতে এখানে আমি প্রথম দ্বিতীয় দুই বিশ্ব মহাযুদ্ধকেই বোঝাচ্ছি। প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় বাঙালীর মনোজীবনের ভিতর যে নূতন ভাবধারার আলোড়নের সূত্রপাত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে তা আরও তীব্রতা প্রাপ্ত হয়েছে—প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে এইমাত্র পার্থক্য। এই যে নতুন ভাবধারার আলোড়ন, এক কথায় তার বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয়, বাঙালী মানসে সত্যিকার সমাজচেতনার স্ফুরণ এই পর্ব থেকেই সুরু হয়। যুদ্ধোত্তর বাঙালী মানস প্রখর সমাজ-চৈতন্যের দ্বারা প্রদীপ্ত। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী বাঙালী মনের এ বৈশিষ্ট্য ছিল না, থাকলেও তা খুব স্পষ্টগ্রাহ্য ভাবে ধরা পড়ে নি। বাংলা দেশের সমাজ-মানসে যুদ্ধের আগে পর্যন্ত যে ধারা ক্রিয়াশীল ছিল তা হল উনিশ শতকের লিবারেল ঐতিহ্যের ধারা। এই ধারায় নিস্নাত হয়ে উনিশ-শতকীয় বাঙালীপ্রধানেরা ও তাঁদের অব্যবহিত পরেকার উত্তর-সাধকেরা বাংলা দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রভৃতি বিচিত্র ক্ষেত্রকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তাঁদের কর্মোদ্যম বহু মুখে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সেই যুগের সাধারণ লক্ষণ এই ছিল যে, জাতিসেবার মানসে যিনি যে কর্মক্ষেত্রকেই বেছে নিয়ে থাকুন না কেন, তাঁদের কর্মোদ্যমের মূল প্রেরণা এসেছে ধর্ম থেকে। বোধ হয় একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাদ দিলে আর প্রায় সব কৃতী পুরুষই ধর্মকে কেন্দ্র করে তাঁদের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার বিস্তার সাধন করেছিলেন। কি শিক্ষা-বিস্তার প্রয়াসে, কি সমাজ-সংস্কার চেষ্টায়, কি সাহিত্য-চর্চায় সর্বত্র আমরা ধর্মীয় প্রণোদনার প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ্য করি। সমাজকল্যাণ নিশ্চয়ই উনিশ-শতকীয় প্রধানদের অন্যতম প্রধান একটি লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তার মূলে ছিল ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধির সাধনা। অধিকাংশেরই মনের পটে আত্মসমাহিত বিশুদ্ধ জীবনযাপনের আদর্শ সু অঙ্কিত ছিল। এই ব্যক্তিমোক্ষের সাধনা ও অভীপ্সা প্রধানতঃ ধর্মের খাত বেয়ে তাঁদের চিত্ততলে আশ্রয় লাভ করেছিল।

কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। যুদ্ধের আঘাতে-সংঘাতে বাঙালী মনের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপান্তর সাধিত হয়েছে। ধর্মের পূর্বতন প্রতিষ্ঠা আর নেই, রাজনীতি ধর্মের স্থান অধিকার করেছে। এর ফল ভাল-মন্দ দুই-ই হয়েছে। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধির স্পৃহা কমে গেছে, কিন্তু আমাদের সমাজ-চেতনা অনেক গুণ বেশী প্রখরতর হয়েছে। কিসে ব্যাপক ভিত্তিতে সমাজের কল্যাণ সাধন করা যায় এই চিন্তা অনেকেরই সংবেদনশীল চিত্ত আজ অধিকার করে রয়েছে। অসম সমাজ-ব্যবস্থার অন্যায় নিষ্পেষণে ব্যক্তিত্বের অবদমন ও ক্ষয়ের দৃষ্টান্তে আজ অনুভূতিপরায়ণ বাঙালীমাত্রেরই মন অতিশয় ম্রিয়মাণ। এই বিমর্ষ ভাবনার দ্বারা তাঁর মন এতদূর আচ্ছন্ন যে, ব্যক্তিমোক্ষ বা ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধির কথা ভাববার তাঁর অবসর নেই। বোধ হয় এ দুইয়ের মধ্যে একটা বিপরীত অনুপাতের সম্পর্ক বিদ্যমান। যে অনুপাতে মানুষের মধ্যে সমাজচৈতন্য বাড়ে, ঠিক সেই অনুপাতেই বোধ হয় তার ভিতর আত্মশুদ্ধির চিন্তা কমে আসে। তার মন ঊর্ধ্বমুখ থেকে প্রতিহত হয়ে ব্যাপ্তির অভিমুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অর্থাৎ যা ছিল প্রলম্ব বা vertical অভীপ্সা, তা অনুভূমিক বা horizontal অভীপ্সায় রূপান্তরিত হয়। এই অবস্থায় সংবেদনশীল চিত্ত বহু মানুষের কথা যত ভাবে স্বীয় আত্মশুদ্ধির কথা তত ভাবে না।

বাংলা দেশে প্রথম যুদ্ধের পর থেকে এমনতর অবস্থারই সূচনা হয়েছে। ধীরে ধীরে এই সমাজমুখী প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। উনিশ শতকের বাঙালী মানসে আত্মোপলব্ধির পাশে পাশে অথবা তারই অনুষঙ্গ হিসাবে সমাজ-সংস্কারের যে চেষ্টা দেখা যায় তা প্রধানতঃ ভদ্রলোক শ্রেণীর অর্থাৎ উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নয়ন-প্রয়াসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সেই চেষ্টার সঙ্গে গণজীবনের

কোন যোগ ছিল না। সাধারণ মানুষের আশা-আশঙ্কা উনিশ-শতকীয় চিন্তার প্রায়-বহির্ভূত ছিল। কিন্তু এখন আর সে কথা বলা যায় না। এখন সমাজ-মানসের মূল প্রবণতাই গণকল্যাণের অভিমুখে। যে নির্যাতিত অবহেলিতদের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু কিছু সমাজ সমালোচনা-মূলক রচনায়, দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে, রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক প্রেরণাজাত দুই-একটি কবিতায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীতে ছাড়া পূর্বেকার সাহিত্যে আর বড়-একটা কোথাও স্থান পায় নি, সেই অবহেলিতরাই যুদ্ধোত্তর সাহিত্যচিন্তায় একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠাভূমি দখল করে আছে। রবীন্দ্রনাথেরই উত্তর-জীবনে আমরা এই খাতে একটা বড় রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করি। তাঁর একাধিক পরবর্তী রচনা প্রগতিশীল সমাজ-ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। বর্তমান সংস্কৃতি ও সাহিত্যকর্মীদের চিন্তা অবধারিত ভাবে বৃহত্তর সমাজকল্যাণের ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে আছে। এখন আর নিরবচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সমুন্নতির আদর্শ সংস্কৃতি-চিন্তাকে আলোড়িত করে না; সমাজের সকল স্তর ও শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ যে আদর্শের অঙ্গীভূত নয়, তেমন আদর্শ যতই আপাতমনোহর হোক আধুনিক সাংস্কৃতিক ভাবনার মানদণ্ডে অগ্রাহ্য। সমাজ-মানসের ব্যক্তিচেতনা থেকে গণচেতনায় এই যে ক্রমিক উত্তরণ, এটি নিঃসন্দেহেই এ যুগের একটি শুভ লক্ষণ, বিশিষ্ট লক্ষণ।

কিন্তু এই পরিবর্তন আমাদের পক্ষে পুরাপুরি শুভফলদায়ক হয়েছে এমন কথা বলতে পারব না। ব্যাপ্তির দিক দিয়ে আমরা যতটা লাভবান হয়েছি, ঊর্ধ্বচিন্তার দিক দিয়ে আমরা ততটাই হারিয়েছি। আজ আর আমরা আত্মশুদ্ধি তথা আত্মোপলব্ধির কল্পনায় তেমন আনন্দ পাই না। আত্মোপলব্ধির সাধনার পিছনে যে ধর্মীয় প্রণোদনা ছিল তা ত গেছেই, তার নৈতিক প্রেরণাটুকুও অন্তর্হিত হয়েছে। আমরা এক অদ্ভুত অবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছি: আমরা জনসাধারণের কল্যাণের কথা বলি, কিন্তু ব্যক্তির উন্নয়নের কথা আমাদের মনে স্থান পায় না। ব্যক্তির সমবায়েই ত জনসাধারণ নামক abstract একটি সমষ্টির গঠন, সেই ব্যক্তির প্রয়োজন দাবী-দাওয়া আত্মিক ও নৈতিক ক্ষুধাকে উপেক্ষিত রেখে আমরা সমষ্টির কল্যাণ-ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছি। এমনতর প্রক্রিয়ার ফাঁক ও ফাঁকিটুকু বিচক্ষণের চোখ এড়াতে পারে না।

আমাদের উপর উনিশ-শতকীয় মানুষের এইখানেই ছিল জিত। উনিশ-শতকীয় লিবারেল ধ্যান-ধারণায় লালিত সমাজচিন্তার যতই সঙ্কীর্ণতা, গণ্ডীবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা থাকুক, তাঁদের চিন্তার ঊর্ধ্বগতি অর্থাৎ তাঁদের আত্মোন্নয়ন-প্রয়াস তাঁদের ব্যক্তিত্বকে একটা বিশেষ মহিমা দান করেছিল। ধর্মের ভিতর দিয়ে তাঁদের এই self-realisation-এর চেষ্টায় তাঁদের চরিত্রে একটা জোর এসেছিল। সেই জোরটুকু আমরা হারিয়েছি। ব্যাপক সমাজকল্যাণের আদর্শ যতই আজ উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হোক না কেন, পূর্বতন মানুষদের তুলনায় অদ্যতন মানুষের চরিত্রমাহাত্ম্য অনেক গুণ নিষ্প্রভ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ সকলেরই জীবনে আমরা এক আশ্চর্য চরিত্রের তেজ লক্ষ্য করি। এমনকি পরবর্তীকালীন অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ বিশ-শতকীয় প্রথম পাদের বাঙালী প্রধানদের মধ্যেও এই চারিত্রবল প্রকটিত। ইদানীং যেন এই চারিত্রবলের প্রবাহে ভাঁটার টান লেগেছে। আমরা ব্যক্তিকে অপরিশোধিত রেখেই ব্যক্তির সমাহার সমাজের শোধনের কথা ভাবছি। এই বিসদৃশ অবস্থার কারণ আমার যা মনে হয়েছে তার আভাস পূর্বেই দিয়েছি। সমাজকল্যাণের অভীপ্সার সঙ্গে আত্মশুদ্ধি যুক্ত না হওয়াতেই বর্তমানের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে বলে আমার ধারণা। এ দুই সাধনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হলে আমরা একটা চমৎকার অবস্থায় পৌঁছাতে পারতাম, পরিতাপের বিষয়, সেই সমন্বয় থেকে বর্তমান বাঙালী সমাজ-মানস বহু দূরে অবস্থান করছে। দুই-দুইটি যুদ্ধের ফলে দুয়ের মধ্যে সমন্বয় ত পরের কথা, বিচ্ছেদ আরও বেড়েছে। আমাদের ভিতরকার বস্তুগত সুখভোগের প্রবণতা আরও তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। আমাদের মধ্যে ত্যাগতিতিক্ষা কমে গিয়ে স্বার্থবোধ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি আধ্যাত্মিকতায় কিংবা আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের গতানুগতিক নিষ্ঠায় প্রত্যাবর্তনের কথা বলছি না। আনুষ্ঠানিক ধর্মের পুরাতন প্রতিপত্তি আজকের পরিবেশে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। সার্বজনীন দুর্গোৎসব বা কালীপূজার ব্যাপক উন্মাদনাকে আমরা যেন অন্ধকার ধর্মীয় পরিস্থিতির নিশানা বলে ভুল না করি। এই সব বারোয়ারী উৎসব-অনুষ্ঠানের বিবিধ প্রকরণের মধ্যে তামসিকতার যে ঘোরতর লীলা প্রকট, তদ্দ্বারা অসংস্কৃত জনজীবন উন্মথিত হলেও সমাজের চিন্তাশীল অংশের কাছে তার কোন আবেদন নেই। আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের নামে ধর্মের এই বিকৃতিতে সমাজের বিচক্ষণ অংশ বরং বিব্রত, বিচলিত। কিন্তু এ সব সমাজলক্ষণ আমাদের অগ্রসর মনের নিকট যতই অরুচিকর ঠেকুক, আমাদের নিজেদের কোঠায় সম্বল কী আছে, যার দ্বারা আমরা আমাদের মনের অপূর্ণতাকে ভরিয়ে তুলতে

পারি? জনজীবনের তবু ত একটা আশ্রয় আছে, সে তামসিকতাই হোক আর যাই হোক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী ভাবুক চিন্তাব্রতীদের কী আশ্রয়? ভর করে দাঁড়াবার মত কোন্ সুদৃঢ় প্রত্যয়ভূমি আমাদের পায়ের তলায় বিলম্বিত আছে? আমরা বুকে হাত দিয়ে যদি আত্মানুসন্ধান করে দেখি তা হলে দেখব যে, আমাদের মন যেখান থেকে বল, প্রেরণা ও প্রাণশক্তি আহরণ করে ব্যক্তিত্বকে পুষ্ট, জীবনকে সমৃদ্ধ করে, সেই প্রত্যয়ের ভূমিতে নৈরাজ্য বিরাজ করছে। আজকের মানুষ আমরা ঘড়ির দোলকের মত প্রত্যয় থেকে প্রত্যয়ান্তরে দোল খেয়ে ফিরছি, কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় থেকে আমরা বল সংগ্রহ করতে পারছি না। চরিত্রের বল ব্যক্তিত্বের বল। উনিশ-শতকীয় আদর্শবাদের উৎসমুখ আজ একেবারেই বিশুষ্ক-প্রায়। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তবু জাতীয়তার একটা প্রাণ-চঞ্চল উন্মাদনা সর্বদাই আমাদের মনকে সজীব রাখত, স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সঞ্জীবনী বিশল্যকরণীটিকেও আমরা যেন হারিয়েছি। অথচ আমাদের ব্যক্তিত্বের ক্ষুধা মেটে এমন কোন নূতন প্রত্যয়ের দ্বারা আমরা আমাদের মনের আকাশ উদ্ভাসিত করে তুলতে পারি নি। বলা হবে সর্বব্যাপী সমাজকল্যাণের যে আদর্শ এ যুগের মানুষ আমরা গ্রহণ করেছি, তাই আমাদের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির পক্ষে যথেষ্ট। আমি বলব, নয়। প্রখর সমাজচেতনার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে আমরা সমাজকে সমুন্নত করবার পথে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি সন্দেহ নেই ; কিন্তু ওটি বহিরঙ্গের সাধনা, অন্তরঙ্গের সাধনা নয়। আমাদের অন্তরঙ্গ জীবনকে সমৃদ্ধ করবার জন্য সমাজচেতনার অনুশীলনের বাইরে আমা-দের আরও কিছু করা দরকার। একটা সুনির্দিষ্ট, সুচিহ্নিত আদর্শবাদী প্রত্যয়ের দ্বারা আমাদের মনোজীবন চালিত হওয়া দরকার। বুর্জোয়া লিবারেল ভাবধারার আওতায় লালিত ও পুষ্ট উনিশ-শতকীয় বাঙালী-মানসের সামনে এই-রূপ একটি সুস্থিত প্রত্যয় ছিল ; ধ্রুবতারার মত সে প্রত্যয় তার দিগ্‌দর্শনের সহায়তা করত। আমরা তেমন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। আমরা এগিয়েছি যেমন, আবার পেছিয়েওছি। এই পশ্চাদ্‌গতির ক্ষতিপূরণে আমাদের বিশেষভাবে সক্রিয় হওয়া আবশ্যক।

এইখানেই উনিশ-শতকীয় মূল্যবোধগুলির বিধিবদ্ধ অনু-শীলনের সার্থকতা। উনিশ-শতকীয় বাঙালী প্রধানদের সামাজিক আভিজাত্যবোধ, অসার বনেদিয়ানার মনোভাব ও মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে আমরা গ্রহণ করব না, কিন্তু তাঁদের চারিত্রবলের আদর্শটিকে আমরা গ্রহণ করব এবং যে উপায়ের সাহায্যে তাঁরা ওই বল সংগ্রহ করেছিলেন সেই উপায়টিকে করায়ত্ত করবার চেষ্টা করব। আজকের বাঙালী সমাজের বিশেষ পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের ধ্যান ধারণার নতুন করে মূল্যায়নের সবিশেষ প্রয়োজন আছে। সংস্কৃতি পরিষদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের এক অধিবেশনে আমার এক প্রাবন্ধিক বন্ধু এই বলে আক্ষেপ করেছিলেন যে, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতক নিয়ে বড্ড বেশী মাতামাতি করা হচ্ছে। উনিশ শতককে ঘিরে এই উৎসাহ-আতিশয্য আমাদের মনের পশ্চাদ্‌মুখী প্রবণতার লক্ষণ—এই তাঁর মত। আমি তা মনে করি না। আমার মনে হয়, আমাদের সাম্প্রতিক সংস্কৃতি-জীবনের অপূর্ণতার শোধনের জন্য আমাদের আরও বেশী করে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমৃদ্ধ মানসের দ্বারস্থ হওয়া কর্তব্য। আমরা আমাদের সমাজচৈতন্যের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হব না, অথচ উনিশ-শতকের চরিত্রানুশীলনের তত্ত্বটিকেও ভাল করে বুঝে নেব এই আমাদের সঙ্কল্প হওয়া উচিত। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য পূর্বসূরীদের জীবনাচরণ থেকে প্রয়োজনীয় সঙ্কেত গ্রহণ করে তার পর যদি আমরা আমাদের অভীষ্ট পথে অগ্রসর হই, তা হলে আর আমাদের মার নেই।

বিশুদ্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা একই রকমের পরি-স্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বড্ড বেশী রোমাণ্টিসিজমের চর্চা হচ্ছে বলে আমার ধারণা—কি কাব্যে কি গল্পে। এই আত্যন্তিক রোমাণ্টিকতারও মূলে রয়েছে সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় ও তজ্জনিত শক্তির অভাব। তিরিশের বৎসরগুলিতে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রভাব বাংলার শিল্পী-মানসের আকাশে-বাতাসে ছড়ানো ছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় শিল্পী-শ্রেণীর একাংশের মধ্যে গান্ধী-দর্শনের প্রাদুর্ভাব ঘটল। গান্ধীবাদ যদিও রাজনীতি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দশক থেকেই সক্রিয় ছিল, কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক শ্রেণীর উপর তার প্রভাব পড়ে অনেক পরে—প্রায় তৃতীয় দশকের শেষের দিকে। কিন্তু মার্ক্সীয় দর্শনই বলুন আর গান্ধী-দর্শনই বলুন কোনটাই আমাদের মনের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি, এ দুই-ই একটা প্রবল রোমাণ্টিক সংস্কারের মত আমাদের মনের উপরতলাকে অধিকার করেছিল। ফল যা হবার তাই হয়েছে। আমরা সমাজকল্যাণের দীক্ষা গ্রহণ করেছি, কিন্তু ওই দীক্ষাকে আবশ্যক বলের দ্বারা শক্তিমতী করে তুলতে পারি নি। মার্ক্সবাদ কিংবা গান্ধীবাদকে যদি আমরা নিশ্বাসবায়ুর মতই গ্রহণ করে থাকব, তবে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের ভাষায় ভাবালুতার এত উচ্ছ্বাস কেন, বস্তু মননশীলতার এত অভাব কেন? মার্ক্সবাদ, গান্ধীবাদ দুটিই সুনির্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট সুসংহত প্রত্যয়, কিন্তু ওই

প্রত্যয় দুটির পল্লবগ্রাহিতাকেই শুধু আমরা নিয়েছি, তাদের আদর্শবাদ ত্যাগ-তিতিক্ষাকে নিতে পারি নি। এই দুটি আন্দোলনের আবেদন আমাদের মনশ্চক্ষে মূলতঃ রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার মায়াকাজলের দ্বারা অনুলিপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে বলেই আমাদের সাহিত্যে তাদের রোমান্টিক রূপটিই প্রবল হয়ে উঠেছে, ওই দুটি প্রত্যয়ের সত্যকে আমরা খাঁটি শিল্প-সত্যে রূপান্তরিত করে তুলতে পারি নি। ব্যক্তিজীবনে আমাদের ঋজুতার অভাব, সাহিত্যেও তাই। আমাদের আধুনিক কাব্য, কথা ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের অতিরিক্ত ভঙ্গি-প্রাধান্য, লিপিচাতুর্যনিষ্ঠা, অলঙ্করণপ্রিয়তা ও রোমান্টিক ভাবালুতা এই কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমরা কোন স্থির প্রত্যয়ভূমির উপর দাঁড়িয়ে সাহিত্য অনুশীলন করি না, যুগধর্মের তাগিদ ছাড়া অন্য কোন গভীরতর তাগিদ আমাদের মনে সক্রিয় নেই। আমাদের সমাজচৈতন্য নিঃসংশয়ে একটি সুস্থ আদর্শ দেশের বাস্তব পরিস্থিতিও এই আদর্শ অঙ্গীকারের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, কিন্তু এখনও আমরা সমাজচেতনাকে সত্যিকার বিশ্বাসের সত্যে পরিণত করতে পারি নি। তা যদি পারতাম তা হলে আমাদের বর্তমান সংস্কৃতি ও সাহিত্যের চেহারা অন্য রকম হত। সমাজবাস্তবতার আদর্শ দুই দুইটি মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাতের পরও রোমান্টিক প্রাণনা ও বুদ্ধিগত মননের বাইরে তার অধিকার-সীমা বিস্তার করতে পারে নি। এদিকে মার্ক্সবাদ ও গান্ধী-বাদের প্রতিক্রিয়ামুখে ইদানীং কিছু কিছু নূতন মতবাদের নাম শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলিরও প্রভাব নিতান্ত ভাসা-ভাসা, মনের গভীরে তাদের শিকড় প্রবেশ করে নি। প্রথম-নামীয় দুটি মতবাদের বেলায় যেমন, এ সকল নূতন মত-বাদের বেলায়ও তেমনি বাঙালী শিল্পী-মানস এদের রোমান্টিক আকর্ষণেই প্রধানতঃ মজেছে। Existentialism বা অস্তি-বাদ, Neo-Humanism বা নব্য মানবতন্ত্র ইত্যাদি নবদর্শন আমাদের মনের উপরকার জলে খানিকটা ঝিলিমিলি কাটতে-না-কাটতেই মিলিয়ে যাবার দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। মননের সত্যকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে পারলে এমন অবস্থা হত না।

তাই বলে বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির সকল দিকই সমান নৈরাশ্যকর এমন কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। বেশ বোঝা যাচ্ছে, গত কয়েক বছরে সংস্কৃতি কর্মের প্রভূত ব্যাপ্তি ঘটেছে। এই যে চারিদিকে আজকাল সভাসমিতি, সংস্কৃতি-অনুষ্ঠান, আলোচনা-চক্র, বিতর্ক-সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান হচ্ছে এ সমস্তই একালীন বাঙালীর প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচায়ক। অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির ক্ষেত্রে নানা ভাবে বিপর্যস্ত হয়েও যে বাঙালী তার প্রাণপ্রাচুর্য হারায় নি সেই আশাব্যঞ্জক সত্যের প্রমাণ এতে পাওয়া যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রভৃতির আতিশয্যকে কোন কোন অনুদার সমালোচক আধুনিক বাঙালীর তরল মনোভাবের পরিচায়ক বলে ব্যাখ্যা করলেও এ কথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, এদের ভিতর দিয়ে নবীন বাংলার সতেজ প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। হয়ত এর মধ্যে কিছু-কিঞ্চিৎ হুজুগেপনা আছে, দেখানেপনা আছে, তা হলেও নবীন প্রাণের উদ্দীপনাটুকুও এর মধ্যে দুর্লক্ষ্য নয়। এতে আমাদের সকল বিপত্তিকর অবস্থার উর্ধ্বে ওঠবার ক্ষমতা সম্পর্কে মনে আশা জাগিয়ে তোলে। আর-একটি নূতন আশার লক্ষণ দেখতে পেলাম বিপিনচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্যাপক গণ-উদ্দীপনার মধ্যে। এই উদ্দীপনাকে আমাদের স্থায়ী করবার চেষ্টা করতে হবে। বিপিনচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র উভয়েই ঋজু মানসিকতা ও প্রগাঢ় মননশীলতার প্রতীক। এঁদের আদর্শ সমাজ-মানসের উপর সামান্য হলেও প্রভাব বিস্তার করেছে, সে বড় কম কথা নয়। এ ঘটনা আধুনিক বাঙালী চিত্তের প্রবিষ্ণুতারই প্রমাণ। প্রভাবটি যাতে হারিয়ে না যায় সে বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার। শতবার্ষিকীর উপলক্ষেই র‍্যাশনাল ভাবাদর্শের প্রতি আমাদের যা কিছু নৈবেদ্য-নিবেদন, উপলক্ষটি ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অভ্যস্ত রীতিতে রবীন্দ্র-জয়ন্তী আর শরৎ জয়ন্তীর সম্মোহনকারী ঢালাও আয়োজনে চিন্তা ও যুক্তির সম্পূর্ণ নিমজ্জন—এ রকম যেন দেখতে না হয়। আমরা যে উনিশ-শতকীয় যুক্তিপন্থী ও বীর্যবান লেখকদেরই উত্তর-সাধনার স্রোতোমুখে বাংলাদেশের মনের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছি, তাঁদের অনাত্মীয় নই—একথা প্রমাণের জন্যেও অন্ততঃ আমাদের মাঝে মাঝে রবীন্দ্র-জয়ন্তী আর শরৎ-জয়ন্তীর আতিশয্য খর্ব করে রামমোহন, মাইকেল মধুসূদন, বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্রের জয়ন্তী-উৎসব পালনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া দরকার। রোমান্টিক আদর্শের প্রতি মোহবশতঃই সাহিত্যের আর সব দিক্‌পালদের ভুলে সবটুকু ঝোঁক গিয়ে পড়ছে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপর। এটি সুস্থ লক্ষণ নয়। কাব্যকল্পনা আর হৃদয়াবেগ-সমৃদ্ধির সঙ্গে ঋজু মনস্বিতা যুক্ত হলে তবেই আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠিত হওয়া সম্ভব, নচেৎ নয়। সে যাই হোক, আদর্শ-ব্যক্তিত্ব তৈরী হওয়ার পথে যে একটি শুভ-সূচনা দেখা দিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অন্য দিকে সাহিত্যে উৎসাহ ক্রমবর্ধমান। লেখক-সংখ্যা, লিখিত রচনার সংখ্যা, পাঠকসংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সংখ্যা ও

ক্ষুধা যেমন বাড়ছে তেমনি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রন্থসংখ্যাও হু হু করে বেড়ে চলেছে। আজ সাহিত্যক্ষেত্রে বহু বহু লেখক অনুশীলন-নিরত রয়েছেন। কি সাহিত্যের বিষয়-বস্তুর নির্বাচনে, কি সাহিত্য-রচয়িতার শ্রেণীস্বরূপের দিক দিয়ে সাহিত্যে যথার্থ গণতান্ত্রিক পর্বের সূচনা হয়েছে। প্রতিভার যুগ চলে গেলেও সম্মিলিত শক্তির বিজয় গৌরবের যুগ সমাগত। সব দিক বিচার করলে এই অবস্থায় আমাদের আশান্বিতই হওয়া উচিত।

সেই দিন

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

যে-প্রভাত আশে যুগে যুগে মোরা
মরিয়াও জয়ী হয়েছি সুখে।
যে-অমৃত মাগি বিষের পাত্র
মহা আনন্দে তুলেছি মুখে।
সেই শুভদিন হয় ত আজিও আসে নি,
অনাগত স্বপ্ন-সূর্য্য যদিও হাসে নি,
বিশ্বাস রাখি সেদিন ফিরিয়া আসিবে।
নূতন দিনের আশার আলোক হাসিবে।

পরাধীনতার শৃঙ্খলভার
খসিয়াছে বটে মিথ্যা নয়।
শত শহীদের আত্ম-আহুতি
জীবন-দান কি ব্যর্থ হয়।
এই স্বাধীনতা কাম্য ছিল না জানি তা,
মুক্তি-আহবে বিজয়ী আমরা মানি তা,
বিশ্বাস রাখি আমাদেরও দিন আসিবে।
নূতন দিনের সার্থক মুখ হাসিবে।

তুমি আছ

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

সম্মুখে, পশ্চাতে আর দক্ষিণে ও বামে—
যেদিকে তাকাই, সবি আছে ঠিকঠাক।
ছুটে চলে নরনারী জীবন-সংগ্রামে
তবু মনে হয়, যেন মস্ত বড় ফাঁক,
সর্বদা নিঃশ্বাস ফেলে ঘড়ির কাঁটায়
ক্লান্ত, ন্যুব্জ মাথা রেখে। তুমি নেই তাই
মৃত-ম্লান স্রোতস্বিনী যৌবন ভাঁটায়
তোলে সুর : তুমি নেই, আমি চলে যাই!

তুমি নেই! সত্যি বল, তুমি নেই! আর
মিথ্যে হাসি, মিথ্যে গান, মিথ্যেই মায়ায়
এতকাল মজে লগ্ন হ'ল কি ফেরার
অতল সমুদ্র পানে ক্ষুব্ধ হতাশায়?

না, না—তুমি ছিলে, আজো রয়েছ অমৃতে;
দৃষ্টি অবরুদ্ধকারী আনন্দ স্মৃতিতে!

বাউণ্ডুলে কানাই

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

—উমা উমা!

আট বছরের ছোট মেয়ে উমা কানাইয়ের পাশে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে তার কাজ দেখছিল। সানাইয়ের মুখে দেবার অংশটার সরু সরু করে কাটা তালপাতাগুলো একত্রিত করে তাইতে ফুঁ দিয়ে সুরটা পরখ করছিল কানাই। নিজে ভাল সানাই বাজায় কানাই। উমার এমনি একটা বাঁশীর সখ অনেক দিনের। নিজের মনের বাসনা গোপন না করে বলেছে কানাইকে। হাতের কাজটা শেষ হলে উমার জন্যে অমনই একটা বাঁশী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কানাই। তাই নীরবে বসে ছিল উমা। এমনি সময় পাঁচিলের ওপার থেকে তীক্ষ্ণ একটা সুর ভেসে এলো।

কাজ করতে করতেই একবার আট বছরের মেয়েটার দিকে আড়চোখে তাকাল কানাই। উমার চোখে-মুখে উঠে যাবার কোন চিহ্ন না দেখে মনে মনে হাসল কানাই।

—শুনতে পাচ্ছিস হারামজাদি, পোড়ারমুখী!

আবার পাঁচিলের ওপার থেকে ভেসে এল একটা কর্কশ সুর। কানাই উমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললে—জানিস উমা, তুই হলি শক্ত বেধ বিটি।

উমা কিছু বুঝল না, তাকিয়ে থাকল হাঁ করে কাকার মুখের উপর। হেসে উঠল কানাই উমার বোকা বোকা চাহনি দেখে।

হাঁ শক্রই ত, জন্মশক্র উমার মা। বলাইটাও বৌয়ের কথায় উঠে বসে।

নবগ্রামের জগন্নাথ ঘোষকে সবাই চেনে। ঘোষেদের বংশটা এখানকার পুরাতন বংশ, নামডাকে ঘোষেদের সমপর্যায় কেউ ছিল না। এই বংশের পঞ্চম পুরুষ জগন্নাথ ঘোষ, পিতৃপুরুষের সম্মান রেখেছিলেন। পেশা চাষাদি হলেও চাষ করেও জীবনধারণ করবার খুব একটা সুযোগ আসে নি জগন্নাথের। তার কারণ, প্রথম পুরুষ যতটুকু জমি করেছিলেন দ্বিতীয় পুরুষ তা থেকে কিছু বাড়ালেও তৃতীয়-চতুর্থ পুরুষ তাই বিক্রী করে দায়-ঝক্কি থেকে বেঁচেছিলেন। পঞ্চম পুরুষ জগন্নাথের কাছে অবশিষ্টাংশ এলেও, তাকে ধরে রাখবার সামর্থ ছিল না তাঁর। কিছু বিক্রী করে একটা মুদির দোকান করে বাঁচতে চেয়েছিল,' কিন্তু তাও হয় নি—মহাজনের দেনাই বেড়েছিল শুধু। লোকে বলে—পরের জন্যই নাকি দেনা হয়েছিল জগন্নাথের। কথাটা সত্যি হতেও পারে।

এই জগন্নাথ ঘোষের দুই সন্তান। প্রথম বলাই, দ্বিতীয় কানাই। দু'ভাইয়ের বয়সের পার্থক্য আট বছর। বলাই হওয়ার সাত বছর পর কোলে এসেছিল বলে কানাইয়ের প্রতি বাপমায়ের আদরটাও ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। সারা দিন বাবার কোলে কোলেই থাকত কানাই। লেখাপড়া শেখবার সুযোগ তার হয় নি। মরবার আগে কানাইকে সংসারী করে দেবার ইচ্ছা জানালে বলাইয়ের সঙ্গে জগন্নাথ ঘোষের হয়েছিল মতান্তর। বলাই বলেছিল, হালের বোঁটা ধরতে শিখে নি—জমির আল চিনে না, আর এরই মধ্যে ওর বিয়ে দিলে ও সংসার চালাবে কি করে শুনি?

—সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবেক নাই। আমি মরবার আগে সে ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।

—বেশ তাই কর।

বিয়ে হ'ল কানাইয়ের, ছোট্ট একটু বালিকা বধূ চেলী পরে' ঘরেও এল, কিন্তু যে ব্যবস্থা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জগন্নাথ তা আর করে যেতে পারেন নি। কানাইয়ের বিয়ের মাসখানেক পরে জগন্নাথ পরলোক গমন করলেন। স্বামীর শোক এমন পেয়ে বসল কানাইয়ের মাকে যে, পিতার মৃত্যুর এক মাস পরে মাও মারা গেলেন। এত দিন যাঁদের অবলম্বন করে লতার মত বেড় দিয়ে দিয়ে'বেড়ে উঠছিল কানাই, মা বাপের অবর্তমানে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। যে যেদিকে টেনে নিয়ে যায় সেই দিকেই যায় কানাই। এমনি করেই একদিন কানাই গিয়ে হাজির হয়েছিল ভুতা ডোমের আখড়ায়। সারাদিন সেইখানেই পড়ে থাকত, গান-বাজনা করত। ভুতা ডোম শানাই বাজাত ভাল, সে সানাইয়ের সুর শুনলে অতি বেরসিকও রসময় হয়ে উঠত। বাড়ী ফিরতে প্রত্যহই রাত্রি হ'ত তার, কখনও কখনও দু'তিন দিন পরও বাড়ী আসত। পরে যখন একদিন আবিষ্কৃত হ'ল যে, কানাই ভুতা ডোমের দলের ঢাকী, তখন বলাইয়ের স্ত্রীর সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ভদ্দর লোকের ছেলে হয়ে কানাই কিনা ডোমেদের সঙ্গে মিশছে!

সে কোন্‌না তাদের ছোঁয়া খায়। জাতধর্ম-বিচার সব গেল।

একদিন এই কথাই বলেছিল বলাইয়ের স্ত্রী।

—যাই বল, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে আর থাকা যায় না।

বলাই বলেছিল, ফেলেই আর দিই কোথায় বল? তার ওপর সঙ্গে একটা লেজুড় আছে।

—তাই বলে যা খুশি তাই করবে নাকি? ভদ্দর লোকের ছেলে হয়ে ডোমেদের সঙ্গে বাজনা বাজায় কে বলত? না বাপু, তোমার ভাইকে দেখলে গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করে।

—আচ্ছা আজ আসুক—শাসন করে দেব। আর মিশবে না।

ছোট বউ চম্পার কানে সব কথাই যেত। প্রতিবাদ করতে পারত না চম্পা—ঘরের এক কোণে বসে চোখের জল ফেলত। কেন ফেলত বলতে পারে না—তবে কেউ যদি কানাইয়ের দুর্নাম করত, মনোবীণার একটা তারে গিয়ে আঘাত করত। স্বামীকে নিবিড় করে বেঁধে রাখবার বয়স যদিও তখনও হয় নি তার, তবু কানাইকে দেখলেই আনন্দে কেমন দুলে উঠত বুকটা।

দিন চারেক পর সেদিন রাত্রে ফিরে এসেছিল কানাই। চুপি চুপি আপনার ঘরে শুতে গেলে জেগে উঠেছিল চম্পা। চার দিন পর স্বামীকে দেখে একই সঙ্গে আনন্দ আর দুঃখে হাসি আর অশ্রু দিয়েছিল দেখা।

—কোথায় ছিলে এই ক'দিন? ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করেছিল চম্পা।

—সে অনেক কথা, কাল বলব।

আর কোন কথা না বলেই চম্পার পাশে শুয়ে পড়েছিল কানাই।

—তোমাকে তাওব শাসন করবে। চুপি চুপি বলেছিল চম্পা।

—কেন?

—ডোমেদের সঙ্গে মেশামেশি কর কেন?

—বেশ করি। আমাকে বিরক্ত করিস না। নইলে—

গাঁ থেকে দশ মাইল দূরের একটা বিয়ে বাড়ীতে গিয়েছিল কানাই। খাতির করেছিল যা হোক, খুব খাইয়েছে। জীবনে ও রকম খাবার খায় নি সে। আসবার সময় কয়েকটা সিগারেট সঙ্গে নিয়ে এসেছিল কানাই। সেই একটা ধরিয়ে বারকয়েক বেশ আরাম করে টান দিল।

—নইলে কি?

কিছু না বলে এক মুখ ধোঁয়া মুখ থেকে ফুঃ করে বের করে দিল চম্পার মুখে। চম্পা কাশি সামলাতে গিয়ে মুখে কাপড় দিল।

—তুমি আর ডোমেদের বাড়ী যেতে পাবে না।

—বেশী বকর বকর করিস না বউ, নইলে দিব এখুনি তোর পিঠে টি-কয়া বাজিয়ে।

—আমিও জোরে জোরে কেঁদে দিব।

—বেশ মারব না, আয়—কাছে আয়। নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল কানাই চম্পাকে।

এত আদর! চম্পা নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কানাইয়ের মুখের দিকে। তার পর কোথা দিয়ে কেমন করে যে রাতটা কেটে গিয়েছিল জানতেও পারে নি।

পরের দিনে ঘটেছিল আর এক কাণ্ড।

ঘুম থেকে উঠে পুকুরঘাটে গিয়েছিল কানাই, ফিরে এসে দেখলে যে বিছানায় সে শুয়েছিল সেই বিছানাগুলি উঠানের এক পাশে পড়ে আছে, আর চম্পা বিছানাগুলির পানে তাকিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছে।

—এসব কি হ'ল রে বউ? পড়ে-থাকা বিছানাগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে চীৎকার করে বলল কানাই।

চম্পা কোন উত্তর দিল না।

ভিতরে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল বলাইয়ের স্ত্রী। দেবরের চীৎকার শুনে হাতের কাজ ফেলে দিয়ে এসে কানাইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, আমি ফেলে দিয়েছি।

—কেন? লাল হয়ে উঠল কানাইয়ের চোখ দুটো, যেন নেশা করেছে কানাই, মাথাটা কেমন যেন ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে।—ডোমের বিছানা ভদ্দর লোকের বাড়ীতে থাকে না।

—কি বললি, আমি ডোম? বেশ তাই হ'ল, কিন্তু তোর বাবার কি—আমি কি তোর বাবার বাড়ীতে আছি, না তুই আমার বাবার বাড়ীতে আছিস্‌? একটা অশ্লীল গালিগালাজ বেরিয়ে এল কানাইয়ের মুখ থেকে।

ঘরের মধ্যেই এতক্ষণ আত্মগোপন করে সব কথা শুনছিল বলাই, কিন্তু ক্রমেই কানাইয়ের কথাগুলো অসহ্য হয়ে উঠল। আর থাকতে না পেরে বেরিয়ে এসে কানাইয়ের গালে এক চড় মেরে বলল, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! বেরো বাড়ী থেকে।

কানাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা এমনি ভাবে অকস্মাৎ ঘটে যাবে—এ মোটেই ধারণাই করতে পারে নি কানাই। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল দাদার মুখের পানে।

—আজ থেকে তুই আলাদা হয়ে যা কানা। দৃঢ়ভাবে বলল বলাই।

সেইদিনই আলাদা হয়ে গিয়েছে কানাই। নিজেই উঠানটার মধ্যিখানে ভিৎ কেটে একটা পাঁচিল টেনে দুটো ভাগ করে দিয়েছে উঠা-টা।

এই ঘটনার পর, বেশ কয়েকটা বছরই এগিয়ে গিয়েছে। গৌরী তখন হয় নি, এখন আট বছরের মেয়ে। বেশ ফুটফুটে মেয়েটি, লম্বা লম্বা দুটি চলচলে চোখ, সরু সরু দুটি ঠোঁট—সব সময় হাসি মাখানো। মেয়েটাকে দেখলেই না ভালবেসে পারা যায় না। মাসছয়েক বয়স যখন গৌরীর, তখন থেকেই কানাই ওকে আপনার করে নিয়েছে। এই জন্যে দুর্ভোগ যে তাকে ভুগতে হয় নি তা নয়। গালাগালি করেছে গৌরীর মা, কত মন্দ কথা বলেছে, কিন্তু সে সব কথায় কান দেয় নি কানাই।

—ওরে গৌরী, বলি কানের মাথা কি খেয়েছিস নাকি? আয় আজ, তোর হাড় এক দিকে আর মাস এক দিকে যদি না করি তবে আমি কি! হতচ্ছাড়ি, মাগী, মরছেন।

গৌরীর মা আবার প্রাচীরের আড়াল থেকে চীৎকার করে উঠলেন, কিন্তু গৌরী উঠবার কোন লক্ষণ দেখাল না।

চম্পা রান্নার জোগাড় করছিল, কানাইকে চিরকাল ভয় করে ও তার পর বড় জায়ের যা মুখ! হাতের কাজ অসমাপ্ত রেখে দিয়েই চম্পা এসে বলল, বাড়ী যা গৌরী, তোর মা ডাকছে।

—বাড়ী গেলে আর বাঁশী হবে না গৌরী, তা বলে দিচ্ছি। আপনার ঘুনাইটায় একটা ফুঁ দিয়ে বলল কানাই।

—আমি যাব না, মা মারবে।

—না যাস না, আজ আমি তোকে ডোমপাড়ায় নিয়ে গিয়ে ভাল বাঁশী করে দেব। চুপি চুপি বললে কানাই।

—তা না নিয়ে গেলে দাদার জাত যাবে কি করে! বাপ রে বাপ, ঢের ঢের শত্রু দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। ওপার থেকে ভর্ৎসনা ভেসে এল।

সে ভর্ৎসনাকে উপেক্ষা করেই কানাই অত্যন্ত সহজসুরে বলল, চল্ গৌরী, আমরা যাই।

—চল।

গৌরীর হাত ধরে ঘরের বাইরে আসতেই কোথা হতে ঝড়ের মত বেগে গৌরীর মা ছুটে এসে কানাইয়ের হাত থেকে টেনে নিয়ে গেল গৌরীকে। তারপর যা ঘটনা ঘটল তাই দেখে-শুনে কানাইয়ের চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ল। ছোট্ট মেয়েটার কান্নার সুর এখনও কানে ভাসে তার।

—আর তুমি ওকে নিয়ে যেও না বলে দিচ্ছি। বলল কানাইয়ের স্ত্রী।

—কেন?

—মারটা ত তোমার পিঠে পড়বে না, অই বাচ্চা মেয়ের পিঠ ফুলে যাবে।

—এবার মারলে আমিও—হুঁ!

কানাইকে চেনে চম্পা, চেনে বলেই এই মানুষটিকে নিয়ে তার ভাবনার অন্ত নেই। এমনিতে বেশ ভাল মানুষ কানাই, সারাদিন টো টো করে ঘুরেই বেড়ায়, কখনও তাসের আড্ডায় কখনও আবার ভুতো ডোমের উঠানে পড়ে থাকে। কেউ কোন ফরমাস করলে তা তৎক্ষণাৎ করে দিতেও আপত্তি করে না। এজন্যে অনেকে বাউণ্ডুলে বলে কানাইকে।

সেদিন তাই বলেছিল কানাইয়ের স্ত্রী চম্পা, বিশ্বাস করে নি কানাই।

—এসব তোর বানান কথা।

—এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি।

—কে বলছিল বল ত?

—তা বলব না, শুনলেই ত এখুনি খুনখারাপি কাণ্ড বাধাবে।

—তুই না বললেও আমি বুঝেছি। ঐ ব্যাটা বাসনা—নিশ্চয় বাসনা। ব্যাটাকে দিয়েছিলাম কিনা এক গাঁট্টা!

—কোন্ দিন তুমি জেল খাটবে।

—খাটি খাটব। ব্যাটা বলে কিনা ধানও নেই, পয়সাও নেই। আরে, আমরা সবাই দেখলাম, মতি বাউরী ভাগে চাষ করল তোর জমি, আর আজ ওর অভাবের দিনে তুই কিনা বলেছিলি মারব না, উপরন্তু মতের বুড়ীমা চাইতে গিয়ে মার খেয়ে এল! বুঝুক ব্যাটা, মারটা কেমন লাগে! আবার থানায় গিয়েছিল! কি হ'ল ঘণ্টা! এর পর বেশী বাড়াবাড়ি করলে দিব ঘরে আগুন দিয়ে। বিশ্বাস নেই কানাইকে, ও সব করতে পারে।

দিনকয়েক আর গৌরীকে দেখা গেল না রাস্তায়। হঠাৎ একদিন সকালেই শুনল গৌরী জিদ ধরেছে কাকার কাছে যাবে।

—যাবি কি, যা দেখি—

—না যাব!

—যাবি? যা—

পর পর কয়েকটা চপেটাঘাতের শব্দ গেল শোনা, আর থাকতে পারল না কানাই।

—দে ত বউ লাঠিটা, দেখি একবার শালীকে।

চম্পার অপেক্ষা না করেই নিজেই ঘর থেকে লাঠিটা বের করে এনে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল কানাই। বাধা

দেবার চেষ্টা করল চম্পা কিন্তু পারল না। দরজাতেই বলাইয়ের সঙ্গে দেখা।

—কার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে যাচ্ছিস কানা? পথ আগলে জিজ্ঞেস করল বলাই।

—শুনতে পাও না, মেয়েটাকে যে খুন করে দিল ঐ ডাইনী।

—ওর মেয়ে, ও যদি শাসন করে আপনার মেয়েকে তাতে তোর কি?

—শাসন করতে গিয়ে মেরে ফেলবে নাকি?

—যা খুশী তাই করবে।

দাদার মুখের পানে খানিক অপলক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল—অঃ! ঐ রাস্তাতেই বেরিয়ে গেল কানাই, ফিরল অধিক রাত্রে টলছে। গন্ধ বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে—তীব্র, ঝাঁঝালো গন্ধ। স্বামীর অবস্থা দেখে চম্পা কি করবে তাই ভাবছিল—

—কি ভাবছিস? আজ মদ খেয়েছি রে বউ, কোন দিন খাই নি আজ খেলাম। বেশ লাগে—বুকটা জলে উঠে, তার পর—

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না কানাই। চম্পা তাড়াতাড়ি মাটিতেই একটা বিছানা করে কানাইকে শুইয়ে দিয়ে তার মাথায় হাওয়া করতে বসল।

তার পর দিন আর কোথাও বেরুল না কানাই। এমন কি উঠানে এসেও বসল না। সন্ধ্যাবেলায় আর থাকতে না পেরে শানাইটা নিয়ে উঠানের এক পাশের কাঁঠালগাছটার নীচে এসে বসল।

বাঁশী ভালবাসে গৌরী।

সুর তুলল কানাই। ইনিয়ে-বিনিয়ে ইমন রাগে একটা সঙ্গীত গাইল। নিজের কাছে নিজেরই বড় বেমানান রকমের করুণ শোনাল—সে সুর-লহরী। জল গড়িয়ে পড়ল চোখ দিয়ে।

এল না গৌরী।

ঠোঁট দুটো ব্যথা করে উঠল, রীডটা গেল অকেজো হয়ে, তবু এল না গৌরী। শেষে রাগে আর অভিমানে টুকরো টুকরো করে দিল বাঁশীটা।

পরের দিন কি একটা কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিল কানাই, রাস্তায় এসে পা দিতেই দেখল এক হাঁটু ধুলোর উপর বসে, ধুলো দিয়েই একটা ঘর বানিয়েছে গৌরী, আর সে বসে আছে ঘরের মাঝখানে।

গৌরীকে দেখে চোখ দুটো কেমন হেসে উঠল কানাইয়ের। অতি সন্তর্পণে, এগিয়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে গৌরীর চোখ দুটো টিপে ধরল কানাই। গৌরী চীৎকার করে উঠল।

—আঃ, ছাড়্ খুকু, ছাড়্ বলছি।

চোখ দুটো ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়াল কানাই।

—আমাকে চিনতে পারিস নেই।

—না।

—চল্ বাঁশী নিবি গৌরী?

—না, তোমার কাছে গেলে মা মারবে।

—তোর গায়ে হাত দিলে আমিও আর ছেড়ে কথা কইব না, আয়।

—না।

—যাবি না?

—না।

পৃথিবীটা ঘুরে গেল। ক্ষণিকের জন্য হলেও সমস্ত বিশ্ব-সংসার তার চোখের সামনে থেকে গেল মুছে। একবার গৌরীর রচনা করা খেলাঘরটার দিকে তাকাল কানাই। পায়ে করে ধুলোর দেওয়ালগুলোকে ভেঙে দিলেই পথটার সঙ্গে আর কোন পার্থক্য থাকবে না গৌরীর ঘরের। কিন্তু তা করলে পাছে গৌরী কাঁদে তাই সে কাজ করল না কানাই। ফিরে এল বাড়ীতে, গুম হয়ে বসে থাকল খানিক দাওয়ার উপর। অন্তরের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব পাক খেতে খেতে কানাইকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছিল—তাই ঝেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল কানাই।

—শাবলটা দে ত বউ!

—কি করবে?

—কাজ আছে, দে!

শাবলটা ঝাড়নের তলা থেকে টেনে নিয়ে এল কানাই, তার পর উন্মত্ত ভাবে উঠানের মাঝখানের দেওয়ালটার গায়ে মারতে সুরু করল।

—এ কি করছ?

—বেশ করছি। আমি নিজের হাতে দিয়েছি, আমি ভাঙব, কারও কিছু বলার ধার আমি ধারি না। আমি এই ভাঙছি, ভাঙছি, ভাঙছি।

প্রতিবার শাবলটা চালাবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করল কথাগুলি। তার রুদ্রমূর্তির সামনে কেউ এসে দাঁড়াতে সাহস করল না। বার বার আঘাত করার পর সত্যিই দেওয়ালটার খানিকটা পড়ে গিয়ে ওপারে দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকা গৌরীর মুখখানা উঠল ভেসে।

—কাকা! গৌরী ডাকল।

গল্পের জন্মান্তর

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
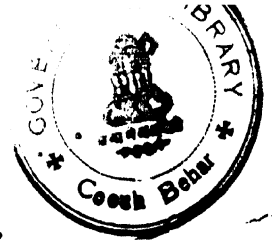
আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালায় 'সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভে'র গল্প পড়িয়াছি। স্মরণার্থে গল্পটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

"এক গর্দভ, সিংহের চর্মে সর্বশরীর আবৃত করিয়া, মনে ভাবিল, অতঃপর সকলেই আমায় সিংহ মনে করিবে, কেহই গর্দভ বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। অতএব, আজ অবধি আমি এই বনে সিংহের ন্যায় আধিপত্য করিব। এই স্থির করিয়া, কোনও জন্তুকে সম্মুখে দেখিলেই, সে চীৎকার ও লম্ফঝম্প করিয়া ভয় দেখায়। নির্বোধ জন্তুরা তাহাকে সিংহ মনে করিয়া, ভয়ে পলাইয়া যায়। এক দিবস, এক শৃগালকে ঐরূপ ভয় দেখাইলে সে বলিল, 'অরে গর্দভ, আমার কাছে তোর চালাকি খাটিবে না। আমি যদি তোর স্বর না চিনিতাম, তাহা হইলে সিংহ ভাবিয়া ভয় পাইতাম'।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় রেভারেণ্ড টমাস জেমস-এর "Aesop's Fable" হইতে ইহা ভাষান্তরিত করেন। ইংরেজিতে ইহার কি রূপ ছিল দেখাইতেছি:

"An Ass having put on a Lion's skin roamed about, frightening all the silly animals he met with and seeing a Fox, he tried to alarm him also. But Reynard, having heard his voice, said, 'Well to be sure! and I should have been frightened too, if I had not heard you bray'."

আমরা দেখি বাংলায় জন্মলাভ করিয়া, ইংরেজির 'Fox শিয়াল হইয়া গিয়াছে। এই গল্পের ঠিক পূর্বজন্ম গ্রীসে। সেখানে কি রূপ ছিল, তাহার একটা বাংলা ফটো দিতেছি:

"এক গর্দভ সিংহের চর্ম পরিয়া সকল পশুকে ভয় দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। একটি খ্যাকশিয়ালকে দেখিয়া সে অন্যের মত তাহাকেও ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু খ্যাকশিয়ালটি তাহাকে চীৎকার করিতে শুনিয়াছিল। সে বলিল, 'আমি স্বীকার করি, যদি না আমি তোকে চীৎকার করিতে শুনিতাম, তবে আমিও নিজে ভয়ে পলাইতাম'।"

এই গ্রীক গল্পটি পূর্বজন্মে ছিল ভারতে। বৌদ্ধজাতকে তাহার যে পালি-রূপ ছিল, তাহার একটি তর্জমা নিয়ে দিতেছি:

"এক সময়ে যখন ব্রহ্মদত্ত বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছিলেন, বোধিসত্ত্ব এক কৃষককুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকেন। সেই সময়ে এক বণিক্ ছিল; সে চারিদিকে জিনিস ফেরি করিয়া বেচিত। একটি গর্দভ তাহার জিনিস-পত্র বহন করিত। কোনও স্থানে পৌঁছিয়া সে গর্দভের পৃষ্ঠ হইতে বোঝা নামাইয়া তাহাকে সিংহচর্ম দ্বারা আবৃত করিয়া ধান ও যবক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত। ক্ষেত্ররক্ষকেরা এই প্রাণীটিকে দেখিয়া তাহাকে সিংহ মনে করিয়া তাহার নিকটে যাইতে সাহস করিত না।

"একদিন সেই ফেরিওয়ালা এক গ্রামে আসিয়া আড্ডা করিল। যখন সে তাহার খাদ্য পাক করিতে লাগিল, সেই অবসরে সে গর্দভের গায়ে সিংহচর্ম দিয়া তাহাকে এক যব-ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিল। ক্ষেত্ররক্ষকেরা তাহাকে সিংহ মনে করিয়া তাহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। তাহারা গ্রামে পলাইয়া গিয়া সকলকে ভয়ের সংবাদ দিল। গ্রামের লোকেরা লাঠিসোটা লইয়া দৌড়িয়া ক্ষেতে গেল। সেখানে গিয়া তাহারা চীৎকার করিতে, শাঁখ বাজাইতে এবং ঢাক পিটাইতে লাগিল। গর্দভ ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে গর্দভ বলিয়া জানিতে পারিয়া প্রথম গাথা আবৃত্তি করিলেন:

'আমি সিংহও দেখি না, বাঘও দেখি না, চিতাও দেখি না, আমি দেখি সিংহচর্মাবৃত এক গর্দভ।'

"যখন গ্রামবাসীরা জানিতে পারিল যে, সেটা একটা গাধা মাত্র, তখন তাহারা তাহাকে লাঠি-পেটা করিয়া তাহার হাড়গোড় ভাঙিয়া দিয়া সিংহচর্ম লইয়া চলিয়া গেল। তখন সেই বণিক্ সেখানে আসিয়া গর্দভের দুরবস্থা দেখিয়া দ্বিতীয় গাথা আবৃত্তি করিল:

'যদি গর্দভের জ্ঞান থাকিত,তবে সে বহুদিন ধরিয়া কাঁচা যব খাইতে পারিত,

সিংহচর্ম ছিল তাহার ছদ্মবেশ; কিন্তু সে চীৎকার করিয়া মার খাইল।'

"যখন সে এইরূপ বলিতেছিল, গর্দভটি মরিয়া গেল। বণিক্ তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।"

(সীহচম্মজাতক)

গল্পটি ছিল প্রাচীন ভারতের একটি লোককথা (folk-lore)। বৌদ্ধেরা তাহার মধ্যে বোধিসত্ত্বকে টানিয়া আনিয়া তাহার উপর ধর্মের একটা পাতলা রং দিয়া দিয়াছে। গল্পটি যে প্রাচীন ভারতের তাহার প্রমাণ এই যে, এই গল্পটির রূপান্তর বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্রে' দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অনুবাদ নীচে দিতেছি :

"কোনও একস্থানে শুদ্ধপট নামে এক রজক বাস করিত। তাহার একটি গর্দভ ছিল। সে ঘাসের অভাবে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর সেই রজক বনে বেড়াইতে বেড়াইতে একটি মৃত ব্যাঘ্র দেখিল। তখন সে ভাবিল, 'ওহো! বেশ ভাল হইল। এই ব্যাঘ্রচর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গাধাকে রাত্রে যবক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিব। তাহাতে তাহাকে বাঘ মনে করিয়া নিকটবর্তী ক্ষেত্রপাল-সকল তাহাকে তাড়াইবে না।' সেইরূপ করিলে গর্দভ ইচ্ছামত যব খাইতে লাগিল। প্রত্যুষে রজক তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিত। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে গর্দভ মোটাসোটা হইল। তখন তাহাকে অতিকষ্টে বন্ধন স্থানে আনা যাইত। অনন্তর এক দিবস সে মদোদ্ধত হইয়া দূর হইতে গর্দভীর শব্দ শুনিতে পাইল। তাহা শুনিবামাত্র সেও নিজে শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই ক্ষেত্রপাল-সকল এটা ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত গর্দভ, ইহা জানিতে পারিয়া লাঠি, তীর ও পাথর মারিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল।"

('পঞ্চতন্ত্র', পৃঃ ২৯৫-৯৬, বোম্বাই সংস্করণ)

'পঞ্চতন্ত্রে'র পরবর্তী সংস্করণ নারায়ণ পণ্ডিতের 'হিতোপদেশে' গল্পটির পুনর্জন্ম ঘটিয়াছে। আমি নিম্নে তাহার রূপটি দেখাইতেছি :

"হস্তিনাপুরে বিলাস নামে এক রজক ছিল। তাহার গর্দভ অতি ভার বহন হেতু দুর্বল হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন সেই রজক তাহাকে ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত করিয়া বনের নিকটস্থ শস্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিত। তখন ক্ষেত্রপতিসকল দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র মনে করিয়া সত্বর পলায়ন করিত। অনন্তর একদা এক শস্যরক্ষক ধূসরবর্ণ কম্বল দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়া তীরধনুক লইয়া অবনত দেহে এক প্রান্তে অবস্থান করিল। তখন তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া গর্দভটি, যে এখন যথেষ্ট শস্যভক্ষণ হেতু বলবান্ এবং পুষ্টাঙ্গ হইয়াছিল, ওটি গর্দভ মনে করিয়া উচ্চ শব্দ করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল। শস্যরক্ষক চীৎকার শব্দদ্বারা তাহাকে গর্দভ নিশ্চয় করিয়া অনায়াসেই বধ করিল।"

('হিতোপদেশ', পৃঃ ৮৩, বোম্বাই সংস্করণ)

আমরা দেখিতেছি যে, 'পঞ্চতন্ত্রে' ও 'হিতোপদেশে' জাতকের বণিক্ রজক হইয়া গিয়াছে এবং সিংহচর্ম স্থানে ব্যাঘ্রচর্ম আনিয়াছে। গ্রীকে বণিক্ রজক কিছুই নাই। গর্দভের চীৎকারের কারণ জাতকে ভয়, গ্রীক গল্পে অন্যকে ভয়প্রদর্শন, পঞ্চতন্ত্রে গর্দভীর দর্শন, হিতোপদেশে ধূসর-কম্বলাবৃত লোককে গর্দভ-ভ্রম। বোধ হয় মূলে গর্দভের সিংহচর্মাবৃত হইবার কথাই ছিল এবং তাহাতে গর্দভীর দর্শন বা কৃত্রিম গর্দভ-দর্শনের কথা ছিল না।

এইরূপ আরও অনেক ভারতীয় পশুপক্ষীঘটিত উপকথা ঈসপের গ্রীক গল্পে নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

অতীতের আকর্ষণ

শ্রীকালিদাস রায়

অতীতের সেই কাব্য ভারত দেয় মোরে হাতছানি
মন উচাটন, যদিও ফেরার উপায় নেই তা জানি।
দূরগামী পাখী যতদূরই যাক যেমন সে নীড়ে ফিরে
নদী কি তেমনি ফিরে যায় গিরিশিরে ?
মরুভূমে রয়ে সুমেরু স্বপ্ন দেখা!
বর্তমানের জনতারণ্যে পথহারা আমি একা।
নির্বাসনের ব্যথা সই হেথা কোন অপরাধে বুঝি
মনের মানুষ যারা সব হেথা তাদেরে পাই না খুঁজি।
হোক সবি মায়া, কল্পনা ছায়া, সকলি স্বপ্নময়,
তাদের জন্য বিরহ বেদনা তাহা ত মিথ্যা নয়।

আমার শোণিতে ধ্বনিত যে হয় তাহাদের কলভাষ,
তাহাদের কেশ বেশের গন্ধে ভরে মোর নিশ্বাস।
সে মানুষ নাই, আছে সেই চাঁদ সেই মেঘ নদী বন
জাতিস্মারিকা সে প্রকৃতি মোর উচাটন করে মন।
সে ভারতে যেন সোনার কমল মৃণাল কন্দ আমি,
পঙ্কে রহিয়া তাহারি স্বপ্ন দেখিতেছি দিবাযামী।
ভাঙিয়া গিয়াছে মৃণাল দণ্ডখানি
সূক্ষ্ম তন্তু ধরি শুধু আমি টানি।
যত টানি তত বাড়িয়াই চলে এ কি এ কর্মভোগ।
ব্যবধান বাড়ে, ছিন্ন হয় না যোগ।

পক্ষিতীর্থে অপেক্ষারত জনমণ্ডলীর সম্মুখে পক্ষিদ্বয়ের আবির্ভাব

দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ

শ্রী[illegible]কুমার পাকড়াশী

সংসারের কড়া বন্ধনে জীবনটা যার বন্ধ হয়ে গেছে, তার পক্ষে ভ্রমণ-বিলাসী হওয়া সাজে না। তবুও সুযোগ পেলেই কোথাও না কোথাও পাড়ি দিই। এমনি করে সারা উত্তর ভারতটা আমার এক রকম দেখা শেষ হয়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। দক্ষিণ ভারতের দিকেও যে যাইনি, তা নয়; কিন্তু যে দুবারই গেছি, মাদ্রাজ শহরের বেশী আর কোথাও বড় একটা যাবার সুযোগ হয় নি, এক পণ্ডিচেরী ছাড়া। মন্দিরময় ভারতের যে পূর্ণ প্রকাশ দক্ষিণ-ভারত, তা না দেখে শুধু মাদ্রাজ শহর থেকে দু'দুবার বাধ্য হয়ে ফিরে এসে মনটা কেমন ভিতরে ভিতরে ক্লান্ত হয়ে ছিল, তাই সুযোগ খুঁজছিলাম—কখন একবার বেরিয়ে পড়তে পারি। আর এবার বেরুলে ভারতের ভূ-পৃষ্ঠের শেষ প্রান্ত (The Land's End) পর্য্যন্ত না গিয়ে আর কিছুতেই ক্ষান্ত হব না।

ভাগ্য বোধ হয় এবার প্রসন্নই ছিল তাই বহুপোষিত বাসনার তৃপ্তিসাধনের এক মহা সুযোগ ঘটে গেল। আমাদের প্রতিবেশিনী শ্রীমতী গৌরী দেবীর সঙ্গে আমার পরিবারবর্গের এমনি ঘনিষ্ঠতা যে, তাঁকে আর শুধুমাত্র আমাদের প্রতিবেশিনী বলা যায় না, বরং বলা যায় তিনিও এখন আমাদেরই একজন। এবং একদিন তিনি কথায় কথায় বললেন, কন্যাকুমারী যাবার তাঁর বড় সাধ, কিন্তু তাঁর স্বামীর অবসর না ঘটায় এ সাধ আর তাঁর পূর্ণ হচ্ছে না। এমন একজন তেমন সঙ্গীও পান না যাঁর সঙ্গে যেতে পারেন। তাঁর কথা শুনে কেমন নিজেকে অপরাধী মনে করলাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের এত ঘনিষ্ঠতা—কিন্তু কৈ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে আমি বিদেশে বেড়াতে যাবার সময় কখন ত তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই নি? মনের কথা মনেই রইল, এ প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আর কোনও আলোচনা করলাম না।

এরই কিছুদিনের মধ্যে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে বাইরে বেরুবার সুযোগ ঘটল—আর এবারে যে আকাঙ্ক্ষিত স্থানে না গিয়ে ক্ষান্ত হব না, সে সম্বন্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প হলাম। কিন্তু যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে গিয়ে দেখলাম, বাড়ীর সকলের এ সময়ে যাবার সুবিধা নেই। শুধু আমার দুই মেয়ে আভা ও আরতি আমার সঙ্গী হতে পারে। আভার যাওয়ার সুবিধা হতে আমি সত্যিই খুব খুসী হলাম, কারণ সে প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে এম-এ পাস করেছে, ভারতের প্রচীন শিল্পকলা সম্বন্ধে সে অনেক কিছু পড়েছে, এবার সে-সকলের সঙ্গে তার চাক্ষুষ পরিচয় হবার সুযোগ হবে। আর আরতি—সে যদিও এখনও স্কুলের ছাত্রী, কিন্তু ভগবানদত্ত তার এমনি মধুর কণ্ঠ, আর সঙ্গীত সম্বন্ধে তার এমনি দক্ষতা যে, বিদেশে সে সঙ্গে থাকলে অবসর সময়টা সকলেরই কাটবে ভাল। ওদিকে শুনলাম শ্রীমতী গৌরী দেবী তাঁর কিশোরী দুটি মেয়ে—নূপুর ও মালাকে সঙ্গে নেবেন। অঙ্কের ভাষায় ফিফটি-ফিফটি, অর্থাৎ দু'পক্ষেরই লোকবল সমান।

৪ঠা নভেম্বর ১৯৫৮ বেলা ১-৫৫ মিনিটের মাদ্রাজ মেল ধরবার জন্য সবাই হাওড়া ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। আগে থেকেই একটি ছোট কামরা রিজার্ভ করা ছিল, অতএব এ ব্যাপারে কোন হাঙ্গামা সহ্য করবার ছিল না। গাড়ীতে উঠেই জিনিসপত্র সব যথারীতি সাজিয়ে-গুছিয়ে সুস্থির হয়ে বসতে কিছুটা সময় গেল। দেখলাম, শুধু একজন সঙ্গী পেলেই যে কন্যাকুমারী যেতে পারেন,

এটা গৌরী দেবী অতিশয়োক্তি করেন নি। কাজ-কর্মে তিনি যে দক্ষ, তাঁর সঙ্গীর কাছে তিনি যে একটা বোঝা নন, উপরন্তু সঙ্গীটির নিজের বহু ভার যে তিনি অতি সহজেই বহন করতে পারেন—গাড়ীতে বসেই এটা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করলাম।

দিনের বেলা রেলে চড়ার একটা সুবিধা এই যে, দু'পাশের দৃশ্য সব দেখা যায়। অতএব রিজার্ভ কামরায় আর অন্য যাত্রী না থাকায় চুপচাপ আমরা আশপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যেতে লাগলাম। মালাই মাঝে মাঝে তার স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা প্রকাশ করে আমাদের মনের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে আমাদের সজাগ করে দিচ্ছিল।

বিকেল ৪-১৫ মিনিটের সময় গাড়ী এসে থামল খড়্গপুরে। এখানে আমরা চায়ের পর্ব সেরে নিলাম। তার পর আবার চুপ-চাপ। এমনি করে সন্ধ্যার সময় গাড়ী যখন বালাসোরে এসে পৌঁছল তখন খাবার-গাড়ী থেকে রাত্রের খাবার দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু দেখলাম, তাড়াতাড়িতে বাড়ী থেকে আমি তেমন খাবার না আনলেও গৌরী দেবীর সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হয় নি। প্রচুর আহার্য্য তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন, তাই গাড়ী থেকে আবার যখন খাবার সব এল তখন সত্যিই তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আমি এদিকটা মোটেই ভাবি নি।

সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত বাইরের যে দৃশ্যাবলী চোখে পড়ছিল এখন তা আর হবার উপায় রইল না। শুধু এক ষ্টেশন থেকে আর এক ষ্টেশনে গাড়ী এলে কিছু একটা পরিবর্ত্তন মনে হয়—আর এ পরিবর্ত্তন সবচেয়ে ভাষার পরিবর্ত্তন। এ অবস্থায় রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে দিতে হলে নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন—আমরাও তাই করলাম; কিন্তু কুম্ভকর্ণ ত নই, অতএব মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়, আবার ঘুমবার চেষ্টা করি। এমনি করে নওপাড়াতে যখন বেশ ফর্সা হ'ল, তখন চা-রুটি খেয়ে একটু তাজা হবার চেষ্টা করা গেল। বেলা যখন এগারটা তখন গাড়ী এসে থামল ওয়ালটেয়ারে। ষ্টেশন থেকে আসল শহরটি খানিকটা দূরে, পাহাড়ের ব্যবধান থাকায় শহরটি মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বাস্থ্যের জন্য পুরীর মত এ দেশটিরও বেশ সুনাম আছে। এরই একটি অংশকে ভিজিগাপটম বা ভাইজাগ বলা হয়।

ওয়ালটেয়ার থেকে গাড়ী যতই এগুতে লাগল, একটি জিনিস, যা কারুরই দৃষ্টি এড়াতে পারে না, তা হচ্ছে রেললাইনের দু'পাশের তাল ও নারিকেল বৃক্ষের সমারোহ—অনেকটা প্রায় 'তমালতালী-বনরাজীনীলা'র মত। আর প্রতি ষ্টেশনে কদলী ফলটির প্রাচুর্য্য দেখে যে কথাটি মনে পড়বে তা প্রকাশ করে না বলাই যুক্তিসঙ্গত।

বেলা যখন আড়াইটে, ট্রেন এসে থামল সামালকোটে। এখানে খাবার-গাড়ি থেকে আহারের ব্যবস্থা করে ভাত খাওয়া পর্ব্ব শেষ করা গেল। সন্ধ্যা নাগাদ গোদাবরী ষ্টেশনে গাড়ী এসে পৌঁছতেই তড়িৎস্পৃষ্টের মত সকলেই যেন সজাগ হয়ে উঠলাম। একেই বলে 'নাম-মাহাত্ম্য।' গোদাবরী নামটির সঙ্গে বাল্যের যেন একটা স্মৃতি জড়িত—'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু।' আর গোদাবরী ষ্টেশনটি একেবারে গোদাবরী নদীর ধারেই, তাই 'বিশাল শাল্মলী তরু'টি অধিকতর উজ্জ্বল ভাবেই স্মৃতিপটে উদিত হ'ল। শুনেছি, বড়র চাপে ছোট চাপা পড়ে যায়। কিন্তু এমনি মজা, বাল্যের সেই বিশাল শাল্মলীতরু আজও তেমনি বিশাল হয়েই মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত। অথচ একটি কথাকে স্মৃতির মধ্যে ধরে রাখতে এক এক সময় কতই না বেগ পেতে হয়। আধুনিক সাহিত্যে রসের স্থান নেই—কিন্তু ঐ বাক্যটির মধ্যে যদি রসের স্পর্শ না থাকত, তা হলে কি ওটি এমনি ধারা বেঁচে থাকতে পারত! এ প্রশ্নটির উত্তর কি? কিন্তু থাক এসব কথা। গোদাবরীর সেতুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় দু' মাইল হবে। এরই অপর পারে কাভুর ষ্টেশন। নদীটির বিশালতা আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে চড়া পড়ে যাওয়ায় জলের তেমন বেগ নেই। এখান-কার সূর্য্যাস্তের দৃশ্যটি খুবই মনোরম লাগল। রাত্রির অন্ধকারে এলোর প্রভৃতি পেরিয়ে গাড়ী যখন ন'টা নাগাদ বেজওয়াদায় এসে পৌঁছল, তখন আমরা রাত্রির আহার শেষ করে নিলাম। এবারে রুটি, মাখন, কলা, চায়ের উপর দিয়েই কাটল—ভরসা এই, কাল সকাল ন'টার মধ্যেই গাড়ী মাদ্রাজে পৌঁছবে। শ্রীমতী গৌরী দেবী গাড়ীতে উঠেই আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, আমার চা ও পানের ভার তাঁর; অর্থাৎ আমি যে চা ও পানে অতিশয় আসক্ত, এটা তিনি আমার সম্পর্কে বেশই লক্ষ্য করে এসেছেন, আর বাস্তবিকই এতটা পথ যে গাড়ীতে এলাম, এ দুটোর অভাব এক মুহূর্ত্তও অনুভব করতে হয় নি। তিনি যে প্রকৃতই সুগৃহিণী, এ প্রশংসা তাঁকে করা যায়।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটার সময় গাড়ী এসে পৌঁছল মাদ্রাজ ষ্টেশনে। দু'খানা ঝটকা ভাড়া করে আমরা শহরে গিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণ-লজ' নামে একটি মাদ্রাজী হোটেলে এসে উপস্থিত হলাম। ঝটকা আর কিছুই নয়, টাঙ্গারই মত, কোথাও দেখলাম ঘোড়ায় টানা, কোথাও বা গরুতে টানা। লজে বেশ একটি বড় ঘরই পাওয়া গেল—আলো, পাখা, সংলগ্ন স্নানের ঘর প্রভৃতি—বন্দোবস্ত মন্দ নয়। ভাড়া ঠিক হ'ল—আহার বাদে, দৈনিক ছয় টাকা। আহারের অবশ্য ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সে খাবার আমরা খেতে পারব কিনা ভেবে, বাইরের একটা আমিষ হোটেল থেকে মাছের কারি, ভাত ও মাংস আনিয়ে নিলাম। কিন্তু খেতে খেতেই বুঝা গেল—হ্যাঁ, মাদ্রাজী রান্নাই বটে, এত ঝাল জীবনেও বোধ হয় কেউ আমরা কখন খাই নি।

বৈকাল তিনটা নাগাদ মাদ্রাজ শহর দেখবার জন্য ঝটকা ভাড়া করা হ'ল। শহরের দক্ষিণাংশে মেরিনো নামে রাস্তাটিই সবচেয়ে সুন্দর। ধনী লোকেরা সকাল-সন্ধ্যায় এখানে গাড়ী করে ঘুরে বেড়ান। এই রাস্তার উপরেই 'মচ্ছি হাউস' (Acquarium)। কাঁচের চৌবাচ্চা করে এখানে কত যে রকমারী মাছ—কত রঙের, কত আকারের—জীবন্ত অবস্থায় রাখা আছে, তা যুগপৎ বিস্ময় ও

আনন্দ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া শহরের আর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে হাইকোর্টের বাড়ী ও তৎসংলগ্ন লাইট হাউস, ল' কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, My lady's garden, মূর মার্কেট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লাইট হাউসের কত যে সিঁড়ি তা গুণে শেষ করা যায় না—আমরা তু ২৩৬টা গুণে আর গুণবার ধৈর্য্য রাখতে পারি নি। My lady's gardenয়ের সঙ্গে আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেনের তুলনাই হয় না—গাছের তেমন বৈচিত্র্য নেই। মূর মার্কেট নামে যে বাজারটি আছে, সেটিকে আমাদের হগ মার্কেটের শিশু-সংস্করণ বলা যায়। শহরে দেবালয়ের বেশী প্রাচুর্য্য নেই—সংখ্যায় খুবই কম। দক্ষিণ-ভারতের মন্দির গৌরব মাদ্রাজ শহর ছেড়ে আরম্ভ হয়েছে।

পরদিন খুব ভোরে উঠে, এক রকম অন্ধকার থাকতে থাকতেই, সাইকেল-রিক্সা করে বেরিয়ে পড়া গেল Broadway Standএ। সেখান থেকে পক্ষীতীর্থমের (দ্রাবিড় ভাষায়, তিরুকালকুণ্ড্রম্) মটর-বাস ধরবার জন্যে। বাস ছাড়বার সময় ছয়টা—আমরা যথাসময়ে পৌঁছে প্রথম বাসখানিই পেলাম। মাঝপথে চিঙ্গলপুট, বেশ বড় জায়গা, এবং জেলা শহর অতিক্রম করে আমরা যখন পক্ষীতীর্থম্ পৌঁছলাম তখন বেলা নয়টা। গিরিশীর্ষে অবস্থিত 'বেদগিরিশ্বর' শিব-মন্দিরই পক্ষীতীর্থম নামে খ্যাত। কিন্তু নগরীর মধ্যস্থলে প্রাচীর বেষ্টিত যে শিবমন্দিরটি আছে, স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে এর গৌরব কম নয়, কিন্তু পক্ষীতীর্থমের মাহাত্ম্যে এর খ্যাতি তেমন প্রসার লাভ করতে পারে নি।

পক্ষীতীর্থমের মাহাত্ম্য হচ্ছে—ঠিক যথাসময়ে গিরিশীর্ষে দুটি গৃধ্রের সমাবেশ—পুরোহিতের হাতে আহার গ্রহণ এবং তার পরে আবার সে স্থান থেকে উড়ে যাওয়া। যুগ যুগ ধরেই নাকি এ ঘটনাটি ঘটে আসছে, কোনও দিন এর ব্যতিক্রম হয় নি। এ নিয়ে কত যে কিংবদন্তী আছে তার ইয়ত্তা নেই। ব্যাপারটি যে সাধারণ বুদ্ধিতে সত্যিই রহস্যজনক এবং এটি যে বহু বিদেশী, বহু পণ্ডিত, বহু তত্ত্ববিদ চাক্ষুষ দেখে এর সত্যতা সম্বন্ধে মতামত দিয়ে গেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই।

পক্ষীতীর্থমের পাহাড়টি অধিরোহণ করবার সময় যেটি সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে, তা হচ্ছে এর সুন্দর চওড়া সিঁড়িগুলি—সংখ্যায় ৬৬৯টি। বেলা যখন এগারটা, পুরোহিত তখন এর শীর্ষদেশে এসে উপবেশন করলেন। পাখিদুটির আহারের আয়োজনসহ। কোথা থেকে যে দুটি শকুনি জাতীয় পাখী উড়ে এল তা বুঝা গেল না। দেখলাম, পাখী দুটি আকারে ছোট, গায়ে সাদা রঙ, কিন্তু ঠোঁট দুটি হলদে। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পুরোহিতের হাত থেকে আহার্য্য খেয়ে আবার উড়ে গেল। খুব প্রচলিত কিংবদন্তী হচ্ছে ওরা দু'জনেই শাপভ্রষ্ট ঋষি-তনয়—পক্ষীরূপে পরিণত হয়েছে। ওরা আসে বারাণসী থেকে, স্নান করে রামেশ্বরে আর আহার করে এই পক্ষীতীর্থে।

পক্ষিতীর্থমের এই রহস্যজনক ঘটনাটি, যা এতকাল শুনেই আসা হচ্ছিল, তা স্বচক্ষে দেখে কান্তকবির কথাই মনে পড়তে লাগল—'ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে, ক'টা কেনর জবাব দেয়।' যাই হউক, মন্দিরে পূজা দিয়ে আমরা অন্য পথ দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। এসে দেখি সামনেই মহাবলিপুরমের বাস অপেক্ষা করছে। আমরা তাড়াতাড়ি তাতে উঠে পড়লাম। পক্ষিতীর্থম থেকে মহাবলিপুরম্ হচ্ছে বিশ মাইল। তামিল দেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের জন্যে মহাবলিপুরমের ঐতিহাসিক খ্যাতি সপ্তম শতক থেকে চলে আসছে—পল্লব রাজাদের সময় থেকে। এর আর এক নাম 'সপ্ত-প্যাগোডা'। এর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে যে, মন্দিরগুলি ও খোদিত মূর্ত্তিগুলি সবই পাহাড় কেটে তৈরি, আর তাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে 'গঙ্গাবতরণ', 'বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যা', 'অর্জ্জুনের তপস্যা' প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলি অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ করে 'গঙ্গাবতরণ' মূর্ত্তিটি শিল্পকলার এক অবিশ্বাস্য নিদর্শন বলা যায়। নব্বই ফুট দীর্ঘ ও তেতাল্লিশ ফুট উচ্চ গ্রানাইট পাথরে খোদিত এই মূর্ত্তিটিকে দেখে সেই অজ্ঞাত শিল্পীর চরণতলে স্বতঃই মস্তক অবনত হয়ে আসে। জানি না, পৃথিবীতে এমন আর একটি আছে কিনা। কিন্তু যদিও এটি সপ্ত-প্যাগোডার দেশ, বর্ত্তমানে মাত্র একটিরই অস্তিত্ব আছে—বাকি ছয়টি সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

মহাবলিপুরম থেকে যখন আমরা মাদ্রাজ শহরে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারাদিন পরিশ্রম করে সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, অতএব আর ঘোরাঘুরি করবার কারুরই শক্তি ছিল না।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই হোটেল থেকে বেরিয়ে সাইকেল-রিক্সা নিয়ে Broadway Bus Stand-এ এসে উপস্থিত হলাম কাঞ্জিভরম-এর বাস ধরবার জন্যে। কাঞ্জিভরম হচ্ছে প্রাচীন কাঞ্চীনগরীর বর্ত্তমান নাম। যে সাতটি নগরী হিন্দুদের মোক্ষস্থান বলে খ্যাত, যথা, অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, পুরী, দ্বারকা, অবন্তিকা, এই শহরটি তাদেরই অন্যতম বলে একে দাক্ষিণাত্যের বারাণসী বলা হয়। শহরটি দুটি ভাগে বিভক্ত—একটি শিবকাঞ্চী, অপরটি বিষ্ণুকাঞ্চী। এখানকার রাস্তাগুলি যেমন বড় তেমনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কয়েকটি রাস্তার প্রায় দু'ধারেই সিল্কের শাড়ির সারি সারি দোকান—বেশ বুঝা যায়, সিল্ক-শিল্পের এ দেশটি বড় কেন্দ্র। এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে পাথরের গায়ে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় বহু অনুশাসন লেখা আছে। কামাক্ষী দেবীর প্রাঙ্গণে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সমাধি, এবং তার উপরে তাঁর প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কাঞ্চীর নৃসিংহদেব ও বামন অবতারের মূর্ত্তি দুটি দেখবার বস্তু। বামন মূর্ত্তিটি পুরোপুরি কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত—উচ্চতায় কুড়ি ফুটের কম নয়। শুনলাম, এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার ধনরত্ন আছে। এখানে বেদের খুব চর্চ্চা হয় এবং বাঙালীর মত বেদ পাঠ না করা ব্রাহ্মণ এখানে

মিলবে না। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় শেষ বাসে চেপে আমরা মাদ্রাজ শহরে ফিরে এলাম।

মাদ্রাজে এসে পর্যান্ত এক রাত ছাড়া বিশ্রামের বড় সুযোগ ঘটে নি। তাই দিনের বেলাটা লজ-এতে বিশ্রাম করে কাটান হ'ল। বেলা যখন পাঁচটা তখন বেরিয়ে পড়া গেল রামেশ্বর যাত্রার উদ্দেশ্যে। দু খানা ঝটকা ভাড়া করে এগমোর ষ্টেশনে উপস্থিত হলাম। সন্ধ্যা সাতটা পনর মিনিটের Madras Dhanuskodi Boat mail ধরা হ'ল। এখানে আমাদের কামরা রিজার্ভ করার ব্যবস্থা করা হ'ল, কিন্তু যাত্রীদের এত ভীড় ছিল যে, দু'একজন ভদ্রলোকের অনুরোধে তাঁদের একটি বার্থ ছেড়ে দিতে হয়। রাত্রের আহারের ব্যবস্থাস্বরূপ ষ্টেশনের রেস্তরাঁ থেকে, পুরী, ডালের বড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করে নিলাম। খাবার সময়ে দেখলাম খাদ্যগুলি কুখাদ্য বা অখাদ্য নয়, এমন কি ডালের বড়াগুলি ঝালের মাত্রাধিক্য সত্ত্বেও বেশ মুখরোচক।

পরদিন ট্রেন যখন মানামাদুরাই পৌঁছাল তখন বেলা সাড়ে দশটা। এখানে আমরা এক প্রস্থ খাওয়ার পর্ব্ব সেরে নিলাম। কারণ গাড়ী পাম্বনে পৌঁছাতে বেলা আড়াইটা হয়ে যাবে। যথাসময়ে পাম্বনে পৌঁছে গাড়ী বদল করে ছোট লাইনের গাড়ীতে উঠা গেল। ট্রেনখানি এই গাড়ীর যাত্রীদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। রামেশ্বর মন্দির পাম্বন দ্বীপের উপর অবস্থিত বললেই চলে। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে বার মাইল ও প্রস্থে পাঁচ মাইল। সমুদ্রের উপর রেল কোম্পানীর নির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়ে ট্রেনকে যেতে হয়। সন্ধ্যা নাগাদ রামেশ্বরম পৌঁছান গেল। উভয় পার্শ্বের দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর।

এখানে পৌঁছে ঝটকা (গরুতে টানা) ভাড়া করে আমরা একটি গুজরাটি ধর্ম্মশালায় উঠলাম। আমাদের জন্য যে ঘরটির ব্যবস্থা হ'ল তা এতই ছোট যে আমাদের জিনিসপত্রেই তা ভরে গেল, কিন্তু তখন উপায়ই বা কি? সন্ধ্যে হয়ে গেছে, কোথায় আর ঘুরাঘুরি করি। কোন রকমে এইখানেই মাথা গুঁজে থাকা গেল—সুরাহা এই যে, সামনের একটি খোলা ছাদ ছিল এবং পাশে একটি বারান্দা ছিল। কিন্তু জলের জন্য কুয়া থেকে জল টেনে টেনে তুলতে সত্যিই কষ্ট হয়েছিল। যা হোক, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করবার পর মন্দির দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম। বিরাট এক মন্দির, চতুর্দ্দিকে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থার জন্য একটি Power house আছে।

প্রবাদ আছে যে, রামচন্দ্র ও সীতা যে বালির শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন, মন্দিরের সেই শিবলিঙ্গই। এ ছাড়া, মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রায় এক সহস্র শিবলিঙ্গ আছে। অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্ত্তিরও অভাব নেই। মন্দিরে কয়েকটি "Strong Room" আছে—তার মধ্যে নাকি সোনার সিংহাসন, পাল্কি, অশ্ব, সিংহ, হস্তি—এরূপ প্রভূত ঐশ্বর্য্য আছে। রামেশ্বরকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর বলা হয়। এর কারণ রামেশ্বর তীর্থের দক্ষিণে যে সঙ্কীর্ণ দ্বীপশ্রেণী আছে, প্রবাদ হচ্ছে যে, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা যাবার সময় তা নির্ম্মাণ করেছিলেন।

মন্দির দেখে কাছাকাছি একটা নিরামিষ হোটেলে খাওয়ার কার্য্যটি সেরে নিয়ে ধর্ম্মশালায় ফিরে এসে কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে ভোরে উঠেই ধনুষ্কোটি যাত্রার উদ্দেশে রামেশ্বরম্ ষ্টেশনে আসা হয় ও সাড়ে সাতটার পাম্বনের ট্রেন ধরলাম। সেখানে পৌঁছে গাড়ী বদল করে ধনুষ্কোটির দিকে যাত্রা করলাম। ধনুষ্কোটি রামেশ্বরম থেকে মাত্র ২৪ মাইল। বেলা ন'টা নাগাদ পৌঁছান গেল। ধনুষ্কোটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিত্তকে অভিভূত করে। এখানে ষ্টেশনে waiting room-এ জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা করে আমরা আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করলাম। আহারের ব্যবস্থাও মন্দ হ'ল না। এমন কি ভাতের সঙ্গে পমফ্রেট মাছ ভাজা পর্য্যন্ত খাওয়া গেল।

বেলা একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ধনুষ্কোটি-কোয়েম্বাটুর যাত্রীগাড়ী চড়ে মাদুরা যাত্রা করি। রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় মাদুরা পৌঁছে ষ্টেশনের নিকট রয়লক্ষ্মী হোটেলে গিয়ে উঠি। এখানেও বেশ ভাল একটি ঘর পাওয়া গেল। বিজলি বাতি থেকে আরম্ভ করে থাকবার সব কিছুই সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকায় হোটেলটি বেশ ভালই লাগল। সকালে উঠেই মাদুরার বিখ্যাত মীনাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি দেখতে যাওয়া হ'ল। বিশালতার দিক দিয়ে ও কারুকার্য্যের দিক দিয়ে রামেশ্বরের মন্দির আর মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। মাদুরার মন্দির-প্রাচীরের ফটকগুলি উচ্চতায় অভ্রভেদী বললেও অত্যুক্তি হয় না। মন্দির-প্রাচীরের ভিতর একটি হলঘর আছে। তার স্তম্ভসংখ্যা হচ্ছে হাজার। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মন্দিরের উত্তর প্রাঙ্গণের ফটকের নিকট যে পাঁচটি স্তম্ভ আছে, তাদের গায়ে প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আঘাত করলে সপ্ত সুরের ঝঙ্কার ওঠে—অনেকটা জলতরঙ্গের শব্দের অনুরূপ। রামেশ্বর ও মাদুরার মন্দির দেখে স্বতঃই যে প্রশ্নটি মনে জাগে তা হচ্ছে সেই প্রাচীনকালে স্থাপত্যবিদ্যায় এতখানি উৎকর্ষ সম্ভব হয়েছিল কি করে? মন্দিরের কাছেই রাস্তার দুধারে বড় বড় দোকান, সবই শাড়ির। এখান থেকে কিছু শাড়ি কেনা হ'ল।

পরদিন প্রাতে সাতটার সময় বেরিয়ে পড়ি ও ত্রিবান্দ্রাম এক্সপ্রেস ধরা হয়। সন্ধ্যে সাতটার সময় ত্রিবান্দ্রাম-এ এসে পৌঁছাই। সারা দিন গাড়ীতে মন্দ কাটে নি। ষ্টোভ জ্বেলে চা তৈরি করে চায়ের পর্ব্ব ঘটা করেই সারা হয়। পথে সেঙ্কোটা-তেঙ্কাশীর মধ্যে প্রকৃতির যে শোভা তা সত্যিই পথের কষ্টকে ভুলিয়ে দেয়। দূরে পাহাড়ে একটা জলপ্রপাতের কথা শোনা গেল কিন্তু ট্রেন থেকে তা দৃষ্টি-গোচর হয় না। যে দিকে দৃষ্টি যায় কেবল নারিকেল, সুপারি গাছ, মাঝে মাঝে কিছু তাল ও কলা গাছও আছে। এখানে পথের খাবারের মধ্যে ঝিরিঝিরি-তেলে ভাজা নানা রকমের বড়া খেয়ে দিন কাটাতে হ'ল। অবশ্য গৌরীদেবীর সুগৃহিণীত্বের গুণে আমাদের চায়ের অভাব কোথাও হয় নি।

ত্রিবান্দ্রামে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে আমরা একটি গুজরাটি ধর্ম্মশালাতে উঠলাম। কিন্তু বাঙালীর এখানে থাকবার উপায় নেই। কারণ বাঙালী মাছ মাংস রান্না করে ও খায়। ধর্ম্মশালার রক্ষক আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে,আমি বাঙালী কি না।' উত্তরে বললাম, আমি বাঙালী ব্রাহ্মণ—এবং নিরামিষাশী। এই কথা শুনে কেন জানি না আমার থাকা সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি হ'ল না। ঠিক এই সময়েই আর একটি বাঙালী দলের আবির্ভাব ঘটল, এবং বলাই বাহুল্য তৎক্ষণাৎ তাঁদের ফিরে যেতে হ'ল। তাঁরা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবতে ভাবতে গেলেন, কি পুণ্যে আমার স্থান হ'ল। রোম দেশে রোমান হতে হয়, কাজেই ঐখানে আমাকে 'নিরামিষাশী' হতে হয়েছিল।

ধর্ম্মশালার ঘরগুলি বেশ সুন্দর ও বড়। বিজলি বাতি, স্নানের ঘর, ড্রেন প্রভৃতি থাকায় কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। কাছাকাছি একটা সৌরাষ্ট্র হোটেল থেকে নানা রকমের তরকারী, পুরী প্রভৃতি আনিয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খাওয়া গেল। সকলেই বেশ ক্লান্ত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি শোয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল। প্রথমটা মশারি না টাঙিয়েই সব শোয়া হয়েছিল, কিন্তু মশার যে অত্যাচার সুরু হ'ল তাতে আর মশারি না খাটিয়ে উপায় রইল না।

সকাল বেলা একটা ট্যাক্সি করে শহর দেখতে বের হওয়া গেল। ত্রিবান্দ্রাম-এর প্রধান দর্শনীয় স্থান হচ্ছে 'পদ্মনাভ স্বামী'র (অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণ) মন্দির। বিগ্রহটি ত্রিবাঙ্কুর রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মন্দির ও তৎসংলগ্ন রাজপ্রাসাদ উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত। মন্দিরের প্রবেশদ্বার পূর্ব্ব দিকে—১০০ ফুট উচ্চ একটি তোরণ। এই দ্বারের সম্মুখে পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে থাকে—আমার পরিধানে প্যান্ট-কোট থাকায় আমাকে তারা ভিতরে যেতে দিলে না, আর মেয়েদেরও ভিতরে যাবার বাধা, তবে সে অন্য কারণে, কারণ ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী তখন মন্দিরের মধ্যে ছিলেন। নিরুপায় হয়ে আমরা আমাদের ট্যাক্সিতে ফিরে এসে শহরের অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু দেখাই সমীচীন মনে করলাম। এখানেও সমুদ্রের ধারে একটি Acquarium আছে, তবে ছোট, কিন্তু মাছের সংগ্রহ মন্দ নয়। তার পর ইউনিভার্সিটি, কলেজ, রাজপ্রাসাদ, Zoo প্রভৃতি দেখা গেল। রাস্তাগুলি সত্যিই সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলি প্রায় সব এক ছাঁদেই তৈরী। লোকেরাও বেশ শিক্ষিত। বড় ডাকঘরের সামনে একটি বড় রেস্তোরাঁতে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজ সেরে নিলাম। দশ রকম তরকারী, চাটনি, ভাজা, দই, কলা, পায়েস প্রভৃতি কোন কিছুরই অভাব হয় নি। এমন পরিতৃপ্তভাবে আহারের পর আর ঘোরার উৎসাহ রইল না। এই ট্যাক্সি করেই ধর্ম্মশালায় ফিরে এলাম।

ধর্ম্মশালায় নেমে ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে কন্যাকুমারী যাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। ঠিক হ'ল—আজই এখন আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে, কন্যাকুমারীতে রাতটা আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে কাল অপরাহ্ণ চারটার সময় আমাদের কন্যাকুমারী থেকে ত্রিভেন্দ্রামে ফিরিয়ে আনবে—মোট ভাড়া ৫৫৲ টাকা।
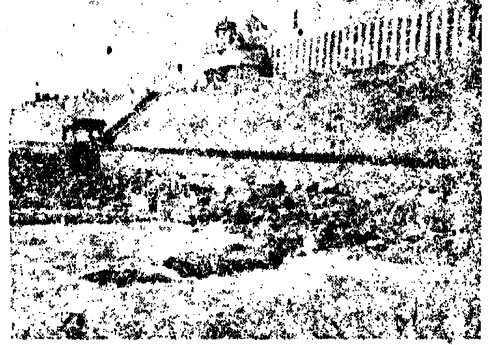
ভূ-পৃষ্ঠের শেষ প্রান্ত। সমুদ্রতটে দেবীকুমারীর মন্দির

ব্যবস্থা মত দুপুর দেড়টার সময় আমরা কন্যাকুমারী যাত্রা করলাম। মোটর যাবার পক্ষে রাস্তাটি বড় চমৎকার, আর পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীও বেশ মনোরম। অতএব বেশ আনন্দের সঙ্গেই আমরা বৈকাল চারটার সময় কন্যাকুমারীতে এসে উপস্থিত হলাম।

দেবীকুমারীর কৃষ্ণপ্রস্তরের বিগ্রহ

ভূগোলে যাকে কুমারিকা অন্তরীপ (Cape Comorin) বলা হয়, সাধারণ ভাষায় তাকেই কন্যাকুমারী বলে। এই স্থানটিই

ভারতের ভূপৃষ্ঠের শেষ প্রান্ত—স্থানীয় লোকেরা বলে থাকে —'The Lands End.', এর তিনটি অংশই সমুদ্র-বেষ্টিত—পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর ও দক্ষিণে ভারত মহা সাগর। একটি বস্তু লক্ষ্য করলাম যে, তিন সমুদ্রের তিন রকম বিভিন্ন রঙের বালি—ঢেউয়ের সঙ্গে বালি beach-এ এসে পড়ছে, কিন্তু কোনটা কোনটার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না। কোন স্মরণাতীত কাল থেকে স্থানটি তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতায় পূত। দেবী কুমারী, যিনি পরমা প্রকৃতির অংশস্বরূপ, তাঁরই মাহাত্ম্যে স্থানটি সমুজ্জ্বল। সমুদ্রের বেলাভূমির উপর কারুকার্য্য-শোভিত বিরাট মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবীর বরমাল্যহস্তে মোহিনী রূপের কৃষ্ণ-প্রস্তরের বিগ্রহ। কথিত আছে, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতাররূপে যিনি খ্যাত, সেই পরশুরাম এই বিগ্রহটি স্থাপন করেছিলেন এবং পরবর্ত্তী কালে এদেশের কোন রাজা মন্দিরটি নির্ম্মাণ করান। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপারে বেশ সুব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যাত্রীদের জন্য বেশ বড় পান্থনিবাস আছে—নাম দেবস্থান, তা ছাড়া 'কেপ হোটেল' নামে হোটেলও আছে ও ছোটখাটো আমিষ হোটেলও আছে। মোট কথা ওখানে থাকার কোন অসুবিধা নেই। পান্থ-নিবাসে, বিজলী আলো, ফ্লেন, স্নানের ঘর—সব ব্যবস্থাই ভাল। ভোর পাঁচটা থেকে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত মন্দিরের দরজা খোলা থাকে, তার পর আবার বৈকাল পাঁচটার সময় খোলা হয়। সন্ধ্যার পর দেবীর অর্চনা হয়ে গেলে রাত্রি আটটার সময় জাঁকজমকসহ দেবীকে তিনবার মন্দিরের বহির্দেশ পরিক্রমণ করানো নিত্যকার ঘটনা। এ সময়টা খুবই লোকসমাগম হয় এবং তাদের দেবীর সালঙ্কারা অপরূপ মূর্ত্তি দেখবার সৌভাগ্য হয়।

একদিকে দেবীর এই মাহাত্ম্য, অন্য দিকে প্রকৃতির এক মোহন রূপ স্থানটিকে পরম রমণীয় করে তুলেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়, এ যেন কোন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। এইখানেই একদিন স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরাও সেই 'বিবেকানন্দ-রক'-এর অতি সন্নিকটে একটি শিলা-খণ্ডের উপর স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করি। এখানকার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য এক অপরূপ মহিমায় চিত্তকে অভিষিক্ত করে। প্রকৃতই কন্যাকুমারীতে এসে চিত্তের যে আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করেছি, তা বিস্মৃত হবার নয়। আমার কন্যা শ্রীমতী আরতীর ভাগ্য ভাল, তার একটি ভজন গান মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক মশাই tape recording করে নিয়েছেন যাত্রীদের শোনাবার জন্য।

কন্যাকুমারী ত্যাগ করে আসতে যেন কারুরই ইচ্ছা নয়, কিন্তু আসতেই হ'ল। ফেরার পথে ত্রিবান্দ্রামে (Trivandram) রাতটা কাটিয়ে পর দিন সকালে ট্রেন ধরে পরের দিন সকালে মাদ্রাজ ফিরে এলাম। একদিন এখানে বিশ্রাম করে পরদিন আমরা কলিকাতার জন্য যাত্রা করলাম।

দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করে এইটাই উপলব্ধি হ'ল, দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য যার দেখবার সৌভাগ্য না হয়, ভারতের শিল্প-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তার কোন ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

সন্ধ্যা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

দিগন্তের প্রান্ত হতে, সন্ধ্যা, তুমি এলে
গোধূলির খেলা শেষ করি অবহেলে
বেদনা মেদুর মন্দ মন্থর পবনে
অয়ি, তমোময়ি, এই বিশ্বের ভবনে!
ওগো উন্মাদিনি, তব নৃত্য ছন্দহারা
প্রলয়ে ডুবিয়া গেল সৃজনের ধারা।
মাধবীর লতাকুঞ্জ হইল মলিন
তব তপ্তশ্বাসে। পলে হ'ল লীন
বিহগের কলকণ্ঠ আলোর উৎসব
প্রাণের সংগীতময় মুগ্ধ কলরব

অকস্মাৎ, সন্ধ্যা, তব চরণ পরশে
নিমিষে থামিয়া গেল। বিশ্বের উরসে
সহসা উঠিল ফুটি ব্যথার কমল
রূপহীন, রসহীন সেই শতদল
তব যোগাসন। নহ সন্ধ্যা, নহ তুমি
ব্যথার দেবতা,—দেবতার ক্রীড়াভূমি,
অসীমের পারাবারে রূপের প্রতীক
কান্ত শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি সদাই নির্ভীক।

শঙ্করের "জীবন্মুক্তিবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(৪)

পূর্ব সংখ্যায়, জীবন্মুক্ত যে অকর্তা, সে সম্বন্ধে শঙ্কর কি ভাবে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে। এই বিষয়ে আরও কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে।

ঐতরেয়োপনিষদের প্রারম্ভেও শঙ্কর পূর্বপক্ষীয় আপত্তি বা বিপরীত মতবাদ খণ্ডন করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি সকাম-কর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন যেহেতু সকাম-কর্মের কারণস্বরূপ বাসনা-কামনার কোন অস্তিত্ব তখন থাকে না।

এ স্থলে পূর্বপক্ষবাদী বা বিরুদ্ধমতবাদী এরূপ আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, জ্ঞান ও কর্ম যে পরস্পরবিরোধী এবং সেজন্য একত্রে স্থিতি করতে পারে না—এ কথা যুক্তি-যুক্ত নয়। প্রথমতঃ, কর্মত্যাগী জ্ঞানীই যে একমাত্র মোক্ষের অধিকারী, তার কোন প্রমাণ শ্রুতিতে নেই। উপরন্তু, এই উপনিষদেও কর্মের অবতারণা করে, তার পরেই আত্মবিদ্যার কথা বলা হয়েছে। এই থেকেই প্রমাণিত হয় যে, কর্মকারী পুরুষই জ্ঞানে অধিকারী, কর্মত্যাগী সাধক নয়—নতুবা শাস্ত্র অকারণে কর্মের উল্লেখ করবেন কেন?

দ্বিতীয়তঃ, এ কথাও বলা যায় না যে, কর্মের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের কোনরূপ সম্বন্ধ নেই, যেহেতু পূর্বের ন্যায় এস্থলেও কর্মকাণ্ড দিয়ে আরম্ভ করে, আত্মবিদ্যা দিয়ে শেষ করা হয়েছে। যদি কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে কোন সম্পর্কই না থাকত, তবে এই প্রণালী ত সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ত।

তৃতীয়তঃ, আত্মজ্ঞান ও কর্মের মধ্যে এরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকলে পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডেই কর্মের বিধিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানের বিষয়ও বলা হয়ে গেছে; সেজন্য জ্ঞানকাণ্ডে বা উপনিষদে তার পুনরুক্তি করে আর লাভ কি?—এই আপত্তির উত্তরে বলা চলে যে, কোন পুনরুক্তি-দোষ এস্থলে হচ্ছে না। বস্তুতঃ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে উপাসনার দুটি বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে। উপাসনা দুই শ্রেণীর, শুদ্ধোপাসনা ও কর্মাঙ্গোপাসনা। কেবলমাত্র সাক্ষাৎভাবে আত্মারই উপাসনার নাম "শুদ্ধোপাসনা"; যাগযজ্ঞাদি কর্মের অঙ্গাদির উপাসনার নাম "কর্মাঙ্গোপাসনা"। "কর্মাঙ্গোপাসনা"ও দ্বিবিধঃ—কর্মের অবয়বাদির উপাসনা যেমন, অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বকে 'উষা' প্রভৃতি রূপে ধ্যান; এবং কর্মোপযো[illegible]স্তোত্রাদির বিভিন্নরূপে ধ্যান, যেমন, ছান্দোগ্যোপনিষদের 'উক্থ' ও 'উদ্গীথ' উপাসনা প্রভৃতি। সেজন্য, কর্মকাণ্ডে বিহিত কর্মসংশ্লিষ্ট আত্মোপাসনা ব্যতীতও যে শুদ্ধ, কর্মবিরহিত আত্মোপাসনাও সম্ভবপর, তাই স্পষ্ট করবার জন্যই জ্ঞানকাণ্ডে এরূপ আত্মোপাসনা বিহিত হয়েছে। এই কারণে এস্থলে কোন পুনরুক্তি দোষের উদ্ভব হচ্ছে না।

চতুর্থতঃ, ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্মত্যাগ শ্রুতিসম্মত নয়। শাস্ত্র-মতে দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ—এই তিনটি ঋণ নিয়েই মানব সংসারে জন্মগ্রহণ করে। সেজন্য এই ঋণ পরিশোধ না করে সে মোক্ষলাভের প্রচেষ্টা করতে পারে কি করে? বস্তুতঃ, অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি যারা কর্মে অসমর্থ, তাদের জন্যই কেবল শাস্ত্রে কর্মত্যাগের বিধান আছে—অন্যদের জন্য নয়।

এই পূর্বপক্ষীয়, বিরুদ্ধমতবাদ খণ্ডন করে, শঙ্কর ঐতরেয় উপনিষদের প্রারম্ভে বলেছেন যে, প্রথমতঃ, প্রকৃত আত্ম-জ্ঞানের উদয় হলে, আর অন্য কোন ফলই কাম্য থাকতে পারে না, যেহেতু তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষই ত সাধক লাভ করে ধন্য হন। কিন্তু সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় কোন একটি বিশেষ ফল লাভের জন্যই কেবল। সেজন্য, ব্রহ্মোপ-লব্ধি-ধন্য, আপ্তকাম, জীবন্মুক্তের যখন কোন কর্মফলের আর আকাঙ্ক্ষা নেই, তখন তাঁর কোন কর্মেও আর প্রবৃত্তি নেই—এ ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

দ্বিতীয়তঃ, আকাঙ্ক্ষা না থাকলেও, শাস্ত্রোক্ত বিধানানু-সারে এরূপ সাধককে কর্মে রত হতেই হয়—এ কথাও বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞ, মুক্ত আত্মার ক্ষেত্রে ত কোনরূপ বিধিনিষেধের প্রশ্নই ওঠে না। যিনি ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট-বর্জন করতে চান, তাঁর ক্ষেত্রেই কেবল উপায়রূপে বিভিন্ন বিধিনিষেধের সার্থকতা থাকতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যখন ইষ্টানিষ্টের কোন প্রশ্নই নেই, তখন বিধিনিষেধেরও কোন প্রশ্ন নেই। এবং, প্রশ্ন না থাকলেও, বিধিনিষেধ বহির্ভূত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও যদি জোর করে বিধিনিষেধ প্রযোজ্য বলে ধরা হয়, তা হলে সকলের ক্ষেত্রেই, সর্বদাই সকলপ্রকার বিধিনিষেধই সমান ভাবে প্রযোজ্য হয়ে পড়ে—সকলেই সত্যই সেই বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে পড়ুক, আর নাই পড়ুক। কিন্তু কর্মকাণ্ডানুসারে, সকলপ্রকার

বিধিনিষেধই সকল ব্যক্তির পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য কোনক্রমেই নয়।

তৃতীয়তঃ, নিযোজ্য জীবন্মুক্ত স্বয়ং ব্রহ্ম, নিয়োগকর্তা বেদ সেই ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন। কিন্তু যে যার থেকে সৃষ্ট হয়, সে তাকে কোন কিছু কার্যে নিযুক্ত করবে কি করে? কারণ, স্রষ্টা কারণ নিশ্চয়ই সৃষ্ট কার্য থেকে উচ্চস্তরগত; সেজন্য কারণই কেবল কার্যকে নিযুক্ত করতে পারে, কার্য কারণকে কোনদিনও নয়; যেমন বুদ্ধিহীন ভৃত্য কোনদিনও জ্ঞানবুদ্ধিমান প্রভুকে কোন বিষয়ে আদেশ করতে পারে না। একই ভাবে, যে জীব স্বয়ংই ব্রহ্ম ও মুক্ত, তাঁকে ব্রহ্ম-সৃষ্ট বেদ বিধিনিষেধ দ্বারা আদেশ করতে বা উপদেশ দিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, বেদকে এইভাবে ব্রহ্মসৃষ্ট বলে গ্রহণ না করে, নিত্য বলে গ্রহণ করলেও, দ্বিতীয় খণ্ডনে যে দোষের উল্লেখ করা হয়েছে, তার স্খালন হয় না। অর্থাৎ, এরূপ নিত্য বেদের বিধিনিষেধ সকলের পক্ষেই সর্বদাই, সমান ভাবেই প্রযোজ্য হয়ে পড়ে।

পঞ্চমতঃ, শাস্ত্র একই সঙ্গে কর্মানুষ্ঠান ও আত্মজ্ঞানের বিধান দিয়েছেন মুক্তপুরুষের জন্য—এই মতও ভ্রান্ত। কারণ নিত্য, অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত শাস্ত্র এরূপ বিরুদ্ধ বিধান দেবেন কিরূপে? অগ্নিকে উষ্ণ ও শীতল বলে কে বর্ণনা করবেন?

ষষ্ঠতঃ, কর্মের মূল ভিত্তি যে ইষ্টলাভ ও অনিষ্টপরিহারের ইচ্ছা, তা' জীবের অতি স্বাভাবিক সাধারণ ইচ্ছা; তা' ত শাস্ত্রজনিত ইচ্ছা নয়, তা হলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সেই ইচ্ছা থাকতে পারত না। সেজন্য, যা' স্বাভাবিক বলে জনসাধারণে জ্ঞাত, সে বিষয়ে শাস্ত্র বৃথা উপদেশ দান করবেন কেন? "অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্"—যা সাধারণে জ্ঞাত নয়, তাই ত আমরা জানতে পারি শাস্ত্রের মাধ্যমে। অতএব শাস্ত্র যখন বিরুদ্ধ উপদেশ দিতে পারেন না, তখন শাস্ত্র হয় কর্ম, না হয় আত্মতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন—তা' অবশ্য স্বীকার্য। সেজন্য, শাস্ত্র যে অজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব বিষয়ই কেবল প্রপঞ্চনা করেন—তা' নিঃসন্দেহ।

সপ্তমতঃ, প্রয়োজন নেই বলে যেমন ব্রহ্মজ্ঞ জীবন্মুক্তের কর্মে প্রবৃত্তি হয় না, ঠিক তেমনি, প্রয়োজন নেই বলেই, তাঁর কর্মে অপ্রবৃত্তিও হয় না একই ভাবে—এ কথাও এক্ষেত্রে বলা যায় না। কারণ 'কর্মে প্রবৃত্তি' হ'ল একটি সদর্থক, ভাবমূলক ক্রিয়া (Positive); কিন্তু 'কর্মে অপ্রবৃত্তি' হ'ল একটি নঞর্থক, অভাবমূলক অক্রিয়াই মাত্র (Negative)। যা' ভাবমূলক ক্রিয়া, তার জন্য অবশ্য একটি প্রয়োজন থাকা চাই; কিন্তু যা' অভাবমূলক অক্রিয়া, তার জন্য পুনরায় অপর একটি প্রয়োজনের প্রশ্নই নেই। কারণ, ক্রিয়ার যা প্রয়োজন, অর্থাৎ, ইষ্টলাভ ও অনিষ্টপরিহার, জ্ঞানোদয়ে তার নিবৃত্তি হলেই ক্রিয়ার নিবৃত্তি; এবং ক্রিয়ার নিবৃত্তির অর্থ ই ত অক্রিয়া বা ক্রিয়ার অভাব। সেজন্য এই কর্ম-পরিত্যাগ বা ক্রিয়ার অভাবের আর অন্য কোন প্রয়োজন বা কারণ নেই—একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ই সাধন। যেমন, অন্ধকার পথের যাত্রী একটি আলোক লাভ করলে, তাঁর ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই গর্ত, পঙ্ক, কণ্টকাদিতে পতনের অভাব হয়; কিন্তু এই পতনাভাবের আর অন্য কোন কারণ নেই; আলোকের দ্বারা পথের প্রকৃত রূপটি প্রকাশিত হলেই, সঙ্গে সঙ্গে বিপথে গমনের অভাব হয় স্বভাবতঃই। একই ভাবে, নিষ্ক্রিয়তা নিত্য পূর্ণ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম—জ্ঞানালোকে তা' প্রকাশিতই হয় মাত্র, তার আর অন্য কোন কারণের প্রয়োজন নেই।

অষ্টমতঃ, নিষ্ক্রিয়তা যদি আত্মার স্বাভাবিক ধর্মই হয়, তা হলে সে সম্বন্ধেও বিধির প্রয়োজন নেই, ষষ্ঠ খণ্ডনানুসারে, এবং সেক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞ গৃহস্থের পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণের প্রয়োজন নেই, গৃহে বাস করে, নিষ্কাম কর্মসাধনই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট—এ কথাও বলা সঙ্গত নয়। অবশ্য, এ কথাও ঠিক যে, 'অহং মম' ভাবের অভাবই হ'ল নিষ্কামতা এবং তজ্জনিত নিষ্ক্রিয়তা, গৃহে বাস করা, বা না করাই কেবল নয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও, এ কথাও ঠিক যে, গার্হস্থ্যাশ্রমে নিষ্কাম ও নিষ্ক্রিয়ভাবে জীবনযাপন করা সুকঠিন।

নবমতঃ, সন্ন্যাসিগণও যেরূপ দেহ ধারণের জন্য ভিক্ষা, পর্যটন প্রভৃতি কর্মে রত হন, সেরূপ মুক্ত গৃহস্থগণও গৃহেই কেবলমাত্র দেহধারণের জন্যই অন্ন-বস্ত্রাদি অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারেন, গৃহ ত্যাগ করে' সন্ন্যাসগ্রহণে তাঁদের আর কোন প্রয়োজনই নেই—এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। কারণ, পূর্বেই যা' বলা হয়েছে, সত্যই যদি গৃহস্থগণও এই ভাবে গৃহকে নিজের বলে মনে না করে গৃহেই বাস করতে পারেন, তা হলে ফলতঃ তাঁরা ত ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীই হলেন। কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রভৃতি কয়েকটি নিত্যকর্ম বিহিত হয়েছে, যা' জ্ঞানীর পক্ষে প্রযোজ্য নয়। সেই দিক্ থেকে জ্ঞানীর বরং সংসার ত্যাগই শ্রেয়ঃ, কারণ একটি বিশেষ আশ্রমে বাস করলে তার বিধিপালনও নিশ্চয় আবশ্যক হয়ে পড়ে।

দশমতঃ, নিত্য বিধিবিধানও যদি এই ভাবে মুক্তপুরুষদের পক্ষে প্রযোজ্য না হয়, তবে সেই সকল বিধির আর মর্যাদা ও সার্থকতা থাকে কিরূপে?—এ কথাও বলা চলে না। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানহীন, সাধারণ জনদের জন্যই সেগুলি প্রযোজ্য এবং তাতেই ত তাদের সার্থকতা। ফলতঃ, মুক্ত-

পুরুষ সন্ন্যাসিগণ যে জীবন রক্ষার জন্য ভিক্ষাচরণ প্রমুখ কর্মে প্রবৃত্ত হন, তাও সাধারণ প্রবৃত্তিমূলক কর্ম নয়। অর্থাৎ, সাধারণ লোকদের মত, তাঁদের ক্ষুধাবোধ, শৈত্যবোধ এবং অন্নবস্ত্রাদির জন্য কোন কামনা নেই। আচমনকারী ব্যক্তির যেরূপ সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা শান্তি হয়, সেরূপ তাঁরাও কামনা ব্যতীতই ভিক্ষাচর্যা প্রভৃতি নিয়ম পালন করেন।

একাদশতঃ, কামনা বা প্রয়োজন ব্যতীত কর্মের অনুষ্ঠান সম্ভবপরই নয়—এই আপত্তিও অযৌক্তিক। এক্ষেত্রে মুক্ত সন্ন্যাসিগণ মোক্ষের পূর্বে যে সকল নিয়ম পালন করতেন, তা' তাঁরা মোক্ষের পরে বিনা প্রয়োজনেই, অভ্যাসবশতঃই পালন করে চলেন।

একাদশতঃ, ব্রহ্মচর্যপ্রমুখ ব্রহ্ম-বিদ্যা সাধনসমূহ গৃহস্থগণের অপেক্ষা সন্ন্যাসিগণের পক্ষেই পূর্ণতরভাবে সম্ভবপর।

দ্বাদশতঃ, শাস্ত্রানুসারেও, যিনি মোক্ষকামী, তাঁর পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণ অত্যাবশ্যক।

ত্রয়োদশতঃ, প্রত্যেক আশ্রমেরই স্ব স্ব বিহিত কর্তব্যাদি ও তার ফল আছে, যা' অন্য আশ্রমে সম্ভবপরই নয়। যেমন, গার্হস্থ্যাশ্রমের বিহিত কর্ম হ'ল যাগযজ্ঞাদি এবং বিহিত ফল হ'ল দেবতাতে সম্প্রাপ্তি। সেজন্য, সন্ন্যাসাশ্রমের বিহিত বস্তু হ'ল কর্মত্যাগ ও ফল হ'ল ব্রহ্মোপলব্ধি। এই কারণে, পরস্পর-বিরোধী গার্হস্থ্যাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমকে মিশ্রিত না করে পৃথক রাখাই শ্রেয়ঃ, যেহেতু প্রত্যেক আশ্রমধর্ম যথাযথ ভাবে সম্পাদন না করলে সব আশ্রমই নিরর্থক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, কর্মত্যাগী, ব্রহ্মজ্ঞানীর সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেয়ঃ।

চতুর্দশতঃ, দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ প্রমুখ যে ত্রিবিধ ঋণের কথা বলা হয়েছে, তা' জ্ঞানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সাধারণ জনদের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য।

পঞ্চদশতঃ, যাঁরা গার্হস্থ্যাশ্রম বরণ করেন, কেবল তাঁদের ক্ষেত্রেই এই সকল ঋণ পরিশোধের প্রশ্ন উঠে। কিন্তু যাঁরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাঁরা ত গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশই করেন না, সেজন্য তাঁদের ক্ষেত্রে এরূপ ঋণ-পরিশোধের কোন প্রশ্নই নেই। এই কারণেই, যাঁরা গার্হস্থ্যাশ্রমে অধিকারী, কেবল তাঁদের জন্যই ঋণ ও ঋণ পরিশোধের বিধান শাস্ত্র দিয়েছেন, সকলের জন্য নয়। একটি বিশেষ শ্রেণীর অধিকারীদের জন্য বিহিত নিয়ম যদি সকলের জন্যই বিহিত বলে গ্রহণ করা হয়, তা হলে ত বিধিনিষেধ শাস্ত্রের কোন অর্থই থাকে না। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে (দ্বিতীয় খণ্ড)। বস্তুতঃ যাঁরা গার্হস্থ্যাশ্রমী, তাঁরাও যদি আত্মজ্ঞান লাভে অভিলাষী হন, তবে তাঁদের পক্ষেও সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেয়ঃ।

ষোড়শতঃ, যাঁরা কর্মসম্পাদনে অক্ষম, তাঁদের জন্যই কেবল কর্মত্যাগের বিধান দেওয়া হয়েছে—এ মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের জন্য শাস্ত্র বিশেষ বিধিবিধান দিয়েছেন নানাভাবে, তাঁদের দৈহিক ও মানসিক অপটুতার দিকে দৃষ্টি রেখে'। সেজন্য কর্ম-ত্যাগের যে সাধারণ বিধান, তা' কর্মক্ষম, অথচ আত্মজ্ঞানেচ্ছু, সাধকদের জন্যই দেওয়া হয়েছে।

সপ্তদশতঃ, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, কারণ না থাকলে কার্যের উৎপত্তি হতে পারে না। সেজন্য ঐহিক কামনাবাসনাই যখন সাধারণ, সকাম কর্মের কারণ, এবং এরূপ কামাচার-প্রবৃত্তি যখন কেবল মূঢ়, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন, বদ্ধ-জীবদের ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়, তখন জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে ত তা একেবারেই অসম্ভব। বিশেষ করে, এমনকি, শাস্ত্রবিহিত কর্মও জ্ঞানীদের নিকট অতি দুর্বহ, গুরুভার বলেই মনে হয়। সে ক্ষেত্রে, সাধারণ কামনা-বাসনামূলক কর্ম যে তাঁদের নিকট একেবারেই হেয়, ঘৃণ্যরূপে প্রতিভাত হবে, তা' আর আশ্চর্যের বিষয় কি? সাধারণ দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যাবে যে, উন্মাদ বা চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি সেই অবস্থায় যা' যা' দেখেন, রোগমুক্ত হলে তাঁরা সেই সেই বস্তুকে নিশ্চয়ই সেই সেই প্রকারেই দেখেন না; যেহেতু তাঁদের পূর্বের বিকৃত দৃষ্টির কারণ যে রোগ, তার উপশম এখন হয়েছে। একই ভাবে, কারণরূপ অজ্ঞান এবং তজ্জনিত কামনা-বাসনার এখন উপশম হয়েছে বলেই, আত্মজ্ঞ মুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, কার্যরূপ সকাম কর্মেরও তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয়ে যায়। সেজন্যই তাঁদের ক্ষেত্রে, কর্মত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং তাঁদের অন্য কোন কর্তব্যও অবশিষ্ট থাকে না।

অষ্টাদশতঃ, উপনিষদে কর্মের অবতারণার পরে আত্ম-বিদ্যার উল্লেখ থাকলেই যে কর্মকারী পুরুষই কেবল মোক্ষের অধিকারী হয়ে পড়েন, এ কথাও স্বীকার্য নয়। শাস্ত্রবিহিত কর্ম চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক হয় বলেই এরূপ প্রপঞ্চনা-প্রণালী স্থলবিশেষে দেখা যায়।

ঊনবিংশতঃ, কর্মকাণ্ড প্রারম্ভে ও জ্ঞানকাণ্ড পরিশেষে থাকলেই যে এই দুটি কাণ্ড অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—এই মতবাদও ভ্রান্ত। এই দুটি কাণ্ডের মধ্যে এরূপ কোন অবিচ্ছেদ্য, মূলগত সম্বন্ধই নেই যাতে কর্মকাণ্ডকে বাদ দিয়ে জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ ভাবে উপনীত হওয়া যায় না। উপরন্তু, শাস্ত্রবিহিত কর্ম নিষ্কামভাবে সম্পাদন করলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয় নিশ্চয়ই, এবং তা' জ্ঞানোৎপত্তির সহায়কও হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু তা' সত্ত্বেও, এমনকি এরূপ নিষ্কাম-কর্ম-সম্পাদনও মোক্ষের দিক্ থেকে অত্যাবশ্যক নয়, এবং কর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করেও, সাধক শুদ্ধ-জ্ঞানের পথেই মুক্তি লাভ করতে পারেন, নিঃসন্দেহ।

বিংশতঃ, জ্ঞানকাণ্ডে শুদ্ধ আত্মোপাসনার বিধান দেওয়া

হয়েছে—এই কথাও বলা যায় না। জ্ঞানকাণ্ড সম্পূর্ণভাবেই একমাত্র ব্রহ্মেরই প্রপঞ্চনা করে, কর্ম বা উপাসনার নয়।

এইভাবে, বিশটি প্রধান যুক্তির সাহায্যে, শঙ্কর ঐতরেয়োপনিষদ্ ভাষ্যের প্রারম্ভে প্রমাণিত করবার প্রচেষ্টা করেছেন যে, সকাম-কর্ম কামনামূলক এবং জীবন্মুক্ত কামনা-বিহীন বলে ব্রহ্মজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞ, জীবন্মুক্তের পক্ষে কোনরূপ সকাম কর্ম সম্ভবপর নয়, তাঁর আর কোনরূপ কর্তব্য কর্মও নেই; এবং সেজন্য তাঁর পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেয়ঃ।

সর্ব্বোদয়

শ্রীকৃষ্ণধন দে

১

শ্যাম অরণ্য, সুনীল সিন্ধু, তুষারমৌলি গিরি,
পিঙ্গল মরু বক্ষে ধরেছ স্নেহ অঞ্চলে ঘিরি'
মেরুর ললাটে দিয়েছ পরায়ে নিশীথ রবির মায়া
তুন্দ্রার বুকে তন্দ্রা এনেছ হিমেল যুগের ছায়া
ওগো ধরিত্রি, যুগযুগান্তে তোমার করুণাতলে
সৃজন মরণ, মরণ সৃজন আজো একই পথে চলে,
মানুষ ভুলেছে প্রেমের বারতা হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতি,
মানুষ ভুলেছে তোমার কাহিনী কল্যাণভরা গীতি।
বলে দাও আজ অমর মন্ত্র জীবনের রসায়ন,
বলে দাও আজ নিখিল প্রাণের অমৃত-উজ্জীবন।
কহে ধরিত্রী: ওগো সন্তান, সর্ব্বোদয়ের ক্ষণে,
তুমি সকলের, সকলে তোমার, এই কথা রেখো মনে।

২

কোথা কতদূরে মানুষ রয়েছে, সন্ধান নাহি তার,
তবু যে চিত্ত চাহিছে নিত্য স্পর্শ সে সবাকার।
রচে অরণ্য স্নেহের বাঁধন ফুল ফল বীজ আনি,
শত অরণ্য মাথা তুলে গড়ে শ্যামল অর্ঘ্যখানি।
এক নদী হতে শত ধারা বয়, শস্য সাজায় তটে,
একই সিন্ধু গড়ে শত মেঘ উর্ম্মির ছায়ানটে।
এক দীপ হতে সাজে শত দীপ, ঢেউ হতে শত ঢেউ,
কোথা হতে আসে এ গূঢ় বাঁধন আজিও জানে না কেউ।
মানুষ খুঁজিছে মানুষের প্রীতি অনাদিকালের দোলে,
পার হয়ে মরু গিরি প্রান্তর কত কান্তার কোলে।
মানুষ চেয়েছে মানুষের মাঝে টুটে দিতে ব্যবধান,
সর্ব্বোদয়ের মন্ত্রে গেয়েছে মহামিলনের গান।

৩

মানুষের মাঝে সব দেশে আজো রয়েছে মানুষ-ভাই,
আদানে প্রদানে প্রীতি কল্যাণে পৃথিবী চলেছে তাই।
ধনের দম্ভ টুটে গেছে আজ এই মানুষেরি হাতে,
মানুষেরে আজ বরণ করিতে মানুষই আসন পাতে।
মানুষেরি চোখে জেগে ওঠে আজ মানুষের নবরূপ,
দিকে দিকে আজ গন্ধ বিলায় প্রেমমঙ্গল ধূপ।
শ্রমিক চাহে না ক্রীতদাস হতে ধনিক দুয়ারে আর,
এক মুঠি শুধু ক্ষুধার অন্নে আশা যে মেটে না তার।
সব একাকার হয়ে যায় তাই সর্ব্বোদয়ের গানে
দেশে দেশে দেখ, মিলন-বাঁধনে মানুষ মানুষে টানে,
আজি শুভদিনে নব উষালোক এসেছে তোমারি দ্বারে,
হৃদয়-অর্ঘ্যে বরি লও তারে প্রেম-গীতি-ঝঙ্কারে।*

---

* "সর্ব্বোদয়" উপলক্ষ্যে ৩০শে জানুয়ারী (১৯৫৯) কলিকাতা রেডিওতে পঠিত।

সারেংহাটি কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

শৈশবের স্মৃতির দুয়ারটা খুলে গেল। চোখের সামনে দৃশ্যগুলো সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠল এবার।

—দিদি! অনুনাসিক সুরে এষা বলছে, আদর পাওয়ার জন্য এ সুরটা সে ব্যবহার করে থাকে।

কি? উত্তর দিলে মালতী।

আমি নিজে চান করব আজ।

না, আমি করিয়ে দিচ্ছি।

তুই বড্ড চোখে সাবান ঢুকিয়ে দিস।

তুই চোখ খুলিস কেন তাই ত সাবান লাগে। চোখ বন্ধ করে থাকবি মোটে চোখ জ্বালা করবে না। উপদেশ দিলে মালতী।

দিঁদি। সেই সুর।

আবার কি হ'ল?

আমি নিচে চান করব।

কেন?

নিচে চৌবাচ্চায় ডুবে চান করব।

বাদরামি করিস না এষা, আমার আজ সকাল সকাল কলেজ।

না, আমি চান করব না। হঠাৎ মত বদলায় এষা।

এস লক্ষ্মী মেয়ে, কাল নিচে চান করবে, নিজে সাবান মাখবে কেমন?

তোর সেই বোনার কাঠি দুটো দিবি? কিছু চাইবার মত সুযোগ পেয়েছে এষা।

আচ্ছা দোব, আগে চান কর।

আজকে তোকে খাইয়ে দিতে হবে দিদি।

কেন?

আহা, হাত কেটে গেছে জান না? এত বড় খবরটা মালতী রাখে না আশ্চর্য্য!

কৈ দেখি! দেখবার চেষ্টা করে মালতী, খালি চোখে দেখা যায় না, আতস কাচের দরকার হয়, হেসে ফেলল মালতী।

হাসলি যে? থাক তোকে চুল মোছাতে হবে না। মাথা ঝাঁকি দিয়ে ওঠে এষা।

আয় শীগগির—চুল বেয়ে টস্‌টস্ করে জল পড়ছে। পড়ুক, তোকে দিতে হবে না। এষার কি রাগ নেই? অত স্পষ্ট কাটার দাগটা রয়েছে অথচ।

শীগগির আয়, বাবাকে বলে দেব তা না হলে।

দিঁদি!

কি?

ও রকম করে চুল আঁচড়াস না। অনুরোধ করল এষা।

তবে কি রকম করে আঁচড়াব?

দু'পাশটা তুলে ওপরে একটা 'বো' করে দে—

হুঁ, আবার ষ্টাইল হচ্ছে—

থাক, তোকে দিতে হবে না। মাথাটা সরিয়ে নেয় এষা।

আচ্ছা আচ্ছা, দিচ্ছি। ফরমাস মত চুল বেঁধে দেওয়া হ'ল।

এবারে খাওয়ার পালা।

দিঁদি!

কি?

মাছ খাব না। আবার মাথা ঝাঁকি দিল এষা।

না তা খাবে কেন? চোখটা যখন নষ্ট হবে তখন বুঝবে। মালতীর মনে আছে মা তাকে ঐ কথা বলেই মাছ খাওয়াতেন।

কি রকম আঁশটে গন্ধ লাগে।

মাছ খেলে গায়ে জোর হয়, জানিস তোদের স্কুলের মেমরা খুব মাছ খায়, সেই জন্যেই ত অত ফরসা।

সত্যি?

হ্যাঁ রে সত্যি।

তা হলে কেষ্ট ত মাছ খায়, ও কাল কেন?

কেষ্ট বাড়ীর চাকর।

বাজে তর্ক করিস না—নে খেয়ে নে, আমার আজ নির্ঘাৎ দেরী হবে।

মাঝে মাঝে অবশ্য এত সহজে মেটে না। বাবার কাছেও নালিশ করতে হয়। সুরেনবাবু তাঁর ঘরটিতে বই আর খাতার মধ্যে ডুবে থাকেন, সেখানেও উৎপাত।

বাবা! মালতী সেদিন ঢুকল ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে।

কেন মা? বই থেকে মুখ তুলে বললেন সুরেনবাবু।

আমি আর পারছি না, তুমি একটা ব্যবস্থা কর।

কিসের ?

তোমার ছোট মেয়ের।

না বাবা। সঙ্গে সঙ্গে আসামী উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ জানায়।

কি করেছ—এষা মা ? ছোট মেয়ের দিকে বাবা তাকান।

কিছু নয় বাবা।

তুই জামা পরছিস না কেন ? জান বাবা সর্দ্দিতে ফোঁস ফোঁস করছে একেবারে আর জামা পরবে না কিছুতেই। জোরাল নালিশ পেশ করল মালতী।

এষা মা !

উঁ।

এদিকে এস। বাবার কোলের কাছে দাঁড়ায় এষা। একটা হাত দিয়ে টেনে নিলেন সুরেনবাবু এষাকে। বললেন, লক্ষ্মী মা আমার, জামা পরে নাও।

এষা নিরুত্তর।—দিদির কথা শুনতে হয়। আবার বললেন বাবা।

দিদি আমায় পশম দেয় নি কেন ? এবার পাল্টা নালিশ করল এষা।

পশম ?

হ্যাঁ।

কি হবে ?

বুনব, দিদি যেমন তোমায় 'স্লিপ ওভার' বুনে দিয়েছে আমিও ওই রকম করব। দিদির চেয়ে সে কোন অংশেই কম নয়।

ওঃ, তা বেশ ত, আগে দিদির কাছে শিখে নাও, তবে ত—

আমি জানি ; আমি ত পুতুলের একটা করেছি।

তাই নাকি ? বেশ বেশ, তা হলে ত পশম দিতেই হয় কি মালতী মা ?

হ্যাঁ। হাসল মালতী—আয় জামা পরবি আয়।

সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সুরেনবাবু মেয়েদের দিকে।

কত স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনেই না মানুষ নিজেকে বেঁধে রাখে। দার্শনিকরা নাকি একে মায়া বলেন, তা হতে পারে কিন্তু এ মায়া যেন চিরদিন তাকে সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে রাখে। বাবা, মালতীদি, সঞ্জীব তিন জনেই তার কাছে অপরিহার্য্য। মাঠের প্রান্তে ঐ প্রকাণ্ড বটগাছের মত সুদৃঢ় শিকড় আর ডালপালা নিয়ে তার মনে অটল হয়ে গেঁথে রয়েছে, তাকে মায়া বলে, উড়িয়ে দেবে নাকি ?

এষার মনটা ভরে উঠল। ছোট্ট ভ্যানিটি ব্যাগটা থেকে ততোধিক ছোট্ট একটা রুমাল বার করে মুখ মুছলে এষা। বিশ্রী কালি পড়েছে, ধোঁয়া আর ধুলোয় মুখটা কাল হয়ে গেছে নিশ্চয়। এই জিনিসটা ভীষণ অপছন্দ করে সে, আর ট্রেনে যাতায়াত করলে এটা এড়ান সম্ভব না। যদি একবার মুখটা সাবান দিয়ে নিতে পারত—কিন্তু তা আর কি করে হয় ? এক গাদা লোকের মধ্যে বাথরুমের ভেতর ঢুকতে সঙ্কোচ হচ্ছে এষার। পরের ষ্টেশনে দেখা যাবে, ভাবল সে। অকস্মাৎ সশব্দে পাশ দিয়ে একটা ট্রেন চকিতে চলে গেল, মুখ বাড়িয়ে এষা তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

ব্রজেশ্বরবাবুও তাকিয়ে আছেন রথীনের দিকে। এ ছেলেটিও দেখতে মন্দ নয়। ডাক্তার নৃপেশ মুখুজ্জের ভাই কি রকম দেখতে কে জানে ? সুনীল রায়কে দেখে কিছুক্ষণ আগে ওই কথাই মনে পড়েছিল তাঁর। বস্তুতঃ, সুন্দর চেহারার ছেলে দেখলেই মেয়ের বিয়ের কথাই মনে পড়ে যায় ব্রজেশ্বরবাবুর। বুড়ী মানে তাঁর মেয়ে কল্যাণী যখন জন্মেছিল তখন তাকে অনেকে রহস্য করে বলতেন, 'মেয়ে হয়েছে টাকা জমাও, জামাই আনতে হবে। হাসতেন ব্রজেশ্বরবাবু। অত সামান্য কথাটার পিছনে যে এত বড় সত্য লুকিয়ে আছে তা এখন বুঝতে পারছেন তিনি। সামান্য একটা তামাসার কথা এত দিন পরে যে এত অদ্ভুত ভাবে বাস্তবে পরিণত হবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। হঠাৎ তাঁর আরামবাগের কথা মনে পড়ল, মাধবীকে ভাল ভাবে চিনতে পেরেছেন তিনি। তখনও পুলিসের চাকরীতে ঢোকেন নি ব্রজেশ্বরবাবু। সে সময়ে দেশের সেবায় মন দিয়েছিলেন তিনি। স্বদেশী যুগের কথা, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহের বন্যায় দেশ ভেসে গিয়েছে সেই সময়। মনে পড়ল জনসেবায় আর পল্লীসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। মরা পোড়ানো, দুর্গতের সেবা লাইব্রেরীর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি নানাপ্রকার জনকল্যাণকর কাজ নিয়ে মেতেছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁদের বাড়ীর রাঁধুনির কলেরা হয়, তিনি এবং দলের স্বেচ্ছাসেবকরা তার পরিচর্য্যা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সদর হাসপাতালে সে মারা গেল। তার সেই নোংরা শুঁটকে মেয়েটা যে এত দিনে মাধবীতে পরিণত হয়েছে তা তিনি কি করে বুঝবেন। শুধু কি তাই, জীবনে তিনি এত বেশী 'হিরো ওয়ার সিপ' পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। বিয়ের পর যেদিন সুরমা প্রথম গলায় কাপড় দিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিলেন সেদিনও তাঁর মনোভাব অনেকটা এই রকমই

হয়েছিল। পুলিসের চাকরী ব্যপদেশে অনেকেই তাঁকে অতিভক্তি প্রদর্শন করেছে বটে তবে প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী সেটা ওই শ্রেণীর লোকেদের কাছ থেকেই বরাবর পেয়েছেন এবং লক্ষণটাও সব সময়েই মিলেছে। উপঢৌকন, নানা জাতীয় ভেট, ওপরওয়ালার চাপ এবং তৎসঙ্গে এই অতি-ভক্তি তাঁর চাকুরী জীবনে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, সুতরাং মাধবী নাম্নী যুবতীটি যখন বিনা কারণে শুধুমাত্র পূর্ব্ব পরিচয়ের জেরে তাঁর পায়ে অকুণ্ঠ ভক্তি এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বিনয়াবনত চিত্তে অর্পণ করল তখন তিনি যে হতচকিত হয়েছিলেন একথা সত্যি। এতক্ষণে কিন্তু সেই পরম ক্ষণটুকু সম্বন্ধে তিনি মনে মনে চিন্তা করছিলেন। বেশ আত্মস্ফীত হয়ে পড়েছেন তিনি। কেশ বিরল মাথাটায় একবার খুব সুলভ ভঙ্গীতে হাত বুলিয়ে নিলেন তিনি। মনটা বেশ হালকা ঠেকছে, যেন একটা নূতন ধরনের প্রেরণা পেলেন—ক্ষিধের কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছেন এতক্ষণ। প্রেরণাই প্রতিভা বিকাশের সহায়। কালিদাসের মত কবি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত ভক্ত, মাদাম কুরীর মত বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক নেতারা সকলেরই প্রেরণার প্রয়োজন হয়েছে এবং সেই কারণেই প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়েছে এ কথা অস্বীকার করা চলে না, সুতরাং ব্রজেশ্বরবাবুর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হবে এ আর বিচিত্র কি? কিন্তু খুব ক্ষণস্থায়ী হ'ল তাঁর চাঞ্চল্য। টিফিনকেরিয়ারটা ট্রেনের আচমকা ঝাঁকুনিতে কাৎ হয়ে পড়ে গেল, শশব্যস্ত হয়ে তুললেন সেটাকে, হাত দিয়ে গায়ের ধুলো মুছিয়ে দিলেন—যেন অতি আদরের সন্তান পড়ে গিয়েছে তাঁর। সত্যই এদিক দিয়ে ব্রজেশ্বরবাবুর সহ্যশক্তি খুব কম। কল্যাণীর যদি কখনও অসুখ হ'ত তা হলে তিনি রাত্রে জেগে বসে থাকতেন, একবার কাশির শব্দ পেলেই উঠে বসে সুরমাকে বলতেন, শুনছ সুরমা?

উঁঃ। নিদ্রাজড়িত সুরে উত্তর দিতেন সুরমা।

খুকু কাসছে না? ব্রজেশ্বরবাবুর স্বরে উৎকণ্ঠা।

তা কাসলেই বা। বিরক্ত হতেন সুরমা, বলতেন, তুমি ঘুমোও ত।

গায়ে হাত দিয়ে দেখ ত, গাটা গরম কিনা।

না গরম নয়, শুধু শুধু এমন কর তুমি। বিরক্ত হয়ে উত্তর দিতেন সুরমা দেবী।

তোমার মত নিশ্চিন্ত হয়ে নাক ডাকালেই হয়েছে আর কি!

তবে জেগে বসে থাক তোমার সোহাগের মেয়েকে নিয়ে, পাশ ফিরে শুয়ে পড়তেন সুরমা।

গরমের দিনে এক রাত্রে পাখা খুলতেই খুট করে আওয়াজ হ'ল একটা, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেশ্বরবাবু বিচলিত হয়ে উঠলেন।

শুনলে ত। বললেন তিনি স্ত্রীকে।

কি?

ওই যে সুইচ টিপতেই খুট করে পাখাতে একটা আওয়াজ হ'ল।

তাতে কি হয়েছে?

যদি খুলে পড়ে যায়—খুকু ত ঠিক পাখার তলায় শোয়।

তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল নাকি? আশ্চর্য্য হলেন সুরমা।

কেন খুলে পড়তে পারে না? তুমি জান? এই পরশু আমাদের আপিসে একটা পাখা খুলে পড়ে গেল।

বাজে বকো না বাপু, এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তোমার মাথায় আসে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরমা ঘুমিয়ে পড়লেন কিন্তু ব্রজেশ্বর-বাবু ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। নানা চিন্তা ভিড় করে তাঁর মাথায় আসতে শুরু করল। যদি ওই ভারী পাখাটা খুকুর ছোট্ট বুকের ওপর পড়ে যায়, তা হলে? সেই রক্তাক্ত বীভৎস দৃশ্যটা বারবার কল্পনা করে উত্তেজিত হয়ে উঠে বিছানায় বসতে লাগলেন তিনি।

শুনছ সুরমা! ব্রজেশ্বরবাবু আর থাকতে পারেন না।

কি?

তুমি ওকে সরিয়ে শুইয়ে দাও, তা না হলে আমি ঘুমুতে পারছি না। কাতরস্বরে বললেন তিনি।

এত রাত্রেও দুর্ভাবনায় ঘুমুতে পারছে না? সমবেদনায় মনটা ভরে গেল সুরমার। একটু দূরে সরিয়ে দিলেন খুকুকে।

নাও, এবার হবে ত? কোন ব্যঙ্গ করলেন না তিনি, বিরক্তও হলেন না।

হ্যাঁ হয়েছে। শান্ত হলেন ব্রজেশ্বরবাবু, নির্ব্বিঘ্নে রাতটা কেটে গেল।

সেই খুকু বড় হয়েছে তাঁর আদরের বুড়ী—কল্যাণী। কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে, কত দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় নিপীড়িত হয়েছেন ব্রজেশ্বরবাবু তার জন্যে। শুধু কি তাই? স্বামীস্ত্রীর মধ্যেও অনেক ঝড়ঝাপটা বয়ে গিয়েছে ওই এক-রত্তি মেয়েটার জন্য। ব্রজেশ্বরবাবু একটা জিনিস সহ্য করতে পারতেন না—সেটা হ'ল তাঁর মেয়ের গায়ে হাত তোলা।

আর একদিনের কথা তখন কল্যাণী ছোট। নীচে বসে

আছেন ব্রজেশ্বরবাবু, হঠাৎ ওঘরে মেয়ের চীৎকার শুনে উঠে এলেন।

কাঁদছে কেন? কি হয়েছে? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি স্ত্রীকে।

আমি মেরেছি। নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দেন সুরমা।

মেরেছ?

হাঁা।

কেন?

বাঁদরামি করলেই মারব।

বাঁদরামিটা কি?

কাঁসার গ্লাসটা ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিয়েছে।

ততক্ষণে কল্যাণীর কান্না কিন্তু থেমেছে, তাকে কেন্দ্র করে কি ঘটনা ঘটছে তা জানতে উৎসুক হ'ল সে।

কেন? শুধু শুধু অমনি ফেলে দিলে?

তোমার মেয়ের রাগ হয়েছিল তাই।

দেখ সুরমা, আমি তোমাকে অনেকবার বারণ করেছি ওর গায়ে হাত তুলবে না।

তার মানে?

তার মানে শুধু শুধু ওকে মারবে না।

অন্যায় করলে শাসন করব না বলতে চাও?

তা বলছি না, কিন্তু এ রকম নির্দয় ভাবে মারার কোন দরকার নেই ত।

নির্দয় ভাবে?

নিশ্চয়, গালে লাল হয়ে দাগ পড়েছে।

বেশ হয়েছে, অন্যায় করলেই মারব।

না, মারবে না। মতটা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে মেয়েকে নিয়ে নিচে নেমে গেলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

সেদিন অনেক সাধ্য-সাধনার পর ব্রজেশ্বরবাবু ভাত খেয়েছিলেন। সুরমারও খুব রাগ হয়েছিল, কিন্তু মানুষটার অন্তরের পরিচয় এত দিনে তিনি পেয়েছেন, অদ্ভুত কোমল মনটা।

ভাবছেন ব্রজেশ্বরবাবু, এই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে কি তাঁর কথা আর মনে রাখবে? সেই সব দিনের কথা, ছোট ছোট ঘটনার বৈচিত্র্য কি জায়গা পাবে তার মধুর স্বপ্নভরা নূতন জীবনের মধ্যে? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ব্রজেশ্বরবাবু— হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর নিজের কথা।

সেবার পূজোর সময় আরামবাগ থেকে তাঁর মা তাঁকে বাড়ী যাবার জন্য লিখেছিলেন কিন্তু তিনি যান নি, যেতে পারেন নি, সদ্যবিবাহিতা বধূর ঢলঢলে মুখ এবং সান্নিধ্য ছেড়ে আরামবাগে মায়ের তৈরি নারকেল নাড়ু খেতে তাঁর মন ওঠে নি।

ক্রমাগত চক্রাকারে তাই হয়ে চলেছে। নাগর দোলাটা অবিরত ঘুরে যাচ্ছে। বৃত্তের ব্যাসের বিভিন্ন জায়গায় থেকে ছবিগুলো প্রতিফলিত হচ্ছে বার বার। পরের বেলায় সমালোচনা করা হচ্ছে বটে কিন্তু নিজের বেলায় নয়, আবার যদি সেই দিনটা ফিরে আসে তা হলে মায়ের কাছে নিশ্চয় ফিরে যাবেন ব্রজেশ্বর বাবু। আর ভুল হবে না। হঠাৎ তাঁর মনে এ কথাটা উঠল কেন? বুঝতে পারলেন তিনি। কন্যাকে ছাড়বার ভয়ে এ প্রশ্নটা জেগেছে তাঁর মনে। যদি তার নিজের দোষ স্খলন করে, প্রায়শ্চিত্ত করেও মেয়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত না হন, মনে মনে তাই এ কথাটা ভাবছিলেন ব্রজেশ্বরবাবু। হাসলেন তিনি, কারণ বৃত্তটা সমান ভাবেই ঘুরে চলেছে যে—সেটাকে থামাবার তাঁর শক্তি কোথায়?

ডাঃ নৃপেশ মুখার্জীর ছোট ভাই পরেশ মুখার্জী। বড় ডাক্তার, ছোট ইঞ্জিনীয়ার। গত দু বছর হ'ল পরেশ শিবপুর কলেজ থেকে পাশ করেছে। বাবা অনেকদিন আগেই গেছেন তার পর গেলেন মা। দু ভাই তখন বেশ বড় হয়েছে, পরেশ তখনও ছাত্র, নৃপেশ সবেমাত্র পাস করেছে। পরেশের পেশা হ'ল রাজনীতি—কিন্তু সবচেয়ে বড় নেশা হ'ল তার দাদা। দাদাকে ছেড়ে কোন জিনিসই কল্পনা করতে পারে না পরেশ। তার এই স্বাধীনতা, তার রাজনৈতিক মতবাদ, শিক্ষা, সবই দাদার পাশাপাশি থেকে সম্ভব হয়েছে। বিপক্ষ দলে দাদা থাকলেও তার জয়েও দাদা দুঃখ পায় না বরঞ্চ যেন খুশীই হয়। পরেশের জীবনে একটা বড় স্থান অধিকার করে রেখেছে নৃপেশ, সেটা পরেশ নিজেই অনুভব করে।

ম্যাসিমাকে নিয়ে আসার ইচ্ছে তার ছিল না, তবে দুটো কারণে সে রাজী হয়েছে, প্রথম সে না এলে দাদাকে আসতে হত, তাতে দাদার ক্ষতি হত প্রচুর, সম্প্রতি যে কাজটা হাতে নিয়েছে নৃপেশ এবং যে ভাবে পরিশ্রম করছে তাতে দাদার জন্য পরেশ চিন্তিত হয়েছে। এমন খেয়ালী লোক দেখে নি পরেশ—দিনের পর দিন দাদাকে যদি চা আর সিগারেট সরবরাহ করা যায় আর তার কাজ নিয়ে থাকতে দেওয়া হয় তাহলেই হ'ল। খাওয়া বা বিশ্রাম করার কোন দরকারই করে না দাদার। অপর একটা কারণ হ'ল তার পার্টির কাজ। যুক্তপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলে তাদের কাজটা কতদূর অগ্রসর হয়েছে সেটা দেখা দরকার। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হ'ল দাদা। দাদাকে ভয় সবচেয়ে তার খাম-খেয়ালীর জন্যে। সেবার যখন ওষুধের কারখানা খুলল, তখন সেই বিরাট আয়োজনের কথা মনে পড়ল পরেশের, উল্টোডাঙ্গার কাছে একটা বড় জায়গা নিয়ে শেড করা হয়।

জার্মানী, ইউ কে থেকে নানা রকম যন্ত্রপাতি আমদানী করা হ'ল। অদ্ভুত আকৃতির যন্ত্র সব। কোনটা পাতা থেকে রস নিষ্কাশনের জন্য, কোনটা পাউডার করার জন্য, কোনটা বা ট্যাবলেট তৈরীর জন্য। সেই সঙ্গে তৈরী হ'ল একটা ল্যাবোরেটারী। শক্তিশালী মাইক্রোসকোপ থেকে ইনকিউবেটার পর্য্যন্ত, অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। সে নিজেও কিছু কিছু সাহায্য করছিল। যন্ত্রপাতি বসাবার ব্যাপারে। পরেশের মনে আছে, নৃপেশ যেন উন্মত্তের মত কাজ নিয়ে মেতে গিয়েছিল, পর পর কয়েকদিন বাড়ীই ফিরল না, সেদিন পরেশ দাদাকে বাড়ীতে আনতে গিয়ে দেখে স্তূপাকার গাছের পাতা নিয়ে কি যেন করছে সে—পরেশ ডাকলে—

—দাদা—

—এই যে পরেশ এসেছ ?

—হ্যাঁ, তুমি বাড়ী যাও নি কেন ? কৈফিয়ৎ দাবী করল পরেশ।

—কি করে যাই বল এসব ফেলে ?

—খেলে কি, চা আর সিগারেট ?

—দুধ খেয়েছি, হাসল নৃপেশ—

—বল কি, দুধ খেয়েছ, কবে বলত ?

—এই ত—' মুস্কিলে ফেললে—ইয়ে বোধ হয় কাল—

—চল, বাড়ী চল—আদেশের স্বরে বলে পরেশ।

—বাড়ী ?

—হ্যাঁ।

—অনেক কাজ বাকী রয়েছে পরেশ, ভ্যাটগুলো বসান হয় নি, ওদিকে ফায়ার ব্রিক্সের অভাবে ফারনেসটা সবটা হয়ে উঠছে না—অজানা দেশী গাছ-গাছড়া থেকে ততোধিক অজানা উপায়ে একটিভ প্রিন্সিপিলগুলো বার করতে হবে, ল্যাবরেটারির কাজ ঢিমে-তালে চলছে এ রকম অবস্থায় কি করে যাই বল।

—তা হ'ক চল, একদিন বিশ্রাম করলে আরও কাজে মন দিতে পারবে, কি হাসছ যে ?

—ভাবছি তুমি ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ডাক্তারী করছ, আর আমি যদি ডাক্তার হয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং করি—

—ডাক্তারদের কিন্তু একটা সুবিধে আছে দাদা—

—কি বলত ?

—ডাক্তারী মতটা তাদের নিজেদের উপর প্রযোজ্য নয়, সেটা রোগীদের জন্য। নাও উঠ।

নৃপেশ ভাইয়ের কথা ঠেলতে পারে নি, বাড়ীতে এসে এক রাত্রি বিশ্রাম করেছিল।

কিন্তু অত পরিশ্রম আর অর্থব্যয়ে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেছিল নৃপেশ—হঠাৎ সেটা ছেড়ে দিতেও বাধল না তার।

পরেশ, কারখানাটা ছেড়ে দিচ্ছি—একদিন নির্লিপ্ত গলায় বললে নৃপেশ—

—সে কি দাদা—কেন ?

—প্রথমতঃ লোকসান হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের ওষুধ ডাক্তার বাবুদের কাছে বিশেষ আদর পাচ্ছে না, কবিরাজ বলে নাক সিঁটকাচ্ছেন।

—সেইজন্য ছেড়ে দেবে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু দাদা অত পরিশ্রম আর অর্থ ব্যয় বিফলে যাবে ?

—বিফল কোথায় পরেশ ? অভিজ্ঞতার মূল্য দেবে না ? মাঝে মাঝে দাদার ওপর বিরক্ত হয় পরেশ—সম্প্রতি তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দাদা যেন মেতে উঠছে। মালদহ থেকে মাসিমাকে আনিয়ে তার ওপর দস্তুরমত চাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এটা তার ভাল লাগছে না কারণ বিয়ের কথায় তার রীতিমত ভয় করে। বিয়ে করে লোভনীয় সরকারী স্থায়ী একটা চাকরী নিয়ে দিনের পর দিন বৈচিত্র্যহীন জীবন কাটাতে সে খুব উৎসুক নয়। সংসার, স্ত্রী, সন্তান এবং সমাজ এইগুলোই বার বার তাকে নিয়ে টেবিল-টেনিসের বলের মত এক হাত থেকে অপর হাতে বার বার সজোর আঘাতে তাড়িত করবে এটা সে জানে। গতিহীনতা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে থাকবে তার জীবনের ওপর। জাতীয় জীবনে তার দেওয়ার মত কিছুই থাকবে না। অনড় অচল হয়ে থাকবে জগন্নাথের রথের মত। দাদাকে অবশ্য বোঝাবার সে চেষ্টা করেছে কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না—পরেশ সেইজন্য বিরক্ত হয়েছে দাদার ওপর। এত ব্যস্ত হওয়ারই বা প্রয়োজন কি ? বিয়ে করে বংশবৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু কাজ নেই তার, নিজে ত বেশ নির্ঝঞ্ঝাটের খেয়াল খুশী চরিতার্থ করে যাচ্ছে, এ নিয়ে অবশ্য কয়েকবার ভায়ে ভায়ে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে—কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি।

ইতিমধ্যে মেয়ে দেখাও হয়ে গিয়েছে এবং আরও আশ্চর্য্যের কথা পছন্দও হয়েছে, কোথাকার এক পুলিশ অফিসারের মেয়ে। ভাবতেও সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে যায় তার, শুধু তাই নয় আবার লোভের ইঙ্গিতও আছে। একমাত্র সুন্দরী কন্যা। কিন্তু দাদার বিরুদ্ধে কিছু বলা শক্ত। বিরুদ্ধতার কথা ত ভাবতেই পারা যায় না। কামরার দিকে তাকিয়ে একবার দেখল পরেশ, এখনও সেই ব্রিটিশ আমলের '২২ জন বসিবেক' লেখা বিজ্ঞাপনটা এনামেলের ফলকে পার্টিশানের গায়ে টাঙ্গান আছে। তিনটে আলো টিম টিম

জ্বলছে আর গাদাগাদি করে মানুষগুলো বসে রয়েছে আ নীচে।

নিচের তলার মানুষ, প্রলিতারিয়েত। ঘুমন্ত প্রকাণ্ড একটা দৈত্য যেন নেশা করে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে উদাসীন, লক্ষ্য করছে না, আঘাতের তীব্রতা স্পর্শও করছে না ওকে। অপর পক্ষ কিন্তু উৎকট উল্লাসে, আঘাত হেনে চলেছে। কিন্তু বুর্জোয়া সভ্যতা শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে, শোষণের দিন শেষ হয়ে এসেছে ওদের। মানুষের মত বাঁচবার অধিকার সকলের আছে তা ওরা স্বীকার করেন না। পৃথিবীতে যতদিন ক্যাপিটালিজম থাকবে ততদিন শোষণ চলবে। তা ত হবেই, রক্তলোলুপের দল রক্তের স্বাদ পেয়েছে তাই নিজের থেকে সরে যাবার লক্ষণ নেই। কিন্তু ওরা জানে না ক্রমবিবর্তনের কথা, ওরা বুঝতে চায় না বৈজ্ঞানিক সত্য। মানব সমাজ যে মানব দেহের মতই পরিবর্তনশীল এ সত্য ওদের চোখে এখনও ধরা পড়ে নি। আদিম গুহাবাসী মানুষ এবং বর্তমান সমাজের মধ্যে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক বিবর্তনটা যেন ওরা ইচ্ছে করেই লক্ষ্য করছে না। শশকের মত বালির মধ্যে নিজের মাথাটা লুকিয়ে ভাবছে সে অন্যের অগোচরে রয়েছে। ফিউডালিজম, রাজতন্ত্র এবং জমিদারদের উত্থান হয়েছে একের পর এক, প্রজাদের শ্রমের সুফলে নিজেরা পরিপুষ্ট হয়েছে, শুধু পুষ্ট নয় অবাঞ্ছিত ভাবে নষ্ট করেছে, সেই স্বেদমিশ্রিত ধনভাণ্ডার নিজেদের বিলাসব্যসনে। উন্মত্ত দানবের মত স্বৈরাচার আর স্বেচ্ছাচারিতার জলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেল তারা। তার পর এল গণতন্ত্র। কিন্তু শুধু নামেই গণতন্ত্র পিছনে লুকিয়ে আছে ধনতন্ত্রবাদী গোষ্ঠীরা। গণতন্ত্রের রহস্যপূর্ণ মুখোস পরে অভিনয় করে যাচ্ছে, তারা সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে ধাপ্পাবাজী দিয়ে, বিজ্ঞাপনের জৌলুস দিয়ে তারা নিজেদের কদর্যতা ঢেকে রাখছে। শাসনতন্ত্রের রাশ ধরে রয়েছে জোর মুষ্টিতে। কোশলে করায়ত্ত করেছে গণদেবতাকে। দুধের বদলে পিটুলি-গোলা জল দিয়ে ভুলিয়ে রাখছে, বার বার চীৎকার করে ঘোষণা করছে—'বিশ্বাস কর, এইটাই দুধ—পুষ্টিকর, বলকারক এবং খাঁটি নির্ভেজাল'। সমাজতন্ত্রবাদীরা এতেই খুশী। তারা ভাবছে হিমালয়ের নীচে যখন এসে পৌঁছেছি তখন আর শৃঙ্গটা কত দূর? মূর্খের স্বপ্নবিলাস। ধনতন্ত্রের দিন কিন্তু শেষ হয়ে এসেছে তাই শেষ কামড় দিচ্ছে। ছলে-বলে-কৌশলে ভাসিয়ে রাখতে চাইছে তাদের শতচ্ছিদ্র নৌকাটা হাস্যকর প্রচেষ্টা! বৈজ্ঞানিক সত্যকে লুকিয়ে রাখা কিন্তু সম্ভব নয়। এবার মাথা নাড়া দিয়েছে নিচের তলার লোক। ধর্মের আফিং খাইয়ে জুজুর ভয় দেখিয়ে আর তাদের দাবিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। ছোট ছোট চোখ দিয়ে হাতীটা নিজের দেহের আয়তনটা দেখে ফেলেছে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে তার চেতনা বোধ এসেছে এবার।

ট্রেনের গতিটা কমে আসছে, লাইন থেকে অপর লাইনে চলছে সেটা। দুলছে কামরাটা—এক পাশ থেকে অপর পাশে।

মাসীমার দিকে তাকাল পরেশ। তিনি আড়ষ্ট ভাবে বসে রয়েছেন ওধারের বেঞ্চিটায়। সকলের স্পর্শ বাঁচিয়ে নিজেকে অত্যন্ত সাবধানে সরিয়ে রেখেছেন। পাছে কেউ ছুঁয়ে ফেলে এই ভয়ে তিনি যেন সব সময়েই বিচলিত হয়ে রয়েছেন, এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। ঠিক তার সামনের বেঞ্চে একটা নিম্নশ্রেণীর মেয়ে বসে রয়েছে তার ছোট শিশুটিকে নিয়ে। মাসীমা এক-একবার আড়চোখে তাকে দেখছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখে-চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠছে। হঠাৎ মনে পড়ল পরেশের, হিন্দুস্থানী মেয়েটা মেথরাণী। সে পরিচয় সে এবং তার স্বামী প্রথমেই দিয়েছিল। উচ্চবংশীয়রা তাই ও পাশের বেঞ্চে বেশী ভীড় করেন নি, তাতে ওদের সুবিধেই হয়েছিল।

মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন মাসীমা। নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল পরেশের, না, তিনি এ ধরনের ছিলেন না, তবে অল্পেতেই বিরক্ত হতেন, অল্পেতে হাসতেন বা কাঁদতেন, মনের জোর কম ছিল। মানসিক সুস্থতা এবং অসুস্থতার মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়। মনটা যেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্র। একটা 'গ্যাসডেনোমিটারে'র মত, সামান্য তারতম্যও ধরা পড়ে যায়। মায়ের জন্য কিন্তু এভাবে বিপদে পড়তে হয় নি তাদের কোন দিন। মাসীমা যেন একদিনেই ওদের পাগল বানিয়ে ছেড়েছেন।

বৌদির কথা মনে পড়ল—রেবা বৌদি। মালদহে কয়েকবারই গিয়েছে পরেশ, সে লক্ষ্য করেছিল যে ননীদার সঙ্গে বৌদির খাপ খেত না, কোথায় যেন একটা অদৃশ্য প্রাচীর ছিল ওদের মধ্যে, অবশ্য কারণও একটা ছিল। সেটা জানতে পেরেছিল পরেশ মালদহে থাকতেই। বৌদির পুতুলের আলমারীতে একটা পুতুলের ফাঁপা জায়গাটায় একটা ছোট কাগজ লুকান ছিল, পরেশ সেটা লুকিয়ে দেখেছে—একটা ছোট কবিতা, সুন্দর, স্বচ্ছ তার ভাব, ভাষা ঠিক মনে নেই সবটা তবে এটা জেনেছিল পরেশ, বৌদি অন্য কাউকে ভালবাসে এবং সে ব্যক্তি ননীদা নয়—সারাজীবন এই কাঁটাটা বুকে নিয়ে বৌদিকে বেড়াতে হ'ল। মানুষের জীবনটা সামান্য কারণেই যেন অর্থহীন হয়ে যায় বলে মনে হ'ল পরেশের। একজনের অভাবে একটা গোটা সংসার ভেঙে যায়। মনে আছে একদিন এ বিষয়ে বৌদিকে

প্রশ্নও করেছিল, পরেশ বলেছিল—বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

একটা নয় ভাই, অনেকগুলো কর। মিষ্টিসুরে উত্তর দিলে বৌদি।

তোমার এখানে ভাল লাগে ? কথাটা হঠাৎ বলা ভাল নয় ভাবলৈ পরেশ।

এখানে আমার সবচেয়ে কি ভাল লাগে জান ?

কি ?

ওই হারু ছুতোরের কাজ দেখতে আর এই নর্দ্দমাটা।

সেকি ? আশ্চর্য্য হয় পরেশ।

হ্যাঁ, অবশ্য তোমাকে ভাল লাগে, কিন্তু তুমি আর ক'দিন থাক বল ? হতাশার একটা নকল ভঙ্গী করল বৌদি।

তা হলে আমি, হারু ছুতোর এবং ওই নর্দ্দমাটা এই তিনটে জিনিস তুমি ভালবাস ? পরেশের বলার ভঙ্গীতে হেসে ফেলল রেবা।

আচ্ছা বৌদি—

উঁ—

তোমার অন্য কোথাও বিয়ের ঠিক হয় নি ?

সম্বন্ধ হয়েছিল অনেক জায়গায়, তবে ঠিক হয়েছিল এই-খানে, তা না হলে কি তোমায় পেতাম ?

এ ধরনের কথা প্রায়ই বৌদি বলতেন, মজা দেখার জন্যে, অর্থাৎ আসল কথাটি এড়িয়ে যেতেন এই ভাবে। ননীদাকেও মনে পড়ল পরেশের—মোটা থপথপে চেহারা, মালদহে ওকালতী করতেন। লোক খারাপ নয়, কিন্তু কেমন যেন ভাল লাগত না ননীদাকে। নথি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবান্তর কথা বলতে পারতেন ননীদা। একদিনের কথা মনে পড়ল।

জানিস পরেশ, আজ দিলাম ঠুকে হাকিমকে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন ননীদা।

তাই নাকি ? পরেশ পাশ কাটাতে পারে না।

হ্যাঁ, বলে কিনা, 'উইটনেস হোস্‌টাইল'—আরে বাবা—তা কি করে হয় ?

১৯৩৫ সনের হাইকোর্টের লর্ড উইলিয়মসের ঘরে ক্রাউন ভার্সেস সেখ কামরুদ্দিনের কেসটা সাইট করলাম, একেবারে চক্ষু ট্যারা হয়ে গেল বাছাধনের। অনুকরণ করে ননীদা নিজের চোখ ট্যারা করলেন।

তাই নাকি ? মন্তব্য করার মত অন্য কিছু খুঁজে পায় না পরেশ।

হ্যাঁ, আসল কথা কি জানিস ? জানে না, কিসসু জানে না, কোন রকমে ধরে করে পাস করেছে, আর তৈল মর্দ্দন করে চাকরীটা বাগিয়েছে, ব্যস, হাকিম বনে গেল। কই গো গামছাটা দাও—

বৌদি গামছাটা দিয়ে গেলেন ? সশব্দে নাক ঝাড়লেন ননীদা, তার পর গামছাটা কাঁধে ফেলে এগিয়ে গেলেন উঠোনের দিকে। পরেশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, এত তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাবে তা সে আশা করে নি।

হঠাৎ পাশ ফিরে তাকাল পরেশ। মালদহের ছবিটা মিলিয়ে গেল। কোলাহল মুখরিত, ধূলিধূসরিত তৃতীয় শ্রেণীর রেলকামরায় মনটা আবার ফিরে এল পরেশের। পাশেই বসে আছে একটি মেয়ে, নাকে তিলক কেটে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িয়েছে—এটা পরেশের খুব খারাপ লাগে। ধর্ম্মের বন্ধনে মানুষ কতবার তার মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। কত রক্ত-স্রোতের বন্যায় ধুয়ে গেছে, পৃথিবীর ইতিহাস সে সংবাদ রাখে। যে কোন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কারণ খুঁজলে ইতিহাসের পাতায় ওই একটি কারণই পাওয়া যায়—ধর্ম্ম। ধর্ম্মের নেশা যে কোন নেশার চেয়ে অনেক তেজস্কর। এই নেশার বসে পৃথিবীতে যে পরিমাণ লোকক্ষয় হয়েছে তা কল্পনা করাও অসম্ভব। মানুষকে উন্মাদনা দিতে, তার ব্যক্তিত্ব এবং সত্তাকে অবলুপ্ত করে তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুর পর্য্যায়ে এনে দেয় এই ধর্ম্ম। পৃথিবীর অনেক বড় কাজ মানুষ তুচ্ছ করে এই নেশার বশীভূত হয়েছে, তা না হলে, পৃথিবী আজ লক্ষ বৎসর এগিয়ে যেতে পারত ; একথা পরেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। ঠিক এই বিশ্বাসের অভাবের জন্য সুলতাকে ছাড়তে হ'ল। সুলতা রায় তার এই বিশ্বাসের মূল্য দেয় নি, উপরন্তু উপহাস করেছিল। দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে আছে ওর মনে ওই কুসংস্কারের আগাছাগুলো। মনটা তার ঘেঁটু ভূত, ওর ঘাড়ে চেপে আছে, সেখানে সুন্দর চেহারা, শিক্ষা, বংশ সবই অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। মনে পড়ল, সেদিন আসতে সুলতার একটু দেরী হয়েছিল, ড্রইংরুমে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরেশকে। লাল পাড় শাড়ী পরে' ঘরে ঢুকল সুলতা, বললে, কি, অনেক-ক্ষণ বসে আছ ? দুঃখিত—এর আগে আসার উপায় ছিল না, কারণ বাড়ীতে পুজো ছিল।

পুজো ? ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল পরেশের।

হ্যাঁ, সত্যনারায়ণের পুজো।

সত্যনারায়ণ ?

হ্যাঁ, তুমি যে একেবারে সাহেব হয়ে গেলে! সুলতা তাকাল পরেশের দিকে।

না, সাহেব হই নি, তবে পার্টি মিটিংএ তুমি বোধ হয় আজকাল আর যাও না ?

কেন যাব না—

গেলে এ জিনিস নিয়ে এত মাতামাতি করতে না।

মাতামাতি ?

হ্যাঁ, মাতামাতি ছাড়া আর কি। সুলতা, এ নেশা যত বাড়াবে তত বাড়বে, মরফিয়ার মত মাত্রা ক্রমশঃ বাড়াতে হবে তবে আরাম পাবে।

সেকথা যদি বল পরেশ, তা হলে সব জিনিসই তাই—

তার মানে ? আশ্চর্য্য হয় পরেশ।

তার মানে—এই ধর না মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা। আমরা যে পরস্পর মিশছি এও ত নেশার মত।

সুলতা। বিরক্ত হয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে পরেশ।

আবার ধর রাজনৈতিক মতবাদের কথাটা, সেটাও ত একটা নেশা বলা যায়।

তোমার মনে এসব কথা কখন এল ? আমাদের রাজনৈতিক মতবাদ বৈজ্ঞানিক, সেখানে নেশার কথা ওঠে কেন ?

বিজ্ঞানকেও ত নেশা বলতে পারা যায়, রাজনীতিকে বলতে আপত্তি কি ?

না সুলতা, তুমি ভুল করছ, তোমার মনের ভেতর বুর্জোয়া ভূতটা আবার জেগে উঠতে চেষ্টা করছে, শতাব্দীর অভিশাপ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে তোমার মনের কোণে, কুসংস্কারের রূপ নিয়ে।

তুমি কি নিজেকে সংস্কারমুক্ত ভাব নাকি, পরেশ ?

তোমার বিদ্রূপটা বুঝতে পারলাম সুলতা, কিন্তু কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি যদি ভেবে থাক, আমার দোষ দেখিয়ে তোমার নিজের দুর্ব্বলতাটা ঢাকা দেবে, তা হলে ভুল করছ।

আমার দুর্ব্বলতা নেই পরেশ, আমি ফ্যানাটিক নই, আমার মতবাদ অন্য লোক জানতে না পারলে তাকে আমি ছোট বলে ভাবি না। অন্ধের মত, তোতাপাখীর মত বই পড়ে আমি আমার মতবাদ সৃষ্টি করি না, সে রাজনৈতিকই হোক আর সমাজতান্ত্রিক হোক কিংবা ধর্ম্ম সম্বন্ধেই হোক। আমি আমার মনকে বুঝি, তাকে চলতে দিই স্বাধীনভাবে শৃঙ্খলিত করে, চাপ দিয়ে তাকে মোড় ফেরাই না। আর ধর্ম্মকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার মত যুক্তি এখনও আমি খুঁজে পাই নি—

ব্যঙ্গের কথা নয় সুলতা, নেশার কথা। ধর্ম্মান্ধ হলে অন্য জিনিসের রূপ তুমি সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পাবে না, নতুন সমাজ গড়বার ভার আমাদের ওপর। পীড়ন বন্ধ করে গ্লানি হীন সুন্দর সমাজ সৃষ্টি করব আমরা।

মানুষকে তৈরি করা সম্ভব নয় পরেশ। তার নিজের সত্তা আছে, রাষ্ট্রের কেন অন্য কোন জিনিসের সঙ্গেই তাকে যুক্ত করে দেওয়া সম্ভব নয়, তা হলে সে আর মানুষ থাকবে না, যন্ত্র হয়ে যাবে—নীরস শুষ্ক যন্ত্র। প্রকাণ্ড একটা হুইলের স্ক্রুর মত। আর কিছু নয়।

ক্রমশঃ

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস

আমেদাবাদ অধিবেশন

ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী

এবার আমেদাবাদে অধিবেশন হবে। তোড়জোড় চলছে। মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডক্টর বি. এল. আত্রেয়। ডক্টর আত্রেয় খ্যাতনামা মনীষী। আধুনিক ভারতবর্ষের দার্শনিকদের অগ্রগণ্য তিনি। তাঁর মনীষার খ্যাতি দিগ্বিদিক প্রসারিত। একদিকে পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের ম্যাঞ্চেষ্টার আমেদাবাদের আতিথ্য, অন্যদিকে ডক্টর আত্রেয়ের মনীষাদীপ্তি, উপেক্ষা করতে পারলাম না এই দ্বৈত আমন্ত্রণ। সপরিবারে যাত্রা করলাম। সন্ধ্যার প্রদোষ অন্ধকারে কলকাতার স্বচ্ছ কুয়াশা ভেদ করে যন্ত্রযান হাওড়া ষ্টেশনে এল। তার পর লটবহর নিয়ে ট্রেনে আরোহণ। আরোহণ পর্ব্ব সমাধা করে হাত-মুখ ধুয়ে আহারপর্ব্বে মনোনিবেশ করা গেল। 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' জানি না কোন গণ্ডমূর্খ এই প্রত্যাদেশ পেয়ে তা প্রচার করেছিলেন; যদি নবাবী চালে, পরম স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কালাতিপাত করতে চান তবে 'নারীবিবর্জ্জিতা' হয়ে পথ চলবেন না। অবশ্য নারীটি আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী হওয়া চাই; তবেই আরামের মধ্যে পরম আলস্যে কালাতিপাত করতে পারবেন। অন্যথায় 'সিভালরির' বিড়ম্বনায় প্রাণ বেরিয়ে যাবে। পথে এবার সহযাত্রী ছিলেন ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার। অমিয়বাবু স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি বহুধাবিস্তৃত ছিল। কলকাতা তথা বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ সর্ব্বজনবিদিত। দু'দিনের পথ আমেদাবাদ। এই দীর্ঘ পথ অমিয়বাবুর সঙ্গে অতিক্রম করেছি। তাঁর বিদগ্ধ মনের যে পরিচয় পেয়েছি তা দেশ-বিদেশের মানুষের চোখে চিরকাল পরম ঐশ্বর্য্য বলে গণ্য হয়ে এসেছে।

২৭শে ডিসেম্বর অতি প্রত্যূষ। ধীরে ধীরে ট্রেন এসে লাগল পরিচ্ছন্ন, সুবৃহৎ আমেদাবাদ ষ্টেশনে। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-স্বেচ্ছাসেবকেরা স্থানে স্থানে মোতায়েন। ডেলিগেটদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন তাঁরা। আমরা জন চার-পাঁচ ডেলিগেট ট্রেন থেকে নামলাম। বাসের ব্যবস্থা, গাড়ীর ব্যবস্থা—সুচারু, স্বচ্ছন্দ। ভোরবেলার প্রথম আলোর আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে আমেদাবাদ শহর প্রদক্ষিণ করে এসে পৌঁছলাম সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে। কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার ব্রাসাঞ্জা এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ভোরেই ডেলিগেটদের আবাসভূমি কলরবমুখরিত। ঘরে ঘরে লোক ছুটাছুটি করছে। ডেলিগেটদের গরম জল দেওয়া, চা দেওয়া, কফি দেওয়া পরম উৎসাহে চলেছে। আমরাও আমাদের ঘরে এসে গেলাম। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক আকোলকর পত্রোত্তরে আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে ছিলেন যে, আমাদের জন্য যে ঘরটি ঠিক করা হয়েছে সেখানে আমরা আরামেই থাকতে পারব। অধ্যাপক আকোলকর যে অমৃতভাষণ করেন নি সেটা বুঝতে পারলাম কামরাটি দেখেই। ঘরে ঢুকে গৃহিণী প্রীত হয়ে উঠলেন। আমার শিশু-কন্যা পরম উৎসাহে নিকবর্ত্তী বড় টেবিলটির উপরে উঠতে আরম্ভ করল; বৃহৎ কক্ষটি যেন তাঁর ভবিষ্যৎ ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ হিসাবে ভালই কাজ দেবে, এটা শিশুর স্বচ্ছদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল বোধ হয়। তাই তার আনন্দ সীমাহীন হয়ে উঠল অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে।

এর পরে আমন্ত্রণ এল গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রম দেখতে যাবার জন্য। বেলা দশটা নাগাদ আমরা যাত্রা করলাম। শীত-শীর্ণ সবরমতী নদীর তীর। সেখানে জাতির জনকের পুণ্য-পীঠস্থান। বিনম্র শ্রদ্ধায় দেশ-বিদেশের দার্শনিকেরা নগ্নপদে এই মহানচিত্ত মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। গান্ধীজির জীবনকথা ছবির মাধ্যমে সাবরমতী আশ্রমে পরিবেশন করা হয়। যাঁরা বিদেশী, যাঁরা গান্ধীজির জীবনকথার সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন না তাঁরা উপকৃত হলেন। আমরা ধন্য হলাম। পুণ্য স্পর্শ পেলাম সেই মহামানবের; অন্তরের নিভৃতলোকে বার বার এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠল:

'তোমার আসন শূন্য আজি,
হে বীর পূর্ণ কর।'

মহামানবকে প্রণাম জানিয়ে যন্ত্রযানে উঠলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মনোরম পরিবেশে ফিরে এলাম। দেখা হ'ল পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে, যাঁরা বেলায় এসেছেন। দেখা হ'ল ডক্টর ডি. এন. দত্তের সঙ্গে। ডক্টর দত্ত সম্প্রতি দার্শনিকগোষ্ঠীর অগ্রজ স্থানীয়। তিনি সর্ব্বজন মান্য। তাঁকে ঘিরে সব সময়েই দেখেছি পণ্ডিতদের জটলা। এই সদালাপী অমায়িক মানুষটি পাণ্ডিত্যের ভারে আপনার মনোকার সহজ মানুষটিকে সমাধিস্থ করে দেননি। দেখা হ'ল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর অধরচন্দ্র দাসের সঙ্গে। উনি তখন একটা প্রকাণ্ড ওভার-কোট চাপিয়ে আমেদাবাদের ঠাণ্ডাকে জব্দ করতে ব্যস্ত। দেখা হ'ল শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে, অধ্যাপক ডক্টর সন্তোষ সেনগুপ্তের সঙ্গে। কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন অধ্যাপক চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য, ডক্টর রাসবিহারী দাস, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার, ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী, অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। মহিলা ডেলিগেটদের মধ্যে বাংলা দেশ থেকে গিয়েছিলেন শ্রীমতী সবিতা মিশ্র এবং শ্রীমতী লীনা নন্দী। উড়িষ্যা থেকে এসেছিলেন ডক্টর গণেশ্বর মিশ্র, অধ্যাপক গৌরাঙ্গচরণ নায়ক; পাটনা থেকে অধ্যাপক হরিমোহন ঝা এসেছিলেন; দিল্লী থেকে এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান

দর্শনাধ্যাপক ডক্টর নিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা ডক্টর কৃষ্ণা সেন। বোম্বাই থেকে ডক্টর চাব, জামনগর থেকে অধ্যাপক কোটারি এবং হায়দ্রাবাদ থেকে অধ্যাপক বাহিউদ্দিন। নানান্ দিগ্দেশ থেকে অগণিত মনীষীর সমাবেশ হয়েছিল এবার গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে। বিদেশাগত পণ্ডিতদের মধ্যে অধ্যাপক সিডনিহুক, অধ্যাপক এমরেট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উপাচার্য্য দেশাই পূর্ব্ব-ভাবে আমাদের স্বাগত জানালেন। উত্তর-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। তাঁর কণ্ঠেও আমন্ত্রণের ঐকান্তিক ঔদার্য্য ঘোষিত হ'ল। উদ্বোধনী অধিবেশনের শেষে আমেদাবাদের পৌরপতি আয়োজিত চা-পান সভায় আমরা সদলে যাত্রা করলাম। ভীকাভাই জীবাভাই মিউনিসিপ্যাল পার্কটি অতীব মনোরম। ফোয়ারার জল পশ্চিমের পড়ন্ত রৌদ্রে নানা-বর্ণময় হয়ে উঠেছে। চারিদিকে অজস্র ফুলের সমারোহ। সযত্ন-রক্ষিত লতাগুল্মের কেয়ারি। পাশে বয়ে যাচ্ছে সবরমতী নদী। ভাল লেগেছিল সেদিনের সান্ধ্য পরিবেশটুকু। ফেরার পথে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলাম 'কেমন লাগল?'—উত্তর পেলাম: 'অপরূপকে দেখে নিলাম দুটি নয়ন ভরে।' বোধ হয় শ্রীমতী অতি-কথন করেন নি।

তার পরের দিন থেকে চলল নানান্ বিভাগের অধিবেশন, সকালে, দুপুরে এবং বৈকালে। রাত্রে অবশ্য আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত ছিল রোজই। আঞ্চলিক লোকগীতি, লোকনৃত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। স্থানীয় ছাত্রেরা শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' অভিনয় করলেন একদিন। বড় ভাল লাগল ছাত্রদের দরদী অভিনয়। আরও বোধ হয় ভাল লেগেছিল শরৎচন্দ্রের লেখা বলে। মনের মধ্যে বাঙালী বলে যে আত্মাভিমানটা আছে সেটা ঠিক সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার এ ঔদ্ধত্যটুকু আমি বরাবর ক্ষমা করে এসেছি। আপনাদেরও ক্ষমা করতে বলি। এই অভিমান, এই গর্ব্বটুকু থাকা বোধ হয় ভাল। এই অহঙ্কারটুকু না থাকলে সৃষ্টি সম্ভব হয় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মানুষের অহংকার-পটেই বিশ্বকর্ম্মার বিশ্বশিল্প। মানুষের, হাতে-গড়া শিল্পকর্ম্মের কথা তিনি বলেন নি; তিনি বলেন দেবশিল্পের কথা। আর মানুষের শিল্পকর্ম্ম হ'ল এই দেবশিল্পের অনুকারী। অলমতিবিস্তরেণ। দর্শনেতিহাস বিভাগ, নীতিশাস্ত্র ও সমাজদর্শন বিভাগ, স্থায়শাস্ত্র ও পরাতত্ত্ব বিভাগ এবং মনস্তত্ত্ব বিভাগ—এই চারটি শাখায় প্রায় অৰ্দ্ধশত প্রবন্ধ পাঠ করা হ'ল এবং তাদের আলোচনা করা হ'ল তিনদিন ধরে। বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি ছিলেন পুণার ডক্টর এম্. ভি. কালে, বোম্বাইয়ের অধ্যাপক জি. এন্. মাথরাণি, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস বাহিউদ্দিন এবং ওয়ালটেয়ারের ডক্টর কে. সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি। বিভাগীয় সভাপতি হয়েছিলেন যাঁরা তাঁরা সকলেই বহুখ্যাত অধ্যাপক এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁদের ভাষণগুলি মনোজ্ঞ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক কালে মনস্তত্ত্বের উপর ভাষণ দিলেন; অধ্যাপক মাথরাণি নীতিশাস্ত্র এবং সমাজদর্শনের ওপর। অধ্যাপক বাহিউদ্দিন দর্শনেতিহাসের ওপর এবং অধ্যাপক মূর্ত্তি স্থায়শাস্ত্র ও পরাতত্ত্বের ওপর বললেন। অধ্যাপক বাহিউদ্দিনের সুন্দর ইংরেজী উচ্চারণ বিদেশাগত পণ্ডিতদের প্রশংসা পেয়েছিল। উনি সুদীর্ঘদিন বিলেতে এবং জার্ম্মানীতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছিলেন। অধিবেশন শেষ করে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরছি। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর চাবের সঙ্গে দেখা। উনি আমার কন্যা ধৃতিকে কোলে নিয়ে বললেন, 'I must honour the youngest delegate of the conference But how?' এই বলে বোধ হয় সম্মানিত করবার জন্য পত্রপুষ্পের খোঁজে একবার চারদিকে তাকালেন। কিছুই হাতের কাছে না পেয়ে নিজের ডেলিগেট ব্যাজটি খুলে ধৃতির জামায় পরিয়ে দিয়ে বললেন: 'Thus I honour the budding philosopher' উদীয়মান দার্শনিক তখন ডক্টর চাবের সুন্দর কলমটা পকেট থেকে তুলে নেবার চেষ্টা করছিল এই বিরাট সম্মানপ্রাপ্তিকে একেবারে উপেক্ষা করে।

দেখতে দেখতে তিন দিন কেটে গেল। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ সন। সেদিন প্রত্যুষেই ফেরার পালা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সহৃদয় আতিথ্যের জন্য অধ্যাপক এবং ছাত্রদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বাসে উঠলাম। সকাল সাড়ে সাতটায় সৌরাষ্ট্র মেল। ষ্টেশনে এসে দেখি আমাদের রিজার্ভ কামরায় বসে আছেন দার্শনিকপ্রবর ডক্টর রাসবিহারী দাস। ফেরার পথে কিছুদূর তাঁর সঙ্গ পেয়েছিলাম। তাঁর চিন্তাদৃঢ় মনের কোণায় যে রসিক মানুষটি লুকিয়ে আছে তার সন্ধান পেলাম। দেশ-বিদেশের জ্ঞানতপস্যার নানান্ গল্পকথায় সময় কেটে গেল। উনি অমলনীড়ে নামলেন; ওখানে অধ্যাপক মাসকানির আতিথ্য গ্রহণ করবেন, বললেন। আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা দুরন্ত গতিতে দেশের পর দেশ পেরিয়ে চললাম। রাত্রি ভোর হ'ল। সকাল দশটায় এসে পৌঁছালাম নাগপুরে। সুহৃদসত্তম ডক্টর সুনীলচন্দ্র রায়, শ্রীমতী পূরবী রায় এবং শ্রীমান কিটু আমাদের একরকম জোর করেই নাগপুরে নামিয়ে নিলেন। দূরে নাগপুর শহরের প্রান্তসীমায় পাহাড়ের পাদদেশে ডক্টর রায়ের বাংলো। দুটো দিন কেটে গেল আরাম কেদারায় শুয়ে মেজাজী খোসগল্পে। অতীত দিনের পুরাণো কথার রোমন্থন। সেই ছাত্র-জীবন, সেই বাল্যকাল, সেই যৌবনসন্ধির স্বপ্ন—সবই ছায়াছবির মত আচ্ছন্ন করে রইল এই দুটো দিনের আলোকে এবং রাত্রির অন্ধকারকে। সব সুরুরই শেষ আছে। এই পরম আনন্দময় মুহূর্ত্তগুলোও তাই কেটে গেল। দেখতে দেখতে আবার যাত্রার লগ্ন আসন্ন হয়ে এল। সাইকেল রিক্সাবাহিত হয়ে যথাসময়ে আমরা নাগপুর ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। ডক্টর রায়ের আনুকূল্যে একটা 'কুপে' পাওয়া গিয়েছিল। যখন সবে গুছিয়ে বসে বন্ধু এবং বন্ধুপত্নী দুজনকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, গাড়ীর ঘণ্টা বেজে উঠল। আবার সেই গার্ডের হুইসল আর ফ্ল্যাগ, গাড়ী ছাড়ল। কন্যা শ্রীমতী ধৃতি হাত নেড়ে তার পরম সুহৃদ শ্রীমান কিটুকে 'টা-টা-বাই-বাই' জানিয়ে দিল। গাড়ী ডিসট্যাণ্ট সিগন্যাল পার হয়ে চলল। কলকাতা তখনও অনেক দূর।

মানুচির দেখা মুঘল ভারত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়

[মুঘলযুগের এই ভারত বিবরণী মূলতঃ Mr. Niccolao Mannucci (Venetian) First Physician to Shah Alam—Eldest son of king Aurangeb লিখিত "Storia Do Mogor—1653-1708"-এর Mr. William Ivina কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত। এই পুস্তকের উপর ভিত্তি করিয়াই লিখিত হইয়াছে।]

পূর্ব্বাভাষ

মধ্যযুগের শেষভাগে যখন মুঘল সম্রাটদের অত্যুজ্জ্বল বীরত্বগাথা ও অতুল ধন-ঐশ্বর্য্যের বিলাসব্যসনের অতিরঞ্জিত কাহিনীসমূহ সুদূর ইউরোপের অধিবাসীদের মনে একটা সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিল তখন বিস্মিত অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের সৌভাগ্য অর্জ্জন মানসে ভারতবর্ষে ছুটে এসেছিলেন এবং অনেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারতবর্ষেই থেকে যান। মুঘল ভারত ইউরোপের অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল, তাহার মধ্যে একজন ছিলেন ভেনিসের এক ১৪ বৎসর বয়স্ক তরুণ যুবক। পৃথিবী পরিভ্রমণের সঙ্কল্প নিয়ে শুধুমাত্র ভাগ্যকে সম্বল করে যুবকটি স্বদেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। ভাগ্য অবশ্য তাকে প্রতারণা করেনি। পথিমধ্যে যুবকটির ইংলণ্ডের সিংহাসনচ্যুত সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসের প্রেরিত ব্যক্তিগত রাষ্ট্রদূত লর্ড বেলোমেণ্টের সঙ্গে পরিচয় ঘটে এবং অবশেষে তাঁরই সাহচর্য্যে ও আশ্রয়ে যুবক প্রথমে পারস্য ও পরে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান। লর্ড বেলোমেণ্ট দ্বিতীয় চার্লসের হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় পারস্য ও মুঘল সম্রাটের সাহায্য ভিক্ষা মানসেই আসছিলেন। যদিও যুবকটি পৃথিবী পরিভ্রমণের সঙ্কল্প নিয়েই স্বদেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষে এসে তার সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটে এবং সুদীর্ঘ ৪৮ বৎসর কাল ভারতে কাটিয়ে তিনি সরাসরি স্বদেশেই প্রত্যাগমন করেন। এই যুবকই হচ্ছেন ভবিষ্যৎ কালের ভারতবর্ষের শেষ শক্তিমান মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অন্যতম বিদেশী বিবরণীকার মিঃ নিকোলাও মানুচি—যার বিবরণীই বর্ত্তমান কাহিনীর প্রধান উপাদান।

ভেনিস ছাড়ার প্রায় ৪ মাসকাল পর মানুচি লর্ড বেলোমেণ্টের সঙ্গে পৌঁছান তুরস্কের বন্দর স্মার্ণায় এবং সেখান থেকে এরিভান হয়ে তাব্রিজে। তাব্রিজে প্রায় ১ মাস কাটিয়ে তাঁরা চলে যান কাজ্বিনে কারণ পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাস তখন কাজ্বিনেই অবস্থান করছিলেন। লর্ড বেলোমেণ্ট প্রথমে পারস্যের প্রধানমন্ত্রী এতেমদ-উ-দৌলার কাছে তাঁর দৌত্যকর্ম্মের কথা ব্যক্ত করে পরে সম্রাটকে ইংলণ্ডেশ্বরের পত্র অর্পণ ক'রে সম্রাটের সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। পারস্য সম্রাট বহুদিন ধরে লর্ডকে আশা-নিরাশার মাঝে ঝুলিয়ে রেখে অবশেষে বিভিন্ন অজুহাতে প্রার্থিত সাহায্য দান করায় তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে পর লর্ড মানুচিকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী সুরাট বন্দরে এসে পৌঁছান।

সুরাটের শাসনকর্ত্তা লর্ড বেলোমেণ্টকে নিয়মমাফিক সৌজন্য প্রদর্শনের পর তাঁকে দিল্লীর দরবারে যাবার ছাড়পত্র দেন। লর্ড বেলোমেণ্ট কয়েক দিন সুরাটে অবস্থানের পর মানুচিকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী যাত্রা করেন কিন্তু দিল্লী পৌঁছানর পূর্ব্বেই পথিমধ্যে হুডোলের (আগ্রা-দিল্লীর মধ্যপথ) কাছে লর্ড বিশেষ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই তিনি ২০শে জুন ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রভু ও অকৃত্রিম বন্ধুর অকাল মৃত্যুতে মানুচি প্রথমে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেও তিনি কখনই ভেঙে পড়েন নি। তদানীন্তন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রচলিত নিয়মানুসারে স্থানীয় কাজী লর্ডের এবং সেই সঙ্গে মানুচির আবশ্যকীয় তৈজসপত্রাদি যখন বাজেয়াপ্ত করে নেন তখন মানুচি কোন উপায়ান্তর না দেখে আগ্রার ইংরেজ কুঠিয়ালদের কাছে সমস্ত ঘটনাটি বিবৃত ক'রে এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন কিন্তু ফল হ'ল উল্টো, সুযোগ বুঝে কুঠির দু'জন ইংরেজ মিঃ রোচ ও মিঃ বিউরেন স্মিথ দিল্লীর দরবার থেকে লর্ড বেলোমেণ্টের উত্তরাধিকারীর পরিচয় দিয়ে এক আদেশপত্র বার করে নিয়ে সমস্ত তৈজসপত্রাদির মালিক হয়ে বসলেন। মানুচি এই অবিচারের প্রতিকারকল্পে দরবারে নালিস জানাবার উদ্দেশ্যে নিয়ে নিতান্ত নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় দিল্লী যাত্রা করলেন।

দিল্লীতে পৌঁছনর পর মানুচির সঙ্গে মর্শিয়ে ক্লডিও মালিয়ের নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয় এবং এই আলাপ শেষে বন্ধুত্বে পর্য্যবসিত হয়। এই বন্ধুর সহযোগিতা ও সাহচর্য্যেই মানুচি বাদশাজাদা দারা শিকোর উজীর ওয়াজীর খানের কাছে সর্ব্বপ্রথম তার নালিস জানাবার সুযোগ পান। ওয়াজীর খাঁন যুবক মানুচির বলিষ্ঠ সৌন্দর্য্যদীপ্ত অবয়ব দেখে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়ে যান ও পরে মানুচির এদেশীয় প্রথায় কুর্ণিশ করার নিখুঁত কায়দা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যান এবং মানুচির বিনয়নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে দরবারে তার নালিশ পেশ করবার প্রতিশ্রুতি দেন। সম্রাট শাজাহানের দরবারে ওয়াজীর খান মানুচিকে তার প্রতিশ্রুতি মত পেশ করলে পর সম্রাট সমগ্র ঘটনাটি শুনে আদেশ দেন যে মানুচি তার নিজের জিনিসপত্র সবকিছুই ফেরত পাবেন। লর্ডের তৈজসপত্রাদি সুরাটের ইংরেজ কুঠিয়াল, মিঃ ইয়ংয়ের কাছে পাঠিয়ে

দেওয়া হবে এবং তিনি এ সম্বন্ধে যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

মামুচি দরবারের বিচারে খুশী হয়ে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেন কিন্তু যাত্রা অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে পুনরায় বাদশাজাদা দারা শিকোর নির্দ্দেশে দিল্লী ফিরে আসতে হয়। বাদশাজাদা মামুচিকে জানান যে, তাঁর নির্ভীকোচিত ব্যবহারে তিনি খুবই খুশী হয়েছেন এবং মামুচিকে তাঁর সৈন্য বাহিনীতে একটি চাকুরী দিতে তিনি ইচ্ছুক, অবশ্য মামুচি যদি চাকুরি করতে ইচ্ছুক থাকেন। সহায়-সম্বলহীন মামুচি সেই মুহূর্ত্তে এই রকম একটা আশ্রয়ই খুঁজছিলেন তাই বাদশাজাদার প্রস্তাবে তিনি দ্বিরুক্তি না করে খুশী মনেই তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যান। দৈনিক ৮ টাকা রোজ হিসাবে তাঁর মাহিনা স্থির হয়। বাদশাজাদা মামুচিকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁকে একটি শিরোপা ও একটি ভাল ঘোড়া দেবার জন্য উজীরকে আদেশ দেন। এই ভাবেই পৃথিবী পরিক্রমণের নেশায় বিভোর দেশছাড়া-ঘরছাড়া যুবক মামুচি মুঘল ভারতে আটকা পড়ে যান এবং সঙ্কল্পচ্যুত হন। মামুচি সর্ব্বসমেত ৪৮ বৎসর ভারতে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর এই অবস্থানকালের মধ্যে বাদশাজাদা দারা শিকো ছাড়াও তিনি রাজা জয়সিংহের অধীনে ও পরে সম্রাট ঔরংজেবের পুত্র শাহ আলমের (যিনি পরে বাহাদুরশাহ নাম নিয়ে সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন) অধীনেও চাকুরি করেন। ভারতে অবস্থানকালেই তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জ্জন ও চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। মামুচি তাঁর ভারত অবস্থানকালের শেষ পর্য্যায়ে বাদশাজাদা শাহ আলমের প্রধান চিকিৎসকরূপে বহুদিন নিয়োজিত ছিলেন।

মামুচি চিকিৎসক হওয়ায় শুধু মুঘল দরবারেই নয় মুঘল সম্রাটের অন্তঃপুরে অর্থাৎ হারেমেও তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল যা অন্য কোন বিদেশী কেন—অনেক দেশীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বা ওমরাহদের ভাগ্যে জোটে নি এবং সেইহেতু মুঘল রাজপরিবারের অনেক ভিতরকার ব্যাপার জানবার ও দেখবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন এবং মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতে অবস্থানকালেই তিনি মুঘল ভারতের বিবরণীর সঙ্গে মুঘল সম্রাটদের ইতিবৃত্তও লিপিবদ্ধ করে যান। তৈমুরলং থেকে সুরু করে শাজাহানের রাজত্বকালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মামুচির ভারত আগমনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মুঘল সম্রাটদের ইতিহাস যা তিনি দিল্লীর দরবারে সংরক্ষিত ইতিহাস থেকে সংগ্রহ ক'রে তাঁর নিজের বিবরণীতে সংযোজন করেছেন নিষ্প্রয়োজনবোধে তা একেবারেই বাদ দেওয়া হ'ল। মুঘল হারেম, মুঘল দরবার এবং সম্রাট শাজাহান, ঔরংজেব ও তাঁর পুত্রদের রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত যা মামুচির ভারত অবস্থানকালে ঘটেছিল তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে বিবৃত করা হ'ল। মিঃ উইলিয়ম আরউইং কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত মামুচির সুবৃহৎ ভারত বিবরণীই নিম্নোক্ত বিবরণীর ভিত্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মামুচি মুঘল দরবার ও হারেমের বিবরণীর মুখবন্ধে বলেছেন যে, "অনেক ইউরোপবাসীদের ধারণা আছে যে, তাদের স্বদেশের সম্রাটদের ধন-ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার জাঁকজমকের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সম্রাটদের তুলনাই করা যায় না। যারা এসব কথা ভাবে বা বলে তাদের আমি শুধু এইটুকুই জানিয়ে দিতে চাই যে, একমাত্র চীনা সম্রাটের দরবার ছাড়া ভারতের মুঘল সম্রাটের দরবারের ধন-ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার মানের সঙ্গে তুলনায় এমন কোন দরবার আছে বলে আমার মনে হয় না। মুঘল দরবার এত উচ্চস্তরের যে, ইউরোপের যে কোন শ্রেষ্ঠ দরবারের সঙ্গেও তার তুলনা করা চলে না।" তৎকালীন ইতিহাস, কিংবদন্তী বিদেশী পর্য্যটকদের ভ্রমণকাহিনীসমূহ পর্য্যালোচনা করলে মামুচির এই উক্তির সত্যতা বহুলাংশে প্রমাণিত হয়। এখন মামুচি তাঁর বিবরণীতে এ সম্বন্ধে যা লিপিবদ্ধ করেছেন নিম্নে তাহাই বিবৃত করা হ'ল।

মুঘল হারেম বা রাজ অন্তঃপুর: মুঘল হারেমকে যদিও মুঘল সম্রাটদের প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত একটি মহল বলে অভিহিত করা হয় কিন্তু এর আয়তনের বিশালত্ব, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও এর মধ্যেকার অধিবাসীনীদের সংখ্যা বিচার করে দেখলে কখনই একে প্রাসাদের একটি মহল বলে কল্পনা করা যায় না। এটিকে একটি সংরক্ষিত ঐশ্বর্য্য-শালী নারী-অধ্যুষিত স্বতন্ত্র নগরী বললেই বোধ হয় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা যায়। মুঘল হারেমের মত এমন দৃষ্টিবিভ্রমকারী যথেচ্ছ ব্যয়-প্রাচুর্য্যের দৃষ্টান্ত অন্য কোন দেশে কখনও দেখা গিয়েছিল কিনা সন্দেহ।

হারেমে কেবলমাত্র রমণীরাই বাস করতেন এবং সেখানে সম্রাট, বাদশাজাদারা ও প্রয়োজনবোধে চিকিৎসক ছাড়া আর কোন পুরুষেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এ ছাড়া আর যারা ছিল তারা হচ্ছে নপুংসক খোজা প্রহরীর দল, যাদের ওপরই হারেমের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। সাধারণতঃ হারেমে প্রায় দুই হাজার বিভিন্ন জাতীয় রমণীর বাস ছিল (কথিত আছে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে হারেম-অধিবাসীনীদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার এবং সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের রাজত্বকালে এই সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল)*। এদের প্রত্যেকেরই ওপর কোন না কোন কাজের ভার অর্পণ করা ছিল। সম্রাটের কিংবা তাঁর বেগমদের বা সম্রাট তনয়াদের বা সম্রাটের উপপত্নীদের আদেশ-পালন-কার্য্যেই তারা নিয়োজিত ছিল। সাধারণতঃ বেগম, বাদশাজাদী এবং সম্রাটের উপপত্নীদের প্রত্যেকের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী পৃথক পৃথক মহল ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক

---

* 'Mughal Harems in India'—An article written by Sri V. Rangachari in Daily Herold (London), 1912.

মহলের জন্য পৃথকভাবে একদল করে পরিচারিকা ও দশ-বার জন করে বাঁদী (চাকরাণী) নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। এইসব পরিচারিকাদের বেতন সাধারণতঃ মাসিক তিন শত টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য করা হ'ত। বাঁদীদের বেতনও নিজ নিজ গুণানুসারে মাসিক পঞ্চাশ টাকা থেকে শুরু করে দুইশত টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য করা ছিল। এইসব পরিচারিকাবৃন্দ ছাড়াও একদল গায়িকা ও নর্ত্তকী ছিল যারা সম্রাটের বেগম, পুত্রকন্যাদি ও উচ্চশ্রেণীর উপপত্নীদের মনোরঞ্জনার্থে নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন যাদের হাতেই সম্রাট দুহিতারা সর্ব্বপ্রথম হাসির ছড়ার মাধ্যমে লিখতে ও পড়তে শিখত।

হারেমের অন্তঃপুরবাসিনীরা সকলেই একই পদমর্য্যাদাসম্পন্ন নন। এদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ ছিল যেমন সম্রাটের পত্নী, ভগিনী ও কন্যারা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এঁদের সম্রাটের দেয় উপাধি হচ্ছে 'বেগম' ও 'খানুম'। সম্রাটের বৃত্তিভোগিনী উপপত্নীরা হচ্ছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং হারেমের গায়িকা ও নর্ত্তকীরা হচ্ছেন তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এর পর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন হারেমের অগণিত পরিচারিকাবৃন্দ অবশ্য এদের মধ্যেও শ্রেণীভাগ করা ছিল। এক শ্রেণীর বর্ষীয়সী রমণী (কুটনীরা) ছিলেন যাদের ওপর সম্রাট তার উপপত্নীদের পরিচর্য্যার ভার দিয়ে রেখেছিলেন। এরাই প্রয়োজনবোধে সম্রাটের জন্য নূতন নূতন রূপসী নারীর সন্ধান করতেন ও নানা কৌশলে তাদেরকে হারেমের মধ্যে আনতেন। পদমর্য্যাদায় এরা অন্যান্য পরিচারিকাবৃন্দের নেত্রীস্থানীয়া ও উপদেষ্টা স্বরূপা ছিলেন। এদের মাসিক বেতন তিন শত টাকা থেকে সুরু করে পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য করা হ'ত। এদের পরেই স্থান হচ্ছে বাঁদীদের এবং সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ছিল নারীরক্ষিবৃন্দেরা যারা সাধারণত সম্রাটের দেহরক্ষীরূপেই নিয়োজিত ছিল।

মুঘল সম্রাটেরা প্রধানত: রাজপুত রাজকন্যাদের ও বিশিষ্ট ওমরাহদের কন্যাবর্গকেই রাজমহিষীর যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং তাদেরই হারেমে বিবাহিত পত্নীরূপে স্থান দিতেন। বলা বাহুল্য এঁদের সম্রাটের মহিষীরূপে বরণ করার পিছনে অনেকখানি রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল, বোধ হয় সেই কারণেই এদের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে মুঘল সম্রাটেরা কোন দিনই কুণ্ঠিত হন নি, যার ফলে রাজমহিষীরা শুধুমাত্র অতুল ধন-ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণীই হন নি, সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এঁরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সুযোগ বুঝে এঁরা অনেকক্ষেত্রে বাদশাজাদা ও রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাজবিদ্রোহের সহায়তা করেছেন। সব সময়েই এঁরা সম্রাটকে প্রভাবান্বিত করে স্ব স্ব মনোমত সৈন্যাধ্যক্ষ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেবার চেষ্টা করতেন যাতে বিপদকালে তাদের অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে না হয়।

এই সব রাজমহিষীদের সম্রাটের দেয় একটি করে স্তুতিবাচক পোষাকী নাম ছিল যেমন তাজমহল, নুরমহল, নুরজাহান, নবাব বাই, আকবরাবাদী, ঔরঙ্গাবাদী, উদিপুরী বেগম, বেগম দিল রাজ বানু ইত্যাদি। সম্রাটের দেয় পোষাকী নামেতেই এঁরা হারেমের মধ্যে ও হারেমের বাইরে পরিচিত হতেন। এঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত আসল নামগুলি এদের জীবিতকালে ধরতে গেলে অনুচ্চারিত থেকে যেত। এঁদের বিপুল অর্থসম্পদ যেমন একদিকে বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য্যের রন্ধ্রপথে নির্গত হ'ত, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যেও কিছু কিছু ব্যয়িত হ'ত। কথিত আছে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এদের মাসোহারার পরিমাণ রূপ, গুণ ও বংশমর্য্যাদা অনুসারে মাসিক এক হাজার ছয় শত টাকা থেকে সুরু করে এক হাজার আট শত টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত ছিল। এ ছাড়া স্ব স্ব জায়গীরের আয়ও ছিল কয়েক লক্ষ টাকা। অর্থ ও জায়গীর ছাড়াও এদের আরও একটি সম্পদ ছিল অর্থাৎ এঁদের অলঙ্কারাদি। এঁদের স্বর্ণ ও হীরে জহরত সমৃদ্ধ অলঙ্কারাদির পরিমাণ খুবই বেশী ছিল, যার মূল্য এদের জায়গীর ও মাসোহারার সম্মিলিত আয়ের বহু গুণ বেশী এবং সত্যই বিস্ময়কর।

বেগমদের মত সম্রাট দুহিতা ও ভগিনীরাও সম্রাটের দেওয়া পোষাকী নামেই পরিচিত হতেন, যেমন জেবন-উন-নিশা বেগম, জিন্নত-উন-নিশা, জানী বেগম, বদর-উন-নিশা, ফকরু-উন-নিশা, বেগম-সাহেবা (জাহানারা বেগম), রোশেনারা বেগম ইত্যাদি। বেগমদের মত এদেরও মাসিক মাসোহারার বন্দোবস্ত ছিল এবং নিজস্ব জায়গীর ছিল। এই সব জায়গীরের আয়ও ছিল প্রচুর। মানুচি সুরাট বন্দরে প্রথম পদার্পণ করে সেখানকার বার্ষিক আয়ের হিসাব নির্দ্ধারণ করে বলেছেন যে, প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা রাজস্ব কেবলমাত্র সুরাট বন্দর থেকেই বছরে সম্রাট পেতেন এবং সম্রাট শাজাহান নাকি তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা জাহানারা বেগমের (বেগম-সাহেবা) পানদোক্তা খাবার খরচ মেটাবার জন্য জাহানারাকে সুরাটের সমুদয় রাজস্ব দান করেছিলেন। মুঘল হারেমে বিলাসিতার পিছনে কিরূপ অর্থব্যয় করা হ'ত তার কিছুটা আন্দাজ এর থেকেই করতে পারা যায়। বেগমদের মত সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পিছনে সম্রাট দুহিতা ও ভগিনীরাও যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মুঘল ইতিহাস জুড়ে রয়েছে। সম্রাট শাজাহানের হাত থেকে সম্রাট ঔরংজেবের ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে শাজাহানের দুই কন্যা জাহানারা ও রোশেনারার পারস্পরিক সাহায্যদানের ইতিবৃত্ত নিয়ে মুঘল ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়েছে।

মুঘল সম্রাটেরা যে তাদের কন্যাবর্গের বিবাহ দিতে রাজী হতেন না তারও একটা রাজনৈতিক কারণ ছিল। সিংহাসনের ভবিষ্যৎ দাবীদারের সংখ্যাবৃদ্ধির ভয়ে এবং অসীম শক্তিশালিনী বাদশাজাদীদের সহায়তায় যাতে তাদের স্বামীরা সম্রাট বা বাদশাজাদাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে না পারে সেই ভয়েই মুঘল সম্রাটেরা তাঁদের কন্যাবর্গের বিবাহ দিতে রাজী হতেন না। সম্রাট

আকবরই নাকি বাদশাজাদীদের চিরকাল অবিবাহিত থাকার জঘন্য প্রথার প্রবর্ত্তক। এ সম্বন্ধে মানুচি বলেছেন যে, সম্রাট আকবর তাঁর এক কন্যার সঙ্গে দরবারের এক বিশিষ্ট ওমরাহের বিবাহ দিয়েছিলেন কিন্তু কিছুকাল বাদে সেই ওমরাহটি সিংহাসন দখলের উদ্দেশ্য নিয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যাই হোক সম্রাট কৌশলে তাকে বন্দী করে তার শিরশ্ছেদ করেন এবং উপরোক্ত জঘন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। ঔরংজেব তাঁর নিজের কন্যার ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রথা লঙ্ঘন করেন। কারণ, ঔরংজেবের দুই কন্যা জেবউন্নিশা ও জিন্নত উন্নিশা তাঁকে তাঁদের বিবাহ দিতে যখন বিশেষ করে পীড়াপীড়ি করেন তখন ঔরংজেব তাঁদের বংশের প্রথার দিকে কন্যাদ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পর তাঁরা সম্রাটকে জানান যে, মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদও তাঁর কন্যার বিবাহ আলির সঙ্গে দিয়েছিলেন এবং মুঘল সম্রাট যখন মহম্মদের আদর্শেই অনুপ্রাণিত তখন কেন তাঁদের বিবাহিত সুখী জীবনযাপনের পথে সম্রাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ঔরংজেব এদের যুক্তির কাছে পরাজিত হয়ে এক ফকিরের পরামর্শ অনুযায়ী বাদশাজাদা দারা শিকো ও মুরাদের দুই পুত্রের সঙ্গে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দিতে বাধ্য হন। বিবাহের পর সম্রাট তাঁর দুই কন্যারই শালিমগড় দুর্গে বসবাস করার বন্দোবস্ত করে দেন।

সম্রাট দুহিতাদের রাজনৈতিক কারণে বিবাহ না দেওয়ায় বাদশাজাদীদের অবশ্য বিশেষ কিছু অসুবিধা হ'ত না কারণ তাঁরা হারেমের মধ্যেই গোপনে তাঁদের নির্ব্বাচিত প্রণয়ীদের নিয়ে অবৈধ প্রেমলীলা চালাতেন এবং এর অনেক দৃষ্টান্ত বিদেশী পর্য্যটকদের বিবরণীতে পাওয়া যায়। বেগম সাহেবা ও রোশেনারা বেগমের অবৈধ প্রেমলীলা সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে বিবৃত করা হ'ল।

একবার বেগম সাহেবার মহলে একটি যুবকের গোপন অবস্থিতির সংবাদ পেয়ে সম্রাট শাজাহান নিজে বেগম সাহেবার কাছে এসে হাজির হন। বেগম সাহেবা সম্রাটের অতর্কিত আগমনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তাই উপায়ান্তর না দেখে তিনি তাঁর প্রণয়ী যুবকটিকে জল গরম করার জালার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। সম্রাট বেগম সাহেবার কক্ষে ঢুকেই বুঝতে পারেন যে, জালার মধ্যেই যুবকটি আশ্রয় নিয়েছে, তাই তিনি তাঁর খোজা প্রহরীদের জালার তলাকার উনুন জ্বালিয়ে জল গরম করার আদেশ দেন এবং যতক্ষণ না পর্য্যন্ত যুবকটি জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার সংবাদ পান ততক্ষণ তিনি বেগম সাহেবার মহলেই দাঁড়িয়েছিলেন।*

বেগম সাহেবা সম্রাট শাজাহানের কাছ থেকে আগ্রা দুর্গের বাইরে নিজের প্রাসাদে থাকবার অনুমতি করিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি সদাসর্ব্বদাই একদল প্রণয়ী যুবকবৃন্দের সঙ্গে বেশ সুখেই দিন কাটাতেন। এদের মধ্যে একজনই অবশ্য তাঁর খুব প্রিয় ছিল সে হচ্ছে দুলেরা নামক এক নর্ত্তকীর পুত্র। এই যুবকটি শিশুকাল থেকেই হারেমে স্থানলাভ করেছিল এবং সেখান থেকেই সে বড় হয়ে উঠেছিল। যুবকটি যেমন রূপবান তেমনি সঙ্গীত-অনুরাগী ছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই বোধ হয় যুবকটি বেগম সাহেবার মন জয় করতে পেরেছিল। বেগম সাহেবাই যুবকের নাম দুলেরা দেন এবং তার প্রভাবেই দুলেরা ভবিষ্যৎ কালে উচ্চ পদমর্য্যাদাসম্পন্ন সৈন্যাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বেগম সাহেবা প্রধানতঃ এর সঙ্গেই রাতের পর রাত নাচ-গান ও আকণ্ঠ সুরাপানের মধ্য দিয়ে যৌবনকে উপভোগ করতেন। এইরূপ একটি মজলিসি রাত্রে বেগম সাহেবার এক প্রিয় নর্ত্তকীর ওড়নায় হঠাৎ কোন কারণে আগুন ধরে যায় এবং বেগম সাহেবা নর্ত্তকীটিকে বাঁচাতে গিয়ে তাকে নিজের বুকের মধ্যে জাপটে ধরেন, ফলে তিনি নিজেও অগ্নিদগ্ধ হয়ে যান কিন্তু দুঃখের বিষয় এত করেও তিনি নর্ত্তকীটিকে বাঁচাতে পারেন নি। বেগম সাহেবার প্রণয়লীলার প্রধান অঙ্গই ছিল সুরা যা সুদূর কাশ্মীর, পারস্য ও কাবুল থেকে আমদানি করা হ'ত। আবার প্রাসাদের মধ্যেও সুরা প্রস্তুত করা হ'ত। মানুচি বলেছেন যে, তাকেও নাকি বেগম সাহেবা তার মহলস্থ মহিলাদের অসুখ ভাল করার প্রতিদান হিসাবে অনেকবার এই সব ভাল ভাল দিরাজী কয়েক বোতল করে তাঁর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুরার প্রতি বেগম সাহেবার আকর্ষণ এতই বেশী ছিল যে, রাত্রিশেষে প্রমোদকক্ষ থেকে শয্যায় উঠে যাবার শক্তি পর্য্যন্ত তাঁর থাকত না, তাঁর পরিচারিকারা তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শয্যায় শুইয়ে দিত। সম্রাট ঔরংজেব যখন সম্রাট শাজাহান ও বেগম সাহেবাকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করে রাখেন তখন থেকেই বেগম সাহেবার সঙ্গে দুলেরার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। দুলেরা কয়েকবার বেগম সাহেবার সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফলকাম হন নি। এরপর একদিন দুলেরা মুরাদের সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য অপমানিত ও প্রহৃত হয় এবং তার পর থেকেই দুলেরা তার নিজের বাড়ীতেই নিঃসঙ্গ ভাবে বাকী জীবন কাটিয়ে দেয়; বেগম সাহেবার সঙ্গে আর কোনদিন মিলিত হবার চেষ্টা করে নি।

মানুচি তার বিবরণীতে বলেছেন যে, বাদশাজাদা দারা সম্রাট শাজাহানকে একবার বেগম সাহেবার সঙ্গে বঙ্গের রাজবংশের অধস্তন বংশধর সেনাপতি নাজিবৎ খানের বিবাহ দেবার প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু শাজাহানের শ্যালক শায়েস্তা খান এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি জানান এবং কারণ স্বরূপ তিনি বলেন যে, বেগম সাহেবার স্বামীর উপযুক্ত মর্য্যাদা দান করতে গেলে তাকে বাদশাজাদার সমপর্য্যায়ভুক্ত মর্য্যাদা দান করতে হয় কিন্তু ততখানি ক্ষমতা দান করলে ভবিষ্যতে সেই হয়ত ক্ষমতার দম্ভে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। সম্রাট শাজাহান এরপর আর বেগম সাহেবার বিবাহ দেবার কোন চেষ্টাই করেন নি। সম্রাট শাজাহান তাঁর

* Travels of F. Bernier—Eng. Translation by H. Oldenburg (1901).

পুত্রকন্যাদের মধ্যে বেগম সাহেবাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন এবং সকলের চেয়ে বেশী সম্পদ তিনি তাঁকেই দিয়েছিলেন। বেগম সাহেবা যে দারাকে সিংহাসনে বসাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং সম্রাট শাজাহানের তার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার সুযোগ নিয়ে দারাকে সিংহাসন দেবার অনুকূলে সম্রাটের মত করিয়েছিলেন তার একমাত্র কারণ হচ্ছে দারা বেগম সাহেবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পরমুহূর্তেই বেগম সাহেবার বিবাহ দিয়ে দিবেন। বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক ম সিয়ে বার্নিয়ার সম্রাট শাজাহান এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোর সঙ্গে বেগম সাহেবার অবৈধ সম্পর্ক সম্বন্ধে যে জঘন্য ও অভদ্রোচিত উক্তি করেছেন মানুচি তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন যে, বার্নিয়ারের এই উক্তির পিছনে কোন সত্য নেই, বেগম সাহেবার সঙ্গে তাঁর পিতার বা জেষ্ঠভ্রাতার সম্পর্ক সত্যই খুব পবিত্র ছিল।

সম্রাট শাজাহানের কনিষ্ঠ কন্যা রোশেনারা বেগম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, ঔরংজেবের সিংহাসন প্রাপ্তির পথে রোশেনারা তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন, সেইজন্য ঔরংজেব রোশেনারাকে যতখানি সম্ভব উচ্চ পদমর্য্যাদা দান ক'রে তার প্রতিদান দিয়েছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতাভগ্নীদের মধ্যে তার ওপরই তিনি সদয় ছিলেন। ঔরংজেবের সিংহাসনপ্রাপ্তির পর রোশেনারা বেগম ঔরংজেবকে একবার অনুরোধ করেছিলেন যে, বেগম সাহেবা যেমন স্বতন্ত্র প্রাসাদে বাস করবার অনুমতি পেয়েছিলেন, ঔরংজেব যেন তাকেও অনুরূপ অনুমতি দান করেন। ঔরংজেব খুব ভাল ভাবেই জানতেন যে, কেন তাঁর ভগ্নী দুর্গের বাইরে থাকবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তাই তিনি তাঁর আবেদনের প্রত্যুত্তরে জানান যে, "সম্রাট দুহিতাদের হারেমের বাইরে বাস করা যেমন অশোভনীয় তেমনিই লজ্জাকর; তা ছাড়া তাঁর কন্যাবর্গের বাদশাজাদীর উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ভার যখন তিনি রোশেনারার ওপরই অর্পণ করেছেন তখন তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? হারেমের মধ্যে থাকার যদি কিছু প্রতিবন্ধক থাকে তা হলে রোশেনারা যেন সম্রাটকে সে কথা জানায় এবং সম্ভব হলে সম্রাট সেই প্রতিবন্ধক দূরীকরণের চেষ্টা করবেন।" দুর্গের বাইরে থাকার প্রচেষ্টা যখন তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেল তখন রোশেনারা হারেমের মধ্যেই গোপনে প্রণয়ীদের নিয়ে তার অবৈধ প্রেমলীলা চালাতে থাকেন। একদিন তিনি এ ব্যাপারে ধরাও পড়ে গেলেন। হারেমের খোজা গুপ্তচরেরা দুজন প্রণয়ীকে একদিন রোশেনারার মহল থেকে বেরিয়ে যাবার সময় হাতে-নাতে ধরে ফেলে ও ঔরংজেবের সম্মুখে হাজির করে। ঔরংজেব সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে যুবকদ্বয়কে কোনরূপ শাস্তি না দিয়ে হারেমের নাজিরকে আদেশ দেন যে, এরা যে পথে এসেছে সেই পথ দিয়েই যেন এদেরকে বার করে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে একজন হারেমের দ্বারপথে এসেছে বললে পর তাকে সেই পথ দিয়েই চলে যেতে দেওয়া হয়। অপর যুবকটি যখন বলে যে মহলের প্রাচীর ডিঙ্গিয়েই এসেছে তখন নাজির তাকে প্রাচীরের ওপর তুলে ঠেলে ফেলে দেয় ফলে যুবকটির মৃত্যু হয়। ঔরংজেব এই সংবাদ পেলে পর নাজিরের ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হন কারণ যাতে বাইরের লোক এই কলঙ্কের কথা জানতে না পারে সেইজন্যই তিনি যুবকদ্বয়কে কোনরূপ শাস্তি দেন নি কিন্তু নাজিরের অবিমৃষ্য-কারিতার জন্য তাঁর সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

রোশেনারা বেগমের মৃত্যুর পিছনেও ছিল তার অবৈধ প্রেম-লীলা। মানুচি বলেছেন যে, একবার ঔরঙ্গজেবের এক কন্যা তার পিসীর প্রতি ঈর্ষাবশে সম্রাটকে রোশেনারার মহলে নয় জন যুবকের অবস্থিতির গোপন সংবাদ জানিয়ে দেন। হারেমের খোজা প্রহরীরা সেই নয় জন যুবককে বন্দী করবার পর হারেমের কলঙ্ক এড়াবার জন্য চুরির অভিযোগে তাদের বিচার করে সাজা দেওয়া হয়। এ ছাড়া ঔরংজেব শহর কোতোয়ালকে নির্দেশ দেন এই নয় জন যুবককে যতশীঘ্র পারা যায় যেন গোপনে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। সুযোগ্য শহর কোতোয়াল সম্রাটের এই আদেশ পালন করতে বেশী সময় নেয় নি। এক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন কৌশলে নয় জনেরই মৃত্যু ঘটিয়ে দেন। এই ঘটনার পর সম্রাট রোশেনারার অসংযমী আচরণে খুবই ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হন এবং কিছুকালের মধ্যেই গোপনে বিষপ্রয়োগ করে রোশেনারার জীবন-দীপ নির্বাপিত করে দেন। মানুচি উপরোক্ত ঘটনাটি রোশেনারার প্রিয়-বাঁদী পর্তুগীজ রমণী থোমাজিয়া মার্টিনস-এর কাছে শুনেছিলেন।

হারেমের বেগম ও বাদশাজাদীদের পরেই স্থান হচ্ছে সম্রাটের উপপত্নীদের। এদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, একদল নারী-গুপ্তচর সাম্রাজ্যের সর্বত্র—এমন কি সুদূর পল্লী অঞ্চলে পর্য্যন্ত সুন্দরী তরুণীর সন্ধান করে বেড়াত এবং সেরূপ সন্ধান পেলে হারেমের কুটনীদের সংবাদ দিত। হারেমের অতি কৌশলী কুটনীরা হয় নিজেরা কিংবা গুপ্তচর মারফতই নানা প্রলোভন দেখিয়ে ও ছলনার দ্বারা ভুলিয়ে এনে সুন্দরী গৃহস্থ তরুণীদের সম্রাট কিংবা বাদশাজাদাদের ইচ্ছামত কোন এক মহলে এনে হাজির করত তখন এদের সম্রাট, নয়ত বাদশাজাদাদের কাম-লালসার বহ্নিতে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হওয়া ছাড়া কোন পথই খোলা থাকত না। এরপর হয় এদের হারেমে স্থান দেওয়া হ'ত নয়ত দামী দামী উপঢৌকন ও অর্থাদি দিয়ে গোপনেই এদের স্বস্থানে প্রেরণ করা হ'ত। এই সংগ্রহের মধ্যে কোনরূপ জাতিগত ও ধর্মগত বিচার-বিবেচনা করা হ'ত না, তাই মুঘল হারেমে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই উপপত্নীদের মধ্যে হিন্দুরাজন্য-বর্গের ও মুসলমান ওমরাহদের কন্যারাও ছিলেন। সম্রাট এ দের প্রত্যেকের জন্যই পৃথক পৃথক মহল, পরিচারিকা, দাসদাসী, গায়িকা ও নর্ত্তকীর বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

সম্রাট বেগমদের মতন এ দেরও মাসোহারার এবং পদমর্য্যাদা অনুসারে জায়গীর দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ দেরও সম্রাটের

দের একটি করে স্তুতিবাচক উপাধি আছে। যেমন মহান (গরবিণী), সিঙ্গার (সুবেশিনী), সুগদায়িন (সুগন্ধাত্রী) পিয়ার৽ (প্রিয়া), লাজুকবদন (লতিতাঙ্গী), বাদম চশম (নীলনয়না), রানাদিল (স্বচ্ছহৃদয়া) ইত্যাদি। এই নামগুলি দেখলেই বোঝা যায় পারস্য বা হিন্দু-রমণীদের নামানুসারেই এই নামগুলি রাখা হ'ত।

পদমর্য্যাদায় হারেমে উপপত্নীদের পরেই স্থান হচ্ছে হারেমের গায়িকা ও নর্ত্তকীর। সম্রাট ঔরংজেব যদিও তাঁর সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই নৃত্যগীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন কিন্তু হারেমকে সেই আদেশের আওতায় আনতে সক্ষম হন নি, বোধ হয় তা করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। এইসব নৃত্যপটীয়সীরা ও গায়িকারা হারেমের অন্তঃপুরবাসিনীদের মনোরঞ্জনার্থেই নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে এক একজন প্রধানা নর্ত্তকী বা গায়িকা ছিল যাদের অধীনে দশ-বার জন করে শিষ্যা ছিল। সাধারণতঃ এক-একটি পৃথক দল হিসাবে এরা এক-একটি বেগমের মহলে অধিষ্ঠিত থাকত এবং বিশেষ অনুষ্ঠান ব্যতীত এরা অন্য কোন বেগমের মহলে নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে যোগ দিত না। এদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিশেষ পদমর্য্যাদা ছিল এবং পোষাকী নামও ছিল। যেমন জ্ঞানবাই, হীরাবাই, কেশরবাই, চঞ্চলবাই ইত্যাদি। এরা প্রায় সবাই হিন্দু-গৃহস্থের কন্যা ছিল এবং যুদ্ধের সময় বন্দিনী হয়ে হারেমে উপনীত হয়েছিল। এরা হারেমের নৃত্যগীত-বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে থেকে যৌবনাবস্থাতেই শিক্ষা পেয়ে এই বিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে ওঠে। বোধ হয় এই জন্যই এদের মুসলমান ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত করার পরও হিন্দুদের নামানুসারেই উপরোক্ত নামসমূহ রাখা হয়েছিল। এরা স্বভাবতঃই নম্রভাষিনী। ভোগসুখাসক্তা ও কথাবার্ত্তা বা চালচলনে মাধুর্য্যময়ী কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়ে এরা খুব বেশী রকমের অসংযমী ছিল। নৃত্যগীতের বাইরে এদের কার্য্যধারার মধ্যে সেইটাই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হ'ত।

হারেমে এদের পরেই যাদের স্থান, তারা হচ্ছে হারেমের অসংখ্য পরিচারিকাবৃন্দ। এদের মধ্যে কুটনীরাই উচ্চশ্রেণীর ছিল। সম্রাট এদের ওপরই তার উপপত্নীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং এরাই সম্রাটের জন্য নতুন নতুন রূপসী নারীর সংগ্রহকার্য্যে নিয়োজিত ছিল। বলা বাহুল্য এরা সম্রাটের খুবই প্রিয় ছিল। হারেমে এদের সংখ্যা খুব নগণ্য ছিল না, সারা হারেম জুড়েই এদের আধিপত্য বিরাজমান ছিল। চরিত্রের দিক থেকে বিচার করলে এরা খুবই নিম্নস্তরের, কারণ সম্রাটের জন্য যে-কোন অন্যায় ও হীনতম কাজ করতেও এরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করত না। এদেরও সম্রাটের দেয় একটি করে পোষাকী নাম ছিল। যেমন, নিয়াজ বিবি বানু, কাহিমা বানু, দিলজো বানু, জীরা বাই বানু ইত্যাদি।

হারেমের বাঁদীদের স্থান ছিল কুটনীদের পরেই। বাঁদীদের মধ্যেও একজন করে প্রধানা বাঁদী ছিল, যাদের অধীনে দশ-বার জন করে বাঁদী ছিল। বাঁদীদের মধ্যে অনেকেই ছিল ক্রীতদাসী। সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য এরাও সম্রাটের প্রিয়পাত্রী ছিল। সম্রাট এদের প্রত্যেকের চালচলন, কথাবার্ত্তা বলার ধরন-ধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এদের পোষাকী নামগুলি রাখতেন যেমন, চামেলী, কেশরী, কমলনয়নী, কস্তুরী, আনারকলী, কেতকী ইত্যাদি। এদের পোষাক-পরিচ্ছদের যেমন জৌলুস ছিল তেমনি অলঙ্কারাদির পরিমাণও ছিল অঢেল। কারণ সম্রাট ও বেগমদের কাছ থেকে এরা প্রায়ই দামী দামী জহরত ও অলঙ্কারাদি ইনামস্বরূপ পেত।

সম্রাটের নিজের জন্য একটি নারী-রক্ষীবাহিনীও হারেমের মধ্যে ছিল, যারা সাধারণতঃ সম্রাটের দেহরক্ষা কার্য্যেই নিয়োজিত ছিল। সাধারণতঃ গাড়োয়াল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির নারীদের নিয়েই এই নারীবাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং এইসব নারীরক্ষীরা তলোয়ার, বর্শা, ছুরি চালাতে ও অশ্বচালনায় খুবই পারদর্শিনী ছিল। সম্রাট যখন নিদ্রা যেতেন তখন এরাই উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে সম্রাটের নিরপত্তাকার্য্যে নিযুক্ত থাকত। এরা ছাড়াও হারেমে আরও একদল রক্ষীবাহিনী ছিল,তারা হচ্ছে হারেমের নপুংসক খোজা প্রহরীর দল। হারেমের আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সম্রাট এদের উপরেই অর্পণ করেছিলেন। সম্রাট এদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং এদের কাযের উপর কারুর হস্তক্ষেপ করাকে তিনি অনধিকার চর্চ্চা বলে মনে করতেন। এ সম্বন্ধে মানুচি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

সম্রাট ঔরংজেব যখন কাশ্মীর পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন একদিন বাদশাজাদা শাহআলমের শিবির রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল আতস খান নামে এক সৈন্যাধ্যক্ষের উপর। আতস খান শিবিরে নিরাপত্তা রক্ষার নিমিত্ত নিরাপত্তাসূচক কয়েকটি নূতন বিধিনিষেধ আরোপ করতে অগ্রণী হন কিন্তু বাদশাজাদার হারেমের পরিচারিকাবৃন্দ ও খোজা প্রহরীরা তাদের অধিকারের উপর এই অহেতুক হস্তক্ষেপের ফলে ভীষণভাবে আতস খানের উপর চটিয়া যায় এবং লাঠি-সড়কী, শিল-নোড়া, হামানদিস্তা, জুতা প্রভৃতি দিয়া আতস খানের সৈন্যদলের উপর আক্রমণ ক'রে শিবিরাঞ্চল থেকে তাড়াইয়া দেয়। আতস খান যখন এ বিষয়ে বাদশাজাদার কাছে নালিস জানান তখন বাদশাজাদা হেসে বলেছিলেন যে ওদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে যাওয়াই আতস খানের অন্যায় হয়েছিল এবং এটা অনধিকার চর্চ্চারই সামিল বলে তিনি মনে করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হারেমের অন্তঃপুরবাসীদের বিলাসিতাপূর্ণ জীবন-যাপন প্রণালী ও বিলাসের প্রাচুর্য্যের উল্লেখ করতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, বেগম, বাদশাজাদী ও উপপত্নীদের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত তাদের মহলগুলির সম্মুখ দিয়ে কৃত্রিম জলস্রোতের জল যাবার জন্যে পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ ও মহলের চারি ধার ঘিরে পুষ্পোদ্যান রচনা করে

দেওয়া হয়েছিল। এই সব উদ্যানে বিভিন্ন জাতের গোলাপের ও অন্যান্য ভাল জাতের ফুলের চাষ করা হয়েছিল। উদ্যানে বেগমদের বসবার জন্য বিভিন্ন ধরনের লতাপাতার তৈরী কুঞ্জ এবং মার্বেল পাথরের বেদী তৈরি করা হয়েছিল যেথানে বেগমরা রাত্রিকালে সুখনিদ্রা যেতেন।

প্রত্যেক বেগম ও বাদশাজাদীর খুব কম করেও প্রায় আটপ্রস্থ করে অলঙ্কারাদি ছিল যার মধ্যে থাকত মাথার জন্য মতির ঝাপটা; সিঁথিতে চাঁদ বা তারার আকারে মুক্তার টিকলী, কানের জন্য মণি-মুক্তা-খচিত কুণ্ডল, গলার জন্য পাঁচনলী মুক্তার হার ও জড়োয়া কণ্ঠহার, উপর-হাতের জন্য চওড়া মণিমুক্তা-খচিত বাজুবন্ধ এর সঙ্গে দোদুল্যমান মুক্তাগুচ্ছও সংযুক্ত ছিল। নীচের হাতের জন্য মুক্তা-বসান মাস্তাসা বা জড়োয়া চুড়ী, হাতের আঙুলের জন্য হীরের আংটি, মুক্তার মধ্যে—মুকুর-খচিত আংটি। কটিদেশের জন্য মুক্তা-খচিত গোটহার, পায়ের জন্য মোতির বা সোনারূপার তৈরী পাঁয়জোর। নূতন নূতন অলঙ্কারাদি নির্মাণ ও হীরে-জহরাদি ক্রয় করা হারেম অধিবাসীদের একটি ব্যয়সাধ্য বিলাস এবং এর জন্য রাজধানীর স্বর্ণকারদের দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হ'ত। বলা বাহুল্য যে, সম্রাট স্বয়ং, তাঁর মহিষী, উপপত্নীরা ও কন্যাবর্গ ও ভগিনীরা যে সব অলঙ্কারাদি ব্যবহার করতেন তা অতীব মূল্যবান ছিল।

পোষাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার দিকে হারেমবাসিনীদের বিশেষ ঝোঁক ছিল। সাধারণতঃ এরা প্রতিদিন বিভিন্ন সুগন্ধি কেশতৈল মেখে গোলাপ জলে অবগাহন স্নান করে সযত্নে কেশ প্রসাধনে ব্রতী হতেন এবং এর পর সুগন্ধি মেহেদিপাতা দিয়ে করতল ও পদতল রঞ্জিত করে চোখে সুর্মার অঞ্জন দিতেন। এঁরা প্রায় সর্ব্বদাই পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে রাখতেন। সাধারণতঃ এরা একটা পায়জামা বা ইজের পরে তার উপর এত সূক্ষ্ম মসলিনের শাড়ী ও জামা পরতেন যে মসলিনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের দেহের লাবণ্য পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠত। মসলিনের শাড়ীগুলি এতই সূক্ষ্ম ছিল যে, একটি প্রমাণ শাড়ীর ওজন আড়াই তোলার বেশী হ'ত না এবং একটি ছোট আংটির মধ্য দিয়ে শাড়ীটিকে গলিয়ে বার করে নেওয়া সম্ভব হ'ত। জরীর পাড় বাদ দিয়ে প্রতিটি মসলিনের শাড়ীর দাম পড়ত ৫০৲ টাকা। বেগম ও বাদশাজাদীরা এই সব শাড়ী এক-দিনের বেশী ব্যবহার করতেন না, প্রতিদিনই নূতন শাড়ী পরতেন ও তথাকথিত পুরান শাড়ী দাসী-বাঁদীদের দান করে দিতেন। শীত-কালে বেগমরা মসলিনের জামার উপর একটি পশমের তৈরী 'কাবা' ব্যবহার করতেন এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত কাশ্মীরী শাল গায়ে দিতেন। মাথায় এরা সোনার জরীদার ওড়নাও ব্যবহার করতেন। কোন কোন বাদশাজাদী সম্রাটের অনুমতি নিয়ে মাথায় উষ্ণীষ ব্যবহার করতেন। অনেক ক্ষেত্রে এই সব উষ্ণীষে পাখীর পালকের উপর মণিখচিত শিখাও আঁটা থাকত। হারেমের নর্ত্তকীরাও বিশেষ উৎসবকালে ঐরূপ উষ্ণীষ মাথায় দিয়ে নাচতেন।

বেগমদের ব্যয়সাধ্য অভ্যাস ও বিলাসের মধ্যে তাম্বুল সেবন, সিরাজী পান ও গোলাপের আতর মাখা অন্যতম। সুদূর কাশ্মীর, কাবুল ও পারস্য থেকে আঙুর হতে তৈরি করা সিরাজী বেগমদের ব্যবহারের জন্য আনা হ'ত। এঁরা এতই সুরাসক্ত ছিলেন যে, এঁরা পানীয় জলের বদলে সিরাজী ব্যবহার করতেন। এ সম্বন্ধে মানুচি একটি বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল কাশ্মীরে যখন ঔরংজেব কাশ্মীর পরিভ্রমণ করছিলেন। একদিন ঔরংজেবের প্রিয় জর্জিয়ান বেগম উদিপুরী অত্যধিক সুরাপান বশতঃ মাতাল হয়ে যান। সম্রাটের অন্যান্য বেগমেরা ঈর্ষাবশতঃ উদিপুরীকে অপদস্থ করার মানসে সেই দেখে সম্রাটের কাছে অনুরোধ করেন যে সম্রাট যদি উদিপুরী বেগমকে তার মহল থেকে ডেকে পাঠান তা হলে তারা সবাই মিলে একটি প্রীতি-উৎসব অনুষ্ঠানের অয়োজন করতে প্রয়াস পান। সম্রাট তৎক্ষণাৎ একজন বাঁদীকে উদিপুরীর কাছে পাঠান এবং তাঁর কাছে আসতে অনুরোধ করেন কিন্তু উদিপুরী বেগমের তখন প্রায় বেহুঁস অবস্থা তাই তিনি সম্রাটকে বলে পাঠান যে, তিনি বিশেষ অসুস্থ। এই সংবাদ শোনা মাত্র উপস্থিত বেগমরা উচ্চৈস্বরে হেসে উঠেন তখন সম্রাট নিজেই উদিপুরীর মহলে গিয়ে হাজির হন। উদিপুরী বেগমের অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন। চোখ চেয়ে থাকার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তখন তাঁর লোপ পেয়ে গেছে। ঔরংজেব যখন উদিপুরীর পাশে বসে তাঁর গাত্র-স্পর্শ করেন তখন উদিপুরী বাঁদী-ভ্রমে তাকে আরো সিরাজী দিতে আদেশ করেন। ঔরংজেব বুঝতে পারেন যে, বেগম নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তাই আর কোন কথা না বলে মহল থেকে বেরিয়ে মহলের দ্বাররক্ষীদের মহলে সিরাজী প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করেন এবং এ বিষয়ে আরো সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য আদেশ দেন।

ঔরংজেব অনেক চেষ্টা করেও হারেমের মধ্যে সুরাপান বন্ধ করতে পারেন নি। তিনি একবার মোল্লাদের অনুরোধে হারেমের অন্তঃপুরবাসিনীদের আঁটসাট ইজের পরার বদলে ঢিলা পায়জামা পরতে ও কোরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে সুরাপান নিবারণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তখন বেগমসাহেবা সম্রাটের এই নির্দ্দেশে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন এবং একদিন মোল্লা-গৃহিণীদের হারেমে নিমন্ত্রণ করে এনে প্রচুর সিরাজী খাইয়ে সম্রাটকে ডেকে এনে দেখান যে, মোল্লাদের গৃহিণীরা ইজের পরেছেন এবং সিরাজীর নেশায় বিভোর হয়ে গেছেন। মোল্লারা যখন তাঁদের নিজেদের অন্দরমহলে কোন নিয়ম চালু করতে অক্ষম তখন তাঁরা কি সাহসে রাজ-অন্তঃপুরে সেই নিয়মাবলী বলবৎ করতে সম্রাটকে অনুরোধ করেন? এর পর সম্রাট এ বিষয়ে আর কিছু না বলে শুধু অন্তঃপুরে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ গাঁজা আফিম ইত্যাদি প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন ও প্রহরীদের এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আদেশ দেন।

বেগম ও বাদশাজাদীরা যে-সব গোলাপী আতর ও গুলাব জল ব্যবহার করতেন তা প্রস্তুত করা অতীব ব্যয়সাধ্য ছিল। তাঁদের

পান খাওয়ার মশলাদি সংগ্রহ করতে সেইরূপ ব্যয়সাধ্য ছিল, কিন্তু হারেমে এই দুইটি জিনিসের ব্যবহারই ছিল অসচ্ছল।

বেগম ও বাদশাজাদীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, এঁরা স্নান ও ঘন-ঘন কেশ ও বেশ প্রসাধনে প্রচুর সময় কাটাতেন। এ ছাড়া বাকী সময় এরা নিজেদের মহলের নর্ত্তকীদের নৃত্য ও নটীগণের অভিনীত প্রহসন দেখে, সুকণ্ঠী গায়িকাদের গীত, সঙ্গীত শুনে, উদ্যানে পুষ্পচয়ন ও ভ্রমণ ক'রে, কৃত্রিম জলস্রোতের মৃদু কলস্বর শুনে, রূপকথা ও আদিরসাত্মক প্রেমকাহিনী শুনে সিরাজী ও তাম্বুল পান করে কাটিয়ে দিতেন। হারেমে নবাগতা অতিথিদের নিজেদের অলঙ্কারাদি দেখান ও সবিস্তারে বর্ণনা করতেও এরা খুবই উৎসাহী ছিলেন। সময় কাটাবার এটিও একটি অঙ্গস্বরূপ ছিল।

এদের মানসিক অবস্থার কথা বলতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধারার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য ও সদা আমোদ-প্রমোদের মধ্যে থেকেও এদের মন হিংসা, দ্বেষ ও খল-চাতুরীতে পূর্ণ ছিল, তবে এরা সেটা কখনই বাইরে প্রকাশ করতেন না মনে মনেই রাখতেন ও সুযোগের অপেক্ষা করতেন। কোনরূপ অবৈধ বা পাপকার্য্য করতে এরা পিছপাও হতেন না এবং চরিত্রের দিক থেকে এরা ছিলেন পুরোমাত্রায় অসংযমী। নির্দ্ধারিত মাসোহারা, জায়গীরের রাজস্ব ছাড়াও এরা সম্রাটের কাছ থেকে মাঝে মাঝে কৌশলে বিভিন্ন অজুহাতে অর্থাৎ পান-সুপারী, আতর ও বিলাসদ্রব্য ক্রয়ের নিমিত্ত অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পত্তি আদায় করে নিতেন। এদের সঙ্কীর্ণ মনের অনেকখানি অংশই স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য-চিন্তায় ভরে থাকত।

সমগ্র হারেমের মধ্যে মৃত্যুর কোন বিভীষিকা ছিল না কারণ মৃত্যুর কথা চিন্তা করার অবসরও যেমন হারেমবাসিনীদের ছিল না তেমনি হারেমের মধ্যে মৃত্যুর কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে কারুর যদি কখনও অসুখ করত তা হলে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে 'বিমারখানা' নামক একটি মহলে স্থানান্তরিত করা হ'ত, পাছে অন্যান্য সকলের মনে মৃত্যুর বিভীষিকা জাগে। অবশ্য 'বিমারখানায়' রোগিণীদের সুচিকিৎসার জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাই বর্ত্তমান ছিল। সম্পূর্ণরূপে সুস্থ বা মৃত না হলে রোগিণীকে 'বিমারখানার' বাইরে আনা হ'ত না। কোন অন্তঃপুরবাসিনী মারা গেলে পর তার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি রাজকোষে জমা পড়ে যেত।

হারেমবাসিনীদের ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য, অতি-বিলাস ও অপচয়ের প্রাবল্য দেখেও সম্রাট ঔরংজেব কোনদিন কোন প্রতিবাদ করেন নি বা তা করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। এর কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে মানুচি মন্তব্য করেছেন যে, মুঘল সম্রাটরা স্বভাবতঃই রমণীপ্রিয় ও লাম্পট্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। নারীকে তাঁরা কামলালসার চরিতার্থের উপকরণস্বরূপই বিবেচনা করতেন। মুঘল সম্রাটদের পূর্ব্বাপর বংশধরেরা এই একইভাবে জীবনযাপন করে এসেছেন এবং অসংযমী চরিত্রের তাঁরাই হচ্ছেন জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ।

সম্রাট শাজাহানের অসংযমী চরিত্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, শাজাহান তাঁর অন্তঃপুরবাসী রমণীদের উপভোগ করে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই তিনি তাঁর দরবারের ওমরাহবর্গের পত্নীদের সঙ্গেও অবৈধ প্রেমলীলা করে তাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। সম্রাট শাজাহানের পতনের প্রধান কারণগুলির মধ্যে এটাও একটি কারণ ছিল। তিনি তাঁর আপন শ্যালিকা আত্মীয় জাফর খানের পত্নী ফরজান বেগম ও শ্যালক-কন্যা খলিলুল্লা খানের পত্নীর সঙ্গে নির্লজ্জভাবে প্রেমলীলা চালিয়েছিলেন এবং তাঁদের ওপর শাজাহানের আসক্তি এত বেশী হয়েছিল যে, তিনি তাঁদের স্বামীদের হত্যা করতে পর্য্যন্ত উদ্যত হয়েছিলেন। শাজাহান তাঁর নিজের শ্যালক সায়েস্তা খানের পত্নীকে কৌশলে হারেমের মধ্যে এনে তার সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন। যার জন্য সায়েস্তা খানের পত্নী আত্মহত্যা করে লজ্জার হাত থেকে নিজেকে নিষ্কৃতি দিতে বাধ্য হন। ভবিষ্যৎ কালে সায়েস্তা খান যে ঔরংজেবের পক্ষ নিয়েছিলেন ইহাই তার প্রধান কারণ ছিল।

সম্রাট শাজাহান এতই কামুক ও লালসাপরায়ণ ছিলেন যে, তাঁর লালসাবহ্নি চরিতার্থের জন্য তিনি হারেমের মধ্যে একটি বিরাট প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করেছিলেন, যার চারিদিক আয়নায় দিয়ে মোড়া ছিল। স্বর্ণ, হীরে, জহরৎ ও মসৃণ পাথর দিয়ে সাজানো এই কক্ষের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছিল তার সঠিক পরিমাণ বলা শক্ত, তবে মণিমুক্তা, হীরে, জহরৎ বাদে কেবলমাত্র সোনার কাজ করতে খরচ পড়েছিল প্রায় দেড় কোটি টাকার মত। নির্ব্বাচিত সুন্দরী রমণীদের সঙ্গে নিজের বিভিন্ন ভঙ্গিমার প্রতিবিম্বের প্রতিফলন কাচের ওপর দেখে তাঁর কামবাসনাকে উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই কক্ষটি নির্ম্মাণ করেছিলেন। শাজাহানের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে সময় সময় মনে হয় যে, কেবলমাত্র নারীকে ভোগ করাই বোধ হয় তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

সম্রাট আকবরের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে হারেমের মধ্যে নববর্ষের প্রারম্ভে ১১ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত নববর্ষ উৎসবকালে একটি মহিলাদের বাজার হারেমের মধ্যেই বসত। শাজাহানের সময় এই বাজার আট দিনের জন্য বসত। উৎসবকালে শাজাহান নিজে চতুর্দ্দোলায় করে দিনে দু'বার করে এই বাজারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁর এই বেড়ানর উদ্দেশ্যই ছিল নূতন নারীর সন্ধান করা। বাজারের মধ্যে যাকে তাঁর পছন্দ হ'ত তাকে তিনি তাঁর কুট্টনীদের দেখিয়ে দিতেন এবং কুট্টনীরা নানা কৌশলে সেই নারীকে সম্রাটের প্রমোদকক্ষে এনে তুলত। সেই নারীর উপর সম্রাটের নেশা কাটলে পর হয় তাকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে তার বাড়ীতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত কিংবা হারেমেই উপপত্নীর মর্য্যাদা দিয়ে তাকে স্থান দেওয়া হ'ত। উৎসবের আট দিন হারেমের দ্বার রুদ্ধ করে রাখা হ'ত এবং হারেমের মধ্যে পুরুষ বলতে একমাত্র সম্রাটই থাকতেন। একবার এই উৎসবে সমবেত নারীর সংখ্যা গণনা করে দেখা গিয়েছিল যে, সেই সংখ্যা ত্রিশ হাজারকেও

ছাড়িয়ে গেছে। এত করার পরও শাজাহান তৃপ্তি না পেয়ে রাজধানীর সাধারণ বাইজীদের হারেমের মধ্যে নৃত্যগীতাদি করার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে সারারাত ধরে শাজাহান তাদের সঙ্গে কাটিয়ে দিতেন।

মানুচি শাজাহানের মৃত্যু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, বুড়ো বয়সেও যৌবনের উন্মাদনা পাবার জন্য শাজাহান প্রচুর পরিমাণে উত্তেজক হাকিমী ঔষধাদি ব্যবহার করতেন। একদিন তিনি তাঁর কক্ষে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর গোঁফ জোড়ার প্রসাধন (কলপ লাগানর) কার্যে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় তাঁর দুজন তরুণী বাঁদী তাঁর যৌবন ফিরিয়ে আনবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা দেখে হেসে ফেলেছিল। শাজাহান তাই দেখে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং তাড়াতাড়ি তাঁর যৌবনশক্তি ফিরিয়ে আনার আশায় উত্তেজক হাকিমী ঔষধাদি দ্বিগুণ পরিমাণে খেতে সুরু করেন কিন্তু অমিতাচারী অসংযমী বৃদ্ধের জীর্ণ পরিপাকযন্ত্র এতে একেবারেই বিকল হয়ে যায় এবং প্রস্রাবদ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। পরিণামে একদিন মধ্যরাত্রে (১লা ফেব্রুয়ারী ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ সোমবার) তাঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নাকি তাঁর ডান হাতের চেটোটা একবার শুঁকেছিলেন। কথিত আছে যে, একবার এক ফকির নাকি শাজাহানের হাতে একটি আপেল দিয়ে বলেছিলেন যে এই আপেলের গন্ধ তাঁর হাতে সব সময়েই পাওয়া যাবে এবং যেদিন এই আপেলের গন্ধ তাঁর করতল থেকে অন্তর্হিত হবে, সেইদিনই সম্রাট তাঁর মৃত্যু সুনিশ্চিত বলে জানবেন। বোধ হয় হতভাগ্য সম্রাট তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হাত শুঁকে শেষবারের মত ফকিরের ভবিষ্যৎবাণীই পরখ করে দেখতে চেয়েছিলেন।

সম্রাট ঔরংজেবের কিন্তু সম্রাট শাজাহানের মত অতখানি নারীপ্রীতি ছিল না। এ সম্বন্ধে মানুচি একটি বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, দারাকে হত্যা করার পর ঔরংজেব দারার দুই উপপত্নী অর্থাৎ উদিপুরী বেগম ও রাণাদিনকে তাঁর হারেম অলঙ্কৃত করতে আমন্ত্রণ জানান। উদিপুরী বেগম আমন্ত্রণ পাওয়া মাত্রই ঔরংজেবের হারেমে এসে হাজির হন কিন্তু রাণাদিন এলেন না। তিনি ঔরংজেবকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন যে কিসের জন্য তাকে সম্রাটের এত ভাল লেগেছে যার জন্য তাকে হারেমে নিয়ে যাওয়ার জন্য সম্রাট উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন? ঔরংজেব এর উত্তরে বলে পাঠালেন যে, রাণাদিনের সুন্দর কেশের জন্যই তাকে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন। ঔরংজেবের জবাব শুনে রাণাদিন তৎক্ষণাৎ তার কেশগুচ্ছ কেটে সম্রাটকে ভেট পাঠিয়ে দিয়ে বললেন যে, যে কেশগুচ্ছের জন্য সম্রাটের তাকে প্রয়োজন হয়েছিল সেই কেশগুচ্ছ তিনি স্বেচ্ছায় কেটে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ঔরংজেব কিন্তু এর পরও রাণাদিনকে বলে পাঠান যে, তিনি তাকে বিবাহ করে বেগমের মর্য্যাদাভুক্ত করতে চান এবং রাণাদিন তাঁকে সারা বলে মনে করেই গ্রহণ করেন। এই সংবাদ পেয়ে রাণাদিন একটি ধারাল ছুরি দিয়ে তার নিজের মুখখানি ক্ষতবিক্ষত করে একটি কাপড়কে রক্তে রঞ্জিত করে সম্রাটকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন যে, সম্রাট যদি তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকেন তা হলে সম্রাট জানুন যে সেই সুন্দর মুখ এখন আর তার নেই, আর সম্রাট যদি তার রক্ত নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চান তা হলে সম্রাট নিজে তার কাছে আসতে পারেন। ঔরংজেব এই রমণীর তেজঃদীপ্তি দেখে এর পর থেকে তাকে খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন এবং তাকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে দিতে মনস্থ করেছিলেন। ভবিষ্যতেও তিনি একে যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছিলেন। রাণাদিন প্রথম জীবনে একজন বাজারের বাইজী ছিলেন। বাদশাজাদা দারা প্রথম জীবনে এর রূপে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে একে বিবাহ করতে চান। সম্রাট শাজাহান প্রথমে এই বিবাহে মত দেন নি কিন্তু যখন দেখলেন যে যুবরাজ দারা এর জন্য মৃত্যুপণ করেছেন তখন উপায়ান্তর না দেখে বিয়েতে মত দিতে বাধ্য হন। দারার মৃত্যুতে রাণাদিন গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন, তাই বাকী জীবন তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় একাকীই নির্জ্জনে কাটিয়েছিলেন।

মানুচি বলেছেন যে, ঔরংজেবের শুধুমাত্র নারীর প্রতি আসক্তিই কম ছিল না, তাঁর বিলাসিতাও সম্রাট শাজাহানের তুলনায় খুবই অল্প ছিল। তিনি যে কাবা ব্যবহার করতেন তাঁর দাম ছিল মাত্র দশ টাকা। তিনি যে তাজ ব্যবহার করতেন তার মধ্যস্থলে মাত্র একটি বড় মণি খচিত ছিল। তাঁর কোমর-বন্ধনীতেও একটিমাত্র মণি-খচিত ছিল এবং এ ছাড়া আর কোন জহরতই তিনি ব্যবহার করতেন না। প্রত্যেকটি দামী দামী হীরে জহরতের তিনি একটি করে বিশেষ নাম দিয়েছিলেন যেমন 'চন্দ্র', 'সূর্য্য' ইত্যাদি। এই সব মূল্যবান পাথর ও জহরতাদি তৈমুরলং থেকে বংশপরম্পরায় মুঘল সম্রাটদের হারেমে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য জয়ের পর সেখান থেকেও অনেক হীরে-জহরতাদি সম্রাট ঔরংজেব সংগ্রহ করেছিলেন। সাধারণতঃ মুঘল সম্রাটরা তাঁদের হীরে-জহরতাদি কখনই হাতছাড়া করতেন না, যেখানেই যেতেন সেখানেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। সম্রাট হুমায়ুন যখন ভারত থেকে শেরশাহ কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছিলেন, তখনও পূর্ব্ববর্ত্তী মুঘল সম্রাটদের সংগৃহীত হীরে-জহরতাদি তাঁর সঙ্গেই ছিল এবং পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্তির পর সেগুলি যথাস্থানেই সংরক্ষিত হয়েছিল।

ঔরংজেব বিশেষ ভোজনবিলাসীও ছিলেন না, তিনি মাত্র একাহারী ছিলেন।

[ক্রমশঃ—

অভিমান

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

সামান্য কথা নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল স্বামীস্ত্রীতে। দোতলা ফ্ল্যাটের পাতলা মেঝের ওপর দিয়ে দুম দুম শব্দে পা ফেলে ঘরের কোণে চলে যায় রেবা, উবু হয়ে বসে কটাং শব্দে নিজের ছোট্ট ট্রাঙ্কটির ডালা খোলে, আর মুহূর্তের মধ্যে শাড়ী সায়া ব্লাউজের স্তূপে পূর্ণ হয়ে ওঠে তার শূন্য গহ্বর।

গুম হয়ে পাশের ঘরে খাটের ওপর বসে থাকে বিকাশ, ছাঁটা ছোট গোঁফ দু'আঙুলে ধরতে চেষ্টা করে—অল্প আগের গরম গরম কথাগুলো মস্তিষ্কের ভেতর পাক খেতে থাকে।

খোলা দরজার সুমুখে বিদ্যুতের মত এসে দাঁড়ায় রেবা, পরণে তার বাইরে বেরুবার বেশ, নাকের একপাশে আটকে-থাকা পাউডারটুকু তার দ্রুত প্রসাধনের নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে, মুখ তুলে বিহ্বলের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকে বিকাশ।

"আমি চললাম।" থমথমে গলায় ঘোষণা করে রেবা। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে, তার পরে খুট খুট শব্দে জুতোর আওয়াজে সিঁড়িপথ মুখর করে নেমে যায় নীচে। বাক্স ঘাড়ে অনুসরণ করে বালকভৃত্য হরিচরণ।

একটা কথাও বেরোয় না বিকাশের মুখ দিয়ে। দুরন্ত অভিমানের মেঘে দাম্পত্য প্রেমের সূর্য ঢাকা পড়ে।

চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে রাগে ফুঁসতে থাকে রেবার মন। মনে করেছিল যে, বেরুবার পূর্ব মুহূর্তেও নিজের ভুল স্বীকার করবে বিকাশ। বেরিয়ে পড়বার ঠিক আগে দরজার সুমুখে কয়েকটি মুহূর্তের নিষ্ফল প্রতীক্ষা করেছিল সে। মনের কোণে প্রত্যাশার ক্ষীণ ঝিকিমিকি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রত্যাশিত সে আহ্বান শুনতে না পাওয়ায় মনের ভার তার বাড়ে বৈ কমে না।

রেবার পিসতুত বোনের বিয়ে। পিসেমশাই বড় চাকুরে, মেয়ের বিয়েও দিচ্ছেন বড় ঘরে। এই তাঁর শেষ কাজ, তাই কাছে-দূরের সব আত্মীয়স্বজনের কাছেই পাঠিয়েছেন সাদর আমন্ত্রণ-লিপি।

রেবার ইচ্ছে ষাট-পঁয়ষট্টি টাকার মধ্যে একখানা ভাল মহীশূর জর্জেট কিনে দেয় বোনের বিয়েতে, তা না হলে মান থাকে না তার। চারদিক থেকে আসা অগণ্য উপহারের স্তূপে তার উপহারটা নেহাৎ নগণ্য দেখাবে তা না হলে। এদিকে বিকাশের ভীষণ টানাটানি চলছে ক'মাস। পরীক্ষায় ফেল করায় তিনটি ছাত্রের বাড়ী টুইশানি করা বন্ধ হয়েছে তার। এর ওপর আবার গোদের ওপর বিষফোড়ার মত নিউ ইণ্ডিয়ার এক চ্যাংড়া ছোকরা এজেণ্ট এ পাড়ায় বাসা বাঁধায় তার ইনসিওরেন্সের পার্টটাইম আয়ও গেছে কমে। তাই সে প্রস্তাব করল কম দামি একখানা ধনেখালির।

শোনামাত্র রেবা বলে, "না।"

"আহা, কথাটা বুঝে দেখ একবার।" হাত তুলে রেবাকে বোঝাতে চায় বিকাশ।

"বুঝবার কিছু নেই।" দৃঢ়স্বরে রেবা বলে, "তোমার লজ্জা না থাকলেও আমার আছে। ও রকম একটা খেলো জিনিস হাতে নিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াতে পারব না আমি।"

"কিন্তু যার যেমন অবস্থা—"

বিকাশের কথা শেষ হবার আগেই ঘর ছেড়ে চলে যায় রেবা, গুম হয়ে বসে থাকে রান্নাঘরের ছোট্ট পিঁড়িটার ওপর।

মেয়েদের হৃদয়াবেগের কাছে যুক্তিতর্কের কোন স্থান নেই। তাই বিকাশের অকাট্য যুক্তির শাণিত তীরগুলি রেবার অবুঝ আবদারের কঠিন বর্মে ঠেকে প্রতিহত হ'ল, লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। রেবার দুর্জয় মান, বড়লোক পিসতুত বোনের কাছে মাথা হেঁট করতে রাজি নয় সে কোন মতেই।

তাই এক কথায় দু'কথায় সূত্র ধরে এগুতে এগুতে শেষটায় কলহের জটিল জালে ক্রমে ক্রমে আটকে পড়ে দু' জনেই।

রেবা চলে গেছে। মনে মনে একথাটি একবার আবৃত্তি করে বিকাশ। ছোট্ট দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট, রেবা থাকতে যেন পরিপূর্ণ হয়ে ভরে ছিল। নীড়াভিলাষী পাখীর মত সারাক্ষণ এটা-ওটা দিয়ে ঘর সাজাতে ব্যস্ত থাকত সে। ঘটি-বাটি নাড়ার, কি পায়ের, কি নিশ্বাসের শব্দে যেন বিচিত্র সুর ঝঙ্কার উঠত। আজ সব শূন্য। নিরাবরণ সাদা দেওয়ালের দিকে বোবা চোখে তাকায় বিকাশ। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সবই যেন অন্তঃসারশূন্যতায় ভরা।

অথচ মাত্র মাসছয়েক হ'ল বিয়ে হয়েছে ওদের। পরস্পরকে গভীর ভাবে পাওয়ার নেশা এখনও অবসাদ আনে

নি ওদের জীবন। কূজনে গুঞ্জনে ভরপুর গৃহে আজ এ কি আকস্মিক ছন্দপতন!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় বিকাশ। অলস কল্পনার স্থান অতিশয় সীমিত তার জীবনে, জীবন-সংগ্রামের রুদ্র আহ্বান ডাক দিচ্ছে তাকে বাইরে থেকে।

পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে জীবন বীমার সম্ভাব্য শিকার খুঁজতে বের হয় বিকাশ।

ওদিকে দ্রুতগামী গোমো এক্সপ্রেসের নিরালা কোণে বসে প্রতি মুহূর্তে কলকাতা থেকে দূরে, আরও দূরে সরে যেতে যেতে রেবার দু'চোখ বারে বারে জলে ভরে আসে। গাড়ীর দুলুনীর তালে তালে দুলতে দুলতে মনে মনে ভাবছিল যে একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেল যেন। এ ভাবে চলে না এলেই ভাল হ'ত। অভিমানের কোমল লতায় বড় বেশী টান পড়েছে।

হৃদয়মূলের প্রেমের উৎসে চেপে বসা অভিমানের জগদ্দল পাথরখানা একটুখানি নড়ে উঠল।

সন্ধ্যার অন্ধকারকে ঘাড় ধরে ঠেলে বার করে দিয়েছে আসানসোল স্টেশনের অগুনতি বাতি। চা-গ্রম, পান-সিগরেট আর আরও অনেক হৈ চৈ হট্টগোলকে পেছনে ফেলে রিক্সা করে জি. টি, রোডের ওপর একটা দোতলা বাড়ীর সুমুখে এসে নামল রেবা।

হঠাৎ রেবাকে দেখে অবাক হয়ে যান রেবার দাদা মণীশ সান্যাল। রেবার পেছনে কুলি, কুলির পেছনে দৃষ্টি চালিয়ে কার যেন খোঁজ করেন তিনি, তার পর নিরাশ হয়ে প্রশ্নভরা দৃষ্টি ফেলেন রেবার মুখে। তাঁর এই অনুচ্চার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আবিরের ছোঁয়া লাগে রেবার মুখে, শাড়ীর কোণ পাকাতে পাকাতে বলে, "ও আসে নি আমার সঙ্গে।"

মক্কেলবিহীন বৈঠকখানায় অবাক হওয়া দাদাকে রেখে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে রেবা, সান্ধ্য-রেডিও শ্রবণরতা বৌদি পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

হঠাৎ রেবাকে দেখে খুশীর আভায় নেচে ওঠে বৌদির দু'চোখ। দু'হাতে রেবাকে জড়িয়ে ধরে গানের সুরে চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি, "ওরে আমার রেবা এসেছে রে..."

"কই মা, কই মা—।" বলতে বলতে পড়ার বইয়ের বাঁধন কাটবার অভাবনীয় উপলক্ষ্য পেয়ে নাচতে নাচতে ছুটে এল মিতা, সীতা আর টুলু।

এর পর বৌদির রঙ্গ-রসিকতা, ভাইপো-ভাইঝিদের হুল্লোড় হুড়াহুড়ি কিছুক্ষণের জন্ত রেবাকে ভুলিয়ে দিল সব। মনের ভেতর চেপে বসা ব্যথাটা হালকা হয়ে মিলিয়ে গেল এক সময়ে।

কিন্তু নিশীথ রাতের নির্জনতা আনমনা করে তোলে রেবাকে। বিয়ের পর এই প্রথম ছাড়াছাড়ি, আর তাও কি না এ ভাবে! বড় শূন্য মনে হ'তে থাকে হৃদয়পুরকে। কার নিবিড় সুখ-স্পর্শের স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা করে তোলে তাকে।

অনেকক্ষণ নিদ্রাবিহীন শয্যায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করে করে শেষটায় সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রেবা। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তার মাথায় কপালে গলায় স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায়।

সুমুখেই কালো বিসপিল রেখায় গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পড়ে আছে নিবিড় অন্ধকারে ঘুমন্ত অজগরের মত। অনেকক্ষণ পরে পরে তীব্র দ্যুতিময় হেড লাইট জ্বেলে সগর্জনে সারা রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে চলে যায় মাল বোঝাই ট্রাক। অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায় তাদের পেছনের রক্তিম বাতি, তার পর হঠাৎ বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকায় রেবা। মাথার ওপর সহস্র চক্ষু আকাশ তারই মত নিদ্রাবিহীন অপলক চোখে নীচের দিকে চেয়ে আছে।

পাশেই দাদা বৌদির শোবার ঘর। ভিতর থেকে মৃদু আলাপনের গুঞ্জন উড়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে চার ধারের নিশীথ অন্ধকারে। হঠাৎ তার নাম উচ্চারিত হতে শুনে উৎকর্ণ হ'ল রেবা। চারি দিকের স্তব্ধ নির্জনতায় শুনতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না তার, তবু আরও ভাল করে শুনবার আশায় এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল রুদ্ধদ্বার কক্ষের দিকে।

"আমার মনে হয় একটা কিছু হয়েছে দু'টিতে," গুঞ্জনরবে বৌদি বলেন, "তা না হলে এ ভাবে আসে? না চিঠি, না পত্তর।"

"ঠিকই বলেছ শোভা—" জবাব দেন রেবার দাদা, "এই সেদিনও ত রেবাকে এখানে আসার জন্য চিঠি দিলে ফ্লাটলি রিফিউজ করল বিকাশচন্দর। তাতে রেবারও মত ছিল নিশ্চয়ই।"

"তা আবার ছিল না" খিল খিল শব্দের ঢেউ ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে রেবার কান দুটো গরম হয়ে ওঠে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার।

—"মাঝে মাঝে মুখখানা থমথমিয়ে উঠছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছ?" বৌদির গলা শোনা যায় আবার।

—"ঝগড়া ঝাঁটি নয়ত?"

"তাই বলেই ত মনে হয়। হাজার হউক, তোমারই ত বোন।"

"আহা নিজে যেন ভিজে বেড়ালটি—আঃ ছাড় ছাড় শুনতে পাবে।"

আলাপ ক্রমেই ঘোরালো বাঁকা পথ ধরেছে দেখে আস্তে আস্তে সরে এল রেবা। ঘরে এসে বিছানায় বসে জোরে মাথা চেপে ধরল দু হাতে। উষ্ণ রক্তস্রোতের ধারা ততক্ষণে মাথার ভিতরে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছে।

অনেকক্ষণ পরে স্বেদলাঞ্ছিত কপোলতল ঘাড় আর কপাল ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে চোখ বুঁজে নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে রইল রেবা।

বিকাশ যে অতদূরে থেকেও এমন ভাবে তাকে জ্বালাবে তা সে ভাবতেও পারে নি এর আগে।

পরদিন ভোরে চা খাবার টেবিলে বসে বৌদির চোখে তাকাতেই পারল না রেবা। বৌদি কিন্তু নির্ব্বিকার। হাসি ঠাট্টা রঙ্গ রসিকতায় ঠিক আগের মতই—বরং যেন বেশী।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর পান মুখে দিয়ে রেবাকে ডেকে বলেন বৌদি—চল রেবা, ঘুরে আসি একটু।"

"কোথায় বৌদি ?" নিরুৎসুক সুরে রেবা বলে।

"এই কাছেই, হটন রোডে। বন্দনাকে চিনিস ত ? তাদের বাড়ী "শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বৌদি বলেন।

"কোন বন্দনা ?" অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে রেবা।

"সে কি রে"—খুবই আশ্চর্য্য হয়ে বৌদি বলেন, "কেন, বিকাশ কিছু বলে নি তোকে ?"

হৃৎস্পন্দন দ্রুতলয়ে চলে, স্পষ্ট অনুভব করে রেবা, তবু মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়া রক্তিমাভা অস্বীকার করে বৌদির চোখে চোখ রেখে বলে—"কৈ না তো" তার পর অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, "হয়ত বলেছে, ভুলে গেছি আমি।"

"বন্দনা হিন্দুস্থানের এজেন্ট" আড় চোখে রেবার মুখ দেখে গম্ভীর সুরে বৌদি বলেন, "সেই সূত্রে বিকাশ যখন আসানসোলে ছিল তখন থেকেই দু' জনায় খুব আলাপ অন্তরঙ্গতা। অন্তরঙ্গতা বাড়তে বাড়তে গভীরতর অন্য কিছুতে পরিণত হতে হতে হয় নি—বিকাশের হঠাৎ কলকাতায় বদলী হবার জন্য। অবশ্য এ সবই তোদের বিয়ের আগের ঘটনা।"

চক্ষু নত করে বুকের ভিতরের ভূমিকম্পটাকে অতি কষ্টে সামলে নেয় রেবা।

ওঃ ভিতরে ভিতরে এত! মিষ্টি মিষ্টি মন কেড়ে নেওয়া কথাগুলো তবে আসলে শূন্য গর্ভ! কে জানে, এই কথা-গুলোই হয়ত বন্দনার কানেও মধু ঢেলেছিল একদিন।

উঃ কি শঠ আর কপট—এই পুরুষ জাতটা! এই ছ' মাসের মধ্যে বন্দনা নামে একটি মেয়ের সম্বন্ধে একটা কথাও ত বলে নি বিকাশ! ভুলতে না পারাটাই এই গোপনতার আসল মানে।

বেড়াবার ইচ্ছা আর তিলমাত্রও ছিল না। তবু বৌদির হাজার জেরার হাত এড়াবার জন্যই শাড়িটা পাল্টে নেয় রেবা। তার অনিচ্ছুক পা দুটো ম্রিয়মান শরীরটাকে বয়ে নিয়ে গেল জি. টি. রোডের ওপর দিয়ে হটন রোডের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত।

বাড়ীতেই ছিল বন্দনা। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায় দু' জনকে। কলকণ্ঠে বলে ওঠে—দিদি যে, কি ভাগ্যি আমার···আসুন, আসুন, এ ঘরটা বড় গরম, ও ঘরে চলুন···"

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর আপাদমস্তক দেখল রেবা। বিতৃষ্ণায় মন ভরে ওঠে তার। কি অসভ্য! অতখানি লো কাট ব্লাউজ বুঝি ভদ্রঘরে কেউ পরে? ঠিক যেন যৌবনের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন। রং ত মাজা মাজা, সাদা পাউডারের ছোপ তার ওপরে সুস্পষ্ট। চোখ দুটি অবশ্য মন্দ নয়, সব সময়েই যেন হাসছে—অনিচ্ছার সঙ্গে মনে মনে স্বীকার করে নিল রেবা, তবে রুচির পরিচয় নেই বেশ-বাসে। বাসন্তী রং শাড়ির সঙ্গে লাল রঙের ব্লাউজ পরেছে দ্যাখ না!

খুশীতে ভরপুর বন্দনাকে থামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বৌদি বলেন, "ওরে থাম থাম, দম নিতে দে আমাকে। এই যে, আমার সঙ্গে দেখছিস, এ কে বলত ?"

এক ঝলক আলো, পড়ে যেন রেবার মুখে, বন্দনার বড় বড় চোখ দুটি রেবার কঠিন মুখ ছুঁয়ে যায়!

"পারলি না ত বলতে ?" এক পলক অপেক্ষা করে বৌদি বলেন, "এ হচ্ছে আমার ননদ, বিকাশের বৌ।"

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বন্দনা, "কি আশ্চর্য্য! বিকাশদার বৌ আপনি? কি ভাগ্যি যে দেখা হল আপনার সঙ্গে! ভীষণ ঝগড়া আছে কিন্তু বিকাশদার সঙ্গে আমার। চুপি চুপি বিয়ে করে মিষ্টির অঙ্কে শূন্য বসান বার করব আমি। দেখা হউক না একবার, মজাটা টের পাইয়ে দেব।"

প্রাণোচ্ছলা তরুণী এই বন্দনা। হাসি গল্পে ডুবিয়ে দেয় রেবা আর তার বৌদিকে।

এমন তুখোড় না হলে ইন্‌সিওরেন্সের শিকার ধরবে কেমন করে? মনে মনে ভাবে রেবা আক্রোশভরা অন্ধ বিদ্বেষ জাগে ওর মনে। কত না নির্জন অবসরক্ষণে এমনি ভাবে গল্পগাছা করেছে বন্দনা বিকাশ। ভেবে চোখ দুটি জ্বালা করে উঠে রেবার। নিশ্চয়ই গভীর অন্তরঙ্গতার সুর বেজেছিল দু'জনার মনে—মনে মনে ভাবে রেবা—তা না হলে লুকিয়েছে কেন ওর কথা আমার কাছে? কতদূর

এগিয়েছিল ওরা দু জনে? তীক্ষ্ণ চোখে বন্দনার মুখে তাকায় রেবা, যেন কোন এক দুরূহ লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টায়।

সহজে ওদের ছাড়ল না বন্দনা। বিকেল হ'ল, চা খাবার খাওয়া হ'ল, তার পর আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে ছাড়া পেল রেবা আর বৌদি।

"বড় ভাল মেয়ে এই বন্দনা," ফেরার পথে বৌদি বলেন, "খুব মিশুক আর আমুদে।"

ঐ করেই ত মাথাটা খেয়েছে আমার—মনে মনে ভাবে রেবা, তা না হলে সামান্য একটা শাড়ির জন্য এত কাণ্ড হয় কখনও? এখন হয়ত পুরানো প্রেমের রোমন্থন করছে বিকাশ। তাই বুঝি একটা চিঠিও দিচ্ছে না, বেঁচে আছি না মরে রেহাই দিয়েছি তারও খোঁজ নিচ্ছে না।

অভিমানের বিপুল তরঙ্গ বুক থেকে উঠে গলার কাছে আছড়ে পড়ে। চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে, কি যেন একটা আটকে আছে গলার ভিতর পুঁটুলির মত। নাকের ভিতরটা কেমন যেন নোনতা নোনতা।

পথ চলতে চলতে আড় চোখে রেবার আনত মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকান বৌদি। মুখে আর কিছু বলেন না।

৩

এর পরের সাত আটটা দিন রেবাকে যেন কুচি কুচি করে কেটে রেখে গেল। বৌদির রঙ্গ তামাশা, ভাইপো ভাইঝিদের আদর আবদারের অত্যাচার, দাদার স্নেহগর্ভ কথাবার্তা কিছুই ভাল লাগে না রেবার। ঈর্ষা আর সন্দেহের কীট তার ফুলের মত বুকটাকে কুরে কুরে খেতে থাকে।

বিকেল বেলা গা ধুয়ে পরিষ্কার শাড়িখানা পরে আয়নার সুমুখে দাঁড়িয়ে কপালে সিন্দুর টিপ পরতে পরতে বৌদি বলেন, "শুনেছিস রেবা—বন্দনা বদলী হ'ল কলকাতার আপিসে।"

জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে চুপ করে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল রেবা—কথাটা কানে যেতেই চমকে বৌদির পিঠের দিকে তাকাল।

আয়নার ভিতর দিয়ে রেবার শুকনো মুখে একটিবার তাকিয়ে বৌদি বলেন, "মহা মুস্কিলে পড়েছে বেচারী, কলকাতায় ওর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই যে গিয়ে উঠবে।"

চুপ করে শোনে রেবা, উত্তর দেয় না।

একটু ইতস্ততঃ করে, কেসে গলাটা পরিষ্কার করে বৌদি বলেন, "আমায় বলছিল তোদের ফ্ল্যাটের দুটি ঘরের একটি তাকে ছেড়ে দিতে পারিস কি না জিজ্ঞেস করতে, তা তোর কি অসুবিধে হবে খুব?"

তীরবেগে উঠে দাঁড়ায় রেবা। ওর অগ্নিজ্বলা চোখে এক মুহূর্ত তাকিয়ে মুখ নিচু করেন বৌদি, আমতা আমতা করে বলেন, "অবশ্য সাময়িক ভাবেই চায় ও, নতুন বাসার খোঁজ পেলেই উঠে যাবে। তা কি বলিস?"

দাঁতে দাঁতে চেপে রেবা শুধু বলে, "না।"

"বড়ই মুস্কিলে পড়বে বেচারী—কলকাতায় ঘর পাওয়া যে কি"—আক্ষেপের সুরে বৌদি বলেন, "যাই, বলে আসি ওকে। দু'চার দিনের মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছে বন্দনা। ওর ত খুবই আশা যে গিয়ে পড়লে বিকাশ ওকে না করতে পারবে না।"

সাজসজ্জা সেরে বেরুবার মুখে রেবাকে সেখানেই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বৌদি বলেন, "বন্দনার ওখানে যাচ্ছি, যাবি আমার সঙ্গে?"

থর থর কাঁপা ঠোঁট দুটো শক্ত ভাবে চেপে কোন মতে রেবা বলে, "না।"

বৌদি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একছুটে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে রেবা। কান্নার সমুদ্রে জোয়ার আসে।

তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত একটা কথা তার মর্মতল বিদ্ধ করতে থাকে—বিকাশ ওকে না করতে পারবে না।

চোখের পাতা দুটি এক করতে পারল না সে রাত্রে রেবা। পরদিন সকালে নিরক্ত কঠিন মুখে দাদা বৌদির কাছে বিদায় নিয়ে সকালের ডাউন গোয়ো এক্সপ্রেস ধরল রেবা।

প্রণাম করবার সময়ে বৌদির মুখে সামান্য একটু হাসির যে ঝলক দেখল রেবা সেকি শুধু চোখের ভ্রম?

পরিচিত ফ্ল্যাটে এসে দুরু দুরু বুকে সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে রেবা। পা যেন আর চলতে চায় না তার। যে প্রচণ্ড আবেগ এতক্ষণ ধরে শক্তি যোগাচ্ছিল তাকে, পুড়ে যাওয়া হাউইর মত তা যেন সহসা নিঃশেষ হয়ে গেল।

পি-১১৭। নেমপ্লেটটিও ঠিক তেমনি আছে। বন্ধ দরজার বুকে আঘাত করার পূর্বক্ষণেই ভিতর থেকে খুলে যায় পাল্লা দুটো। ভ্রমণ-সজ্জায় সুমুখে দাঁড়িয়ে বিকাশ।

"একি, রেবা!" আনন্দের পাড় লাগান সংশয়ের সুর ফোটে বিকাশের কণ্ঠে।

মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে রেবার, টলেই পড়ে যাচ্ছিল, দু' হাত বাড়িয়ে বিকাশ ধরে ফেলে তার বেপথু পতনোন্মুখ শরীর

একটু পরে দু'হাতে বিকাশের মুখখানা তুলে ধরে চেয়ে চেয়ে দেখে রেবা। চোখের কোলে কালি পড়েছে বিকাশেরও, শীর্ণ হয়েছে লম্বাটে মুখ।

"একটা খোঁজও ত নিলে না" বলে উচ্ছ্বসিত কান্নায় বিকাশের বুকে ভেঙে পড়ে রেবা। বন্ধনমুক্ত কবরীগুচ্ছ সর্পিল ভঙ্গিমায় লুটিয়ে পড়ে ওর পিঠে। অভিমানের ভরা সমুদ্রতুফান উঠল যেন।

"কি করে নেব?" ওর পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বিকাশ বলে," তুমি যাবার পরেই ত বোম্বে যেতে হ'ল আমায় আপিসের কাজে। এই ত ফিরেছি, ফিরেই বেরুচ্ছিলাম আসানসোল যাবার জন্য।"

তার পর দিবাবলুপ্তি আর অন্ধকার, আর সুখের হিল্লোলে ভেসে ভেসে যাওয়া। আনন্দ বেদনার মিশ্র সম্মেলন।

সুটকেশ খুলে বিকাশ বার করে একটি ময়ূরকণ্ঠির মাদ্রাজী শাড়ি।

বোম্বাইয়ে খুব সস্তায় পেলাম। দামও তোমার ধনেখালি আর জর্জেটের মাঝামাঝি।

শাড়িখানা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে হাসি ফোটে রেবার মুখে, ধারাস্নাত শুভ্র মল্লিকার ওপর এক ঝলক চন্দ্রকিরণ পড়ল যেন।

বন্দনার প্রশ্ন তক্ষুণি আর তোলে না রেবা। ভাবে দুদিন যাক, আস্তে আস্তে বার করতে হবে সব কথা।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয় না। পরের দিনের ডাকে বৌদির চিঠিতে সব কথাই জানতে পারে রেবা।

বিকাশেরই দূর সম্পর্কের মামাতো বোন বন্দনা। আসানসোলে থাকবার সময়ে বিকাশই ওর চাকরী করে দিয়েছিল। মিথ্যাচরণটুকুর জন্য বৌদির ওপর যেন রাগ না করে রেবা।

চলোর্মি

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

ঢেউয়ের পরে ঢেউ তাথৈ ইতিহাস,
কোথাও কূল নাই শ্যামল সুষমায়,
আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চকিত সন্ত্রাস
তবুও হেলাভরে এ ভেলা ভেসে যায়।

কত যে শহরের প্রহর হ'লে সারা
বিবাগী জাহাজের বিধবা বন্দর!
রাতের হাতে আজ জ্বলে নি কোন তারা,
প্রলয়ে বিকিয়েছে বাহির ও অন্দর

হৃদয় পাল তুলে চলেছে দুলে দুলে
অজাত জগতের বিজন বীজ বয়ে,
কখন মহাকাল ধূসর জটা খুলে
বুদ্বুদে, দেখা দিবে চিকন চাঁদ লয়ে!

ঢেউয়ের পরে ঢেউ তাথৈ ইতিহাস!
ফাঁকির কর ঝড় নেবে ত ফানুসের,
ফেনায় দেনা শুধে যে বালু ক্রীতদাস,
প্রেমের নিশানেই নিশানা মানুষের।

মাতাল এ তুফানে মেলেছে ডানা গান,
শীকরে রঙে রঙে অরোরা-ঝোরা এল,
তনুর তনিমাতে তোমার শতখান
কামনা আপনারে এবার চিনে নিল।

এখানে কলরোল কবিতা নীলাকাশে
ঘুমিয়ে পড়ে ঢেউ সুরের বুকে সুর,
উতলা এলোকেশে স্বপন ঘিরে আসে
দ্বীপের দীপালিতে প্রদোষ ভরপুর।

নিমেষে নিঃশেষ নিখিল সংশয়
বেদনা দানা বাঁধা অশ্রু মাধুরীতে,
মরেছে যত কথা, তাইতো বাজে জয়,
ধন্য এ জীবন অধরা ধরণীতে।

শিল্পী-দরদী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সত্যিকারের কবি মন নিয়েই জন্মেছিলেন। তাই তিনি কেবলমাত্র কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হন নি। অপরপক্ষে প্রাচীন কবিওয়ালাদের দুষ্প্রাপ্য ও প্রায়-লুপ্ত গান সংগ্রহ করে এবং তা প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে গেছেন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কবিওয়ালা ও তাদের কবিগান এক অপরিহার্য্য অধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রেরই ঐকান্তিক চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের অনেক অমূল্য সম্পদ নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে।

—বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখা যাবে, তিনি শুধু কবিওয়ালাদের জীবনী এবং তাঁদের গান সংগ্রহ করেন নি—অত্যাচারিত চিত্রশিল্পীর দুঃখদুর্দ্দশা দর্শনেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কবিমন ব্যথার ভারে আক্রান্ত হয়েছে। এবং তাঁর নির্ভীক কবিমন একদিকে শিল্পীকে সান্ত্বনা দিয়েছে আর এক দিকে অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সুতীব্র কটাক্ষে তার স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছে।

কলুটোলানিবাসী দীননাথ দে একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই এই শিল্পের প্রতি তিনি অনুরক্ত হন। এবং বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার শেষে এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করতে থাকেন। এই ভাবে কিছুদিন যাবার পর প্রথমে বেনেট ও পরে রুডস সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়।[১] দীননাথ উক্ত শিল্পী-দ্বয়ের নিকট যথারীতি শিক্ষালাভ করেন এবং ক্রমশঃ বেশ দক্ষতা অর্জ্জন করেন। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলে-ছিলেন[২] :

"সুবিখ্যাত হডসন এবং রুডস প্রভৃতি চিত্রকরদিগের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির সহিত ইহার চিত্রের তুলনা করিলে কিছু মাত্রই বিভিন্নতা বোধ হইবে না। দৃষ্টিমাত্রই সকলে বোধ করিবেন যে, এতন্মধ্যে এক জনের হস্তেই এই প্রতিমূর্ত্তি লিখিত হইয়াছে।"[২]

কিন্তু পারিশ্রমিকের বেলায় এ দেশের শিল্পীর কপালে যে বিরাট শূন্য লাভ হয় তা বোধ করি অনেকেই জানেন এবং দরদী ঈশ্বরচন্দ্র বিলক্ষণ জানতেন। তাই তিনি (বাংলা ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫) সংবাদ প্রভাকরে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বাঙালী চিত্রশিল্পী ও তুলনায় ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের সম্পর্কে আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত লোকের মনোভাব বর্ণনাপ্রসঙ্গে যা বলেছিলেন আজও তার কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তিনি বলেছিলেন :

"কার্য্য বিষয়ে যথার্থ ই সমতুল্য, কিন্তু মূল্য বিষয়ে তুল্য নহে। কারণ ইহার উদর অতি ক্ষুদ্র, লম্বোদর নহে। 'অতি অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইয়া যথাযোগ্য পরিশ্রম করেন। সাহেবরা যেরূপ বেতন গ্রহণ করেন, ইনি তাহার চতুর্থাংশের একাংশ পাইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু কি পরিতাপ! কি আক্ষেপ! এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য জনেরা এই স্বদেশীয় সুযোগ্য ব্যক্তির উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কিছুমাত্রই মনোযোগ করেন না। ইংরাজেরা হডসন ও রুডস ভিন্ন কখনই বাঙালী চিত্রকরদিগে্যে ডাকিবেন না, কারণ স্বজাতির উন্নতি সাধন করা মানবের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়াই তাঁহারা বিবেচনা করেন। ইহাতে আমরা কদাচই তাঁহারদিগের উপর দোষার্পণ করিতে পারি না। ফলতঃ উপযুক্ত বাঙালী কারিকর থাকিতেও যে বাঙালী বাবুরা বিজাতীয় চিত্রকরকে আহ্বান পূর্ব্বক বিপুলবিত্ত প্রণামি দিয়া বিদায় করেন, ইহার পর আশ্চর্য্য আর কি আছে?"

উক্ত দীননাথ দে'র আত্মীয়েরা, এ দেশের চিত্রশিল্পীদের প্রতি দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের এই রকম বিমাতৃসুলভ ব্যবহারে নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হন। এবং শিল্পীকে অবিরত তাঁর পেশা পরিবর্ত্তনের জন্যে তাগিদ দিতেন এবং শেষ পর্য্যন্ত দীননাথ দে'কে অনেক লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হয়। এই খবর যে ভাবে হোক ঈশ্বরচন্দ্রের কানে আসে। যে মুহূর্ত্তে তিনি জানতে পারলেন যে, দীননাথ দে'র আত্মীয়েরা কেবলমাত্র শিল্পীর প্রতি নয় উপরন্তু চিত্রশিল্পের প্রতিও অযথা অশিক্ষিতজনোচিত মন্তব্য করেছেন তখন দরদী ঈশ্বরচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না। আত্মীয়েরা দীননাথকে বলেছিলেন :

'চিত্রবিদ্যা অতি উঞ্ছ বিদ্যা, এ বিষয়ের বৃত্তি অতি উঞ্ছ বিদ্যা। তুমি এই দণ্ডে এই কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া কেরাণীগিরি কর্ম্মে প্রযুক্ত হও, তাহা হইলে আমরা তোমাকে সুপারিস চিঠি দিতে পারি। তুমি এ কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে আমরা তোমার কোন উপকারই করিব না।'[৩]

—শিল্পীর জীবনে এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর নেই—এ কথা আমি অতি বিনীতভাবে কিন্তু জোর করেই বলতে পারি। ঈশ্বরচন্দ্রও ঠিক তেমনি বিনয় ও দৃঢ়তার সঙ্গে যা বলেছিলেন আজও কোন শিক্ষিত বাঙালী কি তার কোন সদুত্তর দিতে পারেন?—নিশ্চয় না। ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রসঙ্গে তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অতি সাধারণ এবং অশিক্ষিত জনের মনোভাবের যে তুলনামূলক চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তার মর্ম্মস্পর্শী আবেদন আজও ফুরোয় নি। আর, সে আবেদনের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে, বোধ হয় কেন নিশ্চয় ভাবে

এখনও অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত থাকবে। ঈশ্বরচন্দ্র উক্ত দীননাথ দে'র ঘটনা উপলক্ষ্যে লিখেছিলেন :

"কি চিত্র! এই চিত্র বর্ণনীয় কার্য্য হইল, হাঁ। এদেশের ভদ্র জাতিতে পূর্ব্বে এ কার্য্য করেন নাই বটে, কিন্তু এ কার্য্য কখনই ইতর কার্য্য নহে। ইহাকে উত্তম কার্য্যই বলিতে হইবে, কেন না চিত্রবিদ্যা বিদ্যার মধ্যে এক প্রধান বিদ্যা, পূর্ব্বতন হিন্দু রাজা প্রভৃতি প্রধান লোকেরা যত্নপূর্ব্বক চিত্রবিদ্যার অনুশীলন করিতেন। এইক্ষণে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সকল বিষয়েরি ভেদ হইয়াছে যাহা হউক, এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর উপস্থিত অবস্থায় মনুষ্য কোনোরূপ বিজ্ঞান বিদ্যার বলে স্বাধীন বৃত্তি দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, এমত প্রত্যাশা কোনমতেই করা যাইতে পারে না।

এইক্ষণে মনুষ্যের পক্ষে উপজীবিকার উপায়ের পথ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য। কেবল লেখনী ধরিয়া দাসত্ব করাতে সকলের সুপ্রতুলরূপে দিনপাত হইতে পারে না, কেননা, বিবিধ প্রকার বিড়ম্বনা বশতঃ আমারদিগের দিনপাতের পক্ষে ক্রমেই ব্যাঘাত হইয়া আসিতেছে। অতএব এই স্থলে স্বাধীন বৃত্তি ও আর আর প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা অর্থ আহরণ করাই বিশেষ বিধেয় হইতেছে। এবং স্বদেশীয় স্বজাতীয় যে কোন ব্যক্তি যে কোন বৃত্তি ও ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন, তাঁহার তদ্বিষয়ে সমাদর পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপ সাহায্য করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে। আমরা কেবল এই দীননাথের দিনপাতের নিমিত্তই লেখনী ধারণ করিয়াছি কেহ যেন এরূপ বিবেচনা না করেন, সকল বাঙালীর সকল প্রকার ব্যবসার বিষয়েই লিখিতেছি। ইদানীং অনেক বাঙালীরা ইমারৎ চিকিৎসালয়, পুস্তকালয় ও অন্যান্য অশেষবিধ কার্য্য করিতেছেন, কিন্তু দুঃখ এই যে, ভাগাধর ও অপরাপর বাঙালী বাবুরা তাঁহারদিগের উচিত মত আনুকূল্য করেন না। বড় বড় বড়মানুষের বাটীতে গিয়া দর্শন করি, গোরা মিস্ত্রীতে কর্ম্ম করিতেছে। কিন্তু সেই কর্ম্ম বাঙালীকে প্রদান করিলে তদপেক্ষা কত অল্প ব্যয়ে কার্য্য-নির্ব্বাহ এবং স্বজাতিকে সাহায্য করা হয়, ভ্রমেও একবার তাহা বিবেচনা করেন না, কেমন এক 'সাহেবী নেশা' কোনমতেই তাহা ছাড়িতে পারেন না, সাহেবেরা ছাই করিলেও সোনা কহিবেন, আর বাঙালীদিগের স্বর্ণকে ভস্ম কহিবেন। এইরূপ বাঙালীকৃত পুস্তকালয় প্রভৃতির প্রতিও কোন প্রকার উৎসাহ প্রদান করিবেন না। ইহাতেই সকলে পদে পদে মলীন ও ভগ্নোদ্যম হইয়া নিরুৎসাহে মনের দুঃখে অবসন্ন হইতেছেন।

উৎকল দেশীয় যে সকল অসভ্য লোক উপার্জ্জনার্থ এদেশে আগমন করিয়াছে, সেই উড়ে-মেড়োরাও স্বদেশীয় ভিন্ন পরদেশীয় লোকের সহিত আহার্য্য ব্যবহার্য্য কোন কার্য্যেরি সংযোগ সম্বন্ধ কখনই রাখেন না, উড়েরা উড়ে ধোবার নিকট কাপড় কাচায়, উড়ে নাপিতের নিকট মাতা কামায়, উড়ে গোয়ালার নিকট দুগ্ধ ক্রয় করে, উড়ে মুদি ও উড়ে ময়রার নিকট খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করে। অপিচ খোট্টারাও ঐ প্রকার সকল বিষয়ে খোট্টা ব্যতীত অন্যের সহিত সম্পর্ক রাখে না।"[৪]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সর্ব্বশেষে এদেশের শিক্ষিত জনের কাছে যে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং উক্ত দীননাথ দে'র চিত্রকর্ম্মের যে প্রশংসা করেছিলেন তা যথাযথ তুলে দিয়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করছি।

"এইক্ষণে বিনয়পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগে নিবেদন করিতেছি, সকলে দেশস্থ লোককে যথাসম্ভব সাহায্য দ্বারা উন্নত করিতে বিশেষরূপে যত্ন করুন।

উক্ত দীননাথ দের চিত্রকার্য্য আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করত চমৎকৃত হইয়াছি, তিনি সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগী শ্রীমান্ বাবু উমেশ-চন্দ্র দত্ত এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি অবিকল চিত্র করিয়াছেন, কোন অঙ্গের কিছুমাত্রই বৈলক্ষণ্য হয় নাই, অথচ বাবুর তদ্বিষয়ে তাদৃশ ব্যয় হয় নাই, অতএব যাঁহারা অনুরূপ চিত্রপটের প্রার্থনা করেন, তাঁহারা এই ব্যক্তিকে যেন আহ্বান করেন।"[৫]

কতখানি উদারহৃদয় ও কবিমন থাকলে এইভাবে শিল্পীর ব্যথায় সহানুভূতি জানানো এবং সমাজকে তার অন্যায় দেখিয়ে দেওয়ার মত সাহস পাওয়া যায়? সব চেয়ে বড় কথা, সেকালে এবং একালে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছাড়া আর কে আমাদের সমাজে সর্ব্বপ্রকারে লাঞ্ছিত অবহেলিত কবি ও শিল্পীর প্রতি এমন ভাবে শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন? সম্ভবত কেউ নন। তাই ঈশ্বরগুপ্ত শুধু কবি নন। সবচেয়ে বড় কথা—ঈশ্বরগুপ্ত যথার্থ শিল্পীদরদী।

১—৫। দ্রঃ সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রভাকর, ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫।
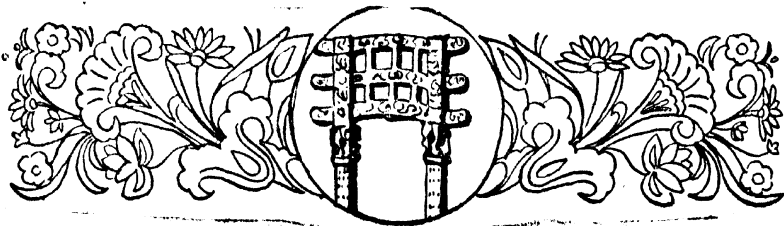
মন্দিরময় ভারত—গুহামন্দির

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

এলোরা ও খণ্ডগিরি-উদয়গিরি

প্রচারিত হয় যখন বুদ্ধের বাণী গঙ্গার উপত্যকায় রাজগৃহে আর সারনাথে, বাণী প্রচার করেন বর্দ্ধমান মহাবীরও। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ, অধীশ্বর তিনি ত্রিহুতের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জনপদের পরিচিত কুন্দন পুরা নামে। জননী তাঁর ত্রিশলা, এক ক্ষত্রিয়া রাজকুমারী, নিকটতম আত্মীয়া বৈশালীর অধিপতির, আত্মীয়া মগধেশ্বরেরও। মহাবীর বিবাহ করেন যশোধা নাম্নী এক ক্ষত্রিয়া রাজকুমারীকে, কিছুদিন ধাম্মিক গৃহস্থের জীবন যাপন করেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পরিত্যাগ করেন সংসার। ত্যাগ করেন স্নেহময় পিতামাতাকে, ছেড়ে চলে যান পরমা রূপবতী প্রিয়তমা পত্নীকেও। নিরাবরণ সন্ন্যাসীর বেশে তিনি ভ্রমণ করেন পূর্ব্ব-ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কিছুদিন সহবাসী হন সন্ন্যাসী গোপালার, শেষে নিযুক্ত হন কঠোর তপস্যায়। তপস্যা করেন দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর। ত্রয়োদশ বৎসরে তিনি জ্রীম্ভীকা গ্রামে উপনীত হন, আসন স্থাপন করেন ঋজু—পালিকা নদীর উত্তর পারে। লাভ করেন পরম জ্ঞান, কেবলীন জ্ঞান, হন কেবলীন, হন সর্ব্বজ্ঞ, হন জিনা, রিপু-বিজেতা, হন মহাবীর বা বিজয়ীও। গড়ে তোলেন এক সম্প্রদায়, পরিচিত নির্গ্রন্থ নামে। মানে না তারা কোন বাধা, গ্রাহ্য করে না বিঘ্ন। তিনি সেই সম্প্রদায়ের পুরোধা হন, প্রচার করেন তাঁর বাণী সারা পূর্ব্ব-ভারতে, অঙ্গে, মগধে, বিদেহ দেশে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর। শেষে বাহাত্তর বৎসর বয়সে, দক্ষিণ বিহারে, পাভাতে লাভ করেন মহানির্ব্বাণ, লাভ করেন সিদ্ধশিকা। তিরোহিত হন এক যুগাবতার, এক মহামানব। এই ঘটনা ঘটে খ্রীষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর আগে। কেউ বলেন পাঁচ শত আটাশ বৎসর আগে। জৈনধর্ম্ম নামে পরিচিত হয় তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম।

জৈনরা বলেন, মহাবীর চতুর্বিংশতি বা শেষ তীর্থঙ্কর, নন তিনি প্রথম প্রবর্ত্তক এই ধর্ম্মের। জন্মগ্রহণ করেন আরও তেইশ জন তীর্থঙ্কর। তাঁর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন আদিনাথ, অজিতনাথ, চন্দ্রপ্রভা, শান্তিনাথ, অনাথনাথ, সুপার্শ্বনাথ, মল্লিনাথ, নেমিনাথ প্রভৃতি। জন্মগ্রহণ করেন ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথও, তিনি ছিলেন বারাণসীর রাজকুমার। তাঁরা সকলেই এই ধর্ম্মের প্রচারক, প্রচার করেন যুগের পর যুগ। প্রচারিত হয় অহিংসা আর সত্য ভাষণের বাণী, হয় নির্লোভের আর মোহমুক্তির বাণী, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। মহাবীর যোগ করেন পঞ্চম বাণী—সে বাণী ব্রহ্মচর্যের বাণী। যুক্ত হয় তিনটি অনুশাসনও। অনুশাসন সংজ্ঞানের, সৎ বিশ্বাসের আর সৎ জীবনযাপনের। মানেন না তিনি বেদের অভ্রান্ততা, বিশ্বাস নাই তাঁর যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে, অবিশ্বাসী তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও। বিশ্বাসী তিনি শুধু মানবাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে। তবেই লাভ করবে জীব ঐশী শক্তি—করবে বিশ্বাস, কঠোর তপশ্চরণ ও অপরিসীম কৃচ্ছ্র সাধন দিয়ে, প্রবেশ করবে অনির্ব্বচনীয় আনন্দধামে। বলেন তিনি, তবেই হবে তাদের মোক্ষলাভ, পতিত হতে হবে না তাদের পূর্ব্বজন্মের আবর্ত্তে, মুক্ত হবে জন্মান্তরের কষ্ট থেকে।

বিভক্ত জৈনরাও দুইটি সম্প্রদায়ে—শ্বেতাম্বর, ভূষিত তারা শ্বেত অম্বরে বা বস্ত্রে। দিগম্বর—নাই তাদের কোন অম্বর বা বসন, নিরাবরণ বসনহীন তারা।

বৌদ্ধ আর হিন্দুদের অনুকরণে তাঁরাও নির্ম্মাণ সুরু করেন গুহামন্দির। নির্ম্মিত হয় উড়িষ্যায়—উদয়গিরি আর খণ্ডগিরিতে। নির্ম্মাণ করেন বৈকুণ্ঠ গুহা বা স্বর্গপুরী, হয় হাতি গুম্ফাও। প্রথম শ্রেণীর গুহামন্দির দিয়ে শোভিত করেন এলোরাকেও। নির্ম্মিত হয় ইন্দ্রসভা আর জগন্নাথসভা ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দ্রাবিড় স্থপতির আর ভাস্করের। খুব সম্ভব তাঁরা দ্রাবিড় স্থান থেকে শিল্পী আনিয়ে তাদেরই সাহায্যে এই দুইটি গুহামন্দির নির্ম্মাণ করেন—তাই এই বৈশিষ্ট্য। সৌরাষ্ট্রে, জুনাগড়েও আছে কয়েকটি জৈন গুহামন্দির। ছড়িয়ে আছে কিছু গুহামন্দির দাক্ষিণাত্যেও। তাই সীমাবদ্ধ তাঁদের দান।

অন্য মন্দিরে কিন্তু অপরিমিত তাঁদের দান। খুব সম্ভব, প্রাচীনতম জৈনমন্দির বুকে নিয়ে আছে দাক্ষিণাত্যের মেগুতি। নির্ম্মিত হয় এই মন্দিরটিও, অঙ্গে নিয়ে দ্রাবিড় পদ্ধতি, নিদর্শন দ্রাবিড় স্থাপত্যের, ছ'শ চৌত্রিশ খৃষ্টাব্দে চালুক্য রাজারা নির্ম্মাণ করেন।

মধ্যপন্থী তাঁরা হিন্দু আর বৌদ্ধদের ধর্ম্মে, তাই তাঁদের স্থাপত্য সমসাময়িক ও নিকটবর্ত্তী হিন্দু অথবা বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে গড়ে ওঠে। তীর্থস্থানে পরিণত হয় কয়েকটি পর্ব্বত, পরিণত হয় মহাতীর্থে, লাভ করে অমরত্ব, অপরূপ মন্দির অথবা মন্দিরের সমষ্টি দিয়ে শোভিত হয় সেই সব পরম পবিত্র শৈলমালার শীর্ষদেশ। নির্ম্মিত হয় কত জৈন বস্তি, কত চৈত্য, কত অরহৎ, বুকে নিয়ে সমসাময়িক হিন্দু অথবা বৌদ্ধ স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, প্রতীক এক এক গৌরবময় যুগের। রচিত হয় এক-একটি অলোক-সুন্দর শাশ্বত মন্দিরময় নগর। পূজিত হন সেই সব মন্দিরে তীর্থঙ্কর, হন আদিনাথ, শান্তিনাথ, মল্লিনাথ, পার্শ্বনাথ, মহাবীরও

হন। দলে দলে যাত্রী আসে, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে মন্দিরের অঙ্গের শিল্পসম্ভার, দর্শন করে তাদের গাত্রের মূর্তিসম্ভারও, ভক্তিভরে পূজা দেয় মন্দিরে, প্রতিষ্ঠিত তীর্থঙ্করকে, সফল হয় তাদের মনস্কাম, ধন্য হয় তাদের জীবন।

এমনই করে গড়ে উঠে কাথিওয়াড়ের পবিত্র শৈলমালার শীর্ষদেশে, পলিতনা নগরের দক্ষিণে, করলার বাসিতুকের উত্তর প্রান্তে সিতুরঞ্জয় বৃহত্তম আর সুন্দরতম মন্দিরময় নগর। বুকে নিয়ে আছে সিতুরঞ্জয় শত শত মন্দির, মণ্ডপ আর গর্ভগৃহ। এইখানে চৌমুখ মন্দিরে পূজিত হন আদিনাথ, প্রথম তীর্থঙ্কর। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়।

সিতুরঞ্জয়ের বিপরীত দিকে বিমলাবাসীতুকেও দাঁড়িয়ে আছে একটি অপরূপ মন্দির, বুকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ জৈন স্থাপত্যের নিদর্শন। পূজিত হন এই মন্দিরেও আদিশ্বর। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি শৈলমালার পবিত্রতম প্রদেশে, তাই পরম পবিত্র এই মন্দিরটি, মহাতীর্থে পরিণত হয় বিমলাবাসীতুকও! প্রাচীনতরও এই মন্দির নির্ম্মিত হয় ৯৬০ খৃষ্টাব্দে। সংস্কৃত হয় ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে।

কাথিওয়াড়েই প্রখ্যাত জুনাগড়ের নিকটে, গির্ণারের গিরি শিখরেও অনুরূপ একটি শাশ্বত মন্দির নগর রচিত হয়। নির্ম্মিত হয় সেখানে নেমিনাথের মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, একশ' নব্বই ফুট দীর্ঘ ও একশ' ত্রিশ ফুট প্রস্থ প্রাঙ্গণের মধ্যে। মন্দিরটির পরিধি একশ' কুড়ি ফুট দীর্ঘ আর ষাট ফুট প্রস্থ। নির্ম্মিত হয় তেত্তাল্লিশ ফুট স্কোয়ার একটি অপরূপ মণ্ডপ। বিভক্ত সেই মণ্ডপের অভ্যন্তর ভাগ বেদী ও গলিপথে। বাইশটি অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে পৃথক করা হয়েছে চারিদিকের গলিপথকে, মণ্ডপের কেন্দ্রস্থল থেকে। একটি বিমানও রচিত হয়েছে। বুকে নিয়ে আছে মণ্ডপটি আর তার বিমানের ও স্তম্ভের অঙ্গ অনুপম শিল্পসম্ভার।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নির্ম্মিত হয় আরও একটি মন্দির গির্ণারে, পরিচিত বাস্তুপাল তেজপাল মন্দির নামে। গুজরাটের অধিপতিরা নির্ম্মাণ করেন। পূজিত হন সেই মন্দিরে তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ। তিনটি মন্দিরের সমষ্টি এই মন্দিরটি সংযুক্ত হয়। কেন্দ্রস্থলের একটি মণ্ডপের সঙ্গে, চতুর্থ দ্বারে প্রবেশপথ। নির্ম্মিত হয় আবু পর্ব্বতের শীর্ষদেশেও বিমলা ও তেজপালের মন্দির।

আরও কয়েকটি পবিত্র নগর গড়ে ওঠে, নির্ম্মিত হয় মন্দির সেই সব নগরেও। কিন্তু সমতুল্য নয় সেই সব মন্দির কাথিওয়াড়ের আর গির্ণারের মন্দিরের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্বে আর মহিমময়ত্বে। নিকৃষ্ট অনুকরণ তার, নাই স্থপতির মহিমময় পরিকল্পনা, নাই অনবদ্য, সুন্দরতম রূপদানও। গড়ে ওঠে মধ্য ভারতে, দাতিয়ার কাছে, সোনার গড়ে, মধ্য প্রদেশে, দামো জেলায়, কুন্দনপুরে, পঞ্চাশটি মন্দির। মন্দির নির্ম্মিত হয় বেরারে, গোয়ালগড়ের নিকটে, মুক্ত গিরিতে আর বিহারে পরেশনাথের শীর্ষদেশে।

এই সমস্ত পবিত্র নগর ছাড়াও অপরূপ, মহিমময় মন্দির নির্ম্মিত হয় পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে। বুকে নিয়ে আছে এই সব মন্দির অনবদ্য জৈন শিল্পসম্ভার, প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণ। নির্ম্মিত হয় আদিনাথের চৌমুখ মন্দির মাড়োয়ারের সদারির কাছে রনপুরে। ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ধরণক এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। খুব সম্ভব বৃহত্তম জৈনমন্দির, এই আদিনাথের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে চ'ল্লিশ হাজার স্কোয়ার ফুট পরিধি নিয়ে। আছে এই মন্দিরে ঊনত্রিশটি সুপ্রশস্ত মণ্ডপ, শোভিত হয়ে আছে চারিশত কুড়িটি নিখুত সুন্দরতম স্তম্ভ নিয়ে। বিভিন্ন তাদের গঠনপদ্ধতি, বিভিন্ন তাদের অঙ্গের শিল্পসম্পদ আর অলঙ্করণও। একটি সুউচ্চ মঞ্চের উপর উচু প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে মন্দিরটি। অনুরূপ এই প্রাচীরটি, দুর্গের প্রাচীরের, বাড়ে মন্দিরের নিরাপত্তা। নির্জ্জনতম হয় মন্দির, হয় নিভৃততমও। সেই নির্জ্জনে, নিভৃতে নিরাপদ, মহাশক্তির পরিবেশে বসে জৈন তীর্থযাত্রীরা পূজা করেন তীর্থঙ্করকে, করেন দেবতাকে। বিভিন্ন অলঙ্করণে অলঙ্কৃত প্রাচীরের গাত্রও। রচিত হয় ছেষট্টিটি প্রকোষ্ঠ। অপরূপ সুশোভন চূড়া দিয়ে শোভিত করা হয় তাদের শীর্ষদেশও। তাদের পিছনেও শোভা পায় সুউচ্চ চূড়া আর কুপলার শ্রেণী। অপরূপ, মহিমময় এই দৃশ্য। পাঁচটি শিখারাও নির্ম্মিত হয়, বৃহত্তম আর সুন্দরতম। তাদের মধ্যে কেন্দ্রস্থলের প্রধান মন্দিরের শীর্ষদেশের শিখারাটি সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে, প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণে। শীর্ষে নিয়ে আছে কুড়িটি মণ্ডপ, কুড়িটি সুষ্ঠু-গঠন নয়নাভিরাম গম্বুজ।

প্রাচীরের তিন দিকে, কেন্দ্রস্থলে তিনটি দ্বিতল প্রবেশদ্বার, দাঁড়িয়ে আছে বুকে নিয়ে সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, বৃহত্তম ও সুন্দরতম। তাদের মধ্যে পশ্চিম দিকেরটি প্রবেশদ্বার প্রধান মন্দিরের। প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকে অনেকগুলি স্তম্ভযুক্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে মূল মন্দিরে উপনীত হতে হয়। বেষ্টিত হয়ে আছে মূল মন্দিরটি অসংখ্য ক্ষুদ্র মন্দির আর উপাসনা মন্দির দিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে তারা এক একটি পঁচানব্বই ফুট প্রস্থ আর একশ' ফুট দীর্ঘ আয়তনক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে। সঙ্গে নিয়ে আছে প্রধান মন্দিরটি একটি সুপ্রশস্ত মণ্ডপ। শোভা পায় সেই মণ্ডপে একশ'টি সুষ্ঠু-গঠন অনবদ্য স্তম্ভ, বুকে নিয়ে সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। দ্বিতল এই মন্দিরটি, গর্ভগৃহে বিরাজ করেন শ্বেত মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত আদিনাথ, প্রথম তীর্থঙ্কর। মহামহিমময় এই মন্দিরের পরিকল্পনা, অনবদ্য সূক্ষ্মতম রূপদান, প্রতীক এক মহাগৌরবময় সৃষ্টির, এক অক্ষয় কীর্ত্তির।

খ্রীষ্টের জন্মের তিনশ'নয় বছর পূর্ব্বে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে যুদ্ধ বাধে প্রথম তীর্থঙ্কর পুরুদেব বা আদিনাথের পুত্র গোমতেশ্বরের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা ভারতের। পরিচিত গোমতেশ্বর বহুবলী নামেও। পরাজিত হন গোমতেশ্বর। রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করে কয়েকজন ভক্ত অনুচর সঙ্গে নিয়ে তিনি আশ্রয় নেন এসে সুদূর দাক্ষিণাত্যে, শ্রাবণবেল গোলাতে, মহীশূর শহর থেকে বাষট্টি মাইল দূরে। দুই দিকে প্রায় চার হাজার ফুট উচু স্ফটিকের মহাপবিত্র শৈলমালা চন্দ্রগিরি আর বিন্ধ্যগিরি বা ইন্দ্রবেটা, পদতলে একটি

বৃহৎ ত্রিকোণ স্বচ্ছ সরোবর বা বেলগোলা, প্রকৃতির এক সুন্দরতম পরিবেশে এক লীলাভূমিতে অবস্থিত এই শ্রাবণবেল গোলা। তিনি নিযুক্ত হন কঠোর তপস্যায়, হন সন্ন্যাসী। শেষে অনাহারে মৃত্যু-বরণ করে তিনি সিদ্ধপুরুষে পরিণত হন। এক মহাতীর্থে পরিণত হয় শ্রাবণবেল গোলাও। ভ্রাতা এই খবর অবগত হন। ভ্রাতার স্মৃতির পূজার জন্য তিনি নির্ম্মাণ করেন এখানে একটি পাঁচশ' পঁচিশ ধনু পরিমাণ উঁচু ভ্রাতার এক প্রতিমূর্ত্তি। ক্রমে সর্পের আলয়ে পরিণত হয় এই স্থান, হয় অনতিক্রম্য। শেষে লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হয় মূর্ত্তি, অদৃশ্য হয়ে যায় একেবারে।

আসে ৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ, মহীশূরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন গঙ্গ-বংশীয় রাজমল্ল। চামুণ্ডারায় নিযুক্ত হন তাঁর মন্ত্রী। বাসনা জাগে চামুণ্ডারায়ের অন্তরে এই মূর্ত্তি দর্শন করবার। কিন্তু সফল হয় না তাঁর বাসনা, সম্ভব হয় না মূর্ত্তি দর্শন। তখন তিনি মহা-পবিত্র বিন্ধ্যগিরির শীর্ষদেশে তিন হাজার তিন শত সাতচল্লিশ ফুট উচুতে নির্ম্মাণ করান সাতান্ন ফুট উঁচু গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি। পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্ত্তি, বৃহত্তর মিশরের রামেসিসের মূর্ত্তির চাইতেও, দাঁড়িয়ে আছেন দিগম্বর গোমতেশ্বর এক মহামহিমময় মূর্ত্তিতে। রচিত হয় বিন্ধ্যর স্ফটিকের অঙ্গও, পাঁচ শত সোপানশ্রেণী, হয় একটি অলিন্দ আর তেতাল্লিশটি ক্ষুদ্র মন্দিরও। বিরাজ করেন এই সব মন্দিরে এক একজন তীর্থঙ্কর। একটি প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত এই সব ক্ষুদ্র মন্দির আর গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি। আসে দলে দলে জৈন তীর্থযাত্রী, হাজারে হাজারে আসে ভারতের প্রান্ততম প্রদেশ থেকেও আসে, নিবেদন করে শ্রদ্ধার অঞ্জলী, পূজা করে গোমতেশ্বরকে, করে তীর্থঙ্করদেরও। প্রতি চতুর্দ্দশ বৎসরে অনুষ্ঠিত হয় এখানে, দেবতা গোমতেশ্বরের মস্তক অভিষেকের উৎসব মুখরিত হয় শ্রাবণবেল গোলা লক্ষ লক্ষ যাত্রীর কোলাহলে। রচিত হয় একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে একটি প্রবেশপথও, পরিচিত অখণ্ড বাগিলু নামে। বুকে নিয়ে আছে এই প্রবেশপথটি ও সুন্দর শিল্পসম্ভার। লিন্‌টেলের উপর উপবিষ্টা গজলক্ষ্মী, তাঁর দু'পাশ থেকে দুই হস্তী তাঁকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে।

বস্তি বা জৈন মন্দির দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে পবিত্র ঋষি-গিরি বা চন্দ্রগিরির শীর্ষদেশও। বুকে নিয়ে আছে এই বস্তিগুলি ও দ্রাবিড় স্থাপত্যের সুন্দর প্রতীক। এই বস্তিগুলি অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়, হয় শান্তিনাথ বস্তি, সুপার্শ্বনাথ বস্তি, পার্শ্বনাথ বস্তি ও আরও অনেক বস্তি। বৃহত্তম ও সুন্দরতম তাদের মধ্যে চামুণ্ডারায়ের বস্তি। ৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে চামুণ্ডারায় নির্ম্মাণ করেন এই বস্তিটি। বিরাজ করেন এই বস্তিতে বিংশতি তীর্থঙ্কর নেমিনাথ। বুকে নিয়ে আছে এই বস্তিটি দ্রাবিড় স্থাপত্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের—স্থপতির আর ভাস্করের সুন্দরতম দান।

বুকে নিয়ে আছে শ্রাবণবেল গোলাও অনেকগুলি বস্তি। সুন্দরতম তাদের মধ্যে ভাণ্ডারী বস্তি। ১১৩১ থেকে ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, হোয়সল রাজা প্রথম নরসিংহের ভাণ্ডারী, হুল্ল, এই বস্তিটি নির্ম্মাণ করেন। বিরাজ করেন এই বস্তির গর্ভগৃহে চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর। বস্তির প্রবেশপথে একটি অপরূপ মনোস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, বুকে নিয়ে সুন্দরতম অলঙ্করণ। বুকে নিয়ে আছে অক্কানা বস্তি, ও সুন্দর হোয়সল স্থপতির দান। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে পার্শ্বনাথ বিরাজ করেন, তাঁর শিরে শোভা পায় একটি সপ্তফণাযুক্ত সর্প। আছে সিদ্ধান্ত বস্তি আর নগর জিনালয়, হোয়সল রাজ দ্বিতীয় বল্লালের মন্ত্রী নাগদেব নির্ম্মাণ করেন। নির্ম্মিত হয় একটি জৈনমঠ বা বিহারও, বাস করতেন সেখানে জৈনগুরুরা। অলঙ্কৃত সেই বিহারের প্রাচীরের গাত্র অনবদ্য অঙ্কনচিত্র দিয়ে। চিত্র দিয়ে বর্ণিত হয় জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনী, কাহিনী জৈনরাজাদেরও।

তিনটি মন্দিরের সমষ্টি দিয়ে রচিত এই ইন্দ্রসভা, ত্রয়স্ত্রিংশৎ মন্দির একেবারে, দুইটি দ্বিতল ও একটি একতলা। তাদের মধ্যে প্রথমটি ইন্দ্রসভা নামে পরিচিত। আছে কয়েকটি উপাসনা মন্দিরও।

একটি প্রস্তরের পর্দা অতিক্রম করে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। বাইরে, পূর্ব্বদিকে উপাসনা মন্দির, শোভিত তার সম্মুখভাগ দুইটি সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে। পিছনেও দুইটি অপরূপ স্তম্ভ দেখি। প্রাচীরের গাত্রে, উত্তর প্রান্তে, এক-একটি ত্রয়বিংশতি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি। দিগম্বর সেই মূর্ত্তিগুলি, নাই কোন বসন তাদের অঙ্গে, শোভা পায় তাদের শিরে সর্পের ফণা, বিস্তৃত ছত্রাকারে। তাদের দুই পাশেও দুই অর্দ্ধ নাগিনী ধারণ করে আছে ছত্র। তাদের দুইদিকে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি। বামপ্রান্তে দুই জন পূজারী বসে আছেন।

দক্ষিণপ্রান্তে উপবিষ্ট দিগম্বর গোমাতা বা গোমতেশ্বর। একটি লতা তাঁর বাহু বেষ্টন করে আছে। সঙ্গে আছেন নারী-সহচরী আর পূজারী। ধ্যানময় তাঁরা সবাই।

পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে বৃক্ষের নীচে হস্তীপৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র বসে আছেন। সঙ্গে আছেন পত্নী ইন্দ্রাণী ও দু'জন সহচরী।

মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃহে বেদীর উপর মহাবীর বিরাজ করেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দেখি, দক্ষিণে মঞ্চের উপর একটি অতিকায় হস্তী দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে একটি সাতাশ ফুট উঁচু মনোস্তম্ভ। রচিত এই এক-প্রস্তর স্তম্ভটি একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে, তার শীর্ষে শোভা পায় একটি চৌমুখের মূর্ত্তি। অঙ্গে নিয়ে আছে স্তম্ভটি অপরূপ শিল্পসম্ভার। প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে, মণ্ডপের উপর চারিটি মহাবীরের মূর্ত্তি, স্কন্ধে নিয়ে সিংহাসন। সিংহাসনের চার কোণে চারিটি সিংহ আর চক্র। অনুরূপ এই সিংহাসনগুলি বৌদ্ধ গুহা-মন্দিরের সিংহাসনের। প্রাঙ্গণের পশ্চিমপ্রান্তে একটি সভাগৃহ নির্ম্মিত হয়েছে। শোভিত তার সম্মুখভাগও দুই অনবদ্য, সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে। সভাগৃহের ভিতরেও চারিটি সুন্দর স্তম্ভ।

কেন্দ্রস্থলের সুপ্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করে দেখি, অলঙ্কৃত প্রাচীরের গাত্র ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি দিয়ে। তাঁর বিপরীত

দিকে, পদতলে কুকুর আর হরিণ নিয়ে গোমাতা। আছে তিনটি মহিমময় গোমাতার মূর্তি শ্রাবণবেল গোলাতে, কারিকালায় আর ভেনুরেও। পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে শোভা পান ইন্দ্র, সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রাণী। গর্ভগৃহে, সিংহাসনে মহাবীর বিরাজ করেন, তাঁর শিরে তিনটি ছত্র। অপরূপ সুষ্ঠুগঠন, জীবন্ত এই মূর্তিগুলি, শ্রেষ্ঠ দান জৈন-ভাস্করের। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি।

নীচের তলায় সুপ্রশস্ত কক্ষটিতে প্রবেশ করি। দেখি একটি পর্দা দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে তার অলিন্দ, দুইটি অংশে। অলিন্দ অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। বুকে নিয়ে আছে এই সভাগৃহটি বারোটি সুন্দরতম স্তম্ভ, রচিত এক-একটি সম্পূর্ণ প্রস্তর কেটে। সম্মুখের অলিন্দের বাম পাশে ষোড়শ তীর্থঙ্কর, শান্তিনাথের দুইটি মহিমময় দিগম্বর মূর্তি দেখি। দাঁড়িয়ে আছে মূর্তি দুইটি উদ্গত স্তম্ভের উপর। বুকে নিয়ে আছে উদ্গত স্তম্ভ দুইটিও সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ। তাদের একটির অঙ্গের শিলালিপিতে লেখা আছে, শৈল নামে একটি জৈন ব্রহ্মচারী এই মূর্তিটি নির্মাণ করেন। নবম আর দশম শতাব্দীতে এই লিপি প্রচলিত ছিল।

সভাগৃহ অতিক্রম করে আমরা একটি উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করি। আছে সেই উপাসনা মন্দিরেও একটি গর্ভগৃহ। শোভিত সেই উপাসনা মন্দির কত বিভিন্ন শোভন গঠনমূর্তি দিয়ে। গর্ভগৃহে এক মহামহিমময় দিগম্বর তীর্থঙ্কর বিরাজ করেন। তাঁর নীচেও এক খোদিত লিপিতে লেখা আছে, নির্মাণ করেন এই মূর্তিটি নাগবর্ম্মা।

অলিন্দের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত প্রস্তর-নির্মিত সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হই। দেখি, অনবদ্য, সুষ্ঠু-গঠন মূর্তি দিয়ে অলঙ্কৃত প্রাচীরের গাত্র। দক্ষিণে পার্শ্বনাথ উপবিষ্ট, বামে গোমাতা, পশ্চাতে ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র। মন্দিরের ভিতরে গর্ভগৃহে, সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন মহাবীর। একটি অলিন্দে পৌঁছাই, সংযুক্ত এই অলিন্দটি প্রধান সভাগৃহের সঙ্গে। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি তার ছাদের অঙ্গের অতুলনীয় অঙ্কন-চিত্রের ধ্বংসাবশেষ। ভূষিত ছিল এই অলিন্দের প্রাচীরের গাত্র আর ছাদের অঙ্গ অনবদ্য চিত্রসম্ভারে, প্রজ্জ্বলিত ছিল বর্ণ সুষমায় আর প্রকৃষ্টতম গঠন সৌষ্ঠবে। প্রদীপ্ত ছিল সমস্ত অলিন্দটি। আজ অবশিষ্ট আছে শুধু কয়েকটি বিভিন্ন অংশ, বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে চারিদিকে—সাক্ষি তাদের পূর্ব্ব গৌরবের। দেখি, অলিন্দের সম্মুখভাগের দুই প্রান্তদেশে দুইটি অর্দ্ধভগ্ন চতুষ্কোণ স্তম্ভ। তার সঙ্গে উদ্গত স্তম্ভ, নীচু প্রাচীর দিয়ে যুক্ত হয়েছে। পশ্চাতদিকেও দুইটি স্তম্ভ দেখি, চতুষ্কোণ তাদের নিম্নতম প্রদেশ, ষোল কোণ দণ্ড আর শীর্ষদেশ স্তম্ভ দিয়ে অলিন্দকে সভাগৃহ থেকে পৃথক করা হয়েছে। বেষ্টিত দেখি সভাগৃহের অভ্যন্তরও বারোটি স্তম্ভ দিয়ে, বিভিন্ন তাদের প্রতিটির গঠনপদ্ধতি। সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে এই স্তম্ভগুলি অনবদ্য সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে, বুকে নিয়ে আছে জৈন-স্থপতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাদের সুন্দরতম দান। সাড়ে চৌদ্দ ফুট উঁচু এই অলিন্দের দুই প্রান্তদেশ শোভা করে আছেন ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণী, আছেন মহামহিমময় মূর্তিতে, একজন বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন অপরজন আম্র বৃক্ষের। অনেকগুলি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত দুই পাশের প্রাচীরের গাত্র, বিভক্ত গলিপথের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রও। শোভিত সেই সব প্রকোষ্ঠ, এক এক তীর্থঙ্করের মূর্তি দিয়ে। কেন্দ্রস্থলে সিংহাসনে উপবিষ্ট এক তীর্থঙ্কর, মহিমময় তাঁর মূর্তি। মন্দিরের দ্বারে উদ্গত স্তম্ভের উপর একদিকে পার্শ্বনাথ, অপরদিকে গোমাতা, তাঁরা এক-একটি বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। এই বটবৃক্ষের নীচে বসেই সিদ্ধার্থ পরম জ্ঞান লাভ করেন, হন মহাজ্ঞানী, হন বুদ্ধ। তারই প্রতীক এই বটবৃক্ষ। গন্ধর্ব্বরাও আছেন হস্তে নিয়ে মালা। দ্বারের দুই দিকে দুই দিগম্বর দ্বারপালও উদ্গত স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাশে মহাবীর বসে আছেন। কত বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে শোভিত করা হয়েছে দ্বারের অঙ্গও। বারো ফুট উঁচু মন্দিরের গর্ভগৃহে সিংহাসন আলো করে আছেন মহাবীর।

অলিন্দ অতিক্রম করে সভাগৃহে প্রবেশ করি। দেখি, কেন্দ্রস্থলে চতুর্মুখ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মস্তকের উপর ছাদের অঙ্গে শোভা পায় একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। ধ্বংসে পরিণত হয়েছে এই মূর্তিটি।

দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্তের একটি দ্বার অতিক্রম করে, একটি কক্ষে উপস্থিত হই। চারিদিকে বহু জৈনসাধুর মূর্তি দেখি। আরও একটি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করি। সামনে নিয়ে আছে এই কক্ষটি একটি অলিন্দ। অলিন্দের দক্ষিণে, কুলুঙ্গির ভিতর গোমাতার মূর্তি, বামে পার্শ্বনাথ, দক্ষিণ-প্রান্তদেশে দেবরাজ ইন্দ্র, তিনি বামহস্তে ধারণ করে আছেন একটি আধার, দক্ষিণহস্তে পুষ্প। ইন্দ্রের দিকে মুখ করে, প্রবেশপথে ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে আছেন। বুকে নিয়ে আছে কক্ষটি চারিটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ, বৃত্তাকার তাদের শীর্ষদেশ। অনবদ্য এই স্তম্ভগুলিও। গর্ভগৃহের দুই পাশে দুই দিগম্বর দ্বারপাল, প্রহরী তারা মন্দিরের। দেখি ছাদের অঙ্গেও অবশিষ্ট কিছু চিত্রসম্ভার, পরিচায়ক পূর্ব্ব গৌরবের।

উত্তর-পূর্ব্বপ্রান্তের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ অতিক্রম করে আমরা একটি মন্দিরে প্রবেশ করি। দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটি পশ্চিমপ্রান্তে। সাজিয়েছেন স্থপতি তাঁর সম্মুখ ভাগও অপরূপ সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে, অলঙ্কৃত করেছেন ভাস্কর সুষ্ঠু-গঠন, জীবন্ত মূর্তিসম্ভার দিয়েও। তুলনাহীন এই মূর্তিগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব, শ্রেষ্ঠ দান জৈনভাস্করের, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সৃষ্টি এক মহা গৌরবময় যুগের। প্রবেশপথের দক্ষিণপাশে একটি চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি দেখি। তাঁর দুই হস্তে শোভা পায় দুইটি চক্র, তৃতীয় হস্তে তিনি ধারণ করে আছেন একটি বজ্র। বামপাশে ময়ূরবাহনে অষ্টভুজা সরস্বতী, অনুরূপ এই কক্ষটি পূর্ব্বপ্রান্তের কক্ষের, বিভিন্ন শুধু তার কেন্দ্রস্থলের স্তম্ভের শীর্ষদেশের গঠন, রচিত হয় আনমিত কর্ণের আকৃতিতে, বৃত্তাকার নয়। কক্ষের ভিতরে পার্শ্বনাথ বসে আছেন, আছেন গোমাতা আর ইন্দ্র, সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রাণী। ছত্রধারী নাগ

আর নাগিনীরাও আছেন। বসে আছেন যে-যার নির্দিষ্ট স্থানে। আলো করে আছেন সমস্ত কক্ষটি। অনুপম শোভন তাঁদের গঠনভঙ্গিমাও, জীবন্ত, রচনা করেন ভাস্কর হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে মনের সবখানি মাধুরী, তাই লাভ করে তারা শ্রেষ্ঠত্ব, হয় সুন্দরতম। সফলকাম হন ভাস্কর আর স্থপতিও সম্পূর্ণ, রূপ পরিগ্রহ করে তাঁদের বহু শত বৎসরের অক্লান্ত সাধনা, লাভ করে পূর্ণ পরিণতি, রচিত হয় ইন্দ্রসভা, এক স্বপ্নলোক, এক রহস্যপুরী। হন তাঁরা বিশ্বজিৎ।

শ্রদ্ধাবনত মস্তকে শিল্পীদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসি, অক্ষয় হয়ে থাকে মনের মণি-কোঠায়, তার স্মৃতি হয় না ম্লান।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে জগন্নাথ সভায় প্রবেশ করি। প্রাঙ্গণের পশ্চিমপ্রান্তে রচিত হয়েছে একটি কক্ষ, দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে দুইটি বৃহৎ চতুষ্কোণ স্তম্ভ। দেখি কেন্দ্রস্থলেও চারিটি স্তম্ভ, অনুরূপ ইন্দ্রসভার স্তম্ভের গঠনে, সৌন্দর্য্যে আর অঙ্গের শিল্পসম্ভারে। এখানেও দক্ষিণে পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি দেখি, বামে গোমাতার বা গোমতেশ্বরের, মন্দিরে মহাবীর বিরাজ করেন। অলিন্দের দুই প্রান্তে ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণী। স্তম্ভের অঙ্গের কেনারিজ ভাষায় লিখিত খোদিত লিপিতে লেখা আছে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই উপাসনা মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়।

বিপরীত দিকেও একটি উপাসনা মন্দির দেখি। ভিতরে প্রবেশ করে একটি অতি সুন্দর প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হই। অলঙ্কৃত হয়ে আছে এই প্রকোষ্ঠটিও অনবদ্য, সুন্দরতম মূর্ত্তিসম্ভার নিয়ে। অনুরূপ এই মূর্ত্তিগুলি ইন্দ্রসভার মূর্ত্তির, গঠন-গরিমায় ও শিল্পসম্পদে।

প্রাঙ্গণের পিছনে একটি গুহায় প্রবেশ করি। দেখি, তার ভিতরেও সম্মুখের গলিপথের দুই প্রান্তে সপরিষদ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী, এক একটি বৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। অনবদ্য তাঁদের গঠন-সৌষ্ঠবও, দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। বুকে নিয়ে আছে গলিপথটিও কয়েকটি অপরূপ শোভন-গঠন স্তম্ভ। চতুষ্কোণ সামনের সারির স্তম্ভগুলি বাঁশীর আকারে রচিত তাদের শীর্ষদেশ। চতুষ্কোণ পিছনের সারির স্তম্ভগুলিরও ষোল কোণ তাদের শীর্ষদেশ। কেন্দ্রস্থলের চতুষ্কোণ স্তম্ভগুলি শীর্ষে নিয়ে আছে আনমিত কর্ণ। দেখি মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি অপরূপ আচ্ছাদিত তোরণ। সংযুক্ত সেই তোরণটি একটি চন্দ্রাতপের সঙ্গে। বুকে নিয়ে আছে চন্দ্রাতপ আর তোরণ সূক্ষ্মতম অলঙ্করণ, শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের প্রতীক। এখানেও গর্ভগৃহে বিরাজ করেন গোমাতা আর পার্শ্বনাথ, সঙ্গে নিয়ে পরিষদবর্গ।

প্রবেশপথের পূর্ব্বদিকেও একটি উপাসনা মন্দির দাঁড়িয়ে আছে। সেই মন্দিরের দুই প্রান্তে মহাবীর আর শান্তিনাথ, তাঁদের পিছনে গোমাতা আর পার্শ্বনাথ দাঁড়িয়ে আছেন।

সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে একটি সুপ্রশস্ত সভাগৃহে প্রবেশ করি। বুকে নিয়ে আছে এই সভাগৃহটিও বারোটি নিখুঁত সুষ্ঠু-গঠন স্তম্ভ। বিভিন্ন তাদের উচ্চতা—কোনটি তের ফুট দশ ইঞ্চি, কোনটি সাড়ে চোদ্দ ফুট, বিভিন্ন তাদের আকৃতিও—কারও চতুষ্কোণ পাদদেশ আর বৃত্তাকার শীর্ষদেশ, কেউ চতুষ্কোণ শিরে নিয়ে আছে গদি। বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অনুপম, সূক্ষ্মতম অলঙ্করণও, শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি জৈনস্থপতির। দাঁড়িয়ে আছে দুইটি সুন্দর স্তম্ভ গুহার সম্মুখভাগেও শৈলমালার অঙ্গে। দেখি খোদিত সভাগৃহের পঞ্চাশটি মহাবীরের মহিমময় মূর্ত্তি, দশটি পার্শ্বনাথের মূর্ত্তিও দেখি। অঙ্কিত দেখি তাদের মস্তকের উপর অনেকগুলি জৈনমূর্ত্তি। পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রে ইন্দ্র আর ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি, দ্বারে দাঁড়িয়ে দুই দ্বারপাল, নাই তাদের অঙ্গে কোন বসন। মন্দিরের গর্ভগৃহে সিংহাসন অলঙ্কৃত করে আছেন জিতেন্দ্রিয় মহাবীর, তাঁর শিরে শোভা পায় তিনটি ছত্র, পদতলে পাশাপাশি উপবিষ্ট মৃগ আর সারমেয়। সিংহাসনের সামনে চারিটি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। শোভন-গঠন এই মূর্ত্তিগুলিও, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জৈনভাস্করের অমর কীর্ত্তি। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে। স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা জানাই।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে শৈলমালার শীর্ষদেশে উপনীত হই। দেখি, মহামহিমময় মূর্ত্তিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট ষোল ফুট উঁচু পার্শ্বনাথ ও তাঁর দক্ষিণে আর বামে ভক্তের দল। দেখি উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি তাঁর সিংহাসনের অঙ্গে। খোদিত এই লিপিটি ১২৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। উল্লিখিত আছে তাতে "জয়যুক্ত হক প্রসিদ্ধ ১১৫৬ শকাব্দ, হোক পরম স্মরণীয়। ঐ দিন শ্রীবর্দ্ধন-পুরাতে রঙ্গিনী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র গালুগী বিবাহ করেন স্বর্ণকে। জন্মগ্রহণ করেন চক্রেশ্বর ও আর তিন পুত্র স্বর্ণের গর্ভে। মহাদানশীল চক্রেশ্বর, তিনিই চারণ পরিক্রমিত এই মহাপবিত্র শৈলমালার শীর্ষদেশে, নির্ম্মাণ করেন পার্শ্বনাথের এই মহামহিমময় মূর্ত্তিটি। মুক্ত হয় তাঁর কর্ম্মের বন্ধন। নির্ম্মাণ করেন তিনি আরও অনেক জৈনসাধুদের পবিত্র মূর্ত্তি এই চরণদ্রী গিরিশিখরে। মহা-তীর্থে পরিণত হয় চরণদ্রী, সমপর্য্যায়ে পড়ে মহাপবিত্র কৈলাসের, পরিণত করেন ভারত। তিনি বিশ্বাসের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি, পূত আর দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিপূর্ণ তাঁর হৃদয়। তিনি দয়ার অবতার, একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমে, দানে কল্পতরুর সমান। চক্রেশ্বর রক্ষাকর্ত্তা পবিত্র জৈনধর্ম্মের, পরিণত হন তিনি পঞ্চম বাসুদেবে।"

পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি দেখে পাহাড় থেকে অবতরণ করে আমরা ট্যাক্সির নিকট উপনীত হই। তার পর চা-পান ও জলযোগ সেরে ট্যাক্সিতে উঠে বসি। তিন মাইল দূরবর্ত্তী গিরিস্থানেশ্বরের মন্দিরে উপনীত হই। নির্ম্মাণ করেন এই মন্দিরটি প্রাতঃস্মরণীয়া, পুণ্যবতী, হোলকারের মহারাণী অহল্যাবাই। রাজত্ব করেন তিনি ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। পরিচিত এই মন্দিরটি অহল্যাবাইয়ের মন্দির নামে, বুকে নিয়ে আছে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যপদ্ধতি, শীর্ষে নিয়ে আছে ক্রমশীর্ণায়মান শিখারা। অলঙ্কৃত তার সারা অঙ্গ,

সুন্দরতম অলঙ্করণে, মুগ্ধ হয়ে দেখি। স্থপতিকে আর মহারাণীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, ট্যাক্সিতে উঠে বসি। ঔরঙ্গবাদে ফিরে যাই।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে কত অপরূপ চিত্র—চিত্র ভূস্বর্গ, অমরাবতী, কৈলাসের, চিত্র বিশ্বের স্থপতির মহাতীর্থ বিশ্বকর্ম্মার, চিত্র স্বপ্নলোক, রহস্যপুরী ইন্দ্রসভার। ভেসে ওঠে একে একে, মূর্ত্তি কত স্থপতির আর ভাস্করের, মূর্ত্তি কত চিত্রশিল্পীরও হস্তে নিয়ে বিভিন্ন আর বিচিত্র যন্ত্রপাতি। আছেন তাঁদের মধ্যে মুক্তকচ্ছ দ্রাবিড়, পীতবাস বৌদ্ধ, মালকচ্ছ হিন্দু, শ্বেতাম্বর জৈনও আছেন, সজ্জিত তাঁরা কত বিভিন্ন ভূষণে। বলেন, আমরাই রচনা করেছি এই মহান, সুন্দরতম পরিকল্পনা, দিয়েছি তাতে অনবদ্য সুক্ষ্মতম রূপ। করেছি অরূপকে অপরূপ, সুন্দরকে সুন্দরতম, মহানকে মহামহিমময়, অসম্ভবকে করেছি সম্ভব, রচনা করেছি এক স্বর্গ পুরী, এক স্বপ্নলোক, দান করেছি অমরত্ব এলোরাকে, নিজেরাও হয়েছি অমর।

ভেঙে যায় তন্দ্রা, ছুটে যায় স্বপ্নের ঘোর, ট্যাক্সি এসে থামে ধর্ম্মশালার দ্বারে, রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে ধরিত্রীর বুকে।

১১

অনেক বছর আগে, একদিন পুরী এক্সপ্রেসে চড়ে পুরী অভিমুখে রওনা হই। গৃহিনীও সঙ্গে যান।

পবিত্র তীর্থ পুরীধাম, ক্ষেত্র দেবাদিদেব জগন্নাথের, লীলাভূমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের, পরম সিদ্ধপুরুষ বিজয়কৃষ্ণের ও আরও অনেক সাধু মহাত্মার। এইখানেই লীলান্তে শ্রীচৈতন্যদেব মিশে যান সাগরের জলে। স্থাপন করেন আচার্য্যশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য তাঁর চতুর্থ মঠ। গোবর্দ্ধন মঠ নামে খ্যাতিলাভ করে সেই মঠ। প্রচারিত হয় সেখান থেকে তাঁর অদ্বৈতবাদের বাণী। ছড়িয়ে পড়ে সেই বাণী সারা পুরীধামে, প্রতিধ্বনিত হয় তার আকাশে, বাতাসে — লাভ করে হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠত্বের আসন, ফিরে পায় লুপ্ত গৌরব।

মহা পুণ্যভূমি এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, পরিচিত বিরাজমণ্ডল আর শ্রীক্ষেত্র নামেও, পরিধি তার দশ যোজন, বিভক্ত চার মণ্ডলে। তার নীলাচলে, শঙ্খমণ্ডলে, সমুদ্রতীরে, মন্দিরে বিরাজ করেন দারুময় সাক্ষাৎ ভগবান জগন্নাথদেব। অপর দিকে চক্রমণ্ডলে, আম্রকাননে বা ভুবনেশ্বরে, মহানদীর তীরে, মন্দিরে বিরাজ করেন দেবাদিদেব ত্রিভুবনেশ্বর, পরিচিত লিঙ্গরাজ নামেও। বৈতরণী তীরে, যাজপুরে, গদামণ্ডল আর চন্দ্রভাগা তীরে অর্কক্ষেত্র বা পদ্মমণ্ডল। মাঝখানে সবুজ বনানী, শীর্ষে নিয়ে পবিত্র শৈলমালা খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

কলিঙ্গাধীশ, জীতারীর সঙ্গে চতুর্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের পিতৃস্বসার বিবাহ হয়। তিনি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে এই উদয়গিরিতে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। হন শেষে মুক্ত পুরুষ, পরিণত হন অর্হতে। মহাতীর্থে পরিণত হয় উদয়গিরিও। আসেন এখানে দলে দলে তীর্থযাত্রী, নিযুক্ত হন কঠোর তপস্যায়, লাভ করেন মোক্ষ। বুকে নিয়ে আছে এই খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি প্রাচীনতম গুহামন্দির উড়িষ্যার অঙ্গে নিয়ে জৈনস্থপতির আর ভাস্করের শ্রেষ্ঠ দান, আর কলিঙ্গশ্রেষ্ঠ খারবেলের বিজয়ের কাহিনী। শীর্ষে নিয়ে আছে নিকটবর্ত্তী ধাউলি শৈলমালা ও প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের শিলালিপি, প্রহরী তার একটি হস্তী, রচিত অশোকের আমলে প্রতীক এক প্রাচীনতম ভাস্কর্য্যের। বিরাজ করেন সাক্ষী-গোপালও সাক্ষী তিনি পবিত্রতার। পথ যায় বঙ্কিম গতিতে, স্পর্শ করে যায় জগন্নাথদেবের চরণ, অতিক্রম করে যায় কত গ্রাম, কত প্রান্তর, কত বন উপবন, অতিক্রম করে সাক্ষীগোপাল, স্পর্শ করে ঘন বনবীথি বেষ্টিত উদয়গিরি আর খণ্ডগিরির পাদদেশ, উপনীত হয় ভুবনেশ্বরে, পবিত্রতম তীর্থস্থান উড়িষ্যার, অন্যতম পবিত্র তীর্থ ভারতেরও। মহাপবিত্র এই পথ, পরিচিত ভায়াশত্র নামে, পবিত্র পথ তীর্থযাত্রীর।

পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন বুদ্ধ, বিতরিত হয় তাঁর চারিটি দণ্ড। একটি দেবতারা গ্রহণ করেন, দ্বিতীয়টি নাগেরা, তৃতীয়টি প্রেরিত হয় গন্ধর্ব্বদেশে, চতুর্থটি কলিঙ্গের রাজা লাভ করেন। অপরিজ্ঞাত থেকে যায় অপর তিনটি দণ্ডের ভবিষ্যৎ। সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে কিন্তু বুদ্ধের চতুর্থ বাস দণ্ডটি। রচিত হয় একটি স্তূপ কলিঙ্গ দেশে, কলিঙ্গপট্টমে, প্রাচীনতম বৌদ্ধস্তূপ ভারতের বুকে নিয়ে সেই দণ্ডটি, বুকে নিয়ে তথাগতের স্মৃতি। দণ্ডপুরা নামে খ্যাতি লাভ করে সেই স্থান, পরিণত হয় বৌদ্ধ মহাতীর্থে। পরিণত হয় কলিঙ্গ পর্য্যায়ক্রমে জৈন, বৌদ্ধ ও শৈব ধর্ম্মের পীঠস্থানে, কেন্দ্রস্থল হয় তাদের সংস্কৃতির ও কৃষ্টির।

অন্ধ্রদের মতই অন্যতম প্রাচীনতম জাতি এই কলিঙ্গরা, বাস করতেন তাঁরাও দক্ষিণ ভারতে, সীমানা তার বৈতরণী নদী থেকে গোদাবরীর তটভূমি পর্য্যন্ত। লেখা আছে তাঁদের কথা পরবর্ত্তী হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থে, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থেও আছে। অধিপতি তাঁরা এক স্বাধীন রাজ্যের, মহাশক্তিশালী, অধিকার করেন ভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান। মুগ্ধ তাঁদের শৌর্য্যে আর সামরিক প্রতিভায়, মুখর তাঁদের প্রশংসায় গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও।

২৭২ খ্রীষ্ট পূর্ব্বে, মহারাজ অশোক অধিরোহণ করেন মগধের সিংহাসনে—তিনি জয় করেন কলিঙ্গ। কলিঙ্গ মগধের অধিকারে আসে।

২৩২ খ্রীষ্ট পূর্ব্বে মৃত্যু হয় সম্রাট অশোকের, হীনবল হন মৌর্য্যেরা কলিঙ্গ ফিরে পায় তার স্বাধীনতা। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে, চেত বংশের খারবেল আরোহণ করেন কলিঙ্গের সিংহাসনে। রাজধানী স্থাপিত হয় উদয়গিরির নিকটবর্ত্তী শিশুপালগড়ে। মহাপরাক্রমশালী, প্রতিভাবান, দিগ্বিজয়ী বীর তিনি, পরাভূত করেন পশ্চিমে মূষিক নগরের অধিবাসীদের, দাক্ষিণাত্যে রথিক আর ভোজকদের, উত্তরে বহপতিক্ষিতকে। খুব সম্ভব তিনিই পাটলিপুত্রের অধিপতি পুষ্যমিত্র। তাঁর বিজয়বাহিনী অতিক্রম করে

উত্তরে মগধ আর অঙ্গদেশ, পশ্চিমে তামিলনদ। উল্লিখিত আছে তাঁর বিজয়ের কাহিনী হাতীগুম্ফার শিলালিপিতে।

নিবদ্ধ থাকে না তাঁর কীর্ত্তি শুধু রাজ্যজয়েই। তিনি সংস্কার করেন রাজধানী কলিঙ্গ নগরের ভগ্নদুর্গ প্রাচীর আর তোরণ, সংস্কৃত হয় একটি পয়ঃপ্রণালীও। নির্ম্মাণ করেন মগধের নন্দরাজা। তিনিই স্থাপন করেন কুমারী পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটি জয়স্তম্ভ। শ্রেষ্ঠ রাজা কলিঙ্গের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা প্রাচীন ভারতেরও, অধিকার করেন খারবেল এক বিশিষ্ট স্থান ভারতের ইতিহাসের পাতায়।

খারবেলের মৃত্যুর পরে, বুকে নিয়ে আছে কলিঙ্গ ইতিহাস এক উত্থান আর পতনের, জয় আর পরাজয়ের, স্বাধীনতার আর পরাধীনতার। অধীনতা স্বীকার করতে হয় তাদের বঙ্গাধীশ, প্রবল পরাক্রান্ত শশাঙ্কের আর দেবপালের কাছে, মগধের গুপ্ত-রাজাদের আর কনৌজে হর্ষবর্দ্ধনের কাছেও। জন্মায় না খারবেলের মত কোন দিগ্বিজয়ী বীর কলিঙ্গের রঙ্গমঞ্চে, চিরস্মরণীয় হন না কোন রাজা ইতিহাসের পাতায়।

এমন করেই অতিবাহিত হয় বহুশত বৎসর। শেষে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয় কলিঙ্গদেশে মহাশক্তিশালী কেশরী-বংশ। স্থাপন করেন বীরশ্রেষ্ঠ যযাতি। অলঙ্কৃত করেন এই বংশের চল্লিশ জন নৃপতি কলিঙ্গের সিংহাসন। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা তাঁরা, অসংখ্য মহামহিমময় মন্দির দিয়ে সাজান পবিত্র ভুবনেশ্বরের বুক, হয় সে মন্দিরময়।

১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় চোড় গঙ্গবংশ উড়িষ্যায়। স্থাপন করেন মহাপরাক্রমশীল অনন্ত বর্ম্মা চোড় গঙ্গ। রাজত্ব করেন তিনি ১০৭৬ থেকে ১১৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সপ্ততি বৎসর। বিস্তৃত তাঁর রাজ্যের সীমানা গঙ্গা থেকে দক্ষিণে, গোদাবরী পর্য্যন্ত। উৎসাহী তিনি ধর্ম্ম প্রচারের, পৃষ্ঠপোষক তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষার। তিনিই নির্ম্মাণ সুরু করেন মহামহিমময় জগন্নাথের মন্দির পুরীতে। বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি, শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন, প্রতীক এক গৌরবময় যুগের স্মৃতি।

নরসিংহই শ্রেষ্ঠ রাজা চোড়গঙ্গবংশের। তিনি অলঙ্কৃত করেন উড়িষ্যার সিংহাসন ১২৩৮ থেকে ১২৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ব্যাহত করেন তিনি উড়িষ্যায় মুসলমান আক্রমণ। প্রবেশ করতে পারেন না বাংলার মুসলমান শাসকেরা উৎকলে। তাঁর রাজত্বকালেই পরিসমাপ্তি হয় পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ। তিনিই নির্ম্মাণ করেন কোনারকে বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির, বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটিও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নিদর্শন, প্রতীক এক অমর কীর্ত্তির। এই মন্দিরেই উড়িষ্যার স্থাপত্য লাভ করে চরম উৎকর্ষ, পূর্ণপরিণতি।

হীনবল হন চোড়গঙ্গরা, মহা প্রবল হন কলিঙ্গদেশে, গজপতিরা। কপিলেন্দ্র এক দিগ্বিজয়ী বীর এই বংশের, অধিকার করেন কলিঙ্গের সিংহাসন ১৪৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। মহাপরাক্রমশালী তিনি, প্রতিভাবানও। তাঁর বিজয়বাহিনী উৎকল অতিক্রম করে উপনীত হয় দক্ষিণে কাবেরী পর্য্যন্ত, পৌঁছায় বাহমনী রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে, বিদরে। তাঁর কাছে পরাভূত হন বিজয়নগরের বিজয়ী রাজারাও। কাঞ্চীপুরম ও উদয়গিরি তাঁর অধিকারে আসে। উল্লিখিত আছে গোপীনাথপুরের শিলালিপিতে। উৎকল ফিরে পায় তার পূর্ব্ব-গৌরব।

পুরুষোত্তম ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রাজত্ব করেন ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। বিজয়নগরের নরসিংহ শালুব অধিকার করেন কৃষ্ণার দক্ষিণ ভূভাগ, গোদাবরী, কৃষ্ণা, দোয়াব বাহমনীদের অধিকারে আসে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুনরায় দোয়াব অধিকার করেন, অন্ধ্রদেশের কিয়দংশও তাঁর অধিকারে ফিরে আসে।

তাঁর পুত্র প্রতাপ রুদ্রদেব অলঙ্কৃত করেন উড়িষ্যার সিংহাসন ১৪৯৭ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। বিস্তৃত তাঁর রাজ্যের সীমানা বঙ্গদেশের মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা থেকে মাদ্রাজে গুণ্টুর জেলা পর্য্যন্ত। তেলিঙ্গানার কিয়দংশও তাঁর অধিকারে আসে। সমসাময়িক তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষিত বৈষ্ণবধর্ম্মে, শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্তও। মহাপরাক্রান্ত হয় বিজয়নগর, শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদেবরায় বিজয়নগরে, হন গোলকুণ্ডার মুসলমান সুলতানও পূর্ব্ব-উপকূলে। তিন বার উড়িষ্যা আক্রমিত হয়। বাধ্য হয় উড়িষ্যাভূপ প্রতাপ রুদ্রদেব সন্ধি করতে, ছেড়ে দিতে গোদাবরীর দক্ষিণ পারের বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিজয়নগরকে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে কপিলেন্দ্র বংশের পতন সুরু হয়। শেষে ১৫৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হন কপিলেন্দ্র বংশের শেষ রাজা, প্রতাপ রুদ্রদেবের মন্ত্রী গোবিন্দের হস্তে। স্থাপিত হয় ভোই রাজবংশ উড়িষ্যায়। ছিলেন তাঁরা লেখক শ্রেণীভুক্ত।

রাজত্ব করেন ভোইবংশ উড়িষ্যার সিংহাসনে, মোটে আঠার বছর। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, মুকুন্দ হরিচন্দন অধিকার করেন উড়িষ্যার সিংহাসন। বিতাড়িত হন ভোইবংশের রাজা। ব্যাহত করেন তিনি উড়িষ্যায় মুসলমান আক্রমণ, কিছুদিন পর্য্যন্ত। ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মুসলমান শাসক সুলেমান কররাণী আক্রমণ করেন উৎকল। সেনাপতি তাঁর কালাপাহাড়, এক বিধর্ম্মী হিন্দু। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন মুকুন্দ হরিচন্দন। ধ্বংসে পরিণত হয় জগন্নাথদেবের মন্দির। ধ্বংস করেন কালাপাহাড়। পরিসমাপ্তি হয় উৎকলে হিন্দুরাজত্বের। অন্তর্হিত হয় হিন্দু ক্ষমতা, হিন্দু শৌর্য্য, হিন্দু গৌরব সঙ্গে নিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু কৃষ্টি উৎকল থেকে। সুরু হয় উৎকলের অধিকার নিয়ে মুঘল ও আফগানের সংঘর্ষ।

ক্রমশঃ

গান্ধীজীর মৃত্যুবার্ষিকীতে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

জীবনে তিনি মহৎ ছিলেন। মৃত্যু তাঁকে মহত্তর করেছে। 'ধন নয়, মান নয়, ইন্দ্রিয়সুখ নয়। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল ঈশ্বর লাভ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে তাঁর মন সর্ব্বদার জন্য যুক্ত থাকতো। রাম নাম উচ্চারণ করেই না তিনি জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। এই ঈশ্বর তাঁহার কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন সত্যরূপে। নারায়ণ তাঁর কাছে ছিলেন সত্যনারায়ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই সত্যনারায়ণকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করতে হলে সকলের চেয়ে অধম যে জীব তাকেও আত্মবৎ ভালবাসতে হবে। এই বিশ্বাসই তাঁকে টেনে এনেছিল আবর্ত্তসঙ্কুল রাজনীতির মধ্যে। যে মানুষ প্রেমে সকলের সঙ্গে এক হয়ে গেছে সে ত কখনও 'রুদ্ধ দ্বার দেবালয়ের' কোণে একান্তে ঈশ্বরকে ডেকে সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না। জীবনের কোন ক্ষেত্র থেকেই দূরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। গান্ধী দেখলেন ভারতবর্ষ যেন একটা জলন্ত জতুগৃহ। আগুনের শিখায় ভারতবাসীদের জীবন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ অন্নাভাবে যেন জীবন্ত নরকঙ্কাল। স্বদেশের এই অন্তহীন দুঃখ-সমুদ্রের তীরে নির্জ্জনে ধ্যান-ধারণার মধ্যে ডুবে থাকা গান্ধীর পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। যে মানুষ তার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসে সে তার দুঃখের বোঝা হালকা করবার চেষ্টা করবেই। প্রতিবেশীর দুঃখের ও বিপদের সামনে যে-ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট তার প্রেম শূন্যগর্ভ ভাবোচ্ছাস মাত্র।

গান্ধীর প্রেমের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। প্রেমেই তিনি বিপ্লবী হয়েছিলেন। যে মানুষ ভালবাসে তার প্রতিবেশীকে সে শোষণের প্রতিবাদ করবেই, গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেই। মানুষকে ভালবেসে পুরুষোচিত একটা কাজও যারা করল না, উৎপীড়িত জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার সামনে যাদের রসনায় সত্যবাক্য খর খড়োর মত ঝলে উঠল না, কেবল আবেগের আর বাষ্পের মধ্যে সারাজীবন যারা আকণ্ঠ ডুবে রইল সেই কর্ম্ম-বিমুখ স্বপ্নবিলাসীদের মত এমন ঘৃণ্য জীব পৃথিবীতে, বোধ হয়, খুব কমই আছে। 'কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জ্জন এমন মানুষ ছিলেন গান্ধী। তাই অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের জবাব দিলেন গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তনের দ্বারা। ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। সাম্রাজ্যবাদ কঠিন নাগপাশে বেঁধে রেখেছে জাতির জীবনকে। ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ ছিন্ন করতে না পারলে ভারতের আপামর জনসাধারণের কল্যাণ কোথায়? ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত ইউরোপের এবং আমেরিকার কয়েকটা শহরের মুষ্টিমেয় ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিল পৃথিবীর কর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা। কোটি কোটি মানুষের জীবন চলত তাদেরই অঙ্গুলিহেলনে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নারীজাতি, পাশ্চাত্যের প্রায় সমস্ত মজুর সম্প্রদায় এবং আফ্রিকার ও এশিয়ার প্রায় সমস্ত কৃষিজীবী ছিল সমাজের নিষ্ক্রিয় অঙ্গ। তাঁরা ছিল অন্যের হুকুমের দাস। আফ্রিকা, ভারতবর্ষ তথা এসিয়ার জনজাগরণ সুরু হ'ল গান্ধীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে আশ্রয় করে। তখনই পরপদদলিত মানুষ নিজেকে চিনতে সুরু করল এবং বুঝতে পারল অমৃতে তারও অধিকার আছে। ভয়ে এবং অজ্ঞতায় তারা এতদিন রাজশক্তির বশ্যতা স্বীকার করে এসছিল। দেহাত্মবুদ্ধির মূঢ়তাই ছিল দেশজোড়া ভয়ের মূল। গান্ধী এই ভয়ের মূলে করলেন কুঠারাঘাত। মানুষের পরিমাপ ত তার রক্তমাংসে নয়। হাড়মাসের খাঁচার মধ্যে আসল মানুষটা হচ্ছে আত্মা আর আত্মিক শক্তিকে আশ্রয় করলে মানুষ দেহের উর্দ্ধে উঠে মৃত্যুভয়কে অনায়াসে তুচ্ছ করতে পারে। সত্যাগ্রহের মধ্যে মানুষের এই অপরাজেয় আত্মিক শক্তির প্রকাশ। সাম্রাজ্য-বাদের নাগপাশ ছিন্ন করবার জন্যে গান্ধী জনসাধারণের হাতে তুলে দিলেন সত্যাগ্রহের অমোঘ অস্ত্র। চার্চ্চিল ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, বারুদের জোরে ভারতের অহিংস-গণবিপ্লবকে তিনি অনায়াসে ঠাণ্ডা করে দেবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বারুদের উত্তাপই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চার্চ্চিল তাঁর মার দেবার ক্ষমতাকেই একান্ত বড় করে দেখেছিলেন। অতি সাধারণ মানুষও রাইফেলের সামনে অকম্পিত পদে আগিয়ে যেতে পারে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে প্রিয়তম সখার মত— এই সত্যকে তিনি গণনার মধ্যেই আনেন নি। ভারতবাসীরা যখন বেটনের এবং রাইফেলের কুঁদার আঘাতের সামনেও দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকল, এক পাও পিছু হটল না তখনই তারা দেখিয়ে দিল ইংলণ্ডের ক্ষমতার পুঁজি নিঃশেষ এবং ভারতবর্ষ অপরাজেয়।

আত্মার এই অপরাজেয় শক্তির অগ্নিমন্ত্র স্বামী বিবেকানন্দ ইতিপূর্ব্বেই বারবার ঘোষণা করেছিলেন ভারতবর্ষের মহানিদ্রা ভাঙবার জন্যে—তার অবসন্ন স্নায়ুমণ্ডলীতে শক্তি সঞ্চারিত করবার জন্যে। বেদান্ত তিনি এত জোরের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন— কারণ উপনিষদের মধ্যে শক্তিরই মন্ত্র। বিবেকানন্দের অগ্নিবচনের কষাঘাতে ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙল। কিন্তু একটা জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে বেদান্তের শক্তির মন্ত্রকে সত্য করে তুলবার জন্যে প্রয়োজন ছিল আর একজন মহামানবের। এই মহামানবের

মূর্তিতে দেখা দিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁর ভৈরবআহ্বানে বিপ্লবের পথে দলে দলে বেরিয়ে এল কৃষকেরা তাদের ক্ষেতখামার পিছনে রেখে, বেরিয়ে এল অবহেলিত মাতৃজাতি অবরোধের অন্ধকার থেকে। বেরিয়ে এল ছাত্র-অধ্যাপক-উকীল-ব্যারিষ্টার-ডাক্তার-ব্যবসায়ী। কে নয়? বুকের উষ্ণ শোণিতে তারা ভিজিয়ে দিল দেশের মাটি। সত্যাগ্রহীদের সেই নিষ্পল রক্তধারায় পরাধীনতার কলঙ্ককালিমা মুছে গেল দেশমাতৃকার ললাট থেকে। স্বাধীন ভারতবর্ষ আবার অসীমবীর্য্যে মাথাতুলে দাঁড়াল মুগ্ধজগতের সামনে। শ্রদ্ধানত জাতি গান্ধীকে আবাহন করল জাতির পিতা বলে।

মানুষের কাছ থেকে জোর করে কুর্ণিশ আদায় করে নেবার মত কোন ক্ষমতা ছিল না গান্ধীর। তাঁর না ছিল সৌধ, না ছিল সিপাহী-শাস্ত্রী; ক্ষমতার আড়ম্বর বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি বাস করতেন পল্লীর নিভৃতে এক পর্ণকুটিরে। কৌপীন-পরিহিত ফকির বলতে যা বুঝায় তিনি কি তাই ছিলেন না? তবুও এই অনাড়ম্বর ফকিরের আহ্বানে তাঁর সহস্র সহস্র দেশবাসী মৃত্যুর মুখেও ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি। তাঁর এই অলৌকিক ব্যক্তিত্বের মূলে ছিল তাঁর বিশাল হৃদয়ের অপ্রমেয় ভালবাসা। কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ের উপর তাঁর যে অসামান্য কর্তৃত্ব ছিল—সে কর্তৃত্ব এসেছিল ভালবাসা থেকেই। ভালবাসলে তবেই না ভালবাসা পাওয়া যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর জীবনের প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে, প্রতিটি কর্ম্মে, প্রতিটি চিন্তায় তাঁর প্রেম সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আলোর মত। সেই প্রেম কোথাও কোন সীমারেখাকে স্বীকার করে নি। স্বদেশের সীমাকে অতিক্রম করে সেই প্রেম ব্যাপ্ত ছিল সমস্ত মানবজাতির মধ্যে। তাই ত তাঁর মৃত্যুতে যাঁরা তাঁকে চোখে কখনও দেখে নি তাঁরাও মর্ম্মের গভীরে অনুভব করেছেন আত্মীয় বিয়োগের মর্ম্মান্তিক ব্যথা।

গান্ধী জাগ্রত ভারতবর্ষের যে মহিমময় স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকে ফলবান দেখে যেতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন একটা অখণ্ড জাতি যার নরনারীরা থাকবে সমস্ত ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে, যারা হবে স্বাধীনচেতা এবং সাহসে দুর্জ্জয়। তিনি সফলকাম হতে পারেন নি এ কথা সত্য—তবুও যুগে যুগে মানুষ শ্রদ্ধানত শিরে তাঁকে স্মরণ করবে। স্মরণ করবে, কারণ মানুষের চরিত্রগত সমস্ত দুর্ব্বলতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও অতন্দ্র সাধনার দ্বারা তিনি জীবনকে এতটা উঁচুতে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। ছেলেবেলায় তিনি খুবই ভীরু প্রকৃতির ছিলেন। চোরের ভয়ে, সাপের ভয়ে রাত্রিতে ঘরের বাহির হতে পারতেন না। বাল্যের সেই ভীরু গান্ধী জগতকে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, ভয়কে কেমন করে সর্ব্বতোভাবে জয় করা যায়। জীবনের প্রতি তাঁর অনুরাগ কিছু কম ছিল না। একশো পঁচিশ বৎসর তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন, তবু যখনই কর্ত্তব্যের ডাক এসেছে গান্ধী প্রায়োবেশনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, বারংবার প্রসন্নচিত্তে এগিয়ে গেছেন মরণের মুখে। জীবনে কত বড় ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। যে অখণ্ড ভারতবর্ষের জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্ন তাঁর মনকে জুড়ে ছিল—সেই প্রিয়তম স্বদেশ চোখের সামনে টুকরো হয়ে ভেঙে গেল এবং সেই দ্বিখণ্ডিত দেশের উপরে চলতে লাগল সাম্প্রদায়িকতার উদ্দাম প্রেতনৃত্য! কিন্তু এত বড় বিফলতার সামনে গান্ধী নৈরাশ্যে ত ভেঙে পড়লেন না। চিত্তে অন্তহীন আশা নিয়ে তিনি দেশময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বিরোধের কোলাহলের মধ্যে। কণ্ঠে একলা চল রে গান, হৃদয়ে মানুষের উপরে অক্ষুন্ন বিশ্বাস। মানবজাতি মহাসমুদ্রের মত। সমুদ্রের কয়েক ফোঁটা জল যদি নোংরাই হয় তাই বলে মহাসিন্ধু ত তার নির্ম্মলতা হারিয়ে ফেলতে পারে না। জীবনের এত বড় ব্যর্থতার সামনে যে মানুষ ভগ্নহৃদয় না হয়ে উৎসাহের সঙ্গে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন তাঁর চিত্ত কত যে বলিষ্ঠ ছিল—তা অনুমান করা যেতে পারে। দুর্ব্বলচেতা মানুষ হলে শান্তি খুঁজতে হিমালয়ের ক্রোড়ে আশ্রয় নিতেন।

ভীরুতাই গান্ধীর একমাত্র দুর্ব্বলতা ছিল না। এত কোপনস্বভাব ছিলেন যে, তাঁর মতে মত দিতে না পারায় দক্ষিণ আফ্রিকায় নিজের স্ত্রীকে টানতে টানতে রাস্তায় বার করে দিয়েছিলেন। যৌবনের সেই ক্রোধের বশীভূত গান্ধী শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বজগতকে শিখিয়ে গেলেন কি করে আত্মজয় করতে হয়।

সাত্ত্বিক আনন্দের একটি নির্ম্মল হাসি সর্ব্বদাই জড়িয়ে লেগে থাকত তাঁর মুখে। এ আনন্দ ত সহজলভ্য নয়! আত্মসংযমের দ্বারা, সুকঠিন সাধনায় এই শাশ্বত আনন্দকে জয় করে নিতে হয়। সমস্ত কামনাকে জয় করলে তবেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ হওয়া সম্ভব আর গান্ধীর চিরপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে প্রকাশ পেত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের স্বর্গীয় আনন্দ। তাঁর জীবন যে ভগবদ্ গীতার জীবন্ত ভাষ্য ছিল—এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আজ শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র মানবজাতির। যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ তাঁর জীবনের আলো থেকে জ্বালিয়ে নেবে নিজেদের জীবনপ্রদীপ, তাঁর জীবনী পড়ে শিখবে কেমন করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার থেকে সোৎসাহে কর্ত্তব্য পালন করে যেতে হয়, পরম দুঃখের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসেও কি করে মানুষকে শোনান যায় আশার বাণী।*

* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে।

মিনির হাসি

শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

মিনি হাসে। কখন কখন হো হো করে হাসে। বলতে পারেন কিসের হাসি?

ঠিক বুঝতে পারি না। অনেক ভেবেছি। মিনিকে নিভৃতে ডেকে জিগ্যেস করেছি। জোর করে বলেছি—বল মিনি, তুই যখন-তখন ওরকম হাসিস কেন? জিগ্যেস করলেই মিনি গম্ভীর হয়ে ওঠে। তার তখনকার গাম্ভীর্য্য দেখলে ভয় হয়। চোখ দুটো বড় বড় করে আমার দিকে তাকায়। তার পর হো হো করে হেসে বলে—কিছু নয়, রতনদা। আমার বিশ্রী স্বভাব হয়ে গেছে। এমনি হাসি। চা খাবে? বস। চা করে আনি। এই বলে আমাকে বসিয়ে রেখে মিনি চা করতে চলে যায়। আমি বসে মিনির কথা ভাবি।

আমি মিনিকে তার জন্ম হতে দেখে আসছি। মিনির বাবা শশধরবাবু আমার জ্ঞাতি কাকা। শশধর কাকা ধনী লোক। পৈত্রিক সম্পত্তি ত প্রচুর পেয়েছেন। তার ওপর তিনি নিজে জমির দালালি এবং লরী-ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করে ধন-সম্পত্তি আরও বাড়িয়েছেন।

শশধর কাকার যেমন লক্ষ্মীভাগ্য তেমনি তাঁর পোষ্যও অনেকগুলি। তাঁর নিজের দশটি ছেলেমেয়ে। তার ওপর ভাগনে-ভাগনি-ভাইপোর দল। মিনিই সকলের বড়। তার বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে। মিনির পরেই রজত। তার বয়স কুড়ির একটু নীচে। রজতের পরের গুলির বয়সের আর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। উপস্থিত সকলের ছোটটি খোকা। তার বয়স দুই।

শশধর কাকার বয়স পঞ্চাশের একটু উপরেই। তাঁর স্বাস্থ্য খুব মজবুত না হলেও বিশেষ খারাপ নয়। তবে কাকীমার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। কাকীমাকে নিয়ে কাকা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারবাবু বলেছেন যে তাঁকে শিগগির কলকাতার বাইরে বায়ু পরিবর্ত্তনে নিয়ে যেতে হবে। নচেৎ সমূহ বিপদ। শশধর কাকা অবশ্য আগে কাকীমাকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরে এসেছেন। তবে কলকাতার বাইরে তাঁর পক্ষে বেশী দিন থাকা সম্ভব হয় না। নিজের ব্যবসা দেখতে হয়। তার ওপর বৈষয়িক ঝামেলাও আছে।

সম্প্রতি কাকা কাশীতে একখানি বাড়ী কিনেছেন। কাকীমার ইচ্ছা তিনি মাঝে মাঝে কাশীতে গিয়ে থাকবেন। বাড়ীখানি একটু পুরোন। জায়গাটি বেশ ভাল। রমাপুরার কাছে। বাড়ী থেকে বিশ্বনাথের মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট পাঁচ মিনিটের পথ।

পূজোর পর। কাকা গেছেন বাড়ীখানি মেরামত করাতে। তিনি ফিরে এলেই রজত সকলকে নিয়ে কাশী যাবে। কাকা বাড়ীতেই থাকবেন। ব্যবস্থা এই রকম ঠিক হয়ে আছে।

মিনির জন্ম কলকাতাতে হলেও সে কোন দিন একলা রাস্তা-ঘাটে বেরোয় নি, ট্রামে-বাসে ওঠা ত দূরের কথা। সিনেমায় গেলেও মিনির মা তার সঙ্গে থাকে। মিনি লেখা-পড়া খুব বিশেষ করে নি। কারণ কাকা খুব গোঁড়া। তিনি মেয়েছেলের লেখা-পড়া পছন্দ করেন না। তবে মিনি গৃহকর্ম্মে খুব নিপুণা হয়েছে। কিন্তু এত বাঁধা-ধরা নিয়ম-কানুনের মধ্যে থেকেও একটি যুবকের সঙ্গে মিনির ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সিদ্ধার্থ শশধর কাকার এক অন্তরঙ্গ ব্যবসায়ী বন্ধুর ছেলে। অবস্থাও ভাল। বেশ সুশ্রী। মধুর ব্যবহার। কথাবার্তা, চালচলন, বেশ সুরুচিপূর্ণ। এক কথায় সবদিক থেকেই সিদ্ধার্থ সহজ সরল এবং লোভনীয়। কাকীমা সিদ্ধার্থের সঙ্গে মিনির বিয়ে দেবেন ঠিক করে ফেলেছেন। একথা অনেকেই জানে। কাকীমা প্রায়ই সিদ্ধার্থকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান। সিদ্ধার্থের বাবা-মা শশধর কাকার বাড়ীতে আসেন। তবে মিনি কোন দিন সিদ্ধার্থদের বাড়ী যায় নি। বিয়ের আগে সে যাবেও না।

রজতের বিয়েও এক রকম ঠিক হয়ে আছে। ভাবী স্ত্রীকে রজত দেখেছে। রজতকেও দেখেছে অনুশীলা। তবে ওদের এখনও বাড়ী-যাওয়া-আসা আরম্ভ হয় নি। কাকীমা বেশ বুঝেছেন যে তাঁর শরীর দিন-দিন ভেঙে পড়ছে। তাই তিনি ঠিক করেছেন যে মিনির বিয়ের পরেই রজতের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ এনে খানিকটা নিশ্চিন্ত হবেন। শশধর কাকাও কাকীমার মতকে সমর্থন করে-ছেন। কাকীমার মতের বিরুদ্ধে তিনি কখনও যান না। কাকীমাকে তিনি সত্যই ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন।

ব্যবস্থা সবই ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু অলক্ষ্যে নিয়তি দেবী একটু ক্রুর হাসি হাসেন। নিমেষের মধ্যে শশধর কাকার বাড়ীর রূপ একেবারে বদলে যায়। যেন কোত্থেকে এক প্রলয়-বন্যা এসে কাকার সাধের জম-জমাট সংসারটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কাকা তখন কাশীতে বাড়ী মেরামতের কাজে ব্যস্ত। ভাই-দ্বিতীয়ার দিনে কাকীমা কলেরায় আক্রান্ত হন। এশিয়াটিক কলেরা। বড় মারাত্মক। এ রোগ মানুষকে ডাক্তার ডাকবার সময় দেয় না। মিনি রজত স্তম্ভিত হয়ে যায়। কর্পূরের মত কোথায় উবে গেল তাদের মা? এক সঙ্গে তারা সকলে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। শশধর কাকাকে জোরাল টেলিগ্রাম করা হয়। ট্রাঙ্ক কলে ডাকা হয়, তিনি যখন বাড়ী ফিরলেন তখন সব শেষ।

সব দেখে শুনে শশধর কাকা থ ব'নে যান। একি হ'ল? তাঁর সরোজিনী কোথায় চলে গেল? মৃত্যুর সময় একবার দেখা হ'ল না তার সঙ্গে। দীর্ঘ-বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিগুলি যেন এক এক করে তাঁর মনে উদয় হতে থাকে। সরোজিনীর কি ভাল চিকিৎসা হয়েছিল? তিনি উপস্থিত থাকলে হয় ত সরোজিনী মরত না। ভাল ভাল ডাক্তার এনে বাড়ীতে বোর্ড বসিয়ে তিনি সরোজিনীর চিকিৎসা করাতে পারতেন। শশধর কাকা সকলের সামনেই বলে ওঠেন—চিকিৎসা হয় নি, চিকিৎসা হয় নি। মিনি রজত ভাল করে চিকিৎসা করাতে পারে নি। মনে মনে নিজের ওপর ধিক্কার দেন তিনি। লোকের সঙ্গে বিশেষ কথা ক'ন না কাকা। কাকীমার শ্রাদ্ধ হয়ে যায়। বাড়ী হয়ে পড়ে নিঝুম। আনন্দ-নিকেতনে নেমে আসে ঘোর অমানিশার অন্ধকার। বাড়ীতে যেন ঢুকতে ভয় হয়।

ছ' মাস অতীত হয়ে যায়। শশধর কাকা যেন একটু প্রকৃতিস্থ হন। আবার আগের মত তিনি হেসে হেসে কথা কইতে থাকেন। ব্যবসা এবং বৈষয়িক ব্যাপারে মন দেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যখন কেঁদে কেঁদে তাদের মাকে খুঁজতে থাকে, তখন শশধর কাকা তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে ভোলান। এমনি ভাবে কাকার দিন চলে যায়।

কাকীমার মৃত্যুর পর শশধর কাকার দূর সম্পর্কের এক দরিদ্র শ্যালক তাঁর কাছে যাতায়াত সুরু করে। উদ্দেশ্য এই ফাঁকে তার বয়স্থা ভগ্নীকে শশধর কাকার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। রাজলক্ষ্মীর বয়স ত্রিশ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড মাংসবহুল দেহ। গায়ের রং ময়লা। সামনের দুটো দাঁত একটু বেরিয়ে আছে। তবে রাজলক্ষ্মী আধুনিকা নন। লেখা-পড়া এক রকম জানে না বললেই হয়। ভেতরে ভেতরে ঠিক হচ্ছে শশধর কাকার সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বিয়ে হবে। শশধর কাকার মনেও যেন কিসের দোলা লেগেছে। তিনি এখন অনুক্ষণ ভাবেন তাঁর মা-হারা বাচ্ছা-কাচ্ছাগুলিকে কে দেখবে। মিনি রজতের বিয়ের পর বাড়ীর অবস্থা কি দাঁড়াবে সে বিষয়েও তিনি চিন্তাকুল। ছেলের বৌ যদি তাঁকে এবং তাঁর মা-হারাদের আদর-যত্ন না করে? ছেলে যদি শ্বশুর বাড়ীর দিকে চলে পড়ে? তার উপর মেয়ে ত আধুনিকা। কলেজের ছাত্রী। সরু লিকলিকে চেহারা। গতর একেবারে নেই বললেই হয়। সে কি সংসারের ভার মাথায় করে নিতে পারবে ঠিক যেমনটি পেরেছিল তাঁর সরোজিনী? এই সব সাত-পাঁচ ভেবে কাকা যেন দিশেহারা হয়ে পড়েন। কিছু ঠিক করতে পারেন না। কিসের যেন একটা হাহাকার তাঁর মনের ভেতর অনুক্ষণ কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। এক একবার তিনি রাজলক্ষ্মীকে কাকীমার আসনে বসিয়ে মনশ্চক্ষে দেখেন। তখন বোধহয় আনন্দ এবং সঙ্কোচ এক সঙ্গে এসে তাঁর মনোলোকের উপর ধাক্কাধাক্কি করে। হঠাৎ দেখা যায় কাকা দেশী ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবী পরে এক সন্ধ্যায় রাজলক্ষ্মীদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হন। রাজলক্ষ্মী শশধর কাকাকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে দেখে একটু মুখ টিপে হেসে তাঁর সামনে হতে চলে যায়। একটু পরে চা-খাবার আসে। প্রৌঢ় শশধর কাকা এক বিগত-যৌবনা নারীর চিন্তায় মসগুল হয়ে ওঠেন। কাকা মিষ্টি খেয়ে চায়ের কাপে চুমুক দেন। হঠাৎ কাকার মনে হয় যেন রাজলক্ষ্মীকে ছাড়া তাঁর আর একদণ্ডও চলবে না।

প্রথমে রজত বাইরে থেকে সব শোনে। রজতের কাছ থেকে মিনি শোনে। শুনে মিনি স্তম্ভিত হয়ে যায়। মিনির মুখ থেকে কথা বেরয় না। সে নিশ্চল কাঠের মূর্তির মত বসে থাকে।

ভেতর থেকে শশধর কাকার ডাক আসে। রজত চলে যায়। মিনি চুপ করে বসে ভাবতে থাকে।

ভাই-বোনের দেখা হলেই পরামর্শ চলে। কিন্তু তারা ভেবে কোন কূল-কিনারা পায় না। শশধর কাকা যদি পুনরায় বিয়ে করেই ফেলেন তা হলে মিনি রজতই বা কি করতে পারে? রজতের চেয়ে মিনিই বেশী ভাবে। রজতের বুদ্ধি এখনও তরল।

কতকগুলি নাবালক মাতৃ-হারা ভাই-বোনদের মুখের দিকে চেয়ে মিনি তার আকস্মিক মাতৃ-মৃত্যুর শোক ভুলে মনকে বেশ শক্ত করে ফেলেছে। কিন্তু যখন সে শোনে তার বাবা রাজু মাসীকে বিয়ে করতে চলেছেন তখন তার মনের ভেতর আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। এ কি করে সম্ভব? ভাবতে ভাবতে মিনির মাথা গরম হয়ে উঠে। সে আর স্থির থাকতে পারে না। ছাদের উপর গিয়ে কেবল পায়চারি করতে সুরু করে দেয়।

কাকীমা সংসারের কাজেই অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। শশধর কাকার অর্থ-ভাণ্ডারের দিকটা মিনিই ভাল বোঝে। কোন্ ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে, কোথায় কত শেয়ার আছে, বাড়ী ভাড়া কত টাকা আদায় হয় সব মিনির যেন নখ-দর্পণে। তাই মিনি ভাবে: আজ যদি তার বিয়ে হয়ে যায় এবং রাজু মাসী তাদের সংসারে এসে বসে তা হলে ত সর্ব্বনাশ হবে। তার বাবাকে ত দু' দিনেই রাজু-মাসী কুক্ষিগত করে ফেলবে। রজত ছেলে মানুষ। তার বৌকে রাজুমাসী গ্রাহ্যও করবে না। ছোট ছোট ভাই-বোনগুলিকে কেউ আদর-যত্ন করবে না। তারা অসহায়ের মত ঘুরে বেড়াবে। তার উপর রাজু মাসীর যদি সন্তান হয় তা হলে ত সোনায় সোহাগা। রাজু-মাসীর মা ভাইরাও যে বাড়ীতে এসে বসবে না তারও ত স্থিরতা নেই। এই সব ভাবে মিনি। চব্বিশ ঘণ্টা ভাবে। রাত্রে ঘুম আসে না তার। কিন্তু মিনি বুঝতে পারে এ-বাড়ী হতে তার বিদায় আসন্ন।

এক সন্ধ্যা। মিনির আশীর্ব্বাদের মাত্র পাঁচ দিন বাকী আছে। মিনি ছাদে উঠে রজতকে ইশারা করে ডাকে। রজত হন্তদন্ত হয়ে মিনির কাছে যায়। মিনির সে সময়কার মুখ গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ কিন্তু বড় মাধুর্য্যমণ্ডিত। মিনি রজতকে বলে, এখন কি করা যায় বল।

—কিসের?

—আমার বিয়ে দিয়ে ত বাবা আবার বিয়ে করবেন।

—তাতে তোর সন্দেহ আছে ?

—আগে ছিল। এখন আর নেই।

মিনি ধীর কণ্ঠে বলে, আয় এক কাজ করি।

—কি কাজ ?

—তুই বাবাকে গিয়ে বল আমি বিয়ে করব না যতদিন না ছোটগুলো একটু বড় হয়। বিস্মিত হয়ে রজত বলে, সে কি দিদি ! কি বলছিস ? তোর শ্বশুর বাড়ীর লোকেরাই বা ভাববে কি ?

—যা ভাবে ভাবুক। তুই শুধু ওকে গিয়ে বল যে আমার পক্ষে এখন বিয়ে করা সম্ভব নয়।

রজত মিনির কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে মিনির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মিনি বলে, আমি বিয়ে না করলে রাজু-মাসী এলেও ছেলে-মেয়েগুলো ভেসে যাবে না।

—সত্যি বিয়ে করবি না, দিদি ?

মিনি বলে, হাঁ। মুখের চেহারাটা তার কি রকম হয়ে যায়। রজত কোন কথা বলে না। মিনি হো হো করে হেসে বলে, তুই আমাকে অবিশ্বাস করছিস ? আবার হাসে মিনি। রজত একটু ধমক দিয়ে বলে, তুই অত হাসছিস কেন ? আস্তে আস্তে বল না।

আবার হেসে ওঠে মিনি।

রজত বলে, ছাখ দিদি, ছেলে-মানুষি করিস না। ভাল করে ভাব। তুই বিয়ে করবি না শুনলে বাবাই বা কি মনে করবেন আর দেবব্রত বাবুই বা কি ভাববেন ?

—আমি এক বছর ধরে ভেবে ভেবে এই ঠিক করেছি। আমি এ-বাড়ী হতে চলে গেলে সংসারটা তচনচ হয়ে যাবে। রাজু মাসীর মত একটা হস্তীনীকে বিয়ে করলে বাবা প্রাণে বাঁচবেন না। বাবার বিয়ে সাময়িক ভাবে বন্ধ করতে হলে এ-ছাড়া আর অন্য পথ নেই, রজত।

রজত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দিদির কথা শুনে বলে, তা হলে আমিও বিয়ে করব না। মিনি আবার হেসে বলে, তা কি হয় ? তুই বিয়ে করিস। সে কথা পরে হবে। এখন সামনের বিপদ থেকে বাবাকে বাঁচাবার ভাবনা ভাব।

রজত বলে, আমিও অনেক ভেবেছি, দিদি। কিন্তু তুই যে বিয়ে করবি না তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি। বেশ— আজই রাত্রে আমি বাবাকে গিয়ে বলব। জোর করে বলব— আপনি বিয়ে করতে পারবেন না। আয়—নেমে আয়। আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি। আবার হাসছিস ? চুপ কর্। পাগল কোথাকার ?

রাত্রি আন্দাজ দশটা। খাটের উপর আধ-শোয়া অবস্থায় বসে শশধর কাকা কাকীমার অয়েল পেণ্টিংটার দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে কি ভাবছেন। হঠাৎ মিনি আর রজত এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। সামনের ঘরে তাঁর আটটি ছেলে-মেয়ে অঘোরে ঘুমোয়। শশধর কাকা হঠাৎ মিনি আর রজতকে দেখে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করেন—কিরে ? তোরা এখন ?

মিনি এবং রজত দুজনেই তাদের মনোভাব অকপটে ব্যক্ত করে শশধর কাকার কাছে। শশধর কাকা তাদের কথা শুনে অবাক হয়ে যান। এরা বলে কি ? এরা এদের ছোট ভাই-বোন-দের মানুষ করবার জন্যে বিয়েই করবে না ? পাগল হ'ল নাকি এরা ?

শশধর কাকা মিনির দিকে চেয়ে বলেন—তা কি হয়, মা ? গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। রজতের বিয়ে দু'বছর পরে দিলেও চলবে। কিন্তু তোমার ত সব ঠিক করে ফেলেছি, মা।

মিনি তখন বলে—এখন আমার বিয়ে অসম্ভব, বাবা। আপনি রাজু মাসীকে বিয়ে করবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন। সংসারটা একেবারে ভেসে যাবে। আপনাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে ওরা সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে। আর ঐ যারা ও-ঘরে ঘুমুচ্ছে তারা রাস্তায় রাস্তায় ভিখিরীর মত ঘুরে বেড়াবে। আপনি কি এই চান ?

রজত চুপ করে দাঁড়িয়ে মিনির কথা শোনে। তার শ্বাস বেশ দ্রুত বইতে থাকে।

শশধর কাকা খাট হতে নেমে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে মিনি আর রজতের গলা ধরে বলেন—আচ্ছা, তাই হবে। তোরা নিশ্চিন্ত থাক্। মিনি আর রজত কাঁদতে আরম্ভ করে। সে এক অদ্ভুত অপার্থিব দৃশ্য।

প্রায় বছর খানেক উত্তীর্ণ হয়ে যায়। দেবব্রত অর্থাৎ মিনির ভাবী বর সব শোনে। কিন্তু সে কিছু করতে পারে না। তার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। মিনির প্রাণে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তার হাসি বন্ধ হয়ে যায়। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়ে মিনি। অনু-শীলারও অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়।

তিন বছর পরের কথা বলছি। আমাকে কোন কারণে দু' বছরের জন্য ভারতের বাইরে যেতে হয়। ফিরে এসে একদিন সকালে শশধর কাকার বাড়ীর দিকে যাচ্ছি। হঠাৎ মিনির সঙ্গে দেখা। ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সে গঙ্গা স্নান করে ফিরছে।

তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। মনে হচ্ছে যৌবন তার দেহ হতে বিদায় নেবার উপক্রম করছে। আমাকে দেখে মিনি স্মিত মুখে বলে ওঠে—রতন দা, কবে ফিরলেন ?

—এই কিছুদিন আগে। তোদের বাড়ীতেই যাচ্ছি। তোরা সব কেমন আছিস ? কাকা বাবু কেমন ?

—সব ভাল রতন দা ?

মিনির সঙ্গে আমি উপরে উঠি। শশধর কাকা খুব আদর করে আমাকে তাঁর পাশে বসান। মিনি আমার জন্য চা-খাবার এনে সামনে রাখে। দেখি শশধর কাকা বিয়ে করেন নি। সেই সঙ্গে মিনি-ও না। রজত-ও না।

দিবসকালীন ছাত্রী নিকেতন

শ্রীসুধা সেন

বাংলা দেশ বিভক্ত হওয়ার পর নানা ভাগ্যবিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের বহু উদ্বাস্তু নরনারী সপরিবারে যখন কলিকাতা মহানগরীতে সমাগত হতে আরম্ভ হ'ল, তখন দেখা দিল নানা প্রকার সমস্যা। লোক সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় বাসস্থানের অভাব, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, রোগের আক্রমণ, আরও নানা প্রকার জটিল সমস্যা সমস্ত জনসমাজকে চিন্তান্বিত করে তুলল। শিক্ষা সমস্যাও তার ভিতর অন্যতম।

দেশের নেতাগণ, সমাজসেবকেরা যখন এই সব সমস্যা সমাধানের নানা প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন, সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য্য মাননীয় ডাঃ শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বাংলা দেশের, বিশেষতঃ কলিকাতার ছাত্র-ছাত্রী-মণ্ডলীর একটি পরিকল্পনা ও নিরীক্ষা গ্রহণ করে ঘোষণা করলেন যে, জন সমাকীর্ণ এই শহরে স্বল্প পরিসর বাসস্থানে মধ্যবিত্ত অল্প আয়ের গৃহস্থ ঘরের ছাত্র-ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার পক্ষে অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে এবং ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা শিক্ষার আশানুরূপ সফলতা লাভ করতে পারে না। বিদ্যালয়ে পাঠের শেষে কলেজে ভর্ত্তি হবার পর তাদের পাঠের যখন চাপ পড়ে, গৃহের নানারূপ অসুবিধা ভোগের মাঝে তাদের পড়ায় অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে উঠে। তাই তিনি পরিকল্পনা করলেন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এমন দিবসকালীন নিকেতনের (Day Student's Home), যেখানে কলেজের অবসরে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা সারাদিনে পাঠ তৈয়ারী করবার সুযোগ পাবে, সঙ্গে থাকবে গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম। পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী পুস্তকাদির মূল্য অত্যধিক হওয়ায় সকলের পক্ষে পুস্তক ক্রয়ও সম্ভব নয়—সেজন্য এই সব ছাত্রাবাসে গ্রন্থাগার থাকবে, সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক লাভ করে পাঠাগারে সারাদিন বসে ছাত্র-ছাত্রী পাঠ তৈয়ারী করবে। দীর্ঘ সময় থাকা কালীন আহারেরও প্রয়োজন হবে, তাই স্থির হ'ল, মাত্র অল্প মূল্যের কুপনের বিনিময়ে প্রাচুর্য্যবিহীন অথচ পুষ্টিকর খাদ্য ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হবে, শরীরের আরাম ও স্নিগ্ধতার জন্য স্নানেরও ব্যবস্থা চাই।

নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয় এ পরিকল্পনার রূপ দিতে সক্ষম হন নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাধিকার এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এক অংশ রূপে অস্থায়ী পরীক্ষামূলক ভাবে এটি পরিকল্পনার জন্য সমাজসেবী মহিলা ও ভদ্র-মহোদয় বিশিষ্ট কার্য্যকরী কমিটি গঠিত করে সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ-পূর্ব্বক অর্থ সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে কলিকাতা সহরে তিনটি পাঠাগার ও ছাত্রছাত্রী নিকেতনের কাজ তাঁরা আরম্ভ করলেন ১৯৫৬ সনের শেষ ভাগে।
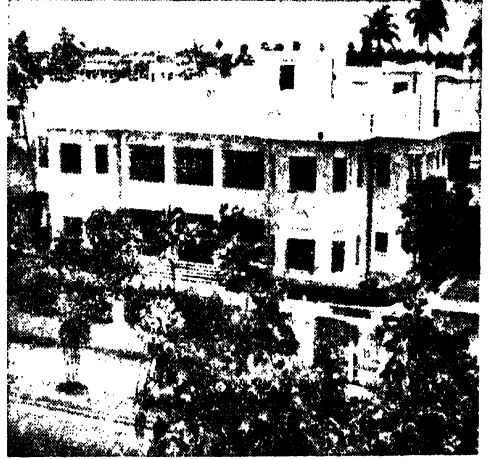
ছাত্রী নিকেতন ও পাঠাগার

কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে ১৪৭ নং রাসবেহারী এভিনিউয়ের উপর অবস্থিত প্রাসাদোপম গৃহখানি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রয় করে ছাত্রী নিকেতন ও গ্রন্থাগারের জন্য মনোনীত কমিটির হাতে অর্পণ করলেন।

১৯৫৬ সনের ২১শে নভেম্বর তারিখ থেকে কর্ম্মী নিয়োগ সুরু করে অফিসের কাজ আরম্ভ হ'ল। ধীরে ধীরে বিভিন্ন দোকান থেকে মূল্য তালিকা সংগ্রহ করে পুস্তক ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় করা হতে লাগল।

সকল প্রকার ব্যবস্থা সম্পন্ন, সুন্দর পরিবেশের মাঝে ছাত্রী নিকেতনের গৃহখানির প্রশস্ত ৪৮টি কক্ষ ও বারান্দা পাঠাগারের পক্ষে উপযোগী। সম্মুখভাগের দ্বিতল গৃহটি পাঠাগার, গ্রন্থাগার ও নানা প্রকার অফিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। পিছনের চারিতলা গৃহের নীচে ১৫টি স্নানাগার, তিনতলায় ক্যান্টিন ও রন্ধনশালা, চারিতলার উপর সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ও ক্যান্টিনের কর্ম্মীগণের বাসগৃহ। ঐ অংশের দ্বিতলের কক্ষগুলিতে বর্ত্তমানে অস্থায়ী ভাবে ১৯৫৭

---

* চিত্রগ্রহণ করেছেন শ্রীগোপা মল্লিক

সনের মার্চ্চ মাস থেকে সরকারের অনুমোদিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন কার্য্যকরী কমিটি।

ছাত্রীনিকেতনে কলেজের ছাত্রীগণ (under-graduate) অবসর সময়ে বিনাবেতনে পাঠাগারের সুযোগ লাভ করে। শান্ত পরিবেশে সারাদিন একাগ্র মনে পাঠাভ্যাস করতে পারে।

একাগ্রমনে পাঠরতা ছাত্রীবৃন্দ

ছাত্রী নিকেতনের সভ্য তালিকাভুক্ত হবার জন্য কিছু নিয়ম অবশ্য পালন করতে হয় :—

(১) অভিভাবকের আয় মাসিক ৩০০৲ অথবা তার নিম্নে, কিম্বা পরিবারের স্বজন হিসাবে গড়পড়তা আয় মাসিক ৩০৲ হওয়া দরকার। এজন্য আবেদনপত্রের সঙ্গে আয়ের প্রমাণ স্বরূপ কর্ম্মস্থলের স্বাক্ষরিত কর্ম্মনিয়োগপত্র দাখিল করতে হয়।

(২) আবেদনকারী কলিকাতা বা সহরতলীর কোনও কলেজের ছাত্রী হিসাবে অধ্যক্ষের অনুমোদন স্বাক্ষরসহ দরখাস্ত পেশ করবে।

প্রতি সপ্তাহে ছাত্রীগণ আবেদনপত্র নিয়ে যথাযথ ভাবে পূরণ করে সেগুলি অফিসে জমা দিয়ে যায়। প্রতি সোমবার তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে, পাঠাগারের নিয়মাবলী পালন করবার কথা বুঝিয়ে কর্ম্মাধ্যক্ষা ছাত্রীদের ভর্ত্তি করেন, আবশ্যকবোধে সভানেত্রীও ছাত্রীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করে ভর্ত্তি অনুমোদন করেন। কথাবার্ত্তায় ছাত্রীগণের সঙ্গে পরিচয় লাভ হয়।

ছাত্রী আবাস ও পাঠাগার প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার বন্ধ থাকে।

যদিও কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে এই ছাত্রী নিকেতন অবস্থিত, তথাপি কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল ও সহরতলীর উপকণ্ঠ থেকে ছাত্রীগণ সভ্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। বজবজ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, কসবা, সাহাপুর, গরফা, বেলঘরিয়া, ক্যানিং, বারাসাত, খড়দা, ব্যারাকপুর, বাটানগর, কুলিয়া ট্যাংরা, সন্তোষপুর, বারুইপুর, হালুট, পুটিয়ারী, কোদালিয়া প্রভৃতি সকল জায়গার বাসিন্দার কন্যাগণ ছাত্রী হিসাবে এই পাঠাগারের সুযোগ ভোগ করছে। দূর থেকে এসে তারা কলিকাতায় কলেজে পড়ে এবং প্রতিদিন কলেজের আগে ও পরে অবসর সময়ে ছাত্রী নিকেতনের সুযোগটুকু লাভ করে। পাথেয়র জন্য তাদের বেশী খরচ হয় না।

কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত প্রায় ২১টি কলেজের* ছাত্রী এই পাঠাগারের সভ্য। কলেজ দূরে অবস্থিত হলেও ছাত্রীগণ উৎসাহভরে কলেজের অবসরে পাঠাগারে এসে পাঠাভ্যাস করে।...যে সকল ছাত্রী ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সনে এই পাঠাগারে উপকৃত হয়ে পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেছে, তারা আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে যে, সকলপ্রকার পুস্তকাদির সাহায্যে ও এমন শান্ত পরিবেশে পাঠাভ্যাস না করলে তাদের এ সফলতা লাভ সম্ভবপর হ'ত না। নিজ নিজ গৃহে স্থানাভাবে ও সংসারের নানাপ্রকার কোলাহলের মাঝে নিরালায় পাঠাভ্যাসের সুযোগ তারা পায় না।

ইণ্টার মিডিয়েট, বি, এ, বি. এস. সি, আই. কম ও বি. কম ক্লাশের (I. A, B. A, B, Sc, I, com, B, com) পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সকল প্রকার পুস্তক ক্রয় করা হচ্ছে। ছাত্রীগণ প্রয়োজনবোধে যে পুস্তকের যখনই দাবী জানায়, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত করিয়ে ক্রয় করা হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার অভিধান, Encyclopedia, Book of knowledge ও বহুবিধ reference বইও ক্রয় করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার

ছাত্রীগণ ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গে একটি পরিচয় কার্ড (identity card) দেওয়া হয়, প্রতিদিন প্রবেশদ্বারে ঐ পত্রটি প্রদর্শনপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করে। নিজস্ব পুস্তক, অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রবেশদ্বারের নিকট দ্বাররক্ষকের তত্ত্বাবধানে জমা দিয়ে

---

* পরিশিষ্টে ব্যক্ত

চিহ্নটীকা (Token) কাছে রাখে, পুনরায় গৃহে যাবার সময় দ্রব্যাদি ফেরৎ পায়।

প্রয়োজনমত পাঠ্যপুস্তক তালিকা ও পুস্তকের চিহ্নিত কার্ড দেখে নির্ব্বাচন করে স্বাক্ষরযুক্ত কাগজে দাবী জানিয়ে নিজেরাই গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে পুস্তক গ্রহণ করে। তিনখানি পুস্তকের বেশী একবারে দেওয়া হয় না, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীর একখানি পুস্তক প্রাপ্য। তবে আবশ্যকবোধে বদলিয়ে নিতে পারে।

পুস্তক বাহিরে নিতে পারে না—পাঠাগারেই তার ব্যবহার করতে পারে।

পাঠাভ্যাসের জন্য দীর্ঘসময় পাঠাগারে অতিবাহিত করতে হলে ছাত্রীরা শরীরের আরামের জন্য (বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে) স্নান করবে, সেজন্য ১৫টি ঝর্ণা দেওয়া স্নানের ঘর তৈয়ারী হয়েছে। বস্ত্রাদি রাখবার জন্য ছোট ছোট খোপবিশিষ্ট আলমারী আছে।

কর্তৃপক্ষ স্বল্পমূল্যে কুপনের বিনিময়ে পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করেছেন। কমিটি যথাযথ নিয়মানুসারে নির্ব্বাচন করে পাঁচ জন কর্ম্মীকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। এই সকল মহিলা-কর্ম্মী যথেষ্ট যত্নসহকারে ছাত্রীগণের আহারের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করছেন।

ক্যান্টিনের আহারকক্ষ

ক্যান্টিনে টেবিল-চেয়ারে, stainless steel-এর ঝক্‌ঝকে বাসনে ছাত্রীরা আহার্য্য পায়। তারা মাত্র ৵০ (দুই আনা মূল্যে কুপন ক্রয় করে এবং সরকারের অর্থ-সাহায্যে ঐ কুপনের বিনিময়ে ।৵০ (ছয় আনা) মূল্যের আহার্য্য তাদের দেওয়া হয়। প্রতি ছাত্রী পূর্ব্বদিনে পরের দিনের কুপন ক্রয় করে এবং যথাদিনে সেই কুপন দেখিয়ে আহার করে। প্রতি ছাত্রী ইচ্ছা করলে প্রতিদিন একবার এই আহার্য্য পেতে পারে।

দ্বিপ্রহরে ভাত, ডাল, তরকারী, মাছ বা মাংস অথবা ডিমের কারী, কোনও দিন চাটনী এবং যারা বৈকালে টিফিনে আসে তাদের এক-চতুর্থাংশ পাউণ্ড রুটি, মাছ বা মাংস অথবা ডিমের তরকারী, চা এবং ফল দেওয়া হয়। খাদ্য-তালিকায় পরিবর্ত্তন প্রায়ই করা হয়।

যারা সারাদিন পরে (বিশেষতঃ পরীক্ষার পূর্ব্বে অথবা পরীক্ষার সময়ে) দ্বিপ্রহরে সরকারী সাহায্যে ।৵০ (ছয় আনায়) পুরা আহার করার পর বিকালে অতিরিক্ত টিফিন ক্রয়মূল্যে কিনে খেতে পারে। তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

খাদ্যদ্রব্যাদি যাহাতে তাজা ও খাদ্যপ্রাণ-সংযুক্ত এবং পরিমিত হবার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

আহারের শেষে ছাত্রীগণকে আপন আপন বাসন ধুয়ে রাখতে হয়। তার জন্য ব্যবস্থা করা আছে।

১৯৫৭ সনে ১৫ই জানুয়ারী মাত্র সাতটি ছাত্রী নিয়ে এই বিরাট পরিকল্পনা আরম্ভ এবং ছাত্রী-আবাস ও পাঠাগারের কার্য্য-সূচনা হয়েছিল। আজ সেই স্থানে ছাত্রীসংখ্যা নয়শত দুইজন, যারা এই পাঠাগারের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে প্রতি বৎসরই পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদল এবং অন্যান্য নানা কারণে কিছু ছাত্রী চলে যাবে আবার নূতন দল আসবে।

এই পাঠাগারের বিভিন্ন কক্ষ ও বারান্দায় একত্রে দুইশত পঞ্চাশ জন ছাত্রীর বসবার স্থান ও ব্যবস্থা আছে।

১৯৫৮ সনের চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থিনীর কয়েকজন

এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠার প্রথম দিক থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, অধিকাংশ ছাত্রীর ইংরেজীতে দখল কম, এবং অনেক স্থলে সেই কারণেই পরীক্ষার ফল ভাল হয় না। ইংরেজী পাঠ্য-পুস্তক অপেক্ষা notes তাদের সহায়তা করে, বিশেষতঃ যে সব notes-এ বাংলায় অনুবাদ করে সাহায্যকরা আছে, তার চাহিদাই বড়। Reference বই, এমন কি ভাল অভিধানের পরামর্শও ছাত্রীরা গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না। সেজন্য কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে বিনা পারিশ্রমিকে কয়েকজন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষায় ব্রতী ছাত্রী, ইংরেজী ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, রাষ্ট্রতত্ত্ব, পৌর-বিজ্ঞানের উপর শিক্ষকতা করে এই পাঠাগারের কোচিংক্লাশে ছাত্রীগণের প্রভূত সাহায্য করছেন। ছাত্রীগণ বিনা-বেতনে এই ক্লাশে যোগদান করে উপকার লাভ করেছে এবং তারা খুবই কৃতজ্ঞ।

এই ছাত্রীনিকেতন এবং পাঠাগারে সকল বিষয়ে কাজ

করবার জন্য বার জন মহিলা-কর্ম্মী এবং একজন হিসাবরক্ষক নিযুক্ত আছেন। ইহা ব্যতীত দারবান পিয়ন, সাহায্যকারিণী, জমাদার ও মালী নয় জন আছে। সকলেরই কাজের সময় নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সাড়ে ছয় ঘণ্টা এবং ছাত্রীগণের পাঠের সুবিধার জন্য বৎসরে দশ দিন মাত্র পাঠাগার বন্ধ থাকে। তবে প্রত্যেক কর্ম্মীই সপ্তাহে দেড় দিন বিশ্রাম লাভ করেন এবং অন্যান্য নিয়মানুসারে ছুটি পেতে পারেন। সকলে একতাসহযোগে পাঠাগারের উন্নতিবিধানে পরিশ্রম করেন।

পাঠাগারের নিয়মানুসারে পুস্তকাদি ব্যবস্থামত রাখা হয়। কর্ম্মিগণের ভিতর পাঠাগারের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে শিক্ষিত চার জন আছেন।

এই পর্য্যন্ত মোট পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে ৪১১০ খানি এবং তার মূল্য দেওয়া হয়েছে টা ৩৫,৪২৫'৭৯ নঃ পঃ।

ছাত্রীদিগের অসুস্থতাবোধে বিশ্রামের জন্য একটি আরাম কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে, আশু চিকিৎসার জন্যে কিছু ঔষধও ক্রয় করা হয়েছে। সকল প্রকার অসুবিধা দূরীকরণের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়।

পাঠাগারের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রীগণের পরীক্ষায় সফলতা ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে জানবার জন্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। যে সকল ছাত্রী কিছু দিন যাবৎ অনুপস্থিত থাকে, তাদের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে পত্র প্রেরণ করা হয়।

কিছুদিন এই পাঠাগারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে ছাত্রীগণের পরীক্ষার ফলাফলের উন্নতি পরিলক্ষিত হবে আশা করা যায়। তখনই এই পরিকল্পনার সার্থকতা। যে নারী জাতির উপর ভবিষ্যৎ বংশ নির্ভর করছে, শিক্ষায়, মনের বিকাশ এবং সকল প্রকার কর্ম্মদক্ষতায় সেই ভবিষ্যৎ মায়েরা আজ ছাত্রীরূপে এই পাঠাগারের উপকারিতা গ্রহণ করতে সক্ষম হউক।

পরিশিষ্ট অনুলিপি

(ক)

বিভিন্ন কলেজের নাম

(১) মুরলীধর, (২) সুরেন্দ্রনাথ, (৩) আশুতোষ, (৪) চারুচন্দ্র, (৫) সিটি কলেজ, (সাউথ) (৬) সিটি কলেজ, (মেন) (৭) সাউথ ক্যালকাটা, (৮) উইমেনস ক্রীশ্চান কলেজ, (৯) বঙ্গবাসী, (১০) বিদ্যাসাগর, (১১) প্রেসিডেন্সী, (১২) স্কটিশ চার্চ্চ, (১৩) গোয়েঙ্কা, (১৪) লেডী ব্রেবোর্ণ, (১৫) দেশবন্ধু, (১৬) দীনবন্ধু এনড্রিউস, (১৭) বিজ্ঞান কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্গত), (১৮) বিজয়গড়, (১৯) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, (২০) মহারাজা মণীন্দ্র, (২১) বেথুন কলেজ।

(খ)

জানুয়ারী ১৯৫৭—ডিসেম্বর ১৯৫৮

(১) আবেদনপত্র প্রাপ্ত সংখ্যা—১১৭০, (২) পাঠের জন্য সুবিধা ভোগ করিয়াছে এবং করিতেছে মোট ছাত্রী সংখ্যা—৯০২ (৩) প্রতিদিন উপস্থিত ছাত্রী সংখ্যা—গড়পড়তা—২০০, (৪) প্রতি ছাত্রী দিনে পাঠাভ্যাস করে গড়পড়তা সময়—৪ ঘণ্টা। (কয়েকজন ছাত্রী ১০ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পড়ে, পরীক্ষা নিকটে আসিলে এই দলের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়) (৫) মোট পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে—৪১১০ (Art, Science and reference books), (৬) পুস্তকের জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়েছে টা ৩৫,৪২৫'৭৯ নঃ পঃ।

তুমি ও আমি

শ্রীবিভা সরকার

সারা দিনমান বিকিকিনি লয়ে ব্যস্ত রয়েছি আমি
নিভৃতে বসিয়া হাসিছ শুধুই তুমি অন্তর্যামী—
মনে হয় যেন ছলনা করিছে আমারে আমারই ছায়া
পথ ভুলে যাই লক্ষ্য হারাই হৃদয় কাঁদায় মায়া।
সকল পাওয়ার মাঝে না পাওয়ার গোপন গভীর ব্যথা
কেন মনে আনে কি জানি কে জানে অকারণ ব্যর্থতা!
বিহ্বল হয়ে একি হাহাকার মানস বিরহী তোলে
জন কোলাহলে এ জনারণ্যে বুঝি-বা নিজেরে ভোলে।
সব লেনদেন ফুরাবে যেদিন ওগো অন্তর্য্যামী
নিভৃতে সেদিন হব মুখোমুখি শুধু তুমি আর আমি!

অলসময়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

ঠিক এক মাস পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল কুমার। মনটা খুশীতে আছে এখন ওর। রমলারা এসে পৌঁছোচ্ছে কাল। ওদের জন্যে চেলসীতে তিনটে ঘর ঠিক করে রেখেছে মার্কাস, একটা বাড়ীতে। একেবারে শহরের মধ্যে এতগুলি ঘর একসঙ্গে পাওয়া শক্ত। মার্কাস বলেছে, চেষ্টা করলে বোধহয় ওবাড়ীতে আরও একটা ঘর যোগাড় করতে পারা যেতে পারে, তা হ'লে কুমার সেখানে গিয়ে অধিষ্ঠান হবে। কিন্তু আপাততঃ জুনি বার্কারের বাড়ী তার ঠিক আছে, অন্ততঃ তার আগের দিন সকালবেলা এসেও তাই বলে গেছে জুনি। জুনির সম্বন্ধে ধারণা ওর বদলে গিয়েছিল—অসুখের সময়ে এত যত্ন করেছিল ওকে। বেচারা এখনও তার জর্জকে ফিরে পায় নি। যখনই জিজ্ঞেস করে, শোনে, সামনের সপ্তাহে আসবে। তার জন্যে ঘর সাজাতে সাজাতে ছেলেমেয়ে সমেত হাঁপিয়ে উঠেছে জুনি। শোনা গেল, ছোট ছেলেমেয়ে দুটি ঘরের মেঝে পালিশ করেছে। আর জন ও মার্গারেট দেয়ালে ওয়াল-পেপার বসিয়েছে। জানলা, দরজা রঙ করেছে। আরও আর ওর ননদ দু'জনে মিলে সেলাই করেছে পর্দা, বেড-কাভার ল্যাম্পসেড ইত্যাদি।

—"সত্যি এবারে সামনের সপ্তাহ ঠিক ত"? কুমার জিজ্ঞেস করেছিল।

—"দেখে নিও, এবারে ঠিক এসে যাবে," বলতে বলতে কথা ঘুরিয়ে নিয়েছিল জুনি। বলেছিল—"বাড়ী যা সাজিয়েছি, দেখে আর চিনতে পারবে না।"

—"কিন্তু ঢুকতে পারব ত?"

কুমার হেসেছিল—"নাকি আমার ঘরটা ইতিমধ্যে আর কাউকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছ।"

—"পাগল?" জুনি আকাশ থেকে পড়েছিল, "আর আমি ঘরভাড়া দেব না। যাদের দেওয়া আছে, তাদেরই মধ্যে কিছু তাড়াতে চাই। জর্জ আবার বেশী লোক বাড়ীর মধ্যে পছন্দ করে না। ঐ ছোট ঘরটা বাচ্চাদের নার্সারী করে দেব। ফিলিপ আর ম্যাগিকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেব বোর্ডার করে। ঐ ননদটাকে আর তখন বাড়ীতে ঢুকতে দেব না। কুমার, জর্জকে নিয়ে আমি সুখে থাকব।"

—"তা হলে কাল সন্ধ্যাবেলা আমি বাড়ী যাচ্ছি।"

কুমার হেসেছিল, নিজে থেকে সেধে নেমন্তন্ন নিয়ে বলেছিল, আমার জন্যে আইরিশ স্ট্ করে রেখ, প্লীজ।"

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল জুনি বার্কার। কুমার জানত, ও খাওয়াতে ভালবাসে। যদিও নিজের এত অভাব, তবু ফস করে একদিন বেরিয়ে পড়ে, কোন জমকালো কাফেতে ঢুকে বেশ কিছু খরচ করে সঙ্গী-সাথীদের খাইয়ে দিতে ভালবাসে। কুমারকে অনেকবার সাধাসাধি করেছে আগে। কিন্তু কুমার রাজী হয় নি। আর তখন তার অবসরগুলির এমন সময় ছিল না, যা, জুনির সঙ্গে নষ্ট করতে পারে। তাই আজ ওকে খুশী করতে চাইল কুমার।

সন্ধ্যাবেলা সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে ও যখন বেরিয়ে এসে বাগানের মধ্যে দিয়ে চলেছে, তখন ঈভা এসে ওর পাশে দাঁড়াল। অবাক হ'ল কুমার, এই ত সবার সঙ্গে ওর কাছেও বিদায় নিয়ে এল। "ঈয়েস ঈভ," ফিরে দাঁড়াল কুমার—ব্যাপার কি? "ফ্যাকাশে মুখের লাজুক চোখ ওর দিকে তুলে ঈভ বললে, "তোমার ঠিকানাটা দাও।" এই অর্দ্ধ বিদেশিনীর বাঙালী ধরনের মুখের দিকে যতবার চেয়ে দেখেছে, বার বার মনে হয়েছে, এরকম যদি ওর ছোট একটি বোন থাকত।"

ব্যাগ খুলে ছোট একটা খাতা বার করলে ঈভ। খাতাসমেত সেই হাতটা ধরে ফেলল কুমার। বলল, "কেন ঈভ, আমার ঠিকানা দিয়ে তোমার কি হবে? প্রতিদিন কত রোগীকে তোমাদের সেবা করতে হয়, তাদের সকলের নাম-ধাম ত আর লিখে রাখ না।"

কুমারের হাতের মধ্যে খুশী হয়ে উঠল ঈভের হাত, আর সেই খুশীর ঝিলিক হাসি হয়ে ফুটে উঠল চোখে। বললে, "তোমাকে একদিন একটা কাজের ভার দেব, তোমায় দেখে আমার মনে হয় যে, তোমাকে বিশ্বাস করা যায়, মন চায় তোমাকে নিজের ভাই-এর মত। আর তুমি ত

জান, আমাদের কোয়ার্টার্স, আর দেখা করবার সময় খবর দিও, যদি কোনদিন বোঝ বোনকে কোন দরকার আছে।"

—"নিশ্চয়ই" মুগ্ধ বিস্ময়ে কুমার বললে, "লণ্ডনের হাসপাতালে পথের ধারে হঠাৎ যে এমন একটি বোন পাওয়া যাবে, কে জানত ?" ওর হাতটা খুব করে নেড়ে দিয়ে কুমার ট্যাক্সিতে উঠে বসল। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে ঈভ হাত নাড়লে—আরিভোয়া। কি আশ্চর্য্য মিষ্টি মেয়েটি, কুমার ভাবলে, দেখতে যে ভাল নয়, সেকথা মনেই পড়ে না। নেহাৎই সাদামাটা চেহারা তবু এমন একটা ছাপ আছে যা বাংলার নিজস্ব। কুমারের মনে হ'ল, সে চরিত্র-মাধুর্যের ছাপ। ওকে দেখে বারবার নিজের ঠাকুমাকে মনে পড়ে যেত কুমারের। মনে হ'ত, কিশোরী ঠাকুমা যখন কপালের উপরে ঘোমটা টেনে, ওদের দেশের বাড়ীর পুজো-দালানে অথবা রান্নাবাড়ীতে ছুটোছুটি করে ফরমাস খেটে বেড়াতেন, তখন তাঁকে বোধ হয় এমনি দেখাত। ঈভার মাথায় একটা মস্ত খোঁপা আর কপালে একটা ছোট্ট টিপ লাগালে কেমন দেখাত, মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করে কুমার।

অথচ ঈভা কিন্তু পুরোপুরি বাঙালী নয়। ওর বাবা ত্রিবাঙ্কুরের লোক আর মা বাঙালীর মেয়ে। ওর বাবার খ্রীষ্টধর্মে নাকি প্রায় দুই হাজার বছরের ট্র্যাডিশন—সিরিয়ান খ্রীষ্টান ওরা। আর ওর মায়ের খ্রীষ্টধর্ম মাত্র দুপুরুষের। ধর্মান্তর গ্রহণ ওর দাদামশায়ের কীর্তি। তাঁরা হুগলীর লোক। কিন্তু বিয়ের পরে ওর মা-বাবা চলে যায় উটকামণ্ডে। সেখানে কোন একটা কফি চাষের ম্যানেজার ছিলেন ওর বাবা। ঢালু সবুজ পাহাড়ের গায়ে ঝাউ গাছের ঝিরঝিরে হাওয়া ছড়ান লাল টালীর ছাদগাঁথা সাদা বাংলো বাড়ীটা আজও ওর এলবামের মতই মনের পাতায় ক্লিপ করা আছে। একটি শান্ত সুন্দর সংসারের আভাসমাখা এই বাড়ীটির ছবি, ঈভা কুমারকে দেখিয়েছে। বছর দশেক বয়েস পর্যন্ত ঈভার কেটেছে সেখানে। প্রকৃতির কোলে, পাখীডাকা সকাল-বিকেলে ওর মা-বাবার স্নেহের পুতুল হয়ে। তার পরেই কি যেন একটা মহাবিপ্লব ওদের সংসার ছিন্নভিন্ন করে ওকে ওর সেই বাল্যলীলার উৎসবপ্রাঙ্গণ থেকে উপড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে অনেক সাগর পার করে। যদিও এসব কথা ঈভা কুমারকে বলে নি। কুমারের কাছে গল্প করেছে শুধু সুখের স্মৃতির। ডিউটিতে এসে প্রথম দিন ওকে দেখে এবং ভারতীয় বলে ওর পরিচয় পেয়েই ঈভার মন টলেছিল। যেদিন শুনল বাঙালী, সেদিন ওর মন উতল হয়ে উঠল। ওরা তা হলে এক মায়ের সন্তান—সহোদর।

ঈভার গল্প এইটুকুই জানে কুমার। এই যেটুকু ঈভা সানন্দে গল্প করেছে, কিন্তু কুমার আভাসে বুঝেছে। ওর তেইশ-চব্বিশ বছরের জীবন চরিতের সবটাই অকথিত রয়ে গেছে। যা শুনেছে তা শুধুই সুখের রোমন্থন। বাকী সুবৃহৎ বেদনার ইতিহাস যা ওর কোমল মুখের আড়ালে একটা করুণ বিচ্ছেদ কাহিনী প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার কথা কখনও কিছুই শোনে নি কুমার, কিন্তু আজ মনে হ'ল সেই কথাই একদিন বলবে বলে ঈভা আজ ওর ঠিকানা নিল।

আলো ঝলমল অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের প্রত্যেকটি দোকানের কাঁচের জানলায় আসন্ন উৎসবের সমারোহ। শিশুদের মন ভোলানো কত প্রচুর কত বিচিত্র সজ্জা, তার কত রং, কত কারুকাজ। সবুজ 'ক্রিস্টমাস গাছে'র সরু সরু নাইলনের পাতায় কত বিন্দু বিন্দু রঙীন আলো। সাদা তুলোর বরফের পাহাড়, বুড়ো ক্রিস্টমাসের সাদা দাড়িতে কত রামধনুর প্রতিফলন।

একটার পর একটা মোড় পেরিয়ে বেকার ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়ে বার্কলে ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে ১০ নং বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি থামল। ভাড়া চুকিয়ে নেমে দাঁড়াল কুমার। কনকনে হাওয়া ওর ঘাড়ের পাশ দিয়ে ফরাসী টুপির ফাঁক দিয়ে ঢুকে, অনেক দিন পরে বাইরের নতুন বাতাসের একটা ঢেউ তুলে দিল। ওপাশে হৃতপত্র গাছগুলির সরু-মোটা ডালে বরফের এবড়ো-খেবড়ো মালা ঝুলে ঝুলে আছে। তার উপরে অষ্টমীর চাঁদের অস্পষ্ট মায়া লণ্ডনের এই কুশ্রী কালো বাড়ীগুলির উপরেও যেন একটা স্বপ্নের মত ছায়া ফেলেছে। অকারণে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমার বেল টিপলে, একবার দুবার তিনবার।

ভিতর থেকে ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, কাণে আসছে চাপা কথার আভাস। ওরা কি জানে না যে ওর আসবার কথা আছে—দরজা খুলতে এত দ্বিধা কেন, আবার রিং করল কুমার অনেকক্ষণ ধরে। দরজা খুলে গেল। জন আর মার্গারেট দাঁড়িয়ে আছে। আর ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে একটি কুটকুটে কালো মাঝ-বয়সী মেয়ে। তাঁর পরণে একটা কটকটে হলদে রঙের ব্লাউজের সঙ্গে টকটকে লাল রঙের স্কার্ট। কুমার বুঝলে, জুনি বার্কারের এ পক্ষের ননদ। এরই ভয়ে এরা বাড়ীশুদ্ধ তটস্থ।

মার্গারেট পরিচয় করিয়ে দিল। এলসি ডেভিড আমার আন্টি আর আঙ্কল কুমার। বেটি আর পল এসে জড়িয়ে ধরল, আঙ্কল কুমার, আঙ্কল কুমার। মিষ্টি কৈ ?" কুমার

অবাক হয়ে ভাবল, এও নতুন। পকেট থেকে চারজনের জন্যে চারটে চকোলেটের চাক্তি বের করে দিয়ে কুমার বললে, "তোমাদের মা কোথায় ?"

—"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !" বেটী ছুটে সরে গিয়ে হাসতে লাগল। অর্দ্ধেক কথা মুখে রেখে পল বললে, "তোমার ঘর নেই আঙ্কল কুমার। আজ তোমাকে এই সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।" অবাক হয়ে গেল কুমার। বেটি হাসতে লাগল—"হিঃ হিঃ।" স্টপ ইউ তাকে ধমক দিল মার্গারেট। এলিস ডেভিড বললে, "আমাকে একটু মাপ করতে হবে।" সে পালাল ঘরের ভিতর। কুমারের চোখে ঘনাল শঙ্কার ছায়া। এমন অভ্যর্থনার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না।—"ব্যাপার কি মার্গারেট—সত্যি কি আমার ঘর তোমরা আর কাউকে ভাড়া দিয়েছ নাকি ?"

—হাঃ হাঃ বেটি হেসে উঠল আবার। তোমার ঘরে এখন সিলোনের রাজা এসে আছে। এই দেখ, আমাকে দিয়েছে বালা। হাতের ঝলঝলে নতুন মালার মত বালা তুলে গর্বভরে দেখাল ন'বছরের বেটি। ছ'বছরের পল লাল গাল ফুলিয়ে অর্দ্ধেক কথা মুখে রেখে বললে, "আমাদের বাড়ীতে এখন একজন রাজা আছে, তুমি ত ছিলে মাত্র প্রিন্স। কুমার নিজেই কবে বোধ হয় একদিন নিজের নামের ব্যাখ্যা করেছিল ওদের কাছে।

—থাম থাম বোকার দল, মার্গারেট ধমকে উঠল। ও মোটেই রাজা নয়, রাজা শুধু ওর নাম। আঙ্কল কুমার তুমি এসে বোস, মা বলে গেছে তোমাকে আমাদের ঘরে অপেক্ষা করতে। যাক্ তবু এ আমন্ত্রণটুকু পেয়ে বেঁচে গেল কুমার। আর দাঁড়িয়ে থাকার মত অবস্থা ছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল এখুনি এদের দু'চারটে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে চলে যায়। কিন্তু কোথায় যাবে, এই মুহূর্তে ওর আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।

মৌবির কথা সেদিন কেন শোনে নি।—এই আক্ষেপ গুমরে উঠল মনে, কিংবা বিশ্বাস কি, সন্দেহ কালো হয়ে ওঠে কুমারের মনে। কে জানে, সেই বা শেষ পর্যন্ত কেমন ব্যবহার করত, নইলে একটা সামান্য মুখের কথা সহ্য হ'ল না। একেবারে জন্মের মত চলে গেল, না বলে কয়ে। অথচ কতদিনই ত ওকে খুঁচিয়ে ওর দেশের নিন্দে করে কত কথাই বলেছে। কৈ কুমার ত তাতে অত রাগে নি কোনদিন।

এদিকে সাতটা ক্রমে আটটার দিকে চলল। জুনি বার্কারের তখনও দেখা নেই এবং এলিস ডেভিড যে কোথায় সরে পড়েছে কে জানে।

এদিকে ডাক্তাররা কড়া হুকুম দিয়েছে, খাওয়া দাওয়ায় যেন অনিয়ম না হয়, ঠাণ্ডা যেন না লাগে। কিন্তু যেমন অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে আইরিশ স্টু এর আশা না রাখাই সঙ্গত। আবার সারা রাত না খেয়ে থাকাও ডাক্তারী কানুনে ওর বর্তমান শরীরের পক্ষে বেশীরকম অসঙ্গত। এই অসুখের পরে দেহের পুষ্টি তাড়াতাড়ি করে নিতে না পারলে, সেই রাজ-অসুখটার ভয় আছে। কি বা খায় কুমার ভাবে, অথচ এই গনগনে আগুন ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করে না। বাইরে বেরুলে আবার ঠাণ্ডা লাগার ভয়টাও যথেষ্ট আছে।

এদিকে হার্থের মধ্যে লাল আগুন ফোঁস ফোঁস করছে। ওদিকে প্র্যামের মধ্যে টুপসী ঘুমিয়ে আছে। সামনের ছোট কার্পেটটার উপরে আগুনের তাপে আরাম করে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে ঝাঁকড়াচুলো 'এক্সিমু'। ঘরটা বোধ হয় সত্যিই আগের চেয়ে একটু সাজানো গোছানো হয়েছে, মনে হ'ল কুমারের। কিন্তু কুমারের নিজের মনটাই যে কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপার কি ? সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত ওকে জায়গা দেবে না নাকি। বাঃ রে, চালাকি নাকি। কুমারের জিনিসপত্র সবই ত এখানে। সেই বেসমেন্টে রান্নাঘরে যাবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কুমার চেঁচিয়ে ডাকল,—"মার্গারেট।"

—"ইয়েস" বলে সাড়া দিয়ে মার্গারেট বেরিয়ে এল। ওর একহাতে একখণ্ড রুটি, আর একহাতে ছুরি। দেখা যাক না রান্নাঘর হাতড়ে কিছু পাওয়া যায় কিনা, ভাবল কুমার। ওর অনেক খাবার খেয়েছে ওরা। আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল কুমার, বললে, "কি হচ্ছে ?"

একটু অবাক হয়ে মাগ্গি বললে, "কিছু না।"

—টেবিলের কাছে ময়লা চেয়ারটা টেনে এনে তাতেই বসে পড়ল কুমার। বলল, "তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। কি করছিলে ?"

—"এই যে লিফটের উপরে মায়ের সব কফির সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখছি। তার পরে বসে সাপারটা সেরে নেব ভাবছিলাম।"

সাপার বলতে কি বোঝায় তাকিয়ে দেখল কুমার। দু' টুকরো রুটি আর মার্জারিন আর দুটো ছোট্ট টম্যাটোর বাচ্চা। বোতলে আধ বোতল দুধ ছিল, তা থেকে একটা কাপে একটুখানি ঢেলে নিয়ে চোরা চাউনিতে চারিদিকে চেয়ে মার্গারেট বললে, "বলে দিও না যেন মাকে।"

—"এই খেয়ে তোমার পেট ভরবে ?" বিস্মিত প্রশ্ন বেরুল কুমারের কণ্ঠে।

হৃত আত্মসম্মান ফিরে এল কিশোরীর, বললে,

"বিকেলে অনেক খেয়েছি, কেক, স্যাণ্ডুইচ, বিস্কিট তাই খিদে নেই। বেটি চেঁচিয়ে উঠল পাশের শুদোমঘর থেকে—"এই ম্যাগি তুই কি খাচ্ছিস ?"

—"কিছু না, পাজী কোথাকার, ম্যাগী চ্যাচাল, চুপ করে ঘুমো।"

—"ওদের খাওয়া হয়ে গেছে"—প্রশ্ন করল কুমার।

—"কিছু দেয় নি খেতে, আঙ্কল, বেটি রেগে বললে। বিকেলে একটু কেক দিয়েছিল বলে এখন খালি রুটি দিয়েছে, আর অল্প একটু মার্জারিন। নিজের জন্যে সব রেখেছে পাজী।"

অবাক হয়েছিল কুমার। এত কম খেয়ে ওরা বাঁচে কি করে ? বেশ ত হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল টকটকে চেহারা। তা ছাড়া কি খাটতেই পারে। অবাক হয়ে যায় কুমার। যতটুকু যা খায় সবটাই বোধ হয় লেগে যায় দেহপুষ্টির কাজে। কিংবা হয় ত দুপুরবেলা স্কুল থেকে যে আমিষ খাবারটা দেয়, সেইটেই যথেষ্ট সারাদিনের পক্ষে। যাই হোক, সমস্ত ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে। জুনি বার্কার যখন ঠোঁঠ রাঙিয়ে, চুলে কোঁকড়া ফণা দুলিয়ে, গলায় নকল মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে নকল ফারের কোট পরে, কোন রেস্তোঁরায় বসে সবন্ধু কফি কিংবা চা খায়, তখন কে বলবে বাড়ীতে তার ছেলেমেয়েগুলি খিদেয় কান্নাকাটি করছে।

সেদিন বসে বসে মার্গারেটের খাওয়া দেখতে দেখতে আর সমাজতত্ত্ব ও খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা যদিও কুমারের মনে হচ্ছিল। তবু নিজের দেহের মধ্যে ক্ষুধাতথ্যও ওকে কম পীড়ন করে নি। কিন্তু সে সমস্যার কোন মীমাংসা হবে বলে মনে হ'ল না। কুমার বললে, "বোস তুমি খাও, আমি একটু বেরুচ্ছি, আমার স্যুটকেসটা রইল, বাকী জিনিস ত তোমাদের কাছেই আছে। এসে যেন দেখতে পাই শোবার ব্যবস্থা করে রেখেছ।"

—"আচ্ছা" বললে মার্গারেট। আমার এখনও অজস্র কাজ বাকী আছে। কাল সকালে স্কুলের জন্যে তিনজনের জামা ইস্ত্রি করে রাখতে হবে।

—"তার চেয়ে ভোরে উঠে করলেই পার," কুমার যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে মন্তব্য করে।

—"আমি কখন উঠি জান, ছ'টার সময় ব্রেকফাস্ট তৈরি করে, খেয়ে, নীচের ঘর সিঁড়ি ও ল্যাণ্ডিং-এর ছোট হলটা মুছে তবে স্কুলে যাই।"

যেসব জায়গাগুলি মার্গারেট মোছে বলে দাবি করলে, সেগুলি এত ময়লা যে, অবাক হয়ে তাকিয়েছিল কুমার। আর তাই দেখে রেগে উঠল মার্গারেট—তুমি ভাবছ, এগুলো মোছা হয় না, কারণ এখন নোংরা দেখাচ্ছে। তোমরা সবাই মিলে নোংরা করলে আমি কি করব। এই ত তোমার পায়ের ছাপ, তুমিই ত নোংরা করলে। আমি রোজ সাবানজল দিয়ে পুঁছব আর সবাই নোংরা করবে। হঠাৎ যেন রাগে দুঃখে ওর চোখে জল এল। "সরি ম্যাগি, ভুল বুঝ না, আমি তোমার উপর একটুও সন্দেহ করি নি।" আস্তে উঠে এসে ল্যাণ্ডিং-এর এক কোণে বাঁধা হুকে টাঙানো ওভারকোটটা পরে বেল্ট আঁটছে, পা টিপে টিপে চোরের মত উঠে এল বেটি। ওর কোটের বেল্ট চেপে ধরে চুপি চুপি বললে, "জান, কাল আমরা স্কেটিং করতে যাব, স্কুল থেকে বন্দোবস্ত করেছে।"

"সত্যি নাকি ? বাঃ," কুমার উৎসাহ দেখায়।

কিন্তু, বেটি ইতস্তত করে, "জান, আমাদের কিন্তু চাঁদা লাগবে দু'শিলিং করে।"

—ও, তাই বুঝি, একটু ইতস্তত করে কুমার। এই বঞ্চিত শিশুদের চার শিলিং দিতে ওর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু হঠাৎ এরকম চাওয়া ওদের পক্ষে বেশ একটু অস্বাভাবিক। আগে কখনও এ ধরনের চাইতে শোনেন নি কুমার। নিশ্চয়ই মার্গারেটই ওকে শিখিয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু কেন ? যে মেয়ে খালিপেটে কতবার খাবার প্রত্যাখ্যান করেছে; সেই মেয়ে আজ স্কেটিং-এর লোভ সামলাতে পারল না। এই প্রথম কুমার যেন স্পষ্ট করে বুঝতে পারল যে, শুধু অভাব নয় লোভই মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে।

কুমারের দ্বিধান্বিত ভাব দেখে বেটি ভয় পেয়ে আরও কাছ ঘেঁসে এসে বললে, "কুমার, দিদি বলেছে তোমার লেখা-টেখার যদি কিছু কাজ থাকে ত কাল রাত্তিরে এসে সব সে করে দেবে। আজ যদি তুমি আগাম পাঁচ শিলিং দাও।"

পার্স খুলে পাঁচ শিলিং বার করে দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল কুমার। আর এক দমক হৈম বাতাস বদ্ধঘরের ভ্যাপসা গরম ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ছুটে এসে ওর পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল বেটি। কানের উপরে কোটের কলার তুলে দিয়ে বেরে টুপীটা কপালের উপরে নামিয়ে দিয়ে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল কুমার। কনকনে ঠাণ্ডা ক্রমশঃ ওর মন ঠাণ্ডা করে দিল।

খাবার দোকান এখন এ পাড়ায় খোলা পাওয়া যাবে না নিশ্চয়। টিউবে করে চট করে রাসেল স্কোয়ারের দিকে যেতে পারে দিশী ছেলেদের আড্ডায়। কিন্তু তাও কাউকে পাবে কি না ঠিক কি। অবশ্য শীতের সন্ধ্যায় বড় কেউ একটা বাইরে যায় না। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পাট নিশ্চয় সকলের চুকেছে। হঠাৎ গিয়ে খেতে চাওয়াটা হয়ত অশোভন ঠেকবে। কোন বিলিতী পরিবারে গিয়ে এখন

খেতে চাওয়া অর্থহীন। দেশী পরিবার বলতে চেনে কেবল রমেন আর প্রতিমাকে। কিন্তু ওরাও ত ছুটি নিয়ে ইটালী গেছে। তা হলে কি করবে এখন। এদিকে ঠাণ্ডাটা জমে গিয়ে কোটের একটু-আধটু ফাঁক দিয়ে ছুঁচের মত ঢুকে দেহ যেন করাত দিয়ে চিরে চিরে কাটছিল। ভয় হ'ল কুমারের। আর বেশীক্ষণ হাঁটলে বোধ হয় অবশ হয়ে পড়ে যাবে পা। দেবীপ্রসাদের কাছে গেলে হয়, খাওয়াতে ভালবাসে লোকটা। কিন্তু ওর ঠিকানা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। শেষ পর্যন্ত পিকাডেলিতেই যেতে হবে বোধ হয়, কিন্তু ঠাণ্ডায় ও যেন চলতেই পারছে না আর। কুমার বুঝল, এ বরফ জমানো ঠাণ্ডা। কি অদ্ভুত ঐ জুনি বার্কার, এত অনায়াসে এত অকারণ মিথ্যে বলে। সেদিন ওর মাথায় জ্বরের ভূত চেপেছিল, তাই মৌরির কথা না শুনে ঐ অন্ধ নরকে রয়ে গেল।

উঃ কবে যে এদেশের হাত থেকে রেহাই পাবে কে জানে। কেন এখানে এসেছিল কটা বেশী টাকা মাইনের লোভে। আজও কেন নিজের দেশের কাজ করতে গেলে নামের পিছনে বিদেশী তক্মা আঁটতে হয়।

—কখন যে ঝুর ঝুর করে বরফ পড়া সুরু হয়ে গেছে, আপন মনে চলতে চলতে লক্ষ্য করে নি কুমার। দেখতে দেখতে তুলোর ফুলের মত কণা কণা বরফ ঝাপসা করে দিল দৃষ্টিকে। কোটের হাতে মাথার টুপীতে আর কাঁধে সাদা পুরু আল্পনা আঁকা হয়ে গেল। পথের দুধারে বাড়ীর কার্ণিশে, জানলার খাঁজে, আর পত্রহীন গাছের শুকনো ডালে গলে যাওয়া বরফের মলিন দাগের উপরে নতুন সাদা তুষারের মালা রচিত হতে লাগল। কুমার ভাবলে হয়ত আজ ওর মৃত্যুদিন, হয়ত এই ওর কপালের লেখা ছিল। সদ্য অসুখ থেকে উঠে এই বিদেশে শীতের রাতে অনাহারে ঘুরতে ঘুরতে হয়ত শেষরাতের দিকে পথে পড়ে মরতে হবে ওকে। এখন ওর এমন অবস্থা যে, একটু বিশ্রামের জন্যে ও যে-কোন জায়গায় ঢুকতে পারে, কিন্তু কোন বাড়ীর কোন দরজায় একটু ফাঁক নেই। মনে হ'ল ভুল করেছে, খাবার সন্ধানে বেরিয়ে সে ত ভাল করেই জানত, এদিকে এত রাতে কিছু খোলা পাওয়া যাবে না। জুনি বার্কারের ঘরে আগুনের ধারের চেয়ারে বসে থাকলে অন্তত জমে যাবার ভয় থাকত না। হাঁটতে হাঁটতে দুটো স্টেশন মিছি মিছি ফেলে গেছে কুমার, ভেবেছে একটা ট্যাক্সি পাবার ভাগ্য এখুনি পেয়ে যাবে। কিন্তু যে সময় যেটি সবচেয়ে প্রয়োজন, সেই সময়ই সেটি সবচেয়ে দুর্লভ। ট্যাক্সি কোথাও দেখা গেল না, কিন্তু কপালটা একেবারে খারাপ নয়—দেখা গেল, ওদিকের রাস্তায় কয়েকটা বাড়ীর পরেই ঐ দোকানের পাশে সাদা বরফে ঢাকা লাল ছাদ দেওয়া একতলা বাড়ীর রুদ্ধ জানলা দিয়ে আলোর ধারা বইছে। আর ভারী একটা হুড়মুড়ে আওয়াজ রুদ্ধ বাড়ীর ভিতর দিয়ে চাপা গর্জনের মত বেরিয়ে আসছে। ব্যাপার কি ভাবতে চেষ্টা করে কুমার, কি হচ্ছে ওখানে। যাই হোক, এটুকু বোঝা গেল যে, বাড়ীটাতে মানুষজন বেশ ভাল মতন জেগে আছে। শুধু তাই নয়, বাড়ীর মাথা থেকে একটা হাতের মত বেরিয়ে একটা নেমপ্লেট ধরে আছে। হয়ত ওটা কোন দোকান কিংবা হতেও পারে একটা কাফে। মার্জিতরুচি সূক্ষ্ম মানসের অধিকারী সুসভ্য কুমারের চোখের সামনে কাফের আলোটা ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে মাংসখণ্ডের মত তীব্র আকর্ষণে জ্বলতে লাগল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল কুমার। জমে ওঠা পিছলে তুষার পায়ে পায়ে মাড়িয়ে। যা ভেবেছে সত্যিই—Snow Down Public Bar। তারই নীচে ছোট হরফে লেখা—'মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকে।' ছাপার হরফ কটা অমৃতের ফোঁটার মত কুমারের চোখের সামনে ঝুলে রইল। পিতলের নব ঘুরিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকল কুমার। গনগনে আগুন এবং মানুষের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত ঘরের ঘনসন্নিবিষ্ট গরম ও উজ্জ্বল আলো শীতের রাতকে দরজার বাইরে বরফঝরা পথের মধ্যে ঠেলে বের করে দিল।

বারের পাশের উঁচু টুলগুলির প্রত্যেকটাতে লোক। এ ধারের গদিআঁটা বেঞ্চি দুটোও প্রায় ভর্তি। ওদিকে কয়েকটা সোফা আছে, তার একটা খালি। কিন্তু পাশেই বসে আছে একটা জাঁদরেল সাহেব। তার আগুনের মত গনগনে রঙে প্রচণ্ড একজোড়া পাকানো গোঁফ। তার পাশের চেয়ারটা খালি থাকলেও কুমারের বসতে ইচ্ছে হ'ল না। ওদিকে একটা খিলেনে রঙীন কাঠির ঝিলমিলে পর্দা—সেদিক থেকেই বাজনার সুর আসছে। সেদিক দিয়ে ভিতরে ঢুকল কুমার। সেখানে একটা কার্পেট-মোড়া লম্বা দাওয়ার নীচে মস্ত দালান তার ছাদে আলোর ঝাড়ে রঙীন রহস্যের ছায়া। আলোর বন্যা থেকে থেকেই স্তিমিত হয়ে আঁধার ঘনিয়ে তুলছে। কুমার বুঝলে এটা পুরোপুরি নাইট ক্লাব। রাতের রহস্য আনার জন্যে আলো বেশীক্ষণই আঁধারের দিকে চেয়ে আছে। তার থামগুলিতে বিলিতী লতার মাঝে মাঝে আধুনিক ছবি। একপাশে ব্যাণ্ড বসেছে, আর মাঝখানে পানোত্তেজিত নরনারীর উল্লাসোজ্জ্বল নাচ। এদিকের কার্পেটে মোড়া দাওয়ায় ছড়ানো রয়েছে কয়েকটা সোফা, তারই একটায় বসে পড়ল কুমার। নরম গদি দুহাত ভরে তাকে কোলে তুলে নিল। আরামে শরীর এলিয়ে দিয়ে কুমার নিঃশ্বাস ফেলল—আঃ।

লাল ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে, মাথা দুলিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে

লাস্যময়ী তরুণী এসে প্রশ্ন করলে, "তোমার জন্যে কি আনব মহাশয় ?"

কুমারের জানা ছিল, ঠাণ্ডার ওষুধ ব্র্যাণ্ডি। তাই হুকুম দিল—"নিয়ে এস ব্র্যাণ্ডি, আর খাবার যা আছে সবই।"

—"ওয়ান মিনিট সার", তরুণী চলে গেল! নিয়ে এল একটা ছাপানো কার্ড, মদের লিষ্টি আর এক কোণায় স্বল্প কিছু খাদ্য তালিকা।

এই লিষ্টি দেখে বাছাই করার মত অবস্থা তখন কুমারের নয়। তবু গরম ঘরে এসে শরীর একটু চনমনে হয়ে উঠেছে। তাই নিজের মেজাজ ফিরিয়ে আনতে চাইল কুমার। মিষ্টি হাসির ভাব ফুটিয়ে বললে, "ত্রাণ কর কুমারী, আমি নেহাৎই আনাড়ী। তুমি তোমার দক্ষিণ হস্তে যা এনে দেবে তাই আমি নির্বিচারে খাব। শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, আমি সদ্যরোগমুক্ত এবং প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। আমার এই মুহুর্তের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায়, আমি বোধ হয় এই টেবিল চেয়ার লাইট ফ্যান সব কিছু গ্রাস করতে পারি।"

—হাহা করে হেসে উঠল মেয়েটি, উছল যৌবনের ঢেউ দুলিয়ে দিয়ে গেল বাহুর বিক্ষেপে।

ঝন্ ঝন্ করে থেমে গেল বাজনা, নাচের একটা পর্ব শেষ হ'ল। জুড়িরা নতভঙ্গিতে পরস্পরকে নৃত্যনিয়মসম্মত বিনিতী নমস্কার জানিয়ে ক্ষণিকের জন্যে বিজোড় হলেন। পরক্ষণেই হাসিতে উছলে উছলে, হাতে হাতে ধরে তাঁরা উঠে এলেন। দপ করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলো, ছাদ থেকে ঝোলান মালাগুলি ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল। ছোট দাওয়াটুকু গিস্‌গিস্ করতে লাগল, রঙে আর কথায় আর গন্ধে—বিচিত্র মানুষের আর বিচিত্র সুরার একটা মিশ্র গন্ধ আর তার সঙ্গে মিলে রয়েছে মেয়েদের গায়ের বিচিত্র এসেন্স পাউডারের সৌরভ। যে যেখানে পারল বসে পড়ল, বেশীর ভাগই রইল দাঁড়িয়ে। হাতে তুলে নিল অর্ধপীত পানপাত্র, কেউ কেউ শূন্যপাত্র হাতে চলে গেল ভিতরে 'বারে'।

ক্রমশঃ

প্রলয়ের মাভৈঃ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জগৎ জুড়ে পাপের আগুন উঠল জ্বলে হিংসায়
মৃত্যুমুখী মানবরা আজ মত্ত সবাই দ্বন্দ্বে,
পাপের দাহে ছুটছে সবাই খুঁজছে কোথায় শান্তি
কাঁপছে মহাশূন্য নিখিল ভরল নিরানন্দে।
আত্মঘাতী হিংসাবিষের পাপের কালোধূম্র
এই জীবনের তলায় থেকে উঠল জ্বলে অগ্নি,
উর্দ্ধমুখে লকলকিয়ে উঠছে তারি জিহ্বা
রক্ষা নাই আজ পালিয়ে কোথাও কাঁদছে ভ্রাতাভগ্নী।
কোথায় যাবে ? গর্জ্জে মড়ক আসছে ছুটে বন্যা
ঝঞ্ঝা আসে প্রলয়-নাচে বজ্র হাঁকে ঝন্‌ঝন্,
অন্ধকারে গগন ঢেকে গর্জ্জে আসে বৃষ্টি
উন্মাদিনী ধরিত্রী মা ঘুরছে রোষে বন্ বন্।
যুগ যুগেরি লক্ষ পাপের উত্তাপেরি ধূম্রে
উঠল জ্বলে অগ্নিতে এই প্রলয়রোষের ধ্বংস,
ঝড় তুফানের সঙ্গে হঠাৎ আসছে কখন যুদ্ধ
কেউ জানে না থাকবে কিনা এই মানুষের বংশ।
রক্ষা নাই আজ মানবনারী কাঁদছে হতভাগ্য
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিতে এই সবাই তারা জ্বলবে,
দুর্নীতি ও হিংসাঘাতের রক্তঝরা বক্ষে
ধর্ম্মদেবের রুদ্র অভিসম্পাত আজি ফলবে।

ক্ষীরোদসাগর শুষ্ক হ'ল কোন্ পাপে এই বিশ্বে
খুঁজল না কেউ কোথায় সে পাপ রইল হয়ে গুপ্ত,
দেহের পথিক জানল না কোন্ উর্দ্ধটানের সূত্রে
ক্ষুধার সুধা কেমন করে আকাশে হ'ল লুপ্ত ?
রাষ্ট্র-সমাজধর্ম্ম আজি লক্ষ পাপে তপ্ত
সব মানুষের কর্ম্ম জুড়ে জ্বলছে যে তাই অগ্নি,
তপ্ত গগন তপ্ত মাটি শস্যহীনা পৃথ্বী
আর্ত্তনাদে মৃত্যুমুখে চলছে ভ্রাতাভগ্নী।
আজ এই প্রলয়-পর্ব্বে নিয়ে আশীর্ব্বাদের মন্ত্র
মিথ্যা এবং অধর্ম্মেতে হয় নি যারা বিদ্ধ।
তোমায় ধরে রইল যারা তারাই শুধু বাঁচবে
থাকবে শুধুই ভক্ত যারা নিষ্পাপেতে সিদ্ধ।
আত্মসমর্পণের যারা সর্ব্বজয়ী বীরদল
আয়রে তোরা তাল বাজা আজ জ্বলুক প্রলয় অগ্নি,
ঝড়ের সাথে নাচছে ঈশান কাঁপছে মহী থর থর
বীরের মত আয়রে দাঁড়া আয়রে ভ্রাতাভগ্নী।
উলঙ্গিনী প্রলয় মায়ের উন্মাদন ঐ নৃত্যে
সংহারেরি খড়্গ দেখে কিসের তোদের ভয় গো ?
তোদের লাগি ঝরছে যে রে ঐ বরাভয় ঝরঝর
ভক্তবীরের দল যে তোরা করবি প্রলয় জয় গো।

আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক উন্নয়নে বিশ্ব-ব্যাঙ্ক

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

গঠন

আন্তর্জ্জাতিক উন্নয়ন এবং পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান (সাধারণত বিশ্ব-ব্যাঙ্ক বলিয়া পরিচিত) ১৯৪৪ সনের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস নামক স্থানের আর্থিক সম্মেলনের সময় স্থাপিত হয়, কিন্তু ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়, ১৯৪৬ সনের জুলাই মাস হইতে। ইহা একটি আন্তর্জ্জাতিক সমবায় প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা ইউনাইটেড নেসন-এর একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক উন্নতি বিধানে সাহায্য এবং সারা পৃথিবীর লোকের জীবনধারণের মান উন্নয়ন এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। এই ব্যাঙ্ক সদস্য-গবর্ণমেণ্টসমূহকে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং বেসরকারী শিল্পকে কর্জ্জ দেয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে কর্জ্জ দিতে হইলে সদস্য গবর্ণমেণ্টের সেই কর্জ্জ সম্পর্কে গ্যারান্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

৬৭টি দেশের গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাঙ্কের সদস্য শ্রেণীভুক্ত, ইহারাই অংশীদাররূপে নিজেদের আর্থিক শক্তি অনুযায়ী ব্যাঙ্কের মূলধন সরবরাহ করিয়াছে। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে (বোর্ড অব গবর্ণরস) এক একজন গবর্ণর মনোনীত করেন, কিন্তু এই বোর্ডের বৎসরে একটির বেশী অধিবেশন হয় না। এ জন্য বোর্ড অব গবর্ণরস তাহাদের প্রায় সকল ক্ষমতা ১৭ জন একজিকিউটিভ ডাইরেক্টরের উপর অর্পণ করেন। প্রত্যেক মাসেই ইহাদের অন্ততঃ একটি অধিবেশন হয়। সর্ব্ব বৃহৎ পাঁচটা রাষ্ট্রের পাঁচজন মনোনীত প্রতিনিধি এবং অপর রাষ্ট্রসমূহের ১২ জন নির্ব্বাচিত ডাইরেক্টর লইয়া একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর সভা গঠিত।

একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর বোর্ডের সভায় সদস্যের ভোটের বা মতের গুরুত্ব নির্ভর করে ডাইরেক্টর যে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধি সেই রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহ ব্যাঙ্কের মূলধনে কি পরিমাণ অংশ দিয়াছেন তাহার উপর। ব্যাঙ্কের মূলনীতি নির্দ্ধারণ ও কর্জ্জ দেওয়া সম্পর্কিত দায়িত্ব একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর বোর্ডের। ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালন, কর্জ্জ দাদন এবং মূলনীতি সম্পর্কে সুপারিশ করার দায়িত্ব হইতেছে, ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতির। প্রেসিডেণ্টই আবার একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান বা পরিচালক।

ব্যাঙ্কের বিক্রীত মূলধন ৯৪০,০০,০০,০০০ কোটি ডলার। ইহার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ, আংশিক ডলার মুদ্রা কিম্বা স্বর্ণে এবং আংশিক স্থানীয় মুদ্রায় আদায় করা হইয়াছে। মূলধনের অবশিষ্ট ৮০ ভাগ ব্যাঙ্ক আবশ্যকমত আদায় করিতে পারে।

কার্য্য

ব্যাঙ্ক কেবল ধার দেয় না, কর্জ্জ করে, কারণ সদস্য রাষ্ট্রগণের নিকট আদায়ী মূলধন হইতে লেন-দেনের সকল কার্য্য করা ব্যাঙ্কের মোটেই উদ্দেশ্য নয়। আজ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক মোট ২৭০ কোটি ডলার কর্জ্জ দিয়াছে, কিন্তু এ জন্য সদস্য রাষ্ট্রগণের আদায়ী চাঁদা হইতে ১৩৪ কোটি ডলারের সমতুল্য অর্থ ব্যবস্থা বা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাকী সমস্ত অর্থই পৃথিবীর নানা দেশের মূলধনের তথা টাকার বাজারে বণ্ড বিক্রয় করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯৫৮ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত বাজারে ব্যাঙ্কের অপরিশোধিত কর্জ্জের পরিমাণ ছিল ১৪১ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার—ইহার বেশী পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের ডলার বণ্ড—কানাডার ডলার এবং অন্যান্য ইউরোপীয় মুদ্রার বণ্ডও যথেষ্ট। ব্যাঙ্কের বণ্ডে নিয়োজিত অর্থের অর্দ্ধেক আসিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বাকী অর্দ্ধেক অন্যান্য নানা দেশের।

প্রাইভেট অর্থ নিয়োগকারীগণের সহযোগ কামনায় ব্যাঙ্ক কিছুটা কর্জ্জের বণ্ড তাহাদের নিকট বিক্রয় করে এবং এইরূপে ৪০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার উন্নয়নমূলক দাদনের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ব্যাঙ্ক নিজ লভ্যাংশ এবং ঋণ পরিশোধের আদায়ী অর্থ পুনরায় কর্জ্জে খাটাইয়া থাকে।

যে সকল স্থলে বেসরকারী মূলধন প্রতিষ্ঠান হইতে ন্যায্য সর্ত্তে কর্জ্জ দেওয়া যায় না সেই সকল ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক নিজে দেয়। ব্যাঙ্কের প্রথম কর্জ্জগুলি ১৯৪৭ সনে ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পুনর্গঠনের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। এই কর্জ্জের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি ডলার। ১৯৪৮ সন হইতে ব্যাঙ্ক উন্নয়ন কার্য্যের জন্য পৃথিবীর অনগ্রসর দেশসমূহে বেশী পরিমাণ কর্জ্জ দিতে সুরু করিয়াছে। ব্যাঙ্ক ১৯৫৮ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত ১৯৬টি কর্জ্জে মোট ৩৬০ কোটি ডলার লগ্নি করিয়াছে এই অর্থ পাইয়াছে পৃথিবীর ৪৬টি দেশে ৬০০টি পরিকল্পনার কাজের জন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই দাদনের পরিমাণ এরূপ : আফ্রিকা ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলার, এসিয়া ৮৭ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার, অষ্ট্রেলিয়া ৩১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার, ইউরোপ ১১৯ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার, পশ্চিম গোলার্দ্ধ ৮০ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার।

ব্যাঙ্কের দাদন দেওয়া হয় প্রধানতঃ ইহার সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক বনিয়াদ শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য। কর্জ্জের মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ বৈদ্যুতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য দেওয়া হইয়াছে —পৃথিবীতে যাহাতে আরও ৮০ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি

উৎপাদিত হয় এ জন্যই এই দাদন। এক-তৃতীয়াংশ দাদন পরিবহন—রেলপথ, রাস্তা, আকাশপথ এবং জলপথ নির্ম্মাণ এবং উন্নয়নের জন্য। বাকী তৃতীয়াংশ কৃষি—বিশেষতঃ সেচকার্য্য, শিল্প—বিশেষতঃ লৌহ এবং অন্যান্য উন্নয়ন কার্য্যের জন্য।

ব্যাঙ্ক কি সুদে কর্জ্জ দিবে তাহা নির্ভর করে' দাদন করিবার সময় ব্যাঙ্ককে বাজার হইতে অর্থ সংগ্রহের জন্য কত সুদ দিতে হইবে' উহার উপর। যে সুদ ব্যাঙ্ককে দিতে হয় উহার উপর শতকরা এক চড়াইয়া সুদ আদায় করা হয় এই আদায়ী এক অংশ কমিশন হিসাবে আদায় করিয়া ব্যাঙ্কের বিশেষ রিজার্ভে রাখা হয়। কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, পৃথিবীর বড় বড় মূলধনের বাজারের সুদের হারের উঠা-নামার জন্য (এই সকল বাজারেই ব্যাঙ্কের বণ্ড বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়) ব্যাঙ্কের দীর্ঘকালীন দাদনসমূহের সুদের হার বার্ষিক শতকরা ৪।০ হইতে ৬। একই সময় বিভিন্ন দেশকে যে কর্জ্জ দেওয়া হয় তাহাদের সুদের হারে কোনই পার্থক্য করা হয় না।

কর্জ্জ দেওয়া ব্যতীত ব্যাঙ্ক সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য নানারূপ বিশেষজ্ঞের সাহায্য করিয়া থাকে। কোন কোন দেশের আর্থিক সম্ভাব্য উন্নয়নের জন্য পূর্ণ ভাবে আর্থিক জরিপ করা হয়। আজ পর্য্যন্ত ১৫টা দেশ সম্বন্ধে এরূপ জরিপ বা অনুসন্ধান করা হইয়াছে। আঞ্চলিক অনুসন্ধান কিম্বা পরিকল্পনা বিশেষের পরীক্ষাও করা হয়। ইহা ব্যতীত আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া সাহায্য করে। সিন্ধু উপত্যকার জল ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে কি ভাবে বণ্টন হইবে, সুয়েজ খাল জাতীয়করণ হইলে পর মিশর কি ভাবে অংশীদারগণকে ক্ষতিপূরণ দিবে এই দুইটি আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার মীমাংসায় ব্যাঙ্ক সাহায্য করিতেছে।

মূলনীতি

তিনটি মূলনীতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বিশ্ব-ব্যাঙ্কের কর্জ্জাদি দেওয়া হয়ঃ যথা (১) কর্জ্জগ্রহণকারী দেশ পরিশোধ করিতে অক্ষম, (২) যে পরিকল্পনা বা কার্য্যসূচীর জন্য সাহায্য করা হইবে তাহাদ্বারা প্রকৃতই দেশের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা হইবে এবং এজন্য বিদেশী মুদ্রার কর্জ্জগ্রহণ সমর্থনীয় এবং (৩) পরিকল্পনাটি সুন্দরভাবে রচিত হইয়াছে এবং ইহা কার্য্যকরী করা সম্ভব।

কর্জ্জ দিবার পূর্ব্বে সে কর্জ্জ কোন গবর্ণমেণ্টের কিংবা বেসরকারী স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য হউক—ব্যাঙ্ক দেখে যে কর্জ্জের অর্থ ঠিকভাবে প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। ব্যাঙ্ক এই সম্পর্কে অধমর্ণের অবস্থা স্থানীয় মুদ্রার নিরিখে যাচাই করিয়াই ক্ষান্ত হন না, সে দেশের বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের অবস্থাও বিচার করিয়া নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—কারণ ব্যাঙ্কের কর্জ্জ কোন এক বিদেশী মুদ্রায় দেওয়া হয়, বিদেশী মুদ্রায়ই উহা পরিশোধনীয়, অধমর্ণের নিজের দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা চলে না।

অতঃপর ব্যাঙ্ক বিচার করিয়া দেখে বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে ব্যাঙ্কের অভিমত স্থির হইলে, ব্যাঙ্ক-অনুমোদিত পরিকল্পনাটির প্লান, ড্রইং এবং কার্য্যাবলীর খুঁটিনাটি, উহার আর্থিক সুবিধা অসুবিধা এবং লাভের আশা আছে কি না এবং কর্ম্মসূচী অনুযায়ী পরিকল্পনাটির কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পরবর্ত্তী ভবিষ্যতে উহা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার সম্ভাবনা বিষয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া দেখে।

সকল দিক হইতে বিচার করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে ব্যাঙ্ক ঋণদান বিষয়ে কথাবার্ত্তা সুরু করে। ব্যাঙ্ক কখনও কোন পরিকল্পনার সমগ্র খরচের জন্য কর্জ্জ দেয় না। বিদেশ হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় এবং বিশেষজ্ঞ ও কারিগর নিয়োগ সম্পর্কে ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহাই কর্জ্জ দিয়া থাকে। স্থানীয় মুদ্রায় যে সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হয় অধমর্ণ তাহা নিজ সম্পত্তি হইতে পূরণ করে—ইহার পরিমাণ সাধারণতঃ মোট ব্যয়ের অর্দ্ধেকের বেশী। কাজ বা নির্ম্মাণকার্য্য চলার সময়ে ব্যাঙ্ক ক্রমে ক্রমে কর্জ্জের অর্থ যোগান দেয়—অবশ্য দেখে যে উহা প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিকভাবে খরচ করা হইতেছে। দ্রব্যাদি ক্রয় এবং বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি সংগ্রহের সম্পর্কে অর্থব্যয় কর্জ্জগ্রহণকারী এক্তিয়ার থাকিলেও এবং উহার আদেশে হইলেও, ব্যাঙ্ক লক্ষ্য রাখে যে, উহা ঠিক-ঠিক ভাবে খরচ হইতেছে কি না। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ আরও লক্ষ্য রাখে যে, উহার দেয় কর্জ্জের অর্থ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছে এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি অর্ডার পায়।

যখন নির্ম্মাণকার্য্য চলিতে থাকে তখন ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ উহা পরিদর্শন করেন—অধমর্ণকেও নির্ম্মাণকার্য্যের ক্রমোন্নতি বিষয়ে রীতিমত বিবরণী পেশ করিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত নির্ম্মাণকার্য্য চলে ততদিন ব্যাঙ্ক উহার সহিত সংস্পর্শে থাকে এবং ইহার পরেও উৎপাদন কার্য্য সুরু হইলে যতদিন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের দেনা শোধ না হয় ততদিন উহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সময়ের পরিমাণ বিভিন্ন তবে সাধারণতঃ ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

পৃথিবীর নানা দেশ ব্যাঙ্কের সহায়তায় তাহাদের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছে এবং ব্যাঙ্কের কর্জ্জদাদননীতিও লাভজনক প্রমাণিত হইতেছে। ১৯৫৮ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত ৩৪ কোটি ডলার ব্যাঙ্কের রিজার্ভে জমিয়াছে—ইহার মধ্যে ১১ কোটি ডলার স্পেশাল রিজার্ভের অন্তর্গত। ব্যাঙ্কের নিট বার্ষিক আয় ৪ কোটি ডলার, ইহা ব্যতীত প্রত্যেক দাদনে বার্ষিক শতকরা ১ ডলার কমিশন আদায় করা হয় ইহাও আয়ের অন্তর্গত।

ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৫৫০ জন—ইহারা ৪০টি বিভিন্ন জাতি হইতে আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আছেন ব্যাঙ্কার, অর্থশাস্ত্রবিদ্, হিসাবতত্ত্ববিদ্, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ।

১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে নয়াদিল্লীতে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্ব-ব্যাঙ্কের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্য দেশে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাঙ্কের বার্ষিক

অধিবেশন এই প্রথম। এজন্ত এই অধিবেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিবেশনে ৬৮টি সদস্য-দেশের প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে একমত যে, অনুন্নত দেশসমূহে আরও আর্থিক সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন—তবে কেবল আর্থিক সাহায্যই যথেষ্ট নয় যদি জাতিবিশেষের এই আর্থিক সাহায্য কাজে লাগাইবার সামর্থ্যের অভাব হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবক্রমে তহবিল-ব্যাঙ্কের মূলধন বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। মূলধন বৃদ্ধি পাইলে সাহায্যের পরিমাণও বাড়াইবার সুবিধা হইবে এবং পৃথিবীর টাকা তথা মূলধনের বাজারে আরও অধিক পরিমাণ বণ্ড বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। ব্যাঙ্কের 'আন্তর্জ্জাতিক' বণ্ডগুলি পৃথিবীর নানা দেশের আর্থিকবাজারে জনপ্রিয় হইতেছে। যদিও ইহার একটা বৃহৎ অংশ আমেরিকার বাজারে বিক্রয় হইয়াছিল কিন্তু যতদিন যাইতেছে অন্যান্য দেশগুলিও ইহা ক্রয় করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। পৃথিবীর টাকার বাজারে ব্যাঙ্কের পশারপ্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন মহাদেশে লগ্নি

পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যাঙ্কের কর্জ্জের সংখ্যা ও পরিমাণ এইরূপ :

দেশ	লগ্নি সংখ্যা	পরিমাণ (ডলার)
ইউরোপ—		
অষ্ট্রিয়া	৫	৫,৬৫,৭১,৪২৯
বেলজিয়ম	৪	৭,৬০,০০,০০০
ডেনমার্ক	১	৪,০০,০০,০০০
ফিনল্যাণ্ড	৬	৬,৫০,৮০,১৮০
ফ্রান্স	১	২৫,০০,০০,০০০
আইসল্যাণ্ড	৫	৫৯,১৪,০০০
ইটালী	৫	২৩,৮০,২৮,০০০
ল্যুক্সেমবার্গ	১	১,১৭,৬১,৯৮৩
নেদারল্যাণ্ডস	১০	২৩,৬৪,৫১,৯৮৫
নরওয়ে	৩	৭,৫০,০০,০০০
তুর্কী	৬	৬,০৮,২২,৩৮৩
যুগোস্লাভিয়া	৩	৬,০৭,০০,০০০
লাটিন (দক্ষিণ) আমেরিকা—		
ব্রেজিল	১১	১৮,২৪,৭১,০৫৪
চিলি	৭	৭,৩৬,৫৪,৪৫৬
কলম্বিয়া	১১	১১,১২,০৫,৪৪১
কোষ্টারিকা	১	৩০,০০,০০০
ইকোয়েডর	৫	৩,২৬,০০,০০০
এল স্থালভেডর	২	২,৬৩,৪৫,০০০
গায়েটেমালা	১	১,৮২,০০,০০০
হেইটী	১	২৬,০০,০০০
হোনডিউরাস	১	৪২,০০,০০০
মেক্সিকো	৭	১৫,২৩,২৭,৮৮৮
নিকারাগুয়া	১০	২,২৯,৯০,১১৫
পানামা	৩	৬৮,৪৭,৪২৬
প্যারাগয়ে	১	৪৪,৯২,১৯১
পেরু	৪	৪,০৯,১০,২৯৯
উরুগয়ে	৩	৬,৪০,০০,০০০
আফ্রিকা—		
আলজিরিয়া	১	১,০০,০০,০০০
বেলজিয়ানকঙ্গো	২	৮,০০,০০,০০০
ইষ্ট আফ্রিকা	১	২,৪০,০০,০০০
ইথিওপীয়া	৪	২,৩৫,০০,০০০
ফ্রেঞ্চ ওয়েষ্ট আফ্রিকা	১	৭০,৯১,৫৬৭
রোডেসিয়া ও নাইসাল্যাণ্ড	৩	১২,২০,০০,০০০
রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি	১	৪৮,০০,০০০
ইউনিয়ন-অব-সাউথ আফ্রিকা	৬	১৬,০২,০০,০০০
এসিয়া—		
বার্ম্মা	২	১,৯৩,৫০,০০০
সিলোন	১	১,৭৩,৭২,২৫০
ভারত	১৬	৩৫,৬৩,৫৪,৩১৩
ইরাণ	১	৭,৫০,০০,০০০
ইরাক	১	৬২,৯৩,৯৪৬
জাপান	৯	৮,৯৯,৬৩,৭০৯
লেবানন	১	২,৭০,০০,০০০
পাকিস্থান	৮	১১,২৪,৫০,০০০
ফিলিপীন্‌স	১	২,১০,০০,০০০
থাইল্যাণ্ড	৬	১০,৬৮,০০,০০০
অষ্ট্রেলেসিয়া—		
অষ্ট্রেলিয়া	৬	৩১,৭৭,৩০,০০০

ক্ষুধা

শ্রীকাজল চক্রবর্তী

[স্থান : আজমীর শহরের বিখ্যাত ডাক্তার সোমেন রায়ের সুরম্য অট্টালিকা।

সোমেন আট বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তারি পাস করিয়া স্ত্রী শীলাকে লইয়া এই সুদূর রাজস্থানে আসিয়া প্র্যাক্‌টিস সুরু করিয়াছিল। ভাগ্যলক্ষ্মী অল্পদিনেই সোমেনের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। আজমীর শহরে সে বিখ্যাত। কিন্তু সংসারে সুখের মূল যে সন্তান দুর্ভাগ্যবশতঃ ছয় বৎসরেও তাহার আগমন না হওয়ায় সোমেন দুঃখিত ছিল। শীলা স্বামীর দুঃখের কারণ লক্ষ্য করিয়া স্বার্থত্যাগ করিয়া অপর্ণার সহিত স্বামীর পুনরায় বিবাহ দিয়াছে। এই বিবাহ নিস্ফল হয় নাই। ছয় মাস পূর্ব্বে অপর্ণার একটি সুন্দর পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। অপর্ণা ও সোমেন সুখী হইয়াছে, কিন্তু শীলা সুখী হইতে পারে নাই। কারণ আজ এক বৎসর হইল সে কঠিন যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছে। আজ সেই নবকুমারের অন্নপ্রাশন। সমস্ত বাড়ী আনন্দ কলরব ও শানাইয়ের মধুর সুরে মুখরিত। বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। উপরের একখানি ছোট ঘরে খাটের উপরে বালিশে হেলান দিয়া শীলা শয়ন করিয়া আছে। কঠিন রোগের করাল ছায়া চোখে মুখে গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে। মাঝে মাঝে কাশিতেছে। তাহার হাতে একখানি লাল রঙের নিমন্ত্রণ-পত্র। বামুন-দি প্রবেশ করিলেন। বয়সে প্রাচীনা। হাতে দুধের পাত্র।]

শীলা। বামুন-দি, খোকার মুখে ভাত দেওয়া হয়ে গেছে?

বামুন-দি। হাঁ, দিদিমনি। ওদিকে ব্যস্ত ছিলাম বলেই তোমায় দুধটুকু দিয়ে যেতে পারি নি। কত করে বললাম কমলিকে, তা কিছুতেই রাজি নয়। ঘরে এলেই যেন রোগ ঘাড়ে পড়বে। এখন ওঁরা আশীর্ব্বাদ করতে গেলেন, তাই অবসর পেয়ে দিতে এলাম।

শীলা। (মৃদু হাসিয়া) রোগটা খারাপ কিনা তাই—তা হাঁ বামুনদি, উনি বুঝি প্রথমে আশীর্ব্বাদ করবেন?

বামুনদি। না, না, উনি করবেন কেন, দাদু, দিদিমা এসেছেন, আগে তাঁরাই করবেন।

শীলা। হাঁ, ওঁরাই ত আগে করবেন, গুরুজন—তা আশীর্ব্বাদ করে ওঁরা কি দেবেন? শুনেছ ত? আংটি, না হার?

বামুন দি। ওঁদের আর আছে কি, তা দেবেন, বোধ হয় টাকা দিয়ে করবেন।

শীলা। সত্যিই ত, কোথায় পাবেন, একটা রোজগেরে ছেলেও নেই, পেন্সনের ঐ ত ক'টা টাকা। খোকনকে চেলি পরিয়ে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, না বামুনদি?

বামুনদি। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন মোমের পুতুলটি। খোকনের গায়ের রঙ ত সুন্দর, তায় লাল চেলি—

শীলা। সুন্দর ত হবেই বামুনদি। উনি ত কালো নন, আর অপুও সুন্দরী—অপুর গায়ের রঙই পেয়েছে, না বামুন দি?

বামুন দি। শুধু রঙ কেন দিদিমনি, নাক, মুখ, চোখ, সবই ছোট দিদিমনির মত। কে যেন কেটে বসিয়েছে।

শীলা। চুলগুলো ত ঠিক ওঁর মত ঘন আর কোঁকড়ান—না, সে চুল তুমি দেখনি, এখন ত আর সে চুল নেই। হ্যাট মাথায় দিয়ে দিয়ে টাক পড়ে গেছে। যখন কলেজে পড়তেন তখন দেখার মত চুল ছিল। বন্ধুরা হিংসে করত। জান বামুনদি, এমনি একটা ছেলের জন্যে ঠাকুরের কাছে কত মাথা খুঁড়েছি, কিন্তু ভাগ্য এমনি—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল)

বামুনদি। সে কথা ভেবে আর দুঃখ করনা দিদিমনি। ঐ ছেলেই ত তোমার ছেলে। তোমার শূন্য কোল খোকনই ভরে দেবে।

শীলা। কত ঠাকুরের কাছে মানৎ করেছি হত্যে দিয়েছি, এই দেখ, একুশটা মাদুলি হাতে—কিন্তু সবই বৃথা—তা, তুমি যা বলেছ ঠিকই। আমিই ত ছেলের জন্যে বিয়ে দিয়েছি—(ব্যস্ত ভাবে) বামুনদি, আমাকে ধান দুর্ব্বো এনে দিতে পার? খোকাকে আশীর্ব্বাদ করব। (সোজা হইয়া বসিয়া) আমাকে একটু নীচে নিয়ে যাবে? না, থাক, উনি হয় ত রাগ করবেন। এই খারাপ রোগ নিয়ে—আচ্ছা ওদের বললে ওরা কি খোকাকে একবার নিয়ে আসবে না?

বামুনদি। কেন নিয়ে আসবে না। ছোটদিদিমনিই ত দাদাবাবুকে বলছিল, দিদিকে নিয়ে এস খোকনকে আশীর্ব্বাদ করবে।

শীলা। বলছিল বুঝি? তা ত বলবেই। আমি ত ওকে যে সে ঘর থেকে আনিনি, ওদের বংশের মেয়েদের কত উঁচু মন—তা উনি কি বললেন? নিশ্চয় রাজি হন নি—খারাপ রোগ—

বামুনদি। না, না, তা বলবেন কেন, দাদাবাবু বললেন, রুগ্ন শরীরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে কষ্ট হবে। তার চেয়ে একবার দেখিয়ে এন।

শীলা। এ কথা ত বলবেনই বামুন দি, আজ না হয় এক

বছর রোগে পড়ে আছি, তাই বলে কি ভালবাসেন না। জান, আমরা কলেজে এক সঙ্গে পড়তাম। তার পর এক দিন কেমন করে যেন ভালবেসে ফেললাম। দুজনে দুজনকে একদিন না দেখে থাকতে পারতাম না। তার পর আমাদের বিয়ে হ'ল—এই ত সেবারে যখন অপুর সঙ্গে বিয়ের ঠিক করলাম তখন সে কি কাণ্ড, কিছুতেই বিয়ে করবেন না। বলেন, মানুষ জীবনে ভালবাসে একবার, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারব না। এখন কাজের চাপ তাই আমার ঘরে আসতে সময় পান না, না হলে—আচ্ছা তুমি যাও, খোকাকে এখানেই আনতে বল।

বামুনদি। হাঁ, এই যে যাই।

শীলা। বামুনদি, খোকার নাম কি হ'ল বললে না? আর প্রথমে টাকা ধরলে না দোয়াত কলম?

বামুনদি। খোকার নাম হয়েছে অশোক। আর প্রথমেই ছো মেরে কলমটা তুলে নিয়ে দিব্বি মুখের মধ্যে দিয়ে চুষতে লাগল —কি বুদ্ধিমান ছেলে।

শীলা। অশোক, বাঃ ভারি সুন্দর নাম হয়েছে। আর কলম যখন ধরেছে তখন বিদ্বানই হবে। জান বামুন দি, আমার ছোট ভাই কমল, ভাতের সময় কলম ধরেছিল, তাই দেখে দাদু বলেছিলেন, কমল মস্ত বড় স্কলার হবে। সত্যি তাই হয়েছে। ইউনিভার্সিটির নাম করা প্রফেসর হয়েছে। আচ্ছা, তুমি এখন যাও বামুনদি, ওদের পাঠিয়ে দাও। ধান, দুর্ব্বো পাঠাতে কিন্তু ভুলো না।

[বামুনদির প্রস্থান]

[শীলা দেয়ালে টাঙান কালীঠাকুরের ছবির দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখে জল দেখা গেল। ছবির দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া নিজের হাতে বাঁধা মাদুলীগুলির দিকে চাহিয়া কিছুকাল কি চিন্তা করিল তাহার পর সেগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই সময়ে দ্বারের বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। শীলা সচকিত হইয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিল। অপর্ণা নবকুমারকে কোলে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পিছনে বামুনদি, তাহার হাতে রেকাবী, তাহাতে ধান ও দুর্ব্বা।]

অপর্ণা। খোকাকে এনেছি দিদি, তুমি ওকে আশীর্ব্বাদ কর।

(নবকুমারকে শীলার কোলের উপর বসাইয়া দিল)

শীলা। ওমা কি সুন্দর হয়েছে খোকন।

(মুহূর্ত্তের জন্য শীলার মুখে খুশীর আলোক দেখা গেল, কিন্তু পরক্ষণেই অন্ধকার হইয়া উঠিল)

বামুনদি। (আগাইয়া গিয়া রেকাবী সম্মুখে ধরিয়া) এই নাও দিদিমনি, ধান দুর্ব্বো)

শীলা। হাঁ বামুনদি, শুধু ধান দুর্ব্বোই এনেছ, একটা টাকাও আনোনি। আজকের দিনে কি শুধু হাতে আশীর্ব্বাদ করে?

অপর্ণা। তা হোক দিদি, আমার ছেলে, আমি বলছি, তোমার শুধু হাতের আশীর্ব্বাদেই হবে।

শীলা। ছেলে তোর, এ কথা তুই বলবিই, সকলেই তাই বলে—

[কথার শেষে অদ্ভুত ভাবে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর অকস্মাৎ দুই হাত দিয়া নবকুমারের গলা চাপিয়া ধরিল কিন্তু অত্যধিক উত্তেজনায় কেমন যেন হইয়া গেল। থর থর করিয়া তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। শীলার প্রাণহীন দেহ খাটের উপর হইতে নীচে পড়িয়া গেল। অপর্ণা ও বামুনদি ভীতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

যবনিকা

অক্সফোর্ডে এক বছর

শ্রীঅর্চ্চনা বসু

ছোট বয়সে আমরা যা শুনি সেটি মনের মধ্যে এত দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় যে বলা যায় না। ছোট বেলায় আমার পরিবারস্থ কেউ যদি কোনও দোষ করে ফেলতেন—মার কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ তাঁর দোষ ঢাকার জন্য শুনতে পেতাম যে "ও ত আর অক্সফোর্ড থেকে, মানুষ হয়ে আসে নি অতএব কেন আশা করছ যে সব সে ভাল ভাবে করতে পারবে?" সেই যে, ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে অক্সফোর্ড-এ সমস্তই অতুলনীয়—সেই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আমি এসেছিলাম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সত্যই আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, পড়াশুনার ক্ষেত্রে এঁরা কোনও ত্রুটি রাখেন না। এঁদের পড়ানোর ধরন একেবারে অন্য ধরনের। এঁরা চান প্রত্যেকের একটি নিজস্ব সত্ত্বা গড়ে তুলতে। এ দেশে যখন এলাম তখন একটু অদ্ভুত ঠেকেছিল এই দেখে যে এঁরা যত গুণী জ্ঞানী হউন না কেন—সব সময় ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং এতে করে ছাত্রের মনেও এই ধারণা হয় যে, তাঁর শিক্ষক মহাশয়কেও পরামর্শ দেবার মত ক্ষমতা আছে। নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে যতদিন না আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আসে ততদিন আমরা পড়াশুনাটাকে ভীতিপ্রদ বস্তু জ্ঞান করব। তাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটা আমার খুবই ভাল লেগেছে। অক্সফোর্ডে আছেন পাঁচজন নোবেল পুরষ্কারধারী। তাঁদের মধ্যে আমি যে ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী সেই ডিপার্টমেন্টের প্রোফেসর। ইনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক. প্রোফেসর ক্রেবস। ইনি পৃথিবীর মধ্যে নামকরা সাতজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে অন্যতম। সম্প্রতি ইংলণ্ডের রাণী এঁকে নাইট উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানান দেশ থেকে নানান বৈজ্ঞানিক আসেন তাঁদের নিজেদের গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য। যখন তাঁদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিকগণের তর্ক হয়—তখন আমার মনে হয় যে, আমাদের পুরাকালে বর্ণিত জ্ঞানীর লড়াই হচ্ছে বুঝি—নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সত্যই অক্সফোর্ডের বিশেষত্ব হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা।

আমাদের দেশের, লণ্ডনের ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ও আমি দেখেছি বটে, কিন্তু অক্সফোর্ডের তুলনা করা যায় না কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। অবশ্য শুনেছি ক্যামব্রিজেও নাকি একই শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—কিন্তু আমার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরকার খবর জানা নেই।

এত গেল পড়াশুনার কথা।

এইবার বলব ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে কিছু। সাধারণতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা আসেন তাঁরা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রের দল। তাই জ্ঞানের দিক থেকে তাঁরা সত্যিকারের গুণী। কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে হয়ত দেখা যাবে যে তাঁরা অত্যন্ত আপনভোলা। কারণ হয়ত তাঁরা রাত্রিবেলা হঠাৎ উঠে এসেছেন শয্যা থেকে—হঠাৎ মনে পড়ে যায় ফেলে আসা কাজের জন্যে অথবা কোনও নূতন তথ্য এসেছে মগজে তাই সেটি করার জন্য। এঁদের সকালে দেখা যাবে রাত্রের কামিজ পরা অবস্থায়—কিন্তু খেয়াল নেই যে তাঁরা কাজ করছেন এই জামা পরে। অবশ্য এটা দেখা যায় বিজ্ঞানের ছাত্রমহলেই বেশী। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল আমাদের এই ল্যাবরেটরী রীডারের কথা। ইনিও বেশ নামজাদা বৈজ্ঞানিক—নাম হচ্ছে ডাঃ অগ্‌ষ্টোন, একদিন সকাল সাড়ে সাতটায় আমি গেছি ল্যাবরেটরীতে, কারণ রাত ১২টা পর্য্যন্ত কাজ করেও আমার শেষ হয় নি কাজ—এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, আমরা যারা গবেষণামূলক কাজে ব্যাপৃত,তাদের কাছে একটি করে ল্যাবরেটরীতে ঢোকার জন্য দরজার চাবি থাকে। এর কারণ যদিও ল্যাবরেটরীর দরজা খোলা থাকে সকাল ৯টার থেকে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত—তার পরেও যদি কেহ ল্যাবরেটরীতে আসতে চান তা হলে তাঁকে নিজের চাবি ব্যবহার করতে হয়।

হাঁ, ঐদিন সকাল বেলায় কাজে গেছি—ভেবেছিলাম অত সকালে হয়ত কেউ থাকবে না—কিন্তু দেখি যে ডাঃ অগষ্টোন তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন। তাঁকে দেখে অবাক হলাম—কিন্তু আরও অবাক হলাম এই দেখে যে রাতের পায়জামার ওপর একটি ভাল কোট পরে এসেছেন। বুঝলাম যে ভদ্রলোক রাত্রে শুতে গিয়ে কোনও নূতন তথ্যের সন্ধান পেয়ে ছুটে এসেছেন ল্যাবরেটরীতে। তাই সময় হয় নি অথবা মনেও পড়ে নি যে কি পরে এসেছেন। আরও দেখা যায় যে এঁদের বড়দিনের উৎসবেতে এঁরা কাজ করছেন প্রয়োজনবশতঃ। অবশ্য তাই বলে বলব না যে কেবল কাজই করে যান অন্য কোন দিকে দেখার সময় এঁদের নেই। আমি এও দেখেছি যে এঁরা স্ত্রী-পুত্রকন্যা নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করছেন।

এ দেশে ছাত্রদের জন্য ৩৫টি কলেজ আছে আর ছাত্রীদের জন্য মাত্র ৫টি। কলেজগুলির বিশেষত্ব এই যে, এখানে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে—কোনও ক্লাস হয় না। ক্লাস হয় প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে—যেমন, যে ইংরেজীর ছাত্র সে ইংরেজীর ডিপার্টমেন্টে ক্লাস করতে যায়, যে রসায়নের ছাত্র সে রসায়নের ডিপার্টমেন্টে

যায়। আরও একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে ক্লাসে যোগদান না করলেও কিছুই হয় না, কারণ আমাদের দেশের মত এখানে কেউ উপস্থিত ও অনুপস্থিতের হিসাব রাখে না। তবে প্রধান দরকারী ক্লাস হচ্ছে টিউটোরিয়াল। টিউটোরিয়ালে প্রত্যেকের একজন করে অধ্যাপক থাকেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে হয় প্রতি সপ্তাহে। স্কুলের পড়া শেষ করে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীরা আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার জন্য পরীক্ষা দিতে এবং তাঁরা প্রত্যেক কলেজে এই পরীক্ষা দিয়ে থাকেন লিখিত এবং মৌখিক। এই পরীক্ষা গ্রহণ করে কলেজের কর্তৃপক্ষ—বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই পরীক্ষার নেই কোন সংযোগ। যখন ছাত্রছাত্রিগণ কলেজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হন তখন সুরু হয় বি. এ. পড়া। বিজ্ঞান ও কলা উভয় ক্ষেত্রেই এদের পড়তে হয় বি. এ.। এমনকি যাঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়তে চান তাঁদেরও পড়তে হয় বি. এ.। অবশ্য বছর দুই বি. এ পড়ার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাঁরা হাসপাতালে কাজ আরম্ভ করেন শিক্ষার্থী হিসাবে। তিন বছর শিক্ষার্থী থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী শেষ পরীক্ষায় এরা ডিগ্রী পেয়ে থাকেন—বি. এম যা আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি. বি-এস.র সমান। অতএব অক্সফোর্ডের ডাক্তারগণ দুটি উপাধি পান—বি. এ. ও বি. এম।

গবেষণামূলক ডিগ্রী দুটি—যাঁরা বিজ্ঞানে গবেষণা করেন তাঁরা পান বি. এসসি. এবং ডি. ফিল আর যাঁরা কলাবিষয়ক সম্বন্ধে গবেষণা করতে চান তাঁরা পান বি. লিট এবং ডি. ফিল। বি. এস. সি ও বি. লিট দু বছরে পাওয়া যায়। আর ডি ফিলের জন্য বছর তিন প্রয়োজন। ডি, এস. সি ডি. লিট ও এম-এ এইগুলি পরীক্ষামূলক উপাধি নহে। স্থান হিসাবে অক্সফোর্ড একটি গ্রাম্য শহর অথচ এর নাম সহর। যাঁরা কলকাতার কাছেই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছেন তাঁরা অনেকটা অক্সফোর্ডের সঙ্গে তুলনা করতে পারবেন। তবে অক্সফোর্ডের বিশেষত্ব হচ্ছে পুরাতন কলেজ সমূহ। এইগুলি এত পুরাতন যে দূর থেকে দেখলে মনে হবে বুঝি কয়লার খনি থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে কলেজগুলিকে। সব চেয়ে পুরাতন কলেজ হচ্ছে নিউ কলেজ—১২১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এই কলেজটির এক ধারের দেয়াল ভেঙে গেছে তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ সারাবার ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে করে ঐ আগের ধরনের দেয়ালের মত কারুকার্যখচিত দেয়াল গঠিত করা যায়। এখানে কলেজগুলির ভিতরে প্রশস্ত মাঠ আছে। এই মাঠে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্রাম করেন বা খেলাধূলা করতে পারেন। এখানে ম্যাগডেলিন্ কলেজ বলে একটি কলেজ আছে যার ভিতরে 'Deer park' আছে—কারণ ইহার ভিতরে হরিণ আছে। এই হরিণগুলি এই কলেজের পোষা।

এখানে থেমস নদীর দুটি ক্ষুদ্র শাখা আছে। একটির নাম চারওয়েল এবং অপরটির নাম আইসিস। এখানে গ্রীষ্মকালে ছুটির দিনে দুপুরে প্রায় সকলেই এই দুটি নদীতে নৌকা করে ঘুরে বেড়ায়। এই নৌকাগুলি কিন্তু দাঁড় টেনে বাইতে হয় না—লগি মেরে চালাতে হয়। এই লগি মেরে নৌকা বাওয়ার নাম punting। এটি হচ্ছে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের নিজস্ব, তাই যখন কোনও অতিথি আসেন এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে, প্রথম কাজ হচ্ছে তাঁকে নিয়ে নৌকায় ভ্রমণ করা।

এই হচ্ছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়।

পুরুলিয়ার মাটিতে

শ্রীহাসিরাশি দেবী

অরণ্য কি কথা কয়! হিমঝরা পাতায় পাতায়
ছড়ায় সোনালী রোদ মুঠো মুঠো এখানে ওখানে,
এ পথের লাল মাটি থেকে থেকে বুঝি শিহরায়!
অরণ্য কি কথা বলে? কি জানি। কে জানে?

এ পথে নরম মাটি, এ পথের ঘাস যে সবুজ,
এদিকে ওদিকে শাল-শিমুলের গাছ-ভরা-বন,
দু' চারটে ঝোপ-ঝাড়,—দু' একটি নাবাল-জমির
ওপোরে ছড়ায় ফুল,—অকারণ,—শুধু অকারণ।

হাওয়া বয়ে বয়ে আনে—আনমনা কি খুশীর ঢেউ,
কোথা থেকে কোথা যায় মুহূর্তের স্রোত এঁকা-বেঁকা,—
তবু যেন মনে হয়—বন-শেষে বসে আছে কেউ,—
কেউ বা গ্রামের পথে গান গেয়ে ফিরে যায় একা।

যে মাটিতে একদিন নেমেছিল ফাগুনের রাত,
কপোতের প্রেমডোরে কপোতীর ডানা ছিল বাঁধা,—
কূজনে,—গুঞ্জনে কত কেটে গেছে মধ্যাহ্ন-প্রভাত,—
অরণ্য কি বলে আজ তাদেরই সে ভুলে যাওয়া কথা।

আবার শীতের শেষ;—আবার এ পথের দু' পাশে—
শাল আর শিমুলের কচি পাতা নতুন সবুজে,—
নীরব নিশ্চিন্ত মনে বুঝিবা তেমনি হাসি হাসে!
বুনো পাখী বাসা বাঁধে, গান গায়,—সাথী খুঁজে খুঁজে।

তবু হাওয়া বয়ে যায়,—তবু খুশী ভরে দেয় মন,—
অরণ্য যে কথা কয়,—সে কথায় জড়ানো-স্বপন।

নিস্তরণ

শ্রীসরসিজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরের পিছনে তেঁতুল গাছটায় একটা রাতচরা পাখী কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল ফতিমার। কি এক অশুভ আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ সে ডান হাতটা অন্ধকারে চালিত করে আনোয়ারের বিছানায়। কেউ নেই। বিছানা খালি। শূন্য থেকে হাতটা ধপ করে প্রথমে পড়ল বিছানায়, তার পর ব্যাকুল আগ্রহে হাতড়ে বেড়াতে লাগল শূন্য শয্যায়।

কোলের বাচ্চাটা চুকচুক করে মাঝে মাঝে মাই খাচ্ছিল এতক্ষণ। সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ার আগে পর্য্যন্ত প্রায় অসাড়ে সেটুকু টের পাচ্ছিল ফতিমা। ব্যস, যেই বাচ্চাটা ঘুমিয়ে গেছে মাই খেতে খেতে, খাটুনিতে আধমরা ফতিমাও অমনি ঢলে পড়েছে গভীর ঘুমে। আর সেই মুহূর্ত্তে তাক বুঝে, সুট করে চুপি চুপি পালিয়েছে আনোয়ার।

হারামজাদা, শয়তান। অন্ধকারে বিড়ালের মত চোখ দুটো জ্বলে ওঠে ফতিমার, চাপা আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে গর্জ্জে উঠল সে, আজ দায়ের কোপে তোর মাথাটা দু-ফাঁক না করি ত আমার নাম ফতিমা নয়। তুই মনে করেছিস কি! আমার খাবি আর আমারই বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবি! ভারী আমার পেয়ারের মরদ রে, ওর ডরে রাতের নিদ্ বন্ধ করে আমি বসে বসে আগলাব ওকে! বেহায়া নিলাজ নিমকহারাম কুকুর কোথাকার!

বলতে বলতে উঠে বসে সে বালিসের তলা থেকে বার করে দেশলাইটা। তার পর বিড় বিড় করে শপথ আর দুর্ব্বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে খোপে রাখা কেরোসিনের টেমিটা জ্বালল। ঘর আলোকিত হলে আর একবার সে চনমন করে চোখ বুলিয়ে দেখে সারাঘর। নাঃ, সংশয়ের কোন কারণ নেই। তক্কে তক্কে ছিল আনোয়ার, ফাক বুঝে ঝট করে পালিয়েছে।

দেখেশুনে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে ওঠে ফতিমার। রগের শিরাদুটো দপ দপ করতে থাকে, কাণদুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে উত্তেজনায়। তাড়াতাড়ি সে ঘুমন্ত বাচ্চাটার গায়ে একটা ছোট্ট কাঁথা টেনে দিয়ে, একটা জলভরা-বাটিতে খানিকটা চিনি গুলে একফালি ন্যাকড়া ভিজিয়ে নেয় সেই চিনির রসে। রসে ভেজান ন্যাকড়াটা সলতের মত করে ঘুমন্ত বাচ্চার আলগা ঠোঁটের ফাকে গুঁজে দিল ফতিমা। তার পর ক্ষিপ্রহাতে চালে গোঁজা দাখানা টেনে বের করল, টেমির আলোয় মুহূর্ত্তের জন্য চকচকে দাখানার দিকে তাকিয়ে সে বাচ্চার দিকে একবার চোখ বুলাল। কি যেন ভাবল ও। ঠিক আছে, ভয় কি? ছিটেবেড়ার দেওয়ালের ওপাশেই আছে মেয়ে জরিণা। এ ঘরে বাচ্চাটা কেঁদে উঠলে সে নিশ্চয়ই টের পাবে। আর কতক্ষণই বা দেরি হবে তার। যাবে আর আসবে। বদমাসটাকে যদি ধরতে পারে হাতেনাতে, কতক্ষণ লাগবে তাকে সায়েস্তা করতে?

ফুঁ দিয়ে টেমিটা নিভিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল ফতিমা। ঘরের আগড়টা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে ভালভাবে দাখানা বাগিয়ে ধরে সে। অভিযান সুরু করার আগে এক মুহূর্ত্তের জন্য ফতিমা থমকে দাঁড়াল। অন্ধকার। চারদিকে কয়লা খাদের নিচের মত জমাট অন্ধকার। নিশুতি রাতে জনমানবের চিহ্ন নেই। বিশ্বসংসার সব চুপ। থমথমে সুপ্ত গ্রামটা তার অজগরের মত আকাবাঁকা অতিকায় শরীর নিয়ে খাঁ খাঁ করছে। পথ ঘাট সব ফাকা। তেমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার। এতটুকু আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আকাশে শুধু তারার ঝিকিমিকি। যেন ফিনিক ফুটছে। পৃথিবীতে যতই আঁধার থাক, ঊর্দ্ধ আকাশে আলোর বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীতে আছে শুধু ঝোপের গায়ে গায়ে অজস্র জোনাকির চুমকি। জ্বলছে আর নিভছে।

একচল্লিশ বছর বয়সের মুসলমান ঘরের খেটে-খাওয়া প্রৌঢ়া ফতিমার মাঝরাত্রে উঠে নিসর্গ সৌন্দর্য্য দেখবার মনও নেই আর সময়ও নেই। ভাল লাগুক মন্দ লাগুক, তবু একবার চারদিকে চোখ চেয়ে দেখতে হ'ল ফতিমাকে। নিস্তব্ধ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য নয়, অন্ধকারে পথ ঠাহর করে পলাতক স্বামীকে ধরে আনার ভাবনায়।

কিছু দিন ধরেই আনোয়ারের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না ফতিমার। প্রথম প্রথম সে লক্ষ্য করছিল দ্বিতীয় বারের নিকে করা স্বামীর আনমনা উড়ুউড়ু ভাব, কাজে গাফলতি, আলসেমি। আগেকার সে কৃতজ্ঞতার, সে বাধ্যতার ভাব দেখা যাচ্ছিল না আর তার মুখে-চোখে—ঠিক যেমনটি দেখা যেত তিন বছর আগে—বাইশ বছরের ছন্নছাড়া বেকার আনোয়ার এ গাঁয়ে যখন এসেছিল কাজের সন্ধানে, আশ্রয়ের খোঁজে। সেদিন ভিনগাঁয়ের ছেলে আনোয়ার এ গ্রামের পথে পথে, প্রতিটি সম্পন্ন চাষীর ঘরে ঘরে, ঘুরেছিল মুনিষ-খাটার, চাষবাসের কাজের খোঁজে। কোথাও মেলেনি কাজ। অজন্মার বছর, কজনেরই বা আছে সঙ্গতি স্থায়ী লোক রাখার। শেষে ঐ ডিম বেচা হাঁস-মুরগী আর ছাগলের পালের সামান্য মালিকানী ফতিমার বাড়ীতে জায়গা মিলেছিল আনোয়ারের। ডিম বেচে, হাঁস-মুরগী-ছাগলের ব্যবসার পুঁজি থেকে বিঘে কয়েক জমি করেছিল ফতিমা। বয়েস হয়ে যাওয়ায় সব দিক দেখাশোনা করায় অসুবিধা হচ্ছিল তার। সংসারে একা মানুষ। এদিকে

মেয়ে জরিণারও বিয়ের বয়স হয়ে এল। আর কবছর পরে বিয়ে দিলে সে চলে যাবে পরের ঘরে। তখন সব দায়িত্ব পড়বে ফতিমার একার ঘাড়ে। টুকিটাকি যেটুকু করছিল জরিণা, তাতে ঘরের দিকটা দেখতে হত না ফতিমাকে। সে তার হাঁস-মুরগী-ছাগল আর চাষবাসের তদারকি নিয়েই ছিল।

তার আগে অবশ্য লোক-দেখান সহায়ক একজন ছিল। দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী জব্বর মিঞা। কিন্তু সে ওই নামেই স্বামী। আসলে, ভাত-কাপড় দেবার মুরোদ নেই, আবার কিল মারবার গোঁসাই। রোজগারের নামে লবডঙ্কা, কিন্তু নেশাভাঙ করে, রাতদুপুরে এসে তম্বিহাম্বি আর জুলুম করতে খুব ওস্তাদ।

সংসারের মুখ চেয়ে, সমাজের ভয়ে, মেয়ের ইজ্জতের ভাবনা ভেবে অনেক দিন জব্বর মিঞার দাপট সয়েছিল ফতিমা। শেষে আরপার ছিল না। উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল জীবনটা। সবচেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার অপব্যয়। এত কষ্টের রোজগারের পয়সা জব্বর মিঞা স্ফূর্তি করে উড়িয়ে দিলে বুক ফেটে যাবে না ফতিমার! সে জানে কত কষ্ট করলে, কত মেহনতের পর, দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাওয়া যায়। আর সেই রক্ত-জলকরা পয়সা খোলামকুচির মত উড়িয়ে দেবে মিঞা! অসহ্য! পুরুষগুলো যে কেন এত স্বার্থপর আর অবুঝ হয়।

পুরুষ জাতের কথা ভাবতেই মনে পড়ল ইব্রাহিমের কথা। একজন ডাকসাইটে দুঁদে পুরুষ। যারা বিশ্বাস করে জরু আর গরুকে ঠেঙিয়ে বশে রাখতে হয় তাদের দলের। তেজারতি কারবার করে বেশ দুপয়সা করেছে। তিনখানা লাঙলের চাষও আছে। অর্থাৎ বেশ কিছু বিত্তসম্পত্তির মালিক। অতএব, আর কি! ঘরে নাম-কা-ওয়াস্তে একটা বিয়ে-করা বৌ সামনে রেখে সমস্ত যৌবনটা মেয়েমানুষ নিয়ে লোফালুফি করেছে। ঘরের বৌকে খুশি রাখবার জন্যে বছর বছর একটা করে বাচ্চাও জন্মাত। কিন্তু একটাও টিকত না। হ'ত আর মরে যেত। লোকে দোষ দিত ইব্রাহিমের বৌকে। বলত, সে মৃতবৎসা। ইব্রাহিমের মা-বোন বৌকে গাল দিত, রাক্ষসী ডাইনী, পুত্তের মাথাখাকি!

লাঞ্ছনায় গঞ্জনায় অতিষ্ঠ বৌটা লজ্জায় আর অপমানে, বাড়ীর কাছের আমড়া গাছটার ডালে পরণের শাড়ীখানা বেঁধে একদিন ঝুলিয়ে দিল নিজেকে।

বৌ মরার পর বোধ হয় মাসখানেকও যায় নি, ইব্রাহিম নানান অজুহাতে ছুক ছুক করে আসতে আরম্ভ করেছিল ফতিমার বাড়ী। কারণে-অকারণে পাঠাতে আরম্ভ করেছিল তার মা-বোনকে। শেষ কালে তাদের মুখ থেকেই একদিন জানা গেল ইব্রাহিমের প্রকৃত উদ্দেশ্য। শয়তানের নজর পড়েছিল কচিমেয়ে জরিণার উপর। তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল দ্বিতীয় পক্ষের ঘরণী করে। মা-বোনকে বিমুখ হয়ে ফিরতে দেখেও তার বিশ্বাস হয়নি, চূড়ান্ত মতামতটা জানতে এসেছিল নিজেই।

ফতিমা শুধু ইব্রাহিমকে ফিরিয়েই দেয়নি, মুখের উপর কড়া কথাও শুনিয়ে দিয়েছিল অনেক। বলেছিল, সারাজীবন ধরে বুড়ী ছুঁড়ি নিয়ে অনেক কারবারই ত করলে মিঞা, এখন কি নজর পড়েছে ওই কচি মেয়েটার উপর। কচি পাঁঠা, কচি মুরগী এদের মাংসই ত মিষ্টি জানি, তোমার আবার কচি মেয়েতেও সমান রুচি আছে নাকি?

অপমানে মুখ কালো করে ফিরে গিয়েছিল ইব্রাহিম। এবং পরে, যেন অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে ভেবে, জরিণার চেয়ে দ্বিগুণ রূপসী পরীবানুকে কোন দূর দেশের গ্রাম থেকে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলেছিল।

তবু সে বৈরিতা ভোলে নি, শত্রুতা ত্যাগ করে নি। ফতিমাকে নির্বিকার, বেপরোয়া দেখেই সে বোধহয় আরও জ্বলে উঠেছিল ভিতরে ভিতরে। তাই ফতিমা যখন একদিন রাত্রে মাতাল জব্বর মিঞাকে কসে এক চড় মেরে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে চিরদিনের মত দূর করে দিয়েছিল তার বাড়ী থেকে, গাঁয়ের পুরুষ-সমাজকে ফতিমার বিরুদ্ধে তাতিয়ে তোলার অনেক চেষ্টা করেছিল ইব্রাহিম সেদিন।

কিন্তু কেউ সাহস পায় নি ফতিমার কাছে এসে তাকে ঘাঁটাতে। ওই আড়ালে আড়ালেই যা নিন্দা-অপবাদ। সামনে মুখ খোলার সাহস ছিল না কারও। একে ফতিমা গায়ে-গতরে মজবুত, মোটা-সোটা পেশীবহুল চেহারা। চিরকালটা মাঠে-গোঠে ঘুরে বেড়ানোর দরুণ রোদপোড়া হাত-পা, রুক্ষ মুখমণ্ডল, তামাটে অমসৃণ চামড়া। তার ওপর তার মেজাজও সদাসর্বদা তিরিক্ষি। কারও সঙ্গে বনি-বনা না হলেই কথায় কথায় রেগে টং হয়ে যায়। লোকে তাকে ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলত—জাঁদরেল জাঁহাবাজ মেয়ে বলে।

তার এই বদনামের একটু ইতিহাস আছে। অনেক দিন আগে জরিণা যখন মাত্র কয়বছরের বাচ্চা, সেই সময় জরিণার জন্মদাতা ফতিমার প্রথমপক্ষের বিবাহিত স্বামী বিনা দোষে স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায়। ফতিমা সেদিন স্বামীর পায়ে ধরে অনেক মিনতি করেছিল, অনেক কেঁদেছিল তার মন ভেজাতে। তবু জরিণার বাপের মন টলাতে পারে নি। নিষ্ঠুরের মত সে সেদিন বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিল। অপরাধ গ্রামান্তরে জরিণার বাপ যে বিবাহেচ্ছুক সদ্য-বিধবাটির সন্ধান পেয়েছিল, ফতিমা তার মত স্বর্ণহংসী নয়। দুনিয়ায় ফতিমার সম্পত্তি বলতে ছিল ওই কুঁড়েঘরটা, আর কয়েকটা হাঁস-মুরগী-ছাগল। ওই ক'টা জিনিসের মায়া জরিণার বাপকে বেঁধে রাখতে পারে নি।

সেই অবধি ফতিমার ঘেন্না জন্মে গিয়েছিল পুরুষজাতটার উপর। সে জিবের ডগা আর ঝাঁটার আগায় পুরুষমানুষকে জব্দ করে রাখার সেরা পথ বলে বেছে নিয়েছিল। লোকে তাই কখনও তাকে বদনাম দিতে ছাড়ে নি। এমন কি তারা বলে বেড়াত তার প্রথম স্বামীও নাকি ওর জিবের বিষের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পিঠটান দিয়েছে। অথচ এ যে কতবড় মিথ্যে ফতিমা নিজেই তা জানত।

আর ওই ইব্রাহিম। চিরকালের শত্রু। আমরণ ছিনে জোঁকের মতন লেগে আছে তার পিছনে। মরণকাল পর্য্যন্ত সে জালিয়ে যাবে ফতিমাকে। এই গত বছর, আনোয়ার ফতিমার কাজে বহাল হবার পর যখন বছর দুই কেটে গেছে, হঠাৎ যখন পাঁচ জনের চোখে পুনরায় ফতিমার মাতৃত্বের সম্ভাবনা প্রকাশ পেয়েছিল, গ্রামের মুরুব্বী-মাতব্বরদের নিয়ে ফতিমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাবার কি চেষ্টাটাই না করেছিল সে। কিন্তু সে জানত না, অত সহজে ঘাবড়াবার মেয়ে ফতিমা নয়। দীর্ঘদিন সে অসংখ্য বৈরিতার মাঝখানে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। আর সবাই যখন চুলোচুলি, মামলা-মোকদ্দমা করে মরছে, সে তখন শুধুমাত্র রসনার জোরে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে দেয় নি। উল্টে দিন দিন হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ।

সুতরাং মাতৃত্বের সম্ভাবনায় সে এতটুকুও চুপসে যায় নি। নিজেই মোল্লা ডেকে আনোয়ারের সঙ্গে নিকেটা শাস্ত্রসিদ্ধ করে নিয়েছিল। ফতিমার অনাগত সন্তানের পিতৃত্বের দায়িত্ব অস্বীকার করায় সাহস আনোয়ারের ছিল না। নিকে করতে অরাজি হওয়ার বিকল্প রাস্তা যা খোলা ছিল তা পুনর্মূষিক হওয়ার। অর্থাৎ পথের মানুষ পুনরায় ফিরে যাওয়া পথে। তার চেয়ে ফতিমার স্বামীত্ব স্বীকার করাই ভাল—এই ভেবে নির্ব্বিবাদে ফতিমার নির্দ্দেশিত ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল আনোয়ার।

কিন্তু বাচ্চাটা জন্মাবার পর হঠাৎ তার ভাবান্তর দেখা যেতে লাগল। ফতিমার উপর আস্তে আস্তে যেন ফিকে হয়ে আসতে লাগল অনুরাগের নেশা। কাজকর্ম্মের উৎসাহ যেতে লাগল কমে। বাচ্চাটার দিকেও এতটুকু আসক্তি নেই। বসে থাকে জড়ভরতের মতন চুপচাপ। নির্ব্বিকার, উদাসীন। তার হাবভাব ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠল ফতিমার কাছে। বাড়ীর বাইরে তার গতিবিধি কেমন যেন সন্দেহজনক হয়ে উঠল। সমস্ত দিনের মধ্যে দুটি কাজে আনোয়ারকে খুব তৎপর দেখা যায়: সকালবেলায় গাঁ ছাড়িয়ে মাঠের ধারের পুকুরটার পাড়ে গরু দড়িবাঁধ দেওয়ায় আর দুপুর-বেলায় সেটা খুলে নিয়ে আসায়।

মেয়েমানুষের সহজাত অভিজ্ঞতায় ফতিমা কোথায় যেন রহস্যের গন্ধ পায়। আনোয়ারের চলাফেরার উপর সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে।

একদিন সুযোগ মত জায়গায় আড়ি পেতে ওদের দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেললে ফতিমা। আনোয়ার আর পরীবানুকে। এক ডাই বাসন নিয়ে মাঠের ধারের পুকুরটায় ধুতে এসেছিল পরীবানু। ভর্ত্তি দুপুর। কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ মুগুর হাতে আনোয়ার হাজির সেখানে। চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে গরুর খুঁটি ওপড়াবার অছিলায় গেল জলের ধারে। দু'জনে তার পর দিব্যি কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

ওদিকে পুকুর পাড় থেকে মুখখানা শ্রাবণ-আকাশের মত থমথমে করে বাড়ী গেল ফতিমা। এবং আনোয়ার গরুসহ বাড়ী ফিরতেই সুরু হ'ল বর্ষণ: তাই বলি মিঞার গরু নিয়ে যাওয়া-আসায় অত ছটফটানি কেন! মিঞা যে আবার ওদিকে পিরিত জমিয়েছে তা কি করে জানব! তা শোন গো ভালমানুষের পুত, শোন সাহেব, অত ফুটুনি চলবে না এখানে। খাবে-দাবে আর কাম করবে। এর বেশী কিছু চলবে না আমার এখানে, তা বলে দিচ্ছি।

কথার ধরনে গা জলে উঠল আনোয়ারের। হাত-মুখ নেড়ে সে জবাব দিল, কেন গো বিবি, আমি কি তোমার কেনা গোলাম, যে তোমার হুকুম মত চলতে হবে আমাকে!

কেনা গোলাম—চোখ লাল হয়ে উঠল ফতিমার। তুই ত কেনা গোলামেরও বেহদ্দ। মেয়েমানুষের অন্নে বেঁচে আছিস, খেতে-পরতে পাচ্ছিস। তুই ত আমার গোলামই।

—খবরদার হারামজাদি, চুপ থাক, জবান উপড়ে ফেলব নইলে এখুনি!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল ফতিমা। এই সেই তিন বছর আগেকার আনোয়ার! সাত চড়েও যার রা বেরুত না, মুখে কথাটি ছিল না—মুনিবের প্রশ্নের জবাবে শুধু হ্যাঁ-না করে ঘাড় নাড়ত একান্ত বাধ্য কুকুরের মত। কোত্থেকে পেল সে এত সাহস—ফতিমার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মুখের ওপর জবাব দেবার! ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে চোখ দুটো ভাঁটার মত লাল করে বললে সে, তোমার আস্পর্দ্ধা দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি মিঞা। তুমি যে এত নেমক-হারাম তা জানতাম না। মনে রাখবে সেদিনের কথাটা, যেদিন চাকরি নেই বাকরি নেই, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে না খেতে পেয়ে, সেদিন কে তোমাকে দিয়েছিল ঠাঁই। কোথাও আশ্রয় না মিললে যে আজ মাথা খুঁড়ে মরতে হ'ত রাস্তায় রাস্তায়। ঘরে জায়গা দিয়ে, কাম দিয়ে আজ তিন বছর ধরে যে পুষলাম, খাওয়ালাম তার কি এই প্রতিদান দিচ্ছ! কিন্তু আগুন নিয়ে দিললাগী কর না ভালমানুষের পো, বলে দিচ্ছি আগে থেকে। ফতিমাবিবিকে ঘাটিও না, ভালয় ভালয় বলছি, নইলে শেষে বাপ-বাপ ডাক ছাড়তে হবে।

আরে রাখ রাখ ফতিমাবিবি, অমন ঢের দেখেছি ফতিমাবিবি-দের। জায়গা দিয়েছ, কাম দিয়েছ বলে আমার ইমানটাও কিনে নিয়েছ নাকি? তোমার দোরে মুনিষ খাটি বলে কি কেনা গোলাম হয়ে গেছি! পরীবানু আমার গাঁয়ের মেয়ে, আগে থেকে জানা-শোনা, ভাব-ভালবাসা ছিল। তা দেখা পেয়ে দুটো কথা কয়েছি তাতে কি এমন হয়েছে যে, অমন করে চোখ রাঙাচ্ছ। থোড়াই কেয়ার করি অমন চোখরাঙানিকে।

বটে! এতদূর বেরেছ! দেখি, তোমার কতদূর মুরোদ! হুসিয়ার করে দিচ্ছি তোমাকে মিঞা, খবর্দ্দার, পরীবানুর সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখা চলবে না।

উঃ, অমনি বললেই হ'ল আর কি! বেশ করব, আমি পরী-বানুর সঙ্গে কথা বলব, আমার খুশি।

ইস, তোমার খুশি হলেই হ'ল বুঝি। থোতামুখ ভোতা করে দেব না এক্ষুনি।

আয় না বজ্জাত মাগী, দেখি তোর কতদূর দৌড়—এক হাতে তালশাঁসকাটা কাটারীখানা বাগিয়ে ধরে মারমূর্তি হয়ে দাঁড়াল আনোয়ার।

ভয়ঙ্কর একটা কিছু হয়ে যেত সেদিন, যদি না কোলের বাচ্চাটা আচমকা ট্যা ট্যা করে কেঁদে উঠত। জেরটা কিন্তু মেটেনি অত সহজে। আনোয়ারের চোখে সেদিন ঝিলিক দিয়ে ওঠা ভীষণতার ছায়া যদিও পরে আর ছিল না। এক-একটা গৃহপালিত জন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ যেমন ফিরে পায় বন্যস্বভাব, তাদের মাঝে প্রকাশ পায় উগ্রতা, আনোয়ারেরও তাই। পরে আবার সে যথারীতি মিইয়ে পড়েছে।

আর না পড়েই বা করে কি। ফতিমা কি বশ মানবার। উল্টে সে-ই চায় পুরুষ-মানুষকে দাপটে রাখতে। ব্যাটাছেলে যদি হাতের তেলোর না রইল তা হলে আর সুখ কোথায়! অতএব পরের ক'টাদিন আনোয়ারকে বিয়ে-করা বৌয়ের লাঞ্ছনা আর রক্তচক্ষুর শাসনে কাটাতে হয়েছিল।

মাত্র তাতেই ফতিমা নিরস্ত থাকে নি। অবাধ্য স্বামীকে বাগ মানাতে প্রয়োগ করেছিল মোক্ষম অস্ত্র! আজই বিকেলে সে নিজে বাড়ী বয়ে গিয়েছিল চির-বৈরী ইব্রাহিমের কাছে। খানিকক্ষণ গুজগাজ ফিসফাস করার পর হৃষ্টমনে ফিরে এসেছিল। ব্যস, এতেই ফল হবে। এতেই টিট হয়ে যাবে বজ্জাত আনোয়ার। তবু সে স্বামীকে চোখে চোখে রাখতে ছাড়ে নি।

তার পরের ঘটনাই নিশুতি রাতে আনোয়ারের পলায়ন। ভাবতে ভাবতে রাগে ফতিমার গা গরম হয়ে ওঠে, শিরায় শিরায় বইতে থাকে উষ্ণ রক্তস্রোত। দূরে গাঁয়ের ওমাথা থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ডাক। হঠাৎ ফতিমা ভাল করে কান পেতে শোনে। কুকুরের চীৎকার ছাড়া আর একটা কি আওয়াজ ভেসে আসছে না কানে! মাঝে মাঝে ডুকরে-ওঠা কান্নার সঙ্গে একটানা গুমরানির শব্দ!

হ্যাঁ, ঠিক। অন্ধকারে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি মেলে দিয়ে ফতিমা দেখে, ওপাড়ার শেষ মাথার দিকে একটা বাড়ীতে মিটমিটে আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। আর কান্নার শব্দটাও আসছে সেইখান থেকেই। চেয়ে দেখতে দেখতে ফতিমার মনে হয়, ওটা ইব্রাহিমের বাড়ী না! হু, তাই ত মনে হচ্ছে। ঠিক, এতক্ষণে বোঝা গেছে কোথায় গিয়েছে মূর্তিমান। নিশ্চয়ই গেছে ভাল-বাসার মানুষের কাছে—গভীর নিশীথে চোরের মত চুপিচুপি।

চলতে চলতে ফতিমা নিজের মনেই ভাবল, দাঁড়া, দেখাচ্ছি রাত দুপুরে পরের বৌয়ের সঙ্গে পিরিত-করা! ওরে মুখ্যু, তোর একটু হুঁস নেই, তুই সামান্য একটা মেয়েমানুষের বাড়ীতে মুনিষ খেটে খাস, কোন সাহসে তুই ইব্রাহিমের মতন জবরদস্ত লোকের ঘরওয়ালীর সঙ্গে খাতির জমাস! জানতে পারলে দু'জনকেই কচুকাটা করে ফেলবে না ইব্রাহিম!

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প্রশ্ন জাগে, পরীবানু কাঁদছে কেন? তবে কি তারই ওষুধের প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেছে? বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে। মর ছুঁড়ি এবার, পরের মানুষকে ছিনিয়ে নেওয়ার ফলভোগ কর। অ্যা, কত রূপের দেমাক! দ্যাখ এইবার, জাহান্নামে যা—খুনে ডাকাত স্বামীর কবলে পড়ে!

বিড়ালীর মত নিঃশব্দ গতিতে ইব্রাহিমের বাড়ীর পাশে গিয়ে হাজির হ'ল ফতিমা। ঘনছায়াচ্ছন্ন একটা ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। চোরের মত আত্মগোপন করে পাকড়াতে হবে আনোয়ারকে। বাড়ীর আনাচে-কানাচে চালার নীচে কোথায় সে গা-ঢাকা দিয়ে আছে কে জানে। যে নিরন্ধ্র অন্ধকার। এক হাত দূরের মানুষকেও চেনা যায় না।

ওদিকে বাড়ীর ভিতরে বৌয়ের ওপর চলেছে ইব্রাহিমের বিক্রমপ্রদর্শন। সপাং সপাং করে চাবুকের আওয়াজের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে অবিরাম অশ্রাব্য গালিগালাজ। সঙ্গে সঙ্গে পরী-বানুর আর্ত-চীৎকার রাতের আকাশকে খানখান করে ফেলছে। তার একটানা গুমরানি শেষ হওয়ার আগেই আবার পিঠে পড়ছে চাবুক এবং সেই সঙ্গে নির্ভেজাল কটুকাটব্য। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফতিমার কেমন যেন মায়া হয় অভাগিনী মেয়েটার জন্যে। অজান্তেই তার মত পাষাণ প্রাণও করুণায় ভিজে আসে, চোখের পাতার নিচেটা সপসপে হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়ল ফতিমার। হাত কয়েক দূরে পাঁচিলের নীচে অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে না! হ, ঠিক ত, একজন মানুষই ত! চুপিচুপি ঝোপের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে কাছে এল ফতিমা। কাছ থেকে চিনতে পারল লোকটাকে। আর কেউ নয়, তার পলাতক ভর্তা আনোয়ার স্বয়ং সামনে দাঁড়িয়ে, তন্ময় হয়ে সে কান পেতে আছে ঘরের দিকে। পিছনে কোন মানুষের অস্তিত্ব টেরই পাচ্ছে না। ইব্রাহিমের প্রতিটি চাবুক পরীবানুর গায়ে পড়ামাত্র সে শিউরে উঠছে, ক্রোধে বেদনায় সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে, অবরুদ্ধ মর্মযন্ত্রণার ক্ষোভে রোষে আঙুল কামড়াচ্ছে মুষ্টিবদ্ধ হাত বারবার হাতের তালুতে মারছে, মাঝে মাঝে বুক চাপড়াচ্ছে দু'হাতে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ফতিমা। তার পর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে আনোয়ারের হাতের মুঠো তুলে নিল নিজের হাতে।

চমকিত আনোয়ার পিছন ফিরে ফতিমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, ফতিমা আরেক হাত দিয়ে আনোয়ারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বলল, চুপ কর! আমি ফতিমা!

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে হাতে হাত বেঁধে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। স্ত্রীর হাতের মুঠোয় আনোয়ারের হাতের তেলো ঘেমে উঠল। তবু সে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না। অনেকক্ষণ পরে

প্রহার শেষ করে ইব্রাহিম যখন ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছে, ভিতর থেকে তার নাক ডাকার আওয়াজ কানে আসছে, দাওয়ায় বসা পরীবানুর কান্নাও প্রায় থেমে এসেছে, স্বামীর হাত ছেড়ে দিয়ে ফতিমা মৃদুকণ্ঠে তাকে বলল, দাঁড়াও এখানে চুপ করে।

বলে পরণের শাড়ীটা গাছকোমর বেঁধে সে পাঁচিল বেয়ে উঠল উপরে। আঙিনার এক কোণে অন্ধকার জায়গা দেখে লাফ দিয়ে ফতিমা পড়ল ভিতর বাড়ীতে। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে কয়েক মিনিট ধরে পলকহীন চোখে দেখল দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসা পরীবানুকে। অমন সোনার অঙ্গ ফালাফালা হয়ে গেছে শয়তান ইব্রাহিমের চাবুকের ঘায়ে। সারা গায়ে ডোরা ডোরা দাগ—জমাট রক্তের রেখা। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় দেখা যাচ্ছে তার মুখ-চোখ কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে।

মমতায় ভিজে গেল ফতিমার মনটা। পিছন থেকে পরীবানুর কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতি-ভেজা গলায় সে ডাকল, বৌ।

পরীবানু চমকে উঠে পিছনে তাকায়। ফতিমা ঠোঁটের উপর তর্জ্জনী রেখে বলে, চুপ। তার পর কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলে, শোন, বাইরে শোন, কথা আছে।

দু'জনে পা টিপেটিপে আঙিনা পেরিয়ে এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে। দরজা খুলে পরীবানু বাইরে আসবামাত্র আনোয়ার অন্ধকারের আড়ালে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে সে বসেছিল, ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। তার গা-হাত-মাথা-পিঠ সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে হাসিকান্নায় মিশিয়ে জড়ানস্বরে কি যেন বলে যায়। পরীবানুও তার বলিষ্ঠ বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে.

গভীর নিশীথে তাদের এই গোপন প্রেমের সাক্ষী থাকে কেবল স্তব্ধ প্রকৃতি আর ফতিমাবিবি। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে সে দেখে যায় পরীবানু আর আনোয়ারের ভালোবাসার প্রকাশ। খানিকক্ষণ পরে ওরা দু'জন আত্মস্থ হলে ফতিমা ধীরপদে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

ওরা দুজন কোন কথা না বলে ফতিমার দিকে ফিরে দাঁড়ায়। ফতিমা নিঃশব্দে আনোয়ারের ডান হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে, আমার দায়িত্ব থেকে তোকে আজ থেকে ছেড়ে দিলাম, যা। তার পর আস্তে আস্তে পরীবানুর একটা হাত তুলে দেয় আনোয়ারের হাতে। দিয়ে স্নেহ কোমল স্বরে বলে, তোরা দুজন আজ রাতেই চলে যা গাঁ ছেড়ে। যা, এই ক্রোশ রাস্তা রাতা-রাতিই উজিয়ে দিতে পারবি। কাল সকালে বর্দ্ধমানে সবচেয়ে পথথর্মটাতেই চলে যাবি কইলকাতা। সেখানে যেয়ে চটকল ফটকলে কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে বিয়ে সাদি করে ঘর-সংসার পাতবি দু'জনে। আর এই নে, এই দু'টোতে রাহাখরচ চালিয়ে, যা বাঁচবে তাতে যেকটা দিন পারিস চালাস। হ্যাঁ, আর একটা কথা, দিনকতক বেশ ভাল করে থাকবি গা-ঢাকা দিয়ে। যে শয়তান ইব্রাহিম, উর অসাধ্য কিছু নেই। আর পরীকে কষ্ট দিস না রে, বড্ড ভালো মেয়েটা। তোরা যে কেন বুঝিস নারে, মেয়ে জাতটা ভালোবাসার কাঙাল, ভালোবাসার কাছে ওরা সবাই বশ।

বলে নিজের হাত থেকে মোটা মোটা রুপার খাড়ু দু'খানা খুলে. স্তম্ভিত আনোয়ারের হাতে তুলে দিয়ে পরীবানুর চিবুকে চুমু খেয়ে বলে ফতিমা, আজ আমার থেকেই তোর অত কষ্ট হ'ল, কিছু পাপ ধরিস না বোন তোর মনে, তোর এই দিদিকে মাফ করিস।

বলতে বলতে ওর গলার স্বর ভারী হয়ে আসে। আঁচলে এক সময় নিজের চোখ দুটো মুছে নেয়। বিস্মিত হৃদয় দুটি দাঁড়িয়ে থাকে নিঃশব্দে। স্তম্ভিত, নির্ব্বাক, আকস্মিকতায় বিমূঢ়। ওদের দুজনকে পথের দিকে ঠেলে দেয় ফতিমা, যা, দেরি করিসনি আর।

ওরা চলতে সুরু করে। যেতে যেতে আবার পিছু ফেরে আনোয়ার, কাছে এসে বেদনাদীর্ণ কণ্ঠে বলে, আর বৌ, তুমি?

আমি?—নিজের সর্ব্বাঙ্গে একবার হাত বুলিয়ে দেখে ফতিমা, শিথিল লোল চামড়া, স্পর্শে নিরুত্তাপ, কোন সাড়া নেই। শোণিতের স্রোতে পড়ন্ত বেলার আভাস। মুখে আর একটিও ভাঁজ নেই, সব ভরাট হয়ে গেছে মাংসস্তূপে। হেমন্তের একটি জীর্ণ বিবর্ণ পাতা, থরথর করে কাঁপছে। ভগ্নকণ্ঠে ফতিমা বলে, আমার কি আর দিন আছে রে! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। যা তোরা, শীগ্‌গির পা চালিয়ে যা। বাজ পড়া গাছের মত ঘাড় ঝুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ফতিমা। পথের বাঁকে অন্ধকারে দুটি মূর্ত্তি দেখা গেল, কাছ ঘেঁসে, বোধহয় হাতে হাত রেখে চলেছে। ফতিমার মুখে পরিচ্ছন্ন তৃপ্তির আভাস ফুটে উঠল।
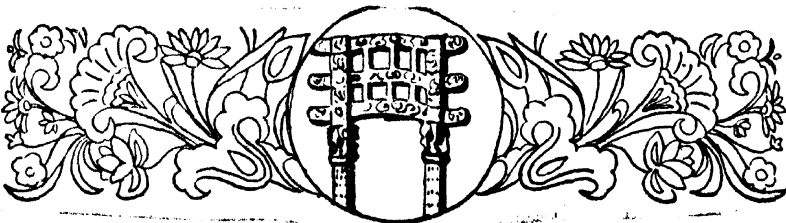
বাঙালী-সংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তর

শ্রীঅশোককুমার ভঞ্জ চৌধুরী

পণ্ডিতদের মতে আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বেও বাঙালী তাহার স্বতন্ত্র সভ্যতা লইয়া সগৌরবে বাংলাদেশে বাস করিত। বহুদিন একত্রে বসবাসের ফলে পরবর্তীকালে আর্যসভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হইলেও বাঙালী কখনও পুরাপুরি ভাবে আর্যসভ্যতাকে স্বীকার করিয়া নেয় নাই। হয়ত এই কারণে প্রাচীন আর্যগণ বাঙালীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে নাই। তাই সর্বপ্রথম ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বাঙালী-নিন্দার পরিচয় পাই :

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেঽপি চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমহতি ॥"

এতদ্ভিন্ন মহাভারতে, পুরাণে এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থে বাঙালী-নিন্দার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, আর্যনিন্দিত বাঙালী বরাবরই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি বজায় রাখিয়া আসিয়াছে।

"বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া শত-সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই বাঙ্গালী-সংস্কৃতি।"

জাতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিল্পে, সাহিত্যে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সর্বত্রই এই বাঙালী-সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। স্থাপত্যশিল্প, চিত্রশিল্প, বস্ত্রশিল্প, নৌশিল্প প্রভৃতি বাঙালীর নিজস্ব শিল্প। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :

"বাঙালীর ভাস্কর্য অপূর্ব ও স্বতন্ত্র।...বাঙালীর জনার্দন, বিশ্বম্ভর, জনমেজয় প্রভৃতি কর্মকারগণ যেমন তোপ, কামান তৈয়ারী করিতে পারিত, দিল্লীর কারিগরে তেমন পারিত না। বাঙ্গালার নৌশিল্প সত্যই অপরাজেয় ছিল।"

বাঙালী কুলবধূর গৃহশিল্প নানাদিক দিয়া স্বতন্ত্র ও অপূর্ব বিশিষ্টতায় মণ্ডিত :

"বাঙ্গালার চিত্রশিল্পের রাণী বাঙালী কুলবধূরা।...বিবাহ বাসরে মেয়েদেরই রাজ্য। এখানে মেয়েরা কর্ত্রী; বরকনের কড়ি...পিঁড়িচিত্র প্রভৃতি সকলই মেয়েরা করিতেন। কনের বাড়ীতে পানের খিলি দেওয়ার জন্য নবীন কদলীপত্রে মোড়ক এরূপ ভাবে শিল্পমণ্ডিত করিতেন যে, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। শিকা, লেপ তোষক বাঁধিবার দড়ি...এমনকি হাঁড়ির গায়ে কতরূপ চিত্রাঙ্কন হইত তাহা বর্ণনা করা যায় না।...একটি নারিকেলের শাঁস লইয়া কত শিল্প নৈপুণ্য যে তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন, তাহা পূর্ববঙ্গের মহিলাদের নির্মিত নারিকেলের মেঠাই না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না।"

বৃহৎ বঙ্গ, পৃ. ৪২২, ৪২৩, ৪২৭—দীনেশচন্দ্র সেন

মহিলাদের কাঁথাশিল্পও অতি অপূর্ব। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, একখানি কাঁথা তিন পুরুষ ধরিয়া তৈয়ারী হইয়াছে। নানাবিধ ব্রত ও ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে বধূরা গৃহ-অঙ্গন সরল অথচ সুন্দর ভাবে সজ্জিত করিতেন। পিটালী-বাটা জল দিয়া আলিপনা আঁকা বাঙালী বধূদের শিল্প-নৈপুণ্য ও বাঙালীর স্নিগ্ধ পল্লীসভ্যতার পরিচয় দেয়।

বাঙালীর ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প প্রধানতঃ মন্দির, স্তূপ, বিহারকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজসাহী, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার কয়েকটি স্থানে যে সমুদয় মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের গাত্রস্থিত কারুকার্য বাংলার মন্দির-শিল্পের চমৎকার নিদর্শন, সন্দেহ নাই। পাহাড়পুরের মন্দিরের অপূর্ব শিল্পকর্ম সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বাংলাদেশে যে সকল স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ঢাকার আসরফপুর ও বাঁকুড়ার স্তূপগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে একদা জৈন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল; তাই এখানে বহু স্তূপ ও বিহার নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল স্তূপ ও বিহারের শিল্পনির্মাণ-কৌশল বাস্তবিকই নয়নাভিরাম। অজন্তার গুহার অনেক চিত্রই বাঙালী শিল্পীর রচিত বলিয়া কাহারও কাহারও অভিমত। বাঙালীর এই শিল্পপ্রতিভা একদিন বাংলাদেশ অতিক্রম করিয়া সুদূর অঞ্চলে তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ("The art of Bihar and Bengal excercised a lasting influence on that of Nepal, Burma, Ceylon and Java.")

নৃত্যগীতবাদ্যেও বাঙালীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। পল্লী বাংলার রাইবেঁশে, কাঠিনৃত্য বাঙালী-সংস্কৃতির এক সুন্দর নিদর্শন।

সাহিত্যক্ষেত্রে—মঙ্গলকাব্যে, চণ্ডীকাব্যে বাঙালী-সংস্কৃতির নিখুঁত রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলার লোক-সাহিত্য বাঙালী-সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট উপাদান। তথাকথিত অশিক্ষিত গ্রাম্যকবিগণ যে সমস্ত গান ও ছড়া রচনা করিয়াছেন, যুগ যুগ ধরিয়া তাহা আমাদের কাছে মধুর রস পরিবেশন করিয়া আসিতেছে এবং ইহাদেরই মাধ্যমে আমরা আমাদের পল্লীজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্না বস্তুতঃ বাঙালীর জাতীয় জীবনের সমগ্র রূপটির যেন পরিচয় পাই:

"বাঙ্গালার সংস্কৃতি মুখ্যতঃ গ্রামজীবনকেই অবলম্বন করিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল···গ্রামের বড় দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি।"

বাংলার গ্রাম্যকবিগণ কবিগান, পাঁচালীগান, আখড়াই, টপ্পা, সারিগান, মুর্শিদাগান, গম্ভীরাগান প্রভৃতির মাধ্যমে সহজ ও সরল ভাষায় ছড়া কাটিয়া গণচেতনা উদ্বুদ্ধ করিতেন। যেমন, মালদহের একটি গম্ভীরাগানের অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি:

"কাউন্সিলে জানাও গো গিয়ে ভারত স্বরাজ নিবে বলে
(আবার) জাদের সনে দেখা হলে ফিরিয়ে দিও মতি
জাদ্ গে পন্তুর সুতোয় নৌকায় চড়েছেন
জহরলাল গুণ টানিছেন।
(আবার) গান্ধীজী হাল ধরেছেন দেখে দিনের গতি।
মায়ের ডাকে গেছেন যারা প্রকৃত বীরপুরুষ তারা
দেশের জন্য দাঁড়ায়েছেন বিশাল বক্ষ পাতি।"

(মীরাজুদ্দিন)

· · ·

সেকচার শুনে গাম্ভীর মুখে এলাম দোরে
হে সাহেব, এলাম দোরে।
দেখছি একটা পরা আছে হাঁইসাল ঘরে
হে সাহেব ঢেঁকীর ঘরে।
দুলাই যদি এখানে ব্যথা পাবি প্রাণে
ম্যাঞ্চেষ্টার বন্ধ হবে লণ্ডনে।
············বিনা কারণে ধ'রে এনে এখানে।"

(মীরাজুদ্দিন)

বাংলাদেশের ভাট-কবিগণ বা চারণ-সম্প্রদায় নানারূপ ছড়া তৈয়ারি করিয়া গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইত। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ স্থানের চারণগণের গানগুলি বিশেষ উপভোগ্য। যেমন:

"তেরশ' তের সালে
তেরশ' তের সালে বরিশালে নববর্ষ দিনে
কি অত্যাচার করল সেথা কেম্প এমার্সনে।
বল্‌তে সেসব কথা
বল্‌তে সেসব কথা মনে ব্যথা নিরন্তর পাই
কুলার লাটের লীলার বুঝি তুলনা আর নাই।
প্রাদেশিক সম্মিলনে সেবকগণে লাঠি পিটা করি
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে নিয়ে গেল ধরি।
সম্মিলন বন্ধ করলো
সম্মিলন বন্ধ করলো হৈ চৈ পড়লো সমগ্র বাঙ্গালায়
ব্যামফাইল্ড ফুলার কীর্তি পার্লামেণ্টে যায়।"*

বাংলার ব্রত বাঙালী-সংস্কৃতির আর একটি রূপ। বাংলারই জলবায়ুতে পরিপুষ্ট পল্লীবাসীরা তাহাদের অনাবিল চিন্তা ও কামনা প্রকাশ করিয়াছে এই সব ব্রতে। ব্রতের মধ্যে নারীরা বিভিন্ন দেব-দেবী ও প্রকৃতির নিকট তাহাদের প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছে যুগ যুগ ধরিয়া। কারণ অনেক ব্রতই আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বেও এদেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। তাই এই ভাবে প্রাচীনকাল হইতে আজও পর্যন্ত মেয়েদের ব্রতানুষ্ঠান চলিয়াছে। 'তোষলা ব্রতে' মেয়েরা তাহাদের কামনা জানায়:

"কোদাল-কাটা ধন পাব,
গোহাল-আলো গরু পাব,
দরবার-আলো বেটা পাব,
সেঁজ-আলো ঝি পাব,
আড়ি-মাপা সিঁদুর পাব।
ঘর করব নগরে
মরব গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম কুলে,
তোমার কাছে মাগি এই বর—
স্বামী-পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।"

বাঙালীর সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঙালীর আসল চরিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আনন্দ-উৎসব বাঙালীর জাতীয় জীবনের প্রাণস্বরূপ। তাই বাঙালীর প্রত্যেক ক্রিয়াকর্মে, সামাজিক অনুষ্ঠানে এই আনন্দ-উৎসবের বড় বেশী মাতামাতি। এই সমুদয় অনুষ্ঠানে নানারূপ লৌকিক আচার, নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতির প্রচুর আয়োজন হইয়া থাকে। বাঙালীর 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' লাগিয়াই আছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানেই বাঙালীর সরল প্রাণের সহজ পরিচয়টুকুর

* ডক্টর অবিনাশ ভট্টাচার্য লিখিত 'স্বদেশী ভাটের ছড়া' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত। আনন্দবাজার, ২৫শে কার্তিক, ১৩৫২ সাল।

যেন সন্ধান মিলে। বাঙালীর দুর্গাপূজা, দেবদোল, রাস, নবান্ন, অন্নপ্রাশন, জামাইষষ্ঠী প্রভৃতি অসংখ্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যে অনাবিল ভক্তি-আনন্দ-হাসির সমারোহ চলে তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। তিথিভেদে খাদ্যবিচার, উপবাসপালন, বিদেশ-যাত্রা প্রভৃতি খুঁটিনাটি কার্যকলাপের মধ্যেও বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ছবি ফুটিয়া উঠে।

বাঙালী-জীবনের অনেকখানি অংশ জুড়িয়া আছেন বাঙালীর কুলবধূরা। লক্ষ্মীস্বরূপিনী বাঙালী-বধূর কোমল পেলব অন্তরের মধুর স্পর্শে বাঙালীর জীবন অপূর্ব মাধুর্যে ভরিয়া উঠে। প্রতিটি আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠান এই কুলবধূর অচ্ছেদ্য সংযোগ-সম্পর্কিত। 'গৃহিনী গৃহমুচ্যতে' এই মহাজনবাণী বাঙালী-নারীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে যেন তাহা আরও বেশী সার্থক হইয়া উঠে। ক্রিয়াকর্মে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ-সজ্জা, শঙ্খ ও উলুধ্বনি প্রভৃতি কর্মে বাঙালী-নারীর মঙ্গলময়ী মূর্তিরই যেন জীবন্ত প্রকাশ। 'স্ত্রী-আচার' বাঙালীর সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' অনুষ্ঠানের কর্ত্রী বাঙালী মায়েরাই; অনাবিল আনন্দ-রসের মন্দাকিনী-ধারা বহাইয়া তুলেন তাঁহারাই। বাঙালীর সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে পৌষপার্বণ একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। পৌষপার্বণে নারীরাই কর্ত্রী; তাই এই উপলক্ষে তাঁহাদের ধূমধাম, কাজকর্মের সীমা নাই। কবির কথায়ঃ

"ঘোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা॥
খোলায় পিটুলি দেন হ'য়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি॥

*　　*　　*

মেয়েদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধুম॥"

এ পর্যন্ত বাঙালী-সংস্কৃতির যে রূপের পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা বাঙালীর সমাজ-জীবনের গঠনভঙ্গী, মানসিক সত্তা ও বৈচিত্র্যেরই পরিচয়। মনীষী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের ভাষায় বাঙালীর সমাজজীবন তথা বাঙালী-সংস্কৃতির একটি চিত্র তুলিয়া ধরিতেছিঃ

"লোকের ধান্য ছিল, স্বাস্থ্য ও বাহুবল ছিল, হা অন্ন হা অন্ন! করিয়া দেশে ছুটিয়া বেড়াইবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। লোকে ঘরে বসিয়া হাতে-লেখা তুলট-কাগজের রামায়ণ-মহাভারত পড়িত, অবসর সময়ে কবিকঙ্কনের চণ্ডীর গান গাহিত।...বালকেরা মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। কখন বা ঘোড়া ধরিয়া তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে... চাপিয়া বসিত; কখন বা নদী, খাল, বিলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া সাঁতার কাটিত। দিনশেষে ঠাকুরমার উপকথায় হুঁ দিতে দিতে স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত।...যুবকদল বৈকালে লাঠি-তরবারি ভাঁজিত, সন্ধ্যা-সমাগমে সযত্নবিলম্বিত লম্বা কোঁচা দোলাইয়া...কাঁধের উপর রঙ্গীন গামছা ছড়াইয়া দিয়া বাবরী চুলে চিরুণী গুঁজিয়া, শুকসারী অথবা নিতান্ত অভাবপক্ষে একটি বুলবুল হাতে লইয়া তাম্বুল-রাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠে মৃদুমন্দ শিস্ দিতে দিতে পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইত। বৃদ্ধেরা...সায়াহ্নে তামাকু সেবনের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে, নদীসৈকতে অথবা বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া, দেশের কথা, দশের কথা, "ওপাড়ার মুখুয্যেদের বিধবা ভাদ্রবধূর কথা"—কত কি আবশ্যক অনাবশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সন্ধ্যার পর হরিসঙ্কীর্তনে অথবা পুরাণ-শ্রবণে ভক্তিগদগদ হৃদয়ে নিমগ্ন হইতেন।"

কিন্তু বাঙালী-সংস্কৃতির রূপের আজ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সামাজিক অনুষ্ঠানের সেই আনন্দ, সেই উৎসাহ, সেই প্রাণবন্ততা এখন যান্ত্রিক সভ্যতা ও নানা 'ইজমে'র যুগে আর সেরূপ নাই। তাই বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিতে বাঙালী-সংস্কৃতির এই রূপ ও রূপান্তরের কথা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছেঃ

"এখনকার উৎসবগুলি ক্রমশঃই যেন আপিসী ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিতেছে—তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাব-পত্রের হাঙ্গামা যত অধিক, আনন্দ সে পরিমাণে নাই। তখনকার দিনে বড়লোকের বাটিতে কোন ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে মাসেক কাল পূর্ব হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানী-পসারীর গতিবিধি সুরু হইত।...অন্তঃপুরে...নাপিতানী দিদিঠাকুরাণী ও বধূরাণীদিগকে কোমল পদপল্লবে ঝামা ঘসিয়া আলতা পরাইয়া দিয়া যাইত। আমাদের উৎসবে এই অন্তঃপুরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা।"

বাঙালী-সংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তরের পূর্ণ পরিচয় দানের অবকাশ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। বাঙালী আজ নিজদেশে যেন পরদেশী, ছিন্নস্কন্ধ কবন্ধের মত বাংলা আজ অঙ্গহীন।

কিন্নরীদের দেশ

শ্রীঅণিমা রায়

বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতে বিশেষতঃ উত্তরখণ্ডে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরেরা ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াত এবং মানুষের যাগযজ্ঞে ও উৎসবে উপস্থিত হ'ত। সেকালের লোকের ধারণা ছিল যে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরেরা দেবতাও নয় এবং মানুষও নয়—দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্ত্তী স্তরের জীব।

যদিও প্রাচীন মন্দিরের গায়ে যক্ষিণী, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরীদের মূর্ত্তি খোদিত দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব আজ একেবারে নিখোঁজ। কিন্নর ও কিন্নরীদের এখনও দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কিন্নরেরা বাস করে। যে নূতন হিমাচল প্রদেশ ১৯৪৮ সনে সৃষ্ট হয়েছে, তার এক দুর্গম অংশ কিন্নরদের বাসভূমি। এই অংশটিকে কিন্নরভূমি বলা চলে। কিন্নরভূমির পূর্ব্বে তিব্বত, পশ্চিমে কুলু, উত্তরে কাংড়া অধিত্যকা এবং দক্ষিণে রামপুর তহশীল। এই ভূখণ্ডের আয়তন ২০৬০ বর্গ-মাইল এবং এখানে প্রায় ৩৫ হাজার কিন্নর-কিন্নরী বাস করে। তিব্বতের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত "নমগ্যা গ্রাম" ও "শিবকী গ্রাম" কিন্নর দেশের পূর্ব্বসীমা। এই দুটি গ্রাম মারফত কিন্নরেরা তিব্বতীয়দের সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের বিনিময় করে।

কিন্নরভূমি একটি অত্যন্ত শীতপ্রধান ও পার্ব্বত্য দেশ। এর মধ্যে বহু সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ আছে যা বারোমাস বরফে আবৃত থাকে। কৈলাস পাহাড় এই সব গিরিশৃঙ্গের মধ্যে প্রধান। সমুদ্রতীর থেকে এর উচ্চতা ২১,২৫০ ফুট। মানস সরোবরের পার্শ্বস্থিত কৈলাস আর কিন্নরদেশের কৈলাস দুটি পৃথক পর্ব্বত। কিন্নরদেশে কিংবদন্তী আছে যে, পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে বেরিয়ে হিমালয়ের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে কিন্নরভূমির কৈলাসের পথে অনেকে দেহত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির এই কৈলাসে এসে দেহত্যাগ ও স্বর্গারোহণ করেন। কিন্নরভূমিস্থ কুমারসেনের নিকট হংসদেশক নামে আর একটি বরফাবৃত গিরিশৃঙ্গ আছে। কিন্নরদের বিশ্বাস যে, মানুষ মৃত্যুর পর এই হংসদেশে স্থান-লাভ করে।

পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে কিন্নরদের যে দৈহিক বিবরণ পাওয়া যায়—আজও তাদের চেহারা ও আকৃতি প্রায় সেই রকমই আছে। লম্বা বলিষ্ঠ দেহ, গৌরবর্ণ, সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের বিশেষত্ব। তাদের কণ্ঠস্বর সুললিত। মহাকবি কালিদাস তাদের যে "অশ্বমুখ" বলে গিয়েছেন, তারও ভিত্তি আছে। মানুষের মুখ খুব লম্বা হলে তাকে ঘোড়ামুখো ও ঘোড়ামুখী বলা হয়। বাস্তবিকই কিন্নর-কিন্নরীদের মুখ একটু বেশী রকম লম্বাধবনের।

নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে কিন্নরেরা মূল আর্য্যবংশসম্ভূত। আর্য্য ও বৈদেশিক সংস্কৃতি তাদের মধ্যে সুপরিস্ফুট। কিন্তু তাদের চেহারা দেখে মনে হয় যেন কিছু মঙ্গোলীয় রক্তও তাদের অনেকের মধ্যে এসে পড়েছে। তিব্বতীয়দের এত সান্নিধ্যে বাস, কাজেই এটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

কিন্নরেরা পশমের পোষাক পরে। এই প্রচণ্ড শীতের জায়গায় তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পুরুষ ও নারী উভয়েই পশমের টুপি মাথায় দেয়। টুপিতে একটি পশমের পটী জড়ান থাকে, ঠাণ্ডায় দরকার হলে তা দিয়ে কান ঢাকা দেয়। মেয়েরা মাথার উপর বেণী বাঁধে এবং সেটি টুপি দিয়ে ঢাকে। কিন্নরীদের পোষাক—কম্বলের মতন মোটা পশমের শাড়ি, (ওরা দোহর বলে), টুপি, (টেঝ বলে) আর পশমের চোলি। গ্রীষ্মের সময় চোলি ব্যবহার করে না, শাড়ীটিকেই গায়ে জড়িয়ে রাখে। পুরুষেরা পশমের পায়জামা ও পশমের লম্বা আচকান পরে। এই পোষাক তাদের বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। পুরুষ ও নারী উভয়েই পশমের জুতা ব্যবহার করে। ছাগলের চুল দিয়ে তারা একরকম জুতা তৈরি করে যা বরফের উপর চলবার সময় ব্যবহৃত হয়। এই পশমের সুতো কিন্নর-কিন্নরীরা নিজেরাই কেটে নেয়। পুরুষ, নারী ও ছেলেমেয়ে সকলেরই হাতে একটি করে কাঠের "তকলী" থাকে, সময় পেলেই তারা তাই দিয়ে পশমের সুতা কাটে। এমন কি হাঁটবার সময়ও তাদের সুতা কাটা বন্ধ যায় না।

এই অপূর্ব্ব জাতির উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে কতকটা চাষের আর বেশীর ভাগটা পশুপালনের উপর। পাহাড়ের গায়ে তাদের ছোট ছোট অনুর্ব্বর শস্যক্ষেত আছে, বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে এই সব ক্ষেত তৈরি হয়। জল বয়ে এনে জলসেচ করাও এক কঠিন ব্যাপার। আশ্চর্য্য যে, এই সমস্ত কষ্টসাধ্য কাজ কিন্নরীদের করতে হয়। কিন্নরেরা বৎসরের ভিতর শুধু একটি দিন ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়েই ছুটি পায়।

এই সব ক্ষেত্রলব্ধ শস্যে দিন চলে না। কাজেই তাদের পশমের ব্যবসা করতে হয়। কিন্নরদের প্রধান উপজীবিকা পশমের জন্য ছাগল, ভেড়া পালন। এ কাজটিরও ভার কিন্নরীদের উপর থাকে। তারাই ছাগল, ভেড়া চরায়। শুধু খুব শীতের সময়, যখন পাহাড়ের উপর ঘাস, পাতা থাকে না, তখন কিন্নরীরা ছাগল, ভেড়ার পাল নিয়ে নিচে সমতলভূমিতে চরাতে আসে। এ ছাড়া যাবতীয় গৃহকর্ম্ম, সন্তানপালন সমস্তই কিন্নরীদের করতে হয়। এমন কি হাট-বাজারে পণ্য-বিনিময়ও কিন্নরীরা করে। বড় বড় বোঝা পিঠে করে নিয়ে কিন্নরীদের পর্ব্বত আরোহণ করতে হয়। এই সব মাল বহনের কাজে কিন্নরেরা পরাঙ্মুখ। কিন্নরেরা আলস্যে

ময় কাটায়, ধূমপান, মদ্যপান নানা রকম খোশগল্প ও নাচগানে তাদের জীবন কাটে। "মেহেমী ও আঙ্গুরা মদ" কিন্নরীরা পুরুষদের জন্য স্বগৃহে তৈরি করে। কিন্নরীরা একেবারেই মদ্যপান করে না। যারা পরিশ্রম করে, যারা কর্মী, দেশটা তাদেরই হওয়া উচিত—এই ধারণাই আজকের দিনের রীতি। কাজেই এই দেশটিকে "কিন্নরীদের দেশ" বলা উচিত।

কিন্নরভূমি ও তিব্বতের অনেকটা সমসীমানা থাকায় কিন্নর ও তিব্বতের মধ্যে ভাষা, আচার-ব্যবহার ও কৃষ্টির বহু আদান-প্রদান আছে। কিছু তিব্বতী শব্দ আসা সত্ত্বেও কিন্নরদের একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে কিন্তু কোন লিপি নেই। কিন্নরভাষা আর্যভাষা এবং প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই ভাষার স্থানীয় নাম-হমস্কত। এই ভাষায় কোন সাহিত্য নেই কিন্তু বহু অপূর্ব মধুর লোকগীতি আছে। এখন কিন্নরেরা নাগরীলিপি ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত, তবে তাকে তান্ত্রিকতা-মিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম বলা যেতে পারে। কিন্নরভূমিতেও বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট বিকাশ হয়েছে, কিন্তু এখানকার বৌদ্ধধর্ম বৈদিকধর্মের সঙ্গে জড়িত আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তিব্বত থেকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি কিন্নরভূমিতে আমদানী করা হয়েছে। এ কথা সত্য নহে। অতি প্রাচীনকালে, এমনকি সম্রাট অশোকের সময়েও কিন্নরভূমিতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। কিন্নরভূমিস্থ কালসীগ্রামের সন্নিকটে নদীর ধারে মহারাজ অশোকের চতুর্দ্দশ অনুশাসনের শিলালিপিযুক্ত স্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান আছে।

কিন্নরভূমির প্রায় প্রতি গ্রামেই বৌদ্ধমন্দির এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি করে লামা আছে। প্রায় প্রতি গৃহেই একটি সাদা বৌদ্ধ-মন্ত্রলিখিত পতাকা উড্ডীয়মান। কিন্তু উত্তরাখণ্ড দেবভূমি। প্রতি গ্রামে একটি হিন্দু দেব বা দেবী থাকেন।

মূর্ত্তিপূজা বা পশু বলি কিন্নরভূমির সর্বত্র দেখা যায়। মাংস ভোজনও এখানে প্রচলিত।

তিব্বতীয়দের মধ্যে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ একেবারেই নেই, কিন্তু কিন্নরদের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু কিন্নরভূমিতে "হরিজন" আছে—যারা একেবারেই অস্পৃশ্য এবং যাদের ছায়াও কলুষিত করে। কিন্নরসমাজে "হরিজনদের" দুর্গতি ও লাঞ্ছনার সীমা নেই। হরিজনদের মধ্যে আবার বর্ণভেদ আছে। মর্য্যাদা অনুসারে তাদের নাম—(১) হালী, (২) রেগড়ু, (৩) বৈটু, (৪) বওয়ার। অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, ২য়, ৩য়, এবং ৪র্থ শ্রেণীর হরিজন ১ম শ্রেণীর হরিজনদের নিকট অছুৎ। ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর হরিজন ১ম এবং ২য় শ্রেণীর হরিজনের কাছে অছুৎ। ৪র্থ শ্রেণীর হরিজন অন্যসব হরিজনের কাছে অছুৎ। কিন্নর হরিজনের গোমাংস ভোজন উচ্চবর্ণীয় কিন্নরের ঘৃণার পাত্র হওয়ার অন্যতম কারণ।

আর্য্য সংস্কৃতি, পাণ্ডবীয় সংস্কৃতি ও তিব্বতীয় সংস্কৃতি—এই ত্রিবিধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণে কিন্নরদের সংস্কৃতির উদ্ভূত হয়েছে। তিব্বতীয়দের মধ্যে নারীর বহু ভর্তৃকতা বিদ্যমান এবং কিন্নরীদের মধ্যেও বহুপতিপ্রথা আছে। কিন্তু কিন্নরীদের এই বহুপতিপ্রথা তিব্বতীয় সংস্কৃতি থেকে এসেছে, না পাণ্ডবীয় সংস্কৃতি থেকে এসেছে তা বলা কঠিন। কিন্নরভূমিতে পাণ্ডবদের প্রভাব অতিশয় গভীর। বহু উৎসব রাতে এখানে পাণ্ডব সম্বন্ধে নানা লোকগীতি গীত হয়ে থাকে। কিন্নরভূমিতে এই বহুপতিপ্রথা নারীসংখ্যার অল্পতার জন্য নয়। ১৯৫১ সনের আদমসুমারি অনুসারে জানা যায় যে এখানে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।

একটি পরিবারের কোন পুত্রের সঙ্গে কোন কিন্নরকন্যার বিবাহ হলে কিন্নরীকে সেই সব-কয়টি ভাইয়ের পত্নী হতে হয়। কোন কিন্নরীকে বিভিন্ন পরিবারস্থ দুই বা ততোধিক পুরুষকে বিবাহ করতে হয় না। কিন্নরভূমিতে বহু ভর্তৃকতার এই বিশেষত্ব। এই বহুপতিপ্রথার একটি কারণ যে অর্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সব ভাইয়ের এক-একটি করে পৃথক পত্নী থাকলে, ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ হয় এবং তাদের পৃথক বাস করবার ইচ্ছা হয়। ভাইয়েরা পৃথক হয়ে গেলে পরিবারের সামান্য শস্যক্ষেত ও পশুপাল তাদের মধ্যে ভাগ করে নিতে হয়। এতে দরিদ্র কিন্নরপরিবারের দারিদ্র্য এত বেড়ে যায় যে, জীবনযাত্রা চালান কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্নর হরিজনদের জমিজমা বা পশুপালন প্রভৃতি কিছুই নেই—যারা সাধারণতঃ দিনমজুরি করে দিন কাটায় তাদের মধ্যে বহুপতিপ্রথা নেই। এসব ক্ষেত্রে ভাইয়েরা ভিন্ন ভিন্ন পত্নী গ্রহণ করে পৃথক ভাবে বাস করে। রামপুর থেকে ৯ মাইল দূরে গোরা বলে একটি স্থান আছে, সেখানে উচ্চজাতীয় (রাজপুত প্রভৃতি) কিন্নরদের মধ্যে বহু পতি প্রথা আছে কিন্তু হরিজনদের মধ্যে নেই। আবার রামপুর, কোঠগড় প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে বহুপতিপ্রথা একেবারেই দেখা যায় না। আর কিন্নর-ভূমির যে সকল স্থানে (অবশ্য অধিকাংশ স্থানে) বহু পতি প্রথা প্রচলিত সেখানকার অধিবাসীরা লোকগীতির মাধ্যমে পাণ্ডবের জয়গান করে। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, কিন্নরদের মধ্যে বহু ভর্তৃকতার মূলে দুটি কারণ আছে—(১) অর্থনৈতিক অবস্থা, (২) পাণ্ডব সংস্কৃতি।

কিন্নরসমাজে কুড়ি বৎসরের নিচে যুবক-যুবতীদের বিবাহ হয় না। বিবাহে কন্যাপণ বা বরপণ দেওয়ার রীতি নেই। সচরাচর পিতামাতার সম্মতিক্রমে বিবাহ হয়। বর, বরের পিতা ও কয়েকটি আত্মীয় বন্ধু নিয়ে বিবাহ-দিবসে কন্যার গৃহে উপস্থিত হয় এবং মদ্য-পান ও আহারাদি করে এক দিন কাটায়। তার পর বরযাত্রীর দল, বর ও কনেকে নিয়ে বরের বাড়ীতে ফিরে আসে—সঙ্গে আসে অন্ততঃ আটগুণ কন্যাযাত্রী। এই কন্যাযাত্রীরা দুই দিন বরের বাড়ীতে মদ্য মাংস প্রভৃতি খেয়ে বাড়ী ফিরে যায়। এই ভোজই বিবাহের একমাত্র অনুষ্ঠান। যজ্ঞাগ্নি, সপ্তপদী বা কোন প্রক্রিয়া বিবাহে নেই, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বরের বাড়ীতে

এসে কন্যাকে বরের অন্য সব ভাইয়ের পত্নী হবে বলে স্বীকৃত হতে হয়। সচরাচর বড় ভাই বিবাহ করতে যায় ও বধূ নিয়ে আসে।

কোন কোন ক্ষেত্রে যুবক-যুবতী কোন মেলায় পরস্পরকে পছন্দ করে স্থানীয় দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করে। এই ভাবেই তাহাদের বিবাহ হয়ে যায়। কালক্রমে তাদের পিতামাতা এ বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

কিন্নরসমাজে বিবাহবিচ্ছেদ-প্রথা আছে। স্বামী বা স্ত্রী উভয়েরই বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকার আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ করবার পূর্ব্বে স্বামীকে স্ত্রীর পিতার নিকট এ বিষয়ে সম্মতি নিয়ে আসতে হয় এবং স্ত্রীকে ৫৲ থেকে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিয়ে তার মায়ের কাছে রেখে আসতে হয়। যদি স্ত্রীকে অপর কেউ নিয়ে যায়, তা হলে স্বামী ২০০৲ থেকে ৫০০৲ টাকা নিয়ে স্ত্রীর উপর দাবী ছেড়ে দেয়। এটা নিছক পত্নী বিক্রয়।

কিন্নর সমাজে বহু পতি প্রথা আছে কিন্তু বহু পত্নী প্রথা নেই বললেও চলে। এই জন্য বহু মেয়েকে অবিবাহিতা থাকতে হয়। আজন্ম কুমারীও এ দেশে অনেক আছে। এই সব মেয়েদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় লামার নিকট দীক্ষা নিয়ে 'জোমো' হয় এবং ধর্ম্ম-চর্চ্চায় জীবন কাটাবার প্রতিজ্ঞা করে। জোমোরা পিতামাতার কাছে থাকে। তখন তাদের পিতার সংসারে যাবতীয় কাজ করতে হয়। এরা আজীবন বিনা বেতনের মজুর হয়ে কাল কাটায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দীক্ষা নেবার অনেক বৎসর পরেও 'জোমো'কে বিবাহ করতে দেখা যায়। কিন্নরসমাজে বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে যৌন-অশুচিতা দেখা যায় না।

স্থানীয় ভাষায় কিন্নরভূমিকে 'কুনীর' ও কিন্নরজাতিকে 'কুনীরা' বলে। প্রাচীনকালে কামরু কিন্নরভূমির রাজধানী ছিল। কামরুতে একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক দুর্গ আছে, যা চারিদিকে বন্ধ—কোন জানলা বা দরজা নাই। ছাদে একটি ফাঁক আছে, এই ফাঁক দিয়ে আজন্ম কারাদণ্ড অপরাধীকে দড়ির সাহায্যে দুর্গের ভিতর নামিয়ে দেওয়া হ'ত। কয়েদীর বাইরে আসবার কোন উপায় থাকত না। 'চিনী' থেকে ১৮ মাইল দূরে শতদ্রু নদীর তীরে মে °ং নামক স্থানে পাণ্ডবদের একটি দুর্গ আছে। কিম্বদন্তী আছে যে, পাণ্ডবেরা এখানে অজ্ঞাতবাস করেছিলেন এবং ঐ দুর্গটি রাতারাতি তৈরী হয়েছিল। ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত আর একটি দুর্গকেও পাণ্ডবদের দুর্গ বলা হয়।

দুর্গম কিন্নরভূমি সমেত সমস্ত হিমালয় প্রদেশটির শাসনের ভার ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সর্ব্ব প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, এই দুর্গম স্থানটিকে বহির্জগতের সহিত কয়েকটি ভাল রাস্তার দ্বারা সংযুক্ত করা। ভারতীয় সংবিধানে মনুষ্যবিক্রয় এবং বিনামজুরীতে শ্রম আদায় করা দণ্ডনীয়। কিন্নর-ভূমিতে এটি এখনও চলছে। এ বিষয়ে হিমাচল প্রদেশ সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। হরিজনদের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় রাখা একেবারেই চলবে না। কয়েকটি স্থানে জল ক্রয় করতে হয় কিন্তু জলাভাব এত বেশী যে, দাম দিয়াও নিতান্ত প্রয়োজনীয় জলটুকুও পাওয়া যায় না, এখানে চাষের বিশেষ সুবিধা হবে না আপেল, আঙ্গুর, খোবানি প্রভৃতি বাগান খুব ভাল ভাবে করা যাবে ঝাউ, চিড়, কেলু, দেবদারু প্রভৃতি জঙ্গল তৈরি না করে, এমন সব গাছের জঙ্গল তৈরি করতে হবে—যার পাতা ছাগল-ভেড়ার খাদ্য। এ কয়েকটি বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রবন্ধ শেষ করলাম

স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষা ও গণতন্ত্র

অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ
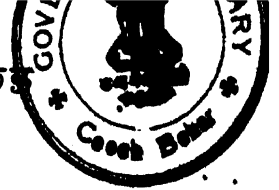
"দেশের অধিবাসিগণই প্রকৃত নির্ভরস্থল, তাহারাই দেশের প্রকৃত দুর্গ।"

"দেশবাসিগণের শিক্ষার উপরই দেশের অদৃষ্ট নির্ভর করে।"

"দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেই সেই স্বভাব প্রবাহিত হয় ও সেই সব লোকের উদ্ভব হয়, যাহারা দেশের বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, জাতীয় প্রতিরক্ষা, সুকুমার বিদ্যা এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয়-জীবনের প্রতি বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করে।...যে পরিমাণে জ্ঞানের ও বিদ্যার ঐ উৎসগুলি অবহেলিত হয় এবং তাহাদের পূর্ণ বিকাশের উপযোগী অর্থ হইতে বঞ্চিত থাকে, সেই পরিমাণে জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌঁছিতে পারে না।"—ফোর্ড ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ৮ (কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত)।

"একমাত্র সুশিক্ষার প্রভাবেই চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্ভব সম্ভব হয়।" (ঐ, পৃঃ ৯)

"জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতেছে তাহার জনগণ।" (ঐ পৃঃ ১৪)

"শিক্ষার জন্য জাতি যে অর্থ দান করে, তাহা ঠিক দান নহে, তাহা অর্থের বিনিয়োগ মাত্র। ইহা জাতিকে উচ্চহারে সুদ ফিরাইয়া দেয়।"—শ্রীমতী এ্যানী বেসান্ত, "কমলা বক্তৃতা।" (১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ)

"অদ্যকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে আগামীকল্যকার জগৎ জন্মলাভ করে।"—এম. এল. জ্যাক্স "The Headmaster Speaks" (প্রধান শিক্ষকমহাশয়ের ভাষণ) (Kegan Paul, কিগান পল)।

১। 'শিক্ষা' ও 'গণতন্ত্রে'র মধ্যে একটি অতি-ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রহিয়াছে, শিক্ষা বিনা গণতন্ত্র বাঁচিতে পারে না। সর্ব্বজনীন ভোটাধিকার-যুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যালট-বাক্সের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। 'উত্তরাধিকারী' জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত না হইলে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা হয়।

গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ও গণতন্ত্রের পুষ্টির ব্যাপারে শিক্ষা যে ভূমিকা গ্রহণ করে, আমাদের দেশের জনসাধারণ তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করেন না, কারণ আমাদের দেশে গণতন্ত্র এখনও ক্রমবিকাশমান। প্রকৃতপক্ষে, "শিক্ষা" ও "গণতন্ত্রের" মধ্যে অতি-ঘনিষ্ঠ একটি যে যোগসূত্র রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিবার মত আমরা এখনও যথেষ্ট-শিক্ষা পাই নাই।

গত ২৭শে জুলাই ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনেহরু কলিকাতায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ের আলোচনা করেন। "তাঁহার পরে কি হইবে?"—এই প্রশ্ন তিনি নিজেই উত্থাপন করিয়া একজন প্রকৃত গণতান্ত্রিক হিসাবে নিজেই তাহার উত্তর দেন। যদি "গণতন্ত্রের" অর্থ হয় "জনসাধারণ কর্ত্তৃক শাসন-ব্যবস্থা", তাহা হইলে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় জনসাধারণের মধ্য হইতেই উত্তরকালের কর্ম্মিগণের উদ্ভব হইবে, এরূপ আশা করা আমাদের কর্ত্তব্য। যদি কোন দল বা নেতা নিজেদের উত্তরাধিকারী (একটি বা কয়েকটি) নিজেরাই "মনোনীত" করিয়া সেই ভাবে গড়িয়া তুলেন, তাহা হইলে তাহা গণতন্ত্র-বিরোধী হইবে, গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা হইবে ও তাহাতে গণতন্ত্রের অপলাপ হইবে। এরূপ চলিতে পারে সম্রাট-শাসিত কিংবা "একতান্ত্রিক" দেশে, যেখানে জনসাধারণের কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেখানে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে, যেখানে সর্ব্বজনীন ভোটাধিকার একটি বিধানসঙ্গত অধিকার, সেখানে প্রতি ব্যক্তি ব্যালট-বাক্সের মাধ্যমে তাঁহার নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ নিরূপণ করিতে পারেন। যেখানে ব্যালট-বাক্সই একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা, সেখানে কোন দল বা নেতা কর্ত্তৃক "মনোনয়ন" সম্ভব নয়। যেখানে গণতন্ত্র চালু সেখানে প্রতি ব্যক্তিরই অসীম সম্ভাবনা ও সুযোগ রহিয়াছে। সুতরাং কোন "অতি-মানবের" উদ্ভব সেখানে সম্ভব নয়, তাঁহার উত্তরাধিকারীর ত আদৌ নয়। গণতন্ত্র চালু থাকার দরুণ সাধারণভাবেই একজন গণতান্ত্রিক উত্তরাধিকারীর উদ্ভব হয় তিনি জনসাধারণেরই একজন। হয়ত বা তিনি পূর্ব্বগামী ব্যক্তির সমান গুণসম্পন্ন না হইতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ গণতন্ত্র চালু থাকে ততক্ষণ বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না।

২। অতএব শিক্ষার অত্যাবশ্যকতা।

তাই গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনসাধারণের মধ্যে অনুশীলনের (training-এর) প্রসার করিতে হইবে। ইহার পরিধি বিস্তার করিতে হইবে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম স্তরে সর্ব্বসাধারণকে এই অনুশীলন দ্বারা গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই অনুশীলনের মাধ্যম বিবিধ, কিন্তু শিক্ষা বিনা সকল অনুশীলনই ব্যর্থ হইবে। তাই শ্রীনেহরুর মতে, গণতন্ত্রের পক্ষে ঠিক ধরনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার অতি প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান
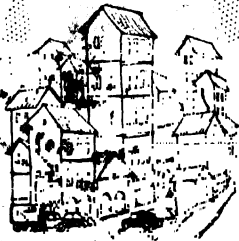
কোলকাতা বণাম মধুপুর

চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। ওঁকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।

বিমলঃ কি ভুতোদা, সহর দেখতে এসেছেন? সামলে চলবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদাঃ (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঃ যা তোদের সহরের ছিরি।

বিনয়ঃ সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেল্লায় সহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদাঃ সহর না ছাই। রাস্তায় বেরোনোর জো নেই। একটু ধীরে সুস্থে চলেছো কি কুড়িজন ঘাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমলা তুই বলনা—তুই তো ছিলি আমার সঙ্গে।

বিমলঃ ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায়। খ্যাচ খ্যাচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী ওঁর ইঞ্চি কয়েক দূরে আটকে গেল। উনি পানজর্দা মুখে দিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে 'ভাল জালা' বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্রাফিক পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদাঃ আচ্ছা তোরাই বল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আরাম করে পানজর্দাও খেতে পারবনা? একি সহরের ছিরি! আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমলঃ মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজপাড়াগাঁয়ে—

ভুতোদাঃ যাঃ যাঃ তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও সব পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে): কি! কি!!

বিনয়ঃ বলুন কি চাই আপনার—এরোপ্লেন? রাজহাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদাঃ (হাসিমুখে) তাজা ফুরফুরে হাওয়া। বিমল আর
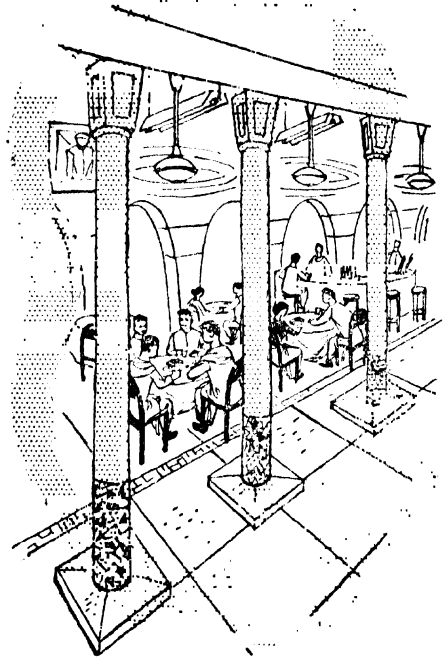
বিনয় একেবারে চুপসে গেল।

ভুতোদাঃ সকালবেলা যখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মাটীর গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

DL. 466A-X52 BG

এ ধোঁয়া কালি সিমেন্টের গরাদখানায় সে হাওয়ার মর্ম তোরা বুঝবিনারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াই না। আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়না তোদের এ সহরে।

ভুতোদা: কাল বাজারে গিয়েছিলাম। সখ হোল একটু মাছটা ফলটা কেনার। কিন্তু মুদীর দোকানে যা ব্যাপার দেখলাম। বিমল আর বিনয় ঘাবড়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। বেজায় জব্দ করছেন ভুতোদা ওদের। আবার কি যে ছাড়েন।

বিনয়: কি ব্যাপার ?

ভুতোদা: এক খদ্দের মুদীকে কি নাজেহালটাই করলে! হোত আমাদের মধুপুর মুদী চেলাকাঠ নিয়ে পেটাতো।
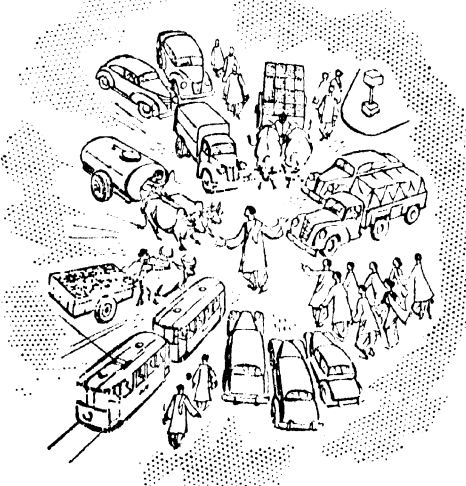
বিমল: বলুনই না কি করলে ?

ভুতোদা: খদ্দের চেয়েছে 'ডালডা'। মুদী যেই 'ডালডার' টিনে হাতটা ঢুকিয়েছে খদ্দের রেগে খুন। বলে "তুমি লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি ? 'ডালডা' তো পাওয়া যায় শীলকরা টিনে। খোলা আজেবাজে কি গছাচ্ছ আমায় ?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো মশাই 'ডালডার' এত কাটতি বলে এরা সব আজেবাজে জিনিব 'ডালডার' নামে বিক্রী করছে। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।"

বিনয়: আপনি কি বললেন ভুতোদা ?

ভুতোদা: আমি তো হেসেই অস্থির। ভদ্রলোককে বললাম—মশাই আপনার এ সহরের হালচালই আলাদা। মধুপুরে বিপিন মুদীর কাছ থেকে খোলা 'ডালডাই' তো আমরা কিনে থাকি।" ভদ্রলোক গেলেন বেজায় চটে। বললেন—"আপনি 'ডালডা' কেনেন না আরো কিছু। কেনেন যত খোলা জিনিষ যাতে ধুলোময়লা আর মাছি বসে" বলে গট্‌গট্ করে চলে গেলেন। (ভুতোদার অট্টহাসি) বিমল আর বিনয় আরো জোরে হেসে উঠল। ভুতোদার হাসি গেল মিলিয়ে। উনি ভেবেছেন বেজায় জব্দ করছেন। ওদের কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে তো তা মনে হচ্ছেনা।

বিমল: খোলা হাওয়া আর খোলা 'ডালডা'—আহাহা কি ডায়েট—হা: হা:

ভুতোদা: হাসির কি হোল ?

বিনয়: ভদ্রলোক আপনাকে ঠিকই বলেছেন। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। ভুতোদা (চটে): তবে মধুপুরে আমরা কি খাই ? বিনয়: ভদ্রলোক যা বলেছেন তাই। কারণ 'ডালডা' কোন জায়গাতেই খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।

ভুতোদা: দ্যাখ! বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস ? বিমল: আপনি এই রেষ্টুরেন্টের মালিক হরেনদাকে জিজ্ঞাস করুন। বাড়ীতে মিনুদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন।

হরেনদা: হাঁ, ওরা ঠিকই বলছে। আমার 'ডালডা' নিয়েই তো কারবার 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা বায়ুরোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।

বিনয়: শীলকরা টিনে 'ডালডা' তাজা ফুরফুরে হাওয়ার মতই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভুতোদা চুপসে গেলেন। মিনমিন করে একবার বললেন "খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।"

বিমল: একটা লেগেছে ভুতোদা। সেকেণ্ডটা মিস্‌ফায়ার হয়ে গেল।
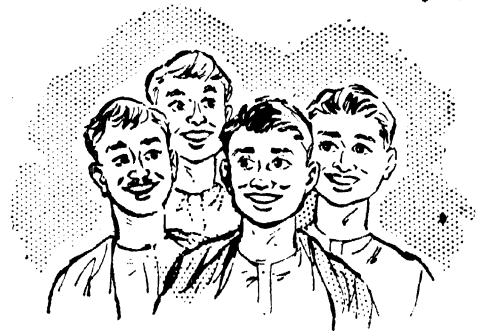
নিবন্ধে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে, শিক্ষা গণতন্ত্রের প্রাণবায়ুস্বরূপ, শিক্ষা বিনা গণতন্ত্রের আয়ু প্রায় শেষ হইয়া যায়, আর শিক্ষিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীই গণতন্ত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

৩। দেশে শ্রীনেহেরুর উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনের কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় নাই। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ব্যাপারে ঔদাসিন্য ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে।

গণতন্ত্রের দিক্‌ দিয়া শিক্ষা যে একটি বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করে, তাহা শ্রীনেহেরু স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণে সামান্যই উপলব্ধি করে। আমরা শিক্ষা ব্যাপারে অতি-উদাসীন, তাই শ্রীনেহেরুর এই সাংবাদিক সম্মেলনে দেশে কোনরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় নাই, ইহার কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেশে দেখা যায় নাই।

৪। আমাদের সকল পরিকল্পনায় শিক্ষার স্থান সর্ব্বোচ্চে দিতে হইবে। সকল পরিকল্পনার পূর্ব্বে মনুষ্যত্ব গড়িবার জন্য শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের সকল পরিকল্পনায় শিক্ষাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে হইবে, শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। চমকপ্রদ বিরাট পরিকল্পনা-রাজির সম্মুখে আমাদের ভুলিয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক যে সকল যন্ত্রের পিছনে রহিয়াছে মানুষ, তাই মনে রাখিতে হইবে এই মানুষকেই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে ধরিতে হইবে, গড়িতে হইবে ও তাহার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। আমাদের লক্ষ্য শিল্পে উন্নতি বটে, কিন্তু সর্ব্বজনীন শিক্ষা বিনা এই শিল্পোন্নতি সম্ভব নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মাথাপিছু উৎপাদন শক্তির দিক দিয়া আমাদের দেশ সকল দেশের পিছনে পড়িয়া আছে। ইহার কারণ হইতেছে আমাদের দেশের শিল্প-কর্ম্মিগণের মধ্যে শিক্ষার অভাব। আজ চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ হইল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাপানে সফর করিবার সময় তাঁহার হোটেলের পরিচারিকাকে তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ 'সাধনা' জাপানী-সংস্করণ পড়িতে দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতা তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণের নিকট বিবৃত করেন (প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিন, নভেম্বর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ)। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে জাতির হোটেলের পরিচারিকাও এরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, সে জাতির যে পুনরভ্যুত্থান হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি থাকিতে পারে।

৫। শিক্ষার ফল হইতেছে—সুবর্দ্ধিত মেধা। সকল ক্ষেত্রেই এই সুবর্দ্ধিত মেধা কার্য্যকরী হয়। তাই উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাব কখনও অনুভূত হয় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপযুক্ত উত্তরাধিকারী প্রস্তুত রাখিতে সাহায্য করে।

শিক্ষার ফলে মেধা সুবর্দ্ধিত হয় বলিয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিবার কৌশল সহজেই আয়ত্ত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাই সর্ব্বজনীন শিক্ষা প্রয়োজনীয়। যখনই এবং যেখানেই ফাঁক পড়িবে, গণতন্ত্রের বিধিব্যবস্থার ফলে ও তাহার ক্রমিক গতির সঙ্গে সঙ্গে একজন উত্তরাধিকারীর নিশ্চয়ই উদ্ভব সম্ভব হইবে। সেই ব্যক্তিই অগ্রসর হইয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করিবেন। সর্ব্বজনীন শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে গণতন্ত্র এরূপ একটি বিধি-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলে ও এরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, প্রতি বিভাগেই উপযুক্ত উত্তরাধিকারী প্রস্তুত থাকে। প্রয়োজন হইলেই তাঁহারা ভার গ্রহণ করেন। যদি এরূপ না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে গণতন্ত্র বিফল হইয়াছে। যখনই যে-কোন বিভাগে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব ঘটিবে, তখনই বুঝিতে হইবে, ইহা একটি সাবধান-সূচক সঙ্কেত, আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছে যে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় কোন একটি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, আর এই ত্রুটি অনতিবিলম্বেই দূর করিতে হইবে। এই ত্রুটি থাকিলেই আমাদের বুঝিতে হইবে যে, যে-জনগণ জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, শিক্ষার দ্বারা সেই জনগণের উপযুক্ত উন্নতি সাধিত হয় নাই, আর যে-পরিমাণে এই মানবরূপ সম্পদের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার ও উন্নতি সাধিত না হইবে, সেই পরিমাণে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকার গণতন্ত্র এ বিষয়ে সর্ব্বদা সজাগ এবং শিক্ষার বিধি-ব্যবস্থার জন্য তাহার বিশাল শাসনযন্ত্রের কোন বিভাগেই সেখানে কখনও লোকাভাব অনুভূত হয় নাই। এই গণতন্ত্র প্রভাবেই আমেরিকার ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণে কাঠের কুটীর হইতে হোয়াইট-হাউসে যাত্রা লিন্‌কনের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছিল এবং এই গণতন্ত্রই লিন্‌কনকে এক বিশ্ববিশ্রুত, অপূর্ব্ব বক্তৃতা দিতে প্রেরণা দিয়াছিল, আর যদিও তিনি কখনও কোন সাহিত্যিক বিশেষজ্ঞতা অর্জ্জন করেন নাই তথাপি এই বক্তৃতাই সাহিত্য-ভাণ্ডারের বিশেষ একটি রত্নস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে এবং রাজনীতির জটিল পথে মানব-জাতিকে আলোক দেখাইয়া বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এ সমস্তই গণতন্ত্রের প্রভাবে সম্ভব হইয়াছে।

৬। ব্যালট-বাক্স কর্ত্তৃক জনসাধারণের উপর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের 'প্রভু'দের শিক্ষিত করিতে হইবে। শিক্ষিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে রাজনৈতিক প্রতিযোগীদলগুলির মধ্যে সাম্য (balance) রক্ষিত হয়।

আর একটি কারণে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে সর্ব্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে গণতন্ত্রের একটি বিরাট পরীক্ষাগার বলা যাইতে পারে, এখানে গণতন্ত্রের বিরাট পরীক্ষা চলিতেছে। এখানে আজ ব্যালট-বাক্স ক্ষুদ্রতম ভারতীয় নাগরিকের উপর অসীম ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, ভারতবর্ষের কল্যাণকল্পে দেখিতে হইবে যে, এই ক্ষমতার যেন অপপ্রয়োগ না হয়, দেখিতে হইবে যে, এই গুরুদায়িত্ব যেন সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়।

সুতরাং ভোটাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার করিতে হইলে তবেই ভোটাধিকার সার্থক হইবে। এখানে গ্রেট ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত সমীচীন হইবে। ৭ই জুন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে যখন বিখ্যাত "রিফর্ম্‌স্ বিল" বিধিবদ্ধ হয়, তখন সেখানে শিক্ষা অত্যন্ত অবনতি-অবস্থায় ছিল, এই "বিল" আইনে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার কর্তৃক নাগরিকদের শিক্ষাভার গ্রহণ সুরু হয়। অবশেষে গ্ল্যাড ষ্টোনের মন্ত্রিত্বকালে যখন ভোটাধিকারের অধিকতর প্রসারের ফলে দেশের শাসনভার তাঁহার হস্তে আসে, তখন তিনি সমাজ-সংস্কারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রথমেই শিক্ষা-সংস্কারে হাত দেন, কারণ তখন সকলেই অনুভব করেন যে, আমাদের প্রভুদের এবার শিক্ষিত করিয়া তুলিবার সময় আসিয়াছে। ('now we must educate our masters')। তাই ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে "প্রাথমিক শিক্ষা-বিধি' ("Elementary Education Act") আইনবদ্ধ হয় ও "গুরুমহাশয় তাঁহার পাঠ্যপুস্তক লইয়া বাহির হইয়া পড়েন' '(the school master was abroad with his primer.)' শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলী গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কারণ, একমাত্র শিক্ষার প্রভাবেই চিন্তাশীল ব্যক্তির, চিন্তাশীল নাগরিকের উদ্ভব সম্ভব হয়। রাজনৈতিক উত্তেজনায় অচঞ্চল থাকিয়া এই শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলীই ভোটাধিকারের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিয়া গণতন্ত্রকে অবিমৃষ্যকারিতা হইতে রক্ষা করেন। সর্ব্বশেষে, এইরূপ নির্ব্বাচকমণ্ডলীই শাসনযন্ত্রের উপর বহু দিক্ দিয়া শুভপ্রভাব বিস্তার করেন। প্রথমতঃ, ভোটাধিকার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার হইলে আকর্ষণের কেন্দ্র সমাজের বিশেষ কোন শ্রেণীতে নিবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে ; এবং দ্বিতীয়তঃ এইরূপ নির্ব্বাচকমণ্ডলী থাকিলে শক্তিমান বিরোধীদল সকলের উৎপত্তি সম্ভব হয় ও তাহার ফলে শাসনভার-প্রাপ্ত দল সতর্ক থাকেন। এইরূপে শিক্ষিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীই গণতন্ত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ হইয়া উঠে। শিক্ষিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে গঠিত এই সকল বিরোধী দল যে রাষ্ট্রে অনুপস্থিত সেখানে একতন্ত্র স্থাপিত হয়, আর ইহাদের উপস্থিতিতেই গণতন্ত্রের পুষ্টি-সাধিত হয়। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হইল এই যে, শাসনভার কোন বিশেষ দলের মধ্যে চিরদিন নিবদ্ধ থাকে না, জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে না পারিলে আগামীকল্যই শাসনভার হস্তান্তরিত হইতে পারে, অদ্যকার বিরোধীদল আগামীকল্য শাসন-ভার গ্রহণ করিতে পারেন। অতএব গণতন্ত্রে প্রতিদলকেই সজাগ থাকিতে হয়—এই নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতাই, শুধু স্বাধীনতা কেন, গণতন্ত্রেরও মূল্য। এইরূপ বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে দলগুলির মধ্যে সাম্য স্থাপিত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, এই স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাই গণতন্ত্রের জীবন। এইরূপে প্রতি-দলই জনসাধারণের কণ্ঠধ্বনির দিকে সজাগ থাকিবে, "জনসাধারণের কণ্ঠধ্বনি হইতেছে ভগবানেরই কণ্ঠধ্বনি"—এই বাণী এইরূপেই সার্থক হইবে। গণতন্ত্রে শিক্ষিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী, তাই এত প্রয়োজনীয়। তাই আমরা বার বার বলিতেছি, শিক্ষিত নির্ব্বাচক-মণ্ডলীই গণতন্ত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

৭। আমাদের লক্ষ্য হইবে শুধু সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নহে, বয়স্কদেরও সর্ব্বজনীন শিক্ষা (adult education)।

সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হইবে—শুধু একটি বিশেষ বয়স্কদের (৫ কিংবা ৬ হইতে ১১) মধ্যে সর্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার নহে, ইহার ঊর্দ্ধ বয়স্কদেরও মধ্যে সর্ব্বজনীন শিক্ষাপ্রসার আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। উক্ত বিশেষ বয়স্ক দলের বাহিরে যে বিরাট নিরক্ষর, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত শ্রেণী আছে, তাহারা উপযুক্ত নাগরিক হইয়া গড়িয়া উঠিবে, তবেই তাহারাও ভোটাধিকারের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং তাহাদের উপরে যে গুরুদায়িত্বপূর্ণ জটিল কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইয়াছে সে ভার সুষ্ঠুভাবে বহন করিতে পারিবে। সুতরাং সমস্ত জাতিকেই পাঠশালায় যাইতে হইবে। তবেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বর্ত্তমান প্রভেদ আর থাকিবে না, গণতন্ত্রের ক্রমোন্নতি সুনিশ্চিত ও দৃঢ় হইবে।

৮। খুচরা খুচরা শিক্ষা দেওয়ার নীতি অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিতের সংখ্যাধিক্যের প্রতিকূল প্রভাব। গণতন্ত্রের সম্মুখে একটি কূট বিপদ।

গণতন্ত্র যদি সর্ব্বজনীন শিক্ষার ভার গ্রহণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে দুইটি ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেই দুইটি বিপদ সম্বন্ধে আমরা এখানে সাবধানবাণী ঘোষণা করিব। প্রথমটি হইতেছে অতি সূক্ষ্ম, তাই উহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যদি দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশটি অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত রহিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শিক্ষিত অংশকে চাপিয়া রাখিবে ও তাহাদের প্রাপ্ত শিক্ষার সমস্ত সুফল নাকচ করিয়া দিবে। অশিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত বা কু-শিক্ষিত-জনসম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে গণতন্ত্রের পক্ষে তাহা প্রকৃত বিপজ্জনক। এই বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ-সম্প্রদায়ের "মাধ্যাকর্ষণ" শক্তি প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। ফলে, শুধু যে সংখ্যা-লঘু শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সকল শিক্ষাই ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিভাগেরই মান নামিয়া যাইবে, আর এই মান উচ্চে তুলিবার প্রতি চেষ্টাই উক্ত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় প্রাণ-পণে বাধা দিবে। সুতরাং আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করি যে, সমগ্র জাতিকে যে শুধু পাঠশালায় যাইতে হইবে তাহা নহে, সকলকেই "একসঙ্গে" যাইতে হইবে। অর্থের অজুহাতে খুচরা খুচরা শিক্ষা দেওয়া এবং সর্ব্বজনীন শিক্ষায় বিলম্ব করা, উভয়ই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

৯। সর্ব্বজনীন শিক্ষাই গণতন্ত্রকে "উচ্ছৃঙ্খলজনতাতন্ত্র" হইতে রক্ষা করে।

সর্ব্বজনীন শিক্ষা গণতন্ত্রকে আর একটি ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করে। এই দ্বিতীয় বিপদটির নাম দেওয়া যাইতে পারে

"উচ্ছৃঙ্খলজনতাতন্ত্র" (mobocracy)। শিক্ষা হইতেই দৃঢ়-নিয়মানুবর্ত্তিতা (Discipline) অর্জ্জিত হয়, ইহার অভাব ঘটিলে উচ্ছৃঙ্খলজনতার স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হয়। গণতন্ত্রের ব্যক্তিত্ব-প্রসারের দিকে যখন কোন বাধাই নাই, তখন এই ব্যক্তিত্বের অপব্যবহার যাহাতে না হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই ব্যক্তিত্বকে উপযুক্ত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে না পারিলে ঘোর বিপদ হইবে। শিক্ষা ব্যতীত সংযমবৃত্তি জাগে না, আমাদের অসংযত ব্যক্তিত্বকে শান্ত, সংহত করিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার প্রসার হইলেই গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র হইতে রক্ষা পাইবে, আর রক্ষা না পাইলে ধীরে ধীরে "একতন্ত্র" স্থাপিত হইবে। তাই আমরা এই প্রসঙ্গে জন মিলটনের সতর্কবাণীর এখানে পুনরুল্লেখ করিতেছি। তাঁহার মতে নিয়মানুবর্ত্তিতার অক্ষদণ্ডের উপর জাতির ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘুরে।

১০। সর্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যয়ভারের কতখানি অংশ বে-সরকারী দল গ্রহণ করিতে পারেন। বে-সরকারী অর্থ-ভাণ্ডার সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা।

একটি বিষয়ের দিকে আমরা এতক্ষণ দৃষ্টি আকর্ষণ করি নাই, এই বার সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বে-সরকারী দল সর্ব্বজনীন শিক্ষার বিপুল ব্যয়ভারের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া সরকারকে কতখানি সাহায্য করিতে পারেন,সে সম্বন্ধে আমরা এইবার আলোচনা করিব। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের আয় এই বিরাট প্রচেষ্টার সমতুল্য নয়, ইহা স্মরণ রাখিয়া আমাদের সকলকেই অগ্রসর হইতে হইবে। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে সকল ব্যয়ভারের জন্য শুধু সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না, বে-সরকারী দলকে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে, এবং সর্ব্বজনীন শিক্ষার বিপুল ব্যয়ভারের কিয়দংশ গ্রহণ করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক আমেরিকায় যেমন বে-সরকারী দলের দান শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষেও বে-সরকারী দলের দান সেই ভূমিকা গ্রহণ করুক। স্বাধীন, গণতান্ত্রিক দেশে এরূপ আত্মনির্ভরতা সমীচীন হইবে। বিরাট বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের অর্থভাণ্ডার উন্মুক্ত করুন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা অবিমিশ্র দান হইবে না, ইহা অর্থ-বিনিয়োগের নামান্তর মাত্র, কারণ এই দান শেষে তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূলই হইবে। দেশের কল্যাণের দিকে চাহিয়া সর্ব্বজনীন শিক্ষার জন্য আমাদিগের কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যদি সমগ্র জাতিকে এক সঙ্গে পাঠশালায় যাইতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র জাতিকেই সে ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। গণতন্ত্রের সরকার জাতি হইতে বিভিন্ন নহে, উহা জাতীয় সরকার। সুতরাং সেই সরকার যেখানে আয়ের দিক দিয়া সম্পূর্ণ সমর্থ নয়, তখন বে-সরকারী দলকে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে, বিশেষতঃ সর্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যাপারে কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। সমগ্র দেশে প্রতি প্রতিষ্ঠানে, প্রতি রাজ্যসরকারে এবং কেন্দ্রীয় সরকারে "শিক্ষা-উন্নয়ন-ভাণ্ডার" খোলা হউক। আর এই ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহের সুবিধার জন্য "শিক্ষা-উন্নয়ন-ভাণ্ডার-বিধি" প্রত্যেক বিধানসভায় বিধিবদ্ধ হউক, তাহা হইলে বেসরকারী দিক হইতে ব্যক্তিগত ভাবে কিংবা প্রতিষ্ঠানগত ভাবে এই ভাণ্ডারে দান করা আইন সম্মত হইবে। এইরূপে সর্ব্বজনীন শিক্ষার বিরাট প্রচেষ্টায় সকলেই অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। ব্যক্তিগত দান যত সামান্যই হউক না কেন, একুনে সামান্য হইবে না, জনসাধারণের নিকট হইতে একটি একটি করিয়া পয়সা পাইলেও উচ্চ শ্রেণীর মোটা মোটা দান অপেক্ষা একুনে অধিক হইবে। আমেরিকার ফোর্ড বা রকেফেলার-ভাণ্ডারের আদর্শে আমাদের দেশের ধনকুবেরগণের প্রতিষ্ঠানগুলি অনুরূপ ভাণ্ডার খুলুন। তাহাদের কর্ম্মসূচী অনুরূপ হউক, তাহা হইলে এই সকল ভাণ্ডার সরকারী ব্যয়-বরাদ্দের ন্যূনতা-পূরক হইবে।

১১। "জনগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত, জনগণের কল্যাণে পরিচালিত, জনগণেরই নিজস্ব শাসনতন্ত্র" ভারতবর্ষে চালু রাখিতে সর্ব্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজন, এবং সেজন্য অর্থ-সংগ্রহেরও প্রয়োজন।

এই নিবন্ধে যাহা আমাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, উপসংহারে আমরা তাহারই পুনরুল্লেখ করিব। সর্ব্বজনীন শিক্ষার খাতে আমরা যেন অর্থ-বরাদ্দ করিতে কার্পণ্য না করি। "শিক্ষার জন্য অর্থ, আরও অর্থ" যেন আমাদের জপমালা হয়। বিশেষজ্ঞরা মিলিত হইয়া অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে পরামর্শ ও উপায় উদ্ভাবন করুন, কারণ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সকলে মিলিত হইয়া অভিযান চালাইতে হইবে। আমরা "অভিযান" শব্দটি বিবেচনা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি, কারণ শিক্ষা-সমস্যাকে সামরিক পর্য্যায়ভুক্ত না করিলে উহার আশু সমাধান সম্ভব নহে। যখন আমাদের স্বাধীনতার একাদশবর্ষেও একটি বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তখন আমরা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাই শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদিগকে যথাসম্ভব ত্বরা করিতে হইবে। অন্য সব কিছুই অপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সর্ব্বজনীন শিক্ষা-সমস্যাকে আর ঠেকাইয়া রাখা চলে না। সুতরাং আমাদের পরিকল্পনা-সূচীর অগ্রাধিকার বিষয়ের সংশোধনের এখন সময় আসিয়াছে। যাহা সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়, তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে স্থান দিতে হইবে, আর আমাদের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষা যে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সুতরাং আমাদের রাজস্বব্যয়ের খাতে, রাজ্যসরকারে বা কেন্দ্রীয় সরকারে, শিক্ষার দাবী হইতেছে সর্ব্বাগ্রে। এতদিন "শিক্ষা" একটি অবহেলিত বিষয় ছিল, বিদেশী শাসক বিমাতার মত তাহার প্রতি ব্যবহার করিয়াছিল, আশা করি, আজ সেদিন গিয়াছে। শুধু প্রাথমিক শিক্ষা কেন, সর্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তবেই "জনগণ-পরিচালিত, জনগণের কল্যাণে পরিচালিত, জনগণেরই নিজস্ব শাসনতন্ত্র" ভারতবর্ষে চালু হইবে।

নেতাজী স্মরণে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

নেতাজী তোমারে ব্যর্থ করেছি
স্বপ্ন হ'ল না পূর্ণ।
"কোহিমার রণে" হে বিজয়ী বীর
দর্প করেছি চূর্ণ।
মহিমা তোমার প্রচারিয়া যারা
শোষণ করেছে দেশ।
দেশের সেবায় পথে তুমি আজ,
তাহারা রয়েছে বেশ।
নির্ব্বোধ তুমি! দেশের সেবায়
নিজেরে করেছ শেষ।
আমরা কেমন আরামে কাটাই
মুখে বলি "দেশ" "দেশ"।
রাজার কুমার সন্ন্যাসী হলে
বাহবা দিয়েছি ঢের।
পিছে পিছে ঘুরে পাগল করেছি
পেয়েছ কি কিছু টের?
পাগল হয়েছ? মাটির ধরণী
মাটিরই উপরে রবে।
মানুষ ভুলিবে 'স্বভাব ধর্ম্ম'?
স্বর্গ নামবে ভবে?
শস্যশ্যামলা হবে এ ভারত
দীনের জুটিবে অন্ন?
বিদেশী জিনিস রবে না এ দেশে
গড়িবে স্বদেশী পণ্য?
সত্য ও প্রেমের গড়িবে সৌধ
অসত্য ভিতের 'পর।
বালুচরে তুমি বাতুল নেতাজী
রচিবে বাসর ঘর?
মানুষ বাসিবে মানুষেরে ভাল
নেবে সবে বুকে তুলে,
অহিংসা হইবে সবার পূজ্য,
হিংসারে যাবে ভুলে?
ফিরে এস তুমি হে তেয়াগী বীর
পূজ্য হে মহীয়ান!
এ পোড়া দেশেরে বাসিও না ভাল,
হয়ে যাক শত খান।

উপনিষদ মালা

শ্রীপুষ্পদেবী

যে দিকেতে চাই মৃত্যু আঁধার চির বিচ্ছেদময়,
আকুল পরাণ, প্রিয়জন তরে মনেতে শুধুই ভয়।
হ'ল ছারখার সংসার কত
দুখ বেদনায় মন ব্যাকুলিত,
মনে হয় হায় ক্ষণিক জীবন কেন এই আয়োজন,
যাহারেই ধরি সেই যায় চলি ভেঙ্গে চুরে দিয়ে মন।

কেঁদে বলি কেন সৃষ্টি তোমার কেন এ মিথ্যা খেলা
অমঙ্গলের মাঝে এ কি তব সর্ব্বনাশের লীলা?
তবে কেন দিলে এত অনুভূতি?
কেন এত দয়া ভালোবাসা প্রীতি,
যাহা ভেঙ্গে যাবে গড়িবারে তারে কেন বৃথা আয়োজন,
আস্থা হারায়ে তোমা প্রতি কেহ ভোগে রত অনুখন।

ভ্রান্ত পথ এ বুদ্ধি নাশা এ পরাণেতে ঠিক জেনো,
দেহটারে যদি বড় করে ধরো উপায় যে নেই কোনো,
এই মোহ যদি দূর করে দাও,
দেহ কারাগার কেন তারে চাও,
দেহরে সত্য মানিয়া মনেতে এ গ্লানি দুঃখ জেনো,
দেহাতীত সেই সকল মুক্ত বারেক তাঁহাকে চেনো।

তাঁহারে লভিতে লালসালোলুপ অধীরতা নাহি সাজে,
প্রেম যদি তব নিকষিত হেম অন্তরতলে বাজে
হয়ে স্থির ধীর প্রতীক্ষারত
তাঁর আশা পথ চেয়ে অবিরত
কেটে যাবে যুগ নিমেষের মত পাইবে রাজাধিরাজে,
তাহারে লভিতে লালসালোলুপ অধীরতা নাহি সাজে।

তাঁরি প্রেমে মন হবে ভরপুর সুমধুর রসে ভরা,
বিরহ মিলন ব্যথায় সুধায় পরাণ পাগলপারা।
ভয় দুখ সব চরণে ধরিয়া
নিজে হতে তারা যাবে যে সরিয়া
করযোড় করি আমন্ত্রিবে যে মরণ দুঃখহরা,
অমৃতময় সে পরশ লভিয়া ঘুচিবে দেহের জরা।

শ্বেতোপনিষদ ৪.৫.৬.৭

বেদান্ত ও জাতীয়তা

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

ভারতীয় জনগণের দৈনন্দিন জীবনে বেদান্তসূত্রের প্রভাব এরূপ গভীর যে, বর্তমান যুগে কেহ কেহ ইহাকে ভাববাদী দর্শন বলিয়া মনে করিলেও দর্শনটির অতীত ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। এশিয়া ও ইউরোপের সংযুক্তির ভিত্তিতে রাশিয়ার অভ্যুত্থান, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর মিশর ও সিরিয়ার সংযোজনে নবরাষ্ট্রের জন্মলাভ প্রভৃতি পূর্ব গোলার্ধের একীকরণজনিত আন্তর্জাতিক অবস্থার যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহাতে ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনকে খাপ খাওয়াইবার প্রয়োজন বোধ হয় অত্যন্ত জরুরী হইয়াছে। এই প্রয়োজনের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধির জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর দর্শনটির প্রভাব আলোচনা করিব।

বৌদ্ধধর্মকে ঠেকাইবার জন্য আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত ধর্ম বা আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তধর্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া পাঠানযুগে বিদ্যারণ্য মুনি বা মাধবাচার্যের কার্যকলাপের সমূহ বিবরণ হইতেই আমাদের আলোচনা আরম্ভ হওয়া কর্তব্য। বিজয়নগর রাজ্যের সংস্থাপক অদ্বৈত বেদান্তবাদী এই দার্শনিক শুধু যে এই দর্শনখানির উপর (১) বিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ, (২) পঞ্চদশী, (৩) অনুভূতি প্রকাশ প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি বিজয়নগরাধিপতি বুক্ক-নরপতির কুলগুরু, সভাপণ্ডিত, প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতিরূপে রাজ্যের বিজয় স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বে আদর্শবান হইয়াই তিনি বাহুবলে দাক্ষিণাত্যে এই হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য যে সাম্প্রদায়িক ছিল না তাহা তদ্রচিত "জৈমিনীয় ন্যায়মালা" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্ধের উক্তি এবং তদুপরি "বিস্তর" টীকা দ্বারা বুঝা যায়। উক্ত শ্লোকে আমরা পাই যে :

> মুক্তিং মানবতীং বিদন্ স্থিরধৃতির্ভেদে বিশেষার্থভা
>
> পাণ্ড্যোহঃ ক্রমকৃৎ প্রযুক্তি নিপুণঃ শ্লাঘ্যাতি দেশোন্নতিঃ।

ইহার "বিস্তর" টীকায় তিনি বলিয়াছেন—"অত্র চিকীর্ষিত ধর্মশাস্ত্রে...স্বরাজ্য প্রতিপালন প্রকারঃ প্রতিপাদ্যতে।" ভারতের স্বাধীনতা আসিলেও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইহাকে ঈপ্সিত "স্বরাজ" বলিয়া গ্রহণ করেন না। বাস্তবিক উদ্ধৃত শ্লোকাংশের শেষে উল্লিখিত "অতিদেশোন্নতি" অংশের উক্ত টীকায় যে—"অতি বহুলস্য দেশস্যোন্নতিঃ সমস্ত ভোগ্য-বস্তু সম্পত্তিঃ। সা চ পররাষ্ট্র নিবাসিভিঃ সকল প্রাণিভিঃ শ্লাঘ্যতে"—বলিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে পারি যে, শুধু খাদ্যাভাবপূরণ নহে সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু সম্পত্তির প্রাচুর্য আনিয়া স্বদেশবাসী ত বটেই পররাষ্ট্রনিবাসী সকল প্রাণীর আশা পূর্ণ হইবার অবস্থা না আসিলে শ্রীমাধবের আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ আমাদের বহু দূরে। আচার্যের এই চিন্তার মধ্যে শুধু যে জাতীয়তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত তাহা নহে, পররাষ্ট্রের কথা উল্লেখ দ্বারা আন্তর্জাতীয়তা সাধনার নির্দেশও সুস্পষ্ট।

এই বৈদান্তিক রাজনীতিকের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা ইংরেজ আমলের প্রারম্ভেই আর একজন অনুরূপ প্রতিভা-শালী মহাত্মার দর্শন পাই—ইনি হইতেছেন ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন। দেশকে বিদেশী ধর্মের প্রভাব-মুক্ত করিবার বাসনায় বেদান্তদর্শনে উদ্বুদ্ধ এই মহাপুরুষ দর্শনখানির উপর (১) বেদান্তগ্রন্থ ও (২) বেদান্তসার প্রভৃতি টীকা লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই পরন্তু ইঁহারই প্রভাবে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার প্রেরণায় সেই তিমিরাচ্ছন্ন যুগে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহা আজ নিশ্চিত স্বীকার্য যে, তিনিই বাংলা ভাষায় বেদান্তের সর্বপ্রথম ভাষ্য-কার এবং ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন ভারতের প্রথম ব্যক্তি। রাজনৈতিক ব্যাপারে উদার এবং আন্তর্জাতিক মনোভাবসম্পন্ন বলিয়াই, স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকট হইতে এক নিয়মানুগ শাসনতন্ত্র আদায় করিয়াও নেপল্‌সবাসিগণ অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ কর্তৃক পুনরায় দাসত্বপাশে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলে তিনি মর্মান্তিক আহত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া মিঃ বাকিংহামকে পত্র দিয়াছিলেন এবং স্পেনের স্বেচ্ছাচার হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তির সংবাদে উৎফুল্ল হইয়াই স্বভবনে বন্ধুগণকে আমন্ত্রণ করিয়া ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ফরাসী বিপ্লব হইতেই সমগ্র পৃথিবী রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ উপলব্ধি করিয়াছে। ইংলণ্ডে যাইবার পথে রামমোহন যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপটাউনে যান তখন দুইটি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতাসূচক

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিচে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

S. 258A-X52 BG

নূতন তিন রঙের নিশান উড়িতেছে দেখিয়া নিজের ভগ্নপদের কথা চিন্তা না করিয়া সেই জাহাজগুলিতে গিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করেন। মৃত্যু হওয়ায় ইংলণ্ড হইতে ভারতে ফিরিবার অবকাশ পান নাই বলিয়াই ভারতবাসীকে জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করিবার অবকাশ পান নাই; কিন্তু তাঁহার সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে বেদান্তের ভিত্তিতে ধর্ম-প্রচারের চেষ্টা দ্বারা তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মধারার ইঙ্গিত পাই। ফ্রান্সের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লিখিত পত্রে এক স্থানে দেখা যায়:

"It is now generally admitted that not religion only but unbiassed common sense as well as the accurate deductions of scientific reasarch lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are various branches."

ইহা হইতে তাঁহার রাষ্ট্রচিন্তায় বেদান্তের প্রভাব ধরা পড়ে। আধুনিক যুগে সোভিয়েট-রাশিয়া-বিঘোষিত "শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থান (peaceful co-existence) নীতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক বিবাদ শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার নীতিও উল্লিখিত পত্রে দৃষ্ট হয়:

"The ends of constitutional government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a congress composed of an equal number from the parliaments of each, the decision of the majority to be acquised in both nations and the chairman to be chosen by each Nation alternately for one year and the place of metting to be one year within the limits of one Country and next within those of the other."

ইহাও যে রাষ্ট্রচিন্তা এবং মানবাত্মার পবিত্রতা-জ্ঞানপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেদান্তধর্মে বিশ্বাসী পরবর্তী দুই জন হইতেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দ। সর্বধর্মসমন্বয়কারী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য স্বামীজী বেদান্তের উপর কোনও গ্রন্থ না লিখিলেও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া —"ভারতের দরিদ্র চণ্ডাল মুচি মেথর আমার ভাই" প্রভৃতি উক্তি এবং তন্মূলে জনসেবার আদর্শ ও বাংলার যৌবনশক্তির উদ্বোধন নবভারতকে আজিও প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দিতেছে। তাঁহার বিশ্বাসে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলেও ব্রাহ্মসমাজের মহান পৃষ্ঠপোষক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "Vedantic Doctrines Vindicated" গ্রন্থ রচনা ছাড়াও রাজনৈতিক চিন্তায় পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। তাঁহার "আত্মজীবনী"তে (পৃ. ১০৭) পাই:

"যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিভিন্ন ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে। তার পূর্বেকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে।"

ভারতের পরবর্তী জাতীয়তা-চিন্তার ইতিহাস যে কতকাংশে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন উক্ত দর্শন ও জাতীয় ভাবধারায় নূতন কিছু দান না করিলেও তাঁহার নগরকীর্তন গানে—

নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাতবিচার॥"—

উভয়েরই উন্মাদনা পাই। কিন্তু এই দর্শন ও ভাবের প্রকৃত কর্মময় রূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনেই পরিগ্রহ হইয়াছিল। তাঁহার রচিত "প্রতিজ্ঞাপত্র"টির অনুশীলন যে এখনও একান্ত আবশ্যক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, এই মহাত্মা তাঁহার ১৮৮৮ সনের ১০ই ডিসেম্বরের ডায়েরীতে (সম্ভবতঃ এস. এস. রোহিলা নামক জাহাজে বসিয়া লিখিত) যে "কম্যুনিজম"-এর কল্পনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে ঐ সুপরিচিত কথাটি অধিকাংশ মানবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করিলেও সেই প্রাচীন সময়ে তিনি ভিন্ন অন্য কোনও ভারতবাসী এই শব্দটির সহিত পরিচিত ছিলেন না। ইহা নিশ্চয়ই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ও বেদান্তের জ্ঞান হইতেই আসিয়াছিল।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর সমসাময়িক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ অত্যন্ত সুপরিচিত না হইলেও তিনি তাঁহার "বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস" ও "রাজনীতি" গ্রন্থদ্বয় এবং যতিজীবন স্বীকৃতি সত্ত্বেও রাজনৈতিক বন্দীজীবন যাপন দ্বারা বেদান্ত ও জাতীয়তার সমন্বয় দেখাইয়া গিয়াছেন। এই দুই মনীষী যখন স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া অন্যান্য স্বাধীনতা চিন্তার সহিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য দল গঠন ও নির্যাতন ভোগ করিতেছিলেন, তখন রাশিয়ায় বলশেভিক নবেম্বর বিপ্লব সংঘটিত হইয়া পৃথিবীর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়াছে। আচার্য শিবনাথের উগ্র জাতীয়তা সমাজ-সংস্কারের কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল কিন্তু স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের উগ্র জাতীয়তা বিপ্লবী রাজনৈতিক ধারায় প্রবাহিত হয়।

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শাস্ত্রবাক্য-মূলীভূত 'বেদান্তদর্শন যে ভারতবাসীকে আন্তর্জাতীয়তারও নূতন প্রেরণা দিতে পারে তাহা এই স্নায়ুযুদ্ধের যুগে ভারতবাসী উপলব্ধি না করিলে মানবসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহা বুঝা একান্ত আবশ্যক। বিজ্ঞানের সুউচ্চ বিকাশ সত্ত্বেও আমরা ভারতবাসী আজিও যে দশ বা চতুর্ভুজযুক্ত, সিংহ, হংস, মূষিক প্রভৃতি প্রাণী আরোহণকারী ভাববিলাসসৃষ্ট অদ্ভুত দেবদেবীর পূজা করিতেছি তাহা নিবারণের জন্যও এই দর্শনের অন্তর্নিহিত অর্থ দেশবাসীর অনুধাবন করা কর্তব্য। রামমোহন, শিবনাথ প্রভৃতি জাতীয়তার ভাবধারকগণের আরব্ধ কর্মের সার্বজনীনতা উপলব্ধির জন্য ও ব্রহ্মসূত্রের নূতন ভাষ্য রচনা এবং তাহার প্রচার জন্য সমাজ-ধর্মমন্দির বা মঠগুলির সংহতিকরণ প্রচেষ্টার আবশ্যকতা আসিয়াছে।

বহ্নিকে পতঙ্গ

শ্রীমায়া বসু (রাহা)

হে মৃত্যুরূপিণী প্রলয়ঙ্করী বহ্নিশিখা—
আজ আমার স্বল্পায়ু জীবনের শেষ লগ্নক্ষণে
রেখে যাই আমার শেষ প্রণতি !
রেখে যাই তোমার মৃত্যুবেদীতলে,
রূপমুগ্ধ দগ্ধপক্ষ মৃত্যুমুখ পতঙ্গের
শেষ নিবেদন ।
আজ আমার ক্ষণজীবনের শেষ রাত্রি
প্রত্যুষের শুকতারা আমার জীবনে—
আর কখনও মিলিয়ে যাবে না রক্তিম সূর্য্যোদয়ে !
শস্যশ্যামলা প্রান্তর ভূমি হতে
গৃহপ্রত্যাগত শব্দায়মান পশুপালের শেষ ঘণ্টাধ্বনি,
আর কোনদিনও বাজবে না আমার শ্রবণে ।
সুগন্ধশ্বাস ঊষার বাতাস
আমার জীবনে আর কোনদিনো বয়ে আনবে না—
সোনালী ফসলের স্বপ্নভরা মদির সুবাস !
সূর্য্যকরোজ্জ্বল দীপ্ত দীর্ঘ দিবসের
কোনখানেই পড়বে না আমার ক্ষুদ্র পক্ষচ্ছায়াখানি ।
গোধূলী সন্ধ্যার শেষ সূর্য্যাস্তের
বিচিত্ররূপিণী বর্ণালী মায়ায়
মুগ্ধ আতুর হয়ে উঠবে না আমার
এ দুটি মৃত্যুহিমাচ্ছন্ন নয়ন ।
আর কিছুক্ষণ !
তারপর !
মৃত্যুর মোহানায় উত্তীর্ণ আমার শীর্ণ শুষ্ক জীবনধারা
অবলুপ্ত হবে তোমার অগ্নিসাগরে ।
—হে রূপসী অগ্নিশিখা
তোমাকে ভালবেসেছি, আমি মুগ্ধ পতঙ্গ
পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে,
শেষ হয়ে আসছে আমার সীমিত আয়ুর প্রহর !
আমার পূজার শেষ নৈবেদ্য
এইবার সমর্পণ করব তোমাকে ।
হে মায়ারূপিণী যাদুকরী,
তোমার প্রচণ্ড ভয়াল রূপে আমাকে আকর্ষিত করেছ
উদ্বেলিত—চূর্ণবিচূর্ণ করেছ আমার হৃদয় ।
মৃত্যুশীতল পাণ্ডুর অধর হতে,
নিঃশেষ করে করে পান করেছ
আমার জীবনের যৌবনের শেষ পানপাত্রখানি ।
আমার সমস্ত আকাশ পৃথিবী আচ্ছন্ন করে আছ তুমি
তোমার প্রদীপ্ত জলন্ত রূপশিখায় !

তোমার রূপবন্যায় ভেসে গেছে আমার
ইহকাল পরকাল !
তোমার ক্ষণিকের জ্বালাময়ী অগ্নিস্পর্শে
পুড়ে গেছে আমার দুই পাখা ।
মুক্তিহীন শক্তিহীন অক্ষম প্রয়াস দিয়ে
তবু তোমাকেই আলিঙ্গন করতে চেয়েছি ।
মৃত্যুদায়িনী হে সূর্যকন্যা—
হে ক্ষণিকের লীলাসঙ্গিনী ।
শেষ কর শেষ কর তোমার নিষ্ঠুর লীলাবিলাস !
নিষ্পেষিত কর আমাকে তোমার শেষ আলিঙ্গনে ।
আমার সমস্ত হৃদয় থরথর করে কাঁপছে
তরঙ্গে টলমল রক্তকমলের মত
সেই পরম লগ্নের প্রতীক্ষায় ।
দুই চোখ ভরে তোমাকে দেখে
শেষ বন্দনা করে যাই তোমাকে
আমার শেষ কণ্ঠোচ্চারিত বাণীমন্ত্রে !
তারপর—
তারপর তোমার অগ্নি আলিঙ্গনে নিজেকে আহুতি দেবার
শেষ মুহূর্ত্তে,
দিয়ে যাই তোমাকে আমার বুভুক্ষিত অতৃপ্ত হৃদয়ের
চরম অভিশাপ !
শত পতঙ্গের প্রাণহারিকা হে নিষ্ঠুরা বহ্নিশিখা,
সবাই তোমাকে ভালবাসবে ;
চিরদিন চিররাত্রি তাদের কামনার ইন্ধনে
কামনা-উদ্বেলিত বাসনা-চঞ্চল হবে তুমি !
কিন্তু পাবে না কাউকে ।
পারবে না কাউকে ভালবাসতে ।
দগ্ধ প্রান্তরের ভস্মীভূত চিতাগ্নির মত
চিরদিন তুমি রবে নিঃসঙ্গ একাকী ।
কামনা জর্জ্জর আকণ্ঠ তৃষ্ণা বয়ে বেড়াবে
তোমার অপরূপ রূপময় বক্ষে !
কোনদিন মিটবে না তোমার অতৃপ্ত ক্ষুধা ।
তোমাকে ভালবেসে তোমার রূপাগ্নিতে
ভস্মীভূত হ'ল যে পতঙ্গ,
তারি নির্ম্মম অভিশাপে
তোমার সমস্ত আকাশ কালো হয়ে উঠবে ।
কোনদিন মুক্তি পাবে না তুমি
নিয়তির মত অব্যর্থ এ অভিশাপ হতে ।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীবাণী বসু

"প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলাম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলাম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগলভ স্তব্ধতায়,—আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলাম—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

—রবীন্দ্রনাথ

কবিগুরু যাঁকে এমন করে প্রণাম জানিয়েছেন, রোমাঁ রোলাঁ যাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে নতি জানিয়েছেন তিনিই ভারতপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত্ত বিগ্রহ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও সাধনার প্রতীক এই মহামানব শুধু বাংলায় বা ভারতে নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের ভাবলোকে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মানুষ যখন রাজনৈতিক আঘাত-সংঘাতে বিধ্বস্ত, বস্তুবাদের পীড়নে জর্জ্জরিত তখন শ্রীঅরবিন্দ মানুষকে জানিয়েছেন নতুন জীবনের বাণী, নতুন জগতের কথা। দীর্ঘকালের তন্দ্রাচ্ছন্ন জাতিকে তিনি ডমরুধ্বনি করে উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রাণধারণের কঠিনতম সংগ্রামে লিপ্ত সংশয়ভীরু জাতির সামনে নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর আদর্শ ধরে তিনি কম্বুকণ্ঠে প্রচার করেছেন সেই বেদান্তের বাণী—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার দিশা সাধারণ স্বল্পজ্ঞানী লোক না পেলেও এর ভেতর একটা মহা কিছু নিশ্চয়ই আছে যাকে জগতের মহামনীষীরা একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে অবিসম্বাদী প্রত্যয় জানিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম জীবন তাঁকে চিনিয়েছে আমাদের কাছে যোগীর রূপে, আত্মসমাহিত ঋষির রূপে। বস্তুবাদমত্ত রাজনৈতিক সংগ্রামই যে মানুষের মুক্তির পথ নয় একথা তিনি বার বার পৃথিবীর সব মানুষের উদ্দেশ্যে বলেছেন। তিনি ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করেছেন। এই সাধনালব্ধ জ্ঞান দিয়েই তিনি মানবলোকে শান্তির বাণী প্রচার করেছেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে তাঁকে আমরা দেখেছি দেশ-কর্ম্মীর রূপে, রাজনৈতিক নেতার রূপে। ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যশস্বী ছাত্র গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জার্ম্মান ও ইংরেজী ভাষার অপরাজেয় স্কলার, আই-সি-এস পরীক্ষোত্তীর্ণ অরবিন্দ, বরোদার রাজশিক্ষক অরবিন্দ একদিন বরোদা ত্যাগ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করে বাংলায় এলেন। জাতীয়তাবোধে প্রখরভাবে দীপ্যমান ঋষি রাজনারায়ণ বসুর বংশগত স্বাজাত্যবোধে তেজোদীপ্ত তরুণ বাংলার স্বদেশীযুগে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। বঙ্গ-রাজনীতির প্রচণ্ড ঝড়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রক্তক্ষরা সে যুগ। তিনি আনলেন নতুন সুর—সুরু করলেন বাংলার জাতীয় ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। বিলাতে লালিত-পালিত-বর্দ্ধিত ডাঃ কে. ডি. ঘোষের পুত্র অরবিন্দকে আমরা দেখলাম স্বদেশপ্রেমের ঋষি জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্গাতা এক প্রাণবান নেতারূপে। সমস্ত জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্যে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলেন। স্বদেশী যুগে রাজনীতির ভেতর তিনি আনলেন নতুন যুগ আর নতুন সুর। শুষ্ক মরানদীতে বান ডাকার মত অভূতপূর্ব্ব প্রাণচাঞ্চল্য এনে দিলেন তিনি বাংলার যুবসমাজের মধ্যে। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে যে কাজ করেছিলেন তা বাংলার জাতীয় ইতিহাস কখনও বিস্মৃত হবে না। শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, শৌর্য্য, মনুষ্যত্বে তিনি জাগ্রত করে তুলেছিলেন সমস্ত জাতিকে। তাঁর সহকর্ম্মী ছিলেন বাগ্মী বিপিনচন্দ্র। দেশবন্ধু ও হীরেন্দ্রনাথ সাহায্য করেছিলেন তাঁকে সংগঠনে। বিজয় চাটুজ্জে, রজত রায় ও শ্যামসুন্দর সাহায্য করেছিলেন সাংবাদিকতায়, বন্দেমাতরম্ কাগজের তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁর অমর লেখনীতে যে ওজস্বিতা ও স্বদেশাত্মার বিপ্লবী বাণীরূপ মূর্ত্ত হয়ে উঠে তা দেখে একমাত্র মুক্তিমন্ত্রের চারণরূপে শ্রীঅরবিন্দকে কল্পনা করা যায়। আমাদের নবজাগ্রত জাতীয় মন্ত্রের ঋষি যেন তিনি! এর পর ১৯০৮ সনে বিখ্যাত আলিপুর বোমা মামলায় রাজবিদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারী রূপে তিনি কারাবরণ করেন। আলিপুর বোমা মামলা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আদালতে সাক্ষী না দিয়ে বিপিনচন্দ্র এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ঐকান্তিক চেষ্টায় নিরপরাধ প্রমাণিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি লাভ করলেন। অভিযুক্ত শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে ১৯০৯ সনে বিচারক মিঃ বীচক্রফটকে উদ্দেশ্য করে দেশবন্ধু এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—

'আপনাদের কাছে আমার আবেদন এই যে, এই বিরোধ থেমে যাবার বহু দিন পরে—এই বিক্ষোভ আর আলোড়ন থেমে যাবার বহু দিন পরে—তাঁর মৃত্যুর বহু দিন পরে, তাঁকে লোকে মনে রাখবে—মনে রাখবে স্বদেশপ্রেমের কবিরূপে, জাতীয়তার উদ্গাতারূপে, তাঁর মৃত্যুর বহু বহু দিন পরে তাঁর বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে—শুধু ভারতে নয়, দূর সমুদ্রপারে দূর দেশান্তরে। তাই বলি, তাঁর মত ব্যক্তি শুধু এই বিচারসভার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নেই—তিনি দাঁড়িয়েছেন এসে ইতিহাসের বিচারসভার সম্মুখে।'

এর পর তাঁকে আমরা দেখি সুদূর ফরাসী শহর পণ্ডিচেরীতে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তিনি আসেন। সেখানে তিনি গড়ে তুললেন বিশ্বমানবের পরম তীর্থ পণ্ডিচেরী আশ্রম। এখানেই আমরা দেখি জাতীয় আন্দোলনের মহানেতার এক অধ্যায়ের অবসান—আর এক অধ্যায়ের সূচনা—অধ্যাত্ম সাধনার সুরু। 'সত্যদ্রষ্টা শ্রীঅরবিন্দের আর এক নূতন রূপ—আজিকার ঋষি শ্রীঅবিন্দের জীবনদর্শন ও সাধনা সম্পর্কে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন—'শ্রীঅরবিন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রতিভার পরিপূর্ণ সমন্বয়ের প্রতীক। নূতন জ্ঞান, নূতন শক্তি ও নূতন কর্ম্মসাধনায় প্রগতি-শীল। মানব সভ্যতার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী। উনবিংশ শতাব্দীর জড়বিজ্ঞানের নূতন আবিক্রিয়া যে বিপ্লব সাধন করিয়াছিল, এই জ্ঞানও মানব-জীবনে সেইরূপ বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করিবে। প্রতীচ্যের যাঁহারা প্রাচ্যকে শান্ত, স্থিত ও কর্ম্মপ্রেরণাহীন রূপে এত-কাল চিত্রিত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিবেন যে, ভারতবর্ষ শীঘ্রই কর্ম্মক্ষমতা ও প্রাণশক্তিতে আমাদের অতিক্রম করিয়া যাইবে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও ঘোষ—এর সাধনা যদি তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্ত ধ্যানশান্ত আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া রাখে, তাহা অগ্রগমনের পূর্ব্বে প্রস্তুতিক্ষেত্র মাত্র। মহান ঋষিকুলের শেষ প্রতীক যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি অক্লান্ত নিষ্ঠার দৃঢ় মুষ্টিতে সৃষ্টি প্রেরণার জ্যা ধারণা করিয়া আছেন।"

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ। সত্যিকারের স্থিতধী, বিংশ শতাব্দীর বেদের নূতন ব্যাখ্যাতা, যোগের নূতন পথদ্রষ্টা। তিনি তাঁর সকল শক্তি, সকল জ্ঞানের সমষ্টি নিয়ে আমাদের নব-জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করে অবশেষে নবমানবতার পথ দেখিয়ে তাঁর কর্ম্মজীবন শেষ করলেন।

তিনি যোগে রত ছিলেন এই পৃথিবীর মানুষকে অমরার মানুষে পরিণত করার শক্তি অর্জ্জনের জন্ত। মানুষকে তিনি দেবতায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তিনি দিব্যজীবনের সাধক। রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তাই শ্রীঅরবিন্দের ভাস্বর পরিচয়।…"প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলাম—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। কথা বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলাম, তারি মধ্যে মনে হ'ল তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত, কোন খর-দস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব্ব করেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেন নি, আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলাম—আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে শৃণ্বন্তু বিশ্বে।"

তাঁর জন্মদিন ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-দিবস হবে এ তিনি আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। গত মহাযুদ্ধে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করবার জন্ত ভারতবাসীকে তিনি আহ্বান করেছিলেন এবং ফ্যাসীবাদের পরাজয় হবেও বলে-ছিলেন। তিনি অতুলনীয় ইংরেজী কাব্যের লেখক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিকতার মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। 'The Human Cycle, Life Divine, প্রভৃতি 'গীতাভাষ্য' প্রভৃতি বাংলার অপূর্ব্ব জাতীয় সম্পদ। শ্রীঅরবিন্দ বৎসরে চারবার আশ্রমের বাইরে এসে জনসাধারণকে দর্শনদান করতেন। তাঁর শিষ্যা মাদাম মীরা রিশার এখনও শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—ভক্তদের "শ্রীমা"।

শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞানজ্যোতির স্পর্শে আমাদের প্রকৃতি রূপান্তরিত হউক দিব্য চেতনায়, সব কিছুই জেগে উঠুক আত্ম-সত্যের আলোয়, তাঁর ক্লান্তিহীন কর্ম্ম, সংগ্রাম, দুঃখবরণ, অপরিসীম সহিষ্ণুতা, আমাদের জন্ত তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অনির্ব্বাণ দীপ্তি আমাদের স্মরণ-লোককে আলোকিত করুক্।

শিশুশিক্ষার নবরূপায়ণ

শ্রীচারুশীলা বোলার

১৩৬৪ সালের "প্রবাসী"তে ধারাবাহিক ভাবে শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনাকালে একথা উল্লেখ করেছি যে, গৃহে পিতামাতা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকশিক্ষিকার দায়িত্ব প্রায় সমান। উভয়কেই শিশু সম্বন্ধে কতকগুলি দৈনিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

আমরা যখন আমাদের বিদ্যালয়ের শিশু-ছাত্রদের বাড়ীতে মায়েদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে যাই তখন শিশু সম্বন্ধে মায়েদের কত নালিশ, কত অভিযোগ শোনা যায়। বাবলাকে(৪) নিয়ে তার মা অতিষ্ঠ—"কি করি দিদিমণি বলুন ত? দিনরাত রোদে ঘুরবে, ঐ লাট্ট আর ঘুড়ি! নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠেছে। কথা মোটে শোনে না", ইত্যাদি। ঠাকুরমা তার আদরের নাতি সমীরের(৫) গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, "কারও কথা মানে না মা, মনোমত কিছু না হলেই মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। ওর মা যা করতে বারণ করে ও তাই-ই করবে।" সীতুকে(৩) রোজই দেখা যায় বাড়ীর বারান্দায় গড়াগড়ি দিয়ে তীব্র চীৎকার—জিদ আর কান্নায় পাড়া ফাটাতে। মা যতই আদর করেন, গায়ে হাত বুলিয়ে ওঠাবার চেষ্টা করেন, সীতুর স্বর ততই আরও সপ্তমে চড়ে। অবশেষে না পেরে দুটো বড় রকমের চড় কসিয়ে মা চলে যান।

শিশু-বিদ্যালয়েও শিশুদের মধ্যে কান্নাকাটি, চীৎকার, রাগ, হিংসা, ভয় দেখা যায়। কিন্তু শিশুবিদ্যায় শিক্ষিতা শিক্ষিকারা জানেন যে, এগুলো সবই হচ্ছে তাদের ভিতরের প্রক্ষোভ (emotion)-এর একটা স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। বয়স যাই হোক, বুদ্ধি যতই থাকুক, অন্তরের অবরুদ্ধ ভাবাবেগ তাদের ব্যবহারকে অনবরত প্রভাবিত করছে। আমাদের বয়স্কদের বেলাতেই দেখি, বুদ্ধি অনেক সময় এক রকম কাজ করতে বলে কিন্তু আমাদের আবেগের ঢেউ অন্য দিকে তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পরে দেখি কত বড় ভুল হয়ে গেছে, কত বড় মূর্খের মত কাজ করে ফেলেছি।

শিশুর বেলাতেও বুঝতে হবে, যখন সে বেয়াড়াপনা করছে, তখন নিশ্চয়ই তার ন্যায়সঙ্গত দাবী যা চাহিদা, যে কোন কারণেই হোক উপেক্ষিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যেমন ঐ যে বাবলা এত মার, এত শাস্তি পাওয়া সত্ত্বেও কেন বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে রোদে ঘোরে? শিশু অবাধ্যতা করে কেন? বাড়ীতে বা বিদ্যালয়ে নিশ্চয়ই তার চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। হয়ত খেলার সঙ্গী তার মনের মত হয় নি বা উপযুক্ত উপকরণ সে পায় না। মা-বাবার ভালবাসার নিরাপত্তার উপর হয়ত নির্ভর করতে পারছে না। সুতরাং পিতামাতার নিষেধ, মারধর, শাস্তি সম্বন্ধে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

বহু পিতামাতা শিশুর এই মেজাজ, স্বেচ্ছাচারিতা, 'ঘ্যান ঘ্যান—প্যান প্যান' করা সম্বন্ধে অসহায় বোধ করেন, কি করবেন কিছুই বুঝতে পারেন না। শিশু যদি বড়দের কাছে তার অভাব-অভিযোগ জানাতে পারত তা হলে সমস্যা এত বেশী জটিল হয়ে উঠত না। তাই সে আপত্তি জানায় কেঁদে, হাত-পা ছুঁড়ে, চীৎকার করে।

নিতান্ত শিশুকাল থেকেই শিশুর প্রক্ষোভঘটিত আচরণ প্রকাশ পায়। সে যখন মুখ বিকৃত করে, হাতের মুঠি শক্ত করে লাল হয়ে খুব চীৎকার করে কাঁদে, তখন আবিষ্কার করা শক্ত যে কি কারণে সে কাঁদছে—রাগ, ভয়, ব্যথা না খিদে। ঐ সময় তার অনুভূতি নির্বিশেষ (unspecialised) থাকে, ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অনুযায়ী ভঙ্গিমা প্রকাশ পায়। পাঁচ-ছ'মাস বয়স থেকেই শিশু ভয়, রাগ, বিরক্তি প্রকাশ করে। সাত-আট মাস বয়সে খুশী হয়ে নেচে ওঠে। এক বৎসরের শিশু বয়স্ক ব্যক্তি অথবা অন্যান্য শিশুদের প্রতি অনুরাগভঙ্গী প্রকাশ করে। আবার অন্য দিকে হিংসার ভাবও প্রকাশ পায়।

শিক্ষানবীশ ব্রাজ্ বলেন, প্রক্ষোভ আর কিছুই নয়—জীবনে চলার পথে 'বাধা'। বেশ সুন্দর ভাবে দিন কেটে যাচ্ছে, হঠাৎ এমন এক পরিস্থিতি দেখা দিল, মানুষ সেখানে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলে প্রক্ষোভের প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু না পারলেই জাগে। আমাদের সামনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। আমাদেরও ঐ উদ্দেশ্যের মধ্যে এক বাধা সৃষ্টি হয় যেটা আমাদের ইচ্ছাকে নিষ্ফল করে। প্রক্ষোভ এখানে দেখা দেয় এবং তার ফলে পূর্বের শান্ত-সুন্দর অবস্থার একটা পরিবর্তন দেখা যায়। মানসিক ও শারীরিক দু'দিক দিয়েই পরিবর্তন ঘটে। বাধা যে সব সময়েই ক্ষতিকর তা নয়।

মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্যে শিক্ষার মূল্য অনেক কিন্তু ভাবস্ফূর্তির সাম্যরক্ষা (emotional harmony) চর্চা করার জন্যেও শিক্ষার মূল্য অতুলনীয়। বয়স্ক ব্যক্তির

বেলাতেও দেখা গেছে,ভাবব্যঞ্জনায় অপরিণত (emotionally immature) হলে সব কাজে এগিয়ে যেতে পারে না, মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে না, অন্যের সুখদুঃখে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ হয়। আবার যাদের ভাবের আবেগ বা ঝোঁক খুব প্রবল, তারা হয় নিজের আক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ সংযত করতে পারে না, না হয় এত বেশী চেপে রাখে যে স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হতে বাধা পায়। হিংসা, ভীতি এগুলো তার ব্যক্তিত্বের সমতার অভাব সৃষ্টি করে। ফলে তীক্ষ্ণবুদ্ধিও শক্তিহীন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, স্বাস্থ্য খারাপ হয়। তার মানসিক অশান্তির কারণ হয় বিশ্বাসের অভাব, হিংসা, ব্যর্থতা ও অসহায়তা। এই ধরনের লোক সাধারণ জীবন থেকে দূরে চলে যায়, হীনতা বোধ করে। কোন কোন লোকের ক্ষেত্রে তা অপরাধপ্রবণতায় পরিবর্ত্তিত হয়। দৃঢ়চেতা মানুষের প্রক্ষোভঘটিত জীবন সর্ব্বদা প্রবল ও সুসংযত। এই সব কারণেই শৈশব অবস্থা থেকেই ভাবাবেগ, সংযম শিক্ষা বা স্থিতধী হবার শিক্ষার এত প্রয়োজন।

দুই বৎসর বয়স থেকেই শিশুর ভিতর আবেগজনিত কার্য্যকলাপ খুব বেশী প্রকাশ পায়। দেড় বৎসর থেকে চার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই সময় উপযুক্ত সাহায্য ও পরিচালনার বিশেষ দরকার; কারণ এ সময় অন্তরের ইচ্ছাকে তারা বাইরে পূর্ণ রূপ দেয়। স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় একগুঁয়েমি প্রকাশ পায়। পিতামাতার কর্ত্তব্য শিশুর প্রক্ষোভিক বিকাশগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা।

তিন-চার বৎসরে শিশুর ভিতর জিদ, চ্যাঁটামি, বড়দের কথা না মানা এগুলো দেখা যায়। এগুলো কিন্তু এ বয়সে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। শিশু, সমাজে যখন এই রকম ব্যবহার করে তখন মা বেশ বিব্রত হয়ে পড়েন। অথচ মা-ই এর জন্যে কতকাংশে দায়ী। হয়ত সে প্রথম সন্তান অথবা একমাত্র সন্তান, বা শিশু লালনপালন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অনেক মা শিশুর এই ব্যবহারের জন্যে মারধর করেন। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। শিশুর ভিতর তখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। একদিকে তার মায়ের উপর গভীর ভালবাসা অন্যদিকে স্বাধীন ও আত্মনির্ভর হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এর ফলে শিশু উদ্বিগ্ন হয়, ভয় পায়। তার ভয় হয় এই জন্যে যে, এই বুঝি মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হ'ল। নতুন ভাইবোন জন্মালেও শিশুর এই সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে, বহুদিন পর্য্যন্ত যদি সে একমাত্র সন্তান থেকে থাকে—হিংসা ভাবের উদ্রেক হয়। ছোট ভাই মিণ্টু জন্মাবার পর রুনুকে বলতে শুনেছি, "আমি হামাগুড়ি দিচ্ছি মা, আমাকে কোলে নাও।" যে শিশু বহুদিন পর্য্যন্ত বিছানা ভেজায় তার ভিতরও অনেক সমস্যা দেখা দেয়। খাওয়া নিয়ে গোলমাল করে, আধো আধো কথা বলে, অনেক সময় কথাই বলতে পারে না, অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে, মা বিব্রত হন। শিশু এতে অসুখী হয়। অসহায় হয়ে পড়ে। শিশু ও মায়ের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, একটু ছন্দভঙ্গ হলেই ভবিষ্যতে খুবই অনিষ্টকর ফল ফলে।

প্রক্ষোভ শিশুদের ভিতর আপনা থেকে দেখা দেয়। শিশুর অভিজ্ঞতা নেই যে, কিভাবে নিজেকে সংযত করলে সে নিজেকে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে। শিক্ষা (training) এ বিষয়ে তাকে খুব বেশী সাহায্য করতে পারে। শিক্ষা এটাকে দাবিয়ে দেয় না বা দূর করার চেষ্টা করে না; কিন্তু সবক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবহার করতে শেখায়। ভয় পেলে শিশু কাঁদে, পালিয়ে যায়। রাগ হলে হাতপা ছোঁড়ে, পা দাপায়, ঠেলা দেয়, মারে, জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেয়, মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। এর কোনটাই চরিত্র-গঠনের জন্যে উপযুক্ত নয়। তাকে শিখতে হবে, এ রকম অনুভূতিকে কিভাবে সংযত করতে হয়। কান্না-রোগ শিশুদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়, পড়ে গিয়ে কাঁদলেই তার অর্থ এ নয় যে, সে আঘাত পেয়েছে। সে হয় ত বিরক্ত হয়েছে, নিজের নিপুণতার অভাবে, নিজের হীনতার উপর বিরক্ত। এ ক্ষেত্রে শিক্ষিকা তাকে সাহায্য করবেন, কোলে তুলে নিয়ে 'আহা', 'উহু' বলে নয়, কিন্তু হেসে বলবেন, 'দেখি কত তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে উঠতে পার'। তাকে সাহস দিতে হবে—উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে হবে। তবে আঘাত পেলে বা মনের দিক থেকে ধাক্কা পেলে অন্য কথা। শিশুর গতিবিধির কৌশল শিক্ষা খুব প্রয়োজন।

আচরণ কখনও নির্দ্দিষ্ট মানে পরিমিত করা যায় না। শিশুর বয়স এবং মেজাজে খাপ খায় এমন ভাবে সাহায্য করতে হবে। যত দূর সম্ভব যে সব পরিস্থিতিতে বিরোধিতা ও বেপরোয়া ভাব শিশুর মধ্যে প্রকাশ পায় সেগুলি উপেক্ষা করা দরকার। তা না হলে শিশুর আত্মবিশ্বাস কমে যায়, জীবনীশক্তি নষ্ট হয়। শৃঙ্খলাবোধ জাগাতে হবে, তবে কড়াকড়ি করে নয়। অর্থাৎ সে যা চায়, তা যে সমাজ ও তার নিজের পক্ষে ক্ষতিকর বা ক্ষতিকর নয়, তা বুঝতে সুযোগ দিতে হবে।

শিশু তার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্যে সুযোগ-সুবিধা পেলে সর্বদাই যে বয়স্ক ব্যক্তির মনের মত কাজ করবে এমন না-ও হতে পারে। শিশুর যদি স্থির বিশ্বাস থাকে যে, বয়স্ক ব্যক্তি তাকে সাহায্য করার জন্যে, তার দেখা-শোনার

জন্যে, তার যত্নের জন্যে, অবাঞ্ছনীয় কাজ থেকে তাকে বাধা দেবার জন্যে সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকে তবেই সে খুশী হয়, নিশ্চিন্ত থাকে।

নার্সারী স্কুলে শিশুর জীবন, শিশুর প্রক্ষোভের দিক থেকে খুবই সাহায্য করে। বাড়ীতে দু'একজন লোকের পরিবর্ত্তে এখানে অন্য বহু সমবয়সী সঙ্গী ও বিভিন্ন বয়স্কজনের সংস্পর্শে আসে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাড়ীতে পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের ঠিক রাখতে পারেন না, কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারা পারেন। এর অর্থ এই নয় যে, মায়ের চেয়ে শিক্ষিকার বুদ্ধি অনেক বেশী—অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা হয় ত বেশী। কিছুটা হচ্ছে শিশু স্কুলে এসে শিক্ষিকাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি রূপে পাচ্ছে। মায়ের উপর জন্মাবধি সে নির্ভরশীল, কিন্তু শিক্ষিকার সঙ্গে সে রকম কোনও বন্ধন নেই তার। শিক্ষিকার এই একটিমাত্র কাজ—শিশুর প্রতি সর্ব্বতোভাবে যত্ন নেওয়া, কিন্তু মাকে অন্যান্য নানা রকম কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। শিক্ষিকার পক্ষে শান্তচিত্তে ও ধৈর্য্যসহকারে শিশুকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেতে সুযোগ দেওয়া সম্ভবপর, যা মায়ের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়।

মায়ের চেয়ে শিক্ষিকাকে কম ভালবাসলেও শিশু এত বেশী 'নেওটা' হয় যে, তার কাছ থেকেও স্নেহ-ভালবাসা দাবী করে। সুশিক্ষিকা অবশ্য শিশুর সেই দাবী সানন্দেই পূরণ করেন। শিশুদের নিজেদের ভিতরেও স্নেহ-ভালবাসা জন্মায়। তারা পরস্পরের হাঁত ধরে, গলা জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়, এক সঙ্গে কাছে বসে খেলা করে, অনেক ভাবে জানায় তারা একজন অন্য জনকে পছন্দ করে। অনেক শিশু আছে শিক্ষিকার গা ঘেঁসে বসতে ভালবাসে, গলা জড়িয়ে ধরে। শিক্ষিকা অবশ্যই সেই সব স্নেহ-ব্যঞ্জনায় সাড়া দেবেন, কিন্তু তাঁকে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকতে হবে, যেন অন্য শিশুরা তাঁর সকলের প্রতি সমান আদর ও নিরপেক্ষতার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে। কতকগুলি সামাজিক পরিস্থিতির জন্যে শিশুর ভিতর নানারকম বিক্ষোভ দেখা দেয়—হিংসা, বিরোধিতা, একগুঁয়েমী, মেজাজ। সমাজে বাস করতে হলে পরস্পরের জন্যে চিন্তা করতে হবে, অন্যের ভালমন্দ দেখতে হবে। এই জন্যেই নার্সারী স্কুলের এত প্রয়োজন। ধীরে ধীরে হলেও শিশুর শিক্ষা এইখানেই আরম্ভ। কথায় নয় কিন্তু ক্রিয়াকলাপ দ্বারা শিশু নিজেকে প্রকাশ করে। এই ভাবে সকল শিশুই তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে, ঝগড়া-বিবাদ হয়। কিন্তু ক্রমশঃ সে নিজের অভিজ্ঞতা, অনুভূতির ভিতর দিয়ে অন্যের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করলে খুশী ও আনন্দে থাকবে শিক্ষা করতে থাকে।

শিশু যেন সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন হয়ে চলাফেরা করতে পারে, নার্সারী স্কুল সেই রকমই একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই জন্যেই এখানকার আসবাবপত্র, উপকরণ শিশু-জগতের উপযুক্ত করা হয়—নীচু জলের কল, ছোট ছোট বাসনপত্র, ছোট ছোট আসন, মাদুর ইত্যাদি ; যাতে শিশু সব কাজে কৃতকার্য্য হয়—বিরক্ত বা বিব্রত না হয়। এতে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়, আত্মবিশ্বাস জন্মায়, হীনতা বোধ থাকে না।

১৩৬৪ সালের মাঘ মাসের "প্রবাসী"তে আলোচনা করেছি যে, কাল্পনিক খেলা এ বয়সের একটা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনের পক্ষে অর্থপূর্ণ ক্রীড়া, প্রক্ষোভের একটা বড় নির্গমপথের ভিতর দিয়ে শিশু নিরাপত্তা বোধ করে এবং জীবনের যে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে তার বাধে না। তার অভিজ্ঞতা জন্মায় ও বহু আকাঙ্ক্ষা সে খেলার ভিতর দিয়ে অভিনয়ের আকারে প্রকাশ করে। পুতুলকে বকে, তুলোর ভরা কুকুরগুলোকে মারে—এই ভাবে সে মুক্ত হয়। তার প্রতি যেভাবে ব্যবহার করা হয় অথবা তার মনে যে সকল ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেইগুলিই তার কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়ে পূর্ণ করে। কখনও বা তার পছন্দ ও অপছন্দের ভাবও খেলার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে। প্রক্ষোভের উত্তেজনা দূরীকরণের জন্যে এমন উপকরণ চাই যে, শিশু যা খুশী তাই করতে পারে, ভাঙলেও নষ্ট হবে না।

নার্সারী স্কুলে প্রায়ই দেখা যায়, শিশু কিছু করতে বা বলতে প্রচণ্ড ভাবে বাধা দেয়, রেগে যায় এবং যতক্ষণ তার মেজাজ বিগড়ে থাকে শিক্ষিকার তরফ থেকে ততক্ষণ তাকে না ঘাঁটানোই বুদ্ধিমানের কাজ। শৃঙ্খলাবোধ কখনও জোর করে শেখানো উচিত নয়। এতে শিক্ষিকা ও শিশুর ভিতর একটা বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ শিশুর 'বেগড়ানো মেজাজ' শান্ত না হয়, ততক্ষণ তাকে ঘাঁটাতে নেই। সে যেন তার নিজের ভুল বুঝতে পারে, শিক্ষিকা সেই চেষ্টা করবেন।

শিশু যেভাবেই বায়না করুক না, যত প্রচণ্ড ভাবেই তা প্রকাশ করুক না কেন, শিক্ষিকা বা অভিভাবক যদি একবার তার অন্যায় আবদারের প্রচণ্ডতায় বা দৃঢ়তায় বিব্রত বা করুণাদুর্ব্বল হয়ে তার আবদার বা বায়না রক্ষা করেন তবে নিশ্চয় জানবেন যে, ভবিষ্যৎ জীবনে, অবাধ্য, একগুঁয়ে, স্বেচ্ছাচারী, বেয়ারা হয়ে ওঠার জন্যে ঐ সামান্য (?) প্রথম-আস্কারাদানই প্রধানতঃ দায়ী। নিজেদের অস্বস্তি এবং সাময়িক হাঙ্গামা থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে শিশুর সমগ্র ও সামগ্রিক ভবিষ্যৎ জীবন যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে নিজেদের গা বাঁচাবার চেষ্টাতেই ঐ কুকীর্ত্তি তাঁরা করে গেলেন। ভবিষ্যতের চোখের জলের মধ্যে দিয়ে একথা যেন তাঁরা স্মরণ করেন।

দেশ-বিদেশের কথা

পাশ্চাত্ত্যে বাঙালী সাহিত্যিকের সম্মান

জাইষ্ট উণ্ড জাইট (Zeist Und Zeit) জার্ম্মানীর একখানি উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্র। ইহার নিয়মিত লেখকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক। সম্প্রতি এই পত্র প্রথম স্থান দিয়া শ্রীদেবেশ দাসের একটি ছোট গল্প প্রকাশ করিয়াছে। গল্পটির নাম, 'রোম থেকে রমনা'। এই সংখ্যায় যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গত বৎসরের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক জুয়ান জিমেনেজ, 'কোয়াইট ফ্লো-স দি ডনে'র রচয়িতা মাইকেল শোলোকফ এবং অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন লেখক রহিয়াছেন। লেখক-পরিচিতিতে সম্পাদক বলিতেছেন, "গল্প-রচয়িতা একজন ভারতবর্ষীয় প্রখ্যাত লেখক। তিনি নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি, সাহিত্য-আকাডেমীর সদস্য এবং ভারত-সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'ইউরোপা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসা লাভ করে। যে সব প্রতীচ্য পাঠক ভারতবর্ষের জীবনধারা, সামাজিক প্রথা এবং আচার-আচরণের সহিত মোটেই পরিচিত নয়, লেখকের লেখার গুণে তাহাদের পক্ষেও গল্পটির রসগ্রহণে বাধা লাগিবে না। 'গত মহাযুদ্ধের পর রোমের দুর্দ্দশা এবং ভারত-বিভাগের পর উদ্বাস্তদের অবস্থা একান্ত নৈপুণ্যে একই গল্পের সূত্রে বিজড়িত করিয়া লেখক যে করুন সহানুভূতিসঞ্জাত রসেরসৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অন্য প্রকারে সম্ভব হইত না।" গত যুদ্ধের বাস্তব পটভূমিকায় লেখা শ্রীদেবেশ দাসের উপন্যাস "রক্তরাগে"র জার্ম্মান অনুবাদও এক বিশিষ্ট জার্ম্মান প্রকাশক প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্মরণীয়—সুশীল রায়। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, '৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা ৩৮৪। মূল্য আট টাকা।

গ্রন্থারম্ভে আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির এই উক্তিটি স্মরণীয়—"জীবিত মানুষের জীবনী লিখিয়া আপনি বাংলা সাহিত্যে নূতন দিক আবিষ্কার করিলেন।" বাস্তবিক পুস্তকখানির ইহা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থকার ১৯৫৩-৫৪ সনে গ্রন্থলিখিত প্রায় সকল মনীষী ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জীবন ও কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব তথ্য-কাহিনী তাঁহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহাই তিনি সংক্ষেপে মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকে বাংলার তেত্রিশ জন মনীষীর জীবন-কথা চিত্র সহযোগে আলোচিত হইয়াছে। এই মনীষীদের ভিতরে আছেন সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, দার্শনিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ১৮৫৯ সনে। সুপণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ হইয়াছে গত জানুয়ারী মাসে। ১৮৫৯-১৯৫৯ এই দীর্ঘ একশত বৎসরের ভিতরে ঐ সকল মনীষীর অধিকাংশেরই আয়ুষ্কাল। সুতরাং একশতাব্দী যাবৎ বাঙালী শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস চর্চ্চায়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের গবেষণায়, চারুশিল্প ও কারুশিল্পের অনুশীলনে, প্রাচীন বিদ্যা সংস্কৃত সাহিত্যের সাধনায় কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাহার পরিমাপ করা যাইবে।

পুস্তকখানির আলোচ্য জীবন-কাহিনীগুলির অধিকাংশ প্রথমে সংবাদপত্রে এবং পরে খণ্ডশঃ পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। এই পত্রিকায় তাহার পরিচিতি প্রদানের সুযোগও আমার ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়াছে। গ্রন্থকার যে সব মনীষীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকে এখন আর ইহজগতে নাই, কাজেই তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে শুনিয়া ও জানিয়া যাহা কিছু আমাদিগকে লিখিত ভাবে উপহার দিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে ঐ কারণে। এ জন্যও তিনি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে পাঠকও যেন গ্রন্থকারের সঙ্গে কঙ্করময় পথে ধুলাবালির মধ্য দিয়া বাঁকুড়ায় আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের গৃহে উপনীত হইয়াছেন অথবা সন্ধ্যার অন্ধকারে আঁকাবাঁকা অলিগলির ভিতর দিয়া নবতিতম বয়স্ক পণ্ডিতাগ্রগণ্যের নবদ্বীপস্থ বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিতেছেন। মনীষীদের খোঁজে কলিকাতার নিভৃত নিরালা গৃহাঙ্গনেও যেন আমরা প্রবেশ করিতেছি। লেখকের বর্ণনা-কৌশলে এক একটি জীবন সরস এবং প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আচার্য্য যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে আমরাও বলি তিনি এরূপ জীবনী গ্রন্থ লিখিয়া বাংলা সাহিত্যের একটি নূতন দিক খুলিয়া দিলেন।' প্রত্যেক মনীষীর এক একখানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। চিত্রগুলি একই স্থলে সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানির সৌষ্ঠবও বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতির পিতৃঋণ পরিশোধের এই অভিনব উপায়টিকে আমরা সাধুবাদ করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা—শ্রীকুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত। গ্রন্থগৃহ, ৪৫এ, গড়পার রোড, কলিকাতা—৯। দাম চার টাকা।

বহুদিন পূর্ব্বে কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা'। আজ কিন্তু সে কথা বলা চলে না। বাংলার এই রসের ধারাটি প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছে। হাসি এখন দুর্ল্লভ, অধিকাংশ লেখকই অশ্রুর উপাসক হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় শ্রীকুমারেশ ঘোষ হাস্য-রসাত্মক কবিতার এই সঙ্কলন বাঙালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়া ভালই করিয়াছেন। এমন একখানি সঙ্কলনগ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। 'শ্রেষ্ঠ' ব্যঙ্গ-কবিতার 'শ্রেষ্ঠ' কথাটির বিশেষ কোন অর্থ নাই। এ কথা সম্পাদকও জানেন। ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন, "বিজ্ঞাপনের যুগে এ কথাটি বহু ব্যাপারেই অপরিহার্য্য। এই 'শ্রেষ্ঠ' তিলকটি কোন-কিছুর কপালে এটে না দিলে বাজারে তার মানের পরিমাণ অনেকটা কমে যায়।" সমকালীন বলিতে তিনি রবীন্দ্রোত্তর কবিদের রচনা বুঝাইয়াছেন। রঙ্গ ও ব্যঙ্গের মধ্যে প্রভেদ আছে। ব্যক্তি নহিলে ব্যঙ্গ হয় না, কিন্তু শুধু ঘটনা আশ্রয় করিয়াও রঙ্গরচনা চলে। অতএব রঙ্গরসাত্মক কবিতামাত্রকেই ব্যঙ্গ-কবিতা বলিলে অর্থের কিছু অসঙ্গতি হয়। গ্রন্থে পঁচানব্বই জন কবির পঁচানব্বইটি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। অতিগম্ভীর বর্ত্তমান বাংলায় যে এতগুলি হাসির কবিতা পাওয়া যায়, এ বড় কম কথা নয়। গ্রন্থে নবীন-প্রবীণের সম্মিলন ঘটিয়াছে। এখানে পরশুরাম হইতে আরম্ভ করিয়া বনফুল, অবধূত পর্য্যন্ত অনেকেরই সাক্ষাৎ মিলিবে। সঙ্কলন 'গোষ্ঠীগত ব্যাপার' হয় নাই, 'আমাদের কথা'য় সম্পাদক বলিতেছেন, "আমরা সঙ্কীর্ণতার পথ অসঙ্কোচে পরিহার করবার চেষ্টা করেছি সর্ব্বতোভাবে।" সুপরিচিত এবং অপরিচিত, খ্যাতনামা এবং খ্যাতনামা নয় এমন অনেক কবিই এখানে সমবেত হইয়া হাসির দীপালি জ্বালিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথম কবিতা পরশুরামের 'ঘাস'।।

এই দেখুন না, হরিণ গো মহিষ ছাগ
সেয়েক ঘাস খেয়েই কেমন পরিপুষ্ট,
আবার তাদেরই গোস্ত খেয়ে বাঘ
কেমন তাগড়াই কেঁদো আর সন্তুষ্ট।

অর্থাৎ আরও বেশী ঘাস খান প্রতিদিন,
কারণ, ঘাসেই পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বলাধান,
দেবার ক্যালরি, প্রোটিন ও ভাইটামিন,
ঘাসেই হবে অন্নসমস্যার সমাধান।

এ-ধরনের সঙ্কলন বাংলায় প্রথম প্রচেষ্টা বলিতে পারা যায়। এ চেষ্টা বহুলাংশে-পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। পরিশিষ্টে একটি কবি-পরিচিতি আছে। অনেকগুলি ব্যঙ্গ-কবিতাই উপভোগ্য। সঙ্কলন-বৈচিত্র্যে পাঠক আনন্দলাভ করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। রামকৃষ্ণ মিশন সিষ্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল। ৫, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ভগিনী নিবেদিতার জীবন-কাহিনী। নিবেদিতার কর্ম্মময় জীবন ভারতীয় আদর্শে গঠিত। এই সম্বন্ধে লেখিকা একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—"জীবনী অপেক্ষা জীবন অনেক মহত্তর। জীবনের সম্পূর্ণ কাহিনী জীবনী-রচনায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে, তেমনই অসম্ভব যুক্তি ও ব্যাখ্যা দ্বারা এক মহৎ জীবনের কার্য্যাবলীর অনুধাবনের প্রচেষ্টা। যে জীবন মহৎ, অসাধারণ তাহা মৃত্যুর সহিত নিঃশেষ হইয়া যায় না। দ্রুত, সর্ব্ববিধ্বংসী কালের প্রভাবকে উপেক্ষা করিয়া তাহার শাশ্বত ভাব-ধারা ভাবী যুগের প্রেরণা বক্ষে লইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। ভগিনী নিবেদিতার মধ্য দিয়া যে দৈবী-শক্তির এক বিশেষ প্রকাশ ঘটিয়াছিল, ভারতের জাতীয় জীবনের নব জাগরণের প্রতি পদক্ষেপে তাহার পরিচয় পাই। শিক্ষায়, সেবায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, রাজনীতিতে তাঁহার অবদান ভারত-ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।"

নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা। শিল্পী যেমন করিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া মূর্ত্তি গড়ে, স্বামীজি ঠিক তেমনি করিয়া নিবেদিতাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কি কঠোর তপস্যা আমরা নিবেদিতার জীবনে দেখিতে পাই—সেই সাধনা ছিল বলিয়াই এবং ঐকান্তিকভাবে নিজেকে সমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি উত্তর জীবনে নিবেদিতা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"মানুষের সত্যরূপ, চিৎরূপ যে কি, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে।"

স্বামী বিবেকানন্দ নিজের মুক্তি চাহেন নাই—তিনি চাহিয়া-ছিলেন দেশের মুক্তি, জাতির মুক্তি। 'দেশের এই ঘোর অবনতির জন্য দায়ী ধর্ম্ম নয়, পরন্তু ধর্ম্মের নামে প্রচলিত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও কুসংস্কার। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মসংস্থাপনের উপরেই নির্ভর করিতেছে ভারতের জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণ।' এই মন্ত্র লইয়াই তিনি আজীবন কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। মানস-কন্যা নিবেদিতাকেও তিনি ঠিক অনুরূপ ছাঁচে ঢালিয়াছিলেন। কর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া নিবেদিতার মধ্যে দেখিতে পাই আমরা এক সেবাপরায়ণা জগজ্জননীকে। কিন্তু তেজ ছিল তাঁহার অসাধারণ—যেন আগুন। কিন্তু স্বাধীনচেতা হইয়াও তিনি আপন সত্তাকে পর্য্যন্ত গুরুপদে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এইভাবে সমর্পণ করাই ত যোগের আসল বস্তু। কর্ম্মের সঙ্গে ভক্তির সমন্বয় তাঁহার এই কারণেই হইয়াছিল। নিবেদিতার অধ্যবসায়ও ছিল যেমন অসাধারণ স্বামীজির যত্নেরও তেমনি তুলনা হয় না। এই মমতাই নিবেদিতাকে গুরুর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে।

নিবেদিতার জীবন-কাহিনী লেখা অতি দুরূহ সাধনা। কারণ তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার বিষয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া থাকে। সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রাণবন্ত করা ঐ ভাবের ভাবুক না হইলে কখনই সম্ভব নয়। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার হাতে তাই ঠিক সুরটি বাজিয়াছে। যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলাম। নিবেদিতার জীবনের দ্বন্দ্ব এমন খুঁটিয়া খুঁটিয়া পরিবেশন করিবার কারিগরী তাঁহার রচনায় দেখা গেল। অপর হাতে পড়িলে ঠিক এই রূপটি ফুটিত না। এমন একখানি সুন্দর জীবনী গ্রন্থ উপহার দেওয়ায় তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীগৌতম সেন

সেতু-বন্ধন—শ্রীগৌতম সেন। কলিকাতা পুস্তকালয় প্রাঃ লিঃ, ৩নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২·০০ টাকা মাত্র।

অতীত দিনের বাংলার একটি সমাজ-চিত্র এই উপন্যাসের বিষয়-বস্তু। 'লাঠি যার—মাটি তার' প্রবাদবাক্যটি ভূস্বামী-অধ্যুষিত বাংলায় এককালে প্রবাদবাক্য মাত্র ছিল না—ক্ষমতার দাপটে দু'টি প্রতিপক্ষ দলের ছিল মূলমন্ত্র। ইহাতে অনর্থপাতও হইত এবং কয়েক পুরুষ ধরিয়া চলিত বৈরিসাধনের জের। এই সব ক্ষেত্রে মান-সম্মানের প্রশ্নটা ছিল জীবন-মরণের সমস্যা। ক্ষমতার অপ-প্রয়োগে সমাজ-জীবন পঙ্কিল এবং পারিবারিক সুখশান্তি বিষাক্ত হইয়া উঠিত। ইংরেজ শাসনের অন্তিম যুগে এবং স্বাধীন ভারতে জমিদারী প্রতাপের আগুন ম্লান হইতে হইতে নিবিয়া গিয়াছে—কাজেই দু'টি বংশের বিরোধ-কাহিনী এখন ইতিহাসের বিষয়। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক অতীত ইতিহাসের সেই পৃষ্ঠা খুলিয়া ধরিয়াছেন। তিন পুরুষ ধরিয়া জীয়াইয়া-রাখা কলহের জের টানিয়া চলিয়াছে দু'টি পরিবার, তাহাদের মধ্যে দু'টি তরুণ তরুণীর মনে জ্বলিয়াছে প্রেমের প্রদীপ। সেবার সার্থকতায় তাহারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, কিন্তু স্বপ্ন সফল হইবার মুখে আসিয়াছে প্রচণ্ড বাধা। বাধা উত্তরণের প্রয়াসে অনেক চরিত্র আর অনেক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন লেখক। 'গল্পের গতিটা দ্রুত। দু' একটি চরিত্র ও ঘটনা আকস্মিক ভাবে আসিয়াছে মনে হয় কিন্তু গল্পের রস তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত গল্পটির সম্ভাব্য পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন লেখক। বর্ত্তমান যুগের কোন সমস্যাকে

কেন্দ্র না করিয়াও গল্পের রস যে জমানো যায়—তাহা খ্যাতিমান কথা সাহিত্যিক প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্যবিজয় বা নামমহিমা—শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য। সারস্বতমন্দির; ১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীচৈতন্য ও ভক্ত হরিদাসের জীবন-কথা অবলম্বনে রচিত নাটক। স্ত্রীভূমিকাহীন, সুতরাং সহজে অভিনয়যোগ্য। চৈতন্য-দেবের অধ্যাত্মবল কাহিনীর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অবস্থার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। সাহিত্যিক নৈপুণ্য অপেক্ষা এখানে বিষয়মাহাত্ম্যই বড়। মহা-জীবনের আদর্শ পাঠক ও দর্শকদের অনুপ্রাণিত করবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফিলিপাইনে কৃষিসংস্কার—অনালভিন এইচ, স্ক্যাক। পার্ল পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই—১। মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা, পৃষ্ঠা ১১৬।

অনুবাদগ্রন্থ। মূল পুস্তকের নাম The Philipine Answer to Communism। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযোগেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায়। এই অনুবাদ পুস্তকের মূল ইংরেজী নাম হইতেই জানা যায় কি উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি লিখিত। ফিলিপাইন দেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সনে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে। পূর্ব্ব-এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত এই দ্বীপপুঞ্জও জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। জাপানী অধিকারের পরে সে দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয় তাহা হইতে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যেরূপ এখানেও সেইভাবেই কম্যুনিজম প্রসার লাভ করে, বলপ্রয়োগ এবং আদর্শবাদের অপ-প্রচারের সাহায্যে। কিরূপে মার্কিন সামরিক শক্তি ও অর্থ এবং তাহাদের অনুগত ফিলিপাইনবাসী এই অবস্থা হইতে দেশকে উদ্ধার করিল পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবি, সুতরাং জমির মালিকানার সংস্কার, কৃষির উন্নতি, শিল্পের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যই সাম্য-বাদিগণের বিদ্রোহ সফল হইতে পারে নাই।

এই পুস্তকের নূতন উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে নানা তথ্য বর্ত্তমান ভারতের উদ্বাস্তু-সমস্যা সমাধানের নানাপ্রকার চিন্তার খোরাক জোগাইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কথা দাও—অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ জগৎ, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

'কথা দাও' বইখানি গানের, লেখক শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের আসরে অপরিচিত নন। এর অনেক গানই রেডিওতে এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া হয়েছে। আধুনিক গানের সুর সম্বন্ধে কিছু বলবার যোগ্যতা আমার নাই, কিন্তু কথা সম্বন্ধে আমার একটা মত আছে এবং এই মতের সমর্থন পাচ্ছি কবি ও সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের লেখা এই বইয়ের ভূমিকায়। প্রেমেন বাবু লিখেছেন, 'আধুনিক ছায়াছবির কল্যাণে সুর ও কথার মিতালি প্রায় ভেঙে যেতে বসেছে। সুরের দাসত্ব করতে গিয়ে কথা তার অর্থ হারিয়ে প্রলাপে গিয়ে পৌঁছেচে।' এমন সত্যকথা এতখানি জোর দিয়ে এর আগে বলা হয়েছে কিনা জানি না। নট খোঁড়া হলে নৃত্যের যে হাস্যকর পরিণতি হয় আধুনিক গানেরও হয়েছে তাই। যে কথার উপর ভর দিয়ে আত্ম-বিকাশ করবে সেই কথাই তার পঙ্গু। এই অরাজকতার আসরে যে দু' চারজন কবি গানের সুষ্ঠু কথা দান করতে পেরেছেন শ্রীঅমিয়-জীবন মুখোপাধ্যায় তাদের মধ্যে একজন। তাঁর সুন্দর কথাকে আশ্রয় করে গান যে সুন্দরতর হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অমিয়বাবুর রচিত গান সুর যোজনা না করে কবিতা হিসেবে পড়লেও খুব উপভোগ্য হবে। ভাল কবিতার সব গুণই এতে বিদ্যমান। তবে, এই বইয়ের প্রায় সব গানই প্রেমের এবং সুর বিরহের। বিরহের সুর, ব্যথার সুর মানুষকে বেশী আকৃষ্ট করে তাই অমিয়বাবু বোধ হয় অশ্রুর মর্য্যাদা বেশী দিয়েছেন।

বইয়ের প্রচ্ছদপটটিও সুন্দর হয়েছে। আশা করি গায়ক ও পাঠক মহলে বইখানির আদর হবে।

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

বৃষ্টি যদি আসে—সমীর চৌধুরী, চারু সাহিত্য প্রকাশনী ৬৮, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা ৪, ১৩৬৫, পৃষ্ঠা ৫৬, মূল্য দুই টাকা।

'নতুনের সন্ধানে' পত্রিকায় যখন প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে সমীর চৌধুরীর কবিতা পড়ি তখনই কবির সমাজচেতনা ও কবিত্বশক্তির সমন্বয় লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাহার অল্পদিন পরেই সমীর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া দক্ষিণ ভারতের এক স্বাস্থ্যনিবাসে চলিয়া যান। বর্ত্তমান কবিতা সঙ্কলনে কবির পরবর্ত্তী কবিতাগুলি দেখিয়া কবিকে প্রথম দেখার সময় যে ধারণা জন্মিয়াছিল তাহারই পরিপূর্ণ রূপ দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত ও গর্ব্বিত হইলাম। কবিতা-গুলির গুণ সম্পর্কে বর্ত্তমান বাংলার অন্যতম কবি শ্রীসুভাষ মুখো-পাধ্যায় পুস্তকের ভূমিকায় যাহা বলিয়াছেন আমি তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি।

'রোগশয্যায় মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে লেখা। অথচ কোন কবিতার কোথাও আক্ষেপ কিংবা কাতরোক্তি নেই। মুখ আগাগোড়া জীবনেরই দিকে ফেরান। আত্মসমর্পণ নেই, আছে নিরন্তর সংগ্রামস্পৃহা। দেশ ও কালের তীব্র উপস্থিতিবোধ।'

'বৃষ্টি যদি আসে' আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন।

শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৮শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৬৫

৬ষ্ঠ সংখ্যা
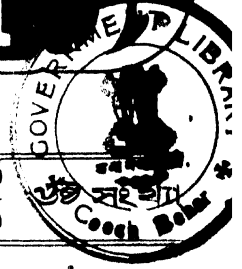
বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতের ছাত্রসমাজ

কিছুদিন যাবৎ ভারতের ছাত্রসমাজে যে মনোবিকার দেখা যাইতেছে তাহা এ দেশের ও এই ভারতের জাতিসমষ্টির পক্ষে অতি অশুভ লক্ষণ। যাহারা ভবিষ্যতের আশাবর্ত্তিকা-বাহক তাহাদের মধ্যে যদি বিনয় ও শিষ্টাচার লুপ্ত হয় তবে এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্রবৃত্তি ও যথেচ্ছাচারে আসক্তি যাহাদের, তাহারা হয়ত সংখ্যায় অল্প অন্ততঃ আমরা আশা করি তাহারা সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, তাহাদের হস্তে সমস্ত ছাত্রসমাজ চালনার অধিকার ক্রমেই আসিয়া যাইতেছে। ইহা অতি অশুভ লক্ষণ এবং ইহার প্রতিকার সত্বর ও সবল হস্তে হওয়া প্রয়োজন। না হইলে মুষ্টিমেয় বিকার-গ্রস্ত ও উদ্ধত তরুণের অত্যাচারে সমস্ত দেশের যুবক ও যুবতীর শিক্ষা-দীক্ষা দূষিত হইয়া যাইবে।

সম্প্রতি কলিকাতায় আই-এসসির কেমিষ্ট্রির দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষায় মধ্য ও উত্তর কলিকাতায় নিরীহ ছাত্রছাত্রী ও পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ-কারীদের উপর দিয়া যে অত্যাচার ও হাঙ্গামা হইয়াছে তাহাকে কোন কোন সংবাদপত্রে "ছাত্রবিক্ষোভ" বলা হইয়াছে। এবং একথার আভাসও দেওয়া হইয়াছে যে, প্রশ্নপত্র অতি জটিল ও পাঠ্যের বহির্ভূত ছিল।

আমরা নিজে ও অন্য নানা লোকের মারফৎ সবিশেষ খোঁজ লইয়া যাহা বুঝিলাম তাহাতে প্রশ্নপত্রের সম্পর্কে অভিযোগ দুইটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। যাহারা পাঠ্য পুস্তক পড়িয়াছে এবং শিক্ষকের নিকট লেকচার বুঝিয়া লইয়াছে এরূপ সকল ছাত্রছাত্রীই ঐ প্রশ্ন-পত্রের ভাল ভাবে উত্তর দিতে পারিত। পারিত না তাহারা, যাহারা লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়া, নোট হইতে "সম্ভাব্য" প্রশ্নের কিছু মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় চালাকীর জয় দেখাইতে গিয়াছিল। ইহাদের আশায় ছাই পড়ার ফলে এই হাঙ্গামার সৃষ্টি। সুতরাং এই গোলমালকে যদি "বিক্ষোভ" বলা হয় তবে গুণ্ডামি বলিব কাহাকে?

হাঙ্গামার ব্যাপারে পুলিসের কার্য্যক্রমও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। একটি মেয়েদের কেন্দ্রে প্রথম ছোট একদল হাঙ্গামাকারী পুলিসের টহলদারীদের সামনে পড়ে। পুলিস তাহাদের হটাইয়া মাত্র দুইজন কনষ্টেবল রাখিয়া চলিয়া যায় এবং বোধ হয় লালবাজারেও কিছু জানায় নাই। নহিলে পরের দল লোহার গেট ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়া কাঁচের দরজা ভাঙিয়া পরীক্ষার খাতা-পত্র ছিঁড়িয়া চেয়ার-টেবিল ভাঙিয়া পলাইবার পর পুলিসবাহিনী পৌঁছাইত না।

সংস্কৃত কলেজের ব্যাপার আরও গুরুতর। সেখানে যাহারা হাঙ্গামা করে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি মনুষ্যশাবক অধ্যক্ষ শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রীর ন্যায় অমায়িক সজ্জনকে লোহার ডাণ্ডা দিয়া জখম করার চেষ্টা করে। স্থানীয় ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নিজেরা প্রহৃত হইয়াও তাঁহাকে বাঁচান। পুলিস আসে অনেক পরে।

প্রশ্ন এই যে প্রতিকার কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন তবে এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই যে, অপরাধ প্রমাণিত হইলে গুরু-দণ্ড হওয়া প্রয়োজন। নহিলে এই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান কোন মতেই হইবে না। দুর্বিনীত দুরাচারী যে, তাহাকে 'বাপ বাছা' বলা বৃথা। ইংলণ্ডে অল্পবয়স্ক "কৃষ্ণাঙ্গদলনকারী" দুরাচার-দিগকে যে ভাবে সুমতি দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

এরূপ ছাত্রদের অভিভাবকদিগেরও বলিহারী দিতে হয়। এরূপ কীর্ত্তিকলাপ যাহারা নির্ভয়ে করে তাহাদের উপরে কি কেহই নাই? এই সঙ্গে এ প্রশ্নও করা প্রয়োজন যে, "সম্ভাব্য প্রশ্ন" ইত্যাদির তালিকা পুস্তক কি "রেসটিপ" জাতীয় জুয়াখেলা সহায়ক পুস্তক নহে? আমাদের আজব দেশের আইনে যাই বলুক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত জানাইয়া দেওয়া যে, উহা জুয়ারই নাম-ফেরতার সামিল।

কানপুরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা আরও উদ্বেগের কারণ। সেখানে দলবদ্ধভাবে গুণ্ডামী করিয়াছে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের দল এবং পাল্টা জবাব দিয়াছে পুলিসের দল। এ ত মাৎস্যন্যায়ের আরম্ভ। শাসনতন্ত্রের অধিকারিবর্গের ঘুম ভাঙিবে কবে?

কেন্দ্রীয় বাজেটে নূতন করধার্য্য

আগামী বৎসরের নূতন বাজেটে যদিও চমকপ্রদ নূতন কোনও প্রকার কর ধার্য্য করা হয় নাই তথাপি আভ্যন্তরিক সম্পদ সৃষ্টির পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সম্পদসৃষ্টির জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহা হইতেছে ঘাটতি ব্যয়-ব্যবস্থা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে মূলধনের যোগানের অধিকাংশ পরিমাণই ঘাটতি ব্যয় দ্বারা পূরণ করা হইবে, যদিও অতিরিক্ত ঘাটতি ব্যয়ের কুফল সম্বন্ধে বহু বিশেষজ্ঞ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। নূতন বাজেটে প্রস্তাবিত নূতন কর হইতে প্রায় ২৬ কোটি টাকা আয় হইবে। রাজস্ব-খাতে মোট ৮১৬৭ কোটি টাকা ঘাটতি হওয়ার কথা এবং নূতন করধার্য্য দ্বারা ইহার মাত্র এক-চতুর্থাংশ পূরণ করা হইবে। বাকী টাকার জন্য ঘাটতি ব্যয় করা হইবে এবং নূতন করের আয় ধরিয়াও মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ২২২ কোটি টাকায়।

নূতন বাজেটে পরোক্ষ-করের দ্বারাই অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের অধিকাংশ পরিমাণ আসিবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমান কর-ব্যবস্থাকে অধিকতর সরল করার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া অর্থমন্ত্রী দাবী করিতেছেন। কোম্পানীগুলির উপর হইতে সম্পদ-কর এবং অতিরিক্ত লভ্যাংশ-কর তুলিয়া লওয়া হইবে। কোম্পানী-গুলির উপর সম্পদ করের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি উঠিয়াছিল, কারণ যে সকল যৌথসংস্থান কোনও লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহা-দের পক্ষেও ইহা প্রদেয় ছিল, যদিও যে সকল নূতন কোম্পানী কোনওপ্রকার লাভ করিতে পারিতেছে না, তাহাদের এই কর দিতে হইত না।

ব্যক্তিগত করের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্পদ-কর ও ব্যয়-করের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত এবং অবিভক্ত হিন্দুপরিবারের ক্ষেত্রে সম্পদ-করের হার অর্দ্ধ শতাংশ হিসাবে বৃদ্ধি করা হইবে। ব্যয়-করের হার যদিও অপরিবর্ত্তিত আছে তথাপি কতকগুলি সুবিধা ইহার আওতার বহির্ভূত করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে যে নিম্নতম ছাড় দেওয়া হয়, তাহাতে মধ্যবিত্ত আয়কারী ব্যক্তিরাই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমানে জীবনযাত্রার খরচা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সেই তুলনায় মধ্যবিত্ত আয়কারীদের আয় প্রায় স্থিরীকৃত আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি সর্ব্বক্ষেত্রে মূল্যমানবৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বহুপ্রকার পরোক্ষ-কর প্রভৃতির ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনযাত্রা দিন দিন দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। জনসংখ্যার ইহারা প্রায় ৪০ শতাংশ এবং ইহাদের সমবেত সমৃদ্ধির উপর জাতীয় সমৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত আয়করের ছাড়ের পরিমাণ অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা হওয়া উচিত। অর্থমন্ত্রীর বাজেট প্রস্তাবে ইহাদের বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই, পরন্তু নূতন কর প্রস্তাবের ফলে ইহাদের জীবনযাত্রার মান আরও বৃদ্ধি পাইতেছে, যেমন সরিষার তৈলের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে।

সেই তুলনায় দেখা যায় যে, জোতদার এবং বৃহৎ চাষীরা শহরের অধিকাংশ মধ্যবিত্তদের চেয়ে বদ্ধিষ্ণু। মূল্যমান বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জোতদারদের কোন আয়কর দিতে হয় না। ভারতীয় জাতীয় আয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ আসে কৃষিজাত উৎপন্ন হইতে, কিন্তু কৃষি আয়ের উপর কোনও প্রত্যক্ষকর নাই। ভারতীয় ব্যক্তিগত আয়করকে ব্যাপকতর করা উচিত এবং ইহার জন্য প্রয়োজন কৃষি-আয়ের উপর আয়কর বসান।

ভারতীয় ব্যক্তিগত আয়করের অতিরিক্ত হারের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাঁকি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্যালডরের অভিমত এই যে, আয়করের সর্ব্বোচ্চ হার ৪৫ শতাংশের অধিক হওয়া উচিত নহে, বর্ত্তমানে সর্ব্বোচ্চ হার প্রায় ৯২ শতাংশ। আয়করের ফাঁকি প্রভৃতি বন্ধ করার জন্য ভারতীয় আয়কর-ব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ আয়কর, সম্পদকর, সম্পদ-মূল্যবৃদ্ধি-কর ব্যয়কর, এবং দানকরকে একত্রিত ব্যবস্থায় পরিণত করা উচিত এবং তাহাতে আয়করের সর্ব্বোচ্চ হার ৪৫ শতাংশ হইবে।

গত তিন বৎসর ধরিয়া ভারতীয় কর-ব্যবস্থাকে সংশোধন এবং পুনর্গঠন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। নূতন করধার্য্য দ্বারা দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। গত বৎসরে টাকার বাজার হইতে অধিকতর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ সম্ভবপর হইয়াছে। বিদেশী সাহায্যের পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তথাপি গত তিন বৎসরের বাজেটে মোট ৯৫০ কোটি টাকার মত ঘাটতি পড়িয়াছে অর্থাৎ এই পরিমাণ খরচ ঘাটতি-ব্যয় দ্বারা সম্পন্ন করা হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সনে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়াছিল এবং এই বিষয়ে গত বৎসরে বিশেষ কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। যদিও কেবলমাত্র বাজেট ঘাটতির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নিরূপিত হয় না, তথাপি ইহা মুদ্রাস্ফীতির অবস্থান সূচনা করে।

১৯৫৮-৫৯ সনে দানকর প্রচলিত হইয়াছে এবং সম্পদাশুল্কের নিম্নতম ছাড়ের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। গত বৎসরে এবং বর্ত্তমানে বহু নূতন উৎপাদন শুল্ক এবং রপ্তানী শুল্ক আরোপ করা হইয়াছে। গত তিন বৎসরে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় খরচও বেশী হইতেছে, ফলে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে না। ১৯৫৬-৫৭ সনে জাতীয় আয়ের ৯ শতাংশ ছিল রাজস্ব আয় এবং গত বৎসর ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১০ শতাংশে। কিন্তু বেসামরিক শাসনতান্ত্রিক ব্যয়ের পরিমাণ ৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ অনুৎপাদকশীল ব্যয়, ফলে জাতীয় ব্যয় ও উৎপাদনের মধ্যে একটি বিরাট ফাঁক বর্ত্তমান থাকিয়া যাইতেছে এবং সেই কারণে মূল্যমান তথা জীবনযাত্রার ব্যয়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

সমবায় প্রথার প্রতিবন্ধকতা

নাগপুর কংগ্রেস ভারতের ভূমি-সংস্কার বিষয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ

করিয়াছে তাহা লইয়া তীব্র সমালোচনা সুরু হইয়াছে। নাগপুর প্রস্তাবে দুইটি প্রধান বিষয় আছে—মাথাপিছু জমির পরিমাণের সীমানা নির্দ্ধারণ এবং এই হিসাব অনুসারে অতিরিক্ত জমির পুনর্বণ্টন। জমির পুনর্বণ্টন অবশ্য হইবে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে, এবং সমন্বয়-প্রথার ভিত্তিতে চাষ-আবাদ সুরু হইবে। আপত্তি উঠিয়াছে সমবায়প্রথার চাষের বিরুদ্ধে, আপত্তির অবশ্য সঠিক কারণ প্রতিপক্ষরা কিছু দিতে পারিতেছেন না; তাঁহাদের বক্তব্য যে ইহাতে চাষীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা নাকি লোপ পাইবে। কিন্তু আপত্তির আসল কারণ হইতেছে যে, ইহাতে বড় বড় জোতদারদের স্বার্থহানি হইবে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে আপত্তি আসিতেছে প্রধানতঃ তাঁহাদেরই নিকট হইতে যাঁহারা শহরে বাস করেন এবং যাঁহাদের সহিত চাষের সম্পর্ক কিছু নাই বলিলেও চলে।

ভারতে অর্থনৈতিক স্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠা করা অতি অবশ্যপ্রয়োজনীয় তাহা না হইলে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। অর্থনৈতিক স্থৈর্য্যের অবশ্যম্ভাবী ভিত্তি হইতেছে কৃষি-উৎপাদনে স্বাবলম্বী হওয়া এবং তাহার জন্য প্রয়োজন ভূমি-সংস্কার। মোগল যুগের পর হইতে ভারতে কোনওপ্রকার ভূমিপ্রথার সংস্কার সাধিত হয় নাই বলিলেই চলে এবং ইংরেজ আমলে যাহা হইয়াছে তাহা জোড়াতালির নামান্তর মাত্র। সুতরাং বর্ত্তমানের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োজন দুইশত বৎসরের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রয়োজন হইতে বিভিন্ন হইতে বাধ্য। ভূমিপ্রথারসংস্কার সাধন করিতে না পারিলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতের পক্ষে স্বাবলম্বী হওয়া সুদূরপরাহত। ভারতের অর্থনীতি অত্যধিক জনসংখ্যার জন্য বিব্রত এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বাবলম্বিতাই একমাত্র ভারসাম্য রক্ষা করিবে। যেখানে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল, সেখানে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে দেশের পক্ষে সমূহ বিপদ দেখা দিবে।

ভারতের মোট ৩৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা হইতেছে ২৫ কোটি। এখানে সর্ব্বভারতীয় হিসাব অনুসারে গড়পড়তা মাথাপিছু জমির পরিমাণ ২·২৫ একর (প্রায় ৬ বিঘা) এবং বাংলাদেশে ইহার পরিমাণ মাত্র আড়াই বিঘা। কৃষিজীবির মাথাপিছু গড়পড়তায় মাত্র ১.১৮ একর জমি চাষ-আবাদ হয় এবং এই অল্প পরিমাণ জমির চাষে প্রকৃতপক্ষে কোনও চাষীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। জমিগুলি একত্রিত করিয়া বৃহৎ আকারে চাষ করিলে গভীরতর কৃষি সম্ভবপর এবং তাহাতে জমির উৎপাদন-শীলতা বৃদ্ধি পাইবে। জাপান কিংবা মিশরের তুলনায় ভারতের জমির উৎপাদনশীলতা মাত্র এক-তৃতীয়াংশ।

সুতরাং ভারতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইলে জমিকে সমবায়-প্রথায় চাষ করা প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা নূতন কিছু নহে, ১৯৫০ সন হইতেই ভারতের বহু জায়গায় সমবায় ব্যবস্থায় চাষ-আবাদ সুরু হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের বহু স্থানে সমবায় কৃষিব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমবায় কৃষিব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে এই কারণে যে, কেবলমাত্র ইহার দ্বারাই জোতদারী প্রথার বিলোপ সাধন করা সম্ভবপর। ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩ শতাংশ ভূমিহীন চাষী ও কৃষি শ্রমিক এবং ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৮।৯ কোটি হইবে। ইহাদিগকে জমি দিতে হইলে জোতদারীপ্রথার বিলোপসাধন করিতে হইবে এবং জমিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণে পুনরায় বিতরণ করা প্রয়োজন। এই সকল স্বল্প এলাকার জমিতে ফসল বৃদ্ধি করিতে হইবে সমবায়-প্রথার দ্বারা ব্যাপকতর এবং গভীরতর চাষের প্রয়োজন। জোতদারীপ্রথা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিরোধী এবং ইহার বিলোপসাধন করিতে না পারিলে দেশের কৃষি সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না।

সমবায়-ব্যবস্থায় কৃষি ব্যবস্থার ফলে ফসলের সরবরাহ সহজ হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় জোতদার এবং বড় বড় চাষীরা খাদ্যশস্য বাজারে বিক্রয় না করিয়া মজুত করিয়া রাখিতেছে এবং সেই জন্য যদিও বর্ত্তমান বৎসরে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে (প্রায় ৩ কোটি টন) তথাপি বাজারে চাউলের অভাব দেখা যাইতেছে। ভারতে যে পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় ঠিক সেই পরিমাণে সরবরাহের সমতা রক্ষা করা হয় না, এবং সেই কারণে বাজারে অভাব সকল সময়ে পরিলক্ষিত হয়। চীনের জনসংখ্যাও অত্যধিক এবং তাহার অর্থনীতিও অনগ্রসর। চীন তাহার খাদ্যসমস্যার সমাধান করিয়াছে সমবায় কৃষিব্যবস্থার দ্বারা।

ভারতের সমবায় কৃষিব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে, কিন্তু চাষআবাদ যৌথভাবে করিতে হইবে। ইহাতে যাহারা প্রকৃত চাষী তাহাদের আপত্তির কারণ কিছু থাকিতে পারে না। আপত্তি করিবে তাহারাই যাহারা নিজে চাষ করিতে অপারগ কিংবা অনিচ্ছুক। গ্রাম্য-সম্প্রদায় উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সমবায় চাষ ব্যবস্থা যুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আর এমন বহু জমি আছে যাহাদের উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত অল্প এবং অনেক জমি আবার ব্যক্তিগত চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত। এই সকল ক্ষেত্রেও সমবায়-প্রথায় কৃষিব্যবস্থা প্রয়োজনীয়।

ভারতের বর্তমান সমবায় আইনে অনেক গলদ আছে, সেগুলির আশু সংশোধন প্রয়োজন। ভারতে যে ১,৩৩,০০০ ছোট ছোট সমবায় ঋণ-সমিতি আছে তাহাদের মধ্যে ৩০,০০০ সমিতি ক্ষতিতে পরিচালিত হইতেছে এবং অন্য ৪০,০০০ সমিতি তাহাদের সভ্যদের কোনওপ্রকার ঋণ দেয় নাই। ১৯৫৭ সন পর্য্যন্ত একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই প্রায় তিন হাজারের অধিক সমিতি বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং মাদ্রাজে বাতিল সমিতির সংখ্যা প্রায় ২,০০০। আবার দেখা যায় যে, সমবায় সমিতিগুলি আইনতঃ কার্য্যকরী থাকিলেও, সামাজিক ন্যায় ও সমবায় নীতি বজায় রাখে না। যেমন দেখা যায় যে, বহু সমবায় সমিতি কোম্পানী আইন অনুসারে রেজেষ্টারীকৃত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা না করিয়া সমবায় সমিতি আইন-অনুসারে রেজেষ্টারী হইয়াছে। এইরূপ সমিতি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য সমবায় উদ্দেশ্য সাধন করা নহে, উদ্দেশ্য এই যে কড়িয়া হিসাবে মাধ্যমিক মুনাফা লাভ করা। এই সকল অনাচার বন্ধ করিতে হইবে।

বর্তমান সঙ্কটে ফরাক্কা বাঁধের প্রয়োজনীয়তা

ফরাক্কা বাঁধ লইয়া আজও তর্ক-বিতর্কের অবসান হইল না! অথচ ইহার প্রয়োজনীয়তাকে কোন দিক দিয়াই অস্বীকার করা চলে না। কলিকাতাকে, বাংলাকে এবং দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের শিল্প-বাণিজ্যকে রক্ষা করিতে হইলে ফরাক্কা বাঁধ চাই এবং অবিলম্বে চাই—বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে এই দাবি ধ্বনিত হইয়াছে। দাবি নূতনও নয়, অসঙ্গতও নয়। এ দেশের যে অংশটুকুতে সব ক্ষয়ক্ষতি শেষে বাঙালী আজও তাহার সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য লইয়া কোন মতে টিকিয়া আছে—এবং যাহার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে সেই ভাগীরথীর আয়ুরেখা আজ সীমিত। যে পলি জমিয়া জমিয়া গঙ্গাকে আজ নিষ্প্রাণ করিল, তাহাকে না উঠাইলে এবং গঙ্গাকে স্রোতবলে পুষ্ট না করিতে পারিলে আজ বাঙালীর বাঁচিবার আশা নাই। নাগরিক এবং গ্রামীণ সভ্যতা দুই-ই লুপ্ত হইবে।

গঙ্গাকে আমরা পুণ্যসলিলা বলিয়াই জানি, কিন্তু সে ত শুধু পুণ্যসলিলাই নয়, পণ্যবাহিনীও। পুণ্যবল তাহার এখনও অটুট কিন্তু পণ্যবহনের ক্ষমতা ফুরাইয়া আসিল। আজ বিপুলা ভাগীরথী 'খাড়ি' মাত্র। তাহার অস্তিত্বই বিপন্ন।

গঙ্গার সঙ্গে কলিকাতার অস্তিত্বও আজ যাইতে বসিয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে এই নগরী আর মধ্যমণি নয় যদিও, কিন্তু তাহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব আজও বিপুল ও সর্ব্বোচ্চ। বহু বর্গমাইল ব্যাপী শিল্পাঞ্চল এই ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে। জগতের নানা দেশের জাহাজের ভিড় সেখানে। ভাগীরথীকে না বাঁচাইতে পারিলে ইহাও একদিন লুপ্ত হইয়া যাইবে। ভগীরথের কথা না তুলিয়াও বলা চলে, আবার পূর্ব্ব প্রবাহ ফিরাইয়া আনা খুব কঠিন কার্য্য নহে। যেখানে মূলধারা হইতে নদী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেখানে তাহার স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ফরাক্কা বাঁধের কল্পনা সেইজন্যই।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে কল্পনা আজও স্পষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট রূপ পায় নাই। প্রথমে কথাটা কেহ শুনিয়াও শোনে নাই, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও ইহার স্থান হইল না। দাবি যখন আরও উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে, তখন একটা প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ়তার আভাস পর্য্যন্ত নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কখনও সামর্থ্যের অভাবের কথা বলিতেছেন আবার কখনও বা প্রতিবেশী পাকিস্থানের দিকে কাতর নয়নে চাহিতেছেন। পাকিস্থান আপত্তি করিতে পারে—ইহা যেমনই হাস্যকর তেমনই বেদনাদায়ক। আত্মরক্ষার জন্যও অপরের অনুমতি চাই, এমন দুর্ব্বলতা আমাদের দেশেই সম্ভব?

লোকে অশুভ কাজে কালহরণ করে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার শুভ কাজেও করিতেছেন।

অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না করিতে পারিলে সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের শিল্প-ব্যবসায় বাণিজ্যের কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবে—এই সাবধানবাণী বেঙ্গল চেম্বারের সভাপতির সহিত আমরাও করিতেছি।

সেই সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে, এদেশের লোকে আজ মনে করিতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি ও অকল্যাণ যাহাদের কাম্য এরূপ নীচাশয় ব্যক্তিদের পরামর্শেই ফরাক্কা বাঁধের কথা চাপা দেওয়া হইতেছে। অন্য সবকিছু অজুহাত মাত্র। কলিকাতা বন্দর ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন যাহাতে নষ্ট হয় তাহার চেষ্টা নানাদিক হইতেই চলিতেছে একথা কিছু ভুল নহে। ভুল শুধু এই ধারণা যে, কলিকাতা বন্দর ও পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানার বিরাট সমাবেশ নষ্ট হইলেও ভারতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব হইবে।

গণতন্ত্রের পথে ভারত

১৯৫০-এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন হইতেই ইহা ভাল কি মন্দ এই প্রশ্ন সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। চল্লিশ কোটি মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষ। অসংখ্য জনের অসংখ্য সমস্যা যেখানে, সেখানে প্রশ্ন থাকিবেই, কিন্তু প্রশ্ন শুধু বর্ত্তমানের নয় ভবিষ্যতেরও।

আমরা কোন্ পথে চলিতেছি, আমাদের লক্ষ্য কি, সে লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় কি—এই বিবিধ প্রশ্নই মানুষকে আজ উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। এ জিজ্ঞাসা তাহাদের স্বতোৎসারিত। কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় নাই। জীবনই তাহাদের বড় শিক্ষাদাতা। এ প্রশ্ন অবশ্য শুধু ভারতের নয়, সারা পৃথিবীব্যাপী আজ সমাজ-কল্যাণের কর্ম্মপন্থা লইয়া আলোচনা চলিয়াছে। গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র—কোন্ তন্ত্রে রহিয়াছে মানুষের যথার্থ কল্যাণ।

এক পক্ষ বলিতেছে, ধনতন্ত্রই ব্যষ্টিক ও সামাজিক কল্যাণের শ্রেষ্ঠ পথ, অপর পক্ষ বলিতেছে সমাজতন্ত্র। আবার ইহার মধ্যেও সমাজতন্ত্রের চরমপন্থী প্রবর্ত্তকরা বলিতেছে, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের পথই একমাত্র পথ।

কিন্তু পথের সন্ধান করিতে গিয়া কেবল বৈষয়িক সুখ-সুবিধা বিচার করিলেই চলিবে না। শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, "সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের সাফল্য অবশ্যই বিস্ময়কর এবং নানা দিক দিয়া প্রশংসারও যোগ্য। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, এই সাফল্যের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের জনসাধারণকে কত কঠিনতম দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। নৈতিক ক্ষতিও তাহাদের কম হয় নাই। রাশিয়া ও চীনের সমাজতান্ত্রিক প্রগতির দুর্ব্বল দিকটি বড় করিয়া না দেখাইলেও, ইহা নিন্দনীয়। ধনতন্ত্রের ইতিহাসেও হিংসা এবং বলপ্রয়োগের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষ যে পথ লইবে তাহা যেন হিংসা এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে পরিহার করে।"

এ কথা বলা সহজ। মানুষের হিতসাধন জাতীর সঙ্কল্প, ইহা প্রতিদিনই উচ্চারিত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে কাহারও ক্ষতি হইবে না, কাহাকেও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে না, মন্ত্রবলে দেশের কোটি কোটিলোকের জীবন স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় হইবে ইহা ভাবিতে বেশ, কিন্তু কল্পনা আর বাস্তব এক বস্তু নয়। আজ

শ্রেণীগত স্বার্থের বিরোধের ফলে দেশে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, এ বিরোধ অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে ইহার মীমাংসাই বা হইতেছে কোথায় ?

তবুও গণতান্ত্রিক উপায়ের প্রতি আস্থা হারাইবার কোন যুক্তি নাই। কারণ সামন্ততন্ত্রের বিলোপ, জমিদারী ব্যবস্থার অবসান ঐ পথ ধরিয়াই আসিয়াছে। গণতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করিলে ভারতবর্ষের স্বাধীন সত্তা এবং স্বকীয় ঐতিহ্য ধ্বংস হইবে, দলমত-নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোকেরই আজ ইহা মনে রাখা উচিত। অবশ্য সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে সমাজব্যবস্থা জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথ রোধ করে তাহা গণতন্ত্র বা যে কোন তন্ত্রই হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে না।

শাসনতন্ত্র কি ভাবে চালিত হইতেছে তাহাই মূল কথা। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র এগুলি স্তোকবাক্যমাত্রই। জনকল্যাণ—যাহা সমাজতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য—যদি শাসনতন্ত্রের দৌর্ব্বল্যে ব্যাহত হয় তবে কোন তন্ত্রই সফল হইতে পারে না, ইতিহাস সে সাক্ষ্য বহুবার দিয়াছে।

পুলিস-দায়িত্বের অপব্যবহার

জনবহুল আসানসোল শহরের রাজপথ হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে কিছুদিন আগে যে কাণ্ডটি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। ঘটনাটি এইরূপ: একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছুটির পর গৃহে ফিরিতেছিল। দুইজন গুণ্ডা তাহাকে বলপূর্ব্বক একটি ট্যাক্সীতে তুলিয়া পলায়ন করে। পথচারীদের তৎপরতার ফলে কয়েক ঘণ্টা পরে বালিকাটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ট্যাক্সীর মালিক এবং একজন মোটর ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস চালান দিয়াছে। স্কুলের ছাত্রী-হরণের প্রয়াসটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র হইলেও আমাদের আশঙ্কা অন্যত্র। ঘটনার পিছনে কোন্ ষড়যন্ত্র কাজ করিতেছে ইহাই আলোচ্য বিষয়। কয়েকদিন পূর্ব্বে ঐ শহরেই প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ইহাতে স্থানীয় লোকেদের মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে। হইবারই কথা। মানুষের ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করিবার জন্যই এই পুলিশ-বাহিনীর সৃষ্টি। বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য দেশ বলিয়া আমাদের গর্ব্ব আছে। সভ্য দেশে যাহা কিছু প্রয়োজন—আইন, আদালত, শান্ত্রী, প্রহরী, কোতোয়াল, কোন কিছুরই অভাব নাই, তথাপি এইরূপ ঘটনা প্রায় নিত্য ঘটিতেছে।

মধ্যযুগে দুর্বৃত্তদের হাতে নারীর লাঞ্ছনা মানুষকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। আজ সে যুগকে বিদায় দিয়াও আমরা নিরাপদ হইতে পারিলাম না ইহাই লজ্জার কথা। আজ গণতন্ত্রের যুগে পাত্র-মিত্র-অমাত্যদের হাতেই দেশের শাসনভার। তবে কি তাঁহারা কেবল শাসন করিতেই জানেন, পালন করেন না ? অথচ দেখিতে পাই, প্রতি বৎসর পুলিস-খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে! অর্থ তাঁহারা ব্যয় করেন প্রগতিরই নামে। কিন্তু প্রগতির অন্যতম সর্ত্তপূরণ—সাধারণের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তির নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় কোনও দায় ইঁহাদের নাই। তাহা থাকিলে পুলিসের এই নিষ্ক্রিয়তা, ঔদাসীন্য এবং তাহাদের অক্ষমতা এমন করিয়া প্রকাশ পাইত না।

সম্প্রতি বিধান-পরিষদেও পুলিস দুর্নীতি সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। কথা নিত্যই উঠে, কিন্তু প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই হয় না ইহাই আশ্চর্য্য !

স্বাধীনতার পর প্রায় বারো বৎসর কাটিল, অনেক-কিছু বদলাইয়া গেল। কিন্তু পুলিসী ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের ভয় ও সন্দেহ আজও কাটিল না। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা রাষ্ট্রের একটি প্রধান দায়িত্ব। স্বাধীনতা-পরবর্ত্তী যুগে এদেশে নানা কারণে সে দায়িত্ব দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আমাদের রাজ্যের স্বাভাবিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। বিস্তৃত শিল্পাঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যাও আগের চেয়ে এখন জটিল। আরও অনেক কারণে পুলিসের উপর ভরসা না করিয়া উপায় নাই। তাহাদের দায়িত্বও বাড়িয়াছে অত্যধিক। সেই সঙ্গে দায়িত্ব যেমন বাড়িয়াছে, ক্ষমতাও কম বাড়ে নাই। পুলিসের ক্ষমতার অপব্যবহার ব্রিটিশ আমলেও ছিল, কিন্তু এখন তাহার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, পুলিসের দায়িত্ব ও ক্ষমতা না হয় সঙ্গত কারণেই বাড়িয়াছে, কিন্তু জনগণতন্ত্রী সরকারের অধীনে সেই দায়িত্ব ও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ হইবে না কেন ? আমরা বলিতে বাধ্য যে, পুলিস যাঁহার আয়ত্তে সেই মন্ত্রীপ্রবরের যোগ্যতা ও কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে।

হাসপাতালের বিরুদ্ধে নূতন অভিযোগ

কলিকাতার হাসপাতালগুলির সম্বন্ধে অভিযোগ আজ নূতন নয়। তাহাদের অব্যবস্থা, অনাচার, দুর্নীতির কথাও অনেক শুনিয়াছি। অভিযোগ দীর্ঘকালের ও বহু প্রকারের। তাহা লইয়া আন্দোলন-আলোচনাও কিছু কম হয় নাই। কিন্তু প্রতিকার হওয়া দূরের কথা, তাহাদের অপরাধের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে হাসপাতালের রোগীদের প্রতি ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহারের অনেক বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি নীলরতন সরকার হাসপাতালে একটি মৃতদেহ বদলের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে অমার্জ্জনীয় ঔদাসীন্য এবং অমানুষিক ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে রক্ত-মাংসের মানুষমাত্রেই বিচলিত হইবেন।

মৃত বালকটির মাতা অভিযোগ করিয়াছেন, নীলরতন সরকার হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার পর পুত্রের অবস্থা জানিতে গিয়া তিনি দুর্ব্যবহার পাইয়াছেন, পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া পুত্রকে

দেখিতে গেলেও পুত্রকে, দেখিবার অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই এবং বহু কাঠ-খড় পোড়াইয়া যখন মৃতদেহটি লইবার অনুমতি পাওয়া গেল তখন দেখা গেল, মৃতদেহটি তাঁহার পুত্রের নহে, অন্য এক বালকের।

সন্তানহারা জননীর এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে দোষ দিব কাহাকে? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের, না যাঁহারা এই সব প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক তাঁহাদের? এরূপ হৃদয়হীন মানুষ সভ্যসমাজে আজও বুক ফুলাইয়া বিচরণ করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য!

ইহার পর হয়ত জোর তদন্ত চলিবে, অপরাধীদের শাস্তিও হয় ত হইবে, কিন্তু ইহাতে সন্তান-শোকার্ত্তা জননীর বেদনা কিছু-মাত্র উপশমিত হইবে না। আমরা ইহার প্রতিকার চাহিতেছি, যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ আচরণ আর অনুষ্ঠিত না হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

সমগ্র দেহ যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন সামগ্রিকভাবেই চিকিৎসা করা বিধেয়। হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ যেরূপ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে ইহাদের পরিচালন-ব্যবস্থা ঢালিয়া না সাজিলে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুন্দর করা যাইবে না।

অন্যান্য সভ্যদেশে হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে পারিলে মানুষ আশ্বস্ত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কেহ হাসপাতালে যায় না।

কিন্তু কেন এরূপ হয়? হাসপাতাল যাঁহারা পরিচালনা করেন, হাসপাতালের যাঁহারা চিকিৎসক, রোগীদের শুশ্রূষার গুরু-দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত মানুষ। সাধারণ মানুষ অপেক্ষাও তাঁহারা হৃদয়বান হইবেন, এরূপ আশা করাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তাঁহারা কেন একথা মনে করিতে পারেন না, রোগীরা বিপন্ন হইয়া হাসপাতালে যায়। তাহাদের সংবাদ জানিবার জন্য আত্মীয়-স্বজনের ব্যাকুলতাও স্বাভাবিক। সেই বিপন্নতা ও ব্যাকুলতা দরদীমন লইয়া না দেখিয়া রূঢ়তার দ্বারা যাঁহারা আঘাত করেন, তাঁহারা আর যাহাই হন, সেবাব্রতে রত হইবার মত সদ্গুণের যে অভাব তাঁহাদের আছে তাহা বলিতেই হইবে।

কর্পোরেশনের ত্রুটি সংশোধনে মেয়র

কলিকাতা কর্পোরেশনের কলঙ্কময় কাহিনী আজ যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহা নাগরিক জীবনকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা—সেই নগরপিতাদের আচরণবিধি সংশোধনের জন্য প্রয়োজন হইয়াছে সকলের চাইতে বেশী। ইহারা যতক্ষণ না অনুভব করিতেছেন যে, তাঁহাদের প্রতিটি কথা ও প্রতিটি কাজের ফলভোগ করিতেছে কলিকাতার নাগরিকগণ, ততক্ষণ জোড়াতালি দিয়া তাঁহাদের আচরণকে খোপদুরস্ত করিলে কোনই লাভ হইবে না। আজ জনসাধারণের ধারণা হইয়াছে, তাঁহাদের আচরণ এরূপ অসংযত, দায়িত্বহীন যে, তাঁহারা কলিকাতা কর্পোরেশনের মত সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যোগ্য নন।

কলিকাতার মেয়র ডঃ ত্রিগুণা সেন সেদিন বলিয়াছেন, 'নগর-পিতাদে'র চাল-চলন সংশোধন করা প্রয়োজন। তিনি সংশোধনের পন্থা হিসাবে যেসব পালনীয় কর্ম্মধারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সুশ্রাব্য। কিন্তু তাহা পালন করিবে কয়জন? আমাদের দেশের —বিশেষ কলিকাতার নাগরিক তাঁহার মুখপাত্রের দোষত্রুটির বিষয়ে যতদিন উদাসীন থাকিবেন ততদিন প্রায় কেহই না।

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অকর্ম্মণ্যতা, নগরজীবনের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অজ্ঞতা, উদাসীনতা অথবা দায়িত্বহীনতা—কর্পোরেশনের এইসব দৃঢ়মূল গ্লানিকর বনিয়াদী ত্রুটিগুলি কেবল সভাগৃহের নূতন আচরণ-বিধি প্রবর্ত্তন করিয়া দূর করা যাইবে না, বড়জোর চাপা দেওয়া যাইতে পারে। সভার বাহিরে, আগে ও পরে, কর্পোরেশনের অন্দরমহলে নগরপিতারা কি করেন এবং কি করিবেন তাহার আচরণ-বিধি ঠিক রাখা যাইবে কি উপায়ে?

অবশ্য কর্ম্মকর্ত্তাদের আচরণ-বিধি সংশোধনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন আছে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গির ও মনোভাবের সংশোধনের। তাঁহারা যতক্ষণ না অনুভব করিতেছেন যে, তাঁহাদের প্রতিটি কথা ও প্রতিটি কাজের ফলভোগ করিতেছে কলিকাতার নাগরিকগণ, ততক্ষণ কোন কিছুই হইবার নয়। স্বভাব না বদলাইলে আচরণ বদলায় না। তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইবে। তাঁহারা সভাগৃহে শোভন, সংযত ও দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করিবেন, এরূপ নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া অবশ্যই ভাল, কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কথা হইল, কেবল আচরণে নয়, মননে, অনুশীলনে নগরজীবনের সমস্যা সমাধানে তাঁহারা সততা ও দূরদর্শিতার নীতি অনুসরণ করিবেন।

সংশোধনের সকল অস্ত্রই নাগরিকদিগের হাতে। নির্জীব জড়ভরত নাগরিক যেখানে সেখানে চৌরচক্রের প্রাবল্য অনিবার্য্য।

শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ

প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি ভাল ছিল কি মন্দ ছিল, এই প্রসঙ্গ না তুলিয়াও বর্ত্তমান পদ্ধতি যে যোগ্যপথে চলিতেছে না ইহা আমরা নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই বিভাগটির গুরুদায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত তাঁহারা এখনও নির্দিষ্ট ক্রম বাছিয়া লইতে পারেন নাই। কারণ এখনও দেখা যাইতেছে, এ বিষয়ে তাঁহাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নাই! উচ্চশ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিলাম, যাহারা আজও অপ্রাপ্তবয়স্ক—সেই প্রাইমারি বা প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার্থী-দের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রভূত গলদ রহিয়া গিয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীর বালক-বালিকাদের ইংরেজী পড়ান হয় না। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিয়াই তাহাদের ইংরেজী সাহিত্যের সহিত ট্রানশ্লেসন এবং গ্রামার পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ অবাস্তব পরিকল্পনায় পরিবর্ত্তন আবশ্যক। পূর্ব্বে এইসব শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মৌখিক পরীক্ষার চলন ছিল। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহাদের লিখিয়া পরীক্ষা দিতে হইতেছে। যাহারা ঐ বয়সে

বানান করিয়া করিয়া লেখা অভ্যাস করিতেছে, তাহাদের পক্ষে প্রশ্নের উত্তরগুলি যথাযথ লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কি করিয়া সম্ভব ?

ইহার পর বোর্ড এবারে নূতন নিয়ম করিলেন, প্রাইমারি পরীক্ষা শেষ পরীক্ষার মত তাহাদের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে গিয়া দিতে হইবে। এ নিয়মও তাঁহারা অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে অর্থাৎ পরীক্ষার এক মাস আগে স্কুলগুলিকে জানাইয়া দিলেন। যাহার ফলে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা পাঠ তৈয়ারি করিবারও সময় পাইল না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে পরীক্ষা-নামটাই আতঙ্কর—তাহার উপর এক অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে গিয়া তাহাদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাকে বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। যাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়। প্রশ্নপত্রগুলি ফুলস্কেপ কাগজের পূর্ণ এক পৃষ্ঠা। যাহারা সবে লিখিতে শিখিতেছে তাহাদের পক্ষে মাত্র আড়াই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঐ দীর্ঘ প্রশ্নগুলির উত্তর লেখা কি করিয়া সম্ভব—ইহা কি কেহই ভাবিয়া দেখিলেন না ?

যাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছেন তাঁহাদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহাদের জন্য ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে বুঝিল না তাহারা ,ইহাই দুঃখ !

শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারদের এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

বর্দ্ধমানে বিদ্যালয় সমস্যা

ছেলেমেয়েদের সংখ্যানুপাতে মফঃস্বলে উচ্চমানের বিদ্যালয়ের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত নহে। পরাধীন থাকাকালীন যে অসুবিধাগুলি ছিল, আজ স্বাধীন দেশে তাহা থাকিবার কথা নহে। কিন্তু এত বৎসর অতিক্রান্ত হইল, সরকার উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থাই করিতে পারেন নাই। উদাহরণ-স্বরূপ 'বর্দ্ধমান' পত্রিকা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"বর্দ্ধমান সহরে বালকদের জন্য পাঁচটি ও বালিকাদের জন্য তিনটি মাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাহার মধ্যে বালিকাদের জন্য একটি মাত্র বিদ্যালয় সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে ও বালকদের বিদ্যালয়ের দুইটি সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের দিকেই অধিকসংখ্যক ছাত্র ঝুঁকিয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ সহর বর্দ্ধমানে মাত্র আশীটি ছাত্রের বিজ্ঞান পড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, শহরের একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারের নিকট কোনরূপ সাহায্য না লইয়াই বিজ্ঞান বিভাগ খুলিতে চাহিতেছে, কিন্তু অনুমতি পাইতেছে না। আমরা অবিলম্বে যাহাতে অধিকসংখ্যক ছাত্র বিজ্ঞান পড়িবার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছি।"

বালী মিউনিসিপ্যালিটির অব্যবস্থা

বালী হইতে 'সাধারণী' পত্রিকা লিখিতেছেন :

"বালী পৌর এলাকার জনবহুল রাস্তাগুলির অপরিষ্কারজনিত অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় অসহনীয় পরিবেশের কথা আমরা বহু পূর্ব্বেই পৌর-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে এনেছি—তার মধ্যে মনুষ্যত্বকে পশুত্বে পরিণত করার যে অভিনব পন্থা কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিযোগ ও জনসাধারণের ক্ষুব্ধ গুঞ্জনধ্বনি উপেক্ষা করে আজও অব্যাহতগতিতে তা চালিয়ে যাচ্ছেন। পৌর-সভার পরিচালন-ব্যবস্থার এই কলঙ্কজনক পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সম্বন্ধে নূতন কোন পন্থা প্রবর্ত্তন করার আলোচনা বোধ হয় আত্মসন্তুষ্ট, বধির, অনড় ও অকর্ম্মণ্য পৌর কর্ত্তৃপক্ষগণকে তিলার্দ্ধ বিচলিত করতে সক্ষম হবে বলে যথেষ্ট সংশয় আছে তথাপি জন-স্বার্থে সর্ব্বজনীন কল্যাণের জন্য এবারও দু'একটি কথা বলতে হচ্ছে।

"বালীর বিভিন্ন পাড়ার রাস্তার আঁকাবাঁকা বাঁকগুলির বিপজ্জনক অবস্থার সংস্কারসাধনের জন্য গত ৯-৪-৫৬ তারিখে পৌর কর্ত্তৃ-পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল এবং কর্ত্তৃপক্ষও এই বিষয়ে গত ২৮-১১-৫৬ তারিখে কমিশনর মহোদয়গণের মাসিক সভায় রাস্তার মোড়ের সংস্কারজনক ব্যবস্থার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জানা গেছে, মাত্র ১০টির ক্ষেত্রে এই সংস্কারজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই আঁকা-বাঁকা রাস্তার বিপজ্জনক অবস্থার সমাধান হয়। এই কার্য্যে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকগণও স্বেচ্ছায় এই কল্যাণমূলক কাজে বিনা খেসারতে জমিও দান করতে প্রস্তুত আছেন। সম্প্রতি একটির ক্ষেত্রে তর্ক-সিদ্ধান্ত লেনস্থ শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু পরিমাণ জমি পৌর কর্ত্তৃপক্ষকে রেজিষ্ট্রিকৃত দানপত্র দ্বারা প্রদান করেছেন। এই বিষয়ে হাওড়ার জিলাশাসক মহাশয়ও যথেষ্ট আগ্রহশীল হয়ে পৌর কর্ত্তৃপক্ষকে যথাশীঘ্র কার্য্যটি সম্পাদন করার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার বিষয় যে, পূর্ব্বাপর অন্যান্য ব্যবস্থার ন্যায় এই ব্যাপারেও কর্ত্তৃপক্ষ আজও নিশ্চল নীরব হয়ে আছেন।"

দেশের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির অব্যবস্থা আজ নূতন নহে। ইহার সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু সংস্কার করিবে কে ? গলদ যে গোড়ায় !

ধুবুলিয়ায় নূতন যক্ষ্মা হাসপাতাল

আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত লোকের সংখ্যানুপাতে উপযুক্ত হাসপাতাল নাই। শোনা যাইতেছে, ধুবুলিয়ায় যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার জন্য এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল ও রোগমুক্তদের পূর্ণ স্বাস্থ্য-প্রাপ্তির জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্ম্মাণের কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এবং ইহাও শোনা গেল, বর্ত্তমান বৎসরেই অর্থাৎ ১৯৫৯ সনের শেষাশেষি এই আরোগ্য-নিকেতন চালু হইবে।

বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব কিছুটা কমিয়াছে, কিন্তু যক্ষ্মা একমাত্র ব্যাধি যাহার প্রকোপ দিন

দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং রোগ-বৃদ্ধির তুলনায় আশানুরূপ হাসপাতালের ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কাজেই দেশের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই যে সম্পূর্ণাঙ্গ যক্ষ্মা-হাসপাতাল ও আরোগ্য-নিকেতনের ব্যবস্থা করা হইতেছে, ইহাতে দেশবাসী প্রকৃতই উপকৃত হইবেন।

কিন্তু কথা হইতেছে অন্যত্র। রোগ তাড়ান অপেক্ষা রোগের কারণ দূর করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যে দারিদ্র্যজনিত অপুষ্টির প্রভাবে এই রোগাক্রমণ এতটা ব্যাপক হইয়াছে—সমাজ হইতে সেই কারণ দূর করিতে না পারিলে এই ব্যাধির ব্যাপ্তিও দূর করা যাইবে না। সুতরাং হাসপাতাল বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঐদিক দিয়াও চিন্তা করিতে হইবে।

হরিণঘাটার সরকারী কৃষি-ফার্ম্মে অব্যবস্থা

অবশেষে হরিণঘাটার সরকারী কৃষিফার্ম্মে অব্যবস্থার কথাও উঠিল। অভিযোগ করিয়াছেন শ্রীবিজয়সিং নাহার। তিনি বলেন, এই ফার্ম্মটি সরকারের গৌরব। এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠানটি দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে অনেক লোক এখানে আসেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাদের এই আগমনকে ফার্ম্মের একশ্রেণীর অফিসার প্রীতির চক্ষে দেখেন না। দুর্ব্যবহার না করিলেও ভাল ব্যবহার করেন না। এমন কি, তাঁহাদের অভ্যর্থনা পর্য্যন্ত না করিয়া, প্রশ্নের উত্তর দিতেও তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন।

ইহা ছাড়াও, সেখানে বেসরকারী যে সব ব্যক্তি বা গোয়ালার গরু মহিষ রহিয়াছে, সরকারী কর্ম্মচারীরা সেগুলিরও ভালভাবে দেখা-শোনার ব্যবস্থা করেন না। কয়েকজন শিক্ষিত যুবক এই ফার্ম্মের কাছাকাছি থাকিয়া দুগ্ধ-ব্যবসায় করিতে গিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতি অফিসারেরা দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। কি করিলে ঐসব ব্যবসায়ী ঐ স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন, নিরন্তর এই চেষ্টাই তাঁহারা করিতেন।

কৃষিমন্ত্রীর নিকট এই সম্পর্কে জানাইয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

দিবালোকে মালগাড়ী হইতে রড পাচার

দমদম হইতে 'নয়া সমাজ' যে সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন তাহা যেমনই বিস্ময়কর তেমনই আতঙ্কজনক। দেশ যদি এরূপ অরাজক হয় তবে মানুষ নিরাপদ-আশ্রয় কোথায় খুঁজিবে? সংবাদটির দিকে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :—

"গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সকাল ৯টায় দক্ষিণ দমদমের ৩নং ওয়ার্ড পাতিপুকুর এলাকায় দুর্বৃত্তগণ রেলওয়ে মালগাড়ী হইতে যখন মাল নামাইতেছিল তখন স্থানীয় বিশিষ্ট অধিবাসীরা নিজেরাই ইহাদের ধরিতে যান। ইহাদের আসিতে দেখিয়া মালগাড়ী চালাইবার চেষ্টা করা হয় এবং দুর্বৃত্তরা তিন জনকে ভোজালি দিয়া আহত করে।

"খবরে প্রকাশ যে, মঙ্গলবার সকালে প্রকাশ্য দিবালোকে যখন দুর্বৃত্তরা রেলওয়ে ওয়াগন হইতে ত্রিশ ফুট লম্বা লোহার রড অপসারণ করিতেছিল, তখন স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ ইহা ধরিবার জন্য নিজেরাই অগ্রসর হন। এই দলটিকে দেখিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং চোরাই পাচারকারীরা কতক পলায়ন করে এবং বাকী কয়েকজন এই নাগরিকগণকে ভোজালি দ্বারা আক্রমণ করে। ইহাতে স্থানীয় যুবক শ্রীসুবোধ নন্দী, সুজন ব্যানার্জী, জগদীশ বিশ্বাস ও অনিলকুমার দাস আঘাতপ্রাপ্ত হন। নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করিয়াও স্থানীয় যুবকরা ইহাদের সাত জনকে ধরিয়া ফেলেন। দুই ঘণ্টা বাদে পুলিসের থানা বিভাগ হইতে লোক আসে এবং ইহাদের গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় লোকেরা নিজেরাই নানা জায়গা তল্লাসী করিয়া চোরাই মাল পুলিসের হাতে জমা দেন।"

বাঁকুড়া শহরে মহিলা কলেজ

বাঁকুড়ার 'মল্লভূম' পত্রিকা লিখিতেছে :

"আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঁকুড়া শহরে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে মহিলাদের জন্য একটি পৃথক কলেজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। বাঁকুড়া জেলা অভিভাবক সমিতি উদ্‌যোগী হইয়া গত বৎসর বাঁকুড়া কালীতলা বালিকা বিদ্যালয় ভবনে প্রাতে ৬-১০টা মহিলা কলেজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এবার দেখিতেছি, জেলা কর্ত্তৃপক্ষও বাঁকুড়া মহিলা কলেজ স্থাপনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। জেলা-শাসককে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। শোনা যাইতেছে, তাঁহারা শহরের বাহিরে নূতন চটি পার হইয়া 'পাণ্ডববর্জ্জিত' ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। সভাপতির খেয়াল হইয়াছে, ১৫ বিঘা জায়গা না হইলে কলেজ হয় না—শহরের ভিতর এত জায়গা পাওয়া সম্ভবপর নয় কাজেই তাঁহার খেয়ালে বাধা দিবার চেষ্টাও কোন সভ্য করেন নাই। যদিও তাঁহারা বুঝেন যে, শহরের বালিকাদের শহর ছাড়িয়া অতদূরে যাওয়া নিরাপদ ও সম্ভবপর নয়।"

ঐ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা যদি সম্ভব হয় তবেই শহর হইতে দূরে কলেজ স্থাপিত হওয়া ভাল। আমরা মনে করি যে, যদি ১৫ বিঘা জমি লইয়া শহরের বাহিরে কলেজ হয় তবে তাহা ভালই হইবে। শহরের দূষিত পরিবেশে সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু তরুণীগণের নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াতের ব্যবস্থা হওয়া চাই-ই, নচেৎ কলেজের স্থাপনায় পুনর্ব্বিবেচনা প্রার্থনীয়।

হুগলী নদীর ভাঙনে শহর বিপন্ন

হুগলীর 'বর্ত্তমান ভারত' জানাইতেছেন :

"হুগলী বাবুগঞ্জ ও ঘুঁটিয়াবাজার এলাকার সংলগ্ন রাস্তা ও নদীর তীরভূমি গত কয়েক বৎসর হইতে নদীস্রোতে অতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই এলাকা হুগলী ব্রীজ হইতে হুগলী মহসীন কলেজের দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে ফাটল দেখা দিয়াছে ও জমি ধ্বসিয়া যাইতেছে এবং সময়োচিত

ব্যবস্থার অভাবে অতি অল্পদিনের মধ্যে সদর রাস্তা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নদীর ভাঙনমুখ হইতে রক্ষা করা সুকঠিন হইবে। এই অঞ্চলে কয়েকটি স্নানঘাট, রাস্তার পার্শ্ববর্তী পাকা সংরক্ষণ প্রাচীর, একটি স্মৃতি-মন্দির ও শ্মশানঘাট প্রায় ভগ্নপ্রাপ্ত। শহরের এই সুন্দর অঞ্চলটি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এই প্রসঙ্গে চন্দননগরের গোঁসাইঘাট অঞ্চলের দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে মনে হয়। স্থানীয় পৌরসভার কিছুটা ঔদাসীন্যও বোধ হয় আর্থিক প্রতিকূলতা নাগরিকদের গত কয়েক বৎসরের অনুরোধ ও লিখিত যুক্ত আবেদন কোন উপায় উদ্ভাবনে তৎপর করিতেছে না।"

বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনা প্রয়োজন।

বাঁধের সংস্কার চাই

শ্রীহট্টের 'জনশক্তি'র নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটির প্রতি আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

"কমলগঞ্জ থানার সুনছড়ায় সরকারী সহায়তায় একটি বাঁধ নির্মাণ হইয়া স্থানীয় জনসাধারণের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গত কার্তিক মাসে ধলাই নদীর আকস্মিক বন্যায় বাঁধটি স্থানে স্থানে ভাঙিয়া গিয়া এতদ্‌অঞ্চলের শস্যপূর্ণ ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া দিয়া যায়। বর্ষা সন্নিকটবর্তী, ইতিমধ্যে যদি বাঁধটির পুনঃসংস্কার না হয় তাহা হইলে বর্ষার বাণে এতদ্‌অঞ্চলের ফসল পুনরায় নষ্ট হইয়া যাইবে।

অবিলম্বে বাঁধটি সংস্কারের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আমরা জেলা ডেভেলাপমেণ্ট কমিটির কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

গ্রাম পঞ্চায়েতের অসহায় অবস্থা

বর্দ্ধমানের 'দামোদর' নিম্নের সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন :

"স্থানীয় হাটতলার পার্শ্ববর্তী চিরকালের জনসাধারণের ব্যবহার্য্য প্রশস্ত পয়নালাটি সম্প্রতি স্থানীয় বিদায়ী জমিদার পুলিসের সহায়তায় জোর করিয়া বুজাইয়া দেওয়ায় বাজারে জলনিকাশ বন্ধ হইয়া রাস্তার উপর দিয়া জল যাইতেছে। ফলে রাস্তা কর্দ্দমাক্ত হইয়া চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে বর্দ্ধমানের মহকুমা শাসককে জানানো হইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে কোন তদন্ত বা প্রতিকার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। পয়নালাটি ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ছিল, বর্ত্তমানে উহা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে আসিয়াছে।"

এ বিষয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

অকালবন্যায় শনবিলের সমগ্র এলাকা

সর্ব্বত্র ধান-চাউলের অভাব। ইহার উপর অসময়ে বন্যা আসিলে মানুষের অসহায়ের মত সহ্য করা ছাড়া আর কোন পথ নাই। এইরূপ একটি বন্যার খবর করিমগঞ্জের 'জনশক্তি' দিয়াছেন :

"গত কয়েক দিন প্রবল বারিপাতের ফলে করিমগঞ্জ মহকুমার সুবিশাল শনবিল এলাকা বন্যায় প্লাবিত হইয়া বোরো ফসলের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সমগ্র শনবিল অঞ্চলে প্রতি বৎসর ছয় হাজার বিঘা পরিমিত জমিতে অর্দ্ধ লক্ষাধিক মণ বোরো ফসল ফলে এবং এই ফসলের উপর বিশেষ ভাবে শনবিল অঞ্চলের হাজার হাজার অধিবাসী সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কিন্তু এই অকাল-বন্যার ফলে তাহাদের মুখের গ্রাস বিনষ্ট হওয়ায় উক্ত অঞ্চলের আপামরজনসাধারণ এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে।"

বনাঞ্চলে 'জুম' চাষপ্রথা রহিত

নিম্নোক্ত সংবাদটি দিতেছেন আগরতলার 'সেবক' পত্রিকা :

"কৈলাসহর এবং ধর্ম্মনগর মহকুমান্তর্গত কয়েকটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুম প্রথায় চাষাবাদ রহিত করার ফলে শত শত লুসাই, চাকমা, রিয়াং উপজাতি জুমিয়া পরিবার হঠাৎ বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদের মনে ভীষণ আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, বনকর বিভাগের কর্ম্মচারিগণ জানাইয়া দিয়াছেন যে, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুম প্রথায় চাষ করা আইনতঃ দণ্ডনীয়। জুমিয়াগণ সরকারের আদেশ মানিতে গিয়া দেখে তাহারা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বেকার হইয়া পড়িয়াছে। বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করিয়া হঠাৎ জুম চাষ বন্ধ করায় স্থানীয় জুমিয়াগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে।"

যে প্রথা তাহাদের বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়ার পক্ষে যে যুক্তিই সরকারের থাকুক, তাহার বিকল্প একটা ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন।

জুম চাষে বনসম্পদ নষ্ট হয় এবং জমিও ক্রমে অনুর্ব্বর হয়। এই আশঙ্কাই বোধ হয় ঐ নিষেধের কারণ।

প্রাচীন আরবী গ্রন্থের রুশ অনুবাদ

আজ হইতে হাজার বৎসর পূর্ব্বে—দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, আরব দেশের সুবিখ্যাত পর্য্যটক ও ভূগোলবিদ্ বুজুর্গ ইবন শাহরিয়ার "অজব হিন্দুস্তাঁ" (বিস্ময়ভরা ভারত) নামে ভারতবর্ষের এক ভৌগোলিক বৃত্তান্ত রচনা করেন। তৎকালীন আরব পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত বিভিন্ন শাখাকে যে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইল এই ভূগোল গ্রন্থটি। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণগুলি লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই গ্রন্থে ভারতীয় জনসাধারণের ধর্ম্ম-সংস্কৃতি ও সামাজিক আচারবিচারের বিবরণও দিয়া গিয়াছেন। ইবন শাহরিয়ার নিজে ভারতে আসিয়া ছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। হয় ত তিনি এই ভারত-বৃত্তান্ত অন্যান্য আরব পর্য্যটকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ

সম্পর্কে তাঁহার গভীর একটি রোমান্টিক অনুরাগের পরিচয় এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়।"

শাহরিয়াদের পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থের মাত্র একটি অনুলিপি এতদিন পর্যান্ত সংরক্ষিত আছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, সম্প্রতি নিখিল সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের প্রাচ্য বিদ্যানুশীলন ভবন এই আরবী গ্রন্থের রুশ অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পাকিস্থানের নূতন চুক্তিতে মার্কিন-নীতি

পাকিস্থান ও আমেরিকার মধ্যে মৈত্রীর নামে যে সামরিক চুক্তি হইয়া গেল, ইহাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আবার নূতন করিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহার এইরূপ চিন্তার অভিনয় দেখিয়া যে কোন বুদ্ধিমান লোক বিস্ময় ও উদ্বেগ বোধ করিবেন। কারণ আমরা সহস্রবাহুস্তে দেখিতে পাইতেছি যে, এই নূতন চুক্তি ভারতবর্ষের শান্তি ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিতেছে। পাকিস্থানী ভাষ্যই সত্য হউক, কিংবা মার্কিনী ব্যাখ্যাই খাঁটি হউক, ইহার কোনটাই আমরা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, আজিকার পৃথিবীতে মানুষের শান্তি অবিচ্ছেদ্য। ইতিহাস ইহা বার বার প্রমাণ করিয়াছে—কোরিয়ায়, ইন্দোচীনে, মালয়ে, সুয়েজ খালে কিংবা লেবাননে যেখানেই আক্রমণ অনুষ্ঠিত ও শান্তি বিঘ্নিত হইয়াছে সেখানেই উহা গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

মার্কিন গবর্ণমেণ্ট সরকারীভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, পাকিস্থানের সহিত এই যে নূতন সামরিক চুক্তি ইহাতে ভারতের ভীত হইবার কোন কারণ নাই—ভারতবর্ষ যদি পাকিস্থান কোনদিন আক্রমণও করে তবে তাঁহারা পাকিস্থানকে সাহায্য দিবেন না। এ চুক্তি হইল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস।

এই বক্তব্য এবং ভাষ্যের পিছনে আন্তরিকতা কতখানি আছে, সেই প্রশ্ন না তুলিয়াও আমরা বলিতে পারি যে, এই ধরনের সামরিক চুক্তি ভারতবর্ষের সন্দেহ ও অবিশ্বাস যেমন উদ্রিক্ত করিবে, তেমনি তাহাদের শান্তি বিঘ্নিত ও বিপন্ন করিবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও ঐ কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ভারত সীমান্তে পাকিস্থানীরা যে হামলা ঘটাইতেছে, তাহাতে মার্কিন সামরিক অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ যে কোন স্বাধীন দেশের গবর্ণমেণ্ট নিজের অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য অন্য কোন স্বাধীন দেশের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারেন। ইহাতে আইনগত কোন বাধাই নাই। কিন্তু দেখিতে হইবে যে, উহার ফলে অপরের উপর কি প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে। আমরা কয়েক বৎসর ধরিয়াই দেখিতেছি যে, পাকিস্থান-সংক্রান্ত মার্কিন-নীতি ভারতবর্ষকে ক্রমাগত বিপাকেই ফেলিতেছে। সীমান্ত-সমস্যায় যত কিছু উৎপাত ঘটিতেছে, উহার পিছনে শক্তি জোগাইতেছে মার্কিন সামরিক নীতি ও তাহাদের সাহায্য। সুতরাং ভারতবর্ষকে সেই দিক দিয়াই চিন্তা করিতে হইবে, এবং যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই আক্রমণাত্মক উপদ্রব বাড়িয়াই চলে আর যদি শেষ পর্য্যন্ত সীমান্তের প্রশ্ন ও কাশ্মীর প্রশ্ন একত্র হইয়া পাকিস্থানী আক্রমণ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন নেহরু গবর্ণমেণ্ট কিভাবে সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবেন?

জানি না পণ্ডিত নেহরু কোন্ যুক্তিতে চলিতেছেন! বার বার চুক্তি করিয়াও যাহারা পরমুহূর্ত্তে ভঙ্গ করে তাহাদের বিশ্বাস করিয়া তিনি কোন্ আশা পোষণ করিতেছেন তিনিই বলিতে পারেন। রাজনীতি বড় কূট, ইহা তাঁহারও অজ্ঞাত নয়। পাকিস্থান টুকেরগ্রাম দখল করিয়া বসিয়া আছে, প্রধানমন্ত্রী হইয়াও তিনি প্রতিকার করেন নাই। অন্যায় যে সহে, তাহার অপরাধ অন্যায় যে করে তাহার অপেক্ষা কম নয়—একথাও আজ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে।

পাকিস্থান কর্ত্তৃক মার্কিন অস্ত্র ব্যবহারের কথা যখন তাঁহার কানে আসিল, তখন কি তিনি মার্কিন সরকারের নিকট কোন প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন? সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, প্রতিবাদ করেন নাই বটে, তবে খবরটা তাঁহাদের গোচরে আনিয়া থাকিবেন। ঠিক স্মরণে নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষ মোহগ্রস্ত নয়। তাহারা প্রতিদিন পাকিস্থানী উপদ্রব আর বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহে। ভারতবর্ষ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র নহে, কিন্তু মার্কিন-নীতি অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকেও ক্রমাগত উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে। ফলে বাধ্য হইয়া হয়ত অকম্যুনিষ্ট ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাল্টা আত্মরক্ষায় সামরিক ও রাজনৈতিক উপায় সন্ধান করিতে হইবে। পণ্ডিত নেহরুকে আমরা এদিক দিয়াই চিন্তা করিতে বলি।

পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি

এই চুক্তির বিষয়ে সংবাদ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নীচে দেওয়া হইল:

নয়াদিল্লী, ১৩ই মার্চ্চ—লোকসভা এবং রাজ্যসভার মিলিত অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু অদ্য বলেন, মার্কিন গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় সরকারকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, পাক-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি ভারতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে না।

এই চুক্তি সম্পর্কে পাকিস্থান যে ভাষ্য করিয়াছে উহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য এবং উহার ফলে যে সন্দেহ জাগিয়াছে তাহা অপসারণের জন্য ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অনুরোধ করে এবং উহার উত্তরেই মার্কিন গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সংসদের উভয় পরিষদে পাকিস্থান, তুরস্ক ও ইরাণের সহিত আমেরিকার সাহায্যচুক্তি সম্বন্ধে যে বিবৃতি দেন নিম্নে তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুরস্ক, ইরাণ ও পাকিস্থানের যে সামরিক সাহায্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯৫৮ সনের ২৯শে জুলাই তারিখে লণ্ডনে বাগদাদ চুক্তি

পরিষদের এক সভা হয়। ইরাকের বিপ্লবের পরই ঐ বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে ইরাণ, তুরস্ক, পাকিস্থান ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডালেসের পক্ষ হইতে একটি ঘোষণা করা হয়। সেই বিবৃতির একটি অনুলিপি এই বিবৃতির সহিত দেওয়া হইল। ঘোষণার শেষ অনুচ্ছেদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। সেই অনুচ্ছেদে বলা হয়—১৯৫৫ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাগদাদে যে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহার এক নম্বর অনুচ্ছেদে এই বিধান আছে যে, চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি পরস্পরের নিরাপত্তার ব্যাপারে সহযোগিতা করিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব-শান্তি রক্ষার জন্য কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য সহযোগিতা করিতে সম্মত আছে। এই সহযোগিতামূলক চুক্তি কার্যকরী করার জন্য যে চুক্তি করার প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাও করিবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৫৯ সনের মার্চ মাসে আঙ্কারায় বৈঠক হয় এবং ১৯৫৯ সনের ৫ই মার্চ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুরস্ক, ইরাণ ও পাকিস্থানের এক চুক্তি হয়, ৫ই মার্চ তারিখে স্বাক্ষরিত ঐ চুক্তিগুলি একই ধরনের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পাকিস্থানের যে চুক্তি হয় তাহার অনুলিপি এই বিবৃতির সহিত দেওয়া হইল।

১৯৫৯ সনের ৫ই মার্চ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—পাকিস্থান সরকার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। যদি পাকিস্থানের উপর আক্রমণ হয় তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে—প্রয়োজন হইলে মার্কিন সরকার পশ্চিম এশিয়ার শান্তি ও স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য যৌথ প্রস্তাব এবং পাক সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী তাহাকে সাহায্য করার জন্য পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। মার্কিন সরকার সেনাবাহিনীও নিয়োগ করিবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ হইতে দেখা যায় যে, মার্কিন সরকার পাকিস্থানের উপর আক্রমণ হইলে পাক সরকারের অনুরোধে সশস্ত্রবাহিনী নিয়োগ করিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতীত অন্য দেশের সাহায্যার্থ মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করা চলে না। পারস্পরিক নিরাপত্তা আইনবলে মার্কিন সরকার অন্য দেশকে সামরিক সাহায্য এবং অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন, কিন্তু উহার দ্বারা সৈন্য দিয়া সাহায্য করার ক্ষমতা মার্কিন সরকারকে দেওয়া হয় নাই। কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতীত মার্কিন সরকার অন্য দেশকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে পারেন না। তবে ১৯৫৭ সনের ৯ই মার্চ তারিখে কংগ্রেসের যৌথ প্রস্তাব অনুযায়ী মার্কিন সরকার উহা করিতে পারেন।

করাচী, ১২ই মার্চ—অত্র এখানে রুশ দূতাবাস মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্থানের নিকট এক কড়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্রে পাকিস্থানকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সামরিক চুক্তি করায় পাকিস্থানকে উহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়ার পত্রে আরও বলা হইয়াছে যে, নূতন দ্বিশক্তি সামরিক চুক্তির ফলে কেবলমাত্র রাশিয়ার আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিপন্ন হয় নাই, রাশিয়ার বন্ধু প্রতিবেশী রাষ্ট্র-সমূহের নিরাপত্তাও বিপন্ন হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত দ্বিশক্তি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর সোভিয়েট রাশিয়া ইরাণের নিকট যে ধরনের পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, পাকিস্থানের নিকটও সেই ধরনের পত্র প্রেরিত হইয়াছে। পাকিস্থান নিজ এলাকায় বিদেশী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিতে দেওয়ায় সোভিয়েট রাশিয়া বিশেষ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে।

পুস্তকের বিক্রয়কর রদ

আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নস্থ সংবাদ দিয়াছেন :

মঙ্গলবার সকল দলের সদস্যদের হর্ষধ্বনির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকার উপর হইতে বিক্রয়-কর প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই রাজ্যের প্রকাশন ব্যবসায় ও জনসাধারণ, বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ঐ ঘোষণার জন্য বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ একের পর এক উঠিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে, ঐ সিদ্ধান্তের ফলে সরকার পুস্তক ব্যবসায়ে নিযুক্ত দুই লক্ষ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত দশ লক্ষ লোকের শুভেচ্ছা পাইবেন।

এই দিন বিক্রয়কর এবং অন্যান্য কর ও শুল্কখাতে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবী উত্থাপন করিয়া মুখ্যমন্ত্রী উক্তরূপ ঘোষণা করেন। এই সম্পর্কে বিতর্ক শেষে বিরোধী পক্ষ হইতে ঐ দুইটি খাতে দুই-বার ভোট গণনার দাবী জানান হয়। উহা ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। অতঃপর বিক্রয়-কর খাতে ২৬,১৯,০০০ টাকা এবং অন্যান্য কর ও শুল্কখাতে ১১,২০,০০০ টাকা ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবী গৃহীত হয়।

উক্ত দুইটি খাতে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবী উত্থাপন করিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন, এই রাজ্যের অনেক ছাত্র যে আর্থিক অনটনের দরুণ পাঠ্যপুস্তক কিনিতে পারে না, তৎসম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন। প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার নিকট ছাত্রদের তরফ হইতে পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষার ফী ইত্যাদির জন্য সাহায্য করিবার আবেদন আসে। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের উপর কোন কর ধার্য্য করা হয় নাই। মাঝে মাঝেই পুস্তক-ব্যবসায়, ছাত্র এবং বিধানসভার সদস্যদের তরফ হইতে পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয়-কর প্রত্যাহারের দাবী উত্থাপন করা হইতে থাকে। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যই এতদিন পর্য্যন্ত উহা প্রত্যাহার করা হয়

নাই। সম্প্রতি প্রকাশন ব্যবসায়ের প্রতিনিধিগণ এই ব্যাপারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করেন। তাঁহাদের দাবী উপেক্ষা করা যায় না। ভারতের নয়টি রাজ্যে পুস্তক এবং সাময়িকীর উপর বিক্রয়-কর ধার্য্য করা হয় নাই। পুস্তক-প্রকাশন ব্যবসায়ের দুইটি কেন্দ্র বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও পুস্তক ও সাময়িকী-গুলিকে বিক্রয়-করের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশন ব্যবসায়ীদের সম্মুখে সর্বভারতীয় বাজারে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইবার বিপদ দেখা দিল। এইরূপ সম্ভাবনাও দেখা দিল যে, পুস্তক-ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গ হইতে পুস্তক না কিনিয়া বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে ক্রয় করিতে পারেন। ইহার ফলে এক সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হয় এবং সরকার উহা গভীর ভাবে বিবেচনা করেন।

পুলিস ও পুলিসমন্ত্রী

আনন্দবাজার পত্রিকা বলিতেছেন :

"গত মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পুলিস বাজেটের আলোচনাকালে বিরোধিপক্ষ হইতে বিভিন্ন সদস্য কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অক্ষমতা, দুষ্কৃতিপরায়ণতা, কর্ত্তব্যে শৈথিল্য ও জনগণের আন্দোলন দমনে অত্যাচারের বিবিধ অভিযোগ উত্থাপন করিলে সভাকক্ষে থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

কোন কোন সদস্য স্বরাষ্ট্র (পুলিস) মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র আক্রমণ চালান এবং অভিযোগ করেন যে, তিনি দলীয় স্বার্থে পুলিসের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছেন এবং ইহার ফলে পুলিসের মধ্যে দুর্নীতির প্রসার ঘটিতেছে। কেহ কেহ পুলিসমন্ত্রীকে এক-শ্রেণীর পদস্থ অফিসারের 'পাপেট' বলিয়াও অভিহিত করেন।

পক্ষান্তরে কংগ্রেসী সদস্যগণ কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল অঞ্চলে বিভিন্ন অপরাধদমনে পুলিসের কর্ম্মতৎপরতা ও আন্তরিকতার উল্লেখ করিয়া তথ্যাদির সাহায্যে দেখান যে, সারা পশ্চিমবঙ্গে অপরাধের সংখ্যা বেশ হ্রাস পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কোন কোন সদস্য কম্যুনিষ্টশাসিত কেরল রাজ্যে বিভিন্ন অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধির উল্লেখ করিলে কংগ্রেসপক্ষ হইতে বিরোধী দলের উদ্দেশে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি উত্থিত হয়।

বিতর্কের উত্তরে পুলিসমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি বলেন যে, পুলিসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও কর্ম্মশৈথিল্যের বহু অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। 'এগুলির সবই সত্য, এ কথা কিছুতেই বলিব না, আবার সবই মিথ্যা একথাও বলিব না।' শ্রী মুখার্জ্জি বলেন যে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমগ্র অবস্থা বিচার বিশ্লেষণ করিতে হইবে। পুলিসের কর্ম্মচারীরা আমাদের সমাজেরই লোক। সুতরাং তাহাদের কাহারও কাহারও কার্য্যে আমাদের সমাজের মধ্যে যে দুর্নীতি আছে তাহার যদি কিছুটা প্রতিফলন হয় তবে তাহা অস্বাভাবিক কিছু নহে। কিন্তু তিনি একথা দৃঢ়ভাবে বলিতে চাহেন যে, কোন পুলিস কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনাচার অত্যাচারের অভিযোগ সত্য হইলে নিশ্চয়ই সরকার উহার বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। তবে এই সম্পর্কে যথোচিত তদন্ত করিয়াই উহা করা হইবে। কোন পুলিসের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলেই যে তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে—এরূপ 'নাদিরশাহী' মনোভাব গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁহারা কিছুতেই অবলম্বন করিবেন না।"

পরীক্ষাকেন্দ্রে হাঙ্গামা

আই-এসসি পরীক্ষায় যে গোলমাল হয় তাহার বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নীচে দেওয়া হইল :

প্রকাশ, ঐ হাঙ্গামা ও গোলমাল দক্ষিণ কলিকাতার কেন্দ্র-গুলিতে তেমন স্পর্শ করে নাই। কিন্তু ঐ সব কেন্দ্রেও পরীক্ষার্থীরা কেমিষ্ট্রির ২য় প্রশ্নপত্রের ধরন দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যায় এবং উহা অত্যধিক কঠিন হইয়াছে অভিযোগ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে। কোন একটি কেন্দ্রে মেয়েদের মধ্যে অনেকে কান্নাকাটিও করে। তবুও শেষ পর্য্যন্ত তাহারা কোনরূপ বিশৃঙ্খল আচরণ না করিয়া কেহ বা শূন্য খাতা, কেহ বা অর্দ্ধ লিখিত খাতা যথারীতি দাখিল করিয়া আসে।

উপরোক্ত হাঙ্গামায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মহল উদ্বিগ্ন হন। যে সব কেন্দ্রে ঐ ভাবে কেমিষ্ট্রির ২য় পত্রের পরীক্ষা নষ্ট হইয়াছে, সেই সব কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের ঐ পেপারের পরীক্ষা সম্বন্ধে কি করণীয়, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ এখনও ঠিক করেন নাই। ঐ সম্পর্কে পরে সিণ্ডিকেটের সভায় যাহা হয় স্থির করা হইবে। ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার হইতে পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত কেন্দ্রে যথারীতি কর্ম্মসূচী অনুযায়ী বাকি বিষয়গুলির পরীক্ষা গৃহীত হইবে বলিয়া অস্থায়ী ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এবং কণ্ট্রোলার ডঃ শ্রীনরেশচন্দ্র রায় সাংবাদিকগণের নিকট ঘোষণা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ আরও ঘোষণা করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবন ও আশুতোষ ভবনে আর্টস, সায়েন্স, কমার্স, ল' এবং অন্যান্য যে সব শ্রেণীর ক্লাস হইয়া থাকে, আজ বৃহস্পতিবার এবং কাল শুক্রবার—এই দুইদিন সেই সব শ্রেণীর সমস্ত ক্লাস ছুটি থাকিবে। কতকগুলি পরীক্ষা-কেন্দ্রে হাঙ্গামাজনিত অবস্থার পরি-প্রেক্ষিতেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লিখিত হয়।

বুধবার অপরাহ্নের দিকে বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্রে হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়াই কলিকাতার পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ দ্রুত বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিস প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। পুলিস দল কোন কোন কেন্দ্রের সম্মুখে মোতায়েন থাকিয়া বিশৃঙ্খলা রোধের চেষ্টা করে। তিনটি কেন্দ্রের নিকট হইতে পুলিস এই দিন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে ১৬ জন যুবককে গ্রেপ্তার করে। পরে অবশ্য তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

জানা যায় যে, বুধবারের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতার পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার হইতে বিভিন্ন পরীক্ষা-কেন্দ্রের সম্মুখে পুলিস পাহারা মোতায়েন করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া

পুলিসের টহলদারী গাড়ীও বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

কলিকাতায় প্রায় ৬৪টি কেন্দ্রে আই-এ এবং আই-এস্‌সি পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে এবং এই দিন শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুমান ১০ হাজার পরীক্ষার্থী কেমিষ্ট্রি পরীক্ষা দেয়। তন্মধ্যে প্রায় ৫০০ ছাত্রী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিষ্ট্রির দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা গ্রহণকালে বুধবার উত্তর ও মধ্য-কলিকাতার কতকগুলি কেন্দ্রে যে বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা হয়, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এক বিশেষ সভা হয়। সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ ছাড়াও কতকগুলি কলেজের অধ্যক্ষগণ ঐ সভায় যোগদান করেন।

প্রকাশ, সিণ্ডিকেটের সদস্যগণ বুধবারের ঘটনার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস শ্রবণ করেন এবং ঠিক হয় যে, সিণ্ডিকেটের সদস্যগণ অপর একটি বৈঠকে মিলিত হইয়া এই বিষয়টি পুনরায় পর্য্যালোচনা করিবেন। সেই সময় সিণ্ডিকেট যদি উপরোক্ত কেমিষ্ট্রি পরীক্ষাটি পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন তাহা হইলে উহা এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদই গ্রহণ করার ব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

ইতিমধ্যে অপরাপর পরীক্ষা নির্দিষ্ট কার্য্যসূচী অনুযায়ী চলিতে থাকিবে।

শিল্পপতি ও পণ্ডিত নেহরু

পণ্ডিত নেহরুর ভাবধারার চিন্তাধারা নিম্নস্থ ভাষণে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়:

নয়াদিল্লী, ৭ই মার্চ্চ—প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু অদ্য ভারতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়িগণকে বলেন যে, জগতে কায়েমী স্বার্থের ক্রমশঃ অস্তিত্ব লোপ পাইবে এবং "যাহা কিছু দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করিবে বা তাহাদের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ হইবে, তাহা বিলুপ্ত হইবেই।"

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু অদ্য প্রাতঃকালে বিজ্ঞান ভবনে ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতি সমিতি সঙ্ঘের ৩২তম বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন-প্রসঙ্গে উক্তরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

পণ্ডিত নেহরু দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতামূলক পদ্ধতির প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সঙ্ঘের সভাপতিও তাঁহার বক্তৃতায় অনুরূপ ধরনের মন্তব্য করায় পণ্ডিত নেহরু তাহার প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, দেশের সম্মুখে লক্ষ্য কি রহিয়াছে এবং কি অবস্থার মধ্যে তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইতেছে, এ সম্বন্ধে যদি কোন মতদ্বৈধ না থাকে, তবে কি নীতি অনুসরণ করা হইবে, না হইবে তাহা লইয়া মতভেদে কিছু আসে যায় না। কারণ জীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই নীতিগুলি পরস্পরের কাছাকাছি আসিতে বাধ্য হইবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিশ্বে বহু বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। "তথাপি আমরা সরকারের মধ্যে অথবা সরকারের বাহিরেই থাকি না কেন, আমাদের সকলেরই কিছুটা অটল মনোভাব পোষণ করার দিকেই প্রবণতা বেশী। আপনারা আমাকে একথা বলার জন্য ক্ষমা করিবেন যে, যে ধরনেরই কায়েমী স্বার্থ হউক না কেন, কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তির মনোভাব অপেক্ষা আর কাহারও মনোভাব অধিকতর অটল নহে। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সমালোচনা নহে, ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এই ব্যাপার ব্যষ্টি ও গোষ্ঠী সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। এই পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বে যাহারা পরিবর্ত্তনের দাবী করে, তাহাদের সহিত কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।"

পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, যাঁহারা ঘটনাচক্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহারা অস্বস্তি বোধ করেন? কারণ, অন্যান্য সকলে তাঁহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে চায়। সাধারণ কথায় এই অবস্থাকে শ্রেণী সংঘর্ষ ইত্যাদির মত নানা নামে অভিহিত করা হয়। ইহার উপর অধিক গুরুত্বদান ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার মনঃপূত না হইলেও, ইহাকে উপেক্ষা করার অর্থ জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর দিকে চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকা। সুস্পষ্টরূপেই বিভিন্ন স্তরে সংঘাতশীল স্বার্থ রহিয়াছে এবং যথাসম্ভব বেদনাদায়ক অবস্থা পরিহার করিয়া এই সমস্ত স্বার্থকে দূরীভূত করা সমাজ অথবা সরকারের কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, সব সময় এই কার্য্য বেদনাদায়ক না হইয়া যায় না। যাহাদের কোন না কোন প্রকারের স্বার্থ আছে—কায়েমী স্বার্থ আছে, তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে, সেই পরিবর্ত্তনের ব্যাপারে তাহাদের কিছুটা বেদনাবোধ অনিবার্য্য। অবশ্য সেই স্বার্থের পরিবর্ত্তন সাধন করা না হইলে অধিকতর বেদনার কারণ ঘটিবে। অতএব সেই অবস্থার দিক হইতেও ইহার (পরিবর্ত্তনের) প্রয়োজন আছে।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, "আমরা উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে নীতি অনুসরণ করিতেছি এবং যেভাবে আমরা তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে যাইতেছি, তাহার উপর" তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, "মোটের উপর চিন্তার উদ্দেশ্যের সমগ্রতায় বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির চিন্তার সমন্বয়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। অন্যথায় আমরা কেবল অপসৃয়মান বালুকারাশির সহিত তাড়িত হইতে থাকিব এবং অবস্থার দাস হইয়া পড়িব। কেবল অবস্থার দাস হওয়া নহে, পরন্তু যথাসাধ্য তাহা অতিক্রম করিয়া চলাই সভ্য জীবনের সমগ্র উদ্দেশ্য।"

শ্রেণীহীন সমাজ সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু বলেন, প্রথম প্রথম যখন শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলা হইত, তখন ইহাকে বড় রকমের একটা বিপ্লবের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হইত। এখন দেখা যাইতেছে, যেসব দেশে পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সর্ব্বাধিক বিকাশ ঘটিয়াছে, সেসব দেশেও শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলিতে শোনা যাইতেছে। বস্তুতঃ যেসব দেশ শ্রেণীহীন সমাজের কথা মুখে বলে, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিক হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেইরূপ

অনেক দেশ অপেক্ষা বেশী অগ্রসর। শব্দ কিরূপ ভ্রান্তি সৃষ্টি করে ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত। আমরা বাঁধা-গতে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, ভুলিয়া যাই যে পরিবর্ত্তনশীল জগতে পুরাতন ধারণারও পরিবর্ত্তন ঘটে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মনটা এক অচলায়তনের গণ্ডীতে আটক থাকিয়া যায়।

শিল্পপতি সম্মেলন

শিল্পপতিদিগের মধ্যে শ্রীরামস্বামী মুদালিয়র কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। ইঁহার চিন্তাধারায় মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষণের অংশবিশেষ আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম:

বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীএ. রামস্বামী মুদালিয়ার গতকল্য ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতি সমিতি সঙ্ঘের ৩২তম অধিবেশনের এক ভোজ-সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, বিভিন্ন করধার্য্যের ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে একই রকম ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, সরকারী শিল্পের অন্তরায় হিসাবে বেসরকারী শিল্প সম্বন্ধে দেশে অনেক কথাই হয়। যদি ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা হইলে কোন শিল্প বেসরকারী হউক অথবা সরকারী হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু হাঙ্গামা তখন বাধে, যখন দেখা যায় যে, সরকারী শিল্প বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

তিনি বলেন, সম্প্রতি দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সমালোচনার বিষয় হইয়াছে এবং শিল্প ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক সুখকর নহে। এমন কি শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর ন্যায় লোকও সম্প্রতি আমার নিকট এই "ঠাণ্ডা লড়াই"য়ের অবসানের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে কিরূপ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শ্রীমুদালিয়ার বলেন যে, এমন এক সময় ছিল যখন এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হইত। পার্লামেণ্টে আমি যে সব বক্তৃতা শুনিয়াছি তাহাতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এমন রূঢ় সমালোচনা করা হইয়াছে যেন তাঁহারা সমাজের 'ঘৃণ্য' লোক এবং তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নহে।

তিনি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এই পেশার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে আবেদন জানান। তিনি বলেন, "আমি দেখিতে চাই যে, আমরা যেন ভদ্রলোক হিসাবে গণ্য হই এবং আমাদের যেন অপরাধী বলিয়া মনে করা না হয়।"

বিদেশ হইতে ঋণের বোঝা না বাড়াইয়া দেশেই বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগে সরকারকে উৎসাহ গ্রহণ করিতে এবং বৈদেশিক মূলধন আনার ব্যাপারে উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে বলা হয়। প্রস্তাবে চাকুরী সংস্থানের সুবিধার জন্য দেশে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই অভিমতও প্রকাশ করা হয় যে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠাও সমধিক প্রয়োজন।

শ্রীমুদালিয়ার বস্ত্রশিল্পের সঙ্কটজনক অবস্থার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং ইহার সহিত যাঁহারা জড়িত বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তাঁহাদের দায়ী করেন। দেশের আর্থিক নীতি সম্বন্ধে ডাঃ কালডর যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি তাহার তীব্র সমালোচনা করেন।

সঙ্ঘ কর্ত্তৃক গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তঃরাজ্য ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠন করিতে বলা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে মাল চলাচল সংক্রান্ত যে সব নিয়ম-কানুন আছে, অবাধে মাল চলাচলের ব্যাপারে যাহাতে তাহার অন্তরায় না হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সংক্রান্ত অপর একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, চাকুরীর বাজারে মন্দা পড়ায় মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এক সঙ্কটজনক সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। গত দেড় বৎসরে দেশের বৈষয়িক ক্ষেত্রে আশানুরূপ কাজকর্ম্ম না হওয়ায় ও খাদ্যশস্যের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সম্প্রদায়ের কষ্ট আরও বাড়িয়াছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য তাহাদের ছোটখাট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি বণ্টন ও বিক্রয়ের জন্য ভারতীয় শিল্পপতিদের সচেষ্ট হইতে বলা হইয়াছে।

দুর্গাপুরের আশাপথ

দুর্গাপুরের শিল্পায়নে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যাহা আশা করেন তাহা নীচের সংবাদে স্পষ্টই বুঝা যায়। আমরাও আশা করি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে।

দুর্গাপুর, ১৪ই মার্চ্চ—প্রখর রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল রাঙ্গামাটির বিস্তীর্ণ আশ্রয়ে, নবনির্ম্মিত কয়লাচুল্লীর কোলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক, অর্থশাস্ত্রবিদ্, সাহিত্যিক, রাজকর্ম্মচারী এবং নাগরিকের এক বিরাট সমাবেশ উন্মুখ আগ্রহে প্রতীক্ষারত। ডঃ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ক্ষুদ্র একটি রূপালী প্রদীপের শিখা হইতে হেমবর্ণ গ্যাসমশালে অগ্নিসংযোগ করিলেন, অমনি অনতিদূরে অবস্থিত অর্দ্ধশতাধিক ফুট উচ্চ গ্যাস চিমনির আকাশমুখী শিখা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই শিখা অনির্ব্বাণ। এই শিখা অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গের শিল্পভিত্তিক জীবনের এক নবীন উদ্বোধনের প্রতীক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গঠিত সওয়া সাত কোটি টাকা মূল্যের এই কয়লাচুল্লী কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এইভাবে সম্পন্ন করিয়া ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, এই কারখানা স্থাপনের দ্বারা ভারতের শিল্পসম্পদের অপচয় নিবারণের সূচনা হইল। সূচনা হইল বিরাট অপচয়কে কাজে লাগাইয়া নব নব সম্পদসৃষ্টির পালার। এই উদ্বোধন সেদিক হইতে দেশের ভাবী সম্ভাবনারই সূচনা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দুর্গাপুরে কোকচুল্লী কারখানার উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। ডাঃ রায় বলেন, "আজ

আমরা শিল্প-প্রতিষ্ঠার যে কার্যক্রম সূচনা করিতেছি, তাহাই বৃহৎ শিল্পোন্নয়নের অগ্রদূত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এবং এই শিল্পোন্নয়ন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জনসাধারণকে এবং বহুকাল ধরিয়া তাঁহাদের উত্তর-পুরুষকে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক সুযোগ সুবিধা দান করিবে।"

অতঃপর ডাঃ রায় বলেন যে, দুর্গাপুরে যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে এই অঞ্চলের উদ্বৃত্ত জনশক্তিকে নিয়োজিত করা যাইতে পারিবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই স্থানে কোকচুল্লীর কারখানা এবং তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ছাড়াও এই স্থানে ভারত সরকার কর্তৃক সরকারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি ইস্পাতের কারখানা, বীক্ষণ কাচ উৎপাদনের কারখানা এবং কয়লাখনির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা এবং বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে উচ্চচাপবিশিষ্ট বয়লার নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হইতেছে।

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, কোকচুল্লী কারখানায় যে কোক-ওভেন গ্যাস উৎপন্ন হইবে, তাহা কলকারখানায় ব্যবহারের জন্য, আলো জ্বালাইবার জন্য এবং গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সরবরাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ডাঃ রায় বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন দুর্গাপুরে একটি বাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত করিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। কারণ এই এলাকায় বহু শিল্প, বিশেষ করিয়া কয়লা-নির্ভর শিল্পগুলির উন্নয়নবিধানের জন্য সঞ্চিত জলরাশি সদ্ব্যবহারের এক সুবর্ণ সুযোগ উহার ফলে পাওয়া যায়। এই সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিয়া ১৯৪৯ সনে সরকার এখানকার জঙ্গলাকীর্ণ এক বিশাল ভূখণ্ড দখলের জন্য একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। এখন এই এলাকা অনেক উন্নত হইয়াছে। দুর্গাপুর হইতে যে নাব্য খালটি খনন করা হইতেছে, উহার কাজ সম্পূর্ণ হইলে কলিকাতায় অল্প খরচে ভারী ভারী মালপত্র পাঠানো সহজসাধ্য হইবে। পূর্ব্বে কলিকাতা ও পশ্চিমে মোগলসরাইয়ের সহিত দুর্গাপুরের বৈদ্যুতিক ট্রেন সংযোগ-ব্যবস্থা স্থাপনেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে। স্থানটির ভবিষ্যৎ গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার এক শত ফুট প্রশস্ত একটি কলিকাতা-দুর্গাপুর সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাঃ রায় আরও বলেন যে, দুর্গাপুরে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে আশপাশের অঞ্চলের কর্ম্মহীনদের জীবিকার সংস্থান হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখানে কোকচুল্লীর কারখানা ও তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, ভারত সরকার স্থাপন করিয়াছেন ইস্পাত কারখানা এবং বেসরকারীভাবে স্থাপিত হইয়াছে একটি চশমার কাঁচ নির্মাণের কারখানা ও একটি খনিযন্ত্র নির্মাণের কারখানা। বেসরকারীভাবে একটি উচ্চচাপ বয়লার নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠাও আসন্নপ্রায়। এখানকার কারখানায় উৎপাদিত কোক-গ্যাস কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের শিল্পকার্য্যে এবং পথঘাট আলোকিত করার ব্যাপারে ও গৃহস্থের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করিতে সরকার চাহেন। তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা হইতে ছোট-বড় সকল শিল্প ও কুটীর-শিল্পকে সস্তা দরে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হইবে।

ডাঃ রায় বলেন, যে সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে বা হইবে, তাহার জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৮ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশের হার্ডকোকের অভাব আছে। দুর্গাপুর সে অভাব পূরণ করিবে। আলকাতরা, ন্যাপথলিন, পিচকেনল ইত্যাদি বিভিন্ন উপজাত সামগ্রীর মধ্যে এই কারখানায় দৈনিক দেড় কোটি ঘনফুট গ্যাসও উৎপাদিত হইবে।

৬০ হাজার কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা দুর্গাপুর পরিকল্পনারই অচ্ছেদ্য অংশ। বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা এই রাজ্যে ক্রমশঃই বাড়িতেছে। অনুমান করা যাইতেছে যে, ডি-ভি-সি ও পশ্চিমবঙ্গ তাপ-বিদ্যুৎ কারখানাও ভবিষ্যতে বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা মিটাইতে পারিবে না।

ডাঃ রায় বলেন, শীঘ্রই এই এলাকায় একটি কারিগরি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। বস্তুতঃ দুর্গাপুর এলাকা অচিরে একটি পুরাদস্তুর শিল্পনগরী হইয়া উঠিবে। এখানকার বাসিন্দাদের জন্য হাট-বাজার, বিদ্যালয়, পার্ক, হাসপাতাল ইত্যাদি সকল রকম সুখ-সুবিধারই ব্যবস্থা করা হইবে।

ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণের উপসংহারে যে সকল দেশী-বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান দুর্গাপুর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুব্রত আন্দোলন

'আনন্দবাজার পত্রিকা' নীচের বিবরণ দিয়াছেন। আমরা তাহার দীর্ঘ উক্তি দিলাম কেননা, আমরা আচার্য্য তুলসীর মহান্‌ব্রত অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছি :

"অনুব্রত আন্দোলনের প্রবর্তক আচার্য্য শ্রীতুলসী রবিবার মহাজাতি সদনে এক বিরাট সমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে ধনকুবেরদের অর্থলিপ্সার কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, শোষণ ও অন্যায় ভাবে অর্থোপার্জ্জন ছাড়া কখনও ধনকুবের হওয়া যায় না। তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে ভেজাল না মিশাইবার জন্য আবেদন জানান এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মচারীদের উদ্দেশে অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ না করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

সর্ব্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন যে, আধ্যাত্মিক বিলম্ব না হইলে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মানবসমাজ ও সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য।

সভার সূচনায় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন যে, এদেশে খাদ্যদ্রব্যে যত ভেজাল দেওয়া হয়, এমন আর কোন দেশে নয়।

আচার্য্য শ্রীতুলসী-প্রবর্ত্তিত অনুব্রত আন্দোলন ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে পালন করিতে পারিলে ঐ সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর হইতে পারে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। সকল ধর্ম্মের মূল অহিংসা। জীবনে অহিংসা ও সংযম পালন করিতে পারিলে নূতন সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, বর্ত্তমানে সমগ্র বিশ্বে এক আধ্যাত্মিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকে এক নৈতিক অধঃপতনের পটভূমিকার সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের উন্নয়নের জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে, কিন্তু মানুষ তৈয়ারি করা হইতেছে না। ইহা না হইলে সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কাজ নিষ্ফল হইবে।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, মানুষের জীবনে যে আধ্যাত্মিক শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পূরণ করিতে না পারিলে এই বৈজ্ঞানিক যুগে ধ্বংস কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। বিজ্ঞান অতুলনীয় ধনসম্পদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং ধর্ম্মকে অনাবশ্যক বলিয়া গণ্য করিতেছে। এই আনবিক যুগে মানবজীবন ধর্ম্ম-ভিত্তিক না হইলে বিজ্ঞান মানবসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে। এজন্য এক সর্ব্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বিপ্লবের প্রয়োজন। সমগ্র মানবসমাজের মুক্তি না হইলে ব্যক্তিগত মোক্ষ নিরর্থকতায় পর্য্যবসিত হইবে। তিনি অনুব্রত আন্দোলনের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেন।

আচার্য্য শ্রীতুলসী বলেন, আজকাল অর্থোপার্জ্জন করাই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজে অনাচার ও ভ্রষ্টাচার ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জ্জন না করিলে কেহ ধনকুবের হইতে পারে না। তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষাবাদ, জাতিবাদ এবং প্রাদেশিকতাবাদ বর্জ্জন করিতে অনুরোধ জানান।

আচার্য্যজী নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানকালে দুর্নীতির উল্লেখ করেন এবং বলেন, এইরূপ দেখা যায় যে, "নোট না হইলে ভোট মিলে না।" অর্থ সংগ্রহের জন্য নেতৃবৃন্দকে ধনকুবেরদের শরণাপন্ন হইতে হয়। ধনকুবেরেরা তাঁহাদের এই জন্য টাকা দেন যে, পরে তাঁহারা উহা "চার গুণ উশুল করিয়া লইবেন।" তিনি প্রশ্ন করেন—"ইহা কি মানবতার হত্যা নয়?" যাঁহারা ভবিষ্যতে আইন প্রণয়ন করিবেন তাঁহারাই নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানকালে এইভাবে আইন ভঙ্গ করেন। তাঁহার মতে দলগত রাজনীতি এত ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, মানুষ আর মানুষ থাকিতেছে না। এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে দেশের রক্তাক্ত বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, ঐ অবস্থায় জন্য জনসাধারণ নহে, নেতারাই দায়ী হইবেন।

আচার্য্যজী বলেন, সংযমই জীবন। দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে মানবতাকে রক্ষা করিতে হইবে এবং সংযমের আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে।

সভায় জানান হয় যে, আগামী ৫ই এপ্রিল কলিকাতায় "মৈত্রী দিবস" উদ্‌যাপন করা হইবে।"

ডাঃ মুকুন্দরামরাও জয়াকর

প্রবীণ উদারনৈতিক নেতা ডাঃ মুকুন্দরামরাও জয়াকর গত ৩০ই মার্চ্চ বোম্বাইয়ে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে এমন এক যুগ গিয়াছে, যখন সার তেজবাহাদুর সপ্রু ও এম, আর. জয়াকরের নাম সকলেরই মুখে মুখে উচ্চারিত হইত। মানুষের চিন্তাধারা প্রতি যুগে বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। ভারতে মুক্তি-আন্দোলনেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। এই মুক্তি-আন্দোলনে জাতীয় সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে ডাঃ জয়াকর ও সপ্রুর নাম এই জন্যই স্মরণীয় হইয়া আছে। ডাঃ জয়াকর ছিলেন ব্যারিষ্টার। ১৯১৬ সনে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে প্রথম রাজনীতিতে যোগদান করেন।

ভারতের বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে সপ্রু-জয়াকর এমন এক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহাদের সাহায্য এবং সহ-যোগিতা অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। ১৯৪৮ সনে তিনি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন এবং বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটি দিক লইয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ডাঃ জয়াকর পরিণত বয়সে যে আত্মজীবনী রচনা করিয়াছেন, উহাও ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হিসাবে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

রাজনীতিতে নরমপন্থী বা উদারনৈতিক নেতা হিসাবে তাঁহার পরিচয় হইলেও উহাই একমাত্র পরিচয় নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে, আইনের ক্ষেত্রে ও দেশোন্নতির বিবিধ ক্ষেত্রে যে অক্লান্তকর্ম্মের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয়। মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও মনুষ্যত্বই যে বড়, ডাঃ জয়াকরের জীবনই তাহার প্রমাণ।

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

যাঁহারা সন ১৩৬৫ সালে প্রবাসীর গ্রাহক আছেন, আশা করি, আগামী ১৩৬৬ সালেও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন।

গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী বর্ষের বার্ষিক মূল্য ১২ বারো টাকা মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার কুপনে তাঁহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমার পক্ষে অসুবিধা হয় এবং তিনি নূতন বা পুরাতন গ্রাহক ইহা ঠিক করিতে না পারায় ভি-পিও চলিয়া যায়।

অতএব প্রার্থনা যেন তাঁহারা গ্রাহকনম্বরসহ টাকা পাঠান, অন্যথায় পূর্ব্ব গ্রাহক নম্বরে ভি-পি যাইতে পারে; তাহা ফেরত দিবেন।

যাঁহারা আগামী ২৬শে চৈত্রের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না তাঁহাদের নামে বৈশাখ সংখ্যা ভি-পিতে পাঠানো হইবে।

যাঁহারা অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে ২০শে চৈত্রের পূর্ব্বেই জানাইয়া দিবেন।

ভি-পিতে টাকা পাইতে কখনও কখনও বিলম্ব ঘটে, সুতরাং প্রবাসী পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠানো সুবিধাজনক। ইতি—

প্রবাসী-ম্যানেজার

শ্রীনিকেতন হলকর্ষণ উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবী একদিন যখন সমুদ্রস্নানের পরে জীবধাত্রী রূপ ধারণ করলেন তখন তাঁর প্রথম যে প্রাণের আতিথ্য-ক্ষেত্র সে ছিল অরণ্যে। তাই মানুষের আদিম জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যচর রূপে। পুরাণে আমরা দেখতে পাই এখন যে সকল দেশ মরুভূমির মত প্রখর গ্রীষ্মের তাপে উত্তপ্ত, সেখানে এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত দণ্ডক নৈমিষ খাণ্ডব ইত্যাদি বড় বড় সুনিবিড় অরণ্যছায়া বিস্তার করে ছিল। আর্য্য ঔপনিবেশিকেরা প্রথম আশ্রয় পেয়েছিলেন এই সব অরণ্যে, জীবিকা পেয়েছিলেন এরই ফলেমূলে আর আত্মজ্ঞানের সূচনা পেয়েছিলেন এরই জনবিরল শান্তির গভীরতায়।

জীবনযাত্রার প্রথম অবস্থায় মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য পশুহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তখন সে জীবজননী ধরিত্রীর বিদ্রোহাচরণ করেছে। এই বর্বরতার যুগে মানুষের মনে মৈত্রীর স্থান ছিল না। হিংস্রতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তখন অরণ্য মানুষের পথ রোধ করে নিবিড় হয়ে থাকত। সে ছিল এক দিকে আশ্রয় অন্য দিকে বাধা। যারা এই দুর্গমতার মধ্যে একত্র হবার চেষ্টা করেছে তারা অগত্যা ছোটো সীমানায় ছোটো ছোটো দল বেঁধে বাস করেছে। একদল অন্যদলের সংশয় ও বিদ্বেষের উদ্দীপনাকে নিরন্তর জ্বালিয়ে রেখেছে। এই রকম মনোবৃত্তি নিয়ে তাদের ধর্মানুষ্ঠান হয়েছে নরঘাতক। মানুষ মানুষের সব চেয়ে নিদারুণ শত্রু হয়ে উঠেছে, সেই শত্রুতার আজও অবসান হয় নি। ঐ সব দুষ্প্রবেশ্য বাসস্থান ও পশুচারণ-ভূমির অধিকার হতে পরস্পরকে বঞ্চিত করবার জন্য তারা ক্রমাগত নিরন্তর লড়াই করে এসেছে। পৃথিবীতে যে সব জন্তু টিঁকে আছে তারা স্বজাতি হত্যার দ্বারা পরস্পর ধ্বংসসাধনের চেষ্টা করে না।

এই দুর্গম্যতায় বেষ্টিত আদিম লোকালয়ে দস্যুবৃত্তি ও ঘোর নির্দয়তার মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল এবং হিংস্র শক্তিকেই নৃত্যে গানে শিল্পকলায় ধর্মানুষ্ঠানে সকলের চেয়ে গৌরব তারা দিয়েছিল। তার পর কখনো দৈবক্রমে, কখনো বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ সভ্যতার অভিমুখে আপনার যাত্রাপথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। এই দিকে তার প্রথম মহান্ আবিষ্কার আগুন। সেই যুগে আগুনের আশ্চর্য ক্ষমতাতে মানুষ প্রকৃতির শক্তির যে প্রভাব দেখেছিল আজো নানা দিকে তার ক্রিয়া চলেছে। আজও আগুন নানা মূর্ত্তিতে সভ্যতার প্রধান বাহক। এই আগুন ছিল ভারতীয় আর্যদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম মার্গ।

তার পর এল কৃষি। কৃষির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছে। পৃথিবীর গর্ভে যে জননশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল সেই শক্তিকে আহ্বান করেছে। তার পূর্ব্বে আহার্যের আয়োজন ছিল স্বল্প পরিমাণে এবং দৈবায়ত্ত। তার ভাগ ছিল অল্প লোকের ভোগে। এই জন্য তাতে স্বার্থপরতাকে শান দিয়েছে এবং পরস্পর হানাহানিকে উদ্যত করে রেখেছে। সেই সঙ্গে জাগিলো ধর্মনীতি। কৃষিসম্ভব করেছে জনসমবায়। কেননা বহুলোক একত্র হলে যা তাদের ধারণ করে রাখতে পারে তাকেই বলে ধর্ম। ভেদবুদ্ধি বিদ্বেষবুদ্ধিকে দমন করে শ্রেয়োবোধ ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলার ভার ধর্মের 'পরে। জীবিকা যত সহজ হয় ততই ধর্মের পক্ষে সহজ হয় প্রীতিমূলক ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। বস্তুতঃ মানব-সভ্যতায় কৃষিই প্রথম পত্তন করেছে সাত্ত্বিকতার ভূমিকা। সভ্যতার সোপানে আগুনের পরেই এসেছে কৃষি। একদিন কৃষিক্ষেত্রে ভূমিকে মানুষ আহ্বান করেছিল আপনসখ্যে। সেই ছিল তার একটা বড় যুগ। সেই দিন সখ্যধর্ম মানুষের সমাজে প্রশস্ত স্থান পেয়েছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে আরণ্যক সমাজ শাখায় শাখায় বিভক্ত ছিল তখন যাগযজ্ঞ ছিল বিশেষ দলের বিশেষ ফল কামনায়।

বনসম্পদ ও শত্রুজয়ের আশায় বিশেষ মন্ত্রে বিশেষ শক্তি কল্পনা করে তারি সহযোগে বিশেষ পদ্ধতির যজ্ঞানুষ্ঠানে তখন গৌরব পেত। কিন্তু যে হেতু এর লক্ষ্য ছিল বাহ্য ফললাভ এই জন্য এর মধ্যে বিষয়বুদ্ধিই ছিল মুখ্য। প্রতিযোগিতার সঙ্কীর্ণ সীমায় ছিল এর মূল্য। বৃহৎ ঐক্যবুদ্ধি এর মধ্যে মুক্তি পেত না। তার পরে এল এক যুগ, তাকে জনক রাজর্ষির যুগ নাম দিতে পারি। তখন দেখা গেল দুই বিদ্যার আবির্ভাব। ব্যবহারিক দিকে কৃষিবিদ্যা, পারমার্থিক দিকে ব্রহ্মবিদ্যা। কৃষিবিদ্যা জনসমাজকে দিলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্কীর্ণ সীমা থেকে মুক্তি, সম্ভব করলে সমাজের বহুলোকের মধ্যে জীবিকায় মিলন। আর ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে ঘোষণা করলে আত্মবৎ সর্বভূতেষু ন পশ্যতি স পশ্যতে।

কৃষিবিদ্যাকে সেদিন আর্যসমাজ কত বড় মূল্যবান বলে জেনেছিল তার আভাস পাই রামায়ণে। হলকর্ষণ রেখাতেই সীতা পেয়েছিলেন রূপ। অহল্যাভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্যপর্বত ভেদ করে ভারতের দক্ষিণকে এক করেছিল। যে অনার্য রাক্ষসেরা আর্যদের শত্রু ছিল তাদের শক্তিকে পরাভূত করে, তাদের হাত থেকে এই নূতন বিদ্যাকে রক্ষা করতে, উদ্ধার করতে বিস্তর প্রয়াস করতে হয়েছিল। পৃথিবীর দানগ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠলো মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্বরতা ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্য তাপে দুঃসহ। এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ উৎসব। আজকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাবনিকাশের উপলক্ষ্যে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অন্নসত্রে একত্র হবার যে বিদ্যা মানব-সভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনের আনন্দ স্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে। কৃষিযুগের পরে সদর্পে সম্প্রতি এসেছে যন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাঙ্গণে পণ্যদ্রব্য দিচ্ছে ঢেলে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না। একদিন মানুষের জীবিকা যখন ছিল সঙ্কীর্ণ সীমায় পরিমিত, তখন মানুষ ছিল পরস্পরের নিষ্ঠুর প্রতিযোগী। তখন তারা সর্বদাই মারের অস্ত্র নিয়ে উদ্যত। সে মার আজ আরো দারুণ হয়ে উঠলো। আজ তার ধনের উৎপাদন হচ্ছে যতই অপরিমিত, তার লোভ ততই তাকে ছাড়িয়ে চলেছে। অস্ত্রশস্ত্রে সমাজ হয়ে উঠছে কণ্টকিত। আগেকার দিনে পরস্পর ঈর্ষায় মানুষকে মানুষ মারত কিন্তু তার মারবার অস্ত্র ছিল দুর্বল তার হত্যার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। নইলে এত দীর্ঘযুগের ইতিহাসে এতদিনে একটি পৃথিবীব্যাপী কবরস্থান সমুদ্রের এক তীর থেকে আর এক তীর অধিকার করে থাকত। আজ যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহু শত শতঘ্নী। আর যুদ্ধের শেষে তার হত্যার হিসাব ছাড়িয়ে চলেছে প্রভূত শত সংখ্যা। আত্মশত্রু আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংসবন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায় তারও প্রেরণা ছিল লোভ। মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায় সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রচণ্ড একটা চিতা সেখানে। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, তার ললিতকলা।

যন্ত্রযুগের বহু পূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ কর্ব্ব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানগণকে পরিমিত অন্ন পরিবেশন করেছেন। যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট, যা এত বীভৎস রকমে উদ্‌বৃত্ত ছিল যার স্তূপের উপরে কুশ্রী লোলুপতায় মানুষ নির্লজ্জ ভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে লুটোপুটি হানাহানি করতো না।*

---

* শ্রীনিকেতন সচিব স্বর্গীয় রায়বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত ও তাঁহার কন্যা পুষ্প দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

জাতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হায়দ্রাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি পড়ছিলাম। একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে :

…every Congress Committee and every Congressman must always remember the great message of Mahatma Gandhi that means should never be subordinated to ends and public life should be governed by moral and ethical principles and high standards of integrity.

প্রস্তাবটি পড়ে মনে অনেক চিন্তার তরঙ্গ উঠল। কর্ম্মীদের বলা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর বাণীকে নিয়ত স্মরণ রাখতে। কি সেই বাণী? অহিংসার এবং সত্যের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে স্বরাজের গগনচুম্বী ইমারত আশী কোটি হাতের শ্রম দিয়ে।

Swaraj is a mighty structure. Eighty croses of hands have to work at building it.

গান্ধীজী স্বকার্য্যসাধন করে চলে গেছেন পরলোকে। প্রিয়তম দুই শিষ্য জওহরলাল এবং বিনোবা গুরুদেবের ধ্বজাকেই বহন করে চলেছেন। উভয়েরই কণ্ঠে প্রেমের এবং সত্যের জয়ধ্বনি। বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস অহিংসার এবং সত্যের আদর্শকে হৃদয়াকাশে ধ্রুবতারার মত জ্বালিয়ে রাখবার জন্যে প্রত্যেক কংগ্রেসকর্ম্মীর কাছে আবেদন জানিয়েছে, প্রত্যেক কংগ্রেস কমিটিকে নির্দ্দেশ দিয়েছে গান্ধীজীর উপদেশ স্মরণে রেখে কাজ করতে।

অহিংসার এবং সত্যের আদর্শ দুইটিকে এতটা মূল্য দেবার মধ্যে বাড়াবাড়ি কিন্তু একটুও নেই। মনে রাখতে হবে ইংরেজ শাসনের অবসান ছিল উপায়, লক্ষ্য ছিল স্বরাজ। আর স্বরাজ বলতে ঠিক কি বুঝায় তা গান্ধীজীর ভাষায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বরাজ হচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তির মুক্তি—জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই মুক্তি। স্বরাজে ক্ষুধার্ত নেই কেউ, ব্যাধিগ্রস্ত বিরল, কাজের মধ্যে আনন্দ রয়েছে, একে অন্যকে সহানুভূতির চোখে দেখে, মনগুলি রাজভয়, লোকভয়, মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি পেয়েছে। পূর্ণ স্বাধীনতার বা স্বরাজের এই জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্ন আমাদের চোখে দিয়ে গেছেন গান্ধীজী। শুধু একটা বিরাট আলো-ঝলমল স্বপ্ন দিয়ে গেলেন না। কোন্ পথে গেলে স্বপ্ন ফলবান হবে তারও নিশানা দিয়ে গেলেন রচনাত্মক কাজের ফিরিস্তীর মধ্যে।

একটা দেশ মহিমময় হয়ে ওঠে—সে কি শুধু গগনচুম্বী অট্টালিকা শ্রেণীর দ্বারা, না বড় বড় স্কুল-কলেজ অথবা গ্রন্থাগারকে আশ্রয় করে? অনেক লোকের বসতি অথবা ধনরত্নের প্রাচুর্য্য থাকলেই কি একটা দেশ 'সকল দেশের রাণী' হবার গৌরব করতে পারে? মার্কিন কবি হুইটম্যান বলছেন, একটা দেশ তখনই গৌরবের দাবি করতে পারে যখন তার মানুষগুলির মধ্যে দেখা যায় মনুষ্যত্বের মহিমা।

A great city is that which has the greatest men and women.

If it be a few rugged huts it is still the greatest city in the whole world.

মহানগরী ত তাকেই বলি যেখানে সেরা সেরা পুরুষের আর সেরা সেরা নারীর বসতি।

সেই জায়গা যদি কয়েকটি পর্ণকুটিরের সমষ্টি হয় তবু তাকেই বলতে হবে সারা পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম শহর।

আকাশচুম্বী সৌধরাজীকে নয়, নানা পণ্যদ্রব্যে সুসজ্জিত দোকানপসারকে নয়, ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য অথবা লোকসংখ্যার বিপুলতাকেও নয়—প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে একটি মর্য্যাদা আছে তাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন গান্ধী—যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন হুইটম্যান। মানুষের জীবন যেখানে উন্মেষিত হয়ে উঠল না জ্ঞানের মধ্যে, সকল-ডোবান প্রেমের মধ্যে, চিত্তের অকুণ্ঠ নির্ভীকতার মধ্যে, মনুষ্যত্ব যেখানে খর্ব্ব হয়ে রইল ভয়ে, মূঢ়তায়, আত্মকেন্দ্রিকতায়—সেখানে কি সার্থকতা থাকতে পারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার আর স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রাচুর্য্যের?

গান্ধীজীর পরিকল্পিত স্বরাজের ছবিতে তাই ত হীরা-মুক্তামাণিক্যের কোন ঘটা নেই, নেই জনাকীর্ণ শহরগুলির প্রগল্‌ভ জৌলুস, নেই সভ্যতার চোখ ঝলসানো ঠাট। স্বরাজের বৈশিষ্ট্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মুক্তিতে। গান্ধীজীর স্বপ্নের স্বরাজে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। মানুষের আত্মার মূল্য, জীবনের মূল্য আর

সমস্তকিছুর মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে। হুইট্‌ম্যানের সেই অবিস্মরণীয় কথাগুলি :

I swear, I begin to see the meaning of these things,
It is not the earth, it is not America who is so great,
It is I who am great or to be great, it is You up there or any one,

শপথ করে আমি বলছি, এত দিনে আমি বুঝতে পাচ্ছি এই সমস্ত কিছুর তাৎপর্য্য,
পৃথিবী নয়, আমেরিকাও এত বড় নয়,
বড় আমি অথবা আমাকেই হতে হবে বড়, বড় হচ্ছ ঐ তুমি অথবা যে কেউ।

কিন্তু মহৎ মানুষ বলতে আমরা কি ধরনের মানুষ বুঝব? ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন্ কোন্ আদর্শ মূর্ত্ত হয়ে উঠলে তবে মানব মহামানবে রূপান্তরিত হয়? ভারতবর্ষের মহাকবিরা, মহাপুরুষেরা যা বলে গেছেন, লিখে গেছেন তাদের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করতে পারি সেই সব বিরাট আদর্শকে যারা হচ্ছে ভারতীয় চরিত্রের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য এবং যাদের উপরে আমাদের সভ্যতাকে একান্ত ভাবে নির্ভর করতেই হবে। কারণ একথা ঠিকই No policy can succeed if it be not in accord with national character, (The National Being—A, E.)

জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে যার মিল নেই এমন নীতি কখনও কার্য্যকরী হতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছিলেন : "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?" পরানুকরণ সত্যই আত্মঘাতী। অন্যকে অনুকরণ করে আমরা কোনকালে মহত্ত্বের শিখরে আরোহণ করতে পারব না।

আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের, প্রাচীন সাহিত্যের একটা মস্ত বড় সার্থকতা আছে। ওরা আমাদের জাতীয় চরিত্রের আভাস দেয়। ঐ চরিত্রই ত বারে বারে আত্মপ্রকাশ করে আমাদের জাতীয় জীবনে। এ যুগের এত জটিলতার মধ্যেও জাতির যা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য তা আত্মগোপন করে নেই। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি টেকনলজিকে মূল্য দিয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আরও মূল্য দিয়েছে moral and ethical principleগুলিকে। মহামানব বলতে ঠিক কি ছাঁদের মানুষ বুঝায় তার একটা ছবি কি আমরা আমাদের মহাকাব্য রামায়ণের মধ্যে খুঁজে পাইনে? রামচরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি সত্যানুরাগের এবং প্রেমের মধ্যে নয়? প্রবল সত্যানুরাগই ত তাঁকে সিংহাসনের মোহ থেকে ছিন্ন করে নিয়ে গেল অরণ্যের গভীরে। রামচন্দ্রের বিশাল প্রেমের আকর্ষণেই ত বনের বানরেরা হ'ল তাঁর পরমাত্মীয়। রাম আদিকবির অন্তরের নিবিড় স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এমন একটা গরিমাময় চরিত্র যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হাজার হাজার মানুষের মনকে একটা বিশেষ আদর্শের রঙে রাঙিয়ে আসছে। রামচরিত্র কখনই এমন চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠত না, যদি না মাঝখান থেকে কৈকেয়ী এসে অযোধ্যার রাজপরিবারের প্রশান্ত জীবনযাত্রার উপরে বৈশাখী ঝড়ের মত ভেঙে না পড়ত। সময়ের স্রোতে রামচন্দ্রের জীবনতরী ভেসে চলেছিল শান্তছন্দে। পৃথিবীর আর দশ জন রাজপুত্রের মত যথাকালে মুকুটিত হয়ে তিনি যদি সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করে যেতেন তবে তাঁর জীবনের অভিব্যক্তির মধ্যে নাটকীয় কিছু খুঁজে পেতাম না আমরা। এমন কত রাজা আসে, কত রাজা চলে যায়। একটা জাতির মহাকাব্যের নায়করূপে চিত্রিত হবার যোগ্যতা রাখে কয়জন? রামচন্দ্র সসাগরা ধরণীর সিংহাসনে আরোহণ করবেন; অযোধ্যায় উৎসবের কি ঘটা; ঠিক এমনি সময়ে কৈকেয়ী স্বামীর কাছে জানালেন রামচন্দ্রকে বনে পাঠাবার প্রার্থনা। দশরথ কৈকেয়ীর দুইটি প্রার্থনা পূর্ণ করবেন—এ প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়েছিলেন। কৈকেয়ী বরপ্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের জীবনে একটা নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল। পিতা সত্য দিয়েছেন বিমাতাকে। পিতৃসত্যপালনে উদাসীন থাকলে মাথায় রাজমুকুট; আরামের সীমা নেই। আর সত্যপালনের পথ গ্রহণ করলে রাক্ষসসঙ্কুল অরণ্যের গভীরে নির্ব্বাসিতের বিঘ্নবহুল জীবন। যে মুহূর্ত্তে রামচন্দ্র সত্যকে আশ্রয় করে বনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন সেই মুহূর্ত্তে বিধাতা মুকুটহীন যুবরাজের মস্তকে এমন একটি অদৃশ্য মুকুট পরিয়ে দিলেন যার স্বর্ণজ্যোতির কাছে কোটি কোহিনূরের দীপ্তি ম্লান হয়ে যায়।

রামচন্দ্র বাল্মীকির অনেক দিনের কল্পনা দিয়ে তৈরী। কত রাজ্য ভাঙল, কত রাজ্য উঠল। সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যে রামচন্দ্র আজও ভারতবর্ষের হৃদয়মন্দিরে বিরাজ করছেন কালজয়ী পুরুষসিংহের দেবদুর্লভ মহিমায়। আদিকবি মহাকাব্যে যে আদর্শের কণ্ঠে জয়মাল্য পরিয়ে গেছেন সেই সত্যনিষ্ঠার আদর্শই ত যুগে যুগে ভারতের মহামানবদের কাছ থেকে পূজার নির্ম্মাল্য পেয়ে আসছে। আইরিশ কবি এবং দার্শনিক এ.ই. ঠিকই মন্তব্য করেছেন :

The better minds in every race, eliminating passion and prejudice, by the exercise of the imaginative reason have revealed to their countrymen ideals which they recognized were inplicit in national character.

প্রত্যেক জাতির মধ্যে যাঁরা মনস্বী তাঁরা অনাসক্ত মন নিয়ে এবং কল্পনা ও যুক্তি উভয়কেই সহায় করে সেই সব আদর্শকেই দেশবাসীর সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন যাদের সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের মজ্জাগত একটা মিল আছে।

এই মন্তব্য যে কত সত্য তা রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়লেই নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করা যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক 'বিদায় অভিশাপ' কবিতাটির ইঙ্গিতের কথা। এর মধ্যে রস রয়েছে গভীর, সুষমা রয়েছে প্রচুর, কিন্তু আরও একটা বৈশিষ্ট্যে কবিতাটি অনুপম হয়ে আছে বিশ্বসাহিত্যে। এই বৈশিষ্ট্য বিদায় অভিশাপের নৈতিক আদর্শের মহিমায়। বৃহস্পতিপুত্র কচ শুক্রাচার্য্যের কাছ থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখে দেবলোকে ফিরে যেতে উদ্যত। গুরুগৃহে এতকাল কেটেছে, যেমন তপোবনে সব শিষ্যের কাটে। কচ বেণুমতীর তীরে তীরে গুরুর গোধন চরিয়েছে, তরুতলে তৃণাসনে নির্জ্জনে একমনে অধ্যয়ন করেছে, গুরুকন্যা দেবযানীর শূন্য-সাজি শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে ভরে দিয়েছে, গুরুকন্যাকে কত সন্ধ্যায় গানও শুনিয়েছে। কচের ছাত্রজীবনে এমন কিছু ঘটে নি যাকে ঠিক নাটকীয় বলা যেতে পারে। বিদায়-বেলায় অকস্মাৎ কচের জীবনে এল একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। ঈর্ষ্যান্বিত দৈত্যগণের কাছ থেকে নয়, স্বয়ং দেবযানীর কাছ থেকে আর এই ধাক্কায় কচের বিদায়ের ক্ষণটি সত্যই নাটকীয় হয়ে উঠেছে। কচ ভালবেসে ফেলেছে দেবযানীকে কিন্তু অন্তরের সেই গোপন কথাটি গুরুকন্যাকে কখনও জানতে দেয় নি। দেবযানীও কচকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছে। স্বর্গলোকের দিকে কচ যখন পা বাড়িয়েছে সেই বিদায়ের মুহূর্ত্তে দেবযানী মরিয়া হয়ে নিবেদন করল তার প্রেম। সে কি আবেগভরা মিনতি!

> থাকো তবে, থাকো তবে,
> যেও নাকো। সুখ নাই যশের গৌরবে।
> হেথা বেণুমতী-তীরে মোরা দুই জন
> অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
> এ নির্জ্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
> নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
> নিখিল বিস্মৃত।

এমনি একটা পরিস্থিতিতে কচের মুখ দিয়ে যে উত্তর বেরিয়ে এসেছে তার মধ্যে খুঁজে পাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের চিরন্তন বৈশিষ্ট্যকে। কচ সুখ চাইল না, বরণ করল সত্যকে। দেবতাদের কাছে সে যে কথা দিয়ে এসেছে মহা-সঞ্জীবনী বিদ্যা আহরণ করে স্বর্গলোকে সে ফিরে যাবে। সত্যভ্রষ্ট হলে জীবনে আর রইল কি? না, সুখের লালসায় প্রতিশ্রুতি কিছুতেই ভঙ্গ করা চলে না। অভিমানিনী দেবযানীকে কচ এমন কথা শোনাল যার জন্যে দেবযানী প্রস্তুত ছিল না।

> ভালবাসি কিনা আজ
> সে তর্কে কী ফল। আমার যা আছে কাজ
> সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
> যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
> যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
> চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধপ্রাণে মম
> সর্বকাম্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
> সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
> এই সঞ্জীবনীবিদ্যা করিয়া প্রদান
> নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
> সার্থক হইবে। তার পূর্ব্বে নাহি মানি
> আপনার সুখ।

দেবযানী কচকে যত গভীর করে ভালবেসেছিল কচও কি দেবযানীকে তত গভীর করেই ভালবাসেনি? কচের এই প্রেমের মধ্যে আবেগের কিছুই কমতি ছিল না। কিন্তু হৃদয়াবেগের বশে কচ যদি সত্যকে বেণুমতীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বনের নিভৃত ছায়ায় দেবযানীকে নিয়ে নীড় বাঁধত সে ভালবাসায় তার জীবন কোন সার্থকতা লাভ করত না। জীবনের সার্থকতার পরিমাপ হৃদয়াবেগে, না প্রজ্ঞায়? ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের সংস্কৃতির মাপকাঠিতে প্রজ্ঞাই পেয়েছে প্রাধান্য। গীতার আদর্শ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ। মন যখন যা চাইল তাই করলাম, সংযমের কোনই বালাই নেই, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে কিছু না শিখবার গোঁয়াতুর্মি, বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা, জীবনকে সকল দিক দিয়ে পূর্ণ করে তুলবার দিকে দৃষ্টি না দেবার ঔদাসীন্য—এ সমস্তই বর্ব্বরতার লক্ষণ। ভারতবর্ষের সাধকেরা, মহাকবিরা বর্ব্বরতাকে কখন প্রশ্রয় দেন নি। ভারতের প্রাচীনসাহিত্যে সংযমকে সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে—আবেগকে নয়। রবিঠাকুর সত্যভ্রষ্ট কচকে যদি দেবযানীর ভুজবন্ধনের মধ্যে বেঁধে রাখতেন, সহজাতপ্রবৃত্তি এবং প্রজ্ঞা—উভয়ের দ্বন্দ্বে প্রাধান্য দিতেন প্রবৃত্তিকে তবে বিদায় অভিশাপ হ'ত এ যুগের প্রথিতযশা দার্শনিক Santayanaর ভাষায় Poetry of

Barbarism। এ যুগের আর একজন প্রতিযশা মনীষী রাসেলের লেখায় পড়ছিলাম :

It is thought and spirit that raise man above the level of the brutes.

শুধু প্রাণধারণের জন্তে যেখানে বেঁচে থাকা সেখানে মানুষ জন্তু ছাড়া আর কি? মানুষের জীবনে তখনই কল্যাণের আবির্ভাব হয়েছে যখন প্রজ্ঞা এসে তার জীবনের হাল ধরেছে। প্রজ্ঞার নির্দ্দেশকে উপেক্ষা করে সংসার-পথে বেশী দূর চলতে গেলেই মৃত্যুর অভিশাপ তাকে অমঙ্গল থেকে অমঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাবেই। আত্মসংযমের আদর্শকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দিয়ে কচ যদি দেবযানীকে নিয়ে নীড় বাঁধত সেই নীড়ের জীবন কচকে কত দিন ক্লান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারত? হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে মানুষের জীবনে প্রাণের উচ্ছলতা আসে সন্দেহ নেই। সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে গলা টিপে মারতে গেলে রক্তহীনতায় জীবন নির্জীব হয়ে পড়ে—একথাও ঠিক। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নরনারীর হৃদয়াবেগের দিকটাকে তাই কোথাও অবজ্ঞা করা হয় নি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বাপ যখন বাখরগঞ্জে বিয়ে করতে গেল কবি সেই অবসরে মঞ্জুলিকাকে ফরাক্কাবাদে রওনা করে দিয়েছেন চাটুজ্জেদের পুলিনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। "আগুন হয়ে বাপ বারে বারে দিলেন অভিশাপ।" কিন্তু কবির আশিসধারা নিশ্চয়ই ঝরে পড়েছে মাতৃহারা মঞ্জুলিকার মাথার উপরে। সুতরাং এমন কথা যেন ভেবে না বসি, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ কচকে দেবযানীর কাছ থেকে ছিন্ন করে নিয়ে গেছেন দেবলোকে, ভেঙে দিয়েছেন দেবযানীর স্নেহের সোনালী স্বপ্নকে সেই হেতু হৃদয়াবেগের উপরে তিনি খড়্গহস্ত। মোটেই নয়। বিদায় অভিশাপ কবিতার মধ্যে কবি এই কথাই বলতে চেয়েছেন :

"জীবনকে যদি কল্যাণময় করতে চাও প্রয়োজন আছে হৃদয়াবেগকে সংযমের বাঁধনে বাঁধবার, তাকে প্রজ্ঞার শাসনে আনবার। আর প্রজ্ঞার শুচিশুভ্র আলোতে ভারতের সাধকেরা এবং মহাকবিরা দেখেছেন—জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক—সুখের অন্বেষণ করাই আমাদের চিরকালের মানবীয় স্বভাব। তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে এ সত্যও প্রতিভাত হয়েছে : ইন্দ্রিয়সুখ শাশ্বত নয়; প্রথমটায় লাগে অমৃতের মত; শেষে বিষের জ্বালা। সুখ দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়; পিছে রেখে যায় নৈরাশ্যের তিক্ততা আর ক্লান্তি; সবই মিথ্যে—এমনি একটা অনুভূতি। ইন্দ্রিয়সুখের অনিত্যতার কথা ঠাকুর কি চমৎকার উপমা দিয়েই বলেছিলেন : "আর কামিনীকাঞ্চন ভোগ কি আর করবে? সন্দেশ গলা থেকে নেমে গেলে টক কি মিষ্টি মনে থাকে না!"

এই জন্যই সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে : "অসতো মা সদ্‌গময়।" অনিত্য থেকে নিয়ে যাও নিত্যে। এ প্রার্থনা খুবই স্বাভাবিক; কারণ আমাদের অন্তরাত্মা জীবন থেকে দাবি করে এমন কিছু যা শাশ্বত, যাকে পেলে আমাদের চাইবার আর কিছুই থাকে না। আমাদের আত্মা যখন তার গভীরতম আকাঙ্ক্ষার এই বস্তুটিকে পায় তখন আমরা সব দুঃখের পারে চলে যাই, আমাদের জীবনের পানপাত্র আনন্দ-সুধায় ভরে ওঠে কানায় কানায়।

কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে আমাদের যে শাশ্বত অনির্ব্বচনীয় শান্তি রয়েছে তাকে সহজে লাভ করবার কোনই উপায় নেই; তাকে জয় করে নিতে হয় তপস্যার দ্বারা, সাধনার দ্বারা। অহিংসা এবং সত্য এই সাধনার অঙ্গ। সত্যানুরাগের সঙ্গে ভগবানকে পাওয়ার কি সম্পর্ক—তার রহস্য অপূর্ব্ব ভাষায় ফুটে উঠেছে ঠাকুরের এই কথাগুলির মধ্যে :

"এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট ক'রে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। আমি এই ভেবে যদিও কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, মা। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা, এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। যখন এই সব বলেছিলুম তখন একথা বলতে পারি নাই, মা এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য। সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।"

সত্যের উপরে ঠাকুর যেমন জোর দিয়েছেন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দও তেমনি জোর দিয়েছেন। কতখানি জোর দিয়েছেন তার প্রমাণ তাঁর পত্রাবলী। পত্রাবলীর পাতায় পাতায় সত্যের এবং প্রেমের জয়ধ্বনি। ওয়াশিংটন থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এক শিষ্যকে লিখছেন :

"হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা কখন বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, প্রেমের জয় হইবেই।"

আবার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এক চিঠিতে লিখছেন :

"চালাকীর দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

প্রেম এবং সত্যানুরাগের উপরে আবার জোর। আর একখানি পত্রে আছে :

"আমি সত্যে বিশ্বাসী, আমি যেখানেই যাই না কেন, প্রভু আমার জন্য দলে দলে কর্ম্মী প্রেরণ করেন।"

স্বামীজীর এই ধরনের উক্তি কত আর উদ্ধৃত করব? প্রবন্ধ তা হলে অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যাবে।

সেই বাল্মীকির যুগে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে সত্যের এবং প্রেমের যে জয়ধ্বনি আমরা শুনেছি সেই জয়ধ্বনি রামকৃষ্ণের এবং বিবেকানন্দের কণ্ঠেও। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও এই দুইটি আদর্শই মুকুটিত হয়েছে। বিদায় অভিশাপের মধ্যে সত্যানুরাগের যে-আদর্শ কবির লেখনী থেকে মর্য্যাদা লাভ করেছে সেই একই আদর্শ গৌরবের মুকুট পরেছে "রামকানাইয়ের নির্ব্বুদ্ধিতা" গল্পটিতে। গল্পের উপসংহারে রামকানাইয়ের চরিত্রবল কী অপূর্ব্ব গরিমায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে! সেই অনুপম ছবিটি। সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়ায় রামকানাই—'অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ'। সম্মুখে জজের বিচারাসন। জোড়হস্তে রামকানাই বললে, "আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছে তাহা মিথ্যা।"

আদিকবি বাল্মীকির রামচন্দ্র যেমন সত্যের—আর কারও নয়; মৃত্যুপথযাত্রী পিতা দশরথের নয়, পুত্রবিচ্ছেদ-কাতরা মাতা কৌশল্যার নয়, অযোধ্যার রোরুদ্যমান নাগরিকদেরও নয়, সসাগরা ধরণীর রাজসিংহাসনের আকর্ষণও তাঁকে যেমন সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারল না—তেমনি রবীন্দ্রনাথের রামকানাই রাজপুত্র না হলেও একমাত্র সত্যের, আর কারও নয়। সত্যের আহ্বানে পুত্রকে পর্য্যন্ত সে ত্যাগ করেছে।

সত্যের জন্যে জীবনের সর্ব্বপ্রিয়বস্তুকে পরিত্যাগ করবার এই চারিত্রিক দৃঢ়তার নিদারুণ অভাব ঘটেছে সত্য কিন্তু খুঁজলে জনসাধারণের মধ্য থেকে দুশ' পাঁচশ' রামকানাই এখনও মেলে না—একথা ঠিক নয়। আমাদের দেশের নরনারীর মধ্যে সেই আধ্যাত্মিকতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখনও আছে যা কিছুতেই নষ্ট হবার নয়। নূতনতর ভারতবর্ষ জগৎসভায় আবার গৌরবের আসনে উপবেশন করতে পারে, যদি বড় হবার যথার্থ রহস্যটা আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়। এই রহস্যের সন্ধান দেবার জন্যেই ত মাঝে মাঝে জাতীয় জীবনের রঙ্গমঞ্চে ক্ষণজন্মা পুরুষদের আবির্ভাব। তাঁরা এসে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যান জাতীয় চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা। সেদিনও এমনি একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের কণ্ঠে আমরা শুনেছি, 'হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!'

স্বামীজীর কণ্ঠে এই যে প্রেমের উদার আহ্বান—এই আহ্বানই ত কবির কণ্ঠেও :

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমানভার।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি মহাপ্রভুর কণ্ঠে ঘোষণা করেছে 'মানদ' হবার বাণী; 'মানদ' অর্থাৎ জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। ভারতবর্ষে এত বড় একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম হয়ে গেল পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে তাতেও সত্য এবং অহিংসাকে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সত্য এবং অহিংসাকে বাদ দিয়ে যে-রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে তার মধ্যে আমরা স্বরাজের মহিমাকে কোথাও খুঁজে পাব না—এই কথাই গান্ধীজী আমাদের শুনিয়ে গেছেন, এই কথাই নেহরু সকলকে শোনাচ্ছেন, এই কথাই সেদিনও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি হায়দ্রাবাদে মেঘমন্দ্রস্বরে ঘোষণা করল। উচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে উপায়ও নিষ্কলঙ্ক হওয়া দরকার।

টেকনলজির মূল্যকে খর্ব্ব করতে যাওয়া নিশ্চয়ই মূঢ়তা। কিন্তু তাকে মাথায় নিয়ে এতটা নর্ত্তনকুর্দ্দনও কি মূঢ়তা নয়? টেকনলজিকে আশ্রয় করে জড়প্রকৃতিকে আমরা জয় করেছি, অন্তরীক্ষে পাখীর মত উড়তে শিখেছি,

স্থানের দূরত্বকে বিলুপ্ত করে দিয়েছি—এতে সন্দেহ নেই। সবই সত্যি কিন্তু টেকনলজি বিভিন্ন দেশের মানুষকে পরস্পরের এত কাছাকাছি এনে সমস্যাগুলিকে কি জটিলতর করে নি? যারা পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত তাদের নিমেষের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে টেকনলজি, কিন্তু মনের সঙ্গে মনকে, বিশেষ করে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে মিলিয়ে দেওয়া—এর জন্যে বিস্তর সময়ের দরকার। শুধু তাই নয়। যেখানে পরস্পরের মধ্যে কোন হৃদয়গত সম্পর্ক নেই, কেউ কাউকে বোঝে না সেখানে শারীরিক নৈকট্য শেষ পর্যন্ত মিলনের না হয়ে বিরোধের কারণ হয়ে ওঠে। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক টয়েনবী ঠিকই বলেছেন:

Technology can bring strangers physically face to face with one another in an instant, but it may take generations for their minds and centuries for their hearts, to grow together. Physical proximity, not accompanied by simultaneous mutual understanding and sympathy, is apt to produce antipathy, not affechon, and consequently discord, not harmony.

তাই টেকনলজির প্রয়োজনকে ছোট করে না দেখেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আজকের দিনে মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা টেকনিক্যাল নয়, আধ্যাত্মিক। বিজ্ঞানকে সহায় করে অন্তরীক্ষকে জয় করলে কি হবে? মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে শ্রদ্ধারই যদি অভাব ঘটে, নিজের উৎকট আত্মকেন্দ্রিকতাকে মানুষ যদি জয় করতে না পারে, টেকনলজি পৃথিবীকে সর্ব্বনাশের মধ্যে ডুবিয়ে দেবেই। আবার ঐতিহাসিক টয়েনবীর ভাষায়:

His crux is the spiritual problem of dealing with himself, his fellowmen, and God, not the technical problem of dealing with Non-human Nature,

মানুষের বাধা আজ বাহিরের নয়। পরম বাধা তার নিজেরই মধ্যে। সে বাধা তার আত্মকেন্দ্রিকতা (self centredness).

ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতিতে তাই বিজ্ঞান নিয়ে মাতামাতি নেই। টেকনলজির অনুশীলনে ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হতে পারে; দুর্ব্বলকে পদানত করেও রাখা যেতে পারে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইচ্ছা করলে ঐ বিদ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ছিল আঁধারের পারে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জানা যাঁকে জানলে শাশ্বত সুখের অধিকারী হওয়া যায়। সত্যে অনুরাগ না থাকলে, 'মানব' হতে না পারলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সেই আর্য্যঋষিদের সাধনা আজ জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। জাতির অন্তরের মণিকোঠায় রয়েছে ধর্ম্ম আর একে স্পর্শ করে কার সাধ্য? স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়:

This is the national characteristic, and this cannot be touched,

ঈশ্বর আমাদিগকে পরানুকরণের অপমৃত্যু থেকে নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন। তিনি নাশ করবেন আমাদের আত্ম অবিশ্বাস। পৃথিবীকে আমাদের দেবার মত কি বস্তু আছে তা জানবার দিন কি আজও আসে নি?

শতরূপা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি দিয়ে মঞ্জু স্বাগত জানাল উমাকে। কিন্তু ওর এই হাসিটি উমার তেমন ভাল লাগল না। এর সঙ্গে পরিচয় নেই তার। কতকটা শঙ্কিত এবং বিস্মিত কণ্ঠে সে বলল, তোর কি হয়েছে বল ত মঞ্জু!

মঞ্জু পুনশ্চ একটু হাসল, তার প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করল না।

উমা এগিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখী দাঁড়াল। মঞ্জুর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে খুঁজে দেখতে লাগল ওর এই দুর্বোধ্য হাসির একটা সহজ অর্থ। কিন্তু তার ভাবলেশহীন দৃষ্টির মাঝে হারিয়ে গিয়ে পুনরায় একই প্রশ্ন করল, তোর আজ হ'ল কি মঞ্জু?

মঞ্জুর চাহনি নরম হয়ে এল। কণ্ঠস্বর ভিজে উঠল একটা অব্যক্ত বেদনায় আর অপরিসীম ক্লান্তিতে, সে বলল, সেইটেই এতক্ষণ ধরে ভাবছিলাম উমা। হিসেব করতে বসে বারে বারেই ভুল হয়ে যাচ্ছে, নিজেরই কাজের সমর্থন খুঁজে পাচ্ছি না। আমার বিবেক আর আত্মা কৈফিয়ৎ চাইছে।

উমার চোখে একরাশ বিস্ময়।

মঞ্জু বলতে থাকে, নিজেকে কোনদিন ঘৃণা করে দেখেছিস উমা?

উমা জবাব দেয় না, চেয়ে থাকে।

মঞ্জু বলে, নিজেকে আমি ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি, তাই এগোতে ভয় পাই, পিছিয়ে যাবার সাহসও আমার নেই। এ যে কি অসহনীয় জ্বালা তা তোকে আমি বোঝাতে পারব না।

এতক্ষণে উমা কথা বলল, হঠাৎ নিজেকে ঘৃণা করবার বিলাসিতা তোমার মধ্যে দেখা দিল কেন?

মঞ্জু কতকটা আত্মগত ভাবেই জবাব দিল, ওটা আমারও প্রশ্ন, কিন্তু কথাটা সময় থাকতে একবারও আমার মনে হয় নি, তাইতেই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার সত্তা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে স্বস্থানে ফিরে আসবার জন্যে। কিন্তু পারছে না। বাধা পাচ্ছি নিজের কাছ থেকেই।

উমা একটু হেসে বলল, তুই জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছিস মঞ্জু না তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

মঞ্জু ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হাসল। বলল, তোর কথা সত্যি হলে আমি বেঁচে যেতাম উমা। কিন্তু আমার ভাগ্য অতটুকু দিতেও আজ কার্পণ্য করছে, বুদ্ধি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে। বিবেক বিদ্রূপের হাসি হাসছে। আমি সবই দেখছি—অনুভব করছি কিন্তু মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছি।

মঞ্জু থামল, দু'পা এগিয়ে গিয়ে পাখার রেগুলেটারটা শেষ পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ওর রকম দেখে উমা বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, মঞ্জু—

মঞ্জু ক্লান্ত গলায় সাড়া দিল।

অনেকখানি আগ্রহ নিয়ে উমা বলল, আমি কি তোকে সাহায্য করতে পারি?

অন্যমনস্ক ভাবে মঞ্জু জবাব দিল, না—বরং যা জটিল তাকে আরও জটিলতর করে তুলবে।

ক্ষুব্ধ গলায় উমা বলল, তবুও এত কথা না বলে পারলি না! আশ্চর্য্য!

সত্যিই আশ্চর্য্য উমা। মঞ্জু ক্লান্ত গলায় বলল, নইলে গত দু'দিন ধরে তোকে আমি একান্তভাবে চাইব কেন? তোকে কাছে পেয়ে তাই খুশী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু পারলাম না ভাই, আবার পিছিয়ে যেতে হ'ল।

উমা মঞ্জুর একখানি হাত ধরে ব্যাকুল আগ্রহে বলল, তুই আমাকেও বিশ্বাস করতে পারছিস না এই কথাটাই আমি আজ জেনে যাব?

মঞ্জু ভারি মিষ্টি করে একটুখানি হাসল, কোন জবাব দিল না।

উমা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, তুই হাসছিস কিন্তু আমার কান্না পাচ্ছে মঞ্জু।

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর বেদনায় ভেঙে পড়ল। বলল, আমি কাঁদতে পারি না বলেই দম আটকে আসছে উমা। সব কাজ কি সকলে করতে পারে ভাই!

উমা কিছু না ভেবেই জবাব দিল, চেষ্টা করলেই পারে।

মঞ্জু সহসা অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল। বলল, তোর স্বামীর চোখ এড়িয়ে আমার স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে

পারিস? আমি একটা অপরিচ্ছন্ন সম্বন্ধের কথা বলছি উমা।...

উমার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, উচ্ছন্নে যা— তুই নিশ্চয় আজ প্রকৃতিস্থ নয়। আমি দেখছি বিমলবাবু কোথায় গেলেন।

মঞ্জুও শান্ত ভাবে তাকে বাধা দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, রাগ করে চলে যাসনে উমা। তোকে আমার সত্যিই বড় দরকার, তা ছাড়া তিনি শহরের বাইরে গেছেন।

উমা প্রস্থানোদ্যত হলেও ফিরে দাঁড়াল। রাগত কণ্ঠে বলল, তোর এ ধরনের পাগলামি আর কতক্ষণ চলবে বলতে পারিস।

মঞ্জু উমার মুখের পানে খানিক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে গভীর কণ্ঠে বলল, সব কথা খুলে বলতে পারছি না বলেই তোর কাছে পাগলামি বলে মনে হচ্ছে। একটু থেমে সে পুনরায় বলল, বিষ খেয়ে যে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মরে যায় তার ছটফটানি কোনদিন দেখেছিস?

তাকে বাধা দিয়ে উমা বলল, আমার দেখে দরকার নেই, তীক্ষ্ণকণ্ঠে উমা জবাব দিল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল। মঞ্জু তাকে বাধা দেবারও অবকাশ পেল না।

মঞ্জু নিঃশব্দে সরে গিয়ে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়াল। শূন্য দৃষ্টি মহাশূন্যে নিবদ্ধ হল আকাশে তারার মেলা বসেছে। এমনি আগ্রহ নিয়ে সে আরও বহুদিন তারায় ভরা আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। কত তারা স্থানভ্রষ্ট হয়েছে তার চোখের সামনে। ওরা আবার স্বস্থানে ফিরে এসেছে কিনা সে খবর মঞ্জু রাখে না। সে কিন্তু তার নিজের গণ্ডীর মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে। অথচ কিছুতেই ভাবতে পারছে না যে, তার পায়ের তলার মাটি ঠিক তেমনি করেই তার পদস্পর্শকে ধারণ করছে কিনা। এত বড় পরাজয়ের গ্লানি মঞ্জু কেমন করে বহন করবে।

উমা রাগ করে চলে গেছে। রাগ করবার যথেষ্ট কারণ আছে তার। মঞ্জুর বাল্যবন্ধু উমা। শুধু বন্ধু বললে কম করে বলা হয়। তার জীবনের বহু সুখদুঃখেরও অংশীদার। তবুও আজ উমার কাছে সে মুখ খুলতে পারে নি। জীবনের এত বড় গ্লানিময় বোঝা সে একলাই বয়ে বেড়াবে। অংশ দিয়ে সে বোঝাকে হালকা করে নিতেও সে ভয় পাচ্ছে।

কে?...মঞ্জু ভয় পাওয়া গলায় প্রশ্ন করল।

ভৃত্য সাড়া দিল, আমি মা—

মঞ্জু আশ্বস্ত হ'ল। মৃদুকণ্ঠে বলল, কিছু বলবে আমাকে রমেশ?

রমেশ বলল, নতুন বাবু গাড়ী বের করেছেন। আপনাকে খবর দিতে বললেন।

নীরস কণ্ঠে মঞ্জু বলল, আমি ত গাড়ী বের করতে বলি নি। কথাটা সম্পূর্ণ না করে মঞ্জু থামল, নিজের কথা নিজেরই কানে অত্যন্ত বেসুরো ঠেকল।

রমেশ বলল, গাড়ী কি তুলে রাখতে বলব মা?

মঞ্জু রমেশকে ধমক দিল, বড্ড বোকা তুমি। তাঁকে একলাই যেতে বল। আমার যাওয়া হবে না।

রমেশ দ্বিতীয় কথা না বলে নিঃশব্দে প্রস্থান করল। কিন্তু অনতিবিলম্বে নতুন বাবু অমল এসে উপস্থিত হ'ল বলল, রমেশ বলছিল—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মঞ্জু বলল, রমেশ ঠিকই বলেছে অমলবাবু। আপনি একলাই যান। আমার যাওয়া হবে না।

বউঠাকরুণের কি শরীর খারাপ? অমল প্রশ্ন করল, নইলে হঠাৎ ব্যবস্থাটা বাতিল করলেন কেন? অমল টিপে টিপে হাসতে থাকে।

মঞ্জু শান্ত গলায় বলল, আপনার অনুমান ঠিক। শরীরটা আমার বিশেষ ভাল নেই।

অমল নিরীহ কণ্ঠে বলল, খোলা হাওয়ায় ঘুরে এলে হয়ত কিছু আরাম পেতেন বৌঠান—

বাধা দিয়ে মঞ্জু বলল, না।

রমেশ পুনরায় দেখা দিয়েছে, ও জানতে এসেছে অমলবাবু বার হবেন কিনা—

অমলকে মঞ্জু বলল, আমি না যেতে পারার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আমার জন্যে আপনার প্রোগ্রাম বাতিল করবেন না যেন।

তার পরে রমেশের পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, বাবু বার হবেন রমেশ। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বল।

রমেশ চলে গেল।

অমল ভালমানুষের মত মুখ করে বলল, বৌঠান যখন বলছেন তখন না গিয়ে উপায় নেই। বলে দু'পা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে পকেট থেকে একখানা টেলিগ্রাম বার করে বলল, বিমলের টেলিগ্রাম, খানিক আগে এসেছে। ওর রাঁচি থেকে আসতে দু'দিন দেরী হবে।

একটু থেমে সে পুনরায় বলল, টেলিগ্রামটা আপনার নামে এলেও আমিই ভয় পেয়ে খুলেছিলাম। আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মাপ করবেন। বলেই আর উত্তরের অপেক্ষা না করে অমল দ্রুত ঘর থেকে বার হয়ে গেল; মঞ্জু শঙ্কিত আর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার চলার পথের পানে

খানিক চেয়ে থেকে পুনরায় জানালার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বিমলের টেলিগ্রামখানা তার হাতেই রয়েছে। খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নেবার কথাও তার মনে এল না।

পুনরায় রমেশ দেখা দিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে মঞ্জু বলে, আবার কেন রমেশ?

রমেশ বলে, বাবু বুঝি আজ আসবেন না?

মঞ্জু বলল, না।

রমেশ পুনরায় বলল, বামুন ঠাকুর জিজ্ঞেস করছিল পেসপ্যাসটা কি আপনি দেখিয়ে দেবেন?

মঞ্জু বলল, না—বামুন ঠাকুরকেই রাঁধতে বলগে রমেশ।

রমেশ তথাপি দাঁড়িয়ে আছে দেখে মঞ্জু বিরক্তিভরে বলল, কিরে তবু দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কি বললাম শুনতে পাস নি?

রমেশ ত্রস্তপদে প্রস্থান করল। কিন্তু আজ ক'দিন ধরেই ওর চালচলন মঞ্জুর কাছে ভাল লাগছে না। কারণে-অকারণে দশবার করে ওর সম্মুখীন হওয়া—অনাবশ্যক পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ান তার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। নতুন বাবু সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহটাও মঞ্জুর কাছে বিসদৃশ লাগছে অথচ মুখ ফুটে একটা শক্ত কথা বলতেও সে দ্বিধা করছে। আজকের এই পরিস্থিতির জন্য সে নিজেকেই দায়ী মনে করে। মঞ্জু নিজেরই কাছে নিজে ছোট হয়ে গেছে তাই ওর ভাষা সঙ্গতি হারিয়েছে। বাড়ীর ভৃত্যকেও জোর করে একটা কথা বলতে সে ভয় পাচ্ছে।

আশ্চর্য্য মানুষের মন—মঞ্জু ভাবছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও যদি সে এই পথে চিন্তা করত হয় ত নিজের কাছেও তাকে এভাবে কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত না। স্বামী তাকে সন্দেহ করেন এই চিন্তাটাই তাকে পাগল করে তুলেছিল। তার এই অশোভন সন্দিগ্ধতার পালটা জবাব দিতে গিয়ে আজ সে নিজেরই কাছে জবাবদিহি করতে বসেছে। যে অস্ত্র সে নিজে হাতে নিক্ষেপ করেছে তা ফিরে এসে তাকেই নির্ম্মম ভাবে আঘাত করছে। বিদীর্ণ করেছে তার হৃদ্‌পিণ্ড—টলে উঠেছে সত্তা। আর যাকে উপলক্ষ্য করে মঞ্জুর জীবনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল তিনি আজ নির্ব্বিকার নিরুদ্বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর এই নিরুদ্বেগ মঞ্জুকে নিজের পানে খোলা চোখে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করেছে।

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের পানে চোখ পড়তে মঞ্জু শিউরে উঠল। বিষের জ্বালায় তার সর্ব্বাঙ্গ কালো হয়ে গেছে। যে চিন্তা আজ দু'দিন ধরে তার মনের চেহারা বদলে দিয়েছে তারই সুস্পষ্ট ছাপ ওর মুখের উপর ফুটে উঠেছে। এই চেহারা দেখেই কি রমেশ—মঞ্জু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল অমল। বলল, ভয় পাবেন না—আমি বৌঠান, এইমাত্র ফিরলাম। কেমন আছেন একটা খবর নিতে এলাম।

অমল হাসল। আধো-আলো আর আধো-অন্ধকারে তার দাঁতগুলো আর সেই সঙ্গে চোখ দুটো ঝক ঝক করে উঠল।

মঞ্জু সামলে নিয়ে জবাব দিল, ভালই আছি।

অমল দুঃখ করে বলল, অথচ আপনার জন্য আজকের সন্ধ্যাটা একেবারে মাটি হয়ে গেল। তা যাক কিন্তু আপনি ভাল আছেন শুনে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু...

কথাটা অসমাপ্ত রেখে অমল অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, আপনার স্বামী কি রমেশকে আপনার আমার উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করে গেছেন? অমল এগিয়ে গিয়ে একখানি কৌচে উপবেশন করল।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে মঞ্জু জবাব দিল, হতেও পারে—

অমলের মুখে খানিক চাপা হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে বলল, বৌঠানকে বড্ড বেশী চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে যেন, বিমলের জন্য মন খারাপ হয়েছে বুঝি?

মঞ্জু জ্বলে উঠতে গিয়েও নিভে গেল। মৃদুর গলায় বলল, আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন ঠাকুরপো—

অমলের হাসির শব্দটা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বলল, আমাদের সম্পর্কটা যে ঠাট্টার বৌঠান। অথচ আপনি কোন কিছুকেই ঠাট্টার ভাবে নিতে পারছেন না।

ক্লান্ত হেসে মঞ্জু জবাব দিল, আপনি মিথ্যে বলেন নি।

অমল হালকা হেসে বলল, আপনার দৃষ্টির দেখছি ব্যাপ্তি নেই। জীবনটাকে দেখতে হলে, বুঝতে হলে, জানতে হলে মনটাকে আরও ঢের বেশী উদার করতে হয় বৌঠান। জানালার ফোঁকর দিয়ে যে আকাশকে দেখা যায় সেইটেই তার আসল রূপ নয়—

মঞ্জুর কথায় হঠাৎ খানিক স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বার হয়ে এল। বলল, কথাটা দু'দিন আগে শুনলে আমার উপকার হ'ত ঠাকুরপো। কিন্তু জানালার ফোঁকর দিয়ে যে আকাশ দেখার কথা বললেন, তাকেই কি ছাই বুঝতে পেরেছিলাম?

কেমন করে পারবেন বলুন, অমল বলল, খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চোখ তুলে তাকালে তবেই না তার পরিপূর্ণ রূপের সন্ধান পাবেন বৌঠান—

মঞ্জু একবার তীব্র দৃষ্টিতে অমলের মুখের পানে তাকাল,

তার পরে জোর করেই একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, খোলা মাঠ যদি পায়ের তলা থেকে সরে গিয়ে জলাশয়ে পরিণত হয় তা হলে ভাগ্যে কিন্তু আকাশ দেখার অবকাশ মেলে না…পাঁক আর নুড়ি ঘাঁটাই সার হয়।

অমলের চোখ দুটো জল জল করে উঠল। বলল, মূল্যবান পাথরও মিলতে পারে। আপনি কাঁচা ডুবুরি তাই একটা দিকই আপনার চোখে পড়েছে বৌঠান। শুধু পাঁকই আপনার গায়ে লেগেছে আর নুড়িই হাতে ঠেকেছে—

কথাটা স্বীকার করে নিয়েই মঞ্জু বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন, সব দিক বিবেচনা করে না দেখে যারা জলে নামে তাদের ভাগ্যে ওর বেশী কিছু জোটে না।

অমলের ঠোঁটের ডগায় বড় বিচিত্র ধরনের খানিকটা হাসি ফুটে উঠল। বলল, জলে কখনও দাগ কেটে দেখেছেন বৌঠান ?

মঞ্জু অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলল, থামুন অমলবাবু। ওর কণ্ঠস্বর কতকটা আর্তনাদের মত শোনাল।

অমল কিন্তু থামতে পারে না। তেমনি হাসতে হাসতেই বলে, মানুষের দেহটা হচ্ছে জল। ওতে দাগ পড়ে না। যেটা চোখে পড়ে ওটা ভ্রম। আমার কথাটা একবার খোলা মন নিয়ে ভেবে দেখবেন বৌঠান। এত অল্পেই আপনি মনের স্থৈর্য্য হারিয়ে বসে আছেন।

এতক্ষণে মঞ্জু কতকটা সামলে নিয়েছে। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আপনিও ভুল করছেন ঠাকুরপো। আমার মনের স্থৈর্য্য আবার ফিরে পেয়েছি বলেই জলের দাগ আমার বুকে কেটে বসে গিয়েছে। কিন্তু দোহাই অমলবাবু আপনার যুক্তি থামান—আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে খানিক একলা থাকতে দিন।

অমল উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য্য রকম ঠাণ্ডা গলায় বলল, দেখুন দেখি কি অন্যায়—কথাটা এতক্ষণ আমাকে বলতে হয়। আমি যাচ্ছি কিন্তু কথাটা আর একবার ভেবে দেখবেন বৌঠান। বলেই সে পুনরায় তেমনি টেনে টেনে হাসতে লাগল।

গলান ধাতুর মত সে হাসির ধ্বনি মঞ্জুর কানে এসে প্রবেশ করল। সে চমকে উঠল, আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

অমল হাসতে হাসতেই ঘর ছেড়ে চলে গেল। মঞ্জু ভীরু চোখে তার চলার পথের পানে চেয়ে রইল।

অমল ঘর থেকে চলে গেছে। একটা প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে এতক্ষণ ধরে লড়াই করে মঞ্জু বিরস দেহে অবসন্ন মনে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিল। অকস্মাৎ তার স্বামীর কথা মনে পড়ল। শুধু মনেই পড়ল না, তাঁর উপস্থিতি একান্ত ভাবে কামনা করল মঞ্জু। তার বুক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু নিজের কথা কারুর কাছে প্রকাশ করতে পারছে না। চোখ বুজে এলোমেলো চিন্তা করতে থাকে মঞ্জু।

রমেশ আবার দেখা দিয়েছে, খাবার তাগিদ দিতে এসেছে। বলল, নতুন বাবু আপনার জন্তে খাবার টেবিলে বসে আছেন মা। একটু থেমে রমেশ পুনরায় বলে, আপনার শরীর ভাল নেই শুনছিলাম, বলেন ত আপনার খাবার এখানেই দিয়ে যাই।

মঞ্জু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমিই যাচ্ছি রমেশ। উনি অতিথি। ওকে একলা খেতে দেওয়া ভাল দেখায় না।

রমেশ প্রস্থান করল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুও উঠে দাঁড়াল।

লঘুপদে অতি সন্তর্পণ গতিতে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল মঞ্জু। বেশ রাত হয়েছে। ঠাকুর চাকররাও এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে। মঞ্জু নিঃশব্দে রমেশের বন্ধ ঘরের পাশে এসে উপস্থিত হ'ল। মুহূর্ত্তের জন্ত একটু দ্বিধা করে দরজায় মৃদু আঘাত করল। রমেশ জেগেই ছিল, দরজা খুলে সম্মুখে গৃহকর্ত্রীকে দেখে শঙ্কিত ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, এত রাত্রে আপনি মা !

ওর বিস্ময় মঞ্জুকে ধাক্কা দিল। বলল, উমার বাড়ী যাচ্ছি রমেশ, এইমাত্র ফোন পেলাম। গ্যারেজের চাবি নিয়ে আয়। আমি নিজেই ড্রাইভ করে যাব। আজ আর ফিরব না, গেট বন্ধ করে দিও।

গাড়ী বাড়ীর সীমানা অতিক্রম করে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে অমল এসে উপস্থিত হ'ল। রমেশকে প্রশ্ন করল, এত রাত্রে গাড়ী নিয়ে কে বার হলেন রমেশ ?

রমেশ জবাব দিল, মা নিজেই গেলেন—

একলাই গেলেন বুঝি ? অমল পুনরায় প্রশ্ন করল, কোথায় গেলেন তোমাদের মা-ঠাকরুণ ?

রমেশ নীরব।

অমল বলল, চুপ করে আছ যে…বলি জান কিছু ?

রমেশ জবাব দিল, জিজ্ঞেস করি নি নতুন বাবু। জিজ্ঞেস করবার হুকুম নেই কিনা। ওর কণ্ঠস্বরে খানিকটা চাপা বিরক্তি প্রকাশ পেল। অমলের কানেও তা ধরা পড়ল। মুহূর্ত্তেই সে তার প্রশ্নের ধরনটা পালটে দিয়ে বলল, বাড়ীতে তিন রাত্রি কাটালাম ত রমেশ, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। তা ছাড়া তোমাদের মাঠাকরুণের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না শুনেছিলাম। সেই জন্তেই গাড়ীর শব্দ পেয়ে খানিকটা ভয় পেয়ে ছুটে এসেছি।

আজ্ঞে মা ত বেশ ভালই আছেন নতুন বাবু। রমেশ বিনয়ে একেবারে গলে গেল।

সে ত দেখতেই পেলাম রমেশ। অমল ধীরে ধীরে প্রস্থান করল। রমেশ সদরে তালা বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এল।

উমার কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে ভেঙে পড়ল। অমন করে হাঁপাচ্ছিস কেন মঞ্জু—হঠাৎ এই রাত দুপুরে—কি হয়েছে তোর—মানে কোন বিপদ-আপদ—বিমলবাবু ফেরেন নি না কি?

—বলছি। মঞ্জু বলল, তার আগে এক গ্লাস জল খাওয়া উমা, গলাটা শুকিয়ে গেছে।

উমা জল এনে দিতে এক নিশ্বাসে তা পান করে তার পরে ধীরে ধীরে বলল, উনি দু'দিন পরে ফিরবেন জানিয়েছেন, কিন্তু খুব বিপদে পড়েই এত রাত্রে তোর কাছে আসতে হয়েছে। উনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমি তোর কাছে থাকতে চাই উমা।

মঞ্জুর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারল না উমা। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে সে বলল, ও আবার কি কথা—তোর বাড়ীতে কি স্থানাভাব ঘটেছে মঞ্জু?

মঞ্জু একটু হাসল, জবাব দিল না।

উমা পুনরায় বলল, তোর আজ কি হয়েছে আমি জানি না—জানবার অধিকার তুই দিস নি বলেই আবার নতুন করে জিজ্ঞেস করতে চাই না।

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মঞ্জু হঠাৎ উমার একখানি হাত চেপে ধরে ভেঙে পড়ল। বলল, তুই আমাকে ক্ষমা কর ভাই—না বুঝে আমার উপর অবিচার করিস নে উমা।

উমা কিছুক্ষণ নীরব থেকে অনুরোধপূর্ণ কণ্ঠে বলল, আমাকে অন্ধকারে রাখিস নে মঞ্জু। আমায় বল কিসের জন্য তুই নিজের বাড়ীতেও এমন অসহায় হয়ে পড়েছিস।

এক মুহূর্ত্তের জন্য মঞ্জুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, পরক্ষণেই একটু হাসবার চেষ্টা করে মৃদুকণ্ঠে বলল, সেই কথা বলবার জন্যেই আমি এসেছি। ভেবেছিলাম আমার এত বড় লজ্জার কথা কাউকেই বলব না। তুই রাগ করে চলে এলি—

উমা বলল, আমি রাগ করি নি দুঃখ পেয়েছি মঞ্জু।

মঞ্জু ক্লান্ত গলায় বলল, ও একই কথা।

উমা চুপ করে চেয়ে রইল। মঞ্জু বলতে লাগল, জিজ্ঞেস করছিলি নিজের বাড়ীতে আমার এ অসহায় অবস্থা হ'ল কেন? আমি নিজেই তার জন্য দায়ী। আমি আগুনে হাত পুড়িয়েছি। সে আগুন এখন আমার সর্ব্বাঙ্গ বদলে দিতে এগিয়ে এসেছে।

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর বেদনায় ভারী হয়ে উঠেছে। উমা মুহূর্ত্তের জন্য চমকে উঠল এবং অল্পেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, তোর কথা আমি কাল শুনব, আজ শুতে যাবি আয় মঞ্জু—

মঞ্জু সহসা ওর একখানি হাত শক্ত করে চেপে ধরে, উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, কাল হয় ত আবার আমি পিছিয়ে যাব উমা। তুই বিশ্বাস কর আমি আর গোপনতার ভার বইতে পারছি না—

উমা তেমনি চুপ করেই থাকে। মঞ্জু উত্তেজিত ভাবে বলতে থাকে, তোরা ঘটা করে সকলে মিলে আমার রূপ নিয়ে আলোচনা করতিস। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এমনকি আমার মা ও বাবার ঐ একটি বস্তুকে আমার জীবনের সবার সেরা মূলধন বলে চিরদিন ইঙ্গিত করে এসেছেন। আমার নিজেরও তা নিয়ে অহঙ্কারের অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, আমার দেহের সৌন্দর্য্যের চেয়ে মনের সৌন্দর্য্য যদি আর একটু বেশী থাকত তা হলে হয় ত এত বড় দুঃখ আমাকে পেতে হ'ত না।

রূপ রূপ আর রূপ। জ্ঞান হবার পর থেকেই ঐ একটা কথা সব সময় আমার মনটাকে ঘিরে থাকত। ভাল ঘরে আর বরে বিয়ে হ'ল। সেখানেও ঐ রূপ। স্বামীর বন্ধু-বান্ধবরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—কানের কাছে গুঞ্জন তুললেন—স্বামী পাগলের মত ভালবাসেন সেও নাকি ঐ রূপের জন্য। আমার চেয়ে আমার রূপটা এত বড় হয়ে উঠল যে, আমি নিজে গেলাম হারিয়ে। স্বামী অনুযোগ দিতে সুরু করলেন। সে অনুযোগ এক সময় অভিযোগের রূপ নিল। আমি অবাক হলাম, আমার ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। আমার দেওয়ার মধ্যে একটুও কৃপণতা ছিল না। তবুও কেন এ অভিযোগ? কেন আমার চলা, ফেরা, কথা বলায় চতুর্দ্দিকে ও গণ্ডী টেনে দিতে চায়—কি মনে করে আমাকে—

উমা মৃদুকণ্ঠে ডাকল—মঞ্জু…

মঞ্জু বলতে থাকে, ওর ব্যবহারের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন আমাকে ভাবিয়ে তুলল। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। একটা বিষাক্ত সাপ এঁকেবেঁকে এগিয়ে এসে আমার চিন্তার উৎসমুখে তীব্র বিষ ঢেলে দিল, দৃষ্টি বদলে দিল। ওর প্রত্যেকটি কথার আর কাজের মধ্যে আমি একটা অন্যায় সন্দেহের ছায়া দেখে শিউরে উঠলাম। বিচার করতে গিয়ে অবিচার করে বসলাম, ওর

কথা, হাসি-এমনকি ভাবভঙ্গীর উপরও আমি সজাগ দৃষ্টি মেলে রাখলাম। শান্তি ঘুচল।

উনি ঠাট্টা করেন। আমি তার মধ্যে অশ্লীলতার গন্ধ পাই। ঠাট্টাকে নিছক ঠাট্টা বলে গ্রহণ করতে পারি না। স্বামীর প্রতি মন আমার ধীরে ধীরে বিরূপ হয়ে উঠতে থাকে।

উমা একটি নিশ্বাস চেপে মৃদু কণ্ঠে বলে, এত কাণ্ড ভিতরে ভিতরে করেছিস অথচ একটিবার আমাকে তা জানাস নি!

মঞ্জু শান্তকণ্ঠে বলল, আমার এত বড় পরাজয়ের কথা কোনদিন কারুর কাছে প্রকাশ করব না বলেই চুপ করে ছিলাম।

উমা স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, একে তুই পরাজয় ভাবতে গেলি কেন মঞ্জু।

মঞ্জু ক্লান্ত গলায় জবাব দিল, সেইখানেই ঘটেছে আমার আসল পরাজয় স্বামীকে ভুল বুঝে নিয়ে ভুল করলাম। তাই নিজের ঘরেও অপরের ভয়ে দরজা বন্ধ করে থাকতে হচ্ছে। বাতাসের শব্দে চমকে উঠি। দরজায় মৃদু করাঘাত শুনে পালিয়ে এলাম। বাধা দেবার শক্তিকে যে ইতিপূর্ব্বেই বন্ধক রেখেছি উমা। পাশব শক্তিকে আমি রুখব কেমন করে।

মঞ্জু! উমা ডাকল।

মঞ্জু যেন তার নিজ আয়ত্তাধীনে নেই এমনি ভাবে বলতে থাকে, মিথ্যে নয় উমা—তাই ত এত বড় লজ্জার কথা তোর কাছেও প্রকাশ করতে পারি নি, ভয় পেয়েছি। অমলকে আমি প্রশ্রয় দিয়েছি স্বামীকে শিক্ষা দেবার জন্য—যে দিনের পর দিন কথা দিয়ে ব্যবহার দিয়ে আমাকে পাগল করে তুলেছিল—

উমা চীৎকার করে উঠল, মঞ্জু—

মঞ্জু কান্না-মেশানো হাসি হেসে বলল, এর দরকার ছিল উমা, নইলে হয়ত কোনদিনই আমি নিজেকে চিনতে পারতাম না। মিথ্যে অহঙ্কারটাই আমার জীবনে সত্য হয়ে বেঁচে থাকত, কিন্তু দাম আমাকে কম দিতে হয় নি। শিক্ষা দিতে গিয়ে যে শিক্ষা আমি পেলাম তার আঘাতে আমি পাগল হয়ে উঠেছি।

একটু থেমে সে পুনরায় বলতে লাগল, আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিল অমল আর আমি ক্ষিপ্ত উন্মাদনায় আমার ঝলসান হাতখানা নির্লজ্জের মত স্বামীর চোখের সুমুখে তুলে ধরলাম। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম তাঁর তখনকার প্রশান্ত হাসি দেখে। হাতখানা আমার অসাড় হয়ে গেল। সমস্ত জ্বালা দিয়ে আমায় বুকে আশ্রয় নিল। তিনি বললেন, অনেক দিন পরে আবার তুমি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছ। অমলকে সহজে ছেড়ে দিও না। ও নির্ম্মল বাতাস সঙ্গে করে এনেছে। তোমার মনের মেঘ দু'দিনেই উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

আমি মরে গেলাম উমা, কিন্তু ওর মুখের সেদিনের সে হাসিকে আমি আর নতুন করে ভুল বুঝি নি। ও হাসিতে কোন ছলনা ছিল না। ঘুরিয়ে উপহাস করবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। নিজের পানে আবার ফিরে তাকালাম। নির্ব্বোধের মত যতটুকু এগিয়েছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশী পিছিয়ে এলাম—আতঙ্কে আর অনুশোচনায়। আমার সমস্ত চেতনাকে আজ ঐ প্রশান্ত অমলিন হাসিটি রক্ষাকবচের মত ঘিরে আছে। তুই বল ত উমা, আমি কেমন করে স্বস্থানে ফিরে যাই—কেমন করে আমি মাথা তুলে দাঁড়াই। উনি নির্ব্বিবাদে বাইরে চলে গেছেন অমলকে আমার কাছে রেখে। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে মঞ্জু ভেঙে পড়ল।

উমা তাকে বাধা দিল না। ও কতকটা বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

মঞ্জু পুনরায় ভিজে গলায় বলতে থাকে, অমল কি বলে জানিস? মানুষের দেহটা হ'ল জল। ওতে দাগ কাটলে যে ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ে সেটা নাকি দৃষ্টিভ্রম। কিন্তু আমার দেহটায় যে দাগ পড়েছে সে দাগ যে আমার মনের মধ্যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে উমা। তার হাত থেকে আমি নিজেকে বাঁচাব কোন্ মন্ত্রবলে বলতে পারিস ভাই?

এ মন্ত্রের সন্ধান উমার জানা নেই, তথাপি সে শান্তকণ্ঠে বলল, তুই খুব বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিস মঞ্জু। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে তোকেই মন্ত্রের সন্ধান করতে হবে। এখন ঘুমাতে চল।

মঞ্জু সে রাত্রে প্রচুর ঘুমিয়েছিল। উমার চোখে ঘুম এল না। একটা তীব্র অস্বস্তি তাকে সারারাত ঘুমাতে দেয় নি, জেগে থেকে মঞ্জুকে সে পাহারা দিয়েছে। ভোরের দিকে কখন একসময় যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তা জানতে পারে নি। মঞ্জুর আহ্বানে সে চোখ মেলে তাকাল।

মঞ্জু বলছিল, বাড়ী যাচ্ছি উমা।

উমা উঠে বসল।

মঞ্জু বলল, মন্ত্রের সন্ধান পেয়েছি, পারিস ত বিকেলে একবার আমার ওখানে যাস।

উমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই সে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাড়ীর কম্পাউণ্ডে গাড়ী এসে প্রবেশ করতেই রমেশ

ছুটে এল, আপনি এসেছেন মা—এদিকে নতুন বাবু কাল রাত থেকেই বিস্তর হৈ চৈ সুরু করে দিয়েছেন। আপনি, কোথায় গিয়েছেন—কেন গিয়েছেন—

মঞ্জুর চোখেমুখে খানিক বিরক্তি এবং ক্রোধের ভাব দেখা দিলেও সহজ কণ্ঠেই সে রমেশকে থামিয়ে দিয়ে বলল, খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বাবুর কোন রকম অযত্ন হয় নি ত? সময়মত চা জলখাবার দেওয়া হয়েছে? কি বললে? দিয়েছিলে—তিনি খান নি? আচ্ছা আমিই দেখছি, তুমি যাও রমেশ।

মঞ্জু ধীর পায়ে এসে অমলের ঘরে প্রবেশ করল। অমল চুপচাপ বসেছিল, মঞ্জু হাসিমুখে বলল, অমন চুপ করে বসে আছেন কেন ঠাকুরপো? শুনলাম চা জলখাবার পর্যন্ত ফেরত পাঠিয়েছেন। বড্ড ছেলেমানুষ আপনি, চাকর-বাকর কি মনে করল ভাবুন ত?

অমল এ অভিযোগের কোন জবাব দিল না।

মঞ্জু বলল, লজ্জা পেলেন বুঝি, কি আর করেছেন আপনি ঠাকুরপো! ঠাট্টার মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছে, সেই কথাই আমি উমাকে বলছিলাম। কাল সারারাত আপনাকে নিয়ে আমরা মজা করে গল্প করেছি—

আপনি বৌঠান—। কথাটা সমাপ্ত করতে পারে না অমল।' ওর চোখ'দুটো মুহূর্তের জন্য একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল।

মঞ্জু অদ্ভুত ভাবে হাসতে থাকে। বলে, ভয় নেই, ঠাকুরপো, উমা আমার বাল্যবন্ধু। আপনার গত রাত্রের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা সে আর কাউকে বলবে না আমাকে কথা দিয়েছে। কিন্তু আপনাকে একবার নিজের চোখে দেখবার জন্যে বিকেলে আসবে বলেছে।

শতরূপা নারী—অমল মনে মনে উচ্চারণ করল।

মঞ্জু বলতে থাকে, আলাপ করে খুব আনন্দ পাবেন। দেহ সম্বন্ধে আপনার থিওরীটা উমার খুব ভাল লেগেছে।...

অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে মঞ্জু অকস্মাৎ ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এরই খানিক পরে মঞ্জুর দোর গোড়ায় এসে অমল দাঁড়াল। বলল, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি বৌঠান। যাবার আগে আপনাকে একটা ধন্যবাদ জানাতে এলাম।

অমল অদ্ভুত ভাবে হাসতে থাকে।

মঞ্জু এ হাসি সহ্য করতে পারে না। তীব্রকণ্ঠে বলল আপনার বক্তব্য নিশ্চয় শেষ হয়েছে ঠাকুরপো।

একথার কোন জবাব না দিয়ে পিছন ফিরে অমল চলতে সুরু করল। আর মঞ্জু হাসি আর কান্নায় ভেঙে পড়ল তার শয্যার উপর।

এক-হয়ে-থাকা অবসরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কৈশোরের স্বপ্ন কবে মূর্ত্ত হ'ল যৌবন প্রভাতে
ভুলে গেছি : শুধু পড়ে মনে তুমি এসে সাজি হাতে
করেছ আঘাত মোর দ্বারে ফুল তুলিবার ছলে ;
মায়ার কাজলপরা আঁখি দুটি,—বুঝি তার তলে
রহস্যের ইন্দ্রজালে ঘেরেছিলে বাসনারে ঢাকি,
সেদিন ভাবি নি,—তোমারে পরাতে হবে রাঙারাখী !

প্রণয়ের লিপিখানি ফাল্গুনের প্রথম নিশীথে
উন্মত্ত কামনা সনে অনুরাগে তোমারে সঁপিতে
স্পন্দিত হয়েছে বক্ষ বহুবার। হৃদয়ের তীরে
আবেগের ঢেউগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেছে ধীরে,
তুমি ফিরে ফিরে মোর পানে চেয়ে ছিলে যে বিহ্বল,
রক্তিম কপোলে তব দেখেছিনু উষ্ণ অশ্রুজল !

মন-দেওয়া-নেওয়া এক-হয়ে থাকা অবসরে
রচে নি ব্যাঘাত কেহ, কত কথা, রাণু! গেল ঝরে
ফোটা ফুল সম, তুমি যেন মোর প্রেমের শাখাকে
করেছ বেষ্টন মাধবীলতার মত, পথটাকে
সলজ্জ বর্ণাঢ্য করে চাঁদ-ওঠা অন্তর বিতানে,
তব কলকণ্ঠগীতি শুনেছিনু ধূসর বিহানে।

প্রেম কিগো সচেতন সযতনে আবেশে গভীর
অভিসারক্ষণে! চিত্ত করি প্রসারিত, রচি নীড়
জনারণ্য মাঝে কল্পনার বিবর্ত্তনে, আশা লয়ে
গেয়ে যেতে আশাবরী! নিরালায় সচকিত হয়ে,
তোমারে শুধাই এবে প্রেম কিগো মিথুন-বিলাস,
দেহদীপ তুলে ধরি অতনুর আরতি-উল্লাস ?

কর্ম্মায়তি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জপের সময় ঠিক থাকে না—হরিনাম ও কচিৎ করি।
কিন্তু এখন সারা দিবস ভগবানের দেউল গড়ি।
ক্ষুদ্র দেউল, ক্ষুদ্র অতি, যারা দেখে তারাই কহে,—
আমি জানি গড়িতেছি জগন্নাথের শ্রীমন্দির হে।
সাধ্য নাহি প্রেমের বলে ভগবানকে নামিয়ে আনি,
প্রাণ ভরিয়া চাই গড়িতে তাঁহার বসার আসন খানি।
ভাব যে আমার রূপ লভিছে, ইষ্টকে আর বালি চুণে—
এ নয় আমার জড়ত্ব ভাই—হেসোনা কেউ কথা শুনে।

২

ইঁট বহে দিই, জল এনে দিই, আনন্দেতে সরাই মাটি,
আমি হরির ঘরের লাগি শিল্পী সাথে নিজেই খাটি।
ওই কাজই মোর ভজন, সাধন, তপস্যা আর উপাসনা,—
কাজ করি, তাঁর কাজই করি, কথায় তাঁহার আর থাকি না।
স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন করি নাক এখন আমি,—
দেখি পুণ্য চিন্তা চেয়ে পুণ্য কর্ম্ম অধিক দামী।
ছায়া-পথে ধাওয়া ছেড়ে—আঁধার ঘরে জ্বালি আলো—
গুঞ্জরণের চেয়ে ছোট মধুক্রমও গড়াই ভাল।

৩

মন্দির ময় করলে যারা শ্রীবিশাল এই ভারত ভূমি,
আকাঙ্ক্ষাকে কি রূপ দিলে!—ভাবি এবং নিন প্রণমি।
অমৃতের ও সত্রগুলি কে বসালে—বলিহারি,
মূর্ত্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে যেন ভজন গানের সারি।
যারা গড়ায় যারা সাজায় ভক্ত তারা কম নহে তো—
সাধক তারা, কর্ম্মযোগী সম্ভ্রমে হয় মাথা নত।
অলস জীবন কাটলো আমার, বিস্ময়ে ও প্রশংসাতে—
কিছুই আমি করি নি তো, গড়ি নি তো নিজের হাতে।

৪

সকল ভাঙা মন্দির হায়—ভাঙা দেউল সোমনাথেরই—
অরুন্তুদ দেয় বেদনা, যখন তাহা যেথায় হেরি।
সব দেউলে সন্ধ্যা দেখাই, বেড়াই সারা ভারত ঘুরি',
শঙ্খ হয়ে আমিই বাজি, ধূপ হয়ে যে আমিই পুড়ি।
গড়েছিলাম ভাবের ভুবন অতীত সাথে মিশে ছিলাম—
অস্তমিত সে মহিমা ফিরাইতে কই পারিলাম?
ভাঙার লাগি কান্না ভাল চিন্তা এবং দুঃখ করা,—
তাহার চেয়ে অধিক ভাল একটি নূতন দেউল গড়া।

৫

ভাবের বহু মূল্য আছে—সত্য তাহা অপার্থিব—
তবু আমি তাহার চেয়ে কাজকে অধিক মূল্য দিব।
ভাবই এখন কর্ম্মেতে রূপ করছে দেখি পরিগ্রহ—
আনন্দ যে অসীম এতে—সেবার লাগি কি আগ্রহ!
পূজার ফুলের বাগান রচি—অঙ্গন বেশ বড়ই আছে—
কবিতা মোর—পুষ্প হয়ে ফুটছে এখন গাছে গাছে।
আপনাকে ঘসেই আমি মিলিয়ে যাই চন্দনেতে,—
বজায় রাখি এই চাকুরী জীর্ণ শীর্ণ এই দেহেতে।

৬

কর্ম্ম যতই হোক না ছোট—নয় তা ছোট কর্ম্ম নহে—
সম্ভাবনার পদ্মবীজে পদ্মনাভ লুকিয়ে রহে।
অনেক কিছু ভাবার চেয়ে অল্প কিছু করাই শ্রেয়—
সকল কাজই তাঁহারি কাজ, নয় কোন কাজ অশ্রদ্ধেয়।
ছোট আমি, কাজও ছোট, কিন্তু তাতে নাহিক ক্ষতি,
তাঁহার কর্ম্ম-যজ্ঞকুণ্ডে আমিও তো দিই আহুতি।
প্রভুকে কই ভৃত্য তোমার দেখ কি কাজ করছে নিতি-
যা করি, হোক তোমার প্রিয় শ্রীচরণে এই মিনতি।

ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন (মহাবলীপুরম)

মহাবলীপুরম

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

জেমিনি ষ্টুডিওর পাশ দিয়ে বাস ছুটে চলল। অচিরেই মাদ্রাজ নগরীর সীমা অতিক্রান্ত হয়ে সারিবাঁধা তিন্তিড়ী বৃক্ষের মধ্য দিয়ে সুগম পিচঢালা পথে পূর্ণোদমে অগ্রসর হয়ে চলল বাস। দু'পাশে দিগন্তপ্রসারী শ্যামল ধরিত্রী, ঘনসন্নিবিষ্ট নারিকেলকুঞ্জ, অনুচ্চ অগণিত পাহাড়ের শোভাযাত্রা। স্থানে স্থানে পাহাড়ের চক্রব্যূহ ভেদ করে বিসর্পিল গতিতে আমাদের পেট্রলযান অগ্রসর হচ্ছে। তালীবনরাজি কোথাও নিকটে আসছে, কোথাও দূরে সরে যাচ্ছে। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে প্রাগমধ্যাহ্নকালে বাস পক্ষীতীর্থে এসে পৌছল। জনসমাগমপুষ্ট পক্ষীতীর্থ। আমরা বলি পক্ষীতীর্থ, এখানে বলে তিরুক্কালুকুন্রম্। পর্ব্বতের সানুদেশে একটি বৃহৎ মন্দির, পাঁচ শত ফুট উর্দ্ধে উঠলে পর্ব্বতশীর্ষে একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখা যায়। কিংবদন্তী বলে, স্বর্গত দুই মহাপুরুষের আত্মা পক্ষীরূপে নিত্য দ্বিপ্রহরে পর্ব্বত-শীর্ষের মন্দির প্রাঙ্গণ হতে ভোজ্য গ্রহণ করে যান। যাথার্থ নিরাকরণের সময় ছিল না আমাদের। বাস মাত্র বিশ মিনিট অপেক্ষা করল, তাও আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে। তাই পক্ষীমহারাজদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে এ যাত্রায় আমরা গন্তব্যস্থল মহাবলীপুরমের দিকে অগ্রসর হলাম।

কিছুক্ষণ পরে মহাবলীপুরমের প্রবেশদ্বারে বাস থামল। অতি নির্জ্জন, শান্ত পরিবেশে আত্মসমাহিত মহাবলীপুরম্। পক্ষীতীর্থের ভিড় নেই এখানে, কারণ তীর্থ-গরিমায় এ স্থান সমুজ্জ্বল নয়। তীর্থযাত্রায় আকর্ষণ নেই, আছে সৈকত দেউলের আহ্বান, অনুসন্ধিৎসায় ঔৎসুক্য, শিলা-শিল্পের প্রাণময়তা। মহাবলীপুরমের ডাক তাই সকলের কাছে পৌছয় না, শুনতে পায় শুধু তারাই যারা অতীত-পরিক্রমা করে। এখানে ধর্ম্মধ্বজীরা নেই, পাণ্ডারা নেই বা তাদের ছড়িদারদেরও দেখা মেলে না। তবে কেউ যে নেই, এমন কথা নয়। আছে বৈ কি? গাইডরা আছে। ছোট ছেলে থেকে বুড়ো পর্য্যন্ত সকল বয়সের লোকই এখানে গাইডের কাজ করে। আগন্তুকদের নিয়ে যায় পাহাড়-মণ্ডপে আর রূপকথা শোনায়। একটি ছেলে মাত্র আট আনার বিনিময়ে আমাদের সবকিছু দেখাবার ভার গ্রহণ করলে।

বিস্ময় চকিত চোখে চেয়ে দেখি সম্মুখে চারিটি কৃষ্ণি পাথরের স্তম্ভ। হয়ত এরাই একদা ধারণ করেছিল কোন গোপুরম্ বা ঐ জাতীয় জিনিস, কারণ অনতিদূরেই চোখে পড়ে ক্ষয়িষ্ণু বিষ্ণুমন্দির। কিন্তু মহাবলীপুরম্ ত শিবের রাজ্য, পল্লবরাজগণ ছিলেন শৈব এখানে বিষ্ণুমন্দির এল কি করে? এ প্রশ্নে ইতিহাস নীরব, লোক-সাহিত্য দিয়েছে সমাধানসূত্র। গল্পের মোহিনী শক্তি প্রচার করেছে উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী। কেদার-বদরী পথে উখী-মঠেও উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী সমভাবে প্রচারিত। তবে মহাবলীপুর হ'ল উষার পিত্রালয়। অনিরুদ্ধ বাণরাজকন্যা উষাকে মহাবলীপুর হতে হরণ করে নিয়ে গিয়ে উখী মঠে বিবাহ করে। শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণরাজার তুমুল যুদ্ধ বাধে। পরাজিত বাণরাজ সন্ধির সর্ত্ত-স্বরূপ বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন মহাবলীপুরে। রূপকথাকাররা বলে, এই সেই বাণরাজের বিষ্ণুমন্দির, আজও কালের স্থূল হস্তাবলেপকে অগ্রাহ্য করে

বেঁচে আছে। এসব উপাখ্যানের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার সুধীজনের।

যবনিকার অন্তরালে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল মহাবলীপুর। অষ্টাদশ শতকে ইটালীয় পর্যটক মামুচি হঠাৎ স্থানটি আবিষ্কার করে ফেলেন। সেই থেকে সপ্ত প্যাগোডার দেশ নামে খ্যাতিলাভ করে মহাবলীপুর। এখন সমুদ্র-বেলায় সাতটি মন্দিরের পরিবর্ত্তে তিনটি মন্দির দৃষ্ট হয়। দু'টি ভগ্ন, তৃতীয়টিকে বালুকারাশি গ্রাস করতে বসেছিল। বালুকা-কবলমুক্ত করে সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ পাষাণ-আবেষ্টনে এটিকে অবলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তৃতীয় মন্দিরটির কিছু দূরে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ যেন গর্জ্জনমুখর হয়ে উঠেছে। এখানের লোকে অনুমান করে ঐখানে সলিলসমাধি লাভ করেছে সপ্ত প্যাগোডার অবশিষ্ট মন্দিরগুলি। সমুদ্র-বেলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গাইড ছেলেটি বললে, See, Sir, seven pagodas Sir,one gone not, all lost going to sea, that's that's Sir. অর্থাৎ ঐখানে সাতটি প্যাগোডা মন্দির ছিল। সবই সমুদ্র গ্রাস করে ফেলেছে। মাত্র একটি স্মৃতিবাহী হয়ে বেঁচে আছে। ছেলেটি ইংরেজীর দক্ষিণী উচ্চারণ স্থানীয় ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে মাঝে মাঝে দু-একটা অর্ব্বাচীন হিন্দী শব্দ প্রয়োগ করে এক নূতন ভাষাজাল সৃষ্টি করে সব জিনিসই আমাদের বোঝাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল। মনের ভাব যাতে প্রকাশিত হয়, সেই ত ভাষা। অশুদ্ধ হলেও ছেলেটির ভাষা বুঝতে আমাদের কোন কষ্ট হয় নি।

সপ্ত প্যাগোডার নামকরণের কারণ জানা যায় না কিছু। সমুদ্র সৈকতে সাতটি মন্দিরও নেই, দূরের গ্রামের রথ-মন্দিরগুলির সংখ্যাও সাত নয়, আট। তবে কেন বিদেশীরা 'প্লেস অফ সেভেন প্যাগোডাস' বলে স্থানটিকে অভিহিত করেছিলেন? সমুদ্রগর্ভে বিলুপ্ত হয়েছে বাকি মন্দিরগুলি এমন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও নেই কোথাও।

ইতিহাসের দিক হতে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে পল্লব রাজাদের রাজত্বে গড়ে উঠেছিল মহাবলীপুরে। কাঞ্চি ছিল তাঁদের রাজধানী। এদের একে গড়ে উঠেছিল শৈলমণ্ডপগুলি, শিল্পের কোরক উন্মীলিত হাতে হতে প্রস্ফুট পদ্মে পরিণত হয়েছিল মহামল্ল নরসিংহ বর্ম্মণের রাজত্বকালে। পিতা মহেন্দ্র বর্ম্মণের আমলে আরম্ভ হলেও মহাবলীপুরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নরসিংহ বর্ম্মণের হস্তে। তাঁর মহামল্ল নাম হতেই হয়ত মহামল্লপুরম্ বা মহাবলীপুরম নামের উদ্ভব হয়ে থাকবে। স্থানীয় অধিবাসীরা কিন্তু ও কথা মানে না। পৌরাণিক বলী রাজার উপাখ্যানে বিশ্বাস করে তারা। মহাবলীপুরের নামের দাবিতে বলী রাজার নামই তাদের কাছে অগ্রগণ্য। প্রথম নরসিংহ বর্ম্মণ সূত্রপাত করান শৈল-মণ্ডপ মন্দিরের যার থেকে পরবর্ত্তী কালে দক্ষিণী গোপুরম পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে বলে মনে হয়। আঙ্গিকের নূতন আবেষ্টনে সঙ্কীর্ণতামুক্ত পল্লব ভাস্কর্য্য-শিল্প উত্তরের শিল্প-পদ্ধতি হতে বহুদূর অগ্রগামী হয়েছিল রাজা নরসিংহ বর্ম্মণের প্রচেষ্টায়। আজ সমুদ্রের লবণাক্ত জলকণা বায়ুবাহিত হয়ে ধ্বংসের ইঙ্গিত এঁকে চলেছে শিল্পসুষমার সর্ব্বাঙ্গে। উন্নত দ্রাবিড় স্থাপত্যের নিদর্শনবাহী হয়ে আজও বেঁচে আছে একটি সৈকত-মন্দির। সিংহ-স্তম্ভ, পদ্মচিহ্ন, চতুষ্কোণ 'পেলগৈ', জীবন্ত নির্জীব-জন্তু—বিশেষ করে রথমন্দির-সম্মুখের একটি হাতীর প্রতিকৃতি, বৈশিষ্ট্য দান করেছে পল্লবরাজ মহামল্লের স্থাপত্য-শিল্পকে।

স্থাপত্য-শিল্পের মত রূপকথার রাজ্য এই মহাবলীপুর। শৈল শিলার স্নিগ্ধ রূপায়ণ আর রূপরমণীর লীলায়িত ভঙ্গিমা পাষাণে বিধৃত হবার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রূপকথার আলেখ্য। ঘৃতাচী অপ্সরার অভিশাপে মর্ত্ত্যে জন্ম নিলেন বিশ্বকর্ম্মা ব্রাহ্মণ কন্যারূপে। কালে তিনিই হলেন মহামল্ল মহিষী এবং গড়ে তুলতে লাগলেন শৈল-মণ্ডপের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যশিল্প। রাত্রের অন্ধকারে সুষুপ্তিময় কাঞ্চিপুরম হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজমহিষীরূপী বিশ্বকর্ম্মা মহাবলী-পুরমের পাহাড়ে পাহাড়ে গড়ে চলেছিলেন শিল্পসম্ভার। হঠাৎ একদিন রাজমহিষীকে শয্যায় না দেখে সন্দিগ্ধ হলেন মহামল্ল। তাঁর দ্রুতগামী অশ্ব থেমে গেল মহাবলীপুরের প্রান্তরে। দূরের পাহাড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি লক্ষ্য করলেন তিনি। চোখাচোখি হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি এক প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করলে মহামল্লকে লক্ষ্য করে। হঠাৎ কোথা হতে ছুটে এসে রাজমহিষী বামহস্ত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড পাথর অবলীলাক্রমে ধরে ফেললেন। তার পর মিলিয়ে গেল জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, মিলিয়ে গেল রাজমহিষী। অতীতের সাক্ষী হয়ে আজও পড়ে আছে সেই পাথর একটি ছোট টিলার উপর। এখনও আগন্তুক শঙ্কিত হয় সেই টিলাটা অতিক্রম করতে। পাছে পাথরটা গড়িয়ে ঘাড়ে পড়ে যায়। পাথর কিন্তু পতনোন্মুখ অবস্থাতে থেকেও কত যুগ যুগ ধরে তার ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। অদ্ভুত মহাবলীপুরের এই পাথর, যার অবস্থান-বৈচিত্র্যে আগন্তুকমাত্রেই আকৃষ্ট হবেন।

শ্রুতি-সাহিত্যে সমৃদ্ধ মহাবলীপুর। পাণ্ডবরা নাকি এখানে অজ্ঞাতবাস করেছিলেন কিছুদিন। যাজ্ঞসেনীর রন্ধন-যজ্ঞে বহু অতিথি আপ্যায়িত হয়েছিল এই শৈল-গৃহে। গাইডরা এখনও একটি শিলা-গৃহকে দ্রৌপদীর রন্ধনশালা বলে নির্দ্দেশ করে। অপর একটি শিলা-বেষ্টনী তাঁর স্নানাগার নামে এখনও খ্যাত হয়ে আছে।

বাস থেকে নেমে সামনের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছি আমরা। এক ফার্লং পরেই পেলাম অর্জ্জুন-তপস্যার অনবদ্য ভাস্কর্য্য-শিল্প। নব্বই ফুট দীর্ঘ এবং তেতাল্লিশ ফুট প্রস্থ এক বিশাল পাথর অপরূপ হয়ে উঠেছে শিল্পীর মনের মাধুরীর রূপায়ণে। প্রস্তর-গাত্রে অসংখ্য মূর্ত্তির সারিবদ্ধ রূপ। দেখলে মনে হবে যেন কত অপ্সরা কিন্নরী অর্জ্জুনের তপোভঙ্গের চেষ্টা করছে। আসলে কিন্তু চিত্রটি অর্জ্জুন তপস্যার নয়। মহাবলীপুরের রথ-মন্দিরগুলি পঞ্চ পাণ্ডব-দের নামোৎকীর্ণ। তাই সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা হয়ে থাকবে এ চিত্রটি তৃতীয় পাণ্ডবের পাশুপত অস্ত্রলাভের পূর্ব্বের তপস্যানিরত

মূর্তি। ছবিটি গঙ্গাবতরণের বা ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়নের বলে অনুমিত হয়। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান লাভ করেন। কপিলমুনির শাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত পূর্ব্বপুরুষদের উদ্ধারকল্পে ভগীরথ তপস্যা করে ব্রহ্মা কমণ্ডলু হতে শিবের জটাজালের মাধ্যমে সপ্তধারা গঙ্গার একটি ধারাকে মর্ত্ত্যের মাটিতে নামিয়ে আনেন। মহাবলীপুরের পাথরে গঙ্গানয়নের শিলায়িত রূপ ফুটে উঠেছে।

সামান্য একটু অগ্রসর হতে চোখে পড়ল সরকারের স্থাপত্যবিদ্যালয় স্থাপন-প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ নবনির্ম্মিত কয়েকটি সৌধ। এখানে ভারত সরকার স্থপতি বিদ্যাশিক্ষালয় গড়ে তুলছেন। স্থাপত্য-শিল্পের প্রাণকেন্দ্র মহাবলীপুরে স্থপতি-বিদ্যালয় স্থাপন খুবই সমীচীন হয়েছে বলতে হবে।

মহিষমর্দিনী মূর্ত্তি (মহাবলীপুরম)

সম্মুখের পথে অগ্রসর হয়ে ডাইনে মোড় ঘুরে আবার সোজা অগ্রসর হয়ে প্রায় অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করে একটি ছোট্ট গ্রাম পাওয়া গেল। এই গ্রামের মধ্যে পাণ্ডব-মন্দিরগুলি অবস্থিত। দূর হতে চোখে পড়ে একটি হস্তী। নিখুত শিল্প-সুষমার নিদর্শন এটি। হস্তীটির বৈশিষ্ট্য নিকটে না যাওয়া পর্য্যন্ত এটি যে রক্ত-মাংসের নয়, তা বোঝা কঠিন। মন্দিরগুলি দক্ষিণের অন্যান্য মন্দিরের মত প্রাকার-প্রধান নয়, রথাকৃতি। এক-একটি পাহার কেটে এক একটি মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়েছে। প্রথমেই চতুষ্কোণ কুটীরাকৃতি দ্রৌপদীরথ। সম্মুখে প্রহরারতা দ্বারপালিকা, পশ্চাতে বৃষভ। দ্বিতীয়টি অর্জ্জুনরথ। পার্শ্বে ইন্দ্রারূঢ় ঐরাবত, নন্দীর উপর উপবিষ্ট শিব। তৃতীয় রথমন্দিরটি নকুল ও সহদেবের। চতুর্থটি ভীমসেনের। মধ্যম পাণ্ডবের আকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ঐ রথমন্দিরটি আয়তনে কিছু বৃহৎ করে নির্ম্মাণ করা হয়েছে। এটি সমকোণী চতুর্ভুজের মত। উপরের অংশটি যেন একটি চালাঘর। সর্ব্বশেষে যুধিষ্ঠিরের রথ। কারুকার্য্যের দিক হতে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের রথই শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। রথ-মন্দিরটির পশ্চাতে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি, উভয় পার্শ্বে প্রহরীমূর্ত্তি। দ্রাবিড়ী আকারে নির্ম্মিত তিনতলা বিশিষ্ট এই পিরামিড ধরনের মন্দিরটি ৬০০ থেকে ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়েছিল। পল্লবরাজগণ ছিলেন শৈব। তাই কোন কোন ঐতিহাসিক রথমন্দিরগুলির নামের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করে থাকেন। তাঁদের মতে রথগুলি শিব, পার্ব্বতী, গণেশ, কার্ত্তিকেয় এবং শিবের দেহরক্ষী কালভৈরবের। আরও তিনটি বিক্ষিপ্ত রথ-মন্দির চোখে পড়ল প্রত্যাবর্ত্তনের সময়।

গ্রাম হতে ফিরে আসছি। একদিকে মর্ম্মস্পর্শী প্রকৃতি চিত্র, অপরদিকে মনোবিমোহন মানুষের হাতে গড়া প্রাণবন্ত শিল্পসম্ভার। অনতিদূরে নীল উদ্বেল গর্জ্জনমুখর সমুদ্র। মোড় পর্য্যন্ত এসে বাঁ দিকে অগ্রসর হয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিক্রমা আরম্ভ করলাম। ক্রমোন্নত শৈলপথে আরোহণ করে প্রথমেই প্রবেশ করলাম মহিষমর্দ্দিনী মণ্ডপে। মহাবলীপুরমের শিল্পভাণ্ডারে এটি একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ সন্দেহ নেই। পাহাড় কেটে মণ্ডপ অথবা গুম্ফা নির্ম্মাণের পদ্ধতি ভুবনেশ্বরের উদয়গিরির রাণী-গুম্ফা এবং অন্যত্র নজরে পড়ে। এগুলি যতি-যোগীদের ধ্যানধারণার স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। মহাবলীপুরমের মণ্ডপ-মন্দিরগুলিও বৌদ্ধ-জৈন-সন্ন্যাসীদের আবাস-ভূমি ছিল কিনা কে জানে। কোন্ সে শিল্পী যার নির্দ্দেশে এবং ছেনির আঘাতে পাহাড়ের অঙ্গ কেটে মহিষ-মণ্ডপের দুর্গামূর্ত্তি, কৃষ্ণের গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ-চিত্র, নন্দের দুগ্ধদোহন চিত্র, মধুকৈটভ-বধের চিত্র প্রভৃতি কাব্যময় ভাস্কর্য্য শিল্পসম্ভারগুলি রূপ নিয়েছিল? শিল্পীদের নামের ইতিহাস সমুদ্রে সলিলসমাধি লাভ করেছে যেমন হারিয়ে গেছে মহাবলীপুরের প্রকৃত পরিচয়। মানুষের কোলাহল নেই, সিপাহী-সৈন্যের যুদ্ধনিনাদ নেই, সওদাগরী জাহাজের শীর্ষ-পতাকার পত পত শব্দ নেই। সিংহল, মালয়, যবদ্বীপগামী যাত্রীদের কলধ্বনি কোথাও মিলিয়ে গেছে আজ। শুধু অনুমানের ইট-কাঠ দিয়ে আমরা ইতিহাসের সৌধ রচনা করে চলেছি।

মহিষমর্দ্দিনীর মন্দিরের একপাশে মহিষাসুর বধরতা মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি, অন্য পাশে শায়িত নারায়ণ মূর্ত্তি, মাঝখানে হরপার্ব্বতী। চারিধারের পাষাণে পাষাণে উৎকীর্ণ করা আছে কৈলাসের বৈভব-লীলা আর নন্দী-ভৃঙ্গীর সজাগ প্রহরারত চিত্র। মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির দশপ্রহরণ, মহিষাসুর, সিংহ এবং অনুচরবর্গ প্রত্যেকটিই আজও ভাস্কর্য্য শিল্পের অম্লান নিদর্শন হয়ে আছে। মহিষ-মণ্ডপের শিরে আছে পুরাতন লাইটহাউস। লাইটহাউসটিতে ঝড়ের সঙ্কেতে লবণাক্ত বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত। অতি সন্তর্পণে উপরে উঠে বারিধির বিশাল রূপ দেখে নয়ন সার্থক করতে হয়। ভাগ্যবানরাই

বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা (মহাবলীপুরম)

উপরে উঠলেন। অধম নীচে দাঁড়িয়ে রইল, যদিও একাধিক বীর-পুঙ্গব আমার কাপুরুষতার প্রতি কটাক্ষপাত করে সদর্পে উপরে উঠে গেলেন। বিনোদবাবুর কিছু বেশী সাহস। কাজেই তিনি ত্বরান্বিত হয়ে উঠতে গিয়ে উল্টে পড়লেন এক পাথরের উপর। ভাগ্যিস পাথরটি তাঁকে আশ্রয়দান করলে, নতুবা মাধ্যাকর্ষণের ফলে যদি তিনি মাটি স্পর্শ করতেন তা হলে তাঁকে পঞ্চভূতেই মিলিয়ে যেতে হ'ত।

অভিযাত্রীর দল নীচে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেরা 'হা ডাব, নারিয়েল-এ' ধ্বনি তুলে তাঁদের পিছু নিলে। ডাবের দাম সস্তা। এক আনায় একটা ডাব। প্রত্যেকেই ডাবের জলে শুষ্ক-রসনা সরস করে নিলেন। ছেলেরাও খুশী মনে পয়সা নিয়ে চলে গেল। সম্মুখে নূতন বাতিঘর। এখান থেকে শৈল-সঙ্কুল সমুদ্রে সংঘর্ষ বাঁচানোর জন্য সমুদ্রে বিচরণশীল জাহাজকে রাত্রিকালে আলোকবার্তা পাঠান হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন আলোক-স্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়। এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ পুরাতন আলোক-স্তম্ভই মহাবলীপুর বন্দরের আলোকবার্তার কাজ চালিয়ে এসেছে। নূতন লাইটহাউসে ওঠা অপেক্ষাকৃত সহজ, তাই আমিও উপরে উঠলাম। লাইটহাউসের পাশে একটা ছোট্ট টিলার উপর একটি বিশাল-আয়তনের পাথর স্থির রক্ষিত অবস্থায় দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করছে। এ পাথরটি সম্পর্কে গাইড কোন রূপ-কথা শোনাল না।

নূতন লাইটহাউস থেকে আমরা বাঁদিকে অগ্রসর হয়ে রামানুজ-মণ্ডপে উপস্থিত হলাম। এটি একটি একপ্রস্তর-নির্ম্মিত অসম্পূর্ণ গুহা। এর নির্ম্মাণ সন ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ। গুহার মূর্ত্তিগুলি মুসলমান কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়েছে। রামানুজ মণ্ডপের ডান পাশের একটি অর্দ্ধসমাপ্ত মণ্ডপ অতিক্রম করে আমরা দ্রৌপদীর স্নানাগার নামক স্থানে পৌঁছলাম। এখানে দশাবতার মূর্ত্তি খোদাই-করা অসমাপ্ত কৃষ্ণরথ চোখে পড়ল। এর পরের উল্লেখযোগ্য মণ্ডপ— বরাহমণ্ডপ। ঐ মণ্ডপের অভ্যন্তরে বামদিকে বরাহমূর্ত্তি, ক্রোড়ে সদ্যোত্থিতা পৃথিবী। মণ্ডপের দক্ষিণ প্রান্তে ত্রিপাদ বিশিষ্ট বামন অবতার মূর্ত্তি। তিনি বলীরাজার দর্পচূর্ণ করছেন, মস্তকে একটা পদ স্থাপন করে।

এবার কতকগুলি অর্ব্বাচীন মূর্ত্তি নির্ম্মাণের নিদর্শন চোখে পড়ল। কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ে শিল্পীর ছেনির আঘাতের কয়েকটি দাগ লক্ষ্য করলাম। এ পাহাড়গুলিতে কোন মূর্ত্তি খোদাই করা নেই। কোন মণ্ডপও নেই, শুধু কিছু নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা হয়েছিল বোঝা যায়। অনেক অসমাপ্ত মণ্ডপ ও অসমাপ্ত মূর্ত্তি প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখতে পেলাম। এগুলি দেখে এমনও অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, পরবর্ত্তীকালে এখানে কোন শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তাই বোধ হয় শিল্প-শিক্ষার্থীদের অপটু হাতের শিল্প-নিদর্শন পাষাণের বুকে আঁকা হয়ে আছে। অনুমানই আমাদের অতীত পরিক্রমার প্রধান অবলম্বন।

নির্ম্মাণ শ্রেণী অনুযায়ী চার ভাগে বিভক্ত হতে পারে, মহাবলী-পুরের শিল্প-সম্রাট নরসিংহ বর্ম্মণের প্রস্তরশিল্প। (১) এক প্রস্তর স্তম্ভ অর্থাৎ একটি পাথর কেটে সমগ্র স্তম্ভ বা মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। (২) গুহাস্তম্ভ, (৩) খণ্ড পাথরের নির্ম্মিত মন্দির, (৪) পাহাড়-গাত্রে খোদিত দৃশ্যাবলী। প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন পাণ্ডব রথমন্দিরগুলি।

ডানদিকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে আমরা গণেশরথের সম্মুখে থামলাম। মণ্ডপ মধ্যে কালো পাথরের গণেশমূর্ত্তি। এখানে একটি পুরোহিতকে পূজারত দেখতে পেলাম। গণেশরথকে দক্ষিণে রেখে অগ্রসর হলাম। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্র স্থির হয়ে গেল বিপুলায়তন অত্যদ্ভুত একটি প্রস্তর দেখে। এই সেই পাথর যাকে ঘিরে মহামল্ল আর বিশ্বকর্ম্মা রূপকথা বিস্তারলাভ করেছে। প্রস্তর-খণ্ডটির চারিদিকে সমুদ্রের দুরন্ত বাতাস দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই তাকে কেন্দ্রচ্যুত করতে পারছে না। আগন্তুক ভীত হয় সামনের পথ অতিক্রম করতে। এক ছুটে আমরা পার হয়ে এলাম প্রস্তরখণ্ডটি।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন মহাবলীপুরে কোন্ জিনিস সবচেয়ে বেশী আকর্ষণের। বলব, ঐ পাথর আর হাতী। ঐ দুটো জিনিসই মনকে বেশী নাড়া দেয়। সবই শ্রেষ্ঠ তবে হাতী আর পাথর শ্রেষ্ঠতর। গাইড ছেলেটি বললে, ঐ পাথর হ'ল শ্রীকৃষ্ণের বাটার বল। মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে মাখনের গুলি খেতে দিতেন, সেই গুলির একটা এখন পাথর হয়ে গেছে। ভাবলাম সবই ত বিরাট ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে-ছিলেন যিনি তাঁর নিজের মুখ-বিবরে, তাঁর বাটার বল যখন, তখন ঐরকম পাঁচশ' মণ ওজনের হওয়াই সম্ভব। ছেলেটি বললে, মা যশোদা বাটার বল ছুড়ে দিতেন— আর শ্রীকৃষ্ণ হাঁ করে গিলে ফেলতেন। এখন সেই বাটার পাথর হয়ে গেছে।

ভাবতে লাগলাম কথাগুলো। কোথায় দ্বাপর যুগ, কোথায় শ্রীকৃষ্ণ আর কোথায় বা নন্দগোপালের গৃহ? মথুরার পাশে

গোকুলেই ত দেখে এসেছি নন্দালয়। এখন শুনলাম মা যশোদা এখানেও শ্রীকৃষ্ণকে বাটার বল খাওয়াতেন, সবই অপ্রাকৃত ব্যাপার। ঠাকুর-দেবতার পক্ষে হয়ত সবই সম্ভব। তবু কেমন যেন অবিশ্বাস হ'ল। ছেলেটিকে বললাম, পরিক্রমা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে যে তুমি মহামল্ল মহিষীরূপী বিশ্বকর্ম্মা ঐ পাথরটা বাঁ-হাতে ধরে ফেলেছিলেন বলেছিলে? এবার ছেলেটি মাথা চুলকোতে লাগল। তার মুখ ম্লান হয়ে এল। ছেলেটির বিপত্তি বুঝে আমরা বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করলাম। সেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সামনে দুটি টিলা পাশাপাশি থেকে একটি ত্রিভুজ আকারের গুহা সৃষ্টি করেছে। ছেলেটি বললে, ওটি ভীমসেনের রন্ধনশালা। সম্মুখের অমসৃণ ও সমতল একটি পাহাড় দেখিয়ে বললে, এটি হ'ল খাদ্য পরিবেশনের ঠাই। ছেলেটি সহজে হটবার পাত্র নয়। পাহাড় থেকে অবতরণের সময় সে একটি টিলার উপর জলপূর্ণ কূপের মত স্থান দেখিয়ে বললে, এই দেখুন এখানে মন্থনদণ্ডের সাহায্যে মাখন তোলা হ'ত। মনে পড়ল গোকুলের কথা। সেখানেও মন্থনদণ্ড রক্ষিত আছে দেখে এসেছি। সেখানেও পাণ্ডারা দাবি করেছে এইটিই আসল মন্থনদণ্ড বলে।

ভাবলাম ভেজালের বাজার। পণ্ডিতজন ভাবুন কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক।

মোটর বাসের হর্ণ মুহুর্মুহু বেজে চলেছে। ওয়ার্নিং বেল দিচ্ছে ড্রাইভার। এবার প্রত্যাবর্ত্তন না করলে বাস ফিরে যাবে মাদ্রাজের পথে। অতএব বিদায় মহাবলীপুরম্।

প্রশ্ন

শ্রীকালীপদ হালদার

জীবন-মরুভূ-মাঝে ছায়াস্নিগ্ধ কোথা মরূদ্যান?
কোথায় পিপাসা মেটে? কোথা করি শান্তিবারি পান?
সমাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশ নিরাশার ঘন ধূম্রজালে,
আঁখি দুটি বাণীহারা বেদনার তপ্ত অশ্রু ঢালে।
কোথা সত্য? কোথা শিব? সুন্দরের কল্যাণের বাণী
কোথায় রচনা করে সুখ-নীড় মুক্তিফল দানি?
নিপীড়িত-বুকে সদা জিঘাংসার ফেনিল উচ্ছ্বাসে
স্বার্থের বিষাক্ত ছুরি নিরঙ্কুশ ক্রুর অট্টহাসে
হেনে যায় নির্বিচারে শয়তানে—কোথায় বিচার?
মানবতা পচে মরে ষড়যন্ত্রে ঘৃণ্য হীনতার!

কোথা সাম্য-শান্তি-সুধা? মৈত্রীমাখা অভয় আশ্বাস?
পরোপচিকীর্ষা কোথা? হৃদয়ের মমতা আভাস?
নিশ্চিন্ততা কোথা মেলে বুভুক্ষুর প্রতিটি নিশ্বাসে?
কোথা সত্য-ন্যায়-নীতি তৃপ্তি আনে পরম বিশ্বাসে?
একান্ত নির্ভরশীল সারল্যের জীবনযাপনে
শোষণের তূর্য্যধ্বনি অসহায় কুটীর-প্রাঙ্গণে!

দোটানা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

কপোতের প্রেমে কপোতীর বাঁধা ডানা,
দু'চোখে নেমেছে স্বপ্নের আবিলতা,
নীরব প্রাণের আকুতি মানে না মানা,
ঠোঁটের রেখায় সীমায়িত যত কথা।
তবু, নিশ্বাসে কাঁপে যেন ব্যথা তার,
সারা দিবসের সঞ্চিত বাসনার।

আকাশের বুক কত রং দিয়ে আঁকা,
কত ঘুম ভাঙা জ্যোছনা ঝরানো রাত,
সুয়ে সুয়ে ছোঁয় বন্ধ দু'খানা পাখা,
খোলা হাওয়া এসে কাঁপায় অকস্মাৎ।

ভয় জাগে বুঝি! হঠাৎ কে দেয় দোলা,
মন চায় বাঁধা, ডানা পেতে চায় খোলা।

সারেংহাটি'কালভার্ট

নিরঙ্কুশ

তুমি হয় ত সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন দেখাবে, তুমি হয় ত রাজনৈতিক মতবাদের ছকে আমার মনকে গড়ে নেওয়ার উপদেশ দেবে, কিংবা তুমি আমাদের মতবাদ ছাড়া আর সবই যে অকল্যাণকর আর দোষনীয়, সে কথাই আমায় বোঝাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু পরেশ আমি তা মানি না।

তুমি আমাদের মতবাদে বিশ্বাস কর না সুলতা ?

বিশ্বাসের প্রশ্ন নয় পরেশ, এটা আমার মনের কথা, আর মনকে পঙ্গু করার মত কোন মতবাদই সৃষ্টি হয় নি বলে আমি বিশ্বাস করি।

তার পর মনে পড়ল পরেশের, সুলতার সঙ্গে এ ঘটনার পর আর দেখা করে নি সে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল পরেশ, রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে সেটাকে সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করলে একবার। খোলা জানালা দিয়ে কামরাটার মধ্যে হু হু শব্দে বাতাস বয়ে চলেছে। মাসীমার দিকে এবার তাকাল পরেশ। মাসীমা অপর পাশে উপবিষ্ট মেথরাণীটার সঙ্গে কথা বলছেন। আশ্চর্য্য হ'ল পরেশ, মেথরাণীর সঙ্গে কথা কইলে মাসীমার জাত যাবে না ত ? মেথরাণীর কোলের ছেলেটা কাঁদছে। কালো মোটা-সোটা ছেলেটা, বয়স প্রায় বছরখানেক হবে। কোমরে কালো সুতো দিয়ে বাঁধা একটা ফুটো পয়সা। ওদের আলাপের কিছুটা শুনতে পেল পরেশ।

মাসীমা বলছেন, ছেলেটাকে কাঁধে ফেল, না না, ও রকম নয়, বাংলা কথাও বুঝিস না। হ্যাঁ, ওই রকম, পেটে চাপ পড়লে তবে ত ছেলে চুপ করবে।

ছেলেটা এবার সত্যিই চুপ করে।

তোর নাম কি ? মাসীমা সন্তর্পণে আলাপ করছেন মেথরাণীর সঙ্গে।

কুসমী। আড়চোখে তাকিয়ে জবাব দেয় সে।

কোথায় থাকিস ?

হাতিবাগানে ধাঙড় বস্তিতে, হাসপাতালে কাম করি মা।

নিজের অজ্ঞাতে সুহাসিনী দেবীর মুখটা বিকৃত হ'ল। হামার আদমীভি কাম করে। আবার বলল কুসমী। পাশে উপবিষ্ট বিদেশীর দিকে সলজ্জভঙ্গীতে তাকায় একবার, নতুন মা হওয়ার গর্ব্বে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ও। কাঁধের ওপর ছেলেটা আবার যেন উসখুস করছে।

দুধ দে ওকে। আদেশের ভঙ্গীতে বললেন মাসীমা। ছেলেটাকে কোলে শোয়ালে কুসমী, তার পর জামার বোতাম খুলে দুগ্ধপুষ্ট স্তনটা এগিয়ে দিল শিশুটার মুখের কাছে। দু' একবার অন্ধের মত হাতড়ায় শিশুটা, মুখ ঘষে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে তার খাদ্যের উৎসমুখটা। রকম দেখে হাসে কুসমী, ছেলেটার সত্যিই খিদে পেয়েছে, সে বুঝতে পারে নি, মা কিন্তু ঠিক বুঝেছেন ত !

সশব্দে একটা ট্রেন ডাউন লাইনে চলে গেল—ছেলেটা আচমকা আওয়াজে চমকে উঠেছে।

সুহাসিনী দেবী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন কুসমীর ছেলেটার দিকে।...ননীর কথা মনে পড়ে গেল তাঁর, ননীও ওই রকম মোটা-সোটা কোল ভারী ছেলে ছিল। কতদিন আগেকার কথা কিন্তু এখনও সব খুঁটিনাটিগুলি পর্য্যন্ত মনে আছে তাঁর। বিস্মৃতির অতলগহ্বরে এখনও মিলিয়ে যায় নি সব। আনন্দ, শঙ্কা আর তৃপ্তি মেশানো মধুর দিনগুলি কোথায় গেল কে জানে !

গাড়ীর দোলাতে সুহাসিনী দেবীর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

দোলনায় না শোয়ালে ননীর ঘুম হ'ত না, ছোট ছোট হাতপা ছুঁড়ে চীৎকার করে পাড়া মাথায় তুলত। ভারি দুষ্ট ছিল ননী, মোটা নরম হাত দুটো দিয়ে তাঁর মুখে আঘাত করত বার বার। স্পষ্ট মনে আছে, সেই ঈষদুষ্ণ কচি হাতের স্পর্শটা এখনও লেপটে আছে যেন, সেই ছোঁয়াটা তাঁর মুখে।

নিজের অজান্তে শীর্ণ শুষ্ক মুখে হাতের তালুটা রাখলেন সুহাসিনী দেবী।

কবি কমলাকান্ত সরকারের ঘুম পায় নি বটে কিন্তু সে যেন একটু বিরক্ত বোধ করছিল। বিরক্তির অবশ্য কারণও ছিল। অপর বেঞ্চে উপবিষ্ট ভদ্রলোক উপর্য্যুপরি একটার পর একটা ধূমপান করে চলেছেন, তাতে শীতের রাতে বন্ধ কামরাতে রীতিমত ধোঁয়া জমে গিয়েছে। সদ্যলব্ধ গলার প্রদাহে সেটা খুব আরামপ্রদ নয়। কবি কমলাকান্ত ধূমপান

করে না, শুধু সিগারেট কেন অন্য কোন রকম নেশাই তার নেই। কমলাকান্তর মনে পড়ল রেবার সঙ্গে এ বিষয়ে ওর একবার আলোচনাও হয়েছিল।

কমল, তুমি সিগারেট খাও না? প্রসঙ্গক্রমে একদিন রেবা জিজ্ঞেস করেছিল।

না, আমার কোন নেশাই নেই। উত্তর দিল কমলাকান্ত।

কবিতা লেখাটা কি? ভ্রূ দুটো একটু তুলে প্রশ্ন করে রেবা।

ওটা জীবনের প্রকাশ। সূর্য্যের প্রকাশ তার আলোতে, মাধুর্য্যে আর ভালবাসায়।

তা না হয় হ'ল, কিন্তু ও ছাড়া আরও একটা নেশা তোমার আছে কমল। আড়চোখে তাকায় রেবা।

কই না ত?

হ্যাঁ, এই যে আমি। নিজের দিকে তাকিয়ে কথাটা পেশ করে রেবা।

তুমি নেশা, কি বলছ রেবা?

তা ছাড়া কি। সুন্দর একটা ভঙ্গী করল রেবা।

ভালবাসাকে নেশা বলতে হয় ত মেয়েরাই পারে। সত্যি যারা ভালবাসে, তাদের কাছে ভালবাসা নেশা নয়, স্বপ্ন নয়, এমনকি অবলম্বনও নয়, ওটা তার সত্বা।

তুমি কি সুন্দর কথা বলতে পার কমল।

তুমি পার না?

না, আমি অত ভাবতেও পারি না। তুমি যেন আমার মনটাকে আতস কাচের নীচে লক্ষ্য কর। আর তার বিভিন্নমুখী রসকে বিশ্লেষণ করে উপভোগ কর।

সেইটাই ত কবির কাজ।

আচ্ছা কমল, তুমি কবি কি করে হলে?

তা ত জানি না, কখন কি করে কবিতাকে ভালবেসেছি, কোন্ মুহূর্ত্তে জীবনের বৈচিত্র্যময় অনুভূতির ছোঁয়া আমার মাঝে দোলা দিয়েছিল তা কি করে বলব? জান রেবা, মানুষের মন যুগ যুগ ধরে সত্যের অনুসন্ধান করে চলেছে, সুন্দর আর মঙ্গলের আশায়, পথ বেয়ে চলেছে সে আকুল আগ্রহে। জীবনের কত বৈচিত্র্য রঙে, রসে, গন্ধে সুরভিত হয়ে রয়েছে—প্রাণভরে যদি তাকে অনুভব করতে না পারলাম তা হলে ত দেউলিয়া হয়ে যেতে হবে রেবা।

আরও যেন কি বলেছিল কমলাকান্ত এখন ঠিক মনে পড়ছে না, সব কথাগুলোকে মনে করার একবার চেষ্টা করল সে। চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে দূরে অন্ধকারে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইল কবি। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। একটানা আওয়াজটা হচ্ছে ক্রমাগত ঝক্ ঝক্, ঝক্—শাল আর মহুয়ার বনের মধ্যে শব্দটা যেন লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে—প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বার বার।

ঘন অন্ধকারের বুক চিরে ট্রেনটা উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে একটা প্রাগৈতিহাসিক জীবের মত। রাত্রের নিস্তব্ধতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার গতিবেগের মত্ততায়। একবার কামরার দিকে তাকিয়ে দেখল কমলাকান্ত। ওপাশে উপবিষ্ট গেরুয়াধারী সাধু, সুদর্শন প্রেমিকযুগল, মেমসাহেব, সে নিজে, সবাই ভিন্ন জায়গার মানুষ কিন্তু সবাই এসে জুটেছে এই কামরায়। ট্রেনটা যেন একটা চলন্ত মুসাফিরখানা বলে মনে হ'ল কবির কাছে। কত লোক উঠছে, নামছে, আসছে, যাচ্ছে যেন নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। কত প্রেমিক ফিরে যাচ্ছে তার প্রেমাস্পদের কাছে, দীর্ঘ বিরহের অবসান হবে। সেই সঙ্গে আবার কত ব্যথা আর বেদনাই না বহন করছে এই ট্রেনটা। বিচ্ছেদের করুণ আর্ত্তস্বরটা যেন বাতাসের হু হু শ্বাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। হাসিকান্নার মেলা নিয়ে চলেছে ট্রেনটা, মানবহৃদয়ের চলমান প্রদর্শনী যেন একটা। ঝক্ ঝক্—ইঞ্জিনের আওয়াজটা পালটে গিয়েছে। বাইরে মুখ বাড়িয়ে আবার দেখল কমলাকান্ত।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বাসদেও শর্ম্মা মনমরা হয়ে বসে রয়েছে। অনেকগুলো চিন্তা তার মাথায় ঘুরছে। পুলিসে নোকরী তার বাইশ বছর হ'ল, কিন্তু ক্রমেই সে নিরাশ হয়ে পড়ছে। এই ত আজকেরই কথা, সে সবেমাত্র রোটি আর আলু করেলার ভাজি' বানিয়েছে—ডহড় ডালটা সবেমাত্র নামিয়েছে—ব্যস্, হুকুম হ'ল ব্যানার্জ্জি সাহেবের বাড়ী খবর দিতে। মুখের খানা ছেড়ে ছুটতে হ'ল সেই বহুবাজারে। কি করবে, সরকারী কাম করতেই হবে। স্বরাজ পেয়ে ত খুব লাভ হ'ল। আগেকার দিনে সাহেবদের আমলে তবু দু'পয়সার মুখে দেখা যেত। শক্ত কেস ধরলে বকশিস মিলত, প্রমোশন ছিল, তা ছাড়া খাতির কি কম ছিল, লাল পাগড়ী দেখলে তা বড় তা বড় বদমাস ঠাণ্ডা হয়ে যেত, যারা একটু উলটো-পালটা করত তাদের দু'এক দিন ঠাণ্ডিঘরে রাখলে কিংবা ধোবিয়া বা কালুয়া প্যাঁচের স্বাদ পেলে ত কথাই নেই। আর এখন? পাবলিক ত পুলিসকে কেয়ারই করে না, তা ছাড়া উপরির কথা না বলাই ভাল, সে তুলনায় আগেকার দিনে তাদের খরচই ছিল না কিছু। মুচি জুতো সেলাই করে, পালিস করে কৃতার্থ হ'ত, দোকানে খাবার, চা, পান ও সরবতের চালাও ব্যবস্থা ছিল, লোকেরা দেখলেই হাত তুলে 'আচ্ছা হায় জমাদার

সাব' বলে তাদের সম্ভাষণ জানাত। এখন আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই! স্বরাজ পেয়ে ত এই লাভ! অবশ্য এই মওকায় কয়েকজন বেশ গুছিয়েও নিয়েছে। তার এক ভাতিজা রামস্বরূপ শর্ম্মা ত মন্ত্রী না কি যেন হয়েছে। গোরখপুর থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিল। না, তার সঙ্গে বাসদেও দেখা করে নি। আগে'ত সে ক্ষেতির কাম করত, এখন মন্ত্রী হয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, আর ঝুটমুট দেখা করেই বা লাভ কি? খোসামোদ সে করতে পারবে না, তা সে মন্ত্রীই হোক আর লাটসাহেবই হোক!

আর এই খোসামোদ করতে পারে নি বলেই ত আজ তাকে মুখের রুটি ফেলে ছুটতে হচ্ছে, তা না হলে ত এত দিন বাসদেও শর্ম্মা চেয়ারে বসে হুকুম চালাতে পারত!

দেশের কথা মনে পড়ল বাসদেও শর্ম্মার। বছরতিনেক হ'ল, সে আর দেশে যায় নি, আর গিয়েই বা কি হবে? চার সাল হ'ল তার জানানা মারা গেছে, শেষ সময়ে দেখাও হয় নি তার। একটা মেয়ে অবশ্য আছে—ধনপতি দেবী, তার সাদিও সে দিয়ে দিয়েছে, ব্যস্, আর দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? জায়গা জমি আর ক্ষেতীর কাম যা আছে সে সব দেখাশুনা তার ভাই রামদুলারই করে। ঘরে তার চারটে ভঁইস আছে, গাইভী দু'তিনটে আছে; অভাব কিছুরই নেই তবু যেন তার দেশে যেতে প্রাণ আর চায় না। অবশ্য কারণ একটা আছে, তিন বছর আগে বাসদেও বাড়ীতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তাতে তার মনটা তিক্ত হয়ে গিয়েছে। বাড়ী গিয়ে বাসদেও অসুখে পড়েছিল। প্রায় পাঁচ দিন তাকে খাটিয়াতে শুয়ে থাকতে হয়েছিল, সেই সময়ে তার বাড়ীর আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন সে লক্ষ্য করেছে। নিজের বাড়ী তার কাছে যেন অপরিচিত বলে মনে হয়েছিল। তার ভাই রামদুলার অবশ্য তাকে বহু ভক্তি করেছে, কিন্তু ওর বহুটা বহুত বদমাস, দিনভোর খালি চিল্লাচিল্লি করে, বিলকুল বেশরম, ঘরে যে সে শুয়ে রয়েছে তার সে গ্রাহ্যই নেই! না দেশে আর সে যাবে না, যখন তার কোন টান নেই, যখন তার আশায় কেউ অপেক্ষা করার লোকই নেই, তখন সে আর যাবে কেন?

চলন্ত ট্রেনের কামরা দিয়ে বাসদেও শর্ম্মা বাইরের শূন্য অন্ধকারের দিকে উদাস ভাবে তাকিয়ে রইল। অকস্মাৎ কোমরের রিভলভারটায় হাত ঠেকল বাসদেওয়ের; চিন্তার জালটা মুহূর্ত্তে ছিন্ন হয়ে গেল, সেই সঙ্গে মনটা তার নেমে এল বাস্তব জগতে। কর্ত্তব্যের কথা মনে পড়ল বাসদেও শর্ম্মার। ট্রেনটা আর একটা ষ্টেশনে থামল। জুতোটা পরে' বাসদেও ব্রজেশ্বরবাবুর খোঁজে এগিয়ে চলল। ব্রজেশ্বর বাবুর কামরার সামনে গেল না সে। তাদের পরস্পরের সম্বন্ধটা অপর পক্ষের অগোচরে রাখাই নিয়ম, নিজেদের যত দূর সম্ভব অলক্ষ্যে রেখে কাজ হাসিল করতে হয়। ব্যানার্জি সাহেবও তাকে দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হ'ল, কারণ তিনি কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা নিরিবিলি চায়ের স্টলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাসদেও পাশে দাঁড়াতেই ব্রজেশ্বর বাবু চাপা গলায় বললেন, নানকুর খবর পেয়েছি বাসদেও। উত্তেজনায় গলার স্বরটা কেঁপে উঠল তাঁর।

কোথায় হুজুর? সারা ডিপার্টমেন্ট যার জন্যে সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে, সেই দুর্দ্ধর্ষ নানকুর নামটা শুনেই বাসদেওয়ের সর্ব্বশরীরের মাংসপেশীগুলি মুহূর্ত্তে টান হয়ে গেল।

সুনীল রায়ের কামরায় সাধু সেজে বসে রয়েছে। ফিস্ ফিস্ করে উত্তর দিলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

আমি ও কামরায় যাব হুজুর? ব্যগ্র হয়ে উঠল বাসদেও শর্ম্মা।

এখন নয়, তুমি একবার দূর থেকে দেখে এস।

বাসদেও স্বামিজীর কামরা লক্ষ্য করে চলল, ব্রজেশ্বর বাবু সেই অবসরে এক কাপ চা খেয়ে নিলেন।

ফিরে এল বাসদেও। হ্যাঁ নানকুই বটে, তাকে চিনতে দেরী হয় নি বাসদেও শর্ম্মার।

চিনতে পেরেছ? ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন ব্রজেশ্বরবাবু।

হ্যাঁ হুজুর।

তোমার কাছে পিস্তল আছে?

আছে। সন্তর্পণে একবার কোমরে রাখা পিস্তলের ওপর হাতটা স্পর্শ করল বাসদেও।

বিজয়ের কাছে?

আছে।

তা হলে তুমি বিজয়কে বল ও কামরায় চলে যেতে।

ক্ষুণ্ণ হ'ল বাসদেও, তার পরিবর্ত্তে বিজয়কে পাঠান তার মনঃপূত হয় নি। ব্রজেশ্বরবাবু তার মনের ভাবটা যেন বুঝতে পারলেন, বললেন, বিজয়কে আগে পাঠাও, তার পর আমরা দুজনেই যাব।

কখন হুজুর? ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল বাসদেও।

ন'টা চল্লিশে সাবেংহাটি ষ্টেশনে পৌঁছব, সেখানেই—। কথাটা শেষ করলেন না ব্রজেশ্বর বাবু, চোখের একটা ইঙ্গিত করলেন শুধু।

আদেশমত বিজয় সিংহ সুনীল রায়ের কামরায় গিয়ে উঠল। আগন্তুকের দিকে সকলেই তাকাল—স্বামিজী, হাসমু, কবি কমলাকান্ত এবং সুনীল রায়। বিজয় সিংহকে

দেখে কমলাকান্তর টিকটিকিটার কথা মনে পড়ে গেল। শিকারের আশায় যখন সে হলদে পার্টিশনের ওপর বসে গোল গোল চোখ দিয়ে তাকায়, তখন তার ভাবভঙ্গীটাও অনেকটা এই লোকটারই মত হয় বলে মনে হ'ল যেন।

সুনীল রায়ও বিজয় সিংহকে লক্ষ্য করল। অপর দিকের বেঞ্চে বসে লোকটা একটা খবরের কাগজের আড়াল থেকে তাকেই নিরীক্ষণ করছে বলে মনে হ'ল তার। সুনীল রায় অস্বস্তি বোধ করছে, শীতের রাত্রেও তার কপাল ঘামে ভিজে উঠেছে—গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে, পেটের ভিতরের অন্ত্রগুলি তাল-গোল পাকাচ্ছে যেন। শরীরের মধ্যে একটা ক্রমবর্দ্ধমান কম্পনপ্রবাহ তাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, প্রচণ্ড চাপের ফলে তার স্নায়ুতন্ত্রীগুলি ছিন্নপ্রায়। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বের এক পেগ হুইস্কির ক্রিয়া এখন আর অনুভব করতে পারছে না সুনীল রায়।

আর একটা সিগারেট ধরাল সে—জোর করে সমস্ত জিনিসটার গতি মনে মনে ফেরাতে চেষ্টা করল সুনীল রায়। হাসনুর দিকে তাকিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি ভুলতে চেষ্টা করল সে।

হাসনু বুঝতে পেরেছে যে কোন কারণে সুনীল রায় অস্থির হয়ে পড়েছে, চাঞ্চল্যের কারণটা অবশ্য অনুমান করতে সে অক্ষম তবে এটুকু সে জানে স্ত্রীলোকের চাঞ্চল্যের হেতুটা অনেক সময় যেমন হাস্যকর হয় পুরুষের বেলায় কিন্তু তা হয় না, পিছনে অধিকাংশ সময়ে রীতিমত গুরুতর কারণই থাকে। কারণগুলো অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে জানাবার মত হয় না। তা না হলে লক্ষ্ণৌর মনসুর আলি নির্ব্বাক ভাবে তার জীবন থেকে সরে দাঁড়াল কেন? পরে অবশ্য হাসনু বুঝেছিল কাপুরের সঙ্গে তার হৃদ্যতার কথা মনসুরের কানে পৌঁচেছিল নিশ্চয়ই। মনসুর আলির কথা মনে পড়ল হাসনুর।

প্রথম যৌবনের রঙীন স্বপ্নময় জীবন। কাশ্মীরের স্বর্গীয় আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলির কথা এখনও মনে আছে হাসনুর। অদ্ভুত সুদর্শন ছিল মনসুর আলি। ধীরে ধীরে কথা বলার অভ্যাস ছিল মনসুরের। পিছন থেকে হাসনুর কাঁধের কাছে মুখটা এনে অস্ফুট স্বরে তার সৌন্দর্য্যের তারিফ করত। মাঝে মাঝে হাফিজ আর ওমর খৈয়ামের বয়েৎ আবৃত্তি করত মধুর কণ্ঠে। কাশ্মীরের চন্দ্রালোকে শিকারার স্বপ্নময় মধুনিশির কথা এখনও ভোলে নি হাসনু। মনসুরের ভালবাসার পদ্ধতিটা ছিল অসাধারণ, হাসনুর কাছে সান্নিধ্যের প্রশ্নই বড় ছিল, কিন্তু মনসুর যেন দূরত্বের মাধুর্য্যকে উপভোগ করত বেশী, অনেক সময় মনসুর তাকে দূর থেকে অপলক দৃষ্টিতে দেখত। বিরক্ত লাগত হাসনুর সেই সময়ে। মন আর দেহ যখন উন্মুখ হয়ে থাকত তার সান্নিধ্যলাভের প্রতীক্ষায় তখন নিরাশ হলে বিরক্তি আসে বৈকি! মনসুর আলি কিন্তু হাসনুর গজল গানের একজন সমজদার ভক্ত ছিল। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত তার দিকে মনসুর—গানের প্রত্যেকটি কথা আর সুরের বিন্যাসকে তারিফ করত, কদর করত গুণমুগ্ধ শ্রোতার মত।

তার পর এল ঘনশ্যাম কাপুর—নিয়ে এল আর এক নতুন ধরনের আস্বাদ। যৌবনের প্রচণ্ডতা আর উদ্দাম চাঞ্চল্য তার প্রত্যেক পদক্ষেপে ফুটে উঠত; দুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য্যে আর দুর্ব্বার জীবনের উন্মাদনায় যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল ঘনশ্যাম কাপুর। নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দিত না হাসনুকে, হাঁফিয়ে উঠত যেন সে। ঘনশ্যামের ভালবাসার তীব্রতা সহ্য করতে পারত না অনেক সময়, কিন্তু হাসনুর ভাল লাগত—খুব ভাল লাগত মনসুরের মৃদুমন্দ প্রেমের স্নিগ্ধতার পর হাসনু পেল আর একটা নতুন স্বাদ। রহস্যাবৃত হেমন্তের কুহেলিকার পর এল শত সূর্য্যের আলো-ঝলমল দীপ্তি। ঘনশ্যাম কাপুরের ঐশ্বর্য্য ছিল প্রচুর; অর্থের সীমা ছিল না যেন। কটন মিলস, বিস্কুটের কারখানা, সাবানের কারখানা, মোটরের এজেন্সী, বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট কিছু বাদ নেই। একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল ঘনশ্যাম কাপুর। অদ্ভুত মনের জোর ছিল কাপুরের—সবই করত কিন্তু কাজের সময়—ব্যবসার বেলায় অন্য রকম। তখন শত হাসনুরও সাধ্য ছিল না তাকে ফিরিয়ে আনে। ঘনশ্যামও হারিয়ে গেল—তার বিয়ে হ'ল বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ের সঙ্গে। ব্যবসার জন্যে এ বিয়ের নাকি প্রয়োজন হয়েছিল। প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই মানুষের জন্ম। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এক-একটা করে আহরণ করতে হবে, তার পর সেই সংগ্রহের দিকে তাকিয়ে নিজের পিঠ নিজে চাপড়ানোর নামই বোধ হয় তৃপ্তি! ঘনশ্যাম কাপুরের পর হাসনুর জীবনে এল নিরঞ্জন ভার্গব—পঞ্জাবের অধিবাসী। একটু মোটা ধরনের বুদ্ধি আর স্থূল রুচি ছিল নিরঞ্জনের। হাসনুর নাচ তার খুব ভাল লাগত, তাই তাকে ক্রমাগত নাচতে হ'ত বিভিন্ন সজ্জায়। তা ছাড়া নিরঞ্জনের আরও একটা দোষ ছিল—প্রচুর মদ খেত সে। নিরঞ্জন ভার্গবের সাহায্যে সে ফিলমে প্রথম নামতে পেরেছিল, সেকথা হাসনুর মনে আছে। এক এক করে কতজন এল তার জীবনে—কত পদধ্বনি মুখরিত করল তার যৌবনের অঙ্গন, কত ফুল সুরভিত করল তার স্নিগ্ধ ছায়াঘেরা মালঞ্চে? এখনও আসবে, এখনও সে প্রতীক্ষায় আছে তার পরিণতির আশায়। সুনীল রায়ের সিগারেটের ধোঁয়াটা হাসনুর মুখের চতুর্দ্দিকে ঘিরে ধরেছে—খোলা জানালা দিয়ে বাইরে মুখটা বাড়াল হাসনু—ট্রেনটা

ধীরে ধীরে চলেছে। অদূরে আলোকসজ্জিত স্টেশনটা নজরে পড়ল হাসনুর।

ট্রেনটা দাঁড়াতেই ডাইরেক্টর ধীরেন ভড় নেমে এল। এতক্ষণ সে মুনমরা হয়ে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করছিল।

নবীন সরকারের মত লোকেরও চাকরীতে উন্নতি হচ্ছে, অথচ তার অবস্থা যথা পূর্ব্বং তথা পরং। উপরি আয়ের সুযোগ আজকাল আর তেমন নেই। কিছুদিন হ'ল অবশ্য একটা বই কোম্পানীকে গছানো গিয়েছে। লেখককে কোম্পানী দু'হাজার টাকা দিয়েছিল তা থেকে পাঁচশ' টাকা সে লেখককে দিয়েছে, বাকি টাকাটা সে নিজেই নিয়েছে। অজানা নতুন লেখকের পক্ষে পাঁচশ' টাকাই যথেষ্ট। কে ও বই নিত? কতশত আচ্ছা আচ্ছা সাহিত্যিক দু'বেলা কোম্পানীর দরজায় ধর্ণা দিচ্ছে। আর লেখকের কেরামতি যে কত তা আর জানতে বাকি নেই তার। পুরনো মাসিক পত্রিকা আর ইংরেজী সিনেমা থেকে জোড়াতালি দিয়ে, এর মুণ্ডু ওর ধড়ে চাপিয়ে, একটা যা হোক তা হোক প্লট খাড়া করলেই হ'ল, আর কোনরকমে ধরে-করে একবার ফিলম কোম্পানীতে গছাতে পারলেই হ'ল—ব্যস সাহিত্যিক বনে গেলেই আজ এ কাগজে, কাল সে মাসিকে, পরশু ও ছবির বইয়েতে ছবি ছাপতে সুরু হয়ে গেল।

সাপ-ব্যাং যা হোক লিখলেই হ'ল—দোষ যা কিছু তার জন্যে আছে প্রবাদবাক্যের নন্দ ঘোষ—মানে ডাইরেক্টর। বাইরে থেকে শুনতেই ভাল—ফিলম ডাইরেক্টর, কিন্তু ভেতরের খবর রাখে কে?

মোটরগাড়ীটা কোম্পানীর—তার নয়, সঙ্গের সুন্দরী নারী তার লীলাসঙ্গিনী নয় কোম্পানী নিয়োজিত, মালিকের মনোরঞ্জনকারিণী অভিনেত্রী মাত্র, এ খবর কে রাখে। জনসাধারণের ডাইরেক্টর সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা আছে বলে মনে হয়। হয়ত ভাবে কবিত্বপূর্ণ আবহাওয়াতে আধুনিক রুচিসম্মত পরিবেশে ডাইরেক্টরের সময় কাটে ভাল। এদের একবার তার নিজের বাড়ীটা দেখিয়ে আনলে হয়। বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেই চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। নোনাধরা দেওয়ালে ঘেরা ছোট দুটো গুমোট ঘর—তার মাঝে শ্যাওলা-ধরা উঠান—পাশের কল থেকে সুতোর মত জল পড়ছে, নীচে রয়েছে একটা জং-ধরা পুরনো টিনের ড্রাম। খালি বালির একটা মরচে-ধরা টিনে করে তা থেকে জল নেওয়া হয় নানা দরকারে। বাইরের দিকে পায়রার খোপের মত একটা ছোট কুঠুরি আছে, সেটা হ'ল ধীরেন ভড়ের বৈঠকখানা। একপাশে তার একটা ছোট তক্তাপোশ তার ওপর একটা তেলচিটে সতরঞ্চি পাতা থাকে। দু'পাশে দুটো নড়বড়ে হাতলবিহীন চেয়ার। সামনের দেওয়ালে দু'বৎসরের পুরনো একটা ক্যালেণ্ডার টাঙ্গান—শিবের ছবি, ঘন জটার মধ্যে থেকে মা গঙ্গা শতধারে ঝরে পড়ছেন। শিবের চোখ দুটি অর্দ্ধনিমীলিত, কানে দুটো ধুতরা ফুল গোঁজা আর গলায় মাফলারের অনুকরণে একটা মোটা সাপ জড়ানো। ক্যালেণ্ডারের তলায় লেখা 'জাহাজমার্কা বিড়ি পান করুন—সোল এজেন্টস্ মহম্মদ সুলেমান'। অপর দিকের দেওয়ালে একটি বাঁধান ছবি। একটি বিদেশী নর্ত্তকী মনোহর ভঙ্গীতে নৃত্য করছেন, আশপাশে আরও কয়েকজন স্বল্পবেশা মহিলা বিভিন্ন ভঙ্গীতে শুয়ে বা বসে রয়েছেন, একধারে একটি জলাধার, তার একপ্রান্তে কয়েকটি পদ্মপাত দেখা যায়, অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি ময়ূর।

দরজার মাথার ওপরেও একটি ছবি, তবে এটি একটি ফটো। ছবিটির বয়স অনুমান করা শক্ত, তবে সময়ের চিহ্ন ফুটে রয়েছে সর্ব্বাঙ্গে। কাঠের ফ্রেমের রং বা পালিস বহু পূর্ব্বেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, কাঁচের ওপর একটা পুরু ময়লার আস্তরণ পড়েছে।

ফটোটি স্ত্রীলোকের কিংবা পুরুষের তা বুঝতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

ক্রমশঃ

পাড়াগাঁয়ের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ইংরেজী ১৮৮৬ সনের ২৪শে ডিসেম্বর, হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম ঘোষের (স্বামী প্রেমানন্দ) পল্লীনিবাসে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), আট জন অন্তরঙ্গসহ সন্ধ্যাকালে প্রজ্বলিত ধুনীর সম্মুখে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের যে চরম সঙ্কল্প করেন, সেই পবিত্র দিনটির বার্ষিক স্মরণোৎসবে যোগদান করিতে গিয়া আঁটপুরে দুই সপ্তাহেরও অধিককাল অবস্থান করিয়াছিলাম। স্থানীয় জনসাধারণ, ঘোষবংশীয়গণ ও আঁটপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও কর্ম্মিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত এই উৎসবে বেলুড় মঠ প্রেরিত স্বামীজী পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ইহাতে কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতেও ভক্তসমাগম হইয়া থাকে। এবার, উৎসবানুষ্ঠানের পরদিবস ২৫শে ডিসেম্বর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও ত্রাণবিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঐ স্থানে স্থাপিত স্মারকস্তম্ভে শ্রদ্ধার্ঘ্যদান করিয়াছিলেন। ঐদিন তিনি আঁটপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও অনগ্রসর শ্রেণীর বালিকাদিগের জন্য পরিচালিত অঘোরকামিনী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ও এক জনসভায় মিলিত হন। তিনি স্থানীয় মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির এক সভায় যোগদান করিয়া স্থানীয় খাদ্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন।

গ্রামে অবস্থানকালে "ঊনবর্ষায় দুনো শীত" প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা গেল। "জনপদবাসিগণের" অধিকাংশেরই শীতনিবারণের প্রচেষ্টায় "জানু-ভানু-কুশানুই" ভরসামাত্র। তাহাদের অবস্থা দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না।

সেচ-পরিকল্পনা অনুসারে রবিশস্যের জন্য "কানা দামোদরে" যে জল ছাড়া হইয়াছে তাহার সাহায্যে কিছু কিছু জমিতে আলুর চাষ হইতেছে। উপর্য্যুপরি তিন বৎসরের অনাবৃষ্টিতে পুকুর-ডোবা একেবারে শুষ্ক। "কানা দামোদর" হইতে অতি অল্পসংখ্যক পুকুর-ডোবাতেই জল পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব বলিয়া ঐ সব জলাশয় হইতে সেচের সাহায্যে যে সব জমিতে আলু, কপি, বেগুণ প্রভৃতি ফসলের চাষ হইত সেই সব জমিতে এবার ঐসকল ফসলের চাষ হইতে পারে নাই। টিউবওয়েলগুলি পানীয় জল সরবরাহ করিতেছে বটে; কিন্তু, স্নানাদির জন্য ব্যবহৃত পুষ্করিণীগুলিতে জল না থাকায় সকলেরই খুব অসুবিধা হইতেছে। গবাদি পশুরও কষ্ট কম নহে।

ধান্য ফসলের চাষ এই অঞ্চলে একেবারেই হয় নাই। কৃষি শ্রমিকদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সরকার গত কয়েক মাস যাবৎ "টেষ্ট রিলিফ" কার্য্যের মাধ্যমে, পথঘাট নির্ম্মাণ, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি কার্য্য করাইতেছেন। সরকারী "ডিলারের" মারফৎ গম, আটা এবং অল্প পরিমাণ চাউলও "ন্যায্যমূল্যে" এ অঞ্চলে সরবরাহ করা হইতেছে। এখন সরকার ধান-চাউলের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও যেমন ঘটিতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে, এই অঞ্চলেও সেইরূপই ঘটিতেছে, অর্থাৎ সরকার-নির্দ্দিষ্টমূল্যে ধান-চাউল পাওয়া যাইতেছে না। গত পৌষ মাসের প্রবাসীতে "পাড়াগাঁয়ের কথায়" কোনও এক "রেশন ডিলারের" কোটার মালের মধ্যে এক বস্তা বিশুদ্ধ ধূলার অবস্থিতির কথা লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি সংবাদপত্রে ছবিসহ প্রকাশিত কলিকাতায় হাটখোলার এক চাউলের গুদামে বহু বস্তাভর্ত্তি কাঁকর প্রাপ্তির সংবাদ সকল সংবাদপত্র পাঠকই পড়িয়াছেন। এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। দেশের লোক যদি সৎ না হন, লোকের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলেন কোন আইনের দ্বারাই এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব হইবে না। তবে সরকারকেও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সেই কঠোরতা সাধারণতঃ দেখা যাইতেছে না।

এ অঞ্চলে যে কয়টি উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই প্রথম সমস্যা, উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করা এবং দ্বিতীয় সমস্যা, গৃহনির্ম্মাণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় মালমসলা জোগাড় করিতে পারা। এই সমস্যা দুইটির আজিও সমাধান হয় নাই। এইগুলির সমাধানে সহায়তা করার জন্য রাজ্য সরকার নূতন কিছু ব্যবস্থা করিতেছেন কি না তাহা এখনও আমরা অবগত হইতে পারি নাই। অবিলম্বে কিছু করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আরও একটি সমস্যা হইতেছে সরকারী সাহায্য গ্রহণের জন্য সরকার-নির্দ্দিষ্ট স্থানীয় আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করা।

এই অঞ্চল হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রায় দূরীভূত

হইয়াছে। ধীরজক্ত সরকার বাহাদুরের প্রচেষ্টা বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তবে, ম্যালেরিয়ার স্থলে অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। চিকিৎসক আছেন—সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় ঔষধ-পথ্যও আছে কিন্তু লোকের সঙ্গতি কোথায়—চিকিৎসক ডাকা এবং ঔষধ পথ্যও ক্রয় করা। ভাগ্যের উপর নির্ভর করা তাহাদের পরম সান্ত্বনা।

আগেকার দিনের গ্রাম্য দলাদলির (village politics) স্থান এখন "রাজনৈতিক দলাদলি" অধিকার করিয়াছে। ফলে, গ্রাম্যজীবনে একটা আলোড়ন লক্ষিত হইতেছে। ইহার ফল কিন্তু সকলক্ষেত্রে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে হইতেছে না। যে কোনও সৎ ও জনহিতকর প্রচেষ্টা, সকলের সাহায্য এবং শুভেচ্ছা পাইলে যেরূপ সার্থক হয়, অন্যথায় সেরূপ হইতে পারে না। বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে দেশের মঙ্গলজনক যে কোনও কার্য্যে সকলের যোগদান একান্ত কাম্য। মনে হয়, আমরা ক্রমশঃ যেন অত্যন্ত অধিকমাত্রায় "ছিদ্রান্বেষী" হইয়া পড়িতেছি। দৈনন্দিন জীবনেও আমাদের মধ্যে এই সকল লক্ষণ যেন পরিস্ফুট হইতে দেখা যাইতেছে।

যে প্রসঙ্গ লইয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই প্রসঙ্গের কথা বলিয়াই শেষ করি। এবারকার ২৪শে ডিসেম্বরের উৎসবে বেলুড় মঠের স্বামী ভবানন্দ মহারাজ পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন—ঊষা-কীর্ত্তন, পূজা, জনসভায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আলোচনা, সন্ধ্যায় ধুনীর সম্মুখে কথা এবং সর্ব্বোপরি দরিদ্রনারায়ণের সেবা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল। স্বামী ভবানন্দের বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। জানি না ইহার দ্বারা স্থানীয় জীবন নূতনভাবে গড়িয়া উঠিবে কিনা। স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমির এবং স্বামী বিবেকানন্দের পদধূলিতে পবিত্র স্থানের অধিবাসিবৃন্দ গ্রামের এক নূতন ইতিহাস রচনা করিবেন—ইহাই প্রার্থনা করি। প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় এই অনুষ্ঠানের সময় আঁটপুর গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে দুই দিন অবস্থান করিয়া গ্রামের ঐতিহ্য ও গ্রামের সমস্যা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

তিমির-বিভূতি

শ্রীনমিতা দেবী

মহাকাল মগ্ন হ'ল তিমিরের ধ্যানে
খুলে গেল তৃতীয় নয়ন,
কাঁপিছে ত্রিকালবার্ত্তা সহস্র সংকেতে
তারাতে তারাতে ক্ষণে ক্ষণ।
অন্তহীন মহাকাল অসীমের কল্পলোক
অবর্ণিত ধ্যান কল্পনার,
অন্ধকারে যেন কার দিব্য বিভূতিতে
খুলে গেল অনন্তের দ্বার।

সে আনন্দ পরিপূর্ণ অব্যক্তের মাঝে
শান্তি ভরা পরম তৃপ্তির,
এই সারা সৃষ্টি মাঝে হঠাৎ দেখিতে পাই
প্রকাশের লীলা মূর্ত্তিটির।
অধরা সে ধরা দেয় করুণা অমৃত হাতে
মুহূর্ত্তেতে দেয় ইচ্ছাবর,
কানে আসে মহাকাল তরঙ্গ কল্লোলে
সর্বব্যাপী ঝঙ্কারের স্বর।

অন্তহীন মহাকাব্য অনন্ত জীবন
কালজয়ী অক্ষরে অক্ষরে,
লেখা আছে সময়ের পাতায় পাতায়
অসীমের খাতাখানি ভরে'।
অনাহত ঝিল্লী-স্বরে কি যে বাণী অনির্বচনীয়
স্পর্শ এনে দেয় ক্ষণে ক্ষণ,
অসীমের কল্পলোক তারা ভরা ধ্যান অন্ধকারে
খুলে দেয় তৃতীয় নয়ন।
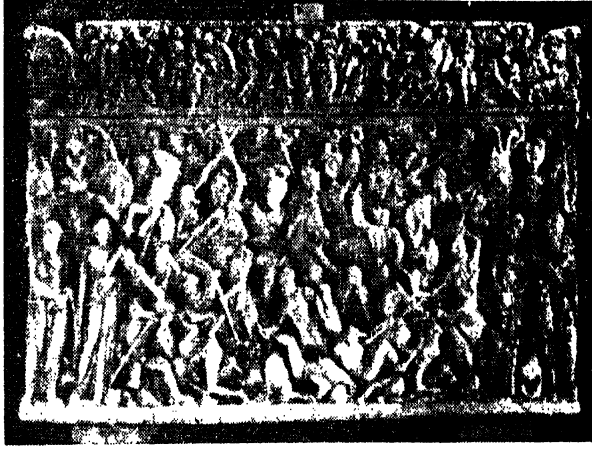
রোমান-জার্মান যুদ্ধ-চিত্র (রোম)

গান্ধার-শিল্প

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্তী

যে কোনও কর্ম বা ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া আসে এবং তাহার পরের প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে একটি সমন্বয় আনয়ন করে। নব আদর্শের প্রেরণায় ঘটিকার দোলক একপ্রান্ত হইতে বিপরীত অপর প্রান্তে ছুটিয়া যায় এবং অবশেষে মধ্যভাগে আসিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করে। এইরূপে দুইটি আদর্শের সমন্বয়ে একটি নূতন আদর্শের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে গান্ধার শিল্পের সৃষ্টি এইরূপেই ঘটিয়াছে।

বিগত ১৯৫৮ সনের মধ্যভাগে রোম নগরীতে প্রাচীন গান্ধার শিল্প সংগ্রহের একটি বিরাট প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর শিল্প-নিদর্শনগুলি পরিদর্শন করিয়া অধ্যাপক বেঞ্জামিন রোল্যাণ্ড তাঁহার যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। সমগ্রভাবে তাঁহার অভিমত অনেকের নিকট সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য মনে না হইলেও এই অভিমত যে অনেকাংশে সত্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বর্তমান আফগানিস্থানে গান্ধার নামে একটি রাজ্য ছিল। প্রাচীন-কালে ও মৌর্য্য রাজত্বের কালেও গান্ধার ভারত সাম্রাজ্যেরই একটি প্রদেশ ছিল। এই পথেই বিদেশীয়গণ বহুবার ভারতে আগমন করিয়াছে। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার এই পথেই ভারত আক্রমণ করেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং দুইটি সভ্যতা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতিতে এই প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন প্রসিদ্ধ "গান্ধার শিল্প" আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরোক্ষ ফল। এই আক্রমণের পরবর্ত্তীকালে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে গমনাগমনের পথ সুগম হওয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং শিল্পদ্রব্যাদির আদান-প্রদান চলিতে থাকে। মৌর্য্য বংশের পতনের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে সিরিয়া ও ব্যাকট্রিয়ার (বহ্লীক) গ্রীকরাজ তৃতীয় আন্তিয়োকস্, য়ুথিডেমস, ডেমেট্রিয়াস, য়ুক্রাটিডিস প্রভৃতি আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন ও গান্ধার অধিকার করেন। মিনাণ্ডার বা মিলিন্দ পাঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট) নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত আছে তিনি নাগসেন নামক বৌদ্ধভিক্ষুর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই গ্রীক শাসন প্রায় এক শতাব্দীকাল স্থায়ী হইয়াছিল। পম্পির জেরুজালেম অধিকারের পরবর্ত্তীকালে এসিয়ামাইনর ও প্যালেষ্টাইনে রোমীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে

রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের যোগসূত্র নিঃসন্দেহে নিকটতর হইয়াছিল।

গান্ধার পুরুষ মূর্তি

রোমে অনুষ্ঠিত "গান্ধার শিল্প" প্রদর্শনী অধ্যাপক রোল্যাণ্ডকে এই যোগসূত্র অনুসন্ধানে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। এই শিল্প-প্রদর্শনী রোম নগরীতে আয়োজিত হওয়ায় তিনি গান্ধার শিল্প নিদর্শনগুলির সহিত গ্রীক-রোমীয় নিদর্শনাদির সহিত একত্রে তুলনা করিয়া দেখিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছেন। রোল্যাণ্ড বলিতেছেন, গান্ধার-শিল্পের নিদর্শনগুলি খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ক্রম-বিকশিত হইয়াছে এবং ইহাদের গঠনপ্রণালী ও কৌশল পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত এবং রোমক শিল্পে অভিজ্ঞ শিল্পীর সৃষ্টি বলিয়া অনুমান করা ভুল হইবে না।

রোল্যাণ্ড বলেন যে, রোম আলেকজান্দারের ন্যায় বিশ্বজয়ের ও প্রাচ্য-প্রতীচ্য মিলনের স্বপ্ন দেখে নাই। রোম প্রাচ্যদেশে ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারেও সক্ষম হয় নাই। রোম প্রাচ্য দেশগুলিকে রোমীয় নাগরিক হইতেও শিক্ষা দিতে পারে নাই। সাম্রাজ্য সীমানার বাহিরে রোম কেবল-মাত্র শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমেই তাহাদের বিজয় অভিযান প্রাচ্য দেশাভিমুখে প্রসারিত করিয়াছে। রোল্যাণ্ড বলিতে চান "গান্ধার শিল্প" তাহারই একটি প্রমাণ। কুষাণ সম্রাট হুবিষ্কের রাজত্বকালের স্বর্ণমুদ্রায় অঙ্কিত দেবীমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার প্রমাণের সমর্থন উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই দেবীমূর্ত্তি রোমনগরীশ্বরী দেবী (মিনার্ভা বা গ্রীক পাল্লাস এথেনা)। এই মূর্ত্তির পোশাক, শিরস্ত্রাণ ও হস্তধৃত বর্শা নার্ভায় অবস্থিত প্রাচীন রোমান বিচারালয়ের প্রাচীরে অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলির অনুরূপ। ইহা ভিন্ন উত্তর পাঞ্জাবের মর্দ্দানের নিকট প্রাপ্ত প্রস্তরাঙ্কিত মূর্ত্তিগুলির পরিধেয় বস্ত্রের ভাঁজরেখাগুলি রোমে অবস্থিত সম্রাট হাড্রিয়ানের কালের মিনার্ভা মূর্ত্তির সমতুল্য। এই মূর্ত্তিগুলি গান্ধার শিল্পের প্রথম যুগে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন। কুষাণ রাজত্বের প্রথম যুগের অঙ্কনগুলিতে গ্রীক, ভারতীয় ও ইরাণীয় (পার্থিয়) দেবদেবীর সংমিশ্রণ দেখা যায়।

রোল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ও প্রমাণ গান্ধার শিল্পের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি। কুষাণ বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্কের কালের মুদ্রাগুলিতে অঙ্কিত বুদ্ধমূর্ত্তি পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় বৃষবাহন শিবমূর্ত্তির অনুরূপ। কিন্তু মর্দ্দানে প্রাপ্ত পরবর্ত্তী কালের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি তাঁহার মতে রোমক শিল্পের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। তিনি এই মূর্ত্তিগুলির পরিধেয় বস্ত্র পরিধানের রীতির পরিবর্ত্তনের উপর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এই-গুলি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এই মূর্ত্তিগুলির পরিধানের বহির্ব্বাস রোমক "টোগা"র অনুরূপ। গ্রীক পরিধেয় পরিচ্ছদ হইতে রোমক "টোগা"র যে পার্থক্য এই মূর্ত্তিগুলির বহির্ব্বাসে ও পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় পরিচ্ছদেরও সেইরূপ পার্থক্য। রোমক এন্টোনাইন পর্ব্বের রাজত্বকালের মূর্ত্তির বহির্ব্বাসের সহিত এই সকল মূর্ত্তির বহির্ব্বাসের নিকটতর সাদৃশ্য। গান্ধার শিল্পে এই পরিবর্ত্তনের প্রবণতা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকেই প্রবলতর হইয়াছিল বলিয়া রোল্যাণ্ড অনুমান করেন। প্রদর্শনীর একটি প্রধান নিদর্শন "শাক্যমুনি" মূর্ত্তিটির সহিত গ্রীক-রোমীয় সূর্য্যদেবতা এপেলো মূর্ত্তির আদর্শের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে বলিয়া রোল্যাণ্ড

মনে করেন। এই মূর্ত্তিটির কুঞ্চিত কেশরাজি এপোলো মূর্ত্তির কেশের সহিত তুলনীয় এবং বুদ্ধদেবের সৌর প্রতীকের নিদর্শন বলিয়া তিনি মনে করেন। বুদ্ধদেবকে বৌদ্ধগ্রন্থে নবসূর্য্য বলিয়া বর্ণনার তিনি উল্লেখ করেন।

সমগ্র গান্ধার-শিল্পের নিদর্শন-গুলিকে রোল্যাণ্ড তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন। (১) শূন্য পটভূমিতে বিচ্ছিন্ন একক মূর্ত্তি; এইগুলি খ্রীঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক শিল্পের সহিত তুলনীয়, যাহা পরবর্ত্তীকালে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যে পুনর্জ্জীবিত হয়। (২) বিশেষ পটভূমিকায় সাবিবদ্ধ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত অনেকগুলি মূর্ত্তির সমাবেশ। (৩) দ্বিতীয় বিভাগেরই আরও উন্নত শিল্পাঙ্কন; ইহাতে মূর্ত্তিগুলির চলনভঙ্গী, গতিশীলতা ও স্থানকালের ব্যবধান প্রকাশের চেষ্টা আছে। গ্রীক-রোমীয় শিল্পাঙ্কন-পদ্ধতির গান্ধার শিল্পের সংমিশ্রণের কোনও ধারা-বাহিক ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। তবে অনুমান করা যায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দি হইতেই রোমীয় শিল্পবস্তু ও শিল্পীর আদান-প্রদান আরম্ভ হয়। ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপনের কালও এই সময়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহার ক্রমবিকাশ দেখা যায় এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ইহার শেষ পরিণতি। মর্দ্দানে প্রাপ্ত স্তম্ভ বা প্রাচীর শীর্ষভাগে খোদিত নারীমূর্ত্তি নার্ভায় রোমক বিচারালয়ের প্রাচীরে অঙ্কিত নারী-সদৃশ। এই সাদৃশ্য কেবলমাত্র পরিধেয় বস্ত্রেই নহে, বস্ত্রের ভাঁজের রেখার বিন্যাসেও পরিস্ফুট। রোল্যাণ্ডের এই মত প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পাভিজ্ঞ সোপার কর্ত্তৃক সমর্থিত ("গান্ধার ও রোমীয় শিল্পকলা" প্রবন্ধ)।

তুরিন-এ অবস্থিত "মুসিও দি-অন্তিচিতা"র রৌপ্যপাত্রের অঙ্কনের সহিত মর্দ্দানের শিল্পাঙ্কনের সাদৃশ্যের অপর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। মর্দ্দানেও সুরাপানোৎসবে মত্ত একটি দৃশ্যাঙ্কন পাওয়া গিয়াছে। এই দৃশ্যে পানপাত্রের যে আকৃতি দেখা যায় সেই-আকৃতির পানপাত্র ইহার বহুপূর্ব্বেই তক্ষশীলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। রোম হইতে প্রেরিত কুষাণ রাজত্বকালের এইরূপ বহু শিল্পদ্রব্য তক্ষশীলা ও বেগ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহা কেবল বাণিজ্যিক যোগ নিদর্শক নহে, শিল্পকলায় রোমীয় প্রভাবও নির্দ্দেশ করে। হোতি-মর্দ্দানে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি ও পানোৎসবের দৃশ্য গ্রীক-রোমীয় বা সম্রাট অগাষ্টাসের রাজত্বকালের শিল্পী সম্প্রদায়ের
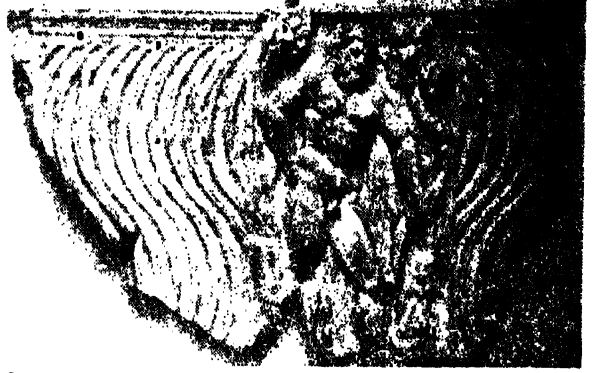
রোমীয় পুরুষ মূর্ত্তি

আদর্শে খোদিত বলিয়া রোল্যাণ্ড মনে করেন। 'আরা' লিপিতে কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক সম্রাট দ্বিতীয় কণিষ্ককে "সীজার" বলিয়া উল্লেখ রোমীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি।

গান্ধার-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন লৌড়িয় টাঙ্গাইয়ে প্রাপ্ত (কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত) বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ দৃশ্য। এই অঙ্কনের মূর্ত্তিগুলি গভীর ছায়ালোকের পরি-বেষ্টনীর পটে গতিশীল বলিয়া মনে হয়। এই চিত্রে অসংখ্য মানবের অনন্ত পথযাত্রীর অনুগামী হইবার দৃশ্যটি প্রকাশ করিয়াছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় রোমের "মিউজিও-দেল্লে-টার্মি"র রোমীয়-জার্ম্মান যুদ্ধের দৃশ্যাঙ্কন। এই স্থানেও সেই আধ অন্ধকার ছায়ালোকের অস্পষ্ট আলেখ্যে মূর্ত্তিগুলি যেন গতিশীল। উভয় দৃশ্যেই দুঃখ ও বেদনার একটি অস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়। তবে দেল্লে-টার্মির দৃশ্যে গতি-শীলতার কিছু উগ্রতা আছে এবং গান্ধার অঙ্কনে গতিশীলতার রূপ শান্ত।

অপর একটি নিদর্শন যাহা প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা লাহোর মিউজিয়ামে রক্ষিত ভগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মস্তিষ্ক সহ দেহের উপরিভাগের একটি মূর্ত্তি। ইহা একটি পুরুষমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির সহিত নিকটতম সাদৃশ্য লক্ষিত হয় সম্রাট এন্টোনিনাসের কালের নির্ম্মিত হারকিউলিস মূর্ত্তির সহিত (রোম মিউজিয়াম)। নিগ্রাই-এ (আফগানিস্থান) প্রাপ্ত হারকিউলিসের ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তি অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের সহিত কুষাণে আমদানী হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। ভগ্ন মূর্ত্তিটির সহিত এই দুইটি হারকিউলিস মূর্ত্তির সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। দেহের গঠন

নির্ব্বাণ চিত্র (গান্ধার)

প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার উপাসনা-পূজাদি করে। এই কারণে বৌদ্ধদের চাহিদা অনুযায়ী বৌদ্ধ অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ অকস্মাৎ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। গান্ধার ও মথুরার স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ একই সময় বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। গান্ধার শিল্পে গ্রীক-রোমান প্রভাব সুস্পষ্ট এবং মথুরা শিল্প সম্পূর্ণ প্রাচীন ভারতীয়। মার্শালের মতে গান্ধার শিল্প বা গ্রীক-রোমান প্রভাবিত শিল্প ভারতের উপর স্থায়ী কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ডাঃ কুমার স্বামীর (The Origin of Buddha Incages) মতে গান্ধার ভাস্কর গ্রীক দেবতা এপেলোকে বুদ্ধে পরিণত করে নাই, বুদ্ধকেই এপেলোতে পরিণত করিয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে গান্ধারে অন্যান্য হিন্দুদের দেবীর মূর্ত্তি যাহা মথুরা হইতে গান্ধারে আমদানী হইত সেই সময় বৌদ্ধদের চাহিদা অনুযায়ী বৌদ্ধমূর্ত্তিও আমদানী হইত (পতঞ্জলি)। হ্যাভেলের মতে অশিক্ষিত গ্রীক-রোমীয় শিল্পীদের নিকট তাহাদের গুরু বৌদ্ধভিক্ষুরা বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় ভাব সম্বন্ধে যে ধারণা দিতেন, গান্ধার শিল্প তাহাকে রূপ দেওয়ার একটি স্থূল চেষ্টামাত্র। সুতরাং গান্ধার শিল্পের নিজস্ব মৌলিকত্ব নাই। ইহাকে ভারতীয় শিল্পের গ্রীক-রোমীয় সংস্করণও বলা যাইতে পারে। গান্ধার শিল্পের বৈশিষ্ট্য গ্রীক-রোমীয় "পরিচ্ছন্নতা" অর্জ্জন। রোল্যাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তির পরিধেয় বহির্ব্বাসের ভাঁজে যে গ্রীক-রোমীয় প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা "আলঙ্কারিক" ভাঁজ। স্বাভাবিক ও চৈটি 'আদর্শের সাবলীল রেখায় পরিস্ফুট ভাঁজ সম্পূর্ণ ভারতীয় গান্ধার শিল্প সংমিশ্রণে একটি নূতন সৃষ্টি। গ্রীক অধিকারের প্রথম যুগের গ্রীক-রোমীয় অনুকরণের প্রবণতা পরবর্ত্তী যুগে বিপরীতগামী হইয়া মথুরার বৃষবাহন শিবমূর্ত্তির অনুকরণের দিকে ঝুঁকিয়া অবশেষে যেন ঘটিকার দোলকের ন্যায় সমন্বয় সাধনে গান্ধার শিল্পের নব কলেবরে মধ্যস্থলে আসিয়া স্থির হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিল্পের প্রাচ্যকরণ কথায় (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৬৫) বলা হইয়াছে প্রাচ্য শিল্পাদি পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যদেশে এই সকল শিল্প নব রূপায়নে যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা পাশ্চাত্ত্য "পরিচ্ছন্নতা" ও "বাস্তবতা"। ভারতীয় রহস্যময় ও রূপক শিল্পের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছে গান্ধার শিল্প। মানুষের অন্তরাত্মা যেরূপ দর্শনের তৃষ্ণায় চির সুন্দরের অনুসন্ধান করে, শিল্প সাধনা তাহার বাহ্যিক প্রকাশ।

প্রণালী যে গ্রীক-রোমীয় ইহার সমর্থনে রোল্যাণ্ড অধ্যাপক মেরীও বুশগ্লির অভিমতের উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রস্তর ও প্রাচীর গাত্রের দ্রাক্ষালতা অঙ্কনও তিনি গ্রীক-রোমীয় শিল্পের অনুরূপ মনে করেন। সারি-বাহলোলে প্রাপ্ত শিল্পাঙ্কনে ভারতীয় ও গ্রীক-রোমীয় শিল্পাঙ্কনের সংমিশ্রণ খুবই স্পষ্ট। রোমে রক্ষিত দ্রাক্ষালতাদির আবেষ্টনে অলঙ্কৃত মানুষ ও পশুমূর্ত্তি গ্রীক-রোমীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে এণ্টোনাইনগণের রাজত্বকালের নিদর্শনগুলিতে।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শিল্পাদর্শ যাহা গ্রীক-রোমান প্রভাবে গঠিত হইয়াছে তাহা মানব প্রতিকৃতি অঙ্কন এবং মানব দেহের উর্দ্ধার্দ্ধ অংশ (Bust) অঙ্কন। পেশোয়ার মিউজিয়ামে রক্ষিত মানব প্রতিকৃতি (সারি-বাহলোলে প্রাপ্ত) ও তাহার গঠন কৌশল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত অঙ্কিত রোমক রাজ্যের যে কোনও মানব প্রতিকৃতির সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত প্রোবাস এর প্রতিকৃতি (রোম) ও সারি-বাহলোলের বৌদ্ধ ভিক্ষুমূর্ত্তি এক ও অভিন্ন, অন্ততঃ গঠন-প্রণালী ও কৌশলে। কুষাণ সম্রাটগণকে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও গঠনে প্রেরণা দিয়াছে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ধর্ম্মীয় গাম্ভীর্য্য রক্ষার জন্য গ্রীক-রোমীয় দেব দেবীর মূর্ত্তির আদর্শ গ্রহণ প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া রোল্যাণ্ড মনে করেন।

রোল্যাণ্ডের অভিমত সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে হইলে ইহার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মহাযান মতবাদ স্বীকৃত হয়। মহাযান পন্থীরা বুদ্ধদেবকে দেবতার আসনে

মানুচির দেখা মুঘল ভারত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হারেমের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, হারেমের শাসনযন্ত্র সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্রেরই অনুকরণে গঠিত হয়েছিল। দরবারে যেমন উজীর মীরবক্সী ছিল তেমনি হারেমের উচ্চ পদস্থ নারী কর্ম্মচারী ছিল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উচ্চ বংশজাতা ছিলেন তাঁরাই আমীর-ওমরাহের মত অনুরূপ পদমর্য্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। সম্রাট এদের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল ছিলেন, বিশেষতঃ সম্রাট যতক্ষণ হারেমের মধ্যে থাকতেন ততক্ষণ এরাই সম্রাটের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা রূপে সাম্রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে সাহায্য করতেন। সেইজন্য সম্রাট এদের সততা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার উপর লক্ষ্য রেখে খুব সতর্কতার সঙ্গে এদের নির্ব্বাচন করতেন। সম্রাটের উপর এদের প্রভাবও ছিল অসীম। প্রকৃতপক্ষে দরবারের মন্ত্রিগণ অপেক্ষা এরা সাম্রাজ্যের অনেক বেশী সংবাদ রাখতেন। এমনকি খোজা গুপ্তচর মারফৎ এরা সাম্রাজ্যের যে সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করতেন তার মধ্যে অনেক সংবাদই দরবারের মন্ত্রিবর্গেরা পর্য্যন্ত কোন দিন জানতে পারতেন না বা তা জানার সুযোগও তাঁদের ছিল না। এরা গুপ্তচর মারফৎ যতশীঘ্র কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হতেন সাম্রাজ্যের মন্ত্রীরা ততশীঘ্র কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারতেন না। এক কথায় সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদাদি এরাই সর্ব্বাগ্রে পেতেন।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের রাজকর্ম্মচারিগণ প্রেরিত গোপনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় সংবাদাদি এরা সম্রাটকে পাঠ করে শোনাতেন এবং সম্রাটের আদেশ অনুসারে সম্রাটের জবানীতে তার উত্তর দিতেন। সাধারণতঃ খোজা প্রহরীরাই শীলমোহর করা চিঠিপত্রাদি হারেমের মধ্যে নিয়ে আসত ও সম্রাটের আদেশ ও নির্দ্দেশাবলী দরবারে কর্ম্মচারীদের কাছে পৌঁছে দিত। পূর্ব্ববর্ত্তী মুঘল সম্রাটদের প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রাদেশিক'ওয়াকিয়হ নবিস' অর্থাৎ সাধারণ সংবাদদাতা এবং 'খুফিয়হ নবিস' অর্থাৎ গুপ্ত সংবাদ দাতারা 'ওয়াকিহ'তে অর্থাৎ গেজেটে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় ও জরুরী সংবাদাদি লিপিবদ্ধ করে একটি করে সাপ্তাহিক চিঠি দাখিল করত। হারেমের উপরোক্ত কর্ম্মচারীরা এই সব চিঠিপত্রের সংবাদাদি সম্রাটকে প্রত্যহ রাত ৯টার সময় পড়ে শোনাতেন এবং এই ভাবেই সাধারণতঃ সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হতেন। গুপ্তচরদের প্রেরিত সাপ্তাহিক চিঠিপত্রের মধ্যে বাদশাজাদাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও সংবাদ থাকত। সম্রাট প্রায় মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত এই চিঠিপত্র শুনতেন ও তার জবাব দিতে ব্যস্ত থাকতেন এবং তার পরই সম্রাট ঘুমাতেন। সম্রাট ঔরংজেব সারাদিনরাত্রির মধ্যে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমাতেন এবং অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই উঠে পড়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা করে সারাদিনের কার্য্যক্রমের ফিরিস্তি ছকে নিতেন।

উপরোক্ত বিবরণ থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়দলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার কতখানি সুযোগ অন্তঃপুরবাসিনীরা পেতেন এবং সেইহেতু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের কার্য্যধারার গুরুত্ব যে কত বেশী ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

হারেমের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালন ব্যাপারে নারীরা ছাড়াও অনেক কৃতক্লীব পুরুষ অর্থাৎ খোজা কর্ম্মচারীও নিযুক্ত ছিল। এদের মধ্যে একদল পরিচালক ছিল যাদের 'নাজির' বলা হ'ত। নাজিরদেরও একজন প্রধান ছিলেন যিনি ওমরাহের সমপর্য্যায়ভুক্ত এবং প্রকৃতপক্ষে হারেমের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনি একদিকে যেমন হারেমের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন তেমনি সম্রাটের পোষাকঘরেরও অধিকর্ত্তা ছিলেন। সম্রাট কোন ব্যক্তিকে যদি কোন 'শিরোপা' দিয়ে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তখন প্রধান নাজিরই শিরোপার নমুনা অনুগৃহীত ব্যক্তিবিশেষের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী ঠিক করে দিতেন। হারেমের ধনরত্নাদি, অলঙ্কারাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির হিসেবনিকেশ রাখার দায়িত্বও এরই উপর অর্পিত ছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি বেগমের মহলের তত্ত্বাবধান কার্য্যে একজন করে নাজির নিয়োজিত ছিল যার অধীনে অনেকগুলি করে খোজা কর্ম্মচারী অর্থাৎ গুপ্তচর, দূত, পত্রবাহক, পরিচালক ও দ্বাররক্ষক ছিল। এই সব খোজারা নিজেদের গুরুত্ব বুঝে স্থান বিশেষে আমীর-ওমরাহদের উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতেও ভয় পেত না। অসময়ে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাবার জন্য অনেকক্ষেত্রে আমীর-ওমরাহদের এদেরই ঘুষ দিয়ে সেই সাক্ষাতের আয়োজন করতে হ'ত। এরা সম্রাটের ধনঐশ্বর্যের রক্ষক ও ধারক হওয়ায় স্বভাবতঃই অল্পদিনের মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী হয়ে উঠত, এমনকি দরবারের অনেক ওমরাহের চেয়ে বেশী ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হ'ত।

যে সমস্ত খোজা প্রহরীদের উপর হারেমের দ্বার রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাদের উপর সম্রাটের নির্দ্দেশ ছিল যে, হারেমের মধ্যে প্রবেশেচ্ছু প্রত্যেককেই, তা যে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, দেহতল্লাসী করে তবে যেন হারেমের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। এই তল্লাসীর উদ্দেশ্য ছিল যে, এরা লুকিয়ে কোন মাদকদ্রব্য অর্থাৎ ভাং, সুরা, আফিম, জায়ফল বা মূলা, শশা বা ঐরূপ আকৃতির

কোন কল বা সঙ্গী হারেমে নিয়ে আসছে কি না তাই দেখা। হারেম থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ও এদের দেহ তল্লাসী করে দেখা হ'ত যে হারেমের কোন ধনরত্নাদি এদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে কি না। এই তল্লাসীর আরও একটি কারণ ছিল সেটা হচ্ছে কোন পুরুষ নারীর ছদ্মবেশে হারেমে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে কিনা তাই দেখা। এই সব দ্বাররক্ষীরা অনেক ক্ষেত্রে হারেমে প্রবেশেচ্ছু মহিলাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি অভদ্র ভাবে তল্লাসী করতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হ'ত না। বোধ হয় হতভাগ্য পৌরুষ-বঞ্চিত ভাগ্যের উপর বিদ্বেষের আক্রোশেই তারা এটা করত। প্রত্যেকটি বেগমের মহলের দ্বারপথে যে সব নারী প্রহরীরা পাহারা দেওয়ার কার্য্যে নিযুক্ত থাকত তাদের সঙ্গে একজন করে খোজা সংবাদ-লেখকও থাকত যারা মহলের মধ্যে কারা কখন আসছে বা যাচ্ছে তাই লিখে মহলের নাজিরকে জানিয়ে দিত।

হারেমের মধ্যে যদি কোন পুরুষ মিস্ত্রী অর্থাৎ রাজমিস্ত্রী বা ছুতার মিস্ত্রীর আসার প্রয়োজন হ'ত তা হলে তাদের নাম-ধাম, দেহের বিবরণ ও বিশেষ চিহ্নগুলি হারেমের দ্বারপার্শ্বে সংবাদ-লেখকের খাতায় লিখিয়ে দেহতল্লাসী করে তবে প্রবেশ করান হ'ত এবং যখন কাজ সেরে হারেম থেকে বেরিয়ে যেত তখন সেইসব চিহ্নাদি মিলিয়ে দেখে তবে বেরুতে দেওয়া হ'ত। একের বদলে অপরে যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে সেইজন্যই এই ব্যবস্থা।

হারেমে যখন কোন চিকিৎসকের যাওয়ার প্রয়োজন হ'ত তখন দ্বারপ্রান্তেই তাদের বোরখা পরিয়ে দিয়ে তবে অন্দরে নিয়ে যাওয়া হ'ত। চিকিৎসকরা সাধারণতঃ পর্দ্দার আড়ালে শায়িত রোগিণীর মাত্র হাতখানি স্পর্শ করে রোগিণীদের পরীক্ষা করতে হ'ত, তাদের দেখার সুযোগ চিকিৎসকরা পেতেন না। নাড়ী দেখে ও রোগের বিবরণ শুনেই তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিতে হ'ত। মানুচি অবশ্য বাদশাজাদা শাহ আলমকে অভিযোগ করায় বাদশাজাদা তাকে বিনা বোরখাতেই হারেমের মধ্যে আসবার অনুমতি দিয়েছিলেন সেইজন্য হারেমের অনেক-কিছুই দেখার সুযোগ মানুচি পেয়েছিলেন যা কোন বিদেশী এবং অনেক ভারত-বাসীই হয়ত পান নি।

হারেমের কোন অন্তঃপুরবাসিনীর পুরুষ আত্মীয় যদি কখনও তার সঙ্গে দেখা করতে আসবার প্রয়োজন হ'ত তা হলে প্রথমে দর্শনার্থী পুরুষটিকে দ্বাররক্ষীদের কাছে তার এই দেখা করার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে হ'ত এবং রক্ষীরা অন্তঃপুরবাসিনীর কাছে সেই সংবাদ পাঠিয়ে দিতেন ও তাদের অনুমতি পেলে পর দর্শনার্থীকে তার কাছে নিয়ে যেত। অন্তঃপুরবাসিনী পর্দ্দার আড়াল থেকেই আগন্তুকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতেন এবং কথা শেষ হলে পর কোন বাঁদী মারফৎ একটি পান পাঠিয়ে দিতেন তার পর দর্শনার্থী পুরুষটি ফিরে যেতেন।

মানুচি হারেমে যাওয়া-আসার নিয়মাবলীর কঠোরতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, মুসলমানদের মন ভয়ঙ্কর সন্দেহাকুল ছিল। এরা কাউকেই বিশ্বাস করতে চাইতেন না বিশেষ করে মহিলাদের ব্যাপারে। এদের মধ্যে অনেকে এমনকি নিজের সহোদর ভাইকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে চাইতেন না বা তাদের গৃহিণীদের ভাই-এর সামনে পর্য্যন্ত বেরুতে দিতেন না। বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের সব কিছু স্বাধীনতা হারিয়ে সদাসর্ব্বদা সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত হয়ে থাকার দরুণ এই সব মহিলাদের মন ঈর্ষা-বিদ্বেষে সর্ব্বদা পূর্ণ হয়ে থাকত, ফলে এদের কোন ভাল কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। উজীর আসাদ খানের স্ত্রী নাভাস-বাই নিজে মানুচির কাছে উক্ত মর্ম্মে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। তিনি মানুচিকে বলেছিলেন যে, তাদের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে কি উপায়ে তাদের স্বামীকে একান্ত নিজের করে রাখা সম্ভব তারই উপায় উদ্ভাবন করা, যাতে তাদের স্বামী অন্য কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে সেইজন্য তাদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। বৈচিত্র্যহীন বন্দিনী জীবনযাত্রার কথা ভুলে থাকার জন্য সিরাজী পান, প্রসাধন, অলঙ্কারাদি পর্য্যবেক্ষণ, পান খাওয়া, নৃত্যগীতাদিতে আকৃষ্ট থাকা, প্রেমোপাখ্যান পড়া ও সুযোগ বুঝে রাষ্ট্রবিপ্লবের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকাই হারেমবাসিনীদের বন্দিনী জীবনের কর্ম্মযোগ ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। মানুচি এদের বহির্জগতের লোকদের সঙ্গে মেশবার আগ্রহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, শুধু একজন বহির্জগতের পরপুরুষের সান্নিধ্য পাবার জন্য অনেক সময় মিথ্যা করে তারা অসুস্থ বলে প্রচার করতেন এবং যখন মানুচি তাদেরকে অর্থাৎ রোগিণীকে পরীক্ষা করবার জন্য পর্দ্দার স্বল্প ছিদ্র দিয়ে তার হাত ভিতরে পুরে রোগিণীর হাত ধরতেন তখন তারা তার হাত ইচ্ছা করেই আলতো করে কামড়ে দিয়েছে বা তাদের স্তনের ওপর অনেকক্ষণ ধরে চেপে ধরে রেখেছে। পার্শ্বে দণ্ডায়মান খোজা প্রহরীরা যাতে কোনরূপে এই অপকর্ম্মের কথা জানতে না পারে বা সন্দেহ পর্য্যন্ত না করতে পারে সেইজন্য মানুচিকে সর্ব্বক্ষেত্রেই তার মুখের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে হয়েছে। এরূপ ঘটনা মানুচির ক্ষেত্রে বহুবার ঘটেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুচি তাদের মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে প্রকাশ্যেই সম্রাট বা বাদশাজাদাদের মিথ্যা করে জানিয়েছিলেন যে, রোগিণীর শারীরিক অসুস্থতার একমাত্র কারণ হচ্ছে যৌন-বিকৃতি যার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিবাহ দেওয়া। অনেকক্ষেত্রে সম্রাট তার নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিবাহ দিয়ে দেখেছিলেন সত্যসত্যই সেই রমণী বেশ সুখেই সুস্থ শরীরে জীবন কাটিয়েছেন।

বেগম বা বাদশাজাদীরা সাধারণতঃ হারেমের বাইরে যেতেন না তবে কোনরূপ উৎসব বা সম্রাটের দেশভ্রমণ কালে এরাও সম্রাটের সঙ্গী হতেন। সুসজ্জিত হস্তী-পৃষ্ঠের উপর স্থাপিত 'পিতাম্বর' (মঃ বার্ণিয়ার বলেছেন, 'মেঘডম্বর') নামক চতুর্দ্দোলাতে করেই এরা যাতায়াত করতেন। বিভিন্ন রঙিন পর্দ্দা দিয়ে আবৃত চতুর্দ্দোলার মধ্য থেকে বেগমরা বাইরের সবকিছু পর্য্যবেক্ষণ করতেন। এই সব হস্তীদের গলায় ঘণ্টা বাঁধা থাকত এবং ঘণ্টার শব্দ পেলে পরেই সাধারণ লোক রাজপথ ছেড়ে সরে যেত। ঘণ্টা

পোনার পরও যদি কোন পথিক বেগমদের দেখার জন্ম পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকত তা হলে সেই কৌতূহল বেগমের সঙ্গী খোজা-প্রহরীরা বেত্রাঘাতে মিটিয়ে দিত। খোজা প্রহরীরা এদের সঙ্গে, সঙ্গেই যেত এবং সেই সঙ্গে পোষাকধারী নকীবরাও যেত। তাদের কাজ ছিল চীৎকার করে বেগমদের পরিচয়াদি জ্ঞাপন করা। ওমরাহদের মধ্যে কেউ যদি এদের চলন পথে কখন এসে পড়তেন তা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে নেমে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ত যতক্ষণ না পর্য্যন্ত বেগমদের হস্তী চলে যেত। কখনও কখনও বেগমরা এইসব ওমরাহদের জন্ম তাম্বুল পাঠিয়ে দিয়ে তাদের কৃতার্থ করতেন।

মানুচি এই হতভাগ্য হারেমবাসিনীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, এদের মধ্যে অনেক দয়াশীলা মহিলাও ছিলেন যাঁরা তাঁদের নিজেদের ধনসম্পদ দিয়ে অনেক জনহিতকর কার্য্য অর্থাৎ পান্থশালা, লঙ্গরখানা, জলছত্র প্রভৃতি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং গরীবদের প্রভূত অর্থদান করে গেছেন। সম্রাটকে প্রভাবান্বিত করে এরা অনেক রাজকর্মচারীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ পর্য্যন্ত মকুব করিয়ে দিয়েছেন দেখা গেছে। মুঘল সাম্রাজ্যের চারুকলা শিল্পের প্রভূত উন্নতিবিধানের পিছনে এদের অকৃত্রিম অনুরাগ ও আর্থিক সাহায্যদান অনস্বীকার্য্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুচি তাঁর বিবরণীতে মুঘল সম্রাটের পুত্রকন্যা ও নাতিনাতনীদের কি ভাবে হারেমের মধ্যে মানুষ করা হ'ত তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সম্রাট বা বাদশাজাদার কোন পুত্র বা কন্যা জন্মালে হারেমের মধ্যে একটি বিশেষ উৎসব পালন করা হ'ত। পুত্র জন্মিলে সম্রাটের আদেশ অনুসারে সারা সাম্রাজ্য জুড়েই কয়েকদিন ধরে এক আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'ত। দরবারের আমীর ও অমরাহরা নবজাত শিশুর কল্যাণ কামনা করে ধনরত্ন ও অশ্বহস্তী প্রভৃতি ভেট দিতেন। নবজাত শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট তার জন্ম বিশেষ জায়গীরের বন্দোবস্ত করে দিতেন এবং সেই সব সম্পত্তি দেখাশুনা করার জন্ম পদস্থ কর্মচারীও নিয়োগ করতেন। জায়গীর থেকে বৎসর সালিয়ানা যা লাভ হ'ত তার সবটাই শিশুর খাতে রাজকোষে জমা পড়ত এবং তার বিবাহের সময় সেই সংরক্ষিত অর্থ বিবাহের যৌতুক হিসাবে সম্রাট দান করতেন।

বাদশাজাদাদের বৃত্তির পরিমাণ কখনই ৫০ হাজার টাকার উর্দ্ধে ধার্য্য করা হ'ত না এবং এই সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি সাধারণতঃ সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্রকেই দেওয়া হ'ত। বাদশাজাদারা অনেক সময় গুপ্তভাবে হিন্দু নৃপতি ও রাজন্যবর্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ভবিষ্যতে সম্রাট হলে পর তাদেরকে জায়গীর ও দরবারে উচ্চপদ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আদায় করতেন। এদের মধ্যে ভবিষ্যতে যাঁরা পরে সত্যই সিংহাসনে বসতেন তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে সচেষ্ট হতেন দেখা গেছে।

যখন কোন বাদশাজাদার কোন পুত্র জন্মাত তখন নিয়মানুসারে শিশুপুত্রের ঠাকুর্দাই অর্থাৎ সম্রাটই তাঁদের নামকরণ করে দিতেন, তার জন্ম জায়গীরের বন্দোবস্ত করে দিতেন। সম্রাট শিশুপুত্রের খাওয়া দাওয়া ও পরিচর্য্যার জন্ম দৈনিক ২.৩ শত টাকা বরাদ্দ করে দিতেন। যতদিন না শাহাজাদার (বাদশাজাদার পুত্র) বিবাহের বয়স হয় ততদিন এই ব্যবস্থাই চালু থাকে এবং বিবাহের উপযুক্ত বয়স অর্জ্জন করলে পর নিয়মানুসারে তার জন্ম বৃত্তির ব্যবস্থা করতেন। শিশুপুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মানুসারে তার হাতে একটি লাল ফিতা পরিয়ে গিঁট বেঁধে দেওয়া হ'ত এবং তার প্রতি বাৎসরিক জন্মদিনে এই ফিতায় একটি করে নূতন গিঁট যোগ করে দেওয়া হ'ত ও উৎসব পালিত হ'ত। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বাৎসরিক গিঁট-বাঁধা কাজ চলত।

শিশু শাহাজাদার পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম হলে পর তাকে আরবি কিম্বা তুর্কী ভাষা লেখাপড়া সেখান হ'ত এবং পরে এদের জ্ঞানী শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হ'ত যাঁরা এদেরকে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বিদ্যাতেও পারদর্শী করে তুলতেন। এদের সংশিক্ষা দেবার জন্ম মাঝে মাঝে শিক্ষকেরা বিভিন্ন অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন এবং বিচার-বিবেচনা করার বিভিন্ন পদ্ধতি ও যুদ্ধনীতি শিক্ষা দিতেন। সম্রাট যখন কোন শিকারে যেতেন বা মসজিদে যেতেন তখন তিনি বাদশাজাদা এবং শাহাজাদাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। ১৬ বৎসর বয়সকাল পর্য্যন্ত এদের হারেমের মধ্যেই মানুষ করা হ'ত। তার পর এদের বিবাহ দিয়ে এদের জন্ম পৃথক প্রাসাদের বন্দোবস্ত করা হ'ত কিন্তু তাই বলে এদের সম্রাট একা থাকতে দিতেন না সর্ব্বদাই এদের সঙ্গে জ্ঞানীগুণী শিক্ষকদের থাকারও বন্দোবস্ত তিনি করতেন। এ ছাড়া সম্রাট এদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্ম গুপ্তচরও নিয়োগ করতেন যাঁরা প্রতিদিনই সম্রাটকে এদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদই জানাত।

সম্রাট ও সম্রাট পুত্রদের জন্মদিবসে যে বিশেষ উৎসবটি পালন করা হ'ত তাকে 'নৌরোজ' বলা হ'ত এবং এইদিনে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী তাদেরকে ধনরত্ন, বস্ত্র, শস্য ইত্যাদি দিয়ে পৃথক ভাবে ওজন করা হ'ত ও উপরোক্ত দ্রব্যাদি রাজধানীর গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হ'ত। সম্রাট এইদিনে আমীর, ওমরাহ ও হিন্দু রাজন্যবর্গের কাছ থেকে বিশেষ উপঢৌকন পেতেন। সম্রাটও এই দিনে তাঁর অনুগৃহীত কর্মচারী ও ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন সম্মানসূচক শিরোপা দিতেন এবং পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির আদেশ দিতেন। হারেমের গায়িকা ও নর্তকীদেরও এই উৎসবে বিশেষ ইনাম দেওয়া হ'ত। সম্রাটের উপঢৌকন গ্রহণ করা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, মুঘল সম্রাটরা নিজেদের সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বররূপে কল্পনা করতেন এবং যেহেতু তিনি সম্রাট সেহেতু তাঁর অধীনস্থ সকলেই তাঁকে যেমন উপঢৌকন দিতে বাধ্য তেমনি তা গ্রহণ করার অধিকারও তাঁর আছে এইরূপ মনোভাব

পোষণ করতেন। সম্রাটের কাছে কোন অনুগ্রহ পেতে গেলে প্রথমে তাঁকে কিছু উপঢৌকন দেওয়াই মুঘল যুগের রীতি'। বিদেশী রাষ্ট্রদূতের পক্ষেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। দরবারে কোন লোককে নিয়োগ করার পূর্ব্বে এমনকি সম্রাট পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতেন যে, উপযুক্ত অর্থ অর্থাৎ ঘুষ পাওয়া গেছে কি না। ঐ আদায়কৃত অর্থের কিছু অংশ আদায়কারীকে দিয়ে বাকী অংশ রাজকোষে জমা পড়ত।

মানুচি তাঁর বিবরণীতে বলেছেন যে, মুঘল হারেমের বাৎসরিক খরচের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি মুদ্রা (প্রায় ১১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ডের সমতুল্য)। এই খরচের মধ্যে অবশ্য সম্রাট কর্তৃক অনুগৃহীত ব্যক্তিবর্গের প্রতি প্রদত্ত 'শিরোপার' খরচাদি ধরা আছে। বিরাট এক প্রাচুর্য্যময়ী বিলাস নগরীর খরচের পরিমাণ যে একটু বিরাট আকারেরই হবে তাতে আর সন্দেহ কি? (পর্য্যটক হকিন্সের মতে হারেমের পাকশালার জন্য দৈনিক ১ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় হারেমের দৈনিক ব্যয় ছিল ৩০ হাজার টাকা। একমাত্র সম্রাটের নিজের জন্য দৈনিক খরচ হ'ত প্রায় ৫০ হাজার টাকা।)* সম্রাট ও বাদশাজাদাদের পেসাদী খাদ্যসম্ভার বেগম, শাহাজাদী ও রক্ষী প্রধানদের সরবরাহ করা হত। এতে তারা শুধু খুসীই হতেন না অনুগৃহীতও হতেন এবং সরবরাহকারী খোজাদের এর জন্য পুরস্কারও দিতেন। সম্রাট যখন যুদ্ধার্থে শত্রুপক্ষের দেশে অবস্থান করতেন তখনও কিন্তু সম্রাটের খাদ্য-তালিকায় কোন পরিবর্ত্তন করা হ'ত না যার জন্য পাকশালার খরচাদি বরাদ্দকৃত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা কখনই সম্ভবপর হয়ে উঠত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুঘল দরবার:—মানুচি এর পর মুঘল দরবার তথা মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার যে বিবরণী দিয়েছেন নিম্নে তাই বিবৃত করা হ'ল:

মুঘল সম্রাট তার দরবারের কার্য্যাদি প্রধানতঃ তিনজন সর্ব্বোচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী মারফৎ পরিচালনা করতেন, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রধান উজীর অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টা; দ্বিতীয় জন হচ্ছেন দেওয়ান এবং তৃতীয় জন হচ্ছেন মীর শামান।

প্রধান মন্ত্রীই প্রধানতঃ সাম্রাজ্যের ভূমিবণ্টন ও ভূমি-রাজস্ব আদায়ী কার্য্যাদি পরিচালনা করতেন, অবশ্য প্রত্যেক বিভাগের উপরই এর কর্তৃত্ব ছিল এবং সেই সঙ্গে সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্বও অর্পিত ছিল। দরবারের সঙ্গে ওমরাহ ও নিম্নতম কর্ম্মচারীদের সংযোগ রক্ষার দায়িত্বও এরই উপর অর্পিত ছিল।

দেওয়ানের প্রধান কাজ ছিল ভূমি-রাজস্ব ছাড়া অন্যান্য রাজস্ব ও কর আদায় করা, মৃত প্রজার বা সরকারী কার্য্য থেকে বরখাস্ত কর্ম্মচারীদের সম্পত্তির তদারকী করা এবং বেতন ও মাসোহারা বণ্টন করা।

মীর শামানের প্রধান কাজই ছিল, রাজপ্রাসাদ ও হারেমের খরচাদির তদারক করা।

এঁরা ছাড়াও আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন যেমন মীর বক্সী, কাজী ও কোতয়াল। সম্রাটের অশ্বারোহী এবং পদাতিক ও গোলন্দাজ সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন দুইজন মীর বক্সী। কাজী হচ্ছেন রাজ্যের প্রধান বিচারক। কোতয়াল ছিলেন রাজধানীর শান্তিরক্ষক।

অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধানকল্পে প্রজারা কাজীর কাছেই বিচারপ্রার্থী হয়ে মামলা দায়ের করতেন এবং কাজী বাদী ও বিবাদী পক্ষের বক্তব্য শুনে তাঁর রায় দিতেন। কোন অপরাধীকে গুরুতর কোন অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে কাজীকে তিনবার সম্রাটের কাছে অপরাধীর অপরাধ ও তার বিচারের যুক্তিগুলি পেশ করতে হ'ত এবং তা না করলে পর তিনি কোন মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিতে পারতেন না। কাজীর বিচারকার্য্যে সহায়তা করার জন্য দুজন মুফতিও ছিল। কোন নারী যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা কাজীর কাছে দায়ের করতেন তা হলে কাজী তাকে তার নিজের বাড়ীতে তিন দিন রেখে তার চালচলন দেখে তবে তিনি মামলার রায় দিতেন। কাজীর আদেশের উপর কারুর মন্তব্য করার অধিকার ছিল না। মানুচি বলেছেন যে, অনেকক্ষেত্রে কাজী অর্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতেন। এ সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, একবার একটি যুবক কাজীর দরবারে তার এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে সম্পত্তির স্বত্বের অধিকার সম্পর্কে একটি মামলা দায়ের করেন। যুবকটি কাজীকে তার স্বপক্ষে রায় দেবার জন্য বিশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে অনুরোধ করেন যে, যখন সে ছোট ছিল তখন তার পিতা তার সমস্ত সম্পত্তির তদারকের ভার আত্মীয়টির উপর দিয়ে যান কিন্তু আত্মীয়টি এখন সেই সম্পত্তি থেকে তাকে (যুবকটিকে) বঞ্চিত করতে চাচ্ছে। বিবাদী পক্ষও এই মামলা দায়ের হতে দেখে তার স্বপক্ষে কাজীর রায় পাবার জন্য কাজীকে ৩০৲ হাজার টাকা ঘুষ দেয়। কাজী তখন মামলা সম্পর্কে সব কিছুই সম্রাট গোচরে আনেন কেবল যুবকের দেওয়া ২০ হাজার টাকা ঘুষ দেওয়ার কথাটি বাদে। সম্রাট সব শুনে শেষে বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিতে ও ঘুষের ৩০৲ হাজার টাকা রাজকোষে জমা দিতে বলেন। ফলে কাজী ২০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে ও ন্যায় বিচারের সুখ্যাতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মানুচি অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেটি কাজীর নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্কে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রটি অনেক সময় তাঁর হয়ে বিভিন্ন মামলায় শুনানী শুনে মামলার রায় দিতেন। একবার এই

---

* Mughal Harems in India—An article written by Sri V. Rangachari in Daily Herald (London)—1912.

যুবকটি একটি হিন্দু গৃহস্থের সুন্দরী স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে তাকে তার স্বামীর ঘর থেকে জোর করে ধরে এনে তাঁর বাড়ীতে আটকে রাখেন। হিন্দু গৃহস্থটি যখন এই ঘটনার কথা কাজীর দরবারে বিচারপ্রার্থী হয়ে পেশ করেন তখন কাজী তার মামলা গ্রহণ না করে উল্টে তাকেই শাসিয়ে দিয়ে বললেন যে, তার স্ত্রীকে দিয়ে এরূপ পাপকার্য্য করানর জন্য তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ হওয়া উচিত। হিন্দুটি উপায়ান্তর না দেখে অপরাধীকে শাস্তি দেবার ভার নিজের হাতেই তুলে নেন ও একদিন পথিমধ্যে কাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে খুন করে ফেরার হয়ে যান।

শহর কোতয়াল যিনি ছিলেন তাঁকে নিয়মানুসারে কাজীর আদেশ মানতে হ'ত যদিও রাজধানীর শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষার কাজে তিনিই ছিলেন প্রধান। কোতয়ালের প্রধান কাজই ছিল রাজধানীতে কেউ গোপনে মদ চোলাই করছে কিনা তাই দেখা এবং প্রয়োজনবোধে তার প্রতিবিধান করা। বারবনিতাদের রাজধানীতে আড্ডা গাড়তে না দেওয়া ও রাজধানীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদি। রাজধানীর কোথায় কি ঘটছে তার সংবাদ পাবার জন্য এরা কতকগুলি হালালকরদের (মেথরদের) নিয়োগ করতেন, যাদের প্রতিদিন রাজধানীর প্রত্যেকটি বাড়ীতেই ২ বার করে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য যেতেই হয়। তারা বাড়ীর মধ্যে থাকাকালে বাড়ীর অধিবাসীদের মুখ থেকে শোনা সংবাদাদি সংগ্রহ করে এনে কোতয়ালকে জানাত। রাজধানীতে যাতে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানী না হয় সে জন্য কোতয়ালের অধীনস্থ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যেরা ২৪ ঘণ্টাই রাজধানীর পথে পথে টহল দিয়ে বেড়াত। রাজধানীর যা কিছু কর বা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও এরই উপর অর্পিত ছিল।

মুঘল সম্রাটদের নিয়মানুসারে সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি ওমরাহ ও ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের বাড়ীতে সম্রাটের নিযুক্ত একজন করে 'ওয়াকিহ নবিস' ও 'খুসিয়হ নবিস'কে স্থান দিতে হ'ত। এদের কাজই হচ্ছে সম্রাটকে বাড়ীর মালিকদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সব কিছু জানান।

সাম্রাজ্যের ভূমিরাজস্ব যাঁরা আদায় করতেন তাঁদের 'ফৌজদার' বলা হ'ত। সাধারণতঃ 'ফৌজদার'রা তাঁদের দলবল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে বেড়াতেন এবং প্রয়োজন হলে কৃষকদের মারধোর করেও তা আদায় করতেন। ভূমিতে ফসল না ফললেও কৃষকদের রাজস্ব দিতে হ'ত তা সে গবাদি পশু বিক্রী করেই হউক বা স্ত্রীপুত্র বিক্রীকরেই হউক। সময় সময় ফৌজদারদের অকথ্য অত্যাচারের ফলে সাম্রাজ্যে স্থানে স্থানে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিত যা দমন করতে রীতিমত যুদ্ধের প্রয়োজন হয়ে পড়ত। যুদ্ধে কৃষকরা হেরে গেলে সৈন্যবাহিনীর লোকেরা তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে তাদের স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের লুট করে নিয়ে যেত। লুণ্ঠিত নারীদের মধ্যে যাদের ভাল দেখতে তাদেরকে সম্রাটের কাছে ভেটস্বরূপ পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত এবং বাদবাকীগুলিকে বিক্রি করে দেওয়া হ'ত'। মানুচি বলেছেন যে, সম্রাট ঔরংজেবের রাজত্বকালে অনেক বুড়ো ফৌজদারের মৃত্যু অথবা কার্য্যচ্যুতির ফলে অনেক নূতন অল্পবয়স্ক ফৌজদারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই নবীন ফৌজদাররা খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত অর্থ উপায় করার উন্মাদনায় অন্যায় উৎপীড়ন করে নিজেদের খ্যাতিমান করে তুলেছিল এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সারা সাম্রাজ্য জুড়েই অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই সব অসন্তোষের কথা যাতে সম্রাটের কানে না ওঠে তার জন্যে ফৌজদাররা 'ওয়াকিহ নবিস' ও 'খুসিয়হ নবিসদের' ঘুষ দিয়ে বশ করেছিল। সম্রাট অবশ্য বেশ ঘটা করেই প্রচার করতেন যে, ন্যায় বিচার সমভাবে যাতে ধনী-দরিদ্র পায় সে দিকে তার সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রয়েছে বা তিনি নিজে এ সম্বন্ধে কোন প্রভেদ রাখেন নি, তার সব বিচারের প্রমাণস্বরূপ রাজধানীর রাজপথ দিয়ে প্রতিদিন প্রভাতে একই শিকল-বাঁধা একটি সিংহ ও ছাগলকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

ফৌজদারদের উপর ভূমিরাজস্ব আদায় করা ছাড়া আরও একটি কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল সেটি হচ্ছে রাজপথের তদারক করার ভার। যদি কোন পথিক পথিমধ্যে দুর্বৃত্তদের কবলে পড়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যায় তা হলে সরকারী তহবিল থেকেই তার অপহৃত ধনসম্পদের খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু পথিক যদি রাত্রিতে পথিমধ্যে কোন দুর্বৃত্তের হাতে পড়ে নিগৃহীত হ'ত তা হলে তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হ'ত না কারণ রাত্রিকালে পথিপার্শ্বস্থ সরাইখানায় আশ্রয় না নিয়ে পথের দুর্বিপাকের দায়িত্ব পথিক নিজে ইচ্ছে করেই নিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হ'ত।

সম্রাট তার প্রজাবর্গের অভাব অভিযোগ সাধারণতঃ 'আম খাস'-এ বসে শুনতেন এবং অপরাধীর শাস্তিবিধান করতেন। চোর-ডাকাত রাজবিদ্রোহীদের শিরশ্ছেদেরই আদেশ দেওয়া হ'ত। যখন কোন বিদেশীর পথিমধ্যে দুর্বৃত্তদ্বারা নিগৃহীত হওয়ার অভিযোগ সম্রাটের কাছে উত্থাপন করতেন তখন সম্রাট ক্ষেত্রবিশেষে ফৌজদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দ্দেশ দিতেন বা অভিযোগের তদন্ত করার নির্দেশ দিতেন। প্রজাদের অপেক্ষাকৃত গুরুতর অভিযোগসমূহ বা গুপ্তচরদের প্রেরিত সংবাদাদি সম্রাট 'আম খাস'-এ না শুনে 'গুসলখানায়' অর্থাৎ সলাপরামর্শ কক্ষ (Privy Council Room)এ বসেই শুনতেন ও তার আদেশ ও নির্দ্দেশ দিতেন। রাজকর্ম্মচারীদের কথায় উপর নির্ভর করেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি আদেশ ও নির্দ্দেশাদি দিতেন কারণ সব জিনিস দেখার ফুরসুৎও যেমন তাঁর ছিল না তেমনি তা করার সময় ও সুযোগ-সুবিধাও তিনি পেতেন না। গুসলখানায় সম্রাটের প্রিয় কর্ম্মচারী, ওমরাহ ও রাজন্যবর্গরাই মাত্র আসবার অনুমতি পেতেন।

সম্রাটের চিঠিপত্র ও প্রয়োজনীয় সংবাদাদি বাদশাজাদা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রায় ৫০০ অশ্বারোহী 'হাল বরদার' ছিল। এদের মাসিক বেতন

তিন শ' টাকা থেকে শুরু করে হাজার টাকা' পর্যন্ত ধার্য্য করা হয়েছিল। এঁরা সম্রাটের পতাকাও বহন করত। সম্রাটের আরও একদল 'হাল বরদার' ছিল যারা সম্রাটের চিঠিপত্রাদি সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনাপতিদের কাছে বয়ে নিয়ে যেত। যখন দরবার বসত তখন এরাই বিভিন্ন সাজপোষাক পরে দরজায় হাজির থেকে দরবারের শোভাবর্দ্ধন করত আবার দরবারের শান্তিরক্ষার কাজেও সহায়তা করত।

প্রাসাদরক্ষীদের যিনি প্রধান ছিলেন তাকে 'খাস চৌকীর দারগা' বলা হ'ত। এর অধীনে প্রায় ৪ হাজার শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী সৈন্য জরুরী অবস্থার জন্য সব সময় মজুত থাকত। সম্রাটের 'গুসলখানার' দেখাশুনার ভার এরই উপর ন্যস্ত ছিল। সম্রাটের ব্যবহারার্থে একটি শ্রেষ্ঠ হস্তীকে সব সময় সজ্জিত করে দরবারের সিংহাসনের কাছ থেকে শুরু করে নদীর তীর পর্য্যন্ত যে সুরঙ্গ-পথ ছিল তারই প্রান্তদেশের এক স্থানে মোতায়েন রাখা হ'ত। এ ছাড়া ৪টি শ্রেষ্ঠ অশ্বকেও সম্রাটের ব্যবহারার্থে গুসলখানার প্রাঙ্গণে সব সময় মজুত রাখতে হ'ত। সাধারণতঃ দরবার চলাকালে সম্রাটের হস্তীবাহিনীর ৯টি শ্রেষ্ঠ হস্তীকে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত করে দরবারের প্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে বেঁধে রাখা হ'ত যারা সম্রাটের সিংহাসন আরোহণকালে তাদের শুঁড় দিয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানাত।

সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী তাঁর নিজস্ব অশ্ববাহিনীর কয়েকটি অশ্ব গুসলখানার দ্বারপথে বেঁধে রাখা হ'ত যাতে করে সম্রাট তাঁর অনুগৃহীত রাজকর্ম্মচারীকে তার কার্য্যে পারিতোষিকরূপে কোন অশ্ব পুরস্কারস্বরূপ দিতে ইচ্ছা করলে সঙ্গে সঙ্গেই তা দিতে পারেন।

দরবারে প্রত্যেক ওমরাহের বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর জন্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল এবং তা না মেনে চলা দরবারে নিয়মবিরুদ্ধ কাজ বলেই বিবেচিত হ'ত। মানুচি এ সম্বন্ধে একটি বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল সম্রাট ঔরংজেবের দরবারে? একবার দরবারে মীর বক্সী রহুল্লা খান, যিনি পদমর্য্যাদায় উজীরের নিম্নবর্ত্তী কর্ম্মচারী সম্রাটের কাছে একটি আর্জ্জি পেশ করবার সময় উজীরের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের অগ্রভাগে প্রায় সম্রাটের কাছাকাছি চলে যান। উজীর জাফর খান সেটি লক্ষ্য করেন এবং যখন দেখেন সম্রাট মীর বক্সীকে উপরোক্ত নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করার জন্য কিছুই মন্তব্য করলেন না তখন তিনি অপমানিতবোধে দরবার-কক্ষ ত্যাগ করেন। পরদিন তিনি যখন দরবারে সম্রাটের সঙ্গে কথোপকথন কালে তার নিজের পদমর্য্যাদা অনুযায়ী নির্দ্ধারিত স্থানের চেয়ে ইচ্ছে করেই এক পা এগিয়ে গিয়ে সম্রাটের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান তখন সম্রাট মন্তব্য করেন যে উজীর খুব সম্ভবত দরবারের নিয়মকানুন মানতে সচেষ্ট নন, তাই তিনি দরবারের নিয়ম লঙ্ঘন করে নির্দ্দিষ্ট স্থান ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন। উজীর জাফরখান সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটকে গত দিবসে মীর বক্সীর এগিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন যে, যেহেতু তিনি পদমর্য্যাদায় মীর বক্সীর উর্দ্ধে সেইহেতু তাঁকে বাধ্য হয়েই আরও এক পা এগিয়ে আসতে হয়েছে। সম্রাট তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে উজীরকে আর কিছু না বলে নিজের ভুল স্বীকার করে নেন এবং বলেন যে এ ভুল তিনি ভবিষ্যতে হতে দেবেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানুচি এর পর মুঘল দরবারের কর্ম্মচারীদের শ্রেণী বিভাগ ও তাদের বেতনবণ্টনের প্রণালীর একটি বিবরণ দিয়েছেন। সম্রাট আকবরই এই শ্রেণী বিভাগের প্রবর্ত্তক।

প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হ'ত যেমন 'এক বিস্তী' অর্থাৎ 'এককুড়ি টাকা মাসমাহিনার মনসবদার' এইরূপে 'দো বিস্তী' (দুই কুড়ি টাকা), তিন বিস্তী (তিন কুড়ি টাকা) 'চার বিস্তী' (চার কুড়ি টাকা) 'এক শদি' (১০০৲) 'দো শদি (২০০৲), 'সি শদি' (৩০০৲), 'চার শদি' (৪০০৲), 'পাঁচ শদি' (৫০০৲), 'ছে শদি' (৬০০৲), 'সাত শদি' (৭০০৲) 'আট শদি' (৮০০৲), 'নউ শদি' (৯০০৲) পর্য্যন্ত মনসবদার পর্য্যায়ভুক্ত কর্ম্মচারী বলে গণ্য হ'ত। এর পর 'ওমরাহ' শ্রেণীভুক্ত যেমন 'এক-হাজারী ওমরাহ' থেকে সুরু করে সাত-হাজারী ওমরাহ পর্য্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিল। উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে আবার তিনটি উপশ্রেণী বিভাগ ছিল প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়। যারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিল তারা নির্দ্দিষ্ট মাসিক বেতনের হার অনুযায়ী বারো মাসের মাহিনার তিন গুণ পেতেন, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তেরা পেতেন ছয় মাসের মাহিনার তিন গুণ ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্তেরা চার মাসের মাহিনার তিন গুণ পেতেন। সাধারণতঃ এই হিসাবের ওপরও কিছু কিছু বেশী বেতনই দেওয়া হ'ত, যেমন দেখা যায় যে, প্রথম শ্রেণীভুক্ত 'এক বিস্তীর' কর্ম্মচারীরা বার্ষিক ৭৫০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীরা ৩৭৫৲ এবং তৃতীয় শ্রেণীভুক্তেরা বার্ষিক ২৪০ টাকা বেতন পেতেন। এই নিয়ম অনুযায়ীই 'নউশদি' শ্রেণীভুক্ত কর্ম্মচারীদের (মনসবদার দের) পর্য্যন্ত বেতন দেওয়া হ'ত কিন্তু ওমরাহদের বেলায় কোন নির্দ্দিষ্ট হার সবক্ষেত্রে মেনে চলা হ'ত না তবে দেখা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর ওমরাহেরা যা বেতন পেতেন দ্বিতীয় শ্রেণীরা তার অর্দ্ধেক ও তৃতীয় শ্রেণীরা এক-তৃতীয়াংশ বেতন পেতেন।

'এক-হাজারী ওমরাহদের' প্রথম শ্রেণীরা বার্ষিক ৫০,০০০৲, দ্বিতীয় শ্রেণীরা ২৫০০০৲ এবং তৃতীয় শ্রেণীরা ১৬,৬০০৲ বেতন পেতেন। নিয়ম অনুযায়ী এদের ২৫০টি এবং সম্রাটের জন্য আলাদা করে ছয়টি অশ্ব পুষতে হ'ত। সম্রাটের জন্য একটি হস্তীও এদের পুষতে হ'ত।

'দোহাজারী ওমরাহদের' প্রথম শ্রেণীরা বার্ষিক এক লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীরা ৫০,০০০, এবং তৃতীয় শ্রেণীরা ৩৩,৩৩৩৲ টাকা বেতন পেতেন। এদের ২টি হস্তী ও ২০টি অশ্ব পুষতে হ'ত। তিন-হাজারী ওমরাহদের (উপাধি : সহিব-ই-নউবৎ ,

প্রথম শ্রেণীরা বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বার্ষিক ৭৫,০০০, এবং তৃতীয় শ্রেণীয়েরা ৫০,০০০ টাকা বেতন পেতেন। চার-হাজারী ওমরাহদের (উপাধি: নহির-ই-দউবং) প্রথম শ্রেণীরা বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীরা তিন লক্ষ টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীয়েরা ৬৬,৬৬৬ টাকা বেতন পেতেন।

পাঁচ-হাজারী ওমরাহদের (উপাধি: নহির-ই-দউবং) প্রথম শ্রেণীরা বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীরা সও। লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীরা ৬৮,৬৫৫ টাকা বেতন পেতেন। সাধারণতঃ যে সব পদস্থ কর্মচারীদের 'পাঁচ-হাজারীর' পর্যায়ে সম্রাট উন্নীত করতেন তারা বয়সে যেরূপ প্রাচীন ছিলেন বুদ্ধিতেও তেমনি পাকা ছিলেন। এদের মধ্যে যারা প্রথম শ্রেণীর তাঁদের সাধারণতঃ যুদ্ধদলের সৈন্যাধ্যক্ষ বা প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করা হ'ত। দরবারে এদের স্থান খুবই উঁচে ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্তদেরও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদেই নিযুক্ত করা হয়েছিল। সাত-হাজারী ও ছে-হাজারী ওমরাহদের' খান উপাধি দেওয়া হ'ত। এদের বার্ষিক যথাক্রমে সাড়ে তিন লক্ষ ও তিন লক্ষ টাকা বেতন দেওয়া হ'ত। এইরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারীর সংখ্যা সারা সাম্রাজ্যে সর্বসমেত পাঁচ-ছয় জন ছিলেন। এরাই মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারীরূপে পরিগণিত হতেন কারণ এদের ওপরই ছিলেন বাদশাজাদারা। এদের রাজকীয় মর্যাদা এবং অধীনস্থ লোকলস্কর সৈন্যাদির পরিমাণ বাদশাজাদাদের সম পর্যায়ভুক্ত। সম্রাট এদের সময় সময় পান-সুপারী বা মিষ্টি খাবার জন্য বহু অর্থ উপহারস্বরূপ দিতেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচটি পদ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী, কাবুল, দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও উজ্জয়িনী প্রদেশের শাসনকর্তার পদগুলি। এরা সাধারণতঃ বাদশাজাদাদের অনুমতি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গেই বসতে পারতেন।

সৈন্যদল ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন রাজকোষ থেকেই মেটান হ'ত এবং বেতন বণ্টনের সময় শতকরা দশভাগ কেটে রেখে বেতন দেওয়া হ'ত। (বেতন বণ্টনের ক্ষেত্রে টাকার বদলে দামের হিসাবেই বেতন দেওয়া হ'ত। প্রতি ৪০ দাম ১ টাকার সমান)। সাধারণতঃ 'সিপাহি' পদমর্যাদাসম্পন্ন মনসবদার থেকে সুরু করে সাত-হাজারী ওমরাহদের পর্যন্ত স্ব স্ব পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অশ্বারোহী সৈন্য পুষতে হ'ত।

[এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, মানুচি টাকার মাপকাঠি দিয়েই কর্মচারীদের পদমর্যাদা পরিমাপ করেছেন অবশ্য মানুচি তার বিবরণী চতুর্থ খণ্ডের শেষভাগে বলেছেন যে, সাধারণতঃ সম্রাট যাদের 'হাজারী' পদমর্যাদা দান করতেন তাদের কিছু কিছু জায়গীরও দান করতেন কারণ সেই জায়গীরের রাজস্ব থেকেই তারা তাদের এক হাজার অশ্বারোহী পুষতে হ'ত। এ ছাড়াও সম্রাট প্রত্যেকটি অশ্বারোহী সৈন্য রাখার জন্য দিন প্রতি এক টাকা হিসাবে প্রয়োজনীয় অর্থও হাজারী মনসবদার ওমরাহদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই হিসাব অনুযায়ী তারা এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পোষার জন্য খরচ পেত বার্ষিক ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও ব্যক্তিগত খরচ মেটানোর জন্য পেত বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা। সম্রাট বেশ ভালভাবেই জানতেন যে, মনসবদারদের পক্ষে এত অশ্বারোহী সৈন্য এই অল্প টাকায় পোষণ করা সম্ভব নয় তাই তিনি তাদের নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অশ্বারোহীর এক-তৃতীয়াংশ রাখার আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু টাকার বেলায় উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী পুরো টাকাটাই এদের দেওয়া হ'ত। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, এরা যদিও এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পোষার খরচ পেতেন এরা ২৫০টির বেশী সৈন্য রাখতেন না। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সম্রাট 'হাজারী'র পদমর্যাদা দান করলেও তাদের উপযুক্ত অন্যান্য খেতাব বা মর্যাদা সম্রাট এদেরকে দিতেন না। এদের মধ্যে যাদেরকে তিনি ভালবাসতেন কেবলমাত্র তাঁদেরই খেতাব দিতেন। সৈন্যাধ্যক্ষেরা যাতে অর্থশালী ও শক্তিশালী হয়ে না ওঠে সেইজন্য অনেক সময় তিনি যদিও মনসবদারদের 'হাজারী'র পদমর্যাদা উন্নীত করতেন কিন্তু বেতন দিতেন মাত্র চার মাসের। হাজারীর পদমর্যাদার সমতুল্য অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী রাখার জন্য অনেকক্ষেত্রে মনসবদাররা কিছুই অর্থসঞ্চয় করতে পারতেন না। এরা যাতে কোনরূপ বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে না পারেন সেইজন্য সম্রাট এদের স্ব স্ব জন্মভূমি থেকে বহুদূরে রাখতেন। আবুল ফজল 'আইনী-ই-আকবরী'তে বলেছেন যে, অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যার পরিমাপ নিয়েই কর্মচারীদের পদমর্যাদা স্থির করা হ'ত, যেমন, এক-হাজারী ওমরাহ তাদেরই বলা হ'ত যাদের এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অধিকার সম্রাট দিয়েছিলেন।

মানুচি মনসবদার ও ওমরাহ এই দুই শ্রেণীর কর্মচারীদের বিভেদটা ঠিক কোনখানে এবং বেতনের পরিমাপটা ঠিক কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল তার সঠিক সংখ্যা বোধ হয় বুঝতে পারেন নি, তাই তার দেয় বেতনের হার কতখানি নির্ভরযোগ্য সেটাই বিবেচ্য। খুব সম্ভবত আবুল ফজলের সংখ্যাটাই ঠিক।—লেখক]

সাধারণতঃ মনসবদাররা এদের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর অশ্বসমূহের ডান দিকের পাছাতে একটি করে রাজচিহ্ন চিহ্নিত করিয়ে নিতেন। যে দিন থেকে মনসবদাররা এই রাজচিহ্ন অঙ্কিত করিয়ে নিতেন সেই দিন থেকেই তাদের বেতনের হিসাব করা হ'ত। সৈন্যদলের সেনাপতিরা তাদের সেনাবাহিনীর অশ্বসমূহের বাঁদিকের পাছাতে তার নিজের দলের একটি চিহ্ন অঙ্কিত করে দিতেন। সাধারণতঃ তাদের নামের আদ্যক্ষরটি চিহ্নস্বরূপ ব্যবহার করা হ'ত।

মুঘল সাম্রাজ্যের উপরোক্ত বেতনবণ্টনের প্রণালী ছাড়াও আরও একটি হিসাবে বেতন দেওয়া হ'ত সেটি হচ্ছে 'রোজিনদার' অর্থাৎ 'দৈনিক রোজে'র হিসাবে। সাধারণতঃ সৈন্যদের, গোলন্দাজদের, খ্রীষ্টান চিকিৎসকদের এবং অনেকক্ষেত্রে হারেমের অন্তঃপুরবাসিনীদের এই হিসাবেই বেতন ও মাসোহারা দেওয়া হ'ত।

নিয়মানুসারে সাধারণ সৈন্য থেকে সুরু করে সেনাপতি পর্যন্ত

প্রত্যেককেই জামিন রেখে সরকারী কার্য্য গ্রহণ করতে হ'ত, এমনকি বাদশাজাদাদের পর্য্যন্তও ক্ষেত্রবিশেষে জামিন রেখে কাজ করতে হ'ত। যখন কোন রাজন্যবর্গ বা সেনাপতি তার সৈন্যদলের সৈন্য বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক হতেন তখন তাদের বিশেষ কষ্ট করতে হ'ত না কারণ একবার লোক ভর্ত্তি করার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লেই হাজার হাজার লোক জড় হয়ে যেত এবং সেনাপতি তাদের মধ্যে থেকে লোক বেছে নিয়ে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করতেন। যখন কোন সৈন্যের ঘোড়া মরে যেত তখন তাকে সেই মৃত ঘোড়ার হাড় ও রাজচিহ্ন নিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের দেখাতে হ'ত এবং সাত দিনের মধ্যে যদি সৈন্যটি নূতন ঘোড়া কিনতে না পারত তা হলে তার বেতন হ্রাস করে দেওয়া হ'ত। বৎসরে দুবার করে অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষেরা অর্থাৎ বক্সীরা তাদের নিজ নিজ বাহিনী পরিদর্শন করতেন এবং পরিদর্শনকালে বৃদ্ধ অক্ষম অশ্বারোহী সৈন্য ও ঘোড়াদের সৈন্যবাহিনী থেকে বহিষ্কৃত করে দিতেন। অকর্ম্মণ্য অশ্বারোহী সৈন্যদের বেতন তাদের দলপতির বেতন থেকে কেটে নেওয়ার আদেশও সৈন্যাধ্যক্ষ দিতেন। নিয়মানুসারে যদিও প্রত্যেকটি সরকারী আস্তাবলে সরকারী কার্য্যে ব্যবহারের নিমিত্ত ৫০টি থেকে ১০০টি অশ্ব মজুত রাখতে হ'ত—মানুচি বলেছেন যে, কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যেত যে মাত্র ৫।৬টি অশ্ব আস্তাবলে মজুত রাখা হ'ত। কেবল সৈন্যাধ্যক্ষদের পরিদর্শন কালে সাময়িক ভাবে নিয়ম অনুযায়ী পুরোসংখ্যক অশ্বই রাখা হ'ত। মানুচি এখানে মন্তব্য করেছেন যে, সম্রাটের অনেক আদেশই এই রকম শঠতার সঙ্গে পালিত হ'ত।

সৈন্যদের বেতনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মানুচি বলেছেন যে, হতভাগ্য সৈনিকেরা কোনদিনই পুরা বেতন পেত না কারণ তাদের সৈন্যাধ্যক্ষরা, যাদের হাতে তাদের বেতন বণ্টনের দায়িত্ব অর্পিত ছিল, কখনই পুরা বেতন দিতেন না। নিজের খুসীমত ২০।৩০৲ টাকা যাকে যেমন ইচ্ছা বেতন দিতেন এবং ভবিষ্যতে আরও টাকা দেবেন এই ভুয়ো আশ্বাস দিয়ে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতেন। সৈনিকেরা বাধ্য হয়েই তাই সুদখোর শরাফদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করত। শরাফরা সৈন্যাধ্যক্ষের বিনা অনুমতিতে কাউকে টাকা ধার দিতেন না। শরাফদের সঙ্গে সৈন্যাধ্যক্ষদের টাকার বিশেষ লেনদেন ছিল অর্থাৎ আদায়ীকৃত সুদের কিছু অংশ শরাফরা সৈন্যাধ্যক্ষদের দিতেন। শরাফদের কারবার যাতে বেশ ভাল করে চলে সেই জন্যই সেনাধ্যক্ষেরা সৈনিকদের কখনই পুরা বেতন দিতেন না। সৈনিকেরা অনেক সময় হাতচিঠি দিয়ে শরাফদের কাছ থেকে টাকা ধার করত। সৈন্যেরা ১০০ টাকার হাতচিঠি দিয়ে মাত্র ২৫ টাকা ধার পেত। সৈনিকরা কোনদিনই শরাফদের ধারের টাকা মেটাতে পারত না ও সেই কারণে অন্য কোন চাকরী জোগাড়ের অনুমতিও সেনাধ্যক্ষদের কাছ থেকে পেত না এবং বাধ্য হয়েই তাদের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতে হ'ত। স্ব-ইচ্ছায় কোন সৈন্য সেনাদল ত্যাগ করতে চাইলে নিয়মানুযায়ী সেনাধ্যক্ষেরা তাদের দুই মাসের বেতন কেটে নিয়ে তবে তাদের মুক্তি দিতেন।

মানুচি এই দুর্নীতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, এর সংবাদ হয়ত সম্রাটের কানে গিয়ে পৌঁছাত না এবং যদি বা পৌঁছাত এ দুর্নীতি বন্ধ করার মত প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বা শাসনযন্ত্র তার ছিল না। অনেক সময় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা সম্রাটকে বিভিন্ন উপঢৌকন দিয়ে নিজেদের অনুকূলে নিয়ম-বহির্ভূত আদেশাবলী আদায় করে নিতেন, ফলে দুর্নীতি বেড়েই চলেছিল। সম্রাট ঔরংজেবের আদেশ ও নির্দ্দেশাবলী তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা মেনে চলতেন না বলেই শত্রুপক্ষ বার বার মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঘাত হেনে প্রজাবর্গের অশেষ ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। ঔরংজেবের সময় রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল যে, তারা সম্রাটের মোহরাঙ্কিত ফারমানের সম্মান পর্য্যন্ত রাখতেন না যতক্ষণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘুষ না পেতেন। মানুচি বলেছেন যে, বেতন পাওয়ার ব্যাপারে হারেমের বাঁদী ও পরিচারিকারা, খোজা প্রহরীরা সৈনিকদের চেয়ে ভাগ্যবান ছিল, কারণ তারা প্রায় ঠিক সময়েই বেতন পেত এবং অনেকক্ষেত্রে পুরা বেতনই পেত ও কাঁচা টাকাতেই পেত।

বেগম ও বাদশাজাদীদের মাসোহারার অর্দ্ধেক রাজকোষ থেকে ও বাকী অর্দ্ধাংশ ভূমি দিয়ে বা ভূমিরাজস্ব থেকে আদায়ীকৃত অর্থ থেকে মেটান হ'ত। রাজ-চিকিৎসকদের ও বিদ্বজ্জনকে এই একই পন্থায় মাসোহারা দেওয়া হ'ত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন, প্রদেশসমূহের, সামন্ত রাজ্যসমূহের ও উপজাতিসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং মুঘল সম্রাটের অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী ও দুর্গের অবস্থিতির কথা তার বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তাহাই বিবৃত করা হ'ল।

মানুচি বলেছেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তনের সঠিক পরিমাপ করা খুবই শক্ত, কারণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন হিন্দু নৃপতিবর্গের রাজ্য ও জমিদারদের অধিকৃত এমন সব অঞ্চল ছিল যার ওপর দিয়ে মুঘলদের চলাফেরা করতে দেওয়া হ'ত না। এদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যাঁরা মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতেন না বা কোন করও তাঁকে দিতেন না। আবার অনেকে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে তাকে বার্ষিক কর দিতেন। সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যে এরূপ জমিদারের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্য পরিভ্রমণ করতে গেলে ভ্রমণকারীকে ঘুরে ঘুরেই যেতে হবে। সাম্রাজ্যের দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকের বিস্তৃতি ছিল দৈর্ঘ্যে মাদ্রাজ বন্দর থেকে সুরু করে গোলকুণ্ডা হয়ে ঔরংগাবাদ, বুরহানপুর ও সিরনোজের মধ্য দিয়ে আগ্রা পর্য্যন্ত এবং সেখান থেকে সুরু করে দিল্লী, শিরহিন্দ হয়ে লাহোর এবং লাহোর থেকে এগিয়ে সিন্ধুনদ পেরিয়ে পেশোয়ার কাবুল হয়ে গজনী পর্য্যন্ত। এর দূরত্ব ছিল খুব সম্ভবতঃ ২,৯০৪ মাইল।

গজনী থেকে পারস্য সম্রাটের সীমান্তবর্তী শহর কান্দাহারের দূরত্ব ছিল মাত্র ২০ লীগ। প্রস্থে সুরাট বন্দর থেকে সুরু করে বুরহানপুর, আগ্রা, তাতওয়া, মুলতান হয়ে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর দূরত্ব ছিল সম্ভবতঃ এক হাজার মাইল। উত্তর দিকের সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল উজবেকদের রাজ্যসীমা থেকে শুরু করে সুদূর বাংলা দেশ পর্যন্ত। এর দূরত্ব ছিল প্রায় দুই হাজার মাইল। এ ছাড়াও এলাহাবাদের নীচের দিকে কয়েকটি অঞ্চল সম্রাটের তাঁবেদারী অঞ্চলরূপেই পরিগণিত হ'ত।

মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহ ও প্রাদেশিক রাজধানীসমূহের বিবরণ :

দিল্লী—মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই দিল্লী শহরই মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ভারতের ইতিহাসে দিল্লীর নাম যুগযুগান্তর ধরে উল্লিখিত হয়ে এসেছে, কারণ এই দিল্লীতেই পুরাকালের বহু দুর্দ্ধর্ষ রাজচক্রবর্তীরা তাঁদের স্ব স্ব রাজ্যসমূহের রাজধানীরূপে ব্যবহার করেছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রায় ৩১টি পাঠান নৃপতি এই দিল্লীতেই রাজত্ব করে গেছেন। বহু সৈয়দ ও রাজপুতদের বহু যুদ্ধের নীরব সাক্ষ্য বহন করে রয়েছে এই চিরপুরাতন ও চিরনবীন দিল্লী শহর। দিল্লীতে যদিও কোন জিনিসই তৈরী হ'ত না তবুও সম্রাট ও রাজন্যবর্গের কর্মস্থানরূপেই দিল্লী বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এসেছে। এখানকার ভূমির ফসল খুবই ভাল এবং বেশ মোটা টাকার রাজস্বই এখান থেকে আদায় হ'ত।

দিল্লীতে সাধারণতঃ ২০ হাজার পদাতিক রাজপুত সৈন্য সব সময় মোতায়েন থাকত, এর মধ্যে গোলন্দাজ সৈন্য ছিল ১২ হাজার ও বাকি ৮ হাজার সৈন্য রাজপ্রাসাদসমূহের প্রহরার কার্য্যে নিয়োজিত ছিল। দিল্লীর রাজ-আস্তাবলে সৈন্যদলের ব্যবহারার্থে প্রায় ৫০ হাজার অশ্ব সব সময় মজুত থাকত।

সম্রাটের নিজস্ব একটি সৈন্যদলও দিল্লীতে মোতায়েন ছিল। প্রায় ৭ হাজার বিভিন্ন জাতীয় ক্রীতদাসদের নিয়েই সম্রাটের এই সৈন্যদল গঠিত ছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন ছিল যারা সম্রাটের খুবই প্রিয়পাত্র এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে এই সৈন্যদলের পরিচালক ছিল। সম্রাট এদের কাহিম, ফারাদ, নেকদিল প্রভৃতি বিশেষ নামে অভিহিত করতেন। এই সৈন্যদলের সকলেই খুব ভাল যোদ্ধা ছিল, সেইজন্য এদের বেতনও বেশী দেওয়া হ'ত। এই সৈন্যদলের একভাগ ছিল পদাতিক ও অপর ভাগ অশ্বারোহী। পদাতিক দলে প্রায় ৪ হাজার ও অশ্বারোহী দলে প্রায় ৩ হাজার ক্রীতদাস ছিল। সম্রাট গুপ্তচর মারফৎ যখন কোন বাদশাজাদার বা দরবারের কোন ওমরাহ ও রাজন্যবর্গের রাষ্ট্রবিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করার কোন সংবাদ পেতেন তখন এই সৈন্যবাহিনীকে তার মূলোৎপাটনের কাজে সর্ব্বপ্রথম নিয়োগ করতেন।

নিয়মানুসারে দিল্লীবাসীদের সপ্তাহে একদিন করে দুর্গের বাইরে কিংবা ভিতরে প্রহরীর কাজ করতে হ'ত।

আগ্রা—এই প্রদেশে সাদা সুতির এবং রেশমের সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হ'ত। নীলের চাষও যথেষ্ট পরিমাণে হ'ত। আগ্রায় প্রায় ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন ছিল। এখানে সৈন্য রাখার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল কৃষক-বিদ্রোহ দমন করা। বাংলা প্রদেশ থেকে আগত রাজস্ব সবই এখানকার রাজকোষে জমা থাকত।

লাহোর—লাহোর প্রদেশ বিভিন্ন রঙ-বেরঙের রেশমী কাপড় ও সূক্ষ্ম সাদা বস্ত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হ'ত। এ ছাড়া এখানে সূচী-শিল্পের কাজ, কার্পেট, তীর-ধনুক, তাঁবু, অশ্বের রেকাব, তরবারী, মোটা গরমের বস্ত্রাদি, জুতা প্রভৃতি তৈরী হ'ত। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী অঞ্চল থেকে আমদানীকৃত সৈন্ধব লবণ এখান থেকে দিল্লীতে প্রচুর পরিমাণে চালান যেত। অনেকে এই প্রদেশকে পঞ্জাব বলত কারণ পাঁচটি নদী এই প্রদেশের মধ্যেই মিলিত হয়েছে। এখানে প্রায় ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য মোতায়েন ছিল।

আজমীর—এই প্রদেশে সূক্ষ্ম সাদা বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। খাদ্যশস্য, দুগ্ধ, ঘি এবং লবণ এখানে অসচ্ছল পরিমাণে পাওয়া যায়। এই প্রদেশের সীমানা রাজপুত, রাঠোর ও রাণা-রাজ্যের সঙ্গে সীমানালগ্ন সেইজন্য এখানে প্রায় ছয় হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

গুজরাট বা আমেদাবাদ—এই প্রদেশে প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে সোনারূপার কাজকরা ও সিল্কের ফুলকাটা বস্ত্রাদি এত বেশী ছিল যে, এখান থেকে সারা সাম্রাজ্যেই সেগুলি চালান দেওয়া হ'ত। এখানে সোনার গহনাদিও বিশেষতঃ জড়োয়া গহনাদির কাজও বিখ্যাত ছিল। এখানকার ব্যবসায়ীরা সবাই ছিল হিন্দু। সুলতান বাহাদুরের কাছ থেকে সম্রাট আকবর এই প্রদেশ জয় করে নেন। এখানে প্রায় দশ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

মালওয়া—এখানে বিভিন্ন রঙীন বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে তৈরী হ'ত। এখানকার জমির ফসলও ভাল। এখানে প্রায় সাত হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

পাটনা বা বিহার—এখানকার তৈরী মাটির বাসন-কোসন এতই সুন্দর ছিল যে, দেখে মনে হয় যেন কাগজের তৈরী। সূক্ষ্ম সাদা বস্ত্রাদিও এখানে তৈরী হ'ত। এখানে প্রায় সাত হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

মুলতান—মুলতানে বিভিন্ন জাতীয় পশু (উট, খচ্চর, গরু, ছাগল, গাধা প্রভৃতি) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এই প্রদেশ 'বিলোচ' জাতীয় অনেকগুলি জমিদার ছিল যাঁরা মুঘল সম্রাটের খুবই অনুগত ছিল। এখানে প্রায় ছয় হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

কাবুল—এখানকার বাজারে প্রচুর পরিমাণে তুর্কী ঘোড়া ও উট বিক্রি হ'ত। ভাল জাতের ফলের চাষও এখানে প্রচুর। ভারতীয় বণিকরা এখান থেকেই সাধারণতঃ তিমিরবীজ, কস্তুরী, পশুচর্ম্ম, বাদাকসান ও বল্ক থেকে আমদানীকৃত গবাদি পশু কিনত।

যদিও এখান থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ খুবই অল্প ছিল তবুও এখানকার সর্বকারী আস্তাবলে প্রায় ৬০ হাজার ঘোড়া মোতায়েন ছিল। খুব সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী পাঠান ও পারস্যের সীমানা এই প্রদেশের সীমানালগ্ন, সেই জন্যই এখানে এত বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল।

তাতওয়া—এই প্রদেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রচুর। এখানকার প্রস্তুতিকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে বস্ত্রাদিই প্রধান। গবাদি পশুর চামড়াও এখান থেকে যথেষ্ট পরিমাণে চালান যেত। এখানে প্রায় ৫ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

বাখর—এই প্রদেশের অধিবাসীরা খুবই গরীব। এখানকার লোকদের প্রধান জীবিকা হচ্ছে পশুপালন। এখানে ২ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

উড়িষ্যা—এই প্রদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রচুর। এই প্রদেশেই হিন্দুদের বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত।

কাশ্মীর—এখানে প্রচুর পরিমাণে উলের বস্ত্রাদি তৈরী হ'ত এবং সেগুলি দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গেরাই ব্যবহার করতেন। এখানকার কাঠের কাজ বিখ্যাত। খুব ভাল জাতের ফলও এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানে প্রায় ৪ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

এলাহাবাদ—এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বেনারস শহরে সিল্ক, সোনারূপার কাজকরা বস্ত্রাদি, তাজ, কাচুলী প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হ'ত। এখানে প্রায় ৮ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

আউরঙ্গাবাদ—এই প্রদেশে সিল্ক ও সাদা সুতী বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হ'ত। ঔরংজেব যখন যুবরাজ ছিলেন তখনই তিনি নিজের নামের স্মারণিক হিসাবে আউরঙ্গাবাদ শহরের পত্তন করেছিলেন।

বেয়ার (বেরার ?)—এখানকার খাদ্যশস্য, শাকসব্জি ও পপি গাছের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে হ'ত। এখানে ৭ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

বুরহানপুর বা খান্দেশ—এখানে যে সব রঙীন সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি প্রস্তুত হ'ত তা পারস্য, আরব ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশে চালান যেত। এখানে প্রায় ৬ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

বাগনালা—এখানে যে সব বস্ত্রাদি প্রস্তুত হ'ত তা সবই মোটা ধরনের। এখানে প্রায় ৫ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

নোদের (নামদের ?)—এখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রচুর। এখানে প্রায় ৬ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

ঢাকা বা বাংলা—বাংলা দেশের প্রধান শহর ও রাজধানী ছিল ঢাকা। এই শহরে শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি (মসলিন) প্রস্তুত হ'ত এবং এখান থেকে সেই সব বস্ত্রাদি সুদূর ইউরোপে চালান যেত। এখানে প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

উজ্জয়িনী—এই প্রদেশের খাদ্যশস্যের ফলন প্রচুর। এই প্রদেশের চারিধারে দুর্দ্ধর্ষ হিন্দু নৃপতিদের রাজ্যের সীমানালগ্ন বলে এখানে প্রায় ১০ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল। এখানে হিন্দুদের ধ্বংসোন্মুখী অনেকগুলি ধর্মমন্দির ছিল যেখানে হিন্দুরা পূজা-পার্ব্বণ ও ধর্মীয় উৎসবাদি পালন করত।

রাজমহল—এখানে সম্রাট ঔরংজেবের ভ্রাতা শাহসুজা এক সময় বসবাস করতেন। খাদ্যশস্যের ফলন এখানে প্রচুর। এখানে প্রায় ৪ হাজার সৈন্য মোতায়েন ছিল।

গোলকুণ্ডা—মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাপা কাপড় এখানেই প্রস্তুত হ'ত। এই প্রদেশে একটি হীরের খনি আছে এবং সেই খনি থেকে উত্থিত হীরকসমূহের বেশীর ভাগ অংশই সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি প্রদেশেই রাজকীয় ট্যাকশাল ছিল। সম্রাট ও বাদশাজাদাদের নিযুক্ত নিজস্ব কর্ম্মচারী উপরোক্ত প্রত্যেকটি প্রদেশেই অবস্থান করতেন যাঁদের একমাত্র কাজ ছিল স্থানীয় উৎপন্ন শ্রেষ্ঠ দ্রব্যাদি সম্রাট ও বাদশাজাদাদের জন্য সংগ্রহ করা। স্থানীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী হিন্দু জমিদার বা রাজন্যবর্গের সংঘর্ষ প্রায় সব সময়ই লেগে থাকত তার কারণ প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সব সময়েই এই সব জমিদার ও রাজন্যবর্গদের কাছ থেকে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত সম্রাটের নির্দিষ্ট দেয় রাজস্বের পরিমাণের চেয়ে বেশী রাজস্ব আদায় করতে সচেষ্ট হতেন।

মানুচি এর পর কয়েকটি হিন্দু নৃপতিবর্গের রাজ্যসমূহের বিবরণ দিয়েছেন। নিম্নে তাহাই বিবৃত করা হ'ল :

উদয়পুর—শিশোদিয়া বংশের হিন্দু নৃপতিদের রাণা বলা হ'ত। এর অধীনে প্রায় ৫০ হাজার অশ্বারোহী ও ২ লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। ইনি যেমন শক্তিশালী তেমনি ধনশালী ছিলেন। ইনিই একমাত্র নৃপতি যিনি মুঘল রাজত্বে ছত্র মাথায় দিয়ে চলাফেরা করতেন। রাণার রাজ্যে যেমন প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হ'ত তেমনি পপয়া নামক এক রকম কলা এবং পপি গাছের চাষও প্রচুর পরিমাণে হ'ত। রাণার নিজস্ব অনেকগুলি তামার খনি ছিল।

যোধপুর—যোধপুরের নৃপতিকে রাঠোর বলা হ'ত। মেবারের ৯টি জেলা নিয়েই এই রাজ্য গঠিত ছিল এবং রাজা যশোবন্ত সিংহের বংশধরেরাই এ রাজ্যের শাসক। রাজ্যের বেশীর ভাগ অঞ্চলই মরুভূমি। এখানে জলের অপ্রতুলতা ভয়ঙ্কর বেশী। এখানকার উৎপন্ন ফসলের পরিমাণও খুব কম। এ অঞ্চলে প্রচুর উট পাওয়া যায়। রাঠোরে একটি বিরাট সৈন্যদলও ছিল।

অম্বর—অম্বরের অধিপতিকে কাছোয়া বলা হ'ত। রাজা জয়সিংহের বংশধরেরাই এই রাজ্যের শাসক। এর অধীনে প্রায় ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও দেড় লক্ষের অধিক পদাতিক সৈন্য ছিল। মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্য বিস্তারে এই রাজ্যের নৃপতিদের দান অশেষ।

এরা ছাড়াও সর্ব্বসমেত প্রায় ৮০টি অপেক্ষাকৃত ছোট সামন্ত

রাজ্য ছিল তাদের মধ্যে রাজা করণ, রাজা ছত্রসান রায়, বুন্দেলের রাজা, বাউতেলার রাজা রামসিংএর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সামন্ত রাজ্য সমূহের অধিবাসীরা অধিকাংশই হচ্ছে রাজপুত এবং তাদের সকলের উপাধি সিং। এরা সাধারণতঃ ধর্মভীরু এবং খুবই বিশ্বাসী। নিজেদের জীবন পণ করেও এরা এদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্ম সচেষ্টবান। সমতলভূমিতেই এদের বাস এবং চাষবাসই এদের প্রধান উপজীব্য অবশ্য প্রয়োজন হলে এরাই অস্ত্র ধরে থাকে। রাজ-আদেশে এদের প্রায় সকলকেই একটা করে ঘোড়া রাখতে হয় এবং রাজনির্দ্দেশমাত্রই যুদ্ধক্ষেত্রে হাজিরা দিতে হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আফিমখোর। বিশেষ করে হলদে রং-এর বস্ত্রাদি এদের খুবই প্রিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে এদের উৎসাহ দেবার জন্ম একদল এদেশীয় চারণকবি এদের যুদ্ধ-যাত্রার সঙ্গী হ'ত। যুদ্ধক্ষেত্রে এদের মত মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে খুব কম জাতকেই মানুচি দেখেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ এদের জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব বলে বিবেচিত হয় এবং তরবারি এদের জীবনসাথীস্বরূপ। এমনকি জমিতে চাষ করার সময়ও এদের কাছে তরবারি থাকে। মানুচি এদের বিচিত্র চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, এদের বন্ধুত্ব যেমন প্রশংসনীয় এদের শত্রুতাও নিন্দনীয়। পূর্ব্ব-পুরুষদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এরা বংশপরম্পরায় বহন করে চলে, যেমন বুরখিয়ার রাজাদের সঙ্গে রাজা জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষদের বিবোধ বিগত ৫০০ বৎসর ধরেই চলছে এমনকি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দেও তার নিষ্পত্তি হয় নি। নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্ম এরা খুবই সচেষ্ট এবং একমাত্র এই বিভেদের ফলেই এরা কোন দিনই একজোট হতে পারে নি বা ভবিষ্যতে হতেও পারবে না। মানুচি মন্তব্য করেছেন যে, যদি এরা কোন দিন বিভেদ ভুলে এক পতাকাতলে এসে দাঁড়াতে পারে তা হলে সেদিন মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে উঠবে।

ভারতের উত্তরের পর্ব্বতমালার মধ্যে অনেকগুলি হিন্দুরাজার রাজত্ব আছে যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বোটান্দ (খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ভুটান)। এই রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে সোনা, কস্তুরী ও মণিমাণিক্য পাওয়া যায় কিন্তু বহিঃজগতের ব্যবসায়ীরা এই সব বস্তাদি কিনতে পারেন না কারণ এখানকার রাজা ব্যবসায়ীদের মুঘলের চর বলে সন্দেহ করেন সেইজন্ম তাঁর রাজ্যে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সাধারণতঃ পর্য্যটকরা এদেশে পৌঁছে প্রথমেই রাজাকে গোলাপজল সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি ও চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি উপহার দেন। এবং তারপর রাজা তাদের তার রাজ্য পরিভ্রমণের অনুমতি দেন। এখান কার উৎপন্ন ফলাদি ও অন্যান্য খাদ্যশস্যাদি খুবই সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়। বিদেশী আগন্তুকরা এদেশের মেয়েদের ক্রীতদাসী রূপে তাদের বাড়ীতে রাখতে পারেন তাতে কেউই আপত্তি জানায় না। কোন বিদেশী যদি এখানে থাকাকালে মারা যান, তা হলে তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন রাজা নিজে।

মানুচি এর পর মুঘল সাম্রাজ্যের উপজাতিসমূহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে হিন্দু উপজাতিদের মধ্যে চৌহান, পুনওয়ার, ভাদাউরিয়া, বাঙ্কাল, গোটি, রাজবংশী, বাচগোর, চন্দ্রওয়াত, চণ্ডাল, বানাফির, সোলাঙ্কি, সূর্য্যবংশী, সোমবংশী, মেদাওয়ার, সিনা, বাউরিয়া, পুরবীর্য্য, বুন্দেলা ও ভাতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্য থেকেই একজন করে রাজা থাকতেন যিনি এদের পরি-চালন ও শাসন করতেন। এদের মধ্যে কয়েকটি উপজাতি চাপে পড়ে যদিও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তবুও তারা তাদের আদবকায়দা, রীতিনীতি ও অভ্যাসের কোন পরিবর্ত্তন করেন নি। সাধারণতঃ এরা বিশেষ বাধ্য না হলে মুঘলদের কর্ত্তৃত্ব মানতে রাজি হতেন না সেই জন্ম মুঘল সৈন্যদলের সঙ্গে এদের সংঘর্ষ প্রায় লেগেই ছিল। মুসলমান উপজাতিদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঠানরা। পুস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে ৬৩টি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক ভাগেরই আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি আলাদা ধরনের কিন্তু ধর্ম্ম এদের এক অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্ম। এরা প্রায় সকলেই যোদ্ধা। এদের মধ্যে অধি-কাংশই মুঘল সম্রাটের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত ছিল কিন্তু মজার বিষয় এই যে, এরা মুঘলদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করত এবং নিজেদের শত্রু বলে মনে করত। এদের জীবনধারণ-প্রণালী ছিল খুবই নীচু স্তরের। এরা খায় গোমাংসযুক্ত খিচুড়ী আর শোর মাছকে। খেলাধূলার মধ্যে পাশা খেলা হচ্ছে এদের খুবই প্রিয়। কুকুর পোষাও এদের একটি প্রিয় সখ। এরা নিজেদের জাতের মধ্যেই নারীদের নিয়ে প্রায়ই মারামারি কাটাকাটি করত। এদের শতকরা ৯৯ জনই ছিল আকাটমুর্খ্য। পাঠানরা ছাড়াও আরও কয়েকটি উপজাতি ছিল, যেমন সৈয়দ, শেকজাদা, বালুচি, জাঠ প্রভৃতি। এরা প্রায় সবাই মুঘল সম্রাটের সৈন্যবাহিনীতে চাকুরি করেই এদের জীবিকানির্ব্বাহ করত।

মানুচি এর পর মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্গসমূহের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের প্রায় ৪৮০টি দুর্গ ছিল। সম্রাটের দুর্গসমষ্টির মধ্যে শক্তিশালী দুর্গরূপে আগ্রা, গোয়ালিয়র, কাবুল, দৌলতাবাদ, বিজাপুর, হায়দ্রাবাদ ও রোটাস দুর্গই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটি দুর্গের পরিচালনার দায়িত্ব একজন শাসন-কর্ত্তার উপর ন্যস্ত ছিল। একমাত্র চিকিৎসক ছাড়া অন্য কাউকে, দুর্গের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হ'ত না। নিয়ম অনুযায়ী পাঠানদের কোন মতেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না এবং যদিও বা কাউকে দেওয়া হ'ত তা হলে তাকে দুর্গ দ্বারে বোরখা পরিয়ে তবে দুর্গে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত। এমনকি সম্রাটের ফারমান নিয়েও যে আসত তাকেও অনুরূপ পন্থায় দুর্গমধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'ত। নিয়মানুসারে দুর্গাধিপতি যতক্ষণ দুর্গের শাসনকর্ত্তারূপে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততক্ষণ তার দুর্গের বাইরে আসা নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণতঃ খুব গোপন আদেশ দ্বারাই দুর্গাধিপকে বদলি করা হ'ত।

ক্রমশঃ

বাসি ফুল

শ্রীঅর্ণব সেন

চাবুকের মত চেহারা, কিন্তু গলার স্বর বাঁশির মত নরম!

লোকটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখছিল। মাথার চুলগুলো কপালের ওপর এসে পড়েছে। লম্বা লম্বা সোজা চুল। আশ্চর্য্য সরল। চোখের ওপরও বুঝি পড়েছিল দু'একটা চুল। মাথা ঝাঁকানি দিল। চাবুকের মত ছিটকে গেল চুলগুলো ওপরের দিকে। হাঁা, চাবুকের মতই চুলগুলো অদ্ভুত সতেজ আর দৃপ্ত। লোকটার চেহারাও যেন চাবুকের মত। কালো গায়ের রঙ, চোখ ঘন কালো, চুল আরও কালো। লেখার ভঙ্গির মধ্যেই একটা কাঠিন্যের আভাস। লোকটাও যেন চাবুকের মত তীক্ষ্ণ, সরল, দৃপ্ত। কিন্তু রুক্ষ নয়। লোকটার গলার স্বর শুনে নীলিমা চমকে উঠেছিল। চাবুকের মত চেহারার মানুষের গলার স্বর বাঁশির মত নরম!

'আপনার কিছু দরকার আছে?' নীলিমা জানতে চাইল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

চমকে উঠল সে। উঠে দাঁড়াল।

'না, কিছু দরকার নেই। আপনাকে যথেষ্ট বিরক্ত করলাম।'

নীলিমা হাসল। 'না, একটুও না। আপনি মাধবীদির হাতে যেটুকু যত্ন পেতেন তার সিকিও করতে পারি নি।'

'দেখুন, বেশি যত্ন আমি ভালবাসি না। খুব বেশি যত্নও আমার ভাল লাগে না।'

'ও! কিছু লিখছিলেন?'

সরোজ খাতাটা বন্ধ করে হাসল। 'কিছু না, ডায়েরী লিখছিলাম। সকালবেলার ঘটনাগুলো লিখে রাখছি।'

'আপনি লেখেন বুঝি? মানে আপনি লেখক?'

হেসে উঠল সরোজ। 'না, না, ওসব পাগলামি আমার নেই। তবে এককালে ক'টা কবিতা লিখেছিলাম। কিছুই হয় নি। ফেলে দিয়েছি। আর ওসব দিকে যাই না। গল্প, কবিতা লেখবার মত ধৈর্য্য আমার নেই। বরং এই ঘুরে ঘুরে বেড়াতেই ভাল লাগে। এতে অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়, অনেক দেশ দেখা হয়।'

'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে বিকেলের দিকে আলাপ করা যাবে। এখন চলি। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।' নীলিমা চলে যেতে চাইল। তার পর আবার বলল, 'হাঁা, কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে খবর পাঠাবেন।'

'না, কিছু লাগবে না আমার।'

নীলিমা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। স্কুল-বাড়ির বারান্দা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেল। ছোট্ট মাঠটা পেরল। তার পর বাড়ি। বাড়ি মানে ছোট দু'খানা টালির ছাদ-দেওয়া ঘর। মেয়ে-স্কুলের দু'জন টিচার থাকবার এই ব্যবস্থা। মাধবীদি নেই, ছুটিতে গেছেন দাদার বাড়ি বেড়াতে। এখন নীলিমা একলা। গরমের ছুটিটা ওকে একা-একাই কাটিয়ে দিতে হবে।

কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? যাওয়ার মধ্যে ছিল এক কাকার বাড়ি। সে কাকাও মারা গেছেন দু'বছর হ'ল। আর কার কাছে যাবে? মামার দিকেও কেউ নেই। না মামা, না মাসি। এদিকেও শেষ। বাবার দিকেও কেউ নেই। হাঁা, আছে, কাকার এক ছেলে আছে। তবে, তার কাছে যেতে ইচ্ছে করে না। আর যাবেই বা কেন? ওকে যখন পছন্দ করে না তারা তখন যাওয়ার দরকার কি? এই ত বেশ চলে যাচ্ছে। কলকাতায় এর আগে কাকার কাছে থেকে পড়াশুনা করেছে। কাকা মারা যাওয়ার পর থেকেই ত নিজের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে এসে পড়েছে। তখন থেকেই চাকরি। স্কুলে কাজ নিয়েছে। তার পর এক বছর হ'ল এখানে। কলকাতা দূরে, রেলস্টেশন থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে, এই গ্রামে চলে এসেছে।

সকালবেলার ঘটনাটা আবার মনে পড়ল নীলিমার।

পরীক্ষার খাতা দেখছিল নীলিমা। বিরক্তিকর এই কাজটা। বাঁকাচোরা হাতের লেখা উদ্ধার করা এক সমস্যা। মাঝে মাঝে ও মুখ তুলে বাইরের দিকে চাইছিল। ধুলোয় ভরা রাস্তাটার দিকে চাইছিল নীলিমা। সকালবেলার রোদও গরমের দিনে আশ্চর্য্য প্রখর। ক্লান্তিকরও। এই গরমের দিনে মানুষের কর্ম্মশক্তি যেন ঝিমিয়ে পড়ে। মন অবসন্ন হয়ে পড়ে।

নীলিমা রাস্তার দিকে অলস চোখ দুটোকে স্থির করে রেখে ভাবছিল মাঝে মাঝে। ওই রাস্তা ধরেই ষ্টেশনে যাওয়া যাবে। ওখানে ষ্টেশনে গাড়ী পাওয়া যাবে। সেই গাড়ীতে কলকাতা যাওয়া যাবে। কিন্তু গিয়ে লাভ কি? কার কাছেই বা যাবে? পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। কিন্তু কেইবা আছে? আরতির বিয়ে হয়ে গেছে। বাসন্তী বিয়ে করেছে নিজেই পছন্দ করে। শোভনাও তাই। ভারতী এখন কোথায়? সেই মাস ছয়েক আগে শুনেছিল দিল্লীতে আছে। সবাই ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই ব্যস্ত।

রাস্তা দিয়ে অন্যমনস্কের মত সে হেঁটে আসছিল। ধুলো উড়ছিল তার খেয়াল ছিল না যেন। এদিকে-ওদিকে দেখতে দেখতে সে এগিয়ে এল। তার কাঁধে একটা ঝুলানো ব্যাগ। পায়ে অনেক

ধুলো। জুতোটা ধুলোয় ঢাকা পড়েছিল বুঝি। কোথায় যাবে লোকটা? আশ্চর্য্য সতেজ লোকটা, নতুন জল-পাওয়া গাছের মত। কালো, কিন্তু লোকটার গায়ের রঙ কালো, চোখ ঘন কালো, চুল আরও কালো। সে গেট খুলে এগিয়ে এল নীলিমার দিকে।

'এটাই বুঝি সোনারগাঁ মেয়ে-স্কুল? মাধবীদি আছেন?'

নীলিমা চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটাই সোনারগাঁ মেয়ে-স্কুল। কিন্তু মাধবীদি ত নেই। তিনি ক'দিন হ'ল চলে গেছেন। এখন স্কুল ছুটি কিনা।'

'ওঃ, আচ্ছা নমস্কার, আপনাকে বিরক্ত করলাম।' লোকটা দাঁড়িয়েছিল। তার পর চলে যেতে চাইল।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু আপনার কোন দরকার ছিল কি?

গেটের হাতলটা ধরে দাঁড়িয়ে সে হাসল। আশ্চর্য্য সাদা ধবধবে দাঁতগুলো যেন চমকে দিল নীলিমাকে।

'হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল। কিন্তু থাক। তিনি যখন নেই। আপনার পক্ষে কি সম্ভব হবে?' আবার হেসে বলল সে।

'বলুন না, সম্ভব হতেও পারে।'

তখন সে আবার এগিয়ে এসে একটা চিঠি পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিল নীলিমার দিকে।

নীলিমা চিঠিটা নিয়ে পড়ল। মাধবীদির এক আত্মীয় লিখছেন মাধবীর কাছে। ছোট চিঠি। বক্তব্য: এই ভদ্রলোকটি পায়ে হেঁটে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যদি একদিনের জন্য সোনারগাঁর স্কুল-বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তা হলে তিনি খুশী হবেন। এছাড়া একদিনের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থাটা করা সম্ভব হলে বিশেষ ভাল হয়। তবে সামান্য ব্যবস্থা করলেই চলবে। ভদ্রলোকের নাম সরোজ ঘোষ।

নীলিমা চিঠিটা টেবিলের ওপর রাখল।

'বসুন, মাধবীদি নাই-বা থাকলেন। আমিই আপনার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপত্তি আছে কি?'

'না, কিছুমাত্র না।' চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল সরোজ।

'যান, হাত-পা ধুয়ে আসুন। আমাদের কুয়াটা ওইদিকে।' নীলিমা নির্দ্দেশ দিল সরোজকে।

সরোজ উঠে দাঁড়াল।

'দেখুন, আমার জন্যে সামান্য ব্যবস্থা করলেই খুসী হব। অযথা আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'না, সেকি কথা! আপনি কত দূর থেকে আমাদের গ্রাম দেখতে এসেছেন। একদিন ত মোটে থাকবেন।'

স্কুল-বাড়ির একটা ঘর খুলিয়ে দিয়েছে নীলিমা যতীনকে দিয়ে। একটা রাত্ত সরোজ থাকবে। খাওয়ার ব্যবস্থাটা ও নিজেই করেছে অর্থাৎ ও-ই রান্না করেছে।

বিকেলের দিকে চা তৈরী করল নীলিমা। 'আর অন্য কিছু খাবার।' যতীনকে দিয়েই স্কুল-বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু যতীন একটু পরেই ফিরে এল।

'দিদিমণি, বাবুটি ত নেই। কোথাও বেরিয়েছেন বোধ হয়।'

'ওঃ, আচ্ছা আমি দেখছি।'

নীলিমা স্কুল-বাড়ির মাঠ পেরিয়ে এসে দাঁড়াল রাস্তাটার সামনে। না, দেখা যাচ্ছে না ত। নীলিমা এগিয়ে গেল একটু। ডান দিকে একটা সরু রাস্তা বেরিয়ে গেছে গ্রামের ভেতর দিয়ে। আমবাগানের ভেতর দিয়ে পথ। নীলিমা সেই পথটা ধরেই এগিয়ে গেল। রোদ পড়ে এসেছে। তবু গরমের দিনের বেলা। গিয়েও যেতে চায় না। উঃ কি গরম। সারা দিনটা কি গরমই না গেছে! আশ্চর্য্য, সে গেল কোথায়! অথচ নীলিমা তারই জন্যে চা-খাবার করল। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! বিশ্রী! কেমন যেন খেয়ালী ভদ্রলোক! তিনি কি জানেন না কিছুই? সাংসারিক জ্ঞান বোধহয় একটু কম ওঁর। নীলিমার মনে পড়ল, সকালবেলাই ও জেনেছিল, বাড়িতে ওঁর মা ছাড়া আর কেউ নেই। বিয়েও করেন নি। অবশ্য বয়েসও কম। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। এখনও ছেলেমানুষী ভাবটুকু যায় নি।

ওই যে আসছেন বোধ হয়। হ্যাঁ, ঠিক।

'এই যে আপনি বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?' আপনাদের গ্রামটা একটু ঘুরে দেখে এলাম। বেশ লাগল জায়গাটা।'

নীলিমার ইচ্ছে হ'ল বলে, 'আপনাকে খুঁজতেই বেরিয়েছি।' কিন্তু ও তা বলল না। শুধু বলল, 'হ্যাঁ, একটু বেড়াচ্ছি। কি দেখলেন আমাদের এখানে?'

সরোজ হাসল। ওর হাতে একটা লাল শালুক ছিল। সেটা এতক্ষণে লক্ষ্য করল নীলিমা।

'অনেক কিছু দেখলাম। নদী, বাঁশ বাগান, পুরাণ মন্দির, ভাঙা বাড়ী। এ ছাড়া দু'একজনের সঙ্গে আলাপ করলাম।'

'ওটা পেলেন কোথায়? ওই ফুলটা?'

'ওঃ, এটা? হ্যাঁ, ভারী সুন্দর ফুল হয়েছিল একটা পুকুরে। নেবে তুলে আনলাম। কিন্তু তুলেই বা লাভ কি বলুন? আমি ত কাল ভোরেই চলে যাব এখান থেকে। এ সব ফুলটুল নিয়ে আমার কোন লাভ নেই। ফেলে যেতে হবে। আর এ ত শুকিয়েও যাবে দু' এক দিনের মধ্যে।'

'এখন ফিরবেন একটু? চা খেলেন না ত?'

সরোজ বলল, 'ও, চা ত আমি খাই না।'

নীলিমা বলল, 'খাবার খাবেন না? অনেকক্ষণ ত খেয়েছেন। তার পর প্রায় পুরো দুপুরটাই এখানে ঘুরেছেন রোদে।'

'হ্যাঁ, রোদটা বড্ড চড়া। তবে ছোটবেলা থেকেই রোদে ঘোরা আমার অভ্যেস আছে। রোদে ঘুরে ঘুরেই ত এমন পাকা গায়ের রঙ হয়েছে। অবশ্য ফর্সা আমি কোনদিনই ছিলাম না।'

'আপনি বুঝি দুষ্ট ছেলেদের মত সারা দুপুর স্কুল ফাঁকি দিয়ে ঘুরতেন?' নীলিমা হেসে সরোজের দিকে চাইলে।

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। ছোটবেলায় মা'র কাছে অনেক মার খেয়েছি এ জন্যে। স্কুলেও মার খেয়েছি। কিন্তু আমি বদলাইনি। এ জন্যে পড়াশুনাটা হ'ল না ভাল করে। ম্যাট্রিকটা কোন রকমে পাশ করেছিলাম। আর ওদিকে যাই নি। ও সব আমার ভাল লাগে না। নিয়মিত ভালো ছেলের মত পড়া মুখস্থ করা আমার দ্বারা হয়ে ওঠে নি।'

'তার চেয়ে দুরন্তপনা করতেই ভাল লাগে আপনার না?' নীলিমা হেসে বলল।

সরোজ হেসে উঠল।

'আপনি দেখছি আমার স্বভাবটা ঠিক ধরে ফেলেছেন। আমার মাও ঠিক আপনার মত কথা বলে।'

'কি বলেন তিনি?'

'এই বলেন আমি নাকি সারাজীবনটা দুরন্তপনা করেই কাটিয়ে দিলাম।'

'ও তাই নাকি? আপনি বুঝি মাকে খুব বিরক্ত করেন?'

'না, একেবারেই না। তবে ওই কোথাও বেরুলে আমার ফেরবার ঠিক থাকে না। রাতে বাড়ী ফিরতে দেরী করলে, ভীষণ রাগ করেন। আমি কত দিন বলেছি আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। কিন্তু সে মা শুনবে না। সেই না খেয়ে অপেক্ষা করে আমার জন্যে। এ ভাল লাগে না আমার।'

'আচ্ছা, আপনি কত দিন হ'ল বেরিয়েছেন বাড়ী থেকে?'

সরোজ একটু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, প্রায় দু' মাস হবে।'

নীলিমা পথ হাঁটল কিছুক্ষণ চুপচাপ। তার পর এক সময় জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি মাকে চিঠি লেখেন নিয়মিত?'

সরোজ গম্ভীর হয়ে বলল, 'না, নিয়মিত লিখি না। সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে লিখি।'

'কিন্তু তিনি ত চিন্তা করতে পারেন আপনার জন্যে?'

'কি জানি, ও সব ভেবে দেখিনি। যাক ওসব কথা। হ্যাঁ, একটা কথা জানতে চাই। আচ্ছা, আপনাদের স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা কি রকম? মানে, এই দেখে আমি গ্রামের শিক্ষার মান অনেকটা বুঝতে পারব।'

নীলিমা বলল, 'খুব বেশি নয়, বর্ত্তমানে ষাটের কাছাকাছি। তবে এরা অনেকে আবার বহু দূরের স্থান থেকেও আসে।'

'হুঁ, এখানে ছেলেদের ত আলাদা স্কুল আছে, না?'

'হ্যাঁ, আছে একটা।'

রাত নটার সময় নীলিমা যতীনকে দিয়ে সরোজের কাছে খবর পাঠাল, খাবার দেওয়া হয়েছে। খাওয়ার পর সরোজ বলল, 'দেখুন আমি একটু বেরুচ্ছি। আজ বেশ চাঁদের আলো আছে। কিছুটা বেড়িয়ে আসি।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু, এই রাতে অচেনা জায়গায় বেরবেন?' সরোজ হেসে উঠল ওর চুল ঝাঁকিয়ে।

'অনেক অচেনা জায়গায় আমি ঘুরেছি। তবে বেশি দেরী করব না আমি। আবার রাতে ডায়েরী লিখতে হবে কিছুক্ষণ। কাল খুব ভোরে বেরুব আমি। এখনি বিদায় নিয়ে রাখি। রাত থাকতেই বেরিয়ে যাব আমি।'

'আপনি রোজ ডায়েরী লেখেন?'

'হ্যাঁ, রোজই। আমার বেশ লাগে এটা। মানে এই ডায়েরী লেখাটা।'

'আপনি কালকের দিনটা থেকে গেলে পারতেন না? কাছাকাছি আরও কতকগুলি গ্রাম এখান থেকেই দেখে আসতে পারতেন। দু মাস ঘুরছেন। না হয় দুদিন বিশ্রামই করুন না? এ ভাবে একটানা হেঁটে যাওয়াটা কি ঠিক? অসুখ-বিসুখ করতে পারে।'

সরোজ হেসে বলল, 'না, বিশ্রাম আমার ভাল লাগে না। এ জায়গাটা আমার দেখা হয়ে গেছে। আর থেকে কি হবে?'

সরোজ বেরিয়ে চলে গেল। নীলিমা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। মাথা নীচু করে হাঁটছিল সরোজ। চুলগুলো মুখের উপর পড়েছে। গেট পর্য্যন্ত গিয়েই থমকে দাঁড়াল সরোজ।

'হ্যাঁ, আপনি যেন অপেক্ষা করবেন না আমার জন্যে। হয় ত দেরীও হতে পারে।'

একটু দাঁড়িয়ে রইল সে মাথা নীচু করে। তার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল। হ্যাঁ, চুলগুলো চাবুকের মত পেছন দিকে ছিটকে গেল। আর একটুও দাঁড়াল না সে। দ্রুত পায়ে হেঁটে গেল। কোণাকুণি মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে গেল।

নীলিমা জেগেই ছিল। আবার পরীক্ষার খাতাগুলো দেখছিল। শুধু শুধু বসে থাকা যায় না। তা ছাড়া খাতাগুলো শেষ করে ফেলাই ভাল।

সে ফিরল অনেক রাতে। নীলিমা তখনও জেগেই ছিল। কিন্তু তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। না, না, কি ভাববে তা হলে? তবু আলোটা জ্বলছিল দেখেই ও হয় ত বুঝতে পারবে, নীলিমা এখনও ঘুমায়নি। নীলিমা দরজা খোলার শব্দ পেয়েছিল। এখনও হয় ত ও জেগে থাকবে। জেগে থেকে ডায়েরী লিখবে। কি লিখবে? কার কথা লিখবে? ভেবে লাভ কি? কাল ভোরেই ও চলে যাবে। আর কোন দিন আসবে না কোন দিন দেখা হবে না। চাবুকের মত চেহারার মানুষটিকে আর দেখবে না।

নীলিমা উঠল। সতর্ক পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গেল। পা টিপে টিপে চুপি চুপি স্কুল-বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল।

মোমবাতির আলো জেলে সে লিখছিল। মাথা নীচু করে তাড়াতাড়ি লিখে যাচ্ছে। এখন কত রাত?

'কখন ফিরলেন?' নীলিমা কথা বলল।

'এই ত একটু আগে। আপনি এখনও জেগে আছেন?'

'হ্যাঁ, ঘুম আসছিল না। তা ছাড়া পরীক্ষার খাতাগুলো শেষ করছিলুম। আপনি কালই চলে যাবেন?'

'হুঁ, খুব ভোরে যাব। অনেকটা রাস্তা হাঁটব কাল।'

'রাতে জল খান? জল দিয়ে যাব?'

'না, প্রয়োজন নেই। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'আচ্ছা আমি যাই তা হলে।'

নীলিমা আবার ফেরে নিজের ঘরে।

পরের দিন ভোরবেলা নীলিমা সেই ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল। ফাকা ঘর। অনেকক্ষণ আগেই সে চলে গিয়েছে। নীলিমা জানতেও পারেনি।

নীলিমা দেখল ফাকা ঘর। টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল নীলিমা। ওই টেবিলেই সে লিখছিল কাল। সেই লাল শালুক ফুলটা টেবিলের উপর পড়ে ছিল। গরমে শুকিয়ে গেছে ফুলটা। পাতাগুলি কুঁকড়ে গেছে। সেই ফুলটার দিকে এগিয়ে গেল ও।

ছোট্ট এক টুকরা কাগজ চাপা রয়েছে সেই ফুলটা দিয়ে। নীলিমা কাগজটা টেনে নিল। ছোট ছোট অক্ষরে ব্যস্ত হাতের লেখা: 'আমার পক্ষে এখানে আরও একদিন থাকা সম্ভব হ'ল না। কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।'

নীলিমা কাগজটা মুঠো করে ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার পর সেই শুকনা ফুলটা তুলে নিল। শুকনা ফুল, বাসি ফুল। কাল কত সুন্দর ছিল, সতেজ ছিল। কি হবে আজ এই বাসি ফুলটা নিয়ে?

নীলিমা জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল ফুলটা।

চেরী ও তুমি

শ্রীবৈদ্যনাথ গুপ্ত

ফুলের আভাস জাগে জাগে ওই
চেরীর শাখায়
বনে বনে তাই প্রজাপতি যত
রঙীন পাখায়
রঙীন রোদের রশ্মি মাথায়।
মধু সেবনের নিমন্ত্রণ
পাঠায় তাদের অনুক্ষণ
বসন্ত
ফুলে ফুলে তাই মধুমাছি দলে
মধুভুঞ্জনে গুঞ্জন চলে
জাগে সুখ সব অন্তর তলে
অনন্ত।
দল মেলে কলি, আঁখি মেলে অলি
আবেশে তাকায়,
ফুলের আভাস জাগে জাগে ওই
চেরীর শাখায়।

সে-মধুমাসের বারতা পেয়েছে
চিত্ত মম
তোমাকে তখনই পেয়েছি অমিত
বিত্ত সম
অথবা জাগর-স্বপ্ন-কম।

আমারও খুশীর চেরী বনে-বনে
ফুটেছে ফুল,
তাই তুলে আমি কর্ণে তোমার
পরাব দুল।
আহা, কি ভুল।
চেরী যাবে ঝরে
তুমি যাবে সরে
নিঠুরতম
তবু চিরকাল যাচবে তোমা
চিত্ত মম।

বুন্দেলখণ্ডের লোকগীতি

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

বুন্দেলখণ্ড প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হিসেবে অতি রমণীয় স্থান। সেখানকার অধিবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে বারোমাস নানা নৃত্যগীতে তাদের সরল গ্রাম্যজীবনযাত্রা মনোরম করে তোলে। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে একটি বিশেষ লোকনৃত্য হয় তার নাম "শৈলানৃত্য।"

বুন্দেলখণ্ডে পর্দ্দা আছে তাই উচ্চশ্রেণীর ঘরণীরা এসব নাচে যোগ দেয় না, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রেণীর পুরুষ ও নারীরাই এই নৃত্যগীতে বুন্দেলখণ্ডকে প্রাণবন্ত করে তোলে। নৃত্যকারিণীরা যদিও পুরুষের সহিত এই নৃত্যে যোগ দেয় তবু সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে তাদের মুখ ঢাকা থাকে। তারা যথাসাধ্য রঙ্গীণ বস্ত্রালঙ্কারে সেজেগুজে আসে, ঘন চুনট-করা ভারী ঘাঘরা পরে।

একজন পুরুষ ও একজন নারী, এ ভাবে নৃত্যকারীরা এক সুবৃহৎ বৃত্ত রচনা করে। প্রত্যেকের হাতে থাকে এক একটা কাঠি। নারীরা পায়ে ঘুংঘুর বাঁধে। বৃত্তের মধ্যভাগে এক ব্যক্তি মৃদঙ্গ নিয়ে দাঁড়ায়। পুরুষ ও নারী উভয়েই গীত গেয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে থাকে। সাধারণতঃ যে মৃদঙ্গ বাজায় সে এই নৃত্যের তালমানলয় স্থির করে। নৃত্যগীত সুরু হবার পূর্ব্বে মৃদঙ্গওয়ালা মৃদঙ্গে আওয়াজ তুলে, নৃত্যকারী ও নৃত্যকারিণীরা পরস্পরের কাঠিতে ঠকাঠক আওয়াজ তুলে মৃদঙ্গের তালে তালে সুর ঠিক করে নেয়, তার পর নৃত্যগীত আরম্ভ হয়।

সব নৃত্যের মধ্যে শৈলানৃত্য বড়ই কঠিন, এই শৈলানৃত্য শুধু একই ধরনের হয় না,তার বিভিন্ন নৃত্যছন্দ আছে। মৃদঙ্গওয়ালা মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে সুরের মূর্চ্ছনায় উত্তেজিত হয়ে উঠে, সে কখনও বাজাতে বাজাতে বসে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই নৃত্যকারী গোল বৃত্তাকারে বসে যায়, আর মৃদঙ্গের তালে তালে হাঁটু ভেঙে মাটির উপর ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে, আর এই নৃত্যের ছন্দটিই বিশেষ কঠিন।

যখন পুরুষ ও নারীর বৃত্তটি নৃত্যের তালে তালে বিকশিত কমলের আকার ধারণ করে, তখন সে দৃশ্যটি দেখবার মত। কোন বিশেষ উৎসবে এই নৃত্যগীতের সময় একজন লোক সিঙ্গা বাজাতে থাকে। বুন্দেলখণ্ডে সিঙ্গাকে "রামতুলা" বলে।

পূর্ব্বকালে রাজপুত, বুন্দেলখণ্ডী, ভীল, গোণ্ড ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত, তাই সে সময়ের নৃত্য ও গীতের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনাই বেশীর ভাগ এসে যেত। নীচের গীতটির বিষয়বস্তু হ'ল যোদ্ধারা রণক্ষেত্রে যাবে, নারীরা তাদের বিদায় দিতে এসেছে। গানের ভিতর দিয়ে যোদ্ধাদের ও তাদের পত্নীদের উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে থাকে।

"ঘরর ঘরর নদিয়া বহে, অরে রৈইয়া
গোরিধন পানিয়াকো জায়।
সজনা বসত পরদেশরে, অরে রৈইয়া
আগই বৈরণ বরসাত।
ঘিরেরে অঁধরিয়া, ফুহর চলে অরে রৈইয়া
বরসত ঘন সারীরাত।
সুনী মড়ইয়া মোহে ডর লাগে অরে রৈইয়া
বরসত ঘন সারীরাত।
সাওয়ন মে পনছী, ঘর ছোড়ে নহি অরে রৈইয়া
বনজারা বনজ নহি জায়।
পরভাত ঘন আধী রাত
জুঝকো ডংকারে বেতন বজে অরে রৈইয়া
বীরন লড়নকো জায়।

—ঘর ঘর করে নদী বয়ে যাচ্ছে, অরে রৈইয়া গোরিধন জল আনতে যাচ্ছে। (কিশোরী, তরুণী এদের গোরিধন বলে।) পত্নী বলছে, ঘোর বর্ষা শুরু হয়ে এল, এ সময় আমার পতি প্রবাসে আছে। অন্ধকার রাত, ঝিমঝিম করে জল ঝরছে, সারারাত ধরে বৃষ্টি পড়ছে, অরে রৈইয়া আমার শূন্য ঘরে একা ভয় করে, সারারাত বারি ঝরছে। এমন শ্রাবণ মাসে পাখীও ঘর ছেড়ে বের হয় না। বনজরা বাণিজ্যে যায় না। মাঝ রাত পর্য্যন্ত মেঘ গর্জ্জন চলছে, আর এমনি দিনে যুদ্ধের রণডঙ্কা বেজে উঠল, সব বয়স্করা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে।"

পুরুষ—"বৈঠীতো রহিয়োরে, বৈঠিতো রহিয়োরে
অরে রাণী সতখণ্ডা
খৈইয়ো ডবাঁকে পান।
জব হম লোটে, অরে রণ জীতকে
ভোরী মোতিন ভরা দেঁহো মাংগ।"

যোদ্ধা তার পত্নীকে বলছে—"রাণী তুমি সাতখণ্ড মহলে বসে থেকো, ডিবা থেকে পান নিয়ে খেয়ো আমি যখন যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসব, তখন তোমার সিঁথিতে মোতির মালা পরিয়ে দিব।"

স্ত্রী—"জারিয়ো তো বারিয়োরে, জারিয়ো তো বারিয়োরে
অরে রাজা তেরে সাতখণ্ডা
পাঁনো পে পড়েরে তুষার, তেরে অকেলে
অরে জিয়রা বিন সুনোঁ লাগে সকল সংসার"

স্ত্রী স্বামীর প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা পেল না, রেগে বললে, "ও রাজা তোমার সাতখণ্ড মহল জলে যাক, হিম পড়ে সব পান খারাপ হয়ে যাক, তুমি ছাড়া আমার সকল সংসার শূন্য মনে হয়।"

পুরুষ—'নায় সে আগঁইয়ে, নায় সে আগই
অরে নদী বেতওয়া হো
মায় সে আগই ধসান
দোই নদ্দিয়েঁা কে অরে বড় বীচমে
ঝণ্ডা রোপে মরদ মলখান।

এদিকে বেতোয়া নদী প্রবল বেগে বয়ে আসছে, আর ওদিকে নদী ধসান, আর ঐ দুই নদীর মধ্যে বীর মলখান তাঁর নিশান পুঁতে দাঁড় করিয়ে সবাইকে যুদ্ধে আহ্বান করছে।"

স্ত্রী—কাহে সে বঢ়গইয়ে, কাহে সে বঢ়গই
অরে নদী বেতওয়া হো, কাহে সে বঢ়গই ধসান।
কাঁহে সে বঢ়গয়ে অরে সুমধনী
কাঁহে সে মরদ মলখান।

ওগো কি করে বেতোয়া নদীতে এত স্রোত এল, কি করে ধসান নদীতে এত স্রোত এল, কি করে সুমর্ধনী আর বীর মলখানের এত শৌর্য্য এল?

পুরুষ—"ভরখোসে বঢ়গয়েরে, ভরখোসে বঢ়গয়ে
অরে নদী বেতোয়ো হো, পথরন শৈল ধসান।
ফৌজ সে বঢ়গয়ে অরে সুমর্ধনী
তেগা সে মরদ মলখান।'

—নদী বেতয়োর ভিতরে গভীর খাদ আছে, আর সেগুলো সব সময়ই জলে পূর্ণ থাকে, কাজেই বেতোয়া নদীতে স্রোত এসে সে নদীকে খুব গভীর করে তুলেছে, আর ধসান নদী বড় বড় পাথরে ঠাসা, সেই বড় বড় পাথরের টুকরার উপর দিয়ে ধসান নদী প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছে। সৈন্যবলে সুমর্ধনী শক্তি সঞ্চয় করেছে আর মরদ মলখান তেজী হয়ে উঠেছে তার বর্শা অস্ত্রে।

স্ত্রী—"গুরজন, গুরজনরে, গুরজন গুরজনরে
অরে ঝুলা ডারে ঝুলে সকল সংসার
এক হু না ঝুলে, অরে লখন বহু
জাকে কন্তা বসে পরদেশ।"

—গাছের এ ডালে ও ডালে দোলনা দোলছে, সকল সংসার মানে সবই ঝুলায় দুলছে, শুধু একজন ঝোলায় দুলছে না, সে হ'ল লখন যোদ্ধার স্ত্রী, যার পতি প্রবাসে আছে।"

পুরুষ—"হরী করোদন রে হরী করোদন
অরে ঝক ঝলরি হো।
হরে সুয়া তোরে পঙ্খ, হরে বছেরা
হরে পরমল কে হো
কছু রণ মেঁ তো করত কিলোল।"

সবুজ করবন্দ (করমচা) ওরে সবুজ করবন্দতে গাছ ছেয়ে আছে, ও তোতা পাখী তোর পাখাও সবুজ, আর পরমল যোদ্ধার ঘোড়াও সবুজ, সবে রণক্ষেত্রে ক্রীড়া করছে।

সবুজ হ'ল তারুণ্যের লক্ষণ, তাই সবুজের সঙ্গে যৌবনের তুলনা দেওয়া হয়। ফলভরা গাছ যেমন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠে যৌবনে, সেরকম বীর পরমল ও তাঁর যৌবনে শৌর্য্যেবীর্য্যে পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে আর তাঁর ঘোড়াও সবুজ, মানে যৌবনের শক্তিতে তেজীয়ান হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে চলেছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, জয়ী হয়ে বীররা দেশে ফিরে এল, সবার গৃহে আনন্দের বন্যা বয়ে চলল, আবার নৃত্যগীতে গ্রাম মুখর হয়ে উঠল, আর নারীরা আনন্দে গাইতে লাগল।

"সখিরে মায় তো ভই ন ব্রজকী মোর
সখিরে মায় তো ভইন ব্রজকী মোর
কৌন গলী ওড়তীরে কোন গলি ওড়তী
কোন গলী করতে কিলোল।
মথুরা ওড়তীরে মথুরা ওড়তী
মধুবন করত কিলোল
সখিরে মায় তো ভইন ব্রজকী মোর
ওড় ওড় পঙ্খ গিরে, ধরণী পে, গিরে ধরণী পে
বীনত যুগল কিশোর সখিরে।
ওন পঁখোকে মুকুট বনো হ্যায়
বাঁধত যুগল কিশোর
সখিরে মায় তো ভইন ব্রজকী মোর
বৃন্দবনকী সখরি গলিয়া রে সখরি গলিয়া
ঢড়গই পঙ্খ করোর সখিরে।"

সখি, আমি তো ব্রজের ময়ূর নই, সখি আমি তো ব্রজের ময়ূর নই। ময়ূর কোন গলিতে উড়ছে, কোন গলিতে উড়ছে, কোন গলিতে খেলা করছে? মথুরায় উড়ছে, মথুরায় উড়ছে, আর মধুবনে খেলা করছে। সখিরে আমি তো ব্রজের ময়ূর নই। পাখা ছড়িয়ে ময়ূর উড়ছে, আর যুগলকিশোর শোভা পাচ্ছে—ওই ময়ূর পাখের মুকুট বানিয়ে যুগলকিশোরের মাথায় বেঁধেছে। সখিরে আমি ত ব্রজের ময়ূর নই, বৃন্দাবনের সরু গলিতে পাখা আটকে গেছে, সখি আমি ত ব্রজের ময়ূর নই।
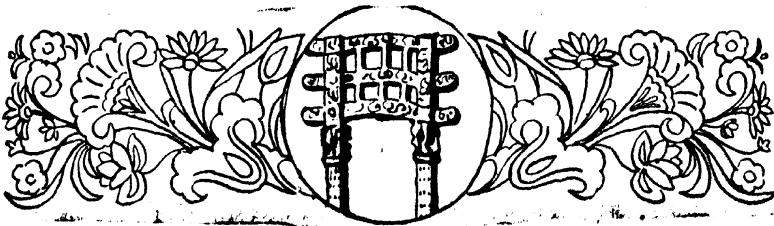
নূতন সিদ্ধান্ত

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদিশা পাবলিক রেস্তরাঁয় চাকরী করে। আপিস পাড়ায় এই দোকানের বড় নাম। দক্ষিণ দেয়ালের সম্মুখে একটু জায়গা কাঠ দিয়ে ঘেরা। সে সকালে এখানে টাকার বাক্স নিয়ে বসে। আট ঘণ্টা পয়সা গুণে কাটিয়ে দিয়ে বিকেল পাঁচটায় চলে যায়। তার দিনগুলি এই ভাবেই কাটে। এ পাড়ায় যে দীঘিটা আছে, সে কখনও লক্ষ্য করে দেখে না তার জল নীল কি, গাছের পাতা সবুজ কি, কিংবা সূর্য্যাস্তের রঙ রক্তরাগরঞ্জিত কি এবং শুধু তাই নয়, এই দীঘিতে যে অত বড় একটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, তাও তার নজরে পড়ে না। সে এমনি ক্লান্ত উদাসীন। তার আকাঙ্ক্ষা নেই, সে একুশ বছর বয়সে বুড়ী হয়ে গেছে। এই যখন অবস্থা, সে তখন একদিন অকস্মাৎ চতুর্দ্দিকে নজর দিতে আরম্ভ করল। কখন বসন্তের অনুরক্ত সমীরণ এ অঞ্চলে একটু দোলা দিয়ে গেল তা সে টের পেল না।

দেবেশ নিকটে এক ডাচ বণিকের কার্য্যে চাকরী নিয়ে এল। প্রথম মধ্যাহ্নের সে চমক লাগানর কথা বিদিশা আজও ভুলতে পারে না। রোজ বিকেলে চাঁদপালে কিংবা ইডেনে বেড়াতে বেড়াতে সে কথা একবার মনে করিয়ে দেয়।

আজ একটু আগে আপিস-আদালতে ছুটি হয়ে গেছে। হাই-কোর্টের সম্মুখটা নির্জ্জন। দেবেশ ও বিদিশা পাশাপাশি হাঁটছে। দেবেশ বলল, কে জানত, এমনি করে রোজ তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

বিদিশা তার কথা অনুমোদন করে বলল, হ্যাঁ, এ এক দুর্ঘটনা। সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

দেবেশ হেসে বলল, আমি মোটেই অবাক হই নি।

আপনি অবাক করবেন বলেই ত আগে বলেন নি। সে একটু এগিয়ে গিয়ে মনে পড়ে যাওয়াতে বলে উঠল, ঐ দেখেছেন, একে-বারে ভুলে গিয়েছিলাম, দিদি আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে।—

সে বোধহয় আরও কিছু বলত, কিন্তু দেবেশ তার আগেই বলে উঠল, তোমার দিদি দিব্যি ছেলে নিয়ে আছেন। চল না, আজ আউট্রাম ঘুরে আসি।

না না, সে ভারী বিশ্রী হবে, দিদি খুব রাগ করবে।

আর একজন যদি তার চেয়েও খুব রাগ করে।

বিদিশা এ কথার উত্তর না দিয়ে সহসা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে শান্ত-দৃঢ়তায় বলল, চলুন ফিরি।

সূর্য্য গঙ্গার ওপারে। সম্মুখে গঙ্গার ভারতের একখানা বড় যানোয়াযী জাহাজ তার সমস্ত ছটা গ্রাস করেছে। উপরে আলোর ম্লান রেখা, নীচে অন্ধকার। সেই আলো-আঁধারে জাহাজে কর্ম্মরত মানুষগুলিকে অস্পষ্ট অবচ্ছ বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। বিদিশা ঐদিকে চেয়ে আছে। সে বোধহয় তার অন্তরের দূরস্থিত গভীরে এমনি একটা আলো-আঁধারে খেলা দেখছে। সে আপন মনে বলে উঠল, কেন জোর করেন, আমি যে বড় দুর্ব্বল হয়ে যাই।

দেবেশ এই অস্পষ্ট বাক্যের সমস্ত শব্দ শুনতে না পেলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে ক্ষুন্ন কণ্ঠে বলল, বেশ, তুমি যাও।

বিদিশা ব্যস্ত হয়ে বলল, না না। এ আপনি কি বলছেন। কেন বোঝেন না—দিদি সারাদিন কি উৎকণ্ঠায় আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকে।

দেবেশ অধৈর্য্য হয়ে উঠে বলল, জানি। বার বার দিদির কথা মনে করিয়ে দিতে হবে না।

বিদিশা ম্লান হেসে বলল, বড্ড রেগে গেছেন না? আচ্ছা, আজ চলুন, আর একদিন আজকের ফাঁকটুকু পুষিয়ে দেব।

যেমন কোথা থেকে এক খণ্ড কালো মেঘ এসে মধ্যাহ্নসূর্য্য ঢেকে দেয়, পৃথিবীতে ছায়া ফেলে, তেমনি করে এক খণ্ড লঘু মেঘ উড়ে এসে এদের জীবনে মধ্যে মধ্যে ছায়া ফেলতে লাগল। কিন্তু ছায়ার ধর্ম্ম আছে। তার নিজের শক্তি নেই। পরের শক্তি তার অবলম্বন। সে শক্তি যখন থাকে না, ছায়াও তখন লুপ্ত হয়। বিদিশা সমস্ত পথটা এই কথা ভাবতে ভাবতে এল যে, সে কেন সমস্ত জোর হারিয়ে ফেলছে।

ধক স্ট্রীটে বড় বাড়ীটার ঘরে ঘরে আলো জ্বালা হয়েছে। খোলা জানালা-দরজা দিয়ে আলো বেরিয়ে আসছে। তারই একটা ফ্ল্যাটে ঢুকে বিদিশা উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠল, দিদি দেখলে কি লক্ষ্মী মেয়ে—

ধ্যানশ্রী বোধ হয় তাদেরই অপেক্ষা করছিল। সে হেসে বলল, আয়, বোস, চা করি। একটু এগিয়ে গিয়ে দেবেশকে বলল, তুমি একবারটি নীচে যাবে?

বিদিশা বলল, কেন বল ত?

ধ্যানশ্রী ইতস্ততঃ করে বলল, ওরে কি লজ্জার কথা, চায়ের টিনে হাত দিয়ে দেখি খালি।

বিদিশা বলল, তা অজয়কে পাঠাও না।

ধ্যানশ্রী বলল, ঐ ত হয়েছে মুস্কিল, না হলে কখন আনিয়ে রাখতাম। অজয় খোকনকে মাঠে নিয়ে গেছে।

দেবেশ মৃদু কণ্ঠে বলল, এই রকমই হয়। ওই জন্যেই বলি যে মেয়েদের বাইরে খাটা উচিত। তাতে দায়িত্বজ্ঞানটা পাকে।

ধ্যানশ্রী উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, মেয়েমানুষ বসে বসে পুরুষের অন্ন ধ্বংস করে—এই তোমার ধারণা। তারা ঘরে খাটে না, অমনি হয়।

পৃথিবীতে কোন ভূখণ্ডে ঝড় উঠেছে জানা না গেলেও এটুকু বোঝা গেল যে, এই ক্ষুদ্র ঘরখানিতে তারই ইঙ্গিতে বিদিশা থেকে থেকে চমকিয়ে উঠতে লাগল। তাই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, দিদি চুপ কর, দেবেশবাবু বোধহয় ও ভেবে বলেন নি।

ধ্যানশ্রী গম্ভীর মুখে বলল, তোমার দেবেশবাবু অনেক-কিছু বলেন, যা ভাবেন না।

যথা।

থাক, চাটা এনে দেবে না আমি যাব।

বিদিশা এগিয়ে গিয়ে হেসে বলল, এই ত নীচে দোকান, দাও পয়সা দাও, আমি যাচ্ছি।

দেবেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না। তুমি যাবে কেন।

বিদিশা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তাতে কোন দোষ হয় না। সে চায়ের পাতা কিনতে গেল।

দেবেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বললে, এ ভাবে আমাকে অপমান না করলে চলত না।

ধ্যানশ্রী কিছু বুঝতে না পেরে বিস্ময়ে বলল, অপমান!

হাঁ, অপমান। তুমি বালিকা নও, বোঝবার বয়েস নিশ্চয়ই হয়েছে।

তাই নাকি! তা তোমার মর্য্যাদা এত ঠুনকো জানতাম না। কবে থেকে হ'ল?

দেবেশ আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠে বলল, রসিকতা করার কথা নয়।

ধ্যানশ্রী রান্নাঘরে যেতে যেতে বলল, কে ঠাট্টা করছে, আমার সময়ই বা কই?

দেবেশ তাকে অনুচ্চকণ্ঠে ডেকে বলল, যেও না, দাঁড়াও। বিদিশার সুমুখে ওকথা না বললে চলত না।

কি কথা।

কি কথা, তুমি নিশ্চয় বুঝেছ।

ধ্যানশ্রী হেসে বলল, যাও, হাতমুখ ধুয়ে এসে বস। বিদিশা আমার বোন।

বিদিশা ইতিমধ্যে চা কিনে ফিরে এল। সে ঘরে দেবেশকে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে হেসে বলল, কি মশাই রাগ পড়ল?

দেবেশ মৃদু গলায় বলল, এখানে ঢুকলে রাগ আরও বাড়ে।

বিদিশা এই উত্তরে ভীত হয়ে উঠে এদিকে ওদিকে চেয়ে সেখানে আর দাঁড়াল না, রান্নাঘরে চলে গেল।

দেবেশ বেতের মোড়ায় বসে আছে। একদিকে একটা ডবল-বেডের খাট পাতা, তাতে ধবধবে সাদা বিছানা পাতা রয়েছে। এক ধারে গোটাকতক টিনের ট্রাঙ্ক রাখা রয়েছে। সাড়ীর পাড় দিয়ে পরিষ্কার ঢাকা দিয়ে বাক্সগুলি ঢাকা। দেওয়ালে একটা সেতার ঝুলছে। ছিট কাপড়ের অড় পরাণ। আরও কত কি ঘরখানায় আছে। কোথাও কোন কোণে মাকড়সার বৃত্তাকার ছোট জাল ঝুলছে না, কোথাও একটুকু ধুলা জমে নেই। গৃহস্বামিনীর সদা-জাগ্রত দৃষ্টির সদা-সতর্ক নজর এ পরিবারের লোকজনদের মত আসবাবপত্রগুলির উপরও স্পষ্ট। দেবেশ উঠে সেতারের কাছে গেল। কি ভেবে পরক্ষণে ফিরে এল। মেঝেতে শীতলপাটি পাতা আছে, তার উপরে গিয়ে বসল।

ধ্যানশ্রী বোনের সহযোগিতায় চায়ের সরঞ্জাম এনে বসল। মজলিস জমে উঠল। কিছুক্ষণ আগে আসন্ন ঝড়ের যে দুর্লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, তা উপে গেল। ধ্যানশ্রী বলল, পুরুষ মানুষের বাইরে ঘোরা স্বভাব, আমার আজকাল সময় হয় না। দিশা, তুই মাঝে মাঝে তোর দেবেশ বাবুকে নিয়ে সিনেমায় গেলেই পারিস।

দেবেশ এই সরল কথাগুলির বিকৃত অর্থ করে নিজেই অস্বস্তি-বোধ করতে লাগল। সে অকারণ প্রতিবাদ করে বলল, কবে বলেছি যে কেবল বাইরে ঘুরতে চাই।

ধ্যানশ্রী হেসে বলল, আঃ, তাই বুঝি আমি বলছি। তুমি বলবে কেন, আমি কি বুঝিনে যে, তোমরা বাইরে একটু ঘুরলে ভাল থাক। একটু থেমে পুনরায় বলতে লাগল, মনে নেই, বিয়ের আগে আমাকে নিয়ে কি চরকী ঘোরাই ঘুরতে। রাত এগারটা ত তোমার কাছে সন্ধ্যে। কতবার বলতাম, এইবার বাড়ী যাও—

দেবেশ অপ্রস্তুতে পড়ে আমতা আমতা করে কি একটা বলতে গেল কিন্তু বিদিশা তাকে বাধা দিয়ে কৌতুক করে বলল, মশাই, সব বিদ্যে ফাঁস হয়ে গেল যে।

ধ্যানশ্রী হাসতে হাসতে বলল, এতে আর দোষের কি আছে। বিয়ের আগে সবাই অমন একটু-আধটু নিয়ে ঘুরতে ভালবাসে।

বিদিশা হাসি চেপে বলল, আঃ; দিদি চুপ কর, দেখছ না বেচারীর চোখের মুখের অবস্থা কি রকম হয়ে উঠছে।

দেবেশ দুই বোনের দুধারা আক্রমণে পর্য্যুদস্ত হয়ে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য দুর্ব্বল কৈফিয়ৎ দিয়ে বলে উঠল। যত দোষ এই পুরুষ জাতটার, তোমরা সাধু। তোমরা বেড়ান-টেড়ান বুঝি ঠিক পছন্দ কর না।

বিদিশা বলল, করি বৈকি, কিন্তু রাসটানা বলে একটা কথা আছে। আমরা সেটা জানি।

ধ্যানশ্রী তাকে সমর্থন করে উচ্চৈস্বরে বলে উঠল, ঠিক বলেছিস।

এমনি করে হাস্যপরিহাসের মধ্য দিয়ে ধ্যানশ্রীর অন্তর বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। সে সংসারের এই কাজেই লিপ্ত থাকে। বাইরে নজর দেবার বড় সময় পায় না।

পাঁচ বছরের গৌতম মাঠ থেকে বেড়িয়ে এই মাত্র ফিরেছে। সে ছুটতে ছুটতে এসে ধ্যানশ্রীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কচি ছুটো হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে অনর্গল বকবক করতে লাগল। কোন্ কোন্ দেশে মাকে দেখে শিল্পী মা ও ছেলের ছবি এঁকে-

ছিলেন জানি না। তবে তিনি বোধ হয় এমনি কোন দুর্লভ মুহূর্ত্তে কোন মাকে ছেলে-কোলে বসে থাকতে দেখেছিলেন। তাই আজও সেই ছবিতে বিশ্বজননীর যে মূর্ত্তিটি ধরা আছে, তা ধ্যানশ্রীকে দেখলে মনে পড়ে। ধ্যানশ্রী উঠে দাঁড়াল। সে বিদিশাকে বলল, তোরা বোস, আমি আসছি।

যে লঘু হাওয়াটা উপরে ভাসছিল, ধ্যানশ্রী তা সঙ্গে নিয়ে গেছে। তাই সে উঠে যাবার পরে আর কথা জমল না। নীরব উপস্থিতি যখন এমনি ভারী হয়ে উঠতে লাগল, দেবেশ তখন এক সময়ে মুখ তুলে বলল, চল কাল সিনেমায় যাই!

বিদিশা নতমুখেই উত্তর দিল, দিদিকে বলুন না।

দেবেশ বলল, শুনলে ত উনি যাবেন না, ওঁর সময় হয় না।

বিদিশা জিজ্ঞাসা করল, কখনো জোর করে নিয়ে গেছেন?

দেবেশ বলল, আমার কথা বিশ্বাস না হয় তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

বিদিশা বলল, আগে নিয়ে জান নি এ অপবাদ আমি দিচ্ছি নে, আমি বলছি পরে কখনো জোর করেছেন।

দেবেশ একটু পরে কি একটা ভেবে বলে উঠল, তুমি আমাকে কি ভাবছ বলত?

বলব—, থাক।

বল।

বিদিশা এ কথার উত্তরে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। ধ্যানশ্রী পুনরায় ঘরে ঢুকল। সে ছেলেকে কোল থেকে নাবিয়ে দিয়ে বিদিশাকে জিজ্ঞাসা করল, তুই বাড়ী যাবি, না থাকবি।

দেবেশ তাড়াতাড়ি বলল, থাক না, বিদিশা। এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া যাবে।

বিদিশা ধ্যানশ্রীকে বলল, কিন্তু দিদি, বলে আসি নি, মা ভীষণ ভাববেন।

ধ্যানশ্রী বলল, তবে থাক। বরং কাল বলে আসিস যে এখানে থাকবি।

দেবেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজই যাচ্ছি, মাকে খবর দিয়ে আসছি।

বিদিশা কৌতুক করে বলল, মশাই দেখছি আমাকে রাখার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

ধ্যানশ্রী হেসে ফেলে বলল, তুই যে বড় মধুর সম্বন্ধ।

তার উদ্দীপনা প্রদীপের মত নিবে গেল। দেবেশ অসহায় লজ্জায় জড়পিণ্ড হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ধ্যানশ্রী তাকে দেখে বলল, তাই না হয় যাও। মাকে বলে এস। আর দাঁড়াও টাকা দিচ্ছি, অমনি বাজার থেকে একটু মাংসও এন।

দেবেশ চলে গেল।

ছোট সংসার এই ভাবে চলে।

দেবেশ যখন ফিরে এল তখন তার চোখেমুখে আনন্দ জলজল করছে। মানুষ যখন আকস্মিক কিছু লাভ করে, তখন তার যে আনন্দ হয়, সে আনন্দ পরিমাপ করা অসাধ্য, তার আনন্দও তেমনি। এ বস্তু কোন-কিছু দিয়ে পরিমাপ করার নয়। সে উচ্ছ্বসিত আবেগে বার্ত্তাবহর কাজে লেগে গেল। হেঁসেলের দোরগোড়ায় বসে ধ্যানশ্রীকে কত কথা বলতে লাগল। ধ্যানশ্রী কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাঁ, হু ইত্যাদি মন্তব্য করে সায় দিতে লাগল। এক ফাঁকে মুখ তুলে বলল, মা কাপড় দিতে গেলেন কেন, আমার কি সাড়ী ছিল না। আর তুমিও স্বচ্ছন্দে বয়ে আনলে।

দেবেশ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, আমি আর অত কি জানি। তোমাদের একজনের বস্ত্রে চলে যায়।

ধ্যানশ্রী মাংসের টুকরো থেকে চুল বাছতে বাছতে বলল, তা বেশ করেছ। ভগ্নীপতি হয়ে না হয় ছোট শালীর একখানা কাপড়ই বয়ে এনেছ। সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিদিশার সাড়া পেয়ে চুপ করে গেল। বিদিশা গৌতমকে নিয়ে দেবেশের পিছনে দাঁড়িয়েছে। সে ঠাট্টা করে বলল, ছুটি মেলেনি বুঝি, সুপারিশ ধরুন।

ধ্যানশ্রী ঘরে বসেই বলল, যা না, তোর দেবেশবাবুকে নিয়ে যা। এখানে বসে থাকলে আমারও কাজের ব্যাঘাত হবে, তোদেরও গল্প হবে না। তার চেয়ে অজয়কে এখানে পাঠিয়ে দে। আর শোন, ওকে বাজাতে বল, অনেকদিন শুনি নি।

বিদিশা ছদ্ম আদেশে বলল, চলুন ছুটি মঞ্জুর।

রাত ভারী হয়ে উঠছে। এই অঞ্চল এখন নিস্তব্ধ। কেবল দূরে রাস্তায় মাঝে মাঝে দু'একখানা মোটর অস্পষ্ট শব্দ করে চলে যাচ্ছে। দক্ষিণের বড় জানালা খোলা, ঘরে হু হু করে হাওয়া ঢুকছে। আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দু'একটা তারা মিটমিট করছে।

দেবেশ সেতার পেড়ে আনল। সে দরবারীতে আলাপ ধরেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাজিয়ে ও শুনিয়ে উভয়েই নিজেদের বিস্মৃত হয়ে কোথায় কোন্ জগতে বিচরণ করতে চলে গেল। আকাশে যে বিরহটা ভেসে ভেসে বেড়ায় দেবেশ তাকেই তার বাজনার মধ্যে ধরে এনে অন্তরের কান্নার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে দিল। এমনি করেই মানুষ আর এক জনের মধ্যে নিজেকে পেতে চায়। অনেকক্ষণ পরে দেবেশ যখন থামল বিদিশা তখনও এই পৃথিবীতে ফিরতে পারে নি। সে তন্ময় হয়ে বাইরে চেয়ে আছে। দেবেশ সেতার রেখে দিয়ে মৃদু গলায় বলল, বললে না, কেমন লাগল?

উঃ, বলে সাড়া দিয়ে পরক্ষণে আত্মস্থ হয়ে বিদিশা বলতে লাগল, কতগুলো ভাল লাগা কথা দিয়ে বোঝান যায় না। নাইবা জানলেন, আমি কি পেলাম। শেষের দিকে তার স্বর কি এক রকম হয়ে গেল, সে সেইরকম গলায় বলল, দেওয়া-নেওয়ার সব বিচার কেবল কথায় স্পষ্ট হয় না। সে অতর্কিতে আরও কি বলতে পারে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, বলল, দিদি অনেকক্ষণ একা আছে, আমি যাই।

দেবেশ বলল, কেন, অজয় সেখানে রয়েছে ত।

বিদিশা এইভাবে নিজের কাছ থেকেই পালাতে চাইল। সে

যেতে যেতে জড়িতকণ্ঠে বলতে লাগল, আমাকে মাপ করুন, আমাকে মাপ করুন।

দেবেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। দূরে খাটের উপরে গৌতম শুয়ে ঘুমচ্ছে। সে যে সংশয়ে পড়েছে, সেই সংশয়ের নিশ্চিন্ত উপায়ের একান্ত চিহ্ন তার মুখে খুঁজতে লাগল। ওই যে ক্ষুদ্র মানব-শিশুটি একান্তই নিদ্রিত, সে ত তারই ভালবাসার ফল। দূরের সেই দিনে আজকের মত এই শিশুর জননীকেও ত এমনি করে সে সর্বশক্তি দিয়ে সেতার বাজিয়ে শোনাত।

তাকে এইভাবে তন্ময় হয়ে ভাবতে দেখে ধ্যানশ্রী বলে উঠল, কি ভাবছ অমন করে, কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছি, একেবারে সাড়া নেই।

দেবেশ থতমত খেয়ে গেল, সে কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বলল, গৌতমকে দেখছিলাম।

ধ্যানশ্রী খুশী হয়ে বলল, তবু ভাল, তুমি ওকে দেখ। সে থেমে অকারণ উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করল, খোকন বড় রোগা হয়ে গেছে, তাই না?

দেবেশ তার অনুমান হেতুহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে বলল, না না, তুমি ওসব ভাবছ কেন।

ধ্যানশ্রী সন্তুষ্ট ও নিঃশঙ্কিত হয়ে বলল, চল, তোমাদের খেতে দিই। সে সেতারে ছড় পরাতে গেলে তাকে বারণ করে বলল, থাক। অজয়কে পাঠাচ্ছি। তুমি এস।

খাওয়ার পর্ব যখন মিটল রাত তখন আরও গড়িয়েছে। দক্ষিণের চওড়া বারান্দায় বিদিশাকে বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে। সে বিছানায় কতক্ষণ শুয়ে ছিল, কিন্তু ঘুমাতে না পেরে উঠে গিয়ে রেলিঙের ধারে দাঁড়াল। সে এই কথাটাই ভাবতে লাগল যে, যে চোরাবালিতে তার পা দুটা আটকিয়ে গেছে, একটু একটু করে নীচে টানছে। কে এসে তাকে তা থেকে টেনে তুলবে। আকাশ আরও পরিষ্কার হয়েছে, তারা আরও স্পষ্ট। সে ঐ মৌন তারাদের কাছে তার নিরুদ্ধ বেদনার নীরব কান্নার কথা জানাতে লাগল। মানুষ এমনি করে তার চোখের জলের নালিশ নিঃসংশয়ে মানুষেরই কানে পৌঁছে দিতে না পেরে সীমাহীন বিস্তারে পৌঁছে দেয়। আকাশের ঐ বিস্তারের যেমন কোথাও শেষ নেই, সাথী নেই, তার বেদনারও তেমনি শেষ নেই।

দু-একটা রাত-জাগা পাখী মাঝে মাঝে লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যে উড়ে যাচ্ছে। তাদের ডানার অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ পাশে কার উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসে বিদিশা ঘাড় ফিরিয়ে চমকে উঠল। দেবেশ ফিসফিস করে বলছে, ঘুম এল না।

হায় ভালবাসা! ঘরে যে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় নিদ্রিত, সে কি ভালবাসা নয়, সে কি বড় প্রেম নয়! সে ত টেরও পেল না যে, এমনি করে তার বিছানা থেকে একজন উঠে এসেছে। হয় ত আর একটু পরে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে ডান হাতখানা দিয়ে তার পরম নির্ভরকে ধরবে। কিন্তু ঘুম ভেঙে চোখ মেলে দেখবে, সে যাকে চায় সে সেখানে নেই। কেবল একটা সুবিস্তীর্ণ ফাঁকি অর্থহীন অসঙ্গতিতে ঐ শূন্য শয্যায় পড়ে আছে!

বিদিশা সন্ত্রস্ত হয়ে মৃদু গলায় বলল, ছি ছি, আপনি এখানে উঠে এসেছেন। দিদি যদি ঘুম ভেঙে—

সে কথা শেষ করতে পারল না, অসমাপ্ত কথার মধ্যপথেই থেমে গেল। ধ্যানশ্রী ঘরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলছে, বিদিশা, ভাই, তুমি দেবেশকে মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যেও। ও আজকাল যেন কি রকম হয়ে গেছে।

বিদিশা ভয়ে-বিহ্বলে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, শীগগির যান, ঐ দিদি উঠে পড়ল।

দেবেশের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সে তেমনি ফিস ফিস করে বলতে লাগল, না না, ও স্বপ্ন দেখছে, প্রায়ই স্বপ্ন দেখে।

বিদিশা রুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগল, আপনার লজ্জা হওয়া উচিত। আপনি যান, নচেৎ আমিই গিয়ে দিদিকে জাগিয়ে দেব।

দেবেশ এই স্পষ্ট অপমানও বুঝতে পারল না। সে আত্মবিস্মৃত অসহায়ের মত বলতে লাগল, আমাকে একটু থাকতে দাও।

কেন? কি চান আপনি?

আমি বড় একা, বড় একা।

রাত তিনটের সময় উঠে থিয়েটার জুড়ে দিলেন নাকি! অদ্ভুত! সে একবার থেমে পুনরায় বলতে লাগল, পুরুষ কি হলে একা বোধ করে কি হলে করে না, তা বোধ হয় মেয়েমানুষ বোঝে না, না হলে দিদি কি অমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমত? তা বেশ হয়েছে। চলুন, থিয়েটার করতে হয় ত ঘরে চলুন। দিদিকে ডাকি, দুজনেই আপনার পার্ট শুনব।

দেবেশ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সে হাঁটতে ভুলে গেছে। বিদিশা রুদ্ধ-নিঃসংশয়ে বলে উঠল, এখন বুঝলাম, কেন আপনি আমাকে রাখবার জন্যে অত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

দেবেশ অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠল, থাম! কি বলছ তুমি? এত কথা তুমি ভাবতে পারলে।

এই উন্মত্ত চীৎকারে ঘরে ধ্যানশ্রী উঠে বসল। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। বিদিশা ক্রোধে ও উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছে। ধ্যানশ্রী কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে রে দিশা?

সে কেবলমাত্র এক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ়-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরক্ষণে ক্রোধে উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, দেখ না দিদি, লোকে বাজে তর্ক করলে আমার বড় রাগ হয়। তখন থেকে বলছি ওটা শুকতারা। দেবেশবাবু কেবলই তর্ক করছেন না ওটা শুকতারা নয়।

বড় মিথ্যা বলবার গুণে কখনও বড় সত্য হয়ে উঠে। এ মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করতে তার স্বরযন্ত্র বারে বারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, তবু আর একজনের নিরুপায় অবস্থার কথা ভেবে তাকে এত বড় ফাঁকি দিতেই হ'ল। কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য হ'ল তা বুঝতে না পেরে দেবেশ আগের মতই দাঁড়িয়ে রইল। কেবল তার চোখ দুটো

দিয়ে কৃতজ্ঞতা ঝরে ঝরে পড়ছে। কিন্তু এ অঁাধারে দুই বোনের কেউ তা টের পেল না। শুধু বিদিশা উপলব্ধি করতে পারল যে, আসন্ন লজ্জা ও অখ্যাতির অপবাদ থেকে সে দেবেশকে রক্ষা করতে পেরেছে। ধ্যানশ্রী সদ্য-ঘুমভাঙা কণ্ঠে বলল, তা তোদের আকাশের তারা নিয়ে গবেষণা করার সময় মন্দ নয়! কিন্তু ও উঠে এল কখন?

বিদিশা ম্লান হেসে বলল, শুকতারা দিয়ে ত আর সন্ধ্যেবেলায় গবেষণা করা যায় না, দিদি?

দেবেশ চুপ করে ছিল। পাছে কথা বলতে গিয়ে তার গলা কেঁপে উঠে তাই সে চুপ করেই রইল। বিদিশা ধ্যানশ্রীর শেষ কথার উত্তরে বলল, তা ক্ষণিকক্ষণ হ'ল বৈকী?

ধ্যানশ্রী আর কথা না বাড়িয়ে বোনকে ডেকে বলল, আয়, রাত আর বেশী নেই, চা করি। তার পরে স্বামীকে ডেকে বলল, তুমিও এস। আকাশের তারা নিয়ে আর এই রাতে মীমাংসা করতেহবে না।

এত বড় লজ্জা এই সুনিপুণ সুসঙ্গতিতে সমাপ্ত হবে, দেবেশ তা কল্পনাও করেনি, সে এই মালিন্যের হাত থেকে এই ভাবে মুক্তি পেয়ে এখানে একজনের উদ্দেশ্যে নীরব কৃতজ্ঞতায়, নিঃশব্দ ভাষায় হাজার কথা রেখে গেল।

বিদিশা বলল, তোমরা যাও, আমি আসছি।

বারান্দায় ধ্যানশ্রী যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে মনে মনে সেই মেঝের ধুলায় লুটিয়ে পড়ে বারে বারে তার দিদির কাছে মার্জ্জনা চাইতে লাগল।

ভোরের প্রথম আলো ঘুলঘুলি দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘরে ষ্টোভ ধরাণ হয়েছে। তারই কোলাহলের মধ্যে বিদিশা এসে ধ্যানশ্রীর পাশে বসল। রাত্রির নিঃশব্দ অন্ধকারে বহু দূরস্থ অতীতের কি একটা ক্ষুধা মানুষকে গ্রাস করে। যুগান্তরের সাধনা এমনি করে পণ্ড হয়। কিন্তু দিনমানের প্রথম অস্ফুট আলোয় সে পুনরায় নিজেকে চিনে নেয়। তাই বিগত রাত্রির নাটকখানা, প্রথম আলোকপাতে সেখানে শেষ হয়ে গেল, এ ভালই হ'ল, বিদিশা তাকে সহজে ভুলতে পারল। না ভুলে উপায়ই বা কি? কিন্তু একটা কথা তাকে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল যে, যে পরিমাণ চাতুরীর বিনিময়ে সে এই নারীকে ঠকাল, তার বোঝা ভুলতে তার জীবনের কতটা দিতে হবে। সে বলল, আমি চা খেয়েই চলে যাব।

ধ্যানশ্রী তার কথা বুঝতে না পেরে বলল, কেন, এখানেই দুটি খেয়ে তোর দেবেশবাবু আর তুই একসঙ্গে যাস।

বিদিশা অকারণ জোর দিয়ে বলল, না।

দেবেশ সেই যে চুপ করেছে, এর মধ্যে একবারও কথা বলেনি। সে এখনও চুপ করে আছে দেখে ধ্যানশ্রী বলল, তুমি শালীকে বল না—

বিদিশা শশব্যস্তে বলে উঠল, না, সে হবে না, আমি বাড়ী যাব।

ধ্যানশ্রী নিস্পৃহকণ্ঠে বলল, তাই যাস, কিন্তু কি হ'ল এর মধ্যে?

বিদিশা চলে গেল।

এই সুচতুর অভিনয়ের সুকৌশল নাট্যাঙ্কের কিছুদিন পরে আবার একদিন তাদের দেখা হ'ল। সে দিন যে লজ্জা ভুলে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না, আজ দেবেশ তা সহজে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'ল। সে আগের মত তেমনি বিদিশার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, চল ইডেনে যাই।

চলুন।

এই জায়গাটা কম নির্জ্জন। পাশে কয়েকটা ছোট গাছ ঝোপ রচনা করেছে। দেবেশ সবুজ ঘাসের উপরে গিয়ে বসল। উদ্দেশ্য বিহীন সাহচর্য্য এমনি করে নীরবতায় সমাপ্ত হয়। বুকে কত কথা লুকিয়ে থাকে কিন্তু কি এক দুস্তর লজ্জার আবরণ সরিয়ে তারা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না। এই ভাবেই যখন সময় ঘড়ির কাঁটার ঘণ্টা মিনিট ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল, দেবেশ তখন বিদিশার নত মুখের দিকে চেয়ে তার ডান হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিল। কিছুক্ষণ পরে গদগদ হয়ে বলল, একটা কথা সত্যি বলবে?

সে বাধা দিল না, হাত সরিয়ে নিল না, তেমনি নীরবে নিম্ন-মুখে বসে থেকে কেবল ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল, বাসি।

কত দিন ধরে যে কথা জানবার কত না ব্যর্থ প্রয়াস করে আজ নিঃসংশয়ে সে কথা মেনে নিল, এর পরে কি করবে বুঝতে না পেরে দেবেশ তার হাতখানা ধরে তেমনি নীরবেই বসে রইল। একটা ছোট কথাও বলতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে বিদিশা মৃদু টানে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলল, কেন আমাকে এ সংশয়ে এনে ফেললে?

কিসের সংশয়? আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

ছি, ও কথা আর বল না, ও বড় খারাপ। চল, বাড়ী যাই।

দেবেশ তেমনি ভাবে বসে রইল, উঠবার লক্ষণ দেখা গেল না। সে বলল, তুমি আমাকে খুব খারাপ ভাব, তাই না?

কেন, বিদিশা মুখ তুলে চাইল। তার আয়ত চক্ষুর ঘনসন্নদ্ধ পাপড়ী জলে ভিজে উঠেছে, সে অসঙ্কোচ দৃঢ়তায় বলল, তুমি ত কোন গর্হিত কাজ করনি। পরক্ষণেই কিসের এক গুরুভার পীড়ায় ঘাড় দুলিয়ে আপন মনে বলতে লাগল, কিন্তু এ ভাল হ'ল না, এ ভাল হল না! অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, বাড়ী চল।

নিজেরই এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বে এমনি একটা গভীর আবর্ত্তের বিক্ষুব্ধ কেন্দ্রস্থলে পড়ে সে বিচার-বিবেচনা শক্তি হারিয়ে ফেলল। সে কখনও দেবেশের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তার অতৃপ্ত জীবনের সার্থকতা অনুসন্ধান করে। কখনও নিদারুণ লজ্জায় নিজেকে লুকোবার জন্ম রাতের অন্ধকারেও একটু অন্ধকার খোঁজে। সে দ্বিধাগ্রস্ত। তাই দেবেশ যখন তাকে হাত ধরে আরও অনেক-ক্ষণ বসিয়ে রাখল সে তখন একটা না বলতে পারল না। তারপর

হঠাৎ উপরের আলোতে রিষ্ট ওয়াচ দেখে চমকে উঠে বলল, ইস, সাড়ে নটা! এ ভারী অন্যায় হয়ে গেল। ছি ছি।

এমনি করে ছি ছি কারের মধ্য দিয়ে একটা অশান্ত উপদ্রব তার জীবনের স্বচ্ছ বেগ ঘুলিয়ে দিয়ে গেল। যে প্রেম তাকে জীবনে অনেক দিতে পারত সেই ভালবাসাই তাকে অন্য পথে নিয়ে গিয়ে সদাসর্ব্বদা আতঙ্কিত করে তুলল। সে নালিশ করবে কাকে? তাই নিজেরই প্রতিপক্ষের বিচার বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারে সে নিজকেই বিড়ম্বিত করে তুলল। রাস্তায় সে আর একটা কথাও না বলে ট্রামে উঠে বসল।

তারা যখন বাড়ীতে এসে পৌঁছল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। ধ্যানশ্রী তাদের দেখে এমনি বলে উঠল, কিরে এত দেরী হ'ল, সিনেমায় গিয়েছিলি বুঝি?

আজ আর একদিনের মত মিথ্যা কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারল না, বিদিশা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দেবেশ একটা অস্পষ্ট হাঁ, বলে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল।

ধ্যানশ্রী বিদিশাকে দোড় গোড়ায় ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, ভেতরে আয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। কলে যাবি ত ঘুরে আয়, আমি খাবার ব্যবস্থা করি।

একটা উদ্‌গত কান্না কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না, ঠোঁট কামড়িয়ে কান্নার বেগটা দমন করে বিদিশা অকস্মাৎ ধ্যানশ্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে গুমরিয়ে গুমরিয়ে উঠতে লাগল। ধ্যানশ্রী সস্নেহে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উৎকণ্ঠায়, অধীরতায় বার বার বলতে লাগল, কি হয়েছে, হঠাৎ কাঁদছিস কেন, বল ভাই কি হয়েছে! বিদিশা একটা বাক্যও উচ্চারণ করতে পারল না, তেমনি ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল। ধ্যানশ্রী পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে বল, বল কি হয়েছে? এত কথা বলেও সে তাকে চুপ করাতে পারলনা। তাকে ধরে নিয়ে বিছানায় বসল। বিদিশা অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে দিদি বলে পুনর্ব্বার তার কোলে মুখ লুকলো। ধ্যানশ্রী সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলতে বুলতে বলল, বল কি হয়েছে? তোর দেবেশবাবু কিছু বলেছে?

বহুদিনের সঞ্চিত অপরাধবোধ যখন এইভাবে কান্নার সুবিচারে পথ পেয়ে গেল, বিদিশা তখন তার কোলে মুখ গুজে পড়ে রইল, তেমনি করে পড়ে থেকে একবার মাত্র বলে উঠল, দিদি, আমাকে বিষ দে।

ধ্যানশ্রী স্তম্ভিত বেদনায় একবার কেঁপে উঠল। পরক্ষণে নিজকে সামলিয়ে নিয়ে বলল, ওরে দিশা, কেন ও-কথা বলছিস? কি সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছিস?

বিদিশা কোলের মধ্যে ঘাড় নেড়ে বলল, না না। একবার থেমে একটু পরে ফিসফিস করে বলল, বাইরে চল, সব বলব।

বারান্দায় তার সেই অনতিদীর্ঘ কাহিনী সমাপ্ত করে সে যখন মুখ তুলে চাইল, ধ্যানশ্রীর দু' চোখ বেয়ে তখন জলের ধারা টপ টপ করে মেঝেতে পড়ছে। সে নীরব কান্নায় নূতন সংশয়ে বলে উঠল, এ তুই কি করলি রে মুখপুড়ী। পরমুহূর্ত্তে দাঁড়া, বলে খসে-পড়া নক্ষত্রের জ্বলন্ত আবেগে ঘরে উঠে গেল। সম্মুখে দেবেশকে খাটে বসে থাকতে দেখে ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করে উঠল। কেন তুমি এ সর্ব্বনাশ করলে, কেন, কেন! তোমার খিদে কি আকাশের মত এতই অপরিমেয়। একটা মেয়েকে নষ্ট করতে তোমার রুচিতে আটকাল না। দাও, তোমার সর্ব্বনাশা ভালবাসার একটুকরো বিষ আমার হাতে দাও। আমরা দু'বোনেই খেয়ে মরি।

দেবেশ নিম্নমুখে নতনেত্রে জড়িতকণ্ঠে কি একটা বলতে গেল, ধ্যানশ্রী পুনরায় চীৎকার করে উঠল, থাম। তুমি না আমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলে!

এই বিক্ষুব্ধ আবেগের নিশ্চিন্ত পরিণাম অনুমান করে দেবেশ দুর্ব্বলকণ্ঠে অনুনয় করে বলল, শ্রী আমাকে ক্ষমা কর।

ধ্যানশ্রী তেমনি উত্তেজনায় বলে উঠল, ও নামে আমাকে আর ডেক না।

সে আর দাঁড়াল না। এগিয়ে গিয়ে বাক্স খুলে অনেক নীচে থেকে একটা কাগজ বার করল। তার পর তার সম্মুখে গিয়ে তাদের সেই ভালবাসার মূক-সাক্ষীকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে বলে উঠল, তোমাকে ক্ষমা আমি কখনও করতে পারব না। তবে তোমার ওপর আমার কোন অধিকার কোনদিনও দাবী করব না, তুমি তোমার পথে চল।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিদিশা ছুটে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। ডাকল, দিদি!

ধ্যানশ্রী দৃপ্ত তেজে বলতে লাগল, মেয়েমানুষ যেখানে এখনও কেবল ভোগের বস্তু সেখানে ভালবাসার মূল্য কি রে। চল, মা এখনও বেঁচে আছেন!

বিদিশা প্রশ্ন করল, কিন্তু তোমার গৌতম?

ওকে বড় করেছি, আমি আর ভাবি না।

মোহানা

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

এখানেই এ যাত্রা ফুরালো।
পল-ক্ষণ-দিন-মাস-বছরের সর্পিল মিছিল,
যুগ-অব্দ পার-করা, পার-করা শতাব্দীর তীর;
তুষারের স্বপ্ন-গলা, পাথরের পাঁজরা-ক্ষয়ানো
ভূর্জ-দেবদারু-ফেলু-চীড়-বরাসের গা-ধোয়ানো,
অনেক বসন্ত-ছোঁয়া, অনেক মেঘের লীলামাখা,
নীল শতাব্দীর স্রোতে ছায়া-ফেলা রাজ-হংস-পাখা;
অনেক অনেক জল, কভু বেগে, কখনও বা থেমে,
অনেক দূরের থেকে, অনেক উত্তুঙ্গ হতে নেমে,—
খোলা নীলে চরণ ডুবালো।
এখানেই এ যাত্রা ফুরালো।

ধীরে ধীরে জমে ওঠে মাটী—
ধরিত্রীর অঞ্জলিতে ঢেলে দিয়ে চুরি করা ঋণ,
ভরে দেয় দুটি হাত। ভরে ওঠে দিন প্রতিদিন
গর্ব্ভের অনন্ত সাধ; মেদিনীর থরে থরে মেদ,
ঋতুতে ঋতুতে বৃদ্ধি; ভ্রূণগড়া জড়ত্বের ক্লেদ
স্রোতমুখে জড়ো হ'ল। জড়ো হ'ল স্তূপ হতে স্তূপে;
কণামুখে স্তর জড়ো ধরণীর গূঢ় গর্ব্ভকূপে।

সে-মাটী এসেছে কোন্ দিগন্তের ললাট ধোয়ানো;
অজানা গ্রামের শেষে শীর্ণরেখা স্রোতস্বিনী, কোন—
ক্ষেত্ত-ভাঙা কূলালের বুক ছেঁড়া মৃদু কল্লোলিতা;
সে মাটী আগ্নেয় লাভা-জলা কোন্ প্রান্তরের চিতা
ধুয়ে আনা অন্য নদী নাড়ী-স্রোতে বয়ে বয়ে আসা;
হয় ত সে মাটী কোন্ পাড় ভাঙা স্রোত সর্বনাশা,
সর্বগ্রাসী অরণ্যের গ্রাসে যাওয়া কোন পল্লী কোল;
ইতিহাস-ধোওয়া কোন রাজন্যের আত্ম সম্বল;
সন্ধ্যা দিক্‌চক্রবালে উড়ে-যাওয়া ক্লান্ত পদধূলি;
গরুটানা-গাড়ী-পথে উড়ে-ওঠা সুবর্ণ-গোধূলি;

সুদূর মানস-হংস-পক্ষচ্যুত যে ধূলির কণা
মেশে গোমুখীর উৎসমুখে; তুলসী-মঞ্চের আবর্জনা
যেই স্রোতে হ'ল হারা; যে মাটীর পঙ্ক মেখে গায়
চলেছে গ্রামের নদী; মিশে আছে জলের ধারায়।
এ দেশের ও দেশের,—এ কালের, ও কালের পার;
পার হয়ে পুষ্পপুর, চেদি, বৎস, অবন্তী, গান্ধার;—
শুধু মাটী, শুধু মাটী, শত লক্ষ সলিল জিহ্বায়
কেবলি ত বয়ে এলো, থেমে যেতে এক মোহানায়।
এই জল বয়ে আসে কত-কাল ভুলে-আসা কথা;
কত যৌবনের আশা, কত জরা, কত মর্মব্যথা!
এ জল হয়েছে কাদা কত উর্বশীর অঙ্গরাগে;
যাজ্ঞসেনী-জাহানারা এই জলে মাটী হয়ে জাগে।
এ জলের নীলে তাই তাদের চুলের কালো-খেলা
এখনো রয়েছে আঁকা। যুগান্তে কাটিয়া গেল বেলা।

এ জলে মিশেছে মাটী সে কালের শতদেহ হতে,
নালন্দা গড়েছে যারা, যে-শ্রমিক গান্ধারের পথে
স্তূপে ঢেলেছিল মাটী, গড়েছিল তক্ষশিলা পথ;
কোণারক মন্দিরেতে গড়েছিল পাষাণের রথ;
দিগন্তের শ্রমশেষে এই জলে ধুয়েছিল ধূলি;
সে ধূলি এসেছে বয়ে শত মৌন অধ্যায়েরে ভুলি
গড়িতে নূতন কাল, নবদেশ। সেদিনের জল
তেমনি সে এলো চলে। সেদিনের বাসনা পিছল
তেমনি এসেছে বয়ে। শুধু তার নিঃসীম পিপাসা,—
সমুদ্রের কোলে যেন ধরণীর জঠরের আশা
পূর্ণ হতে পূর্ণতর স্ফীত হতে স্ফীততর হয়।
এ জলের এই ভাষা; যুগ-যুগ একই কথা কয়।
বয়ে আনে আগামীরে পশ্চাত হতেও যাহা খাঁটি;
ধীরে, তবু সত্যপথে; জমে ওঠে—মাটী, শুধু মাটী,
নেই তার থেমে থাকা, নেই তার মানা।
মহাকাল রচিল মোহানা।

মন্দিরময় ভারত—গুহামন্দির

শ্রীঅপূর্ব্বরতন ভাদুড়ী

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি

আমরা খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপন করি। তার পর চা ও জলযোগ সেরে ষ্টেশন ওয়াগনে চড়ে খণ্ডগিরি, উদয়গিরি অভিমুখে রওনা হই। শহর অতিক্রম করে কটক রোডে উপনীত হই। গাড়ী নক্ষত্রগতিতে ছোটে। আমরা অতিক্রম করি কত ঘনবসতি গ্রাম, কত দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, কত নারিকেলকুঞ্জ আর

খণ্ডগিরি (ভুবনেশ্বর)

কলাগাছের ঝাড়, উপনীত হই মহাতীর্থ ভুবনেশ্বরে, পরিচিত আম্র-কানন নামেও। সেখানে মন্দির দেখে, আবার আমরা ষ্টেশন ওয়াগনে উঠে বসি। গাড়ী যায় সর্পিল গতিতে, দু'পাশের ঘন-বনবীথি আর অরণ্যানী ভেদ করে। উপনীত হয় একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথে, উদয়গিরির পাদদেশে এসে থামে। দাঁড়িয়ে আছে উদয়-গিরি ও খণ্ডগিরি শৈলমালা, ভুবনেশ্বরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে পৃথক হয়ে আছে একটি গিরিসঙ্কট দিয়ে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে ঘন বনানীর ভিতর দিয়ে পর্ব্বত আরোহণ করে হাতীগুম্ফাতে উপস্থিত হই। কষ্টসাধ্য এই পর্ব্বত-আরোহণ। মহাপবিত্র খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি শৈলমালা, পরিচিত কুমারী পর্ব্বত নামেও। দীর্ঘ দু' হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান ভারতের জৈনদের, দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, কলিঙ্গের প্রাচীনতম চেদী-রাজবংশের রাজধানী শিশুপালগড় থেকে পাঁচ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিমে। তার এক দিকে তীর্থরাজ সমুদ্রতীরে। নীলাচলে শঙ্খমণ্ডলে, জগন্নাথদেব বিরাজ করেন। অপর দিকে মহানদী তীরে, ভুবনেশ্বরে চক্রমণ্ডলে লিঙ্গরাজ। তৃতীয় দিকে চন্দ্রভাগা তীরে, অর্কক্ষেত্রে পদ্মমণ্ডলে কোনারক।

বুকে নিয়ে আছে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পঁয়ত্রিশটি জৈন গুহা-মন্দির। তাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়—রচিত হয় সুন্দরতম আর শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলি। নির্ম্মিত হয় কয়েকটি মন্দির খ্রীষ্টাব্দ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেও। কয়েকটি অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে খণ্ডগিরির বুকে। পুনরুজ্জীবিত হয় যখন উড়িষ্যার স্থাপত্য আর ভাস্কর্য্য নির্ম্মিত হয় যখন শত শত মন্দির মন্দিরময় নগর ভুবনেশ্বরে।

উদয়গিরি (ভুবনেশ্বর)

একটি অগভীর প্রাকৃতিক গুহা এই হাতীগুম্ফা, রচিত হয় পাহাড়ের অঙ্গ কেটে। বুকে নিয়ে আছে এই গুহাটি খোদিতলিপি, উৎকীর্ণ খ্রীষ্টের জন্মের একশত ষাট বৎসর পূর্ব্বে। জৈন অর্হৎ ও সিদ্ধদেবকে প্রণতি জানিয়ে বর্ণিত হয় এই লিপিতে কলিঙ্গ দেশের শ্রেষ্ঠ রাজা খারবেলের কীর্ত্তির কাহিনী, বিবরণ তাঁর রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীরও। প্রথম বছরে তিনি সংস্কার করেন দুর্গ-প্রাচীর, তোরণ আর পয়ঃপ্রণালী। পঞ্চম বৎসরে বর্দ্ধিত হয় অঙ্গুলিয়াবস্থ প্রণালীর আয়তন, বিস্তৃত হয় রাজধানী শিশুপাল-গড় পর্য্যন্ত। নবম বর্ষে আটত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজপ্রাসাদ 'মহাবিজয়' নির্ম্মিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় মহা আড়ম্বরে কল্পতরু উৎসবও, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী উপাধিতে ভূষিত হন। দ্বাদশ বৎসরে তিনি মগধ বিজয় করে ফিরে আসেন, ফিরিয়ে আনেন মহা পবিত্র কলিঙ্গ জিনা। হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন মগধের নন্দরাজারা। ত্রয়োদশ বৎসরে সমাপ্ত তাঁর বিজয়ের অভিযান, তিনি মনোনিবেশ করেন ধর্ম্ম-কর্ম্মে, নিযুক্ত হন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে। অধ্যয়ন করেন কত জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ, হন দীক্ষিতও। নির্ম্মিত হয় কুমারী পর্ব্বতের শীর্ষ-দেশে, সাড়ে সত্তর লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহারাণীর বাসের জন্য একটি অট্টালিকাও। সংগৃহীত তার জন্য প্রস্তরখণ্ড বহু দূরে অবস্থিত

পাহাড় থেকে। বর্ণিত হন তিনি ধার্ম্মিক নৃপতি, বলা হয় তাঁকে ভিক্ষুরাজাও। সমৃদ্ধিশালী তাঁর রাজ্য, বিরাজ করে সেখানে মহাশান্তি। প্রজারঞ্জনকারী তিনি, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও। প্রতিষ্ঠা করেন এক সার্বভৌম সাম্রাজ্য, নির্ম্মাণ করেন কত প্রাসাদ আর অট্টালিকা, নির্ম্মিত হয় একটি দুর্ভেদ্য দুর্গও।

এইখানেই পরিসমাপ্তি হয় তাঁর রাজত্বের বিবরণ। কিন্তু জীবিত থাকেন মহাপরাক্রমশালী খারবেল তার পরেও বহু বৎসর। বুকে নিয়ে আছে তার প্রমাণ স্বর্গপুরী গুম্ফার অঙ্গের শিলালেখ, উৎকীর্ণ তাঁর মহিষী মহারাণী অগ্রমহিষী কর্তৃক।

মুখরিত হত এই সময়ে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি আর তার চতুর্দ্দিক জৈন সাধকদের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে। তাঁদের উদাত্ত-কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণে আর বাদ্য-ধ্বনিতে। সমাগত হতেন এখানে কত জৈন সাধু, কত নৃপতি, কত জৈন তীর্থযাত্রীও। প্রকম্পিত হ'ত তাঁদের কলকোলাহলে আর উৎসবের ধ্বনিতে তার আকাশ-বাতাস।

হাতীগুম্ফা দেখে আমরা একে একে অন্য গুহামন্দিরগুলি দেখতে থাকি। দেখি, নাই কোন সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি এই মন্দির নির্ম্মাণের, রচনা করেন স্থপতি মন্দিরগুলি যথোপযুক্ত স্থানে। একটি পথও তৈরী হয়, যুক্ত হয় মন্দিরগুলি পরস্পরের সঙ্গে, আজও পাহাড়ের বুকে অরণ্যানীর ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় তার চিহ্ন, অবশিষ্ট সেই পথের।

বুকে নিয়ে আছে দুইটি মন্দির একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ। রচিত হয় একাধিক প্রকোষ্ঠ চারিটি মন্দিরে, অলিন্দ দিয়ে শোভিত করা হয় তাদের সম্মুখভাগ। অলিন্দের তিন দিকে অনুচ্চ প্রস্তর-নির্ম্মিত দীর্ঘ আসন। অলিন্দের সামনে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। চারিটি বৃহত্তম ও সুবিস্তৃত মন্দিরও নির্ম্মিত হয়। দ্বিতল এই মন্দির-গুলি, বুকে নিয়ে আছে মঞ্চ আর প্রকোষ্ঠ উভয় তলাতেই; তাদের সামনেও চতুর্ভুজ ক্ষেত্র নাই কোন আচ্ছাদন তাদের উপরেও, উন্মুক্ত তারাও। অনুরূপ নয় তারা মহারাজা অশোকের নির্ম্মিত আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণের, বিভিন্ন পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার অঙ্গের বৌদ্ধ গুহামন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকেও, আচ্ছাদিত তারাও।

বুকে নিয়ে আছে বৃহত্তম মন্দিরগুলির সম্মুখভাগ। তাদের সম্মুখের স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ আর প্রকোষ্ঠের প্রবেশপথ, সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম উড়িষ্যার স্থাপত্যের নিদর্শন—উড়িষ্যার বিহারের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সম্ভার, অঙ্গে নিয়ে আছে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের প্রতীক ও অনবদ্য সুষ্ঠুগঠন জীবন্ত মূর্ত্তিসম্ভার।

রচিত হয় স্তম্ভ, অঙ্গে নিয়ে চতুষ্কোণ স্তম্ভদণ্ড, শীর্ষে নিয়ে বন্ধনী। বিচিত্র সেই বন্ধনীর আকৃতি, বিভিন্ন প্রতিটির নির্ম্মাণ পদ্ধতিও। শীর্ষে নিয়ে আছে রাণীগুম্ফার স্তম্ভ আদি বন্ধনী, রূপ তার বঙ্কিম বৃক্ষকাণ্ডের মত। সুষ্ঠু নয় এই বন্ধনীর গঠন, নয় শোভনও, সমৃদ্ধিশালী নয় তাদের অঙ্গও, ভাস্করের হস্তের স্পর্শে কারুকার্য্যবিহীন। অনবদ্য মঞ্চপুরীর অলিন্দের স্তম্ভের বন্ধনী, পরিচায়ক প্রকৃষ্টতম স্থাপত্যজ্ঞানের, সমৃদ্ধিশালী মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের স্পর্শেও। অঙ্গে নিয়ে আছে এই বন্ধনীগুলি, কত পক্ষীরাজ ঘোড়া, কত কাল্পনিক জন্তু, তাদের কারও পৃষ্ঠে শোভা পায় নর, কেউ বা নারী বাহন। অনুরূপ বন্ধনী দিয়ে শোভিত করা হয় খাথোয়ারের নিকটে বাদামীর বা বাতাপির ব্রাহ্মণ্য গুহা-মন্দিরের শীর্ষদেশ। রচনা করেন চালুক্য স্থপতি আর ভাস্কর ছয় শত বৎসর পরে।

রচিত হয় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তোরণও প্রাচীরের গাত্রে। বিভিন্ন বৌদ্ধ তোরণের আকৃতিতে দাঁড়িয়ে আছে উড়িষ্যার মন্দিরের তোরণ, দুই পাশের উদ্গাত স্তম্ভের শীর্ষদেশে। শোভা পায় দুইটি করে শায়িত জন্তু উদ্গাত স্তম্ভের শীর্ষদেশে, পাত্রাকারে নির্ম্মিত হয় তাদের পাদদেশ। বৌদ্ধ গুহামন্দিরের মত সমতল নয় প্রকোষ্ঠের মেঝেও, ক্রম উর্দ্ধমান হয়ে উঠে যায় প্রকোষ্ঠের অন্তরতম প্রদেশে, রচিত হয় প্রান্তদেশে উপাধান, রূপ পরিগ্রহ করে হেলান শয্যার। নয় চতুষ্কোণও, আয়ত ক্ষেত্র এই প্রকোষ্ঠগুলি, নীচু ও চারি ফুটের বেশী উঁচুও নয়, উপযুক্ত শুধু শয়নের। অপ্রশস্ত দ্বারগুলিও, হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। তাই অনন্যসাধারণ এই মন্দিরগুলি, বুকে নিয়ে আছে উড়িষ্যার স্থপতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

আমরা মঞ্চপুরীতে উপনীত হই। অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির উদয়গিরি নির্ম্মিত খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে বুকে নিয়ে আছে এই বিহারটি তিনটি প্রকোষ্ঠ। প্রথম দুইটি কুদেপশ্রী ও ভাদুকা নির্ম্মাণ করেন, তৃতীয়টি খুব সম্ভব খারবেল। হেলান শয্যার আকারে এই প্রকোষ্ঠগুলির মেঝেও। বিস্মিত হয়ে সম্মুখ ভাগের কেন্দ্রস্থলের মূর্ত্তিসম্ভার দেখি। দেখি, কলিঙ্গ জিনার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দৃশ্য। কেন্দ্রস্থলে সিংহাসনে উপবিষ্ট কলিঙ্গ জিনা, তাঁর দুই পাশে রাজন্যবর্গ দাঁড়িয়ে আছেন। রাণীরা আর রাজকন্যারাও আছেন, খারবেল, কুদেবশ্রী আর রাজকুমার ভাদুকাও উপস্থিত। একটি উড়ন্ত বিদ্যাধর ও দুইটি গন্ধর্ব্ব ঢক্কা বাদনে নিযুক্ত। খোদিত আছে এই বিহারটির অঙ্গে দুইটি শিলালিপিও। প্রথমটির রচয়িতা কলিঙ্গাধিপতি মহারাজা কুদেপশ্রী, দ্বিতীয়টির কুমার ভাদুকা।

স্বর্গপুরীতে উপনীত হই। সমসাময়িক মঞ্চপুরীও, দুই প্রকোষ্ঠ সমন্বিত এই বিহারটি। জৈন সাধুর শয়নোপযোগী করে নির্ম্মিত তাদের মেঝেও। দুই প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে উৎকীর্ণ একটি শিলা-লিপি, লেখা আছে তাতে মহারাজ খারবেলের পত্নী এই বিহারটি নির্ম্মাণ করেন। রচিত হয় সম্মুখ ভাগে উদ্গাত স্তম্ভের শীর্ষদেশে চারিটি অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি অপরূপ, সুন্দরতম তোরণ, তোরণের অঙ্গে দুইটি জীবন্ত হস্তীমূর্ত্তি। দেখি মুগ্ধ বিস্ময়ে কলিঙ্গের মহা অভিজ্ঞ ভাস্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান।

সেখান থেকে জয়-বিজয় গুম্ফায় উপনীত হই। দ্বিতল এই গুম্ফাটি নির্ম্মিতও খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় অথবা প্রথম শতাব্দীতে, বুকে নিয়ে আছে প্রতিটি তলায় দুইটি করে চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ, আর একটি অলিন্দ, অলিন্দের তিন দিকে অনুচ্চ দীর্ঘ আসন। সম্মুখে একটি সোপানের শ্রেণী, সেই সোপান অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হতে হয়। দেখি, দ্বিতলের অলিন্দের দুই প্রান্তে দুইটি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে

তাদের মধ্যে একজন পুরুষ, অপরটি নারী। দেখি অঙ্গে নিয়ে আছে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ একটি করে প্রবেশ পথ, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খিলানের আকারে রচিত তাদের শীর্ষদেশ—তাদের দুই পাশে বোধিবৃক্ষ পরিপূর্ণ ফলসম্ভারে, বেষ্টিত সুন্দরতম রেলিং দিয়েও। বৃক্ষের দক্ষিণে আর বামে থালা ভর্ত্তি পূজার উপকরণ হস্তে নারী পূজারিণীরা। ভক্তিপ্রণত তাদের মস্তক, আননে দিব্যভাব। অঙ্গে নিয়ে আছে এই গুহাটিও, কত বিভিন্ন সুন্দরতম পুষ্প আর কত বামনের মূর্ত্তি হস্তে নিয়ে কেউ থালা, কেউ পূজার উপকরণ, কেউ বা পুষ্পমাল্য, শিরে শিরোভূষণ। অপরূপ এই মূর্ত্তিগুলি মুগ্ধ হয়ে দেখি।

রাণীগুম্ফায় উপনীত হই। পরিচিত রাণীকানুর নামেও, বৃহত্তম আর সুন্দরতম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠও উড়িষ্যার গুহামন্দিরের মধ্যে, নির্ম্মিত হয় মহারাজা খারবেলের রাজত্বকালে, খ্রীষ্টের জন্মের একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর রাণীর বাসের জন্য। বিহার আর চৈত্যের এক সুন্দরতম সমন্বয় এই বিহারটি, বুকে নিয়ে আছে বাস করবার জন্য কক্ষ, সঙ্গে নিয়ে ধর্ম্ম মন্দির। দ্বিতল এই বিহারটি, তিন ফুট এগার ইঞ্চি তার নীচের তলার উচ্চতা বেষ্টন করে আছে প্রকোষ্ঠ-গুলিকে একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিন দিক, চতুর্থ দিকে, দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে, মন্দিরের প্রবেশপথ। দোতলা থেকে একটি উন্মুক্ত ছাদ নির্গত হয়, তার নীচে স্তম্ভের শ্রেণী। নীচের তলায় একটি স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ। নির্ম্মিত হয় তার এক পাশে পাহাড়ের অঙ্গকেটে সোপানের শ্রেণী, উপনীত হয় দ্বিতলের উন্মুক্ত ছাদে। সোপান-শ্রেণীর সম্মুখে একটি বৃহৎ সিংহাসনও তৈরী হয়, উপবেশন করতেন সেই সিংহাসনে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, বাস করতেন প্রকোষ্ঠে জৈন সাধুরা। নির্ম্মিত হয় প্রকোষ্ঠ পরিচ্ছদ রাখবার জন্য পূজার উপকরণ সাজাবার জন্য, পূজার জন্য পবিত্র তৈজস রাখবার জন্যও।

উৎসবে মুখরিত হ'ত সম্মুখের উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ। যাত্রী আসত সারা উড়িষ্যা থেকে, বিদেশ থেকেও আসত প্রণতি জানাত জিনকে—জানাত মহাবীরকে।

সোপান অতিক্রম করে দ্বিতলে উপনীত হই। সাত ফুট উচু দ্বিতলের প্রকোষ্ঠগুলি। মুগ্ধ বিস্ময়ে দ্বিতলের প্রাচীরের গাত্রের মূর্ত্তিসম্ভার দেখি। মূর্ত্তি দিয়ে বর্ণিত কত কাহিনী। দেখি প্রাচীরের অঙ্গে ভাস্করের রচিত এক মহামহিময়, বহুবিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ, জীবন্ত মহাঅভিজ্ঞ ভাস্করের হস্তের স্পর্শে।

পরমাসুন্দরী নারী পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধ করেন এক মহাশক্তি-শালী নৃপতি হস্তীযূথ পরিবৃত একটি অতিকায় হস্তীর সঙ্গে। তার পাশেই একটি গভীর অরণ্য, বাস করে সেই অরণ্যে গুহার মধ্যে, পশুরাজ সিংহ, বিচরণ করে কত হিংস্র ব্যাঘ্র, কত ভয়াল সর্প আর বানর, তার বৃক্ষশাখায় কত বিভিন্ন আর বিচিত্র পক্ষী।

দেখি, সজ্যের সামনে একটি পরমারূপবতী নারী ও একটি সুদর্শন পুরুষ। রুদ্ধ করে নারী পুরুষের গতি কিন্তু নারীকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয় পুরুষটি, প্রবেশ করে সজ্যে।

দেখি, যুদ্ধের সাজে সজ্জিত একটি পুরুষ ও নারী, বিস্তৃত নারীর উড্ডীন বেণী। নারী পরাজিত হয়, তাকে অঙ্কে তুলে নিয়ে অগ্রসর হয় পুরুষটি। কিন্তু স্বীকার করে না নারী তার পরাজয়, দক্ষিণ হস্তে পুরুষকে অনুশাসন করে, তার বাম হস্তে শোভা পায় একটি ঢাল।

দেখি, এক নৃপতি নিযুক্ত মৃগয়ায়। তিনি অশ্ব থেকে অবতরণ করেন, অশ্বের বল্গা ধরে থাকে সহিস। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে বিদ্যুৎ বেগে পলায়ন করে মৃগ, মস্তকে তার দুইটি বিশাল শৃঙ্গ, তার অনুগমন করে দুইটি মৃগশাবক। ছুটে এসে মৃগ বৃক্ষের নীচে দণ্ডায়মানা তার অধিকর্ত্রীর কাছে আশ্রয় নেয়। মৃগের অনুসরণ করে নৃপতি দুষ্মন্তও শকুন্তলার নিকটে উপনীত হন, পৌছান মৃগের অধিকর্ত্রীর কাছে।

একটি নৃত্য-সভার দৃশ্যও দেখি। নৃত্য করেন তিনটি রূপবতী নারী, অনবদ্য তাদের নৃত্যের ছন্দ, নৃত্য করেন বাদ্যের তালে তালে, অপর তিনটি পরমা সুন্দরী নারী সেই বাজনা বাজান। এক প্রান্তে উপবেশন করে সখী পরিবৃতা হয়ে মহারাণী সেই নৃত্য দর্শন করেন। তাঁর পিছনেও দুইটি রূপবতী নারী দাঁড়িয়ে আছে হস্তে নিয়ে পাত্র, পাত্রের উপরে এক একটি পুষ্পমাল্য। বিপরীত দিকে বসে, রাজাও সেই নৃত্য দেখেন। তাঁর সামনে এক সারি আধার পরিপূর্ণ মণি-মুক্তায়, বিতরিত হবে বিজেতাদের পারিতোষিক হিসাবে।

দেখি, সারি সারি তিনটি রাজদম্পতির মূর্ত্তিও। প্রথম দুটিতে উপবিষ্টা রাণী রাজার অঙ্কে, তৃতীয়টি হন তিনি অঙ্কচ্যুতা, রাজাও বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। কিন্তু হতে চান রাণী ক্রোড়-চ্যুতা, নৃপতিকে সবলে আকর্ষণ করে থাকেন। দেখি ঘুরে ঘুরে এই অপরূপ মূর্ত্তির সম্ভার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কলিঙ্গ ভাস্করের—তাদের অমর কীর্ত্তি। যত দেখি, বিস্ময় বাড়ে তত। নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলী মহাঅভিজ্ঞ ভাস্করকে, লাভ করেন তাঁরা অমরত্ব, সৌভাগ্য-শালী হয় ভারতবর্ষ।

দেখি, অলংকৃত হয় নারীমূর্ত্তি দিয়েই অলিন্দের স্তম্ভের অঙ্গ অনুরূপ সাঁচীর পশ্চিম তোরণের স্তম্ভের অঙ্গের। প্রবেশপথেও সিংহ বাহনে নরের মূর্ত্তি দেখি অনুরূপ মৌর্য্য যক্ষের। দ্বারে দ্বার-পাল দাঁড়িয়ে আছে হস্তে নিয়ে কঞ্চুক। তাই বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি বৌদ্ধ প্রভাব।

নীচে নেমে আসি। দেখি দ্বারের অঙ্গে দ্বারপালের মূর্ত্তি। দেখি প্রাচীরের গাত্রে একটি অরণ্যের অপরূপ দৃশ্য। ঘন বনবীথি ও লতাগুল্মে পরিপূর্ণ একটি অরণ্য। সেই অরণ্যে কত মৃগ, কত ব্যাঘ্র, কত সিংহ বিচরণ করে। বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট কত বিভিন্ন আর বিচিত্র পক্ষী, শোনা যায় তাদের কাকলি। অরণ্যের সম্মুখে একটি সরোবর, সেই সরোবরে একটি হস্তী ক্রীড়ায় নিযুক্ত, বৃক্ষশাখায় বসে বৃক্ষের ফল খেতে খেতে একটি বানরদম্পতি উপভোগ করে সেই খেলা। এক সুন্দরতম পরিকল্পনা আর তার অনবদ্য রূপদান। দেখি, মুগ্ধ বিস্ময়ে।

দেখি উৎকাত স্তম্ভের সারি দিয়ে অলঙ্কৃত সম্মুখ ভাগ, তার পাশে একটি অম্রকুঞ্জ, দাঁড়িয়ে আছে একটি 'পুণ্যশালাও'। নিশ্চিহ্ন হয়েছে অলিন্দের মূর্ত্তিগুলি। খুব সম্ভব এখানে প্রাচীরের গাত্রে খোদিত ছিল-কলিঙ্গাধিপতি, মহাপরাক্রমশালী খারবেলের বিজয় অভিযান থেকে ফিরে আসার দৃশ্য, দৃশ্য তাঁর অভিনন্দনেরও, অভিনন্দন নগরবাসীদের।

উপনীত হই উত্তর প্রান্তে, দেখি গুহার অভ্যন্তরেও কত বিভিন্ন জন্তুর মূর্ত্তি—কত সিংহের, কত ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি। পরিপূর্ণ অরণ্য আম্রবৃক্ষে, অরণ্যের বৃক্ষের কাণ্ডে কত বিচিত্র পক্ষী আর বানর।

একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি, দেখি একটি দীর্ঘদেহী সাড়ে চার ফুট উচু প্রমাণ আকৃতির সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে, তার হস্তে একটি বল্লম, শিরে শোভা পায় মুকুট, মুকুটের অঙ্গে জন্তুর মূর্ত্তি—মূর্ত্তি ষণ্ডের, সিংহের, হস্তীর আর অশ্বের। জীবন্ত এই মূর্ত্তিটি, সুন্দরতম দান কলিঙ্গ ভাস্করের, দেখি মুগ্ধবিস্ময়ে।

দেখি দুই পাশের নিকুঞ্জও। থাকত এখানে জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ, রাখা হ'ত মহাপবিত্র কমণ্ডলুও। অনবদ্য জীবন্ত মূর্ত্তিসম্ভার দিয়ে সমৃদ্ধিশালী এই নিকুঞ্জের সামনের রেলিংয়ের অঙ্গও, দেখি মুগ্ধ হয়ে। অগ্রসর হয় কত রূপবতী নারী, হস্তে নিয়ে পূজার উপকরণ, যায় মন্দির অভিমুখে। সিংহাসনে নৃপতি উপবিষ্ট, তাঁর দুই পাশে দুই রাণী পদতলে, সুন্দরতম শিল্পসম্ভারে অলঙ্কৃত চন্দ্রাতপের নীচে একটি পরমাসুন্দরী নারী নিযুক্তা নৃত্যে, অনবদ্য তার নৃত্যের ছন্দ নিখুঁত তার তাল। হস্তে নিয়ে আছে দ্বিতীয় নারীটি একটি করতাল, তৃতীয়টি বীণা বাজায়, চতুর্থটি বেণু। শোভা পায় কুণ্ডল নারীদের কর্ণে। বিচিত্র বীণার আকৃতিও। ভারহুতের মত, পিরামিডের আকৃতিতে নির্ম্মিত হয় চন্দ্রাতপের শীর্ষদেশ।

মন্দির অভিমুখে ভূপতি অগ্রসর হন, তাঁর অনুগমন করেন একটি সুন্দরী নারী, নারীর হস্তে একটি পাত্র, পরিপূর্ণ পূজার উপকরণে। রাজার মস্তকে শোভা পায় বহুমূল্য শিরোভূষণ, তার উপরে রাজছত্র বিরাজ করে। দেখি স্তব্ধ হয়ে ভাস্করের এই অনবদ্য,জীবন্ত মূর্ত্তিসম্ভার, নিদর্শন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের নিবেদন করি শ্রদ্ধার অঞ্জলি ভাস্করকে।

গণেশ গুম্ফায় উপনীত হই। অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির উদয়গিরির এই গুম্ফাটিও খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়। দাঁড়িয়ে আছে একতলা গুম্ফাটি, উদয়গিরির উচ্চতম শিখরে, অঙ্গে নিয়ে আছে দুইটি প্রকোষ্ঠ ও একটি আচ্ছাদিত অলিন্দ বুকে নিয়ে আছে স্তম্ভ চতুষ্কোণ তার পদদেশ আর শীর্ষদেশ অষ্ট কোণ স্তম্ভদণ্ড। স্পর্শ করে আছে তাদের শীর্ষদেশের বন্ধনী অলিন্দের ছাদ। দেখি অলিন্দের বামে উৎকাত স্তম্ভের অঙ্গে বল্লম হস্তে নিয়ে একটি দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। দেখি প্রতিটি প্রকোষ্ঠে দুইটি করে দ্বার, দ্বারের শীর্ষদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান, তার উপরে রেল অলিন্দের তিন দিকে প্রাচীরের সংলগ্ন দীর্ঘ প্রস্তর নির্ম্মিত আসন।

দেখি মূর্ত্তি দিয়ে বর্ণিত এই গুম্ফার প্রাচীরের গাত্রেও কত কাহিনী—কাহিনী কত সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র সংস্করণ তারা রাণী গুম্ফার।

দেখি একটি নারীকে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগে ধরে নিয়ে যায়। বিবদমান একটি পুরুষ ও নারীকেও দেখি। তার পাশে একটি পুরুষ নারীর অনুগমন করে, গুহার সামনে গিয়ে শয়ন করে, তার সর্ব্বাঙ্গ বিস্তার করে রুদ্ধ হয় গুহার মুখ, নারী এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে।

দেখি অলিন্দের বাম প্রান্তে রেলিংয়ের উপরে স্তম্ভশীর্ষের পাশে, কি কিরাত সৈন্যেরা অনুসরণ করে একটি হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দলকে। আছে তাদের মধ্যে একটি নারী হস্তে নিয়ে অঙ্কুশ, নৃপতিও আছেন, তাঁর অঙ্গে কিরাতের ভূষণ, পল্লব দিয়ে রচিত সেই ভূষণ, হস্তে ধনুর্ব্বাণ, নিক্ষিপ্ত হয় শর অনুসরণকারী সৈনিকদের উপর। আছে অনুচরও হস্তে নিয়ে মুদ্রা, ভূপতিত হয় মুদ্রা সেই আধার থেকে, প্রলুব্ধ হয় অনুসরণকারীরা। দেখি হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নৃপতি অবতরণ করেন, সঙ্গে নিয়ে রমণী আর অনুচর। ধনুহস্তে ভূপতি অগ্রসর হন, তাঁর পিছনে রমণী, হস্তে নিয়ে ফল। মুদ্রার আধার হস্তে অনুচর তাঁদের অনুগমন করেন। বসে পড়েন রমণী, বিলাপ করতে থাকেন, তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রাজা তাকে সান্ত্বনা দেন। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে দেখে অনুচর, তার এক হস্তে রাজার ধনু অপর হস্তে মুদ্রাধার। বিস্তৃত এই পরিকল্পনাটি আর তার সুন্দরতম রূপদান। বুকে নিয়ে আছে প্রতীক এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির।

দেখি নারীমূর্ত্তি দিয়ে রচিত এই স্তম্ভের শীর্ষদেশ, অনুরূপ সাচীর স্তম্ভের। তোরণের দুই পাশে উৎকাত স্তম্ভ, তাদের শীর্ষদেশে এক একটি অপরূপ মকরের মূর্ত্তি, তাদের মুখগহ্বর থেকে লতাপল্লব নির্গত হয়। অনুরূপ এই মূর্ত্তি দুইটি, অমরাবতীর মকরের মূর্ত্তির।

মূর্ত্তি দিয়েই অলঙ্কৃত স্তম্ভের শীর্ষদেশের, বন্ধনীর অঙ্গও—মূর্ত্তি রাজার, মূর্ত্তি একটি শোভন নর ও একটি সুন্দরী নারীরও। মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অপরূপ মূর্ত্তিসম্ভার দেখি, দেখি ভাস্করের এক অনুপম সৃষ্টি, সৃষ্টি এক মহাগৌরবময় যুগের।

প্রকোষ্ঠের ভিতরে প্রবেশ করি। একটিতে একটি মুণি দাঁড়িয়ে আছেন, দ্বিতীয়টিতে প্রাচীরের গাত্রে একটি গণেশের মূর্ত্তি। তাই পরিচিত এই গুম্ফাটি গণেশগুম্ফা নামে। অঙ্গে নিয়ে আছে গুম্ফাটি একটি শিলালিপিও। উৎকীর্ণ করবংশীয় শান্তিদেবের রাজত্বকালে, রাজত্ব করেন তিনি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে।

গণেশগুম্ফা দেখে আমরা ছোট হাতীগুম্ফাতে উপনীত হই। এক প্রকোষ্ঠসমন্বিত এই গুম্ফাটি। খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জৈন শ্রমণদের বাসের জন্য নির্ম্মিত হয়। তার সম্মুখভাগে দুইটি প্রমাণ আকৃতির হস্তী দাঁড়িয়ে আছে। শুণ্ডে ধারণ করে আছে হস্তী দুইটি, পূজার জন্য পুষ্প। অনবদ্য এই হস্তী দুইটির গঠন-সৌষ্ঠব, একেবারে জীবন্ত। দেখি মুগ্ধ হয়ে কলিঙ্গ-ভাস্করের এক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এক অমর কীর্ত্তি।

অলোকাপুরীগুম্ফায় উপনীত হই। নির্ম্মিত হয় এই গুম্ফাটিও খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অঙ্গে নিয়ে দুইটি প্রকোষ্ঠ, বাসস্থান, জৈন শ্রমণদের। অলঙ্কৃত এই গুহামন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠটি একটি অপরূপ পরমারূপবতী নারীমূর্ত্তি দিয়ে। পীনোন্নত, যৌবন-পুষ্টা, তাঁর অনাবৃত বক্ষ, লীলায়িত তার বঙ্কিম গ্রীবা, আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, বক্ষে তুলে নিয়ে আদর করেন তিনি তাঁর প্রিয় কাকাতুয়াকে, সোহাগে বিগলিত হয়ে। দেখি মুগ্ধ হয়ে কলিঙ্গ-ভাস্করের এই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, এক অপরূপ সৃষ্টি।

দেখি একে একে সর্পগুম্ফা, পবনারীগুম্ফা, বাঘ গুম্ফা, যক্ষেশ্বর আর হরিদাসগুম্ফা। এই গুম্ফাগুলি খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হয়। নাই তাদের অঙ্গে কোন শিল্পসম্ভার, সমৃদ্ধিশালী নয় অলঙ্করণে।

সর্পের আকার এই পাহাড়ের শীর্ষদেশ, তাই পরিচিত মন্দিরটি সর্পগুম্ফা নামে। বুকে নিয়ে আছে শুধু একটি প্রকোষ্ঠ ও তার সংলগ্ন একটি অলিন্দ, অঙ্গে নিয়ে আছে দুইটি শিলালিপি, তাতে লেখা আছে অনতিক্রম্য চুলাকামের প্রকোষ্ঠ, আর কম্মা ও হলক্ষীণার চন্দ্রাতপ।

পবনারী গুম্ফা ছয়টি গুহার সমষ্টি বুকে নিয়ে আছে।

ব্যাঘ্রের মুখের আকারে রচিত বাঘগুম্ফার প্রবেশপথের শীর্ষদেশ, বুকে নিয়ে আছে একটি মাত্র প্রকোষ্ঠ ও একটি অলিন্দ। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এই প্রকোষ্ঠের দ্বারের শীর্ষদেশ, দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের উপর অবস্থিত দু'পাশের উদ্গত স্তম্ভের উপর। আছে একটি শিলালেখ ও উল্লিখিত আছে তাতে "সভূতির গুহা"।

বুকে নিয়ে আছে যক্ষেশ্বর দুইটি প্রবেশপথ আর স্তম্ভ। অষ্টকোণ তাদের কেন্দ্রস্থল, ঘন বাকী অংশ। আছে তার সম্মুখভাগেও একটি শিলালিপি, লেখা আছে তাতে "মহামদার স্ত্রী নায়িকা"।

হরিদাসগুম্ফা গণেশগুম্ফার অনুরূপ। বুকে নিয়ে আছে ঘন-আকৃতির স্তম্ভ। শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অনবদ্য, সুন্দরতম, বন্ধনী, নির্ম্মিত গণেশগুম্ফার বন্ধনীর অনুকরণে। তার অলিন্দের অঙ্গের শিলালিপিতে লেখা আছে "তুলনাহীন গুহা ও চন্দ্রাতপ চুলাকর্ম্মার"।

সবশেষে জগন্নাথগুম্ফায় উপস্থিত হই। নির্ম্মিত এই গুম্ফাটি খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীতে, বুকে নিয়ে আছে মহাপবিত্র উদয়গিরি, শৈলমালার অঙ্গের দীর্ঘতম প্রকোষ্ঠ, পরিধি তার সাড়ে সাতাশ ফুট দীর্ঘ, সাত ফুট প্রস্থ। অঙ্গে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্প-সম্ভার, সমৃদ্ধিশালী হয়ে আছে প্রকৃষ্টতম অলঙ্করণেও, শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তারা উদ্ভাবার স্থপতির ও ভাস্করের। দেখি অলঙ্কৃত তার প্রাচীরের গাত্রও কত সুষ্ঠু শোভন গঠন, মূর্ত্তি দিয়ে। মূর্ত্তি কত বিদ্যুতের, গনের বিদ্যাধরের, মূর্ত্তি বিজাতীয় জীবের-হরিণের আর রাজহংসের। জীবন্ত এই মূর্ত্তিগুলি, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। অতুলনীয় এই গুম্ফার স্তম্ভের শীর্ষদেশের বন্ধনীর অঙ্গের মূর্ত্তিসম্ভারও। দেখি একটি সারস দাঁড়িয়ে আছে। বিস্তৃত তার মুখগহ্বর। একটি গণ নিযুক্ত তার গলদেশ থেকে একটি কণ্টক উৎপাটনে। অপরূপ এই মূর্ত্তিসম্ভার, শ্রেষ্ঠ দান কলিঙ্গের মহাঅভিজ্ঞ-ভাস্করের সুনিপুণ হস্তের, রচিত তাঁদের হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য উজাড় করে দিয়ে, মিশিয়ে দিয়ে তাদের মনের সীমাহীন মাধুর্য্য—তাই রূপময়, বাঙ্ময়ও। লাভ করেন স্থপতি আর ভাস্করও শ্রেষ্ঠত্বের আসন, হন বিশ্বজিৎ। লাভ করেন তাঁরা অমরত্বও, অমরত্ব লাভ করেন কলিঙ্গাধিপতিরাও, ইতিহাসের পাতায়।

স্থপতি আর ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে উদয়গিরি শৈলমালা অবতরণ করে, সংযোগ স্থলে উপস্থিত হই। তার পর খণ্ডগিরি আরোহণ সুরু হয়। ধীরে ধীরে অতিক্রম করি পথ, দু'পাশের ঘন বনবীথির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হই, বহু কষ্টে উপনীত হই পবিত্র খণ্ডগিরির শীর্ষদেশে।

শীর্ষে নিয়ে আছে শৈলমালা, প্রথম জৈনতীর্থঙ্কর আদিনাথের মন্দির। কটকের রাজা মঞ্জু চৌধুরী, পরবর্তী কালে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন। মহান এই মন্দিরটি, বুকে নিয়ে আছে অনবদ্য, সুন্দরতম শিল্পসম্ভার, প্রকৃষ্টতম নিদর্শন পরবর্তী জৈন স্থপতির আর ভাস্করের।

আদিনাথের মন্দির দেখে আমরা অনন্ত গুম্ফায় উপনীত হই। সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠ গুহামন্দির পবিত্র খণ্ডগিরি শৈলমালার, নির্ম্মিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে। দাঁড়িয়ে আছে পবিত্র খণ্ডগিরির উচ্চতর স্তরে। পাশে নিয়ে আছে এই গুম্ফার তোরণ দুইটি সর্প। তাই পরিচিত অনন্তগুম্ফা নামে। বুকে নিয়ে আছে চব্বিশ ফুট দীর্ঘ ও সাত ফুট প্রস্থ একটি প্রকোষ্ঠ ও একটি সম-আকৃতির আচ্ছাদিত অলিন্দ। ছিল এই প্রকোষ্ঠে চারিটি দ্বার, এখন পরিণত হয়েছে তিনটি দ্বার ও একটি গবাক্ষে। রচিত হয় প্রবেশপথের শীর্ষদেশে বৃত্তাকার খিলান, তার উপরে সূক্ষ্ম পিরামিডাকৃতি রেলিং ও অর্গল, নাই অন্য কোন গুম্ফায়। অলঙ্কৃত রেলিং-এর অঙ্গ একাস্তর পদ্মের কোরক দিয়ে, নাই অন্য কোন শিল্পসম্ভার।

দেখি মন্দিরের সম্মুখভাগে উদ্গত স্তম্ভ, চতুষ্কোণ তার কেন্দ্র-স্থলের দণ্ড, স্তম্ভের ফাঁকে ফাঁকে উড়ন্ত বিদ্যাধরের মূর্ত্তি। মূর্ত্তি দেখি সিংহের, মকরের আর শার্দ্দুলেরও। তোরণের অঙ্গে চঞ্চুতে মুক্তার মালা নিয়ে রাজহংস। ত্রিরত্নের মূর্ত্তি দিয়ে অলঙ্কৃত তার শীর্ষদেশ। তোরণের নীচে একটি হস্তী শয়ন করে আছে তার দুই পাশে দুইটি হস্তিনী।

দেখি দেব দিবাকর দুই হস্তে নিয়ে ধারণ করে আছেন একটি দ্বিচক্র রথের রশি, চার অশ্বে পরিচালিত সেই রথ। তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর দুই পত্নী উষা আর প্রত্যুষা, রথের এক পাশে একটি অর্দ্ধবৃত্ত অপর পাশে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম-প্রতীক চন্দ্র আর জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের।

দেখি দুইটি হস্তীর কেন্দ্রস্থলে একটি গজলক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছেন, হস্তে নিয়ে প্রস্ফুটিত পদ্ম। অনুরূপ ভারহুতের গজলক্ষ্মীর আকৃতিতে

কিন্তু সমপর্য্যায়ে পড়ে সাঁচী ও মথুরার গজলক্ষ্মীর, নির্ম্মাণ কৌশলে এই গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তিটি।

চতুর্থ তোরণের নীচে একটি ত্রৈরাত্রিক চৈত্য বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে, বেষ্টিত হয়ে আছে সুন্দর রেলিং দিয়ে। পূজা করেন সেই চৈত্যবৃক্ষ একটি নৃপতি সঙ্গে নিয়ে রাণী, তাদের হস্তে শোভা পায় পুষ্পমাল্য। অপরূপ এই রাণীর মূর্ত্তিটি, সমপর্য্যায়ে পড়ে মথুরা ও অমরাবতীর রাণীমূর্ত্তির।

দেখি অলঙ্কৃত অলিন্দের দুই প্রান্তদেশ উড়ন্ত বিদ্যাধরের মূর্ত্তি-তাঁদের হস্তে শোভা পায় পুষ্প। শোভিত দক্ষিণ প্রত্যন্ত প্রদেশও একটি উড়ন্ত বিদ্যাধরের মূর্ত্তি দিয়ে। কেড়ে নেন বিদ্যাধর একটি অতিকায় বিকটাকার দৈত্যের হস্তে ধৃত একটি থালার উপর থেকে, সেই পুষ্পমাল্য। আকর্ণ বিস্তৃত এই দৈত্যের মুখগহ্বর, বৃক্ষপত্রের আকারে তার কর্ণদ্বয়। দেখি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে এই অপরূপ মূর্ত্তি-সম্ভার।

অনবদ্য এই মন্দিরের ভিতরের স্তম্ভগুলিও, অষ্টকোণ তাদের কেন্দ্রস্থল শীর্ষে শোভা পায় জোড়া বন্ধনী। প্রথম বন্ধনীর ভিতরের দিকে রচিত হয় একটি দৈত্যের মূর্ত্তি, স্কন্ধে নিয়ে আছে দৈত্য একটি হস্তী, হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট একটি নর ও একটি নারী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বন্ধনীর অভ্যন্তরের অঙ্গে শোভা পায় দুইটি পরমারূপবতী রমণীর মূর্ত্তি, পূজারিণী তাঁরা নিযুক্তা দেবতার পূজায়, তাঁদের হস্তে পল্লবের বন্ধনী। অপরূপ তাঁদের দেহবল্লরী, অতি শোভন তাঁদের অঙ্গের ভঙ্গিমা। তৃতীয়টির ভিতরাঙ্গে পরমাসুন্দরী নারীমূর্ত্তি, হস্তে নিয়ে প্রস্ফুটিত পদ্ম, তাদের একটির মণিবন্ধে শোভা পায় বহুমূল্য জড়োয়ার কঙ্কণ। পঞ্চমটির ভিতরাঙ্গ বুকে নিয়ে আছে একটি হস্তী, দাঁড়িয়ে আছে হস্তীটি একটি পদ্মের উপর। অলঙ্কৃত অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে প্রথম ও পঞ্চমটির বহিরাঙ্গ শোভা পায় দৈত্যের মূর্ত্তি, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বন্ধনীর বহিরাঙ্গে। অপরূপ এই বন্ধনীর অঙ্গের শিল্পসম্ভার, প্রতীক শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের এক সুন্দরতম সৃষ্টির উড়িষ্যার ভাস্করের। দেখি বিস্ময়ে মূক হয়ে।

প্রকোষ্ঠের পশ্চাতের প্রাচীরের গাত্রেও, দেখি খোদিত কত প্রতীক স্বস্তিকের, নন্দীপদের, ত্রিরত্নের আর পঞ্চ পরমেষ্ঠিনের। তাই মনে হয় বুকে নিয়ে আছে এই গুহাটিও বৌদ্ধ প্রভাব। অঙ্গে নিয়ে আছে এই মন্দিরটির অলিন্দ একটি শিলালিপিও, উৎকীর্ণ আছে তাতে—"দোহাদার শ্রমণের প্রকোষ্ঠ"।

স্থপতি ও ভাস্করকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বার হয়ে আসি, পর্ব্বত অবতরণ করে তেঁতুলিগুম্ফায় উপনীত হই।

এই গুহামন্দিরটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ছিল এই গুহামন্দিরটির সামনে একটি তেঁতুল বৃক্ষ, তাই পরিচিত তেঁতুলিগুম্ফা নামে। গুহার উৎকল প্রতিশব্দ গুম্ফা।

দেখি এই গুহামন্দিরটিও বুকে নিয়ে আছে শোভন-গঠন স্তম্ভ, অষ্টকোণ তাদের কেন্দ্রস্থল, ঘন অবশিষ্ট অংশ। সুন্দরতম আর উন্নততম এই মন্দিরের গাত্রের উদগত স্তম্ভ বুকে নিয়ে আছে হস্তী আর ব্যাঘ্রের মূর্ত্তি, অনবদ্য তাদের গঠন সৌষ্ঠব—জীবন্ত। দেখি স্তম্ভের শীর্ষদেশে বন্ধনীর অঙ্গে একটি পরমা রূপবতী পীনোন্নতবক্ষা নারী হস্তে নিয়ে পদ্ম। অপরূপ এই নারীটির দেহবল্লরীও সুন্দর-তম তার দাঁড়াবার ভঙ্গি, বিস্ময় জাগায় মনে।

তেঁতুলিগুম্ফা দেখে আমরা তত্ত্বগুম্ফায় উপনীত হই। অন্য-তম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম গুহামন্দির পবিত্র খণ্ডগিরি শৈলমালার অঙ্গের, নির্ম্মিত হয় এই মন্দিরটিও খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে।

দেখি, বুকে নিয়ে আছে এই গুম্ফাটি একটি সভাগৃহ (বৃহৎ কক্ষ)। বেষ্টিত হয়ে আছে সভাগৃহটি দুপাশের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দিয়ে, বুকে নিয়ে আছে তিনটি প্রবেশপথও। দেখি অলঙ্কৃত এই গুহাটিও অনবদ্য সুন্দরতম স্তম্ভ দিয়ে, শীর্ষে নিয়ে আছে স্তম্ভগুলি অপরূপ বন্ধনী, বন্ধনীর অঙ্গে নর্ত্তকীর মূর্ত্তি, তার সামনে একটি পরমা সুন্দরী নারী হস্তে নিয়ে বীণা। দেখি বন্ধনীর অঙ্গে আরও একটি পরমা, রূপবতী নারীর মূর্ত্তি হস্তে নিয়ে একটি পাত্র পরিপূর্ণ পুষ্প সম্ভারে বিন্যস্ত তার কুঞ্চিত কুন্তল, দাঁড়িয়ে আছে নারী পূজারিণী ভক্তি-প্রণত মস্তকে। দেখি অলঙ্কৃত বন্ধনীর শীর্ষদেশ আর কার্নিসের নিম্নাংশও একটি নারী মূর্ত্তি দিয়ে, তার দক্ষিণ প্রান্তে একটি হস্তী বামে একটি সিংহ দাঁড়িয়ে আছে। একটি রেলিংও তৈরী হয় অনুরূপ এই রেলিংটি বুদ্ধগয়ার রেলিংয়ের নির্ম্মাণ পদ্ধতিতে।

অনেকগুলি তোরণও নির্ম্মিত হয় প্রাচীরের গাত্রে, দাঁড়িয়ে আছে তোরণগুলি দুপাশের উদ্গত স্তম্ভের উপর। স্ফীত তাদের কোনটির শীর্ষদেশ, কেউ ঘণ্টার আকারে তৈরী কোনটির পাকান রজ্জুর আকার আবার কোনটির পিরামিডের, কারও শীর্ষদেশে শোভা পায় মূর্ত্তি. মূর্ত্তি কত বিভিন্ন জন্তুর। বেষ্টিত হয়ে আছে তোরণগুলি লতাপল্লব দিয়েও। দেখি, একটি মৃগ দম্পতি একটি তোরণের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে দ্বিতীয় তোরণটির শীর্ষদেশে একটি পারাবত দম্পতি, তৃতীয় তোরণটির শীর্ষ নিয়ে আছে একটি কাকাতুয়া দম্পতি। শোভা পায় কেন্দ্রস্থলের তোরণের শীর্ষদেশে একটি সর্পের ফণা। অভিনব এই তোরণগুলির পরিকল্পনা, সুন্দর-তম রূপ দান শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি উড়িষ্যার ভাস্করের, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি।

দ্বিতীয় তত্ত্বগুম্ফাতে উপনীত হই, সমসাময়িক প্রথম তত্ত্ব-গুম্ফার বুকে নিয়ে আছে এই মন্দিরটি একটিমাত্র প্রকোষ্ঠ অঙ্গে নিয়ে দুইটি প্রবেশপথ। অলঙ্কৃত হয়ে আছে এই গুহামন্দিরটির প্রাচীরের গাত্রও, সুন্দরতম তোরণ দিয়ে বেষ্টিত হয়ে আছে তোরণ-গুলি অভিনব উদ্গত স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে। সমপর্য্যায়ে পড়ে এই উদ্গত স্তম্ভগুলি রাণীগুম্ফার উদ্গত স্তম্ভের, আকৃতিতে ও অঙ্গের শিল্প ও মূর্ত্তিসম্ভারে। দেখি, তোরণের শীর্ষদেশে শোভা পায় কাকাতুয়ার মূর্ত্তি, মূর্ত্তি এক মকরেরও, তার মুখগহ্বর থেকে নির্গত হয় একটি লতা। অভিনব এই মকরটিরও গঠনসৌষ্ঠবে, জীবন্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। দেখি, দ্বারে একটি অতিকায় দ্বারপাল দাঁড়িয়ে আছে। অনুরূপ এই মূর্ত্তিটি অমরাবতীর অন্ধ্র নৃপতি গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীর মূর্ত্তির।

উল্লিখিত আছে, অলিন্দের প্রাচীরের গাত্রের শিলালিপিতে : পাদমালিকা নিবাসী কুসুমার গুহা।

দেখি একে একে খণ্ডগিরি, ধ্যানঘর, নবমুনি, বড়ভুজি, ত্রিশূল, লালাটেন্দু আর কেশরীগুম্ফা। এই গুম্ফাগুলি নির্ম্মিত হয় পরবর্ত্তী কালে। নাই তাদের বুকেও কোন প্রকৃষ্ট অলঙ্করণ, সমৃদ্ধিশালী নয় তারা ভাস্করের হস্তের স্পর্শে।

খণ্ডগিরি একটি দ্বিতল গুহামন্দির। ধ্যান ঘরে আছে একটি মাত্র সভাগৃহ। বুকে নিয়ে আছে নবমুনি, দুইটি প্রকোষ্ঠ ও একটি অলিন্দ। তার প্রাচীরের গাত্রে শোভা পায় জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি, সঙ্গে নিয়ে তাদের নিজস্ব প্রতীক, মূর্ত্তি শাসন দেবতাদেরও, বুকে নিয়ে আছে চারিটি শিলালেখও। প্রথমটি উৎকীর্ণ হয় কেশরী রাজবংশের উদ্দিত কেশরীর রাজত্বকালে, দশম শতাব্দীতে। বড়ভুজিও বুকে নিয়ে আছে তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি, সঙ্গে নিয়ে তাঁদের প্রতীক মূর্ত্তি শাসন দেবতাদের আর শাসন দেবীদেরও। মূর্ত্তি দেখি চক্রেশ্বরীর আর সিদ্ধায়ণীরও, আত্মীয়া তাঁরা প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের আর চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীরের।

ত্রিশূলগুম্ফার অঙ্গে খোদিত একটি ত্রিশূলের মূর্ত্তি, তাই পরিচিত ত্রিশূলগুম্ফা নামে। শোভিত তার প্রাচীরের গাত্রও চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি দিয়ে, সঙ্গে নিয়ে তাঁদের প্রতীক—মূর্ত্তি ঋষভদেবের, অজিতনাথের সম্ভবনাথের, অভিনন্দননাথের, সুমিত-নাথের, পদ্মপ্রভুর, সুপার্শ্বনাথের, চন্দ্রপ্রভুর, সুবিদনাথের, শীতল-নাথের, শ্রেয়াংশুনাথের, শ্রীবাসপূজ্যনাথের, বিমলনাথের, অনন্ত-নাথের, শ্রীধর্ম্মনাথের, শান্তিনাথের, কুন্থনাথের, শ্রীঅরনাথের, মল্লি-নাথের, মুনি সুব্রতনাথের, নমিনাথের, নেমিনাথের, শ্রীপার্শ্বনাথের আর মহাবীরের। আবির্ভাব হন তাঁরা একের পর এক সঙ্গে নিয়ে তাদের নিজের নিজের প্রতীক বৃষ, হস্তী, অশ্ব, বানর, বক, পদ্ম, স্বস্তিকা, চন্দ্র, মকর, শ্রীবাস্ত, গণ্ডার, মহিষ, বরাহ, ঈগল, বজ্র, হরিণ, মেষ, নন্দীবর্ত্ত, কলস, কূর্ম্ম, পদ্মপত্র, শঙ্খ, সর্প আর সিংহ। দেখি মন্দিরের সম্মুখভাগে একটি প্রস্তরে নির্ম্মিত মঞ্চ।

দেখি অনুরূপ একটি মঞ্চ বড়ভুজির সম্মুখভাগেও। লালাটেন্দু একটি দ্বিতল গুহামন্দির, কিন্তু ধ্বংসে পরিণত হয়েছে তার সম্মুখ ভাগ। অলঙ্কৃত তার প্রাচীরের গাত্রও তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি দিয়ে, মূর্ত্তি পার্শ্বনাথের আর ঋষভদেবের। অঙ্গে নিয়ে আছে লালাটেন্দু একটি শিলালিপিও বর্ণিত হয় খণ্ডগিরি কুমারী পর্ব্বত নামে সেই শিলালিপিতে। বর্ণিত হয় উদয়গিরিও কুমারী পর্ব্বত নামে হাতী গুম্ফার শিলালিপিতে।

দেখি লালাটেন্দুর সামনে তিনটি দিগম্বর মূর্ত্তি একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর। দুইটি ঋষভদেবের ও একটি অম্বিকার মূর্ত্তি। দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শাসন দেবী অম্বিকা, অধিকার করেন অন্যতম প্রধান অংশ জৈনধর্ম্মে, করেন জৈন সাহিত্যেও। তাই অসম্পূর্ণ থেকে যায় জৈনমন্দির তাঁকে বাদ দিলে। এই মূর্ত্তিগুলি অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়।

নির্ম্মাণ করেন যখন গুহামন্দির, হীনযান বৌদ্ধ স্থপতি খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অলঙ্কৃত করেন মহাপবিত্র পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমালার অঙ্গ—সুন্দরতম গুহামন্দির দিয়ে রচনা করেন বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য আর বিহার, বুকে নিয়ে অনুপম শিল্পসম্ভার শোভন, গঠন স্তম্ভ সুন্দরতম রেলিং শোভিত করেন জৈন স্থপতি আর ভাস্করও, মহাপবিত্র কুমারী পর্ব্বতের অঙ্গ রচনা করেন গুম্ফা নির্ম্মিত হয় শ্রমণদের বাসের স্থান, স্থান পূজার জন্যও। ভূষিত করেন তাদের অঙ্গ সুন্দরতম আর সূক্ষ্মতম শিল্পসম্ভারে আর অনবদ্য মহিমময় মূর্ত্তি সম্ভারে রচিত হয় অনবদ্য স্তম্ভ, শীর্ষে নিয়ে কত মূর্ত্তি, মূর্ত্তি কত নরের, কত নারীর, কত জন্তুর, কত পক্ষীর, কত জৈন প্রতীকেরও, অপরূপ নারীমূর্ত্তি দিয়ে রচিত হয় স্তম্ভের বন্ধনী। নির্ম্মিত হয় কত অনবদ্য সুন্দরতম রেলিংও, অঙ্গে নিয়ে সুষ্ঠু গঠন জীবন্ত মূর্ত্তি সম্ভার। মূর্ত্তি দিয়ে রচিত হয় প্রাচীরের গাত্রে কত দৃশ্য, দৃশ্য কত রাজ সভার, কত সরোবরের, কত অরণ্যের, কত বন, উপবনের, কত বিভিন্ন লতা পল্লব আর পুষ্পেরও, মূর্ত্তি দিয়েই বর্ণিত হয় প্রস্তরের অঙ্গে কত কাহিনী, কাহিনী সামাজিক জীবনের, বিজয়ের অভিযানের, কাহিনী পুরাণেরও। মহামহিমময়, সুন্দরতম তাদের পরিকল্পনা, অনবদ্য, সূক্ষ্মতম রূপ-দান। রচনা করেন কলিঙ্গের মহা অভিজ্ঞ স্থপতি আর সুনিপুণ ভাস্কর উজাড় করে দিয়ে তাঁদের হৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, মিশিয়ে দিয়ে মনের অন্তহীন মাধুরী, লাভ করেন তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের আসন বিশ্বের স্থাপত্যের আর ভাস্কর্য্যের দরবারে হন বিশ্বজিত।

আসে দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে যাত্রী, মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে এই মহামহিমময় সৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কলিঙ্গের এক মহা-গৌরবময় যুগের, এক অমর কীর্ত্তি। নিবেদন করে শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

আমরাও প্রণতি জানাই জিনকে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি কলিঙ্গ স্থপতি আর ভাস্করকে, অমর তাঁরা, অমর মহা পবিত্র খণ্ডগিরি আর উদয়গিরিও ইতিহাসের পাতায়, সঙ্গে নিয়ে আসি স্মৃতি, যা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মণিকোঠায়।

সমাপ্ত

পথ ও প্রান্তরে

শ্রীছদ্মবেশী

বহুদিন আগে এক অলক্ষ্য ইশারা মোরে ডেকেছিল,
তারে আমি খুঁজিয়াছি ফিরে শহরের পথে পথে,
রেলের কামারায়, গিরির শীর্ষদেশে, অজন্তা, ইলোরার গুহাতে
তাঁর আজও পাই নাই দেখা। তন্দ্রার আবেশ কে যেন ঢেলে দিল

আমার শ্রান্ত চোখের পাতায়, আজও তারে খুঁজে ফিরছি,
চড়াই উৎরাই কত করেছি। স্থাপত্য আর ভস্কর্য্যের মুখ
দেখে বার বার ভুল করেছি তাকে। জানা অজানার হয়েছি সম্মুখ,
তবুও থামে নি চলা। একবার মনে হয়েছিল এসেছি কাছাকাছি।

কুয়াশায় ছায়া ঢাকা কত গ্রাম, কত পথ, কত কুঁড়েঘর,
প্রদীপের ক্ষীণ আলো। বিদ্যুতের দিনের আলোর মত,
হারিয়ে যাওয়া দিনের নিশায় চেনা চেনা মুখ কত
ফিরায়ে নিয়েছে গ্রীবা। তবুও চলার স্রোত আজও খরতর।

নিঃসঙ্গ হেঁটে হেঁটে এদের আমি করেছি অনুভব প্রতি নিশ্বাসে।
কত দিন, কত রাত্রি, কত চিত্র, বিচিত্র জীবন এসেছে,
সেই সব চেনা, অচেনা মুখ আমায় দেখে বার বার হেসেছে,
তবুও আমি আজিও ঘুরিতেছি। তারে পাব সেই জ্বলন্ত বিশ্বাসে।

কতদিন একা একা বসেছিলাম গুহার আঁধারে,
অযোধ্যার পথে পথে হেঁটেছি, বিদর্ভনাগরীর সাথে
সঙ্গোপনে কহিয়াছি কথা। কত দিন শুব্ধ রাতে,
অবাক বিস্ময়ে দেখেছি চেয়ে মহেন্দ্র আর সঙ্ঘমিত্রারে।

মাঝে মাঝে নির্জনতা আমারে ঘিরেছে এসে,
প্রকৃতির কত শোভা, মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জীবনযাত্রায়
আমারে দিয়েছে হতবাক করে, নির্জনতা ভেদ করে প্রায়
একবার মনে হয়েছিল সে যেন কথা কয়েছিল হেসে।

তাহার স্মৃতিরে লয়ে মনের গহ্বরে
আজও আমি পথ চলি, হাতছানি দেয় যেন অলক্ষ্য ইশারা,
ভারতের প্রান্ত হতে প্রান্তরে ঘুরে তার পাই নাই সারা,
তবুও খোঁজার হবে না শেষ আমার মৃত্যুর পরে।

বাউল

শ্রীঅর্চ্চনা চৌধুরী

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ভরদুপুর বেলায় ভিক্ষে সেরে ফিরছিল বাউল রতনদাস। রতনদাসের হাতে একতারা, বাঁ কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি। বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাকে। রোদের আঁচে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে; পরণে তার গেরুয়া রঙের বিবর্ণ শতচ্ছিন্ন আলখাল্লা—মাথার ওপরে ভাঁজ করে দেওয়া ভিজে গামছাটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। ক্লান্ত দেহটাকে কোন মতে টেনে টেনে পথ চলছিল রতন বাউল। এখনও অনেকটা পথ তাকে যেতে হবে। অবরুদ্ধ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপতে গিয়ে অজ্ঞাতেই রতন বাউলের চোখ জলে ভরে ওঠে। পরনের আলখাল্লায় চোখের কোণটা মুছে আবার পথ চলে সে। শুকনো গলায় গুন গুন করে হরিনাম গায়—"মাধব বহুত মিনতি করি তোঁয়—" জাত বাউল রতনদাস।

আস্তানায় ফিরে কাঁধের ঝোলা আর একতারাটা পাশে রেখেই হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে রতনদাস। শুয়ে শুয়েই চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সে। সেই অপরিচ্ছন্ন পরিস্থিতি। জনারণ্য প্রকাশ্য রাজপথের পাশে পাশে পৌর প্রতিষ্ঠানের নম্বর দেওয়া এক একটা গাছের তলায় এক একটা সংসার। মধ্যবয়সী নকুল ভিক্ষারী তার নুলো পা নিয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে রোজ ভোর হতেই ভিক্ষেয় বেরিয়ে যায়। নকুলের ভিক্ষে করার অদ্ভুত আওয়াজ শুনে বিরক্ত হয়ে রতনদাস কতদিন ওকে ধমক দিয়েছে—"আচ্ছা, তুমি এমন বিকট চীৎকার কর কেন বল ত? এই ত চেহারা, তার ওপর নুলো পা নিয়ে ছেঁচড়ে চল—নজরে না পড়বার কথা ত নয়, চীৎকার করলেই বুঝি বেশী ভিক্ষে মেলে—?"

নকুল চটে যায়, অশ্লীল গাল দেয় একটা, তার পর সেও একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে—"তুমি থাম ত, আমার ওপর আর খবরদারী করতে হবে না তোমায়।"

রতনদাসের সবই গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবুও মাঝে মাঝে ও অনুভব করে, এ আবহাওয়া তার ভাল লাগে না। তার মনের কোণে সর্ব্বদাই একটা অস্বস্তি খোঁচা দেয়। এতদিন হয়ত চলেই যেত সে কিন্তু—

রতনের পাশের গাছতলায় থাকে পচা আর বিমলি। গাছে ঠেস দিয়ে বসে বসে পচা বিমলার চুলের জট ছাড়িয়ে উকুন বেছে দিচ্ছিল। বিমলি ওর গাছের গায়ে আঁটা তেল-চিটচিটে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ছবিখানার নীচে মাল রেখে অর্দ্ধনিমিলিত চোখে বসে বসে গুন গুন করে একটা বেসুরো রসাল গান গাইছিল।

রতনদাসকে শুয়ে পড়তে দেখে পচা একগাল হেসে বলে—"কি গো বৈরাগী—শুয়ে পড়লে, রান্না করবে না? খাবে কখন?"

রতন শুয়ে শুয়েই সংক্ষেপে উত্তর দেয়—"বেলা পড়ুক তার পর ভাত ফুটিয়ে নেব—"

বিমলি ফিক করে একটু হেসে বলে—"আমার হাঁড়ীতে পান্তা আছে, খাবে পেঁয়াজ দিয়ে—?"

রতন বিরক্ত হয়ে পাশ ফেরে, কোন উত্তর দেয় না।

মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে রতনদাসের গায়ে পড়ে। ও একটু সরে শোয়।

একশ' নম্বর গাছের হরিদাসীর একপাল ছেলেমেয়ে। হরিদাসীরও বিষয়বুদ্ধি কারু চেয়ে কম নয়। সব ক'টা ছেলেমেয়েকে দিয়ে ও রোজগার করায়। ট্রাম এসে দাঁড়ালেই ওর সাত বছরের ছেলেটা দেড় বছরের মেয়েটাকে কাঁধের ওপর ফেলে একটা সিগারেটের টিন হাতে করে টেনে টেনে চীৎকার করে—"বাবাগো এই কাঙালের ছেলেটাকে দয়া করে দুটো খেতে দাও। রাজা বাবুগো, ভগবান দেবেন—এ কাঙালের ছেলেটাকে হাত তুলে একটা দুটো পয়সা দাও—"

আগের ষ্টপেজে হরিদাসীর পাঁচ বছরের মেয়েটাও চীৎকার করে—"রাজারাণী মা, একটা পয়সা দাও গো, দুটো মুড়ি কিনে খাব; সকাল থেকে কিছু খাই নি বাবা—ভগবান দেবেন তোমায়—বাবাগো এই কাঙালের মেয়েটাকে, হাত তুলে কিছু দাও—"

চীৎকারের ধাপে ধাপে ওর কঙ্কালসার ছোট্ট শরীরটার প্রতিটি শিরা ফুলে ফুলে ওঠে। মাঝে মাঝে ও দম নেয়। হয়ত ভিক্ষে চাইতে ভুলেও যায় অনেক সময়। ট্রাম ছেড়ে যেতেই ভয়ে ভয়ে চারিদিক চেয়ে দেখে, ওর মা দেখেছে কিনা। কিছুটা দূরে হরিদাসী ডাষ্টবিন হাতড়ায়, এটা-ওটা টেনে টেনে বের করে; পোড়া কয়লা, কাগজ, ভাঙ্গা-কৌটা—ওর চোখ-মুখের একাগ্রতা দেখে মনে হয় ও যেন

সমুদ্রে মুক্তোর সন্ধান করছে। ওরই ফাঁকে ফাঁকে ছেলে-মেয়েদের দিকে লক্ষ্য রাখে। রোজগার মনঃপুত না হলে কঠিন শাসন করে।

হরিদাসী আজকাল ভিক্ষেয় যায় না। ভিক্ষে আজকাল মেলে না, মেলে শুধু প্রচুর বিদ্রূপ আর অপমান—"জোয়ান মেয়েছেলে রোজগার করে খেতে পার না—"। হরিদাসী চটে যায় কিন্তু এ লাইনের আটঘাট ওর জানা, তাই ও রাগ করে না। করুণ সুরে বলে—"কাজ কে দেবে বাবু, কাজের চেষ্টায় বেরিয়ে দেখেছি ত। চোর-ছ্যাঁচোড় বলে লোকে তাড়িয়ে দেয় কুকুর বেড়ালের মত—মানুষের মন কি আর আগের মত আছে যে, দরিদ্রনারায়ণ বলে সেবা করবে?"

এ লাইনে হরিদাসী বনেদী, তাই ভিখিরী সমাজে ওর সম্মানও আছে। ভিক্ষে থেকে সবাই ফিরে যখন তিনটে ইঁটের উনুনে খড়কুটো জেলে রান্না চড়ায় ও তখন ঘুরে ঘুরে তদারক করে। "ওমা, শুধু ভাত খাবে কি করে—দাঁড়াও আমি শেষ বাজারের অনেক আনাজ এনে রেখেছি ওই দিয়ে একটা ছ্যাচড়া করে খাও—দাঁড়াও আনছি।" শুকনো ডাঁটা, পচা আলু, কুমড়োর ফালি, মাছের কান্‌কো, ল্যাজা, পচা কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কার বিচি, শুকনো পেঁয়াজ ওর ভরা ভাণ্ডার থেকে সকলকে বিলায়। ওর একটা ভাঙা পাথরের টুকরো আছে, এক টুকরো পাথর দিয়ে ও লঙ্কা বাঁটে, পেঁয়াজ বাঁটে। ছেলেমেয়ের রোজগারের পয়সা দিয়ে নুন কেনে, হয়ত বা কোনদিন দোকানে দোকানে চেয়েচিন্তে একটু সরষের তেলও জোগাড় করে। ও রাঁধেও ভাল—ভিখিরী সমাজে ওর রান্নার সুনাম আছে। আর এই সুনামটুকু অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে চেষ্টারও অন্ত নেই। ও মাঝে মাঝে ওর বড় মাটির হাঁড়ি ভর্তি করে মাছের কাঁটা পচা আর শুকনো আনাজ, লঙ্কাবাঁটা আর পেঁয়াজ বাঁটা দিয়ে পরিপাটি করে তরকারী রান্না করে। ভিখিরী-সম্প্রদায় কর্পোরেশন আলোর নীচে, ফুটপাথের কোণ ঘেঁষে যখন সারিবদ্ধ হয়ে খেতে বসে ও তখন সুধাভাণ্ড হাতে মোহিনী-মূর্ত্তির মত আবির্ভাব হয়ে ভাঙা কলাই-ওঠা হাতা দিয়ে সকলের পাতে পরিবেশন করে। সেদিন ওর সুখ্যাতিতে ও নিজেও বিভোর হয়ে যায়। হরিদাসী দেখতেও তেমন খারাপ নয়—যৌবনও যেন দেহে এখনও একটু ছুঁয়ে আছে, কিন্তু এত থাকতেও হরিদাসী একজনের মন এখনও পেল না, সে ওই বাউণ্ডুলে বৈরাগী।

রতনদাসকে শুয়ে থাকতে দেখে ও একসময় ওর পাশে এসে দাঁড়ায়; কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে ডাকে—"বৈরাগী ও বৈরাগী—"

রতন মুখের ঢাকা খুলে একবার ওর দিকে বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই আবার চোখ বোজে।

হরিদাসী বিড়বিড় করে—"আমি না হয় মন্দ, আমার কথা শুনলে না হয় পাপ হয় তোমার। তাই বলে তুমি আজও খাবে না নাকি? রোজ রোজ না খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াও—বলি তোমার দেহে কি মানুষের রক্তও নেই—?"

রতন সাড়া দেয় না, নিঃশব্দে পড়ে থাকে। হরিদাসী এবার অন্যপথ ধরে। ডাষ্টবিনটার কাছে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে—"লক্ষ্মী, ওরে ও হতচ্ছাড়ী ছুঁড়ী, ওখানে ওপর দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছিস কি, হ্যাঁরে?—এদিকে আয় শুনে যা—"

লক্ষ্মীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়। ভয়ে ভয়ে এক পা দু' পা করে কাছে এসেই ও ভ্যা করে কেঁদে ওঠে, কিছু বলবার আগেই।

—"লাও ঠ্যালা, হ্যাঁরে কাঁদলি যে বড়, মেরেছি আমি তোকে? শোন, কাঁদিসনে, আজ মুড়িমুড়কি খেতে পয়সা দেব তোকে—"

লক্ষ্মী হাঁ করেই পরম বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, ধীরে ধীরে ওর কান্নার আওয়াজ বন্ধ হয়। পরনের ছেঁড়া জামাটা তুলে নাক মুছতে সুরু করে ও। ফিস্‌ফিস্ করে হরিদাসী মেয়েকে যেন কি শেখায়। তার পর কলাই-ওঠা সানকি-খানা কাগজ ঢাকা দিয়ে মেয়ের হাতে তুলে দেয়। এবারে লক্ষ্মী বুঝতে পারে, হাসে একটু। তার পর সানকিখানা হাতে করে এগিয়ে যায় ও রতনদাসের গাছের দিকে।

রতন বাউলের মনে সুখ নেই। দেহভরা ওর ক্লান্তি। আজ ভিক্ষে সেরে ফেরবার পথে যার সঙ্গে আচমকা দেখা হ'ল, সঙ্গের ওই লোকটা না থাকলে ও কাজলি বলেই ভুল করত। কাজলি—! রতনদাসের সর্ব্ব শরীর একটা কিসের যেন অনুভূতিতে শির শির করে ওঠে। ও চাদরখানা ভাল করে মুখে ঢাকা দেয়। চোখ বন্ধ করে ও বাইরের জগতকে যেন প্রাণপণে অস্বীকার করতে চায়। দুটো হাত মুঠো করে ও যেন চ্যালেঞ্জ জানায় ওর অদৃষ্টকে। অদৃষ্ট তার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। আজকের এ বাস্তবতায় তার অতীত জীবনের এতটুকুও চিহ্ন নেই। কিন্তু তার মনের পটভূমিকায় যে ছবি একবার আঁকা হয়ে গেছে তাকে সে মুছে ফেলবে কোন অদৃষ্ট দিয়ে? নাঃ! রতনদাস তার অতীতকে আঁকড়ে ধরেই মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে চায়। চোখ বুজলেই ত ও এখনও দেখতে পায় পদ্মানদীর ধারে তার সেই ছোট্ট ঘরখানি। নিজের হাতে এ-ঘর সে বেঁধেছিল চাটাই বেড়া আর খড়ের ছাউনি দিয়ে। উঠানের ফুলবাগানে সন্ধ্যামণি, বেলী, গাঁদা, টগর, জবা—কত ফুল! ফুলে ফুলে

আলো হয়ে থাকত উঠানটা। উঠানের একপাশে তুলসী-মঞ্চের পাশ দিয়ে বাঁশের মাচায় ফুলেভরা সেই মাধবীলতা, তরুলতা। বাড়ীটা ঘিরে ও লাগিয়েছিল কলাগাছ। কত ভাল ভাল কলা—সেবারে বাবুদের বাড়ী কীর্ত্তন গেয়ে পেয়েছিল অনেক—উপরন্ত বাবুরা তাকে তাদের মালভোগ কলা বাগান থেকে দু-তিন রকম কলাগাছের চারা দিয়েছিল। কাঁদীতে কাঁদীতে কলা ফলত, দিয়ে-থেয়েও শেষ হ'ত না। আর খাবার মত ছিলই বা ক'জন। কাজলি আর পাঁচ বছরের মেয়ে রাধারাণী। রাধারাণী !! বৈষ্ণবের ছেলে সে। আদর করে একমাত্র মেয়ের নাম রেখেছিল রাধারাণী। নাদুস-নুদুস ফুটফুটে মেয়ে রাধারাণী, পায়ের মল বাজিয়ে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াত সারা বাড়ীময়। মাথায় চূড়ো করে চুল বেঁধে তাতে নানা রঙের ফুলের মালা গেঁথে কাজলি পরিয়ে দিত। কাজল পরিয়ে দিত ওর টানা টানা চোখে। কোন কোন দিন রতনদাস বাড়ীতে থাকলে মেয়ে এনে কোলে বসিয়ে দিয়ে বলত—"মেয়ের মায়ের দিকে না হয় নজর নাই, তাই বলে মেয়েটার দিকেও একবার চোখ তুলে চাইবে না নাকি ?"

মেয়েকে কোলে নিয়ে রতনদাস মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকত, তার পর কাজলির দিকে চেয়ে একটু হেসে বলত—"তোরই ত মেয়ে কাজলি তাই এত সুন্দর, নইলে মেয়ের বাপের' যা বাহার—"

কাজলি মুখঝামটা দিত—"কথার ছিরি দেখ না। যাই আমি, আমার কাজ আছে, তুমি মেয়ে নিয়ে আদিখ্যেতা কর।"

ঢাকা চাদরের ওপর দিয়েই রতনদাসের দেহ একবার কেঁপে ওঠে, বুকের কাছটা ঘন ঘন ওঠানামা করে। বুকটা দু' হাতে চেপে ধরে ছটফট করে রতনদাস।

অমন দলদলে মেয়ে রাধারাণী, কি যে হ'ল একদিন ধপ করে মরে গেল। রতনদাস দাঁতে দাঁত চেপে ধরে। মনে পড়ে ওর সেই দিনটার কথা যেদিন ওর মাথায় লাঠি মেরে কাজলিকে নিয়ে গিয়েছিল মুসলমানরা। কাজলির ওপর ওদের বহুদিনের লোভ। কতদিন ও ভিক্ষে থেকে ফিরলে কাজলি মুখভার করে বলত—"চল বৈরাগী, এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই—তুমি বাড়ী থাক না, বাড়ীর আশে-পাশে কারা যেন ঘুরঘুর করে, শিস্ দেয়, খারাপ গান গায়। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি—শেষে কোনদিন কি না জানি হবে। তাই চল বাউল, এখান থেকে চলে যাই আমরা।"

রতনদাস সান্ত্বনা দিত—"দুর পাগলী, অত সাহস হবে না ওই চামচিকেগুলির। রতনদাসের বৈষ্ণবীর গায়ে হাত তুলবে এমন বুকের পাটা নেই ওদের। তুই কিছু ভয় করিসনে—"

নিজের হাত কামড়ে রক্ত বের করে ফেলে রতনদাস। নিজের বল-সাহসের বড় বড়াই ছিল রতনদাসের, তাই ভগবান দর্পচূর্ণ করলেন—নিজের ইস্তিরীকে অবধি রক্ষে করতে পারল না সে। কিন্তু এ অক্ষমতার জন্য দায়ী কি একমাত্র সে-ই। কই আগে ত কেউ সাহস করে নি ? দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল। আচ্ছা মানুষের সঙ্গে মানুষের এমন মিলও হয়—কাজলি ত কবেই মরে গেছে। সেই যে রাধারাণী মরে যাবার পরের দিন, যখন সে শেষ রাতের অন্ধকারে ছোট্ট একটা পুঁটলি সম্বল করে পদ্মার ধার ঘেঁসে ঘেঁসে ইষ্টিশানের পথে চলেছিল তখনও অন্ধকার ফিকে হয় নি। হঠাৎ ওর খেয়াল হ'ল রাধারাণীর কবরটা শেষবারের মত একবার দেখে যাবে। এখান থেকে বেশী দূরও নয়। ওই যে দেখা যাচ্ছে ফুলে-ভরা কদম গাছটা, ওরই তলায়—গাছের কাছে পৌঁছে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রতনদাস। রাধারাণীর কবরের ওপর পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল কাজলি—হ্যাঁ কাজলিই, অস্পষ্ট অন্ধকারেও ওর চিনতে ভুল হয় নি।

—"সোনারে—মানিকরে—"

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে রতনদাস কাজলির পাশে বসে পড়ে, সস্নেহে পিঠে হাত দেয়—কাঁদিসনে কাজলি, কি হবে আর কেঁদে। ওঠ লক্ষীটি—"

তড়িৎপৃষ্ঠের মত উঠে বসে কাজলি—"তুমি !"

—"হ্যাঁরে আমি, তোর অপদার্থ সোয়ামী—"

—"এত রাতে তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

—"এখানে আর ভাল লাগে নারে—ঘরও ভাঙল এবারে, পথ চলি—"

—"সেই তুমি গেলে বৈরাগী—দু'দিন আগে গেলে ত—"

কান্নায় কাজলির কথা বন্ধ হয়, ও ডুকরে ডুকরে কাঁদে, রতনদাসের পায়ে মাথা কোটে।

—"অদৃষ্ট, তা না হলে অমন দুর্ব্বুদ্ধি আমার হবেই বা কেন ?"

কাজলির পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলায় রতনদাস। ভোরের আকাশ ক্রমে ফরসা হয়ে আসে। কাজলির দু'খানা হাত চেপে ধরে রতনদাস বলে—"তুইও আমার সঙ্গে চল কাজলি—দূরদেশে গিয়ে আমরা আবার ঘর বাঁধব।"

কাজলির সারা শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে—দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণটা প্রাণপণে চেপে ধরে—কেটে গিয়ে সূক্ষ্ম একটা রক্তের ধারা নেমে আসে কশ বেয়ে।

—"ওগো অমন করে বল না তুমি। তুমি আমার

সোয়ামী, আমার দেবতা। তোমাকে দেবার মত আর আমার কি আছে বৈরাগী? যে ফুল পোকায় কাটিস যে ফুল উচ্ছিষ্ট হয়ে গেল—তা দিয়ে কি আর দেবতার পুজো হয়?"

কাজলির হাত চেপে ধরে রতনদাস—"কিন্তু আমি ত দেবতা নই কাজলি, আর তোর কথাও যদি সত্যি হয়, আমি বলব তুই গঙ্গাজল—তোকে উচ্ছিষ্ট করা যায় না।"

—"তা হয় না বাউল, তোমার কর্ত্তব্য তুমি করলে, এবার আমার কর্ত্তব্য আমায় করতে দাও—"

—"তুই এখানে কি করে এলি—?"

—"পালিয়ে এসেছি বৈরাগী। ওরা আমায় তালা দিয়ে রেখেছিল। আমি পেছনে সিঁদ কেটে পালিয়ে এসেছি। আমায় মারবার জন্য ঘরের কোণে একটা লাঠি রেখেছিল ওরা, তাই দিয়ে—কিন্তু তুমি আর দেরী কর না, ফরসা হয়ে গেলেই ওরা টের পাবে, আর প্রথমেই তোমায় সন্দেহ করবে, তুমি পা চালিয়ে গিয়ে সকালের গাড়ী ধরেই চলে যাও—"

—"কিন্তু তোর কি হবে কাজলি? তুই কোথায় যাবি—?"

—"আমার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি বাউল—রাধারাণীর কাছে গিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। কিন্তু আর দেরী নয়, ওঠ তুমি।" হাতে পুঁটলীটা তুলে দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে কাজলি—তার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় পদ্মার কোল ঘেঁসে।

প্রবল উত্তেজনায় চাদর ফেলে দিয়ে ধরফর করে উঠে বসে রতনদাস। শূন্য দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে সামনের দিকে। এক সময়ে অন্যমনস্কের মত একতারাটা নিয়ে টুংটাং করে।

—"বৈরাগী—"

রতনদাস চমকে ওঠে। লক্ষ্মী আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ওর পাশটিতে বসে পড়ে তার পর বলে—"তোমার জন্যে মুড়ি আর বাতাসা এনেছি—"

—"কেন আনলি?"

—"বাঃ রে! তুমি যে কিছু খাও নি—"

—"নাই বা খেলাম। আমার ক্ষিদে নেই, তুই খা আমি দেখি।"

—"না—"

—"না কেন?"

—"আমায় বাজনা শেখাবে?" লক্ষ্মী কথার মোড় ঘোরায়।

—"শেখাব—"

—"খাওনা, বাবারে বাবা! এতও খোসামোদ করতে হয় তোমায়। আচ্ছা আমিই খাইয়ে দিচ্ছি—"

এক হাতে চোখ ঢেকে আর এক হাতে মুড়ি বাতাসা দিয়ে লক্ষ্মী বলে—"কে খায়, কে খায়—"

রতনদাস আর স্থির থাকতে পারে না। দু'হাত বাড়িয়ে লক্ষ্মীকে কোলে তুলে নেয়। তার দু' চোখে জলের ধারা নামে। লক্ষ্মী মুছিয়ে দেয়। তার পর দু'জনে বসে বসে মুড়ি-বাতাসা খায় আর গল্প করে। খাওয়া শেষ হলে সানকি ভরে রাস্তার কল থেকে জল ভরে আনে লক্ষ্মী, ঢক ঢক করে সবটা জল খেয়ে নেয় রতনদাস।

—"এবার আমি যাই বৈরাগী—"

—"না—না, তুই আমায় ফেলে কোথাও যাসনে রাধারাণী—" দু'হাত বাড়িয়ে লক্ষ্মীকে আগলে ধরে রতনদাস।

লক্ষ্মী ফিক্ করে হাসে, বলে—"আমি বুঝি রাধারাণী? আমি ত লক্ষ্মী—"

—"ঠিক বলেছিস মা, তুই গোলকে লক্ষ্মী, বৃন্দাবনে রাধারাণী—আয় কোলে আয়—"

রতনদাসের কোলে বসে লক্ষ্মী গলা জড়িয়ে ধরে—

—"তোমায় আমার খুবই ভাল লাগে বৈরাগী—"

—"হ্যাঁরে লক্ষ্মী, তুই আমার রাধারাণী হবি?"

—"হুঁ—"

—"আয় তবে—"

রতনদাস ওর ঝোলা থেকে একটা পুঁটলী বার করে, তার পর তার মধ্যে থেকে এটা-ওটা বের করে লক্ষ্মীকে সাজায়। মাথার চুল চূড়া করে বেঁধে দেয়, তার ওপর জড়িয়ে দেয় সাতনরী তুলসীমালা। পায়ে রূপোর মল, হাতে রূপোর বালা, গলায় রঙীন লাল কাচের মালা, পরনে ঘাগড়া, ওড়না। তার পর কপালে নাকে রসকলি এঁকে দেয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ করে রতনদাস কোথাও ভুল হ'ল কিনা। মুগ্ধদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার একতারাটা টেনে নিয়ে বলে—"আমি গাই, তুই নাচ রাধারাণী—"

বাউল রতনদাসের কীর্ত্তনের তালে তালে মল বাজিয়ে নাচে হরিদাসীর মেয়ে লক্ষ্মী।

বেলা গড়িয়ে যায়, নিমীলিত চোখে রতন বাউল একটার পর একটা কীর্ত্তন গেয়ে চলে। ক্রমে ফুটপাথে ভীড় জমে। লক্ষ্মী নেচে নেচে সকলের সামনে হাত পাতে, পয়সায়, আনিতে ওর হাত ভরে ওঠে। কখন এক ফাঁকে এসে হরিদাসী ওর হাতে একটা সিগারেটের টিন দিয়ে যায়—ক্রমে সেটাও ভরে আসে। রতনদাসের কোন দিকে খেয়াল নেই, ওর কীর্ত্তনের ভাণ্ডার আজ বুঝি ও শূন্য করে ঢেলে দেবে সকলের মাঝে। চোখ বুজে একতারা বাজিয়ে একটার পর একটা পদাবলী গেয়ে যায়—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে
দেখা না হইতে পরাণ গেলে—

লক্ষ্মী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে রতনদাসের পাশে। হরিদাসী এগিয়ে এসে রতনদাসের গায়ে ঠ্যালা দেয়—"এবার ক্ষ্যান্ত দাও বাউল, আবার কাল হবে, লক্ষ্মীকে আমি তোমায় দিয়ে দিলাম—ওকে নিয়েই তুমি ভিক্ষেয় বেরিও কাল থেকে। তা, হ্যাঁ গো বৈরাগী! তোমার মেয়ের নাম বুঝি রাধারাণী ছিল—ভগবান বুঝি কেড়ে নিয়েছেন—?"

রতনদাস সাড়া দেয় না। ওর কণ্ঠ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। একসময় ওর ক্লান্তদেহ ঢলে পড়ে মাটিতে—।

* * * *

দিন কাটে। লক্ষ্মীর হাত ধরে রতনদাস বাউল পথে পথে গান গেয়ে ভিক্ষে করে। তার অন্তরের নিবিড় ব্যথা উজাড় করে ঢেলে দেয় গানের সুরের ভেতর। গানের সুরে সুরে রতনদাসের মন যেন বিরোধহীন একটা ব্যাপ্তির মধ্যে একটু একটু করে তলিয়ে যায়।

দিনে দিনে মাস—মাসে মাসে বছর কেটে যায়। চক্রাকারে আবর্ত্তিত হয় ষড়ঋতু। অবসন্ন দিনের শেষে একটার পর একটা স্বপ্নময় রাত্রি শেষ হয়। অতীতের ছায়াময় স্বপ্নমূর্ত্তি একটা অজানা হাতছানিতে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। ভোর হয়। দূর থেকে ভেসে আসে ঘুম-ভাঙ্গা পাখীর কর্ম্মকাকলী। চোখে পড়ে খোলা নীল আকাশে ভেসে যাওয়া পাখীর গতিবেগ। পূব দিকের রাঙা আকাশে সূর্য্যোদয় হয়। ঝিরঝিরে ভোরের বাতাস গায়ে মেখে মেঠো রতন বাউল পথ চলে তার পুরাণো একতারায় সুর তুলে—সেই সুরে কচি গলা মিলিয়ে লক্ষ্মী গান গায়ঃ

তাই মা আমি নিলাম শরণ
তোর ও দুটি রাঙা চরণ
নিলাম শরণ
এড়িয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন
মা তোর অভয় চরণ পেয়ে,
জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস মা
শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে।

লক্ষ্মীর মা হরিদাসী কিন্তু এতে তৃপ্ত হয় না। সে লোভীর মত হাত বাড়ায় বাউলের দিকে। বাউল শিউরে ওঠে!—সেই নরক! বাউল সেই রাতেই অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়ল আবার পথে। সেই থেকে পথের বাউল পথেই ঘোরে।

মনমাধুরী

শ্রীবিভা সরকার

কঙ্কর কাঁটা শুধু কি
দলেছি পায়?
অঙ্গে মেখেছি শুধুই
পথের ধূলি?
মনকে শুধাই এ প্রশ্ন
মূক ভাষে—
জবাব কিছুই দেয় না
আপনা ভুলি!
তবু জানি মনে মনে
কত দিন এল গেল
কচি পাতা গেল ভরি
শীতের শীর্ণ ডালে
দুঃখ-কেতন যদি বা উড়েছে
সন্ধ্যার অবসাদে
বিজয়-তিলক নতুন উষায়
পড়েছে আমার ভালে!

হারায়ে গিয়েছে যদি বা
অমৃত ক্ষণ—
ব্যর্থ ফাগুন কেঁদেছে
আমার দ্বারে—
ফুল ফোটাবার জাগে সমারোহ
মনমালঞ্চে তবু
মধুর দক্ষিণা মাতাল হয়েছে
শাশ্বত মধুভারে।
হয় নি ব্যর্থ দিনগুলি মোর
ধূলোর এ পথে চলি
সুখে অনুরাগে ধরণীর প্রেমে
ভরিয়াছে মোর ঝাঁপি।
ঘনযামিনীর ঘোর উদ্বেগ মাঝে
দামিনী দেখালো পথ
হৃদয়মাধুরী ছড়ায়ে গিয়েছে
তাই তো বিশ্বব্যাপী!

কাঁচরাপাড়ার কথা

শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু

ইতিহাসের মর্য্যাদা বর্ত্তমানে নয়—অতীতে। যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রলয়-বিলয় প্রভৃতির মধ্য থেকে যে কাহিনী উদ্ধার করে বর্ত্তমানের সামনে তুলে ধরা যাবে—ইতিহাস সার্থকতা লাভ করবে সেইখানে। তাই কাঁচরাপাড়ার পরিচয় লিখতে গেলে যখনই কাহিনীর কথা মনে হচ্ছে, তখন চোখের সামনে ভেসে উঠছে এই অঞ্চলের শত শত বৎসরের কথা।

অতীত ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। এই অঞ্চল একদা বাংলা দেশের সারস্বত অবদানের উৎসস্থল ছিল। তখন কাঁচরাপাড়ার পূর্ব্ব নাম ছিল কাঞ্চনপল্লী এবং ইহা ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত। ১৮২১ সনে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তৎকালীন ইংরাজ সরকার জেলা ভাগ করেন, তখন বাগের খালের উত্তরাঞ্চল নদীয়ার মধ্যে পড়ে যায়। বর্ত্তমান যে কাঁচরাপাড়া দেখতে পাই তার নাম কাঞ্চনপল্লী নাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে শোনা যায় এবং এই অঞ্চল রেলওয়ে কারখানা অবস্থানের পর হতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় ক্রমশঃ উন্নত হয়। জেলা বিভাগ হলেও কাঁচরাপাড়ার পরিচয় আলোচনা করতে গেলে পূর্ব্বের সমগ্র অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করা দরকার নতুবা এই অঞ্চলের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কাঁচরাপাড়ার অদূরে বাগের খালের উত্তরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ সবচেয়ে প্রাচীন। বর্ত্তমান মন্দিরটি ১৭৮৫ খ্রীঃ গৌরচরণ ও নিমাইচরণ উভয় ভ্রাতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই সম্বন্ধে রায় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক বাহাদুর লিখেছেন—"কাঞ্চনপল্লী বর্ত্তমান কাঁচরাপাড়া, নদীয়া জেলায় একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম[১] বহুপূর্ব্বে ইহার নাম ছিল নবহক্ গ্রাম।···বর্ত্তমান কাঞ্চনপল্লী গ্রামটি গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের চরভূমির উপর স্থাপিত। পূর্ব্বখ্যাত কাঞ্চনপল্লী কালের কুটিল গতিতে এখন গঙ্গাবক্ষে বিরাজ করিতেছে। বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ পাঠমালা গ্রন্থে দেখা যায় যে, কাঞ্চনপল্লী সেন শিবানন্দের পাট বলিয়া উক্ত আছে। শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই শিবানন্দের বাটিতে আগমন করিয়াছিলেন ও এখান হইতে শান্তিপুর অদ্বৈত মন্দিরে, পরে তথা হইতে নবদ্বীপে জননী দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেন শিবানন্দ নিজগুরু শ্রীনাথ আচার্য্যের নামে যে 'কৃষ্ণরায়' বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন, ঐ বিগ্রহ প্রথমে শ্রীনাথ আচার্য্যের দৌহিত্র শ্রীমহেশের নিজ বাটিতে থাকিতেন। ঐ বিগ্রহের পদ্মাসনে একটি শ্লোক খোদিত আছে।

কথিত আছে বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতপুত্র যশোহরজিৎ কচুরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দিল্লী দরবারে যাইবার কালীন কাঞ্চনপল্লী দিয়া গমন করেন,···কিন্তু যাত্রাকালে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইরূপ মানসিক করেন—'যদি এ যাত্রায় আমি ফতে হই, তাহা হইলে ঠাকুরের একটি শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিব।' সেবারে তিনি দরবারে সফল-মনোরথ হওয়ায় প্রত্যাগমন কালে পুনরায় কৃষ্ণরায়কে দর্শন করিতে এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির, দোলমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেন, এবং ঠাকুরের নিত্য সেবা নির্ব্বাহার্থ 'কৃষ্ণবাটি' নামে একখানি তালুক জায়গীর দেন, এখনও উক্ত তালুক তাঁহার সেবার্থ নিয়োজিত আছে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে ইহার বার্ষিক ২৮৶০ কর ধার্য্য করিয়া গিয়াছেন, পুরাতন কাঞ্চনপল্লী যখন গঙ্গার ভাঙনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন যশোহরজিতের নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। বর্ত্তমান শ্রীমন্দির যাহা ভারতীয় শিল্প-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, ১৭০৭ শকে১ কলিকাতার প্রসিদ্ধ নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের ব্যয়ে নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ সুন্দর-গঠন, সুঠাম মন্দির সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।"[২]

মন্দির নির্ম্মাণের বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর "কাঁচরাপাড়া, কবিকর্ণপুর" প্রবন্ধে লিখেছেন—"সেই মন্দির কালে গঙ্গাগর্ভে গত হইলে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার নিমাইচরণ মল্লিক ও গৌরবেণ মল্লিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।"[৩]

এই মন্দির নির্ম্মাণ উপলক্ষে তাঁরা যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, সে সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—"পূর্ব্বে কাঁচরাপাড়ায় সেন শিবানন্দের পাট ও তথায় শ্রীশ্রী৺ কৃষ্ণরায়জিউ নামক বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহারা এই দেবতার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বহু সমারোহে তাহার প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করেন। কথিত আছে তদুপলক্ষে কাঙালী বিদায়ে দুই টাকা করিয়া প্রতিজনকে দান করা হয়। এই দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ইহারা তত্রত্য এক খণ্ড ও একটি বাগান দেবত্র দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দেব-সেবার মাসিক ব্যয়ের বন্দনীও করিয়া যান।"[৪]

মন্দিরের গায়ে একটি পাথরের ফলকে গৌরচরণ, নিমাইচরণ ও

১। ইং ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে

২। নদীয়া কথা, পৃঃ ৩৪৯-৩৫০

৩। 'বঙ্গবাণী', চৈত্র, ১৩২৮, পৃঃ ১৭০। ৪। শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল বংশবল্লী, পৃঃ ২১।

৪। বঙ্গবাণী, চৈত্র ১৩২৮, পৃঃ ১৭১।

রাধাচরণের নাম এবং মন্দিরনির্ম্মাণের সময় লেখা আছে—"কুলাদ্রিবিন্দুসপ্তেন্দু সম্মিত" (১৭০৭) শক বৎসর অর্থাৎ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির নির্ম্মিত হয়।

মন্দিরটির প্রবেশপথ দক্ষিণ দিকে। তিন বিঘা জমির উপর ইহা অবস্থিত ; এ ছাড়া বাগান প্রভৃতি আরও ৪০ বিঘা আয়তন হবে। মন্দিরটি লম্বা ৬০ ফুট, চওড়া ৪০ ফুট ও উচ্চ ৭০ ফুট। দীনেশচন্দ্র সেন মন্দিরের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—"শুধু দরজা ছাড়া ইহাতে কাঠের কাজ কোথাও নেই। প্রকাণ্ড খিলানগুলি ও ছাদে কড়ি-বরগার সংস্রব নাই। অথচ তাহা বেশ সুদৃঢ় ও সুন্দর।"*

মন্দিরের সিংহদরজা ২টি ছাদওয়ালা, সামনে তিন-ফুকুরে ঠাকুর-দালান ও ৪ কোণে ৪টি পার্শ্বগৃহ। পশ্চাতে রান্নাবাড়ী, অনতিদূরে দোলমঞ্চ, ইহা দশ ফুট উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত; বর্ত্তমানে মন্দির হতে গঙ্গা এক মাইল এবং কাঁচরাপাড়া রেল ষ্টেশন থেকে দুই মাইল পথ। সিংহদরজার ডান দিকে টিনের চালা ঘর, এই স্থানে উৎসবের সময় যাত্রা ও থিয়েটার হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায়ের বিগ্রহ আসন একটি কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি অষ্ট ধাতু দিয়ে তৈরী। ঠাকুর সেবার ব্যয়ের জন্য নিমাই মল্লিকের ট্রাষ্ট ফাণ্ড হতে ২০০৲ ও রামমোহন মল্লিকের ট্রাষ্ট ফণ্ড হতে ২০০৲ টাকা, এই মোট ৪০০৲ টাকা বাৎসরিক দেওয়া হয়। ঠাকুরের নিত্য ভোগে পাঁচ সের চালের অন্ন দেওয়া হয় এবং সমাগত দরিদ্র অতিথিদের মধ্যে তাহা বিতরণ করা হয়। রথের সময় এখানে ৯ দিন উৎসব হয়। ঠাকুরের রথ পূর্ব্বে কাঠের ছিল, কিন্তু উহা আগুনে পুড়ে যাওয়ার জন্য বর্ত্তমানে একটি লৌহ রথ নির্ম্মাণ করা হয়েছে।

বাগের খালটি কাটা খাল, এ সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তা এই : "বাগের খাল নামক একটি কৃত্রিম নদী, ইহাকে মূল স্থান কুমারহট্ট (অধুনা হালিসহর) হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা যে কুমারহট্টের সঙ্গে একত্র ও সংযুক্ত ছিল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ বাগের খাল নামক খাল কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লী সংস্থাপনের অনেক পরে নির্ব্বাসিত মল্লিক সাহেব, তাহার বাসস্থানের গড়স্বরূপ বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধার জন্য ফুলিয়া গ্রামের (নদীয়া জেলার খ্যাতনামা কৃত্তিবাসের পল্লী রামায়ণ প্রণেতা জন্ম-ভূমি) নিম্নস্থ যমুনা হইতে ভাগীরথী পর্য্যন্ত প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তৃত একটি খাল কাটাইয়াছিলেন, বাগের খালের ইতিকথা।" এই মল্লিক সাহেব কেনই বা এখানে নির্ব্বাসিত হলেন ? তার ইতিহাস বড় কথা নয়! আর ঘোষ বাবুরা কেন এখানে বসবাস করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন ? সে অনেক কথা! কাঞ্চনপল্লীর ইতিহাসে দুটি পরিবার বিশেষ ভাবে জড়িত।

বর্ত্তমান কাঁচরাপাড়ার রেলওয়ে কলোনীর মধ্যে আর একটি কালী বিগ্রহ আছে, এই কালী বিগ্রহটি 'প্রসিদ্ধ ডাকাতে কালী' বলে প্রচলিত। বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সঠিক সময় নিরূপণ করা যায় না। তবে দেড় শত থেকে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এ অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলাকীর্ণ, লোকবসতি একরূপ ছিল না বললেই চলে। এখানে এক দল ডাকাত ঐ সময় এসে বাসা বাঁধে এবং পূজার জন্য তারা একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে। বট, নিম, কাঁঠাল এই তিনটি গাছ এখানে ছিল ২০ বছর আগেও এর অস্তিত্ব দেখা গেছে, এই গাছতলায় ডাকাতদল বাস করত ও দেবীর সন্তুষ্টিকল্পে দিত নরবলি। একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন সেখানে এবং ডাকাত সর্দ্দারকে বললেন, তোর নিজের ছেলেকে এনে বলি দে, অন্ধ ডাকাত সর্দ্দারের কথা অমান্য করে নি, নিজের হাতেই নিজের ছেলেকে বলি দিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। সন্ন্যাসী সেইদিন সেখানে থেকে গেলেন, পরের দিন ডাকাত সর্দ্দার এসে দেখতে পেল তার ছেলে জীবিত অবস্থায় খেলা করছে, তখন সন্ন্যাসীর কাছে স্বীয় পুত্র বলে দাবি করে এবং সন্ন্যাসী তখন তাকে নরবলি দিতে নিষেধ করেন এবং ছেলেকে ফিরিয়ে দেন। সেই থেকে নরবলি বন্ধ হয়।

মন্দিরের মধ্যে কালী, বিষ্ণু, বলরাম প্রভৃতি দেবদেবী আছে। এখনও এই দেবদেবীর নিয়মিত পূজা ও ভোগ হয়। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে এই মন্দিরে প্রচুর লোকসমাগম হয় তাই আজও এই আলুলায়িতকুন্তলা, নৃমুণ্ডমালা, তমোময়ী দেবী ডাকাতে কালী নামে খ্যাত। মন্দিরের এক বৃদ্ধ পূজারীর কাছ থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়—এর অতীত ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এবার উনবিংশ শতাব্দীর কথা আরম্ভ করা যাক। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাদেশের একজন সুসন্তান এই কাঞ্চন-পল্লী বা কাঁচরাপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। যাঁর প্রতিভায়, যাঁর চিন্তায়, যাঁর প্রচেষ্টায় পুরাতন যুগের অবসান ও নূতন যুগের সূচনা হ'ল—তিনি হলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইনি ১২১৮ সালে ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়া একদা বাংলাদেশের সংস্কৃতির উৎসস্থল ছিল, এই স্থানের প্রাচীন সংস্কৃতির সম্বন্ধে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁর "বাঙালীর সারস্বত অবদান" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন খাঁটি বাঙালী কবি ও সাংবাদিক। তাঁর "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকা সেই সাক্ষ্য বহন করছে। যে যুগে যখন সমস্ত বাঙালী ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ করে চলেছেন এবং বাঙালী নিজস্ব জিনিস ত্যাগ করে তাঁদের পিছু পিছু ছুটেছেন এমনকি বাংলা ভাষা জানি না বলে কেউ কেউ গর্ব্ব বোধ করতেন, সেই সব বিপথগামী দেশবাসীকে গুপ্ত কবি সংবাদ-প্রভাকরের পাতায় বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন তাই তিনি আজও বাঙালী মনোমন্দিরে উদয় আছেন এর জন্য কাঞ্চনপল্লীর অধিবাসীরা গর্ব্বিত। দীর্ঘ ১০০ বৎসর পরে, ১৯৫৭-৫৮ সনে, বাংলা দেশে তাঁর স্মরণে যে জয়ন্তী উৎসব ও অভিন্ন জায়গায় আলোচনা-সভা এবং জয়ন্তী কমিটি কর্ত্তৃক "স্মারকগ্রন্থ" প্রকাশ করা হয়েছে তাহা গুপ্ত কবিকে অধিকতর মর্য্যাদা দান করছে। কাঞ্চন-পল্লীতে (অধুনা কল্যাণী) ১৯৩০ সনে ঈশ্বরগুপ্তের একটি স্মৃতিস্তম্ভ

স্থাপিত হয় এই উপলক্ষে তৎকালীন "প্রবাসী" সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

"কাঁচরাপাড়ার পুরান' ইতিহাসে আজকের কাঁচরাপাড়ার চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না। শ্রীচৈতন্য-পুরাণে দেখতে পাই যে, কুমার হাট (অর্থাৎ হাবিলী শহর আধুনিক হালিশহর) সন্নান্ত অঞ্চল, তারই অন্তর্ভুক্ত ছিল কাঁচরাপাড়া। কাঁচরাপাড়া নাম নিয়ে আরও একটি প্রবাদ আছে। গ্রাম নাম কাঁচরাপাড়া বা কাঞ্চনপাড়া। আবার পশ্চিমাংশে বর্দ্ধমান জেলা বা রাঢ় অঞ্চলের লোকেরা একে 'কাতলা পাড়াও' বলে। কিন্তু আজও গ্রামের মধ্যে পুরুষপরম্পরায় একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে, কাঞ্চনপল্লী নামটি এর গৌরবসূচক নাম তার কারণ, প্রাক-চৈতন্য যুগে এবং পূর্ব্ব পাঠান যুগে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও বিচক্ষণ চিকিৎসকের বসবাস ছিল। সেইজন্য আদর করে লোকে কাঞ্চনপল্লী বলত। কাচনা নামে এক প্রকার ঔষধি ঘাস এখানে পাওয়া যায় এবং আজও ঐ ঘাস দেখা যায়। এই ঘাস কবিরাজি চিকিৎসার লাগে। এই কাচনা ঘাস থেকে কাচনা বা কালক্রমে কাঁচরা শব্দের উদ্ভব হয়। এ ত গেল একটা প্রবাদ, এ ছাড়া আর একটি প্রবাদ আছে যে, অনেক আগে এখানে সুবর্ণবণিকের বাস ছিল এবং স্বর্ণ রৌপ্য কেনাবেচা চলত। ওপারে বাঁশবেড়িয়ার সঙ্গে এদের যোগ ছিল। এদের ওজনের নিক্তি তৎনকার বাজারে প্রামাণ্য ওজন বলে গৃহীত হ'ত। এদের নিক্তির ওজনকে কাচনা বা কাঁচরা বলা হ'ত। সেই থেকে অঞ্চলটি "কাঞ্চনপল্লী" নামে খ্যাত। অবশ্য এটা ঠিক আজও বড়বাজার অঞ্চলে কাঁচরাপাড়ার ওজনের নিক্তি বলে ডাঁড়িপাল্লা বিক্রেতারা পরিচয় দেয়।"*

কাঁচরাপাড়া, হালিসহর প্রভৃতি নিয়ে থানার নাম হ'ল বীজপুর। এই থানার অন্তর্গত 'জেঠিয়া-মাঝিপাড়া' ইউনিয়ন বোর্ড। পল্লী অঞ্চলগুলির মধ্যে কাঁচনা, পলাশী জেঠিয়া, চাকলা, মাঝিপাড়া—সমগ্র গ্রাম প্রায় জরাজীর্ণ! কিন্তু একদা কাঁচরাপাড়ার পশ্চিমে গঙ্গা-নিকটবর্ত্তী ঘোষপাড়া ঐশ্বর্য্যে সম্পদে সমৃদ্ধশালী ছিল, পূর্ব্বপ্রান্তে এই গ্রামগুলিও অনেক সম্পদশালী ছিল। হরিণঘাটার পথে যে সুদৃশ্য পাকা রাস্তা কলকাতা হতে এসে চলে গেছে কৃষ্ণনগরের দিকে, তার একপ্রান্তে পলাশী গ্রাম আর মাঝিপাড়া যেখানে আজ নীলকুঠি ধরনের ভগ্নাবশেষ বাংলো দেখতে পাওয়া যায়। ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর নেতৃত্বে '২৪ পরগণা জেলা এগ্রিকালচার এসোসিয়েশানই নদীয়া প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে মাঝিপাড়ায় একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা হয় ১৯৩৮ সনে। তখন এই সামান্য দূরবর্ত্তী জায়গাতে কালাজ্বরের বীজাণু পাওয়া যায়। এখানেই বিখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ তারকনাথ দাসের বসতবাটী ও জন্মভূমি।

চাঁয়াপোল নামক গ্রামে একটি কৃষিক্ষেত্র আছে ইহার নাম "কাশীনাথ কৃষিক্ষেত্র।" শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য্য বহুদিনের চেষ্টায় এই কৃষিক্ষেত্রটি সরকারী সাহায্যে গড়ে তুলেছেন। দেশ-বিদেশ থেকে বহু গবেষকরা এখানে পরিদর্শন করতে আসেন। ইউনিয়ন বোর্ড অন্তর্গত একটিমাত্র উচ্চ বিদ্যালয় ও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, এ ছাড়া গ্রন্থাগার, চিকিৎসালয় আছে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিক আলো ও জলের ব্যবস্থা হয় নি, রাস্তাঘাটেরও বিশেষ উন্নতি হয় নি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এদের কোন বিশেষ উন্নতি হয় নি। তাই এখানকার জনসাধারণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার দেখা যায়।

কলিকাতা থেকে কাঁচরাপাড়ার দূরত্ব হবে প্রায় ৩০ মাইল ইহা ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। কাঁচরাপাড়া গড়ে উঠেছে রেলওয়ে ওয়ার্কশপকে কেন্দ্র করে—সুন্দর রাস্তা, ছোট-বড় বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী, রাস্তায় প্রচুর আলো, হাসপাতাল, রঙ্গমঞ্চ, গ্রন্থাগার, ষ্টেডিয়াম প্রভৃতি রেল কলোনির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। রেলওয়ে কারখানায় প্রায় ৮.১০ হাজার লোক কাজ করে। বগি ও ওয়াগন সারান ও তৈরি, ইঞ্জিন মেরামতি প্রভৃতি কাজ এখানে হয়; এখানে বাঙালী ও অবাঙালী দুই সম্প্রদায় লোক কাজ করে।

কাঁচরাপাড়া পৌরসভা স্থাপিত হয় ১৯১৭ সনের ১লা অক্টোবর। ইহার আয়তন ৩'৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১৯৫১ সনের গণনা অনুযায়ী ৫৬,৬৬৮ জন। ইহার মধ্যে উদ্বাস্তু ২০,৫২৬ জন। দেশ বিভাগের পর কাঁচরাপাড়ায় প্রচুর লোকসমাগম হয় ও যে সব জায়গা জঙ্গলাবৃত ছিল সে সব জায়গা লোকবসতি হয়ে যায় এবং প্রচুর দোকান, ব্যবসার নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক সঙ্কট পরিত্রাণের জন্য নানারূপ সমিতি ও সমবায় সমিতিও গঠিত হয়। ষ্টেশন রোডে প্রচুর বিপণি-সম্ভার রাস্তাকে জমকালো করে রেখেছে। পাড়াগুলির নাম অদ্ভুত—'নীচুবাধা', 'ওয়ার্কশপ পাড়া', 'সাউথ কলোনি', 'জনপুর', 'ক্রিপার কলোনি', 'বাবু কলোনি' 'মুরগী পাড়া' ইত্যাদি। মনে হয় না এই বাংলা দেশ! অথচ এই কাঁচরাপাড়ার প্রাচীন বাংলার একটি ঐতিহ্য আছে, সংস্কৃতির পরিচয় আছে। দু'দিন পরে হয়ত এ কথাও অনেকে ভুলে যাবে। রেল কলোনীতে যে সব স্কুল বা ইনষ্টিটিউট আছে তা এখনও সাহেবের নামে। দেখলে মনে হয় ওরাই যেন আমাদের সভ্য করেছে, যেমন 'হ্যারনেট হাই স্কুল', 'হাইওয়ার্ড ইনষ্টিটিউট', রেল ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি। তাই খণ্ডি খণ্ডি করে তাদের নাম গৌরবোজ্জ্বলে লিখে রেখেছে—ভবিষ্যতের কাছে চিরস্মরণীয় করে তুলে রাখবে বলে? কাঁচরাপাড়ায় মোট ৬টি ছেলেদের উচ্চ বিদ্যালয় ও ২টি মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি মেয়েদের জুনিয়র (Class VIII) বিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বেসরকারী একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও প্রসূতি-সদন আছে কিন্তু ইহা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম। ছোটখাট

---

* ব্যারাকপুর মহকুমা সমিতির প্রচারপত্র ৮ হইতে উদ্ধৃত

গ্রন্থাগার কয়েকটি আছে যেমন 'প্রগতি পাঠাগার', 'বিপিনস্মৃতি পাঠাগার', 'নেতাজী ক্লাবের পাঠাগার', 'হলডিং ইনষ্টিটিউট' 'উদয়ন সঙ্ঘ', 'ফ্রী থিংকারস এসোসিয়েশন', 'মনিমেলা', 'সব পেয়েছির আসর' ইত্যাদি শিক্ষামূলক ও সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আছে। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা এখানে গত ১০।১২ বৎসরে অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার সুরু ও সমাপ্তি অবশ্য স্মরণীয়। যে কারখানার খবর পাওয়া গেল তার মধ্যে 'সোনালি পত্র', 'প্রদীপ', 'দরদী', 'মর্ম্মবাণী', 'ব্রতী' ইত্যাদি এর সবগুলিই বন্ধ হয়ে গেছে তবে বর্ত্তমানে 'জাগরণ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে (১৫।১২।৫৮)। জানি না এর আয়ুষ্কাল কত দিন?

দেশ বিভাগের পর কাঁচরাপাড়ার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তন হয়েছে। যে সকল নূতন মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এসেছেন তাঁদের সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নৈতিক পরিবর্ত্তন এসেছে। যাঁরা পূর্ব্ব-বাংলায় চাষ-আবাদ নিয়ে ছিলেন, তাঁদের অনেকে এখন চাকরী ও দোকানদারী আরম্ভ করেছেন। তা ছাড়া রাজনৈতিক আঘাতের দরুন মানুষ বাঁচার জন্য নূতন পথের সন্ধান খুঁজে বেড়াচ্ছে। পূর্ব্ব-বাংলার বহুলোক আসাতে কুটীর-শিল্পের ও ছোটখাট শিল্পের হয়েছে উন্নতি যেমন, মাদুর, পাটি, মুলিবাঁশের বেড়া, কাঠের জিনিষ ইত্যাদি শিল্পগুলি প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে এবং মানুষের প্রয়োজন ও আয়ের পথ কিছু মিটেছে। এ ছাড়া চাষী, কামার, কুমার, জেলে প্রভৃতি জাতীয় কাজ অনেক বেড়েছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্য কয়েকটি কলোনী তৈরি করা হয়েছে যেমন 'বাগের মোড় কলোনী', 'মিলন-নগর', 'গান্ধী-নগর', 'দেশবন্ধু নগর', 'শহীদ-নগর' ইত্যাদি। এ ছাড়া বিক্ষিপ্ত ও ভাড়াটে বাড়ীতে বহু নবাগতরা বসবাস করছেন।

কাঁচরাপাড়ার সামাজিক পরিবেশ তত ভাল নয়। নানা দেশের লোক এক জায়গায় হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে এখনও ঐক্য গড়ে নি। এখানে একটি পৌরসভা আছে—এর কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চললে এই ঐক্যবোধ বাসিন্দাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ হওয়া সম্ভব।

উপনিষদ মালা

শ্রীপুষ্প দেবী

আপন হৃদয়ে জিজ্ঞাসি যবে
সুখী তুমি কারে লয়ে?
আপনারে ছাড়া আর কারে নহে
কহিল সে নত হয়ে।
আপনারে শুধু কেন্দ্র করিয়া,
মোর ভালবাসা পড়ে যে ঝরিয়া
আপনার জনে ভালবাসি তাই
আত্মকেন্দ্র মোহে,
আপনার প্রতি ভালবাসা মোর
অন্যের প্রতি নহে।
বিস্মিত আমি সত্য উক্তি
কহিল সে নির্ভয়ে!
প্রতিটি শিরার প্রতি তন্ত্রীতে
এই ভালবাসা বহে।
আপনার সেই প্রতিবিম্বতে
প্রেম ধায় মোর খুঁজি সেই পথে
আত্মকেন্দ্র আত্ম প্রীতিতে
ভরে ওঠে মোর মন।
অশ্রু ধারায় ব্যথিত হৃদয়ে
খুঁজি মোর হারাধন।

কোথা সেই জন আপন হইতে
যে জন আপন মোর?
যাহা কিছু মোর সকল জড়ায়ে
বাঁধা যার প্রেম ডোর।
আমার মনের যত ভালবাসা
বিরহে মিলনে যত কাঁদাহাসা
যা কিছু আমার দুঃখ বেদনা
সব ভার যেই লহে,
মোর হৃদয়ের যত কিছু প্রেম
তাঁরি পানে যাক বহে।
তাঁহারে চিনিলে আর ত থাকে না
কোন কিছু নাহি চেনা।
সেই অজানারে জানিলে পরেতে
সকলি যে যায় জানা।
সেই যে সবার আসল আপন
হৃদয় আসনে রাজে যেই জন
তাঁহারে পাইলে দেখিবে তখন
সকলেরে তাঁরি মাঝে
একটি প্রেমের বিশাল পথেতে
হারান মুক্তি রাজে।

বৃহ ২.৪.৫ ও ৪.৫.৬

অলসমায়া

শ্রীচিত্রিতা দেবী

বিহ্বল হয়ে বসেছিল কুমার. এসব জায়গায় আগে বেশী আসে নি ও। সময়ই হ'ত না, পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হ'ত সারাক্ষণ। বিলেতে এসেই প্রথম দিকে অশোক, সুধীর, বিনয়দের পাল্লায় পড়ে একটা স্কুলে নাচ শিখতে সুরু করেছিল। তার পরে মৌরিদের দলে পড়ে ছাড়তে হয়েছিল সে পাঠশালা। স্কুলে গিয়ে নাচ শেখার কথা বলে ফেলে একদিন হাসির ধাক্কায় বেশ কিছুক্ষণ নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছিল কুমারকে।

স্কুলে গিয়ে অত সিরিয়াসলি কি শিখছ তুমি? ব্যালে না ট্যাপ ড্যান্সিং।

কুমারকে সেদিন যথেষ্ট অপ্রস্তুত হতে হয়েছিল। অবশ্য মৌরিরাও যে না নাচত তা নয়, তবে তার মধ্যে সবটাই মজা, এমনকি শেখার অংশটুকুও। এক-একদিন ঘরের টেবিল-চেয়ার সরিয়ে খালি মেঝেতে নাচ হ'ত রেকর্ড বাজিয়ে, আর হাসির ঘণ্টা বাজত সকলের গলায়। সে ছিল শুধু খুশী মনের খেলার নাচ।

এদের দেশে নাচ সুরু হয় ছোটবেলা থেকে। নিজেদের বসার ঘরে, বাপ-মা, ভাইবোন সকলের সঙ্গে মিলে। কিংবা স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে।

কুমারের মনে পড়ল, মাঝে মাঝে নাচের পার্টিতে ও যে না গিয়েছে এমন নয়। কিন্তু সেগুলির পরিবেশ ছিল ভারী চমৎকার। কিন্তু এ রকম জায়গায় বন্ধুদের পাল্লায় পড়েও এসেছে বলে মনে হ'ল না।

শূকর মাংসের মোটা স্যাণ্ডউইচ আর বিলিতী সিঙারা নিয়ে এল রঙ্গিনী পরিবেশনকারিণী। গেলাস ভরে এল সোডামিশ্রিত জনি ওয়াকার।

"খুব হালকা করে এনেছি।" মিষ্টি করে হাসল সাকী। —"এইটেই এ সময়ের একমাত্র ওষুধ, পিও আর পিও। আমি আবার এসে তোমার তদারক করে যাব।" ভুরু নাচিয়ে চলে গেল সে।

খাওয়া শেষ করে, গরম ঘরে আরামে বসে চুমুকে চুমুকে সুরা পান করে, কুমারের জমে যাওয়া রক্তে উত্তেজনার পোকারা শিরশির করে উঠল। বিলেতবাসের সেই প্রথম পর্বের স্বল্পশেখা নাচের তাল ওর মনের মধ্যে উঠে-পড়ে, হঠাৎ আধুনিক আমেরিকান সঙ্গীতের সুর ঝঞ্চনায় দিকভ্রান্ত হয়ে গেল।

খাওয়া শেষ হ'ল, পানীয় শেষ হ'ল, তবু ওর তৃষ্ণা মিটল না, শুষ্কপ্রাণ কামনা করল এক গেলাস জল। তার বদলে দ্বিতীয় পাত্র পূর্ণ করে সুরা নিয়ে এল নারী। মনকে বোঝাল কুমার—এই ভাল, দুধের সাধ ঘোলে না মিটলেও ঘোলের সাধ হয় ত দুধে মেটে।

মনকে ট্রেইন করবে ঠিক করল কুমার, খুব তরল ট্রেইনিং। জলের তৃষ্ণা মিটাবে হুইস্কিতে। অনেক দূরে মিলিয়ে আছে বাবার বিরক্ত ভ্রূকুটি, মায়ের চোখের পাতার ঘনায়মান শঙ্কার ছায়া সরে গেছে। আছে শুধু আলো আর রং আর উত্তেজনা। চঞ্চল স্নায়ুরা অবশ হয়ে আসে। বাজনা নয় ত যেন অস্ত্রের ঝনঝনা। সুরে সুরে মত্ত কোলাহল। তারই তালে তাল মিলিয়ে, পায়ে পায়ে পা জড়িয়ে, জুতোর হীল-খটখটিয়ে রঙের ঘূর্ণী ঘুরছে সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে।

ওরা যেন মানুষ নয়, ঘর-সংসারের দিনরাতের বোঝা-বওয়া যে মানুষ। ওরা যেন কামনার ঝড়। তীক্ষ্ণ অদৃশ্য কমনারা যেন ঝাঁকে ঝাঁকে রূপ ধরে নাচছে। প্রথমে আস্তে আস্তে, ক্রমশঃ অন্যমনস্ক দ্রুত চুমুকে বেশ কয়েক পাত্র স্কচদেশীয় বারুণী পান করল কুমার। অবশ স্নায়ুরা রিম্ রিম্ করে উঠল। মদিরাবাহিনী সাকী এসে প্রশ্ন করলে "আর চাই"?

—"নিশ্চয়ই, আরও আরও অনেক অনেক,"—তার তারাজ্বলা চোখের ভিতরে মত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কুমার হো হো করে হেসে উঠল। বলল, "নাচবে সখি?"

—"তুমি নাচবে?" এবারে হাসির পালা সাকীর,—বললে "তুমি নাচ জান নাকি? কোথায় শিখেছ?" কুমারের গলার ভিতর থেকে কোন মাতাল বলে উঠল। "আজ শিখব তোমার কাছে?"

—"শেখাতে পারি, প্রতি লেসন্ পাঁচ শিলিং।

—"বহুৎ আচ্ছা", ওর কাঁধ ধরে উঠে দাঁড়াল কুমার।

—"একি তোমার পা টলছে, তুমি অসুস্থ।" বিব্রত গলায় একটু চেঁচাল সাকী।

—"নিশ্চই অসুস্থ," কুমার তার বক্তব্য প্রমাণ করে ওর হাত ধরে একটু টানল, বলল,—"নিশ্চয়ই, নইলে এখানে আসব কেন।"

—"সাট্ আপ ইউ পিগ্", চেয়ারের উপরে ওকে জোর করে ফেলে দিয়ে ফিরে গেল নটী," ভরাপাত্রটা পড়ে রইল টেবিলে, সেদিকে আর হাত বাড়াতে ইচ্ছে হ'ল না কুমারের। চেয়ারের উপরে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে দিল। নৃত্যবিরতির অবকাশ ভরিয়ে দিল শূন্য চেয়ারের অবকাশগুলি।

কুমারের পাশের চেয়ার যে এসে বসল, তার দিকে তাকিয়ে কুমার অবাক হয়ে গেল। লোকটিকে কোথায় কবে দেখেছে কিছুই মনে নেই। কিন্তু তার ভাবভঙ্গী নিতান্ত পরিচিত। মনে হ'ল নিশ্চয়ই কুমার তাকে ভাল করেই চেনে, শুধু এখন মনে পড়ছে না—তাই অপরিচিতের রক্তবর্ণ মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল কুমার।

—"তুমি সেই জুনির ভারতীয় ভাড়াটে না?" বললে লালমুখাধিকারী।

—"হ্যাঁ, তাই বটে, কিন্তু তুমি কে?"

—"আমি? তার বিযুক্ত স্বামী—এই আমার প্রধান পরিচয়।"

কুমারের ঝিমঝিমে মাথায় সবটা ঢুকল না। বললে, —"তুমি জর্জ বার্কার?"

—"না, আমি ডেভিড পিয়াস'ন, তার প্রথম স্বামী।"

—"ওঃ তাই এত চেনা লাগছিল। এগারো বছরের কিশোর জনের সঙ্গে তার যৌবনোত্তীর্ণ পিতার কি অদ্ভুত মিল।"

অবাক হয়ে কুমার বললে, —"তুমি আমাকে চিনলে কি করে?"

—"তোমাকে দেখেছি বলে, জুনির ভাড়াটে এবং প্রেমিক।"

—"কি করে দেখলে?"

—"জুনি প্রায়ই ঝড়ের মত আমার ঘরে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ গর্জন করে আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে জানলা দিয়ে তোমাকে দেখায়। বলে, তুমি নাকি তাদের সংসারে অর্দ্ধেকের বেশী খরচ দাও।

—"কি আশ্চর্য, হবেও বা, কুমারের অবিন্যস্ত মস্তিষ্কে সেই পুরণো প্রবাদটা ভেসে উঠল—স্ত্রিয়াংশ্চরিত্রং…ও বললে,—"তুমি ত শুনেছি কাছাকাছিই থাক।"

—"ঠিকই শুনেছ, সেই জন্যেই ত হরদম এসে আমাকে তার ঐশ্বর্য দেখাতে নিয়ে যায়।"

—"তুমি যাও কেন?"

—"মজা দেখতে।" বিভ্রান্ত মাথায় কুমার ভাল করে বুঝতে পারল না, মজাটা কি।

জুনির প্রথম স্বামী বললে,—"এখন শেষ মজাটা দেখবার আশায় আছি। ওর দ্বিতীয় স্বামীকে নিয়ে কেমন করে ঘরকন্না করে সেইটে দেখবার আশায়।"

একটু ভেবে কুমার বললে,—"অর্থাৎ জর্জ বার্কার। সে কবে আসবে জান নাকি?"

—"তুমি বুঝি তাকে কখনও দেখ নি?

—"আমি? আমি কি করে দেখব? সে ত শুনছি 'জামাইকা'তে প্র্যাকটিস করছে, মানে ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ-এ।"

—"হো হো হো হো করে হেসে উঠল ডেভিড পিয়ার্স'ন। কুমারের জন্যে আনা গেলাসের শেষটা একচুমুকে পান করে ডেভিড বললে,—"জর্জ বার্কারকে দেখতে চাও ত তাকিয়ে দেখ। আজ তোমার কপালগুণে জুনির দুই স্বামীকেই একসঙ্গে দেখতে পাবে।"

ডেভিডের নির্দেশমত তাকাল কুমার। মোহিত সরকারের সেই বর্ষীয়সী লেডী বান্ধবী, যার কালো রঙের সুপার স্নাইপে করে মোহিত ইংলণ্ড ঘুরেছিল।

—"কি আশ্চর্য, এই পাড়ায় এত রাত্রে একজন বর্ষীয়সী অভিজাত ঘরণী একজন লম্বাচওড়া খাস জামাইকানের সঙ্গে নাচতে আসবে, একি সম্ভব।"

—"কেন আসবে না," পিয়ার্স'ন বললে,—"অভিজাতঘরে ওর দিন ফুরিয়েছে,অর্থাৎ সুখ ফুরিয়েছে, অর্থাৎ সেখানে আর ওর খাদ্য নেই। বুড়ি চিরজীবন অনেক খেয়েছে, তবু এখনও ওর খিদে মেটে নি। তাছাড়া কালো রঙের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। তাইত জুনির এখন ভারতীয় অথবা নিগ্রোনীজ যে কেউ হলেই হয়,—জর্জ যখন আসছেই না।"

"বাজে কথা", কুমার বলে, "শ্রীমতী বার্কার আমার সঙ্গে অন্ততঃ কোনদিন ভাব জমাতে আসে নি। সে যাই হোক্, জর্জ বার্কার লণ্ডনে এসেছে অথচ জুনির কাছে নেই?"

—"না, আমি জানি, ও ওই লেডী রিচার্ডের বাড়ীতেই আছে।"

—"শুনেছিলাম, জর্জ বার্কার দেশে আছে, আর তার বুড়ীমা তার ঘর দেখাশোনা করছে।"

—"হুঁঃ, বুড়ীমার সঙ্গে আরও কেউ আছে ধরতে পার, ওর চার বউ।"

মদ্যপ্রভাব ওর ভাষায় জোয়ার এনেছে বুঝতে পারল কুমার। নইলে এত অপরিচিতের সঙ্গে এত গল্প ইংরেজ করে না।—"দুটো কাল আর দুটো সাদা, ডেভিড বলে,"একটাকে ডিভোর্স করেছে, আর দুটো আন-অফিসিয়াল দেশে আছে। এখানে ওই জুনি আর এই ত দেখছ।"

তাই'ত দেখছে সত্যি। জর্জ বার্কারের চেহারায় তার দেশীয় ছাপ পুরোমাত্রায় বর্তমান। রঙ কালো, তবে একেবারে পালিস-করা নয়, পুরু ঠোঁট আর ঘনকুঞ্চিত মোটা চুল। লেডী রিচার্ডস ওর মধ্যে' কি এমন দেখতে পেয়েছে? কিই-বা দেখেছে জুনি বার্কার, যার জন্যে এমন সুপুরুষ স্বামীকে ছেড়ে ওর চার প্রিয়ার অন্যতমা হতে গেল। ওর চেহারায় কোন অন্তর্নিহিত মাধুরীর ছাপ দেখতে পেল না কুমারের শিল্পরসিক চোখ। নেহাৎই একটা খুব মোটা রকম ভাব। যার একমাত্র নাম দেওয়া যেতে পারে ভালগার—এমন একটা অদ্ভুত অশ্লীল ভঙ্গি বেশী দেখা যায় না।

আশ্চর্য্য! কুমার ভাবে, আর সাইফুনের ভিতর থেকে সোডার ফেনা উপচে উপচে পড়ে। বোতলভরা মাদকতা মেশে তার সঙ্গে। ডেভিড পিয়ারসন বলে চলে। তার গল্প তার জড়ানো কথার ধাক্কায় হোঁচট খেতে খেতে বেরিয়ে আসে। মাঝে মাঝে চুপ করে যায় পিয়ারসন, নেশায় বুঁদ হয়ে বসে থাকে। আবার সুরু করে তেমনি অর্ধোচ্চারিত ভঙ্গিতে। কষ্ট করে তার মানে বুঝতে বুঝতে কুমারের নেশা অনেক কমে এল।

লম্বাচওড়া প্রকাণ্ড জর্জ বার্কার তার প্রায় সমমাপের পঞ্চান্ন বছরের প্রণয়িনীকে নিয়ে নাচছে, হাতে হাত, পায়ে পা ঠেকিয়ে প্রেমিকের ভঙ্গিতে নাচছে। সেদিকে তাকাতে কেমন যেন ঘৃণা হ'ল কুমারের। মনের ভিতরটা রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, কবে আমাদের সেই হিন্দুস্থান রোডের দোতলার ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় মাদুর পেতে বসব। ভাবতে গিয়ে মুহূর্তে যেন কলকাতার নীলাকাশ ভরা সমস্ত রোদ আর খুশী আর হাওয়া ওর সর্বাঙ্গে হুড়মুড়িয়ে পড়ল।

পিয়ারসন বলছে,—"জুনিকে আমি ভালবাসতাম জান? ওকে যখন প্রথম দেখি, তখন ওর শরীরে আঠারো বছরের মায়া। সে কি সুন্দর, যেন স্বপ্ন। এতদিন ভুলে গিয়েছিলাম, আজ আবার ওর সেই চেহারা মনে পড়ছে। বোধ হয় আজ আমার মৃত্যু হবে, তাই।"

—"প্রেমের তুমি কিছু জানো? কাউকে ভালবেসেছ? ডেভিড বলে, জুনিকে? "আরে ছিঃ, সে জুনি আর এ জুনি? সে মানুষ কি এই মানুষ? আরে না, এ তার নামধাম চুরি করে নিজের বলে চালাচ্ছে—এ চোর। আমি যাকে ভালবেসেছিলাম, সে ছিল মূর্তিমতী সৌন্দর্য—স্বর্গের কামনা। এক দিন বসন্তের বিকেলে, ফুলেভরা গোলাপকুঞ্জের ছায়ায় আমি তাকে প্রেম নিবেদন করেছিলাম, সে হাসি দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে গিয়েছিল।"

চমকে উঠল কুমার, গল্পের এইটুকু তার জানা আছে—কবে যেন শুনেছিল। ওঃহো, সেই জ্বরের দিন, মৌরির সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রাক্কালে। সেদিন প্রথম পরিচ্ছেদটা শুনেছিল জুনির নিজের মুখে, আজ শেষটা শোনা যাক তার স্বামীর কাছে।

নড়ে-চড়ে উঠে বসল কুমার, এতক্ষণে উৎসুক হয়ে বললে,—"তার পরে?"

—"তার পরে? তার পরে জুনির হাসির ধাক্কায় আমি ঠিকরে চলে এলাম পুরনো জীবনের রুটিনে। দিনের বেলা কাজ, সন্ধ্যেবেলা সিনেমা দেখা আর রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়া। হঠাৎ একদিন রাত তিনটের সময় ঘরের বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি খুব রেগে গালাগাল দিতে দিতে দরজা খুলে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে আমার দিনরাতের একটিমাত্র স্বপ্ন। ভয়ে ও উত্তেজনায় তার দেহ কাঁপছে। আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। মুহূর্তে সেই হাতের উপরে ও ছেড়ে দিল নিজের ক্লান্ত দেহের ভার। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে ঘরে এনে বসিয়ে দিলাম একটা সোফায়। ও বসে পড়ে আমার দিকে একটা চাবী বার করে ছুঁড়ে দিল। শ্রান্ত গলায় বললে, 'বাইরে আমার গাড়ী খোলা পড়ে আছে।'

—"বুঝলাম ওর বাবার গাড়ীটা নিয়ে সারারাত ড্রাইভ করে এসেছে। কিন্তু কেন? আমাকে ওর হঠাৎ এত কি প্রয়োজন পড়ল? নিজেই একদিন আমার ঠিকানা চেয়ে রেখেছিল বটে, কিন্তু এত শীঘ্র তার প্রয়োজন হবে ভাবি নি।

—"আমি বললাম, 'আমাকে একটা ফোন করে দিলেই ত আমি ছুটে যেতাম। এত রাতে এমন ড্রাইভ করে আসা এ যে মস্ত রিস্ক।'

—" 'হুঁ, রিস্ক বটে, তবে না নিয়ে আমার উপায় ছিল না।'

—ও রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করে বলল। আমি শ্লটে পয়সা দিয়ে ঘরে গ্যাসের আগুন জ্বাললাম। তার পরে এসে ওর পাশে বসে বললাম, 'তোমার জন্যে কি করতে পারি জুন? কি করলে তুমি খুশী হও?' ও চেয়ারের হাতলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, আর দুঃখে আমার যাকে বলে বুক ফেটে যেতে লাগল। কান্না আমার গলায় আটকে আটকে কথা বন্ধ করে দিল। আমি নিঃশব্দে ওর পিঠে হাত বুলাতে লাগলাম।"

অন্যমনস্ক হয়ে গল্প শুনছিল কুমার, এ কথায় ফিরে তাকাল। ওর চোখে তীব্র চোখ রেখে বুঝতে চাইল—এ কি সত্যি? এই ছন্নছাড়া মাতাল মানুষটাই কি ওই রূপকথার প্রেমিক? কুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। গল্পের কথক যে স্বয়ং তার নায়ক, একথা ঐ ক'টা তুচ্ছ

নাম আর স্মৃতির মালার ফাঁকেই আটকে আছে। আর কোথাও তার অবশিষ্ট নেই।

একথা কি তা হলে সত্য যে মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে জন্মায় আর মুহূর্তে মুহূর্তে মরে। তা হলে এক মাস আগেকার সেই প্রেমিক আর শিল্পরসিক কুমার কি আজও বেঁচে আছে? এই যে মানুষটা এই মুহূর্ত আগে পঙ্কিল রসিকতায় পানশালার দাসীকে পর্যন্ত বিরক্ত করে তুলেছিল, তার মধ্যে? আছে বৈকি, আজও বেঁচে আছে বলেই কুমার এখুনি পালিয়ে যেতে চাইছে, অনেক দূরে, অনেক দূরে—যেখানে শুধু হাওয়া আর আলো-আঁধারের রহস্য, যেখানে শুধু স্তব্ধতার সুর, দুঃখ যেখানে মিথ্যা, সুখ যেখানে তুচ্ছ, মৃত্যু যেখানে আনন্দ। কিন্তু সাহস নেই, কুমারের সেখানে যাবার সাহস নেই। এই মুহূর্তেই দুই পদক্ষেপে সে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, যেখানে আকাশ জুড়ে পুষ্পবৃষ্টি করছেন দেবতারা, মৃত্যুর তুষার পুষ্প।—তার শুভ্র পবিত্র দীপ্তির ছটায় কুশ্রী কালো লণ্ডন শহরটাও শঙ্করের ভস্মলিপ্ত ললাটের মত মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তার উপরে মৃদু চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ আলো। কিন্তু সেখানে যেতে সাহস নেই কুমারের। জড়িয়ে আছে দেহে মনে অনেক দুঃখের বাধা, ভয়ের নিষেধ। তাই এই বদ্ধঘরের রুদ্ধ বাতাসে বসে বসে হাঁপধরা প্রাণকে নিষ্পেষিত করতে হবে। পান করে যেতে হবে গেলাসের পরে গেলাস জ্বালাময়ী তৃষাহারিণীকে। যত পান করবে, তত আরও বাড়বে তৃষ্ণা, বুকে জ্বলবে অগ্নিকণা। দেহ, মন ছুটে যাবে ইচ্ছার বন্ধন মুক্ত হয়ে, মানবে না শাসন। আজ বসে বসে তিল তিল করে সেই কুমারের মৃত্যু ঘটাবে কুমার। তার পরে কাল যখন নতুন আলোয় নতুন পৃথিবী জেগে উঠবে, তখন দেখবে কুমার, সেই নবজন্মে যে মানুষ বেঁচে উঠবে, সে কোন্ মানুষ, সে নিশ্চয়ই তার চিরকালের চেনা সুখস্বপ্নের মানুষ, যাকে মৌরি ভালবেসেছিল। আজকের এই দুঃখাভিভূত আচ্ছন্ন চৈতন্য জীবের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। কোন্ দার্শনিক কবে বলেছিল, সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে আচ্ছন্ন চৈতন্যের প্রদোষে, ভ্রষ্টচেতনার আকাশে। কেন চেতনা সত্যভ্রষ্ট হয়, কেন সে ঢাকা পড়ে কুয়াশার অন্ধকারে। যদি তাই সত্যি হয়, যদি সৃষ্টির প্রকাশ হয় অন্ধকারে, জগতের বিকাশ হয় ভ্রান্তিতে, তবে সত্য কি? অন্ধকার না আলো?

মদ খেলে নাকি অনেক সময়ে মাথার ভিতরে তত্ত্বকথারা সব গজগজ করে ওঠে—শুনেছিল কুমার অনেক অভিজ্ঞের কাছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই কথা।

হেসে উঠল আপন মনে—কে জানে, হয় ত এই সংসারটাই কোন্ মাতালের মত্ত কল্পনা। তা নইলে এই জগৎজোড়া অসঙ্গতির ব্যাখ্যা সম্ভব কেমন করে।

দু'হাতে দু'গেলাস ভরে নিয়ে এসে কুমার একটা পিয়ারসনকে দিল। 'অন্য পাত্রে চুমুকের পর চুমুক দিয়ে কুমার একবার হো হো করে হেসে উঠল—একটা অত্যন্ত নাটকীয় হাসি, ওর হাসির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল পাশে রাখা একটা গেলাস।

পিয়ারসন বললে,—"জুনি আমার দিকে ফিরে বলল, 'ডেভিড, তোমার কাছে ভিক্ষা আছে?'

"'ভিক্ষা? আমার কাছে? ভেবে দেখ ছোকরী, আমার সর্বস্ব যার হাতে দিয়ে বসে আছি—তাকে আবার কি ভিক্ষা দেব? আমি বিমূঢ়ভাবে ওর দিকে তাকালাম। সে বললে, 'আর কিছু চাই না, শুধু একটা নাম ভিক্ষা দাও আমাকে, মাত্র একটা নাম, তোমার নাম—পিয়ারসন। জুন পিয়ারসন।'

—'বল কি? জুন, জুন, তুমি চাইতে এসেছ না দিতে এসেছ?'

"হঠাৎ শেষ রাতে ঘুম ভাঙিয়ে ভিক্টোরিয়াকে নাকি শোনান হয়েছিল তার রাণী হবার খবর। আমার জন্যে জুন যে খবর নিয়ে এল সে তারও চেয়ে দামী।

"এত কথা আমি কিন্তু বলতে পারি নি সেদিন, হাসতেও পারি নি ভাল করে, শুধু বিহ্বল ভাবে চেয়েছিলাম। আর আমার চোখের সামনে নবযৌবনা মেয়েটা তার ভরা দেহ চেয়ারে লুটিয়ে কান্নায় ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। ও এসেছিল আমার কাছে নাম চাইতে। যে নাম দেবার জন্যে, আমি এতদিন হাত বাড়িয়ে বসেছিলাম সেই নাম। কিন্তু শুধু ওর নিজের জন্যে নয়, ওর গর্ভে ছিল অন্যের সন্তান, তার জন্যে।"

এই পর্যন্ত বলে পিয়ারসন চুপ করলে। ডিক্যাণ্টার থেকে আরও পানীয় পাত্রে ঢেলে কুমার বললে,—"বল, বল, তার পরে?"

—"তার পরে?"

গুমরে উঠল পিয়ারসনের গলা,—"তার পরে, আমি তিন দিনের মধ্যে ওকে বিয়ে করলাম। এ তিন দিন ওকে যত্ন দিয়ে ঘিরে রইল আমার ভালবাসা। কিন্তু ওর দেহের মধ্যে অজাত অসহায় মানবসন্তান আমার বিকৃত ঈর্ষার অদৃশ্য উত্তাপে দগ্ধ হতে লাগল।

—"তিনদিন প্রবল মানসিক চেষ্টায় নিজেকে কোনমতে স্থির রেখেছিল জুন। বিয়ের পরেই তার সমস্ত জোর শিথিল হয়ে গেল, নাম সই করে খাতার উপরেই ঢলে পড়ল জুন। রেজেষ্ট্রী আপিস থেকে সোজা নিয়ে যেতে হ'ল হাসপাতালে।

পাঁচ ঘণ্টার মোটর ড্রাইভ এবং প্রবল মানসিক উত্তেজনায় ওর প্রথম শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগেই এ জন্মের দায় ঘোচাল। তখনকার দিনে এত অবৈধ সন্তানের রেওয়াজ হয় নি। সমস্ত ব্যবস্থা করতে আমার অনেক হাঙ্গামা হ'ল, অনেক লজ্জা পেতে হ'ল আত্মীয়-বন্ধুদের আছে। তার উপরে জুনি তার অসুস্থ ক্ষীণ দেহে প্রতিদিন নূতন লাবণ্যের প্রভা বিকীর্ণ করে আমার সামনে জেগে রইল।

—কিন্তু ডাক্তারের নিষেধে এক বছর ওকে ছুঁতে পারলাম না।

—ক্রমে আমার ভালবাসা শুকিয়ে এল। সেই কোমল ফুলের মত ভালবাসা, যার মিঠে মিঠে, নরম নরম রঙে আমার আকাশ ভরে ছিল, তা শুকনো পাতার মত বিবর্ণ হয়ে উঠল, আর তাতে জ্বলে উঠল আদি কামনার আগুন। আমি তখন এত মদ খেতে শিখি নি, তবু আমার রক্ত মাতাল হয়ে উঠল।

—"আমি ওর সমস্ত রস নিংড়ে নিংড়ে পান করতে চাইলাম। ডাক্তারের নিষেধ ওর কাছে আশীর্বাদ ছিল। আমি জানতাম ও আমার কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ, কিন্তু ও আমাকে ভালবাসে না। তবু আমি দশ বছর ধরে ওকে নিঃশেষে ভোগ করলাম। একটা পাপচক্র বলতে পার আর কি! যত ওর মন পেতাম না, তত ওর দেহকে জর্জরিত করতাম উন্মত্ত কামনায়। আর আমার বাসনার তাপে ওর মন আরও দূরে ছিটকে ছিটকে সরে যেত। ওকে কোনদিন সুখী করতে পারি নি, নিজেও হই নি। প্রতিদিন ওকে পান করেছি, কিন্তু তৃষা মেটে নি—ওরও নয়, আমারও নয়। আমার হাত থেকে রেহাই পাবে বলে, ও পালিয়ে যাবে ঠিক করল ভারতবর্ষে। ওখানে গিয়ে কোন রাজারাজড়ার বাড়ীতে গভর্ণেস হয়ে থাকবে। ও ভেবেছিল, ভারতে গেলেই সেখানকার রাজা আর জমিদাররা ওর রূপের পায়ে তাদের ধনের থালা উজাড় করে দেবে। তাই রিস্ক নিয়ে ওর এত দিনের একটু একটু করে সংসারের খরচ থেকে জমিয়ে তোলা টাকা দিয়ে নৌকাভাড়া সংগ্রহ করলে।

আমি খবর পেয়ে ভারতে একটা চাকরী জুটিয়ে ফেললাম,—বিলিতী চায়ের কোম্পানীতে। আর সোজা এ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে অনেক চেষ্টায় ঐ এক জাহাজেই প্যাসেজ বুক করলাম। সে এক দারুণ নাটক।"

হো হো করে হেসে উঠল জুনির পূর্বস্বামী। বললে,—"আমি যে ওকে এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকতে পারতাম না। এতে ওর গর্বও একটু হয় ত ছিল, কিন্তু ঘৃণার যেন অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ কি মনে হয় জান," ডেভিড বললে—"আজ মনে হয় ও হয়ত ঘৃণা করতে করতে কখন আমায় ভালবেসে ফেলেছে। তা না হলে এখনও কেন ছুটে ছুটে আসে আমাকে ওর নতুন প্রেমের গল্প শোনাতে। আমি ত ওকে ছেড়ে দিয়েছি অনেক আগে, ও কেন আমাকে আজও ছাড়তে পারছে না? কেবল আসবে টেনে টেনে ঝগড়া করতে।"

বলে আবার হেসে উঠল ডেভিড। বললে,—"অথচ জান, আমাকে ডাইভোর্স করার পথ ছিল না ওর। ওর বাবা ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল ওর সেই প্রথম অপরাধের পর থেকে। পিসী বলত, মরার সময় ওকে তার সব সম্পত্তি দিয়ে যাবে। কিন্তু সে কবে ও জানত না। আমার সঙ্গে লড়াই করার মত অর্থ বা সামর্থ্য কিছুই ওর ছিল না।"

কুমারের মাথার মধ্যে কি যেন চনমন করে উঠল। স্নায়ুরা যেন ঝন্‌ঝন্ করে বাজছে, পীয়ারসনের অর্ধেক কথা বুঝতে পারছে না কুমার।

কুমার বললে—"কি বললে?"

ডেভিড বললে—"জর্জকে দেখে জুনি মত্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমার মনে হয় জর্জকেও ও ভালবাসে নি।"

হা হা হা হা করে হাসল ডেভিড। "ও ভালবাসত সেই বদমাইসটাকে, যে ওর সেই অজাত সন্তানের পিতা।—তার পরে শোন মজা।"

ডেভিড বললে—"জাহাজে উঠেই জর্জের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমাদের। ও এসেছিল ওর সাদা মুরুব্বি উইলিয়মসকে তুলে দিতে। আমরা ঠিকানা দেওয়া-নেওয়া করলাম। যাবার আগে ও জুনির হস্তচুম্বন করে গেল। ষোল দিন জাহাজে একসঙ্গে কাটালাম, উইলিয়মসের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল, জান।"

ডেভিড হাসল—"উইলিয়মস বললে যে, জর্জ ওর হাতের পুতুল, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ওরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত কালো দিয়ে কালো তোলার চেষ্টা করছে। কালোর বিপক্ষে কালোরা যেমন লাগতে পারে এমন আর কেউ নয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়াতেও ত সেই ট্যাকটিক্‌সই চলছিল, শুধু ঐ গ্যানডির জন্যে হ'ল না, জান, আমি গ্যান্ডিকে দেখেছি।"

আবার হো হো করে হেসে উঠল ডেভিড চেয়ারে মাথা রেখে। কুমারের সমস্ত শরীরে একটা প্রবল উত্তেজনা ঝন ঝন করে বেজে উঠল।

ডেভিডের হাসি থামল না। বললে—"হা হা হা হা, সে বড় মজার লোক, বলে কিনা, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে সব মানুষকে ব্রহ্মচর্য প্র্যাকটিস করতে হবে। ওঃ হো হো—"

—"খবরদার।" কুমার চেঁচিয়ে উঠল—"গ্যানডি গ্যানডি করো না।"

হঠাৎ থতমত খেয়ে চুপ করে গেল পীয়ারসন, পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল—"নিশ্চয় করব আলবৎ করব, গ্যানডি, গ্যানডি গ্যানডি—এই ত তার নাম।"

—"না।" গর্জে উঠল কুমার—"তার নাম মহাত্মা।"

—"হা হা মহাত্মা। আই নো, মহাত্মা great spirit হা হা This is my spirit।" ও সন্থ কেনা বোতল থেকে আবার ঢাললে মদ।

—"Hang it!" দু'হাতে বোতল নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল কুমার। তখন সবে নাচ থেমেছে, চকের গুঁড়ো মাখা পিছল উঠোন কাচের গুঁড়োয় আর পানীয়ে কর্দমাক্ত হয়ে উঠল। ঘুষি পাকিয়ে উঠে দাঁড়াল পীয়ারসন। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই ছুটে এল এ-ও সে। অনেকে মিলে দুজনকে ধরে রাখল দু'দিকে। ওদের সকলেরই পা টলছে, শরীর কাঁপছে। মূর্তিমান রসভঙ্গের উপরে ওরা রেগে উঠেছে। নানারকম মতামত নিয়ে ওরা চেঁচাতে সুরু করেছে।

—"কিক দেম আউট।"

"বজ্জাত পাজী ভারতীয়গুলোকে কেন এদেশে ঢুকতে দেওয়া হয়।"

—"ওরা ত অসভ্য জানোয়ার।" বললে কেউ কেউ।

—"নিশ্চয়। এখনও ওদের মধ্যে অনেক ক্যানিব্যালস আছে।"

—"নিশ্চয়।"

—"কেন ঢুকতে দেওয়া হয়।"

—"কেন, কেন।"

চেচিয়ে উঠল, কেউ-বা রেগে উঠল—"হবে না ? তোমাদের পেয়ারের সরকার, তোমাদের লেবার গবর্ণমেন্ট ? সেই ত ওদের এত দূর বাড়িয়েছে।"

—"এই চুপ, খবরদার। তোদের টোরি ত দেশটাকে বিকিয়ে দিচ্ছে ব্যবসাদারদের হাতে।"

—"চোপরাও।"

—"খবরদার।"

চীৎকার, চেঁচামেচি, মারামারি, টেবিল-চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি, হট্টগোলের মধ্যে প্রায় নিত্যকার মতই আজকের পানোৎসবও শেষ হ'ল এদের। আর তারই ধাক্কার টাল সামলাতে সামলাতে কুমার এসে ছিটকে পড়ল বাইরে।

তখন মধ্যরাত্রের শেষে কৃষ্ণপক্ষের ছেঁড়া চাঁদ আকাশ-জোড়া কুয়াসার চাদরটার প্রান্তে এসে উঠেছে। তুষারাবৃত এজওয়ার রোডের প্রান্তে সেই ক্ষুব্ধ প্রচ্ছন্ন অবরুদ্ধ চন্দ্রালোকের দিকে তাকিয়ে ওর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ভয় হ'ল, আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে নাকি ?

মদের ফেনার মত হাসির বুদ্বুদ্ ওর পিছনে গমকে গমকে ঝলকে পড়তে লাগল। ও চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে জানালার কাঁচের ভিতর থেকে পানশালার দাসীরা ওর দিকে রক্তনখর তর্জনী দিয়ে ইঙ্গিত করে স্বল্পবাস দেহবল্লরী তরঙ্গিত করে হাসির হিল্লোলে দুলছে।

লজ্জা, অপমান, ঘৃণা আর অবসাদ কেমন করে সেদিন বহন করেছিল, সেকথা কুমারের তেমন মনে নেই। কে এসে পিছন থেকে ওর কাঁধে হাত রেখেছিল, তার পরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গাড়ীতে তুলেছিল। তখন বুঝতে পারে নি কুমার।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, বুঝল সে পীয়ারসন। পীয়ারসন মাতাল হয়েছিল বটে, কিন্তু জ্ঞান হারায় নি, হারায় নি মনুষ্যত্ব।

বেলা দশটা নাগাদ পরদিন যখন ওর ঘুম ভাঙল, তখন বন্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে শীতের রোদ ওর মুখের উপরে থরথরিয়ে কাঁপছে।

প্রথম কথা মনে পড়ল—আজ রমলারা আসছে। দ্বিতীয় কথা মনে হ'ল ঘড়ির দিকে চেয়ে। দশটা বেজে পনেরো মিনিট। আর ন'টা পনেরোয় ওদের ট্রেন এসে পৌছবার কথা।

স্টেশনে ওকে না দেখে ওরা নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে যে, ও এখনও হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় নি। ট্যাক্সি করে ওরা এতক্ষণ হয় ত নিজেদের ঠিকানায় চলে গেছে। হাসপাতালেও হয় ত ফোন করেছে, আর খবর পেয়েছে যে ও কাল সন্ধ্যায় ছাড়া পেয়েছে। আর সেকথা শুনে রমলার নাকের পাটা নিশ্চয় ফুলের পাঁপড়ির মত লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। রমলার অভিমানের কথা সর্বজনবিদিত। তার উপরে এতখানি কারণ পেলে সে যে কি করবে, ভাবতে পারে না কুমার।

সব জুগুপ্সা ও দুর্বলতা নিশ্লেষের ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল কুমার।

ক্রমশঃ

বুধগ্রহের ক্রন্দন

শ্রীআশিস গুপ্ত

রাত্রিদিন একি আকুলতা মনে
কোন এক বিদেহী সত্তা
আচ্ছন্ন করেছে আমার মনকে।
গোধূলি সন্ধ্যার মত
সুন্দর বিষাদময়
ক্লান্ত!

থেকে থেকে কানপেতে রই
ভাবি শুনতে পাব একস্থর
মর্মান্তিক করুণ।
আমারই বুকভাঙা কান্না সে যে,
শুনতে পাই না।

আমার মানসে আমি ক্রন্দনরত
তার ভাষাকে আমি জানি না
অনুভব করেছি তার
ভাবময়তাকে।

সহসা সেদিন
স্তব্ধ আর নিবিড় নিশীথে রাত্রিতে
সেই ভাবময়তা
ভাষায় রূপ পেলো!

সে ভাষা তোমরা কেউ জান না
শুধু আমি জানি।
সে ভাষা বুধগ্রহের…

সেদিন
গভীর আর কালো রাত্রিতে
বহুদূর হ'তে আমার
আর পৃথিবীর ;
আর সূর্য্যের খুব কাছ থেকে
আমায় ডেকে বলেছিল বুধগ্রহ ;
বলেছিলো
—"আমি বুধগ্রহ
তোমার বেদনায় আমি বেদনার্ত্ত"—
বলেছিলো,—
—"আমি বুধগ্রহ
সূর্য্যের নিকটতম প্রতিবেশী।
সূর্য্যের প্রচণ্ড শক্তিতে
আমি বিস্মিত,
সূর্য্যের প্রচণ্ড দাবদাহে
আমি
পৃথিবীর উষরতম মরু হতেও
উষর, শুষ্ক বিদীর্ণ।"—

আমার মনেও
বুধগ্রহের কান্না।
তাই সে ক্রন্দনের ভাষাকে
পার্থিব মন নিয়ে
বুঝিনি এতদিন!

শঙ্করের "জীবন্মুক্তিবাদ"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

(৫)

পূর্ব সংখ্যায় শঙ্কর কি ভাবে জীবন্মুক্তের অকর্তৃত্ব নানা প্রমাণ দ্বারা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে প্রপঞ্চিত করেছেন, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু তা' সত্ত্বেও, জীবন্মুক্তের স্বীয় কর্তব্যকর্ম কিছু না থাকলেও, লোকহিতার্থে তাঁকে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে। তিনিই ত হলেন লোকগুরু, মোক্ষ-পথ-প্রদর্শক। সেজন্য একদিকে যেমন তিনি ব্যাখ্যালোচনাদির মাধ্যমে নিগূঢ়তম ব্রহ্মতত্ত্ব মুমুক্ষুগণের নিকট প্রকটিত করবেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের পক্ষে অবশ্যকরণীয় কর্ম স্বয়ং সম্পাদন করে' তাঁদের সেই সেই কর্মে নিয়োজিত করবেন। এরূপে, সাধারণ জনদের শিক্ষার জন্যই জীবন্মুক্ত কর্মে প্রবৃত্ত হন নিষ্কামভাবে। (গীতা-ভাষ্য ৩·২৫-২৬)

সেজন্যই গীতা-ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন :

"যদি পুনরহমিব ত্বং কৃতার্থ-বুদ্ধিরাত্মবিদন্যো বা তস্যাপ্যাত্মনঃ কর্তব্যাভাবেঽপি পরানুগ্রহ এব কর্তব্য, ইত্যাহ"

(গীতা-ভাষ্য, ৩·২৫)

"এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষোর্ণ মমাত্মবিদঃ কর্তব্যমস্ত্যন্যস্য বা লোকসংগ্রহং মুক্ত্বা তু তস্যাত্মবিদ ইদমুপদিশ্যতে।...কিন্তু কুর্যাৎ যোজয়েৎ কারয়েৎ সর্ব-কর্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ং তদেপবিদুষাং কর্ম যুক্তঃ অভিযুক্তঃ সমাচরন্।"

(গীতা-ভাষ্য ৩·২৬)

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলছেন : "যদি তুমি 'আমার মত আত্মজ্ঞ হয়ে' কৃতার্থবুদ্ধি হও, তাহলে তোমার নিজের কোন কর্তব্য না থাকলেও পরকে অনুগ্রহ বা সাহায্য করবার জন্য তোমাকে কর্ম করতেই হবে।

এরূপ লোকশিক্ষার ইচ্ছাতেই কর্মে প্রবৃত্ত আমার বা অন্য কোন আত্মজ্ঞের, লোকশিক্ষা ব্যতীত আর কোন কর্তব্য নেই। এরূপ আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব কর্ম সম্পাদন করে' অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে তাদের পক্ষে বিহিত কর্মে নিয়োজিত করবেন, যাতে সেই সকল কর্মাধিকারী ব্যক্তির কর্মে বিশ্বাস শিথিল না হয়।"

বস্তুতঃ, সাধনপ্রণালী প্রভেদে, জীবন্মুক্ত দুই শ্রেণীর—কেবলমাত্র জ্ঞানমার্গ-নিষ্ঠ ও কর্মমার্গনিষ্ঠ হয়ে পরে জ্ঞানমার্গ-নিষ্ঠ। প্রথম শ্রেণীর জীবন্মুক্ত জীবনমাত্র রক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক কর্ম ভিন্ন, অর্থাৎ শরীর ধারণ ব্যতীত অন্য কোনরূপ কর্মেই প্রবৃত্ত হ'ন না; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবন্মুক্ত, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, লোকশিক্ষার্থে ও শিষ্টাচারের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হন। তা সত্ত্বেও কেবলমাত্র জীবনরক্ষার জন্যই হোক্, অথবা লোকহিতার্থে ও শিষ্টাচারের জন্যই হোক্, অথবা শিষ্টজন কর্তৃক সম্ভাব্য নিন্দার ভয়েই হোক্, জীবন্মুক্তকৃত কোন কর্মই প্রকৃতরূপে কর্ম নয়, যেহেতু জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাঁর সকল কর্মই দগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই, আত্মজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি কোন কর্ম করলেও, সেই কর্ম কর্মই নয়, যেহেতু, পূর্বেই যা' বলা হয়েছে, কর্মের কোন লক্ষণই নেই যথা :

"বিদুষা ক্রিয়মাণং কর্ম পরমার্থতোঽকর্মৈব তস্য নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শন-সম্পন্নত্বাৎ." (গীতা-ভাষ্য ৩·২০)।

তত্ত্বজ্ঞ কর্তৃক কৃত কর্ম পারমার্থিক দিক্ থেকে অকর্মই মাত্র, যেহেতু তিনি নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্ম-দর্শন করেছেন।

সেজন্যই শঙ্কর বলছেন যে, কর্মযোগাধিকারী, কর্ম-যোগনিষ্ঠ যে "যোগী" পরে জ্ঞানযোগের মাধ্যমে আত্মজ্ঞ হন, তিনিই লোকশিক্ষার জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হলেও কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না।

"স তত্রৈবং বর্তমানো লোকসংগ্রহায় কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ন কর্মভির্বধ্যত ইত্যর্থঃ।" (গীতা-ভাষ্য ৫·৭)।

যিনি সম্যগ্‌দর্শনের উপায়রূপে "যোগ"কে আশ্রয় করেছেন, তিনি নিষ্কাম নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম দ্বারা বিশুদ্ধ-চিত্ত, বিজিতদেহ ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে ক্রমশঃ জ্ঞানের মাধ্যমে সর্বভূতাত্মাকেই স্বীয় আত্মারূপে উপলব্ধি করেন। এরূপ, আত্মজ্ঞ হয়েও যদি তিনি লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করেন, তা হলে তিনি সেই কর্মের দ্বারা লিপ্ত বা বদ্ধ হন না।

একই ভাবে, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্য-ভূমিকায় শঙ্কর বলেছেন যে, "যোগ"-মার্গাধিকারিগণ অবিদ্যা ও কামনাপ্রসূত সকাম কর্ম পরিত্যাগ করে', যজ্ঞ-দান-তপস্যা প্রমুখ নিষ্কাম কর্মে প্রবৃত্ত হলে, চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে ক্রমশঃ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষলাভ করেন। তার পরেও তাঁরা পূর্বের ন্যায় কর্ম করে যান লোকশিক্ষার জন্য। কিন্তু সেই সকল কর্ম অবিদ্যা, কামনা ও অভিজ্ঞানশূন্য বলে' "কর্ম" পদবাচ্যই নয়।

গীতা-ভাষ্যে (৩—৫) শঙ্কর অন্যত্রও বলেছেন যে, জ্ঞানিগণ স্বরূপতঃই কর্ম করতে অক্ষম,—

"সাংখ্যানাং পৃথক্ করণাৎ অজ্ঞানামেব হি কর্মযোগঃ, ন জ্ঞানিনাম্। জ্ঞানিনাং তু গুণৈরচাল্যমানানাং স্বতশ্চলনাভাবাৎ কর্মযোগো নোপপদ্যতে।" (গীতা-ভাষ্য ৩-৫)।

"সাংখ্য" বা জ্ঞানিদের কোন কর্ম নেই, কেবল অজ্ঞানিদেরই তা' আছে। প্রকৃতিগত ত্রিবিধ গুণ দ্বারা জ্ঞানী চালিত হন না, স্বয়ং ও চলনাদিরূপ বিকারভাগী নন, সেজন্য তাঁর পক্ষে কোনরূপ কর্ম সম্পাদন অসম্ভব।

সেজন্যও জীবন্মুক্ত অকর্তা।

গীতা-ভাষ্যের অন্য একস্থলেও (৩-১৭) একই ভাবে শঙ্কর বলছেন যে, যাঁরা ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞান লাভ করে' মিথ্যাজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা স্বভাবতঃই মিথ্যাজ্ঞানবান্ পুরুষগণের অবশ্য কর্তব্য বর্ণাশ্রম ধর্ম বা সকাম কর্ম থেকে নিবৃত্ত হন এবং শরীর ধারণের জন্য কেবলমাত্র ভিক্ষাচর্য বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

"ন তেষামাত্ম-জ্ঞান-নিষ্ঠা-ব্যতিরেকেণ অন্যৎ কার্যমস্তী"তি (গীতা-ভাষ্য, ৩-১৭)।

আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠা ব্যতীত এরূপ জীবন্মুক্তের আর অন্য কোন কর্তব্য কর্মই নেই।

এরূপ জ্ঞানী বা আত্মজ্ঞান নিষ্ঠ জীবন্মুক্তই "আত্মরতি", "আত্মতৃপ্ত", "আত্মসন্তুষ্ট" (গীতা ৩-১৭)।

অর্থাৎ, কেবল আত্মাতেই তাঁর আনন্দ, অন্য কোনরূপ বসাদি প্রিয় বস্তুতে নয়, কেবল আত্মাতেই তিনি তৃপ্ত, অন্নপানাদিতে নয়; কেবল আত্মাতেই তিনি সন্তুষ্ট, অন্য কোন বাহ্য দ্রব্যে নয়।

"য ঈদৃশ আত্মবিৎ, তস্য কার্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ।" (গীতা-ভাষ্য, ৩-১৭)।

এরূপ আত্মজ্ঞ জীবন্মুক্তের করণীয় কোন কার্যই নেই। কারণ, এরূপ আত্মজ্ঞের কর্ম দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না—ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে স্থাবরাদি পর্যন্ত কারও কাছে তাঁর স্বার্থসিদ্ধিরূপ কোন প্রয়োজনই নেই, যার জন্য তাঁকে কোন ক্রিয়াসম্পাদন করতে হবে (গীতা-ভাষ্য ৩-১৮)

জীবন্মুক্ত কেন অকর্তা—তার কারণও গীতায় বারংবার নির্দেশ করে, শঙ্কর বলেছেন যে, জ্ঞান ও কর্ম স্বরূপতঃ 'পরস্পরবিরোধী বলে', জ্ঞান ও কর্ম একত্রে থাকতে পারে না।

সেজন্য, পূর্বেই যা বলা হয়েছে, জীবন্মুক্ত যে অকর্তা তার প্রধানতম কারণ এই যে, কর্তা, সাধন, উপাদান, ফলাদিভেদে কর্ম ওতপ্রোতভাবে ভেদমূলক। সেজন্য অভেদ-ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্তের পক্ষে ভেদমূলক কর্ম একেবারেই অসম্ভব। পুনঃ পুনঃ শঙ্কর এ কথা বলছেন:

"অত্রোচ্যতে, আত্মবিদো নিবৃত্ত-মিথ্যা-জ্ঞানত্বাৎ বিপর্যয়-জ্ঞানমূলস্য কর্মযোগস্য অসম্ভবঃ স্যাৎ।"

"তস্মাৎ আত্মবিদো নিবৃত্ত-মিথ্যা-জ্ঞানস্য বিপর্যয়মূলঃ কর্মযোগঃ ন সম্ভবতি ইতি যুক্তমুক্তং স্যাৎ।"

"অতশ্চ কথমাত্মবিদঃ কর্ম যোগস্যাসম্ভবঃ স্যাদিতি। অত্রোচ্যতে সম্যগ্-জ্ঞান-মিথ্যা-জ্ঞান-তৎকার্য বিরোধাৎ।"

"কৃতকৃত্যত্বেন আত্মবিদঃ প্রয়োজনান্তর ভাবাৎ অন্য কার্যং ন বিদ্যতে ইতি কর্তব্যান্তর-ভাব বচনাচ্চ।"

"আত্মতত্ত্ববিদঃ সম্যগ্-দর্শন-বিরুদ্ধ মিথ্যা-জ্ঞান-হেতুকঃ কর্মযোগঃ স্বপ্নেঽপি ন সম্ভাবয়িতুং শক্যতে।"

(গীতা-ভাষ্য, ৫-১)।

যিনি আত্মজ্ঞ, তাঁর মিথ্যা জ্ঞান দূর হয়েছে বলে' মিথ্যা-জ্ঞানমূলক কর্মযোগ তাঁর ক্ষেত্রে অসম্ভব।

শাস্ত্রে আত্মজ্ঞের কর্মাভাবই সর্বত্র প্রপঞ্চিত হয়েছে।

আত্মজ্ঞের ক্ষেত্রে কর্মযোগ অসম্ভব কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল এই যে, সম্যগ্-জ্ঞান মিথ্যা-জ্ঞানও তার কার্যের বিরোধী।

যিনি আত্মজ্ঞ, তিনি কৃত-কৃতার্থ—মোক্ষলাভ করে' আর সকল অর্থই লাভ করেছেন। সেজন্য তাঁর অন্য কোন কর্ম অবশিষ্ট নেই। সেজন্যই শ্রুতিতে এরূপ জ্ঞানীর কোন কর্তব্য নেই বলে' নির্দেশ করা হয়েছে।

আত্মজ্ঞের ক্ষেত্রে সম্যগ্-দর্শন-বিরুদ্ধ, মিথ্যা জ্ঞান-সৃষ্ট কর্মযোগের সম্ভাবনা স্বপ্নেও নেই।
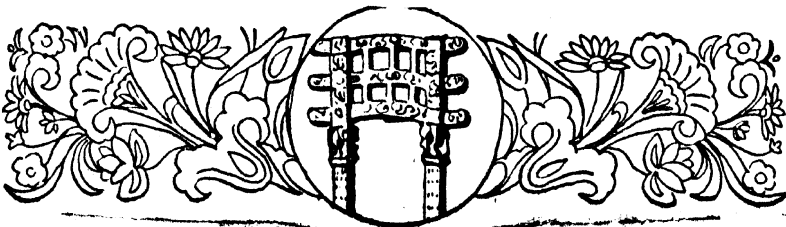
দুবরাজপুর

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

আমরা কলিকাতা অঞ্চলের লোক দুবরাজপুর নামটি শুনিলেই বীরভূম জেলার প্রখ্যাত দুবরাজপুর মনে করি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ২৭টি দুবরাজপুর নামে গ্রাম বা মৌজা আছে। নিম্নে আমরা জেলা-ওয়ারী ও থানা-ওয়ারী দুবরাজপুর নামক গ্রামের অবস্থান দিলাম :

			কালি
		বর্দ্ধমান (২)	
কাঁকসা	থানা	১টি	১০৯ একর
পূর্ব্বস্থলী	”	১টি	১৩৩ ”
		বীরভূম (৩)	
রাজনগর	”	১টি	৮৫ ”
মাহমুদনগর	”	১টি	১২১ ”
দুবরাজপুর	”	১টি	১৮১ ”
		বাঁকুড়া (৭)	
ওঁদা	”	১টি	২০০ ”
ছাতনা	”	১টি	২৭৫ ”
শালতোড়া	”	১টি	১৪৩ ”
খাতড়া	”	১টি	২৬৯ ”
ইঁদপুর	”	১টি	১৯১ ”
রায়পুর	”	১টি	৩৪৪ ”
সিমলাপোল	”	১টি	১৮৯ ”
		মেদিনীপুর (১৫)	
শালবনী	”	১টি	৩৭৯ ”
গড়বেতা	”	৪টি	৭৩৩ ”
সাবং	”	১টি	২২১ ”
দাসপুর	”	২টি	২৪৩ ”
ঝাড়গ্রাম	”	১টি	৪৮২ ”
জামবনী	”	২টি	২৭৫ ”
বিনপুর	”	৪টি	৮০০ ”

গ্রামের পরিমাণ ৮৫ হইতে ৪৮২ একর পর্যান্ত দেখিতে পাওয়া যায় ; গড়ে বর্দ্ধমানে ১২১ একর, বীরভূমে ১২৫ একর, বাঁকুড়ায় ১৫৯ একর এবং মেদিনীপুরে ১০৫ একর। একমাত্র পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত দুবরাজপুর বাদ দিলে ইহাদের অবস্থান পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা বরাবর। কেন এইরূপ হইল ? প্রশ্ন করা সহজ হইলেও উত্তর দেওয়া আদৌ সহজ নহে। আমরা চেষ্টা করিয়া কোনও সদুত্তর বাহির করিতে পারি নাই। তবে আমাদের মনে যাহা আসিতেছে, পাঠকবর্গের নিকট তাহা নিবেদন করিব।

আমরা যাহাদের সাঁওতাল বলি, তাহারা এককালে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সাঁওত বা সাঁত পরগণায় বাস করিত। এ বিষয়ে সাঁওতাল জাতির ইতিবৃত্ত "মারে হাপ্‌রাম কো রেয়াঃক কথ" - যাহা শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ হাঁসদা বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে আছে যে :

"আমাদের খেরওয়ার নাম লোপ হয় কি প্রকারে জানি না। কেহ বলেন, শিকার দেশের ওপারে সাঁত দেশে অনেকদিন ছিলাম বলিয়া সাঁওতাল করা হইয়াছে। শিকার রাজার সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিলাম এবং তাঁহার অধীনে কিছু লোক বহু গ্রামের মালিক ছিলাম। কিন্তু সেখান হইতেও হিন্দুরা আমাদিগকে তাড়াইলেন এবং আমাদের জমি জায়গা অধিকার করিলেন। শিকার দেশের রাজার নিকট হইতে ছাতা পরব শিখিলাম। শিকার হইতে টুণ্ডিতে (টুণ্ডিদেশ) কিছু লোক চলিয়া আসিলাম, কোথায় থাকিব স্থান নাই। বৃদ্ধরা বলিলেন, অজয় নদী পার হইব না আর যাহারা পার হইবে, তাহাদের পেটের ছেলেকে পর্য্যন্ত চিনিটি কাটিয়া দিবে ; কারণ ওখানটা তুরুক [মুসলমান] দেশ—ভণ্ডদেশ।" [পৃ. ৭]

কালক্রমে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে ও আমরা তাহাদিগকে সাঁওতাল বলি। আর এই সব অঞ্চলে অনেক সাঁওতালের বাস আছে। এজন্য মনে হয়, সাঁওতালদের সহিত দুবরাজপুরের কিছু সম্বন্ধ থাকা সম্ভব।

"দুবরাজপুর" কথাটি কিন্তু সাঁওতালী নহে, পুরাপুরি বাংলাও নহে। রাজপুর কথাটি বাংলা ; সাঁওতালী অভিধানে কিন্তু "দুব" বলিয়া কোন শব্দ পাই নাই। মুণ্ডা ভাষার অভিধানে "দুব" কথার অর্থ হইতেছে—বসা (to sit)। ইহা হইতে কল্পনা করা যায় যে, যেস্থানে রাজা বা সর্দ্দার বিচারের জন্য বসিতেন, সেই সব স্থানকে 'দুবরাজপুর' বা রাজা বসিবার স্থান বলিয়া অপভ্রংশ অনার্য্য ভাষায় নির্দ্দেশ করা হইত।

এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ যদি মন দেন ও স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ গ্রামের নাম "ছুবরাজপুর" হইল কেন এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন ত ভাল হয়।

শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা বলেন যে, গ্রিমের শব্দ পরিবর্তনের নিয়ম-অনুযায়ী ল্যাটিন ভাষার j (য়) যেমন ফরাসী, ইটালীয়, স্পেন ও পর্তুগালের ভাষায় g, d, yতে পরিবর্তিত হয়, তেমনি আমাদের বাংলা "যুবরাজপুর" কোনও অনার্য্য ভাষায় উচ্চারণের দোষে "দুবরাজপুর" এ পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং বর্তমানের উচ্চারণে "দুব্‌রাজ্‌পুরে" পরিণত হইয়াছে। 'গ্রিম্‌স ল' আর্য্যভাষা হইতে অনার্য্য ভাষায় পরিবর্তিত হইবার পক্ষে কতদূর প্রযোজ্য তাহা বলিতে পারি না।

পূর্ব্বে এই অঞ্চলে বহু রাজা ছিল। তাহাদের অধীন সর্দ্দারগণ সীমান্ত বা ঘাঁটি রক্ষা না করিয়া অনেক সময়ে বিদ্রোহ করিয়া নিজেরা রাজা হইতেন। এজন্য রাজারা নিজের ছেলেদের সর্দ্দার করিয়া সীমান্ত রক্ষার ভার দিতেন—তাঁহারা সাধারণে ছোটরাজা অথবা ঘাটরাজা বা যুবরাজা বলিয়া পরিচিত হইতেন—এইরূপ গল্প কিছু কিছু শুনা যায়। মনে হয়, যুবরাজদের ঘাঁটি পরে যুবরাজপুর তথা দুবরাজপুরে পরিণত হইয়াছে।

অনামিকা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নীলাকাশে ভাসে ইন্দুলেখা,—তারাবলী
হাসে মিটিমিটি।
ধীরে ধীরে চল চলি
কূলে কূলে ভরা, পূর্ণ যৌবনার মত
মৃদুল মন্থরা, আঁখি দুটি অবনত,—
দূর পথযাত্রী এক স্বচ্ছ স্রোতস্বতী
চলে যেন পথ চিনে সাবধানে অতি
দয়িতের অভিসারে ক্ষীণ চন্দ্রালোকে
স্বর্ণনটীসমা।
প্রত্যহের সুখে শোকে
পুলকে পীড়নে,—আগমন বিদায়ের
হাসি ও রোদনে,—সান্ত্বনা ও সন্তোষের
অভিনয় শেষে,—অবসন্না বসুমতী
ঘুমায় অঘোরে, শান্ত পরিশ্রান্ত অতি
গোধূলির বেলাশেষে।
নিদ্রালস আঁখি,—
নিমীলিত পদ্মসম, ক্রমে যায় ঢাকি,—
এলায় কুন্তল দাম আলুথালু প্রায়
সুষুপ্তির তৃপ্তি শ্বাস স্বচ্ছন্দে দোলায়
তালে তালে বক্ষ তা'র।
রাত্রি,—পাশ ফিরে,—
স্বপনে কাহারে হেরি',—দেহলতাটিরে
সঙ্কোচে কুঞ্চিত করে প্রথম পরশে
কুণ্ঠিতা বধূর মত, তাই পড়ে খ'সে
কণ্ঠহার হ'তে তার চ্যুত তারাগুলি,—
ছিন্নবৃন্ত পুষ্পসম, ধরণীর ধূলি
আলিঙ্গিয়া অভিমানে।
কি বেদনা তা'র
কোন স্মৃতি লুকাবারে গাঢ় অন্ধকার
রজনী রহস্যময়ী সসঙ্কোচে টানি
দেয় সর্বগাত্রে তার; দূরে যায় গ্লানি
নিদ্রা যায় জীবলোক,—যে যার কুলায়,—
একান্ত আশ্রয়লব্ধ বিহঙ্গের প্রায়
প্রত্যাগত দিবাশেষে।
প্রাতে সূর্য আসি
তমস্বিনী রজনীর অন্ধকার নাশি
পূর্বাকাশ পটে আঁকে চারুচিত্র লেখা
রশ্মি মসীপাত্র হ'তে রক্ত পীত রেখা
দূর দিগ্বলয়ে।

গিরিশীর্ষ প্রাংশু রুক্ষ
উপত্যকা শ্যাম সমতল, অন্তরীক্ষ
আলোক-উজ্জ্বল, প্রশান্ত সমুদ্র হেন
দৃশ্য অচঞ্চল। 'মনে হয়, দিবা যেন
দেয় দিব্য আলো, —রাত্রি যেন দস্যুরূপে
নিসর্গের সকল সম্পদ চুপে চুপে
নিত্য লয় কাড়ি।

যবে ডুবে যায় রবি—
গোধূলি ধূসর আলো শ্যামস্নিগ্ধচ্ছবি
আসে সন্ধ্যা তন্দ্রাতুর দূরদৃষ্টি হারা
অঞ্চলে খচিত শশী সংখ্যাহীন তারা
উঠে ফুটি পুষ্পসম।

ভাবি সেইক্ষণে
এই নীলকান্তমণি মণ্ডিত গগনে
কে লুকায় দিবালোকে—রৌদ্র-অন্ধ আঁখি
হ'তে দৃষ্টি লয় কাড়ি ?

শুধাইলে ডাকি',—
নিরুত্তর প্রতিধ্বনি শুধু আসে ফিরে
প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন।
রৌদ্রালোকে ঘিরে'
দিবস লুকায় আধা,—আঁখি হীনবল
তারাভরা নীলাকাশ দেখে না বিহ্বল
দীপ্যমান নভস্তলে।

রজনী লুকায় আধা
ছায়ায় মায়ায় ঘিরে,—মিথ্যা তা'রে সাধা
উদয়াস্তে গগনের ফাগুয়ার মেলা
ময়ূরের শিখণ্ডকে ইন্দ্রধনু খেলা
প্রজাপতি-পক্ষে কপোতের কণ্ঠতটে
প্রতি পতঙ্গের অঙ্গে যেই রঙ্গ রটে
সে-বিচিত্র-চিত্রকলা রাত্রি পাবে কোথা
শুধু নীল-মণি গর্ভ রত্নাকর হোথা
ছায়াপথ-পারে।

হারাইয়া যায় মন
জাদুকরী তমসার রহস্যে মগন
দিশাহারা,—দশদিকে,—শুধু দুইদিক
এক 'আমি' আর 'অনামিকা' অনিমিখ
আঁখিতে আঁখিতে চাহি' আঁখি দৃষ্টিহারা,—
চাওয়া, দেখা নাহি পাওয়া,—'আমি' ছাড়া
'আমি'-হারা আর যাহা কিছু,—অনামিকা
আছে পূর্ণ করি।

রজনীর যবনিকা-
অন্তরালে, অন্ধকারে ঢাকা, হে অসীমা
কৃষ্ণতনু প্রেয়সী আমার, শ্যামলিমা
অঙ্গের লাবণি,—ঝরিয়া বহিয়া যায়
প্লাবিয়া অবনীতল,—যেন উড়ে যায়
চীনাংশুক চেলাঞ্চল নভস্তল ছেয়ে :

* * * *

স্বর্গজয়ী নিসর্গের কেবা সেই মেয়ে,—
কি তা'র প্রকৃতি রীতি ?—কেন ঢাকাঢাকি
কভু মুকুলিত, কভু নিমীলিত রাখি,
অসীম রহস্য, আর অপার বিস্ময়,—
রাত্রিদিন, প্রতিদিন, পটক্ষেপ হয়
ছায়াচিত্রে অভিরাম অবিরাম-গতি—
অর্ধব্যক্ত অর্ধগূঢ় বিচিত্র নিয়তি
পুনঃ পুনঃ আবর্তনে।

সর্ব আকিঞ্চন
সুন্দরের সমাধিতে হয় নিমগন
সমুদ্রে সহস্রধারা, স্বর্গে ধরাতলে
এই মত চলে খেলা, চক্রবৃরে চলে
অনাদি অনন্ত পথে।

* * *

নব কৌতূহলে
কৌতুকে আসিয়া পুনঃ কোন ভূমণ্ডলে
কোথায় চলিয়া যাও,—অয়ি লীলাময়ি !
লীলায় খেলায় তুমি বাস্তবেরে জয়ি'
চঞ্চলা বিজলীসমা কল্পনার লতা
এই নাই, এই পাই, তোমারি পূর্ণতা,—
তোমারি পরশ,—

যেদিকে যেখানে চাই
রূপে অপরূপা, নামে 'অনামিকা' তাই ॥

শ্রীশ্রীকালিদাস-গ্রন্থ-স্তুতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

অনুবাদিকা—ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

নিগমাগমপ্রভা তমোদলী
মধুরমোহনবীণাবাদিনী।
বাণী স্ফাটিকমালাধারিণী
স্বয়ং কালিদাসপ্রিয়সাধিনী ॥১

ঋতুসংহারমাল্যং তৎ সদা বিশ্ববিভূষণম্।
সদৃশং রচনং যস্য নাদ্যাপি হ্যুপলভ্যতে ॥২

কুমারসংভবগ্রন্থঃ শাংকরকরুণাখনিঃ।
যত্র পূতং জগত্যম্বা পার্বতী ক্ষেমদায়িনী ॥৩

মন্দাক্রান্তামধুচ্ছন্দো মধুধারাপ্রবাহিণী।
বিরহে যুজ্যতে নিত্যং মেঘদূতাদনন্তরম্ ॥৪

রঘুবংশমহাগ্রন্থো রসোল্লাসপ্রপূরিতঃ।
গুণালঙ্কারমাধুর্য-পূর্ণগৌরব-বর্ধকঃ ॥৫

জগদানন্দসংধায়ি বিখ্যাতং নাটকত্রয়ম্।
কণমাত্রপ্রয়োগেণ জীয়তে জাগতং মনঃ ॥৬

উজ্জয়িন্যাং মহাপুর্য্যাং সম্মেলনমিদং মহৎ।
ভবতান্নিত্যমোদায় মহাকাল-প্রসাদতঃ ॥৭

জায়তাং পরমো মোদঃ কালিদাস-প্রসাদিনাম্।
নিতরাং শান্তিমাপ্নোতু সর্বংসহা বসুন্ধরা ॥৮

রসজ্ঞা সুখিনঃ সর্বে কালিদাস-প্রমোদিনঃ।
মধু ক্ষরন্তু ক্ষরতু সর্বত্র জগন্মধুমদস্তু নঃ ॥৯

কালিদাস মহাপুণ্যে তব লীলানিকেতনে।
যতীন্দ্রবিমলো দীনো যাচতে তে কৃপাকণাম্ ॥১০

বঙ্গানুবাদ

বেদ ও তন্ত্রই যাঁর দীপ্তি এবং তদ্দ্বারা যিনি সমস্ত অন্ধকার দূর করেন, যিনি বীণার তারে মধুর ও মনোমুগ্ধকর ঝঙ্কার তুলছেন, সেই স্ফটিকমালা-পরিহিতা দেবী সরস্বতী স্বয়ং কালিদাসকে বর প্রদান করেছিলেন।১

তাঁর "ঋতুসংহার" নামক গ্রন্থমালিকা সমস্ত বিশ্বের শোভা করেছে বর্ধন। এ প্রকারের এ বিষয়ে রচনা এখনও সমগ্র বিশ্বে পাওয়া যায় না।২

"কুমারসম্ভব" নামক কাব্য স্বয়ং শিবের করুণার খনি। এই গ্রন্থে চিরকল্যাণকারিণী জননী পার্বতী নিজেই বিলাস করেন।৩

মন্দাক্রান্তা মধুমাখা ছন্দ; এর গতিপথে প্রবাহিত হয় মধুর ধারা। মেঘদূত শ্রীগ্রন্থ বিরচিত হওয়ার পরে এই ছন্দঃ বিরহবেদন সংবেদনে নিয়ত প্রযুক্ত হচ্ছে।৪

রঘুবংশ মহাকাব্য অনুপম; সর্বপ্রকার রসের প্লাবনে এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত নিষিক্ত। এই গ্রন্থই কাব্যগুণ এবং অলঙ্কারসমূহের পূর্ণ গৌরব বৃদ্ধি করেছে।৫

কালিদাসের বিখ্যাত তিনটি নাটকই জগতের আনন্দের হেতু। এর তিলমাত্র নাট্যে প্রযুক্ত হলেই নিখিল জগতের চিত্ত বিজিত হয়।৬

আজ উজ্জয়িনী মহাপুরীতে এই যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, শ্রীমহাকাল শিবের প্রসাদে তা শাশ্বত আনন্দের কারণ হোক্।৭

কালিদাস-বিষয়ে রসিক যাঁরা, তাঁদের পরম আনন্দ সংঘটিত হোক্। সর্বংসহা ধরিত্রী প্রভূত শান্তির আকর হউন।৮

কালিদাস রসিক জনেরা সকলেই সুখী হউন। সর্বত্র মধু ঝরে পড়ুক; জগৎ আমাদের পক্ষে মধুময় হয়ে উঠুক।৯

হে কালিদাস! তোমার এই মহাপুণ্য লীলাভবনে দীন যতীন্দ্রবিমল তোমার কাছে তোমার কৃপালেশ মাত্র প্রার্থনা করছে।১০

* এই কবিতাটি ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক উজ্জয়িনী কালিদাস-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কবি-সম্মেলনে পঠিত হয়।

শকুন্তলা নাটকে রামায়ণের প্রভাব

শ্রীদিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

মহাকবি কালিদাসের অনবদ্য সৃষ্টি 'শকুন্তলা' নাটক আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে, শিল্পকৌশলে এবং রচনামাধুর্যে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আজিও চিরস্থায়ী আসন অধিকার করিয়া আছে। শিল্পীপ্রতিভার অপরতন্ত্রতার প্রসঙ্গ ত্যাগ করলেও স্বীকার করিতে হয় যে, বিষয়বস্তুর কল্পনায় মহাকবির রচনা সর্বাংশে মৌলিক নহে। মহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যান হইতে নাটকীয় বিষয়বস্তুর উপাদান সংগৃহীত হইলেও মহাকবির কল্পনায় ভাস্বর হইয়াছিল রামায়ণের আদর্শ। কালিদাসের সমগ্র সাহিত্যে যে বিরাট আত্মোপলব্ধির মহিমা, সংযম, চারিত্রশুদ্ধি, এবং ত্যাগের আদর্শ কীর্তিত হইয়াছে তাহার মূল বোধহয় রামায়ণে। সেইজন্য কালিদাসের অধিকাংশ রচনায়ই রামায়ণের প্রভাব ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। মহাভারতে উল্লিখিত আপাততুচ্ছ বিষয়কে কালিদাস কল্পনার তুলিকায় নানাবর্ণসমাবেশে অপরূপ সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কালিদাস প্রথিতবস্তু শকুন্তলায় প্রেমের যে আদর্শকে রূপায়িত করা হইয়াছে তাঁহাতে মূলতঃ রামায়ণের প্রভাব। শকুন্তলা নাটকের বীজটি অতি গুপ্ত। তাহা হইতেছে দুষ্যন্তের পুত্রোৎপত্তি। সুতরাং নরনারীর সামাজিক মিলন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে—তাহার পশ্চাতে বিরাট সামাজিক কর্তব্য রহিয়াছে। যে প্রেম আপনাতে আপনি সীমাবদ্ধ তাহা তুচ্ছ ও নশ্বর তাহাতে কল্যাণের কোন স্পর্শ নাই। দেহাতীত মিলনের মধ্যে রহিয়াছে সেই কল্যাণের স্পর্শ। শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের মিলনের কাহিনী মহাভারতে এই সঙ্কীর্ণ জৈব-প্রেমের আদর্শকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে মহত্তর এবং উন্নততর রূপদান করিয়াছেন কবি রামায়ণের আদর্শে। রামায়ণে সীতা এবং রামের মিলনের অপূর্ব শুচিসুন্দর রূপ ভারতীয় সাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ। রামচন্দ্র সীতার চারিত্রিকশুদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিহান, তথাপি সামাজিক কর্তব্যের অনুরোধে তাঁহার অগ্নিপরীক্ষা। অকুণ্ঠ প্রেমের মহিমায় এই অগ্নিপরীক্ষাকে সীতা প্রিয়তমের দানরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। রাম প্রজা রঞ্জনের নিমিত্তই সীতাকে ত্যাগ করিয়াছেন—তাহাতেও তাঁহার অবিচল নিষ্ঠার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই মহান্ প্রেমের আদর্শে ভোগবাসনার কোন স্পর্শ নাই—সকল জাগতিক মালিন্যের ঊর্ধ্বে তাহা অবস্থিত। মহাভারতের কাহিনীতে এই আদর্শের অভাব লক্ষ্য করিয়া 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে কবি তাহাকে রূপায়িত করিয়াছেন রামায়ণের আদর্শে। সেইজন্য শকুন্তলা নাটকে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলন হইয়াছে সকল পার্থিব মালিন্যের ঊর্ধ্বে মহর্ষিগণের পরম তপস্যার ধাম হেমতীর্থে। এই বিদেহী প্রেমের ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম উপলব্ধি রামায়ণে, কালিদাসের নাটকে তাহার দ্বিতীয়বার রূপায়ণ। সীতার ন্যায় এই নীরব আত্মত্যাগ শকুন্তলার মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীতা কেবলমাত্র তাঁহার চারিত্রিক অপবাদের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"জানামি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব। ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা যা হিতা তব নিত্যশঃ॥ ময়াহি পরিহর্তব্যং ত্বং হি মে পরমা গতিঃ। বক্তব্যশ্চৈব নৃপতি-ধর্মেন সুসমাহিতঃ॥ প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ ভর্তুঃ কার্যং বিশেষতঃ। ইতি বচনাদ্ রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ" (উত্তরাকাণ্ড অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ)। অবমাননায় সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতা সীতা স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলিয়া সম্বোধন করেন নাই, সম্বোধন করিয়াছেন 'নৃপতি' এবং 'রাম' এই বলিয়া। বিনয় এবং নম্রতার অন্তরালে কেবলমাত্র এই দুইটি বাক্যের মধ্য দিয়া যে তীব্র ধিক্কার এবং ভর্ৎসনা ধ্বনিত হইয়াছে, স্বামীর অন্যায়াচরণের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করিবার তাহাই পর্যাপ্ত উদাহরণ। শকুন্তলার রূঢ় প্রত্যাখ্যানের সময়ে দুষ্যন্ত তাঁহার চারিত্রিক বিশুদ্ধতার এবং সতীত্বের উপর যে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া শকুন্তলা বলিয়াছিলেন—"অনজ্জ, অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্খসি।" স্বামীকে 'অনার্য' বলিয়া সম্বোধন তাঁহার মানসিক বিক্ষোভের প্রকাশ মাত্র তাহা প্রগল্ভা নারীর উক্তি নহে। সীতা ও শকুন্তলা উভয়ের চরিত্রকল্পনার মৌলিক পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগের মনে হয় যে, রামায়ণের অলক্ষ্য প্রভাব কবিচিত্তকে প্রভাবান্বিত করিবার ফলেই শকুন্তলার সকল মানসিক বেদনা এইরূপ তীব্র আক্ষেপের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল? আলোচ্য নিবন্ধের যৌক্তিকতার প্রমাণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। মেঘদূতকাব্যে উত্তরমেঘকে সম্ভাষণ করিয়া যক্ষ বলিতেছেন—"ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলী-বোন্মুখী সা" এবং কাব্যারম্ভে টীকাকৃৎ কোলাচলসূরি শ্রীমল্লিনাথ বলিয়াছেন - রামায়ণের ছায়া অবলম্বন করিয়া মেঘদূতকাব্য রচিত। অনুরূপভাবে মূলগ্রন্থ বিশ্লেষণ করিলে

শকুন্তলার উপর রামায়ণের প্রভাব বিষয়ে একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে অশ্বমেধযজ্ঞে রাম ও সীতার পুনর্মিলন। প্রজানুরঞ্জন এবং সীতার পবিত্রতা-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে পুনরায় রামচন্দ্র সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রার্থনা করেন। শোকদীর্ণা ও লাঞ্ছিতা সীতা জীবধাত্রীজননী ধরিত্রীর ক্রোড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রামায়ণে দেখা যায় সীতার উক্তি :

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥
মনসা কর্মণা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥"
(উত্তরাকাণ্ডম্—১১১শঃ সর্গঃ)।

স্বামী প্রত্যাখ্যাতা ভাগ্যবিড়ম্বিতা পুরোহিতের পশ্চাদ্‌-বর্তিনী শকুন্তলা ঐকান্তিক অবস্তিতে সর্বংসহা ধরিত্রীর ক্রোড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন, 'ভগবতি বসুধে দেহি বিবরম্‌' এই বাক্যের দ্বারা। বসুন্ধরার পরিবর্তে স্বয়ং মেনকা আবির্ভূতা হইয়া লাঞ্ছিতা দুহিতার সকল বেদনার অবসান করিলেন। সীতা বলিয়াছিলেন,"মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি",শকুন্তলা বলিয়াছিলেন—"ভগবতি বসুধে দেহি বিবরম্‌।" কেবল-বাক্যবিন্যাসের দিক্‌ হইতে নহে, ঘটনাবলীর নিবিড় সাদৃশ্য শকুন্তলা নাটকের উপরে রামায়ণের প্রভাব বিষয়ে পাঠক-চিত্তকে স্বভাবতঃই উদ্‌গ্রীব করিয়া তুলে।

স্বপ্নের আকাশ

শ্রীকৃতী সোম

বিক্ষুব্ধ উতল প্রাণ আজো বাঁধে আকাঙ্ক্ষার নীড়।
ভুলে গিয়ে প্রাত্যহিক-ব্যর্থতার আছাড়-যন্ত্রণা
বন্ধ্যাভাগ্য প্রহরের ধূলিম্লান বেদনার ভীড়
একটি অলীক স্বপ্নে ঘুরে মরে খেয়ালী কল্পনা।

আলোর ইসারা পাই মৃত্যুকালো অন্ধকার রাতে
অথচ শিকারক্ষিপ্ত বুভুক্ষিত বাস্তব-হাঙ্গর
অপ্রাপ্তির স্রোত শুধু বয়ে যায় সময়ের খাতে
অদৃশ্য ইমন শুনি—অর্থহীন আবেগের ঝড়।

ঝুমকোলতার মত দুরুদুরু-কাঁপা ভীরুবুকে
জীবিকার অন্বেষায় ছুটে চলি কর্মের পসারী
মানস-সারস তবু বুঁদ হায় নেশা-ভুলচুকে
অক্টোপাশ-বন্দী হয়ে তবু আমি মুক্তির দিশারী।

ব্যথাদীর্ণ জীবনেতে খেয়ালের খুঁজি অবকাশ,
একরাশ সুখ নয়—একমুঠো স্বপ্নের আকাশ।

চরণ

শ্রীবিমলানন্দ ভট্টাচার্য্য

ধরণীর ধূলি 'পরে কুণ্ঠিত চরণে
নিখিলের হৃদয়ের মাধুরীশোণিমা
তিলে তিলে গড়িয়াছে লালসা-বরণে,
অসীম বুভুক্ষা তাহে লভিয়াছে সীমা।

কাননে ফুটিত ফুল ও রাঙা পরশে—
ঝঙ্কারিয়া স্রোতস্বিনী বয়ে যেত গানে,
উদ্বেলিত যৌবনের নয়ন-রভসে
রঞ্জিত হইয়া উঠে আজি প্রাণে প্রাণে ?

কত বসন্তের গীতি ওইখানে ডোরে
অশোকমঞ্জরী আর মাধবীলতায়,
শিশির-বন্দিত ফুল্ল কুসুমের কোরে
আর স্নিগ্ধ সায়াহ্নের সুস্মিত ছায়ায়।

ধরণীর ধূলি 'পরে ও রাঙা চরণ
হৃদয়-আকাশ চাহে লইতে শরণ।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বার্দ্ধক্যের সমস্যা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পশ্চিম ইউরোপে এবং উত্তর আমেরিকায় এক দিকে যেরূপ বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়িতেছে, হারাহারি ভাবে অপর দিকে শিশুর সংখ্যা কমিতেছে। ইহা এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৮০ সনে সুইডেন ও গ্রেট ব্রিটেনে ৬০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এরূপ বৃদ্ধের সংখ্যা মোটে ভোটদাতাগণের সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়াইবে। চিন্তাশীলতা, ভাবপ্রবণতা এবং ব্যক্তিত্ব যদি পরিণত বয়সের বিশেষত্ব হয় তবে সমাজের গঠন বা প্যাটার্ণ তখন কিরূপ হইবে? এই জন্যই যাঁহারা সার্থক দীর্ঘ জীবনে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করা প্রয়োজন। স্বভাবতঃই যাঁহারা নিজেদের শক্তি সামর্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছেন এবং বহু বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই জীবন যুদ্ধে জয়ী হইয়া পরিণত বয়স লাভ করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে নিজেদের স্বাভাবিক শক্তি হারান না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বার্দ্ধক্যের জন্য প্রস্তুত সম্পর্কে বহু গবেষণা হইয়াছে এবং কোন্ অবস্থায় অবসর লইতে হইবে সে বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হয়। এই বিষয়ে অন্যান্য দেশও আমেরিকাকে অনুসরণ করিতেছে এবং মনে হয় সকল দেশের পক্ষেই এই বিষয়ে একটি কার্যসূচী গ্রহণ করা সমীচীন। জীব মাত্রেই যদি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচে তাহা হইলে জীবন ধারারও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে, দায়িত্ব এবং নেতৃত্বের ভার দিতে হইবে যৌবনকে এবং বৃদ্ধদের অবশিষ্ট জীবনকালকে তদনুযায়ী খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির জন্য পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় শিশু মাত্রেই সম্ভাব্য দীর্ঘ জীবন লইয়া জন্মগ্রহণ করে। বার্দ্ধক্যের সমস্যা আজও চিকিৎসাশাস্ত্র সমাধান করিতে পারে নাই। বার্দ্ধক্যের বহু অক্ষমতা ব্যাধির জন্যই হয়। কাজে কাজেই প্রাণী জীবনের মূলসমস্যা এবং প্রশ্নের জবাব আজও অজ্ঞাত।

এই চিকিৎসা বনাম সামাজিক সমস্যা খুবই বিরাট—জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আয়ের এক বড় অংশ বার্দ্ধক্য এবং যে সকল রোগের কারণে বার্দ্ধক্য এবং তজ্জনিত অক্ষমতা আসে তদ্বিষয়ে গবেষণা করার জন্য বরাদ্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শরীর ও মনের অসুস্থতাই বৃদ্ধ বয়সের অক্ষমতার প্রধান কারণ।

বৃদ্ধদিগকে যদি সমাজজীবন হইতে একেবারে বাদ না দিতে হয় এবং সার্থক ভাবে সমাজের কাজে লাগাইতে হয় তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে কোন্ সকল কারণে বিশেষতঃ সামাজিক কারণে মানুষের শরীর ও মনের শক্তি হ্রাস পায়, সেই সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে পূর্ণ ভাবে জ্ঞান লাভ দরকার। বৃদ্ধগণকে একেবারে বাদ দিতে গেলে সমাজজীবন বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

মোট কথা হইতেছে এই যে, বার্দ্ধক্যের প্রশ্নটি একাধারে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক একাধারে সামাজিক এবং রাজনৈতিক। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, প্রাণীবিজ্ঞান সম্পর্কীয় মানুষের এই সমস্যাটি নানা দিক দিয়া গভীরভাবে আলোচনার যোগ্য।

অথচ বার্দ্ধক্যের সমস্যাটি কিছু নূতন নহে। আদীম মানুষের জ্ঞান হওয়া অবধি সে দেখিয়াছে যে, সে নিজে এবং যে সকল প্রাণী সে শিকার করে কিংবা গৃহে পালন করে, উভয়ের জীবন খুবই সীমাবদ্ধ, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কর্মক্ষমতা, শক্তি এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। মোটামুটি ভাবে বলা চলে, 'বার্দ্ধক্য' বলিতে বয়স বুঝায়, পরে ইহার ভয়ানক অর্থ দাঁড়াইয়াছে সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমতার হ্রাস বা জরা।

ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ প্রভূত ক্ষমতা লইয়াই ৬০, ৭০ এমন কি ৮০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থে আরও বেশী বয়সের লোকের শক্তি-সামর্থ্যের উল্লেখ আছে, অতিশয়োক্তি বাদ (১০০০, ২০০০ এবং ৫০০০ ইত্যাদি) দিলেও ইঁহারা যে খুব বেশী বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু বৃদ্ধদের সংখ্যা নিতান্ত সাম্প্রতিক কাল ব্যতীত, খুবই অল্প এবং বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে বর্ণনা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কেরাই করিয়াছে। বার্দ্ধক্য ও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা খুব অল্পদিনই মানুষ বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিতেছে। প্রাচীনকালের আলোচনা অনেকটা দার্শনিকতার দিক হইতে।

গ্রীসের চিন্তা পাশ্চাত্য জগতকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে—সুতরাং বৃদ্ধ বয়স সম্বন্ধে গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা হইতে অভিন্ন। গ্রীকেরা অবশ্য বার্দ্ধক্যের প্রতি মুখে সম্মান দেখাইয়াছে—তাহাদের বড় বড় দার্শনিক ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ—কিন্তু যুবকই ছিল তাহাদের নিকট পূর্ণতার প্রতীক। সোফোক্লিস বৃদ্ধ বয়স সম্বন্ধে বলেন, 'বুদ্ধি সঙ্কুচিত হয়, যাহা কিছু করে সকলই হয় নিষ্ফল, এজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই।' বার্দ্ধক্য ছিল ভয়াবহ—কারণ শারীরিক অক্ষমতা এবং শক্তির বিনাস ছিল বার্দ্ধক্যের সহচর।

তবে সকল গ্রীকেরই এই মত নহে। স্পাটার লাইকারগাসের সংবিধানে গবর্ণমেন্টের সংগঠনে তিনটি স্তরের ব্যবস্থা ছিল—রাজা, বিচারক পরিষদ (Ephors) এবং Gerousia বৃদ্ধ বা প্রবীণ পরিষদ।' প্রবীণ পরিষদের সভ্য সংখ্যা ছিল ২৮ জন, প্রত্যেকের

বয়স ৬০ বৎসরের উপর। এই বয়সের যে ব্যক্তিগণ নির্বাচন প্রার্থী হইত তাহাদের ভিতর হইতে ২৮ জনকে বাছাই করা হইত। তবে 'গেরৌসিয়া'র ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। তাহারা নিজেদের ভিতর হইতে সভাপতি' নির্বাচন করিতে পারিত না, রাজাই ছিলেন তাহাদের সভাপতি। তাহাদের সভা ডাকিত 'একরগণ' (বিচারক পরিষদ)। বৃদ্ধেরা উপদেষ্টা মাত্র ছিল কিন্তু স্পার্টার সমাজে তাঁহারা সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই জন্যই গ্রীক প্রবচন হইয়াছে 'একমাত্র স্পার্টার বৃদ্ধ হওয়া ভাল' (only in Sparta is it good to grow old)।

অন্যান্য জাতির মধ্যে বার্দ্ধক্য ছিল অবজ্ঞাত—যাযাবর এবং পশু শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিতে এরূপ বহু জাতির (tribe) মধ্যে কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি আত্মরক্ষায় অক্ষম হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলা হইত বা তাহাকে পরিত্যাগ করা হইত। আমেরিকার ওমাহা কো ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে যখন পিতা বার্দ্ধক্যের জন্য আর জাতির সহিত চলাফেরা করিতে অক্ষম হইত তখন পুত্রের কর্ত্তব্য ছিল তাহাকে হত্যা করা।

ঠিক ইহার বিপরীত ছিল চীনাগণ। সভ্যতার ইতিহাসের প্রাচীনকাল হইতে চীনদেশ বৃদ্ধের সম্মান করিয়া আসিতেছে। চীনা ভাষায় আলাপের ভাষা হইতেছে "মহাশয়ের সম্মানিত বয়স কত।" কনফিউসিয়াস বৃদ্ধ বয়সকে সম্মান করিতে নৈতিক উপদেশ দিয়াছেন—এই উপদেশ তাও ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া চীন মানসে যে আরও গভীর রেখাপাত করিয়াছে। চীনাগণ বৃদ্ধের প্রতি সম্ভ্রমশীল হইলেও বার্দ্ধক্যে যে শরীর ও মনের অক্ষমতা আসে এ বিষয়ে তাহারা খুবই অন্তঃদৃষ্টিসম্পন্ন—প্রাচীন চীনা কবিতা তাহাই প্রমাণ করে।

প্রাণী বেশী দিন বাঁচিলে তাহার আরও বেশী দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা বাড়ে, কারণ অধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য জীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সে এড়াইয়া চলিতে পারে এবং দীর্ঘকালীন সহচর্য্যের দরুণ রোগের সংক্রামকতাও তাহাকে স্পর্শ করে না। মানুষের পক্ষেও ইহা সত্য হইতে পারিত, কিন্তু কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে বয়োধিক্যের সহিত জরার সম্পর্কের বেশী উল্লেখ দেখা যায়। এই যে সকল দিক দিয়াই শরীর ক্ষয় হয় ইহাই কি স্বভাবের নিয়ম? এই বিষয়ে নানা মতবাদ আছে এবং মতবাদ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এই সকল মতবাদের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে একই মতবাদের পুনরুক্তি হইতেছে মনে হয়। দার্শনিক মত বৈজ্ঞানিক মতকে প্রভাবান্বিত করার জন্যই বাস্তবক্ষেত্রে ইহার যথাযথ অনুসন্ধান চলে নাই।

বিশেষ শারীরযন্ত্রের ব্যবহার ও প্রজননের সহিত বার্দ্ধক্য বা জরার সম্পর্কের আলোচনায় বিষয়টি আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ব্রুটিন একটি ইঁদুর, কুকুর ও মানবশিশুর জীবনের প্রথম বৎসর এইরূপে তুলনা করিয়াছেন, এক বৎসরে ইঁদুর উহার জীবনে যতগুলি সন্তান উৎপাদন করা উচিত সবগুলি করিয়াছে—নিজে প্রায় বারো মাস মাত্র বাঁচিবে। কুকুরী এক বৎসরে সন্তান প্রসবের উপযুক্ত হইয়াছে—হয় ত এখনও সন্তান প্রসব করে নাই। মানবশিশু সবে হাঁটিতে শিখিতেছে—সন্তান প্রসব ত দূরের কথা।

কোন কোন জীবের বেলা যৌন বিষয়ে পক্বতা ও প্রজনন একই সঙ্গে হয়, কিন্তু মানুষের বেলা এই উভয়ের মধ্যে কয়েক বৎসরের ব্যবধান দেখা যায়। আমাদের জ্ঞানমতে অতি অল্প সংখ্যক জীবই প্রজনন স্থগিত হওয়ার পরও বাঁচিয়া থাকে—মানুষ এই অল্প সংখ্যকের অন্তর্গত। প্রজনন শক্তি লোপ পাইলেও মানুষ বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। চাষী এবং পশুপালকেরা চায় না যে, তাহাদের গৃহপালিত জন্তুগুলি প্রজনন শক্তি লোপ পাইবার পরও বাঁচিয়া থাকুক। এই সকল জীবজন্তু প্রজনন শক্তি লোপের পর উহারা কতকাল বাঁচিয়া থাকে উহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। অবশ্য এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, কোন কোন উদ্ভিদ এবং মাছের ফল বা সন্তান উৎপাদনের পর জরা আসে, কিন্তু এরূপ প্রমাণ বলে মানুষ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

কোন এক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, শরীরের মধ্যে বিষ জাতীয় জিনিস জমিয়া বার্দ্ধক্যের সৃষ্টি করে। কেহ বলেন যে, নানা প্রকারের জীবাণু অন্ত্রের ভিতর জমিয়া জরা আনে। অতিরিক্ত ভোজন করিলে অন্ত্রে বিষ জমে ইহাও একটি মত। কম খাদ্য দেওয়ায় ইঁদুরের দৈহিকবৃদ্ধি কমিলেও আয়ুবৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা দেখা গিয়াছে। তবে প্রজননের বয়সে উপনীত হইলে ইঁদুরকে যদি কম খাদ্য দেওয়া হয় তবে উহার জীবনকাল হ্রাস পায়।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস, দেহের ক্ষয়-ক্ষতি হইতেই জরা আসে। কিন্তু কোন একটি মাত্র মান প্রয়োগ করিয়া জরার পরিমাপ করা চলে না। এ্যাকচুয়ারীর লাইফ-টেবল হইতে কিছুটা গাণিতিক পরিমাপ চলে, কিন্তু তাহাও সম্ভাব্য মৃত্যুসম্পর্কীয়। এ্যাকচুয়ারীর টেবল তৈরী করিতে কতগুলি বিষয় স্বীকার করিয়া লওয়া হয়—যথা, বাইবেল বর্ণিত মানুষের জীবন তিন কুড়ি এবং দশ বৎসর এই'বাক্যের কোন সার্থকতা নাই, বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে মোটামুটি ভাবে কোন ব্যবধান নাই। এই সকল এবং অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও এ্যাকচুয়ারীর টেবল হইতে এরূপ সকল তথ্যাদি পাওয়া যায় যাহা জীব এবং সমাজ বিজ্ঞানীদের নিকট খুবই মূল্যবান।

মৃত্যু হঠাৎ আসে। ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ নহে যে, স্বাভাবিক ভাবে শারীরযন্ত্রগুলি নির্জীব হইয়া আসে এবং স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মৃত্যু হয়। একজন বৈজ্ঞানিক দুইজন ব্যক্তির বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন, যাহারা এক শত বৎসর বাঁচিয়া সামান্য রোগে ভুগিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। মৃত্যুর পরে তাহাদের দেহ সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের দেহের মধ্যে এরূপ সকল পরিবর্ত্তন পাওয়া গিয়াছে যাহার জন্যে বিগত ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে যে কোন সময়ে তাহাদের মৃত্যু হইতে পারিত। নানা প্রকার

রোগের প্রাদুর্ভাব জন্য ইতর জীবের মধ্যে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিতে পারা যায় নাই। মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানুষকে ভিতর ও বাহিরের সকল প্রকার বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিলে যে ১০০ বা ১২০ বৎসর বাঁচিবে ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। মানুষ স্বভাবতঃই ৭০ বৎসর বাঁচে —বাইবেলের এই উক্তির সমর্থন কোথাও মেলে নাই।

জনগণের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের লোকের সংখ্যা গণনার জন্য বৃদ্ধ লোক এবং বার্দ্ধক্যের সমস্যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা আবিষ্কার নব জাতকের দীর্ঘ জীবন লাভের সহায়ক হইয়াছে। শিশুমৃত্যু কমিয়াছে—এজন্য sulphonamides এবং antibiotics বহুলাংশে দায়ী। যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৮৯ সনে জন্মের সময় শিশুসম্ভাব্য জীবন ছিল সাড়ে ৩৫ বৎসর, ১৮৫০ সনে ৪০ বৎসর, ১৯০০ সনে ৫০ বৎসর, ১৯২০ সনে ৫৫ বৎসর, ১৯৩০ সনে ৬০ এবং বর্ত্তমানে ৭০ বৎসর। পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার অনেক দেশেই এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৮৭৬-৮০ সনে সুইজারল্যাণ্ডে নর ও নারীর সম্ভাব্য জীবনকালের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৭ এবং ৫১ বৎসর। ১৯২৯-৩২ সনে পুরুষের ৬৮ এবং নারীর ৭০ বৎসরে দাঁড়াইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে গ্রেটব্রিটেনে সম্ভাব্য জীবনকাল ছিল ৫০ বৎসর, এখন পুরুষের ৬৮ এবং নারীর ৭০ বৎসর হইয়াছে।

শতকরা ষষ্টোত্তর

বয়স্কের সংখ্যা	ফ্রান্স	সুইডেন	ইংলণ্ড এবং ওয়েলস	জার্ম্মেনী	ইটালী
৮	১৭৯০	১৮৫০	১৯১০	১৯১১	১৮৬০
১০	১৮৫০	১৮৮২	১৯২৫	১৯২৫	১৯০৮
১২	১৮৭৫	১৯১২	১৯৩১	১৯৩৭	১৯৫২
১৪	১৯৩১	১৯৪০	১৯৩৮	১৯৫১(১)	১৯৬৪
১৬	১৯৫০	১৯৫৫	১৯৫২	১৯৫৯(১)	১৯৭২
১৮	১৯৬৪	১৯৬৫	১৯৬২	১৯৬৪(১)	১৯৮৮

(১) ১৯৪৫ এর পরে কেবল পশ্চিম জার্ম্মেনী।

সওভি উপরোক্ত টেবল দ্বারা কিরূপে পশ্চিম ইয়োরোপে ষাটের অতিরিক্ত বয়সের ব্যক্তিগণের সংখ্যা শতকরা হিসাবে বাড়ে তাহা দেখাইয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, এবং আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ জনগণের বৃদ্ধির গতি এবং বয়ক্রম ১৯৮০ সনের পরে কি দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে কোন ভবিষ্যৎ উক্তি করা চলে না, কারণ জন্মের হার সম্বন্ধে ঠিকভাবে কোন অনুমান করা যায় না। যুক্তরাজ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে যুদ্ধোত্তর সময়ে জন্মের সংখ্যা বাড়িয়াছে—সুতরাং বড়জোর বলা চলে যে, বৃদ্ধির সম্ভাবনা এরূপ—নিশ্চয় ভাবে কিছু বলা চলে না। যদি জীবজগতের নিয়ম অনুযায়ী জন্ম মৃত্যুর সমতা হয়—জন্মের হার এরূপ হয় যে, এক পুরুষের মৃত্যু পরবর্ত্তী পুরুষের জন্মদ্বারা পূরণ হয় মাত্র এবং বাঁচিবার সম্ভাবনা বর্ত্তমানে যেরূপ ভবিষ্যতেও তাহাই থাকে, তাহা হইলে গ্রেট ব্রিটেনে শতকরা ২৪ জন ষাটোত্তর বয়সের হইবার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমানে যুক্তরাজ্যে শতকরা ১৪ জন পেন্সন পাওয়ার বয়সে পৌঁছিয়াছে—অর্থাৎ পুরুষের ৬৫ বৎসরের অধিক এবং নারীর ৬০ বৎসরের অধিক এরূপ লোকের সংখ্যা ১০০তে ১৪ জন। অর্থাৎ প্রত্যেক ১৫ জনের মধ্যে ২ জন এবং প্রত্যেক ১৫ জনের ১ জন ৭০ বৎসর বয়স্ক। আগামী ২৫ বৎসরে প্রত্যেক ১৪ জনের মধ্যে ৩ জন পেন্সন পাওয়ার বয়সে পৌঁছিবে—৯ জনের ১ জন সপ্ততিবর্ষীয় হইবে। সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এরূপ লোকের সংখ্যা হইবে ৫০ লক্ষ।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির গতি রাজনীতি এবং অর্থনীতির দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনগ্রসর দেশগুলিতে—প্রাচ্য এবং পূর্ব্ব ইউরোপে, বৃদ্ধের সংখ্যা শতকরা ২.৩ জন মাত্র। পরিবর্ত্তন এই সকল দেশেও হইতেছে, তবে জন্মের হারের বৃদ্ধির জন্য দ্রুতগতিতে হইতেছে না। উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইয়োরোপে জন্মের সংখ্যা বাড়িলেও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়িবে, কারণ ইতিমধ্যে মধ্য বয়সীর সংখ্যা খুবই বাড়িয়াছে, আর ইহারা বার্দ্ধক্যের দিকে চলিয়াছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির জন্য যে সকল সংক্রামক রোগ তরুণদিগকে আক্রমণ করে তাহা বাধা পাইতেছে। যে সকল রোগ জীবনের দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেখা যায়—যথা, হৃদরোগ, অস্ত্রের ব্যাধি, শিরক্ষয়জনিত রোগ, ক্যানসার প্রভৃতির আক্রমণ হঠাৎ হইয়া থাকে—ইহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের আরও উন্নতির উপর নির্ভর করে। নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা জীবন ধ্বংসকারী রোগের প্রতিরোধ হইলে মানুষ আরও বেশী বাঁচিবে এবং তখন সম্ভাব্য জীবনকাল স্বভাবতঃই ১০০ বৎসর কিম্বা আরও বেশী বৎসর হইবে।

গত ১০০ বৎসরে শিশুর জন্মসময়ের সম্ভাব্য জীবনকালের পরিমাণ বাড়িয়াছে, কিন্তু মধ্য বয়স্কের বিশেষ কিছু বাড়ে নাই। ১৯০১-১০-এ ইংলণ্ডে একজন ৬০ বৎসর বয়স্কের সম্ভাব্য জীবনকাল ছিল সাড়ে তের বৎসর, ১৯৫০-এ ইহা হয় ১৫ বৎসর—অর্থাৎ আরও দেড় বৎসর বাড়িয়াছে। ১৯৫৫ সনের হিসাব মত এই দেড় বৎসরের স্থলে বৃদ্ধি হইয়াছে ৩ বৎসর। সুতরাং সম্ভাব্য জীবনকালের বেশী বৃদ্ধি দেখা যায় জন্মসময়ের হিসাবে।

সাধারণের ধারণা বার্দ্ধক্য ক্ষয়ের নিদর্শন মাত্র। বার্দ্ধক্যের অবলম্বন হইতেছে পরচুল, কাণে-চোঙ্গা, চশমা, নকল দাঁত, নকল পা ইত্যাদি। ইহা নিঃসন্দেহ যে, জীবনের কঠোরতা এবং রোগ ভোগ হইতেই বৃদ্ধ বয়সের অনেক অক্ষমতা আসে। এক একটা পেশার লোকেরা এক একটা বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়, কিন্তু এই

সকল রোগ হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়, আজও সে পন্থাগুলির আবিষ্কার হয় নাই।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সমানভাবে পূর্ণ ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জ্জন করে না, আর হারাহারি ভাবে উহা হারায়ও না। ১০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হয় অথচ অনেকে ৫০ বৎসরে উপনীত হইবার পূর্ব্বে চশমা ব্যবহার করে না। ৬০ বৎসরে পৌঁছিলে তবে গীর্জ্জায়, থিয়েটারে এবং বক্তৃতা সভায় সামনের দিকে বসিতে চায়, কারণ শ্রবণশক্তি হ্রাস পাইতেছে। ষাটের উপর বয়স বাড়িলে চলা-ফেরার অসুবিধা টের পায়, প্রতি পায়ের সন্ধিগুলিতে যেন খিল ধরিতেছে—দ্রুত চলা পরিহার করে। এই বয়সেই দেহের সঙ্কোচন বেশ উপলব্ধি হয়। সত্তরে পড়িলেই বৃদ্ধ নিজে বুঝিতে না পারিলেও তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন বন্ধুদের নিকট ধরা পড়ে।

তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে ও পরিমাণে মানসিক পরিবর্ত্তন হয়, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। এরূপ বলা হয়, বৃদ্ধ আবার দ্বিতীয় বার শিশুর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যদিও শৈশবের মাধুর্য্য তাহার মধ্যে থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি এবং মননশক্তির কি ভাবে পরিবর্ত্তন হয় তাহা পরিমাপ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইত যে, বৃদ্ধ বয়সে মানসিক শক্তি দ্রুত হ্রাস পায় কিন্তু সাম্প্রতিক পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ২০ হইতে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত মানসিক শক্তি নিয়মিত ভাবে ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, ৬০ বৎসরের এই হ্রাসের গতি একটু দ্রুত হয়।

যে সকল পরীক্ষা শিশুদের করা হয়, প্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে তাহা খাটে না, সুতরাং এই সকল পরীক্ষা হইতে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহা খুব সাবধানে গ্রহণীয়। যোগ্যতা অর্জ্জনের সহিত ক্ষমতা হ্রাসের কোন সম্পর্ক তাহাও জানা যায় না। এই যে ক্ষমতা হ্রাস ইহা কি সকল ক্ষেত্রে একই মাত্রায় হয় যে, খুব মননশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির বেলায় দেখা যায় যে, ৬০ বৎসর বয়সে ক্ষমতা হ্রাস সত্ত্বেও তিনি মহামনীষাসম্পন্ন। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন, চারি উপায়ে অল্পবয়স্কের সহিত বৃদ্ধের মননাশক্তির তুলনা করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রকার তুলনাও কোন প্রকার তথ্যে পৌঁছানর পক্ষে চূড়ান্ত নহে।

অসুবিধা হইতেছে এই যে, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার ব্যাপারে 'বুদ্ধি' এবং 'অভ্যাস' প্রতিবন্ধক জন্মায়। সুতরাং বয়সের সঙ্গে যে মানসিক পরিবর্ত্তন আসে তৎসম্বন্ধে সাধারণের কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা আছে।

বরং ইতিহাসে দেখা যায়, সত্তর কিম্বা আশী বৎসর বয়সেও লোকেরা অদ্ভুত মানসিক ক্ষমতার প্রমাণ দিয়াছে—বিরাট গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছে। আশী বৎসরে গোটে তাঁহার 'ফষ্ট' দ্বিতীয় খণ্ড, ভার্ডি তাঁহার 'ফলষ্টাফ' এবং হ্যামসেন্ট তাঁহার 'কসমস' রচনা করিয়াছেন। গত দশকে জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে, বিজ্ঞানে, সঙ্গীতে, কলায়, সাহিত্যে, দর্শনে এমন কি রাজনীতিতেও বিরাট কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছেন এইরূপ মহান ব্যক্তিগণ—যাঁহারা এখন অশীতিপর বৃদ্ধ—এখনও তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে আছেন এবং সৃজনী শক্তি হারান নাই। বর্ত্তমানে এই গতি হইতে ভবিষ্যতের আশা, স্বতঃই মনে জাগে।

যে সকল অক্ষমতার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে সাধারণ মানুষের অদৃষ্টে তাহাই ঘটে—তবে কাহারও পূর্ব্বে এবং কাহারও পরে। রোগে এই অক্ষমতার কাল আগাইয়া আনে। চিকিৎসা শাস্ত্রমতে জাতির মধ্যে বেশী বয়সের লোকের সংখ্যা বাড়িলে, বেশী সংখ্যক লোকের সীমাবদ্ধ যোগ্যতা লইয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে, যদি না নূতন আবিষ্কার এবং যন্ত্রপাতি—যথা, শ্রবণ-সহায়ক (hearing aids), চশমা, নকল দাঁত প্রভৃতি এই সকল অযোগ্যতার পরিমাণ হ্রাস বা একেবারে দূর করে। বৃদ্ধ বয়সে এই সকল অযোগ্যতা স্বাভাবিক হইলেও অপেক্ষাকৃত কম বয়সে ইহারা দেখা দিলে কঠোর এবং গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে।

মধ্য এবং বৃদ্ধ বয়সের লোকেরা যে সকল রোগে আক্রান্ত হয় তজ্জন্য চিকিৎসার খরচও খুব বেশী। জীবনের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে সকল রোগ হয় তাহা সাধারণতঃ শরীর ক্ষয় এবং শিরা-উপশিরা সম্পর্কিত যথা, hypertension, coronery, artery, মূত্রাশয় ক্যানসার, ক্রনিক ব্রংকাইটিস, osteoarthritis, মানসিক বিকৃতি, বহুমূত্র ইত্যাদি। এই সকল রোগ ক্রমে বাড়িয়া চলে, নিশ্চিত ভাবে নিরাময়ের ঔষধ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। দূষিত আবহাওয়া হইতে কতকগুলি রোগ হয়—ধোঁয়া কিম্বা শিল্পের জন্য আবহাওয়া বিষাক্ত হওয়ার কারণগুলি দূর করিতে পারিলে কাসি প্রভৃতি রোগ হ্রাস বা দূর করা সম্ভব।

যে সকল রোগের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে ভুগিয়া এবং বার বার চিকিৎসা করাইয়াও শেষে লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং হাসপাতালই হয় আশ্রয়। বর্ত্তমানে সমাজসেবার জন্য খুবই ব্যয় হয়—ইহার বৃহত্তম অংশ ব্যয়িত হয় চিকিৎসায়। হারাহারি ভাবে সমাজে বৃদ্ধের সংখ্যা বাড়িলে চিকিৎসায় ব্যয় অত্যধিক হইতে বাধ্য। বর্ত্তমানে গ্রেট ব্রিটেনের মানসিক হাসপাতালে অর্দ্ধেকের বেশী রোগীর বয়স ৬০ বৎসরের উপরে।

৫০ বৎসরের বেশী বয়সের লোকের মৃত্যু বেশী হয় কোন না কোনরূপ নিউমনিয়া বা ব্রংকাইটিস রোগে। বর্ত্তমানে লোকে এন্টিবাইয়োটিক চিকিৎসায় সংক্রমকতা হইতে রক্ষা পায় বটে কিন্তু তাহাদের শরীর এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে তাহারা যে কোন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং বৎসরে কয়েকবার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাইতে হয়। ইহা হইল 'চিকিৎসার জোরে' বাঁচিয়া থাকা।

কয়েকজন প্রতিভাবান বৃদ্ধ—

সোফোক্লিস—(খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫-৪০৬) ইনি ৯০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। ৭৫ বৎসর বয়সে Oedipus Rex রচনা করেন।

...dipus and Colonus রচিত হয় ৮৯ বৎসর বয়সে। ... বয়সে ইনি এথেন্স নগর রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করেন।

টিটিয়ান—(১৪৭৭-১৫৭৬) ইহার বয়স যখন ৯৫ বৎসর তখন The Battle of Zepanto নামক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৯৭ বৎসর বয়সে Descent from the Cross লেখা সুরু করেন। ৯৯ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

গেটে—(১৭৪৯-১৮৩২) পৃথিবীর অন্যতম চিন্তানায়ক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জার্ম্মান কবি, তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Faust নামক কাব্যের শেষ খণ্ড মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ৮৩ বৎসরে সম্পূর্ণ করেন।

ভার্ডি—(১৮১৩-১৯০১) ইনি ৮৮ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। ৭৩ বৎসর বয়সে Othello নামক অপেরা লেখেন, ৮০বৎসর বয়সে Falstaff এবং ৮৫ বৎসর বয়সেও ইহার রচনার বিরাম ছিল না।

(ইউনেস্কো-ক্যুরিয়ার)

যুগান্তরকারী বাংলা উপন্যাস

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

উপন্যাস সমালোচনায় 'যুগান্তরকারী' কথাটি অনেক সময় শিথিল-ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখনই কোন উপন্যাসের টেক্‌নিকে অভিনবত্বের ছোপ লাগে তখনই উচ্ছ্বসিত হয়ে আমরা উপন্যাস-খানিকে যুগান্তরকারী উপন্যাস বলতে দ্বিধা করি না। এ কথাটা আমরা ভুলে যাই 'যুগান্তরকারী' কথাটি গভীর অর্থবহ, শিল্প সমালোচনায় চরমতম মতের পরিচায়ক।

প্রশ্ন উঠে, যুগান্তরকারী উপন্যাস তবে আমরা বলব কাকে? কোন্ বিশেষ অর্থব্যঞ্জনা দ্যোতনা করে সমালোচনায় ব্যবহৃত ওই বিশেষণটি?

যুগান্তরকারী উপন্যাসের এমন একটা সংজ্ঞা দিলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না: ভাবাদর্শ, জীবন-জিজ্ঞাসা বা রূপাঙ্গিকের দিক দিয়ে যখন কোন উপন্যাস সমসাময়িক বা পরবর্তী উপন্যাসের উপর একটা অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করে; বা উপন্যাস রচনার একটা নূতন পথের ইঙ্গিত দেয় তখন তাকে বলা চলে যুগান্তরকারী উপন্যাস। এ ধরনের উপন্যাস সব সময় মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত না হলেও যে অনন্য সৃষ্টি হয়ে ওঠে তাতে সন্দেহ নেই।

উদাহরণ স্বরূপ ধরুন, বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। এ উপন্যাসখানিতে বঙ্কিমের পরিণত প্রতিভার ছাপ নেই এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য্য, কিন্তু এ অপরিণত শিল্প-সৃষ্টি সে যুগে বাংলা সাহিত্যের বর্ণহীন আকাশে রোমান্টিক কল্পনার রঙ ছড়িয়ে লেখক ও পাঠকের সামনে যে একটি নূতন ও অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য্য জগতের সন্ধান দিয়েছিল সে কথা অস্বীকার করবার উপায় আছে কি? আজ উপন্যাস শিল্প রচনার একটা উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়ে সে উষর যুগের রোমান্টিক কল্পনায় ভরপুর দুর্গেশনন্দিনী আবির্ভাবের গূঢ় অর্থ-ব্যঞ্জনাকে হয়ত আমরা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারব না; কিন্তু নবসৃষ্টির ক্ষেত্রে দুর্গেশনন্দিনীর প্রবল রোমান্টিক ভাবাবেগ সে যুগের শিল্পীমনের সামনে যে একটা অ-দৃষ্ট ও অননুভূত কল্পলোকের সন্ধান দিয়েছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের প্রাণহীন বাংলা কথা-সাহিত্যকে সর্ব্বপ্রথম নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করেছে মানুষের হৃদয় রহস্যেঘেরা কাহিনী দুর্গেশনন্দিনী, আর সমসাময়িক কথাকারদের সামনে আধুনিক ইউরোপীয় টেকনিকে উপন্যাস রচনার দৃষ্টান্তও দেখিয়েছিল বঙ্কিমের এ প্রথম উপন্যাসখানি—এ হিসেবে দুর্গেশনন্দিনী অবশ্যই একখানি যুগান্তর-কারী উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এ উপন্যাসখানির গুরুত্ব বিশ্লেষণে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন: "দুর্গেশনন্দিনী আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্ব চালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ সামাজিক (কৃষ্ণকান্তের উইল), অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক ও সমাজচিন্তাশ্রিত রোমান্টিক (চন্দ্রশেখর) এবং ঐতিহাসিক (রাজসিংহ) উপন্যাসকেও মোটামুটিভাবে যুগান্তরকারী উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলা চলে, কারণ এ উপন্যাসগুলিও তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী লেখকদের উপর অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু তাঁর মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত গভীর দেশাত্মবোধক উপন্যাস 'আনন্দমঠ'কে নিঃসন্দেহে একখানি 'যুগান্তরকারী' উপন্যাস বলতে কোন বাধা নেই। শিল্প রচনায় অপূর্ণতা সত্ত্বেও এ উপন্যাসখানি শুধু তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তী যুগের উপন্যাস-শিল্পীর উপরে যে একটা অমোঘ প্রভাব বিস্তার করেছে তা নয়, এ উপন্যাসখানির সুমহান ভাবপ্রেরণা অনির্ব্বাণ দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়ে একটা আত্মবিস্মৃত পরাধীন জাতিকে যুগে যুগে বন্ধনমুক্তির স্বপ্ন উন্মত্ত করেছে। একটি সমগ্র দেশ ও জাতির উপর একখানি উপন্যাসের এত সর্ব্বব্যাপী প্রভাব জগতের উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। এ উপন্যাসখানির মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্য ও জাতীয় জীবনের উপর অসামান্য প্রভাবের কথা চিন্তা করে সুসাহিত্যিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "পৃথিবীর যে কয়েকখানি যুগান্তরকারী গ্রন্থ আছে, 'আনন্দমঠ' তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে।"

রোমান্স-প্লাবিত বাংলা উপন্যাসের যুগে সাধারণ নিম্নবিত্ত পল্লী-বাসী বাঙালীর কঠিন জীবন-সমস্যাকে কেন্দ্র করে একান্তভাবে বাস্তবধর্ম্মী উপন্যাস রচনায় বিশিষ্টতা অর্জ্জন করেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস রচনা করে (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এ উপন্যাসখানিতে 'যুগান্তরকারী উপন্যাসের' সম্ভাবনা ছিল প্রচুর, কিন্তু বঙ্কিমের উচ্চশ্রেণীর শিল্পকৌশল কিংবা জীবন-রহস্যের গভীরে প্রবেশ করবার শক্তি তারকনাথের আয়ত্তে না থাকায় এ উপন্যাস-খানি সমসাময়িক বা পরবর্তী লেখকদের উপর অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রকাশের পূর্ব্ব পর্যন্ত সে যুগের প্রায় সমস্ত ঔপন্যাসিক অনুবর্তন করেছেন বঙ্কিম প্রদর্শিত পথে; এমনকি উপন্যাস রচনায় প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-চেতনাও ছিল বঙ্কিমের রোমান্টিক দৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন।

বঙ্কিমের পরে দীর্ঘকালের ব্যবধানে বাংলা উপন্যাসের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ একাধিক যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনা করে। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'চোখের বালি'র আবির্ভাব যেমন বিংশ শতাব্দীতে (১৯০৩ খ্রীঃ অঃ), তেমনই এ উপন্যাসখানির প্রাণকেন্দ্রে লেগেছে এ যুগের হাওয়া। নগরকেন্দ্রিক উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী সমাজ এ উপন্যাসের পটভূমিকায়, আর প্রচলিত সুনীতি-দুর্নীতির সাধারণ মাপকাঠি পরিত্যাগ করে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অকম্পিত বাস্তবচেতনা নরনারীর—বিশেষ করে বিধবা হিন্দু-নারীর—সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে যে আণুবীক্ষণিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে আধুনিকতার পরিচয়বাহী। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে না হউক, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ-ধর্মিতার পথ ধরে বাস্তববাদী উপন্যাস রচনায় সার্থকতার পথ খুঁজেছেন এ যুগের বহু ঔপন্যাসিক (এমনকি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রও এ মন্তব্যের ব্যতিক্রম নন)। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসখানিকে যখন 'উপন্যাস সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক' বলে আখ্যায়িত করেন তখন এ মন্তব্য অত্যুক্তি বলে মনে হয় না।

উপন্যাসের টেক্‌নিক্ বিচারে নিখুঁত উপন্যাস বলে বিবেচিত না হলেও রোমাণ্টিক প্রেমের আদর্শ স্থাপনে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'ও এ যুগের বাংলা উপন্যাসে যুগান্তরের সৃষ্টি করেছে (১৯২৯)। 'শেষের কবিতা'র আবেগময় তির্য্যকভঙ্গি অননুকরণীয়, তাই আধুনিক ঔপন্যাসিকের উপর এ ভঙ্গির প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য হলেও মুক্ত জীবনের কষ্ঠে তাঁর উপন্যাস রচনায় যে অনুভব-যোগ্য মুক্তপ্রেমের স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন অনুপ্রাণিত করেছে এ যুগের বহু শিল্পীচিত্তকে ভাবাতিশায়ী বহু সার্থক ও অসার্থক উপন্যাস রচনায়।

রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রও বাংলা সাহিত্যে একাধিক যুগান্তরকারী উপন্যাসের স্রষ্টা। শরৎচন্দ্রের এ শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', এবং 'শ্রীকান্ত' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রচলিত সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে যাকে আমরা 'চরিত্রহীন' বলি, মনুষ্যত্ব বিচারে সে বাস্তবিক চরিত্রহীন কিনা এ মৌল প্রশ্নের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিলেন শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনে'। 'গৃহদাহে' সংস্কারও আবেগের দ্বন্দ্বে নারীমনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে দারুণ দুঃসাহসিকতার সঙ্গে। সম্পূর্ণ নূতন টেক্‌নিকে লেখা ঔপন্যাসিকের 'জীবন দর্শনে'র পরিচয়বাহী চার খণ্ডে সমাপ্ত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস। এ তিনখানি উপন্যাসেই জীবনের প্রতি লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ব্ববর্ত্তী ঔপন্যাসিক হতে শুধু যে তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে তা নয়, সমকালীন বহু ঔপন্যাসিককে অনুপ্রাণিত করেছে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্য নির্ণায়ক উপন্যাস রচনায়। শুধু সমসাময়িক উপন্যাস শিল্পীকে নয়, সমকালীন যুগচিত্তকে অভিনব চিন্তার আঘাতে আন্দোলিত করেছে শরৎচন্দ্রের উক্ত তিনটি উপন্যাসের মত খুব কম বাংলা উপন্যাস।

শরৎচন্দ্রোত্তর বহু উপন্যাস বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, চিন্তাধারার বহুমুখিনতায়, টেকনিকের ঔজ্জ্বল্যে ও রসনিবিড়তায় সমৃদ্ধ সন্দেহ নেই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে বিচারে আমরা কোন কোন উপন্যাসকে 'যুগান্তরকারী' বলে অভিহিত করেছি সে পরিপ্রেক্ষিতে এ যুগের কোন্ কোন্ উপন্যাসকে 'যুগান্তরকারী' বলা চলে খুব সতর্কতার সঙ্গে সে সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে হবে। সতর্কতা এ জন্য যে সাম্প্রতিক রচনা সমকালীন লেখকদের চিন্তা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর উপর প্রভাব বিস্তার করছে কিনা, অথবা পাঠকচিত্তকে একটা বিশিষ্ট আদর্শাভিমুখী করে তুলছে কিনা তা হয়ত আমরা কালের সান্নিধ্যের জন্যে খুব ভাল করে বুঝে উঠতে পারি না। এমনও হতে পারে যে ভাবকেন্দ্রে অগ্রগামী চিন্তা অনুসৃত থাকায় কোন কোন উপন্যাসের আবেদন তখন-তখনি সমসাময়িক লেখকের উপর প্রভাব বিস্তার না করলেও অদূর ভবিষ্যতে সে অভিনব ভাবধারার প্রভাব পরবর্ত্তী লেখকদের উপর হয়ত অনিবার্য্য হয়ে উঠে।

এ রকম একখানা নিঃসঙ্গ অথচ যুগান্তরকারী উপন্যাসের পরিচয় বহন করে চিন্তাশীল লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিক চিন্তা ও ভাবাতিশায়ী হৃদয়ানুভূতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মননের উপর প্রতিষ্ঠিত এ সুবৃহৎ উপন্যাসখানি (লেখক যাকে এপিক উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন) হয়ত বা সমকালীন উপন্যাস শিল্পের উপর একটা অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করে নি, কিন্তু এ কথা বোধ হয় খুবই অনুমান করা চলে যে, সর্ব্বাধুনিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রবল সংঘাতে তরল ভাবধর্ম্মী হৃদয় চর্চ্চামূলক উপন্যাস রচনার স্রোত যখন মন্দীভূত হয়ে আসবে তখন অনাগতকালের উপন্যাস শিল্পী মানুষের সর্ব্বপ্রকার মননের সামগ্রীকেও উপন্যাসের বিষয়বস্তু করে তুলবে। বস্তুতঃপক্ষে সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক চিন্তার পটভূমিকায় না হউক, আমাদের দেশের বাস্তুহারা সমস্যা, শ্রমিক ও কৃষক সমস্যা, শিক্ষক সমস্যা, শ্রেণী সংঘাত প্রভৃতি মননশীল বহু বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে সুরু হয়ে গেছে তাতো আমরা হামেশাই দেখতে পাচ্ছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে অন্নদাশঙ্করের চিন্তা ও মনন যেরূপ সদাজাগ্রত, তাতে হৃদয় চর্চ্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদচারণা না করে তিনি যদি মননশীল উপন্যাস রচনায় একাগ্রচিত্ত হতেন তা হ'লে তাঁর শক্তিমান লেখনীতে যে একাধিক উপন্যাস সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল তা অনুমান করা অহেতুক নয়।

১৯২০ সনে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'শুভা' উপন্যাস প্রকাশের পর থেকে ১৯৩৬ সনে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রকাশের কাল পর্য্যন্ত এ ষোল বৎসর বহু শক্তিমান লেখকের শিল্প তুলিকার স্পর্শে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটা প্রাচুর্য্যের জোয়ার এসেছিল সন্দেহ নেই। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পরিবর্ত্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় এ সময়ে উপন্যাস রচনা করে যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত

বিশ্লেষণধর্মী ও রোমান্টিক লেখক, বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মত কল্পনাবিলাসী কাব্যধর্মী ঔপন্যাসিক প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং প্রবোধ সান্যালের মত তীক্ষ্ণ জীবন সমালোচক কথাশিল্পী, দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত কালচারবিলাসী ঔপন্যাসিক। কাহিনী রচনায় বৈচিত্র্য, বিশ্লেষণে নিপুণতা, সংলাপে উজ্জ্বল দীপ্তি এবং সমসাময়িক বিবর্তনশীল জীবনের পটভূমিকায় সজীব চরিত্রসৃষ্টি করে তাঁরা শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা উপন্যাসকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাবাদর্শের দিক দিয়ে বাংলা উপন্যাসে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হন নি বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

জীবনদৃষ্টির স্বকীয়তা, কাহিনী নির্ব্বাচনে অভিনব স্থানিক পরিবেশ, আর সংলাপ রচনায় ক্ষেত্রে এ যাবৎ নগরকেন্দ্রিক উপন্যাসে অব্যবহৃত পূর্ব্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষার ব্যাপক ব্যবহারে চমকপ্রদ উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'তে সে যুগান্তর সৃষ্টি অনিবার্য্য ভাবে দেখা দিল। মাজাঘষা নাগরিক সভ্য সমাজের বাইরে আমাদের প্রাকৃত জীবনের মধ্যেও যে রসসৃষ্টি-উপযোগী বিষয়বস্তুর অভাব নেই সেদিকে আধুনিক বাঙালী ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রতিভাবান কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবল দুঃসাহসিকতার সঙ্গে। সৌভাগ্যের বিষয় তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য এবং জীবনদৃষ্টির অভিনবত্ব আমাদের pseudo-realistic ভুঁইফোঁড় কালচারবিলাসী ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিকে সবলে আকর্ষণ করেছে প্রাকৃত জীবনের নানা অনাবিষ্কৃত দিকের প্রতি, আর এ বিস্তৃত জীবনবোধ সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে এনে দিয়েছে সীমাহীন প্রাণপ্রাচুর্য্য। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলেও যে কোন সচেতন পাঠকের কাছে এ সত্য অগোচর নয় যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায় পর্য্যন্ত বহু ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্তৃত জীবন-চেতনার পথে অগ্রসর হয়ে উপন্যাস সৃষ্টিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

স্বতন্ত্র রূপ, রং স্বাদ ও মেজাজে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রমানুবন্ধী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) ও 'অপরাজিত' (১৯৩২) বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেদিন যুগান্তরের সন্ধান দিয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সমকালীন বা পরবর্ত্তী ঔপন্যাসিকের ওপর বিভূতিভূষণের আত্যন্তিক অনুভূতি-প্রধান সৃষ্টিচেতনা বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাই যুগান্তকারী উপন্যাসের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হলেও বিভূতিভূষণের উপন্যাস দুখানি বিস্মিত পাঠকের সামনে আজও নিঃসঙ্গ মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে।

সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমোত্তর উপন্যাস সাহিত্য ক্রমশঃ আত্যন্তিক রোমান্টিক ভাবালুতা ও কল্পনাবিলাস মুক্ত হবার সাধনা করেছে, আর নবজাগ্রত মানবিক সমবেদনা দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনবোধকে। তারাশঙ্করের সহানুভূতি আরও বিস্তৃত হয়েছে মাটি-ঘেঁষা পল্লীকেন্দ্রিক গণজীবনের অভ্যন্তরে। এত সচেতন ভাবে গণজীবনের মর্ম্মলোকে প্রবেশ করে মননশীলতার সঙ্গে সে সদা-আন্দোলিত বিবর্ত্তনশীল জীবনের সামগ্রিক চিত্র তাঁর পূর্ব্বে খুব কম ঔপন্যাসিকই করেছেন বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। সে হিসেবে তারাশঙ্কর তাঁর ক্রমানুবন্ধী উপন্যাস 'গণদেবতা' (১৯৪২) এবং 'পঞ্চগ্রামে' (১৯৪৪) পল্লী-প্রধান বাংলা দেশের ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-কুটিল, আনন্দ-বেদনা-রোমাঞ্চিত জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করে সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী উপন্যাস-শিল্পীদের জন্য বিরাট সম্ভাবনাময় একটা নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। আজ আমরা যে প্রেমানুভূতি-গৌণ, বিশ্লেষণধর্মী ও সমস্যা-প্রধান গণজীবনকেন্দ্রিক বহু সার্থক ও অসার্থক উপন্যাস রচনা-প্রচেষ্টা নিত্য নিরন্ত দেখতে পাচ্ছি সে উদার প্রগতিশীল ভাবধারার প্রথম জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়েছে তারাশঙ্করের যুগান্তকারী উপন্যাস 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে'। সমসাময়িক নিত্য পরিবর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাসঙ্কটে আমাদের গণজীবন আজ বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত। তাই সে চঞ্চল জীবনকেন্দ্রিক গণচেতনামূলক উপন্যাসে রসসৃষ্টি হয়ত নিবিড়তা লাভ করতে পারছে না। কিন্তু সে বঞ্চাহত গণজীবন যদি কখনও স্থিতিস্থাপকতা লাভ করে, আর ভবিষ্যৎ কোন মহত্তর শিল্পীর প্রতিভা স্পর্শে সে জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস যদি শ্রেষ্ঠ শিল্প পরিণতি লাভ করে তখন তারাশঙ্করের উক্ত দুখানি যুগান্তকারী উপন্যাসের কথা ইতিহাস নিশ্চয়ই বিস্মৃত হবে না।

সমকালীন যে সমস্ত ঔপন্যাসিক তাঁদের বিস্তৃত জীবনবোধ, নিত্য নূতন চিন্তা ও সর্ব্বাধুনিক শিল্প-চেতনার সাহায্যে বাংলা উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিচিত্রধর্মী আদর্শের সন্ধান দিয়েছেন তাঁদের 'প্রচেষ্টা উপন্যাস পাঠক ও সাহিত্য সমালোচকের অভিনন্দনযোগ্য; কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি কতটা যুগান্তরকারী উপন্যাসের পরিচয়বাহী তা বলা শক্ত।' বর্ত্তমান ও অনাগত ভবিষ্যৎ কালের লেখকের ওপর তাঁদের রচনার প্রভাব যখন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে তখন তাঁদের সৃষ্টিকে 'যুগান্তরকারী' উপন্যাস বলতে আর দ্বিধা থাকবে না। তবে চিন্তা ও ভাবধারার অনন্যতার এবং রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্যে যাঁরা ইতিমধ্যেই যুগান্তরকারী উপন্যাস সৃষ্টি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবি রাখেন—বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও দীপক চৌধুরী। জানি, বর্ত্তমান যুগান্তরকারী উপন্যাস, সৃষ্টিশক্তির অধিকারীদের সম্পর্কে মতান্তরের যথেষ্ট অবকাশ আছে, কিন্তু আমার এ মত নেহাৎ ব্যক্তিগত। চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ সুধীসমাজের বিচার-বিবেচনা এবং সম্ভাব্য নূতন মতের সঙ্গে পরিচিত হবার ভরসাতেই আমার এ ব্যক্তিগত মতের অবতারণা।

লক্ষ্মী কমলা!
আমার ভাইঝি কমলা স্কুলের ছুটিতে আমার এখানে আসার পর থেকেই
বাড়ীর চেহারা যেন বদলে গেছে। আগে আমি সব সময়েই ব্যস্ত থাকতাম, কিছুই
যেন হয়ে উঠতো না কিন্তু কমলার হাতের
ছোঁয়ায় সমস্ত কাজ যেন মূহুর্ত্তের মধ্যে হয়ে যায়!
এই কাপড় ধোওয়ার ব্যাপারেই দেখুন না।
কাপড় কাচার মধ্যে যে কোন বিশেষত্ব থাকতে
পারে আমি তা জানতাম না তাই কমলা যখন
আমায় বলল যে কাপড়কাচা সাবান হওয়া
দরকার খাঁটী আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়ে-
ছিলাম। ও বলল, "খাঁটী সাবান হলে
জামাকাপড় কাচা ভাল হয় কারণ খাঁটী
সাবানে প্রচুর ফেণা হয়। সে ফেণায়

মরণের পথে তিনটি ভারতীয় উপজাতি

শ্রীঅণিমা রায়

কোন পশু বা পক্ষীজাতি যদি কোনও দেশ থেকে লোপ পাবার মত হয় তাহলে স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ সমাজের মধ্যে আজকাল একটা বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার শ্বেতাঙ্গেরা গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ মরণোন্মুখ পশু বা পক্ষীজাতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে আসছেন। তাঁরা বেশ বুঝতে পারেন যে, অতীতে মানুষের বর্ব্বরতা বা নিষ্ঠুরতার জন্য কোন কোনও পশু পক্ষীরদল প্রায় নির্ব্বংশ হয়ে এসেছে, তাদের কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—যাতে এসব পশুপক্ষীগোষ্ঠী পৃথিবী থেকে মুছে না যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন কৃষ্ণবর্ণ, পীতবর্ণ, বা লোহিতবর্ণ মানবগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হবার মত হয়, এই শ্বেতাঙ্গদলের মনে বিশেষ কোন করুণার উদ্রেক হয় না। ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বহু আদিবাসী শ্বেতমানুষের এই বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতা থেকে নিজেদের বাঁচাতে না পেরে পৃথিবী থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে।

ভারতে দু'শো বৎসর ব্যাপী ইংরেজ রাজত্বকালে এই শ্বেতাঙ্গ মনোবৃত্তি বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ভারতের জঙ্গলে সিংহ লুপ্তপ্রায় হয়েছিল বলে গুজরাটের গির জঙ্গলে পরমযত্নে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সিংহকুল বৃদ্ধির চেষ্টা ইংরেজ করেছিলেন এবং কতকটা সাফল্যলাভও করেছিলেন। ইংরেজের এ উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাদের ভূমি-আইন, জঙ্গল-আইন ও আবগারী-নীতি ভারতীয় অগ্রসর সমাজকে শোষণ করে শেষ পর্য্যন্ত যখন পাহাড়ে-জঙ্গলে উপজাতীয় অনগ্রসর সমাজকে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করলে তখন বহু উপজাতীয় নরগোষ্ঠী সে ধাক্কা সহ্য করতে পারে নি। তাদের মধ্যে কেহ কেহ দারিদ্র্যের চরমসীমায় উপস্থিত হ'ল এবং নানাবিধ সভ্য সমাজের ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় এবং খাদ্যাভাবে মরণের পথে এগিয়ে পড়ল—ইংরেজ সরকার এই হতভাগ্য নরগোষ্ঠীর সম্বন্ধে কোন চিন্তাও করেন নি।

সমস্ত পশুপক্ষীর মধ্যে একটি সংখ্যাকে বিপজ্জনক সংখ্যা (critical number) বলা হয়। যদি কোন দেশে কোন পশু বা পক্ষীর সংখ্যা এই বিপজ্জনক সংখ্যার চেয়ে নিচে নেমে আসে তাহলে সেই পশু বা পক্ষীজাতিকে বাঁচিয়ে রাখা খুবই শক্ত। নরগোষ্ঠীর মধ্যেও এইরূপ বিপজ্জনক সংখ্যা বা critical number আছে। ইংরেজ রাজত্বের শেষভাগে তিনটি উপজাতির সংখ্যা এই বিপজ্জনক সংখ্যার বহু নীচে নেমে এসেছিল এবং ইংরেজ এদের বাঁচাবার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নি। কোচীনের কাদার নীলগিরির টোডা ও পশ্চিম বাংলার টোটো মরণোন্মুখ এই তিনটি উপজাতিকে বাঁচান বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। পঞ্চাশ বৎসর আগে থেকে চেষ্টা করলে এরা হয়ত বেঁচে যেত। এই তিনটি উপজাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করা হ'ল।

কোচীনের কাদার উপজাতি

এই উপজাতীয় দলটি বোধ হয় ভারতের প্রাচীনতম বাসিন্দাদের অন্যতম। কোচীনের পাহাড়িয়া অঞ্চলে গভীর বনের মধ্যে তারা বাস করে। কাদারেরা নিগ্রোবটু জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়, তবে তাদের মুখে-চোখে প্রটো-অষ্ট্রেলয়েড ছাপও পরিস্ফুট। তাদের ভাষা এখন তামিল, পূর্ব্বে কি ছিল তা বলা যায় না।

কাদারদের রং কালো, চুল আংটির মতন পাকান, ছোট মাথা, আকৃতিতে বেঁটে, শরীরের তুলনায় হাত লম্বা এবং হালকা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হাজার হাজার বৎসর ধরে এই জাতি নিজেদের চেহারার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে। এই সময়ের মধ্যে অন্য জাতিদের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

কাদারের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের মত' ছিল। শিকার করে, নানাবিধ ফলমূল আহরণ করে এবং বহুবিধ গাছ-গাছড়া তুলে এনে তাদের আহার চলত। গাছের ছাল, আঁশ, পাতা প্রভৃতি দিয়ে তাদের আচ্ছাদন ও আভরণ তৈরি হ'ত। চাষ, গো-পালন বা কোন রকম কুটিরশিল্প তাদের মধ্যে অজ্ঞাত ছিল।

সমাজ-গঠন তাদের মধ্যে আদিমযুগের ন্যায়। কাহারও কোন সম্পত্তি না থাকার জন্য তাদের মধ্যে উত্তরাধিকার আইন বলে কিছু নেই। স্বামী-স্ত্রী ও পুত্রকন্যা নিয়ে এক-একটি পরিবার, তাদের প্রতিবেশী পরিবারদের সঙ্গে পরম সৌহার্দ্দ্যে বাস করে। কাহারও অবস্থা অন্যের চেয়ে উন্নত নয় বলে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি তাদের মধ্যে অজ্ঞাত। কাদার সমাজ একেবারে গণতান্ত্রিক,—এখানে স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকলের সমান অধিকার।

এক সময়ে কোচীনের জঙ্গলগুলিতে বহু কাদারের বাস ছিল এবং তারা এই অঞ্চলের মালিক ছিল।

১৯১১ সনে কাদার সংখ্যা ছিল ৪৪৭, ১৯২১ সনে এই সংখ্যা কমে ২১৪ হয়। ১৯৩১ সনে ২৬৭তে নেমে আসে। ১৯৪১ সনের আদমসুমারি অনুসারে কাদারের সংখ্যা অনেক বেশী বলে দেখান হয়েছে বটে, কিন্তু মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ডাক্তার ইউ আর এহেরনফেল্স যে হারে কাদার সংখ্যা গণনা করে দেখেছেন যে, তাদের সংখ্যা বিশেষ বাড়ে নি।

ইংরেজ রাজত্বকালে কাদার অঞ্চলে বনজদ্রব্য, মধু প্রভৃতি সংগ্রহ করবার একচেটিয়া ক্ষমতা একদল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদারের উপর দেওয়া হয়। এই ঠিকাদারের দল কাদারের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে বন গাছ গাছড়া, মধু, ছোট এলাচ প্রভৃতি সংগ্রহ করত। কাদারদের এই কাজে ভাল করে খাটাবার জন্য ঠিকাদারেরা নানাবিধ মাদক দ্রব্য (আফিং, মদ, গাঁজা প্রভৃতি) ও কাপড়-চোপড় তাদের উপহার দিতে আরম্ভ করে। ক্রমে কাদারদের মধ্যে নানাবিধ কুঅভ্যাসের সৃষ্টি হয় ও কাদারেরা নিজেদের খাদ্য পরিত্যাগ করে ঠিকাদারের খাদ্য গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। এটাই তাদের সর্বনাশের মূল। এখন তাদের ভেতর জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহারই বেশী এবং খুব শীঘ্র রাজসরকার তাদের ব্যবস্থা না করলে এই অতি প্রাচীন জাতটি একেবারে লোপ পেয়ে যাবে।

নীলগিরি পাহাড়ের টোডা উপজাতি

টোডারা প্রোটো-অষ্ট্রেলয়েড জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভাষা মিশ্রিত তামিল ভাষা।

নৃতাত্ত্বিক জগতে টোডাদের নাম নিম্নলিখিত দুটি কারণে সুপরিচিত :—

(১) টোডারা মহিষপন্থী—মহিষ তাদের সর্বস্ব ও মহিষ তাদের প্রতীক্।

(২) টোডা নারীদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত। একই কন্যাকে গৃহস্থের সবকয়টি পুত্রের স্ত্রী হতে হয়।

অন্যান্য উপজাতির ন্যায় টোডারা মাংসভোজী নয় এবং অধিক বয়সে বিবাহ করে না। টোডারা একেবারে নিরামিষাশী এবং দু'তিন বছর বয়সে টোডারা পুত্র-কন্যার বিবাহ দেয়। টোডা পুত্রের পক্ষে নিজের মামাত বোনকে বিয়ে করাটা সবচেয়ে প্রশস্ত।

টোডারা চাষের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে—তবে একস্থানে তারা থাকতে চায় না। কিছুদিন একস্থানে চাষ করবার পর জমি একটু অনুর্বর হয়ে গেলে, তারা অন্যত্র গিয়ে আবার চাষবাস আরম্ভ করে। টোডারা কাঠের উপর নানাবিধ কারুকার্য করে এবং টোডা নারীরা সূচীকার্যে অতিশয় নিপুণা হয়। তাদের কবিতা ও গান এবং নানাবিধ কারুকার্য থেকে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে শিল্পী মনোভাব খুব পরিস্ফুট।

টোডা মেয়ে ও পুরুষেরা একটি মোটা সাদা কাপড় কোমরে জড়িয়ে রাখে এবং কাঁধের উপর থেকে আর একটি মোটা সাদা কাপড় ঝুলিয়ে দেয়। এই শেষোক্ত কাপড়টিকে ওরা 'পুটকুলি' বলে।

টোডাদের বাসগৃহ দেখলে মনে হয় যেন একটি পিপেকে লম্বা ভাবে চিরে মাটির উপর রাখা হয়েছে। ঘরের সামনের দিকে একটি ২॥ ফুট উঁচু ও ১॥ ফুট চওড়া দরজা থাকে। হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। ভিতর থেকে একটি বড় পাথর বা কাঠ দিয়ে এই পথ বন্ধ করা হয়। তিন-চারটি এই রকম ঘর, একটি দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান, দু'একটি মহিষ রাখবার জায়গা ও বাছুর রাখবার ঘেরা জায়গা নিয়ে একটি গ্রাম হয়। গ্রামকে তারা 'মাণ্ড' বলে।

টোডাদের মধ্যে দুটি শাখা আছে—টারথার এবং টেভিলি। এই শাখাদ্বয়ের মধ্যে বিবাহ চলে। প্রত্যেক শাখায় আবার কয়েকটি উপশাখা আছে—তাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

মৃত্যুর পর টোডাদের শবদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু মৃতের এক গোছা চুল রেখে দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে নানাবিধ প্রক্রিয়া করে পাথর দিয়ে ঘেরা গোলাকৃতি একটি জায়গায় ভিতর এই চুলের গোছাটি পোড়ান হয়। পোড়ানর সময় একটি করে মহিষ বলি দেওয়া হয়।

টোডারা কতকগুলি মহিষকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করে। যে গৃহে এই সব মহিষের দুধ থেকে ননী তোলা হয় সেই স্থানটিকে বা দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানটিকে টোডারা মন্দির বলে মনে করে। পুরোহিতেরা এই ননী তোলার সময়ে নানাবিধ প্রক্রিয়া ও প্রার্থনা করে। এই সব পুরোহিতকে বহুবিধ নিয়মানুবর্তী হয়ে থাকতে হয়। নারীদের এই সব দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানের নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ। পুরোহিত বা 'পলোলকে' অবিবাহিত জীবন অতিবাহিত করতে হয় এবং কেউ পুরোহিতকে ছুঁয়ে ফেললে, তার পুরোহিত পদ চলে যায়।

টোডাদের ভেতর কয়েকটি ওঝা থাকে। টোডাদের বিশ্বাস যে নিজেরা বা মহিষেরা পীড়িত হলে বা অন্য কোন বিপদ উপস্থিত হলে এই ওঝারা বিপদমুক্ত করতে পারে।

টোডাদের বহু দেবদেবী আছে, তার মধ্যে দুটি প্রধান—(১) টেকিরসি দেবী—তিনি জীবজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি টোডা, তাদের গ্রাম, মহিষ প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন।

(২) এন দেবতা—তিনি মৃতলোক বা পরলোকের দেবতা।

নীলগিরি অধিত্যকায় একদিন বহু টোডার বাস ছিল। এই স্থানটিকে টোডারাজ্য বলা হ'ত। বাদাগা নামীয় আর একটি উপজাতি ও ইংরাজ এখানে প্রবেশ করার পর থেকে টোডাদের অবস্থা হীন হতে আরম্ভ হয়। টোডারা অতি প্রাচীন জাতি। টোডাগ্রামের কাছাকাছি নীলগিরি গাত্রে যে সব সুন্দর গুহা আছে সে গুলি যে টোডাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা নির্মিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কুনুর, উতাকামাণ্ড প্রভৃতি স্থান নামমাত্র মূল্যে টোডাদের কাছ থেকে নিয়ে এবং এই সব স্থান থেকে তাদের বহিষ্কৃত করে দিয়ে ইংরাজ এই জাতিসমূহের ক্ষতি করেছেন। চা-বাগান বা কফির ক্ষেত তৈরী হয়ে অজস্র টোডাগ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। উতাকামাণ্ড, কুনুর, ওয়েলিংটন এবং কোটাগিরি নামে চারিটি পাহাড়ীশহর তৈরী হওয়ায়, টোডাদের মহিষ চরাবার স্থানগুলি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। একদিন সমস্ত নীলগিরি অধিত্যকাটি টোডাদের নিবাস ছিল, আর এখন মাত্র ২০০ একর জমি তাদের আলু চাষ করবার জন্য দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ীশহরে ইংরেজ সৈনিক রাখা হ'ত, তাদের সাহচর্যে টোডাদের মধ্যে

প্রবল যৌনব্যাধি দেখা দিয়াছে। এই ভাবে জমি ও স্বাস্থ্য হারিয়ে টোড়ারা ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থা এখন অতি শোচনীয়। ১৯০১ সনে টোডাদের সংখ্যা ছিল ৮৫৭, ১৯৫১ সনের আদমসুমারী অনুসারে টোডাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪৫০। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই—১৯২৭ সনের ১৭ই অক্টোবর ইংরেজ সরকার টোডাদের যৌনব্যাধি চিকিৎসার জন্য একটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনার্থে ৬,৫০০৲ টাকা ব্যয় করতে রাজী হন নি। ১৯৪৯ সনে টোডাদের মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যু হয় এবং ঐ সনে মাত্র পাঁচটি টোডা জন্মগ্রহণ করে। ১৯৫১ সনে দেখা গিয়াছে যে যৌনব্যাধির জন্য ১০০টি দম্পতি অপুত্রক। এই ভাবে ঐ জাত আর কতদিন বেঁচে থাকতে পারবে? ভারত সেবক সমাজ (Servants of India Society) এই হতভাগ্য প্রাচীন জাতির রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছেন। ভারত সরকারকেও এ কার্য্যে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হতে হবে।

পশ্চিম বাংলার টোটো উপজাতি

ভুটানের পার্ব্বত্য অংশের নিকটে জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম ডুয়ার্সের মধ্যে দুরন্ত তোরসা নদীর তীরে টোটোপাড়া নামে একটি দুর্গম স্থান আছে। এই টোটোপাড়ায় টোটো উপজাতির বাসস্থান।

টোটোদের আর উপজাতি বলা চলে না; কেন না তাদের জীবনযাত্রা আর গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় চলে না। তবে অতীতে যে তারা আদিবাসী সমাজের লোক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাদের উপসমাজ বলা যেতে পারে।

টোটোপাড়া ২,০০০ একর জমির উপর অবস্থিত; তার মধ্যে ৩০০ একর জমিতে টোটোদের বাস ও চাষ। টোটোদের চতুষ্পার্শ্বে ভিন্ন ধর্ম্মীয় ও ভিন্ন ভাষা-ভাষী লোকের বাস। টোটোরা এদের মধ্যে কোথা থেকে এসেছে জিজ্ঞাসা করলে, এরা তার উত্তর দিতে পারে না। হয়ত খুব বড় একটি টোটোজাতি এখানে বাস করত; সব মরে গিয়ে এই মুষ্টিমেয় টোটোগুলি এখানে পড়ে আছে। কিংবা হয়ত ভুটিয়ারা, যারা এক সময়ে সমস্ত ডুয়ার্সের মালিক ছিল, কোথাও লড়াইয়ে জিতে এই মুষ্টিমেয় লোক কয়টিকে বন্দী করে নিয়ে এসে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে টোটোপাড়ায় ছেড়ে দেয়। টোটোদের চোখমুখ দেখে মনে হয় যে, তারা মঙ্গোলয়েড জাতিভুক্ত। তাদের একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে।

টোটোরা ১৩টি শাখায় বিভক্ত। একই শাখায় মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে ও পুরুষের মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নয়। স্ত্রী গত হলে এক বৎসর বাদে পুরুষেরা পুনরায় বিয়ে করতে পারে। মদ্য পান ও একত্র আহার ব্যতীত বিবাহের আর কোন অনুষ্ঠান নেই। কন্যাপণ দিয়ে টোটোদের বিয়ে করতে হয় না।

মাটিতে চতুষ্কোণে চারটি আট দশ ফুট উঁচু খুঁটি পুঁতে তার উপর বাঁশের মাচা ও ঘাস-পাতার চাল দিয়ে টোটোরা ঘর বাঁধে। ঘরের নিচেটা শূয়র, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তুর খোঁয়াড় হয়। টোটোরা ধান, ভুট্টা, গম প্রভৃতি চাষ করে এবং চাষলব্ধ শস্যই খায়। তা ছাড়া নানাবিধ পশুপক্ষীর মাংস (এমন কি পচা মাংসও) তাদের খাদ্য।

টোটোরা টোটোপাড়া ছেড়ে এক পাও নড়তে চায় না। তাদের ধারণা যে, টোটোপাড়ার বাইরে বাস করলে তাদের রক্ষয়িত্রীদেবী ইস্পা কুপিত হবেন। বহির্জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দুদিকে—(১) উত্তরে ভুটিয়াদের কাছ থেকে কমলালেবু ক্রয় করা এবং (২) দক্ষিণে মাদারীঘাটের বাঙালী ব্যবসায়ীদের কাছে লেবু প্রভৃতি বিক্রী করা। স্থানীয় খাদ্য পর্য্যাপ্ত না হলে টোটোরা মাদারীঘাটের ব্যবসায়ীদের কাছে কমলালেবু, সুপারী, বাঁশ প্রভৃতি দিয়ে তার বদলে ধান, মুরগী, শূয়র ইত্যাদি নেয়। এইজন্য মাদারীঘাটের ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর শীতকালে বলদের পিঠে এই সব পণ্যদ্রব্য টোটোপাড়ায় পাঠায়।

টোটোদের ধর্ম্মজীবন অতি সাদাসিদে। তাদের মধ্যে পুরোহিত নেই। যে যার পূজা নিজে করে। ইস্পা ও চীনা এই দুটি ঠাকুর। পশু বলিদান করে পূজা হয়। তাদের নৈতিক জীবনের উপর গ্রামের মোড়ল অত্যন্ত কড়া নজর রাখে। তা সত্ত্বেও তাদের নৈতিকজীবন অন্যান্য উপজাতির ন্যায়। নিজের নিজের বাড়ীতে টোটোরা "ইউ" নামে এক প্রকার মদ চোলাই করে স্ত্রী-পুরুষ ও ছেলেমেয়ে খায়।

টোটোরা অত্যন্ত নোংরাভাবে থাকে এবং কচিৎ স্নান করে। এইজন্য তারা নানাবিধ চর্ম্মরোগে ভোগে। তাদের মধ্যে কুষ্ঠব্যাধিও দেখা দিয়েছে।

এটি একটি মরণোন্মুখ উপজাতি। ১৯৫১ সনের আদমসুমারি অনুসারে টোটোদের লোকসংখ্যা ছিল মোট ৩১৪ জন এবং পরিবার সংখ্যা ছিল ৫০টি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ছোট্ট নর-গোষ্ঠীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেছেন। কিছু ফলও বোধ হয় হয়েছে। ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপজাতি কল্যাণ বিভাগের শ্রী বি, কে, বর্ম্মণ টোটো-পাড়ায় গিয়ে দেখে এসেছেন যে, টোটোদের লোকসংখ্যা কিছু বেড়েছে এবং এখন ৭৪ ঘর টোটো বাস করছে। কিন্তু নূতন এক উৎপাত টোটোপাড়ায় দেখা দিয়েছে। বহু নেপালী ও বিহারী সেখানে বসবাস সুরু করেছে। তাদের চাপে ও শোষণে এই নিরীহ উপজাতিটির ধ্বংস দ্রুততর হয়ে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন এ বিষয়ে অবহিত হন। আর এই হতভাগ্য উপজাতিটিকে বাঁচাতে হলে তাদের ভিতর থেকে কুষ্ঠব্যাধি একেবারে নির্ম্মূল করতে হবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমধর্ম

শ্রীবেলা দাশগুপ্তা

বৈষ্ণব পদকর্তা লোচনদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্তন করে লিখেছেন :

"আমার নিতাই গুণমণি
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলা অবনী।
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে ॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥"

দ্বিতীয় পদকর্তা বৃন্দাবনদাসের উক্তি :

"আরে ভাই নিতাই আমার দয়ার অবধি।
জীবেরে করুণা করি দেশে দেশে ফিরি
প্রেমধন যাচে নিরবধি ॥"

নিত্যানন্দ বিতরিত এই প্রেমধন কি বস্তু? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের যে ভক্তিভাব থেকে ক্রমে অনুরাগ বা প্রেম সঞ্জাত হয়, সেই ভক্তিকে বলা হয় প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তিই বৈষ্ণব পদকর্তাদের উদ্দিষ্ট প্রেমধন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রচারিত প্রেমভক্তি গৌড়ীয় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের সাধনার বৈশিষ্ট্য।

তন্ত্রশাস্ত্রকার বলেন—'জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিভুক্তি যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ। সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তি সুদুর্লভা।' জ্ঞানে মুক্তিসুলভ এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকার্যে স্বর্গভোগ, কিন্তু সহস্র-সাধনেও হরিভক্তি সুদুর্লভ। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত—'মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং'—ইত্যাদি রূপ বাক্যেও হরিভক্তির নিগূঢ়ত্ব ও দুর্লভত্ব প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু এই ভক্তি ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ লাভের অন্য কোন সহজ পন্থাও নেই, কারণ ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—ধর্মকর্ম, যোগ, তপস্যা বা বৈরাগ্যের সাধনায় তিনি তত তুষ্ট নন, যত ভক্তির সাধনায় (ভা. ১১।১৪।২০)। অতএব শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যাচ্ছে যে, ভক্তিমার্গের সাধনায় শ্রীকৃষ্ণ সহজলভ্য, কিন্তু ভক্তি অনায়াসলভ্য নয়। ভগবদ্ভক্তির উচ্চস্তরের প্রকাশ ভগবদ্প্রেম। সুতরাং প্রেম আরও দুর্লভ। এ প্রেম সাধনার দ্বারা লভ্য নয়। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তির সাধনে নির্মলচিত্ত ভক্তের হৃদয়েই প্রেমোদয় হয়ে থাকে—

'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥'

জ্ঞানযোগ ও যজ্ঞাদির সাধনায় মুক্তি ও ভুক্তি শাস্ত্র অনুসরণেই অনায়াসলভ্য কিন্তু প্রেমভক্তি শাস্ত্রজ্ঞানগম্য বা সাধনলভ্য নয়। এ প্রেমধর্ম ব্রহ্মারও অবিদিত, তাই ব্রহ্মদুর্লভ মহাধন।

'ব্রহ্মার দুর্লভ' এই 'প্রেম মহাধন' শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় বাংলার বৈষ্ণবভক্তদের পক্ষে সহজলভ্য হয়েছিল, তাই পদকর্তা জ্ঞানদাসও বলেন :

"নিতাই চাঁদেরে যে জন ভজে।
সংসার তাপের, শিরে পদ ধরি, অমিয়া সাগরে মজে।
নিতাই যাহা যাহা রহিয়ে।
ব্রহ্মার দুর্লভ, প্রেম সুধানিধি, মানস ভরিয়া পিয়ে ॥"

গৌড়ীয় অর্থাৎ বাংলার বৈষ্ণবভক্তের অভীষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ। এই সম্প্রদায় প্রেমকেই পুরুষার্থ মেনে নিয়েছেন। কারণ, প্রেমেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি, তার ফলে কৃষ্ণমাধুর্যের আস্বাদন ও সেবাসুখের আনন্দ লাভ হয়। মোক্ষাদি লাভের আনন্দ সে তুলনায় তৃণবৎ নগণ্য। এজন্যই প্রেম—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থের অতিরিক্ত পঞ্চম পুরুষার্থ ও পরম পুরুষার্থ। কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য চরিতামৃতে প্রেমরূপ পঞ্চম পুরুষার্থের এই তাৎপর্যই ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি লিখেছেন :

"কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু ॥"
(১।৭৮৪-৮৫)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শাস্ত্রবুদ্ধির অনধিগম্য যে প্রেম, সে প্রেমরূপ পুরুষার্থ না হলে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, কাজেই রসময় শ্রীকৃষ্ণের রসমাধুর্য আস্বাদনে 'আনন্দী' হওয়াও যায় না। পরম পুরুষার্থ এ প্রেমলাভের কি উপায়? ভাগবত সম্প্রদায় বলেন—ভগবানের নাম ভিন্ন কলিকালে আর কোন মন্ত্রই নেই, নামমন্ত্রই ভক্তিধর্মের সার। গৌড়ীয় সম্প্রদায় আরও বলেন—এই নামমন্ত্রের প্রভাবেই ভক্তহৃদয়ে প্রেম সঞ্জাত হয়। প্রেমলাভের এই সহজ উপায়ের প্রচার উদ্দেশ্যেই নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ভাণ্ডারী'। কৃষ্ণনাম ও গুণ-

কীর্তন ইত্যাদিরূপ ভক্তির সাধনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রতির উদয় হয়—রতি হ'ল প্রেমের অঙ্কুর—রতি গাঢ় হয়েই প্রেমে পরিণত হয়। নাম-গুণ কীর্তন ভিন্ন কৃষ্ণপ্রেম লাভের আর সহজ পন্থা নেই। তাই নিত্যানন্দ গৌড়ের গ্রাম-গ্রামান্তরে, গৃহে-গৃহান্তরে ঘুরে ঘুরে নামমন্ত্র প্রচার করেছেন:

'অক্রোধ-পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
চণ্ডাল পতিত জনের ঘরে ঘরে যাইয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দিছে বিলাইয়া॥'

তাঁর এই অমূল্য দানের মহিমা প্রেমধন্য গৌড়ীয় ভক্ত তাঁদের পদাবলী ও কাব্যে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে গিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় হ'ল প্রেম, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রেমকে সেই জন্যই প্রয়োজন তত্ত্বরূপে গণ্য করা হয়েছে। সাধনভক্তির সহায়তায় এই প্রেম লভ্য, অতএব ভক্তি অভিধেয় তত্ত্ব। ষড়ৈশ্বর্যশালী, সবিশেষ সচ্চিদানন্দময়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, গৌড়ীয়দের অভীষ্টদেবতা। প্রেম-বশ এই শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ তত্ত্ব। এই তত্ত্বত্রয়ের উপর গৌড়ীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ বা ভাগবতসন্দর্ভ এই ত্রিতত্ত্বের দার্শনিক আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নোক্ত রূপে এই তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যাত হয়েছে:

"বৃহদ্‌বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্ব ধাম॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য তার নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান সম্বন্ধ॥
তারে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥
ভগবান্ প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়॥
সেই সব বেদের হয় অভিধেয় নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্‌গম॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেম হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্ত বশ।
প্রেম হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবাসুখরস॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্বসূত্রে পর্যবসান॥"

(১।৭।১৩৮—১৪৬)

নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন মহা কৃষ্ণপ্রেমিক, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ। প্রেম গাঢ় হলে অন্তরে যেমন আনন্দের উপলব্ধি, তেমনি বাইরে স্বেদকম্পাদি প্রেমবিকার বা সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। প্রেম ও আনন্দাতিশয্যে ভক্তের তখন উন্মত্ত অবস্থা। এই হ'ল কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব।

"প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।
উন্মত্ত হৈয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্‌গদ্ বৈবর্ণ।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্য॥
এতভাবে প্রেম। ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সুখসাগরে ভাসায়॥"

কৃষ্ণপ্রেমের আর এক স্বভাব, প্রেমাতিশয্যে ভক্তের সর্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্তি হয়, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তখন তাঁর কাছে কৃষ্ণময়। শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে (১১।২।৪৩)।

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত নিত্যানন্দ এই অর্থে ছিলেন ভাগবতোত্তম। সর্বত্র যাঁর কৃষ্ণস্ফূর্তি সকলের সঙ্গেই তাঁর প্রেম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভালমন্দ, ধনীদরিদ্র, উচ্চনীচ, পাপী-পুণ্যবানের ভেদবিচার সে ক্ষেত্রে অবান্তর। কৃষ্ণময় জগতে আচণ্ডাল সকলেই ছিল নিত্যানন্দের প্রেমভাজন। সেজন্যই তিনি পাপী জগাই-মাধাইকে প্রেমালিঙ্গনে কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি দান করেছিলেন, সমাজের নীচশ্রেণীকেও বঞ্চিত করেন নি। ব্রাহ্মণ থেকে যবন-চণ্ডালাদি পর্যন্ত তাঁর প্রেমদানের সীমা প্রসারিত হয়েছিল। নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম প্রচারের এই বৈশিষ্ট্য।

মহাভাগবত নিত্যানন্দ তাঁর এই কীর্তির জন্য বৈষ্ণব-সমাজে বরণীয় হয়েছেন, তাঁকে তাঁরা 'প্রেমসাগরের কর্ণধার' রূপেই গণ্য করেন। প্রেমসাগর পাড়ি দিয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদ প্রাপ্তির জন্য তাঁরা সর্বপ্রথম নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপালাভ প্রয়োজন মনে করেন। বৈষ্ণবাচার্য নরোত্তমদাসের পদেও ভক্তদের প্রতি সেই নির্দেশ দেখতে পাই:

"নিতাই পদকমল কোটিচন্দ্র সুশীতল
যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥

নিতাইর দয়া হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
কর রাঙা চরণের আশ।"

চুলের কতখানি যত্ন আপনি করছেন?

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রেমভক্তিকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীদের প্রেমভক্তির চতুর্বিধ ভাগ। গৌড়ীয় ভক্তদের সেই ভক্তিই আদর্শ, তাঁদের অনুগত এই ভক্তিকেই বলে রাগানুরাগ ভক্তি। ব্রজধামের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমভক্তির মধ্যে গোপগোপীদের সখ্যপ্রেম নিত্যানন্দের প্রেমধর্মের আদর্শ। তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য সম্প্রদায়ও সখ্য-প্রেমের প্রেমিক। প্রেমভক্তির প্রচার দ্বারা তাঁরাও যশস্বী হয়েছেন। তাঁদের সম্বন্ধে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী লিখেছেন :

"এই সর্বশাখাপূর্ণ পক প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসালো সকলে॥
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল॥"

নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং প্রেমভক্তি প্রচারের প্রেরণা লাভ করেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কাছ থেকে। গৌড়ীয় মতে, 'শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত' শ্রীকৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ প্রেমমাধুর্যের আস্বাদন ও জীবোদ্ধার নিমিত্ত প্রেম প্রচারোদ্দেশ্যে বলরামাবতার নিত্যানন্দ ও অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গ পরিবৃত হয়ে মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গৌড়ে প্রেমপ্রচার কার্য সম্পাদনের ভার তিনি নিত্যানন্দের উপর অর্পণ করেছিলেন। নিত্যানন্দের প্রেমপ্রচারের ফলেই মহাপ্রভুর অভিলাষিত জীবোদ্ধার কার্য সফল হয়েছিল, তাই নিত্যানন্দ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বরেণ্য, তাঁকে বলা হয় 'করুণার অবতার', 'পতিতের বন্ধু', 'পাপীর ত্রাণকর্তা'। মহাকারুণিক, মহাপ্রেমিক এই মহাপুরুষের মহিমা স্মরণ করে পদকর্তা ঘনশ্যামদাসের ভাষায় প্রবন্ধের শেষ করি :

"ভকতি রতনখনি উঘারিয়া প্রেমমণি
নিজগুণ সোনায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই যারে দেখে তার ঠাঞি
দান করে জগত বেড়িয়া॥
সে ভরি নিতাইর গুণ যেমন করয়ে মন
তাহা কি কহিতে পারি ভাই।
লাখে লাখে হয় মুখ তবে সে মনে সুখ
ঠাকুর নিতাইর গুণ গাই॥"

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য সাত টাকা।

শিশুদের সাহিত্য এই অর্থেই বোধ হয় গ্রন্থকার এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া থাকিবেন। অতি-প্রচলিত এই 'শিশু-সাহিত্য' শিরোনামার বিরুদ্ধে আজ আর কোন যুক্তিই খাটিবে না। গ্রন্থকার ভূমিকাতেও একথার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ও-প্রসঙ্গ এইখানেই থাক।

১৮১৮ হইতে ১৯১৮—এই একটি শতাব্দীর মধ্যে শিশু-সাহিত্য কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে গ্রন্থকার তাহারই ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। এই শিশু-সাহিত্যের প্রয়োজন অনুভূত হয় শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক রচনার মাধ্যমে। ইংরাজিয়ানার প্রভাবে তখন বাংলা ভাষার চর্চা একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। তাই শিশু-পাঠ্য রচনায় অনুবাদের শরণ লইতে হয়। এবং সে অনুবাদও অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জিত সংস্কৃতেরই ভিন্নরূপ। তাই পাঠ্য-পুস্তক তৈয়ারী হইল বটে, কিন্তু তাহা শিশু-বোধ্য হইল না। ইহা গ্রন্থকার উদাহরণ দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

সত্যিকার শিশুদের পাঠ্য-পুস্তকের উদ্ভব আমরা দেখিতে পাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায়। বাংলা শিশু-সাহিত্যের তিনি ছিলেন যুগস্রষ্টা। এই যুগের আরম্ভ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।

কিন্তু তাঁহার রচনার মধ্যেও মৌলিক রচনা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন বেতাল পঞ্চবিংশতি। পরবর্তী রচনা 'কথামালা'ও ঈশপের কতকগুলি গল্পের অনুবাদ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু অনুবাদ হইলেও সরল এবং সুমিষ্ট ভাষা। বরং ইহাকে বলা যাইতে পারে, শিশু-সাহিত্যের আদর্শ ভাষা—যাহা পূর্ব্বে কেহই রচনা করিতে পারেন নাই।

বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনার পরিচয় আমরা পাই তাঁহার বর্ণ-পরিচয় দ্বিতীয় ভাগে। পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক-বালিকারাও অনায়াসে যাহার অর্থোপলব্ধি করিতে পারে। গল্প সম্বন্ধেও গ্রন্থকার 'ভুবন'-এর গল্পটির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ইংরেজ আমলে বাংলা সাহিত্যে মৌলিক ছোট গল্পের প্রারম্ভ এই।" বাস্তবিক, ছোট গল্পের যাহা টেক্নিক তাহা এই গল্পটিতে অতি সুন্দরভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকার আক্ষেপ করিয়াছেন, গদ্য রচিত হইলেও, সে সময় শিশুদের মত করিয়া পদ্য কেহই লেখেন নাই। ঈশ্বরগুপ্ত পারিতেন, কিন্তু তিনিও সেদিকে দৃষ্টি দেন নাই। গ্রন্থকার ইহার উল্লেখ করিয়া বলেন, "১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলার শিশু-সাহিত্যক্ষেত্রে একটিও কবিতাকুসুম প্রস্ফুটিত হয় নি। কিন্তু শিশুশিক্ষা প্রথমভাগেই তর্কালঙ্কারের (মদনমোহন তর্কালঙ্কার) লেখনী এমনই একটি কবিতাকুসুম প্রসব করে যা আজও অমলিন। হাজার শিশুর কণ্ঠে কবিতাটি এখনও শোনা যায়:

পাখী...র করে ...তি পোহাইল।
কান... ...সর্বত্র ফুটিল॥ ইত্যাদি।
শতাব্দীর শিশু-সাহিত্যে ইহাই আদি মৌলিক কবিতা।

এই গ্রন্থখানিকে গ্রন্থকার দুটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন। একটি পত্রিকা-প্রসঙ্গ, অপরটি গ্রন্থ-প্রসঙ্গ। তখনকার শিশু সাহিত্য কেবল পাঠ্য-পুস্তকেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহাদের জন্য বিবিধ পত্রিকাও জন্মলাভ করিয়াছিল, ইহার পরিচয়ও আমরা এই গ্রন্থের মারফৎ পাই।

এই পুস্তক রচনায় লেখক যে অনুশীলনীর পরিচয় দিয়াছেন তাহা দুর্লভ। তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। যে বিষয় লইয়া কেহই এতদিন মাথা ঘামান নাই, সেই উপেক্ষিত বিষয়-বস্তুকে তিনি ইতিহাসের মর্য্যাদা দান করিলেন। তাঁহার জয় হউক।

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, মহানাম সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত, ৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১। মূল্য বার আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি মহাপুরুষ জগদ্বন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী। খ্যাতিমান শিশু-সাহিত্যিকের হাতে পড়িয়া গ্রন্থের ভাষা হইয়াছে যেমনই সহজ তেমনই সরস। ইহাতে ছেলেমেয়েদের পড়িতেও কোন অসুবিধা হইবে না।

জন্মের পরই অন্যান্য মহাপুরুষদের ন্যায় জগদ্বন্ধুর মধ্যে মহাপুরুষের সকল লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাঁহার কোন মিল নাই, তাঁহাকেই আমরা বলি অতি-মানুষ। জগদ্বন্ধুও ছিলেন সেই অতি মানুষ। এই অতি মানুষের চরিত্র ফুটাইয়া তোলা সেই রসের রসিক না হইলে সম্ভব নয়। যোগ্য হাতে পড়ায় তাই এ গ্রন্থ হইয়াছে ভাবপ্রধান। ছেলেমেয়েদের এই সব চরিত্রকথা যত শোনান যায় ততই দেশের কল্যাণ। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগৌতম সেন

হিন্দী-সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীব্রজনন্দন সিংহ। মুখার্জী ...র, ১৯৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা, পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কর্তৃক বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন ও শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ওড়িয়া ও অসমীয়া সাহিত্যের দুইখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি একজন হিন্দীভাষী বাংলা ভাষায় হিন্দী-সাহিত্যের এই জাতীয় একখানি ইতিহাস রচনা ও প্রকাশ করিয়া সাহিত্য রসিক বাঙালী পাঠককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকে পনরটি পরিচ্ছেদে হিন্দী-...ত্যের আদিযুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক বিবরণ ...য়াছে। ইহাতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট লেখকদের পরিচয় সঙ্কলিত হইয়াছে—তাঁহাদের রচনার নিদর্শনী উদ্ধৃত ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে হিন্দী-সাহিত্যের সামগ্রিক রূপ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হইবে। তবে ইহার ভাষা বাঙালী পাঠককে পদে পদে ক্ষুব্ধ করিবে। একজন বাঙালী সাহিত্যিকের সহযোগিতায় ইহার ভাষার সংস্কার সাধিত হইলে ইহা পাঠককে বেশী আকৃষ্ট করিতে পারিত সন্দেহ নাই। প্রাদেশিক সাহিত্য-চর্চ্চার ভার আজ কোন বাঙালী সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করা উচিত। আগ্রার গয়াপ্রসাদ এণ্ড সন্স ও পাটনার বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ হিন্দী ভাষার মধ্য দিয়া এই জাতীয় কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রাষ্ট্রভাষা পরিষদ চতুর্দ্দশ ভাষা-নিবন্ধাবলী নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের চৌদ্দটি প্রধান ভাষা ও তাহাদের সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, মৈথিলী, রাজস্থানী, নেপালী প্রভৃতি আরও কয়েকটি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আগ্রা হইতে প্রকাশিত মারাঠী সাহিত্যের ইতিহাস পুস্তকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে মারাঠী সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ আরও কিছু পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

প্রেমের ঠাকুর- প্রথম খণ্ড। শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বামদেব সঙ্ঘ। ৮, প্রামাণিক ঘাট রোড, কাশীপুর, কলিকাতা-৩৬। মূল্য চার টাকা।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজীবন ও সাধনতত্ত্ব লইয়া এযাবৎ বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ভক্তের মন, সাধকের অন্তর্দৃষ্টি, কবির সৌন্দর্য্য-কল্পনা, গৃহীর কামনা-ভাবনা প্রভৃতি নানা দিক হইতে এই লোকোত্তর চরিত্রকে জানিবার চেষ্টা আজও অক্লান্তভাবে চলিতেছে। যুগের সঙ্গে জীবনকে এবং জীবনের নানা চিন্তা-ভাবনা সমস্যা-সঙ্কটকে মিলাইয়া এমন সহজ ধর্ম্মসমন্বয়ের বার্ত্তা উনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধে আর কেহ প্রচার করেন নাই। অর্দ্ধ-অতিক্রান্ত বিংশ শতকেও আমরা সেই অমূল্য বাণীর কল্যাণ স্পর্শ সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া অনুভব করিতেছি, এই মহা জীবনকে স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা আনন্দ লাভ করিতেছি। 'প্রেমের ঠাকুর' এই পুণ্যচরিত অনুধ্যানে সহায়তা করিবে নিঃসন্দেহে।

আলোচ্য প্রথম খণ্ডে ঠাকুরের বংশপরিচয়, বাল্যলীলা, ভগবৎ প্রেমের বিকাশ, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের মূলসূত্র, অদ্বৈততত্ত্বের ধারণা, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের ঘটনা প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু এটি ঠাকুরের পূর্ণাঙ্গ জীবনী নহে—গ্রন্থকার ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে ততটা নজর দেন নাই। গ্রন্থকার ভক্ত ও ভাবুকের দৃষ্টি দিয়া ঠাকুরের সাধন-রহস্যের ক্রমবিকাশটি ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহাকে ভক্তজনের ভাবভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এটি একটি নূতন দিক, সর্ব্বজনগ্রাহ্য না হইলেও

ভক্তমনের ঐকান্তিক [illegible]তি যেকপ [illegible] ইহার মধ্যে লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ [illegible]কারের স্বরচিত সঙ্গীতগুলি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া পুরাণ, তন্ত্র, গীতা [illegible] ধর্মগ্রন্থ হইতে শ্লোক, শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক বহু সাধকের [illegible] ও সাধনার দৃষ্টান্ত দিয়া ভগবৎ সাধনার জটিল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন লেখক। এই গ্রন্থপাঠে ভক্ত ভাবুকের মনে ঠাকুরের প্রেমঘন-চরিত্রটি উজ্জ্বল হইয়াই ফুটিবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রেম মৃত্যুহীন—আরভিং ষ্টোন। অনুবাদিকা গীতা দেবী। ০,পাল পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিঃ। বোম্বাই-১। দুই খণ্ডে সমাপ্ত। মূল্য প্রতি খণ্ড এক টাকা।

খাঁটি প্রেম শুধু ভালবাসার মধ্যেই সম্পূর্ণ নয়—ভালবাসার পাত্রকে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাইবার অনুপ্রেরণাও যোগায়। মেরী টডের প্রেম এমনি এক কালজয়ী প্রেম যা আব্রাহাম লিঙ্কনের মত একজন সাধারণ আইনজীবিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিল। লিঙ্কনের পারিবারিক এবং রাজনীতিক জীবনের নানা উত্থান-পতনের বহু মর্ম্মস্পর্শী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুস্তকখানি দুই খণ্ডে লিখিত হইয়াছে।

সুন্দর অনুবাদ, আকর্ষণীয় ছাপা এবং প্রায় বিনামূল্যেই পুস্তক দু'খানি পাঠক-সমাজের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শিল্পপতির আসন—ক্যামেরন হলি। অনুবাদক: যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পাল পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিঃ। বোম্বাই-১। মূল্য এক টাকা।

উপন্যাস—পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৬০। অ্যাভেরি বুলার্ড ট্রেডওয়ে কর্পোরেশনের অধিনায়ক। নানা কারণে দ্বিতীয় অধিনায়ক মনোনীত হইতে বিলম্ব হইতেছিল। কিন্তু এই মনোনয়নপর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বেই অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে বুলার্ড মৃত্যুমুখে পতিত হন। সমস্যা দেখা দিল মৃত প্রধানের স্থলাভিষিক্তকে লইয়া। এবং এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনাপ্রবাহ নানা জটিল ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের মধ্যে পাক খাইতে খাইতে সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। নূতন ধরনের চিত্তাকর্ষক উপন্যাস। সাবলিল অনুবাদ। সুন্দর ছাপা। দাম আশাতীত সুলভ।

পরগাছা—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। অরুণিমা প্রকাশনী। ৩২, জগবন্ধু মোদক রোড, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

লেখক এই পুস্তিকাখানিকে বলিয়াছেন উপন্যাস। উপন্যাসের মধ্যে লেখকের কিছুটা স্বাধীনতা থাকে বটে, কিন্তু লেখক তাঁহার আবোল-তাবোল বক্তৃতাগুলিও ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহার ফলে গল্প কোথাও দানা বাঁধে নাই। অথচ গল্পই হইল উপন্যাসের প্রাণ। লেখককে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে বলি।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবার অমৃতবাণী—ডাক্তার খগেন্দ্রমোহন দাস কর্তৃক সংকলিত। প্রকাশক ডাক্তার খগেন্দ্রমোহন দাস ১২৬ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা—২৫। ১৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই টাকা।

বিন্ধ্যাচলের প্রসিদ্ধ মহাত্মা সিদ্ধবাবার উপদেশ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংগৃহীত। কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার খগেন্দ্রমোহন দাস প্রায় দশ বৎসর তাঁর পদপ্রান্তে বসে যে সকল ধর্ম্মকথা শুনেছেন তাহাই ইহাতে প্রকাশের প্রয়াসী হয়েছেন। শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবা পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রাচীন জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র দশ বৎসর বয়সে কৈশোরেই সংসার ত্যাগ করে নানা তীর্থ পদব্রজে ভ্রমণান্তে গয়াধামের সন্নিকটে দুর্গম ধুনিয়া পাহাড়ে উদাসী সাধু নানকপন্থী ঠাকুরদাস বাবার আশ্রমে উপস্থিত হন। তাঁর গুরু ঠাকুরদাসই তাঁকে এই শুভ নামে ভূষিত করেন। সিদ্ধিলাভের পর তিনি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করেন। এই জন্য তিনি বিন্ধ্যাচলের সিদ্ধবাবা নামে পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা মহাপুরুষ শিবানন্দজীর সঙ্গে সিদ্ধবাবার অসাধারণ অন্তরঙ্গতা ছিল।

সিদ্ধবাবা স্বীয় গুরুর অনুমতিক্রমে ১৩২৮ সালে প্রথম দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন এবং ১৩৪৭ সালে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার দেহরক্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় বিশ বৎসরের মধ্যে মাত্র ৩০৮ জন যোগ্য প্রার্থীকে দীক্ষা দান করেন। কলিকাতার যশস্বী ডাক্তার সুবোধ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ দে, নারায়ণ সেনগুপ্ত, সতীশ মিত্র প্রভৃতি তাঁর সুকৃতি শিষ্য। ডাক্তার সুবোধ মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ দে উভয়ে স্ব স্ব পুণ্যস্মৃতি আলোচ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অন্তিমজীবনে ইঁহার ছুটির সময় সিদ্ধবাবা মন্দার পর্ব্বতে বা বিন্ধ্যাচলে ১০।১২ হাজার সাধু, ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণদের সপ্রেম সেবা করিতেন। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য সাধুদের মত গৈরিক বসন বা জটাজুট ধারণ করিতেন না। তিনি কোন মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন নাই এবং বলিতেন, "যখন যেখানে থাকি তখন সেখানেই আমার আশ্রম হয়।" বিহারের রায় বাহাদুর সূর্য্যপ্রসাদ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর শিষ্য ছিলেন। ইহাতে সিদ্ধবাবার দুইখানি সুন্দর ছবি প্রদত্ত এবং কলিকাতার অদূরে বড়িশাতে তাঁর স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই পুস্তকে প্রকাশিত উপদেশাবলীতে গুরু, দীক্ষা, বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম্মসাধক অপূর্ব্ব আলোক পাবেন। আমরা সিদ্ধবাবার বিস্তৃত জীবনী রচনার জন্য তাঁর শিষ্যবৃন্দকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

হিন্দুধর্ম্ম—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। প্রকাশক শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মচক্র, ২১১ এ গিরিশ ঘোষ রোড বেলুড়, হাওড়া। ১৮৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ২।০।

আলোচ্য পুস্তকের রচয়িতা স্বামী ... তৎকর্তৃক অনূদিত গীতা

যা গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন ... সারা বাংলায় প্রচলিত।

ওঙ্কার এবং তৎপ্রণীত অন্য পুস্তক ... ধর্মচক্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের

বর্তমান গ্রন্থখানি বেলুড় রামকৃষ্ণ ... ইহা সেটি সুলিখিত

মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রকাশিত। ... শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মর্মবাণী

অধ্যায়ে সমাপ্ত। ... দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত। গ্রন্থারম্ভে

প্রাঞ্জল ভাষায় ... চতুর্বেদের প্রথম মন্ত্রচতুষ্টয় অনুবাদসহ

হিন্দুধর্মের আদি শাস্ত্র ... চিন্তাশীল গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের যে পূর্ণ

প্রদত্ত। প্রথম অধ্যায়ে ... নবালোকপ্রদ ও প্রণিধানযোগ্য। উক্ত

সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা ... আলোচনা করিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের

সংজ্ঞার আলো ... স্পষ্ট ধারণা জন্মে। অবশিষ্ট এগারটি

... ও গুরুতত্ত্বাদি বিষয় এবং

... শ্রীপূজা ... শ্রীচৈতন্য, শ্রী...

... দাস, রঘুনাথ ...

... প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী ব্যাখ্যাত।

গতানুগতিক পন্থা বর্জনপূর্বক গ্রন্থকার সনাতন হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যায় যে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট আদরণীয় হইবে। উল্লিখিত ধর্মাচার্যগণের জীবনে এই প্রাচীন ধর্ম যে ভাবে রূপায়িত হইয়াছে তাহা অবগত হইলেই হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। হিন্দুধর্ম জিজ্ঞাসু জনগণের পক্ষে গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ্য। প্রচুর উদ্ধৃতি ও সংগৃহীত তথ্য পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক যুগে এইরূপ একখানি ক্ষুদ্র ও সারগর্ভ গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃষ্ঠা ...

নারী সামরিক ...

কর্তব্য পালন ক...

হলেও নাসের ব্রত ...

আরাম, শান্তি ও ...

ফিরে পায়। মহৎকর্ম

প্রশংসার পাত্র। ...

ব্রতের ঠাট ...

পরিণত করা হয় ...

সাহিত্যে ...

... গ্রন্থকার বিবিধ চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে নৈপুণ্যের সঙ্গে তা প্রকাশ করেছেন। আবার সেই ... কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যেগুলির মধ্যে গভীর ...তা, অমিত তেজ ও প্রশংসনীয় সংযম সুপরিস্ফুট। ...খানির ঘটনাক্ষেত্র ভারত থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত। ... প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি, দুটিই শিল্পে দর্শনে মানব জাতির ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করতে করতে মনে হয় যেন একখানি বিরাট ক্যানভাসে নানা বর্ণে অঙ্কিত বিবিধ নরনারীর জীবন্ত রূপ চোখে পড়ছে। চোখে পড়ছে সুজলা সুফলা ছায়াময়ী বাংলার উর্বর মরুময় খর্জ্জুরকুঞ্জখচিত মিশর, জীবকুলের প্রাণরসপ্রদায়িনী নাইল ও গঙ্গা, মৌন পিরামিড ও তাজমহল, কায়রো ও কলিকাতা। লেখকের ভাষায় জড়তা নেই, স্থানে স্থানে সংযমের নানা বেঁধে উঠেছে। এমন সার্থক রচনা পাঠকসাধারণকে আনন্দরস দান করবে বলেই আমাদের দৃঢ় ধারণা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ভক্তমনের ঐকান্তিক প্রীতি যেরূপে প্রকাশ ইহার মধ্যে লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীকায়েতের রচিত সঙ্গীতগুলি উল্লেখযোগ্য। পুরাণ, তন্ত্র, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে শ্লোক এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক বহু সাধকের দিয়া ভগবৎ সাধনার জটিল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করি গ্রন্থপাঠে ভক্ত ভাবুকের মনে ঠাকুরের হইয়াই ফুটিবে।

শ্রী

দেশ-বিদেশের কথা

প্রেম মৃত্যুহীন—আরভিং ষ্টোন। দেবী পি. পাল, পাবলিকেশনস প্রাইভেট লি:। বোম্বাই-১ খণ্ডে স

হিরণ লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী

১৯০৯—১৯৫৯

গত ১৪ই মার্চ্চ স্বর্গীয় অনাথনাথ দেবের বাটীতে 'হিরণ লাইব্রেরী'র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উপলক্ষে বহু সুধীজনের সমাগম হইয়াছিল। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন পণ্ডিত শ্রীহরিহর শাস্ত্রী এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বাংলা দেশের পাঠাগারগুলি প্রায় স্বল্লায়ু। 'হিরণ লাইব্রেরী'কে দীর্ঘায়ু করার মূলে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম্মনিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা প্রশংসনীয়।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখিয়াছেন, "গ্রন্থাগারের মূল্য শুধু সংখ্যা গণনায় নয়, জ্ঞানের বিস্তৃতিতে ও চিন্তার মানের উন্নতি সাধনে। সাধারণতঃ গ্রন্থ-নির্ব্বাচনে ও পাঠক্রমে কোন সুপরিকল্পিত নীতি বা কোন বিশেষ বিষয়ে নিয়মিত অনুশীলনের সাহায্যে জ্ঞান বিস্তারের অনুসৃত হয় না। এই নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাবের জন্য আমরা পাঠাগার থেকে যতটা লাভবান হতে পারতাম তা হই না। সেইজন্য এলোমেলো ভাবে বা খেয়ালখুশীমত বই না পড়ে, একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে যদি পাঠের প্রেরণা দিতে পারা যায়, তবে আমাদের জ্ঞান চিন্তার প্রসার আরও বেশী ঘটতে পারে।"

পাঠাগার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—"The importance of a library for the intellectual and cultural progress of a people is admitted on all hands, and it has been very well said that a true university is just a collection of books."

সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা ... উদাসী ... সভাপতি শ্রীযুক্ত ... । তাঁর গুরু ... তাঁকে এই শুভ নামে ভূষিত করেন ... —অভ্যর্থনা ... ত্রিশ বৎসর ... নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি ব... ছেন, "আয়ু পরিমিত, কিন্তু জ্ঞান ও বিদ্যা দেবতার দান, বিভূতির ন্যায় তাহারও আয়ুকাল অনন্ত ও অসীম। সেই কা... জ্ঞানভাণ্ডার তত দিনই পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইতে থাকে যত... তাহার ভাণ্ডারীগণের জ্ঞানস্পৃহা সজাগ ও সজীব থাকে। যত... তাঁহাদের মনপ্রাণ চিরকিশোরের ন্যায় সরস ও সচেতন থাকে তত... তাঁহাদের প্রিয় বিদ্যানিকেতনের কোনরূপ ক্ষয় বা দৈন্য আ... পারে না।

লাইব্রেরী জ্ঞানভাণ্ডার এবং এই ভাণ্ডার একদিনে ... কখনও পূর্ণ হয় না, অন্যদিকে ইহা অফুরন্ত ও অজস্র দানের ... কখন রিক্তও হয় না, যদি সেই দান শ্রদ্ধায় গৃহীত হয়। ... শ্রদ্ধার আকর শুচিতা।

লাইব্রেরী বিদ্যানিকেতন এবং সেই কারণে মন্দির বিশে... কোনও অশুচি কোনও কিছু মলিন যেন এখানে স্থান পায় ... সে বিষয়ে এখানের কর্ম্মীবৃন্দ সচেতন ছিলেন বলিয়াই ইহার ... ও প্রগতি সম্ভব হইয়াছে। যতদিন সেই চেতনা সেই বি... সক্রিয় থাকিবে ততদিন এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির পথ উন্মুক্ত ... ইহার উন্নতির সঙ্গে এই অঞ্চলের জ্ঞানপিপাসু সন্তানগণেরও ... মনের উন্নতি হইবে। কেননা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি ও উন্নতি... একমাত্র সোপান বি...। চাণক্য যাহা ২৩ শতাব্দী পূর্ব্বে ব... গিয়াছেন তাহা আজও সত্য, যদিও আমাদের সাময়িকভাবে বি... চক্ষে আজ তাহা ভুল বলিয়া মনে হইতে পারে।"

একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে পঞ্চাশ বৎসর আয়ু খুব বড় কথা। তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে পুরুষ হইতে পুরুষা... সংস্কৃতির এই ঐতিহ্যেরও মূল্য আছে। এই পাঠাগারের নি... কর্ম্মীবৃন্দকে ইহা সর্ব্বদাই স্মরণে রাখিতে বলি।

এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে যে ... পরিচয় তাঁহারা দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা